সাহিত্য

মাসিকপত্র ও সমালোচন

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সম্পাদিত

পঞ্চবিংশ বর্ষ

১৩২১

কলিকাতা,

২।১ নং রামধন মিত্রের লেন, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

PRINTED BY RADHASHYAM DAS
AT THE VICTORIA PRESS,
2 Goabagan Street. Calcutta.

লেখকগণের নামানুক্রমিক সূচী

ভ্রম সংশোধন।—"বঙ্গীয় মুসলমান ও বঙ্গ-সাহিত্য" প্রবন্ধে ১২৫ পৃষ্ঠার ২০ পংক্তি হইতে ১২৭ পৃষ্ঠার ১২পংক্তি পর্য্যন্ত ১২১ পৃষ্ঠার ২৫ পংক্তির পর বসিবে।

দ্রষ্টব্য।—"সাক্ষী" নামক কবিতাটি আমার অজ্ঞাতে কবি অন্য পত্রে ছাপিয়াছেন। পুনঃ প্রকাশের জন্য আমিই দায়ী। আমি আগে পাইয়াছিলাম, পরে ছাপিলাম। বিলম্বের ভয়ে বাদ দিয়া আবার ফর্ম্মাটি ছাপিতে পারিলাম না। সাহিত্য-সম্পাদক।

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ।

কলিকাতা মহানগরীর এই বিশাল পুরশ্রীমণ্ডপে বঙ্গ-সরস্বতীর অনুরক্ত ভক্ত-পুত্রগণকে একত্র সমাসীন দেখিয়া আমার কি যে আনন্দ হইতেছে, তাহা বলিতে পারি না। আমার ইচ্ছা হইতেছে, দুই দণ্ড নিস্তব্ধ হইয়া অকূল আনন্দ-সাগরে মনকে ভাসাইয়া দিই। সেদিন বই না—আমার চক্ষের সম্মুখে ভারতী-মাতার জন দশ বাছা বাছা ভক্ত সেবক বঙ্গবিদ্যার পতিত ভূমিতে একটি ক্ষুদ্র চারা-গাছ রোপণ করিয়া সুরু করিয়া তাহার নাম দিলেন সাহিত্য-পরিষৎ। ইহারই মধ্যে তাহা একটা বৃক্ষের মত বৃক্ষ হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া আমার মনে আনন্দ ধরিতেছে না—বিধাতার কাণ্ড দেখিয়া আহ্লাদে আমার মুখে বাক্য সরিতেছে না। সে দিন নিম্নে গ্রীবা নত করিয়া যাহাকে আমি দেখিয়াছি ক্ষুদ্র একরত্তি চারা-গাছ—আজ ঊর্দ্ধে নয়ন উন্মীলন করিয়া তাহাকে দেখিতেছি প্রকাণ্ড একটা বনস্পতি—ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি হইতে পারে? ঈশ্বরের কৃপায় তাহার শুভ ফল বঙ্গের আপাদমস্তক জুড়িয়া যে কিরূপ প্রচুর পরিমাণে ফলিয়া উঠিয়াছে, তাহা আপনারা যতটা জানেন, ততটা জানা আমার পক্ষে সম্ভব নহে যদিচ;—কেন না প্রথমতঃ ষোলো-সতেরো বৎসর বা ততোধিক কাল যাবৎ আমি লোকালয় হইতে বহুদূরে বোলপুরের নির্জন কুটীরে বাস করিতেছি; দ্বিতীয়তঃ আমি সংবাদপত্র ছুঁই না; কিন্তু তবুও যখন ভাল ভাল লোকের মুখ দিয়া সময়ে সময়ে সাহিত্য-পরিষদের শ্রীবৃদ্ধির কথা—সুদূর আকাশ-মার্গে যেন শঙ্খঘণ্টার মঙ্গলধ্বনি হইতেছে এইরূপ মৃদু-মধুর ভাবে—আমার কর্ণে পৌছিতে ক্ষান্ত হইতেছে না, তখনই আমি বুঝিয়াছি যে, এ আগুন খড়ের আগুন নহে;—বাড়বানল যেমন জলে নেভে না, ঝড়ে টলে না, এ আগুন তাহারই ছোটো ভাই! অপার করুণার সাগর বিশ্ববিধাতার গূঢ় অভিপ্রায় কে বুঝিতে পারে! কিন্তু সকলেই আমরা এটা বুঝিতে পারি যে, মঙ্গলের সূচনা যেখানে যত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা তাঁহারই অভিপ্রেত, সুতরাং তাহা ব্যর্থ হইবার নহে। এখন যাঁহারা আজিকের মত এইরূপ ঘটাড়ম্বরকেই সাহিত্য-পরিষদাদি সভার সার সর্ব্বস্ব মনে করিতেছেন—কতিপয় বৎসর পরে যখন সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের দৈবী শক্তির প্রভাবে বঙ্গলক্ষ্মীর বিষাদাচ্ছন্ন মলিন বদন মেঘমুক্ত শারদ-পূর্ণিমার ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, আর, তাহা দেখিয়া লোকে যখন সাহিত্য-পরিষদের জয়জয়কার করিতে থাকিবে, তখন তাঁহারা বলিবেন, "এ যাহা দেখিতেছি এ'কে তো শুধু কেবল ঘটা-আড়ম্বর বলা

সাজে না—এ যে মঙ্গল মূর্ত্তিমান্! দশ জন কলহপ্রিয় বাঙ্গালীর সংসদ্ হইতে যাহা কস্মিন্‌কালেও হইয়া উঠিতে পারে বলিয়া স্বপ্নেও মনে করি নাই—এ যে দেখিতেছি তাহা চক্ষের সম্মুখে প্রত্যক্ষ বিরাজমান! ধন্য জগদীশ্বর! তোমার লীলা অদ্ভুত! তোমার করুণা অপার!

বঙ্গবিদ্যার এই মহাসাগরে কি যে আমি আজ অর্ঘ্য প্রদান করিব, তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। আমার ঘটে যৎকিঞ্চিৎ সরস্বতীর প্রসাদ যাহা সংগোপিত আছে, তাহার মূল্য আমার নিকটে যদিচ নিতান্ত কম না, কিন্তু যাঁহাদের একত্র-সম্মিলনে আজিকার এই সভা গৌরবান্বিত হইয়াছে, সেই সকল বড় বড় বিদ্যার জহরীগণের নিকটে তাহার মূল্য অতীব যৎসামান্য হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। কিন্তু আপনারা যখন আপনাদের মহত্ত্বগুণে আমার ক্ষুদ্রত্বের প্রতি উপেক্ষা করিয়া আমাকে আজিকার এই শুভ সম্মিলনের সভাপতিত্বে বরণ করিয়াছেন, তখন আমার পুতুল-খ্যালা-গোচের ছোটো খাটো নৈবেদ্যের ডালা সভার সমক্ষে অনাবৃত করিতে কুণ্ঠিত হওয়া এখন আর আমার পক্ষে শোভা পায় না; অতএব সাহসে ভর করিয়া তাহাতেই এক্ষণে আমি প্রবৃত্ত হইতেছি। কিন্তু তাহাতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমার একটি অবশ্যম্ভাবী অপরাধ—যাহা আমার পক্ষে সাম্‌লানো দুষ্কর—তাহার জন্য আপনাদের নিকটে অগ্রিম ক্ষমা যাচ্ঞা করিতেছি:— আমার বক্তব্য কথাটি আমি সংক্ষেপে সারিতে চাই; আর সেই জন্য তাহার বারো-আনা ভাগ আমার মনের মধ্যে আটক পড়িয়া থাকিবে! আমার এ অপরাধটি আপনারা যদি দয়ার্দ্রচিত্তে ক্ষমা না করেন, তবে আমি নিরুপায়; কেন না আয়-সংক্ষেপের সহিত যুঝিতে হইলে ব্যয়-সংক্ষেপ ব্যতিরেকে যেমন গৃহস্থের গত্যন্তর নাই—সময়-সংক্ষেপের সহিত যুঝিতে হইলে তেমনই বচন-সংক্ষেপ ব্যতিরেকে বক্তার গত্যন্তর নাই। আমার একটি অনতিক্রমণীয় ভাবী অপরাধের দায় হইতে কথঞ্চিৎ-প্রকারে নিষ্কৃতি পাইবার অভিলাষে একটু যাহা আমার বলিবার ছিল, তাহা বলিলাম। এক্ষণে অনুমতি হো'ক্—সভাস্থ সজ্জনগণকে সাদরে অভিনন্দন করিয়া অভিভাষণ কার্য্যটা প্রকৃতপ্রস্তাবে আরম্ভ করি।

আর্য্য-সভ্যতা এখন এই যে মহা মহা সাগরকে গোষ্পদ জ্ঞান করিয়া—মহা মহা পর্ব্বতকে বল্মীক জ্ঞান করিয়া—অজেয় বলবিক্রমের সহিত পৃথিবীর উপরে আধিপত্য করিতেছে, এ সভ্যতার মূল-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল আমাদের এই পুণ্য ভারত-ভূমিতে। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে অমরাপুরী হইতে কল্পতরুর একটা ডাল কাটিয়া আনিয়া গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর সঙ্গম-স্থানে রোপণ করা হইয়াছিল সমবেত

অরণ্যবাসী ঋষিমহর্ষিগণের সামগানের সহিত তান মিলাইয়া! তাহাই এক্ষণে পাতালে মূল প্রসারিত করিয়া এবং আকাশে মস্তক উত্তোলন করিয়া শত সহস্র শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া অযুত সহস্র দল-পল্লবে এবং নানা রসের নানা রঙ্গের ফলফুলে পৃথিবীর আপাদ-মস্তক ছাইয়া ফেলিয়াছে। আর্য্যসভ্যতা ভূঁইফোঁড়-শ্রেণীর নূতন সভ্যতা নহে; পুরাতন আর্য্যাবর্ত্তের সভ্যতার নামই আর্য্য-সভ্যতা। যেমন, হিমালয় যে দেখে নাই, সে পর্ব্বত কাহাকে বলে, তাহা জানে না; ভাগীরথী যে দেখে নাই, সে নদী কাহাকে বলে, তাহা জানে না; ভারতভূমি যে দেখে নাই, সে পৃথিবী কাহাকে বলে, তাহা জানে না; তেমনই আর্য্যবর্ত্তের আর্য্য-সভ্যতা যে দেখে নাই, সে সভ্যতা কাহাকে বলে, তাহা জানে না। কেহ যদি আমাকে বলেন, "বাক্যের ফোয়ারা ছুটাইয়া এ যাহা তুমি বলিতেছ, তাহার প্রমাণ কি?" তবে আমি তাঁহাকে বলিব—ভারতের মহা-সভ্যতার প্রমাণ ভারতেরই মহাভারত! প্রশ্নকর্ত্তা যদি দেবনাগর অক্ষরে লিখিত মহাভারতখানি আদ্যোপান্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করেন, তবে সভ্যতা যে বলে কাহাকে—সভ্যতার যে কতগুলি গঠনোপকরণ; সভ্যতার যে কোথায় কি দোষ, কোথায় কি গুণ; কাহাকে বলে রাজধর্ম্ম, কাহাকে বলে আপদ্ধর্ম্ম, কাহাকে বলে মোক্ষধর্ম্ম; কোন ধর্ম্ম কখন কি অংশে সেবনীয়—কোন ধর্ম্ম কখন্ কি অংশে বর্জ্জনীয়—সমস্তই তাঁহার নখদর্পণে প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইবে। সভ্যতার একটা সার্ব্বাঙ্গীন এবং সমীচীন আদর্শ মনোমধ্যে গঠন করিয়া তুলিতে হইলে তাহার জন্য যত কিছু মালমস্লার প্রয়োজন, সমস্তই তিনি দেখিবেন—তাঁহার হাতের কাছে মৌজুত; তাঁহার কিছুরই জন্য তাঁহাকে দেশ বিদেশে ঘুঁটিয়া বেড়াইতে হইবে না। কিন্তু প্রশ্নকর্ত্তা যদি বলেন, "তবে কেন আমাদের এ দশা?" তবে সে কথাটা ভাবিয়া দেখিবার বিষয় বটে! আজ কিন্তু ঐ বৃহৎ মাম্‌লাটার একটা সরাসরি রকমের বিচার-নিষ্পত্তি ভিন্ন পাকাপাকি-রকমের চরম নিষ্পত্তি এই অল্প সময়টুকুর মধ্যে আমা কর্ত্তৃক ঘটিয়া ওঠা অসম্ভব। কিন্তু তা বলিয়া একেবারেই হাল ছাড়িয়া দেওয়া আমি শ্রেয় বোধ করি না। আমার ক্ষুদ্র আদালতের মোটামুটী রকমের বিচার্য্য কার্য্য আমি উপস্থিত মতে নির্ব্বাহ ত করি—তাহার পরে আপীল আদালতের সূক্ষ্ম বিচারের মালিক আপনারা আছেন—সে জন্য আমার মাথা ভাবাইবার আমি কোনও প্রয়োজন দেখি না।

আমার এইরূপ ধারণা যে, আমাদের দেশের সভ্যতার মস্তক তত্ত্বজ্ঞান; পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের সভ্যতার মস্তক বিজ্ঞান। কেহ যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, দুটার মধ্যে কোন্‌টা ভাল? তত্ত্বজ্ঞান ভাল—না বিজ্ঞান ভাল? তবে আমি তাঁহাকে

বলিব, দুটাই ভাল। কিন্তু তাহার মধ্যে, একটী কথা আছে :—প্রকৃতির সমস্ত ব্যাপারই ত্রিগুণাত্মক। সকল বস্তুরই দুই দিক্ আছে; ভালর দিক্‌ও আছে—মন্দের দিক্‌ও আছে। মন্দ জিনিসেরও ভালর দিক্ আছে—ভাল জিনিসেরও মন্দের দিক্ আছে। উচিত ব্যবহার দুয়েরই ভালর দিক্ ফুটাইয়া তোলে; অনুচিত ব্যবহার দুয়েরই মন্দের দিক্ ফুটাইয়া তোলে। ধোঁয়া-কলের নৌকা খুবই ভাল জিনিস; কিন্তু কখন্ তাহা ভাল জিনিস? যখন তাহা পাকা মাঝির হাতে পড়ে, তখনই তাহা ভাল জিনিস্; আনাড়ি মাঝির হাতে পড়িলে তাহা সর্ব্বনাশের মূল। তত্ত্বজ্ঞানও যেমন, বিজ্ঞানও তেমনই দুইই পরমোৎকৃষ্ট বস্তু, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই; কিন্তু হইলে হইবে কি—তত্ত্বজ্ঞানের অপব্যবহার আমাদের দেশে প্রচুর-পরিমাণে হইয়াছে এবং হইতেছে; বিজ্ঞানের অপব্যবহার ইউরোপ-আমেরিকায় প্রচুরপরিমাণে হইয়াছে এবং হইতেছে। বিজ্ঞানের অপব্যবহারজনিত দুর্গতি পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের অধিবাসীদিগের ঘটিয়াছে যেরূপ ভয়ানক—আগে সেই কথাটা বলি; তত্ত্বজ্ঞানের অপব্যবহার-জনিত দুর্গতি আমাদের দেশের লোকদিগের ঘটিয়াছে যেরূপ বিসদৃশ—পরে তাহা বলিব।

ইউরোপ-আমেরিকায় মহা মহা বিজ্ঞান-প্রসূত কলকারখানার ঘূর্ণাচক্রের টানে পড়িয়া সহস্র সহস্র দীন দরিদ্র শ্রমজীবী লোকের ইহকাল পরকাল ক্রমশই রসাতলের নিকটবর্ত্তী হইতেছে—তাহাদের মা-বাপ বলিবার কেহই নাই। বড়লোকেরা দুষ্ট লক্ষ্মীর পূজায় জীবন উৎসর্গ করিয়া ধর্ম্মকে গির্জার ফাটকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। আর সেই সব বড়লোকদিগের মনস্কামনা আশু সফল করিবার জন্য গির্জার কারাধ্যক্ষেরা ধর্ম্মকে বিষমিশ্রিত অন্ন ভক্ষণ করাইতেছেন; সংকীর্ণতা, কৃত্রিমতা এবং আত্মগরিমার কালকূট মিশাইয়া ঈসা মহাপ্রভুর উদার সরল এবং সুধাময় উপদেশান্ন ভক্ষণ করাইতেছেন। বড় বড় বণিক মহাজনদিগের হ্যাঁপায় পড়িয়া মধ্যবিধ শ্রেণীর কর্ম্মী লোকেরা ব্যবহার-বিজ্ঞানকে (political economy কে) ধর্ম্মশাস্ত্রের স্থলাভিষিক্ত করিয়া লক্ষ্মীবেশধারিণী অলক্ষ্মীর পশ্চাতে, এক কথায়—আলেয়াকিন্নরীর পশ্চাতে, ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান হইতেছেন;—কেবল ঈসা মহাপ্রভুর গোটা চার-পাঁচ সেরা সেরা ধর্ম্মোপদেশের বাল্যসংস্কার তাঁহাদিগকে ভয়ানক অধোগতি হইতে এযাবৎকাল পর্য্যন্ত কথঞ্চিৎ প্রকারে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। আমেরিকা দেশের বড় বড় রুই-কাৎলা-শ্রেণীর বণিক্ জনেরা পুঁটীমাছ-শ্রেণীর বণিক্‌দিগকে গ্রাস করিবার জন্য মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছেন। ছোটো ছোটো মাছেরা বড় বড় মাছদিগের সঙ্গে বল-বিক্রমে এবং ফন্দিবাজিতে আঁটিয়া উঠিতে

অক্ষম হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ব্যাঙাচী-বেচারীগুলির উপরে ঝাল ঝাড়িতেছেন যমমূর্ত্তি ধারণ করিয়া! ইহাই যদি সভ্যতা হয়, তবে সভ্যতাকে ধিক্!

তত্ত্বজ্ঞানের অপব্যবহার-জনিত দুর্গতি আমাদের দেশের লোকের যাহা ঘটিয়াছে, তাহাও শোচনীয় কম না। তাহা যে সূত্রে যে রকম করিয়া ঘটিয়াছে, তাহা বলিতেছি প্রণিধান করুন্।

বহু পুরাকালে আমাদের দেশে তত্ত্বজ্ঞান ব্রাহ্মণাধিষ্ঠিত তপোবনের চতুঃসীমার মধ্যেই অবরুদ্ধ ছিল। কিয়ৎকাল পরে তাহা তপোবনের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া বিশ্বামিত্র জনক ভীষ্ম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়-কুলের মস্তকস্থানীয় কতিপয় মহাত্মার হস্তে ধরা দিয়াছিল; আর, সেই সঙ্গে বিদুরের ন্যায় দুই এক জন নিম্নবংশীয় সাধু পুরুষের কুটীরদ্বারেও মাথা নোয়াইতে সংকুচিত হয় নাই। কিন্তু তদ্ব্যতীত অপরাপর লোকের নিকটে—জন-সাধারণের নিকটে—তাহা একপ্রকার প্রহেলিকার আকার ধারণ করিয়াই ক্ষান্ত ছিল; তবে যদি দৈবের কৃপায় উহার দুর্ভেদ্য রহস্যের ভিতরে প্রবেশের অধিকার সহস্রের মধ্যে এক ব্যক্তির ভাগ্যে কোনও গতিকে ঘটিয়া থাকে, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে; কিন্তু তাহাও ঘটিয়াছিল কি না সন্দেহ। তত্ত্বজ্ঞানের দেবস্পৃহনীয় অমৃত মান্ধাতার আমল হইতে এ যাবৎকাল পর্য্যন্ত আমাদের দেশের বিদ্যার ভাণ্ডারে এত যে শ্রদ্ধা ভক্তি এবং যত্ন সমাদরের সহিত সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে, তাহা সত্ত্বেও কেন যে তাহা পূর্ব্বতনকালেও জনসাধারণের উচিত-মত ভোগে আসে নাই, এবং অধুনাতন কালেও জনসাধারণের উচিত-মত ভোগে আসিতেছে না, তাহার কোনো-না-কোনো কারণ অবশ্য থাকিবে। তাহার প্রধান একটি কারণ যাহা আমার বিবেচনায় সম্ভব বলিয়া মনে হয়, তাহা স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলিতেছি—প্রণিধান করুন্।

কাহাকে যে বলে বিজ্ঞান—অধুনাতন কালের পাঠশালার বালকদিগেরও তাহা জানিতে বাকি নাই; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এক্ষণে আমাদের দেশ যেহেতু আমাদের দেশ নহে, এই জন্য ভারতবর্ষীয় তত্ত্বজ্ঞানের মূর্ত্তি যে কিরূপ, তাহা আমাদের দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণেরও নিজ-বুদ্ধির অগোচর; কেবল তাহার এক একখানি বিকলাঙ্গ ছবি যাহা তাঁহারা ছাত্র-পাঠ্য ইংরাজি পুস্তক হইতে আপন আপন মানস-পটে ফটোগ্রাফ্ করিয়া লইয়াছেন, সেই আবছায়া-গোচের ফটোগ্রাফের ফটোগ্রাফ্ তাঁহাদের নিকটে ভারতবর্ষীয় তত্ত্বজ্ঞানের সার-সর্ব্বস্ব। প্রথমে আমি তাই ভারতবর্ষীয় তত্ত্বজ্ঞানের মূল মন্ত্রটির মর্ম্ম এবং তাৎপর্য্য খোলসা করিয়া ভাঙ্গিয়া বলিব—কিন্তু খুব সংক্ষেপে; এইরূপে আমি আমার বক্তব্য

কথাটির গোড়া ফাঁদিয়া তাহার পরে একটি ছেলেভুলানিয়া গোচের ছোটো খাটো গল্পের আকারে তাহাকে আমি সভার মাঝখানে উপস্থিত করিব। এ রকমের একটা বিসদৃশ ব্যাপার দৃষ্টে পাছে আপনারা আশ্চর্য্য হন, এই জন্য আমি আগে-ভাগে আপনাদিগকে তাহা জানাইয়া রাখিতেছি। ইহাতে আমার অপরাধ নাই; কেন না তাহা না করিয়া আমি যদি প্রকৃতপ্রস্তাবে আমাদের দেশের পুরাকালের ঐতিহাসিক বিবরণের গহন অরণ্যে ধৃষ্টতার সহিত প্রবেশ করি, তাহা হইলে দুই চারি পা অগ্রসর হইতে না হইতেই পথ হারাইয়া কোথায় যে কোন্ অন্ধকার-অমানব-পুরীতে গিয়া পড়িব, তাহার ঠিকানা নাই।

ভারতবর্ষীয় তত্ত্বজ্ঞানের মূল মন্ত্রটির প্রকৃত মর্ম্ম এবং তাৎপর্য্য যাহা আমি বেদান্তাদি শাস্ত্রের মধ্য হইতে নিকর্ষণ করিয়া কথঞ্চিৎ প্রকারে আমার বুদ্ধির আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পারিয়াছি, তাহা সংক্ষেপে এই:—

সত্য যদিচ এক বই দুই নহে, কিন্তু তথাপি তাহা ভিন্ন ভিন্ন দেশকালপাত্রে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। বৈদান্তিক আচার্য্যেরা তাই বলেন—

সত্য তিন প্রকার,

(১) পারমার্থিক সত্য,

(২) ব্যাবহারিক সত্য,

(৩) প্রাতিভাসিক সত্য;

আর, তদনুসারে তাঁহারা জ্ঞানরাজ্যের পংক্তি-বিভাগ ধার্য্য করিয়াছেন তিনটি;

(১) পরাবিদ্যা বা তত্ত্বজ্ঞান,

(২) অপরাবিদ্যা বা বিজ্ঞান,

(৩) অবিদ্যা বা ভ্রমজ্ঞান।

বিজ্ঞান ব্যষ্টি-জ্ঞান, বা শাখা-জ্ঞান; তত্ত্বজ্ঞান সমষ্টিজ্ঞান, বা মোট জ্ঞান। মোট জ্ঞানের মোট সত্যের নাম পারমার্থিক সত্য। সে সত্য কি—আপনারা আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে সত্য কথা যদি বলিতে হয়—তবে এ সভার মাঝখানে সহসা আমি তাহার উত্তর দিতে প্রস্তুত নহি। কিন্তু আবার—একটা কথা কোমর বাঁধিয়া বলিতে আরম্ভ করিয়া পথের মাঝখানে থামিয়া যাওয়াও দোষ! অতএব জিজ্ঞাসিত প্রশ্নটির মোটামুটি-রকমের একটা মীমাংসা যাহা আমার মনে উপস্থিত হইতেছে—সংক্ষেপে তাহা আপনাদের সুবিবেচনায় সমর্পণ করিতেছি, প্রণিধান করুন।

সাম্প্রদায়িক দলাদলি এবং দার্শনিক মতামতের রাজ্যে নগর-সংকীর্ত্তনের ধুম বেজায় অতিরিক্ত! সে নগর-সংকীর্ত্তন কম নহে কীর্ত্তন! তাহা মতবাদীদিগের স্ব স্ব মতের এবং দলপতিদিগের স্ব স্ব দলের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন! সে নগর-সংকীর্ত্তনের খোলপিটন হ'চ্চে বাদের বাগ্যোদ্যম, আর, করতাল-সংঘর্ষণ হ'চ্চে ISM এর ঝমঝম-ধ্বনি। বাদের বাগ্যোদ্যমের চরম পর্য্যাপ্তি হ'চ্চে বিবাদের উন্মত্ত কোলাহল; ISM এর ঝমাঝম-ধ্বনির চরম পর্য্যাপ্তি হচ্চে SCHISM এর দম্ভ-আস্ফালন। আমাদের দেশে যত প্রকার বাদ আছে, তাহার মধ্যে সর্দ্দার-শ্রেণীর প্রধান দুই মল্ল হ'চ্চে অদ্বৈতবাদ, এবং দ্বৈতবাদ। দেশশুদ্ধ লোকের এইরূপ ধারণা যে, উপনিষদের তত্ত্বমসি বাক্যটির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ ডাহা অদ্বৈতবাদ। আমার কিন্তু এটা ধ্রুব বিশ্বাস যে, উপনিষদে এক যা বাদ আছে সত্যবাদ, তদ্ব্যতীত দ্বিতীয় বাদ তাহার ত্রিসীমার মধ্যে নাই। তবে যদি উপনিষদ্-শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মজ্ঞানের ঐ সাঙ্কেতিক সাধনমন্ত্রটিকে কোনও দার্শনিক পণ্ডিত অদ্বৈতবাদের অঙ্গীভূত করিয়া সাজাইয়া দাঁড় করান্—সে কথা স্বতন্ত্র; যিনি সাজাইয়া দাঁড় করান, তিনিই তাহার জন্য দায়ী; তা' বই উপনিষদ্ তাহার জন্য ঘুণাক্ষরেও দায়ী নহে। তত্ত্বমসি বচনটির শব্দার্থ যে কি, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সংস্কৃত বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর বালকেরাও জানে যে, তৎ শব্দের অর্থ তাহা বা সে-বস্তু; ত্বং শব্দের অর্থ তুমি। "তৎ ত্বং" কি না সে-বস্তু তুমি! কথাটা যে নিতান্তই একটা হেঁয়ালি-ঢঙ্গের সংকেত-বচন, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। কাজেই, উহার প্রকৃত মর্ম্ম এবং তাৎপর্য্যটি তলাইয়া না বুঝিলে উহা কেবল একটা মুখের কথা হইয়া—ফাঁকা আওয়াজ হইয়া—বাতাসে উড়িয়া যায়। ত্বং শব্দের বাক্যার্থ তুমি—এ কথা খুবই সত্য; কিন্তু তাহার ভাবার্থ আত্মা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। আমি যেমন তোমাকে ত্বং বলিয়া সম্বোধন করি, তুমিও তেমনই আমাকে ত্বং বলিয়া সম্বোধন কর; আর, বেদান্তের সেই যে এই দেবদত্ত ("সোঽয়ং দেবদত্তঃ") যিনি ভাগ্যক্রমে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত, ইঁহাকে আমরা উভয়েই ত্বং বলিয়া সম্বোধন করি। তুমি ত্বং আমার নিকটে, আমি ত্বং তোমার নিকটে, দেবদত্ত ত্বং আমাদের উভয়েরই নিকটে। অতএব, একা কেবল তুমিই যে ত্বং, তাহা নহে; তুমিও ত্বং, আমিও ত্বং, দেবদত্তও ত্বং। ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ত্বং আমি-তুমি-তিনির প্রতিনিধি-স্বরূপ; এক কথায়—সমষ্টি আত্মার প্রতিনিধিস্বরূপ। তবেই হইতেছে যে, ত্বং শব্দের বাক্যার্থ যদিচ "তুমি" বই না, কিন্তু তাহার ভাবার্থ সমষ্টি আত্মা, কি না পরমাত্মা। এমতে দাঁড়াইতেছে যে,

"তত্ত্বমসি" বচনটির বাক্যার্থ যদিচ "সে বস্তু তুমি", কিন্তু তাহার ভাবার্থ 'সে বস্তু পরমাত্মা"। উপনিষদে তত্ত্বংও আছে—তদ্‌ব্রহ্মও আছে—দুইই আছে। তার সাক্ষী "তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম"; ইহার অর্থ এই যে, সে বস্তুকে বিশেষ মতে জানিতে ইচ্ছা কর—সে বস্তু ব্রহ্ম। সাংখ্য দর্শনের মতে প্রকৃতিই বিশেষ মতে জানিবার বস্তু, আর সেই জন্য সাংখ্যের পরিভাষায় ব্রহ্ম প্রকৃতিরই আর এক নাম। গীতাশাস্ত্রে ব্রহ্ম শব্দ স্থল-বিশেষে প্রকৃতি অর্থে এবং স্থল-বিশেষে পরম পুরুষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন

"সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহৎযোনি রহং বীজপ্রদঃ পিতা॥"

এখানে ব্রহ্ম শব্দের অর্থ প্রকৃতি। আবার

"পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুং॥
আহুস্ত্বাং ঋষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।"

এখানে ব্রহ্মশব্দের অর্থ পরম পুরুষ। বেদান্ত শাস্ত্রে কিন্তু তৎসৎ শব্দ এবং তদ্‌ব্রহ্ম শব্দের মধ্যে মূলেই কোনও অর্থ-ভেদ নাই। সৎ শব্দের অর্থ ধ্রুব সত্য। সকল শাস্ত্রের মতেই পুরুষ অপরিবর্ত্তনীয় ধ্রুব সত্য—প্রকৃতি পরিবর্ত্তনশীল। তবেই হইতেছে যে, "তৎসৎ" বলাও যা (অর্থাৎ "সে বস্তু ধ্রুব সত্য" বলাও যা), আর "সে বস্তু পরম পুরুষ পরমাত্মা" বলাও তা, একই কথা। এইরূপে আমরা পাইতেছি যে, তিন স্থানের এই যে তিনটি উপনিষদ্-বচন (১) তত্ত্বং, (২) তদ্‌ব্রহ্ম, (৩) তৎসৎ, তিনটিরই ভাবার্থ "সে বস্তু পরম পুরুষ পরমাত্মা।" তৎ শব্দের সামান্য অর্থ হ'চ্চে চেয়ার-টেবিল-ঘটিবাটির ন্যায় যা-তা জ্ঞেয় বস্তু, আর, তাহার বিশেষ অর্থ হ'চ্চে পরম জ্ঞেয় বস্তু, অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট জানিবার বস্তু। সৎশব্দের বহুবচন হচ্চে "সন্তঃ"; সন্তঃ শব্দের অর্থ সৎপুরুষেরা! এতদনুসারে দাঁড়াইতেছে এই যে, সৎ শব্দের সামান্য অর্থ তুমি-আমি-তিনি প্রভৃতির ন্যায় যে-সে সৎলোক বা সৎপুরুষ; আর, তাহার বিশেষ অর্থ পরম-পুরুষ পরমাত্মা! বেদান্তাদি শাস্ত্রের মতে ব্রহ্ম শুধুই কেবল পরম জ্ঞেয় বস্তু নহেন—শুধুই কেবল তৎ নহেন; এক দিকে যেমন তিনি জ্ঞানের পরম লক্ষ্য তৎ, আর এক দিকে তেমনই তিনি আত্মার পরমপ্রতিষ্ঠা সদাত্মা বা পরমাত্মা। "তৎ" কি না সত্যস্বরূপ পরম বস্তু; "সৎ" কি না মঙ্গলস্বরূপ পরম আত্মা। ইংরাজি দার্শনিক ভাষায়—তৎ হ'চ্চে Fundamental Substance, "সৎ"

হ'চ্চে Supreme Subject। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এবিষয়ে আর বেশী বাক্যব্যয় এবং সময়-ব্যয় না করিয়া সংক্ষেপে আমার বক্তব্য কথাটার উপসংহার করি।

পারমার্থিক সত্যের মূল মন্ত্র ওঁ তৎ-সৎ। এই মহামন্ত্রটির অর্থ আমার বুদ্ধির খদ্যোতালোকে আমি যেটুকু বুঝিতে পারিয়াছি, তাহা এই :—

তৎ কিনা জ্ঞেয় প্রকৃতি।

সৎ কিনা জ্ঞাতা পুরুষ।

তৎ উপাদান-কারণ।

সৎ নিমিত্ত-কারণ।

তৎ সত্য; সৎ মঙ্গল।

"ওঁ তৎসৎ" কি না যিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা, তিনি সত্য এবং মঙ্গল একাধারে; তিনি জানিবার বস্তু এবং জানিবার কর্ত্তা একাধারে; তিনি Substance এবং Subject একাধারে; তিনি উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ একাধারে; তিনি প্রকৃতি এবং পুরুষ একাধারে; তিনি মাতা এবং পিতা একাধারে; এক কথায়—তিনি মোট জ্ঞানের মোট সত্য; আর তাহারই নাম পারমার্থিক সত্য।

পারমার্থিক সত্য যেমন মোট জ্ঞানের মোট সত্য; ব্যাবহারিক সত্য তেমনই বিভিন্ন জ্ঞানের বিভিন্ন সত্য; যেমন—জ্যোতিষ-বিজ্ঞানের গ্রহাদিঘটিত সত্য; বীজগণিতের সংখ্যা-ঘটিত সত্য; ক্ষেত্রতত্ত্বের স্থানাধিকারঘটিত সত্য; রসায়ন বিজ্ঞানের দ্রব্যগুণ-ঘটিত সত্য; ইত্যাদি।

পারমার্থিক সত্য এবং ব্যাবহারিক সত্য ছাড়া আর এক রকমের সত্য আছে যাহার শাস্ত্রীয় নাম—প্রাতিভাসিক সত্য। "প্রাতিভাসিক" অর্থাৎ ইংরাজিতে যাহাকে বলে Phenomenal। রীতিমত বুদ্ধি বিবেচনা খাটাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা সত্যকেই (যেমন পৃথিবী গোলাকার এই একটি সত্যকে) বিজ্ঞান-রাজ্যে যত্ন সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া তাহার জন্য যথোপযুক্ত বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়; আর সেই সঙ্গে মনের সংস্কার-মূলক আপাত-সুলভ সত্যকে (পৃথিবী চ্যাপ্টা এই রকমের কাঁচা সত্যকে) দ্বার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। বিজ্ঞান-রাজ্যের সুপরীক্ষিত সত্য খুব কাজের সত্য, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই; কিন্তু তথাপি তাহা ব্যাবহারিক সত্য বই পারমার্থিক সত্য নহে। বিজ্ঞানের সত্যকে ব্যাবহারিক সত্য বলিবার কারণ কি—আপনারা যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমার বিবেচনায় সে কারণ এই :—

বড় বড় বণিক্ মহাজনেরা কিছু-আর জাহাজ-বোঝাই-করা সমগ্র বিক্রেয় বস্তুর মোট ভাঙ্গিয়া তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডাংশ পৌরজনের ব্যবহারার্থ আপনারা বিক্রয় করেন না; সে কার্য্যের ভার তাঁহারা খুচরা জিনিসের ব্যাপারীদিগের হস্তে গছাইয়া দেন্। তত্ত্বজ্ঞানের সমগ্র সত্য বিজ্ঞানের বাজারে চলিতে পারে না এই জন্য—যেহেতু অতবড় মহামূল্য সামগ্রী যে মানুষ ক্রয় করিতে পারে, তদুপযুক্ত ক্রোরপতি বিদ্বজ্জন-সমাজে সুদুর্লভ। তাহা ক্রয় করিতে হইলে বেদান্ত-শাস্ত্রোক্ত শমদমাদির পরাকাষ্ঠা আবশ্যক—পাতঞ্জল-শাস্ত্রোক্ত যমনিয়মাদির পরাকাষ্ঠা আবশ্যক! যিনিই যত বড় পণ্ডিত হউন্ না কেন, তাঁহার ঘর-পোরা বিরাট বিশ্ব-কোষেও অত মূল্যের তপস্যা-নিধির সিকির সিকিরও সংস্থান নাই। পৌরজনেরা যেমন স্ব স্ব ব্যবহার্য্য সামগ্রী সকল ছোটো-খাটো দোকানদারদিগের নিকট হইতে ক্রয় করে, তা' বই বড় বড় বণিক্ মহাজনদিগের নিকট হইতে ক্রয় করে না, বিদ্যার্থী ব্যক্তিরা তেমনই স্ব স্ব ব্যবহার্য্য সত্য-সকল বিজ্ঞানের দোকানদারদিগের নিকট হইতে ক্রয় করেন, তা' বই তত্ত্বজ্ঞানের মহাজনদিগের নিকট হইতে ক্রয় করেন না; আর সেই জন্য বিজ্ঞানের সত্য সকল ব্যাবহারিক সত্য নামে সংজ্ঞিত হইয়াছে।

আমাদেরই এই ভারতবর্ষ যে বিজ্ঞানের জন্মভূমি, তাহার আমি সন্ধান পাইয়াছি নানা প্রকার লক্ষণ দৃষ্টে; কিন্তু তাহা কৃতবিদ্য-সমাজের বিচারালয়ের প্রখরবুদ্ধি জুরী-মহোদয়গণের নিকটে প্রমাণ করিতে পারিবার মত ঐতিহাসিক সাক্ষীর জোগাড় করিয়া ওঠা আমি বড় সহজ মনে করি না। যাহাই হো'ক্ না কেন—পূর্ণ বিচারালয়ের মাঝখানে দ্বাদশ শপথকার মহোদয়গণের মুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া আমি এ কথা বলিতে একটুও ভীত নহি যে, পুরাকালে আমাদের দেশে বিজ্ঞানের বয়স যদিচ খুব অল্প ছিল—কিন্তু তাঁহার সেই কচি বয়সেই তিনি যেরূপ তাঁহার অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার নিকটে বড় বড় প্রবীণ পণ্ডিতগণের বিদ্যা-বুদ্ধির মাথা হেঁট হইয়া যায়। এ বিষয়ে বেশী ওকালতি করা আমার পক্ষে নিতান্তই একটা তেলা-মাথায় তেল-দেওয়ার ন্যায় বাহুল্য কার্য্য; কেন না, পুরাতন ভারতে জ্যোতিষ-বিদ্যা, বীজ-গণিত, ক্ষেত্রতত্ত্ব, রসায়ন-বিদ্যা, পশুপালনী-বিদ্যা, স্থাপত্য-বিদ্যা, চিত্রকর্ম্ম, সঙ্গীত-বিদ্যা প্রভৃতি অনেকানেক বিদ্যা কত দূর যে কালোচিত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তাহা ত্রিজগতে রাষ্ট্র। তা ছাড়া—রাবণের পুষ্পকবিমানের কথার ভিতরে যদি কোনও প্রকার ঐতিহাসিক সত্য চাপা দেওয়া থাকে—তবে তো

ত্রেতাযুগেরই জিত! কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার একটা তাম্রলিপি বা আর কোনও প্রকার মাতব্বর-গোচের ঐতিহাসিক দলিল ভারতবাসীর হস্তগত না হইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে বিষয়ে কোনও কথার উচ্চবাচ্য না করাই ভারতের উকীল-ব্যারিষ্টারগণের পক্ষে সৎপরামর্শসিদ্ধ।

ঘড়ি কি বলিতেছে তাহা জানি না—কিন্তু আমার কণ্ঠের তেজ নরমিয়া আসিতেছে দেখিয়া আমার মন বলিতেছে, সময় নাই। অতএব আর কাল-বিলম্ব না করিয়া আমার অবশিষ্ট বক্তব্যটিকে একটি ক্ষুদ্র উপকথার বেশ পরিধান করাইয়া তাহার প্রতি আপনাদের কৃপাদৃষ্টি যাচ্ঞা করিতেছি। আপনাদিগকে মাঝে মাঝে হুঁ দিতে বলিতে আমি সাহস করি না—কেবল যদি আপনারা গল্পটিকে অযোগ্য-বোধে শ্রবণদ্বার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া না দেন, তাহা হইলেই আমি আজ আপনাকে যথেষ্ট অনুগৃহীত মনে করিব।

পুরাকালে আমাদের দেশে তত্ত্বজ্ঞান ছিলেন সভ্যতা রাজ্যের রাজর্ষি। পরাবিদ্যা ছিলেন রাজমহিষী। বিজ্ঞান ছিলেন তাঁহাদের সবে-মাত্র একটি পুত্র। স্মৃতিপুরাণ ছিলেন রাজমন্ত্রী। রাজর্ষি তত্ত্বজ্ঞান মনে মনে সংকল্প করিলেন—যাজ্ঞবল্ক্য-ঋষির ন্যায় পত্নী সহ বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন। বিজ্ঞানের বয়ঃক্রম সাত আট বৎসরের অধিক না—না নহিলে রাজর্ষি বিজ্ঞানকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করাইতেন। তাহা যখন দেখিলেন হইবার নহে, তখন তিনি বিজ্ঞানের বয়ঃপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত রাজ্যশাসনের ভার তাঁহার প্রবীণ মন্ত্রিবর স্মৃতিপুরাণের হস্তে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে মনঃস্থ করিলেন। তিনি বনে গমন করিবার পূর্ব্বে রাজ্যময় দুর্ভিক্ষ হইয়াছে শুনিয়া মন্ত্রিবর স্মৃতিপুরাণকে ডাকাইয়া প্রজারা যাহাতে অক্ষয় রাজভাণ্ডারের অমৃতোপম ভক্ষ্য পানীয় সকল সুলভ মূল্যে পাইতে পারে, তাহার একটা সদ্ব্যবস্থা করিতে আদেশ করিলেন; আর সেই সঙ্গে——কিরূপে বিজ্ঞানকে ধীরে ধীরে সর্ব্ববিদ্যায় এবং সর্ব্বগুণে সম্ভৃত করিয়া তুলিয়া যথোপযুক্ত বয়সে রাজধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে হইবে, এবং বিশেষতঃ বিজ্ঞান যাহাতে বিপথে পদার্পণ না করে তাহার প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে, সেই বিষয়ের একটা সারগর্ভ উপদেশ-পত্র স্বহস্তে লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া মন্ত্রিবরের হস্তে তাহা সযত্নে সমর্পণ করিলেন। অতঃপর রাজর্ষির আজ্ঞাক্রমে মন্ত্রিবর ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া পুনঃপুনঃ শপথ করিলেন যে, তাঁহার জীবন থাকিতে উপদেশ-পত্রের একটি কথারও তিনি অন্যথাচরণ করিবেন না। অনতিপরে রাজর্ষি-তত্ত্বজ্ঞান পত্নী সহ তপোবনে প্রয়াণ করিলেন।

মন্ত্রিবর স্মৃতিপুরাণ রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া রাজ-ভাণ্ডারের অপর্য্যাপ্ত ভক্ষ্য-পানীয় সকল যাহাতে প্রজারা সুলভ মূল্যে পাইতে পারে, তাহার উচিতমত ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার অনেক কালের বহুদর্শিতা এবং বিচক্ষণতা রীতিমত কাজে খাটাইয়া, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া এবং সব দিক্ বাঁচাইয়া যে দ্রব্যের যে মূল্য ধার্য্য করিলেন, তাহা প্রজাদিগের আদবেই মনঃপূত হইল না। কিয়ৎ পরে সমস্ত প্রজাবর্গ একযোট হইয়া মন্ত্রিবরের নিকটে এইরূপ আবেদন জানাইল যে, "ন্যায়মতে রাজভাণ্ডারের ভক্ষ্য-পেয় সকল আমরা বিনামূল্যে পাইবার অধিকারী। নিতান্তই যদি আমাদিগকে তাহা মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয়, তবে এক টাকার জিনিস এক পয়সা মূল্যে লইতে আমাদের মনকে কোনমত-প্রকারে লওয়াইলেও লওয়াইতে পারি; নচেৎ আমরা না খাইয়া মরিব সেও ভাল, তথাপি তার সিকি পয়সা বেশী মূল্যে আমরা তাহা লইব না।" মন্ত্রিবর ফাঁপরে পড়িলেন। মন্ত্রিবরের মন্ত্রিণী ঠাকুরাণী ছিলেন দুই সপত্নী। তাঁহার কৌশল্যা ছিলেন রক্ষানীতি; আর, তাঁহার কৈকেয়ী ছিলেন লোকরঞ্জনা। প্রজাদের ঐরূপ কঠিন প্রতিজ্ঞার কথা উভয় মন্ত্রিণী ঠাকুরাণীরই কর্ণে পৌঁছিল। মন্ত্রিবর মধ্যাহ্ন-ভোজনে বসিয়া ভাল করিয়া আহার করিতেছেন না দেখিয়া বড় মন্ত্রিণী রক্ষানীতি বলিলেন, "ভাব্‌চ কেন অত; প্রজাদের যারা প্রধান মোড়ল—যাদের বুদ্ধি আছে, বিবেচনা আছে, তাদের সবাইকে ডাকিয়ে এনে' ভাল ক'রে বুঝিয়ে ব'ল্লেই তারা বুঝ্‌বে; আর প্রধানেরা বুঝলেই ক্রমে ক্রমে সবাই বুঝিবে; তা হ'লেই আপদ্ বালাই চুকে যাবে।" ছোটো মন্ত্রিণী লোকরঞ্জনা বলিলেন, "দিদি যা ব'ল্‌চেন, তা যদি ভাল বোঝো, তবে তাই কর'। সখীমণি ঘাটে জল তুল্‌তে গিয়েছিল—জল তুলে এনে আমাকে ব'ল্লে যে, রাস্তায় লোকের ভিড় হ'য়েচে এমনই যে, দুদণ্ড তা'কে পথের একধারে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হ'য়েছিল; আর, প্রজারা সবাই মিলে যা ব'ল-ছিল, সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনেচে, তার চ'কের সাম্‌নে, প্রধান মোড়লেরাই বা কি, আর খুচ্‌রো চাসাভুসোরাই বা কি, সবাই মিলে ব'ল্‌ছিল যে, তারা না খেয়ে মর্‌বে, তবুও তারা এক টাকার সামগ্রী এক পয়সার বেশী দাম দিয়ে নেবে না। দেশসুদ্ধ লোক না খেয়ে ম'চ্চে—আমি তা চ'কে দেখ্‌তে পার্‌ব না; তার আগে যা'তে তা আমাকে দেখ্‌তে না হয়, আমি তা না খেয়েই হোক্ আর যা খেয়েই হোক্—যেমন ক'রে হোক্—ক'রে ক'র্ম্মে চুকে নিশ্চিন্তি হ'ব। তা হ'লেই দিদি ঘরের একেশ্বরী হ'বেন, আর তোমার সব আপদ বালাই চুকে যাবে।"

মন্ত্রিবর তাঁহার কৈকেয়ী-ঠাকুরাণী লোকরঞ্জনার শক্ত আব্দার কিছুতেই থামাইতে পারিলেন না; তিনি আর কোনও উপায় না দেখিয়া রাজভাণ্ডারের বিশুদ্ধ তত্ত্বান্নের সহিত নানা প্রকার অর্থহীন এবং অসার ক্রিয়াকর্ম্মের ভেজাল মিশাইয়া প্রজাদিগের মধ্যে একটা জিনিস্ সিকি পয়সা মূল্যে বিলি করিতে আরম্ভ করিলেন। বিজ্ঞানের বয়স তখন যদিও খুব কম, তথাপি মন্ত্রিবরের ঐরূপ গর্হিত কার্য্য তাঁহার একটুও ভাল লাগিল না। বিজ্ঞানের মুখ ভার দেখিয়া মন্ত্রিবর তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি আমার কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়াছ? কেন যে আমি এইরূপ দেশকাল-পাত্রোচিত বিধি-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনা করিতেছি, এখনও তোমার তাহা বুঝিতে পারিবার সময় হয় নাই; আমার মত যখন তোমার চুল পাকিবে, তখন তুমি তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিবে যে, বৃদ্ধ মন্ত্রীটি ছিলেন বলিয়া রাজ্য এখন পর্য্যন্ত টেঁকিয়া আছে, নহিলে কোন্ কালে তাহা রসাতলে যাইত।" বিজ্ঞান বলিল, "আপনি ঐ যে কদর্য্য সামগ্রীগুলা বাজারে চালাইয়া দিতেছেন, ও যে বিষ!" মন্ত্রিবর স্মৃতিপুরাণ বলিলেন "ঐ দ্রব্যগুলারই মধ্যে দুই চারি ফোঁটা অমৃত যাহা সঙ্গোপিত আছে, তাহা অমনধারা দশ দশ হাঁড়ি বিষকে গিলিয়া খাইতে পারে।" মন্ত্রিবরের সঙ্গে বিজ্ঞানের এই সূত্রে মনান্তর ঘটিল। বিজ্ঞান একদিন কথাপ্রসঙ্গে মন্ত্রিবরকে বলিল, "আমি বালক বলিয়া আমার কথা আপনি অগ্রাহ্য করিবেন, তাহা আমি জানি; কিন্তু তবুও আমি বলিতেছি যে, এ রাজ্যের মঙ্গল নাই! বছর-আষ্টেক পরে যখন আপনার দুর্নীতির ফল পাকিয়া উঠিবে, তখন আপনি বলিবেন যে, সত্য কথা বালকের মুখ দিয়া বাহির হইলেও তাহা সত্য বই মিথ্যা নহে; আর, অশুভ কার্য্য প্রবীণের হস্ত দিয়া বাহির হইলেও তাহা শুভ বই অশুভ নহে।" বছর আষ্টেক পরেই বিজ্ঞান কাঁদিতে কাঁদিতে আপনার জননী ভারতভূমির নিকট হইতে জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিলেন, আর কিয়ৎপরে ঈশ্বরের কৃপায় এবং আপনার বাহুবলে নানা বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিয়া পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে আপনার আধিপত্য অটলরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অনতিবিলম্বে আমাদের দেশে বিজ্ঞানের কথাই ফলিল। অসার এবং অধম সামগ্রী সকল উদরস্থ হওয়াতে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার হাড়ে হাড়ে নানা প্রকার সংক্রামক ব্যাধির সঞ্চার হইতে লাগিল। অন্তঃসারশূন্য অলীক অপদার্থ এবং অবৈজ্ঞানিক ক্রিয়া-কর্ম্মের ভারে তত্ত্বজ্ঞানের রাজভাণ্ডারের বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম চাপা পড়িয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে আর্য্য সভ্যতার জ্যোতির্ম্ময় মুখশ্রী তমসাচ্ছন্ন হইয়া

গিয়া আর্য্যসভ্যতা অধম বর্ব্বরতায় পর্য্যবসিত হইল। তাই আমাদের আজ এই দশা!

বিজ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞানের অপব্যবহারে যে কিরূপ বিষময় ফল, এই তো তাঁহা দেখিলাম। কিন্তু মঙ্গলময় পরমেশ্বরের করুণা অপার! পশ্চিমে বিজ্ঞানের এত যে অপব্যবহার হইয়াছে, এবং হইতেছে, তথাপি তাহা বিজ্ঞানের সত্য জ্যোতিঃকে তিলমাত্রও খর্ব্ব করিতে পারেও নাই, পারিবেও না। আমাদের দেশে তত্ত্বজ্ঞানের এত যে অপব্যবহার হইয়াছে, এবং হইতেছে, কিন্তু তথাপি তাহা তত্ত্বজ্ঞানের সুমঙ্গল শান্তিকে একচুলও টলাইতে পারেও নাই, পারিবেও না।

প্রবীণ স্মৃতি পুরাণ নবীন বিজ্ঞানকে এই যে একটি কথা বলিয়া ছিলেন—যে, রাজ-ভাণ্ডারের ভক্ষ্য পেয় সামগ্রীতে সহস্র ভেজাল মিশ্রিত থাকা সত্ত্বেও তাহার ভিতরে এক আধ ফোঁটা অমৃত যাহা সঙ্গোপিত রহিয়াছে, তাহা সকল রোগের মহৌষধ, তাঁহার এ কথা সত্য বই মিথ্যা নহে; তাহার সাক্ষী—রামায়ণ এবং মহাভারত এখনও পর্য্যন্ত আমাদের দেশের আধ্যাত্মিক সভ্যতাকে মৃত্যুর হস্ত হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। আবার তাও বলি—মন্ত্রিবরের উপরে রাগ করিয়া বিজ্ঞান যে তাঁহার পিতার অনভিমতে আপনার জননীতুল্য জন্মভূমিকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া পশ্চিম ভূগোলখণ্ডে আপনার রাজ্য-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—এটা তাঁহার উচিত কার্য্য হয় নাই। ব্যাবহারিক সত্যের জ্ঞানোপার্জ্জন মনুষ্যবুদ্ধি কর্ত্তৃক হইয়া ওঠা যত দূর সম্ভবে—বিজ্ঞানের তাহা হইতে বাকি নাই যদিচ, কিন্তু তথাপি ইহা কম আক্ষেপের বিষয় নহে যে, পারমার্থিক সত্যের ক-খ-গ-ঘও আজ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের আয়ত্তের মধ্যে ধরা দিল না। বিজ্ঞানের উচিত ছিল—ভারতভূমি পরিত্যাগ না করিয়া তাঁহার দেবতুল্য পিতার নিকটে পারমার্থিক সত্যের মন্ত্র গ্রহণ করিয়া সেই মন্ত্রের যথাবিহিত সাধন দ্বারা তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডারের শূন্য উপর-মহলটা পুরাইয়া লওয়া। তাহা না করিয়া তিনি তাঁহার অর্দ্ধশিক্ষিত অবস্থায় ভারতভূমি পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমে রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করা'তে তাঁহার রাজ্যমধ্যে এক্ষণে যেরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে, তাহা যে অবশ্যম্ভাবী—প্রবীণ মন্ত্রিবর তাহা তখনই বুঝিতে পারিয়াছিলেন; বুঝিতে পারিয়া—কলিতে দুর্ভিক্ষের পরে দুর্ভিক্ষ, ক্লেশের পরে ক্লেশ, ভয়ের পরে ভয়, যাহা যাহা ঘটিবে, তাহা ভারতময় ঢ্যাঁঢ়রা পিটিয়া দেওয়াইয়াছিলেন। অতএব বিজ্ঞান যদি বৃদ্ধ ভারতমন্ত্রীর হিতপরামর্শ শোনেন, তবে ভারতে ফিরিয়া আসুন্; ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার লোকপূজ্য পিতার নিকটে দীক্ষিত হউন; দীক্ষিত

হইয়া ভারতবর্ষীয় আর্য্যসভ্যতার যৌবরাজ্যের সিংহাসন অধিকার করিয়া তাঁহার রাজর্ষি পিতার চিরপোষিত মনস্কামনা পূরণ করুন্; তাহা হইলে তাঁহার পৈতৃক প্রাচ্যরাজ্যেরও মঙ্গল হইবে; আর, তাঁহার স্বোপার্জ্জিত প্রাতীচ্য রাজ্যেরও মঙ্গল হইবে। আমার ক্ষুদ্র উপকথাটি ফুরাইল। আমারও শান্তি হইল, আপনাদেরও শান্তি হইল, শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃওঁ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণ।

নবদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক শ্রীরাম শিরোমণি, মাধব তর্কসিদ্ধান্ত ও প্রধান স্মার্ত্ত লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণ কোনও একসময়ে দেবমন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে নাটোর রাজধানীতে আহূত হইয়াছিলেন। তাঁহারা রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে সঙ্গে লইয়া "চতুর্ভিঃ শোভনা যাত্রা" করিয়াছিলেন। নাটোরে যাইয়া ব্রাহ্মণ রাজার অনুরোধে পণ্ডিতত্রয় সেই কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছিলেন। সর্ব্ববেদে পারদর্শী না হইলে কেহ ব্রহ্ম-বরণ পাইতেন না; কিন্তু যজ্ঞে ব্রহ্মার অধিক মন্ত্রপাঠ নাই, কেবল "সীদামি" মাত্র বলিতে হয়। বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতত্রয় তাহা বুঝিয়া রামচন্দ্রকে ব্রহ্মবরণ দিবার জন্য রাজাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। রাজাও তাঁহাদিগের অনুরোধে রামচন্দ্রকে ব্রহ্ম-বরণ দিয়াছিলেন। নাটোরাধিপতি মহারাজের অনুষ্ঠিত সেই রীতি—মূর্খকে ব্রহ্মা করিবার পদ্ধতি সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। আজ সাহিত্য-সম্মিলনের সাহিত্য-সম্মিলনে সেই রীতির প্রবর্ত্তনা দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি। আমিও "সীদামি" বলিয়া রামচন্দ্রের ন্যায় আসনপরিগ্রহ করিয়াছি। আমার উপরে মন্ত্রের চাপ দিয়া কর্ত্তৃপক্ষ এক্ষণে অনুচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন।

গৌড়ব্রাহ্মণের অন্তর্গত যেমন আর একটী গৌড় ব্রাহ্মণ আছে, দ্রাবিড় ব্রাহ্মণের অন্তর্গত যেমন একটী শ্রেণীর নাম দ্রাবিড় আছে; সেইরূপ এই শাখা-সম্মিলনের কল্পনা করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত সাহিত্য শব্দের একটি ব্যাপ্য অর্থের কল্পনা করিয়াছেন। সাহিত্য শব্দের ব্যাপ্য অর্থ, কাব্য অর্থ গ্রহণ করিলেও বেদ, তন্ত্র, স্মৃতি, পুরাণ, গণিত, জ্যোতিষ, ন্যায়, দর্শন, ব্যাকরণ, ব্যবহারশাস্ত্র, কলাশাস্ত্র-রূপ অর্থ পরিত্যাগ করিবার উপায় নাই। এই সমস্ত না জানিলে কাব্যজ্ঞান হয় না। তাই মম্মট ভট্ট কাব্যপ্রকাশে সেই সমস্ত কথারই উল্লেখ করিয়াছেন। অলঙ্কার শাস্ত্রকে আমরা কাব্যের বিজ্ঞানশাস্ত্র বলিতে পারি। এই অলঙ্কার শাস্ত্রের

সর্ব্বপ্রথমে সমস্ত দর্শনের স্বীকৃত শক্তি-লক্ষণার বিচার; আবার প্রচলিত দর্শনের ভিতরে কোনও দার্শনিক যাহা স্বীকার করেন নাই, ব্যঞ্জনা নামে আর একটী সর্ব্ব-দর্শনের অস্বীকৃত বৃত্তির কল্পনা, স্থাপনা ও যুক্তিতর্ক দ্বারা তাহার সমর্থন আছে। যে প্রাণালীতে বেদান্তদর্শনে অদ্বৈতব্রহ্মের সিদ্ধি ও উপলব্ধি আছে, অলঙ্কারশাস্ত্রেও সিদ্ধি ও অনুভূতিতে সেই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। রসাদির, বিভাবাদির, গুণরীতির, শব্দ ও অর্থালঙ্কারের, এবং প্রত্যেক অলঙ্কারের লক্ষণে ন্যায়দর্শনের পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে। প্রত্যেকের বিভাজক ধর্ম্ম বাদমুখে প্রদর্শিত হইয়াছে; মীমাংসকের 'অন্বিতাভিধানবাদ' ও নৈয়ায়িকের 'অভিহিতান্বয়বাদ'—এই উভয় মতই উদ্ধৃত হইয়াছে; ন্যায়মতে সাঙ্কর্য্যনিবন্ধন যে ভূতত্ব ও মূর্ত্তত্ব জাতিদ্বয়ের কল্পনা নাই—সর্ব্বত্র জাতির সত্তা আছে বলিয়া যুক্তিপ্রদর্শনে তাহার খণ্ডন করা হইয়াছে। পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ সার্ব্বত্রিক, কি দৈশিক? সার্ব্বত্রিক হইলে উপচয় (বৃদ্ধি) হয় না। পদার্থদ্বয়ের দৈশিক সংযোগেই সেই সংযোগজন্য পদার্থের আকারে বৃদ্ধি হয়; দৈশিক সংযোগ স্বীকার করিলে পরমাণুকে আর নিরবয়ব বলা যায় না, সাবয়ব বলিতে হয়, ইত্যাদি যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বিবর্ত্তবাদী ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যে পরমাণু-বাদের খণ্ডন করিয়াছেন, সার্ব্বত্রিক সংযোগে যে উপচয় হয় না, ইহার ব্যাপ্তিগ্রহ হইল কোথায়, নৈয়ায়িক অবশ্য জিজ্ঞাসা করিবেন। আলঙ্কারিকেরা সেই পরমাণু-বাদ স্বীকার করিয়াছেন। সেই জন্য বলিতেছিলাম,—"ন্যায়াদি দর্শনশাস্ত্র না জানিলে অলঙ্কারশাস্ত্র জানা যায় না; অলঙ্কারশাস্ত্র না জানিলে কাব্য জানা যায় না। অলঙ্কার-শাস্ত্র ছাড়িয়া দিয়া কাব্যের শুধু যথাশ্রুত অর্থ বুঝিতে হইলেও যে ন্যায়াদি দর্শনের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। নৈষধচরিতে পরমাণুর কথা আছে; মনঃ যে অণুস্বরূপ, তাহার উল্লেখ আছে। সেই মনোদ্বয়রূপ দুইটী অণুর সংযোগে দ্ব্যণুকের সৃষ্টি করিয়া একটি নূতন জগতের সৃষ্টির কল্পনা আছে। দার্শনিক কবি শ্রীহর্ষের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি মহাকবি কালিদাসের কাব্যজগতে প্রবেশ করা যায়, তাহাতেও পরমাণুবাদের শিক্ষা লাভ করা যায়। "তং বেধা বিদধে নূনং মহাভূতসমাধিনা। তথাহি সর্ব্বে তস্যাসন্ পরার্থৈকফলাগুণাঃ।"—বিধাতা নিশ্চয় তাঁহাকে মহাভূতের সমাহারে প্রস্তুত করিয়াছেন; এই জন্য তাঁহার সমস্ত গুণেরই ফল পরের প্রয়োজন-সিদ্ধি। যে ভূতের প্রত্যক্ষ হয়, যে ভূতের গুণের উপলব্ধি হয়, বলিতে হইবে—শ্লোকস্থ মহাভূত শব্দের সেই অর্থ। আবার ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, যাহার গুণের প্রত্যক্ষ হয় না, সে ভূতেরও প্রত্যক্ষ হয় না। এইরূপ সূক্ষ্ম ভূতেরও সত্তা আছে। কিন্তু তাহাদিগের গুণ অন্যের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য নয়। সেই সূক্ষ্ম

ভূতের ব্যাবর্ত্তন করিবার জন্যই ভূতপদের 'মহৎ' এই একটি বিশেষণপদের প্রয়োগ করা হইয়াছে। যে সাহিত্যাচার্য্য ন্যায়বৈশেষিক মত জানেন না, তিনি কি এই শ্লোকটী বুঝাইতে পারিবেন?—যে ছাত্র ন্যায়বৈশেষিক মত জানে না, সেই ছাত্রই কি এই শ্লোকের মর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে পারিবে? আবার সাংখ্যাচার্য্য যে "সংঘাতপরার্থত্বাৎ"—এই হেতুনির্দ্দেশ করিয়া আত্মসিদ্ধি করিয়াছেন, কালিদাসও এই শ্লোকের চতুর্থ চরণে "পরার্থৈকফলা গুণাঃ" বলিয়া সেই আকারের হেতুনির্দ্দেশ করিয়াছেন। বেদান্তমতেও সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের সমষ্টিতে স্থূল ভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। সূক্ষ্ম ভূতের গুণ পুরুষের ভোগ্য নয়; কারণ, তাহার উপলব্ধি হয় না। পুরুষ মহাভূতেরই গুণের উপলব্ধি করে। মহামান্য সভাসদ্‌গণ! আপনারা দেখুন, প্রণিধান করুন, কালিদাসের এই অল্পাক্ষরনিবদ্ধ একটী কবিতার চতুর্থ চরণের আটটী অক্ষরের ব্যাখ্যা বুঝিতে হইলেই ন্যায়বৈশেষিক জানিতে হয়, সাংখ্যবেদান্ত জানিতে হয়।

মহাকবি কালিদাস "ত্বামামনন্তি প্রকৃতিং পুরুষার্থপ্রবর্ত্তিনীং"—বলিয়াছেন, সাংখ্যাচার্য্যদিগের প্রকৃতবাদ বা পরিণামবাদ না জানিলে প্রকৃতি বুঝা যায় কি? প্রকৃতি-প্রবৃত্তির সাংখ্যাচার্য্যসম্মত কারণ না জানিলে পুরুষার্থ বুঝা যায় কি? নৈয়ায়িক মতে, কপাল এবং কপালিকার সংযোগে ঘটের উৎপত্তি হয়। এই কপাল এবং কপালিকা ঘটের অবয়ব, ঘট অবয়বী। এই ঘট-রূপ অবয়ব কপাল-রূপ অবয়বে সমবায়-সম্বন্ধে নিত্য-সম্বন্ধে অবস্থিত। রূপ প্রভৃতি ঘটীয় গুণের ঘট সমবায়ী কারণ। কপালীয় রূপ প্রভৃতি গুণ ঘটের সেই সেই গুণের অসমবায়ী কারণ। নৈয়ায়িকদিগের এই সিদ্ধান্তে সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন,—ন্যায়মতে গুণের উপরে গুণ থাকে না। সুতরাং রূপের পরিমাণ ও গুরুত্ব না থাকিতে পারে। কিন্তু কপালের গুরুত্ব ভিন্ন ঘটের গুরুত্ব ত পৃথক্, এবং ঘটের গুরুত্বের উৎপত্তির পরেও ত কপালের গুরুত্ব কপালে অবস্থিতি করে। তাহা হইলে ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বে কপাল কপালিকাকে একবার ওজন করিয়া ঘটোৎপত্তির পরে আবার সেই ঘটের ওজন, করিলে কপাল কপালিকার পূর্ব্ববিদিত সেই গুরুত্ব অপেক্ষা ঘটের ওজনের সময়ে কেন অধিক গুরুত্বের উপলব্ধি হয় না? ইত্যাদি বিবিধ যুক্তির অবতারণা করিয়া সাংখ্যাচার্য্যেরা সৎকার্য্যবাদের অবধারণ করিয়াছেন। সাহিত্যের মূলে যে ব্যাকরণ রহিয়াছে, এই সৎকার্য্যবাদ না জানিলে, সেই ব্যাকরণসম্মত কর্ত্তৃকারকের লক্ষণ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারা যায় না। "যোগিনী ভবসি, কিংবা বিয়োগিন্যসি?"—পাতঞ্জলদর্শন না জানিলে এই শ্লোকাংশেরই বা কি অর্থ বুঝিতে পারা যায়? আর কি বুঝিতে পারা

যায়,—"অপবাদৈরিবোৎসর্গাঃ"—? ইহাও যে জৈমিনিদর্শনের কথা। এই উৎসর্গ-অপবাদ লইয়াই যে বৈধ পশুহিংসার বিচার। এই বিচার লইয়া "জৈমিনির অনুবর্ত্তনে শ্রীমদ্ভাগবতের ১২শ স্কন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন,—বৈধ হিংসায় দোষ নাই। জগদ্গুরু আচার্য্য শঙ্করও শারীরকভাষ্যে বৈধহিংসায় দোষ নাই,—স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। কিন্তু কপিলশিষ্য পঞ্চশিখাচার্য্যও পশ্চাৎপদ নহেন। তিনি বলিয়াছেন,—দোষ আছে, নিশ্চয় আছে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ঋষি নহেন, ঋষিবচনের সংগ্রাহক, ঋষিবচনের ব্যাখ্যাতা। তাঁহার সমস্ত গ্রন্থে এই উৎসর্গ-অপবাদ লইয়া বিচার, ঋষিবচনের ব্যাখ্যায় জৈমিনিদর্শনের নানা-অধিকরণ প্রদর্শন। রঘুনন্দনের এই ব্যাখ্যায় প্রশংসা নাই। কারণ, তিনি নগ্নপদ, নগ্নদেহ, অসভ্য ভট্টাচার্য্য। অবশ্য এ্যাডভোকেট-জেনারেল মিষ্টার পল্ আইনের অন্তঃধারা দেখাইয়া অন্য ধারার অর্থাবধারণের প্রতিভার পরিচয় দিতেছেন, তাহার প্রশংসা আছে। কারণ, তিনি সুসভ্য দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া সুসভ্য দেশে 'সায়েন্টিফিক্' প্রণালীতে সুশিক্ষা লাভ করিয়াছেন।

আবার কালিদাসের একটি কবিতাতে আছে—"শ্রুতেরিবার্থং স্মৃতিরন্বগচ্ছৎ"—রাজমহিষী নন্দিনীর ক্ষুরবিন্যাসে পবিত্র-ধূলিবিশিষ্ট-পথে অনুগমন করিয়াছিলেন, যেমন শ্রুতির (বেদের) অনুগমন করে স্মৃতি। বুঝিলেন কি, কালিদাস কি বলিলেন? যিনি পূর্ব্বমীমাংসা (জৈমিনিদর্শন) অধ্যয়ন করেন নাই, তিনি কি করিয়া বুঝিলেন,—কালিদাস কি বলিবেন। ভগবান জৈমিনি বিবিধযুক্তি-প্রদর্শনে বেদের প্রামাণ্য অবধারণ করিয়া বেদমূলক বলিয়া স্মৃতির প্রামাণ্য-স্থাপন করিয়াছেন। যে স্মৃতির বেদমূলকতা নাই, প্রত্যুত বেদবিরোধিতা আছে, সেই স্মৃতির প্রামাণ্য নাই,—জৈমিনি স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু বেদে নাই, স্মৃতিতে আছে—এমন স্থলে কি কর্ত্তব্য? তাহার উত্তরে—"অসতি হ্যনুমানং"—এই সূত্রাংশ দ্বারা উপদেশ দিয়াছেন। বেদ না থাকিলে সেই স্মৃতির দ্বারা তাদৃশ একটি বেদ আছে, অনুমান করিতে হইবে। কারণ, বেদার্থের স্মরণে স্মৃতি লিখিত। বেদার্থের স্মরণ আছে বলিয়া স্মৃতির নাম 'স্মৃতি' হইয়াছে। এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, যাঁহারা অত্যুক্তি-দোষদুষ্ট বলিয়া নৈষধচরিতের নামে নাসিকাকুঞ্চন করিয়াও বর্ত্তমান কালের অনুযায়ি নবীন স্মৃতি নির্ম্মাণের জন্য নগণ্য আমাদিগকে পর্য্যন্ত ব্যাস-বশিষ্ঠের আসনে অধিষ্ঠিত করিতে চান, তাঁহাদিগকে বিনয়নম্রতার সহিত অনুরোধ করি, তাঁহারা একবার জৈমিনিদর্শনের 'বলাবলাধিকরণন্যায়' বিলোকন করুন। দেখিবেন, মহর্ষি মনুরও সেই শ্রুতিক্ষুণ্ণ মার্গ হইতে রেখামাত্র অন্য দিকে যাইবার

অধিকার ছিল না। আরও বক্তব্য, ভারতীয় স্মৃতি, ভারতীয় পুরাণ, ভারতীয় কাব্য, ভারতীয় শিল্প, সমস্তই সেই এক দিকে ধাবিত। "সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ"—সমস্ত নদীর গতি যেমন সমুদ্রের দিকে, ভারতের সমস্তের গতি সেইরূপ বেদের দিকে। জড় প্রকৃতির আলিঙ্গনে আত্মবিস্মৃতির উদয় হয়, বেদ সেই সময়ে মানবকে সতর্কতা-গ্রহণে উপদেশ দেয়, রাগপ্রণোদিত প্রবৃত্তির উপরে প্রতিনিয়ত কশাঘাত করে।

রঙ্গমণ্ডপে যাইয়া দর্শকের আসনে উপবিষ্ট হইয়া অভিনয় দেখিতে দেখিতে যদি অভিনেতার অভিনয়-কৌশলে একান্ত মুগ্ধ হইয়া পড়ি, তখন অভিনয় দেখিতেছি বলিয়া আর বোধ থাকিবে না। প্রত্যুত, তখন অভিনীত বিষয় ও পাত্রগুলি প্রকৃত বলিয়া মনে প্রতিভাত হইবে। অভিনেতাকে আর অভিনেতা বলিয়া চিনিতে পারা যাইবে না। বহিঃপ্রাঙ্গণেও প্রকৃতির নাট্যলীলায় বিমুগ্ধ হইলে, প্রকৃতির নাট্যলীলাকে প্রকৃত মনে করিলে, সেই আদ্যন্তশূন্য নাটকের সূত্রধারকে আর চিনিতে পারা যাইবে না। প্রকৃতিসুন্দরী প্রথমতঃ তোমার যে দুইটি স্বচ্ছ স্ফটিকনির্ম্মিত পানপাত্র আছে, তাহাকে পূর্ণ করিয়া অফুরন্ত মধুর দ্রাক্ষারস ঢালিয়া দিবে। তুমি বসিয়া বসিয়া সেই মদিরা পান করিবে, আর প্রকৃতির নাটক দেখিবে। পিপাসা বাড়িলেই আবার প্রকৃতির উন্মুক্ত ভাণ্ডারের সুমিষ্ট মদিরা পাইবে। মদিরাপানে উন্মত্ত তুমি, প্রকৃতির নর্ত্তনে নর্ত্তকীর হাব-ভাব-সমন্বিত নর্ত্তনে একেবারে মোহিত হইয়া যাইবে, একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িবে। তখন তোমার রাগদৃপ্ত উন্মত্ত চক্ষুঃ সূত্রধারকে আর কি করিয়া চিনিবে? তখন আর তুমি নাটককে নাটক বলিয়া বুঝ না, উগ্র মদিরায় জ্ঞানহীন তুমি নর্ত্তকীর সেই বিমোহন হাবভাবে উন্মত্ত হইয়া পড়। নর্ত্তকীর ক্রীতদাস হইতে যাও। ইহার উদাহরণ অন্যত্র দেখাইবার জন্য আয়াস করিতে হইবে না। এই কলিকাতায় প্রত্যেক রঙ্গশালায় জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ রহিয়াছে। দর্শকদিগকে কুপথে পাতিত করিবার সহায়ক, সঙ্গতিশূন্য, রসবিরোধী সর্ব্বত্র কটাক্ষচালনার সহিত নর্ত্তকীর নর্ত্তনের ব্যবস্থা।

বেদ গুরুর ন্যায় দাঁড়াইয়া সুবর্ণ-বেত্র ঘুরাইয়া গুরুগম্ভীরস্বরে বলিতেছেন,— সাবধান! এই পাপ প্রকৃতির প্রদত্ত পাপ-মদিরা পান করিবে না, কদাচ করিবে না। সেই বৃদ্ধ গুরুর অনুবর্ত্তী ধর্ম্মশাস্ত্রও তাহাই বলিতেছেন, পুরাণশাস্ত্রও তাহাই বলিতেছেন। এমন কি, ভারতীয় কাব্য পর্য্যন্ত তাহাই বলিতেছে। তাই বৃদ্ধ আলঙ্কারিকেরা বলিয়াছেন, শাস্ত্র তিন প্রকার; রাজতুল্য, বন্ধুতুল্য, কান্তাতুল্য।

রাজাজ্ঞায় বিধি ও নিষেধের আজ্ঞা থাকে, যুক্তি থাকে না। বেদের উপদেশেও সেইরূপ বিধিনিষেধ আছে, যুক্তি নাই। বন্ধু সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার জন্য ও অসৎ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য যুক্তিপ্রদর্শন করে। পুরাণেও সেইরূপ যুক্তিপ্রদর্শন আছে। কান্তা কান্তকে নিজেতে অনুরক্ত ও অন্যে বিরক্ত করিবার উদ্দেশে রাজার ন্যায় আজ্ঞা প্রচার করে না, বন্ধুর ন্যায় উপদেশ দিয়া যুক্তিপ্রদর্শন করে না, কেবল নিজের সৌন্দর্য্যচাতুর্য্যের আতিশয্য বুঝাইয়া দেয়। যে স্ত্রীতে পতির অলক্ষ্যরূপে অনুরাগের অঙ্কুরোৎপত্তি হইতেছে, তাহার সৌন্দর্য্যচাতুর্য্য কিছুই নাই, স্বামীর নিকটে চাতুর্য্যে তাহা বুঝাইয়া দেয়। তাহার দ্বারাতেই অঙ্কুরের সমূলে উৎপাটন হয়। শুনিয়াছি, সে কালের কলিকাতাবাসী কোনও বিখ্যাত ধনীর বিদগ্ধা পত্নী পতির দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিয়া সেই স্থানেই ফাঁদ পাতিয়াছিলেন এবং সেই ফাঁদে ফেলিয়াই সেই উদ্দাম বলোদৃপ্ত শার্দ্দূলকে হস্তগত করিয়াছিলেন। কাব্যও সেইরূপ অমুক কার্য্য করিবে, অমুক কার্য্য করিবে না, স্পষ্টাক্ষরে বলে না। কিন্তু আখ্যানোক্ত পাত্রদিগের মধ্যে সদ্‌বৃত্ত ও অসদ্‌বৃত্তের চরিত্র এত স্পষ্ট করিয়া চিত্রিত করে, এবং তাহার উত্তরফল—কল্যাণ ও অকল্যাণ এত স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেয় যে, কাব্যের পাঠক ও দর্শকের পাপে প্রবৃত্তি জন্মে না, পুণ্যে প্রবৃত্তি জন্মে। দুঃখের বিষয়, বঙ্গ-সাহিত্যে সেই ভারতীয় আদর্শের তিরোধান হইয়াছে,—চণ্ডীমণ্ডপে আজ শঙ্খঘণ্টার পরিবর্ত্তে 'ক্লারিওনেট' বাজিতেছে; সীতাসাবিত্রীর আসনে আজ কুন্দনন্দিনী উপবিষ্টা!

আমরা কালিদাসের একটি শ্লোকের একটি চরণ বুঝাইতে যাইয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। অনেক কথা বলিবার আছে। কাব্যে যে পর্য্যাপ্তপরিমাণে দার্শনিকতা আছে, তাহার দিঙ্‌মাত্র উদাহরণ এখনও প্রদর্শিত হয় নাই।

কালিদাস রঘুবংশের আরম্ভে যে পার্ব্বতীপরমেশ্বরের বন্দনা করিয়াছেন, তাহাতে আছে,—"বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ"—শব্দ ও অর্থের ন্যায় পরস্পর পরস্পরের সহিত নিত্যসম্বন্ধে সম্বন্ধী। নৈয়ায়িকেরা সমবায় নামে একটি নিত্যসম্বন্ধ স্বীকার করেন; কিন্তু নৈয়ায়িক মতে শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ সমবায় বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। সাংখ্যাচার্য্যের ন্যায় মীমাংসক কার্য্যকে নিত্য বলেন না, কিন্তু কার্য্যের ধারাকে নিত্য বলেন। কার্য্যব্যক্তির বিনাশে কার্য্যধারার বিনাশ হয় না। ধারা থাকিলে সেই সেই শ্রেণীর অর্থ থাকিল। মীমাংসকগণ এই ভাবে অনুমানপ্রমাণের বলে অর্থের নিত্যতা-সাধন করিয়াছেন। মহাপ্রতিভাশালী নৈয়ায়িক-চূড়ামণি উদয়নাচার্য্য স্বকৃত কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে "বর্ষাদিবদ্ ভবোপাধিঃ"—

ইত্যাদি কারিকার দ্বারা মীমাংসকের সেই অনুমানে ব্যভিচার-উদ্‌ভাবনের উদ্দেশে দুইটি উপাধি দিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, সেই উপাধি দুইটির মধ্যে একটিও মীমাংসকের উদ্‌ভাবিত সেই অনুমানকে স্পর্শ করিয়া দোষদুষ্ট করিতে পারে নাই। শব্দ নিত্য; এই সম্বন্ধে মীমাংসকের প্রদর্শিত যুক্তি অনেক; বাহুল্যভয়ে সেইগুলি এই স্থলে উদ্ধৃত করিব না। দুইটি একটিমাত্র দেখাইব।

ভারতীয় দার্শনিকদিগের ভিতরে কেহই শব্দকে বায়ুর গুণ বলেন না। শব্দ আকাশের গুণ, অধিকাংশ দার্শনিকের এই মত। "অযাবদ্দ্রব্যভাবিত্ব"—এই হেতু নির্দ্দেশ করিয়া নৈয়ায়িকেরা শব্দ বায়ুর গুণ নয়, সিদ্ধান্ত করিয়া শব্দসমবায়ী কারণ আকাশকে স্থির করিয়াছেন। "অযাবদ্দ্রব্যভাবিত্ব" কি, আমাকে আর তাহা বুঝাইতে হইবে না। সে ভার অন্যের হস্তে অর্পিত। কাব্যের সহিত দার্শনিকতার সম্বন্ধ আছে, সেইটুকুমাত্র আমি বলিব। মীমাংসকেরা বলেন,—শব্দ আকাশের গুণ স্বীকার করিলে, শব্দকে নিত্য বলিতে হইবে। নৈয়ায়িকমতে, ঈশ্বর, আত্মা, দিক্, কাল, আকাশ, বিভু, এবং শব্দ একটি বিশেষ গুণ। এতগুলি বিভুর মধ্যে কেবল আত্মার অদৃষ্ট আছে, অন্যের নাই। সুতরাং অদৃষ্টসমানাধিকরণ বিভুবিশেষগুণত্বকে হেতু করিয়া শব্দকে নিত্য বলিতে পারি। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, ঈশ্বরের ইচ্ছাকে উপস্থাপিত করিতে পারি। দুর্গসিংহও এই যুক্তিমূলে "যথাসিদ্ধমাকাশং" লিখিয়াছেন। শব্দকে দ্রব্য বলিবারও যুক্তি আছে। সেই সকল বিষয়ের অবতারণা করিয়া সভ্যবৃন্দের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে চাহি না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, সুসভ্য ইউরোপে বসিয়া মনীষী পণ্ডিতগণ যে সময়ে নানারূপ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের আবিষ্কার করিয়া সমস্ত সুসভ্য জগৎকে তরঙ্গিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই সময়ে ভারতীয় পণ্ডিতেরা "তাল পড়িয়াই শব্দ হয়, কি শব্দ হইয়াই তাল পড়ে", কেবল তাহারই অবধারণ করিবার জন্য সময়ক্ষেপ করেন নাই। তাঁহাদিগের আলোচনার ভিতরে যুক্তিতর্কের সমাবেশ আছে। এই স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, বিজ্ঞান কাহাকে বলে? ইংরাজি 'সায়েন্স' শব্দেরই ত যোড়াতালি দিয়া বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আদর্শ বিজ্ঞানের লক্ষণ কি? বিজ্ঞানের মূলে কি প্রমাণ নাই? প্রমাণের দ্বারা অর্থাব-ধারণের নাম বিজ্ঞান হইলে ভারতীয় পণ্ডিতেরা প্রমাণ দ্বারা কি অর্থের

অবধারণ করেন নাই? তবে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র বিজ্ঞানের অন্তর্গত নয় কেন, বুঝি না। যদি হ্যাট, কোট, প্যাণ্টালুন, সার্ট, নেকটাই, কলার বসনভূষণে বিভূষিত শ্বেতাঙ্গ পুরুষের যন্ত্রবলে সিদ্ধান্তের উন্নমনের নাম বিজ্ঞান হয়, তবে বলিতে পারি, নিউটনের মাধ্যাকর্ষণশক্তি-আবিষ্কারের নামও বিজ্ঞান নয়, ডাক্তার বসুর আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের মূলেও বিজ্ঞান নাই। সুতরাং অবনতকন্ধরে স্বীকার করিতে হইবে, অশ্বথবৃক্ষের ছায়ায় পাতিত কুশাসনে বসিয়া নগ্নদেহ রঘুনাথ শিরোমণি তালপত্রে বাকারীর কলমে পত্র-বিশেষের রসে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, সেইগুলিও বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। এবং সে দিনেও যে উৎকলীয় পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রশেখর সামান্য দুইগাছি তৃণের সাহায্যে বর্ত্তমান সময়ে শুক্রগ্রহ হইতে মঙ্গলগ্রহ কত দূর ব্যবধানে অবস্থিত, অবধারণ করিতেন,—তাহাও বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। আরও বলিব, যাঁহারা শব্দকে 'নিত্য' বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারা 'শব্দের পরে তাল পড়ে', এই মাত্র বলেন না; তাঁহাদের মতে, নিত্য শব্দ প্রাদুর্ভূত হইয়া বায়ুরাশিতে পরমাণুপুঞ্জে তরঙ্গের উদ্ভব করে, এবং সেই তরঙ্গেই পরমাণু-দ্বয়ের সংযোগ, সেই সংযোগেই দ্ব্যণুকের উৎপত্তি হয়, ক্রমে ত্রসরেণুর উৎপত্তি, তাহা হইতেই আবার ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি পর্য্যন্ত সাধিত হয়। তাঁহারা শব্দকে 'ব্রহ্ম' পর্য্যন্ত বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাই মহাকবি ভবভূতি "শব্দব্রহ্মবিদো বিদুঃ" বলিয়াছেন; আবার রামায়ণকে শব্দব্রহ্মের "বিবর্ত্ত" বলিয়াছেন। ভবভূতি অনেকবার বিবর্ত্ত শব্দেরও ব্যবহার করিয়াছেন। বেদান্তদর্শনের আগাগোড়া এই বিবর্ত্তবাদ। বেদান্ত না জানিলে বিবর্ত্ত কি জানা যায়? ডারউইনের (Darwin) এভোলিউসন (Evolution Theory) বিবর্ত্ত নয়। এই স্থলে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের নিকটে আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তাঁহারা পাশ্চাত্য বিদ্যার অনুশীলনে যে সুদীর্ঘ সময় ব্যয়িত করেন, তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের নিত্যনিষেবিত, নিত্য-আরাধিত, নিত্য-ধ্যাত সংস্কৃত বিদ্যার অনুশীলনেও সেই সময়ের দশমাংশ নিয়োজিত করুন। তাহা হইলে, যে অর্থে যে শব্দের শক্তি আছে, বঙ্গভাষায় অন্ততঃ সেই অর্থে তাহার ব্যবহার হইবে।

লিখিত ভাষায় শব্দের উক্তরূপ অপব্যবহার অমার্জ্জনীয়। অবশ্য, কথ্য ভাষায় এইরূপ নূতন নূতন অর্থে শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে। যেমন পূর্ব্বে কথ্য ভাষায় 'কন্যা' অর্থে 'ঝি' শব্দ ব্যবহৃত হইত, এক্ষণে 'দাসী' অর্থে 'ঝি' শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও ননদকে বুঝাইতে ঠাকুরঝি

শব্দের ব্যবহার আছে। কিন্তু কেবল অর্থতঃ (হাব, ভাব, চাল, চলন লইয়া) নয়, শব্দতঃও ইংরাজীর অনুকরণ অন্তঃপুরে পর্য্যন্ত ঢুকিয়াছে। স্বামীর সহিত যাহার যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ ধরিয়াই যেমন গৃহিণীরা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে অল্পকাল পরেই যে 'ঠাকুরঝি' 'দিদি' হইয়া দাঁড়াইবে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। এই স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, যদি কথ্য ভাষা ও লেখ্য ভাষা এক করা যায়, তবে কোনও গ্রন্থকারের কথ্য ভাষায় লিখিত গ্রন্থের ঠাকুরঝি শব্দকে লইয়া ভবিষ্যৎ বংশধরেরা বড়ই গোলে পড়িবে। নাটোরের বিখ্যাতা রাজকুমারী তারাকে সেকালের লোকে 'তারা ঠাকুরঝি' বলিত। কবিশ্রেষ্ঠ ভারতচন্দ্র বিদ্যাকে 'রাজার ঝি' বলিয়াছেন। যদি কোনও গ্রন্থকার লেখেন, 'তারা ঠাকুরঝির সর্ব্বজয়াব্রতের উদ্‌যাপনে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী, মিথিলার সমস্ত পণ্ডিত প্রচুরপরিমাণে দান দক্ষিণা পাইয়া আপ্যায়িত হইয়াছিলেন,' তাহা হইলে ভাবী প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ভারতচন্দ্রের সেই প্রাচীন লিপি ও এই নবীন গ্রন্থকারের এই নবীন লিপি দেখিয়া কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন? তাঁহারা নিশ্চয় সিদ্ধান্ত করিবেন যে, তিন শত বৎসর পূর্ব্বেও বঙ্গদেশে এত সংস্কৃত চর্চ্চা ছিল যে, একটি চাকরাণী পর্য্যন্ত পাণ্ডিত্যের স্পর্দ্ধায়, সাহসে ভর করিয়া পণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিল যে, তাহার সহিত তর্কযুদ্ধে যে বিজয়ী হইবে, তাহাকেই সে বরমাল্য প্রদান করিবে। আর সেকালের পণ্ডিতদিগের এইরূপ সংকীর্ণতা ছিল না; তাঁহারা অনায়াসে চাকরাণীর অনুষ্ঠিত ব্রতের বরণ লইয়াছিলেন, এবং অম্লানবদনে তাহার দান দক্ষিণা গ্রহণ করিয়াছিলেন! এই প্রসঙ্গে আমরা এ কথাও বলিতে পারি যে, সুদূর ইউরোপনিবাসী বা এই ভারতবর্ষের ভিন্নপ্রদেশবাসী যদি সেইরূপ কলিকাতার কথ্য ভাষায় লিখিত পুস্তক পাঠ করিয়া বাঙ্গলা শিখেন, তবে তাঁহাকে বাখরগঞ্জে গিয়া ফাঁপরে পড়িতে হইবে। যদি প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষাকে লেখ্যভাষায় পরিণত করা যায়, তবে বিদেশীর পক্ষে সেই সমস্ত ভাষা শিখিতে অনর্থক কত দীর্ঘ সময় নষ্ট হইবে, ভাবিবার বিষয়। অন্যের দ্বারা নিজের কার্য্যের সহায়তা অবলম্বনের জন্য এবং পরস্পরের ভাব-বিনিময়ের জন্য ভাষার প্রয়োজন। সঙ্কীর্ণ ভাষার দ্বারা সংকীর্ণতার সৃষ্টি করিলে সেই অবলম্বনের—সেই বিনিময়ের ব্যাপকতা ভঙ্গ হয়, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবেন।

বৈষ্ণব সাহিত্য এক সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া উৎকল, বিহার ও কামরূপকে বাঙ্গালার ভিতরে টানিয়া লইয়াছিল। আজ ২।১ জন গ্রন্থকারের প্রাদেশিক

ভাষায় রচিত গ্রন্থ দেখিয়া তাহারা পৃথক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা দেশের *সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য, চিন্তা করিবার বিষয়।* প্রাচীন ভারতেও প্রাদেশিক কথ্য ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃত ভাষা ছিল। তৎসত্ত্বেও সম্রাট অশোক ভিন্ন তৎ তৎ দেশের নৃপকবৃন্দ রাজকীয় কার্য্যে সেই সেই ভাষার ব্যবহার করিতেন না। করিতেন না বলিয়া আজ আমরা তাঁহাদিগের প্রদত্ত তাম্রশাসন দেখিয়া মন্দিরে, স্তম্ভে, গিরিগাত্রে ও গিরিগুহায় উৎকীর্ণ শ্লোকমালা বিলোকন করিয়া প্রত্নতত্ত্বা-বধারণে সাহসী ও সমর্থ হইতেছি।

পঠদ্দশায় প্রখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় অধ্যাপক বালশাস্ত্রীর সহিত আমি সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তিনি সংস্কৃতে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন,—"আপনাকে সংস্কৃত বলিতে হইবে না। বাঙ্গালায় বলিলেই আমি বুঝিব। অন্য প্রাদেশিক ভাষার মত বাঙ্গালা ভাষা দুর্ব্বোধ্য নহে। সংস্কৃতশব্দবহুল বাঙ্গালা ভাষা সুখবোধ্য। বাঙ্গালা ভাষার কেবল সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহৃত বিভক্তি কয়েকটি নাই; আর সমস্ত আছে।" সেই মহাপণ্ডিতের মুখে এই ভাবে বাঙ্গালা ভাষার প্রশংসা শুনিয়া তদবধি আমার বাঙ্গালা ভাষার উপরে শ্রদ্ধাভক্তি জন্মে। তদবধি আমি বাঙ্গালাভাষার যথাশক্তি সেবা করিবার জন্য আত্মোৎসর্গ করি।

সংস্কৃত ভাষার প্রশংসা কিসের জন্য? সংস্কৃতে প্রচুরপরিমাণে ধাতু আছে। এই ধাতুবৈভবে আমরা নিত্য নূতন শব্দ প্রস্তুত করিতে সমর্থ। সংস্কৃতে সমাস-বন্ধন আছে। এই সমাসবন্ধনের বলে আমরা নবীনার্থের প্রতিপাদক নবীন শব্দের সৃষ্টি করিতে সমর্থ। যে কোনও ভাষায় লিখিত যে কোনও গভীর ভাষার প্রবন্ধ বা পুস্তক হউক না কেন, আমরা বিশুদ্ধ সংস্কৃতে তাহার অনুবাদ করিতে পারি। সেই ধাতুবৈভবে, সেই সমাসবন্ধনের বলে, প্রবন্ধ-কলেবরের হ্রাসবৃদ্ধিতেও আমাদিগের স্বচ্ছন্দ অধিকার আছে। সংস্কৃতে যেমন একটি অর্থের অনেক শব্দ আছে, অন্য কোনও ভাষায় সেরূপ নাই। আমরা যখন যে রসের বর্ণনা করিতে যাই, সংস্কৃতে এক অর্থে অনেক শব্দ আছে বলিয়া, অনায়াসে সেই বর্ণনায় সেই রসের অনুকূল বর্ণমালায় গ্রথিত শব্দের ব্যবহার করিতে পারি। অর্থোপলব্ধি না হইলেও শব্দসামর্থ্যে শ্রোতা সেই রসে অভিষিক্ত হয়। আবার এক শব্দের অনেক অর্থ আছে; তাহা দ্বারা আমরা বিবিধ অলঙ্কারে কবিতা-সুন্দরীকে সাজাইতে পারি।

অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকবালিকার ও তাহার সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়া কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ তাহার পুরুষপরম্পরা-রক্ষিত বহুমূল্য অলঙ্কার—চুণি পান্না হীরায় বিজড়িত, রত্নখচিত অলঙ্কার প্রথমেই নীলামে চড়ায়; সেইরূপ ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত, ইংরাজি ভাবে ভাবিত, কেহ কেহ বালিকা বঙ্গভাষার অভিভাবক, সাজিয়া তাহার অঙ্গ হইতে মাতৃদত্ত অলঙ্কারের উন্মোচন করিতে চান।

বলিতে বলিতে শ্লেষালাঙ্কারের উদাহরণস্বরূপ দুই একটি পুরাতন গল্প মনে পড়িল,—নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়ের সহিত নিজের গোশালা দেখিতে গিয়াছিলেন। রাজার গোশালায় ভাল ভাল পশ্চিমা গাভী ছিল, আবার মহিষী ছিল। রাজা বলিলেন, "দেখুন, কেমন মহিষী! আপনি মাহিষ-দুগ্ধ পান করেন ত?" তর্কবাগীশ হাসিয়া বলিলেন, "ভাল হইবে বই কি! মহারাজের মহিষী যে! স্বয়ং মহারাজ মহিষীর দুগ্ধ পর্য্যাপ্তরূপে পান করেন, বাঁচিলে ত তর্কবাগীশ পাইবে।"

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বৰ্দ্ধমান হইতে প্রত্যাগত গোপাল ভাঁড়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গোপাল, বৰ্দ্ধমান কেমন দেখিলে?" গোপাল উত্তরে বলিল, "বৰ্দ্ধমান বেশ, মন্দ নয়, এই রকমেরই। এখানে যেমন হস্তিশালা, অশ্বশালা, রাজাশালা, দেওয়ানশালা আছে, সেখানেও তেমন রাজাশালা, দেওয়ানশালার মত বহু শালা আছে। কেবল এখানকার মত পণ্ডিতশালা নাই।" কেবল মুখের কথায় নয়, সেকালের কাব্যেও আমরা শ্লেষালঙ্কারের সদ্ভাব দেখিতে পাই। "কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত, ব্যক্ত চরাচর, যাঁহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর।" "গোত্ররে প্রধান পিতা মুখবংশ-জাত।"—"ধনি, আমি কেবল নিদানে"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সুকবি রবীন্দ্রনাথের অনেক গানে অনেক কবিতায় শ্লেষালঙ্কার আছে। কিন্তু সেইগুলি শব্দশ্লেষ নহে, অর্থশ্লেষ। শব্দ-শ্লেষে শব্দের পরিবর্ত্তনে আর সে অলঙ্কার থাকে না, অর্থশ্লেষে থাকে। ভাষান্তর করিলেও থাকে। শব্দালঙ্কারমাত্রেরই একটু বিশেষত্ব, সে পরিবর্ত্তন সহিতে পারে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সংস্কৃত শব্দ-রাশি লইয়াই বঙ্গভাষা। সুতরাং সংস্কৃত শ্লিষ্ট শব্দ লইয়া বাঙ্গালায় শ্লেষ হইতে পারে, আবার খাঁটী বাঙ্গালা শব্দ লইয়াও বাঙ্গালায় শ্লেষের ব্যবহার হইতে পারে।

যাঁহারা মাতৃসমৃদ্ধিতে ঐশ্বর্য্যশালিনী বঙ্গভাষাকে দেখিয়া ঐশ্বর্য্যশূন্য করিয়া দীনা করিতে চান, যাঁহারা বিদেশের দৃষ্টান্তে বঙ্গভাষাকে অলঙ্কারশূন্য করিয়া বিধবার বেশে সাজাইতে চান, তাঁহাদিগকে বলিবার কিছুই নাই। পাশ্চাত্য জগতের

মহাকবি মিল্‌টনও ভারতীয় রীতিতে কবিতাসুন্দরীকে সাজাইয়াছেন, স্পষ্ট দেখাইতে পারি।

অবশ্য রূপকে (নাটকে) পাত্রবিশেষের মুখে প্রাদেশিক শব্দেরই ব্যবহার সঙ্গত। তাই বলিয়া পণ্ডিতের মুখে, রাজার মুখে, মন্ত্রীর মুখে প্রাদেশিক শব্দের ব্যবহার সঙ্গত নয়। গভীর বিষয়ের বক্তৃতা করিতে যাইয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে উন্মাদনা আনিতে ইচ্ছা করিয়া যদি কেহ প্রাদেশিক ভাষায় বক্তৃতা করেন, সে বক্তৃতা জলের মত উপরে উপরে ভাসিয়া যায়, ক্ষুদ্র নদীর ক্ষুদ্র বীচির মত তাৎকালিক ক্ষুদ্রভাবের সৃষ্টি করিয়া পাদমূলমাত্র স্পর্শ করিয়া চলিয়া যায়। আবার যে বক্তৃতায় শব্দের ঝঙ্কার আছে, ডম্বর-বন্ধ আছে, গুম্ফনকৌশল আছে, সে বক্তৃতা কর্ণমূল স্পর্শ করিয়া উপরে উপরে ভাসিয়া যায় না। অগাধ, অকূল ফেনিল জলনিধির হিমাদ্রিশৃঙ্গস্পর্দ্ধী উচ্চ উত্তাল শুভ্রমুক্তাবর্ষী তরঙ্গের মত গভীর মেঘগর্জ্জনে ছুটিয়া সভ্যমণ্ডলীকে আপ্লাবিত করিয়া ফেলে, আকুল করিয়া ফেলে, অধীর করিয়া তুলে, মুহূর্ত্তের মধ্যে আকাশে তুলিয়া ভূমিপৃষ্ঠে উৎক্ষিপ্ত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে শরীরের সমস্ত গ্লানি, মনের সমস্ত অবসাদ লইয়া চলিয়া যায়। সেইরূপ বক্তৃতা ভিন্ন মনে অভূতপূর্ব্ব ভাবাবেশ হয় না, তেজের সঞ্চার হয় না, উন্মাদনা আসে না। তেজঃসঞ্চার করিতে হইলে তেজস্বিনী ভাষার প্রয়োজন। ওজোগুণ না থাকিলে ভাষার তেজস্বিতা হয় না। সংস্কৃতবহুল বাক্যের প্রয়োগ ভিন্ন ভাষায় ওজোগুণ আসে না।

যাঁহারা কথ্য ভাষাকে লেখ্য ভাষা করিতে চান, তাঁহারাও কখনও ধর্ম্মকে 'ধম্ম' উচ্চারণ করেন না। পুরন্ধ্রীবর্গের অনেকের মুখে, অশিক্ষিত ইতরশ্রেণীর সর্ব্বসাধারণের মুখে, ধম্মই আমরা শুনিতে পাই। ইহা দ্বারা কি বুঝিব, প্রকৃত শব্দ কি অবধারণ করিব? অক্ষম জিহ্বায় উচ্চারিত, বিকৃত শব্দকে শব্দ-সমাজের আসনে বসাইলে ইংরেজের উচ্চারিত 'টুমি'কেও তুমির আসনে বসাইতে হয়। মহামনা বঙ্কিমচন্দ্রও সর্ব্বত্র টেকচাঁদী ভাষার অনুবর্ত্তন করেন নাই; স্থানবিশেষে তাঁহার লেখনী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষাকে পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়া সমাসবহুল বাক্যের সৃষ্টি করিয়াছে। মহাকবি রবীন্দ্রনাথের গানেও আমরা সংস্কৃত শব্দরাশির সমাবেশ দেখিতে পাই। তাঁহার কৃত প্রাচীন সাহিত্য নামক গ্রন্থও আমাদের কথার সম্যক্ সমর্থন করিবে। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, যাঁহাদিগের সংস্কৃত ভাষায় ও সংস্কৃত ব্যাকরণে সম্যক্ বুৎপত্তি নাই, তাঁহাদিগের কৃত সমাসগ্রন্থি, তাঁহাদিগের কৃত সন্ধিবন্ধ প্রবন্ধের গৌরববৃদ্ধি করে না; প্রত্যুত সেই প্রবন্ধের সঙ্গে

সঙ্গে ভাষায় আবর্জ্জনা আনয়ন করিয়া ভাষাকে কলুষিত করে। ভাবগৌরবে যদি সেই প্রবন্ধের, সেই পুস্তকের সমাজে আদর হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে সংক্রামক পীড়ার ন্যায় সেই দুষ্ট গ্রন্থন যে নবীন লেখকদিগকে আক্রান্ত করিয়া ভাষাকে আক্রমণ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সংস্কৃতানভিজ্ঞ লেখকগণ অনবধানতাবশতঃ লেখনী-চালনায়, লেখনীর আঘাতে ভাষাসুন্দরীর লাবণ্যোচ্ছ্বসিত অনিন্দ্যসুন্দর দেহের নানা স্থানে যে পূযশোণিতপূর্ণ ক্ষতের সৃষ্টি করিয়া সৌন্দর্য্যের ক্ষতি করিতেছেন, দুর্ভাগ্য-বশতঃ ব্যাকরণ-বিভীষিকা দ্বারা তাঁহাদিগের সেই সমস্ত ভ্রম প্রদর্শিত হইলেও, মোহ-বশে তাঁহারা বুঝেন না। তর্কবিদ্যার লীলাক্ষেত্র বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া তর্কে কেন তাঁহারা হটিবেন? তাঁহাদিগের সেই অশুদ্ধ-পদমালা-রক্ষার জন্য বলিয়া উঠিবেন,—"ইহা সংস্কৃত ভাষা নহে, বাঙ্গালা ভাষা। ইহাতে সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্র খাটিবে কেন?" উত্তরে বলিতে পারি—সমাস ও সন্ধি কাহার? যাহার নিকট হইতে সন্ধি, সমাস গ্রহণ করিয়াছ, তাহার নিয়ম মানিবে না—ইহা কেমন? ডাক্তারী ঔষধ খাইবে, অথচ ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ মানিবে না; রসায়নবিজ্ঞান না জানিয়া নিজেই প্রেস্‌ক্রুপ্‌সন্ করিলে যে দোষ হয়, এ স্থলে তাহাই হইবে। আমরা আবার বলিতেছি, কাব্যে সর্ব্বশাস্ত্রের সম্বন্ধ রহিয়াছে।

"সূর্য্যের কিরণ যেমন ক্রমে চন্দ্রের একটি দুইটি করিয়া সমস্ত কলায় সংক্রান্ত হইয়া ক্রমে সমস্ত কলাকে আলোকিত করে, দিলীপের গুণগুলিও সেইরূপ রঘুতে সংক্রান্ত হইতেছিল।"—এই শ্লোকটিতে জ্যোতিষের সিদ্ধান্ত নিহিত রহিয়াছে। "চন্দ্রের মধ্যস্থল হইতে সার অংশ গ্রহণ করিয়া বিধাতা তাহা দ্বারা দময়ন্তীর মুখ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই গহ্বর এখনও চন্দ্রে বিদ্যমান। যাহাকে সাধারণে কলঙ্ক বলে।" এই শ্লোক দেখিয়াও আমরা জ্যোতিষবিদ্যারই নিদর্শন পাই। আবার "বয়ঃস্থা নাগরাসঙ্গাৎ" ও ভবভূতির "পুটপাকপ্রতীকাশ"—ইত্যাদি শ্লোক দেখিলে চিকিৎসাশাস্ত্রের স্মরণ হয়। "মূর্চ্ছনাং বিস্মরন্তী"—দেখিয়া সঙ্গীতের কথা মনে পড়ে।

যেমন সর্ব্বশাস্ত্রের কথা কাব্যে আছে, সেইরূপ সর্ব্বত্র সর্ব্বশাস্ত্রে কাব্যের ছায়া পড়িয়াছে। যে দেশে মন্ত্রে ছন্দঃ, ব্যাকরণে ছন্দঃ, অভিধানে ছন্দঃ, ন্যায়ে ছন্দঃ, দর্শনে ছন্দঃ, ইতিহাসে ছন্দঃ, দানপত্রে ছন্দঃ, সেই ছন্দঃপ্রিয় দেশে যে সর্ব্বত্র কাব্যের সমাবেশ থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কি আছে? এই যে সর্ব্ব-প্রথমে মন্ত্রের উল্লেখ করিলাম, সেই মন্ত্র পাঠ করিয়া দেখুন, তাহাতে মহাভাবের সমাবেশ আছে, রসের উচ্ছ্বাস আছে, শব্দগ্রন্থনের কৌশল আছে, শব্দঝঙ্কার,

অলঙ্কারের ঝঙ্কার আছে, রচনা-গাম্ভীর্য্য আছে ; বুঝিয়া পাঠ করিলে অশ্রু, পুলক, রোমাঞ্চ, স্বেদ—সমস্তই হইয়া থাকে। কাব্য ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি করিতে পারে ? উপনিষদে তাহা হয়, তন্ত্রে তাহা হয়, পুরাণে তাহা হয়, ইতিহাসে তাহা হয়, সুতরাং কি করিয়া বলিব, সেগুলি কাব্য নয় ? এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মনু-সংহিতা শুনিয়া অতীত যুগের ব্রাহ্মণগণ যে মনু-ব্যবস্থিত এই কঠোর নিয়মগুলি পালন করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম রক্ষা করিতেন, আজ আমরা প্রলোভনের বশে বহির্জগতের চাকচিক্যে মোহিত হইয়া সেই পবিত্র ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ হইতে বিচ্যুত হইতেছি,—ইহা স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন। আমি তদবধি স্মৃতিশাস্ত্রকেও কাব্যের অন্তর্নিবিষ্ট করিতে অভিলাষী হইয়াছি। ভাস্করাচার্য্যের লীলাবতীর ভিতরেও কাব্য আছে।

যাহা হউক, এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর পুস্তক কাব্যের অন্তর্গত হউক বা না হউক, সাহিত্যের অন্তর্গত হইবেই। আমি বারান্তরে সাহিত্য শব্দ লইয়া অনেক আলোচনা করিয়াছি। এবার আর সেই সমস্ত বলিয়া উদ্‌গীর্ণের উদ্‌গিরণ করিব না। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার যে সাহিত্য শব্দের অর্থ করিয়াছেন, সে শব্দ গ্রন্থ-বিশেষের পারিভাষিক শব্দ। 'সহিতের ভাব' এই অর্থে যখন সহিত শব্দের উত্তরবর্ত্তী তদ্ধিত 'যেন্‌' প্রত্যয়ে সাহিত্য শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, তখন নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, সাহিত্যের অর্থ আর কিছুই নয়, সাহিত্যের অর্থ—সাহচর্য্য। কার্য্য-কারণে সাহচর্য্য আছে, হেতুসাধ্যে সাহচর্য্য আছে। দুই হইতে অর্ব্বুদ সংখ্যা পর্য্যন্ত সাহচর্য্য আছে, জ্ঞানমূলক জ্ঞানেও সাহচর্য্য আছে। বাক্যান্তর্গত পদরাজির মধ্যেও সাহচর্য্য আছে, পরমাণুপুঞ্জের সাহিত্যে জগতের উৎপত্তি ; সুতরাং ন্যায় ও বৈশেষিকে সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত। সাংখ্যের সত্ত্ব, রজঃ, তমের সাহিত্যে জগতের উৎপত্তি, সুতরাং সাংখ্যেও সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত। নৈয়ায়িকের ব্যাপ্তি সাহিত্য। সাংখ্যাচার্য্যের প্রকৃতি পুরুষের মিশ্রণও সাহিত্য। বেদান্তের জীবে অজ্ঞানোপহতিও সাহিত্য। দার্শনে সাহিত্য আছে, জ্যোতিষেও সাহিত্য আছে। পরস্পর এক সূত্রে গ্রথিত মালার ন্যায় গ্রহ উপগ্রহ যে অসীম, অনন্ত আকাশের মধ্যে নিজ নিজ কক্ষায় নিত্য নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে, ইহার ভিতরেও পরস্পরের সাহিত্য রহিয়াছে। গণিতে সাহিত্য আছে, চিকিৎসাবিদ্যায় সাহিত্য আছে, রসায়নে সাহিত্য আছে, ইতিহাসে সাহিত্য আছে, সঙ্গীতে সাহিত্য আছে, কাব্যে সাহিত্য আছে, চিত্রে সাহিত্য আছে, ভাস্কর্য্যে সাহিত্য আছে ; এমন কি, ব্যাকরণে পর্য্যন্ত সাহিত্য আছে। ভগবান

পাণিনি তরঙ্গসঙ্কুল শব্দসমুদ্রে সাহিত্য দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাই তিনি বিশৃঙ্খলার ভিতরে শৃঙ্খলা আনিতে পারিয়াছিলেন। একমাত্র সাহিত্যই বিশৃঙ্খলার ভিতর শৃঙ্খলা আনিতে পারে, ধ্বংসের ভিতরে সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইয়া দিতে পারে, সৃষ্টির ভিতরে ধ্বংসের ভীমভৈরব ভেরীনিনাদ শুনাইতে সমর্থ হয়। যিনি গ্রন্থ-অধ্যাপনার সময়ে গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয়ের মধ্যে পরস্পরের সাহিত্য বুঝাইতে পারেন, বহির্বিষয়ের সহিত গ্রন্থ-প্রতিপাদ্যের কতটুকু সাহিত্য আছে—বুঝাইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত অধ্যাপক। আর যে ছাত্র তাহা বুঝিতে পারে, সেই প্রকৃত ছাত্র। তাহারই অধ্যয়ন সফল। নয় ত অধ্যয়ন অধ্যাপনা—উভয়ই একান্ত বিফল। কোন্ তালের সহিত কোন্ রাগের কতটুকু সাহিত্য আছে বুঝিতে না পারিলে, সপ্তস্বরের পরস্পর সাহিত্য বুঝিতে না পারিলে, নৃত্যের সহিত গীতের সাহিত্য বুঝিতে না পারিলে, সঙ্গীত বুঝা হইল না; বর্ণের সাহিত্য—রেখার সাহিত্য বুঝিতে না পারিলে চিত্রবিদ্যায় জ্ঞান হইল না।

জ্ঞানবাচক লাটিন 'স্যায়েন্টিয়া' শব্দ হইতে 'সায়েন্স্' শব্দের উৎপত্তি। 'সায়েন্স্' শব্দ হইতে 'সায়েনটিফিক্' শব্দ নিষ্পন্ন। এখন যে 'সায়েন্টিফিক্' শিক্ষার কথা শুনিতেছি, এই শিক্ষা সর্ব্বত্র আছে। জ্ঞানমূলক জ্ঞানের শিক্ষা ভারতীয় সর্ব্বশাস্ত্রে আছে। যে যে শাস্ত্রে এই সাহিত্যের সাহচর্য্যের শিক্ষা আছে, লক্ষণাবলে সেই সেই শাস্ত্রকেও সাহিত্য বলা হয়। সুতরাং শাস্ত্রমাত্রেরই নাম সাহিত্য। এই সাহিত্যরূপ ব্যাপক ধর্ম্ম সর্ব্বত্র আছে বলিয়া সকলের মধ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের মিল আছে। আবার যে যে বিশেষ বিশেষ শাস্ত্র বা বিদ্যা নিজের নিজের যতটুকু ব্যাপ্য ধর্ম্ম, বিশেষত্ব গ্রহণ করিয়াছে, সেই সেইটুকু লইয়া পরস্পরে পরস্পরের মিল নাই। যেমন প্রাণিসাধারণের ব্যাপকধর্ম্ম প্রাণিত্ব। এই প্রাণিত্ব লইয়া মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ এক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আবার সেই প্রাণিত্বের ব্যাপ্য-ধর্ম্ম মনুষ্যত্ব, পশুত্ব, পক্ষিত্ব প্রভৃতি। তাহা তাহা লইয়া মনুষ্য প্রভৃতি পৃথক পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। এই সাহিত্যের ভিতরেই আমরা কাব্য দেখি, ব্যাকরণ দেখি, অভিধান দেখি, কাব্যের উপযোগী ছন্দঃ ও অলঙ্কার দেখি, গণিত দেখি, জ্যোতিষ দেখি, ইতিহাস দেখি, বেদ, তন্ত্র, উপনিষৎ, স্মৃতি, পুরাণ, দর্শন—সমস্তই দেখি। তাই আমরা এই সাহিত্য-সম্মিলনে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে সমর্থ, তাই সাহিত্য-পরিষৎ ও সাহিত্য-সভায় সকল বিষয়ের আলোচনা হইতেছে।

কার্য্য-কারণ-ভাবের অবধারণ লইয়াই দর্শন-শাস্ত্রের প্রবৃত্তি। কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধও সাহিত্য-বিশেষ। সুতরাং সামান্য সাহিত্যের ভিতরে দর্শনশাস্ত্রের অন্তর্নিবেশ, আবার ন্যায়বৈশেষিক আরম্ভবাদ লইয়া, সাংখ্য পরিণামবাদ লইয়া, বেদান্ত বিবর্ত্তবাদ লইয়া পৃথক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাব্যেও পরস্পর সঙ্গতি আছে, পরস্পরের সহিত পরস্পরের সাহিত্য আছে; কিন্তু দর্শনাদি শাস্ত্র হইতে কাব্যের বিশেষত্ব রস লইয়া। দর্শন তর্কমূলে খাঁটী বিষয়ের অবধারণ করে; ইতিহাস অতীত সত্য বিষয়ের যথাযথ বর্ণন করে; কাব্য নানা বর্ণের সমাবেশ করিয়া তাহাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলে; রচয়িতা যে তাহাতে মন্ত্রশক্তিবলে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, রসস্বরূপ আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা বুঝাইয়া দেয়—এইটুকুই কাব্যের বিশেষত্ব। এইরূপ কাব্য সংস্কৃতে যথেষ্ট আছে; বাঙ্গলায় নাই বলিতে পারি না—আছে; কিন্তু পরিমাণে অল্প। যদিও মাসিকপত্রের সদ্ভাবে, মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাবে, কি গদ্যে কি পদ্যে রাশি রাশি কাব্যের সৃষ্টি হইতেছে, কিন্তু সেই সমস্ত কাব্যেই কি কাব্যের আত্মা আছে? এই জন্য বলিতেছি,—সংখ্যায় অল্প। দিন দিন ছোট গল্পলেখকের সংখ্যা হু হু করিয়া বাড়িতেছে; মাসিক-পত্রিকার পত্র উদ্‌ঘাটন করিলে একটি নয়, দুই তিনটি ছোট গল্প আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু পড়িলেই বুঝা যায়, তাহার মধ্যে অধিকাংশ লেখকেরই মৌলিকতার অভাব। অধিকাংশ ছোট গল্পই জীবিত বা মৃত পাশ্চাত্য লেখকগণের ছোট গল্পের অনুবাদ। ইহার অর্থ আর কিছুই নয়, গল্প প্রস্তুত করিতে হইলে যে কল্পনা আবশ্যক, চিন্তা আবশ্যক, অলস লেখক সেই পরিশ্রমটুকু করিতে নারাজ। অনুবাদেরও আবশ্যকতা আছে; কিন্তু তাহা ছোট গল্প লইয়া নয়, গভীর বিষয় লইয়া। জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের তর্ক-বিদ্যার অনুবাদ হউক, আবশ্যকতা আছে; কার্লাইল, মেকলে, ইমার্সনের 'এসে'র (essays) অনুবাদ হউক, আবশ্যকতা আছে; প্লেটো ও হেগেলের প্রতিষ্ঠিত দর্শনের অনুবাদ হউক, আবশ্যকতা আছে; কিন্তু ছোট গল্প, যাহা প্রস্তুত করিবার জন্য প্রতিভাবান্ লেখক বাঙ্গালায় বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তাহার জন্য আবার ইংরেজী গল্পের অনুবাদ কেন? তুমি অসমর্থ হও, ছাড়িয়া দাও। সকলেরই একরূপ কার্য্য করিতে হইবে, এরূপ নয়। অন্য কার্য্যের যদি মৌলিকতা দেখাইতে পার, তাহা কর; অনুবাদে সমর্থ হও, হেগেল ইমার্সনের অনুবাদ কর।

তার পর ছন্দোবদ্ধ কবিতা। ছন্দোবদ্ধ কবিতারও বড়ই ছড়াছড়ি

দেখিতেছি”। কিন্তু সমস্তই এক বিষয়ে, সমস্তই প্রেমগাথা। লজ্জার কথা, গৃহলক্ষ্মীরা পর্য্যন্ত পত্রিকায় প্রেমগাথা গায়িতেছেন। অশ্লীল কবিতা কাহাকে বলে? অশ্লীল শব্দ থাকিলেই যদি অশ্লীল কবিতা হয়, তবে শান্তি-শতক, বৈরাগ্যশতকও অশ্লীল হইয়া পড়ে। অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিচার করিতে চাই না; এই পর্য্যন্ত বলিতে চাই যে, যে কাব্য মনের ভাবকে কলুষিত করে, সেই অশ্লীল। এই হিসাবে বিদ্যাসুন্দরকেও তত অশ্লীল না বলিলে না বলিতে পারি। কারণ, কবি বিদ্যার পণে বীজবপন করিয়া প্রথমে বিদ্যার সহিত সুন্দরের বিবাহ দেওয়াইয়াছেন; আর রৈবতক, কুরুক্ষেত্রে অন্য ভাব দেখি। রৈবতকে, কুরুক্ষেত্রে বাসুকি-ভগিনী জরৎকারুর সহিত মহর্ষি দুর্ব্বাসার বিবাহ হইয়াছে। সেই পরিণীতা জরৎকারুর হস্তে সেই বৃদ্ধ স্বামীর লাঞ্ছনা ও কৃষ্ণের জন্য জরৎকারুর কুরুক্ষেত্র-সমরে হত ও আহতের সহিত মৃতের ন্যায় শয়ন, এবং শ্রীকৃষ্ণের নিকটে দয়ামূর্ত্তি কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রার মুখে জরৎকারুর চিরপোষিত অবৈধ প্রণয়পূরণের প্রস্তাব ও অনুরোধ, এগুলিকে মুক্তকণ্ঠে সহস্রবার বলি—অশ্লীল। পত্রিকায় যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা বাহির হয়, সেই সমস্ত কবিতার অধিকাংশ কবিতার মধ্যে আমরা এইরূপ প্রণয়ের একটা ইঙ্গিত পাই। যেমন নিয়ত মিষ্টরস গ্রহণ করিতে জিহ্বা অসমর্থ, যেমন অবিচ্ছিন্ন মধুর বংশীধ্বনিও কর্ণে মধুবর্ষণ করে না, সেই-রূপ বিরতিশূন্য প্রেমকাহিনী শুনিতেও কর্ণ অনিচ্ছুক; সেইরূপ ধারাবাহী প্রেমগান কর্ণে অমৃতবৃষ্টি করে না। সেই জন্য অন্য রসের অবতারণারও আবশ্যকতা আছে।

একদিন উত্তর-গোগৃহের মহাসমরে দেবদত্ত শঙ্খের ভীম গর্জ্জনে বিরাটপুত্র উত্তর বীর হইয়াও চেতনা হারাইয়াছিল, প্রতিপক্ষ বীরগণ যুদ্ধের জয়ের আশা নাই অবধারণ করিয়াছিল; একদিন মধুসূদনের মুখমারুতে প্রপূরিত হইয়া দেবদত্ত শঙ্খের সহিত পাঞ্চজন্য শঙ্খ প্রলয়পয়োনিধির ঘোর গর্জ্জনে বিশ্ববিজয়ী মহারথদিগকে পর্য্যন্ত ভীত, স্তম্ভিত, রোমাঞ্চিত, স্বেদখিন্ন ও বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, সে গম্ভীর গর্জ্জন কি আর কবির মুখে শুনিব না? চিরদিনই কি বীণার নিক্কণ, বেণুধ্বনি ও নূপুরশিঞ্জিত শুনিব? বাঙ্গালীর শক্তি নাই—বলিতে পারি না। সে দিনেও ত মেঘনাদবধে বাঙ্গালীর মেঘমন্দ্র গভীর ভেরীনিনাদ শুনিয়াছি। আর শুনি না কেন? এই জন্যই দুঃখ হয়।

যাঁহারা বলেন, আহারের পরে বিশ্রাম-কেদারায় অর্দ্ধশয়নাবস্থায় ধূমপানের

মত কবিতার প্রয়োজন; তাঁহাদিগের সহিত আমরা একমত হইতে পারি না। ভিন্ন দেশে তাহা হইতে পারে, ভারতে তাহা নয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আবার বলিতেছি, বেদ, তন্ত্র, উপনিষদ, স্মৃতি, পুরাণ যেমন, অন্তর্মুখীন কবিতাও সেইরূপ অন্তর্মুখীন। ভারতের সঙ্গীত যেমন স্বরের লহর তুলিয়া অন্তরে টানিয়া লয়, ভারতের কবিতাও তেমনই ভাবের তরঙ্গ ছুটাইয়া অন্তরে টানিয়া লয়। ভারতের চিত্র ভারতের ভাস্কর্য্য যেমন চক্ষুঃ ও মুখের ভাবে অন্তর্দৃষ্টি বুঝাইয়া দেয়, ভারতের কবিতাও সেইরূপ অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া দেয়। ভারতের জ্যোতিষ যেমন গ্রহ উপগ্রহ দেখাইতে দেখাইতে সত্যালোকে লইয়া যায়, গণিত যেমন এক দুই করিয়া গুণিতে গুণিতে সংখ্যাতীতের সমাচার ঘোষণা করে, কবিতাও সেইরূপ এ রস সে রস বলিতে বলিতে রসস্বরূপ ব্রহ্মের পরিচয় প্রদান করে। সেই জন্য বলিতেছি, কাব্য খেলার সামগ্রী,—আয়াসের সামগ্রী নয়। কাব্য দিব্যচক্ষুর উন্মীলক, ব্রহ্মসত্তার পরিজ্ঞাপক। এইরূপ বিশিষ্ট ভাব আছে বলিয়া সহস্র চিত্রের মধ্যে ভারতীয় চিত্রকে টানিয়া বাহির করিতে পারি; এইরূপ বিশিষ্ট ভাব আছে বলিয়া সহস্র কবিতার মধ্য হইতে ভারতীয় কবিতার অবধারণ করিতে পারি। বিদেশে যাহাকে রোম্যান্টিক (Romantic) কাব্য বলে, এদেশীয় পণ্ডিতেরা তাহাকেই ধ্বন্যাত্মক কাব্য বলিয়াছেন। বাচার্থের উপলব্ধি হইতেছে না, এমন কাব্যকে রোম্যান্টিক বা ধ্বন্যাত্মক কাব্য বলিতে পারি না। তাহা হইলে প্রসাদ গুণকে জলে ভাসাইতে হয়। বাচ্যার্থের উপলব্ধি না হইলে অক্ষম কবির ভাষায় অস্ফুটতারই দ্যোতনা হয়। যে কাব্য পরিস্ফুটরূপে বাচ্যার্থের উপলব্ধি করাইয়া, শব্দে যাহা নাই, বাক্যে যাহা নাই, ইঙ্গিতে এমন আর একটি অর্থ বুঝাইয়া দেয়, এবং সেই বাচ্যার্থ অপেক্ষা সেই অর্থের যদি চমৎকারিতা থাকে, তাহাকেই ভারতীয় পণ্ডিতেরা ধ্বনিকাব্য বলিয়াছেন।

কাব্যে যে দার্শনিকতা আছে, বিদেশে তাহার সম্যক্ উপলব্ধি হয় নাই। এজন্য তাঁহারা রোম্যান্টিক কাব্য কি লক্ষণনির্দ্দেশ দ্বারা বুঝাইতে পারেন নাই; কিন্তু নিজে অনুভব করিয়াছেন। বাঙ্গালায় ধ্বন্যাত্মক কাব্য আছে, প্রচুর পরিমাণে নাই, বাড়াইতে হইবে। বাঙ্গালায় অলঙ্কারশাস্ত্র আছে, আলস্য-প্রধান বাঙ্গালী তন্দ্রাপ্রিয় বাঙ্গালী তাহা পড়িতে যাইয়া মস্তিষ্কের ব্যায়াম করিতে অসম্মত। বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের সামর্থ্য নাই বলিতে পারি না; তাঁহারা

যে কোনও জটিল বিষয়ে পরীক্ষা দিতে যাইয়া যখন গুরুপুত্রদিগকে পর্য্যন্ত কখনও কখনও পশ্চাৎপদ করিতে সমর্থ হয়েন, তখন যে তাঁহারা অলঙ্কার শাস্ত্র বুঝিবেন না, বলিতে পারি না। বাঙ্গালী কেমন পাঠের সময়ে শিক্ষার সময়ে অপরিসীম পরিশ্রম করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আর পরিশ্রম করিতে চায় না। মস্তিষ্কচালনা আছে বুঝিলেই, বুদ্ধির ব্যায়াম আছে বুঝিলেই, কেমন সুন্দরভাবে সেই ক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়ায়! অনেক দিন হইল "ন্যায়-মুকুল" মুদ্রিত হইলেও, ভাষাপরিচ্ছেদ মুক্তাবলী বঙ্গভাষায় অনূদিত ও প্রচারিত হইলেও, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট সেই সেই পুস্তকের আদর হইল না; এই জন্য শারীরক সূত্র ও ভাষ্যের সুবৃহৎ বঙ্গানুবাদ পণ্যশালার এক কোণে পতিত হইয়া কীটদষ্ট হইতেছে; এই জন্য তত্ত্বকৌমুদীর ও পাতঞ্জলভাষ্যের অনুবাদগ্রন্থ শ্রাদ্ধবাসরে দানের সহিত ব্রাহ্মণপণ্ডিতের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে।—তাই বলিয়া আমাদিগের হতাশ হইলে চলিবে না, আলস্যের প্রশ্রয় দিলে হইবে না। নিদ্রিত সমাজকে জাগাইতে হইবে, শয্যাশয়ানসমাজের সুখসুপ্তি ভাঙ্গিতে হইবে। সাহিত্য-সভায় দার্শনিক বিষয়ের আলোচনা আছে, সাহিত্য-পরিষদে নাই। সাহিত্য-পরিষদে ও সাহিত্য-সম্মিলনে পুনঃ পুনঃ জটিল বিষয়ের আলোচনা করিয়া দার্শনিক বিষয়ের পুনঃ পুনঃ অবতারণা করিয়া বাঙ্গালীর রুচি সেই দিকে পরিবর্ত্তিত, প্রবর্ত্তিত, প্রবর্দ্ধিত করিতে হইবে; সাহিত্য-সভায় দার্শনিক বিষয়ের আলোচনা আরও বাড়াইতে হইবে; প্রত্যেক বাঙ্গালা মাসিকপত্রিকায় একটি দুইটি দার্শনিক প্রবন্ধ লিখিতে হইবে; বঙ্গসাহিত্যে তরল বিষয়ের অবতারণা কমাইয়া গভীর বিষয়ের অবতারণা করিতে হইবে।

বঙ্গসাহিত্যে এখনও অনেক বিষয়ের অভাব আছে। আমি জানি, বাৎস্যায়ন-ভাষ্যের অনুবাদ আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু নব্য ন্যায়ের অনুবাদ করিতে কেহই অগ্রসর হয়েন নাই। মীমাংসা দর্শনের অনুবাদ হয় নাই; সিদ্ধান্তজ্যোতিষের অনুবাদ হয় নাই। অনেক পুরাণের অনুবাদ হইয়াছে; রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃত অনেক স্মৃতিতত্ত্বের অনুবাদ হইয়াছে; একাদশী তত্ত্বের অনুবাদ হয় নাই। এ স্থলে স্বর্গীয় পণ্ডিত হৃষীকেশ শাস্ত্রী মহাশয়ের জন্য বড়ই শোকসন্তপ্ত হইতেছি। তিনি রঘুনন্দনের তর্কজটিল মীমাংসাগুলি জলের মত বঙ্গভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি জীবিত থাকিলে, আমরা অনেক গভীর তত্ত্ব বাঙ্গালায় পাইতাম। ভর্ত্তৃহরি কৃত "বাক্যপদীয়" "বৈয়াকরণভূষণসার"—ব্যাকরণসম্মত দার্শনিক মতের প্রতিপাদক গ্রন্থ, "মহাভাষ্যে"র স্থানে স্থানে ব্যাকরণের দর্শনবাদ

আছে। এই সমস্ত গ্রন্থের বাঙ্গালায় অনুবাদ হওয়া চাই। বৌদ্ধ দর্শনের ও জৈন দর্শনের বাঙ্গলায় অনুবাদ নাই। বাঙ্গলায় তাহা জানিতে হইবে। হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সারের মত বিদেশীয় চিন্তাশীল পণ্ডিতদিগের কি দর্শন, কি বিজ্ঞান, কি অর্থনীতি, কি সমাজনীতি—ইত্যাদি সমস্ত মতবাদেরই বাঙ্গালায় অনুবাদ চাই।

বাঙ্গালাভাষায় বিনয়নম্রতার বড় অভাব,—বিদেশীর মুখে, ভারতের বিভিন্ন দেশবাসীর মুখে প্রায়ই এইরূপ শুনিতে পাই। তাঁহারা তাহার উদাহরণস্বরূপ বলিয়া থাকেন,—"ইংরেজীতে আছে,—আমি আপনার সময়ের উপর আক্রমণ করিতেছি।—হিন্দীতে আছে,—আপ কিস্ নামসে ভূষিত হ্যায়?—বাঙ্গলায় এরূপ কবিত্বপূর্ণ বিনয় নাই।" আমরা তাহা বলি না, বাঙ্গলায় আবার অন্য বিষয়ে ইহা অপেক্ষা কবিত্বপূর্ণ বিনয় অনেক আছে। যাহা হউক, শুধু বিনয় নয়, অন্যান্য বিষয়েও শিক্ষা আছে, এ জন্য মহাকবি সেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকগুলির, প্রসিদ্ধ কবি ও দার্শনিক গেটের নাটকাদির যথাযথ কাব্যাকারে ও চাঁদকবির হিন্দী "পৃথ্বীরাজ রাসৌ" কাব্যের যথাযথ কাব্যাকারে বাঙ্গালায় অনুবাদ হওয়া আবশ্যক। প্রাচীন কবি হোমারের ইলিয়াডেরও বাঙ্গলায় অনুবাদ আবশ্যক। তাহা দ্বারা প্রাচীন ইতিহাসের কথঞ্চিৎ উদ্ধার হইবে, গ্রীকের সহিত ভারতের ধর্ম্মে, আচারে, ব্যবহারে কতটুকু সম্বন্ধ ছিল, তাহাও ব্যক্ত হইবে।

সাহিত্য-পরিষৎ বাঙ্গলা সাহিত্যের সংগ্রহ করিয়া অদম্য উৎসাহে ইতিহাসের আহরণ করিতেছেন; বরেন্দ্র-অনুসন্ধানসমিতি এক জন মুক্তহস্ত, শিক্ষিত রাজকুমারের ধনবল, জনবল, বুদ্ধিবলে, এক জন বিশেষজ্ঞের নেতৃত্বে, দেবমূর্ত্তি, প্রস্তরফলক, তোরণফলক, তোরণস্তম্ভ আহরণ করিয়া আহৃত লিপিমালার অর্থের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ইতিহাস-উদ্ধারের যত্ন করিতেছেন। এজন্য আশা করি, অজ্ঞানমলিন, ধূলিধূসর বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস অচিরে মার্জ্জিত হইয়া, অগ্নিপরীক্ষায় পরিশুভ্র হইয়া নিজের উজ্জ্বলালোক লোক-লোচনের সমীপে উপস্থাপিত করিবে। এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, প্রাচীন খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী লিপি পাঠ করিতে পারেন, বাঙ্গালীর ভিতরে এমন দুই তিনটীমাত্র উদ্যমশীল, শিক্ষিত যুবক দেখিতেছি। তাঁহাদিগকে দৃষ্টান্ত করিয়া এই লিপিতত্ত্ববিদ্যার শিক্ষাবিস্তার আবশ্যক। অল্প দিন হইল, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মনস্বী লেখকের চিন্তাপ্রসূত বাঙ্গলাভাষার ব্যাকরণ বাহির হইয়াছে। বাঙ্গলাভাষার প্রকৃতির ও গতির নির্দ্ধারণের জন্য, পালী, প্রাকৃত ও সংস্কৃতের সহিত সম্বন্ধ-নির্ণয়ের প্রয়োজন

হইয়াছে। ভুয়োদর্শন দ্বারা অক্ষরপরিবর্ত্তনের দোষশূন্য নিয়মের আবিষ্কার একান্ত আবশ্যক। তাহা দ্বারা কেবল শব্দতত্ত্ব বুঝিব, এমন নয়, প্রাচীন ইতিহাসও পরিস্ফুটরূপে পরিব্যক্ত হইবে। উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারি, ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে ভারতে পূর্ব্বে নাটক ছিল না, গ্রীকের সম্বন্ধে ভারতে নাটক আসিয়াছে। রামায়ণে অযোধ্যাবর্ণনে যে নাট্যশালার উল্লেখ আছে, তাহা বোধ হয় তাঁহারা প্রক্ষিপ্ত বলিতে চাহেন। মহাকবি ভাসের "স্বপ্নবাসবদত্ত" প্রভৃতি নাটক প্রচারের পর অবশ্য তাঁহাদিগের সেই সিদ্ধান্ত ভিত্তিশূন্য হইয়া পড়িতেছে। ভাষাতত্ত্বের বিশ্লেষণেও আমরা সুদূর প্রাচীন ভারতে অভিনয়ের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির উপলব্ধি করিতে পারি। বাঙ্গলাভাষায় ব্যবহৃত "বিটলে" শব্দে আমরা "বিটে"র নিদর্শন দেখিতে পাই। রঙ্গপুরবাসী ইতর লোকের ভাষায় "মাতামহী"কে বুঝাইতে অম্বাজাত "আম্বী" শব্দের ব্যবহার ও নান্দীজাত "নান্দ্য" শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাই। এজন্যও আমাদিগের ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করিতে হইবে। কবিকঙ্কণ-চণ্ডী ও চৈতন্য-চরিতামৃতে যেমন তিন চারি শত বর্ষ পূর্ব্বের সমাজচিত্র দেখিতে পাই, সেইরূপ সেই সেই যুগের সমাজচিত্র রামায়ণে আছে, মহাভারতে আছে, পরবর্ত্তী কালের কাব্যনাটকেও আছে। কেবল ভারতীয় রাজা ও রাজপুরুষের ইতিহাস সংগ্রহ করিলে ভারতের ইতিহাস হইবে না; ভারতীয় নরনারীদিগের তাৎকালিক ধর্ম্ম, নীতি, আচার, ব্যবহার—সমস্তই বঙ্গভাষায় আনিয়া লোকলোচনের সমক্ষে ধরিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে, সংস্কৃত-সাহিত্যের সেবা আবশ্যক।

এই যে হবির্গন্ধি, অবিচ্ছিন্ন হোমধুম ব্যোমতলে তরঙ্গে তরঙ্গে ক্রীড়া করিয়া তপোবনের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে; এই যে আশ্রমমূলে প্রবাহিতা গঙ্গা, যমুনা, সরযূ, রেবা, গোদাবরী, তমসার সলিলসিক্ত ধূপধূমবাহী কুসুমসুরভি-স্নিগ্ধ সমীরণ আশ্রমগমনোন্মুখ পথিকের ত্রিতাপদগ্ধ হৃদয়কে স্পর্শ করিয়া ভক্তির পবিত্র ধারা বহাইতেছে, এই যে আশ্রমতরুর আলবালে বিহঙ্গমবিহঙ্গমীরা নিঃশঙ্ক-চিত্তে মুনিকন্যাদিগের কলসোন্মুক্ত জলধারা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছে; এই যে উটজপ্রাঙ্গণে নিঃশঙ্কশয়ানা হরিণী কৃষ্ণসারের শৃঙ্গে কণ্ডুয়িত হইয়া অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে সুখে রোমন্থন করিতেছে; এই যে উটজদ্বারে যূথে যূথে শাবকানুসৃত হরিণহরিণী মুনিপত্নীদিগের ভাগে ভাগে হস্তদত্ত নীবাররাশি ভক্ষণ করিতেছে; এই যে স্নিগ্ধ বটচ্ছায়ায় উপবিষ্ট মুনিকুমারদিগের সামগানের স্বরতরঙ্গে আকৃষ্ট পক্ষিকুল ও শ্বাপদকুল পরস্পরের হিংসা ভুলিয়া মন্ত্রমুগ্ধের

ন্যায় চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; আর ঐ যে মেদিনী বুক চিরিয়া, সমুদ্র অগাধ জলরাশি সরাইয়া, পর্ব্বত নিজের গুহাদ্বার উন্মুক্ত করিয়া, যাঁহার চরণে নিয়ত রাশি রাশি মহার্ঘ রত্ন উপহার দিতেছে; যক্ষ, রক্ষ, দৈত্য, দানব সসম্ভ্রমে যাঁহাকে কর যোগাইতেছে; সেই সসাগরা সদ্বীপা সকাননশৈলা বসুধার অধীশ্বর ঐ যে মহিষীর সহিত ক্রীতদাসের ন্যায় হোমধেনুর সেবা করিতেছেন, সে কালের এই চিত্র, অতীত যুগের এই চিত্র কাব্যে ভিন্ন কোথায় পাইব? পূজনীয়া মুনিপত্নীদিগকে আদর্শ করিয়া সেকালের গৃহিণীরা যে মুক্তহস্তে পশুপক্ষীকে পর্য্যন্ত অকাতরে অন্ন দিয়া দয়ার উৎস ছুটাইয়া দিতেন; সে কালের ক্ষুৎক্ষাম দরিদ্র গৃহীরা পর্য্যন্ত মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে উপস্থিত অতিথিকে নিজের অন্ন দিয়া দেবনির্ব্বিশেষে পূজা করিতেন; আর যাঁহারা তৈলাভাবে নিজে অন্ধকারে থাকিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে জগৎকে আলোকিত করিতেন, নির্জনে বসিয়া যোগনিষ্ঠ হইয়া চিন্তাসমুদ্রের উন্মথনে বিবিধ বিদ্যার নানাবিধ রত্ন উদ্ধরণ ও আহরণ করিয়া জগৎকে বিলাইয়া দিতেন; নিজের জীবিকার জন্য একটিও রাখিতেন না; বুদ্ধিবলে, মন্ত্রণাবলে, শক্তিবলে অন্যকে রাজসিংহাসনে বসাইয়া নিজে পর্ণ-কুটীরে বাস করিতেন; সেই জ্বলদগ্নিপ্রভ তপ্তকাঞ্চনকান্তি বিদ্যুৎপুঞ্জ, একমাত্র জগতের হিতব্রতে সমাধিস্থ, লোভশূন্য জগদ্‌গুরু ব্রাহ্মণ কোথায়? রাজা-ধিরাজের মস্তকস্থ মণিময় মুকুট যাঁহার চরণস্পর্শ করিতে ভীত, সেই জগৎপূজ্য ব্রাহ্মণ আজ কোথায়?

সেই অতীত যুগের, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের কাব্যপ্রদর্শিত ব্রাহ্মণের আদর্শ-ঋষির আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া শিক্ষা করিলে ব্রাহ্মণের সেইরূপ মালিন্যশূন্য-তেজঃ-পূর্ণ ব্রহ্মণ্য ফুটিয়া বাহির হইবে, জগতের গুরুগিরি করিতে আবার ব্রাহ্মণের সামর্থ্য জন্মিবে, ঋষিপত্নীদিগের আদর্শ গ্রহণ করিলে আবার ভারত সীতা-সাবিত্রীর পরমপবিত্রচরণ স্পর্শে ধন্য হইবে, প্রত্যেক গৃহ—রাজপ্রাসাদ হইতে দরিদ্রের পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত একসুরে এক লক্ষ্যে বাঁধা হইয়া প্রপূত তপোবনে পরিণত হইবে। যতই কেন ঘুরাইয়া ফিরাইয়া রাখি না, কম্পাসের কাঁটা সেই এক দিকে, এক উত্তর দিকেই মুখ রাখিয়া অবস্থিতি করিবে। এককে ছাড়িয়া যেমন শত, সহস্র, অযুত, নিযুত, খর্ব্ব, নিখর্ব্ব, অর্ব্বুদ, কিছুই হয় না, এক হইতে যেমন নয় পর্য্যন্ত যাইয়া আবার একে উপনীত হইতে হয়, একের পরে যেমন শূন্য ভিন্ন আর কিছুই নাই, শূন্যের উপরে প্রাসাদ-কল্পনার মত যেমন মিছামিছি খর্ব্ব, নিখর্ব্ব গণা হয়; কৃষ্ণদ্বৈপায়নের উপদেশে ভারত তাহাই বুঝিয়াছে।

আদর্শ পুরুষ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের আদেশে "ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা"—ভগবানের এই আটটি বিভিন্ন প্রকৃতি জানিয়া একের সঙ্গে যোগ নয়টি গুণিয়া আবার একে উপস্থিত হইবার শিক্ষা লাভ করিয়াছে। আদর্শশূন্য শিক্ষা ভারতের নয়, লক্ষ্যশূন্য গতি, গন্তব্যশূন্য ধাবন ভিন্ন দেশের হইতে পারে, উন্নতির শেষ নাই, ভিন্ন দেশের সিদ্ধান্ত; এ দেশের নয়।

একদিন তমসাতীরে রক্তাক্ত-কলেবর বিহঙ্গকে দেখিয়া বিহঙ্গমীর আর্ত্তনাদে ব্যথিত-হৃদয় হইয়া যে স্বচ্ছন্দচারী বনবিহঙ্গম উন্মুক্ত কলকণ্ঠে করুণ রসের মূর্চ্ছনায় আকাশ ভাসাইয়াছিল, রাজপ্রাসাদে পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গম বহুকাল শিক্ষা করিয়াও কি সেই সুরে গাহিতে পারিয়াছে? তাই বলি, ঋষির আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। ব্রহ্মমুখ-কমলবন-বিহারিণী মরালীকে মহর্ষি কি মন্ত্রে আবাহন করিয়া পৃথিবীতে আনিয়াছিলেন, বেদের অনুষ্টুপ ছন্দকে শোকগাথার শ্লোকে পরিণত করিয়াছিলেন; সে মন্ত্র লিখিতে হইবে, সেই মন্ত্রবলে আবার সংস্কৃতরূপ সত্যলোক হইতে বঙ্গভাষারূপ মর্ত্তলোকে তাহার ভাবরাশি আনিতে হইবে।

রাজাধিরাজ ভারতসম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের শাসনকালে জ্ঞানের আলোচনায় আমাদিগের অবাধ প্রসার রহিয়াছে। বঙ্গে ও ভারতে নানা জাতির সমাবেশ, নানাধর্ম্মাবলম্বীর অধিবাস, আমরা বঙ্গবাসী এক আস্থানগৃহে পাশাপাশি ভাবে বসিতে বা দাঁড়াইতে অসমর্থ। এক বাণীর আরাধনায়, বাণীর অর্চ্চনায় আমরা বঙ্গবাসী হিন্দু, ব্রাহ্ম, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টিয়ান—সকলে ভ্রাতৃভাবে মিলিয়া মিশিয়া সরস্বতীর পবিত্র মণ্ডপে একত্র সমবেত হইতে পারি। তাই, আজ আমরা সরস্বতীর পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি ভরিয়া ফুল লইয়া পবিত্রচিত্তে এক সঙ্গে এক মণ্ডপে এই সাহিত্য-সম্মিলনে উপস্থিত হইয়াছি। আমাদিগের সেই ব্যাস বাল্মীকির আরাধিতা, কালিদাস ভবভূতির অর্চ্চিতা সরস্বতীও আজ বাঙ্গালীর পূজা লইবার জন্য বাঙ্গালীর বেশে, বঙ্গভাষা-বেশে সম্মুখে অধিষ্ঠিতা। সভ্যগণ, ভ্রাতৃগণ, সৌভাগ্যের দিন উপস্থিত; মন্ত্র পাঠ করিয়া মায়ের চরণে অঞ্জলি দান করুন; শতসহস্র ঘৃতপ্রদীপ জ্বালিয়া মায়ের আরত্তি করুন; আর যিনি শঙ্খ বাজাইতে জানেন, তিনি এক সুরে মঙ্গলশঙ্খ বাজাইয়া দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করুন।

কি বলিতে কি বলিলাম, জানি না। সঙ্গীতজ্ঞ পিতা অনুপস্থিত, সঙ্গীতে অনভিজ্ঞ পুত্র পিতৃগৃহে প্রবেশ করিয়া পিতার পতিত বীণা ক্রোড়ে তুলিয়া এখানে সেখানে সকল তারে এক এক বার আঘাত করিয়া দেখিল, বীণায় লুক্কায়িত বীণার

প্রকৃত সুর বাহির হইল না। আমারও বুঝি সেই দশা ঘটিয়াছে। এখানে সেখানে নানা স্থানে আঘাত করিলাম, সাহিত্যের প্রকৃত সুর বুঝি বাহির করিতে পারিলাম না। "সীদামি" বলিয়া উপবিষ্ট হইয়াছি, "উৎসীদামি" বলিয়া এখন উঠিয়া পড়ি, আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন।

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন।

ইতিহাস-শাখার সভাপতির অভিভাষণ।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের বর্ত্তমান অধিবেশন, সপ্তম অধিবেশন। কিন্তু ইহা নানা কারণে নব-পর্য্যায়ের প্রথম অধিবেশন নামেই কথিত হইবার যোগ্য। যে সদাশয় রাজপুরুষ, বাঙ্গালীর অকৃত্রিম কল্যাণ-কামনায়, জ্ঞানোন্নতির উৎসাহবর্দ্ধন করিয়া, সকলের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাপূর্ণ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সেই মহানুভব লর্ড কারমাইকেল মহোদয় স্বয়ং স্বস্তিবাচন করিয়া, এই অধিবেশনের মঙ্গলদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। যে রাজনগর বহু-বিবুধ-সমাবাসিত ভারত-ভূমির অভিনব জ্ঞানকেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, সেই কলিকাতা-রাজনগর এই অধিবেশনের অধিষ্ঠানক্ষেত্র। যাঁহারা বঙ্গভূমির অলঙ্কার ও বঙ্গসাহিত্যের ধুরন্ধর, তাঁহারা সকলেই এই রাজনগরে বাস করিয়া, রচনা-প্রতিভায় বঙ্গসাহিত্যকে বিশ্ব-সাহিত্যসমাজে সম্মানাস্পদ করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহাদের সমাগম-সৌভাগ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে যে নবজীবন-স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছে, এই অধিবেশনের সকল বিভাগেই তাহার অবিরল রসধারা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল কারণে, বঙ্গসাহিত্যের ক্রমোন্নতির ইতিহাসে, এই অধিবেশনের কথা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এরূপ অধিবেশনে,—ইতিহাস-বিভাগের আলোচনায়,—আমার ন্যায় পল্লীনিবাসী কর্ম্মক্লান্ত অবসরশূন্য নগণ্য ব্যক্তিকে সভাপতিপদে বরণ করিয়া, আপনারা যেরূপ সমাদর প্রদর্শন করিয়াছেন, আমাকে তাহার যোগ্যপাত্র মনে করিয়া, আমার আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিবার উপায় নাই। তথাপি আপনাদের আজ্ঞা "অবিচারণীয়া" বলিয়া,—অযোগ্য হইলেও,—আমাকে আজ্ঞা পালন করিতে হইয়াছে। আপনাদের সাহচর্য্যে,—আপনাদের সদ্ভাবপূর্ণ সমীচীন সমালোচনায়, আপনাদের উপদেশে ও দৃষ্টান্তে,—বহুবিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে পারিব, ইহা আমার পক্ষে অল্প প্রলোভনের বিষয় নহে। আপনারা বিবিধ বিভাগের আলোচনার জন্য

স্বতন্ত্র অধিবেশনের ব্যবস্থা করিয়া, সে প্রলোভনকে আরও অনতিক্রমণীয় করিয়া তুলিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন "মিলন এবং মেলন" মাত্রে পরিতৃপ্ত না থাকিয়া, অন্যান্য সভ্যসমাজের সাহিত্য-সম্মিলনের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া, মানব-জ্ঞানের বিবিধ বিভাগের পর্য্যাপ্ত আলোচনার যথাযোগ্য অবসরলাভের জন্য উৎসুক হইয়া উঠিতেছিল; আপনারা এই অধিবেশনে তাহার ব্যবস্থা করিয়া, নবযুগের অবতারণা করিয়াছেন। ইহার জন্য বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ বঙ্গবাসিগণ কৃতজ্ঞহৃদয়ে আপনাদের জয়কীর্ত্তন করিবে। আমি সর্ব্বপ্রথমে সেই কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করিবার সুযোগ লাভ করিয়া পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ করিতেছি।

বঙ্গ-সাহিত্যে সত্য সত্যই এক নূতন যুগের অভ্যুদয় হইয়াছে; নূতন যুগের অভ্যুদয়ে এক নূতন শক্তিও পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। এখন বঙ্গ-সাহিত্যই বাঙ্গালীর প্রকৃত উন্নতিলাভের প্রধান সোপান বলিয়া সর্ব্বত্র মুক্তকণ্ঠে স্বীকৃত হইতেছে। এই নবযুগে, ইতিহাস দিন দিন অধিক মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। এখন পল্লীর ইতিহাস হইতে পৃথিবীর ইতিহাস পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় লিখিত ও প্রকাশিত হইতেছে। যাহা ছিল না, তাহা আসিয়াছে;—দেশের ইতিহাসের জন্য দেশের নরনারীর আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। আপাততঃ ইহাতেই যেন আমরা প্রচুর পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি। সুতরাং কোন্ প্রণালীতে ইতিহাস সঙ্কলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাহা স্থির করিবার প্রয়োজন এখনও অনুভূত হইতে পারে নাই।

আমাদের ইতিহাস নাই, ইতিহাস রচিত হউক। ইহাই এতকাল বলিবার কথা ছিল। সে কথা পুনঃপুনঃ বলা হইয়া গিয়াছে। "যে দেশে গৌড়-তাম্রলিপ্ত-সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, সে দেশের ইতিহাস নাই।" ইহা শত ভাবে শত ধিক্কারে বাঙ্গালীর সাহিত্য-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। এখন আর ইহার পুনরুক্তি করিবার প্রয়োজন নাই। এখন "আমার দেশ" সকলের চিত্তবৃত্তি অধিকার করিয়া, ইতিহাস-সঙ্কলনের প্রশংসনীয় উদ্যমে বঙ্গবাসীকে উৎসাহ-পূর্ণ করিতেছে, এবং একে একে অনেকগুলি "অনুসন্ধান-সমিতি"র জন্ম দান করিয়াছে। এখন কিছু বলিতে হইলে, আর একটু অগ্রসর হইয়া, বলিতে হয়—"ইতিহাস রচিত হয় ত যথাযোগ্য-ভাবে রচিত হউক।" কারণ, ইতিহাসের নামে যাহা তাহা রচিত হইতে থাকিলে, অল্প কালের মধ্যেই আমাদের এই অভিনব উদ্যম অশ্রদ্ধার ও উপহাসের বিষয় হইয়া পড়িবে;—আমাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিবে। এই কথা বলিবার সময় আসিয়াছে বলিয়া, আমি কেবল এই একটি কথা লইয়াই আপনাদের সম্মুখে

উপস্থিত হইয়াছি। বহু সাধকের বহু বর্ষের অবিচলিত সাধনা-প্রভাবে আমাদের ইতিহাসের যে সকল উপাদান ধীরে ধীরে সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহার পুনরুক্তি না করিলেও, তাহা আমাদের নিজস্ব হইয়া থাকিবে। যাঁহারা তাহার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র, তাঁহাদের নামোল্লেখ না করিলেও, তাঁহারা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। ভবিষ্যদ্বংশীয়গণ তাঁহাদের সমস্ত ভ্রম ক্রটী ও অসম্পূর্ণতা তিতিক্ষার সহৃদয় দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া, কেবল তাঁহাদের সাধু উদ্দেশ্যের ও প্রশংসনীয় উদ্যমের যথাযোগ্য জয়কীর্ত্তন করিবে। সুতরাং আমি তাঁহাদের নামের ও প্রত্যেকের কীর্ত্তিকলাপের উল্লেখ করিয়া ধন্য হইবার প্রবল প্রলোভন অতিক্রম করিয়া, আমাদের ভবিষ্যতের কর্ত্তব্য সম্বন্ধেই যৎসামান্য আলোচনার সূত্রপাত করিব। আমাদের ভবিষ্যৎ ধীরে ধীরে জ্ঞানালোকে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে; আমাদের সাহিত্য-বল প্রতিভাসম্পন্ন সাধকগণের দৃঢ় নিষ্ঠায় ক্রমে ক্রমে শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে; ধনকুবেরগণের ও রাজপুরুষগণের নিকট বিবিধ উৎসাহ লাভ করিয়া, আমাদের আশা দিন দিন অধিক পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিতে পারিলে, বঙ্গসাহিত্য যে বিশ্ব-সাহিত্য-সমাজে যথাযোগ্য প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবে, তাহার পূর্ব্বাভাস প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। এই শুভ লক্ষণের সমাদর-রক্ষার জন্যও আমাদিগকে ভবিষ্যতের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত করিতে হইবে।

ইতিহাস-সঙ্কলনের প্রকৃষ্ট প্রণালী স্থির করিবার জন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী বিবিধ উপাদেয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। আমাদের সাহিত্যে এখনও সেরূপ চেষ্টা প্রচলিত হয় নাই। ইতিহাস বলিতে কি বুঝিব,—তাহা এখনও আমাদের দেশে বিলক্ষণ তর্কসঙ্কুল হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং প্রণালী-নির্ণয়ের প্রয়োজন প্রকৃত প্রয়োজন বলিয়া অনুভূত হইতে পারে নাই। এক সময়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতসমাজেও এইরূপ অবস্থা বর্ত্তমান ছিল। "ইংলণ্ডের প্রত্যেক পল্লীর ইতিহাস আছে, ভারতবর্ষের ন্যায় সুবৃহৎ দেশের একখানিমাত্র ইতিহাস নাই," যাঁহারা এই কথা শুনাইয়া স্পর্দ্ধা করিতেন, তাঁহারা এখন বুঝিতে পারিয়াছেন,—তাঁহাদের যাহা আছে, তাহাও ইতিহাস নহে—প্রকৃত ইতিহাস কোনও দেশেই সঙ্কলিত হয় নাই। প্রকৃত ইতিহাস কাহাকে বলে, তাহা কেবল আধুনিক যুগেই,—অল্পদিনমাত্র,—উদ্ভাবিত হইয়াছে।

যাহা পুরাকাল হইতে ইতিহাস নামে মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিল, তাহা

কেবল কতিপয় স্মরণযোগ্য ঘটনাবলীর একদেশদর্শিনী বিবরণমালা ; তাহাতে ব্যক্তি-বিশেষের বা জনসমাজ-বিশেষের জয়পরাজয়-কাহিনীর প্রাধান্য। কাহারও তুষ্টি সম্পাদন করা, অথবা শিক্ষাদান করা, অথবা যুগপৎ এই উভয় কার্য্য, সুসম্পন্ন করা, ইতিহাস-রচনার উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তজ্জন্য তাহা রস-সাহিত্যের অন্তর্গত এক শ্রেণীর সরস আখ্যায়িকার আকার ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহা অবসর-সময়ে চিত্তবিনোদন করিত ;—রচনাশিক্ষার্থীকে উৎকৃষ্ট আদর্শের সন্ধান প্রদান করিত ;—বীরকীর্ত্তির ও অলৌকিক আত্ম-বিসর্জ্জনের সমুজ্জ্বল বর্ণনায় লোকচিত্ত মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিত। তাহা সত্য কি না, কেহ তাহা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজনমাত্র অনুভব করিত না। ভাটের গাথা এবং ইতিহাসের কথা তুল্য ভাবেই পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছিল। যাঁহারা ইতিহাস চাহিতেন, এবং যাঁহারা ইতিহাস রচনা করিতেন, তাঁহারা কেহই পূর্ণাঙ্গ সত্যের জন্য লালায়িত হইতেন না ;—তাঁহারা চাহিতেন রচনালালিত্য, বর্ণনা-মাধুর্য্য, স্বজাতি-গৌরব, স্বপক্ষ-পক্ষপাত, স্বরচিত আত্ম-সম্বর্দ্ধনা। সুতরাং পুরাকালের ইতিহাসে প্রমাণ-উল্লেখের আড়ম্বর দেখিতে পাওয়া যাইত না। মধ্যযুগে ইহার প্রথম পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়। তখন হইতে বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণের উল্লেখ করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইবার সূত্রপাত হয়। তথাপি অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রমাণ গৌণকল্প ছিল ; মুখ্যকল্প ছিল আখ্যায়িকা ;—তাহার সকল কথার সহিত উল্লিখিত প্রমাণের সর্ব্বাংশে সামঞ্জস্য না থাকিলেও, ইতিহাস ক্ষুণ্ণ হইত না। অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে ইতিহাস তাহার চিরপরিচিত ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করিয়া, সমগ্র মানব-সমাজের সহিত সম্বন্ধ-সংস্থাপনার আয়োজন করিতে অগ্রসর হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে তাহাই ক্রমে ক্রমে মানবজ্ঞানের একটি বিশিষ্ট বিভাগ বলিয়া আত্মঘোষণা করিয়াছে। রস-সাহিত্যের মোহ-মদিরা প্রত্যাখ্যান করিয়া, বৈজ্ঞানিক আত্মসংযম অভ্যাস করিতে গিয়া, ইতিহাসকে অনেক বিষয়ে অনেক ত্যাগস্বীকার করিতে হইয়াছে। এখন আর সে দিন নাই। এখন আর ইতিহাস সরস আখ্যায়িকা-রূপে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতে সম্মত হয় না ; এখন তাহা মানব-বিজ্ঞানের উচ্চপদবী অধিকার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। এখন কেবল প্রমাণের প্রাধান্য। যে বিষয়ে প্রমাণের অভাব, সে বিষয়ে ইতিহাস নীরবে থাকিতে বাধ্য। যে বিষয়ের প্রমাণ কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, সে বিষয়ের ইতিহাসও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এখন আর জলপ্লাবন-কাহিনী হইতে কথা আরম্ভ করিবার

প্রথা মর্য্যাদালাভ করিতে পারে না। যাহা গিয়াছে, তাহা গিয়াছে;—তাহার স্থান পূর্ণ করিবার জন্য এখন আর কল্পনা-লোলুপ রচনা-লালিত্যের প্রশ্রয়দান করিবার উপায় নাই। এখন প্রমাণ চাই। প্রমাণ থাকে, ইতিহাস আছে; প্রমাণ নাই, ইতিহাসও নাই। যাহার প্রমাণ আছে,—এখন অথবা ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হইবার আশা ও সম্ভাবনা আছে,—এখন কেবল তাহার দিকেই ইতিহাসের দৃষ্টি দৃঢ়নিবদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং এখন ইতিহাসের প্রধান লক্ষ্য—তথ্যানুসন্ধান। তাহার সহিত লেখনী অপেক্ষা খনিত্রের সম্বন্ধ নিকটতর;—তাহার পক্ষে রচনালালিত্য অপেক্ষা যাথাতথ্য অধিক উপাদেয়। এই অভিনব পরিবর্ত্তন-প্রবাহের অনুসরণ করিতে অসমর্থ হইয়া, আমরা কখনও কখনও আমাদের পূর্ব্বসংস্কারের প্রতিকূল প্রত্যেক প্রমাণ-পর্য্যালোচনার পাশ্চাত্য চেষ্টাকে আমাদের বিরুদ্ধে জাতিগত আক্রমণ মনে করিয়া, আত্মরক্ষার্থ দ্বন্দ্বযুদ্ধে অগ্রসর হইয়া, বিচার-দুর্ব্বলতার পরিচয় প্রদান করি।

এ দিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের অধ্যবসায়-বলে তথ্যানুসন্ধান-কার্য্য যত দূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছে, তাহাতেই বুঝিতে পারা গিয়াছে, (১) প্রমাণ-আবিষ্কারের চেষ্টা, (২) প্রমাণসংগ্রহের ও সংরক্ষণের আয়োজন, এবং (৩) প্রমাণ-পর্য্যালোচনার প্রণালী সমুচিত শিক্ষার ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। সেরূপ শিক্ষার ও অভিজ্ঞতার অভাব থাকিলে, যাহার তাহার উদ্যমে, যথাযোগ্য ভাবে ইতিহাস সঙ্কলিত হইবার সম্ভাবনা নাই। অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় এই শাস্ত্রেও অধিকারি-নির্ণয়ের প্রয়োজন আছে।

আমাদের ইতিহাস যথাযোগ্য ভাবে সঙ্কলিত হউক, এইরূপ একটি সাধু ইচ্ছামাত্র বিজ্ঞাপিত করিয়া, বিজ্ঞতার অন্তরালে আত্মগোপন করিবার উপায় নাই। বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের পক্ষে এই কার্য্যে সহসা সফলতা-লাভের সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না। যথাযোগ্য ভাবে ইতিহাস সঙ্কলিত করিতে যেরূপ শিক্ষার ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের দেশে তাহার অভাব অত্যন্ত অধিক। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এই শ্রেণীর শিক্ষা বিস্তৃত করিবার জন্য লালায়িত ছিল না। ঐতিহাসিক বিচারবুদ্ধি প্রবুদ্ধ করাইবার জন্য চেষ্টা করা অপেক্ষা বহুবিস্তৃত বিবরণভারে মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত করিবার চেষ্টাই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য চেষ্টায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল। তাহার শিক্ষা-প্রণালী পুরাতন যুগের পরিত্যক্ত প্রণালীর অনুসরণ করিতে গিয়া, স্থিতিশীল থাকিবার জন্য যত্নশীল হইয়াছিল। অতি অল্পদিন হইতে তাহার বিবিধ

অসুবিধা অনুভূত হইয়াছে; এবং আরও অতি অল্পদিন হইতে যে সকল অভিনব ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে, তাহা এখনও আশানুরূপ ফল প্রসব করিবার অবসর লাভ করে নাই। সুতরাং আমাদের দেশে যেরূপ শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত আছে, তাহাকে-ইতিহাস সঙ্কলনের পক্ষে যথাযোগ্য অভিজ্ঞতা জন্মাইবার অনুকূল বলিয়া বর্ণনা করা যায় না।

এরূপ অবস্থায় আমাদের দেশে যাঁহারা কিছু কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন, আমাদের দেশের একান্ত অভাবের মধ্যে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা সোল্লাসে উল্লিখিত হইবার যোগ্য,—প্রচুর না হইলেও, প্রশংসনীয় বলিয়া অভিনন্দিত হইবার উপযুক্ত। কারণ, আমাদের দেশের অভিজ্ঞগণকে প্রতিপদে অনেক প্রতিকূল অবস্থার সহিত শক্তি-পরীক্ষা করিয়া, কোনও কোনও বিষয়ের একদেশমাত্রে যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হইয়াছে। সুখের বিষয় এই যে,—তাঁহাদের সকল উদ্যম সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া যায় নাই; প্রশংসার বিষয় এই যে,—তাঁহাদের অসম্যক্ অভিজ্ঞতার অসম্পূর্ণ অনুশীলনেও অনেক অজ্ঞাতপূর্ব্ব প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে; অনেক পূর্ব্বাবিষ্কৃত প্রমাণ পর্য্যালোচিত হইয়াছে; অন্ধতমসাচ্ছন্ন পুরাকীর্ত্তির পুরাতন গহ্বর অনেক নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। এই শ্রেণীর অভিজ্ঞের সংখ্যা অল্প। সুতরাং যাহা হইয়াছে, বর্ত্তমান অবস্থায়, তাহার অধিক ফললাভের আশা করা যাইত না।

এই রূপে যাহা সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা একদিনে বা একের যত্নে সঞ্চিত হয় নাই। এক সময়ে তাহা "সুবর্ণমুষ্টি" নামে কথিত হইলেও, মুষ্টিভিক্ষা বলিয়াই ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত সেইরূপ মুষ্টিভিক্ষাই দরিদ্র ভিক্ষুকের ভিক্ষার ঝুলিতে সময়ে সময়ে নিপতিত হইয়াছে। প্রয়োজনের হিসাবে আমাদের দীর্ঘ-কালের সঞ্চিত সামগ্রী প্রচুর না হইলেও, তাহাই তথ্যানুসন্ধানের নানা পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। তাহা আমাদের পরম লাভ, তাহা আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য-গণের পরম দান। তাহার ফলে যাহা হইয়াছে, তাহাতে এক নূতন জগতের সন্ধান লাভ করা গিয়াছে। সে জগতে বাঙ্গালী উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। তাহারই ইতিহাস বাঙ্গালীর ইতিহাস। বঙ্গভূমির সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে তাহার সমগ্র পরিচয় প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। তাহার পরিচয়-লাভের জন্য বঙ্গভূমির চতুঃসীমার অভ্যন্তরে এবং চতুঃসীমার বাহিরে—স্থলপথে ও জল পথে—বহু দূরদেশেও অগ্রসর হইতে হইবে। তাহার জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন, বহু আয়োজনের প্রয়োজন, বহু অভিজ্ঞ সাধকের আত্মত্যাগের

প্রয়োজন, এবং তথ্যানুসন্ধানের প্রকৃষ্ট প্রণালী স্থির করিবার প্রয়োজন। সুতরাং বাঙ্গালীর ইতিহাসের উপাদান-সংগ্রহের জন্য তথ্যানুসন্ধানের চেষ্টা কোনও ক্রমেই অনায়াসসাধ্য বলিয়া কথিত হইতে পারে না। অনুশীলনের অভাবে আমরা যাহা হারাইয়া ফেলিয়াছি, সেই একাগ্রতার ও দৃঢ়নিষ্ঠার প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায়, আমাদের পক্ষে তথ্যানুসন্ধান-চেষ্টা সমধিক আয়াসসাধ্য ব্যাপার বলিয়াই প্রতিভাত হয়।

প্রমাণ-সংগ্রহের ও সংরক্ষণের ব্যবস্থাও অল্প আয়াসসাধ্য বলিয়া কথিত হইতে পারে না। বহু স্থানে বিক্ষিপ্ত, বহু প্রকারে বিপর্য্যস্ত, ক্কচিৎ অর্দ্ধবিলুপ্ত, ক্কচিৎ অর্দ্ধধ্বংসপ্রাপ্ত পুরাকীর্ত্তির স্মৃতি-চিহ্ন একত্র সংগৃহীত ও সংরক্ষিত করাইবার উদ্যম কত কঠিন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ তাহা মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়া আসিতেছেন। এ পর্য্যন্ত এই শ্রেণীর যে সকল প্রমাণ নানাস্থানে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণগুলিও আমাদের দেশের কোনও একটি পুস্তকাগারে একত্র দেখিবার সম্ভাবনা নাই। পুস্তকাগার চাই, এবং সংগ্রহাগার চাই। আমাদের দেশে এই সকল নাম ধারণ করিয়া যে সকল অট্টালিকা আকাশে মস্তকোত্তোলন করিয়াছে, তাহাতে কেবল লালসা বর্দ্ধিত হয়,—পরিতৃপ্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

ইতিহাস প্রমাণের উপরই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ইতিহাসের সকল প্রমাণই পরোক্ষ প্রমাণ। তজ্জন্য প্রথম দৃষ্টিপাতে অপরোক্ষ-প্রমাণমূলক বিজ্ঞান শাস্ত্রের সহিত ইতিহাসের প্রবল পার্থক্য অনুভূত হইতে পারে। কিন্তু প্রমাণ যেরূপ হউক, তাহার পর্য্যালোচনা-প্রণালী সর্ব্বত্র একরূপ বলিয়া, ইতিহাসও এক শ্রেণীর বিজ্ঞান-রূপে স্বীকৃত হইয়াছে। যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহাকে আবার ঘটাইয়া লইয়া, প্রত্যক্ষ ভাবে পরীক্ষা করিবার উপায় নাই। সুতরাং ইতিহাসের প্রমাণ অধিক সতর্ক দৃষ্টিতে,—সমুচিত সমালোচনার সাহায্যে,—ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। অনেক সময়ে প্রমাণের আবিষ্কার-সাধন অপেক্ষাকৃত সহজ হইতে পারে;—কখনও কখনও তজ্জন্য কিছুমাত্র আয়াস—স্বীকারের প্রয়োজন উপস্থিত না হইতে পারে;—তাহা নিরক্ষর কৃষকগণের দ্বারা অকস্মাৎ আবিষ্কৃত হইয়া পড়িতে পারে, এবং ধনকুবেরগণের কৃপাকটাক্ষে তাহার সংগ্রহ ও সংরক্ষণও সহজসাধ্য হইতে পারে। কিন্তু যাহা অনভিজ্ঞের অজ্ঞাতসারে অকস্মাৎ আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে, ধনকুবেরগণের কৃপাকটাক্ষে কাচাবরণে সযত্নে সুরক্ষিত হয়, তাহার পরীক্ষাকার্য্যে বহু অভিজ্ঞ পণ্ডিতের বহু বৎসরের অকাতর পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়া যায়।

ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়,—ইতিহাস-সঙ্কলনের আয়োজন কত কঠিন ব্যাপার। তাহার কার্য্য-প্রণালী স্থিরীকৃত না হইলে, আন্তরিক অনুরাগ, অবিচলিত অধ্যবসায়, অকাতর অর্থব্যয়, সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং কার্য্য-প্রণালী স্থির করা কর্ত্তব্য। তাহার সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে। প্রমাণ না পাইলে, ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারে না। সুতরাং তথ্যানুসন্ধানকেই প্রথম কর্ত্তব্য এবং অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পুরাকালের প্রথম ইতিহাস-লেখকগণ সমসাময়িক ব্যাপারের ইতিহাস-রচনা-কার্য্যে অধিক উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহারাও নানা বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে—আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ইতিহাস-সঙ্কলনের সময়ে,—সমসাময়িক ঘটনাবলীর বিবরণ-সংগ্রহের জন্যও ব্যান্‌ক্রফট্‌ যে কিরূপ বিপুল উদ্যমের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা সুধী-সমাজে সুপরিচিত। যে সকল ব্যাপার বহুপূর্ব্বে সংঘটিত হইয়া গিয়াছে, তাহার প্রমাণ-সংগ্রহের জন্য তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন কত অধিক, তাহা সহজেই প্রতিভাত হয়।

যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়া যায়, তাহার কিছু কিছু স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া যায়। কোনও স্মৃতিচিহ্ন ক্ষীণ রেখায়, কোনও স্মৃতিচিহ্ন গভীর রেখায় অঙ্কিত হইয়া থাকে। কালক্রমে তাহা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে পারে,—নানা কারণে রূপান্তরিত হইতে পারে,—কোনও কোনও বিষয়ের স্মৃতিরেখা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং এই সকল স্মৃতিচিহ্নের আবিষ্কার-সাধন সহজসাধ্য বলিয়া কথিত হইতে পারে না। আবিষ্কার-চেষ্টার সঙ্গে দুইটি কার্য্যের সম্পর্ক-রক্ষা করা অপরিহার্য্য,—অনুসন্ধানের জন্য অধ্যয়ন এবং অধ্যয়নের জন্য অনুসন্ধান। একের অভাবে অপর কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না। যাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে পুস্তকালয়ের সাহায্য-লাভে চরিতার্থ, তাঁহারা অনুসন্ধান-ক্ষেত্রের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিলে, পুরাতন পুস্তকের সকল কথা বুঝিয়া লইবার আশা করিতে পারেন না। যাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে অনুসন্ধান-ক্ষেত্রের সন্ধান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা পুস্তকালয়ের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইলে, অনেক সময়ে অনুসন্ধানের প্রকৃত বিষয়েও লক্ষ্যচ্যুত হইতে পারেন। কোনও বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানকার্য্যে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে প্রথম কর্ত্তব্য,—তদ্বিষয়ে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু জানিতে পারা গিয়াছে, তাহা জানিয়া লইবার চেষ্টা। বঙ্গভাষামাত্র অবলম্বন করিয়া, এই কার্য্যে সফলকাম হইবার আশা নাই। বিভিন্ন ভাষায় এই শ্রেণীর যে

সকল বিবরণ ক্রমে ক্রমে পুঞ্জীভূত হইয়াছে, তাহার সন্ধানলাভ করাই কত কঠিন; তৎসমস্ত বঙ্গভাষায় অনূদিত করাইয়া লওয়া আরও কঠিন,—একরূপ অসাধ্য-সাধন-চেষ্টা। এই শ্রেণীর যে সকল বিবরণ ইংরেজী ভাষায় স্থানলাভ করিতে পারে নাই, আপাততঃ তাহাই বঙ্গভাষায় অনূদিত করাইয়া লইবার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

তাহার আয়োজন না করিয়া, বঙ্গভাষামাত্র অবলম্বন করিয়া তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, অনেক ভ্রমক্রটী ঘটিয়া যাইতে পারে। কেবল অসঙ্গত ও অতিরিক্ত প্রশংসাবাদে আত্মহারা হইয়া, আমরা অনেক সময়ে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারি না। যাঁহারা যে বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হইবেন, তদ্বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানে সফলকাম হইবার জন্য যে সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য, তাহা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করা তাঁহাদের পক্ষে প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করিতে হইবে। যেমন প্রমাণ না থাকিলে ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারে না, সেইরূপ গ্রন্থাদি না থাকিলে, তথ্যানুসন্ধান-কার্য্যও যথাযোগ্য ভাবে পরিচালিত হইতে পারে না। যাঁহারা তথ্যানুসন্ধানের আয়োজন করিবেন, তাঁহাদিগকে অধ্যয়নেরও আয়োজন করিতে হইবে। অন্যান্য বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধান অপেক্ষা ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানে অধ্যয়নের প্রয়োজন অল্প বলিয়া কথিত হইতে পারে না, বরং নানা কারণে কিছু অধিক বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। বাঙ্গালা দেশের যে সকল স্থানে ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন আরব্ধ হইয়াছে, সেই সকল নবোদ্যমের কেন্দ্রস্থলে এক একটি পুস্তকালয় সংস্থাপিত করা আবশ্যক। যাঁহারা কলিকাতা হইতে যত দূরে অবস্থিত, তাঁহারা ইহার অভাব তত অধিক অনুভব করিয়া থাকেন।

তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, পূর্ব্বসংস্কার সুসংযত করিতে হয়,—ইচ্ছা-অনিচ্ছা বিসর্জ্জন দিতে হয়,—ব্যক্তিগত সম্প্রদায়গত বা দেশগত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অনুসন্ধানলব্ধ প্রমাণ-পরম্পরার অধীন করিবার উপযুক্ত অকাতর উদারতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। স্বদেশপ্রীতি, স্বজাতি-প্রেম, স্বধর্ম্মনিষ্ঠা মানবহৃদয়ের মহোচ্চবৃত্তি—সত্য তাহা অপেক্ষা উচ্চতর। ইহা স্বীকার করিতে অসম্মত হইয়া, গ্যালিলিওর সমসাময়িক ব্যক্তিগণ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিল। এ কথা আমাদের দেশে পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইবার যোগ্য। এখন কাহাকেও কারারুদ্ধ করিবার শক্তি আমাদের আয়ত্ত না থাকিলেও, আমাদের আপন বিচার-বুদ্ধিকে কারারুদ্ধ করিবার শক্তি এখনও আমাদেরই আয়ত্ত রহিয়াছে। সে

শক্তিকে চিরনির্ব্বাসিত করিয়া, তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে;—যাহা সত্য, তাহাকে অবনতমস্তকে স্বীকার করিয়া লইবার উপযুক্ত চিত্তবল উপার্জ্জন করিতে হইবে।

প্রথমে তথ্যানুসন্ধানের ক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিতে হইবে, কিংবা প্রথমে তথ্যানুসন্ধানের বিষয় নির্ব্বাচন করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে অনেক সময়ে মতভেদ উপস্থিত হইতে পারে। যাঁহারা কোনও নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানের আয়োজন করেন, তাঁহাদিগকে প্রথমে ক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিতে হয় না,—প্রয়োজন অনুসারে অনুসন্ধানক্ষেত্র ক্রমশঃ বিস্তৃত বা পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে। যাঁহারা সেরূপ আয়োজন করিবেন না, তাঁহারা প্রথমেই ক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে কেবল নির্ব্বাচিত ক্ষেত্রের অনুসন্ধানলব্ধ প্রমাণাবলী প্রকাশিত করিয়াই নিরস্ত হইতে হইবে;—তাহার সাহায্যে অন্যের ইতিহাস-রচনার শ্রম অল্প হইতে পারিবে, কিন্তু কেবল তাহার সাহায্যে অনুসন্ধানকারিগণের পক্ষে ইতিহাস রচনা করিবার সম্ভাবনা অধিক হইতে পারিবে না।

তথ্যানুসন্ধান-কার্য্যে স্বার্থশূন্য হইতে পারিলেই ভ্রমপ্রমাদ অল্প হইবার সম্ভাবনা। এখন আর ভ্রম-প্রমাদকে সত্য বলিয়া আঁকড়িয়া ধরিয়া দীর্ঘকাল নিশ্চিন্ত থাকিবার আশা করা অসম্ভব। এখন সভ্যসমাজের সুধীবর্গ সমগ্র ভূমণ্ডলকে তথ্যানুসন্ধানের উন্মুক্ত ক্ষেত্ররূপে ব্যবহার করিয়া, সকল প্রমাণকেই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার অধীন করিয়া লইতেছেন। এখন ভ্রম-প্রমাদে জড়িত হইলে, অল্পকালের মধ্যেই তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রথম হইতেই ভ্রম-প্রমাদ পরিহার করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বিচারবুদ্ধিকে পূর্ব্বসংস্কারের পুরাতন শৃঙ্খলে বাঁধিয়া তথ্যানুসন্ধান করিবার চেষ্টা, আর নৌকা ঘাটে বাঁধিয়া রাখিয়া দাঁড় টানিয়া গন্তব্যস্থানে উপনীত হইবার চেষ্টা তুল্য ফল প্রসব করিয়া থাকে।

বিচারবুদ্ধি মানবমাত্রের স্বাভাবিক শক্তি হইলেও, বিশ্বাস তাহা অপেক্ষা স্বাভাবিক, আলস্য সর্ব্বাপেক্ষা চিরসহচর। আলস্যের আবেশে সুখসুপ্ত মানব-সমাজের নিকট বিশ্বাসের প্রাধান্য অধিক। কারণ, তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইলে, তথ্যানুসন্ধানের বা বিচারশ্রমের ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না। বিচারণাকে স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত করিতে হইলে, দীর্ঘকালের অপ্রতিহত শিক্ষা-প্রণালীর অধীন হইতে হয়। সুতরাং সাধারণ শিক্ষার অভাব থাকিলে, বিচরণাশক্তির সম্যক্ প্রয়োগের অভ্যাসে সফলতা লাভ করা কঠিন হইয়া

পড়ে। তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে এই সকল কথা চিন্তা করা কর্ত্তব্য। উৎসাহ ও অধ্যবসায় তথ্যানুসন্ধানের অপরিহার্য্য চিরসহচর; অর্থব্যয় ও স্বার্থ-ত্যাগ তাহার প্রাণ-শক্তি;—কিন্তু বিচারণার অভাব থাকিলে, কিছুতেই তাহার স্থান পূর্ণ করিয়া লইবার উপায় থাকে না। তাহাই অনুসন্ধান-ক্ষেত্রের পথ-প্রদর্শক, তাহাই বিষয়-নির্ব্বাচনের প্রধান পরামর্শ-দাতা, তাহাই অনুসন্ধান-লব্ধ প্রমাণ-পর্য্যালোচনার প্রধান উপদেষ্টা।

বাঙ্গালীর পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধান-ক্ষেত্র কোথায়? ইহার প্রথম ও সহজ উত্তর এই যে,—বাঙ্গালা দেশের চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী সকল স্থানই বাঙ্গালীর পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধান-ক্ষেত্র। কিন্তু তাহাই একমাত্র অনুসন্ধান-ক্ষেত্র নহে। কি স্থলপথে, কি জলপথে, অনেক দূর পর্য্যন্ত অনেক দেশে অনেক দ্বীপে বাঙ্গালীর পুরাতত্ত্বের অনেক উপাদান প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের যত্নে তাহার পরিচয় উত্তরোত্তর অধিক পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। আমরা কি সত্য সত্যই বাঙ্গালীর ইতিহাস সঙ্কলিত করিতে চাই? আকাঙ্ক্ষা আন্তরিক হইলে, বাঙ্গালা দেশের চতুঃসীমার বাহিরেও তথ্যানুসন্ধানের আয়োজন করিতে হইবে। তাহাতে কৃতকার্য্য হইবার জন্য অনেক দেশের ভাষা ও সাহিত্য অধিগত করিতে হইবে,—অনেক অকীর্ত্তিকর সংকীর্ণ ধারণার মোহপাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া তিতীর্ষু হৃদয়ে সাগরতীরেও উপনীত হইতে হইবে। তাহার বেলাভূমিতে বাঙ্গালীর বহু কীর্ত্তিরেখা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; তটান্তমিলিত লবণাম্বুরাশি অনেক পুরাতত্ত্ব কুক্ষিগত করিয়া রাখিয়াছে।

কি স্বদেশে, কি বিদেশে—সকল স্থানেই, অনুসন্ধান-ক্ষেত্র কেবল ভূপৃষ্ঠে সীমাবদ্ধ নহে। তাহা বাহিরে ও অভ্যন্তরে,—ভূপৃষ্ঠে ভূগর্ভে—দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান। যে সকল অদৃশ্যমান কীর্ত্তিচিহ্ন ভূগর্ভে নিহিত রহিয়াছে, তাহার যৎকিঞ্চিৎ অকস্মাৎ আবিষ্কৃত হইয়া, ভূগর্ভেও তথ্যানুসন্ধান করাইবার জন্য সভ্য-সমাজকে উৎসাহ দান করিয়াছে। অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষের বিবিধ প্রদেশেও তাহার সূত্রপাত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ তাহার আরম্ভকাল। ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে তাহার ধারাবাহিক কার্য্যপ্রণালী স্থিরীকৃত হইয়াছে, এবং উত্তরোত্তর অধিক মর্য্যাদা লাভ করিতেছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গই তাহার প্রথম ও প্রধান পথপ্রদর্শক।

ব্যক্তিগত চেষ্টায় ও গবর্মেণ্টের উদ্যোগে ভারতবর্ষের নানা স্থানে এই শ্রেণীর অনুসন্ধানকার্য্য কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া থাকিলেও, এখনও বঙ্গভূমি সুধীবর্গের

দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে রোমনগরে প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌গণের "দ্বাদশ আন্তর্জ্জাতীয় মহাসম্মিলনে" এতদ্বিষয়ের যেরূপ আলোচনা হইয়াছিল, তাহার ফলে ইউরোপ-আমেরিকার জ্ঞানলিপ্সু সুধী-সমাজ অর্থসংগ্রহ করিয়া, ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের সূত্রপাত করাইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তাঁহাদের যত্নে যে "আন্তর্জ্জাতিক" অনুসন্ধান-সমিতি সংগঠিত হইয়াছিল, তাহার দৃষ্টিও বঙ্গভূমির বাহিরেই নিপতিত হইয়াছিল। গভর্মেণ্টের বা বিদেশের সুধীবর্গের দৃষ্টি বঙ্গভূমিতে নিপতিত হইতে বিলম্ব ঘটিবার কারণ-পরম্পরার অভাব নাই। তজ্জন্য তাঁহাদিগের কার্য্য-প্রণালীকে অসমীচীন বলা যাইতে পারে না।

বাঙ্গালা দেশের প্রতি কাহার দৃষ্টি প্রথমে নিপতিত হওয়া সর্ব্বাপেক্ষা স্বাভাবিক? যাঁহাদের পক্ষে তাহা স্বাভাবিক,—যাঁহাদের পক্ষে তাহা অবশ্য-কর্ত্তব্য,—যাঁহাদের পক্ষে তাহা অপরিহার্য্য,—তাঁহারা তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, বাঙ্গালীর তথ্যানুসন্ধান-চেষ্টাকে পরপদানুসরণ-কার্য্যেই অধিক নিবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। বঙ্গদেশের ভূগর্ভ হইতে অকস্মাৎ কিছু আবিষ্কৃত হইলে, ক্ষণকালের জন্য এক অনির্ব্বচনীয় সুখস্বপ্নমোহে আবিষ্ট হইয়া আবার আমরা চিরাভ্যস্ত আলস্যপরায়ণতার আশ্রয় গ্রহণ করি। ইহাই আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার পরিণাম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার জন্য আমরা পুনঃ পুনঃ তিরস্কার লাভ করিয়াছি; আমাদের উচ্চশিক্ষা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে বলিয়া আমরা উপহাসের পাত্র বলিয়াও নিন্দিত হইয়া আসিতেছি।

সুখের বিষয়, গৌরবের বিষয়, আশার বিষয়, উৎসাহের বিষয়,—বঙ্গ-জননীর এক সুশিক্ষিত সুসন্তান বঙ্গভূমির চতুঃসীমার মধ্যে পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধানকার্য্যের জন্য খনন-কার্য্যের আরম্ভ করাইবার আশায় দশ সহস্র মুদ্রা, এবং আবিষ্কৃত নিদর্শনের সংগ্রহ-সংরক্ষণের উপযোগী গৃহনির্ম্মাণের জন্য বিংশতি সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। যিনি এইরূপে জীবনব্যাপী বিবিধ সৎকার্য্যের সঙ্গে আরও একটী অনুকরণযোগ্য সৎকার্য্যের শুভ-সম্মিলন ঘটাইবার সুব্যবস্থা করিয়া, বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন, সেই সুমঙ্গল-নামধেয় পুণ্যশ্লোক নিঃস্বার্থ সাধকের দীর্ঘজীবনকামনায় ভগবানের নিকট আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি।

খনন-কার্য্য তথ্যানুসন্ধানের নিত্য-সহচর;—বঙ্গভূমির ন্যায় মানব-সভ্যতার পুরাতন লীলাভূমির পক্ষে অপরিহার্য্য নিত্য-সহচর। সুতরাং বঙ্গভূমিতে

খনন-কার্য্যের সূত্রপাত করাইতে বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু সকল দেশের খনন-কার্য্যে একই প্রণালী অনুসৃত হইতে পারে না। বঙ্গদেশের অভ্যন্তরে তাহার সূত্রপাত করাইতে হইলে, প্রথমে এক স্থানে কার্য্যারম্ভ করাইয়া, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হইবে। যাহাদের সাহায্যে এই কার্য্য সম্পন্ন করাইতে হয়, তাহারা অশিক্ষিত শ্রমজীবী। কার্য্য-পরিদর্শকের কর্ত্তব্যনিষ্ঠার উপরেই প্রকৃত সফলতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। যিনি দীর্ঘকাল এই কার্য্যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া জগদ্বিখ্যাত কীর্ত্তিলাভ করিয়াছেন, সেই মিশর-তত্ত্বজ্ঞ মহামনা ফ্লীণ্ডার্স পেট্রি স্বরচিত-পুস্তকের এক স্থানে লিখিয়াছেন ঃ—যিনি খনন কার্য্য করাইবেন, তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রমজীবীর ন্যায় স্বয়ং সকলের সঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শ্রম স্বীকার করিতে হইবে,—প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, সুখস্বচ্ছন্দতার ও পরিচ্ছদের মমতা বিসর্জ্জন করিয়া, ধূলিকর্দ্দমে অবলিপ্ত হইবার জন্যও সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আমাদের দেশে এরূপ অধ্যবসায়শীল কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বলিষ্ঠ সেবকের অভাব নাই,—অনেকবার তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া আশান্বিত হইয়াছি। খনন-কার্য্যের পূর্ব্বে এবং খনন-কার্য্য পরিচালিত হইবার সময়ে, মানচিত্র ও আলোকচিত্র প্রস্তুত করা এবং আবিষ্কৃত তাবৎ সামগ্রীর যথাযোগ্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়া থাকে। তাহা কোন্ প্রণালীতে সুসম্পন্ন হইতে পারে, তদ্বিষয়ক স্বতন্ত্র গ্রন্থের অভাব নাই। তাহা সযত্নে অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য।

লিখিত গ্রন্থের পক্ষে এই রীতি অবলম্বন করিবার সম্ভাবনা অল্প। কারণ, তাহাতে ক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যয়বাহুল্য উপস্থিত হইতে পারে। সুতরাং লিখিত গ্রন্থের পাঠমুদ্রণের জন্য একাধিক গ্রন্থের শরণাপন্ন হইবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়া থাকে। যাঁহারা আমাদের দেশে লিখিত গ্রন্থের পাঠ-মুদ্রণের চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা অনেক স্থলেই আশানুরূপ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিতে পারেন নাই। ব্যয়লাঘবের জন্য অনুপযুক্ত ব্যক্তির উপরে এই ভার ন্যস্ত করিলে, ফললাভের আশা করা যায় না। যাঁহারা সুপণ্ডিত ও উপযুক্ত ব্যক্তি, তাঁহারাও এই কার্য্যের জন্য পূর্ব্বে অভিজ্ঞতা-সঞ্চয় না করিলে, সহসা কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন না। যে সকল হস্তলিখিত গ্রন্থ অবলম্বনে মুদ্রাঙ্কনার্থ পাঠ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা কোন সময়ের, কাহার লিখিত, অনেক স্থলে তাহার কিছুমাত্র সন্ধান-লাভ করা যায় না। সুতরাং কোন্ গ্রন্থের পাঠ আদর্শ-পাঠ বলিয়া গৃহীত হইবে, তদ্বিষয়ে সংশয় নিরস্ত হয় না। যদি সকল গ্রন্থেরই লিপিকালের সন্ধান প্রাপ্ত

হওয়া যায়, তাহা হইলেও, সকল সংশয় নিরস্ত হইতে পারে না। অনেকে সর্ব্ব-প্রাচীন গ্রন্থকেই সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ গ্রন্থ মনে করিয়া, অন্ধবৎ তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকেন। যাহা সর্ব্বপ্রাচীন, তাহাই যে সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ নহে, তাহার অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় হস্তলিখিত গ্রন্থের বিশুদ্ধ পাঠ-নির্ণয়-চেষ্টা বিলক্ষণ দুরূহ বলিয়াই বোধ হয়। সমুচিত বিচারণা ভিন্ন বিশুদ্ধ পাঠ স্থিরীকৃত হইতে পারে না। অনেকে পাঠ-পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়া, আত্ম-কার্য্য সহজসাধ্য করিবার আয়োজন করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, ইহা রীতি-সম্মত নহে। এই সকল কারণে, বাঙ্গালীর উদ্যোগে যে সকল পুরাতন গ্রন্থের পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার অল্প গ্রন্থই পাশ্চাত্য সুধীসমাজে প্রশংসালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এ বিষয়ে আমাদের যে সকল ত্রুটী আছে, তাহার মূলে রীতি-শিক্ষায় অনাস্থা বা স্বাভাবিক আলস্যপ্রবণতা। তাহা সর্ব্বপ্রযত্নে পরিহার করা কর্ত্তব্য। হস্তলিখিত গ্রন্থের বিশুদ্ধ পাঠ মুদ্রিত করাইবার প্রয়োজন কত অধিক, তাহা এখনও আমাদের দেশে সম্যক্ অনুভূত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। তজ্জন্য অনেক শ্রম ও অর্থব্যয় ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত-সমাজে পুরাতন পুস্তকের পাঠনির্ব্বাচনের জন্য ও অনুবাদ-সাধনের জন্য অনেক সুধী-সমিতি সংগঠিত হইয়াছে। বিশুদ্ধ পাঠ নির্দ্দিষ্ট না হইলে, অনুবাদ-কার্য্যের আরম্ভ হইতে পারে না। আমাদের দেশে পাঠ-বিচারণার পূর্ব্বেই অনুবাদ-কার্য্যের আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, এবং সুলভ বঙ্গানুবাদ-প্রচারের অর্থকরী চেষ্টা অনেক স্থলে অনধিকারচর্চ্চারও প্রশ্রয় দান করিয়াছে। অনুবাদ সর্ব্বাংশে মূলানুগত না হইলে, তাহার সাহায্যে, ইতিহাসের উপাদান সঙ্কলন করা যায় না। সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদের বঙ্গানুবাদে সকল স্থলে মূল বিষয়ের স্থূল মর্ম্মও সুরক্ষিত হইবার আশা সফল হইতে পারে না। এ বিষয়ে আমরা এতদিন যাহা করিয়াছি, তাহার পরীক্ষাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, অধিকাংশ স্থলেই কৃতিত্বের সঙ্গে বিজ্ঞাপনের সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না। যথাযোগ্যভাবে ইতিহাস সংকলন করিবার আকাঙ্ক্ষা আন্তরিক হইলে, এই সকল অপ্রিয় সত্য স্বীকার করিয়া লইয়া, সর্ব্বপ্রযত্নে আত্ম-সংশোধনের চেষ্টা করিতে হইবে। তাহাই ভবিষ্যতে সফলতা লাভ করিবার প্রথম সোপান।

প্রমাণ-পর্য্যালোচনাই ইতিহাস-সঙ্কলনের বৈজ্ঞানিক প্রণালী। এই প্রণালী অবলম্বিত হইলে, ইতিহাস—ইতিহাস; নচেৎ তাহা এক শ্রেণীর সরস আখ্যায়িকা-মাত্র। পাশ্চাত্য সুধীসমাজ হইতে আখ্যায়িকার যুগ চলিয়া যাইতেছে; তাহা

কেবল আমাদের দেশেই তিষ্টিয়া রহিয়াছে; এবং এখনও ভূমিকায়, সমালোচনায় প্রশংসাপত্রে, বিজ্ঞাপনে, নিতান্ত অসঙ্গত ভাষায় উৎসাহলাভ করিতেছে। আমরা কি তাহারই অনুসরণ করিব? অথবা তাহার মোহপাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া, বৈজ্ঞানিক সংযম-শিক্ষায় আমাদের ঐতিহাসিক রচনাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিব?

বঙ্গভূমির চতুঃসীমার অভ্যন্তরে যে সকল কীর্ত্তিচিহ্ন ভূপৃষ্ঠে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর কীর্ত্তিচিহ্ন অনায়াসে সংগৃহীত ও সংগ্রহাগারে আনীত হইতে পারে; আর এক শ্রেণীর কীর্ত্তিচিহ্ন আনীত হইবার যোগ্য নহে; অথবা যোগ্য হইলেও, নানা কারণে স্বস্থানে সংস্থাপিত থাকিবার উপযুক্ত। উভয় শ্রেণীর কীর্ত্তিচিহ্নেরই সচিত্র বিবরণ সঙ্কলিত করা কর্ত্তব্য, এবং উভয় শ্রেণীর কীর্ত্তিচিহ্নেরই যথাযোগ্য সংরক্ষণ-ব্যবস্থা উদ্ভাবিত, করা কর্ত্তব্য। সংগ্রহ-কার্য্যের প্রলোভনে, অনেকে তাহা বিস্মৃত হইয়া, অনেক কীর্ত্তি-চিহ্নকে দুর্দ্দশাপন্ন করিয়া থাকেন। কোন্ কীর্ত্তিচিহ্ন কিরূপ অবস্থান-সামঞ্জস্যের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণের অভাবে, সংগ্রহাগারের শ্রেণীবিভাগমূলক কৃত্রিম অবস্থান-ব্যবস্থা হইতে তাহাদের সম্বন্ধে সকল সমাচার অবগত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। তজ্জন্য সংগ্রহ-কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে সচিত্র বিবরণ প্রকাশেরও ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

আবিষ্কৃত ও সংগৃহীত নিদর্শননিচয় নানা ভাগে বিভক্ত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে এক শ্রেণীর সামগ্রী,—তাহার সাধারণ নাম 'প্রমাণ'। তাহার মধ্যে কোনটি বস্তুগত প্রমাণ, কোনটি বা লিপিগত প্রমাণ। উভয়ের অবস্থাই একরূপ। রহস্যোদ্ধারের ও পাঠোদ্ধারের উপরেই তাহাদের প্রকৃত মর্য্যাদা নির্ভর করে। যাহা লিপিগত প্রমাণ, তাহার পাঠোদ্ধারকার্য্য অপেক্ষাকৃত সহজ;—যাহা বস্তুগত প্রমাণ, তাহার রহস্যোদ্ধার দীর্ঘকালেও সুসম্পন্ন না হইতে পারে। এই শ্রেণীর কোনও কোনও নিদর্শন বহু পূর্ব্বে সংগৃহীত ও কলিকাতায় মিউজিয়মে সুরক্ষিত হইলেও, এখনও তাহার রহস্যোদ্ধার সাধিত হইতে পারে নাই! যাঁহারা এই শ্রেণীর বস্তুগত প্রমাণ প্রাপ্ত হইবামাত্র, তাহার সরহস্য বিবরণ প্রকাশিত করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই কার্য্যকে যেরূপ সহজসাধ্য মনে করেন, ইহা সেরূপ সহজসাধ্য বলিয়া কথিত হইতে পারে না। যে সকল নিদর্শনের সহিত প্রাচীন ধর্ম্মবিশ্বাসের সম্পর্ক আছে, তাহার রহস্যোদ্ধার সর্ব্বাপেক্ষা প্রহেলিকাপূর্ণ।

লিপিগত প্রমাণের পাঠোদ্ধার-কার্য্য অপেক্ষাকৃত সহজ হইলেও, তাহাও অনায়াসসাধ্য নহে। সমুচিত শিক্ষার ও অভিজ্ঞতার উপরেই তৎকার্য্যের প্রকৃত সফলতা নির্ভর করে। অনভিজ্ঞের হস্তে তাহার বিড়ম্বনা-ভোগ অনিবার্য্য। তাঁহাদের হস্তে প্রকৃত পাঠ বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়, মনঃকল্পিত পাঠ সংযুক্ত হইয়া থাকে, তথ্যানুসন্ধান-চেষ্টা প্রতিহত হইয়া পড়ে। যাহা শিলাপট্টে বা ধাতুফলকে একবারমাত্র উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহার উৎকীর্ণ-কর্ম্ম যত্ন-সম্পাদিত হইলেও, স্থানে স্থানে ভ্রমপ্রমাদ সংঘটিত হইয়াছিল। লেখকের ন্যায় উৎকীর্ণ-কর্ম্মকারকও ভ্রমপ্রমাদশূন্য হইতে পারেন না। কোনও কোনও স্থলে সংশোধন-চেষ্টার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু অনেক স্থলে ভ্রমপ্রমাদ অসংশোধিত অবস্থাতেই রহিয়া গিয়াছিল। যে লিপি যে যুগের যে ভাষায় লিখিত, সেই যুগের সেই ভাষার রচনা-রীতির সহিত সুপরিচিত ব্যক্তি ভিন্ন, অন্য কেহ পাঠ-সংশোধনের ভার গ্রহণ করিলে, তাহা সকল স্থলে সমীচীন না হইতে পারে। তজ্জন্য প্রতিকৃতিসংযুক্ত পাঠ-মুদ্রাঙ্কনের রীতি প্রচলিত হইয়াছে, তাহার সাহায্যে উদ্ধৃত পাঠের পরীক্ষা-কার্য্য সাধিত হইতে পারে। এই রীতি বঙ্গসাহিত্যেও সমাদর লাভ করিয়াছে। কিন্তু প্রতিকৃতি-প্রকাশে বঙ্গীয় মুদ্রণ-প্রণালী সকল স্থলে প্রশংসালাভ করিতে পারে নাই। ইহার উন্নতিসাধন প্রার্থনীয়। কারণ, অনেক স্থলে পাঠোদ্ধারসাধনের পক্ষে ফলক অপেক্ষা প্রতিকৃতি অধিক উপকারজনক। যাঁহারা প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার-কার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা পাঠোদ্ধার-প্রণালীর ব্যাখ্যা করিয়া গ্রন্থ-প্রণয়ন করিয়া দিলে, ভবিষ্যৎকালের শিক্ষার্থিগণের উপকার সাধিত হইতে পারে। যিনি এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিককাল অভিজ্ঞতা-সঞ্চয় করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট আমাদের প্রার্থনা জানাইবার আয়োজন করা কর্ত্তব্য।

প্রমাণ-পর্য্যালোচনার বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিতে হইলে, আমাদিগকে অনেক পূর্ব্বাভ্যাস পরিত্যাগ করিতে হইবে। প্রমাণ-পর্য্যালোচনার প্রথম কার্য্য প্রমাণের প্রকৃত প্রকৃতি-নির্ণয়। সকল প্রমাণ এক শ্রেণীর নহে। তজ্জন্যই প্রমাণের প্রকৃতি-নির্ণয়ে বিলক্ষণ সাবধান হইতে হয়। যাহা কিছু লিখিত বা মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে, তাহাই অসন্দিগ্ধ প্রকৃষ্ট প্রমাণ-রূপে গৃহীত হইতে পারে না। তাহা হইলে, প্রমাণ-পর্য্যালোচনার প্রয়োজন থাকিত না।

লিপিগত প্রমাণ অপেক্ষা বস্তুগত প্রমাণ অধিকাংশ স্থলে অধিক নির্ভর-যোগ্য বলিয়া সুধীসমাজে স্থিরীকৃত হইয়াছে। তাহার কারণ সহজেই প্রতিভাত

হইতে পারে। লিপিগত প্রমাণ অনেক সময়ে লেখকের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছায়, পক্ষপাত-অপক্ষপাতে, সত্যে ও কল্পনায়, জড়িত হইয়া পড়িতে পারে। বস্তুগত প্রমাণে সেরূপ সম্ভাবনা অল্প। যে সকল মুদ্রা দীর্ঘকাল ক্রয়বিক্রয়-ব্যাপারে ব্যবহৃত হইত, তাহা সমসাময়িক জন-সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। তাহার প্রমাণ মুখ্য প্রমাণ। মুদ্রাতত্ত্ববিদ্যার সাহায্যে তাহা হইতে ইতিহাসের যে সকল উপাদান সংগৃহীত হইতেছে, তাহাতে ভারতবর্ষের ইতিহাসের অনেক পূর্ব্বপরিচিত সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। এই বিদ্যা সহসা অধিগত হয় না; ইহা শিক্ষা দিবার উপযুক্ত গ্রন্থ বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। এরূপ গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার প্রয়োজন আছে। এতদিন ইহা প্রকাশিত হইতে পারিত, কিন্তু আমাদের রচনালালসা মাসিক পত্রিকার বিবর্দ্ধমান কলেবর পূর্ণ করিবার জন্য ক্রমশঃপ্রকাশ্য আখ্যায়িকা-বিস্তারে অধিক অনুরক্ত হইয়া পড়িতেছে!

স্থাপত্যের ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শন মুখ্য প্রমাণ। তাহাতে জন-সমাজের শিক্ষা-দীক্ষার, রুচি-প্রবৃত্তির ও শিল্প-প্রতিভার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। লিখিত গ্রন্থের বর্ণনা পাঠ করিয়া, সেরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হইবার আশা করা যাইতে পারে না। শিল্প-প্রতিভার আলোচনা আরব্ধ হইয়াছে; কিন্তু তাহার সহিত ইতিহাসের কিরূপ সম্পর্ক বর্ত্তমান ছিল, তাহার পরিচয় কল্পনা-প্রাবল্যে এখনও আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। শিল্পের সহিত ইতিহাসের সম্পর্ক চির-পরিচিত। ঐতিহাসিকের সহিত শিল্পীর কলহ অপেক্ষাকৃত অভিনব। শিল্পের ইতিহাস সঙ্কলিত হইলে, এই কলহ ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইবে। তখন পাণ্ডিত্যের প্রতি অকারণ অশ্রদ্ধা দূরীভূত হইবে,—শিল্প-সমালোচনা "আহা উঁহুঁ" ছাড়িয়া, বৈজ্ঞানিক বিচার-প্রণালীর অনুগত হইবে। যত দিন তাহা না হইতেছে, ততদিন—ইষ্টক ইষ্টক, প্রস্তর প্রস্তর,—তাহা কুড়াইবার চেষ্টা বাতুলতা,—তাহা হইতে দূরে থাকিবার উদাসীনতা বিজ্ঞতা-বিজ্ঞাপক আত্মশ্লাঘা! সুতরাং এখনও লিখিত প্রমাণই প্রধান প্রমাণ, অনেকের নিকট একমাত্র প্রমাণ বলিয়া সমাদর লাভ করিতেছে;—শিল্প-সমলোচনা সেরূপ সমাদর লাভ করিতে পারে নাই।

লিখিত প্রমাণ এক শ্রেণীর গৌণ প্রমাণমাত্র। কে লিখিয়াছিল, কবে লিখিয়াছিল, কেন লিখিয়াছিল, কিরূপ সত্যনিষ্ঠার সহিত কোন্ শ্রেণীর প্রমাণের সাহায্যে লিখিয়াছিল,—এ সকল বিষয়ে সহসা সংশয়শূন্য হইবার উপায় থাকে না। ইহার প্রত্যেক বিষয়ের বিশ্বাসযোগ্য পরিচয় প্রকাশিত না হইলে, লিখিত প্রমাণ মুখ্য প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না।

লিখিত প্রমাণ দুই ভাগে বিভক্ত হইবার যোগ্য। এক, সমসাময়িক; অপর, পরকাল-প্রণীত। পরকাল-প্রণীত লিখিত প্রমাণ অপেক্ষা সমসাময়িক লিখিত প্রমাণ অধিক নির্ভরযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। কূটলিপি না হইলে, সমসাময়িক লিখিত প্রমাণ অধিক মর্য্যাদা-লাভের যোগ্য। তাহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,—রাজশাসন, এবং তদিতর লিপি। উভয় শ্রেণীর লিপিতেই বর্ণনা-মাধুর্য্যের প্রবল প্রলোভনে, লেখকগণ অনেক সময়ে রচনা-রীতিকে অপরিমিত মাত্রায় পল্লবিত করিয়া গিয়াছেন; তথাপি, তাহাতে তৎকাল-পরিচিত শিক্ষাদীক্ষার, আচার-ব্যবহারের, রীতিনীতির ও জ্ঞান-বিশ্বাসের অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার তুলনায়, পরকাল-প্রণীত লিখিত প্রমাণ অধিক মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে না।

পরকাল-প্রণীত-গ্রন্থ-নিহিত বিবরণ এবং প্রচলিত জনশ্রুতিও কোনও কোনও বিষয়ের প্রমাণরূপে গৃহীত ও ব্যবহৃত হইবার যোগ্য হইতে পারে। কিন্তু তাহা কোন্ শ্রেণীর প্রমাণ,—কোন্ বিষয়ের প্রমাণ,—সমসাময়িক প্রমাণের বিরোধী হইলে, কত দূর বিশ্বাসযোগ্য,—তাহার বিচার না করিয়া, তাহার উপর একান্ত নির্ভর করা অসঙ্গত। ভাটের গাথা এবং কুলশাস্ত্রের পুথি কোন্ শ্রেণীর প্রমাণ, তাহা লইয়া আমাদের দেশে বিলক্ষণ দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রচলিত হইয়াছে। যাঁহারা এই শ্রেণীর লিখিত প্রমাণকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে অসম্মত, তাঁহারা ইহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছেন। যাঁহারা ইহাকে পরিত্যাগ করিতে অসম্মত, তাঁহারা ইহার প্রমাণকে মুখ্য প্রমাণের মর্য্যাদা দান করিতেও ইতস্ততঃ করিতেছেন না। এই শ্রেণীর প্রমাণকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিবার উপায় নাই; সকল বিষয়ের মুখ্য প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিবারও উপায় নাই। এই শ্রেণীর বহুগ্রন্থ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এক সঙ্গে পরীক্ষা করিয়া, তাহা হইতে কোন্ শ্রেণীর কি কি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা সঙ্কলিত করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সেরূপ চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। কেবল অযথা নিন্দাবাদ বা অযথা স্তুতিবাদ প্রচলিত হইয়া, এই শ্রেণীর গ্রন্থ কত দূর নির্ভরযোগ্য, কাহাকেও তাহা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবার অবসর দান করিতেছে না।

আমাদের ইতিহাসের সকল প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই, কখনও হইবে কি না, তাহারও কিছুমাত্র নিশ্চয়তা নাই। অনেক প্রমাণ হয় ত চিরবিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; অনেক প্রমাণ হয় ত সমস্ত যত্ন চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া, চিরকাল বা দীর্ঘকাল অনাবিষ্কৃত থাকিবে। এরূপ অবস্থায় কিরূপে ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারে?

সকল দেশের সম্বন্ধেই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে পারে। তথাপি সকল দেশেই ইতিহাস সঙ্কলিত হইতেছে। বৈজ্ঞানিক রচনা কদাচ চিরসমাপ্তি লাভ করিতে পারে না। জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া, তাহাকে নূতন মর্য্যাদায় বিভূষিত করে। ইতিহাসের অবস্থাও সেইরূপ। যত দূর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তত দূর ইতিহাস রচিত হইবে:—কালে নূতন প্রমাণের আবিষ্কার সাধিত হইলে, ইতিহাস সংশোধিত হইবে;—প্রয়োজন হইলে পরিবর্ত্তিত হইবে—যাহা সত্য, তাহাই বিজয়লাভ করিবে।

প্রমাণের সাহায্যে পুরাতত্ত্ব কত দূর অবগত হওয়া যায়, তাহারও আলোচনা আবশ্যক। তাহাতে প্রবৃত্ত হইলে, দেখিতে পাওয়া যায়,—আবিষ্কৃত প্রমাণ কিয়ৎপরিমাণে কোনও কোনও বিষয়ের অসন্দিগ্ধ পরিচয় প্রদান করে, কোনও কোনও বৃত্তান্তের আভাসমাত্র সূচিত করিয়া নিরস্ত হয়, এবং অসন্দিগ্ধ বৃত্তান্তের সাহায্যে কোনও কোনও অপরিজ্ঞাত ও অনাবিষ্কৃত বৃত্তান্তের প্রকৃতিনির্ণয়ের পথ প্রদর্শন করে। যাহা অসন্দিগ্ধ, তাহা গৃহীত হইতে পারে। যাহার আভাসমাত্রই প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা সেই ভাবে সূচিত হইতে পারে। যাহা অজ্ঞাত ও অনাবিষ্কৃত, অথচ জ্ঞাত বিষয়ের সাহায্যে কিয়ৎপরিমাণে অনুভূত হইতে পারে, তাহার সম্বন্ধে কেহ কেহ নিজ নিজ ধারণার কথা লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন। তাহা অনেক সময়ে কল্পনা-প্রসূত; অথবা ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টির অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত বলিয়া কথিত হইতে পারে। তাহাকে ধারণারূপে ব্যক্ত করাই কর্ত্তব্য। তাহা মিথ্যা হইয়া গেলেও, ইতিহাসের ক্ষতি হয় না। ভবিষ্যতের তথ্যানুসন্ধানের পথ-প্রদর্শন করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। তাহাতে যে পথ নির্দ্দিষ্ট হয়, সে পথে কিয়দ্দূর মাত্র অগ্রসর হইয়া ভ্রম বুঝিতে পারিলেও, অনেক বিষয় জানা হইয়া যায়। বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই এইরূপ ধারণার অবতারণা করিবার রীতি ও উপকার দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা ধারণামাত্র, তাহাকে ঐতিহাসিক সত্যরূপে প্রচারিত করিবার প্রগল্‌ভতা পরিত্যাগ করিতে পারিলে, ইহা কাহাকেও পথভ্রান্ত করিতে পারে না।

ইতিহাসের কথা উত্থাপিত হইলেই, ধারাবাহিকত্বের আকাঙ্ক্ষা স্বভাবতঃ প্রবল হয়। আমাদের দেশের রাজ-শাসনের ধারাবাহিক ইতিহাস-সঙ্কলনের উপযুক্ত অধিক প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু তাহাই একমাত্র ইতিহাস নহে। জনসমাজের ইতিহাসে রাজশাসনের কথা অপরিহার্য্য হইলেও, সর্ব্বস্ব বলিয়া কথিত হইতে পারে না। জনসমাজের ধারাবাহিক ইতিহাস তাহাদের



রাজেশ্বর ও ভিখারিণী।

চিত্রকর—সার্ এডোয়ার্ড বরন্‌জোন্স।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

সভ্যতা-বিকাশের ইতিহাস, তাহার উপাদান অপ্রচুর বলিয়া বোধ হয় না। বরং অন্যান্য দেশের তুলনায়, আমাদের দেশেই তাহার প্রচুর উপাদান প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা। সে ভাবে বাঙ্গালীর ইতিহাস সঙ্কলিত করাইতে পারিলে, ধারাবাহিকত্বের অভাব অন্তরায় বলিয়া প্রতিভাত হইবে না।

ইতিহাসের রচনা-লালিত্য কিরূপ হইবে, তৎসম্বন্ধে অনেক রুচি-বৈচিত্র্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেহ কেহ রচনা-লালিত্যকে ইতিহাস হইতে চিরনির্ব্বাসিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর; তাঁহারা ইতিহাসকে কেবল অভিজ্ঞ পাঠকের অধ্যয়নের উপযুক্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে রচিত করাইবার জন্য লালায়িত। রচনা-লালিত্যের সহিত বিজ্ঞানের চিরবিরোধ কল্পিত হইতে পারে না। বিজ্ঞানের সারসিদ্ধান্ত সরস রচনায় ব্যক্ত হইবার অযোগ্য বলিয়া কথিত হইতে পারে না। কিন্তু রচনা-লালিত্য ইতিহাসের সর্ব্বস্ব নহে,—প্রমাণই সর্ব্বস্ব বলিয়া পরিচিত। তাহাকে অবিকৃত রাখিয়া, রচনালালিত্য বিস্তৃত করিতে পারিলে, পাঠকগণের পক্ষে ইতিহাস অধিক প্রীতিপ্রদ হইতে পারে।

আমাদের ইতিহাস নাই, ইতিহাস রচিত হউক। কেবল তাহাই নহে,—আমাদের ইতিহাস যথাযোগ্য ভাবে রচিত হউক। সেরূপ ইতিহাস রচিত হইলে, অনেক ভ্রান্ত বিশ্বাস দূরীভূত হইবে, অনেক হিংসা-দ্বেষ প্রশমিত হইবে,—আমাদের পথভ্রান্ত চিত্তবৃত্তি মানবের মহোচ্চ আদর্শের অনুগামী হইতে পারিবে,—ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন ধর্ম্ম, ভিন্ন আচারব্যবহার প্রচলিত থাকিলেও, সকল বাঙ্গালী মহামিলনের সাধারণ ভিত্তির সন্ধান লাভ করিবে। এক সময়ে ইতিহাস বিদ্যালয়ে অধ্যাপিত হইত না, সাধারণ শিক্ষায় ইতিহাসের অধ্যয়নের প্রয়োজন পর্য্যন্ত স্বীকৃত হইত না;—তাহা কেবল রাজকুমারগণের ও রাজপুরুষগণের শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যেই স্থান প্রাপ্ত হইত। তাহার পর যখন ইতিহাস জনসাধারণের পাঠ্য বলিয়া স্বীকৃত হয়, তখনও তাহা রস-সাহিত্যের অন্তর্গত আখ্যায়িকারূপেই অধীত ও অধ্যাপিত হইত। এখন ইতিহাসের অধ্যয়ন বিজ্ঞানশাস্ত্রের ন্যায় সকল শ্রেণীর নরনারীর জন্য সমান ভাবে অপরিহার্য্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা উপদেষ্টা, তাঁহারা ইতিহাসকে যথার্থ উচ্চশিক্ষার প্রধান সহায় বলিয়াই কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এ সময়ে যথাযোগ্যভাবে ইতিহাস রচনা করাইবার প্রয়োজন দিন দিন অধিক অনুভূত হইতেছে।

বাঙ্গালীর ইতিহাস সঙ্কলিত করাইতে হইলে, বাঙ্গালীকেই তাহার সমস্ত আয়োজনের সুব্যবস্থা করিতে হইবে,—আখ্যায়িকামাত্র সঙ্কলিত করাইবার

অনায়াসসাধ্য অলীক উদ্যম পরিত্যাগ করিয়া, বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অনুসরণ করিবার জন্য যত্নশীল হইতে হইবে। তাহা ব্যয়-সাধ্য, শ্রমসাধ্য, সময়সাধ্য কঠিন ব্যাপার হইলেও, তাহাই সুধী-সম্মত একমাত্র প্রকৃষ্ট প্রণালী। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালীর সংসর্গে আসিয়া, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের অধিবাসীর মধ্যে বঙ্গদেশের অধিবাসিবর্গই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসার সহিত জ্ঞানসাম্রাজ্যের বিবিধ বিভাগে বিজয়লাভের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। স্বদেশের ইতিহাসের উপাদান-সঙ্কলন-কার্য্যেও তাঁহারা আন্তরিক আকাঙ্ক্ষার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই আকাঙ্ক্ষা আরও আন্তরিক হউক,—এই আকাঙ্ক্ষা যথাযোগ্য বৈজ্ঞানিক চেষ্টার পরিচয় প্রদান করুক,—কালক্রমে সেই চেষ্টা অবশ্যই কাম্যফল প্রদান করিয়া, বর্ত্তমান অসম্যক্ চেষ্টার প্রথম পরিশ্রম ও প্রথম স্বার্থত্যাগ চরিতার্থ করিয়া দিবে।

ইতিহাসের উন্মাদনা সকলের নিকটেই সুপরিচিত। তাহার মূল মানব-প্রকৃতির গূঢ়তম গভীরতার মধ্যে গুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। কাহারও কৌতূহলের উদ্রেক করিয়া, কাহারও বুদ্ধিবৃত্তিকে সুমার্জ্জিত করিয়া, কাহারও বা সুকোমল চিত্তবৃত্তির অনুরাগবর্দ্ধন করিয়া, অতীত-প্রীতি মানব-হৃদয়ের উপর নানাভাবে অধিকার বিস্তৃত করে। সভ্যতার উন্মেষে তাহা একটি প্রবল শক্তিরূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়া থাকে। তখন তাহা কেবল অতীত-প্রীতি বলিয়া স্বীকৃত হয় না। তাহা মানব-সমাজের বর্ত্তমানকে অতীতের সঙ্গে এক সূত্রে গ্রথিত করিয়া অনাগত ভবিষ্যৎকেও দৃষ্টি-পথের সম্মুখীন করিয়া দেয়। তখন তাহা মানব-বিজ্ঞানের আকার ধারণ করে। তাহার আলোকে সকল ক্ষুদ্রতা মহাপ্রাণতায় বিলীন হইয়া যায়,—সমগ্র মানব-সমাজের অখ্যাত অজ্ঞাত চিরবিস্মৃত নরনারীর অতীত-কাহিনী প্রত্যেকের চিরপরিচিত আত্ম-কাহিনীর ন্যায় প্রতিভাত হয়,—যোগযুক্ত আত্মত্যাগীর চিরারাধ্য অদ্বৈততত্ত্ব সাধারণ নরনারীর হৃদয়মন অভিষিক্ত করে। বর্ত্তমান, তাহার স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া, চিরপ্রবহমানা কাল-কল্লোলিনীর একটিমাত্র অবিচ্ছিন্ন সলিল-ধারার ন্যায়, অতীতের সম্প্রসারিত অস্তিত্ব-রূপে, ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হইতে থাকে। তখন বর্ত্তমান কেবল অতীতের এক মহাভাষ্যরূপে প্রতিভাত হইয়া, মানব-সমাজকে কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর করিয়া দেয়, এবং বর্ত্তমানের সকল অভিজ্ঞতা অতীতকে প্রত্যক্ষবৎ উদ্ভাসিত করে। অন্যান্য বিজ্ঞান বাহিরের বস্তুতত্ত্বের পরিচয় প্রদান করে। কিন্তু ইতিহাস সকল যুগের সকল অবস্থার মানব-সমাজের সকল কার্য্যের মধ্যে বিশ্বমানবের সকল

চিন্তার, সকল আকাঙ্ক্ষার, সকল আশার পরিচয় প্রদান করিয়া, অন্যান্য বিজ্ঞান অপেক্ষা মানবচিত্তের অধিক উন্মেষ-সাধন করিতে কৃতকার্য্য হয়।

The knowledge of how man has acquired his present position and powers—is one of the widest studies, best fitted to open the mind, and to produce that type of wide interests and toleration which is the highest result of education.

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

দার্শনিক-শাখার সভাপতির অভিভাষণ।

সভ্যমহোদয়গণ!

আপনাদের প্রতিনিধিস্বরূপ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ সুধীগণ যখন আমাকে আপনাদের এই সাহিত্য-সম্মিলনের দার্শনিক-শাখার সভাপতি হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন, তখন আমি প্রথমতঃ সে প্রস্তাব নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। আমি নিজের চিন্তা ও অধ্যয়ন লইয়া জগতের এক পার্শ্বে পড়িয়া থাকি, সভাসমিতির সম্পর্কে আসিয়া নিজের অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিবার চেষ্টা যত দূর সম্ভব বর্জ্জন করিয়াই থাকি; সুতরাং আমাকে এই সম্মিলনক্ষেত্রে টানিয়া আনিয়া কাহারও যে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি থাকিতে পারে, এ কথা কখনও আমার মনে আসে নাই। বিশেষতঃ আমি দুঃখের সহিত অনুভব করিয়া থাকি যে, আমি কখনও আপনাদের ন্যায় মাতৃভাষার সেবা করিয়াছি বলিয়া গৌরব করিতে পারি না। তবে আমারই জীবনকালের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা যে অতি আশ্চর্য্য দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, ইহা আমি আনন্দের সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। নানা কোলাহলের নিম্ন দিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের যে স্রোতটি বহিয়া যাইতেছে, তাহার আবেগ ও উচ্ছ্বাস আমি আশার সহিত অনুভব করিয়া থাকি। বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিতে যাঁহারা সহায়তা করিতেছেন, তাঁহারা বরেণ্য; যাঁহাদের চেষ্টা ও যত্নে এই ক্ষীণ আলোকটি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে, মাতৃভাষার সেই একনিষ্ঠ সেবকগণ বঙ্গবাসিমাত্রেরই শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁহাদের মধ্যে কেহ যদি অদ্যকার সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত

করিতেন, তাহা হইলেই যোগ্য এবং শোভন হইত। মাতৃভাষার উপাসনা-মন্দিরে পৌরোহিত্য করিবার অধিকার আমার নাই। আপনাদের যত্নার্জ্জিত স্বাভাবিক নেতৃত্ব আজ আমার প্রতি অর্পণ করিয়া আপনারা যে মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাদিগের নিকটে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করিয়া সেই সঙ্গে সঙ্গে আপনারাও যে একটি গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা ভুলিলে চলিবে না। যাহাতে আপনাদের নির্ব্বাচন কোনও বিষয়ে নিন্দনীয় না হয়, এইক্ষণ সেই ব্যবস্থা করিয়া অদ্যকার এই অধিবেশন সার্থক করুন। সভার কার্য্যে সহায়তা করিয়া আপনাদেরও দায়িত্ব পূরণ করুন, ইহাই আপনাদের নিকট আমার বিনীত অনুরোধ।

আমার মনে হয় যে, অদ্যকার দার্শনিক বিভাগের অধিবেশন বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। আমাদের দেশের চিন্তার ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দার্শনিক সাহিত্য সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের সহিত চিরকাল মিশ্রিত, জড়িত হইয়াই রহিয়াছে। ধর্ম্মনৈতিক, সমাজনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক সত্যের সহিত দর্শনশাস্ত্রের অতি নিকট সম্বন্ধ থাকিলেও, ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের এবং অনুশীলন-প্রণালীর যে যথেষ্ট স্বতন্ত্রতা আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আপনারা সাধারণ সাহিত্য হইতে দার্শনিক সাহিত্যকে পৃথক্ করিয়া যে ইহাকে বিজ্ঞান ও ইতিহাসের পার্শ্বে একটি স্বতন্ত্র স্থান প্রদান করিয়াছেন, ইহা বাস্তবিকই অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। আজ যে আমরা একটি স্বতন্ত্র দার্শনিক-শাখার ছায়ায় সম্মিলিত হইতে পারিয়াছি, আমি মনে করি যে, ইহাই বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কোনও জাতির সাহিত্যই তাহার শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। চিন্তাশীলতা বা ভাবুকতাই আবার সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান। ভাষাকে নানা অলঙ্কারে সাজাইয়া রাখিতে পারেন, কল্পনা দিয়া তাহাকে অপূর্ব্ব-শ্রীসমন্বিত করিতে পারেন, কিন্তু একমাত্র চিন্তাশীলতাই ভাষাকে গাম্ভীর্য্য ও শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত করিতে পারে। এক দিকে কোমল কাব্যকলার দিকে যেমন আমাদের মন স্বতঃ আকৃষ্ট হয়, তেমনই দর্শনের সারবান্ বিচার ও মীমাংসার দিকেও একটি আকর্ষণ ক্রমশঃ আমরা অনুভব করিতে থাকি। সাহিত্য-কাননে বিচরণ করিতে করিতে ফুলের শোভায় যতই আমরা প্রলুব্ধ হই, ফলের আস্বাদ পাইবার জন্য ততই আমাদের

আগ্রহ হয় না কি? ভ্রমণ করিতে করিতে যখন আমরা একটি পুষ্পোদ্যান-শোভিত নির্ম্মল স্বচ্ছ নদীর তীরে গিয়া উপনীত হই, তখন সে দৃশ্য আমাদের মনোরম বোধ হয়, কিন্তু তাহা বলিয়া কি ইচ্ছা হয় না যে, অদূরের পর্ব্বতশ্রেণীর উপর গিয়া একবার চতুর্দ্দিকের বিশ্ব ভাল করিয়া দেখিয়া লই?

জগতের সমস্ত সাহিত্যেই দর্শনের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। সাহিত্য মানবের চিন্তাকেই অনুসরণ করিয়া থাকে, সুতরাং চিন্তা যেমন বিস্তৃতি ও গভীরতা লাভ করিয়া কাব্য, বিজ্ঞান ও ইতিহাসে আপনাকে প্রকাশ করে, তেমনই দার্শনিক আলোচনার মধ্যেও ইহা তৃপ্তি ও পরিণতি লাভ করিয়া থাকে। অত্যন্ত সুখের বিষয় যে, বঙ্গসাহিত্যেও এই সর্ব্বতোমুখী উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। বিগত ৩০ বৎসরের মধ্যেই বোধ হয় এ দেশের সাহিত্যের বেশী উন্নতি হইয়াছে। এ বিষয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ জন্য উত্তরকালে বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকগণ পরিষদের নাম যে কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল দার্শনিক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও আমাদের দেশের সাহিত্যের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। কাব্য উপন্যাস ও ইতিহাসের সঙ্গে দার্শনিক সাহিত্যও পরিপুষ্টির দিকে অগ্রসর হইতেছে। বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া উপন্যাস-রসিক বঙ্কিমচন্দ্র পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত মনস্বী লেখকই দার্শনিক সাহিত্যের কলেবর পুষ্ট করিয়া গিয়াছেন। জীবিত লেখকদিগের মধ্যে অনেকেরই রচনার সহিত আমি পরিচিত নহি; সুতরাং কাহাকে ছাড়িয়া কাহার নাম করিব, এই আশঙ্কায় ব্যক্তিগত কৃতিত্বের উল্লেখ করিতে বিরত হইলাম। কিন্তু এই প্রসঙ্গে সম্মিলনের বর্ত্তমান অধিবেশনের সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নাম বোধ হয় নিঃসঙ্কোচে আপনাদের নিকটে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি যেরূপভাবে দার্শনিক সত্যগুলিকে বঙ্গভাষায় বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি আমাদের সকলেরই ধন্যবাদার্হ। এইরূপ আদর্শ অনুসৃত হইলে বঙ্গভাষায় দার্শনিক আলোচনার বহুল প্রচার হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদিগের মধ্যে অনেক সুলেখক আছেন, তাঁহাদের চিন্তা ও অনুসন্ধান-প্রবৃত্তি ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া

বঙ্গভাষায় একটি বিস্তৃত দর্শন-সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে পারে। যাঁহারা দর্শনশাস্ত্রের আলোচনায় নিযুক্ত, তাঁহারা সকলেই বঙ্গভাষার সেবক নহেন, কিন্তু যাঁহাদের সুযোগ এবং শক্তি আছে, তাঁহারা তাঁহাদের ক্ষমতা ও প্রতিভা এই দিকে নিয়োজিত করিলে অনেক সুফলের সম্ভাবনা।

আমার মনে হয় যে, বঙ্গভাষায় দর্শন-চর্চ্চার উন্নতি হইতে হইলে এই শ্রেণীর লোকের দ্বারাই হইবে। ইঁহারা মুখ্যভাবে লেখক না হইলেও, ইঁহাদের হস্তেই দার্শনিক সাহিত্যের উন্নতি বহুলপরিমাণে নির্ভর করিতেছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। সাধারণ সাহিত্যের দিক দিয়া দেখিলেও আমরা ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাই। বর্ত্তমান কাব্য বা উপন্যাস সাহিত্য যে সাধারণতঃ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তির দ্বারাই উন্নতিলাভ করিয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বস্তুতঃ বর্ত্তমান কালে যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই পাশ্চাত্য শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন ;—পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্য দিয়া তাঁহারা দেশীয় চিন্তা, সমাজ ও ইতিহাসকে ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন ; সাধারণ সাহিত্য যেরূপ পাশ্চাত্য জ্ঞানের আলোকে অগ্রসর হইয়াছে, বাঙ্গালার শিশু দার্শনিক সাহিত্যও সেইরূপ আপাততঃ পাশ্চাত্য জ্ঞানের আলোকে বর্দ্ধিত হইবে বলিয়া মনে হয়। যাঁহারা সংস্কৃতের বিপুল দার্শনিক সাহিত্য ও ইয়ুরোপীয় চিন্তার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, তাঁহারাই বঙ্গভাষার দার্শনিক সম্পদ্ বাড়াইতে পারিবেন।

দার্শনিক সাহিত্যের উন্নতি করিতে হইলে পরিভাষার অভাব দূর করিতে হইবে। বাঙ্গালায় কোনও দার্শনিক আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই শব্দের অভাব অনুভব করিতে হয়। বঙ্গ-সাহিত্যের শব্দ-সম্পদ্ যে এখনও আশানুরূপ বর্দ্ধিত হয় নাই, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। এই শব্দ-সম্পদ্ বাড়াইয়া না লইলে দর্শনের ন্যায় গম্ভীর ও জটিল বিষয়ের আলোচনায় পদে পদে ভাষার দৈন্য অনুভব করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে হয় ত আপনারা বলিবেন যে সংস্কৃত-সাহিত্যের অক্ষয় ভাণ্ডার উন্মুক্ত থাকিতে আমরা ভাষার দৈন্য স্বীকার করিব কেন? কিন্তু আমার বোধ হয়, এইখানে একটু উদারতা থাকা চাই। জ্ঞানের সাম্যনৈতিক ক্ষেত্রে সংকীর্ণতা থাকা একেবারেই বাঞ্ছনীয় নহে। সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষার নিকটে প্রয়োজন হইলে ঋণ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইলে চলিবে না। অবশ্য সংস্কৃতকে সাধারণতঃ ভিত্তি-স্বরূপে গ্রহণ করিতে হইবেই ; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, মানবের চিন্তা-জগৎ গতিশীল ; ইহার ক্রম-বিবর্ত্তনে নূতন নূতন

ভাব, নূতন নূতন প্রণালী জন্মলাভ করে; সেই সকল ভাব ও প্রণালী সংস্কৃত সাহিত্যে না থাকিলেও, কিছু অগৌরবের কথা নহে। এ সকল স্থলে পৃথিবীর অন্যান্য ভাষা হইতে শব্দ সংগ্রহ করিবার রীতি অন্য সমস্ত ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য দার্শনিক সাহিত্য নানা ভাষা হইতে সংগৃহীত শব্দে পরিপূর্ণ।

দার্শনিক সাহিত্যের উন্নতির আর একটি উপায়,—পরস্পরের ভাব-বিনিময়ের ব্যবস্থা। যাঁহারা দর্শন শাস্ত্রের আলোচনায় তৃপ্তি লাভ করেন, তাঁহারা যদি সম্মিলিত হইয়া পরস্পরের মনোভাব ও অনুশীলন-প্রণালী জানিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে যে শুধু তাহার দ্বারা অনেক দার্শনিক তত্ত্বের উদ্‌ঘাটন ও মীমাংসা হইতে পারে, তাহা নহে; সেই সঙ্গে আমাদের দেশে দার্শনিক সাহিত্যেরও উন্নতি হইতে পারে। কতকটা এইরূপ উদ্দেশ্য লইয়া কয়েক বৎসর হইল (Calcutta Phillosophical Society) নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মৌলিক অনুসন্ধান ও শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদিগের গ্রন্থ অধ্যয়নের দ্বারা দার্শনিক জ্ঞানের উন্নতি সাধন করা, ভারতীয় দর্শনের অনুশীলন, এবং অভিনব বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীর দ্বারা ভারতীয় দর্শন-সমূহের আলোচনা, দার্শনিক সত্যের আলোকে আমাদের ব্যবহার ও চরিত্রের উৎকর্ষ-সাধনের উপায়-স্থিরীকরণ প্রভৃতি ঐ সমিতির উদ্দেশ্যের অন্তর্গত। আমার মনে হয়, এইরূপ সমিতি দর্শন-সাহিত্যের উন্নতির পক্ষেও বিশেষ সহায়তা করিতে পারে।

কিন্তু এ স্থলে একটি কথা এই, অনেকে হয় ত মনে করিবেন যে, দর্শন সম্বন্ধে আমাদের ভাবপ্রকাশের পক্ষে ইংরেজী ভাষাই অধিকতর উপযোগী। ইংরেজী ছাড়িয়া বাঙ্গালার সাহায্য লইতে যাইব কেন? ইংরেজী ভাষা যে আমাদের ভাব-প্রকাশে বেশী সহায়তা করে, তাহাতে অগৌরবের কিছু আছে বলিয়া বোধ হয় না। কারণ ইংরেজী ভাষার মধ্য দিয়াই বর্ত্তমান কালে আমাদের শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে। ইংরেজী ভাষা পৃথিবীর এক বিপুল সাহিত্যের দ্বার আমাদের নিকট উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। ইহা কদাচ উপেক্ষার বস্তু নহে। পরন্তু আমরা যে এই অপূর্ব্ব সুযোগ লাভ করিয়াছি, ইহা গৌরবের বিষয়। ইউরোপে মধ্যযুগে ভিন্ন ভিন্ন জাতিরা লাটিন ভাষায় ভাব প্রকাশ করিতে সুবিধা বোধ করিতেন, লাটিন ভাষায়ই পুস্তক লিখিতেন। পরে যখন ভিন্ন ভিন্ন জাতির মাতৃভাষা (Vernacular) উন্নতি লাভ করিল, তখন লাটিনের আর প্রয়োজনীয়তা রহিল না। বাঙ্গালা ভাষা যখন পরিপুষ্ট হইবে, ইহার শব্দ-দৈন্য যখন ঘুচিবে, বাঙ্গালা ভাষার পুস্তক যখন অন্য ভাষায় অনূদিত হইবে, তখন হয় ত আমাদেরও আর ইংরেজীর

সহায়তা আবশ্যক হইবে না। কিন্তু যতদিন তাহা না হয়, ততদিন ইংরেজী ভাষায় আমাদের চিন্তার ফল সাধারণের নিকট উপস্থিত করিতে সংকুচিত হইবার কোনও কারণ নাই। কারণ, জগতের বিচারালয়ের সমক্ষে সেগুলিকে উপস্থিত করা, ভারতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে এইরূপ চিন্তার প্রচার করা আপাততঃ কেবল ইংরেজী ভাষার দ্বারাই হইতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে এরূপ প্রণালী বঙ্গভাষার উন্নতির অন্তরায় বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু আমি মনে করি যে, পরোক্ষভাবে ইহার দ্বারাও বঙ্গসাহিত্য লাভবান হইবে। দেশে দার্শনিক চিন্তার প্রসার হইলেই বাঙ্গালা দার্শনিক সাহিত্য তাহার দ্বারা নিশ্চয়ই উপকৃত হইবে। ইংরেজী ভাষার সাহায্যেই হউক, বা অন্য ভাষার সাহায্যেই হউক, যাঁহারা নিষ্ঠার সহিত দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা করিবেন, তাঁহারা যদি বুঝিতে পারেন যে, তাঁহাদের চিন্তা ও গবেষণার ফল জানিবার জন্য তাঁহাদের স্বদেশবাসিগণ ব্যগ্র, তাহা হইলে তাঁহারা বঙ্গ-সাহিত্য অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবেন।

এই স্থলে অনুবাদের উপকারিতা সম্বন্ধেও দুই একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। কোনও জাতির দার্শনিক সাহিত্য পরিপুষ্ট করিতে হইলে কেবল মৌলিক অনুসন্ধানের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। অনুবাদের মূল্যও এ স্থলে স্বীকার করা কর্ত্তব্য। ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে এইরূপেই ভাবের আদান প্রদান হইয়া থাকে। এইরূপে বিনিময়ের দ্বারা জগতের সমস্ত সাহিত্য সর্ব্বকালে উন্নতি ও বিস্তৃতি লাভ করিয়া থাকে।

প্রাচীনকালে দার্শনিক বিদ্যা ভারতে জন্মলাভ করিয়া প্রাচ্য দেশ-সমূহে বিস্তৃত হইয়াছিল। এইরূপ, পশ্চিমে দার্শনিক বিদ্যা গ্রীসে জন্মলাভ করিয়া পাশ্চাত্য দেশে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল; এবং এক সময়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে, ভারত এবং গ্রীসের মধ্যে, পণ্যদ্রব্যের বাণিজ্যের ন্যায় চিন্তারও বাণিজ্য যে প্রচলিত ছিল, তাহা ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায়। পাইথাগোরাসের (Pythagoras) জন্মান্তরবাদ ও সাধন-প্রণালী যে ভারতীয় দর্শন ও সাধনের নিকট ঋণী, সে সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং পরস্পর আদান-প্রদানে ভাবসম্পদ্ অনেক বাড়িয়া যায়। আমাদিগের দার্শনিক সাহিত্যের পক্ষে এইরূপ ঋণগ্রহণ যে নিতান্ত স্বাভাবিক ও শুভাবহ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভাব-প্রবাহ কোনও সময়ে কোনও এক স্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। মানবের চিন্তা সর্ব্বদা গতিশীল। গতিশূন্যতা বা জড়ত্বই চিন্তার অভাব সূচিত করে। বিভিন্ন দেশ হইতে বিভিন্ন জাতির চিন্তাপ্রবাহ পরস্পর সম্মিলিত হইয়া তাহারই

ঘাত প্রতিঘাতে নূতন নূতন ভাব-প্রবাহের সৃষ্টি করে। সুতরাং কোনও একটি ভাবের ধারা বা আদর্শ চিরকালের জন্য কোনও জাতির নিজস্ব সম্পত্তি হইয়া থাকিতে পারে না। প্রাচীনকালে ভারতীয় দর্শন-সমূহের একটি সাধারণ গতি বা আকাঙ্ক্ষা ছিল। ব্যক্তিগত আত্মার মুক্তিসাধনই সাধারণতঃ ভারতীয় দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। দুঃখের অত্যন্ত-নিবৃত্তিই হউক, নির্ব্বাণই হউক, আর ব্রহ্মস্বরূপত্ব-প্রাপ্তিই হউক, যে কোনও উপায়ে মানবাত্মার মোক্ষ-সাধনই পরমপুরুষার্থ। ইহাই একমাত্র কাম্য; ইহাই একমাত্র শ্রেয়ঃ। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইবে, আত্মাকে ভাল করিয়া জানিতে হইবে, মায়ার বিনাশ-সাধন করিতে হইবে, উপাধিশূন্য হইতে হইবে, অনাদি বাসনা-সন্তান ধ্বংস করিতে হইবে। কেন? মুক্তির জন্য; সংসার-বন্ধন-মোচনের জন্য; আত্মার কল্যাণের জন্য; নিঃশ্রেয়সলাভের (Summum bonum) জন্য। সাধারণতঃ ইহাই ভারতীয় দর্শনের মূল সূত্র।

গ্রীকদর্শনের গতি ছিল স্বতন্ত্র। ব্যক্তিগতভাবে ও সমগ্রভাবে জীবনের সৌন্দর্য্য ও মঙ্গলবিধান করাই গ্রীক দর্শনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা ছিল। সৌন্দর্য্যের উপলব্ধিতেই গ্রীকদিগের জাতীয় প্রতিভা স্ফুরিত হইয়াছিল। দর্শনেও তাহাদের এই সৌন্দর্য্য-স্পৃহা আত্মবিকাশ করিতে ছাড়ে নাই। মানবজীবনকে সর্ব্বতোভাবে একটী সুস্থ সামঞ্জস্যের ভাবে গঠন করিয়া লইতে তাহারা তাহাদের চিন্তা-প্রণালী নিয়োজিত করিয়াছিল। প্রথম হইতেই গ্রীকদিগের ব্যক্তিগত জীবন সমাজের সহিত অতি নিবিড়ভাবে জড়িত দেখিতে পাই। আদিম অধিবাসীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সতর্কতা অবলম্বন করিতে গিয়াই হউক, অথবা পার্শ্ববর্ত্তী নগর বা সমাজ হইতে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার জন্যই হউক, গ্রীকেরা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের মধ্যে একটী সুন্দর সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া লইয়াছিল। এই জন্য ভারতীয় দর্শনে যেরূপ মানবাত্মার কল্যাণ অথবা ব্যক্তিগত মোক্ষের সন্ধান দেখিতে পাওয়া যায়, গ্রীক দর্শনে সেইরূপ প্রধানতঃ সমাজ বা রাষ্ট্রের হিতের জন্য আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য ভারতীয় ও গ্রীক উভয় দর্শনেরই মূল কথা আত্মা ও জগৎকে জানিবার আকাঙ্ক্ষা। ভিন্ন ভিন্ন আকারে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় এই একই আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় দর্শন আত্মার ও বিশ্বের জ্ঞানকে মোক্ষের উপযোগী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল—দুঃখ-নিবৃত্তি, পুনরাবর্ত্তন-রাহিত্য, বা নির্ব্বাণের অভিমুখে নিয়োজিত করিয়াছিল। গ্রীক দর্শন আত্মা ও জগতের জ্ঞানকে মানবজীবনের সুখ, সৌন্দর্য্য ও কল্যাণ-বিধানের জন্য এবং রাষ্ট্রের হিতের ও উন্নতির উপায়স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছিল।

ভারতীয় চিন্তার গতি হইল ব্যক্তিগত আত্মার হিতের দিকে, শ্রেয়ের দিকে, যোগের দিকে, সন্ন্যাসের দিকে। গ্রীসীয় চিন্তার গতি হইল;—রাষ্ট্রের মঙ্গলের দিকে, সৌন্দর্য্যের দিকে, সামঞ্জস্যের দিকে, কর্ম্মের দিকে।

বর্ত্তমান সময়েও পাশ্চাত্য জগতে গ্রীক ভাবের প্রভাব দেখা যায়, এবং আমাদের দেশেও প্রাচীন ভাবের প্রভাব এখনও রহিয়াছে। গ্রীকভাবের প্রভাবে পাশ্চাত্যজগৎ বাহ্য প্রকৃতির নিয়ম ও গূঢ় তত্ত্ব সকল আবিষ্কার করিয়া মানব-জীবনের সুখ ও আধিপত্যের উপাদান সংগ্রহ করিতেছে। এবং রাষ্ট্রে সুশাসন স্থাপন করিয়া সকলের মঙ্গলসাধন করিতেছে। আর আমরা এখনও মুক্তি-পথ কোন দিকে, তাহার বার্ত্তা জানিবার জন্য সেই প্রাচীনকালের তপোবনের স্বপ্ন লইয়া বসিয়া আছি।

ভারতীয় এবং বিদেশীয় মনীষিগণের মধ্যে কেহ কেহ এই দুইটি আদর্শকেই যে কতকটা উপলব্ধি করিতে না পারিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি না। মহাভারত এবং মনুসংহিতায় রাষ্ট্র-হিতের একটি সুন্দর কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের মধ্যে প্লেটোর (Plato) দর্শনে এই উভয়বিধ আদর্শের সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি এক দিকে যেমন নিত্য চিরন্তন সত্য-সুন্দরমঙ্গল স্বরূপকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিলেন, তেমনই অপর দিকে রাষ্ট্র বা সমাজের কল্যাণ ও সামঞ্জস্য-কল্পনাও তিনি অতি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছিলেন। প্লেটো যে শুধু দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন, তাহা নহে, তিনি এক জন মহা-ঋষি ছিলেন। ঋষি শুধু সত্যের প্রচারক নহেন, তিনি দ্রষ্টা। এরিষ্টটল্ (Aristotle) তাঁহার গুরু প্লেটোর দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভা পাইয়াছিলেন, এবং সে অসাধারণ প্রতিভার আলোক আরও কত উজ্জ্বলভাবে নানা বিষয়ের উপর প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, তাহা অনেকেই জানেন। কিন্তু তিনি তাঁহার গুরুর সেই ঋষিভাবটুকু তেমন প্রাপ্ত হয়েন নাই। প্লেটোর যথার্থ ঋষিভাবটি তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় লুপ্ত হইয়া গেল। অনেক দিন পরে যদিও প্লেটোর প্রভাব সময়ে সময়ে জাগিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাঁহার সেই ঋষিত্ব আর পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় নাই।

ঋষি সত্যকে, মঙ্গলকে, সুন্দরকে দর্শন করেন, প্রত্যক্ষ করেন, জীবনের অন্তরতম অন্তস্তলে অনুভব করেন। এই যে সত্যকে প্রত্যক্ষ করা, ইহার নামই দর্শন। সুতরাং যথার্থ দার্শনিক হইতে হইলে ঋষি হওয়া চাই। শুধু সত্যের বিশ্লেষণে প্রকৃত দার্শনিক হওয়া যায় না।

ইয়ুরোপীয় দার্শনিকদিগের মধ্যে এই ঋষিভাব বহুল্পরিমাণে না থাকিলেও, ইঁহাদের নিকট আমাদের শিখিবার ও জানিবার বিষয় অনেক আছে। এ কথাটী ভুলিলে চলিবে না। সমস্ত বাস্তব জগৎকে কাল্পনিক মনে করিয়া ইহজীবনের সমস্ত বস্তু হেয় বা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উপেক্ষা করিলে চলিবে না। বৈজ্ঞানিক জগতের নিত্য নব আবিষ্কারে আর উদাসীন থাকা সম্ভব নহে। জড়জগতের এই সকল সত্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া পারমার্থিক বা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব লইয়া সন্তুষ্ট হইলে, সত্যের এক অংশের প্রতি নিতান্ত অসম্মান প্রদর্শন করা হয়। ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় জীবনের মধ্যে একটি নিগূঢ় সামঞ্জস্য স্থাপন করিবার চেষ্টা পাশ্চাত্য দর্শনের একটি বিশেষ লক্ষ্য। এ বিষয়ে গ্রীক দর্শন যে সুমহান্ আদর্শ আমাদের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছে, ইহা কোনও ক্রমে উপেক্ষার সামগ্রী নহে। বস্তুতঃ আমার মনে হয় যে, ভারতীয় ও গ্রীক চিন্তার দুইটি ধারাকে একত্র করিতে পারিলে জগতের দার্শনিক জ্ঞান-ভাণ্ডার অভাবনীয়রূপে উন্নতি লাভ করিবে।

এক দিকে পাশ্চাত্য দর্শনের নিকট আমাদের যেমন শিখিবার বিষয় রহিয়াছে, তেমনই আমাদের দর্শনের নিকটেও পাশ্চাত্য জগৎ অনেক শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। ভারতীয় দর্শনের আধ্যাত্মিকতা, বৈরাগ্য প্রভৃতি সর্ব্বকালেই সর্ব্ব জাতির বিস্ময় উৎপাদন করিবে। বর্ত্তমানকালে ইয়ুরোপীয় চিন্তার উপর এই ভারতীয় ভাবের প্রভাব ক্রমশঃ লক্ষিত হইতেছে। বহু শতাব্দী ধরিয়া জড় জগতের ও বাস্তবের উপাসনায় ব্যাপৃত থাকিয়া পাশ্চাত্য জগৎ আত্মার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা-গুলিকে নিরুদ্ধ করিতে বসিয়াছিল; বাহ্যবস্তু-জনিত সুখ ও ধন-সম্পত্তির বৃদ্ধির সন্ধানে তাহারা ব্রহ্মদর্শনের আনন্দ ও বৈরাগ্যের মহত্ত্ব ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছিল। আবার এ সকলের দিকে পাশ্চাত্য চিন্তার স্রোত ধীরে ধীরে ফিরিতেছে। এই জন্যই আমার মনে হয় যে, ভবিষ্যতের দার্শনিক ইতিহাস গ্রীক ও ভারতীয় আদর্শের সংমিশ্রণেই ও সামঞ্জস্যেই পূর্ণতা লাভ করিবে।

ইংরেজের রাজ্য বিস্তারফলে ভারতে এই উভয় আদর্শের সম্মিলন ঘটিয়াছে। এ সুযোগ আমরা যেন পরিত্যাগ না করি। গ্রীক আদর্শকে অঙ্গীভূত করিয়া ভারতীয় দর্শন যে আদর্শের সৃষ্টি করিবে, তাহা জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডারের একটি অত্যুজ্জ্বল রত্ন হইবে। এই সম্মিলন ও সামঞ্জস্য পাশ্চাত্য জগতেও এখন আকাঙ্ক্ষার বস্তু হইয়াছে। যদি আমরা এই দুইটি আদর্শকে মিলিত করিয়া জগতের সমক্ষে স্থাপিত করিতে পারি, তাহা হইলে সে গৌরব হইতে আমরা বঞ্চিত হইব কেন? এইরূপ ভাবে যদি আমাদের দার্শনিক সাহিত্য উন্নতিলাভ

করে, তবে তাহার প্রভাব সমস্ত সভ্য জগৎ অনুভব করিবে। এক সময়ে যদি ভারতের চিন্তার দ্বারা চীন, পারস্য, মিশর, গ্রীস প্রভাবিত হইয়া থাকে, তবে এ আশা আকাশকুসুমমাত্র নহে যে, আবার এমন দিন আসিবে, যখন ভারতের দার্শনিক চিন্তা জগতের চিন্তারাজ্যে এক অপূর্ব্ব বিস্ময়কর বিপ্লব উপস্থিত করিবে।

শ্রীপ্রসন্নকুমার রায়।

বিজ্ঞান-শাখার সভাপতির অভিভাষণ।

গতবর্ষে চট্টগ্রামে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের যে অধিবেশন হয়, আচার্য্য ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় সেই অধিবেশনে বিজ্ঞানশাখার নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। আমি সেখানে উপস্থিত হইতে পারি নাই। বোধ করি, আমার এই অনুপস্থিতির সুযোগ পাইয়া আমার পরমশ্রদ্ধাভাজন বন্ধুগণ বর্ত্তমান বর্ষে বিজ্ঞানশাখার সভাপতিত্বের ভার আমার উপর অর্পণ করেন। এই বিষয়ে তাঁহারা আমার মতামতের অপেক্ষা-মাত্র রাখেন নাই। যোগ্যতাবিচার দূরে থাকুক, যেরূপ দৈহিক অবস্থা না হইলে এইরূপ সভার নেতৃত্বগ্রহণ কখনই সম্ভবপর হয় না, দুই বৎসর হইতে আমার সেই অবস্থাই নাই। যোগ্যতা ও ক্ষমতা উভয়ের অভাবসত্ত্বেও সভার পরিচালন কিরূপে সাধ্য হইবে, সে বিষয়ে আমি তাঁহাদের উপদেশপ্রার্থী হইলেও, তাঁহারা আমাকে সে উপদেশটুকু দিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন। সভাপতিত্বের গুরুভার আমার মস্তকে ন্যস্ত হইয়াছে, এই সংবাদ যখন আমার নিকট পৌঁছিল, তখন শুনিলাম, এই ভার অস্বীকারেও আমার স্বাধীনতা নাই। জগদ্বিখ্যাত আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র সদ্যঃ যে আসন ত্যাগ করিয়াছেন, সেই আসন-গ্রহণে স্পর্দ্ধা প্রকাশ পাইতে পারে, কিন্তু ইহাতে মনে মনে একটু শ্লাঘা এবং আনন্দ পাই নাই, এই কথা বলিলে মিথ্যা উক্তি হইবে। হয় ত সেই শ্লাঘার বশীভূত হইয়াই এ বিষয় লইয়া আর গণ্ডগোল করি নাই, কিন্তু সম্প্রতি ঘটনাক্রমে আমার দুর্ব্বল স্নায়ুযন্ত্র এরূপ আহত ও অবসন্ন হইয়াছে, যাহাতে এই গুরুভার-গ্রহণে নিতান্ত অক্ষমতার পরিচয় হইবে, ইহা বুঝিয়া সাহিত্য-সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আমার অবস্থা

বিজ্ঞাপন্ করিয়াছিলাম, এবং তৎসঙ্গে কোনও যোগ্যতর পাত্রে এই ভার ন্যস্ত হয়, এইরূপ বিনীত নিবেদনও জানাইয়াছিলাম। কিন্তু আমার করুণ কাহিনী তাঁহাদের হৃদয় আর্দ্র করিল না। বিজ্ঞানসভার নেতৃত্ব কার্য্যে যোগ্যতা বা ক্ষমতা কিছুরই প্রয়োজন নাই, সম্মিলনের অধ্যক্ষগণ কিরূপে এই সিদ্ধান্ত করিলেন, তাহা আমার নিকট উৎকট সমস্যা থাকিয়া গেল। কিন্তু বঙ্গদেশের এই কেন্দ্রস্থলে বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর পুরোভাগে আসীন হইয়া হংসমধ্যে বকের ন্যায় কিরূপ শোভমান হইব, ইহা মনে করিয়া আমার দুর্ব্বল স্নায়ুযন্ত্র কিরূপে কম্পিত হইতেছে, আমি স্বয়ংই তাহার ভুক্তভোগী। যাহা হউক, অধ্যক্ষগণ আমাকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, এই মহতী সভার পুরোভাগে না দাঁড়াইলেও আমার চলিতে পারে। সেকালে নিয়ম ছিল, এবং একালেও হয় ত বহুস্থলে প্রথা আছে যে, রাজদরবারে বা গুণি-গণের সভায় কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে নকিব ফুকরায়, অর্থাৎ, একটা লোক, যাহার মূর্ত্তি এবং বেশভূষা সভাস্থ জনগণের হাস্য-উৎপাদনে সমর্থ, সে অতি উচ্চকণ্ঠে প্রায় অবোধ্য ভাষায় সভার কার্য্যারম্ভ ঘোষণা করিয়া দেয়। বুঝিলাম, বর্ত্তমান সভায় সেই নকিবের কার্য্য করিলেই আমি অব্যাহতি পাইব, এবং আমার বন্ধুগণ আমার প্রতি তুষ্ট থাকিবেন। বর্ত্তমান অবস্থায় নকিবের উচ্চকণ্ঠ আমার নাই, তবে বন্ধুগণের পরিতোষের জন্য আপনাদের মত বিজ্ঞ বুধমণ্ডলীর সম্মুখে কয়েক মিনিটের মত গলা জাহির করিয়া কার্য্যারম্ভের ঘোষণা করিয়া দিতে আমি প্রস্তুত হইয়াছি। আমার অবস্থা দেখিয়া আপনাদের অন্তরে যদি হাস্যরসের সঞ্চার হয়, তাহাতে আমি ক্ষুব্ধ হইব না।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন এবং তৎসম্পৃক্ত বিজ্ঞানশাখা যদি দেশের স্থায়ী অনুষ্ঠান হইয়া দাঁড়ায়, এবং এতদ্দ্বারা দেশের যদি কোনও স্থায়ী হিত সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে কোন ভবিষ্যৎকালে এই অনুষ্ঠানের ইতিবৃত্ত সঙ্কলনের প্রয়োজন হইতে পারে। আজিকার বিজ্ঞানসভায় আমি আর কোনও কার্য্য করিতে না পারি, ভবিষ্যতের ইতিহাসলেখকের কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়া যাইতে পারি। এ কাজটাও নকিবের কাজের অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। নয় বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদকতা-গ্রহণের পর একদিন যোড়াসাঁকোর বাড়ীতে বসিয়া মাননীয় শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সাহিত্য-পরিষদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলাম। দশ বৎসর ধরিয়া আমি সাহিত্য-পরিষদের ঢাক বাজাইয়াছি। যখনই অবসর হইয়াছে, কাঁধ হইতে ঢাক নামাইয়া পরিষদের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সম্বন্ধে অন্যের সহিত আলোচনা এবং অন্যের

উপদেশ-গ্রহণ আমার ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই উদ্দেশ্য লইয়া রবীন্দ্রনাথের নিকট যখনই গিয়াছি, তখনই কিছু না কিছু লাভ করিয়া আসিয়াছি। সেই দিন প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলিলেন, সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যক্ষেত্র বাঙ্গালাদেশ জুড়িয়া বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক। বাঙ্গালা দেশ এবং বাঙ্গালী জাতি সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য হইতে পারে, সাহিত্য-পরিষৎ যদি সেই সমস্ত বার্ত্তা কেন্দ্রীভূত করিতে পারেন, তাহা হইলে পরিষদের জীবন সার্থক হইবে। এই কার্য্যের জন্য সমস্ত বাঙ্গালাদেশ ব্যাপিয়া সমস্ত বাঙ্গালীজাতিকে যথাসম্ভব জাগাইয়া তোলা পরিষদের সম্প্রতি মুখ্য কর্ত্তব্য। আপাততঃ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন কলিকাতায় না করিয়া বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন নগরে পর্য্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত করিলে কার্য্যটার সূচনা হইতে পারে। বিলাতের British Association for the Advancement of Science যেমন বর্ষে বর্ষে ভিন্ন ভিন্ন নগরে উপস্থিত হইয়া নূতন জ্ঞানের আহরণ ও পুরাতন জ্ঞানের প্রচার করিয়া থাকেন, সাহিত্য-পরিষদও সেই পথে চলিতে পারেন। British Association কেবল বিজ্ঞান-শাস্ত্রেরই আলোচনা করেন। বাঙ্গালা দেশে ঐরূপ বিজ্ঞান-সভা গঠিত হইবার এখনও সময় হয় নাই। সাহিত্য-পরিষৎকে সাহিত্যের সকল বিভাগেই কাজ করিতে হইবে। আজ যদি আমি স্বীকার করি যে, রবীন্দ্রনাথের এক একটা কথা এক এক সময়ে মন্ত্রের ন্যায় আমার মোহ উৎপাদন করিয়াছে, তাহা হইলে আপনারা আমাকে নিতান্ত ক্ষীণজীবী ভাবিয়া অবজ্ঞা করিবেন না। এই প্রস্তাবটিও তদবধি আমার মোহ জন্মাইয়াছিল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের লোকবল এবং ধনবল আমার অজ্ঞাত ছিল না। সেই ক্ষীণশক্তি লইয়া পরিষৎ কিরূপে এই বার্ষিক অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে, সেই চিন্তা বহুরাত্রি আমার নিদ্রার ব্যাঘাত করিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে ১৩১২ সালের শেষভাগে হঠাৎ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সূচনা হয়। রঙ্গপুর হইতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী এবং বরিশাল হইতে শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী প্রায় এক সঙ্গে বাঙ্গালার সাহিত্য-সেবিগণকে সম্মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করেন। বরিশালের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু বরিশালের সাহিত্য-সম্মিলন সেই বৎসর বরিশালে আহূত রাষ্ট্রনৈতিক সম্মিলনের পুচ্ছ আশ্রয় করিতে যাওয়ায় সম্মিলন-চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পর বৎসর মুর্শিদাবাদ জেলায় সাহিত্য-সম্মিলনের আহ্বানও দৈবক্রমে নিষ্ফল হয়। তার পর বৎসর কাশিমবাজারের মাননীয় মহারাজের আহ্বানে সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন ঘটে। স্বয়ং

রবীন্দ্রনাথ সেখানে সভাপতি ছিলেন। সম্মিলনের সেই প্রথম বৎসরে বিজ্ঞান-আলোচনার বিশেষ কোনও সুবিধাই ঘটে নাই। পর বৎসর রাজসাহী হইতে নিমন্ত্রণ আইসে। সেখানকার অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয়, সম্মিলন কোন্ পথে চালিত হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে আমার অভিপ্রায় জানিতে চাহিয়া আমাকে অনুগৃহীত করেন। সাহিত্যের নানা বিভাগের সম্যক্ আলোচনার জন্য সাহিত্য-সম্মিলনকে সাহিত্য, ইতিহাস, এবং বিজ্ঞান, এই তিন শাখায় আপাততঃ বিভাগ করা যাইতে পারে, এই অভিপ্রায় আমি জানাইয়াছিলাম। বলা বাহুল্য, ব্রিটিশ আসোসিয়েশনের আদর্শ আমার মনে জাগিতেছিল। শশধর বাবু এককালে কাব্য লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অস্থিমজ্জা বৈজ্ঞানিকের ধাতুতে নির্ম্মিত। নানা মাসিক পত্রে মানবতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার বৈজ্ঞানিক আলোচনা এক শ্রেণীর পাঠকের পক্ষে আনন্দজনক ও অন্য শ্রেণীর পাঠকের পক্ষে ভীতিপ্রদ হইয়া পড়িয়াছে। Eugenics বা মানব জাতির উৎকর্ষবিধান সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া তিনি দেশমধ্যে লোকের গার্হস্থ্য জীবন সম্বন্ধে বিবিধ প্রশ্নের যে সব ছাপান তালিকা ছড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালার গৃহস্থগণও সম্ভবতঃ ভীত হইয়া পড়িতেছেন। গৃহস্থের জীবনের খুঁটিনাটি তত্ত্ববার্ত্তা সম্বন্ধে Life Assurance Company দের ছাপান তালিকা ইহার নিকট হারি মানে। রাজসাহীর সাহিত্য-সম্মিলনকে শশধর বাবু যেরূপে প্রায় বৈজ্ঞানিক সম্মিলনে পরিণত করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহাতে আমিও কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া পড়িয়াছিলাম। সেবার সভাপতি ছিলেন ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়। কতকটা সেই কারণে এবং কতকটা শশধর বাবুর সূত্রচালনায় রাজসাহীর সাহিত্য-সম্মিলনে বৈজ্ঞানিকের এবং বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের ঘনঘটা হইয়াছিল। পর বৎসর ভাগলপুরে এবং তৎপর বৎসর ময়মনসিংহে বৈজ্ঞানিকেরা সেরূপ জটলার অবসর পান নাই। তবে ময়মনসিংহে স্বয়ং আচার্য্য জগদীশচন্দ্র সভাপতি ছিলেন। তাঁহার অভিভাষণটাই বৈজ্ঞানিকের অভিভাষণ। পৃথিবীর যে কোনও বৈজ্ঞানিক-সম্মিলনে উহা সাদরে গৃহীত হইতে পারিত। তদ্ব্যতীত এই উপলক্ষে সান্ধ্য-সম্মিলনে তাঁহার আবিষ্কৃত নূতন তত্ত্ব সকল সাধারণকে বুঝাইয়া দিয়া তিনি একটা নূতন পথ দেখাইয়া দেন। পর বৎসর ভাগলপুরে সাহিত্য-সম্মিলনকে বিভিন্ন শাখায় বিভাগের প্রস্তাব যথারীতি উপস্থিত করা হয়। কিন্তু তখন উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। পর বৎসর হুগলীতে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লইয়া যে কয়েক জন

উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা কতকটা বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। শশধর বাবু এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ইহার ফলে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ-লেখকদিগের একটি স্বতন্ত্র অধিবেশন হইয়াছিল, এবং ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাহায় নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরবৎসর চট্টগ্রামে আমি উপস্থিত হইতে পারি নাই; কিন্তু যে কয়েক জন বিজ্ঞানসেবক সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই কতকটা স্বাতন্ত্র্যপ্রার্থী হইয়া গিয়াছিলেন। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় সম্মিলনের এই বিজ্ঞান-বিভাগের সভাপতি ছিলেন। বর্ত্তমান বৎসরে কলিকাতায় সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, এবং ইতিহাস, এই চারি শাখায় সাহিত্য-সম্মিলনকে বিভক্ত করিবার কল্পনা হইয়াছে, এবং আমার উপর বিজ্ঞানসভার নকিবি-ভার অর্পিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে এইরূপ শাখাবিভাগ সর্ব্বত্র সাধ্য হইবে কি না, বলা দুষ্কর। কলিকাতার পক্ষে যাহা সাধ্য, স্থানাভাব, কালাভাব, এবং লোকাভাবে মফস্বলের ক্ষুদ্র নগরগুলির পক্ষে তাহা সাধ্য না হইতে পারে। অন্য শাখার কথা বলিতে পারি না, বিজ্ঞানশাখা এই কয়েক বৎসরের চেষ্টায় যে স্বাতন্ত্র্যটুকু অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা ত্যাগ করিতে সহজে প্রস্তুত হইবেন কি না সন্দেহ।

এই সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাখার একটু বিশেষ আবদারের কারণ আছে। বৈজ্ঞানিকেরা সাধারণতঃ যে ভাষায় আপনাদের মধ্যে কথা কহিয়া থাকেন, তাহা তাঁহারা নিজেরাই বোঝেন, জনসাধারণের তাহা বোধ্য নহে। তাঁহাদের ভাষা, তাঁহাদের চিন্তার প্রণালী, তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী কতকটা অদ্ভুত গোছের। তাঁহারা যে পথে, যে প্রণালীতে, যে মন্ত্রের সাধনা করিতেছেন, তাহা অধিকারী ভিন্ন অন্যের পক্ষে সুগম নয়। তাঁহাদের সাধনা-ক্ষেত্রে দীক্ষিত ভিন্ন অন্যের প্রবেশ-নিষেধ। তাঁহারা পরস্পর কথা কহিবার সময় যে সকল সঙ্কেতের, যে সকল ইঙ্গিতের প্রয়োগ করেন, সর্ব্বসাধারণের নিকট তাহা দুর্ব্বোধ্য হেঁয়ালিমাত্র। সে হেঁয়ালি ভাঙ্গিতে যে না পারা যায়, এমন নহে, তবে তাঁহারা নিজের সাধনায় এত ব্যস্ত যে, সে হেঁয়ালি ভাঙ্গিয়া তাহার তাৎপর্য্য স্পষ্ট করিবার অবকাশ তাঁহাদের একেবারে নাই। সে প্রবৃত্তিও সকলের নাই। এজন্য তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। সাধনার পথ সর্ব্বত্রই দুর্গম, এবং সাধকেরা সর্ব্বত্রই আত্মগোপনে অভ্যস্ত, এবং দূরে থাকিতে উৎসুক।

বাঙ্গালাদেশে, ইহার মধ্যে যে একটা বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী বা বৈজ্ঞানিক-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এ কথা বলিলে হয় ত অত্যুক্তি হইবে। এদেশে যাঁহারা স্বাধীন-ভাবে বিবিধ বিজ্ঞানের আলোচনা করিতেছেন, তাঁহাদের সংখ্যা এখনও অঙ্গুলি-

সংখ্যার নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু দেশের মধ্যে যে একটা নূতন হাওয়া বহিয়াছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই কয়েক বৎসরের মধ্যেই এ দেশের কতিপয় বিজ্ঞানসেবী যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহাতে ভবিষ্যৎ আশামণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। পঞ্চাশ বৎসরের অধিক হইল, বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে এদেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু এতকাল আমরা সম্পূর্ণভাবে পরমুখাপেক্ষী ছিলাম। দূরদেশে কে কি নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছে, গলা বাড়াইয়া দেখিবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব থাকিতাম; কে কি নূতন কথা বলিতেছে, তাহা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ থাকিতাম। যাহা দেখিতাম, এবং শুনিতাম, তাহাই প্রচার করিতে পারিলে আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইল, ইহাই অমারা জানিতাম। এইরূপে দেখিয়া এবং শুনিয়াই আমাদের জীবন ধন্য হইল, মনে করিতাম। স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করিয়া জগতের নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার, আমাদের দ্বারা যে হইতে পারে, সে ক্ষমতা যে আমাদের থাকিতে পারে, এ বিষয়েই আমাদের সন্দেহ ছিল। বোধ করি এখনও বিশ বৎসর অতীত হয় নাই, Asiatic Societyর তাৎকালিক সভাপতি Sir Alexander Pedler কতকটা ক্ষোভের এবং কতকটা তিরস্কারের সহিত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, Asiatic Societyর কাগজপত্র হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এদেশের লোক স্বাধীন বৈজ্ঞানিক আলোচনায় একান্ত অক্ষম। বিশ বৎসর একটা জাতির জীবনে অধিক দিন নহে, কিন্তু Asiatic Societyর এখনকার সভাপতি বোধ হয়, সেইরূপ মন্তব্য-প্রকাশে সঙ্কোচ বোধ করিবেন। Asiatic Societyর পত্রিকায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে যে প্রমাণ পাওয়া যাইত না, পাশ্চাত্য দেশের বিবিধ বৈজ্ঞানিক সভার পত্রিকা উদ্ঘাটন করিলেই আজকাল তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যাইবে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র এই সভার শোভাবর্দ্ধনের জন্য উপস্থিত নাই, কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্রের কৌমুদীতে এই সভা প্রদীপ্ত হইতেছে। সভাস্থানে আর যে সকল নমস্য বিজ্ঞানাচার্য্যগণকে সমবেত দেখিতেছি, তাহাতে কেবল এই সাহিত্যসম্মিলনী যে দীপ্তি লাভ করিয়াছে, এমন নয়; বঙ্গদেশের এই সাহিত্যকেন্দ্র হইতে যে আলোকের বিকিরণ আরম্ভ হইয়াছে, এবং যাহা ক্রমশঃ, প্রসার লাভ করিয়া দেশ বিদেশে প্রতিফলিত হইবে, তাহা মনে করিয়াই আমার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। বঙ্গের এই ক্ষুদ্র বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীকে আমি সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। বঙ্গজননীর আশীর্ব্বাদ তাঁহাদের মস্তকের উপরে মঙ্গলপুষ্পের ন্যায় বর্ষিত হউক। যে আশা ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া আমি তাঁহাদের প্রতি চাহিয়া আছি, তাহা আমার জীবনের এই

অপরাহ্নকালে ভগ্নদেহে সামর্থ্য দান করিবে। পৃথিবীর নিষ্ঠুর দ্বন্দ্বক্ষেত্রে অধঃশয্যায় শয়ানা আমার প্রাচীনা জননী ধূলিশয্যা পরিত্যাগ করিয়া গৌরবের মুকুট পরিয়া জগতের সম্মুখে পুনরায় দণ্ডায়মান হইবেন, এই আশা অন্তিমদিনে আমার বলাধান করিবে।

বলা বাহুল্য, জগতের বিজ্ঞান-মন্দিরে আমরা এখনও শিক্ষার্থী এবং আরও বহু দিন ধরিয়া আমাদিগকে শিক্ষার্থী থাকিতে হইবে। যে সকল বৈদেশিক আচার্য্যগণের পদপ্রান্তে বসিয়া আমরা শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছি, যাঁহাদের প্রসাদে আমরা পার্থিব জীবনের ধূলি ঝাড়িয়া জীবনকে মধুময় করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাঁহাদের নিকট আমরা চিরদিন প্রণত থাকিব। জাগতিক বিধানে সত্যের মুখ হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা অপিহিত ও আচ্ছাদিত রহিয়াছে, প্রতিভাবলে এবং সাধনাবলে যাঁহারা সেই জ্যোতির্ম্ময় আবরণ ভিন্ন করিয়া সত্যের কোনও না কোনও দেশ দেখিতে পান, যে দেশেই বা যে জাতিমধ্যেই তাঁহাদের জন্ম হউক, তাঁহারাই ঋষি। এদেশের প্রাচীন দার্শনিকেরাই বলিয়াছেন, এ বিষয়ে আর্য্যে এবং ম্লেচ্ছে কোনরূপ লক্ষণভেদ নাই। যেখানেই আমরা আলোক দেখিব, সেইখানেই আমাদিগকে পতঙ্গবৃত্তি হইয়া দৌড়িতে হইবে, কিন্তু তাহাতে পতঙ্গের মত জীবনের নাশ না হইয়া জীবনের বর্দ্ধন হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিজ্ঞান-মন্দিরে যাঁহারা সাধক, তাঁহারা যে ভাষা ব্যবহার করেন, তাহা অন্যের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য। সাধনামন্দিরের বহির্দ্দেশে আসিয়া প্রাকৃত জনের নিকট তাহাদের বোধ্য ভাষায় আত্মপ্রকাশে তাঁহারা স্বভাবতঃ সঙ্কোচ বোধ করেন; অথচ তাঁহাদের সাধনালব্ধ ফলের আস্বাদনের প্রত্যাশায় অসংখ্য নরনারী মন্দিরের বাহিরে উর্দ্ধমুখে ও শুষ্কহৃদয়ে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহা তাঁহারা দেখিতেছেন। তাহাদিগকে বঞ্চিত করিলে চলিবে না। বৈজ্ঞানিকেরা যাহা অর্জ্জন করেন, ও আহরণ করেন, জনসাধারণ তাহার ফলাকাঙ্ক্ষী; এবং ফলভোগে অধিকারী। বৈজ্ঞানিকের ধর্ম্ম বস্তুতই নিষ্কাম ধর্ম্ম। কর্ম্মেই তাঁহাদের অধিকার; ফলে তাঁহাদের একেবারে অধিকার নাই। যাহা কিছু তাঁহারা আহরণ করিবেন, মুক্তহস্তে তাহা তাঁহাদিগকে বিতরণ করিতে হইবে। বিতরণ বিষয়ে অধিকারি-নির্ব্বাচন চলিবে না। এই জন্যই দেখিতে পাই যে, বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে যাঁহারা প্রকৃতই ঋষি, যাঁহাদের দিব্য চক্ষু সত্য-নিরীক্ষণে সমর্থ হইয়াছে, তাঁহাদের অনেকেই যেন প্রাণের তৃষ্ণায় বাহিরে আসিয়া আপামর সাধারণকে সেই সত্যের সহিত পরিচিত করিবার জন্য সময়ে সময়ে ব্যাকুল হইয়া পড়েন। আমি জানি, বৈজ্ঞানিক-

গণের মধ্যে এমন অনেক মহাজন আছেন, যাঁহারা নির্জ্জন সাধনা ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে চাহেন না। জ্ঞান-অর্জ্জন তাঁহাদের কার্য্য; জ্ঞানের প্রচারও কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত। ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি। সর্ব্বত্রই যেরূপ, এখানেও সেইরূপ শ্রমবিভাগের প্রয়োজন। আহরণ ও বিতরণ উভয় কর্ম্মই এক জনে গ্রহণ করিলে কোনটাই হয় ত সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হয় না। আহরণের *শক্তি ও বিতরণের শক্তি ঠিক একজাতীয় নহে। যিনি অর্জ্জনে নিপুণ,* বিতরণে তাঁহার নৈপুণ্য না থাকিতেও পারে। নিতান্ত অনধিকারীর নিকট বিতরণ করিতে গিয়া বিদ্যার মাহাত্ম্যকেও খর্ব্ব করিবার কতকটা আশঙ্কা থাকে। ভূমি যেখানে নিতান্ত অনুর্ব্বর, সেখানে বীজ ছিটান কেবল পরিশ্রমের অপব্যয়। এ সমস্ত যুক্তি স্বীকার করিলেও দেখিতে পাই, সত্যের অন্বেষণে যাঁহারা উজ্জ্বল বর্ত্তিকা হস্তে করিয়া পুরোগামী হইয়াছেন, তাঁহারাই আবার আপনাদের মেরুদণ্ড মুহূর্ত্তের জন্য অবনত করিয়া, নিম্নতর সোপানে নামিয়া আসিয়া, জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানপ্রচারে আনন্দ-লাভ করিতেছেন। বিজ্ঞানবিদ্যাকে সাধারণের উপভোগ্য করিতে পারা যায় কি না, এরূপ চেষ্টায় কোনও লাভ আছে কি না, ইহা লইয়া যতক্ষণ ইচ্ছা বাদানুবাদ চলিতে পারে। ইংরেজীতে বলিলে, Scienceকে popularise করা চলে কি না, এবং করা উচিত কি না, ইহা লইয়া মতভেদ আছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও Lord Kelvin অথবা P. G. Tait, Hermann Helmholtz, অথবা William Kingdon Clifford প্রভৃতির মত ভাস্বরদ্যুতি জ্যোতিষ্ককে আলোক বিতরণ করিয়া ধরাধামের অজ্ঞান-তিমির-অপসারণে প্রবৃত্ত দেখিতে পাই। এই কয়টা নাম উল্লেখের পর বোধ করি আর কেহ মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিবেন না যে, প্রাকৃত জনের সম্মুখে বিজ্ঞান-প্রচারে নিযুক্ত হওয়ায় কোনরূপ লজ্জা বা অগৌরবের হেতু আছে।

বাঙ্গলাদেশে যে সকল মনস্বী পণ্ডিত এবং তাঁহাদের উৎসাহী ছাত্র বিবিধ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নূতন তত্ত্বের আহরণে নিযুক্ত হইয়াছেন, এই সাহিত্য-সম্মিলনে আমরা তাঁহাদিগকে সাদরে আহ্বান করিয়াছি। তাঁহারা একত্র উপস্থিত হইয়া পরস্পর ভাব-বিনিময় করুন, ইহা প্রার্থনা করি। কিন্তু তাঁহারা জনসাধারণকেও একেবারে বিস্মৃত হইবেন না,—এই প্রার্থনাও এই সুযোগে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত করিতে কুণ্ঠিত হইব না। সাধারণের সম্মুখে আসিয়া তাঁহাদের নিজের ভাষা ছাড়িয়া সাধারণের বোধ্য ভাষায় কথা কহিতে হইবে। অন্য দেশে যাহা সম্ভব, এদেশে এখনও তাহা সম্ভব নহে। এখনও বহুদিন ধরিয়া আমাদের যত্না-

র্জ্জিত জ্ঞান বিদেশী-ভাষার সাহায্যে বৈদেশিক বুধমণ্ডলীর নিকট স্থাপিত করিতে হইবে। বিশুদ্ধি-পরীক্ষার জন্য যে নিকষ পাষাণের প্রয়োজন, এদেশে তাহা বর্ত্তমান নাই। বিদেশের অগ্নিকুণ্ডে গলাইয়া ঢালাইয়া তাহার বিশুদ্ধি পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে। বাঙ্গালা ভাষা এখনও বিজ্ঞান-প্রচারের যোগ্য হইতে বিলম্ব রহিয়াছে; কিন্তু এই বিলম্ব ক্রমেই অসহ্য হইয়া পড়িতেছে। এ বিষয়ে অবহিত হইবার জন্য আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি। মাতৃভাষাকে এতদর্থে সুগঠিত করিয়া লইবার জন্য যে যত্ন ও পরিশ্রম আবশ্যক, আপনাদিগকেই তাহা করিতে হইবে। সাহিত্য-সম্মিলনের বিজ্ঞানশাখা যদি বঙ্গভাষার এই অঙ্গের পুষ্টি-বিধানে সাহায্য করে, তাহা হইলে তাহার অস্তিত্ব নিরর্থক হইবে না।

আমাদের বাঙ্গালা ভাষা বর্ত্তমান অবস্থায় যতই দরিদ্র এবং অপুষ্ট হউক, উহা দ্বারা বিজ্ঞান বিদ্যার প্রচার যে একেবারে অসাধ্য, তাহা স্বীকার করিতে আমি প্রস্তুত নহি। আমি আশা করি, এই সাহিত্য-সম্মিলনে যাঁহারা বিবিধ বিজ্ঞানের আলোচনা করিবেন, তাঁহাদের কৃতকার্য্যতাই আমার বাক্য সমর্থন করিবে। এমন এক সময় ছিল, যখন স্কুল এবং কালেজের শিক্ষক এবং অধ্যাপকগণ আপনাদের মধ্যে এবং ছাত্রগণের সহিত কথোপকথনে বাঙ্গালার ব্যবহার বেয়াদবি বলিয়া গণ্য করিতেন। এখনও সর্ব্বত্র সেই ভাব চলিত আছে কি না, জানি না। ক্লাশে বসিয়া অধ্যাপনার সময় বাঙ্গালার ব্যবহার, বোধ হয়, এখনও অধিকাংশ স্থলে লজ্জার হেতু বলিয়া বিবেচিত হয়। আমি স্বয়ং অধ্যাপনা-ব্যবসায়ী। বিজ্ঞান-বিদ্যার সহিত আমার আর কিছু সম্পর্ক না থাকুক, বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্ধারণ-অনুসারে পদার্থবিদ্যা এবং রসায়ন বিদ্যার অধ্যাপনাই আমার জীবিকারূপে গ্রহণ করিয়াছি, এবং সেই জন্য অন্ততঃ জীবিকার অনুরোধে যৎকিঞ্চিৎ বিজ্ঞান-আলোচনাও আমাকে করিতে হইয়াছে। অধ্যাপকের আসনে বসিয়া বাঙ্গালা ভাষায় অধ্যাপনা যদি আপনারা অপরাধ বলিয়া গণ্য করেন, তাহা হইলে আমার মত অপরাধী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকসঙ্ঘমধ্যে খুঁজিয়া মিলিবে না। হয় ত ইংরেজী ভাষায় অজ্ঞতা আমার এই দুষ্প্রবৃত্তির মূল কারণ। বাল্যকালে বেইন সাহেবের Higher English Grammar, মায় তাহার Companion, যথাশক্তি কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম, এবং মুখস্থ বিদ্যা উদ্গিরণ করিয়া মাষ্টার মহাশয়ের বাহবা পাইয়াছিলাম; কিন্তু আজিও কোথায় shall এবং কোথায় will বসাইব, এই দুশ্চিন্তা আসিয়া ইংরেজী লেখাই বন্ধ হয়, কলমটাও অচল হইয়া পড়ে। ইংরেজী ইডিয়ম ও বানান সম্বন্ধে আমার সহস্র অপরাধ দিন দিন চিত্রগুপ্তের ব্লাক-বহিতে

লিপিবদ্ধ হইতেছে। কারণ যাহাই হউক; আমি এই পাপের বোঝা চিরজীবন ধরিয়া মাথায় বহিতেছি। কিন্তু সে জন্য অধ্যাপনা কার্য্যে কখনও যে ব্যাঘাত অনুভব করিয়াছি, তাহা সহজে স্বীকার করিব না। পদার্থবিদ্যায় বাঙ্গালা পারিভাষিক শব্দের একান্ত অভাব রহিয়াছে তাহা স্বীকার করি। অধ্যাপনার সময় ইংরেজি পারিভাষিক শব্দের বাঙ্গালা অনুবাদ যে নিতান্ত আবশ্যক, তাহাও বোধ করি না। পারিভাষিক শব্দগুলি ইংরেজি রাখিয়াই এবং সাঙ্কেতিক চিহ্ন-গুলি ইংরেজি রাখিয়াই আর সমস্ত কথা বাঙ্গালায় প্রকাশ করা যাইতে পারে, কোন স্থানে ঠেকিতে বা ঠকিতে হয় না, এই ধারণা আমার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। ইংরেজি ও বাঙ্গালার মিশ্রণে এইরূপে যে খেচুরী ভাষা প্রস্তুত হয়, তাহা সাধু সাহিত্য কর্ত্তৃক সমাদরে গৃহীত না হইতে পারে, কিন্তু অধ্যাপনা কার্য্যে ঐ ভাষা ব্যবহারে শিক্ষক বা ছাত্র কোন অসুবিধা বোধ করেন, তাহার কোন প্রমাণ পাই নাই। পদার্থবিদ্যার যে সকল তত্ত্ব ছাত্রদিগের নিকট নিতান্ত দুরূহ বলিয়া বোধ হয়, আমার এই অপরূপ ভাষার আশ্রয়েও তাহা ছাত্রদিগের বুদ্ধিগম্য করিতে কখনও কষ্ট পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। Maxwell, Hertz অথবা Thomson এর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া Electro-magnetic Field এর,—অর্থাৎ যে দেশে তাড়িত এবং চুম্বক শক্তি যুগপৎ কাজ করে সেই দেশের,—অবস্থা বুঝাইবার জন্য black board এর কালাপিঠে চা-খড়ির ধলা আঁচড় কাটিয়া সাঙ্কেতিক ভাষায় যখন বড় বড় equation গুলা লেখা যায়, তখন সেই অঙ্কগুলার বিকটমূর্ত্তি ছাত্রদিগের মনে কিরূপ আতঙ্ক সঞ্চার করে, তাহা ভুক্তভোগী ছাত্রমাত্রেই অবগত আছেন। আমি কিন্তু দেখিয়াছি, সহজ বাঙ্গালায় সেই আঁচড়গুলার তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিলে ছাত্রগণের হৃৎকম্প তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হইয়া যায়, এমন কি তাহাদের মনের ভিতর একটা আনন্দের সঞ্চার হয়, তাহারও প্রমাণ পাইয়াছি। কাজেই আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা, তাহার উপর ভর করিয়া আমি বলিতে বাধ্য যে বাঙ্গালা ভাষা জনসাধারণের সম্মুখে পদার্থ বিজ্ঞানের প্রচার কার্য্যে একেবারে অসমর্থ নহে। রসায়ন শাস্ত্রের বিবিধ মৌলিক এবং যৌগিক দ্রব্যের পারিভাষিক নামগুলা এবং তাহাদের গঠনবিজ্ঞাপক সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলা ইংরেজি রাখিব কি বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত ও রূপান্তরিত করিব, তাহা লইয়া একটা বিবাদ বহুকাল হইতে চলিত আছে। আপাততঃ সেই বিবাদের মীমাংসার কোন সম্ভাবনা দেখি না, কিন্তু সেই বিবাদের নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশের শিক্ষার্থীরা—ইংরেজি ভাষায় যাহাদের দখল নাই তাহারা—রসায়ন বিদ্যার রসাস্বাদনে যে

একেবারে বঞ্চিত থাকিবে ইহা উচিত নহে। উদ্ভিদ্বিদ্যা এবং প্রাণিবিদ্যা বিবিধ উদ্ভিদ্ জাতির এবং প্রাণিজাতির নামকরণে লাটিন ভাষার আশ্রয় লন; সেই নামগুলি কোনকালে বাঙ্গালা ভাষার ধাতুর সহিত মিলিতে চাহিবে কি না তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু যেমনেই হউক—লাটিন নামগুলি বজায় রাখিয়াই হউক অথবা তাহাদের অনুবাদের চেষ্টা করিয়াই হউক—উদ্ভিৎতত্ত্বকে প্রাণিতত্ত্বকে বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে স্থান দিতেই হইবে। ভূবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা বিবিধ আকরিকের ও বিবিধ শিলাখণ্ডের যে সকল নাম সর্ব্বদা ব্যবহার করেন, বাঙ্গালীর কোমল বাগ্‌যন্ত্র তাহার উচ্চারণে ছিঁড়িয়া যাইবার আশঙ্কা আছে, তাহা স্বীকার করি। যাঁহারা করাত বা হাতুড়ি হাতে পাহাড়ে পাহাড়ে লাফাইয়া বেড়ান, তাঁহাদের দেহ ও মন আগেটের ও কোরণ্ডমের কাঠিন্য পাইয়াছে সন্দেহ নাই। আমাদের বাগ্‌যন্ত্রের এই কোমলতা দেখিয়া তাঁহাদের হৃদয় কোমল হইবে, এরূপ আশা করি না; কিন্তু ঐ নামগুলাকে কাটিয়া ছাঁটিয়া একটুকু মোলায়েম করিয়া লইলেই যদি আমাদের বাগিন্দ্রিয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয় উভয়েই তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হয়, তখন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের কঠিন অন্তঃকরণকে একটু করুণরসার্দ্র করিতে আমি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।

বাঙ্গালা সাহিত্যের বিজ্ঞান বিভাগ যে নিতান্ত দরিদ্র, এই আক্ষেপোক্তি সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়, অথচ এ পর্য্যন্ত ইহার প্রতিকারের সম্যক্ ব্যবস্থা হয় নাই। শুনিতে পাই, যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সম্প্রতি এ বিষয়ে যত্নপর হইয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন যাহার উদ্দেশ্য, সেই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এ বিষয়ে উপেক্ষা মার্জ্জনীয় হইতে পারে না। কয়েক বৎসর হইতে সাহিত্য-পরিষৎ বিজ্ঞানের বিবিধ বিভাগের ধারাবাহিক আলোচনার জন্য অভিজ্ঞ পণ্ডিতদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত ডাক্তার বনওয়ারী লাল চৌধুরী ব্যতীত আর কেহ পরিষদে প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। তাঁহারা উভয়েই সাহিত্য পরিষদের নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু; কিন্তু তাঁহাদের নিকটেও পরিষদ্ যেটুকু পাইয়াছেন, তাহা তৃষ্ণা নিবারণের পক্ষে প্রচুর নহে। শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং সম্প্রতি শ্রীযুক্ত অধ্যাপক অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত দুইখানি গ্রন্থ দ্বারা পরিষদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী পুষ্ট করিয়াছেন। যদিও সম্প্রতি আমি পরিষদের সেবাকার্য্যে অশক্ত, তথাপি পরিষদের পক্ষ হইতে উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট এ বিষয়ে সাহায্য ভিক্ষায় অধিকারী। বঙ্গদেশে বিজ্ঞানচর্চ্চায় এই জাগরণের দিনে সাহিত্য-পরিষদের এই

প্রার্থনা পূর্ণ হইবে, ইহাই আমার আশা। বাঙ্গালা সাহিত্যের বিজ্ঞান-বিভাগের দারিদ্র্য-মোচন আপনারাই করিতে পারেন। ইহা আপনাদের কর্ত্তব্যমধ্যে গণ্য করিয়া লওয়া উচিত। পারিভাষিক শব্দের অভাব এই বিষয়ে অন্তরায় হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। যিনি শ্রদ্ধার সহিত মাতৃভাষার সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহার মনের ভাব আপনা হইতে শব্দ-রূপে লেখনীমুখে আবির্ভূত হইবে। ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলে একটা সূক্ত রহিয়াছে, অন্তঃশরীরের গুহামধ্যে চিত্তের নিভৃত প্রদেশে যে অশরীরী ভাবরাশি প্রচ্ছন্নভাবে গুপ্ত আছে, তাহা অকস্মাৎ শরীর গ্রহণ করিয়া শব্দ-রূপে এবং নাম-রূপে আত্ম-প্রকাশ করিতেছে, ঋষি বৃহস্পতি তাহাতে অতিমাত্র বিস্মিত হইতেছেন। বাস্তবিকই যখনই আপনারা শ্রদ্ধাশীল হইয়া আপনাদের ভাবরাশিকে প্রকাশ দিতে চাহিবেন, ভাবরাশি মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া তখনই শব্দ-রূপে প্রকাশ পাইবে। সর্ব্বদেশে সর্ব্বজাতির মধ্যেই এই ব্যবস্থা। পরিভাষা-সঙ্কলনের অপেক্ষায় কোনও দেশেই বৈজ্ঞানিক সাহিত্য নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকে নাই। বিজ্ঞানও যেমন উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, বিজ্ঞানের পরিভাষাও সেইরূপ সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে গড়িয়া তুলিয়াছে। ভাব যেখানে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিয়াছে, তখনই তাহা শব্দ-রূপে আবির্ভূত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্গের জনসাধারণ জ্ঞানার্থী হইয়া ঊর্দ্ধমুখে আপনাদের অভিমুখে চাহিয়া রহিয়াছে। আপনারা তাহাদের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করুন। ইহা আপনাদিগের কর্ম্ম; ইহা আপনাদিগের ধর্ম্ম। সাধ্যসত্ত্বে এ বিষয়ে কুণ্ঠিত হইলে আপনাদিগের প্রত্যবায় হইবে।

নিতান্ত ক্ষোভের বিষয়, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচারের যে উদ্যম ছিল, সম্প্রতি তাহা যেন দেখিতে পাই না। পশ্চিম দেশ হইতে নবাগত জ্ঞানালোকের ছটায় যাঁহাদের চক্ষু তখন ঝলসিয়াছিল, তাঁহারা সেই আলোক দেশমধ্যে প্রতিফলিত করিয়া দেশের আঁধার নিবাইবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পর্কে আসিয়া আমি দেখিয়াছি, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যে শ্রেণীর যতগুলি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইত, বর্ত্তমানকালে সেই শ্রেণীর তত গ্রন্থ যেন প্রকাশিত হয় না। তখনকার তুলনায় এখন লেখকের সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে, পাঠকের সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে, দেশে জ্ঞানলাভের স্পৃহা প্রচুর বৃদ্ধি পাইয়াছে, জ্ঞানবিতরণে সমর্থ শিক্ষাদানে সমর্থ পণ্ডিতের সংখ্যা প্রচুরতর বৃদ্ধি পাইয়াছে, গ্রন্থ-প্রকাশের ব্যয় কমিয়াছে, গ্রন্থপ্রচারের সুযোগ বাড়িয়াছে, অথচ বাঙ্গালা

সাহিত্যের কেন এই অবনতি, তাহা আপনাদের চিন্তার বিষয়। সেকালে যাঁহারা বঙ্গের সুধীসমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেককেই জনসাধারণমধ্যে এই জ্ঞানপ্রচারকার্য্যে নিযুক্ত দেখিতে পাই। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং অক্ষয়কুমার দত্তের নাম করিতে পারি। ইঁহারা যেরূপ শ্রদ্ধার সহিত, যেরূপ অনুরাগের সহিত, যেরূপ যত্নের সহিত, বঙ্গের জনসাধারণমধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞানালোক বিতরণ করিতে জীবন অর্পণ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান কালে তাঁহাদের সমকক্ষ ব্যক্তিগণকে সেরূপ করিতে দেখিতে পাই না, ইহার কারণ কি? সে কালের রহস্যসন্দর্ভ, বিবিধার্থসংগ্রহ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রভৃতিকে যে জ্ঞান-প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত দেখিতে পাই, এ কালের কোনও বাঙ্গালা পত্রিকার সেরূপ অধ্যবসায় দেখিতে পাই না কেন? হইতে পারে, উল্লিখিত মনীষিগণ এবং উল্লিখিত সাময়িক পত্রিকগুলি যে সকল তত্ত্ব প্রচার করিতেন, তাহার অধিকাংশ এখন বালকোচিত বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু তাহা সত্য হইলেও এ কালের উপযোগী বয়স্কোচিত কর্ম্মে কয় জন লোক এবং কয়খানি পত্রিকা নিযুক্ত আছে? আমার বাল্যকালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রণীত প্রাকৃতিক ভূগোল, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, নবীনচন্দ্র দত্ত প্রণীত খগোল-বিবরণ প্রভৃতি কয়খানি বাঙ্গালা গ্রন্থ সর্ব্বদাই দেখিতে পাইতাম। হয় ত এগুলি স্কুলপাঠ্য পুস্তক অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর বলিয়া গণ্য হইবে না। কিন্তু একালেও যে সকল স্কুলপাঠ্য পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে, তাহা ঐ কয়খানির তুলনায় নিম্ন পদই পাইবে। স্কুলপাঠ্য নহে, জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান-প্রচার উদ্দেশে লিখিত, এরূপ গ্রন্থেরই বা একালে প্রাচুর্য্য কোথায়? বাঙ্গালা সাহিত্যের চারি দিকে শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, অথচ বিজ্ঞানাঙ্গের এরূপ অধোগতির কারণ কি? আমি যে কারণ অনুমান করি, তাহা স্পষ্ট ভাষায় বলিতে গেলে, এই সভায় উপস্থিত বিদ্বজ্জনের বিশেষ শ্লাঘার হেতু হইবে না। পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্ব কালের তুলনায় আজিকার দিনে আমাদের দেশে মনীষী পণ্ডিতের অভাব নাই, অভিজ্ঞ পণ্ডিতের অভাব নাই, রচনাপটু দক্ষ লেখকের অভাব নাই, তবে কিসের অভাব? আমি অনুমান করি, বলিতে দুঃখ হয়, বলিতে লজ্জা হয়, বলিতে ভয় হয়, আমি অনুমান করি, ইহার মুখ্য কারণ শ্রদ্ধার অভাব, প্রীতির অভাব, অনুরাগের অভাব, প্রেমের অভাব। আমি যাহা পাইয়াছি, তাহা পাঁচ জনের সঙ্গে বাঁটিয়া লইব, আমি যাহা অর্জ্জন করিয়াছি, দেশবাসীকে তাহা বিতরণ করিব, আমি যে অমৃত রসের

অধিকারী হইয়াছি, দীনদরিদ্রনির্ব্বিশেষে আমার ভাই ভগিনীকে সেই অমৃত রসের আস্বাদনের ভাগ না দিলে, দুই হাতে তাহা বিলাইতে না পাইলে, আমার প্রাণের পিপাস মিটিবে না, যে প্রেম হইতে এই মহাভাবের উৎপত্তি হয়, সেই মহাভাবের অসদ্ভাবই ইহার মুখ্য কারণ বলিয়া আমি অনুমান করি। কৃষ্ণমোহন ও রাজেন্দ্রলাল, ভূদেব ও অক্ষয়কুমার, তোমরা প্রীতির ধারা বিলাইয়া তোমাদের পার্থিব জীবনের লীলাভূমিকে উর্ব্বর করিয়া গিয়াছিলে, তোমাদের পরবর্ত্তী আমরা সেই ভূমির সম্পৎ অধিকার করিতেছি, কিন্তু তোমাদের তর্পণ কর্ম্মে আমাদের অধিকার নাই।

অদ্যকার সভায় সমবেত সভ্যমণ্ডলীকে এই লজ্জাবিমোচনের জন্য আমার বিনীত অনুরোধ জানাইয়া আমার বক্তব্যের উপসংহার করিতে ইচ্ছা করি। আপনারা কৃতবিদ্য, আপনারা জ্ঞানী, আপনারা মনস্বী, আপনারা যশস্বী, আপনাদের চেষ্টায় বঙ্গের নব জাগরণ আরব্ধ হইয়াছে। জননী বঙ্গভূমির কীর্ত্তিধ্বজা আপনাদের হস্তে ধৃত রহিয়াছে। আপনাদের নিজের যশোরশ্মি দেশে বিদেশে ব্যাপ্ত হইতেছে। কিন্তু বঙ্গজননী আপনাদের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন; বঙ্গভাষা আপনাদের স্নেহ প্রার্থনা করিতেছে, বঙ্গসাহিত্য আপনাদের করুণাপ্রার্থী, বঙ্গের জনসাধারণ আপনাদিগের অন্তেবাসী; আপনাদের সম্মুখে এই বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া আছে, এক্ষণে আপনারা অবতরণ করুন।

জ্ঞান-বিজ্ঞান মনুষ্যজাতির সাধারণ সম্পত্তি; দেশবিদেশের বা জাতিবিশেষের ইহাতে কোনরূপ বিশিষ্ট অধিকার নাই। গণিতবিদ্যা বা জ্যোতিষবিদ্যা, পদার্থ-বিদ্যা বা রসায়নবিদ্যা, জীবন-বিদ্যা বা অধ্যাত্মবিদ্যা, কোনও বিদ্যাতেই ভারতবর্ষের কিংবা বঙ্গদেশের কোনও বিশিষ্ট স্বত্বাধিকার থাকিতে পারে না। যাঁহারা শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী, তাঁহাদের সকলেরও সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তথাপি ভারতবর্ষের অথবা বাঙ্গালা দেশের সহিত কোনও কোনও বিজ্ঞানের বিশিষ্ট অঙ্গের বিশিষ্ট সম্পর্ক আবিষ্কার করা যাইতে পারে। আমাদের এই বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে এবং আমাদের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বঙ্গীয় সুধীগণ কর্ত্তৃক সেই সকল বিশিষ্ট অঙ্গের বিশিষ্ট আলোচনা দেখিতে ইচ্ছা করি। বাঙ্গালার জলবায়ুতে, বাঙ্গালার আবহাওয়ার গতিতে যে বিশিষ্টতা আছে, তাহার বিশিষ্ট আলোচনায় বঙ্গের চিকিৎসক হইতে বঙ্গের কৃষক পর্য্যন্ত সকলেই উপকৃত হইবেন। বাঙ্গালা দেশের বাতাবর্ত্ত বা cyclone অন্তরিক্ষ-বিদ্যায় বা meteriologyতে একটা নূতন পরিচ্ছেদ যোজনা করিয়াছে। এই বিশিষ্ট আলোচনাতে আরও কি কোনও

নূতন পরিচ্ছেদের যোজনা হইবে না? বঙ্গের সমতল ভূমিতে একখানা কঠিন পাষাণ পাওয়া যায় না। যে অতি পুরাতন মালভূমির ক্ষুদ্র অংশ আজ পর্য্যন্ত সমুদ্রের জলসীমার ঊর্দ্ধে থাকিয়া ভারতোপদ্বীপের দাক্ষিণাত্য অংশ গঠন করিয়াছে, গঙ্গাপ্রবাহ যাহার উত্তর ও পূর্ব্ব সীমায় প্রবহমান, সেই মালভূমিতে নাকি একখানা পুরাতন জীবাশ্ম বা fossil পাওয়া যায় না, এই সকল কারণে এদেশের সমতলভূমি এ পর্য্যন্ত ভূবিদ্যাবিদের শ্রদ্ধা-আকর্ষণে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু তথাপি গঙ্গাপ্রবাহনিক্ষিপ্ত মৃত্তিকারাশি কত কালে কিরূপে আমাদের বঙ্গভূমিকে নির্ম্মিত করিয়াছে, এ বিষয়ের আলোচনা সমাপ্ত হইয়াছে কি? আমাদের মধ্যে যাঁহারা ইতিহাস লেখেন, বা কাব্য লেখেন, তাঁহারা কথায় কথায় বলিয়া থাকেন, এই নিম্নবঙ্গ যেন সেই সেদিন সমুদ্রগর্ভে মগ্ন ছিল; কিন্তু এই কলিকাতা সহরের বহু নিম্নের ভূমি, যাহা এখন সাগরবক্ষের বহু নিম্নে অবস্থিত, তাহাই একদিন বনমণ্ডিত হইয়া সাগরের ঊর্দ্ধে অবস্থিত ছিল, এই তথ্যটা তাঁহাদিগের জানা আবশ্যক নহে কি? ভাগীরথীর পশ্চিমে বীরভূমে যে অনুর্ব্বর রাঙ্গামাটীর অস্তিত্ব দেখিতে পাই, উত্তর-বঙ্গে ও ময়মনসিংহের জঙ্গলে যে রাঙ্গামাটী পুনরায় মাথা তুলিয়াছে, সেই রাঙ্গামাটীর সহিত তদুপরি নিক্ষিপ্ত গঙ্গামৃত্তিকা-নির্ম্মিত নিম্নবঙ্গের সম্পর্কের কথা নিঃসংশয়ে নির্দ্ধারিত হইয়াছে কি? যাঁহারা ভূতত্ত্বে অভিজ্ঞ, তাঁহাদের নিকট এই সকলের এবং এই শ্রেণীর বিবিধ তত্ত্বের সমাধান পথের পথিক প্রত্যাশা করে। বাঙ্গালার মাটীতে এবং বাঙ্গালার জলে, বাঙ্গালার গ্রামে ও বাঙ্গালার বনে, যে সকল পশুপাখী সাপব্যাঙ, মশামাছি পোকা-মাকড় আহার বিহার করিতেছে, তাহাদের বিশিষ্ট বিবরণের জন্য, তাহাদের আহার বিহারের প্রথা জানিবার জন্য, আমরা কি কেবল বিদেশী শিকারীর মুখাপেক্ষা করিয়াই থাকিব? Asiatic Societyর পত্রিকার এবং Indian Museumএর প্রকাশিত monographগুলির উৎকট বৈজ্ঞানিক ভাষার আশ্রয় ভিন্ন আমাদের মত অনভিজ্ঞের পক্ষে স্বদেশের তত্ত্ব জানিবার কোনও গত্যন্তর থাকিবে না? বাঙ্গালা দেশের জীবজন্তু আপন আপন অবস্থানে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিয়া কিরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, কিরূপে পরস্পরকে জীবন-দ্বন্দ্বে হঠাইতে চাহে, কিরূপে বেড়ায়, এবং কি খায়, কিরূপে আততায়ীর প্রতি অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করে, কিরূপ আকারে এবং আচারে অন্য জীবের, এমন কি, আততায়ীর অনুকরণ করিয়া, নানা ছদ্মবেশের আবিষ্কার করিয়া, আততায়ীকে ঠকাইয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে, কিরূপে তাহারা সহস্র শত্রুর সন্নিধানে আপন বংশধারা রক্ষা করিবার

নানা কৌশল উদ্ভাবন করে, এই সকল তথ্য জানিবার জন্য আমরা উৎকর্ণ হইয়া রহিয়াছি; আমাদের আকাঙ্ক্ষা কি মিটিবে না? বাঙ্গালার জলে, বাঙ্গালার বায়ু-মধ্যে, আমাদের প্রত্যেকের গৃহকোণে, শয্যাতলে, খাদ্যের ভিতর, দেহের ভিতর, যে সকল জীবাণু অলক্ষিতে বাস করিয়া রক্তবীজের মত বর্দ্ধিত হইতেছে, এবং কখনও বা আমাদের দেহরক্ষার সৈনিকের কার্য্য করিতেছে, কখনও বা মহামারী উৎপাদন করিয়া লোকক্ষয় করিতেছে, তাহাদের আবিষ্কারের জন্য, তাহাদের বিবরণের জন্য কি আমরা চিরকালই হকারাদি-নামা এবং রকারাদি-নামা বিদেশী পণ্ডিতদেরই মুখের দিকে চাহিয়া রহিব? আশা করি, আমাদের এই সাহিত্য-সম্মিলনে আপনারা বর্ষে বর্ষে সম্মিলিত হইয়া এই সকল তত্ত্বের পরস্পরমধ্যে আলোচনা করিবেন, এবং আপনাদের আলোচনার ফল, অনুসন্ধানের ফল, গবেষণার ফল আমাদের মত অজ্ঞ জনকে উপদেশ দিবেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পত্রিকা আপনাদের অনুসন্ধান-ফল-প্রচারের সুযোগ পাইলে গৌরবান্বিত হইবে। আর আমার বক্তব্য নাই। সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া এই বুধমণ্ডলীর নেতৃত্ব-গ্রহণে আমার অধিকার নাই। তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্য-উপদেশ দিবার ধৃষ্টতা আমার নাই। সে জন্য আমি আপনাদের কর্ণপীড়া উৎপাদন করিতে প্রবৃত্ত হই নাই, আমি কেবল আমার নিবেদন জানাইতে, আমার প্রার্থনা জানাইতে, আমার ভিক্ষা জানাইতে, আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত। আমার শারীরিক এবং মানসিক দৌর্ব্বল্য আপনাদের দর্শনলাভে, আপনাদের সহযোগিতা-লাভে, আপনাদের উপদেশ-লাভে আমাকে সমর্থ করিবে কি না, এখনও আমি তাহা জানি না। নিতান্তই বন্ধুজনের আগ্রহাতিশয়ে আমি আপনাদের সময়ের অপব্যবহার করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। আমার বিনীত প্রার্থনা, আমার বিনীত ভিক্ষা যদি আপনাদের উন্নত হৃদয়কে স্পর্শ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের হিতসাধনে অবনত করে, তাহা হইলেই আমার এই চপলতা সাহিত্য-সম্মিলনের ভবিষ্যৎ ইতিবৃত্তলেখক কর্ত্তৃক মার্জ্জিত হইবে।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

নববর্ষ।

সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়,—সর্জ্জন, পালন, সংহরণ,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র,—নূতন, নিতুই নূতন, চিরপুরাতন ভূতনাথ। এই তিন লইয়াই জগৎ। ক্ষণে ক্ষণে যাহা উৎপন্ন হইতেছে, তাহা নবীন—চিরনবীন; যাহা ক্ষণমাত্র তিষ্ঠিতেছে, জনন-মরণের মধ্যে সমঞ্জসীকৃত শক্তির সাহায্যে কিছুকাল স্থিত হইতেছে, বিদ্যমানতার ভাণ পরিস্ফুট করিতেছে, তাহা নিতুই নূতন, ক্ষণে ক্ষণে নবীনতার ছায়ায় যেন সঞ্জীবিত; আর যাহার বিকাশ সম্পুটিত হইতেছে, যাহা সংহৃত হইয়া অতীতের গর্ভে সঞ্চিত হইতেছে, ভূতনাথ ভূতভাবনের অঙ্গরাগের সহায়তা করিতেছে, তাহা চিরপুরাতন। জগতে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের ক্রিয়া এই ভাবে অনুক্ষণ চলিতেছে। জনন-জীবন-মরণের একটা অব্যাহত প্রবাহ অনবরত চলিতেছে। নবীনতার অনন্ত পরম্পরাই জগৎ। যাহা হইতেছে, যাহা আছে, তাহাই নবীন, এবং নবীনতার পিপাসু; যাহা নাই, যাহা যাইতেছে, তাহাই প্রবীণ, তাহাই পুরাতনের গর্ভজাত।

নববর্ষ!—আমারই নববর্ষ। কেন না, আমি যে আছি, আমি যে থাকিতে চাহি! তাই জগতের অনন্ত গতির মধ্যে, কালের অনন্ত প্রবাহের মধ্যে এক একটা ছেদ দিয়া, এক একটা পরিচ্ছেদের কল্পনা করিয়া, আমি নূতনত্বের উন্মেষ ঘটাইয়া থাকি। কালের পরিমাণ স্মৃতির অঙ্কমাত্র,—জাতির স্মৃতির, ব্যক্তির স্মৃতির পর্ব্বমাত্র। জাতির জীবনের একটা বড় সুখের বা একটা বড় দুঃখের ঘটনা অবলম্বনে বর্ষমান অবধারণ করা হয়। যিশুখৃষ্টের জন্ম খ্রীষ্টান জাতির একটা বড় সুখের ঘটনা; হিজ্রাইয়া মোসলেম জাতির একটা বড় দুঃখের ঘটনা। তাই খৃষ্টের জন্মদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত খৃষ্টান জাতি কেবল বর্ষ গণনা করিয়া চলিয়াছে। যতদিন স্মৃতির রেখা পরিস্ফুট থাকিবে, যতদিন গণনায় ক্লান্তি-বোধ না হইবে, দিনে দিনে সে স্মৃতির শ্লাঘা পুষ্ট হইতে থাকিবে, তত দিন এ গণনা চলিতে থাকিবে। তাহার পর আর একটা নূতন ব্যাপার লইয়া নূতন গণনা আরব্ধ হইবে। সকল জাতির, সকল ধর্ম্মের ও সমাজের গণনার একই পদ্ধতি, একই প্রক্রিয়া। আমাদের হিন্দুর পদ্ধতিই কেবল পৃথক্; কারণ, হিন্দুর স্মৃতির শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই অবসাদ নাই। আমাদের চারি যুগের পরিমাণ ৪৩২০০০০ বিংশতিসহস্রাধিক ত্রিচত্বারিংশৎ লক্ষ পরিমিত বর্ষ। ইহার উপর মন্বন্তর আছে, কল্পাব্দ আছে। এখন

শ্বেতবরাহকল্পান্ত, তাহারই সপ্তম বৈবস্বত মন্বন্তর অধিকার। এই কলিযুগের পরিমাণ ৪৩২০০০ চারি লক্ষ বত্রিশ হাজার বর্ষ; উহার মোট সাড়ে পাঁচ হাজার পনর বর্ষ শেষ হইয়াছে। স্মৃতির শ্রান্তি আছে কি?

আমার ভূতনাথ ভবদেব বসিয়া আছেন, আর এক একটি বর্ষ ভস্মকণার ন্যায়, বিভূতিবিন্দুর ন্যায় তাঁহার অঙ্গে যাইয়া মিশিতেছে। তাই তিনি বিভূতিভূষণ। ১৩২০ সাল তাঁহার দেহে যাইয়া মিশিয়াছে, ১৩২১ সেই পথে চলিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে। মরণের যাত্রায় নূতন বাহির হইয়াছে বলিয়া উহা নববর্ষ; কালের সহিত সবেমাত্র ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া উহা নববর্ষ; সৃষ্টি স্থিতির মধ্যে এখন খেলা করিতেছে বলিয়া উহা নববর্ষ; আমার চিরপুরাতন স্মৃতিকে,—মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহঙ্কারকে নবীনতার আশায় উদ্‌বুদ্ধ করিতেছে বলিয়া উহা নববর্ষ; স্থিতির মাধুরীতে আমাকে মুগ্ধ করিতেছে বলিয়া উহা নববর্ষ। সংহারের দেবতা রুদ্র চির-পুরাতন; স্থিতির ও গতির দেবতা শ্রীকৃষ্ণ নিতুই নূতন। তাই নববর্ষ বিষ্ণুর অংশ; চিরসুন্দরের সৌন্দর্য্যের কণা, চিরমধুরের মাধুর্য্যের কণা, চির-বাঞ্ছিতের আশা-সুখের বিন্দু। যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ বড়ই মধুর—বড়ই সুন্দর; যখন যায়—একেবারে চলিয়া যায়, তখন স্মৃতির ভস্মস্তূপের পুষ্টি করে মাত্র, অনন্ত দুঃখ-পারম্পর্য্যে একটা অঙ্ক যোগ করে মাত্র। তাই নববর্ষে এতই আমোদ, আশার আশায় এতই সুখোদয়।

আমাদের কিসের সুখ? কেবল কাঁধ বদলাইবার সুখ। যে বেহারা পাল্কী বহে, তাহার কাঁধে ত পাল্কীর বোঝা আছেই—থাকিবেই; কিন্তু পথ চলিতে চলিতে সে এক একবার কাঁধ বদলাইয়া লয়; যখন কাঁধ বদলায়, তখন মুহূর্ত্তের জন্য চারি দিকে চাহিবার তাহার অবসর হয়; উপরে নীল আকাশ, নীচে শ্যামা জন্মভূমি, ঐ গিরিচূড়ায় ময়ূর ময়ূরী,—চারি দিকের এই শোভার ছবি সে এক পলক দেখিয়া লয়। ইহাই কাঁধ বদলাইবার সুখ; এই সুখে বঞ্চিত হইতে চাহি না বলিয়াই বারো মাসে এক একবার কাঁধ বদলাইয়া লই। তখন নূতন খাতার ধূম হয়, পানভোজনের আনন্দ হয়—বেহারার শ্রান্তির প্রশ্বাস ফেলিবার শুভক্ষণ আইসে। রামপ্রসাদ বলিয়াছিলেন—

"আমি কি দুঃখেরে ডরাই, কত দুঃখ দিবি মা, দেখি তাই।

রামপ্রসাদ বলে, কৃপাময়ি, বোঝা নামাও, একটু জিরাই ॥"

এই একটু জিরাইবার জন্যই নববর্ষ। মা! তোমার এই সংসার আনন্দ-বাজারে, দেহ-রূপ ঝাঁকা মাথায় ক'রে, দুঃখেরই বেসাতী করিয়া বেড়াই। যখন ঝাঁকা পূর্ণ হয়, তখন মোট মাথায় করিয়া, কর্ত্তার আহ্বানে কি-জানি কোন্ পথে চলিয়া যাই। কল্প-কল্পান্তের স্মৃতির বোঝা বড়ই ভারি বোধ হয়, তাই এক একবার জিরাইবার জন্য তোমাকে ডাকিয়া থাকি, শ্রান্তির প্রশ্বাস ফেলিবার অবসর খুঁজিয়া তোমাকে স্মরণ করি। সে সুখস্মৃতির পরিচ্ছেদ এক একটা নববর্ষে ঘটিয়া থাকে।

আমাদের আবার নূতন কি? সবই অতীত, সবই অতি পুরাতন—তাই আমাদের দেবতা ভূতনাথ মহাদেব। আমাদের ভবিষ্যৎ নাই, কেবল ভূতই আছে। কাজেই আমাদের আবার নূতন কিসের? এ নবীনতা দেহের—এ নবীনতা-বোধ আমাদের দেহাত্মবুদ্ধির। দেহী বলিয়াই নূতন চাই। কিন্তু নূতন যখন চাহি, তখন পুরাতনের ভাবনা ভাবিতে ভুলি না। তাই চড়ক-সংক্রান্তির দিন ভূতনাথ মহাদেবের পূজা করিয়া থাকি। চড়কের গাছটা অখণ্ড দণ্ডায়মান কালের অনুকল্পমাত্র, উহার গতি নাই, পরিবর্ত্তন নাই—উহা আছে, এইমাত্র—উহা স্থাণুমাত্র। এই স্থাণু—মহাকালের উপর জনন-মরণের চরখা লাগান আছে। সেই চরখায় অগণ্য নরনারী ঝুলিতেছে—প্রবৃত্তির রশ্মিতে সংবদ্ধ হইয়া ঝুলিতেছে; গতিময়ী শক্তি উহাকে অনবরত ঘুরাইতেছে—কোটী কোটী জীব কেবল পাক খাইতেছে। গতাগতির—জনন-মরণের—সুখ-দুঃখের—জয়-পরাজয়ের—অভ্যুদয়-অবসানের কেবল পাক খাইতেছে। এই বিবর্ত্তনই সংসার, এই চক্রগতিই জগতের, এই পাক্ খাওয়াই জীবের—সৃষ্ট পদার্থের অদৃষ্ট। সংক্রান্তির দিন, যখন বর্ত্তমান অতীতে পরিণত হইতে যাইতেছে, যখন ভূতনাথ ভবদেবের বিভূতিরাগ পুষ্ট হইবার উপক্রম হইতেছে, তখনই চড়কের অভিনয় ও উৎসব, তখনই আদিনাথ শিবের পূজা। তুমি মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব ভূতভাবন হইয়া বসিয়া আছ, আজ তোমারই মাথায় একটি ফুল—একটি বর্ষ পড়িয়া অতীতে ডুবিতেছে—দেখিও প্রভু, যেন তাহা তোমারই চরণে সঞ্চিত হয়—তাহার স্মৃতি তোমারই যোগ্য হয়। এইটুকুই আমাদের নূতনত্ব—এই বিদায় ও আবাহন,—এই অভিনয় ও ভবিষ্যতের আলাপন—ইহাই আমাদের নূতনত্ব। ইহাই সুখ, ইহাই জীবন।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমাদিগের সাহিত্যসেবা।

আমাদের দেশে সাহিত্যসেবার উদ্দেশ্য ছিল,—চতুর্ব্বর্গফলপ্রাপ্তি। "ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষাণাং বৈচক্ষণ্যং কলাসু চ, করোতি কীর্ত্তিং প্রীতিঞ্চ সাধুকাব্যনিষেবনম্।"* তখন সাহিত্য অর্থে কেবল কাব্য বুঝাইত। এখন আমরা সাহিত্য বলিতে কাব্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, সকলই বুঝি। সুতরাং দায়িত্ব এখন কোনও অংশেই ন্যূন নহে। সাহিত্য-আলোচনার একটা উদ্দেশ্য থাকা সকলেই স্বীকার করিবেন। হস্ত-কণ্ডুয়ন নিবৃত্ত করাই হউক, নাম-কা-ওয়াস্তেই হউক, অথবা মানব-জীবনের পরমপুরুষার্থ-লাভের নিমিত্তই হউক, উদ্দেশ্য একটা আছেই। কেহ কেহ সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিই প্রধান উদ্দেশ্য মনে করেন। যাঁহারা ভাবপ্রধান, তাঁহারা সেই দিকেই পড়িয়া থাকেন। যেমন সকল মানুষ এক প্রকার নহে, তেমনই সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণাও সকলের এক প্রকার নহে। কিন্তু যাঁহার ধারণা যেরূপই হউক, দেশ-কাল-পাত্র-বিবেচনায় উদ্দেশ্য স্থির করাই যে সঙ্গত, সে সম্বন্ধে বোধ হয় বিবেচকগণের মতভেদ নাই। যদি কোনও দেশে কোনও কালে মানব-সমাজ মরণোন্মুখ হইয়া পড়ে, তখন সেই দেশে সেই সমাজে সাহিত্যালোচনার কি উদ্দেশ্য হওয়া উচিত? যে কারণে ঐ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করিয়া উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করা যে শাস্ত্রের অথবা যে সাহিত্যের লক্ষ্য, তাহাই তখন আলোচ্য এবং সেব্য বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত কি না? তখন সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া "সেই মুখ-খানি" অনন্য-মনে ধ্যান করাই শ্রেয়ঃ, অথবা মরণোন্মুখ সমাজকে রক্ষা করিবার উপযুক্ত চেষ্টা যে সাহিত্যে সমালোচিত হয়, তাহারই সেবা করা শ্রেয়ঃ? ইহার উত্তর এক প্রকার ভিন্ন দুই প্রকার হইতেই পারে না। ধর্ম্মানুশীলন, ভগবদ্‌জ্ঞান-লাভ—ইহাই যদি মানব-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়, তবে বিপন্নের উদ্ধারচেষ্টার ন্যায় ধর্ম্মানুশীলন আর কি হইতে পারে? ভগবানের ব্যক্ত রূপ এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক বিবিধ জ্ঞানলাভ অপেক্ষা আর উচ্চতর জ্ঞানলাভ কি হইতে পারে? বিশ্ব-মানবের সেবাই ভগবানের সেবা; কিন্তু তাহার আরম্ভ ক্ষুদ্র সীমা অবলম্বনেই করিতে হয়। অসীম সহজে সেব্য হইবার নহে; তাই নির্দ্দিষ্ট সমাজকে, (প্রকৃতপক্ষে স্বজাতীয় মানব-সমাজকে) অবলম্বন করিয়াই সেবাব্রত আরম্ভ করিতে হয়। তাহাতে ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তুর জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কোন্ দ্রব্য দ্বারা, কিরূপ অনুষ্ঠানে সেবা

* অগ্নিপুরাণ, সাহিত্যদর্পণ-ধৃত।

সফল হইবে, ইহা বুঝিতেই ব্রহ্মাণ্ডজ্ঞানের প্রয়োজন হয়। আর ব্রহ্মাণ্ডজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান; কারণ, তিনিই একাংশে ব্রহ্মাণ্ড-রূপে ব্যক্ত হইয়াছেন। এই উদ্দেশ্য নিত্য, এই লক্ষ্য সনাতন; তবে দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে ইহার সাধনপ্রণালী ভিন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই ইহার পরিপন্থী পদ্ধতি অবলম্বনীয় নহে।

যদি তাহাই হইল, তবে এ সাধনার বীজমন্ত্র কি? সেবা ও জ্ঞান। সেবার অপর নাম—ত্যাগ; এবং জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়ই জ্ঞান-তৃষ্ণা। ত্যাগ ও তৃষ্ণা, এ সাধনার বীজমন্ত্র। ইহা যাহার নাই, তিনি সাহিত্যসেবার,—সকল সেবারই অনধিকারী। ভোগ এবং অজ্ঞান ইহার পরিপন্থী।

মানবের কল্যাণসাধনই যদি যথার্থ ধর্ম্ম হয়, তবে সর্ব্বপ্রকার সাহিত্যালোচনার দ্বারাই তাহা সিদ্ধ হইতে পারে; সেই আলোচনা করিতে জানিলেই হইল। কাব্যের আলোচনা করিব; তাহাতে কেবল কি স্ত্রীমূর্ত্তির বিলাস-বিজড়িত রূপের বর্ণনাই করিব! যাহাতে কাম প্রবৃত্তির এবং অসংযমের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, কেবল কি তাহাই করিব? বর্ত্তমান সময়ের কোনও কোনও মাসিক পত্রিকার ন্যায় কেবল কি ইন্দ্রিয়লালসার উত্তেজক স্ত্রীমূর্ত্তিই অঙ্কিত করিব? নাটক ও নভেলে নিরবচ্ছিন্ন প্রণয় ও প্রণয়েরই ছড়াছড়ি করিব? বর্ত্তমান সময়ে যে সকল সদ্‌গুণ ও সদনুষ্ঠান সমাজের বিবিধ শ্রেণীর উপকারী হইতে পারে, তাহার চিত্র যথাযোগ্য-ভাবে কাব্যসাহিত্যে অঙ্কিত করিতে পারিলে সাহিত্যও সার্থক হয়, সেবাও সফল হয়। মেরী করীলির এক একখানি কাব্য সমাজে কত শক্তি দান করিতেছে, কত কল্যাণসাধম করিবার চেষ্টা করিতেছে। এতদ্দেশে তদ্রূপ কাব্য কোথায়? নীচ যাহাতে উন্নত হয়, পতিত যাহাতে পবিত্র হয়, তেমন আদর্শ-সৃষ্টি বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্য হইতে কি চিরবিদায় গ্রহণ করিল? সংস্কৃত সাহিত্যে, বিশেষতঃ পুরাণে কত আদর্শ পিতা, আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ স্বামী, আদর্শ রাজা, আদর্শ প্রজা, এমন কি, আদর্শ শত্রু পর্য্যন্ত, অঙ্কিত হইয়াছে; তৎসমস্তের অনুশীলনে কত কত নরনারী উন্নত ও পবিত্র জীবন লাভ করিতেছেন, তাহার সংখ্যা হয় না। আমরা কেহ সাহিত্য-সম্রাট্ হইতেছি, কেহ আর কত কি হইতেছি! কিন্তু সমাজের ও সময়ের উপযোগী উন্নত আদর্শ কি একটীও অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইয়াছি? যাহারা কেবল বুঝে রাজত্ব ও আধিপত্য, স্বর্গকেও যাহারা Kingdom ভিন্ন কল্পনা করিতে পারে না, তাহাদিগের ভাষা ধার করিয়া লইয়া সাহিত্যেও আমরা প্রতিনিয়ত "সাহিত্য-সম্রাট্" "কবি-সম্রাট্" ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করিয়াই তৃপ্ত হইতেছি। আমরা



প্রত্যাদেশ।

চিত্রকর—আর্থার হ্যাকার।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

ক্রমে যেরূপ অসহিষ্ণু ও অ-ধীর, বিলাসী ও সৌখীন, অলস ও অদূরদর্শী হইতেছি, তাহাতে আদর্শ-চরিত্রের চিত্রণ বোধ হয় আমাদিগের দ্বারা আর সম্ভব হইবে না। কষ্ট করিয়া ১০ পাতা যে পড়িতে পারে না, চিন্তা করিয়া দুইটি কথার যে মর্ম্মভেদ করিতে সমর্থ হয় না, কালব্যাপিনী চেষ্টা শুনিলেই যাহার দেহে জ্বর আসে, সে ক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র, চুটকী, চটুল, মজাদার, শ্রবণেন্দ্রিয়ের আপাতসুখকর দুই দশ লাইন কবিতা, কি একটু ছোট গল্প ভিন্ন আর কি লিখিবে ? কি বা পড়িবে ? এখন ইহারই নাম সাহিত্য-সেবা দাঁড়াইয়াছে। ইহা মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ। কাব্য সাহিত্যের সহায়তায় মানুষকে উন্নত করা আর আমাদিগের বিবেচনার স্থল নহে।

সাহিত্য-সেবা এক্ষণে আর এক মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। তাহাও মঙ্গলজনক হইতে পারে, যদি সুপথে চালিত হয়। নচেৎ কেবল বৃথা গর্ব্বের প্রশ্রয় দিলে আরও অমঙ্গলের কারণ হইতে পারে। ইহার নাম ঐতিহাসিক আলোচনা। আমাদিগের জাতিটা পূর্ব্বে এত বড় ছিল, অত বড় ছিল, প্রকাণ্ড ছিল, ইত্যাদি জানিলে মঙ্গল আছে ; তাই এ শাস্ত্রের আলোচনা। পূর্ব্বে বড় ছিলাম, এখন ছোট হইয়াছি ; এ সংবাদ জানিলে কাহারও প্রতিজ্ঞা, উদ্যম, অনুষ্ঠান জাগ্রত হইতে পারে না, এমন কথা বলিব না। তবে অনেকেরই বৃথা গর্ব্বমাত্র জাগ্রত হয় ; আর বিশেষ কিছু ফল হয় না। এস্থলে একটী গল্প বলিব। এক গুলিখোর সর্ব্বস্বান্ত হইয়া সমস্ত দিবস উপবাসের পর দুই পয়সার জিলিপি ক্রয় করিয়া লইয়া সন্ধ্যায় বাড়ী যাইতেছে। এমন সময় কে এক জন তাহার দীনবেশ ও দীনমূর্ত্তি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে মশায়, হস্তে ও-টা কি ?" গুলিখোর উত্তর করিল,—"বড় কে নয়। বাবার আমলে দুর্গোৎসব হ'ত। নাম হরিনাথ শর্ম্মা ; হস্তে জিলিপির ঠোঙ্গা। বড় কে নয়।" এই অধঃপতিত গুলিখোর বিলক্ষণ জানে যে, সে বড় বাপের বেটা ; প্রত্যেক "কাপ্তেন", যাহারা নীচ ঘৃণ্য জীবন যাপন করিয়া সর্ব্বস্ব উড়াইয়া দিয়া পথের ফকীর হইতেছে, তাহারা সকলেই জানে যে, তাহারা বড় বাপের বেটা। কিন্তু এই জ্ঞান কয় জনকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছে ? নিজের পিতার কৃতিত্ব ও গৌরব যদি পুত্রকে অনেক স্থলেই উত্তেজিত করিতে না পারে, (শুধু ভাবে উত্তেজিত করার কথা বলিতেছি), তবে দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে "স্বপ্ন বর্ম্মা" কত বড় লোক ছিলেন, তাহা জানিয়া যে বৃথা গর্ব্ব জাগ্রত হওয়া ভিন্ন আর বিশেষ কিছু ফল আছে, এ কথা বিশ্বাস করি না। যে শুধু ভাবে আন্দোলিত হইতে চায়, সে এই ভাবেই ইতিহাসের

আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিবে। কিন্তু ইহার আর একটা দিক আছে। সমাজ কিসে উন্নত হয়, কেনই বা পতিত হয়; অর্থবল, বিদ্যাবল, জনবল থাকিতেও পুরাকালে ইতিহাস-প্রখ্যাত অনেক জাতি কি কারণে উন্নত পদবী হইতে অধঃপতিত হইয়াছিল; মানবের উর্দ্ধাধঃ বিবর্ত্তনের প্রধান হেতু কি? এই সকল মানবতত্ত্বের সুতরাং জীবতত্ত্বের অংশস্বরূপ যে ইতিহাসের আলোচনা, তাহাই লোকহিতকর, তাহাই সমাজের পক্ষে কল্যাণকর। আর যদি লোক-হিতজনক অনুষ্ঠানকে ধর্ম্ম বলা যায়, তবে ঐরূপ অনুশীলনই ধর্ম্ম্য। অন্যবিধ অনুশীলন মানসিক ব্যায়ামমাত্র, এবং অনায়াসেই বৃথা গর্ব্বে পরিণত হইতে পারে। এই হেতু পণ্ডিতপ্রবর রে ল্যাংকেষ্টার বলিয়াছেন —"মানবজাতির জীবনসংগ্রামের, মানবজাতির বিবর্ত্তনের ইতিহাসস্বরূপ লোকতত্ত্বের একাংশ গণ্য করিয়া ইতিহাসের আলোচনা করিলে মূল্যবান সিদ্ধান্ত সকল পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।" * নতুবা প্রাচীনকালীন বিবরণ জ্ঞাত হইয়া বিশেষ কোনও লাভ নাই। "ইতিহাস-সম্রাট" ইত্যাদি হওয়া এতদ্দেশে কঠিন না হইতে পারে; কিন্তু ইতিহাস-আলোচনার উদ্দেশ্য কখনও বঙ্গীয় সমাজে প্রতিভাত হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করিবার বিশেষ কোনও কারণ পাওয়া যায় নাই। শ্রীযুক্ত মোহিনী চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জাতীয় বিদ্যালয়ে অরণ্যে রোদন করিয়াছিলেন; তাঁহার প্রদত্ত বীজ কষ্ট করিয়া চাষ করিতে হয়; তাই কেহ করিল না। ইহাও জাতীয় জড়তার অন্যতম লক্ষণ। মঙ্গলময় অনুষ্ঠানমাত্রই ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। সে ত্যাগ স্বীকার করে কে? কুমার শরৎকুমার রায় অধিক জন্মে না।

সকল আলোচনাই জ্ঞানতৃষ্ণা হইতে জাত হইলে স্থায়ী হইতে পারে। অধ্যাপক পুল্‌টন বৈজ্ঞানিক আলোচনা সম্বন্ধে যে সার কথা বলিয়াছেন, তাহা সকল আলোচনা সম্বন্ধেই প্রয়োজ্য। আমরা বৈজ্ঞানিক অনুশীলন করি কেন?

এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "আমরা জানিতে চাই; তাহাতেই আনন্দ হয়।" † আমরা জানিতে চাই—এই কথা বঙ্গীয় সম্রাটদিগের কে বলিতে

* ·········Scientific Study of the History of the struggles of the races and nations of mankind, as a portion of the knowledge of the evolution of Man, capable of giving conclusions of great value when it has been further and more thoroughly treated as a department of Anthropology.—Kingdom of Man. pp, 57-58.

† I want to find out.—Essays on Evolution, p. xlvii.

পারেন? বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ চরিত্রবান্ উদ্যমশীল ত্যাগী ব্যক্তির আবির্ভাব প্রয়োজনীয় হইয়াছে, * তাহা কি প্রকার, তাহার আদর্শ কি প্রকার, তাহা কে জানিতে চায়? তাহা পদ্যে গদ্যে চিত্রিত করিয়া দেশমধ্যে কে প্রচার করে? ঐরূপ ব্যক্তি কি প্রযত্নলভ্য? যদি প্রযত্নলভ্য হয়, তবে কি উপায়ে, বংশানুক্রমের এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার কিরূপ সমাহারে সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি লভ্য হইতে পারেন, তাহা কি কেহ জানিতে চাহেন? আমি একদিন বলিয়াছিলাম যে, বিদ্যাপতি কবহু লিখিয়াছেন, কি করহুঁ লিখিয়াছেন, এই কথা জানিবার নিমিত্ত এতদ্দেশে যে প্রকার কৌতূহল জাগিয়া উঠিয়াছে, সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিবার ইচ্ছা তাহার শতাংশের একাংশও জাত হয় নাই। কথাটা বলিয়া তিরস্কৃত হইয়াছিলাম, কিন্তু কথাটা কি মিথ্যা? আমি বঙ্গীয় সাহিত্যসেবীদিগকে করযোড়ে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা কি জানিতে চান? কিছুই জানিতে চান কি? এই যে বঙ্গের মুখোজ্জ্বলকারী অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসুর বিবিধ আবিষ্কার জ্ঞান-পিপাসু সভ্য' জগৎকে চমৎকৃত করিতেছে, আমরা বঙ্গীয় সাহিত্যসেবিগণ ক' জন তাহার বিশেষ বিবরণ জ্ঞাত আছি? ক' জন তাঁহার অমূল্য গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়াছি? ইউরোপ ও আমেরিকা প্রশংসা করিয়াছে; নকলনবীশ আমরা অমনই বৃথা গর্ব্বে নৃত্য করিতেছি। শুধু বৃথা একটা ভাবের বড়াই। দেখ আমরা কত বড়—এই অভিমান। রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাইলেন। তাঁহার অমর কবিতা আমরা ক' জন পাঠ করিয়াছি; অথবা তাহা বুঝিয়াছি? রবীন্দ্রনাথের কবিতা কি সম্পদে বড়, তাহা আমরা ক' জন জানি? কিন্তু সেই পরমুখাপেক্ষিতা আমাদিগকে তখনই শুধু বৃথা গর্ব্বভরে ছুটাছুটি করাইল; রবীন্দ্র যা', তা'ই আছেন; কেবল ইউরোপের প্রশংসাই আমাদিগকে অন্ধভাবে লাফালাফি করাইল। আর কিছুই নহে। যে দিক দিয়াই দেখি, আমাদিগের জ্ঞানতৃষ্ণা নাই; কেবল আছে বৃথা গর্ব্ব। আমি কত বড়, আমার বাপের আমলে দুর্গোৎসব হইত, শুধু এই ভাব। এ ভাবও যে মন্দ, তাহা বলিতেছি না; যদি ইহা কেবলমাত্র ঐখানেই পর্য্যবসিত হয়, উদ্যম ও চেষ্টা প্রসব না করে—তবে ইহা আমাদিগকে আরও অধঃপতিত করিবে; তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ভাবের উত্তেজনা কর্ম্মের প্রধান সহায়; কিন্তু তাহার সহিত বুদ্ধির যোগ না থাকিলে কর্ম্ম সফল হয় না। ভাব কর্ম্মের উত্তেজনা দিবে; কিন্তু বুদ্ধি তাহার উপায় উদ্ভাবন করিবে। কি উপায়ে

Descent of Man, (1906) ch. v. particularly p. 203

কর্ম্ম সিদ্ধ হয়, বুদ্ধি তাহা বলিয়া দিখে; তদনুসারে চেষ্টা, একাগ্র চেষ্টা, কালব্যাপিনী চেষ্টা অনুষ্ঠিত হইলে কর্ম্ম সফল হইবার আশা করা যায়; নচেৎ কিছুই হয় না। আমাদিগের তাহা আছে কি? যদি থাকিত, তবে বিগত আট দশ বৎসরের ভাবোন্মত্ততা কোনও স্থায়ী সাহিত্যে প্রতিফলিত হইল না কেন? ভাব শুধু ভারেই থাকিয়া গেল। ইহাই আমাদিগের দৈন্য। যাঁহারা পৃথিবীর বর্ত্তমান অনুন্নত জাতি সকলের সহিত সাক্ষাৎস্বরূপে পরিচিত, তাঁহারা বলেন যে, ঐ সকল জাতি অত্যধিক মাত্রায় ভাবোন্মত্ত। সামান্য একটু কারণ ঘটিল, অমনই তোমাকে ছোরা বসাইয়া দিল; আপন পুত্র একটু দুগ্ধ ফেলিয়া দিয়াছে, অমনই তাহাকে আছড়াইয়া বধ করিল। তুমি একটু চকমকে রঙ্গিন কাপড় কিংবা পালক উপহার দিলে, অমনই হাসিয়া নাচিয়া অস্থির। এ সকলই গ্রন্থকারগণ দেখিয়া লিখিয়াছেন। মানব-শিশুকে দেখিলে, সভ্যতায় যাহাদিগকে শিশু বলা যায়, তাহাদিগের অবস্থা অনেকটা বুঝা যায়। মানব-শিশু বড়ই ভাবের দাস। সে তখনও বুদ্ধি দ্বারা ভাবকে সংযত করিতে শিখে নাই, একটুতেই খুসী, একটুতেই বিরক্ত। যাহার বুদ্ধির বিকাশ যত কম, ভাবের চাঞ্চল্য তাহার তত অধিক হইয়া থাকে। তাই আমরা কাব্য লিখি, ছবি আঁকি, গান করি; কাব্য, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীতবিদ্যা—এ সকলের প্রভাব আমাদিগের উপর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এ সকল ছোট বিদ্যা নহে, হেয় পদার্থ নহে। ইহার অনুশীলনও মানুষকে প্রকৃত মানুষ করিতে পারে। বেহালার বাদ্য সঙ্গীতবিদ্যার অতি উন্নত বিবর্ত্তন; সম্রাট নিরো (Nero) হয় ত উচ্চ অঙ্গের বেহালা-বাদক ছিলেন। কিন্তু যখন পৃথিবীর রাজধানীস্বরূপা রোমনগরী পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইতেছিল, তখন তাঁহার বেহালা-বাদ্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া প্রাণপণ চেষ্টায় অগ্নি নির্ব্বাপিত কবিবার যত্ন করাই বোধ হয় সঙ্গত ছিল। জনসাধারণের মুগ্ধ হইয়া ক্রমাগত বাহবা দিয়া নীরোর বাদনবৃত্তিকে আরও উত্তেজিত করা বোধ হয় ভাল হয় নাই; তাহাদিগেরও তখন অগ্নিনির্ব্বাপনের চেষ্টা করাই বোধ হয় উচিত ছিল। সকল কার্য্যেরই একটা সময় অসময় আছে; দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া সকল কার্য্যই করিতে হয়। ঐ তিনটীকে উপেক্ষা করা যায় না। সকলেই জানেন, আমরা নানারূপে একেবারেই মারা যাইতে বসিয়াছি; সাহিত্যসেবা দ্বারা কি আমাদিগকে রক্ষা করা যায় না? এই বিস্তীর্ণ দেশে এ কথা জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন ক' জন? ইহার চেষ্টাই বা করে কে? তৎপরিবর্ত্তে আমরা করিতেছি কি?

শ্রীশশধর রায়।

বায়ু-পরিবর্ত্তন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"হরিধন—ও হরিধন—বাবা, জরটা ছাড়ল কি ?"

কাঁপিতে কাঁপিতে লেপের ভিতর হইতে হরিধন উত্তর করিল—"হুঁঃ—ছাড়ল !—একেবারে ছাড়বে।"

মা বলিলেন—"ষাট, ষাট—ষেটের বাছা ষষ্ঠীর দাস ! ও কথা কি বলতে আছে রে ?"—হরিধনের কম্প আরও যেন বাড়িয়া উঠিল।

"বড্ড শীত করছে কি বাবা ?"

"হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ।"

"মাথাটা কামড়াচ্ছে ?"

"খসে যাচ্ছে। খসে যাচ্ছে।"

"আমার ত এখন বিছানা ছোঁবার যো নেই। বউমাকে পাঠিয়ে দেব, মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেবে ?"

"যা হয় কর। হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ।"

আশ্চর্য্য এই যে, মা নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র হরিধনের কাঁপুনি বন্ধ হইয়া গেল, তাহার কাতরানিও আর শোনা গেল না। প্রথমে মুখটি, তাহার পর একখানি অস্থিসার হস্তের অগ্রভাগ, লেপের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। খোলা জানালাপথে অপরাহ্ণ-রৌদ্র প্রবেশ করিয়া, শয্যার একটা স্থান উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়া ছিল, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অপ্রসন্নভাবে হরিধন সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

সে এই বিধবার একমাত্র পুত্র। বয়স প্রায় বাইশ তেইশ হইবে, কিন্তু গোঁফদাড়ি এখনও ভাল করিয়া দেখা দেয় নাই। দুই তিন বৎসর হইতে হরিধনকে ম্যালেরিয়ায় ধরিয়াছে। যখন ভাল থাকে, খাইয়া খেলিয়া বেড়ায়, তখন ইহাকে দেখিলে উনিশ কুড়ির অধিক মনে হয় না। দেহখানি পোড়া কাঠের মত, চক্ষু দুইটি কোটরগত, উদরটি ডাগর, পা দুখানি সরু সরু।

এই গ্রামের নাম বলরামপুর। পূর্ব্বে হরিধনদের অবস্থা পল্লীগ্রামের পক্ষে বেশ স্বচ্ছলই ছিল বলিতে হইবে। তাহার পিতা বংশীধর চট্টোপাধ্যায় নিজ বুদ্ধিবলে অনেক জমী জিরাৎ করিয়াছিলেন, মেটে বাড়ী ভাঙ্গিয়া দালান কোঠা তুলিয়াছিলেন। জ্ঞাতিভ্রাতা ভৈরব চট্টোপাধ্যায়ের বৈবাহিক (জ্যেষ্ঠা কন্যার শ্বশুর) কোনও রাজসরকারে কর্ম্ম করিতেন, মহারাণীর জুবিলী উপলক্ষে রাজার সহিত

গোপনে তিনি বিলাত গিয়াছিলেন, এই কথা রাষ্ট্র হইবামাত্র বংশীধর ভৈরবকে একঘরে করিয়া গ্রামে একটা দলের দলপতি হইয়া উঠিলেন। শুধু ভৈরব চট্টোপাধ্যায়ের জাতি মারিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। তাঁহার সহিত অনেকগুলি মামলা মোকর্দ্দমাও পাকাইয়া তুলিলেন। প্রথম কয়েক বৎসর বংশীধর দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে সমাজশাসন ও মোকর্দ্দমাচালন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পর কাবু হইয়া পড়িলেন। ভৈরব চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র ভূপালচন্দ্র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী চাকরী পাইতেই, গ্রামের লোক আর বংশীধরের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে সম্মত হইল না—এবং একে একে তাঁহার দলকে পরিত্যাগ করিয়া ভৈরবচন্দ্রের দলে গিয়া ভিড়িতে লাগিল। বংশীধরের কিন্তু রোখ্ চাপিয়া গিয়াছিল, আরও কয়েক বৎসর মোকর্দ্দমা চালাইয়া একপ্রকার সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, অবশেষে পরলোকে গমন করিলেন। তাই হরিধন আজ দরিদ্র—পৈত্রিক সম্পত্তির সামান্য যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহাতেই কষ্টে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। সংসারটি বৃহৎ নহে, তাই রক্ষা। গৃহে মা, স্ত্রী, পিসীমা ও একটি পিস্তুতো ভাই ছাড়া আর কেহই নাই। অদ্যাবধি তাহার সন্তানাদি হয় নাই।

বাহিরে বারান্দায় স্ত্রীর পদধ্বনি শুনিবামাত্র হরিধন মুখে আবার লেপ চাপা দিল। স্ত্রীর নাম সরলা, বয়স অষ্টাদশ বর্ষ, রঙটি ময়লা, তবে মুখখানি নিন্দার নহে। সরলা আসিয়া বিছানার পাশে বসিল। তাহার পর ধীরে ধীরে মুখ হইতে লেপটি সরাইয়া, কপালে হাত রাখিয়া বলিল—"কৈ না; এখন ত গা তেমন গরম নেই।"

হরিধন মুখ খিচাইয়া বলিল—"নাঃ—গা গরম থাকবে কেন? একেবারে বরফ হয়ে গেছে।"—বলিয়া হুঁ হুঁ করিয়া কাতরাইতে আরম্ভ করিল। "বাপ্ রে—মা গোঃ" বলিয়া এ পাশ ও পাশ করিতে লাগিল।

"দেখি, মাথাটায় হাত বুলিয়ে দিই"—বসিয়া সরলা হরিধনের ললাটস্পর্শ করিল। হরিধন সে হাতটা সবেগে সরাইয়া ফেলিয়া বলিল—"থাক্—আর অত দয়ায় কায নেই। গা যার বরফের মত ঠাণ্ডা, তার কি আর মাথা কামড়ায়।"

সরলা বুঝিল, গা যথেষ্ট গরম নাই বলায় স্বামী রাগ করিয়াছেন। তাই কয়েক মিনিট সে নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার পর আবার হরিধনের কপালে হাত রাখিয়া বলিল—"উঃ—সত্যিই ত! গা যেন পুড়ে যাচ্ছে! অনেকক্ষণ উনুনের কাছে বসে থেকে উঠে এসেছিলাম কি না, আমারই হাত গরম ছিল, তাই তখন ঠিক বুঝতে পারিনি।"

হরিধন ঝাঁকিয়া উঠিয়া, হাতখানি ছুড়িয়া ফেলিয়া বলিল—"যাও যাও—আর সোহাগ কাড়াতে হবে না। এখান থেকে যাও বলছি—নৈলে অপমান হবে।"—বলিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইল।

খানিক পরে ফিরিয়া দেখিল—সরলা বসিয়া কাঁদিতেছে। বলিল—"বসে রইলে কেন ?"

সরলা চক্ষু মুছিয়া বলিল—"তুমি আমার উপর রাগ করেছ কেন ?—আমি কি করেছি ?"

হরিধন ভেঙ্গাইয়া বলিল—"রাগ করেছ কেন, আমি কি করেছি !—কি করতে বাকী রেখেছ ?"

সরলা এক দৃষ্টে স্বামীর মুখ পানে চাহিয়া রহিল। হরিধন বিছানায় মুখ গুঁজিয়া বলিতে লাগিল—"যার স্বামী জ্বরে পড়ে কোঁ কোঁ করছে,—সে যায় নেমন্তন্ন খেতে! আমোদ করতে ?"

সরলা ধীরে ধীরে বলিল—"খুড়ীমা নিজে এসে বলে গিয়েছিলেন, আমরাই হলাম আত্মীয়, আমরা না গেলে কি ভাল দেখাত ?"

"আত্মীয়! আমার বাবা যাদের একঘরে করেছিলেন, তাদের বাড়ীতে যাও নেমন্তন্ন খেতে! কেন ? বাড়ীতে গিলতে পাও না ? এত পেটের জ্বালা ?"

সরলা কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল—"আহা কি মিষ্টি কথাই শিখেছ! লোকে কি খেতে পায় না বলেই আত্মীয় বন্ধুর বাড়ী নেমন্তন্ন খেতে যায় ? আর, ঠাকুর একঘরে করেছিলেন, এখন ত ওঁরা একঘরে নেই—এখন ত সকলেই ওঁদের নিয়ে চলছে—আর আমরা জ্ঞাতি হয়ে—"

হরিধন উত্তেজিতস্বরে বলিল—"জ্ঞাতি শত্রু পরম শত্রু—জান না ? আমাদের কি গ্রাহ্য করে, না কেয়ার করে ? অমন জ্ঞাতির মুখে মারি পাঁচ জুতো। আর যে লোভ না সামলাতে পেরে তাদের বাড়ী যায় নেমন্তন্ন গেতে, তার নোলায় মারি আমি পাঁচ ঝাঁটা।"

সরলা তখন চক্ষে অঞ্চল দিয়া সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাত্রির মধ্যে হরিধনের জ্বরটুকু ছাড়িয়া গেল। পরদিন প্রাতে উঠিয়া পেয়ারা-পাতা চিবাইয়া মুখ ধুইয়া সে ডি-গুপ্ত সেবন করিল। অর্দ্ধঘণ্টা পরে বারান্দায় মাদুর বিছাইয়া বসিয়া খানকতক বিস্কুট লইয়া জলযোগ করিতেছে, এমন সময়

উঠানের প্রান্তভাগ হইতে শব্দ শুনিল—"কোথায় গো জেঠাই মা।" চাহিয়া দেখে, স্বয়ং ভূপাল-চট্টোপাধ্যায়। বিস্কুটগুলা তাড়াতাড়ি পকেটে লুকাইয়া, কোঁচার খুঁটে মুখ মুছিয়া শান্ত গম্ভীরভাবে হরিধন বসিয়া রহিল।

পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে আজ তিন সপ্তাহ হইল ভূপাল বাবু আসিয়াছেন, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে একদিনও এ বাড়ীতে তিনি পদার্পণ করেন নাই; তাহার কারণ ছিল। তিন বৎসর পূর্ব্বে যখন তিনি পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ করিতে আসেন, তখন গ্রামস্থ অপর সকলেই তাঁহার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছিল, করে নাই কেবল হরিধন। নিজেও যায় নাই, মাকে পিসীকেও যাইতে দেয় নাই।—তথাপি, ভূপাল বাবুর মাতা এবার আসিয়া ইহাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছিলেন। হরিধনের মা, হরিধনকে না জানাইয়া, বউটিকে লইয়া গতকল্য সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছিলেন—এবং শুধু তাহাই নহে, সেখানে বলিয়া আসিয়াছিলেন—"জ্বর বলে হরিধন আসতে পারলে না, বাছা কত দুঃখ করতে লাগল।"—বলা বাহুল্য, ইহা একেবারেই কাল্পনিক। কিন্তু ফলটা ভালই হইল। ভূপালবাবু আসিয়া ডাকিলেন—"কোথায় গো জেঠাই মা—হরিধন কেমন আছে?"—বলিতে বলিতে বারান্দার দিকে আসিলেন। হরিধনকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন—"এই যে হরিধন, কেমন আছ হে?"

হরিধন ক্ষীণস্বরে উত্তর করিল—"জ্বরটা এখন ছেড়েছে।"

"কালকে শুনলাম—জেঠাইমার কাছে—যে তোমার জ্বর। কাল ত আর গোলেমালে দেখতে আসতে পারি নি। রাত্তির বারোটার কম খাওয়ান দাওয়ানর জের মিটল না। তাই ত, ভারি কাহিল হয়ে গেছ যে!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আজ তিন বছর ধরে ভুগছি। পাঁচ সাত দশ দিন ভাল থাকি, আবার পড়ি।"

ভূপালবাবু বলিলেন—"এ ত ঠিক নয়। তোমার হাওয়া বদলান উচিত।"

এই সময় হরিধনের মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ভূপালবাবু বলিলেন—"জেঠাই মা, হরিধনের শরীর যে বড়ই কাহিল হয়ে গেছে।"

"হ্যাঁ বাবা, দেখ না। খালি খানকতক হাড়ে ঠেকেছে।"

"তাই আমি বলছিলাম, আর ত গাফিলী করা উচিত নয়। পশ্চিমে কোনও ভাল জায়গায় গিয়ে মাস কতক হাওয়া বদলাতে পারলে ভাল হত।"

"ভাল ত হত বাবা, কিন্তু উপায় কি? কোথায় বা পাঠাই, কে বা নিয়ে যায়।"

ভূপালবাবু বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

হরিধন চিঁ চিঁ করিয়া বলিল—"আর, এই রকম করে যে ক'টা দিন কাটে। সহায় সম্পত্তি থাকত, এতদিন কোন কালে পশ্চিমে চলে যেতাম। চলুক, এমনি করে যদ্দিন চলে"—বলিয়া সে একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

হরিধনের মাতা এ কথা শুনিয়া চক্ষে অঞ্চল দিলেন। ভুপালবাবুরও চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। বলিলেন—"হরিধন, তুমি আমার সঙ্গে যাবে? এ সময়টা মুঙ্গেরে জলহাওয়া খুব ভাল। শীতের ক'টা মাস সেখানে থাকলে উপকার হতে পারে।"

হরিধন অবনতমস্তকে বসিয়া রহিল। তাহার মা বলিলেন—"নিয়ে যাও না বাবা। তোমার হাতে দিয়ে আমি নিশ্চিন্দি হয়ে থাকতে পারি।"

"তা, আমি নিয়ে যেতে পারি জেঠাইমা। এখন এদের এখানেই রেখে যাচ্ছি—তা হলেও, সেখানে আমার বামুন চাকর সবই আছে, কোনও কষ্ট হবে না। আমার বোধ হয় সেখানে গিয়ে মাস দুই তিন থাকলেই জ্বরটা বন্ধ হয়ে যাবে, পিলেটাও কমে যাবে। কেল্লার মধ্যে গঙ্গার ধারেই আমার বাঙ্গলা—বেশ ফাঁকা, দিব্যি হাওয়া বাতাস।"

মা বলিলেন—"তাই যাও বাবা হরিধন, তোমার দাদার বাসায় থেকে শরীরটে সেরে এস। কেমন?"

হরিধন নিরুত্তর। দাদা বলিলেন—"কেল্লার ভিতর বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বেড়াবার জায়গাও যথেষ্ট আছে। খাসা খাসা মাঠ—তক্ তক্ ঝক্ ঝক্ করছে। বিকালে সাহেবেরা মেমেরা সেখানে খেলা করে। ভাল ভাল রাস্তা—মাঝে মাঝে বড় বড় বাগান। খুব বেড়াতে পারবে। আর এই শীতকালে নতুন আলু, কপি, কড়াইসুঁটি উঠেছে। মাছ বেশ সস্তা। গঙ্গার বড় বড় রুই, কাৎলা। আমার বাড়ীতেই গোরু আছে, রোজ চার পাঁচ সের করে দুধ হয়। খাঁটী ঘি—এ দেশের ঘিয়ের মত ভেজাল নয়। চার আনা করে সের পাঁঠার মাংস। আবার এ সময়টা অনেক পাখীও পাওয়া যায়। তিতির, বটের, চাহা, বুনো হাঁস, টিল—শিকারীরা সব বেচতে নিয়ে আসে। আমার উড়ে বামুনটি রাঁধেও ভাল।"

হরিধনের মনে মুঙ্গের যাইবার বাসনা খুবই প্রবল হইয়া উঠিল। বিশেষ, তথাকার সুলভ খাদ্যতালিকা শ্রবণ করিয়া তাহার রসনা জলসিক্ত হইতেছিল। কিন্তু ইহাঁর নিকট উপকৃত হইতে তাহার মনে একটু দ্বিধা। তাই আত্মসংবরণ করিয়া, নীরবে বসিয়া রহিল।

ভুপালবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হে, যাবে?"

হরিধন বলিল—"আচ্ছা দাদা, একটু ভেবে চিন্তে আপনাকে জানাব।"

বধূর সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া হরিধন কিছু বলিবে না, এই ভাবিয়া ভূপালবাবু মনে মনে হাস্য করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হরিধন মুঙ্গেরে আসিল। দেখিল ভূপালবাবুর, বাঙ্গলাখানি দিব্য, আসবাবপত্র যথেষ্ট এবং মূল্যবান। ভৃত্যও অনেকগুলি। শুনিল, উড়িয়া পাচক ব্রাহ্মণটির খোরাক পোষাক বারো টাকা বেতন। দাদার সম্পদ দেখিয়া হরিধন মনে মনে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিল।

তাহার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হইতে লাগিল। প্রথম সপ্তাহে একবার জ্বর হইয়াছিল। সরকারী অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন আসিয়া নাড়ী টিপিলেন, উত্তাপ লইলেন, ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। হরিধন দেখিল, ভূপালবাবু চারিটি টাকা ভিজিট্ ডাক্তারকে দিলেন।

দ্বিতীয় সপ্তাহে স্পষ্ট জ্বর আর হইল না, সামান্য একটু গা গরম হইল মাত্র।

তৃতীয় সপ্তাহে আর কোনও উপসর্গ রহিল না। বেশ ক্ষুধাবৃদ্ধি হইল। হরিধন সকালে বিকালে একটু একটু বেড়াইতে আরম্ভ করিল।

এক মাসে তাহার মুখের ফ্যাকাসে রঙ্গ আবার কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল, চোখের কোল পূরিয়া আসিল, উদরের আয়তন অর্দ্ধেক কমিয়া গেল, দেখিয়া ভূপালবাবু আনন্দলাভ করিলেন।

হরিধন বুঝিল, এ বড়লোকের বাড়ী, আমাকে দরিদ্র বলিয়া জানিলে চাকর বাকরেরা অগ্রাহ্য করিবে। সুতরাং দাদা কাছারী চলিয়া গেলে, ভৃত্যগণকে ডাকিয়া আধা হিন্দী আধা বাঙ্গলা ভাষায় তাহাদের নিকট নিজ মহিমা প্রচার করিতে সে ব্যাপৃত হইল।—এক দিন বলিল—"আমরাই গ্রামের জমীদার। আমার দশ আনা অংশ—তোমাদের বাবুর ছয় আনা মাত্র। আমরাই বড় তরফ। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা রাজা উপাধি পাইয়াছিলেন। এখন প্রজারা আমাদেরই রাজা বলে—আমরা বড় তরফ কি না। ইত্যাদি।"—পরদিন বর্ণনা করিল—"তোমাদের বাবুর এ বাঙ্গলা কি বাঙ্গলা! দেশে আমাদের সে বাড়ী যদি দেখ! প্রকাণ্ড তিন মহল বাড়ী—কাছারী মহল, বৈঠকখানা মহল, অন্দর মহল। এ রকম বাঙ্গলা সেখানে আমাদের অনেক প্রজারই আছে। হ্যাঁ—তোমাদের বাবুর দেশের বাড়ী এ বাঙ্গলার চেয়ে ঢের ভাল বটে—কিন্তু আমাদের মত অত বড় না।

দেশে তোমাদের বাবুর বাড়ীতে মোটে বারো জন ভৃত্য, আমাদের বাড়ীতে বাইশ জন। ইহা হইতেই বাড়ীর আয়তন বুঝিতে পারিবে—ইত্যাদি।”—আর এক দিন জানাইল, “তোমাদের এ বাঙ্গলায় ছুটি মোটে ঘড়ি—একটি বৈঠকখানায়, একটি বাবুর শোবার ঘরে। দেশে আমাদের বাড়ীতে ঘড়ি সবসুদ্ধ সতেরোটা। দম দিবার জন্য মাহিনা-করা ঘড়িওয়ালা নিযুক্ত আছে—ইত্যাদি”।

ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে ডাকিয়া হরিধন একদিন নির্জ্জনে বলিল—“দেখ ঠাকুর, দুধের সর যা পড়ে, সরটা তুলে রেখ, বিকেলে আমার জলখাবারের সময় দিও। আর দেখ, মাছ এলে মুড়ো টুড়োগুলো রোজ বাবুর পাতেই দাও কেন? আমাকে দিও। আর, আমায় যখন ডাল দেবে, খানিকটে ঘি আগুনে বেশ করে তাতিয়ে আমার ডালের বাটিতে ঢেলে দিও। তোমায় বরং মাসে মাসে আমি কিছু কিছু দেব। আপাততঃ এই দুটি টাকা নাও।”—বামুন ঠাকুর হাসিয়া বলিল—“না বাবু, টাকা দিতে হবে না, টাকা রাখুন। আপনার এখন এই নতুন শরীর, বেশী গুরুপাক জিনিস খেতে দিতে বাবু বারণ করেছেন। আপনি আগে বেশ করে সেরে উঠুন, তখন যা খেতে চাইবেন, দেব।”

টাকা দুইটি হরিধনের নিজস্ব নহে। তিন চারি দিন পূর্ব্বে নিজের চাবি দিয়া ভূপাল বাবুর বাক্স গোপনে খুলিয়া এই টাকা দুটি সে অপহরণ করিয়াছিল।

ভূপাল বাবুর একটি ভাল ফাউণ্টেন পেন ছিল। পাছে হারাইয়া যায়, এই ভয়ে তিনি এটি আফিসে লইয়া যাইতেন না। বাড়ীতে সর্ব্বদা এটি ব্যবহার করিতেন। একদিন তিনি কাছারী গেলে, নিজের চিঠি লিখিবার জন্য হরিধন তাঁহার টেবিলের নিকট বসিল। অন্য কলম থাকা সত্ত্বেও ফাউণ্টেন পেনটিই তুলিয়া লইল। কিন্তু ব্যবহার জানিত না। পেঁচ ঘুরাইতে গিয়া কলমটি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। কিয়ৎক্ষণ সেটি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া ব্যবহার সম্বন্ধে হতাশ হইয়া অবশেষে একটি সাধারণ কলমেই পত্র লিখিল।

ভূপাল বাবু কাছারী হইতে ফিরিয়া দেখিলেন, কলমটি ভাঙ্গা। বেহারাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল, হরিবাবুকে এই ঘরে বসিয়া চিঠি লিখিতে দেখিয়াছে, কলমটিও নাড়াচাড়া করিতে দেখিয়াছে।

ভূপাল বাবু তখন হরিধনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মনের রাগ মনের মধ্যে যথাসাধ্য চাপিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“হরিধন? আমার কলমটি ভাঙ্গলে কি করে?”

যেন কতই আশ্চর্য্য হইয়াছে এই ভাবে হরিধন বলিল—“কলম? কোন কলম?”

এই ন্যাকামি দেখিয়া ভূপাল বাবুর আরও রাগ হইল। পূর্ব্ববৎ আত্মসংবৃত ভাবে বলিলেন—"আমার এই ফাউণ্টেন পেনটি ?"

"কৈ, আমি ত ভাঙ্গিনি। আমি ত ও কলম ছুঁইওনি—বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানি না।"

ভূপাল বাবু একটু কঠোর স্বরে বলিলেন—"তুমি আজ দুপুর বেলা এ ঘরে বসে চিঠি লিখছিলে না ?"

"চিঠি! আমি ত তিন চার দিন কাউকে কোন চিঠিই লিখিনি।"

"লেখনি ?—আচ্ছা, এ দিকে এস। দেখ। এ কি ?"—বলিয়া ভূপাল বাবু টেবিলের ব্লটিং-প্যাডের এক স্থানে অঙ্গুলি স্থাপন করিলেন।

হরিধন ঝুঁকিয়া দেখিল, থামে ঠিকানা লিখিয়া প্যাডের উপর চাপিয়া ধরিয়াছিল, তাহার উল্টা ছাপটি স্পষ্ট রহিয়াছে। নির্ব্বাক হইয়া ভূপাল বাবুর মুখপানে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

ভূপাল বাবু একটু তখন নরম হইয়া বলিলেন—"এই ত আরও সব কলম রয়েছে, তাই একটা নিয়ে লিখলেই হত। ও হল অন্য রকম কলম—তুমি আনাড়ি—জান না—খুলতে গিয়ে ভেঙ্গে ফেলেছ।"

হরিধন একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল—"কলমটির দাম কত ?"

"কেন ?"

"আপনার যখন সন্দেহ আমিই কলমটি ভেঙ্গেছি, তখন ঐ কলম একটি বাজার থেকে আপনাকে কিনে এনে দেব।"—দাদার বাক্স হইতে অপহৃত টাকা আরও কয়েকটি তাহার নিকট মজুদ ছিল।

ভূপাল বাবুর মনে হরিধনের প্রতি যে একটু ক্ষমার ভাব আসিতেছিল, এই উত্তর শুনিবামাত্র তাহা তিরোহিত হইল। তাচ্ছীল্যের সহিত বলিলেন—"পাবে কোথা এ কলম ? ঐ মেকারের কলম এ দেশেই পাওয়া যায় না। কলেক্টার সাহেব বিলাত থেকে এনেছিলেন, আমায় একটি উপহার দিয়েছিলেন।"

আরও কিছু দিন গেল।

ভূপাল বাবু বেলা ১১টার সময় কাছারী চলিয়া যাইতেন। এক এক দিন তাহার পূর্ব্বেই ডাক পাইতেন—কিন্তু প্রায়ই পাইতেন না। চিঠিপত্রগুলা তাঁহার টেবিলের উপর রাখা হইত—কাছারী হইতে ফিরিয়া সেগুলি পাঠ করিতেন। চিঠি আসিলে, পোষ্টকার্ডগুলি হরিধন সমস্তই আগাগোড়া পাঠ করিত। খামের চিঠিও খুলিয়া দেখিবার লোভ হইত, কিন্তু সাহসে কুলাইত না। একদিন দেখিল,

একখানি খামের চিঠিতে তাহাদের গ্রামের ডাকঘরের ছাপ, ঠিকানাটিও স্ত্রীলোকের হাতের লেখা। অনুমান করিল, ইহা নিশ্চয়ই বউদিদির চিঠি। বউদিদি ভাল রকম লেখাপড়া জানেন, গ্রামে এ প্রসিদ্ধি ছিল। হরিধন ভাবিল, দাদাকে না জানি কত কি রসের কথাই বউদিদি লিখিয়াছে। ক্রমে প্রলোভন দুর্নিবার হইয়া উঠিল। জল দিয়া ভিজাইয়া খামখানি খুলিয়া হরিধন পত্র পাঠ করিল। খুলিবার সময় খাম একটু ছিঁড়িয়াও গিয়াছিল।

বিকালে ভূপাল বাবু বাড়ী আসিয়া পত্রখানি দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিলেন, জল দিয়া ইহা খোলা হইয়াছে। কে খুলিয়াছে বুঝিতেও তাঁহার বাকী রহিল না। ভৃত্যগণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেই এক জন চাক্ষুষ সাক্ষী পাওয়া গেল।

রাগে ভূপাল বাবুর সর্ব্বশরীর জ্বলিতে লাগিল। হরিধন তখন বেড়াইতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। অল্পক্ষণ পরেই, মাথায় কম্ফর্টার জড়াইয়া, আলোয়ান গায়ে, ছড়ি হস্তে, বাহির হইয়া আসিল।

ভূপাল বাবু ডাকিলেন—"হরিধন।"

"আজ্ঞে।"

"তুমি এ খামখানি খুলেছিলে?"

হরিধন যেন আকাশ হইতে পড়িয়া বলিল—"খাম?—আজ্ঞে আমি ত খুলিনি।"

ভূপাল বাবু তাহাকে ভেঙ্গাইয়া, দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিলেন—"আজ্ঞে তুমি ত খোলনি, তবে কে খুলেছিল?"

"কে খুলেছিল কি জানি?—আমি ত বিন্দুবিসর্গও জানিনে।"

ভূপাল বাবু গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—"ফের মিথ্যে কথা!"

"আজ্ঞে আমি খুলিনি। পৈতে ছুঁয়ে বলতে পারি খুলিনি।"—বলিয়া হরিধন পটাপট কোটের বোতাম খুলিতে আরম্ভ করিল।

ভূপাল বাবু বলিলেন—"আর তোমার পৈতে ছুঁয়ে শপথ করে কায নেই। পৈতের ভারি ত মান রাখছ কিনা! ছি ছি ছি—এমন কদর্য্য প্রবৃত্তি কেন তোমার? এক ত অন্যায় কায করেছ, আবার মিথ্যা বলে তা ঢাকবার চেষ্টা করছ? ছিঃ—অতি নীচ তুমি।"—বলিয়া ভূপাল বাবু স্থানান্তরে গেলেন।

"আমার নামে মিছামিছি বদনাম"—বলিয়া গজর গজর করিতে করিতে হরিধন বাহির হইয়া গেল।

বেড়াইয়া ফিরিয়া সে শয়ন করিতে গেল। রাত্রে আহারের সময় চাকরেরা

তাহাকে অনেক ডাকাডাকি করিল—হরিধন উঠিল না। শেষে ভূপাল বাবু স্বয়ং আসিয়া ডাকিলেন। সে বলিল, তাহার ক্ষুধা নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দিন দিন হরিধনের স্বাস্থ্য উন্নতিলাভ করিতে লাগিল। ক্রমে শীত গেল, বসন্তকাল আসিল।

ইদানীং হরিধনের উপর ভূপাল বাবু বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার ক্যাশ-বাক্সে টাকা থাকিত—টাকা প্রায়ই কমিয়া যায়, হিসাব মিলাইতে পারেন না। হরিধনই যে টাকা চুরি করিতেছে, এ সন্দেহ তাঁহার হইল। কিন্তু কোনও সাক্ষী সাবুদ পাইলেন না। হরিধন সাবধান হইয়া গিয়াছিল; যাহাতে কোনও ভৃত্য দেখিতে না পায়, এইরূপ আটঘাট বাঁধিয়া তবে সে আজকাল অপকার্য্য করিয়া থাকে।

জামালপুর, মুঙ্গেরের অতি নিকটে। রেলে একটা ষ্টেশন মাত্র। কিছু দিন হইতে হরিধন জামালপুরে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছে। ভূপাল বাবু একদিন জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল—"জামালপুরের আপিসে একটা চাকরীর চেষ্টায় আছি।"—জামালপুরে রেলের কয়েকটি বড় বড় আফিস আছে। ভূপাল বাবু ভাবিলেন, জামালপুরে যদি চাকরী হয় তবে ভালই হয়—আপদ দূর হইয়া যায়।

সেদিন রবিবার। ভূপাল বাবু বৈঠকখানার বারান্দায় একখানি চেয়ারে বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন, হঠাৎ এক জন বর্ষীয়ান ভদ্রলোক আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। লোকটির দক্ষিণ হস্তে একটি ছাতা, বাম হস্তে গামছায় জড়ান ধুতি।

আগন্তুককে চিনিতে না পারিয়া ভূপাল বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার কোথা থেকে আসা হচ্ছে?"

"আমি এই ট্রেণে জামালপুর থেকে এলাম।"

"আপনার নাম?"

"আমার নাম শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, আমি জামালপুরে লোকো আপিসে কর্ম্ম করি।"

"বসুন। কি মনে করে আগমন?"

"আজ্ঞে গঙ্গাস্নানে এসেছি। তাই মনে করলাম, আপনার সঙ্গে একবার দেখাটাও করে যাই।"

"বেশ"—বলিয়া ভূপালবাবু প্রতীক্ষা করিলেন।

বাবুটি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—"হরিধন বলে আপনার একটি ভাইপো আছে না?"

"হ্যাঁ—আছে। আমার কোনও সহোদরের ছেলে নয়, জ্ঞাতিসম্পর্ক।"

"হরিধন প্রায়ই আমার ওখানে যায় টায়। আপনাকে বলেছে বোধ হয়?"

"কৈ—না।"

বৃদ্ধ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—"আমার একটি অবিবাহিতা কন্যা আছে—বছর বারো তেরো বয়স, এখনও বিবাহ দিয়ে উঠতে পারিনি। আজকাল মেয়ের বিয়ে দেওয়া কি ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে জানেনই ত! তায় আমার টাকার জোর নেই—সামান্য পঞ্চাশটি টাকা মাইনে পাই, তাহাতেই কোন রকম কায়ক্লেশে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করি। যদি অনুমতি করেন, তবে আপনাকে একবার নিয়ে গিয়ে মেয়েটিকে দেখাই। বাপ হয়ে নিজে মুখে আর কি বলব, ভরসা আছে, আমার মেয়েটিকে দেখলে আপনার অপচ্ছন্দ হবে না।"

ভূপালবাবু বিস্ময়ের সহিত বলিলেন—"আমাকে মেয়ে দেখাবেন?—কেন?"

রাসবিহারী বাবু একটু থতমত খাইয়া বলিলেন—"আজ্ঞে যদি আপনার পচ্ছন্দ হয়—তা হলে—হরিধনের সঙ্গে—"

বাধা দিয়া ভূপাল বাবু বলিলেন—"হরিধনের সঙ্গে বিয়ে?—অসম্ভব।"

বৃদ্ধ বিনয়সূচক একটু মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন—"হরিধন বিয়ে করতে রাজী হবে না, এই ধারণাতেই বোধ হয় আপনি এটা অসম্ভব বিবেচনা করছেন? তা, সে সব একরকম ঠিক হয়ে গেছে। বাড়ীতে শুনেছি, আমার সরযূকে দেখে ওর ভারি পচ্ছন্দ হয়েছে। এমন কি—কথাটা আপনার কাছে প্রকাশ করা ঠিক হচ্ছে কি না জানি না—ও নাকি বলেছে, অভিভাবকদের অমতেও ও বিবাহ করতে প্রস্তুত। তা সত্ত্বেও আমি আপনার কাছে এসেছি, আপনার অনুমতি প্রার্থনা করতে। এতদিন হরিধন বিয়ে করতে চায় নি, কত বড় বড় সম্বন্ধ ফিরে গেছে, এখন বিয়ে করতে ওর মন হয়েছে শুনে আপনাদের নিশ্চয়ই খুব আহ্লাদ হবে। আপনি মহৎ ব্যক্তি—আমি কন্যাদায়গ্রস্ত—আমার প্রার্থনা বিফল করতে পারবেন না, এই ভরসাতেই আসা।"

শুনিয়া ভূপালবাবু নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। হরিধনের এই নূতন কারসাজির পরিচয় পাইয়া ক্রোধে তিনি জ্বলিয়া উঠিলেন।

রাসবিহারীবাবু মনে করিলেন; হয় ত ইনি ভাবিতেছেন, ছেলেকে বশ করিয়া

পণের টাকা ফাঁকি দিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। তাই তিনি বিনয়নম্রস্বরে বলিলেন—"আমি গরীব মানুষ হলেও নিতান্ত কিছুই যে দেব না, তা নয়। আমার ঐ একটিমাত্র মেয়ে, আর ছেলে পিলে নেই। এই মেয়েটিকে পার করতে পারলেই আমার খালাস। আমার পৈত্রিক কিছু ছিল, আর দেশের বাড়ীখানি বাঁধা দিয়ে কিছু ধারও পাব। পাঁচশো টাকা নগদ, হাজার টাকার গহনা, আর পাঁচশো টাকা বরাভরণ দানসামগ্রীতে, এই দুহাজার টাকা আমি কষ্টে সৃষ্টে দিতে পারব। হরিধনকে বলেছি, সে তাতেই রাজি। অবিশ্যি আপনাদের পক্ষে এ কিছুই নয়। আপনাদের সম্মান রক্ষা করতে পারি, এমন সাধ্য আমার কৈ? গরীব ব্রাহ্মণকে দায়ে উদ্ধার করুন"—বলিয়া বৃদ্ধ ঝুঁকিয়া ভূপালবাবুর পদস্পর্শ করিবার উপক্রম করিলেন।

"হাঁ হাঁ—করেন কি—করেন কি"—বলিয়া ভূপালবাবু তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন। বাবুটিকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি হরিধনের বিষয় ভাল করে অনুসন্ধান করেছেন কি?"

"আজ্ঞে, আপনার ভাইপো—আর অনুসন্ধানের প্রয়োজন কি? আমি কোনও অনুসন্ধান করি নি, তবে হরিধন সকল কথাই বাড়ীতে আমার স্ত্রীর কাছে বলেছে।"

"সকল কথা বলেছে?—ওর এক স্ত্রী বর্ত্তমান, তা বলেছে?"

এই কথা শুনিয়া রাসবিহারীবাবু যেন চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"স্ত্রী বর্ত্তমান?—বলেন কি? স্ত্রী বর্ত্তমান?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"ও ত বলেছিল, ওর এক বিবাহ ছিল বটে—কিন্তু সে স্ত্রী আজ দু'বছর হল গত হয়েছে। কোনও ছেলে পিলেও নেই।"

"ছেলে পিলে নেই বটে, কিন্তু স্ত্রী জলজ্যান্ত বেঁচে রয়েছে। যদিও গত হলেই সে হতভাগিনীর সকল কষ্ট ঘুচত বটে।"

"বলেন কি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তাই ত! এমন—তা ত জানতাম না। বলেছিল, দু' বছর হল স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে—সেই থেকেই ওর মনে একটা বৈরাগ্য উপস্থিত হয়—তাই আর বিয়ে করে নি। কত বড় বড় সম্বন্ধ এসে ফিরে গেছে। এমন কি, গত অগ্রহায়ণ মাসে উত্তরপাড়ায় মুখুয্যেদের বাড়ী থেকে এক সম্বন্ধ এসেছিল, তারা নগদে জিনিসে

গহনায় বিশ পঁচিশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিল, তবুও বিবাহ করেনি!"

ভূপালবাবু বলিলেন—"বিলকুল মিথ্যে কথা।"

বৃদ্ধ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"দেখুন একবার! সতীনে ত আমি মেয়ে দেব না—তা যতই বড়লোক হোক্। আমার পাঁচটা নয় সাতটা নয়, ঐ একটিমাত্র মেয়ে, এক জন সচ্চরিত্র গরীবের হাতে পড়ে' যদি একবেলা খেয়েও থাকে, সেও ভাল, তাতেও আমার মেয়ে সুখে থাকবে। সম্পদের লোভে সতীনের উপর অন্ন মেয়ে দিতে পারব না—প্রাণ থাক্‌তে নয়।"

"ও বুঝি নিজেকে এক জন মস্ত সম্পত্তিশালী বলে আপনাদের কাছে বড়াই করেছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। বল্লে, ওর জমিদারীর আয় বছরে পনেরো ষোল হাজার টাকা। এখানে হাওয়া বদলাতে এসেছে, ওর পকেট-খরচের জন্যে ওর গোমস্তা মাসে মাসে ২০০৲ টাকা করে পাঠাচ্ছে। গোমস্তা টাকা পাঠাতে এ মাসে দেরী করেছে বলে আমার কাছে সেদিন ৫০৲ টাকা ধার নিয়ে এল। বিষয় সম্পত্তির কথাও সব মিছে নাকি?"

"একবারে মিছে। বিষয় সম্পত্তির মধ্যে ওর বিঘে পঞ্চাশ ব্রহ্মোত্তর জমী আছে, কতক খাজানায় বিলি করা, কতক ভাগে চাষ করায়, তাইতে কোন রকমে সংসার চালায়।"

বাবুটি ইহা শুনিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন—"তা হলে ত গরীবের ৫০৲টি টাকা গেল দেখছি। সেই দিনই মাইনে পেয়ে টাকাগুলি এনেছিলাম মশায়, বাক্সতেও তুলিনি। সেই টাকা কটি ওকে দিয়ে, পুঁজি ভেঙ্গে মাসকাবারের চাল ডাল কিনেছি।"

এমন সময় দেখা গেল, মস্তকে বাঁকা টেরি, গায়ে শার্টের উপর গলা খোলা ইংরাজি কোট, হাতে (ভূপাল বাবুরই) রূপা বাঁধানো মলক্কা বেতের ছড়ি, লম্বা কোঁচা ক্ষুদ্র নবাবটির মত হরিধন প্রাতভ্রমণ করিয়া ফিরিতেছে। হইলে-হইতে-পারিত শ্বশুরটিকে অসময়ে অস্থানে উপস্থিত দেখিয়া সে পাশ কাটাইবার চেষ্টায় ছিল; কিন্তু ভূপালবাবু তাহাকে ডাকিলেন।

সে আসিয়া দাঁড়াইলে, ভূপালবাবু গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"তুমি কি আর জুচ্চুরি করবার জায়গা পেলে না? এই গরীব ব্রাহ্মণটির মাথা খেতে উদ্যত হয়েছিলে?"

হরিধন বলিল—"মাথা খেতে কি রকম?"

"এঁর মেয়েটিকে জুচ্চুরি করে বিয়ে করবার চেষ্টা করেছিলে ?

"বিয়ে করবার চেষ্টা করেছিলাম বটে—কিন্তু জুচ্চুরি কি করেছি ? কুলীনের ছেলে, আমি ইচ্ছে করলে দশটা বিয়ে করতে পারি। কেন করব না ?"

"বিয়ে ত করতে পার, কিন্তু তুমি এঁকে কি সব বলেছ ?"

"কি বলেছি ? উনিই ত বল্লেন, বাবা আমি গরীব—কন্যাদায়গ্রস্ত—আমার জাত রক্ষা কর। আমি বল্লাম, মশায় আমার এক স্ত্রী রয়েছে যে, তা কি করে হবে ? উনি বল্লেন তা হোক্—কত পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। সেই জন্যে অগত্যা আমি রাজি হয়েছিলাম। কি অন্যায়টা করেছি ?"

বাবুটি বলিলেন—"হ্যাঁ হরিধন!—তুমি ঐ কথা বলেছিলে?—না তুমি বলেছিলে-দুবছর হল তোমার স্ত্রী মরে গেছে ?"

হরিধন চক্ষু রাঙ্গাইয়া বলিল—"আপনি মিথ্যা কথা বলছেন।"

শুনিয়া বাবুটি কাঁদ-কাঁদ হইয়া ভূপালবাবুর পানে চাহিয়া বলিলেন—"আমি মিথ্যা কথা বলিনি—কেন মিথ্যা বলব ? যদি দয়া করে আপনি একবার জামালপুরে আসেন ভূপালবাবু, তবে পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রমাণ করিয়া দিতে পারি, কার কথা সত্য, কার কথা মিথ্যা।"

হরিধন বলিল—"আপনার সব মিথ্যা কথা !"

ভূপাল বাবু গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"বদমায়েস ! পাজি !—চুপ্ করে থাক্। ধাপ্পাবাজি করেছিস্—ধরা পড়ে কোথায় লজ্জিত হবি, না উল্টে ভদ্রলোকের অপমান ?"

হরিধন ভয় পাইয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া বলি—"কেন আমি ওঁকে কি অপমান করলাম ? উনিই ত আমাকে মিথ্যাবাদী বলছেন।—আমি ত—"

ভূপালবাবু রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন—"আবার কথা কচ্ছিস্ ?—চুপ্, রাস্কেল। এই—তেওয়ারী !"

"জি হুজুর"—বলিয়া তাঁহার দ্বারবান তেওয়ারী আসিয়া দাঁড়াইল।

ভূপালবাবু হুকুম দিলেন—"বাবুকা বাকস্, বিছাওনা, কাপড়া, লোটা, ছাতা, জুতা, যাঁহা যো কুছ্ হ্যায়, সব হিঁয়া মাঙ্গাও।"—অন্য এক জন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন—"দোঠো কুলি বোলাও।"

কিয়ৎক্ষণ পরে হরিধনের জিনিসপত্রগুলা সব আসিল। ভূপালবাবু বলিলেন —"বাক্স খোল—এঁর টাকা পঞ্চাশটে বের করে দাও।"

হরিধন বলিল—"টাকা ত—টাকা ত—এখন নেই।"

ভূপালবাবু ঝাঁকিয়া উঠিয়া বলিলেন—"কি হল সে টাকা।"

"আজ্ঞে সে টাকা—সে টাকা—খরচ হয়ে গেছে।"

"খরচ হয়ে গেছে?—কখ্খনো নয়—খোল বাক্স—দেখি।"

'তথাপি হরিধন ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

ভূপালবাবু বলিলেন—"দেখ, ভাল চাও ত মানে মানে টাকাগুলি বের করে দাও। নইলে এখনি কনেষ্টবল ডাকিয়ে পাঠাব—তোমার জুচ্চুরি বের করে দেব।"

তখন হরিধন কাঁদিতে কাঁদিতে বাক্স খুলিল। টাকা গণিতে গণিতে বলিতে লাগিল—"এঁর টাকা ত একটিও নেই, সবই খরচ হয়ে গেছে। এ কটি আমার নিজের ছিল—আগেকার—দেশ থেকে এনেছিলাম।"—গণনা ভুল হইয়া গেল—আবার গণিয়া টাকাগুলি বাবুটির পায়ের কাছে রাখিয়া দিল।

এই সময় কুলীরাও আসিয়া পৌছিল। ভূপালবাবু বলিলেন—"এই কুলীলোগ—চীজ্ উঠাও। বাবু যাঁহা যানে মাঙ্গে হুঁয়া লে যাও।"—হরিধনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"তুমি এই দণ্ডে আমার বাড়ী থেকে দূর হয়ে যাও। আর আমি তোমার মুখদর্শন করতে চাই নে।"

রাসবিহারী বাবু টাকাগুলি পকেটে লইয়া, দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—"মশায়, করেন কি? শান্ত হোন—ওকে মাফ করুন। হাজার হোক্ আপনার ভাইপো। এই কুলীলোগ—যাও যাও। আসি মশায়—নমস্কার।"—বলিয়া বাবুটি প্রস্থান করিলেন।

ভূপালবাবু কুলীদের বলিলেন—"উঠাও চীজ্—দেখতা হায় ক্যা?—তেওয়ারী, তুম বাবুকো নিকালকে ফাটক বন্দ কর্ দেও। আওর কভি ঘুসনে দেও মৎ।"—বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

বাহির হইয়া হরিধন ষ্টেশন অভিমুখে চলিল। কিয়দ্দুর আসিয়া দেখে, পথের ধারে একটি শিরীষ বৃক্ষের ছায়ায় রাসবিহারীবাবু দাঁড়াইয়া আছেন।

হরিধন তাঁহার প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। রাসবিহারী বাবু বলিলেন—"ওহে শোন শোন,—দাঁড়াও।"

হরিধন দাঁড়াইল। তিনি কাছে আসিয়া স্নেহের স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখন কোথা যাবে?"

"দেশে যাব।"

"গাড়ীভাড়ার টাকা সঙ্গে আছে?"

"না।"

"তবে?"

"বাক্সে একটা গরম কোট আছে, একখানা আলোয়ান আছে, দেখিগে, ষ্টেশনে যদি কাউকে বিক্রী ক'রে গাড়ীভাড়ার টাকাটা সংগ্রহ করতে পারি।"

বাবুটি পকেটে হাত দিয়া বলিলেন—"তার দরকার নেই। এই নাও—টিকিট কিনে যেও।"—বলিয়া পাঁচটি টাকা হরিধনের হাতে দিলেন। তাহার পর ছাতাটি খুলিয়া, স্নানার্থ কষ্টহারিণীর ঘাটের দিকে ধীরে ধীরে পদচালনা করিলেন।

হরিধন দেশে পৌঁছিয়া পাড়ায় পাড়ায় বলিয়া বেড়াইতে লাগিব—"মুঙ্গেরে ভূপালদাদার বাড়ীতে যে রকম খৃষ্টানী কাণ্ডকারখানা, তাতে তাঁর বাসায় থেকে হিঁদুর ছেলের জাত বাঁচাইয়া চলা দুষ্কর। মুর্গী ত তাঁর দুটি বেলার আহার, আর বিকেলের জলযোগ। তাতেও অনেক কষ্টে সৃষ্টে, নিজে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেয়ে কোনও রকমে জাত রক্ষা করে পড়েছিলাম। কিন্তু যেদিন স্বচক্ষে দেখলাম, দাদার মুসলমান আরদালী বেটা, দাদার জন্যে গোমাংস কিনে নিয়ে এল, সেদিন আর সহ্য করতে পারলাম না। অমনি জিনিসপত্তর বেঁধে কুলী ডেকে বেরিয়ে পড়লাম। দাদা কত বল্লেন, এ বেলাটা থেকে, খেয়ে দেয়ে যেও—অন্ততঃ একটু মিষ্টি মুখে দিয়ে জল খেয়ে যাও—আমি বল্লাম, আজ্ঞে না থাক্—আমার তেষ্টা পায় নি।—অবিশ্যি সেখানে আমার শরীরের খুবই উন্নতি হচ্ছিল—আর মাস দুই থাকতে পারলে সম্পূর্ণভাবেই আরাম হয়ে আসতে পারতাম। কিন্তু কি করি মশায়, ধর্ম্মের চেয়ে ত প্রাণ বড় নয়—তাই চলে আসতে হল।"

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্যের পরিণতি।

লর্ড ব্রাইস্, মার্কিন যুক্তরাজ্যের ইংরেজ রাজদূতের পদ ত্যাগ করিয়া, আবার সাহিত্য-চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। ইনি সম্প্রতি ইংরেজি সাহিত্যের গতি এবং পরিণতির বিষয় আলোচনা করিতে যাইয়া, অনেকগুলি সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের প্রচার করিয়াছেন। লর্ড ব্রাইস্ বলেন যে, মধ্যযুগে যখন রোমান কাথলিক ধর্ম্ম ইউরোপের ধর্ম্ম ছিল, তখন ইউরোপের ভাব এবং সাহিত্য প্রায় একই রকমের ছিল। এই যুগকে ইউরোপের "লাটিন যুগ" বলা যাইতে পারে। পরে মার্টিন লুথারের অভ্যুদয়ে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের প্রাবল্য ঘটিলে, ইউরোপের সাহিত্য দুই ভাগে এবং দুই ভাবে বিভক্ত হইয়া যায়। প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের প্রভাব ইউরোপের প্রাদেশিক ভাষা সকলের

উন্নতি হইতে থাকে। এই ধর্ম্ম-সঙ্ঘাতের ফলেই ইংলণ্ডে সেক্সপীয়র, মিল্টন, বেকন প্রভৃতির প্রতিভার বিকাশ হয়। তাহার পর ফরাসী-বিপ্লবের যুগ। এই যুগের সামাজিক সমীকরণের প্রভাবে ইউরোপের, লাটিন ও প্রটেষ্টাণ্ট, এই দুই ভাগের বিরোধ অনেকটা কমিয়া যায়। এই সমীকরণের সহায়তা করে আধুনিক বিজ্ঞানচর্চ্চা। বিজ্ঞান বা পদার্থবিদ্যার চর্চ্চার প্রভাবে ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং জর্ম্মণী ভাবে প্রায় এক হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে ধর্ম্মগত যে বৈষম্য ছিল, তাহা এখন আর নাই; কেন না, সমাজের উপর ধর্ম্মের সে প্রভাব নাই। এখন আর ধর্ম্মগত দ্বন্দ্ব ইউরোপের কোনও দুইটী জাতির মধ্যে সম্ভবপর নহে। বিজ্ঞানের চর্চ্চার ফলে বিলাসের উদ্ভব হইয়াছে; বিলাসের পিপাসা মিটাইবার উদ্দেশ্যে সকলকেই পর্য্যাপ্ত অর্থোপার্জ্জনের জন্য সচেষ্ট হইতে হইয়াছে। ইউরোপে এখন ব্যাপারগত বৈষম্যই প্রবল,—ব্যাপার-বিস্তৃতির উদ্দেশ্যেই এখন ইউরোপের মনীষা ব্যস্ত ও বিব্রত। ভাব এতটা মোটা বা (sordid) হইয়া পড়িলে, এতটা সুখলিপ্সু হইলে, সে ভাবের উদ্রেকে সৎসাহিত্যের উদ্ভব সম্ভবপর হয় না।

লর্ড ব্রাইস্ আরও বলেন যে, ইউরোপের জাতীয় ভাব, মার্কিন দেশে নির্ব্বাসিত হইয়া কেবল সঙ্ঘাত্মক হইয়াছে, তাহার হেতুই এই যে, ইউরোপের খ্রীষ্টান, জাতি-কুল-মান, অতীত ইতিহাসের গৌরব-গাথা, বিশিষ্টতা-জ্ঞাপনের সর্ব্বস্ব জলসহি করিয়া এখন কেবল অর্থোপার্জ্জনের জন্য—কেবল ভোগায়তন দেহের তুষ্টি-পুষ্টির জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। অর্থোপার্জ্জনের পক্ষে, এবং ব্যাপার-বিস্তারের পক্ষে সংহতিই যে কার্য্য-সাধিকা, ইউরোপের খ্রীষ্টান বুঝিয়াছে। তাই মার্কিণ দেশের প্রবাসী ইউরোপীয়, নানাপ্রদেশের এবং নানাধর্ম্মাবলম্বী হইলেও, অর্থগৃধ্নুতার প্রভাবে সম্মিলিত এবং যেন সম্পিণ্ডিত হইয়া পড়িতেছে। এ সমবায় অর্থগত এবং স্বার্থগত; এই সমবায়ের ফলে নূতন সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেই পারে না। ইউরোপে যত কাল এই বিজ্ঞানচর্চ্চার প্রাবল্য, এই অর্থোপার্জ্জনের বিষম পিপাসা প্রকট থাকিবে, ততদিন কোনও প্রদেশের কোনও সাহিত্যে আর দান্তে, মলিয়ার, মিল্টন, সেক্সপীয়র, গেটে, হাইন্, পেট্রার্ক, রাসীন জন্মগ্রহণ করিবে না। আবার যদি একটা বিরাট বিপ্লব, ইউরোপ-ব্যাপী সমাজ-বিপ্লব, রাজনীতি-বিপ্লব, ধর্ম্ম-বিপ্লব ঘটে, ইউরোপে একটা ওলট্ পালট্ হইয়া যায়, তাহা হইলে, এই বিপ্লবের ফলে, পরে এক নূতন সাহিত্যের জন্ম হইতে পারে। যতদিন ইউরোপে এক পক্ষে সোসিয়ালিজম্, কম্যিউনিজম্ প্রভৃতি সমাজ-প্রমাথিনী শক্তি সকলের প্রকট প্রকাশ থাকিবে, এবং অন্যপক্ষে (militarism) বা রণপিপাসা জন্য রণসাজের প্রাবল্য থাকিবে, কোটী কোটী মুদ্রা নরহত্যার ভীম চাতুরী-বিকাশে ব্যয়িত হইতে থাকিবে, তত দিন সাহিত্যের উন্মেষ সম্ভবপর নহে।

লর্ড ব্রাইস্ ইহাও বলেন যে, যেমন ধর্ম্ম অজ্ঞেয়ের জ্ঞাতা, তেমনই সাহিত্যও অজ্ঞেয়ের ব্যাখ্যাতা। সুতরাং সমাজে অজ্ঞেয়বাদের প্রচলন কমিয়া যাইলে ধর্ম্মের অপচয়ের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যরসের অপচয়ও অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। যতই বিজ্ঞানের চর্চ্চা হউক না, যতই বিদ্যার ও জ্ঞানের বিস্তার ঘটুক না, মানুষের মেধা ও মনীষা একটা স্থানে যাইয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িবেই। এই শ্রান্তি-স্থানের অপর দিকেই অজ্ঞেয় রাজ্য। বিলাসে এবং উপভোগে মানুষের অনুভূতি সকল মোটা হইয়া না পড়িলে, এই অজ্ঞেয় সাগরের তীরে দাঁড়াইয়া মানুষ বিস্ময়ে বিভোর হইয়া উঠে।

এই বিস্ময়ের ভাব হইতেই সাহিত্যের—উচ্চাঙ্গের কাব্যের এবং প্রগাঢ় ভাব-সমন্বিত ধর্ম্মের উদ্ভব হয়। ইউরোপ এখন (sordid)—বেজায় মোটা ও বোদা, কেবল উপভোগের লালসায় বর্ত্তমানের চিন্তা লইয়া বিব্রত। ইচ্ছা করিয়া আধুনিক ইউরোপ ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবে না; মরণের পরে কি হইবে, তাহার চিন্তায় ব্যাকুল হয় না। ইউরোপ ভাবিতেছে যে, যতক্ষণ বাঁচিয়া আছি, যত দিন দেহভার লইয়া সমাজে বিচরণ করিতেছি, ততক্ষণ বিজ্ঞান এবং অর্থের সাহায্যে ঐহিকের সুখ পারি ত সাড়ে আঠারো আনা উপভোগ করিয়া লই। পরে কি হইবে, কে জানে,—জানিবার প্রয়োজনই বা কি আছে! ইউরোপের সৎসাহিত্যের অবনতির ইহাই মূল কারণ। ইউরোপ অজ্ঞেয়-সাগরে ডুব দিতে আর চাহে না। ইউরোপ বিস্ময়ের সুখ হারাইয়াছে, ইউরোপ কল্পনার মাধুরী বর্জ্জন করিয়াছে। ইউরোপের সাহিত্যের সে ভাবসম্পদ্ আর নাই।

এই যে ভাষা-সমন্বয়ের চেষ্টা, (Esperanto) ভাষা-সৃষ্টির প্রয়াস, এই যে সর্ব্বত্র এবং সর্ব্ববিষয়ে বিশ্লেষণবাদের প্রাবল্য,—কোনখানেই বিস্ময়ের মোহ নাই, অর্দ্ধজ্ঞানের মাধুরী-ছটার বিকাশ নাই, ভাবের বিমূঢ়তার মহিমায় কষ্টভোগের শ্লাঘা নাই;—এ সকলই ত বিষম অর্থ-লিপ্সার পরিচায়ক, কেবল ব্যাপার-বিস্তারের দ্যোতক, কেবল ভোগের প্রকট প্রকাশ। খেয়াল না থাকিলে, কল্পনার প্রাচুর্য্য না ঘটিলে, সৌন্দর্য্য-অনুভূতির উন্মাদনা প্রকাশ না পাইলে, মধুররসের প্লাবন-তরঙ্গ না উঠিলে, সাহিত্যের—উচ্চাঙ্গের কাব্য-শাখার সৃষ্টিই হয় না। যে দেশে উদরের জ্বালা ভীষণ রাবণের চিতার মত অহরহঃ জ্বলিতেছে, আর সেই চিতার আলোকে বসিয়া নরনারী সকল টাকা আনা কড়া ক্রান্তির হিসাব করিতেছে, লাভালাভের খতিয়ান করিতেছে, সে দেশে আর সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেই পারে না। তাই লর্ড ব্রাইস্ বলিয়াছেন যে, ইউরোপের নূতন সাহিত্য কেবল "Sex assertion"—কাম-বিকাশের বিশ্লেষণ কার্য্যেই বিব্রত। যে দিন হইতে মানুষ সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্যকে ছিঁড়িয়া, ছানিয়া, বাছিয়া দেখিবার জন্য উন্মত্ত হইয়াছে, সেই দিন হইতেই মানুষের মধ্যে মর্কটামীর প্রাবল্য ঘটিয়াছে। বাল্‌জাকের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত ইউরোপের সাহিত্যে মর্কটামীর প্রাচুর্য্যই ঘটিতেছে। তাই কাব্যরসের মাধুরী ধীরে ধীরে কমিয়া যাইতেছে; কামের সৌন্দর্য্য অবগুণ্ঠন, তাহাই খসিয়া পড়িতেছে; বিস্মিতের সুখ—অজ্ঞেয়তার আলোড়নে; সে সুখ আর কেহ উপভোগ করিতেছে না। সাহিত্যের উদ্ভব, বিকাশ, বিস্তার মানুষের চেষ্টায় সম্ভবপর নহে। উহা আপনই হয়, আপনই যায়। ইউরোপে এখন সাহিত্য নাই।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

উদ্বোধন—চৈত্র। শ্রীযুক্ত স্বামী সারদানন্দ "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গে" এবার শ্রীশ্রীঠাকুরের "স্বজন-বিয়োগ" ও "ষোড়শীপূজা"র বিবরণ বিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "লীলামৃতে" অনেক অজ্ঞাত তথ্য সঙ্কলিত হইতেছে। স্বামীজী রক্ষা না করিলে, কালক্রমে এই সকল কাহিনী বিকৃত ও লুপ্ত হইত। শ্রীযুক্ত কানাইলাল পাল "ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাসে" গ্রীক্ দর্শনের পর্য্যায়ে প্লেটোর পরিচয় দিতেছেন। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "গুরু-শিষ্য" স্বামী বিবেকানন্দের বিবিধ মত-

বাদের আলোচনা—একটু পল্লবিত হইলেও অনুশীলনের যোগ্য। "কেদারখণ্ডে স্বামি-সংবাদ" ভগিনী নিবেদিতার Notes on Wanderings with Swami Vivekananda নামক ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ।—"উদ্বোধনে"র কর্ত্তৃপক্ষ এই হিতকারী ও মনোহারী সন্দর্ভের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দত্তের "বৌদ্ধ-কথা" উপভোগ্য। "উদ্বোধনে"র "সংবাদ ও মন্তব্য" আর একটু বিস্তৃত হইলে ভাল হয়। "রামকৃষ্ণ-মিশনে"র বিবিধ কেন্দ্রের সংবাদ দেশে প্রচারিত হইলে কল্যাণের আশা করা যায়। অন্য সূত্রে এ অভাব পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। বাঙ্গালা দেশে "উদ্বোধনে"ই মিশনের গতি, প্রকৃতি ও উন্নতির ইতিহাস লিপিবদ্ধ হউক। তাহাতে সুফল ফলিবে।

নব্য-ভারত। চৈত্র।—শ্রীরসিকলাল রায় "সমাজ-সমস্যা" প্রবন্ধে হিন্দু সমাজকে ভাঙ্গিয়া গড়িবার পরামর্শ দিয়াছেন। বোধ হয়, পরামর্শের অভাবেই এতদিন হিন্দু-সমাজের সংস্কার হইয়া উঠে নাই! এতদিন পরে রসিক বাবু সে অভাব পূর্ণ করিলেন। ইঁহাদের পরামর্শ মন্দ নয়, কর্ণরোচক বটে; কিন্তু বিড়ালের গলায় কে ঘণ্টা বাঁধিবে, আমরা তাহা ভাবিয়া একটু নিরাশ হইয়াছি। বাঙ্গালা-সাহিত্যের মত হিন্দু-সমাজও বেওয়ারিশ ময়দায় পরিণত হইয়াছে; সুতরাং, ইতিপূর্ব্বে হাতে কাজ না থাকিলে যাঁহারা জ্যেঠার গঙ্গাযাত্রা করিতেন, এখন তাঁহারা সমাজ থাসিয়া তাল পাকাইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিচার না করিয়া, মূল কারণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত না হইয়া, যাঁহারা সমাজ-সংস্কারের ফয়তা দেন, তাঁহাদের সংস্কার-বাৎসল্য প্রশংসনীয়, কিন্তু বিচারবুদ্ধি করুণার যোগ্য। লেখক বিবাহ-সমস্যার সমাধান করিবার জন্য যে সাতটি ফয়তা দিয়াছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে, বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজকে ভাঙ্গিয়া গড়িতে হয়। লেখক ভাঙ্গিবার হুকুম দিয়াছেন, কিন্তু উপায়নির্দ্দেশ করেন নাই। সংক্ষেপে, লেখকের মতে, সমগ্র জাতির একী-করণই বিবাহসমস্যা-রূপ মারাত্মক রোগের একমাত্র মহৌ-ষধ। কিন্তু সমাজের সকল অঙ্গের সহিত সামাজিকের আর্থিক অবস্থার সম্বন্ধ আছে। লেখকের বিধান অনুসারে, (১) কন্যার বিবাহের বয়সবৃদ্ধি করিলে, (২) রমণীদিগকে চিরকুমারীর অবস্থায় রাখিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জনের উপযোগী শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিলে, (৩) এক জাতির বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বৈবাহিক-সম্বন্ধ স্থাপন করিলে, (৪) কৌলীন্য ও বংশগৌরবের বিচার পরিত্যাগ করিলে, (৫) ভারতের বিভিন্ন-প্রদেশবাসীদিগের মধ্যে আন্তর্গণিক বিবাহ প্রচলিত করিলে, (৬) পাত্র-পাত্রীদিগের মধ্যে স্বেচ্ছানির্ব্বাচন-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলে, এবং (৭) প্রয়োজন হইলে জাতিভেদের উচ্ছেদ ও বিধবা-বিবাহের প্রবর্ত্তন করিলে, বিবাহ-সমস্যার সমাধান হইতে পারে। যদি তর্কের অনুরোধে ইহা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও, এক সমস্যার সমাধানের জন্য সমাজ বহু জটিল সমস্যার ঘূর্ণাবর্ত্তে পতিত হইতে পারে। পৃথিবীর যে সকল সমাজে রমণীদিগের চির-কুমারী থাকিবার অধিকার আছে, সে সকল সমাজেও বিবাহসমস্যা ক্রমশঃ জটিল হইয়া উঠি-তেছে। নারীজাতীর জীবিকার্জ্জনচেষ্টা সকল দেশে সুফলপ্রসূ হইয়াছে, তাহাও ত মনে হয় না। বৃত্তি-বিপর্য্যয়ে যে দেশে জীবিকাই দুর্লভ হইয়াছে, সে দেশে সামাজিক-সংস্থানের এরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তনে কিরূপ বিপ্লব সম্ভব, তাহাও ত বিবেচ্য! কৌলীন্য ও বংশগৌরব প্রভৃতি সংস্কারকের

হুকুমে কেহ ত্যাগ করিবে না। বল্লালের কৌলীন্য মুমূর্ষু, কিন্তু সমাজে নূতন কৌলীন্যের উদ্ভব হইয়াছে—আমরা তাহাকে 'কাঞ্চন-কৌলীন্য' বলিয়া থাকি। প্রাচীন কৌলীন্য ও বংশগৌরব না হয় গেল, কিন্তু নূতন কৌলীন্য, যাহাকে প্রতীচী হইতে আবাহন করিয়া সমাজের স্বর্ণ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, মনুষ্যত্ব বলি দিয়া নিত্য-পূজায় প্রসন্ন করিয়া থাকেন, যে কলেজ-গৌরব, চাকরী-গৌরব, বড়মানুষের-গন্ধ-গৌরব, প্রভাব-গৌরব ক্ষুধার্ত্ত দানবের মত জাতির বিবেক-বুদ্ধি চর্ব্বণ করিতেছে, তাহাদিগকে কে নির্ব্বাসিত করিবে? ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সাধারণ মিলনের পথে লক্ষ বাধা বিঘ্ন ফণীর মত ফণা উদ্যত করিয়া রহিয়াছে, কোন্ মন্ত্রৌষধির প্রভাবে তাহাদিগকে জয় করিবে? পাত্র-পাত্রীদের স্বেচ্ছা-নির্ব্বাচনে বিচার-বুদ্ধি কি সর্ব্বত্র অব্যাহত থাকিবে? নির্ব্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে যদি বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রভৃতি আনুষঙ্গিক অবশ্যম্ভাবী প্রেতের দল সমাজের শ্মশানে তাণ্ডব আরম্ভ করে, তাহা হইলে কোনও রসিক সংস্কারক তাহাদিগকে জব্দ করিতে পারিবেন কি? 'প্রয়োজন হইলে' জাতিভেদের উচ্ছেদ প্রভৃতি কে করিবে? সমাজকে কে ঢালিয়া সাজিবে? আর, যদি কথায় ও ফয়তায় সমাজের সংস্কার সম্ভবই হয়, তাহা হইলে, একটা সোজা কথায় ও সহজ ফয়তায় তাহা সিদ্ধ করিলে হয় না? বিবাহ-সমস্যা নূতন, কিন্তু বিবাহ ত পুরাতন। আমাদের দেশে প্রাচীন কালে—কিছু দিন পূর্ব্বেও—বিবাহে যে নীতি ও যে রীতি অনুসৃত হইত, বর্ত্তমানে সেই নীতি ও সেই রীতির অনুসরণ করিলে হয় না? এতগুলি অসম্ভব সংস্কার সম্ভব না হইলে, বিবাহ-সংস্কারের স্বপ্ন ফলিবে না। এই সাত-কাণ্ড সংস্কারের পালা শেষ হইবার পূর্ব্বে অন্ততঃ বর্ত্তমান শতাব্দী কালসাগরে বিলীন হইবে। যতদিন সাত মণ তেল না পুড়িতেছে, ততদিন রাধাও নাচিবে না। অতএব রসিক বাবুদের সংস্কারচেষ্টা আপাততঃ ব্যর্থ হইতেছে। সমাজ ভাঙ্গিতে বিলম্ব হইবে; গড়িবার কথা না হয় না তুলিলাম। ততদিন আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের মত 'বিবাহের জন্যই বিবাহ'—এই সহজ কথাটা মানিয়া চলিলে হয় না? বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি ও কোম্পানীর কাগজই মনুষ্যত্বের একমাত্র মাপকাঠী নয়, এই ধ্রুব সত্যটা আবার শিরোধার্য্য করিলে ক্ষতি কি? সমাজ একটা ভঙ্গুর বস্তু নয়, শরীরীর মত তাহাও বিবর্ত্তের অধীন। এ সত্য ভুলিয়া 'কিলাইয়া কাঁঠাল পাকাইবার' চেষ্টা করিলে কাহারও কোনও লাভ নাই। বার্ত্তাশাস্ত্রের সহিত সমাজতত্ত্বেরও অতি ঘনিষ্ঠ নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। শুধু 'সেণ্টিমেণ্টে'র রসায়নে সমাজকে গলাইয়া মনের মতন ছাঁচে ঢালিয়া লইবার আদৌ উপায় নাই।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরীর "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্য" উল্লেখযোগ্য—এখনও শেষ হয় নাই। শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষের "ভীমসেন জাতক" সুখপাঠ্য। জাতকের গল্পে বৌদ্ধ সমাজ, ধর্ম্ম, নীতি প্রভৃতি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। গল্পের হিসাবেও জাতকগুলি অত্যন্ত প্রাচীন;—নানা দেশে প্রচলিত বহু গল্পের—পিতামহ ব্রহ্মার মত—আদিপুরুষ। জাতক-গুলির অনুবাদ সম্পূর্ণ হইলে আমাদের সাহিত্য সমৃদ্ধি লাভ করিবে। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসুর "ভারত-মাতা" নব-যুগের নূতন ছড়া,—যদিও শিশুদের জন্য কল্পিত, তথাপি উপভোগ্য, নিত্য-স্মরণীয়। ভাবটিকে সম্পূর্ণ নূতন বলিতে পারি না। স্বামী রামতীর্থ শব্দচিত্রে আর্য্যাবর্ত্তের যে রূপ দিয়াছিলেন, সেই ভাবের বীজ স্বদেশী চিত্রে অঙ্কুরিত হইয়াছিল, যোগীন্দ্রবাবুর কবিতায় তাহাই পুষ্পিত হইয়াছে। আমরা উদ্ধৃত করিলাম।—

"গিরীন্দ্র যাঁর মুকুট-রূপে শিরে শোভা ধরে,
বারীন্দ্র যাঁর রাঙ্গা চরণ ধৌত সদা করে;
বিন্ধ্য যাঁহার কটিভূষণ, গঙ্গা কণ্ঠমালা;
ছয় ঋতু যাঁর পূজায় রত, সাজিয়ে ফুলের ডালা;
মলয় সদা চামর লয়ে ব্যজন করে যাঁয়,
শ্রীপদে যাঁর সোনার কমল লঙ্কা শোভা পায়।
কোটী কোটী সন্তানেরে লয়ে যিনি বুকে,
ক্ষুধার অন্ন, তৃষার বারি যোগান সদা মুখে।
রূপে, গুণে ধরাতলে তুলনা নাই যাঁর,
সেই মোদের এই ভারতমাতা, কর নমস্কার॥"

বিজয়া। চৈত্র।—প্রথমেই একখানি সাধারণ জর্ম্মন্ ওলীওগ্রাফের প্রতিলিপি—তিন রঙ্গে মুদ্রিত। কোনও বিশেষত্ব নাই। এরূপ চিত্রে ছেলে ভুলাইবার উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইতে পারে। "আলাপ ও আলোচনায়" "হিন্দু কি সর্ব্বাপেক্ষা বর্ব্বর?" এই প্রশ্নেরও অবতারণা হইয়াছে। উত্তর এই যে, "হিন্দু পৃথিবীর সকল জাতি অপেক্ষা বর্ব্বর হয় নাই।" এই উত্তরে আমরা বিশেষ আশ্বস্ত হইয়াছি, এমন কথা বলিতে পারিলাম না; কেন না, এমনতর উদ্ভট প্রশ্নের উদয়েও বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইতে পারি নাই। আর্য্যবর্ত্ত হইতে এমন প্রশ্নের মুখের মত উত্তর না দিলেও জগতের পাঠশালায় কোনও পণ্ডিত আমাদিগকে 'নাড়ুগোপাল' করিয়া দিতেন না, তাহা আমরা জানি। শ্রীযুত কুমুদরঞ্জন মল্লিকের "বঙ্গজননী" পড়িয়া আমরা ধৃতরাষ্ট্রের মত বলিতেছি,—"তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়!" কবি ছন্দ, যতি, ভাষা, বানান, কবিতা—সমস্ত মথিয়া বঙ্গজননী 'ননী' তুলিয়াছেন! তাঁহার লেখনী মন্দরের কীর্ত্তি লাভ করুক। 'খাস্ মায়ের রাজ্য বাঙলা'য়

"দুগ্ধ গাভীর স্রবি পড়ে বাঁটে বৎসের সাড়া পেলে,"

অঙ্গে, কলিঙ্গে এমন অঘটন ঘটে না, মদ্রে, অন্ধ্রে, গুর্জ্জরে, মহারাষ্ট্রে, পঞ্চনদে, রামেশ্বর সেতুবন্ধে—এমন কি উৎকলে, উৎকামন্দে, আলমোরায়, সিমলায়—রেঙ্গুনে, ভামোয়, আকায়বে, আরাকাণে, আণ্ডামানে, নিকোবরে, শান-রাজ্য, চীনে, ফিলিপাইনে, শ্যামে, জাপানে, কোরীয়ায়, সাইবীরিয়ার, পেরুতে, মেক্সিকোয় এমনতর ব্যাপার কখনও ঘটে নাই, ঘটিবে না। আমেরিকা ও ইউরোপের কথা ত উঠিতেই পারে না। ও অঞ্চলে আজকাল গাভী 'পানাইবার' রেওয়াজ উঠিয়া গিয়াছে। তার পর,—

"সরসী হেথায় শাবকে বাঁচাতে প্রাণ দেয়ে অবহেলে!"

আর, অন্য দেশে পাখীরা শাবককে ঠোকরাইয়া মারিয়া ফেলে, তাহা অবশ্য বাঙ্গালা দেশের মাসিক পত্রিকার পাঠকগণের অবিদিত নাই! মল্লিক মহাশয় বঙ্গজননীর আর একটি অত্যন্ত অপরূপ বিশেষত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন,—

"কনকলতিকা শুকাইতে চায় ফুল-শিশু বুকে রাখি'।"

বঙ্গ-জননীর ধুয়া এই,— "তনয় লভিতে জননী হেথায় সাগরে ঢালে গো গা।
তাই ত বাঙ্গালী মায়ের কাঙ্গালী, ধন্য বাঙ্গালী মা!'

বিস্ময়ের চিহ্নটুকু আমাদের নয়। আমরা একটু বদলাইয়া বলি,—
"হায় রে বাঙ্গালী, ছড়ায় কাঙ্গালী, ধন্য কবিতা মা!'

শ্রীমতী সরোজবাসিনী গুপ্তার "আহ্বান" কবিতাটি মামুলী চর্ব্বিত-চর্ব্বণের প্রতিধ্বনি—"মগ্ন হ'তে আমার এ অসীম হিয়ায়।" আমাদের এই সসীম দুনিয়ায় এত অসীমও ছিল! চৌদ্দ চরণের মধ্যে একটি 'বক্ষোপরে' পাইয়াছি। 'নিরঙ্কুশাঃ কবয় ইতি।' অতএব, ইনি কবি, এবং "আহ্বান"ও নিঃসন্দেহ কবিতা। "আহ্বানে"র পর "প্রেমের শাসন"। শাসনই বটে। কি কুক্ষণেই রবীন্দ্রনাথের "গীতাঞ্জলি" ছাপা হইয়াছিল। বঙ্গের সমস্ত বালখিল্য এক তারের খবরে তপস্বী হইয়া উঠিল! কবি বলেন,—"ডাকার মত ডাক না হলে,তোমার সাড়া নাহি মিলে।" তাই যদি জানা থাকে, তবে এ ডাকাডাকি—কবিতার হাঁকাহাঁকি কেন? শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র ঘোষালের "এমিলে জোলা" অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত—সুখপাঠ্য। শ্রীযুত কালিদাস রায়ের "প্রিয়ের শুভ" একটি চতুর্দ্দশপদী ছড়া। ইহার উপদেশ,—"ভালবাস যদি, ছুরী মেরো না'ক বুকে।" আমরাও কবিকে ঐ কথা বলি। যদি কবিতাই ভালবাস, তবে তার "ছুরী মেরো না'ক বুকে।" বিশারদের কথাই মনে পড়ে, "তাও ছাপালি পদ্য হলো—নগদ মূল্য এক টাকা।" এ ক্ষেত্রে অবশ্য—অ-মূল্য। শ্রীযুত জ্যোতিষচন্দ্র সেনের "আদিনাথ"—সুখপাঠ্য। "শ্রীহট্টের কয়েকখানি প্রাচীন দলিলপত্র" ইতিহাসের হিসাবে মূল্যবান। দলিলের ছবিগুলিতে দেখিলাম—কেবল মসীলেপ।" কলিকাতা হিন্দী সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির "অভিভাষণে"র অনুবাদ আমরা সকলকে পাঠ করিতে বলি। "বিজয়া"র কতিপয় প্রবন্ধের নিম্নে শ্রীযুত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্নের চতুষ্পদী কবিতা স্থানপূরণের কাজ করিয়াছে।—কবি "প্রতিশোধে" লিখিয়াছেন,—"আপনার প্রতি লব আমি প্রতিশোধ।" কিন্তু প্রতিশোধের জ্বালাটা পাঠককেই ভুগিতে হইতেছে। পাদপূরণে 'চ-বৈ-তু-হি'রই অধিকার ছিল। বাঙ্গালায় স্থান-পূরণের জন্য চতুষ্পদের আবির্ভাব হইয়াছে। 'যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ।' আশ্চর্য্য এই যে, "বিজয়া"র সমস্ত কবিতায় অত্যন্ত আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য বর্ত্তমান। উনিশ ও বিশ হইতে পারে, কিন্তু অধিক প্রভেদ নাই। এ বলে, আমাকে দেখ, ও বলে আমাকে দেখ—ইহা অত্যুক্তি নহে, আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য। শ্রীযুত হেমচন্দ্র মজুমদারের "চঞ্চলা" নামক চিত্রখানি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। ইনি ত 'চঞ্চলা' নন, নিতান্তই 'স্থিরা'। এমন কি, 'আড়ষ্টর্কা'ও বলা চলে। বেচারী চোরের মত জড়-সড়। 'কারণগুণাঃ কার্য্যগুণমারভন্তে।' বোধ করি চিত্রকরের ভাবটা চিত্রে আসিয়াছে। বিদেশের কল্পনাকে শাড়ী দিয়া ঢাকিয়া স্বদেশী বলিয়া চালাইবার চেষ্টা 'ভারতবর্ষে' দেখা গিয়াছে। চঞ্চলার চিত্রকরও মহাজনের পথ অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি ধন্য! কিন্তু 'শাক দিয়া মাছ ঢাকা' যায় কি? শ্রীযুত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ব্রাহ্মণ-সভা"য় অনেক কাজের কথা, ভাবিবার কথা আছে। স্থানাভাবে আমরা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

ভারতী। চৈত্র।—"শ্মশানে হরিশ্চন্দ্র" ও "বসন্ত ঋতু" নামক চিত্র দুইখানি এলাহাবাদের ইণ্ডিয়া প্রেসের আমদানী। চিত্রশিল্পও ত্রিবেণীসঙ্গমে মাথা মুড়াইয়াছে, তাহা এত দিন জানিতাম না। "হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যা"র চিত্রে প্রাচ্য ভাব অদৌ নাই। প্রতীচ্য নর-নারীর আর্য্যীকরণচেষ্টা প্রায়ই সফল হয় না। চিত্রের নকল চলিতে পারে, অনুবাদ বোধ করি সম্ভবও নহে, সার্থকও হইতে পারে না। "বসন্ত-ঋতু" বোধ হয় প্রাচীন চিত্র। প্রাচীনতার গৌরব থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা চিত্রে মনোজ্ঞতার আরোপ করিতে পারে না। কলাকৌশলের অত্যন্তাভাব অতীতের গৌরবে

মণ্ডিত হইলেও, সুষমা ও সার্থকতার অধিকারী হইতে পারে না। এইরূপ অক্ষমতার নিদর্শনগুলি বর্ত্তমানে "ভারতীয় চিত্রকলাপতি"র আদর্শে পরিণত হইয়াছে! ভারতীয় "বসন্ত-ঋতু"র পর একখানি বিলাতী "বসন্ত-ঋতু"র চিত্র আছে। কোনও বিশেষত্ব নাই।—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "আমার বোম্বাই প্রবাস" সমাজ ও ধর্ম্ম ও সংস্কারে পরিপূর্ণ। "চীন-রমণীর প্রেমপত্র" চলনসই—লেখক ভাষাবিন্যাসে 'নূতন কিছু' করিবার পক্ষপাতী,—উদ্ভট-পন্থী : কাঁচা হাতে চলিত ভাষার সুব্যবহারের আশা করা যায় না। কলিকাতার "বেড়াচ্ছিল" ও "কচ্ছিল" প্রভৃতি চট্টল বা নোয়াখালীর অধিবাসীরা শিরোধার্য্য করিবেন কেন, তাহাও ত বুঝিতে পারি না। 'নানান দেশে নানান ভাষা'—তাহার উপর প্রত্যেক জেলার প্রাদেশিকতা কি স্বতন্ত্র ভাষার মূর্ত্তি গ্রহণ করিবে? বাঙ্গালীর আশা ও আকাঙ্ক্ষার সহিত পরিচিত হইবার জন্য মারাঠী, মান্দ্রাজী, বা পঞ্জাবী কি বাঙ্গালার ছত্রিশ জেলার ছত্রিশটি ভাষা শিক্ষা করিবে? "সাহিত্য" কি মিলনের সেতু না হইয়া বিচ্ছেদের হেতু হইয়া উঠিবে? শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ দাসগুপ্তের "অভিজ্ঞান" পড়িয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। ইহাতে 'কাব্যি'র গন্ধ অত্যন্ত প্রবল। গঙ্গাচরণের পুরাতন পৌরাণিক ঝঙ্কার "অভিজ্ঞানে" নাই॥ শক্তিশালী লেখকেরাও কি কুহেলিকায় কবিতা রচিবেন?—গতানুগতিকের স্রোতে গা ঢালিয়া দিবেন? শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের "আত্মা ও মন সম্বন্ধে শারীর-বিধান শাস্ত্রের মত" উল্লেখযোগ্য, শিক্ষাপ্রদ। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর De la mazelioreর ফরাসী হইতে "মোগল শাসনাধীনে ভারতের আর্থিক অবস্থা"র পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীলীলাদেবীর চতুষ্পদী কবিতার একটি পদও বুঝিতে পারিলাম না।

"উষার নীহার সম আছিল সে মোর বুকে
এ হিয়া-কমল ফুল্ল কম্পিত উল্লাস-সুখে।"

'সে' যেই হউক, তাহার সন্ধান না হয় নাই করিলাম। কিন্তু হিয়াই কি কমল? হিয়া-কমলই কি ফুল্ল? আর উল্লাস-সুখে কাঁপিল কে? যেই কাঁপুক, কবির লেখনী কাঁপিবার নয়। অগত্যা আজকাল কবিতা দেখিলেই কাঁপিয়া উঠিতে হয়। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের "শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকা"র দুই পৃষ্ঠা প্রকাশিত হইয়াছে। এরূপ প্রবন্ধের মাত্রা এত অল্প হইলে রসগ্রহণে বাধা ঘটে। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের "পাটলিপুত্র" প্রত্নতত্ত্বের যৎকিঞ্চিৎ।

প্রবাসী। চৈত্র।—প্রথমেই "হিরণ্ময়ীর নিকট পুরন্দরের বিদায়গ্রহণ" নামক একখানি বর্ণলিপ্ত 'ভারতীয়' পট—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্ত্তৃক অঙ্কিত। করের করে অবনীন্দ্রী কলার বাহার অত্যন্ত খুলিয়াছে, তাহা আমরা অস্বীকার করিব না। যেমন হিরণ্ময়ী, তেমনই পুরন্দর! হিরণ্ময়ী মুখ ফিরাইয়া বসিয়া আছেন, পুরন্দরের মুখ দেখিবেন না। পুরন্দর এক হাতে মুক্তার বা মুড়ির মালা নাড়িতে নাড়িতে বোধ করি চলিতেছেন; কারণ, তাঁহার পীত বসন পুরোভাগে চরণাগ্রে উদ্যত হইয়া আছে। অতএব গতি সূচিত হইতেছে। হিরণ্ময়ীর বসিবার চৌকীখানি শূন্যে ঝুলিতেছে, নীচে নামিলেই সুরেন্দ্র-সৃষ্ট ফুলদল দলিত করিতে হয়! আকাশ, ভূমি, হর্ম্ম্য, চৌকী প্রভৃতি চিত্রের সমুদায় সরঞ্জাম এক ক্ষেত্রে অবস্থিত—পটখানির 'সাম্য' নাম দিলেও ক্ষতি ছিল না। হিরণ্ময়ীর অঙ্গুলিগুলি খড়্‌কে-গঞ্জিনী, লতানেও বটে। জে, বি, গ্রিউজের অঙ্কিত "বিশ্বস্ততা" ত্রিবর্ণে মুদ্রিত প্রতীচ্য চিত্র। "প্রবাসী"র চিত্রশালায় 'ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতি'র

পার্শ্বে প্রতীচ্য শিল্পীদের জন্য একটু স্থান হইয়াছে—প্রাচী ও প্রতীচী, উভয়েরই সৌভাগ্য। "বিবিধ প্রসঙ্গে" অনেক কাজের কথা আছে। এক স্থলে দেখিলাম,—"গণপৎ কাশীনাথ ম্হাত্রের মত প্রস্তর মূর্ত্তিনির্ম্মাতা বঙ্গে এক জনও হন নাই।" ম্হাত্রের মত কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু এক জন বাঙ্গালী—শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বর্ম্মণ মূর্ত্তি শিল্পের অনুশীলন করিবার জন্য বিদেশে গিয়াছেন,—লণ্ডনে ষ্টুডিও খুলিবার চেষ্টায় ছিলেন, জানি। "গানে" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ষোলটি গান ছাপা হইয়াছে। গানে রবির কিরণ নাই। আধ্যাত্মিকতা থাকিতে পারে, প্রতিভার গৌরব বা কবিতার সৌরভ নাই। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের "ভারতবর্ষের অধঃপতনের একটি বৈজ্ঞানিক কারণ" চলিতেছে। এরূপ আলোচনায় কল্যাণের আশা করা যায়। শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবীর চতুষ্পদী "পূর্ণতা"য় দেখিলাম,—"আকাশ পৃথ্বীর শূন্য দিয়াছে ভরিয়া।" আকাশ ও পৃথ্বীর শূন্য কি, তাহা ত বুঝিলাম না। অতএব পাঠের ফলেও শূন্য থাকিয়া গেল। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "মিয়াকো ওদোরি" জাপানী নৃত্যবিশেষের কাহিনী—সুখপাঠ্য। শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "চিকিৎসা" গল্পে বিশেষত্ব নাই। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের "হাতীর দাঁতের শিল্পসামগ্রী" উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "মৃত্যু-স্বয়ংবরে" কবিতার পক্ষেও বলা যায়,—"মুলুক জুড়ে প্রেতের নৃত্য, অর্থ-পিশাচ হৃদয়-হীন।" এ ক্ষেত্রে অর্থ = মানে—ইতি মল্লিনাথ। ক্ষমতার চমৎকার অপব্যবহার—মানসীর আশ্চর্য্য ভ্যাঙ্গচানী! শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "একটি মন্ত্র" তাঁহার এই শ্রেণীর রচনার পূর্ব্বগৌরব রক্ষা করিয়াছে। সংক্ষিপ্ত মানব-জীবনের পক্ষে এ সকল মন্ত্র চিরকালই বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে। 'দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তি'র জন্য যাঁহাদের নূতন দুঃখ-বরণে আপত্তি নাই, আমরা কবিবরকে ধন্যবাদ দিয়া, সসম্মানে তাঁহাদিগকে পথ ছাড়িয়া দিতেছি।

চিত্র-পরিচয়।

রাজেশ্বর ও ভিখারিণী।—কিম্বদন্তী এই,—কফেটুয়া আফ্রিকার রাজা, কোটীশ্বর ও অত্যন্ত নারী-বিদ্বেষী ছিলেন। কিন্তু প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে, একদিন বাতায়ন হইতে এক অসামান্য রূপবতী ভিখারিণী কুমারীকে দর্শনমাত্র, তাঁহার আজীবন-সঞ্চিত নারী-বিদ্বেষ চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছিল। ভিখারিণীর নাম পেনেলোপন; সেক্সপীর বলেন,—জেনেলোপন। ইংরেজীতে এই অসম-প্রেমের অনেকগুলি গাথা আছে। টেনিসনের ক্ষুদ্র গাথাটি অবলম্বন করিয়া বরন্ জোনস্ এই চিত্রখানি অঙ্কিত করিয়াছেন।

চিত্রের বিষয়,—রাজা ছিন্নবস্ত্রা ভিখারিণীকে রাজসিংহাসনে বসাইয়া, তাহার পদতলে স্বীয় রাজমুকুট উপহার দিতেছেন। চিত্রকর ভিখারিণীর সুন্দর মুখে ঔৎসুক্য ও শঙ্কার দ্বন্দ্ব অতি নিপুণভাবে ফুটাইয়াছেন। সমালোচকদিগের মতে, এইখানি বরন্ জোন্সের সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিত্র। মূল চিত্রখানি সাড়ে সাতানব্বই হাজার টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল।

প্রত্যাদেশ।—বাইবেলে কথিত আছে, যীশুর জন্মের পূর্ব্বে, স্বর্গ হইতে দেবদূত আসিয়া মেরীকে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন,—"তোমার গর্ভে ভগবান জন্ম গ্রহণ করিবেন।"—ইহাই চিত্রের বস্তু।

৪৭-১, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা,—শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে,
শ্রীঅধরচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

অভিভাষণ।

আবার এস মা সঙ্গীত-সাহিত্য-মাতা ভাব-ভাষা-জননী ভারতী! বর্ষান্তে সকলে মিলিয়া সাড়ম্বরে তোমার পূজা করি। চিরদিনই মা তোমার শ্বেতবর্ণ, শ্বেতবাস, শ্বেতবীণা, শ্বেতহাস; চিরদিনই মা তুমি শ্বেত-সরসিজ-নিবাসিনী,—তাহাতে আবার সম্প্রতি শ্বেতদ্বীপ-নিবাসিগণের লক্ষোপচার পূজার আনন্দে নন্দিতা হইয়া শ্বেত-গৌরববর্দ্ধিনী। তাই মা আজি শ্বেতসম্রাটের শ্বেতপ্রতিনিধিবর্গের আগমনে উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া অধিকতর আবেগভরে তোমার অধিবাস-গীত গান করিতেছি। শ্বেত-কৃষ্ণের এমন অপূর্ব্বমিলনদিনে, কলিকাতার এই মিলনমন্দিরে, দাও মা আমার ভগ্নকণ্ঠে সুস্বর-সংযোগ, দাও মা জরাজীর্ণদেহে যৎকিঞ্চিৎ বল—যেন আমি উল্লাসে, উৎসাহে আমার কর্ত্তব্যকার্য্য সুসাধন করিতে পারি।

আমার কর্ত্তব্য কার্য্যের সাধনের জন্য আমি সাগ্রহে দেবতার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি—অথচ আমি জানি না, আমার কর্ত্তব্য কার্য্য কি? এইরূপ বিড়ম্বনায় আমরা ভারতবাসী নিয়ত বিড়ম্বিত। আমরা আড়ম্বর করিতে দক্ষ করিতেছি,—কিন্তু আমাদের কার্য্য কি, তাহা জানি না। তাই বলি মা বাগীশ্বরী—বাক্য-বিনোদিনী! 'আমরা তোমার কাছে কি বর চাহিব', অগ্রে তাহাই আমাদিগকে শিখাইয়া দাও। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মত তোমারই কথায় তোমার পূজা করি।

এটি সপ্তম সাহিত্য-সম্মিলন। পূর্ব্বে ছয়টি হইয়া গিয়াছে। শেষের দুইটিতে আমি ভুক্তভোগিভাবে সংলিপ্ত ছিলাম। তথাপি আমি ইহার আড়ম্বর বুঝিয়াছি—প্রথমেই সঙ্কল্পে—কথা ছিল যে, সাহিত্য-পরিষৎ কলিকাতায় সুপ্রতিষ্ঠিত, এইখানেই ইহার সভা-সমিতি, আন্দোলন-আলোচনা হইয়া থাকে; মধ্যে মধ্যে কলিকাতা হইতে দূরে, পল্লীগ্রামে সাহিত্যের প্রভাব-বিভাব দেখাইতে পারিলে, সৎসাহিত্যের বিস্তারের পক্ষে বড় সুবিধা হয়, সুদূর পল্লীবাসীর আনন্দ-উৎসাহ হয়। এই মূল কথার সহিত এখন আর মিল নাই। কাজেই আমার মত নির্ব্বোধের পক্ষে, সাহিত্য-সম্মিলনের ভাব বোধগম্য করা বড়ই দুরূহ। এ ত গেল মূল কথার কথা—প্রকরণ পদ্ধতির কথাও ধরুন। আমাদের হিন্দুমুসলমানের দেশ;—সভার পতি হয় অবশ্য একটি। আর যিনি আয়োজন অভ্যর্থনাদি করেন, তিনিও একরূপ সভাপতি। এবার শুনিতেছি সভাপতি হইবেন—৪টি বা ৫টি। ভূতপূর্ব্ব সভাপতিরা পঞ্চম বা ষষ্ঠ সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন না; সুতরাং তাঁহাদের কার্য্যাকার্য্যের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় নাই। সুতরাং আমি যে ভূতপূর্ব্ব, এও

অভূতপূর্ব্ব। আমি পঞ্চভূতেরই এক জন—অথবা পঞ্চভূতের ধোবী বা মলবাহি-মাত্র—তাহাও বেশ বুঝিতে পারিতেছি না। মা শিখাইয়া দিতেছেন, নাই-বা অমন করিয়া বুঝিলে; এই শ্বেতকৃষ্ণের এমন শুভসম্মিলন, "সুখ-ভোগ-সুসংযোগ না হয়, সকল কপালে," এ সুসংযোগে তুমি কিছু বলিতে ছাড়িবে কেন? তোমার প্রাণের কথা তুমি বল! তথাস্তু দেবী! তাই বলিতেছি—

সাহিত্যসেবী ভ্রাতৃবৃন্দ এবং উপস্থিত সদাশয়মণ্ডলী!

আমি একটা কথা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম—"আমরা মস্তিষ্কের তীব্র-চালনাগুণে পাইতেছি—জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিদ্যা-দর্শন, পুরাবৃত্ত-ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব-জীবতত্ত্ব;—হারাইতে বসিয়াছি—দয়া-মায়া, শ্রদ্ধা-ভক্তি, স্নেহ-মমতা, কারুণ্য-আতিথ্য, আনুগত্য-শিষ্যত্ব।" "আমরা কোমলপ্রাণ বাঙ্গালী, আমাদের আশঙ্কা হয়, আমরা কোমলতা হারাইয়া বুঝি বা সর্ব্বস্ব হারাইয়া ফেলি।" "হৃদয়ে কোমলতার Culture, কর্ষণ বা উৎকর্ষ হয়—সুকুমার-সাহিত্যসেবায়। অথচ এই সুকুমার সাহিত্যের সেবা পূর্ব্বাপেক্ষা এখন কম হইতেছে; পূর্ব্ব-সময় বলিতে আমি বিক্রমাদিত্যের বা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় বলিতেছি না; ত্রিশ বৎসর মধ্যে সাহিত্যসেবায় ত্রুটী পড়িয়াছে। যদিও বঙ্গসাহিত্যের সমালোচনাই আমাদের লক্ষ্য, কিন্তু আমি কেবল বঙ্গসাহিত্য লইয়া এ কথা বলিতেছি না। সংস্কৃত ও ইংরাজি সাহিত্য শুদ্ধ জড়াইয়া লইয়া বলিতেছি। সংস্কৃতে এখন সাংখ্য-বেদান্তের চর্চ্চা হয় ত বাড়িয়াছে, কিন্তু সুকুমার সংস্কৃতসাহিত্যচর্চ্চার পূর্ব্বের মত প্রগাঢ়তা নাই। আর ইংরাজি সাহিত্য আমরা যে ভাবে যতটুকু পড়িয়াছিলাম, বা পড়িতাম, এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের এত বিস্তৃতিতেও বোধ হয় তাহার চতুর্থাংশের একাংশ এখনকার ছাত্রগণ পড়ে না। সেক্সপিয়রের কোনও কিছু জানিবার আবশ্যক হইলে, সেই বালককালের মত শ্রীযুক্ত দীননাথ ধর দাদামহাশয়ের নিকট দৌড়াইতে হয়; এ কালের ছেলেদের দ্বারা কোনও ফল পাওয়া যায় না। বাঙ্গালা সাহিত্যে ইতিহাসের পর দব্-ইতিহাস, তাহার পর ছে-ইতিহাস দাখিল হইতেছে; এক দীনেশ বাবুই যে কত দলীল দাখিল করিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই; আবার ইদানীং সওয়াল জবাবও আরম্ভ হইয়াছে; কত স্থানে, কত রূপে বঙ্গসাহিত্যের সম্মিলন হইতেছে—উত্তর-বঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ, ঈশানবঙ্গ, অগ্নিবঙ্গ, কত স্থানেই না মূল, শাখা, প্রশাখা পল্লব-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তবু বিনীতভাবে কাতরে জিজ্ঞাসা করি,—বাস্তবিক কি আমাদের দেশে সুকুমার-সাহিত্য-আলোচনার প্রসারবৃদ্ধি হইতেছে?—সেই যে মুদী-মাকালী, ভাণ্ডারী-ব্যাপারী,—সকলেই অবসর, স্থান ও

শ্রোতা পাইলেই কৃত্তিবাস-কাশীদাস পড়িত, তা'ারা কি এখনও সেই ভাবেই পড়ে? না 'নবীন নামে এক বালক' পড়িয়া তাহাদের বোধোদয় হয় যে, "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ", তাহার পর সুগোল, উজ্জ্বল, চাকচিক্যশালী চৈতন্য-স্বরূপের—ভুক্তিমুক্তিদাতা রজত-বিগ্রহের উপাসনায় ব্যস্ত হয়? আপনাদিগের সমীপে আবার কাতরে, বিনয়ে নিবেদন করি, আপনারা নির্জন-নিলয়ে, নিশাগে, যে দিন ম্যালেরিয়ার তাড়না নাই, মোকদ্দমার তাগাদা নাই, কন্যাদায়ের বোঝা মস্তকে ঝুলান নাই, এমন শুভ-রাত্রিতে আশ্বস্ত হইয়া ভাবিয়া দেখুন দেখি, বঙ্গভাষায় সুকুমার সাহিত্যের প্রচার পূর্ব্ববৎ হইতেছে কি না?—হইতেছে—এমন বিশ্বাসের বাণী কখনই আপনাদিগের মুখ হইতে বহির্গত হইবে না।

বহুকাল হইতেই সঙ্গীত-সাধনাই ছিল—বাঙ্গালীর জীবন। বাঙ্গালী গ্রামে গ্রামে, পালোয়ান, বাগ্দী, পোদ, গোপ, চণ্ডাল প্রহরী রাখিয়া, আপনাদের বিত্তস্বত্ব রক্ষা করিত, আর সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা মাতৃভূমির সেবা করিয়া সঙ্গীত-সাহিত্য-সেবায় সময় অতিবাহিত করিত। ভারতের প্রাণ—ধর্ম্ম, বাঙ্গালীর প্রাণ,—সেই ধর্ম্মের সহিত সঙ্গীত-সাহিত্যের সাধনা। চারি পাচ শত বর্ষের বাঙ্গালীর ইতিহাস আমরা ভালরূপে জানিতে পারিয়াছি। এই চারি পাচ শত বৎসর বাঙ্গালী এই রূপেই কাটাইয়াছে। মধ্যে মধ্যে বাধা পড়িয়াছে বটে, কিন্তু সে অল্পকালের জন্য। যখন মোগল-পাঠানের লড়ায়ে বাঙ্গালা বিধ্বস্ত হইতেছিল, তখনও বাঙ্গালী সাহিত্য-সঙ্গীত-সাধনায় বিরাম দেয় নাই। তবে যখন পশ্চিমে মারাট্টা, পূর্ব্বে ফিরিঙ্গী মহাদৌরাত্ম্য করিল, যখন পলাশী-প্রাঙ্গনের প্রাণান্ত-পরীক্ষায় রাজ্য বিপর্য্যস্ত হইল, এগার শত ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে দেশে কালের করালছায়া পড়িল, যখন নাখেরাজ বাজেয়াপ্তের আদেশে দেশে মহতী বিভীষিকা দেখা দিল, তখন কিছুকালের জন্য সাহিত্যসেবার ব্যাঘাত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সাধারণতঃ আহারান্তে খড়ের চণ্ডীমণ্ডপে খুটী হেলান দিয়া 'মুটকলমে' ইতিহাসপুরাণ অবলম্বনে পুঁথী লেখা, এবং বৈকালে কোনও প্রকাশ্য স্থানে গ্রামস্থ সমস্ত অবসরপ্রাপ্ত ভদ্র অভদ্র লোক একত্র রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতাদির শ্রবণ—এই সকলে কখনই সংসার বাধা দিতে পারে নাই।

এক রামায়ণের যদি দশখানি অনুবাদ থাকে, তাহা হইলে মহাভারতের পঞ্চাশখানি আছে। এই এক মঙ্গলগ্রন্থ—কত মঙ্গলই যে আছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। চৈতন্যমঙ্গল, অম্বিকামঙ্গল, কৃষ্ণমঙ্গল, গোবিন্দমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, রায়মঙ্গল, শীতলামঙ্গল, কমলামঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, কালীমঙ্গল—এইরূপ কত

মঙ্গলই যে আছে, তাহা স্থির করা যায় না। তাহার মধ্যে আবার মনসামঙ্গলে যে কত জনের লিখিত পুঁথী প্রচারিত আছে, তাহারও কিছু স্থির করা যায় না। এক চট্টগ্রামেই বাইশখানি মনসার পুঁথী আছে।

বাঙ্গালীর বইলেখা 'বাই' ছিল। আমরা যখন বালক, যখন ছাপাখানা পুরানো হইয়াছে বলিলেও চলে, তখনও সেই বায়ুর নিবৃত্তি হয় নাই। পরে বঙ্কিমচন্দ্রের লক্ষ্যবিদ্ধ বটতলা তখনও অক্ষয়শরীরে বিরাজমান। "তখন পুস্তকের ফেরি-ওয়ালারা আমাদের এতৎ অঞ্চলের নগর পল্লীর অলিতে গলিতে সমস্ত-দিন পুস্তক বিক্রয় করিত। কাশীদাস, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ, চরিতামৃত, প্রেমবিলাস, হাতেমতাই, চাহার-দরবেশ প্রভৃতি বটতলার প্রকাশিত গ্রন্থ হিন্দু-মুসলমান পুরুষেরা কিনিত। * * * বটতলা ছাড়া অন্যত্র ছাপা দুই একখানি গ্রন্থও হকারদের কাছে মিলিত। ফেরিওয়ালাদের সঙ্গে আমার বড় পোট ছিল। আমি প্রতি রবিবারে, তাহাদের পুস্তক ঘাঁটাঘাটি করিতাম"—কিনিতাম। এইরূপে কত গ্রন্থ যে কিনিয়াছি ও হারাইয়াছি, তাহার সংখ্যা করা যায় না। ফুলে দেবদেবীর পূজা হয়; পরিশ্রম করিয়া ফুল আহরণ করিতে হয়। পূজার পর ফুলগুলি যাহাতে অপবিত্র স্থানে না পড়ে, তাহারও ব্যবস্থা করিতে হয়, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত—পূজার ফুল রাখিবার ঢাকিবার ব্যবস্থা নাই। আমার নিত্য-সরস্বতী-পূজার ব্যবস্থাও সেইরূপই ছিল। পুস্তক কিনিলাম পড়িলাম,—মায়ের সেবা হইল,—ঐ পর্য্যন্ত; পুস্তকগুলি রাখিবার ঢাকিবার ব্যবস্থা করি নাই। নতুবা আপনাদিগকে বিশেষরূপে দেখাইতে পারিতাম যে, একটি বিশেষ সময়মধ্যে কতগুলি পুস্তক-পুস্তিকা পঠদ্দশায় অবস্থিত এক জন গৃহস্থ-বালকের হস্তে আসিতে পারে। তাহাতেই বলিতেছিলাম, আমরা যখন বালক বা কিশোরবয়স্ক, তখন বাঙ্গালীর বইলেখার 'বাই' যায় নাই। ক্রমে সেই বাঙ্গালীর প্রকৃতি উল্টাইয়া যাইতেছে। বাঙ্গালী 'সেয়ানা' হইয়াছে, পয়সার মায়া বুঝিয়াছে, উকীল মোক্তার-গণ পয়সা ভিন্ন ভাল করিয়া কথাই কহেন না; ডাক্তার কবিরাজ বিজিট না পাইলে রোগীর জিহ্বা দেখিয়া শাদা কাগজে কালীর দাগ দেন না; পয়সার জোর না থাকিলে ছেলেপিলের শিক্ষাই হয় না, পয়সা না হইলে, এমন কি, আশীর্ব্বাদও পাওয়া যায় না।

এইরূপে ক্রমে বাঙ্গালীর, তাহার চিরসাধনার সামগ্রী—সুকুমার সাহিত্যে অবহেলা হইয়াছে; বিশ ত্রিশ বৎসরে এইটি বিশেষ লক্ষিত হইতেছে। আর সেক্সপিয়ারের একটি সামান্য শব্দ লইয়া ঘোরতর বিতণ্ডা শুনিতে পাই না।

সমুদ্র দেখিয়া নবকুমারের মত 'তমালতালীবনরাজিনীলা' কেহ বলিয়া উঠে না; আকাশে কালো মেঘের কোলে রামধনু দেখিয়া, গোপবালকবেশধৃক্ শ্রীকৃষ্ণের চূড়ার উপর ময়ূরপুচ্ছ কেহ ভাবে না;—সে সকল পাগলামি এখন চলিয়া গিয়াছে; বাঙ্গালী সেয়ানা হইয়াছে, 'আপন গণ্ডা' চিনিয়া লইতে শিখিয়াছে।

রবিবাবুর কবিতা, এটি না হয় ওটা, সকলকেই কখনও না কখনও মুগ্ধ করিয়াছে। তাঁহার সম্মান করিতে তাঁহার দেশ-বাসী পরাঙ্মুখ হয় নাই—স্বয়ং সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র নিজগলদেশে গ্রহণ না করিয়া কুসুমমালারূপিণী যশের মালা রবিবাবুর গলদেশে দিয়াছিলেন; প্রথম সাহিত্য-সম্মিলনে রবিবাবুই সভাপতি হন; সাহিত্য-পরিষৎ এবং এই টাউনহলের সভা তাঁহার উপযুক্ত সংবর্দ্ধনা করিয়াছে। স্বয়ং লাটসাহেব তাঁহাকে ভারতের তথা আসিয়ার রাজকবি বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার একটি ক্ষুদ্র কবিতাকণিকা "গীতাঞ্জলি" যাই বিলাতী বাটখারার ওজনে চড়িয়া আপনার গৌরব কাঞ্চনমুদ্রায় স্থির করিল, অমনই মহা শোরগোল পড়িয়া গেল। এক দল বলিয়া উঠিলেন—"এতদিনে রবিবাবুর কবিতা লেখা সার্থক হইল; এতদিনে ভূতের ব্যাগার ঘুচিয়া গেল।" আর এক দল বলিয়া উঠিলেন—"এইবার রবিবাবুর সর্ব্বনাশ হইল; তিনি কাহারও সহিত আলাপই করিবেন না।" কিন্তু বাস্তবিক মনীষিমাত্রই বুঝিতে পারিতেছেন, রবিবাবু বেশী সার্থকও হন নাই, তাঁহার সর্ব্বনাশও হয় নাই। তিনি আমাদের যে রবিবাবু, সেই রবিবাবুই আছেন; তাঁহার "নৈবেদ্য" প্রকৃতই নৈবেদ্য; তাহার ভিত্তি পৃথিবীপরে হইলেও, কাঞ্চনশৃঙ্গের মত উজ্জ্বল শুভ্রকান্তি লইয়া সেই কাব্য নিয়তই রাজরাজেশ্বরের স্বর্গস্থ সিংহাসনাভিমুখে উন্নীত হইয়া আছে। তাঁহার "গীতাঞ্জলি" পরমপিতার পূজার উপকরণ, সাধকের সাধনার সামগ্রী, ধাতুচক্রে তাহার গৌরব বাড়াইতে কমাইতে পারিবে না। যাহারা গিনি গণনা করিয়া সকল বিষয়েরই গৌরব অবধারণ করে, তাহারা যে ভাবে বুঝিয়াছে, সেই ভাবেই বুঝুক, আমরা কেন বিশুদ্ধ সাহিত্যের শুভ্র যশের পরিমাণ ঐ ভাবে করিব? আমরা হয় ত অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছি, কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকের হৃদয় এখনও আছে বলিয়া বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসেই আশ্বাস পাইতেছি।—না, আমরা পারিতোষিকের পরিমাণ দেখিয়া সুকুমার সাহিত্যের গৌরব বুঝিব না। নিষ্কাম সাহিত্যসেবা বহুকাল হইতে বাঙ্গালায় ছিল, এখনও আছে; নানা কারণে সেইরূপ সেবার ঐকান্তিকতা আজিকালি একটু কমিয়াছে বটে, কিন্তু ভরসা করা অসঙ্গত নহে, আর সেই

ভরসাতেই জীবন ধারণ করিয়া আছি যে, সুকুমার সাহিত্যের সেবা বাঙ্গালাতে আবার নিষ্কামভাবেই হইবে। অর্থাগমের জন্য সাহিত্য-সেবার বিস্তার বাড়িবে, এরূপ মনে করিতেও আমি পারি না,—অর্থাগম,—সাহিত্যসেবায়—আমার একেবারেই নাই বলিলেও চলে, অথচ বারবার আমাকে সাহিত্য-সভার একরূপ না হয় অন্যরূপ শ্রেষ্ঠ স্থলে স্থাপিত করিয়া, আমার কথা এইরূপ মহতী মণ্ডলী যে একান্তমনে শ্রবণ করিতেছেন, ইহাতে কি বুঝিতে হইবে যে, বাঙ্গালার সাহিত্যসেবিগণ অর্থাগমকেই গৌরবের বাটখারা করিয়াছেন?—তা' কখনই নহে। বাঙ্গালায় সংসাহিত্যের আলোচনা আপনার গৌরবে আপনিই মস্‌গুল থাকে;—যে সেবা করে, সেও যেমন অর্থাগমের কথা ভাবে না, যাঁহারা সেবকবৃন্দের আদর-আপ্যায়ন করেন, তাঁহারাও উঁহাদের অর্থাগমের কথা ভাবেন না। আমরা প্রায় সকল দিকেই অর্থের দাসত্বে লিপ্ত হইতেছি বটে, কিন্তু প্রকৃত সাহিত্যসেবায় সেরূপ আজিও হয় নাই। আজিকার এই সাহিত্য-সম্মিলন-সভাই এই কথার প্রমাণ করিতেছে—আজি অনেকেই দারিদ্র্যের দারুণ দুর্বহ ভার শিরে বহন করিয়া এই সাহিত্য-সভা সমুজ্জ্বল করিয়াছেন।

বাঙ্গালীর এই যে বহুবর্ষব্যাপিনী সাহিত্য-সেবার প্রবৃত্তি, এইটিকে রক্ষা করিয়া বাঙ্গালীর সকল কার্য্য করিতে হইবে। যে বড় হইতে চায়, সে প্রথমে আপনার বিশেষত্ব রক্ষা করিবে, তাহার পর বড় হইবার প্রকরণপদ্ধতি অবলম্বন করিবে। বাঙ্গালীর প্রাণ—ধর্ম্মের সহিত সঙ্গীত-সাহিত্যের সাধনা। ধর্ম্মের কথা এখন সকল সভায় বলিতে নাই বলিয়া বলিব না, কিন্তু সঙ্গীত-সাহিত্যের কথা বলিতেই হইবে। এই সঙ্গীত-সাহিত্যের সাধনায় বাঙ্গালীর যদি ত্রুটী লক্ষিত হয়, তাহা হইলে সেটি দুঃখের বিষয় বৈ আর কি বলিব? আমরা আপনারাই যখন আপনাদের শত্রু, তখন আমাদিগকে অতি সাবধানে অতি সন্তর্পণেই অগ্রসর হইতে হইবে। ভাল করিতে পারিব না মন্দ করিব, কি দিবে দাও—আমাদের মধ্যে এরূপ ভাবটা যেন না হয়।

সাহিত্যের কথা চিরদিন বলিতেছি, বলিবও, কিন্তু আপনাদের অনুমতি লইয়া সঙ্গীতের কথাও দুটা একটা আমাকে বলিতে হইতেছে। আমি সঙ্গীতজ্ঞ নহি, সুতরাং কতকটা আমার অনধিকারচর্চ্চা হইতেছে, কাজেই এই বিষয়ে আপনাদের বিশেষ অনুমতি লইতেছি। মানবের কণ্ঠ-সঙ্গীত বিজ্ঞান-অনুসারে প্রধান দুই-ভাগে বিভক্ত। আরবের মর্ছিয়া, পারস্যের গজল এবং ভারতবর্ষের উত্তর ও দক্ষিণখণ্ডের সমগ্র সাধু-সঙ্গীত—মীড়মূর্চ্ছনায় পরিপূর্ণ। য়ুরোপের সঙ্গীতে মীড়-

মূর্চ্ছনা নাই, এমন নয়; আছে, অল্প আছে;—সেই সঙ্গীত প্রধানতঃ খাড়া সুরে গড়া। ভারতবর্ষ মীড়মূর্চ্ছনার দেশ। বাঙ্গালা আবার ভারতের ভারত—বাঙ্গালার কীর্ত্তনের সুর কেবল মীড়মূর্চ্ছনায় পরিপূর্ণ। বাঙ্গালায় কীর্ত্তনের আদর আছে বলিলেও হয়, নাই বলিলেও হয়। এই কলিকাতা সভ্যতার কেন্দ্র—কিন্তু এই আট লক্ষ অধিবাসীর কাণে রসিকদাসের কীর্ত্তন কখনও উঠে নাই, আর উঠিবেও না; রসিকদাসের মৃত্যু হইয়াছে। এটা কি দুঃখের বিষয় নয়? কিন্তু এই দুঃখ—প্রকাশের জন্য আমি এ কথার অবতারণা করি নাই। আমার বর্ত্তমান দুঃখ-নবাযুবকদলের মধ্যে ইংরাজি সুরে সঙ্গীতচর্চ্চা দেখিয়া। সেবার চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলনে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে দুই একটি কথা বলিয়াছিলাম বলিয়া আমি কাহারও কাহারও বিরাগভাজন হইয়াছিলাম—মৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আক্রমণকারী বলিয়া। আমি বলি, যাঁহাদের কীর্ত্তি বা অকীর্ত্তি জীবন্ত রহিয়াছে, তাঁহারা ত মৃত নয়, বরং তাঁহারাই জীবিত, "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।" যে সুরের কথা আমি বলিতেছিলাম, সেটি প্রধানতঃ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কর্ত্তৃকই নব্যসমাজে প্রচারিত হইয়াছে। যখন পাঁচ জন যুবক এক সঙ্গে বসিয়া ঐ খাড়াসুরে গান করিতে থাকেন, তখন আমার প্রাণে বড় ব্যথা লাগে; আমি ভাবি, এই ভাবে যদি আমাদের উন্নতি হইতে থাকে, তবে আমাদের অবনতি আবার হইবে কিরূপে? দ্বিজেন্দ্রলাল কর্ত্তৃক সুরের বিকৃতি-সাধনের কথা আমি বৈঠকী-সভায় চট্টগ্রামে তুলিয়াছিলাম, কাহারও মনে ছাপ লাগাইতে পারি নাই, এবার একেবারে সম্মিলনে উপস্থাপিত করিলাম।

ক্রমে দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে প্রকৃত সমালোচনা বঙ্গসাহিত্যে দেখা দিয়াছে। অগ্রহায়ণের "আর্য্যাবর্ত্ত" বলিয়াছেন—"দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশবাৎসল্য সাধারণতঃ রজনীতিকের স্বদেশবাৎসল্য—ক্বচিৎ কবির স্বদেশবাৎসল্য—কুত্রাপি স্বদেশপ্রেমিকের স্বদেশবাৎসল্য নহে। অর্থাৎ যে স্বদেশবাৎসল্য সর্ব্বোত্তম, তাহা তিনি দেখাইতে পারেন নাই; ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন—

ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥

এই যে বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া দেশের কুকুরকেও আদর করা—ইহাই স্বদেশ-প্রেমিকের স্বদেশবাৎসল্য। সমালোচকের দৃষ্টিতে দেশের যে দৈন্য লক্ষিত হয়, স্বদেশপ্রেমিক সে দৈন্য বিষয়ে অন্ধ।"

আমার কথা—দ্বিজেন্দ্রলাল প্রকৃত ও প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেমিক হইলে তিনি খাড়াসুর বাঙ্গলায় চালাইতে চেষ্টা করিতেন না। তাঁহার পিতা কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় অতি সুমিষ্ট গায়ক ছিলেন; খেয়াল, ধ্রুপদ, ব্রহ্মসঙ্গীত, টপ্পা তিনি অতি মিষ্টস্বরে নিপুণভাবে গাহিতেন; জানি না, কা'র কেমন দুর্ভাগ্য কিরূপে হয়, এ হেন পিতৃসমীপে বসিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল কি দশ দিনও সঙ্গীতচর্চ্চা করেন নাই? দুর্ভাগ্য! দুর্ভাগ্য আরও ঘোরতর, কেন না, গানগুলির বাঁধুনিতে সুন্দর নিপুণতা আছে। এখন সঙ্গীতজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করি—ঐ গানগুলিতে আমরা খেয়ালের সুর বসাইতে কি পারি না?

সাহিত্যসেবায় এমন অনেকের মনে হয় যে, মহতের অনুকরণ করিয়া আমরা মহত্ত্ব অর্জ্জন করিব। কথাটি শাদাসিধা বলিতে মন্দ নয়, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই নানা গণ্ডগোলে পড়িতে হয়। মহতের মহত্ত্ব কিসে, তাহা বুঝা বড় কঠিন। এই মহতীমণ্ডলী-মধ্যে অনেক মহৎ ব্যক্তি আছেন, কিন্তু কোন্ ব্যক্তি কোন্ গুণে কোন্ বিষয়ে মহৎ হইয়াছেন, তাহা যদি আমরা না জানি, বা না বুঝিতে পারি, তাহা হইলে আমরা কিসের অনুকরণ করিয়া মহত্ত্ব লাভ করিব? জগতে যেমন সর্ব্বত্র বৈচিত্র্য আছে, তেমনই মহত্ত্বেও বৈচিত্র্য আছে। ঘনসন্নিবিষ্ট স্থূল পত্র লইয়া বিশাল বিটপী বট, তাহার মহত্ত্ব জীবদ্দশায় ছায়াদানে, কলকাকলী-কুহরিত পক্ষিকুলকে আশ্রয়দানে। আর 'বল্ রে তরু কার উদ্দেশে, গগন ভেদ ক'রে যাস্ ঊর্দ্ধদেশে' বলিয়া কবি যাহাকে সম্বোধন করেন, সেই সুচ্চ শালের মহত্ত্ব এমন দিনে, সুগন্ধিপুষ্পগুচ্ছের সৌরভবিস্তারে বন আমোদিত করা, শুষ্ক ভুঙ্গরসে সর্জ্জরসে দেব-নিকেতনে দেবতার আবির্ভাব সম্ভব করা, এবং নিজদেহদানে সৌভাগ্যবানের সৌধ সজ্জিত করা—এখন বলুন দেখি, বটবিটপী শালের কি অনুকরণ করিবে, আর শালই বা বটের কতটুকু অনুকরণ করিবে? দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্নজাতিমধ্যে পরস্পর কেহ কাহারও অনুকরণ করাই অসম্ভব, তা' অনুকরণে মহত্ত্বলাভ ত দূরের কথা! সেইরূপ মানবসমাজেও পৃথক পৃথক জাতির বিভিন্নরূপ বৈশিষ্ট্য আছে, কে কাহার কতটুকু অনুকরণ করিবে, তাহা স্থির করা বিষম সমস্যা।

সম্প্রতি সাহিত্যসেবায় আমাদের কিছু ক্রটী ঘটিয়াছে বলিয়া এমন মনে করিতে হইবে না যে, আমরা একেবারে অধঃপাতে গিয়াছি, আমাদের মহত্ত্ব কিছু নাই, আমরা লঘু হইতে লঘু হইয়াছি। আমাদের মধ্যে এক জন মনীষী একদিন বলিয়া-ছিলেন যে, আমরা—They may not know how to fight, but they know how to live and—to die. বাঙ্গালী লড়াই করিতে না জানুক—জানে

বাঁচিতে ও মরিতে। রাজসিক শক্তি দুই দিকের চাপে আমাদের কমিয়া গিয়াছে বটে, এক দিকে সাত্ত্বিকতার প্রভাবে আমরা রাজসিকতা ছাড়াইয়া উঠিয়াছি, আর কোথাও তামস বৃদ্ধি পাইয়া রাজসিকতার হ্রাস হইয়াছে—কিন্তু এত বিড়ম্বনায় বিড়ম্বিত হইয়াও আমরা যাহা আছি, তাহা মহৎ বলিতে কুণ্ঠিত হও, বলিও না—কিন্তু লঘু কোনও মতে বলিতে দিব না।

আমাদের মধ্যে চারি ভাগের তিন ভাগ লোক মদ্যমাংসমৎস্যত্যাগী, নিরামিষ আহারে সন্তুষ্ট ও সংযমী। কাটাকাটি, মারামারি, মাম্‌লা, মোকদ্দমা আমরা কম করি। অন্য জাতির সহিত হঠাৎ তুলনা করিতে প্রবৃত্তি হয় না; বিশেষ আমরা পরাধীন—রাজজাতির সঙ্গে কোনও বিষয়ে তুলনা করা আমাদের সাজেই না, করিতেই নাই; অথচ দিনের পর দিন আমরা যে আপনাদিকে ক্রমেই লঘু হইতে লঘুতর মনে করিতেছি, সেই তামসভাব মন হইতে অপসারিত করাও একান্ত কর্ত্তব্য। কাজেই যৎকিঞ্চিৎ তুলনা না করিলেও চলে না। জর্ম্মনজাতি আজি-কালি সভ্য-জগতে বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন, তাহাদের দণ্ডনীতির কথা বলিলে, বোধ হয় কোনও দোষ হইবে না। বার্লিন রাজধানীতে একটি সুবৃহৎ কারাগার আছে, তাহার নাম Moabit Prison। তাহারই অধ্যক্ষ বা Superintendent Dr. Finkelr Burgh; তিনি একখানি পুস্তক প্রণয়ণ করিয়াছেন, তাহার নাম "People who have been punished in Germany." "জর্ম্মনীদেশে কত লোকের সাজা হইয়াছে?" অধ্যক্ষের কথা, দুইটি স্থানের একটু একটু উদ্ধৃত করিব। এক স্থানে আছে—already every sixth man and every twentyfifth woman in German Empire has been punished for violation of some one or other of the many thousands of paragraphs of the German Penal Code." জর্ম্মনসাম্রাজ্যের মধ্যে পুরুষের মধ্যে ছয় ভাগ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে পঁচিশ ভাগ জর্ম্মান দণ্ডনীতির কোনও না কোনও ধারার নীতিভঙ্গ করায় দণ্ডিত হইয়াছে। আর এক স্থানে আছে—"বর্ত্তমান সময়ে জর্ম্মনীতে দণ্ডিত ব্যক্তির সংখ্যা ৩৮,৬৯০০০ আটত্রিশ লক্ষ উনসত্তর হাজার, তাহার মধ্যে ৩০, ৬০০০০ ত্রিশ লক্ষ ষাট হাজার পুরুষ, এবং ৮,০৯০০০ আট লক্ষ নয় হাজার স্ত্রীলোক। ১২ হইতে ১৮ বৎসর বয়সের বালকের মধ্যে ৪৩ জনের মধ্যে ১ জন ও বালিকার মধ্যে ২১৩ জনের মধ্যে এক জন দণ্ডিত হইয়াছে। দেখুন কি বিভীষিকাময় ব্যাপার! জর্ম্মান্—মহৎ, কলকব্জায় মহৎ, রঙ্গবিরঙ্গ ফন্দানয় মহৎ, সৈন্যসজ্জায় ও শিক্ষায় মহৎ, হয় ত

আর দশ বৎসরে অর্ণবযানসংঘ-সংখ্যায়ও মহৎ হইবে,—তা বলিয়া কি তাহাদের অনুকরণ করিতে গিয়া আমরা দণ্ডিত লোকশ্রেণীর সংখ্যাপরিমাণ লইয়া মহৎ হইব? মাতঃ ভারতী! চিরদিনই তোমার লীলাখেলার অভিব্যক্তি আমাদের বোধাতীত; তুমি মা জর্ম্মনজাতিকে সংস্কৃতশিক্ষায় পটুত্ব প্রদান করিয়া, আমাদিগকে তাহাদের দিকে আকৃষ্ট করিতেছ;—দেখ মা, তোমার লীলাভূমির অধম তনয় আমরা যেন সেই আকর্ষণে এরূপ মহত্ত্ব লাভ না করি, যাহাতে আমাদের মধ্যে ছয় ভাগ পুরুষ ও পঁচিশ ভাগ স্ত্রীলোক দণ্ডিত হয়।

আমরা যে কাটাকাটি, মারামারি, মামলা মোকর্দ্দমা কম করি, এবং তাহাতেই যে আমাদের মহত্ত্ব প্রকাশিত হয়, এমন নহে; আমরা সংযমী ও প্রধানতঃ নিরামিষাশী হইলেও, আমাদের মধ্যে দরিদ্র কৃষকও যেরূপ ফলমূল, সুপক্ব সুমিষ্ট আম, কাঁটাল, তরমুজ, খরমুজ খাইতে পায়, তাহা অন্য দেশের ধনিসন্তানের পক্ষেও দুর্লভ। আমরা সংযমী হইয়াও ভোগবঞ্চিত নহি। কেবল জিহ্বার উপভোগ নহে, সমস্ত সৌন্দর্য্য-উপভোগের শক্তিই সভ্যতার নিদর্শন। সেই শক্তি বাঙ্গালীর বিলক্ষণ আছে। একটু পরে দেখিবেন, এই কলনাদিনী ভাগীরথীর দুই কূলে মুটে-মজুর, বাবু-বিলাসী, ব্রাহ্মণপণ্ডিত স্বচ্ছন্দে বসিয়া, গঙ্গাবক্ষের অপূর্ব্ব দৃশ্য প্রাণ ভরিয়া দেখিতেছে, নয়ন ভরিয়া উপভোগ করিতেছে, এবং বিষম বিষময় বিষয়-আশীবিষের দিবসের দংশনজ্বালা এইরূপেই প্রশমিত করিতেছে। এক জন সাঁওতাল কসমের লোক ৺বৈদ্যনাথ হইতে কলিকাতায় গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বলে, "বাবু! তোমার দেশে খুব ঘর বাড়ী, আমাদের দেশে কেবল গাছপালা";—খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বাবু, এর কোন্‌টা ভাল?" আমি তাহার সৌন্দর্যপ্রিয়তা বুঝিয়া কোনও উত্তর দিতে না পারিয়া একটু হাসিয়াছিলাম, সেও একটু হাসিয়া যেন লজ্জিত হইয়াছিল।

তাহার পর সঙ্গীত। যে ভজন কীর্ত্তন ভারতবাসী গায়িতে পারে, এবং শুনিতে পায়—তাহা দেবতার পক্ষেও দুর্লভ। তাই সদ্যোমৃত দ্বিজেন্দ্রলালে দোষারোপ করিয়া, ভব্যতার সীমা লঙ্ঘন করিয়াও, মনের তৃপ্তি হইতেছে না। যে দেশে জয়দেব তান ছড়াইয়া গিয়াছেন, সেই দেশের শিক্ষিত যুবক সমবেত হইয়া খাড়া-সুরে, অহংরাগে অনুকরণে মহৎ হইবে মনে করিয়া, 'ধাপা পাধা মামা' করিলে যে হাসিতে পারে হাসুক্—"Other may laugh, we far rather weep at this melancholy decadence of the tone of the nation." আমরা বাঙ্গালী জাতির শোভানুভাবুকতার এইরূপ শোচনীয় অবনতিতে কেবল কাঁদিতেই পারি।

শেষ, সাহিত্য। জগতের মধ্যে উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক মহাকাব্য বাল্মীকির রামায়ণ, উৎকৃষ্ট দার্শনিক মহাকাব্য—মহাভারত;—রামায়ণ-মহাভারতের মহা-ভাবের মহত্ত্বে আমাদের ধনি-নির্ধনের, পণ্ডিত-মূর্খের—আমাদের সকলকার জীবন-যন্ত্রের সুর সমানে বাঁধা। আমাদের মন্ত্রই দেবতা—সেই মন্ত্রের একটি অক্ষরও যদি উচ্চারিত হয়, তাহা হইলেই দেবদর্শনে আমরা সার্থকজীবন হই। আমাদের নিকটস্থ এক জন স্বর্ণকারনন্দন যখন—"মাতঃ শৈলসুতাসপত্নি বসুধাশৃঙ্গার-হারাবলিঃ" বলিয়া জোড়করে গঙ্গাতীরে প্রণাম করে, তখন সগরসন্তানগণের মুক্তি যেন সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছি বলিয়া মনে হয়।

আমরা দেবকার্য্যে, পিতৃকার্য্যে, ভক্তির উচ্ছ্বাসে, মনের বিশ্বাসে দেবভাষা সংস্কৃত, বুঝি বা না বুঝি, ব্যবহার করি। ভাষা ও ভাবের গৌরবে আমাদের ক্রিয়াকর্ম্মের একরূপ অপূর্ব্ব গৌরব হয়। তাহার পর আমাদের মধ্যে প্রচলিত এই প্রাকৃতভাষা—বঙ্গভাষা—সেই সংস্কৃতের আদরের কন্যা। অষ্টাদশ ভাষার মধ্যে ইনিই মায়ের অত্যন্ত প্রিয়া। বুড়ী বুঝে না—মানান হইল, কি না হইল, সর্ব্বদাই আপনার গায়ের গহনা মেয়ের গায়ে পরাইতে ব্যস্ত—"মা গো! আমার গায়ে যে মানান হয় না"—"তা হৌক, তুই দশ বৎসর পরে হইবে"—"তখন ত মা, ওরূপ অলঙ্কারভঙ্গি থাকিবে না"—"তা' না থাকুক্, আমি ত দেখিয়া চক্ষু সার্থক করি।" কাযেই বঙ্গভাষা আপনার অঙ্গযষ্টি মায়ের অলঙ্কারের উপযোগিনী করিবার জন্য নিয়ত ব্যস্ত। ইহাতে বঙ্গভাষা বিপুল ঐশ্বর্য্যময়ী হইয়াছে। ঐশ্বর্য্যে কার্য্যতৎপরতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, সুতরাং কিসে কার্য্যতৎপরতার সহিত ঐশ্বর্য্যের সামঞ্জস্য হয়, সে ভাবনাও ভাবিতে হইতেছে। এই কথাতে আমরা সেই পুরাতন কথায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম, ভাষা কতটা সংস্কৃতানুসারিণী, আর কতটাই বা প্রাকৃতানুসারিণী হইবে, তাহারই ভাবনা। সে কথার একটু আলোচনা না হয় পরে করিব, এখন যাহা বলিতেছিলাম, তাহা প্রথমে শেষ করি—আমরা অধিকাংশ লোক নিরামিষ-সংযতাহারী, মারামারি কাটাকাটি কম করি, জগতের উৎকৃষ্ট ফলমূল উপভোগ করিবার আমাদের দীনদরিদ্রের যে সুবিধা আছে, তাহা অন্য স্থানের ধনিসন্তানেরও নাই। জগতের মধ্যে উৎকৃষ্ট সঙ্গীত আমরা উপভোগ করি; দীনদরিদ্র পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট স্তোত্র পাঠ করিয়া দেবতার আরাধনা করি; উৎকৃষ্ট সাহিত্য, কাব্য, নাটক আমাদের সম্পত্তি, আমাদের প্রাকৃতভাষা সর্ব্বপ্রকার ভাবপ্রকাশের উপযোগিনী। সুতরাং আমাদের আপনা-দিগকে লঘু মনে করিবার, হেয় মনে করিবার বিশেষ কারণ নাই। তবে

আমাদের এই সমৃদ্ধি আমরা আমাদের আলস্যে নষ্ট করিতে বসিয়াছি বটে, এবং সেই কথা সর্ব্বশেষে বলিব।

এক্ষণে বঙ্গভাষার গতি সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব। আমাদের এতদঞ্চলের ভাষা অনেক স্থলেই প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। এই ভাষায় যাঁহারা গ্রন্থ লেখেন, তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা হয় যে, সেই ভাষায় যেন তাঁহারা প্রাদেশিক চলিতভাষা ব্যবহার না করেন, তাহা হইলে অন্য প্রদেশের লোকদিগের, বিশেষ বালকদিগের বোধসুকর হয় না, তাহারা অনর্থক বিড়ম্বিত হয়। একটি দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছি। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় উত্তম বাঙ্গালা লেখেন, তাঁহার ভাষা ভাল, ভাব ভাল, তিনি চিন্তাশীল সুলেখক। তিনি "শিশু-শরীর-পালন" প্রভৃতির গ্রন্থকার ৺যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় ঐরূপ দোষারোপ করিয়াছেন। বলিয়া রাখি, যদুবাবুর ভাষা অতি প্রাঞ্জল, বুঝিতে কষ্ট হয় না, সেই ভাষায় চৌধুরী মহাশয় দোষ দেখিতেছেন। যদুবাবু লিখিয়াছেন—জ্বরের পর 'পল্‌তার ডালনা' পথ্যরূপে খাওয়া ভাল। এই 'পল্‌তার ডাল্‌না' কথার উপর চৌধুরী মহাশয়ের ঘোর আপত্তি! পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি, আমি চৌধুরী মহাশয়কে শ্রদ্ধা করি। শ্রদ্ধা করি বলিয়াই তাঁহার আপত্তির কথা এখানে তুলিলাম। তিনি বলেন—'পলতার ডালনা' বলিলে আমাদের উত্তরাঞ্চলের বালকেরা, বালকেরা কেন, হয় ত গুরুমহাশয়েরাও কিছুই বুঝে না। কেন না, তাহারা পল্‌তা কি, তাহা জানে না, এবং ডালনা কাহাকে বলে, বুঝে না। যদুবাবুর লেখা উচিত ছিল—'পটলপত্রের ব্যঞ্জন'। এই সমালোচনে আমার ঘোর আপত্তি আছে। পটল-লতা—এই দুইটি শব্দের শীঘ্র উচ্চারণে পল্‌তা শব্দ জন্মিয়াছে; সকল ভাষাতেই এরূপ হয়; সেই শব্দকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আবার দুইটি বিভিন্ন শব্দ করাই কি সাধু পরামর্শ? আর একটি ঠিক ঐরূপ শব্দ লওয়া যাউক—নল এবং তিতা, এই দুইটি শব্দের যোগে 'নাল্‌তে' শব্দ হইয়াছে। নল অর্থে যে পাট, আমাদের ছাত্র ও গুরু কেহই জানে না; এখন যদি চৌধুরী মহাশয়ের পরামর্শমত আমরা 'নাল্‌তিতা' কিনিতে বাজারে যাই, তাহা হইলে ক্রেতা বিক্রেতা কেহ কিছু না বুঝিলে অবশ্য ফিরিয়া আসিতে হইবে; অথচ সংক্ষিপ্ত শব্দ 'নাল্‌তে' ব্যবহার করিলে, আর কোনও গোলযোগ নাই। সেইরূপ পটল-লতার সংক্ষিপ্ত শব্দ যদি কোনও অঞ্চলে না বুঝে, একবার বুঝাইয়া দিলেই চিরকাল চলিবে। নিত্য-ব্যবহার্য্য শব্দ সংক্ষিপ্ত করিতেই সকলে ব্যস্ত, তাহাতে বাধা দেওয়া ভাল নহে। 'ডালনা'র পরিবর্ত্তে ব্যঞ্জন শব্দ ব্যবহার করিতে বলাও ভাল উপদেশ

নহে। 'ব্যঞ্জন' হইল সাধারণ নাম;—বিশেষ নাম হইল—ডাল্‌না, চড়চড়ি, সড়সড়ি ইত্যাদি। বিশেষ নাম হয় ত সকলে জানে না, বা পায় নাই; তা বলিয়া কি চিরকালই সাধারণ নাম দিয়া কথা কহিতে হইবে? তাহা হইলে ব্যঞ্জনের বৈচিত্র্যও হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে ভাষার বৈচিত্র্যও হইবে না। অনেক স্থলে শাক, ঝাল, মাছ, অম্বল, এই চারিটি নাম বই আর কিছু জানে না, দশপ্রকার ব্যঞ্জন করিলেও ঐ চারিটি নাম চালাইয়া লয়, বলে,—কাঁটালের ঝাল, কলাফুলের ঝাল, আলুর ঝাল, ইত্যাদি; সেই অবস্থাই ভাল, না ব্যঞ্জনেও বৈচিত্র্য, ভাষাতেও বৈচিত্র্য থাকাই ভাল?

আমাদের এতদঞ্চলের কোনও কোনও খ্যাতনামা লেখক নাকি কর্‌চি, যাচ্চি শব্দের এইরূপ আকার চালাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে এইরূপ চেষ্টার প্রতিবাদ করি। Do not যোগ হইয়া অর্থাৎ শীঘ্র উচ্চারিত হইয়া don't এই আকৃতি ধারণ করে; কথা কহিবার সময় অনেক সাহেবশুভাই don't বলিয়া থাকেন; তাই বলিয়া কি কোনও গম্ভীর প্রবন্ধে কেহ don't এইরূপ পদ ব্যবহার করিবেন? তাহা কখনই করিবেন না—এখানে ভাষার পার্থক্যের কথাই হইতেছে না, বরঞ্চ ধরিতে গেলে বানানের পার্থক্যের কথাই হইতেছে। ক্বচিৎ কখনও প্রাদেশিক সংক্ষেপ-বিধান গ্রাহ্য হয় বটে, তাই বলিয়া কি লিখিত ভাষার উপর জবরদস্তি কথিত-ভাষার সংক্ষেপ-বিধান চালাইতে হইবে? তাহা কখনই হইবে না। আর এক স্থলেও ভাষাকে জবরদস্তি সংক্ষেপ করিবার চেষ্টা আছে; সে চেষ্টাও ভাল নহে। যাচ্চি, হচ্চি প্রভৃতির যে চেষ্টা, তাহা হইল বানান বদলের চেষ্টা, কিন্তু যেটি এবার বলিব—সেটি ব্যাকরণ-পরিবর্ত্তনের চেষ্টা। যে স্থলে আমরা লিখি—"এই কথাটা আমার অভিভাষণমধ্যে না লিখিয়া আমি থাকিতে পারিলাম না"; সেই কথাটা অনেক স্থলের গণ্যমান্য লেখক লিখিবেন,—"না লিখিয়া আমি পারিলাম না"; অর্থাৎ 'থাকিতে' কথাটি অনাবশ্যকবোধে বাদ দিবেন, কাযেই বাক্যটি একটু সংক্ষিপ্ত হইবে। কিন্তু এরূপ সংক্ষেপ করা কেবল 'ব্যাকরণ' নষ্ট করা। এ কথা বড় করিয়া বলিতে গেলে কেবল গুরুমশাইগিরি হইবে, তাহা করিব না। এইটুকু বলি যে, 'পারি' সমাপিকার পূর্ব্বে প্রায় একটি অসমাপিকা বসে। করিতে পারি, যাইতে পারি, থাকিতে পারি—ইত্যাদি। যাঁহারা ইংরাজিতে পদচ্ছেদ বা analysis প্রভৃতি অতি নিপুণতাসহকারে সম্পাদন করেন, তাঁহারা ধরাইয়া দিলেও যে এই স্থূল কথাটা বুঝিতে পারিবেন না, এমন একটা ধারণাই আমি করিতে পারিতেছি না। সুতরাং গুরুমহাশয়গিরি এই পর্য্যন্ত।

সংস্কৃতবহুলা ভাষায়, নানা গুণ থাকিলেও, একটু প্রাণ কম থাকে। ভাষায় প্রাণ না থাকিলে, জীবনেও প্রাণ থাকে না, বা আসে না। সেই জন্য ভাষা যত চলিত-ভাষার কাছাকাছি থাকে, তত ভাল। তা বলিয়া ভাষায় যে গ্রাম্য শব্দ, অশ্লীল শব্দ, বা অপবিত্র শব্দ অধিক ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা নহে। আবার এ দিকেও বলি—"ভাষার পারিপাট্যসাধন করিতে গিয়া বা ভাষাকে অলঙ্কৃত করিতে গিয়া ভাষাকে গুরুভারে পীড়িত করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে।" ভাষা যত সহজ হইবে, এবং অবলীলাক্রমে লেখনীমুখ হইতে নিঃসৃত হইবে, ততই ভাল হইবে। ভাষার প্রাঞ্জলতা ভাষার প্রধান গুণ। তাহার পরে যেখানে যেমন ভাব, সেখানে সেইরূপ গুণ থাকিবে। যেখানে যেমন, কোথাও নাচিবে, কোথাও হাসিবে, কোথাও করুণ ক্রন্দনের সুরে এলায়ে এলায়ে গড়ায়ে গড়ায়ে চলিয়া যাইবে। যখন দক্ষযজ্ঞনাশ, তখন ভাষা দেখুন—

"ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে,
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে;
বাজাগণ্ড লণ্ডভণ্ড বিস্ফুলিঙ্গ ছুটিছে,
ছুল স্থূল কুল কুল ব্রহ্মডিম্ব ফুটিছে।"

কেবল যে ছন্দের বিভিন্নতায় এরূপ রস বিভিন্ন হয়, তাহা ঠিক নহে, ঐ তূণকছন্দে, দক্ষযজ্ঞধ্বংসের ছন্দে, উত্তম করুণগাথা গীত হয়—যথা গৃহদাহ-বর্ণনায়—

"ধেনুপাল আলথাল, উর্দ্ধ ফুক্ক চাহিছে,
দগ্ধকায় শারিকায় মৃত্যুগীত গাহিছে।"

ভাব ও ভাষা ঠিক থাকিলে, ছন্দ পুরাতন ভৃত্যের মত যে দিকে যাইতে বলিবে, সেই দিকে যাইবে।

ভাষার সম্বন্ধেও সেই কথা; ভাষার রীতিমত সেবা করিলে ভাষা সেবিকা হইবে, যে ভাবে লাগাইবে, সেই ভাবে যাইবে।

আমরা যতই দুঃখ করি, ক্রন্দন করি, আমাদের মনে রাখিতে হইবে, আমাদের মহদ্বংশে জন্ম। আমরা বিষয়ী হইলেও সংযমী; আমরা অল্পে সন্তুষ্ট হইতে জানি। ঋষিদিগের জ্ঞানবল, দর্শনবিদ্যা আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছি। উৎকৃষ্ট কাব্য নাটক আমাদের উপজীব্য। যে সঙ্গীত আমরা সামান্য ভিখারীর মুখে শুনিতে পাই, তাহা অন্যান্য দেশে অতি দুর্লভ পদার্থ। আমরা যে সকল স্তব-স্তোত্র পাঠ করিয়া সন্ধ্যাবন্দনা, পূজাহোম সম্পন্ন করি, তদ্দ্বারা আমাদের সাক্ষাৎ

দেবদর্শনের ফল হয়। অতিথি অভ্যাগতকে দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করি; আবার অতিথিসেবা নিত্যধর্ম্ম বলিয়া জানি। যেখানে অতিথির সাঙ্গোপাঙ্গ-সেবা করিতে পারি না, সেখানে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া, সুশীতল পানীয় দিয়া, অতিথির সন্তোষসাধনের চেষ্টা করি। সামান্য সামগ্রীসম্ভারে আমাদের গৃহস্থালী ব্যাপার জগতের শিখিবার জিনিস। যদি কেবল সোনা-দানা, গাড়ী-বাড়ী, ঘড়ি-জুড়ী লইয়া, কলকব্জা কারখানা লইয়া জাতীয় গৌরবের নির্দ্ধারণ না হয়, যদি সত্য, সহিষ্ণুতা, দয়া, ধর্ম্ম, ভালবাসা, ভক্তি, পুরুষের সাধুতা ও নারীর পাতিব্রত্য লইয়া জাতীয় গৌরব স্থির হয়, তাহা হইলে আমরা জঘন্য বা নগণ্য নহি, পরন্তু আমাদের আপনা-আপনি সন্তুষ্ট থাকিবার যথেষ্ট উপচার আছে। পাঁচ জনে আমাদিগকে ক্ষুদ্র বলাতে আমরা সরলভাবে বুঝিয়াছি যে, আমরা ক্ষুদ্র। এই বোধ আমাদের অনেকের মধ্যে তামসভাব আনিয়াছে; আমাদিগকে অলস-প্রকৃতি করিয়া তুলিতেছে। সকলের সমবেত চেষ্টায় এই তামসভাব বিদূরিত করিতে হইবে।

আমাদের অবহেলায়, আলস্যে, ঔদাসীন্যে—আমাদের দেশ বড় অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে। এই অস্বাস্থ্যতানিবন্ধন আমরা আমাদের সর্ব্বস্ব খোয়াইতে বসিয়াছি। বহুকাল যাবৎ আমি সকলের চক্ষু উন্মীলিত করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়া আসিতেছি, সমগ্র বঙ্গের সমস্ত সাহিত্যসেবীদের নিকট উপর্য্যুপরি দুই বৎসর কাতরে আবেদন নিবেদন করিয়াছি, করিয়া প্রায় নিরাশার পঙ্কে নিমজ্জিত হইতেছিলাম, এ বৎসর এই জীর্ণ প্রাণে আশার সঞ্চার হইয়াছে। দেশের অনেক গণ্যমান্য লোক আমার চক্ষে বঙ্গের দুর্দ্দশা দৃষ্টি করিতেছেন; প্রথমেই সুরেন্দ্র বাবুর কথা বলিব; তাঁহাকে সকলেই জানেন, আমি ভালরূপে চিনি—অনেক সময় অনেক বৎসর তাঁহার সঙ্গে একত্র দেশের সেবা করিয়াছিলাম; তাঁহার হৃদয় আছে, উৎসাহ আছে, ক্ষমতা আছে; এ হেন লোক যে দেশের কোন্ অভাবটা অগ্রে দূর করিতে হইবে, তাহা যদি না বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে নির্জ্জনে নিশীথে ভগবানের পদপ্রান্তে মাথাকুটা ছাড়া আর কি উপায় আছে? এতদিনে ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন; আমাদের ক্রন্দনধ্বনি তাঁহার সিংহাসন স্পর্শ করিয়াছে; তিনি আপনার চিহ্নিত সন্তানের চমক ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন।

"There can be no gainsaying the fact that Bengal villages have now been mostly thinned by Malaria, Cholera and such other fell diseses, * * * So the first thing needful is to make the rural areas fit for habitation before any economic

experiment can be even so much as thought of. * * * Reform of social abuses, abandonment of injurious customs, the promotion of education may wait, but to free the villages from Malaria is the condition precedent to all other reforms. Malaria will not respect a villager because he has ceased to spend much on marriages or look down on a member of inferior caste, * * Neither does the talk of promotion of education inspire much hope in those, who knew that it is the infant population that readily succumb to Malaria, In fact the village population of Bengal stands in need of the same immediate relief from Malaria, as people suffering from such natural visitation of flood, famine or earthquake, We need immediate organised efforts on the part of the people and the Government to improve the sanitary condition of rural Bengal," Bengalee, Feb. 4, 14.

এর আর অনুবাদ করিব কি? সমস্তই আমার পুরাতন কথা—দেশ হইতে ম্যালেরিয়া, অস্বাস্থ্য বিদূরিত করিতে না পারিলে, আমাদের দেশের কোনই উন্নতি হইবে না। আমার কথা সুরেন্দ্র বাবু বলিতেছেন বলিয়া আমি কি অহঙ্কার প্রকাশ করিতেছি?—হা হরি! তা' কেন করিব? আমার যে আজি আনন্দ হৃদয়ে ধরে না, তাই হাসিতে গিয়া কাঁদিয়া বলিতেছি—ও গো। ও আমারই কথা, আমারই কথা, এতদিন কেহ ভাল করিয়া শুনেন নাই গো!—এখন সুরেন্দ্র বাবুর লেখনী মুখে ঐ কথা শুনিয়া আমার বড়ই আহ্লাদ হইয়াছে। আপনারা যদি একটু কান পাতিয়া শুনেন, এবং তলাইয়া দেখেন, তা' আপনারা সকলেই ঐ কথা বলিবেন—

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।"

"অমৃতবাজার" চিরদিনই পল্লীজীবনের সুখদুঃখ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ, এবং বাঙ্গালার অস্বাস্থ্যতার কথা উহাতে আলোচিত হয়। তাহাতে এই বৎসর শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল ঘোষ মহাশয় সরকারসমীপে পল্লীর দুর্দ্দশা সম্বন্ধে যে "নোটস্" অর্থাৎ বিবরণী দিয়াছেন, তাঁহাতে অতি দক্ষতাসহকারে দেখাইয়াছেন যে, দেশের অস্বাস্থ্যতাই দেশের প্রধান শত্রু। তাঁহার লেখা পড়িলেই কাঁদিতে হয়।

শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এক জন সদাশয় সহৃদয় যুবক—বহরমপুর কলেজের প্রফেসর। তিনি পল্লীরক্ষা সম্বন্ধে সাময়িক পত্রে বিশেষ আলোচনা করিতেছেন, প্রধানতঃ প্রজার দারিদ্র্যের কথা বলিতেছেন; দেশ যে বিষম অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে, এ কথা ভাল করিয়া বলেন নাই। সেই পল্লীরক্ষা-প্রবন্ধের আলোচনা-অবসরে "আর্য্যাবর্ত্ত" বলিতেছেন—"এই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ-বৃদ্ধিই যে বাঙ্গালার গ্রামগুলির অবনতির সর্ব্বপ্রধান কারণ, আর সেই কারণ দূর করিতে

না পারিলে যে পল্লীরক্ষার কোনও উপায়ই করা যাইবে না, সে কথা তিনি যেমন করিয়া বলিবেন, আশা করিয়াছিলাম, তেমন করিয়া বলেন নাই, ইহাই আমাদের দুঃখ।” দুঃখ বৈ কি! বলে,—

আধা ব্যথার ব্যথিত,
আধা পথের পথিক,
মাঝ-পথে ফেলে যায়,
দুঃখ কেবল বেড়ে যায়।

৺দ্বিজেন্দ্রলালের জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, আমাদের সাহিত্য-সেবিগণের নিকট অপরিচিত নহেন; তিনি চিন্তাশীল সুলেখক বলিয়াই পরিচিত; তিনি অগ্রহায়ণের ‘সাহিত্যে’ বাঙ্গালা ‘সাহিত্যের প্রকৃতি ও গতি’ পর্য্যালোচনার অবসরে ম্যালেরিয়ার কথা তুলিয়াছেন—দেশের দুরবস্থার কথা বিবৃত করিয়াছেন; বিশেষ হৃদয়গ্রাহী লেখা বলিয়া সেইটুকু আপনাদিগকে উদ্ধৃত করিয়া শুনাইতেছি:—

“গৃহে গৃহে মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা, ঘরে ঘরে অকালমৃত্যুর শোক; সুস্থ নরনারীপূর্ণ কোলাহলময় জনপদসমূহ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে ও হইতেছে, যেখানে পূর্ব্বে সুরম্য হর্ম্মরাজি বিরাজ করিত, পণ্যবীথিকায় রাজবর্ত্ম সুশোভিত ছিল, যে স্থান দিবসে ব্যবসায়িগণের গুঞ্জনে মুখরিত হইত, রজনী-সমাগমে যে স্থান পৌরজনের সুখময় গীতবাদ্যে, সেতার-তানপুরা-মৃদঙ্গধ্বনিমিশ্রিত কলকণ্ঠগীতিতে নিনাদিত হইত, যে স্থানে সখিজনের মধুর সঙ্গীত পল্লীপথে কাঁপিতে কাঁপিতে আকাশে সমুত্থিত হইয়া চারি দিকে পল্লীবাসিগণের উপর সুধাবর্ষণ করিত,—অদ্য সেই স্থানে শৃগালব্যাঘ্রসর্পসঙ্কুল অরণ্য বিরাজ করিতেছে, এবং মধ্যে মধ্যে তাহাদের ভীষণ গর্জ্জনে শব্দিত হইতেছে। যেখানে ব্রহ্মচর্য্য-গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইত, যেখানে শাস্ত্রকল্প অনুশাসিত হইত, যেখানে প্রতিদিন সন্ধ্যার পর মন্দির ঘণ্টা-কাঁসর-নিনাদে প্রতিধ্বনিত হইত, আরতির পবিত্র আলোকে আলোকিত হইত, পুরুষগণ ও অবগুণ্ঠনবতী কুলবধূগণ দেবপূজার জন্য দলে দলে সম্মিলিত হইত, অদ্য সে স্থানে ভগ্নমন্দিরারূঢ় অশ্বত্থ বৃক্ষে পেচকে ঘূৎকার শব্দ করিতেছে, মন্দিরের অভ্যন্তরে চর্ম্মচটিকা উড়িতেছে, মূষিক ও সরীসৃপ বাস করিতেছে। আর চতুর্দ্দিকে অরণ্যে বায়ু যেন অবসাদের ও দুঃখের নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে অসৎকৃত প্রেতাত্মার ন্যায় বিচরণ করিতেছে। আর ভগ্নগৃহসমূহের ইষ্টকস্তূপ হইতে মৃত্যুশয্যায় শায়িত গৃহস্থের মৃত্যুযন্ত্রণাধ্বনি—শোকক্ষিপ্ত স্বজনের আর্ত্তনাদ যেন আজিও থাকিয়া থাকিয়া নৈশ-নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া আকাশমার্গে ঘুরিতেছে।” জ্ঞানেন্দ্র বাবুর এই

লেখা একটুও অতিরঞ্জিত নহে। তিনি সাহিত্যের ঝোঁকে, শব্দবিন্যাস-ঘটার প্রলোভনে এই বর্ণন করেন নাই; তিনি ভুক্তভোগী, চারি দিকে তাঁহার দৃষ্টি আছে, হৃদয় আছে—বলিবার বা লিখিবার শক্তি আছে।

এই সাহিত্য-সম্মিলনের নাম কলিকাতা ও চব্বিশ-পরগণা সাহিত্য-সম্মিলন। আপনারা যে কেবল কলিকাতার কলের জল খাইয়া তাড়িতবীজনে শীতল হইয়া কাটাইবেন, সেটা ত ভাল কথা নহে। চব্বিশ-পরগণার দিকেও দৃষ্টিপাত করিবেন। চব্বিশ-পরগণার হালিসহর অতি গণ্ডগ্রাম এবং বঙ্গসাহিত্যের তীর্থ-ক্ষেত্র—রামপ্রসাদ, ঈশ্বর গুপ্তের জন্মভূমি। সেই সাহিত্যতীর্থের বর্ত্তমান অবস্থা যদি এখন একবার দেখেন, তখন বুঝিবেন, জ্ঞানেন্দ্র বাবু পল্লীর দুর্দ্দশা অতিরঞ্জন করিবেন কি, সম্যক পরিস্ফুট করিতে পারেন নাই। আমার একটি দৌহিত্রীর হালিসহরে বিবাহ দিয়াছি। যে রাত্রি পাকাপত্র করিয়া ফিরিতেছিলাম, সেই রাত্রি ব্যাঘ্রগর্জ্জনের শব্দে আমরা সন্ত্রস্ত হইলাম। বিবাহ হইয়া গেল, আট দিনের মধ্যে দৌহিত্রী ফিরিয়া আসিল—তাহারই মুখে শুনিলাম, তাহার পূর্ব্ব রাত্রিতে তাহার শ্বশুরের গোয়াল হইতে ব্যাঘ্রে গাভী লইয়া গিয়াছে। কর্কেনওয়েল গির্জ্জার সার্সী ভাঙ্গার পর গ্লাড্‌ষ্টোন বলিয়াছিলেন, এতদিনে আয়র্লণ্ডে আত্ম-শাসনের কথা practical politics হইল—আমি আপনাদিগকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করি—আমাদের এই ম্যালেরিয়া ব্যাপার কি এখন practical politics হয় নাই? জ্ঞানেন্দ্র বাবু সাহিত্যসেবিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—"হে সাহিত্যিকগণ! সৌখীন-বিলাসিনী রচনার প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্যপালনে উদাসীন থাকিবেন না। গবেষণা—ভাল, আবশ্যক। জীর্ণপুঁথি উদ্ধার করিতেছেন—বেশ। কিন্তু বঙ্গবাসীর জীর্ণদেহ উদ্ধার করা—তাহাও কি আপনাদের আলোচ্য বিষয় নহে, গুরুতর কার্য্য নহে? পুরাতত্ত্ব আলোচনা করিয়া বাহির করিতেছেন,—করুন, নিরস্ত হইতে বলি না। কিন্তু বর্ত্তমানতত্ত্ব, বর্ত্তমান জীবন-মরণাত্মক সমস্যা, তাহারও আলোচনা, সমাধান করুন। সাহিত্য বিজ্ঞানকে টানিয়া আনিবে, তখন দেশে সাহিত্য ও বিজ্ঞান, নিতাই-নিমাইয়ের ন্যায়, শান্তি-কল্যাণীর ন্যায়, শিব ও শক্তির ন্যায়, মিলিত হইয়া স্বদেশবাসিগণকে উদ্ধার করিবে, জীবন দিবে, মুক্তি দিবে।"

এই সকল লেখা দেখিয়াই আমার বুড়া হাড়ে আবার জীবনী পাইয়াছি। গবর্মেণ্ট ত পল্লীর স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ ব্যগ্র, কিন্তু আমাদের পোড়াকপালের কথা বলিতে লজ্জা হয়, গবর্মেণ্ট স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য জেলায় জেলায় যে টাকা

জেলাবোর্ডের হস্তে প্রদান করিয়াছেন, সে টাকা সদস্যগণ নাকি ব্যয় করিবার সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। গবর্মেণ্ট ইহাতে বড় দুঃখিত হইয়াছেন। গবর্মেণ্ট সরকার হইতে কতকগুলি কাম্বেলি ডাক্তার নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোর, হুগলী প্রভৃতি জেলায় নিযুক্ত করিয়াছেন, আর ম্যালেরিয়ার বীজাণু-পরীক্ষায় বিশেষ দক্ষ এমন ক'জন ভাল ডাক্তার তাঁহাদের উপর তত্ত্বাবধায়করূপে নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহাদেরই এক জনের মুখে শুনিয়াছি—গবর্মেণ্ট থানা ভাগ করিয়া বালকবালিকার প্লীহাযকৃতের সংখ্যাবধারণ করিতেছেন—মুশিদাবাদ জেলার কয়েকটি গ্রামে এক শত বালকবালিকার মধ্যে নব্বই জনের প্লীহা যকৃত স্ফীত বলিয়া গণনা করা হইয়াছে। ব্যাপার বিশেষ গুরুতর বটে, কিন্তু এতকাল পরেও যে এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধান হইতেছে,—ইহাতেও আশা হয়—কালে আবার আমরা পূরা মনুষ্যত্ব লাভ করিব। গবর্মেণ্ট বিনামূল্যে কুইনাইনাদি ঔষধ প্রদান করিতেছেন, বিনামূল্যে ৪ মাস করিয়া লোকের বাড়ী বাড়ী চিকিৎসক প্রেরণ করিতেছেন—নদী খাল বিল যে সকল স্থলে ভরাট হইয়াছে, সেইগুলি বহতা করিবার জন্য অল্প স্বল্প ব্যয় করিতেছেন, কিন্তু গবর্মেণ্ট জঙ্গল কাটার জন্য রীতিমত ব্যয় করিতে ইচ্ছুক নহেন। তবে এ বৎসর পরীক্ষাস্বরূপ দুই এক স্থলের জঙ্গল কাটাইবেন মাত্র। গবর্মেণ্টের এই ভঙ্গি আমরা ভাল বুঝি না—কৌন্সিলে বজেট-বিবরণীর আন্দোলন-অবসরে কোনও কোনও সদাশয় সভ্য এই কথা সরকারের কাছে নিবেদন করিয়াছেন, কিন্তু সে কথায় যে কোনও ফল ফলিবে, তাহা বোধ হয় না। যাহা হউক্, এখন যখন নূতন Sanitary Board, Sanitary Engineer এবং জেলায় জেলায় Sanitary Inspector হইতে চলিল, তখন কালে সুফল ফলিবার আশা একেবারে দুরাশা না হইতে পারে। যাহা হউক্, আমরা অনর্থক আশা করিতেছি, এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ আর নাই। বেশ মনে লাগিতেছে, হাওয়া ফিরিয়াছে, সুর বদলাইয়াছে, পূর্ব্ব গগনে প্রভাতারুণের অপূর্ব্ব ছটা দেখা দিয়াছে। আপনারা নৈরাশ্যের, ঔদাস্যের মোহমায়া কাটাইয়া গাত্রোত্থান করুন। একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখুন, জ্বররাক্ষস, ম্যালেরিয়া রাক্ষসী বাঙ্গালার কি দুর্দ্দশা করিয়াছে। দেখুন, তাহার পর স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখুন, আমরা কি উপায়ে সেই রাক্ষস-রাক্ষসী দূরীভূত করিতে পারি। আমরা যখন কলেজ ছাড়িয়া সংসারে প্রবেশ করিবার জন্য উদ্যোগ করিতেছিলাম, তখনকার বিভীষিকা আপনাদের কাছে একটু বলি;—সন্ধ্যার পর আমরা যেখানে যাইতাম, সেইখানেই সুরাসেবনের অনুরোধ অতিথির সম্বর্দ্ধনা করিত।

বিবাহাদি ক্রিয়ায় প্রায়ই সর্ব্বত্র মদের ঢলাঢলি হইত। ঐ যে কলেজ স্কোয়ার বা গোলদীঘী, উহার চারি দিকে প্রস্তুত কুক্কুটমাংস বার চৌদ্দখানা দোকানে বিক্রীত হইত। তাহার পর, বড় লোকের বড় কথা, হোটেল খানসামা ত ছিলই, এখনও কলিকাতায় আছে, এবং মফস্বলের দুইটি নগরে কিছু কিছু আছে। কোথাও কোথাও নাই বলিলেই হইল; তখন আমাদের সম্মুখে কদমতলার পুষ্করিণীতে প্রতি রবিবার বেলা ১টার পর ১০।১২টী যুবক মদ্যপানে বিভোর হইয়া মহিষের মত জলে সন্তরণ দিতেন। শনিবার রাত্রি ছিল,—আশঙ্কার আধার। কখন কার বাড়ীতে কিরূপ অত্যাচার হয়, তাহা কেহই গণনা করিতে পারিত না। তখন ছিল—

গো টু হেল্ হিন্দুয়ানি ন্যাড্ শাস্ত্র আর্ কি মানি,
ম্যাড্ হ'য়ে আর কি থাকিব ?
ভেরি গুড্ চল তবে ডুবিয়া ভবের টবে
রোষ্ট খানা সকলে খাইব।

কথায়ও যা', কাজেও তাই। তখনকার ভাবগতিক দেখিয়া কেহই মনে করিতে পারিত না যে, এই বাঙ্গালী আবার পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বাঁচিয়া থাকিয়া বাঙ্গালা ভোগদখল করিবে। মনে হইত, এই পুরুষেই শেষ—পিণ্ডান্তপিণ্ড শেষ। তাহার পর ব্যভিচার; জেলার নগরে নগরে অনেক সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারী, উকীল, মোক্তারের রক্ষিত স্ত্রীলোক ছিল; সন্ধ্যার পর ঐরূপ স্থানে আমোদ প্রমোদের উপায় না থাকিলে বিষয়ী লোকের সম্ভ্রমই থাকিত না। হঠাৎ কোন জেলার সদরে উপস্থিত হইলে, ও পরিচিত লোক না থাকিলে, বেশ্যালয়ে বাসা লওয়া ব্যতীত ভদ্রলোকের উপায় ছিল না। এখন আমরা সেই দুর্দ্দিনের দারুণ দুর্দ্দশা কাটাইয়া উঠিয়াছি। ভগবৎকৃপায় বাঙ্গালী চরিত্রে বল পাইয়াছে। আবার সেই ভগবানের কৃপাতেই আমরা এই দারুণ দুর্দ্দশা কাটাইয়া উঠিব। নিরাশ হইবার কোনও কারণ নাই। দিনের পর রাত্রি হয়, রাত্রির পর দিন হয়। আমাদের রাত্রি কাটিয়াছে, তামস-মোহ বিদূরিত হইয়াছে, উঠুন, গাত্রোত্থান করুন, চক্ষু মেলিয়া চারি দিকে দেখুন ও কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন। আমাদের আলস্যে, ঔদাস্যে, অবহেলায়, অশ্রদ্ধায় ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—স্বভাবপ্রদত্ত এই পঞ্চভূতের অধিকার হইতে আমরা বঞ্চিত হইতে বসিয়াছি; দেশে এমন জঙ্গল হইয়াছে, মাটীতে আর রৌদ্র হাওয়া পায় না, সেঁতা ঘরে, ভিজা উঠানে, প্রান্তরের জঙ্গলে আমরা আপনারাই মাটী হইয়া যাইতেছি। নদী নালা ভরাট হইয়াছে, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার হয় না। স্নান-

পানের জন্য, পাকের জন্য পরিষ্কার পয় আমরা আর পাই না। সূর্য্যের তেজে, রৌদ্রে সকলের সমান অধিকার, কিন্তু বাস্তবাটীর চারি দিকের জঙ্গলে অনেক স্থলে সূর্য্যের মুখও দেখিতে পাই না। বায়ু দূষিত হইয়াছে, গাছ পালার বিস্তারে বায়ু খেলিতে পায় না, পরিষ্কার আকাশ দেখিতে হইলে মাঠে যাওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। দেখুন আমরা সকল দিকেই বঞ্চিত—ঘর থাকিতে বাবুই ভেজে। আমাদের বাঙ্গালীর সকল থাকিতেও কিছুই নাই। কিন্তু আমরা ৪ কোটী ৬৩ লক্ষ। আমাদের রাজার দেশের সহিত তুলনা করিলে, আমাদের দেশ বাঙ্গালা আয়তনে কিছু কম। কিন্তু লোকসংখ্যায় প্রায় দশ লক্ষ বেশী। দেখুন, তাঁহারা বিক্রমে সমগ্র পৃথিবী ছাইয়া ফেলিয়াছেন, বিদ্যুৎ বজ্রের সহায় লইয়া, মেঘবাষ্প বাহন করিয়া পৃথিবীতে একছত্র হইয়াছেন। আমরা অনুকরণ ভালবাসি, আসুন না আমাদের সমস্ত অধিবাসীর শতাংশের একাংশ গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া, জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া, পুষ্করিণী খনন করিয়া, জলপ্রবাহ, বায়ুপ্রবাহ পরিষ্কার করিয়া, আমাদের দেশ বাসোপযোগী করি।

বাঙ্গালী সাহিত্যসেবায় কিছু অবহেলা করিয়াছিল বটে, আপনার স্বাস্থ্যোন্নতির দিকে দৃষ্টিদান করে নাই বটে, কিন্তু এ ভাব আর বহুদিন থাকিবে না—এই শুভ-সম্মিলনেই আমরা বুঝিতেছি, এ দুর্দ্দিন থাকিবে না। এই যে রাজপুরুষেরা আমাদের এই সম্মিলনে আদরে স্বেচ্ছায় যোগদান করিয়াছেন, একমনে সহিষ্ণুতা-সহকারে অধমের ভগ্নকণ্ঠের এই কর্কশ কাকু শুনিতেছেন, এই যে মহামান্য গবর্ণর সাহেব বাঙ্গালা শিখিয়া পূর্ব্বে দুই স্থানে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, অদ্য এই সভার উদ্বোধন করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিলেন—এ সকল ক্ষণিকমঙ্গলের লক্ষণ নহে, প্রত্যুত চিরমঙ্গলের সূচনা। তাহার পর আমাদের আপনাদের মধ্যেও সাড়া পড়িয়াছে; মহামহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ দলে দলে সভাতে উপস্থিত হইয়া বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করিতেছেন, নাটোর-মহারাজ নিয়মিত সাহিত্যসেবার সুবিধার জন্য একখানি সাময়িক পত্রের সম্পাদকতা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের বৰ্দ্ধমানাধিরাজ নিয়মিতরূপে তাঁহার বিদেশভ্রমণের ধারাবাহিক বৃত্তান্ত বাঙ্গালা সাময়িক পত্রে বাহির করিতেছেন। এমন ভরসা করা ধৃষ্টতা হইবে না যে, তিনিও একখানি সাময়িকপত্রের সমস্ত ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া আমাদের রাঢ়াঞ্চলের প্রগাঢ় অন্ধকার অচিরে দূর করিবেন।

বৰ্দ্ধমানের সবজজ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রবিজয় বসুর উদ্যোগে এবং মহারাজের

অনুগ্রহে বর্দ্ধমানে সাহিত্য-সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—সুতরাং বর্দ্ধমান হইতে কোনরূপে সাহিত্য-পত্রের প্রতিষ্ঠা একেবারে আব্দারের কথা নহে।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু প্রকৃত পরিশ্রমী, সাহিত্যসেবী। আমি বিশেষ ঘনিষ্ঠরূপে বহুকাল হইতে তাঁহার সহিত পরিচিত। তিনি যে ভগবদ্গীতার অনুবাদ ও ভাষ্য ক্রমিক বাহির করিতেছেন, তাহার দুই খণ্ড বাহির হইয়াছে; উহাই এ বৎসরের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ভগবদ্গীতার নানারূপ সংস্করণ হইয়াছে, কিন্তু এমন ভাবে চুল চিরিয়া এবং এক একটি কথা ওজন করিয়া পূর্ব্বে কেহ বাঙ্গালীকে গীতা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা মনে হয় না। আজি তিন বৎসর বাঙ্গালায় বৈষ্ণবগ্রন্থ-প্রচারের চেষ্টা হইতেছে, এ বৎসরও কয়েকখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে; প্রভুপাদ শ্রীমদ্ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী এই সকল কার্য্যের নেতা; তিনি চিরদিনই আমাদের প্রণম্য ও ধন্যবাদার্হ।

আমি চট্টগ্রামের সভাপতিরূপে আপনাদের সমক্ষে দণ্ডায়মান। এই সময় চট্টগ্রাম সম্বন্ধে দুটা কথা আমায় বলিতে দেওয়া হউক—চট্টগ্রাম বাঙ্গালার এক প্রান্তে অবস্থিত বটে, কিন্তু সাহিত্যসেবায় চট্টগ্রাম মফস্বলের গ্রাম, নগর, জেলার পশ্চাৎপদ নহে। যিনি আমাদের তীর্থকার্য্যের প্রধান সহায় হইলেন, তিনিও সাহিত্যসেবী, আর ঐ যে দীনবেশে দরিয়ার পীরের মত জনতার মধ্যে লুকাইয়া রহিয়াছেন শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহেব, তিনিও বিলক্ষণ বিচক্ষণ সাহিত্যসেবী। কেবল যে নবীনচন্দ্র সেন, ছিলেন; এমন নহে, এখন ও রায় গুণাকর নবীনচন্দ্র আছেন, তিনি এক জন কবি। আমি সাহিত্য-সম্মিলনে ৩৫খানি গ্রন্থ পাইয়াছিলাম। আর বাড়ীতে সত্তরখানি পাইয়াছি। তাহার মধ্যে ১২।১৪ খানি শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে মহাশয় প্রণীত অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। যেরূপ ভরসা করিতেছি, বাঙ্গালীর দৃষ্টি বাঙ্গালার দুর্দ্দশাগ্রস্ত পল্লীগ্রামের দিকে আকৃষ্ট হইলে, এই সকল গ্রন্থ অমূল্য বলিয়া গণ্য হইবে। কাব্য উপাখ্যান অনেক পাইয়াছি বটে, কিন্তু সে সকলের বিশেষ পরিচয় এমন সভায় প্রদান করা সময়োপযোগী হইবে বলিয়া মনে করি না। তবে উপাখ্যানের মধ্যে শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত 'পুনরাগমন' বেশ সময়োচিত, দেশোচিত ও পাত্রোচিত বলিতে পারি। তবে দৈব-ব্যাপার ও স্বপ্নলীলা কিছু অতিরিক্ত থাকাতে শিল্প-কৌশল যে সুন্দররূপে রক্ষিত হইয়াছে, এমন বলিতে পারি না। এই পুস্তকের প্রথমার্দ্ধ যেমন সমীচীন হইয়াছে, শেষার্দ্ধ তেমন হয় নাই; ভরসা করি, বিদ্যাবিনোদ দ্বিতীয় সংস্করণে এই কথাটা স্মরণ রাখিবেন। গত বৎসর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়ের জয়দেবের উল্লেখ

করিয়াছিলাম। এ বৎসর তিনি রসমঞ্জরীর পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে বিস্তৃত ভূমিকা আছে; সেইটির দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের কর্ম্মকথা প্রভৃতি গ্রন্থগুলিও এই সভায় উল্লেখ-যোগ্য, তাঁহার মত চিন্তাশীল লেখক বাঙ্গালায় অতি অল্পই আছেন। আর আপনাদের সহিষ্ণুতার উপর আক্রমণ করিব না; বিশেষ মহামহোপাধ্যায় ও প্রবীণ ঠাকুর মহাশয়ের অভিভাষণ শুনিতে আমার মত আপনারাও ব্যগ্র হইয়াছেন।

আমরা সাহিত্যসেবী, এবার বঙ্গের কেন্দ্রস্থানে—কলিকাতায় সমবেত হইয়াছি—উপসংহারে আমার কথা, এই অপূর্ব্ব সম্মিলনের ফলে বাঙ্গালার স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা হউক্—সাহিত্য-মাতা সরস্বতীর নিকট ঐটি একান্ত প্রার্থনা করিয়া আমি আশা-পূর্ণহৃদয়ে তাঁহার, আপনাদের, এবং রাজপুরুষগণের জয় উচ্চারণ করিতেছি। আমাদের বাঙ্গালাদেশ ক্রমে রোগশূন্য হইয়া সরস্বতীদেবীর পূর্ব্ববৎ পীঠস্থলী হউক্— ইহাই আমার কামনা।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

সামন্ত-রাজ লোকনাথ।

পরলোকগত গঙ্গামোহন লস্কর এম্ এ মহাশয়ের পিতা অচির-পরলোকগত হরিমোহন লস্কর মহাশয় প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে একখানি তাম্রশাসন বিক্রয় করিবার জন্য বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। ডাক্তার ব্লকের রিপোর্টে জানা যায় যে, গঙ্গামোহন পাঠোদ্ধারের জন্য বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে একখানি তাম্রশাসন লইয়া গিয়াছিলেন। লস্কর মহাশয়ের আনীত তাম্রশাসন সেই তাম্রশাসন বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছিল। এই সকল কারণে, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি তাহা ক্রয় করিতে অসম্মত হইলে, বৃদ্ধ হরিমোহন পাঠোদ্ধারের জন্য তাম্রশাসনখানি কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত সমিতির নিকট রাখিয়া গিয়াছিলেন; তাহা তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তির পর গঙ্গামোহনের উত্তরাধিকারীর নিকট প্রত্যর্পিত হইবার জন্য প্রেরিত হইয়াছে।

তাম্রপট্টখানির অবস্থা কিছু শোচনীয়। চারিটি কোণই খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। সেই লুপ্ত কোণে ও অন্যান্য লুপ্ত স্থানে সংজ্ঞা-বাচক কয়েকটি শব্দ থাকিবার সম্ভাবনা ছিল; অন্ততঃ শ্লোকগুলির ছন্দ হইতে তদ্রূপই প্রতীয়মান

হয়। ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায়, তাম্রপট্টের নিম্নাংশ অন্যাংশের অপেক্ষা কম পুরু হইয়া গিয়াছে। কাল-প্রভাবে কোনও কোনও স্থলে অক্ষরগুলি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত; কোনও কোনও স্থলে অর্দ্ধবিলুপ্ত ও অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি এই তাম্র-পট্টখানি ও তাহার প্রতিকৃতি আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া পাঠোদ্ধারের ভার প্রদান করায়, যেরূপ পাঠ উদ্ধৃত করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা যথাসময়ে প্রকাশিত হইবে।

এই তাম্রশাসন পূর্ব্ববঙ্গের ত্রিপুরা জিলায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, এবং ত্রিপুরা ষ্টেটের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ম্যাক্‌মিন্ সাহেব কর্তৃক ইহা বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীতে প্রেরিত হইয়াছিল। প্রাপ্তি-স্থানের নামানুসারে ইহা "ত্রিপুরা-শাসন" নামে অভিহিত হইতে পারে। যে অক্ষরে শাসন-লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে, তাহা মাগধ-কুটিলাক্ষর বলিয়াই প্রতিভাত হয়। হর্ষবর্দ্ধনের বাঁশখারা শাসনের, কামরূপাধিপতি ভাস্কর বর্ম্মার [শ্রীহট্ট পঞ্চখণ্ডে প্রাপ্ত নবাবিষ্কৃত] তাম্রশাসনের, উত্তর কালের গুপ্তবংশীয় মগধেশ্বর মহারাজ আদিত্যসেনের অপ্‌সড় শিলালিপির, ও সেই বংশেরই শেষ মহারাজ দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের দেওবরণার্ক [দেব বরুণার্ক] শিলাস্তম্ভলিপির অক্ষর পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ত্রিপুরা-শাসনের লিপিকে সপ্তম-শতাব্দী-প্রচলিত কুটিল-লিপি বলিতেই প্রবৃত্তি হয়। এই লিপির কোনও কোনও অক্ষরের সহিত ফরিদপুর জিলার ঘাগ্রাহাটীতে আবিষ্কৃত মহারাজাধিরাজ সমাচার দেবের সময়ের তাম্রশাসনের কোনও কোনও অক্ষরের সাদৃশ্যও পরিলক্ষিত হয়। অষ্টম নবম শতাব্দীর অক্ষরে লিখিত ঢাকা জিলার আসরফপুরে আবিষ্কৃত বৌদ্ধনরপতি দেব খড়্গের তাম্রশাসনের কোনও কোনও অক্ষরের সহিতও আলোচ্য শাসনের কোনও কোনও অক্ষরের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ডাক্তার ব্লক ত্রিপুরা-তাম্রশাসনের লিপিকাল নবম-দশম শতাব্দীতে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন কেন, তাহার কারণ উল্লেখ করেন নাই।

এই তাম্রশাসনে একটি সুবৃহৎ মুদ্রা সংযুক্ত আছে। তাহাতে পদ্মাসনে দণ্ডায়মানা "শ্রী" বা "লক্ষ্মী"র মূর্ত্তি উৎকীর্ণ। দেবীর পাদমূলে পূর্ব্বকালের উত্তর-ভারতীয় গুপ্ত-নরপতিগণের সমসাময়িক লিপিতে উৎকীর্ণ একটি পংক্তিতে লিখিত আছে—"কুমারামাত্যাধিকরণস্য"। শ্রীমূর্ত্তির দক্ষিণপার্শ্বে বড় মুদ্রাটির উপরেই একটি ছোট মুদ্রায়, পরবর্ত্তী কালের কুটিল অক্ষরে উৎকীর্ণ আর একটি পংক্তিতে লিখিত আছে—"শ্রীলোকনাথস্য"। ইহা "কুমারামাত্য" নামক রাজকীয়-পদে প্রতিষ্ঠিত "লোকনাথ" নামক কোনও প্রখ্যাত পুরুষের প্রদত্ত দলীল।

এই স্থানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে—মুদ্রায় উৎকীর্ণ পংক্তি দুইটি ভিন্ন ভিন্ন কালের অক্ষরে লিখিত দেখা যায় কেন?—বর্ত্তমান শাসনের সম্পাদন-কারী রাজার কাল-নির্ণয়ে তাহার কোনরূপ সার্থকতা আছে কি না?—তাহা ক্রমশঃ আলোচিত হইবে।

লিপিটি ৫৮ পংক্তিতে সমাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু সম্প্রতি ৫৬ পংক্তি পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম দুই পংক্তির কিয়দংশ সংস্কৃত-ভাষায় গদ্যে, তৎপর ১৬শ পংক্তির কিয়দংশ পর্য্যন্ত পদ্যে, তৎপর ৫২ পংক্তির কিয়দংশ পর্য্যন্ত গদ্যে, তৎপর ধর্ম্মানুশংসী কয়েকটি শ্লোকের পর, পুনরায় শেষ পর্য্যন্ত লিপিটি গদ্যে লিখিত। তাম্রশাসনের উপরিভাগের দক্ষিণ কোণ জীর্ণ হইয়া খসিয়া গিয়াছে বলিয়া লিপি-প্রারম্ভ বুঝা যাইতেছে না। কোন্ বাসক, কোন্ কটক, বা কোন্ স্কন্ধাবার হইতে শাসন সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহাই প্রথম পংক্তির বিলুপ্ত অংশের মর্ম্ম ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কারণ, "কুমারামাত্যা……বোধয়ন্তি"—এই বাক্যের পূর্ব্বে,—"আ (া) ৎ"—এইরূপ লিখিত থাকা দেখা যায়। পঞ্চমী-বিভক্তি-সূচক এই "আৎ" অংশ—"অমুক-বাসকাৎ", "অমুক-কটকাৎ" বা "অমুক-স্কন্ধাবারাৎ" প্রভৃতির অন্যতম-রূপে উৎকীর্ণ হইয়া থাকিবে। এই শাসনের অন্য কুত্রাপি শাসন-সম্পাদন-স্থানের উল্লেখ দেখা যায় না। রীতি অনুসারে বিজ্ঞাপন সূচিত হইলে পর, নয়টি শ্লোকে লোকনাথের পূর্ব্বপুরুষগণের ও তাঁহার নিজেরও কিছু কিছু বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথম শ্লোকে রাজকবি "অষ্টমূর্ত্তিধর উজ্ঝিত-মন্মথ শঙ্কর"কে অশুভ-নিরাকরণের জন্য স্মরণ করিয়াছেন,—

"… (উ) জ্ঝিত-মন্মথঃ স জয় [তি] ধ্বস্তাশুভঃ শঙ্করঃ।"

দ্বিতীয় শ্লোকে রাজবংশের আদিপুরুষ "অধিমহারাজ" বা "মহারাজাধিরাজ" শব্দে অলঙ্কৃত ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে, যথা—

"শ্রীমান্ প্রখ্যাতকীর্ত্তিঃ প্রভবদধিমহারাজশব্দাধিকারঃ।"

এই শ্লোক হইতে ইহাও জানিতে পারা যায় যে, তিনি "মুনি-ভরদ্বাজ-সদ্বংশ-জাতঃ" ছিলেন। লোকনাথের পূর্ব্বপুরুষগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন কি না, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও, তাঁহার মাতৃকুলের কেহ কেহ "দ্বিজসত্তমঃ" "দ্বিজবরঃ" ছিলেন; তাহা পরবর্ত্তী একটি শ্লোকে উল্লিখিত আছে। কিন্তু তিনি নিজে "পারশবের দৌহিত্র" এই কথাও অন্যত্র উল্লিখিত থাকা দেখিতে পাওয়া যায়। অক্ষর-বিলোপে এই "অধিমহারাজে"র নামটি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

তৃতীয় শ্লোকে দ্বিতীয়-শ্লোকোক্ত মহারাজাধিরাজের পুত্রের বর্ণনা। এই

"প্রখ্যাতবীর্য্য" পুত্রের নামটিও সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না ; তাহা "নাথ"-শব্দ-যুক্ত ছিল বলিয়া প্রতিভাত হয় ; কারণ, শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত-বৃত্তে বিরচিত এই শ্লোকের তৃতীয় চরণের দীর্ঘস্বরযুক্ত প্রথম অক্ষরটিমাত্র বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহার পরই "নাথ" শব্দটি বর্ত্তমান আছে, এবং ভগবানের সহিত তাঁহার উপমা প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব নামটি 'শ্রীনাথঃ' হইলেও হইতে পারে। তিনি যে নাথই হউন না কেন, তাঁহার বিশেষণগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেই প্রতীতি হয় যে, তিনি বীরপুরুষ ছিলেন, এবং যুদ্ধক্ষেত্রে লব্ধকীর্ত্তি হইয়াও ধর্ম্মক্রিয়ানিরত ছিলেন ; এবং তিনি কোনও সার্ব্বভৌম নরপতির সামন্ত-রূপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, যথা,—

"সামন্তো যুধি লব্ধ-পৌরুষ-ধনো ধর্ম্মক্রিয়ৈকাশ্রয়ঃ।"

চতুর্থ শ্লোকে এই সামন্ত-রাজের পুত্রের কথা উল্লিখিত আছে; তিনিও কি-নাথ-নামা, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। কিন্তু "নাথ" হইলেও, তিনি যেন অনাথের মতই থাকিতে চাহিয়াছিলেন ; কারণ,

"সংসার-সাগর-জলোত্তরণৈক-চিত্তঃ॥"

হইয়া, তিনি গুণবান ভ্রাতুষ্পুত্রের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া, স্বয়ং নির্লিপ্ত হইয়া "ঋষিসমঃ" হইয়াছিলেন। এই অজ্ঞাতনামা ভ্রাতুষ্পুত্র কুল-সন্ততির জন্য আত্মসদৃশী কুল-লক্ষ্মীতুল্যা "পতিব্রত-গুণাভরণোজ্জ্বলা" ভার্য্যা হইতে "পুত্র-বর্য্য" প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাই পঞ্চম শ্লোকের মর্ম্মার্থ।

ষষ্ঠ শ্লোক হইতে নবম শ্লোক পর্য্যন্ত তাম্রশাসন-সম্পাদনকারী সামন্তরাজ লোকনাথের বর্ণনা। প্রথমতঃ, কবি ষষ্ঠ শ্লোকে নৃপতি লোকনাথের মাতৃকুলের পরিচয় দিয়া বলিয়াছেন,—বীরাখ্য "দ্বিজসত্তমঃ" তাঁহার প্রমাতামহ ছিলেন, এবং তাঁহার মাতামহ সর্ব্বদা নৃপগোচরে থাকিয়া "বলগণ-প্রাপ্তাধিকারঃ" অর্থাৎ সৈন্যাধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত ছিলেন। সম্ভবতঃ লোকনাথের পিতার বা পিতামহের রাজ্যকালেই তিনি সৈন্যাধিকৃত রাজকর্ম্মচারী ছিলেন।

সে যাহাই হউক, রাজা লোকনাথের মাতামহ সাধু হইলেও, 'পারশব' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

"সাধুঃ পারশবঃ সতামভিমতো মা * * শং *।"

এই 'পারশব' শব্দটি ত্রিপুরা-শাসনের একটি উল্লেখযোগ্য শব্দ। যখন অনুলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল, তখন 'পারশব' শব্দ শূদ্রার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে জাত পুত্রকে বুঝাইত। যথা, মনুঃ—

'যং ব্রাহ্মণস্তু শূদ্রায়াং কামাদুৎপাদয়েৎ সুতম্।
স পারয়ন্নেব শবস্তস্মাৎ পারশবঃ স্মৃতঃ॥"—৯।১৭৮

"কামবশতঃ ব্রাহ্মণ যদি শূদ্রার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করেন, তাহা হইলে সেই পুত্র পিতাকে নরক হইতে 'পার' করিলেও, 'শব'-তুল্য বলিয়া, 'পার-শব' নামে অভিহিত হইবে,—ইহাই স্মৃতির বিধান।" এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় কুল্লুক বলিয়া গিয়াছেন—'পরিণীতা' শূদ্রা ভার্য্যাতে উৎপন্ন পুত্রই 'পারশব'; এবং তিনি আরও বলিয়া গিয়াছেন,—

"যদ্যপ্যয়ং পিতুরুপকারার্থং শ্রাদ্ধাদি করোত্যেব তথাপ্যসংপূর্ণোপকারকত্বাৎ শব-ব্যপদেশঃ।"

অর্থাৎ, পিতার উদ্ধারের জন্য শ্রাদ্ধাদিতে তাঁহার অধিকার থাকিলেও, এই প্রকার শ্রাদ্ধাদি দ্বারা অসম্পূর্ণ উপকার সাধন করেন বলিয়া, এই পুত্রের শব-ব্যপদেশ।

সপ্তম শতাব্দীতে 'পারশব' যে সুপরিচিত ছিল, তাহার উদাহরণ হর্ষচরিতে পাওয়া যায়। মহারাজ হর্ষের সভাকবি বাণভট্ট বাৎস্যায়ন-বংশসম্ভূত চন্দ্রভানুনামা সদ্ব্রাহ্মণের পুত্র ছিলেন। তিনি নিজেই হর্ষচরিতের [প্রথম উচ্ছ্বাসে] আত্ম-জন্ম-বৃত্তান্ত লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

"অলভত চ চিত্রভানুস্তেষাং মধ্যে রাজদেবাভিধানায়াং ব্রাহ্মণ্যাং বাণমাত্মজম্।"

রাজদেবী নাম্নী ব্রাহ্মণীর গর্ভে চিত্রভানু বাণ নামক পুত্রকে লাভ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ কবি বাণভট্ট হর্ষচরিতের প্রথমোচ্ছ্বাসে সমবয়স্ক সুহৃদ্‌গণের ও সহায়গণের নামোল্লেখ-সময়ে বলিয়াছেন যে—"ভ্রাতরৌ পারশবৌ চন্দ্রসেন-মাতৃষেণৌ"—চন্দ্রসেন ও মাতৃষেণ নামে তাঁহার দুইটি 'পারশব' [বৈমাত্রেয়] ভ্রাতা ছিলেন। দ্বিতীয়োচ্ছ্বাসে কবি পুনরায় লিখিয়াছেন যে, একদিন গ্রীষ্মকালের অপরাহ্ণ-সময়ে তিনি স্বগৃহে আহার করিতেছিলেন, এমন সময় ভ্রাতা 'পারশব' চন্দ্রসেন তথায় প্রবেশ করিয়া, মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রীহর্ষদেবের কৃষ্ণনামা ভ্রাতার প্রেরিত এক লেখ-হারকের উপস্থিতি বিজ্ঞাপিত করিলেন। যথা,—

"তথাভূতে চ তস্মিন্নত্যুগ্রে গ্রীষ্মসময়ে কদাচিদস্য স্বগৃহাবস্থিতস্য ভুক্তবতোঽপরাহ্ণসময়ে ভ্রাতা পারশবশ্চন্দ্রসেন-নামা প্রবিশ্যাকথয়ৎ"—

ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, বাণভট্টের ব্রাহ্মণ পিতা চন্দ্রভানু এক শূদ্রাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং সেই শূদ্রার গর্ভজাত পুত্রই বাণের ভ্রাতা চন্দ্রসেন। চন্দ্রভানুর ন্যায়

"সরস্বতী-পাণি-সরোজ-সংপুট-প্রমৃষ্ট-হোমশ্রম-শীকরাম্ভসঃ।"

বৈদিক ব্রাহ্মণও শূদ্রাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া সংসারধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তৎকাল পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজে অনুলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল; তাহা কাহারও সামাজিক গ্লানির কারণ হইত না, এবং যোগ্যতা থাকিলে 'পারশব' উচ্চ রাজকার্য্যেও নিয়োগ লাভ করিতে পারিতেন।

পরবর্ত্তী কালে 'পারশব' শব্দে কেবল নিষাদ জাতিকে বুঝাইয়াছে কেন, তাহা চিন্তনীয়। যথা—

"ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে॥"

সপ্তম শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে যে, সেই পারশবের একমাত্র দৌহিত্র "শ্রীলোকনাথো নৃপঃ" গুণবান্, সত্যৈকবন্ধু ও যুদ্ধবিশারদ বীর-পুরুষ ছিলেন; তাঁহার দোর্দ্দণ্ডে 'জ্বলিতাসি' অত্যন্ত শোভা পাইত; তাঁহার সৈন্যগণ প্রজ্ঞাবলে যুদ্ধে জয়লাভ করিত; এবং তাঁহার তুরঙ্গগুলি বলান্বিত ছিল—এই সমস্ত কারণেই "পরমেশ্বরে"র [সার্ব্বভৌম নরপতির] বহুসংখ্যক সৈন্য তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল। যথা,—

"যস্মিঞ্জ্রী পরমেশ্বরস্য বহুশো যাতং ক্ষয়ং সৈনিকম্।"

অষ্টম শ্লোকেও লোকনাথের অন্যান্য গুণাবলী কীর্ত্তিত দেখিতে পাওয়া যায়। নীতি-বিধানে সুচতুর লোকনাথের প্রজাকুল নিত্যই হর্ষাকুল থাকিত, এবং বিদ্বজ্জনই তাঁহার প্রিয়জন ছিলেন। এই শ্লোকের শেষচরণোক্ত বিশেষণগুলি সার্থকতাপূর্ণ; যথা,—

"সাধুঃ সর্ব্বসমাশ্রয়ঃ পটুমতির্লব্ধপ্রতাপোদয়ঃ।"

অশরণের শরণ সাধু নরপতি লোকনাথ পটুমতি হইয়াও প্রতাপ ও অভ্যুদয়লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। তৎপর নবম শ্লোকে কবি অল্প কথায় একটি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। লোকনাথের শৌর্য্য-বীর্য্য-ধৈর্য্য প্রভৃতি রাজ-গুণের পর্য্যালোচনা করিয়াই বিশ্বস্ত মন্ত্রিগণের সুবিনিশ্চিত পরামর্শে "শ্রীজীবধারণ নৃপ" যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া লোকনাথকে সৈন্য সহ 'বিষয়' দান করিয়াছিলেন। এই শ্লোকে পারশব দৌহিত্র লোকনাথের আর একটি বিশেষণ দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষণটি এই,—"শ্রীপট্টপ্রাপ্ত—করণায়"—অর্থাৎ "করণ" লোকনাথ শ্রীপট্ট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শূদ্রার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে জাত পারশবের দৌহিত্র লোকনাথ 'করণ' ছিলেন।

'কুমারামাত্যাধিকরণ' 'সামন্তরাজ লোকনাথ' এই তাম্রশাসন সম্পাদিত করাইয়াছিলেন। আহিতাগ্নি বুধস্বামীর পুত্র বৃহস্পতিস্বামীর দুহিতা সুবচনার গর্ভে, অগস্ত্য-সগোত্র, দেবশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণের প্রপৌত্র, জয়শর্ম্মস্বামীর পৌত্র, তোবশর্ম্মা বিপ্রের ঔরসে জাত পুত্র, "বিদিতভুজবলবীর্য্য উদারান্বয়ী দ্বিজন্মা" মহা-সামন্ত-প্রদোষশর্ম্মা, যুবরাজ লক্ষ্মীনাথকে দূতক করিয়া রাজপাদমূলে বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, সামন্তরাজের সুব্যুঙ্গ-বিষয়ে,

"মৃগ-মহিষ-বরাহ-ব্যাঘ্র-সরীসৃপাদিভির্যথেচ্ছমনুভূয়মান...... সন্তোগগহন-গুল্ম-লতা-বিতান-কৃতাকৃতাবরুদ্ধাটবী-ভূখণ্ডঃ"—

অটবী-ভূখণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে। এই ভূখণ্ডে প্রদোষ শর্ম্মা "দেবাবসথ" [দেবকুল বা দেউল] নির্ম্মাণ করাইয়া, "ভগবান অবিদিতান্তানন্তনারায়ণ" স্থাপিত করিয়া, দেবতার বলি-চরু-সত্র-প্রবর্ত্তনের জন্য ও কৃতবিদ্য ব্রাহ্মণগণের ব্যবহারের জন্য রাজসমীপে ভূমি-প্রার্থী হইয়াছিলেন। এ স্থলে রাজকবি প্রদোষ শর্ম্মার আবেদন-মধ্যে অনন্তনারায়ণকে যে বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত হইবার যোগ্য। যথা,—

"ভগবতোমর-বরাসুর-দিনকর-শশধর-কুবের-কিন্নর-বিদ্যাধর-মহোরগ-গন্ধর্ব্ব-বরুণ-যক্ষ-রক্ষো-রক্ষো···ভিষ্ঠ ত-বপুষোনন্তনারায়ণস্য সততমষ্টপুষিক-বলি-চরুসত্র-প্রবৃত্তয়ে"—ইত্যাদি।

প্রদোষ শর্ম্মার প্রার্থনামতে রাজা লোকনাথ তাম্রশাসন সম্পাদন-পূর্ব্বক রাজ-প্রসাদরূপে মহাসামন্তকে ভূমি দান করিয়াছিলেন। পার্ব্বত্যদেশে প্রাপ্ত এই তাম্রশাসনখণ্ডে উল্লিখিত ভূখণ্ডও যে পর্ব্বতময় প্রদেশেই অবস্থিত ছিল, তাহার প্রমাণ, প্রদত্তভূমির পূর্ব্বসীমায় "কণামোটিকা পর্ব্বত" ছিল বলিয়া যে সীমা-বচ্ছেদের কথা বর্ণিত আছে, তাহাতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পর্ব্বত বর্ত্ত-মান সময়ে কোথায় অবস্থিত ও কিং-নামধেয়, তাহা অপরিজ্ঞাত।

অটবীভূখণ্ডের কত পাটক-ভূমি কোন ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হইবেন, তাহার বিভাগ-সূচনার জন্য, এই তাম্রশাসনে শতাধিক ব্রাহ্মণের নাম উল্লিখিত হইয়াছিল। ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, সপ্তম শতাব্দীতে আমাদের দেশে ব্রাহ্মণের অভাব ছিল না। এই সকল ব্রাহ্মণ অন্য কোনও প্রদেশ হইতে আনীত বা বিনির্গত বলিয়া উল্লেখ দেখা যায় না। ইহার সহিত আদিশূর-কাহিনীর কিরূপ সামঞ্জস্য সাধিত হইতে পারে, তাহা কুল-শাস্ত্রজ্ঞ সুধীগণের আলোচ্য।

সামন্ত-রাজ লোকনাথ স্বকীয় সান্ধি-বিগ্রহিক প্রশান্তদেবের দ্বারা এই শাসন সম্পাদিত করাইয়া, স্বকীয় মহা-সামান্ত প্রদোষ শর্ম্মার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজগণের যেমন সামন্তচক্র থাকিত, এবং প্রভাববিজ্ঞাপক বিবিধ রাজ-পাদোপজীবী থাকিত, তদনুকরণে সামন্তগণেরও সামন্তচক্র ও রাজপাদোপজীবী থাকিত। তজ্জন্য ত্রিপুরা-শাসনে প্রদোষ শর্ম্মাকে লোকনাথের মহাসামন্ত-রূপে ও প্রশান্তদেবকে লোকনাথের সান্ধিবিগ্রহিক-রূপে উল্লিখিত দেখা যাইতেছে।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় "মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের

তাম্রশাসন” শীর্ষক প্রবন্ধের [“সাহিত্য”; ১৩২০ সন। বৈশাখ-সংখ্যা।] এক স্থানে লিখিয়াছেন—“সামন্তগণের স্বাধিকারে [স্বামিধর্ম্মের প্রচলিত নিয়মানুসারে] রাজাধিরাজের রাজ্যসংবৎ প্রচলিত ছিল, কিংবা সামন্তগণের নিজের রাজ্য-সংবৎ প্রচলিত ছিল, তাহার মীমাংসা করিবার উপায় নাই।” বর্ত্তমান শাসন সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যাইতে পারে। এই শাসন-সম্পাদনের সময় সম্বন্ধে এইমাত্রই এখন সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়—“চতুশ্চত্বারিংশৎসংবৎসরে ফাল্গুনমাসে।” ইহা কাহার প্রচলিত সংবৎসর, তাহার উল্লেখ না থাকায়, অনেকে অনেক অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিবেন। লিপিবিচার করিয়া এই শ্রেণীর সংবৎসরকে কেহ কেহ হর্ষ-সংবৎসর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা লোকনাথের রাজ্য-সংবৎসর হইলে তাঁহার দীর্ঘকাল রাজ্যভোগের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু তদ্দ্বারা কোনও নির্দ্দিষ্ট কালের পরিচয় লাভ করা যায় না।

এই তাম্রশাসনের রাজমুদ্রার, ইহার লিপিপ্রণালীর ও লিপি-লিখিত বিবরণের রচনারীতির আলোচনা করিয়া, সামন্তরাজ লোকনাথের প্রভাব-কাল স্থির করিতে হইলে, ‘চতুশ্চত্বারিংশৎ সংবৎসর’কে হর্ষবর্দ্ধনের তিরোভাবের পরে ও দ্বিতীয় জীবিত গুপ্তের আবির্ভাবের পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্য-সংস্থাপন-চেষ্টার সম-সময়ে প্রাচ্যভারতের অনেক স্থানে অনেক সামন্ত নরপতি স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধনের প্রবল প্রতাপ কিয়ৎকালের জন্য সকলকে পদানত রাখিতে সমর্থ হইলেও, তাঁহার তিরোভাবে তাঁহার সাম্রাজ্য ছত্রভঙ্গ হইবার সময়, প্রাচ্যপ্রদেশে আবার বহুসংখ্যক স্বাধীন নরপতি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। চীনদেশীয় পরিব্রাজক ইৎসিঙের গ্রন্থে সপ্তম শতাব্দীর শেষাংশে সমতটে রাজভট নামক এক বৌদ্ধ নরপতি বর্ত্তমান থাকিবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। লোকনাথের সহিত তাঁহার কোনও রাজনৈতিক সম্বন্ধ ছিল কি না, তাহা বলিতে পারা যায় না।

উত্তরাপথের সার্ব্বভৌম নরপতি হর্ষবর্দ্ধনের ও তদীয় মিত্র কামরূপাধিপতি ভাস্কর বর্ম্মার তিরোভাবের সঙ্গে, বঙ্গে দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছিল। পরস্পরের সংযোগ নষ্ট হইলে, দ্রব্যের পরমাণুগুলি যেমন বিচ্ছিন্ন হইয়া, স্ব স্ব নৈসর্গিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ একচ্ছত্রাধিপতি শ্রীহর্ষের শাসনশৃঙ্খলাবদ্ধ সংযোগ নষ্ট হওয়ায়, অন্যান্য স্থানের মত, বঙ্গেরও সামন্ত রাজগণ দণ্ডধরাভাবে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া নিজ নিজ রাজ্যকে স্বপ্রধান রাজ্য-রূপে পরিণত করিয়াছিলেন। যথার্থ দণ্ড প্রদান করিয়া, স্থানীয় নরপালদিগকে স্বশাসনাধীনে আনয়ন করেন,

এই যুগে এইরূপ প্রবল-পরাক্রান্ত নরপতি কেহ ছিলেন না। কৌটিল্য লিখিয়াছেন যে, সুপ্রণীত দণ্ড দ্বারা রাজা প্রজাবর্গকে শান্তিতে রাখিতে পারেন, দুষ্প্রণীত দণ্ড দ্বারা তিনি তাহাদিগকে উদ্বিগ্ন করিয়া তাহাদের কেবল কোপ উৎপাদন করেন। আর যথাসময়ে দণ্ড প্রণীত না হইলে,

"অপ্রণীতো হি মাৎস্যন্যায়মুদ্ভাবয়তি। বলীয়ান্ বলং গ্রসতে দণ্ডধরাভাবে, তেন গুপ্তঃ প্রভবতি।"

[অর্থশাস্ত্র, ১ অধিঃ ; ৪র্থ অধ্যায়।]

দণ্ডধরের অভাবে 'মাৎস্যন্যায়' উপস্থিত হয়, তখন বলবান অবলকে গ্রাস করে ; কিন্তু দণ্ডবলে বলীয়ান রাজা প্রভাবযুক্ত হইতে পারেন। হর্ষবর্দ্ধনের তিরোভাবকাল হইতে আরম্ভ করিয়া, গৌড়ে পালসাম্রাজ্য সংস্থাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত যে যুগ, তাহাই বঙ্গের মাৎস্যন্যায়-যুগ, ঘোর বিপ্লব ও বিগ্রহের যুগ।

সামন্ত-রাজ লোকনাথের তাম্রশাসনে রাজমুদ্রা।

সামন্তরাজ লোকনাথের পূর্ব্বাধিকারী মহারাজাধিরাজ-উপাধিযুক্ত আদিপুরুষের পুত্র সামন্ত-রূপে উল্লিখিত। লোকনাথকে গুপ্তরাজগণের শাসনসময়ের প্রচলিত পুরাতন মুদ্রার ব্যবহার করিতে দেখিয়া স্বতঃই মনে হইতে পারে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ

গুপ্তরাজগণের সামন্ত ছিলেন, এবং তিনিও যে শ্রীপট্ট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার সহিত, হয় ত, গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পুনঃসংস্থাপন চেষ্টার সম্পর্ক ছিল, এবং তৎকাল-সম্পাদিত তাম্রশাসনে লোকনাথ তজ্জন্যই পুরাতন মুদ্রায় নিজ নাম উৎকীর্ণ করাইয়া শাসনপট্টে সংযুক্ত করাইয়া থাকিবেন। লোকনাথের তাম্রশাসন সম্পাদনের পূর্ব্ববর্ত্তী একটিমাত্র ঐতিহাসিক ঘটনাই তাম্রশাসনে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা তাঁহার বিজয়-বিজ্ঞাপক প্রশস্তি-রূপেই প্রতিভাত হয়। তাঁহাকে উৎখাত করিতে আসিয়া পরমেশ্বর-উপাধিধারী শ্রীজীবধারণ নামক নৃপতি মন্ত্রিবর্গের পরামর্শে যুদ্ধ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মন্ত্রিগণের পরামর্শ ইহার মুখ্য কারণ-রূপে উল্লিখিত হইলেও, তাঁহাদের পরামর্শের কারণ-রূপে দুইটি বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথম, লোকনাথের প্রভাব ও অভ্যুদয়; দ্বিতীয়, তাঁহার শ্রীপট্ট-প্রাপ্তি। এই সকল একত্র বিচার করিলে মনে হইতে পারে যে, হর্ষবর্দ্ধনের প্রবল সাম্রাজ্যের ছত্রভঙ্গ অবস্থা সংঘটিত হইলে যে মাৎস্য-ন্যায়ের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহার সুযোগ পাইয়া, লোকনাথ সামন্ত হইলেও, প্রথমে প্রতাপ ও অভ্যুদয় লাভ করেন, পরে, হয় ত, তাহারই জন্য শ্রীপট্ট প্রাপ্ত হয়েন; এবং জীবধারণ তাঁহাকে উৎখাত করিতে আসিয়াও প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়েন। লোকনাথ যাঁহার নিকট শ্রীপট্ট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং যে শ্রীপট্টের জন্য জীবধারণ যুদ্ধ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা তৎকালবিদিত সার্ব্বভৌমের প্রদত্ত শ্রীপট্ট হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়—হর্ষবর্দ্ধনের তিরোভাবে অবসর লাভ করিয়া, আদিত্য সেন পুনরায় গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সামন্ত-রাজ লোকনাথ স্বকীয় তাম্রশাসনে গুপ্তরাজ-মুদ্রার ব্যবহার করায়, আপাততঃ তাঁহাকে শেষ-গুপ্তরাজগণের আশ্রিত সামন্তরাজ-রূপে গ্রহণ করা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। এই সময়ে জীবধারণ নামক এক নরপতির পরমেশ্বর উপাধি বিঘোষিত করিয়া প্রাচ্য প্রদেশে সাম্রাজ্য-সংস্থাপনের চেষ্টা করিবার ক্ষীণ আভাসমাত্র এই তাম্রশাসনে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই নরপতির অন্য পরিচয় এ পর্য্যন্ত অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। তিনি বিপ্লবযুগের শেষ গুপ্তনরপালগণের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার চেষ্টা করিয়া থাকিতে পারেন।

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক।



ঘুমিয়ে পড়া !

পান্থ।

[ওমারের অনুবাদ ও অনুসরণ।]

১

একদিন কুম্ভকার-গৃহ-পার্শ্ব দিয়া
যাইতে, শুনিয়াছিনু,—কাঁদিয়া কাঁদিয়া
কহিছে কর্দ্দম-পিণ্ড—নরকণ্ঠে যেন,—
"ধীরে, বন্ধু, বাজে বড়, মেরো না বাঁধিয়া।"

২

শশব্যস্তে গৃহমধ্যে করিনু প্রবেশ ;
বিবিধ মৃণ্ময় পাত্র, মঞ্চে সমাবেশ।
গঠিত, চিত্রিত কেহ, কেহ ভগ্নদেহ,
কেহ বুঁদি, কেহ মুদি, কেহ অবশেষ।

৩

কেহ কহে,—"ভাঙ্গিও না, থাকুক্ এমনি।"
কেহ কহে,—"ভেঙ্গে গড়, ওগো গুণমণি!"
কেহ কহে,—"কে কুলাল? কাহার দুলাল?"
কেহ কহে,—"কার দোষ? গড়েছ আপনি।"

৪

কেহ কহে,—"তরু, লতা, সাগর, ভূধর—
সুন্দর জগতে এই সকলি সুন্দর।
আমি অসুন্দর কেন? গড়িতে আমায়
কাঁপিয়াছিল কি তবে বিধাতার কর?"

৫

দেখ ওই পানপাত্র চুম্বনের তরে
চেয়ে আছে মুখপানে কি আগ্রহভরে!
কে বিরহী—বুকে লয়ি অতৃপ্ত প্রণয়,
মুহূর্ত্তে মরিতে চায় অধরে অধরে!

৬

কত দিন স্বপনে বা অর্দ্ধ-জাগরণে
ভ্রমিয়াছি কত লোকে বিস্মিতনয়নে ;
পরিহরি' সর্ব্ব সুখ এসেছি ছুটিয়া,
যখনি মৃত্তিকা-রূপ ফুটিয়াছে মনে !

৭

খুঁজি নাই উচ্চ পদ, যশঃ কিংবা জ্ঞান,—
'মদ্যপ' বলিলে,—ভাবি যথেষ্ট সম্মান !
ছিল কি দ্রাক্ষার মূল মোর মৃত্তিকায়,
বিধাতা নির্ম্মাণ-কালে পান নি সন্ধান ?

৮

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—কাহারে না সাধি ;
সুরায় ডুবায়ে দেছি সর্ব্ব আধি ব্যাধি।
মৃত্যুকালে দেহ মোর প্রক্ষালিয়া মদে,
নবীন দ্রাক্ষার তলে দিও গো সমাধি।

৯

হে তার্কিক, থাক্ তব বিদ্রূপ-বচন,
কোন্ যুগে সৃষ্ট তুমি—আছে কি স্মরণ ?
শুকায়ে গিয়াছে রস, পানাধারে, প্রিয়,
সরস করিয়া লও নীরস জীবন !

১০

কে বলিল—মৃত্তিকায় হইব বিলীন ?
হয় ত মৃত্তিকা কিছু দিয়াছিল ঋণ ;
সুদে মূলে ফিরে দিতে কভু কি ফুরায়,
এই বিশ্বভরা প্রেম, জ্ঞান সর্ব্বাঙ্গীন ?

১১

বাসনা—সহস্র-ফণা, খুঁজে বিশ্বময়,
কোথা সে কারণ-সিন্ধু—কার্য্যের আশ্রয় !
এই কি নিয়তি, বন্ধু,—শিক্ষা দীক্ষা বৃথা ;
ইচ্ছা এক, কর্ম্ম আর,—সর্ব্ব বিপর্য্যয় !

১২

হেরি জনপদ-প্রান্তে স্থির সরোবরে,
ভাবিতেছি শান্তি-সুখ কাতর-অন্তরে!
ভেদিয়া পর্ব্বত-গুহা, খুঁদিয়া ধরণী,
ছুটেছি—লুটিতে কিন্তু দুরন্ত-সাগরে।

১৩

প্রতিদিন মনে হয়,—শ্রেয়ঃপথে চলি;
প্রতিদিন অনিচ্ছায় দেই আত্মবলি।
তুমি দেব ইচ্ছাময়, কর্ম্মভোগী নর—
ইচ্ছার বিচার নাই, কর্ম্ম কি সকলি?

১৪

তুমি হে বেতস-বুদ্ধি,—জয়ী এ সংসারে;
সুখে দুঃখে উঠ নামো—ভাগ্য-অনুসারে।
নির্ব্বোধ—উদ্ধত আমি, প্রতিঘাত দিয়া
ছিন্ন-ভিন্ন উচ্ছেদিত অদৃষ্ট-প্রহারে!

১৫

থাক্ তর্ক, ঢালো সুরা। জীবন-পাশায়
প্রতিক্ষেপে পরাজিত, আশায় আশায়
তবু খেলি প্রতিদিন সর্ব্বস্ব হারায়ে!
দেহে নয়,—মত্ত আমি দেহের নেশায়!

১৬

হৃদয় দুর্ব্বহ অতি,—নহি আশা-হীন,
দুঃখের সোপান বহি' উঠি দিন দিন;
একদিন সে মন্দিরে বক্ষে বক্ষঃ চাপি',
বুঝিব মানুষ কিংবা দেবতা কঠিন!

১৭

খুঁজিয়াছি, পাই নাই,—এইমাত্র দুখ;
দুঃখের এ অন্বেষণ,—প্রেমের তো সুখ!
প্রেম নহে আহরণ,—চির অপব্যয়,
ইহ-পর-সর্ব্বকাল দিয়া সে মরুক।

১৮

এ প্রেম কল্পনা শুধু ?—তনুহীন স্মর !
এ প্রেম উন্মাদ-রোগ ?—উন্মত্ত শঙ্কর !
এ প্রেম দীনতা নহে,—এ প্রেম মহান্,
মানিনী গোপিকা-পদে লুটে ব্রজেশ্বর !

১৯

যে হৃদে আছিল শোভা শত অমরার,
অমরী আসিত যেথা ছুটে বার বার ;—
তুমি, নারী, মৃদু হেসে, আঁখি-কোণে চেয়ে—
নিলে অনায়াসে লুটে সে হৃদি আমার !

২০

কখন যে এলো সন্ধ্যা,—ভাবিয়া না পাই ;
কেমনে সে মধু-ক্রমে ফিরে আর যাই !
সারাদিন বনে বনে, ফুলে ফুলে বুলে',
পিয়ে সুখ-দুঃখ-মধু, সে শকতি নাই !

২১

অস্ফুট-কৈশোরে সেই,—বসন্ত-প্রভাতে,
স্নিগ্ধ পুষ্প-গন্ধে, লোল-আলোক-সম্পাতে,
কি মদিরা দিলে ঢালি' ! আনন্দে উল্লাসে
জগৎ উঠিল দুলি' আশা-পদ্মপাতে !

২২

মধুর শরতে, বধু,—প্রথম-যৌবনে
কি প্রেম-মদিরা-পান চুম্বনে চুম্বনে !
মোহে না স্বপনে, চিত্রে, কাব্যে না সঙ্গীতে—
কোথা দিয়া গেছে দিন—জানি না কেমনে !

২৩

শীতের সায়াহ্নে আজ আঁধার আকাশ,
শূন্যমনে শুনিতেছি আপন নিঃশ্বাস !
নদী-পারে ডাকে চকা হারায়ে সঙ্গিনী,
শুষ্ক তরু-শাখে-শাখে কাঁদিছে বাতাস !

২৩

শিশুষ্ক কমল-দল, পিক ভগ্নস্বর,
তরু শ্যাম-পত্র-হীন, অরণ্য ধূসর;
আসিছে দুরন্ত শীত, হে শ্রান্ত পথিক,
উঠ—উঠ, গৃহমুখে চল অতঃপর!

২৫

নিশা ক্রমে হয় গাঢ়, ম্লান ধ্রুব-তারা
আর নাহি ঢালে তার মৃদু রশ্মিধারা!
অতি অন্ধকার পথ, হে অন্ধ পথিক,
কতদিন র'বে তুমি নিজ-গৃহ-ছাড়া!

২৬

হে আত্মা, এ ভগ্ন-দেহে কি ভুঞ্জিবে আর?
এখনো কি আছে আশা—সময় তোমার!
যে ফুল শুকায়ে গেছে, সে কি পুনঃ ফুটে—
জগতে বসন্ত যদি আসে শতবার?

২৭

সম্মুখে দাঁড়ায়ে চির-অন্ধ বিভাবরী—
কি ফল বিলম্বে আর,—উঠি ত্বরা করি!
সহায় সম্বল নাই, গেছি পথ ভুলে,
যেতে হবে বহুদুর,—দীর্ঘ পথ পড়ি'!

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

সাহিত্যের আভিজাত্য।

প্রত্যেক সাহিত্যকেই তিনটি স্তর অতিক্রম করিতে হয়; (ক) ভাবুকতার প্রথম যুগ; নবজীবনের সূচনা, নূতন ভাবের উদ্বেগ। সাহিত্যে অশান্তি ও ব্যাকুলতার পরিচয়, স্বাধীনতা ও বিপ্লববাদ—কল্পনারাজ্যগঠন, [illegible] সহিত সাহিত্যের বিয়োগ; আত্মকেন্দ্রতা ও আত্মসর্ব্বস্বতা। Shelley ও Byronএর কবিতা, Goetheএর The Sorrows of Werther, Jurkvosky, Pushkin ও Lermonteffএর romance, রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির পরিশোধ, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ও তাঁহার প্রথম বয়সের খণ্ডকবিতা এই স্তরের।

(খ) ভাবুকতার সহিত বস্তুতন্ত্রের সংমিশ্রণ।—অশান্তি ও বিপ্লবের পর একটা সামঞ্জস্যবিধানের আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হয়। বিপ্লববাদের পর একটা ধীর সমালোচনার প্রয়োজন হয়। পুরাতন আদর্শের সহিত নূতন ভাবের একটা সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা হয়। সাহিত্য আত্মসর্ব্বস্ব না হইয়া ক্রমে মনুষ্য ও সমাজের দৈনন্দিন জীবনের সহিত একটা নূতন সম্বন্ধ স্থাপন করে। জার্ম্মান সাহিত্যে Goethe, Novalis, Richter ও Heine, ফরাসী সাহিত্যে Victor Hugo, Gauther ও Musset, ইংরাজী সাহিত্যে Browning ও Suinburne, এইরূপে একটা নূতন পুরাতনে সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন, ভাব-রাজ্য ও বাস্তবজীবনের একটা সমন্বয়-বিধানের প্রয়াসী হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব কবিতায় আমরা পুরাতন ভাবগুলি নূতন করিয়া গড়িবার চেষ্টা দেখিতে পাই। রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জ্জন', 'অচলায়তন', 'রাজা' ও 'ডাকঘরে' আমরা একটা নূতন সমাজ-গঠনের উপাদান দেখিতে পাই; রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যে তাঁহার জীবন-দেবতার, নৈবেদ্যে মরণসঙ্গীতে আমরা একটা নূতন ব্যক্তিত্বের—একটা নূতন জীবনের পরিচয় পাই।

(গ) বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত ভাবুকতা,—সাহিত্য তখন কবির কল্পনার সামগ্রী নহে, কবির সাধনার ফল। এবং কবির সাধনা তখন সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। কবি অনেক সাধনার পর ভাবুকতার সহিত বাস্তবজীবনের একটা সুন্দর সমন্বয়সাধন করিতে পারিয়াছেন; এবং তিনি জীবনের লক্ষ্য বুঝিতে পারিয়াছেন, সমাজের যুগধর্ম্ম আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন; এবং সাহিত্যের দ্বারা সেই জ্ঞান বিতরণ করিতেছেন। Ibsen ও Maeterlinck কাব্য-নাট্যে, Tolsty ও Dostoeiveskyর নাটকে উপন্যাসে, Sudde man ও Hauptmannএর কাব্যে নাটকে আমরা এই তৃতীয় স্তরের সাহিত্যের পরিচয় পাই।

আমাদের বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য এখন তৃতীয় স্তরে পদার্পণ করিয়াছে মাত্র। প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের সাহিত্যের গুণগুলি আমাদের সাহিত্যে যেরূপ বিকাশলাভ করিয়াছে, তাহা অপর কোনও সাহিত্যে দুর্লভ। সাহিত্যে অশান্তি ও বিপ্লববাদের পরিচয়, বিশ্বপ্রকৃতিতে আত্মসমর্পণ; বন্ধনের ভিতর পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ আমাদের রবীন্দ্রনাথেই আছে। নূতন জগৎ গড়িবার আকাঙ্ক্ষা, নূতন ব্যক্তিত্বের সূচনাও রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভূরিপরিমাণে পাওয়া যায়। নূতন সমাজের অতি সুন্দর চিত্র রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন, কিন্তু সবগুলিই স্বপ্নের রাজ্য। রবীন্দ্র-সাহিত্য বস্তুতন্ত্রহীন। রবীন্দ্রনাথ 'অচলায়তন' ও 'গোরা'য় যে চিত্র

আঁকিয়াছেন, তাহার সহিত বাস্তবজীবনের বিশেষ সম্বন্ধ নাই; তাহাকে একটা আদর্শ জীবন বলিতে পারি না; কারণ, তাহা একবারেই অনধিগম্য।

আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্য তৃতীয় স্তরের ছিল। আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে বেদ বেদান্ত উপনিষদ্ গীতা প্রভৃতিতে শুধু ভাব-রাজ্যের কথা আছে, মুক্তির কথা আছে, সংসারের—বাস্তবজীবনের কোনও কথা নাই। কিন্তু বেদ বেদান্ত উপনিষদ গীতা লইয়াই আমাদের সংস্কৃত সাহিত্য নহে। আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, রঘুবংশ আছে; নীতিশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র আছে; শিল্পশাস্ত্র, বাস্তবিদ্যা আছে। বেদান্ত প্রভৃতির আরম্ভ "অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা"। ব্রহ্মের স্বরূপ কি, ব্রহ্মলাভের উপায় কি, এই সব প্রশ্নের আমাদের মোক্ষশাস্ত্রে মীমাংসা হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুসাহিত্য শুধু মোক্ষ লইয়া ব্যস্ত নহে, শুধু ব্রহ্মজিজ্ঞাসা লইয়া ব্যস্ত নহে। ধর্ম্ম, অর্থ, কামও হিন্দুসাহিত্যে আছে; "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"র সহিত, "সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে" তাহারও উপদেশ আছে। আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত সাংসারিক কর্ত্তব্যবোধের সমন্বয় হইয়াছে, ভাবুকতার সহিত বাস্তবজীবনের সামঞ্জস্য স্থাপিত হইয়াছে। আমাদের সাহিত্য যে ব্যক্তিত্ব গঠন করিয়াছে, তাহা

"Type of the wise who soar but never roam
True to the kindred points of heaven and home."

আমাদের মহাভারত কি? আমরা বলি,—"যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে।" ভারতাত্মার স্বপ্রকাশ হইয়াছে মহাভারতে। মহাভারত ভারতের মহাকাব্য; ভারতের মহাকাব্যে আমরা কি দেখিতে পাই? বেদান্ত উপনিষদে যে সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই সত্যগুলিই সমাজ ও সংসারের কাজে লাগিয়াছে,—মহাভারতে। মহাভারতে,—আমরা দেখি টাকার ঝন্‌ঝনানি, বিলাসিতার আড়ম্বর, ভোগবাসনার প্রবল তাড়না, নারীর অবমাননা, পাশাখেলা, ব্যসন সমুদায়ের চরিতার্থতা, বৈষয়িক অবস্থার চরম উন্নতি, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা, আন্তর্দ্দেশীয় সন্ধি, যুদ্ধবিগ্রহ,—ইহসংসারের সর্ব্ববিধ-উন্নতি, ভোগ-বাসনার চরম;—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বেদান্ত উপনিষদের সুর বেশ শুনা যাইতেছে, দুর্য্যোধনের সঙ্গে ভীষ্মও আছেন,—দুর্য্যোধনের অসীম শক্তি, অসীম ভোগ, ভীষ্মের রাজমুকুট ও সিংহাসন ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রত-অবলম্বন, কর্ম্মের ব্যস্ততার মধ্যে সমস্ত কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ, মহাযুদ্ধের প্রত্যেক অঙ্কে পরাজিত শত্রুর প্রতি ক্ষমাপ্রদর্শন, নিষ্কামসেবাব্রত, বৈরাগ্য, ব্রহ্মবিদ্যা—সবই মহাভারতে আছে,—

জ্ঞানে মৌনং ক্ষমা শক্তৌ ত্যাগে শ্লাঘাবিপর্য্যয়ঃ।
গুণা গুণানুবন্ধিত্বাৎ তস্য সপ্রসবা ইব ॥

মহাভারতে সংসার ভোগের চরিতার্থতা-সাধনের পথ দেখাইতেছে; ধর্ম্ম ভোগকে সংযমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতেছে; সংসার কর্ম্মস্পৃহা জাগাইতেছে; ধর্ম্ম ভগবানে কর্ম্মফল-সমর্পণ শিখাইতেছে; সংসার অর্থাগমের সুযোগবিধান করিতেছে; ধর্ম্ম বৈরাগ্য ও দানব্রতের মহিমা প্রচারিত করিতেছে; সংসার গৃহস্থালী শিখাইতেছে; ধর্ম্ম প্রতিবেশী অতিথি অনাথদিগের মধ্যে গৃহবিস্তার শিখাইতেছে। সংসার বলিতেছে,—তুমি তোমাকে অজর অমর মনে করিয়া বিদ্যা ও অর্থের চিন্তা কর; ধর্ম্ম বলিতেছে,—সংসার এখনই আছে, এখনই নাই,—পদ্মপত্রে জলের মত, তুমি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্তিসাধনের জন্য প্রস্তুত হও।

মহাভারতে আমরা মোক্ষধর্ম্ম ও সংসারধর্ম্মের সমন্বয়সাধনের চরম দেখিয়াছি; ভাবুকতার সহিত বাস্তবজীবনের সামঞ্জস্যবিধানের চরম দেখিয়াছি।

আমাদের রামায়ণেও আমরা তাহাই দেখিয়াছি। ঐশ্বর্য্য ভোগবিলাসের উপর ত্যাগধর্ম্মের—সত্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, কর্ত্তব্যবোধের নিকট ইন্দ্রিয়সুখের বলিদান রামায়ণে আছে।

আমাদের পুরাণ, ভাগবত প্রভৃতি জনসমাজে মোক্ষধর্ম্মের মহনীয় ভাবগুলির প্রচার করিয়াছে। ভাবুকতা বা mysticism গল্প কাহিনী উপন্যাস রূপকথার ভিতর দিয়া চরম বাস্তবজীবনের ভিত্তির উপর গ্রথিত হইয়া জনসমাজের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে, এবং তাহার চরিত্রগঠন করিয়াছে।

আমাদের সাহিত্য কখনই একটা অলীক ভাবুকতা—একটা অপকৃষ্ট mysticism লইয়া সন্তুষ্ট ছিল না। আমাদের সাহিত্য চিরকালই ব্যক্তির সংসার-বন্ধনের মধ্যে আপনার কর্ত্তব্যসাধনের পন্থার নির্দ্দেশ করিত। আমরা শকুন্তলায় কি দেখি? ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় সাহিত্যে romantic loveএর চূড়ান্ত নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে; শকুন্তলায় সেই romantic loveএর পরিণাম ইঙ্গিতে সূচিত হইয়াছে। রাজা দুষ্মন্ত তপস্বিনী শকুন্তলাকে চাহিলেন। কাম সমাজবন্ধন মানিতে চাহিল না। তপস্বিনীও রাজমহিষী হইতে চাহিলেন। দুর্ব্বাসার অভিশাপ ভগবান বা সমাজের অমোঘ বিধানের মত ইন্দ্রিয়সুখভোগের অন্তরায় হইল। তপস্বিনী রাজগৃহিণী হইতে পারিলেন না।

রাজা তপস্বিনীকে ভোগপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য পাইলেন না। শেষে সংসার ও সমাজের জন্য আপনার কর্ত্তব্যসাধন করিয়া, আপনাদের নিজ নিজ

আশ্রমে স্বধর্ম্ম-নিরত থাকিয়া, অসহ্য অনুতাপ-দুঃখের দ্বারা পবিত্র হইয়া,—দুই জনের romantic loveএর নহে,—প্রেমের মিলন হইল। শকুন্তলা মারীচের তপোবনে "বসনে পরিধূসরে বসানা" হইলেন, "নিয়মক্ষামমুখী" হইলেন; তবেই তিনি দুষ্মন্তকে পাইলেন। তাঁহার প্রকৃত প্রেম হইয়াছিল,—তাহা আমরা তখন বুঝিতে পারি, যখন তিনি মিলনকালে দুষ্মন্তকে কোনও দোষ দিলেন না, শুধু কাঁদিতে লাগিলেন,—আপনার ভাগ্যকে দোষ দিলেন। দুষ্মন্তেরও প্রকৃত প্রেম হইয়াছিল, তাই তিনি অগ্রে পুত্র ভরতকে পাইলেন, তাহার পর ভরতজননীকে পাইলেন। "প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্"। ইহাই ধর্ম্ম। শান্ত, সংযত, অথচ প্রবল পুত্রস্নেহের ভিতর দিয়া,—মোহোন্মত্ততার ভিতর দিয়া নহে,—দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে পাইলেন। Romantic love সংসারের শাসন অবজ্ঞা করিয়া একটা বিরোধ আনিয়াছিল। কিন্তু বিরোধ দূর হইয়া শান্তি আসিল। কাম প্রেমে পরিণত হইল। যৌবনলীলার ভাবরাজ্যের সহিত সংসারের কল্যাণ-কর্ম্মের কোনও অসামঞ্জস্য থাকিল না। শকুন্তলা আরম্ভ হইয়াছিল উদ্বেগে, অসংযমে; শেষ হইল গভীর শান্তি ও স্তব্ধতায়। শকুন্তলার মত হিন্দুজীবন এইরূপেই ভাবুকতার সহিত সংসারধর্ম্মের সমন্বয়সাধন করিয়া প্রকৃত শান্তি অনুভব করিয়াছে। শকুন্তলায় আমরা ভাবুকতা ও বস্তুতন্ত্রের সুন্দর মিলন দেখিলাম। ভাবুকতা ও বস্তুতন্ত্রের এই সুন্দর সম্মিলন লক্ষ্য করিয়াই Goethe বলিয়াছিলেন,—মর্ত্ত্য এবং স্বর্গ যদি কেহ একাধারে পাইতে চাহে, সে শকুন্তলায় তাহা পাইবে।

সাহিত্যে ভাবুকতার সহিত বাস্তবজীবনের সমন্বয়বিধান, mysticism ও Realismএর সংমিশ্রণের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের আর একটা বড় আদর্শেরও পুষ্টিবিধান হইয়াছিল।

যেখানে mysticism ও Realismএর একটা সামঞ্জস্যবিধান না হয়, সেখানে সাহিত্য জনসমাজ হইতে দূরে সরিয়া যায়; সাহিত্যে অধিকারভেদের সৃষ্টি হয়, অভিজাত্য-গৌরব সে সাহিত্যকে আক্রমণ করে। তখন একটা ধারণা জন্মে,—সাহিত্যে সকলের সমান অধিকার নাই,—সাহিত্যের মহনীয় ভাবগুলি সার্ব্বজনীন নহে। আমাদের সাহিত্যে তাহা হইতে পারে নাই। হিন্দু ঋষিগণ যে সমস্ত মহনীয় ভাব উপলব্ধি করিতেন—সেইগুলিই নানা গল্প রূপকথার ভিতর দিয়া লোকসমাজে প্রচারিত হইত। আমরা মহাভারতের শিক্ষা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। মহাভারতের গল্পগুলি ভারতবর্ষের প্রত্যেক ভাষাতেই অনূদিত হইয়াছিল। এই রূপে হিন্দু ঋষিগণের মহনীয় ভাব সমুদয় সার্ব্বজনীন হইয়াছিল।

আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রত্ন—কাশীরাম দাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ। এখন কাশীরাম দাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ গ্রামে গ্রামে জাতীয় চরিত্রের গঠন করিতেছে। রামায়ণ মহাভারত ভারতবর্ষের জাতীয় 'এপিক'। কিন্তু রামায়ণ মহাভারতের চরিত্রগুলি দেবতা বা অতিপ্রাকৃত নহে। রামও মানুষ, কৃষ্ণও মানুষ; ভীষ্মও মানুষ, পঞ্চ পাণ্ডব-গণও মানুষ। রামায়ণের চরিত্র-বর্ণনায় রামচন্দ্র যদি দেবতা হইতেন, তাহা হইলে, তিনি কখনই বহু-শতাব্দী ধরিয়া সকলের হৃদয়ে স্থান পাইতেন না। মুদী যখন সন্ধ্যার সময়ে দোকানের কেনাবেচা শেষ করিয়া রামায়ণ মহাভারত পড়িতে থাকে, এবং খেয়ার মাঝি, গ্রামের কামার, ছুতার, চাষা মিলিয়া তাহাকে ঘিরিয়া বসে, তখন তাহারা সকলেই জানে, তাহারা দেবতাদের অতিপ্রাকৃত জীবনের কথা নহে, ক্ষুদ্র মনুষ্যের সুখ দুঃখের কাহিনী পাঠ করিতেছে। রামায়ণ মহাভারতে যে ভ্রাতার আত্মত্যাগ, পতিপত্নীর প্রেম, ভৃত্যের প্রভুসেবা, মাতৃস্নেহ, গুরুভক্তি প্রভৃতি দেখান হইয়াছে, তাহাদের সহিত আপনাদের দৈনন্দিন জীবনের কোনও ঘটনার সাদৃশ্য আছে কি না, তাহা শ্রোতৃমণ্ডলী ভাবিয়া থাকে। এই উপায়েই তাহাদের চরিত্রগঠন হয়। রামায়ণ মহাভারত গৃহজীবনের এক একটা প্রকাণ্ড কাব্য। ইহারা epic বটে, কিন্তু Prometheus, Samson এর অতি-প্রাকৃত ঘটনার আশ্রয় না করিয়া দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলীর বর্ণনা করিয়াছে বলিয়া একই সঙ্গে আপামর জনসাধারণকে শিক্ষা ও আনন্দ দিয়াছে।

লোক-সাহিত্যের আরও দুইটি প্রধান ধারা লক্ষিত হয়। প্রথম, চণ্ডী-সাহিত্য।—এখানেও ভাবুকতার সহিত বস্তুতন্ত্রের সুন্দর সমন্বয় হইয়াছে। কালি-দাসের কুমার-সম্ভবে ইহার সূচনা। পার্ব্বতী মহাদেবকে বিবাহ করিবেন। মহাদেব তাপস-শ্রেষ্ঠ। পার্ব্বতী বসন্তপুষ্পাভরণা হইয়া ললিত যৌবন-সৌন্দর্য্যের ছবির মত যোগীর নিকট উপস্থিত হইলেন। অকাল বসন্ত ও বসন্তসখা লইয়া তিনি আসিয়াছিলেন। তাই মহাদেব তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। তাহার পর পার্ব্বতীর কঠোর তপস্যা ও মহাদেবের সহিত মদনভস্মের পর প্রেমের মিলন। বাঙ্গালী-কন্যারা এখনও স্বামী লাভ করিবার জন্য মেনকা-কন্যার মত মহাদেবের পূজা করিয়া থাকে। বাঙ্গালা সাহিত্যে কালিদাসের বর্ণনা-মাধুর্য্য নাই। কিন্তু বাঙ্গালী কবিগণ পার্ব্বতীর বিবাহ, শ্মশানচারী জামাইকে দেখিয়া সকলের খেদ, মহাদেবের ভুবনমোহন রূপ, পার্ব্বতীর শ্বশুরালয়ে যাত্রাকালে বিদায়-দুঃখ, বৎসরান্তে একবার কন্যার পিতৃগৃহে আগমন ও সকলের আনন্দ উৎসাহ এমন সুন্দর ভাবে

চিত্রিত করিয়াছেন যে, মনে হয়, কালিদাস নহে, ইঁহারাই হর-পার্ব্বতীর গল্পকে গৃহজীবনের একটি সুন্দর মহাকাব্যে পরিণত করিতে পারিয়াছেন। কালিদাসের কুমারসম্ভবে, রাজসভার কবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে, জনসাধারণের কবি মুকুন্দরামের চণ্ডী কাব্যে আমরা হরগৌরীর আখ্যান পাইয়াছি। কালিদাসের হরগৌরী কৈলাসের শিবপার্ব্বতী; কৈলাসেই তাঁহাদের ঘর-সংসার, দেবদারুগাছ, কৃষ্ণসার মৃগ; কিন্নরদিগের মধ্যে শিবপার্ব্বতী সংসার পাতিয়াছেন। কিন্তু ভারতচন্দ্র ও মুকুন্দরাম শিবপার্ব্বতীকে একেবারেই বাঙ্গালীর ঘরে আনিয়া বসাইয়াছেন। বিশেষতঃ মুকুন্দরাম হরগৌরীকে আমাদের পর্ণকুটীরের সমস্ত দৈন্য ও ক্ষুদ্রতার দ্বারাই অলঙ্কৃত করিয়াছেন। তিন জনেই একটা ভাবরাজ্যের কল্পনাকে গৃহধর্ম্মের শিক্ষায় পরিণত করিয়াছেন। যাঁহার নিকট দেশের জন-সাধারণ সর্ব্বাপেক্ষা আপন, তিনি হরগৌরীকে দেশের সর্ব্বাপেক্ষা আপন করিতে পারিয়াছেন। ভারতচন্দ্র ও মুকুন্দরাম ব্যতীত আরও অনেক কবি হরগৌরীর আখ্যায়িকা লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। সকলেই কালিদাসের কুমারসম্ভব হইতে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাঁহারা প্রকৃত কবি, তাঁহারা নূতন সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন; অন্যে কালিদাসের অনুকরণ করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন।

লোকসাহিত্যের আর একটি ধারা—বৈষ্ণব সাহিত্য। বৈষ্ণব সাহিত্য এক অপরূপ অনন্ত সৌন্দর্য্যের, অনন্ত প্রেমের রাজ্য গড়িয়াছে। কিন্তু এ রাজ্যের সহিত কি সংসারের কোনও সম্বন্ধ নাই? বৈষ্ণবের গান কি শুধু বৈকুণ্ঠের—রাধাকৃষ্ণের, এ সংসারের নহে? বৈষ্ণবের প্রেমগান এ সংসারের, শুধু রাধাকৃষ্ণের নহে। প্রত্যেক গৃহের নর-নারীর মিলনের ছবি বৈষ্ণব কবিগণ আঁকিয়াছেন।—

"এই প্রেম-গীতিহার
গাঁথা হয় নর-নারী-মিলন-মেলায়
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে চাই
তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।"

বৈকুণ্ঠের সহিত সংসার কিরূপ মিশিতে পারে, দেখিলাম; চরম ভাবুকতার সহিত সংসার-ধর্ম্মের সম্বন্ধ-স্থাপন দেখিলাম।

আমরা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের মূলসূত্রগুলির ইঙ্গিত করিয়া, তাহাই অবলম্বন করিয়া সমাজে হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক সাহিত্যের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আমরা বলিয়াছি, সাহিত্যের প্রথম স্তর—একটা নূতন ভাব ও আদর্শের শক্তি—স্বাধীনতা, অশান্তি ও বিপ্লববাদ; যতদিন সে ভাব ও আদর্শের সহিত পুরাতন সমাজের একটা সামঞ্জস্যবিধান না হয়, ততদিন সেই অশান্তি ও বিপ্লবের শেষ হয় না। দ্বিতীয় স্তরে ঐ নূতন আদর্শ লইয়া সমাজের একটা ভাঙ্গা গড়া হয়; শেষে ভাঙ্গা গড়ার পর যখন সমাজ ঐ নূতন আদর্শ গ্রহণ করিয়া একবারে পূর্ণগঠিত হয়, তখন সাহিত্যের বাণী সার্থক হয়।

প্রথমে আমরা লোকসাহিত্যে অশান্তি ও বিপ্লববাদের কথা বলিতেছি। ভারতবর্ষ চিরকাল গৃহধর্ম্ম ও সমাজধর্ম্মটাকে খুব বড় করিয়া দেখিয়াছে। ভারতবর্ষে সমাজ চিরকালই ব্যক্তির কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া দেয়। পরিবার, জাতি ও আশ্রমের অনুবর্ত্তী থাকিয়া ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। সমাজতন্ত্রই ভারতে ব্যক্তিত্ব গঠন করিয়া থাকে। কিন্তু ব্যক্তির এক দিকে স্বাধীনতা আছে; সে স্বাধীনতার উপর কেহই হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। তাহা ধর্ম্মের দিকে—ব্যক্তি আপনার মুক্তিসাধন আপনিই করিবে। আপনার নিজের সাধনা ভিন্ন মুক্তিলাভ অসম্ভব। ইহাই হিন্দুর বিশ্বাস—হিন্দু আপনার অধ্যাত্মক্ষেত্রে সম্পূর্ণ একাকী। সমাজ এক দিকে তাহাকে কর্ম্মবন্ধনে বাঁধিয়া রাখিতেছে; ব্যক্তি আর এক দিকে কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্তি-সাধনের প্রয়াসী হইয়াছে—এই রূপেই হিন্দু-ব্যক্তিত্ব বিকাশ লাভ করিয়াছে। অনেক সময়েই সমাজের এই কর্ত্তব্যবন্ধন খুব কঠোর বলিয়াই মনে হয়। সাহিত্যে এই বন্ধন ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আকাঙ্ক্ষা আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই। আমরা হরগৌরীর গান ও রাধাকৃষ্ণের গানে তাহা পাইয়াছি।

হিমালয়ের তপোবনে মহাদেব যোগনিমগ্ন রহিয়াছেন। এমন সময় বসন্ত আসিল। বিশ্বপ্রকৃতির উন্মত্ত অবস্থার নামই বসন্ত। মনুষ্য-প্রকৃতিতেও একটা উন্মত্ত প্রেমের উন্মেষ হইল। সে উন্মত্ত প্রেম দেশকালপাত্রকে অগ্রাহ্য অপমানিত করিয়া এক জন তপস্বীর নিকট এক "বসন্তপুষ্পাভরণা" কুমারীকে গৃহপ্রাঙ্গন হইতে বিচ্যুত করিয়া লইয়া আসিল। প্রেমের দুর্নিবার শক্তি যোগীর তপোভঙ্গের—গৃহধর্ম্মের পরাভবের সূচনা করিল; সমাজের কর্ত্তব্য-বন্ধনকে বিচ্ছিন্ন করিবার সুযোগ পাইল।

বৃন্দাবনেও রাধা কুলশীল জাতিমান সবই ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।

"বঁধু, কি আর বলিব আমি!
মরণে জীবনে, জনমে জনমে প্রাণনাথ হইও তুমি।
এ কুলে ও কুলে, গোকুলে দু কুলে আপন বলিব কায়?
শীতল বলিয়া শরণ লইলাম ও দুটি কমল-পায়॥

কলঙ্ককে বরণ করিতে দ্বিধা করিলেন না,

"কলঙ্কী বলিয়া ভাবে সব লোক,
তাহাতে নাহিক দুখ;
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ।"

রাধাকৃষ্ণের গানে আমরা যে শুধু সংসারের কর্ত্তব্যবন্ধন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিবার আকাঙ্ক্ষা দেখাইতেছি, তাহা নহে। এখানে প্রেমের দুর্নিবার স্রোতে—শুধু সমাজ নহে, শুধু "জাতিকুল" নহে,—মান সম্ভ্রম, ধর্ম্ম—"দু কুল" ভাসিয়া গিয়াছে। হর-গৌরীর গান অপেক্ষা রাধাকৃষ্ণের গানে আমরা প্রেমের সর্ব্ববন্ধনচ্ছেদিনী শক্তির অধিক পরিচয় পাই। গৌরীর প্রেমে আমরা গৃহের শাসন সম্বন্ধে ঔদাসীন্য দেখি; নিন্দা ও লজ্জাকে কখনও বা অগ্রাহ্য করা দেখি, কিন্তু রাধার প্রেমের মত মান-সম্ভ্রম-ত্যাগ, কলঙ্কের প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখিতে পাই না।

"কুলবতী হইয়া, কুলে দাঁড়াঞা,
যে ধনী পিরীতি করে।
তুষের অনল যেন সাজাইয়া
এমতি পুড়িয়া মরে॥"

হর-গৌরীর গানে আমরা এই 'তুষের অনলে' আত্মসমর্পণ ও আত্মবিস্মৃতি দেখি না। রাধাকৃষ্ণের গানে প্রেমের দুর্নিবার শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, হরগৌরীর গানে নহে।

কিন্তু গৌরীর প্রেম ও রাধার প্রেম, দুইই হিন্দুসমাজনীতির হিসাবে দোষের। তাই হিন্দু সাহিত্য যখন উন্মত্ত প্রেমের চিত্র আঁকিয়াছে, তখন তাহাকে সমাজের বাহিরে সংসার হইতে অনেক দূরে রাখিতে ভুলে নাই। হিমালয়ের তপোবন, বৃন্দাবনের কুঞ্জের সহিত আমাদের সমাজের কোনও সম্বন্ধ নাই। প্রেম ব্যক্তিকে সমাজবন্ধন অবজ্ঞা করিতে বলিয়াছে, কিন্তু ব্যক্তির এই বিপ্লব প্রকাশ্যে সমাজের ভিতর দেখা যায় নাই, গোপনে সংসার হইতে অনেক দূরে এই বন্ধনবিহীন প্রেমের লীলা দেখা গিয়াছে।

তবুও সাহিত্যক্ষেত্রে প্রেমের এই বিপ্লব-সাধনের সহিত সংসার-ধর্ম্মের একটা সুন্দর সামঞ্জস্য স্থাপিত হইয়াছে।

মহাদেব গৌরীর উন্মত্ত প্রেমকে অগ্রাহ্য করিলেন; মদনকে ভস্মীভূত করিলেন। মহাদেব যেমন তপস্যা করিয়াছেন, পার্ব্বতীও সেইরূপ তপস্যা আরম্ভ করিলেন। কোনও মুনিও পার্ব্বতীর মত এত কঠিন তপস্যা করেন নাই। সুকঠোর তপস্যার দ্বারা পার্ব্বতী মহাদেবকে বুঝিলেন। তাঁহার প্রকৃত প্রেম জন্মিল। তাই যখন মহাদেব তাঁহাকে ছলনা করিতে আসিলেন, তিনি কোনও লজ্জা বা দ্বিধা না করিয়া মহাদেবের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিলেন। তপস্যার পূর্ব্বে পার্ব্বতীর হৃদয় সংশয়রহিত ছিল না। সখীদিগের সহিত মহাদেবের সম্বন্ধে কথাবার্ত্তায়, মাতার সহিত কথোপকথনে, আমরা তাহার পরিচয় পাই। পার্ব্বতী অপরিচিত সন্ন্যাসীর নিকট মহাদেবের অপমান শুনিয়া অবশেষে নিঃশঙ্কচিত্তে বলিয়া উঠিলেন,—

"মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতং
ন কামবৃত্তির্বচনীয়মীক্ষতে॥"

আমার মন মহাদেবেই আসক্ত রহিয়াছে। কামবৃত্তি লোকাপবাদ ভয় করে না। পার্ব্বতী আপনাকে যখন "কামবৃত্তি" বলিয়া স্বীকার করিলেন, তখন তাঁহার প্রকৃত প্রেম হইয়াছে। মহাদেব প্রেমমূর্ত্তি তপঃকৃশা পার্ব্বতীকে আর প্রত্যাখ্যান করিলেন না; "তবাস্মি দাসঃ"; তুমি আমাকে তপস্যার দ্বারা কিনিয়া লইয়াছ, এই বলিলেন। তাহার পর মহাদেব পার্ব্বতীকে বিবাহ করিবার আকাঙ্ক্ষা সপ্ত ঋষিগণকে জানাইলেন। তৃষ্ণার্ত্ত চাতক যেমন মেঘের নিকট বৃষ্টি প্রার্থনা করে, সেইরূপ দেবগণ আমাকে পরহিতব্রত জানিয়া আমার নিকট সন্তান প্রার্থনা করিতেছেন। 'যাজ্ঞিক যেরূপ অগ্নি উৎপাদন করিবার জন্য অরণি আহরণ করেন, আমি সেইরূপ সন্তান উৎপাদন করিবার জন্য পার্ব্বতীকে চাহিতেছি।' ঋষিগণ পার্ব্বতীর পিতার নিকট যাইয়া মহাদেবের জন্য পার্ব্বতীকে চাহিলেন।

যাচন্ত্যেতানি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
মাতরং কল্পয়ন্ত্যেণামীশো হি জগতঃ পিতা॥

চরাচর সমগ্র বিশ্ব তোমার কন্যাকে মা বলিয়া সম্বোধন করুক; কারণ, মহেশ জগতের পিতা।

বসন্তের ভাবরাজ্যের উন্মত্ত প্রেমের, সুনিয়ম সংযমের "প্রতিকূলবর্ত্তী" বসন্তে মদনের আবির্ভাবে, "বসন্তপুষ্পাভরণা" গৌরীর ললিত যৌবনের সৌন্দর্য্যে আরম্ভ হইয়াছিল, সুকঠোর তপস্যায়, "অতিমাত্রকর্ষিতা" "দিবাকরাপ্লুষ্টবিভূষণাস্পদা"

গৌরীর কল্যাণী-মূর্ত্তিতে জিতেন্দ্রিয় মহাদেবের "অত আহর্ত্তুমিচ্ছামি পার্ব্বতীমাত্মজন্মনে" এই অভিলাষে শেষ হইল। মহাদেব পার্ব্বতীর বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইলেন। বিবাহের দিনে—

তয়া প্রবৃদ্ধাননচন্দ্রকান্ত্যা, প্রফুল্লচক্ষুঃকুমুদঃ কুমার্য্যাঃ।
প্রসন্নচেতঃসলিলঃ শিবোঽভূৎ সংসৃজ্যমানঃ শরদীব লোকঃ॥

শরৎকালে চন্দ্রোদয়ে যেমন কুমুদকুল ফুটিয়া উঠে, এবং জল নির্ম্মল হয়, সেইরূপ কুমারীর সহিত মিলিত হইয়া মহাদেবের চক্ষু প্রফুল্ল কুমুদপুষ্পের ন্যায় বিকাশ প্রাপ্ত হইল, এবং তাঁহার মন নির্ম্মল জলের মত প্রসন্ন হইল। কবি ইহার সঙ্গে কি সুন্দর শান্তি ও সংযমের মঙ্গলময় ছবি আঁকিয়াছেন,—

হরস্তু কিঞ্চিৎপরিলুপ্তধৈর্য্যশ্চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ।

মহাদেবর, চন্দ্রোদয়ে সমুদ্র যেমন চঞ্চল,—ধৈর্য্যহীন হয়, সেইরূপ হইলেন। তুলনা করিলে আমরা কুমারসম্ভবের তৃতীয় ও ষষ্ঠ স্বর্গের প্রভেদ বুঝিতে পারি।

বিবাহের দিনে মেনকার খেদ—

কান্দয়ে মেনকা গৌরীর মায়া-মোহে
ঝলকে ঝলকে খসে লোচনের লোহে॥
বর দেখি আইয়ো সয় করে কাণাকাণী
চক্ষু খাউক কন্যার পিতা, চক্ষে পড়ুক ছানি॥

শিবের মদনমোহন-বেশধারণ, নারীগণের পতিনিন্দা, কিন্তু—

সতী রমণী বলে খালি আপন জাতিকুল।
আপন স্বামী কনকচাঁপা, পর শিমুলের ফুল॥

গৌরীর সহিত মেনকার কলহ,—গৌরীকে মেনকা বলিতেছেন—

যদি দুগ্ধ উতলয়ে নাহি দেহ পাণী,
পাশা খেল সবে মিলি দিবস-রজনী।
মিছা কাজে ফিরে স্বামী, নাহি চাষ বাসা,
ভাত কাপড় কত আর যোগাব বার মাসা।

গৌরী উত্তর দিলেন—

জামাতারে পিতা মোর দিল ভূমিদান।
তাহে হয় মাষ মসুরী তিল কাজলে ধান॥
রান্ধিয়া বাড়িয়া মা গো কত দেহ খোঁটা।
আজি হইতে তোমার ঘরে পুঁতিলাম কাটা॥

হরগৌরীর কৈলাসত্যাগ, হরগৌরীর কলহ প্রভৃতি বাঙ্গালী কবি এমন ভাবে আঁকিয়াছেন যে, আমরা মনে করিতেছি,—হর ও গৌরী বাঙ্গালীর কুটীরেরই

নরনারী, তাহাদের সুখদুঃখ, [illegible] কবি সুন্দরভাবে দেখাইয়া গৃহধর্ম্মের সহজ ও সরল উপদেশ দিয়াছেন।

হরগৌরীর কথাগুলি গ্রামে গ্রামে কাব্য, গান, কবিতা ও ছড়ার ভিতর দিয়া বাঙ্গালীকে গৃহধর্ম্ম শিখাইয়া আসিতেছে। হরগৌরীর কথায় প্রথমে আমরা প্রেমের বন্ধনবিহীনতা দেখি; প্রেমের আবেগে সমাজবাধা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার সূচনা দেখি; কিন্তু বন্ধনবিহীন প্রেমের পরাজয় হইল, প্রেম বন্ধনে সার্থকতা লাভ করিল। তখন অকাল-বসন্ত, গৌরীর একাকিনী মহাদেবের নিকট আগমন, মদনের শরসন্ধান রহিল না। সংসারের সকলেই প্রেম-মিলনে যোগদান করিল, কিছুই গুপ্ত, কিছুই অপ্রাকৃত রহিল না, সবই সহজ, সরল, ব্যক্ত, শুভ হইল। হরগৌরীর কথা আরম্ভ হইয়াছিল সমাজ-বন্ধনের অবজ্ঞায়; শেষ হইল সমাজনিয়মের প্রতিষ্ঠায়। হিন্দুসমাজ স্ত্রী-পুরুষের স্বাধীন বরণ কখনও স্বীকার করে নাই; সাহিত্যক্ষেত্রে, কবিগণের কাল্পনিক জগতে তাই আমরা ইহার বিরুদ্ধে একটা বিপ্লব দেখিলাম; সে বিপ্লবে অশান্তি ও অসংযম রহিল না, সমাজে একটা সামঞ্জস্য স্থাপিত হইল। সাহিত্যই এই সামঞ্জস্যবিধান করিল; ধর্ম্ম এই সামঞ্জস্যবিধানের সহায় হইল। কবিগণের কল্পনা-জগতের সহিত গৃহসংসারের একটা সুন্দর সমন্বয় দেখা গেল।

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

উত্তরবঙ্গের প্রত্ন-সম্পৎ।

উত্তরবঙ্গ অতি প্রাচীন দেশ। বর্ত্তমানে উত্তরবঙ্গ বলিলে যে দেশ বুঝায়, প্রাচীন কালে [৯ম শতাব্দীতে] বরেন্দ্র বলিলে, প্রায় তাহাই বুঝাইত। তবে উত্তরবঙ্গের পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমা বরেন্দ্রভূমির পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমা অপেক্ষা কিছু অধিক দূর বিস্তৃত। বরেন্দ্রভূমির পূর্ব্ব সীমায় করতোয়া নদী ও পশ্চিম সীমায় মহানন্দা নদী প্রবাহিত ছিল। এক্ষণে এই উভয় নদীই ক্ষীণতোয়া হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহারা এখন আর সীমা-নির্দ্দেশক-রূপে গণ্য হইতেছে না। করতোয়ার পরপার্শ্ববর্ত্তী পূর্ব্বকালের কামরূপের কিয়দংশ এখন রঙ্গপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়া উত্তরবঙ্গের অঙ্গীভূত হইয়াছে। অপর দিকে মালদহ জেলার অভ্যন্তর দিয়া এক্ষণে মহানন্দা প্রবাহিতা হইতেছে। দক্ষিণ দিকেও গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া

এবং গঙ্গা-তরঙ্গ, ক্ষীণতর পদ্মা-তরঙ্গের সহিত মিশিয়া, এক নূতন উন্মাদিনী, তটপ্লাবিনী, তরঙ্গ-ভঙ্গ-সঙ্কুলা, বিশালদেহা নদীর সৃষ্টি করিয়াছে। পদ্মার খাতে গঙ্গার জল প্রবাহিত হওয়ায় এই নূতন নদীর নাম পদ্মাই হইয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান গঙ্গা বরেন্দ্রভূমির দক্ষিণ-সীমা নির্দ্দেশ করে না। এই নূতন পদ্মানদী এরূপ প্রখরা ও বিপুলা যে, বর্ত্তমান উত্তরবঙ্গের দক্ষিণ অংশের অনেক স্থলকে ভাঙ্গিয়া ও গড়িয়া নূতন আকার প্রদান করিয়াছে। প্রতিবর্ষে বর্ষাকালে এই খণ্ড প্লাবিত হইয়া যায়। এই নিমিত্ত উত্তরবঙ্গের বা বরেন্দ্রের বর্ত্তমান দক্ষিণ ভূভাগে পুরাকীর্ত্তির অভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, উত্তরবঙ্গের উত্তরভূভাগ কঠিন রক্তবর্ণ মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত হওয়ায়, এবং অতি দীর্ঘকাল নদীর দ্বারা প্লাবিত না হওয়ায়, মালদহ, দিনাজপুর, রাজসাহী ও পাবনার উত্তর-পশ্চিমাংশ, বগুড়ার পশ্চিমাংশ, এবং রঙ্গপুরের পশ্চিমাংশ প্রত্নসম্পদে এখনও পরিপূর্ণ। তবে এই সকল স্থানের মৃত্তিকা কঠিন এবং নদীপ্লাবন হইতে নিরাপদ হইলেও, অধিকাংশ স্থলে পুরাকীর্ত্তিগুলি ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া পড়িয়াছে। যেগুলি এখনও উপরে বিদ্যমান আছে, সেগুলি ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়া লতাগুল্মে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। সম্প্রতি সাঁওতালগণের আগমনে অনেক স্থানের জঙ্গল পরিষ্কৃত হইয়া শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে, সুতরাং ক্রমে ক্রমে প্রাচীন স্থানের চিহ্নগুলি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। হল-মুখে যে সকল মূর্ত্তি প্রভৃতি উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িতেছে, অথবা যাহা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল, সেগুলি সাঁওতাল বা অপরাপর কৃষকগণ কর্ত্তৃক সংরক্ষিত ও তৈল-সিন্দূর-লিপ্ত হইয়া গ্রাম্যদেবতা-রূপে বিরাজ করিতেছে। এইরূপ ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত যতগুলি মূর্ত্তি আমরা সংগ্রহ করিতে বা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহার দুই চারিটি ছাড়া প্রায় সবগুলিই উৎকৃষ্ট কালো কষ্টিপাথরে গঠিত, এবং যেন একই যুগে নির্ম্মিত বলিয়া বিবেচিত হয়। এই রচনা-যুগ খ্রীঃ ৮০০ হইতে ১২০০ অব্দ পর্য্যন্ত ধরা যাইতে পারে। বঙ্গে মোসলমান অধিকার বিস্তৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই যুগের অবসান হয়।

খৃঃ অষ্টম শতাব্দে বঙ্গদেশ অরাজকতার লীলাভূমি ছিল। অন্তর্বিগ্রহে ও পুনঃপুনঃ বহিরাক্রমণে বঙ্গদেশ সবিশেষ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। অতঃপর বঙ্গবাসিগণ এই সুদীর্ঘ ভীষণ অরাজকতা আর সহ্য করিতে না পারিয়া, অষ্টম শতাব্দের শেষপাদে বরেন্দ্রনিবাসী গোপাল নামক জনৈক ব্যক্তিকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অরাজকতার মূলোচ্ছেদ করে। গোপাল ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ বরেন্দ্র, বঙ্গ, রাঢ়, অঙ্গ, মগধ প্রভৃতি দেশে কিঞ্চিদধিক তিন শত বৎসর

কাল রাজত্ব করেন, এবং কলিঙ্গ ও কামরূপও পদানত রাখেন। পাল-নরপালগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, এবং এই সময়ে কেবল তাঁহাদের কর্ত্তৃক শাসিত গৌড়-রাষ্ট্রই বৌদ্ধশাসিত শেষ রাজ্য ছিল। সুতরাং নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত গৌড়-সাম্রাজ্যই সমগ্র বৌদ্ধ-জগতের কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। এই সময়ে মগধে নালন্দ, অঙ্গে বিক্রমশিলা, এবং বরেন্দ্রে জগদ্দল (বঙ্গে ও রাঢ়ে কোনও মহাবিহার প্রতিষ্ঠিত ছিল কি না, তাহার সন্ধান এখনও পাই নাই) নামক তিনটি মহাবিহার প্রতিষ্ঠিত রহিয়া বৌদ্ধজগতের সর্ব্বত্র জ্ঞানালোক বিস্তার করিতে নিযুক্ত ছিল। সুতরাং ধর্ম্ম, সাহিত্য ও শিল্পের আদর্শ গৌড়সাম্রাজ্য হইতেই চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িত। আমরা তিব্বতীয় লামা তারানাথের গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি, মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মপাল ও তৎপুত্র মহারাজাধিরাজ দেবপালদেবের শাসনকালে ধীমান ও তৎপুত্র বিৎ-পাল নামক দুই জন সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর ও ভাস্কর বরেন্দ্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং চিত্র ও ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে দুইটি অভিনব শাখা স্থাপিত করিয়াছিলেন। লামা তারানাথ বলেন, বরেন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত এতদুভয় শিল্পশাখা কর্ত্তৃক যেরূপ শিল্পরীতি উদ্ভূত হইয়াছিল, নাগ [মৌর্য্য ও আন্ধ্র?]—শিল্পরীতির পর আর সেরূপ চিত্র ও ভাস্কর্য্য দৃষ্টিগোচর হয় নাই। প্রকৃতপ্রস্তাবে বর্ত্তমান উত্তরবঙ্গের [বরেন্দ্রের] প্রত্নসম্পদের যে পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার সহিত ভারতীয় অপরাপর স্থানের ভাস্কর্য্যের মধ্য-যুগের তুলনা করিলে তারানাথের কথার যথার্থতা উপলব্ধি করা যায়। অতএব, মধ্যযুগের শিল্প-ভাস্কর্য্যের মূলানুসন্ধান করিতে হইলে বরেন্দ্রেই তাহার সূত্রপাত করিতে হইবে। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও পরীক্ষিত অনেকগুলি ভাস্কর্য্য এরূপ শিল্প-সামঞ্জস্য-পরিপূর্ণ যে, তাহা ধীমান বা তৎপুত্র কর্ত্তৃক, অথবা তাঁহাদেরই প্রতিষ্ঠিত শিল্পশাখা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, সহজে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

বরেন্দ্রের এই শিল্পশাখার প্রভাব বঙ্গদেশ অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। বরেন্দ্র হইতে নেপালে, নেপাল হইতে তিব্বতে, এবং তিব্বত হইতে ক্রমে চীন, জাপান প্রভৃতি সুদূর মহাদেশ সকলেও এই শিল্পাদর্শ বিস্তৃত হয়। ও দিকে ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশে, এমন কি, সমুদ্র পার হইয়া সুদূর যব ও বলী দ্বীপেও এই আদর্শ স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। যবদ্বীপের ভুবন-বিখ্যাত বোরো-বোদরের ভাস্কর্য্য যে এই আদর্শে অনুপ্রাণিত, তাহা তথাকার মূর্ত্তিনিচয়ের সহিত বরেন্দ্রে সংগৃহীত মূর্ত্তিনিচয়ের তুলনা করিলে প্রতিভাত হইতে পারে।

উত্তরবঙ্গ মধ্যে যে সকল স্থান প্রত্নসম্পদে পূর্ণ, তন্মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ

করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। সর্ব্বপ্রথমে বাণ-নগরের নাম করা যাইতে পারে। এ পর্য্যন্ত আমরা যতগুলি স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি, তন্মধ্যে বাণ-নগরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহার অপর নাম দেবীকোট। ডাঃ বুকানন হ্যামিলটন বলিয়াছেন, বর্ত্তমান দমদমা মৌজার নামান্তর দেবীকোট। কানিংহামও দেবীকোটকে একটি মৌজার নামরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে দেবীকোট একটি পরগণার নামে পর্য্যবসিত হইয়াছে। আইন-ই-আকবরীতে এই পরগণা সরকার লক্ষ্মণাবতীর অন্তর্গত ডিহিকোট নামক একটি ক্ষুদ্র মহলরূপে পরিগণিত হইয়াছে। তবকৎ-ই-নাসিরি গ্রন্থে দেওকোট একটি প্রাচীন নগর-রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। অভিধান-চিন্তামণিতে হেমচন্দ্র ইহার উল্লেখ করিয়াছেন—"দেবীকোট উমাবনম্। কোটিবর্ষং বাণপুরং স্যাচ্ছোণিতপুরঞ্চ তৎ।" ত্রিকাণ্ডশেষ অভিধানে পুরুষত্তমদেবও এই পর্য্যায় প্রদান করিয়াছেন।—"দেবীকোটো বাণপুরং কোটিবর্ষমুমাবনম্। স্যাচ্ছোণিতপুরঞ্চাথ।" এখানে মহাদেবের এক অবতারের অবির্ভাব হইয়াছিল, এমন কথাও পুরাণে বর্ণিত আছে। এই সকল প্রমাণে বুঝা যায়, প্রাচীন কালে দেবীকোট একটি নগররূপে পরিগণিত হইত। বাণ-নগর বা দেবীকোটের ধ্বংসাবশেষ বহুবিস্তৃত। এইখানে কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতির লিপিযুক্ত একটি কষ্টিপাথরের স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছিল। তাহা হইতে জানা যায়, উক্ত গৌড়পতি এইখানে একটি বিশাল শিবমন্দির নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। এই স্থানে প্রথম মহীপালদেব-প্রদত্ত একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। দিনাজপুরের মহারাজের প্রাসাদে বাণ-নগরের পুরাকীর্ত্তির অনেকগুলি নিদর্শন রক্ষিত রহিয়াছে। এগুলির কারুকার্য্য দেখিলে বিস্ময়ে আপ্লুত হইতে হয়। ইহা ব্যতিরেকে বাণ-নগরেও অনেকগুলি স্তম্ভাদি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাণ-নগরের প্রকৃত প্রত্নসম্পদের অনুসন্ধানকারিগণের কেবল উপরিভাগে প্রাপ্ত পুরাকীর্ত্তির নমুনা দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইলে চলিবে না, তাঁহাদিগকে মাটীর নীচেও নামিতে হইবে। সবিশেষ সহিষ্ণুতাসহকারে খনিত্র-হস্তে মৃত্তিকা সরাইয়া ফেলিলে তবে সেই প্রাচীন বাণ-নগরের প্রাচীন কীর্ত্তিনিচয়ের সন্ধান পাইতে পারিবেন। মোসলমানাধিকারের পরও বাণ-নগরের প্রতিপত্তি খর্ব্বতা প্রাপ্ত হয় নাই। পাঠানশাসনকালের প্রথম আমলে দেবীকোটই প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহাদের রাজধানীরূপে ব্যবহৃত হইত। এখান হইতে বক্তিয়ার খিলিজি তিব্বতাভিযান করেন, এবং তথা হইতে এখানে ফিরিয়াই কাল-কবলে নিপতিত হন। মোসলমানাধিকারের চিহ্নস্বরূপ লক্ষ্মণাবতী হইতে দেবীকোট পর্য্যন্ত রাজপথ, দমদমার গড় ও

পাঠানশাসনসময়ের শিলালিপিসংযুক্ত মৌলানা আতাউদ্দীনের দরগা এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে।

যোগি-গুম্ফা নামক স্থানে পুরাকীর্ত্তির বহু নিদর্শন পতিত রহিয়াছে। একটি ইষ্টকাকীর্ণ জঙ্গলময় উচ্চভূমি দেবপালরাজের "ভিটা" বলিয়া প্রসিদ্ধ। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে প্রতি বর্ষে দেবপালের নামে পূজা প্রদত্ত হইয়া থাকে। নিকটেই ভগ্ন মন্দিরে প্রস্তর-নির্ম্মিত চৈত্যচূড়া বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া দেবপালের কন্যারূপে পূজিত হইতেছে। এই মৌজার নাম দেবপুর।

উত্তরবঙ্গ রেলপথের পাঁচবিবি ষ্টেশনের তিন মাইল পূর্ব্বে মহীপুর। বগুড়া জেলার মধ্যে এই ভগ্নাবশেষ অবস্থিত। এই ইষ্টকাকীর্ণ বিস্তীর্ণ ভগ্নাবশেষের সহিত মহীপালদেবের নাম সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। এখানে নিমাইসাহার দরগার নিকট প্রতিবৎসর একটি মেলা হইয়া থাকে। মহীপালদেবের নামের সহিত অপর একটি ভগ্নাবশেষেরও সংস্রব দেখা যাইতেছে। তাহার নাম মহী-সন্তোষ। এখানেও পাঠান-শাসন-সময়ের শিলালিপিসংযুক্ত একটি প্রাচীন দরগা ও প্রাচীনতর বহু প্রস্তরস্তম্ভাদি বিদ্যমান।

দিনাজপুর জেলার দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে মঙ্গলবারি-হাট নামে একটি স্থান আছে। এই স্থানেই গুরব মিশ্রের বিখ্যাত গরুড়স্তম্ভ বর্ত্তমান। এই স্তম্ভ-গাত্রে যে লিপি ক্ষোদিত রহিয়াছে, তাহা হইতে পাল-সাম্রাজ্যের অনেক মূল্যবান তথ্য জানিতে পারা যায়। ইহার চতুর্দ্দিকেও পুরাকীর্ত্তি-নিদর্শনের অভাব নাই।'

উত্তরবঙ্গ রেলপথের জামালগঞ্জ ষ্টেশনের প্রায় দুই ক্রোশ পশ্চিমে পাহাড়পুর নামক একটি স্থান আছে। এইখানে প্রায় ৮০ ফুট উচ্চ জঙ্গলাকীর্ণ একটি সুবিশাল ইষ্টকময় স্তূপ আছে। এই স্তূপের সহিত গোপালের নামের সংস্রব রহিয়াছে।

বগুড়া জেলার বর্ত্তমান বগুড়া সহরের সাত মাইল উত্তরে মহাস্থানগড় অবস্থিত। এখানে মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত পাষাণ-সোপানাদি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। গড়ের উপরে মোসলমানদিগের একটি দরগা রহিয়াছে। তাহার প্রবেশদ্বারের প্রস্তর-ফলকে "শ্রীনরসিংহদাসস্য"—এইরূপ লিখিত আছে।

রাজসাহী জেলার বর্ত্তমান রাজসাহী সহরের প্রায় চারি ক্রোশ পশ্চিমে খেতরীর নিকটে বিজয়নগর অবস্থিত। ইহাই সেনরাজ বিজয়সেনের রাজধানী বিজয়পুর। ইহার উত্তরাংশে দেবপাড়া নামক স্থানে পদুম-সহর নামক দীর্ঘিকার পূর্ব্বতীরে বিজয়সেনদেবের প্রস্তর-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই স্থানে উক্ত প্রস্তর-লিপিতে উল্লিখিত প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দিরদ্বারের উড়ুম্বরদ্বয় আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার

নিকট পালপুর নামক স্থানে সুদীর্ঘ দুর্গপরিখার চিহ্ন অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। দেবপাড়ার আরও উত্তরপশ্চিমে মাড়ইল নামক স্থানে অনেক ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান। এখানে অনেকগুলি প্রস্তরমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে জৈন তীর্থঙ্কর শান্তি-নাথের মূর্ত্তি একতম। এ পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তরবঙ্গের অপর কোনও স্থলে আমরা জৈন-মূর্ত্তি প্রাপ্ত হই নাই। মাড়ইলের নিকটবর্ত্তী ইটাহার নামক গ্রামে সিংহনাদ-লোকেশ্বরের একটি মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে।

গৌড়-পাণ্ডুয়ার সম্বন্ধে বহু বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তথাপি এই অঞ্চলের অনেক স্থানই উপযুক্ত অনুসন্ধানের অভাবে এখনও তিমিরাবৃত রহিয়াছে। উত্তর-বঙ্গের মধ্যেই প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অবস্থিত ছিল। এখন আর এই নামের কোনও স্থানের সন্ধান পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগর কোথায় ছিল, তদ্বিষয়ে বাদানুবাদ এখনও নিরস্ত হয় নাই। যথাযোগ্য খনন-কার্য্যের সূত্রপাত না হইলে, এ বিষয়ে কোনও স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার উপায় নাই। কেবল পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগর কেন, আরও যে কত কত প্রাচীন নগর এইরূপে বিস্মৃতি-গর্ভে বিলীন হইয়া রহিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে?

বঙ্গের এই সমস্ত প্রাচীন নগরের যথাযোগ্য প্রত্ন-সম্পদের উদ্ধার করিতে হইলে খনন-কার্য্যের আরম্ভ করিতে হইবে। প্রত্নসম্পদের উদ্ধারসাধন হইলেই ইতিহাসের উদ্ধার সাধিত হইবে। নচেৎ যে উপাদান এ পর্য্যন্ত সংগৃহীত হইয়াছে, তদ্দারা প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হইতে পারে না। তাহা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিলে, প্রকৃত ইতিহাসের উদ্ধার কোনও কালেই সম্পন্ন হইবে না। বাঙ্গালীকেই বাঙ্গালার ইতি-হাসের উদ্ধারসাধন করিতে হইবে, এবং তাহাকেই কুদ্দালী-হস্তে ভূগর্ভে অবতরণ করিতে হইবে। গায়ে কাদা লাগিবার ভয়ে বা অতিশয় শ্রমসাধ্য বোধে, হঠিলে চলিবে না। যিনি অর্থশালী, তাঁহাকে অর্থদান করিতে হইবে; যিনি শ্রমশীল, তাঁহাকে শ্রমস্বীকার করিতে হইবে; যিনি বিশেষজ্ঞ, তাঁহাকে মস্তিষ্কচালনাপূর্ব্বক লব্ধবস্তুর বিশ্লেষণ করিতে হইবে;—যিনি যে কার্য্যে পারদর্শী, তাঁহাকে তাঁহাই করিতে হইবে। এইরূপ বিভিন্ন শক্তিশালী ব্যক্তিগণের সমাবেশে এই কার্য্যের সূচনা করিতে হইবে, এবং প্রচুর ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক নিপুণ ও সতর্কভাবে অগ্রসর হইতে হইবে, তবেই বাঙ্গালার ইতিহাস সংকলিত হইতে পারিবে। ইহা একের কার্য্য নহে, বা শুধু গৃহাভ্যন্তরে বসিয়া এ কার্য্য সম্পন্ন হইবার নহে;—ইহাতে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির সমগ্র-শক্তি-নিয়োগের প্রয়োজন।

শ্রীশরৎকুমার রায়।

চন্দ্র কি পৃথিবীর উপগ্রহ ?

চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ, না পৃথিবী-চন্দ্র যুগলগ্রহ, এই প্রশ্ন লইয়া বহু বাক্‌বিতণ্ডা চলিতেছে। অনেকে বলেন, চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ নয়, চন্দ্র ও পৃথিবী যুগলগ্রহ। প্রমাণস্বরূপ বলেন, আজ কাল আকাশে যে বহুসংখ্যক যুগল-নক্ষত্র আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহার একটার ভৌতিক অবস্থা ও প্রকৃতি যেমন অপরটী হইতে ভিন্ন, পৃথিবী ও চন্দ্রের অবস্থাও তদ্রূপ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পৃথিবী বায়ু-জল-উদ্ভিজ্জ-জীব-পালিনী, চন্দ্র বায়ু-জল-উদ্ভিজ্জ-জীব রহিত।

যুগলনক্ষত্রসমূহ তাহাদের উভয়ের মাধ্যাকর্ষণের কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিয়া আবর্ত্তিত হয়। চন্দ্র এবং পৃথিবীও পরস্পরের মাধ্যাকর্ষণের কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে। চন্দ্র ও পৃথিবীর দূরত্ব পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধের ৬০ গুণ, কিন্তু পৃথিবী চন্দ্র অপেক্ষা ৮১$\frac{1}{2}$ গুণ ভারী। কাজেই এখনও পরস্পরের মাধ্যাকর্ষণের কেন্দ্র পৃথিবীর মধ্যেই অবস্থিত রহিয়াছে। কিন্তু এই মাধ্যাকর্ষণের কেন্দ্র পৃথিবীর মধ্যবিন্দু হইতে বহুদূরে অবস্থিত। একটা সবলকায় ব্যক্তি একটি ক্ষুদ্র শিশুকে ঘুরাইবার সময় যেমন করিয়া ঘোরে, পৃথিবী ও চন্দ্রও কতকটা তদ্রূপ ঘোরে। উপরিউক্ত কারণে প্রতিমাসে পৃথিবীর কিয়ৎপরিমাণ গতিবিভ্রম সংঘটিত হয়, এবং জ্যোতিষ-গণনায় সময় উক্ত গতিবিভ্রম সংশোধিত করিয়া লইতে হয়।

চন্দ্র যখন পৃথিবী হইতে দূরে সরিয়া গিয়া পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধের সাড়ে একান্ন গুণ অপেক্ষা অধিক দূরে যাইবে, তখন চন্দ্র ও পৃথিবীকে একে অন্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে দেখা যাইবে, এবং তখন পৃথিবী ও চন্দ্রের সর্ব্বপ্রকার গতিতে বিচ্ছিন্নতা সম্পাদিত হইবে।

পৃথিবী ও চন্দ্রের বিভিন্নতা।

চন্দ্রমণ্ডলে বায়ু নাই, [illegible] জলীয় বাষ্প নাই; তথায় জলের কোনও প্রকার চিহ্ন বা [illegible] যায় না। কাজেই চন্দ্র অনুর্ব্বর, শীতাতপক্লিষ্ট, জীব-বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। এ পার্থক্যের কারণ কি ?

চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহই হউক, কিংবা চন্দ্র ও পৃথিবী যুগলগ্রহই হউক, চন্দ্র ও পৃথিবীর পার্থক্য বাস্তবিকই অত্যন্ত বিস্ময়াবহ। তবে প্রমাণস্বরূপ একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহা কত দূর প্রামাণিক, তাহা বিচার করা কঠিন। দৃষ্টান্তটী এই।

সম্প্রতি গগনমার্গে বহু যুগলনক্ষত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং সাধারণতঃ দেখা যায়, যুগলনক্ষত্রের একটী নক্ষত্রের ভৌতিক অবস্থা অন্যটির অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। Algot নামক যুগলনক্ষত্রের একটী জ্যোতিষ্মান্, অপরটী জ্যোতিঃহীন, একেবারে জ্যোতিঃহীন না হইলেও অতি অল্প আলোক বিকিরণ করে। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, যখন একটী জ্যোতিষ্ক হইতে দুইটী জ্যোতিষ্কের উদ্ভব হয়, তখন উহার পরমাণুসমূহ এরূপ ভাবে বিভক্ত হয় যে, উৎপন্ন জ্যোতিষ্কদ্বয়ের অবস্থা সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইয়া যায়।

সম্ভবতঃ চন্দ্র-পৃথিবীর উদ্ভবকালেও পরমাণুসমূহের এইরূপ বিভাগ হইয়াছিল। তবে কি কারণে যে এরূপ বিভাগ হইতে পারে, তাহা মানববুদ্ধির অগম্য। পরন্তু চন্দ্রমণ্ডলে এরূপ কোনও ঘটনা ঘটিতেছে না, যদ্দ্বারা আমরা চন্দ্রের পূর্ব্ব অবস্থার কোনও সূত্র প্রাপ্ত হইতে পারি।

চন্দ্রমণ্ডল যে শুধু পৃথিবী হইতে ভিন্ন, এরূপ নহে; প্রকৃতি ও অবস্থাও মঙ্গল, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহের উপগ্রহসমূহ হইতেও বিভিন্ন।

চন্দ্রের অতীত ও ভবিষ্যৎ ইতিহাস।

সার্ জর্জ্জ ডারবিন্ জোয়ার ভাঁটার কার্য্যপ্রসঙ্গে চন্দ্রের অতীত ও ভবিষ্যৎ ইতিহাসের যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত বিস্ময়জনক ও চিত্তাকর্ষক।

জোয়ার ভাঁটা পৃথিবীর দৈনন্দিন গতির প্রতিকূলে কার্য্য করে। সুতরাং আমাদের দিবস (অর্থাৎ পৃথিবীর স্বীয় অক্ষে বিবর্ত্তন-কাল) অতি ধীরে বর্দ্ধিত হইতেছে। প্রত্যেক আঘাতের প্রতিঘাত আছে। জোয়ার ভাঁটার প্রতিঘাতে চন্দ্র ক্রমশঃ পৃথিবী হইতে অতিধীরে দূরে সরিয়া যাইতেছে। ফলে আমাদের মাস ও (অর্থাৎ চন্দ্রের পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বিবর্ত্তন-কাল) অতিধীরে বর্দ্ধিত হইতেছে।

কোটী কোটী বৎসর ব্যাপী এই ঘাতপ্রতিঘাতের কার্য্যের আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে, এক সময় চন্দ্র পৃথিবীর অত্যন্ত সন্নিকটে অবস্থিত ছিল, এবং দিবস ও মাস সমান ছিল। তখন দিবস ও মাস আমাদের বর্ত্তমান ঘণ্টায় প্রায় তিন হইতে পাঁচ ঘণ্টা ব্যাপী ছিল। যখন চন্দ্র ও পৃথিবী পরস্পর সন্নিহিত ছিল, তখন জোয়ার ভাঁটার ঘাত প্রতিঘাতও বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা অধিকতর বেগশালী ও কার্য্যকর ছিল। চন্দ্র ক্রমশঃ দূরে সরিতে লাগিল, এবং মাস বড় হইতে লাগিল। দিবসও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, কিন্তু মাসের ন্যায় এত সত্বর নহে। এইরূপে ক্রমশঃ আমরা বর্ত্তমানে ২৪ ঘণ্টা ব্যাপী দিবস এবং ২৭·৩ দিবসব্যাপী চান্দ্রমাসে উপনীত হইয়াছি।

সার জর্জ ডারবিন্ বলেন, বর্ত্তমানে এই ঘাত প্রতিঘাতের ফলে দিবস ক্রমশঃ মাস অপেক্ষা অধিকতর দ্রুতবেগে বর্দ্ধিত হইবে; ফলে সুদূর ভবিষ্যতে দিবস ও মাস পুনরায় সমান হইবে, এবং আমাদের বর্ত্তমান দিবসের প্রায় ৫৫ দিবসব্যাপী হইবে। তৎপরে চন্দ্র পুনরায় পৃথিবীর দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিবে, এবং যদি ইতঃপূর্ব্বে সৃষ্টি ধ্বংস হইয়া না যায়, তবে সৃষ্টির প্রারম্ভে যে পৃথিবী হইতে সম্ভবতঃ চন্দ্রের উদ্ভব হইয়াছিল, চন্দ্র সেই পৃথিবীর সহিত পুনরায় মিলিত হইবে।

দিবসের পরিমাণকালের পরিবর্ত্তন।

অতি ক্ষুদ্র নানা কারণে দিবসের পরিমাণকালের পরিবর্ত্তন হইতেছে। সব কারণগুলি একই ভাবে কার্য্য করিতেছে না; অর্থাৎ কতকগুলি কারণ দিবসের পরিমাণ-কালকে দীর্ঘ করিতে চেষ্টা করিতেছে, এবং কতকগুলি হ্রস্ব করিতে চেষ্টা করিতেছে।

(১) উল্কাপাত, (২) জোয়ার ভাঁটা, (৩) অপেক্ষাকৃত আধুনিক প্রাত্ন-তত্ত্বিক যুগে হিমালয় প্রভৃতি উচ্চ পর্ব্বতমালাসমূহের ভূগর্ভ হইতে উত্থান, এবং এমন কি (৪) আমেরিকার গগনচুম্বী সৌধসমূহের (Skyscrapers) নির্ম্মাণ, পৃথিবীর দৈনন্দিন গতির প্রতিকূলে কার্য্য করিয়া, অতিধীরে দিবসের পরিমাণ-কালকে বর্দ্ধিত করিতেছে।

পক্ষান্তরে, (১) তাপবিকীরণ হেতু ভূপৃষ্ঠের সংকোচ এবং (২) বৃষ্টি ও তুষার-পাতে পৃথিবীর ভূভাগের ক্ষয়, পৃথিবীর নীজ অক্ষোপরি বিবর্ত্তনকাল অর্থাৎ দিবসকে হ্রস্ব করিতেছে।

অতীতে এই সমস্ত কারণে দিবসের পরিমাণকাল যে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে প্রচুর প্রমাণ বর্ত্তমান। সেই বৃদ্ধির পরিমাণ অত্যল্প হইলেও অনুভবযোগ্য, অবহেলাযোগ্য নহে।

বিষয়টী অত্যন্ত জটিল, কিন্তু কাউয়েল বলেন যে, দিবসের পরিমাণকাল এক শতাব্দীতে এক সেকেণ্ডের দুই শত ভাগের এক ভাগ ($\frac{১}{২০০}$ সেঃ) বর্দ্ধিত হইতেছে, এইরূপ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

এই হিসাবে দিবসের পরিমাণকাল বেদ-সৃষ্টির (খৃঃ পূঃ ২০০০ বৎসর) পর হইতে এ পর্য্যন্ত $\frac{১}{৫}$ সেকেণ্ড এবং খৃষ্টজন্ম হইতে এ পর্য্যন্ত $\frac{১}{১০}$ সেকেণ্ড পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

নীহারিকার তরলতা।

সকলেই জানেন, নীহারিকা অত্যন্ত তরল জ্যোতিষ্মান্ পদার্থের সমষ্টি। কিন্তু সে তরলতা যে কত অল্প, তাহা কেহ কল্পনা করিয়াছেন কি ?

ধরুন Orion বা কালপুরুষের সন্নিহিত নীহারিকার কথা। উহার বিস্তৃতি চন্দ্রের দৃশ্যমান গোলকের অর্দ্ধেক। উহা পৃথিবী হইতে বহু দূরে অবস্থিত— এত দূরে অবস্থিত যে, সেই দূরত্ব ধারণা করিবার উপায় নাই। তবে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী তারকা সূর্য্যমণ্ডল হইতে যত দূরে অবস্থিত, এই নীহারিকাকে তদপেক্ষা ১৫০ গুণ দূরে অবস্থিত বলিয়া ধরিয়া লইলে ভ্রম মারাত্মক হইবে না। এই হিসাবে কালপুরুষের নীহারিকার ব্যাপ্তি আমাদের সূর্য্যের ৫৮, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০টীর সমান।

সূর্য্যের আপেক্ষিক গুরুত্ব জলের সওয়া গুণ; অর্থাৎ, প্রায় ভূপৃষ্ঠস্থিত বায়ুর ১০০০ গুণ।

যদি এক শত কোটী সূর্য্যকে চূর্ণ করিয়া বায়ুর মত তরল করা যায়, তবে সেই চূর্ণ এক লক্ষ কোটী সূর্য্যের স্থান ব্যাপ্ত করিবে। তাহাতে উল্লিখিত ২১ শূন্যের মাত্র ১২টী কাটা যাইবে। ৫৮র পৃষ্ঠে আরও নয়টী শূন্য বাকী থাকিবে।

ইহার তাৎপর্য্য এই হইল যে, কালপুরুষের নীহারিকা যে স্থান ব্যাপ্ত করিয়া আছে, এক শত কোটী সূর্য্যকে চূর্ণ করিয়া যদি সেই স্থান ব্যাপ্ত করান যায়, তাহা হইলে সেই চূর্ণের আপেক্ষিক গুরুত্ব ভূপৃষ্ঠস্থিত বায়ুর পাঁচ হাজার আট শত কোটী ভাগের এক ভাগ হইবে।

কিন্তু কালপুরুষের নীহারিকার উপাদানসমষ্টি এক শত কোটী সূর্য্যের উপাদান-সমষ্টির সমতুল ত নহেই, তাহার সহজে ধারণাযোগ্য কোনও ভগ্নাংশের সমতুল হয় কি না সন্দেহ। *

কাজেই নীহারিকার উপদানের সূক্ষ্মতা অনুধাবন করা মানবমস্তিষ্কের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব।

আকাশ কি নক্ষত্রবহুল ?

অনেকে মনে করেন, আকাশে নক্ষত্রের যেরূপ প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই নক্ষত্রে নক্ষত্রে সংঘর্ষ সংঘটিত হইবে। তাহার ফলে

* কোটী কোটী ঘন মাইলব্যাপী হালির ধূমকেতুর পুচ্ছ জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের গণনায় ওজনে ৪।৫ পাউণ্ডের অধিক নহে।

উক্ত নক্ষত্রদ্বয় ত ধ্বংস প্রাপ্ত হইবেই, পরন্তু উহা নক্ষত্রসমূহের গতির এরূপ বিপর্য্যয় সংঘটিত করিবে, যদ্দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লয় প্রাপ্ত হইবে।

এই সকল উৎকট সংঘর্ষবাদীদিগকে শান্ত করিবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তটী দেওয়া যাইতে পারে।

সূর্য্যমণ্ডলকে যদি একের এক শত ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট একটী ক্ষুদ্র বালুকাকণা বলিয়া অনুমান করিয়া লওয়া যায়, এবং পৃথিবীকে তাহার এক ইঞ্চি দূরবর্ত্তী একটী অদৃশ্য বিন্দু বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তবে এই হিসাবে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী তারকা ৪ মাইল দূরবর্ত্তী আর একটী ক্ষুদ্র বালুকাকণায় পরিণত হয়। প্রতি সেকেণ্ডে দুই লক্ষ মাইল বেগে ধাবিত হইয়াও আলোক সর্ব্বাপেক্ষা নিকট-বর্ত্তী নক্ষত্র হইতে পৃথিবীতে আসিতে ৩১ $\frac{১}{৪}$ বৎসর সময় লয়।

এই সমুদয় আলোচনা করিলে নক্ষত্র-বাহুল্য এবং সংঘর্ষ-সম্ভাবনা অপেক্ষা, মহাশূন্যের মহাবিশালতাই হৃদয়কে অধিক অভিভূত করিয়া ফেলে।

সূর্য্যমণ্ডলের অবস্থা।

সূর্য্যমণ্ডল গ্যাসের সমষ্টি, কিন্তু সে গ্যাসের আপেক্ষিক গুরুত্ব আমাদের পৃথিবীর জলের সওয়া গুণ। মানবের Laboratoryতে সে প্রকার গ্যাস্ প্রস্তুত হইতে পারে না।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দাস।

'তানা-নানা'।

১

সন্ধ্যা তখনও গভীর হয় নাই। 'ইজি-চেয়ারের' উভয় পার্শ্বের লম্বমান অবলম্বনের উপর শ্রান্ত পদযুগল সাবধানে বিন্যস্ত করিয়া মিষ্টার রমাকান্ত মুখুয্যে ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible]। আপিস্ হইতে প্রত্যাগত ডিপুটীর [illegible] দৈনিক অবস্থা। [illegible] ইন্দ্রিয় অবসাদপ্রাপ্ত। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ক্ষুধা ও তৃষ্ণা লইয়া জাগ্রত হইয়া [illegible] করিতেছিল। রমাকান্ত তাহাতে বাধা দিয়া খানিকটা বিশ্রাম-লাভের জন্য চিন্তিত হইলেন। ক্ষুধার নিবৃত্তি প্রত্যহই হয়, কিন্তু তাহাতে সন্তোষের লেশমাত্র নাই। খাইলেই অজীর্ণ হয়। অজীর্ণ [illegible] কারণ।

'কলেজ-লাইফে' 'লনটেনিস্', 'ফুটবল' প্রভৃতি খেলা রমাকান্তের খুব অভ্যাস ছিল। এখন দুইটী ঘোর কর্ত্তব্যকর্ম্ম জীবনের দুই পার্শ্ব আক্রমণ করিয়া বসিয়াছে। প্রথমতঃ, রায় লেখা। এত সাক্ষী সবুত, এত রাশি রাশি কাগজপত্র যে, আদালতে পড়িয়া উঠা অসম্ভব। সেগুলি বাক্সবন্দী করিয়া বাটীতে লইয়া আসিতে হয়। কিন্তু তাহাতেও রীতিমত সময় পাওয়া যায় না। কারণ, (দ্বিতীয়তঃ) স্ত্রীর সহিত সংসারের সুখ দুঃখের কথা। প্রথম কর্ত্তব্যকর্ম্ম দ্বিতীয়টার প্রতিদ্বন্দ্বী। রায় লিখিতে বসিয়া গেলে বিশ্রম্ভালাপ ঘটে না। কথোপকথনে মন ঢালিয়া দিলে রায় লেখা দুর্ঘট হইয়া পড়ে। একটা জীবিকানির্ব্বাহের জন্য নিতান্ত দরকার, অন্যটা শান্তিরক্ষার জন্য। যদি ভূমণ্ডলে এমন কোনও উপায় থাকিত যে, তদ্দ্বারা উভয় কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত, তাহা হইলে মিষ্টার মুখার্জি সেই উপায়টি অবলম্বন করিয়া খুব খুসী হইতেন। কিন্তু সমাজতন্ত্রে এবংবিধ উপায় এ পর্য্যন্ত উদ্ভাবিত হয় নাই।

কোনও রকম চালাকী করিলেও চলে না। সরলা খুব সুশিক্ষিতা। বয়স প্রায় উনিশ। সৌন্দর্য্যছটার সহিত গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখমণ্ডল বহু প্রকারের ভঙ্গীবিশিষ্ট করিয়া শ্লেষমিশ্রিত সমালোচনা আরম্ভ করিলে আর রক্ষা থাকিত না। বিশেষ আপদের কথা, কর্ম্মস্থল কলিকাতায়। বাসাতে মাতঙ্গিনী ঝি ও কাদম্বিনী পিসী ছাড়া কোনও লোক নাই। ক্রমাগত বদলি হইয়া ধন্নচাস্ত। দেশ হইতে আত্মীয়গণকে আনিয়া সংসারোদ্যানকে ক্রোটনগাছ দিয়া সাজান অধিকতর ব্যয়সাপেক্ষ। কাজেই সরলার জীবন, দিনরাত্রি রমাকান্তের জীবনের খুব নিকটে ঘুরিয়া বেড়াইত। এই যে একটা অনেকটা 'পুলিস সর্ভেলেনসে'র মত ব্যাপার, রমাকান্তের পক্ষে তাহাও কম আতঙ্কের বিষয় নহে।

চালাকী করা দূরে থাকুক, কোনও সত্য কথার মধ্যে একটু মিথ্যা থাকিলে, কোনও ভাবের খানিকটা লুকানো থাকিলে, কোনও সুখের খানিকটা চাপিয়া গেলে, কোনও দুঃখ কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত করিলে, মিসেস্ মুখার্জি তাহা কার্লাইল, হার্বার্ট স্পেন্সর, কিংবা ম্যাথিউ আর্ণল্ডের মত তন্ন তন্ন করিয়া তৎক্ষণাৎ পরীক্ষা করিত। কটিনাটি-ইয়ারকি-সঙ্কুল সংসারের মধ্যে তার-লইয়া-টানাটানি-ব্যাপারপ্রিয় এক জন সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক নিকটে থাকিলে কীদৃশ জঞ্জাল উপস্থিত হয়, তাহা অভিজ্ঞ মাত্রেই জানেন। বোধ হয়, বয়ঃস্থা পাত্রী দেখিয়া বিবাহ করিতে গিয়া রমাকান্ত এই বিপদ ঘাড়ে টানিয়া আনিয়াছিলেন। রমাকান্ত নিজে 'একস্ট্রিমিষ্ট' না হইলেও, বাল্যবিবাহ তাঁহার পছন্দের বহির্ভাগে গিয়া পড়িয়াছিল। ইহার নিদর্শন

কোনও কারণ ছিল, কোনও ইতিহাস ছিল, তাহা হয় ত তিনিই জানিতেন। সেই-টুকু সরলা মুখার্জি তীক্ষ্ণবুদ্ধিগুণে বিবাহের এক বৎসর পরে বুঝিতে পারিয়াছিল। তৎপরবর্ত্তী দুই বৎসরের মধ্যে বহু চেষ্টা করিয়াও সরলা তাহার কোনও 'হদিস' পায় নাই। তাই সরলা নিকটে থাকিয়াও খানিকটা দূরে, খানিকটা জীবন-পর্দ্দার আড়ালে। প্রায় এক ঘণ্টা হইল, রমাকান্ত কাছারী হইতে প্রত্যাগত, অথচ সরলার দেখা নাই। ইহাতে রমাকান্তের যে বিশেষ আপত্তি ছিল, তাহা নহে। কিন্তু দেখাশুনা, কথাবার্ত্তা দিয়া অসার জীবনের জীর্ণ ভগ্নাংশগুলিকে গ্রথিত না করিলে সেটা যে নিতান্ত শূন্য, আবরণবিহীন হইয়া পড়ে, তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

রমাকান্ত দুই একটা নূতন এবং পুরাতন চিন্তা মস্তিষ্কভাণ্ডার হইতে পছন্দ করিয়া বাছিয়া লইলেন। সরলা নিকটে না থাকিলে দণ্ডকারণ্যবাসী শ্রীরামচন্দ্রের তূণ-নিহিত সায়কপুঞ্জের ন্যায় সেগুলি মধ্যে মধ্যে কাজে লাগিত। কল্পনাধনুতে সেগুলি আরোপিত করিয়া রমাকান্ত একেবারে ভবিষ্যৎ অন্ধকারে লক্ষ্যহীন হইয়া ছাড়িয়া দিতেন। ঝিল্লীর 'কন্‌সার্ট' তখন আরম্ভ হইয়াছে। ঊর্দ্ধে বৃদ্ধ-তারকামণ্ডলী অনন্ত পরকলাচক্ষে পৃথিবীর সান্ধ্যদৃশ্য দেখিয়া ঘন ঘন নস্য লইতে-ছিল। অদূরে মাতঙ্গিনী ঝির বাসনমাজার শব্দ, এবং কাদম্বিনী পিসীর 'কুটনা-কুটা'র আবাহন বেশ স্পষ্টভাবে শুনা যাইতেছিল। ঘোর গ্রীষ্ম। মলয় যথাসাধ্য কুকুরের মত লাঙ্গুল দোলাইয়া প্রকৃতির মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছিল।

রমাকান্ত চতুর্দ্দিকের ব্যাপার দেখিয়া কিছু বিরক্ত হইলেন। এই সকল ব্যাঙাচি ও ঝিল্লীবর্গ বেকায়দা সন্ধ্যার সময় চ্যাঁচায় কেন? বোধ হয়, জগতের অন্তর হইতে একটা তীব্র বেদনাধ্বনি সন্ধ্যাকালে উত্থিত হয়; সেটা তাহারা লুকাইয়া রাখে। মশা, মাছি, আরশোলা প্রভৃতি যত নিম্ন জীবের এই ব্যবসা। আসল ব্যথাটুকু তাহারা আঁচড়াইয়া, কামড়াইয়া আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। এই যে চালাকী এবং প্রবঞ্চনা, বিশ্বের অতিকদর্য্য নিয়ম। মানবকে ভাবিবার একটু সময় দেওয়া উচিত। তাহার জীবনের উদ্দেশ্য সে খুঁজিয়া বাহির না করিলে অন্য কাহারা করিবে? আর এই যে অনাসৃষ্টি কাণ্ড—সন্ধ্যার সময় পরিশ্রান্তকলেবর স্বামী কাটাতে আসিলে কেহ খবর লইবে না, ইহা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। সরলার সহিত ইহা লইয়া একদিন তর্ক হইয়া গিয়াছিল। চকা-চকী, কপোত, কোকিল, এমন কি, কোনও পশুপক্ষীর মধ্যেই সন্ধ্যার পরে দাম্পত্য সম্বন্ধ থাকে না। কিন্তু মানুষের পক্ষে সেটা কি রকম করিয়া খাটিবে? মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব, কথা কহিতে

জানে। বাজাইতে জানে। গায়িতে জানে। নির্জ্জনে প্রাণের লোকের সঙ্গে ইহার উৎকর্ষসাধন না করিলে আবর্ত্তনের উদ্দেশ্য কি?

ভারি অন্যায়। ঘোর অন্যায়। এতই কি কুৎসিত এবং হীন যে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এক ঘণ্টাও পছন্দ হয় না? ন্যায়বর্জ্জিত ভাব স্ত্রীলোকের পক্ষে বড় খারাপ। ভালবাসা বড় দুর্ম্মূল্য ধন। সকলের হৃদয়ে থাকে না। অনেক নারিকেলের মধ্যে জল থাকে না। অনেক ফুল সুদৃশ্য হইলেও সৌরভ থাকে না। যে সকল স্ত্রীলোকের হৃদয়ে ভালবাসা নাই, তাহারা সৃষ্টির কলঙ্ক।

সৃষ্টির মধ্যে একটু দোষ দেখিতে পাইয়া মিষ্টার মুখার্জ্জি দীর্ঘনিঃশ্বাস দ্বারা সন্ধ্যাকালে আত্মবন্দনা সাঙ্গ করিলেন। ক্রমে তাঁহার হৃদয় বিশ্বের অন্য দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। মুখার্জ্জি কখনও গান জানিতেন না; সুরেরও কোনও ধার ধারিতেন না; অথচ আজ যেন বোধ হইল যে, গানের একটু চেষ্টা করিলে মন্দ হয় না। ইচ্ছাটা এত প্রবল হইয়া পড়িল যে, গলা সাফ্ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। গলা সাফ করিবামাত্র ভাবটা গলার দিকে আসিল। ভাবটা যে ঠিক কি রকম, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। কথাটা যে কি, তাহার কোনই চিহ্ন নাই। সুরটা যে কোনও বিশেষ রাগরাগিণীর অন্তর্গত, তাহাও নয়। কেবল 'তানা—না—না—না'। ইহাই ক্রমান্বয়ে নানা রকম সুরে রমাকান্তের গলা হইতে বাহির হইয়া অন্ধকার ও নির্জ্জনতা বিদীর্ণ করিল।

২

গান স্বর্গীয় অশ্ব। স্বর্গের কতকগুলি পথ আছে, তাহার একটা সোজা পথে ঘোড়ার পৃষ্ঠে যাওয়া যায়। সেই পথ সঙ্গীতময়। অন্যান্য মার্ত্ত্য অশ্বের মত ইহার চারিটা পা নহে, সাতটা। প্রাণটা খুলিয়া দিলে এই সাতটা পা কৌশলে চালাইয়া অশ্ববর টক্ টক্ করিয়া স্বর্গে লইয়া যায়। আরোহীর বেশী ওস্তাদী কিংবা বজ্জাত ভাব থাকিলে অশ্বের গতির বাধা পড়ে। হয় ত দুই পদ অগ্রসর হয়, অবশিষ্ট পাঁচটা পশ্চাদ্ভাগে বিদ্রোহীর ভাব অবলম্বন করে। কিংবা লাগামটা মুখ হইতে খুলিয়া গেলে অশ্বারোহীর বিপন্ন অবস্থা হয়। যাহাই হউক না কেন, সুরের মর্য্যাদা আছে। গাড়ীবারান্দার নীচে ফুলের টবের পার্শ্বে একটা তানা—নানা শব্দ শুনিতে পাইয়া সরলা অন্তরাল হইতে বাহিরের ঘরের বাতায়নপার্শ্বে দৃষ্টিসঞ্চার করিয়া স্বামীর দুরবস্থা বুঝিতে পারিল। ইতিপূর্ব্বে যে গানের নাম শুনিলে চটিয়া যাইত, এমন ধারা লোকের গলা দিয়া তানা—নানা বহির্গত হওয়া যে কিসের কোনও সারসত্যের অসাময়িক আবির্ভাব, সরলার তাহা ধ্রুব বিশ্বাস হইল।

সেই সত্যের তথ্যানুসন্ধানতৎপরা বিস্মিতা মিসেস্ মুখার্জি এক পেয়ালা চা ও দুইখানি 'টোষ্ট' হস্তে মুখের হাসি কুন্দনিন্দিত দন্তে কোমল ওষ্ঠে চাপিয়া অন্ধকারে স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। পদসঞ্চার নিঃশব্দ হইলেও রমাকান্ত মুখার্জির কর্ণকুহর তাহা অনাহতধ্বনির মর্ম্মের ন্যায় পূর্ব্ব কলরবের সাহায্যে তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করিল। কোনও কথা না কহিয়া রমাকান্ত চার পেয়ালা ও 'টোষ্ট' অবলীলাক্রমে সরলার হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া পাঁচ মিনিটের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে গলাধঃকরণ করিলেন। এই সময়টুকুর মধ্যে সরলা একবার ফুলের টবের পার্শ্বে, একবার স্বামীর চেয়ারের পশ্চাতে পাইচারি করিতে করিতে ভাবিতেছিল, 'কাহার আগে কথা কহা উচিত?' বিবেক আসিয়া কহিল, 'সুরের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে তোমারই অগ্রে সম্ভাষণ করা কর্ত্তব্য।' রমাকান্ত ঘাড় তুলিয়া আকাশের দিকে চাহিলেন। সরলা বেলফুলের গোটা কতক কুঁড়ি লইয়া ছিন্ন করিতে লাগিল। ক্রমে উভয়ের 'প্যান্টোমিমিক' ভাব অন্তর্হিত হইয়া কিঞ্চিৎ 'ড্রামাটিক' ভাবের সঞ্চার হইলে পর, মুখার্জি চার উষ্ণতার সাহায্যে বলিয়া বসিলেন, 'কি মনে করিয়া?'

সরলা। তোমার গান শুনিতে।

রমাকান্ত। আমি কেবল গানের 'চেষ্টা' কচ্ছি'লেম। কথা ও সুরের অভাবে সেটা ব্যর্থ হইয়া গেল।

সরলা। কিন্তু ভাঁজাটা মন্দ হয় নাই। আমি যখন প্রথম রান্না শিখি, তখন তরকারী কুটিয়া লইয়া প্রথমে ঘণ্ট, চচ্চড়ি, কিংবা ডালনা. কোনটা আরম্ভ করিব, ঠিক্ পাইতাম না। ক্রমে হাত 'সেট্' হইয়া গেলে দেখিলাম, 'চপ' পর্য্যন্ত ভাজাও নিতান্ত সহজ ব্যাপার। কেবল ইহার মধ্যে একটু লুকানো কথা আছে। মন চাই। কাহার জন্য কি করিব, কে কি খাইতে ভালবাসে, সেটুকুর উপর লক্ষ্য না থাকিলে সকলই বৃথা। আজ মহাশয়ের গানের উত্তমের মধ্যে সেই লক্ষ্যটুকু দেখিতে পাইয়াছি। এখন জিজ্ঞাস্য, তাহা নূতন কি পুরাতন?

সমালোচনার অবতারণা দেখিয়া মুখার্জি বলিতে যাইতেছিলেন, "আজ "রায়" লিখিবার জন্য রাশীকৃত কাগজ লইয়া আসিয়াছি।' কিন্তু সরলার কথার মধ্যে অন্যদিন অপেক্ষা আজ একটু বেদনার ভাব ছিল। হৃদয়বীণার কোনও একটা তার যেন হইতে স্পর্শ করিয়া সরলা যেন তাহা পরখ করিতেছিল। সেইটুকুর জন্য রমাকান্তের কৌতূহল প্রদীপ্ত হইল।

রমাকান্ত। ডারউইন এ সম্বন্ধে কি বলেন?

সরলা। ডারউইন ও গর্ণী প্রভৃতির মতে প্রণয়োচ্ছ্বাসটা খরতর না হইলে গলার মাংসপেশীর মধ্যে সুরের সঞ্চার হয় না। হার্ব্বার্ট স্পেন্সর তাহা মানেন না। কিন্তু সচরাচর যাহা দেখা যায়, তাহাতে বোধ হয়—

রমাকান্ত। তোমারই কথা ঠিক। কিন্তু আমার 'ভাঙ্গা দেউল'—তাহা বোধ হয় জান।

কথাটা যে অর্থে রমাকান্ত বলিতে গিয়াছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে সরলা সে অর্থে তাহা গ্রহণ করিল না। আগে যে সন্দেহ ছিল, সরলার মনে তাহা দৃঢ়তর হইল। সরলা বলিল—'তা জানি, এবং ভাঙ্গা মন্দিরের দেবতা মধ্যে মধ্যে চলিয়া গিয়া আবার মায়াবশতঃ ফিরিয়া আসে, তাহাও জানি। সুতরাং কল্পনায় তাহাকে দেখিলে 'তানা-নানা'র একটা সঙ্গীন অর্থ হইয়া পড়ে। আমার মতে গোধূলি লগ্নে 'তানা—নানা'র' সঞ্চার পূর্ব্বপ্রেমের অকাট্য প্রমাণ।'

রমাকান্ত। আমার বোধ হয় হৃদয়ের মধ্যে একটা দর্পণ আছে; তাহাতে নিজের ইতিহাস দেখিয়া সকলে অন্যের উপর তাহার আরোপ করে। আমার ঠিক স্মরণ নাই, কিন্তু আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত যে, বাসরঘরে তোমার মুখ প্যাঁচার মত গম্ভীর হয়েছিল।

সরলা। বাসরঘরে তোমার পূর্ব্বানুরাগের ইতস্ততঃ-সঞ্চালিত অনুসন্ধান দেখিয়া আমার বেশ মনে হইয়াছিল, তুমি একটি বদ্ধ জুয়াচোর।

কলহের সম্ভাবনা দেখিয়া রমাকান্ত বলিলেন, 'তুমি একটু স্থির হও। মানুষের জীবন একেই সঙ্কীর্ণ, তাহার উপর আবার জীর্ণশীর্ণ অবস্থা। যেরূপ গতিক দাঁড়াইতেছে, তাহাতে হয় ত আমাকে রঙ্গস্থল হইতে সরিয়া পড়িতে হইবে, নচেৎ আত্মহত্যা। যদি পছন্দ হয়, তবে আমি তাহাতেও রাজি। বিবেচনা করিয়া দেখ, ইহা অপেক্ষা চিরকৌমারাবস্থা কত ভাল।'

সরলা কথার জবাব দিবে না মনে করিয়াছিল, কিন্তু বলিল, 'কুমারগণ নিজের সুখটুকু লইয়াই ব্যস্ত, কুমারীগণকে সুখী করিবার জন্য বিবাহ করে না। কাঁদিবার জন্য আমাদের জন্ম, পদদলিত করিবার জন্য তোমরা আমাদিগকে সংসারে টানিয়া আন। জীবনের একটা কথাও তুমি একদিন আমাকে বল নাই। চতুর্দ্দিকে যাহা দেখি, তাহার সহিত তোমার অবস্থার কোনও পার্থক্য দেখি না। পুরানো কালে প্রেমের একজন করিয়া দূতী থাকিত; কিন্তু সাক্ষী সবুত সত্ত্বেও তোমরা বৃন্দাবনপার হইয়া মথুরায় যাইতে। পরে অন্য যুগে বাল্যবিবাহ করিয়া অভাগিনীকে যন্ত্রণা দিতে। এখন প্রকাশ্যে অন্য রমণীর উপর অনুরাগ ব্যক্ত করিয়া তোমরা বাহাদুরী লও।'

রমাকান্ত। তুমি এক জন ঘোর 'সক্রেজিষ্ট'।

সরলা। নিশ্চয়। সাবধান থাকিও, যদি আমি ঘুণাক্ষরে তোমার পূর্ব্ব-প্রণয়িণীর সন্ধান পাই, তবে তাহার গলা টিপিয়া দিব।

ছোটখাট একটা আক্রমণের ভাব দেখাইয়া সরলা চলিয়া গেল। রমাকান্ত মুখার্জি পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'দোষটা আমার, না সরলার?'

৩

বাল্যকালের বন্ধুত্ব! কতই মধুর! তাহার স্মৃতি মরণের সময়ও বিলুপ্ত হয় না।

বিশ্বে ভালবাসিবার যাহা কিছু, সকলই বোধ হয় কৈশোরের। তাহারাই ঘুরিয়া ফিরিয়া যৌবনের সাজ সাজিয়া আসে; তাহারাই মরণের সময় পুঁজিপাটা লইয়া নাট্যশালা হইতে চলিয়া যায়। সম্বল শুধু ভালবাসা।

যে নদীবক্ষে এক সময় পূর্ণ জোয়ার অতিশয় উৎপাত করিয়াছিল, সেখানে এখন বালুকাসৈকত। কণাগুলি কৈশোরের অস্থি।

তাহারই মধ্যে বার্দ্ধক্যের কঙ্কাল স্থানে স্থানে ভীতির সঞ্চার করিয়া শ্মশানের দৃশ্য নয়নের সম্মুখে উপস্থিত করে। খুঁড়িয়া দেখ, অতিশয় স্বচ্ছ জল। তাহাই ভালবাসা।

উদ্বেগহীন, স্বার্থহীন, গর্ব্বহীন ভালবাসা। বার্দ্ধক্যের গভীর স্তরে কিশোর বয়সের চিহ্নগুলি কালক্রমে আশ্রয়লাভ করে। তীব্র বিশ্ববিরহের অগ্ন্যুৎপাতে সেগুলি উৎক্রান্ত হইয়া আবার নূতন জগৎসৃষ্টির উপকরণ হয়।

প্রস্তরযুগের নরকঙ্কাল ভূগর্ভ হইতে বাহির করিয়া আমরা সাদরে হৃদয়ে লইয়া চুম্বন করিতেছি, স্মিতমুখে মস্তকে ধরিতেছি। হে ভূতত্ত্ববিৎ! তুমিই বাল্যপ্রেমের মর্ম্ম জান।

প্রোফেসার বিনয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেই রকম একটি কঙ্কালের মত। খুব কম বয়স, অথচ চুল অর্দ্ধেক পাকিয়া গিয়াছে। যাহার যত গভীর ভালবাসা, তাহার চুল তত শীঘ্র পাকে। এই রকম উদাহরণই বেশী। তাহার শরীর জীর্ণ হয়। আহার-নিদ্রা-বিহীন অবস্থায় 'মরণের পবিত্র আস্বাদন পার্থিব জীবনের মধ্যে যে ব্যক্তি অল্পকালের মধ্যে পাইয়া পুণ্যময় হইয়া উঠে, সেই লোকই যথার্থ 'প্রোফেসার'। বিনয় বিজ্ঞানের প্রোফেসার। বিনয়ের ভিতর ও বাহির উভয়ই সুন্দর। বোধ হয়, বিশ্বের ছোট এবং বড় যত প্রকার দেবতা, মধু লইয়া কোনও নির্জ্জন স্থানে সেচন করিত; প্রকৃতি সেইখানে বসিয়া বিনয়কে



দেশলাইয়ের শেষ কাঠিটি !

চিত্রকর—ডব্লিউ, স্মল।

U RAY & SONS, Calcutta.

গড়িয়াছিলেন। শ্রমসহিষ্ণুতার স্নায়ু দিয়া, প্রেমের শোণিত দিয়া, পরহিতের মাংসপেশী ও করুণার [illegible] দিয়া বিনয়ের দেহ সংগঠিত। দুঃখময় জীবনের মধ্যে যাহারা সেগুলি দেখিত, স্বতঃই আকৃষ্ট হইত।

রমাকান্তও এককালে আকৃষ্ট হইয়াছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়নকালে বিনয় রমাকান্তকে অবকাশ হইলেই তাহাদের মাণিকতলার বাটীতে লইয়া যাইত। নিজের হাতে দোকান হইতে ভাল সন্দেশ আনিয়া খাওয়াইত। সূর্য্যাস্ত হইলে গোলদিঘীর শ্যামল শীতল পাড়ে বসিয়া রমার মধুর কথা শুনিত। অনন্ত জীবনের অনন্ত ভালবাসার 'অনন্ত' প্রতিজ্ঞা করিত। রমাকান্ত প্রত্যহ বিনয়ের মুখের দিকে একবার শেষ সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বাটী চলিয়া যাইত। বিনয় বোধ হয় একটু বেশী 'প্র্যাকৃটিক্যাল' ছিল। সে রমাকান্তের জন্য প্রায় সারারাত্রি জাগিয়া নিজের 'নোট'গুলি নকল করিয়া রাখিত। পরীক্ষার তিন মাস পূর্ব্বে রমাকান্তকে ধরিয়া সেগুলি মুখস্থ করাইত, এবং রমাকান্ত পাশ হইলে তাহার মাতার নিকট এক ক্রোশ ছুটিয়া গিয়া মরজীবনের অমর সুখটুকু হাসিভরা মুখে জ্ঞাপন করিয়া আসিত। রমাকান্তের মাতা বলিতেন—'এত ভালবাসা আমাদেরও আছে কি না সন্দেহ।' রমাকান্তের পিতা উত্তর দিতেন—'ঠিক তাই, আমরা মরিয়া গেলে অন্ততঃ এক জন লোক রমাকান্তের সারাজীবনের প্রহরী থাকিবে।'

রমাকান্তের বিবাহের ইচ্ছা দেখিয়া বিনয় তাহার জন্য একটি সুন্দরী পাত্রী খুঁজিয়া রাখিয়াছিল। সুকুমারী সামান্য গৃহস্থ-ঘরের দশ বৎসরের মেয়ে। সৌন্দর্য্যের আধার। ঋষি ও কবিকুলের কল্পনার আদর্শ। লক্ষ্মীর মত গৃহকর্ম্মে পটু। সরল-হৃদয়া, সর্ব্বদাই সলজ্জহাসি। রমাকান্তের মাতা আহ্লাদে আটখানা হইয়া তাহারই সহিত রমার বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, কিন্তু সেই সময় রমাকান্তের জীবনা-কাশে একখণ্ড মেঘের সঞ্চার হইল।

বিনয় 'জেনারেল অ্যাসেম্ব্লি ইন্‌ষ্টিটিউশনে' প্রোফেসারির পদ গ্রহণ করিলে, তাহার এক জন বন্ধু আশুতোষ, সরলার সহিত বিনয়ের বিবাহের প্রস্তাব করিল। সরলা বেথুন স্কুল হইতে সে বৎসরে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া আগ্রায় যাইবার বন্দোবস্ত করিতেছিল। আশুতোষকে সরলার পিতা ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায় খুব সম্মান করিতেন; কারণ, আশুবাবুর পিতৃবৎ স্নেহ ও অযাচিত পরিশ্রমের ফলেই সরলার উচ্চশিক্ষা। সরলাকে দেখিয়া বিনয়ের পছন্দ হইল, এবং ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায় আশুবাবুর প্রস্তাবে আপত্তি করিলেন না। সরলার আগ্রায় যাওয়া হইল না। কলিকাতায় থাকিয়া আশুতোষ বাবুর নিকট অধ্যয়ন করিয়া

এফ্. এ. পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইল। সেই সময় বিনয় সরলাকে দেখাইবার জন্য রমাকান্তকে বীডন্ ষ্ট্রীটে লইয়া গিয়াছিল।

সরলা বেশী রাত্রি জাগিয়া পড়িত, চা খাইত, এবং বিজ্ঞানের বহিগুলি লইয়া ভবিষ্যতে একখানা পুঁথি লিখিবে মনে করিয়া, রাশীকৃত 'নোট' লিখিত। এইরূপ কঠিন পরিশ্রমের ফলে তাহার 'মূর্চ্ছা'র সূত্রপাত হইয়াছিল। রমাকান্ত মুখার্জ্জি সবে এক বৎসর ডেপুটীর পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। হ্যাটকোট পরিধানপূর্ব্বক বাল্যবন্ধু বিনয়ের ভাবী পত্নীকে দেখিতে গিয়া সরলা দেবীর মূর্চ্ছা দেখিয়া মোহিত হইয়া পড়িলেন। শুধু মূর্চ্ছা নয়। ষোড়শীর মূর্চ্ছা! বিদুষীর মূর্চ্ছা! রমাকান্ত ভাবিল, 'কি সুন্দর মূর্চ্ছা! যে স্ত্রীর মূর্চ্ছা হয় না, তাহার কোনও মাধুর্য্য নাই। তাহাকে বিবাহ করা বিড়ম্বনা।'

রমাকান্ত কোনও কোনও বন্ধুকে বলিলেন, 'বিনয় আমার সহিত প্রবঞ্চনা করিয়াছে। সে ভালটি আপনি বাছিয়া লইয়া আমার কপালে একটা পরীর জলছবি মারিয়া দিয়াছে।'

কথাটা বিনয়ের কাণে গেল। সারারাত্রি বিনয় কি করিয়া অতিবাহিত করিয়াছিল, তাহা কেহ জানে না; কিন্তু ভোর বেলা কম্পিতহস্তে একখানা চিঠি লইয়া সে বীডন্ ষ্ট্রীটের ডাকঘরে পোষ্ট করিয়া আসিল।

রমাকান্ত ডাক খুলিয়া একখানা চিঠি পাইল—'রমা, তোমার কপাল হইতে জলছবি তুলিয়া লইলাম। তোমার মনের কথা যদি আগে আমাকে জানাইতে, তবে সরলা কেন, হৃদয়ের রক্ত দিয়াও আমাদের ছেলেবেলার সম্বন্ধটুকু রাখিতাম। সব ঠিক হইয়া গিয়াছে। তোমার সহিত সরলার সোমবারে বিবাহ।—বিনয়।'

কি করিয়া এই অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল, তাহার বিন্দুবিসর্গ কেহ জানিতে পাইল না। কোনও কথা উঠিল না। মহানগরীর সান্ধ্য মহাকলরবের মধ্যে সোমবারে 'মিষ্টার মুখার্জ্জি'র সহিত সরলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ হইয়া গেল। বাসরঘরের দ্বার হইতে উভয়কে বিনয় হৃদয়ের সহিত আশীর্ব্বাদ করিল।

আর সুকুমারী? এক বৎসর পরে সেই 'জলছবি'টি বিনয় ঘরে লইয়া গিয়া আত্মচরণে উপহার দিল। একদিন সন্ধ্যার সময় সেই তের বৎসরের ক্ষীণাঙ্গী বালিকা শিয়রে বসিয়া বিনয়ের বিজ্ঞানের বহিগুলির ছবি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া লুকাইয়া দেখিতেছিল। সহসা তাহা আবিষ্কার করিয়া বিনয় নববধূকে লইয়া বাতায়নের দিকে গেল। সন্ধ্যা-তারকার দিকে চাহিয়া বিনয় একবার জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি ভালবাসিতে শিখিয়াছ?'

সুকুমারী বিনয়ের অঙ্কে বসিয়া কি ভাবিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে বলিল, 'অনেক দিন শিখিয়াছি। কিন্তু তুমি পায়ে ঠেলিয়াছিলে কেন?'

বিনয় ধীরে ধীরে বালিকার কেশভার স্বীয় গলদেশে বেষ্টন করিয়া বলিল; 'পাগ্‌লী! রমণীর প্রেম অপেক্ষা বাল্যস্নেহ আরও গভীর। কিন্তু হায়! কাল আসিয়া সকলই সংহার করে। সে আমাকে দাগা দিয়াছে, কিন্তু তুমি তাহার সাক্ষী। তুমি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর বলিয়া তাহারজন্য বাছিয়া লইয়াছিলাম। সে চাহে নাই বলিয়া তুমি আমার অতিশয় বেদনার সামগ্রী। সে স্বেচ্ছায় উৎসর্গ করিয়াছে বলিয়া তুমি আমারই চিরজীবনের সম্বল।' তাহার পর বিনয় সুকুমারী'কে তাহাদের পূর্ব্বকথা সকলই বলিল। কিছুই লুকাইল না।

সেই মহান, নিঃস্বার্থ, মুক্ত হৃদয়ের পবিত্র ছবি দেখিয়া বালিকা মুহূর্ত্তের জন্য বুঝিতে পারিল যে, সংসারের পুণ্যপথের দেবতা তাহার সম্মুখে।

৪

অবসরপ্রাপ্ত সদরালা নবকুমার বাবুর বাটীতে পারিবারিক 'গার্ডেন পার্টি'। নবকুমার বাবু ক্ষীণজীবী মানুষ। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী এবং মেয়েরা স্বাস্থ্য এবং কলেবরের ব্যাপ্তি সম্বন্ধে বিখ্যাতা। তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠা মেয়ে ভানুমতীর লাহোরের এক জন বড় উকীলের সঙ্গে বিবাহ হইয়া যাওয়াতে এই 'পার্টি'র ব্যবস্থা। নবকুমার বাবু খুব প্রফুল্লচিত্তে বন্ধুবান্ধবগণের সহিত কথোপকথনে ব্যস্ত। 'দাদা, এইবার গোজন্ম হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছি। চারিটি মেয়ের বিবাহে ষোল হাজার টাকার শ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে। চারা নাই। বিপর্য্যয় পণের ডাকহাঁক। দেশের এই কলঙ্কটা অপনোদন করে, এমন লোক নাই। যাহা হউক, বেনারসী 'সিল্ক' অনেকটা সস্তা, আর অলঙ্কারের পালিশের মধ্যে অনেক জুয়াচুরি ঢুকিয়াছে। ফলে দুই হাজার টাকার অলঙ্কার চারি হাজারের নামে চলিয়া গিয়াছে। গিন্নী ও মেয়েদের গায়ে যাহা দেখিতেছ, সব বাজে 'সিল্ক'। মনে কর, ছয় গজ করিয়া কাপড়-ছত্রিশ ইঞ্চি বহরের, প্রত্যেকের একটা করিয়া জ্যাকেটে খরচ হয়, খাঁটী রেশম দিতে গেলে বিকাইয়া যাইতাম। ও:—'

দূর হইতে গিন্নীর কটমট দৃষ্টিনিক্ষেপ লক্ষ্য করিয়া নবকুমার বাবু সুচাক বুঝাইয়া দিলেন যে, দর্জি ঐ কাপড়ের অর্দ্ধেক চুরি করে। বাস্তবিক ছয় গজ কাপড় কাহারও শরীরে লাগে না, যত বড়ই হউক না কেন।

মেয়েরা অতি শান্ত স্বভাবা। ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়া হীনার ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিল। অত্যন্ত গ্রীষ্ম হওয়াতে পুরুষবর্গ বাগানের দিকে বয়স্ক

খাইতে বসিয়া গেল। স্ত্রীলোকেরা বারান্দায় পাখার নিচে পাইচারী করিতে লাগিলেন।

প্রতিবাসিনী মহিলাদিগের মধ্যে অনেকে নিমন্ত্রিতা হইয়াছিলেন। সরলা তাঁহাদের মধ্যে এক জন। সরলা ভানীর (ভানুমতীর) সহপাঠিনী। বেথুন স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করিয়া সরলা চলিয়া যাইবার পর তাহাদের সঙ্গে আর দেখা হয় নাই। সরলাকে ভানী সকলের সহিত আলাপ করাইয়া চরিতার্থ হইল। সরলার বাক্যালাপে সকলেই মুগ্ধ।

ভানী। সরলা দিদি! তোর 'মূর্চ্ছা'টা এখন কি রকম?

সরলা। বিবাহ করিয়া সারিয়া গিয়াছে।

ভানীর মতে সেটা কিন্তু ভাল হয় নাই। আজকাল মূর্চ্ছা না গেলে স্বামী নিকটে আসে না। সেই জন্য ভানী 'হিষ্টেরিক ফিটে'র কসরৎ আরম্ভ করিয়াছে। 'কিন্তু' দেখ, সরলাদিদি! আমার শরীরটা তোমার মত পাত্‌লা নয়, একবার পড়িয়া গেলে উঠিতে কষ্ট হয়।'

সরলা দুঃখে দুঃখী হইয়া ভানীর মুখচুম্বন করিল। নবকুমার বাবুর স্ত্রী তাহা দেখিয়া সকলকে বলিলেন, 'মেয়েটী রাজরাণীর উপযুক্ত।'

সরলা বলিল, 'এখানে কেউ গাহিতে জানে না?'

এক জন বলিল, বিনয় বাবুর স্ত্রী সুকুমারী বেশ গায়। সে মহাকালী পাঠ-শালায় গান শিখিয়াছিল।

সরলা সুকুমারীকে কখনও দেখে নাই। তাহার পূর্ব্বকথাও কিছু জানে না। প্রথমে মনে করিল 'বিনয় বাবুর স্ত্রীকে ডাকিয়া আনাটা ন্যায়সঙ্গত নহে।' পরে কি মনে করিয়া ধরিয়া আনিল।

সুকুমারীকে হার্ম্মোনিয়মের পার্শ্বে দাঁড় করাইয়া সরলা বলিল, 'একটা বিরহের গান গাও।'

হঠাৎ ধৃতা হওয়াতে সুকুমারীর হৃৎকম্প হইয়াছিল। কিন্তু নিমেষের মধ্যে সে হৃদয় হইতে ভয় দূর করিয়া 'আমার প্রাণ যারে চায়'—সেই গানটি গাহিতে লাগিল।

"সেই অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বর প্রকোষ্ঠ হইতে উদ্যানে পরিব্যাপ্ত হইয়া সকলের কর্ণকুহরে সুধাবর্ষণ করিতেছিল। সর্ব্বাপেক্ষা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন রমাকান্ত মুখার্জি। তিনি উদ্যান ছাড়িয়া বারান্দার এক পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া নিঃস্পন্দভাবে সেই গান শুনিতেছিলেন।

এক জন চুপি চুপি বলিল, 'উনিই সরলার স্বামী।' সুকুমারী চকিতভাবে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। বালিকার স্মৃতিপথে স্বামীর পূর্ব্বকথা উদিত হইল। উনিই আমার স্বামীকে 'দাগা' দিয়াছিলেন? সুকুমারী আবার তাকাইয়া দেখিল। রমাকান্ত সতৃষ্ণনয়নে সুকুমারীর দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিলেন, 'বিনয় নিশ্চয়ই ইহাকে লইয়া জীবনে সুখী হইয়াছে। আশীর্ব্বাদ করি, বাঁচিয়া থাকুক।' হঠাৎ সুকুমারীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। সে আর গাহিল না।

সরলা সুকুমারীর হস্ত ধরিয়া পার্শ্বের ঘরে লইয়া গেল। সেখানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'তুমি একটু বরফ খাবে?'

সুকুমারী বলিল, 'না'।

সরলা বলিল, 'তুমি বড় বেহায়া। তোমার লজ্জা কম, এখন হইতে নীতিশিক্ষা করা উচিত। তুমি যে রকম করিয়া এক জন পরপুরুষের দিকে চাহিতেছিলে, তাহা বিনয়ের স্ত্রীর উপযুক্ত নয়।'

সরলা বিনীতভাবে বলিল, 'দিদি, সে জন্য নয়—'

কিন্তু সরলার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল। সে ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, 'তথাপি নীতিবিরুদ্ধ—ধর্ম্মবিরুদ্ধ।' ক্রমে আত্মহারা হইয়া সরলা সুকুমারীর গাল সজোরে টিপিয়া দিল। 'ইহাই তোমার শাস্তি। তুমি বড় বেহায়া।' আরও টিপিলে শোণিতোদ্গম হইত, কিন্তু সে অসহ্য ব্যথা সহিয়া সুকুমারী কেবল কহিল, 'দিদি আমাকে মের' না, আমার কোনও দোষ নাই।' অবিলম্বেই সরলা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

নবকুমার বাবুর মেয়েরা এবং অনেকেই ঘটনার মর্ম্ম বুঝিয়াছিল। কিন্তু মূর্চ্ছা হওয়াতে গোলমালটা সেই দিকে গড়াইল। কথাটা প্রকাশ্যভাবে আন্দোলিত না হইয়া, প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়া গেল। কেহ কেহ বলিল, 'সরলারই দোষ। অমন করিয়া গাল টিপিয়া দেওয়া হিংস্রক জন্তুর স্বভাবের মত।' অপরে কহিল, 'হিষ্টিরিয়া জিনিষটা বুঝা দুষ্কর।' এক জন বলিলেন, 'সুকুমারীরও ভাবগতিকটা ঠিক বুঝা গেল না।—'

৫

বাড়ী ফিরিয়া সরলা তাহার নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে দ্বার রুদ্ধ করিয়া কাঁদিতে বসিল। সুকুমারীর গাল টিপিয়া দিয়া তাহার নৈতিক জীবনে মহা বিপ্লব ঘটিয়াছিল। 'তাহাকে ব্যথা দিবার আমার অধিকার কি?' সরলা নিজের হীনতা স্বীকার করিল। দ্বেষপরবশ হইয়া কাহাকেও আক্রমণ করা অতিশয় লজ্জার কথা।

'যাহাকে নীতিশিক্ষা দিতে গিয়াছিলাম, তাহার নিকট আমার নিজের নৈতিক উৎকর্ষের বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছি।'

সরলার বোধ হইল যে, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কেবল সুকুমারীর নিকট গিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করা। সেটা না করিয়া সে স্বামীর নিকট মুখ দেখাইতে পারিবে না। বিনয়ের নিকট কিংবা কোনও বন্ধুর নিকট সাহস করিয়া মুখ তুলিতে পারিবে না। সরলা গভীর চিন্তায় মগ্ন হইল।

বহির্বাটীতে মিষ্টার মুখার্জি কাছারীর দুই দিনের রাশীকৃত কাগজ লইয়া, রায় লিখিতেছিলেন। নবকুমার বাবুর বাটীতে সরলার অপূর্ব্ব 'ড্রামাটিক' ব্যবহার ও এবং মূর্চ্ছা প্রভৃতির কথা তাঁহার কাণে গিয়াছিল। সরলার ভাব গতিক দেখিয়া তিনি বিলক্ষণ ভয় পাইয়াছিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে মাতঙ্গিনী ঝিকে ডাকিয়া 'উনি কি ক'চ্ছেন,' সে খবরটুকু ব্যগ্রতাসহকারে গ্রহণ করিতেছিলেন। এমন সময় কাদম্বিনী পিসী আসিয়া বলিলেন, 'বাবা রমা, বোধ হয় তোমার একটু বাড়ীর মধ্যে আসিলে ভাল হয়।'

নিতান্ত উল্লেখযোগ্য কোনও ঘটনা না ঘটিলে কাদম্বিনী পিসীর অলস দেহের আবির্ভাব অসম্ভব। রমাকান্তের আতঙ্ক উপস্থিত হইল। রায় লেখা বন্ধ করিয়া, সিগারেটের বাক্সটি বালিশের নীচে রাখিয়া, এবং গলার 'নেকটাই' বিলক্ষণরূপে শিথিল করিয়া মিষ্টার মুখার্জি অন্দরমহলে প্রবেশ করিলেন। সরলা বালিসে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছিল। সরলা পূর্ব্বে কখনও স্বামিসকাশে কাঁদে নাই, সুতরাং কোন প্রণালীর সান্ত্বনাবাক্য কহিলে কান্নার উপশম হইবে, সে সম্বন্ধে রমাকান্ত সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

রমাকান্ত অতি আস্তে একবার বলিলেন, 'ছি!'—কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হইল না। কান্নাটা যে 'ছি'র বিষয় নয়, বরং তাহার কার্য্যটাই 'ছি'র অন্তর্গত, সে সম্বন্ধে সরলার কোনও সন্দেহই ছিল না। স্বামীর সেই অর্থহীন ভাবশূন্য সান্ত্বনায় সরলার হৃদয়ের ব্যথা বর্দ্ধিত হইল।

মিষ্টার মুখার্জি ভাবিলেন, 'খাওয়া দাওয়ার কথাটা তুলিলে কি রকম হয়?' 'আচ্ছা, আজ রাত্রিকালে বোধ হয় তুমি কিছু খাবে না? যদি খাও, তবে বাগান হইতে গোটাকতক গোলাপজাম ও লকেট তুলিয়া আনি।'

মুখার্জি ভাবিয়াছিলেন যদি স্বহস্তরোপিত বৃক্ষের ফলের উপর সরলার মায়া থাকে, তবে অন্ততঃ কথার একটা উত্তর দিবে। কিন্তু সরলা কথার উত্তর না দিয়া নীরব ও নিঃস্পন্দভাব ধারণ করিল।

মিষ্টার রমাকান্ত বলিলেন, 'আমার ভয় ক'চ্ছে, বোধ হয় ডাক্তারকে ডাকিলে ভাল হয়।'

সরলা উঠিয়া বসিল।

রমাকান্ত অনেকটা আশ্বাস পাইয়া নতমুখে ভাল ভাল সান্ত্বনা-বাক্যের ভাষাগুলি মনে মনে স্মরণপূর্ব্বক কথা রচনা করিতেছিলেন, এমন সময় সরলা অতি কঠিন স্বরে বলিল, 'দেখ, আমি কচি মেয়ে নয় যে, মিষ্ট কথায় ভুলাইবে। তোমার আচরণ চিরস্মরণীয়। আপাততঃ আমার একটা ইচ্ছা হইয়াছে, তাহাতে বাধা দিও না। আমি এখনই বিনয় বাবুর বাড়ীতে গিয়া তাঁহার স্ত্রীর নিকট ক্ষমা চাহিব। তোমারও যদি ইচ্ছা হয়, তবে সঙ্গে যাইতে পার।'

কি ঘোরতর সমস্যা! একে রাত্রিকাল, তাহাতে বিনয়ের বাটীতে সরলাকে লইয়া যাওয়া! শুধু ঘটনা নহে, একটা ঘটনা-চক্র। ইহার মধ্যে বিধাতার কি বিধান ছিল, তাহা রমাকান্ত বুঝিতে পারিলেন না। জীবনের কোনও অজানা পথে তিনি এত দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, ফিরিয়া পূর্ব্বজীবনের অভ্যস্ত পথে যাওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল। বিনয়ের নিকট গিয়া বলিবেন ?

অথচ সরলার অভিপ্রায়ে বাধা-প্রদানও অসম্ভব। সরলার মুখের ভাবগতিক দেখিয়া তাঁহার বেশ বোধ হইল যে তাহা হইলে একটা তুমুলকাণ্ড ঘটিবে। অন্তরে শান্তি না থাকিলেও বাহিরে শান্তিটুকুর জন্য রমাকান্ত আজীবন প্রয়াসী।

এই উভয় সঙ্কটের মধ্যে পড়িয়া মিষ্টার মুখার্জ্জি একবার ভাবিলেন, 'সরলা একাকিনী গেলে কি হয় ?' কিন্তু তাহাও ভাল দেখায় না। বিনয়ের সহিত সরলার বিবাহের প্রস্তাব, এবং বিনয়ের অসাধারণ আত্মত্যাগ প্রভৃতি পূর্ব্বকথা অনুক্ষণ আলোচনা করিয়া রমাকান্তের মনে একটা সন্দেহের সূত্রপাত হইয়াছিল। সুকুমারীর প্রতি সরলার আক্রোশ যে সেই জন্য অনেকটা, এরূপ সম্ভাবনাও রমাকান্তের কল্পনায় সে দিন স্থান পাইয়াছিল। অনেক দেখিয়া শুনিয়া, সাক্ষী সাবুত সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া, অনেক রায় লিখিয়া রমাকান্তের চরিত্র ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণভাব ধারণ করিতেছিল, এবং তাহার মধ্যে সরলতার অভাব ঘটিতেছিল।

রমাকান্ত ভাবিয়া কূলকিনারা পাইলেন না। সরলার উদ্বেগ দেখিয়া বোধ হইল, যেন কোনও অজ্ঞাত শক্তি তাঁহাকে অদৃষ্টচক্রের দিকে আকর্ষণ করিতেছে। তাহার গতি রোধ করা অসম্ভব। মিষ্টার মুখার্জ্জি একটা দীর্ঘনি-শ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'একটু দাঁড়াও, একখানা গাড়ী ডাকিয়া আনি।'

রাত্রি প্রায় নয়টা। বিনয় বাবুর বাসার সম্মুখে গাড়ী দাঁড়াইলে স্বামী ও স্ত্রী

উভয়ে নীরবে অবতীর্ণ হইলেন। বাটী নিস্তব্ধ। বিনয়ের মাতা কালীঘাটে গিয়াছিলেন। সুকুমারীর জ্বর হইয়াছিল। বিনয় হোমিওপ্যাথিকের বাক্স হইতে 'আর্নিকা' খুঁজিয়া বাহির করিতেছিল। হঠাৎ বাটীর মধ্যে পদশব্দ শুনিয়া বিনয় জিজ্ঞাসা করিল, 'কেও ?'

রমাকান্ত মুখার্জি অতি ক্ষীণস্বরে কহিলেন, 'আমরা।'

বিনয় আলোকহস্তে বাহিরে আসিয়া সরলা ও রমাকান্তকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল।

সরলা বলিল, 'আমরা সুকুমারীকে দেখিতে আসিয়াছি।' রমাকান্ত ঘাড় নাড়িয়া তাহার অনুমোদন করিলেন।

বিনয় বলিল, 'বাটীর মধ্যে চলুন।'

৬

প্রায় চারি পাঁচ বৎসর হইল, রমাকান্ত সে বাটীতে পদার্পণ করেন নাই, সুতরাং ছাতের বিম ও বরগাগুলির সংখ্যা ঠিক পূর্ব্বেকার মত আছে কি না, তাহা জানা নিতান্ত দরকার বোধ হইল। দালানের একখানা নূতন চৌকির উপর পুরাতন তাকিয়া ঠেস দিয়া খুব ঔৎসুক্যসহকারে কড়িকাঠের দিকে তাকাইতে লাগিলেন। তাঁহার প্রীতির আবির্ভাব দেখিয়া বিনয় বাবুর বৃদ্ধ কুকুর 'টম', স্বীয় শীর্ণ লাঙ্গুল যথাসাধ্য দোলাইয়া পূর্ব্বপ্রণয়ের পরিচয় দিতেছিল।

বাটীর আভ্যন্তরিক অবস্থা শোচনীয়। টবে জল নাই। ছেঁড়া কাগজপত্রের ছড়াছড়ি। কতকগুলি অপরিষ্কৃত চা'র পেয়ালা, কীটদষ্ট পুঁথি, একটা ভাঙ্গা হার্ম্মোনিয়ম ও 'ইলেক্‌ট্রিক্ ব্যাটারি' শয়নগৃহের মধ্যে অনাদৃতভাবে পড়িয়া আছে। মেজের উপর কুণ্ডলীকৃত একটা পুরাতন নেটের মশারি মাথায় দিয়া সুকুমারী শয়ানা। গৃহে প্রবেশ করিয়াই সরলা সুকুমারীকে কোলে লইয়া বসিল।

বিনয় শয়নগৃহ ও দালানের মধ্যবর্ত্তী একটা প্রচ্ছন্ন প্রদেশে রমাকান্তের জন্য তামাকু সাজিতে বসিয়া গেল।

সরলা বারম্বার সুকুমারীর আহত কপোল দুইটি চুম্বন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তোর জ্বর হয়েছে ?'

সুকুমারী সরলার স্নেহস্ফীত নিরুপম শুভ্র—কোমল—বক্ষঃস্থলের মধ্যে জ্বালা যন্ত্রণা জুড়াইবার সনাতন স্থানটি আবিষ্কার করিয়া, সেখানে তাহার কচি মুখ ও কোমল কেশগুচ্ছের খানিকটা অবাধে রাখিয়া দিল। বাকি খানিকটার মধ্য হইতে ভয়বিহ্বলা কুরঙ্গিনীর ন্যায় সরলার দিকে তাকাইয়া কহিল, 'মাসিমা'।

বিনয় কাঁচের গ্লাসের মধ্যে যে ঔষধটুকু লইয়া আসিয়াছিল, সরলা তাহা সুকুমারীর মুখে ঢালিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তোদের বাড়ীতে ঝি বামুন নাই?'

সুকুমারী হাসিয়া বলিল, 'বামুনের দরকার নাই, আমিই রাঁধি। ঝি মার সঙ্গে কালীঘাটে গিয়াছে। আজ বোধ হয় আসিবে না। আজ আমাদের বাজারের খাবার কিনিয়া খাইবার কথা। 'উনি' খাইয়াছেন কি না, জানি না। আমার অসুখ, খাব না।'

সরলা। আমি তোর সাবুদানা তৈয়ারী করিয়া দিব। আর—বিনয়বাবু কি খান?—লুচি?

সুকুমারী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, 'সে কি! এত রাত্তিরে তরকারি কুটিয়া দিবে কে? জল আনিয়া দিবে কে? উনুন ধরাইয়া—'

সরলা পুনর্ব্বার চুম্বন দ্বারা সুকুমারীর কথা রুদ্ধ করিয়া দিল। নিজের গলার হারটা লইয়া সুকুমারীর গলায় পরাইয়া দিল, চুড়িগুলির অর্দ্ধেক সুকুমারীর রোগা হাত দেখিয়া, বাহু পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া, সেখানে বিন্যস্ত করিল, এবং অবশেষে খাটের উপর সুকুমারীকে শয়ন করাইয়া বলিল,—

'নন্দনকাননে প্রথমে দুইটি মানুষ ছিল মাত্র। এক জন স্ত্রী ও আর এক জন স্বামী। তাদের বামুন চাকর ছিল না, অথচ সুখে দিন কাটিত। তার পর একটা সাপ আসিয়া জুটিয়াছিল, তাহারই জন্য যত সর্ব্বনাশ।'

সুকুমারী অতিশয় ঔৎসুক্যসহকারে জিজ্ঞাসা করিল, 'তার পর?'

সরলা। ক্রমে বল্‌ছি, আগে বিনয় বাবুকে ডাকি।

তখন সরলা ডাকিল, 'বিনয় দাদা—! একবার শুনিয়া যাও।'

বহুকাল পরে সরলার মুখে সাদর ভ্রাতৃসম্ভাষণ শুনিয়া, বিনয় গৃহে প্রবেশ করিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। সরলা বলিল, 'বিনয়দা'—তুমি তরকারীগুলো কোট, আমি ততক্ষণ পান সাজি।'

প্রোফেসার বিনয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যতক্ষণ বাহিরে তরকারী কুটিতেছিলেন, সরলা সুকুমারীর নিকট বসিয়া পান সাজিতেছিল ও পূর্ব্বেকার কাহিনীগুলি সুকুমারীর মুখ হইতে বাহির করিতেছিল। যেগুলি লুকানো ছিল, যাহা কেহ জানিত না, সরলা সেগুলি শুনিল।

শেষ পানের লবঙ্গটি সুকুমারীর মুখে টিপিয়া দিয়া সরলা বাহিরে গিয়া দেখিল যে, বিজ্ঞানের অধ্যাপক বিনয়চন্দ্রের তরকারী কুটার অর্দ্ধেকও তখন

শেষ হয় নাই। অদূরে মিষ্টার মুখার্জি তামাকু টানিতে টানিতে তাঁহার 'তানা-নানা'র শেষভাগটা কসরৎ করিতেছিলেন।

সরলা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া বিনয়ের হাত হইতে তরকারীগুলি কাড়িয়া লইল, এবং অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে বাটনা বাটিয়া ও লুচি ও ডাল্না প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দুইখানা আসন পাড়িয়া দিল।

উভয় বন্ধুরই খুব ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল, এবং এক একখানি লুচির অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে বোধ হয় পুরাণো কথাগুলি মনে পড়িতেছিল। কারণ, রমাকান্ত মুখার্জি হঠাৎ বলিলেন, 'বিনয়, আমার মনে পড়ে—এইখানে বসিয়া তোর হাতে সন্দেশ খাইতাম।'

রমাকান্তের আঁখির আর্দ্রভাব এবং উত্তরোত্তর উজ্জ্বলতা দেখিয়া বিনয় একটু অন্ধকারের দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

সরলা শয়নগৃহে সুকুমারীকে সাবুদানা খাওয়াইতেছিল। সুকুমারীর জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছিল। তাহাদের কি কথা হইয়াছিল, উভয় বন্ধু কেহই শুনিতে পায় নাই; কিন্তু সরলার লুচি কখানি লইয়া সুকুমারী যে গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা নিশ্চয়। কিন্তু সরলা তাহার সব ক'খানি যে খায় নাই, তাহাও নিশ্চয়; কারণ, প্রত্যূষে যখন সুকুমারী সরলাকে শয্যা হইতে হাত ধরিয়া টানিয়া আনিল, তখন সরলার চক্ষুপল্লব দুইটি খুব ভারি।

রমাকান্ত মুখার্জি বন্ধুর বাটীতে রাত্রিযাপন করিয়া যাহা পাইয়াছিলেন, তাহা হঠাৎ কেহ পায় না—অর্থাৎ স্ত্রীর হৃদয়ভরা ভালবাসা। হঠাৎ এক জন হইতে অন্য জন, এবং অন্যজন হইতে তাঁহার দিকে সেই ভালবাসাটা কেমন করিয়া গড়াইয়া আসিল, এবং রমাকান্তের মনের কালো মেঘখানি কেমন করিয়া অপসৃত হইল, তাহা বিজ্ঞানের প্রোফেসার বিনয়চন্দ্র ঠিক বুঝাইয়া দিতে পারিলেন না। তবে যখন সুকুমারীর নমস্কার গ্রহণ করিয়া স্বামী ও স্ত্রী বাড়ীতে ফিরিয়া গেল, তখন উভয়েই নূতন মানুষ, এবং মিষ্টার রমাকান্ত মুখার্জি যে দেখিতে অতিশয় সুন্দর, এবং তাহার কথাবার্ত্তা যে অতিশয় মিষ্ট, তাহা আদালতের লোক ও বন্ধুমণ্ডলী সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইল।

দ্বিপ্রহর রাত্রিকালে 'রায়' লেখা শেষ করিয়া যখন রমাকান্ত সরলার ক্ষুদ্র সুসজ্জিত গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার চক্ষু টিপিয়া ধরিলেন, তখন সরলা বলিল, 'তোমার অনেকটা উন্নতি হয়েছে। আমার বোধ হয়, এখন 'তানা-নানা' ছাড়িয়া একটা গান শেখা উচিত।'

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

সবুজ সাহিত্য।

"সবুজ পত্র" নামক নব মাসিকপত্র রবীন্দ্রনাথের দেশচর্য্যারূপ জীবন-ব্যাপী সত্রের একটি অভিনব অঙ্গ। এই যজ্ঞের হোতা ও উদ্গাতা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, অধ্বর্য্যু বা সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী মহাশয়—ওরফে বীরবল। হোতার কার্য্য ঋঙ্মন্ত্রোচ্চারণ, উদ্গাতার কার্য্য সামগান, অধ্বর্য্যুর কার্য্য গদ্যময়, যজুর্মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক স্বহস্তে যজ্ঞ-সম্পাদন করেন। সারস্বত যজ্ঞের হোতার উদ্গাতার অবিবেচনার আব্দার এবং ভাবের উন্মাদতরঙ্গ সহনীয়, কিন্তু অধ্বর্য্যুর নিকট হইতে যুক্তিমূলক তথ্য (reasonal truth) না পাইলে চলিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ "সবুজের অভিযান" মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এবং "আমরা চলি সমুখ পানে" এই সামগান করিয়া এক নূতন ভাব-বন্যার সূচনা করিয়াছেন। এই বন্যার তাড়নায় দেশের কল্যাণকরী গতিশীলতা বৃদ্ধি পাইবে। অধ্বর্য্যুর ভারও যথাযোগ্য হস্তেই ন্যস্ত হইয়াছে। এখনকার বাঙ্গালা লেখকগণের মধ্যে তাঁহার তুল্য সুশিক্ষিত লোক অতি অল্পই আছেন। তাঁহার রচনাশক্তি ও রচনার মধ্যে রসসেচনের শক্তিও অসামান্য। এ যাবৎ "সবুজ পত্রে"র দুই সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। এই দুই সংখ্যায় সম্পাদক যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সাবধানে আলোচ্য।

অধ্বর্য্যু "ওঁ প্রাণায় স্বাহা" বলিয়া এই নব সারস্বত যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। "মুখপত্রে" সাহিত্য সম্বন্ধে যে গুটি কয়েক সাধারণ কথা বলিয়াছেন, তাহা মূল্যবান ও সময়োপযোগী। বিগত তিন বৎসর যাবৎ বাঙ্গালার সমবেত সাহিত্যিকগণকে সম্মিলনের উচ্চতম আসন হইতে ম্যালেরিয়া-দমনের জন্য আহ্বান করা হইতেছে। তাহার উপর এবার আদেশ করা হইয়াছে, "আপনারা এই সাহিত্যের দ্বারা যাহাতে দেশের ধনাগম হয়, দারিদ্র্য দূর হয়, আত্মসম্মানরক্ষা হয় ও আত্মজ্ঞান-লাভ হয়, সেই বিষয়ে চেষ্টা করুন।" এই সকল আদেশ ফরমায়েস সংসার সম্বন্ধে উদাসীন দরিদ্র সাহিত্যিকের জীবন দুর্ব্বহ করিয়া তুলিয়াছিল। "সবুজ পত্রে"র "মুখপত্রে" "সাহিত্য হাতে হাতে মানুষের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে' দিতে পারে না" এই কথা পাঠ করিয়া, সে এখন দুই হাত তুলিয়া লেখককে আশীর্ব্বাদ করিবে। কিন্তু "মুখপত্রে"র যাহা "শেষ কথা", তাহার অনেক কথা অনেকে স্বীকার করিতে পারিবেন না।

এই "শেষ কথা"র মধ্যে "সবুজ পত্রে"র সম্পাদক "মেঘনাদবধ" কাব্যের উপর ঘোর অবিচার করিয়াছেন। তিনি বলেন,—

"পশ্চিমের প্রাণবায়ু যে ভাবের বীজ বহন করে আন্‌ছে, তা দেশের মাটিতে শিকড় গাড়তে পারছে না বলে, হয় শুকিয়ে যাচ্চে নয় পরগাছা হচ্ছে। এই কারণেই 'মেঘনাদবধ' কাব্য পরগাছার ফুল। 'অর্কিড'এর মত তার আকারের অপূর্ব্বতা এবং বর্ণের গৌরব থাক্‌লেও, তার সৌরভ নেই।"

কাব্যের প্রাণ,—রস। কাব্যের যে "সৌরভ" কি, তাহা বুঝিলাম না। "মেঘনাদ-বধে" তাহার অভাব নাই। এই মহাকাব্য রামসীতার সহজ ভক্ত হিন্দু পাঠককে রাক্ষসরাজ রাবণের দুঃখে অশ্রুপাত করিতে বাধ্য করিয়াছে। "মেঘনাদবধে"র শিকড় ও এ দেশের মাটীর সহিতই সংলগ্ন। "মেঘনাদবধে"র নায়ক ইন্দ্রজিৎ বাল্মীকির বা কৃত্তিবাসের ইন্দ্রজিতের মত মায়াবী রাক্ষস নহে, মানুষ—নিষ্ঠাবান হিন্দু—ভক্ত বীরপুরুষ। বাল্মীকির ও কৃত্তিবাসের ইন্দ্রজিৎ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া রথে চড়িয়া যুদ্ধ করিয়া নিহত হইয়াছিলেন। মধুসূদনের ইন্দ্রজিৎ দ্বার রুদ্ধ করিয়া কাষায়-বসন পরিধান করিয়া ভক্তিভরে ইষ্টদেবের আরাধনা করিতেছিলেন; মায়াবলে লক্ষ্মণ পূজাগৃহে প্রবেশ করিলে তাঁহাকে ইষ্টদেব বিভাবসু-ভ্রমে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়াছিলেন; এবং সেইখানে নিরস্ত্র যুদ্ধ করিতে করিতে লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। "মেঘনাদবধে"র নায়িকা প্রমীলাও হিন্দুর কুলবধূর আদর্শে গঠিত। পতির চিতানলে তাহার জীবনের পরিসমাপ্তি। ইন্দ্রজিৎ ও প্রমীলা যে কাব্যের নায়ক নায়িকা, তাহার শিকড় বাঙ্গালার—হিন্দুস্থানের মাটীতে প্রবেশ করিতে পারে নাই, তাহা অর্কিড বা পরগাছামাত্র, এ কথা কাব্যরসজ্ঞ ব্যক্তি স্বীকার করিতে পারেন না। কে যে "অর্কিড" কথাটা সাহিত্য-সমালোচনায় প্রথম ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা জানি না। মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়ের পাবনা-সম্মিলনের অভিভাষণে যখন এ কথা প্রথম শুনিয়াছিলাম, তখন একটু চমকিয়া উঠিয়াছিলাম! কিন্তু তখন মনে কল্পনাও করিতে পারি নাই যে, নবাবিষ্কৃত "অর্কিড ন্যায়ে"র এইরূপ অপব্যবহার হইবে। আমরা নিজেরাই এখন দেশের মাটী হইতে এত দূরে সরিয়া পড়িয়াছি যে, তাহার ভিতর কোন্ শিকড় প্রবেশ করিয়াছে, কোন্ শিকড় প্রবেশ করে নাই, তাহা আমাদের জানা নাই।

"অন্নদামঙ্গল" প্রসঙ্গে সম্পাদক বলিয়াছেন, "খাঁটী স্বদেশী বলে' তাহা কাব্য।" সাহিত্যের খাঁটী স্বাদেশিকতা যে কি, তিনি তাহা খুলিয়া বলেন নাই। সাহিত্য দুই প্রকার। একপ্রকার রচনার উদ্দেশ্য—বাহ্য বস্তুর অবিকল বর্ণনা। এই শ্রেণীর

রচনাকে বস্তুতন্ত্র সাহিত্য (literature of fact) বলা হয়। আর এক প্রকার রচনার উদ্দেশ্য বাহ্য বস্তুর ফটোগ্রাফ নহে, লেখক বাহ্য বস্তুর সত্তা স্বয়ং যে ভাবে অনুভব করেন—তাঁহার প্রকৃতির, তাঁহার রুচির ও তাঁহার কল্পনাশক্তির স্পর্শে বাহ্য বস্তু যে নবকলেবর ধারণ করে, তাহার অবিকল চিত্র। এই শ্রেণীর রচনাকে আত্মশক্তিতন্ত্র সাহিত্য (literature of power) বলে। আত্মশক্তিতন্ত্র সাহিত্যই প্রকৃত সাহিত্য ; বস্তুতন্ত্র সাহিত্য, বিজ্ঞান। সত্য উভয় প্রকার সাহিত্যেরই প্রাণ। আমার স্বদেশবাসীর প্রাণের ভাব যে রচনায় সত্য ফুটিয়া উঠে, তাঁহাকেই আমি খাঁটী স্বদেশী সাহিত্য বলি। ভাবের বীজ,—বাহ্য বস্তু। তাহা যে দেশের ইচ্ছা, সে দেশের হউক। তাহা আমার কোনও শক্তিমান স্বদেশবাসীর সরস হৃদয়ে পতিত হইয়া যে ফুলফলময় বৃক্ষে পরিণত হয়, তাহার অবিকল চিত্রই খাঁটী স্বদেশী সাহিত্য। অবিকলতাই স্বাদেশিকতার ভিত্তি। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র যেখান হইতেই ভাবের বীজ আহরণ করিয়া থাকুন না কেন, তাঁহারা যাহা প্রাণে অনুভব করিয়াছেন, তাহা যেখানে অকপটভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা খাঁটী স্বদেশী সাহিত্য। তাহার শিকড় আমার দেশের মাটীতে, কেন না, তাহা আমার এক জন মহাপ্রাণ স্বদেশবাসীর প্রাণের কথার সত্য অভিব্যক্তি। আমার কাছে যাহা সত্য, তাহা আমার স্বদেশী। মধুসূদন রাক্ষসকুলের দুর্দ্দশায় হৃদয়ে যে বেদনা অনুভব করিয়াছেন, তাহা "মেঘনাদবধ" কাব্যে অবিকৃতভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাই "মেঘনাদবধ" পাঠ করিয়া আমরা সেই বেদনা অনুভব করি। সুতরাং "মেঘনাদ বধ" খাঁটী স্বদেশী। "অন্নদা-মঙ্গলে"র নায়ক ভবানন্দ মজুমদারের অন্নদাভক্তি সকাম মেকী ভক্তি, তাহা পাঠকের হৃদয়ে ভক্তিরসের উদ্রেক করিতে পারে না। ভারতচন্দ্র যদিও জাহাঙ্গীর পাতশার দ্বারা অন্নপূর্ণার পূজা করাইয়া ছাড়িয়াছেন, তথাপি অন্নদাভক্তের আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে পারেন নাই। ভক্তিরসের হিসাবে "অন্নদামঙ্গল" তেমন সরস নয়। "বিদ্যাসুন্দর" "অন্নদামঙ্গল"কে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। ভারতচন্দ্র তাঁহার কাব্য-রচনার উদ্দেশ্য গোপন করেন নাই, অন্নদার মুখে [illegible],—

"কৃষ্ণচন্দ্র অনুমতি দিলেন তোমারে।
মোর ইচ্ছা, গীতে তুমি তোষহ তাঁহারে॥"

"'বৃত্রসংহার' মহাপ্রাণ হ'লেও মহাকাব্য নয়",—এ হেঁয়ালির অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। "বৃত্রসংহার" মহাপ্রাণ হইলে নিশ্চয়ই মহাকাব্য, এবং পৃথিবীর সকল দেশ তাহাকে আপনার বলিয়া চিনিয়া লইতে বাধ্য। কেন না "ওঁ প্রাণায় স্বাহা"

সার্ব্বভৌম। "মেঘনাদবধ" "বৃত্রসংহার"কে সরাসরি ডিসমিস করিয়া এবং "অন্নদামঙ্গলের" পক্ষে ডিক্রি দিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে "সবুজ-পত্রে"র সম্পাদক বলিয়াছেন—

"দেশের অতীত ও বিদেশের বর্ত্তমান, এই দুটি প্রাণশক্তির বিরোধ নয়, মিলনের উপর আমাদের সাহিত্যের ও সমাজের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। আশা করি বাঙ্গলার পতিত জমি সেই মিলনক্ষেত্র হবে। সেই পতিত জমি আবাদ করলেই তা'তে যে সাহিত্যের ফুল ফুটে উঠবে, তাই ক্রমে জীবনের ফলে পরিণত হবে।"

"দেশের অতীত" অনেক দিন অতীত হইয়াছে, "বিদেশের বর্ত্তমানে"র সহিত মিলিবার জন্য বসিয়া নাই। "বিদেশের বর্ত্তমান"ও আপনার বলে আপনই হু-হু করিয়া চলিয়াছে, এ "দেশের অতীতে"র দিকে ফিরিয়া চাহিবার তাহার অবসর নাই। বাঙ্গলার জমীও পতিত পড়িয়া নাই, "অর্কিড" হইতে ডালপালা বাহির হইয়া তাহা আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, ভিতরে ভিতরে শিকড়ও গাড়িয়াছে। ঊর্দ্ধমূল অধঃশাখই হউক, অথবা অধোমূল ঊর্দ্ধশাখই হউক, এ দেশের "অতীত" ও "ভবিষ্যতে"র সন্ধিস্থলে এ দেশের একটা বর্ত্তমানও আছে। সেই বর্ত্তমানকে উপেক্ষা করিয়া সাহিত্য গড়িতে গেলে তাহা অর্কিড বা আকাশ-কুসুম হইবে। চক্ষু দিয়া যে দিকে ইচ্ছা সে দিকে তাকাইতে পার, কিন্তু পা মাটীতে না রাখিলে দাঁড়াইতে পারিবে না, সুতরাং তাকাইতেও পারিবে না। দেশের অতীত ও বিদেশের বর্ত্তমানকে আত্মশক্তিবলে দেশের বর্ত্তমানের সহিত মিলাইয়া, রসাইয়া, রঙ্গাইয়া দশের সাম্‌নে ধর, দেখিবে, সকলেই তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবে। যাঁহারা দেশের বর্ত্তমান-গঠন-কল্পে প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা দেশের অতীত ভাল করিয়া জানিতেন না, তাই তাঁহাদের স্থলে স্থলে স্খলন হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের—বঙ্গদেশের অতীত এখন আর সেকালের মত অন্ধকারাচ্ছন্ন বলা যায় না। এখন বিচারমূলক সবুজ সাহিত্য গড়িবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। "সবুজ পত্র"-সম্পাদকের যে সে সামর্থ্য আছে, সাহিত্য-সম্মিলনে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয়-লাভের সৌভাগ্য হইয়াছিল। কিন্তু তিনি আত্মবিস্মৃত। আবুল ফজলের মত শক্তিশালী হইয়াও তিনি বীরবল সাজিয়া ভাঁড়ামি ও হেঁয়ালি রচনা করিতেছেন। তাই এত কথা বলিতেছি।

ভাষা-সংস্কারের দিকেই আপাততঃ "সবুজ-পত্র"-সম্পাদকের ঝোঁক দেখা যায় বেশী। তিনি "মুখপত্রে" লিখিয়াছেন, "আমরা শিখি ইংরাজি, লিখি বাঙ্গলা;

মধ্যে থাকে সংস্কৃতের ব্যবধান।" অর্থাৎ, আমাদের লেখা ঠিক বাঙ্গলা হয় না, সংস্কৃত হয়। এ কথা দ্বিতীয় সংখ্যায় তিনি খুলিয়া বলিয়াছেন—

"আমি বহুকাল হ'তে এই কথা বলে আস্‌ছি যে, বাঙ্গালা সাহিত্য বাঙ্গালা ভাষাতেই রচিত হওয়া উচিত। কিন্তু এই সহজ কথাটি অনেকের কাছে এত দুর্ব্বোধ ঠেকে যে, তাঁরা এরূপ আজগুবি কথা শুনে বিরক্ত হন। এঁদের মতে বাঙ্গলা হচ্ছে আমাদের আটপৌরে ভাষা, তা'তে সাহিত্যের ভদ্রতা রক্ষা হয় না; সুতরাং সাহিত্যের জন্য সাধু ভাষা নামক একটা পোষাকী ভাষা তৈরি করা চাই। পোষাক যখন চাই-ই, তখন তা যত ভারি আর জমকালো হয়, ততই ভাল।"

ইচ্ছাপূর্ব্বক ভাষাকে ভারি বা জমকাল করা কেহ সমর্থন করিবে না। সুলেখকেরা তাহা কখনও করেন না। কেন যে কোনও কোনও কবি তাহা সময়ে সময়ে করিতে বাধ্য হয়েন, "বাংলা ছন্দ" প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা, "বাংলা ভাষার শব্দের মধ্যে আওয়াজ মৃদু বলিয়া অনেক সময় আমাদের কবিদিগকে দায়ে পড়িয়া অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে হয়।" কিন্তু "সবুজ পত্র"-সম্পাদক বাঙ্গালার সাহিত্যের ভাষা সম্বন্ধে আর যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমার দুর্ব্বোধ ও আজগুবি বলিয়া মনে হয়, এ কথা আমি অসঙ্কোচে বলিতে পারি। আটপৌরে ও পোষাকী ভাষা, গ্রাম্য ভাষা এবং সাধুভাষা, কথিত ভাষা এবং লিখিত ভাষা, এই দুই প্রকার বাঙ্গালা ভাষার সহিত আমরা চিরকালই পরিচিত আছি। তাই "সাধুভাষা নামক একটা পোষাকী ভাষা তৈরি করা"র কথা শুনিয়া তাহা বুঝিতে পারি না। এই সাধু ভাষা "সবুজপত্র"-সম্পাদকের আদেশলঙ্ঘনকারী অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়ের মত কোনও আধুনিক লেখকের হাতগড়া বস্তু নয়, অন্ততঃ চারি শত বৎসর যাবৎ রামায়ণ মহাভারতের প্রথম অনুবাদকগণের, প্রথম বৈষ্ণব লেখকগণের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে, এবং শত চেষ্টা করিলেও বাঙ্গালা লেখকের পক্ষে এই সাধুভাষার হাত ছাড়াইবার যো নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ চলিত বাঙ্গালার রচনার গুরু রবীন্দ্রনাথের "বাংলা ছন্দ" হইতে কয়েক পংক্তি তুলিয়া দিব।—

৯৩ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "'করিতেছি' শব্দটা ভোঁতা। উহাতে কোন সুর বাজে না; কিন্তু 'কর্চ্চি' শব্দে একটা সুর আছে। 'যাহা হইবার তাহাই হইবে' এই বাক্যের ধ্বনিটা অত্যন্ত ঢিলা, সেই জন্ত ইহার অর্থের মধ্যেও একটা আলস্য প্রকাশ পায়।" কিন্তু ইহার পরেই তিনি "খেয়ে" না লিখিয়া "খাইয়া", "জাগিয়ে" না লিখিয়া "জাগাইয়া", এবং "বের হয়" না লিখিয়া "বাহির হয়"

লিখিয়াছেন। ৯৪ পৃষ্ঠায় আছে, "কিন্তু বাংলার অসাধু ভাবাটা খুব জোরালো ভাষা—এবং তাহার চেহারা বলিয়া একটা পদার্থ আছে"। এখানে "তাহার" এবং "বলিয়া" সাধুভাষার নিকট হইতে ধার করা হইয়াছে। এই পৃষ্ঠাতেই "করিয়া ছাইয়া রহিয়াছে", "করিয়া বেড়াইতে", "বাজিতেছেই" প্রভৃতি ঢিলা কথাগুলিও ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৩ পংক্তিতে ভোঁতা "করিতেছে" পর্য্যন্ত উপস্থিত! ইহার কারণ কি? ইহার কারণ, সাধুভাষা জিনিসটার শাসন লঙ্ঘন করা এখন আমাদের অসাধ্য। আমরা কলম ধরিলেই সে ভাষা আপনা-আপনি আসিয়া পড়ে। হাতে কলমে আমাদের খাঁটী অসাধু-ভাষাই লেখা কঠিন। রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতে এই যে সকল দৃষ্টান্ত দিলাম, তাহা হইতে মনে হয়, তাঁহার মত প্রবল পরাক্রান্ত শব্দ-শিল্পীকেও চলিত ভাষায় লিখিতে হইলে চেষ্টা করিয়া, কষ্ট করিয়া, সাধুভাষা হইতে কথিত ভাষায় অনুবাদ করিয়া, লিখিতে হয়। অবশ্যই "বীরবল" সাধুভাষার রীতি অনুসারে সর্ব্বনাম বা ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেন না। রবীন্দ্রনাথ যেখানে "নাই" লেখেন, তিনি সেখানে "নেই" লেখেন; রবীন্দ্রনাথ যেখানে "তাহার" লেখেন, তিনি সেখানে "তার" লেখেন। কিন্তু বীরবলের রচনা বিশেষ কষ্ট-প্রসূত, সাধুভাষার অসাধু অনুবাদমাত্র। তাঁহার এই আটপৌরে ভাষাটা নেহাত "তৈরি" জিনিস। তাই তিনি মনে করেন, সাধুভাষাটাও তেমনই "তৈরি"। তিনি ভাষা "তৈরী" করিতে যে সময়টা নষ্ট করেন, যদি ভাব বা মত ফুটাইতে সেই সময়টার নিয়োগ করেন, তাহা হইলে, আমাদের ভাষাকে অনেক সুবর্ণপত্রের দ্বারা সমৃদ্ধ করিতে পারিবেন।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

মাসিক সাহিত্য সমালোচন।

উদ্বোধন।—বৈশাখ। শ্রীযুত স্বামী সারদানন্দ মহারাজের "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ" চলিতেছে। "স্বামী বিবেকানন্দের পত্র" বাঙ্গালীর অবশ্যপাঠ্য। পত্রগুলি ব্যক্তিবিশেষের উদ্দেশে লিখিত ও উপাদানগুলি তাঁহাদের জন্যই কল্পিত বটে, কিন্তু বাঙ্গালীমাত্রেরই স্মরণীয় ও পালনীয়। "সমস্ত কার্য্যের সফলতা তোমাদের পরস্পরের ভালবাসার উপর নির্ভর করিতেছে। দ্বেষ, ঈর্ষ্যা, অহমিকাবুদ্ধি যতদিন থাকিবে, তত দিন কোনও কল্যাণ নাই।" "সকলকে Sympathyর সহিত গ্রহণ করিবে, রামকৃষ্ণ পরমহংস মানুক বা না মানুক।" "সকল মতের লোকের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিবে। "you must push forward, do you see 'আমি কি জানি,' 'আমি কি জানি,—ও রকম বুদ্ধিতে তিনকালেও কিছু জানতে পারবে না।' স্বামীজীর ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই এপ্রেল তারিখে লিখিত পত্রখানির শেষ অংশে আছে,—

"I fret and stamp like a leashed hound"—এই বাক্যের অনুবাদে সমগ্র ভাবটুকু পরিস্ফুট হয় নাই। মৃগয়াকালে 'হাউণ্ড' দড়িতে বাঁধা থাকে। শিকার দেখিলে হাউণ্ড অগ্রসর হইবার চেষ্টা করে। আগ্রহ যখন ঘনীভূত হয়, চেষ্টা যখন চরমে উঠে, তখন হাউণ্ড বন্ধন-রজ্জু ছিঁড়িয়া ছুটিয়া যায়। স্বামীজী অল্প কথায় অনেকটা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। আশা করি, গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করিবার সময় অনুবাদক মহাশয় এ বিষয়ে অবহিত হইবেন। স্বামী বিবেকানন্দের "দেববাণী" দার্শনিক চিন্তার রত্নাকর। "মঙ্গল জিনিসটা সত্যের সমীপবর্ত্তী বটে, কিন্তু তবু ওটা সত্য নয়। অমঙ্গল যাতে আমাদের বিচলিত করিতে না পারে, এইটে শেখবার পর আমাদের শিখতে হবে,—যাতে মঙ্গল আমাদের সুখী করতে না পারে। আমাদের জানতে হবে যে, আমরা মঙ্গল অমঙ্গল, দুয়েরই বাইরে। ওদের উভয়েরই যে স্থাননির্দ্দেশ আছে, সেটা আমাদের লক্ষ্য করতে হবে, আর বুঝতে হবে যে, একটা থাকলেই অপরটা থাকবেই থাকবে।" ইহা কি অহং-গানমুখর বঙ্গে 'দেববাণী' নয়? "কেদার-খণ্ডে স্বামিসংবাদে"র ভাষা এবার একটু জটিল হইয়াছে—২২৬ পৃষ্ঠা ও ২২৭ পৃষ্ঠা আরও বিশদ না হইলে সাধারণের অধিগম্য হইবে না। শ্রীযুক্ত স্বামী শুদ্ধানন্দের "ধর্ম্মের প্রমাণ" সুচিন্তিত, সুলিখিত দার্শনিক সন্দর্ভ। "তোমার যেটুকু শক্তি আছে, তাহার সম্পূর্ণ ব্যবহার কর—অকপটে নির্ভয়ে সত্যানুসন্ধানে অগ্রসর হও, আলোক আসিবেই আসিবে।" "সম্প্রদায়ভুক্ত হও, ক্ষতি নাই, কিন্তু সাম্প্রদায়িক হইও না—অগ্রসর হও, অগ্রসর হও। উপলব্ধির প্রশস্ত ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে।" "ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাসে" গ্রীক দর্শনের পর্য্যায়ে 'প্লেটো' চলিতেছে। শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী "পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার কারণ কি?" প্রবন্ধে পরিশ্রমসহকারে বহু তথ্যের সমাবেশ করিয়াছেন। 'উদ্বোধনে'র মত পত্রে সংক্ষেপে কারণটুকু নির্দ্দিষ্ট হইলেই যথেষ্ট হইত। সূক্ষ্মানুসন্ধান চরিতেই আবশ্যক। শ্রীযুত অতুলকৃষ্ণ দাসের "কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রম" সুখপাঠ্য। "উদ্বোধনে" পূর্ব্বে প্রায়ই তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী প্রকাশিত হইত। এখন হয় না। বহুদিন পরে অতুলবাবু কেদার-বদরীর পরিচয় দিয়াছেন।—আশা করি, অতঃপর 'সকল-মত-পথ-বিহারী'র ভাবের দেউলে তীর্থের ছবিও দেখিতে পাইব। এইরূপ ছবি সাধারণের পক্ষে 'কিণ্ডারগার্টেনে'র মত হিতকারী ও মনোহারী। "সংবাদ ও মন্তব্যে" প্রকাশ,—মান্দ্রাজের ক্যানানোর, টেলিচেরী ও কৈলাণ্ডীতে রামকৃষ্ণ-মিশনের তিনটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কালীকটের নৈশবিদ্যালয়ে ৭০ জন ছাত্র বিদ্যালাভ করিতেছে। কালীকটে মালয়ালম্ ভাষায় একখানি মাসিকপত্র-প্রকাশের আয়োজন হইতেছে। মান্দ্রাজ-মঠের কর্ত্তৃপক্ষ একখানি ইংরাজী মাসিকপত্র-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছেন।—'তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী!'

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।—বৈশাখ। কবিবর শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এখন "তত্ত্ববোধিনী"র সম্পাদক। প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের একটি গানের স্বরলিপি আছে। রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন,—

"দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ও পারে।
আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাইনে তোমারে॥"

'চরণে' শ্লেষ আছে! এতগুলি চরণ সত্ত্বেও গানটি যে খোঁড়া হইয়াছে, তাহা হইতেই সপ্রমাণ হইতেছে, সুরগুলি চরণ পাইবামাত্র তাহাদিগকে ব্রহ্মসঙ্গীতের ময়দানে ছাড়িয়া দিলেও কোনও লাভ নাই। "তুমি এত আলো জ্বালিয়াছ এই গগনে"—ইত্যাদি গানটি আদৌ জগতের আলো না দেখিলেও কোনও ক্ষতি ছিল না। শ্রীযুত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর "জন্ম" কবিত্ব, দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রহেলিকা। আজকাল সাদা কথা সোজা ভাষায় লিখিলে প্রবন্ধ হয় না। রূপক নহিলে জগতের কোনও সত্য বা তথ্য ব্যক্ত করা যায় না। এতকাল মানবজাতি মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য ভাষার ব্যবহার করিয়া আসিতেছিল। সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিষ্যবর্গ ভাবকে ঢাকিবার জন্য ভাষার ব্যবহার করিতেছেন। নূতন বটে, কিন্তু একটু সাংঘাতিক। রবীন্দ্রনাথের "মনুষ্যত্বের সাধনা"ও এই শ্রেণীর। তবে শিষ্যবিদ্যা গুরুর অপেক্ষা গরীয়সী হইয়াছে, আশা করি, রবীন্দ্রনাথ সে জন্য দুঃখিত হইবেন না। তাঁহার এই রচনাটির কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছি। যথা,—"মানুষ কেমন ক'রে ত্যাগ করচে, কেমন ক'রে মহত্ত্ব প্রকাশ কচ্চে, তাই দেখ—সেইখানে মানুষের যথার্থ স্বভাবের পরিচয় পাবে। সেইখানেই মানুষের সম্মান, মানুষের গৌরব। মানুষের যথার্থ সম্মান অভিমানকে বলিদান দিয়ে, অভিমানকে চরিতার্থ ক'রে নয়।" এই উপদেশটুকু মনে রাখিলে বাঙ্গালী—বিশেষতঃ সাহিত্যসেবী বাঙ্গালী—আমরা সকলেই বিশেষ উপকৃত হইব, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ময়রায় অবশ্য সন্দেশ খায় না; তবু বলি, "মানুষের যথার্থ সম্মান অভিমানকে বলিদান—[যদিচ শুধু বলি দিলেই যথেষ্ট হইত—দানের উপর দান অত্যুক্তির খয়রাৎ] দিয়ে"—সাধনার এই সারসত্যটুকু সর্ব্বদা মনে রাখিলে উপদেষ্টাও যথেষ্ট উপকৃত হইবেন। আমাদের দেশের মানুষ কেমন ক'রে আত্মশক্তি ও ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত ত্যাগ করছে, এবং 'নাকুয়ার বদলে খুরুয়া'র মত বিদেশের প্রসাদ লাভ ক'রে অভিমানে স্ফীত হয়ে উঠ্‌ছে, বস্তুতঃ তা দেখে ঘৃণায় সঙ্কুচিত হ'য়ে কারও কোনও লাভ নাই। তার চেয়ে বরং এই সকল উপদেশের মহত্ত্বগুলি দেখে গেলে লাভ আছে। শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "আমার বোম্বাই-প্রবাস" "ভারতী"তে আছে, "তত্ত্ববোধিনী"তেও চলিতেছে। সকলের প্রবাস এত কাজে লাগে না। শ্রীযুত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর "ইউরোপের ইতিহাসের ধারা" উল্লেখযোগ্য। ভাবাও। শ্রীযুত সুধাকান্ত রায় চৌধুরীর "গন্ধরাজ গাছের কীট ও তাহার প্রজাপতি" লেখকের অনুসন্ধানের ফল। প্রশংসনীয়।

গম্ভীরা।—ত্রৈমাসিক পত্র। প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা। বৈশাখ।—মালদহ কলিগ্রাম হইতে প্রকাশিত। প্রথম সংখ্যা দেখিয়া আশা হইতেছে। "বিজ্ঞান" অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। কিন্তু লেখক সংক্ষেপে অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বসের "আম্রবৃক্ষের উন্নতি" কাজের কথায় পূর্ণ। বিশেষজ্ঞের উপদেশে সুফল ফলিবে। "রামায়ণে লোকশিক্ষা"য় বিশেষত্ব নাই। আমেরিকা ওহায়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুত রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুর. "স্বাস্থ্য ও সংসার" নামক সন্দর্ভে বাঙ্গালীকে স্বাস্থ্যবিধানে অবহিত হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। বলিবার প্রণালী জটিল। কিন্তু এ আহ্বান উপেক্ষা করিবার নহে। "বঙ্গবাণী"তে অনেকগুলি প্রবন্ধের সার-সংগ্রহ আছে। "মালদহের উদীয়মান নাট্যকারে"র পরিচয়ে প্রমাণ নাই। নকীবের জয়গান সমালোচনা নহে। "নাটকখানির মূল উদ্দেশ্য—সমাজসংস্কার।" সংস্কার নাটকেও সিদ্ধ হইতে পারে, তবে নাটকের মূল উদ্দেশ্য

নাটকত্ব। "গম্ভীরা"র গুরুগম্ভীর কবিতা না থাকিলেও আমরা দুঃখিত হইতাম না। শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ চৌধুরীর "আবাহনে" কবির নিজের কোনও বক্তব্য নাই। ভাষায় অধিকার আছে। ছন্দের গতি কষ্টকল্পনার নিগড়ে নিয়ন্ত্রিত নহে। সাধিলে সিদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু "এসেছে দুয়ারে নব জাগরণ লয়ে সঙ্গীত, পুলক রব" দেখিয়া "পুলক নর্ত্তিছে গাছে গাছে" মনে পড়ে। 'নব জাগরণ দুয়ারে' আসিলে বাঙ্গালীর তন্দ্রা তাহাকে একমুষ্টি ভিক্ষা দিয়া আবার পাশ ফিরিয়া শুইতে পারে। কিন্তু 'পুলক রব' রবি-রাহুর দেশে আর কক্ষে পাইবে কি? 'পুলক' ও 'রব' স্বতন্ত্র, না একপদ? 'পুলকের রব'ই কি নবীন কবির উদ্দিষ্ট? সে রব কি-রূপ, কিংভূত, কিমাকার? শ্রীযুত কুমুদনাথ লাহিড়ীর "অন্ধকারে আলো"র কষ্টকল্পনার ক্লান্তি অত্যন্ত শোচনীয়। "গম্ভীরা" কবিতা-নির্ব্বাচনে একটু গম্ভীরা হইলে, গাম্ভীর্য্যের পরিচয় দিলে, দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় কোনও ক্রটী ঘটিবে না, দশের শিক্ষালাভের সুযোগ কমিবে না, তাহা আমরা হলপ করিয়া বলিতে পারি। "গম্ভীরা"র মূলমন্ত্র—"ত্যাগবলং পরং বলম্"। কবিতা-সংগ্রহে এই ত্যাগবলের পরিচয় দিলে "গম্ভীরা"র বল বাড়িবে বই কমিবে না।

জগজ্জ্যোতিঃ। বৈশাখ। শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র ঘোষের "চতুর্দ্বার জাতক" উল্লেখযোগ্য, সুখপাঠ্য। চট্টগ্রাম বৌদ্ধ-সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি শ্রীমৎগুণালঙ্কার মহাস্থবির কর্ত্তৃক পঠিত "সভাপতির অভিভাষণ" বিবিধ তথ্যে পূর্ণ। ইহার আলোচনায় শুধু বৌদ্ধ-সমাজ নহে, সাধারণ বাঙ্গালীও উপকৃত হইবেন। আধুনিক 'কাব্যি'র প্রভাব এই পত্রেও সুস্পষ্ট। শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্তের "মনের প্রতি বিবেকে" উপদেশ আছে, কবিত্ব নাই।

নব্যভারত। বৈশাখ। প্রথমেই সম্পাদকের "তপোবল"। লেখক বলেন,—"সত্যযুগের ন্যায় সমাজের উন্নতি চাও যদি, ধর্ম্মসাধন কর।" এই কথাই মামুলী ছন্দে, এমার্সন প্রভৃতির নজীরে, আধ-আধ গদ্য-কাব্যির ভাষায় প্রবীণ সম্পাদক বহুকাল বলিয়া আসিতেছেন। নববর্ষে আবার বলিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালী চোরা এই ধর্ম্মের কাহিনী শুনিবে কি? শ্রীযুত তরণীকান্ত সরস্বতী "খনার বচন" একত্র সংগ্রহ করিবার চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছেন। খনার বচন—"ঘরে বসে পুছে বাত, তার ঘরে হাবাত—[হা-ভাত?]—বাঙ্গালীর নিত্য-স্মরণীয়। শ্রীযুত রসময় লাহার "বীণা" এমন বেসুরা হইল কেন? শ্রীযুত মহেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরীর "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্য" নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধটি এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইল। আশা করি, নূতন ভাইস-চ্যান্সেলার ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। শ্রীযুত বেণোয়ারীলাল গোস্বামী "বাসন্তী গাথায়" অমিত্রাক্ষর ছন্দকে জবাই করিয়াই নিরস্ত হন নাই, সেই রক্তে পরনিন্দার পটে নিজের যে ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা দেখিয়া দুঃখ হয়—বলিয়াই নিরস্ত হইলাম। আর কিছু বলিলে কালী কলমের মান থাকে না। শ্রীযুত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের "পান্থ" নামক কবিতাটি "বুড়া বয়সে"র গান,—উপাদেয়, উপভোগ্য। পড়িতে পড়িতে মনে হয়, যেন সুদূরের ধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনিতেছি। আসলে "পান্থে"র ধ্বনির আঘাতেই হৃদয়ে প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠে। শ্রীযুত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় "বিশ্ববিদ্যালয়ে স্তর আশুতোষ" প্রবন্ধে আশু-স্তোত্রের উপসংহারে লিখিয়াছেন,—"তুমিই তোমার তুলনা, * * * তুমি চিরদিনই অতুলনীয় থাকিবে।" নিধু বাবুর টপ্পাটি উদ্ধৃত করি,—

"তোমারই তুলনা তুমি, প্রাণ, এ মহীমণ্ডলে।
যেমন গঙ্গা পূজে গঙ্গাজলে।"

আশুতোষের প্রসাদ-বিতরণের পালা শেষ হইয়াছে; সর্ব্বাধিকারীর অভিনন্দন-সভায় আশুতোষের মোসাহেব প্রেতের পাল ধেই-ধেই করিয়া নাচিতেছে। এখন আশুতোষ ভাবিতেছেন—

"আমার বলে ছিল যারা,
আর ত তারা দেয় না সাড়া।"

বিসর্জ্জনের বাজনা না থামিতেই চণ্ডীর গান সুরু হইয়াছে; ভক্তির গান শুনিয়া আমরা পুলকিত হইয়াছি—এমন কি, রবীন্দ্রের ভাষা একটু বদলাইয়া বলিতে পারি, "পুলক নাচিছে হাড়ে হাড়ে।" জীতা রহো চণ্ডীচরণ,—পদলেহী কুকুরের দল তোমার দৃষ্টান্ত দেখিয়া কৃতজ্ঞতা শিখুক। শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসুর "বারাণসীর রাজবংশ" উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র দাসের "নববর্ষ" নামক কবিতাটি গোবিন্দের যোগ্য বটে। কবির আশা,—কবির প্রার্থনা "সত্য হউক, সত্য হউক, হে ভগবান।"—

"জ্বালাময়ী মহাভাষা, জাগাবে জাতীয় আশা, শিরে গঙ্গা দেশ-প্রীতি, নাশিবে নরক-ভীতি,
ইন্দিরা খুলিবে রত্ন-মন্দির-তোরণ, পতিত সগর-বংশ পাইবে জীবন!
উদ্যম জাগিবে আগে, কর্ম্মের সে অনুরাগে, প্লাবিয়া বরুণা অসি, নাশি ব্যাস-বারাণসী,
বিনাশি' বিঘন বাধা বজ্র দৃঢ়পণ! ঘৃণিত গর্দ্দভ-জন্ম কর নিবারণ,
হে বর্ষ, ভারতভূমি শিবময় কর তুমি, অন্নপূর্ণা কৃপানেত্রে, চাহবে ভারত-ক্ষেত্রে,
শকতি-সাধন যোগে কর নিমগন, হইবে শিবের কাশী আনন্দ-কানন!"

অর্চ্চনা।—বৈশাখ। শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য "কালিদাসের দুষ্মন্ত" প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন,—"ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটি বৃত্তির বিমিশ্রণেই দুষ্মন্ত-চরিত্র গঠিত।" অর্থও কি একটি বৃত্তি? মহাকবির চিত্রিত চরিত্রের আংশিক আলোচনায় 'অন্ধের হস্তিদর্শনে'র ন্যায় বিড়ম্বনা ঘটিবার সম্ভাবনা। সুতরাং আমরা নিরস্ত হইলাম। সম্পাদকের "জীবজন্তুর সৌহৃদ্য" ই বৈশাখী অর্চ্চনার শ্রেষ্ঠ উপচার। "বিবেক-বাণী"তে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তিগুলি একত্র সঙ্কলিত হইতেছে। "পুরস্কার" ও "গুরু-গিন্নী" গল্প;—চলনসই। "অর্চ্চনা"র কবিতা নাই!—এ যুগে ইহাও বিশেষত্ব।

স্বাস্থ্য-সমাচার।—বৈশাখ। এই বর্ষে "স্বাস্থ্য-সমাচার" তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। "স্বাস্থ্য-সমাচারে"র আকার বাড়িয়াছে। ইহার উপযোগিতাও সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইতেছে। আনন্দের বিষয় এই যে, বাঙ্গালী "স্বাস্থ্য-সমাচারে"র আদর করিতেছে। বাঙ্গালা ভাষায় 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্'—এই মন্ত্র প্রচার করিবার দ্বিতীয় পত্র নাই। সুতরাং "স্বাস্থ্য-সমাচার"ই আমাদের 'সবে-ধন নীলমণি'। বহুবার বলিয়াছি, আবার বলি, "স্বাস্থ্য-সমাচার" নূতন পত্রিকার মত বাঙ্গালার গৃহে গৃহে বিরাজ করুক,—ডাক্তার বসুর এই পুণ্যব্রত সফল হউক। "স্বাস্থ্য-নীতি" নিবন্ধের বিশ্রাম ও নিদ্রা, পরিশ্রম ও ব্যায়াম বাঙ্গালীমাত্রের আলোচ্য। শ্রীযুত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের "কাঁচা খাদ্যের সহিত পুষ্টির সম্বন্ধ" সুচিন্তিত ও সুলিখিত সন্দর্ভ।

শ্রীযুত সুবোধচন্দ্র মিত্রের "কোষ্ঠবদ্ধতা" প্রবন্ধে রুগ্ন-গৃহস্থ যথেষ্ট উপকৃত হইবেন। শ্রীযুত রাজেন্দ্রকুমার ঘোষের "পুষ্করিণী ও কূপখনন" প্রবন্ধটি মফস্বলের সর্ব্বত্র প্রচারিত হউক, ইহাই আমাদের কামনা। "স্বাস্থ্য-সমাচারে"র আদ্যোপান্ত কাজের কথায় পূর্ণ।—ইহার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে না পারিলে—শুধু তাহাই নয়, স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে না পারিলে, বাঙ্গালী বাঁচিবে না। যদি জীবন-ধারা—বংশের পারম্পর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাও, বাঙ্গালী, বাঁচিবার চেষ্টা কর। স্বাস্থ্য-তত্ত্বের মূলসূত্রের সহিত পরিচিত না হইলে, এবং সর্ব্বাংশে স্বাস্থ্যনীতির অনুশাসন শিরোধার্য্য না করিলে, বাঙ্গালী জাতির বিলোপ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিবে।—"স্বাস্থ্য-সমাচারে"র উপদেশসমূহ দেশে প্রচারিত হইলে অনেক কল্যাণ হইতে পারে। এই গ্রীষ্মাবকাশে স্কুল কলেজের ছাত্রগণ দেশে ফিরিয়াছেন, তাঁহারা "স্বাস্থ্য-সমাচারে"র উপদেশগুলি গ্রামে গ্রামে প্রচার করুন। দেশবাসীকে "স্বাস্থ্য-সমাচার" পড়িতে বলুন। যাহারা অসুরবিক্রমে সমগ্র দুনিয়া চষিয়া ফিরিতেছে, তাহারাও স্বাস্থ্যোন্নতির—বংশোৎকর্ষের চেষ্টায় প্রাণপাত করিতেছে। আর ম্যালেরিয়ায় জর্জ্জরিত, মারীভয়ে সদা-শঙ্কিত, ক্ষীণ, দুর্ব্বল, মরণোন্মুখ বাঙ্গালী আত্মরক্ষার উপায় না করিয়া 'জগতের দরবারে বাঙ্গালীর মহিমা' জাহির করিবার জন্য দিনরাত্রি শুধু 'জ্যাঠামী' করিতেছে! এই শোচনীয় অথচ হাস্যোদ্দীপক দৃশ্য দেখিয়া বিশ্ববাসী হাসিবে, না মৃত্যুপথের পথিকের গলায় বিজয়-মাল্য পরাইয়া দিবে? "সাহিত্যে"র গ্রাহক ও পাঠকগণকে আমরা "স্বাস্থ্য-সমাচারে"র নিয়মিত পাঠক হইতে অনুরোধ করি।—কলিকাতা, ৪৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে "স্বাস্থ্য-সমাচার" প্রাপ্তব্য।

শান্তি।—প্রথম বর্ষ। ১ম সংখ্যা। বৈশাখ। প্রথমেই 'কাব্যি'। শ্রীযুত বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী 'চিরবাঞ্ছিতা দেবী'কে ছন্দে ডাকিয়াছেন। বিপিনের আবদার অদ্ভুত—"সুনীল গগনকেশে তব উঠুক ভাতিয়া তারা অগণন।" কল্পনার এমন গগনস্পর্দ্ধী লম্ফ বাঙ্গালার কবিতা-কুঞ্জেও অল্প দেখিয়াছি। বিপিনের mandate—"নিবিড় অরণ্য-অম্বরেতে জলুক হয়ষে ক্ষণ-প্রভাগণ।" ক্ষণপ্রভার পাল চাই, একটি আধটিতে লাগিবে না। শ্রীযুত পাঁচুলাল ঘোষের "বধূ" নামক গল্পে কোনও বিশেষত্ব নাই। এরূপ রাবিশ ছাপিয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে জঞ্জাল বাড়াইয়া লাভ কি? শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্রের "মহৎচিন্তা ও মহত্বলাভ" উল্লেখযোগ্য। ফেনাইয়া বড় না করিলে প্রবন্ধটি সার্থক হইতে পারিত। অতিবিস্তৃতি রচনার বিষম শত্রু। উচ্ছ্বাস সংযত হইলে বরং ফলোপধায়ক হয়। শোথগ্রস্ত স্ফীত উদ্দীপনার প্রেরণা মরিয়া যায়, সার্থক হইতে পারে না। তথ্য ও সত্য বাগ্‌-বাহুল্য অপেক্ষা মনে অধিক প্রভাব-বিস্তার করিতে পারে। সন্দর্ভে বস্তু আছে; তাই ভবিষ্যতে বাহুল্য-বর্জ্জন করিতে অনুরোধ করিতেছি। প্রথমেই আবাহনে 'চিরবাঞ্ছিতা'র অধিষ্ঠান দেখিয়াছি। চব্বিশ পৃষ্ঠায় আবার 'বাঞ্ছিতে'র আবির্ভাব! কবি ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রায়-কবির 'নূতন কিছু করো' এতদিন পরে পালন করিয়াছেন। স্বর্গে বোধ হয় এ সব কবিতা পঁহুছিতে পারে না—তাহা হইলে স্বর্গে নরকে ভেদ থাকিত না, এবং দেবতারা স্বর্গ ছাড়িয়া পালাইতেন। তবে দূর হইতে যদি দৃষ্টি দেন,—তাহা হইলে মাইকেল, হেম, নবীন, দ্বিজেন প্রভৃতি এই নূতন কবির নূতন তান শুনিয়া প্রহসন-হর্ষ অনুভব করিবেন, সে

বিষয়ে সন্দেহ নাই।—"অপূর্ব্ব ত্যাগের রম্য মরকত-ভাতি।" "ত্যাগ" যে মরকতের মত হরিত, তাহা কি ত্যাগের উপদেষ্টা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও জানিতেন? সম্ভবতঃ শ্রীমান্ অর্জ্জুনও ধীরেন্দ্রের মত ধীমান ছিলেন না। তাই ত্যাগের সবুজ ভাতি ধরিতে পারেন নাই। "উপদেশামৃত" উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতী ননীবালা প্রভৃতি আরও অনেক কবি "শান্তি"র অন্তরালে থাকিয়া ছন্দে, ভাষায়, ভাবে অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছেন। মা সরস্বতী হয় ইঁহাদের শান্তি দিন, নয় সাহিত্যকে তাঁহার শান্তি-পুরের পথ দেখাইয়া দিন। "শান্তি"র নমুনা ভীতিপ্রদ, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি।

ব্রাহ্মণ-সমাজ।—বৈশাখ। ব্রাহ্মণের শিখায় পুষ্পের মত "ব্রাহ্মণসমাজে"র মুখপাতেও "শান্তি"র কবি ধীরেন্দ্রনাথের কবিতা ঝুলিতেছে। "খিন্ন বাঁধন ছিন্ন করুক আবেগের কম্পনে।" ইত্যলম্। শ্রীমান্ শ্রীজীব ভট্টাচার্য্য "সাহিত্যে হৃষীকেশে" স্বর্গীয় হৃষীকেশ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরিচয় দিতেছেন। প্রবন্ধটি এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। "ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণে" দেখিলাম,—"ব্রাহ্মণ কখনও সঙ্কীর্ণমনা হইতে পারেন না, ব্রাহ্মণত্ব ও অনুদারতা পরস্পর বিরুদ্ধ-লক্ষণাক্রান্ত।" যে সভায় এই প্রবন্ধটি পঠিত হইয়াছিল, সে সভার উদ্যোগীরা ব্রাহ্মণ ত? দুঃখের সহিত সভাপতি—সুসঙ্গের মহারাজ কুমুদচন্দ্রকে বলিতে হইতেছে, মহাসম্মিলনে 'দরাজ' মনের কোনও পরিচয় পাই নাই। ইহা হইতে কি সিদ্ধান্ত করিব? তাঁহার কথা সত্য, না কলির ব্রাহ্মণে কৌমুদী সংজ্ঞা খাটে না? শ্রীযুত শশিভূষণ শিরোমণির "বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়" শিক্ষাপ্রদ। এইরূপ প্রবন্ধ বিবৃত হইলে, এবং এই শ্রেণীর প্রবন্ধের আধিক্য থাকিলে, "ব্রাহ্মণসমাজ" আবর্জ্জনামুক্ত ও সার্থক হইতে পারে। গোঁড়ামীর গর্জ্জনে, হ্রেষায়, এমন কি, বৃংহিতেও ব্রাহ্মণ জাগিবে না। জ্ঞানের বিস্তারেই, আদর্শের প্রতিষ্ঠাতেই, তাহা সম্ভব হইতে পারে।

ভারতী।—বৈশাখ। শ্রীযুত মুকুলচন্দ্র দের অঙ্কিত "শকুন্তলা" দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। এই কি সেই শকুন্তলা,—যাঁহার সৃষ্টি করিয়া ব্যাস ধন্য হইয়াছিলেন, কালিদাস মুগ্ধ হইয়াছিলেন, ভারতের দুষ্মন্ত ও জর্ম্মণীর গেটে মুগ্ধ হইয়াছিলেন? শকুন্তলার হাত দু'খানি প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ির বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত, প্রাংশু-অলভ্য শাখা হেলায় ধরিয়া রহিয়াছে। উপকথার অপদেবতা এই ভাবে ছাদ হইতে হাত বাড়াইয়া গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী তালগাছের তাল পাড়িত। চিত্রকর সবে মুকুল, তাহাতেই এই; ফুটিলে চিত্রজগৎ মাৎ হইয়া যাইবে, অত্র সন্দেহো নাস্তি। শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'জাগৃহি' পড়িয়া—সম্ভাবনার অপমৃত্যু দেখিয়া—দুঃখ হয়। বলিবার কথা ছিল, ভাব ছিল; ভাষা ও আন্তরিকতারও অভাব ছিল না। কেবল এক 'নকলে আসল খাস্ত' হইয়া গেল। দুঃখের বিষয় নহে কি? বাহিরের শাসনে—অনুকরণের ইঙ্গিতে কোনও প্রতি-ভাই নিজের পথ ছাড়িয়া রবির পথ ধরিতে পারে না। সত্যেন্দ্রনাথের নিজস্ব যাহা ছিল, তাহা গতানুগতিকতায় সমাধিলাভ করিয়াছে। "পাপড়ী-ঝরা পুরাতনের পাণ্ডুবরণ পদ্মচাকী" পরি-পাক করা যায় না। 'পদ্মচাকী' শুনিলেই 'নালাইচাকী' মনে পড়ে। অথচ 'পদ্মচাকী'র স্বরূপ মনে কোটেই না। 'জাগ পুরাতনের পুরে নূতনেরি সম্ভাবনা'—'সবুজ সাহিত্যে' হইতে পারে, কিন্তু এরূপ যতিবিন্যাস এ যুগে শোভা পায় না। 'বিধাতা আর ধাতায় মিলে ঘুরায় মুহু অমন্-যন্তি'

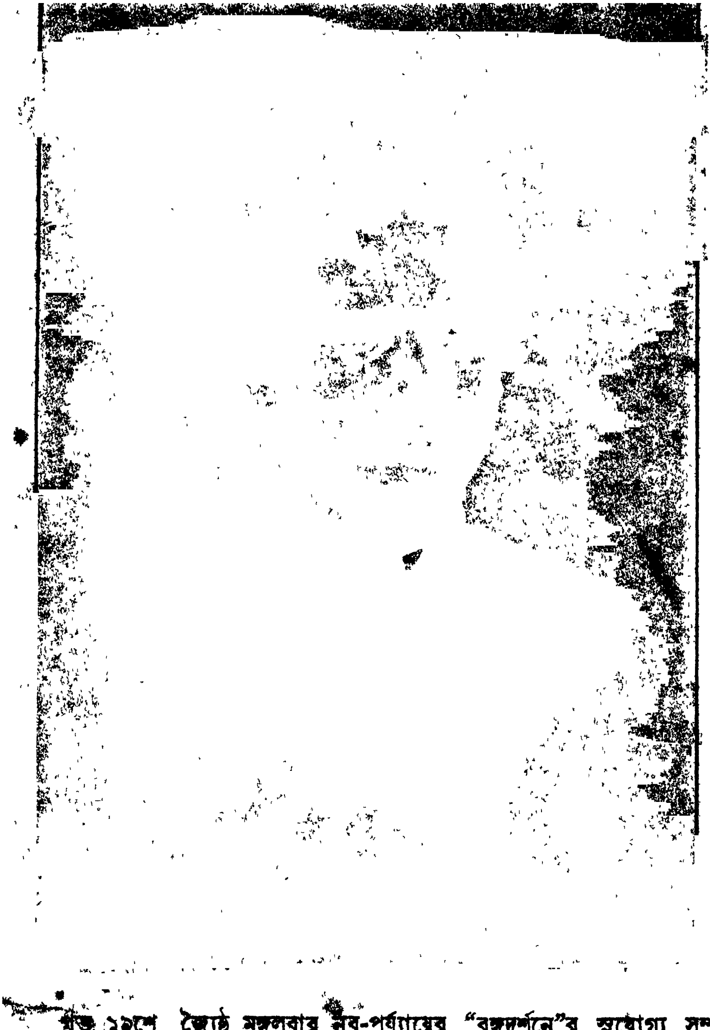
বাঙ্গালী বুঝিতে পারিবে কি? বিধাতাই বা কে, ধাত্রাই বা কে, তাহাই বা কে বলিয়া দিবে? 'নিশ্বাস রোধ', ও 'বলপ্রদ'র মিল একটু সাংঘাতিক নয়? "সর্ব্বে-পায়া বটের বীজে ভবিষ্যতের বনস্পতি"—অতি সুন্দর। কিন্তু 'সর্ব্বে-পায়া'র চলিত ক্ষেত্রেই যদি লুটিলেন, তবে আবার বনস্পতির শাখার লোভ কেন? শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর "নূতন বর্ষে" কবিতাটি বেশ। শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র ঘোষালের "প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যু" সেক্সপীয়রের ছবি, বাণভট্টের আঁকা। শ্রীযুত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "আলো ছায়া"র কালায় ধলায় যুদ্ধ চলিতেছে।—

'আ মরি কি ছবি এঁকেছ।

তুলিতে ললিতে মরি, শুধু কালী মেখেছ!'

শ্রীযুত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুদিত "রেডিয়মের আবিষ্কারকের সহিত সাক্ষাৎকার" উপভোগ্য। শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর "প্রেমের খেয়াল" খেয়ালের পর্য্যায়ে না পড়ুক, টপ্পার মান রাখিয়াছে। ইহার তানটুকু নূতন,—মনোরম। শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই "গান"টিই "তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা"র তত্ত্বের ভরা ভারী করিয়া "ভারতী"র ডালায় আসিয়া পড়িয়াছে। কবির দ্বৈত-ভাব। শ্রীযুত সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায় "নবাবে"র সঙ্গে "ভারতী"র মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছেন। "নবাব" তাঁহার, বা অন্য দেশের আমদানী, তাহা প্রকাশ নাই। শ্রীযুত ভুবনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "পরিচয়ে" বুঝিলাম, তিনি এত দিন পটের তেক্কীওয়ালা ছিলেন, এখন ভাষার মায়াবী হইলেন! সাধু! বর্ণভাণ্ডের যখন অভাব নাই, তখন রঙ্গ বদলাইবার ভাবনা কি?—এতদিন ভাষার ভঙ্গীতে রবি কাকাকে ভ্যাঙ্গচাইয়া আসিয়াছেন, সম্প্রতি বোধ করি হাতে কাজ নাই বলিয়া দ্বিজেন্দ্র জ্যাঠার গঙ্গাযাত্রায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শ্রীমান আর্য্যকুমার চৌধুরীর "ক্ষেতের পথে" ছবিখানি সুন্দর:—ছাপার চাপা পড়িয়াছে। শ্রীপ্রমথ চৌধুরী "ব্রাহ্মণ-মহাসভা" প্রবন্ধে যে সকল কাজের কথার অবতারণা করিয়াছেন, আমরা পারি ত পরে তাহার আলোচনা করিব। তৃতীয় স্তবকের প্রারম্ভেই প্রমথবাবু লিখিয়াছেন,—"ব্রাহ্মণ- মহাসভার এই লম্ফ-ঝম্পের দরুণ আমি বিশেষ লজ্জিত।"—প্রমথ বাবুর মত সুশিক্ষিত, মনীষার বর-পুত্রের রচনায়—সামাজিক সমস্যার আলোচনায় এই 'বোস্-পুরোণো' লম্ফঝম্পের আবির্ভাব দেখিয়া অনেক সামাজিক লজ্জিত হইবেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্তে সামাজিক প্রসঙ্গের আলোচনা যদি এই পথের পথিক হয়, তাহা হইলে তথাকথিত মুক্তকচ্ছ কুক্কুট মিশ্র শর্ম্মার ও উক্ততোরণ কামব্রজের সুমার্জ্জিত তার্কিকে কোনও প্রভেদ থাকিবে না। "ভারতী"র মন্দিরে "অথ টিকি-মেধযজ্ঞ" ও "কালীপ্রসন্ন সিংহ" নামক শুঁটকী মাছের সানকী দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। ইহা শিষ্টসমাজের যোগ্য নয়। শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কি এমন অধঃপতন হইয়াছে? শ্রীযুত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের "জীবনস্মৃতি" নিশ্চয়ই কৌতুকাবহ। রবীন্দ্র, সত্যেন্দ্র জীবনস্মৃতি দিয়াছেন; জ্যোতিরিন্দ্র আরম্ভ করিলেন। ভবিষ্যতে বেকার জীবনচরিত-কারেরা বলিবে,—লিখিব যে ঠাকুর-চরিত, "তাহারও দিলে না অবকাশ।" [শেষটুকু "রাজা ও রাণী" হইতে উদ্ধৃত।] "আর্ট—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" অনুশীলনের যোগ্য।

শৈলেশচন্দ্র



গত ১৭শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার নব-পর্য্যায়ের “বঙ্গদর্শনে”র সুযোগ্য সম্পাদক, সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক, সৌজন্য ও বিনয়ের প্রতিমূর্ত্তি, মধুরচরিত, সুলেখক শৈলেশচন্দ্র মজুমদার অকালে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।—শৈলেশের সহিত যাঁহাদের পরিচয় ছিল, তাঁহারা কখনও তাঁহাকে ভুলিতে পারিবেন না।—ভগবান শৈলেশের শোকার্ত্ত পরিবারে শান্তি ও সান্ত্বনা দিন।

২।১,০ রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর, কলিকাতা, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত, এবং ৪৭।১, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে শ্রীঅধরচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বৌদ্ধযুগে জ্ঞানচর্চ্চা।

বৌদ্ধযুগে জ্ঞানচর্চ্চার ধারা নির্ণয় করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে সুদূর বৈদিকযুগে যাইতে হয়, এবং কালের যবনিকা উত্তোলন করিয়া দেখিতে হয়, জ্ঞানোদ্দীপ্ত ঋষিগণ কিরূপ ভাবে জীবন যাপন করিতেন। সুত্তনিপাতের ব্রাহ্মণধম্মিকসুত্তে বর্ণিত আছে,—

"পুরাতন ঋষিগণ, করি আত্মসংযমন,
করি আরো তপঃ আচরণ।
পঞ্চেন্দ্রিয়ামোদ সার, করি সবে পরিহার,
আত্মসুখ করিত চিন্তন॥
পশু আদি ধান্য ধন, না ছিল কাঞ্চন ধন,
পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণসদনে।
ধ্যান ছিল ধান্য ধন, ধ্যানই পরম ধন,
রক্ষিত যা' অতীব যতনে॥"
"সমস্ত প্রদেশবাসী ধনবানগণ আসি
করিত সে ব্রাহ্মণ-পূজন।
অবধ্য অদমনীয়, অজেয় অলঙ্ঘনীয়,
ছিল পূর্ব্বতন দ্বিজগণ।
গিয়া কার দরজায়, ব্রাহ্মণ যদি দাঁড়ায়,
নাহি বিরোধিত কোন জন॥
দ্বি-উনপঞ্চাশ বর্ষ, চিত্তে অতিশয় হর্ষ,
যৌবনেতে করিয়া সন্ন্যাস।
সবে করি আচরণ, পূর্ব্বতন দ্বিজগণ,
ব্রহ্মচর্য্য করিত অভ্যাস॥
পূর্ব্বতন দ্বিজগণ, করিতেন অন্বেষণ,
শিখিতে বিজ্ঞান দরশন।
আদর্শ সৎ-আচরণ শিখিতেন সর্ব্বজন,
নানা স্থানে করিয়া ভ্রমণ॥"

বৌদ্ধসাহিত্য পাঠ করিলে দেখা যায়, পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে দুই শ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন; যথা, তাপস ও পরিব্রাজক। তন্মধ্যে তাপসগণ কোনও এক নির্জ্জন বনপ্রদেশে আশ্রমস্থাপন করিয়া ব্রহ্মচর্য্যপালন, তত্ত্বানুশীলন ও ফল-মূলাহারে জীবনযাপন করিতেন। তাঁহাদের যে কয়েক জন শিষ্য থাকিতেন,

তাঁহারা তাঁহাদিগকে ব্রহ্মচর্য্য ও শাস্ত্রশিক্ষা দিতেন। শিষ্যগণ ঋষিকুমার নামে অভিহিত হইতেন। বাল্মীকির তপোবনে কুশ ও লবকে যে ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল, রামায়ণ-পাঠে তাহা অবগত হওয়া যায়। তাপসগণ শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু, উভয়ের কার্য্যই সম্পন্ন করিতেন। গুরুগৃহে থাকিয়া অধ্যয়নের কথাও স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়। গুরু শিষ্যের নিকট হইতে পারিশ্রমিক কিছু গ্রহণ করিতেন না, বরং তিনিই শিষ্যদিগকে 'খোরাক পোষাক' দিতেন। শিষ্যেরা বন হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতেন, গরু চরাইতেন, এবং ক্ষেত্রে কাজ করিতেন। শিষ্যদের কায়িক পরিশ্রম ভিন্ন গুরু অন্য কোনও পারিশ্রমিকের আশা করিতেন না। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে শিষ্যগণ গুরুদক্ষিণাস্বরূপ কিছু দিতেন, এবং দেশের রাজা ও ধনিগণ বিদ্যাশিক্ষার্থীদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। তিত্তিরিয়-জাতকে প্রাচীন বিদ্যালয়ের সুন্দর বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পরিব্রাজকগণ বর্ষার তিন মাস ভিন্ন অন্যান্য ঋতুতে আর্য্যাবর্ত্তের নানা স্থানে পর্য্যটন করিতেন, এবং যে স্থানে যাইতেন, তথাকার ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানের তাপস ও পণ্ডিতগণকে দার্শনিক তর্ক-সমরে আহ্বান করিতেন। তাঁহাদের বিশ্রামের জন্য স্থানে স্থানে পান্থশালা (সন্থাগার) ও উদ্যান-বাটিকা নির্দ্দিষ্ট ছিল। পরিব্রাজকগণ অবিবাহিত থাকিতেন, এবং জ্ঞানচর্চ্চার উদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গ করিতেন। স্থানে স্থানে পরিব্রাজিকার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তাপসেরাও অনেক সময় পরিব্রাজক-বৃত্তি অবলম্বন করিতেন। তৎপক্ষে কোনও প্রকার বাধা বিপত্তি ছিল না।

বুদ্ধদেবের সময়ে ভারতবর্ষে অনেকগুলি ধর্ম্ম ও শিক্ষা সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। বৌদ্ধসাহিত্য হইতে মুণ্ড-সাবক, জটিলক, মগণ্ডিক, তেদণ্ডিক, অবিরুদ্ধক, গোতমক, দেবধম্মিক, নিগন্থ, আজীবক প্রভৃতি কতিপয় নাম অবগত হওয়া যায়। তন্মধ্যে জটিলক ভিন্ন অপর সকলে ভিক্ষু নামে অভিহিত হইতেন। বুদ্ধদেবের শিষ্যগণ 'সাক্যপুত্তিয় সমণ' নামে পরিচিত ছিলেন। উরুবিল্বে তিন জন কাস্যপ ভ্রাতার অধীনে এক সহস্র শিষ্য বাস করিতেন। অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও শিষ্যসংখ্যা পাঁচ শতের অধিক ভিন্ন অল্প ছিল না। ইচ্ছালঙ্ঘন, বনভাগ ও চম্পা প্রভৃতি স্থানে বর্ত্তমান মোহন্তদের ন্যায় অনেক শিষ্য প্রশিষ্য লইয়া এবং মগধরাজ বিম্বিসার ও কোশলরাজ প্রসেনজিৎ প্রভৃতি রাজগণের প্রদত্ত ব্রহ্মদান ভোগ করিয়া কতিপয় ব্রাহ্মণ রাজার ন্যায় সুখে বাস করিতেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক সময় ধর্ম্ম ও দর্শনসম্বন্ধীয়

তর্ক বিতর্ক হইত, এবং শিক্ষার্থিগণ ইচ্ছাক্রমে সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিতে পারিতেন। কিন্তু নিয়ত শিক্ষক-পরিবর্ত্তন শিক্ষার পক্ষে বিষম অন্তরায় জানিয়া বৌদ্ধদের মধ্যে উহাকে একটি গুরুতর অপরাধরূপে গণ্য করা হইয়াছিল।

বুদ্ধত্বলাভের প্রথম বৎসরে বুদ্ধদেবের শিষ্যসংখ্যা তের শতের অধিক হইয়াছিল। সুত্তপিটকে দেখা যায়, বুদ্ধদেব ৫০০ সংখ্যক ভিক্ষুর সহিত নানা স্থানে গমনাগমন করিতেন। কেবল সামঞ্‌ঞফলসুত্তেই ১২৫০ জন ভিক্ষুর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বুদ্ধদেবের শিষ্যগণের মধ্যে অশীতিসংখ্যক ভিক্ষু সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহারা বৌদ্ধসাহিত্যে অশীতি মহাশ্রাবক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। বুদ্ধদেবের ন্যায় আয়ুষ্মান স্থবিরগণও অনেক ভিক্ষু শিষ্য লইয়া পাবা ও নালন্দা প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেন। ভিক্ষুধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য পূর্ব্বে কোনও নিয়ম পদ্ধতি ছিল না। বুদ্ধদেব যাহাকে 'এস' বলিয়া ডাকিতেন, তিনিই ভিক্ষুরূপে গণ্য হইতেন। কিন্তু কালসহকারে দীক্ষার বিধি-বিধান ও শ্রেণীবিভাগ হইয়াছিল। দীক্ষার সাধারণ নাম ছিল প্রব্রজ্যা। পরে শ্রামণের দীক্ষা হইতে স্বতন্ত্র করিবার মানসে শ্রমণদের দীক্ষাকে উপসম্পদা নামে অভিহিত করা হয়। যাহাদের বয়স বিশ বৎসরের কম ছিল, তাঁহাদিগকে প্রব্রজ্যা এবং তদূর্দ্ধবয়স্ক ব্যক্তিগণকে উপসম্পদা প্রদান করা হইত। যাঁহারা দীক্ষা প্রদান করিতেন, তাঁহারা উপাধ্যায় ও যাঁহারা শাস্ত্রাদি শিক্ষা দিতেন, তাঁহারা আচার্য্য নামে অভিহিত হইতেন। জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে দীক্ষা প্রদান করা হইত। কেবল যাঁহারা পিতামাতার অনুমতি লইয়া আসিতেন না, যাঁহাদের কোনও অঙ্গবৈকল্য ও সংক্রামক ব্যাধি থাকিত, যাঁহারা রাজসরকারে কার্য্য করিতেন, এবং যাঁহারা পরাধীন ও ঋণগ্রস্ত ছিলেন, তাঁহারাই ভিক্ষুসংঘে প্রবেশাধিকারে বঞ্চিত হইতেন। শ্রামণগণের জন্য দশ শিক্ষাপদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, এবং শ্রমণদিগকে পাতিমোক্ষ-নির্দ্দিষ্ট ২২৭টী নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইত। তাঁহারা শিরে জটাজূট ধারণ, অঙ্গে ভস্মলেপন, মাটীতে শয়ন প্রভৃতি করিতে পারিতেন না। তাঁহাদিগকে সর্ব্ববিষয়ে মধ্যপথ অবলম্বনপূর্ব্বক অতিশয় পবিত্রভাবে জীবনযাপন করিতে হইত।

রাজগৃহ, বৈশালী, কপিলবাস্তু, শ্রাবস্তী ও কৌশাম্বী প্রভৃতি অনেক স্থানে বৌদ্ধবিহার নির্ম্মিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। জেতবন বিহারের নির্ম্মাণপ্রণালীও অতিশয় কৌতুকাবহ ছিল।

মধ্যস্থলে বুদ্ধদেবের শয়নাগার, এবং উহার চতুর্দ্দিকে আয়ুষ্মান স্থবিরগণের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিহারখানি চতুর্দ্দিকে প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। তোরণের পার্শ্বে একটী উপস্থানশালা ছিল; সেখানে পালাক্রমে ভিক্ষুগণ প্রহরীর কার্য্য করিতেন। বিহারপ্রাঙ্গনে একটী মণ্ডলমাল বা সভাগৃহ ছিল। ঐ সভাগৃহে প্রভাতে ও সায়াহ্নে ভিক্ষুগণ সমবেত হইতেন, এবং বয়সানুসারে সুন্দর শ্রেণীবদ্ধভাবে আসন পরিগ্রহ করিতেন। ভগবানের জন্য স্বতন্ত্র আসন নির্দ্দিষ্ট থাকিত। ভগবান মণ্ডলমালে উপস্থিত হইলে ভিক্ষুগণ সসম্ভ্রমে আসন হইতে গাত্রোত্থান করিতেন। ভগবান অনেক সময় ভিক্ষুগণের কথোপকথন হইতে কোনও একটী বিষয় লইয়া তৎসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেন।

বৌদ্ধভিক্ষুসংঘ কালসহকারে শাসন বা ধর্ম্মরাজ্য নামে অভিহিত হইয়াছিল। ভগবান সেই ধর্ম্মরাজ্যের একমাত্র পরিচালক ছিলেন। সারিপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন, আয়ুষ্মান আনন্দ প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁহার সাহায্য করিতেন। ভগবানের সহিত কেহ সাক্ষাৎ করিতে আসিলে প্রথমতঃ উপস্থানশালায় অপেক্ষা করিতে হইত। প্রহরী ভিক্ষু আগন্তুকের আগমনোদ্দেশ্য অবগত হইয়া আনন্দকে জ্ঞাপন করিতেন, এবং আনন্দ ভগবানের অনুমতিক্রমে দর্শনেচ্ছু ব্যক্তিকে ভগবানের নিকট লইয়া আসিতেন। বর্ষার চারি মাস ভিক্ষুগণ নিজ নিজ বিহারে ধর্ম্মচর্চ্চা করিতেন। বর্ষাবাসান্তে শ্রাবস্তী ও রাজগৃহ প্রভৃতি স্থানে ভিক্ষুগণ আসিয়া সম্মিলিত হইতেন, এবং ঐ সম্মিলনে ভগবান, ভিক্ষু ও উপাসকদিগকে তাঁহাদের পারদর্শিতা অনুসারে বিবিধ উপাধি প্রদান করিতেন। উপাধি-বিতরণের পারিভাষিক নাম ছিল—"এতদগ্রে স্থাপনং"। ভিক্ষুসংঘে কোনও নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে, সভা আহ্বান করা হইত, এবং ঐ সভার নির্দ্দেশমতে গুরুতর কার্য্য সমুদয় সম্পন্ন হইত। একতাই সংঘের শক্তি ছিল। সকলে সমযোগে কার্য্য করিতেন। তাঁহারা প্রাচীন প্রথাসমূহ হঠাৎ রহিত না করিয়া,—আবশ্যক হইলে তাহাদেরই মধ্য দিয়া সংস্কারের প্রবর্ত্তন করিতেন। তাঁহারা বয়োজ্যেষ্ঠকে সম্মান ও বয়ঃকনিষ্ঠকে স্নেহ করিতেন, এবং দানলব্ধ বস্তু বিভাগ করিয়া ভোগ করিতেন।

তখনও এ দেশে লিখন-পদ্ধতি সম্যক প্রচলিত ছিল না।—ললিতবিস্তর গ্রন্থে চৌষট্টি প্রকার লিপির উল্লেখ থাকিলেও বুঝিতে হইবে, উহা অনেক পরবর্ত্তী কালের বর্ণনা। তখন ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতগণ মুখে মুখে সকল শাস্ত্র

শিক্ষা করিতেন। বর্ত্তমানের ন্যায় তখন পুঁথিগত বা পুস্তকে স্থাপিত বিদ্যা ছিল না। সমুদয় শাস্ত্রই পণ্ডিতদিগের কণ্ঠস্থ থাকিত। ভগবান বুদ্ধদেব এবং অন্যান্য স্থবির-স্থবিরাগণ যে সকল ধর্ম্মোপদেশ দিতেন, তৎসমুদয় তাঁহারা মুখস্থ করিয়া রাখিতেন।

বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের পর তাঁহার বাণীনিচয় সংগৃহীত করিবার মানসে রাজগৃহে প্রথম বৌদ্ধসঙ্গীতি আহ্বান করা হইয়াছিল। স্থবির মহাকাশ্যপ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সভায় ৫০০ শত সংখ্যক খ্যাতনামা স্থবির যোগদান করিয়াছিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ ধর্ম্মবিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পারদর্শী, এবং উপালি বিনয় শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। মহাকাশ্যপ আনন্দকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে এবং উপালিকে বিনয় সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, এবং তাঁহারা যে সকল প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন, তৎসমুদয় অপরাপর স্থবিরগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে পর, সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছিল। এইরূপে ধর্ম্মবিনয় বা প্রথম বৌদ্ধশাস্ত্র প্রণীত হয়। দীপবংসের বর্ণনা-মতে, স্থবিরগণ সূত্রানুসারে আগম পিটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। একমাত্র স্থবিরগণের দ্বারা বৌদ্ধশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছিল বলিয়া, উহা স্থবিরবাদ নামে প্রসিদ্ধ হয়। স্থবিরবাদের অপর নাম অগ্রবাদ। সাত মাসে প্রথম সঙ্গীতির কার্য্য সম্পন্ন হয়। বৌদ্ধস্থবিরগণ যে কেবল বাণীনিচয় সংগৃহীত করিয়াছিলেন, এমন নয়; তাঁহারা তৎসমুদয়কে বর্গ, নিপাত, সংযুক্ত প্রভৃতি অনুসারে সুবিভক্তও করিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের এক শত বৎসর পরে রাজা কালাশোকের সময়ে বৈশালীর বজ্জিপুত্তক ভিক্ষুগণ দশবিধ বিনয়-বিগর্হিত আচার প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহাদিগকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে রেবত স্থবিরের সভাপতিত্বে দ্বিতীয় বৌদ্ধসঙ্গীতি আহ্বান করা হয়। ঐ সঙ্গীতিতে পাপভিক্ষুগণের বিচার করিয়া, যাঁহারা বিচার মানিয়া চলিতে অস্বীকার করেন, তাঁহাদিগকে সংঘ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়, এবং প্রথম সঙ্গীতির অনুকরণে স্থবিরগণ বৌদ্ধশাস্ত্র আবৃত্তি করেন। এ দিকে পাপভিক্ষুগণ কৌশলবলে অনেক লোকের সহায়তা লাভ করিয়া মহাসঙ্গীতি নামে অপর একটি সভা আহ্বান করেন। সুতরাং দেখা যায়, দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভেই বৌদ্ধভিক্ষুগণ প্রথম দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হন, এবং ঐ শতাব্দীর মধ্যেই স্থবিরবাদ ও মহাসঙ্গীতি ভিন্ন হইয়া সর্ব্বশুদ্ধ অষ্টাদশ বৌদ্ধসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। কথিত আছে, ঐ সকল সম্প্রদায় পূর্ব্ব সংগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন সংগ্রহ প্রস্তুত করেন। তাঁহারা

এই স্থানের সূত্র ঐ স্থানে, এবং ঐ স্থানের সূত্র এই স্থানে বিন্যস্ত করিয়া নানা প্রকার গোলমাল করেন। তাঁহারা ভাষা ও ভাবেরও অনেক পরিবর্ত্তন করেন। পরবর্ত্তী কালে আরও অনেক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। তাঁহারাও পূর্ব্বোক্তভাবে নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন করেন। এইরূপে বৌদ্ধেরা নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া নানা শাস্ত্র প্রণয়ন করেন।

রাজা অশোকের সময়—মৌদ্গলীপুত্র তিষ্যের সভাপতিত্বে অপর একটি বৌদ্ধসঙ্গীতি আহ্বান করা হয়। যে সকল ভিক্ষু আদি বৌদ্ধমতের বিপরীত মত পোষণ করিতেন, তাঁহাদিগকে দমন করাই সঙ্গীতির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। যাঁহারা আদিমতাবলম্বী ছিলেন, তাঁহারা বিভাজ্যবাদী নামে অভিহিত হইতেন। বিভাজ্যবাদী ও অন্যান্য দার্শনিকমতাবলম্বী ভিক্ষুদের মধ্যে যে তর্ক-বিতর্ক হইয়াছিল, তৎসমুদয় লইয়া "কথাবথু পকরণ" নামক একখানি সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থ প্রণীত ও পিটকগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কথিত আছে,—রাজা কণিষ্কের সময় জালন্ধর নামক স্থানে বসুমিত্রের সভাপতিত্বে অপর একটি বৌদ্ধসভা আহ্বান করা হয়। ত্রিপিটকসম্পর্কীয় তিনটী বিভাষাশাস্ত্র প্রণয়ন করাই সভার প্রধান কার্য্য ছিল।

কিরূপে বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার আভাষ দেওয়া হইল। এক্ষণে আমরা বৌদ্ধশাস্ত্রের শ্রেণীবিভাগ ও বহুলপ্রচার সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

বৌদ্ধাচার্য্যগণ বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহকে নানা ভাবে বিভক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে ধর্ম্ম-বিনয়ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বিভাগ বলিতে হইবে। বুদ্ধদেব নিজেই তাঁহার উপদেশমূলক বাণীনিচয়কে ধর্ম্ম এবং আদেশমূলক বাণীনিচয়কে বিনয় নামে অভিহিত করিতেন। বৌদ্ধশাস্ত্রকে সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম্ম নামক পিটকত্রয়েও বিভক্ত করা হয়। তন্মধ্যে সূত্র ও অভিধর্ম্ম পিটক ধর্ম্মের, এবং বিনয় পিটক বিনয়-সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। কোনও কোনও স্থলে দীর্ঘ, মধ্যম, সংযুক্ত, অঙ্গোত্তর ও ক্ষুদ্র ভেদে পাঁচটী নিকায়েও বিভক্ত করা হইয়া থাকে। পঞ্চ নিকায়ের বিভাগানুসারে সমগ্র অভিধর্ম্ম পিটক ও বিনয়পিটক ক্ষুদ্র নিকায়ের অন্তর্ভুক্ত। পিটকগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত সর্ব্বশুদ্ধ ২৯টী পুস্তকের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে ক্ষুদ্র নিকায়ের অন্তর্গত ক্ষুদ্দকপাঠ, ধম্মপদ প্রভৃতি পনরখানি পুস্তক। কিন্তু তদ্বিষয়ে বৌদ্ধাচার্য্যগণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। দীঘভাণকামতে ক্ষুদ্রনিকায়ে বারখানি পুস্তক এবং মজ্ঝিম-ভাণকামতে ১৫খানি পুস্তক হইলেও, তন্মধ্যে খুদ্দকপাঠের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

বৌদ্ধাচার্য্যগণ আলোচ্য বিষয়ানুসারে পিটকগ্রন্থকে ৮৪০০০ ধর্ম্মস্কন্ধে এবং শ্রেণী অনুসারে সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইত্যুক্ত, জাতক, অদ্ভুতধর্ম্ম ও বেদল্য, এই নয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। নেপালী বৌদ্ধগ্রন্থে বার শ্রেণীর বৌদ্ধসাহিত্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পিটকগ্রন্থ ব্যতীত নেত্তিপকরণ,—মিলিন্দপঞ্‌হো, বিসুদ্ধিমাগ্‌গ, ললিতবিস্তর, মহাবস্তু, বুদ্ধচরিত প্রভৃতি কত অসংখ্য গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে,—তাহার আলোচনা করিবার স্থান ইহা নহে।

বৌদ্ধভিক্ষুগণ জ্ঞানচর্চ্চা বিষয়ে স্বার্থপর ছিলেন না। দ্বারে দ্বারে অমৃত বিতরণ করাই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। বুদ্ধদেব স্বয়ং তাঁহাদিগকে এই প্রেরণা দিয়াছিলেন। রাজা অশোকের সময় বৌদ্ধপ্রচারকগণ সিংহল, অপরান্ত, মহারাষ্ট্র, সুবর্ণভূমি, হিমবন্ত, যবন প্রভৃতি পৃথিবীর নানা স্থানে যাইয়া শিক্ষামৃত বিতরণ করিয়াছিলেন। সঙ্গে চীবর এবং হৃদয়ে বিশ্বমানবতা ভিন্ন অপর কিছু সম্বল ছিল না। তাঁহারা সেই দুইটী জিনিসকে সম্বল স্বরূপ করিয়া এবং সাগর ভূধর অতিক্রমপূর্ব্বক বেক্ট্রিয়া, ইজিপ্ট, তিব্বত, চীন, মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া, জাপান, সাইবীরিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যাইয়া, আর্য্য, অনার্য্য, রক্ষ, যক্ষ, নাগ ও গন্ধর্ব্ব নির্ব্বিশেষে সকলের হৃদয়ে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়াছিলেন।

রাজা অশোকের পূর্ব্বে লিখনপদ্ধতি ভারতবর্ষে প্রচলিত থাকিলেও, বলিতে হইবে, তিনিই সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্রিকার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। প্রেস ও কাগজ প্রভৃতির অভাবে তাঁহাকে শৈলগাত্রে রাজ্য ও ধর্ম্মসম্পর্কীয় অনুশাসনসমূহ ক্ষোদিত করিতে হইয়াছিল। দাতব্য চিকিৎসালয়-স্থাপন, বৃক্ষরোপণ, জলাশয়-খনন, স্তূপনির্ম্মাণ, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি বৌদ্ধযুগের মহীয়ান কীর্ত্তিকলাপের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপনই সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। মিলিন্দপঞ্‌হো পাঠে দেখা যায়, বৌদ্ধবিহারগুলি কালক্রমে পরিবেণ বা বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছিল। বর্ত্তমানেও বৌদ্ধবিহারগুলি শিক্ষামন্দির ভিন্ন আর কিছুই নহে। ব্রহ্মদেশে বিহারকে ক্যাঙ বা স্কুল নামে অভিহিত করা হয়। কলম্বো নগরে বিদ্যোদয়পরিবেণ জগৎ-প্রসিদ্ধ। সুতরাং আশ্চর্য্যের বিষয় ইহা নহে যে, বৌদ্ধবিহারগুলি উত্তরকালে আদর্শ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছিল।

জাতকগ্রন্থ-পাঠে দেখা যায়, পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষীয় যুবকগণ তক্ষশিলায় সকলপ্রকার শিল্পে পারদর্শিতা লাভ করিয়া গৃহে ফিরিতেন। তথায় শ্রুতি,

স্মৃতি, সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, সঙ্গীত, গণিত, ধনুর্ব্বিদ্যা, বেদ, পুরাণ, চিকিৎসা, ইতিহাস, জ্যোতিষ, মায়া, ছন্দ, হেতুমন্ত্র ও শাব্দ, এই অষ্টাদশ শিল্প শিক্ষা দেওয়া হইত। সুতরাং বলিতে হইলে, তক্ষশিলাই ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্র। বৌদ্ধসাহিত্যে বিম্বিসারের রাজবৈদ্য জীবকের ইতিহাসে তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী কিরূপ ছিল, তাহা অবগত হওয়া যায়। কথিত আছে, জীবক নানা শাস্ত্র শিখিবার উদ্দেশ্যে রাজগৃহ হইতে পদব্রজে তক্ষশিলায় গমন করিয়াছিলেন। তৎকালে ঐত্রেয় নামক জনৈক ঋষি চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। জীবক প্রথমতঃ ঐত্রেয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া চিকিৎসাশাস্ত্র শিখিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন।

ঐত্রেয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি আমাকে কি দক্ষিণা দিতে পার?" জীবক বলিয়াছিলেন, "মহাভাগ, আমি বহুদূর দেশান্তর হইতে এখানে আসিয়াছি। কিন্তু গৃহ ত্যাগ করিবার কালে আমি আমার পিতা মাতা ও বন্ধুবান্ধবের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করি নাই। অতএব, আমার নিজকে ভিন্ন আপনাকে অন্য দক্ষিণা দিবার শক্তি আমার নাই।" ঐত্রেয় ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া সাত বৎসরকাল জীবককে চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন। শেষ পরীক্ষার দিন জীবককে তক্ষশিলার চতুর্দ্দিকে পনর মাইল দূরবর্ত্তী স্থানসমূহে যে সকল উদ্ভিদ জন্মিয়াছিল, তৎসমুদয়ের দ্রব্যগুণ নির্দ্দেশ করিতে হইয়াছিল। চারি দিন দ্রব্যগুণ পরীক্ষা করিয়া জীবক তাঁহার অধ্যাপককে বলিয়াছিলেন যে, "এখানে এমন কোনও একটি উদ্ভিদ নাই—যাহার মধ্যে কিছু না কিছু দ্রব্যগুণ পাওয়া যায় না।"

পরবর্ত্তী কালে কোশল ও মগধ সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা-কেন্দ্রও তক্ষশিলা হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। তক্ষশিলা যখন শিক্ষাকেন্দ্র, বারাণসী রাজ্যই তখন সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ছিল।

সিদ্ধ নাগার্জ্জুনের সময়ে বিদর্ভ দেশে কৃষ্ণা নদীর তীরে শ্রীধন্যকটক নামে একটি বিশ্ব-বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। তথায় ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হইত। কথিত আছে,—তিব্বতের দাপুং বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীধন্যকটকের আদর্শেই নির্ম্মিত হইয়াছিল।

প্রাচীন ভারতের দ্বিতীয় এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ বৌদ্ধবিশ্ববিদ্যালয়ের নাম—নালন্দা। নালন্দা ধর্ম্মসেনাপতি সারিপুত্রের জন্মস্থান। চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ানের সময় পর্য্যন্ত নালন্দায় তেমন কোনও শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়

নাই। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ কিংবা ৭ম শতাব্দীতেই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। নালন্দার রত্নোদধি নামক পুস্তকালয়ের কথা কাহারও অবিদিত নাই। কথিত আছে,—এক নবতল গৃহে ঐ পুস্তকালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল। সমস্ত মগধ সাম্রাজ্যে নালন্দা বিহার ধর্ম্মগঞ্জ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। চীন পরিব্রাজক হুয়েনসাঙ এই স্থানে বৌদ্ধসংস্কৃতসাহিত্য শিক্ষা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, নানাদেশাগত প্রায় দশ সহস্র ছাত্র নালন্দায় অধ্যয়ন করিতেন। সাধারণের দানে ছাত্রগণের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত।

মগধে পালবংশের আধিপত্য স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে ওদন্তপুরী বিহার নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু পরে পালবংশীয় নরপতিগণের সহায়তায় উহা তৃতীয় বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। রাজা মহীপালের সময়ে এক সহস্র হীনজানীয় ভিক্ষু ও পাঁচ সহস্র মহাযানীয় ভিক্ষু তথায় বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। পালবংশ-রাজগণ ওদন্তপুরীতে যে পুস্তকালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন, কথিত আছে, তাহা ১২০২ খৃষ্টাব্দে মুসলমান আক্রমণকারী কর্ত্তৃক ভস্মীভূত হইয়াছিল। এই ওদন্তপুরী বিহারের অনুকরণে তিব্বতে তাহার রাজগণের অধীনে শাক্য বিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

এক্ষণে বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে, ভাগীরথীর উত্তর-কূলে বিক্রমশিলা পাহাড়ের উপর রাজা ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক দেববিহার প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বিহারের চারিধারে আরও ১০৭খানি বিহার নির্ম্মিত ছিল। উহারা চতুর্দ্দিকে একটি প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছিল। বিক্রমশিলায় ১০৮ জন অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সকলের মধ্যবর্ত্তী বিহারে প্রজ্ঞাপারমিতাশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হইত। রাজা ভয়পালের সময়ে ছয় দ্বারে ছয় জন পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং রাজর্ষি জেতরি অন্নসত্র বা ছাত্রাবাস নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তথায় ছাত্রগণ রাজসরকার হইতে আহার্য্য ও পরিচ্ছদ প্রাপ্ত হইতেন। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বিহার সংলগ্ন অপর একটি সত্র নির্ম্মিত হইয়াছিল। চারি শতাব্দীকাল বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য অতি সুন্দরভাবে চলিয়াছিল। এইবার এপর্য্যন্ত আলোচনা করিলাম। বারান্তরে সবিস্তর আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

শ্রীগুণালঙ্কার মহাস্থবির।

প্রাচীন শিল্প-পরিচয়।

অলঙ্কার।

রুচিবৈচিত্র্যের প্রভাবে, দেশভেদে ও কালভেদে, বিলাসোপকরণের পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। তাহার নিদর্শন শাস্ত্রে ও প্রাচীন মূর্ত্তিগাত্রে সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঙ্গালা দেশে যুবকের গাত্রে আজকাল ঘড়ী, চেন, চশমা ও অঙ্গুরীয় ভিন্ন অন্য অলঙ্কারের সমাবেশ প্রায় দেখা যায় না; কিন্তু মাড়োয়ারী-মহলে যুবক হইতে প্রৌঢ়ের দেহ পর্য্যন্ত হার-বলয়-কটিসূত্রে এখনও বিভূষিত হইতে দেখা যায়।

পূর্ব্বকালে কতকগুলি আভরণ স্ত্রী-শরীরে এবং পুরুষ-শরীরে সমভাবে ব্যবহৃত হইত, এবং কতকগুলি কেবল স্ত্রী-শরীরেই শোভা পাইত। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, দেহের আভরণ সাধারণতঃ (১) আবেধ্য, (২) বন্ধনীয়, (৩) ক্ষেপ্য, এবং (৪) আরোপ্য, এই চারি প্রকার। তন্মধ্যে কুণ্ডল প্রভৃতি কর্ণাভরণ "আবেধ্য"; কটিসূত্র, অঙ্গদ প্রভৃতি "বন্ধনীয়"; নূপুর এবং বস্ত্রাভরণ "ক্ষেপ্য"; স্বর্ণসূত্র ও বিবিধ হার "আরোপ্য" নামে অভিহিত। (১)

চূড়ামণি ও মুকুট মস্তকের আভরণ; কুণ্ডল কর্ণের আভরণ; মুক্তাবলী (মুক্তাহার) হর্ষক এবং সূত্র কণ্ঠের আভরণ; বটিকা এবং অঙ্গুলিমুদ্রা অঙ্গুলীর আভরণ, কেয়ূর ও অঙ্গদ কূর্পরের (কনুইএর) উপরিভাগের আভরণ; ত্রিসর এবং হার গ্রীবার ও স্তনমণ্ডলের আভরণ; লম্বমান মুক্তাহার ও

(১) চতুর্ব্বিধন্তু বিজ্ঞেয়ং দেহস্যাভরণং বুধৈঃ।
আবেধ্যং বন্ধনীয়ঞ্চ ক্ষেপ্যমারোপ্যকং তথা ॥
আবেধ্যং কুণ্ডলাদীহ যৎ স্যাচ্ছ্রবণভূষণম্।
শ্রোণীসূত্রাঙ্গদৈর্ম্মুক্তা বন্ধনীয়া বিনির্দ্দিশেৎ ॥
প্রক্ষেপ্যং নূপুরং বিদ্যাদ্বস্ত্রাভরণমেব চ ॥
আরোপ্যং হেমসূত্রাণি হারাশ্চ বিবিধাশ্রয়াঃ ॥২১।১১।১২।১৩

মালা প্রভৃতি দেহের আভরণ; তরল ও সূত্রক কটির আভরণ। এই সকল আভরণ পুরুষ-শরীরেও ধৃত হইত। (২)

অতঃপর দেবতার এবং পার্থিব-রমণীদিগের আভরণ কথিত হইয়াছে। শিখাপাশ, শিখাজাল, খণ্ডপত্র, চূড়ামণি, মকরিকা, মুক্তাজাল, গবাক্ষি, কুণ্ডল, খড়্গাপত্র, বেণীগুচ্ছ, দারক, ললাট-তিলক, ভ্রূর এবং কক্ষের উপরিভাগে ধারণীয় গুচ্ছ; নানাপ্রকার ফুলের অনুকরণ, অর্থাৎ স্বর্ণাদির দ্বারা নির্ম্মিত বিবিধ ফুল। কর্ণের আভরণ কর্ণিকা, কর্ণ-বলয়, পত্রকর্ণিকা, আপেশ্রুক, কর্ণমুদ্রা, কর্ণোৎপল, নানাবিধ রত্নখচিত দন্তপত্র ও কর্ণপূর এবং গণ্ডস্থলের ভূষণ তিলক ও পত্রলেখা। (৩)

মেঘদূতের টীকায় মল্লিনাথ "রসাকর" নামক গ্রন্থ হইতে যে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে রমণীদিগের সাধারণতঃ চারিপ্রকার ভূষণের

(২) চূড়ামণিঃ সমুকুটঃ শিরসো ভূষণং স্মৃতম্।
কুণ্ডলং কর্ণমেবৈকং কলাকরণমিষ্যতে ॥২১।১৫
মুক্তাবলী হর্ষকঞ্চ সসূত্রং কণ্ঠভূষণম্।
বটিকাঙ্গুলিমুদ্রা চ স্যাদঙ্গুলিবিভূষণম্ ॥
কেয়ূরাবঙ্গদে চৈব কূর্পরোপরি ভূষণম্।
ত্রিসরশ্চৈব হারশ্চ গ্রীবাবক্ষোজভূষণম্ ॥
ব্যালম্বিমুক্তিকাহারা মালাদ্যা দেহভূষণম্।
তরলং সূত্রকঞ্চৈব ভবেৎ কটিবিভূষণম্ ॥
অয়ং পুরুষনিযোগঃ কার্য্যস্ত্বাভরণাশ্রয়ঃ ॥১৬—১৯

(৩) দেবানাং পার্থিবাণাঞ্চ পুনর্বক্ষ্যামি যোষিতাম্।
শিখাপাশং শিখাজালং খণ্ডপত্রং তথৈব চ ॥
চূড়ামণিং মকরিকাং মুক্তাজালং গবাক্ষি (কং)।
কুণ্ডলং খড়্গাপত্রঞ্চ বেণীগুচ্ছঃ সদারকঃ ॥
ললাটতিলকশ্চৈব নানাশিল্পপ্রযোজিতঃ।
ভ্রূকক্ষোপরি গুচ্ছশ্চ কুসুমানুকৃতিস্তথা ॥
কর্ণিকা কর্ণবলয়ং তথা স্যাৎ পত্রকর্ণিকা।
আপেশ্রুকঃ কর্ণমুদ্রা কর্ণোৎপলকমেব চ ॥
নানারত্নবিচিত্রাণি দন্তপত্রাণি চৈব হি।
কর্ণয়োর্ভূষণং কার্য্যং কর্ণপূরস্তথৈব চ ॥
তিলকাঃ পত্রলেখাশ্চ ভবেদ্‌গণ্ডবিভূষণম্ ।২১অ।১৯—২৪

পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা (১) "কচধার্য্য", (২) "দেহধার্য্য", (৩) "পরিধেয়", এবং (৪) "বিলেপন" নামে অভিহিত হইয়াছে; এবং অন্যান্য আভরণ "দৈশিক" (দেশবিশেষে প্রসিদ্ধ) বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। (৪) এই স্থানে কেশে ধারণীয় পুষ্প প্রভৃতি, শরীরে লেপনীয় চন্দন কুঙ্কুম অলক্ত কস্তূরী প্রভৃতি ও পরিধেয়-বস্ত্র, এই ত্রিবিধ বস্তুর অতিরিক্ত যাবতীয় অলঙ্কারই "দেহধার্য্য" বলিয়া কথিত হইয়াছে।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে যে সকল অলঙ্কারের নাম নির্দ্দিশ হইয়াছে, কোষগ্রন্থে তাহাদের কতকগুলির শ্রেণীবিভাগের ও উপাদানভেদে নামবিশেষের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু কর্ণাভরণ প্রভৃতির যত প্রকার ভেদের উল্লেখ আছে, বর্ত্তমান সময়ে তাহাদের আকৃতি-নির্ণয়ের উপায় নাই। যদিও বিভিন্ন কালের প্রস্তরমূর্ত্তিগাত্রে দেদীপ্যমান আভরণসমূহ অতীতযুগের শিল্প-নৈপুণ্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, তথাপি তাহা হইতে অলঙ্কারের আকৃতির পরিচয় পাওয়া গেলেও, নামের পরিচয় পাওয়া যায় না। ব্যাকরণের সাহায্যে যত দূর অর্থ বাহির করা যায়, তাহার উপর নির্ভর করিয়া, আত্মপ্রসাদলাভ করা যায় না। তথাপি উপায়ান্তরের অভাবে তাহাই একমাত্র অবলম্বনীয়।

রামায়ণে হার, হেমসূত্র, রশনা, অঙ্গদ, কেয়ূর, কুণ্ডল ও বলয়, এই কয়টি প্রধান অলঙ্কারের উল্লেখ উপলক্ষে, অঙ্গদের "বিচিত্র" বিশেষণ ও কেয়ূরের "শুভ" বিশেষণ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং অঙ্গদ ও কুণ্ডল যে স্বর্ণে নির্ম্মিত হইত, তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়। (৫)

মস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া চরণ পর্য্যন্ত যে সকল আভরণ ধারণ করা যায়, তাঁহাদের তথ্য নির্ণয় করিতে হইলে, প্রথমতঃ উত্তমাঙ্গ-ধার্য্য আভরণের উল্লেখই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কোষকার অমর সিংহও মুকুট হইতেই

(৪) কচধার্য্যং দেহধার্য্যং পরিধেয়ং বিলেপনম্।
চতুর্ধা ভূষণং প্রাহুঃ স্ত্রীণামন্যচ্চ দেশিকম্॥—উত্তরমেঘ—১৩-টীকা।

(৫) হারঞ্চ হেমসূত্রঞ্চ ভার্য্যায়ৈ সৌম্য হারয়।
রশনাং চাথ সা সীতা দাতুমিচ্ছতি তে সখী॥
* অঙ্গদানি বিচিত্রাণি কেয়ূরাণি শুভানি চ।
জাতরূপময়ৈর্মুখ্যৈরঙ্গদৈঃ কুণ্ডলৈঃ শুভৈঃ॥
সহেমসূত্রৈর্ম্মণিভিঃ কেয়ূরৈর্বলয়ৈরপি॥—অযোধ্যাকাণ্ড; ৩২স, ৭।৮।৫২

* তিলক-টীকাকার বলেন,—"হেমসূত্র" বক্ষঃস্থলের আভরণ।

অলঙ্কারের নামকথনে প্রয়াসী হইয়াছেন। (৬) তাঁহার গ্রন্থে সীমন্তে ধার্য্য আভরণ "বালপাশ্যা" এবং "পরিতথ্যা" নামে অভিহিত হইয়াছে (৭)। বালপাশে অর্থাৎ সীমন্তাকারে নিবদ্ধ কেশ-সমূহে "সাধু", এই অর্থে যৎ প্রত্যয়ের দ্বারা (৪।৪।৯৮) "বালপাশ্যা" এই রূপ সিদ্ধ হইয়াছে। এই অলঙ্কার বর্ত্তমান সময়েও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং বাঙ্গালা দেশে স্বর্ণের দ্বারাই সচরাচর ইহা নির্ম্মিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু হিন্দুস্থানী নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের মস্তকে রূপ্য-নির্ম্মিত এই আভরণ দেখা যায়। টীকাকার ভানুজী দীক্ষিত স্বর্ণাতিরিক্ত উপাদানেরও উল্লেখ করিয়াছেন। (৮) প্রাচীন প্রস্তরমূর্ত্তির মস্তকে এই শ্রেণীর আভরণের প্রভূত ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং তাহাতে শিল্প-নৈপুণ্যের বিশেষ নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু তাহা দেখিয়া, উপাদান নির্ণয় করিবার কোনও উপায় নাই। ললাটের আভরণ "পত্রপাশ্যা" এবং "ললাটিকা" নামে পরিচিত। (৯) কর্ণের এবং ললাটের আভরণ বুঝাইলে, কর্ণ এবং ললাট, এই উভয় শব্দের উত্তর "কণ্" প্রত্যয় হয়। (১০)

পাণিনির এই সূত্রের অর্থানুসারে, ইহার আকারের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু "পত্রপাশ্যা" শব্দের অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে হয়, ইহা যেন বৃক্ষের পত্রসমূহের আকারে নির্ম্মিত হইত; অর্থাৎ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রসমূহের বৃন্তকে কেন্দ্র করিয়া, তাহাদের অগ্রভাগ নানা দিকে বিন্যস্ত করিলে, একটি সুন্দর আকৃতি সংঘটিত হয়। পত্রের পাশ (সমূহ) তাহার তুল্য, এই অর্থে তদ্ধিত হইলে, "পত্রপাশ্যা" শব্দের পূর্ব্বোক্ত অর্থ হইতে পারে।

কর্ণাভরণ।

অমরের মতে, কর্ণের আভরণ সাধারণতঃ কুণ্ডল ও কর্ণিকা, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে "কর্ণিকা"র অপর নাম "তাল-পত্র"; ইহা কর্ণের উপরিভাগে ধার্য্য আভরণের নাম বলিয়া বোধ হয়। কারণ, কুণ্ডলের ব্যবহার কর্ণের নিম্নভাগেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আচার্য্য হেমচন্দ্র

(৬) অথ মুকুটং কিরীটং পুংনপুংসকম্।—মনুষ্যবর্গ; ১০১।

(৭) মনুষ্যবর্গ; ১০৩।

(৮) সীমন্তস্থিতায়াঃ স্বর্ণাদিনির্ম্মিতায়াঃ পট্টিকায়াঃ।

(৯) মনুষ্যবর্গ; ১০৩।

(১০) কর্ণললাটাৎ কর্ণালঙ্কারে (৪।৩।৬৫)

যেন "তালপত্র" ও "আটঙ্ক"কে কুণ্ডল স্থানের আভরণ বলিয়াছেন, এবং কর্ণের পৃষ্ঠভাগে ধারণীয় অলঙ্কারকে "উৎক্ষিপ্তিকা", "কর্ণান্দু" ও "বালীকা"- এই তিন নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (১১)

প্রাচীন সময়ে এক এক কর্ণে এক এক রূপ অলঙ্কার-ধারণেরও নিদর্শন দেখা যায়। কাদম্বরীতে বর্ণিত চাণ্ডাল-কন্যকার এক কর্ণে দন্তনির্ম্মিত পত্র-ধারণের উল্লেখ আছে। (১২)

এই রীতি অনুসারে এক কর্ণে "তাটঙ্ক" ও অপর কর্ণে "কুণ্ডল", অথবা রুচিভেদে এক স্থানে বিবিধ-শ্রেণীর আভরণের সমাবেশ হইতে পারে। বাসবদত্তাতে তাটঙ্কাভরণের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়; ইহা যে রজত ও রত্ন প্রভৃতি উপাদানের দ্বারা নির্ম্মিত হইত, তাহা কথিত হইয়াছে। অস্ত-গমনোন্মুখ শশাঙ্কদেব পশ্চিম-পর্ব্বতরূপ উপাধানে সুখনিহিত মস্তক পশ্চিম-দিগ্‌বধূর রাজত-তাটঙ্ক রূপে উৎপ্রেক্ষিত হইয়াছেন। (১৩) রাজা শৃঙ্গার-শেখরের বাহুদণ্ড সুপ্ত-সীমন্তিনীর রত্ন-তাটঙ্করূপ মুদ্রার দ্বারা অঙ্কিত বলিয়া কথিত হইয়াছে। (১৪) অতি প্রাচীনকাল হইতেই কুণ্ডলজাতীয় আভরণের সহিত কর্ণের সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সুশ্রুত-সংহিতায় কথিত হইয়াছে যে, শরীররক্ষক ঔষধ-ধারণ এবং অলঙ্কার-ধারণ, এই উভয় উদ্দেশ্যেই বালকের কর্ণবেধ করিতে হয়। (১৫)

কবিপ্রবর বাণভট্ট দধীচের কর্ণে "ত্রিকণ্টক" নামক এক প্রকার আভরণ সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন। কদম্ব-কোরক-সদৃশ স্থূল মুক্তাফলদ্বয় এবং তদুভয়ের মধ্যস্থিত মরকতমণি, বর্ণিত "ত্রিকণ্টকে"র উপাদানরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। (১৬) ইহার প্রেঙ্খৎ বিশেষণ দেখিয়া বোধ হয়, মধ্যযুগের আবিষ্কৃত এই আভরণটি কুণ্ডলের স্থান অধিকার করিয়াছিল।

(১১) তাটঙ্কস্তু তাড়পত্রং কুণ্ডলং কর্ণবেষ্টনম্।
উৎক্ষিপ্তিকা তু কর্ণান্দুর্বালীকা কর্ণপৃষ্ঠগা।

(১২) এককর্ণা মুক্তদন্তপত্রপ্রভাধবলিতকপোলমণ্ডলাম্।

(১৩) পশ্চিমাচলোপধানসুখবিলীনশিরসো রাজততাটঙ্ক ইব।—৪৪ পৃ।

(১৪) যত্র চ সুরতভরখিন্নসুপ্তসীমন্তিনীরত্নতাটঙ্কমুদ্রাঙ্কিতবাহুদণ্ডঃ।—১২১ পৃ।

(১৫) রক্ষাভূষণনিমিত্তং বালস্য কর্ণৌ বিধ্যেতে।—সূত্রস্থান। ১৬ অধ্যায়।

(১৬) কদম্বমুকুলস্থূলমুক্তাফলযুগলমধ্যাধ্যাসিতমরকতস্য ত্রিকণ্টককর্ণাভরণস্য: প্রেঙ্খতঃ প্রভয়া………।—হর্ষচরিত। বোম্বাই, নির্ণয়সাগর প্রেসে মুদ্রিত। ২২ পৃ।

শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণাভিসরণপ্রবৃত্ত গোপীবৃন্দের "জবলোলকুণ্ডলা"—বিশেষণ (১৭) দেখিয়া বোধ হয়, আধুনিক মাকড়ি, দুল্ প্রভৃতি যেমন কর্ণে ঝুলিয়া থাকে, পূর্ব্বকালে কুণ্ডলের ব্যবহারও এই রীতিতেই সম্পন্ন হইত। পুরাতন দেবমূর্ত্তির কর্ণে যে সকল কুণ্ডল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের আকার গোল; এবং উপরে নানারূপ কারুকার্য্যসমাবেশ লক্ষিত হয়। কুণ্ডলে বিভিন্নজাতীয় মণি সন্নিবেশের উল্লেখ দেখা যায়। শিশুপালবধে কৃষ্ণের কুণ্ডলে নিহিত গারুত্মত-মণির উল্লেখ আছে। সেই হরির বক্ষঃস্থল স্বর্ণময় কুণ্ডলাগ্র-নিহিত মরকত-মণির দীপ্তির দ্বারা বাল্যকালে অভ্যস্ত ময়ূরপিচ্ছমালার সম্পর্কই যেন পাইয়াছিল। (১৮)

রামায়ণে লঙ্কাপুরবাসী মহিলাবৃন্দের কর্ণান্তে পরিহিত হিরণ্ময় কুণ্ডলে হীরকের ও বৈদূর্য্যমণির সন্নিবেশ বর্ণিত হইয়াছে। (১৯)

শিশুপালবধের স্থানান্তরে বিবিধ শ্রেণীর প্রস্তরনির্ম্মিত কুণ্ডলের পরিচয় পাওয়া যায়। ধনুর্ব্বলয়ধারী মেঘের বিচিত্রবর্ণ নানাপ্রকার মণিনির্ম্মিত কুণ্ডল-দ্যুতিপুঞ্জের সহিত মিলিত কৃষ্ণের দেহকান্তির অনুকরণ করিয়াছিল। (২০)

পত্রলেখার মণিময় কুণ্ডলে মরকতমণিনির্ম্মিত "মকরপত্রভঙ্গে"র সন্নিবেশ দেখা যায়। (২১) আমাদের নিত্যপূজ্য নারায়ণ ঠাকুরের কণককুণ্ডলধারী দেহ ধ্যেয়-রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। (২২) জগন্মাতা জগদ্ধাত্রীও শোভমান রত্ন-কুণ্ডল ধারণ করিয়া সাধকের চিত্তপটে দর্শন প্রদান করেন। (২৩) দময়ন্তীর স্বয়ংবর-সভায় সমাগত নৃপতিবৃন্দের কর্ণযুগল পরিষ্কৃত মণিকুণ্ডলে শোভিত হইয়াছিল। (২৪)

(১৭) আজগ্মু রন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলা।—দশম স্কন্ধ; ২৯।৪

(১৮) তস্যোল্লসৎকাঞ্চনকুণ্ডলাগ্র প্রত্যুপ্তগারুত্মতরত্নভাসা।
অবাপ বাল্যোচিতনীলকণ্ঠপিচ্ছাবচূড়াকলনামিবোরঃ।—২য়; ৩৩

(১৯) বজ্রবৈদূর্য্যগর্ভাণি শ্রবণান্তেষু যোষিতাম্।
দদর্শ তাপনীয়ানি কুণ্ডলান্যঙ্গদানি চ।—সুন্দরকাণ্ড। ২য়। ৬

(২০) অনুযযৌ বিবিধোপলকুণ্ডল-দ্যুতিবিতানকসংবলিতাংশুকম্।
ধৃতধনুর্বলয়স্য পয়োমুচঃ শবলিমা বলিমানমুষো বপুঃ॥ ৬ সর্গ। ২৭

(২১) মণিময়কুণ্ডলমরকতমকরপত্রভঙ্গকোটিকিরণাতপাহতকপোলতয়া।—কাদম্বরী।

(২২) কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী।

(২৩) দুর্গা দুর্গতিহারিণী ভবতু মে রত্নোল্লসৎকুণ্ডলা।

(২৪) সুরভিস্রগ্ধরাঃ সর্ব্বে প্রমৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ।—মহাভারত; বনপর্ব্ব। ৫৭

আজন্মবনবাসী সরলচেতা ঋষ্যশৃঙ্গ পিতার নিকট নবাগত মুনিকুমারের (বেশ্যার) কর্ণদ্বয়ে ধৃত অলঙ্কারকে চক্রবাকের ন্যায় বিচিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অধিকন্তু, এই আভরণ সুরূপযুক্ত, এবং ইহার দ্বারা কর্ণদ্বয় সমাবৃত, এইরূপও কীর্ত্তন করিয়াছেন। (২৫) ঋষ্যশৃঙ্গবর্ণিত এই আভরণ কর্ণপৃষ্ঠগ "উৎক্ষিপ্তিকা"দির অন্তর্গত বলিয়া বোধ হয়।

কণ্ঠাভরণ।

কণ্ঠলগ্ন আভরণ (কণ্ঠী, তাবিজ প্রভৃতি) "গ্রৈবেয়ক" নামে অভিহিত। (২৬) বর্ত্তমানকালের চিক, গোপহার প্রভৃতিও "গ্রৈবেয়কে"র অন্তর্গত।

কিঞ্চিল্লম্বমান কণ্ঠাভরণ "ললন্তিকা" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। (২৭) উক্ত "ললন্তিকা" স্বর্ণের দ্বারা নির্ম্মিত হইলে, "প্রালম্বিকা" নামে অভিহিত হইত; এবং মুক্তার দ্বারা নির্ম্মিত হইলে, তাহাই "উরঃসূত্রিকা" নামে খ্যাতি লাভ করিত। (২৮) কণ্ঠের কিঞ্চিন্নিম্নভাগে ধৃত হাঁসুলী নামক এক শ্রেণীর আভরণ দেখা যায়। বর্ত্তমান সময়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য ইহার উপাদানরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। ইহার নামটি দেশ্য এবং সংস্কৃত-গন্ধরহিত বলিয়া বোধ হয়। এই আভরণ "ললন্তিকা" শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে। কত দিন হইতে ইহার উদ্‌ভাবন হইয়াছে, তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না; কারণ, সাহিত্যে ইহার প্রায় উল্লেখ দেখা যায় না। কিন্তু প্রাচীন প্রস্তরমূর্ত্তির গাত্রে ইহার প্রভূত ব্যবহার দেখিয়া বোধ হয়, মধ্যযুগে ভদ্রমহলে ইহার বিশেষ সমাদর হইয়াছিল; নতুবা আরাধ্যদেবতার অঙ্গে ইহা স্থান পাইতে পারিত না। প্রস্তরমূর্ত্তিস্থ সে কালের এই শ্রেণীর আভরণে কারুকার্য্যের অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়; চিত্রের সাহায্য ব্যতীত সেই সমস্ত বৈচিত্র্য-পূর্ণ আভরণ পাঠকের দৃষ্টিপথে উপন্যস্ত করিবার উপায় নাই।

কি উপাদানে এই আভরণ নির্ম্মিত হইত, পাথরের পুতুল দেখিয়া তাহাও নির্ণীত হইতে পারে না।

বর্ত্তমান সময়ে গলদেশেই মালা ধারণ করিবার প্রথা দেখা যায়, এবং এই মালা কাষ্ঠ, পুষ্প, স্বর্ণ, প্রবাল প্রভৃতি বিবিধ উপাদানে নির্ম্মিত হইয়া থাকে;

(২৫) কর্ণৌ চ চিত্রৈরিব চক্রবাকৈঃ সমাবৃতৌ তস্য সুরূপবদ্ভিঃ।—মহাভা ; বনপ ; ১১২অ।৯

(২৬) ১০৪ কারিকা ; মনুষ্যবর্গ।

(২৭) ১০৪ ঐ

(২৮) ১০৪ ঐ

কিন্তু অমরসিংহ "মালা" ও তৎসমানার্থক "মাল্য" ও "স্রক্", এই কয়টি শব্দকে মস্তকে ধার্য্য আভরণের বাচক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (২৯) ইহার উপাদান সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু মেদিনীকোষে পুষ্পই মাল্যের উপাদানরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। (৩০) হেমচন্দ্র 'আদি' শব্দের দ্বারা পুষ্পাতিরিক্ত পদার্থেরও আভাস প্রদান করিয়াছেন। (৩১) বৈদিক গ্রন্থে সুবর্ণনির্ম্মিত স্রকেরও উল্লেখ দেখা যায়। তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণে যজ্ঞে ব্যাপৃত ঋত্বিগ্‌বর্গের প্রতি দেয় দ্রব্যসমূহের নির্দ্দেশপ্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে যে, উদ্‌গাতাকে "সুবর্ণনির্ম্মিত স্রক্" দান করিবে। সূর্য্য যেমন সমস্ত জগতের প্রকাশ করিয়া থাকেন, উদ্‌গাতাও সেইরূপ সামবেদের অর্থ প্রকাশ করেন; অতএব, উদ্‌গাতা সৌর্য্য, সুবর্ণ-স্রগ্‌ধারণের পূর্ব্বে, "উষঃকাল" (প্রভাত) সম্পন্ন হয় না; স্রগ্‌ধারণের পর, সূর্য্য বিশেষরূপে "উষঃকাল" সম্পাদন করেন। (৩২)

এ স্থলে স্রকের ধারণস্থান কথিত হয় নাই; পক্ষান্তরে, হোতার প্রতিদেয় "রুক্ম" নামক কনকাকার সুবর্ণাভরণের বর্ণনায় বুঝা যায়,—এই আভরণ উপরিভাগে অর্থাৎ মস্তকে ধারণ করা হইত।—হোতা আগ্নেয়; অতএব প্রকাশস্বরূপ "রুক্ম" তাঁহার যোগ্য; অপিচ, এই হোতার জন্য উক্ত "রুক্ম"রূপ আদিত্যকে উন্নয়ন করে, অর্থাৎ, হোতার ঊর্দ্ধদেশে স্থাপন করে। (৩৩)

গোভিলের গৃহ্যসূত্রে হিরণ্য-স্রকের অতিরিক্ত গন্ধরহিত স্রক "স্নাতকব্রতী"র পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছে। (৩৪) এবং সমাবৃত্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক স্রগ্‌ধারণ বিহিত হইয়াছে। সমাবৃত্ত-ধার্য্য এই স্রক্ পুষ্পমাল্য, এবং মস্তকে ধারণীয়,—পূজ্যপাদ ভাষ্যকার এইরূপ স্থির করিয়াছেন (৩৫)। সুতরাং গোভিলের সময়ে শিরোধার্য্য পুষ্পমালা ও কণ্ঠধার্য্য স্বর্ণাদি-মালা, এই উভয়ে, সমভাবে স্রক্ শব্দের প্রয়োগ হইত।

---

(২৯) মাল্যং মালাস্রজৌ মূর্দ্ধ্নি।

(৩০) মাল্যং কুসুমতৎস্রজোঃ।

(৩১) মালা তু পুষ্পাদিদামনি।

(৩২) স্রগুদ্‌গাতুস্সৌর্য্যো উদ্‌গাতা ন বৈ তস্মৈ ব্যোচ্ছ দথোব্যেবাস্মৈ বাসয়তি।—১৮।৯।৮

(৩৩) রুক্মো হোতুরাগ্নেয়ো হোতা খো অমুমেবাস্মা আদিত্যমুন্নয়তি।—১৩।৯।৯

(৩৪) নাগন্ধাং স্রজং ধারয়েৎ।—৪।৫।১৫। অন্যাং হিরণ্যস্রজঃ।—৩।৫।১৬

(৩৫) স্নাত্বাঽলঙ্কৃত্যাহতে বাসসী পরিধায় স্রজমাবধ্নীত, "শ্রীরসি ময়ি রমস্বেতি"।—৩।৪।২৫
স্রজং পুষ্পমালাং শিরঃপ্রধানত্বাদঙ্গানাং শিরস্যাবধ্নীত।—ভাষ্য।

বিস্তাকর-ধৃত বচনে তুলসীকাষ্ঠ-নির্ম্মিত মালাধারণের উপদেশ পাওয়া যায়। (৩৬) বৈষ্ণবসমাজে নানাশ্রেণীর কাষ্ঠমালার ব্যবহার দেখিয়া বোধ হয়, গোভিলের সময়ে যাহা কেবল শোভাসম্পাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত, কালক্রমে তাহাই ধর্ম্মকর্ম্মের অঙ্গরূপেও পরিগণিত হইয়াছিল।

বৈদিক যুগে "নিষ্ক" নামক একপ্রকার আভরণের পরিচয় পাওয়া যায়; এই আভরণ বক্ষঃস্থলে ধারণ করা হইত। রাজা জানশ্রুতি ঋষিপ্রবর রৈক্ককে ছয় শত গরু, একটি নিষ্ক ও অশ্বতরীযুক্ত রথ দান করিয়াছিলেন। নিষ্কের আকার সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। অমরসিংহ নানার্থবর্গে নিষ্ককে "উরো-ভূষণ" রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (৩৭) মেদিনীও অমর-মতের অনুসরণ করিয়া ইহাকে "বক্ষোঽলঙ্কার" সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। এই উভয় কোষকার নিষ্ককে হার-নামে নির্দ্দেশ করেন নাই। কিন্তু ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত রৈক্কজান শ্রুতিবৃত্তান্তে অবজ্ঞাকারী রৈক্ক জানশ্রুতিপ্রদত্ত নিষ্ককে হার নামেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—হে শূদ্র! এই হারযুক্ত গন্ত্রী এবং গো সকল তোমারই থাক। (৩৮) বৈদিকযুগের হার মধ্যযুগে হারের শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত হইল কেন, তাহা বুঝা গেল না। বৈদিকযুগেই "সৃঙ্কা" নামক আর এক প্রকার হারজাতীয় আভরণের উল্লেখ দেখা যায়। ধর্ম্মরাজ যম নচিকেতার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাকে একটি সৃঙ্কা উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। (৩৯) এই সৃঙ্কাতে বহু রূপের সমাবেশ বর্ণিত হইয়াছে।

হার।

প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্য হারের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। সাহিত্যে যত প্রকার আভরণের পরিচয় পাওয়া যায়, তন্মধ্যে হারের মত শ্রেণীবিভাগ আর কুত্রাপি

(৩৬) ন ধারয়ন্তি যে মালাং তুলসীকাষ্ঠনির্ম্মিতাম্।
নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে দগ্ধাঃ ক্রোধাগ্নিনা হরেঃ।—একাদশীতত্ত্ব।

(৩৭) সাষ্টে শতে সুবর্ণানাং হেম্ন্যুরোভূষণে পলে।
দীনারেঽপি চ নিষ্কোঽস্ত্রী।

(৩৮) রৈক্কেমানি ষট্‌শতানি গবাময়মশ্বতরীরথো নু এতাং
ভগবো দেবতাং শাধি যাং দেবতামুপাস্স ইতি।
তমুহ পরঃ প্রত্যুবাচাহহারে ত্বা শূদ্র তবৈব সহ গোভিরস্তু।—৪র্থ অধ্যায়।

(৩৯) তমব্রবীৎ প্রীয়মাণো মহাত্মা বরং তবেহাদ্য দদামি ভূয়ঃ।
তবৈব নাম্না ভবিতায়মগ্নিঃ সৃঙ্কাঞ্চেমামনেকরূপাং গৃহাণ।—কঠবল্লী। ১।১৬।

প্রায় পরিলক্ষিত হয় না। এই হার সচরাচর মুক্তার দ্বারা নির্ম্মিত হইত; সেই জন্য হারের অপর নাম "মুক্তাবলী"। হারের লহরগুলির নাম যষ্টি-লতা, সর ও সরি। লহরের সংখ্যা অনুসারে হারের বিশেষ নাম দেখা যায়। শত-লহর হার দেবচ্ছন্দক নামে অভিহিত, দ্বাত্রিংশৎ লহর গুৎস, চতুর্ব্বিংশতি গুৎসার্দ্ধ, চতুস্ত্রিংশৎ লহর "গোস্তন", বিংশতি লহর "মাণবক", একলহর "একাবলী"। যদি একাবলী হারে সাতাশটি মুক্তা সন্নিবেশিত হয়, তবে তাহার নাম নক্ষত্রমালা। (৪০) যদিও অমরসিংহ অল্পেই হারপর্ব্ব সমাপ্ত করিয়াছেন, তথাপি প্রাচীন গ্রন্থের সাহায্যে ইহার প্রভূত বিবরণ জানিতে পারা যায়।

অর্ব্বাচীন সাহিত্যেও "দেবন্দক হার" শতেশ্বরী নামে অভিহিত হইয়াছে।

"গলে শতেশ্বরী হার শোভে নানা অলঙ্কার,
করে শঙ্খ শোভে তাড়বালা।" (৪১)

বৃহৎসংহিতায় "মুক্তারচিতাভরণ সংজ্ঞা" নামক একটি প্রকরণ আছে, তাহাতে হারের নানাবিধ শ্রেণীবিভাগ দেখা যায়। দেবতার ভূষণ "ইন্দুচ্ছন্দ" নামক হারে এক সহস্র আটটি লহর, এবং "বিজয়চ্ছন্দ" হারে তাহার অর্দ্ধেক অর্থাৎ পাঁচ শত চারিটি মুক্তালহরের সমাবেশ থাকিবে। ইন্দুচ্ছন্দের পরিমাণ চারি হস্ত, অর্থাৎ লহরগুলি চারি হাত প্রমাণ হইবে। বিজয়চ্ছন্দের পরিমাণ দ্বিহস্ত। এক শত আটটি মুক্তালহরের দ্বারা এবং একাশীতি মুক্তালহরের দ্বারা নির্ম্মিত দ্বিহস্তপরিমিত হার "দেবচ্ছন্দ" নামে অভিহিত। চতুঃষষ্টি মুক্তা লহরের দ্বারা নির্ম্মিত "অর্দ্ধহার", এবং চুয়ান্নটি মুক্তালহরের দ্বারা নির্ম্মিত হার "রশ্মিকলাপ" নামে পরিচিত। বত্রিশ-লহর মুক্তাহার "গুৎস", বিংশতি লহর "গুৎসার্দ্ধ", ষোড়শ-লহর মুক্তাহার "মাণবক", দ্বাদশ লহর "অর্দ্ধ-মাণবক" নামে পরিচিত। অর্দ্ধ-হার হইতে অর্দ্ধ-মাণবক পর্য্যন্ত প্রত্যেক হারেই লহর দ্বিহস্ত পরিমিত হইবে। (৪২)

(৪০) হারের বিবরণ সম্বন্ধে অমরকোষের মনুষ্যবর্গস্থ ১০৫।১০৬ সংখ্যক কারিকা ও তত্রত্য ভানুজী দীক্ষিতের টীকা দ্রষ্টব্য।

(৪১) কবিকঙ্কণ-চণ্ডী; খুল্লনার রূপ।

(৪২) সুরভূষণং লতানাং সহস্রমষ্টোত্তরং চতুর্হস্তম্।
ইন্দুচ্ছন্দো নাম্না বিজয়চ্ছন্দস্তদর্দ্ধেন। ৩১।

আট লহর হার "মন্দর", পাঁচ লহর হার "হারফলক", সপ্তবিংশতি মুক্তা-নির্ম্মিত হস্তপরিমিত হারের নাম "নক্ষত্রমালা"। হস্তপ্রমাণ হারমধ্য যদি মণি অথবা সুবর্ণগুলিকাখচিত হয়, তবে তাহার নাম "মণিসোপান"। এই মণিসোপানের মধ্যভাগে যদি "তরলক" অর্থাৎ সুবর্ণনিবদ্ধ মণি সন্নিবেশিত হয়, তবে তাহার নাম "চাটুকার"। নির্দ্দিষ্টসংখ্যারহিত মুক্তার দ্বারা নির্ম্মিত হস্তপ্রমাণ হার (যাহার মধ্যে মণি সন্নিবেশিত হয় নাই) তাহার নাম "একাবলী", এবং যাহার মধ্যে মণির সন্নিবেশ হয়, তাহার নাম "যষ্টি"। (৪৩)

বিক্রমোর্ব্বশী ত্রোটকে উর্ব্বশীর একাবলীতে "বৈজয়ন্তিকা" বিশেষণ দেখা যায়। (৪৪) ভাগবতেও শ্রীকৃষ্ণের "বৈজয়ন্তী" মালার উল্লেখ দেখা যায়। (৪৪) উর্ব্বশীর "একাবলী-বৈজয়ন্তী" এবং ভগবানের মালা "বৈজয়ন্তী," এই উভয় এক-জাতীয় কি না, তাহা ঠিক বুঝা যায় না।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

শতমষ্টযুতং হারো দেবচ্ছন্দোঽশীতিরেকযুতা।
অষ্টাষ্টকোঽর্দ্ধহারো রশ্মিকলাপশ্চ নবষট্কঃ। ৩২।
দ্বাত্রিংশতা তু গুচ্ছো * বিংশত্যা কীর্ত্তিতোঽর্দ্ধগুচ্ছাখ্যঃ।
ষোড়শভির্মাণবকো দ্বাদশভিশ্চার্দ্ধমাণবকঃ †।—৩৩।৮০অ।

* গুৎস ও গুচ্ছ, এই উভয় রূপই সঙ্গত। এ সম্বন্ধে অমরকোষের ১০৫ শ্লোকের ভানুজী দীক্ষিতের টীকা দ্রষ্টব্য।

† ভট্টোৎপলের বিবৃতি দ্রষ্টব্য।

(৪৩) মন্দরসংজ্ঞোঽষ্টাভিঃ পঞ্চলতা হারফলকমিত্যুক্তম্।
সপ্তবিংশতিমুক্তাহস্তো নক্ষত্রমালেতি॥
অন্তরমণিসংযুক্তা মণিসোপানং সুবর্ণগুলিকৈর্বা।
তরলকমণিমধ্যং তদ্বিজ্ঞেয়ং চাটুকারমিতি॥
একাবলী নাম যথেষ্টসংখ্যা হস্তপ্রমাণা মণিবিপ্রযুক্তা।
সংযোজিতা যা মণিনা তু মধ্যে যষ্টীতি সা ভূষণবিদ্ভিরুক্তা॥

—৮০ অধ্যায়। ৩৪—৩০

(৪৪) উর্ব্বশী। অম্মো! লদাবিড়বে এআবলী বৈজঅন্তিআ মে লগ্‌গা।—১ম অ।

(৪৫) উপগীয়মান উদ্‌গায়ন্ বনিতা শতযূথপঃ।
মালাং বিভ্রদ্বৈজয়ন্তীং ব্যচরন্মণ্ডয়ন্ বনম্।—১০ স্কন্ধ। ২৯ অ। ৪৪

সাহিত্যের আভিজাত্য।

২

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হরগৌরীর গান অপেক্ষা রাধাকৃষ্ণের গানে প্রেম অধিক দুর্নিবার হইয়াছে। আমরা হরগৌরীর কথায় এই প্রেম ও সংসার-ধর্ম্মের একটা সামঞ্জস্য-স্থাপন দেখিলাম। রাধাকৃষ্ণের গানেও একটা সামঞ্জস্য-স্থাপন হইয়াছে, তাহাও গৃহধর্ম্মের সহিত সামঞ্জস্য-স্থাপন। বৈষ্ণব কবিগণ নর-নারীর দুর্নিবার সমাজ-বিরোধী প্রেমের নিন্দা-লজ্জা-ভয়ে অবজ্ঞা ও পরিপূর্ণ আত্মবিস্মৃতিকে নূতন চক্ষে দেখিয়াছেন। তাঁহারা এই আত্মবিস্মৃতিকে ঈশ্বরের সহিত জীবের নিগূঢ় সম্বন্ধ বলিয়া বুঝিয়াছেন। সংসার-সমাজের সমস্ত বাধা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া আপনার জাতি-কুল-মান সব ভুলিয়া ভগবানের চরণে একাকী সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিলে জীবন সার্থক হয়, বৈষ্ণব-কবি ইহাই বলিয়াছেন।

> "পিরীতি রসেতে ঢালি তনু মন দিয়াছি তোমার পায়।
> তুমি মোর পতি, তুমি মোর গতি, মন নাহি আন ভায়॥
> সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত, ভাল মন্দ নাহি জানি।
> কহে চণ্ডীদাস, পাপ-পুণ্য মম তোমার চরণখানি।"

চণ্ডীদাসের "তুমি মোর পতি, তুমি মোর গতি"—ইহার সঙ্গে "ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ" মিলাইলে কোনও প্রভেদ দেখিতে পাইব না। যখন বিদ্যাপতি তাঁহার সুললিত কণ্ঠে গান ধরিয়াছেন, তখন ভগবৎ-প্রেমের বিহ্বলতা ও অতৃপ্তিই বর্ণিত হইয়াছে।—

> জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
> নয়ন না তিরপিত ভেল।
> সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলু
> শ্রুতিপথে পরশন গেল॥
> কত মধুযামিনী রভসে গোঁয়াইনু
> না বুঝিনু কৈছন কেল।
> লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু,
> তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥

কবি চণ্ডীদাস সমাজের হিসাবে অত্যন্ত কুকাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তিনি—গোপনে অস্পষ্ট ভাষায় নহে,—সহজ ও সরলভাবে গায়িলেন :—

শুন, রজকিনী রামি।
ও দুটি চরণ শীতল দেখিয়া,
শরণ লইলাম আমি॥
তুমি রজকিনী, আমার রমণী,
তুমি হও পিতৃ মাতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন, তোমার ভজন,
তুমি বেদমাতা গায়ত্রী॥

যখন তিনি বলিলেন,—

"কামগন্ধ নাহি তায়,"
"তুমি সে মন্ত্র, তুমি সে তন্ত্র,
তুমি উপাসনা রস॥"

তখন যে সমাজ ব্রাহ্মণ ও নিম্নবর্ণের অধিকারভেদস্থাপন করিয়া গর্ব্ব করিয়াছে, সে সমাজ তাহা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল না। চণ্ডীদাসের প্রেমের আধ্যাত্মিকতায় মুগ্ধ হইল, এবং শতাব্দী ধরিয়া তাঁহার মর্ম্মস্পর্শী গানগুলিকে প্রেমের সুগভীর মন্ত্র বলিয়া বরণ করিয়া লইল। যে প্রেম চণ্ডীদাসের পদাবলীতে সরল, মধুর ও গভীরভাবে ব্যক্ত হইয়াছিল, তাহাই পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর জাতীয় সাধনার ধন হইয়াছিল। আর এই জাতীয় সাধনার প্রতিমূর্ত্তি হইয়াছিলেন, প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনই চণ্ডীদাসের গীতি-কবিতার মত। চণ্ডীদাস যে প্রেমের কথা গায়িয়াছেন, চৈতন্যদেব নিজ জীবনে তাহা দেখাইয়াছেন :—

"গুরুজন আগে দাঁড়াইতে নারি
সদা ছল-ছল আঁখি।
পুলকে আকুল দিক্ নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি॥
দাঁড়াই যদি সখীগণ সঙ্গে।
পুলকে পুরয় তনু শ্যাম-পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে নানা করি পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥"

চৈতন্যদেবের সমসাময়িক বাঙ্গালা দেশে ইহা গানের পদ নহে,—জীবনের কথা ছিল। শুষ্ক বিজ্ঞানচর্চ্চা ও কঠোর জীবনযাত্রার দিনে বাঙ্গালী বুঝিতে

পারিতেছে না যে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রেমের কি অনন্ত সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী যেরূপ প্রেমের সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্ব বুঝিয়াছিল, অন্ত কোনও জাতি তাহা বুঝিতে পারে নাই। প্রেমের সৌন্দর্য্য সাদী, হাফেজ, ওমার খায়াম কিছু বুঝিয়াছিলেন। মহম্মদীয় সুফীগণও কিছু বুঝিয়াছিলেন। লয়লা-ময়জুনের গল্পে আমরা গভীর প্রেমের বিশ্ববিস্মৃতি, বিরহের অনন্ত বেদনা বিশ্বপ্রকৃতির গভীর সমবেদনা কিছু পাই। লয়লা-ময়জুনে গল্পের রূপকে আমরা ভগবৎ-প্রেমের সাম্যাবস্থার কিছু পরিচয় পাই। কিন্তু বৈষ্ণব-কবিগণের মধ্যে প্রেমের মাধুর্য্য ও মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা দেখা গিয়াছে।

যে সমাজ বন্ধনের দ্বারা, সমাজ-সংসারের অসংখ্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের দ্বারা ব্যক্তির চরিত্রবিকাশের পথ নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, সেই সমাজে বৈষ্ণব-সাহিত্য সর্ব্ববাধাহীন, সর্ব্ববন্ধনচ্ছেদী, সর্ব্বত্যাগী, কলঙ্ক-অঙ্কিত প্রেমের মহিমা গান করিল। কিন্তু তাহাতে সমাজের বন্ধন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয় নাই। যে শক্তির প্রভাবে ব্যক্তি সমাজের বন্ধন মানিতে চাহিল না, সেই শক্তিই তাহাকে পার্থিব প্রেমের সীমা উল্লঙ্ঘন করাইল, এক অনন্ত অফুরন্ত স্বর্গীয় প্রেমের নিকট তাহাকে পঁহুছাইয়া দিল। সে প্রেমে কামগন্ধ নাই; সে প্রেম "উপাসনারস"। রাধার সহিত কৃষ্ণের যে সম্বন্ধ, প্রত্যেক মানুষ জীবনব্যাপিনী কঠোর সাধনার দ্বারা প্রেমময় ভগবানের সহিত সেই সম্বন্ধ স্থাপন করিবার প্রয়াসী হইল। বৈষ্ণব-কবিগণ রাধার কৃষ্ণপ্রেম-বর্ণনায় রূপক দিয়া ভগবৎপ্রেমের বিহ্বলতা ও মাধুর্য্য গান করিয়াছিলেন। তাঁহারা সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা আনেন নাই; বরং সমাজকে এক অপূর্ব্ব অধ্যাত্মলোকে সৌন্দর্য্যক্ষেত্রে লইয়া গিয়াছিলেন, যেখানে চিরবসন্ত, অনন্ত-প্রেম, অনন্ত যৌবন, অনন্ত ভোগ, এবং—

"লাখ লাখ যুগ, হিয়ে হিয়ে রাখনু,
তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥

বৈষ্ণব-সাহিত্যে নর-নারীর প্রেমের দুর্নিবার শক্তি যেরূপ অঙ্কিত হইয়াছে, অন্য কোনও সাহিত্যে তাহা পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রেম এখানে বিপ্লবসাধন করে নাই। প্রেম এখানে ব্যক্তিত্বক অধ্যাত্ম-সৌন্দর্য্যের রসে মুগ্ধ করিল। প্রেমের এখানেও প্রচণ্ড শক্তি, তাহা কোনও বাধা-বিঘ্ন মানে না; কিন্তু এ শক্তির ভিতর বিপ্লবের বীজ নাই, একটা অনির্ব্বচনীয় শান্তি-সৌন্দর্য্য ও মঙ্গলের বীজ সুপ্ত আছে। বৈষ্ণব-সাহিত্য বাহ্যতঃ একটা ব্যক্তির উচ্ছৃঙ্খলতা বিপ্লবের পরিপোষক; কিন্তু ভিতরে ইহা অত্যন্ত কঠোর সংযম ও তপস্যাকে

বরণ করিয়াছে। বৈষ্ণব-সাহিত্য এই উপায়েই সমাজকে ভাঙ্গে নাই, একটা নূতন জীবন ও নূতন সমাজ গড়িয়াছে।

হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণবিষয়ক সাহিত্যে আমরা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের তৃতীয় স্তরের ভাবুকতা ও সমাজ-জীবনের সমন্বয় দেখিলাম। সাহিত্য-বিকাশের প্রথম স্তরের স্বাধীনতা অশান্ত ও অসংযত। দ্বিতীয় স্তরের আত্মবিশ্লেষণ ও তৃতীয় স্তরের বাস্তব ভাবের সমন্বয় হইয়াছে বলিয়াই হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণের গান ভারতবর্ষের প্রাণ এত গভীরভাবে স্পর্শ করিতে পারিয়াছে; সমগ্র ভারতবর্ষে এত শীঘ্র সর্ব্বপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। বসন্তপুষ্পাভরণা গৌরী ও কলঙ্কিনী রাধার গানে যে স্বাধীনতা আছে, তাহা অন্য প্রকার লোক-সাহিত্যের বস্তুতন্ত্রের মধ্যে চাপা পড়িয়াছে। তাই, যে সমাজ স্ত্রীপুরুষের স্বাধীন বরণ কখনও মানে নাই, তাহার নিকট উহা এত প্রিয় বোধ হইল। তাই, অন্য প্রকার লোক-সাহিত্য হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণবিষয়ক সাহিত্যের অনেক নিম্নবর্ত্তী। কিন্তু এই স্বাধীনতার গান শেষে সাহিত্য ও সমাজের সাধনার ফলে সমাজবিরোধী উচ্ছৃঙ্খলতার গানে পরিণত হইল না। সমাজের নিয়ম সংযম-প্রতিষ্ঠায় এই স্বাধীনতার গান পর্য্যবসিত হইল। স্বাধীনতা ও সংযমের, ভাবুকতা ও সমাজ-জীবনের একটা সমন্বয় সাধিত হইল। লোকসাহিত্যের এই দুইটী প্রধান ধারা এখনও সজীব রহিয়াছে, বাঙ্গালীর অন্তস্তলে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বহিয়া উহাকে শীতল ও পবিত্র করিতেছে।

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে ভাবুকতা ও বস্তুতন্ত্রের যে সমন্বয় ছিল, আজ-কালকার সাহিত্যে তাহা লক্ষিত হয় না। আমাদের সাহিত্যকে একটা অলীক ভাবুকতা আসিয়া আক্রমণ করিয়াছে। আমরা কল্পনার দ্বারা একটা ভাবরাজ্য গড়িতেছি; সাধনার দ্বারা বাস্তবজীবনের সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ-স্থাপন করিতে পারিতেছি না। আমাদের সাহিত্য ভাবরাজ্যের সহিত বাস্তব-জীবনের কোনও সমন্বয়সাধন করিতে পারে নাই বলিয়া তাহা সমাজকে গভীর-ভাবে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। এই কারণেই সাহিত্য সার্ব্বজনীন হইতেছে না। বস্তুতন্ত্রের অভাব দূর না হইলে আমাদের সাহিত্য সার্ব্বজনীন হইবে না। আমাদের সাহিত্য একটা ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রহিয়াছে। সাহিত্যে অধিকারভেদ আসিয়াছে; আভিজাত্য দোষ আসিয়াছে। জনসমাজের প্রাণ হইতে দূরে থাকিয়া আমরা শুধু বাক্যবিন্যাস ও রচনাকৌশলের উন্নতিবিধান করিতেছি।

এক জন নবীন সুকবি, নীলকণ্ঠ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের লোকসাহিত্য সম্বন্ধেও সাধারণভাবে বলা যায়,—

"নহ তুমি শিল্পি-কবি,—অনুশীলনের ফুল করনি সম্বল ;
অকৃত্রিম বনফুল গীতি তব, ভাব-মধু যাহে ঢল ঢল।
মাননি শাসন-রীতি, রীতি তব ছন্দঃ-শাস্ত্র অলঙ্কার ছাড়া,
আছে ভক্তি, আছে প্রাণ, লাবণ্য সে অনবদ্য, সর্ব্বভূষাহারা।
হিমাংশুর রাজ্ঞীগণ সম নাহি অঙ্গে ভূষণসম্ভার,
কাঙ্গাল সে ভিখারীর প্রিয়া সম আছে রূপ সতীতেজ তার।
তবুও সঙ্গীত তব কোলাহলে পল্লীপ্রান্তে যায়নাক ডুবে,
যদিও সে গীত শুধু গোপীযন্ত্রে বাঁশী আর গাবগুবাগুবে
পল্লীবাটে মাঠে ঘাটে ইক্ষুক্ষেত্রে জেলেদের তালডিঙ্গি 'পরে,
ওগো কণ্ঠ ! কণ্ঠ তব শুনা যায় এক গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে।
প্রেমিক সে সাড়া দেয় মাঠ হ'তে, তব গানে, প্রেমিকাব তার ;
সন্ধ্যামুখে কৃষিজীবী ও গীত-সলিলে ধোয় কষ্ট-ক্লান্তি-ভার।
সর্ব্বভীতিহরা গীতি গায়ি' পান্থ জানায় সে গ্রামের প্রবেশ,
ভিখারী-সম্বল গান দুরিল হৃদয় হ'তে চিন্তা-চেষ্টা-লেশ।
ওগো কণ্ঠ ! কণ্ঠ তুমি বঙ্গ-মার চিরমুক্ত সর্ব্ববাধাহারা—
সহজ সরল লঘু পরাণের ক্ষরে যাহে আনন্দের ধারা।
সমগ্র এ বঙ্গভূমে করিয়া রেখেছ তুমি চির-বৃন্দাবন—
'কানু বিনা গীত নাই'—কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরে নন্দের নন্দন।"

কিন্তু আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্য সম্বন্ধে কখনই বলা যায় না,—

"কণ্ঠ তুমি বঙ্গ-মার চিরমুক্ত সর্ব্ববাধাহারা—
সহজ সরল লঘু পরাণের ক্ষরে যাহে আনন্দের ধারা।"

আমাদের সাহিত্যে আর "অনবদ্য সর্ব্বভূষাহারা" লাবণ্য নাই।

আমরা সাহিত্যে Art for Art's sake তত্ত্বে মাতিয়া আছি। আর্টের চরম আদর্শ আমরা এখনও সাহিত্যে আনিতে পারি নাই। Tolstoyর বিখ্যাত আর্টবিষয়ক গ্রন্থে সেই আদর্শেরই ব্যাখ্যা আছে। সেই আদর্শ কি ? আর্ট যুগধর্ম্মের ইঙ্গিত করে। যুগধর্ম্ম যেরূপ প্রত্যেক লোকেরই পালনীয়, যুগধর্ম্ম যেরূপ এক জন ব্যক্তির নহে, কোনও যুগের প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে তাহা গ্রাহ্য,—সেইরূপ আর্টও সার্ব্বজনীন; কোনও বিশিষ্ট দল বা সম্প্রদায়ের জন্ম নহে। Lowell কৃষক-কবি Burns সম্বন্ধে কবিতায় বলিয়াছেন,—

All that hath been majestical
In life or death, since time began
Is native in the simple heart of all
The angel heart of man.

মহনীয় ভাবগুলি সকল হৃদয় সমানভাবে আকর্ষণ করে। কেবলমাত্র দুই এক জন চিন্তাশীল ব্যক্তির বোধগম্য রচনা অপেক্ষা, যে রচনা খুব সরল ও সহজ, যাহা প্রত্যেকের হৃদয়কে স্পর্শ করে, তাহাই ভাল।

It may be glorious to write
Thoughts that shall glad the two or three
High Souls, like those far stars that came in sight
Once in a century
But better far it is * * *
* * * * *
To write same earnest verse or time
Which seeking not the praise of art,
Shall make a clearer faith and manhood shine
In the untutored heart.

Lowell বলিয়াছেন, যে লেখক সকল হৃদয়কে স্পর্শ করেন, তিনি artist না হইতে পারেন, কিন্তু তিনিই চিরসম্মাননীয় থাকিবেন। Tolstoy বলিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত artist, তাঁহারই হাতে আর্টের চরম সার্থকতা। এক জন artist বড় কি ছোট, তাহার বিচার করিতে হইলে দেখিতে হইবে, তিনি খুব মহনীয় ভাবগুলি সকলেরই বোধগম্য করিতে পারিয়াছেন কি না; তাঁহার ভাবগুলি দেশের জনসাধারণের প্রাণকে স্পর্শ করিয়াছে কি না। তাঁহার art সার্ব্বজনীন কি না।—

Tolstoy maintains that it is just the immensely difficult task of carrying high messages of art to the common man—that is the supreme test of an artist's capacity to render mighty service to humanity.

আমরা এখনও এ আদর্শকে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত দেখি নাই। আমরা এখন সাহিত্যচর্চ্চা করিতেছি। সাহিত্য যুগধর্ম্ম প্রকাশ করিতেছে কি না, সমাজের উপর সাহিত্যের কিরূপ প্রভাব, তাহা আমরা দেখিতেছি না। তাই আমাদের দেশে সাহিত্যের ক্ষেত্রেও দলাদলি। এক সাহিত্য এক দলের, আর এক সাহিত্য আর এক দলের হইয়াছে। আসল সাহিত্য যে কোনও দল-বিশেষের নহে, কোনও দেশের প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গেই যে আর্ট সমানভাবে সেই যুগের উপযোগী কর্ত্তব্যের ইঙ্গিত করিয়া দেয়, তাহা আমরা ভুলিয়াছি।

সেই জন্য সাহিত্যচর্চ্চা এখন সাধনার নহে, বুদ্ধিরই পরিচয় দেয়। অধ্যাপক Rudolf Eucken তাঁহার বিখ্যাত 'Main currents of modern thought' গ্রন্থে আর্ট সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া দেখাইয়াছেন,—যেখানে আর্টচর্চ্চায় এইরূপ একটা কর্ত্তব্যবোধ না লক্ষিত হয়, সে আর্ট বাহিরের অলঙ্কারের ভারে পঙ্গু হইয়া যায়।

An art devoted preponderatingly to form easily becomes a mere matter of professional dexterity, the first concern of which is to display (to itself if not to others) its own skill. This gives rise to a predilection for the eccentric, paradoxical, and exaggerated and, in seeking after effects of this kind, the promised freedom only too easily becomes merely another kind of dependence, a dependence of the artist upon others and upon his own moods. Genuine independence is to be found only when the creation work proceeds from an inner necessity of the artist's own notion. But this cannot take place unless there is something to say, nay, something to reveal.

আমাদের সাহিত্যের প্রাণ জ্ঞান ও সাধনা নহে, বিদ্যা ও বুদ্ধি হইয়াছে। আমাদের সাহিত্যে রচনাকৌশল, বাক্যবিন্যাস, ছন্দঃশাস্ত্র, অলঙ্কার আছে, মহনীয় ভাব ও সত্য আবিষ্কৃত হইতেছে না। আমাদের সাহিত্যে এখন অনুকরণের স্রোত খুব প্রবল। সাধনার ফলে কেহই একটা নূতন জগতের আবিষ্কার করিতেছেন না। রবীন্দ্রনাথ যে ভাব-রাজ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা হইতেই সকলে উপাদান সংগ্রহ করিতেছেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বস্তুতন্ত্রহীনতার অভাব জন্য রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রকৃতভাবে দেশের যুগধর্ম্ম ব্যক্ত করিতে অসমর্থ হইয়াছে। আমাদের সাহিত্যে বস্তুতন্ত্র খুঁজিতে হইলে আমাদিগকে ঐতিহাসিক নাটকের শরণাপন্ন হইতে হয়,—প্রতাপাদিত্য, শাহাজাহান, মেবার-পতন, ভীষ্ম, শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্যলীলা প্রভৃতি নাটকের শরণাপন্ন হইতে হয়; অথবা ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের শোণিততর্পণের মধ্যে খুঁজিতে হয়, যেন বর্ত্তমান দৈনন্দিন জীবন হইতে আমরা realism খুঁজিয়া পাই না। আমাদের অনেকগুলি সুন্দর সামাজিক নাটক আছে সত্য, কিন্তু সমগ্র দেশ বা সমাজের যুগধর্ম্মের ইঙ্গিত তাহাতে পাওয়া যায় না; তাহাতে গৃহধর্ম্ম, পরিবার-ধর্ম্ম ও জাতি-ধর্ম্মের দুই একটি সমস্যাপূরণের চেষ্টা হইয়াছে মাত্র। উপন্যাস-ক্ষেত্রেও তাহাই। হিন্দু, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, খৃষ্টান, পার্শী ও মুসলমানের যুগধর্ম্ম নাটক উপন্যাসে ব্যক্ত হয় নাই। ভবিষ্যৎ ভারত-সমাজের সুস্পষ্ট চিত্র আমরা

নাটক উপন্যাসে এখনও পাই নাই। রবীন্দ্রনাথের "গোরা" ও "অচলায়তনে" আমরা কেবল সূচনা দেখিয়াছি।

সাহিত্যে এখন নূতন আদর্শের প্রচার করিতে হইবে। Art for Art's *sake সূত্র এখন বিসর্জ্জন দিতে হইবে। সাহিত্যে এখন রচনাকৌশল,* বাক্যবিন্যাস অলঙ্কারের চরম হইয়াছে। সাহিত্যের শরীরে আর অলঙ্কার চাপাইলে, অলঙ্কার বোঝা হইয়া দাঁড়াইবে। হিন্দু ত চিরকালই রূপক ছাড়িয়া ভাবের সাধনা করিয়াছে; রূপসাগরে ডুব দিয়াও অরূপ রতনকে খুঁজিয়াছে; তবে সাহিত্যে কেন রূপের সমাদর থাকিবে? সাহিত্যে এখন ভাবের আদর বাড়াইতে হইবে। এখন নূতন সাধনা, নূতন ভাব চাই। আমাদের সাহিত্যের ভাবগুলি পুরাতন হইয়া গিয়াছে। কাব্যে এখন আমাদের অরুচি হইয়াছে। কাব্য এখন একঘেয়ে হইয়াছে; কাব্যের আর প্রাণ নাই। কাব্যে কালোপযোগী ভাব নাই। এখন নূতন সাধনার ফলে যুগোপযোগী নূতন ভাব-আবিষ্কারের প্রয়োজন। কাব্য ও সাহিত্যকে নূতন প্রাণ দিতে হইলে আধুনিক সমাজের অভাব ও আকাঙ্ক্ষার আলোচনা করিতে হইবে,—ভবিষ্যৎ ভারত-সমাজের আদর্শকে লক্ষ্য করিতে হইবে, সেই আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্যার দ্বারা নহে, বুদ্ধির দ্বারা নহে, পরানুকরণের দ্বারা নহে, আপনার নিজের সাধনার দ্বারা যুগধর্ম্ম কল্পনা, অনুভব ও ব্যক্ত করিতে হইবে। তাহা না হইলে কাব্য ও সাহিত্য পুনর্জ্জীবিত হইবে না। আমাদের ভবিষ্যৎ সাহিত্যে যুগধর্ম্মের উপযোগী দরিদ্র-জনসাধারণই চিন্তার কেন্দ্র হইবে। জনসাধারণের অভাব ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া আমাদের সাহিত্য নূতন জীবন লাভ করিবে। আমরা দেশে এখন কৃষকের স্থান ও অধিকার বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি;—এতদিন পরে আমরা বুঝিতে পারিতেছি, দেশের ধনী ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সমাজের বল নহে; দেশের নৈতিক বল কৃষকসমাজে সুপ্ত রহিয়াছে। ধনী ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় নবানুকরণের ফলে দুর্ব্বল হইয়াছে। কৃষকগণের মধ্যে হিন্দুজাতির মহাপ্রাণ আজও জাগ্রত রহিয়াছে। নবানুকরণ-স্পৃহা তাহাদিগকে এখনও নির্জীব করে নাই। হিন্দুজাতি, হিন্দু-জনসাধারণ, হিন্দু কৃষকগণের মধ্যেই জীবিত রহিয়াছে; তাই সাহিত্য হিন্দু-জনসাধারণ, হিন্দু কৃষকগণের আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ হইতেই তাহার নূতন জীবন ও নূতন শক্তি গ্রহণ করিবে। নিখিল-আশা-আকাঙ্ক্ষাময় কৃষক-জীবন হইতে যখন সাহিত্যে প্রাণসঞ্চার হইবে, তখন তাহার বস্তুতন্ত্রের অভাবদোষ দূর হইবে। কৃষকের

ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখ বুঝিতে আরম্ভ করিলে সাহিত্যে খাঁটী ও সুন্দর realism আসিবে; সাহিত্য তখন একটা নূতন তেজ ও শক্তির পরিচয় পাইয়া উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিবে,—

নিখিল-আশা-আকাঙ্ক্ষাময়
দুঃখে সুখে
ঝাঁপ দিয়ে তার তরঙ্গপাত
ধরব বুকে।
মন্দ ভালোর আঘাত-বেগে
তোমার বুকে উঠব জেগে,
শুন্‌ব বাণী বিশ্বজনের
কলরবে,
প্রাণের পথে বাহির হতে
পার্‌ব কবে?

আমাদের সাহিত্যে এখন অলীক ভাবুকতার আর প্রয়োজন নাই। ভাবুকতার চরম হইয়াছে; এখন ভাবুকতাকে জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের ভিত্তির উপর গড়িতে হইবে।

রুশ সমালোচক Blanski রুশ সাহিত্যিকগণকে অনেক বৎসর পূর্ব্বে এই কথাই বলিয়াছিলেন। Romance খুব হইয়াছে,—The elements of a new romantic art shall be found in the life of the masses. Blanskiর পর রুশ-সাহিত্যে যুগান্তর আসিয়াছিল। আমরা Blanskiর পরবর্ত্তী রুশ-সাহিত্যের ধারা ও সমাজের উপর তাহার প্রভাব সম্বন্ধে অন্য প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। আমাদের সাহিত্যিকগণকে এখন সেই একই কথা শুনাইতে হইবে। আমাদের সমাজে আমরা এখন কৃষক-সমাজের স্থান ও অধিকার বেশ অনুভব করিয়াছি; তাহারই ফলে দেশে পল্লীপরিষৎ-গঠন, পল্লীসেবা, পল্লীসংস্কারের আয়োজন, জনসাসাধাণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, নৈশ-বিদ্যালয়-স্থাপন প্রভৃতি দেখিতেছি। কিন্তু সাহিত্যে এই নবজাগ্রত জনসাধারণের প্রতি শ্রদ্ধা এখনও প্রকাশ পায় নাই। গীতিকাব্যে আমরা দেবতাকে দীন-দরিদ্র কৃষকের সাজে দেখিয়াছি,—

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙ্গে
ক'রছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙ্গে কাটছে যেথায় পথ,
খাটছে বারো মাস।

রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে,
ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে ;
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি
আয় রে ধূলার পরে।

"কিন্তু তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি আয় রে ধূলার পরে"—এ আহ্বান এখনও সাহিত্যে শুনা যায় নাই। আমাদের সাহিত্য এখনও ধনী ও শিক্ষিত লইয়াই রহিয়াছে। আমাদের সাহিত্য এখনও 'একলা ঘরের আড়াল ভাঙ্গিয়া' হাটের পথে বাহির হয় নাই।

রুশ-সাহিত্য Dortoeiverxi ও Tolstoyর সাধনার ভিতর দিয়া প্রবল প্রেমে হাটের পথে বাহির হইয়াছে। Dortoeiverxiর পাপী, তাপী ও দরিদ্রের পূজা তাঁহার Religion of human sufferingএ, রিক্তভূষণ Tostoyর অধম দীনদরিদ্রের জন্ম সাহিত্যসেবায়, তাঁহার আর্টবিষয়ক আলোচনায়, আমরা সাহিত্যকে অপমান নির্য্যাতন মাথায় রাখিয়া দীন-হীন পতিতের ভগবানকে পূজা করিবার জন্ম ধূলায় নামিতে দেখিয়াছি।

আমাদের সমাজে দরিদ্রনারায়ণের পূজা আরম্ভ হইয়াছে। The religion of human sufferingএর মর্ম্ম শুনিয়া বুঝিতে সমর্থ হইয়াছি, নর-নারায়ণ-পূজা আমাদের নূতন ব্যক্তিত্বের সূচনা করিয়াছে। কিন্তু আমাদের সাহিত্য এখনও সহজ ও সরল প্রেমে অধম ও পতিতকে আলিঙ্গন করে নাই। বীণা, বেণু, মালতী ও মল্লিকা ফুলের ডালি আমাদের সাহিত্য ছাড়িতে পারে নাই। বস্ত্র ছিঁড়িবে, অলঙ্কার হারাইবে, ধূলা-বালি লাগিবে, এই ভয়ে আমাদের সাহিত্য রাস্তায় বাহির হয় নাই, ঘরের ভিতর দ্বার রুদ্ধ করিয়া অন্ধকারে লুকাইয়া আছে। বাহিরের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে আমাদের সাহিত্যের আলাপ হইতেছে না, তাই তাহার realismএর অভাব দূর হইতেছে না ; তাই তাহা এখনও সুধু কল্পনার সামগ্রী রহিয়াছে। এখন সাহিত্যকে অন্ধকার ঘর ছাড়িয়া বৈশাখের রৌদ্রে রাস্তার কুলী মজুরের সঙ্গে বাহির হইতে হইবে ; প্রখর রৌদ্রে ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি করিয়া ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইতে হইবে। পূর্ণিমা-নিশি ও মায়া-কুহেলিকারি মোহ দূর করিতে হইবে। ফুল, মালা, অলঙ্কার এখন বিসর্জ্জন দিতে হইবে। কৃষকের মত রাস্তার ধূলা, মাঠের কাদা, মাথার ঘাম এখন সাহিত্যের অলঙ্কার হইবে। শুভ্র পরিচ্ছন্ন বস্ত্র ছাড়িয়া সাহিত্যকে কৃষকের অপরিচ্ছন্ন অল্প বস্ত্রে সাজিতে হইবে। কৃষকের নিখিল-দুঃখ দারিদ্র্যের বোঝা বুকে করিয়া কৃষকের সহিত নীরবে নির্ব্বিবাদে

ক্লান্তিবিহীন কাজের মধ্যে প্রভাত-কুসুমের প্রাণ লইয়া সন্ধ্যার পাখীর গান শুনিয়া সাহিত্যকে দিনের পর দিন কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে। সাহিত্য রাজার বেশ না ছাড়িলে, রাখাল-বেশ না পরিলে, কুলী-মজুর কৃষকের সঙ্গে পথের মাঝে, রৌদ্র, বায়ু, ধূলা, কাদায় না ছুটিলে কখনও প্রাণ পাইবে না; সতেজ, সবল সুস্থ হইবে না; খেলা ও আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবে না—

"যেথায় বিশ্বজনের মেলা
সমস্ত দিন নানান খেলা
চারি দিকে বিরাট গাথা বাজে হাজার সুরে—
সেথায় সে যে পায় না অধিকার,—
রাজার মত বেশে তুমি সাজাও যে শিশুরে
পরাও যারে মণি-রতন-হার।
খেলা ধূলা আনন্দ তার সকলি যায় ঘুরে
বসন ভূষণ হয় যে বিষম ভার। *

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

রচনা-রীতি।

[ভাল লেখা।]

রচনার নানা রকম রীতি। কিন্তু রীতি রীতিই;—রূপ রূপই। রীতির মধ্যে কোন্ রীতি এবং রূপের মধ্যে কোন্ রূপ—ভাল রীতি, এবং ভাল রূপ? এক কথায় "ভাল লেখা"র কিরূপ রূপ? ভাল লেখার ভাব কেমন, ভাষাই বা "কিম্ভুতা"?

ভাল লেখা সরল কিংবা বক্র? অথবা দুয়ের আধা-আধি? উহা ত্রিকোণ, কিংবা চতুষ্কোণ? অথবা এ দুয়ের কিছুই নয়,—দুয়েরই বার? ভাল লেখা তবে কি?

ভাল লেখা কি তবে গোল গোল চক্রাকার? মতিচুরের মত? অথবা কমলা লেবুর মত কতক গোল—"উত্তরে ও দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা"?

* বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের গত অধিবেশনে পঠিত

ভাল লেখা অম্লে মধুর, অথবা শুক্তোর মত তিক্ত? কোমলে কঠিন কিংবা কঠিনে কোমল? ভাল লেখা অম্লে মধুর, অথবা কেবলই মধুর? লবণাক্ত, তিক্ত, কিংবা নিছক কুইনাইন?

ভাল লেখা ফাল্গুনে হাওয়ার মত স্ফূর্ত্তিতে ফুর-ফুর উড়ে; অথবা তেজো-গম্ভীর গজেন্দ্রগমনে, ধীর-মন্থরে মর্দ্দানা চালে চলে? কিংবা এ দুই চালের কোনও চালেই সে চলে না; ক্রমাগত কলিকাতার থার্ড-ক্লাস ক্যারেজের মত বেতালা চালে চলিয়াছে ত চলিয়াছেই; চাবুকের পর চাবুকেও তার চাল্ বেগড়ায় না। ভাল লেখা অশ্বজাতির মত এক দমে দৌড়ায়, অথবা মৌতাতী আফিমী-অনুরূপী ট্রামকারের মত ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া খেয়া দেয়?

ভাল লেখা চকিতে বিদ্যুৎ চমকিয়া চলিয়া যায়, কিংবা কলম পুরাইবার জন্ম কালি কলম লইয়া কাগজের উপর ক্রমাগতই কসরত করে; তাঁতীর তাঁত বোনার মত একই ভাবের অসংখ্য তানা পোড়েন টানে? পক্ষান্তরে, ভাল লেখা কেবলই ওস্তাদের ইশারা, অথবা আয়তন অবয়বও তাহার এক আধটু থাকা চাই? সে দীর্ঘ, হ্রস্ব, সূক্ষ্ম, অথবা স্থূল? শরীরী, অশরীরী, কিংবা লিঙ্গদেহে দোদুল্যমান?

ভাল লেখা শ্রাবণের ধারা, কিংবা প্রাতঃকালের মেঘডম্বুরের মত কেবলই গর্জ্জে, কিছুই বর্ষে না? ভাল লেখা ভাদ্রের ভরা নদী, দু'কূল ভাসাইয়া যায়, অথবা বৈশাখের বেলা-ভূমি, ঔদাস্যে আকুল করে?

ভাল লেখা আধ-ঘুমন্ত আবছায়া, আয়েসে আর আবল্যে অষ্ট প্রহরই আলুলায়িত? অথবা আঁটো, খাটো, ডাঁটো, প্রস্ফুট, প্রখর, সুতীক্ষ-দৃষ্টি সূর্য্যমুখী?

ভাল লেখা আড়াই গজ অবগুণ্ঠনে আবৃতা সেকালের কুলবধূ—নিঃশব্দে পদ-নিক্ষেপ করেন, অথবা আধ-ঘোমটা-টানা ঘোমটামাত্রবিরহিতা এ কালের গৃহ-লক্ষ্মীর মত আটগাছা মল বাজাইয়া মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধেন? ভাল লেখা অষ্ট-অলঙ্কার-শোভিতা, অলঙ্কারভারাবনতা সুন্দরী, অথবা কেবল এক রত্তি রাঙ্গা সূতা হাতে বাঁধিয়া এয়োতের পরিচয় দেন? তিনি কুমারী-কন্যা, বিবাহিতা কামিনী, অথবা বিধবা—চিরব্রহ্মচর্য্য-ব্রত-ধারিণী? ভাল লেখা ললিতলবঙ্গ-লতা—নিয়তই নব রসে রঙ্গিণী, অথবা গাছ-কোমোর বাঁধিয়া শতমুখী-সঞ্চালনে, ভাব, ভাষা ও ভবসংসারের শাসনকারিণী? তিনি তোলো-মুখী? ঈষৎ স্মিতাধরা, বা অট্টহাসিনী? তিনি নর, না নারী? খর' কি মাটো?



ভার্সেলের পথে।

ভাল লেখা ভাব-ভরা ভামিনী, কিংবা ঠেঁটী-পরা ভাড়ানী? তিনি ভামিনীবৎ ভাষার ঘোরে ভাবের ভরে ঢলিয়া গলিয়া ভাঙ্গিয়া পড়েন, অথবা ভাড়ানীর মত দ্রুতপদে দিবারাত্রি ধেই-ধেই ঢেঁকির পাড় পাড়িতেছেন ত পাড়িতেছেনই;—ধপাস্-ধপাস্ একঘেয়ে আওয়াজ অষ্ট প্রহরই ঐকরূপ চলিয়াছে।

বাঁকা কথা সোজা করিয়া বলা ভাল লেখা, অথবা সোজা কথা বাঁকাইয়া বলাকেই ভাল লেখা বল? ভাল লেখা ভাসা-ভাসা ভেলচাই, প্রগাঢ় প্রচ্ছন্ন, কিংবা কটমট কড়া? ভাল লেখা স্পষ্ট, পরিষ্কৃত, তরলে তীব্র, কঠিনে কোমল, মধুরে উজ্জ্বল, অথবা তাহা অস্পষ্ট অন্ধকারাবৃত প্রহেলিকা, কেবল হেঁয়ালীর হের-ফের, আর পচা 'প্যারাফেরেজে'র আরও পচা 'প্যারাফেরেজ'?

হে ভগবন! ভাল লেখা কাহাকে বলে? বল বেতাল! ভাল লেখার ভাবখানা কি? ভাল লেখা 'বৈদর্ভী' 'গৌড়ী' 'পাঞ্চালী' কিংবা 'লাটী'? ইহাদের কিসে? হে পণ্ডিত পাঠক! তোমার প্রবৃত্তি লাটী বলিতে লাটী প্রভৃতি শোঁটা লইয়া লড়াই করা নয়। লাটী রীতির রচনার একটা নমুনা উদ্ধৃত করিয়াই প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছি। পরন্তু, অন্য কয়েকটা রীতির কথাও কিছু কহা যাইতেছে। বৈদর্ভী ও পাঞ্চালীর ব্যাখার প্রয়োজন নাই; গৌড়ীর গটন পিটন লইয়াই কথা; কারণ, বঙ্গবাসী বিচারক ও পাঠকের তাহাই বোধগম্য। গৌড়ীয় বঙ্গভাষার রচনা-রীতি সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা, সাধ্বী ও প্রাকৃতী? সাধ্বী অর্থে সংস্কৃত, সাধুভাষাপ্রবণ রচনা, আর প্রাকৃতী বলিতে প্রাকৃতপরায়ণা লেখা। সংস্কৃত ও প্রাকৃত কাহাকে বলে, অবশ্য আমাদের পাঠক ও পালকেরা জানেন। প্রাকৃত প্রণালীর লেখার নমুনা বাঙ্গালা নভেলে ও সংবাদপত্রে পর্য্যন্ত প্রাপ্তব্য। প্রাকৃতী দুই শ্রেণীতে বিভক্ত;—বিশুদ্ধ ও অবিশুদ্ধ। বিশুদ্ধ প্রাকৃতের দৃষ্টান্ত কোনও অলঙ্কারিক এইরূপ দিয়াছেন।—

"যাহাদের আপনার ভাল হইবার সম্ভাবনা নাই, পরের ভাল দেখি তাহাদের চোখ টাটাইয়া উঠে। এ নিমিত্ত তাহারা পরের প্রাধান্যলো অসূয়া করে।"—"বসন্তসেনা" অবিশুদ্ধ প্রাকৃতী প্রণালী, নানা বাবনিক হইতে সংগৃহীত শব্দ সংমিশ্রিত রচনা-রীতি। এ রীতির ভূরি দৃষ্টান্ত চন্দ্রাদির গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। বিজাতীয় ভাব ও শব্দের ব্যবহারে যে বস্তুত বাঙ্গালা বিড়ম্বিত হয় তাহা নহে। প্রাচীন ও নবীন বাঙ্গালার প্রায় বিদেশীয় শব্দ-সমবায়ে সংগঠিত।

পরন্তু, রচনার সাধ্বী রীতির চারি শ্রেণী ; যথা—"দাম্ভোলী", "হৈমী", "বৈমাতুরী" ও "মাহুনী", বা "লাটী"।

দাম্ভোলী রচনা দম্পন-কম্পন-দাপট্‌-চাপট্‌-যুক্ত ; ওজস্বিনী, আড়ম্বরময়ী। ইনি "ধক্‌-ধক তক তক অগ্নিচন্দ্র জ্বালিকে।" বাবু বঙ্গের বক্তৃতা দাম্ভোলী রীতির উৎকৃষ্ট উদাহরণ। "চক্ষু ঘুরে যেন চাক, হাত নাড়া ঘন ডাক, চমকে সকল পুরজন।" ইহাও দাম্ভোলী, তবে প্রথানুসারী ; কিন্তু এই দাম্ভোলীই হোচ্ছেন আসল গৌড়ী, অর্থাৎ খাঁটী বাঙ্গালা। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা যে রীতিকে গৌড়ী অর্থাৎ বঙ্গদেশীয় রীতি কহিয়া গিয়াছেন, সে রীত্যনুসারে লিখিলে অনবরতই রচনা-রাণীর "চক্ষু ঘুরে যেন চাক, হাত নাড়া ঘন ডাক" ইত্যাদি।

হৈমী বা বৈদর্ভী রীতিতে কেবল কোমল, কান্ত, ললিতলবঙ্গলতানু-প্রাণিত পদ ; রচনা সরল, তরল, শীতল, সরবৎ,—"বরজ-কুলজ-জলজ-নয়নী ঘুমল বিমল-কমল-বয়নী। বৈমাতুরী বা পাঞ্চালী, দাম্ভোলী ও হৈমীর মধ্যবর্ত্তিনী, অল্পাধিক-শ্লেষাত্মিকা রচনা। প্রাচীন পাঞ্চাল হইতে এই রীতি উদ্ভূত, তথায় অধিক প্রচলিত ছিল বলিয়াই বোধ হয়, ইহার নাম পাঞ্চালী। বাঙ্গালা উদাহরণ একটু অনুসন্ধান করিলেই অনেক পাইবেন।

মাহুনী রীতিরই অপর নাম লাটী। এ রীতি লাটদেশ-জাত। ইহাও মৃদু মোলায়েম মধুর রচনা। মাহুনী হৈমীরই নামান্তর ; এ উভয়ই লাটী।

কিন্তু এ সব ত হইল রীতি। ভাল রীতি কোন্‌টী, ভাল লেখা কাহাকে বলে ? কেবলই ভাব-বৈভব কিংবা নিছক শব্দ-সম্পদ, অথবা ইহাদের উভয়ই ? যদি উভয়ই হয়, তবে কাহার পরিমাণ কতটা করিয়া, কেহ বলিতে পার কি ? কখনও কোনও আলঙ্কারিক বা সমালোচক সে কথাটা কহিতে পারিয়াছেন কি ? ভাব-বৈভবের ও শব্দ-সম্পদের সংমিশ্রণ-মাত্রাটা কেহ কখনও মাপ-কাঠী দিয়া মাপ জোঁক করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কি ? যদি না হইয়া থাকেন, তবে ভাল লেখার পরিমাপক কি ? পরিমাপক কে ?

পাঠক ! বলিতে পারেন, "অত তত বুঝি না ; যাহা ভাল লাগে, তাহাকেই ভাল বলি।" তা বটে ! কিন্তু ভাল লাগা সম্বন্ধেও বুঝ-সমুজের বড়ই বেশী দরকার। বরং ভাল লেখা কি বোঝা অপেক্ষা, ভাল লাগা কাহাকে বলে, ইহা বুঝা আরও শক্ত। পরন্তু, যাহা ভাল লাগে, তাহাই ভাল ; আর যাহা ভাল লাগে না, তাহাই মন্দ ;—এ কথাও সজ্ঞানে কেহ স্বীকার করিবেন

না। পরন্তু পাত্র, প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি, শিক্ষা ও শক্তির তারতম্য অনুসারে, ভাল বা মন্দ লাগার ভিন্ন ভিন্ন ও বহুতর বিপরীতভাবাপন্ন অবস্থা ঘটে। অতএব, ভাল লাগাও ভাল লেখার ঠিক পরিমাপক নহে।

৺ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

উদ্ভিদের সুখদুঃখ।

উদ্ভিদের সুখ-দুঃখ আছে, এ কথা বলিলে অনেকে হয় ত ইহাকে 'আজগুবি' কথা মনে করিতে পারেন, কিন্তু তাহা নহে। উদ্ভিদ্‌মাত্রই সজীব পদার্থ, ইহা আমরা অবগত আছি। যাহার জীবন আছে, তাহারই সুখ-দুঃখ আছে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। উদ্ভিদ্‌গণ বধির কি না, জানি না; মূক যে, তাহা আমরা সকলেই জানি। বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসুর মতে, উদ্ভিদের শ্রবণশক্তি আছে; কেন না, তিনি কোনও উদ্ভিদ্‌কে গালি দিতেন বলিয়া সেই উদ্ভিদ্‌টী নাকি ক্রমে বিমর্ষ হইয়া গিয়াছিল! শ্রবণশক্তি না থাকিলেও উদ্ভিদের অনুভূতি আছে, এবং বাক্‌শক্তি না থাকিলেও ব্যক্ত করিবার শক্তি আছে। কোনও উদ্ভিদ্ বিশেষ কোনও আঘাত পাইলে তাহার পরিগঠনের (Structural System) মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া যায়। আচার্য্য বসু তাহা সে দিন অনেককে দেখাইয়াছেন; সে জন্য তাঁহাকে নানা কৌশলসম্পন্ন যন্ত্র-তন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে ও ব্যবহার করিতে হইয়াছে। সে কথা যাউক। গাছে আঘাত লাগিলে, আঘাতের গুরুত্ব-অনুসারে অল্লাধিককালের জন্য তাহার বৃদ্ধি স্থিরভাব ধারণ করে; গুরুতর আঘাতে গাছ ঝিমাইয়া যায়; ক্রমে গাছের পত্রনিচয় ঝরিয়া পড়ে। আঘাতমাত্রই উদ্ভিদ্‌মধ্যে যে একটী পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়, আঘাতের পূর্ব্বে ও পরে সেই গাছের এক একখানি ফটোগ্রাফ লইয়া মিলাইলে তাহা বেশ দৃষ্টিগোচর হয়। উদ্ভিদের কোনও অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিলে তথা হইতে রস নির্গত হইতে থাকে; তাহার অনিবার্য্য ফলে সে অঙ্গটী শিথিলভাব ধারণ করে। গাছের কোনও অবয়বে কীট প্রবেশ করিলে, সেই স্থান হইতেও রস নির্গত হয়; এবং সে অঙ্গ বিমর্ষ হইয়া পড়ে; আবার সেই আহত ও কীটদষ্ট অংশকে চিকিৎসাধীন করিলে, তাহার পুনরুদ্ধার করিতে পারা যায়।

উদ্ভিদ্‌গণের সুখের প্রধান লক্ষণ—নিদ্রা। নিদ্রাকাল আরামের কাল; সে

সময়ে কি জীব, কি উদ্ভিদ্, সকলেরই আবেশ আসে; ইন্দ্রিয়নিচয়ের ক্রিয়া সকল স্থিরভাব ধারণ করে। ইন্দ্রিয়দিগের ক্রিয়াশীলতাই সজীবত্তার উপাদান। দৌর্ব্বল্যাবস্থায় ধাতু শিথিলভাব ধারণ করে বলিয়া মানুষকে বিমর্ষ ও জ্যোতির্হীন দেখায়। উদ্ভিজ্জীবনেও সেই নিয়ম প্রযোজ্য। বিধির বিধানানুসারে রাত্রিকাল আরামের ও নিদ্রার সময়। উদ্ভিদ্গণ দিবাবসানে আপন আপন কার্য্যশীলতা আকুঞ্চিত করিয়া লয়; তখন আর দিবাভাগের ন্যায় তাহাদিগকে তাজা দেখায় না। শৈম্বিক জাতীয় (Leguminosæ) উদ্ভিদ—তেঁতুল, বক, শিরীষ, খদির, বাবলা, কাঞ্চন, মুগ, চীনাবাদাম প্রভৃতি উদ্ভিদ্গণের পত্রগণ সন্ধ্যার প্রাক্কালে মুড়িয়া যায়, এবং প্রাতে খুলিয়া যায়। এই জাতীয় উদ্ভিদ্দিগের নিদ্রা বেশ দেখিতে ও বুঝিতে পারা যায়। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলেও ইহারা বুঝিতে পারে, এবং সে সময়ে অল্লাধিক ঘুমাইয়া পড়িবার চেষ্টা করে। কারণ, দেখা গিয়াছে, সে সময়ে তাহাদিগের পাতাগুলি আপনা হইতে মুড়িয়া যায়। গামলা সমেত উল্লিখিত কোনও জাতীয় উদ্ভিদ্কে রাত্রিকালে প্রখর আলোকসন্নিধানে আনিলে তাহার বিরক্তি উৎপাদন করা হয়। নিদ্রাভঙ্গ করিলে কে না বিরক্ত হয়? কাজেই তাহার মুদিত পাতাগুলি প্রসারিত হয়। ইংলণ্ডের ও যুক্ত-রাজ্যের কোনও কোনও বিশিষ্ট পল্লী-গৃহস্থ নিজ নিজ আবাদের ফসলকে রজনীযোগেও জাগরিত রাখিবার জন্ত বৈদ্যুতিক আলোক ব্যবহার করেন। এতদ্দ্বারা রাত্রিকালেও উদ্ভিদের নিদ্রা থাকে না; দিবাভাগের ন্যায় রাত্রিকালেও উদ্ভিদ্গণ ক্রিয়াশীল থাকে; তন্নিবন্ধন অপরাপর উদ্ভিদ্ অপেক্ষা ইহাদিগের বৃদ্ধি অধিক হয়; ফসল অধিক হয়, এবং শীঘ্র হয়। বলা বাহুল্য, দিবারাত্রি অবিরাম শ্রমহেতু উদ্ভিদ্গণ অনেক আগে মরিয়া যায়; ইহাতে কিন্তু মালিকের ক্ষতি না হইয়া অধিক লাভ হইয়া থাকে। শীঘ্র জমী খালি হয়, এবং অগ্রে ফসল উৎপন্ন হয়। এই দুইটাই পরম লাভ।

কোনও একটী ছোট উদ্ভিদ্কে যত্নসহকারে ভূমি হইতে উৎপাটিত করিয়া যথা তথা ফেলিয়া রাখিলে অল্পকালমধ্যে তাহা ঝিমাইয়া যায়; কিন্তু ঝিমান গাছটীকে জলপূর্ণ পাত্রে রাখিয়া দিলে পুনরায় তাহা সজীব হইয়া উঠে। কর্ত্তিত গাছের শাখাকে এইরূপে দীর্ঘকাল জীবিত রাখিতে পারা যায়। জলপূর্ণ শিশি বা বোতলে ক্রোটোনের একটী ডগা রাখিয়া দিলে দীর্ঘকাল জীবিত থাকে; কেবল তাহাই নহে, উক্ত ডগার নিম্নাগ্রভাগ হইতে ক্রমে বহু শিকড় উদ্ভূত হয়। এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, সুখই সজীবতার মূল।

অনেক গাছ, বিশেষতঃ ছোট জাতীয় বা ছোট গাছ, দীর্ঘকাল আর্দ্র মাটিতে থাকিলে বিবর্ণ হইয়া যায়; ক্রমে পাতা খসিয়া গিয়া কঙ্কালের আকার ধারণ করে; অবশেষে মরিয়া যায়। উদ্ভিদ্ রসশোষণ করিতে সক্ষম বলিয়া যে জলে ডুবিয়া থাকিবে, এমন কোনও কথা নাই। নিতান্ত আর্দ্র ও স্যাঁতানি স্থানে থাকিলে অনভ্যস্ত উদ্ভিদ্গণের নিশ্চয় অসুখ হয়; তাহার ফলে পত্র বিবর্ণ হইয়া যায়; পাতা ঝিমাইয়া পড়ে। কিন্তু সেই পীড়িত গাছটীকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া অনতিসরস মাটীতে পুতিয়া দিলে ক্রমে তাহার রোগ সারে। আরও শীঘ্র রোগবিমুক্ত করিতে হইলে আবদ্ধ ও অন্ধকারময় গৃহমধ্যে রাখিয়া দিতে হয়। উদ্ভিদের অসুস্থাবস্থায় অধিক বাতাস বা আলোক বড় প্রীতিপ্রদ নহে। দুইটী গাছকে দুই ভাবে পরিচর্য্যা করিলে উভয়ের শরীরে স্বতন্ত্র ফল প্রকাশ পাইবে। যে উৎপাটিত গাছকে স্বতন্ত্রভাবে পুনঃপ্রোথিত করিয়া একটীকে ছিদ্রবদ্ধ গামলা চাপা, আর একটীকে অনাবৃত রাখিয়া দিলে, হাতে হাতে পরিচর্য্যাভেদের ফল দেখা যাইবে। বেশীক্ষণ নহে, এক ঘণ্টা পরে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, গামলা-ঢাকা গাছটী পূর্ব্বাপেক্ষা তাজা হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু অপরটী বিমর্ষ-দশায় পড়িয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। এক্ষণে পরিচর্য্যার পরিবর্ত্তন করিলে, অর্থাৎ আবৃত গাছটীকে অনাবৃত এবং অনাবৃতকে আবৃত করিয়া দিলে, প্রথমোক্ত গাছটী বিমর্ষ হইবে, এবং অন্যটী তাজা হইয়া উঠিবে।

অনেক কোমল উদ্ভিদ প্রখর শীতের প্রকোপ সহ্য করিতে পারে না। অনেক গাছ শীতের কয় মাস নির্জীবাবস্থায় কালযাপন করে; আবার অনেক গাছ মরিয়া যায়। আবার, এরূপ উদ্ভিদ্ও বিরল নহে, যাহারা আপাততঃ মরিয়া যায়, এবং শীতকাল অতীত হইলে পুনরায় সজীব হইয়া উঠে; সঙ্গে সঙ্গে নূতন মুকুলে সুশোভিত হইয়া আমাদিগের নয়ন মন বিমোহিত করে। বাঙ্গালার সমতল প্রদেশে তত অধিক শীত হয় না, তত অধিক শিশিরপাতও হয় না; তথাপি এমন অনেক উদ্ভিদ্ আছে, যাহারা বঙ্গীয় সমতল প্রদেশের শিশির ও শীতে মুহ্যমান হয়, বা মরিয়া যায়; অথবা তাহাদিগের সাময়িক মৃত্যু সংঘটিত হয়। ঈদৃশ উদ্ভিদ্গণকে বারো মাস বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে, কিংবা তাজা রাখিতে হইলে, কৃত্রিম উপায়ে শীত ও শিশির হইতে রক্ষা করিতে হয়। এতদর্থে শীত-প্রধান দেশে সার্সী-গৃহ (Glass House) থাকে। এ দেশের শীতসঙ্কুল পার্ব্বত্যস্থান—দারজিলিং, শিলং, মসূরী, উতকামন্দ, নীলগিরি প্রভৃতি দেশে কাচের উদ্ভিদ্শালা আছে। সমতল দেশেও অনেক ধনাঢ্যের বাটীতে বা বাগানে এইরূপ উদ্ভিদ্শালা দেখিতে পাওয়া

যায়। উহার মধ্যে শীতকালে বহু উদ্ভিদ্ রক্ষিত হয়। এ সময়ে তথায় প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে, তন্মধ্যস্থিত গাছগুলি বহির্দ্দেশ অপেক্ষা খুব ভালই আছে। শীতপ্রধান দেশে শীতের প্রকোপ নিতান্ত অধিক বলিয়া স্সার্সীগৃহমধ্যে উত্তাপ দিবারও ব্যবস্থা আছে।

ত্রিশ বৎসরেরও অধিককাল লক্ষ লক্ষ উদ্ভিদের সেবা করিয়াছি। সুতরাং তাহাদিগের জীবনানুশীলনের যথেষ্ট সুযোগ হইয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে শত শত বর্গ আছে। প্রত্যেক বর্গে শত শত বর্ণ আছে; এবং প্রত্যেক বর্ণেরও শ্রেণী আছে। ইহাদিগের আকার, ইহাদিগের প্রকৃতি, এই উভয়ে কত প্রভেদ, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া উঠা যায় না; তাহা হইলেও সকলের মধ্যে এক স্থলে মিলন আছে। আমাদিগের জীবনধারণের জন্য যাহা প্রয়োজনীয়, উদ্ভিদেরও তাহাই প্রয়োজন। যাহাতে আমাদিগের সুখ ও আরাম, তাহাদিগেরও তাহাতেই আরাম। আমাদিগের জন্ম আছে, মরণ আছে, সুখ ও আরাম আছে, ব্যাধি ও বিকার আছে। তাহার পর প্রজননেচ্ছা ও প্রজণ-শক্তি,—ইহারা জীবোদ্ভিদ্‌নির্ব্বিশেষে সকলের সাধারণ সম্পত্তি। একমাত্র জলপান করিয়া আমরা জীবনধারণ করিতে পারি, কিন্তু সে জীবন সুখাবহ নহে; কারণ, কেবল জলে শরীরের পুষ্টি হয় না; উপরন্তু শরীর দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইয়া পড়ে; শরীরের উত্তাপ হ্রাস পায়; অবশেষে এবং অচিরকাল-মধ্যে জীবলীলা শেষ করিতে হয়। অতঃপর, মুখরোচক ও পুষ্টিকর খাদ্যে তৃপ্তি হয়, শরীরে বলাধান হয়। এগুলি সুখের কারণ। রসনাতৃপ্তিকর কোনও দ্রব্য পান বা আহার করিলে মনে প্রফুল্লতা হয়ই, কিন্তু তাহার বিকাশ হয়—শরীরের উপরে। সে তৃপ্তি, সে সুখ মুখে ব্যক্ত না করিলেও, অবয়বে তাহা প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। অর্দ্ধাহারে বা অনাহারে থাকিলে আমাদিগকে যেরূপ ম্রিয়মান থাকিতে হয়, উদ্ভিদ্‌গণকেও সেইরূপ হইতে হয়। ঈদৃশ বাহ্য লক্ষণ দৃষ্টেও যদি সুখ বা দুঃখের অভিব্যক্তির উপলব্ধি না হয়, তাহা হইলে কিসে হইবে, জানি না। ব্যক্ত করিতে পারিলেই যে সুখ-দুঃখের অনুভূতি হয়, তাহা নহে। যে ব্যক্তি মূক, বাক্‌শক্তি-বিবর্জ্জিত বলিয়া কি সে সুখ-দুঃখ অনুভব করিতে পারে না? না, তাহা প্রকাশ করিতে পারে না? মূক ব্যক্তি সুখে উৎফুল্ল হয়; কিন্তু তাহার সে সুখ, সে প্রফুল্লতা নখাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত পরিপ্লুত করিয়া দেয়। মূক নিজে তাহা বুঝে; তাহার সন্নিহিত ব্যক্তিগণও তাহা উপলব্ধি করে। বর্দ্ধমানের

সীতাভোগ বা মতিচূরেও হয় ত কাহারও তৃপ্তি হয় না ; আবার কাহারও জগা উড়ের দোকানের গুড়ে-পক্কান্ন বা তেলে-ভাজা ফুলুরিতেও পরম পরিতোষ হয়। কিন্তু তাহা স্বতন্ত্র কথা। কারণ, সৃষ্টিপদ্ধতির স্তরবিন্যাসের সহিত আচার অভ্যাসের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এ প্রভেদে কিছু আসিয়া যায় না। মোট কথা, উভয়েরই সুখ আছে, এবং যাহার সুখ আছে, তাহারই দুঃখ আছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

জল কাহারও খাদ্য নহে ; সকলেরই পানীয়। নিরেট ভুক্ত পদার্থকে সহজে বিগলিত হইবার সুবিধা করিয়া দিবার জন্য সকলেই জল পান করিয়া থাকে। আমাদিগের শরীর হইতে ঘর্ম্মাদিরূপে কত রস বহির্গত হইয়া যাইতেছে, কে তাহার হিসাব রাখিতেছে? শরীর হইতে যে পরিমাণ রস বহির্গত হইয়া যাইতেছে, তাহারই স্থানকে পুনঃপুরিত করিয়া দিবার জন্য আমাদিগকে পুনঃপুনঃ জল বা জলীয় সামগ্রী পান করিতে হয়। তৃষ্ণা ত আর কিছুই নহে, নির্গত সামগ্রীর পরিপূরণের প্রয়াস। এতদ্ব্যতীত জল-পানের আর কি প্রয়োজনীয়তা আছে? সর্ব্বদাই সরস সামগ্রী আহার করিলে জলের কোনই প্রয়োজন হয় না। আর একটী কথা বলিয়া রাখি ;—জলের উপাদান কি?—দুই ভাগ হাইড্রোজেন ও এক ভাগ অক্সিজেন। এতদুভয়ের সমন্বয়ে জলের উৎপত্তি। কিন্তু উক্ত দুইটী মৌলিক সামগ্রীই বাস্পীয় পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে। উক্ত বাস্পীয় পদার্থদ্বয় সর্ব্বদাই শরীর হইতে নির্গত হইতেছে। উদ্ভিদ্ যতই রস আহরণ করুক, সে সকলই শীঘ্র বা বিলম্বে ত্যাগ করে। যত আহরণ, যদি ততই বিস্ফুরণ হয়, তাহা হইলে দেহরক্ষা হয় কিরূপে?

উদ্ভিদ্‌গণ রস আহরণ করে, কিন্তু আহরণ করিবার পূর্ব্বে সে রসকে কৃত্রিম উপায়ে বিশুদ্ধ না করিলে, তাহার মধ্যে অনেক সামগ্রী থাকিতে দেখা যায়। উদ্ভিদ্ যখন মাটী হইতে রস আহরণ করে, তখনই সেই রসের সহিত মৃত্তিকান্তর্গত রাশি রাশি সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম খাদ্য দ্রব্য আহরণ করিয়া আপনার শরীর-মধ্যে রক্ষা করে। মাটীবিশেষে খাদ্যের তারতম্য হইয়া থাকে ; এই জন্য আমরা দেখিতে পাই, কোনও জমীতে গাছ মরিয়া যায় ; আবার কোনও জমীতে গাছের শ্রীবৃদ্ধি হয়। উষর বা লোণা মাটীতে কোনও উদ্ভিদই জন্মে না ; কিন্তু মিঠেন জমীতে সারাল মাটীতে তাহার কি সুন্দর শ্রীই হয়! একটী কাঁচের গেলাসের মধ্যে পৃথক্‌ভাবে দুই তিন প্রকারের মাটী কিংবা সার রাখিয়া দিলে

অল্পদিনের মধ্যে দেখা যাইবে যে, শাখিমূলগণ (Secondary roots) ও তন্তুমূলগণ (Lateral or fibrous roots) অপেক্ষাকৃত সারবান্ মাটী বা সারের দিকে ধাবিত হয়, এবং সেইখানেই যেন রেণ্ড-ভাটের মতন গুলতান করে। সেই মাটীর কোনও স্থানে কোনও তীব্র কষায় পদার্থ—যথা, চূণ কিংবা তুঁতে রাখিয়া দিলে মূলগণ কিছুতেই সে দিকে যাইবে না। লাউ, কুমড়া, শশা, ঝিঙ্গে প্রভৃতি, বা অন্য যে কোনও ভূপৃষ্ঠচারিণী লতিকার গমনপথে ঐরূপ কোনও সামগ্রী থাকিলে, সে ডগা সে দিকে অগ্রসর না হইয়া অন্য দিকে ফিরিবে। ইহাকে উদ্ভিদের বিচারশক্তি বলিতে হইবে; ভৌতিক বা নৈমিত্তিক কারণ ফল বলিলে চলিবে না।

ধূম, ধূলা, বা কর্দ্দমের সংস্পর্শে উদ্ভিদ্ ক্লেশ পায়। বড় বড় সহরের গাছপালা তাদৃশ তেজাল বা সুশ্রী হয় না; কারণ, এরূপ স্থানে রাস্তার ধূলা এবং নানাবিধ কলের চিম্‌নীর ধূমে বায়ুমণ্ডল নিরন্তর কলুষিত হইয়া থাকে। ঈদৃশ বায়ু আহরণ করিতে আমাদিগকে কত কষ্ট পাইতে হয়। অনেক সময়ে শ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হয়। এরূপ স্থানে উদ্ভিদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়; কারণ, উদ্ভিদ্‌ও সেই ধূলি, ধূম ও নানাবিধ বিষাক্তপদার্থমিশ্রিত বাতাস আহরণ করিতে পারে না। তাহা ব্যতীত, বায়ুমণ্ডলের সেই সকল আবর্জ্জনা দ্বারা উদ্ভিদ্‌গণের শ্বাসকূপ সকল (Stomata) রুদ্ধ হইয়া যায়। ফলতঃ শ্বাস-প্রশ্বাসের শক্তিই কমিয়া যায়। সহরের ধূলা-ধূম-মণ্ডিত উদ্ভিদ্‌কে দেখিলেই নির্জীব ও বিষণ্ণ মনে হয়। কিন্তু তাহাকে উত্তমরূপে স্নান করাইয়া দিতে পারিলে, ক্ষণকালমধ্যেই তাহার শরীরে প্রফুল্লতার আবির্ভাব হয়। একটী গামলার গাছ লইয়া পরীক্ষা করিলে ইহা সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। যে উদ্ভিদ্‌কে প্রতিদিন স্নান করাইয়া দেওয়া হয়, সে রোজই প্রফুল্ল থাকে, এবং দর্শককেও প্রফুল্লতা দান করে। উদ্ভিদ্‌শালার (Conservatory) মধ্যে যে সকল উদ্ভিদ্ রক্ষিত হয়, তাহাদিগের অবয়বে অধিক ধূলাদি লাগিতে পায় না; চারি দিক আবৃত থাকিবার ফলে গৃহমধ্যে অধিক ধূম বা ধূলা প্রবেশ করিতে পায় না। এই সকল কারণে উদ্ভিদ্‌শালার গাছমাত্রই তাহাদের বহির্দ্দেশস্থ বন্ধুগণ অপেক্ষা সুখে ও স্বচ্ছন্দে থাকে। আর এক কথা,—উদ্ভিদশালা ভাগ্যবান্ সৌখীনের সখের উপকরণ; এ জন্য তথাকার উদ্ভিদ্‌গণের লালনপালনের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকে। প্রতিদিন সকল গাছের উপর জল দেওয়া হয়; ইহাতেই গাছের স্নান হয়। উদ্ভিদ্‌শালার মধ্যে প্রবেশ করিলেই প্রফুল্লতার প্রবল তরঙ্গ আসিয়া যেন দর্শকের হৃদয়ে আঘাত করে।

যেমন অতিশয় শীতে উদ্ভিদের কষ্ট হয়, তেমনই অতি গ্রীষ্মেও তাহার ক্লেশ আছে। প্রচণ্ড উত্তাপের সময় গাছের সে রসালভাব বা ঔজ্জ্বল্য থাকে না। পত্রনিচয় বিশেষতঃ নবোদ্গত কোমল পত্র ও ডগাগুলি ভূপৃষ্ঠাভিমুখে ঝুঁকিয়া পড়ে, এবং সে অবস্থায় তাহাদিগের সে সুচিক্কণ দৃশ্য থাকে না। কিন্তু সেই উদ্ভিদ্‌টীকে গৃহমধ্যে লইয়া গেলে, কিংবা কোনরূপে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলে, তাহার পূর্ব্বভাব বিদুরিত হয়, পুনরায় সে তাজা হইয়া উঠে।* গাছপালা মাঠ-ময়দানে থাকে বটে, কিন্তু তাহাদিগের ভোগস্পৃহা যে নাই, তাহা কিরূপে বলিব? মাঠ-ময়দানের উদ্ভিদ্‌গণ পুরুষানুক্রমে অনাবৃত স্থানে থাকে; তাই তাহাদিগের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তাহারা শীতাতপসহ হয় সুতরাং বহির্দ্দেশের অনেক আপদ—অতিশীত, অতিগ্রীষ্ম প্রভৃতি সহনের উপযোগী হইয়া উঠে। কঠোর শীতে, প্রচণ্ড রৌদ্রে, বা অবিরাম বর্ষায় মেঠো-কৃষক অনায়াসে মাঠে কাল কাটাইতে পারে; কিন্তু অনভ্যস্ত ভদ্রলোক তাহা পারে না। অভ্যাসফলে জীবনের শক্তি স্বতন্ত্র হইয়া যায়। শীত ও শিশির হইতে রক্ষার্থ যেরূপ সার্সীগৃহ আছে, উত্তাপ ও বর্ষার প্রাখর্য্য হইতে উদ্ভিদ্‌দিগকে রক্ষা করিবার জন্য সেইরূপ স্বতন্ত্র গৃহ আছে। তাহার দেশী নমুনা পানের-বরোজ; বিলাতী অনুকরণ, গ্রীষ্মাবাস বা (Summer house) আছে।

গ্রীষ্মকালের প্রখর রৌদ্রে সন্তপ্ত হইলে, একটু শীতল বারি স্পর্শ করিলে কত আরাম হয় আবার যেন নবজীবন পাই! উত্তাপতপ্ত কোনও উদ্ভিদ্‌কে গৃহে আনিয়া বারি দান করিলে তাহার যে সুখ হয়, তাহা তখনই বুঝিতে পারা যায়। এই সকলের পর্য্যালোচনা করিতে হইলে সূক্ষ্ম দৃষ্টির প্রয়োজন। সে দৃষ্টি যাহার নাই, তাহার সম্মুখে নরহত্যা হইলেও তাহার গুরুত্ব সে উপলব্ধি করিতে পারে না।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

নরবলি।

১

দেবতাই হউন, আর মনুষ্যই হউন, কাহাকেও সন্তুষ্ট করিবার, কিংবা কাহারও নিকট হইতে কার্য্য উদ্ধার করিবার প্রধান উপায়—কিছু নজর বা সেলামী প্রদান, তাবায় বলি, 'প্রণামী।' মানব জাতির—সমগ্র মানবজাতির না হউক,

আর্য্য জাতির—সর্ব্বপ্রথম রচনা, বেদ; বেদেও আমরা দেখিতে পাই, ঋষিগণ হোমানলে আহুতি দিতে দিতে গায়িতেছেন,—"হে ঠাকুর, আমর প্রদত্ত এই সোমরস পান কর, হবিঃ ভোজন কর আর আমাকে ধন; দাও, [illegible]পদ দাও, স্ত্রী দাও, পুত্র দাও, গরু দাও, শস্য দাও, আমার শত্রুকে পরাস্ত কর।"

এখনকার দিনেও আমরা আমাদের অভীষ্ট দেবতাকে ষোড়শোপচারে পূজা অর্পণপূর্ব্বক ফুল-চন্দন-হস্তে মন্ত্র পাঠ করি,—

"রূপং দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে।
পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্ব্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে॥"

আর 'বড়দিন' উপলক্ষে মনিব-দেবতার পাদপদ্মে বড় বড় ভেট্‌কী মাছ ও মর্ত্তমান কলার কাঁদী ও মিঠাই-মণ্ডার ডালি ঢালিয়া 'অন্নগ্রাসী বঙ্গবাসী স্তন্যপায়ী জীব' আমরা কাকুতি মিনতি করি,—

'চাক্‌রীং দেহি Bonus দেহি উপ্‌রিং কিছু কিছু দেহি মে।'

জগতের ইতিহাসে দেখা যায়, সকল প্রাচীন জাতিই—কি সভ্য, কি অসভ্য, সকলেই বলি বা উপহার লইয়া দেবতার সন্নিহিত হইতেন। আমাদের প্রাচীন কাব্য নাটকেও দৃষ্ট হয়, রিক্তহস্তে দেবদর্শন বা রাজদর্শন করা চলিত না। দেব-অর্চ্চনায় বলি—নরবলি, পশুবলি (জন্তুবলি বলাই ঠিক; কেন না, মৎস্য, পক্ষীও ইহার ভিতর আছে,) বা শস্যবলি পূজার অঙ্গ বলিয়া বহু পুরাকাল হইতে প্রচলিত। পৃথিবীর সকল দেশেই, কি গৃহদেবতার পূজায়, কি সাধারণ যজ্ঞস্থলে, বরাবর যে সকল উপকরণ মনুষ্যের জীবনধারণোপযোগী, সেই সকল দ্রব্যই দেবতাকে উপহার প্রদত্ত হইত; যথা—ফল, মূল, শস্য, মদ্য, মাংস ইত্যাদি। এই সকল সামগ্রী, যাহা দেবতাকে উপহার প্রদত্ত হইত, অথবা দেব-প্রসাদ বলিয়া উপাসকগণ কর্ত্তৃক উপভুক্ত হইত, এই সমস্ত ভক্ষ্য ভোজ্য উপকরণ 'বলি' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। হিন্দুদিগের নৈবেদ্যও বলি; দেবতার নিকট নৈবেদ্য নিবেদনও বলিদান। তবে, হিন্দুজাতির মধ্যে সম্প্রদায়-বিশেষ, বলি ও বলিদান শব্দের ভিন্ন অর্থ ধরিয়া থাকেন।

সাধারণতঃ লোকের ধারণা যে, এই সকল বলি দেবগণ উপভোগ করিয়া বাস্তবিকই তৃপ্তিলাভ করেন, এবং তজ্জন্য ভক্তের অর্থাৎ প্রদাতার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন। দেবতারা এই সকল ভক্ষ্য-ভোজ্য গলাধঃকরণ করেন না বটে, অন্ততঃ তৎসমস্তের গন্ধ-আঘ্রাণে পরিতোষ প্রাপ্ত হয়েন, এইরূপ ধরিয়া লওয়া চলে। প্রতীচ্য জগতে সভ্যতার প্রথম রশ্মিতে উদ্ভাসিত

রোমানগণ ও ইহুদী ধর্ম্মযাজকগণ, সকলেই এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী ছিলেন। প্রাচ্য সাহিত্য হইতেও এই ধারণার উদাহরণ যথেষ্ট মিলে। বলির সার অংশ যজ্ঞানল হইতে সুবাসিত ধূমরূপে দেব-ধাম স্বর্গের অভিমুখে উত্থিত হইয়া দেবতার নিকট পঁহুছায়, এ বিশ্বাস যজ্ঞকর্ত্তাদিগের মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। কি প্রতীচ্য, কি প্রাচ্য,—জগতে সর্ব্বত্র সকল জাতিই মনে করিত, মনুষ্য যজ্ঞ দ্বারা দেবতাকে তুষ্ট করে, এবং দেবতা সুবর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে ধন-ধান্যে পূর্ণ করিয়া মনুষ্যের উপকারসাধন করিয়া থাকেন; এইরূপে স্বর্গে মর্ত্ত্যে আদান-প্রদান চলে। যাঁহারা ধর্ম্মের সঙ্গে একটু বিজ্ঞান মিশাইতে চাহেন, তাঁহারা কহেন,—ঘৃতভুক্ত যজ্ঞানল হইতে ধূমরাশি উৎপন্ন হয়; গাঢ় ধূমে মেঘ জন্মে; মেঘ বা পর্জ্জন্য হইতে বৃষ্টি হয়। স্বর্গপতি ইন্দ্রের নামও পর্জ্জন্য।

অতি পুরাকালে কোনও কোনও জাতির ধারণা ছিল, দেবগণ স্বয়ং এই সমস্ত যজ্ঞীয় ভক্ষ্যপদার্থ ভোজন করেন। এ বিশ্বাসও ত ছিল যে, পরলোকগত পিতৃগণ তাঁহাদের সমাধির উপর রক্ষিত উপভোগসামগ্রী উপযোগ করিয়া থাকেন। শ্রাদ্ধাদির সময় চাউল কলার পিণ্ড মাখিয়া চক্ষু মুদিয়া আমাদের ধ্যান করিতে হয়, পরলোকস্থিত আত্মীয়-স্বজন সেই পিণ্ড ভোজন করিতেছেন। শরৎকালীন তর্পণকালে সকাল সকাল জলগণ্ডূষ না দিলে হিন্দুর ঘরে প্রাচীনা গৃহিণীরা রাগ করিয়া থাকেন; সলিলাভাবে পিতৃপুরুষ ও মাতৃদেবীগণ লোকান্তরে তৃষ্ণায় টাঁ-টা করিতেছেন!

অসভ্য জাতির ধর্ম্মেও দেখা যায়, দেবগণ ও পরলোকপ্রাপ্ত আত্মীয়বর্গ ইহলোকের নিত্যপ্রয়োজনীয় বহু সামগ্রীর আবশ্যকতা অনুভব করেন; তাহার মধ্যে ভক্ষ্য-পানীয়ের আবশ্যকতাও বিলক্ষণ গুরুতর।

দেখা যাইতেছে, বলি প্রধানতঃ দেবতার নিকট উপহৃত ভোজ্য। কোনও কোনও স্থলে, বিশেষতঃ যে স্থলে দ্রব্য সকল একেবারে অগ্নিতে সমর্পিত হয়, সে স্থলে এই বলি কেবল দেবতার জন্যই নির্দ্দিষ্ট, বুঝিতে হয়। কিন্তু সচরাচর দৃষ্ট হয়, বলি উপাস্য-দেবতা ও উপাসকগণ, উভয়েরই ভোগে লাগে। বলি দেবতাকে নিবেদনান্তর উপাসকগণ দ্বারা উপভুক্ত হইয়া থাকে। প্রসাদও মহাপ্রসাদ; অবশ্য, ভক্ষ্য-জন্তু বা ফল-মূল ওষধি বলির বেলা এ কথা নিশ্চয়ই খাটে; কিন্তু অভক্ষ্য প্রাণীর বলিদানে কিংবা নর-বলির সময় এ কথা বলা কি চলে? আমরা ক্রমশঃ দেখিতে পাইব।

সেমাইট জাতিদিগের মধ্যে দেবোদ্দেশে বলি, এবং আহারের জন্য জীব-হনন,

উভয়ের মধ্যে বড় ব্যবধান নাই। হিব্রুগণ একই শব্দ উভয় অর্থেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। আরবীয়গণ আহারের উদ্দেশে কোনও পশু হনন (কোর্‌বানি) করিবার সময় যে আল্লার নাম গ্রহণ করেন, তাহা এই দেব-নিবেদনার্থ বলি-ব্যাপারেরই নিদর্শন।

দেবতা ও মনুষ্যের প্রাণ উল্লসিত করে, এমন যে সামগ্রী—সুরা, যে দেশে সুরা উৎপাদিত হয়, সে দেশে এই চিত্তমুগ্ধকর পানীয়ও দেব-উপহারে বাদ যাইত না। দেব-বলিতে মাদক-দ্রব্য-'নয়োগের প্রকৃষ্ট উদাহরণ—প্রাচীন আর্য্যজাতির সোম-যজ্ঞ; সোম-যজ্ঞে দেবতাদিগকে ভাণ্ড ভাণ্ড অমূল্য সোমরস সমর্পণ করিয়া পরিতৃপ্ত করা হইত। যজ্ঞকারীরা উল্লাসভরে গাহিয়াছেন,—"সে অমিয়ধারা পান করিলে অসুস্থ সুস্থ হইয়া উঠে, কবির কবিত্ব-উচ্ছ্বাস ফুটে, দরিদ্র মনে মনে ধন-ভাণ্ডার লুঠে!"

আর আমাদের তন্ত্র-শাস্ত্র, পূজোপকরণ পঞ্চ 'ম'কারের অন্যতম মদ্য সম্বন্ধে বিধান দিয়াছেন—

"পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পতিত্বা চ মহীতলে।
উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥"

একেবারে মোক্ষ-লাভ।

প্রতীচ্য সাহিত্যে দৃষ্ট হয় যে, প্রায় সকল জাতির মধ্যেই যজ্ঞ-কাণ্ড বা বলি ব্যাপার, শস্যসংগ্রহ কিংবা পশুবংশ-বৃদ্ধির সহিত সংস্রবযুক্ত। যে ঋতুর যে সময়ে শস্য সংগৃহীত হইত, অথবা পশুবংশ-বৃদ্ধির সম্ভাবনা ঘটিত, সেই সময়ে ফল মূলের অগ্রভাগ বা প্রথম অংশ এবং পশ্বাদির প্রথম বৎস দেবতাকে নিবেদিত হইত। কেন না, দেবতাই অনুগ্রহপূর্ব্বক মানবজাতিকে শস্য, পশু প্রভৃতি দান করিয়া জীবনধারণের উপায় করিয়া দিয়াছেন। মানবেরাও কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ অনুগ্রহ-লব্ধ সামগ্রীর অগ্রভাগ প্রদাতাকে উপহার দিত। অতএব, এখানেও যজ্ঞ বা বলি-ব্যাপার দেবতা-মনুষ্যের আদান-প্রদানের নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। আমাদের দেশে এখনও আমরা দেখিতে পাই, ঋতুর প্রথম শস্য, সময়ের প্রথম ফল, সর্ব্বাগ্রে দেবতাকে ভোগ দেওয়া হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে হিন্দুর প্রথম সন্তানকেও স্থলে স্থলে বলি-রূপে গঙ্গা-মায়ীর গর্ভে বিসর্জ্জন দেওয়া হইত।

যে সমস্ত সামগ্রী মনুষ্যের উপভোগ-যোগ্য সেই সকলই দেবতাকে বলি-রূপে অর্পণ করা হইয়া আসিতেছে। বলির ভিতর নর-বলিও দেওয়া হইত, সন্দেহ

নাই। ইহা হইতে কি অপ্রমাণ হয়? পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত,—ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, অনেক স্থলে নরবলি নর-খাদকতা-প্রবৃত্তির সহিত জড়িত। এই আচার বিজাতীয় বা শত্রুজাতীয় মানবের মাংসভক্ষণের সহিত অধিকতর সংশ্লিষ্ট। কেহ কেহ বলিয়াছেন, নরখাদক মনুষ্য, ব্যাঘ্রগণ যেমন ব্যাঘ্র-পশুর মাংস-ভক্ষণে রত নহে, সেইরূপ স্বজাতীয় বা আত্মীয় স্বজনের মাংসে উদরপূর্ত্তি করিবার জন্য ততটা লালায়িত নহে। কিন্তু শত্রুর অস্থি মাংস চর্ব্বণ করিতে পাইলে—ওঃ! সে এক স্বতন্ত্র কথা। প্রাচীন কোনও কোনও ধর্ম্মের অনেক আচার অনুষ্ঠান সময়গতিকে লোপ পাইলেও, নরমাংসভক্ষণের লক্ষণ কতক কতক ঘুণাক্ষরে জানিতে পারা যায়। বিশেষতঃ, যে সকল ধর্ম্মে, যে সকল জাতির মধ্যে মাংসভুক্ দেবতার অস্তিত্ব মিলে, সে ধর্ম্মে উপাসকগণের নরমাংসভক্ষণ প্রবৃত্তির লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

নরবলি ও নরমাংস-ভক্ষণ-প্রথা যে কেবল অতি অসভ্য বর্ব্বরজাতির মধ্যেই আবদ্ধ, এমন নহে। প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায়, সভ্য-নামে পরিচিত অনেক জাতির মধ্যে এই বীভৎস আচার প্রচলিত ছিল। বহু পণ্ডিত-লোকের মত,—প্রাচীনকালে যে প্রায় সর্ব্বদেশে নরবলি প্রদত্ত হইত, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। যাহারা নরবলি প্রদান করিত, তাহারা কোনও না কোনও সময়ে নরমাংসাশী ছিল; কারণ, নরমাংস সুখাদ্য বলিয়া বোধ না হইলে কখনই দেবতাগণের সন্তোষসাধনার্থ তাহা দিবার প্রবৃত্তি হইত না। বিশ্ব-সাহিত্যে অভিজ্ঞ অধ্যাপক ম্যাক্‌স্‌মূলার, মনিয়ার উইলিয়ম্‌স্ প্রভৃতি লিখিয়াছেন,—সভ্যতার উচ্চ অবস্থার সহিত নরবলি-প্রথা যে ঠিক খাপ খায় না, এ কথা বলা চলে না। বিশেষতঃ, যে সকল জাতি আত্মার অবিনশ্বরতায় বিশ্বাসবান্, অথচ পৃথিবীতে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা দুর্লভ ও মূল্যবান্ পদার্থ, তাহাই ইষ্টদেবতাকে উপহার দিতে একান্ত ইচ্ছুক, তাহাদের মধ্যে দেবতাকে নরবলি দিবার প্রথা বিদ্যমান থাকা আদৌ অসম্ভব নহে। জগতের ইতিহাসে প্রায় এমন কোনও জাতিই নাই, যাহার আদিম অবস্থার কাহিনীতে নরবলির কোনও না কোনও নিদর্শন না পাওয়া যায়।

আমরা দেব-ভোগের কথা বলিতে বসিয়াছি; শুধু নরমাংস-ভোজন-ব্যাপার লইয়া আলোচনা করিব না। এই লোমহর্ষণ কাণ্ডের বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। এখনও পর্য্যন্ত আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্ব্বর্ত্তী কোনও কোনও প্রদেশ-বা তৎসন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জের কোনও কোনও স্থল হইতে অসভ্য

বর্ব্বরগণ খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারক কিংবা রাজকর্ম্মচারীর অনুচরবর্গকে বাগে পাইলে ধরিয়া উদর-দেবতার ভোগে লাগাইয়া থাকে, এ সংবাদ মধ্যে মধ্যে আমাদের কর্ণগোচর হইতেছে। ইহা অবশ্য নরবলির নিদর্শন বলিয়া গৃহীত হইবার নহে। ইউরোপীয় বিখ্যাত পর্য্যাটকগণ তাঁহাদের ভ্রমণবৃত্তান্তে স্বচক্ষে দেখিয়া কিংবা দেশবাসী লোকদিগের নিকট হইতে স্বকর্ণে শুনিয়া, এই জাতীয় নরমাংস-ভোজীদিগের নানা বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অদ্যাবধি মনুষ্য নামে পরিচিত এমন সব জাতিও ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করিতেছে! কে জানে, সেই দূর পূর্ব্বকালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণও এই প্রকৃতির মানব ছিলেন কি না!

সে সব কথা থাক্। আমরা দেবতাকে প্রদেয় বলির বিষয় বলিতেছি। প্রাচীন পুরাবৃত্তে দেখিতে পাওয়া যায়,—ফিনিসিয়ানগণ (Phœnician) তাহাদের রক্তপিপাসু দেবতা 'বল' ও 'মোলকে'র নিকট তাঁহাদের রক্তপিপাসা-শান্তির নিমিত্ত সর্ব্বদা নরবলি প্রদান করিত। কার্থেজিনিয়ানগণও (Carthagenian) ঐ দেবতার উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর স্বজাতীয় কোনও ব্যক্তির রক্তে তাঁহাদের বলি-পীঠ অভিষিক্ত করিত। বলি দিবার জন্য তাহারা পরের শিশু পুষিত। কথিত আছে, একবার যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় দেবতার বৈমুখ্য মনে করিয়া, তাহারা মোলোক দেবের প্রতিমূর্ত্তির নিকট আপনাদের সমাজভুক্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের দুই শত শিশু বলি দিয়াছিল। সিদিয়ানগণ (Scythian) শত শত মনুষ্যকে এক সঙ্গে বলিদান দিয়া দেবতার নিকট ভক্তি প্রদর্শন করিত। আসিরিয়ানগণ (Assyrian) ভূমধ্যসাগরতীরস্থ অপরাপর দেশবাসীদিগের ন্যায় যখন তখন নরবলি দিত, এবং মনে করিত, এইরূপ বলিই দেবতার ঈপ্সিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপহার। ড্রুইডগণ (Druid) ইংলণ্ডে ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায়, অর্থাৎ নরওয়ে সুইডেনে নরবলি দ্বারা তাহাদের দেবতার আত্মাকে তৃপ্ত করিবার চেষ্টা পাইত। তাহারা বেত্রনির্ম্মিত প্রকাণ্ড ঝুড়ির মধ্যে অনেকগুলি মনুষ্যকে একত্র আবদ্ধ করিয়া জ্বালাইয়া দিত। এথিনিয়ান্-(Athenian)-গণের থারগেলিয়াতে সমগ্র জাতির পাপক্ষালনের উদ্দেশে একটি নর ও একটি নারীকে প্রতি বৎসর বলি দেওয়া হইত। এথিনিয়ানগণ দেশে মারীভয়, দুর্ভিক্ষ, বা তদ্রূপ কোনও দৈব-উপদ্রবের সময় সমুদ্রে ফেলিয়া দিবার নিমিত্ত কতকগুলি অকর্ম্মণ্য বাজে লোককে আলাহিদা করিয়া রাখিয়া দিত। তাহাদের বিশ্বাস ছিল, এই উপায়ে দৈব ভোগ যোগাইয়া সমগ্র জাতির পাপ বা অপরাধ ক্ষালিত হয়। মহাকবি হোমার উল্লেখ করিয়াছেন যে,—গ্রীকবীর প্যাট্রোক্লসের

সংকারকালে তাঁহার প্রেতাত্মার তৃপ্ত্যর্থ দ্বাদশটি ট্রোজান বন্দীকে হত্যা করা হইয়াছিল। বীরবর আগামেম্‌ননের দুহিতা ইফিজেনিয়াকে বলি দিবার মর্ম্মস্পর্শিণী কাহিনী অনেকেই বোধ হয়, অবগত আছেন। মেনিলেয়স্, গ্রীক-ধারণা-অনুসারে পবনদেবের তুষ্টির জন্য কতকগুলি শিশু বলিদান করিয়াছিলেন বলিয়া ইজিপ্‌সিয়ানগণ কর্ত্তৃক ধৃত হন। প্রতিহিংসা-প্রণোদিত ভক্তি দেখাইবার জন্য মহাবীর অগষ্টস্ দেবরূপে সম্মানিত তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃব্যের প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে তিন শত পেরিউসিয়া-নগরবাসীকে বলি দিয়াছিলেন, ইতিহাসে দৃষ্ট হয়। অবশ্য স্বীকার করিতে হয়, সকল বলির সহিত মহাপ্রসাদ-ভোজনের সম্বন্ধ নাই। তবে সে দৃষ্টান্তেরও অভাব ঘটিবে না।

যুদ্ধে পরাজিত বন্দিগণের মাংস বিশেষ আনন্দের সহিত ভক্ষণ—এ নিষ্ঠুর আচার সাইক্লপ্‌স্‌দিগের (Cyclops) মধ্যে প্রচলিত ছিল। হোমার বর্ণনা করিয়াছেন,—গ্রীক বীর ইউলিসিসের ছয় জন সহচর কুহকিনী স্কাইলা (Scylla) কর্ত্তৃক সাইক্লপ্‌স্‌দিগের গুহাকন্দরে ভক্ষিত হইয়াছিল। মায়াবিনী সুন্দরী সুগায়িকা সাইরেন্‌গণ (Syren) ক্যাম্পেনীয়া-তীরস্থ নরবলি-গ্রাহী দেবতার মন্দিরের পূজারিণী ভিন্ন আর কিছু নয়, ইহা অনেকের বিশ্বাস। বোধ হয়, জলমগ্ন নৌকার নাবিকগণকে বলি দিতে তাহারা যে সাহায্য করিত, সেই ঘটনা হইতেই তাহাদের দুর্নাম সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। কথিত আছে, স্যাটারন্ (Saturn) বা শনি দেবতা নিজ সন্তান ভক্ষণ করিতেন। অপ্‌স্ (Ops) দেবেরও এই দুষ্প্রবৃত্তি ছিল; এই দেবতার মন্দিরে কচি শিশু বলি দিবার প্রথাই এই নিষ্ঠুর আখ্যানের মূল বলিয়া মনে হয়। আরিষ্টটল (Aristotle) দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপের এক জাতির পরিচয় দিয়াছেন। তাহারা গর্ভবতী স্ত্রীলোকের উদর চিরিয়া ভ্রূণ বাহির করিয়া লইয়া ভক্ষণ করিত! ক্রীট দ্বীপে যজ্ঞবিশেষ উপলক্ষে জীবন্ত প্রাণীর গাত্র হইতে খণ্ড খণ্ড মাংস দন্ত দ্বারা কামড়াইয়া ছিঁড়িয়া লওয়া হইত। কীয়স্ দ্বীপে ডাইয়োনিসস্ (Dionisus) দেবের নিকট বলি দিবার উদ্দেশ্যে কোনও মনুষ্যের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিন্ন করিয়া লওয়া ধর্ম্মানুমোদিত বিধি বলিয়া প্রচলিত ছিল।* কথিত আছে, সঙ্গীতগুরু আর্ফিয়স্ (Orpheus) সর্ব্বপ্রথমে এই নৃশংস অনুষ্ঠান রহিত করাইয়া দেন। কাহারও কাহারও মতে, তিনি কেবল আম-মাংস-ভোজনের প্রথা রহিত করিয়াছিলেন; কিন্তু এই ভীষণ আচার একেবারে উঠাইয়া দিতে পারেন নাই। ডাইডোরাস্ জানাইয়াছেন,—ইজিপ্টের অধিপতিগণ পুরাকালে রক্তবর্ণ বা কটা-কেশ-বিশিষ্ট

মনুষ্য পাইলেই তাহাদের অসিরিস্ (Osiris) দেবতার নিকট বলি দিতেন। সাইপ্রস্ দ্বীপের অধিবাসিগণের প্রসঙ্গে হিরোডোটাস্ বলিয়াছেন, এই স্থানের অধিবাসীগণ চিরকুমারী আর্টেমিস্ দেবীর (Artemis) উপাসনা করিয়া থাকে; দুর্ভাগ্যক্রমে যে সকল মনুষ্য এই দ্বীপের উপকূলে ভগ্নজলযান হইয়া উপনীত হয়, তাহাদের সকলকে ধরিয়া দ্বীপবাসীরা সেই কুমারী দেবীর নিকট বলি দেয়।

জর্ম্মান্ জাতি ও নরওয়েবাসীদিগের মধ্যে এক সময়ে নরবলি দিবার রীতি বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল। নদী-পারাপারের সময় স্ত্রীলোক বলি ও শিশু বলি দিবার প্রথা ফ্র্যাঙ্ক জাতির মধ্যে পূর্ব্বকালে দেখা যাইত। এই আচার গ্রীক্‌দিগের মধ্যেও খুব চলিত ছিল। একবার দুর্ভিক্ষের সময় যখন অন্যান্য নানা বলি কোনও ফলদায়ক হইল'না তখন সুইডেনবাসীরা আপনাদের রাজা ডোমাল্ডিকেই বলি প্রদান করিয়াছিল। নরওয়ে দেশের প্রাচীন ইতিহাসে আছে, রাজা ওইন (Oen) নিজের দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া প্রধান দেবতা ওডিনের (Odin) নিকট উপর্য্যুপরি নিজের নয়টি পুত্রকে বলি দিয়াছিলেন।

দক্ষিণ আমেরিকার পেরুদেশবাসিগণ নর বলিতে বিশেষরূপ অভ্যস্ত ছিল। ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ (খৃষ্টীয়) শতাব্দীর মধ্যে পেরুদেশে ইন্‌কাস্ (Incas) নামে এক সম্প্রদায় শাসক ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যখন কোনও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি দুঃসাধ্য রোগে আক্রান্ত হইতেন, তখন দেবতার নিকট আরোগ্য প্রার্থনা করিয়া তাঁহারা নিজের পুত্রকে বলি দিতেন। উত্তর আমেরিকার মেক্সিকোবাসী পিতামাতারা তেজকাট্‌লিপোকা ঠাকুরের সম্মুখে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ কন্যাটিকে বলি দিয়া পুণ্য অর্জ্জন করিতে লেশমাত্র দ্বিধা করিত না।

আমেরিকা মহাদেশের প্রাচীন বিবিধ জাতির মধ্যে আজটেক্ (Aztec) জাতিই সর্ব্বাপেক্ষা সভ্য বলিয়া পরিচিত ছিল; কিন্তু এই আজটেক্‌গণ নরবলি প্রথায় এতদূর মাতিয়াছিল যে, অতি নিকৃষ্ট অসভ্যদিগের মধ্যেও সেরূপ হইলে লজ্জা ও ঘৃণার বিষয় দাঁড়ায়। দেশে অনাবৃষ্টি ঘটিলে শিশু বলিদান, রাজ-অভিষেকাদির সময়—এমন কি, যে কোন উৎসবের সময়, তাহারা প্রচুর পরিমাণে নরবলি প্রদান করিত। আজটেক্‌গণ শুধু তাহাদের দেবতার নিকট বলি দিয়াই নিরস্ত থাকিত না; যুদ্ধের পর বলিরূপে নিহত বন্দীর মৃতদেহের যেরূপ ব্যবস্থা করিত, শুনিলে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। যে বীর যে যোদ্ধাকে বন্দী করিতেন, বন্দীকে দেব-সমীপে বলি দিবার পর, তাহার মৃতদেহ সেই

বীরের হস্তে সমর্পিত হইত। সেই দেহ নানাবিধ মশলাসংযোগে পাক হইত; তখন সেই বিজয়ী বীর এক প্রীতিভোজনের অনুষ্ঠান করিয়া বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে সেই পক্ক মাংস পরিবেশন করিতেন! আমাদের মনে রাখিতে হয়, এই প্রীতি-ভোজ বুভুক্ষা-পীড়িত আম-মাংসভোজী বর্ব্বর নরখাদকদিগের জঘন্য খাদ্যগ্রাস নহে, পরন্তু ইহা সভ্য নামে পরিচিত এক বিশিষ্ট জাতির মহা-সমারোহের আমোদের ভোজ। সে ভোজে সভ্যতাভিমানী পুরুষ ও স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত আহ্লাদের সহিত যোগ দিতেন! নানাবিধ চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় সে ভোজের উপাদানরূপে বিরাজ করিত; কিন্তু তাহার ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয় ভোজ্য থাকিত,—সেই নরমাংস-ব্যঞ্জন!

আসিয়া মহাদেশের মঙ্গোলিয়াবাসিগণ মনুষ্যের কর্ণ অম্বলে ভিজাইয়া রাখিয়া মধ্যে মধ্যে আস্বাদ গ্রহণ করিতেন; ইহা তাঁহাদিগের বড় মুখরোচক চাট্‌নী ছিল। বোর্ণিও দ্বীপের অধিবাসী ডায়াকগণ (Dyak) এতই মানব-মুড়ির ভক্ত ছিল যে, নানা স্থান হইতে তাহারা মনুষ্যের মুণ্ড সংগ্রহ করিয়া বেড়াইত। মধ্যযুগে দক্ষিণ পূর্ব্বের চীন ও জাপানবাসীরা যুদ্ধে ধৃত বন্দীদিগের রক্ত পান করিত, এবং মাংস ভক্ষণ করিত; লিখিত আছে, তাহাদের নিকট এই মাংসই সুখাদ্যের সেরা বলিয়া পরিগণিত ছিল। দক্ষিণ-ভারতে ও সিংহল বা লঙ্কাদ্বীপে 'রাক্ষস' নামে এক নরভুক্ জাতিই ছিল। তাতার, তুর্ক ও তিব্বতীয় জাতি, এবং যাবা, সুমাত্রা, আণ্ডামান দ্বীপবাসী,—ইহাদের নরমাংসভক্ষণে প্রসক্তির কথা পর্য্যাটকগণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; কাহারও ছিল দেবতা, কাহারও বা অপদেবতা।

মেক্সিকো দেশে উপাসকগণ পূজার পর পূজার দেবতার মিষ্টান্ননির্ম্মিত মূর্ত্তি ভক্ষণ করিত; কিংবা কোনও মনুষ্যকে দেবতার প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া তাহাকে বধ করিয়া তদীয় মাংস ভোজে লাগাইত। দেবতাকেই উদরে পূরিবার উদ্যোগ!

প্রাচীন ইহুদী জাতি তাহাদের প্রতিবেশী অপরাপর জাতি অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন; কিন্তু নরবলি-প্রথা তাঁহাদের মধ্যেও যে আদপে চলিত ছিল না, এমন নহে। আব্রাহাম ঈশ্বরের নিকট নিজ পুত্রের পরিবর্ত্তে মেষ বলি প্রদান করিয়াছিলেন, ইহা বাইবেলের প্রসিদ্ধ কথা। জেপ্‌থা তাঁহার 'মানত' অনুসারে আপন দুহিতাকে বলি দিয়াছিলেন।

প্রাচীন রোমান্ [illegible]ত্বের সময়ে রোমের অধীন বহু মন্দিরে নরবলি দেওয়া

হইত; হাড্রিয়ান ভূপতির সময় খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

ক্রমশঃ নরবলি-কাণ্ডে প্রতিনিধি-নিয়োগ,—এই আচারের বহুল প্রচার সকল প্রাচীন ধর্ম্মে সকল জাতির মধ্যে দৃষ্ট হয়। রোমানগণ যথাবিধি বলি সংগ্রহ করিতে না পারিলে, ময়দার বা মোমের প্রস্তুত প্রতিমূর্ত্তি তৎস্থলীয় করিয়া কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেন; অথবা ধরিয়া লইতেন, যেন মেষই হরিণ, ছাগই বৎসতর, ইত্যাদি।

উপযোগের কথা ছাড়িয়া দিলে বুঝিতে পারা যায়, মনুষ্যের পাপক্ষালন বা অপরাধ-শাস্তি, কিংবা মনুষ্যের উপর দেবতার রোষ-প্রশমন,—এই সকলের জন্য দেবতার উদ্দেশে নরবলি আবশ্যক হইত। ইহাও দেখা যায়, অনেক স্থলে দেবতা, অন্য প্রাণের পরিবর্ত্তে এক প্রাণ গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট; অথবা একটি সমগ্র সম্প্রদায়ের স্থলে বাছা বাছা গুটিকতক জীবন গ্রহণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন;—অবশ্য এই গুটিকতক জীবন অপরাধী ব্যক্তিগণের আত্মীয় স্বজনের হওয়া চাই। দেখিতে পাওয়া যায়, হত্যা-প্রতিশোধে হত্যাকারীর কোনও আত্মীয়কে নিহত করিতে পারিলে আত্মা চরিতার্থ হয়। রক্তের বিনিময়ে রক্তপাত করিতে পারিলে জিঘাংসাবৃত্তি পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। বোধ হয়, এইরূপ কারণবশতঃই এই সকল নির্ম্মম আচার ব্যবহারের প্রচলন। আত্মার চরিতার্থতাই দেবতৃপ্তির নিদর্শন বলিয়া বিবেচিত হইত।

ইহাও আমাদের বুঝিতে বাকি থাকে না যে, জাতি সকল যেমন সভ্যতার সোপানে উন্নীত হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে এই সকল বীভৎস আচার ব্যবহার পরিত্যাগ কিংবা পরিবর্ত্তনের দিকে তাহাদের প্রবৃত্তি জন্মে। তখন হয় তাহারা বলির জীবের একেবারে প্রাণনাশ না করিয়া কোনও উপায়ে তাহার রক্তপাত করিয়া, সেই রক্ত দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করে; অথবা বলি-স্থলে প্রতিনিধি দ্বারা কর্ম্মসাধনের বিধি মানিয়া লয়। প্রাচীন ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, গ্রীকগণ আর্টেমিস্ অর্থিয়া (Artemis Orthia) দেবীর বলি-পীঠে স্পার্টান্ বালকগণের প্রাণনাশ না করিয়া কোনরূপে তাহাদের কিঞ্চিৎ দেহরক্ত বাহির করিয়া লইয়া কাজ সারিতেন। রোমান্গণ মানিয়া (Mania) দেবীর নিকট নরবলি-স্থলে প্রতিমূর্ত্তি চালাইতেন, এবং সাংবৎসরিক পাপ-ক্ষালন যজ্ঞে খড়ের পুতুল গড়িয়া টাইবর নদীতে নিমজ্জিত করিতেন।

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, লোকের ধারণা দাঁড়াইয়াছে, মনুষ্যজীবনের পরিবর্ত্তে পশুজীবন বলিরূপে গ্রহণ করিয়া দেবতারা পরিতৃপ্ত হয়েন। আমরা

ঐতিহাসিক গ্রন্থে দেখিতে পাই, ইজিপ্সিয়ানগণ বলির পশুর গলদেশে পাশ-বদ্ধ পাতিতজানু সখড়্গা উপবিষ্ট মনুষ্যের প্রতিকৃতির ছাপ মারিয়া দিতেন। অনেক স্থলে ইহাও দেখা যায় যে, যে পাপ ক্ষালিত করিতে হইবে, মহা আড়ম্বর-সহকারে সেই পাপ বলির পশুর মস্তকে আরোপিত হইতেছে।

প্রাচীন সকল জাতির মধ্যে, বোধ হয়, পারসীকগণই একমাত্র জাতি, যাঁহাদিগের নরবলিতে আসক্তি দেখা যায় না। ইঁহাদের ধর্ম্মে কোনও বলিই নাই। প্রাচীন পারস্যবাসিগণ তাঁহাদের দেবযজন কেবল মন্ত্রোচ্চারণ বা উপাসনা দ্বারাই নিষ্পন্ন করিতেন; তাঁহারা বলিরূপে কোনও সামগ্রী দেবতাকে অর্পণ করা আবশ্যক মনে করিতেন না; তাঁহাদের দেবগণ কোনও জড় পদার্থের লোভী ছিলেন না। [তাঁহাদের দেবতা কিন্তু আমাদের অসুর !]

ভারতবাসিগণের মধ্যে বৈদিককালে ও পৌরাণিক যুগে,—এমন কি, অপেক্ষাকৃত আধুনিক তান্ত্রিক বিধানেও নরবলির প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। সে কথা পরে বলিব।

অধিক দিনের কথা নয়, মধ্যযুগে মহম্মদের অন্তর্দ্ধানের পর, তাঁহার ধর্ম্মাবলম্বী ধর্ম্মপ্রচারকগণ এক হস্তে কোরাণ ও অপর হস্তে তরবারি গ্রহণপূর্ব্বক জগতে যে ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশে কাফের বলি দিতে সদলবলে বহির্গত হইয়াছিলেন, তাহাও কি তাঁহাদের মতে ভগবানের তৃপ্ত্যর্থ নরবলির নিদর্শন নহে? সেও ত ধর্ম্মের নামে কোটী কোটী নরহত্যা!

ইউরোপীয় খ্রীষ্টিয়ানগণের ক্রুসেড্ (Crusade) নামক ধর্ম্মযুদ্ধে প্রভু যীশু খৃষ্টের জন্মভূমির নিকটবর্ত্তী স্থান কতবার রক্তস্রোতে প্লাবিত হইয়া গিয়াছে!—কত সহস্র সহস্র লোককেই না প্রাণ উৎসর্গ করিতে হইয়াছে! সেও ত ধর্ম্মের নামে অসংখ্য প্রাণনাশ! তাহাও কি নরবলি-বিশেষ নহে?

মধ্যযুগে রোমান্-ক্যাথলিক সম্প্রদায় ইন্‌কুইজিসন (Inquisition) নামক ধর্ম্মবিচারালয়ের সাঙ্ঘাতিক কাণ্ডে কত শত নিরপরাধ প্রটেষ্টাণ্ট নরনারীকে জীবন্ত অবস্থায় অগ্নিমুখে সমর্পণ করিয়া কি নৃশংসতার পরিচয়ই না দিয়াছিল! সেও ত ধর্ম্মের দোহাই দিয়া প্রাণ লইয়া হেলাফেলা! তাহাকেও নরবলি ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

সেণ্ট্ বারথোলোমিউ (Saint Bartholomew) হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি মনে পড়িলে, ধর্ম্মান্ধ মানবেরা ধর্ম্মের নামে কিরূপ অধর্ম্ম-আচরণেও প্রবৃত্ত হইতে পারে, তাহা দেখিয়া, বিস্ময়াভিভূত হইতে হয়।

এই সকল হইতে বুঝা যায়, সভ্যতার উচ্চস্তরে অবস্থিত ও দয়াপ্রধান উদার-ধর্ম্মের অনুসারী হইলেও, মনুষ্য ধর্ম্মের দোহাই দিয়া বহুসংখ্যক স্বজাতির প্রাণ অকাতরে বিনাশ করিতে পরাঙ্মুখ হয় না। পৃথিবীতে ধর্ম্মনিবন্ধন যত যন্ত্রণা-প্রদান, যত শোণিতপাত, যত প্রাণসংহার হইয়াছে, এত আর কিছুতে হইয়াছে কি না সন্দেহ। সভ্যতার আদিযুগে আর্য্য ও অনার্য্যগণের সংঘর্ষ, হিন্দু ও ইরাণীগণের বিরোধ হইতে আরম্ভ করিয়া সেদিনকার হিন্দু-বৌদ্ধ-দ্বন্দ্ব পর্য্যন্ত তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে! * ক্রমশঃ।

শ্রীঅনাথকৃষ্ণ দেব।

খাস-মুন্সী র নক্সা

প্রথম অধ্যায়।

হুগলী জেলার সোমড়া সুখরীয়া গ্রামে সম্ভবতঃ ১৮১৭—১৮১৮ খৃষ্টাব্দে আমার পিতার জন্ম হয়। তিনি অতি দরিদ্রের সন্তান। পিতামহ মহাশয় শ্বশুরালয়ে "ঘরজামাই" ছিলেন। পিতৃদেবের পাঁচ ভাই। শুনিতে পাই, পরিবার বৃহৎ, দুই বেলা গৃহে প্রায় ৫০ খানা পাত পড়িত। বড় জ্যেঠামহাশয়ের সময়ে সে কালের হিসাবে অবস্থা একটু স্বচ্ছল হইয়াছিল। তিনি সোমড়া গ্রামের মুস্তফী জমীদারদের সংসারে চাকরী করিতেন। বেতন যদিও সামান্য ছিল, কিন্তু এখনকার মত জিনিসপত্র দুর্ম্মূল্য ছিল না বলিয়া এক প্রকার বেশ চলিয়া যাইত। আমার বড় জ্যেঠার জ্যেষ্ঠ পুত্র জমীদারী কার্য্যে অদ্বিতীয় ছিলেন, এবং তাঁহার কৃত একটি পুষ্করিণী সুখরীয়ায় এখনও বর্ত্তমান। উহার নাম "পদ্ম-পুকুর"। তাঁহার নাম ছিল পদ্মলোচন। তাঁহার নামেই পুষ্করিণীর নামকরণ হইয়াছিল কি না, বলিতে পারি না। আমরা বহুকাল দেশছাড়া। আমি ও আমার জ্যেষ্ঠ কেবল একবার জীবনে এই পুণ্যভূমি জন্মভূমি দেখিতে গিয়াছিলাম। পরিচয়ে কেহই চিনিতে পারিল না। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে দেশ জঙ্গল হইয়া গিয়াছে, এবং পুরাতন লোক প্রায় সকলেই মরিয়া গিয়াছেন; সুতরাং বহুকাল দেশান্তরিত লোকের সন্তানদের কে চিনিতে পারিবে? কেবল এক জন ৬০।৭০

* সাহিত্য-সম্মিলনের গত অধিবেশনে পঠিত

বৎসরের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন যে, ছেলেবেলায় অমুক চট্টোপাধ্যায়ের নাম শুনিয়াছিলাম বটে। এই 'অমুক' আমাদের পিতামহ।

১৮৩২ সালে যে বন্যা হয়, সেই সময় আমাদের বড় জ্যেঠা লোকান্তরিত হন, এবং আমাদের পুরাতন ভিটা গঙ্গাগর্ভে লীন হয়। সে সময় আমাদের পরিবারে অত্যন্ত দুর্দ্দশা হইয়াছিল। আমার পিতৃদেব ও সেজ জ্যেঠামহাশয় শেষাবস্থায় কথনও কথনও তাহার গল্প করিতেন, এবং সেই কষ্ট মনে করিয়া অশ্রুপাত করিতেন ইহার কিছুদিন পরে গ্রামস্থ জমীদার মহাশয়দের অত্যাচারে সেজ জ্যেঠামহাশয় পশ্চিমদেশে আগমন করেন। মেজ জ্যেঠামহাশয় বিবাহের এক বৎসর পরেই ইহলোক পরিত্যাগ করেন। আমার পিতৃদেব ১৭।১৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে গ্রামের জমীদার কাশীগতি মুস্তফী মহাশয়ের সহিত নৌকাযোগে পশ্চিমোত্তর দেশে আগমন করেন, এবং প্রয়াগে সেজ জ্যেঠামহাশয়ের নিকট রহিলেন। এখানে আসিয়া প্রথম ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিলেন। সেজ জ্যেঠার বেতন সামান্য; সুতরাং তিনি যে কনিষ্ঠকে ভাল করিয়া শিক্ষা দেন, এরূপ সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। সুতরাং অতি অল্পকালমাত্র যৎকিঞ্চিৎ ইংরাজী শিক্ষা পাইয়া পিতৃদেবকে উদরান্নের চেষ্টা করিতে হয়। প্রথমে অহিফেনের কুঠীতে ১৫৲ টাকা বেতনে একটী চাকরী প্রাপ্ত হইলেন। এই চাকরী তাঁহাকে ৮।১০ বৎসর ধরিয়া করিতে হয়। পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পিতার কাশীতে বিবাহ হয়। আমার পিতামহ বিখ্যাত দেশমান্য রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তীর সন্তান—মুখ্য কুলীন। তাঁহার নিবাস গোয়াড়ী-কৃষ্ণনগর। তিনি শান্তিপুরে নেদেরপাড়ার মহেশনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভগিনী শ্রীমতী নৃত্যকালী দেবীকে বিবাহ করিয়া স্বকৃতভঙ্গ হন। এই হিসাবে আমরা স্বকৃতভঙ্গের দৌহিত্র। বিবাহের অল্পকাল পরেই আমার মাতামহী দেবী বিধবা হন। তথন আমার মাতৃদেবী নয় মাস গর্ভে। মাতামহী দেবী ভ্রাতাদিগের নিকট প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। কথনও শ্বশুরঘর করেন নাই। পরে তিনি আমার মাতৃদেবীকে লইয়া অতি দীন-হীনভাবে কাশীতে আসেন, এবং পুরাতন কাশীবাসী মহেশ কেরাণীর বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সে সময় মহেশ বাবুর কাশীতে বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। তথন কেরাণীগিরী চাকুরী এখানকার মত হেয় হয় নাই। সুতরাং মহেশ বাবু ইংরাজের চাকর বলিয়া তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল।

মাতৃদেবীর বয়স যথন দশ বৎসর, তথন তাঁহার বিবাহ হয়। "যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে।" আমার যেমন দরিদ্র পিতা, ততোধিক দরিদ্রের কন্যা মাতা।

পিতা ১৫টী টাকা মাহিনা পান। মাতামহীর এমন সামর্থ্য নাই যে, একখানি ভাল কাপড় পরাইয়া কন্যাটীকে দান করেন। শুনিয়াছি, দিদিমা একখানি জেলেকাচা কস্তাপেড়ে কাপড় পরাইয়া মাতাকে পিতৃদেবের হস্তে সমর্পণ করেন। এ কথা আমার যখন মনে পড়ে, তখন আমি অশ্রুসংবরণ করিতে পারি না। আমি তাঁহাদের অতি মূঢ় ও অযোগ্য সন্তান। তাঁহাদের জীবিতাবস্থায় আমি তাঁহাদের কোনরূপ সেবা শুশ্রূষা করিতে পারি নাই। তাঁহারা এখন স্বর্গধামে। জগতের সমস্ত সুখ-দুঃখের অতীত। আমি ঘোর পাপী, অনুতাপে দগ্ধ হইতেছি, এবং তাঁহাদের শ্রীচরণে সর্ব্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

অত্যন্ত দারিদ্র্যনিবন্ধন মাতামহী দেবী পিতৃদেবেরই আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিবাহের পর পিতৃদেব প্রয়াগের নিকট ফতেপুর নামক স্থানে বদলী হন, এবং জজের আদালতে ২৫৲ টাকা বেতনের চাকরী পান। এই জজের আদালতের চাক্রী তিনি ৩০ বৎসরাবধি করিয়া শেষে ১৮৭১।৭২ খৃষ্টাব্দে ২০৲ টাকা মাত্র পেন্‌সন্ পাইয়া কাশীবাস করিতে আরম্ভ করেন।

১৮৫৯ সালে কাশীতে আমার জন্ম হয়। ভ্রাতা ভগিনীতে আমরা ৪।৫টী ছিলাম; কিন্তু সকলেই অমৃতময়ের ক্রোড়ে চলিয়া গিয়াছেন। এখন আমরা কেবল দুই ভাই অবশিষ্ট। আমি কনিষ্ঠ, তিনি জ্যেষ্ঠ। পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রম-কালে কোনও গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় অল্প বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়া কাশীস্থ বাঙ্গালী-টোলার প্রিপ্যারেটারী স্কুলে প্রবেশ করি। প্রায় এক বৎসর এইখানে পাঠ করিয়া মাতার সহিত ফতেপুরে পিতার নিকট গমন করি। জ্যেষ্ঠ ও মাতামহী কাশীতেই রহিলেন। ইহার ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে আমার পিতৃদেব ও মেজ জেঠামহাশয় পৃথক হন। বাটী ভাড়া করিয়া থাকিতে গেলে ২৫৲ টাকা আয়ে দুই স্থলের খরচ চলে না। মাতামহীর নিকট ৩০০৲ টাকা ছিল। তিনি সেই টাকায় একখানি ক্ষুদ্র বাটী ভোগ-বন্ধক রাখেন। এই বাটীতে আমার জন্ম। তৎপরে অসাধারণ কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া মাতৃদেবী ও মাতামহী উভয়ের সমবেত চেষ্টায় ১১০০৲ টাকা দিয়া একখানি বাটী খরিদ করেন। আমি যখন ফতেপুরে যাই, তখন জ্যেষ্ঠ ও মাতামহী এই বাটীতে রহিলেন। আমার মাতার প্রকৃতি অত্যন্ত ধীর ও নম্র ছিল। কিন্তু আত্মমর্য্যাদা-রক্ষায় তিনি সতত তৎপর থাকিতেন। আমার মাতামহীর প্রকৃতি অন্যরূপ। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও তেজস্বিনী ছিলেন। সাংসারিক কার্য্যে তাঁহার বিলক্ষণ দূরদৃষ্টি ছিল। উভয়েই সমান কষ্টসহ ও মিতব্যয়ী ছিলেন।

তাঁহাদেরই কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও দূরদৃষ্টির বলে পিতৃদেব এত অল্প আয়ে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিয়াছিলেন।

ফতেপুরে যাওয়াতে আমার পাঠের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। বেশ এক ভাবে কাশীতে পড়িতেছিলাম, তাহাতে বাধা পড়িল। ফতেপুরে তখন একটী ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল; কিন্তু পুস্তকাদি সমস্ত অন্য রকমের, এবং পাঠের ব্যবস্থা তত ভাল ছিল না। বিশেষতঃ পূর্ব্বে উর্দ্দু ভাষা শিক্ষা না করায়, বিশেষ গোলে পড়িতে হইল। গৌরহরি চক্রবর্ত্তী মহাশয় তখন প্রধান শিক্ষক। পরে তিনি ওকালতী পাস করিয়া কাশীতে ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন; অল্প দিন হইল, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। এই এক বৎসর আমার সম্পূর্ণ ক্ষতি হইল। ফতেপুরে বাসকালে আমার একটী ভগিনী জন্মগ্রহণ করে; এটি পিতা-মাতার শেষ সন্তান। সূতিকাগারে মাতৃদেবী ভয়ঙ্কর পীড়িতা হন। তাঁহার বাঁচিবার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। আমার পিতৃদেব সেকালের নিষ্ঠাবান হিন্দু। ডাক্তারী চিকিৎসায় তাঁহার আদৌ শ্রদ্ধা ছিল না। তাহা ছাড়া, ডাক্তারী চিকিৎসা করিতে গেলে পয়সা চাই। আমরা দরিদ্র। জজের কোর্টে এক জন মুসলমান উকীল ছিলেন। তিনি হাকিমী চিকিৎসায় বিলক্ষণ পরিপক্ক। তাঁহারই চিকিৎসায় মাতৃদেবী এক মাস কি দেড় মাসে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন। আমার বয়স তখন সাত কি আট বৎসর। আমার নিজের বয়সোচিত আমি মাতৃদেবীর বিশেষ সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিলাম, এই-টুকু মনে করিয়া আমি মনে একটু শান্তি পাই, নচেৎ আমার মনে শান্তি নাই। আমায় শান্তি-পাগল বলিলেই হয়।

ভগিনীটী ৪।৫ মাসের হইলে পুনরায় কাশীতে ফিরিয়া আসি। পিতৃদেব আবার পূর্ব্বের ন্যায় একাকী ফতেপুরে রহিলেন। আমি সংসারিক মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে মাতৃদেবী ও মাতামহী দেবীকে সমস্ত প্রশংসা অর্পণ করিয়া, একটু অন্যায় করিয়াছি। আমার পিতৃদেবও অত্যন্ত মিতব্যয়ী ও কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন। আমরা তাঁহার ন্যায় কষ্টসহ হইতে পারি নাই, এবং একালে তাহা ত দেখিতেই পাই না। তেমন নিষ্ঠাবান্ বিশুদ্ধ ভাবটী আর আমি দেখিতে পাই না। সেরূপ সরল প্রকৃতিও আমি দেখি না। ফতেপুরে প্রবাসকালে দেখিয়াছি, পিতৃদেবের নিকট যে দাসী ছিল, সে তাঁহার কাছে ক্রমাগত ২৫ বৎসর ধরিয়া চাকরী করিয়া পরলোকে গমন করে। আমি যখন তাহাকে দেখি, সে তখন অতি বৃদ্ধা। কার্য্যে এক প্রকার অক্ষম বলিলেই হয়। কিন্তু পিতৃদেব তাহার কার্য্যেই সন্তুষ্ট

ছিলেন। তাহার নাম ধূনী। ধূনীর ন্যায় বিশ্বস্ত দাসী আমার নয়নগোচর হয় নাই। সে আমাদের সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিত। বাবার নাপিত, বাবার গয়লা, কেহই নূতন ছিল না, সবই পুরাতন। কেহ ১৫ বৎসর, কেহ ২০ বৎসর, কেহ বা ৩০ বৎসর ধরিয়া স্ব স্ব কার্য্য করিতেছে। ৩০ বৎসরের মধ্যে তিনি কেবল একবার বাটী বদলাইয়াছিলেন। বিষয়টী তুচ্ছ হইলেও, ইহা দ্বারাই তাঁহার প্রকৃতি কিরূপ ছিল, তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে। আবার কষ্টসহিষ্ণুতার কথা শুনুন। এতদঞ্চলে গ্রীষ্মকালে সকালে কাছারী হইয়া থাকে। সকালে কাছারী নামমাত্র। দিনের কাছারী অপেক্ষাও তাহা ভয়ঙ্কর। এতদপেক্ষা দিনের কাছারী শতগুণে ভাল। সকালে কাছারী হইলে আমলাদের বেলা ৭টার সময় কাছারী যাইতে হইত, এবং বেলা দুইটার সময় কাছারী হইতে গৃহে আগমন। এতদঞ্চলে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বেলা একটা দুইটার সময় কি ভয়ঙ্কর "লু" নামক গরম হাওয়া চলে, এবং চতুর্দ্দিকে কিরূপ অগ্নিবৃষ্টি হইতে থাকে, তাহা যিনি এতদ্দেশে বাস করিয়াছেন, তিনিই সম্পূর্ণ অবগত। পিতৃদেব সেই বেলা সাতটার সময় অনাহারে পদব্রজে কাছারী যাইতেন, এবং বেলা দুইটার সময় পুনরায় পদব্রজে গৃহে আসিয়া স্বহস্তে পাক করিয়া আহার করিতেন। বাটী হইতে কাছারী প্রায় দুই মাইল। পেন্‌সন্ লইবার তারিখ পর্য্যন্ত তাঁহার সমভাবে গিয়াছে। আমিও তাঁহার ন্যায় কষ্টসহ হইয়াছি। আজ কাল ২০।৩০ টাকার চাক্‌রী হইলেই প্রথম পাচকব্রাহ্মণের অনুসন্ধান। আমার এক জন সেকালের ধরণের পূজ্য আত্মীয় প্রায়ই আমার কাছে বলিতেন যে, এখন হইয়াছে—"দেখ পৈতা, মার ভাত।" জাতিবিচার ভাল কি মন্দ, তাহা আমি বলিতেছি না। জাতি-বিচার থাকা উচিত কি অনুচিত, তাহাও আমি বলিতেছি না। তবে পুরাতন রীতি ত্যাগ করায় আমাদের সমাজের যে অত্যন্ত ক্ষতি হইতেছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। প্রথম ক্ষতি, আমাদের দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইতেছে, অল্প আয়ে আর আমরা সংসার চালাইতে পারি না। দ্বিতীয় ক্ষতি,—আমরা আর আমাদের পিতৃ-পিতামহের ন্যায় কষ্ট সহ্য করিতে পারি না। অত্যন্ত শ্রমকাতর হইয়া পড়িয়াছি।

এ কালের লোকের তাঁহাদের ন্যায় সাহস দেখিতে পাই না। এ কালের যুবকেরা প্রবাসে চাক্‌রী করিতে গেলে প্রায়ই একলা বাটীতে থাকিতে পারেন না। রাত্রিতে অন্ততঃ এক জন চাকর থাকা চাই। আজকাল সকল স্থলে নানা কারণে সস্তায় চাকর পাওয়া দায়। সুতরাং প্রবাসে গিয়া নূতন চাক্‌রীতে প্রবৃত্ত হইয়াই যুবকদিগকে চাকর লইয়া এক মহাগোলে পড়িতে হয়।

আমাদের "খুদী" প্রাতে সাতটার সময় আসিত, এবং রাত্রি আট ঘটিকার সময় গৃহে চলিয়া যাইত। পিতৃদেব একলাই বার মাস সেই বাটীতে থাকিতেন। পিতৃদেব কেন, সে কালের লোকমাত্রই ভূত প্রেতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। পিতৃদেবও সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী ছিলেন। যে বাটীতে তিনি বাস করিতেন, সেই বাটীতে রন্ধনশালার দালানের পার্শ্বে একটি গৃহে এক জন মুসলমানের গোর ছিল। পিতৃদেব বলিতেন যে, সৈয়দ বাবার গোর। তাঁহার মুখে কতবার শুনিয়াছি যে, তিনি সৈয়দ বাবার প্রেতাত্মাকে দেখিয়াছেন। অথচ কখনও ভয় পান নাই। ২৫।৩০ বৎসর ক্রমান্বয়ে সেই বাটীতে কাটাইয়াছেন। প্রতি বৃহস্পতিবার সৈয়দ বাবাকে এক পয়সার রেউড়ী সিন্নী দিতেন। আমার কনিষ্ঠা ভগিনীটী সেই বাটীতে জন্মগ্রহণ করে। অল্প বয়সে মাতৃহীন হইয়াছিল বলিয়া সে পিতার কিছু বেশী স্নেহের পাত্রী ছিল। বাল্যকালে মধ্যে মধ্যে সে "বাহানা" ধরিয়া পিতৃদেবের নিকট দৌরাত্ম্য করিলে, পিতা হাসিয়া বলিতেন. ইহার ঘাড়ে "সৈয়দ বাবা" চাপিয়াছেন। আজ-কালকার অনেক যুবক ভূত প্রেতের নাম শুনিলে গৃহিণীদের অঞ্চল ধারণ করিয়া থাকেন।

এই ত গেল এক ধরণের সাহস। আবার অন্য ধরণের আর একটী সাহসের কথা বলি। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় পিতৃদেব ফতেপুরে থাকিতেন। ফতেপুর, কাণপুর ও এলাহাবাদের মধ্যস্থলে অবস্থিত। কাণপুরে নানা সাহেব বিদ্রোহী হইলে পর, বিদ্রোহী দল ফতেপুরে সমবেত হইল। ফতেপুরের লোকও তাহাদের সহিত যোগ দিল। যাতপুরে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা অধিক। বিদ্রোহীরা এক জন সম্ভ্রান্ত মুসলমানকে নবাব করিল। জেলার কালেক্টর প্রভৃতি সমস্ত ইংরাজ রাজকীয় খাজনা ইত্যাদি ফেলিয়া প্রয়াগাভিমুখে পলায়ন করিলেন। দেশীয় সমস্ত আমলারা হাকিমদের এই "যঃ পলায়তি স জীবতি" নীতির অনুসরণ করিল। থাকিলেন কেবল পিতৃদেব ও তাঁহার প্রভু জজ সাহেব। এই জজ বিখ্যাত টক্কর সাহেব। স্বর্গীয় রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাসে ফতেপুরের এই জজ টক্কর সাহেবের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যখন জেলা হাকিমশূন্য হইল, আর অন্যান্য বিদ্রোহীরা আসিয়া ফতেপুর দখল করিল, তখন পিতা টক্কর সাহেবের নিকট গিয়া তাঁহাকে জেলা পরিত্যাগ করিয়া অপরাপর হাকিমদের ন্যায় প্রয়াগে পলায়ন করিতে পরামর্শ দিলেন, এবং অন্যান্য জেদ

করিতে লাগিলেন। কিন্তু সাহেব কর্ত্তব্যপালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইলেন না। বলিলেন, "তুমি কাশীতে যাও, আর এখানে থাকিও না। আমি সরকারী খাজনা ছাড়িয়া যাইতে পারিব না। আমার প্রাণ থাকিতে আমি সরকারী খাজনা বিদ্রোহীদের হস্তে সমর্পণ করিতে পারিব না। অতএব তুমি আমার ভরসা করিও না, তুমি এখান হইতে কাশী চলিয়া যাও। যদি আমি বাঁচিয়া থাকি, তাহা হইলে তোমাকে আমি এরূপ করিয়া যাইব যে, তোমার পুত্রপৌত্রদের আর চাকরী করিয়া খাইতে হইবে না।" পিতা কোনও মতেই ফতেপুর-ত্যাগে সম্মত হইলেন না। এই বলিয়া গৃহে চলিয়া আসেন যে, আপনি না গেলে আমি ফতেপুর ত্যাগ করিতে পারি না। আমি গৃহে যাইতেছি, তবে প্রত্যহ আসিয়া আপনার খবর লইব। তিনি কোনক্রমে রাত্রিযাপন করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে শুনিলেন, বিদ্রোহীরা টক্কর সাহেবের বাঙ্গলা ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। টক্কর সাহেব একাকী, বিদ্রোহীরা পঙ্গপালের ন্যায় অসংখ্য; তথাপি সাহেবের ভয় নাই। বাঙ্গলাটি দ্বিতল। কালেক্টর পলাইবার পরই তিনি সমস্ত খাজনা নিজ গৃহে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। যখন বিদ্রোহীরা আসিয়া বাঙ্গলা ঘিরিয়া ফেলিল, তখন সাহেব উপরতলে গিয়া ক্রমাগত বন্দুক চালাইতে লাগিলেন। ১০।২০ জন বিদ্রোহীকে একাই ভূতলশায়ী করিলেন। ইতিমধ্যে একটি গুলি আসিয়া সাহেবের দক্ষিণহস্তের কব্জিতে লাগিল। এইবার প্রমাদ হইল। সাহেব আর বন্দুক চালাইতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে বিদ্রোহীরা সাহেবের বাঙ্গলায় আগুন ধরাইয়া দিল। বাঙ্গালায় একটি মধুমক্ষিকার 'চাক' ছিল। ধূমবশতঃ অসংখ্য মধুমক্ষিকা উড়িয়া সাহেবের মুখে, হস্তে, সর্ব্বাঙ্গে হুল বিদ্ধ করিতে লাগিল। সাহেব যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া মুখে রুমাল দিয়া বসিয়া পড়িলেন। বিদ্রোহীরা সাহেবকে আর দেখিতে না পাইয়া "সাহেব কহাঁ গয়া ?" "সাহেব কহাঁ গয়া ?" বলিয়া চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে কাহারও সাহসে কুলায় না। ১০।২০ টাকে ভূমিশায়ী করিয়া টক্কর সাহেব বিদ্রোহী দলের মধ্যে এরূপ ভীতির সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন যে, কেহ কেহ সিঁড়ির ২।৪ ধাপ উঠিয়া আবার নামিয়া পড়ে। এইরূপ কিয়ৎকাল ইতস্ততঃ করিবার পর, এক জন পাঠান সাহসে ভর করিয়া উপরে উঠে, এবং সাহেবকে মুখে রুমাল দিয়া জড়বৎ থাকিতে দেখিয়া লাফাইয়া শাণিত অসি দ্বারা এক আঘাতে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলে। বেলা ১১।১২টার সময় পিতৃদেব বিদ্রোহীদের এই পৈশাচিক ব্যবহারের

সংবাদ পাইয়া আর সেখানে থাকা নিরাপদ নহে ভাবিয়া সমস্ত দ্রব্যাদি ফেলিয়া রাত্রিকালে পলায়ন করেন। পথে সন্ন্যাসীর বেশে, কতক বা পদব্রজে, কতক বা গরুর গাড়ীতে, অশেষবিধ কষ্ট পাইয়া ৭।৮ দিবস পরে কাশী আসিয়া উপস্থিত হন। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ টকার সাহেবের মৃত্যুতে পিতৃদেব মর্ম্মাহত হইয়া সমস্ত আশা ভরসায় একেবারে জলাঞ্জলি দিলেন। আমরা যে তিমিরে—সেই তিমিরেই রহিলাম। নিয়তি কে খণ্ডাইতে পারে!

বিদ্রোহশান্তির পর পিতৃদেব পুনরায় ফতেপুরে স্বীয় চাকরীতে প্রবৃত্ত হইলেন। কাছারী ছিল না; বিদ্রোহীরা পুড়াইয়া দিয়াছে। নূতন জজ সাহেব রাজপথের ধারে তাঁবু খাটাইয়া বিচারে বসিয়াছেন। আসামীদের 'সময়োচিত' বিচারের পর হুকুম হইতেছে—"লট্‌কাও।" যেমন "লট্‌কাও" উচ্চারণ, অমনই পথের ধারের বৃক্ষশ্রেণীর শাখায় ফাঁসি। দিনের মধ্যে এত "লট্‌কাও" হইত যে, পিতৃদেব বলিতেন, রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায় তিনি "লটকাও—লট্‌কাও" শব্দ শুনিতেন।

পিতৃদেবের সাহস-বর্ণনায় আমি আত্মকাহিনী হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। কাশীতে আসিয়া পুনরায় বাঙ্গালীটোলার বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলাম। দেড় বৎসর এই বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত বেশ পাঠ করিলাম। তখন আমার বয়স নয় বৎসর। ইতিমধ্যে আমার ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার লক্ষণ দেখা দিল। সেই নয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে যে রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলাম, এখনও তাহাতেই ভুগিতেছি। স্নেহময়ী মাতা এই সকল দেখিয়া চিন্তিত হইলেন। সুতিকাগারে তিনি পীড়িতা হইলে যে হাকিম তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছিল, তাহার প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি। মনে মনে আমায় পিতার নিকট চিকিৎসার্থ পাঠাইবেন, স্থির করিলেন। ইতিমধ্যে আমার এক জ্যেঠতুতো ভগ্নীপতি কাশীতে আসিয়াছিলেন। তিনিও ফতেপুরে চাকরী করিতেন। তাঁহার সহিত মাতৃদেবী সাশ্রুনয়নে আমায় বিদায় দিলেন। তখন আমি বালক। মাতা ও মাতৃস্নেহ যে কি বস্তু, তাহা জানি না। বাবার কাছে ফতেপুরে যাইব, আবার অনেক দিন পরে রেলে চড়িতে পাইলাম, এই আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে আমি গৃহ হইতে বাহির হইলাম। তবে যাইবার সময় মাতৃদেবী যে ক্রমাগত অশ্রুপাত করিয়াছিলেন, সে বিষয়টী এখনও আমার মনে আছে; এবং পরে মাতামহীর মুখে ইহাও শুনিয়াছি যে, আমার ফতেপুর যাইবার পর মাতৃদেবী পাগলিনীর মত হইয়াছিলেন। সর্ব্বদা আমার নাম করিয়া রোদন করিতেন। আমি

নিষ্ঠুর, তাঁহার অযোগ্য সন্তান, যাইবার সময় একবারও ভাবি নাই যে, জননীর স্নেহ ও ভালবাসা পাইবার দিন আমার অদৃষ্টে শেষ হইয়া আসিতেছে। তাই আমি এখনও মধ্যে মধ্যে ভাবি, মা আমার আজ ৩৫ বৎসর হইতে চলিল, স্বর্গধামে গিয়াছেন। এ দীর্ঘকাল আমায় না দেখিয়া সেখানে কি করিয়া রহিয়াছেন? তিনি আমায় একবারও মনে করেন না। এমন নিষ্ঠুর কেন হইলেন?

নির্ব্বিঘ্নে ফতেপুরে গিয়া পঁছিলাম। মাঘ অথবা ফাল্গুন মাসের কথা। মাসটি ঠিক মনে নাই। পিতৃদেব আমার হাকিমী-চিকিৎসা না করাইয়া, এক জন তদ্দেশীয় ভাল বৈদ্যের নিকট হইতে বসন্ত-মালিনী ও অন্যান্য কিছু ঔষধ লইয়া খাওয়াইতে আরম্ভ করিলেন। স্বল্পকাল থাকিব বলিয়া তথাকার স্কুলে আর প্রবেশ করা হইল না; কিন্তু পাঠের অত্যন্ত ক্ষতি হইতে লাগিল। তখন সে জ্ঞান নাই। আমি প্রতিভা লইয়া এ সংসারে আসি নাই। তবে খেলার দিকে মনটা কিছু বেশী দৌড়িত, এবং দৌরাত্ম্য করিতেও বিলক্ষণ পটু ছিলাম। মাতৃদেবীকে বিস্তর জ্বালাতন করিয়াছি। পিতৃদেব কাছারী চলিয়া গেলে আমি বাটীতে স্বল্পমাত্র লেখাপড়া করিতাম, তৎপরে ক্রমাগত খেলা। এইরূপে ফাল্গুন চৈত্র কাটিয়া গেল। বৈশাখ মাস আসিয়া পড়িল। তখন রৌদ্রের উত্তাপে দুই প্রহরের সময় বাহির হইতে পারি না বটে; কিন্তু বেলা চারিটার সময় বাহির হইতাম, এবং পিতৃদেব যে পর্য্যন্ত আফিস হইতে বাটী না ফিরিতেন, ততক্ষণ বিলক্ষণ খেলা ও দৌড়াদৌড়ি করিতাম। তাঁহার আসিবার সময় হইলে বাটীতে আসিয়া ভদ্র বালকটীর ন্যায় বসিয়া থাকিতাম। তখনও পিতৃদেবের প্রাতঃকালের কাছারী হয় নাই। একদিন আমি আমার নিয়মমত বৈকালিক দৌরাত্ম্য করিতেছি, ইতিমধ্যে হঠাৎ পিতৃদেব আসিয়া পড়িলেন, এবং আমায় তদবস্থ দেখিয়া যথেষ্ট রাগান্বিত হইয়া তিরস্কার করিতে করিতে বলিলেন, এরূপ দৌরাত্ম্য করিলে কাশী পাঠাইয়া দিব।

রাত্রিকালে যথাসময়ে আহারাদি করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। বাল্যাবস্থায় সারাদিন দৌড়াদৌড়ি করা যায় বলিয়া যথেষ্ট পরিশ্রম হয়, তজ্জন্য বালকদের রাত্রিতে নিদ্রাটিও বিলক্ষণ ঘোর হয়। আমিও নিদ্রাদেবীর শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। তখন জানিতে পারি নাই যে, মনঃশান্তির এই আমার শেষ দিন। রাত্রি দুই প্রহরের সময় হঠাৎ পিতৃদেব আমায় জাগাইলেন, এবং বলিলেন যে, উঠ,—প্রস্তুত হও, কাশী যাইতে হইবেক। আমি

সেই রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থা হইতে উঠিয়া পিতার সহিত বাটী হইতে বাহির হইলাম। কিছু ভাবগতিক বুঝিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, পিতৃদেব সন্ধ্যার সময় আমায় যে বলিয়াছিলেন,—"কাশী পাঠাইয়া দিব," তাই কি ক্রোধান্বিত হইয়া আমায় কাশী লইয়া যাইতেছেন? কত কি ভাবিলাম, কিছুই কূল-কিনারা পাইলাম না। অথচ পিতৃদেবকেও বিলক্ষণ চিন্তিত ও বিমর্ষ দেখিলাম। কিন্তু পিতাকে মুখ ফুটিয়া কাশী-যাত্রার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে সাহসে কুলাইল না। পিতৃদেব আমাদের আজীবন স্নেহে ও যত্নে লালন-পালন করিয়াছেন। গায়ে হাত তোলা দূরের কথা, আমরা দুই ভ্রাতা জীবনে অতি অল্প সময়েই তাঁহার নিকট তিরস্কৃত হইয়াছি। আমি জীবনে তাঁহার নিকট কোনও আব্দার করিয়াছি, এরূপ আমার মনে পড়ে না। আমি "মুখচোরা" ছিলাম। তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। সমস্ত পথ তিনি ও আমি উভয়ে নিস্তব্ধভাবে আসিলাম। পরদিন বৈকালে কাশীর রাজঘাটের ষ্টেশনে আসিয়া পঁছিলাম। এখন কাশীতে গঙ্গার উপর সেতু নির্ম্মিত হইয়া রেল-গাড়ীর যাতায়াত আরম্ভ হইয়াছে; তখন তাহা ছিল না। কাশীর অপর পারে রাজঘাট নামক ষ্টেশনে নামিতে হইত; তথা হইতে নৌকাযোগে কাশী আসিতে হইত। ইহাতে প্রায় দুই ঘণ্টা সময় লাগিত। আমরা পিতাপুত্রে বেলা পাঁচটার সময় নিজ বাটীর নিকটস্থ ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বারাণসীতে দরিদ্রা, প্রৌঢ়া, বা বৃদ্ধা অনেক নারী আছে, যাহাদের বাড়ীতে বাড়ীতে কলসী করিয়া গঙ্গার জল বিতরণ করাই উপজীবিকা। তাহাদের "জলভরুণী" কহে। বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী, উভয়জাতীয় স্ত্রীলোকেরাই এ কার্য্য করিয়া থাকে। এখন জলের কল হইয়াছে বলিয়া কাশীতে এই ব্যবসায়ী লোকের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে, এবং অনেক দরিদ্রা বিধবার অন্ন মারা গিয়াছে। একটী পরিচিত "জলভরুণী"কে বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ীর কি খবর?" সে উত্তর দিল, "বাঁচিয়া আছেন, তবে রোগ সাঙ্ঘাতিক।" তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে, কেহ পীড়িত, তাই আমরা ফতেপুর হইতে আসিয়াছি। তখন আর আমি থাকিতে পারিলাম না, মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কার অসুখ?" জলভরুণী বলিল, "তুমি জান না?—তোমার মার।" আমার মস্তকে তখন বজ্রপাত হইল। ঘাটের সন্নিকটেই আমাদের বাটী। পিতা পুত্রে বাড়ীতে গিয়া দেখি, মাতৃদেবীকে নিম্ন-তলের একটী ঘরে রাখা হইয়াছে। তিনি জ্ঞানশূন্য, কখনও উঠিতেছেন, কখনও বসিতেছেন, কখনও বলিতেছেন, "যাই,—

উঠি, সন্ধ্যা হইল, ঘরে প্রদীপ দিই।" এখন সেই সকল কথা মনে করিয়া নির্জ্জনে যখন অশ্রুপাত করি, তখন বুঝিতে পারি যে, সে সময় তাঁহার ঘোর বিকার উপস্থিত হইয়াছিল। তখন আমি সাড়ে নয় কি দশ বৎসরের বালক, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। মাতামহী দেবী মাতার নাম করিয়া ডাকিয়া আমার নাম লইয়া বলিলেন, "দেখ, তোমার অমুক আসিয়াছে।" মাতার যেন তখন একটু চেতনা হইল। বলিলেন, "বাবা এসেছিস,—আয়!" বলিয়া আমাকে বক্ষঃস্থলে মুহূর্ত্তকালমাত্র ধারণ করিলেন। মাতৃদেবীর অমৃতময় স্নেহমাখা বাক্য সেই আমার শেষ শ্রবণ। মাতৃদেবীর স্নেহময় ক্রোড়ে সেই আমার শেষ শয়ন!

কিছুকাল মাতৃদেবীর নিকটে থাকিয়া বাহিরে আসিয়া আমার কনিষ্ঠা ভগিনীর অনুসন্ধান করিলাম। তাহাকে পাইয়া কোলে লইলাম। তাহার প্রতি আমার অত্যন্ত অধিক স্নেহ ছিল। সেও আমায় আন্তরিক ভালবাসিত। তখন তাহার বয়স আড়াই বৎসরমাত্র। গায়ে একটী কোর্ত্তা পর্য্যন্ত আচ্ছাদন নাই। তাহার ললাটদেশে একটি ক্ষতচিহ্ন দেখিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কুমো! তোমার এখানে কি করিয়া লাগিয়াছে?" কুমো আধ-আধ স্বরে বলিল, "ছোটদাদা, খাট থেকে পড়িয়া গিয়া একটী চৌকির কোণে লাগিয়াছিল।" তাহার অবস্থা ও মাতৃদেবীর পীড়াবশতঃ অযত্ন দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তাহাকে অনেকক্ষণ কোলে লইয়া রহিলাম, এবং তাহাকে খেলা দিতে লাগিলাম।

কাশীতে সে সময় দত্তবংশীয় এক জন ডাক্তার ছিলেন। তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতেন। হোমিওপ্যাথিটা "বেওয়ারিশ" মাল। একখানা রস্কোর গোটাকতক পাতা উল্টাইতে পারিলেই হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার হইতে পারা যায়। সে ডাক্তারটীও তদ্রূপ। এরূপ না-পড়া ডাক্তার কাশীতে অনেক পাওয়া যাইত, এবং এখনও বোধ হয়, অনেক পাওয়া যায়। আমাদের ন্যায় দরিদ্র গৃহস্থের ইহারাই কাণ্ডারী। মাতৃদেবীর চিকিৎসা তিনিই করিতেছিলেন। আয়ুর্বলই মহাবল; তবে মাতৃদেবীর যে ভাল চিকিৎসা হয় নাই, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। রাত্রিতে রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রত্যূষে মাতৃদেবীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইল। আমার বোধ হয়, বেলা ১০।১১টার সময় দাদা মহাশয় ও পিতৃদেব জানিতে পারিয়াছিলেন যে, আর বেশী বিলম্ব নাই; তাই আমাকে ও আমার ছোট ভগিনীটিকে আমার সেজ জ্যেষ্ঠ-

তাত্তের বাটীতে পাঠাইয়া দেন। তাঁহাদের বাটী আমাদের বাটীর অতি নিকটে। আমি সেখানে ভগিনীটীর সহিত এক ঘণ্টা মাত্র ছিলাম। তখন হঠাৎ আমার মন এমন বিচলিত হইল, এবং মাতৃদেবীকে দেখিবার জন্য এত উৎকণ্ঠিত হইলাম যে, আর আমি সেখানে তিষ্ঠিতে পারিলাম না। ভগিনীটীর হাত ধরিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাটীর দিকে ধাবমান হইলাম। বাটীর প্রাঙ্গণে পঁহুছিবামাত্র যে হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, তাহা আজ ৩৬ বৎসর হইতে চলিল, আজিও সমভাবে আমার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। এই দুঃখ-কষ্টময় সংসারে আসিয়া এই জীবনে কত যে যাতনা সহ্য করিয়াছি, এবং করিতেছি, সে সমস্তই সময়ের গুণে বিস্মৃতিসাগরে ভাসিয়া গিয়াছে, এবং যাইতেছে; কিন্তু কঠোর বিস্মৃতি আমার হৃদয়পট হইতে সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্যটী এখনও পর্য্যন্ত মুছিতে দেয় নাই। বরঞ্চ সমস্ত জীবন সেই দৃশ্য আমার মনে জাগাইয়া রাখিয়া শোকানলে দগ্ধ করিতেছে।

প্রাঙ্গণে আড়াই বৎসরের কনিষ্ঠা ভগিনীটীর হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া কি দেখিলাম! পূর্ব্বরাত্রে মাতৃদেবী রুগ্নাবস্থায় যে ঘরে ছিলেন, সেই ঘরের সম্মুখস্থিত দালানে তাঁহাকে বাহির করা হইয়াছে। মাতৃদেবীর পূর্ব্ব দিকে মস্তক ও পশ্চিম দিকে পদযুগল। দক্ষিণ দিকে তাঁহার মুখ, এবং উত্তর দিকে পৃষ্ঠ। পিতৃদেব তাঁহার সম্মুখে মুখের কাছে বসিয়া রোদন করিতেছেন।—পৃষ্ঠভাগে দাদা মহাশয় বসিয়া রোদন করিতেছেন।—আর মাতামহী দেবী?—তাঁহার অবস্থা বর্ণনার অতীত। এই কন্যাটীকে আশ্রয় করিয়া তিনি সংসারে বুক বাঁধিয়া ছিলেন। তিনি পায়ের দিকে আছাড়িয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন। মাতৃদেবীর সীমন্তে পিতৃদেব সিন্দূর পরাইয়া দিয়াছেন।

বাটীর চতুর্দ্দিকস্থ দালান প্রতিবেশীদের দ্বারা পরিপূর্ণ। মাতার প্রকৃতি অত্যন্ত মধুর ছিল বলিয়া প্রতিবেশিনীরা তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। পুণ্যবতী জননী আমার, আজ এই নবসাজে সজ্জিত হইয়া স্বামিহস্তে সীমন্তে সিন্দূর পরিয়া চিরকালের জন্য স্বর্গধামে চলিয়াছেন, তাই দেখিবার জন্য সমস্ত প্রতিবেশিনীরা একত্র হইয়াছেন, এবং অজস্র অশ্রুপাত করিতেছেন! এই শোকাবহ দৃশ্যের মধ্যে রোদন করিতে করিতে আমি ভগিনীর হাত ধরিয়া গিয়া দাঁড়াইলাম। দাদা মহাশয় আমাকে দেখিতে পাইয়া "এখান হইতে যা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। আমি বাল্যাবস্থা হইতেই দাদাকে অত্যন্ত ভয় করিতাম। ভয়ের কারণ, আমি দৌরাত্ম্য করিতে ছাড়িতাম না;—তিনিও প্রহার

করিতে ছাড়িতেন না। বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া ভগিনীটীর হাত ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে আবার জ্যেঠা মহাশয়ের বাটীর দিকে চলিলাম। মৃত্যুকালে স্নেহময়ী জননীকে একবার ভাল করিয়া প্রাণ ভরিয়া দেখিতেও পাইলাম না! দাদা আমার সহিত কেন এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলেন, তাহা আমি বলিতে পারি না। বোধ হয়, ভাবিয়াছিলেন যে, আমরা বালক, সে হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিলে অত্যন্ত হেদাইব। কিন্তু আমি যে চিরকাল সেই দৃশ্য মনে করিয়া দগ্ধ হইতেছি, বা আমায় দগ্ধ হইতে হইবে, তাহা ভাবিলেন না!

জ্যেঠা মহাশয়ের বাটীতে সিঁড়ির উপরে উঠিয়াই একটি দালান। সেই দালানে দাঁড়াইয়া আমি ও আমার ক্ষুদ্র ভগিনীটী উচ্চৈঃস্বরে বেলা ১২টা হইতে বেলা ২॥ কি ৩টা পর্য্যন্ত ক্রমাগত রোদন করি। আমার ঠিক্ মনে নাই, জ্যেঠাই-মা তখন বাটীতে, কি আমাদের বাটীতে। জ্যেঠা মহাশয়ের কথাও মনে নাই। তবে এটুকু ঠিক মনে আছে যে, আমরা দুইটীতে এই দুই আড়াই ঘণ্টা কাল ক্রমাগত ক্রন্দন করিয়াছি; এ হতভাগ্য মাতৃহীন দুটী ভাই ভগিনীকে সে সময়ে কেহ একটু সান্ত্বনাও দেয় নাই। আমি ত দূরের কথা, আমার সেই দুগ্ধপোষ্য ভগিনীটীকে কেহ একবার কোলে করিয়া একটী মিষ্ট কথাও বলে নাই। ক্রমাগত এইরূপে কাঁদিবার পর বেলা আড়াইটা কি তিনটার সময় আমাদের বাটীর একটি স্ত্রীলোক আসিয়া আমাদের লইয়া যায়। বাড়ী আসিয়া সমস্ত শূন্য দেখিলাম। উপরে মাতামহী দেবী এক স্থলে সংজ্ঞাহীনের ন্যায় পড়িয়া আছেন। আমাদের দুইটীকে দেখিয়া তাঁহার শোক উথলিয়া উঠিল। তিনি আছাড়িয়া মায়ের নাম করিয়া পুনরায় কাঁদিতে লাগিলেন। আমরাও দুইটিতে সেই সঙ্গে যোগ দিলাম। তিনি আমাদের ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া কত যে ক্রন্দন করিলেন, তাহা বলিতে পারি না।

বেলা পাঁচটার সময় স্নেহময়ী মাতৃদেবীকে চিরকালের জন্য মণিকর্ণিকার ঘাটে পুণ্যতোয়া জাহ্নবীদেবীকে সমর্পণ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও পিতৃদেব শূন্য গৃহে ফিরিলেন। তাঁহাদের দেখিয়া মাতামহী দেবীর শোকানল পুনরায় জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহাকে ধরিয়া রাখা ভার। দেবোপম পিতৃদেবের তখন চক্ষে জল নাই; ধীর গম্ভীর মূর্ত্তি! তিনি আমাদের উভয়কে কোলে টানিয়া লইয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন,—"বাবা, ভয় কি? আমি আছি।" আমি সেই দিন হইতে পিতৃদেবকে একাধারে পিতা-মাতা বুঝিলাম। আমার চিরারাধ্য হরগৌরী তদবধি একত্ব লাভ করিলেন। আজ প্রায় ১৭।১৮



পত্র-মগ্না

চিত্রকর—এইচ্, কিং।

U. RAY & SONS.

বৎসর পিতৃদেব স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু এখনও ভীষণ বিপদ ও দুশ্চিন্তার সময়ে তাঁহার সেই মধুর সান্ত্বনা-বাক্য "বাবা ভয় কি—আমি আছি"—আমার কর্ণে ধ্বনিত হয়।

ক্রমশঃ।

শ্রী—চট্টোপাধ্যায়।

হরিচরণ

'——' সে আজ অনেক দিনের কথা। প্রায় দশ বার বৎসরের কথা। তখন দুর্গাদাস বাবু উকীল হন নাই। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে তুমি বোধ হয় ভাল চেন না। আমি বেশ চিনি;—এস, তাঁহাকে আজ পরিচিত করিয়া দিই।

'ছেলেবেলায় কোথা হইতে এক অনাথ পিতৃমাতৃহীন কায়স্থ-বালক রামদাস বাবুর বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সকলেই বলিত, "ছেলেটি বড় ভাল।" বেশ সুন্দর বুদ্ধিমান চাকর, দুর্গাদাস বাবুর পিতার বড় স্নেহের ভৃত্য।

'সব কাজ কর্ম্মই সে নিজে টানিয়া লয়। গরুর জাব দেওয়া হইতে বাবুকে তেল মাখান পর্য্যন্ত সমস্তই সে নিজে করিতে চাহে। সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতে বড় ভালবাসে।

'ছেলেটির নাম হরিচরণ। গৃহিণী প্রায়ই হরিচরণের কাজ কর্ম্মে বিস্মিত হইতেন। মধ্যে মধ্যে তিরস্কারও করিতেন; বলিতেন, "হরি,—অন্য অন্য চাকর আছে, তুই ছেলে মানুষ এত খাটিস্ কেন?" হরির দোষের মধ্যে ছিল, সে বড় হাসিতে ভালবাসিত। হাসিয়া উত্তর করিত, "মা, আমরা গরীব লোক, চিরকাল খাট্‌তেই হবে, আর ব'সে থেকেই বা কি হবে?"

'এইরূপ কাজ কর্ম্মে, সুখে দুঃখে, স্নেহের ক্রোড়ে হরিচরণের প্রায় এক বৎসর কাল কাটিয়া গেল।

* * * * *

'সুরো রামদাস বাবুর ছোট মেয়ে। সুরোর বয়স এখন প্রায় ৫।৬ বৎসর। হরিচরণের সহিত সুরোর বড় আত্মীয়-ভাব দেখা যাইত। যখন দুগ্ধ-পানের নিমিত্ত গৃহিণীর সহিত সুরো দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিত, যখন মা অনেক অযথা বচসা করিয়াও এই ক্ষুদ্র কন্যাটিকে স্বমতে আনিতে পারিতেন না, এবং দুগ্ধ পানের

বিশেষ আবশ্যকতা ও তাহার অভাবে কন্যারত্নের আশু প্রাণবিয়োগের আশঙ্কায় শঙ্কান্বিতা হইয়া বিষম ক্রোধে সুরবালার গণ্ডদ্বয় বিশেষ টিপিয়া ধরিয়াও তাহাকে দুধ খাওয়াইতে পারিতেন না, তখনও হরিদাসের কথায় অনেক ফললাভ হইত।

'যাক্, অনেক বাজে কথা বলিয়া ফেলিলাম। আসল কথাটা এখন বলি, শোন। না হয়, সুরো হরিদাদাকে ভালবাসিত।

'দুর্গাদাস বাবুর যখন কুড়ি বৎসর বয়স, তখনকার কথাই বলিতেছি। দুর্গাদাস এতদিন কলিকাতাতেই পড়িত। বাড়ী আসিতে হইলে ষ্টীমারে দক্ষিণ দিকে যাইতে হইত; তাহার পরেও প্রায় হাঁটা পথে দশ বার ক্রোশ আসিতে হইত; সুতরাং পথটা বড় সহজগম্য ছিল না। এই জন্যই দুর্গাদাস বাবু বড় একটা বাড়ী যাইতেন না।

'ছেলে বি. এ. পাশ হইয়া বাড়ী আসিয়াছে। মাতা ঠাকুরাণী অতিশয় ব্যস্ত। ছেলেকে ভাল করিয়া খাওয়াইতে দাওয়াইতে, যত্ন আত্মীয়তা করিতে যেন বাটী শুদ্ধ সকলেই এক সঙ্গে উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে।

'—দুর্গাদাস জিজ্ঞাসা করিল, "মা, এ ছেলেটি কে গা?" মা বলিলেন, "এটি এক জন কায়েতের ছেলে; বাপ মা নেই, তাই কর্ত্তা ওকে নিজে রেখেছেন। চাকরের কাজকর্ম্ম সমস্তই করে—আর বড় শান্ত; কোনও কথাতেই রাগ করে না। আহা! বাপ মা নেই,—তা'তে ছেলেমানুষ,—আমি বড় ভালবাসি।" বাড়ী আসিয়া দুর্গাদাস বাবু হরিচরণের এই পরিচয় পাইলেন।

যাহা হউক, আজ কাল হরিচরণের অনেক কাজ বাড়িয়া গিয়াছে। সে তাহাতে সন্তুষ্ট ভিন্ন অসন্তুষ্ট নহে। ছোট বাবুকে (দুর্গাদাসকে) স্নান করান, দরকারমত জলের গাড়ু, ঠিক সময়ে পানের ডিপে, উপযুক্ত অবসরে হুঁকো, ইত্যাদি জোগাড় করিয়া রাখিতে হরিচরণ বেশ পটু। দুর্গাদাস বাবুও প্রায় ভাবেন, ছেলেটি বেশ Intelligent। সুতরাং কাপড় কোঁচান, তামাকু সাজা প্রভৃতি কর্ম্ম হরিচরণ না করিলে দুর্গাদাস বাবুর পছন্দ হয় না।

* * * * *

"কিছু বুঝি না, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়। মনে আছে কি? একবার দু'জনে কাঁদিতে কাঁদিতে পড়ি, 'বড়ই দুরূহ তত্ত্ব!' আমার বোধ হয়—সব কথাতেই এটা খাটে। দেখেছ কি—ভাল থেকে কেবল ভালই দাঁড়ায়,—মন্দ কি কখনও আসিয়া দাঁড়ায় না? যদি না দেখিয়া থাক, তবে এস, আজ তোমাকে দেখাই—বড়ই দুরূহ তত্ত্ব!"

'উপরি-উক্ত কথা কয়টি সকলের বুঝিতে পারা সম্ভবও নয়, প্রয়োজনও নাই, আর আমারও Philosophy নিয়ে Deal করা উদ্দেশ্য নহে;—তবুও আপোষে দুটো কথা বলিয়া রাখায় ক্ষতি কি?

'আজ দুর্গাদাস বাবুর একটা জাঁকাল ভোজের নিমন্ত্রণ আছে। বাড়ীতে খাইবেন না, সম্ভবতঃ অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরিবেন। এই সব কারণে হরিচরণকে প্রাত্যহিক কর্ম্ম সারিয়া রাখিয়া শয়ন করিতে বলিয়া গেলেন।

'এখন হরিচরণের কথা বলি। দুর্গাদাস বাবু বাহিরে বসিবার ঘরেই রাত্রে শয়ন করিতেন। তাহার কারণ অনেকেই অবগত নহে। আমার বোধ হয়, গৃহিণী বাপের বাড়ীতে থাকায়, বাহিরের ঘরে শয়ন করাই তাঁহার অধিক মনোনীত ছিল।

'রাত্রে দুর্গাদাস বাবুর শয্যা রচনা করা, তিনি শয়ন করিলে তাঁহার পদসেবা, ইত্যাদি কাজ হরিচরণের ছিল। পরে বাবুর রীতিমত নিদ্রাকর্ষণ হইলে হরিচরণ পাশের একটা ঘরে শুইতে যাইত।

'সন্ধ্যার প্রাক্কালেই হরিচরণের মাথা টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল। হরিচরণ বুঝিল, জ্বর আসিতে আর অধিক বিলম্ব নাই। মধ্যে মধ্যে তাহার প্রায় জ্বর হইত; সুতরাং এ সব লক্ষণ তাহার বিশেষ জানা ছিল। হরিচরণ আর বসিতে পারিল না; ঘরে যাইয়া শুইয়া পড়িল। ছোট বাবুর যে বিছানা প্রস্তুত হইল না, এ কথা আর মনে রহিল না। রাত্রে সকলেই আহারাদি করিল; কিন্তু হরিচরণ আসিল না। গৃহিণী দেখিতে আসিলেন। হরি ঘুমাইয়া আছে; গায় হাত দিয়া দেখিলেন, গা বড় গরম। বুঝিলেন, জ্বর হইয়াছে; সুতরাং আর বিরক্ত না করিয়া চলিয়া গেলেন।

'রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়াছে। ভোজ শেষ করিয়া দুর্গাদাস বাবু বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, শয্যা পর্য্যন্ত প্রস্তুত হয় নাই। একে ঘুমের ঘোর, তাহাতে আবার সমস্ত পথ কি করিয়া বাড়ী যাইয়া চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িবেন, আর হরিচরণ শ্রান্ত পদযুগলকে বিনামা হইতে বিমুক্ত করিয়া অল্প অল্প টিপিয়া দিতে থাকিবে, এবং সেই সুখে অল্প তন্দ্রার ঝোঁকে গুড়গুড়ির নল মুখে লইয়া একেবারে প্রভাত হইয়াছে দেখিতে পাইবেন, ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছিলেন।

'একেবারে হতাশ হইয়া বিষম জ্বলিয়া উঠিলেন। মহা ক্রুদ্ধ হইয়া দুই চারি বার 'হরিচরণ'—'হরি'—'হরে'—ইত্যাদি রবে চীৎকার করিলেন, কিন্তু কোথায়

হরি? সে জ্বরের প্রকোপে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া আছে। তখন দুর্গাদাস বাবু ভাবিলেন, 'বেটা ঘুমাইয়াছে'। ঘরে গিয়া দেখিলেন, বেশ মুড়ি দিয়া শুইয়া আছে।

'আর সহ্য হইল না। ভয়ানক জোরে হরির চুল ধরিয়া টানিয়া তাহাকে বসাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু হরি ঢলিয়া বিছানার উপর পুনর্ব্বার শুইয়া পড়িল। তখন বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্গাদাস বাবু হিতাহিত বিস্মৃত হইলেন। হরির পৃষ্ঠে সবুট পদাঘাত করিলেন। সে ভীম প্রহারে চৈতন্য লাভ করিয়া হরি উঠিয়া বসিল। দুর্গাবাবু বলিলেন, "কচি খোকা—ঘুমিয়ে পড়েছে, বিছানাটা কি আমি ক'র্‌ব?" কথায় রাগ আরও বাড়িয়া গেল; হস্তের বেত্রযষ্টি আবার হরিচরণের পৃষ্ঠে বার দুই তিন পড়িয়া গেল।

'হরি রাত্রে যখন পদসেবা করিতেছিল, তখন এক ফোঁটা গরম জল, বোধ হয়, দুর্গাদাস বাবুর পায়ের উপর পড়িয়াছিল।

* * * * *

'সমস্ত রাত্রি দুর্গাদাস বাবুর নিদ্রা হয় নাই। এক ফোঁটা জল বড়ই গরম বোধ হইয়াছিল। দুর্গাদাস বাবু হরিচরণকে বড় ভালবাসিতেন। তাহার নম্রতার জন্য সে দুর্গাদাস বাবুর কেন, সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিল। বিশেষ, এই মাস খানেকের ঘনিষ্ঠতায় সে আরও প্রিয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

'রাত্রে কতবার দুর্গাদাস বাবুর মনে হইল যে, একবার দেখিয়া আসেন, কত লাগিয়াছে, কত ফুলিয়াছে। কিন্তু সে যে চাকর, তা ত ভাল দেখায় না। কতবার মনে হইল, একবার জিজ্ঞাসা করিয়া আইসেন, জ্বরটা কমিয়াছে কি না? কিন্তু তাহাতে যে লজ্জাবোধ হয়! সকাল বেলা হরিচরণ মুখ ধুইবার জল আনিয়া দিল; তামাকু সাজিয়া দিল। দুর্গাদাস বাবু তখনও যদি বলিতেন, আহা! সে ত বালকমাত্র, তখনও ত তাহার ত্রয়োদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়া যায় নাই। বালক বলিয়াও যদি একবার কাছে টানিয়া লইয়া দেখিতে, তোমার বেতের আঘাতে কিরূপ রক্ত জমিয়া আছে, তোমার জুতার কাঠীতে কিরূপ ফুলিয়া উঠিয়াছে! বালককে আর লজ্জা কি?

'বেলা নয়টার সময় কোথা হইতে একখানা টেলিগ্রাফ আসিল। তারের সংবাদে দুর্গাদাস বাবুর মনটা কেমন বিচলিত হইয়া উঠিল। খুলিয়া দেখিলেন, 'স্ত্রীর বড় পীড়া।' ধড়াস্ করিয়া বুকখানা এক হাত বসিয়া গেল। সেই দিনই তাঁহাকে কলিকাতায় চলিয়া আসিতে হইল। গাড়ীতে উঠিয়া ভাবিলেন, "ভগবান্! বুঝি বা প্রায়শ্চিত্ত হয়।"

* * * * *

'প্রায় মাস খানেক হইয়া গিয়াছে। দুর্গাদাস বাবুর মুখখানি আজ বড় প্রফুল্ল। তাঁহার স্ত্রী এ যাত্রা বাঁচিয়া গিয়াছেন। অন্ন পথ্য পাইয়াছেন।

'বাড়ী হইতে আজ একখানা পত্র আসিয়াছে। পত্রখানি দুর্গাদাস বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতার লিখিত। তলায় এক স্থানে "পুনশ্চ" বলিয়া লিখিত রহিয়াছে,—বড় দুঃখের কথা, কাল সকাল বেলা দশ দিবসের জ্বরবিকারে আমাদের হরিচরণ মরিয়া গিয়াছে। মরিবার আগে সে অনেকবার আপনাকে দেখিতে চাহিয়াছিল।

'আহা! মাতৃ-পিতৃহীন অনাথ!

'ধীরে ধীরে দুর্গাদাস বাবু পত্রখানি শতধা ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া দিলেন।'

শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বিদেশী গল্প।

শিল্পীর স্বপ্ন।

জ্যাসন,—কবি। সে সর্ব্বদা সমুদ্রের তীরে বসিয়া থাকিতে ভালবাসিত। বড় বড় ঢেউগুলি কূলে বারংবার প্রতিহত হইয়া কেমন ফিরিয়া যাইতেছে। সুনীল আকাশের কোলে সাদা সাদা মেঘগুলি কেমন ভাসিয়া বেড়াইতেছে; তাহাতে সূর্য্য-কিরণ প্রতিফলিত হইয়া কেমন বিচিত্র বর্ণের সৃষ্টি হইতেছে। এই সকল সে বসিয়া বসিয়া দেখিত; তাহার হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। যখন সে অতি শিশু, তখন হইতে সে সমুদ্রকে ভালবাসিতে শিখিয়াছিল। প্রবল ঝটিকার সময় সমুদ্র যখন কালান্তক মূর্ত্তি ধারণ করিত, উত্তাল-তরঙ্গ-মালা শৈলভূমিতে আহত হইয়া যখন চারি দিক বজ্রনির্ঘোষে প্রকম্পিত করিয়া তুলিত, তখন তাহার শিশু-হৃদয় উত্তেজনাপূর্ণ আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিত। আবার যখন সমুদ্র শান্ত হইয়া সুবৃহৎ হ্রদের আকার ধারণ করিত, সে তাহার কুটীরদ্বারে বসিয়া দেখিত, সাগরের জলে সোনা ঢালিয়া দিয়া সূর্য্য কেমন ধীরে ধীরে অস্ত যাইতেছে। এইরূপে সে বড় হইয়াছিল।

গ্রামের বালকেরা তাহাকে বিদ্রূপ করিত। কেহ বলিত, 'ভাবুক'; কেহ বলিত 'পাগল'। কিন্তু এ সকল কথায় সে কাণ দিত না, কাহারও সহিত মিশিত না। আপনার আনন্দে আপনি বিভোর থাকিত।

ভাস্কর-শিল্পে তাহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল, এবং এই বিদ্যায় সে চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল। মৃত্তিকা দিয়া সে অদ্ভুত ও সুন্দর মূর্ত্তি গঠন করিত। তাহার বৃদ্ধ পিতামহ তাহার এই কার্য্যে গৌরব অনুভব করিতেন, এবং প্রতিবেশিগণকে ডাকিয়া সগর্ব্বে পৌত্রের

গঠিত মূর্ত্তি দেখাইতেন। প্রতিবেশীরা বলিত, অতি সুন্দর, অতি চমৎকার, অতি অদ্ভুত! এমন কখনও দেখি নাই।

এক দিন এক প্রসিদ্ধ শিল্পী কিছুকাল বাস করিবার জন্য সেই গ্রামে আসিলেন। তিনি জ্যাসনের গঠিত কয়েকটী সুন্দর ও অদ্ভুত মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার কৃতিত্বের সুখ্যাতি করিলেন। শেষে প্রস্তাব করিলেন, তিনি বালককে নিজ ব্যয়ে সহরে লইয়া গিয়া নিজের শিল্পশালায় শিক্ষা দিবেন। কিন্তু জ্যাসন মাথা নাড়িয়া বলিল, "মহাশয়! আপনাকে ধন্যবাদ, কিন্তু আমি আপনার এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলাম না। যদি এমন কোনও সুন্দর বস্তু কখনও আমার নজরে পড়ে, যাহা প্রস্তরে গঠিত হইবার উপযুক্ত, আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি, তাহার সৌন্দর্য্য প্রস্তরফলকে চিরকাল সজীব থাকিবে। যাহা কিছু আবশ্যক, প্রকৃতি আমাকে শিক্ষা দিয়াছে, এবং যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাও প্রকৃতি হইতেই শিখিব।"

শিল্পী এই কথা শুনিয়া হাসিলেন। বলিলেন, জ্যাসনের কোনও উচ্চাভিলাষ নাই। গ্রামের বৃদ্ধগণ আনন্দিত হইলেন; কারণ, জ্যাসনকে ছাড়িয়া দিতে হইল না। জ্যাসন সমুদ্রতীরে আপনার কুটীরে বাস করিতে লাগিল। পূর্ব্বের মত মূর্ত্তি গঠন করিয়া ও স্বভাবের শোভা উপভোগ করিয়া তাহার দিন কাটিতে লাগিল। সমুদ্রের তীরে বেড়াইতে বেড়াইতে সে ভাবিত, "যদি এমন কিছু কখনও দেখিতে পাই, যাহা প্রস্তরে গঠিত হইয়া চিরকাল থাকিবার উপযুক্ত, তবে তাহা এই সমুদ্রের নিকট হইতেই পাইব।"

এক দিন সে তাহার অভ্যাসানুযায়ী শয্যাত্যাগ করিয়া সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতেছিল। তখন পূর্ব্বাকাশে ধীরে ধীরে উষার সূচনা হইতেছিল। কুজ্ঝটিকায় দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন। এই দৃশ্য তাহার অত্যন্ত প্রীতিকর বোধ হইতে লাগিল। কৌতুকাবিষ্ট হইয়া সে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিল।

সহসা জ্যাসন এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে পাইল। দেখিল, কয়েকটী অনিন্দ্য-সুন্দরী কুমারী সমুদ্রের বেলা-প্রান্তে আসিয়া ক্রীড়া করিতেছে। তাহাদের দীর্ঘ কেশ-রাশি বাতাসে উড়িতেছে। সুললিত বাহুযুগল ঊর্দ্ধে প্রসারিত,—কখনও বা মনোহর লাস্যের ভঙ্গীতে আশে পাশে দুলিতেছে। সুঠাম দেহ-যষ্টি তুষারের ন্যায় লঘু। সাগর-কুমারীগণ জলকেলি করিতেছিল। তাহারা কখনও সাগর-তরঙ্গের সহিত দৌড়িতেছিল, কখনও ঊর্ম্মিমালার সহিত খেলিতেছিল, কখনও বা পরস্পর পরস্পরের অনুসরণ করিতেছিল।

এই অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া জ্যাসনের কবি-হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু সাগর-কুমারীগণ তাহাকে দেখিবামাত্র সভয়ে অস্ফুট চীৎকার করিয়া অদৃশ্য হইল।

জ্যাসন আরও অগ্রসর হইয়া দেখিল, সাগরবালারা অন্তর্হিত;—কেবল একটী মূর্ত্তি তাহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার সেই সুগোল সুঠাম মূর্ত্তি কি সুন্দর! জ্যাসনের মনে হইতেছিল, বায়ুর সামান্য আঘাতে বুঝি সে ভাঙ্গিয়া পড়িবে;—তাহার দেহ এতই কমনীয়, এতই লঘু ও মনোরম! তাহার সুদীর্ঘ কেশপাশ সোনালী পরিচ্ছদের ন্যায় কটিদেশ পর্য্যন্ত ঝুলিতেছিল। তাহার গাঢ়-নীলবর্ণ চক্ষু দুটী কি সুন্দর! তুষার-শুভ্র সূক্ষ্ম পরিচ্ছদের শোভা কি চমৎকার!

জ্যাসন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহার সমীপবর্ত্তী হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি সুন্দরী! তুমি কি মর্ত্তের জীব, না স্বর্গ হইতে আসিয়াছ? তোমার সুনীল চক্ষু দুটী কি সুন্দর!" সুন্দরী কোনও উত্তর করিল না; কিন্তু রমণীয় হাস্যে তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। শিশুর ন্যায় কোমল-পদ-বিক্ষেপে নিকটে আসিয়া সে জ্যাসনের হাত ধরিল, এবং ধীরপদে সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় সুন্দরীর হস্ত-ধৃত হইয়া জ্যাসন তরঙ্গের নিকটবর্ত্তী হইল। তখন তাহার চমক ভাঙ্গিল। বলিল, "না সুন্দরী, আমি তোমার সহিত যাইব না। আমায় তুমি কোথায় লইয়া চলিয়াছ? আর অধিক অগ্রসর হইলে আমি যে ডুবিয়া যাইব? তুমি আমার নিকট এইখানেই থাক।"

সাগর-কুমারী মাথা নাড়িল,—অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া সমুদ্রের দিকে দেখাইল। জ্যাসনের হস্ত হইতে ধীরে আপনার হাত টানিয়া লইয়া ত্বরিতপদে অগ্রসর হইল, এবং সমুদ্রের ফেন-পুঞ্জে অদৃশ্য হইয়া গেল।

জ্যাসন, যত দূর দৃষ্টি চলে, দেখিতে লাগিল। বহুক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল—আবার হয় ত সে আসিবে। কিন্তু কেহ আসিল না। তখন সে ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরিল; কিন্তু সে নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। ভাবিতে লাগিল, যাহা দেখিয়াছি, তাহা স্বপ্ন,—না সত্য!

বাড়ীতে আসিয়া জ্যাসন প্রাতরাশ করিতে বসিল; কিন্তু আহারে রুচি হইল না। আহারের পর সে তাহরে শিল্পোপকরণাদি ও মৃত্তিকা লইয়া বাটীর বাহির হইল। জ্যাসন যাহা আজ দেখিয়াছে, তাহা স্বপ্ন হউক বা সত্য হউক, সে তাহা আদর্শরূপে গঠন করিবে। সমস্ত দিন সে কাজ করিল। প্রভাতের সেই অপরূপ মূর্ত্তি স্মৃতিপটে আঁকিয়া, তাহারই আদর্শে সে মূর্ত্তি গড়িতে আরম্ভ করিল। সন্ধ্যাকালে একটী গুহার মধ্যে যন্ত্র-তন্ত্র ও মূর্ত্তিটি লুকাইয়া রাখিয়া জ্যাসন বাড়ী ফিরিয়া গেল।

রাত্রিতে তাহার ভাল নিদ্রা হইল না। প্রত্যুষে উঠিয়া সে সমুদ্রতীরে বেড়াইতে গেল, এবং ভাবিতে লাগিল, যদি পূর্ব্বদিবসের ঘটনা স্বপ্ন না হয়, তবে আজ হয় ত আবার সেই অপরূপ দৃশ্য দেখিতে পাইব। সে চঞ্চলনেত্রে সমুদ্রের দিকে চাহিতে লাগিল। দেখিল, সাগর-কুমারীগণ নাচিতেছে, খেলিতেছে। তবে ত ইহা স্বপ্ন নয়! জ্যাসনকে দেখিয়া আর সকলে পলাইয়া গেল, কেবল এক জন দাঁড়াইয়া রহিল।

জ্যাসন এবার আর তাহার সহিত কথা কহিল না। কারণ, সে বুঝিয়াছিল, সাগরবালারা কথা কহিতে পারে না। জ্যাসন তাহাকে গুহার দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া তাহার অনুসরণ করিতে সঙ্কেত করিল। সামান্য ইতস্ততঃ করিয়া সে তাহার পশ্চাৎগামিনী হইল। সুন্দরীর কোমল করস্পর্শে তাহার হৃদয় রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

গুহাভ্যন্তরে উপস্থিত হইয়া জ্যাসন তাহাকে সঙ্কেতে বুঝাইল যে, তাহার আদর্শ লইয়া সে একটী মূর্ত্তি গঠন করিবে। সুন্দরী এই সঙ্কেত বুঝিল, এবং মনোহর ভঙ্গিমায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। জ্যাসন দ্রুতহস্তে রচনা আরম্ভ করিল। তাহার ভয় হইতে লাগিল, শুভ্র তুষারখণ্ড প্রভাতরবির কিরণে যেমন গলিয়া পড়ে, এই সুন্দরীর সুকোমল দেহও বুঝি তেমনই

গলিয়া পড়িবে। কার্য্য অতি দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল, এবং সেই মৃত্তিকামূর্ত্তি জীবন্তের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। অকস্মাৎ সুন্দরী হস্ত প্রসারণ করিয়া দেখাইল,—সূর্য্য পূর্ব্বাকাশের অনেক ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। সে তখন ধীরপদবিক্ষেপে বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া সমুদ্রজলে মিশিয়া গেল।

জ্যাসন সমস্ত দিন কাজ করিল। সন্ধ্যাকালে দেখিল, গঠন অতি চমৎকার হইয়াছে, এবং সুন্দরীর অলৌকিক সাদৃশ্য সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হইয়াছে। সে সন্তুষ্টমনে বাড়ী ফিরিল।

জ্যাসনের পিতামহী বলিলেন, "বাছা, তুমি আজ-কাল বাড়ীর বাহিরেই সমস্ত দিন কাটাও।"

"হাঁ,—তা সত্য। সে জন্য ঠাকুমা, রাগ করিও না, আমি 'আদর্শ' পাইয়াছি।"

বৃদ্ধা জ্যাসনের এই সংক্ষিপ্ত উত্তরেই সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি তাহার স্বভাব বুঝিতেন।

জ্যাসন প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠিয়া সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত সেই মূর্ত্তি গঠন করিত। সাগর-কুমারী কোনও দিন অধিক বেলা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিত, কোনও দিন বা দেখা দিয়াই পলাইয়া যাইত। এইরূপে এক মাস পরিশ্রম করিয়া একদিন সন্ধ্যাকালে জ্যাসন তাহার কাজ শেষ করিল।

ইহার পূর্ব্বে সে একদিনও পরিশ্রান্ত হয় নাই। আজ দীর্ঘ পরিশ্রমের অবসানে তাহার দেহ অবসন্ন হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। করতলে মাথা রাখিয়া সে বসিয়া রহিল। তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে চারি দিক সমাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, গুহাভ্যন্তরে উজ্জ্বল চন্দ্র-কিরণ আসিয়া তাহার আদর্শ-প্রতিমার মুখে পতিত হইয়াছে। জ্যাসন নয়ন ভরিয়া দেখিতে লাগিল। কি সুন্দর মূর্ত্তি! আদর্শ না পাইলে এমন মূর্ত্তি কি মানুষ গড়িতে পারে? সুন্দরী দাঁড়াইয়া আছে। তাহার অধরে মধুর হাস্য। কটিদেশ ঈষৎ হেলাইয়া একটী পদ সম্মুখে বাড়াইবার উপক্রম করিতেছে। এইবার বুঝি পলাইয়া যাইবে! কুঞ্চিত কেশদামের কি অপূর্ব্ব শোভা! সূক্ষ্ম পরিধেয়খানি বুঝি বা বায়ুভরে উড়িয়া যায়!

স্বগঠিত অনিন্দ্যসুন্দর মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে জ্যাসন আত্মহারা হইয়া গেল। নতজানু হইয়া, তাহার চরণতলে পড়িয়া, প্রেমাকুলিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"সুন্দরী, আমি তোমায় ভালবাসি,—প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাসি; কিন্তু তুমি সমুদ্রের দেবতা। তোমাকে কেহ ভালবাসিতে পারে না,—মানুষের পক্ষে তোমাকে ভালবাসা সম্ভব নয়,—তথাপি সুন্দরী, আমি তোমায় ভালবাসি।"

জ্যাসন সমস্ত রাত্রি সেইখানে উন্মত্তের ন্যায় পড়িয়া রহিল। পরদিন প্রত্যূষে সাগর-কুমারী আসিয়া দেখিল, শিল্পী ধরাতলে বিলুণ্ঠিত। ভয়ে তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে ধীরে ধীরে জ্যাসনকে ধরিয়া বসাইল, এবং আপনার স্কন্ধোপরি তাহার মাথা রাখিয়া ধীরে ধীরে তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে লাগিল। জ্যাসন চাহিল—তাহার মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। "তুমি আসিয়াছ? আমার হৃদয়ের দেবতা, আসিয়াছ?" বিজড়িতস্বরে সে এই কথা বলিল।

ব্যাকুলভাবে সাগর-কুমারী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই

তাহার অধরে হাসি ফুটিয়া উঠিল। সমুদ্রের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া তাহার অনুগমন করিবার জন্য সে সবিনয়ে জ্যাসনকে ইঙ্গিত করিতে লাগিল। জ্যাসন উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। সাগর-কুমারী হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইতেছিল, এবং পশ্চাৎ ফিরিয়া জ্যাসনকে অনুসরণে উৎসাহিত করিতেছিল। ক্রমশঃ জ্যাসন অনুভব করিতে লাগিল, সমুদ্রের সুশীতল তরঙ্গ আসিয়া তাহাকে বেষ্টন করিতেছে। "সুন্দরী, আমি তোমায় ভালবাসি।"

দুইটী সুললিত বাহু তাহার গলদেশ বেষ্টন করিল,—সাগর-কুমারীর সুকোমল অধর তাহার অধরে মিলিত হইল। অবশেষে তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া তাহার উপর পড়িতে লাগিল।

জ্যাসনকে দেখিতে না পাইয়া গ্রামবাসীরা উৎকণ্ঠিত হইল। তাহাকে খুঁজিবার জন্য চারি দিকে লোক ছুটিল। অবশেষে কয়েক জন ধীবর দেখিতে পাইল, জ্যাসনের দেহ তরঙ্গ-বিতাড়িত বেলাভূমিতে পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাকে 'জলমগ্ন' বলিয়া বোধ হইতেছিল না। তাহার অধরে মধুর হাস্য,—যেন সে নিদ্রাবশে সুখের স্বপ্ন দেখিতেছে।

গ্রামে হাহাকার পড়িয়া গেল। এক ব্যক্তি জানিত, জ্যাসন গুহার মধ্যে বসিয়া কাজ করিত। সেখানে গিয়া সে তাহার নবগঠিত মূর্ত্তি দেখিতে পাইল। তখন সকলে গুহামধ্যে একত্রিত হইল। কি চমৎকার গঠন! এরূপ অপরূপ মূর্ত্তি তাহারা কখনও দেখে নাই। চারি দিকে এই সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া গেল। বিভিন্ন গ্রাম হইতে লোকে সেই মূর্ত্তি দেখিতে ছুটিয়া আসিল। জ্যাসনের খ্যাতি সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। তাহার সমাধিকালে লোকে লোকারণ্য হইল।

সেই প্রসিদ্ধ শিল্পী একদিন ঐ মূর্ত্তি দেখিতে আসিলেন। জ্যাসনের আদর্শ-প্রতিমা দেখিয়া তিনি শতমুখে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। শিল্পী দেখিলেন, জ্যাসন তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিল, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছে। তিনি উচ্চ মূল্যে ঐ মূর্ত্তি ক্রয় করিলেন। সেই আদর্শ-প্রতিমার দিকে বারংবার দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "এ মূর্ত্তি মানুষের নহে। ইহা কোনও পরীর ছবি; স্বপ্নাবেশে সে ইহা দেখিয়া থাকিবে; কিংবা সাগরের কূলে একাকী ঘুরিতে ঘুরিতে সে এই আদর্শ খুঁজিয়া পাইয়াছিল।" *

শ্রীযামিনীকান্ত সোম।

ভূতের দেশত্যাগ।

প্রথম পর্ব্ব।—ভূতের আড্ডা।

বাঞ্ছারাম চক্রবর্ত্তীর বাড়ী কেশবপুর, অবস্থা অতি মন্দ, পৌরোহিত্য করিয়া কোনও রকমে তাহার দিনপাত হইত। বাড়ীতে স্ত্রী কাত্যায়নী ভিন্ন আর

* ইংরেজী গল্প হইতে সঙ্কলিত।

দ্বিতীয় পরিবার ছিল না। যজমান-বাড়ীতে বার মাস ষষ্ঠী, সুবচনী, মনসা-পূজা প্রভৃতিতে যাহা কিছু পাওনা হইত, তাহাতে দুটি লোকের সংসার চালান বিশেষ কঠিন ছিল না। কিন্তু আর সে দিন নাই, কিছুদিন হইতে বাঞ্ছারাম গুলি খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। সকাল নাই, বিকাল নাই, সকল সময়েই সে গুলির আড্ডায় পড়িয়া থাকে; এমন কি, রাত্রি দশটা এগারটা বাজিয়া গিয়াছে; সন্ধ্যাকালেই খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া পল্লীবাসিগণ স্ব স্ব শয্যায় আশ্রয় লইয়াছে, তখনও বাঞ্ছারাম আড্ডায় বসিয়া গুলি টানিতেছে। শেষে রাত্রি দুই প্রহরের সময় আড্ডা ভাঙ্গিয়া গেলে সে ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরিয়া চোরের ন্যায় গৃহে প্রবেশ করিত। কাত্যায়নী তাহার লাঞ্ছনা করিতে কুণ্ঠিত হইত না। কিন্তু বাঞ্ছারাম ঠাকুর 'পেটে খেলে পিঠে সয়' এই নীতিবাক্য স্মরণ করিয়া স্থিরভাবে সকল গঞ্জনা সহ্য করিত। নিরুপায় ব্রাহ্মণকন্যা আর কি করিবে? পৈতা কাটিয়া তাহা বিক্রয় করিয়া যে দুই চারি পয়সা উপায় করিত, তাহাতেই কোনও দিন গৃহে অন্ন জুটিত, কোনও দিন উপবাস ঘটিত। ব্রাহ্মণ উপবাস করিয়া আছে শুনিয়া প্রতিবেশিগণ দয়া করিয়া সময়ে সময়ে চাউল, ডাইল, বা তৈল লবণ দিয়া সাহায্য করিত। যজমানেরা পুরোহিতের দ্বারা কাজ পায় না দেখিয়া অন্য পুরোহিতের আশ্রয় গ্রহণ করিল। বাঞ্ছারাম বলিল, "যজমান ছাড়ে ছাড়ুক, সে জন্য আমি গুলি ছাড়িতে পারি না।"

মাঘ মাসের একদিন রাত্রি দশটার সময় বাঞ্ছারাম গুলির আড্ডা হইতে বাড়ী আসিয়া দেখিল, ভাত নাই; গৃহিণীর উপর ভারি রুখিয়া উঠিল। কাত্যায়নী বলিল, "আমি কি রোজ ধার ক'রে তোমাকে খাওয়াব? যেখানে সমস্ত দিন পড়ে ছিলে, সেখান হ'তে এলে কেন? সেই চুলোতেই রাত্রি কাটাতে পার নি? ঘরে কি যখের ধন এনে রেখেছ যে, মুঠো মুঠো টাকা বের করবো, আর তোমাকে খাওয়াব?" বাঞ্ছারাম বলিল, "কি বল্‌বো গিন্নী, যদি তুমি একবার গুলি ধর ত বোঝ, কেমন মজার নেশা! ঝাঁটা লাথি যত কিছু মার না কেন, আমি গুলি ছাড়ছি নে।"

সন্ধ্যার পর হইতেই মেঘ হইয়াছিল, এতক্ষণে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সে ভয়ানক বৃষ্টি। একে মাঘের কন্‌কনে হাড়-বিঁধান শীত, তাহার উপর মুষলধারে বর্ষণ। বাঞ্ছারামের কুটীরখানির অনেক দিন জীর্ণসংস্কার হয় নাই; চাল দিয়া টুপ-টাপ্ করিয়া সমস্ত ঘরে জল পড়িতে লাগিল; লেপ, কাঁথা, বালিশ—সমস্ত ভিজিয়া

গেল। মাথাটি পর্য্যন্ত রাখিবার স্থান নাই। বাঞ্ছারামের স্ত্রী বলিল, "এমন গুলিখোরের হাতে প'ড়েছিলাম যে, দগ্ধে' দগ্ধে' ম'লাম; প্রাণটা যদি বেরুতো ত বাঁচ্‌তাম। কত কষ্টই যে সইতে হবে, তা ভগবানই জানেন। এমন গুলিখোরের কি এক গাছ দু'হাত দড়ি যোটে না! নাও—এই কলসীটা, নিয়ে গাঙ্গে ডুবে মর গে; আমার হাতের নোয়া, সিঁথের সিঁদুর ঘুচিয়ে নিশ্চিন্ত হই; এমন স্বামী থাকার চেয়ে না থাকা ভাল।"

যেমন বৃষ্টি, তেমনই বাতাস; বাঞ্ছারামের নেশা ছুটিয়া গেল; স্ত্রীর তিরস্কারে মনে মনে ধিক্কার জন্মিল; বলিল, "কি! আমি কি এতই অধম! বাঞ্ছারাম শর্ম্মার কিছু উপায় কর্‌বার ক্ষমতা নেই? চল্লাম আমি এখনই, দেখি, কিছু রোজগার কর্ত্তে পারি কি না?"

বাঞ্ছারাম কাঁধে গামছা ফেলিয়া বৃষ্টির মধ্যে বাহির হইয়া পড়িল। ঘোর অন্ধকার, বৃষ্টির বিরাম নাই, গ্রাম্য পথ কর্দ্দমপূর্ণ, ঝাপটা-বাতাসে হাড়ের মধ্যে শীত বিঁধাইয়া দেয়। এমন রাত্রে কেহ ঘরের বাহির হইতে পারে না; কিন্তু গুলিখোরের রোখ স্বতন্ত্র। সে অন্ধকারপূর্ণ, বৃষ্টি-জলপ্লাবিত, নির্জ্জন গ্রাম্যপথ দিয়া চলিতে লাগিল। কাত্যায়নী মনে করিল, "রাগ ক'রে যায়, যাক্; কত দূর যাবে? বড় জোর মণ্ডলদের চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে তামাকের শ্রাদ্ধ ক'র্‌বে। টাকা রোজগার করবো বলে' বেরুলেন! ওঁর জন্যে লোকে টাকার পুঁটুলি বেঁধে ব'সে আছে! টাকা দেবার জন্যে তাদের ঘুম হচ্ছে না!"

বাঞ্ছারাম কিন্তু মণ্ডলদের চণ্ডীমণ্ডপের দিকে গেল না; গ্রাম্যপথ ধরিয়া বরাবর মাঠের মধ্যে গিয়া পড়িল। গ্রামের মধ্যে তবু ছিল ভাল, মাঠের মধ্যে শীত আরো কন্‌কনে, জলের ঝাপটা ও বাতাসের বেগ আরও বেশী। তাহার সর্ব্বশরীর দিয়া জল ঝরিতে লাগিল, শরীর অবশ হইয়া আসিল; কতবার পা পিছলাইয়া গেল; পায়ে কাঁটা ফুটিল; তথাপি সে মাঠের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে।

এতক্ষণ সে ঘাড় নীচু করিয়া চোখ বুজিয়া চলিতেছিল; একবার মাথা তুলিয়া চাহিতেই দেখিতে পাইল, মাঠের মধ্যে প্রায় আধ ক্রোশ দূরে এক ভয়ানক অগ্নিকুণ্ড! ধূ ধূ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে; এত যে মুষলধারে বৃষ্টি, কিন্তু তাহাতে আগুন নিবিয়া যাওয়া দূরের কথা, বৃষ্টিধারাগুলি সেই প্রজ্বলিত আগুনের উপর ঘৃতাহুতির মত পড়িতেছে।

এ দৃশ্য দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিত, এ একটা ভৌতিক কাণ্ড।

কিন্তু বাঞ্ছারামের মন তখন প্রকৃতিস্থ ছিল না; এই রাত্রি দুইটার সময় বৃষ্টির মধ্যে মাঠে কেন যে আগুন জ্বলিতেছে, বাঞ্ছারামের মনে একবারও সে প্রশ্নের উদয় হইল না। সে ভাবিল, শরীরটা ত শীতে অবসন্ন হইয়া গিয়াছে; ওখানে আগুন জ্বলিতেছে দেখিতেছি; খানিকক্ষণ আগুন পোহাইয়া শরীরটা একটু গরম করিয়া লই,—বাপ রে কি শীত!

অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে, আধ ক্রোশের স্থানে দুই ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া বাঞ্ছারাম সেই অগ্নিকুণ্ডের কাছে উপস্থিত হইল। দেখিল, দশ বার জন লোক সেই অগ্নিকুণ্ডের চারি দিকে বৃত্তাকারে বসিয়া আগুন পোহাইতেছে,—এ লোকগুলি কে? কেন তাহারা এত রাত্রে এখানে বসিয়া অগ্নিসেবা করে? তাহাদের উদ্দেশ্যই বা কি? এরূপ কোনও প্রশ্ন তখন বাঞ্ছারামের মনে উদিত হইল না। বাঞ্ছারাম সেই লোকগুলির কাছে আসিয়া এক জনকে ধাক্কা দিয়া বলিল, "সর রে, তাপাই।" অনন্তর সে আগুন পোহাইতে বসিল।

ক্রমে বৃষ্টি থামিয়া আসিল। এ দিকে অনেকক্ষণ অগ্নিসেবা করিয়া বাঞ্ছারামের অবসন্নভাব দূর হইল,—শরীর বেশ সুস্থ হইল। তখন বাঞ্ছারাম ভাবিল, এত রাত্রে মাঠের মধ্যে এ লোকগুলা কি করিতেছে? ইহাদের কি ঘর বাড়ী নাই? হয় ত এরা ডাকাতের দল। শেষে কি ডাকাতের দলে আসিয়া পড়িয়াছি? সম্বলের মধ্যে ত আছে এক প্রাণ, ব্রাহ্মণীর অত্যাচারে তাহাও না থাকার মধ্যে; তবু যেটুকু আছে, তাহারই চিন্তাতে ব্রাহ্মণ চারি দিক অন্ধকার দেখিল। গুলিখোরেরা মাথা প্রায় হেঁট করিয়াই থাকে, চক্ষুও দিনের মধ্যে বেশীক্ষণ খোলা থাকে না; কিন্তু তাহাদের কান অত্যন্ত সজাগ। বাঞ্ছারাম শুনিতে পাইল, লোকগুলি যেন চুপে চুপে পরস্পর কি বলা-কহা করিতেছে। তাহার সম্বন্ধে কোনও কথা নয় ত? লোকগুলির চেহারা দেখিতে তাহার একটু ইচ্ছা হইল। চক্ষু মেলিয়া তাহাদের দিকে চাহিল। তাহাদের চেহারা দেখিয়াই তাহার কিন্তু চক্ষুঃস্থির! দেখিল, তাহাদের শরীর কাল, গায়ে সজারুর কাঁটার মত লোম, ঢেঁকির মত নাক, কুলোর মত কান, মূলোর মত দাঁত, চোখ কাহারও একটা, কাহারও দুটো, মাথার চুলগুলি খেজুরের ডালের মত, কাহারও লেজ আছে, কাহারও নাই, হাতের লম্বা লম্বা আঙ্গুলে তীক্ষ্ণ বাঁকা নখ—দেখিয়া ব্রাহ্মণের প্রাণ উড়িয়া গেল। বুঝিল, সর্ব্বনাশ হইয়াছে, ভুলিয়া সুবলপুরের মাঠে আসিয়া পড়িয়াছি! রাত্রিকালে দূরের কথা, ভূতের

ভয়ে দিনের বেলাতেও কেহ সুবলপুরের মাঠে আসিতে সাহস করিত না। "এ মাঠে ভূতের আড্ডা।"

দ্বিতীয় পর্ব্ব।—আপনি বাঁচ্‌লে বাপের নাম।

ভয়ে বাঞ্ছারামের জ্ঞানলোপ হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু বিপৎকালে সাহস অবলম্বন না করিলে প্রাণরক্ষা হয় না। বাঞ্ছারাম ভাবিল, এখন ভূতের হাত হইতে কি করিয়া প্রাণ বাঁচাই? এক এক সময় গুলিখোরদের ভারি উপস্থিত-বুদ্ধি জোগায়। এ ক্ষেত্রে বাঞ্ছারামও যথেষ্ট বুদ্ধি খরচ করিল। সে একটু লক্ষ্য করিয়া ভূতের দলের কথা শুনিতেই বুঝিতে পারিল, তাহারা তাহার সম্বন্ধেই আলাপ করিতেছে। সে আরও শুনিতে পাইল, যে ভূতটাকে সে ধাক্কা দিয়া আগুন পোহাইতে বসিয়াছিল, তাহার নাম "তাপাই"; তাপাই-ভূতকে অন্যান্য ভূতেরা জিজ্ঞাসা করিতেছে, "এ ঠাকুর তোর নাম জানলে কেমন ক'রে রে তাপাই?" তাপাই উত্তর করিল, "কি জানি ভাই, আমি ত একে কোনও পুরুষে চিনি না, এ লোকটা ত রোজা-টোজা নয়?"

বাঞ্ছারাম যখন বলিয়াছিল, "সর রে, তাপাই"—তখন সে ভূতের নাম 'তাপাই' ভাবিয়া যে এ কথা বলিয়াছিল, তাহা নহে;—তাহার বক্তব্য ছিল, "সর রে, আমি তাপাই,—কি না, শরীর তাতাইয়া নিই।" কিন্তু স্থূলবুদ্ধি ভূতেরা কথাটা সে অর্থে না বুঝিয়া মনে করিয়া লইল, বাঞ্ছারাম তাহাদের উক্ত নামধারী সহচরটির নাম ধরিয়াই তাহাকে সরিতে বলিয়াছিল। সুতরাং যখন তাপাই বিস্মিতভাবে বলিল, "আমি ত একে কোনও পুরুষে চিনি না", তখন বাঞ্ছারাম সাহসে ভর করিয়া তাপাইকে বলিল, "কি রে, তুই বলিস্ কি? তুই আমাকে কোনও পুরুষে চিনিস না,—বল্লেই কি আমি তোকে অমে ছেড়ে দেব? তোর বাবা বেটা চিরকাল আমার ধান খেয়ে মানুষ, আর তুই বল্লি কি না, 'আমি কোনও পুরুষে একে চিনিনে'। আগে ত শরীরটা গরম করে নিই, তার পর চিনিস্ কি না, জানিয়ে দিচ্ছি। মানুষই নেমক্-হারাম হয়, ভূত বেটারাও যে এমন নেমক্-হারাম, তা ত জান্‌তাম না।"

তাপাই চটিয়া বলিল, "কি ঠাকুর, তুমি এসে গায়ে পড়ে ঝগড়া কর? তোমার কি এত ধার ধারি? ভাল চাও ত মুখটা বুজে চুপ্‌টী ক'রে চলে যাও।"

ব্রাহ্মণ গর্জ্জন করিয়া বলিল, "চুপ কর * * *! এখনই জুতো মেরে পিট ফেঁসো করে দেব। আমি কি শুধু শুধু তোর গায়ে প'ড়ে ঝগড়া কচ্ছি! আমার ত আর কোনও কাজ নেই, আমার ঘর বাড়ীও নেই,—কেমন? তাই

রাত্রি দুপুরের সময় ভূতের আড্ডায় ঘুরে বেড়াচ্ছি! বেটা, তুই যে এখনি সুষ্ট ব'ল্‌লি 'তোমার এত কি ধার ধারি?'—ধার না ধার্‌লে খামকা আমি এখানে আসি? তোর বাপের কাছে আমি তিন শ টাকা পাব, এ নাগাদ সে তার একটি পয়সাও শোধ কল্লে না। যদি ভাল চাস্‌ ত এখনি আমার সে টাকা শোধ ক'রে দে। ক'দিন ধ'রে বেটাকে খুঁজে খুঁজে একেবারে হায়রান হ'য়ে গিয়েছি।"

তাপাই উচ্চ গলা করিয়া বলিল, "বাবা টাকা ধারে ত তার কাছে নাও গে, আমি সে টাকা দিতে গেলাম কেন? আমি কি তোমার কাছে টাকা নিতে গিয়েছিলাম?"

ব্রাহ্মণ বলিল, "তবে সহজে দিবিনে বটে! তুই বেটা যে আর জন্মে মানুষ ছিলি, তা তোর কথার ভাবে বোধ হয় না। জানিস্‌নে, বাপের দেনা থাক্‌লে তা ছেলেকে শোধ কর্ত্তে হয়? তুই কি যে সে মানুষের হাতে প'ড়েছিস্‌? আমার নাম বাঞ্ছারাম শর্ম্মা; আমার বাপের নাম ঠাকুর রাম-রাম শর্ম্মা। যে নাম শুন্‌লে তোদের ভূতগুষ্টির পিলে এখনও পর্য্যন্ত চম্‌কে উঠে। কেমন ক'রে টাকা আদায় করে, তবে দেখ্‌বি,—এই দেখ!" বলিয়া বাঞ্ছারাম তাপাইয়ের পিঠে এক বোম্বাই কিল ঝাড়িল। বোম্বাইকিল বড় সাধারণ জিনিস নয়, মানুষের পিঠে সে কিল একটা পড়িলেই বৈশাখের রৌদ্রে কাঁঠাল-কাঠের মত পিঠের হাড় চৌচির হইয়া ফাটিয়া যায়। তাপাইয়ের পিঠ ভূতের পিঠ হইলেও পিঠ ত বটে! ভাদ্র মাসের পাকা তালের মত পিঠের উপর দুড় দাড় করিয়া দুই চারিটা কিল পড়িতেই তাপাই বুঝিল, ব্যাপার বড় গুরুতর! পলাইয়া যে অব্যাহতি পাইবে, তাহারও যো নাই। বাঞ্ছারাম ঠাকুর বাম হস্তে তাহার খেজুরের পাতার মত চুলের গোছা শক্ত করিয়া ধরিয়াছে। মারের চোটে তাপাই সোজা হইয়া গেল; সবিনয়ে বলিল, "তোমার পায়ে পড়ি ঠাকুর, তোমার বোম্বাই কিল একটু থামাও; তোমরাই ত বল,—'মারের চোটে ভূত পালায়'; কিন্তু আমি যে পালিয়ে বাঁচ্‌বো, তারও উপায় নাই। আগে থেকেই আমার লম্বা চুলগুলি গ্রেফ্‌তার করে বসেছ। আগে যদি জান্‌তাম, ভূতের ঘাড়ে মানুষ এসে পড়্‌বে, তা হ'লে আমাদের নাপিত-ভূত বন্ধুকে দিয়ে মাথাটা কামিয়ে বেলের মত তেল-তেলা ক'রে রাখতাম।"

বাঞ্ছারাম কিল একটু থামাইয়া বলিল, "টাকা দিবি,—বল্‌!" তাপাই সবিনয়ে বলিল, "আজ্ঞে, টাকা কোথায় পাব?"

"কোথা পাবি, তা আমি কি জানি? কিল ছেড়ে শেষে কি পানাই ধরতে হবে?"

পানাইয়ের কথা শুনিয়া ভূতের আশঙ্কা আরও বাড়িল। বলিল, "আজ্ঞে, কিলের চোটেই আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গিয়েছে; পানাই ধ'ল্লে আমার দফা একেবারে রফা হবে। আমি সত্যি বলছি, আমার হাতে একটা কানা কড়িও নেই।"

বাঞ্ছারাম বলিল, "নেই ত চুরি ক'রে আন্! নেই বল্লে আমি শুনবো কেন? পানাইয়ের চোটে তোদের এই বারো ভূতের হাড় গুঁড়ো ক'রে তবে আমি এখান থেকে উঠ্‌বো।"

অন্যান্য ভূতেরা পানাইয়ের আবির্ভাব-আশঙ্কায় অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাপাইকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তোর টাকা নেই বটে, তোর মামার ত তিন শো টাকা ঐ তাল গাছের গোড়ায় পোঁতা আছে; সেই টাকা দে না কেন?"

"কোন্ টাকা?"

ভূতেরা বলিল, "তোর মামা বাঁড়ুর টাকা, আবার কোন্ টাকা?"

তাপাই ত্রস্তভাবে বলিল, "ওরে বাপ রে, সে টাকাতে কি আমি হাত দিতে পারি! মামা এসে যদি টের পায় ত আমার হাড় গুঁড়ো করে দেবে!"

ভূতেরা উত্তর করিল, "ঠাকুরের ঐ বোম্বাই কিলে হাড় আস্ত থাক্‌লে ত তোর মামা এসে গুঁড়ো ক'রবে! আগেই যে তা গুঁড়ো-নাড়া হবার যো হয়েছে! তবু এখনো পানাই বেরোয় নি!"

"না, না,—আমি কোনও মতে সে টাকা দিতে পারবো না। মামাকে চিনিস তো? যদি সে জান্‌তে পারে, তোদের পরামর্শেই আমি তার টাকা নিয়ে বাপের দেনা শোধ করেছি, তা হ'লে আমার ত কথাই নেই, তোদের শুদ্ধ বাপের নাম ভুলিয়ে দেবে।"

ভূতেরা উত্তর করিল, "সে পরে দেখা যাবে,—'আপনি বাঁচ্‌লে বাপের নাম'।"

তৃতীয় পর্ব্ব।—'ভূতের মন্ত্র'—বোম্বাই কিল।

অগত্যা তাপাই আর কোনও প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না; মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিল, "তবে চল, টাকাটা ঠাকুরকে দিয়ে আপাততঃ নিস্তার পাওয়া যাক গে। প্রাণটা এমনেও টিক্‌চে না, অমনেও টিক্‌বে না; মানুষের হাতে ম'রে কেন ভূতের নাম হাসাই? এ যেটুকু বাকি রেখে যাচ্ছে, মামাই না হয় সেটুকু শেষ করবে।"

বাঁড়ুর আড্ডা যে তাল গাছে, বার জন ভূতের সকলেই সেই তালগা'ছ-তলায় উপস্থিত হইল। বাঁড়ু তখন সেখানে ছিল না; থাকিলে ভূতের দলের সাধ্য কি যে, সেখানে যায়! তাহারা জানিত, মামা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই মানস সরোবরের ধারে চরিতে গিয়াছে, রাত্রে আর তাহার আসিবার সম্ভাবনা নাই, ভোর বেলা সে ফিরিয়া আসিবে।

তালগাছতলায় অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া তাপাই তাহার খন্তার মত দীর্ঘ নখ দিয়া মাটী খুঁড়িতে লাগিল। অনেক খুঁড়িয়া মাটী-সমেত এক ঘটী টাকা পাইল; গণিয়া দেখিল, ঠিক তিন শত টাকা আছে। বাঞ্ছারামকে বলিল, "খুব শেয়াল বাঁহাতি ক'রে বেরিয়েছিলে ঠাকুর; এই নাও টাকা, এখন আমাদের ছাড়, মাথার চুলগুলো ধ'রে যে রকম টান দিয়েছ, মাথাটা বন্ বন্ ক'রে ঘুরছে, মানুষের ঘাড়েই ভূত চাপে—ভূতের ঘাড়ে মানুষ এসে পড়ে, তা কখনও শুনিও নি। আজ চোখে দেখা গেল।"

বাঞ্ছারাম বলিল, "এই ক' বছর তিন শো টাকার স-শ টাকা সুদ হয়েছে; আমি সমস্ত সুদের টাকা ছেড়ে দিয়েছি, এখন নিজের ঘাড়ে টাকা ব'য়ে বাড়ী নিয়ে যাব? লাভ ত ভারি! চ' বেটা, তুই পৌঁছে দিয়ে আসবি।" ঠাকুর ভাবিয়াছিল, ভূতেরা যে রকম ত্যক্ত হইয়াছে, তাহাতে তাহারা যদি যো পায়, তা হ'লে আর তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়িয়া দিবে না। তিনি পিঠ ফিরাইলেই, তাঁহার ঘাড়টি ধরিয়া টুক্ করিয়া মটকাইয়া দিবে। তাই সে সকল ভূতকে সঙ্গে লইয়া তাপাইয়ের ঘাড়ে তিন শ টাকা চাপাইয়া বাড়ী চলিল।

বাড়ী যাইতে যাইতে ব্রাহ্মণ ভাবিল, এখন ত কিল চড়ের ভয়ে বেটারা ভালমানুষের মত চলিয়াছে; কিন্তু পরে ইহাদের বিশ্বাস কি? আমার ত সম্বলের মধ্যে একখানা ভাঙ্গা ঘর; আমি রাতদিন গুলির আড্ডাতেই পড়িয়া থাকি। এক সময় যদি ইহারা সদলবলে আসিয়া আমার ঘরখানি ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া যায়, তবে আমি কি করিব? আর আমার ঘর বাড়ীর অবস্থা দেখিলে ইহারা কখনও বিশ্বাস করিবে না যে, আমার কোনও পুরুষে মহাজনী করিয়াছে। ভাগ্যে তাপাইয়ের বাপ বেটা ভূতের দলে ছিল না! সে থাকিলে ত আমার সব মতলবই ফাঁসিয়া যাইত।

অতএব বাঞ্ছারাম তাহাদিগকে নিজের বাড়ীতে না লইয়া গিয়া ঘটোৎকচ শিকদারের অট্টালিকার কাছে লইয়া গেল। ঘটোৎকচ শিকদার চাষী গৃহস্থ, অনেক হাল গরু আছে, বাড়ীখানিও ভাল; মহাজনের বাড়ী বলিয়াই বোধ হয়।

কাঁধ হইতে টাকার ঘটী নামাইয়া দিয়াই তাপাই বলিল, "আজ্ঞে ঠাকুর মশায়, তা হ'লে আমরা এখন যাই?" বাঞ্ছারাম তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "এ ঘরে কি আছে, জানিস্?" কৌতূহলের সহিত সকলে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি?" "এ ঘরে কৃষাণদের ভম্বোলের চামড়ায় তৈরী আশ্‌মানী পানা আছে।" ভূতেরা বিচলিত হইয়া বলিল, "আজ্ঞে, যাই?" ব্রাহ্মণ বলিল, "আচ্ছা যা, কিন্তু খবরদার আর এমুখো হ'স্‌নে,—আর তোর মামা বাঁড়ু শুনেছি বড় বজ্জাত, পানাইয়ের খবরটা তাকেও দিয়ে রাখিস্, সে যেন বুঝে সুঝে এ দিকে আসে। যা এখন।"

ভূতেরা ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

বাঞ্ছারাম তখন টাকাগুলি লইয়া হৃষ্টচিত্তে নিজের গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। কাত্যায়নী তখন দ্বার বন্ধ করিয়া ঘুমাইতেছিল। ঠাকুর দ্বারে ধাক্কা দিয়া বলিল, "গিন্নী, ওঠ, দুয়ার খোল।"

ব্রাহ্মণপত্নী তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া দিল। ব্রাহ্মণ ঘরে প্রবেশ করিয়া চকমকি ঠুকিয়া আগুন ধরাইল; তাহার পর প্রদীপ জ্বালাইয়া গৃহিণীর সম্মুখে ঘটীর টাকা হড়্ হড়্ করিয়া ঢালিয়া দিল, এবং সগর্ব্বে বলিল, "তবে নাকি আমি টাকা রোজগার কর্ত্তে পারি নে?"

ব্রাহ্মণকন্যা তিন শ' টাকা কখনও একত্র দেখে নাই; অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ক'-কুড়ি টাকা আছে?"

বাঞ্ছারাম বলিল, "তা পাঁচ সাত কুড়ি হবে। কেমন, আর গালাগালি পাড়বি?"

ব্রাহ্মণী বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! হ্যাঁ গো, তোমার আবার এ বিদ্যে কবে থেকে হ'লো? শুনেছি, গুলিখোরেরা ছিঁচকে চোরই, তুমি যে রাতারাতি সিঁধেল চোর হ'য়ে উঠেছ! এ ত বড় সাধারণ কথা নয়! এত দিনে দেখছি—হাতে দড়ি পড়লো।"

বাঞ্ছারাম ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না, ব্রাহ্মণী, আমি কারও ঘরে সিঁদ দিয়ে এ টাকা আনি নি; একটু আধটু গুলি খাই বটে, কিন্তু তাই ব'লে কি লোকের ঘরে সিঁদ দেব? তা হ'লে ত অনেক দিনই অনেক টাকা আনতে পার্‌তাম।"

ব্রাহ্মণী অবিশ্বাস করিয়া বলিল, "সিঁদ দেওনি ত শেষরাত্রে লোকে তোমার জন্যে টাকা হাতে ক'রে বসেছিল? টাকাতে ত আর [illegible] কামড়ায় না যে, শেষ রাতে কেউ তোমাকে ডেকে বল্‌বে—'ওগো! এই টাকাগুলি তুমি নিয়ে

যাও, টাকার কামড়ে আমার ঘুম হচ্ছে না।' চুরি ক'রে টাকা এনে ভারি বাহাদুরী হচ্ছে, অলপ্‌পেয়ে মিন্‌সে !"

বাঞ্ছারাম উত্তর করিল, "আরে রাম! তুমি যে আমার কথা একেবারে বিশ্বাস কচ্ছো না; এ চুরি করাও টাকা নয়, মানুষের টাকাও নয়।"

"তবে কি যখের টাকা?—না কোথাও পড়ে পেয়েছ?"

"পড়ে পাওয়াই বটে! এ ভূতের টাকা!"

ব্রাহ্মণী শিহরিয়া উঠিল! কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! ভূতের টাকা ঘরে এনেছ! তা হলে যে আর একটি দিনও দেশে তিষ্ঠতে পারা যাবে না। কাজ নেই অমন টাকায়, তুমি ফিরিয়ে দিয়ে এসো গে, সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল। আমি তোমাকে পৈতে বিক্রী ক'রে খাওয়াব।"

বাঞ্ছারাম হাসিয়া বলিল, "কোনও ভয় নেই, ভূতে আমাকে এ টাকা দিয়াছে।"

ব্রাহ্মণীর সর্ব্বশরীর ঘর্ম্মাপ্লুত হইয়া উঠিল; আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "ভূতে তোমাকে টাকা দিয়াছে! ভূতে ত লোকের ঘাড়ই মটকে দেয়, টাকা দেয়—তা' ত কখনও শুনিনি।"

বাঞ্ছারাম বলিল "আরে, ভূতে কি সহজে টাকা দেয়, না এ রাজ্যে কেউ ভূতের আড্ডায় গিয়ে টাকা আদায় ক'র্ত্তে পারে? আমি যে ভূতের মন্ত্র জানি, তাতে ভূত ভারি বশ করা যায়।"

ব্রাহ্মণী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "সত্যি নাকি, তোমার পেটে এত বিদ্যে, তা' ত আমি জানতাম না। হ্যাঁগা, তা ভূতের মন্তরটা কি শুনি?"

বাঞ্ছারাম হাসিয়া বলিল, "ভূতের মন্ত্র—বোম্বাই কিল।" ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

সহযোগী সাহিত্য।

শিক্ষা এবং স্ত্রীশিক্ষা।

বিলাতে সফরীগেটদিগের উৎপাত উপদ্রব ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া জর্ম্মণীর এক জন অধ্যাপক এক দীর্ঘ সন্দর্ভ লিখিয়াছেন। জর্ম্মণ ভাষায় লিখিত এই সন্দর্ভ অবলম্বনে বিলাতের অনেকগুলি মাসিক পত্রিকায় বেশ একটু আন্দোলন চলিয়াছে। জর্ম্মণ অধ্যাপক বিলাতের শিক্ষা-পদ্ধতির দোষ দেখাইয়া বলিয়াছেন যে, এক পদ্ধতি অনুসারে নর-নারী উভয়কেই শিক্ষিত করিবার চেষ্টা করিলে এই প্রকারের বিষময় ফল অবশ্যম্ভাবী। তিনি বলেন, শিক্ষার একটি মূল উদ্দেশ্য—to draw out the latent faculties of the learner; অর্থাৎ, বিদ্যার্থীর প্রকৃতিজাত সম্মুপ্ত শক্তিসকলের সম্যক্ উন্মেষ। প্রত্যেক নর নারীর গোটাকয়েক

এমন গুণ আছে, যাহার প্রভাবে তাহার বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হইয়া থাকে। তোমার আমার আকারগত এবং ভাবগত ভেদ আছে; কেন না, তোমাতে এমন সকল গুণ আছে, যাহা আমাতে নাই, এবং আমাতেও এমন সকল গুণ আছে, যাহা তোমাতে নাই। এই গুণগুলির জন্যই তোমার তুমিত্ব, এবং আমার আমিত্ব। এবং গুণ বংশানুক্রম এবং প্রতিবেশ-প্রভাব জন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। এ গুণ নষ্ট হইবার নহে, নষ্ট হয় না। যেমন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য জন্য বিশিষ্ট গুণ সকলের বিকাশ, তেমনই জাতিতে জাতিতে পার্থক্য জন্য,—জলবায়ুর, আচার-ব্যবহারের, পুরুষপরম্পরাগত সংস্কারের, রীতি-পদ্ধতির বৈষম্য জন্য বিশিষ্ট গুণ সকলের বিকাশ হইয়া থাকে। এই গুণের দ্বারাই Individualism বা ব্যক্তিত্বের বা ব্যক্তিগত বিশিষ্টতার বিকাশ হইয়া থাকে। নর ও নারীর এক দেহ নহে, দেহের এক প্রকার ক্রিয়া নহে, মস্তিষ্কের এক রকম গঠন নহে,—এমন কি, নর ও নারীর দেহের সকল যন্ত্রের আকার ও ক্রিয়াও ঠিক এক রকমের নহে। বিধাতা যেন দুইটা স্বতন্ত্র উদ্দেশ্যসাধন জন্য এবম্প্রকারের দুই প্রকারের জীব সৃষ্টি করিয়াছেন। অথচ বিলাতের স্ত্রীশিক্ষা দিবার সকল পাঠশালাতেই নারীদিগকে ঠিক নরের মতন শিক্ষা দিবার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। ছেলেদের যাহা খেলা ধূলা, মেয়েদেরও তাহাই; সেই ফুটবল, ক্রিকেট্, নৌকায় বাচ খেলা প্রভৃতি। ছেলেরা যে ভাবে যে সকল পুস্তক পড়িয়া থাকে, মেয়েদেরও তাহাই পড়িতে হয়। এক ভাবে বিজ্ঞান শিখান হয়, এক ভাবে কাব্য সাহিত্যের চর্চ্চা করা হয়। এক ভাবে ইতিহাস ও রাজনীতির চর্চ্চা করা হয়। ইহার ফলে Fusion of types—আদর্শের সম্পিণ্ডীকরণ হইয়া থাকে। নর ও নারীর উভয়ের আদর্শ এক রকমের হইয়া যায়। নারীর Receptivity বা গ্রাহিকাশক্তি অধিক তীব্রতর এবং প্রবলতর। তাই এবম্প্রকারের অস্বাভাবিক শিক্ষার ফলে নারী অনেকটা নরত্ব লাভ করিতেছে; পুরুষের পরুষ ভাব নারীতে অনুস্যূত হইতেছে। অতিমাত্রায় ব্যায়ামের প্রভাবে নারীর মাংসপেশী সকল অতি কঠিন হইয়া উঠিতেছে; নারী অনেকটা নরাকারে পরিণত হইতেছে। গর্টন কলেজের (Girton college) মেয়েরা অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের ছোকরাদের মতন অনেকটা হইয়া উঠিতেছে। অথচ স্ত্রীত্ব ত দূর হইবার নহে, প্রকৃতির বৈষম্য ত নষ্ট করিবার উপায় নাই। শিক্ষার দোষে নারীর চিত্ত ও বুদ্ধি নরের মতন হইলেও, দেহের গঠনভঙ্গী অনেকটা নারীর মতন থাকিয়া যাইবেই। প্রকৃতি (Nature) কোনও উপদ্রব সহেন না, উপদ্রবের প্রতিশোধ লইয়াই থাকেন। তাই বিলাতের কলেজী শিক্ষায় শিক্ষিতা নারীমাত্রই এক প্রকারের (Hysteria) হিষ্টিরিয়া-রোগগ্রস্ত হইয়া থাকেন। কোনও একটা খেয়াল ইহাদের মাথায় ঢুকিলেই তাহা সাম্লাইতে পারে না; ঝোঁকের বশবর্ত্তিনী হইয়া ইহারা সকল কাজ করিয়া থাকে। অনেকের এই স্নায়ব রোগ এত অতিমাত্রায় প্রবল যে, তাহাদিগকে অনায়াসে উন্মাদিনী বলা চলে। বিলাতের শিক্ষিতা নারীর মধ্যে শতকরা আশী জন এই ভাবের উন্মাদ। বিলাতের পাগলা-গারদ সকলে যত অধিক নারী আবদ্ধ আছে, তত উন্মাদিনীর সংখ্যা ইউরোপের অন্য কোনও দেশেই নাই। কেবল ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের পাগলা-গারদে পাঁচ হাজার উন্মাদিনী আবদ্ধ আছে। আয়ারল্যাণ্ডে আবার উন্মাদিনীর সংখ্যা এতটা নহে; কারণ, আয়ারল্যাণ্ডে এই ভাবের স্ত্রীশিক্ষার তেমন প্রচলন এখনও হয় নাই।

এই জর্ম্মণ অধ্যাপক বলেন যে, একগাদা ছেলেকে একটা শ্রেণীতে পুরিয়া এক ভাবে লেখাপড়া শিখান ঠিক নহে। ছেলেদের বিশিষ্টতা নষ্ট হয়, প্রকৃত শিক্ষা বা culture হয় না। তিনি বলেন, গোড়ার অক্ষর-পরিচয় এবং সাধারণ ভাষাজ্ঞানটা এক সঙ্গে হইলেও হইতে পারে, কিন্তু দশ বৎসর বয়স হইতে পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রত্যেক বিদ্যার্থীকে স্বতন্ত্রভাবে, তাহার প্রকৃতিগত বিশিষ্টতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, শিক্ষা দিতে হইবে। ফ্রান্স ও জর্ম্মণীতে ছাত্রের বিশিষ্টতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা দিবার পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে। এই ভাবে শিক্ষিত যাহারা, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই submarines বা জলমগ্ন বা জলমধ্যে বিচরণশীল রণপোতের অধ্যক্ষের পদ পাইয়াছে। উহারা অধিকতর স্বাবলম্বনশীল, নির্ভীক ও তেজস্বী হয়। ইংলণ্ডের অনেক যুবক submarine বা মাৎস্য রণপোতের কার্য্য গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে জর্ম্মণী বা ফ্রান্সে যাইয়া এই পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন। এই মাৎস্য রণপোতে যাহারা কাজ করে, তাহাদিগকে অসাধারণ বুদ্ধিমান, তেজস্বী ও নির্ভীক হইতে হয়। মরণকে তুচ্ছ করিতে না শিখিলে এ কাজ করা যায় না। তাই এ কার্য্য যাহারা করে, তাহাদিগকে এক পক্ষে যেমন বিজ্ঞানবিদ্‌ ও হিসাবী হইতে হয়, অন্য পক্ষে তেমনই স্বাবলম্বী ও ধীর হইতে হয়। সাধারণ স্কুল কলেজে শিক্ষিত যুবকগণ এ কার্য্যের উপযোগিতা লাভ করিতে পারে না; তাহারা চঞ্চল হয়, ব্যস্তবাগীশ হয়, বিপদে অধীর হইয়া উঠে; তাহাদের স্বাবলম্বন নাই বলিলেও চলে। কাজেই যে শিক্ষায় ব্যক্তিগত-বিশিষ্টতাজ্ঞাপক সম্মূঢ় শক্তি সকলের উন্মেষ পূর্ণভাবে না ঘটে, সে শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্রগণের মধ্যে সকলেই বিপজ্জনক কার্য্যে ব্রতী হইতে পারে না।

এই জর্ম্মণ অধ্যাপক শেষে একটা বড় কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, কেবল সাক্ষর লেখাপড়া শিখাইয়া গোটাকয়েক অর্থলোলুপ ও বিলাসী যুবকের সৃষ্টি করা গবর্মে‍ণ্ট-প্রতিষ্ঠিত কোনও শিক্ষা-বিভাগের উদ্দেশ্য হওয়া ঠিক নহে। সাধারণ প্রজার টাকা লইয়া দেশের ছেলেদের লেখাপড়া শিখান প্রত্যেক গবর্মেণ্টের কর্ত্তব্য কেন? গবর্মেণ্ট-প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা-বিভাগের দুইটি উদ্দেশ্য সর্ব্বদা মনে রাখা কর্ত্তব্য। প্রথম—এমন ভাবে দেশের যুবকগণকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে, যাহার প্রভাবে তাহারা বিপদকালে জাতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারে,—জাতির বিশিষ্টতা রক্ষা করিতে পারে। দ্বিতীয়—শান্তির সময়ে এমন ভাবে এই সকল যুবক জীবিকার্জ্জন করিবে, যাহার প্রভাবে দেশের ও জাতির ধনবৃদ্ধি সম্ভবপর হয়, এবং লোকসংখ্যার হিসাবে হৃষ্টপুষ্টকায়, স্বজাতিবৎসল পুত্র কন্যায় জাতির পুষ্টিসাধন হয়। যে শিক্ষার প্রভাবে এই দুইটি উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া থাকে, সে শিক্ষা শিক্ষাই নহে; তেমন শিক্ষার জন্য কোনও গবর্মেণ্টের একটি কপর্দ্দক ব্যয় করা কর্ত্তব্য নহে। আত্মরক্ষা, জাতিরক্ষা, আত্মোন্নতি এবং জাতিপুষ্টি,—এই চারিটি উদ্দেশ্যই সকল প্রকার শিক্ষার (culture) সাধনার বিষয়ীভূত হওয়া কর্ত্তব্য। ধনবল, জনবল, বাহুবল ও বুদ্ধিবল—এই চারিপ্রকারের বলই সকল জাতির মধ্যে গ্রাহ্য। যে শিক্ষায় এই চারিপ্রকারের বলবৃদ্ধিসাধন না হয়, সে শিক্ষার জন্য দেশের প্রজাসাধারণে টেক্স দিয়া গবর্মেণ্টের শিক্ষাবিভাগকে অর্থানুকূল্য করিবে কেন? কোনও দেশের প্রজার এমন ভাবে অর্থের অপব্যয় করা ঠিক নহে।

বিলাতের মাসিকপত্র সকলের আলোচনা দেখিয়া মনে হয়, জর্ম্মণ অধ্যাপকের সিদ্ধান্তের কোনরূপ বিরোধ কেহ ঘটাইতেছেন না। পক্ষান্তরে, Dean Juge, Bishop of Oxford প্রভৃতি ধর্ম্মযাজক মহোদয়গণ, আর্থার ব্যালফোর ও এলেকজ্যাণ্ডার বিরেল এবং ভাইকাউণ্ট হ্যালডেন প্রমুখ রাজনীতিকগণ জর্ম্মণ অধ্যাপকের মতের পোষকতা করিতেছেন। বিলাতের নৌসচিব মাষ্টর চর্চ্চিল্ মহাশয় নৌবিভাগের যুবকগণকে জর্ম্মণ-পদ্ধতি-অনুসারে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই জর্ম্মণ-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া খার্ত্তুমের গর্ডন কলেজ চলিতেছে। ইউরোপ যেন অনেকটা প্রাণের দায়ে কাব্যসাহিত্যের আলোচনা পরিহার করিতে বাধ্য হইতেছে। এখন এমন শিক্ষা চাই, যাহার প্রভাবে দেশবাসী এরোপ্লেনে চড়িয়া, মাৎস্য রণপোত বাহিয়া, ভীমকায় ড্রেডনটে আরোহণ করিয়া, শত্রুদমন করিতে পারে। ইহার প্রত্যেক কার্য্যেই বিশিষ্টতা-উন্মেষের প্রয়োজন ;—বিশিষ্ট জ্ঞান, বিশিষ্ট বিদ্যা, বিশিষ্ট সাহস, বিশিষ্ট স্বাবলম্বন আবশ্যক। তবেই আধুনিক রণকার্য্যে কুশলতা লাভ করিতে পারিবে। অর্থোপার্জ্জনের জন্যও বিশিষ্টতার প্রয়োজন। রসায়নের উন্নতি করিতে হইবে, ভূমির উর্ব্বরতা শতগুণ বর্দ্ধিত করিতে হইবে, অল্পব্যয়ে অধিক মাল উৎপন্ন করিতে হইবে, বেচা-কেনার নূতন পদ্ধতি বাহির করিতে হইবে, তবে পর্য্যাপ্ত অর্থ উপার্জ্জন করা সম্ভবপর হইবে। সকল দিকে, সংসারের সকল ব্যাপারে বিশিষ্টতার প্রয়োজন। কাজেই সেকালের শিক্ষা পুরাতন পদ্ধতিতে চালাইলে এখন আর চলিবে না। এই হেতু জর্ম্মণ অধ্যাপক ইংরেজ জাতিকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন যে, স্ত্রীশিক্ষার পদ্ধতি পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে ; স্ত্রীশিক্ষাকে specialise বা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করিতে হইবে ; নারীকে নারীর মতন করিয়া শিক্ষিত করিতে হইবে। তবে যদি পঞ্চাশ বৎসর পরে এই সফরীগেট পাপ দূর হয়। নহিলে এই শিক্ষার দোষে ইংরেজের গৃহস্থলী ও সমাজ অশান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিবে, জাতি আত্মদ্রোহে জীর্ণ ও শিথিল হইয়া পড়িবে। এখন আপাততঃ সফরীগেটদিগের অনেকগুলি আব্দার রাখিতেই হইবে। তাহারা যে সকল রাজনীতিক অধিকার চাহিতেছে, তাহার কিছু দিতেই হইবে। নচেৎ তাল সামলান দায় হইয়া উঠিবে। কোনও রকমে এই ঝোঁকটা কমাইতে পারিলে, পরে এই নারীদিগকে শাসনে রাখা চলিবে। স্নায়ব-দৌর্ব্বল্যজাত রোগের সংক্রমণ-প্রবণতা জবরদস্তি করিয়া নষ্ট করা যায় না। ব্যক্তিগত হিষ্টিরিয়া রোগ যে ভাবে কমাইতে হয়, সম্প্রদায়-গত হিষ্টিরিয়াকেও সেই পদ্ধতি অনুসারে কমাইতে হইবে। শেষে রোগের মূল কারণ অপসারিত করিতে হইবে। শিক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন ঘটাইতে হইবে। তবে জাতি ও সমাজ রক্ষা পাইবে।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

গৃহস্থ। জ্যৈষ্ঠ।—"আলোচনা"র সাময়িক মন্তব্য ও সুনির্ব্বাচিত সারসংগ্রহ আছে। শ্রীযুত পঞ্চানন তর্করত্ন "বিলাত-যাত্রা" প্রবন্ধে বিরুদ্ধ-পক্ষের সমর্থন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তর্করত্ন মহাশয় সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ে যে সকল 'ফতোয়া' দিয়াছেন, তাহার সকলগুলি সুচিন্তিত নহে। তর্করত্ন মহাশয় বলেন,—"সমাজে যে অংশে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের

প্রভুত্ব, তাহাই সমাজের মেরুদণ্ড,—সেখানে এখনও বিলাসের প্রাদুর্ভাব তেমন হয় নাই। দিন থাকিতে সাবধান হইলে সেই অংশ অবলম্বন করিয়া সমাজের মঙ্গলারম্ভ হইতে পারে।" সমাজের কোন অংশে, কোন জেলার কোন পরগণার কোন মৌজায় কোন ব্রহ্মোত্তরে তর্করত্ন মহাশয় 'ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব' দেখিয়াছেন? নিজের শিষ্য-সেবকদের মধ্যেও সর্বত্র তাঁহাদের সিকি পয়সা মূল্যের প্রভুত্ব, এক কাঁচ্চা ওজনের প্রভাব আছে কি? প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠায় ও তাহার রক্ষায়, শুধু শক্তি নয়, ত্যাগবলও আবশ্যক হয়। কেবল বিলাত-ফেরতকে তাড়া করিলে, বা একঘরে করিবার পরামর্শ দিলে প্রভুত্ব থাকে না, আপনাকেও সেই প্রভুত্ব পালন করিতে হয়। উরগক্ষত অঙ্গুলীর মত উৎপথগামীকে ত্যাগ করিবার শক্তি আপনাদের আছে কি? ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের প্রভুত্ব-শাসিত সমাজের মেরুদণ্ডে "বিলাসের প্রাদুর্ভাব তেমন হয় নাই"—ইহারই বা অর্থ কি? "তেমন" মানে কি? সমাজের কোন্ অংশে বিলাস নাই? ব্রাহ্মণপণ্ডিতরাই যে বিলাসী হইয়াছেন! তর্করত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন,—"৺ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ব্যবহার্য্যতা আকাঙ্ক্ষা করিতেন না"। মিথ্যা কথা। অব্যবহার্য্যতা তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির অন্তরায় হইয়াছিল, ব্যবহার্য্যতা অত্যন্ত আবশ্যক—অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাই ব্রহ্মবান্ধব আবার হিন্দু হইয়াছিলেন। ব্রহ্মবান্ধবের 'গলদশ্রুলোচন' অষ্টাপদ মৃগবিশেষের মত, আরব্যোপন্যাসে বর্ণিত সেই তিমির মত, যাহার পৃষ্ঠে সিন্ধুবাদ হাঁড়ি চড়াইয়াছিলেন! সেই অগ্নিগর্ভ লোচনে গলদশ্রু! মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডে স্নিগ্ধ কৌমুদী? গৌরীপুরের, তাহিরপুরের আটাশে হিন্দু নয়, বিশ্বপুরের একটা 'দুঁদে' পালোয়ান —তাহার নয়নে গলদশ্রু! আমরা জানিতাম; সুতরাং পঞ্চানন-পক্ক এই পক্কান্নটি পরিপাক করিতে পারিলাম না। কোনও বাঙ্গালী যেন "নিগ্রো জাতির কর্ম্মবীর" পড়িতে না ভুলেন। অনুবাদক আর একটু সাবধান হইলে ভাল হয়। ৭৩৯ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে "তাহাদের আন্তরিকতার দৃষ্টান্ত বিরল" আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ইহার ত কোনও অর্থ হয় না। শ্রীযুত ব্রজগোপাল দাসের "ইংলণ্ডে জাতীয় সাহিত্য-প্রচারে" অনেক সুমিষ্ট সংবাদ আছে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে পড়িতেছে। ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, রুসিয়ায়, কৈসরের রাজ্যে, এমন কি, হনোলুলুতে ও কিউবায় যদি আমাদের জাতীয় সাহিত্যের প্রচার হয়, যদি আমাদের সাহিত্য দেখিয়া রাঙ্গা মুখে হাসি ফুটে, এবং সাদা হাতে তালি বাজিয়া উঠে, তাহা হইলে, আমরাও যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিব। যদিও আমাদের দেশেরই মত আমরাও গঙ্গার দিকে পা বাড়াইয়া বসিয়া আছি, তবু আত্মগৌরবে উৎফুল্ল হইবার এখনও সামর্থ্য আছে। কিন্তু বিদেশে সাহিত্য প্রচার করিবার পূর্ব্বে একবার ভাবিয়া দেখিলে হয় না, স্বদেশে আমাদের সাহিত্যের প্রচার হইয়াছে কি না, হইতেছে কি না? যে দেশের পনের-আনা তিন পাই লোকের সাহিত্যের সহিত পরিচয় নাই, তাহারা যদি বিদেশে সাহিত্য খয়রাৎ করিতে যায়, তাহা হইলে ব্যাপারটা একটু উদ্ভট—কিঞ্চিৎ অদ্ভুত, এবং সম্পূর্ণ হাস্য-রসাত্মক হইয়া উঠে না? পুরাতন সাহিত্য গেল। নূতন সাহিত্য দেশের প্রাণশক্তির সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন করিতে পারিতেছে না। লোকশিক্ষার পুরাতন প্রবাহগুলি রুদ্ধ—শুষ্ক হইয়াছে। কথকতা, যাত্রা, পাঁচালী, জারি, গান পঞ্চত্বলাভ করিয়াছে। মেটারলিঙ্কের উচ্ছিষ্ট-প্রসাদে—'ডাকঘরে'র জোয়ারিং পুলিন্দায় কোটী কোটী বাঙ্গালী—তেত্রিশ কোটী ভারতবাসী ইহকালের সুখ ও পরকালের স্বস্তি লাভ

করিবে কি? ক্রীতদাসের সাহিত্যে প্রভুর উপকার হইবে কি না, বলিতে পারি না। বিজিতের সাহিত্যে জেতার লাভ না হইতে পারে, এ সম্ভাবনাও আমাদের মনে উদিত হয় না! বঙ্কিমচন্দ্র এ সাহিত্যের কথা বলেন নাই, নিষ্কাম ধর্ম্মের কথা বলিয়াছিলেন। আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্য কি নিষ্কাম-ধর্ম্মমূলক? নিষ্কাম ধর্ম্ম বিজিত ভারতের বিজিত দাসের সৃষ্টি নয়।—স্বাধীন, স্বতন্ত্র, সজীব ভারতের যুগাবতার ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যুযুৎসু পাণ্ডব ও কৌরব বীরগণের হুঙ্কার-মুখরিত শক্তি-তীর্থে পাঞ্চজন্য-ঘোষে দিঙ্‌মণ্ডল বিকম্পিত করিয়া সব্যসাচী ধনঞ্জয়কে নিষ্কাম-ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছিলেন। বঙ্কিম বলিয়াছিলেন,—ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প যখন এই নিষ্কাম-ধর্ম্মে মিশিবে, সেই দিন মনুষ্য দেবতা হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ আরও স্পষ্ট করিয়া দার্শনিক ভাষায় বলিয়াছেন,—প্রতীচীর রজে ও প্রাচীর সত্ত্বে যখন আদান প্রদান চলিবে, তখন উভয়েরই অভাব পূর্ণ হইবে। সে স্বতন্ত্র কথা। বিজিত জাতির সাহিত্য জাতীয় মুক্তির অনুকূল হউক; এই বিরাট ভ্রাতৃ-সংঘে নবজীবনসঞ্চার করিবার জন্যই যেন আমরা সাহিত্য গড়ি। সে সাহিত্য আগে আমাদের দেশের সর্ব্বত্র—ভারতের তেত্রিশ কোটী অন্তঃপুরে প্রচার করি। সে সাহিত্য যেন আমাদিগকে বলিতে পারে,—'জাগো পুরুষসিংহ, দিন যে যায়!' পর-তন্ত্রতার পদরজে লুণ্ঠিত না হইলে যে সাহিত্য চরিতার্থ হয় না, তাহা জাতীয় মুক্তির অনুকূল হইতে পারে না। বিদেশে ফেরী করিয়া আমরা যদি সাহিত্য গছাইবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে, আমরা জাতীয় গৌরব বাড়াইতে পারিব না, রৌরবের পথই প্রশস্ত করিব। নবযুগে মহনীয় বরণীয় সাহিত্যের সৃষ্টি কর; জগতের সকল জাতি সে সাহিত্য চাহিতে আসিবে। হুয়াং-চুয়াং, ফাহিয়ান অনাহূতই আসিয়াছিলেন। ইউরোপ ধনী,—সকল রকমে 'ঈশ্বর'। ভারতবর্ষ দরিদ্র। এ সত্য কখনও ভুলিও না। মহাভারতের উপদেশ স্মরণ কর—

দরিদ্রাণ্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।

তোমার দেশ দরিদ্র, তাহাকে ভাবসম্পদ্ দান কর। তোমার ও এসিয়ার ঈশ্বর ইউরোপকে দান করিবার জন্য লালায়িত হইয়া, জগতের 'হাটে মামা হারাইয়া' বিড়ম্বিত হইয়া লাভ কি? তোমার কার্য্যক্ষেত্র—আর্য্যাবর্ত্ত। এই লক্ষ্য স্থির না রাখিয়া আমরা যদি সাহিত্যকে বিদেশীর মনের মত করিবার দৌর্ব্বল্যে অভিভূত হই, তাহা হইলে, আমাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। আমাদের সাহিত্য আমাদের জন্য;—তাহা বিশ্ব-সাহিত্য না হইলেও ক্ষতি নাই। জগতের সকল সাহিত্যের তিল-তিল উপাদান লইয়া বিধাতাই বিশ্বসাহিত্য-তিলোত্তমা গড়িয়া থাকেন। রবি শশী তারা, বা জোনাকী বাদলাপোকা শত চেষ্টা করিলেও, আত্মবিলোপ পণ করিলেও, সে অসাধ্য সাধন করিতে পারিবে না। শ্রীযুত চারুচন্দ্র সান্যাল ও শ্রীযুত গিরীন্দ্রশেখর বসুর "হস্তীর জীবনযাত্রা" বহু তথ্যে পূর্ণ,—সুখপাঠ্য। শ্রীযুত রমেশচন্দ্র সাহিত্যসরস্বতীর "বৈদিক সাহিত্য" অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। শ্রীযুত মোহিনীমোহন দাসের "ময়নামতীর পুঁথি" উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ "বঙ্গসাহিত্যের অভাব ও অভিযোগে" লিখিয়াছেন—"পরিণামে আমাদেরই কোন নূতন দর্শনবাদ বিশ্বে নূতন সংবাদ আনিয়া দিবে, এ কথা স্বতঃই মনে উদিত হয়।" পুরাতন দর্শনবাদ বজায় রাখিবার জন্য যে পরিশ্রম আবশ্যক, তাহারই ত অভাব ঘটিতেছে; সেটুকু যেন নূতনের আবিষ্কারচেষ্টায় বাজেখরচ হইয়া না যায়। জ্ঞান-

দুর্শন যে যায়। নৈয়ায়িকের বংশধর নায়েব হইলে নূতন দর্শনের আশা 'বিশায় খণ্ডনম' হইতে পারে। লেখক বলেন,—"নব্য কবিগণের * * * কবিতার ভিতরে অভাবের প্রভাব বড় বেশী—বিরাট কল্পনা, স্বাস্থ্য ও সবলতা।" উপসংহারে লেখক কাঠিন্যধর্ম্মের প্রচার করিতে বলিয়াছেন। বিদেশী চিন্তা-পদ্ধতির আক্ষরিক অনুবাদ দেশবাসীর অত্যন্ত অবোধ্য। কাঠিন্যধর্ম্ম প্রভৃতির ব্যাখ্যা করিয়া লেখক সাধারণকে বুঝাইবার চেষ্টা করুন।

মালঞ্চ।—বৈশাখ। প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা। শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত। মালঞ্চ তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশে,—গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি। দ্বিতীয় অংশে, —আলোচনা। তৃতীয় অংশে,—সংগ্রহ। "মহামিলন" গল্প চলনসই। "ছোট বর" উপন্যাসের সূচনায় ত বিশেষত্ব নাই। অবশ্য পরিণামের প্রতীক্ষা করিতে হয়। "রত্নাবলী"র গদ্য অনুবাদ মন্দ নহে। স্কটের "কেনিলওয়ার্থ" ও কোনান ডয়েলের "শার্লক হোমে"র অনুবাদ চলিতেছে। মালঞ্চে বড় বড় অক্ষরে দেখিতেছি,—সাহিত্য-স'ম্মি'লন। 'সম্মিলন' সন্-মিলন বটে; কিন্তু যদি বানান এত 'বদলিত' হইতে থাকে, তাহা হইলে ক্রমে 'সং-মিলন'ও দেখিতে পাইব। "ভারতবাণী" সুনির্ব্বাচিত। "রঙ্গকৌতুক" ব্যর্থ হইয়াছে। রসিকতার ভাষায় জড়তা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। বাঙ্গালা গল্প-খোরের দেশ। কালীপ্রসন্ন বাবুর এই উদ্যম, সুপ্রযুক্ত হইলে, সাফল্য লাভ করিবে, এ আশা অসঙ্গত নহে।

অর্চ্চনা।—জ্যৈষ্ঠ। শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য "ভারবি ও বৃত্রসংহারে" উভয় কবির বা উভয় কবির উভয় কাব্যের তুলনায় সমালোচনার সূচনা করিয়াছেন। প্রথমেই বলি, "ভারবি" কেন? "কিরাতার্জ্জুনীয়ম্" বলিলেই সঙ্গত হইত। লেখক প্রথম কিস্তিতে দুই একটি 'ঘটনাসাদৃশ্য' দেখাইয়াছেন। তাহাও খুব সাধারণ সাদৃশ্য। শ্রীযুত কেশবচন্দ্র গুপ্তের "পরাজয়ে" আখ্যানবস্তু অপেক্ষা আদর্শ পরিমাণে অধিক। তাঁহার "জীবজন্তুর বাসস্থান" উপাদেয় প্রবন্ধ। ভারবি বলিয়াছেন,—"হিতং মনোহারি চ দুর্ল্লভং বচঃ।" এ দেশে হিতকারী, শিক্ষাপ্রদ, অথচ মনোহারী নিবন্ধ সত্যই দুর্ল্লভ। কেশববাবুর রচনায় এই উভয়ের সমাবেশ আছে। "কে তুমি?" শ্রীযুত হরিহর ভট্টাচার্য্যের রচনা। আমরাও জিজ্ঞাসা করি, কে তুমি? সুপণ্ডিত নৈয়ায়িক কি পুঁথি ফেলিয়া বাঁশী ধরিলেন? "চুমি মকরন্দ-ভার" নিতান্তই ভার বলিয়া মনে হয়।

তত্ত্ববোধিনী।—জ্যৈষ্ঠ। শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বর্ষ শেষ" ও "নববর্ষ" পাশাপাশি মুদ্রিত হইয়াছে। বর্ষ যায়, বর্ষ আসে। কিন্তু এ শ্রেণীর প্রবন্ধ যায় না। যখন বর্ষ যায়, তখন গদ্য-কাব্যি রাখিয়া যায়। যাহা সংসারের মামুলী নিয়ম, তাহা শিরোধার্য্য করাই বিধি। "কবীর" মন্দ নয়। "বীরভূমে"র কথা" সুখপাঠ্য। শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "নূতন গানে" কবিত্ব আছে। তত্ত্ব অল্প। তাই কাব্য ফুটিয়াছে। সেকালের গুরু "তত্ত্ববোধিনী" একালে শিক্ষানবীশের পত্রে পরিণত হইয়াছে। আমরা বলিতে বাধ্য, স্থানের অপব্যবহার হইতেছে। এখনকার "তত্ত্ববোধিনী" দেখিয়া মনে হয়—"তে হি নো দিবসা গতাঃ।"



পরিবারের এক জন !

চিত্রকর- এফ্, জি, কট্‌ম্যান্, আর, আই।

বৌদ্ধধর্ম্ম ও মৌর্য্যশিল্প।

চিত্রকলার ও ভাস্করকলার জন্মকথা কর্ম্মকাণ্ডের জন্মকথার সহিত বিজড়িত। অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষ বিভিন্ন আকৃতির ও বিভিন্ন-আচারী নানা প্রকার বিভিন্ন জাতির বাসভূমি; সুতরাং বিভিন্ন প্রকারের কর্ম্মকাণ্ডের রঙ্গস্থল। এই সকল প্রাচীন কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের সহিতই আমরা সুপরিচিত। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের দুই শাখা;—শ্রৌত এবং গৃহ্য। শ্রৌত ক্রিয়াকলাপের সহিত দেবমন্দিরের বা দেবপ্রতিমার সম্বন্ধ লক্ষিত হয় না; অধিকাংশ গৃহ্যোক্ত ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যায়। সুতরাং বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড চিত্র-ভাস্কর্য্য-স্থাপত্যের পরিপুষ্টিসাধনে বিশেষ কোনও সহায়তা করিয়াছে, এমন মনে হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া, বৈদিক আর্য্যাবর্ত্তে, বৈদিকযুগে এই সকল কলার অনুশীলন আদৌ ছিল না, এরূপ অনুমানও অসঙ্গত। কোনও কোনও গৃহ্যসূত্রে, কোনও কোনও গৃহ্যোক্ত ক্রিয়ার অঙ্গরূপে, দেবমন্দিরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা— "মানবগৃহ্যসূত্রে" (১।৭।১০) আছে,—"দেবাগারে স্থাপয়িত্বাহথ কন্যাং গ্রাহয়েৎ।" সাঙ্খ্যায়ন গৃহ্যসূত্রে (৪।১২।১৫) "দেবায়তন"-প্রদক্ষিণের উল্লেখ আছে। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী সূত্রে (৫।৩।৯৬—১০০) বিভিন্নপ্রকার প্রতিকৃতির উল্লেখ দেখা যায়। অতএব বৈদিক যুগে চিত্রকলা বা ভাস্করকলার অনুশীলন ছিল না, এ কথা বলা যায় না। কিন্তু সেই সুপ্রাচীনকালে অঙ্কিত বা গঠিত কোনও প্রতিমাই এ পর্য্যন্ত আমাদের হস্তগত হয় নাই। এ পর্য্যন্ত যে সকল প্রাচীন শিল্পনিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে যেগুলি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, তাহা মৌর্য্যসম্রাট অশোকের সময়ে নির্ম্মিত, এবং অধিকাংশ স্থলেই বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত সম্পর্কিত। মহাত্মা রাস্কিন বলিয়াছেন—

"Great nations write their auto-biographies in three manuscripts; —the book of their deeds, the book of their words, and the book of their art. Not one of these books can be understood unless we read the two others; but of the three, the only quite trustworthy one is the last. The acts of a nation may be triumphant by its good fortune; and its words mighty by the genius of a few of its children · but its art only by the general gifts and common sympathies of the race."

সমগ্র জাতির মনীষা ও সহানুভূতি বা শ্রদ্ধা শিল্পোৎকর্ষের নিদান। সুতরাং প্রাচীন বৌদ্ধশিল্পের রসাস্বাদন করিতে হইলে, যে কেন্দ্রে তাহা বিকাশলাভ

করিয়াছিল, সেই দেশের জনগণের মনীষা ও শ্রদ্ধা স্বভাবতঃ কোন্ পথের অনুসরণ করিত, তাহা নিরূপণ করা আবশ্যক।

মৌর্য্যশিল্পের উৎপত্তিস্থান মগধ। মগধ উত্তরাপথের একটি অতি প্রাচীন জনপদ। ঋগ্বেদে[*] (৩।৫৩।১৪) মগধের জনগণ "কীকটা" নামে অভিহিত হইয়াছে। যজুর্ব্বেদে ও অথর্ব্ববেদে "মগধ" নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু কি শ্রুতি, কি স্মৃতি, যেখানেই মগধ ও তন্নিকটবর্ত্তী অঙ্গবঙ্গাদি দেশ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ স্থলেই এই সকল জনপদের জনগণের প্রতি শাস্ত্রকারগণের প্রবল বিদ্বেষভাব প্রকাশিত হইয়াছে। অথর্ব্ববেদে (৫।২২।১৪) জ্বররোগকে (তক্মণ) সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে,—"হে জ্বর! লোকে যেরূপ ভৃত্য বা ধন দান করে, সেইরূপ তোমাকে আমরা গন্ধারী (গান্ধারবাসী), মুজবান, অঙ্গ, ও মগধবাসিগণের হস্তে সমর্পণ করিতেছি।"

"অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রে মগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥"

এই প্রসিদ্ধ স্মৃতির বচন অনেকেই অবগত আছেন। মগধাদি দেশের অধিবাসিগণের প্রতি শাস্ত্রকারদিগের এইরূপ বিদ্বেষের কারণও শ্রুতি-স্মৃতিতে উল্লিখিত হইয়াছে। যথা ঋগ্বেদে—"তাহারা যজ্ঞার্থ গোদোহন করে না, বা যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করে না"। যাস্ক কীকট-দেশকে "অনার্য্যনিবাস" বলিয়াছেন। ধর্ম্ম-সূত্রকার বোধায়ন বলিয়াছেন—

"আনর্ত্তকাঙ্গমগধাঃ সুরাষ্ট্রা দক্ষিণাপথঃ।
উপাবৃৎ-সিন্ধু-সৌবীরা এতে সঙ্কীর্ণযোনয়ঃ॥"

অর্থাৎ, অঙ্গ-মগধাদি-দেশবাসীরা মধ্যদেশবাসীদিগের বিশুদ্ধ জাতি নহে;—সঙ্কীর্ণযোনি বা অপর জাতির সংমিশ্রণ-জাত। মগধাদি দেশের অধিবাসীরা সঙ্কীর্ণযোনি, বোধায়নের এই সংস্কারের মূলে জনশ্রুতি থাকিলেও থাকিতে পারে; কিন্তু অধিক সম্ভব, বৈদিক মধ্যদেশের ও মগধাদি বাহ্যদেশের অধিবাসীদিগের মধ্যে ধর্ম্মভেদ ও আচারভেদ প্রত্যক্ষ করিয়াই শাস্ত্রকারগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। যে সময় কাশী, কোশল ও বিদেহ বা মিথিলাদেশে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড বিশেষ প্রচলিত, তখনও যে মগধে স্বতন্ত্র আচারের প্রাধান্য ছিল, বৈদিক-সাহিত্যে তাহার প্রমাণের অভাব নাই। অথর্ব্ববেদের ব্রাত্যাধ্যায়ে (১৫।২।১—৪) ব্রাত্যের সহিত মাগধের বা মগধবাসীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সূচিত হইয়াছে। "পঞ্চবিংশে" বা "তাণ্ড্যব্রাহ্মণে" (১৭।১—৪) চারিপ্রকার ব্রাত্যের পরিচয়

পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত "হীন" ব্রাত্যগণের বিবরণই বিশেষ আলোচ্য। ব্রাহ্মণ-কার লিখিয়াছেন—ইহারা "নহি ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি ন কৃষি র্ন বাণিজ্যং"। "ইহারা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বেদাধ্যয়ন করে না, এবং কৃষিকার্য্য বা বাণিজ্য করে না"। "অদুরুক্তবাক্যন্দুরুক্তমাহুঃ"—যে বাক্য সহজে উচ্চারণ করা যায়, তাহাকে তাহারা দুরুচ্চার্য বলে, এবং "অদীক্ষিতা দীক্ষিতবাচং বদন্তি"; যজ্ঞে দীক্ষিত না হইয়াও, দীক্ষিতের ভাষা ব্যবহার করে। অর্থাৎ, ব্রাত্যগণ বেদচর্চ্চা ও বৈদিক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিত না; কিন্তু তাহারা আর্য্যভাষা-ভাষী ছিল। ব্রাত্যেরা "অদুরুক্ত বাক্যকে দুরুক্ত বলিত"—এই প্রমাণ হইতে পণ্ডিত বেরিডেল কিথ্ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ব্রাত্যগণের মধ্যে এক প্রকার প্রাকৃতভাষা প্রচলিত ছিল। এখন জিজ্ঞাস্য, কোন্ জনপদের অধিবাসিগণকে "হীন" ব্রাত্য বলা হইয়াছে? অথর্ব্ববেদে সূচিত ব্রাত্য ও মাগধ, এই উভয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, এবং কাত্যায়ন, লাট্যায়ন ও আপস্তম্বের শ্রৌতসূত্রে যে সকল প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইতে অনুমান হয়,—বৈদিক সাহিত্যে প্রধানতঃ মগধদেশবাসিগণকেই ব্রাত্য বলা হইয়াছে। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে বিহিত হইয়াছে,—"ব্রাত্যস্তোম" অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাত্যগণ দ্বিজাতিমধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে। ব্রাত্যস্তোম অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাত্যগণ ব্রাত্যধন বা ব্রাত্য অবস্থায় ব্যবহৃত দ্রব্যাদি কাহাকে দান করিবে, সূত্রকারগণ তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যথা—কাত্যায়ন ২২।১৪৪)—"মাগধদেশীয়ায় ব্রহ্মবন্ধবে দক্ষিণাকালে ব্রাত্যধনানি দদ্যুঃ।" কর্ক এই সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"সর্ব্ব এব ব্রাত্যাঃ মগধদেশবাসী যঃ স ব্রহ্মবন্ধুভির্জায়তে মাগধদেশীয় ব্রহ্মবন্ধুঃ তস্মৈ দদ্যুঃ"। "মগধদেশবাসী ব্রহ্মবন্ধু বা নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণগণ হইতে যে উৎপন্ন, সে মগধদেশীয় ব্রহ্মবন্ধু। সকল ব্রাত্যই দক্ষিণাকালে তাহাকে (ব্রাত্যধন) দান করিবে"। ঠিক পরের সূত্রে কাত্যায়ন ব্যবস্থা করিয়াছেন,—"অবিরতেভ্যো বা ব্রাত্যাচরণাৎ।" অথবা যাহারা ব্রাত্যাচার পরিত্যাগ করে নাই, তাহাদিগকে ব্রাত্যধন দান করিবে।

মগধ, অঙ্গ প্রভৃতি দেশের অধিবাসিগণ ব্রাত্যাচারী ছিল বলিয়াই বৌধায়ন ইহাদিগকে সঙ্কীর্ণযোনি বলিয়াছেন, এবং ইহাদিগের দেশে দ্বিজাতির প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু মগধ বৈদিক-সভ্যতার একটি প্রধান কেন্দ্র বিদেহদেশের এত নিকটে অবস্থিত ছিল যে, মগধের ব্রাত্য-সভ্যতা দীর্ঘকাল বৈদিক প্রভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। শাস্ত্রের নিষেধ-সত্ত্বেও কোনও কোনও বেদাচার্য্য যে মগধে যাইয়া বাস না করিতেন, এমন নহে।

সাঙ্খ্যায়ন আরণ্যকে (৭।১৩) মধ্যম প্রতিবোধী পুত্র নামক আচার্য্যকে "মগধবাসী" বলা হইয়াছে। বৈদিক আর্য্যগণের সংস্রবের সুযোগ ছিল বলিয়াই হয় ত মগধগণ বঙ্গ-কলিঙ্গাদি অপরাপর বাহ্য-দেশবাসীদিগের তুলনায় অধিকতর উন্নতিশীল ছিলেন। কিন্তু বৈদিক প্রভাব মগধ-সভ্যতার প্রাণকে অভিভূত করিতে পারিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। মগধ-সভ্যতার প্রাণবস্তুর সন্ধান পাইতে হইলে, মগধের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের এবং মগধে বিকশিত আদিম বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনা করা আবশ্যক।

বৈদিক আর্য্যগণের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের সহিত মগধের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, উভয়দেশের জনগণের মধ্যে একটা প্রকৃতিগত বৈষম্য ছিল। বৈদিক আর্য্যাবর্ত্তে উশীনর, কুরু, পাঞ্চাল, মৎস্য, বৎস, কাশী, কোশল, বিদেহ প্রভৃতি কতকগুলি খণ্ডরাজ্য দীর্ঘকাল পাশাপাশি বিদ্যমান ছিল। বেদের ব্রাহ্মণভাগ ও রামায়ণ মহাভারতাদি হইতে জানা যায়—এই সকল খণ্ডরাজ্যের মধ্যে অনেক সময় যুদ্ধবিগ্রহ চলিত। অশ্বমেধযজ্ঞের ঘোড়া অনেক সময় এই সকল যুদ্ধ বাধাইয়া দিত। কিন্তু খণ্ডরাজ্যগুলিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একচ্ছত্র-সাম্রাজ্য-স্থাপনের চেষ্টা মধ্যদেশে কখনও কেহ করিয়াছিলেন, এরূপ প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না। মহাভারতে বর্ণিত অর্জ্জুনাদির দিগ্বিজয়-কাহিনী ঠিক সাম্রাজ্য-স্থাপনের প্রয়াস বলিয়া গণনা করা যায় না। উহা আড়ম্বরপূর্ণ যজ্ঞাঙ্গবিশেষ। রাষ্ট্রীয় ভাবের সহিত এই প্রকার দিগ্বিজয়ের কোনও সম্পর্ক নাই। উত্তরাপথে প্রথম সাম্রাজ্য-স্থাপয়িতা বৈদিক আর্য্যাবর্ত্তবাসী ক্ষত্রিয় নহেন, মগধবাসী শূদ্র— নন্দ মহাপদ্ম। (১) বিভিন্ন পুরাণকার সমস্বরে বলিয়াছেন,—নন্দরূপী শূদ্র-পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। পুরাণের এই নন্দরাজ-কাহিনী একবারে অমূলক নহে। মেসিডনের আলেকজেণ্ডর বিপাশাতীরে উপনীত হইয়া কুরু, পাঞ্চাল, বা ইক্ষাকু, কাহারও নামগন্ধও শুনিতে পান নাই, নন্দ (Nandram) নামধারী প্রাচ্য বা মগধরাজের প্রবল বাহিনীর কথাই তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল। নন্দবংশ-নাশের পর মগধেই মৌর্য্যবংশীয় সম্রাটগণের অভ্যুদয়। উত্তরাপথে কুষাণ-প্রাধান্য নষ্ট করিয়া, খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দে যাঁহারা নব-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেই গুপ্তবংশীয় প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও সমুদ্রগুপ্তও মগধবাসী ছিলেন। নন্দ-মহাপদ্ম, চন্দ্রগুপ্ত ও সমুদ্রগুপ্তের ন্যায় জননায়কগণের প্রতিভাই যে শুধু মাগধগণকে পুনঃপুনঃ সাম্রাজ্য-গঠনে সমর্থ করিয়াছিল, এমন নহে।

(১) বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে ইতিহাস-শাখায় এই বিষয়ে মৌখিক আলোচনা হইয়াছিল।

মগধের জনসাধারণের মধ্যে এমন কিছু বিশেষ গুণ ছিল, যাহা তাহাদিগকে পুনঃ-পুনঃ সাম্রাজ্য-গঠনক্ষম নেতৃ-নিচয়ের যথোচিত অনুসরণের শক্তি দান করিয়াছিল। এই বিশেষ গুণ মগধবাসীদিগের একান্ত ঐহিক কর্ম্মনিষ্ঠা। বৈদিক-সভ্যতা অন্তর্ম্মুখ, এবং বৈদিক আর্য্যাবর্ত্তবাসী পারত্রিককর্ম্মপর বা আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ ছিলেন। মগধ-সভ্যতা বহির্ম্মুখ, এবং মগধদেশবাসী ঐহিক-কর্ম্ম-নিষ্ঠ। এই হিসাবে মাগধগণকে প্রাচ্য গ্রীক বা প্রাচ্য রোমান্ বলা যাইতে পারে।

ঐহিক-কর্ম্ম-নিষ্ঠ মাগধ-মনীষার প্রভাব পালি-পিটকে বিনিবদ্ধ গৌতমবুদ্ধ-প্রচারিত আদিম বৌদ্ধধর্ম্মেও লক্ষিত হয়। পালি "দীর্ঘনিকায়ে"র অন্তর্গত "মহাপদানসুত্তন্তে" বিপস্সি, সিখি, বেস্সভু, ককুসন্ধ, কোণাগমন ও কস্সপ, গৌতমবুদ্ধের পরবর্ত্তী এই ছয় জন বুদ্ধের চরিতকথা বর্ণিত হইয়াছে, এবং বিপস্সি কর্ত্তৃক গৌতমবুদ্ধের উপদেশের যাহা সার, তাহাও উপদিষ্ট হইয়াছে। অশোকের নিগ্লীব-স্তম্ভলিপি হইতে জানা যায়, অশোক রাজ্যাভিষেকের চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে কোণাকমুনি-বুদ্ধের স্তূপ দ্বিতীয়বার বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, এবং বিংশ বৎসর পরে তথায় যাইয়া সেই স্তূপের পূজা করিয়াছিলেন, এবং সেখানে একটি স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ভারহুতের স্তূপের প্রাচীরগাত্রে বিপস্সি-আদি পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধগণের নামাঙ্কিত বোধিবৃক্ষের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। কিন্তু পালি ও সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থে মহাভিনিষ্ক্রমণ হইতে সিদ্ধার্থের সপ্তবৎসরব্যাপী সাধনের যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে তিনি যে কখনও কস্সপ, বা কোণাগমন, বা অন্য কোনও পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধের প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের কোনও শ্রমণের সংস্রবে আসিয়াছিলেন, এমন প্রমাণ নাই। সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করিয়া, মগধের রাজধানী রাজগৃহে উপনীত হইয়া, যথাক্রমে তন্নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশে অবস্থিত আশ্রমবাসী আলার-কালাম ও উদ্রক রামপুত্র নামক দুই জন আচার্য্যের নিকট শিক্ষাদীক্ষার জন্য গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই দুই জন আচার্য্যের উপদেশ মনঃপূত না হওয়াতে তিনি উরুবেলা নামক গ্রামের নিকটবর্ত্তী বনে (বর্ত্তমান বোধগয়ায়) যাইয়া তপশ্চরণ করিয়াছিলেন, এবং অবশেষে উরুবেলার অশ্বত্থবৃক্ষের তলে বসিয়া নিজ দৃঢ় সঙ্কল্পের বলে সিদ্ধি বা বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন। যে জ্ঞান সিদ্ধার্থকে বুদ্ধে পরিণত করিয়াছিল, তাহার সার কথা,—চারিটি আর্য্য-সত্য। প্রথম, দুঃখমার্য্যসত্যং (জীবন দুঃখময়); দ্বিতীয়, দুঃখসমুদয়ো আর্য্যসত্যং (দুঃখের কারণ) পুনঃপুনঃ জন্মান্তর-উৎপাদক বাসনা; তৃতীয়, দুঃখনিরোধ আর্য্যসত্যং (বাসনার নিরোধ); চতুর্থ, দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদার্থসত্যং,—দুঃখ হইতে মুক্তির আর্য্য অষ্টাঙ্গ

মার্গ। (২) বৌদ্ধশাস্ত্রে বর্ণিত সিদ্ধার্থের সাধনকাহিনীর যদি কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকে, তবে এই :—জৈনধর্ম্মসংস্কারক মহাবীর [বর্দ্ধমান] যেমন নির্ব্বাণমুক্তি-লাভের জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের প্রতিষ্ঠিত পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, সিদ্ধার্থ গৌতম তেমন কিছু করেন নাই। তিনি স্বয়ংসিদ্ধ বুদ্ধ। যদি কস্সপাদি পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধগণ ঐতিহাসিক ব্যক্তিও হয়েন, তথাপি এ পর্য্যন্ত যে সকল প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করিতে গেলে বলিতে হয়,—গৌতম এই আর্য্যসত্য-নিচয়ের জন্য তাঁহাদের নিকট ঋণী নহেন; ইহা তাঁহার নিজের আবিষ্কার। গৌতমবুদ্ধের প্রচারিত আর্য্যসত্য-চতুষ্টয় গুরুপরম্পরাগত জ্ঞান নহে, তাঁহার নিজের উদ্ভাবিত। এখন জিজ্ঞাস্য, তিনি কোথা হইতে এই ধর্ম্মের উপাদান আহরণ করিয়াছিলেন? এ বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতসমাজের অভিমত গতবৎসর কলিকাতায় এসিয়াটীক্ সোসাইটীর একটি অধিবেশনে অধ্যাপক ওল্ডেনবার্গ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। জীবন যে দুঃখময়, এবং সন্ন্যাসই যে এই দুঃখরাশি হইতে মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়, উপনিষদে এই মহনীয় শিক্ষার অঙ্কুর দৃষ্ট হয়। ওল্ডেনবার্গ বলিয়াছেন, "Budhha and the old Buddhism are the true descendants of that Yajnavalkya whom the Brihadaranyaka places before us." (৩) অর্থাৎ, "বুদ্ধ ও প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্ম বৃহদারণ্যকোপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী।" কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধ-ধর্ম্মের কোনও কোনও অঙ্গ,—যেমন আত্মায় অনাস্থা, বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি অশ্রদ্ধা, এবং সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-সম্বন্ধীয় আলোচনার প্রতি অবজ্ঞা—উপনিষদের শিক্ষার একান্ত বিরোধী। পক্ষান্তরে, বৌদ্ধধর্ম্মের এই অঙ্গ বেদবাহ্য মাগধগণের ব্রাত্যভাবের অনুকূল। সুতরাং এ ক্ষেত্রে যে দেশে আসিয়া সিদ্ধার্থের সাধনার সূত্রপাত ও সিদ্ধি, সেই মগধের প্রভাব অনুমান করা অসঙ্গত নয়। বৌদ্ধধর্ম্মের যাহা নিষেধের দিক্, তাহার উপর যেমন মাগধ-মনীষার ছায়া পতিত হইয়াছে, বৌদ্ধধর্ম্মের যাহা বিধানের দিক, তাহার উপরও মাগধ-মনীষার ছায়া তেমনই সুস্পষ্ট। দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের জন্য অষ্টাধিক সুনীতিমার্গের বিধান একান্ত কর্ম্মনিষ্ঠার (practicalityর) পরিচায়ক। এই কর্ম্মনিষ্ঠা উপনিষদের অধ্যাত্মজ্ঞাননিষ্ঠা ও মগধের ঐহিকনিষ্ঠার

(২)। (১) সম্যগ্‌দৃষ্টি, (২) সম্যক্‌সংকল্প, (৩) সম্যগ্‌ব্যায়াম, (৪) সম্যক্‌কর্ম্মান্ত, (৫) সম্যগাজীব, (৬) সম্যগ্বাক্, (৭) সম্যক্‌স্মৃতি, (৮) সম্যক্‌সমাধি।

(৩) Journal and Proc. of A. S. B., 1913.

শুভ সমন্বয়ের ফল। বৌদ্ধশাস্ত্রে এই অষ্টাঙ্গিকমার্গকে এক দিকে কঠোর তপশ্চরণ, এবং অপর দিকে ভোগবিলাস, এই দুই সীমান্তের মধ্যবর্ত্তী "মধ্যমা প্রতিপদা" বলা হইয়াছে। ইতিহাসের হিসাবে দেখিতে গেলে, অষ্টাঙ্গিকমার্গকে ঔপনিষদ-অন্তর্মুখীনতা এবং মাগধ-বহির্মুখীনতা, এই উভয় সীমার "মধ্যমা প্রতিপদা"ও বলা যাইতে পারে। তৃতীয়তঃ, বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বত্র প্রচারের উপায়বিধানও উপনিষদের শিক্ষার বিরোধী, এবং মগধের সাম্রাজ্য-বিস্তারের বিধিসম্মত।

প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মে যাহার প্রভাব প্রচ্ছন্নমাত্র, সেই মাগধ-মনীষার পূর্ণাভিব্যক্তি প্রাচীন বৌদ্ধশিল্পে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতশিল্পের আলোচনা করিতে গেলেই ইহার কোন অঙ্গ পারসীক গ্রীক আদি বিদেশীয়-গণের নিকট হইতে ধার করা, এবং কোন অঙ্গ ভারতবাসীর নিজস্ব, তাহার একটা হিসাব-নিকাশ আবশ্যক। পাশ্চত্য বিশেষজ্ঞগণ অনেকদিন হইতেই এ বিষয়ের হিসাব করিয়া আসিতেছেন। গ্রীকশিল্পের উপর বৈদেশিক প্রভাব সম্বন্ধে মনীষী ব্রুন্ (Brunn) যাহা বলিয়াছেন, প্রাচীন ভারতশিল্পের উপর বিদেশীয় প্রভাব সম্বন্ধে তাহা বলিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। ব্রুন্ বলিয়াছেন,—"গ্রীকগণ ফিনিসীয়দিগের নিকট হইতে বর্ণমালা ধার করিয়াছিলেন, তথাপি সেই বর্ণমালার দ্বারা তাঁহারা ফিনিসীয় ভাষার কথা লিপিবদ্ধ করেন নাই, নিজের কথাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তেমনই গ্রীকগণ পূর্ব্ববর্ত্তিগণের নিকট হইতে শিল্পের বর্ণমালা ধার করিয়াছিলেন। কিন্তু যেমন সাহিত্যে, তেমনই শিল্পেও, (তদ্দ্বারা) সর্ব্বদা নিজের ভাষায় নিজের কথাই বলিয়াছেন।" (৪) শিল্পের সঙ্কেত-(Conventionalities)-গুলিকে শিল্পের বর্ণমালা বলা হয়। আমরা ভারতে এ যাবৎ যে সকল প্রাচীনতম শিল্প-নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা এসিরীয় শিল্পের পতনের, পারসীক শিল্পের পতনের ও গ্রীক-শিল্পের পতনের সূচনায়, পরবর্ত্তী যুগে রচিত। সুতরাং যতদিন না প্রমাণিত হয়, ভারতীয় শিল্পের যে সকল সঙ্কেত পূর্ব্বতন পারসীক ও গ্রীকশিল্পে বিদ্যমান আছে, সেগুলির বিকাশ ভারতশিল্পীর স্বাধীন চেষ্টারই ফল, অর্থাৎ, যতদিন না আরও প্রাচীনতর যুগের শিল্পনিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়া ঐ সকল শিল্প-সঙ্কেতের স্বতন্ত্র বিকাশকাহিনী প্রকাশিত করে, ততদিন ভারতশিল্পের এই সকল অঙ্গ পরের নিকট হইতে ধার করা, এইরূপ মনে না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু এরূপ ধার স্বীকার করিলেও জাতীয় গর্ব্ব খর্ব্ব হয় না।

(৪) Earnest Gardner's "A Hand book of Greek Sculpture," Chap. I. p. 45. (London, 1911.)

ভারতের শিল্পেতিহাসের দ্বারদেশেই মৌর্য্যসম্রাট্ অশোকের মহিমময়ী মূর্ত্তি বিরাজিত। অশোক লোকশিক্ষার ও লোকরঞ্জনের উদ্দেশ্যে মুক্তহস্তে শিল্পিকুলের পোষণ করিতেন। পর্ব্বতগাত্রে উৎকীর্ণ চতুর্থ অনুশাসনে অশোক বলিয়াছেন—

"ত অজ দেবানম্ পিয়স পিয়দসিনো।
রাঞো ধম্মচরণেন ভেরীঘোসো অহো ধম্মঘোসো
বিমানদসনা চ হস্তিদসনা চ অগিখংধানি
চ অনানি দিব্যানি রূপানি দশয়িৎপা অনম্।"

"কিন্তু এখন দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা ধর্ম্মাচরণ আরম্ভ করায়, ভেরীধ্বনি ধর্ম্মধ্বনিতে পরিণত হইয়া জনগণকে বিমানের প্রতিকৃতি, হস্তীর প্রতিকৃতি, অগ্নিপুঞ্জ ও অন্যান্য দিব্যরূপ প্রদর্শন করিয়াছে।"

জনসমাজে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য অশোক যে প্রদর্শনী বা মিছিল বাহির করিতেন, এখানে তাহার কথাই উল্লিখিত হইয়াছে। (৫) এই মিছিলে হস্তীর মূর্ত্তি, দেবতার মূর্ত্তি ও দেবতার বাহন বিমানের মূর্ত্তি প্রদর্শিত হইত। অশোক জনসমাজে যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার লক্ষ্য নির্ব্বাণ নহে, স্বর্গলাভ; এবং তাহাতে নীতি-মার্গের সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার কর্ম্মকাণ্ডও জড়িত ছিল। দেবপূজা অশোক-প্রতিষ্ঠিত কর্ম্মকাণ্ডের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল। ডাক্তার ফ্লিট যাহাকে অশোকের শেষবাক্য বলিয়াছেন, রূপনাথের পর্ব্বতগাত্রে উৎকীর্ণ সেই অনুশাসনে অশোক বলিতেছেন—

"যা ইমায় কালায় জংবু-দিপসি অমিসা দেবা
হুসু তে দানি মিসা কটা।"

বহু বিচারবিতর্কের পর পণ্ডিতগণ এখন একবাক্যে এই বচনের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—

"যে সকল দেবতা এতকাল জম্বুদ্বীপে (জনগণের সহিত) অমিশ্র বা সম্পর্ক-রহিত ছিল [অর্থাৎ জম্বুদ্বীপে যে সকল দেবতার পূজা প্রচলিত ছিল না], এখন [আমার উদ্যমের ফলে] তাহারা (জনসমাজে) মিশ্র অর্থাৎ পূজিত হইতেছে।" (৬)

ইহার উপর অশোক স্বয়ং "দেবানাংপ্রিয়" নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন; এই সকল প্রমাণের একত্র বিচার করিলে নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত করিতে হয়,—অশোক প্রতিমা-পূজা প্রচলিত করিয়াছিলেন, এবং সেই সূত্রে বিশেষভাবে চিত্রকলার ও ভাস্করকলার পৃষ্ঠপোষণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অশোকের পূর্ব্বে যে প্রতিমাপূজা আদৌ

(৫) Journal of the Royal Asiatic Society, 1913, pp. 651—653.
(৬) * J. R. A. S, 1911, p. 1114—1119; Ibid, 1912, p. 1059.

প্রচলিত ছিল না, এবং প্রতিমানির্ম্মাণক্ষম চিত্রকর বা ভাস্কর ছিল না, তাহা নয়। অশোকের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রতিমাপূজা ও তাহার নিত্যসহচর শিল্প হয় ত মগধে ও মধ্যদেশের অংশবিশেষে সীমাবদ্ধ ছিল; অশোক তাহা সমগ্র "জম্বুদ্বীপে" প্রচারিত করিয়াছিলেন। মৌর্য্যবংশ-ধ্বংসকারী পুষ্যমিত্রের পুরোহিত, বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের পুনরভ্যুত্থানকামী, "ব্যাকরণ-মহাভাষ্যকার" পতঞ্জলি অশোকের এই প্রতিমাপূজা-প্রচারকে লক্ষ্য করিয়াই হয় ত লিখিয়া গিয়াছেন,—"মৌর্য্যৈ র্হিরণ্যার্থিভি রর্চাঃ প্রকল্পিতাঃ।" অশোক প্রতিমা-পূজার প্রচার করিতে গিয়া যে শিল্পের পৃষ্ঠপোষণ করিয়াছিলেন, তাহা মাগধভাব-পরিপুষ্ট মাগধ-শিল্প। এই মাগধ ভাব বহির্ম্মুখ ও ঐহিক-কর্ম্মনিষ্ঠ। সুতরাং সমভাবাপন্ন গ্রীক জাতির পূজিত গ্রীক শিল্পীর গঠিত প্রতিমার ন্যায় মাগধগণের পূজিত মাগধশিল্পীর গঠিত প্রতিমা মানুষভাব-পরিপুষ্ট, বহির্ম্মুখ ও স্বভাব-অনুযায়ী। প্রাচীন বৌদ্ধশিল্পের অকপট স্বাভাবিকতার (frank naturalismএর) মূলে মাগধ জাতির জাতীয় চরিত্র।

সম্রাট অশোকের তত্ত্বাবধানে বা আদেশানুসারে যে অসংখ্য ভাস্কর্য্যকীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কতিপয় স্তম্ভশীর্ষ ভিন্ন আর কিছু এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দের প্রারম্ভে ফাহিয়েন যখন পাটলিপুত্র মহানগর পরিদর্শন করেন, তখন তিনি অশোকের রাজপ্রাসাদ ও সভামণ্ডপগুলি (halls) অক্ষুণ্ণ অবস্থায় দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"এই সকল (প্রাসাদ ও মণ্ডপ) সম্রাট অশোক কর্ত্তৃক নিয়োজিত দানবগণ (spirits) নির্ম্মাণ করিয়াছিল। দানবগণ এমন ভাবে পাষাণের উপর পাষাণ বিন্যস্ত করিয়াছিল, প্রাচীর তোরণ সকল নির্ম্মাণ করিয়াছিল, এবং কমনীয় কারুকার্য্য ও ভাস্কর্য্য সম্পাদিত করিয়াছিল, যাহা পৃথিবীর কোনও মানুষ-শিল্পীই সম্পাদন করিতে পারিত না।" (৭)

ফাহিয়েন স্বয়ং শিল্পী ছিলেন। তাম্রলিপ্তিতে অবস্থানকালে তিনি প্রতিমার চিত্র-অঙ্কনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সুতরাং অশোকের রাজপ্রাসাদের শোভা-সম্পাদনার্থ অনুষ্ঠিত ভাস্কর্য্য-কার্য্যের চমৎকারিত্ব সম্বন্ধে ফাহিয়েন যাহা বলিয়াছেন, তাহা অনাদৃত হইতে পারে না। অশোকের সময়ের ভাস্করগণ যে শিল্পনৈপুণ্যে

(৭) "The royal palace and halls in the midst of the city, which exist now as of old were all made by spirits which he employed and which piled up the stones, reared the walls and gates and executed the elegant carving and inlaid sculpture work,—in a way which no human hands of this world would accomplish."

যথার্থই অতুলনীয় ছিলেন, তাহা অশোকস্তম্ভের শীর্ষদেশের বা বোধিকার উপর প্রতিষ্ঠিত পশুমূর্ত্তি দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

অশোকের অনুশাসন-সমন্বিত স্তম্ভনিচয়ের মধ্যে চারিটি স্তম্ভের শীর্ষ বা বোধিকা ও তদুপরস্থিত পশুমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। অশোক-স্তম্ভের বোধিকার তিনটি প্রধান অংশ। সর্ব্বনিম্নে ঘণ্টা (bell)। এই ঘণ্টা পারস্যের প্রাচীন রাজধানী পার্সিপলিস্ নগরের ধ্বংসাবশেষমধ্যে দৃষ্ট স্তম্ভ-বোধিকার ঘণ্টার অনুরূপ। ঘণ্টার উপর মঞ্চ, বা abacus; এবং মঞ্চের উপর পশুমূর্ত্তি। এই পশুমূর্ত্তি প্রোদ্ভিন্ন (statue in round)। কোনও কোনও মঞ্চের গাত্রে প্রায়োদ্ভিন্ন (relief) (৮) পশু বা পক্ষী উৎকীর্ণ হইয়াছে; লতা ও পুষ্প কোনও কোনও মঞ্চের শোভা সম্পাদন করিতেছে। [এই সকল স্তম্ভ-মধ্যে বিহার প্রদেশের চম্পারণ জেলার অন্তর্গত লৌড়িয়ানন্দনগড় গ্রামের স্তম্ভ বোধিকা সহ প্রায় অক্ষত অবস্থায় যথাস্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অশোকের সময়ে স্থাপত্য-বিদ্যা কিরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, এই সুমহান্ স্তম্ভ তাহার জাজ্বল্যমান সাক্ষ্য। এই স্তম্ভের বোধিকার মঞ্চের গাত্রে, চঞ্চু দ্বারা আহার করিতেছে, এমন এক কাতার রাজহংস বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত উৎকীর্ণ রহিয়াছে। মঞ্চের উপরে পশ্চাতের পদদ্বয়ে ভর করিয়া পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট প্রোদ্ভিন্ন মনোরম সিংহ-মূর্ত্তি। চম্পারণ জেলার রামপুরোয়া গ্রামের অশোক-স্তম্ভের বোধিকার সিংহ-মূর্ত্তি ভূগর্ভে প্রোথিত ছিল। ইহা এখন আবিষ্কৃত এবং কলিকাতা মিউজিয়মের প্রবেশ-কক্ষের সম্মুখে স্থাপিত হইয়াছে। এই মূর্ত্তির মুখের ঊর্দ্ধভাগ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এবং ইহা যে সর্ব্বাংশে স্বভাবসঙ্গত, তাহা বলা যায় না। তথাপি ইহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অতিশয় দক্ষতার সহিত নির্ম্মিত, যেন সজীব এবং সতেজ।]

অশোকস্তম্ভের বোধিকার মধ্যে সারনাথ-স্তম্ভের বোধিকাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই বোধিকার মঞ্চগাত্রে প্রায়োদ্ভিন্ন হস্তী, বৃষ, অশ্ব ও সিংহমূর্ত্তি উৎকীর্ণ রহিয়াছে; এবং মঞ্চের উপরে প্রোদ্ভিন্ন চারিটি সুবৃহৎ সিংহ পরস্পরের সহিত পৃষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই সকল মূর্ত্তিই সম্পূর্ণরূপে স্বভাবসঙ্গত ও সজীব। মঞ্চের উপরিস্থ চারিটি সিংহমূর্ত্তিতে ধর্ম্মচক্রবাহি-পশুরাজোচিত মৌন-গাম্ভীর্য্য আশ্চর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে। এই সারনাথ-স্তম্ভের বোধিকা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মার্শেল লিখিয়াছেন,—"Both bell and lions are in an excellent state of preservation and

(৮) শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এই দুইটি পারিভাষিক শব্দ উদ্ভাবন করিয়াছেন।

masterpieces in point of both style and technique—the finest carvings, indeed, that India has yet produced, and unsurpassed, I venture to think, by any thing of their kind in the ancient world."

সাঁচির অশোক-স্তম্ভের বোধিকার উপরেও ঠিক এই প্রকার দণ্ডায়মান চারিটি সিংহমূর্ত্তি আছে। এই সকল সিংহের মাথা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কানিংহাম লিখিয়াছেন,—ইহাদের মাংসপেশী ও থাবা সম্পূর্ণরূপে স্বভাব-সঙ্গত, এবং গ্রীক ভাস্কর্য্য-নিদর্শনের সহিত তুলনীয়। (১০) সাঁচির প্রধান স্তূপের দক্ষিণের তোরণের স্তম্ভের বোধিকার অপকৃষ্ট সিংহমূর্ত্তির সহিত এই অশোকস্তম্ভের সিংহমূর্ত্তির তুলনা করিয়া কানিংহাম অনুমান করিয়াছেন,—সিরিয়া বা বেক্‌ট্রিয়া হইতে আগত গ্রীক ভাস্করের দ্বারা অশোক সাঁচি-স্তম্ভের বোধিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। অধ্যাপক ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "ভারতশিল্পের ইতিহাসে"র ৬০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—সারনাথস্তম্ভের বোধিকা কোনও এসিয়াবাসী গ্রীক ভাস্করের নির্ম্মিত, এরূপ অনুমান মঞ্চগাত্রের পশুমূর্ত্তির রচনা-রীতির বিরোধী। কেন না, "The ability of an Asiatic Greek to represent Indian animals so well may be doubted. কিন্তু ইহার দশ পংক্তি পরেই সাঁচি-স্তূপের দক্ষিণ দ্বারের স্তম্ভের উপরের অপকৃষ্ট সিংহমূর্ত্তি-নির্ম্মাণকারকের অশোক-স্তম্ভের বোধিকার সিংহমূর্ত্তির ন্যায় মূর্ত্তি-গঠনের অক্ষমতার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,—"and his failure supports the theory that the Sarnath-capital must have been wrought by a foreigner." স্তম্ভ-বোধিকায় পরস্পরের পৃষ্ঠের সহিত সংলগ্ন চারিটি সিংহ-স্থাপনের ভারত-সঙ্কেত শিল্পিগণ পারসীক শিল্পনিদর্শন দেখিয়া শিক্ষা করিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু যতদিন ভারতবর্ষের বাহিরে গ্রীকগণের অধ্যুষিত বা অধিকৃত কোনও দেশে সমসময়ে নির্ম্মিত অশোকস্তম্ভের বোধিকা বা পশুমূর্ত্তির ন্যায় বোধিকা আবিষ্কৃত না হয়, ততদিন ভারতীয় ভাস্করগণকে অশোক-স্তম্ভের বোধিকা-নির্ম্মাণের গৌরব হইতে বঞ্চিত করিবার প্রযত্ন একটা অতি অসঙ্গত কল্পনা বলিয়া গণ্য হইবে। পক্ষান্তরে, ব্রাহ্মীলিপিযুক্ত প্রাচীনমুদ্রা সপ্রমাণ করে,—অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে হস্তী, বৃষ প্রভৃতি পশুমূর্ত্তিযুক্ত মুদ্রা ঢালাই প্রচলিত ছিল। অধ্যাপক রেপসন "উদেহকি" বা উদ্দেহিক-রাজের এইরূপ দুইটি মুদ্রার প্রতিকৃতি ও লিপিপাঠ প্রচারিত করিয়াছেন। একটির পৃষ্ঠভাগে ককুদবিশিষ্ট বৃষ এবং

(৯) Archaeological Report, 1904-05, p. 36.
(১০) The Bhilsa Topes, London, 1854, p. 195.

অপরটির পৃষ্ঠভাগে হস্তী অঙ্কিত রহিয়াছে। অক্ষরানুসারে রেপসন ইহাদিগকে অন্যূন খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দের পুরাতন বলিয়া মনে করেন—a date at least as early as the third century before Christ. তিনি আরও বলেন, "in any case, the act of casting coins must be very ancient in India. There is no question here of borrowing from a Greek source." (J R A S, 1900, p. 182).

সভ্যজগতের শিল্পের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, সকল দেশে সকল যুগেই যাহা আরাধনার সামগ্রী, তাহার রচনায় শ্রেষ্ঠ শিল্পীর নৈপুণ্য পর্য্যবসিত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীকভাস্কর-কুলচূড়া ফিদিয়স পারথেনন-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত এথেনা-মূর্ত্তি স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মন্দিরের শোভা-বর্দ্ধনার্থ যে সকল ভাস্কর্য্য রচিত হইয়াছিল, তাহা ফিদিয়সের তত্ত্বাবধানে তাঁহার শিষ্যগণের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল। অশোকের সময়েও ভারতবর্ষে এইরূপ কোনও রীতি প্রচলিত থাকা সম্ভব। এই হিসাবে সারনাথের স্তম্ভবোধিকা স্মরণ রাখিয়া, অশোকের আদেশে নির্ম্মিত "দিব্যরূপাণি" দেবপ্রতিমার শিল্পচাতুর্য্য ও সৌন্দর্য্যের কল্পনা করিতে গেলে, সেই প্রতিমা যে কিরূপ মনোহর বস্তু ছিল, তাহা কতকটা অনুভব করা যাইতে পারে। অশোকের আদেশে রচিত একখানি প্রতিমাও এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই; সুতরাং মৌর্য্যগণের প্রকল্পিত অর্চ্চার সৌন্দর্য্য-উপভোগের সুযোগ আমাদের নাই। কিন্তু অশোকের সময়ের অনতিকাল পরে নির্ম্মিত প্রতিমা পর্য্যবেক্ষণ করিলে, আমরা অশোকের সময়ের প্রতিমার রচনারীতির উপলব্ধি করিতে পারি।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

গীতি-কবিতা।

[স্বর্গীয় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় লিখিত।]

বাঙ্গালা ভাষার কাব্যসাহিত্যে সম্প্রতি গীতি-কবিতার কাল চলিতেছে,—বলিলে, বোধ হয়, বেঠিক বলা হয় না। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত ও প্রকাশিত গীতি-কবিতার "কনকুত" করিয়া, বোধ হয়, বঙ্কিম বাবুই বলিয়াছিলেন যে, ঐ ভাষার সাহিত্যে আর আর যে সামগ্রীরই অভাব থাকুক, গীতি-কবিতার বা খণ্ডকাব্যের অভাব নাই,—আধিক্যও হইয়াছে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যে দ্রব্যের অভাব ছিল না, কিঞ্চিৎ আধিক্যই হইয়াছিল, বিগত ত্রিশ বৎসর কাল, স্বাভাবিক

জননশীলতার নিয়মে ও তাহা ভিন্ন সাহিত্যক্ষেত্রে সাময়িক প্রবল প্রথার অনুসরণে, পরন্তু, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির বা ব্যক্তিবিশেষের কবিত্বশক্তির প্রভাবে, বা রচনা-সৌন্দর্য্যের সংক্রামকতায়, সেই দ্রব্য দিন দিন উৎপন্ন হইয়া এখন যে পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, এবং গীতি-কবিতার এই বিশেষ যুগে নিত্য বর্দ্ধিত হইয়া চলিয়াছে, তাহা সকলেরই প্রত্যক্ষ। প্রশ্ন হইতে পারে, সাহিত্যের যে সকল অঙ্গ অপূর্ণ রহিয়াছে, তাহার পূরণ না হইয়া, যে অঙ্গে অভাব নাই, সে অঙ্গের আধিক্য হয় কেন? এ বিষয়ে দায়ী কে,—দোষী কে? এরূপ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আদৌ আবশ্যক হইলে, আর একটি প্রশ্ন দ্বারা উত্তর দিতে হয়। মহাশয়ের গৃহে পর পর সাতটী কন্যা-রত্ন জন্মিয়াছে, পুত্রসন্তান একটীও জন্মে নাই; অথচ মহাশয়ের এতগুলি কন্যার কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না, পুত্রের প্রয়োজন খুবই রহিয়াছে; তবুও বার . বার কেবল কন্যাই দেখা দেয় কেন? পুত্র একটীবারও প্রসূত হয় না কেন? এ বিষয়ে দায়ী কে—দোষী কে? নিশ্চয়ই সন্ততিগণের পিতা এ সম্বন্ধে দায়ী নহেন; বাক্য-বাণ-নিপীড়িতা প্রসূতিও প্রকৃত-পক্ষে দোষী নহেন। সেইরূপ গীতি-কবিতার অতিরিক্ত গতিশীলতার জন্য আমাদের কবিদিগকে, বোধ হয়, কিছুতেই দায়ী বা দোষী করা যায় না।

গীতি-কবিতার আধিক্য :—
দায়ী কে?

জীবসৃষ্টির ন্যায় সাহিত্য-সৃষ্টি, বিশেষতঃ কাব্য সাহিত্যের সৃষ্টি, দুর্জ্ঞেয় দৈবঘটনারই মধ্যে। উহার গতি ও প্রকৃতি যথেচ্ছ পরিচালিত বা প্রয়োজনানুসারে পরিবর্ত্তিত করা যায় না। কতক জ্ঞাত ও ততোধিক-সংখ্যক অজ্ঞাত কারণ-পরম্পরার সমবায়ে, যেটী ঘটিবার, সেইটীও ঘটে; কেহ মাথা কুটিয়া, তাহা খণ্ডন করিতে পারে না। জীব-সৃষ্টিতে, স্বেচ্ছামত পুত্র কন্যার উৎপাদন সম্বন্ধে, বিজ্ঞানশাস্ত্র কয়েকটী সঙ্কেতের আবিষ্কার ও প্রচার করিয়াছেন। সে সঙ্কেত কি, সংবাদ ও সাময়িক পত্রের নিয়মিত পাঠকগণ অবগত আছেন। এখন সেই সকল সঙ্কেত যদি সফল হয়, তাহা হইলে, খুব সম্ভব, কোনও না কোনও একদিন সাহিত্য-সংসারেও স্বেচ্ছামত সৃষ্টির অমোঘ সঙ্কেতাবলী বাহির হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু, তাহা যতদিন না হইতেছে, ততদিন স্বদেশীয় পুরাতন প্রথার অবলম্বন ও অনুসরণ করা যাইতে পারে। তাহা পুত্রেষ্টিযাগের অনুকরণে "কাব্যেষ্টি" (?) যজ্ঞ,—তপস্যা, সাধনা, আরাধনা। পুরুষকার দ্বারা যখন অটল, অচল, অতিনিষ্ঠুর, অমোঘ অদৃষ্টকেই বিধ্বস্ত, বিচলিত ও খণ্ডিত করা সম্ভব বলিয়া শাস্ত্রোক্তি শুনা যায়, তখন

সাহিত্য-স্রোত ও জীব-সৃষ্টি;
প্রবাহ-পরিবর্ত্তনের উপায় কি?

সাধনা-সঞ্জাত সেই পুরুষকারের সহায়তায়, কবি-প্রতিভা উদ্ভাবিত ও উত্তেজিত, পরিবর্দ্ধিত, বা পরিবর্ত্তিত হইলেও না হইতে পারে, এমন নয়।

পদ্য ও গদ্য।

পদ্যের প্রয়োজনাভাব।

কিন্তু, গীতি-কবিতায় আমাদের গৃহ পূর্ণ হইয়া আরও বিশ ত্রিশ গাড়ী বাহিরে মজুত রহিয়াছে বলিয়া, অতঃপর আর কেহ আমাদের এই বাঙ্গালা সাহিত্য গ্রামটীর সীমানার মধ্যে গান গায়িবে না, গীতি-কবিতা লিখিবে না, এবং তাহা আমাদের গৃহ-দ্বারের সম্মুখে আনিবে না, এমন আপত্তি, আদেশ, বা উপরোধ করা যাইতে পারে না। পরন্তু, এই আবশ্যকাতিরিক্ত আমদানীর অপরাধে আইনসঙ্গত কোনও অভিযোগ আদৌ চলিতে পারে, তাহাও বোধ হয় না। যে হেতু ইহা অপেক্ষা গুরুতর আপত্তির কারণ ও অভিযোগের "অজুহত" উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও, তাহা কোনও সাহিত্য-আদালতেই গ্রাহ্য হয় নাই। সাহিত্য-বিপণীর ব্যাপারিগণ অসঙ্কোচে তাহা অষ্টপ্রহর অগ্রাহ্য করিয়াই কার্য্য করিতেছেন। সে অভিযোগ এই যে, গদ্য অপেক্ষা পদ্যের বয়ঃক্রম অনেক বেশী। পদ্য পাহাড় পর্ব্বতেরই মত পুরাতন। পৃথিবীর প্রায় কোনও সাহিত্যে পদ্যের শরীর অপুষ্ট নাই। অনেক স্থলে তাহা স্ফীততর, স্ফীততম অপেক্ষাও স্ফীত হইয়া পড়িয়াছে; তথাচ প্রতিদিন পুনঃপুনঃ পর্য্যাপ্ত নূতন রক্ত-মাংস-ভারের আধার হইয়া আরও স্ফীত ও বর্দ্ধিত হইয়া চলিয়াছে! এরূপ হয় কেন? না হইলে ত বেশ চলে, না হইলে কিছুই আসে যায় না; অনিষ্টের পরিবর্ত্তে বরং ইষ্টই ত হয়। পদ্যসাহিত্যের ও কাব্যকলার যত দূর উন্নতি ও বৃদ্ধি হইবার, তাহা হইতে বাকি নাই;—যত দূর উন্নতি ও বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব ও স্বাভাবিক, তাহা বহুকাল পূর্ব্বেই ত হইয়া গিয়াছে, নূতন হইবে আর কি, হইতেছেই বা কি? ভাব, রস, ছন্দঃ, সুর, বর্ণরাগ, সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি, চরিত্রগঠন ও চিত্র-অঙ্কন,—এক কথায় কাব্য কবিতার উপযোগী যাবতীয় উপকরণ এবং কাব্যকলার করণীয় যাবতীয় সৃষ্টিই ত নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। তবে আর পুনঃপুনঃ উহাদের পুনরুক্তির ও পুনর্গঠনের প্রয়োজন কি? উহাদের অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত পরিবর্দ্ধনে কেবল সাহিত্য-শরীর নিরতিশয় ভারাক্রান্ত ও সাহিত্য-সংসারিগণের শক্তি, সামর্থ্য ও সময়ের সাংঘাতিক অপব্যয় ও অপচয় হইতেছে বই ত নয়! ফলতঃ, সাহিত্য-নামের উপযুক্ত পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক সাহিত্যই পদ্য-শরীরী; নানাপ্রকার আকারের ও নানাবিধ প্রকৃতির উৎকৃষ্ট কাব্যকবিতা প্রচুর অপেক্ষাও পর্য্যাপ্তপরিমাণে আছে;—এত অধিক আছে যে, এক জন লোক দীর্ঘজীবী পাঁচ জন লোকের পরমায়ু পাইলেও তাহা পড়িয়া

শেষ করিতে পারে না; রীতিমত অধ্যয়ন ও অনুধাবন, চর্ব্বণ ও বিশ্লেষণ করিয়া পরিপাক করা ত দূরের ও পরের কথা! অতএব আর কেন? ইত্যাদি।

গদ্যবাদী ও পদ্যবাদী। গান ও জ্ঞান।

এরূপ অভিযোগ, বিবেচক ও বিজ্ঞ ব্যক্তির কর্ণে যতই বেতালা বাজুক, যতই বিদ্রূপকর হউক, আশ্চর্য্য নয়; নেহাত অসঙ্গতও নয়। অন্ততঃ যুক্তি-তর্ক দ্বারা উহা পদে পদে সপ্রমাণ করিবার বেশ পথ আছে। এক কথায়, এ প্রকার অভিযোগের অভাব নাই; একটু ভীতিও আছে। কথা হইতে পারে যে, গদ্য অপেক্ষা পদ্যের বয়স খুব বেশী হইলেও, পরিমাণে পদ্য অপেক্ষা গদ্যই বাড়িয়া উঠিয়াছে, এবং প্রত্যেক প্রহরেই অতীব প্রচণ্ডবেগে বাড়িয়া চলিয়াছে। অতএব গদ্যের নীরস, শুষ্ক, গর্দ্দভোচিত গুরুভারে জগৎ সংসারের সাহিত্য সকল যদি ভারাক্রান্ত, নিপীড়িত না হয়, তবে সরস সুন্দর সুললিত পদ্যসম্ভারে কোনও সাহিত্যের শরীর সংক্ষুব্ধ হইবে কেন? শোভিতই হইবে; সুশোভিত হইয়াই চলিয়াছে। কিন্তু, পদ্যপ্রিয়ের এ উক্তির ও এ যুক্তির জোরে প্রতিবাদ করিয়া গদ্যবাদী বলিলেন যে, অপ্রয়োজনীয়, অতিরিক্ত, অন্যায়, অযৌক্তিক ও অরুচিকর পৌনঃপৌনিক পরিচ্ছদের ভারে বা একই ধাতু-নির্ম্মিত একই আকার প্রকারের অসংখ্য অলঙ্কারের ভারে কোনও "শরীর"ই শোভিত হয় না, অত্যন্ত ক্ষোভিতই হয়। তা' ছাড়া, দেখিতে হইবে,—যেটি আসল কথা,—কাহার কি পরিমাণে প্রয়োজন ও অপ্রয়োজন। পদ্যের ও কাব্য কবিতার যতটা প্রয়োজন ছিল, তাহার পর্য্যাপ্ত পূরণ বহু পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে; অতএব তাহাদের আর উৎপন্ন বা পুনরুক্ত হওয়া আদৌ অপ্রয়োজন। কিন্তু, গদ্যের অনিবার্য্য ও অলঙ্ঘনীয় প্রভূত প্রয়োজনীয়তা পদে পদেই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। গদ্য নহিলে এ পৃথিবীতে এক পদও চলিবার উপায় নাই। গদ্য নহিলে তোমার জ্ঞানের রাজ-পথ রুদ্ধ হয়, গৃহ-কার্য্য অচল হয়, জীবন-যাত্রা সুনির্ব্বাহিত কেন, একেবারেই নির্ব্বাহিত হয় না, তোমার অসংখ্য অত্যাবশ্যক স্মৃতি সংরক্ষিত হয় না, আলোক লয় প্রাপ্ত হয়, তুমি এক মুহূর্ত্তেই অকস্মাৎ এক বিষম অমাবস্যার অন্ধকারের ভিতরে পড়। ফলতঃ, গদ্য তোমার গতি-শক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞান-উপার্জ্জনের ও আলোচনার একমাত্র প্রকৃষ্ট ও প্রশস্ত পথ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথে মনুষ্যজাতি এখনও নেহাত 'নাবালক'; তাহার বহির্দ্বারে মাত্র দাঁড়াইয়া আছে। গদ্য নহিলে সে সিংহদ্বার খুলে না। গান না গাহিলেও, অন্ততঃ নেহাত অচল হয় না। কিন্তু জ্ঞান নহিলে এক নিমেষও চলে না;

একেবারেই অচল হয়। পুনশ্চ, যে গান আছে, তাহাই গাও; তাহাই গাও, তাহাই পুরুষানুক্রমে গাইয়া ও ভুঞ্জিয়া তুমি ফুরাইতে পারিবে না। তবে কথিত নূতন গানের আর দরকার কি? হৃদ্‌বৃত্তির স্ফুরণ ঢের হইয়াছে। বুদ্ধি-বৃত্তির বিকাশ বিস্তর বাকি। কাজেই জ্ঞানের দরকার এখনও অনেক আছে, চিরকালই সমান থাকিবে। কাযেই গদ্য চাই। পদ্য, গদ্যের অভাবপূরণ—গদ্যের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারে নাই বলিয়াই, গদ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। গদ্যের গুরুতর কার্য্য কোনও কালেই শেষ হইবে না। গদ্যকে গর্দ্দভের ভারই বল, আর যাহাই বল, সে ভার সকলেই সমান বহন করিতে বাধ্য। পদ্যের ললিত লীলা,—পয়ার, পাঁচালী, গান, বাবুগিরির বিলাস বই আর বেশী কি? তাহা না থাকিলেও, পৃথিবী যেমন ঘুরিতেছে, তেমনই ঘুরিবে। বরং বিরহী বিরহিণীদের বিরহ-বেদনা-গুলা শ্লোকে সনেটে গা ঢালিয়া "গুলতান" করিতে না পাইলে নিশ্চয়ই নির্দ্দোষ আরাম হইয়া যাইবে। এবং তাহাতে করিয়া সংসারের সবিশেষ একটা উপকারই হইবে। তবুও "গান" বলিয়া যে জ্ঞান হারাইতেছ! তা গদ্যেও কোন "গান" না হইতে পারে? লিখিতে জানিলে গদ্যেও বেশ কাব্য কবিতা লেখা চলে। পুরাতন পণ্ডিত, দর্শন-বিজ্ঞান-কাব্য-কবিতার প্রপিতামহ অরিস্তোতল, প্লেত প্রভৃতি পদ্যের প্রয়োজনীয়তাই স্বীকার করেন নাই। পদ্যের ছন্দো-বন্ধন ও নিষেধবিধানের বশীভূত হইয়া থামকা গর্ভ-যাতনা ভোগ করাকে অনর্থক আত্মবিড়ম্বনা বলিয়াই বুঝাইয়া গিয়াছেন। প্লেত স্বয়ং গ্রীক গদ্যে গীতিকবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত-সাহিত্যে উৎকৃষ্ট গদ্য কাব্য আছে। ইংরেজী, ফরাসী ও জর্ম্মন সাহিত্যে আছে। বাঙ্গালা সাহিত্যেও কোন্ নাই? ফলতঃ, যে দিক দিয়াই দেখিবে, পদ্যের আদৌ প্রয়োজনাভাব। কাব্য কবিতার কার্য্য বহু কাল হইল শেষ হইয়া গিয়াছে। তবুও যে তাহার যাতনা ও বিড়ম্বনা সাহিত্য-সংসারকে ভোগ করিতে হইতেছে, ইহাকে দৌরাত্ম্য বই আর কি বলিব? পৃথিবীর অসংখ্য অভাব—মনুষ্য-জীবনগত প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা পদ্য পূরণ করিতে পারে নাই বলিয়াই ত গদ্য জন্মিয়াছিল। গদ্য পদ্যের স্থল পূরণ করিতে পারে; কিন্তু পদ্য গদ্যের স্থল পূরণ করিতে পারে না।

গীতি-গাথা অনিবার্য্য। পুরাতনে নূতনে নিত্য-সম্বন্ধ।

ছন্দো-বদ্ধ কবিতামাত্রেরই বিপক্ষে এত অধিক দীর্ঘ ও "গুরুগম্ভীর" অভিযোগ ও আপত্তি সত্ত্বেও, কবিতা নিজে যখন বাঁচিয়া আছেন, বাঁচিয়া থাকিতে পারেন, তখন গীতি-কবিতা বেচারীও, তাহার গীতের বোঝা সত্ত্বেও,

একেবারে মারা পড়ে না; তাহারও বাঁচিয়া থাকিবার কিঞ্চিৎ অবসর অবশ্যই থাকিয়া যায়। ফলতঃ, সংসারে যতই সর্ব্বোচ্চ উত্তম সঙ্গীত থাকুক, সাহিত্যে যতই সুগায়ক তাঁহাদের স্বর্গ-সুধা-বিনিন্দী সুমধুর গীতিরাশি রাখিয়া গিয়া থাকুন, বা গায়িতে থাকুন না কেন, তাহাতে অতি কুগায়কদের কর্কশ গানও থামিতে পারে না।—সাহিত্য-সংসারে সহস্র সহস্র সুকবির ও স্বর্গীয় গায়কের লক্ষ লক্ষ, ললিত, উন্নত ও অবিস্মৃত হৃদয়-স্পর্শিনী কবিতা-লহরী—অসংখ্য অসংখ্য অমর-গীতির অস্তিত্ব, আলোচনা, আবৃত্তি ও অভিনয় সত্ত্বেও, নিকৃষ্ট কবিগণও, এমন কি অকবিগণও,—কণ্ঠহীন গুণ-গৌরব-বিহীন অতি গরীব গায়কগণও তাহাদের প্রাণের গাথা গায়িতে, মনের কথা কহিতে, হৃদয়ের বেগ, আনন্দ, বা ব্যথা জানাইতে ছাড়িবে না। তাহারা তাহাদের ক্ষীণ কণ্ঠের ভাঙ্গা-ভাঙ্গা সুরটুকু শাণাইয়া, হয় ত অপরের রাগ-রাগিণীর এক বিন্দু ঋণ করিয়া লইয়া, তাল-লয়াদির সঙ্গতি বা অসঙ্গতির প্রতি সবিশেষ কোনও লক্ষ্য না করিয়া, সম্মুখস্থ কাষ্ঠ-খণ্ড, হৃৎপিণ্ড, বা বাঁশের দণ্ডটী বাজাইয়া বাজাইয়া, গোপনে গুন্-গুন্ গায়িবে;—আবার সময়বিশেষে, আহ্লাদে বা অবসাদে উদ্বেলিত বা ম্রিয়মাণ হইয়া, উচ্চচীৎকার দ্বারা হৃদয়ের সুখোচ্ছ্বাস প্রবাহিত করিবে। এ গীতি প্রকৃতি জীবিত থাকা পর্য্যন্ত নিবারিত হইবে না। এ গান তুমি শুন আর নাই শুন, উহা শুনাইবার জন্য গায়ক তোমার কাছে ঘনাইয়া ঘনাইয়া আসিবে। ইহা স্বভাব; ইহা স্বাভাবিক। ইহা সংসার; ইহাই সাহিত্য। ইহাতে সংসারের স্থিতি এবং গতি। ইহাতেই সাহিত্যের বিকাশ এবং বিস্তার। শুক-সারী তাহাদের সুধালহরী বর্ষণ করেন বলিয়া, শালিক বেচারী তাহার সুস্বরহীন "সা—রি—গা—মা"টুকুতে বা "সা—রি—গা—মা"-বিহীন বেতালা সুরটুকুতে বঞ্চিত হইতে পারে না; বা সেটুকু অভিমানে বা তোমার সমালোচনার পীড়নে বঙ্গসাগরে বিসর্জ্জন দিয়া বোবা হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। কোকিল তাঁহার "মধুর পঞ্চমে" আকাশ পাতাল পৃথিবী প্লাবিত পুলকিত করেন বলিয়া, দোয়েল তাহার প্রভাত-কাকলিটুকু পরিত্যাগ করে না। আর বিতাড়িত, নিপীড়িত, শত সহস্র প্রকারে দণ্ডিত দাঁড়কাকও তাহার অতি কর্কশ "কা কা" ধ্বনি ছাড়ে না। পরন্তু, কাকাতুয়া ও কাদাখোঁচাগণও তাহাদের কণ্ঠে ঝঙ্কার করে। কাকাতুয়ায় কণ্ঠ-কান্তি না থাকিলেও, তুমি তাহার দেহ-কান্তি দেখিয়া আদর যত্ন কর, খুব বেশী দাম দিয়াও কিনিয়া আন, ছ্যাঁকা দুধের সর খাওয়াইয়া তাহার পালন পোষণ কর। কণ্ঠখানি যতই কঠিন, কটু ও কর্কশ হউক,

কাকাতুয়া তোমার পোষ্য, প্রিয়, এবং প্রশংসনীয়। কিন্তু, কাক ও কাদা-খোঁচার কেবল ডাকে নয়, তাদের নামেই তুমি অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিত হও। তাহাদের লাঞ্ছনা ও তাড়নার জন্য বিহঙ্গ-কুলে তাহাদিগকে নির্ম্মূল ও নির্বংশ করিবার জন্য—তুমি বন্দুক ও মুদ্গরাদির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছ। এটী অবশ্য তোমার অবিচার।—আর বলিলে যদি বিরক্ত ও বেজার না হও,—এটী তোমার পক্ষপাতের পরিচায়ক, এবং প্রকৃত-সমালোচনা-জ্ঞানহীনতা, সৌন্দর্য্য ও কদর্য্যের পরিমাপ ও প্রভেদ করিবার অক্ষমতা, অসহিষ্ণুতা ও অল্পবুদ্ধিরও বিজ্ঞাপক বটে। তা যিনি যাহাই বলুন, বুঝুন, বা ভাবুন, প্রকৃতির কার্য্য অনিবার্য্য। তাহার ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই বড় কঠিন; তাহার ব্যবস্থা তোমার আমার বিধি-নিষেধের বা বাসনার আয়ত্ত—বা অধীন নহে। ঘটনার আলোচনাই আমরা করিতে পারি, তাহার সংঘটন বা পরিবর্ত্তন, তাহাকে নিয়মিত, খণ্ডিত, বা প্রবর্ত্তিত করিতে পারি না; অথবা খুব অল্পই পারি। সাহিত্য ও সাহিত্যের ইতিবৃত্তের আলোচনা করিলে ইহাই প্রতীত হয়,—ইহাই দেদীপ্যমান দেখা যায় যে, পুরাতনে নূতনে, অতীতে বর্ত্তমানে, তথা উত্তমে মধ্যমে, অধমে, যেন কেমন একরূপ অচ্ছেদ্য নিত্যসম্বন্ধ ও সংযোগ বিদ্যমান। এক অপরের পথ অবরুদ্ধ করে না, উন্মুক্ত ও উৎখাত করিয়াই দেয়। পুরাতন নূতনকে, অতীত বর্ত্তমানকে, উত্তম মধ্যমাদিকে অবাধ অবসর দেয়; উত্তেজিত, প্রবাহিত ও উদ্বেলিত করে। এক প্রবাহ অপর প্রবাহের সহিত, জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে, লক্ষ্যে বা অলক্ষ্যে সংযুক্ত রহিয়াছে। নূতনে পুরাতনে আদান-প্রদান স্বাভাবিক, সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর। নূতন, এক দিকে যেমন পুরাতন হইতে উত্থিত, বর্দ্ধিত, প্রদীপ্ত, বা প্রবর্ত্তিত হয়, শক্তি ও সার আকর্ষণ গ্রহণ করে, অপর দিকে তেমনই পুরাতনকে "বহতা" ও বলিষ্ঠ রাখে। এইরূপে সাহিত্যের প্রবাহ নিয়ত প্রবাহিত ও জীবিত রহিয়াছে। পুরাতন নূতনের গতি-বিধায়ক; নূতনের গতি পুরাতনের স্থিতির ফলোৎপাদক। একের গতি অপরের স্থিতিকে সজীব রাখে, এবং সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ হইতে দেয় না। এইরূপ স্থিতির ও গতির অপর নাম উন্নতি। নূতনের অভ্যুদয় গতির লক্ষণ; কিন্তু তাহার অভ্যুদয়মাত্রই উন্নতি নহে। কেন না, গতি বিপথে ও বিপরীত দিকেও হয়। কেন না, অধোগতি ও দুর্গতিও আছে। যে গতি স্বাভাবিক, স্বাস্থ্যপ্রদ, স্থিতির সংরক্ষণশীল, অথচ সম্মুখগামী, স্বতন্ত্র ও সৃষ্টিক্ষম; পরন্তু, যে গতি পুরাতন-প্রভাবিত হইয়াও নূতন-নির্ম্মাণ-তৎপর, সেই গতিকেই উন্নতি বলি। উচ্ছৃঙ্খল ও অস্বাভাবিক গতি অবনতির নামান্তর। অভ্যুদয়মাত্রই উন্নতি নহে। পরবর্ত্তী হইলেই নূতন ও অভিনব হয় না।

পরন্তু, সৃষ্টিমাত্রেই উত্তমাধমের অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী। সাহিত্য-সংসার সর্ব্বথা এই নিয়মের অধীন। "কেবলমাত্র উত্তম ও উপযুক্ততমের জীবন-ধারণ"—নির্ম্মম নৈসর্গিক বিধি সত্ত্বেও, সেই নৈসর্গিক বিধানানুসারেই অধম ও অনুপযুক্তও জগতে জন্মগ্রহণ করে যে অনিবার্য্য বিধির বশবর্ত্তী হইয়া বা স্বাভাবিক প্রবৃত্তির উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া, শ্রেষ্ঠ সুন্দরের সৃষ্টি করেন, সেই বিধি বা বৃত্তিরই প্রভাবে, বা প্ররোচনায় নিকৃষ্ট অসুন্দরের উৎপাদন করে। সবল ও সুন্দর অমর হউন, এবং দুর্ব্বল ও কুৎসিত ক্ষণভঙ্গুর হউক, তথাপি দুর্ব্বল ও কুৎসিতের, বিকলাঙ্গের ও অঙ্গহীনের অভ্যুদয়, নৈসগিক নিয়মানুসারেই অনিবারণীয়। যে হেতু, তাহারও সবিশেষ আবশ্যকতা ও উপযোগিতা আছে। জীবসৃষ্টির ন্যায়, কাব্য সাহিত্যের সৃষ্টিতেও আছে। বাস্তব ও পাশব সৃষ্টিতে, সবল দুর্ব্বলকে গ্রাস ও গণ্ডূষ করে,—ইহা প্রকৃতিগত প্রথা হইলেও, এবং সে প্রথা মার্জ্জিত মানব সৃষ্টিতে পঁহুছিয়া, পূর্ণমাত্রায় ও সুন্দর সভ্যভাবে প্রবাহিত থাকিলেও, সাহিত্য-সৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টের নিপীড়ক ও নিবারক নহেন, উত্তেজক ও উদ্দীপক; পক্ষান্তরে, নিকৃষ্ট শ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠত্বের কিয়ৎপরিমাণে পরিমাপ-দণ্ড এবং গৌরব-বর্দ্ধকও বটে। এ স্থলে, কেবল ইহাই মনে রাখা আবশ্যক যে, কদাকর হইলেই কৃত্রিম হয় না। কিন্তু, কৃত্রিমমাত্রই কুৎসিত। কেন না, কৃত্রিমের বহিরাবণের যতই বাহার ও বর্ণরাগ থাকুক না কেন, তাহার আত্ম-হীন অভ্যন্তর, বিনাশের ও বঞ্চনার একটা বিষম ও বিরক্তিকর কদর্য্য ক্লেদে পরিপূর্ণ। পক্ষান্তরে, প্রকৃতপক্ষে অভাব-প্রভাবিত সৃষ্টি যতই নিকৃষ্ট, যতই অসুন্দর, অঙ্গহীন ও শিল্প-শোভা-বিহীন হউক, তাহার অভ্যন্তরে আত্মা এবং আত্মার স্বভাব-সঞ্জাত কিছু-না-কিছু স্বাভাবিক শ্রী ও শক্তি থাকিবেই থাকিবে। সে শ্রী ও শক্তি এবং সত্তর সে আত্মা, আমরা সচরাচর হয় ত চিনিতে পারি না, কৃত্রিমের মোহে, প্রায়ই হয় ত আমরা তাহা উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করি; অনেক সময়ে আদৌ তাহা ধরিতেই পারি না, ধরিবার সহিষ্ণুতা ও ক্ষমতাই রাখি না। এবং তাহাতে করিয়া সাহিত্যের কিঞ্চিৎ অনিষ্ট ও অল্পাধিক উপযুক্তের অবসাদ ও পতনও হয়। তথাপি, যাহা শ্রী, তাহা শ্রী; এবং যাহা শক্তি, তাহা শক্তিই বটে। এইরূপ কত শ্রী ও কত শক্তি সাহিত্যের হাটে "মাঠে মারা" গিয়াছে! প্রতিদিন যাইতেছে। কিন্তু, সেই হাটেই আবার মিষ্টার কৃত্রিম, কচু কুমড়ার মত, ফি মিনিটে ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিয়া, সাহিত্যের কবিত্বের কারবারে, অতএব অন্ন বস্ত্রের সংসারে,

উত্তম ও অধম; এ উভয়ের অভ্যুদয়।

কোঠা বালাখানা উঠাইতেছেন, এবং তদুপরি উত্থিত উচ্চতর অভ্রভেদী অমর (!) স্মৃতিস্তম্ভে দিগ্বিজয়ী দীর্ঘ জয়পতাকা চড়াইয়া ও উড়াইয়া, তথা হইতে কড়াক্কড় কীর্ত্তির কামান দাগিতেছেন! এই সংসারে, সাহিত্যে, ইহা সদা-সংঘটিত, স্বতঃ-(?)-আগত ঘটনা। হয় ত ইহারও কোনও-না-কোনও আবশ্যকতা আছে। ঘটনা আমাদের আয়ত্ত ও ইচ্ছাধীন নহে। কেবল আলোচনাধীন ও নিন্দা বা প্রশংসার অধীনমাত্র। সমালোচনার নিন্দা-প্রশংসার বৈষম্য ও ব্যভিচার আর এক সঙ্কটময় ঘটনা। এ সম্বন্ধে শেষ কথা এই যে, স্বভাব-প্রভাবিত স্বাভাবিক সৃষ্টি যতই নিকৃষ্ট হউক, নিন্দনীয় নয়; পালনীয় ও শিক্ষণীয়। কিন্তু কৃত্রিম কলা-বিলাসীর বিলাস-কণ্ডুয়নে, তাহার বৈভব-কক্ষের কনক-কবাট পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া ও তাহার কোমল-কান্ত দেহের কৌশিক ওড়না, কিংখাপের কোট উপাড়িয়া অপরিমিত কশাঘাত করা আবশ্যক। পরন্তু, কবিতা-উপজীবীর চাটুকরী কাকলিতে ও কাব্য-ব্যবসায়ীর অলীক কবিত্বেও ঐ ব্যবস্থা বিধেয়। উপরন্তু, ইহাদের এককে রাজ-সভা হইতে রাজ-পথে, অপরকেও দোকান হইতে বাজারের মাঝখানে টানিয়া আনিয়া, আরও কিঞ্চিৎ দক্ষিণা-দান দরকার। কিন্তু সাহিত্য-মঞ্চের মোসাহেবী সমালোচনায় ও সাহিত্যাধিকারের ডাল-রুটীর কামনায় ও তাড়নায়, এ সবই অসম্ভব। এ অসম্ভাবনাও অনিবার্য্য। তথাপি আমাদের মনে রাখা আবশ্যক হয় যে, কাব্য কবিতা কাহারও বিলাস, বা বাণিজ্য, বা চাটুকার্য্যের জন্য সৃষ্ট হয় নাই। যাহারা উহার ঐরূপ ব্যবহার করে, তাহাদের অপরাধ একেবারেই অমার্জ্জনীয়; তা, যত বড় মস্ত লোকই সংশ্লিষ্ট থাকুন না কেন। কবিতা আত্মপ্রাণের মর্ম্ম-গাথা, এবং ক্ষমতা থাকিলে পরপ্রাণের মর্ম্মব্যথা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না, আর কিছুতেই লাগিতে পারে না। জানি, এ হিসাবে বিচার করিলে, পৃথিবীর তিন ভাগ কাব্য কক্ষচ্যুত হয়, এক ভাগ আন্দাজ স্বস্থানে অবশিষ্ট থাকে। তবুও যাহা সত্য, তাহা সত্য; মিথ্যা নহে। ফলতঃ, প্রকৃত ও পূর্ণ কবিতা দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য ও কচিন্মাত্র উৎপাদ্য। এ কারণ, কবিতা প্রকৃতি-অনুসারে যেমন পর্য্যায়ে,—স্বরূপ-অনুসারে সংজ্ঞায়, বিভক্ত ও অভিহিত হইয়াছে, তেমনই স্ব স্ব গুণ-গৌরবের মাত্রানুসারে, অগত্যাই স্বগুণ-নির্দ্দেশক সংখ্যা-বাচক শ্রেণীতে সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে, এবং হইতে বাধ্য হইয়া থাকে। পৃথিবীতে প্রথম শ্রেণীর

সমালোচনায় ব্যভিচার।

ডাল-রুটীর কামনা কবিতা নহে।

কবিতা বড়ই বিরল। আমরা ক্রমে এ কথায় আর একবার উপস্থিত হইলেও হইতে পারি।

প্রবন্ধের প্রথম ছত্রেই লিখিয়াছি, আমাদের এটী গীতি-কবিতার যুগ। এ উক্তির সমর্থনার্থ অধিক কিছু না বলিলেও চলে। কেন না, ঘটনা দেদীপ্যমান। পরন্তু প্রবন্ধের শিরোভাগে অভিনব-প্রকাশিত অগণিত গীতিকাব্যনিচয়ের মধ্যে যত-গুলির আমরা নামের তালিকা লিপিবদ্ধ করিয়াছি, এবং যাহা উপস্থিত ও উপলক্ষ্য করিয়া, গীতিকাব্য সম্বন্ধে আমরা এই আলোচনা করিতে বসিয়াছি, পরন্তু যাহা হইতে এই প্রবন্ধে প্রকটিত চিন্তা-নিচয়ের উদ্রেক হইয়া তদানুষঙ্গিক কিঞ্চিৎ অধ্যয়নে আমাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিল, তাহাই আমাদের উপরি-উক্ত উক্তির প্রচুর প্রমাণ ও সমর্থন বটে। * তদতিরিক্ত আরও ঘটনা এ সম্বন্ধে উপস্থিত করা যদি আবশ্যক হয়, তাহাও আছে। তাহা এই যে, আমাদের এই সম্মুখে গতাগত উপস্থিত সময়ে, গীতিকাব্য ভিন্ন অপরাখ্যার কাব্যের অত্যন্তাভাব। কাব্যকে সাধারণতঃ তিন বৃহৎ বিভাগে বিভক্ত হইয়া তিন আখ্যায় অভিহিত হইতে দেখা যায়। (১) আখ্যান-কাব্য; (২) দৃশ্যকাব্য; এবং (৩) গীতি-কাব্য। এই তিন ভাগের এক এক ভাগের ভিতরে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ, উপভাগ, তস্য বিভাগ আছে, এবং হইতে পারে; তাহা যাউক, ধর্ত্তব্য হইতেছে না। এখন দেখা যাইতেছে যে, (১) ইদানীং আখ্যান-কাব্যের উৎপত্তি নাই। ইহাতে লোকের তেমন আর রুচি আছে, এ কথাও কৃতনিশ্চয় হইয়া বলিতে সাহস করি না। বলিতে পার, সম্প্রতি কোন শ্রেষ্ঠ ও সারবান সাহিত্যেই বা লোকের রুচি আছে? গীতিকাব্যেই কোন্ আছে? উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যই বা ক'টী লোকে বুঝে, পড়ে, আদর করে? নেহাত নিকৃষ্ট ও নিরবচ্ছিন্ন নোংরা না হইলে ৯৯ জন পাঠকে ত তাহাও স্পর্শ করে না; বিশেষতঃ, তাহার বিনিময়ে যদি আধ পয়সা সিকি পয়সার অপব্যয় করার প্রয়োজন হয়, বা তাহা যদি সাহিত্যগত-জীবন অবিরত স্বদেশ-হিতের অমোঘ অনন্ত-ব্রত-পরায়ণ সাধুচিত সংবাদপত্র-বিক্রেতৃগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত দেশের ঔর্দ্ধদৈহিক, সাংবৎসরিক, দানসাগর, বৃষোৎসর্গ

গীতি-কবিতার পর্য্যায় ও শ্রেণী।

কাব্যের বিভাগ;— আখ্যান, দৃশ্য ও গীতি।

* রচয়িতার হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে এই তালিকা ছিল না। প্রবন্ধটির শেষ অংশও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।—সাহিত্য-সম্পাদক।

শ্রাদ্ধে, বৈতরণীপারোদ্দেশে উৎসর্গীকৃত বৃষ-বৎস-স্বরূপ বা অপর কোনও বিশুদ্ধ-চরিত্র আদর্শ ব্যবসায়ীর, ব্রতধারীর, বা স্বদেশ-সংস্কারীর "পণ্য-পরিষ্কারে"র বা পুণ্যপ্রচারের দান বা দক্ষিণা, লেজুড় বা ফাউ, উৎকোচ, "উপহার", "চার" বা সহচর-স্বরূপ অতিরিক্ত আকারে উপস্থিত না হয়! এই "অতিরিক্ত"টী কাব্য-কবিতার পরিবর্ত্তে, পাঁচ গণ্ডা কমলালেবু, বা দুইটা বাঁধা কপি, এক জোড়া তাস, কি একখানা সাবান, বা এক শিশি গন্ধ-তৈল, বা তদ্বৎ অপর দ্রব্য হইলেও চলে। তাহাই সবিশেষ আকর্ষক প্রলোভক ও পরিতৃপ্তিকর হইতে পারে। স্থলবিশেষে চাল্, দাল, মাছ, তরকারী, পাত্রভেদে স্ফূর্ত্তিকর পেয় বা কিঞ্চিৎ রঙ্গ তামাসা হইলে ত কথাই থাকে না। গ্রাহক পাঠক পঙ্গপালের মতই আমদানী নিশ্চয়ই হইতে পারে। অতএব, রুচি অরুচি ও স্পৃহা প্রবৃত্তির কথা এ ক্ষেত্রে উপস্থিত না করাই ভাল। ইহা না বলাই ভাল যে, অরুচি হেতু আখ্যান-কাব্য মহাকাব্য জন্মিতেছে না; আর রুচি ও তৎপ্রতি আগ্রহাতিশয় হেতু গীতি-কাব্য গাড়ী গাড়ী আমদানী হইতেছে। পাঠক-সাধারণের শক্তি ও প্রবৃত্তি ও শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতা প্রায় সব দিকেই সমান; পাঠ্য-পদার্থের পাঠক অণুবীক্ষণেও নজর হয় না। তবে অপাঠ্যের পাঠক-সংখ্যা, উপঢৌকনের ঢক্কা-নাদ ও উৎকোচের আড়ম্বরানুসারে, উচ্চ হইতে পারে। এক দিকে এই; অপর দিকে, সাহিত্য-ক্ষেত্রের যাঁহারা সমাজদার, চাপরাশধারী ঘটক ও সমালোচক, তাঁদের নিকটেও কবিকুলের ও লেখক-মহলের চমৎকার সান্ত্বনা, পরিপাটী উত্তেজনা ও ন্যায্য প্রাপ্যের পাওনা হইয়া থাকে। নিন্দা প্রশংসার কথা তত বলি না। সেটা বা সে দুইটা সময়ে সময়ে, স্বার্থাদির সংঘর্ষে, বা সংমিলনে, বা তাগিদ-তদ্বির তোষামোদাদির পরিমাণে, অল্পাধিক অন্ততঃ কতক স্থলে হইয়াই থাকে। কিন্তু তাহাই কি সব? কেবল তাহাই কি কবির বা যে কোনও গ্রন্থকারের—পুরস্কার প্রতিদান নহে—শ্রমোচিত সান্ত্বনা? ওদাসীন্য উপেক্ষা অপেক্ষা উহা অবশ্য অনেক ভাল;—নিপাট নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা অপেক্ষা নির্জ্জলা নিন্দাও শতগুণে শ্রেয়ঃ। কিন্তু কেবল অগুণগ্রাহী, অর্থশূন্য, অসার নিন্দা-সুখ্যাতি লিপিকরের যথার্থ তৃপ্তিদায়ক, একমাত্র আকাঙ্ক্ষণীয় ও প্রাপ্য? যেরূপে রসোদ্ঘাটন ও রসাস্বাদন করিলে, যেরূপে বুঝিয়া, বুঝাইয়া ও বোধ্য করিয়া অনুকূলে বা প্রতিকূলে দাঁড়াইলে, গ্রন্থকার বা কবি উপবাসী ও অপুরস্কৃত থাকিয়াও তৃপ্ত, চরিতার্থ হন, কৃতজ্ঞ-অন্তরে পৃথিবীর কল্যাণ-কামনা করেন, সে উৎসাহ উত্তেজনা কোথায়? সে বিরাগ বিড়ম্বনাই বা কই? বাঙ্গালা সাহিত্যে বহু পত্র, বহু যন্ত্র, বহু লেখক, বহু

সমালোচক হইয়াছেন, নিত্য নূতন নূতন হইতেছেন, কিন্তু সবই ত দেখি—সেই একই জনাকীর্ণ-পথে দণ্ডায়মান, একই সংকীর্ণ স্রোতে ভাসমান। কই, ঐ পথটাতে কেহ ত কখনও রীতিমত দাঁড়াইলেন না, দাঁড়াইবার শক্তি রাখেন—ইহাও ত একটী দিনের জন্য কেহ দেখাইলেন না। অথচ কথাটার অকার্য্যকরী তোলাপাড়া ও মৌখিক আপত্তি অভিযোগ করাটুকুও আছে। প্রতিযোগী পত্রে পত্রে পরস্পরের প্রবন্ধ লইয়া নিন্দা সুখ্যাতি কলহ কচকচি কবির লড়াই চলে, কিন্তু বাহিরের একখানা জোর দুই শত পৃষ্ঠা পরিমিত বই পড়ার পর তন্নিহিত বিষয়-বিবৃতির চিন্তা ও উক্তির উপযুক্ত পরীক্ষা ও পরিপাক করিয়া একটা আলোচনা প্রকাশিত করার সময় বা শক্তি প্রায় ত কাহারই হয় না! যাহাতে লঘুশ্রম বা শ্রমমাত্র নাই; আর যুক্তি চিন্তা বিবেচনার নামমাত্র নাই, সে কাজটাই আমরা বেশ করিতে পারি। কিন্তু যাহাতে কিঞ্চিৎ গুরুশ্রম, বিষয়োপযোগী অনুসন্ধান, অধ্যয়ন ও যুক্তিতর্কশৃঙ্খলার প্রয়োজন হয়, তাহা আমরা তৎক্ষণাৎ "দপ্তরজাত" করি। তবে যদি কেবল গালাগালি ও কুৎসায় কাজ সারা যায়, বা বার কতক "ভাল ভাল" বা "আহা মরি" বলিয়া ত্রাণ পাওয়া যায়, সেটা আমাদের আয়ত্ত আছে। কিন্তু কেন "ভাল", বা কেন মন্দ, তাহা বুঝাইতে হইলে প্রায়ই আমাদের চক্ষুঃস্থির! এরূপ অবস্থায় রুচি অরুচির, অনুরাগ বিরাগের, বা উৎসাহ অনুৎসাহের নিমিত্ত, বা ইহাদের কোনও অনুকূল প্রতিকূল কারণের উপর নির্ভর করিয়া, সাহিত্যের অঙ্গবিশেষের স্ফূর্ত্তি ও অঙ্গবিশেষের অবসাদ হইতেছে, এ কথা কিছুতেই বলা যায় না। উপস্থিত অবস্থায় যখন অসংখ্য গীতি-কবিতা উৎপন্ন হইতে পারিতেছে, তখন হইবার হইলে, হইবার অবসর বা অঙ্কুর থাকিলে, অন্ততঃ অল্প পরিমাণেও, অবশ্য হইত। লোকের রুচি-প্রবৃত্তির প্রভাব তাহাকে কখনও আটকাইয়া রাখিত না।

এ সব কথার কতক ঠিক; সব ঠিক নহে। স্বপক্ষ-সমর্থনার্থ অতিরঞ্জন ও নিরতিশয় কঠিন কথনও আছে। তবে উহা এক দিকের একটা অভিমতস্বরূপ ধরা যাইতে পারে, এবং মোটের উপর সাহিত্যসেবী ভ্রাতৃবৃন্দের সকলেরই কিছু-না-কিছু বিবেচনাধীন হইবার যোগ্যতা ধরে—বলিয়া বোধ হয়। আখ্যান-কাব্য উৎপন্নের উপর লোকের রুচি প্রভৃতির প্রভাব, যে পরিমাণেই হউক, প্রভূত কার্য্য করিয়াছে, এবং করিতেছে, তাহাতে, উপরি-উক্ত উক্তি সত্ত্বেও, সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালার মুসলমানগণের মাতৃভাষা।

মাতার মুখনিঃসৃত ভাষাই মাতৃভাষা। যে ভাষায় আমরা জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা কহি, পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী সকলের সঙ্গে অক্লেশে ভাবের আদান প্রদান করি, তাহাই আমাদের মাতৃভাষা। মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই সর্ব্বপ্রথম মায়ের মুখে যে ভাষা শুনিতে পায়,—মাতৃস্তন্যপানের সঙ্গে সঙ্গে যে ভাষা আয়ত্ত করে, তাহাই তাহার মাতৃভাষা। নবজাত-শিশু প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত পালিত হইতে হইতে পিতা মাতা প্রভৃতি পরিজনের সংস্রবে আপনা-আপনি যে ভাষা শিক্ষা করে, তাহাই তাহার মাতৃভাষা,—তাহাই তাহার স্বভাবপ্রদত্ত ভাষা। এক দিকে মাতার স্তন হইতে রসাকর্ষণ করিয়া শিশুর দেহ পুষ্টিলাভ করে, অন্য দিকে মাতৃভাষা হইতে রসাকর্ষণ ও উন্মুক্ত প্রকৃতি হইতে ভাব-নিচয় গ্রহণ করিয়া তাহার মানসিক বৃত্তিসমূহ উন্মেষিত হইতে থাকে। মাতৃদুগ্ধ যেমন শিশুর স্বাভাবিক খাদ্য, মাতৃভাষাও তেমনই তাহার প্রকৃতি-দত্ত ভাষা।

বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালা ভাষাই বাঙ্গালীর মাতৃভাষা। বঙ্গদেশবাসী হিন্দুর ন্যায় বঙ্গদেশবাসী মুসলমানদিগকেও বাঙ্গালী ভিন্ন আর কিছু বলা যাইতে পারে না। হিন্দুগণের মত পুরুষানুক্রমে বাঙ্গালী মুসলমানেরাও বাঙ্গালা ভাষাই ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। এই ভাষাই তাঁহাদের সমাজের স্তরে স্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই ভাষাতেই তাঁহারা চিন্তা করেন, এই ভাষাতেই তাঁহারা সাংসারিক যাবতীয় কর্ম্ম নিষ্পন্ন করেন, এবং এই ভাষাতেই জাগতিক ভাবসমূহ তাঁহাদের হৃদয়ে সংহৃত হইয়া ভাবপ্রবাহ ও অনুভূতির সৃষ্টি করে। এই ভাষাই পুরুষপরম্পরাক্রমে তাঁহাদের অস্থিমজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। এই ভাষাই 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া', তাঁহাদের 'প্রাণ আকুল করিয়া' তুলিতে পারে। বাঙ্গালী হিন্দু শিশুর মত বাঙ্গালী মোস্লেম শিশুও মাতৃস্তন্যপানের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির মুখ হইতে এই ভাষাই শিক্ষা করিয়া থাকে, এবং একটু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ মনে করিয়া সর্ব্বপ্রথম এই ভাষারই আশ্রয় গ্রহণ করে। সূতিকা গৃহে সর্ব্বপ্রথম যে ভাষায় হাতে-খড়ি হয়, শিক্ষাগৃহে প্রবেশ করিয়া যে ভাষার আশ্রয় ও সাহচর্য্যের গ্রহণ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে, এবং সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে—জীবনের সর্ব্ববিধ প্রয়োজন যে ভাষায় নিত্য প্রয়োজন হয়, বঙ্গদেশে হিন্দুসমাজ হউক, আর মুসলমান সমাজ হউক, সর্ব্বত্র সে ভাষা এই বাঙ্গালা ভাষা। বঙ্গের

পল্লীতে পল্লীতে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, গৃহে গৃহে যদি কোনও ভাষার সনাতন প্রচার ও অবাধগতি থাকে, জন্ম হইতে মৃত্যু, পর্য্যন্ত যদি কোনও ভাষার প্রয়োজন বাঙ্গালীর থাকে, সে ভাষা এই বাঙ্গালা ভাষা। বাঙ্গালীর– তা হিন্দুর হউক, আর মুসলমানের হউক,—বাঙ্গালীর শুদ্ধান্তঃপুরে, বাঙ্গালীর বৈঠকে, বাঙ্গালী মজলিসে, বাঙ্গালীর মেলায় যদি কোনও ভাষার অপ্রতিহত গতি থাকে, তবে তাহা এই বাঙ্গালা ভাষা। অতএব আমরা বলিতে বাধ্য যে, এই স্বাভাবিক সহজলভ্য ভাষাই —সমাজের অস্থিমজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট এই দেশ-প্রচলিত ভাষাই বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা। এতদ্ভিন্ন অন্য কোনও ভাষাকে ন্যায়তঃ তাঁহাদের মাতৃভাষা বলা যাইতে পারে না।

যে জাতির মাতৃভাষা হইতে জাতীয় ভাষা স্বতন্ত্র, কর্ণধার-বিহীন তরণীর সহিত সে জাতির তুলনা করা যাইতে পারে। উক্তরূপ তরণী যেমন বায়ুচালিত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমানা হয়, কোনও নির্দ্দিষ্ট গন্তব্যপথে চলিতে পারে না, উক্তরূপ জাতিও কোনও নির্দ্দিষ্ট পথের অনুসরণে অক্ষম হইয়া যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিতে থাকে। তাহার জাতীয় ভাষার সাহিত্যে উচ্চ আদর্শ থাকিলেও, পরস্পর বিভিন্নতা হেতু মাতৃভাষার ভিতর দিয়া তাহার দেহাভ্যন্তরে প্রবেশলাভ করিতে না পারায়, তাহাতে প্রতিক্রিয়ার উৎপাদন করিতে পারে না। সুতরাং সে ভাষা ও সাহিত্যে জীবনীশক্তি থাকে না, এবং তাদৃশী জাতীয় ভাষা হইতে সে জাতি কোনও উপকার-লাভে সমর্থ হয় না। ইহাতে তাহার জাতীয় জীবন আদর্শহীন হইয়া পড়ে, এবং কক্ষচ্যুত জ্যোতিষ্কের মত ক্ষিপ্রগতিতে অধোগমনে বাধ্য হয়। জাতিই বলুন, আর সমাজই বলুন, তাহাকে জাতীয় ভাষার সাহিত্য হইতে জীবনীশক্তি ও উপযুক্ত আদর্শ খুঁজিয়া লইতেই হইবে,—জাতীয় ভাষার সাহিত্য হইতে রসাকর্ষণ করিতেই হইবে, নচেৎ তাহার উন্নতি অসম্ভব। কেবল দুই চারি জন শিক্ষিত ব্যক্তি লইয়া কিছু জাতি বা সমাজ হয় না,—আপামরসাধারণ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলকে লইয়াই জাতি বা সমাজ গঠিত হয়। জাতীয় বা সমাজ দেহের অণুতে পরমাণুতে পর্য্যন্ত প্রবাহ সৃষ্টি করিবার একমাত্র উপায় মাতৃভাষা। জাতীয় বা সমাজ-শরীরের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সবল ও চেতনাময় করিয়া তুলিবার পক্ষে মাতৃভাষাই এক-মাত্র মহৌষধ—একমাত্র অমোঘ অস্ত্র। যে জাতির জাতীয়ভাষা ও মাতৃভাষা এক নহে, সে জাতির উভয় ভাষাই পঙ্গু,—উভয় ভাষাই শক্তিহীনা হইয়া থাকে। জাতীয়ভাষা মাতৃভাষার খাতে প্রবাহিত হইয়াই সঞ্জীবনী শক্তি লাভ করিয়া থাকে। এ জন্য আমরা দেখিতে পাই, যে জাতির ভাষা ও সাহিত্য যত শক্তিশালী ও উন্নত,

সে জাতি সংসার-রঙ্গক্ষেত্রে তত উন্নত ও পরাক্রমশালী। পৃথিবীর উন্নত জাতি-সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমাদের এই কথার যাথার্থ্যে সন্দেহ থাকিবে না।

গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, বাঙ্গালার আধুনিক মুসলমানগণের সম্মুখে কোনও উচ্চ জাতীয় আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত নাই। দুই নৌকায় পা দিলে মানুষের যে অবস্থা হয়, বাঙ্গালার মুসলমানদের অবস্থাও প্রায় তাহাই। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যকে তাঁহারা অদ্যাপি জাতীয় ও মাতৃভাষা এবং জাতীয়-সাহিত্য-রূপে সার্ব্বজনীন ভাবে গ্রহণ করেন নাই। যে ভাষার সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ কিছুতেই ছিন্ন হইবার নহে, সে ভাষাকে জাতীয়-ভাষা-রূপে গ্রহণ না করিয়া তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আরব্য, পারস্য, উর্দ্দু প্রভৃতি ভাষার একতমকে জাতীয়-ভাষা-রূপে গ্রহণ করিতে চাহেন, এবং তাহাই সমাজের ও জাতির পক্ষে শুভকর বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা এ কথা ভুলিয়া যান যে, মুখে বা কাগজে-কলমে তাঁহারা যাহাই বলুন না কেন, দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা ও আবহাওয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সম্পূর্ণ প্রতিকূল। দুই চারি জন শিক্ষিত লোক সভা সমিতিতে মন্তব্য বিধিবদ্ধ করিয়া উর্দ্দু প্রভৃতি ভাষাকে জাতীয় ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন সত্য, কিন্তু বাঙ্গালার বিশাল সমাজ-দেহের শিরায় শিরায় মর্ম্মে মর্ম্মে বঙ্গভাষার মত ঐ ভাষা প্রবেশ করান তাঁহাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। স্বাভাবিক সহজপ্রাপ্য দেশীয় নদীকে উপেক্ষা করিয়া বিদেশীয় খাল হইতে পানীয় জল সংগ্রহ করিবার চেষ্টার ন্যায়, বঙ্গীয় মুসলমান-সমাজে উর্দ্দু প্রভৃতির প্রচলনচেষ্টাও একান্ত উপহাস্য। মুখের জোরে যিনি যাহাই বলুন না কেন, প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা ভাষাই বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা। সেই ভাষাকে পরিহার করিয়া আরব্য পারস্যের মত মৃত ভাষাকে বা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের উর্দ্দু ভাষাকে জাতীয়ভাষারূপে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব ও চেষ্টা শুধু যে সম্পূর্ণ অসঙ্গত, এমন নহে ; উহা সমাজের পক্ষে—দেশের পক্ষে বিষম অনিষ্টকরও বটে। এরূপ চেষ্টা ত কখনও ফলবতী হইবেই না ; ফলে এই হইবে যে, উর্দ্দু প্রভৃতির প্রচলনের নিষ্ফল চেষ্টায় এমন কতকটা শক্তির অকারণ অপচয় ঘটিবে, যে শক্তি সুপথে পরিচালিত হইলে সমাজের ও দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইতে পারিত। এরূপ বিফল প্রয়াসে না উর্দ্দু প্রভৃতি ভাষা, না মাতৃভাষা—কোনটাই তাঁহাদের মধ্যে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে। ইহাতে সমাজ দেশের সাহিত্য হইতে উপযুক্ত রস ও জীবনীশক্তি না পাইয়া ক্রমে নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হইতে থাকিবে। বর্ত্তমান বঙ্গীয় মুসলমান-সমাজ যে ঠিক এই

দুর্দ্দশায় উপস্থিত হইয়াছে, একটু গভীর অভিনিবেশসহকারে চিন্তা করিয়া দেখিলে তাহা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই বুঝিতে পারিবেন।

আরব্য পারস্য ভাষা এক সময়ে—কোনও এক সুদূর অতীতে—কল্পনাতীত কালে বঙ্গীয় মুসলমানের আদিপুরুষগণের মাতৃভাষা বা জাতীয় ভাষা হয় ত ছিল। তাই বলিয়া আজও ঐ সকল মৃত ভাষাকে মাতৃভাষা বা জাতীয়-ভাষা-রূপে গ্রহণ করিতে হইবে, এরূপ সিদ্ধান্তের সমর্থন করা যায় না। একদা দেশে ও রাজদরবারে পারস্য ভাষার খুব প্রাদুর্ভাব ছিল সত্য, কিন্তু তাহা কখনও সার্ব্বজনীন মাতৃভাষা বা জাতীয় ভাষা ছিল না। কালের অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত ভাষাসমূহ মোসলেম সমাজ হইতে এতই দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাদিগকে এখন একবারে বিজাতীয় ও বিদেশীয় ভাষা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইংরেজী প্রভৃতি বিদেশীয় ভাষা শিখিতে আমাদিগকে যে কষ্ট ও আয়াস স্বীকার করিতে হয়, আরব্য পারস্য ভাষা শিখিতেও আমাদের তদপেক্ষা অল্প ক্লেশ ও পরিশ্রম হয় না। আমরা দেখিতে পাই, মুসলমানেরা যখন যেখান হইতেই যে ভাষা সঙ্গে লইয়া ভারতে আগমন করুন না কেন, ভারতের যে অংশে যাঁহারা পদার্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা সেই অংশের প্রচলিত ভাষাকেই—দুই দিন আগে হউক, আর পরেই হউক,—আপনাদের ভাষা করিয়া লইয়াছেন। বঙ্গদেশে মুসলমানগণের বঙ্গভাষা-ব্যবহার আমাদের সেই কথারই সমর্থন করিতেছে। আমাদের এই কথা হইতে কেহ এরূপ মনে করিবেন না যে, আমরা আরব্য পারস্য প্রভৃতি ভাষা শিক্ষার বিরোধী। বস্তুতঃ, আরব্য পারস্য কেন, জ্ঞানের জন্য জগতের কোনও ভাষা-শিক্ষারই আমরা বিরোধী নহি। আরব্য ভাষা যে ধর্ম্ম-ভাষারূপে মুসলমানগণের শিক্ষা করা একান্ত আবশ্যক, আমরা তাহা অস্বীকার করিব না। আমাদের শুধু আপত্তি এই যে, ঐ সকল ভাষা কিছুতেই বাঙ্গালার মুসলমানগণের জাতীয়-ভাষা-রূপে গৃহীত হইতে পারে না, এবং তাহা করিবার পক্ষে বিফল চেষ্টা করাও কাহারও উচিত নহে। ঐ সকল ভাষাকে জাতীয়-ভাষা-রূপে গ্রহণ করিতে যাওয়া, আর আপন সমাজের কর্ণচ্ছেদ করা, একই কথা বলিয়া মনে হয়। অনেক হিন্দুও এইরূপ ভ্রান্তিবশতঃ সংস্কৃত ভাষাকে তাঁহাদের জাতীয় ভাষা বলিয়া থাকেন। সংস্কৃত, আরব্য ও পারস্য ভাষা যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলমানের দেবভাষা বা ধর্ম্মভাষা হইতে পারে, কিন্তু জাতীয় ভাষা কোনও মতেই হইতে পারে না। ইউরোপে সমস্ত খৃষ্টান জাতি গ্রীক ও লাটিনকে যেরূপ 'ক্ল্যাসিকাল' ভাষা মনে করেন, অস্মদ্দেশে সংস্কৃত, আরব্য ও পারস্য ভাষাও তদবস্থাপন্ন।

দেশপ্রচলিত আপামরসাধারণের বোধ্য ও নিত্য-ব্যবহৃত জীবন্ত ভাষাই সকল জাতির জাতীয় ভাষা হওয়া উচিত। তাহা হইলেই সেই জাতি সেই ভাষার সাহায্যে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে। বলা বাহুল্য, বঙ্গদেশে বাঙ্গালা ভাষাই একমাত্র তদ্রূপ ভাষা। তদ্ভিন্ন আর কোনও ভাষাই বাঙ্গালীর জাতীয় ভাষা হইতে পারে না।

উর্দ্দু ভাষা যতই সুন্দর, শ্রেষ্ঠ ও প্রয়োজনীয় হউক না কেন, বঙ্গদেশে মুসলমান-সমাজে তাহা কখনই বাঙ্গালা ভাষার স্থান অধিকার করিতে পারিবে না। আমাদের মধ্যে অনেকে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া মাতৃভাষাকে অবহেলা বা অবজ্ঞা করিয়া অনেক সময় কথোপকথনে উর্দ্দু ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এরূপ কার্য্যের ফল কিরূপ বিষময় হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাঁহারা কেহ একবারও তাহা চিন্তা করিয়া দেখেন না। যদি জানিতাম যে, বাঙ্গালার হাটে ঘাটে, বাঙ্গালার মেলায় মজলিসে, বাঙ্গালার প্রত্যেক গৃহস্থের অন্তঃপুরে, বাঙ্গালার প্রত্যেক বিষয়-ব্যাপারে আপামরসাধারণ সমস্ত বাঙ্গালী-মুসলমানের মধ্যে শুধু উর্দ্দুই প্রচলিত রহিয়াছে; তাহা হইলে, আমাদের কোনও বক্তব্যই ছিল না। যে দেশের পনর আনা লোক কথায় লেখায় বাঙ্গালা ভাষার ব্যবহার করে, তাহাতে এরূপ স্বৈরাচার করিবার পূর্ব্বে স্বজাতির হিতকামিমাত্রেরই তাহার ফলাফল একটু চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। ফলে মুসলমান শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বঙ্গভাষাকে আপনাদের জাতীয় ভাষা বলিয়া স্বীকার করিয়া না লওয়ায় এক দিকে সমাজ তাঁহাদিগকে হারাইতে বাধ্য হইতেছে, এবং অন্য দিকে তাঁহাদিগকেও সমাজ হইতে দূরে সরিয়া যাইতে হইতেছে। কোথায় তাঁহারা উচ্চ শিক্ষা-দীক্ষার অধিকারী হইয়া তাঁহাদের জ্ঞানালোক দ্বারা অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন সমাজকে আলোকিত করিবেন, না তৎপরিবর্ত্তে তাঁহারা সমাজের গণ্ডীর বহির্ভূত হইয়া পড়িতেছেন! মানুষ কিছু শুধু নিজের জন্য জীবনধারণ করে না। বিধাতার আশীর্ব্বাদে নানা গুণের অধিকারী হইয়াও যদি দেশের ও সমাজের উপকারেই না আসিলাম, তবে আমার এত গুণজ্ঞানের সার্থকতা বা প্রয়োজনই বা কি? জগৎপিতা দুর্ল্লভ মানব-জীবনে ও পশুজীবনে বিপুল পার্থক্যের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিরা এ কথা ভুলিয়া যান যে, সমাজ তাঁহাদিগকেই আলোক-বর্ত্তিকা করিয়া—তাঁহাদিগকেই ধ্রুবতারা জ্ঞান করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার জন্য সমুৎসুক। তাঁহারা যদি আপনারাই অন্ধকার কক্ষে লুক্কায়িত হইয়া শুধু নিজকে লইয়াই ব্যস্ত থাকেন, তবে তাঁহাদের দুর্গত দেশে—তাঁহাদের দুরবস্থ সমাজে আর

আলোক-বিকিরণ করিবে কে? বাঙ্গালার মুসলমান সমাজে সৈয়দ আহম্মদ কই, বিপিনচন্দ্র কই, সুরেন্দ্রনাথ কই? ওই শুনুন, প্রতিধ্বনি অদূরবর্ত্তী গগনাঙ্কে ব্যাহত হইয়া উত্তরে বলিতেছে—কই, কই, কই!

বলিতেছিলাম, উর্দ্দু ভাষাকে বাঙ্গালী মুসলমানের জাতীয়ভাষারূপে প্রচলিত করিবার চেষ্টা ত কদাপি ফলবতী হইবেই না,—অধিকন্তু তাহাতে এই অনিষ্ট হইবে যে, উর্দ্দু বা বাঙ্গালা ভাষা কোনটাই তাঁহাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে না পারিয়া, উভয় ভাষাই অকর্ম্মণ্য হইবে। মাতৃভাষা ও জাতীয়-সাহিত্যের উন্নতি ভিন্ন কোনও জাতি কখনও বড় হইতে পারে না। কেন না, জাতীয় সাহিত্যই জাতীয় জীবনের প্রাণ। জাতীয় সাহিত্যেই জাতীয়-জীবন-তরীর দিঙ্‌নির্ণয় করিয়া থাকে, এবং জাতীয় সাহিত্য হইতে রসাকর্ষণ করিয়াই সমাজ-দেহ পুষ্টিলাভ করে। আজ হিন্দুসমাজে এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তনের হেতু কি? তাঁহাদের মধ্যে এই নবজীবনের সূত্রপাত কি বাঙ্গালা সাহিত্য হইতেই হয় নাই? হিন্দুসমাজের মর্ম্মে মর্ম্মে এই যে নবজাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, তাহার মূল কি বঙ্গ-সাহিত্য নহে? একই জলবায়ুর প্রভাবে একই দেশে বাস করিয়া বাঙ্গালার দুইটি সহোদর জাতি পরস্পর বিভিন্ন-মুখ হইতেছে কেন, আমাদের মধ্যে সে কথা কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, বঙ্গসাহিত্যই হিন্দুসমাজের এই পরিবর্ত্তন-সূচনার মুখ্য কারণ, এবং বঙ্গসাহিত্যের প্রতি অবহেলাই মুসলমান সমাজের এই নির্জ্জীবতার প্রধান হেতু।

হিন্দুসমাজে বঙ্গসাহিত্য এখন যেরূপ অতর্ক্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহাতে সমাজদেহে এরূপ তীব্র বিক্ষেপ ও নূতন প্রতিক্রিয়া হওয়াই একান্ত স্বাভাবিক। বঙ্গসাহিত্যের প্রসার ও প্রভাব-বৃদ্ধি ব্যতীত হিন্দুসমাজে এত শীঘ্র এমন ভাবে জাতীয় ভাব স্ফুরিত হইতে পারিত না। বঙ্গসাহিত্যই তৎসমাজের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে এমন ভাবে চেতনাময় করিয়া তুলিয়াছে। একমাত্র জাতীয় সাহিত্যের অভাবেই বঙ্গীয় মুসলমান-সমাজ আজও 'যে তিমিরে সে তিমিরে' রহিয়া গিয়াছে, এবং আরও বহুদিন এ ভাবে থাকিবে, তাহাতে আর সন্দেহ হইতে পারে না। যেখানে হিন্দুসমাজে শত শত মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা চলিতে পারে, সেখানে মুসলমানসমাজে একখানিমাত্র সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না,—এ কথা চিন্তা করিয়া দেখিলে মুসলমান-সমাজ যে আজও উন্নতি-পথের কত দূরে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান

করা যায়। এই সকল কি আমাদের সামাজিক ও দেশহিতৈষিগণের গভীর চিন্তা ও অবধানের বিষয় নহে?

আমরা দেখিতে পাই, ইদানীং বহু মুসলমান বালকই বিদ্যাভ্যাস করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ে যোগদান করে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কয় জন সফল-মনোরথ হইয়া বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া আসে, কেহ তাহার সংবাদ লইয়াছেন কি? ইহার জন্য শুধু শিক্ষার্থীদিগের অমনোযোগিতা বা মস্তিষ্কহীনতায় দোষারোপ করিলে সত্যের অপলাপ ঘটিবে। মুসলমান বালকেরা প্রায়ই মাতৃভাষায় (বাঙ্গালার) কোনও জ্ঞানলাভ না করিয়াই, বা অতিসামান্য জ্ঞানলাভ করিয়াই ইংরেজী পড়িতে যায়। সেখানে গিয়া তাহারা যাহা দেখে, তাহাতে তাহাদের অনেকেরই মাথা ঘুরিয়া যায়। তথায় তাহাদিগকে দুইটি সম্পূর্ণ বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতে হয়;—কিন্তু সেই ভাষা-শিক্ষায় তাহাদের মাতৃভাষা তাহাদের কোনও সহায়তা করিতে সমর্থ হয় না। মাতৃভাষায় জ্ঞানাভাব বা সামান্য জ্ঞান তাহাদের প্রধান পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ায়। এক দিকে নিজের অজ্ঞতা, এবং অন্য দিকে আরব্য-পারস্য ভাষার অধ্যাপনার ভার যাঁহাদের উপর অর্পিত থাকে, মাতৃভাষায় তাঁহাদের অজ্ঞানতা হেতু তাঁহারা তদ্ভাষার সাহায্যে সুচারুরূপে অধ্যাপনা করিতে পারেন না। ফলে বালকগণ তোতাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়, এবং ইংরেজী বা আরব্য, বা পারস্য, কোনও ভাষাতেই লব্ধপ্রবেশ হইতে না পারিয়া, তাহাদের মধ্যে বার আনা ছাত্রেরই উদ্যম ভগ্ন হইয়া যায়। অবশ্য ভগ্নোৎসাহ হইবার আরও অনেক কারণ আছে, তাহা অস্বীকার করিবার কথা নয়। এরূপ বিসদৃশ ব্যবহার ফলে অধিকাংশ ছাত্রকেই অকালে ছাত্রজীবনে ইতি দিতে আমরা দেখিয়াছি। এ স্থলে একবার হিন্দু শিক্ষার্থীর কথা বিবেচনা করিয়া দেখুন। তাহাদিগকেও দুইটি ভিন্ন ভাষা শিক্ষা করিতে হয় সত্য, কিন্তু উভয় ভাষার শিক্ষাতেই তাহারা মাতৃভাষার সহায়তা পায়। হিন্দু শিক্ষার্থীদিগের অনেকেও বাঙ্গালা স্কুলে পড়িয়া যায় না বটে, কিন্তু ইংরেজী স্কুলে গিয়া তাহারা মাতৃভাষা শিখিবার সুযোগ ও অবসর প্রাপ্ত হয়। বিশেষতঃ, সংস্কৃত ও আরব্য ও পারস্য ভাষার মধ্যে বিপুল পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। সংস্কৃত ভাষা না শিখিয়াও সংস্কৃতের অধিকাংশ শব্দ আমরা বুঝিতে পারি, কিন্তু আরব্য ও পারস্যের বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারি না। মুসলমান- সমাজের পক্ষে ইহা এক বিষম সমস্যা, সন্দেহ নাই। কি ভাবে এই জটিল সমস্যার সমাধান হইতে পারে, সমাজহিতৈষিগণেরই তাহা বিবেচ্য।

মুসলমান-সমাজ বহুদিন হইতে বহুল মাদ্রাসা পোষণ করিয়া আসিতেছেন, এবং তাহা হইতে সমাজে বৎসর বৎসর মৌলবী-অভিধেয় বহুসংখ্যক কৃতবিদ্যের আমদানী হইতেছে। বলা বাহুল্য, এই সকল মৌলবী আরব্য-পারস্য-উর্দ্দু-বিদ্যায় পারদর্শী বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকেন। উক্ত ভাষাত্রয়ের একতমকে যাহারা বাঙ্গালী মুসলমানের জাতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করিতে চাহেন, তাঁহারা কি অনুগ্রহপূর্ব্বক বলিবেন, এই শ্রেণীর 'জাতীয়ভাষা', শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ে সমাজ কি পরিমাণ উপকার প্রাপ্ত হইতেছে? এতগুলি লোক 'জাতীয়-ভাষা'য় শিক্ষিত হইলেও, মুসলমান-সমাজে শিক্ষিতের সংখ্যা অল্প বলিয়া ধরা হয় কেন? ঐ সকল ভাষার মধ্যে যদি কোনটাই বঙ্গীয় মুসসমানদের জাতীয় ভাষা হইবার উপযোগী হইত, তাহা হইলে আজ এতগুলি মৌলবী বক্ষে ধারণ করিয়াও বঙ্গীয়-মুসলমান-সমাজের এ দুরবস্থা কেন? আরব্য-পারস্যাদি ভাষার সাহায্যে মৃতপ্রায় সমাজকে সজীব করিয়া তোলা সম্ভব হইলে, বাঙ্গালী-মুসলমানদের অবস্থা এখন নিশ্চয়ই অন্য রূপ ধারণ করিত। ফলতঃ, আরব্যাদি ভাষা বঙ্গীয় মুসলমানদের জাতীয় ভাষা কিছুতেই হইতে পারে না, তাহা মৌলবী সাহেবগণই আমাদিগকে 'চোখে আঙ্গুল' দিয়া দেখাইয়া দিতেছেন। ইহার পরও কি আমরা বলিব, দেশ-প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষা আমাদের জাতীয় ভাষা হইতে পারে না?

আমাদের দেশের লোক সংখ্যার ভূয়িষ্টাংশ মুসলমান, এবং অল্পাংশ হিন্দু। অথচ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য যে আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও সজীব ভাষাসমূহের মধ্যে একতম স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে, একমাত্র হিন্দুগণই তাহার মূল। বঙ্গসাহিত্যের আশানুরূপ পুষ্টি ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য হিন্দু মুসলমান উভয়েরই সমবেত যত্ন ও উদ্যম আবশ্যক। কিন্তু এ পর্য্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে অতি পরিমিতসংখ্যক লোকই মাতৃভাষার সেবায় ও অনুশীলনে অবহিত হইয়াছেন। দেহের অর্দ্ধাংশ পক্ষাঘাত গ্রস্ত হইলে, অপরাংশ দ্বারা কোনও কাজ সুনির্ব্বাহিত হইতে পারে না। বঙ্গভাষার ক্ষেত্রেও কি তাহাই ঘটিতেছে না? বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য হইতে একটা অতিমাত্র 'হিন্দু-হিন্দু গন্ধ' অনুভূত হয় বলিয়া আমরা —মুসলমানেরা অনুযোগ করিয়া থাকি। এ অনুযোগ যে কতকটা সত্য, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বঙ্গভাষার এরূপ হিন্দুভাবাপন্নতা বাঞ্ছনীয় না হইতে পারে, কিন্তু তাহা কিছুতেই অস্বাভাবিক হয় নাই। এ পর্য্যন্ত হিন্দুগণই অক্লান্ত পরিশ্রমে ও সাধনায় শীর্ণ-শিশু-সাহিত্যকে প্রাদেশিকতার রৌদ্র-বায়ুহীন সঙ্কীর্ণ গুহা হইতে উদ্ধার করিয়া, উহাকে উন্মুক্ত বায়ু-কিরণময়

জগতের বক্ষে স্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহাদেরই প্রতিভাবলে উহা আজ জগতের সাহিত্য-পরিবারের সঙ্গে বাণিজ্য-স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে। সুতরাং সে জন্য হিন্দুগণকে কিছুতেই দোষ দেওয়া যায় না,—তজ্জন্য মুসলমানদের নিশ্চেষ্ট তাই সম্পূর্ণ দায়ী।

অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, অদ্যাপি মুসলমানগণ সাহিত্যানুশীলনের প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারায়, তাঁহাদের মাতৃভাষার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন রহিয়াছেন। কেবল তাহাই নয়, এখনও অনেকে বঙ্গভাষাকে নিজের বলিয়া স্বীকার করিতে দ্বিধাবোধ করেন। হিন্দুদের মধ্যে বঙ্গভাষার বিপুল প্রসারের ফলে তাঁহাদের ধর্ম্মভাষা সংস্কৃতের প্রায় সমস্ত গ্রন্থরত্নই বাঙ্গালায় অনূদিত হইয়াছে। তাহার ফলে মাতৃ-ভাষার সাহায্যে তাঁহারা তাঁহাদের অক্ষয়কীর্ত্তি পূর্ব্ব-পুরুষগণের প্রাণপ্রবাহ অনুভব করিতে পারিতেছেন। বঙ্গীয় মুসলমানগণও যদি এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া আরব্য পারস্য হইতে তাঁহাদের মহনীয়কীর্ত্তি পূর্ব্ব-পুরুষগণের গ্রন্থনিচয় বাঙ্গালায় রূপান্তরিত করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে বঙ্গভাষা তাঁহাদেরও জাতীয় ভাষা হইয়া দাঁড়াইত, এবং তাহাতে বঙ্গের উভয় সমাজের উন্নতির হেতু ও মিলনের চিরস্থায়ী সেতু নির্ম্মিত হইত। পক্ষান্তরে, বাঙ্গালা ভাষাও সংস্কৃতের ন্যায় আরব্য ও পারস্য ভাষার মহামূল্য রত্নমালায় বিভূষিত হইয়া এবং অপূর্ব্বমহিমা ধারণ করিত, এবং তাহা এখন হিন্দুগন্ধী বলিয়া আমাদের অনুযোগ করিবার কারণ থাকিত না।

মাতৃভাষা বাঙ্গালাকে জাতীয়ভাষারূপে বরণ করিয়া তাহার সমুচিত সমাদর ও অনুশীলন না করায়, মুসলমানসমাজের যে কি অনিষ্ট হইতেছে, তাহা ভাষায় অভি-ব্যক্ত করা সহজ নহে। প্রাচীন বঙ্গে বহু বহু মুসলমান কবি যেরূপ সযত্ন সেবায় বঙ্গসাহিত্যের অনুশীলন করিতেছিলেন, সেই যত্ন ও উদ্যম যদি এতদিন পর্য্যন্ত অবিরাম-প্রবাহে চলিয়া আসিত, তাহা হইলে আজ আমাদের সাহিত্য বিপুল বিস্তার ও অসীম শক্তি লাভ করিত। আমাদের জাতীয়তা-বর্দ্ধন-কল্পেও তাহা অশেষ সহায়তা করিতে পারিত, এবং বঙ্গসাহিত্যও ইস্‌লামের ভাস্কর-গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া উঠিত। বাঙ্গালাভাষা ভিন্ন অপর কোনও ভাষা বাঙ্গালী মুসলমানগণের মাতৃভাষা ও জাতীয়ভাষা হইতে পারে না, ইহা আমাদের, পূর্ব্বপুরুষগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং তদনুসারে তাঁহারা সেই শুভকার্য্যে ব্রতীও হইয়াছিলেন। হিন্দু কবিগণ যেমন রামায়ণ মহাভারতাদি প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থরাজি বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করিতেছিলেন, মুসলমান কবিগণ ও তেমনি তাঁহাদের পূর্ব্বাচার্য্যগণের

গ্রন্থাবলী বাঙ্গালায় নিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। একমাত্র এই অকৃতীর চেষ্টায় এ পর্য্যন্ত ৮০ জন মুসলমান কবি আবিষ্কৃত হইয়াছেন।

এই হিসাবে সমগ্র বঙ্গে কত কবির আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা আপনারাই অনুমান করুন। বহুশত বৎসর বাঙ্গালায় আধিপত্য করিয়া মুসলমানগণ যে বাঙ্গালা ভাষাকে নিজের বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের রাজ্য-মহিমার সঙ্গে সঙ্গে সেই স্বাভাবিক ও সুন্দর 'আত্মভাব' বিলুপ্ত হইয়া না গেলে, আজ বাঙ্গালী মুসলমানের ইতিহাস অন্য আকার ধারণ করিত, সন্দেহ নাই। বঙ্গের বর্ত্তমান মুসলমানগণ যদি তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের শত শত বৎসরের অভিজ্ঞতালব্ধ সিদ্ধান্তে অবহেলা করিয়া কোনও নূতন জাতীয় ভাষার আমদানী ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, সে চেষ্টা কখনও সাফল্য লাভ করিবে না। প্রত্যুত, সে চেষ্টা নিজ হস্তে নিজের মস্তকে কুঠারাঘাতের সহিত তুলিত হইতে পারিবে।

আরও একটা কথা আছে। বঙ্গদেশ হিন্দু ও মুসলমানের দেশ এবং হিন্দু ও মুসলমান লইয়াই বাঙ্গালী জাতি গঠিত। এই দুই জাতির মধ্যে একটি সাধারণ ভাষা প্রচলিত থাকিলে তাহাতে জাতীয়তা-গঠনের যেরূপ সহায়তা হইবে, তাহা আর কিছুতেই হইতে পারে না। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্মিলন-সাধনের প্রয়োজন কি, তাহা বোধ হয় এখন আর কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। একমাত্র বঙ্গভাষাই বঙ্গের দুইটি সহোদর সমাজকে পরস্পরের প্রতি প্রীতিশীল ও অনুরাগ-সম্পন্ন করিতে পারে। প্রায়ই ভাষার ভিতর দিয়াই তাঁহাদের পরস্পরের চিন্তা ও ভাবের আদান প্রদান ঘটিতে পারে, এবং এই ভাষাই তাঁহাদের ক্ষুদ্র বর্ণগত পার্থক্য ঘুচাইয়া তাঁহাদের মধ্যে বিপুল অখণ্ড জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। এই বিষয়ে বাঙ্গালার মুসলমানগণের হৃদয়ে সুমতির উদয় হউক, বিধাতার নিকট এই প্রার্থনা করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। *

আবদুল করিম।

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম [কলিকাতা] অধিবেশনে পঠিত।

———:*:———

খাস-মুন্সীর নক্সা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আমরা গরীব। উদরান্নের সংস্থান নাই। পিতা আর কত দিন ঘরে বসিয়া থাকিবেন? তিনি আমাদের রাখিয়া পুনরায় অন্নচেষ্টায় ফতেপুরে গমন করিলেন। কারণ, তাঁহার ছুটী ফুরাইয়া আসিল। বাটীতে রহিলাম আমি, আমার জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠা ভগিনী, এবং জীবনে মৃতা মাতামহী দেবী। সেই বুদ্ধিমতী, তেজস্বিনী দিদিমার আর সে বুদ্ধি নাই; আর সে পাকা কথা নাই; আর সে কার্য্যসৌষ্ঠব নাই। আমাদের না খাওয়াইলে নয়, তাই একবার উঠিয়া রাঁধিয়া থাকেন। নিজের উদরে কিঞ্চিৎ না দিলে, উঠিয়া কায করা অসম্ভব, তাই দিনান্তে অন্নের কাছে একবার বসেন।

এই ভয়ঙ্কর সাংসারিক অবস্থা-বিপর্য্যয়হেতু আমার স্কন্ধে কতকগুলি নূতন কার্য্য আসিয়া পড়িল। দাদামহাশয় তখন কলেজে প্রবেশিকা পরীক্ষার নিম্নশ্রেণীতে পাঠ করেন। এক বৎসরের মধ্যেই তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবেন, সুতরাং তাঁহার সময় অল্প। ছোটভগিনীটীকে খাওয়ান, নাওয়ান, কাপড় পরান, খেলা দেওয়া—সমস্তই আমার স্কন্ধে পড়িল। এতদ্ব্যতীত দিদিমার যেরূপ শোচনীয় অবস্থা, তাহাতে তাঁহার দ্বারা সাংসারিক কার্য্য বিশেষ কিছুই হইতে পারিত না। বাটীতে অপর কোনও স্ত্রীলোক নাই। জ্যেঠামহাশয় অথবা জ্যেঠাইমা অতি অল্পই আমাদের সংবাদ লইতেন। এই হেতু প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রথমেই ভগিনীটীর আবশ্যক কৃত্য সম্পন্ন করিয়া, আমি রন্ধনশালায় প্রবেশ করিতাম, এবং উনানে অগ্নিসংযোগ হইতে বাটনা, কুটনা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই আমাকে করিতে হইত। মাতামহীদেবী কেবল আসিয়া রন্ধনমাত্র করিতেন। তাঁহার যেরূপ মনের অবস্থা, তাহাতে তিনি যে ঐটুকু করিতেন, বা করিতে পারিতেন, এখন সেই সময়ের কথা মনে পড়িলে, আমার তাহাই আশ্চর্য্য বোধ হয়। শোকে তাঁহার মানসিক বিকৃতিও হইয়াছিল। মাতৃদেবীর মৃত্যুর পর বৎসর শীতকালের এক দিবস অতিকষ্টে মাতামহীদেবী কিছু কড়াইয়ের দাউল বাটিয়া আমায় বড়ী দিতে দিলেন। বড়ী দিতে গেলে আবার যে কড়াইয়ের দাউল উত্তমরূপে হস্ত দ্বারা ফেনাইয়া লইতে হয়, তাহা আমি জানিতাম না। আমি বাটা দাউল লইয়া বড়ী দিয়া ফেলিয়াছি। সে বড়ী শুষ্ক হইবার পর প্রস্তরবৎ কঠিন হইল। নোড়া দ্বারা চূর্ণ করা কঠিন। রন্ধনে কোনরূপেই গলে না। একদিন রন্ধনের কিঞ্চিৎ

পূর্ব্বে মাতামহী বড়ীর কাঠিতে বিরক্ত হইয়া শীলের উপর নোড়া দিয়া বড়ী ভাঙ্গিতেছেন, এমন সময় এক প্রতিবেশিনী আসিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আমার নাম লইয়া বলিলেন, "অমুকের মস্তক চূর্ণ করিতেছি। কোনরূপেই ইহা গলে না তাই ভাঙ্গিতেছি।" প্রচলিত কথা আছে "আসল অপেক্ষা সুদের মায়া বেশী।" আমি বোধ হয় তাঁহার নিকট পূজনীয়া জননীদেবীর অপেক্ষাও অধিক স্নেহের পাত্র, কিন্তু আমার সম্বন্ধেও যখন তিনি এরূপ কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তখন দুহিতৃ-বিয়োগ-শোকে তাঁহার মানসিকবৃত্তি-নিচয়ের কিরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা পাঠকগণ এই গল্পটি পড়িলেই বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবেন।

সারাদিন এইরূপ গৃহকার্য্য ও ভগিনীটীর লালনপালনে ব্যস্ত থাকায় লেখাপড়ার অত্যন্ত ব্যাঘাত হইল। মাতৃদেবীর মৃত্যুর পর প্রায় ছয় মাস এইরূপে অতিবাহিত হইল। লেখাপড়ার বিশেষ কোনও বন্দোবস্ত হইল না। একদিন দাদামহাশয় হঠাৎ আমার পাঠ দেখিতে বসিলেন। পুরাতন পাঠ সমস্তই ভুলিয়াছি, কিছুই মনে নাই। বিলক্ষণ প্রহার হইল। এখন আমায় ইস্কুলে দেওয়া দাদার মত হইল। বাঙ্গালীটোলার ইস্কুলে দেওয়া তাঁহার মত, কিন্তু মাতামহীদেবীর ছোট ইস্কুলে দেওয়া মত হইল; কারণ, সেখানে মাহিনা কম দিতে হইত। এখানে ছোট ইস্কুলের ও বড় ইস্কুলের একটু কৈফিয়ৎ দিয়া রাখি। সেকালের কাশীর সরকারী কালেজ অর্থাৎ Queens College কাশীর বাঙ্গালীটোলার মেয়ে মহলে বড় স্কুল নামে পরিচিত ছিল। আমার দাদামহাশয় এই সরকারী কালেজে পড়িতেন। তথাকার মাহিনা কিছু বেশী, তাহাই যোগাইতে আমাদের কষ্ট হইত। আর ভূকৈলাসের প্রসিদ্ধ রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল মহাশয় ১৮১৮ অথবা ১৮২০ সালে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া উহার পরিচালনের ভার ও কিছু অর্থ ইংরেজ পাদরীদের হস্তে দিয়া গিয়াছেন। এই ইস্কুলটির প্রকৃত নাম Joynarains College শুনিয়াছি, ঘোষাল মহাশয়ের জীবিতাবস্থায় এই বিদ্যালয়স্থ বালকদের পুস্তক, কাগজ, কলম প্রভৃতি তাঁহার প্রদত্ত অর্থ হইতে দেওয়া হইত। আমি যখন এই ইস্কুলে প্রবেশ করি, তখন এখানে First Arts পর্য্যন্ত পড়ান হইত, এবং তখনও দরিদ্রবালকদের নিম্নশ্রেণীতে লিখিবার কাগজ ও কলম দেওয়া হইত। কাশীর বাঙ্গালী মেয়ে-মহলে এই বিদ্যালয়টি ছোট ইস্কুল নামে প্রসিদ্ধ ছিল। দরিদ্র বালকেরাই এখানে অধিক পাঠ করিত। কারণ, নামমাত্র বেতন দিতে হইত।

মাতামহীদেবীর ইচ্ছানুসারে আমি এখন এই বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীতে প্রবেশ

করিলাম। গৃহস্থালীর সমস্ত কার্য্য ও ভগিনীর তত্ত্বাবধান প্রভৃতি কার্য্য করিয়া ইস্কুলে যাইতাম। আবার সন্ধ্যার সময় প্রাতঃকালের ন্যায় রন্ধনের সমস্ত কার্য্য করিতে হইত। সুতরাং সকালে সন্ধ্যায় আমার পাঠ বা পুস্তকাদির আলোচনা প্রায়ই ঘটিয়া উঠিত না। কোনও কোনও দিন সমস্ত দিনের খাটুনীর পরও পাঠ করিতাম। তবে অধিক দিন রাত্রিতে আহারাদির পরই ঘুমাইয়া পড়িতাম। ভগিনীটিও আমার নিকট না হইলে শুইত না, এবং ঘুমাইত না। আমি কোনও কালেই প্রতিভাশালী ছাত্র ছিলাম না। বিশেষ গণিতে আমার অগাধবিদ্যা। গণিতের নাম শুনিলে আমার জ্বর আসিত। যাহা হউক, এই সকল বাধা সত্ত্বেও বাৎসরিক পরীক্ষায় কোনরূপে কৃতকার্য্য হইয়া চতুর্থ শ্রেণীতে উন্নীত হই। মাতৃদেবীর মৃত্যুর পর নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক কষ্টে এইরূপে প্রায় এক বৎসর গেল। যত দিন যাইতে লাগিল মাতামহীদেবীর মানসিক অবস্থা উত্তরোত্তর তত মন্দ হইতে লাগিল। লোকে বলিয়া থাকে,—"Time is a great healer," সময়ে সকল বেদনাই সহিয়া যায়। কিন্তু মাতার মৃত্যুর পর মাতামহীদেবী দুই বৎসর জীবিত ছিলেন, তাঁহাকে আমি সমভাবে শোকে অভিভূত দেখিয়াছি। এক দিনের জন্য মাতৃদেবীর নাম করিয়া রোদনে নিবৃত্ত দেখি নাই। তাঁহার মানসিক বিকৃতির সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রতি কর্কশ ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। খাটিয়া মরি, অথচ তিরস্কার ও গালাগালি হইতে কোনক্রমেই নিষ্কৃতি পাই না। আবার মধ্যে মধ্যে দাদামহাশয় পরীক্ষায় ভাল পড়া বলিতে না পারিলে বিলক্ষণ প্রহার করিতেন। তখন আমার বয়স প্রায় ১০॥০ বৎসর। ঈদৃশ কষ্টভোগে মন অত্যন্ত বিচলিত হইল। বাটীতে থাকিতে আর ইচ্ছা হইল না। বাটী আমার বিষতুল্য হইয়া দাঁড়াইল। অথচ যাই কোথা? ইহসংসারে স্থান নাই। পিতৃদেবের নিকট যাইতে সাহস নাই, পাছে তিনিও ক্রুদ্ধ হন। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আমা অপেক্ষা ২।৪ বৎসর বয়োজ্যেষ্ঠ একটি সতীর্থ ও বন্ধুর নিকট রোদন করিতে করিতে একদিন সমস্ত কথা গোপনে বলিলাম। উভয়েই বালক, তবে আমা অপেক্ষা তিনি বয়সে একটু বড় মাত্র। তিনি আমায় সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন যে, তাঁহার এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাশীর সন্নিহিত মির্জ্জাপুরে চাকরী করেন। চল, সেইখানেই পলাইয়া যাই। আমরা সেইখানে পড়িব, এবং একত্র থাকিব। আমিও বালক-সুলভ চাপল্যে সেই মতে মত দিলাম। এখন পাথেয়ের কথা উত্থিত হইল। তিনি আমায় বলিলেন, যদি তুই ৫৲।৭৲ টাকা যোগাড় করিতে পারিস, আমার কাছে ২৲।৩৲ টাকা আছে তাহা হইলে উভয়ের মিলাইয়া ১০৲।১২৲ টাকা হইলেই আমরা বেশ যাইতে

পারি। মির্জাপুর কত দূর, রেলের ভাড়া কত, পথখরচই বা কি হইবে, এ সকল আমি কিছুই অবগত ছিলাম না। আমাকে মাতামহীদেবী প্রত্যহ জলখাবারের একটি করিয়া পয়সা দিতেন। কোন দিন ভগিনীটিকে খাওয়াইতাম, কোনও দিন বা জমা করিতাম। এইরূপে ২৸৶৹ টাকা আমার সঞ্চিত হইয়াছিল। মাতামহীদেবী সেকালের স্ত্রীলোক। এ কালের মত পয়সা কড়ি রাখিবার তাঁহার বাক্স ইত্যাদি ছিল না। তিনি চালের কলসী, ডালের হাঁড়ী, এই সকল স্থলে পুঁটুলী করিয়া টাকা পয়সা রাখিতেন। রন্ধনের জন্য চাল, ডাল বাহির করিবার সময় ঐ সকল টাকাকড়ি আমার হস্তে পড়িত। দিদিমাকে দেখাইলে বা বলিলে তিনি বলিতেন, "থাক, যাহা আছে, ঐখানেই রাখিয়া দে, খবরদার নিসনে।" আমিও যাহা পাইতাম, তত্তৎস্থানে পুনরায় রাখিয়া দিতাম। সুতরাং বন্ধুর পরামর্শমত টাকা সংগ্রহ আমার পক্ষে কষ্টকর হইল না।

একটি পুঁটুলী হইতে ৫৷৷৵৹ টাকা লইয়া এবং আমার নিজের কাছে যে ২৸৶৹ টাকা ছিল, তাহা মিলাইয়া ১০৷৷৵৹ টাকা সংগ্রহ করিয়া বন্ধুর নিকট যাইলাম। তিনিও, ২৸৶৹ টাকা সংগ্রহ করিলে পর তাঁহার বাটী হইতে উভয়ে ইস্কুলে যাইবার ছলে বাহির হইলাম। আমার পক্ষে ভগিনীটিকে ছাড়িয়া যাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর বোধ হইয়াছিল; কিন্তু অন্যান্য কষ্টের কথা মনে হওয়ায় যাওয়াই স্থির হইল। আমি রাস্তা-ঘাট বড় একটা জানিতাম না। আমি ও বন্ধু প্রথমে কাশীর চকে গেলাম। সেখান হইতে দুইটি ছাতা খরিদ করিয়া পদব্রজে রাজঘাট ষ্টেশনে চলিলাম। রাজঘাট চক হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ। বেলা দুই প্রহরের সময় গঙ্গাবক্ষে নৌকায় সেতু পার হইয়া ষ্টেশনে পঁহুছিলাম। সে সেতু আর এখন নাই। তখন গ্রীষ্ম ও শীতকালে নৌকায় সেতু প্রস্তুত হইত এবং বর্ষাকালে ভাঙ্গিয়া যাইত। এখন রেলের পাকা সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে; তাহারই উপর দিয়া গাড়ী যাতায়াত করে। রাজঘাট ষ্টেশনে তখন শিবচন্দ্র মিত্র 'ষ্টেশন-মাষ্টার' এবং তাঁহার অধীনে কতকগুলি অন্যান্য বাঙ্গালী কর্ম্মচারী। সে সময় এতদঞ্চলে বাঙ্গালীদেরই রেলের কার্য্য একচেটিয়া। আমার নিকট দ্রব্যাদি কিছুই নাই; দুই জনে দুইটি ছাতা হস্তে চলিয়াছি, দেখিয়াই রেলের বাবুরা ধরিয়া ফেলিলেন যে, আমরা পলায়ন করিতেছি। আমার বন্ধুটি তাঁহাদের সহিত নানারূপ তর্ক করিয়া বুঝাইবার প্রয়াস পাইলেন যে, আমরা পলাইতেছি না; কিন্তু তাঁহাদের আর জানিতে বাকি রহিল না। আমি নিজ অবস্থা চিন্তা করিয়া কিছু নিস্তব্ধ ও বিমর্ষভাব ধারণ করিয়াছিলাম।

যথাসময়ে গাড়ী চড়িয়া বেলা ৪।৫টার সময় মির্জাপুর পঁহুছিলাম। সেখানেও আবার সেই উৎপাত। আমার বন্ধুবরের জ্যেষ্ঠের একটি বন্ধু ষ্টেশনে আমাদের সেইরূপ অবস্থায় নামিতে দেখিয়া বলিয়া বসিলেন, "তোরা নিশ্চয়ই পলাইয়া আসিয়াছিস।" বন্ধুবরের জ্যেষ্ঠ মির্জাপুরের Civil Surgeo. এর Mortuary Clerk. আমরা চিকিৎসালয়ে গিয়া নামিলাম। তিনিও আমরা পলায়ন করিয়া আসিয়াছি বলিয়া ধরিয়া ফেলিলেন, এবং আমার ও বন্ধুবরের নিকট যাহা কিছু টাকাকড়ি ছিল, সমস্ত কাড়িয়া লইলেন।

আমরা তাঁহার বাড়ীতে গেলাম। তাঁহার এক মাসী গৃহিণী। তিনি আমাদের অতি যত্নপূর্ব্বক আহারাদি করাইলেন। তাঁহারা উভয়ে—অর্থাৎ মাসী ও বন্ধুর জ্যেষ্ঠ আমাদের চোখে চোখে রাখিতেন। ভয়, পাছে সেখান হইতেও পলায়ন করি। বিশেষতঃ, আমার জন্যই তাঁহাদের চিন্তা। কারণ, আমি পরের ছেলে, তাঁহার ভ্রাতার সহিত পলাইয়া আসিয়াছি।

তিন চারি দিবস এইরূপে গেল। চতুর্থ কি পঞ্চম দিবসে আমরা দুই জনে আহারাদির পর হাঁস্পাতালে বসিয়া অছি। বেলা ১টা কি ২টা হইবে। এমন সময়ে দেখি, পিতৃদেব তথায় আসিয়া উপস্থিত। আমায় পাইয়া তিনি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। আমি একেবারে নিস্তব্ধভাব ধারণ করিলাম। কোনও কথাটী নাই। মনে অত্যন্ত ভয় হইল, না জানি পিতৃদেব কতই তিরস্কার করিবেন, বিশেষ টাকা লইয়া আসিয়াছি। এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা পিতৃদেব সেই চিকিৎসালয়ে অপেক্ষা করিয়াছিলেন। বন্ধুর ভ্রাতা তাঁহার আহারাদির জন্য বিশেষ যত্ন পান, কিন্তু পিতৃদেব পরম নিষ্ঠাবান। তিনি অপরের হস্তের পক্ক অন্ন গ্রহণ করেন না। কিছু জলযোগ করিয়া বেলা ৩টা ৩।৹টার সময় আমাকে লইয়া তথা হইতে বিদায় হইলেন। বন্ধুবরের ভ্রাতাকে বলিলেন "বাবা, আমার ছুটী নাই, কল্যই কাছারী করিতে হইবে; সুতরাং পরবর্ত্তী গাড়ীতেই আমাকে যাইতে হইবে।" তিনি আমায় যত্নপূর্ব্বক আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাকে বৃদ্ধ পিতৃদেব অজস্র আশীর্ব্বচনে তুষ্ট করিলেন। তিনিও আমার নিকট হইতে যাহা কিছু টাকা কড়ি লইয়া নিজের কাছে রাখিয়াছিলেন আমার সম্মুখে, সমস্ত পিতৃদেবকে বুঝাইয়া দিলেন।

হাঁসপাতালের গণ্ডী ছাড়াইয়া রাজপথে আসিয়া পড়িলাম। আসিবার সময় বন্ধুবরের সহিত আর একলা সাক্ষাৎ হইল না। ভয়ে তখন হতবুদ্ধি, না জানি পিতা কতই তিরস্কার করিবেন। কিন্তু তিনি আমায় কিছুই বলিলেন না, বরঞ্চ

সস্নেহে পলাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি আর চক্ষে জল রাখিতে পারিলাম না, কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহার গোচর করিলাম। এই সকল ব্যাপার শুনিয়া পিতার অজস্র অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। স্ত্রী-বিয়োগজনিত কষ্ট, প্রাণসম সন্তানদের এই সকল দুর্দ্দশা তাঁহার হৃদয়কে একেবারে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। পিতাপুত্রে কাঁদিতে কাঁদিতে পদব্রজে ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে পিতৃদেব কি করিয়া জানিতে পারিলেন যে, আমি মির্জাপুরে অবস্থান করিতেছি। পাঠকের মনে থাকিতে পারে, কাশীর রাজঘাট ষ্টেশনে ২।৪ জন বাঙ্গালী রেল-কর্ম্মচারী যখন আমাদের ধরিয়া পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন যে, আমরা পলাইয়া যাইতেছি, সেই সময় আমাদের সহযাত্রী এতদ্দেশীয় ২।৩টি হিন্দুস্থানী সেই তর্কবিতর্ক শুনিয়াছিলেন, এবং কতক কতক বুঝিয়াছিলেন। তাঁহারা বোধ হয় কাণপুর যাইতেছিলেন। আমি ইস্কুল হইতে বাটীতে না ফেরায় দাদামহাশয় পিতৃদেবকে টেলিগ্রাফ করেন। সেই তারের খবর পাইয়া পিতৃদেব ফতেপুর ইষ্টেশন আসিয়া সমস্ত গাড়ী অনুসন্ধান করেন। হঠাৎ সেই দুটী আরোহীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তাহারা আমার সন্ধান বলিয়া দেয়, এবং সংবাদ দেয় যে, আমরা মির্জাপুরে নামিয়াছি। জজ সাহেবের নিকট অনুমতি লইয়া পিতৃদেব এই সূত্রের অনুসরণ ধারণ করিয়া মির্জাপুরে আসেন, এবং তথায় নামিবামাত্র আমার বন্ধুবরের সেই জ্যেষ্ঠভ্রাতার সেই বন্ধুটির সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনিই হাঁসপাতালের ঠিকানা ও আমাদের আসিবার সংবাদ পিতৃদেবকে বলিয়া দেন।

যথাসময়ে ফতেপুরে পঁহুছিলাম। সেই বাটী, সেই ঘর, সেই নাপিত, সেই গোয়ালা, পিতৃদেবের সমস্তই সেই; নূতনের মধ্যে দেখিলাম, "ধুদি" দাসীটী নাই। অতি বৃদ্ধা হইয়া পিতৃদেবের চাকুরী করিতে করিতে সে পরলোকে গমন করিয়াছে। এখন তাহার স্থলে তাহার পুত্রবধূ কার্য্য করে। ২।৪ দিবসের পরে বাবার প্রমুখাৎ শুনিলাম, তিনি ২।৪ মাস পূর্ব্বে পেন্সনের আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রতি জজসাহেবের কৃপাদৃষ্টিবশতঃ তিনি আবেদনপত্রখানি সদরে পাঠান নাই। ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষন জেদ ও তাগাদা করিয়া আবেদনপত্র ও পেন্‌সন-ঘটিত অন্যান্য কাগজপত্র পাঠাইয়া দিয়াছেন। বুঝিলাম, আমাদের কষ্ট আর পিতৃদেবের সহ্য হইল না। তিনি এখন পেন্‌সন লইয়া গৃহে বসিতে ইচ্ছুক। ভাবিলাম, ৪০৲ টাকা মাহিনাতেই আমরা অতি দীনভাবে চালাই; ইহার অর্দ্ধেকে এখন কি করিয়া চলিবে? কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না।

এগুলি বৈশাখ মাসের কথা। আষাঢ় মাসে পিতৃদেবের পেন্‌সন মঞ্জুর হইয়া আসিল। পিতৃদেব আমায় বলিলেন, তুই যদি দিন পনের একা থাকিতে পারিস, তাহা হইলে আমি একবার মথুরা বৃন্দাবন দর্শন করিয়া আসি; কারণ, কাশীতে প্রবেশ করিয়া আর আমার কাশী ছাড়িবার ইচ্ছা নাই। তোর নিকট রাত্রিতে ধুদির পুত্রবধূ শুইয়া থাকিবে। আর তুই তোর জ্যেঠতুতা বড়দাদার বাটীতে খাইয়া আসিবি। আমি সম্মত হইলাম। পিতৃদেব মথুরা বৃন্দাবন দর্শন করিতে চলিয়া গেলেন।

১৫।২০ দিন পরে পিতৃদেব ফিরিয়া আসিলেন, এবং আমরা পিতাপুত্রে দুই জনে ফতেপুর হইতে চিরকালের জন্য বিদায়গ্রহণ করিলাম। এই ফতেপুরে আমার পিতৃদেব, জ্যেষ্ঠতাত, অপর এক জ্যেষ্ঠতাত-তনয়, জ্যেষ্ঠতাত-জামাতা প্রভৃতি আমাদের পরিবারস্থ অনেকেরই চাকুরী ব্যপদেশে ৩০।৪০ বৎসর হইতে বাস। আমাদের আজ সেই বহুকালের সম্বন্ধ ছিন্ন হইল। আমার বালক-হৃদয়ই যখন ফতেপুরের জন্য সে সময় কাতর হইয়াছিল, তখন পিতার অন্তঃকরণে—যে ফতেপুর-বিচ্ছেদজনিত গভীর বিষাদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? অশ্রুপাত করিতে করিতে পিতৃদেব পুরাতন বন্ধু ও আত্মীয়বর্গের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তদ্দেশীয় প্রতিবাসিবর্গ পিতৃদেবকে অত্যন্ত ভালবাসিত, এবং মান্য করিত। তাহারা সকলেই ক্ষুব্ধ-অন্তঃকরণে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া বিদায় দিল। এইরূপে পিতৃদেব আমাদের দুটী ভ্রাতার ও কনিষ্ঠা ভগিনীর মায়ায় চাকুরী ও ফতেপুর ত্যাগ করিলেন। ১৮৭০ সালের শ্রাবণ মাসে আমরা পিতাপুত্রে বারাণসীধামে আসিলাম। তৎপরে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত পিতৃদেব কাশী হইতে একপদও সরেন নাই।

সংসারের ভার এখন পিতৃদেবই গ্রহণ করিলেন। মাতামহীদেবী কখনও রন্ধনশালায় যান, কখনও বা যান না। সন্ধ্যার সময় ত তিনি যাইতেনই না। আগে যেমন আমি মাতামহীদেবীকে রন্ধনকার্য্যে সাহায্য করিতাম, এখন পিতৃদেবকে করিতে লাগিলাম। তবে কর্ম্মের ভার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক লঘু হইল, এবং মাতামহীদেবীর তাড়না হইতে অনেকটা অব্যাহতি পাইলাম। কনিষ্ঠা ভগিনীটিও এখন পিতৃদেবের অনেকটা 'নেওটা' হইল। এই অবসরে আমি বাঙ্গালীটোলার ইস্কুলে পুনরায় চতুর্থ শ্রেণীতে প্রবেশ করিলাম।

অধুনাতন কালে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের ও ইস্কুলসমূহের বাৎসরিক পরীক্ষা গ্রীষ্মঋতুর প্রারম্ভে বা মধ্যসময়ে হইয়া থাকে, আমাদের সময়ে সেরূপ হইত না। তখন বাৎসরিক পরীক্ষা শীতকালে পৌষ অথবা মাঘ মাসে হইত। সুতরাং আমি

শ্রাবণমাসের শেষভাগে ইস্কুলে প্রবেশ করায় পাঠে অনেক পশ্চাতে পড়িয়াছিলাম। সে বৎসর বাংসরিক পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। ইংরেজী ভাষা, বাঙ্গালা প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলাম, কিন্তু গণিতে চিরকালই আমার বিদ্যার দৌড় অধিক। সুতরাং উক্ত বিষয়ে ফেল হইলাম। নিজের দোষ ত ছিলই, এতদ্ভিন্ন পরীক্ষক মহাশয়েরও একটু অদ্ভুত প্রণালীর পরীক্ষা লওয়ায়, বোধ হয়, অকৃতকার্য্য হইলাম। তিনি তিনটিমাত্র অঙ্ক দিলেন, এবং বলিলেন যে, প্রত্যেক অঙ্কে ৩৩ নম্বর দিব। ৭০ নম্বর পাইলে পাস, নতুবা ফেল। যাহার দুইটি শুদ্ধ হইল, সে একেবারে ৬৬ নম্বর পাইল; যাহার একটি মাত্র শুদ্ধ হইল, সে বেচারী একেবারে মাটী হইল—৩৩এর অধিক পাইল না। আমি এই ৩৩এর দলভুক্ত হইলাম। আবার হাতের লেখার পরীক্ষায় এই পরীক্ষক মহাশয় ততোধিক অদ্ভুত প্রণালী অবলম্বন করিলেন। তিনি বলিলেন, "সকলে আপনার শ্লেটে নিজ নিজ নাম দস্তখত করিয়া দেখাও, যাহার ভাল হইবে সেই ফাষ্ট হইবে।" লেখায় আমি ফাষ্ট হইলাম। কিন্তু পরীক্ষা-প্রণালী কি ন্যায়সঙ্গত হইল? আমার বিবেচনায় ত কোনও মতেই নহে। বাল্যকালে অনেকের নিজের নাম দস্তখত ও উহা পুনঃপুনঃ অভ্যাস করিবার একটা বাতিক থাকে। অনেকের হাতের সাধারণ লেখা ভাল না হইলেও, নামটা দস্তখত করিবার সময় অক্ষরগুলা একটু সুন্দর ও পরিপাটী হইয়া থাকে; আমার যদি তাহাই হইয়া থাকে। সুতরাং আমি বাস্তবিক ফাষ্ট হইবার উপযুক্ত ছিলাম কি না, তাহা বলিতে পারি না।

এই প্রসঙ্গে আমাদের সময়ে নিম্নশ্রেণীতে কিরূপ শিক্ষাদান হইত, তাহার একটু বর্ণনা এখানে দেওয়া উচিত, মনে করিতেছি। আমরা এখন প্রায়ই চতুর্দ্দিকে প্রাচীনদের মুখে এইরূপ শুনিতে পাই যে এখন যে, সকল ছাত্র ইস্কুল কলেজ হইতে বাহির হইতেছে, তাহারা আর লেখাপড়ায় সেরূপ "পোক্ত" নহে; যেমন পুরাতন হিন্দুকলেজ অথবা সিনিয়র-জুনিয়ার পরীক্ষা দিয়া বাহির হইত। কথাটা সত্য হইলেও সকলের মুখে অনুযোগই শোনা যায়, কিন্তু এই দোষের প্রতীকারার্থ কাহাকেও ত তর্জ্জনীমাত্র তুলিতেও দেখি না। গবর্মেণ্টের শিক্ষাপ্রণালীর দোষ ত আছেই, কিন্তু কেবল শাসনকর্ত্তাদের স্কন্ধে দোষ চাপাইয়া নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিলেই কি এ দোষ যাইবে? ইহাতে আমাদের দেশের ও সমাজের যে অত্যন্ত অনিষ্ট হইতেছে, তাহা কি কেহ বুঝিতেছেন না? অথচ এ দোষপরিহারার্থ আমাদের যতটুকু শক্তি আছে, সেটুকুও ত আমরা করিতেছি না। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে যাইতেছি না, আমাদের দৃষ্টি

আপাততঃ কেবল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায়। আমাদের মতে, তিনটি দোষ প্রধান বলিয়া বোধ হইতেছে; যথা—(১) বিষয়বাহুল্য ও পরীক্ষা-বাহুল্য, (২) পাঠ্যপুস্তক-নির্ব্বাচন; (৩) শিক্ষক। ইংরেজী বিদ্যাশিক্ষার প্রথম যুগে, অর্থাৎ হিন্দুকলেজের সময় নিম্ন, মধ্যম ও উচ্চশ্রেণীতে বিষয়-বাহুল্য ছিল না। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য এবং ইংরেজী-দর্শন। ছাত্রেরা এইগুলি লইয়াই থাকিত। এমন কি, গণিতেরও বিশেষ চর্চ্চা ছিল না। পরে দ্বারিকানাথ মিত্রের সময়ে বেথুন সাহেব গণিতের বেশী চর্চ্চা বাড়াইয়া দেন। বিষয়গুলি সংক্ষিপ্ত ছিল বলিয়া দেশীয় ছাত্রেরা সাহিত্য প্রভৃতি যাহা পাঠ করিত, সেইগুলিতে বিশেষ পরিপক্কতা লাভ করিত। আবার পাঠ্যনির্ব্বাচন বিষয়ে তখন বিশেষ সাবধানতা দেখা যাইত। পুস্তকাদির তখন বহুল প্রচার ছিল না; কিন্তু যাহা ছিল, তাহা অতি উৎকৃষ্ট ধরণের ছিল। সে কালের নিম্ন শ্রেণীতে প্রায়ই Enfield's Speaker পড়ান হইত। আমার নিকট অতি পুরাতন একখানি Enfield's Speaker ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে এখন ঐ পুস্তকখানি আমার নিকটে নাই। আমার মনে পড়ে, ঐ পুস্তকখানি ইংরজী-সাহিত্যের অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক, সকলের অংশবিশেষ লইয়া সঙ্কলিত। Shakespearএর নাটকাদি হইতে Goldsmith-কৃত প্রবন্ধ-নিচয় পর্য্যন্ত সমস্ত গ্রন্থকর্ত্তার অতি উৎকৃষ্ট ভাবনিচয় উহাতে নিবিষ্ট ছিল। এই পুস্তকখানি সেকালে অতি যত্নের সহিত অধীত হইত। এখন নানা মতের নানা বেশের পরীক্ষা হইয়াছে। নামই পরীক্ষার কত। Upper Primary, Lower Primary, Middle, ছাত্রবৃত্তি ইত্যাদি ইত্যাদি। দুগ্ধপোষ্য বালকদের বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া পরীক্ষা দিতে দিতেই প্রাণান্ত। সেকালে ইহা ছিল না। তাহার পর সর্ব্বোপরি ডিরোজিও, বা ডি এল, রিচার্ডসন, বা বালানটাইন প্রমুখ উৎকৃষ্ট শিক্ষক এখন কোথায়? এই মনীষিগণ আপনাদের ছাত্রদের সন্তানবৎ স্নেহ করিতেন, এবং প্রাণ খুলিয়া শিষ্যদের হৃদয়ে নিজেদের উচ্চ মনের ভাব ঢালিয়া দিতেন। এখন কি তাহা হইয়া থাকে? এখনকার শিক্ষক মহাশয়েরা নিজ শিষ্যদের সহিত পরিচিত কি না সন্দেহ।

পূর্ব্বকালের শিক্ষায় যে দোষ ছিল না, তাহা আমরা বলিতেছি না। তখন যেমন অঙ্গহীন শিক্ষা ছিল, এখনও তেমনই অঙ্গহীন। তবে সেকালে যে শিক্ষা দেওয়া হইত, সেটুকু বেশ "পোক্ত" রকমের, এবং ভিত্তিটুকু বেশ দৃঢ় করিয়া দেওয়া হইত। কিন্তু এখন যাহা কিছু করা হয়, সমস্তই কম জোর ভিত্তির উপর। কাজেই এমারতটি সকল সময়েই টলমল করিতেছে।

লর্ড ড্যালহাউসীর-স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সময় হইতে ভারতবর্ষে যে শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে, যদিও লোকশিক্ষার উহা একটা প্রকৃষ্ট পথ, কিন্তু সেই সঙ্গে শিক্ষা বিভ্রাটও বিস্তর ঘটিয়াছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপনের পর হইতেই বিষয়বাহুল্যে ও পরীক্ষাবাহুল্যে ছাত্রদিগকে ঝালাপালা করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের শাসন-কর্ত্তারা যখন তখন আমাদের বিদ্রূপ করিয়া থাকেন যে, ভারতীয় ছাত্রেরা সবই "রটিয়া মারে"। প্রভুরা ভাবিয়া দেখেন না, দোষটী কাহার। সেকালের ছেলেরা নিম্নশ্রেণীতে একটু গণিত ও ইংরেজী ভাষা লইয়া থাকিত। এখনকার ছাত্রেরা নিম্ন শ্রেণী হইতেই বিষয়বাহুল্যের চাপে পড়িয়া নিষ্পিষ্ট হইতে থাকে। কাজেই পুঁথিগত বিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ না করিলে অন্য উপায় নাই। পূর্ব্বে ছিল প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণী; এখন আবার হইয়াছে প্রথম ষ্টাণ্ডার্ড, দ্বিতীয় ষ্টাণ্ডার্ড, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ছাই শ্রেণী-বিভাগই এখন বোঝা ভার। বালকদের বার্ষিক সাধিতে সাধিতেই প্রাণান্তপরিচ্ছেদ। বিষয়-বাহুল্যের ব্যাপারটা একবার বুঝুন। পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শ্রেণীতেই ইংরেজী ভাষা, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, গণিত, ভূগোল, আবার একটুখানি নক্‌সা-টানা। গণিত বড় কমটি নয়, সমস্তই পাটীগণিত। দশম অথবা একাদশ-বর্ষীয় বালকেরা পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শ্রেণীতে পাঠ করে। এই দুগ্ধপোষ্য বালকদের প্রতি এরূপ অত্যাচার। পাঠ্যপুস্তক-নির্ব্বাচনও কেমন চমৎকার! ভারত হইলেন বিলাতী নিকৃষ্ট গ্রন্থকর্ত্তাদের অধমতারিণী। ম্যাকমিলান কোম্পানী ছাই ভস্ম যাহা কিছু প্রস্তুত করিয়া পাঠাইবেন, ভারতে সব চলিয়া যাইবে। আমাদের সময় পাঠ্যপুস্তক-নির্ব্বাচনে এত বিভ্রাট ছিল না। প্যারীচরণ নিম্নশ্রেণী একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। বিষয়বাহুল্য দেখা দিয়াছিল, তবে এখনকার মত এত নহে। যে পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শ্রেণীতে এখন সমগ্র পাটীগণিতটি উদরস্থ করা হইতেছে, আমাদের সময়ে উক্ত শ্রেণীদ্বয়ে Vulgar fraction পর্য্যন্তই ছিল। পরীক্ষা-বাহুল্য ছিল না, তবে ক্রমে ক্রমে দেখা দিতেছিল। আমার মনে আছে, আমি যখন তৃতীয় শ্রেণীতে পাঠ করি, তখন প্রথম Departmental Examination দেখা দেয় ইহাই পরে Middle Class Examinationএ পরিণত হইয়া পশ্চিমোত্তর দেশে স্বীয় অধিকার বিলক্ষণ বিস্তৃত করে, এবং নানা সাজে সজ্জিত হইয়া কত রকম লীলা খেলা করিয়া এখন যেন একটু শ্রান্তি অবসানে সুখ ভোগ করিতেছে। পূর্ব্বোক্ত Departmental Examinationএ আমাকে প্রেরণ করা হয়। আমার বেশ মনে আছে, কাশীর Joy Narain Collegeএর অধ্যক্ষ Leupolt নামক এক পাদরী-পুঙ্গব এই পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্যের পরীক্ষক।

প্রশ্নপত্র পাইয়া দেখি, Scott's Lay of the Last Minstrel এবং Milton's Paradise Lost হইতে কতকগুলি কবিতা তুলিয়া সংক্ষেপে ভাব বুঝাইতে দেওয়া হইয়াছে। আমার বয়স তখন কিঞ্চিদধিক ত্রয়োদশ বর্ষ। আমি সে বয়সে Scott অথবা Milton-এর নাম পর্য্যন্ত শুনি নাই; তাঁহাদের কাব্যরসের আস্বাদন করা ত বহু দূরের কথা! বিদ্যাবাগীশ Leupolt মহোদয় Departmental পরীক্ষায় ছাত্রদের উপর যে উৎকট বিদ্যা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে আমার ন্যায় শত শত বুদ্ধিহীন ও প্রতিভাহীন ছাত্রকে যুদ্ধে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে হইয়াছিল। তবে তখন "মিডিল" পাশ না করিলে ১০৲ টাকার সরকারী চাকুরী পর্য্যন্ত পাওয়া যাইবে না, অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইবে না, এরূপ উৎকট নিয়মগুলি বিধিবদ্ধ হয় নাই বলিয়া আমি রক্ষা পাইয়াছিলাম, নতুবা আমার বিদ্যাশিক্ষা সেইখানেই শেষ হইত।

আমাদের সময়ের শিক্ষকদের একটু পরিচয় দিই। কিন্তু এইখানে বলিয়া রাখি যে, আমি সরকারী বিদ্যালয়গুলিকে উদ্দেশ করিয়া কোনও কথা বলিতেছি না। কারণ, আমি দরিদ্রের সন্তান। সরকারী বিদ্যালয়ে আমি বাল্যকালে বিদ্যালাভ করি নাই। আমি নিজে গরীব, তাই আমায় গরীব লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হইবে। আমার বক্তব্য, প্রাইবেট অথবা সাহায্যকৃত বিদ্যালয়গুলি লইয়া। আমাদের দেশে সরকারী বিদ্যামন্দির কয়টা? বেশীর ভাগই প্রাইবেট, অথবা গভর্মেণ্ট সাহায্যকৃত। আমি যে বাঙ্গালীটোলার ইস্কুলে পড়িতাম, সেটীও সাহায্যকৃত। কতকগুলি মহৎপ্রকৃতি বাঙ্গালীর চেষ্টায় এই ইস্কুলটী স্থাপিত হয়, এবং কাশীস্থ বাঙ্গালীদের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছে এবং করিতেছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের সময়ে এই ইস্কুলে যে সকল ভয়ানক দোষ ছিল, সে গুলি এ স্থলে না বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। এখন উক্ত বিদ্যালয়ে সে সকল দোষ আছে কি না, তাহা বলিতে পারি না। যদি থাকে, তাহা হইলে বড়ই ক্ষোভের বিষয়। আমাদের সময়ে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে দুই জন শিক্ষক ছিলেন এক জন, ভট্টাচার্য্য অপর জন বন্দ্যোপাধ্যায়। উভয়ই বৃদ্ধ। বয়স ৫০-এর অতিরিক্ত। উভয়ই গবর্মেণ্টের পেন্সনভোগী। তবেই বুঝিতে হইবে যে, পেন্সন লইয়া তাঁহারা বৃদ্ধাবস্থায় কাশীবাস করিতে আসিয়াছিলেন। অবকাশ ছিল সুতরাং যে কয়টা টাকা ইস্কুল হইতে পাওয়া যায়। তাঁহারা জীবনে কখনও শিক্ষকতা করেন নাই; এখন বৃদ্ধ বয়সে এই ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন। সুতরাং শিক্ষাদানের রীতিও তদনুরূপ। ভট্টাচার্য্য মহাশয় সাহিত্যের পাঠগুলির মানে শিখাইয়া

দিতেন আমরা বাটী হইতে মুখস্থ করিয়া আনিয়া উগ্‌দার করিতাম। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অঙ্ক কষাইতেন। গণিতের উদ্দেশ্য (principles) ইত্যাদি ছাত্রদের হৃদয়ঙ্গম করান কাহাকে বলে, তিনি জানিতেন না। বরঞ্চ পাটীগণিতের প্রত্যেক অধ্যায়ের principlesগুলি তিনি নিজে বুঝিতেন এবং জানিতেন কি না সন্দেহ। অঙ্ক দিলে না কষিতে পারিলেই প্রহার। তাঁহার বেত্রাঘাতের ভয়ে আমরা ব্যতিব্যস্ত হইতাম। এই ত গেল পাঠের ব্যবস্থা। তাহার উপর যদি এই সকল মহাত্মার নৈতিক চরিত্র দেখা যায়, তাহা আরও ভয়ঙ্কর। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চরিত্র বিশুদ্ধ ছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের একটি সেবাদাসী ছিল। তিনি একক সেবাদাসীটি সমস্ত গৃহকার্য্য করিত, এবং রাত্রিতে হয় ত পদসেবাও করিত। আবার আমাদের যিনি সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন, সেই পণ্ডিত মহাশয় এক জন উড়িষ্যানিবাসী; বিদ্যালঙ্কার তাঁহার উপাধি। কোন টোলে বা সংস্কৃত কালেজে পাঠ করিয়া বিদ্যালঙ্কার উপাধিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, কি বারাণসীধামে বিনা পয়সায় বা কিঞ্চিৎ পয়সায় (ইহার বৃত্তান্ত পরে দ্রষ্টব্য) উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। হঠাৎ কোনও কার্য্যোপলক্ষে একবার তাঁহার বাটীতে গিয়াছিলাম। সেখানে একটি নয়, দুইটি নয়, সেবাদাসীর এক দল দেখিতে পাই। তাঁহাদের মধ্যে আমাদের পণ্ডিত মহাশয় বিরাজ করিতেছিলেন। যখন এই সকল কথা আমার মনে পড়ে, তখন চরিত্র ঠিক রাখিয়া কিঞ্চিৎ বিদ্যালাভ করিয়া সংসারযাত্রা যে নির্ব্বাহ করিতেছি, ইহাই আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়।

যাহা হউক, চতুর্থ শ্রেণীতে পুনরায় পাঠ চলিতে লাগিল। এই বৎসর গ্রীষ্মকালের জ্যৈষ্ঠ মাসে আমার মাতামহীদেবী কাশীলাভ করিয়া মাতৃদেবীর বিয়োগজনিত ভয়ঙ্কর শোক হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। তিনি শোকদুঃখের অতীত অনন্তধামে চলিয়া গেলেন বটে, কিন্তু আমাদের আবার অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত। আমাদের সংসার এখন সম্পূর্ণ শ্রীহীন। চারিটি প্রাণী লইয়া আমাদের সংসার,—যথা আমি, পিতৃদেব, আমার জ্যেষ্ঠ, এবং চারি বৎসর বয়স্কা আমার কনিষ্ঠা ভগিনী। সংসারের রূপ ও অঙ্গসৌষ্ঠব গৃহিণী অথবা অন্য স্ত্রীজাতীয় পরিজনবর্গ, তাহা আমাদের কেহই নাই। পিতৃদেবের ও আমার হস্তের বেড়ি আর কোনক্রমেই খসে না। কষ্টেরও সীমা আছে। আমাদের অসহ্য হইয়া উঠিল। তখন পিতৃদেব জ্যেষ্ঠ সহোদরের পুনরায় বিবাহ দিতে উদ্যত হইলেন। তখন জ্যেষ্ঠ মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এবং এফ-এ পাঠ করেন। পুনরায় বিবাহ দিবার কথা শুনিয়া পাঠক

মহাশয়েরা আশ্চর্য্য হইবেন। কারণ, পূর্ব্বে দাদার বিবাহের আমি কোনও উল্লেখই করি নাই। আমার বয়স যখন ৪।৫ বৎসর, তখন জ্যেষ্ঠের বয়স ১৩ বৎসর। সেই সময় মাতামহীদেবী ও মাতৃদেবী দাদার বিবাহ দেন। সে ১৮৬৪।৬৫ সালের কথা। সে বিবাহের কথা আমার ছায়ামাত্র মনে আছে। সেকালের স্ত্রীলোকদের একটা অদ্ভুত সাধ ছিল। ক্ষুদে পুত্রবধূ আসিয়া অবগুণ্ঠনবতী হইয়া ঘুর-ঘুর করিয়া বেড়াইবে,—দেখিতে বড়ই সুন্দর। এই সাধের বশবর্ত্তিনী হইয়া আমার মাতামহীদেবী পিতার অসম্মতিতেও জ্যেষ্ঠের বিবাহ দেন। সকলের অমতে বিবাহ দিবার ফল অতি শোচনীয় হয়। বিবাহের পর দেখা গেল, নূতন বধূ কঠিন সঞ্চিত রোগে আতুরা। সুতরাং সে বিবাহ দাদামহাশয়ের নামমাত্র হইয়াছিল। এখন আমাদের নিজের সংসার চলা ভার, বধূঠাকুরাণীর সেবা শুশ্রূষা করে কে? তিনি প্রায় সর্ব্বদাই শয্যাগত। এ জন্য পিতৃদেব সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া দাদামহাশয়ের পুনরায় বিবাহ দিলেন। এই বিবাহকার্য্যে পিতৃদেব যেরূপ নিঃস্পৃহতার প্রমাণ দেখাইলেন, তাহা এখনকার সময়ে আদর্শস্থল। দাদামহাশয় তখন এফ-এ, পাঠ করেন, ইচ্ছা করিলেই পিতৃদেব তখন বিবাহে কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন। কারণ, সেই ১৮৭৪।৭৫ সালেও বরের বাজার গরম হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু পিতৃদেব কন্যাপক্ষ হইতে অর্থ গ্রহণ করাকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। ইহার প্রমাণ পরে আরও দিব।

কালীঘাটের সন্নিকটস্থ একটি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের একটি সদ্বংশজাতা দীনা বিধবার পৌত্রীর সহিত এই পরিণয় সম্পন্ন হয়। বিবাহ কাশীতে হইল। বিধবাটি গ্রামে যাহা কিছু অত্যল্প জমী ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া পৌত্রীটিকে লইয়া কাশীতে আসিয়া দাদার হাতে তাহাকে সমর্পণ করিয়া আমাদের সংসারে গৃহকর্ত্রীর মত রহিলেন। পিতৃদেব তাঁহাকে মাতৃসম্বোধন করিলেন। আমরাও উভয়ে প্রকৃত ও কৃত্রিম সুবাদে তাঁহাকে 'ঠাকুরমা' বলিতে লাগিলাম। তখন তিনি আসাতে আমরা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলাম। আমার কনিষ্ঠা ভগিনীর দুর্দ্দশার একশেষ হইতেছিল। তাহার দুরবস্থার অবসান দেখিয়া আমার বড় আনন্দ হইল। এখন দুইবেলা রাঁধা ভাত খাইবার সুবিধা হইল; ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে? তখন জানিতাম না,—অমৃতেও গরল আছে। এইখানেই আমার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় শেষ করিলাম। এতদিন আমাদের সংসার-স্রোত একটানা রহিতেছিল; এখন স্রোত অন্য দিকে ফিরিল।

শ্রী—চট্টোপাধ্যায়।

ভূতের দেশত্যাগ।

—:০:—

চতুর্থ পর্ব্ব।—বেঁড়ে বড় দুষ্টু এঁড়ে!

অতি প্রত্যুষে বাঁড়ু ভূত সুবলপুরের মাঠে আসিয়া হাজির হইল। যে তাল-গাছটায় তাহার বৈঠকখানা, সেই তালগাছ-তলাতে আসিয়াই দেখিল, গাছের গোড়া খোঁড়া! তাহার সন্দেহ হইল, হয় ত কেহ তাহার টাকাগুলি হস্তগত করিয়াছে। পরীক্ষা করিয়া দেখিল, বাস্তবিকই টাকা নাই, কাহার এত সাহস যে, বাঁড়ুর টাকায় হাত দেয়? রাগে বাঁড়ু ফুলিয়া তিনটে হইল; সিংএর গুঁতায় তালগাছ উপড়াইয়া ফেলিল; মাটীতে সজোরে ল্যাজের আঘাত করিতে লাগিল সে আঘাতে ভূমিকম্প হইতে লাগিল। চীৎকার করিয়া ডাকিল "তাপাই, ভেঙ্গড়ো, ন্যাংটা!—তোরা সব শোন তো।"

ভূতেরা প্রমাদ গণিল, কিন্তু বাঁড়ুর কথা না শুনিলেও নয়। সভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে স্যাওড়া গাছ হইতে নামিয়া আসিল।

বাঁড়ু গর্জ্জন করিয়া বলিল,—"তবে রে ; আমার টাকাগুলো যে সরিয়ে ফেলেছিস্? তোদের কার ঘাড়ে তিনটে মাথা যে, আমার টাকা হজম করিস্? তোদের মরবার কি আর জায়গা ছিল না?"

ভূতেরা সবিনয়ে বলিল, "মামা, তোমার টাকা কি আমরা নিতে পারি? তোমার টাকা কে নিয়েছে, তা আমরা কিছু জানিনে।"

"জানিস্ কি না, তা দেখাচ্ছি" বলিয়া বাঁড়ু তাহার দুই হাতে আট দশটা ভূতের ঘাড় চাপিয়া ধরিল। বড় বড় নখগুলি তাহাদের গলায় বিঁধিতে লাগিল—সে ত নখ নয়, যেন জাহাজের নঙ্গরের এক একটা দাঁত।

তাপাই বলিল, "মামা, রক্ষা কর, বলছি, তোমার টাকা কি হ'লো।" বাঁড়ু বলিল,—"ভাল চাস ত শিগ্গির বল।"

তখন সমবেত ভূতেরা তাহাদের বিচিত্র কণ্ঠ হইতে সরু, মোটা, আনুনাসিক নানা প্রকার শব্দ বাহির করিয়া তাপাইয়ের পিতার উত্তমর্ণ তাহার হঠাৎ আবির্ভাব, এবং বিকট বোম্বাই কিলের উৎকট কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল; সমস্ত কথা শুনিয়া বাঁড়ু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে ভূতের হাসি বড় ভয়ানক। বৈশাখের ঝটিকার মত সেই শব্দে সমস্ত গাছপালা ঘোর আন্দোলিত হইতে লাগিল। বাঁড়ু সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ওরে আহাম্মুখের দল,

ভূতে কি মানুষের কাছে টাকা ধার করে? আর যদিই করে, তবে কি তা ফিরিয়ে দিতে হয়? যখন সেই বিট্‌লে বামুন টাকা নিতে এল, তখন তাকে আচ্ছা করে পিটিয়ে দিলিনে কেন?"

তাপাই বলিল, "পড়তে যদি সে ঠাকুরের পাল্লায়, তবে বুঝ্‌তে কেমন মজা; পিটাইবার অভ্যাস আমাদের চেয়ে তার অনেক বেশী; তার সেই বোম্বাই কিলের চোটে আমার পিঠ এখনো কট্‌কট্‌ করচে, আমরা ভূত, তাই এখনো বেঁচে আছি।"

বাঁড়ু ঘৃণাভরে উত্তর করিল, "তোদের মরাই ছিল ভাল, তোরা ভূতের নাম হাসালি। এখন বল্‌, সে ঠাকুরের আস্তানা কোথায়? আমি আর স্থির থাকৃতে পাচ্ছিনে, হাত নিস্‌ পিস্‌ কচ্ছে, এখনি সে ঠাকুরের টিকি ধরে, তাকে বার কত ঘুরপাক খাওয়াই।"

ভেঙ্গড়ো বলিল, "তার বাড়ী দেখান আমাদের কর্ম্ম নয়। ঠাকুর বলে দিয়েছে, তার বাড়ীতে ভোম্বলের চামড়ার তৈয়ারী কৃষাণদের আশ্‌মানী পানাই আছে, কার ঘাড়ে তিনটে মাথা যে, সেখানে যাবে।"

বাঁড়ু উত্তর করিল, "মানুষটা দেখাতে না পারিস, বাড়ী দেখাতেও এত ভয়? সে ঠাকুরের যদি বাড়ী না দেখাস ত আমি এক একটাকে আস্ত রাখবো না, এখনই চ আমার সঙ্গে, আমি তোদের কোনও কথা শুন্‌তে চাই নে।"

তখন ভূতেরা অগত্যা দূর হইতে বাড়ী দেখাইতে সম্মত হইল, এবং গ্রামের প্রান্তে এক অশ্বথ গাছে চড়িয়া বলিল, "ঐ দেখ, ঐ পাকা বাড়ী।"—এই কথা বলিয়াই তাহারা তৎক্ষণাৎ নিজের আড্ডায় পলায়ন করিল।

বাঁড়ু সমস্তদিন সেই অশ্বথ গাছে বসিয়া থাকিল, কেবল ভাবিতে লাগিল, কখন সন্ধ্যা হইবে, কখন ব্রাহ্মণের বাড়ীতে পড়িয়া একটা লণ্ড ভণ্ড বাধাইব।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। বাঁড়ু ধীরে ধীরে সেই বাড়ীর কাছে আসিল। বলা বাহুল্য, এ বাঞ্ছারামের বাড়ী নহে, ইহা ঘটোৎকচ শিকদারের বাড়ী। বাঁড়ু সাহ্লাদে দেখিল, বাড়ীর প্রাচীরের কাছে একটা প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছ, তাহার একটা মোটা ডাল বাড়ীর ভিতরের দিকে হেলান রহিয়াছে। সে সেই ডালের উপর বসিয়া দুই দিকে দুই পা ঝুলাইয়া দিল, রোষকষায়িত দৃষ্টিতে ভ্রুকুটী করিয়া সে বাড়ীর মধ্যকার সমস্ত জিনিস দেখিতে লাগিল।

এখন সকাল বেলা হইতে শিকদারের একটা এঁড়ে গরু হারাইয়াছে। এঁড়েটা ভারি চোরা খায়। বেড় বাতড় কিছু মানে না,—কাহারও কলা-বাগানে ঢুকিয়া

কলা গাছ ভাঙ্গিতেছে, কলায় পাতা চিবাইতেছে; কারও গমের ক্ষেতে পড়িয়া রাতারাতি বিঘে থানেকের গম নষ্ট করিতেছে; এই রকম অবস্থা! অনেক দিন গৃহস্থেরা গালাগালি দিয়াছে, তাহাকে খোঁয়াড়ে দিয়া আসিয়াছে, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। গতরাত্রে সে গলার দড়া ছিঁড়িয়া গোয়ালঘর হইতে অদৃশ্য হইয়াছিল। গ্রামের মধ্যে তন্ন-তন্ন করিয়া খোঁজা হইল, নিকটে যত খোঁয়াড় ছিল, দেখা হইল, এঁড়ে আর পাওয়া যায় না। অবশেষে ঘটোৎকচ ঠিক করিল, এবার তাহাকে পাওয়া গেলে একগাছ বিশ হাত লম্বা শণের দড়ী দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে, একবারও ছাড়িয়া দিবে না। লাঙ্গল হইতে আসিলেই তাহাকে সেই দড়ী দিয়া বাঁধিয়া নিজের বাগানে চরিতে দিবে।

এই এঁড়ে গরুটি লেজশূন্য, এই জন্য সকলে তাহাকে বেঁড়ে বলিয়া ডাকিত। বেঁড়ে বড় দুষ্ট এঁড়ে।

পঞ্চম পর্ব্ব।—'পালা, পালা, ঐ দড়ি!'

সন্ধ্যাকালে তেঁতুলের ডালে বসিয়া রাঁড়ু ভূত যখন কট্‌মট্‌ করিয়া শিকদারের বাড়ীর ভিতর চাহিতেছিল, ঠিক সেই সময় ঘটোৎকচের বার বছরের ছেলে নিধিরাম দিনের বেলায় রান্না কড়কড়ে ভাত খাইয়া আঁচাইতেছিল। সে আপন মনেই আঁচাইতেছে, একেবারে দেখে নাই যে, একটা বিকট ভূত তাহার দশ হাত তফাতে বসিয়া তাহার দিকে তীব্রদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, এবং তাহার ঘাড় মট্‌কাইবার অবসর খুঁজিতেছে।

হঠাৎ খট্‌খট্‌ করিয়া কি একটা শব্দ হইল। নিধিরাম মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, তাহাদের পলাতক এঁড়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া আহার-অন্বেষণে ফেনজল ফেলিবার গামলার কাছে যাইতেছে।

সমস্তদিন যাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই, সে আপনি বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া বালকের মনে ভারি আহ্লাদ হইল, সে উচ্চৈঃস্বরে তাহার পিতাকে ডাকিয়া সহর্ষে বলিল, "বাবা, বাবা, বেঁড়েকে সমস্ত ঘরে ধ'রে খুঁজে হায়রাণ হওয়া গিয়েছে, ঐ দেখ, এখন আপনিই এসেছে।"

বাঁড়ু একটু বিচলিত হইল; মনে মনে কিঞ্চিৎ অস্বচ্ছন্দতা বোধ করিতে লাগিল; ভাবিল, "এ ত বড় মজার ব্যাপার দেখছি! একটা দুধের ছেলে পর্য্যন্ত আমাকে চেনে, আমার নাম জানে! এর মানে কি?"

নিধিরাম মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমি ত জানি যে, বেঁড়ে সন্ধ্যেবেলা

আসবেই আস্‌বে, বাবা ত ভেবেই অস্থির, বলেন, যদি না আসে ত রাত্তিরে আবার তার কোথায় খোঁজ পাওয়া যাবে ?"

বাঁড়্‌ ভাবিল, "না, আমাকে দেখ্‌তে পায়, এমন যায়গায় বসা ভাল হয় নি ; তাপাই সত্যিই বলেছিল, ঠাকুর বড় সাধারণ লোক নয়। আচ্ছা, আমার জন্যে এরা অস্থির কেন ? সন্ধ্যাবেলা আমি আসবো, তাই বা কেমন করে' জান্‌লে ? আমি এত বড় ভূতের সর্দ্দার, আমার মনেই যে ভয় ঢুকছে। এখন কি করা যায় ? আজকের মত স'রে পড়বো নাকি ?"

নিধিরাম পুনশ্চ বলিল, "পালাবে, তা মনে করো না ; বিশ হাত শক্ত শণের দড়ী রাখা হয়েছে। পাটের পুরোণো দড়ী নয় যে, এক টান মেরে' ছিঁড়ে স'রে পড়বে ! আজ তোমার দুই শিংয়ে এখনই সেই দড়ী দেওয়া যাচ্ছে, তার পর নাদ্‌না ক'সে তোমাকে দুরন্ত করা যাবে।"

বাঁড়্‌ আরও ভীত হইল। বন্ধনভয়ে তাড়াতাড়ি দুই হাত দিয়া দুই শিং ঢাকিয়া ফেলিল ; তা সে বিশাল শিং কি ছাই হাতে ঢাকা যায় ? বাঁড়্‌ ধীরে ধীরে গাছের আড়ালে মুখখানি লুকাইয়া সরিয়া বসিল।

এমন সময় এঁড়েটা ফেনজল যাহা ছিল, নিঃশেষ করিয়া একটু দূরে গেল। নিধিরাম হাঁকিল, "বাবা, বেঁড়ে অস্থির হ'য়ে উঠেছে, আর বেশী দেরী করা ভাল নয়। তুমি কচ্ছো কি ? দড়ী গাছটা এ দিকে ফেলে দাও না, তোমার আসবার দরকার নেই, আমিই ওকে বাঁধছি, আমি ওর শিংকে ভয় করি নে।"

বাঁড়্‌ আরও ভীত হইয়া আর একটা ডালে গিয়া ঘনপাতার মধ্যে বসিয়া দেখিতে লাগিল, ভাবিল, এ ছোট ছেলেটাই যখন আমার শিংকে ভয় করে না—বল্‌ছে, তখন ত ওর বাপ দেখ্‌ছি, ভিজে জমী হ'তে মূলো তোলার মত আমার শিং দুটো এক টানে উপড়ে ফেল্‌তে পারে। ত দেখ্‌ছি, মিথ্যে কথা বলেনি।"

গরুটা হন্ হন্ করিয়া বাহিরের দিকে চলিল। নিধিরাম ব্যস্ত হইয়া বলিল, "বাবা, বেঁড়ে বুঝি পালায়, পালালে কিন্তু ধরা শক্ত হবে, কাঁহাতক রাত্রে মাঠে মাঠে ঘুরে ওর খোঁজ করে বেড়ান যাবে ? শিগ্‌গির দড়িটা দাও।"

ঘটোৎকচ বিশ হাত শণের দড়ীগাছটা 'সড়াৎ' করিয়া পুত্রের কাছে ফেলিয়া দিল। দীপালোকে সভয়ে বাঁড়্‌ দেখিতে পাইল, ভারি মোটা দড়ী—একেবারে নূতন। আর সেখানে অপেক্ষা করা শ্রেয়ঃ নহে ভাবিয়া সে তাড়াতাড়ি গাছ হইতে নামিয়া পড়িতে লাগিল।

গরুটা বাহির হইয়া গেল দেখিয়া নিধিরাম দড়ী হাতে লইয়া ঘর হইতে উঠানে নামিল, বলিল, "পালাস কেন, আর একটু দাঁড়া।"

গাছ হইতে নামিয়া পড়িয়া বাঁড়ু ছুটিতে লাগিল। এ দিকে দড়ী-হস্তে শিকদার-পুত্রকে পশ্চাদ্ধাবিত হইতে দেখিয়া বেঁড়েও লেজ তুলিয়া চোঁচা দৌড় দিল!

বাঁড়ু হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া একটা ফাঁকা যায়গায় দাঁড়াইল। দেখিল, তাহার দুর্দ্দশা দেখিতে তাপাই ও অন্যান্য ভূতেরা সেই দিকে আসিতেছে। তাপাই হাসিয়া বলিল, "কি মামা, দৌড়োও যে? বামন বুঝি আশ্‌মানী পানাই বের করেছে? কেমন, আমরা যা বলেছিলাম, তা সত্যি কি না?"

বাঁড়ু হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "পানাই ত ভাল, এ এমনি মোটা শণের দড়ী, একেবারে নূতন! তবু এখনও বামন বেরোয় নি, তার ছেলেটা আমার শিংএ দড়ী দিতে বেরিয়েছে।"

তাপাই বলিল, "মামা বড় সাহসী! আমরা এক পিঠ নিয়েই অস্থির, তার উপর আবার শিং! শিং থাকলে কি আমরা কাল বাঁচতাম?"

বাঁড়ু বলিল, "কাজ নেই বাবা আর এ মাঠে, এমন লোক যেখানে থাকে, তার তে-সীমানায় থাকতে নেই। রোজা টোজা বরং ভাল, জলপড়া টলপড়া দেয়, কখনও তাতে আমাদের কষ্ট দেয়, কখনও নয়। এ যে আস্ত দড়ী!"

ভূতেরা সমস্বরে বলিল, "ঠিক বলেছ মামা, চল, এখনই পালাই।"

বাঁড়ু উত্তর করিল, "রোস বাপ সকল, আমি বড় হাঁপিয়েছি, একটু জুড়িয়ে নিই।"

এ দিকে এঁড়েকে পলাইতে দেখিয়া ঘটোৎকচ শিকদার নিজে, এবং তাহার তিন জন রাখাল লণ্ঠন জ্বালিয়া সেই বিশ হাত শণের দড়ী লইয়া মাঠ পর্য্যন্ত তাহার খোঁজে আসিল, যদি ধরিতে পারে ত বাঁধিয়া লইয়া যাইবে।

বাঁড়ু নিবিষ্টচিত্তে কথা কহিতেছিল। জম্বু ভূত দূরে লণ্ঠনের আলো দেখিতে পাইল, সভয়ে বলিল, "মামা, তারা বুঝি তোমার সন্ধানে আস্‌ছে, ঐ আলো!"

সকল ভূত আশ্চর্য্য হইয়া সেই দিকে চাহিল; বাঁড়ু ত্রস্তভাবে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিল, বলিল, "পালা, পালা, ঐ দড়ী!"

উপসংহার।

সেই রাত্রেই ভূতেরা দেশছাড়া হইয়া গেল। কেশবপুরের ত্রিসীমানার মধ্যে আর কখনও কোনও ভূত আসিতে সাহস করে নাই, এবং সুবলপুরের মাঠেও আর

কিছুমাত্র ভূতের ভয় রহিল না। রাত্রিকালেও সে মাঠ দিয়া অনায়াসে লোক যাতায়াত করিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণের অবস্থা ফিরিয়া গেল। বাড়ী নূতন হইল, গৃহিণীর পৈতা কাটাও ঘুচিয়া গেল। সকলে জানিল, ভূতের রোজা হইয়া বাঞ্ছারামের হাতে দু' পয়সা সংস্থান হইয়াছে; গৃহিণী স্নান করিতে গিয়া গল্প করিল, "আমাদের কর্ত্তাটি একরাত্রে গাঁকে ভূত-ছাড়া করিয়াছে।" বাঞ্ছারাম ছিল পুরোহিত, হইল রোজা! কিন্তু সে তাহার হাতযশ দেখাইবার অবসর পাইল না! তাপাইয়ের দল দেশে দেশে তাহার বোম্বাই-কিলের কথা রটাইয়া দিল; কোন ভূতের সাধ্য যে, সে দিকে আসে?

বাঁড় মানস-সরোবরের ধারে কায়েমী আড্ডা গাড়িল। তাপাই প্রভৃতি বারো ভূত কোথাও আশ্রয় না পাইয়া মহাদেবকে গিয়া ধরিল। মহাদেব তাহাদের মুখে সকল কথা শুনিয়া ও তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়া দয়া করিয়া বলিলেন, "আমার হুকুম, বড়লোকের যে সকল কাণ্ডজ্ঞানরহিত পুত্র এবং পোষ্যপুত্র আছে, তাদেরই ঘাড়ে তোদের আজ হইতে স্থান হইল। তোরা তাদের বিষয় নিরাপদে ভোগদখল করিবি, কেহ তোদের কোনও অনিষ্ট করিতে পারিবে না।"

"আর, এই গল্প আজ হইতে দেশে দেশে প্রচার হউক। যে এই গল্প মনোযোগ দিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শুনিবে, ইহজন্মে তাহার আর ভূতের ভয় থাকিবে না। আর যে বাড়ীতে এই গল্প পাঠ করা হইবে, সে বাড়ীর কাছে কখনও ভূত আগাইতে পারিবে না।"

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

'পীপল্‌কা পেড়'।

১

প্রয়াগ হইতে চব্বিশ পঁচিশ ক্রোশ,—দেহাতে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। খুব বড় গাঁও। এই গ্রামেই জমীদারের বাস।—আমার সঙ্গী এক জন কালোয়াৎ। খেয়াল-ধ্রুপদে সিদ্ধ। গানেই তাঁহার আনন্দ। ওস্তাদজী সহজেই শ্রোতার চিত্ত অধিকার করিতেন। ওস্তাদজী নাতি-খর্ব্ব, নাতি-দীর্ঘ। কৃশও নন, স্থূলও নন। সুতরাং তাঁহাকে দেবদারুর মত সরল বা গণেশের মত 'খর্ব্বস্থূলকলেবর' বলা যায় না। বর্ণ গৌর। উজ্জ্বল ডাগর চক্ষু। নাসিকা খগচঞ্চুর নিন্দা না করুক, দৃঢ়তার পরিচায়ক।

অধরোষ্ঠে প্রশান্ত স্মিত-রেখা—যেন মিষ্ট, সরল, সহজ হাসির নির্ঝর। তাঁহার উপর দিব্য জমকালো গোঁফ—কিন্তু শ্মশ্রুর বালাই নাই। প্রশস্ত ললাট—চন্দনে চর্চ্চিত। টানা-টানা ভাসা-ভাসা চোখের উপর ভাসমান ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে রক্ত-তিলক; চন্দনের কি কুঙ্কুমের, বলিতে পারি না। ওস্তাদজীর গলায় সোনার মোটা মোটা আমলকীর মত দানার কণ্ঠমালা—'কলারে'র মত কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া আছে। আজ পরিধানে ধুতি—মেরজাই। কিন্তু মজলিসে তিনি পাজামা পরিতেন। গায়ে এক-খানি দোরোখা কাশ্মীরী শাল। ময়মনসিংহ মুক্তাগাছার —রাজা বাহাদুরের পুরস্কার। মস্তকে দিব্য সুপুষ্ট, সুচিক্কণ, স্থূল—বাঙ্গালার টিকী নয়—হিন্দুস্থানের শিখাগুচ্ছ। এখনকার কবিরা এই শিখা দেখিয়া ব্যঙ্গ করিয়া সনেট লিখিলে কেহ নিন্দা করিবে না। ওস্তাদজী বড় সরল, সদালাপী। চেহারায় যেন উদারতা ফুটিয়া উঠিতেছে। মুখের হাসিটুকু যেন ডাকিয়া বলিতেছে,—ইহাকে অবিশ্বাস করিও না। চক্ষু দুটি যেন সত্যের আরসী। ভ্রমণ-সুখের অপেক্ষা সদাপ্রফুল্ল ওস্তাদজীর সঙ্গ আমার অধিক প্রিয়—উপভোগ্য বোধ হইতেছিল।

প্রশস্ত রাজপথ। উভয় পার্শ্বে তরুশ্রেণী—এমন 'বারাসাত' বুঝি বাঙ্গালায় সম্ভব নয়। বড় বড় আম ও জাম ও নিমের শ্রেণী। ঘনপত্রশালী মরকত-হরিত বৃক্ষের সারি পথে ছায়া করিয়া অতীতের সাক্ষীর মত দাঁড়াইয়া আছে। মধ্যে মধ্যে অশ্বত্থ ও বটের সারি চলিয়াছে। অস্তগামী সূর্য্যের কিরণ-প্রদীপ্ত অপরাহ্ন। মধ্যে মধ্যে বায়ু শ্বসিতেছে। অশ্বত্থ-পত্র থর-থর করিয়া কাঁপিতেছে;—মৃদু মর্ম্মর আমাদের কানে বাজিবার পূর্ব্বেই 'মোটরে'র গম্ভীর ঘর্ঘর অওয়াজে ডুবিয়া যাইতেছে। মধ্যে মধ্যে একা ও বয়েলের গাড়ী উন্মত্ত দৈত্যের মত ধাবমান 'মোটর' দেখিয়া রাস্তার এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইতেছে। কখনও বা একখানা বয়েল-গাড়ীর দীর্ঘশৃঙ্গ বাহনযুগল ভয়ে একবারে রাজপথ ছাড়িয়া ক্ষেতে গিয়া নামিতেছে। গাড়ীর ঘর্ঘর ও বয়েলের গলার ঘণ্টাধ্বনি, আরোহীদের কলরব ও চালকের সাধুভাষার সহিত মিশিতেছে।—গরুর গাড়ীর ছাউনীর ভিতর হইতে কচিৎ বা চুনুরিয়া শাড়ীর রঙ্গের ছটা, কখনও বা বৃহৎ নথে দোদুল্যমান মুক্তা, কখনও বা খঞ্জন-নয়নের চকিত কটাক্ষ চোখে পড়িতেছে। গ্রাম-প্রান্তে কুকুরের পাল দূরে থাকিয়া হাওয়াগাড়ীর অনুসরণ করিতেছে—তাহাদের চীৎকারে একতানতা আছে। মধ্যে মধ্যে মোটর-চক্র-পিষ্ট কুকুরের শবদেহ পড়িয়া আছে। ইহারা চীৎকার করে, চাপা পড়ে, এবং মরিয়া যায়। ধূলি-কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করিয়া আমরা অগ্রসর হইলাম। ওস্তাদজীর গুম্ফ ও শিখা ধূলায় ধূসরিত হইয়া

উঠিল। কিন্তু তাঁহার মুখের হাসিটুকু কিছুতেই মলিন হইল না। সে হাসি ত ম্লান হইবার নয়।

৩

'শফার' বলিল, "এঞ্জিন গরম হইয়াছে।" মোটরের দূর-মান-যন্ত্রে দেখিলাম, প্রায় আটচল্লিশ মাইল আসিয়াছি। ওস্তাদজী বলিলেন, "বাবু সাহেব, পূরবীর সময় হইয়াছে। এখন মোটরের হা-হুতাশ বন্ধ থাকুক। ঐ তালাও দেখা যাইতেছে। 'সন্ধ্যা' সারিয়া লই। ব্রাহ্মণের বিধান লঙ্ঘন করিব না।—আপনি ত ব্রাহ্মণ।—তা, আপনারা—"

আমি বলিলাম, "না; আমরা ও সব আচার ত্যাগ করিয়াছি।"

ওস্তাদজী বলিলেন, "বাবুজী, আসুন—আপনি একটু পায়চারী করুন। তার পর, আমি চৌদ্দপুরুষের হুকুমটা তামিল করিয়া আপনাকে একবার ঐ গ্রামে লইয়া যাইব।"

আমি ওস্তাদজীর সঙ্গে চলিলাম। তিনি সেই দীর্ঘিকার জলে শুচি হইয়া সন্ধ্যা-বন্দনা শেষ করিলেন।

ওস্তাদজী বলিলেন, "সায়ংকৃত্যটা একটু আগে সারিতে হইল। এখন গোধূলি। চলুন, গ্রামে যাই।"

উভয়ে অগ্রসর হইলাম। সঙ্কীর্ণ গ্রাম-পথে গো-পাল চলিয়াছে; তাহাদের ক্ষুরোত্থিত ধূলি আকাশে উড়িয়া গোধূলির রক্তচ্ছটায় কালিমার আরোপ করিতেছিল। অদূরে গ্রামমধ্যে গ্রামবাসীদের কুটীর হইতে ধূম উঠিয়া আসন্ন-সন্ধ্যার ছায়া গাঢ়তর করিতেছিল। দূরে—দুই একটী দীপ জ্বলিয়া উঠিতেছিল। আমরা বাজার অতিক্রম করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিলাম। হরিত-বনানী-বেষ্টিত গ্রাম। উচ্চ তরুকুঞ্জের উপরে, আকাশপটে যেন একটি সৌধ সহসা ফুটিয়া উঠিল। আমি বলিলাম, "ওস্তাদজী, এত ক্ষুদ্র গ্রামে এমন বালাখানা! ও কাহার দৌলতখানা?"

ওস্তাদজী তাঁহার সেই স্বাভাবিক হাসির উপর আর একটু হাসি ফুটাইয়া বলিলেন, "বাঁয়ে—এই বাগানের ভিতর দিয়া যাই, শীঘ্র পঁহুছিব—আপনাকে ঐখানেই লইয়া যাইতেছি।"

একটু পরে সেই প্রাসাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম।

দুই এক জন গ্রামবাসী আমাদের সঙ্গে আসিতেছিল।—এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই। অল্পক্ষণের মধ্যে সেই প্রাসাদের সম্মুখে ক্ষুদ্র জনতার সৃষ্টি হইল।—

আমরা এখানে দ্রষ্টব্য বস্তু। বাঙ্গালায় যেমন গ্রামবাসীরা ইংরেজকে সেলাম করে, এখানে আমরা সেইরূপ আভূমি-নত ভক্তের সেলাম ভোগ করিতে লাগিলাম। 'কভি লাও পর গাড়ী, কভি গাড়ী পর লাও!' কোনটা স্বাভাবিক?

আশ্চর্য্য! অত বড় প্রাসাদে সন্ধ্যা-দীপের ক্ষীণ রশ্মিও দেখিলাম না। বিরাট পুরী যেন মূর্চ্ছিত,—অথবা মৃত!

ওস্তাদজী বলিলেন,—"বাবু সাহেব, চৌকীদার পর্য্যন্ত এ বাঁড়ীতে থাকিতে চায় না।"

দেখিলাম, সেই বিপুল প্রাসাদে যেন চিরনীরবতা কায়েম হইয়া বসিয়াছে।—কি ভীষণ পরিত্যক্ত পুরী! সন্ধ্যার অন্ধকারে এ কি বেদনা আমার জন্য সঞ্চিত হইয়া ছিল।—দেখিলাম,—নিস্তব্ধপুরীর নীরবতা কেবল কপোতে ভঙ্গ করিতেছে। তাহারাই উড়িয়া আসিয়া এই শূন্যপুরীতে জুড়িয়া বসিতেছে।

ওস্তাদজী বলিলেন,—এই শ্মশানেও তাঁহার মিষ্ট হাসির বিরাম নাই,—"কবুতরের ডর নাই। গভীর রাত্রে বাদুড়ের দল ইহাদের সহিত মিলিবে। মানুষ—এ পুরীর ত্রিসীমানায় আসিবে না।"

আমি বলিলাম, "কেন?"

ওস্তাদজী বলিলেন, "যে ভয়ে আমি সন্ধ্যা করি—ধর্ম্মকে ধরিয়া থাকি। ব্রহ্মণ্যদেবের অভিশাপের ভয়ে।"

আমি একটু অধীর হইয়া বলিলাম, "ওস্তাদজী, ব্যাপারটা কি খুলিয়া বলুন।"

বঙ্কিম বাবুর "কৃষ্ণকান্তের উইলে" আপনারা যে ওস্তাদজীর সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন, যিনি বলিয়াছিলেন, "এক বাৎ ছোড়কে দো বাৎ হুয়া", আমার ওস্তাদজী সে শ্রেণীর অন্তর্গত নন। তিনি "দো বাৎ ছোড়কে" প্রায়ই দু'শো বাৎ ব্যবহার করিতেন—গল্প না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। আজ তাঁহার এই ওজন-করা কথার ব্যাসাতি দেখিয়া আমি একটু বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। ওস্তাদজী তাহা বুঝিতে পারিলেন,—বলিলেন, "চলুন—সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে যাই। সেখানে গিয়া এই পড়ো বাড়ীর গল্প করিব।"

৩

ওস্তাদজী ইমন ভাঁজিতে ভাঁজিতে অগ্রসর হইলেন। আমরা সঙ্গে চলিলাম। কাহারও কুটীরের পার্শ্ব দিয়া, কাহারও আঙ্গিনার উপর দিয়া, একটা বড় আমবাগান পার হইয়া, আমরা একটু উন্মুক্ত ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম।

মুক্তক্ষেত্রের পূর্ব্বপ্রান্তে একটি শান-বাধান বেদী। তাহার মধ্যস্থলে একটি দীর্ঘ, ক্ষীণ, অপুষ্ট, শাখাশূন্য বৃক্ষ।

ওস্তাদ্‌জী অগ্রসর হইলেন; সেই বেদীমূলে প্রণত হইয়া আলবালের ধূলি গ্রহণ করিয়া মাথায় দিলেন। তাহার পর বলিলেন, "বাবু সাহেব, এই বেদীর উপর পূর্ব্বে যে 'পীপলকা পেড়' ছিল, এই বৃক্ষজী নারায়ণ তাঁহার ক্ষেত্রেই বিরাজ করিতেছেন। কলিকাতার বাবুরা এখানে মাথা হেঁট করিবেন না, কিন্তু বিশ ক্রোশের লোক এই নারায়ণের পূজা করে।"

আমি একটু অসহিষ্ণু হইয়াছিলাম। ওস্তাদজীকে বলিলাম, "আপনি কখন ভাঙ্গ খাইয়াছেন, আমাকে একটু বখরা দিলেন না?"

ওস্তাদ্‌জী বলিলেন, "না, বাবু সাহেব। এ নেশার কথা নহে।" মেরজাইর অভ্যন্তর হইতে যজ্ঞোপবীত খুঁজিয়া টানিয়া বাহির করিয়া মাথায় রাখিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, "বাবুজী, এই 'পীপল্‌কা পেড়ে'র সামনে ঐ যে মোকাম দেখিতেছেন, ঐ মোকামে মিশির বাস করিতেন।"

"তার পর?"

"মিশির বড় গরীব ছিলেন। ক্রমে তাঁহার সংসার অচল হইয়া উঠিল। মিশির শুধু নারায়ণকে ডাকিতেন।

"মিশিরের আয়ী—ঐ যে বেদী ও বৃক্ষ-নারায়ণ দেখিতেছেন—ঐখানে অশ্বত্থ-নারায়ণ প্রতিষ্ঠা করেন। বুড়ী রোজ সকালে অশ্বত্থনারায়ণের সেবা করিতেন। বৈশাখে জলের ধারা দিতেন। সেবায় অর্চ্চনায় নারায়ণ প্রসন্ন হইলেন। অশ্বত্থদেবতা ক্রমে ডালপালা বিস্তার করিয়া বড় হইয়া উঠিলেন।"

এক জন বুড়া সেলাম করিয়া বলিল,—"গ্রামের অনেকে নারায়ণের মাথায় জল ঢালিতে আসিত।"

ওস্তাদজী বলিলেন, "ক্রমে ভক্তের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। ভগবান মিশিরকে কৃপা করিলেন, জাগ্রত হইলেন। ক্রমে দুই একটা পয়সা পড়িতে লাগিল।—দূরদূরান্তর হইতে লোক মিশিরের অশ্বত্থনারায়ণকে মানসিক করিতে আসিত। নারায়ণ মানস পূর্ণ করিতেন। তাহারা পূজা দিত।

"মিশিরের ভাগ্য প্রসন্ন হইল।—নারায়ণ দয়া করিলেন, লক্ষ্মী নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না।—মিশিরের অন্নবস্ত্রের দুঃখ ঘুচিল। আর ঐ অশ্বত্থ-নারায়ণ মিশিরের প্রাণ হইয়া উঠিলেন।"

আমি অধৈর্য্য হইয়া বলিলাম, "তার পর

ওস্তাদজী বলিলেন, "ঐ যে দোতালা বাড়ীখানি দেখিতেছেন, মিশির ক্রমে ঐ বাড়ীখানি তৈয়ার করিলেন।"

আমি বাড়ীখানির দিকে চাহিয়া দেখিলাম—আমাদের দেশে যাহাকে মাটকোঠা বলে, তাহাই। সম্মুখে একটু বারান্দা আছে। বারান্দার উপর ছাদ। ছাদের গড়ানে কড়িগুলি বারান্দা অতিক্রম করিয়া সম্মুখের ভূমির উপর একটু ঝুঁকিয়া আছে।

ওস্তাদজী বলিলেন, "পীপল্‌কা পেড় ক্রমে খুব জম্‌কালো হইয়া উঠিল। গ্রামের লোকে চাঁদা করিয়া পাকা বেদী বাঁধাইয়া দিল। পরে বছরে এক-বার অশ্বত্থ-নারায়ণের মেলা হইতে লাগিল।"

এক জন গ্রামবাসী বলিল, "মেলার দুই বৎসর পরে বেদী বাঁধা হইয়াছিল।"

আর এক জন বলিল, "না, বেদী বাঁধিবার পর মেলা বসিয়াছিল।"

ওস্তাদজী বলিলেন, "চুপ। বাবুজী, আপনি যে নির্জ্জনপুরী দেখিয়া আসিলেন, ঐ পুরীতে গ্রামের জমীদার বাস করিতেন। তিনি ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধির দোষে—"

আমি বলিলাম, "ওস্তাদজী, সংক্ষেপ করিয়া লউন। রাত্রি হইতেছে। চলুন, বরং শুনিতে শুনিতে—"

"না, বাবু সাহেব, এই জমীনে দাঁড়াইয়াই শুনুন। এখনই শেষ করিতেছি।—জমীদার বড় প্রবলপরাক্রান্ত ছিলেন। হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া। গোয়ালে যেমন গরু, তেমনই বয়েল। ক্ষেত খামারের সংখ্যা ছিল না।"

"সব কি জিনিতে উড়াইয়া লইয়া গেল?"

"না, বাবু সাহেব। একটু ধৈর্য্য ধরুন।—জমীদারের অনেক হাতী ছিল। মাহুতেরা হাতীগুলিকে লইয়া দেহাতে চরাইতে যাইত। সোয়ারী হাতী গ্রামে থাকিত।

"গ্রামে হাতী থাকিলে গরীব প্রজার ক্ষেত খামার বাগান বাগিচা প্রায় থাকে না। সবই হাতীর পেটে যায়।—চারি দিকে গাঁওয়ারদের সর্ব্বনাশ করিয়া একদিন মনপেয়ারী কুন্‌কীর মাহুত মিশিরের 'ভিটায় হাজীর হইয়া সেই পীপল্‌কা পেড়ের দিকে হাতী চালাইয়া দিল।—কোথায় দূরে ডাল-পালা খুঁজিয়া মরিবে,—মিশিরের নধরসুন্দর অশ্বত্থটি—উহার ডাল পালায় দু' এক দিন কাটিয়া যাইবে।—হাতী আগুয়ান হইল। মিশিরে অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—'দেশে ত গাছপালার অভাব নাই। তুমি আমার দেবতাকে স্পর্শ করিও না'।"

মাহুত,—বড় মানুষের বান্দা সে কথায় কাণ দিল না।—সে হাতীকে আগু বাড়াইতে লাগিল।

মিশির হাতীর সম্মুখে শুইয়া পড়িলেন। একটা শোরগোল পড়িয়া গেল। মিশিরের তিন ছেলে,—জোয়ান পাট্টা—লাঠী শোঁটা লইয়া অগ্রসর হইল।

"মিশির বলিলেন, 'বাবারা ঠাণ্ডা হও; ধর্ম্ম আমাদের রক্ষা করিবেন। নারায়ণ দণ্ডমণ্ডের কর্ত্তা। তোমরা কে? যদি লাঠী চালাও, আমি মাথা কুটিয়া রক্তগঙ্গা হইব।'

"তিন পাট্টা লাঠী ফেলিয়া দিয়া, সাপুড়ের ধূলোয় অন্ধ সাপের মত গজরাইতে লাগিল।

"মিশির কৃতাঞ্জলিপুটে মাহুতকে বলিলেন, 'তুমি একটু সবুর কর। আমি তোমার মনিবের কাছে যাইতেছি। তিনি আমার রাজা। যদি আমার আর্জী না শোনেন,—ধর্ম্ম যদি আমার প্রতি প্রসন্ন না হন,—তুমি এই পীপলকা পেড় হাতীর পেটে দিও।'

৪

"মিশির উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন। জমীদার তখন কাছারী করিতেছিলেন।—মিশির দপ্তরে ঢুকিয়া তাঁহার সম্মুখে আছাড়িয়া পড়িয়া বলিলেন, "হুজুর, গরীব-পরোয়ার, আমাকে রক্ষা করুন।

"জমীদার আলবোলার নল মুখ হইতে একটু সরাইয়া বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—'ব্যাপার কি?'

"মিশির কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—'হুজুর, আমাকে রক্ষা করুন।—আপনার মাহুত আমার পীপল্‌কা পেড় হাতীর খোরাকের জন্য ভাঙ্গিতে চায়।—আমাকে রক্ষা করুন।'

"জমীদার বলিলেন, 'মিশির, তুমি বড় বজ্জাত। আমার হাতী কি না খাইয়া মরিবে? দেশের লোকে আমার হাতীর ডাল-পালা যোগাইবে, আর তোমার—'

" 'হুজুর, ঐ গাছই যে আমার ইহকালের অন্ন, পরকালের স্বর্গ; দোহাই আপনার, আমাকে রেহাই দিন।'

"জমীদার বলিলেন, 'এ কি ফ্যাসাৎ। কে আছিস,—মাহুতকে হুকুম দিয়া আয়—এখনই মিশিরের অশথ-কা পেড় হাতীর খোরাকে লাগায়।'

"মিশির গলায় বস্ত্র দিয়া, হাতে পৈতা জড়াইয়া, জমীদারের পায়ে লুটিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'আমার এ সর্ব্বনাশ করিবেন না।'

"জমীদার বলিলেন, 'তোমরা কি তামাসা দেখিতেছ? ইহাকে গর্দ্দানা দিয়া বিদায় করিবার লোক কি এ কাছারীতে নাই?'

"মিশির উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, 'হুজুর, আছে। আমি যাইতেছি—কিন্তু বলিয়া যাই—ব্রহ্মহত্যা না করিয়া আপনি আমার দেবতাকে নষ্ট করিতে পারিবেন না। সাবধান,—যদি ব্রহ্মহত্যা-পাতকে ভয় থাকে, আমার দেবতাকে রক্ষা করুন। হাতী ছুঁইলে আমার দেবতা বাঁচিবেন না। আমার দেবতা গেলে আমি এ পৃথিবীতে থাকিব না।'

"জমীদার বলিলেন, 'নিকালো; জাহান্নম্‌মে যাও।'

"কম্পিতকলেবর বৃদ্ধ ঊর্দ্ধশ্বাসে গৃহে ফিরিলেন। দেখিলেন, অশ্বত্থমূলে লোকারণ্য হইয়াছে। ভয়ে মাহুত অগ্রসর হইতে পারিতেছে না।

"মিশির বলিলেন, 'খবরদার—ব্রাহ্মণের শপথ, দেবতার হুকুম, কেহ মাহুতের গায়ে হাত দিও না।—দেবতা সাক্ষী, দেবতাই বিচার করুন। ব্রহ্মহত্যার পাতকে যাহার ভয় নাই, দেবতা ভিন্ন কে তাহাকে দণ্ড দিবে?'

"জনতা গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—'ঠাকুর, তুমি বাধা দিও না! প্রাণ থাকিতে এ গাছ আমরা ভাঙ্গিতে দিব না।'

"মিশির বলিলেন, 'একটু—এক লহমা সবুর কর—দেখ—ভগবান ইহার বিচার করেন কি না?'

"মিশির ছুটিলেন,—উল্কাবেগে বাড়ীতে প্রবেশ করিল।

"বিস্মিত জনতা দেখিল, মিশির বারান্দায় আসিয়া রেলিঙ্গের উপর দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধে অলিন্দ ধরিলেন—উত্তরীয় খুলিয়া অলিন্দের বরগায় বাঁধিয়া ফাঁসি প্রস্তুত করিয়া গলায় দিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—'ব্রহ্মণ্যদেব! তুমি সাক্ষী। আমার দেবতার অঙ্গহানি যেন দেখিতে না হয়—'

"মাহুত হাতী চালাইয়া দিল। হাতী অগ্রসর হইয়া শুঁড় বাড়াইয়া সেই নশ্বর সুন্দর পত্র-মর্ম্মর-মুখর অশ্বত্থের সুপুষ্ট শাখা ধরিয়া আকর্ষণ করিল। মড়্—মড়্—মড়্।

মিশির উগ্র আর্ত্তনাদ করিয়া উদ্বন্ধনে ঝুলিয়া পড়িলেন।

লোকারণ্য স্তব্ধ—মিশিরের তিন পুত্র ছুটিল,—ফাঁসী হইতে যখন মিশিরের দেহ নামাইল, তখন মিশির অশ্বত্থ-দেবতার রাজ্যে চলিয়া গিয়াছেন।

৫

"—বাবু সাহেব, তাহার পর তিন রাত্রি কাটিল না। জমীদারের পুত্র হাতীর

পায়ের তলায় পিষ্ট হইয়া মরিল।—তাহার পর ক্রমে ক্রমে দুই পুত্র গিয়াছে—দুই বউ মরিয়াছে। ঝি—জামাই—নাতী—পুতী কেহ নাই;—দেখিয়া বুড়ী মরিয়াছে। বুড়ার মরণ নাই।—ভয়ে বাড়ী, গ্রাম, দেশ ত্যাগ করিয়াছে—কিন্তু ব্রাহ্মণের অভিশাপ সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে। বুড়া এখনও আছে, কিন্তু বংশে বাতী দিবার কেহ নাই। ভয়ে ও পড়ো-বাড়ীতে চাকর চৌকিদার থাকিতে চায় না—পুরী শ্মশান হইয়া আছে।—বুড়া এখনও নৈনিতালে পক্ষাঘাতে পঙ্গু হইয়া পড়িয়া আছে।"

আমি বলিলাম, "অশ্বত্থ-নারায়ণ কি বুড়ার কিছু করিতে পারিলেন না?"

ওস্তাদজী বলিলেন, "সে ত তিলে তিলে পুড়িতেছে বাবুসাহেব! আপনারা এমন ফিরিঙ্গী হইয়া গিয়াছেন যে, এই সে দিনের এই সত্য ঘটনায় আপনার বিশ্বাস হইতেছে না?"

আমার একটু সঙ্কোচ হইতে লাগিল। বিশ্বাস কি এত সহজে করা চলে? কাক-তালীয় ন্যায়টা কি একেবারে ত্রিবেণীসঙ্গমে বিসর্জ্জন করিব?

ফিরিলাম। ধীরে ধীরে নীল আকাশে আগুনের ফুল ফুটিতে লাগিল। সেই আগুনের শিখা দীপ্ত জ্বালায় পরিণত হইয়া, আমার অন্তরে প্রবেশ করিয়া, আমার আজন্ম-সঞ্চিত অবিশ্বাস যেন পোড়াইতে লাগিল। আমি ভাবিলাম,—বিশ্বাস,—মিশিরের বিশ্বাস,—কি স্বর্গীয় বিশ্বাস! যার জন্য এই মমতার আধার প্রাণটা দিতে পারি, তাহা সত্য হউক, মিথ্যা হউক, তাহাই ধন্য! আর ওস্তাদজী, তোমার বিশ্বাস? কোন বিশ্বাসটা বড়? এই 'অচলায়তনে'র সচল যুগে, এই টিকী-নিগ্রহের সন্ধিক্ষণে, ওস্তাদজী, তোমার এ উদ্ভট আষাঢ়ে কাহিনী কে বিশ্বাস করিবে?

যেমন নক্ষত্র ফুটিতে লাগিল, মনেও তেমনই কত চিন্তা উঠিতে লাগিল,—ভাল হউক, মন্দ হউক, সত্য হউক, মিথ্যা হউক, এ ভারতে আবার মিশিরের বিশ্বাস ফিরিবে কি?

শ্রীসুরেশ সমাজপতি।

বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা।

[ষাট বৎসর পূর্ব্বের কথা।]

১

শরৎকাল, আশ্বিন মাস, কৃষ্ণপক্ষ, সম্মুখে মহালয়া অমাবস্যা। পরে দেবীপক্ষ পড়িবে, দেবীর আবির্ভাব হইবে, বঙ্গবাসী আনন্দে উৎফুল্ল। এখনও ভাদ্রমাসের ভরা নদী, কূলে কূলে জল, স্রোতস্বতী ভাগীরথী অবিশ্রান্তবেগে ছুটিতে ছুটিতে অনন্তস্রোতে গিয়া মিশিতেছে। এই সময়ে এক দিবস অপরাহ্নে কাঁঠালপাড়ার রাধাবল্লভজীউর ঘাটের উত্তর দিকে একটী বিস্তৃত ভূমিখণ্ডে বৃহৎ চন্দ্রাতপের নীচে অনেকগুলি লোক বসিয়া কথকতা শুনিতেছে। গ্রামের এক বর্ষীয়সী স্বর্গারোহণ করিবেন, সেই উপলক্ষে তাঁহাকে রামায়ণ শুনান হইতেছে। গ্রামের প্রাচীনগণ আনন্দ ছাড়িয়া ঐ স্থানে হরিনাম শুনিতেছেন; নিষ্কর্ম্মা যুবকগণ তাসখেলা গানবাজনা ত্যাগ করিয়া ও বালকগণ ছুটাছুটি ছাড়িয়া ঐ স্থানে কথক ঠাকুরের মুখপানে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে।

একখানি চৌকীর উপর পুরু গালিচাতে কথকঠাকুর বসিয়া আছেন। শীর্ণ ও শুষ্ক শরীর, দেহের মধ্যে কোনও স্থানে সরু মোটা নাই; নাসিকাটি বড় লম্বা ও তাহার উপরের ফোঁটাটিও তদ্রূপ লম্বা; নাসিকার উভয় পার্শ্বে চক্ষু দুটি এত ক্ষুদ্র যে দেখিলে ডেঁয়ো পিঁপড়ে মনে হয়। মস্তক কেশহীন, কণ্ঠে তুলসীর মালা, গলায় একছড়া ফুলের মালা, গাত্রে নামাবলী; সম্মুখে একখানি পুঁথি, উহাতে যথেষ্ট চন্দনের চিহ্ন,—বোধ হয় কথকঠাকুর প্রত্যহ উহার পূজা করিতেন; অথবা সরস্বতী-পূজার সময় উহার উপর প্রচুরপরিমাণে চন্দন ঢালিয়াছিলেন। তাঁহার পশ্চাতে একটী তাকিয়া; কথকঠাকুর বক্তৃতা করিতে করিতে, ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে, এক একবার ঐ তাকিয়াতে ঠেস দিতেছেন। তাঁহার হাত মুখ নাড়া বড় রহস্যজনক, বিশেষতঃ শ্বেত সুবৃহৎ দন্তগুলির জন্য আরও রহস্যজনক। ইনি স্থানীয় কথক, সময়াভাবে স্থানান্তর হইতে কথক আনা হয় নাই।

বেদীর বামপার্শ্বে কতকগুলি বালক বসিয়া কথকঠাকুরের মুখ প্রতি চাহিয়া আছে। তন্মধ্যে একটী বালককে দেখিলে অসামান্য বলিয়া বোধ হইবে; রূপবান্ বলিয়া নহে, তাহার মুখে কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাব ছিল; সেই জন্য তাহাকে সকলেই লক্ষ্য করিত। তাহার বয়ঃক্রম দশ এগার কি বার বৎসর হইবে। উপনয়ন হইয়াছে; এমন কি, বিবাহ হইয়াছে। বালিকাপত্নী মঙ্গলের কোলে.

কোলে বেড়াইত। বালকটী গৌরবর্ণ, ক্ষীণদেহ, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ সুগঠিত, মাথায় একরাশি কোঁকড়া কোঁকড়া কাল চুল। নাসিকা দীর্ঘ ও উন্নত। চক্ষু দুইটী অসাধারণ উজ্জ্বল, বড় চঞ্চল, এবং তাহার দৃষ্টি তীব্র। ঠোঁট দুখানি পাতলা ও চাপা; তাহাতে সর্ব্বদা হাসি থাকিত—(এমন কি, তাঁর মৃত্যুর সময়েও ঐ হাসি দেখিয়াছি)। বালকের গায়ে একটা সাদা জামা ছিল; shirt নহে, যাহাকে সেকালে পিরাণ বলিত। ইনিই বঙ্কিমচন্দ্র, ইঁহারই পিতামহীর স্বর্গারোহণ উপলক্ষে কথকতা হইতেছিল। তিন সপ্তাহকাল গঙ্গাতীরে বাস করিয়া পূজার ষষ্ঠীর দিন তাঁহার পিতামহী স্বর্গারোহণ করেন। বালক বঙ্কিমচন্দ্রের আশে পাশে চার পাঁচটী বালক বসিয়াছিল;—কেহ বা বয়োজ্যেষ্ঠ, কেহ বা বয়ঃকনিষ্ঠ। এই লেখকও ঐ দলে বসিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র কথকের মুখ প্রতি চাহিতেছেন, আর বয়স্যদিগকে কি বলিতেছেন, তাহারা টিপি টিপি হাসিতেছে। কথকতা এবং সঙ্গীত তাঁহার ভাল লাগিতেছিল না, ঐ সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিলেন, আর বালকেরা হাসিতেছিল। এই সময়ের দুই একটা কথা আমার অদ্যাপি স্মরণ আছে। ঐ কথাগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকালের রহস্যপ্রিয়তার পরিচায়ক বলিয়া নিম্নে প্রকটিত করিলাম।—

বঙ্কিমচন্দ্র। কথক ঠাকুরের নাকটা বড় পেটুক।

একটী বালক। মানুষ পেটুক শুনিয়াছি, মানুষের নাক পেটুক, এমন ত কথনও শুনি নাই।

বঙ্কিম। আমি তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি, শুন; কথক ঠাকুরের নাকটা ঠোঁট ছাড়াইয়া গালের ভিতর উঁকি মারিতেছে। দেখিতেছ ত?

বালক। হাঁ।

বঙ্কিম। কেন বল দেখি?

বালক। তা' জানিব কেমন ক'রে?

বঙ্কিম। কথক ঠাকুর যখন আহার করেন, তখন নাকটা গালের ভিতর হইতে আহারের দ্রব্যাদি চুরী করিয়া খায়, কথক ঠাকুর উহা জানিতে পারেন না।

এই কথায় বালকেরা উচ্চহাসি হাসিল, শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কর্ত্তৃপক্ষেরা বালকদিগকে ধমক-ধামক করিতে লাগিলেন। নিকটে দুই একটী প্রাচীন যাঁহারা ঐ কথা শুনিয়াছিলেন, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ধমকাইবেন না, বড় সরস কথাটা হইয়াছে, কথা ভাঙ্গিলে বলিব।" বাস্তবিক নাকটা এত লম্বা যে, প্রায় মুখের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে। প্রতিভাশালী বঙ্কিমচন্দ্র তাহা লইয়া রহস্য করিতে-

ছিলেন। নিকটস্থ এক জন প্রাচীন জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, এখন ত কথক ঠাকুর কিছু আহার করিতেছেন না, তবে নাকটা কি খাবার লোভে মুখের ভিতর উঁকি মারিতেছে?" প্রত্যুৎপন্নমতি বঙ্কিমচন্দ্র হাসিয়া উত্তর করিলেন, "এখন নাক কথক ঠাকুরকে খাওয়াইতেছে; নাকের সরস নস্য কথক ঠাকুরের গালের ভিতর ফোঁটা ফোঁটা ঢালিতেছে, কথক ঠাকুর ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে খাইতে অস্বীকার করিতেছেন, এবং মুহুর্মুহু গামছা দিয়া ঠোঁট মুছিতেছেন।" এই কথায় বালকেরা ও নিকটস্থ দুই জন প্রাচীন বড় হাসি হাসিলেন, সভাস্থ সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইল, কিছু বুঝিতে পারিল না।

একদিন কথক ঠাকুর একটা গীত (মধুর মদন ইত্যাদি) গাহিতে গাহিতে অনেক প্রকার মুখভঙ্গী ও অঙ্গভঙ্গী করিতে লাগিলেন। প্রতিভাশালী বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ একটি বালকের দুই হাত ধরিয়া বলিলেন, "দুই আঙ্গুল দ্বারা দুই কাণ বন্ধ কর্ দেখি।" বালক তাহাই করিল। বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "গান শুন্‌তে পাচ্ছিস্?" বালক উত্তর করিল, "একটু একটু পাচ্ছি।"

বঙ্কিম। "আরো জোরে কাণ বন্ধ কর।" এই বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া দেখাইয়া দিলেন। বালক তাহাই করিয়া বলিল, "এখন কিছুই শুনিতে পাই না।"

বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, "তবে একবার কথক ঠাকুরের মুখপানে চা' দেখি!" ছোট বালকটী কিছুক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া চীৎকার করিয়া হাসিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে বালক বঙ্কিমচন্দ্র হাসিয়া উঠিলেন; কিন্তু সম্মুখে তাঁহাদের জ্যেষ্ঠাগ্রজের চোখরাঙ্গা ভুরুভাঙ্গা দেখিয়া তাঁহারা মাথা হেঁট করিলেন। বোধ হয় এ স্থলে আর বুঝাইতে হইবে না, যে, যদি এক জন বধির কোনও মুদ্রাদোষবিশিষ্ট গায়কের গান শুনিতে বসেন, তিনি গান শুনিতে পাইবেন না, কেবল গায়কের হাত-মুখ-নাড়া, নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী ও দন্তের নানারূপ বিকাশ দেখিয়া হাসিয়া উঠিবেন। এই বালকের তাহাই ঘটিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যৌবনেও ঐরূপ দুষ্টামি করিতেন; যদি কোনও গায়কের গান ভাল না লাগিত, আপনিই আপনার কাণ টিপিয়া গায়কের মুখ প্রতি চাহিয়া থাকিতেন, এবং অপরকেও ঐরূপ করাইতেন। হাকিম হইয়া যখন উকীল মোক্তারের বক্তৃতা শুনিতেন, তখন কাণ টিপিয়া তাহাদের মুখ প্রতি চাহিয়া থাকিতেন কি না, সে বিষয়ে কোনও সংবাদ আমরা পাই নাই। বঙ্কিমচন্দ্র-প্রদর্শিত প্রকরণ কিছুদিন তাঁহার সঙ্গীদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল; এই ক্ষুদ্র লেখকও আবশ্যক হইলে ঐ প্রকরণ অদ্যাপি অবলম্বন করিয়া থাকেন।

তাঁহার একটী জমীদার আত্মীয়ের নাক বড় লম্বা ছিল, তিনি তাঁহার সহিত তামাসা করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি পেট ভরে' খেতে পান ত ?"

"কেন ? পেট ভরে' খেতে পাব না কেন ?"

"বলি, আপনার নাকটার জন্য কিছু ব্যাঘাত হয় না ত ? নাকটা কিছু ভাগ লয় না ত ?"

ইহা শুনিয়া জমীদার বাবু খুব হাসিয়াছিলেন। এইরূপ কথার দুষ্টামি তাঁহার যাবজ্জীবন ছিল; বাল্যকালে কিংবা কোনও কালে বাক্যে ভিন্ন কার্য্যে তাঁহার দুষ্টামি ছিল না।

প্রতিদিন কথকতা শেষ হইলে বালক বঙ্কিমচন্দ্র কথকঠাকুরের পশ্চাদনুসরণ করিতেন, এবং নানা প্রশ্ন করিতেন। কথকঠাকুর তেমন পণ্ডিত ছিলেন না, সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেন না, সুতরাং বিরক্ত হইতেন। এইরূপ প্রতিদিন করাতে কথকঠাকুর একদিন বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজকে (মধ্যম ভ্রাতা) বলিলেন, "আপনার এ ভাইটী আমায় বড় বিরক্ত করিয়া থাকে।" বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ তখনও কৈশোর উত্তীর্ণ হন নাই,—তিনিও এক জন প্রতিভাশালী ছিলেন,—হাসিয়া উত্তর করিলেন, "বালক শিখিবার জন্য আপনাকে বিরক্ত করে।" সেই অবধি বঙ্কিমচন্দ্র আর কথকঠাকুরকে কোনও প্রশ্ন করিতেন না।

প্রতিদিন কথকতা শেষ হইলে বঙ্কিমচন্দ্র একখানি চেয়ার অথবা টুল লইয়া নদীতীরে বসিয়া থাকিতেন; পিতামহীর গঙ্গাবাস উপলক্ষে চেয়ার ও টুলের অভাব ছিল না। তিনি বসিয়া নদীর দিকে চাহিয়া থাকিতেন। এখন আর তিনি রহস্যপ্রিয় বালক নহেন, সম্পূর্ণ-ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া গাম্ভীর্য্যশালী প্রবীণের স্বভাব পাইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পিতামহীর গঙ্গাতীরে বাসকালে প্রথম দুই সপ্তাহ কৃষ্ণপক্ষ ও শেষ সপ্তাহ দেবীপক্ষ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই তিন সপ্তাহ কাল প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে ভাগীরথীতীরে বসিতেন, কখনও আকাশে সান্ধ্য-তারা উঠিতেছে—তাহাই দেখিতেন, কখনও বা আকাশে কাস্তের ন্যায় চাঁদ উঠিতেছে—(দেবীপক্ষ) তাহাই দেখিতেন, সঙ্গিগণ তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া অঙ্গুলি দ্বারা তারা গুণিত, "ঐ একটা, ঐ দুটো, রাখাল বল্ দেখি, তোর আমার ক' চোক্ ?" সে উত্তর করিত, "চার চোক্।" "ঐ দেখ্, শত্রু শালার এক চোক্"। এইরূপে অন্যান্য বালকগণ দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলিত, কিন্তু প্রতিভাশালী বঙ্কিমচন্দ্র একমনে ভাগীরথীতীরে সন্ধ্যার সৌন্দর্য্য দেখিতেন। অন্ধকার ধীরে ধীরে



সন্ন্যাসী

চিত্রকর—স্বর্গীয় রবি বর্ম্মা।

U. RAY & SONS.

নদীবক্ষে বিচরণ করিতেছে, দেখিতে দেখিতে নদীবক্ষ গাঢ় অন্ধকারময় হইল, কিছুই দেখা যায় না, কেবল এ পারের ও পারের নৌকাশ্রেণীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলো-গুলি মনুষ্যজীবনের আশার ন্যায় একবার নিবিতেছে, একবার জ্বলিতেছে, আর দুই একখানি পান্‌সী অন্ধকারে কলিকাতার দিকে বাহিয়া যাইতেছে, তাহাদের দাঁড়ের ছপ ছপ শব্দ শুনা যাইতেছে। এই বাল্যস্মৃতি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার পুস্তকের স্থানে স্থানে অঙ্কিত করিয়াছেন, যথা :—

"সন্ধ্যাগগনে রক্তিম মেঘমালা কাঞ্চনবর্ণ ত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। রজনীদত্ত তিমিরাবরণে গঙ্গার বিশাল হৃদয় অস্পষ্টীকৃত হইল। সভামণ্ডলে পরিচারক-হস্ত-জ্বালিত দীপমালার ন্যায়, অথবা প্রভাতে উদ্যান-কুসুম-সমূহের ন্যায় আকাশে নক্ষত্র ফুটিতে লাগিল। প্রায়ান্ধকার নদীহৃদয়ে নৈশসমীরণ কিঞ্চিৎ খরতরবেগে বহিতে লাগিল। * * * নাবিকেরা নৌকাসকল তীরলগ্ন করিয়া রাত্রির জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা করিতে লাগিল।"—মৃণালিনী।

আর এক স্থানে লিখিয়াছেন,—"নবীন শরদুদয়ে ভাগীরথী বিশালোরসী, বহুদূর-বিসর্পিণী, চন্দ্রকর-প্রতিঘাতে উজ্জ্বলতরঙ্গিণী, দূরপ্রান্তে ধূমময়ী, নববারিসমাগমে প্রহ্লাদিনী।"—মৃণালিনী।

২

এই গ্রামের দক্ষিণ দিকে একটি অপ্রশস্ত খাল ছিল। বর্ষাকালে ভাগীরথীর জলে উহা পূর্ণায়তন হইয়া পূর্ব্ব দিকে একটী বিলে মিশিত; খালটী এমত অপ্রশস্ত যে, উভয় পার্শ্বের গাছের ডালের পাতায় পাতায় মিশিয়া ঐ খালের উপর পাতার ছাদ হইয়াছিল, সে জন্য খালটী সর্ব্বদা অন্ধকারময় থাকিত, বঙ্কিম-চন্দ্রের ইস্কুলে (Hugly College) যাইবার জন্য একটী ছোট ডিঙ্গী নৌকা ছিল। তিনি বর্ষাকালে প্রায় সর্ব্বদাই স্কুলের ছুটী হইলে, বাটীতে প্রত্যাগমন না করিয়া, বরাবর ঐ নৌকাতে ঐ খালে প্রবেশ করিতেন; এই লেখকও ঐ নৌকাতে থাকিতেন; কেন না, তিনিও বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত ঐ ইস্কুলে যাইতেন। তাঁহার নৌকা খালে প্রবেশ করিলে, উহার উপরের পাতার ছাদ হইতে অসংখ্য পাখী উড়িত, চীৎকার করিত, আবার বসিত। খালের উভয় পার্শ্বে নিবিড় বন ছিল, তাহাতে নানাপ্রকার বনফুল ফুটিত। বর্ষার জলে গাছগুলি অর্দ্ধনিমজ্জিত, নৌকা প্রবেশ করিবামাত্র উহার জলতাড়নে তাহারা নানাবর্ণের ফুলের সহিত হেলিত, দুলিত, নাচিত। বালক কবি তাহাই দেখিতেন, হাসিতেন, ক্ষণকালের জন্য তাহারা তাঁহার সঙ্গী হইত।

তখন তাঁহার বয়স ১৩ কি ১৪ হইবে, একদিন গভীর রাত্রে শয্যাত্যাগ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সদর-বাটীতে আসিয়া তাঁহার নৌকার মাঝিকে ও দ্বারবানকে উঠাইলেন (পূর্ব্বে ইহা বন্দোবস্ত ছিল), পরে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরে নিঃশব্দে বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বর্ষাকাল, পূর্ণিমা-রাত্রি, চন্দ্রমা মধ্যগগনে বিরাজ করিতেছেন, নীলাকাশে অসংখ্য তারা জ্বলিতেছে, পৃথিবী আলোকময়ী, নিস্তব্ধ; একটা কুকুর তাঁহাদিগকে দেখিয়া ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিতে লাগিল। বালক কবির সেই অন্ধকারময় খালে বিচরণ করিবার উপযোগী সময় বটে। বঙ্কিমচন্দ্র নিঃসঙ্কোচে নৌকায় উঠিলেন, কিছু দূর ভাগীরথী বাহিয়া গিয়া খালে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে জলোচ্ছ্বাসে খাল পরিপূর্ণ ছিল। প্রায় দুই তিন ঘণ্টা পরে বঙ্কিমচন্দ্র বাড়ী ফিরিলেন। তাঁহার এই খাল-বিচরণের কথা পৌরজনের মধ্যে কেহ জানিতে পারে নাই, কেবল তাঁহার অনুজ, যিনি বঙ্কিমচন্দ্রের ঘরে শয়ন করিতেন, তিনিই জানিতেন, কিন্তু ভয়ে ঐ কথা গোপন রাখিয়াছিলেন। অনুজ কিছু দূর তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ধমক খাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

তখন বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের সাকরেৎ; সাধুরঞ্জন ও প্রভাকরে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দীনবন্ধু ও দ্বারকানাথ অধিকারীর সহিত কবিতা লেখার যুদ্ধ করিতেন। নিশীথে খাল-বিচরণ অতি অল্প দিনের মধ্যেই কলম-জাৎ হইল, যথা :—

মহারণ্যে অন্ধকার গভীর নিশায়।
নির্ম্মল আকাশ নীলে, শশী ভেসে যায়॥
কাননের পাতা ছাদ, নাচে শশিকরে।
পবন দোলায় তায় সুমধুর স্বরে॥
নীচে তার অন্ধকার, আছে ক্ষুদ্র নদী।
অন্ধকার, মহাস্তব্ধ, বহে নিরবধি॥
ভীম তরুশাখা যথা পড়িয়াছে জলে।
কল কল করি বারি সুরবে উছলে॥
আঁধারে অস্পষ্ট দেখি যেন বা স্বপন।
কলিকাস্তবকময় ক্ষুদ্র তরুগণ।
শাখার বিচ্ছেদে কভু, শশধর-কর।
স্থানে স্থানে পড়িয়াছে নীল জলোপর॥

ললিতা ও মানস।

৩

যে গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্রের পৈতৃক বাটী, তাহার আশে পাশে বড় বড় গ্রাম, আর সম্মুখে অর্থাৎ ভাগীরথীর পশ্চিমপারে তিন চারিটী বড় বড় নগর ছিল। তাহাতে অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস করিতেন। সে কারণ দুর্গোৎসবের বিজয়ার দিন ভাগীরথীবক্ষে বড় সমারোহ হইত, এক্ষণে কালমাহাত্ম্যেই হউক অথবা দরিদ্রতা জন্যই হউক, সেরূপ সমারোহ আর নাই। ঐ সময় বিজয়ার দিনে বিকালে

ফরাসডাঙ্গার নীচে অনেক নৌকা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দশভুজার প্রতিমা লইয়া জাহ্নবী-বক্ষে বিচরণ করিত। কোনও নৌকাতে যাত্রা হইত, কোনও নৌকাতে বা নাচ হইত, আর এই সকল নৌকার কিঞ্চিৎদূরে অর্থাৎ বাহির-নদীতে অনেকগুলি ছত্রহীন বাচের নৌকা বাচ খেলাইয়া বেড়াইত,—ইহাকেই Boat race বলে। কাহারও বার দাঁড়, কাহারও ষোল দাঁড়। এই সকল সকল নৌকা সন্-সন্ বেগে যাইতেছে, ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে, এবং অন্যান্য নৌকার দাঁড়ীদিগের গাত্রে দাঁড়ের জল দিতেছে। দর্শকগণ দশভুজার প্রতিমা ভুলিয়া গিয়া এই বাচের নৌকাগুলির গতি দেখিতেছে, এবং বাহবা দিতেছে।

যখন চৌদ্দ পনর বৎসর বয়ঃক্রম, তখন একখানি নৌকাতে বঙ্কিমচন্দ্র ভ্রাতাদিগের সহিত ফরাসডাঙ্গায় ভাসান দেখিতে গিয়াছিলেন। আসিবার সময়ে সন্ধ্যা হইল, ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে শ্মশানভূমিতে একটী শবদাহ হইতেছিল। নিকটে অনেকগুলি ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া, একটী স্ত্রীলোক উন্মত্তার ন্যায় প্রজ্বলিত চিতাতে ঝাঁপ দিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু তাহার সঙ্গিনীগণ তাহাকে ধরিল। অবশেষে এই সদ্যোবিধবা স্ত্রী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। বঙ্কিমচন্দ্রের চোখে জল আসিল, সকলেরই এরূপ হইল। নৌকাতে অবস্থিতিকালে বঙ্কিমচন্দ্র সদ্যঃ একটী গীত রচনা করিলেন। ঐ নৌকাতে তাঁহার বয়ঃকনিষ্ঠ দুই এক জন ছিল, তাহাদের চুপি চুপি ঐ গানটী শুনাইলেন; কেন না, তাঁহার অগ্রজেরা ঐ নৌকাতে ছিলেন। কিছুদিন ঐ গানটী মল্লার রাগিনীতে প্রচলিত ছিল, পরে লুপ্ত হইয়া যায়। গানটীর প্রথমাংশ আমার মনে আছে, আর নাই, যথা :—

"হারালে পর পায় কি ফিরে মণি, কি ফণিনী, কি রমণী?"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বিদেশী গল্প।

পৈত্রিক ভিটা।

আট ঘণ্টাব্যাপী দীর্ঘযাত্রা এইবার শেষ হইল। কি কষ্টকর ভ্রমণ! রৌদ্রের ভীষণ উত্তাপ—ধূমময় ও ধূলিজালমণ্ডিত রেলপথ! কক্ষের ক্ষুদ্র অপরিসর বারান্দায় বাতাস পাইবার আশায় তিনটি কি চারিটি মহিলা দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি সেখানে যাইতে পারিতেছিলেন না। মহিলাদিগের কাছে যাইতে হইলে গলার কলার ও ওয়েষ্ট-কোটের বোতাম না আঁটিয়া দিলে চলিবে না; কিন্তু এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মে তাহা অসম্ভব ব্যাপার! তৎপরিবর্ত্তে তিনি ক্রমান্বয়ে অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর এক একটি মখমলমণ্ডিত আসনে বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। ক্লান্তি ও অবসাদে যেন জীবন ক্রমশঃ দুর্ব্বহ বলিয়া মনে হইতেছিল।

তার পর বিচিত্ররূপী 'জেলষ্টাড্' পর্ব্বতমালা নেত্রপথে পতিত হইল। অকস্মাৎ দেখিলেই মনে হয়, তাহারা যেন প্রান্তর ভেদ করিয়া উঠিয়াছে; অপরাহ্লের অনিশ্চিত আলোকে যেন বিরাট উচ্চশীর্ষ বস্ত্রাবাসের মত মনে হইতেছিল।

বহুপূর্ব্বে, বাল্যকালে স্কুলের ছুটী হইলে তিনি জনকজননীর সমভিব্যাহারে বৎসরে দুইবার এই পথে আসিতেন। শৈশবের কল্পনায় এই পর্ব্বতশ্রেণী সেনাপূর্ণ বিরাট শিবিরে পরিণত হইত; ট্রেণের শব্দ যুদ্ধের তূরী-ভেরীধ্বনির ন্যায় পরিকল্পিত হইত।

আতঙ্কে ও উত্তেজনাবশে তিনি মনে মনে কল্পনা করিতেন, কুহেলিকাসমাচ্ছন্ন প্রভাতে সহসা শিবিরশ্রেণীর দ্বার মুক্ত হইতেছে, লোহিতবসনধারী তূরীবাদকগণ বাহিরে আসিতেছে, তাহাদের পশ্চাতে বর্ম্মাবৃত বীরগণ নির্গত হইতেছেন, নবোদিত সূর্য্যকিরণে তাঁহাদের অস্ত্রশস্ত্র ঝল্‌মল্ করিয়া উঠিতেছে। ভীমপরাক্রমশালিনী বাহিনী যেন ধীরে ধীরে জেলষ্টাড্ নগরাভিমুখে প্রয়াণ করিতেছে। তার পর ঘোরযুদ্ধ—আঘাতে আঘাতে তরবারী চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া অপরাহ্লের মৃদু আলোকে বাহিনীর নায়ক জয়গর্ব্বে অশ্বারোহণে সসৈন্য নগরে প্রবেশ করিলেন।

বিলীয়মান পর্ব্বতশ্রেণীর দিকে চাহিয়া জর্জ্জ মৃদু হাস্য করিলেন। আজ সূর্য্যের সমুজ্জ্বল আলোকে বাল্যের উল্লিখিত স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। বিশ বৎসর পূর্ব্বে জেলষ্টাড্ নগর যেমন শান্তিপূর্ণ ছিল, আজও তেমনই প্রশান্তভাবে ধনধান্যে পূর্ণ হইয়া পর্ব্বতমূলে অবস্থিত। যুদ্ধ কোনও কালে সংঘটিত হয় নাই।

যথাসময়ে তাঁহার বৃদ্ধ শকট-চালক ম্যাথা গাড়ী লইয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

"হুজুর, আজ ট্রেণ ঠিক সময়ে এসেছে।"

জর্জ্জ জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন, "সব খবর ভাল ত?" কিন্তু তিনি সহসা থামিয়া গেলেন। তিনি যখন সমস্ত সংবাদই জানেন, তখন অনাবশ্যক প্রশ্ন করিয়া লাভ কি? তিনি ম্যাথার দিকে চাহিয়া শুধু একবার মস্তকান্দোলন করিলেন।

ম্যাথা পশ্চাতে ভৃত্যের আসনে আসিয়া বসিল। যুবক প্রভু স্বয়ং গাড়ী হাঁকাইবেন। পুরাকালে ম্যাথা চিরদিন মনিবের পার্শ্বের আসনে বসিয়া গাড়ী চালাইত; মনিব নগর হইতে আনীত চুরুট তাহাকে দিয়া গ্রামের সমুদয় সংবাদ শ্রবণ করিতেন। কিন্তু সে দিন আর নাই। এখন তাহাকে উপেক্ষিত হইয়া একাকী পশ্চাতে বসিয়া থাকিতে হয়! ম্যাথার চিত্ত আজ অত্যন্ত বিষণ্ণ।

পল্লীপথে গাড়ী চলিল। পথের উভয় পার্শ্বে প্রান্তর ও কানন। প্রান্তর অকর্ষিত। ছোট ছোট মেষপাল (সংখ্যায় অল্প) মাঠে চরিতেছে। ভাল চাষী হইলে এত দিনে মাঠের সমুদয় তৃণ কাটিয়া লইয়া যাইত। প্রথম পল্লীতে গাড়ী পঁহুছিল। পথের ধূলায় হংসী, মুরগী ও শিশুর দল খেলা করিতেছিল; গাড়ী দেখিয়া সকলেই পলায়ন করিল। সারমেয়গণ ঘেউ ঘেউ করিতে করিতে গাড়ীর চাকার পাশে পাশে দৌড়িতে লাগিল। কিয়দ্দূর গিয়া তাহারা থামিল, যেন কর্ত্তব্যপালন করিয়া তাহারা সন্তুষ্ট হইয়াছে। কৃষকেরা টুপী খুলিয়া ফেলিল। জর্জ্জকে দেখিয়া তাহারা অভিনন্দন করে নাই। পীতবর্ণের গাড়ী, ম্যাথার নীল উর্দ্দি দেখিয়াই তাহাদের পিতৃপিতামহগণ যাহা করিয়া গিয়াছেন, আজ তাহারাও সেইরূপ সম্মান দেখাইতেছিল। বিনিময়ে

তাহারা ধন্যবাদও পাইল না। এমন কি, গাড়ীর আরোহীর একবার চকিত দৃষ্টিপাতও তাহারা প্রত্যাশা করে নাই। তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের আমলে অন্য ব্যারণ নিউডক্‌, গাড়ী হাঁকাইতেন। কিন্তু কৃষকদিগের কাছে পার্থক্য ছিল না। তাহারা এ বংশের সকলের প্রতিই সমান সম্মান প্রকাশ করিয়া আসিতেছে। চতুর্থ গ্রামে গাড়ী প্রবেশ করিল। কিয়দ্দূর গিয়া জর্জ্জ একটি উদ্যানমধ্যে গাড়ী লইয়া গেলেন। এইখানেই তাঁহার প্রাসাদ। ম্যাথার্ দিকে লক্ষ্য না করিয়াই তিনি বাড়ীর দরজায় গাড়ী রাখিলেন। ম্যাথার পত্নী,—পূর্ব্বে সে তাঁহার জনকজননীর পাচিকার কার্য্য করিত, তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিল। তিনি ঘাড় নাড়িয়া তাহার স্বাগত ও কুশলপ্রশ্নের উত্তর দিলেন।

কাজটি যত সত্বর সম্ভব, করিতে হইবে। হৃদয়ে ব্যথা লাগিবে বটে; কিন্তু বেদনাটা যত কম লাগে, তাহার চেষ্টার প্রয়োজন। তুইটি সন্দিগ্ধচেতা ব্যবহারাজীব যে দীর্ঘ দলীল সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে হইবে; আগামী কল্য দলীল পঠিত হইলে পর তাহাতে তাঁহার স্বাক্ষর চাই। বস্, তার পর সব শেষ। বর্ত্তমান অতীতের গর্ভে চিরসমাধি লাভ করিবে, তাঁহার পিতৃপিতামহের ভিটা,—শৈশবের সহস্র-স্মৃতি-বিজড়িত নিকেতন অতীতের অন্ধকারে সমাহিত হইবে। সেই সঙ্গে ঋণ ও ঋণের চিন্তারও পরিসমাপ্তি।

এইখানে পাঠাগার ছিল; হল্-ঘরের পার্শ্বেই তাঁহার শৈশবের খেলাঘর। আহারের পূর্ব্বে একবার উদ্যানে বেড়াইবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাইবে।

তিনি ড্রয়িংরুম হইতে উঠিয়া একটি ছোট ছাদের উপর গমন করিলেন। বাল্যকালে এইখানে বসিয়া তিনি কতবার কফি পান করিয়াছেন। উদ্যানের চারি পার্শ্বে বিরাট-দেহ ঝাউ-বৃক্ষশ্রেণী শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া বিরাজিত। নানাপ্রকার বৃক্ষশ্রেণী উদ্যানশোভা-সম্পাদন করিতেছে। সে সুন্দর দৃশ্যে নয়ন জুড়াইয়া যায়। জর্জ্জ উদ্দেশ্য-বিহীনভাবে উদ্যানে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। বাদামবৃক্ষের বীথি অতিক্রম করিয়া তিনি গোলাপকুঞ্জের সমীপে উপস্থিত হইলেন। তারাপুষ্পগুলিও গোলাপের কাছে যেন নিষ্প্রভ হইয়া গেল। আহারের আয়োজন-জ্ঞাপক ঘণ্টাধ্বনি সহসা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। ম্যাথা-পত্নী তাঁহার জন্য আহার্য্য প্রস্তুত করিয়াছিল। সে সুখাদ্যভোজনে তাঁহার সুখী হইবারই কথা। তিনি বিষণ্নমনে ভাবিলেন, "প্রাণদণ্ডের পূর্ব্বে যেন ভোজ খাইতেছি!" অতি কষ্টে তিনি কয়েক গ্রাসমাত্র আহার করিলেন। আজ টেবিলে তিনি একাকী। পূর্ব্বে—প্রথমযৌবনে বহুজনপরিবেষ্টিত হইয়া তিনি প্রতিবার এই টেবিলে বসিয়া আহার করিয়াছেন।

আগে যাহারা এখানে বসিত, এখন তাহারা কোথায়? আজ তিনি পূর্ব্বপুরুষদিগের ভিটাবাড়ী বিক্রয় করিতেছেন, এ কথা শুনিয়া তাহারা কি ভাবিবে? ভোজনাগারের প্রাচীর-বিলম্বিত অসংখ্য তাকের দিকে তিনি চাহিলেন! স্বর্গীয় পিতামহের সযত্ন-অর্জ্জিত অসংখ্য মূল্যবান পাত্র তাকের উপর সজ্জিত। সেগুলি পিতামহের বড় সাধের বাসনপত্র। হায়! এগুলিও চিরদিনের জন্য হস্তান্তরিত হইবে?

উপায় কি? এগুলি রাখিয়া তিনি কি করিবেন?

ঘড়ী? আর ঐ যে নারীরচিত্র—বিষণ্ণনয়নে তিনি তাঁহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছেন—ও

কাহার চিত্র? তাঁহার কি ঘটিয়াছিল? জর্জ্জ সহসা আহার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তাড়াতাড়ি পাঠাগারে প্রবেশ করিলেন।

"ম্যাথা, তুমি এখন শোওগে। কাল খুব ভোরে উঠিয়া ষ্টেশনে যাইবে। দুইটি ভদ্রলোক আসিবেন, তাঁহাদিগকে গাড়ী করিয়া আনিবে—তাঁহারা তোমার নূতন মনিব।"

"হুজুর—মিঃ জর্জ্জ—"

একবার সংক্ষেপে মাথা নাড়িয়াই তিনি তাহাকে বিদায় দিলেন। বৃদ্ধ কোচ্‌ম্যান নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

নীরব রজনী। তিনি একাকী বসিয়া রহিলেন। যেখানে তাঁহার পিতা, পিতামহ, অতিবৃদ্ধ পিতামহ বসিয়া বসিয়া হিসাবপত্র নাড়িয়া চাড়িয়া, অথবা অবস্থার উন্নতিকল্পে নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন, তিনি আজ সেই আসনে বসিয়া আছেন। তাঁহার পিতামহই এই বিশাল সম্পত্তির উদ্ধার এবং ইহার স্থায়িত্বের জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পিতা এবং তিনি উভয়েই দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া জলের ন্যায় অর্থ অপব্যয় করিয়াছেন। কত কষ্টে অর্থ অর্জ্জিত হয়, একবারও তাহা ভাবিয়া দেখেন নাই।

জর্জ্জ পরিচিত দ্রব্যগুলির প্রতি চাহিয়া রহিলেন। মানচিত্র, কাগজকাটা ছুরী, প্রকৃত ঘোড়ার ক্ষুর হইতে নির্ম্মিত 'কাগজ-চাপা' ও বিচিত্র কাচগোলক—একে একে প্রত্যেক জিনিসটি তিনি দেখিলেন। এই কাচগোলকের মধ্যভাগে চিত্রিত পুষ্প—বাল্যে তিনি বিস্ময়-বিহ্বলভাবে উহা কতবার দেখিয়াছেন।

নগরের প্রাসাদে—ধূলিধূমপূর্ণ গ্যাসালোকিত কক্ষে বসিয়া এই সকল প্রিয়পদার্থ বিক্রয় করা খুব সহজসাধ্য বোধ হইয়াছিল; তখন ভাবিয়াছিলেন, কোনরূপে ঋণমুক্ত হইতে পারিলেই হয়। সেখান হইতে তিনি শ্যাম্পেনের বোতল-পূর্ণ বাকস্‌ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন—উহা এখন হল্‌-ঘরের বাহিরে পড়িয়া আছে; আগামী কল্য প্রাতে সকলে মিলিয়া নবাগতদিগের শুভাদৃষ্ট কামনা করিয়া সেই সুরা সানন্দে পান করিবে। নগরে বসিয়া তিনি যাহা সহজসাধ্য কল্পনা করিয়াছিলেন, এখানে পৈত্রিক আবাসে বসিয়া তাহা তেমন সহজ বোধ হইল না। অতীতকালের সহস্রস্মৃতিমণ্ডিত প্রাসাদ, বংশগৌরব, উৎকৃষ্ট দুর্লভ তৈজসপত্র, কাচগোলক, অশ্বক্ষুর—সমস্তই বিদেশীর হস্তগত হইবে? হায়! বহু পূর্ব্বে—পূর্ব্বে ইহা ভাবা উচিত ছিল। এমন কি, তাঁহার পিতা—অধীরভাবে জর্জ্জ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ভাগ্যচক্রের গতি পরিবর্ত্তিত করিবার যখন কোনও উপায় নাই, তখন ইহা সহ্য করিতেই হইবে। কুকুর অভীষ্টলাভে বঞ্চিত হইলে বৃথাই ডাকে; কিন্তু মানুষকে সমস্তই নীরবে সহ্য করিতে হয়। তিনি ডেস্কের ডালা তুলিয়া ফেলিয়া একবার ভিতরের জিনিসগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। পুরাতন রসীদ, বিল, চিঠিপত্র, পারিবারিক নানাবিধ কাগজপত্র, পরলোকগত জনকজননীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে যে নিমন্ত্রণপত্র ছাপা হইয়াছিল, তাহা, মৃত জ্যেষ্ঠভ্রাতার নামকরণের পুরোহিতের স্বাক্ষরিত দলীল—সে ভ্রাতা বাঁচিয়া থাকিলে হয় ত তিনি পিতামহের ন্যায় পরিশ্রমী ও দূরদর্শী হইতে পারিতেন, হয় ত তাহা হইলে আজ পৈত্রিক সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইত না—প্রভৃতি কাগজাদিতে ডেস্কের অভ্যন্তর পূর্ণ। পার্শ্বের একটি ক্ষুদ্র খোপের ভিতর একখানি শূকরচর্ম্মনির্ম্মিত ছোট বাঁধান বহি ছিল। জর্জ্জ উহা হাতে তুলিয়া,

লইলেন। দেখিবামাত্র বুঝিলেন, উহা সম্পত্তির মালিক জমীদারদিগের "নিদর্শন-বহি"! এই পুস্তকে তাঁহার পিতামহ স্বহস্তে বহু বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। জীবনে যে সকল বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল, বাতরোগে যখন তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন, সেই সময় বৃদ্ধ সেই সকল বিষয় এই খাতায় নিজের হাতে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। একাধিকবার তিনি পুত্র পৌত্রকে বলিয়াছিলেন,—

"বৃদ্ধের বচনের মূল্য আছে। যখন তোমরা বিপদ পড়িবে. এই বহি পড়িও।"

উভয়ের কেহই সে আদেশ প্রতিপালন করেন নাই। পুত্রও নহে, পৌত্রও নহে। আজ অন্তিম দুর্দ্দশায়—যখন কোনও উপকার নাই—জর্জ্জ সেই সদুপদেশ পালন করিলেন। তিনি পড়িয়া দেখিলেন, জমীদারকে কিরূপ দিবারাত্র পরিশ্রম করিতে হয়। চিরপ্রচলিত প্রবাদ-বাক্যের অর্থ বুঝিলেন!

"মালিকের দৃষ্টি ব্যতীত গৃহপালিত পশু কখনও হৃষ্টপুষ্ট হয় না।"

বসন্ত, হেমন্ত ও শীতঋতুতে গো, শূকর ও অশ্বাদির পীড়া হইলে কি কি নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়, তাহার উপদেশাবলীও পাঠ করিলেন। পড়িতে পড়িতে রাত্রি তিনটা বাজিল।

সপ্তদশ নিয়ম পড়িতে পড়িতে সহসা মাঝখানে বাধা পড়িল। তাঁহার পিতামহ এক স্থলে লিখিয়াছেন:—"প্রাণাধিক পুত্র, বা পৌত্র, অথবা প্রপৌত্র! আমি জানি, তোমরা অতি চঞ্চল, নির্ব্বোধপ্রকৃতি। তোমাদের পূর্ব্বপুরুষের কথাগুলি ধৈর্য্যসহকারে এত দূর যদি পড়িয়া থাক, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, বড়ই বিপদে পড়িয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া এ কাজ করিতেছ। আমি বাঁচিয়া থাকিলে তোমরা আমার কাছেই ছুটিয়া আসিতে। কিন্তু যখন তোমরা ইহা পড়িবে, তখন আমি ইহজগতে থাকিব না। তথাপি সমাধিমধ্য হইতে আমি তোমাদিগের উপকারার্থ হাত বাড়াইয়া দিতেছি। সম্ভবতঃ বিপদে পড়িয়া তোমাদের কিছু শিক্ষা হইবে। যদি সে শিক্ষা না হয়, তবে তোমাদের আর কোনও আশা নাই। প্রাণাধিক পৌত্র বা প্রপৌত্র!—আমার পুত্রকে এ বহি কখনও পড়িতে হইবে না—ডেস্কের বাম দিকে একটা ছোট বোতামবৎ পদার্থ দেখিতে পাইবে; উহা একটু চাপিয়া ধরিও; অমনই একখানি কাঠ সরিয়া যাইবে। তখন একটি ছোট খোপ দেখিতে পাইবে। কোনও ইংরাজী ব্যাঙ্কের নামে একখানি চেক্ সেখানে দেখিবে। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই অগষ্ট তারিখে সেই ব্যাঙ্কে আমি সাড়ে চারি লক্ষ টাকা তোমাদের নামে জমা রাখিয়াছি। সেই টাকা দ্বারা ঋণ শোধ করিয়া মোটামুটীভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিও, আর মাঝে মাঝে পিতামহের কথা স্মরণ করিও।"

ইহার পরই পুনরায় পশুচিকিৎসা সম্বন্ধে উপদেশাবলী লিখিত। কয়েক মুহূর্ত্ত জর্জ্জ মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া এই ইন্দ্রজালবৎ লেখার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতায় তাঁহার অন্তর ভরিয়া গেল। আগামী কল্য তিনি আগন্তুকদিগকে লিখিত দলীল খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে বলিতে পারিবেন। এই বাড়ী, এই বিস্তৃত জমীদারী, সবই তাঁহার রহিল।

বহির্ভাগে যে সুরাপূর্ণ বাক্স ছিল, তন্মধ্য হইতে তিনি একটি বোতল আনয়ন করিলেন। একটি প্রাচীন কালের গেলাস আনিয়া তাহাতে সুরা ঢালিয়া তিনি পান করিলেন। যেন নব-জীবনের সঞ্চার হইল। উষাগমের প্রতীক্ষায় তিনি বসিয়া রহিলেন। অতীত জীবন এবং ভবিষ্যৎ জীবন—উভয় সম্বন্ধে তিনি বসিয়া বসিয়া নানারূপ কল্পনা করিতে লাগিলেন।

বাতায়নপথে প্রথম সূর্য্যালোক প্রবিষ্ট হইবামাত্র তিনি শয়নাগারে গমন করিলেন। নগরের পোষাক খুলিয়া ফেলিয়া তিনি নীলবর্ণের একটি কোট বাহির করিয়া পরিলেন। সানন্দে আজ তিনি সেই কোট পরিয়া ভবিষ্যতে তিনি কি করিবেন, তাহার পূর্ব্বাভাস প্রকাশ করিলেন।

প্রভাতসমীরণ আজ যেন নবজীবনের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিতেছিল। পাখীরা নূতন স্বরে গান গায়িতেছিল! * •

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

সহযোগী সাহিত্য।

রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালার কবি, বাঙ্গালীর কবি;—আধুনিক ইংরেজী-শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের কবি, তিনি সহসা বিলাতে যাইয়া একটা সম্মান পাইলেন কেমন করিয়া, তাহা ভাবিবার বিষয়। শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের কবি বলিলে এইটুকু বুঝায় যে, ইংরেজী সাহিত্যের তথা ফরাসী ও জর্ম্মন সাহিত্যের ভাব সকল ইনি বা ইহাঁরই মতন বাঙ্গালী কবি, বাঙ্গালার আধুনিক কাব্য সাহিত্যে আমদানী করিয়াছেন। যাহার ভাণ্ডার হইতে নিত্য নবীন তত্ত্ব আমদানী করিতে আমাদের কবি জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহার ভাবের হাটে এমন কি সামগ্রী তিনি হাজির করিতে পারিয়াছিলেন, যাহার জন্য তাঁহার এত আদর? এ জিজ্ঞাসার উত্তর আমরা যাহা দিই না কেন, বিলাতের "টাইম্‌সে"র সাহিত্যিক খণ্ডে (Literary Supplement, Friday, May 15th, 1914), ইহার একটা উত্তর দিবার চেষ্টা হইয়াছে। আমরা তাহারই ভাব সংগ্রহ করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিতেছি।

"টাইম্‌সে"র লেখক গোড়াতেই বলিতেছেন—

"The appearance of Rabindranath Tagore in contemporary English letters is a very significant thing. Although the popularity that cought him up in a flame (a popularity unfailingly registered by the Nobel committee) is likely to fade as rapidly as it was aroused, yet it is, in spite of all its depressing accompaniments, a significant response to a new att ıtude towards life."

অর্থাৎ, আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভ্যুদয় বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়—অবধানতার সহিত বিচার করিবার বিষয়। যদিও যে যশের জ্বালামালায় সমুজ্জ্বল হইয়া তিনি লোকলোচনের গোচরীভূত হইয়াছিলেন, তাহা সম্ভবতঃ অচিরে নির্ব্বাপিত হইতে পারে;—শুষ্ক তালপত্রের অগ্নিজ্বালার মতন উহা যেমন সদ্যঃসদ্যঃ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তেমনিই সদ্যঃসদ্যঃ নিভিয়া যাইতে পারে,—তথাপি এই অসুবিধা সত্ত্বেও, সহসাজাত খ্যাতির এই আপাত-মনোহর ও পরিণামবিরস ব্যাপার সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিলাতবাসীর এই অনুরাগ মানবজীবনের প্রতি একটা নবভাবের দ্যোতক বলিলেও বলা যায়। "টাইম্‌সে"র লেখক একটু চাপা রসিক। তিনি লক্ষণার আড়ালে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথ একটা খ-ধূপ বা হাউইয়ের মতন জ্বলিয়া

---

* জর্ম্মণীর খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক হ্যার রডা রডা রচিত গল্পের ইংরাজী হইতে অনুদিত।

আকাশে উঠিয়াছেন বটে ; ঐ হাউইয়ের মতন অচিরে নিভিয়া যাইবেন। নোবেল-কমিটীর কর্তারা যশের খ-ধূপ বিকাশ দেখিলেই সদ্যঃসদ্যঃ পারিতোষিক বিতরণ করিয়া থাকেন, কবির বা কাব্যের বিচার তাঁহারা বড় একটা করেন না। বিলাতবাসী যে রবীন্দ্রনাথের আদর করিয়াছেন, কেবল রবীন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ হইয়া করেন নাই ; মানবজীবনটাকে তাঁহারা একটা নূতন দিক্ দিয়া দেখিতে শিখিতেছেন, ভাগ্যবশে রবীন্দ্রনাথ সেই দিকের পথ বাহিয়া বিলাতে আসিয়া উপস্থিত হন ; ফলে রুচিপরিবর্ত্তন জন্য সুখ্যাতির বোঝাটা তাঁহারই ঘাড়ে চাপান হইয়াছে।

"Fashions—especially literary fashions—may be trivial things in themselves; yet in the sum total of fashions a certain not altogether superficial tendency of the mind may be discovered."

অর্থাৎ, খোস্-খেয়াল, সখ, ভঙ্গী—বিশেষতঃ সাহিত্যবিষয়ক খোস্খেয়াল—অতি সামান্য বিষয় হইতে পারে ; পরন্তু নানাবিধ খোস্খেয়ালের সমষ্টিমধ্যে মানুষের মন হইতে একটা গাঢ়ভাব বাহির করিতে পারা যায়। স্থূল কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথের বিলাতী যশোদীপ্তি সে দেশের লোকের ফ্যাশান বা খোস্খেয়াল মাত্র ; কিন্তু এই খোসখেয়ালের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, যাহারা এমন খোসখেয়াল করে, তাহাদের মনের একটা গাঢ়ভাব কোনও একটা স্বতন্ত্র হেতুবশতঃ যেন ফুটিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছে। "টাইমসে"র লেখক বিলাতীবাসীর এই খোস্খেয়ালের বনীয়াদস্বরূপ সেই ভাবটুকু খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

"Men have been tired of the merely intellectual pastime called thinking."

বিলাতবাসী চিন্তা নামক মানসিক ক্রীড়ায় পরিশ্রান্ত হইয়াছিল, মনস্তত্ত্ব বা ফিলজফিতে তাহাদের অরুচি ধরিয়াছিল। এই সময়ে বিলাতবাসী শুনিল,—

"The East had always calmly assumed that wisdom was an attitude of the soul, not an activity of the brain."

প্রাচ্যগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জ্ঞান ও মনীষাও মেধাজাত নহে, উহা আত্মার ভাববিশেষ। মস্তিষ্কের কসরৎ করিয়া জ্ঞানোন্মেষ হয় না, বরং মস্তিষ্কের কসরতের ফলে জ্ঞান ম্লান হইয়া যায়। এই সিদ্ধান্তটা বিলাতের বিদ্বজ্জনসমাজের মনে লাগিয়াছিল, তাহারা ভারতের বেদ-উপনিষদের পরিচয়গ্রহণে উদ্যত হইয়াছিল।

"Those lonely bookshops that had stored the Books of the East began to muster large followings;"

যে সকল কেতাবের দোকানে পূর্ব্বে কেহ যাইত না, যাহা পূর্ব্বে সারাদিন নির্জ্জনই থাকিত, যেখানে কেবল পূর্ব্বদেশের জ্ঞানভাণ্ডার পুস্তকাকারে সঞ্চিত ছিল, সেই সকল কেতাবের দোকানে লোক জমিতে লাগিল, তাহাদের পুস্তক সকল বিকাইতে লাগিল।

Thus was Rabindranath Tagore's welcome prepared.

এই ভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভ্যর্থনার আয়োজন হইয়াছিল। বিলাতে তথা ইউরোপে ভাব-বিপর্য্যয়ের সূচনা হইয়াছিল, লোকে নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল বিলাতী ফিলসফির সিদ্ধান্তে তুষ্ট হইতে পারিতেছিল না, বেদান্ত-উপনিষদের পরিচয় একটু একটু শুনিতেছিল, কচিৎ কদাচিৎ তাহার কোনও একটা সিদ্ধান্তের মর্ম্ম বুঝিয়া সাগ্রহে সে কথা শুনিবার ও বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিতে-

ছিল—ঠিক এমনই সময়ে রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলির পাদ্যার্ঘ হস্তে করিয়া বিলাতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন—

"But there was another element in that welcome not quite so obvious."

কিন্তু তাঁহার এই আদর অভ্যর্থনার অন্তরালে আর একটা এমন উপাদান ছিল, যাহা সহসা সকলের চোখে পড়ে না। বিলাতবাসী যে কেবল ভারতের কবি বলিয়া রবীন্দ্রনাথের আদর করিয়াছিলেন, তাহা নহে। তাঁহার ভাবে ও গানে, কাব্যে ও রসে এমন একটা গুপ্ত সামগ্রী ছিল, যাহার আস্বাদ পাইয়া বিলাতবাসী কতকটা উন্মত্তবৎ হইয়া রবীন্দ্রনাথের সংবর্দ্ধনা করিয়াছিল, তাঁহাকে আপনার বলিয়া—স্বজন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। সেটা কি?

"Here was one of a company that turned even more earnestly to Christianity than to the Upanishads, but in the spirit of the Upanishads."

"Rabindranath Tagore is and remains a significant figure. He leads to a re-statement of the teachings of Christ."

"তিনি (রবীন্দ্রনাথ) এমন দলের এক জন, যে দল উপনিষদ অপেক্ষা খ্রীষ্টান-ধর্ম্মের প্রতি আগ্রহাধিক্যের সহিত আকৃষ্ট হয়—যে দল উপনিষদের দৃষ্টিতে খ্রীষ্টান-ধর্ম্ম বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করেন।"

"যাহাই বলি না কেন,—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটা মানুষের মতন মানুষ। যীশুখ্রীষ্টের ধর্ম্ম এবং উপদেশরাশিকে তিনি নূতন করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন—নবভাব দিয়া বুঝাইতেছেন।" সাধনা, চিত্রা ও গীতাঞ্জলি হইতে গান ও সিদ্ধান্ত সকল উদ্ধৃত করিয়া "টাইমসে"র লেখক দেখাইয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথ হিন্দু অপেক্ষা খ্রীষ্টান অধিক, বৌদ্ধ অপেক্ষা যীশুখ্রীষ্টের ভক্ত অধিক। খ্রীষ্টান-ধর্ম্মের গোড়ার কথাগুলি উপনিষদের মশলায় মাখিয়া তিনি এমন অপূর্ব্ব ব্যঞ্জন করিয়া বিলাতবাসীকে উপঢৌকন দিয়াছেন যে, বিলাতবাসী তাঁহাকে মাথায় করিয়া আদর না করিয়া থাকিতে পারে নাই।

রবীন্দ্রনাথ খ্রীষ্টান-ধর্ম্মের কতটুকু ব্যাখ্যা করিয়াছেন? "টাইমসে"র লেখক উত্তর দিতেছেন—

"That the teaching of Christ and his immediate followers was also the propounding of a soul attitude."

"অর্থাৎ, যীশুখ্রীষ্টের এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ সহচরবর্গের উপদেশ কেবল সন্নীতি নহে, আত্মবিলাসের একটা অভিব্যাঞ্জনমাত্র।" "টাইমসে"র মনীষী লেখক খ্রীষ্টানের এই ভাবাভিব্যঞ্জনা রবীন্দ্রনাথের প্রায় সকল লেখায় খুঁজিয়া পাইয়াছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে খ্রীষ্টান বৈদান্তিক বলিয়া ঠাওরাইয়াছেন। অতএব বুঝা গেল যে, রবীন্দ্রনাথকে খ্রীষ্টান বলিয়া চিনিতে পারাতেই বিলাতের বিদ্বজ্জনসমাজ তাঁহার এতটা আদর করিয়াছেন। অধুনা ইউরোপের তথা ইংলণ্ডের খ্রীষ্টান-ধর্ম্ম এক পক্ষে "ফিলজফি"র তুষচূর্ণে,—যুক্তি তর্কের ও ব্যর্থ বাগাড়ম্বরের আবরণে আবৃত হইয়া আছে; অন্য পক্ষে সায়েন্স বা বিজ্ঞানের নিত্য-নূতন সিদ্ধান্ত ও আবিষ্কারে সমূঢ় হইয়া আছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও ব্যাখ্যার প্রতি,—

"They turned to it suddenly as to a very old and beautiful early memory, as men in a hot dusty city feel a morning breeze suddenly blowing through its streets from the high mountains."

তাহারা (ইংরাজ) সহসা ফিরিয়া তাকাইল—একটা বড় সুখের শৈশবস্মৃতির প্রতি মানুষ যেমন সাগ্রহে ফিরিয়া চায়, তেমনই ভাবে ফিরিয়া দেখিল ;—ধূলিসমাচ্ছন্ন, গ্রীষ্মাধিক্য-পীড়িত, সদাউষ্ণ নগরে ঠিক মধ্যাহ্নকালে যদি রথ্যা বাহিয়া চিরতুহিনাবৃত পর্ব্বতশিখর চুম্বিয়া প্রভাতসমীর সহসা বহিয়া যায়—শীতলতা ও স্নিগ্ধতা ছড়াইতে ছড়াইতে উহার মলয় ভাসিয়া যায়, তাহা হইলে লোকে যেমন চমকিত হইয়া তাকাইয়া দেখে—থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া মুহূর্ত্তের সুখ উপভোগ করে; তেমনই রবীন্দ্রনাথের নব খ্রীষ্টানী ভাবসমেত' কবিতাগুলির প্রতি বিলাতের বিদ্বজ্জনসমাজ একবার তাকাইয়া দেখিয়াছিল,—সে পুরাতন কথার নবীন অভিব্যঞ্জনার স্নিগ্ধতায় প্রাণারাম লাভ করিয়া তাহারা চম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষণেকের সুখ উপভোগ করিয়াছিল।

এইবার বুঝিলাম, শ্রীমান রামপ্রসাদ চন্দ কেন রবীন্দ্রনাথকে ঋষি বলিয়াছিলেন। ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টা, কদত্রাচিৎ মন্ত্র-ব্যাখ্যাতা ; ঋষি সরল, অকপট, 'অ-শিক্ষিত' ; ঋষি গোড়ার কথা বলিয়া দেন। খ্রীষ্টান (পল ও পিটর) প্রভৃতিকে 'বিলাতী' ঋষি বলা যায়। "টাইম্‌সে"র লেখক রবীন্দ্রনাথের কবিতার আলোচনা করিয়া বলিতেছেন—

"We are reminded that Paul and his Master were also Easterns—that his bretheren still dwell in the tents of Shem."

"মনে পড়ে,—পল এবং তাঁহার প্রভু যীশুকে ; ইঁহারাও প্রাচ্য ছিলেন, এখনও তাঁহাদের জ্ঞাতিগণ যাযাবর-ব্রত অবলম্বন করিয়া শেমের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে ভেড়া চরাইতেছেন, এবং তাঁবুতে বাস করিতেছেন।" রবীন্দ্রনাথের ঋষিযোগ্য সারল্যেরও উল্লেখ "টাইম্‌সে"র লেখক করিয়াছেন—

"The 'Crescent Moon' contains child poems that are more childish than child—like."

"চন্দ্রকলা নামক কবিতা পুস্তকে এমন সকল পদ্য আছে, যাহাকে শিশু-পদ্য বলা চলে, যাহা শিশুজনোচিত না হইলেও ছেলেমী-পূর্ণ বটে।" এ প্রশংসা ত ঋষির ভোগ্য—ঋষির প্রতি সর্ব্বথা প্রযোজ্য।

এখন জিজ্ঞাস্য,—রবীন্দ্রনাথে খ্রীষ্টানীভাব আসিল কোথা হইতে? স্বামী দয়ানন্দ একবার বলিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম উপনিষদের আবরণে খ্রীষ্টানীমাত্র। আদি ব্রাহ্মসমাজে উপনিষদের আবরণটা কিছু গাঢ় ; কেশবচন্দ্র সে আবরণ ছিন্ন করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে দেশাত্মবোধের নব-লাবণ্য ধর্ম্মের উপর চড়াইয়াছিলেন ; পরে নববিধান নাম দিয়া তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে বাঙ্গালার বৈষ্ণবী ঢং চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্বামী দয়ানন্দের এই কথাটা মাদাম ব্লাভাট্‌স্কি ও কর্ণেল অলকট অনেক স্থানে অনেক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন। বিলাতে রবীন্দ্র-নাথের আদর দেখিয়া, "টাইম্‌সে"র লেখকের অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ পাঠ করিয়া, এত দিন পরে এই পুরাতন কথাটা একটু বুঝিতে পারিতেছি। আমরা নিজেরাই ইংরেজীনবীশ ; প্রথম শৈশব হইতে এই বার্দ্ধক্যের সূচনাকাল পর্য্যন্ত ইংরেজী সাহিত্যের আলোচনা করিয়া অজ্ঞাতে বহু খ্রীষ্টানীভাব ও সিদ্ধান্ত আমাদের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। আমাদের মধ্যে কতটুকু খ্রীষ্টানী এবং কতটুকু হিন্দুয়ানী আছে, তাহা আমরা বিচার করিতে পারি না। খাঁটী ইংরেজ "টাইম্‌সে"র লেখক খাঁটী খ্রীষ্টান, তিনি অনায়াসে রবীন্দ্রনাথের খ্রীষ্টানী ভাবটুকু বাছিয়া বাহির করিয়া

দিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে খ্রীষ্টানীর সহিত হিন্দুয়ানীর আপোষ তাহা আমরা জানিলেও, উহার অনুভূতি আমাদের নাই ;—কেন না, শিক্ষার গুণে আমরাও যে এক এক জন হিন্দুয়ানীর সহিত খ্রীষ্টানীর আপোষের আধারস্বরূপ। কাজেই আমরা রবীন্দ্রনাথে অপূর্ব্ব বা উদ্ভট কিছু দেখিতে পাই না। আমাদের মনে হয়, তিনি আমাদেরই মতন এক জন, কেবল তাঁহাতে অতিমাত্রায় প্রতিভা ও মনীষা বিদ্যমান। পূর্ব্বে একটা সহযোগী সাহিত্যের পরিচয় দিব'র কালে এই সাহিত্যেই বলিয়া রাখিয়াছি যে, প্রত্যেক জাতির সাহিত্যের এক একটা ধর্ম্ম আছে। যে জাতির যে ধর্ম্ম ও যেরূপ প্রকৃতি, সে জাতির সাহিত্য সেই ধর্ম্মভাবযুক্ত ও তদ্রূপ হয়। খ্রীষ্টান ইংলণ্ডের সাহিত্য খ্রীষ্টানীধর্ম্মভাবযুক্ত। এই সাহিত্যের আলোচনা যিনি যত অধিক করিবেন, তিনি তত অধিকপরিমাণে খ্রীষ্টানীভাবমুগ্ধ হইবেন। (থোবরণ) সাহেব একটা বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে যত উচ্চশিক্ষার প্রচার হইবে, ইংরেজী সৎ-সাহিত্যের পঠন-পাঠন বাড়িবে, ততই খ্রীষ্টানীভাবের প্রচার অধিক হইবে ; এই সিদ্ধান্তের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া "টাইমসে"র লেখক রবীন্দ্রনাথের মনীষার বিশ্লেষণ-ব্যপদেশে ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী বাবুদিগকে ইঙ্গিতে বলিয়া রাখিয়াছেন যে, তোমরাও অল্পবিস্তর খ্রীষ্টান। কেবল যে আমাদের মনের মতন করিয়া খ্রীষ্টানতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতেছেন বলিয়া রবীন্দ্রনাথকে আমরা এত আদর করিতেছি, তাহা ভাবিও না ; রবীন্দ্রনাথ তোমাদের বুদ্ধির অনুকূল করিয়া খ্রীষ্টানতত্ত্ব তোমাদিগকে বুঝাইতেছেন, তাই তাহাকে আমরা সহসা এতটা আদর দিয়াছি। কথাটা একটু ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। যে ব্রাহ্মধর্ম্ম একদিন খ্রীষ্টানধর্ম্মের প্রবল প্রবাহের মুখে বালির বাঁধ হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রভাবে, "টাইম্‌সে"র লেখকের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যার প্রভাবে সেই ব্রাহ্মধর্ম্ম আজ খ্রীষ্টানতত্ত্ব-প্রচারের সহায়ক-স্বরূপ হইতেছে! অন্ততঃ ইংলণ্ডের বিদ্বজ্জনসমাজের অনেকেই এবংবিধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। বিলাতের দুই একখানা খ্রীষ্টানধর্ম্ম-প্রচারক মাসিক পত্রে এই বিষয়ের একটু আলোচনার ঢেউ উঠিয়াছে। প্রয়োজন হইলে সে পরিচয় পরে দিব।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

সন্দেশ। আষাঢ়।—দ্বিতীয় বর্ষে "সন্দেশে"র অধিকতর উৎকর্ষ দেখিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। "সন্দেশ" শিশুদের প্রিয় হইয়াছে, আমরা তাহার পরিচয় পাইয়াছি। ইহার প্রবন্ধ-বৈচিত্র্য ও চিত্র-সৌন্দর্য্যও প্রশংসনীয়। এ "সন্দেশ" অভিভাবকদের পাতে পরিবেষণ করিলেও, আপত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। শিশুদের চিত্তরঞ্জনই ইহার একমাত্র লক্ষ্য নয়, বিষয়-বিন্যাসেই তাহার আভাস পাওয়া যায়। যাহাতে শিশুদের মনে পৃচ্ছার উন্মেষ হয়, অল্পবয়স্ক পাঠকেরা কৌতুক ও আনন্দ সম্ভোগ করিতে করিতে নানা বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে, পুরাণের, ইতিহাসের, বিজ্ঞাপনের, ভূগোলের বিবিধ তথ্যের সহিত পরিচিত হয়, সে বিষয়ে সম্পাদক মহাশয়ের দৃষ্টি আছে। গল্পগুলি সুনির্ব্বাচিত ; প্রায়ই কৌতুকাবহ। "সন্দেশ" শিশুর সুপথ্য, তাহা অসঙ্কোচে

বলা যায়। কিন্তু "সন্দেশে"র অধিকাংশ প্রবন্ধ তথাকথিত চলিত ভাষায় লিখিত। শিশুপাঠ্য সাহিত্যের ভাষা প্রাঞ্জল, সরল, সহজবোধ্য না হইলে চলে না, তাহা অবশ্য সর্ব্ববাদি-সম্মত। কিন্তু কলিকাতার 'প্রাদেশিকতা'ও ত বাঙ্গালার সর্ব্বত্র সহজবোধ্য নয়। বিদ্যা-সাগরের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ বর্ণপরিচয় ও কথামালা, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের শিশুশিক্ষা প্রভৃতির ভাষা সহজ চলিত ভাষায় লিখিত; কিন্তু তাহাতে প্রাদেশিকতার উৎপাত নাই। "করিয়া" গারো পাহাড় হইতে মালদহের প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র চলিতে পারে, কিন্তু 'কৈর্‌য়া' প্রদেশবিশেষে উদ্ভূত ও প্রচলিত রূপান্তর, সকল প্রদেশের সুবোধ্য ভাষা নয়। বাঙ্গালার প্রত্যেক জেলার রূপান্তরিত চলিত ভাষায় যদি সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে, এক প্রদেশের সাহিত্য অন্য প্রদেশের অনধিগম্য হইয়া উঠিবে। তাহা কোনও মতেই প্রার্থনীয় নয়। কলিকাতার প্রাদেশিকতা ও Mannarisom সমগ্র বাঙ্গালা শিরোধার্য্য করিবে না।—শিশুপাঠ্য সাহিত্যের ভাষা সাধারণ, উদ্ভটতা-শূন্য, প্রাদেশিকতা-বর্জ্জিত ও সকল প্রদেশের সুবোধ্য না হইলে সার্ব্বভৌমিক হইতে পারে না।—শ্রীযুত প্রমথ চৌধুরীর "আষাঢ়ে ছড়া" নিতান্তই আষাঢ়ে। "আকাশ ভ্যাঙ্‌চায় মুখ বিদ্যুতের সবটুক জিভ্‌ বার করে" ছড়াও নয়, কবিতাও নয়। "সারস মেলিয়া পাখা নাচে হয়ে অাঁকা বাঁকা" নূতন বটে, কিন্তু সারসের 'পাখা-ম্যালা' ও ত্রিভঙ্গ-বঙ্কিম-রূপ অকবিদের অগোচর। "ময়ূর ধরেছে কেকা" এবং তাহার পেখমের নাচেই "গায় কোলা ব্যাঙ্‌!", গুরু'চণ্ডালী ভাবের ছবি। এটুকুর সৌন্দর্য্য শিশুরা না পারুক, আমরা উপভোগ করিলাম। "কখন সড়াৎ করে', অথবা হড়াৎ করে', বেজায় কড়াৎ করে' শিরে পড়ে বাজ" শব্দ-বৈভবের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত,—তবে 'সড়াৎ'টা সুপ্রযুক্ত নয়। ছেলেদের জন্য কল্পিত ছড়া, কবিতা প্রভৃতি 'চাঁছা-ছোলা ও পরিপাটী না হইলে চলে না। "মেঘের মুলুক," "ভূতের খেলা," "পৃথিবীর আকার" প্রভৃতি সুখপাঠ্য। "লুপ্ত সহর" কৌতুকাবহ। শ্রীযুত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের "বাঁশী" ক্ষুদ্র পদ্যগল্প,—উপসংহার অত্যন্ত সাধারণ, তবে শিশুভোগ্য বটে।—"যো হুকুম" ও "মেঘের মুলুকে"র ছবি কয়খানি সুন্দর।

গম্ভীরা। আষাঢ়।—"বিবিধ প্রসঙ্গে" লেখক বলিয়াছেন,—"বঙ্গদেশে বহু ও বিবিধ 'সাহিত্য-সম্মিলনী' প্রভৃতির উদ্ভব হইলেও, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শক্তিহানির আশঙ্কা নাই। "কেবল একটিমাত্র অঙ্গে আমি পূর্ণ নহি। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রত্যেকেই ভিন্ননামধেয়, ভিন্নশক্তি-সমম্বিত, এবং প্রত্যেকেই স্বাধীন। * * * হস্তের কার্য্য পদের দ্বারা সুসম্পন্ন হয় না। প্রত্যেককেই সমান অধিকার ও স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। ইহাকেই আমিত্বের প্রসার বা বৈষম্যে সাম্যের প্রতিষ্ঠা বলে। স্বাধীনতায় অযথা বাধা প্রদান করিলে ফল বিষময়ই হইয়া থাকে।" কিন্তু স্বাধীনতার মূল ভিত্তিই যে বশবর্ত্তিতা, নিয়মানুগত্য আত্মসংযম—আত্ম-বিসর্জ্জন। অক্ষর-পরিচয়ের পূর্ব্বেই মহাভারত পড়া যায় না। আত্ম-প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টাই যে আমাদের সকল অনুষ্ঠানের আদিতে, মধ্যে, অন্তে ফুটিয়া উঠে। তাই লেখক বলিয়াছেন,—"বঙ্গের প্রত্যেক অংশে, প্রত্যেক জেলায়, প্রত্যেক পল্লীতে সাহিত্যের ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপন করিতে যাইয়া ক্ষুদ্রত্ব, অহমিকা, সংকীর্ণতা, বিরুদ্ধাচরণ, হিংসা, দ্বেষ ও দলাদলির প্রশ্রয় দিলে সাহিত্যসমুদ্রমন্থনে অমৃতের পরিবর্ত্তে গরলই উঠিবে।" ইহার মধ্যেই গরল

উঠিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যদি আমাদের সাহিত্যিকগণ সঙ্কীর্ণতা হইতে দলাদলি পর্য্যন্ত "সমস্ত ক্ষুদ্রত্ব পরিহার করিয়া, উদারহৃদয়ে বঙ্গের গৃহে গৃহে বঙ্গজননীর বাণীমূর্ত্তির পূজার আয়োজন করেন", তাহা হইলে লেখকের আশা—দুরাশা পূর্ণ হইতে পারে, আমরাও উন্নত বঙ্গের নূতন মূর্ত্তির আভাস দেখিয়া সুখে মরিতে পারি। "প্রবাসী বাঙ্গালীর সাহিত্য-সেবা"য় দেখিতেছি,—"দিন দিন আমাদের সাহিত্য-চর্চ্চা সিন্ধুমুখী নদীর ন্যায় প্রসার লাভ করিতেছে। মীরাটের প্রবাসী বাঙ্গালীর চেষ্টায় ও যত্নে * * মীরটেও একটি সাহিত্য-পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পরিষদের পুস্তকাগারে প্রায় এক সহস্র পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। সেদিন পরিষদের বাৎসরিক সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। কাশিমবাজারের মহারাজ শ্রীযুত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র রায় "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। "গম্ভীরা"য় তাঁহার প্রবন্ধ ও সভাপতির অভিভাষণ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। মালদহে লোক-শিক্ষার প্রসার হইতেছে। উদ্যোগীরা প্রাচীন পদ্ধতির অনুসরণ করিতেছেন। "গম্ভীরা"য় দেখিতেছি, মালদহের গম্ভীরা-উৎসবে জাতিভেদ নাই। হিন্দু মুসলমান সকলেই এই উৎসবে "যোগদান করিয়া থাকেন। সকলেই সঙ্গীত রচনা করিতে ও গাহিতে পারেন।" আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, "এই সকল গম্ভীরার কবি অশিক্ষিত, এবং অনেকেই আবার অক্ষর-জ্ঞান-বিরহিত"। এ বৎসর বৈশাখ মাসে উৎসব হইয়াছিল। সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা-সংস্কার, স্বাস্থ্য-সংস্কার প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে অনেক গান রচিত ও গীত হইয়াছিল। কুতূহলী পাঠক "গম্ভীরা"য় এই গানের আস্বাদ পাইবেন। বড় দুঃখেই মালদহের গ্রাম্য-কবি মহম্মদ সুফী গায়িয়াছিলেন,—

"ভাবি বসে' দিবানিশি, লণ্ডনকে করছ কাশী,
(ইওর) ইন্টিমেট ফ্রেণ্ড ইংলণ্ডবাসী, আর মোদের চেনো ?
(বাবু) ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, রবীন্দ্র, জগদীশ আর কি দ্বিজেন্দ্র,
ভারত থেকে অর্দ্ধচন্দ্র দিবেন এবার জেনো।
'ইওর ক্যারেক্টার ইজ্ ভেরী ব্যাড্'—বলে সুফী রহমান॥"

সুফী সাহেবের এই সুমিষ্ট 'পয়জারে' আমাদের জ্ঞান হইবে কি? শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ চৌধুরীর "তটিনী-প্রলাপে" শক্তির আভাস আছে। কিন্তু ছাপাখানা সাধনার ক্ষেত্র নয়। "বিজ্ঞান" চলিতেছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেনের "পাশ্চাত্য কর্ম্মবিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত পরিচয়" ও শ্রীযুত নলিনীকান্ত বসুর "শিক্ষার প্রকারভেদ ও উদ্দেশ্য" উল্লেখযোগ্য।

প্রবাসী। আষাঢ়।—প্রথমেই মা যশোদার ছবি। চিত্রবিজ্ঞানের আদ্য শ্রাদ্ধ করিয়াও পট আঁকা যায়, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দে তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। "বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়" হইয়াছে! "শিষ্যবিদ্যা গরীয়সী" হইতেছে। অবনীন্দ্রনাথ চিত্রবিদ্যার পথ এত প্রশস্ত করিয়া দিলেন যে, 'যত ছিল নাড়াবুনে, সব হ'ল কীর্ত্তুনে!' শ্রীযুত অসিতকুমার হালদারের চিত্র সম্বন্ধেও নূতন কিছু বলিবার নাই। শৈলেন্দ্রের পটে বর্ণের বৈভব নাই; কিন্তু অসিতকুমার প্রচুরপরিমাণে রং ঢালিয়া দিয়াছেন। সুতরাং 'হরে-দরে হাঁটু-জল' হইয়া গিয়াছে। "বিবিধ প্রসঙ্গে" বিস্তার ও বাহুল্য আছে, গভীরতা নাই। শ্রী—পাঁড়ের গল্পটি গলায়

"রামকবচ" বাঁধিয়াও মাঠে মারা গিয়াছে। লেখকের লিপিকৌশল নাই, বাহুল্য আছে। "আলোচনা"য় শ্রীযুত কালীপদ মৈত্রের বাঙ্গালা শব্দকোষের সমালোচনা উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত রাধাগোবিন্দ চন্দ্রের "নীহারিকা ও সৃষ্টিতত্ত্ব" উপাদেয়। শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদারের "ভারত-শিল্পের অন্তপ্রর্কৃতি"র ফটকেই "প্র" সিপাহীর মত রেফের সঙ্গীন উদ্যত করিয়া দণ্ডায়মান। অন্তঃপুরে কে প্রবেশ করিবে? ব্যাকরণকে বধ না করিয়া কি গৌড়ের চিত্র-প্রতিভা বিকশিত হইতে পারে না? সকল শাস্ত্রের সকল বিধি ও নিয়মের সঙ্গেই কি ইঁহাদের অহি-নকুল-ভাব? প্রবন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যের অভাব নাই। স্বাভাবিকতা নকল নয়। আর মৌলিকতার অর্থও যথেচ্ছাচার নয়। বিধি-নিষেধের ক্ষেত্রেও সৃষ্টি সম্ভব। জগতে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

ভারতী। আষাঢ়।—প্রথমেই বুদ্ধের ছবি। কোনও বিশেষত্ব নাই। শ্রীযুত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের "অতিথি" নামক কবিতায় "ব্যথা-সমুখ চেতনায় মোর উদ্ভূত এ কি প্রতীতি" পড়িয়া মনে হয়, সাহিত্যেও জুজুর ভয় আছে! "মোর" যদি "মম"কে নির্ব্বাসিত না করিত, এবং "এ কি" যদি সর্ব্বনামের জুটাজুট ধারণ করিত, তাহা হইলে চরণটি খাঁটী সংস্কৃত-সমাজে কুলীন বলিয়া পরিচিত হইতে পারিত। শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর "ও-বাড়ির পুজো!" নাম দিয়া যে ছবিখানি আঁকিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, মহামহোপাধ্যায় হিন্দুর বাড়ীতেও পূজার সময় হোটেলের মহাপ্রসাদ আসিয়া থাকে। অতএব প্রতিপন্ন হইল, বাঙ্গালা দেশে যত হিঁদু আছে, সকলেই লুকাইয়া হোটেলের খানা খায়! হিঁদুয়ানী অক্কা লাভ করিয়াছে! "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" আমরা বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিব না। কিন্তু অশিক্ষিতপটু গগনেন্দ্র পটুয়া "এ-বাড়ির উৎসবে"র একখানি ছবি আঁকুন না!—পূজার ক্রমবিকাশ তাহাতে ফুটাইয়া দিন।—চণ্ডীমণ্ডপে মহামায়া নাই। সে বালাই দূর হইয়াছে। কুসংস্কারের শ্মশানে সু-সংস্কারের রাজ্য হইয়াছে। সুতরাং প্রতিমা-পূজার পরিবর্ত্তে নিরাকারের ভজনা হইতেছে। নৈবেদ্য নাই, ধূপ দীপ আছে। আর উপরের বৈঠকখানায়—দক্ষিণের বারান্দায় কারণের উৎস ছুটিয়াছে। 'পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা' কর্ম্মকর্ত্তার দুই এক জন বংশধর সাঙ্গোপাঙ্গ বসুন্ধরার ক্রোড়ে লুটিতে লুটিতে বলিতেছেন,—'মদ্য—মপেয়—মদেয়—মনিগ্রাহ্যম্!' ছবিখানি স্বভাবের অনুগত হইবে, তাহা আমরা ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি। শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ভারতে ষড়ঙ্গ" সুলিখিত সন্দর্ভ। ভাষায় মুদ্রাদোষ আছে, নহিলে মৌলিকতা থাকে না। কিন্তু প্রবন্ধে গবেষণার ও চিন্তাশীলতার পরিচয় আছে। শ্রীমতী প্রিয়ংবদা দেবীর অনুদিত "দ্বন্দ্বযুদ্ধ" নামক গল্পটি কৌতূহলের উদ্দীপক, এখনও সমাপ্ত হয় নাই। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "স্রোতের ফুল" তর্ক-বিতর্ক, মুদ্রাদোষ, কষ্টকল্পিত ভাব ও দুষ্ট ভাষার যাদুঘর। লেখক বলেন,— "ভগবান আমাদের মাথার মধ্যে মগজ ব'লে এতখানি পদার্থ যে পুরে দিয়েছেন, তা কি শুধু গাধার মতো ভারবহনের জন্যে, কাজে খাটাবার জন্যে একটুও নয়?" সুখের বিষয় এই যে, ভগবান সকলের ঘটে সমান মগজ দেন নি! বোধ হয়, কোনও কোনও মাথায় একেবারেই ও বস্তু নাই। ইহার প্রমাণ—স্রোতের ফুল। মস্তিষ্কের নিকট স্বভাবতঃ যা আশা করা যায়, তা যদি সকল ক্ষেত্রে 'ফলতো', তা হ'লে কেই বা লিখ্‌তো এ গল্প, আর কেই বা বইতো, কেই বা

পড়তো? অংর কেই বা খাটাতো, আর কেই বা গাধার মত খাটতো,—আর আপনাকে দিগ্‌গজ মনে কোরে কেই বা খমন্তের গর্জ্জনকে বৃংহিত বোলে চালাবার চেষ্টা কোরে সজ্জন-সমাজকে একটু হাস্যরস ভিক্ষা দিতো? অতএব, আমেন। শ্রীযুত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের "জীবনস্মৃতি" চলিতেছে। তাহা হইতে মাইকেলের গল্পটি তুলিয়া দিতেছি।—

"মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় কিরূপ সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন, তাহার একটা ঘটনা বলিতেছি। বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত নামে আমাদের এক' জন পরিচিত এবং অনুগত লোক ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই তাঁর টাকে হাত বুলাইতেন এবং ব্যবসা সম্বন্ধীয় নানাবিধ মৎলব আঁটিতেন। কিন্তু কোন ব্যবসায়েই তিনি লাভবান হইতে পারেন নাই। যে কাজেই তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। কিন্তু এ দিকে তিনি এক জন কাব্যরসিক এবং রসজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। মাইকেলের নিকট হইতে 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যের পাণ্ডুলিপি লইয়া পড়িয়া অবধি, কাব্যখানির উপর (?) তিনি অতিশয় অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন, 'ব্রজাঙ্গনা' পড়িয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। মাইকেল তাই জানিতে পারিয়া—'ব্রজাঙ্গনা'র সমস্ত স্বত্ব (কপিরাইট) সেই পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই বৈকুণ্ঠবাবুকে দান করেন। বৈকুণ্ঠবাবু নিজব্যয়ে কাব্যখানি প্রথম প্রকাশ করেন।" হেমচন্দ্রও তাঁহার কয়েকখানি গ্রন্থ এক জনকে দান করিয়াছিলেন। শ্রীমান্ অনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "ক্যামেরার সাহায্যে বন্যজন্তুর ছবি" অনুবাদ। বিষয়টি চিত্তাকর্ষক। কিন্তু শ্রীমানের ভাষা ক্রমে 'ভারতী'র ভাবে কষায়িত হইতেছে। 'বন্যজন্তুর ফটো' বাঙ্গালা, "ক্যামেরার সাহায্যে" ইত্যাদি ইংরাজী। লেখায় আশার আভাস আছে। যথেচ্ছাচারের প্রলোভন সংবরণ করিলে সাধনায় সিদ্ধি হইতে পারে। "শোক-সংবাদে" রাজা সার সৌরীন্দ্র-মোহনের ছবি আছে, শৈলেশের উল্লেখ আছে, ছবি নাই। শৈলেশ বোধ হয় হাসিতে হাসিতে রবি-রাহুকে বলিতেছে,—

"ধনী সে—দরিদ্র আমি,
সে আলো—এ অন্ধকার।"

২।১, রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর, কলিকাতা, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ৪৭।১, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে শ্রীঅধরচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

জাতক।

আমি জাতকগ্রন্থের বঙ্গানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এবং এ পর্য্যন্ত প্রায় এক শত জাতকের অনুবাদ শেষ করিয়াছি। সুতরাং এই প্রবন্ধে যাহা বলিব, তাহা উল্লিখিত শতসংখ্যক জাতকমাত্র অবলম্বন করিয়া। জাতকগ্রন্থ সমুদ্রবিশেষ;—মূল জাতকের সংখ্যা ৫৪৭; আবার তাহাদের অধিকাংশেই দুই, কোন কোনটীতে বা ততোধিক আখ্যায়িকা আছে। এক মহা-উন্মার্গজাতকের আখ্যায়িকা-সংখ্যা এক শতেরও অধিক হইবে। সুতরাং সমস্ত গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিতে পারিলে তাহাতে যে আরও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় থাকিত, তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ নাই। ফলতঃ অংশমাত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কোনও বিস্তীর্ণ দেশের বিবরণ লেখাও যেরূপ, একশতমাত্র আখ্যায়িকার উপর নির্ভর করিয়া সার্দ্ধ পঞ্চশত বা তাহার ত্রিচতুর্গুণ আখ্যায়িকাপূর্ণ গ্রন্থের পরিচয় দেওয়াও সেইরূপ।

জাতক-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, 'জাতক' কি, তাহা বলা আবশ্যক। সাহিত্যে 'জাতক' শব্দ দুইটী অর্থে ব্যবহৃত। ইহার প্রথম অর্থ—নবজাত শিশুর শুভাশুভনির্ণায়ক গ্রন্থ। এ অর্থে জাতক ফলিতজ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের আলোচ্য শাস্ত্রবিশেষ, এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধের বহির্ভূত। জাতকের দ্বিতীয় অর্থ—ভগবান্ গৌতমবুদ্ধের অতীত জন্মসমূহের বৃত্তান্ত। বৌদ্ধেরা ক্রমোন্নতি-বাদী। তাঁহারা বলেন, কোনও এক জন্মের কর্ম্মফলে কেহই গৌতম প্রভৃতির ন্যায় অপারবিভূতিবান্ সম্যক্‌সম্বুদ্ধ হইতে পারেন না। তাঁহারা বোধিসত্ত্ব, অর্থাৎ বুদ্ধাঙ্কুর বেশে কোটীকল্পকাল নানা যোনিতে জন্মজন্মান্তরপরিগ্রহপূর্ব্বক উত্তরোত্তর চরিত্রের উৎকর্ষসাধন এবং অভিজ্ঞা, সমাপত্তি, পারমিতা প্রভৃতি লাভ করেন, এবং অবশেষে পূর্ণপ্রজ্ঞাবলে অভিসম্বুদ্ধ হইয়া মহাপরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। অভিসম্বুদ্ধ হইলে তাঁহারা স্বকীয় ও পরকীয় অতীত জন্মবৃত্তান্তসমূহ নখদর্পণে দেখিতে পান। গৌতমবুদ্ধেরও এই অলৌকিক ক্ষমতা জন্মিয়াছিল। তিনি শিষ্যদিগকে উপদেশ দিবার সময় ভাবান্তর-প্রতিচ্ছন্ন সেই সমস্ত অতীত কথা বলিয়া তাহাদিগকে নির্ব্বাণ-সমুদ্রের অভিমুখে লইয়া যাইতেন।

মূল জাতক পালি অর্থাৎ মাগধীভাষায় লিখিত। পালি সংস্কৃতের সোদরা বা পুত্রী, তাহা ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দিগের বিচার্য্য। গৌতমের পূর্ব্বে ইহাতে যে কোনও

গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল, তাহা মনে করা যায় না; কিন্তু গৌতমের প্রতিভাবলে ইহা সমৃদ্ধি লাভ করিয়া নানা রত্নের প্রসূতি হইয়াছে। জনসাধারণকে মুক্তিমার্গ-প্রদর্শন গৌতমের ব্রত ছিল; কাজেই তিনি জনসাধারণের ভাষাতে ধর্ম্মদেশন করিতেন। দক্ষিণে বুদ্ধগয়া ও রাজগৃহ হইতে উত্তরে কপিলবস্তু ও শ্রাবস্তী, পশ্চিমে সাঙ্কাস্য হইতে পূর্ব্বে বৈশালী, এই সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ড গৌতমের লীলাক্ষেত্র। ইহাতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, নামে মাগধী হইলেও, পালি ভাষা এই সমস্ত ভূভাগেই আপামরসাধারণের ভাষা ছিল। উত্তরকালে রামানন্দ, কবীর প্রভৃতির যত্নে হিন্দীভাষার, কিংবা চৈতন্যদেব ও তদীয় শিষ্যসম্প্রদায়ের যত্নে বঙ্গভাষার যে সৌষ্ঠব সাধিত হইয়াছে, গৌতমের মহিমায় পালির তদপেক্ষাও অধিকতর সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল; কারণ, তিনি ব্যবহার না করিলে ইহা কখনও এমন মহামূল্য সাহিত্যের ভাণ্ডার হইতে পারিত না। ত্রিপিটক, ধম্মপদ, বিশুদ্ধমাগ্গ, মলিন্দপঞ্হ, মহাবংশ, দীপবংশ প্রভৃতি গ্রন্থ পালিভাষার মহার্হ রত্ন। পালি যেমন সুশ্রাব্য ও সুললিত, তাহাতে গৌতমের কণ্ঠবিনিঃসৃত হইয়া ইহা যে এক প্রকার ঐন্দ্রজালিক শক্তি লাভ করিয়াছিল, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

জাতকগ্রন্থ দাক্ষিণাত্য বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত—সপ্তাঙ্গের এক অঙ্গ। তাঁহারা বলেন, সমস্ত জাতকই বুদ্ধপ্রোক্ত। এ কথা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার না করিলেও, জাতক যে অতীব প্রাচীন গ্রন্থ, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। খ্রীষ্টের কিঞ্চিদধিক তিন শত বৎসর পূর্ব্বে মৌর্য্য মহারাজ অশোকের পুত্র স্থবির মহীন্দ্র যখন সিংহলে গমন করেন, তখন তিনি পিটকাদির ন্যায় জাতকগ্রন্থও সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে, তাদৃশ প্রাচীন সময়েও এই আখ্যায়িকাবলী লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। কেবল তাহাই নহে; জাতকের অনেক গল্প চরিয়পিটক প্রভৃতি আদিম বৌদ্ধশাস্ত্রেও সন্নিবেশিত দেখা যায়। চরিয়পিটক সম্ভবতঃ খ্রীষ্টের ৩৭০ বৎসর পূর্ব্বে বৈশালীর সঙ্গীতিতে বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছিল। অতএব এ কথা বোধ হয় নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, অধিকাংশ জাতক খ্রীঃ ৩৭০ বৎসর পূর্ব্বেই গ্রন্থাকার ধারণ করিয়াছিল, এবং খ্রীষ্টের ৩১০ বৎসর পূর্ব্বে মহীন্দ্রের সময়ে জাতক গ্রন্থ পূর্ণাঙ্গ হইয়াছিল। যদি শুদ্ধ সঙ্কলনের কার্য্যই এতাদৃশ প্রাচীন সময়ে হইয়া থাকে, তবে আখ্যায়িকাগুলির উৎপত্তিকাল নির্ণয় করিবার জন্য প্রাগৈতিহাসিক সময়ে যাইতে হয়! তাহারা, কে জানে কত যুগ ধরিয়া, লোকের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল। শিশুর পক্ষেই হউক, কিংবা শিশুকল্প প্রাচীন মানবের পক্ষেই হউক, পশু-পক্ষি-ভূত-প্রেত-সংক্রান্ত আখ্যায়িকা

সমধিক চিত্তগ্রাহিণী। সুতরাং বুদ্ধদেব ও তাঁহার শিষ্যগণ ধর্ম্মদেশনার্থ সে সকলকে আপনাদের সহায় করিয়া লইয়াছিলেন। মহাভারতকার প্রভৃতির কথা ছাড়িয়া দিলেও, উত্তরকালে যীশুখ্রীষ্ট, মোহম্মদ প্রভৃতি ধর্ম্মোপদেষ্টারাও প্রচলিত কথাবলম্বনে ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

ফলতঃ ভূমণ্ডলে কোনও দেশেই জাতক অপেক্ষা প্রাচীনতর কথাকোষ দেখা যায় না। রীস ডেবিড্‌ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, জাতকের অনেক আখ্যায়িকাই দেশকালপাত্রভেদে অল্লাধিকপরিমাণে রূপান্তরিত হইয়া ভারতবর্ষে গুণাঢ্যের ও ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথায়, সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে, বিষ্ণুশর্ম্মার হিতোপদেশে ও পঞ্চতন্ত্রে, এবং য়ুরোপখণ্ডে ঈষপের কথামালায়, চসার ও লা ফণ্টেনের কবিতায়, গ্রীম্‌-ভ্রাতৃদ্বয়ের কথাসংগ্রহে স্থান পাইয়াছে। আমি যতদূর অধ্যয়ন করিয়াছি, তাহাতে জাতকের মধ্যে আরব্য নৈশউপাখ্যানাবলীর সিন্দবাদ বণিকের অঙ্কুর দেখিয়াছি; যুধিষ্ঠিরের চরিত্র-পরীক্ষক বক-রূপী ধর্ম্মের এবং শকুন্তলার আভাস পাইয়াছি; সেণ্ট ম্যাথিয়ু বর্ণিত এক ঝুড়ি রুটী দ্বারা পঞ্চ সহস্র লোকের ভোজননির্ব্বাহবৃত্তান্ত দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি; দশরথ-জাতকে এক অপূর্ব্ব রামায়ণও প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনাদের কৌতূহলনিবৃত্তির জন্য আমি দশরথ-জাতকের বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি :—

পুরাকালে বারাণসীতে দশরথ নামে এক মহারাজ ছিলেন। তিনি ছন্দ, দোষ, মোহ, ভয়, এই চতুর্ব্বিধ অগতি পরিহার করিয়া যথাধর্ম্ম প্রজাপালন করিতেন। তাঁহার ষোড়শ সহস্র অন্তঃপুরচারিণী ছিলেন; তন্মধ্যে অগ্রমহিষীর গর্ভে দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রামপণ্ডিত; কনিষ্ঠ পুত্রের নাম লক্ষ্মণ কুমার, এবং কন্যার নাম সীতাদেবী।

কালসহকারে অগ্রমহিষীর মৃত্যু হইল। দশরথ তাঁহার বিয়োগে অনেকদিন শোকাভিভূত হইয়া রহিলেন; শেষে অমাত্যদিগের পরামর্শে তদীয় ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক অপর এক পত্নীকে অগ্রমহিষীর পদে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। নবীনা মহিষীও দশরথের প্রিয়া ও মনোজ্ঞা হইলেন, কিয়দ্দিনের মধ্যে গর্ভধারণ করিলেন, এবং গর্ভসংস্কারাদি লাভ করিয়া যথাকালে এক পুত্র প্রসব করিলেন। এই পুত্রের নাম হইল ভরতকুমার। রাজা পুত্রস্নেহের আবেগে একদিন মহিষীকে বলিলেন, "প্রিয়ে, আমি তোমায় একটী বর দিব; কি বর লইবে, বল।" মহিষী বলিলেন, "মহারাজ, আপনার বর দাসীর শিরোধার্য্য; কি বর চাই, তাহা এখন বলিব না।"

ক্রমে ভরতকুমারের বয়স সাত বৎসর হইল। তখন মহিষী একদিন দশরথের নিকট গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি আমার পুত্রকে একটী বর দিবেন, বলিয়াছিলেন; এখন সেই অঙ্গীকার পালন করুন।" রাজা বলিলেন, "কি বর চাও, বল।" "স্বামিন্, আমার পুত্রকে রাজপদ দিন্।" রাজা অঙ্গুলি-ছোটন করিয়া বলিলেন, "নিপাত যাও, বৃষলি; আমার প্রজ্বলিত অগ্নিখণ্ডসম অপর দুই পুত্র বর্ত্তমান; তুমি কি তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিতে চাও যে, নিজের পুত্রকে রাজ্য দিবার কথা বলিতেছ?" মহিষী রাজার তর্জ্জনে ভীত হইয়া নিজের সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে চলিয়া গেলেন; কিন্তু অতঃপর পুনঃপুনঃ রাজার নিকট ঐ প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। রাজা তাঁহাকে উক্ত বর দিলেন না বটে, কিন্তু চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'রমণীগণ অকৃতজ্ঞ ও মিত্রদ্রোহী; মহিষী কোনও কুটপত্র লেখাইয়া কিংবা নিজের দুরভিসন্ধিসাধনার্থ উৎকোচ দিয়া আমার পুত্রদিগের প্রাণবধ করাইতে পারেন।' অনন্তর তিনি পুত্রদ্বয়কে ডাকাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন, এবং বলিলেন, "বৎসগণ, এখানে থাকিলে তোমাদের বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা। তোমরা কোনও সামন্তরাজ্যে কিংবা বনে গিয়া বাস কর। যখন আমার দেহ শ্মশানে ভস্মীভূত হইবে, তখন ফিরিয়া আসিয়া পিতৃপৈতামহিক রাজ্য গ্রহণ করিও।" পুত্রদ্বয়কে এই কথা বলিয়া দশরথ দৈবজ্ঞ ডাকাইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলুন ত, আমি আর কত কাল বাঁচিব?" তাঁহারা বলিলেন, "মহারাজ আরও দ্বাদশ বৎসর জীবিত থাকিবেন।" তাহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "বৎসগণ, তোমরা দ্বাদশ বৎসরান্তে প্রত্যাগমন করিয়া রাজচ্ছত্র গ্রহণ করিও।" কুমারদ্বয় "যে আজ্ঞা" বলিয়া পিতার চরণবন্দনাপূর্ব্বক সাশ্রুনয়নে প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন। তখন সীতাদেবী বলিলেন, "আমিও সহোদরদিগের সহিত যাইব", এবং তিনিও পিতাকে প্রণাম করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহাদিগের অনুগমন করিলেন।

যখন ইঁহারা তিন জনে প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন, তখন সহস্র সহস্র নরনারী তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। তাঁহারা ইহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিলেন, এবং কিয়দ্দিন পরে হিমালয়ে প্রবেশ করিয়া সেখানে উদকসম্পন্ন, সুলভফলমূল কোনও স্থানে আশ্রমনির্ম্মাণপূর্ব্বক বন্য ফলমূলে জীবনযাপন করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণ পণ্ডিত ও সীতাদেবী রাম পণ্ডিতকে বলিলেন, "আপনি আমাদের পিতৃস্থানীয়; আপনি আশ্রমে অবস্থিতি করিবেন; আমরা আপনার আহারার্থ

বন্যফলাদি সংগ্রহ করিয়া আনিব।" রাম পণ্ডিত ইহাতে সম্মত হইলেন। তিনি তদবধি আশ্রমে থাকিতেন, এবং লক্ষ্মণ ও সীতা যে ফলমূল সংগ্রহ করিয়া আনিতেন, তাহা আহার করিতেন।

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা বন্য ফলে জীবনধারণপূর্ব্বক এইরূপে বাস করিতে লাগিলেন। এ দিকে মহারাজ দশরথ পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া নবমবর্ষেই দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার শরীরকৃত্য সম্পন্ন হইলে ভরত-জননী বলিলেন, ভরতেরই মস্তকোপরি রাজচ্ছত্র ধারণ করিতে হইবে। কিন্তু অমাত্যেরা ভরতকে রাজ্য দিলেন না; তাঁহারা বলিলেন, "যাঁহারা ছত্রের অধিপতি, তাঁহারা অরণ্যে অবস্থিতি করিতেছেন।" তাঁহারা ভরতকে ছত্র দিলেন না। তখন ভরত স্থির করিলেন, "আমি বনে গিয়া অগ্রজ রাম পণ্ডিতকে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে রাজছত্র দিব।' তিনি পঞ্চবিধ রাজচিহ্ন * লইয়া ও চতুরঙ্গ বলে পরিবৃত হইয়া † সেই বনে উপনীত হইলেন, এবং অবিদূরে স্কন্ধাবার স্থাপনপূর্ব্বক লক্ষ্মণ ও সীতার অনুপস্থিতিকালে কতিপয় অমাত্যসহ আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। সেখানে দেখিতে পাইলেন, পীতকাঞ্চনবর্ণাভ রাম পণ্ডিত নিঃশঙ্ক-মনে পরমসুখে আশ্রমদ্বারে উপবিষ্ট আছেন। ভরত অভিভাষণপূর্ব্বক তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন, এবং একান্তে অবস্থিত হইয়া দশরথের পরলোক-প্রাপ্তির সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপর তিনি অমাত্যদিগের সহিত রামের পাদমূলে পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রাম পণ্ডিত কিন্তু শোকও করিলেন না, ক্রন্দনও করিলেন না; তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র ইন্দ্রিয়বিকার ঘটিল না।

ক্রন্দনান্তে ভরত রামের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া রহিলেন। এ দিকে সায়ংকালে লক্ষ্মণ ও সীতা বন্যফলমূল আহরণপূর্ব্বক আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন। তদ্দর্শনে রাম পণ্ডিত ভাবিতে লাগিলেন, 'ইহারা তরুণবয়স্ক; এখনও আমার মত পূর্ণ প্রজ্ঞা লাভ করে নাই; যদি অকস্মাৎ বলি যে, পিতার মৃত্যু হইয়াছে, তাহা হইলে হয় ত শোকবেগধারণে অসমর্থ হইয়া ইহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইবে; অতএব কোনও উপায়ে ইহাদিগকে জলমধ্যে অবতরণ করাইয়া এই দুঃসংবাদ শুনাইতে হইবে।' অনন্তর পুরোভাগে এক জলাশয় দেখিতে পাইয়া তিনি বলিলেন, "তোমরা আজ বড় বিলম্ব করিয়া আসিয়াছ; আমি তোমাদিগকে তজ্জন্য দণ্ড

---

* খড়্গ, ছত্র, উষ্ণীষ, পাদুকা, বালব্যজন (চামর) এই পাঁচটী রাজককুদভাণ্ড নামে অভিহিত।

† হস্তী অশ্ব, রথ, পদাতি।

দিতেছি—'তোমরা এই জলে অবতরণ করিয়া দাঁড়াইয়া থাক।" অনন্তর তিনি এই গাথার্দ্ধ পাঠ করিলেন :—

১। (ক) লক্ষ্মণ সীতারে লয়ে, অবতরি জলমাঝে,
দুই জনে থাক দাঁড়াইয়া ;

লক্ষ্মণ ও সীতা এই কথা শুনিবামাত্র জলে অবতরণ করিয়া রহিলেন। তখন রাম পণ্ডিত তাঁহাদিগকে উক্ত দুঃসংবাদ দিবার নিমিত্ত গাথার অপরার্দ্ধ আবৃত্তি করিলেন :—

১। (খ) বলিল ভরত আসি গিয়াছেন স্বর্গপুরে
দশরথ জীবন ত্যজিয়া।

লক্ষ্মণ ও সীতা পিতার বিয়োগবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। চেতনা-লাভের পর তাঁহারা আবার যখন এই কথা শুনিলেন, তখন আবার মূর্চ্ছিত হইলেন। এইরূপে তাঁহারা উপর্য্যুপরি তিনবার বিসংজ্ঞ হইলে অমাত্যেরা তাঁহাদিগকে উত্তোলনপূর্ব্বক স্থলে লইয়া আসিলেন; এবং সেখানে তাঁহাদের চৈতন্য-লাভের পর সকলে বসিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন ভরতকুমার চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমার ভ্রাতা লক্ষ্মণকুমার ও ভগিনী সীতাদেবী পিতার মরণসংবাদ শুনিয়া শোকবেগধারণে অসমর্থ হইয়াছেন; কিন্তু রাম পণ্ডিত শোকাভিভূত হন নাই, বিলাপও করিতেছেন না! তাঁহার শোক না করিবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিতেছি।' অনন্তর তিনি দ্বিতীয় গাথা পাঠ করিলেন :—

২। বল, রাম, কোন্ বলে হ'য়ে বলীয়ান শোককালে শোকাতুর নহে তব প্রাণ ?
পিতার বিয়োগ-বার্ত্তা করিলে শ্রবণ, তথাপি না অভিভূত দুঃখে তব মন !

রাম পণ্ডিত নিজের অশোক-কারণ বুঝাইবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত গাথাগুলি পাঠ করিলেন :—

৩। দিবারাত্র উচ্চৈঃস্বরে করিয়া ক্রন্দন
যাহারে রক্ষিতে কেহ পারে না কখন,
তার জন্য বৃথা শোকে হয় কি কাতর
বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ, জ্ঞানবান্ নর ?

৪। বাল, বৃদ্ধ, ধনবান্, অতি দীন হীন,
মূর্খ, বিজ্ঞ, সকলেই মৃত্যুর অধীন।

৫। তরুশাখে ফল যবে পরিপক্ব হয়,
অনুক্ষণ থাকে তার পতনের ভয়।
জীবগণ, সেইরূপ, জন্মলাভ করি
মৃত্যুভয়ে দিবানিশি কাঁপে থরথরি।

৬। উষাকালে যাহাদের পাই দরশন
না হেরি সায়াহ্নকালে তার বহু জন ;
ইহাদের(ও) বহু জন উষা না ফিরিতে
অদৃশ্য হইয়া যায় যমের কুক্ষিতে।

৭। বৃথাশোকে অভিভূত হ'য়ে মূঢ় জন
আত্মার অশেষ ক্লেশ করে উৎপাদন ;
লভিত ইহাতে যদি সুফল তাহারা,
পণ্ডিতেও শোকবেগে হ'ত আত্মহারা।

৮। শোকেতে শরীরক্ষয়, লাভ নাহি আর,
বিবর্ণ, বিশুষ্ক দেহ, অস্থিচর্ম্ম সার।
শোকে কি করিতে পারে মৃতসঞ্জীবন ?
০ কি ফল পাইব তবে করিয়া ক্রন্দন ?

৯। বারির সাহায্যে যথা গৃহ দহ্যমান
সযতনে গৃহিগণ করয়ে নির্ব্বাণ ;
ধীর, শাস্ত্রজ্ঞানী, বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ
তেমতি শোকেরে সদা করেন দমন।
বায়ু-বেগে তুল-রাশি উড়ি যথা যায়,
প্রজ্ঞাবলে শোক তথা শীঘ্র লয় পায়।

১০। কর্ম্মবশে যাতায়াত করে জীবগণ,
কেহ মরে, কেহ করে জনম-গ্রহণ।
এই মাতা, পিতা, এই সোদর আমার,
হেনজ্ঞানে সুখে মগ্ন নিখিল সংসার।

১১। সুধীর শাস্ত্রজ্ঞ লোকে করেন দর্শন
ইহলোকে পরলোকে প্রভেদ কেমন।
যত বড় শোক কেন উপস্থিত হয়,
দহিতে পারে না কভু তাঁদের হৃদয়।

১২। গিয়াছেন স্বর্গে পিতা, কি কাজ ক্রন্দনে?
লইব পিতার স্থান, দীনেরে করিব দান,
মানীর রাখিব মান, ভাবিয়াছি মনে।
জ্ঞাতিজনে সাবধানে করিব পালন,
পুষিব যতনে আর যত পরিজন।

উল্লিখিত গাথাগুলি দ্বারা রামপণ্ডিত সংসারের অনিত্যত্ব বুঝাইয়া দিলেন।

সমবেত জনগণ রামপণ্ডিতের অনিত্যত্ব-ব্যাখ্যা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ শোকমুক্ত হইলেন। অনন্তর ভরত কুমার, রামের চরণবন্দনাপূর্ব্বক বলিলেন, "চলুন, এখন বারাণসীতে প্রতিগমন করুন।" রাম বলিলেন, "ভাই, লক্ষ্মণ ও সীতাকে লইয়া যাও, এবং ইহাদের সহিত রাজ্য শাসন কর।" "না, দাদা! আপনাকেই রাজ্যগ্রহণ করিতে হইবে।" "ভাই, বাবা বলিয়াছিলেন, দ্বাদশ বৎসর পরে আসিয়া রাজ্য লইবে; এখন ফিরিলে তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করা হইবে। আরও তিন বৎসর যাউক; তাহার পর আমি ফিরিব"। "এত দিন কে রাজ্য করিবে?" "তুমি করিবে। "আমি করিব না।" "তবে আমি যত দিন না ফিরি, ততদিন এই পাদুকা রাজ্য করিবে।" ইহা বলিয়া রাম নিজের তৃণনির্ম্মিত পাদুকাদ্বয় খুলিয়া ভরতের হস্তে দিলেন।

অনন্তর ভরত, লক্ষ্মণ ও সীতা ঐ পাদুকা লইয়া রামের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন, এবং সহস্র সহস্র অনুচরে পরিবৃত হইয়া বারাণসীতে ফিরিয়া গেলেন।

রামের পাদুকাই তিন বৎসর বারাণসীরাজ্যের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিল। বিবাদনিষ্পত্তিকালে অমাত্যেরা ইহা সিংহাসনের উপর রাখিয়া দিতেন; যদি নিষ্পত্তি ন্যায়বিরুদ্ধ হইত, তাহা হইলে পাদুকাদ্বয় পরস্পরকে আঘাত করিত; তাহা দেখিয়া অমাত্যেরা সেই বিবাদের প্রতিবিচার করিতেন। নিষ্পত্তি ন্যায়সঙ্গত হইলে পাদুকাদ্বয় নিঃস্পন্দভাবে থাকিত।

তিন বৎসর অতীত হইলে রামপণ্ডিত অরণ্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক বারাণসীর উদ্যানে উপনীত হইলেন। কুমারদ্বয় তাঁহার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া অমাত্যগণ সহ উদ্যানে গমন করিলেন, এবং সীতাকে অগ্রমহিষীর পদে বরণ করিয়া উভয়ের অভিষেকক্রিয়া সম্পাদিত করিলেন। কৃতাভিষেক মহাসত্ত্ব রাম অলঙ্কৃত রথে আরোহণ পূর্ব্বক পুরবাসিগণ সহ নগরে প্রবেশ করিলেন, এবং, পুরপ্রদক্ষিণপূর্ব্বক সুচন্দ্রক নামক প্রাসাদের ঊর্দ্ধতমতলে অধিরোহণ করিলেন।

অতঃপর তিনি ষোড়শসহস্র বৎসর যথাধর্ম্ম রাজ্য করিয়া সুরলোকবাসীদিগের সংখ্যা-বর্দ্ধনার্থ ইহলোক ত্যাগ করিলেন।*

কেবল রামচরিত বলিয়া নয়, অধুনাপ্রচলিত আরও অনেক আখ্যায়িকা জাতকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে কূট-বণিকের কথা, বক-কুলীরকের কথা, আকাশচর কূর্ম্মের কথা, ধর্ম্মবুদ্ধি ও পাপবুদ্ধির কথা, সিংহচর্ম্মধারী গর্দ্দভের কথা প্রভৃতি আমাদের সুপরিচিত বহু কথা আছে। এই সকল কথা ভারতবর্ষীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হওয়া বিস্ময়ের কারণ নহে; কিন্তু ইহারা কিরূপে য়ুরোপে গেল? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমতঃ বৌদ্ধভিক্ষুদিগের অসীম উদ্যমের কথা স্মরণ করিতে হয়। তাঁহারা পতিতের উদ্ধার হেতু হিমাচল লঙ্ঘন করিয়া, দুস্তর সাগর পার হইয়া দূর দেশে গমন করিয়াছিলেন, কাজেই তাঁহাদিগকে

---

* বৌদ্ধ রামায়ণ উপাখ্যানাংশে যে অতীব নিকৃষ্ট, তাহা বোধ হয় বলিবার প্রয়োজন নাই। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এরূপ অপকৃষ্ট আখ্যায়িকার মূল কি? যদি এই জাতকের রচনাকালে বাল্মীকির মহাকাব্য বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় আপামর সাধারণের পরিজ্ঞাত থাকিত, তাহা হইলে, বৌদ্ধ উপাখ্যানকার বোধ হয় মূলঘটনার এরূপ বিকৃতি ঘটাইতে সাহসী হইতেন না। তাঁহার উদ্দেশ্য—গল্পচ্ছলে জনসাধারণকে ধর্ম্মতত্ত্বশিক্ষাদান। সর্ব্বজনগ্রাহ্য কোনও আখ্যায়িকার এবংবিধ হাস্যোদ্দীপক পরিবর্ত্তন ঘটাইলে শুদ্ধ যে ইহার অপকর্ষ সাধিত হয়, তাহা নহে, গল্পের মুখ্য উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হইয়া যায়।

তবে কি বলিতে হইবে যে, বুদ্ধের সময়ে রামায়ণের বৃত্তান্ত এইরূপে অসংস্কৃত অবস্থাতেই লোকের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল; শেষে মহাকবির প্রতিভা-প্রভাবে মহারত্নে পরিণত হইয়াছে? কথাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা জানেন যে, অনেক গল্পই আদিম অবস্থায় কাব্যোৎকর্ষরহিত; কিন্তু শেষে বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, সেক্সপেয়ার প্রভৃতি রসজ্ঞ কবিদের লেখনীর গুণে সুমার্জ্জিত, সংশোধিত ও অলঙ্কৃত হইয়াছে। আমরা জাতকের প্রথমখণ্ডে শকুন্তলার উপাখ্যান ও বকরূপী ধর্ম্মকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের চরিত্রপরীক্ষা-বৃত্তান্তও এইরূপ অসংস্কৃত অবস্থাতেই দেখিতে পাই।

বৌদ্ধ রামায়ণের ন্যায় জৈনদিগেরও এক রামায়ণ আছে। উহা হেমচন্দ্রাচার্য্যপ্রণীত প্রাকৃত ভাষায় লিখিত "ত্রিষষ্টি শলকপুরুষচরিত্র" নামক বিস্তীর্ণ গ্রন্থের অংশ। জৈন রামায়ণ অপেক্ষাকৃত অনেক অধুনাতন সময়ে লিখিত; ইহার সহিত বাল্মীকির রামায়ণের মূলঘটনা সম্বন্ধে তত পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয় না। জৈন রামায়ণে রাবণ-বধের পর তাঁহার পুত্র ইন্দ্রজিৎ এবং ভ্রাতা বিভীষণ ও কুম্ভকর্ণ তদীয় বিশাল রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশের আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, এবং অরণ্যবাস হইতে ফিরিয়া রামচন্দ্র রাজ্যভার গ্রহণ করিলে ভরত সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, এইরূপ বর্ণনা দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন ইহাতে বিস্তর অপ্রাসঙ্গিক কথা আছে; জিনেন্দ্রদিগের মাহাত্ম্যপ্রচার সেগুলির উদ্দেশ্য। অতএব বৌদ্ধরামায়ণ সম্বন্ধে যাহাই স্থির করা যাউক না কেন, জৈন রামায়ণ যে বাল্মীকির অতি অপকৃষ্ট অনুকরণ, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

সহোদরের সহিত সহোদরার বিবাহ ভারতবর্ষে একপ্রকার অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার। প্রাচীন মিশর দেশে টলেমি নামক গ্রীক রাজবংশে এই জঘন্য প্রথার প্রচলন দেখা যায়। টলেমিবংশের রাজ্যপ্রাপ্তি বুদ্ধদেবের বহু পরে হইলেও মহারাজ অশোকের সিংহাসনারোহণের পূর্ব্ববর্ত্তী। ইহা হইতে কি অনুমান করিতে হইবে যে, দশরথ-জাতকটী অশোকের সময়ে বা তাহার কিছু পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল?

জাতকাবলীর আদি প্রচারক বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তাহার পর মাসিডন-পতি সেকেন্দারের প্রতিভাবলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঘটে; ইহা জাতকাবলীর প্রচারের দ্বিতীয় সোপান। তদনন্তর অশোকাদির সময়ে গ্রীস্, মিশর প্রভৃতি অঞ্চলে ভিক্ষুদিগের গমন ও বৌদ্ধ দিগ্‌বিজয়ী এটিলা, জঙ্গিস্ খাঁ প্রভৃতির অভিযান ও য়ুরোপে রাজ্যবিস্তার, এ সমস্ত দ্বারাও প্রতীচ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম-কথার প্রচার হইয়াছিল। অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি, কেবল শ্যামে ও সিংহলে, হিমবন্তে ও হিরণ্যভূমিতে, চীনে ও জাপানে নয়, য়ুরোপে ও আমেরিকাতেও শিশুগণ অদ্যাপি ধাত্রী ও জননীর মুখে ভারতবর্ষজাত এই সকল প্রাচীন কথা শুনিয়া অপার আনন্দ ও উপদেশ লাভ করিতেছে।

মহীন্দ্র যে সকল পালি গ্রন্থ সিংহলে লইয়া যান, সেগুলি কিয়দ্দিন পরে সিংহলী ভাষায় অনূদিত হয়। তৎপরে, কি কারণে বলা যায় না, পালি মূল বিনষ্ট হইয়া যায়। মাগধীব্রাহ্মণকুলজাত সুপ্রসিদ্ধ বুদ্ধঘোষ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে সিংহলে গিয়া ঐ সিংহলী গ্রন্থনিচয়ের পালিভাষায় পুনরনুবাদ করেন। আমরা এখন যে পালি জাতক পাইয়াছি, তাহা বুদ্ধঘোষের লেখনীপ্রসূত কি না, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে বটে; কিন্তু তিনি ইহার লেখক না হইলেও, অনুবাদ যে তাঁহারই সময়ে বা তাঁহার অব্যবহিত পরে সম্পন্ন হইয়াছিল, ইহা নিশ্চিত। উদীচ্য বৌদ্ধেরা 'জাতকমালা' নাম দিয়া ইহার সংস্কৃত অনুবাদেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা কেবল পঁয়ত্রিশটী জাতকের ভাষান্তর করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিব্বত, চীন ও জাপানদেশের ভাষাতেও অনেক জাতকের অনুবাদ হইয়াছিল।

প্রায় পঁচিশ বৎসর হইল, কোপেনহেগেন-বাসী মহামহোপাধ্যায় ফোস্‌বল অক্লান্তপরিশ্রমে ইংরেজী অক্ষরে সমগ্র পালি জাতক প্রকাশ করেন। অতঃপর কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় অধ্যাপক স্বর্গীয় কাউএল মহোদয়ের সম্পাদকত্বে ইহার ইংরাজী অনুবাদ শেষ করিয়াছেন। এই অল্পকালের মধ্যেই জাতকগুলি য়ুরোপবাসীদিগের এত প্রিয় হইয়াছে যে, তাঁহারা ইহাদের কোনও কোনও অংশ অবলম্বন করিয়া শিশুপাঠ্য-গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশে এ পর্য্যন্ত এ দিকে অনেকের দৃষ্টি পড়ে নাই। এই জন্যই আমি ইহার বঙ্গানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছি। হিতবাদী, বসুমতী, নব্যভারত, সাহিত্যসংহিতা, কায়স্থপত্রিকা, জগজ্জ্যোতিঃ প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়েরা মধ্যে মধ্যে অনূদিত অংশ-বিশেষ মুদ্রিত করিয়া আমার উৎসাহবর্দ্ধন করিয়াছেন। আমি যত দূর অগ্রসর হইয়াছি, তাহাতে আশা করি, অচিরে সার্দ্ধশত-আখ্যায়িকাযুক্ত প্রথম

খণ্ড মুদ্রিত করিতে পারিব। কিন্তু আমার যে বয়স, এবং সমগ্র গ্রন্থ যেরূপ বিস্তীর্ণ, তাহাতে আশঙ্কা হয়, আমি ইহা একাকী শেষ করিয়া যাইতে পারিব না।

উপসংহারে জাতকের উপযোগিতা সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব।

প্রথমতঃ।—জাতকের সমস্ত কথাই উপদেশাত্মক, এবং ইহাদের সকলগুলি না হউক, অধিকাংশই মহাপুরুষবাক্য। কাজেই ইহা হইতে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই নির্ম্মল আনন্দের সহিত উপদেশ লাভ করিতে পারিবে। ইহার কোনও কোনও অংশ এমন সুন্দর যে, পাঠের সময় মনে হয়, যেন সেই করুণাবতার জগদ্গুরুর অমৃতময়ী বচনপরম্পরা এখনও আমাদের কর্ণকুহরে ঝঙ্কৃত হইতেছে। কিরূপে কথাচ্ছলে ও বচনমাধুর্য্যে অতি দুরূহ ধর্ম্মতত্ত্বও সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারা যায়, জাতকে তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন আছে।

দ্বিতীয়তঃ।—জাতক-পাঠে সৃষ্টির একত্ব উপলব্ধি হয়, সর্ব্বজীবে প্রীতি জন্মে। খ্রীষ্টধর্ম্মে বলে, মানবমাত্রকেই ভ্রাতৃভাবে দেখ। বৌদ্ধধর্ম্মে বলে—জীবমাত্রকেই আত্মবৎ বিবেচনা কর। যিনি এ যুগে বুদ্ধ, তিনি অতীত যুগে মৃগ, মর্কট, মৎস্য, বা কূর্ম্ম ছিলেন; যে এ যুগে মৃগ বা মর্কট, সেও ভবিষ্যদ্‌যুগে পূর্ণেন্দ্রিয়সম্পন্ন দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিবে। অতএব, অদ্যই হউক, আর কল্পান্তেই হউক, সমস্ত জীবই এক—কর্ম্মসমষ্টিমাত্র, এবং কর্ম্মক্ষয়ান্তে সকলেই নির্ব্বাণ লাভ করিবে।

তৃতীয়তঃ।—জাতকের অনেক আখ্যায়িকায়, বিশেষতঃ প্রত্যুৎপন্নবস্তুতে পুরাকালের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারা যায়। তখন দেশান্তরের সংস্পর্শে ভারতবর্ষের বিকৃতি ঘটে নাই; কাজেই তদানীন্তন সমাজের খাঁটী নিখুঁৎ চিত্র দেখিতে হইলে, এই সকল অংশ পাঠ করা আবশ্যক। আমরা দেখিতে পাই, তাদৃশ প্রাচীন সময়েও এতদ্দেশীয় ধনী লোক সপ্তভূমিক প্রাসাদে বাস করিতেন; বণিকেরা পোতারোহণে দ্বীপান্তরে বাণিজ্য করিতে যাইতেন; জলপথে জল-নিয়ামকেরা ও স্থলপথে মরুকান্তার অতিক্রম করিবার সময় স্থল-নিয়ামকেরা পথ প্রদর্শন করিয়া দিতেন; মহানগরসমূহের অধিবাসিগণ চাঁদা তুলিয়া অনাথাশ্রম চালাইতেন, এবং অনাথ বালকেরা পুণ্যশিষ্যরূপে পরিগৃহীত হইয়া অধ্যাপকদিগের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিত। তখন ভারতবর্ষের মধ্যে তক্ষশিলা নগরই বিদ্যালোচনার সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান ছিল; কাশী প্রভৃতি দেশ হইতে শতসহস্র ছাত্র বিদ্যাশিক্ষার্থ তক্ষশিলায় যাইত। জীবকের আখ্যায়িকায়

দেখা যায়, তক্ষশিলায় চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা দিবার অতি সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। জীবক শল্য-চিকিৎসায় যেরূপ নৈপুণ্যলাভ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমানকালের অনেক বিখ্যাত Surgeonএর পক্ষেও গৌরবজনক।

চতুর্থতঃ।—জাতকে প্রাচীন ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ কোশল ও মগধরাজ্যের অনেক ঐতিহাসিক কথা আছে। প্রসেনজিতের পিতা মহাকোশলের কন্যার সহিত বিম্বিসারের বিবাহ হইয়াছিল; বিবাহকালে মহাকোশল স্নানাগারের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ কন্যাকে কাশীগ্রাম যৌতুক দিয়াছিলেন; দেবদত্তের পরামর্শে বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু পিতার প্রাণবধ করিলে, প্রসেনজিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ গ্রাম বিনষ্ট করিয়াছিলেন; তন্নিবন্ধন প্রসেনজিতের সহিত অজাতশত্রুর যুদ্ধ হইয়াছিল; ঐ যুদ্ধে প্রথমে প্রসেনজিৎ পরাস্ত হইলেও পরে বিজয়ী হইয়াছিলেন, এবং পরিণামে অজাতশত্রুকে কন্যাদান করিয়া সন্ধি করিয়াছিলেন। অজাতশত্রু পিতৃ-বধজনিত অনুতাপে ক্লিষ্ট হইয়া বুদ্ধের শরণ লইয়াছিলেন; লিচ্ছবিগণ কপিলবস্তু বিধ্বস্ত করিয়াছিল; এইরূপ অনেক কথা জাতকে পাওয়া যায়। এই নিমিত্ত Vincent Smith প্রভৃতি পুরাবৃত্তকারগণ জাতককে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিবৃত্তের অন্যতম ভাণ্ডার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পঞ্চমতঃ।—যেমন গ্রীকৃশিল্পে হোমার ও হেসিয়ডের, হিন্দু শিল্পে রামায়ণ ও মহাভারতের, সেইরূপ বৌদ্ধ শিল্পে পিটক ও জাতকের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সাঁচী, ভরহুৎ, বড়বুদ্ধ * প্রভৃতি স্থানের ধ্বংসাবশেষে পুরাতন তক্ষকগণের যে অদ্ভুত প্রতিভার নিদর্শন আছে, তাহা সুন্দররূপে বুঝিতে হইলে, জাতকের সহিত পরিচয় আবশ্যক।

ষষ্ঠতঃ।—জাতকপাঠে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃতি অতি বিশদরূপে প্রকটিত হয়। অনেকের বিশ্বাস, বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী। কিন্তু আমার বোধ হয় যে শাক্ত, শৈব, সৌর, বৈষ্ণব প্রভৃতি মতের ন্যায় বৌদ্ধধর্ম্মও হিন্দুধর্ম্মেরই শাখান্তর। ইহাতে পরলোক আছে, স্বর্গ ও নরক আছে, কর্ম্মফল আছে, ইহাতে ইন্দ্রাদি দেবতা, বলি প্রতিগ্রাহি-দেবতা বৃক্ষদেবতা, যক্ষরাক্ষসাদি উপদেবতা আছেন। ইহা সার্ব্বজনীন হইলেও উচ্চজাতির প্রাধান্য স্বীকার করে, শ্রমণ, ব্রাহ্মণকে সমান আদর করে, নীচবর্ণে জন্ম পাপের ফল বলিয়া মনে করে। ইহার ক্ষণিকত্ববাদ, শূন্যবাদও বোধ হয় নিতান্ত অহিন্দু নহে; ইহার পরিনির্ব্বাণে ও হিন্দুর সাযুজ্য-মুক্তিতে বোধ হয় প্রভেদ অতি অল্প। তবে ধর্ম্মের যাহা বহিরঙ্গমাত্র, যাহাতে আড়ম্বর আছে,

* বড়বুদ্ধ বা বড়বুদোরা যবদ্বীপের অন্তর্ব্বর্ত্তী একটী স্থান।

কিন্তু নিষ্ঠা নাই, যাহাতে যজ্ঞ হয় প্রাণিবধের জন্ত, বৌদ্ধগণ কেবল তাহারই বিরোধী। সে ভাব ত বৈষ্ণবদিগের মধ্যেও দেখা যায়। তবে আমরা বুদ্ধকে, ভগবানের নবম্যাবতারকে অহিন্দু বলিতে যাইব কেন? আমরা বরং তাঁহাকে ও তাঁহার শিষ্যগণকে হিন্দু বলিব। তাহা হইলে বুঝিব, হিন্দুর মাহাত্ম্য, হিন্দুর আধ্যাত্মিক প্রভাব কেবল ভারতবর্ষে সীমাবদ্ধ নহে; সমগ্র ভূমণ্ডলে দেদীপ্যমান—বুঝিব, হিন্দুর সংখ্যা বিংশতি কোটী নহে, সপ্ততি কোটী—বুঝিব, কেবল দশগুণোত্তর অঙ্কলিখন-প্রণালীতে নয়, ধর্ম্মে ও দর্শনেও হিন্দু জগদ্‌গুরু; কারণ, বৌদ্ধধর্ম্মের নিকট খ্রীষ্টধর্ম্মের ঋণ ও খ্রীষ্টধর্ম্মের নিকট মোহম্মদীয় ধর্ম্মের ঋণ এখন আর অস্বীকার করিবার বিষয় নহে।

সপ্তমতঃ।—জাতক পড়িলে দেখা যায়, বৌদ্ধেরা তখন কিরূপ উৎসাহের সহিত কুসংস্কারের বিরোধী হইয়াছিলেন। তাঁহারা যখনই সুযোগ পাইতেন, তখনই ফলিতজ্যোতিষ, শকুনবিদ্যা প্রভৃতিকে বিদ্রূপ করিতেন। ইহার নিদর্শন-স্বরূপ মঙ্গল-জাতকের একটী গাথা শুনুন:—

মঙ্গলামঙ্গল লক্ষণ বিচারি ভীত নয় যাঁর মন,
উল্কাপাত আদি উৎপাত নেহারি অক্ষুব্ধচিত্ত যে জন,
দুঃস্বপ্ন দেখিয়া কাঁপে নাক হিয়া, পণ্ডিত তাঁহারে বলি;
কুসংস্কার-জাল ভেদি জ্ঞানবলে মুক্তিমার্গে যান চলি।
না পারে তাঁহারে স্পর্শ করিবারে যমজ যে সব পাপ; *
পুনর্জন্ম তাঁর কভু নাহি হয় ভুঞ্জিতে ত্রিবিধ তাপ।

নক্ষত্র-জাতক হইতে আর একটী গাথা শুনুন:—

মূর্খ যেই, সেই বাছে শুভাশুভ ক্ষণ,
অথচ সে শুভফল না পায় কখন।
সৌভাগ্য নিজেই শুভগ্রহ আপনার;
আকাশের তারা, তার শক্তি কোন্ ছার।

অষ্টমতঃ।—বাঙ্গালা ভাষার অনেক শব্দের উৎপত্তি-নির্ণয় করিতে হইলে, পালি সাহিত্যের, বিশেষতঃ জাতকের আলোচনা আবশ্যক। অনেক বাঙ্গালা শব্দ সংস্কৃত-জাত হইলেও, এত বিকৃতি পাইয়াছে যে, এখন তাহাদের মূলনির্ণয় করা সুকঠিন। কিন্তু পালির সাহায্যে আমরা এই বিকৃতির প্রথমাবস্থা দেখিতে পাই, কাজেই মূলনির্দ্ধারণ সহজ হয়। উদাহরণস্বরূপ আমি কয়েকটী শব্দ দেখাইতেছি:-

সংস্কৃত	পালি	বাঙ্গালা
দুহিতা	ধীতা	ঝি
দ্বিতীয়+অর্দ্ধ	দিয়ড্ঢো	দেড়

* যমজ পাপ, যথা,—ক্রোধ ও হিংসা ইত্যাদি। ইহাদের একটী জন্মিলেই অন্যটী দেখা দেয়।

অৰ্দ্ধ + তৃতীয়	অদ্ধতীয়	আড়াই
অলাবু	লাপি	লাউ
গবী	গাবী	গাভী
উদক	উলুক	ওড়ুং
নির্দ্ধামন	নিদ্ধামন	নৰ্দ্দামা
নির্দান	নিড্ডান	নিড়ান
প্রীতিকা	পিলোতিকা	পলতে
খাদ্য	খজ্জ	খাজা।
তড়াগ	তলাক	তালাও
ক্ষাম	ঝাম	ঝামা
যবস	যাবস	যাব
দাঢ়িকা	দাথিকা	দাড়ি
হ্রদ	দহ	দ
বাসী	বাসী	বাসুলি, বা'স

অপিচ, জাতক সাধারণগ্রাহ্য ভাষায় লিখিত বলিয়া ইহাতে নিত্যব্যবহার্য্য এমন অনেক শব্দ পাওয়া যায়, যাহা আমরা হারাইয়াছি; অথচ যে সকল শব্দ গ্রহণ করিলে আমাদের ভাষার সৌষ্ঠববৃদ্ধি হইতে পারে। আমরা দেখি, তখন pilot ছিল, তাহারা জল-নিয়ামক নামে অভিহিত হইত। তখন foundation stoneকে মঙ্গলেষ্টক, laying the foundationকে মঙ্গলেষ্টকস্থাপন, Viceroyকে উপরাজ এবং Viceroyaltyকে ঔপরাজ্য বলা হইত। তখন এ দেশের লোক Surgeonকে শল্যকর্ত্তা, nosegayকে পুষ্পগুল, sugar-millকে গুড়যন্ত্র, benchকে ফলকাসন, earnest moneyকে সত্যঙ্কার এবং সায়াহ্নভোজনকে সায়মাশ বলিত। এইরূপ অচল শব্দগুলি সাহিত্যসেবীদিগের প্রয়োজনীয় কিনা তাহা বিবেচনার বিষয়। *

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ।

নর-বলি।

২

এখন আমাদের ঘরের কথা বলিব। হিন্দু জাতির আদিম আচার বলি-বিষয়ে কিরূপ ছিল, দেখা যাউক।

হিন্দু জাতির সকলের আদি রচনা, শ্রুতি। বেদ ও ব্রাহ্মণ শ্রুতি। শ্রুতিমধ্যে বলির কথা প্রচুর; নরবলির উল্লেখের অসদ্ভাব নাই। হিন্দু জাতির সর্ব্বপ্রাচীন আদি ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায় যে, আর্য্যগণ সেই অতি পুরাকালে

---

* সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে পঠিত।

দেবতৃপ্ত্যর্থে, নরবলি প্রদান করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। বেদের মধ্যে ঋগ্বেদ সর্ব্বপ্রাচীন ও সর্ব্বগরিষ্ঠ। ঋক্‌সংহিতার শুনঃশেফমন্ত্র নরবলির পরিচায়ক। শুনঃশেফকে বধ করিবার জন্য যূপকাষ্ঠে তিন স্থানে তাঁহাকে বন্ধন করা হইয়াছিল; মরণভয়ে ব্যাকুল হইয়া মুক্তিলাভের নিমিত্ত, পিতামাতাকে দেখিতে পাইবার নিমিত্ত, পৃথিবীতে থাকিতে পাইবার নিমিত্ত, তিনি কয়েকটি মন্ত্র দ্বারা দেবগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। এই মন্ত্রগুলি ঋক্‌বেদে আছে। ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতেও সপ্রমাণ হয়, ভারত বর্ষীয় আর্য্যগণ প্রকৃতই নরবলি দিতেন। পূর্ব্বে দেবগণ নর বা পুরুষপশু আলম্ভন করিতেন, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুরুষপশু সম্বন্ধে বিস্তর কথা আছে। শুক্ল যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখায় নর-বলির স্পষ্ট উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এখানে বুঝা যায়, দেবতার উদ্দেশে নরমাংস প্রদান করা হইত। তৈত্তিরীয়-সংহিতার মধ্যেও পুরুষপশুবধের ভূরি প্রমাণ আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে পুরুষমেধ যজ্ঞের বিধান লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণে নরবলির বিধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে স্পষ্ট লিখিত আছে, অশ্বমেধ যজ্ঞকালে নরবলি দিতে হয়। শ্রৌতসূত্রসমূহে এই পুরুষমেধের ক্রম-পরিপাটী আরও বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে। পুরুষমেধ-যজ্ঞের পুরুষটির মুণ্ডচ্ছেদ হইবার পর মন্ত্রটি বেশ—

"চয়নকার্য্যে ব্যবহ্রিয়মান হে পুরুষ, তুমি আদিত্যবৎ তেজস্বী সহস্রপোষী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এই যজমান পুরুষকে অমৃতে সিঞ্চিত কর, তেজে পরিবর্দ্ধিত কর; তোমার শির গ্রহণ করা হইয়াছে, ইহাতে জাতক্রোধ হইও না, প্রত্যুত যজমানকে শতায়ু কর।"—যজু—মাধ্য—৪১ কণ্ডিকা—১৩ অঃ।

শতপথ ব্রাহ্মণের এক আখ্যায়িকায় আছে, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা তপস্যা করিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন, তপস্যায় অনন্তত্বলাভ হয় না; অতএব আমি ভূতসমূহের নিকট নিজেকেই ও নিজের নিকট ভূতসমূহকে হোম করিব। তিনি এইরূপ হোম করিয়া সমস্ত ভূতের শ্রেষ্ঠতা, স্বারাজ্য ও আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন।

তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে,—সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল প্রজাপতি ছিলেন, তিনি প্রজা ও পশুসৃষ্টির ইচ্ছায় নিজের বপা উদ্ধৃত করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান ও তাহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন।

কোনও কোনও বিচক্ষণ পণ্ডিতের মত,—আমরা ইদানীং যজ্ঞকে 'যগ্‌গি'তে পরিণত করিয়াছি;—যজ্ঞ সমারোহের সহিত 'দীয়তাং ভুজ্যতাং ব্যাপারে' পরিণত

হইয়াছে। ইহা ভুল; যজ্ঞের আদিম অর্থ ইহা নহে। যজ্ঞের মর্ম্মভাব, ত্যাগ—Sacrifice। পূর্ব্বকালে যজ্ঞ বলিলে লোকের মনে ত্যাগের ভাবই ফুটিয়া উঠিত। বাস্তবিক যজ্ঞের প্রধান উপাদান, ত্যাগ। প্রজাপতি যে বিরাট যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া এই জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন, পুরুষসূক্তে তাহার ইঙ্গিত আছে। সে মহাযজ্ঞ আর কিছুই নহে, জীবের মঙ্গলার্থ ভগবানের বিপুল আত্মত্যাগ। এইরূপ জগতের পোষণের জন্য ভগবানের উদ্দেশে যে আত্মত্যাগ, আর্য্যগণ তাহাকেই যজ্ঞ নামে অভিহিত করিতেন।

কালক্রমে যজ্ঞের এই মহান্ সমুন্নত ভাবের কি দারুণ বিকৃতি ঘটিয়াছিল! যজ্ঞ অর্থে মহামারী কাণ্ড!

যজুর্ব্বেদ-সংহিতায় পুরুষ-পশু-বধের অতি দীর্ঘ বিধান দৃষ্ট হয়। শুক্ল যজুর্ব্বেদের বা বাজসনেয়ি-সংহিতার ত্রিংশ অধ্যায়টি সমগ্র ভাবে কেবল পুরুষমেধসম্বন্ধীয় কথায় পূর্ণ। ১৮৪ দেবতার উদ্দেশে ১৮৪ প্রকার নরপশুর এ স্থানে উল্লেখ দেখিয়া আমাদিগকে স্তম্ভিত হইতে হয়। (১) এই পুরুষ-পশুর মধ্যে কোনও জাতীয় লোকই বাদ পড়েন নাই—

ব্রহ্মণে ব্রাহ্মণং ক্ষত্রায় রাজন্যং মরুদ্ভ্যো বৈশ্যং তপসে শূদ্রম্‌……এই প্রকার আরম্ভ করিয়া সূত, মাগধ, শৈলুষ, রথকার, সূত্রধার, কর্ম্মকার, মণিকার, ইষুকার, ধনুষ্কার, জ্যাকার, রজ্জুকার, মৃগয়ু, (ব্যাধ), কুক্কুরনেতা, নিষাদপুত্র, কুলালপুত্র, হস্তিপাল, অশ্বপাল, গোপাল, মেষপাল, অজপাল, সুরাকার, কাষ্ঠাহার ইত্যাদি।

নানাপ্রকার মৎস্যজীবী, কৃষক (বপ), বহুবিধ বাদ্যকর, খেলোয়াড়, চোর, ডাকাত প্রভৃতি ত আছেই।

ভিষক্, জ্যোতিষী, বাঁশবাজীওয়ালা (বংশনর্ত্তিন্) হইতে চোখ-মিট্‌মিটে (মির্ম্মির), বিড়াল-চোখো (হর্য্যক্ষ), মাথায় টাকওয়ালা (খলতি), দাঁত-বার-করা (দন্তুর), কেহই বাদ পড়েন নাই। কুমারীপুত্র ও দিধিষুপতি—বিধবা-বিবাহকারীও আছেন।

স্ত্রীলোকও নিস্তার পায় নাই; পুরুষের ন্যায় তাহাদিগকেও বলি দেওয়া হইত। এই সকল স্ত্রীলোকের নাম করা হইয়াছে—বস্ত্রপ্রক্ষালনকারিণী, রঙ্গয়িত্রী (বস্ত্রের রঙ্গকারিণী), বন্ধ্যা, যমজপ্রসবিনী, নিরপত্যা, অপ্রসূতা,

(১) পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় ১৮৪ জনের কথা তুলিয়াছেন, কিন্তু মূলে সমগ্র তালিকাটি যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে দৃষ্ট হয়, দেবতা বরং দু চারটি কম, কিন্তু পুরুষপশু (ভরসা করি, কেহ 'মজা জানোয়ার' মনে করিবেন না—তাহা নর ও নারী) এক শত চুরাশী প্রকারেরও অধিক।

কুলটা, উপপত্নী, জর্জ্জরদেহা, পলিতকেশা, কামোদ্দীপিকা (স্মরকারিণী), ইত্যাদি।

আবার এই সকল লোকও যজ্ঞে বধ্য-রূপে উক্ত হইয়াছে,—ভয়ঙ্কর-চীৎকার-কারী (রেভ), কাপুরুষ (ভীমল), দুর্ম্মদ, উন্মত্ত, বিকল (অপ্রতিপদ), ব্রাত্য (সাবিত্রীপতিত), দ্যূতকার, জার, ক্লীব, কুব্জ, বামন, খঞ্জ, জলক্লিন্ননেত্র (স্রাম), অন্ধ, বধির, খর্ব্ব, ইত্যাদি।

তার্কিক (প্রশ্নিন্), কুঁদুলে (প্রকরিতার), জ্যাঠা (ভষ), ফকোড় (বহুবাদিন্), কুৎসাস্বভাব (জনবাদিন্), খবরওয়ালা (ঋতুল), ইঁহারা পর্য্যন্ত রহিয়াছেন।

সদোষের ন্যায় সগুণ লোকও বলি কল্পিত হইতেন। তবে ইহা খুব অল্প দেখা যায়। এই তালিকাতেই আছে—"প্রিয়ায় প্রিয়বাদিনম্", "নর্ম্মায় ভদ্রবতীম্" ইত্যাদি।

বাজসনেয়ি-সংহিতায় এই সকল বধ্য উল্লেখ করিয়া লিখিত হইয়াছে—

"অথৈতান্ অষ্টৌ বিরূপানালভতে—অতিদীর্ঘঞ্চাতিহ্রস্বঞ্চ অতিস্থূলঞ্চাতিকৃশঞ্চ অতিশুক্লঞ্চাতিকৃষ্ণঞ্চ অতিকুল্বঞ্চাতিলোমশঞ্চ।"—৩০—২২—১।

অর্থাৎ, এই সকল বিরূপ লোককে বলি দেওয়া হয়;—অতি-ঢ্যাঙ্গা, অতি-বেঁটে, অতি-মোটা, অতি-রোগা, অতি-ফর্সা, অতি-কালো, অতি-নির্লোম, অতি-লোমযুক্ত।

ইহার আলোচনা করিলে মনে হয়, সাধারণতঃ বিরূপ লোকই বধ্য-মধ্যে পরিগণিত হইত। ভাগ্যে বিধি উঠিয়া গিয়াছে, নহিলে হয় ত আমাদের অনেককেও হাড়কাঠে টান পড়িত!

বাজসনেয়ি-সংহিতায় যেরূপ অতিদীর্ঘ বধ্য-তালিকা পাওয়া যায়, তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে ঠিক ঐরূপ তালিকা আছে। শতপথ-ব্রাহ্মণেও পুরুষ-পশু সম্বন্ধে বিস্তর কথা দেখা যায়। নিখিল প্রাণীর উপর আধিপত্য-লাভের উদ্দেশে পুরুষমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন হইত। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বর্ণেরই শুধু এ যজ্ঞে অধিকার ছিল। [তন্ত্র শাস্ত্রের মতে 'সিদ্ধাই'-লাভার্থ নরবলি-দানে বর্ণনির্ব্বিশেষে সকলেই অধিকারী।]

আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্রে অভিজ্ঞ Rosen, Wilson প্রমুখ পাশ্চাত্য মনীষিগণ ঋগ্বেদের শুনঃশেফ-বৃত্তান্তটীকে একেবারে রূপক ধরিয়া ঋগ্বেদের সময়ে নরবলি প্রচলিত ছিল না, ইহাই বলিতে চাহেন। কৃতবিদ্য রমেশচন্দ্র দত্তের মতও তাহাই। বেদবিদ্ পণ্ডিত দয়ানন্দ স্বরস্বতী সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন,—বৈদিক যুগে জীবন্ত প্রাণী বলিদান কিংবা মাংসভোজন চলিত

ছিল না। শুনিলে বিস্ময় জন্মে। যশস্বী ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র কিন্তু ইঁহাদের সহিত একমত হইতে পারেন নাই; তিনি আচার্য্য ম্যাক্স্মূলার ও মনিয়ার উইলিয়ামস্ প্রভৃতির ন্যায় বিশ্বাস করেন, বৈদিক যুগে নরবলি ছিল; শুনঃশেফ-কাহিনী ও ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের পুরুষমেধ রূপক নয়। অধ্যাপক কোলব্রুক (colebrooke) একটি কঠিন সমস্যার কথা পাড়িয়াছেন; তিনি কহেন, বেদের পুরুষমেধ ও অশ্বমেধ যজ্ঞ রূপক ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না; কারণ, হিন্দুশাস্ত্রে বিধি আছে, যজ্ঞ-শেষ ভোজন করিতে হয়; এই সকল যজ্ঞে যদি প্রকৃত মনুষ্য বা অশ্ব বধ করা হইত, তাহা হইলে ত মানিতে হয়, প্রাচীন ঋষিগণ অশ্বমাংসাশী ও নরখাদক ছিলেন। ইহা সত্য, না সম্ভব? কিন্তু কথাটা হইতেছে, রূপক বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সকল স্থলে খাটে কি?

নরবলির সহিত নরমাংস-ভক্ষণ-প্রবৃত্তির সম্পর্ক আছে—ইহা অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। প্রাচ্য পণ্ডিতগণ বা ব্রাহ্মণ ঠাকুর মহাশয়েরা এ মত গ্রহণ করিতে সম্মত নহেন; তাঁহারা বলেন;—দেব-উপাসনার ইহাই নিয়ম যে, দেবতার নিকটে নিজের মন প্রাণ শরীর সমস্তই উৎসর্গ করিতে হয়। বোধ হয়, এই মহান্ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই উপাসকগণ দেবতার উদ্দেশে আত্মাকে উৎসর্গ করিতেন, নিজের শরীর সমর্পণ করিতেন; দেবতার নিকট নিজেই নিজেকে বলি প্রদান করিতেন। এই ভাব ভারতের পরবর্ত্তী সাহিত্যসমূহের মধ্যেও চলিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ঠিক বিপরীত ভাবও যে দাঁড়াইয়াছিল, সে কথা অস্বীকার করা চলে না। কোথায় আত্মত্যাগ—আপনাকে বলিদান, আর কোথায় উদ্দাম জীবহনন, রক্তগঙ্গার উত্তাল তরঙ্গ! ইহার জন্যই ত ভগবান শাক্য সিংহের অবতার। সে কথা থাক্।

আমরা প্রজাপতির আত্মোৎসর্গের কাহিনীর আভাস দিয়াছি। পুরাণ ইতিহাসে দেখা যায়, সুরথ রাজা নদীপুলিনে ভগবতীর মহীয়সী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া নিজের শরীর-রক্ত দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন। দশানন নিজের সমস্ত আননই ছেদন করিয়া মহেশ্বরের পদতলে উপহার দিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র নিজের চক্ষু উৎপাটন করিয়া শক্তিদেবীর অর্চ্চনা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। [এখন-কার কালেও আমাদের স্নেহময়ী জননী বা আত্মীয়াগণ আমাদের মঙ্গল-কামনায় ইষ্টদেবতার নিকট বুক চিরিয়া রক্ত দিয়া থাকেন।] ভগবানের আনুকূল্য-লাভের জন্য শরীরপাতই এই সকল কঠোর অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

পরে ক্রমশঃ আপনাকে বাঁচাইয়া প্রতিনিধি করিয়া অপর মনুষ্যকে উপহার বা বলি দিবার প্রথা চলিত হইয়াছিল; ইহা হইতেই পুরুষমেধের সৃষ্টি।

শ্রুতির শুনঃশেফও প্রতিনিধি ছিলেন। রামায়ণে আছে, অম্বরীষ রাজার যজ্ঞীয় পশু অপহৃত হইয়াছিল; পুরোহিত ঠাকুর বিধান দিয়াছিলেন, হয় সেই পশুকে ধরিয়া আনা হউক, নহিলে তৎস্থলীয় করিবার জন্য কোনও মনুষ্যকে ক্রয় করিয়া আনিতে হইবে। (১) এক ব্রাহ্মণ বটুকে বলিদানের জন্য ক্রয় করিয়া আনিয়া কার্য্য সম্পন্ন হয়। নহুষ-পুত্র রাজা যযাতি পিতার প্রেতাত্মার সদগতিলাভার্থ নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এখানেও মূল্য দিয়া এক ব্রাহ্মণবটু ক্রীত হইয়াছিল। মহাভারতে আমরা দেখিতে পাই, মগধরাজ জরাসন্ধ মহাদেবের নিকট বলি দিবার নিমিত্ত এক শত নৃপতি সংগ্রহ করিতেছিলেন; শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া বাধা দেন; ভগবান্ জরাসন্ধকে ধমকাইয়া কহিয়াছিলেন, "পাপমতি, ইহা অধর্ম্ম, তোমা ব্যতিরেকে আর কোন ব্যক্তি সবর্ণের পশু-সংজ্ঞা করিতে পারে? আমরা নরবলি কখনও দেখি নাই।" ইহা হইতে সপ্রমাণ হয়, মহাভারতের সময়ে নরবলিপ্রথা বিলক্ষণ কমিয়া আসিয়াছিল। (২)

বৈদিক যুগেও ক্রমে এমন সময় আসিয়াছিল, যখন নরবলি অন্যায় বিবেচিত হওয়ায় পশুই নরের প্রতিনিধিরূপে গৃহীত হইয়াছিল। পশু নিজের প্রতিনিধি বলিয়া বিবেচিত হইত, ইহার প্রমাণ জন্য তৈত্তিরীয়-সংহিতার এই বচনটি তুলিতে পারা যায়—

যদগ্নিষোমীয়ং পশুমালভত আত্মনিক্রয়ণ এবাস্য সঃ।—তৈ—স ; ৬।১।১১।৬

যজমান যে অগ্নিষোমীয় পশু বধ করে, তাহা সে অগ্নি ও সোমকে পশুরূপ মূল্য প্রদান করিয়া তাহাদের নিকট হইতে নিজেকে ক্রয় করিয়া লয়।

পাশ্চাত্য জগতেও যজ্ঞে এইরূপ প্রতিনিধি-নিয়োগের কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

ভারতবর্ষে কতপ্রকার জীব দেব-বলিতে ব্যবহৃত হইত, তাহা তৈত্তিরীয়-সংহিতায় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। এই সকল জীবের মধ্যে জলচর, স্থলচর, উভচর, সর্ব্ববিধ জীবেরই নাম দেখা যায়; যেমন নক্র, মকর, শূকর, মর্কট,

(১) দেবীভাগবতেও ঠিক এইরূপ আখ্যান আছে। একটা মিল আশ্চর্য্যজনক;— কি ঋক্‌বেদ, কি রামায়ণ, কি দেবীভাগবত—সর্ব্বত্রই বলির পুরুষ শুনঃশেফ, সর্ব্বত্রই তিনি সাংঘাতিক মুহূর্ত্তে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন, ইহা রহস্যবিশেষ।

(২) শুধু নরবলি-নিষেধ নহে, মহাভারতেই শ্রীকৃষ্ণ প্রচার করিয়াছেন—
"প্রাণিনামবধস্তাত সর্ব্বজ্যায়ান্ মতো মম।"—অর্থাৎ, অহিংসা পরম ধর্ম্ম।

শুকশারী, ক্রৌঞ্চ, চক্রবাক্ ইত্যাদি। নিরুক্তকার যাস্ক যথার্থই বলিয়াছেন—এতাদৃশ পশুহিংসা-স্থলে বেদ-বচন বলিয়া অহিংসাই বুঝিয়া লইতে হইবে—

আম্নায়বচনাদহিংসা প্রতীয়েত।—নিরুক্ত ১।৫।৩

বুঝিতে পারা যায়, পুরুষমেধ বা নরবলির স্থলে ক্রমে পশুবলি স্থান পাইয়াছিল। প্রথমে প্রায় সর্ব্ববিধ পশুকেই টান পড়িত; ক্রমশঃ ভক্ষ্য প্রাণীগুলিই বলি-শ্রেণীতে টিকিয়া গেল। তার পর সময়ক্রমে বাছাই হইয়া, সুস্বাদু বলিয়াই হউক, আর সুলভ সহজলভ্য বলিয়াই হউক, অধুনা গুটিকতক জীব মেধ্য রহিয়া গিয়াছে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে লিখিত মেধ্যপশুর পর্য্যায় দেখিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয়, বৈদিক কাল, অন্ততঃ ব্রাহ্মণ-যুগ হইতেই নরবলি অপেক্ষা পশুবলি, এবং পশুবলি অপেক্ষা শস্যবলি ক্রমশঃ শ্রেয়স্কর বিবেচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। আখ্যানটি এই –

পূর্ব্বে দেবতারা নর বা পুরুষ-পশু আলম্ভন করিতেন; তাহাকে আলম্ভন করিলে তাহাতে স্থিত যজ্ঞীয় সার ভাগ চলিয়া গেল, তাহা অশ্বে প্রবেশ করিল। তখন তাঁহারা অশ্বকে আলম্ভন করিলেন; তাহাকে আলম্ভন করিলে অশ্ব হইতে যজ্ঞীয় সার ভাগ চলিয়া গেল, তাহা বৃষে প্রবেশ করিল। তখন তাঁহারা বৃষকে আলম্ভন করিলেন; তাহাকে আলম্ভন করিলে ঐ সার ভাগ চলিয়া গেল, তাহা মেষে প্রবেশ করিল। তখন দেবগণ মেষকে আলম্ভন করিলেন। মেষকে আলম্ভন করিলে ঐ সার ভাগ মেষ হইতে চলিয়া গেল, তাহা ছাগে প্রবেশ করিল; তখন তাঁহারা ছাগকে আলম্ভন করিলেন। ছাগকে আলম্ভন করিলে ঐ সার ভাগ চলিয়া গেল, তাহা পৃথিবীতে প্রবেশ করিল। তখন দেবগণ পৃথিবী খনন করিলেন, এবং ব্রীহি লাভ করিলেন।

ব্রীহি, যবাদি শস্য। অতএব দেখা যাইতেছে, ঋষিগণের মতে যজ্ঞীয় সার ভাগ ক্রমে মনুষ্য ও নানা পশু হইতে অপক্রান্ত হইয়া শস্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। নরবলি অপেক্ষা পশুবলি (তাহাও বড় হইতে ক্রমান্বয়ে ছোট জন্তু) এবং পশুবলি

---

(৪) পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কিংবা পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত এ দেশীয় সুধীবর্গের কেহ কেহ (শ্রদ্ধেয় অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি) বলিয়াছেন,—বেদের মন্ত্রভাগই প্রাচীন ও প্রামাণিক। বেদের মন্ত্রভাগে নরবলির আভাস নাই, তবে ব্রাহ্মণভাগে এই বীভৎস আচারের উল্লেখ আছে। কিন্তু শ্রুতির ব্রাহ্মণভাগ মন্ত্রভাগের অন্ততঃ সহস্রবর্ষ পরবর্ত্তী কালের রচনা। ইহাতে যে সমস্ত বিধি দৃষ্ট হয়, সম্ভবতঃ তাহার অনেকগুলি যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণকুলের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত কপোল-কল্পিত বিধান।

অপেক্ষা শস্যবলি প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সামিষ হইতে নিরামিষ যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদিত হইতেছে।

"মা হিংস্যাঃ সর্ব্বা ভূতানি"—এই মহাবাক্য শ্রুতি হইতেই প্রচারিত হইয়াছিল। শ্রুতির ব্রাহ্মণভাগ হইতে স্মৃতিতে সরিয়া আসিলে দেখা যায় যে, পুরুষমেধ ব্যাপার তখনও অপ্রচলিত ছিল না। মনু-স্মৃতি হইতে তাহার প্রমাণ মিলে। কিন্তু বোধ হয় এই বীভৎস অনুষ্ঠানের প্রচলন যখন সাধারণ হইয়া আসিল, বাজসনেয়ি-সংহিতার দোহাই দিয়া যত্র তত্র যখন তখন যেমন খুসী মানুষ বলিদান দেদার চলিতে লাগিল, তখন লোকের বিভীষিকা উৎপাদন করিয়াছিল; তাহাতেই এই আচার কলিযুগে নিষিদ্ধ বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। স্মৃতি-সংহিতাদিতেও, নানা পশু পক্ষী মৎস্যাদি বলিদানের বিধি পাওয়া যায়—'মহোক্ষ' পর্য্যন্ত। সঙ্গে সঙ্গে উপদেশ আছে—"প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।"

পুরাণ শাস্ত্র আচার ব্যবহারে স্মৃতিরই অনুগামী। কেবল স্মৃতিতে নয়, পুরাণেও দেখা যায়, এই পুরুষমেধ-নিষেধের সঙ্গে অশ্বমেধ, মহাপ্রস্থান, দেবর দ্বারা সন্তানোৎপাদন প্রভৃতি অন্য কতকগুলি আচারও নিষিদ্ধ হইয়াছে। তবে, কোনও কোনও পুরাণ চণ্ডিকা দেবীর নিকট নরবলি দিবার বিধি দিয়াছেন, অথচ পুরুষমেধ নিষেধ করিয়াছেন। কালিকা পুরাণ একখানি উপপুরাণ। কালিকা পুরাণের মতে আমাদের শক্তিপূজা হইয়া থাকে; কালিকা পুরাণে নরবলির বিধি ত আছেই, তদ্ব্যতীত পুরুষ-বলিদানের বিধাননিচয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ আছে। (১) কেহ কেহ বলেন, এই শ্রেণীর কয়েকখানি পুরাণ ও উপপুরাণ তন্ত্র শাস্ত্রের আবির্ভাবের পরে প্রণীত এবং তন্ত্র শাস্ত্রের বা তান্ত্রিক বিধানের অনুসারী। তন্ত্র শাস্ত্রের অধিকাংশের বয়স অনেক অধিক নহে। তান্ত্রিক ধর্ম্ম দেড় সহস্র বৎসরের অধিক পুরাতন হইবে না।

তন্ত্র শাস্ত্রে—তান্ত্রিক ধর্ম্মে নরবলির বিধি আছে, দেখা যায়। তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠানে কাপালিক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে নরবলি, শব-সাধনা প্রভৃতি ছিল। নরবলি দ্বারা সিদ্ধিলাভ করা যায়, এই বিশ্বাসে কালীমাতার নিকট কত ভীষণ কাণ্ডই না হইয়া গিয়াছে। শুনা যায়, অঘোরপন্থী প্রভৃতি তান্ত্রিক সম্প্রদায় না কি নরমাংস ও আমমাংস-ভক্ষণেও বিরত নহে; নররক্তও নাকি তাহাদের উপাদেয় পানীয়। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বেকার সংস্কৃত সাহিত্যে নরমাংস-ভক্ষণের উল্লেখ

---

(১) কালিকা পুরাণের মতে নরবলিই বলির শ্রেষ্ঠ, নরবলির ফল সহস্রবর্ষব্যাপী। মুণ্ডমালা তন্ত্রে আছে—'নরে দত্তে মহর্দ্ধিঃ স্যাদষ্টা সিদ্ধেরনুত্তমা।'

আছে। দণ্ডীর পূর্ব্ববর্ত্তী গুণাঢ্য-কৃত পিশাচভাষায় রচিত বৃহৎকথার সংস্কৃত অনুবাদ কথাসরিৎসাগরে ডাকিনী-মন্ত্রসিদ্ধির জন্য নরমাংস-ভক্ষণ বর্ণিত আছে। দণ্ডিকৃত দশকুমারচরিতে দুর্ভিক্ষবশতঃ মনুষ্যমাংস-ভোজন লিখিত দেখা যায়।

বিন্ধ্যাচল ও তৎসন্নিহিত প্রদেশে গোড়, শবর প্রভৃতি অনার্য্য জাতি কয়েকটি ভয়ঙ্কর দেবতা ও নররুধিরপ্রার্থিনী দেবীর পূজা করিত। আর্য্যগণ তাঁহাদিগকে 'কালভৈরব' 'চণ্ডী চামুণ্ডা' নাম দিয়াছিলেন। কোল, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতি ভারতবর্ষের বন্য পার্ব্বত্য বা আদিম অনার্য্য অসভ্য জাতির মধ্যে অপদেবতাদিগের অনিষ্টকর প্রবৃত্তিদমনের নিমিত্ত কিংবা কোনও বিশেষ সমারোহ ব্যাপার উপলক্ষে তাহাদিগকে রক্ত উপহার দেওয়া ধর্ম্মের বা অর্চ্চনার অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত। তাহাদিগের এই সকল দেবতা-বিশেষগণ রক্তপানের জন্য লালায়িত; মনুষ্যরক্ত পাইলে তাহারা বড়ই খুসী; বিশেষতঃ কচি শিশুর রক্তে তাহারা তৃপ্তির চরম লাভ করিয়া থাকে। এই বিশ্বাস এই অসভ্যদিগের হৃদয়ে বদ্ধমূল; তজ্জন্য তাহারা যে কোনও উপায়ে হউক, নররক্তসংগ্রহে ব্যস্ত, এবং প্রতিবেশী জাতিগণের শিশুহরণের অবসর খুঁজিয়া বেড়ায়। আমাদের ভিতর 'ছেলেধরা'র ভয়ের ইহাই বোধ হয় মূল। আজ কাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে সময়ে সময়ে বর্ব্বরগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত নরবলির সংবাদ আমাদিগের নিকট পঁহুছায়। সমাজের নিম্নস্তরের নিরক্ষর অনেক জাতির এখনও ধারণা, কোনও বৃহৎ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিবার জন্য নরবলি আবশ্যক হয়; গুজব উঠিয়াছিল, এই সেদিনও নাকি পূর্ব্ববঙ্গে পদ্মার সাড়া সেতুর ভিত্তি আরম্ভ করিবার প্রাক্কালে গবর্মেণ্ট নরবলির জন্য বেগার লোক ধরিয়া বেড়াইতেছিলেন। গবর্মেণ্ট-রিপোর্ট হইতে জানা যায়, এই বঙ্গদেশের মধ্যেই পর্ব্বতবাসী ও জঙ্গলবাসী অনার্য্য অসভ্যদিগের ভিতর এখন পর্য্যন্ত গোপনে নরবলি প্রচলিত আছে। উড়িষ্যার অন্তর্ব্বর্ত্তী কোনও কোনও প্রদেশে খন্দ জাতির মধ্যে চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও নরবলি দেওয়া হইত; অনাবৃষ্টি ঘটিলে কিংবা শস্যাদি বপন বা সংগ্রহের সময় তাহারা ধরিত্রী দেবীর নিকট শিশু বলি দিত; ইংরেজেরা স্বচক্ষে দেখিয়া তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এই সকল আচার বন্ধ করিবার জন্য গবর্মেণ্টকে আইন করিয়া বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছে।

অধিক দিন নয়, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময় এই বঙ্গদেশেই দেবী কালীর নিকট নরবলি দেওয়া হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কথিত আছে, ঠগী নামক নৃশংস দস্যু-সম্প্রদায় ইষ্টদেবী [illegible] পূজায় নরবলি

প্রদান করিত। জনরব—কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী চিৎপুরে চিত্রেশ্বরী দেবীর নিকট প্রসিদ্ধ 'রোঘো' ডাকাত নরবলি প্রদানপূর্ব্বক ডাকাতি করিতে যাইত। ইদানীং আইনের ভয়েই হউক, আর জ্ঞানবৃদ্ধি সভ্যতাবৃদ্ধির জন্যই হউক, নরবলি ভারতবর্ষে একপ্রকার লোপ পাইয়াছে, বলা চলে; এবং তৎস্থলে পশুবলি প্রচলিত হইয়াছে। তাহাও ক্রমে কমিয়া আসিতেছে, মনে হয়।

বৃহন্নীল তন্ত্র প্রভৃতি তন্ত্রশাস্ত্রে চণ্ডিকা দেবীর নিকট নরবলি দিবার বিধি আছে। পরন্তু বলির নর দুষ্প্রাপ্য হইলে নরের প্রতিকৃতি বলি দিবার বিধানও দৃষ্ট হয়। এই কারণেই কোথাও কোথাও খড়ের বা পিষ্টকের প্রতিমূর্ত্তি-বলি এখনকার কালেও দেখা যায়। বঙ্গদেশে হিন্দুগৃহে অনেক প্রাচীন পরিবার-মধ্যে, যাঁহাদের ভিতর শক্তি-পূজায় এককালে বামাচার প্রথা প্রচলিত ছিল, তাঁহারা পূর্ব্বে দেবী দুর্গা কিংবা কালীর নিকট নরবলি প্রদান করিতেন, বোধ হয়। কেন না, এখনও তাহার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তাঁহাদের বংশধরগণের দ্বারা মনুষ্যের প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া (শত্রু-রূপে?) বলি দেওয়া হইয়া থাকে। এক হস্ত আন্দাজ দীর্ঘ ক্ষীরের পুতুল গড়িয়া কালিকাপুরাণের বিধান অনুসারে দেবীর সম্মুখে বলিদান করা হয়। সেই পুতুলে প্রাণ-প্রতিষ্ঠার মন্ত্র পর্য্যন্ত আওড়ান হইয়া থাকে। অনেক স্থলে ইহা শত্রু-বলি।

দেবীর নিকট স্বগাত্র-রুধির-বলি বা বুক চিরিয়া রক্তদান—অপেক্ষাকৃত আধুনিক বিধান বলিয়া মনে হয়।

দেবতৃপ্ত্যর্থ আত্মপ্রাণ বলি দিবার তথা আত্মীয় স্বজনের প্রাণ উৎসর্গ করিবার আরও কয়েকটি প্রথা এই ভারতে কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। যথাবিধি অনুষ্ঠানের পর 'মহাপ্রস্থান' বা নদীগর্ভে প্রবেশ, 'তুষানল' বা অগ্নিকুণ্ডে আত্মসমর্পণ, 'ভৃগুপাত' বা পর্ব্বতের সমুচ্চ শৃঙ্গ হইতে লম্ফপ্রদান দ্বারা স্বদেহ-চূর্ণীকরণ—এই সকলের দৃষ্টান্তও ভারতবর্ষের বহু স্থানে অনেক পাওয়া যায়। মোক্ষলাভবাসনায় পুরীধামে জগন্নাথদেবের রথচক্রতলে ইচ্ছা করিয়া জীবন-বিসর্জ্জন-প্রথা অতি অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শুনা গিয়াছে। সদ্গতিলাভোদ্দেশে স্বেচ্ছায় অনশনে জীবনত্যাগ বা 'প্রায়োপবেশন'—ইহারও উল্লেখ মিলে। এ সকলও ত দেবতার প্রসাদনে মনুষ্যপ্রাণ-বলির উদাহরণ। দেবতুষ্টির নিমিত্ত নদীগর্ভে সন্তানবিসর্জ্জন, এ নির্ম্মম আচার আমাদের এক পুরুষ পূর্ব্বের লোক কেহ কেহ হয় ত স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।

পর্ব্বতের উচ্চ চূড়া হইতে নীচে ফেলিয়া দিয়া প্রাণসংহার দ্বারা বলিদান—

এ প্রথা ভারতবর্ষে এখন পর্য্যন্ত অপ্রচলিত নহে; তবে দায়ে পড়িয়া নর-স্থলে পশুপ্রয়োগ করিতে হয়। মাইওয়ার ভীলদিগের সম্বন্ধে কোনও গ্রন্থে সেদিন দেখিতেছিলাম যে, যোধপুরে রাজ-অভিষেকসময়ে ইদানীং পর্য্যন্ত চতুর্ভুজা দেবীর সম্মুখে মহিষ ও ছাগ বলি দেওয়া হইয়া থাকে, এবং এই সকল বলির পশুকে ছেদন করা হয় না, সমুচ্চ পর্ব্বতের উপরিস্থিত দুর্গের প্রাচীর-শিখর হইতে নীচে ফেলিয়া দিয়া সংহার করা হয়। চিতোরেও পর্ব্বতশিখরস্থ প্রাচীন দেবমন্দিরে এইরূপ করিয়া বলি দেওয়া হইয়া থাকে। প্রবাদ আছে, ইদানীং পশু নরের স্থান অধিকার করিয়াছে। জয়পুর রাজ্যের পুরাতন রাজধানী অম্বরে অম্বাদেবীর মন্দিরে এখনও পর্য্যন্ত একটি করিয়া ছাগ বলি দেওয়া হয়; কিংবদন্তী এইরূপ,—ঐ স্থানে পূর্ব্বে নরবলি দেওয়া হইত, ছাগ এখন তাহার প্রতিনিধি।

রাজপুতানার প্রাচীন ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারি, কোনও এক চিতোরেশ্বরের নিকট হইতে ক্রমাগত দ্বাদশ রাজপুত্র বলি গ্রহণ করিয়া চিতোরাধিষ্ঠাত্রী দেবী তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। দেবীর সেই 'মঁয় ভুখাঁ হো' ধ্বনি মনে পড়িলে এখনও আমাদের রোমাঞ্চ উপস্থিত হয়। ইহাও না নরবলির নিদর্শন?

রাজোয়ারা-নারীর প্রাণ-উন্মাদক 'জহর' ব্রত ঠিক বলির নিদর্শন না হইলেও, কতকটা এই জাতীয়—প্রাণ লইয়া খেলা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। আর, মেওয়ারের মহারাণার দুহিতা কুমারী কৃষ্ণকুমারীর হত্যা—তাহাও বলিদান-বিশেষ।

ভারতবর্ষে অনেক স্থলে কন্যাসন্তান জন্মিলে, তাহাকে নাকি সদ্যঃ সদ্যঃ জগৎ হইতে বিদায় করিবার ব্যবস্থা হইত; তাহাও ত সমাজ-দেবের নিকট বলি, বোধ হয়, বলা যায়।

আর একটি আচার,—অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যাহা এই হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল, এবং বিশেষ প্রশংসার্হ বলিয়া গণিত হইত; যে আচার জগতের ইতিহাসে আর কোনও সভ্য জাতির মধ্যে কখনও প্রচলিত ছিল বলিয়া জানিতে পারা যায় নাই; (১) বেদ-ব্রাহ্মণে, মনু-যাজ্ঞবল্ক্যে নাই, কোনও কোনও স্মৃতি ও

(১) সভ্য জাতির মধ্যে নাই, কোনও কোনও অসভ্য বর্ব্বর অনার্য্য জাতির ভিতর ছিল ও এখনও আছে, এমন সংবাদ পাওয়া যায়। আফ্রিকার অভ্যন্তরবাসী ও ফিজিদ্বীপ-নিবাসীদিগের কথা শুনা গিয়াছে। প্রাচীন কালে দাক্ষিণাত্যবাসিগণের মধ্যেও নাকি ছিল। কেহ কেহ বলেন, Scythian বা শক জাতির মধ্যেও এ আচার ছিল, তাহাদিগের নিকট হইতে ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা গ্রহণ করিয়াছেন।

পুরাণে মাত্র যে আচারের উল্লেখ মিলে ; রামায়ণে নাই, মহাভারতে কচিৎ যাহার আভাস পাওয়া যায়—তাহাও পরবর্ত্তী কালের প্রক্ষিপ্ত রচনা কি না, ঠিক নাই ; সেই হৃদয়-বিদারক আচার—নরবলিরও অধিক নারী-বলি—কোন দেবতার তৃপ্ত্যর্থ মনে করা যাইতে পারে ? এখন এক প্রকার সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে, ঋক্‌বেদের শেষাংশের একটি শ্লোকের একটি শব্দের ('অগ্রে' স্থলে অগ্নে') 'র' ফলা স্থলে 'ন' -ফলা বসাইবার ভুলের দরুণ এত বড় কঠিন কঠোর মর্ম্মভেদী একটা আচার এই ভারতীয় আর্য্যজাতির মধ্যে অনেক দিন ধরিয়া ধর্ম্মের নাম গ্রহণপূর্ব্বক গট্ট হইয়া বসিয়াছিল। বোধ করি অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন, আমি সতীদাহ প্রথার কথা বলিতেছি। এক শত বৎসর পূর্ব্বেও এ আচার ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ আর্য্যাবর্ত্তে ও বঙ্গদেশে বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল।

প্রসন্নমনে স্মিতবদনে স্বেচ্ছাক্রমে জ্বলন্তচিতায় আত্মসমর্পণ করিয়া অনেক ভারত-রমণী যে পতি-দেবতার সহগমন করিতেন না, এমন নহে ; তাঁহাদের ধৈর্য্য, তাঁহাদের সহিষ্ণুতা, তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস, তাঁহাদের অমানুষিক সাহস, সর্ব্বোপরি তাঁহাদের পতিভক্তির ঐকান্তিকতা জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। কিন্তু ছল কৌশল জোর জবরদস্তীও যে বহুস্থলে চালাইতে হইত, তাহারও ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। এই সভ্য জাতি, এই আর্য্য জাতি, এই হিন্দুজাতির মধ্যে ধর্ম্মের নামে এমন আচারও ছিল। এই নারী-হত্যা—অনেক স্থলে বালিকা-হত্যা কোন শ্রেণীর বলি ? ব্যাপার মনে হইলে অন্তরাত্মা আতঙ্কিত হয়। ধর্ম্মের নামে কি নির্ম্মমতাই চলে! অপরাপর জাতির মধ্যেও নানাপ্রকার হত্যাকাণ্ড—massacre হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা আত্মীয়স্বজন কর্ত্তৃক ধর্ম্মের দোহাই দিয়া এমনতর আত্মীয়-হত্যা নহে। ভারতবর্ষে আশী পঁচাশী বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঢাক ঢোল বাজাইয়া মহা আড়ম্বরের সহিত এই মহা বলিদান চলিত, মহা ধর্ম্মানুষ্ঠান বিবেচিত হইত!

কিন্তু আবার যখন বালবিধবাগণের নৈদাঘ একাদশীপালন, কৃচ্ছ্রব্রতসাধন, কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের মনে হয়, তখন একবার মনে হয়, রহিয়া রহিয়া এমন জীয়ন্তে জ্বলন অপেক্ষা আগেকার সেই একেবারে পুড়িয়া ছাই হওয়া ছিল ভাল।

আর আজ ? আজ এই বলিদান পর্ব্বে এক নূতন অধ্যায় আরব্ধ হইয়াছে। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ ইতিহাসে—ভারতের কেন, জগতের ইতিহাসে ঘুণাক্ষরেও যাহার ইঙ্গিত নাই, এই বঙ্গদেশে এমন আত্মবলির সূচনা দেখা দিয়াছে। কুমারী স্নেহলতা সমাজদেবের নিকট আপনাকে আহুতি দিতে যে অগ্নি প্রজ্বলিত

করিয়াছেন, সে অগ্নি সহজে শীঘ্র নির্ব্বাপিত হইবে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু দেবতা কি প্রসন্ন হইবেন?

শ্রীঅনাথকৃষ্ণ দেব।

সহযোগী সাহিত্য।

আর্থার বাল্‌ফোর।

মহামান্যবর আর্থার বাল্‌ফোরের নাম অনেক বাঙ্গালীই শুনিয়াছেন। ইনি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। বিলাতের রাজনীতিক্ষেত্রে ইনি এক জন অপরাজেয় রাজনীতিক বলিয়া পরিচিত। ইনি বাগ্মী, মনস্বী ও মনীষী; টোরী বা স্থিতিশীল রাজনীতিক দলের নেতা; বিখ্যাত প্রধান মন্ত্রী লর্ড সলস্‌বরীর ভাগিনেয়। ইহাই ইঁহার পর্য্যাপ্ত পরিচয় নহে। লিবারল বা উন্নতিশীল দলভুক্ত লর্ড মর্লী, লর্ড রোজবেরী, এলেকজাণ্ডার বিরেল, লর্ড হ্যাল্‌ডেন প্রভৃতি যেমন উচ্চাঙ্গের রাজনীতিক, তেমনই উচ্চপদবীর সাহিত্যসেবী, চিন্তাশীল লেখক ও ব্যাখ্যাতা; আর্থার বাল্‌ফোরও তদ্রূপ সাহিত্যসেবী, সুলেখক, মনস্তত্ত্ব-বিদ্‌ এবং ব্যাখ্যাতা। রাজনীতিক্ষেত্রে অর্জ্জিত যশোরাশি কালে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলেও, সাহিত্যক্ষেত্রের প্রখ্যাতি ইঁহাদের অচিরে নষ্ট হইবার নহে। আর্থার বাল্‌ফোরের সাহিত্য-বিষয়ক প্রতিভায় একটু বিশিষ্টতা লক্ষিত হয়; তাঁহার সাহিত্যচর্চ্চার ফলে, মনস্তত্ত্বের ও দর্শন শাস্ত্রের আলোচনার ফলে, বিলাতী সমাজের ও সামাজিকগণের ধ্যান ও ধারণার পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে; তিনি দর্শন শাস্ত্রের চর্চ্চায় একটা নূতন পদ্ধতির আদেশ বা আগম সাধন করিয়াছেন। গত মে মাসের সাহিত্যিক "টাইম্‌সে"র এক সংখ্যায় তাঁহার বিশিষ্টতার বিষয় আলোচিত হইয়াছে। সেই আলোচনা অবলম্বনে আমারা আর্থার বাল্‌ফোরের পরিচয় বাঙ্গালী পাঠকগণকে দিব।

"টাইম্‌সে"র লেখক বলেন, He is conscious of the present; but he is also and at all times overwhelmingly conscious of the past. "তিনি বর্ত্তমান কালের বিদ্যমানতার অনুভূতি করেন বটে; পরন্তু তিনি সর্ব্বদা ও সকল সময়ে অতিতীব্রভাবে অতীতের ভাবনায় আচ্ছন্ন।" আর্থার বাল্‌ফোর বিলাতের মনীষিগণকে, তথা সাধারণ বিলাত-বাসী প্রজাবর্গকে বুঝাইতে পারিয়াছেন যে, সহসা কিছু হয় না, সহসা কিছু যায় না। যাহা কদাচিৎ সহসা ঘটে, তাহা জলবুদ্‌বুদ বিলয়বৎ হঠাৎ বিলীন হইয়া যায়; সমাজে তেমন ঘটনার প্রভাব চিরস্থায়ী নহে। পারম্পর্য্য-তত্ত্বটা বিলাতবাসীকে মান্যবর বাল্‌ফোরই সহজবোধ্য সরল ভাষায় বুঝাইয়াছেন। He sees the long descent of the most novel problems. অর্থাৎ, অতি অভিনব, উদ্ভট সমাজ-তত্ত্বের বা সামাজিক প্রশ্নের পশ্চাতে তিনি পারম্পর্য্যের দীর্ঘ শৃঙ্খলা দেখিতে পান। অতীতের সহিত যে বর্ত্তমানের নিত্য সম্বন্ধ, অতীতকে বর্জ্জন করিয়া যে বর্ত্তমান, বিদ্যমানতার প্রবাহমুখে সম্প্রসারিত হইয়া, ভবিষ্যতের গর্ভে বিলীন হইতে পারে না—এই সিদ্ধান্তটুকু বাল্‌ফোরই বিলাতে প্রচার করিয়াছেন। মনুষ্যসমাজ একদিনে গড়িয়া উঠে নাই, এবং একদিনেই পুরাতনকে চূর্ণ করিয়া এক অপূর্ব্ব অভিনব আকার ধারণ করিবে না। বাল্‌ফোরই বিলাতবাসীকে বুঝাইয়াছেন যে—we are not isolated creatures but members of an intricate community.—"আমরা একা আসি নাই, একা থাকিতে পারি না,—আমরা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত, স্বতন্ত্র ও স্বেচ্ছাচার জীব নহি,—আমরা এক বিশাল ও সনাতন, নানা যুগের নানা-ভাব-বিন্যস্ত কুটিল সমাজের অঙ্গীভূত।" তাই—he

will not destroy what many generations have built, merely because some of the plaster work is shaky—"যাহা পূর্ব্ব-পূর্ব্ববংশীয়গণ কত কালের চেষ্টায় গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহা তিনি নষ্ট করিতে চাহেন না। বাড়ীর এক স্থানের পলেস্তারা একটু ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে বলিয়া তিনি গোটা বাড়ীটাকে ধূলিসাৎ করিতে চাহেন না।" Society grows a natural growth but is never shaped or formed after a model.—"সমাজ আপনি গড়িয়া উঠে, সমাজের উন্মেষ সম্ভবপর, এবং উন্মেষই হইয়া থাকে; পরন্তু মানব-সমাজ মানুষের গড়া সামগ্রীর মত কখনও কোনও আদর্শ অনুসারে নির্ম্মিত হয় নাই,—হইবার নহে।" It is an organism, not a machinery.—"মনুষ্যসমাজ শরীরবিশেষ, কোনও কল-কারখানা নহে।" উহা সুতরাং শারীর-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট। তাই "টাইম্‌সে"র লেখক স্পষ্ট করিয়া লিখিতেছেন,—To him the desert hermit and the iconoclast are equally repugnant, for the one is not a social being and the other is the foe of society.—"তাঁহার পক্ষে মরুবিহারী তপস্বী যেমন ঘৃণার পাত্র, তেমনই সমাজধ্বংসকারী পরিবর্ত্তন-পিপাসুও ঘৃণার পাত্র; যে হেতু যিনি সন্ন্যাসী, তিনি সামাজিক ব্যক্তি নহেন বলিয়া উপেক্ষার পাত্র; যে সমাজ ভাঙ্গিতে চাহে, সে সমাজের শত্রু বলিয়া ঘৃণার পাত্র।" যেমন গাছের একটা ডাল কাটিয়া ফেলিলে, উহার চারি পাশ হইতে কত নূতন ডাল বাহির হয়, তেমনই জোর করিয়া একটা সামাজিক পদ্ধতি কাটিয়া উঠাইয়া দিলে উহার চারি পাশে তদনুরূপ অভিনব পদ্ধতি সকল বাহির হইবেই। আর্থার বাল্‌ফোর বলেন,—যাহা আপনি শুকাইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, তাহাকে ঠেক্‌নো দিয়া—চাড়া দিয়া বজায় রাখিবার চেষ্টা করিও না; যাহা সজীব ও সতেজ ভাবে সমাজ অঙ্গে বিরাজ করিতেছে, কদাপি খেয়ালবশে তাহাকে সহসা কাটিয়া ফেলিও না।

"Hope and dream, he seems to say, but if you are wise do not look for too much ; the world is a bridge to pass over, not to build upon." অর্থাৎ, আশা কর, সুখময় স্বপ্ন দেখ; কিন্তু তুমি যদি অভিজ্ঞ হও, তবে ভবিষ্যতে বড় সুখের আশা করিও না। অতীত কালে বড় সুখ কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই, এখনও সে ভাগ্য কাহারও হয় নাই, ভবিষ্যতেও হইবে না। এই সংসার একটা সাঁকো বিশেষ, এই সাঁকোর উপর দিয়া কেবল পারাপারই করিতে হয়; এই সেতুর উপর আশা সুখের বিরাট হর্ম্ম্য রচিতে নাই;—রচিলে উহা ভাঙ্গিয়া পড়িবেই; কারণ, যাতায়াতের মধ্যপথে সেতুর নীচে কোনও বুনীয়াদ ত নাই। কাহার উপর কি গড়িবে? এই সিদ্ধান্তটার ব্যাখ্যা করিবার ছলে বাল্‌ফোর সাহিত্যিক প্রখ্যাতির তেজটুকু বুঝাইয়া দিতেছেন—

"Literary immortality is an unsubstantial fiction devised by literary artists for their own special consolation. It means at the best an existence prolonged though an infinitesimal fraction of that infinitesimal fraction of the world's history during which man has played his part upon it." এই পৃথিবী যে কত কোটী বৎসর পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। পৃথিবীর উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে কিছু মানুষ ধরাবক্ষে একেবারে ফুটিয়া উঠে নাই। এই পৃথিবী স্থাবর জঙ্গমের বাসোপযোগী হইবার বহু লক্ষ বৎসর পরে মানুষ উৎপন্ন হইয়াছে। মানুষ উৎপন্ন হইয়াই কিছু কাব্যামোদী হয় নাই। কাজেই বলিতে হয় যে, সাহিত্যিক অক্ষয় প্রখ্যাতি অন্তঃসারশূন্য গালগল্পমাত্র; সাহিত্যসেবী সকল তাঁহাদের খাস পরিতৃপ্তির জন্য এবম্ভূত সাহিত্যিক যশের সৃষ্টি করিয়াছেন। উহার কোনও মূল্য নাই। কারণ, মানুষ যত কাল এই ধরাবক্ষে বিচরণ করিতেছে, তাহার কত সূক্ষ্ম ভগ্নাংশের কত সূক্ষ্মতম অংশ ব্যাপিয়া এই প্রখ্যাতির অবস্থিতি, তাহা কল্পনায় স্থির করা যায় না। এক হাজার বৎসর পৃথিবীর স্থিতির কতটুকু? ততটুকু কাল ব্যাপিয়াও কি কোনও কবি বা দার্শনিক সুখ্যাতি-রথে আরোহণ করিয়া থাকিতে পারেন? প্রথমে দিন কয়েক কবিবিশেষের কাব্য পড়িয়া হয় ত লোকে

হৈ চৈ করিতে পারে ; পরে সে কবির কাব্য বিদ্যার্থীর পাঠ্য হয় ; তাহার পর প্রত্নতত্ত্বের বিষয়ীভূত হয় ; শেষে বিস্মৃতিগর্ভে ডুবিয়া যায়। ইহা ছাড়া, কোনও কবিই জগদ্ব্যাপী হইতে পারেন না। যিনি যে ভাষার কবি, তিনি সেই ভাষাবিদের মধ্যেই অল্পকালের জন্য পূজ্য। এই অক্ষয়তা ও অমরতার জন্য লালায়িত হইতে নাই। অমরতার এমন নিকেতন গতাগতির সেতু এই সংসারে গড়িতে নাই—গড়িবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করিতে নাই। ইংরেজ দার্শনিক বাল্‌ফোরের এই উক্তিতে আমাদের উপনিষদের গন্ধ বেশ ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

"He believes in and reverences the reason." তিনি মনীষার অগাধ বিশ্বাসী, তিনি জ্ঞানের উপাসক। মনস্বী বাল্‌ফোর স্পষ্টই বলিয়াছেন—"It is true that without enthusiasm nothing would be done. But it is also true that without knowledge nothing would be done well."—অর্থাৎ, ভাবোন্মত্ততা না হইলে কোনও কাজই হয় না—কার্য্য করিতে হইলে তীব্র অনুরাগ আবশ্যক ; কিন্তু জ্ঞান না থাকিলে কোনও কাজই ভালরূপে সম্পন্ন করা যায় না। তাই তিনি জ্ঞানের উপাসক। ভাবোন্মত্ততার আংশিক সমর্থক হইলেও, মান্যবর বাল্‌ফোর ফরাসী মনীষী দেলাইলে আদামের (De L.'Isle Adam) "*sans illusion tout perit.*" এই মতের পোষক নহেন। সামাজিক ব্যাপারে মোহের (Illusion) প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও, মোহ জন্য কৌটিল্যের ও ছলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ছলচাতুরী দ্বারা সমাজ উন্নত হয় না, সমাজ সংস্কৃতও হয় না। মোহজাত ছলচাতুরীর প্রভাবে সমাজ-অঙ্গে কতকটা রিপুকর্ম্ম চলিতে পারে, কিন্তু রিপুকর্ম্মের সাহায্যে পচা কাপড় মজবুত হয় না। তাই তিনি জ্ঞানের প্রাধান্য মান্য করিয়া থাকেন। সে জ্ঞান কেমন? "Reason is common sense, a wise appreciation of the working rules of human society, the free play of the intellect, indeed but an intellect which can understand the intractable subject matter it works with." অর্থাৎ, সে জ্ঞানকে সাধারণ বুদ্ধি বলা চলে, যে অভিনিবেশবুদ্ধির প্রভাবে মানব-সমাজের নিত্য নৈমিত্তিক বিধি নিষেধ সকলের গতি পরিণতি বুঝা যায়—মেধার অবাধ ক্রিয়া, অবশ্য সে মেধা এমন হইবে, যাহার সাহায্যে বিবেচনাধীন কঠিন কঠোর বিষয় বুদ্ধিগম্য হইতে পারে। কথাটা বড় সোজা নহে, একটু তলাইয়া বুঝিতে হইবে। মানুষ যে সামাজিক বিধি নিষেধ ধরিয়া ভাল মন্দের বিচার করে, সে যে কেবল বুদ্ধির সাহায্যে অতীত ইতিহাস জানিয়া এবং পারম্পর্য্যের বিশ্লেষণ করিয়া একটাকে ভাল অপরটাকে মন্দ বলে, তাহা নহে। মানুষ অনেক সময়ে ঝোঁকের উপর—মোহবশতঃ—মমত্বের আকর্ষণবশতঃ কোনটাকে ভাল, কোনটাকে মন্দ বলে। ফরাসী মনীষী দেলাইলে আদাম বলেন যে, এই মমত্বের মোহ—আমার বলিয়া সমাজকে আঁকড়িয়া ধরিবার মোহ সামাজিক বৈশিষ্ট্য-রক্ষার বিশেষ উপাদান। সমাজের বিশিষ্টতা রক্ষা করিতে হইলে এই মোহ—illusion বিশেষ কার্য্যকর হয়। আর্থার বাল্‌ফোর এই মতের বিরোধী। তিনি তাঁহার এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, পতিত ও পরাজিত জাতির পক্ষে সামাজিক বিশিষ্টতা রক্ষা করিতে হইলে এই মোহ কতকটা কার্য্যকর হইলেও হইতে পারে ; কেন না, এই মোহ বা illusion একটা অভিনব শক্তির উদ্বোধন ও উন্মেষ পতিত জাতির সমাজে ঘটাইতে পারে ; পরন্তু ইউরোপের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র খৃষ্টান্-সমাজে এই মোহের স্থান নাই। ফরাসী-বিপ্লবের সূচনায় এই মোহ সমাজে একটা বিষম ওলট্-পালটের সৃষ্টি করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে ওলট্-পালট স্থায়ী কল্যাণপ্রদ হয় নাই। সে বিপ্লবকে প্রশমিত করিয়া সমাজের পুরাতন ও সনাতন কুল্যা বা প্রণালীর মধ্যে সমাজকে আবার প্রবাহিত করিতে হইয়াছে ; অতীতের পারম্পর্য্য কিছুকালের জন্য ছিন্ন হইলেও, সমাজ সে পরম্পরার সূত্রকে টানিয়া আনিয়া আবার বর্ত্তমানের সহিত মিলাইয়া দিয়াছে। সমাজ intractable, উহা কাদামাটী নহে যে, উহাকে যেমন ইচ্ছা তেমন করিয়া ছানিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবে। উহা গড়িবার সামগ্রী নহে, আত্মস্থ—সমাজ-হৃদয়-বিন্যস্ত প্রাকৃত-শক্তির প্রভাবে উহা গজাইয়া উঠে ; কাল অনুকূল হইলে, ক্ষেত্র ঠিক হইলে

উহা আপনি গজায়। ভাল মালী যে হয়, সে আবর্জ্জনা সকল কাটিয়া ছাঁটিয়া গাছটিকে মনের মতন করিয়া তুলিতে পারে; পরন্তু কোনও মালী বৃক্ষের বা গুল্মের প্রকৃতি বদলাইতে পারে না, মেথীর ঝাড়কে উইলোর ঝাড়ে পরিণত করিতে পারে না। সমাজের এই অবলম্বনীয়তা বুঝিয়া, সমাজের উপর পারম্পর্য্যের প্রভাব-পরিসর জানিয়া যে মেধা ও বুদ্ধি সমাজতত্ব বুঝিতে পারে, তাহাই বাল্‌ফোরের মতে Reason। এই মনীষার বিস্তারেই সমাজের মঙ্গল-সাধন হইয়া থাকে। তাঁহার মতকে Humanism বলা চলে। The whole trend of his writings is towards the exaltation of the simple practical soul.—তাঁহার লেখার উদ্দেশ্যই এই যে, সাদা-সিধা সোজা সাধারণ মানুষকে তিনি উন্নত করিতে চাহেন। তিনি জোর করিয়া বলিয়াছেন যে, Society is founded not npon criticism but upon feelings and the beliefs and upon the customs and codes by which feelings and beliefs are, as it were, fixed and rendered stable. সমাজ কেবল সমালোচনার উপর—বিশ্লেষণের উপর বিন্যস্ত নহে। ভাব ও বিশ্বাসের উপর সমাজ গঠিত ও সংরক্ষিত; কেবল তাহাই নহে, আচার ব্যবহার ও বিধিনিষেধের দ্বারা সমাজ সংরক্ষিত। এই আচারপদ্ধতি ও বিধিনিষেধ সামাজিক ভাব ও বিশ্বাসকে স্থায়ী করিয়া রাখিয়াছে। ভাব ও বিশ্বাস সমাজের বনীয়াদ; ভাব ও বিশ্বাস সমাজের রক্ষাকবচ। এই রক্ষাকবচকে চিরস্থায়ী করিবার জন্যই বিধিনিষেধের প্রবর্ত্তন, রীতিপদ্ধতির প্রচলন। যে বুদ্ধি এইটুকু বুঝিতে ও বুঝাইতে পারে, সেই বুদ্ধিই সমাজের মঙ্গলদায়িনী।

যে রক্ষণশীলতা বিলাতের বিদ্বজ্জনসমাজের আদরের, মহামান্যবর আর্থার বাল্‌ফোরের মতন মনস্বী মেধাবী যে রক্ষণশীলতার প্রচারক ও ব্যাখ্যাতা, তাহারই আংশিক পরিচয় দিলাম। এই রক্ষণশীলতার সিদ্ধান্ত অবলম্বনে আমরা হিন্দু সমাজের গতি পরিণতির আলোচনা করিয়া থাকি। এই হেতু সমাজতত্ত্বজ্ঞ আর্থার বাল্‌ফোরের প্রকৃত পরিচয় দিতে আমাদের তেমন আয়াস স্বীকার করিতে হইল না; কারণ, তাঁহার সামাজিক মতের পর্য্যাপ্ত অনুবাদ করিয়া আমি বাঙ্গালী পাঠকবর্গকে নানা ভাবে উপঢৌকন দিয়াছি। পরন্তু দার্শনিক বাল্‌ফোরের পরিচয় দিতে হইলে, যে সকল দার্শনিক পণ্ডিতের সিদ্ধান্তের দ্বারা আধুনিক বিলাতী সমাজ পরিচালিত, তাঁহাদের ও তাঁহাদের সিদ্ধান্তের পূর্ণ পরিচয় প্রথমে দিতে হইবে; Pragmatists and Bergsonianদিগের পরিচয় দিতে হইবে; Eckenএর সিদ্ধান্তের বিশ্লেষণ করিতে হইবে। শিক্ষিত বাঙ্গালীকে আর্থার বাল্‌ফোরের দার্শনিকতার পরিচয় দিবার কোনও প্রয়োজন দেখি না। আমরা ইংরেজী শিখিলেও দর্শন উপনিষদের আলোচনা করিতে ভুলি নাই; যাহাদের দর্শন উপনিষদ্ আছে, তাহাদের বর্গসন-একেনের পরিচয় গ্রহণ করিবার প্রয়োজনাভাব। কিন্তু আমরা ইউরোপের আধুনিক সমাজ-তত্বের—sociologyর কোনও খবর রাখি না; সে তত্বের সিদ্ধান্ত অবলম্বনে আমাদের হিন্দুসমাজের গতি পরিণতির আলোচনা করি নাই। আর্থার বাল্‌ফোরের তুল্য অদ্বিতীয় ইংরেজ মনীষী, রাজনীতিক, বিজ্ঞানবিদ্ ও দার্শনিক সমাজতত্বকে কি ভাবে বুঝেন, কেমন দিক্ দিয়া দেখেন, তাহার পরিচয় পাইলে হয় ত আমরা আমাদের সমাজকে সেই ভাবে দেখিতে চেষ্টা করিব, এই দুরাশায় কঠোর ইংরেজী সন্দর্ভের কতক অংশ ভাষান্তরিত করিয়া দিলাম। বিশেষতঃ মান্যবর বাল্‌ফোরের সামাজিক মতামত ধরিয়া সম্প্রতি বিলাতে একটা আন্দোলন চলিতেছে; এই আন্দোলনের ফলে বিলাতের বিদ্বজ্জনসমাজ একটু অনুসন্ধিৎসু হইয়া উঠিয়াছেন। সাময়িক সহযোগী সাহিত্যের ইহার অঙ্গীভূত বলিয়া কথাটা খুলিয়া লিখিতে হইয়াছে।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমাদিগের সাহিত্য-সেবা।

২

ইতিহাস সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধেও তাহাই বলা যাইতে পারে। বৃথা গর্ব্বের প্রশ্রয় দিলে, কিংবা পুরাকালের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি জন্মিলে, পুরাতত্ত্ব-আলোচনা নিশ্চয়ই কুফলপ্রদ হয়। কিন্তু মানব-বিবর্ত্তনের, বিশেষতঃ সমাজ-বিবর্ত্তনের ইতিহাস-স্বরূপ পুরাতত্ত্ব অবশ্য আলোচ্য। প্রাচীন পুঁথি, তাম্রশাসন, প্রস্তরফলক, মন্দির, মঠ ইত্যাদি ও উহাদিগের গাত্রে উৎকীর্ণ লিপি, নানাবিধ প্রাচীন মূর্ত্তি, এ সকল পুরাতত্ত্ব-আলোচনার উপকরণ। কিন্তু এ সকলও জাল, মিথ্যা, অতিরঞ্জিত—সুতরাং অবিশ্বাস্য হইতে পারে। ইহাদিগকেও বাচনিক সাক্ষীর ন্যায় জেরা করা আবশ্যক; কোন্ সময় কোন্ উদ্দেশ্যে এ সকল রচিত হইয়াছিল, রচয়িতার প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাত হইবার কিরূপ সুবিধা ছিল, সত্য বিকৃত করিবার কোনও বিশেষ কারণ ছিল কি না? এ সকল অনুসন্ধান করা আবশ্যক। নানাবিধ অগ্নিপরীক্ষায় নির্ব্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, এ সকল বৈজ্ঞানিক প্রমাণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে; নচেৎ পারে না। সমাজ প্রথমে ব্যক্তি-প্রধান কিংবা গোষ্ঠী-প্রধান, অথবা দল-প্রধান ছিল; ব্যক্তি-প্রধান থাকিলে সমাজ উন্নত কি অবনত হইয়াছিল; গোষ্ঠী-প্রধান বা দল-প্রধান থাকিলে, উত্থিত বা পতিত হইয়াছিল; ইহা পুরাতত্ত্ব আবিষ্কার করিবে; সেই উত্থান বা পতনের কোনও লক্ষণ বর্ত্তমান সমাজে দৃষ্ট হইতেছে কি না, তাহা বুঝাইয়া দিবে। উপরের লিখিত প্রমাণ-মূলে, মানব-মনের কোনও কোনও বিশেষ ভাবের সহিত উত্থান-পতনের সংস্রাব দেখা যায় কি না, এবং তত্তৎ ভাব বর্ত্তমান সমাজে লক্ষিত হয় কি না, তাহা বুঝাইয়া দিবে। বর্ত্তমান সমাজ কোথা হইতে উৎপন্ন হইল; কোন্ সংমিশ্রণে জাত হইল; সেই সংমিশ্রিত উপাদানগুলির প্রকৃতি কিরূপ, এবং কোন্ পথেই বা এত দিন চালিত হইয়া আসিয়াছে; আর তদ্দৃষ্টে ভবিষ্যতের পথ নির্ণীত হইতে পারে কি না, এ সকল ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, অথবা প্রত্নতত্ত্বের বিশেষভাবে আলোচ্য। পুরাকালীন কোনও উপাদান বর্ত্তমান সময়ে ব্যবহৃত হইতে পারে কি না, উহার প্রচলনে বর্ত্তমান সমাজে ধনাগম সম্ভব কি না, অথবা অন্য প্রকারে সমাজ লাভবান্ হইতে পারে কি না, ইহাও পুরাতত্ত্ব ইঙ্গিত করিতে ত্রুটী করিবে না। দৃষ্টান্ত-

স্থলে এনামেল্-যুক্ত ইষ্টকের কথা বলা যাইতে পারে। প্রাচীনকালীন ঐরূপ একখণ্ড ইষ্টক পাওয়া গেল; রসায়নশাস্ত্রবিদ্ বলিয়া দিলেন, ঐ এনামেল্ কি পদার্থ; শিল্পী বলিয়া দিলেন, উহার প্রচলনে সমাজ লাভবান হইবে কি না? আর পুরাতত্ত্ববিদ্ বলিয়া দিবেন, উহার মধ্যে সমাজ-ধ্বংসকারী দারুণ বিলাসিতার বিষ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে কি না? অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন; সুধু সেই "বাবার আমলে দুর্গোৎসব" হইত, এরূপ বৃথা দর্পে চলিবে না। পুরাতত্ত্বকে মানব-সমাজের উত্থান-পতনের নিয়ম সকল যথাসাধ্য আবিষ্কার করিতেই হইবে। এতদ্দেশে আমরা পশ্চাৎদিকে ফিরিয়া দেখিতে যত ভালবাসি, সম্মুখের দিকে চাহিতে তত ইচ্ছুক নহি। যে মহাপুরুষ লিখিয়াছেন,—"আগে চল্, আগে চল্ ভাই!" তিনি আমাদিগের বর্ত্তমান যুগের প্রধান কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি প্রাচীনের প্রতি অত্যাসক্তি সঙ্গত বোধ করেন নাই। আগে চলিতে হইলে, পশ্চাতের দিকে ফিরিয়া দেখা, কখনও কখনও আবশ্যক হইতে পারে; কিন্তু উহাই একমাত্র কর্ম্ম হওয়া উচিত নহে। নিয়ত যদি পশ্চাতে ফিরিয়াই দেখিতে থাকিব, তবে অগ্রসর হইব কেমন করিয়া?

যাহা হউক, আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্যই অগ্রসর হওয়া; কাব্য ইতিহাস পুরাতত্ত্ব যে পরিমাণে এই উদ্দেশ্যের সাধক হয়, সেই পরিমাণে সার্থক; আর যে পরিমাণে বাধক হয়, সেই পরিমাণে নিরর্থক ও নিষ্ফল।

বর্ত্তমান যুগে আগে চলিবার প্রধান উপায় কি? বোধ হয়, সকলেই ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন, আগে চলিবার প্রধান উপায় বিজ্ঞানসেবা;—ভূবিদ্যা, খনিজবিদ্যা, প্রাকৃতিকবিদ্যা, রসায়ন, জীবতত্ত্ব, বিশেষতঃ মানবতত্ত্ব, রোগতত্ত্ব, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও সকলের উপর গণিতশাস্ত্র, বর্ত্তমান যুগে যাহাদিগের আলোচ্য হইল না, তাহারা আগে চলিবার অধিকারীও হইল না। দেহ-মনের বংশানুক্রমিক উন্নতি অবনতি, উন্নতির স্থায়িত্ব-বিধান ও অবনতির লক্ষণ সকলের দূরীকরণ, সকল বিজ্ঞান-আলোচনারই মূল মন্ত্র হওয়া আবশ্যক। সমাজধ্বংসকারী অযোগ্যগণের বংশক্ষয় ও সমাজের হিতকারী যোগ্যগণের বংশবৃদ্ধি যাহাতে হয়, অর্থাৎ যাহাতে জাতির উৎকর্ষ-সাধন হয়, তাহা যেরূপেই হউক, করিতেই হইবে। এ কার্য্য অতি দুরূহ; হয় ত একটু আরম্ভ ভিন্ন এ পথে অগ্রসর হইবার উপায় এখনও বিশেষরূপে লক্ষিত হইতেছে না। তাহা হইলেও, যে জাতি প্রথমে এই উপায় আবিষ্কার করিবেন, এবং সমাজে প্রবর্ত্তিত করিতে সক্ষম হইবেন, সেই জাতি পৃথিবীর সর্ব্ব-

শ্রেষ্ঠ জাতি হইবেন, সন্দেহ নাই। (১) এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত আমরা জানিতে চাই, বংশগত লক্ষণ অগ্রগণ্য, কিংবা শিক্ষালব্ধ লক্ষণই অগ্রগণ্য? আমরা জানিতে চাই, বংশগত লক্ষণের মধ্যে উন্নতির সাধক লক্ষণ সকল কিরূপে বিকশিত হয়, এবং বাধক লক্ষণ সকল কিরূপে পরিত্যক্ত হয়? আমরা জানিতে চাই, সাধারণ্যে অবাধ শিক্ষাবিস্তার, অবাধ-বিবাহ-প্রচলন মঙ্গলকর, অথবা শিক্ষা ও বিবাহ সমাজমধ্যে নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যগত থাকাই শুভাবহ? পারিপার্শ্বিক বেষ্টনীর প্রভাব জাতীয় জীবনে কতটুকু; এবং জাতীয় জন্মগতভাব অর্থাৎ স্বভাব জাতীয় জীবনে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে? কিরূপ জনগণের সংখ্যা-বৃদ্ধি সমাজের পক্ষে হিতকর, আর কিরূপ জনগণের সংখ্যা-বৃদ্ধিতে সমাজের অহিত? অতীতের পক্ষপাতবিবর্জ্জিত হইয়া জানিতে চাই, মানব-ধর্ম্ম কি, সমাজ-ধর্ম্মই বা কি! এই পদার্থের হ্রাস বৃদ্ধি কিসে হয়, এবং সমাজের উন্নতি অবনতির সহিত এ পদার্থের সংস্রব কিরূপ, এবং কি পরিমাণ ধনাগম সমাজের ইষ্টকর, অথবা অনিষ্টকর, তাহাও জানিতে চাই। ফিনীসিয়ান্, ডচ্, স্পানিয়ার্ড, এবং বোধ হয় ইংরাজ জাতির নিকটেও শুনিতে চাই, পৃথিবীবিস্তৃত বাণিজ্যে বিপুল ধনাগম সত্ত্বেও প্রথম তিন জাতি মরিয়া গেল কেন?

রোমান্, গ্রীক্, মুসলমান্ ও ভারতীয় আর্য্যগণের নিকট জানিতে চাই, অনন্য-সাধারণ বাহুবল, অপ্রমেয় গভীর শাস্ত্রজ্ঞান থাকিতেও সমাজ অধঃপতিত হয় কেন?

যাঁহারা বলিবেন, "উন্নতির পর অবনতি অনিবার্য্য", তাঁহাদিগের জড়-কাপুরুষোচিত উক্তি অগ্রাহ্য। আধুনিক বিজ্ঞান উহা শুনিতে চাহে না। অবনতির কারণ নির্দ্দেশ কর, তাহার পর সাবধান হও; উন্নতির কারণ নির্দ্দেশ কর, তাহার পর সে পথে "আগে চল, আগে চল ভাই!" ইহাই পুরুষোচিত, ইহাই আশাপ্রদ, এবং বিজ্ঞান-সম্মতও বটে। অর্থ, বিক্রম, পাণ্ডিত্য, কিছুই জাতীয় অধঃপতনের পথ নিরুদ্ধ করিতে পারে নাই; প্রাচীনকালেও পারে

---

(1) The whole tread of the resukt obtained is that in order to produce exceptionally gifted men in both body and mind, those with high development of the characters desired should be encouraged to marry? and that to present the production of the weakly and feeble-minded the only methed is to Prevent such from having offspring. There is little doubt that the nation which first finds a way to make these things practical will in a short time the leader of the world—Ducaste Heredity P. 51.

নাই, এখনও পারিবে না। সমাজের একমাত্র সম্পত্তিই মানুষ; মানুষ অধঃপতিত হইলে আর কিছুতেই সমাজ রক্ষা করিতে পারে না। প্রাচীনেরা,—যাঁহাদিগের নাম করিলাম, তাঁহারা মানুষ গড়িতে জানিতেন না; তাই কোনও সমাজই—কোনও সভ্যতাই স্থায়ী হইল না। সমাজ-ধ্বংসকারী দুরাচারগণের (শিক্ষিত হউক, অথবা অশিক্ষিত হউক) সংখ্যা সমাজে অধিক হইলে, সমাজ নষ্ট হইবেই। তাই সমাজহিতকারী যোগ্য লোকের সংখ্যা-বৃদ্ধি করিতে না পারিলে সমাজরক্ষা হয় না।

সমাজে যোগ্য মানুষ গড়িব, এবং বাড়াইব কেমন করিয়া? জন্মের বহু পূর্ব্বে তাহার পিতৃ-মাতৃ-নির্ব্বাচনের দ্বারা। এ প্রশ্নের অন্য উত্তর নাই। নূতন করিয়া "উদ্বাহ-তত্ত্ব" গড়িতে পারিলেই মানব গড়িবার পন্থা আবিষ্কৃত হইতে পারে। মরণোন্মুখ জাতির পক্ষে এই চেষ্টাই প্রধান চেষ্টা। সকল সাহিত্যের ভিতর দিয়া এই মূল মন্ত্রের আবিষ্কারই প্রধান আবিষ্কার। নতুবা অন্য উদ্দেশ্যে কিংবা বিনা উদ্দেশ্যে সাহিত্যসেবা করিলে, আমি বলি, ভুরপনেয় অধর্ম্ম হয়; সে অধর্ম্মের ফল—জাতীয় ধ্বংস। আমরা রসিক ছিলাম, প্রেমিক ছিলাম; জ্ঞানী হইবার চেষ্টা করিব না কি? ইহকালের বন্ধ-মুক্তি—পরকালের বন্ধ-মুক্তি যে জ্ঞানের আয়ত্ত, সে জ্ঞানে জ্ঞানী হইবার চেষ্টা করিব না কি? সাহিত্যক্রীড়া করিয়া আর কতকাল ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিব? ইহা ভাবিবার বিষয়।

শ্রীশশধর রায়।

প্রাচীন শিল্প-পরিচয়।

হস্তাভরণ কঙ্কণের পরেই অঙ্গুলির আভরণ উল্লেখযোগ্য। অঙ্গুলীতে ধার্য্য আভরণ অঙ্গুলীয় এবং ঊর্ম্মিকা নামে কথিত হয়। অঙ্গুলিতে "ভব" অর্থাৎ থাকে, এই অর্থে অঙ্গুলি শব্দের উত্তর ছ প্রত্যয়ের দ্বারা (১) অঙ্গুলীয় এইরূপ সিদ্ধ হইয়া, তাহার উত্তর স্বার্থে কন্ প্রত্যয়ের দ্বারা "অঙ্গুলীয়ক" হইয়াছে। ঊর্ম্মির অর্থাৎ তরঙ্গের তুল্য, এই অর্থে (৫।৩।৯৬) কন্ প্রত্যয়

(১) জিহ্বা মূলাঙ্গুলেশ্ছঃ।৪।৩।৬২

হইয়া উর্ম্মিকা শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে; সুতরাং সাধারণতঃ ইহার আকারে তরঙ্গ-চিহ্ন প্রদর্শিত হইত বলিয়া বোধ হয়। এই উর্ম্মিকাতে অক্ষর লিখিত হইলে, "অঙ্গুলিমুদ্রা" এই নাম হইয়া থাকে। (সাক্ষরাঙ্গুলিমুদ্রা স্যাৎ। অমর; মনুষ্যবর্গ; ১০৭।) এই অঙ্গুলিমুদ্রা হস্তান্তরিত হওয়ার ফলেই চাণক্য-প্রতিদ্বন্দ্বী রাক্ষসের সমস্ত উদ্যম বিফল হইয়াছিল।

বর্ত্তমান সময়ে যেমন দলীলপত্রে নামের মোহর অঙ্কিত হয়, পূর্ব্বকালেও এই রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। অধিকন্তু সেকালে হস্তাঙ্গুলিতে অলঙ্কারার্থ-ধৃত অঙ্গুলীয়কের দ্বারাই এই কার্য্য সম্পন্ন হইত। দুষ্মন্ত-প্রদত্ত অঙ্গুলিমুদ্রা হারাইয়াই শকুন্তলাকে অশেষ দুঃখ অনুভব করিতে হইয়াছিল। (১) এই শ্রেণীর আংটীতে বিষাপহারক মণিও সন্নিবেশিত হইত, "মালবিকাগ্নিমিত্র" নাটক-পাঠে এই রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। দাসী কৌমুদিকা শিল্পগৃহ হইতে আনীত দেবীর নাগ-চিহ্নিত-মুদ্রাযুক্ত অঙ্গুলীয় দেখিতে দেখিতে বকুলাবলিকার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল। (২) এবং এই মুদ্রার প্রভাবে বিদূষকের কৃত্রিম বিষবিকার নিবৃত্ত হইয়াছিল।

কটিসূত্র।

দেহধার্য্য অলঙ্কার প্রসঙ্গে হারের পরেই কটিধার্য্য আভরণ উল্লেখযোগ্য। স্ত্রী-কটিতে ও পুরুষ-কটিতে ধার্য্য এই আভরণের বিভিন্ন সংজ্ঞা দেখা যায়। তন্মধ্যে স্ত্রীকটিতে ধারণীয় মেখলা, কাঞ্চী, সপ্তকী, রশনা ও সারসন নামে অভিহিত হয়। (স্ত্রীকট্যাং মেখলা কাঞ্চী সপ্তকী রশনা তথা ক্লীবে-সারসনং বা) অমর সিংহ পাঁচটি শব্দকেই এক পর্য্যায়ে ফেলিয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থান্তরে ইহাদের বিশেষ পার্থক্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা, একযষ্টি অর্থাৎ একলহর কটিভূষণ কাঞ্চী, অষ্টযষ্টি কটিভূষণ মেখলা, ষোড়শযষ্টি রশনা, এবং পঞ্চবিংশতি-যষ্টি কলাপ নামে পরিচিত। (৩) পুরুষের কটিস্থ এই আভরণ শৃঙ্খল নামে অভিহিত হইয়াছে। যদিও অমরসিংহ স্ত্রীকটির আভরণকেই সারসন

---

(১) একৈকমত্র দিবসে মদীয়ং নামাক্ষরং গণয় গচ্ছসি যাবদন্তম্।
তাবৎ প্রিয়ে! মদবরোধ-নিদেশবর্ত্তী নেতা জনস্তব সমীপমুপেষ্যতীতি।—শকু। ৬।৪।৮৪

(২) অহো বউলাবলিআ, সহি! দেবীএ ইদং সিপ্পিসআসাদো আনীদং নাগমুদ্দাসণাহং অঙ্গুলীঅঅং সিণিদ্ধং নিজ্ঝাঅন্তী তুহ উবালম্ভে পড়িদহ্মি।—১ম অঙ্ক।

(৩) একা যষ্টির্ভবেৎ কাঞ্চী মেখলাষ্টযষ্টিকা।
রশনা ষোড়শজ্ঞেয়া কলাপঃ পঞ্চবিংশকঃ।—ভানুজী।

নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তথাপি সাহিত্যের প্রয়োগে পুরুষ-কটির আভরণেও সারসন-শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। "শিশুপালবধে" এই আভরণে নিহিত মুক্তাময় পাদাগ্রপর্য্যন্ত ব্যাপ্ত মালার নিদর্শন পাওয়া যায়। যথা, ইঁহার (কৃষ্ণের) সারসনে লম্বমান আপ্রপদীন মুক্তাময় দাম (মালা) শোভা পাইয়াছিল। তাহা দেখিয়া বোধ হইত, যেন অঙ্গুষ্ঠনির্গত গঙ্গাজল বিস্তৃত ধারাকারে ঊর্দ্ধদিকে ছুটিতেছে।'(১) কাদম্বরীতেও মেখলাভরণে শব্দায়মান রত্নমালার সমাবেশ দেখা যায়। যথা, "সঞ্চরণকারী বেশ্যাজনের জঘনস্থলের আস্ফালন-বশতঃ ক্বণিত ক্ষুদ্র রত্নমালা-যুক্ত মেখলার মনোহারী ঝঙ্কারের দ্বারা।" সুবন্ধুর বাসবদত্তাতেও রসনায় রত্নমালা-নিধানের পরিচয় পাওয়া যায়। (২) কালি-দাসের বর্ণনায় বুঝা যায় যে, সূত্রগ্রথিত কেবল মণির দ্বারাও মেখলা নির্ম্মিত হইত। যথা, রসভরে সত্বর উত্থিত কোনও রমণীর অর্দ্ধগ্রথিত মেখলা হইতে রত্নগুলি ক্রমে গলিত হইয়া পড়ায় সেই রশনা অঙ্গুষ্ঠার্পিত সূত্রমাত্রাবিশিষ্ট হইয়াছিল। (৩) কবিকঙ্কণের বর্ণনায় শরীরের মধ্যভাগে কিঙ্কিণী-ধারণের পরিচয় পাওয়া যায়। (৪) প্রস্তরমূর্ত্তির গাত্রেও এই আভরণের বড় ছড়াছড়ি।

পাদাভরণ।

চরণে ধারণীয় আভরণ পাদাঙ্গদ, তুলাকোটি, মঞ্জীর, নূপুর, হংসক ও পাদ-কটক, এই কয়টি শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। এই সকল শব্দের অর্থগত কোনও বিশেষত্ব আছে কি না, তাহা স্পষ্টতঃ বুঝা যায় না। যদিও ছয়টি শব্দ সমভাবেই পঠিত হইয়াছে, তথাপি সাধারণের নিকট নূপুরই বিশেষরূপে পরিচিত। সাহিত্যে নূপুরের বর্ণনার অভাব নাই; কিন্তু কি উপাদানে নূপুর নির্ম্মিত হইত, তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। বাণভট্ট-বর্ণিত চাণ্ডাল-কন্যকার নূপুর-মণির উৎসর্পিকিরণজালের বর্ণনা দেখা যায়; কিন্তু ইহাতেও মণিমাত্রকে নূপুরের উপাদানরূপে স্থির করা যায় না। কারণ, উপাদানান্তরে নির্ম্মিত নূপুরেও মণিনিবেশ সম্ভব হয়। মণিমঞ্জীর প্রভৃতি শব্দেও মধ্যপদ-

(১) মুক্তাময়ং সারসনাবলম্বি ভাতি স্ম দামাপ্রপদীনমস্য।
অঙ্গুষ্ঠনিষ্ঠ্যূতমিবোর্দ্ধমুচ্চৈ স্ত্রিস্রোতসঃ সন্ততধারমম্ভঃ।—৩।৮

(২) গগনলক্ষ্মী-রত্ন-রসনামালেব।—২৮২ পৃঃ।

(৩) অর্দ্ধাঞ্চিতা সত্বরমুত্থিতায়াঃ পদে পদে দুর্নিমিতে গলন্তী।
কস্যাশ্চিদাসীদ্রশনা তদানীমঙ্গুষ্ঠমূলার্পিতসূত্রশেষা।—রঘুবং ; ৭।১০।

(৪) ত্রিবলি-বলিত মাঝে, কনক-কিঙ্কিণী সাজে, উরুযুগ রম্ভার সমান।

লোপানুসারে এই অর্থ গৃহীত হইতে পারে। পরযুগের সাহিত্যে কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর বর্ণনায় দর্শিত মতেরই অনুকূলতা দেখা যায়। কবিপ্রবর জগদম্বার চরণ-পঙ্কজে মণিময় কাঞ্চন-নূপুরের সন্নিবেশ করিয়া গিয়াছেন। (১) ইহার আকৃতি কিরূপ ছিল, স্পষ্টতঃ তাহার কোনও উল্লেখ নাই। তবে "হংসক" এই শব্দের নিরুক্তি অনুসারে বোধ হয় ইহার আকার কতক অংশে যেন হাঁসের মত হইতে পারে। কারণ, "হংস ইব" এই অর্থে কন্ প্রত্যয়ের দ্বারা (৫।৩।৯৬) হংসক-রূপ সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু এই নিরুক্তির উপর নির্ভর করা যায় না; কারণ, "হংস ইব কায়তি শব্দায়তে," অর্থাৎ, হাঁসের মত শব্দ করে, এই অর্থে হংসোপপদ কৈ ধাতুর পর ড-প্রত্যয়ের দ্বারাও এই রূপ সিদ্ধ হইতে পারে। প্রাচীন সাহিত্যের বর্ণনাও পরবর্ত্তী মতের অনুকূল। কাদম্বরীতে নূপুর শব্দে হংসের আকর্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীহর্ষের কল্পনাও দময়ন্তীর চরণ-যুগলে বিধির বাহন হংসযুগলকে প্রেরণ করিয়া চরণদ্বয়ের সহংসকতা সম্পাদন করিয়াছে। (২)

কেয়ূর।

কেয়ূর এবং অঙ্গদ, এই উভয়-শব্দ-বাচ্য অলঙ্কার, বাহুর ঊর্দ্ধাংশে ব্যবহৃত হইত। বর্ত্তমান কালের বাজু, অনন্ত প্রভৃতি এই স্থানে পরিহিত হয়। কবিপ্রবর বাণভট্ট রাজা শূদ্রকের বাহুশিখর অর্থাৎ বাহুর ঊর্দ্ধভাগ কেয়ূরের দ্বারা পরি-শোভিত করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে কেয়ূর বাজু নামে পরিচিত হইতেছে, কিন্তু বাণভট্টের বর্ণনা দেখিয়া বোধ হয়, সেকালের কেয়ূরের সহিত একালের কেয়ূরের কিছুমাত্র জ্ঞাতিত্ব নাই। কারণ, সেকালের কেয়ূর নিগড়-শঙ্কা জন্মাইত, সেই কেয়ূর দেখিয়া লোকে তাহাকে সর্প বলিয়া উৎপ্রেক্ষা করিত; অতএব জিনিসটা গোলাকার হইত, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। সুতরাং বর্ত্তমান কালের অনন্তকে কেয়ূরের বংশধর বলা যাইতে পারে।

বলয়।

প্রকোষ্ঠে অর্থাৎ কনুইএর নিম্নভাগে ধারণীয় অলঙ্কার আবাপক, পারিহার্য্য, কটক ও বলয়, এই চারি নামে অভিহিত হইয়াছে। [illegible] বর্ণিত

(১) সুচারু নিতম্ব সাজে, চরণ-পঙ্কজে রাজে মণিময় কাঞ্চন-নূপুর।

(২) অলজে রবিসেবয়েব যে পদমেতৎপদতামবাপতুঃ।
ধ্রুবমেত্য রুতঃ সহংসকীকুরুতস্তে বিধি-পত্র-দম্পতী।—নৈষধ। ২।৩৮

বিরহী যক্ষের প্রকোষ্ঠ বিরহজনিত কৃশতাবশতঃ স্বর্ণবলয়-রহিত হইয়াছিল। (১) মাঘের বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণের বলয়ে পদ্মরাগমণি-নিধানের পরিচয় পাওয়া যায়। (২) বাণভট্টের লেখনী চাণ্ডালকন্যকার হস্তে রত্ননির্ম্মিত বলয় সন্নিবেশিত করিয়াছে। (প্রচলিতরত্নবলয়েন)।

কঙ্কণ।

বলয়ের অধোদেশেই কঙ্কণের অধিকার। এই আভরণ করভূষণ নামেও কথিত হইয়াছে। (কঙ্কণং করভূষণম্। মনুষ্যবর্গ; ১০৮) মধ্যযুগের সাহিত্যে কঙ্কণের বড়ই ছড়াছড়ি দেখা যায়। ভবভূতি জানকীর হস্তে কমনীয় কঙ্কণ সন্নিবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। (অয়মাগৃহীত[illegible]ণঃ।—উত্তরচরিত।) তিনিই আবার সীতার পরিণয়-সময়ে ভার্গবের সহিত সংলাপ-প্রবৃত্ত রামচন্দ্রকে কঙ্কণ-মোচনার্থ অন্তঃপুরে প্রেরণ করিয়া এই প্রসঙ্গে সে কালের একটা স্ত্রীআচারেরও পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। (৩)

চুড়ি।

শেষযুগের সাহিত্যে শঙ্খ বলয়ের মধ্যবর্ত্তী চুড়ির ব্যবহার দেখা যায়। কবিকঙ্কণ কালকেতুকে গালা হাটে জিনিস কিনিতে পাঠাইয়া, তথা হইতে অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে গৃহিণীর জন্য সোনার চুড়িও ক্রয় করাইয়াছেন। যথা,— "হীরা নীলা মোতি পলা কলধৌত কণ্ঠমালা, কুণ্ডল কিনিল স্বর্ণচুড়ি।" কবিকঙ্কণের উক্তিতে কুলপিয়া অর্থাৎ খিল দেওয়া শঙ্খের উল্লেখ দেখা যায়। (৪) ইহাতে বোধ হয়, তাঁহার সময়ে কুলপিয়া শঙ্খ-ধারণ জাঁকজমকের পরিচয় ছিল।

---

(১) কনক-বলয়-ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ।—মেঘদূত; ২

(২) নিসর্গরক্তৈর্বলয়াবনদ্ধ-তাম্রাশ্মরশ্মিচ্ছুরিতৈর্ন খাগ্রৈঃ।—শিশুপালবধ, ৩।৬

(৩) প্রবিশ্য চ কঞ্চুকী।—দেব্যঃ কঙ্কণমোক্ষণায় মিলিতা রাজন্ বরঃ প্রেষ্যতাম্।—মহাবীরচরিত।

অত্রত্য কঙ্কণ-শব্দ অলঙ্কার অর্থে অথবা করসূত্র অর্থে গৃহীত হইয়াছে, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। মেদিনীকোষে কঙ্কণশব্দ করভূষা, সূত্র ও মণ্ডন, এই তিন অর্থে পঠিত হইয়াছে। ইহাতে সূত্র ও মণ্ডন দুইটি জিনিস কি, তাহা প্রকাশ করা হয় নাই। পাঠ ("কঙ্কণং করভূষায়াং সূত্রমণ্ডনয়োরপি", এইরূপ।) রভসের মতে, "ক্লীবং মণ্ডলে সূত্রে কঙ্কণং করভূষণম্"। ইহাতেও বিশদ হইল না; কারণ, "মণ্ডনে-সূত্রে" এই দুইটি বিশেষ্য বিশেষণও হইতে পারে, এবং মণ্ডন ও সূত্র, এই দুইটি বস্তুরও বাচক হইতে পারে। কিন্তু রত্নকোষকার "হস্তমণ্ডন-সূত্র"কে কঙ্কণ নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, মণ্ডন ও সূত্র বিশেষ্য বিশেষণ রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা—(হস্তমণ্ডনসূত্রে স্যাৎ কঙ্কণো মাপ্রতীসরঃ) এই হস্তমণ্ডনসূত্র বর্ত্তমান-কালীন কাঁটিপোয়ালো বলিয়া বোধ হয়।

(৪) পরি দিব্য পাটশাড়ি, কনকরচিত চুড়ি, দুই করে কুলপিয়া শঙ্খ।

কবিকঙ্কণ নাসিকায় দোলায়িত মাণিক্যের বর্ণনা করিয়াছেন। (১) সংস্কৃত সাহিত্যে কেশ হইতে পাদাগ্র পর্য্যন্ত ধারণীয় যে সকল গহনার উল্লেখ দেখা যায়, তাহাতে নাসিকায় পরিধেয় বলাক, বেশর, মুলুক প্রভৃতির উল্লেখ নাই। সুতরাং এই আভরণ শেষযুগে উদ্ভাবিত বলিয়াই বোধ হয়।

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

বিদেশী গল্প।

গাট্রুডের ঘড়ী।

একদা প্রভাতে সিল্‌সেডের সহিত দেখা করিতে গেলাম। বলিলাম, "আজ যদি চ্যাম্‌পিউ হোটেলে ভোজ দাও, তবে আমি এপিকিউরসের শিষ্যত্ব-গ্রহণে রাজি আছি।"

সংক্ষেপে সে বলিল, "একেবারেই অসম্ভব।"

"কেন? পকেটে টাকা কম—— ?"

"তা' নয় ভাই! টাকা যথেষ্ট সঙ্গে আছে।"

বন্ধুবর ছয়টি উজ্জ্বল স্বর্ণ মুদ্রা আমাকে দেখাইল।

"তবে কি?"

সিলসেড্ আমার স্কন্ধে হাত রাখিয়া চলিতে চলিতে বলিল, "বুল্‌ভার্দ্দ-দু-টেম্পল অবধি আমার সঙ্গে চল, পথে সমস্ত গল্পটা বলিতেছি। আমার একটা ঘড়ী আছে; কিন্তু এক শত ফ্রাঙ্ক্ না হইলে সেটা উদ্ধার করিতে পারিতেছি না। প্রায় তের মাস হইয়া গেল, ঘড়ীটা খুড়ার কাছে বন্ধক রাখিয়াছি। গতকল্য তাঁহার কাছে গিয়া আরও কিছুদিন পূর্ব্ব সর্ত্তে ঘড়ীটা রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম, কিন্তু মাননীয় খুড়া মহাশয় সে প্রস্তাবে রাজি নন। তাঁহার কেরাণী বলিল যে, ঘড়ীটা এতক্ষণ নীলাম-আফিসে জমা হইয়া গিয়াছে। তবে একটা উপায় আছে, হয় ত ঘড়ীটা এখনও নীলামে চড়ে নাই, চেষ্টা করিলে পাওয়া যাইতে পারে। আর যদি নীলামে চড়িয়া থাকে, তাহা হইলে অগত্যা দাম দিয়াই কিনিয়া লইতে হইবে। 'খুড়া'র দোকান হইতে বেশ সন্তুষ্টচিত্তে এবং কৃতজ্ঞহৃদয়েই বাহির হইলাম। গত কল্য ঘড়ী খালাস করিতে পারি নাই। আজ তাই নীলামে চলিয়াছি।"

সিল্‌সেডের বক্তব্য শেষ হইলে বলিলাম, "নেহাৎ অদৃষ্ট মন্দ, তা আর কি করিব ভাই। আজ চ্যাম্‌পিও হোটেলে খানা খাইবার এমন ইচ্ছা হইয়াছিল!"

"আমারও কি সে ইচ্ছা নাই? যদি নীলামে ঠিক সময়ে না পঁহুছিতে পারি, আর ঘড়ীটা যদি বিক্রয় হইয়া গিয়া থাকে, দেখি, তাহা হইলে বেলা চারিটায় সময় ফিরিয়া আসিব। তখন হোটেলে গিয়া আমোদ করা যাইবে।"

---

(১) পক্ক বিম্বরে জিনিয়া অধর, নাসায় মাণিক দোলে।— কবিকঙ্কণ।

এই সুনিশ্চিত আশ্বাসবাণী শুনিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাসসহকারে বলিলাম, "বেশ, তবে তাই। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, ঘড়ীটা যেন তুমি ফিরাইয়া পাও।"

"ধন্যবাদ!" সিল্‌সেড্‌ নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া গেল।

* * * *

পশুশালায় পশুগণ যেমন লৌহরেল-মণ্ডিত গৃহে স্বতন্ত্রভাবে থাকে, বন্ধকী কারবার যাহাদের, তাহাদের কর্ম্মচারিগণও তদ্রূপ। সিল্‌সেড্‌ এমনই এক ব্যক্তির সম্মুখে আসিয়া বলিল, "আমার ঘড়ীটা ফিরিয়া দিবেন কি? সমস্ত পাওনা গণ্ডা চুকাইয়া দিতেছি।"

"বড় দেরী হয়ে গেছে। এখন ত আর হয় না। আপনি তাড়াতাড়ি নীলাম-ঘরে যান। বোধ হয় এখনও উহার ডাক হয় নাই।"

সিলসেড্‌ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তাই ত, ঘড়ীটা গেল না কি!"

জনৈক খর্ব্বকায় বৃদ্ধ কাতরস্বরে বলিলেন, "মহাশয়, আমার ঘড়ীটা?"

তিনি বহুদিনের একখানি পীতবর্ণ টিকিট কর্ম্মচারীকে দেখাইলেন।

"বড় দেরী হয়ে গেছে। এখন নীলাম-ঘরে যান।"

"হা, ভগবান!"

বৃদ্ধ দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন।

সিলসেড্‌ নীলামঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার সঙ্গীটিকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। বৃদ্ধের মুখমণ্ডল পাণ্ডুর, অত্যন্ত কৃশকায়, মস্তকে বিরল, শুভ্র কেশরাজি, নয়নে স্নেহকোমল দৃষ্টি। তাঁহার পরিধানে সেকালের পরিচ্ছদ। অশীতিপর বৃদ্ধ হইলেও এখনও তিনি ঋজুভাবে হাঁটিতেছিলেন।

কক্ষমধ্যে অসম্ভব জনতা। সেই চঞ্চল জনতার মধ্য হইতে পায়ের অগ্রভাগে ভর দিয়া বৃদ্ধ দেখিবার চেষ্টা করিলেন। মৃদুগুঞ্জনে বলিলেন, "হায়! আমার চিরকালের সহচর, আমার প্রিয়তম ঘড়ী! ঐ যে টেবিলের উপর রহিয়াছে। জয় জগদীশ! এখনও উহা বিক্রী হয় নাই! ঠিক সময়েই আসিয়াছি!"

বলিতে বলিতে আনন্দের আতিশয্যে তাঁহার দেহ কম্পিত হইল। টলিতে টলিতে প্রাচীর অবলম্বনপূর্ব্বক তিনি পতনবেগ সংবরণ করিলেন। ভাবাতিশয্যে তাঁহার ক্ষুদ্র পদযুগল টলিতেছিল, ক্ষুদ্র অপ্রশস্ত বক্ষোদেশ—আন্দোলিত করপুট থর-থর করিয়া কম্পিত হইতে লাগিল। তাঁহার নয়নে দরবিগলিত অশ্রুধারা, আননে মধুর হাস্যের আনন্দদীপ্তি। সুখাবেগে তিনি তখন এত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে একটি কথাও উচ্চারণ করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। কিন্তু তাঁহার অশ্রুপূর্ণ ভাবময় নয়নযুগল ছন্দোময়ী কবিতার মত সিল্‌সেডের হৃদয়ে বৃদ্ধের অন্তরের ভাবনিচয় প্রকাশ করিয়া দিল।

সে কি করিতে তথায় আসিয়াছে, তাহা বিস্মৃত হইল। সে আপনা ভুলিয়া বৃদ্ধের আননে [illegible] বিকাশ দেখিতেছিল। বৃদ্ধের আনন সরলতাপূর্ণ হইলেও তাহাতে বুদ্ধিমত্তা ও শালীনতার প্রভাব সুস্পষ্ট। সিলসেড্‌ বুঝিল, বৃদ্ধের হৃদয় তাঁহার আননে প্রতিফলিত হইয়াছে। কেহ কাহারও সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করে নাই, তথাপি যুবক বুঝিল, এই বৃদ্ধের সহিত তাহার বন্ধুত্ববন্ধন সুদৃঢ় হইয়াছে। বৃদ্ধের বাক্‌শক্তি ফিরিয়া আসিলে, তিনি সিল্‌সেডের দিকে ফিরিয়া ভগ্নস্বরে বলিলেন, "ঘড়ীটার গল্প আপনাকে বলিতেছি। আপনি টেবিলের উপর ঐ যে ঘড়ীটা দেখিতেছেন, উহা আমার। উহা আবার আমি ফিরিয়া পাইব, আশা হইতেছে। কিন্তু ঘড়ীর ইতিহাসটা বলি শুনুন। কোনও হৃদয়বান্ শ্রোতার নিকট গল্প করিলে আমার অধৈর্য্য অনেকটা শান্ত হইবে, আর উহার বিচ্ছেদের তীব্রতারও কতকটা হ্রাস হইবে।"

সিলসেড্‌ নীরবে বৃদ্ধের সন্নিহিত হইলে, তিনি বলিতে লাগিলেন।

"এ সোনার ঘড়ীটা অতি বৃহৎ এবং চমৎকার। আমি যখন জন্মগ্রহণ করি, তখন ইহা আমার পিতার পকেটে ছিল।

"বাবা এখন কোথায়! আমার ঘড়ী!—পিতা আমার প্রথম বন্ধু ছিলেন, ঘড়ীটা আমার প্রথম ক্রীড়া-সঙ্গী, শৈশবের প্রথম প্রণয়পাত্র।

"বাবা আমার প্রায়ই বলিতেন, 'তোমার পনের বৎসর বয়স হইলে ঘড়ীটা তোমায় দিব, কিন্তু ভাল ছেলে হওয়া চাই'।"

"ওঃ সে কি অধীরতা! আমার বোধ হইত, সে দিন যেন আর আসিবে না। পনের বৎসর! সে কত কাল পরে! প্রায়ই মনে মনে বলিতাম, না, ঘড়ী পাওয়া আর আমার ভাগ্যে নাই। আমি পিতার নয়নের পুত্তলী ছিলাম। প্রতি রবিবারে তিনি একবার উহা আমার হাতে দিতেন।

"আপনি বুঝিতেই পারিতেছেন, মাঝে মাঝে ঘড়ীটা পাইয়া আমার তৃপ্তি হইত না। চিরকালের জন্য উহা অধিকার করিবার বাসনা আমায় অধীর করিয়া তুলিত। পনের বৎসর শীঘ্র আসিল না। কিন্তু হায়! তৎপূর্ব্বেই ঘড়ীটা আমার অধিকারে আসিল। সেটা পিতার দান নহে—উত্তরাধিকারসূত্রে পাইলাম।

"যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন দেশে রাষ্ট্রবিপ্লবের যুগ। দেশমধ্যে ঘোরতর অরাজকতা ও অত্যাচার। একদা অপরাহ্ণে কতিপয় ভীমদর্শন লোক আমার পিতাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিল। পরদিবস পাষণ্ডগণ আর একটি নিরপরাধ হতভাগ্যকে হত্যা করিল। প্রাণদণ্ডের পূর্ব্বে আমি ও জননী অল্পক্ষণের জন্য তাঁহার সহিত দেখা করিবার অনুমতি পাইয়াছিলাম। সেই অল্প সময়েই অশ্রুর নদী বহিয়া গিয়াছিল। বিদায়ের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে বাবা ঘড়ীটা আমার সম্মুখে ধরিলেন; তিনি মুখে কিছু বলিতে পারিলেন না, শুধু একটু হাসিয়াছিলেন। হায়! এখনও সে হাস্যরেখা আমি দেখিতে পাইতেছি!

"তাঁহার গাড়ী চলিয়া গেল। আমিও কারাগার হইতে বাহির হইয়া উহার পাছু লইলাম। বধ্যভূমিতে গিয়া দাঁড়াইলাম। পিতার মস্তক দেহচ্যুত হইতে স্বচক্ষে দেখিলাম। সে দৃশ্যে আপনিই চক্ষু নিমীলিত হইল, শরীরের শোণিতরাশি অকস্মাৎ যেন হৃদয়ে জমা হইল। আমার সমস্ত দেহ শিহরিয়া উঠিল। সবলে আমি ঘড়ীটা চাপিয়া ধরিলাম। সেই সময়ে আমার চিত্তে একটা বিচিত্র ভাবের উন্মেষ হইয়াছিল; উন্মীলিত চক্ষে আমি সেই মুহূর্ত্তে ঘড়ীর দিকে চাহিলাম, পিতার ন্যায় হাসিতে চেষ্টা করিয়া আমি সময়টা দেখিলাম। তখন বারোটা বাজিতে দশ মিনিট বাকি।"

এই সময়ে নীলামাধ্যক্ষ অপর একটি জিনিস নীলামে চড়াইয়া হাঁকিতে লাগিল। বৃদ্ধ চকিতে চাহিয়া দেখিলেন, সেটা তাঁহার ঘড়ী নহে। তখন আবার বলিয়া চলিলেন।—

"কিছুদিন পরে দুঃখে শোকে আমার জননী ইহলোক ত্যাগ করিলেন। তখন এই প্রকাণ্ড বিশ্বে রহিলাম শুধু আমি—সম্পূর্ণ নির্ব্বান্ধব, নিরাশ্রয়, আত্মীয়-স্বজন-বিরহিত। অতীতের যাবতীয় সুখের স্মরণচিহ্ন একে একে বিলুপ্ত হইল; শুধু রহিল পিতৃদত্ত ঘড়ী, আমার শৈশবের—বাল্যের চির-আকাঙ্ক্ষিত ঘড়ী। উহা আমার নিত্যসহচর হইল। এক মুহূর্ত্তের জন্য ঘড়িটি হাতছাড়া করিতাম না। কি বিয়োগান্ত দৃশ্যের স্মৃতি লইয়া সে আমার হস্তে আসিয়াছিল। তাহাকে ছাড়িয়া কি একদণ্ডও থাকিতে পারি! আমার জীবনের প্রত্যেক সুখ প্রত্যেক দুঃখের মুহূর্ত্তটির স্মৃতি বুকে করিয়া সে আমার নিত্যসহচর হইয়াছিল।

"অবশেষে আমরা তিন জন হইলাম। একটি সঙ্গী বাড়িল। ও! সে কি আনন্দের দিন! মার্থা আমাকে দরিদ্র জানিয়াও উপেক্ষা করে নাই। তখনও আমি দরিদ্র ছিলাম, এখনও আমি গরীব। তবে কোনরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত, এইমাত্র। আমি তাহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতাম, শ্রদ্ধা করিতাম। এ ছাড়া আমার আর কোনও গুণ ছিল না। আমাকে অনাথ ও নির্ব্বান্ধব দেখিয়া তাহার নারী-হৃদয় সহানুভূতিতে অভিভূত এবং

বিচলিত হইয়াছিল। আজ চল্লিশ বৎসর, সে কিসে আমি আনন্দ পাইব, শুধু তাহাই ভাবিয়াছে, এবং আমাকে সুখী করিয়াছে। সে চেষ্টা তাহার সার্থক হইয়াছে। যৌবনের সুন্দরী গার্ট্রুড্ এখন বৃদ্ধা, কিন্তু তেমনই স্নেহকোমলহৃদয়া, এবং প্রেমময়ী!

"আমাদের বিবাহে কোনও প্রকার বাহ্যাড়ম্বর ছিল না। বলনাচ, ভোজ, অথবা কোনও প্রকার আমোদ প্রমোদের অনুষ্ঠান হয় নাই। দুইটি বন্ধুর সহিত আমি ও গার্ট্রুড্ টাউনহলে এবং পরে ধর্ম্মমন্দিরে গিয়াছিলাম। কার্য্যশেষে সস্ত্রীক বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। কেহ আমাদিগকে কোনও প্রকার উপহার বা যৌতুক দেয় নাই। কিন্তু আমাদের দারিদ্র্য সত্ত্বেও জগতে আমাদের মত সুখী দম্পতী কেহ ছিল না। কুটীরে প্রবেশ করিবার পর গাট্রুড্ আমাকে সময়টা দেখিতে বলিল। তাহার কথাটা যেন ভগবানের প্রেরণা বলিয়া অনুমান করিলাম।

"গাট্রুড্ এই সামান্য জিনিসটা তোমায় উপহার দিলাম। আমার আর কোনও ধন দৌলত নাই। ঘড়ীটা আমি কত ভালবাসি, এবং কেন উহা আমার প্রিয়, তা বোধ হয় তুমি জান। আজ শুভ বাসররজনীতে এই আমার উপহার। নিজেকে ত তোমায় আগেই দিয়াছি।"

"গার্ট্রুড্ তাহার কোমল শুভ্র করপুট প্রসারিত করিয়া বলিল, 'ধন্যবাদ, প্রিয়তম!' আমি ঘড়িটী তাহাকে দিলাম। তখন রাত্রি বারোটা বাজিতে দশ মিনিট বাকি।"

নীলামাধ্যক্ষের দিকে সহসা ফিরিয়া চাহিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "ও কি? না, ও আমার ঘড়ীটা নয়। আমার কাহিনীর শেষাংশটা এইবার বলিয়া ফেলি।"

"এক মাস পরে আমার জন্মতারিখে গার্ট্রুড্ মধুরহাস্যে কোমলকণ্ঠে বলিল, 'প্রিয়তম, আমার আর কিছু নাই, এই ঘড়ীটা আজ তোমায় সর্ব্বান্তঃকরণে উপহার দিলাম।'

"তিন মাস পরে তাহার জন্মতিথি আসিল। আবার তাহাকে আমি ঘড়ীটি উপহার দিলাম। কিছুদিন পরে আমার জন্মতিথি-উপলক্ষে সে আবার উহা আমায় অর্পণ করিল। এইরূপে পঁচিশ বৎসর ধরিয়া যখনই কোনও উপহার দিবার সুযোগ উপস্থিত হইত, পরস্পর পরস্পরকে ঘড়ীটি উপহার দিতাম। প্রতিবারই উভয়ে ঘড়ী পাইয়া নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিতাম। বোধ হয়, বহুমূল্য উপহারেও এত আনন্দ ও তৃপ্তি জন্মিত না। আমরা জানিতাম, ঘড়ীটি আমাদের উভয়েরই।

"মহাশয়, এই ঘড়ীটি এখানে কিরূপে আসিল, তাহার কারণ জানিবার জন্য আপনি বোধ হয় ব্যগ্র ও বিস্মিত হইতেছেন। কিন্তু কারণটি শুনিলে আপনার বিস্ময় আর থাকিবে না। একদা গার্ট্রুডের পীড়া হইল। অতি কঠিন রোগ। আমাদের যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় হইয়া গেল; কিন্তু রোগ সারিল না। হতাশভাবে অশ্রুমোচন করিতে করিতে আমি গ্রাট্রুডের রোগশয্যার পার্শ্বে বসিলাম। ঔষধ বা পথ্য জোগাড় করিব, এমন একটী পয়সাও হাতে নাই।

"আমার সম্মুখে ঘড়িটী টিক্ টিক্ করিতেছিল—ইহা বন্ধক রাখিলে ঔষধ ও পথ্যের যোগাড় হইতে পারে। আর ইতস্ততঃ করিলাম না। ঘড়িটী তখন গার্ট্রুডের অধিকারে। কিন্তু তখন কি আর বিবেচনার সময় আছে? তথাপি দোকানের সম্মুখে আসিয়া তিনবার আমি প্রবেশ করিতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম। দোকানঘরে প্রবেশ করিতে আমার সাহসে কুলাইতেছিল না। বাস্তবিক আমার বুক তখন ফাটিয়া যাইতেছিল। অবশেষে চল্লিশ ক্রাউ লইয়া ঘড়িটী বাঁধা রাখিলাম। গার্ট্রুড্ এবার সারিয়া উঠিতে পারিবে। অতঃপর যখন ঘটনাটি গার্ট্রুড জানিতে পারিল, তখনকার সে দৃশ্য আমি ভুলিতে পারিব না।

"ক্রোধে অধীর হইয়া সে বলিল, 'আমি বরং মরিয়া যাইতাম!'

"তাহাকে বক্ষোদেশে টানিয়া লইয়া আমি বলিলাম, 'গার্ট্রুড্, আমার দশা তাহা হইলে কি হইত, বল দেখি?'

"সে কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে অশ্রুপাত করিল। আমিও অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলাম না।

"আমার পিতা যেরূপ মিষ্টভাবে বলিয়াছিলেন, আমিও তদ্রূপ মধুর স্বরে বলিলাম

'প্রিয়তমে, কোনও চিন্তা করিও না। এখন তুমি ভাল হইয়াছ; আমি দিবারাত্রি খাটিয়া এক দিন তোমার ঘড়ী খালাস করিয়া আনিব।'

'কত টাকায় বাঁধা দিয়াছ?'

'চল্লিশ ফ্রাঙ্ক্।'

"টাকার পরিমাণ শুনিয়া সে ভীত হইল। সে জানিত, এত টাকা জমা করা কত কঠিন। তথাপি দৃঢ়স্বরে সে বলিল, 'তা হউক, আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া ঘড়ী খালাস করিয়া আনিব।'

"আমরা প্রতিজ্ঞামত সারা দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়াছি; কিন্তু এখনও ঘড়ী খালাস করিতে পারি নাই। বিগত পনের বৎসরে আমি যে টাকা লইয়াছিলাম, তাহার পাঁচ গুণ সুদ দিয়াছি। সুদখোর চামারগুলা গরীবের রক্ত কিরূপে শোষণ করে, ভাবিলেও হৃৎকম্প হয়। পাছে ঘড়ী বিক্রয় হইয়া যায়, এ জন্য আমার বাৎসরিক আয়ের অধিকাংশ আমি পোদ্দারকে দিয়াছি, তবুও দেনা শোধ হইল না। আজও উহা পঞ্চাশ ফ্রাঙ্কের কম ফিরিয়া পাইব না।

"অত্যন্ত অল্প খরচে মিতব্যয়িতার চরম করিয়াও আমরা কিছু করিতে পারি নাই। কখনও রোগের জন্য টাকা খরচ হইয়াছে, কোনও কোনও সময় শুধু বসিয়া থাকিতে হইয়াছে। আবার জিনিসের দুর্মূল্যতাবশতঃ সময়ে সময়ে অধিক অর্থ সঞ্চয় করাও কঠিন হইত। ইহা ছাড়া প্রতিবেশীরা মাঝে মাঝে টাকা ধার লইত; কিন্তু তাহা আর ফিরিয়া পাই নাই। সময়ে সময়ে তাহাদের উপর বড় রাগ হইত; কিন্তু আজ আর সে ক্রোধ নাই। আজ সকলকেই সানন্দে ক্ষমা করিতেছি।

"কত কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করিয়া যে টাকাটা সঞ্চয় করিয়াছি, তাহা ভগবানই জানেন। কত দিন অনশনে অর্দ্ধাশনেই কাটিয়াছে। ইহাতেও পর্য্যাপ্ত অর্থ সংগৃহীত হয় নাই। তিন মাস পূর্ব্বে গণনা করিয়া দেখিয়াছিলাম, আর পাঁচ ফ্রাঙ্ক হইলে তবে ঘড়ীটি খালাস করিতে পারা যাইবে। গার্ট্রুড্ ত আশা ছাড়িয়া দিয়াছিল। এমন সময় ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিলেন। একটা বিবরণ নকল করিয়া দিবার কাজ মিলিল। গত তিন রাত্রি জাগিয়া সেই কাজ করিয়াছি। আজ সকালে গার্ট্রুড্ পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক আমার হাতে গণিয়া দিয়াছে।

"টাকা পাইয়াও মনে আশঙ্কা ছিল, হয় ত সময়ে পঁহুছিতে পারিব না। কিন্তু ভগবানের অসীম দয়া, এখনও সময় আছে। পনের বৎসর আমি ঘড়ী-ছাড়া। আপনি বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছেন—উহা আমার এত প্রিয় কেন? আজ আমি ঘড়ীতে দম দিতে পারিব! বাল্যে যাহার মধুর শব্দে মুগ্ধ থাকিতাম, বহুকাল পরে আজ সেই ধ্বনি শুনিয়া জীবন সার্থক করিব!

"গার্ট্রুড্ যখন শুভসংবাদ শুনিবে, তখন তাহার কি আনন্দই হইবে! সে আমার সঙ্গেই আসিয়াছে, তবে তাহাকে ভিতরে আসিতে দিই নাই। সে যে কি উৎকণ্ঠায় বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে, তাহা আমিই বুঝিতেছি।

"যদি ঘড়ীটা বিক্রয় হইয়া যাইত, আমি বোধ হয় সে কষ্ট সহ্য করিতে পারিতাম না। কিন্তু সে ভয় আর নাই। বন্দীকে মুক্ত করিয়া আজ গার্ট্রুডের হাতে দিতে পারিব।"

বৃদ্ধ ঘড়ীর দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ঐ সেই ঘড়ী!" মিলসেভ দেখিল—নীলামাধ্যক্ষ একটি বড় পুরাতন সোনার ঘড়ী হাতে তুলিয়া লইয়াছে। সে হাঁকিয়া বলিল;

"পঁয়তাল্লিশ ফ্রাঙ্কে একটি সোনার ঘড়ী! পঁয়তাল্লিশ ফ্রাঙ্ক!"

বৃদ্ধ বলিলেন, "ছচল্লিশ ফ্রাঙ্ক!"

কয়েক মুহূর্ত্ত চলিয়া গেল। কেহ অধিক দাম বলিল না। নীলামাধ্যক্ষ হাত বাড়াইয়া বৃদ্ধকে ঘড়ীটি অর্পণ করিতে গেল। বৃদ্ধ বাহু প্রসারিত করিলেন।

কিন্তু আর এক ব্যক্তি ঘড়ীটি নীলামাধ্যক্ষের হস্ত হইতে লইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। সে জনৈক কুসীদজীবী ইহুদী।

সে বলিল, "দেখি—ঘড়ীটা। মন্দ নয়। লোকে এ সব জিনিস কেনে বটে। আমি সাতচল্লিশ ক্রাঙ্ক দিব।"

সে নীলামাধ্যক্ষের হস্তে ঘড়ীটা ফিরাইয়া দিল।

নবাগতের দিকে জলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বৃদ্ধ প্রশান্তস্বরে বলিলেন, "আটচল্লিশ ক্রাঙ্ক !"

ইহুদী বলিল, "উনপঞ্চাশ ক্রাঙ্ক !"

হাত বাড়াইয়া দিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "পঞ্চাশ ক্রাঙ্ক !"

মুহূর্ত্ত নীরবে কাটিল।

ইহুদী গর্জ্জন করিয়া বলিল, "নির্ব্বোধ! যাক, আমি ছাড়্‌ছি না। আমি একান্ন ক্রাঙ্ক দিব।"

হতভাগ্য বৃদ্ধের বিবর্ণ মুখমণ্ডলের চিত্র ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। তাঁহার দেহে যে প্রাণ আছে, তাঁহার চক্ষু দেখিয়া তাহা বুঝা গেল না।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভগ্ন মৃদুকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "পঞ্চাশটি ক্রাঙ্ক আমার আছে; আর টাকা ত নাই !"

নীলামাধ্যক্ষ চীৎকার করিয়া বলিল, "একান্ন ক্রাঙ্ক, সোনার ঘড়ী একান্ন ক্রাঙ্কে যাইতেছে !"

ইহুদী অধীরভাবে বলিল, "তাড়াতাড়ি দিন। আর কেহ ডাকিবে না। ও ঘড়ী আমার।"

বৃদ্ধের তখন যেন চৈতন্য হইল। তিনি উন্মত্তভাবে বলিলেন, "বায়ান্ন ক্রাঙ্ক !"

ইহুদী তাড়াতাড়ি বলিল, "তিপ্‌পান্ন !"

দৃঢ়কণ্ঠে বৃদ্ধ বলিলেন, "চুয়ান্ন।" মৃদুস্বরে তিনি সিলসেড্‌কে বলিলেন, "এ টাকা আমার নাই।"

ইহুদী একটু থামিয়া বলিল, "পঞ্চান্ন !"

সিলসেডের কানের কাছে মুখ আনিয়া কাতরস্বরে বৃদ্ধ বলিলেন, "তবে বিদায় !" নয়নের অশ্রু গোপন করিবার অছিলায় তিনি কক্ষত্যাগের উপক্রম করিলেন।

অকস্মাৎ রঙ্গস্থলে নূতন কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—"ষাট ক্রাঙ্ক !"

এ কণ্ঠস্বর সিলসেডের। অকম্পিতকণ্ঠে যুবক পুনরায় বলিল, "আমি ষাট ক্রাঙ্ক দিব।"

বিস্মিতভাবে বৃদ্ধ থমকিয়া দাঁড়াইলেন। ইহুদী বিকট মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, "পঁয়ষট্টি !"

সিলসেড্ হাঁকিল, "সত্তর !"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া ইহুদী বলিল, "পঁচাত্তর !"

সিলসেড্ একডাকে প্রতিযোগিতার মূলে কুঠারাঘাত করিবার উদ্দেশে বলিল, "নব্বই !"

তাহার উদ্দেশ্য সফল হইল। ইহুদী আর ডাকিল না। ঘড়ী তাহার হাতে আসিল।

উত্তেজনাবশে, তিরস্কারপূর্ণকণ্ঠে বৃদ্ধ বলিলেন, "আপনার এই কাজ ! আমি আপনাকে সদাশয় ভাবিয়া গল্পটি করিলাম, আর শেষে আপনিই আমার ঘড়ীটি লইলেন ! আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই—আপনি এমন কাজ করিতে পারেন !"

উত্তরে সিলসেড্ বৃদ্ধের ক্ষীণ হস্তে ঘড়ীটি অর্পণ করিয়া জনতার মধ্যে মিলাইয়া গেল। বৃদ্ধের বিমূঢ় ভাব তিরোহিত হইবার পূর্ব্বেই যুবক অন্তর্হিত হইল।

রাজপথে বাহির হইবার সময় সে একটি বৃদ্ধা নারীর সম্মুখে পড়িল। জীবনে সে কখনও তাহাকে দেখে নাই; কিন্তু অনুমানে বুঝিল, এই গার্ট্রুড্। সন্নিহিত একটা দ্বারের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া সে দম্পতীর মিলনদৃশ্য দেখিবার জন্য দাঁড়াইল। তাহার নিজের ঘড়ী গিয়াছে, তাহাতে ক্ষতি নাই।

অল্পক্ষণ পরেই বৃদ্ধ ঘড়ী হাতে করিয়া রমণীর সম্মুখে আসিলেন। রমণী দৌড়িয়া গিয়া উহা গ্রহণ করিল। নয়নাসারে ঘড়ী ভিজিয়া গেল। বৃদ্ধ উৎসাহভরে নীলাম-ঘরের কাহিনী তাহাকে শুনাইতেছিলেন।

দম্পতীর আনন্দদর্শনে সিলসেডের সঙ্কোচ বোধ হইল। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা কয়েকবার তাহাদের

উপকারকের সন্ধানে চারি দিকে চাহিলেন; কিন্তু সিল্‌সেড্‌কে দেখিতে না পাইয়া উভয়ে পরস্পরের বাহুলগ্ন হইয়া প্রফুল্লচিত্তে চলিয়া গেলেন।

সন্তোষ-প্রফুল্ল-হৃদয়ে সিলসেড্‌ আমার সহিত দেখা করিতে আসিল।

আমি বলিলাম, "ঘড়ীর কি হইল?"

"চিরদিনের জন্ত তাহাকে বিসর্জ্জন দিয়াছি।"

"তবে তোমাকে এত প্রফুল্ল দেখিতেছি যে?"

"আমার নিজের ঘড়ী ফিরাইয়া পাইলে আজ এত আনন্দ হইত না।"

"টাকাগুলি কি করিলে?"

"খুব ভাল জিনিস আজ কিনিয়াছি।"

"আমাদের ভোজের কি হইল? তুমি বড় স্বার্থপর।"

"সঙ্গে এখনও ত্রিশ ফ্রাঙ্ক আছে, চল, হোটেলে যাই।"

হোটেলে আসিয়া সিলসেড্‌ সংক্ষেপে ঘটনাটা আমাকে বলিল। তাহার কথা শুনিয়া আমারও হৃদয়ে আনন্দ জন্মিল। বোতলবাসিনীকে গেলাসে ঢালিয়া উভয়ে আনন্দপূর্ণকণ্ঠে বলিলাম, "গার্ট্রুড ও তাহার স্বামীর স্বাস্থ্য পান করা যাক।" *

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

উদ্ভিদের ঔদাসীন্য।

কিছুদিন হইল, আমি কয়েকটী য়্যান্টিগোনন লেপ্টোপস্ (antignonun Leptopus) নামক ক্ষুদ্র লতিকা প্রাপ্ত হই। তখন বড় গামলা না থাকায় লতিকা কয়টীকে একটী ৮ইঞ্চ গামলাতেই রক্ষা করি। একে শীতকাল, তাহাতে একত্র ঘেঁসাঘেঁসিতে থাকায় গাছগুলি মরিয়া গেল; কিন্তু গামলাটী তদবস্থায় থাকিল। ফাল্গুনমাসে গরম বাতাস পড়িলে গামলায় দুইটী তেজাল ফেঁকড়ি উদ্গত হইল দেখিয়া গাছ দুইটীকে যত্ন করিবার জন্ত আমার বড় আগ্রহ হইল। এ স্থলে বলিয়া রাখি যে, যেখানে গামলা ছিল, সেখানে দ্বিপ্রহরে দুই তিন ঘণ্টা রৌদ্র আসে। চারি পার্শ্বে দ্বিতল গৃহ থাকায় সেখানে সর্ব্বদা রৌদ্র আসে না। দ্বিতল অতিক্রম করিয়া না উঠিলে লতিকাদ্বয়ের আর সমস্তক্ষণ রৌদ্র-প্রাপ্তির আশা নাই, এবং পূর্ণমাত্রায় আলোক ও রৌদ্র না পাইলে কোনও গাছই কুসুমিত হইতে পারে না। এই জন্ত প্রথম হইতেই লতিকাদ্বয়কে উপরে তুলিবার চেষ্টা করিলাম। যত্নপূর্ব্বক গাছ দুইটীর গোড়ায় ভাল মাটী দিয়া প্রত্যেক গাছের গোড়া ঘেঁসিয়া এক একটী তিন হাত দীর্ঘ যষ্টি পুতিয়া, গাছের সঙ্গে এক এক গাছি সূক্ষ্ম রজ্জু বাঁধিয়া, রজ্জুর শেষাংশ দ্বিতলের বারান্দায় বাঁধিয়া দিলাম। অবলম্বন পাইয়া ডগা দুইটী সরলভাবে উপরে উঠিতে থাকিল। অবলম্বন পাইলে অনেক গাছই, বিশেষতঃ লতাগাছ মূল ডগা লইয়াই বৃদ্ধি

* চার্লস্ ডেস্লি রচিত ফরাসী গল্পের ইংরেজী হইতে অনূদিত।

পাইতে থাকে, শাখাপ্রশাখা, এমন কি, অধিক পত্রও ধারণ করে না। তাহা ব্যতীত এতদবস্থায় লতিকার কাণ্ডে যথোচিত গ্রন্থিও জন্মে না। বহির্বৃদ্ধিশীল (Exogenous) উদ্ভিদের প্রকৃতি অনুসারে মূলকাণ্ড ও শাখা প্রশাখার গাত্রে পত্র উদ্গত হয়, এবং প্রত্যেক পত্রের বৃন্তমূলে এক একটী গ্রন্থির স্থান (nodes) থাকে। কাণ্ড ও পত্রবৃন্তের সংযোগস্থলে একটী কোণ (angle) স্বতঃই দেখা দেয়, কিন্তু সে কোণ উদ্ভিদবিশেষে—৯০ ডিগ্রী বা তদপেক্ষা অল্প বা অধিক হইতে পারে। কোণের পরিমাণ যতই হউক, তাহাতে আমাদিগের কিছু আসিয়া যায় না; কিন্তু সেই কোণগুলির প্রত্যেকটীতে পরিস্ফুট বা প্রচ্ছন্ন শাখা-মুকুল (shoot bud or leaf bud) থাকে, এবং সুযোগ পাইলে শাখাকারে প্রকাশ পায়। প্রশ্ন হইতে পারে, গ্রন্থির আবার অবসর সুযোগ কি? সুতরাং এ স্থলে তাহা বলিয়া রাখিব।

উদ্ভিদের বৃদ্ধি শাখা প্রশাখার বা কাণ্ডের শেষাগ্রভাগেই পরিদৃষ্ট হয়। সকল উদ্ভিদই ঊর্দ্ধদিকে যাইতে চাহে; এই জন্য উদ্ভিদের রস সেই দিকে ছুটিয়া থাকে। কিন্তু রসের সে ঊর্দ্ধগতি কোনও রূপে রুদ্ধ হইলে রসের যোগান বা প্রবাহ বন্ধ হয় না, অথচ রসের উদ্বৃত্তাংশ বহির্গত হইয়া যাওয়া চাই, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। উদ্ভিদগণ রসোদ্গারে ক্ষান্ত না হইলে রসের যোগান বা প্রবাহও বন্ধ হয় না। রসশোষণই মূলের কার্য্য, এবং সে কার্য্যের বিরাম নাই। জীব হউক, বা উদ্ভিদ হউক, যতক্ষণ জীবিত থাকে, ততক্ষণ আহরণ যেমন প্রয়োজনীয়, বিক্ষেপও তদ্রূপ প্রয়োজনীয়। আবার অন্য প্রকারে এরূপও বলিতে পারা যায় যে, বিক্ষেপ বা বর্জ্জন না হইলে আহরণের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ইহা নির্জ্জীব অবস্থা, বা বিরামকাল।

আহরণ ও বর্জ্জন জীবনের লক্ষণ, এবং তাহারই ফল,—বৃদ্ধি। তথাপি বৃদ্ধির একটী বিরামকাল আছে। উহাকে বৃদ্ধির বিরাম বলিব, কি উদ্ভিদের বিরাম বলিব,—জানি না; তবে কৃত্রিম উপায়ে যখন উদ্ভিদকে নিরবচ্ছিন্নভাবে বৃদ্ধিশীল অবস্থায় রাখিতে পারা যায়, তখন উদ্ভিদে বিরামের আরোপ না করিয়া বৃদ্ধিতে করাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, উদ্ভিদ-জীবনে একটী নির্দ্দিষ্ট কাল আছে, তখন বৃদ্ধি স্থগিত থাকে। সাধারণতঃ স্থায়ী (Perenial) উদ্ভিদের বিরামের সময় শীতকাল। এই সময়ে জীবজন্তুর ন্যায় উদ্ভিদগণও নির্জ্জীবভাব ধারণ করে। কারণ, তখন বায়ুমণ্ডলের শৈত্য ও দিবাভাগের অল্পতা হেতু শরীরমধ্যে যথেষ্ট উত্তাপ জন্মে না; তন্নিবন্ধন শরীরের রস ঘন হয়; রসের

পরিক্রমণ মন্থরগতি প্রাপ্ত হয় ; আহৃত-রস-পরিপাকেও বিলম্ব ঘটে। * বিরামের অপর কাল,—ফলন-ফুলনের পর কিছুদিন। উদ্ভিদের বৃদ্ধির চরমাবস্থা,—ফলফুল-ধারণ। ফলপুষ্পধারণে উদ্ভিদের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত থাকে, কাজেই সে সময়ে গাছের বৃদ্ধি স্থগিত থাকে। তাহার পরেও কিছু দিন উদ্ভিদ দুর্ব্বল থাকে। ইহাও উদ্ভিদের বিরামকাল। কিন্তু সৃষ্টি-সামঞ্জস্যের কি অপূর্ব্ব বিধান! স্বাভাবিক বিরামকাল সমাগত হইবার পূর্ব্বে ইহারা পুষ্পিত হয়, সুতরাং স্বাভাবিক বিরাম-কাল ও পৌষ্পিক বিরামকাল প্রায় একই সময়ে উপস্থিত হয়। সাধারণতঃ দেখিতে পাই, ফলফুলের পর উদ্ভিদ বিরামসুখ লাভ করে। কিন্তু তাহা হইলেও আহরণ ও বর্জ্জন-ক্রিয়া রহিত হয় না। বিরামকালের আহরণ ও বর্জ্জন দ্বারা তখন উদ্ভিদের বৃদ্ধি হয় না ; তখন সে শক্তি ও সে সমুদয় আহৃত পদার্থ উদ্ভিদের নষ্ট শক্তি পুনঃসঞ্চারিত করিতে থাকে। জরায়ুতে ভ্রূণসঞ্চার হইলে গর্ভিণীর শরীরস্থ মানবদেহগঠনোপযোগী সমস্ত পদার্থ শিশুর পরিপুষ্টি সাধন করে, এবং সন্তান প্রসূত হইলে জননী ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। তথাপি জননী স্তন্য দ্বারা শিশুকে কিছুদিন পালন করিয়া থাকেন। এ সময়ে জননী-শরীরের উপর পীড়ন হয় বলিয়া জননীকে সাবধানে থাকিতে হয়, পুষ্টিকর খাদ্য ভোজন করিতে হয়। উদ্ভিদ-জগতেও ঠিক এই নিয়ম বিদ্যমান। পাশ্চাত্য উদ্ভিদশাস্ত্রবিদ্‌গণের মতে, পুষ্পসমূহ পত্রেরই উৎকর্ষ, বা শেষ অবস্থা। গাছের বৃদ্ধি-রোধের কথা বলিতেছিলাম। একটী ডগা লইয়া যে গাছটী দিন দিন বাড়িতেছে, তাহার শেষাগ্রভাগকে কোনও অবলম্বনের আশ্রয় হইতে বঞ্চিত করিলে, প্রথম অবস্থায় সে আসে পাশে কোনও অবলম্বনের আশায় টলমল করিতে থাকে ; কিন্তু সে অবস্থায় অধিক দিন বা অধিকক্ষণ থাকিতে না পারিয়া কোনও পার্শ্বে হেলিয়া পড়ে। এইখানেই তাহার সরলবৃদ্ধি স্থগিত হয়, এবং সেই ক্ষণ হইতে রসের প্রবাহ আর ঊর্দ্ধদিকে যাইতে না পারিয়া কাণ্ডস্থ পত্রমুকুল-দিগকে (nodes) জাগরিত করিতে প্রবৃত্ত হয়। প্রচ্ছন্ন বা নিদ্রিত মুকুলসমূহ এক্ষণে সহসা সমধিক রসের সাহায্য পাইয়া পরিস্ফুট হইতে থাকে। কিন্তু কাণ্ডের যে স্থান হইতে ডগা হেলিয়াছে, তাহারই ঠিক নিম্নস্থ পত্র মুকুল সমধিক ও শীঘ্র জাগরিত হইয়া উঠে, এবং অচিরে ফেঁকড়ি-রূপে প্রকাশ পায়। গাছ বিশেষ তেজাল থাকিলে [illegible] পত্রমুকুলের সন্নিহিত নিম্নবর্ত্তী আরও ২।৪টী বা ততোধিক মুকুল পরিস্ফুট ও শাখায় পরিণত হয়। যে স্থলে বক্রতার আপেক্ষিক বেগ বা tension অধিক, তাহারই নিম্নবর্ত্তী নিকটস্থ মুকুল সর্ব্বাগ্রে বিকশিত

হইবার কথা। তাহাকে বল প্রদান করিয়াও রসের জোর থাকিলে তন্নিম্নস্থ বা পার্শ্বস্থ চোকগুলির পরিপুষ্টি সাধিত হয়, এবং ক্রমে বিকশিত ও পল্লবিত হইয়া থাকে। মূলাংশের গ্রন্থিগুলি প্রায় নিদ্রিত থাকিয়া যায়। এবং সে সকল স্থানের ত্বক্ বাহ্য প্রকৃতির সংসর্গে ক্রমে কঠিন হইয়া যায়; ফলতঃ তথাকার চোকগুলি আর ফুটিতে পারে না।

আমার আলোচ্য লতাটী যতদিন দ্বিতলের বারান্দা অবধি উঠিতেছিল, ততদিন একগাছি রজ্জুর অবলম্বন পাইয়াছিল। সুতরাং নির্ব্বিঘ্নে সরলভাবে উঠিয়াছিল, এবং ততদিন ১১।১২ ফুট কাণ্ডের মধ্যে আদৌ শাখা উদ্গত হয় নাই। কিন্তু বারান্দায় পঁহুছিয়া আর অগ্রসর হইবার পথ পাইল না; বারান্দাকে জড়াইয়া ধরিতে পারিল না। এই অবস্থায় দুই এক দিন থাকিয়া পার্শ্বদেশে হেলিয়া পড়িল। ইহার দুই তিন দিন পরে দেখি, পূর্ব্বোক্ত বক্র স্থানের নিম্নস্থিত গ্রন্থিভেদ করিয়া একটী চোক পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। আরও দুই তিন দিন না যাইতেই বেশ তেজাল ফেকড়ির আকার ধারণ করিল, এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মূল ডগাটী অবলম্বনবিরহিত হইবার দিন হইতে এ পর্য্যন্ত কয় দিন তাহা আর বৃদ্ধি পায় নাই, গাছের শক্তি গাছেই প্রচ্ছন্ন ছিল বটে, কিন্তু কাণ্ডের অভ্যন্তরদেশে সে শক্তির বিরাম ছিল না। কারণ, সে শক্তি নিম্নভাগের চোকগুলির পুষ্টিসাধনে ও সমগ্র কাণ্ডটীর পরিপোষণে ব্যাপৃত ছিল। কাণ্ডটী শিশুকাল হইতে অবলম্বন পাইয়াছিল বলিয়া, তাহার পুষ্টিসাধনের চেষ্টা হয় নাই; তখন কেবল ঊর্দ্ধদিকে উঠিবারই চেষ্টা ছিল, এবং সেই জন্য কাণ্ডের গাত্রস্থ পত্রগুলি, তথা গ্রন্থিগুলি, অযথা ব্যবধানে জন্মিয়াছিল। শৈশবকাল হইতে কোনও অবলম্বন না পাইলে উদ্ভিদ স্বয়ং উঠিবার চেষ্টা করিত; সে জন্য কাণ্ডকে স্থূল করিতে হইত, এবং আত্মরক্ষার নিমিত্ত ঘন ঘন গ্রন্থির সৃষ্টি করিত। কেবল লতিকাগণই যে এই বিধানের অধীন, তাহা নহে। কোনও বৃহজ্জাতীয় উদ্ভিদ—আম্র বা কাঁঠালের সদ্য-উদ্ভিন্ন চারাকে সুদীর্ঘ খুঁটীতে বাঁধিয়া দিলে, সেও লতিকার ন্যায় শাখা প্রশাখা বিস্তার না করিয়া হু হু করিয়া ঊর্দ্ধদিকে বৃদ্ধি পাইবে। যত বৃদ্ধি পাইবে, ততই তাহাকে খুঁটীর সহিত বাঁধিয়া রাখিলে, সে আর শাখাপ্রশাখা উদ্গত করিতে পারে না। এইরূপে পাঁচ, সাত, বা দশ বারো হাত বৃদ্ধি পাইবার পর তাহাকে অবলম্বন-বিরহিত করিয়া দিলে, সে আর ক্ষণমাত্র খাড়া থাকিতে পারিবে না; ভূশায়ী হইয়া পড়িবে। অতঃপর

বক্রতার আপেক্ষিক বেগের স্থল (Highest tension) হইতে এতদিনের অকর্ম্মণ্য ও অলস চোক ফুটিবে, এবং তাহা নূতন শাখায় পরিণত হইবে।

উদ্ভিদকে ধরাপৃষ্ঠে যথাকালে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করা শিকড়ের অন্যতম উদ্দেশ্য। শিকড় আল্‌গা বা অপ্রচুর হইলে গাছ আপন ভারেই ভূশায়ী হইবার সম্ভাবনা। পত্র, গ্রন্থি ও শাখা উদ্ভিদের শরীরকে দৃঢ় করে। বাঁশের গাত্রে গাঁট না থাকিলে উহাকে সহজেই বাঁকাইতে পারা যাইত; বাঁশ আপনা হইতেই ভূশায়ী হইয়া পড়িত, এবং লতিকার ন্যায় ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করিত। কিন্তু গ্রন্থিসমূহ তাহাকে ভূশায়ী হইতে দেয় না; অপিচ এমনই দৃঢ় করিয়া রাখে যে, প্রবল ঝঞ্ঝাতেও তাহার কোনও ক্ষতি হয় না। আমাদিগের শরীরেও সেই সার্ব্বভৌমিক নিয়মই দেখিতে পাই। আমাদিগের হস্ত, পদ, অঙ্গুলি প্রভৃতি গ্রন্থিহীন হইলে, এই সকল অঙ্গকে আমরা পরিচালিত করিতে পারিতাম না; অধিক কি, আমাদিগকে দিবারাত্রি শায়িতাবস্থায় অতিবাহিত করিতে হইত। সামান্য আঘাতে ভাঙ্গিয়া যাইত। গ্রন্থিগুলির আর একটী বিশেষ কার্য্য আছে। শরীরনির্ম্মাণোপযোগী উপাদানরাশি গ্রন্থিস্থলে বিরাজ করে; প্রয়োজনানুসারে ব্যবহৃত হয়। এই জন্য মূল অবয়ব ও গ্রন্থির সঙ্গমস্থলে গঠনের প্রভেদ আছে।

উদ্ভিদকে ইচ্ছানুরূপ আকারে পরিণত করা ঔদ্যানিক শিল্পের বিষয়ীভূত। অভিজ্ঞ উচ্চাঙ্গের উদ্যানকের হস্তে অনেক বৃক্ষলতাকে এইরূপে উৎপীড়িত হইতে হয়। উল্লিখিত সূত্রানুসারে সুদৃঢ় মহীরূহ-জাতীয় আম্র বৃক্ষকে লতিকার আকারে পরিণত করিতে পারা যায়। এইরূপে যত দিন কোনও উদ্ভিদ অবলম্বনের সাহায্য পায়, তত দিন সে মূলকাণ্ডকে পরিবর্দ্ধিত করিতে থাকে; কিন্তু সেই কাণ্ডকেও সমুচিত পোষণ করে না। বিনা অবলম্বনে বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদগণও প্রথমাবস্থায় কিছুদিন সরলভাবে ঊর্দ্ধদিকে বর্দ্ধিত হয়। যত দিন এইরূপে বর্দ্ধিত হইবার সামর্থ্য থাকে, তত দিন মূলকাণ্ডে শাখার উদ্ভব হয় না; কিন্তু এরূপ অবস্থায় দীর্ঘকাল থাকিতে পারে না; কারণ, হেলিয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকে। তখন মূল কাণ্ডের বৃদ্ধি কথঞ্চিৎ স্থগিত হয়, এবং কাণ্ড হইতে পত্রমুকুল ভেদ করিয়া শাখা উৎপন্ন হয়। শাখা প্রশাখা উৎপন্ন হইবার একটী বিধান আছে, তাহা উদ্ভিদই জানে। নিজ নিজ অবয়বের ভারকে সমভাবে বিস্তৃত করিয়া রাখিবার জন্য যখন যে দিকে যে শাখার বা পত্রের উৎপাদন আবশ্যক হয়, উদ্ভিদ তাহা করিয়া লয়। আম্র, কাঁঠাল প্রভৃতির বীজ হইতে

চারা জন্মিলে, প্রথমেই একটী সরল কাণ্ড দেখিতে পাই ; তাহাতে শাখা প্রশাখা আদৌ থাকে না ; শিরোদেশে যে কয়টী পত্র থাকে, তাহাদিগের প্রত্যেক কাণ্ড পত্রের সংযোগস্থলে সুপ্ত থাকে। এই অবস্থায় দুই তিন হাত বৃদ্ধি পাইলে পত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ; তন্নিবন্ধন শিরোভাগ টল টল করে ; কাজেই তখন নূতন শাখা উদ্গত না করিলে উদ্ভিদ আর দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না। লম্বমান উদ্ভিদের কাণ্ডকে দৃঢ় বা শাখাসম্পন্ন করিবার জন্য অনেক গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া দেওয়া প্রয়োজন হয়। ডগা ভাঙ্গিয়া দিলে উদ্ভিদের রস আর ঊর্দ্ধে উঠিতে না পারিয়া সুপ্ত গ্রন্থিগুলিতে বলাধান করে ; ফলে শাখা উদ্গত হয় ; কাণ্ডে গাঁট জন্মে, গাছ দৃঢ় হয়। যতদিন অভাব না হয়, ততদিন কোনও উদ্ভিদ অধিক শ্রম করিতে চাহে না। অতঃপর যে সকল শাখার উদ্ভব হয়, তাহাদিগের প্রতিপালন জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক রস ও শক্তির প্রয়োজন হয়। তাহার অভাবে উদ্ভিদ শীর্ণ হইয়া পড়ে। সংসার বাড়িলে যেরূপ আয়-বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হয়, উদ্ভিদের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি পাইলে তাহাকেও সেইরূপ খাদ্য-সংগ্রহে ও শক্তিসঞ্চয়ে সচেষ্ট হইতে হয়। তখন উদ্ভিদকে মূলের সংখ্যা বর্দ্ধিত করিতে হয়, উপমূলের সৃষ্টি করিতে হয়, এবং দূর দূর হইতে খাদ্য-আহরণের নিমিত্ত শিকড়দিগকে দীর্ঘও করিতে হয়। কিন্তু অপরের স্কন্ধে চাপিয়া থাকিলে, কিংবা প্রয়োজন না থাকিলে, উদ্যম আইসে না, ইহা প্রায় স্বাভাবিক। পত্র, শাখাপ্রশাখা, ফলফুল প্রভৃতিকে উদ্ভিদের সংসার বলিলে ক্ষতি হয় না। উহাদিগের বৃদ্ধির সহিত উদ্ভিদের কার্য্য ও উদ্যমও বৃদ্ধি পায়। আমার সে লতিকা এক্ষণে উদ্যমসহকারে অনেকগুলি শাখাপ্রশাখার প্রতিপালনে নিযুক্ত। মূল ডগার প্রতি আর তাহার দৃষ্টি নাই।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে

সংসার।

শক্তি নিয়ে মানবের নিত্য পাড়াপাড়ি,
ধন নিয়ে মানবের নিত্য কাড়াকাড়ি,
মন নিয়ে মানবের নিত্য আড়াআড়ি,
প্রেম নিয়ে মানবের নিত্য বাড়াবাড়ি।
ছুটিয়া চলেছে দিন বড় তাড়াতাড়ি,
না ফুরাতে সেই দিন সব ছাড়াছাড়ি।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

খাস্-মুন্সীর নক্সা।

তৃতীয় অধ্যায়।—পাঠ্যাবস্থা।

এই ভগিনী-আনয়নরূপ বিভ্রাট গ্রীষ্মকালে হয়। পরবর্ত্তী শীতকালে দাদা মহাশয় কোনও সূত্রে [illegible] গমন করিয়া ভগিনীটাকে আনয়ন করেন। এক মাস কাল আমাদের নিকটে ছিল, তৎপরে পুনরায় আমায় গিয়াই তাহাকে সেই পাষণ্ডের নিকট পঁহুছাইয়া আসিতে হয়। ভগিনীটীর মমতায় সেই পাষণ্ডের আলয়ে অবস্থিতি, তাহার অন্নজলগ্রহণ এবং তাহার সহিত হাসিয়া কথা কহিতে হইল। কি করি, নিরুপায়। কন্যা অথবা ভগিনী দিলেই আমাদের সমাজের নিয়মানুসারে খাটো হইতেই হইবে। এই সকল সমাজ-বিভ্রাটের কারণেই রাজপুত ক্ষত্রিয়েরা নিজেদের তেজস্বী স্বভাববশতঃ কন্যা-হনন করিতেন। সময়ে সময়ে বাস্তবিকই অপমান অত্যন্ত অসহ্য হইয়া পড়ে। আমাদের সদাশয় গবর্মেণ্ট অতি কঠিন কন্যা-হনন আইন (Infanticide Law) প্রণয়ন করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি ক্ষত্রিয়দের মধ্যে এ কার্য্য এখনও বিলক্ষণ চলে। এ বিষয় এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক; সুতরাং সময়মত ইহার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব।

এই বৎসর আমি যেন তেন প্রকারেণ এফ্. এ. পাস হই। এবং কাশীর কলেজেই বি. এ. পাঠ আরম্ভ করি।

আমার ব্রাহ্মণীর সহিত ভগিনীর অত্যন্ত প্রীতি হয়। আমাদের সমাজে ননন্দা ও ভ্রাতৃজায়ার মধ্যে যেরূপ বিরোধ ও বিসংবাদ হইয়া থাকে, তাহা আদবেই ছিল না। কিন্তু এ প্রীতি বিধাতা অনেক দিন থাকিতে দেন নাই। ভগিনী যখন কাশীতে পিতার নিকট আসিয়াছিল, তখন পিতৃদেবের নিকট আবদার করিয়া একছড়া স্বর্ণ চিক চাহিয়াছিল। পিতা পরবর্ত্তী শ্রাবণ কি ভাদ্র মাসে অতি কষ্টে ৬০৲।৭০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়া আমাদের অবস্থানুযায়ী এক ছড়া চিক প্রস্তুত করাইলেন। এবং আশ্বিন মাস পড়িতেই মাতৃহীনা ভগিনীটী পূজার সময় তাহার সাধের জিনিসটী অঙ্গে ধারণ করিবে বলিয়া, তাহার শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। চিক পাঠাইবার এক মাস দেড় মাস পূর্ব্ব হইতেই সে দুঃখিনীর পত্রাদি আসা বন্ধ হয়। আমি ও পিতৃদেব অনেকগুলি পত্র তাহাকে

লিখি, কোনও পত্রেরই উত্তর পাই নাই। চিক পার্সেল করিয়া পাঠাইলাম ; পত্রও সেই সঙ্গে গেল। পার্সেলটী দিব্য লওয়া হইল, কিন্তু পত্রের উত্তর নাই। শঙ্কিত-হৃদয়ে আশ্বিন মাস কাটিয়া গেল। কার্ত্তিক মাস পড়িল। ভগিনীর কোনও সংবাদই পাই না। পিতৃদেবের চিন্তায় রাত্রিতে নিদ্রা হয় না। তিনি আমায় এক দিবস, ভগিনীর এক খুড়তত ভাশুর ছিলেন, তাঁহাকে পত্র লিখিতে বলিলেন। এই লোকটী অতি সজ্জন। তিনি এক সময়ে বায়ুপরিবর্ত্তনমানসে আমাদের বাটীতে মাসাবধি বাস করিয়াছিলেন, সেই সূত্রে তাঁহার সহিত আমার বিশেষ প্রীতি হয়। তাঁহাকে আমি পত্র দিলাম। অগ্রহায়ণের প্রারম্ভে পত্রের উত্তর পাইলাম। তাহাতে এই নিদারুণ কথা লিখিত ছিল :—"your sister is no more." তোমার ভগিনী ইহজগতে নাই। এই শোকাবহ সংবাদ পাঠ করিয়া আমি স্তম্ভিত। পিতৃদেবকে কি বলিব, তাই ভাবিতেছি। পিতৃদেব প্রত্যহ ডাকের পথ দেখেন। পত্র আসিলেই আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হন, এবং বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন। অগত্যা তাঁহাকে বলিতে হইল। এই ভয়ঙ্কর সংবাদ শ্রবণ করিয়া তিনি আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, বসিয়া পড়িয়া বক্ষঃস্থল চাপড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে সান্ত্বনা করা ভার হইল। বর্ষা ঋতুর সময় হঠাৎ বেগবতী নদীর বাঁধ ভাঙ্গিলে, কাহার সাধ্য, সে স্রোতের মুখে দাঁড়ায়, অথবা সে জল আটক করে ? আমার দুঃখী পিতার আজ ঠিক সেই অবস্থা। ৬০।৬৫ বৎসরের বৃদ্ধ মাতৃহীনা অশেষবিধ কষ্টে প্রতি-পালিতা কন্যাটীর জন্য হৃদয়বিদারক আর্ত্তনাদ করিতেছেন। মাতৃদেবীর অকালমৃত্যু, আমাদের ও শিশু ভগিনীটীর কষ্ট দেখিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বাটী আগমন, স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আমাদের বাল্যকালে প্রতিপালন, সেই সকল কষ্টের কথা একে একে তাঁহার মনে উদিত হইতে লাগিল, এবং তিনি শোকে অভিভূত হইয়া আছড়াইয়া পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, আর এক এক বার আমার নাম করিয়া বলিতে লাগিলেন, "অমুক বাবা, আমার বক্ষঃস্থলে হাত বুলাইয়া দে, আমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, আমি অতিকষ্টে সেই মাতৃহীনাকে প্রতি-পালন করিয়াছিলাম। মৃত্যুকালে তাহাকে একবার দেখিতেও পাইলাম না—।" আমি পিতৃদেবের এই অবস্থা দেখিয়া নিজের ক্রন্দন ভুলিয়া গেলাম, এবং নানারূপে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলাম। কিন্তু সে বেগ রুদ্ধ করে, কাহার সাধ্য। জানি না, আমার নিষ্কলঙ্ক, সারল্যের আধার, শিবতুল্য পিতৃদেব কি পাপ করিয়াছিলেন, যাহার কারণ বৃদ্ধ বয়সে এরূপ কষ্ট পাইলেন।

এই পত্র-প্রাপ্তির কিছুদিন পরে লোকপ্রমুখাৎ শুনিতে পাওয়া গেল যে, আমার সেই পাপিষ্ঠ নরাধম ভগিনীপতি শ্রাবণ অথবা ভাদ্র মাসে কোনও কারণে আমার ভগিনীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে এরূপ প্রহার করিয়াছিল যে, তাহাতেই তাহার প্রাণবিয়োগ হয়। কি দোষ করিয়াছিল, যাহার জন্য তাহাকে এরূপ শাস্তি দেওয়া হয়, তাহা আজ পর্য্যন্ত আমরা কেহ জানিতে পারি নাই। পরম্পরায় শুনিয়াছি, এই ঘটনায় পুলিসের মহা হাঙ্গাম উপস্থিত হয়। ভগিনীপতি মহাশয়ের ৫০০৲।৭০০৲ টাকা খরচ হয়, এবং গ্রামস্থ প্রবল জমীদার-দের সাহায্যে তিনি সে যাত্রা রক্ষা পান। এই সকল কারণে তাহারা কেহই আমাদের ২।৩ মাস ধরিয়া পত্র দেয় নাই। পাছে এই খুনে মকর্দ্দমা লইয়া আমরা কোনরূপে তাহাদের দণ্ডিত করিবার চেষ্টা করি। আমার পিতৃদেব অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার স্বভাব আদবেই কোপন ছিল না। এই নিদারুণ দুহিতৃহত্যার সংবাদ পাইয়া মহাদেবেরও পদস্খলন হইয়াছিল। তিনি একদিন আমায় ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, আমরা গরীব লোক, আমাদের সঙ্গতি নাই; তাই সে (জামাইয়ের নাম করিয়া) আমাদের উপর এরূপ অত্যাচার করিয়া অব্যাহতি পাইল। আমি ঘটী বাটী বিক্রয় করিয়া তোকে টাকার সংগ্রহ করিয়া দিতেছি, তুই একবার সেখানে গিয়া জেলার হাকিমের কাছে এ সমস্ত ব্যাপার জানাইয়া তাহাকে জব্দ করিতে পারিস? সে আমার নিরাশ্রয়া দুঃখিনী বালিকা কন্যাকে হত্যা করিয়াছে; তাহার কোনও শাস্তি হইবে না?" তাঁহার এই কাতরোক্তি শুনিয়া আমি অশ্রুজল রুদ্ধ করিতে পারিলাম না। আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তাঁহাকে পরামর্শচ্ছলে অনেকরূপ বুঝাইলাম, এবং পরে যখন বলিলাম, "বাবা, আপনি বুঝিয়া দেখুন, সে স্থলে আমরা বিদেশী; গ্রামস্থ লোক, এমন কি, জমীদার পর্য্যন্ত সকলেই তাহাদের পক্ষ। সুতরাং সেখানে আমাদের সফল হইবার কোনও সম্ভাবনাই নাই। এতদ্ব্যতীত এ কাণ্ড আজ দুই তিন মাস হইল হইয়াছে; এতদিন পরে প্রমাণ সংগ্রহ করা অতি কঠিন কথা।" পিতৃদেব বহুকাল জজের আদালতে কার্য্য করিয়াছিলেন, আইন ইত্যাদি অনেক-পরিমাণে বুঝিতেন। ভাবিয়া বলিলেন, "তুই ঠিক কথা বলিতেছিস।" আমি মনে মনে ভাবিলাম, আমরা শাস্তি অথবা দণ্ড দিবার কে? সে আমার অসহায়া ভগিনীকে এরূপ পৈশাচিকভাবে যখন হত্যা করিয়াছে, ভগবান তাহাকে দণ্ড দিবেন। পিতার শাস্তি দিবার প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইল। তিনি অতি

ধীর ও শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন, তবে দুহিতৃবিয়োগজনিত শোকে মনে মনে দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

আমাদের স্বদেশবাসীরা পশ্চিমোত্তরদেশবাসী বাঙ্গালীদের একটু ঘৃণার চক্ষে দেখেন, এবং "উপো" বাঙ্গালী বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন। ভগিনীর মৃত্যুর পর সে সংবাদ গোপন রাখিয়া চিক ছড়াটী পরিষ্কার উদরস্থ করা বোধ হয় অতি উচ্চদরের আদর্শ।

পরবৎসর ১৮৮০ সালে আমার প্রথম কন্যা জন্মে। এ কন্যাটী পিতার বড়ই আদর ও স্নেহের পাত্রী হইয়াছিল। ইহার দ্বারা তিনি কতকটা দুহিতৃ-বিয়োগ-জনিত শোকের অপনোদন করেন। ভগবানের লীলা অপার! আমরা ক্ষুদ্র-বুদ্ধি মানব। তাঁহার লীলা আমাদের বুঝিবার সাধ্য নাই। একটীকে কাড়িয়া লইয়া অপরটীকে যেন পূর্ব্বশোক ভুলিবার জন্য দিলেন। তবে আমার পক্ষে এই প্রথম কন্যার জন্ম অত্যন্ত চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইল। একে আমাদের অবস্থা মন্দ, তাহাতে আমার পাঠ্যাবস্থা, এক পয়সা আনিবার ক্ষমতা নাই, তদুপরি এই কন্যার জন্ম। কন্যা পার করা আমাদের সমাজে যেরূপ কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, বিশেষতঃ যদি ভাল লোকের হস্তে না পড়ে, তাহা হইলে কি বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, তাহা স্বচক্ষেই স্বীয় ভগিনীর ভাগ্যতেই বিলক্ষণ দেখিলাম। তখন হইতেই আমার মনে নানারূপ দুর্ভাবনা উপস্থিত হইল। পাঠ্যাবস্থায় বিবাহ করিলে যে সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহার বিলক্ষণ ভুক্তভোগী হইলাম। এতদ্ব্যতীত আমাদের "ঠাকুরমা"-রূপিণী গৃহিণীর কোপ আমার ব্রাহ্মণীর প্রতি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। নানারূপ দুশ্চিন্তায় আমার মানসিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইতে লাগিল। মনে মনে দগ্ধ হইতে লাগিলাম। মনের বেদনা কাহাকেও জানাইয়া যে কথঞ্চিৎ শান্তি পাইব, এরূপ লোক ছিল না। সে সময় আমার নিভৃতে রোদন ভিন্ন অন্য গতি ছিল না। ফল কথা, আমি এফ্. এ. পাস হইবার পর ২।৩ বৎসর অত্যন্ত মানসিক কষ্টে কাটাই। আমার ব্রাহ্মণীর দুর্দ্দশা ইহা অপেক্ষাও অধিক। ফল হইল যে, প্রথমবার বি. এ. পরীক্ষায় ফেল হইলাম। কষ্টের উপর কষ্ট, কি করিব কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। তখন এইরূপ নিয়ম হইয়াছিল যে, একবার ফেল হইলে পরবর্ত্তী বৎসরে কেবল ছয় মাস মাত্র পাঠ করিয়াই পরীক্ষা দেওয়া যাইতে পারিত। এই নিয়মানু-সারে আমি আর কলেজে ভর্ত্তি হইলাম না। গৃহেই পুরাতন পাঠ দেখিতে

লাগিলাম। ইচ্ছা ছিল, বৃদ্ধ পিতার যতটুকু পারি, ভার লাঘব করি। কিন্তু ভগবান আমায় আর গৃহে থাকিতে দিলেন না। ১৮৮৩ সালের গ্রীষ্মকালে "ঠাকুরমা" আমার এরূপ অত্যাচার করিতে লাগিলেন যে, তাহা অসহ্য হইল। আমি গৃহত্যাগে সংকল্প করিলাম। সংকল্পানুযায়ী ভগবান সুবিধাও করিয়া দিলেন। কাশীর সন্নিহিত একটী স্থানে মিশন-ইস্কুলে ৪০৲ টাকা মাসিক বেতনে একটী চাকুরী পাইলাম। এ মন্দ নহে! লোকে বলে,—নরাণাং মাতুলক্রমঃ। এ ত দেখিতেছি "নরানাং জনকক্রমঃ।" পিতৃদেব ৪০৲ টাকায় সমস্ত জীবন কাটাইয়াছেন! আমিও সেই ৪০৲ টাকায় প্রবেশ করিলাম। আমাদের কি ৪০৲ টাকার গণ্ডী পার হইবে না? দেখা যাউক, ভবিষ্যৎগর্ভে কি আছে। কালবিলম্ব না করিয়া কর্ম্মস্থলে প্রস্থান করিলাম। তদবধি আমি কাশীত্যাগী প্রবাসী। আমার জীবনসংগ্রাম আরম্ভ হইল। এই কঠোর সংগ্রামে জয়ী হইলাম, অথবা হারিলাম, তাহা পরে পাঠকগণের বিচার্য্য। আপাততঃ আমি সংসারসমুদ্রে ভাসিলাম। জানি না, কূল কিনারা পাইব কি না? কেবল ভগবান ভরসা। এ জগতে সহায় নাই, সম্পত্তি নাই, মুরুব্বী নাই। আপাততঃ উদ্দেশ্য,—শিক্ষকতা করিয়া সেই সঙ্গে কোনও ক্রমে বি. এ. পাশ করা। প্রকৃতপক্ষে আমার পঠদ্দশার এইখান হইতে শেষ। সুতরাং এ অধ্যায়েরও এইখানে শেষ।

চতুর্থ অধ্যায়।—জীবন-সংগ্রাম।

শিক্ষকতা করিয়া কোনও ক্রমে বি. এ. পাস হইলাম। মিশনরী মহাশয়েরা আমার ৫৲টী টাকা মাহিনা বাড়াইলেন। এইবার ৪০৲এর গণ্ডী পার হইলাম। মনে মনে একটু আশার সঞ্চার হইল। যিনি এ গণ্ডী পার করিয়াছেন, তাঁহার কৃপাদৃষ্টি থাকিলে কিছুই অসম্ভব নহে। এই বৎসর আমার প্রথম পুত্র জন্মগ্রহণ করে। লক্ষ্মী আমার প্রতি বাম, বাগ্দেবী ততোধিক, কিন্তু জরা রাক্ষসীর বিলক্ষণ সুদৃষ্টি। সেই সঙ্গেই চিন্তার স্রোতও খরতর হইতে লাগিল। ৪৫৲ টাকা মাসিকে কোনও ক্রমে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে এক জন অতি উচ্চপদস্থ স্বদেশীয়ের জামাতা আমাদের মিশন-ইস্কুলে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তিনি বড়লোকের ছেলে, আবার বড়লোকের জামাতা। সুতরাং বিদ্যাবুদ্ধি যত দূর তীক্ষ্ণধার হওয়া উচিত, তাহা সমস্তই ছিল। এণ্ট্রেন্স ক্লাসে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ের গৃহে আমার ডাক পড়িল। প্রায় দেড় বৎসর হইতে চলিল, আমি উক্ত স্থানে

বাস করিয়াছি। একবারও সেই উচ্চপদবীস্থ মহাত্মা এ পর্য্যন্ত আমার কোনও সংবাদ লন নাই। গরজ বড় বালাই। আজ গরজের খাতিরে উপর্য্যুপরি আমার বাসায় তকমাধারী পেয়াদা আসিতে লাগিল। আমার জন্মকাল হইতেই বড়লোক দেখিলে, কি রকম যেন একটু ভয় ও সঙ্কোচ হয়। গরীব বলিয়াই হউক, অথবা বাঙ্গালীর জাত স্বভাবসিদ্ধ একটু ভীতু বলিয়াই হউক, এ রোগটা আমার ছিল, এবং এখনও আছে। বড়লোকের সংস্পর্শে যাইতে সে ভয়-ভয় রোগটা যায় নাই। কিন্তু কি করি, নাচার হইয়া আমায় "ডেপুটী বিভূতির" নিকট যাইতে হইল। প্রথমটা বেশ শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপের পর জামাতাটিকে গৃহে দুই তিন ঘণ্টা পড়াইবার প্রস্তাব করিলেন। আমি তাঁহার বাটীতে গিয়া পড়াইতে অসম্মত হওয়ায়, আমার বাসায় আসিয়া বাবাজী পড়িবেন, এই স্থির হইল। বেতন ইত্যাদির কোনও কথারই উল্লেখ নাই। তৎপরে আমায় কিঞ্চিৎ আপ্যায়িত করা হইল। আমার নাম লইয়া বলিলেন—"বাবু, আপনি বি. এ. পাস করিয়া ৪৫৲ টাকায় একটা পাদরীদের ইস্কুলে কেন পড়িয়া আছেন?" আমি বলিলাম, "কি করি, আমার সহায় নাই, মুরুব্বী নাই কাজেই সরকারী চাকুরীর আশা ত্যাগ করিয়াছি।" তখন বলিলেন, "আহা, আমায় এতদিন বলেন নাই কেন? আমি জানিতে পারিলে কবে করিয়া দিতাম।" আউধের একটা জেলার নাম করিয়া বলিলেন, "সেখানকার কমিশনর মেকোনিশী সাহেব আমার হাত-ধরা, এলাহাবাদ বোর্ডের সাহেব আমার হাত-ধরা। এবার পূজার ছুটীর সময় আমি প্রয়াগে আপনাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া যাহা হয় একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করিব। ইতিমধ্যে আপনি একটু একটু আইন অধ্যয়ন করুন।" এই বলিয়া বৃহৎ দুই খণ্ড টীকা-টিপ্পনী-সংবলিত Civil Procedure code আমায় দেওয়া হইল। আমি ভাবিলাম, হবেও বা; লোকটা পরোপকারী, আমার কষ্টে হয় ত মন ভিজিয়াছে। ভগবানের কৃপায় হয় ত ইহাঁরই দ্বারায় আমার একটা কোনও কিনারা হইতে পারে। আশায় উৎফুল্ল হইয়া গৃহে ফিরিলাম। তাঁহার জামাতা বাবাজীকে পরদিন হইতে প্রত্যহ দুই তিন ঘণ্টা করিয়া অতি যত্নে বাসায় শিক্ষা দিতে লাগিলাম। এক মাস দেড় মাস পরে জামাতা বাবাজী এক দিবস ৮৲টি টাকা আনিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "শ্বশুর মহাশয় এই দিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন, পরে আরও পাঠাইয়া দিবেন।" আমি মুদ্রা কয়টী তাঁহাকে ফেরত দিয়া বলিলাম, "আমি বেতনের প্রত্যাশায় তোমায় পড়াইতে

স্বীকৃত হই নাই। তোমার শ্বশুর মহাশয় আমার প্রতি সদয় হইয়া আমার উপকার করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, এবং আমায় যথেষ্ট আশা দিয়াছেন। সেই আশা দেওয়াতেই আমি নিজেকে উপকৃত বোধ করিতেছি। সুতরাং সে উপকারের প্রত্যুপকার আমার করা উচিত। কিন্তু আমি দীন, হীন, দরিদ্র; কায়িক পরিশ্রম ব্যতীত আমার প্রত্যুপকারের অন্য কোনও উপায় নাই। এই জন্য আমি বেতন লইতে পারি না।" এই বলিয়া টাকা ফেরত দিলাম।

তিন মাস জামাতা বাবাজীকে নিজ বাসায় পাঠ দিই। তৎপরে তিনি মধ্যে মধ্যে অদৃশ্য হইতে লাগিলেন। কিছুদিন এইরূপে গত হইবার পর অমাবস্যার চন্দ্রমার ন্যায় একেবারে অদৃশ্য হইলেন। শুনিতে পাইলাম, এলাহাবাদ অথবা কাশীধাম হইতে ২।১টী বাঙ্গালী অবিদ্যা আসিয়াছে, তিনি সেইখানে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার বিদ্যালাভ সেই পর্য্যন্তই হইল। তৎপরে প্রায় দেড় বৎসর আমি তথায় ছিলাম। কিন্তু ডেপুটী বাবু আর কখনও আমার কোনও "খোঁজ খবর" লন নাই যে, লোকটা আছে, না মরিয়াছে। কিছুকাল পরে তাঁহার দত্ত Civil Procedure code আমিও ফেরত দিলাম। বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া সে পুস্তকখানি লইলেন। আমার সরকারী চাকুরী করা শেষ হইল। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা। আমার ভাগ্যে আর মেকোনিশী সাহেব অথবা প্রয়াগের সদর বোর্ডের সাহেবদের সহিত সাক্ষাৎ হইল না।

এই সহরে আমার একটী আত্মীয় ছিলেন। তাঁহাদের বাটীতে আমি প্রথমে গিয়া আশ্রয় লই। মাসাবধি তাঁহাদের নিকট থাকিয়া পরে বাসা করি। তাঁহারা আমায় অতি যত্নে রাখিয়াছিলেন। তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। এই আত্মীয় মহাশয়দের একটী পরমাত্মীয় ছিলেন। তিনি এক জন গঞ্জিকাসেবী নিরক্ষর লোক বলিলেই হয়। মরি ক্রয়ারী কোম্পানী এই সহরে একটী শাখা মদিরার কারখানা খুলিবার প্রয়াসী হন। পরমাত্মীয়টী কোনও প্রকারে তাঁহাদের বড় বাবু হইলেন। কারখানা খুলিবার পূর্ব্বে জমী খরিদ হইল। পরমাত্মীয় মহাশয়ের বিদ্যা বুদ্ধির দৌড় যথেষ্ট; সুতরাং আমার স্কন্ধে আসিয়া চাপিলেন। তাঁহার সমস্ত কার্য্যই আমি করিতাম। প্রায় এক বৎসর তাঁহার জন্য পরিশ্রম করি। ইতিমধ্যে শ্যামাপূজার সময় আমি কাশী যাই। তিনি আমায় ২০৲ টাকা দেন। নিজের দুই শ্যালকপুত্রের শীতবস্ত্র কাশী হইতে খরিদ করিয়া আনিতে বলেন, এবং সেই সঙ্গে আমার

জন্য এক প্রস্থ শীতবস্ত্র প্রস্তুত করিয়া লইতে বলেন। তদনুসারে আমি নিজের জন্য যেরূপ বস্ত্র ক্রয় করি, ঠিক সেইরূপ বস্ত্র তাঁহার শ্যালকপুত্রদের জন্য আনিয়া দিই। পরম্পরায় পরে শুনি যে, বস্ত্র তাঁহার পছন্দ হয় নাই, এবং ঐ ২০৲ টাকা হইতে আমি উদরসাৎ করিয়াছি, এরূপ অপবাদ দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এই কথা শুনিয়া আমি ভাবিলাম, "আমার উপযুক্ত শাস্তিই হইয়াছে।" "দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী।"

জজের আদালতে এক জন ক্ষত্রী-(ক্ষত্রিয় নহে)-জাতীয় হেডক্লার্ক ছিলেন। অনেকেই অবগত আছেন, জজের হেড বাবুর প্রধান কার্য্যই মকর্দ্দমার নথি সকল ইংরাজীতে অনুবাদ করা। সাহেবের কৃপাদৃষ্টিতে উক্ত মহোদয় হেডবাবু হইয়াছিলেন। পেটে তাদৃশ বিদ্যা বুদ্ধি ছিল না। অনুবাদ কার্য্য অতি দুরূহ। তাঁহার দ্বারা চলিত না। তজ্জন্য তাঁহার এক জন লোকের সাহায্য আবশ্যক হয়। তিনি আসিয়া আমায় ধরিলেন যে, প্রত্যহ রাত্রিকালে তাঁহার বাসায় গিয়া অন্ততঃ দুই ঘণ্টা তাঁহার অনুবাদ কার্য্যে সাহায্য করিতে হইবে। মাসিক ১৫৲ তিনি আমায় দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণী ও পুত্র কন্যাটী আমার নিকট। দুঃখে কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি। ভাবিলাম, অর্থ-কষ্ট যথেষ্ট, যদি শারীরিক পরিশ্রমে ১৫৲টা টাকা মাসে পাই, মন্দ কি? এই কার্য্য স্বীকার করিলাম। অল্পবয়স্কা ব্রাহ্মণী ও দুইটী শিশুসন্তানকে রাত্রিতে একা বাড়ীতে রাখিয়া ৫।৬ মাস ধরিয়া তাঁহার সেবা করি, কিন্তু তিনি কখনও ১০৲ টাকার অধিক আমায় মাসে দেন নাই। এই গতিক দেখিয়া পরে উক্ত কার্য্য ত্যাগ করিলাম। দীনবন্ধু, তোমার উদ্দেশ্য কি? আমি কিছুই এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই। পরিশ্রম করিয়া খাইব, তাহাতেও বাধা। লোকে খাটাইয়া পয়সা দেয় না—এ কিরূপ ন্যায়? অবার এইখানে এমন কতকগুলি লোক দেখিতেছি, যাহারা কিছু জানে না। বিদ্যা বুদ্ধি কোনও বিষয়েই আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে, অথচ ৮০৲।৯০৲।১০০৲ মাসে উপার্জ্জন করিতেছে, এবং আমা অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠভাবে সংসার নির্ব্বাহ করিতেছে। ঈশ্বরের ন্যায়-রাজ্যে এ বৈষম্য কেন? তখন এ সমস্যার পূরণ করিতে শিখি নাই, এখন শিখিয়াছি। যাহা হউক, এইরূপ নানাবিধ মানসিক ও শারীরিক ক্লেশে তথায় তিন বৎসর কাটাই।

এই সহরে অবস্থানকালে কখনও কখনও এরূপ ভাব আমার মনে উদিত হইত যে, যদি দেশীয় রাজ্যে কোনরূপ চাকুরী পাই, তাহা হইলে হয় ত উন্নতি করিতে পারি। ইংরেজ রাজ্যে আমার সহায়, সম্পত্তি, মুরুব্বীর জোর নাই,

সুতরাং একটা নগণ্য কেরাণীগিরিও জোটা ভার। আমার কি এইরূপেই ৪০৲ ৪৫৲ টাকায় চিরকাল কাটাইতে হইবে? শুনিতে পাই, দেশীয়-রাজ্যে তত প্রতিযোগিতা নাই, তজ্জন্য উন্নতির পথ সহসা পরিষ্কৃত হইতে পারে। কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লোক দেশী রাজ্যে ইস্কুলমাষ্টার হইয়া গিয়া পরে উচ্চ পদ লাভ করিয়া যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন। আমিও যদি এইরূপ স্কুলের শিক্ষক হইয়া প্রবেশ লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে হয় ত ভবিষ্যতে উন্নতি করিতে পারি, কিন্তু কি করিয়া সুবিধা হয়, তাহার কোনও পন্থাই ঠিক করিতে পারিলাম না। কাশীস্থ উমাচরণ বাবু ধোলপুর রাজ্যে গিয়া যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন। আমার ভাগ্যদেবী আমার প্রতি কত দিনে সুপ্রসন্না হইবেন, তাহা বলিতে পারি না। হইবেন কি না, তাহাও জানি না। আজি কালি মনুষ্য-জীবনের ঊর্দ্ধসীমা ৫০ বৎসর। তন্মধ্যে আমার ২৩। ২৪ বৎসর ত অতীত হইল। প্রায় অর্দ্ধেক জীবন অতিবাহিত হইল। ইহা ত বৃথাই গেল। সন্তান সন্ততি হইতে লাগিল। যাহা পাই, তাহাতে পেট চলা ভার। সঞ্চয় করা দূরের কথা। কন্যাটী ক্রমশঃ বড় হইতে চলিল। বিবাহের বাজার যেরূপ, তাহাতে ইহাকে কি করিয়া পার করিব, তাহার কোনও স্থিরতা নাই। এইরূপ মানসিক চিন্তায় আমার দেহ ও মন সতত দগ্ধ হইতে লাগিল। কোনরূপে আর কূল কিনারা পাই না। আমি নির্ব্বোধ, জানিতাম না যে, আমার এ সকল বিষয়ে চিন্তা করিবার অনেক পূর্ব্বে আমার জীবনগতি নির্ণীত হইয়া গিয়াছে। যিনি জন্মিবার অনেক পূর্ব্বে মাতৃস্তন্যের ব্যবস্থা করিয়া রাখেন, তিনি কি আর সৃষ্টি করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? আমরা মূর্খ অজ্ঞান, এ সকল বিষয় জানিয়াও, অহরহঃ প্রতিনিয়ত নিজ সম্মুখে দেখিয়াও, আমাদের জ্ঞান হয় না। সময়মত সমস্তই ভুলিয়া যাই। বৃথা চিন্তায় শরীর ও মনকে ক্লেশ দিই।

ঈদৃশ নানারূপ কষ্টে তিন বৎসর অতিবাহিত করি। ইতিমধ্যে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মাবকাশের কিছুদিন পূর্ব্বে প্রয়াগ-ধামের সুপ্রসিদ্ধ "পাইওনীয়র" পত্রে দুই কর্ম্ম-খালির বিজ্ঞাপন দেখিতে পাই। প্রথমটী কোনও একটী দেশীয় রাজ্যের প্রধান শিক্ষকের পদ, এবং অপরটী একটী পাদরীদের পাঠশালায় দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ। প্রথমটীর বেতন ৬০৲ টাকা হইতে ক্রমশঃ উন্নত হইয়া ১০০৲ পর্য্যন্ত, এবং দ্বিতীয়টীর মাত্র ৮০৲। উভয় স্থলেই আবেদন করিলাম। উত্তরের আশায় উদ্‌গ্রীব রহিলাম। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। উত্তর আর পাই না। এ দিকে স্কুলে গ্রীষ্মাবকাশ হইল। নিরাশ

হইয়া ব্রাহ্মণী ছুইটী ও শিশুসন্তানকে সঙ্গে লইয়া গ্রীষ্মাবকাশ কাটাইবার জন্ত অগত্যা কাশীতে পিতৃদেবের নিকট যাইলাম। জগজ্জননী, কেন আমায় ছলনা করিতেছ? এ ভাবে আমায় আর কত দিন কাটাইতে হইবে? আবার কি আমাকে গ্র[illegible] পর সেই ৪৫৲ টাকায় ফিরিয়া আসিতে হইবে? আমার জীবনটা কি এইরূপেই যাইবে? কূল কিনারা কি পাইব না? সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তিহীন-অন্তঃকরণে গৃহাভিমুখে পরিবার লইয়া চলিলাম।

প্রায় অর্দ্ধেক অবকাশ এইরূপ বিষণ্ণমনে কাটিয়া গেল। আমিও চাকুরী ছুইটী পাইবার আশা এক প্রকার ত্যাগ করিলাম। কিন্তু ভগবানের এমনই কৃপা, যখন আমি নিরাশা-সাগরে নিমগ্ন হইয়া দিনযাপন করিতেছিলাম, ঠিক সেই সময় করুণাময় আমার কষ্টে যেন ব্যথিত হইয়া অকূল সাগরের কাণ্ডারী রূপে আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলেন। এইবার বলিয়া নহে, আমার দুঃখময় ও বিপদসঙ্কুল জীবনে আমি শত শত বার ভগবানের এরূপ কৃপা দেখিয়াছি, এবং পাইয়াছি। Man's extremity, God's opportunity আমি শত শত বার এই নগণ্য জীবনে দেখিয়াছি।

গ্রীষ্মাবকাশ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময়ে হঠাৎ একদিন অতি জঘন্ত ইংরেজী অক্ষরে ও ভাষায় লিখিত একখানি নিয়োগপত্র পাইলাম। একটী দেশী রাজ্যের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ পাইবার জন্ত যে আবেদন-পত্র পাঠাইয়াছিলাম, পলিটিকেল-এজেন্ট মহাশয় এতদিন পরে তাহা গ্রাহ্য করিয়া বিদ্যালয়ের সম্পাদক দ্বারা আমায় সংবাদ দিয়াছেন। কালবিলম্ব না করিয়া ব্রাহ্মণীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, পিতৃদেবের পদধূলি ও আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া, এক প্রকার চিরজীবনের জন্য আমার বাল্যের ও যৌবনের লীলাভূমি অতি আদরের কাশীধাম ত্যাগ করিলাম।

মিশনরীদের ইস্কুলের শিক্ষকতার সময়ে ভগবানের নিকট অনেকবার হৃদয় খুলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলাম, যেন দেশী রাজ্যে একটী চাকুরী পাই। ভগবান্ আমার প্রার্থনা শ্রবণ করিলেন, এবং আমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিলেন। কিন্তু তখন জানিতাম না যে, দেশীয় রাজ্যের চাকুরী 'দিল্লীর লাড্ডু', খাইলেও অনুতাপ করিতে হয়, না খাইলেও পস্তাইতে হয়। তখন অতি উচ্চ আশায় বুক বাঁধিয়া কাশী হইতে যাত্রা করিলাম। এখন হইতে আমার জীবনের গতি ফিরিল। ভগবান এই সূত্রে আমায় দেশীয় রাজ্যের একটী কীট করিয়া দিলেন। সেই অবধি সমস্ত জীবনটাই দেশীয় রাজ্যের রাজদরবারের কাণ্ড

কারখানা দেখিতে দেখিতে অতিবাহিত হইয়াছে। সুতরাং এই স্থলে কাশী-বাসীর জীবন-অধ্যায় সমাপ্ত হইল। ক্রমশঃ।

শ্রী——চট্টোপাধ্যায়।

মানব-সমাজ।*

বিখ্যাত দার্শনিক সক্রেটিস্ ইউরোপীয় দর্শন শাস্ত্রের প্রথম পথপ্রদর্শক। তিনি একটী গভীর সত্য শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা এই :—The proper study of mankind is man. "মানবের উপযুক্ত জ্ঞানলাভ মানবতত্ত্ব-অধ্যয়নেই হয়।" প্রকৃতপক্ষেও বহির্জগতে যেমন একটা সুশৃঙ্খলাবদ্ধ কার্য্যপ্রণালী দেখা যায়, অন্তর্জগতেও তেমনই সুশৃঙ্খলাবদ্ধ কার্য্যপ্রণালী পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। মানবকে অনন্তবিস্তৃত বিশ্বের সংক্ষিপ্তসার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং বহির্জগতের নিয়মাবলীর অনুশীলন এবং মানবের আধ্যাত্মিক ও দৈহিক কার্য্যপ্রণালীর আলোচনার ফল তুল্যই। ইউরোপীয় দর্শনে বাহ্যজগতের আলোচনা দ্বারা জ্ঞানলাভ করিবার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। কিন্তু ভারত-বর্ষীয় দর্শনে মানবের অনুশীলনই জ্ঞানলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। তবে, ভারতীয় দর্শনে বাহ্য জগতের সহিত মানবের সামঞ্জস্য করা হইয়াছে বলিয়া সহজে বিবেচনা করা যায় না। ইউরোপীয় দর্শন বাহ্য-জগতের অন্তর্গত রূপেই মানবের আলোচনা করিয়াছে। সেই জন্য ইউরোপীয় দর্শন বস্তুতন্ত্র; কিন্তু ভারতীয় দর্শন আধ্যাত্মিক দৃষ্টির উপর প্রতিষ্ঠিত। মানবের সহিত যেমন বাহ্যজগতের জড়ীয় সামঞ্জস্য আছে, তেমনই মানবের মধ্যে এমন পদার্থও আছে, যাহা জড়ের নিয়মের অনুগত নহে। মানব যেমন জড়, তেমনই আধ্যাত্মিক। ব্যষ্টিভাবে এতদুভয় দিক হইতে মানবের আলোচনা করা দুরূহ; কারণ, বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। কিন্তু সমষ্টিভাবে আলোচনা করিলে সাধারণ সত্যে উপনীত হওয়া যায়। যিনি এক ছিলেন, তিনিই বহু হইয়াছেন; ইহাই বেদান্তের প্রথম ও শেষ উপদেশ। সুতরাং বহুর মধ্যে এক সাধারণ নিয়ম অবশ্যই থাকিবে।

* শ্রীশশধর রায় প্রণীত। ৬৮।২ হরিশ মুখুর্য্যের রোড, ভবানীপুরে, গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

মানবের সমষ্টি অর্থেই সমাজ; ইহার সাধারণ নিয়মগুলিই ব্যষ্টিকে অর্থাৎ ব্যক্তিকে নিয়মিত করিতেছে। তাই সমাজতত্ত্বের আলোচনা ব্রহ্মজ্ঞানের একাংশ; এবং এই সকল নিয়ম অবগত হইয়া অবস্থা-বিবেচনায় কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে মানব ব্যক্তি হিসাবেও ব্রহ্মের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। এই নিমিত্তই সামাজিক নিয়ম সকল অবগত হইয়া কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চতুর্বর্গ ফলই লাভ করা যায়।

সম্প্রতি শ্রীযুত শশধর রায় মহাশয় জীব-বিজ্ঞানের সহিত ঐক্য করিয়া সমাজতত্ত্ববিষয়ক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। উহার নাম "মানব-সমাজ"। বঙ্গভাষায় এরূপ গ্রন্থ অভিনব। সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে এতদ্দেশে অনেক ভ্রান্ত মত প্রচলিত দেখা যায়। এই গ্রন্থ-পাঠে বর্ত্তমান সময়ের অনেকগুলি জটিল বিষয়ের বৈজ্ঞানিক মীমাংসা অবগত হওয়া যায়। জাতীয়উন্নতিকামীর এই গ্রন্থ পাঠ করা অত্যাবশ্যক। ইহাতে জাতীয়-উৎকর্ষসম্বন্ধীয় বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক মত সকল আলোচিত হইয়াছে, এবং তাহার সহিত এতদ্দেশীয় সমাজবিধির সামঞ্জস্য অথবা সংশোধন কোথায় কি ভাবে হওয়া উচিত, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রাচীন সমাজতত্ত্ব পারলৌকিক ফল লইয়া অধিক ব্যস্ত ছিল; কিন্তু তাহার সহিত ইহলোকের উন্নতির প্রকৃত সম্বন্ধস্থাপন করাও কম আবশ্যক নহে। ইহলোক বাস্তবিকপক্ষে পরলোকের সোপানমাত্র। এই গ্রন্থে উভয় দিক হইতেই সমাজতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে, এবং ইহাই এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থের বিশেষত্ব।

ষড়্‌রিপুর সহিত সংগ্রামে জয়ী হওয়াই প্রাচীন কালের সমাজতত্ত্বের মূলমন্ত্র। এ মন্ত্র চিরদিন স্মরণীয়। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে সপ্তম রিপু স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। এ রিপুর সংগ্রামে জয়ী না হইতে পারিলে জাতীয় উন্নতি সুদূরপরাহত হয়। এ রিপুর জন্মস্থান উদর। আহারসংগ্রহ এবং বংশবৃদ্ধি না করিতে পারিলে বর্ত্তমানে টিকিয়া থাকিবারই উপায় নাই; উন্নতি তো পরের কথা। এ নিমিত্ত বর্ত্তমান যুগের সমাজতত্ত্ব অন্য ভাবে আলোচিত হওয়া অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এ রিপুর তাড়নায় বিভিন্ন সমাজের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও বৈরভাব উপস্থিত হয়, তাহাই জীবন-সংগ্রাম। এ সংগ্রামে সমাজের সকলেই এক; দ্বন্দ্ব প্রতিকূল সমাজের সহিত। এ সংগ্রামে জয়ী না হইলে কোনও জীবই ধরাপৃষ্ঠে অবস্থিতি করিতে পারে না। সামাজিক হিসাবে ষড়্‌রিপু-দমন অপেক্ষা এ রিপুর দমন কম প্রয়োজনীয় নহে। এবার জ্যোতিষ শাস্ত্র যে কুরুক্ষেত্র যোগের উল্লেখ

করিয়াছেন, তাহার ফল অধুনা ইউরোপ খণ্ডে দেখা দিয়াছে। ইউরোপে প্রকৃতই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সমাজধ্বংসের উপক্রম হইয়াছে। যাঁহারা সমাজতত্ত্বের বিধান সকল প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন, এ যুদ্ধে তাঁহাদেরই জয়ী হওয়া সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে সমাজতত্ত্বের ভিতর দিয়া এ যুদ্ধের আয়োজন বহুদিন হইতেই হইতেছিল। কারণ, জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিতে গেলে এরূপ যুদ্ধ অনিবার্য্য। ইহার বিধান শুক্রনীতিতে সম্যক্‌রূপে পাওয়া যাইবে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ আছে। ইহার বিধান বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্বের অন্তর্গত। জাতীয় জীবনের সংকট ও সমস্যাগুলি ভবিষ্যৎদৃষ্টিতে অবলোকন করিয়াই সমাজতত্ত্বের আলোচনা করিতে হয়। ইহকাল অগ্রে, পরকাল পরে, ইহা ঐ শব্দদ্বয়ের নামেই প্রকাশ। ইহকাল বিস্মৃত হইলে পরকালও নষ্ট হয়। সমাজতত্ত্বের এই প্রধান কথা আলোচ্য গ্রন্থে বিশদরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সুস্থ দেহ, সবল মন, সুযোগ্য বংশ-পরংপরা—এ সকল ইহকালের উন্নতির পক্ষেও যেমন প্রয়োজনীয়, পরকালের পক্ষেও তেমনই। রুগ্ন, অবসন্ন, নানা দুশ্চিন্তায় জর্জ্জরিত, নানা পীড়নে নিষ্পিষ্ট, নানা বন্ধনে আবদ্ধ, এরূপ ব্যক্তির শান্তি কোথায়? শান্তি না থাকিলে ধর্ম্মালোচনায় বিঘ্ন হয়। তাই বলিয়াছি, প্রকৃত সমাজতত্ত্বের নিয়ম সকল জ্ঞাত হওয়া ইহকাল ও পরকালের পক্ষে তুল্যরূপেই আবশ্যক। সংসারে একাকী উন্নতি করা অসম্ভব; সংসর্গের ফল অনিবার্য্য। চতুষ্পার্শ্বস্থ বেষ্টনীর প্রভাব দুরপনেয়। এ নিমিত্ত যে জনসাধারণের সংসর্গের মধ্যে ডুবিয়া আছি, যে বেষ্টনীর দ্বারা পরিবেষ্টিত আছি, তাহার উন্নতি না হইলে, কোনও ব্যক্তিরই একা উন্নতি হওয়া সম্ভব নহে। সেই জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিরই সামাজিক-ব্যক্তি-ভাবে আত্মদর্শন করা আবশ্যক। সামাজিক উন্নতির বিধান সকল নিজ জীবনে প্রতিপালন করা প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য। যে উপায়ে সমাজকে ধরাতলে গৌরবান্বিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়, সে উপায়ের অনুশীলন প্রত্যেক ব্যক্তিরই প্রধান কর্ম্ম। সমাজের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। যথাবিহিতভাবে এ সকলের অনুশীলন করিতে গেলে সমাজতত্ত্বকে মানবতত্ত্বের অংশস্বরূপ আলোচনা করিতে হয়। শশধর বাবুর "মানবসমাজ" এ সকল অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক দেখাইতেছে। আমরা আশা করি, এ গ্রন্থ সর্ব্বত্র (শুধু পঠিত নহে) অধীত হইবে।

শ্রীসরসীলাল সরকার।

ব্রত-ভঙ্গ।

১

অতুলচন্দ্র কবিতা, কল্পনা, নাটক নভেল, এমন কি, প্রণয়, ভালবাসা, প্রেম শব্দগুলার উপরেও বিষম চটিয়া গেল। অন্তরে ক্রোধের সঞ্চার হইলেই সেটা কার্য্যে প্রকাশ করা শরীর ও মনের একটা বিশেষ গুণ; নহিলে শক্তির মূর্ত্তির প্রমাণাভাব ঘটে। অন্তরে চৈতন্য জাগ্রত হইলে দেহে তাহার তেজ বিকাশ পাইয়া থাকে।

কাজেই অতুলচন্দ্র তাহার দেওয়ান, গোমস্তা, অভিভাবক, আত্মীয় ইত্যাদি বলিতে "একমেবাদ্বিতীয়ং" জ্যেঠাইমার স্কন্ধে তাহার যাবতীয় অস্থাবর, কি না কবিতার খাতা, ফাউণ্টেন্ পেন, রবিবাবুর কাব্যগ্রন্থাবলী, মহিমফ্লুট হারমোনিয়ম, "হাওয়াগাড়ি" সিগারেটের বাক্‌স, কেস্, জাপানী দেশলাই প্রভৃতি, এবং স্থাবর সম্পত্তির নূতন বোঝাটি ফেলিয়া দিয়া, এলাহাবাদে বন্ধু রমেশের নিকট পলাইয়া গেল। বৈষয়িক হিসাবে যাহাকে স্থাবর অস্থাবর বিষয় বলা যায়, বহুদিন হইতেই সেগুলি জ্যেঠাইমার অধিকারভুক্ত।

জ্যেঠাইমা অতুলের পলায়নে তত বেশী উদ্বিগ্ন হইলেন না; কেন না, অতুলের এরূপ কার্য্য এই প্রথম নয়। তাহার দারুণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি জোর করিয়া তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। ভাবিলেন, "খুগ্যি ছেলে। আর বেশী রাশ্ টানা উচিত নয়। দুদিন মনটা একটু ভাল ক'রে ঝোঁক্‌টা সাম্‌লে আসুক।"

অতুলের বন্ধু ও শিষ্য শ্রীমান্ রমেশচন্দ্র কল্পনা ও কবিতায় এখন তাহাকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। গুরুর বাক্যে ও কার্য্যে বৈরাগ্যের ঘোর প্রভাব দেখিয়াও সে ব্যক্তি পশ্চাৎপদ হইল না। বহু গুরু-মারা টীকা করিয়াও যখন সে সুকৃতি-শালী, চতুর্ব্বিধ ভজনাকারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী, বিবিক্ত-হৃদয় অতুলকে প্রকৃতিস্থ করিত পারিল না, (হায় মূঢ় রমেশ! ভগবানের অতি প্রিয় যে পথ, সেই পথের পথিক অতুলের মাথা নিশ্চিতই খারাপ হইয়াছে, এই তাহার ধারণা।) তখন সে তাহার ত্রিতলস্থ একটি কক্ষের সমস্ত আস্‌বাব বাহির করিয়া দিয়া এক সুদীর্ঘ কম্বল পাতিয়া, খানকয়েক মৃগচর্ম্ম ও এক বিকট শার্দ্দূলচর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া গুরুকে ব্যবহার করিতে দিল। ছয় আনা দামের একখানি ক্ষুদ্র গীতা-হস্তে নবীন সন্ন্যাসী অতুলচন্দ্র সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, এবং পরমনিবিষ্টচিত্তে

জীবাত্মা, পরমাত্মা, প্রকৃতি, পুরুষ, মায়া, সত্ত্ব রজঃ তমঃ, কাম্য, নিষ্কাম, বন্ধন, মুক্তি প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনায় নিমগ্ন হইয়া গেল। শ্রীধর স্বামী, শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ ধর্ ধর্ করিয়াও তখন তাহার নাগাল পাইলেন না।

জীবের মুক্তির পথ নিকটস্থ হইলে অহেতুক বৈরাগ্য এই রূপেই উপস্থিত হয়। ইহা জন্মান্তরীণ সুকৃতির ফল।

২

পুরা এক মাস এই বৈরাগ্যের স্রোতে তর্‌তর্ বেগে ভাসিয়া গিয়া সহসা এক বিষম চোরাবালিতে ঠেকিয়া অতুলচন্দ্রের গীতা-রূপ তরণী স্থির হইয়া দাঁড়াইল। যে তরণীর আশ্রয়ে তাহার জীবাত্মা সংসার-সাগরের আধিপূর্ব্ব-ব্যাধিরূপ ঝঞ্ঝা-ব্যাত্যাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া "উদাসীনো গতব্যথঃ" হইয়া ভাসিয়া চলিয়াছিল, সেই তরণীর এহেন বিপত্তিতে অতুলচন্দ্র নষ্টপ্রজ্ঞ হইয়া পড়িল। নৌকা প্রথমে গতিহীন, পরে চারি দিকের বিষম ঠেলাঠেলিতে কাত্ ভাবে একটু টলিয়া শেষে দরিয়ায় ভুস্ করিয়া তলাইয়া গেল। এই চোরাবালিও একটি আত্মাভিমানী বস্তু! ইনি রমেশের তরুণী বিধবা সহোদরা ইন্দুমতী।

সত্যের অনুরোধে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, কিছুদিন হইতেই অতুলের অমিশ্র সত্ত্বগুণাশ্রিত জীবাত্মায় কিঞ্চিৎ তমোগুণের আবির্ভাব হইয়া হইয়াছিল। ভগবানই বলিয়াছেন "রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত। রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা।" তমোগুণ যথা "আলস্যনিদ্রাভিঃ।" তবে পরজন্মের জন্যই তিনি পুরা এই একমাস নৌকাখানা অতিশয় অধ্যবসায়ের সহিত চলাইয়াছিলেন; কেন না, এ সব কিছুই নষ্ট হইবার নয়। ভগবান্ বলিয়াছেন—

"শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে।"

"তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।"

সন্তরণবিদ্যা যেমন বহুদিনের অনভ্যাসেও লোপ পায় না, যে কেহ সে বিদ্যা যতটুকু আয়ত্ত করিয়া রাখে, জলে পড়িবামাত্র তাহার হস্ত পদে তখন সেটুকুর আবির্ভাব হয়, সেইরূপ এ ক্ষেত্রেও অতুল যে জন্মজন্মান্তরেও তাহার এই এক মাসের সঞ্চিত সম্পত্তির দায়াধিকার প্রাপ্ত হইবে, সে বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ ছিল।

ইন্দুমতী বালবিধবা, কিন্তু শিক্ষিতা, এবং বোধ হয় সমধিক শিক্ষার জন্য উৎসুক। কেন না, অতুল তাহাকে প্রায়ই বারান্দায় রয়েলরিডার, মেঘনাদবধ কাব্য, ঋজুপাঠ প্রভৃতি হস্তে আসীনা দেখিতে পাইত। রমেশের মাতা নাই,

পিতা অল্পদিন গত হইয়াছেন। তিনি কিশোরী কন্যাকে অন্দরে বাহিরে সমান অধিকার দিয়াছিলেন। সেই অভ্যাসবশতঃ ইন্দুমতী এখনও মাথায় কাপড় দিতে বা কাহাকেও দেখিয়া সঙ্কুচিতা হইতে শিখে নাই। সংসারে অভিভাবকের মধ্যে এক বৃদ্ধা মাতুলানী। পিতা বালিকা কন্যাকে বিধবা-বেশ পরান নাই, সেই জন্য এখনও ইন্দুমতীর বেশ কুমারীর ন্যায়। পিতা মনে মনে একটু স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতীও ছিলেন। অনেক সময় রমেশের অনুপস্থিতিতে তাহার কক্ষে কোনও শিক্ষার্থিনীর সসঙ্কোচ অঙ্গুলিস্পর্শে দুই চারিটা সোজা গৎ এবং চলিত গানের সুর ধীরে ধীরে বাজিতে থাকে, তাহাও অতুলের কর্ণ এড়ায় নাই।

তমঃকে অভিভূত করিয়া কচিৎ রজঃ ও সত্ত্ব উত্থিত হইয়া থাকে, কিন্তু এবারে যে কি আসিল, তাহা স্থির করিতে অতুলচন্দ্রের অনেকক্ষণ লাগিল। বহু চিন্তার পর স্থির হইল যে, ইহা রজোমিশ্রিত সত্ত্ব। কেন না, কর্ম্মে প্রবৃত্তি আসিতেছে, অথচ সে কর্ম্মটা নিষ্কাম। এই যে বালিকাটি, ইহাকে দেখিলেই বুঝা যায়, এ শিক্ষা-প্রয়াসিনী। ভগবান বলিয়াছেন,– "তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর"। তাঁহার কোনও কর্ত্তব্য নাই, তথাপি তিনি সর্ব্বদাই কর্ম্মে লিপ্ত রহিয়াছেন। বিশেষতঃ, "সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত। কুর্য্যাদ্বিদ্বাং-স্তথাসক্তশ্চিকীর্ষু র্লোকসংগ্রহম্।" অতএব এই শিক্ষাভিলাষিণী বালিকাটির সমাধিক শিক্ষার ব্যবস্থা নিষ্কাম হইয়া করিতেই হইবে।

রমেশের প্রকৃতি তমঃপ্রধান। "ঈশ্বরোঽহম্ অহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী"—এ ভাবটি রমেশে অত্যন্ত প্রস্ফুট। কেবল সে নিজের সুখেই মত্ত, ভগিনীর কোনও সংবাদই রাখে না। অতুল একদিন রমেশকে এ জন্য যথোচিত তিরস্কার করিল। অকালকুষ্মাণ্ডটা তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া হাসিয়া বলিল, "তোমার গীতা জ্ঞান শেষে যে রিফর্মেশনে দাঁড়াল; এতে আশা হচ্ছে।" অতুল বন্ধুর অজ্ঞানসম্ভূত প্রজ্ঞা নষ্ট করিবার জন্য কর্ম্মের গুরুত্ব সম্বন্ধে ঝাড়া দুই ঘণ্টা বক্তৃতা দিল, তথাপি রমেশের কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না। ভগবান এই জন্যই অজ্ঞানের—মূঢ়ের নিকট পরাবুদ্ধির রহস্য প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। শ্রান্ত অতুল হাঁফ ছাড়িয়া দিয়া খানিকটা বরফজল চাহিয়া পান করিল।

কিন্তু পরদিন ইন্দুমতীর শিক্ষার বন্দোবস্ত হইল। ইংরাজী ও বাঙ্গালা বহু পুস্তক আসিল। একটি কক্ষ তাহার পাঠাগার-রূপে নির্দ্দিষ্ট হইল। শ্রীমতী ইন্দুমতী প্রফুল্লমুখে শিক্ষকের নিকট নিয়মিতভাবে পাঠ লইতে

লাগিল। অতুলচন্দ্র সে বন্যা-... ইন্সপেক্টরের পদ গ্রহণ করিল। দ্বাদশ বৎসরে বিধবা হইয়া গত দুই বৎসর ইন্দুমতী পিতার নিকট কেবল পড়াশুনাতেই কাটাইয়াছে। জগতে সে আর কিছুই জানে না, তাহার অন্য কামনাও কিছু ছিল না। পিতার মৃত্যুর পর এই এক বৎসর সে জীবনের কোনও আশ্রয় পাইতেছিল না। খেয়ালী ভ্রাতাটীরও নিকটস্থ হইতে পাইত না। এখন এই শিক্ষাব্যপদেশে ভ্রাতাও এক এক দিন, "দেখি রে ইন্দু, কি শিখ্‌লি?"—বলিয়া তাহাকে ডাকে, এবং অতুলকে বাহবা দেয়। ইন্দু জানিল, অতুলই ইহার মূল। নিষ্কাম কর্ম্ম এবং কর্ম্মযোগ কাহাকে বলে, তাহা সে বোধ হয় জন্মেও শোনে নাই। তাই একদিন আমাদের নিষ্কাম কর্ম্মবীর অতুলচন্দ্রকে সে কথাপ্রসঙ্গে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল। অতুলের তাহা লাগিল ভাল। সতত আত্মসন্ধিৎসু অতুলচন্দ্র ভাবিল, তবে কি এ অমিশ্র রজোগুণ?

৩

যত দিন যাইতে লাগিল, তত্ত্বজ্ঞানী অতুলচন্দ্রের তত্ত্বান্বেষী মনে ততই নানা ভাবের বিকাশ পাইতে লাগিল। ক্রমশঃ বোধ হইল, সে গুণাতীত পুরুষ; কেন না, কোনও গুণের বিচারই এখন তাহার সহজে মনে আসে না। কয়েক মাস পরে মনে হইল, তাহার জীবন্মুক্ত আত্মার কোনও বন্ধন নাই। সে কর্ম্ম করিয়াও নির্লিপ্ত, মুমুক্ষু, আত্মবশী। সে পরাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব এটা কি, সেটা কি, তাহার আর বিচারের প্রয়োজন নাই। বৎসর যখন পূর্ণ হইয়া গেল, তখন আর এ সব চিন্তা তাহার মনেও উদিত হইত না। বোধ হয়, ইহাই ব্রহ্মস্বরূপত্ব। কিন্তু হায়! সে সত্তা যে ভোগ করিবে, সে এ বিষয়ে তখন একেবারেই উদাসীন। সে-ই এখন ইন্দুমতীর শিক্ষক।

কাটী হইতে জ্যেঠাইমা পত্রের উপর পত্র লিখিয়াও কোনও উত্তর পাইলেন না। তিনি বহু সাধ্য সাধনা, অনুনয় বিনয়, শেষে ক্রোধ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিবার পর অতুলের নিকট হইতে একখানি পত্রের উত্তর পাইয়াছিলেন। অতুল লিখিয়াছিল—"আমার জীবনের যত দূর ক্ষতি করিতে হয়, তাহা করিয়াছেন; এখন যদি আমাকে বিবাগীর বেশে সংসার ত্যাগ করাইতে ইচ্ছা না করেন তো এরূপে আমায় ত্যক্ত করিবেন না। আমি আর দেশে যাইব না, ইহা নিশ্চিত; কিন্তু এরূপ টানাটানি করিলে শেষে সন্ন্যাস-পন্থা গ্রহণ করিব।" তাজেই জ্যেঠাইমা আর তাহাকে বিরক্ত করেন নাই।

সন্ন্যাসীর লক্ষণ কি, তাহা মিলাইবার জন্য অতুল গীতাখানার সন্ধান করিয়া সংবাদ পাইল, মলিন ও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় সে এ কোণে ও কোণে পড়িয়া থাকিয়া ঘরময় কেবল ছেঁড়া কাগজের টুক্‌রা ছড়াইতেছিল। ঝড়ুয়া খান্‌সামা সেখানাকে শেষে বাবুদের চায়ের উনানের ইন্ধন-স্বরূপে ব্যবহার করিয়া তাহার গীতা-জন্ম সার্থক করিয়া দিয়াছে। অতুল গুম্ হইয়া খানিক ভাবিল, শেষে তাহার মনে পড়িল, "ব্রহ্মাগ্নৌ,"; তাহাতে গীতার পাতাগুলি "ব্রহ্মহবিঃ", এবং হোতাও ব্রহ্ম, অতএব ঝড়ুয়া এই ব্রহ্মকর্ম্মসাধন হেতু পরিণামে ব্রহ্মত্বই পাইবে।

অতুলচন্দ্র তো গীতা ছাড়িয়াছে, কিন্তু গীতা তাহাকে ছাড়ে কই! দগ্ধীভূত হইবার পরও তাহার অচ্ছেদ্য অদাহ্য অশরীরী আত্মা অতুলচন্দ্রের চারি পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। অতুলচন্দ্র দেখিল, গীতার সেই অনাসক্তির ভাব সর্ব্বত্রই যেন ফুটিয়া উঠিতেছে। এ দিকে রমেশের কাব্যে ও কবিতায় অনাসক্তি ও গান বাজনায় বিরক্তি জন্মিয়াছিল; "দূর হোক্ গে ছাই—আর ভাল লাগে না" ভাষায় প্রকাশ না করিলেও, এই ভাবগুলি সর্ব্বদাই যেন রমেশের মুখে ফুটিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু অতুল ইন্দুমতীর পাঠে অমনোযোগ দেখিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্মিত, বুঝি একটু ব্যথিতও হইল। সেদিন প্রভাতে চা-পানের পর রমেশ একখানা খবরের কাগজ লইয়া বারান্দায় চলিয়া গেল। অতুল ইন্দুমতীর পাঠ্য পুস্তকগুলি সম্মুখে রাখিয়া "মানসী" কাব্যখানা হস্তে লইয়া ইন্দুমতীর প্রতীক্ষা করিতেছিল, এবং মধ্যে মধ্যে এক একবার কাব্যখানায় মনঃসংযোগ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু মন বসিল না। অনেকক্ষণ পরে ইন্দুমতী আসিল। অতুল চাহিয়া দেখিল, তাহার হস্তে গুটিকতক সিক্ত পুষ্প, ললাটে চন্দনচিহ্ন, চুলগুলা একটু বিশৃঙ্খলভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, পরিধানে একখানা সরুপাড় গরদ। ইন্দুমতী ফুল কটি টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, "দাদা কই? মামীমা আশীর্ব্বাদী দিয়েছেন।" অতুল বলিল, "তোমার স্নান হ'য়ে গেছে দেখ্‌ছি যে? আজ পড়্‌লে না?" "না; মামীমার আজ অনেক কাজ ছিল, সে জন্য তাঁর কাছে ছিলাম। দাদা! মামীমা তোমায় আশীর্ব্বাদী দিয়েছেন।" রমেশ গৃহে প্রবেশ করিয়া কাগজখানা এক দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া উদাসভাবে একটা ফুল তুলিয়া লইল। ইন্দুমতী অতুলকে বলিল "আপনিও নেন।" ফুলটি লইতে গিয়াই, জ্যেঠাইমার কথা অতুলের মনে পড়িল। অতুল বলিল, "তুমিও পূজো করতে শিখেছ নাকি?" ইন্দুমতী একটু সলজ্জভাবে হাসিল। "আজ আর পড়্‌বে না?" "না, ওবেলায় পড়া

নেবেন।" অতুল গম্ভীরমুখে বলিল, "তুমি আজ কাল একটু অমনোযোগী হ'য়েছ।" ইন্দুমতী হাসিল। অতুল শিক্ষকের গুরুত্বসূচক স্বরে বলিল, "এ রকমে তো চলবে না।" ইন্দুমতী মাথা হেঁট করিয়া বলিল, "ভাল লাগে না।" রমেশ বলিল, "ঠিক্। ত্যক্ত ধরে যাচ্ছে। না, একটু চেঞ্জ্ না আন্‌লে আর চলে না।" অতুল সে কথা কানে না করিয়া বলিল, "অভ্যাসটাই একেবারে না ছেড়ে, সে সময়ে পড়ার বই ছাড়া অন্য কিছু পড়্‌তে হয়। কাব্য বা গল্প সাহিত্য যা ভাল লাগে।" "তাই ত পড়ি।" "কই তোমার কাব্য টাব্য, বই টই সবই ত এই ঘরে ছড়াছড়ি দেখ্‌ছি।" "আমি একখানা নূতন বই আনিয়েছি, দ্যাখেন নি বুঝি?" "কি বই?" "নৈবেদ্য।" রমেশ বলিল, "চল অতুল, দু দিন একটু বেড়িয়ে আসা যাক্।" "কোথায়?" "বাঙ্‌লায়; যেখানে ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি। পল্লবঘন আম্রকানন রাখালের খেলাগেহ, ছায়া অসরল দীঘি কালো জল নিশীথ শীতল স্নেহ।" অতুলের অন্তরে কে যেন সজোরে বারকয়েক আঘাত করিল। সে বলিল "না।" "ও, তুমি যে বঙ্গ হইতে পলাতক! তবে কলিঙ্গে চল। ওয়াল্‌টেয়ারে যাবে?" "তা গেলে হয়। কিন্তু বেশী দেরী করা হবে না।" "কেন? তোমার ও আমার গৃহ তো শাস্ত্রোক্ত গৃহ নয়। 'ন গৃহং গৃহ-মিত্যাহুঃ'—" অতুল আবার একটু ধাক্কা খাইল। বলিল, "ইন্দুমতীর পড়ার ক্ষতি হবে।" ইন্দুমতী বাধা দিয়া বলিল, "কিছু ক্ষতি হবে না। দাদার মন ভাল হবে, ওয়াল্‌টেয়ার খুব ভাল জায়গা শুনি, শরীরটাও সার্‌বে, আপনারা যান্। আমি নিজে নিজেই পড়্‌ব।" রমেশ বলিল, "অর্থাৎ এই ফাঁকে তুইও একটু হাওয়া খেয়ে নিবি?" ইন্দুমতী হাসিল।

সত্যই রমেশ তল্পী তাল্পী বাঁধিয়া ফেলিল। অগত্যা অতুলও প্রস্তুত হইল। যদিও সঙ্গে চাম্‌ড়া-বাঁধা বিছানা, খাবারের বাক্‌স, দড়াদড়ি-বাঁধা ট্রাঙ্ক, টিকিট-মারা দুখানা বাইক, ঝড়ুয়া খানসামা, তথাপি অতুলের মনে তাহার বৎসরাধিক পূর্ব্বের প্রব্রজ্যার কথা স্মরণ হইল! আর মনে পড়িতেছিল, পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে নির্জ্জনে বসিয়া নিজমনে মৃদু সুরে কি বৈরাগ্যমাখা মুখে ইন্দুমতী গায়িতেছিল, "ঘাটে বসে আছি আনমনা, যেতেছে বহিয়া সুসময়। এ বাতাসে তরী ভাসাব না, তোমা পানে যদি নাহি বয়।"

৪

চিল্কা হ্রদ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারত মহাসাগর এবং তথা হইতে বৈতরণী

নদী, শতদ্রু, বিপাশা, মহানদী, কাটজুড়ী, তক্রক প্রভৃতি নদ নদীর ঘাটে ঘাটে ঘুরিয়া তিন মাস পরে অতুল ও রমেশের তরী গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থলে ফিরিয়া আসিল।

ইন্দুমতী হাসিমুখে আসিয়া তাহাদের অভ্যর্থনা করিল; কিন্তু এত বিলম্ব করার জন্য অনুযোগ করিতে ছাড়িল না। অতুল বলিল "রমেশ কি তবু ফিরতে চায়?" রমেশ হাসিয়া বলিল, "না রে ইন্দু। তোর পড়ার ক্ষতি হচ্চে বলেই এতই শীগ্‌গির ফিরলাম। অতুল তো ভেবেই অস্থির যে, যা শিখেছিলি, সব বুঝি এ তিন মাসে গুলে খেয়ে ফেল্‌লি।" ইন্দু মৃদু হাসিয়া বলিল, "তা ঠিক্‌ই ভেবেছেন।"

বিকালে রমেশ তাগাদা লাগাইল, "চল, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করে' আসা যাক্!" "চল" বলিয়া অতুল টেবিলের উপরিস্থ কয়েকখানা ক্ষুদ্রাকার নূতন পুস্তক হইতে চোখ তুলিয়া বলিল, "এ বই কার?" রমেশ নত হইয়া বলিল, "শান্তিনিকেতন। ইন্দুর হাতে! ইন্দুও তোমার মত যোগ-অভ্যাসে মন দিলে নাকি? ইন্দু! ইন্দু!" ইন্দু আসিল। "এ বই কার?" "আমার।" "পড়িস্ নাকি?" ইন্দু চুপ করিয়া রহিল। "বইগুলো কেমন? ভাল লাগে?" "হাঁ।" রমেশ দু এক পাতা উল্টাইয়া উদাসীনভাবে রাখিয়া দিয়া বলিল, "ভাল বটে, পড়িস্। চল হে অতুল।" অতুল প্রশ্ন করিল, "সব বুঝ্‌তে পার?" ইন্দু নতমস্তকে বলিল, "না।" "তবে?" "বুঝ্‌তে চেষ্টা করি। যেটুকু বুঝি, তাতেই আনন্দ পাই।" অতুল আর প্রশ্ন করিল না।

অতুল দেখিল, ইন্দুমতী যেন ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। আর সে বালিকার মত চাল চলন বেশ ভূষা আচার ব্যবহার কিছুই নাই। চুল আর বাঁধেই না, রুক্ষ বিশৃঙ্খল ভাবে জড়ান থাকে মাত্র। বসন ভূষণও তদ্রূপ। হার্ম্মোনিয়মে ছাতা ধরিয়া গিয়াছে। পড়ার বই অপেক্ষা সাংসারিক কাজ কর্ম্মে, পূজা ইত্যাদিতে তাহার বেশী সময় যায়। অতুল বিস্মিত হইয়েছিল বটে, কিন্তু বিরক্ত হয় নাই। এই পূজারিণী তরুণী সুন্দরীকে দেখিয়া তাহার নয়ন যেন পরিতৃপ্ত হইল। বৈরাগ্য বা অনাসক্তি বস্তুটা কি সর্ব্বত্রই এত মধুর! অতুল ভাবিতে লাগিল।

বন্ধুর দল সেদিন নৌকাযোগে ত্রিবেণীসঙ্গমে বায়ুসেবনে বাহির হইল। দাঁড় টানিতে টানিতে তরুণ হৃদয়গুলি নানা কাব্যালোচনায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। জলে স্থলে তখন অপূর্ব্ব শোভা। প্রকৃতির অনবদ্য মাধুর্য্য

সৌন্দর্য্যদর্শনে এক জন চেঁচাইয়া উঠিল, "দেখ দেখ কি সুন্দর !"; "ঐ হোথা জলে সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতা।" আর এক জন বলিল, "হোথায় কি আছে আলয় তোমার, ঊর্ম্মিমুখর সাগরের পার, মেঘচুম্বিত অস্তগিরির চরণতলে ?" তিন চারি জন এক সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল, "কাহার, কাহার ?" রমেশ বলিল, "নৌকা ফেরাও ; আর না।" অতুল নীরবে হালখানা ধরিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছিল। হালটা সজোরে ঘুরাইতে যাইবামাত্র জীর্ণ দড়ী সহসা ছিঁড়িয়া গেল। ঝোঁক সাম্‌লাইতে না পারিয়া অতুল একেবারে জলে পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তিন চারি জন বন্ধু ও রমেশ ঝাঁপ দিয়া অতুলকে বহু চেষ্টায় নৌকায় তুলিল। পতনের সময় মস্তকে গুরু আঘাত লাগিয়া অতুল নিশ্চেষ্ট বলহীন হইয়া পড়িয়াছিল। নৌকায় তোলার সঙ্গে সঙ্গে অতুলের চৈতন্য বিলুপ্ত হইল।

৫

অতুলকে পাঁচ সাত দিন শয্যাগত থাকিতে হইল। প্রবল জ্বরে ও মস্তকের বেদনায় ৩।৪ দিন সে অজ্ঞান ভাবেই ছিল ; পরে সুস্থ হইতে লাগিল। ডাক্তার বলিয়াছিলেন, "প্রাণের আশঙ্কা নাই।"

ইন্দুমতী ও রমেশের অক্লান্ত সেবায় অতুল অষ্টম দিবসে উঠিয়া বারান্দায় চেয়ারে গিয়া বসিল। আট দিন পরে আজ রমেশও একটু বেড়াইতে বাহির হইল। ইন্দুও কর্ম্মান্তরে গেল। অতুল চেয়ারের গায়ে দুর্ব্বল মাথা রাখিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়াছিল। ললাটে তখনও যেন কাহার কোমল হস্তের মধুর স্পর্শ লাগিয়া রহিয়াছে, মুদ্রিত চক্ষুর সম্মুখেও কাহার উদ্বিগ্ন কোমল দৃষ্টি, নাসাপথে কাহার অঙ্গসৌরভ। তখনও অতুল আত্মসন্ধানে বিরত নয়। কিন্তু সে দেখিল, শরীরের এই দুর্ব্বল অবস্থায় তাহার হৃদয়ও অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে ; এ সুখচিন্তাকে এখন তাহার মস্তিষ্ক হইতে তাড়াইবার সাধ্য নাই। একটু সবল হইতে হইবে ; তবে।

ঝড়ুয়া একখানা চিঠি দিয়া গেল। জ্যেঠাইমার হস্তাক্ষর। অনেক দিন পরে। ঈষৎবিচলিতভাবে সে পত্রখানা ধীরে ধীরে খুলিয়া ফেলিল। জ্যেঠাইমা লিখিয়াছিলেন, "কল্যাণবরেষু !

অতুল ! কর্ত্তব্যবোধে তোমায় আজ একবার আসিতে বলিতেছি। তোমার বিষয় আশয় সবই আমার হাতে। আমি আগামী ৭ই: তারিখে কাশী যাত্রা করিতেছি। তোমার সম্পত্তি একবার আসিয়া বুঝিয়া লইয়া; তার পর তুমি যাহা ইচ্ছা করিও। বাড়ী আসিতে তোমার যে বাধা, তাহাও আর নাই। যে বোঝা

তোমার মাথায় আমি দিয়াছিলাম, আমিই তাহা নামাইয়া দিয়া তোমার সংসার হইতে বিদায় লইতেছি। আজ দেড় বৎসর তাহাকে আনিয়া শুধু চোখের জলেই ভাসাইয়া রাখিয়াছিলাম, কাল তাহাকে আমি নদীর ধারে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া আসিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি। তোমার সঙ্গে আমার আর কোনও বন্ধনই নাই, শুধু এই বিষয়ের বাধাই আমায় এ দুদিন বিলম্ব করাইল। যদি ৭ই তারিখের মধ্যে নাও আস, তথাপি আমার কাশী যাওয়া নিশ্চিত। ধর্ম্মে খালাস হইবার জন্য তোমায় একবার জানাইলাম ইতি—

শ্রীভবতারিণী দেব্যা।"

"আপনার ওষুধ খাওয়ার সময় ব'য়ে গেছে যে। ওষুধ খান্!" অতুল চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, ইন্দুমতী! ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বাড়ী যেতে হবে।"

"বাড়ী—কোন বাড়ী? আপনার দেশে?" "হাঁ!" ইন্দুমতী কিছুক্ষণ বিস্মিতভাবে চাহিয়া রহিল; কেন না, কথাটা অশ্রুতপূর্ব্ব। তাহার বিস্মিত দৃষ্টি দেখিয়া অতুল ও লজ্জিতভাবে চক্ষু নত করিয়া রহিল।

"এ রকম অবস্থায় বাড়ী যাবেন কেন? খুব দরকার নাকি?" "হাঁ!"

"তা হলেও প্রাণের চেয়ে বড় কিছুই নয়। অন্ততঃ আর দিন পাঁচ ছয় না গেলে হ'তেই পারে না।" "দিন পাঁচ ছয় দূরের কথা, আজই—এই রাত্রের ট্রেনেই আমাকে যেতে হবে। পরশু ৭ই।" "কোনও বিপদের আশঙ্কা আছে কি?" "হাঁ!" ইন্দুমতী চিন্তিতভাবে বলিল, "তাই ত! দাদাকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করুন, আপনার এই অবস্থা, কি করে' এত রাস্তা একা ট্রেণে যাবেন?" "যেতেই হবে।" বলিয়া অতুল প্রায় টলিতে টলিতে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চারি দিকে চাহিতে লাগিল। ইন্দুমতী বলিল, "কি খুঁজ্‌ছেন!" "আমার ট্রঙ্ক্—কাপড় চোপড়গুলো।" "কি আশ্চর্য্য! যদি নিতান্ত যেতেই হয়, দাদাও হয়ত আপনার সঙ্গে যাবেন। তিনি আসুন! এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?" "সময় নেই বেশী; ৮টা বাজে; আমার বইগুলো—" —"এই সঙ্গে সবই নিয়ে যাবেন? আর আস্‌বেন না না কি কখনও যে, সব খোঁজ করছেন?" "না না, আর আস্‌ব না।" ইন্দুমতী সম্মুখে আসিয়া ভর্ৎসনাসূচকস্বরে বলিল, "ফেলুন ও সব। চেয়ারখানায় বসুন একটু, বসুন—" অতুল চেয়ারের দিকে না গিয়া টলিতে টলিতে গিয়া শয্যায় পড়িল। পশ্চাৎ হইতে ইন্দুমতী তাহার বাহু না ধরিলে হয় ত সে পড়িয়াই যাইত।

একটু পরে অতুল বলিল, "একখানা গাড়ী আন্‌তে বলো?" "পাগল হলেন কি? এইটুকু চল্‌তে পার্‌ছেন না, ট্রেণে যাবেন?" নিজ মনে ইন্দুমতী বলিল, "আঃ, দাদা করছেন কি? এখনও এলেন না!" অতুল চাহিয়া দেখিল, কি আশঙ্কাব্যাকুলমুখে ইন্দুমতী তাহার পানে চাহিয়া বাতাস করিতেছে। তাহাকে চাহিতে দেখিয়া পাখা রাখিয়া টেবিলের উপর হইতে বলকারক ঔষধ ঢালিয়া আনিল, "এটুকু খান দেখি।"—অতুল নীরবে তাহার আদেশ পালন করিল।

সেই করুণ মুখের পানে চাহিয়া মুহূর্ত্তে অতুলের দিক্‌ভ্রম হইল; সে স্থান কাল পাত্র সমস্তই বিস্মৃত হইল; তাহার মনে হইল, সে ও ইন্দুমতী—উভয়ে "অনাদি কালের হৃদয়-উৎস" হইতে যেন একজোড়া ফুলের মত প্রণয়ের কূলপ্লাবী স্রোতে ভাসিয়া আসিয়াছে। এ সংসারে আর কেহ, আর কিছু নাই। মুক্ত – আজ অতুল মুক্ত। আজ সে অনায়াসে ইন্দুমতীকে জানাইতে পারে, তাহার হৃদয়ে বহু দিন হইতে বিশ্বহিতবাসনার যে অরবিন্দ ফুটিয়াছে, তাহার কোরকে "পাদপদ্ম রয়েছে তোমার অতি লঘুভার।" অতুল কি বলিল, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না; কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে নবীনার আননে সেই কারুণ্যজ্যোৎস্নালোক নিবিড় নীল নীরদে ঢাকিয়া গেল। অতুল দেখিল, কি করালকান্তি মেঘ, চকিতে তীব্র বিদ্যুৎস্ফুরণ, সঙ্গে সঙ্গে বজ্রবাণী—"ছি ছি, অতুল দাদা! দাদার মত আপনাকে জানি, আপনার মুখে এ কি কথা! মাথা খারাপ হয়েছে আপনার।"

সেই বজ্রনির্ঘোষের সঙ্গে সঙ্গে অতুলের নষ্ট সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল সে আজ এ কি করিল! এতকাল সাধনার পর শেষে তাহার এই পরিণাম? অতুল তাড়িতপৃষ্টের মত উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু তখনও তাহার মস্তিষ্ক ধূম্রজালে পরিপূর্ণ। চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা দিয়া অগ্নির জ্বলন্ত শিখা তখনও বহির্গত হইতেছে। সে চারি দিকে চাহিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই। সবেগে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া সে ষ্টেশনের দিকে ছুটিল।

প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি মাথায় করিয়া নৈশ অন্ধকারে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিতে করিতে সগর্জ্জনে ট্রেণ ছুটিয়াছে। অতুল একটা খোলা জানালায় ক্লান্ত বাহু ও মস্তক রাখিল। চলন্ত ট্রেণের গতি ও বায়ুর মত্ত হুঙ্কারের শব্দের সঙ্গে সুর বাঁধিয়া তাহার মস্তিষ্কে ধ্বনিত হইতেছিল—"সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ, স্মৃতি-ভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।" অতুলের সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল।

অতুল ডাকিল, "মা!" তখনও তাহার স্মৃতি স্বস্থানে ফেরে নাই, নহিলে সে হয় ত "জ্যেঠাইমা" বলিয়া সে নিঃশ্বাসটা ত্যাগ করিত।

কোনও উত্তর আসিল না, কেবল ক্ষুদ্র একখানি হাত তাহার ললাটের উপর অতি মৃদুভাবে চলিতে লাগিল। অতুল অনুভব করিল, হাতখানি অতি কোমল। এ হাত তো জ্যেঠাইমার নয়। অতুল বলিল, "আমি কোথায়?" তথাপি কেহই উত্তর দিল না। অতুল বিস্মিতভাবে চাহিয়া দেখিল। এই খাট, এই মশারী, ঐ জানালা, তাহার পার্শ্বে ঐ টেবিল চেয়ার, ঐ বইয়ের সেল্‌প, সবই যে তাহার সুপরিচিত। ঐ যে জানালা দিয়া চিরপরিচিত নিম্ গাছের মাথা দেখা যাইতেছে। এ যে তাহার ঘর। অতুল ডাকিল, "জ্যেঠাইমা!"

এবার উত্তর আসিল, অতি নিকট হইতে ততোধিক মৃদুকণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "জ্যাঠাইমা খাবার ক'রে আনতে গেছেন।" অতুল ধীরে ধীরে মুখ ফিরাইল; কেন না, কণ্ঠটি অপরিচিত। ফিরিয়া দেখিল, মুখখানিও তাই। অতুল চাহিতেই মুখখানি কুণ্ঠার সহিত নত হইয়া পড়িল। চাহিয়া চাহিয়া অতুল জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?" অতুলের বিস্মিত দৃষ্টিপাতের প্রতিপলকে সে অত্যন্ত সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িতেছিল, এবারে মাথার কাপড়টা সে দীর্ঘতর করিয়া টানিয়া দিল। অতুলের বিস্ময় ক্রমে সীমা অতিক্রম করিতে লাগিল। "তোমার নাম কি? জ্যাঠাইমার কে হও তুমি?" বালিকা রক্তিমমুখে একবার তাহার পানে চাহিয়া সহসা কক্ষান্তরে পলাইয়া গেল; তাহার মলের ঝুমুঝুমু শব্দটুকু অতুলের কাণে বড় মধুর লাগিল; কিন্তু ততোধিক মধুর সেই সলাজ দৃষ্টিটুকু।

জ্যেঠাইমার গম্ভীর মুখের কঠিন দৃষ্টি দেখিয়া অতুল কোনও প্রশ্ন উত্থাপন করিতে সাহস করিল না। পথ্যপানান্তে একবারমাত্র মৃদুস্বরে বলিল, "আমি কবে বাড়ী এলাম?" ভাষাটা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইবার পূর্ব্বেই সেই বাল্যকাল হইতে শ্রুত অলঙ্ঘ্য আদেশ কাণে আসিল, "আর খানিকটা ঘুমোও, তার পরে সে কথা।" ক্লান্ত মস্তিষ্ক এ আদেশ পালন করিতে বড় বেশী বিলম্ব করিল না।

নিদ্রাভঙ্গে আবার যখন সে চক্ষু মেলিল, তখন তাহার মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ সুস্থ। অস্তোন্মুখ সূর্য্যের রক্ত আভা মুক্ত গবাক্ষপথে প্রবিষ্ট হইয়া ঘরখানাকে যেন সোনালি আলোকে প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছে। নিকটে বসিয়া যে আমায় বাতাস দিতেছি, অস্তগামী সূর্য্যের বিচিত্র আলোক তাহাকে সন্ধ্যারাণীর মত দেখাইতেছিল। তাহার মৃদু নিঃশ্বাসে যেন ফুটনোন্মুখ পুষ্পকোরকের সুবাস,

নয়নে সন্ধ্যা-তারকার স্নেহকোমল দীপ্তি! মুগ্ধ অতুল আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি?" বালিকা এবার পলাইল না। পাখা রাখিয়া অবগুণ্ঠনটা একটু টানিয়া দিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। চাহিয়া চাহিয়া সানুনয়স্বরে অতুল বলিল, "আমার কিছু মনে পড়ছে না; অসুখে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।" নত মুখ তুলিয়া বালিকা অতুলের পানে চাহিল—বেদনাব্যাকুল দৃষ্টি সহসা যেন তরল আকারে গলিয়া পড়িল। বিস্মিত অতুল সহসা তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "কে তুমি? তুমি কি—তুমি কি—কমলা?"

বালিকা বাম হস্তে চক্ষু আবৃত করিল, ডান হাতখানি অতুলের মুষ্টির ভিতরে। অতুল অনুভব করিল, সেখানি বড় কাঁপিতেছে; চাহিয়া দেখিল, আবৃত হস্ত বহিয়া সেই তরল বেদনাধারা কম্পিত ক্ষীণ ওষ্ঠের উপর আসিয়া পড়িতেছে। আবার অতুল নষ্টপ্রজ্ঞ হইয়া পড়িল। কয়বার ব্যাকুলকণ্ঠে উচ্চারণ করিল, "কমলা—কমলা—কমলা!"

৭

জ্যেঠাইমার মানবচরিত্র-জ্ঞান ও অপূর্ব্ব কৌশলময়ী প্রতিভার সহিত তাহার শিশুকাল হইতেই পরিচয় আছে, তাই অতুল সে বিষয়ে আর কোনও উচ্চবাচ্য করিল না। সে কিরূপে বাড়ী আসিয়াছিল, এ সম্বন্ধেও জ্যেঠাইমার কাছে প্রশ্ন করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল; কিন্তু স্বল্পভাষিণী জ্যেঠাইমার গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া অপরাধী অতুল প্রশ্নটা নিজেই পরিপাক করিয়া ফেলিল। তত্ত্বান্বেষী হৃদয় এবার অল্পেই তৃপ্ত হইল। কমলার কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া সে এইটুকু জানিয়াছিল, একটি ভদ্রলোক তাহাকে পঁহুছিয়া দিয়া পরদিবসই চলিয়া গিয়াছিলেন। ইহা হইতেই সে ব্যাপারটা কতক অনুমান করিয়া লইয়াছিল। অতুল সবল হইয়াই গ্রামের পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট হইতে তাঁহার মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বাধ্যায়-খানা চাহিয়া আনিয়া শ্রীমদ্ভগবৎগীতার পাতাগুলা খুলিয়া বসিল। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস,—"যে মাটীতে পড়ে লোক, উঠে তাই ধরে।" গীতা সে শীঘ্র ছাড়িবে না। ষষ্ঠাধ্যায়ে অর্জ্জুনের "বায়োরিব সুদুষ্করং" তুলনাটিতে অত্যন্ত মুগ্ধ হইল। ইতিপূর্ব্বে অর্জ্জুনকে সে অতীব কৃপাপাত্র বলিয়াই বিবেচনা করিত। তাঁহার প্রশ্নগুলি অত্যন্ত মূঢ়ের মত। কেন না, বায়ুরোধের অপেক্ষা মনোনিগ্রহ যে কত সহজ, তাহা অর্জ্জুন বুঝিতেন না। কিন্তু অতুল জলে ডুব দিয়া দু চার মুহূর্ত্ত না থাকিতে পারিলেও, মনের দুর্নিগ্রহত্ব সম্বন্ধে কই তাহাকে এত ভাবিতে হয় নাই। তাহার বিশ্বাস ছিল, সে অর্জ্জুনের সমসাময়িক হইলে ভগবানকে

কখনই অত বাক্যব্যয় করিতে হইত না! কিন্তু আজ সে ধীরে ধীরে অর্জ্জুন-বাণীর অন্তরালে লুকাইয়া তাঁহার "কাং গতিং গচ্ছতি" প্রশ্নের সমাধান খুঁজিতে লাগিল।

"শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে"। অতুল ধীরে ধীরে বইখানি বন্ধ করিয়া রাখিল। এ তাহার পুনর্জ্জন্ম! শ্রী—সে তো মূর্ত্তিমতী, এবং কি বিশুদ্ধ শুচিতা মনে প্রাণে সে সম্প্রতি অনুভব করিতেছে! গুম্ হইয়া বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে দেখিল, কমলা সহাস্যমুখে একখানা পত্র লইয়া আসিতেছে। অতুলের প্রজ্ঞা শুষ্ক-তত্ত্বানুসন্ধানে বিরত হইল। এ দেহে পূর্ব্ব-দেহের বুদ্ধিসংযোগ তাহার মনঃপূত হইল না। গীতাকে মাথায় ঠেকাইয়া সরাইয়া রাখিল।

রমেশ পত্র লিখিয়াছে।—

"ভায়া হে!—ভেব না যে, আমায় একেবারে অবাক করে দেবে। এ উত্তর-গো-গৃহে বৃহন্নলা বেশে কালযাপনের সময় সৈরিন্ধ্রীকে যে সঙ্গে আননি, সে ভালই করেছিলে; তা হলে হয় ত বেচারা আমাকেই কীচকবধ করে যেতে। এখন অজ্ঞাতবাসের শেষে উভয় হস্তে গাণ্ডীবজ্যা-নির্ঘোষ করিতে করিতে উত্তর গো-গৃহে কবে দেখা দেবে, বল দেখি? হে ভারতশ্রেষ্ঠ! স-সহধর্ম্মিণী তোমাকে দেখবার জন্য এখন আমরা অতিশয় ব্যাকুল। আমরা অর্থে আমি ও ইন্দু। ইন্দুর বুদ্ধি শোন—সে ইতিমধ্যে একটা অচিন্তনীয় কাণ্ড বাধিয়েছে। এই ২৫শে আমার বিয়ে। কনে দেখা টেখা ইন্দু কিছুই বাকী রাখেনি! তুমি সস্ত্রীক কবে আসছ? ইন্দুর আর একটি বিশেষ অনুরোধ,—প্রয়াগ তীর্থস্থান, জ্যেঠাইমাকে অবশ্যই সঙ্গে আনবে—অন্যথা না হয়। তোমাদের যেন দেরী না হয়; কেন না, ইন্দু একা। ইতি তোমার রমেশ।—পুঃ—তোমার মাথাটা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছে ত? ইন্দু সে জন্য চিন্তিত।" অতুলের পত্রপাঠ শেষ না হইতেই বাধা দিয়া কমলা বলিল, "তুমি এখানে আসার সময় যিনি সঙ্গে এসেছিলেন, তিনি রমেশ বাবু? তোমার ব্যারামের সময় তাঁর বোন জ্যাঠাইমাকে দু তিনখানা পত্র লিখে তোমার খবর নিয়েছেন; আজও আবার জ্যাঠাইমাকে কত করে' পত্র দিয়েছেন। তার নাম ইন্দুমতী—নাকি? তার ভাইয়ের বিয়েতে আমাদেরও ত যেতে হবে? ইন্দু নামটি বেশ!" অতুল কমলাকে নিকটে টানিয়া লইয়া মৃদু-কোমলস্বরে বলিল, "হাঁ, সে রমেশের বোন! সে আমারও দিদি।"

শ্রীনিরুপমা দেবী।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রতিভা। শ্রাবণ।—শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরীর 'মাতৃস্তোত্র' ব্যর্থ অনুকরণ—চর্ব্বিত-চর্ব্বণ। সেই হিমাচল, সেই সিন্ধুজল, সেই নীল অম্বর—সব আছে। কেবল কবিত্ব নাই' হৃদয়-তন্ত্রী ধ্বনিত করিবার শক্তি নাই। বড় কবিদের রচনায় সিঁধ কাটিয়া হিমাচলও সংগ্রহ করা যায়, কিন্তু বিধাতার ভাঁড়ার হইতে কবিত্ব বা শক্তি চুরী করিবার পথ অদ্যাবধি কোনও নকলনবীশ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। আজকালকার এই শ্রেণীর একঘেয়ে কবিতার ধ্বনির প্রতিধ্বনিও শুনিতে পাই না ; নির্লজ্জের ভ্যাংচানীই তাহার সর্ব্বস্ব। কবিকুলতিলক অবশ্য কালের দান, অসহ্য হইলেও অনিবার্য্য। ক্ষমতার অভাব শোচনীয় হইলেও লজ্জার বিষয় নয়। কিন্তু 'বড়বিদ্যা' যে ঘৃণার বস্তু। কবিযশ শুকলভ্যও নহে, চোর-ভোগ্যও নহে। শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহের 'বঙ্গের রঘুনাথ শিরোমণি' উল্লেখযোগ্য। এখনও সমাপ্ত হয় নাই। শ্রীকালিদাস রায়ের 'বর্ষাবিরহে' কবিত্বও নাই ; বিশেষত্বও নাই। ইনি বোধ হয়, যা লেখেন, তাই ছাপেন। ইঁহার অনেক কবিতায় শক্তির পরিচয় আছে। 'নন্দকুলচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার' যাঁহার রচনা, তিনিই কি বর্ষার বিরহে সহজবুদ্ধিটুকু অশ্রুজলে ভাসাইয়া দিয়া মামুলী ছন্দে এই কাব্য রচিয়াছেন? শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'রাখালের গান' পড়িয়া তৃপ্ত হইয়াছি। শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ 'প্রকাশে' কিছুই গোপন রাখেন নাই ; 'বুকের বাস টুটিয়া গেছে উতলা বাতাসে, আঁচলখানি ছড়ায়ে গেছে আকাশে।' কাহার, তাহা অবশ্য 'প্রকাশে'ও প্রকাশ নাই। কিন্তু কবির এই চরণটি অত্যন্ত সত্য,—'সরমহারা দাঁড়ানু আসি সবার সকাশে।' কবি যদি সরমটুকু খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে হাটে হাঁড়ী ভাঙ্গিতে হইত না। 'ফেল গো বসন ফেল, ঘুচাও অঞ্চল'র ফল ফলিতেছে! বিবসনা'র resurrection ! শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ 'ভারত-শিল্পের নব জাগরণে' L'Ant Decoratif নামক ফরাসী পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধের ইংরেজী সারসংগ্রহ হইতে 'ভারতীয় চিত্রকলা'র সমালোচনা সঙ্কলন করিয়াছেন। শুভ্র করের রচনা হইলেও, শিরোধার্য্য করিতে পারিলাম না। আমরা জানি, ইহা 'জাগরণ' নয়, দুঃস্বপ্ন। শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর ঘোষ 'পূর্ব্ববঙ্গের মেয়েলি শ্লোকে'র সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। প্রথমে সংগ্রহ, তাহার পর তুলনা, বিশ্লেষণ; তাহার পর তথ্য-উদ্ধারের চেষ্টা করিলে, বাঙ্গালা সাহিত্য সমৃদ্ধ হইতে পারে। শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত 'অসময়ে' যাহা লিখিয়াছেন, সুসময়ের জন্য তাহা সঞ্চয় করিয়া রাখিলে ক্ষতি হইত না। 'অসময়ে'র পূর্ব্বে 'কলমে' মেয়েলি ছড়ায় দেখিতেছি—'অধিক সন্তান যার, পাপের সাজা তার।' কিন্তু সাজায় যাঁহাদের ভয় নাই, তাঁহাদের জন্য বাঙ্গালা মাসিকের অনাথশালা আছে।

উদ্বোধন। শ্রাবণ।—'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' ও 'দেববাণী' চলিতেছে। 'কেদার-খণ্ডে স্বামি-সংবাদে' অনেক নূতন তথ্য ও সত্য আছে ; আর স্বামীজীর জীবনের এক অংশ উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'স্বামী বিবেকানন্দের পত্রে' আদেশ দেখিতেছি,—'তুমি বসে' বসে' একটা কাজ কর—বেদ থেকে আরম্ভ করে' সামান্য সামান্য পুরাণ তন্ত্র পর্য্যন্ত সৃষ্টি প্রলয় সম্বন্ধে, জাতি সম্বন্ধে, স্বর্গ, নরক, আত্মা, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি, ইন্দ্রিয়, মুক্তি, সংসার (পুনর্জ্জন্ম) সম্বন্ধে কি কি বলে, একত্র করতে থাক।' স্বামীজীর এ আদেশ এখনও অপূর্ণ রহিয়াছে, কে পালন করিবে, অগ্রসর হও। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী নিউইয়র্ক হইতে স্বামীজী লিখিয়াছিলেন,—'নিজেরা কিছু করে না, অপরে কিছু করতে গেলে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেয়, এই দোষেই আমাদের জাতের সর্ব্বনাশ হয়েছে। হৃদয়হীনতা, উদ্যমহীনতা সকল দুঃখের কারণ। অতএব, ঐ দুইটি পরিত্যাগ করিবে।' শ্রীমায়াময় মিত্রের 'চন্দ্রনাথ-ভ্রমণ' পড়িয়া

আমরা আনন্দলাভ করিয়াছি। রচনার আড়ম্বরের লেশমাত্র নাই। লেখকের সৌন্দর্য্য দেখিবার চক্ষু ও মাধুর্য্য অনুভব করিবার হৃদয় আছে। সহজ ভাষায় আঁকা সরল ভাবের সুন্দর ছবি পাঠকের চিত্তরঞ্জন করিবে।

প্রকৃতি। শ্রাবণ।—প্রথমেই 'প্রার্থনা'—'ধৃতি যদি দাও নাথ মোরে, দিও তবে ব্রাহ্মণের মত।' কিন্তু 'ধৃতি' কি 'প্রকৃতি'র পাঠক পাঠিকারা বুঝিতে পারিবে? এ কবিতা শিশুদের যোগ্য নহে। বিদ্যাসাগরের ছবিখানি সুন্দর হইয়াছে। 'দীনে দয়া' চলনসই গল্প। 'কে চোর'? পদ্য-গল্প; লোকের হাত কাঁচা। 'চিঠির তাড়া' কি, বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু 'দস্যু কাঁকড়া' সুখপাঠ্য। এইরূপ প্রবন্ধের আধিক্য বাঞ্ছনীয়।

বিক্রমপুর। দ্বিতীয় বর্ষ; তৃতীয় সংখ্যা। আষাঢ়।—শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষের "মাতৃশক্তি—ভারতীয় স্ত্রীমণ্ডলীর নিকট আবেদন" প্রবন্ধের মূল বক্তব্য কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। বিবিধ অবান্তর বিষয়ের অবতারণায়, উচ্ছ্বাসে ও উদ্দীপনায় অতিবিস্তৃতি-দোষ-দুষ্ট রচনাটি 'জমকালো' হইয়া থাকিবে, কিন্তু নিষ্ফল হইয়াছে। ভাষার স্বচ্ছতা অপেক্ষা কুহেলিকার আধিপত্য অধিক। এ 'আবেদন' সাধারণের বোধগম্য হয়, ইহা বোধ করি, লেখিকার ইচ্ছা নয়। 'মানুষ স্বতশ্চল, স্বৈরশাসক, তাহার আত্মবোধই তাহার চেতনার উদ্বর্ত্তনকেন্দ্র।' অভিধানের সাহায্যেও ইহার 'মর্ম্মাববোধ' দুষ্কর। 'চেতনার উদ্বর্ত্তনকেন্দ্র' প্রভৃতি রবীন্দ্র-পন্থীদের মুদ্রাদোষের অপচার – সাহিত্যে তাহাদের স্থান নাই, সার্থকতাও নাই। ভাষার অনাবশ্যক আড়ম্বরে ও কাব্যের ফেনায় কোনও সত্যই প্রতিপন্ন হইতে পারে না। 'পরগাছার মত সমাজবৃক্ষের বিশাল কাণ্ডের উপরে বাত্যাসঞ্চিত ধূলিস্তরের উপর গজাইয়া উঠিয়াছে, নিত্য কালের মানমন্দিরে তাহা একদিন অপরিহার্য্যতঃ ধরা পড়িবেই।' পরগাছা যে কাণ্ডের উপর সঞ্চিত ধূলিস্তরে জন্মগ্রহণ করে, উদ্ভিদশাস্ত্রের এ সত্যটুকু জীনীয়সও জানিতেন না, অধ্যাপক ডারউইন ও জগদীশচন্দ্রও জানেন না। আমরা জানিতাম, গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতুই মানমন্দিরে ধরা পড়ে; কিন্তু লেখিকা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, যাহা 'সভ্যকার প্রয়োজনের ভিতর জন্মলাভ করে নাই', তাহাও মানমন্দিরে 'অপরিহার্য্যতঃ ধরা পড়িবেই।' গ্যালিলিও, কোপর্ণিকস্, হার্শেল প্রভৃতিও এ সত্যের আভাস পান নাই! শুধু 'ধরা পড়া' নয়, তাহার উপর আবার 'অপরিহার্য্যতঃ'! কেবল যে নারীরই শক্তি আছে, এমন নয়; শব্দেরও শক্তি আছে। কিন্তু লেখিকা নারীর শক্তিতে এত অনুপ্রাণিত যে, শব্দ-শক্তির অস্তিত্বও ভুলিয়া গিয়াছেন;—সর্ব্বতোভাবে শব্দের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করিয়াছেন। 'মানুষের অন্তরের অন্তরতম তলে বিচেতনে যে আশঙ্কা জাগে'—ইহার অর্থ কি? 'বিচেতনে' কি বস্তু? 'ভারতবর্ষ সমাজকে যে উচ্চভূমির উপর উন্নয়ন করিয়াছিল, একা পুরুষই কি তাহার স্থিতি প্রদান করিয়াছিল?' 'ভারতের ইতিহাস এ সাক্ষ্য বহন করে না!' 'স্থিতিপ্রদান' ও 'সাক্ষ্যবহন' বাঙ্গালা নয়। 'এত বড় একটা শক্তির অপচার যে দেশ আপনার আলস্যলালিত নিশ্চেষ্টতার ভিতর পরম যত্নে পালন করিতেছে',—শুনিলে আতঙ্ক জন্মে! 'না জাগিলে সব ভারতললনা, এ ভারত আর জাগে না, জাগে না'—এ আর্ত্তনাদ বহুদিন শোনা যাইতেছে। লেখিকাও সেই মামুলী সত্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য এক প্রবন্ধে এত অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন যে, দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। সম্পাদক মহাশয় আগামী সংখ্যায় এই আবেদনের ভাষ্য ছাপাইলে আমরা অনুগৃহীত ও উপকৃত হইব। নারীগণকে কারাকূপ হইতে উদ্ধার করিবার প্রস্তাবে আমাদের আপত্তি নাই; আমরা কেবল একটি অঙ্গীকার চাহিব,—তাঁহারা কোমল করে এমনতর কঠোর, অসহ্য প্রবন্ধ-শক্তিশেল রচিবেন না। 'সংস্কৃত শাস্ত্রে বাঙ্গালী' ও 'রঘুরামপুরের পুষ্করিণী-খননের বিবরণ' উল্লেখযোগ্য। 'রামকৃষ্ণ সমালোচনা'য় সমালোচনা নাই। সমালোচক বলেন,—পরমহংসদেব 'ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন।' নূতন কথা; আমরা কখনও শুনি নাই। 'উদ্বোধন' কি বলেন? শ্রীনিশিকান্ত চক্রবর্ত্তীর 'বল তাঁর কেমন বরণ?' না ছাপিলে

মহাভারত অশুদ্ধ হইত না। আমাদের বিশ্বাস, কেহ এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবেন না। শ্রীযোগানন্দ গোস্বামী 'ঋণী' লিখিয়া ঋণশোধের চেষ্টা করিয়াছেন। 'ঋণী তব যাঁই, সে ঋণ শুধিতে পারি নাহিক ক্ষমতা।" অগত্যা কবিতা লিখিতে হইয়াছে। কবি যখন প্রবাসে যান, তখন 'তিনি' বলিয়াছিলেন,—'দু' ছত্র লিখিতে কভু ভুল না দাসীরে।' কিন্তু 'দু ছত্র যোড়কে চৌদ্দ ছত্র হয়।' আবার শুনুন,—

'এ মিনতি ম্লানমুখে মধুর ঝঙ্কার,
হৃদয়-নৈবেদ্য তব দিয়েছে আমারে।'

হৃদয়-নৈবেদ্যের ঝঙ্কার! রবীন্দ্রনাথের 'স্তন' ও বিশারদের 'বাটখারা' হারিয়াছে! গোস্বামী কবি যে সম্পাদক মহাশয়ের উপর স্বামিত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সে জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ! নতুবা এমন ঝঙ্কারে বঞ্চিত হইতাম।

বিজয়া। আষাঢ়।—প্রথমেই একখানি তিন রঙ্গে ছাপা ছবি। নন্দদুলাল ননী চুরী করিতেছেন, যশোদা যষ্টিহস্তে শাসন করিতে আসিতেছেন। নন্দলাল মাকে দেখিতে পাইয়াছেন, মুখে 'আবদেরে' ছেলে'র 'খাতির নাদারৎ' ভাবটুকু বেশ ফুটিয়াছে। কিন্তু যশোদার 'ভ্রুকুটীকুটিল' মুখের কঠোর ভাব পাহারাওয়ালার যোগ্য, বাৎসল্যের মন্দাকিনী মা যশোদার উপযুক্ত নয়। শ্রীঅনঙ্গমোহন ঘোষ 'রস ও রসের অভিব্যক্তি' প্রবন্ধে স্বয়ং বলিয়াছেন,—'রসের পরিচয় দিতে যাইয়া বহু কথা বলিয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু তবুও রসের একটা জ্যামিতিক সংজ্ঞা আপনাদের কাছে উপস্থিত করিতে পারিলাম না।' ইহা বিনয়ের উক্তি নয়, সত্য। বোধ হয়, এত প্রসঙ্গের অবতারণা না করিয়া, সংক্ষেপে মূল বিষয়ের অনুসরণ করিলে, লেখক সফল হইতে পারিতেন। অতিবিস্তৃতি ও আত্মবিস্মৃতি লেখকের বিষম শত্রু। ইহাদিগকে বিজয় করিয়া তবে কলম ধরিতে হয়। শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী 'ভারতীয় সাহিত্যের উৎপত্তি' নিবন্ধে যে সকল প্রতিপাদ্যের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা উপযুক্ত প্রমাণে প্রতিপন্ন নহে। লেখক এক একটি বাক্যে এক একটি বিবাদাস্পদীভূত বৈদিক ও ঐতিহাসিক বিতর্কের সমাধান করিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা বিশেষজ্ঞ সুধীসমাজ বিনা বিচারে শিরোধার্য্য করিবেন না। যথা,—'শ্রীরামচন্দ্র যে বৈদিক সুদাস রাজারই বংশধর, বৈদিক ঋষি-সম্প্রদায়ের নেতা বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রই যে রামচন্দ্রের কুলগুরু ও শিক্ষাগুরু, উপনিষদের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী রাজর্ষি জনকই যে তাঁহার শ্বশুর—তাহাতেই উহা যথেষ্টরূপে প্রতিপাদিত হয়।' 'উহা প্রতিপাদিত' করিবার পূর্ব্বে, পূর্ব্বোক্ত তথ্যগুলি প্রতিপন্ন করিতে হয়। এত সহজে 'আন্দাজ' করা যায়, [illegible] করা যায় না। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'ভিক্ষুক' গল্পটি মাঠে মারা [illegible]ছে। কিন্তু লেখকের ভাষায় বাহাদুরী আছে। যথা,—'হোসেনি এই ঘটনাটিতে দৈন্যম্লান [illegible] মৌনতায় বসিয়া থাকিত।' কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, লেখকের লেখনী [illegible] মৌনতায় বসিয়া' না থাকিয়া গল্প লিখিয়াছে। তাই আমরা 'পাগড়ীর উপর ঝুল্যমান অংশটি' দেখিতে পাইতেছি! ইহার কোথাও 'নড়চড়', আবার কোথাও 'তিন্তিড়ীতলে'! লেখকের তেঁতুলতলায় যাইতে সাহস হয় না—তাই তিনি 'তেঁতুলতলে'র সৃষ্টি করিয়াছেন! কিন্তু রূপে ভেদ থাকিলেও বস্তুতে ভেদ নাই; তাই বোধ করি গল্পটির গলায় ঘড়্-ঘড়্ শব্দ শোনা যাইতেছে। লিখিতে জানিলে লেখক আখ্যানবস্তুর সদ্ব্যবহার করিতে পারিতেন। পাহাড়িয়া পাখীর বোধ হয় স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্রের কবিতাকুঞ্জ দেখিবার কখনও সুযোগ হয় নাই। গিরিশচন্দ্রের 'ধুতুরা' বাঙ্গালা সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ। তাহার পর আর 'হিন্দু বিধবা'র এ তুলনার কোনও দরকার ছিল না। শ্রীকালিদাস রায় 'নিদাঘে' লিখিয়াছেন,—

'হ্রদের পঙ্ক শুখায়েছে আজ, শফরী পঙ্কে লুটে।
অতিদানে সাধু হয়েছে নিঃস্ব, অন্ন নাহিক জুটে।'

রায় কবি জানিয়া রাখিলে ক্ষতি নাই, এ উক্তি কবির পক্ষেও খাটে। তাঁহার অনেক কবিতায় 'অতিদানে'র ফল দেখিতে পাই। একবারে 'দেউলিয়া' হইবার পূর্ব্বে একটু সাবধান হইলে

ক্ষতি কি? বাঙ্গালা দেশে কবিতার দুর্ভিক্ষ কখনও হইবে না, কবিকে আমরা সে আশ্বাস দিতে পারি। ‘আসাম গোয়ালপাড়া এবং আসামীয়া ভাষা’ উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালী পড়িয়া দেখুন। ভাষাও জাতীয়তার ভিত্তি। শ্রীমোহিনীমোহন দাসের ‘চট্টগ্রামে জাহাজ-নির্ম্মাণ’ আমরা আগ্রহ ও আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছি। ‘মধুরেণ সমাপয়েৎ’ স্মরণ করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

‘গত ১লা চৈত্র রবিবার চট্টগ্রামের ধনিশ্রেষ্ঠ সওদাগর শ্রীযুক্ত আবদুল রহমান দোভাষী সাহেবের “আমীনাখাতুন” নামক একখানা বৃহৎ নূতন দেশীয় জাহাজ (Brig) জলে ভাসান (Launched) হইয়াছে।

‘কর্ণফুলী নদীতীরবর্ত্তী এক উচ্চ ভূমিখণ্ডে (কোন ‘ডকে’ নহে) উক্ত জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছিল। আমাদের দেশে সাধারণতঃ বড় বড় নৌকাদি যে ভাবে প্রস্তুত হয়, ইহাও সেই প্রকরণেই প্রস্তুত হইয়াছে।

‘অশিক্ষিত কারিগর দ্বারা এই প্রকার বৃহৎ জাহাজাদি নির্ম্মাণ-ব্যাপার ও জলে ভাসাইবার কৌশল যে অতীব প্রশংসনীয়, তাহা বলাই বাহুল্য।

এই জাহাজনির্ম্মাণ কার্য্য উক্ত অশিক্ষিত কারিগরদিগের পুরুষানুক্রমিক ব্যবসায়। পিতার নিকট পুত্র—মামার নিকট ভাগিনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া এই কার্য্য শিক্ষা করিয়া আসিতেছে—ইহাই তাহাদের কলেজ, ইহাই তাহাদের ইউনিভার্সিটী। অথচ এই জাহাজ দর্শন করিয়া গবর্মেণ্টের মেরিন সারভেয়ার স্বয়ং বলিয়াছেন যে, “ইহা কোনও অংশে বিলাতী জাহাজ (Ship) অপেক্ষা নির্ম্মাণকৌশলে হীন নহে। পারিপাট্যও তদনুরূপ। ইহাতে মোটর বা ইঞ্জিন সংযোগ করিলেই ষ্টিম-শিপ্ (Steamship) বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।”

‘এই সহরের দক্ষিণ দিকস্থ হালিসহর, পতেঙ্গা প্রভৃতি গ্রামে দেশীয় শিল্পিগণের অনেকগুলি জাহাজনির্ম্মাণের কারখানা ছিল। এই সমস্ত কারখানা দিবারাত্রি শিল্পিগণের হাতুড়ীর ঠক্ ঠক্ শব্দে মুখরিত থাকিত। প্রসিদ্ধ হাণ্টার সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন,—“এই জাহাজ-নির্ম্মাণের কারখানা ১৮৭৫ সন পর্য্যন্ত নিজের মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল।” ঐ সময়ের কিছু পূর্ব্বে এক হিন্দু সওদাগরের “বকলণ্ড” নামক জাহাজ এ দেশের নাবিক-পরিচালিত হইয়া স্কটলণ্ডের “টুইড” পর্য্যন্ত সফর দিয়া আসিয়াছে। ইংরেজ-রাজত্বের উষাসময়ে যখন এদেশীয় জাহাজ উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া সর্ব্বপ্রথমে ইংলণ্ড নগরের বন্দরে উপস্থিত হইয়া লঙ্গর ফেলিল, তখন ইংলণ্ডের বিস্মিত নরনারীর কণ্ঠ হইতে যে পরিব্যক্ত নিরাশার এবং ঈর্ষ্যার আওয়াজ বাহির হইয়াছিল, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিহাসের এক কোণায় তাহা [illegible] আছে।

‘আমাদের বর্ণিত “আমীনাখাতুন” নামক জাহাজ ৪০ জন শূদ্রজাতীয় মিস্ত্রী [illegible] বৎসর পরিশ্রম করিয়া প্রস্তুত করিয়াছে। ইহাদের সকলেরই বাড়ী উক্ত [illegible] গ্রামে। প্রধান মিস্ত্রীর নাম শ্রীকালীকুমার দে। গত ১৯১৩ ইং এপ্রিল মাসে তাহার নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয়, এবং ১৯১৪ ইং মার্চ্চ মাসের ১৫ই তারিখে জলে ভাসান হইল। আনুমানিক ৩০,০০০, ত্রিশ সহস্র টাকা এই জাহাজ-নির্ম্মাণে ব্যয় হইয়াছে। ইহা ৫।৬ হাজার মণ মাল বহন করিতে সক্ষম। ইহা অপেক্ষা দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বৃহৎ জাহাজ অদ্যাপিও চট্টগ্রামের সওদারগণের অধিকারে থাকিয়া বন্দরের শোভাসম্পদ জ্ঞাপন করিতেছে। যে সমস্ত তক্তা দ্বারা এই জাহাজ তৈয়ারী হইয়াছে, তাহা ৪।৫ ইঞ্চি পুরু।

‘জাহাজ প্রস্তুতকালে সর্ব্বপ্রথমে এই কারিগরেরা যে নক্সা (Plan) প্রস্তুত করে, তাহা এক বিরাট ব্যাপার। স্কেল করিয়া, কাঁটা, কম্পাস, সেটস্কোয়ার দিয়া, পার্চ্চমেণ্ট বা ড্রয়িং কাগজে রং বেরংএর চিত্র করিয়া Plan করা তাহাদের সাধ্য নাই, কাজেই যত বড় জাহাজ তৈয়ার হইবে, তত বড় একখানা বাঁশের চাটাই (এ ক্ষেত্রে ৮০ ফুট লম্বা ও ৩০ ফুট চওড়া একখানা চাটাই ব্যবহৃত হইয়াছিল) মাটিতে বিছাইয়া চকখড়ি দ্বারা জাহাজের নক্সা-চিত্র অঙ্কিত করে,

এবং পুনরায় তাহাতে পাকা রং (Paint) দিয়া দাগগুলি ফুটাইয়া তুলে। তৎপর সেই দাগে দাগে 'পিজবোর্ডের' (Paste-board) অার পাতলা তক্তা দ্বারা ফরম সকল তৈয়ার করিয়া লয়, এবং সেই ফর্মার মাপে জাহাজ তৈয়ার করে। অথচ জাহাজ গড়িতে ইহাদের কোনও প্রকার ব্যতিক্রম হয় না।

'সর্ব্বপ্রথমে জাহাজের দাঁড়া বা মেরুদণ্ড (keel) পত্তন করিয়া তাহা হইতে তক্তা গাঁথিয়া ক্রমে জাহাজের গর্ভ (hold) তৈয়ারী হইলে পরে, পাটাতন (deck), কেবিন (cabin) ইত্যাদি ও হাল, মাস্তুল প্রভৃতি তৈয়ারী হয়। এই জাহাজগুলির (Brig) সাধারণতঃ ২টী মাস্তুল থাকে ; মধ্যেরটী main-mast, সম্মুখেরটী fore-mast। আবশ্যকমত বাতাসের অবস্থা বুঝিয়া মাস্তুলের উপরও মাস্তুল চড়ান হয়। তাহাদের প্রত্যেকেরই পৃথক পৃথক নাম আছে। তাহার উপর রশারশি ইত্যাদি বাঁধিয়া পাল খাটানের বন্দোবস্ত করা হয়।

'এই সমস্ত জাহাজ সর্ব্বদাই দক্ষ নাবিকদিগের দ্বারা কেবল পাল খাটাইবার কৌশলে চালিত হইয়া থাকে। ইহা কেবল বাহির-সমুদ্রেই (Sea and ocean) চালিত হইয়া থাকে। গভীর ও বৃহৎ নদীপথেও কখনও কখনও দেখা যায়। কেবল পালের দ্বারা এই সমস্ত জাহাজকে সময় সময় কলের জাহাজকেও পরাস্ত করিতে দেখা গিয়াছে! আমরা হালিসহর-নিবাসী শ্রীযুক্ত উজীর আলী সওদাগরের নিজ মুখে শ্রুত হইয়াছি যে, তিনি তাঁহার সুবৃহৎ "রহেমানী" নামক জাহাজে চড়িয়া বহুবার ভারতমহাসাগরের উপকূলস্থ প্রায় সমস্ত বন্দর ও দ্বীপপুঞ্জ পরিভ্রমণ করিয়াছেন। একদা তিনি তাঁহার এই "রহেমানী" লইয়া অনুকূল বায়ুভরে চট্টগ্রাম বন্দর হইতে এক দিবসে রেঙ্গুন পঁহুছিয়াছিলেন। অতিক্রতগামী কলের জাহাজও তিন দিন-রাত্রির কমে এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে পারে না।

'আজিও শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরার স্থানে স্থানে কৃষকেরা হলকর্ষণকালে ভগ্ন জাহাজের মাস্তুল ও ভগ্ন অংশ সকল উত্তোলন করিতেছে। শ্রীহট্ট-কুলাউড়া-রেলপথে ভাটেরা টিলায় প্রাপ্ত শিলালিপির বর্ণিত বিশাল রণপোতের বহর ইত্যাদি কি? আজ শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা যে অতুলনীয় নৌশিল্প ও বহির্বাণিজ্যকে স্বপ্ন মনে করিতেছে, সমুদ্রতীরবর্ত্তী বাণিজ্যপ্রধান স্থান বলিয়া চট্টগ্রাম তাহা কোন প্রকারে রক্ষা করিয়া আসিতেছে, তাহাও বেশী দিন স্থায়ী হইবে বলিয়া মনে হয় না। কেবল চট্টগ্রাম কেন, সমস্ত ভারত হইতে এই শিল্পকার্য্যাবলী ক্রমে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। বিগত ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে চট্টগ্রামে এই একখানা জাহাজ তৈয়ার হইল।'

---*---

আমি সে প্রণয়ী ?

১

সত্য, লিখেছিনু আমি কবিতা অনেক
প্রথম যৌবনে ;
সে কেবল প্রেম-গাথা,—আমি যে লিখেছি,
বুঝিলে কেমনে ?

২

চাহ – চাহ মুখ-পানে ; এবে বৃদ্ধ আমি,
হে যৌবনময়ী !
কহ—কহ সত্য করি', কর কি বিশ্বাস,
আমি সে প্রণয়ী ?

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

মহিষমর্দ্দিনী।

"ধ্যায়েৎ কালীং মহাদৈত্য-যুদ্ধরাগ-মহোন্মুখীম্।
দক্ষিণে চক্রখড়্গৌ চ বাণং শূলং তথৈব চ॥
বামে খড়্গং তথা চর্ম্ম ধনুস্তর্জ্জনমেব চ।
বিভ্রতীং কালতীব্রোগ্র-মহিষাঙ্গ-নিবেদ্ধুষীম্॥
পীতাম্বরধরাং দেবীং পীনোন্নত-কুচদ্বয়াম্।
জটামুকুট-শোভাঢ্যং পিতৃভূমি-সুখাবহাম্॥"

মহিষমর্দ্দিনী কৃষ্ণবর্ণা,—যুদ্ধোৎসবোন্মুখী,—মহিষারূঢ়া,—পীতাম্বরধরা,—জটা-মুকুট-শোভান্বিতা,—শ্মশান-সুখাবহা। মহিষমর্দ্দিনী অষ্টভুজা,—দক্ষিণে ভুজ-চতুষ্টয়ে চক্র—খড়্গ—বাণ—শূল; বামে ভুজচতুষ্টয়ে খড়্গ—চর্ম্ম—ধনু এবং তর্জ্জন-মুদ্রা। বলা বাহুল্য, এই মূর্ত্তি দুর্গামূর্ত্তি হইতে পৃথক্।

যে প্রয়োজনে মহিষমর্দ্দিনী-মূর্ত্তির সেবা পূজা প্রচলিত হইয়াছিল, সে প্রয়োজন আর নাই। সুতরাং মহিষমর্দ্দিনীর পূজা ক্রমে ক্রমে অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আমাদের ইতিহাসের উপাদানরাশির মধ্যে এখনও মহিষমর্দ্দিনীর অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে পরিচয় বাঙ্গালীর বিস্মৃত কাহিনীর সহিত জড়িত হইয়া পুরাতন গ্রন্থের মধ্যে নীরবে কীটদষ্ট হইতেছে।

শ্রীমূর্ত্তির ও তাহার পূজাপদ্ধতির সঙ্গে দেশের ইতিহাসের কিরূপ নিগূঢ় সম্বন্ধ, তাহা কোনও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিতও ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়া-ছেন। মানবসমাজের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মাচরণ-পদ্ধতি তাহার বাসস্থানের ও বাসপ্রণালীর অনুরূপ হইয়া থাকে,—তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষার দর্পণ-রূপে প্রতিভাত হয়। ইহাই আধুনিক পণ্ডিতবর্গের সমীচীন সিদ্ধান্ত। আমাদের দেশের মূর্ত্তি-পূজার ইতিহাসে তাহার যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মহিষমর্দ্দিনী-পূজা অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। দুর্গাকে মহিষমর্দ্দিনী বলিয়া ধরিয়া লইতে হইলে, স্বীকার করিতে হইবে,—মহিষমর্দ্দিনীর পূজা অনেক বিষয়েই রূপান্তরিত হইয়া পড়িয়াছে। এই রূপান্তরের ইতিহাস কোথায়? ইহার কারণ কি? কোন্ সময় হইতে ইহার সূত্রপাত? তন্ত্রশাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা প্রচলিত না হইলে, এই সকল প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

যেখানে যুদ্ধ-রাগ, সেখানেই মা মহিষমর্দ্দিনীর খেলা। দেহরাজ্যের শ্রেয়ঃ-প্রেয়ের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধই হউক; আর ধরা-রাজ্যের হিংসাদ্বেষপূর্ণ নরশোণিত-পিপাসাই হউক;—যেখানে জয়পরাজয়ের কলহ-কোলাহল, সেখানেই মা মহিষ-মর্দ্দিনীর খেলা। এই খেলা সমগ্র সভ্যসমাজকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে। সেকালে আমাদের দেশে অনেক সময়েই এই খেলার আতিশয্য দেখিতে পাওয়া যাইত। কখনও বহিঃশত্রুর আক্রমণ, শক-হূণ-গুর্জ্জরগণের অভিযান,—কখনও বা অন্তর্বিপ্লবের প্রবল প্রতাপ,—দেশের মধ্যে যুদ্ধের প্রয়োজন, যুদ্ধ-রাগের গৌরব চিরজাগরূক করিয়া রাখিত।

সেকালের প্রয়োজনের অনুরূপ "যুদ্ধরাগ-মহোন্মুখী"-রূপে মা মহিষমর্দ্দিনী বামে-দক্ষিণে দুই হাতে দুইখানি খড়্গ ধরিয়া রণরঙ্গিণী-মূর্ত্তিতে ভক্তসমাজের পূজা গ্রহণ করিতেন। তাহার সহিত অন্যান্য হস্তে থাকিত,—চক্র, ধনুর্ব্বাণ, ত্রিশূল, চর্ম্ম এবং তর্জ্জন-মুদ্রা। "কুলচূড়ামণি" তন্ত্রে মা মহিষমর্দ্দিনীর এইরূপ ধ্যানই দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা প্রবন্ধের শিরোভাগে উদ্ধৃত হইয়াছে।

"কুলচূড়ামণি" কত দিনের গ্রন্থ, তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। তবে "বামকেশ্বর-তন্ত্রে" দেখিতে পাওয়া যায়,—যে চতুঃষষ্টি তন্ত্র মাতৃপূজার পক্ষে সর্ব্বোত্তম বলিয়া উল্লিখিত, "কুলচূড়ামণি" তাহার অন্তর্গত। রচনা-রীতিও তাহার পরিচয় প্রদান করে।

খৃষ্টীয় একাদশ-শতাব্দীর সম-সময়ে শ্রীমল্লক্ষ্মণদেশিকেন্দ্র "শারদাতিলক" নামক বিখ্যাত নিবন্ধ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তখন ভারতভাগ্যস্রোতে ভাঁটার টান অনুভূত হইয়াছে,—পঞ্চনদের পশ্চিমাংশে মুসলমানের নবশক্তি দিগ্বিজয়ের আয়োজনে ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছে। তখনকার নিবন্ধে মা মহিষ-মর্দ্দিনী একটু পরিবর্ত্তিত আকারে উল্লিখিত।

গারুড়োপল-সন্নিভাং মণিমৌলিকুণ্ডলমণ্ডিতাং
নৌমি ভাল-বিলোচনাং মহিষোত্তমাঙ্গ-নিষেদুষীম্।
চক্র-শঙ্খ-কৃপাণ-খেটক-বাণ-কার্ম্মুক-শূলকাং-
তর্জ্জনীমপি বিভ্রতীং নিজবাহুভিঃ শশিশেখরাম্॥

মা তখন "গারুড়োপলবর্ণা"—কৃষ্ণবর্ণের মধ্যে চাক্‌চিক্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। জটামুকুটের পরিবর্ত্তে "মণি-মৌলি" প্রভাব বিস্তার করিয়াছে,—ত্রিনেত্রও ললাটপটে স্থান লাভ করিয়াছে। অস্ত্রশস্ত্রের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। দুই হাতে দুইখানি খড়্গ নাই;—এক হাতে একখানিমাত্র কৃপাণ, আর

একখানির পরিবর্ত্তে "খেটক";—চর্ম্ম নাই, শঙ্খ আসিয়া রণনিনাদ মুখরিত করিতেছে। "তর্জ্জন" তর্জ্জনী হইয়াছে। নিবন্ধের সুযোগ্য টীকাকার স্বনামখ্যাত রাঘবভট্ট বুঝাইয়াছেন,—"তর্জ্জন" বা তর্জ্জনী অভয়-মুদ্রা। যথা,—

"তর্জ্জন্যেকাকিনী ভূর্দ্ধা শেষাঃ সম্মিলিতাস্ত্বধঃ।
মুদ্রেয়ং তর্জ্জনী প্রোক্তা বক্তৃ-শ্রোত্রো স্বতীতিদা॥

তাহার পর, যখন দেশ মুসলমান-শাসনের অধীন, তখনকার প্রধান নিবন্ধকার শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশও "তন্ত্রসারে" এইরূপ ধ্যানই লিখিয়া গিয়াছেন। "কুলচূড়ামণি"র প্রাচীন ধ্যান আর প্রচলিত নাই। "কুলচূড়ামণি"তে একটি স্তোত্র সংযুক্ত হইয়াছে। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়,—

"উর্দ্ধাধঃক্রমসব্যবামকরয়ো শ্চক্রং দরং কর্ত্তৃকাম্।
খেটং বাণধনু-স্ত্রিশূল-ভয়হৃন্মুদ্রাং দধানাং শিবাম্॥"

এখানে দুইখানি খড়্গই তিরোহিত, তাহার পরিবর্ত্তে কেবল এক হাতে একখানিমাত্র কাটারী (কর্ত্তৃকা);—"তর্জ্জনী" একেবারে "অভয়মুদ্রা"য় পরিণত;—তাহার অর্থ বুঝিবার জন্য আর রাঘবভট্টের টীকার শরণাপন্ন হইবার প্রয়োজন নাই। মহিষমর্দ্দিনী-মূর্ত্তির এই তিন প্রকার রণবেশ দেশের তিন অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্যই যেন দুই হাতের দুই খড়্গ ছাড়িয়া একখানি রাখিয়াছিল;—পরে তাহাকেও "কাটারী"তে পরিণত করিয়া লইয়াছিল! স্তোত্রটি "কুলচূড়ামণি"র অন্তর্গত হইলেও, "কুলচূড়ামণি"র মূলাংশের সহিত স্তোত্রাংশের সামঞ্জস্য নাই;—মনে হয়, স্তোত্রটি পরবর্ত্তী কালে সংযুক্ত,—তখন খড়্গ "কাটারী"তে পরিণত হইয়াছে। তথাপি তখনও প্রয়োজন ছিল বলিয়া, [illegible] পূজা প্রচলিত ছিল। এখন তাহাও তিরোহিত হইয়া গিয়াছে।

মুদ্রিত "তন্ত্রসারে" মহিষমর্দ্দিনীর স্তোত্রটি যে ভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে পাঠশুদ্ধি-সম্পাদনের জন্য যথাযোগ্য চেষ্টার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই স্তোত্রটি অনেক ঐতিহাসিক তথ্যের আধার। ইহাকে সেকালের "সামরিক স্তোত্র" নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। এই স্তোত্র ভক্তিভরে পাঠ করিয়া, সেনামণ্ডলী যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইত;—কারণ, ইহার ফলশ্রুতি, "রাজ্যলাভ এবং শত্রুজয়।" প্রয়োজনের অভাবে এই স্তোত্র আর পঠিত হয় না। ১৬৩৪ শকের হস্তলিখিত একখানিমাত্র "তন্ত্রসারে" দেখা গিয়াছে,—এই স্তোত্রটি "কুলচূড়ামণি"

হইতে উদ্ধৃত। মুদ্রিত "তন্ত্রসারে" এ কথার উল্লেখ নাই। মহারাজাধিরাজ নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র রায় রাজেন্দ্র বাহাদুরের সযত্নসংগৃহীত তন্ত্রগ্রন্থের মধ্যে যে "কুলচূড়ামণি তন্ত্র" আছে, তাহাতে এই স্তোত্রটি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ইহার বিশুদ্ধ পাঠ-সংকলনের জন্য, নানা স্থানের প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিয়া, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি যে ভাবে স্তোত্রটি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যুদ্ধের দিনে বিজয়-প্রার্থনার জন্য নানা স্থানে নানা ভাবে স্তব স্তুতি পঠিত হইতেছে। তাহার সহিত ইহাও সংযুক্ত হইবার যোগ্য। রচনা-গৌরবে এই স্তোত্র যেরূপ শ্রুতিসুখকর, ভাবগাম্ভীর্য্যেও ইহা সেইরূপ চিত্তোন্মাদক। মাননীয় আর্থার এভেলন ইহার একটি ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহা অদ্যাপি কবিতায় অনূদিত হয় নাই। বাঙ্গালী এখন যে মহা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত, তাহার বিজয়সাধনের জন্য রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত করিতেছে; সুতরাং মা মহিষমর্দ্দিনীর স্তোত্র আবার বাঙ্গালীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিতে পারে। ইহা ভীরুকে অভয়দান করে;—সাহসীর সাহসবর্দ্ধন করে;—যে পাঠ করে, এবং যে শ্রবণ করে, উভয়েরই অভ্যুদয়সাধন করে। এই স্তোত্র যখন ভক্তকণ্ঠে যথাযোগ্যভাবে ধ্বনিত হইয়া উঠে, তখন ইহার রচনা-নৈপুণ্য সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চসঞ্চার করে। যখন বাহুতে বল ছিল, তখন হৃদয়েও ভক্তির অভাব ছিল না, তখন কণ্ঠ নিরন্তর বিজয়গাথাই গান করিত। এই স্তোত্রে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সামরিক-উচ্ছ্বাসপূর্ণ এমন স্তোত্র স্তোত্রপ্রধান সংস্কৃত সাহিত্যেও বিরল। আধুনিক সভ্যসমাজও যুদ্ধযাত্রাকালে ভগবচ্চরণে বিজয়-প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া থাকে, কেহই নরশক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। কিন্তু সে বিজয়প্রার্থনার ভাষা এবং এই স্তোত্রের ভাষা একরূপ নহে;—তাহা মনুষ্যকণ্ঠের ক্ষীণ অপরিস্ফুট দুর্ব্বল আর্ত্তনাদ; ইহা দেবকণ্ঠের প্রবল পরাক্রান্ত বিজয়বাণী। মা মহিষমর্দ্দিনী করুন,—তাঁহার স্তোত্রপাঠের ফলশ্রুতি বর্ত্তমান জগদ্ব্যাপী যুদ্ধকলহের মধ্যে সফলতা লাভ করুক্।

মহিষমর্দ্দিনী-স্তোত্রম্।

নমিতে বর বরদে ! দূর্জিত-দুরাচার-প্রচণ্ডাসুরি !
বৈরং হারয় ভূরি-দুর্দ্ধর-দর্প্পশ্রীর্দ্ধি-সমাপদঃ।
তেনাদ্য নিরুপদ্রুতা নিরুপম-শ্রীপাদ-পদ্মাটবী-
সামান্যজনতোষণী মম মনীষা স্থিরং নন্দতু [১]

छित्वा चण्डि ! विरञ्च-दारुणपट-प्रोद्दाम-वक्षाकृति-
स्फायत्-कम्र-सुनिष्ठुरोदर-सटाटोपं महिषं सुरा: ।
मात स्त्वत्-पद्मपाद्म-पेशलपट्ट-श्रीपाद-संसेविनं
सेवन्ते करिवैरिणं किमपरैभि भौंति भंवेत् सेविन: [२]

चण्डि ! त्वद्विषयान्तराक्षरपदं श्रीमान्तर खेद गतं
तत्तत्त्वं पुरुष-प्रकृत्यनुगतं ब्रह्मादिभि र्गीयते ।
तस्माद्देवि ! समस्त-दैवतसुधा-सारैकधाम स्फुरत्-
श्रीमत्पादपयोजयुग्मन-परं मानस सम्भावय [३]

मन्निन्दा यदि वास्तु ते कुलपथाचारादरं मास्तु वा
कीर्त्तिं: कैशव-कौशिकासंगचरी नैवास्तु मत्सन्निधि: ।
मातर्ब्रह्महरि-स्मरारि-हुतभुग्-दैत्यारि-सेवास्पद-
श्रीमत्-पादपयोज-चिन्तन-विधौ चित्तं सदैवास्तु न: [४]

निर्द्दिष्टोऽस्मि यदि त्वदीय-पदयुक्-पूर्व्वापरौ-भावने
निर्द्दिष्टस्य तदा ममापि विरलं किम्वास्तु विद्यास्पदम् ।
तस्माद्देवि ! कृपाभराञ्चिततरं श्रीपादपद्मद्वयम्
मच्चित्तेऽचलसम्पदिं प्रसरतु क्षेमङ्करि ! चम्यताम् [५]

आत्मानं परिरभ्य भूतपति रप्युन्माद माधादित:
स्फारं जीवन-रक्षणे स च कृती नैवाभविष्यत् प्रभु: ।
देवाविच्युत-चन्द्र-चन्दनरस-प्रागल्भ्य-गर्भस्रव-
न्माध्वीपूर्ण-भवत्-पदैक-कमलामोदं न मास्वादित: [६]

हा हा मात रनादि-मोहजलधि-व्याहार-विद्धाखिल-
ब्रह्मानन्द-रसाभिषेक-विरस-स्वान्तोदरे मादृशि ।
युष्माकं सुरवृन्द-निर्भर-मनस्तापाभिभूतिक्षम:
श्रीमद्भक्तिरसातिदुर्द्दिन-परीवाह: सदा वर्षतु [७]

यत्पाद-स्फुरदंशुजाल-जठराक्रान्त-कोटि-स्फुरत्-
स्वान्त-ध्वान्त-विदारि निर्म्मलचिदानन्दमयं दैवतम् ।
सर्व्वं संसृजति क्षितिं वितनुते सृष्टिं पुनस्तुम्पति
मोक्षिणाचन-नीलनीरदमद चित्ते सदैवास्तु न: [८]

या ब्रह्माण्डिकचक्रवक्रकुटिलब्रह्माण्डविधावन्मल-
ध्वान्तः-प्रसरत्प्रभा-समधिरी देवं समाकर्षति ।
सा दुर्गा भव-दुर्ग-दुर्गतिहरा कामाख्यकामाविनी
हृत्पद्मे वतवैरि-दारणपटु श्रीकामाख्याह्लादिनी [९]

क्रुध्यत्-खेटक-चामराकुल-वलयक्रान्ताम्बराम्बर-
स्फायत्-सैन्यसिंहीमुखीविकटदन्तास्फालित-ताम्राम्बुधौ ।
झञ्झावात-विसर्पि-गर्जित-सिरः साटोप-दुष्टासुर-
मुह्यत्-सन्तविसृष्टशस्त्राखिल-[illegible]पाशोज्ज्वले [१०]

चलत्-काल-विराम-कालकल-नीलास्फाल-सम्पादकी-
न्मायन्माहिष-तिर्य्यगानतशिरः प्रक्रान्तरावे स्थिते ।
वक्षस्थे वसुपत्र-मध्यकलिते कंण्ठा स्रुती-मौक्तिकैः
हेम्ये चारु-रणाङ्गने रणमुदा घूर्णायमानाम्बरे [११]

ऊर्द्ध्वाधः-क्रम-सव्यवामकरयो खड्गं दरं कर्त्तृकाम्
खेटं चापधनु-स्त्रिशूल-मभयद्ममुद्रां दधानां शिवाम् ।
श्यामां नील-घनौघ-कुन्तलचय-प्रोन्नद्धजूटां स्खलद्-
घोराक्काल-लसत्-करालवदनां घोराट्टहासोद्भटाम् [१२]

एवं ये तव देवि मूर्त्तिं मनघां ध्यायन्ति दुर्गादिभिः
ब्रह्माद्यैरपि पूजितां परपुर-क्षोभादिकं कुर्व्वते ।
राज्यं प्रभुजयः सदर्थधिषणा काव्यामृतादर्शन-
स्तम्भोच्चाटन-मारणादिकृतिना तेषां स्वयं जायते [१३]

श्रीमं ते चरणारविन्दयुगलध्यानावधाना स्तवा
मन्त्रोद्धार-कृतोपचार-रचितं गूढोपदिष्टं यदि ।
ये शृण्वन्ति पठन्ति देवि ! तरसा श्री-नील-कामाख्य
तेषां वशगता भवन्ति जगतां मातर्नमस्ते जय [१४]

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

রমণী ও জননী।

সর্ব্বাগ্রে এই গানটি শুন :—

"দেহি মে আনন্দ,—আমার আহ্লাদিনি,—
একবার এসো এসো পিয়া, হৃদয়ে ধরিয়া,
নয়ন ভরে হেরি চাঁদ বদনখানি।
তুমি প্রেমময়ী, প্রেমের মহাজন,
তব প্রেমে বাঁধা আছে দেহ মন,
(আমি) জপি তব নাম, তুমি সে জীবন,
তব প্রেমে রাই হয়েছি ঋণী॥
তব প্রেমাস্বাদ আস্বাদিতে মন,
তব রূপ ধরি দেখিব কেমন,
কর, কর রাই, সে সাধ পূরণ,
বিনোদ বেশে মোরে সাজাও বিনোদিনি।
(আমার) চাঁচর চিকুরে বাঁধিয়া কবরী,
মালতীর মালা তাহে দেও বেড়ী,
(তোমার) যে বেশে মোর মন মোহিত কিশোরি,
সেই বেশে মোরে সাজাও হে ধনি॥
(আমার) নীলবরণে আমায় নীল শাটী পরাও,
সীমন্তে সিন্দুর বিন্দু দিয়ে দাও,
(তুমি) নাগর হয়ে ধনি, (আমায়) একবার কোলে লও,
(আমি) বসন ঝাঁপি মুখে হই গো মানিনী॥

পুরুষ যখন প্রকৃতির রসে রসিক হইয়া কতকটা আত্মহারা হইয়া উঠেন, প্রকৃতির সহিত নিজের স্বতন্ত্রানুভূতিকে মিলাইয়া ডুবাইয়া রাখিতে চাহেন, মধুর রসের মোহে যখন "অহমস্মি"—পুরুষকারের এই বোধটা লীলানাটপাটনকরী হ্লাদিনীর সহিত এক হইয়া যায়, তখনই এমনই আব্দারের গান বাহির হয়। কথাটা গোলোকের গুপ্ত আনন্দধামের; যখন দুই জনে দুই জনের ভাবে বিভোর, যখন শ্রীমতী "ভাবিতে ভাবিতে রাই কানু হয়ে ভেসে যায়", যখন পাষলের জলে,

মসৃণ পদ্মরাগে, কঙ্কণের কষিত কাঞ্চন-আভায় স্বীয় চাঁদ-মুখ দেখিতে যাইয়া কেবলই কানুর-শত-চাঁদ-নিঙড়ান সুধামাখান মুখখানিই দেখিতে পাইয়া শ্রীমতী নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ স্থির করিয়া আত্মারামে প্রমত্ত হন; যখন, পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণ রাই-রূপের মাধুরী স্বীয় দেহে ফুটাইতে সদা ব্যস্ত,—গানটা তখনকার ভাব লইয়া রচিত। যখন মতি, গতি, নতি, বুদ্ধি, চিতি, স্বস্তি, হ্রী, ঋদ্ধি—এই অষ্ট সখী ফুটিয়া উঠেন নাই, যখন হৃদ্‌বৃন্দাবনে, দেহরূপ গোলোকে, কেবল তুমি আর আমি বিরাজিত,—নবীন নাগর নবীনা নাগরীর নবীনতায় মুগ্ধ, নবীনা নবীনের নিত্য নূতনত্বে আত্মহারা,—যখন "জনম অবধি হাম সে রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল", যখন উভয়ে উভয়কে দেখিতে দেখিতে উভয়েই যেন নয়নময় হইয়া উঠিয়াছেন,—যখন মধুর রসের প্রথম বিন্দু জিরেন-কাটের রসের মত, প্রদোষের প্রথম শিশিরবিন্দুর মত, হৃদ্‌ভাণ্ডে আসিয়া সঞ্চিত হইতেছে—গানটা তখনকারই। লীলানাট্যের পূর্ব্বে, প্রকৃতির বিস্তৃতির পূর্ব্বে যখন কেবল দুই জন ছাড়া তিন জন নাই, তখনকার গুপ্ত কথাটা আর একটু ফুটাইয়া বলিব। মহাপ্রলয়ের পরে যখন বিশ্বসংসার কারণ-বারিধি-গর্ভে সম্মূঢ়; যখন কিছু নাই, আছে কেবল অনন্ত শক্তির সমতা, সুতরাং স্থবিরতা; যখন বিকাশ নাই, বুদ্‌বুদ নাই, শক্তির ক্রিয়া নাই, লীলা নাই—সবই সম্মূঢ় ও সূক্ষ্ম তত্ত্বে লীন; তখন "অহমস্মি"—আমি আছি, একটা বিরাট আমিত্বের অস্তিত্বের জ্ঞান যেন জাগিয়া থাকে। সে আমি কে? সত্যং জ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম—সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দময় চিদ্‌ঘন ব্রহ্মরূপ। সেই ব্রহ্মে কল্পকল্পান্তরের কত মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বেকার কত অতীত সৃষ্টিলীলার সংস্কাররাশি সঞ্চিত রহিয়াছে। সৃষ্টি ও নাশ, নাশ ও সৃষ্টি—এই পরম্পরা অনন্ত, অপরিমেয়, অসংখ্য; সুতরাং ব্রহ্ম কখনই সৃষ্টিসংস্কারবর্জ্জিত নহেন। এই সংস্কারবশে একমেবাদ্বিতীয়ম্, এই জ্ঞানের উপর একোঽহং বহু স্যামঃ—এই জ্ঞানটা পরম্পরা অনুসারে ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদের মতন যেন স্বতঃই ফুটিয়া উঠে। এক আমি বহু হইব, জ্ঞানের এই বুদ্‌বুদ্‌টি ফুটিয়া উঠিলেই বুঝিতে হইবে, শক্তির ক্রীড়া আরব্ধ হইল। শক্তি প্রকৃতি-রূপে পুরুষের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন, কুণ্ডলিনী জগজ্জননীরূপে শিবজ্ঞানের চারি দিক বেষ্টন করিয়া শতদল পদ্মের ন্যায় প্রস্ফুটিতা হইলেন, নবনটবর শ্যামসুন্দরের পার্শ্বে নবীনা নাগরী শ্রীমতী আসিয়া দাঁড়াইলেন। এক দুই হইল, এইবার দুই হইতে বহুর—অসংখ্যের উৎপত্তি হইবে। ইহাই সৃষ্টির গোড়ার কথা।

দেহতত্ত্বের দিক দিয়া বুঝিতে হইলে বুঝিতে হইবে যে, বালক রক্তকণ

শিশু, ততক্ষণ সে আপনার ভাবে, আপনার খেলায় মুগ্ধ। যখন বালকের হৃদয়ে এক আমি বহু হইবার সাধ ফুটিয়া উঠে, তখন সে নবীন, কিশোরে পরিণত হয়, সঙ্গে সঙ্গে নবীনা কিশোরীও তাহার বামে আসিয়া দাঁড়ায়। তাহার হৃদয়ে পুরুষ ও প্রকৃতির লীলানাট্য বালারুণসমুদ্ভাসিত সৃষ্টি-নাট্যের ন্যায় ফুটিয়া উঠে। তখন যুবক জনক হইতে চাহে, নিজকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া শতধা বিভক্ত করিয়া বহুত্বের আস্বাদে প্রমত্ত হইতে চাহে। ইহাই সৃষ্টিরহস্যের আদি লীলা সর্ব্বত্র, সর্ব্বজীবে, সর্ব্বপদার্থে সমভাবে পরিস্ফুট। তন্ত্র বলিতেছেন যে, "ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি, তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে;"—যাহা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, তাহা আছে দেহ-ভাণ্ডে। ব্রহ্মাণ্ডে নিত্য যে লীলা হইতেছে, নিত্য প্রতি দেহঘটে জীবদেহে সেই লীলাই হইতেছে। ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে—গুপ্তবৃন্দাবনধামে—শ্রীরাধা-কৃষ্ণের নিত্য লীলা হইতেছে; দেহভাণ্ডের কেন্দ্রে—হৃদ্‌বৃন্দাবনধামেও—ঠাকুর ঠাকুরাণী সেই একই ভাবে লীলা করিতেছেন। কারণ, দেহভাণ্ড হইল ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণযন্ত্র;—দেহের সাহায্যেই আমি ব্রহ্মাণ্ডের অনুভূতি করিয়া থাকি। দেহের স্নায়ুবিস্তার, এবং ইন্দ্রিয়গ্রাম আমাকে ব্রহ্মাণ্ড চিনাইয়া—বুঝাইয়া দিতেছে। তাই শাস্ত্রের সকল সিদ্ধান্ত দেহতত্ত্বের ও বিশ্বতত্ত্বের সহিত সমঞ্জসীকৃত।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, শক্তি যখন প্রথম ফুটিয়া উঠেন, তখন তিনি রমণী-রূপে ফুটিয়া উঠেন, না জননী-রূপে দেখা দেন? তন্ত্র বলিতেছেন যে, শক্তি সর্ব্বদাই শিবপ্রসূতি—বিশ্বজননী। "অহমস্মি"—এই শিবজ্ঞানটাই মায়ের লীলায় প্রসূত। পুরাণ অর্থবাদের আবরণে বলিতেছেন যে, কারণ-সমুদ্রের তীরে পূর্ব্বকল্পের শিবের শবদেহ ভাসিয়া আইসে—কল্পান্তরের সংস্কাররাশি, সমঞ্জসীভূত শক্তিসাগরে শবাকারে ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া যায়, আদ্যাশক্তি সেই সদাশিবকে তুলিয়া আত্মস্থ করিয়া নূতন শিবকে প্রসব করেন। তাহার পর শিবশক্তি-সমন্বয়ে সৃষ্টি-বৈচিত্র্য প্রকট হয়। এই প্রকটনকালেই জননী—রমণী—মোহিনী—শিবসুন্দরী। মধুর রসের রসিক বৈষ্ণব বলেন, না, এ কথা ঠিক নহে। আগে বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের লীলা, তাহার পর মথুরায় সৃষ্টি, দ্বারকায় বিসৃষ্টি। বৈষ্ণব বলেন, মহাপ্রলয়েও সব এক হইয়া যায় না, দুই থাকেই; পুরুষ প্রকৃতি অবিনশ্বর; শ্রীরাধাকৃষ্ণ নিত্যবিদ্যমান—অখণ্ড, অনন্ত, অবিচ্যুত; তাই তাঁহার নাম অচ্যুত, তিনি কখনই চ্যুত, পরিভ্রষ্ট হন না। শ্রীরাধার সহিত তাঁহার মিলন নিত্যকালসাপেক্ষ। সদ্যঃপ্রসূত শিশু যখন মহাঘোরে আচ্ছন্ন, তখনও তাহার দ্বৈতভাব পরিস্ফুট, তখনও সে জননীর

স্তন্যপান করে, না পাইলে রোদন করে। সুতরাং প্রকৃতি গোড়া হইতেই রমণী, রমণী বলিয়াই পরে তিনি জননী হইতে পারেন। কিন্তু যে ক্ষেত্রে কেবল মাধুরীর আদান-প্রদান, সে বৃন্দাবনে তিনি নিতুই রমণী, কখনই জননী নহেন। মাতৃত্বের বিকাশ হইলেই প্রেম স্নেহে ও ভক্তিতে পরিণত হয়। স্নেহ ও ভক্তি লইয়া বৃন্দাবনলীলা নহে; প্রেম ও মধুর রস বৃন্দাবনের উপাদান। যখন প্রেমের পরিবর্ত্তে স্নেহ ও ভক্তি দেখা দেয়, তখন শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুতে পরিণত হন—পালন-কর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা, বিধাতা পুরুষ হইয়া দাঁড়ান। তখন বাঁশী নাই, হাসি নাই, লীলা নাই, বিরহ নাই, মান নাই, রস নাই;—থাকে কেবল কর্ত্তা-গৃহিণীর ঘর গৃহস্থলী। সে ত বৃন্দাবনের বার্ত্তা নহে, মধুর রসের কথাও নহে; এখন ঘরকন্নার ভাবে বাঙ্গালার বৈষ্ণব মজিয়া নাই। বাঙ্গালার বৈষ্ণব কেবল মজিয়া আছে এই ভাবে—দেহি মে আনন্দ, আমার আহ্লাদিনী। হ্লাদিনী তুমি, তুমি আমায় সেই আনন্দ দাও, যাহাতে আমি তোমাময় হইতে পারি—কতকটা তদাকার-কারিত, তদ্ভাবভাবুক, তবরসরসিক হইয়া তোমার প্রেমে ডুবিতে পারি। আত্মাশক্তির স্ত্রীত্বের মাধুরী এই ভাবেই ষোলকলায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি যখন বিশ্বমোহিনী, তখন পুরুষ প্রকৃতির লেপবশাৎ, অনন্ত কালের সংস্কারবশাৎ, তাঁহার রূপে, তাঁহার মোহে এতটাই মুগ্ধ হয় যে, তন্ময় হইতে চাহে। মোহিনী-মোহনের এই ভাবটাকে তন্ত্র ভীষণ আকার দিয়াছেন। ছিন্নমস্তা-রূপে এই বিপরীত রতির ভাবটা, নিজের মাথা কাটিয়া নিজের রসে প্রকৃতির পিপাসা মিটাইবার সাধটা, প্রকৃতিকে বুকে তুলিয়া প্রকট করিয়া, পুরুষের আত্মদানের ভাবটা ফুটাইয়াছেন। তন্ত্র বলিতেছেন যে, ব্যাপারটাকে অত মধুর করিও না, মানুষ পাগল হইয়া উঠিবে, কামসমুদ্রের কীট হইবে; মাতৃত্বের পথে উহার ভীষণতা ফুটাইয়া দেখাও; জীব সে দৃশ্য দেখিয়া সংযত হইবে, কদাপি জীবত্বের গণ্ডীর বাহিরে যাইতে চাহিবে না।

ইহা হইতেই কামধেনু তন্ত্রে কামিনী-তত্ত্বের ব্যাখ্যা হইয়াছে। তন্ত্র বলিতেছেন—

"মাতা সা সর্ব্বদেবানাং কৈবল্যপদদায়িনী।
কৈবল্যং প্রপদে যস্যাঃ কামিনী সা প্রকীর্ত্তিতা॥
জবাযাবকসিন্দুরসদৃশীং কামিনীং পরাং।
চতুর্ভুজাং ত্রিনেত্রাং বাহুবল্লীবিরাজিতাং।

উৎপত্তেঃ কারণং ভূমেদে বানাকৈব পার্ব্বতি।

* * *

সর্ব্বেষাং জঙ্গমাদীনাং স্থাবরাণাস্তু যোগিনী
দেবতা মাতৃকামায়া সৃষ্টি-ি ত্যন্তকারিণী॥

তিনি কামিনী বটে, রমণী বটে, কিন্তু তিনি সর্ব্বজীবপ্রসূতি, সৃষ্টিস্থিতির উৎপত্তির কারণ। তাই তিনি নারীরূপে সর্ব্বজীবে ও সর্ব্বভূতে বিরাজমানা। তিনি যখন মোহিনী-কামিনী, তখন তিনি হাবভাব-ছলাকলা-পটীয়সী। তাঁহার সেই ছলাকলার আকর্ষণে শিব আকৃষ্ট হন, তখন সৃষ্টি-বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠে। যত জীব তত শিব, যত নারী তত রমণী—ততই জননী ততই আদ্যাশক্তি। কেবল তাহাই নহে, প্রতি দেহে, প্রত্যেক জীবদেহে পুংস্ব ও স্ত্রীত্ব—হরগৌরী মিলিতাঙ্গ হইয়া নিত্য বিদ্যমান। প্রকৃতির লীলা-প্রকটন জন্যই জীবসৃষ্টি, ভূতসৃষ্টি, স্থাবর জঙ্গম সকলের সৃষ্টি। ভক্তগণ, সাধকগণ প্রকৃতির এই নারীত্ব বা মাতৃত্বকে অবলম্বন করিয়া তাঁহারই আরাধনা করিয়া থাকেন। তাই ব্রহ্মানন্দ গিরি তীর্থাবধূত মহোদয় বলিতেছেন—

"মঙ্গলাংসি সর্ব্বেষাং তেন ত্বং সর্ব্বমঙ্গলা।
বরদাসি চ মর্ত্ত্যানাং বরদা তেন কীর্ত্ত্যসে।
অশেষং জয়সে দুর্গা দুর্গা তেন নিগদ্যসে।
ভক্তানাং শঙ্করাসি ত্বং শঙ্করী ত্বন্তু গীয়সে॥
সংসারার্ণবমগ্নানাং সর্ব্বেষাং প্রাণিনামিহ।
চণ্ডিকৈকা পরা পোতো নরাণাং মুক্তয়ে সদা।"

তুমিই সর্ব্বমঙ্গলা, তুমিই দুর্গা, তুমিই বরদা, তুমিই শঙ্করী, তুমিই চণ্ডী, তুমিই পার্ব্বতী—ভাবময়ী দেবী তুমি, ভাবের ঘরে বসিয়া সাধককে ভাবসাগরে ডুবাইয়া রাখ। তাই নারীরূপে জননী তুমি। জায়া হইয়াও তুমি জননী, কেন না আত্মজের প্রসূতি—এক আমি, আমাকে বহুতে পরিণত করিবার আধার-রূপা তুমি। আবার বহু হইতে আমিত্বের সংগ্রহ করিয়া সোহহং ভাবের প্রচারক তুমিই। রমণীই জননী, জননীই রমণী; নহিলে সৃষ্টিরক্ষা হয় কিসে! এই সৃষ্টির মাধুরী ছানিয়া তুলিলে তুমি হ্লাদিনী,—বৃন্দাবন বিহারিণী শ্রীমতী, স্নেহরূপে তুমি জননী। এক তুমি নানা রূপে ও ভাবে প্রকট হইয়া সৃষ্টির লীলা সাধন করিতেছ।

"একৈব হি মহামায়া নামভেদং সমাশ্রিতা।"

রমণী কি ভাবপরম্পরায় জননীরূপা হইয়া দাঁড়ান, তাহা একটি একটি করিয়া খুলিয়া বলিলাম না; ইঙ্গিতেই সকল কথা বলিয়া দিলাম। তন্ত্রের স্পষ্ট নিষেধ না থাকিলে, কতকটা আইনে না বাধিলে, কামধেনু তন্ত্রের রমণীতত্ত্ব এবং মাতৃত্বের উদ্বোধনতত্ত্ব খুলিয়া বলিতে পারিতাম। আমাদের দুর্গোৎসবের দশভুজা প্রতিমা এই দুই তত্ত্বের সমন্বয়-ফলে সমুদ্ভাসিতা। তাই কথাটা ইঙ্গিতেই বলিয়া রাখিলাম। দুর্গোৎসব ভাবের পূজা—মাটীর পুঁতুলের পূজা নহে। ভাবুক বাঙ্গালী অমিয়মাখা বিস্মৃত ভাবটুকু ধরিতে ও বুঝিতে পারিলে আমার শ্রম সার্থক হইবে,—"ফণী ধ'রে খেলা"র বিপদ্ হইতে আমি পরিত্রাণ পাইব। আবার বুঝিবে কি ?

"ডুব দে মন কালী বলে'
হৃদ্-রত্নাকরের অগাধ জলে।"

একবার ডুবিয়া দেখ না—কোন রূপে মা কামিনী, কোন রূপে তিনি জগজ্জননী ?

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমতটের রাজধানী।

"ন রোচতে চেষ্টিমুখে ক্রিয়া তে
বিপ্রত্যয়া তাং প্রতি বুদ্ধিরস্তু।"

সপ্তম-শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে [৬৩০-৬৪৪ খৃঃ অঃ], চীনদেশীয় বৌদ্ধপরিব্রাজক ইউয়ান্ চোয়াঙ্ ভারতবর্ষের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের কিছুকাল পূর্ব্বে, পূর্ব্বভারতের প্রদেশসমূহ পরিদর্শন করিবার সময়ে, তিনি প্রাচ্যভারতের যে যে প্রদেশে পর্য্যটন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে চারিটি প্রদেশ প্রধানভাবে উল্লিখিত, যথা—পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, কর্ণসুবর্ণ, সমতট ও তাম্রলিপ্ত। কিন্তু বাঙ্গলার যে সীমান্তদেশ হইতে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে সে দেশের নাম Ka-chu-wo-k'i-lo [কজঙ্গল] রূপে উল্লিখিত। কানিংহামের মতে, এই দেশ কাঙ্কজোল বা বর্ত্তমান রাজমহল। তাহা হইলে বলিতে হয় যে, ইউয়ান্ চোয়াঙ্ সেকালের বাঙ্গালায় পাঁচটি বিভিন্ন প্রদেশ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। পরিব্রাজক উল্লেখ

করিয়াছেন (১) যে, এই শেষোক্ত [কজঙ্গলা] প্রদেশের প্রাচীন রাজবংশ, তাঁহার তথায় আগমনের পূর্ব্বেই, লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, এবং সেই জন্য প্রদেশটি তখন নিকটবর্ত্তী [চম্পেশ্বরের (?) বা গৌড়েশ্বরের (?)] রাজ্যের অধীন হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, এই প্রদেশের রাজধানী পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকায়, উত্তরাপথের একচ্ছত্রাধিপতি সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন, ভ্রাতৃহন্তা গৌড়াধিপ শশাঙ্কের বিরুদ্ধে পূর্ব্বভারতে অভিযান-সময়ে, পথিমধ্যে এই লোকশূন্য নগরে একটি রাজসভা বসাইয়াছিলেন। বাঙ্গালার সেই চারিটি বিভাগকে ইউয়ান্ চোয়াঙ্ "প্রদেশ" বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু সেই সেই প্রদেশের রাজধানীগুলিরও [নামোল্লেখ ব্যতিরেকে] কিছু কিছু বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেই জন্যই, বোধ হয়, "গৌড়রাজমালা"-প্রণেতা অগ্রজপ্রতিম চন্দ মহাশয় পুণ্ড্রবর্দ্ধন প্রভৃতি স্থান-চতুষ্টয়কে সেই সেই প্রদেশের রাজধানী বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। (২) পরিব্রাজক, বাঙ্গালা ব্যতীত ভারতের অন্যান্য ভাগেরও 'প্রদেশ'-বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে নামোল্লেখ না করিয়া সেই সেই প্রদেশের রাজ-ধানী-গুলিরও বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে সহজে এইরূপ অনুমিত হইতে পারে যে, তিনি রাজধানীগুলিকে প্রদেশগুলির নাম-বিশিষ্ট ধরিয়া লইয়াছিলেন, নচেৎ সেগুলির পৃথক্ নাম নির্দ্দিষ্ট করিতেন। তিনি কর্ণসুবর্ণ প্রদেশের রাজা শশাঙ্কের নাম ব্যতীত, অপরাপর প্রদেশের শাসনকারী রাজগণের নামের উল্লেখ করেন নাই। চন্দ মহাশয় অনুমান করিয়াছেন যে, "পুণ্ড্রবর্দ্ধন, সমতট এবং তাম্রলিপ্তের প্রাচীন রাজবংশ, সম্ভবতঃ, শশাঙ্ক কর্ত্তৃক উন্মূলিত হইয়াছিল, এবং কর্ণসুবর্ণে শশাঙ্কের [অজ্ঞাতনামা ?] উত্তরাধিকারী, হর্ষবর্দ্ধন কর্ত্তৃক সিংহাসন-চ্যুত হইয়াছিলেন।" তাঁহার এই অনুমান যথাযথ বলিয়াই বোধ হয়; কারণ, এক দিকে যেমন সমসাময়িক পরিব্রাজকের ভ্রমণ-বিবরণে, অপর দিকে তেমনই সম্রাজ্-সভাকবি-বাণভট্ট-বিরচিত "হর্ষচরিত" নামক সমসাময়িক গ্রন্থেও, আমরা সমতটাদি প্রদেশের রাজগণের নামোল্লেখ পাই নাই। মনে হয়, শশাঙ্কই সেই সমস্ত রাজগণের উচ্ছেদসাধন করিয়া "গৌড়াধিপ" উপাধিতে নিজেকে বিভূষিত করিয়া স্বশত্রু সম্রাটের আগমন অপেক্ষা করিতেছিলেন। সে যাহা হউক, সম্প্রতি পূর্ব্ববঙ্গে কুমিল্লার নিকটবর্ত্তী বড়কামতা নামক স্থানে উৎকীর্ণ-শিলালিপি-সমন্বিত একটি ভগ্ন নর্ত্তেশ্বর মূর্ত্তির আবিষ্কারের পর হইতে, সপ্তমশতাব্দীতে ও তাহার

(১) Watters, Vol II, p. 183.

(২) গৌড়-রাজমালা, ১০ পৃষ্ঠা।

পূর্ব্ববর্ত্তী ও তাহার পরবর্ত্তী শতাব্দীসমূহে, সমতট প্রদেশের সীমা ও তাহার রাজধানীর স্থাননির্দ্দেশ সম্বন্ধে বহু আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে সমতট-প্রদেশ আমাদের আলোচ্য। বিগত ১৩২০ বঙ্গাব্দের, চৈত্রমাসের "প্রতিভা" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্. এ. মহাশয় "পূর্ব্ববঙ্গের একটি বিস্মৃত জনপদ" শীর্ষক প্রবন্ধে, প্রাচীন সমতট ও উহার রাজধানীর স্থান-নির্দ্দেশ সম্বন্ধে বহুকথা শুনাইয়াছেন, এবং নবাবিষ্কৃত নর্ত্তেশ্বর-মূর্ত্তির পাদপীঠস্থ ক্ষোদিত লিপির সাহায্যে, আসরফপুরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনদ্বয়ে উল্লিখিত খড়্গ-বংশীয় বৌদ্ধ-রাজগণের আবির্ভাব-কাল, রাজ্যবিস্তার ও তদ্বংশ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়া কয়েকটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

পুরাতত্ত্বানুসন্ধানকারী পণ্ডিতগণের মতে, সমতট, বঙ্গ ও হরিকেল—এই তিনটি শব্দ একই প্রদেশের নামান্তর-রূপে গৃহীত হইতেছে। আধুনিক বাঙ্গালা-দেশের পূর্ব্বাঞ্চলকে [সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ধরিয়া] সেকালের সমতট, বা বঙ্গ, বা হরিকেল প্রদেশ বুঝিতে হইবে। ভট্টশালী মহাশয় কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট সমতটের সীমা প্রায় ঠিক হইলেও, কেহ কেহ তাহাতে কিঞ্চিৎ আপত্তি করিতে পারেন। তন্নির্দ্দিষ্ট সীমা হইতে তাঁহারা ত্রিপুরা জিলাকে পৃথক্ ধরিয়া লইতে চাহিবেন; কারণ, প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ সমতটের কিঞ্চিৎ উত্তর-পূর্ব্ব-স্থিত চীনপরিব্রাজকো-ল্লিখিত "শ্রীক্ষেত্র" বা "শ্রীক্ষত্র" দেশকে বর্ত্তমান ত্রিপুরা জিলার অংশবিশেষ বলিয়া ধার্য্য করেন। (১) অতএব একালের পূর্ব্ববঙ্গের বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকা, ত্রিপুরার কতক অংশ, নোয়াখালী এবং পশ্চিমবঙ্গের খুলনা জিলার কতক-অংশ লইয়া, সেকালের সমতট বা বঙ্গ বা হরিকেল প্রদেশের সীমানির্দ্দেশ করিতে হইবে। বরাহ-মিহির মিথিলা ও ওড্র দেশের নামের সহিত সমতট প্রদেশেরও নাম উল্লেখ করিয়াছেন। (২) 'সমতট' এই প্রদেশের নাম আমরা সর্ব্বপ্রথম সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের [৪র্থ শতাব্দীর] এলাহাবাদ-প্রস্তর-স্তম্ভলিপিতে প্রাপ্ত হইলেও, 'বঙ্গ'-রূপে ইহার নাম আমরা আরও প্রাক্তন পুস্তকাদিতে উল্লিখিত দেখিতে পাই। শিষ্যগণ কোনও প্রকারের গৃহে বাস করিতে পারিবেন কি না—এই প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধদেব 'বঙ্গদেশে' ব্যবহৃত একপ্রকার গৃহ-বিশেষে বাস করিতে পারিবেন বলিয়া তাঁহাদিগকে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন,—পালি

(১) "Srikshatra according to the pilgrim's information should correspond roughly to the Tipperah district".—Watters, Vol II, p. 189.

(২) বৃহৎ-সংহিতা—১৪ অঃ; ৬ শ্লোঃ।

বিনয়পিটকে এইরূপ বিবরণ পাঠ করা যায়। (১) অন্ততঃ মহাভারত-কারের সময়েও এই দেশের 'বঙ্গ' নাম থাকা সম্ভব। যথা—

"বঙ্গা বঙ্গাঃ কলিঙ্গাশ্চ যকৃল্লোমান এব চ।
মল্লাঃ সুদেষ্ণাঃ প্রহ্লাদা মাহিকাঃ শশিকাস্তথা।" (২)

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও আমরা বঙ্গদেশের শ্বেতস্নিগ্ধ দুকূলের কথা উল্লিখিত দেখিতে পাই। যথা—"বাঙ্গকং শ্বেতং স্নিগ্ধং দুকূলম্।" (৩) কালিদাসেরও পূর্ব্ববর্ত্তী মহাকবি ভাস বুদ্ধের জীবিতাবস্থায় অবন্তির শাসনকর্ত্তা প্রদ্যোতের সমসাময়িক ব্যক্তিরূপে, এক বঙ্গ-নৃপতির উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—

"অস্মৎসম্বন্ধো মাগধঃ কাশিরাজো বাঙ্গঃ সৌরাষ্ট্রো মৈথিলঃ শূরসেনঃ।" (৪)

পঞ্চম শতাব্দীতেও এই প্রদেশ 'বঙ্গ'-নামেই অভিহিত হইত। যথা,—

"বক্ষোদ্বর্ত্তয়তঃ প্রতীপমুরসা শত্রূন্ সমেত্যাগতান্
বঙ্গেষাহব-বর্ত্তিনোভিলিখিতা খড়্গেন কীর্ত্তির্ভুজে।" ইত্যাদি (৫)

এই প্রদেশের "হরিকেল" নামটি প্রথমতঃ আমরা চীন পরিব্রাজক ইৎসিঙ্গের ভারত পরিভ্রমণ-বৃত্তান্তে উল্লিখিত দেখিতে পাই। তিনি সিংহল হইতে সমুদ্রপথে উত্তর-পূর্ব্বদিকে নৌ-যোগে যাইতে যাইতে, পূর্ব্বভারতের পূর্ব্বসীমা "হরিকেল" দেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন;—এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। (৬) হেমচন্দ্রের অভিধান হইতে আমরা 'হরিকেল' শব্দটিকে 'বঙ্গের'ই নামান্তর-রূপে বুঝিতে পারি। যথা,—

"বঙ্গাস্তু হরিকেলীয়াঃ।" (৭)

একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতেও যে 'হরিকেল' শব্দটি লুপ্ত হয় নাই, সম্প্রতি তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। যথা,—

"আধারো হরিকেল-রাজ-ককুদ-চ্ছত্র-স্মিতানাং শ্রিয়াম্।" ইত্যাদি। (৮) পরবর্ত্তী কালের প্রাচীন লিপিতে ও সংস্কৃত সাহিত্যে 'বঙ্গ' শব্দটির অধিক প্রচলন

(১) Culla-Vagga vi. I.—Buddhism in Translation (Harvard University), p. 412.

(২) মহাভারত—ভীষ্মপর্ব্ব, ৯ম অঃ। ৪৬ শ্লোঃ।

(৩) অর্থশাস্ত্র—২ অধিঃ। ১১ অঃ।

(৪) প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ। ২য় অঙ্ক। ৮ম শ্লোঃ।

(৫) মেহরৌলি লৌহস্তম্ভ-লিপি। Fleet's Gupta Inscriptions. p. xlvi.

(৬) Takakusu's I'tsing, Oxford, 1896, p. xlvi.

(৭) অভিধান-চিন্তামণি—৯৫৭ শ্লোঃ।

(৮) বিক্রমপুরের শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসন। ৫ম শ্লোঃ। সাহিত্য, ১৩২০, ভাদ্র।

দেখা গেলেও, 'সমতট' শব্দটিও একবারে পরিত্যক্ত হইতে পারে নাই, তাহার প্রমাণরূপে আমরা ভাগলপুরে আবিষ্কৃত নারায়ণপালের তাম্রশাসনের (১) "সৎ সমতট-জন্মা" শিল্পীর কথা উল্লেখ করিয়া, ত্রিপুরা জিলার বাঘৌরা গ্রামে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্ত্তির পাদপীঠে সমুৎকীর্ণ মহীপাল দেবের রাজ্যসংবৎ-সমন্বিত লিপিরও উল্লেখ করিতে পারি। যথা,—

"সমতটে বিলকীয়কীয়-পরমবৈষ্ণব"—ইত্যাদি (২)

শ্রীহর্ষের রাজত্ব-সময়ে ও তাঁহার পরলোক-গমনের পর স্থানীয় সামন্ত-রাজগণ কর্ত্তৃক আত্মপ্রাধান্য-স্থাপন-চেষ্টার সময়ে, এই সমতট, বা বঙ্গ, বা হরিকেল প্রদেশ কোন্ রাজবংশের শাসনাধীন ছিল, এবং সেই রাজবংশের রাজধানীই বা কোথায় সংস্থাপিত ছিল, অতঃপর তাহারই কিঞ্চিৎ সমালোচনা করি।

'গৌড়রাজমালা'-প্রণেতার মতানুসরণ করিয়া পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সম্রাট শ্রীহর্ষের রাজ্যসময়ে, সম্ভবতঃ, কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক সমতটাদি বাঙ্গালার প্রদেশগুলিকে নিজশাসনাধীনে আনিয়া "গৌড়েশ্বর" উপাধি ধারণ-পূর্ব্বক সম্রাটের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তৎপরে, তাঁহার মৃত্যুর পরে, তদীয় অজ্ঞাতনামা উত্তরাধিকারীর হস্ত হইতে রাজ্য কাড়িয়া লইয়া শ্রীহর্ষ, হয় ত, স্ববন্ধু কামরূপাধিপতি ভাস্করবর্ম্মার হস্তে প্রদান করিয়া থাকিবেন। কর্ণসুবর্ণ-বাসক হইতে প্রদত্ত ভাস্করবর্ম্মার নবাবিষ্কৃত পঞ্চখণ্ডের তাম্রশাসন পাঠ করিয়া আমরা এইরূপ অনুমান করিলেও করিতে পারি। (৩) কিন্তু, বিগত সালের চৈত্রমাসের "প্রতিভা" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত ভট্টশালী মহাশয় অনেক বিচারের পর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "আসরফপুরের তাম্রশাসনের ভূমি-দাতা মহারাজ (?) দেবখড়্গ হর্ষের সমসাময়িক রাজা", এবং তিনিই সমতটের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনকারী প্রমাণ-রূপে তিনি দুইটি কথার উল্লেখ করিয়াছেন। (১) শ্রীহর্ষের বাঁশমারা ও মধুবনে প্রাপ্ত তাম্রলিপিদ্বয়ের ও আশরফপুরে প্রাপ্ত তাম্রলিপিদ্বয়ের অক্ষরের আনুরূপ্য ও (২) চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিঙ্গ [৬৭১—৬৯৫ খৃঃ অঃ] কর্ত্তৃক সমতট প্রদেশের "রাজভট"-নামা এক বৌদ্ধ নরপতির উল্লেখ।

(১) গৌড়লেখমালা—৮২ পৃষ্ঠা

(২) Dacca Review, Vol 4, may, 1914.

(৩) Dacca Review—June, 1913, Vide my Paper on "A newly-discovered copper-plate inscription of King Bhaskaravarman of Kamarupa."

ভট্টশালী মহাশয় আসরফপুর তাম্রশাসনে ব্যবহৃত অক্ষরের সহিত শ্রীহর্ষের তাম্রশাসনদ্বয়ের ও সমতটের কিঞ্চিৎপরবর্ত্তী কালের রাজা আদিত্যসেনের সাহাপুর ও আপসড-শিলালিপির অক্ষরসাদৃশ্য আছে বলিয়া, যেরূপ দৃঢ়তার সহিত স্বমত বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন, এবং তৎপ্রসঙ্গে ৺ রাজা রাজেন্দ্রলাল ও ৺ গঙ্গা-মোহনের উপর যেরূপ কটাক্ষপাত করিয়াছেন, তাহা সুসঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। লিপিতত্ত্ব-পারদর্শিতায় সেই উভয় মহাত্মাই বড় কম ছিলেন না। সে যাহা হউক, অক্ষর-হিসাবে দেবখড়্গের আসরফপুর-লিপিকে শ্রীহর্ষের পরবর্ত্তী কালেই ধরিতে হইবে বলিয়া বোধ হয়, এবং সপ্তম শতাব্দীর যে সকল লিপিমালা Fleet সাহেবের পুস্তকে বা অন্যান্য তাম্রশাসনাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়, তৎপর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে নিঃসংশয়ে বলিতে হয় যে, শ্রীহর্ষের তাম্র-শাসন-লিপি, ভাস্কর-বর্ম্মার [পঞ্চখণ্ডে প্রাপ্ত] তাম্রশাসনলিপি, [ত্রিপুরায় প্রাপ্ত] সামন্তরাজ লোক-নাথের তাম্র-শাসনলিপি, এমন কি, আদিত্যসেনের শিলালিপিও, আসরফপুরের তাম্রশাসনলিপি অপেক্ষা প্রাচীনতর। স্বর্গীয় লস্কর মহাশয় সেই লিপির কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। (১) ষষ্ঠ শতাব্দীর অক্ষরে প্রাচীন-তালপত্র-লিখিত প্রজ্ঞা-পারমিতা প্রভৃতি বৌদ্ধ-ধর্ম্মগ্রন্থ-সমূহের মোক্ষ-মূলার-সম্পাদিত [গোতীর্থ হইতে প্রকাশিত] পুস্তকের (২) পরিশিষ্টাংশে, ভারতীয় লিপিতত্ত্বের প্রধান গুরু বুল্‌হার মহোদয় যে তালিকা [Plate VI] সংযোজিত করিয়াছেন, তাহার অক্ষরাবলীর সহিত মিলাইলে বলিতে হয় যে, আসরফপুর-শাসনের খ, গ, শ প্রভৃতি অক্ষরগুলির উপরিভাগ প্রাচীন কালের লিপির ন্যায় চ্যাপ্‌টা না হইয়া, গোলাকৃতি ধারণ করিয়াছে, এবং সপ্তম-শতাব্দীর অক্ষরে যেরূপ ছেনির [wedge] আকার দৃষ্ট হয়, আলোচ্যমান শাসনের অক্ষরে তদ্রূপ দৃষ্ট হয় না। যদ্যপি প্রাচীনতর লিপির ন্যায় প, ম ও য প্রভৃতি অক্ষরের উপরিভাগ খোলা, তথাপি ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত সংযুক্ত আ, ই, ঈ, এ ও ওকারের চিহ্ন পূর্ব্ববর্ত্তী কালের ন্যায় মাত্রার উপরে না হইয়া, পরবর্ত্তী কালের ন্যায় মাত্রা হইতে প্রলম্বমান, প্রতীয়মান হয়। এই শাসনের ত, র, ট ও লকার কিছু বেশী অর্ব্বাচীন ঢঙের। পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রীহর্ষ, ভাস্কর বর্ম্মা, আদিত্যসেন, লোক-নাথ প্রভৃতির লিপিসমূহ-

(১) "Palæographic considerations would lead us to place these inscriptions in the 8th or 9th century A. D."—Memoirs. A. S. B., Vol. I, p. 86.

(২) Anecdota Oxoniensia—Aryan Series, Vol. I., Part III.

হইতে দেবখড়্গের লিপিতে মাত্রার ক্রমিক বিকাশ অধিকতর। এই সমস্ত কারণেই আসরফপুরের লিপিকাল সপ্তমশতাব্দীর না হইয়া কিছু পরবর্ত্তী কালেরই হইবে—এইরূপ সিদ্ধান্ত অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। বিশেষতঃ, বুল্‌হারের অক্ষর-তালিকা অনুসারে, এই লিপির অক্ষরের সহিত ১৫৩ শ্রীহর্ষসংবতের নেপাল-লিপির ও ৬৭৩ শকসংবতের সামনগড়-শাসনলিপির অক্ষরের অধিক সাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হয়। লিপিতে উপাধ্মানীয় এবং জিহ্বামূলীয় চিহ্ন আদৌ ব্যবহৃত হয় নাই। সুতরাং, অক্ষর-হিসাবে আমাদের মনে হয় যে, আসরফপুর-তাম্রশাসনের প্রতিপাদয়িতা দেবখড়্গ ও তদ্বংশীয় বৌদ্ধ-রাজগণ, শ্রীহর্ষের পরলোকগমনের পর, যখন স্থানীয় রাজগণ "মাৎস্য-ন্যায়" অনুসারে স্বস্বপ্রধান হইয়া উঠিতেছিলেন, সেই সময়েই, সম্ভবতঃ, পূর্ব্ববঙ্গের পূর্ব্বাঞ্চলে রাজত্ব করিতেছিলেন। খড়্গ-বংশীয় রাজগণের নামের পূর্ব্বে "পরমভট্টারক, পরমেশ্বর" প্রভৃতি সার্ব্বভৌমত্ব-সূচক কোনও উপাধি দেখা যায় না। ইহা হইতেও মনে করা যাইতে পারে যে, তাঁহারা স্বল্পবিস্তর স্থান লইয়াই রাজ্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা "সমতটের মহারাজ" ছিলেন, এইরূপ উক্তি তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় না; সুতরাং উহাকে ভট্টশালী মহাশয়ের স্বকপোল-কল্পিত উক্তি বলিয়াই মনে করিতে হয়। পরলোকগত লস্কর মহাশয়ও লিখিয়া গিয়াছেন যে,—"These kings were local kings of no very extensive dominion".—অথচ ভট্টশালী মহাশয়ের মতে, "রাজরাজভট্ট" ও তাঁহার পিতা দেবখড়্গ ও পিতামহ জাতখড়্গ প্রভৃতি বৌদ্ধ নৃপতিগণ সকলেই "সমতটের রাজা" ছিলেন।

বৌদ্ধ নৃপতি দেবখড়্গকে শ্রীহর্ষের সমসাময়িক সমতট-রাজ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবার কারণরূপে উল্লিখিত ভট্টশালী মহাশয়ের দ্বিতীয় কথা,—চীন পরিব্রাজক ইৎসিঙ্গ কর্ত্তৃক সমতট প্রদেশের "রাজভট্ট" নামা এক বৌদ্ধ রাজার উল্লেখ। তিনি অনুমান করেন যে, এই "রাজভট্ট" ও আসরফপুর-শাসনদ্বয়ে উল্লিখিত দেবখড়্গের পুত্র একই ব্যক্তি। আসরফপুরের প্রথম তাম্রশাসনে আমরা দেবখড়্গ-পুত্রকে "রাজরাজভট্ট"-রূপে, এবং দ্বিতীয় তাম্রশাসনে কেবল "রাজরাজঃ"-রূপে উল্লিখিত, পাইতেছি। এই দুই স্থলে উল্লিখিত রাজাকে একই ব্যক্তি বলিয়া 'ধরিয়া লইতে অনেকেরই আপত্তি হইবে। তবে উভয় স্থলেই তাঁহাকে পরমবৌদ্ধ-রূপেই বর্ণিত পাওয়া যায়, এইমাত্র তুল্যতা। ইৎসিঙ্গ কর্ত্তৃক উল্লিখিত সমতটের রাজা "রাজভট্ট"কে কেহ কেহ দেবখড়্গের পুত্র "রাজরাজভট্ট" বা "রাজরাজঃ" বলিয়া ধরিয়া লইতে স্বীকার করিয়া,

আসরফপুর-লিপিকে অষ্টম-শতাব্দীর লিপি না বলিয়া সপ্তম-শতাব্দীর শেষ-ভাগের লিপি বলিয়া গ্রহণ করিলেও, "সমতটের রাজধানী"র স্থান-নির্দ্দেশ সম্বন্ধে ভট্টশালী মহাশয় যে কৌতুকাবহ সিদ্ধান্তের প্রচার করিয়াছেন, তাহা, বিনা আপত্তিতে, কেহই স্বীকার করিবেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না।

তাঁহার সিদ্ধান্তটি এই,—"কুমিল্লার নিকটবর্ত্তী কর্ম্মান্ত-নগর এই বৃহৎ রাজ্যের [সমতটের] রাজধানী ছিল।" তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, কুমিল্লার প্রায় ১০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত "বড়কামতা" নামক স্থানে আবিষ্কৃত নটেশ শিবমূর্ত্তির পাদপীঠস্থ ক্ষোদিত লিপিতে, তিনি এই "কর্ম্মান্ত নামক নগরের উল্লেখ পাইয়াছেন।" আমরা কিন্তু অনুসন্ধান-"কর্ম্মের অন্ত" করিয়াও সেই লিপিতে "কর্ম্মান্ত" বলিয়া কোনও নগরের উল্লেখ পাইলাম না। "বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনী"র সপ্তম অধিবেশনে ইতিহাস-শাখার সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার মৈত্রেয় মহাশয় তাঁহার অভিভাষণের এক স্থানে বলিয়াছিলেন যে, "তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, পূর্ব্বসংস্কার সুসংযত করিতে হয়,—ইচ্ছা অনিচ্ছা বিসর্জ্জন দিতে হয়,—ব্যক্তিগত, সম্প্রদায়গত, বা দেশগত আশা আকাঙ্ক্ষাকে অনুসন্ধানলব্ধ প্রমাণপরম্পরার অধীন করিবার উপযুক্ত অকাতর উদারতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।" সংস্কার সংযত না করিতে পারিয়া, ভট্টশালী মহাশয় নিজপ্রমাদে সকলকে প্রমাদ-গ্রস্ত করিবার উপক্রম করিয়াছেন। প্রত্যেক ভাষারই একটি নিজস্ব (Genius) ও বিশেষত্ব (Idiom) আছে,—তাহা ভাল করিয়া লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। তজ্জন্যই সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিষয়ের বিচার করিতে হইলে, অতি সন্তর্পণেই বিচার করা আবশ্যক। সংস্কৃত ভাষা অতীব দুরূহ ভাষা ; এই ভাষায় অত্যন্তশিক্ষিত হইলেও কেহই তাহাতে নিজকে অভ্রান্ত মনে করিতে সাহস করেন না। স্বর্গীয় লস্কর মহাশয় লিখিয়াছেন যে, পরবর্ত্তী কালে নূতন তথ্য আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত, কেবল অক্ষর-বিচার করিয়া, আসরফপুরের লিপিতে উল্লিখিত খড়্গবংশীয় বৌদ্ধ-রাজগণের কাল-নির্ণয় সম্ভব নহে। কুমিল্লার নর্ত্তেশ্বর মূর্ত্তির পাদ-পীঠ-লিপির আবিষ্কার ভট্টশালী মহাশয়ের নিকট খড়্গবংশীয় রাজগণের সময়-নির্ণয়ের উপযোগী বলিয়া বোধ হওয়ায়, তিনি সেই "শিলালিপির সাহায্যে, কর্ম্মান্তের (?) খড়্গ-বংশ কোন সময়ে অভ্যুদিত হইয়াছিল? কত দূর পর্য্যন্ত তাহাদের রাজ্য বিস্তৃত ছিল? কিরূপে খড়্গ বংশের পতন হয়?...... এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা" করিয়াছেন। সে চেষ্টায় সবিশেষ ফললাভ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।

আসরফপুর-শাসন-দ্বয়ে ও কুমিল্লার শিলালিপিতে "কর্ম্মান্ত"-শব্দটির উল্লেখ ভট্টশালী মহাশয়ের ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের কারণ হইয়াছিল। আসরফপুরের প্রথম শাসনের শেষ পঙ্‌ক্তিতে লিখিত আছে,—

"লিখিতং জয়-কর্ম্মান্তবাসকে পরম-সৌগতোপাসক-পুরদাসেন", এবং দ্বিতীয় শাসনের ধর্ম্মানুশংসিনী শ্লোকাবলীর পর লিখিত আছে,—

"জয়-কর্ম্মান্তবাসকাৎ লিখিতং পরম-সৌগত-পুরদাসেনেতি।" "জয়-কর্ম্মান্ত-বাসকে" [এবং তথা হইতে] লিপিদ্বয় লিখিত হইয়াছিল মাত্র। লেখক সৌগত পুরদাস। কোন্ রাজধানী বা নগর হইতে রাজা "সমাজ্ঞাপয়তি"—আদেশ করিতেছেন,—লিপিদ্বয়ে তাহার কোনও উল্লেখ আদৌ নাই। স্বর্গীয় গঙ্গামোহন ভ্রান্তভাবে মনে করিয়াছিলেন যে, "Both the charters were *issued* (?) in the same year (Samvat 13) from the place Jaya-Karmanta-Vasaka".—অর্থাৎ, "রাজ্যের ত্রয়োদশ বর্ষে, রাজা "জয়-কর্ম্মান্ত-বসাক" (স্থান) হইতে দানাদেশ করিয়াছিলেন"। ইহা হইতে ভট্টশালী মহাশয়ও মনে করিয়া লইয়াছেন যে, খড়্গবংশীয়গণ "কর্ম্মান্ত-নামক নগর" হইতে সমতটের রাজ্য পরিচালন করিতেন। কুমিল্লায় অনুসন্ধান-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকার সময়ে, হঠাৎ নটেশ শিবমূর্ত্তির পাদ-পীঠ-লিপিতে সেই "কর্ম্মান্ত" নগরটি ও তাহার "রাজা"র নাম পাইবামাত্রই, তিনি "কর্ম্মান্তের খড়্গবংশীয়" রাজগণের সহিত কুমিল্লার ক্ষোদিত লিপিতে উল্লিখিত "কর্ম্মান্ত" রাজগণের সম্বন্ধ-স্থাপন কার্য্যে ব্রতী হইয়া থাকিবেন। ফলে, তিনি অনেক নূতন নূতন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সমস্ত কথার সম্যক্ আলোচনা করিতে হইলে, পূর্ব্বে নর্ত্তেশ্বর-মূর্ত্তির পাদ-পীঠ-লিপির পাঠ পাঠকগণের নয়ন-সম্মুখে উপস্থাপিত হওয়া আবশ্যক।

[পাঠ।]

১। ওঁ। শ্রীমল্লড (?) হচন্দ্র-দেবপাদীয়-বিজয়রাজ্যে অষ্টা……ষ্ণ চতুর্দ্দশ্যাং (?) তিথৌ বৃহস্পতিবারে ব (পূ) ষ্য-নক্ষত্রে কুর্ম্মান্ত-পাল-শ্রী

২। কুসুম-দেব-সুত-শ্রীভাবুদে [ব]-কারিত-শ্রী নর্ত্তেশ্বর-ভট্টা…[চন্দ্রশর্ম্মা ?] আষাঢ়দিনে ১৪॥ খনিতঞ্চ রাতাকেন সর্ব্বাক্ষরঃ (রং]। খনিতঞ্চ শ্রীমধুসূদনেতি॥

বিগত এপ্রেল মাসে ঢাকানগরীতে বাসকালে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ইতিহাসের অন্যতম অধ্যাপক, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার

এম্. এ. মহাশয়ের সঙ্গে ঢাকা-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে রক্ষিত এই মূর্ত্তির পাদ-পীঠস্থ লিপিটির যে পাঠ মূলানুগত মনে করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলাম, উপরে তাহা তদ্রূপেই উদ্ধৃত হইল। শ্রীযুক্ত ভট্টশালী মহাশয় ওঁকারের সাঙ্কেতিক চিহ্নটির কথা তাঁহার প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করেন নাই। তাহা "লডল" বা "লদহ" বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহাকে তিনি "লয়হ" রূপে পাঠ করিয়াছেন। লিপির অন্যান্য "য়"-কার দেখিয়া "লয়হ" পাঠ মূলানুগত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।" "চতুর্দ্দশ্যা তিথৌ"—ভুল পাঠ। "চতুর্দ্দশ্যাং" বলিয়া সংশোধিত করা উচিত ছিল। লিপিতে "পুষ্য" নক্ষত্রই আছে। "পুষ্যা" শব্দটি অধিক প্রচলিত বলিয়া ভট্টশালী মহাশয় এ স্থলে ব্যবহৃত "পুষ্য" শব্দটিতে আকার সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। "স্বত"—সুত হইবে। "ভাবুদেব" কুসুমদেবের (সুত) সারথি ছিলেন না; তাঁহার (সুত) পুত্র ছিলেন। লিপিতে ছয়বার প্রযুক্ত "র"-অক্ষরের সহিত মিলাইয়া "ভাবুদেবকে" "ভারুদেব" কেহই পড়িতে চাহিবেন না। "সর্ব্বাক্ষরঃ" অনুস্বার-যুক্ত করিয়া সংশোধিত হইলে অনেকটা সঙ্গত হইত। সে যাহা হউক, পাঠ সম্বন্ধে এই কয়েকটি কথা অতি সামান্য কথা। কিন্তু লিপির অনুবাদ কেহই বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করিবেন বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না।

ভট্টশালী মহাশয় "অষ্টা......" ইত্যাদি অংশের অনুবাদ "অষ্টাদশ বৎসর" বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন; কিন্তু "অষ্টা......" ইহার পরবর্ত্তী অংশ লুপ্ত হওয়ায়, "অষ্টাদশ" বা "অষ্টাবিংশতি" ইত্যাদিও হইতে পারে ত? কর্ম্মান্তপাল শ্রীকুসুমদেব-সুত শ্রীভাবুদেব"—এই সমাসাবদ্ধ পদের অনুবাদেই আমাদের গুরুতর আপত্তি। কুসুমদেবকে তিনি "কর্ম্মান্ত-রাজ"-রূপে অনুবাদ করিয়াছেন;—এই ব্যক্তি কর্ম্মান্তের [তন্নামধেয় নগরের] রাজা, ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত। আসরফপুর-শাসনদ্বয়ে "জয়কর্ম্মান্ত-বাসক" শব্দে যে কর্ম্মান্তের উল্লেখ আছে, এবং যে "কর্ম্মান্ত"কে সেই স্থলে তিনি সমতটের রাজধানী "কর্ম্মান্ত নগর" বলিয়া প্রমাণের পূর্ব্বেই সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছিলেন,—আলোচ্য শিলালিপির "কর্ম্মান্ত-পাল-শ্রীকুসুমদেব"কেও তিনি সেই কর্ম্মান্ত-নগরেই রাজা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, ভট্টশালী মহাশয় "কর্ম্মান্ত" শব্দটিকে সংজ্ঞাবাচক মনে করিয়া বিষম প্রমাদে পতিত হইয়াছেন। "কর্ম্মান্ত-পাল" রাজকর্ম্মচারি-বিশেষের নিয়োগবাচক শব্দ। এই রাজ-পাদোপজীবী [illegible] বুঝাইবার জন্য "কর্ম্মান্তিক" শব্দের প্রয়োগ দেখা

যায়। সামন্তরাজ লোক-নাথের অপ্রকাশিত তাম্রশাসনে এবং হর্ষচরিতের ষষ্ঠোচ্ছ্বাসে "কর্ম্মান্তিক" শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে [১ অধিঃ। ১২ অঃ] "গূঢ়-পুরুষ-প্রণিধি" প্রকরণে তিনি লিখিয়াছেন,—

"তান্ রাজা স্ববিষয়ে মন্ত্রি-পুরোহিত-সেনাপতি-যুবরাজ-দৌবারিকান্তর্বংশিক-প্রশাস্তৃ-সমাহর্ত্তৃ-সন্নিধাতৃ-প্রদেষ্টৃ-নায়ক-পৌর-ব্যবহারিক-কর্ম্মান্তিক-মন্ত্রিপরিষদধ্যক্ষ-দণ্ডদুর্গান্তপালা-টবিকেষু শ্রদ্ধেয়-দেশ-বেষ-শিল্প-ভাষাভিজনাপদেশান্ ভক্তিতস্ সামর্থ্য-যোগাচ্চাপসর্পয়েৎ"।

এই সন্দর্ভে, দূত-চক্ষুর্বিষয়ীভূত রাজকর্ম্মচারিগণের সহিত "কর্ম্মান্তিক" শব্দেরও ব্যবহার পাইতেছি। পণ্ডিতগণ ইহার অনুবাদ "Superintendent of manufacturies" ["শিল্পশালার অধ্যক্ষ"] বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আলোচ্য শিলালিপিতে উল্লিখিত কর্ম্মান্তপালও সেই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া ধরা যাইতে পারে। উদ্ধৃত সন্দর্ভে যেমন "দণ্ডপাল", "দুর্গপাল" ও "অন্তপাল" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তেমনই "কর্ম্মান্তিক" শব্দের পরিবর্ত্তে "কর্ম্মান্তপাল" শব্দও ব্যবহৃত হইতে পারিত। সংস্কৃত-সাহিত্যে সংজ্ঞাবাচক শব্দকে উপপদ লইয়া, "তৎস্থানং পালয়তি"—এই অর্থে, 'পাল'-যুক্ত শব্দের প্রয়োগ কুত্রাপি পাইয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। দ্বারপাল, উদ্যানপাল, লোকপাল, রাজ্যপাল, অর্থপাল, কামপাল, কোট্টপাল প্রভৃতি শব্দই সচরাচর ব্যবহৃত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উত্তরাপথপাল, বঙ্গপাল, বারাণসীপাল প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার অপ্রসিদ্ধ। অথচ, ভট্টশালী মহাশয় "কর্ম্মান্ত" শব্দের অর্থ ত্যাগ করিয়া, ইহাকে সমতটের রাজধানীর নাম-রূপে কল্পনা করিয়া, অনুবাদে কুসুম-দেবকে রাজকর্ম্মচারী মনে না করিয়া, "কর্ম্মান্তরাজ" বলিয়া অসঙ্গতভাবে অর্থ করিয়াছেন। কর্ম্মান্তের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কিরূপ সচিব [কর্ম্মান্তিক বা কর্ম্মান্তপাল] নিযুক্ত করিতে হইবে, মনুসংহিতায় তাহার ব্যবস্থা আছে,—(১)

"তেষামর্থে নিযুঞ্জীত শূরান্ দক্ষান্ কুলোদ্গতান্।
শুচীনাকর-কর্ম্মান্তে, ভীরূনন্তর্নিবেশনে।"

"সচিবগণের মধ্যে যাঁহারা বিক্রান্ত, চতুর, উচ্চকুলোদ্ভব, এবং শুচি [অর্থ-নিঃস্পৃহ] তাঁহাদিগকেই আকর ও কর্ম্মান্ত [প্রভৃতি ধনোৎপত্তিবিষয়ে] রাজা নিযুক্ত করিবেন; কিন্তু তন্মধ্যে যাঁহারা ভীরু, তাঁহাদিগকে অন্তঃপুরে নিযুক্ত

(১) মনুসংহিতা—৭।৬২

করিবেন।" এই শ্লোকের টীকাতে মেধাতিথি ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"আকরাঃ সুবর্ণরূপ্যাদ্যুৎপত্তি-সংস্কার-স্থানানি; কর্ম্মান্তাঃ ভক্ত[illegible]পাদয়ঃ।" কুল্লুক ভট্টও তদ্রূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। যথা,—"আকরেষু সুবর্ণাদ্যুৎপত্তিস্থানেষু, কর্ম্মান্তেষু ইক্ষুধান্যাদিসংগ্রহস্থানেষু।" মনুসংহিতার অন্যত্র (১) রাজকর্ত্তব্যের উপসংহার-বচনে লিখিত আছে,—

"অহন্যহন্যবেক্ষেত কর্ম্মান্তান্ বাহনানি চ।
আয়-ব্যয়ৌ চ নিয়তাবাকরান্ কোশমেব চ॥"

এই স্থলের কর্ম্মান্ত-শব্দের প্রয়োগ আমাদিগকে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে নানা স্থানে প্রযুক্ত এই শব্দের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। যথা, "দুর্গ-নিবেশন" প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন—(২)

"কর্ম্মান্ত-ক্ষেত্র-বশেন বা কুটুম্বিনাং সীমানং স্থাপয়েৎ।"

হেমচন্দ্রের মতে, "কর্ম্মান্তঃ কৃষ্টভূমিঃ"। অর্থশাস্ত্রের নিম্নোদ্ধৃত স্থানসমূহে কর্ম্মান্ত শব্দকে শিল্পশালা বা কারখানা (workshop) অর্থে প্রযুক্ত বলিয়াই মনে হয়। যথা,—

(১) "ধাতু-সমুত্থিতং তজ্জাত-কর্ম্মান্তেষু প্রয়োজয়েৎ।" "লোহাধ্যক্ষঃ তাম্র-সীস-ত্রপু-বৈকৃন্ত-আরকূট-বৃত্ত-কংসতাল-লোধ্রক-কর্ম্মান্তান্ কারয়েৎ।" "খন্যাধ্যক্ষঃ শঙ্খ-বজ্র-মণি-মুক্তা-প্রবাল-ক্ষার-কর্ম্মান্তান্ কারয়েৎ।" (৩)

(২) "দ্রব্য-বন-কর্ম্মান্তাংশ্চ প্রয়োজয়েৎ।"

"বহিরন্তশ্চ কর্ম্মান্তা বিভক্তাঃ সর্ব্বভাণ্ডিকাঃ।
আজীব-পুর-রক্ষার্থাঃ কার্য্যাঃ কুপ্যোপজীবিনা॥" (৪)

জনপদ-নিবেশ করিতে হইলে রাজাকে কি কি করিতে হইবে, তৎপ্রসঙ্গে কৌটিল্য লিখিয়াছেন যে,—

"আকর-কর্ম্মান্ত-দ্রব্য-হস্তি-বন-ব্রজ বণিক্পথপ্রচারাণ্ বারিস্থলপথপণ্য পত্তনানি চ নিবেশয়েৎ"। (৫)

উপরি-উদ্ধৃত সন্দর্ভনিচয় পরীক্ষা করিয়া আমরা "কর্ম্মান্তপাল" শব্দের অর্থে (১) ধন্যাদি-সংগ্রহস্থানের কার্য্যাধ্যক্ষ [the superintendent of the grain market], অথবা (২) কৃষ্ট ভূমির অধ্যক্ষ, অথবা (৩) ধাতু, মণি, মুক্তা

(১) ঐ—৮।৪১৯
(২) অর্থশাস্ত্র—২ অধিঃ। ৪ অঃ।
(৩) ঐ—২ অধিঃ। ১২ অঃ।
(৪) ঐ—২ অধিঃ। ১৭ অঃ।
(৫) অর্থশাস্ত্র; ২ অধিঃ ২১ অঃ।

প্রভৃতি দ্রব্যসমূহকে ব্যব হারোপযোগ্য করিয়া শিল্প-রূপে পরিণত করিবার জন্য যে সমস্ত শিল্পশালা বা কারখানা থাকে, তাহার তত্ত্বাবধানকারী রাজকর্ম্মচারীকে বুঝিতে পারি। সুতরাং, দেখা যাইতেছে যে, কুমিল্লা নর্ত্তেশ্বর-মূর্ত্তির পাদ-পীঠ-লিপিতে উল্লিখিত কুসুমদেব এইরূপ এক রাজকর্ম্মচারী ছিলেন; এবং তাঁহার পুত্র ভাবুদেব সেই মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। এখন প্রশ্ন হইতেছে, কুসুমদেব কোন্ রাজার কর্ম্মচারী ছিলেন? শিলালিপির সাহায্যেই প্রশ্নের উত্তর সহজে অনুমিত হয়। কুসুমদেব "লদহচন্দ্র বা লডহচন্দ্র" দেবের কর্ম্মচারী। সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে, যিনি যে নৃপতির প্রজা বা কর্ম্মচারী, তিনি তাঁহারই বিজয়-রাজ্য-সংবৎ ব্যবহার করেন।—এ স্থলেও রাজা লদহচন্দ্র বা লডহচন্দ্রের কর্ম্মচারী কুসুমদেবের পুত্র ভাবুদেব স্বপ্রভুর রাজত্বের অষ্টাদশ (?) বা অষ্টাবিংশতি (?) [বা অষ্টপূর্ব্ব অন্য কোনও দাশমিক সংখ্যা সমন্বিত] সংবতে এই নর্ত্তেশ্বর মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন প্রভৃতি প্রবলপরাক্রমশালী সম্রাট্ প্রভৃতির রাজ্য-সংবৎই অন্যান্য রাজগণ নিজ নিজ দলীলাদিতে ব্যবহার করিতেন। কিন্তু বঙ্গের চন্দ্রবংশীয় নরপতিগণ এত প্রসিদ্ধ ছিলেন না যে, তাঁহাদের রাজ্যসীমার বাহিরেও তাঁহাদের রাজ্যসংবৎ ব্যবহৃত হইতে পারে, এরূপ কল্পনা করা যায়। "কর্ম্মান্ত"কে একটি নগরের নাম মনে করিয়া, ভট্টশালী মহাশয় কুসুমদেবকে সেই নগরের রাজা স্থির করিয়াছেন; লদহচন্দ্র বা লডহচন্দ্রকে বঙ্গ ছাড়িয়া আরাকানের চন্দ্রবংশীয় নৃপতিরূপে নির্দ্দিষ্ট করিতে বাধ্য হইয়াছেন; কুসুমদেবকে খড়্গবংশীয় রাজভটের "বংশধর" মনে করিয়াছেন; এবং আসরফপুর-তাম্রশাসন দ্বয়ে উল্লিখিত "জয়কর্ম্মান্তবাসক" ও আলোচ্য শিলালিপির "কর্ম্মান্ত"কে একই "নগর" মনে করিয়া, উহাকে সমতটের রাজধানী বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। এই সমস্ত প্রামাদিক কল্পনা করিয়াই তিনি লিখিয়াছেন,—"লয়হচন্দ্রের সময় অর্থাৎ দশম-শতাব্দীর শেষভাগে রাজা কুসুমদেব লুপ্তগৌরব কর্ম্মান্তের সিংহাসনে বসিয়া আরাকানের সামন্তরাজ-রূপে কর্ম্মান্ত শাসন করিতেছিলেন।" বাস্তবিক পক্ষে, আসরফপুর-শাসনদ্বয়ের "জয়কর্ম্মান্তবাসক" শব্দের অর্থ আমাদের কোনও নগর বলিয়া মনে হয় না, এবং রাজা দেবখড়্গ বা তৎপুত্র রাজরাজ-ভট্ট সেই নগর হইতে দানাদেশ করেন নাই; বরং লেখক বৌদ্ধ পুরদাসই দেব-খড়্গের কর্ম্মান্তপাল বা কর্ম্মান্তিক হইলেও হইতে পারেন, এবং তাঁহার বাসস্থান বা কারখানা হইতে লিপিদ্বয় লিখিত হইয়াছিল। কুমিল্লা-লিপিকে ভট্টশালী মহাশয় কেন যে দশম শতাব্দীর লিপি বলিয়া গ্রহণ করিলেন, তাহাও আমরা

বুঝিতে পারিলাম না। হরিকেল বা বঙ্গের বৌদ্ধরাজা শ্রীচন্দ্রদেবের [রামপালে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনের প্রত্যেক অক্ষরের সহিত কুমিল্লালিপির প্রত্যেক অক্ষরের সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া সুধীগণ যে উভয় লিপিকে একাদশ-দ্বাদশ-শতাব্দীর লিপিরূপে গ্রহণ করিবেন, তাহাই আমাদের নিকট সহজে প্রতিভাত হইতেছে। লদহচন্দ্র বা লডহচন্দ্রকেও বঙ্গের চন্দ্রবংশীয় রাজগণেরই অন্যতমরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহার পরিচয়ের জন্য আরাকানের চন্দ্রবংশীয় নরপাল-গণের তালিকা খুঁজিয়া খুঁজিয়া অবশেষে "ছুল-টৈং-ছন্দ্র"কে ও "লয়হচন্দ্র"কে একই ব্যক্তি সাব্যস্ত করিবার জন্য উৎকট কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে না।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে ভট্টশালী মহাশয়ের অদ্ভুত বিচারপদ্ধতিকে এই ভাবেই বর্ণনা করিতে হয় ;—যে হেতু কুমিল্লার নিকটবর্ত্তী বড়কামতা নামক স্থানে প্রাচীন কীর্ত্তিনিচয় পরিদৃষ্ট হয়, এবং যে হেতু বড়কামতার নিকট প্রাপ্ত এই প্রাচীন নর্ত্তেশ্বর মূর্ত্তির পাদ-পীঠ-লিপিতে একটি "কর্ম্মান্ত" শব্দের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে, অতএব বড়্‌কামতাই কর্ম্মান্ত-নগর। এ দিকে আবার কুমিল্লার অপর পারে আসরফপুরে প্রাপ্ত খড়্গ-বংশীয় বৌদ্ধ রাজা দেবখড়্গের সময়ের তাম্রশাসনলিপিতেও যখন "কর্ম্মান্তবাসকে"র উল্লেখ পাওয়া যায়, যখন সেই কর্ম্মান্তও এই বড়কামতাই হইবে। সুতরাং তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, কামতা বা কুমিল্লার অংশবিশেষই সে কালের সমতটের রাজধানী ছিল ; এবং লোকে এই স্থান বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল বলিয়া, তিনি তাঁহার প্রবন্ধের নাম রাখিয়াছিলেন,—"পূর্ব্ববঙ্গের একটি বিস্মৃত জনপদ।" সুধীগণই এইরূপ বিচার-পদ্ধতির বিচার করিবেন। যদি বা কালে ইউয়ান্‌-চোয়াঙ্‌-বর্ণিত সমতটের প্রাচীন কীর্ত্তিনিচয় এই বড়কামতাতেই আবিষ্কৃত হইয়া, ইহাকে সমতটের রাজধানী বলিয়া প্রতিপন্ন করে, তথাপি ইহা "কর্ম্মান্ত"-নামক নগর বলিয়া গণ্য হইবে না, এ স্থলে ইহাই আমাদের প্রতিপাদ্য।

উপসংহারে আর একটি কথা উল্লিখিত হইবার যোগ্য। এই নূতন শিলা-লিপিতে "রাতাক" নামক ব্যক্তিকে আমরা শিল্পিদ্বয়ের অন্যতর-রূপে উল্লিখিত পাইতেছি। রাজসাহীর অন্তর্গত মান্দা হইতে সংগৃহীত ও শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার মৈত্রেয় কর্ত্তৃক কলিকাতা যাদুঘরে উপহার-রূপে প্রেরিত শিলালিপিতেও আমরা "রাতোক" নামক এক জন শিল্পীর নামোল্লেখ প্রাপ্ত হইয়াছি। (১) তাঁহারা একনামধারী দুই জন পৃথক্ শিল্পী হইলেও হইতে পারেন।

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক।

(১) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ; —ঊনবিংশ ভাগ,—চতুর্থ সংখ্যা।

বিদেশী গল্প।

ইলায়াস্।

উফাতে ইলায়াস্ বশ্‌কীরের বাস। পুত্রের বিবাহ হইবার পর বৎসর তাঁহার জনক ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি পুত্রের জন্ত বেশী কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। ইলায়াস্ সাতটি অশ্বতর, দুইটি পয়স্বিনী গাভী এবং এক কুড়ি ভেড়া পাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নিজের কর্ম্মকুশলতার গুণে অল্পদিনেই তাহাদিগের সংখ্যা বাড়াইয়া ফেলিলেন। পতি ও পত্নী উভয়েই প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতেন। গ্রামবাসীদিগের নিদ্রা ভাঙ্গিবার বহুপূর্ব্বে তাঁহারা শয্যাত্যাগ করিতেন, এবং সকলে নিদ্রিত হইলে তাঁহারা শয়ন করিতেন। এইরূপ পরিশ্রম ও যত্নের ফলে প্রতিবৎসরেই ইলায়াসের সম্পদ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে দুই শত যোটক, দেড় শত পয়স্বিনী গাভী, এবং বার শত মেষের অধিকারী হইলেন। তখন বেতনভুক রাখাল তাঁহার পশুপাল ক্ষেত্রে চরাইত। অশ্বতরী ও গাভীর দুগ্ধদোহনের জন্ত আভীরকন্যাগণ নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহারা দুগ্ধ হইতে ক্ষীর, সর, নবনী ও সুগন্ধি "কুমিস্" পানীয় প্রস্তুত করিত। প্রত্যেক পদার্থই ইলায়াসের গৃহে অপর্য্যাপ্তপরিমাণে উৎপন্ন হইত। সে প্রদেশের সকলেই তাঁহার সৌভাগ্যে ঈর্ষ্যান্বিত ছিল। তাহারা বলিত, "ইলায়াসের মত সৌভাগ্যশালী আর কেহ নাই। তাহার কোনও বিষয়েরই অভাব নাই। পৃথিবীটা তাহার কাছে পরম রমণীয়।"

দেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ইলায়াসের নাম ও তাঁহার সৌভাগ্যের কথা শুনিয়া তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার বাসনা প্রকাশ করিতেন। উপযাচক হইয়া তাঁহারা বহু দূর হইতে ইলায়াসের সহিত দেখা করিবার জন্ত তাঁহার গৃহে আসিতেন। তিনিও সাদরে সকলকে অভ্যর্থনা করিয়া লইতেন, পানে ভোজনে প্রত্যেককেই পরিতৃপ্ত করিতেন। যে কেহ আসুক না কেন, প্রত্যেকের জন্ত কুমিস্, চা, সরবৎ ও মেষ-মাংস প্রস্তুত হইত। অতিথি আসিলেই একটি অথবা দুইটি ভেড়া মারিয়া তাঁহাদের ভোজের আয়োজন হইত।

ইলায়াসের তিনটি সন্তান। দুইটি পুত্র, এবং একটি কন্তা। তিনি সকলেরই বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার অবস্থা যখন সচ্ছল ছিল না, তখন পুত্রগণ তাঁহার সহিত পরিশ্রম করিত; তাহারা স্বয়ং মেষপাল চরাইত, স্বহস্তে পশুদিগের পরিচর্য্যা করিত। কিন্তু তাঁহার অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা অধঃপাতে চলিল; সুরাপান করিতে আরম্ভ করিল। জ্যেষ্ঠপুত্র মাতাল হইয়া দাঙ্গা হাঙ্গাম করিয়াছিল। তাহাতেই সে নিহত হয়। কনিষ্ঠ পুত্র একটী স্বেচ্ছাচারিণী যুবতীকে বিবাহ করিয়াছিল। ইদানীং সে পিতার বশবর্ত্তী ছিল না। পিতাপুত্রে একত্র-বাসও আর সম্ভবপর হইল না।

পুত্র পৃথকভাবে বাস করিতে লাগিল। ইলায়াস্ কয়েকটী গরু ও একখানি বাড়ী পুত্রকে অর্পণ করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার আর কিছু কমিয়া গেল। এই ঘটনার কিছুকাল পরে ইলায়াসের মেষপালের মধ্যে পীড়া দেখা দিল। তাহাতে অনেকগুলি ভেড়া মরিয়া গেল। এ বৎসর শস্যও ভালরূপে জন্মে নাই। শীতকালের আবির্ভাবে বহু পয়স্বিনী গাভীও প্রাণত্যাগ করিল। খিরগিজগণ ইলায়াসের উৎকৃষ্ট অশ্বগুলি ধরিয়া লইয়া গেল। এইরূপে তাঁহার ধনৈশ্বর্য্য একে একে হ্রাস পাইতে লাগিল। তাঁহার শরীরেও ক্রমশঃ শক্তির অভাব ঘটিতে লাগিল। সত্তর বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি একে একে পশুলোম, কার্পেট ও ঘোড়ার সাজসরঞ্জাম এবং বস্ত্রাবাসগুলি বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। ইহার কিছুকাল পরে অবশিষ্ট গো-মেষাদিও বেচিয়া

ফেলিতে হইল। তখন আর কিছুই রহিল না। কেমন করিয়া কোথা দিয়া সমস্ত বৈভব চলিয়া গেল, চঞ্চলা লক্ষ্মী তাঁহার গৃহত্যাগ করিলেন,ইহা বুঝিয়া দেখিবার পূর্ব্বেই তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িলেন। বৃদ্ধবয়সে জীবিকার্জ্জনের জন্য পতিপত্নী অবশেষে দাসত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন। ইলায়াসের পরিহিত বস্ত্র ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। পত্নীরও অবস্থা তদ্রূপ। কনিষ্ঠ পুত্র তখন ভিন্নদেশে চলিয়া গিয়াছিল। কন্যাটি তখন পরলোকে, সুতরাং এই বৃদ্ধ-দম্পতীকে সাহায্য করিবার কেহই ছিল না।

প্রতিবেশী মহম্মদ শা তাঁহাদের দুঃখ দেখিয়া নিজ আবাসে বৃদ্ধ-দম্পতীকে আশ্রয় দান করিলেন। মহম্মদ শা ধনীও নহেন, অথচ তাঁহাকে দরিদ্র বলাও সঙ্গত নহে। তিনি সুখে সচ্ছন্দে থাকিতেন, এইমাত্র বলা যাইতে পারে। লোকটির অন্তঃকরণ মহৎ ছিল। ইলায়াসের পূর্ব্ব আতিথেয়তার কথা তিনি বিস্মৃত হন নাই। বৃদ্ধদম্পতীর দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি বলিলেন, "ইলায়াস্, তোমার পত্নীকে লইয়া আমার এখানে এস। গ্রীষ্মকালে আমার খরমুজক্ষেত্রে সাধ্যমত কাজ করিও; আর শীতকালে আমার গো-মেষাদির পরিচর্য্যা করিও। তোমার পত্নী শ্যাম্‌শেমাজী আমার অশ্বতরীসমূহ দোহন করিয়া 'কুমিস্' তৈয়ার করিবে। আমি তোমাদিগকে আহার্য্য ও বস্ত্রাদি দিব। যখন যাহা প্রয়োজন হইবে, আমাকে বলিও; আমি তৎক্ষণাৎ তাহা দিব।"

ইলায়াস্ প্রতিবেশীকে ধন্যবাদ করিলেন। অতঃপর উভয়ে মহম্মদ শাহার গৃহে কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। প্রথমতঃ উভয়েরই বড় কষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু ক্রমশঃ পরের দাসত্ব অভ্যস্ত হইয়া আসিল। উভয়ে যথাশক্তি পরিশ্রম করিতেন।

এরূপ লোককে কর্ম্মে নিযুক্ত করায় মহম্মদ শাহের বিশেষ উপকার হইল। এককালে যাঁহারা অবিশ্রান্ত পরিশ্রম দ্বারা নিজের ব্যবসায়ের উন্নতি ও পরিচালন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে কাজের কথা বলিয়া দিতে হয় না। বিশেষতঃ বৃদ্ধদম্পতী অলস ছিলেন না। যথাশক্তি তাঁহারা পরিশ্রম করিতেন। কিন্তু অবস্থার উন্নত শিখর হইতে ইলায়াসকে সহসা এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে দেখিয়া মহম্মদ শাহের হৃদয়ে ব্যথা বাজিত।

একদা মহম্মদ শাহের কতিপয় বন্ধু বহুদূর হইতে আসিয়া তাঁহার গৃহে আতিথ্যগ্রহণ করিলেন। জনৈক মোল্লাও সেই সঙ্গে আসিয়াছিলেন। মহম্মদ শাহ ইলায়াসকে একটি মেষ জবাই করিবার আদেশ দিলেন। বৃদ্ধ যথাসময়ে মেষ-মাংস প্রস্তুত করিয়া অতিথিদিগের নিমিত্ত পাঠাইয়া দিলেন। অতিথিগণ যখন 'কুমিস্' পান করিতেছেন, সেই সময় কর্ম্মশেষে ইলায়াস্ দ্বারের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন। মহম্মদ শাহ তাঁহাকে দেখিয়া জনৈক অতিথিকে বলিলেন, "ঐ বৃদ্ধটিকে দেখিয়াছেন কি?"

অতিথি বলিলেন, "হাঁ! কিন্তু উহার সম্বন্ধে লক্ষ্য করিবার কি আছে?"

গৃহস্বামী বলিলেন, "কিছু আছে বৈ কি। এক সময়ে আমাদের এ অঞ্চলে উঁহার তুল্য ঐশ্বর্য্যশালী আর কেহ ছিল না। উঁহার নাম ইলায়াস্। সম্ভবতঃ তাঁহার নাম শুনিয়া থাকিবেন।"

"এ নাম আমি শুনিয়াছি। কিন্তু উঁহাকে কখনও দেখি নাই। উঁহার নাম দেশ-বিদেশে বিখ্যাত।"

মহম্মদ শাহ বলিলেন, "কিন্তু এখন উনি কপর্দ্দকহীন। সংপ্রতি আমার গৃহে শ্রমজীবীর কাজ করিতেছেন। তাঁহার পত্নীও এখানে আছেন, তিনি দুগ্ধ দোহন করিয়া থাকেন।"

অতিথি বিস্মিত হইলেন। শিরঃসঞ্চালনপূর্ব্বক দুঃখপ্রকাশ করিয়া তিনি বলিলেন, "মানুষের ভাগ্য চক্রনেমির ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল। কাহারও অদৃষ্ট-চক্র নামিয়া যাইতেছে, আবার কেহ সৌভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসন্ন হাস্য লাভ করিতেছে! সর্ব্বস্ব হারাইয়াছেন বলিয়া কি বৃদ্ধ শোক প্রকাশ করেন না?"

"তা বলিতে পারি না। তিনি নীরবে সন্তুষ্টভাবেই দিন যাপন করিতেছেন, পরিশ্রমেও আলস্য নাই।"

অতিথি বলিলেন, "আমি একবার উঁহার সহিত গুটিকয়েক কথা কহিতে পারি কি? আমি তাঁহাকে তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থার সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করিব।"

"অনায়াসে।" এই বলিয়া মহম্মদ শাহ ডাকিলেন, "ঠাকুর্দ্দা! ঠানদি'কে নিয়ে আপনি একবার এখানে আসুন। এক সঙ্গে 'কুমিস' পান করা যাবে।"

ইলায়াস্ সস্ত্রীক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মনিব ও অতিথিবর্গকে অভিবাদনানন্তর তিনি একটি স্তোত্র পাঠ করিলেন। তার পর দ্বারসমীপে উপবেশন করিলেন। তাঁহার পত্নী যবনিকার অন্তরালে মনিবপত্নীর পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন।

একপাত্র 'কুমিস্' ইলায়াসের হস্তে প্রদত্ত হইল। সকলের স্বাস্থ্য কামনা করিয়া বৃদ্ধ উহার কিয়দংশ পান করিয়া পাত্রটি রাখিয়া দিলেন।

যে অতিথি তাঁহার সহিত আলাপের জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "আচ্ছা ঠাকুর্দ্দা, আমাদিগকে দেখিয়া আপনার নিশ্চয়ই মনে দুঃখ হইতেছে। এ দৃশ্যে আপনার অতীত সৌভাগ্যের অবস্থার সহিত বর্ত্তমান দুর্দ্দশার তুলনা করিয়া মনটা একটু বিষণ্ন হইতেছে না কি?"

ইলায়াস্ সহাস্যে বলিলেন, "কোনটা সুখ, আর কোনটা দুঃখ, এ কথা যদি আমি বলি, হয় ত আপনারা তাহা বিশ্বাস করিবেন না। আমার পত্নীকে বরং এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন। তিনি নারী, তাঁহার হৃদয়ে যাহা উদিত হইবে, তিনি তাহা তখনই বলিয়া ফেলিবেন। সব কথা তাঁহারই কাছে জানিতে পারিবেন।"

অতিথি যবনিকার দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন, "ঠান্‌দি, বলুন ত, আগের সুখের অবস্থা ও বর্ত্তমানের দুর্দ্দশা, এই দুই অবস্থার তুলনা করিয়া আপনার মনে কি হইতেছে?"

পর্দ্দার আড়াল হইতে শ্যামশেমেজী বলিলেন, "আমার মনে কি হইতেছে, শুনুন। স্বামী ও আমি পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া সুখ খুঁজিয়া বেড়াইয়াছি; কিন্তু কখনও পাই নাই। আজ দুই বৎসর, সর্ব্বস্বান্ত হইয়া এখানে চাকরী-গ্রহণের পর, আমরা প্রকৃত সুখের মুখ দেখিতে পাইয়াছি। বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা অত্যন্ত সুখী।"

অতিথিগণ এই কথায় অতিমাত্র চমৎকৃত হইলেন। মহম্মদ শাহাও বিস্মিত হইলেন। তিনি উঠিয়া বৃদ্ধার মুখ দেখিবার জন্য যবনিকা সরাইয়া দিলেন। উভয় বাহু বক্ষে নিবদ্ধ করিয়া সহাস্য-আননে দাঁড়াইয়া বৃদ্ধা স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন। বৃদ্ধও হাসিলেন। রমণী তখন বলিলেন, "আমি রহস্য করিতেছি না। সত্য কথাই বলিতেছি। অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া আমরা সুখের সন্ধানে ফিরিয়াছিলাম; কিন্তু যতদিন ধনবান ছিলাম, কখনও সুখ পাই নাই। এখন আমরা কপর্দ্দকহীন, শ্রমজীবীর ন্যায় জীবিকার্জ্জন করিতেছি, এখনই প্রকৃত সুখ লাভ করিয়াছি। এখন আমাদের আর কোনও অভাব নাই।"

অতিথি বলিলেন, "কিন্তু আপনাদের এত সুখ কিসে হইল?"

রমণী বলিলেন, "তবে শুনুন। আমরা যখন ঐশ্বর্য্যশালী ছিলাম, তখন নানারূপ কাজকর্ম্ম ও চিন্তায় এত বিব্রত থাকিতাম যে, পরস্পরের সহিত ভাল করিয়া কথা কহিবার অবকাশ ঘটিত না, আত্মা এবং ভগবানের বিষয় যে আলোচনা করিব, সে সময়টুকুও পাইতাম না। অতিথি আসিলে তাঁহাকে কি খাওয়াইব, কিরূপে পরিচর্য্যা করিব, কি কি উপহার দিব, এই সকল দুর্ভাবনায় নিবিষ্ট থাকিতাম। কারণ, পরিচর্য্যার ত্রুটী হইলে তাঁহারা আমাদের ব্যবহারে দুঃখিত হইতে পারেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে শ্রমজীবীদিগকে লইয়া পড়িতাম। তাহারা কেবল কাজে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিত। আর কিরূপে ভাল খাইবে, তাহারই সন্ধানে থাকিত। আমরাও চেষ্টা করিতাম, তাহাদিগকে পেষণ করিয়া যত কাজ আদায় করিয়া লইতে পারি। সুতরাং ইহাতে আমাদের পাপ হইত। তার পর সর্ব্বদা চিন্তা ছিল, কখন বাঘ আসিয়া গরুর পালে পড়ে; অথবা ভাবিতাম, চোরে বুঝি আমাদের ঘোড়া চুরী করিয়া পলাইল। সারারাত্রি আমাদের নিদ্রাই হইত না। সব ঠিক আছে কি না দেখিবার জন্য

পুনঃপুনঃ শয্যা ত্যাগ করিতে হইত। চিন্তার পর চিন্তা। দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। এ সকল ছাড়া আরও এক উৎপাত ছিল;—মাঝে মাঝে আমাদের উভয়ের মতভেদ হইত। স্বামী বলিতেন, 'এই রকম করা দরকার, এইরূপ হইবে।' আমি বলিতাম, 'না, ও ঠিক নয়, এই রকম করা চাই।' এইরূপে মতভেদ হইত, ইহাতেও আমাদের পাপ জন্মিত। কাজেই সুখের পরিবর্ত্তে কেবলই আমরা পাপ ও দুঃখই অর্জ্জন করিতেছিলাম।"

"কিন্তু এখন?"

"এখন? এখন প্রত্যহ প্রভাতে উঠিয়া পরস্পর পরস্পরকে সাদরসম্ভাষণ করি। এখন বড় শান্তিতে আছি। বিবাদ করিবার, মতভেদ ঘটিবার কিছুই এখন নাই। শুধু মনিবের কাজ কিরূপে সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিব, এই চিন্তা ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার দুশ্চিন্তা নাই। সাধ্যমত আমরা পরিশ্রম করি, মনিবের যাহাতে কোনও প্রকার ক্ষতি না হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখি। যখন গৃহে ফিরিয়া আসি, দেখি আমাদের আহার্য্য প্রস্তুত। এখন শীতকালে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া পশমের পোষাক দ্বারা শীত নিবারণ করি। এখন আত্মা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার যথেষ্ট অবসর পাই। ভগবানের আরাধনা করিবারও কোনও প্রতিবন্ধক ঘটে না। পঞ্চাশ বৎসর অনুসন্ধান করিয়াও সুখ পাই নাই। আজ দুই বৎসর সেই সুখ উপভোগ করিতেছি।"

অতিথিরা হাসিয়া উঠিলেন।

ইলায়াস্ বলিলেন, "বন্ধুগণ, হাসিবেন না। ইহা উপহাসের বিষয় নয়—জীবনে ইহাই সার সত্য। প্রথমতঃ আমরাও নির্ব্বোধের ন্যায় অতীত সৌভাগ্যের জন্য শোক করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন ভগবানের অনুগ্রহে আমরা প্রকৃত পথ দেখিতে পাইয়াছি। এ কথা শুধু আত্মতৃপ্তির জন্য বলিতেছি না, ইহাতে আপনাদেরও উপকার হইবে।"

মোল্লা বলিলেন, "বড় জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন। ইলায়াস্ যাহা বলিলেন, তাহা অখণ্ডনীয় সত্য। কোরাণে এই কথাই লেখা আছে।"

অতিথিরা তখন হাসি থামাইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।*

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

সামান্য কথা।

১

৺ শারদীয়া মহাপূজার সময় দেশে যাওয়া আসা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। চাকুরী উপলক্ষে বিদেশে বাস করিলে খরচের অভাবে নড়া চড়া এক রকম অসম্ভব। আবার, অবসর মোটে দশ বার দিন।

কিন্তু হঠাৎ চতুর্দ্দিকে যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতির আতঙ্ক দেখিয়া দেশে যাইতে ইচ্ছা হইল। একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইলে সকলেরই অন্তর্দৃষ্টি হয়। খুব আধ্যাত্মিক ভাব ফুটিয়া উঠে। আমি যে অতিশয় ক্ষুদ্র একটি জীব,—নিঃসহায়, ধর্ম্মহীন, ঈশ্বরপরিত্যক্ত, এই রকম ভাবের উপর ভাব জুটিয়া আকুল করিয়া ফেলে।

* কাউণ্ট টলষ্টয়-রচিত রুশীয় গল্পের ইংরেজী হইতে অনুদিত।

যদি হঠাৎ এই দুর্দ্দিনে বিদেশে মরি, তবে দাহ করিতে লইয়া যাইবে কে? মনে করিয়া দেখুন, ইহা বড় সাধারণ প্রশ্ন নয়। আমরা হিন্দু। যথারীতি শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া প্রভৃতি না হইলে যদি ভূত হইয়া দেশে ঘুরিয়া বেড়াই, সেটা বড় লজ্জার এবং অপমানের কথা।

দাহের জন্য অনেক খরচের দরকার। শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, কাঠ দুষ্প্রাপ্য, দেশলাই আর বাজারে মিলিবে না। বন্ধুবান্ধব সকলে ইতস্ততঃ পলায়নের জন্য ব্যস্ত। দাহের পর একগ্ল্যাস চিনির সরবৎ পাওয়াও দুষ্কর; কারণ, বাজারে চিনি থাকিবে না। যাহার জন্য বিদেশে থাকা, অর্থাৎ ডাক্তার, এবং ভাল ভাল ঔষধ, তাহাও পাওয়া যাইবে না। বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখা গেল যে, এ যাত্রা পাড়াগাঁয়ে যাওয়াই ভাল। দেশে আছে কে?

মনে পড়িল, পিসী আছেন। এক খুল্লতাত ছিলেন, তিনি যদি এখনও বাঁচিয়া থাকেন, তবে ভাল। ভট্টাচার্য্য আছে। শৈশবের বন্ধু যাদব ডাক্তার আছে, এবং ব্রাহ্মণেরও অভাব নাই। এ হেন স্থানে যদি পূজার অবকাশে দেহত্যাগ হয়, তবে বৈকুণ্ঠে বাস নিশ্চিত।

আমার প্রতিবাসী এক জন বন্ধু ছিল। তাহার নিবাস কোথায়, ঠিক জানিতাম না। তবে সময় মাফিক্ সে চা খাইতে আসিত, এবং আমি গান ধরিলে বাহবা দিয়া এই হীন জীবনটাকে সার্থক করিত। আমার একটি কন্যা ছিল।—সরলা বার বৎসরের মেয়ে, বেশ বুদ্ধিমতী। চিঠিপত্র লিখিতে পারে, বুনিতে পারে।

আমার সহধর্ম্মিণী অনেকটা আমারই মত, তবে স্ত্রীলোক বলিয়া আমা হইতে কিঞ্চিৎ তফাৎ।

আর ছিল, এক গরীব ব্রাহ্মণকন্যা। সে রাঁধিত। সে আমার পিতার আমলের। সে কবে বিধবা হইয়াছিল, তাহার সাক্ষী কেহই ছিল না। আমাদের সকলের মতেই সে আজন্ম-বিধবা।

এই চারি জন লোকের সহিত রেলপথ, এবং নানাপ্রকার পথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে দেশে উপস্থিত হইলাম।

দেশ দেখিয়াই ব্রহ্মাণ্ডের সনাতনী মায়া উদ্দীপ্ত হইল। বেশ বোধ হইল, এটা আমারই দেশ, এবং এখানে নির্ব্বিঘ্নে প্রাণত্যাগ করা খুব সোজা।

অনেকে দেশে মরিবার ভয়ে বিদেশে দীর্ঘজীবনলাভের জন্য চাকুরী করে।

আমিও তাহারই মধ্যে এক জন। কিন্তু দেশের রোগ এবং বিদেশের রোগ তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া দেখিলে বোধ হয়, বিশ্বের এ-পিঠ এবং ও-পিঠ।

যদিও আমি বাতরোগগ্রস্ত, সেটা কাহাকেও জানিতে দিই নাই। আহার যদিও কম, তবে ইচ্ছা করিলে খুব বেশী খাইতে পারি। বাহুতে শক্তি এবং হৃদয়ে ভক্তি, সকলই ছিল; কিন্তু ব্যবহার করা হয় নাই।

পুরাতন গৃহে পদার্পণ করিয়াই দেখিলাম যে, পিসীর পরিবর্ত্তন হয় নাই। খুল্লতাত কাশীবাস করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু গুরুর আজ্ঞা পাইয়া সম্প্রতি দেশে ফিরিয়াছেন। যাদব ডাক্তার স্থানীয় যত প্রকার রোগ ছিল, তাহার নাড়ীনক্ষত্র সম্বন্ধে বিশেষরূপে অভিজ্ঞ।

পুষ্করিণীর জল বোধ হয় পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ মলিনত্ব এবং উষ্ণতা লাভ করিয়াছিল। হয় ত অনেক কীট জন্মিয়াছিল। কিন্তু যখন সূর্য্যেও কলঙ্ক ধরিয়াছে, এবং বহুপ্রকার কীটাণু জগৎ ছাইয়া ফেলিতেছে, তখন পুষ্করিণীর দোষ কি?

ভট্টাচার্য্যকে দেখিয়া আলিঙ্গন করিলাম। এই যে একটা ব্রাহ্মণের বংশ মনুর সময় হইতে ভারতবর্ষে বর্ত্তমান, নিশ্চয় তাহার মধ্যে একটা কঠিন প্রাণ বরাবর আছে। মনের কোনও বিকার নাই। শৈশবকালে তাহার মুখে যে হাসি দেখিয়াছিলাম, বিশ বৎসর ধরিয়া তাহার প্রাঞ্জল ও সংস্কৃত ভাব একাদিক্রমে রহিয়া গিয়াছে।

ঘরে অগ্নি জ্বলিতেছে। ব্রাহ্মণের গৃহে দিবানিশি অগ্নি জ্বলে। ইহা বৈদিক যুগের প্রথা। মহা সুবিধা এই যে, দেশলাইয়ের দরকার হয় না। যাহারা যথার্থ ব্রাহ্মণ, তাহাদের পেটেও এই রকম অগ্নি জ্বলে। ঔষধ প্রভৃতি খাইয়া ক্ষুধার উদ্রেক করিবার প্রয়োজন হয় না। যাহারা যথার্থ প্রেমিক, তাহাদেরও বোধ হয় হৃদয়ে এই রকম অগ্নি মধুরভাবে জ্বলিতে থাকে, কোনও পাত্রাপাত্র দেখিয়া নিভিয়া যায় না, কিংবা পুনরায় জ্বলিয়া উঠে না। ভট্টাচার্য্যের আলিঙ্গনে টের পাওয়া গেল যে, আমি তাহার হৃদয়ে ঠিক পূর্ব্বেকার স্থানেই আছি।

খুল্লতাত, পুরাণো পিসী ও তুলসীমণ্ডপ প্রভৃতিকে প্রণাম করিয়া, সস্ত্রীক স্নিগ্ধ হইলাম। বন্ধু শ্যামাচরণ নিস্তব্ধভাবে আমার অনুসরণ করিতে লাগিল। আজন্ম-বিধবা কাদম্বিনী ব্রাহ্মণী নির্ব্বিবাদে রন্ধনশালা অধিকার করিল। সরলা সেকালের একটা প্রকাণ্ড কাষ্ঠসিন্দুকের উপর বিছানা পাতিয়া শুইয়া পড়িল।

যখন রাত্রি খুব গভীর, তখন বাহিরে কুকুর ও গ্রামের অভ্যন্তরে শৃগাল

ডাকিয়া উঠিল। ঝিল্লী ও দর্দ্দুরী, রহিয়া রহিয়া আমাদিগকে নিদ্রাজগতের দিকে লইয়া যাইতেছিল। আমরা শয়ন করিলাম। নূতন লোক দেখিয়া মশার পাল কিঞ্চিৎ অন্তরালে গিয়া কাণাঘুসা করিতে লাগিল। নিদ্রাও গভীর হইয়া পড়িল।

২

'এই যে দেশে আশা গেল, আমাদের দ্বারা এই গ্রামের লোকের কোন উপকারটা হবে, তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। আমরা কেবল খাইতে ও ঘুমাইতে আসি নাই। সংসার, দেশ, গৃহ, সবই এক ছাঁচের।'

এই রকম একটা ভাবের উদয় হওয়াতে বাহিরে আসিলাম। আকাশে তখন শুক্রতারা প্রজ্বলিত। স্বদেশের তারা ও বিদেশের তারা একই, অথচ এ তারাটার ভাব কিছু মধুর। অর্থাৎ, যেখানে আমি দাঁড়াইয়া, সেইখানে আমার স্ত্রীও দাঁড়াইয়া। আমরা কখনও পরস্পরকে ভালবাসিয়াছিলাম কি না, তাহা কোনও কবি অনুসন্ধান করিয়া দেখেন নাই, এবং আমাদের উভয়ের দেখা হইলে দু' জনের মুখের ভাবটা কেমন হয়, তাহা কোনও চিত্রকর চিত্রিত করিবার চেষ্টা করেন নাই। যাহা হউক, অদ্য খানিকটা অন্ধকার ও খানিকটা উষার প্রথম জ্যোতির মধ্যস্থলে আমরা পরস্পরের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, উভয়েই অদ্ভুত জানোয়ার। আমরা পরস্পরের নিকট এত অজানা যে, মরিয়া গেলে কেহ কাহারও মুখ ঠিক স্মরণ করিয়া মানসপটে চিত্রিত করিতে পারিবে না, তাহা নিশ্চিত।

কমলার মুখ অন্ধকারের দিকে ছিল। বোধ হইল, যেন মুখ ফিরাইলে হাসিবে। যদিও সরলার মা, কিন্তু তাহার আকার প্রকার ভাব ভঙ্গী ছেলে-মানুষের মত। হঠাৎ মনে হইল, 'ঐ যে ঠাকুরদালানের প্রতিমা, তিনি ত বিশ্বের মাতা, অথচ কেমন ছেলেমানুষটি!'

স্ত্রীলোকমাত্রই মা দুর্গতিহারিণী জগদ্ধাত্রীর কাঠামে গড়া, কিন্তু সব সময় সেটুকু বুঝা যায় না। জগন্মাতারও যেমন স্বামীর উপর মহারাগ, এদেরও সেই রকম। স্বামী চালচিত্রের উপর বসিয়া, আসরে কেবল মা এবং ছেলেপুলে। দশপ্রহরণ ইন্দ্রিয়প্রধান মহিষাসুরের জন্য। পাছে সে গিয়া স্বামীকে আক্রমণ করে। অথচ নারী অবলা! আপনার কি বিশ্বাস হয়? আমার ত হয় না।

আমি যখন কারবলিক্ টুথপাউডার অন্বেষণ করিতেছিলাম, তখন কমলা কয়লাচূর্ণ দিয়া দাঁত মাজিয়াছে। আমাকে চুপি চুপি চণ্ডীমণ্ডপের দিকে লইয়া

গিয়া কহিল, 'দেখ, টুথ্‌পাউডার আর পাওয়া যাবে না, এ দেশে আগাছা খুব, পুড়াইয়া কয়লা করিব।'

কি আশ্চর্য্য আবিষ্কার! আবার বলিল, 'এতে মশা পলাইয়া যাইবে, জঙ্গল পরিষ্কার হইয়া ম্যালেরিয়া কমিবে। পুড়াইবার জন্ত পাথরের কয়লার দরকার হইবে না। আর আমার মরিবার সময় কাঠ কিনিতে ব্যস্ত হইও না।'

এই শেষের কথাটুকুতে বুঝা গেল, স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃ কবি, এবং সেই জন্য খাম্‌খেয়ালি কথা কয়। আমার বোধ হয়, সকল কবিই এককালে স্ত্রীলোক ছিল। কালক্রমে জঠরযন্ত্রণার কষ্টে, বোধ হয়, অনেকে ব্রহ্মার তপস্যা করিয়া পুরুষের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল!

স্নিগ্ধ প্রভাতে মনে হইল, আমরা যেন পরস্পরের হাত ধরিয়া স্বর্গ হইতে আসিয়াছি। কিন্তু বাস্তবিক তাহা সত্য কথা নয়; কারণ, সরলা তখনই শয্যা হইতে উঠিয়া বলিল, 'বাবা, খাব কি?'

এ ত কলিকাতা নয়। বিস্কুট পাই কোথায়! বাছুরদের এখনও ঘুম ভাঙ্গে নাই, গরুর দুগ্ধ দুহিয়া চা'র জন্য পেয়ালা করিয়া লইয়া আসে কে? দোবরা চিনি কৈ? অনেকের মতে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন হইতে মথুরায় গিয়া দুগ্ধ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু আমরা—আমরা কি দুঃখে চা ছাড়িব?

এমন সময় একটি যুবকের আবির্ভাব!

খুব সুস্থ, সবল। প্রায় কুড়ি বাইশ বৎসর বয়ঃক্রম। মুখের ছাঁচ বেশ, উদার ভাব, কিন্তু টিকি নাই। অথচ উপবীত দেখিয়া বোধ হইল, ব্রাহ্মণ-সন্তান। সে আমাদের দুরবস্থা দেখিয়া চট্ করিয়া দুগ্ধ দুহিয়া দিল। কলিকাতায় বাস করিয়া আমরা দুগ্ধদোহনের হিক্‌মৎটুকু ভুলিয়া গিয়াছিলাম, এবং গাভী দেখিয়া ভয় পাইতাম। যুবকের অসীম সাহস, পরিশ্রমপটুতা, সেবাশীলতা ও সার্ব্বভৌমিক সরলতা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়া গেলাম। সরলা বোধ হয় ভাবিল যে, যুবক অসাধারণ বীরপুরুষ। নামও বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য। আমাদেরই বিরিঞ্চি ভট্টাচার্য্যের পুত্র।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'যুদ্ধের খবর শুনিয়া ভয় পাও নাই ত?' বীরেন্দ্র বিনীতভাবে বলিল, 'আমরা গরীব-ব্রাহ্মণ-সন্তান, আমাদের যুদ্ধের সঙ্গে সম্বন্ধ কি?'

মনে মনে ভাবিলাম, 'আমিও ত ব্রাহ্মণসন্তান, কিন্তু আমার মনে এত আতঙ্ক কেন?'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বিপদ আপদ হইলে আত্মরক্ষা করিতে পার ত?

বীরেন্দ্র। আত্ম কেন, দশ জন পরকেও রক্ষা করিতে পারি।

এমন সময় ফুলের সাজি হস্তে ভট্টাচার্য্য স্বয়ং আসিলেন। তাঁহাকে বলিলাম, 'দাদা! তোমার ছেলেকে দেখে' বড় খুসী হয়েছি। আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, যেন অনেক দিন বাঁচিয়া থাকে।'

ভট্টাচার্য্য। ধর্ম্মই সকলকে জন্ম ও মরণের পথে লইয়া যায়। ধর্ম্মই বিপদে আপদে সহায়। আমরা জগৎসংসারকে চিরকাল ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াছি বলিয়াই রোগ-শোকের মধ্যে টিকিয়া গিয়াছি।—আর পূজার বড় বিলম্ব নাই। সরঞ্জাম সব যোগাড় হইয়াছে ত?

আমি পূজার কথা ভুলি নাই, কিন্তু সরঞ্জামের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

'চারি বেদের মধ্যে শেষটার নাম কি?'

ভট্টাচার্য্য। অথর্ব্ব।

আমি। আমারও সেই অবস্থা। অনুপানের ভয়ে কবিরাজী ঔষধ ছাড়িয়া ডাক্তারী ধরিয়াছি। পুষ্প ও চন্দনের যোগাড় করা শক্ত বলিয়া পূজা আহ্নিক ছাড়িয়া দিয়াছি। দাদা, সরঞ্জামের যোগাড় যদি তুমি না কর, তবে এ যাত্রা প্রতিমা পর্য্যন্তই সার।

ভট্টাচার্য্য হাসিয়া বলিল, 'সরঞ্জামের দ্বারাই দশ জন আকৃষ্ট হয়, বিশেষতঃ, খাদ্যদ্রব্যাদি। আচ্ছা, আমি তাহার বন্দোবস্ত করিব।'

২

যদিও যথেষ্ট আতঙ্ক লইয়া কলিকাতা হইতে আসিয়াছিলাম, এবং সময়টা ম্যালেরিয়ার আবির্ভাবকাল, তথাচ আমরা শীঘ্রই সুস্থ ও সবল বোধ করিতে লাগিলাম। তাহার কারণ, আতঙ্কের দরুণ স্নায়ুচাঞ্চল্য, তজ্জন্য ক্ষুধা-বৃদ্ধি। অপিচ, স্নায়ুচাঞ্চল্যের জন্য ম্যালেরিয়ার 'জারম্' শরীরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। ডাক্তারের মতে, ম্যালেরিয়ার কীটাণুগণ গোলমাল ভালবাসে না। যাহারা অতিশয় ব্যস্তবাগীশ ও সর্ব্বদা ত্রস্ত, তাহাদের এক রকম কম্প দিনরাত্রি লাগিয়াই থাকে। সুতরাং সেখানে অন্য কোনও জীবের কম্পোৎপাদনের প্রবৃত্তি হয় না।

ইহা অতিশয় সামান্য কথা। কিন্তু অনেকে জানে না বলিয়া অনর্থক ম্যালেরিয়া জ্বরে কষ্ট পায়।

আর একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। ভয় না থাকিলে ধর্ম্ম থাকে না।

ভূত, প্রেত, পিতৃলোক ও পরলোকের ভয় ছিল বলিয়াই পূর্ব্বে ধর্ম্ম ছিল, এবং বেশী বুঝাইতে হইত না। এখন সে ভয়গুলি ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইয়া বকাবকির সৃষ্টি হইয়াছে। কুইনাইন বকাবকির শক্তি অনেকটা দমন করে বলিয়া, ইহা অনেক সময় আশুফলপ্রদ।

শরীর ভাল হওয়াতে আবিষ্কার-শক্তি বাড়িয়া গেল। আমাদের বাটীর অনতিদূরে মোগলসম্রাট আওরঙ্গজেব (কিংবা শের শাহ) বাদশার সময়ের একটা বিরাট বটবৃক্ষ ছিল। সেই বৃক্ষের ঊর্দ্ধভাগে কতকগুলি স্থূলশাখা অবলম্বন করিয়া একটা বেড়াবাঁশের বাসা নির্ম্মাণ করিলাম। সেখানে আমার কলিকাতার বন্ধু নির্ব্বিকার বাবু (যিনি আমার সঙ্গে আসিয়াছিলেন) বটের ফল সংগ্রহ করিয়া 'সিরপ অফ্ ফিগ্‌সে'র একটা কারখানা খুলিলেন। বন্ধুবর কেবল চা খাইবার সময় বৃক্ষ হইতে ধীরে ধীরে অবতরণ করিতেন, এবং মনের অবস্থা ভাল থাকিলে, বৃক্ষের উপর বসিয়াই কবিতা লিখিতেন। নির্ব্বিকার বাবু এক জন মস্ত জীবতত্ত্ববিৎ। বৃক্ষের অধিবাসী পিপীলিকা ও নানারকমের পক্ষী ও সরীসৃপগণের চালচলন তিনি সময় পাইলেই নোটবহিতে লিখিয়া রাখিতেন। যদিও তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য, ম্যালেরিয়া হইতে কিঞ্চিৎ দূরে থাকা, কিন্তু গৌণ উদ্দেশ্য, জগতের হিত। তাঁহার মতে, গ্রামে যদি অন্ততঃ দশ বার জন লোক গাছে বাস করে, তাহা হইলেও সকলের পক্ষে মঙ্গল। কারণ, বুদ্ধিমান্ লোকের লোকালয়ে বহুক্ষণ থাকা কাহারও পক্ষে সুবিধাজনক নয়। আমার সন্দেহ হইত, এমন কি, তিনি বৃক্ষে বসিয়া তপস্যা করিতেন।

একটু আফিংএর নেশার অভ্যাস থাকাতে তিনি সদাসর্ব্বদা, বিশেষতঃ সূর্য্যাস্তের পর, বৃক্ষ হইতে নামিতেন না। তাঁহার সুবিধার জন্য আমরা ঘন দুগ্ধ ও অন্নাদি ভাঁড়ে করিয়া লইয়া যাইতাম; তিনি ঊর্দ্ধ হইতে রজ্জু লম্বমান করিয়া দিতেন; আমরা সেগুলি বাঁধিয়া দিতাম। মনে হইত, যেন দেবলোকে ভক্তি-রজ্জু দ্বারা আমাদিগের আত্মাকে বাঁধিয়া পরমাত্মাকে উপহার দিতেছি।

কেবল একটি বিড়াল—কৃষ্ণবর্ণের বিড়াল সেই বৃক্ষের উচ্চ ডালে বসিয়া ঘন দুগ্ধের দিকে চাহিয়া থাকিত। অতিশয় উগ্র তপস্যা তাহার!

কবিতা-লেখার বাধা পড়াতেই হউক, কিংবা কোনও 'ষ্ট্রাটেজিকাল' উদ্দেশ্যেই হউক, একদিন আমরা দেখিলাম যে, রজ্জুতে বিড়ালকে বন্ধন করিয়া বন্ধুবর ভূপৃষ্ঠে নাবাইয়া দিলেন। বিড়ালের গলদেশে একখানা পত্র ছিল।—

'প্রিয় বন্ধু! এই জানোয়ার একটা গুপ্তচর (স্পাই)। তাহার বিশেষ প্রমাণ এই যে; দুগ্ধ দিলেও খায় না, কেবল একদৃষ্টে আমার কর্ম্মকলাপ অধ্যয়ন করে। যদি বিশ্বাস না হয়, অদ্য আমার জন্য যে দুগ্ধ ও অন্ন পাঠাইবে, সেই পাত্রে বিড়ালকে বাঁধিয়া দিও। বিড়ালের নিঃস্পৃহা সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ হইয়া যাইবে।—ভবদীয় নির্ব্বিকার।'

বন্ধুবরের অনুমান ঠিক। খাদ্যের পাত্রের মধ্যে স্থিত হইয়াও বিড়াল খাইবার কোনও চেষ্টা করিল না।

ডাক্তার বলিল, 'ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার জ্বলন্ত উদাহরণ।'

বিরিঞ্চি ভট্টাচার্য্য। হয় ত বন্ধনদশাতে ভীত হইয়াছে—খাদ্যে রুচি নাই।

ঠিক বুঝা গেল না। সমস্ত রাত্রিকাল ভাবিতে লাগিলাম। বোধ হইল, বিড়াল বন্ধুবরের বুদ্ধিপ্রাখর্য্যে বিস্মিত হইয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছিল। জ্ঞানপথে দীক্ষালাভ এই রকম করিয়াই হয়।

খুল্লতাতের সহিত পথিমধ্যে হঠাৎ দেখা হওয়াতে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে হে! যজ্ঞেশ্বর না কি?'

আমি বিনীতভাবে বলিলাম, 'বোধ হয়।' ইহাতে বোধ হয় খুড়া মহাশয় মনে মনে চটিয়া গেলেন।

খুড়া। তোমরা ক'দিন ধরে' ঐ গাছের ওপর কচ্ছ' কি?

আমি। দেশের রোগ-দূরীকরণের জন্য একটা ঔষধ তৈয়ারী ক'চ্ছি।

খুড়া। আগে দলাদলি রোগের একটা ঔষধ যদি সংগ্রহ করিতে পার, তাহার যোগাড় দেখ।

আমি। দলাদলি কেন হয়?

খুড়া। এক পক্ষে অধর্ম্ম বৃদ্ধি হইলে হয়। ঠিক যাহা করিলে মানুষ কোনও রকমে কায়ক্লেশে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে পারে, এবং হিংসাদ্বেষবিবর্জ্জিত হইয়া পরকালের পথ পরিষ্কার করিতে পারে, সেটুকুর বাহিরে গেলেই সমাজে একটা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়।

খুড়ামহাশয়ের দর্শন শাস্ত্রে এত ব্যুৎপত্তি ছিল, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। আমি বিনীতভাবে বলিলাম, 'ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে করিতে আমরা এত বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, সকলে আধুনিক যুগে একটু অধর্ম্ম উপার্জ্জন করিবার চেষ্টা দেখিতেছে। যত দূর বুঝিতে পারা যায়, অধর্ম্মের মূল্যই এখন বেশী। যে রকম খাওয়া দাওয়া, জাঁকজমক, পোষাক, আরাম ও বিলাসের উপকরণ-

গুলিতে ধর্ম্মের ভাব তিরোহিত হয়, সেইগুলিই পাওয়া দুষ্কর হইয়া পড়িতেছে। বাজারে যেগুলির দর বাড়ে, লোকে সেইগুলিকেই সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বের আনুষঙ্গিক জিনিস মনে করে।'

খুড়ামহাশয় চটিয়া বলিলেন, 'সমস্ত সংহার ও আত্মহত্যা করিয়া বিশ্রাম-লাভের চেষ্টা দেখিতেছে। ইহার উপায় কি?'

আমি বিনীতভাবে বলিলাম, 'সিরপ্ অফ্ ফিগ্স্'।

৪

বাস্তবিক, দলাদলির বিলক্ষণ সূত্রপাত হইতেছিল। তাহার কয়েকটি বিশেষ কারণ ছিল।

১। আমাদের আজন্ম-বিধবা কাদম্বিনী ঠাকুরাণীর গ্রামে আবির্ভাব।

২। আমার বন্ধুবরের বৃক্ষদেশে অবস্থান।

৩। আমার স্ত্রীর সাবান মাখা, এবং চাষাভুসার প্রতি সকরুণ ব্যবহার।

বিরিঞ্চি ভট্টাচার্য্য ও ডাক্তারের সহানুভূতির জন্য গ্রামের দলকর্ত্তা তাঁহাদিগকে শাসাইয়াছিলেন।

দল-পাকানো ক্রমবিকাশের একটি লক্ষণ। যে সকল জাতিকে পরিশ্রম করিয়া আহার সংগ্রহ করিতে হয়, তাহাদিগের বাণিজ্য ব্যবসায় প্রভৃতি লইয়া দল। যাহাদের বসিয়া খাইবার সংস্থান আছে, তাহাদের দল-পাকানোর কাণ্ড সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার। ফলে সকল পক্ষেরই মধ্যে একটা ছোট খাটো যুদ্ধ হয়।

একে চতুর্দ্দিকে সমরানল প্রজ্বলিত, তাহার পর গ্রামের মধ্যে এই একটা নূতন দ্বন্দ্ব সংস্থাপিত হওয়াতে মনে করিলাম, বিশ্বের কোনও স্থানই শান্তিপূর্ণ নহে।

অপরাহ্ণে কমলা আসিয়া বলিল, 'আমার সাবানের বাক্স চুরী গিয়াছে। বোধ হয়, ও বাড়ীর নিকট যে মণ্ডলের মেয়েটা থাকে, তাহারই এই কাজ।'

আমি অত্যন্ত চটিয়া গেলাম। 'এখন উপায় কি?' কমলা লুকাইয়া একখানা 'নোটিস্' লিখিয়াছিল, সেখানা অঞ্চলের মধ্য হইতে বাহির করিয়া আমার হাতে দিল। আমি খুব মনোযোগ করিয়া পাঠ করিলাম,—

নোটিশ।

'ওগো, আমাদের স্বদেশী ভগ্নী! তোমরা যে কেহ হও না কেন, আমার সাবানের বাক্স চুরী করিয়া আমাদিগকে যে কি পর্য্যন্ত সম্মানিত এবং আপ্যায়িত করিয়াছ, তাহা এ জীবনে বুঝানো অসম্ভব। তোমরা সাবান মাখিয়া ফর্সা হইলে আমাদের মুখ রক্ষা হয়, এবং আহ্লাদের সহিত তোমাদের মুখচুম্বন করিতে পারি।

'আমার আরও ছুই বাক্স ভিনোলিয়া সোপ্‌ আছে, এবং অনেকগুলি এসেন্সের শিশি আছে। সেগুলিও যদি চুরী করিয়া লইয়া যাও, তবে অতিশয় কৃতজ্ঞ হইব। যদি লজ্জাবশতঃ তাহা না পার, তাহাই মনে করিয়া আমি সেগুলি পুষ্করিণীর উত্তর পাড়ে রাখিয়া আসিতেছি। অনুগ্রহ করিয়া যে সময় সুবিধা হয়, লইয়া যাইও।—তোমাদের চিরানুগত ছোট বোন কমলা।'

আমি বলিলাম, 'চমৎকার হইয়াছে। এখন জিনিসগুলো পুষ্করিণীর পাড়ে পাঠাইয়া দাও।'

একখানি ডালাতে সেগুলি সাজাইয়া সরলার মাথায় দিলাম।

'মা, তুমি এগুলি পুষ্করিণীর পাড়ে গিয়া রেখে এস।' সরলা খুব খুসী হইয়া সেগুলি লইয়া যাইতেছিল, এমন সময় বীরেন্দ্র আসিয়া পঁহুছিল। সে বলিল, 'সরলার একলা যাওয়াটা ভাল নয়। পুষ্করিণীর পাড়ে ভূতের ভয় আছে। আমি সঙ্গে যাই।' উভয়ে চলিয়া গেল। কমলা একটু হাসিয়া বলিল, 'বীরেন্দ্র সরলাকে বড় ভালবাসে।'

আমি। এক জন ভালবাসিবার লোক চাহি। যে রকম সময় পড়িয়াছে, জগতে আর যে কেহ কাহাকেও ভালবাসিবে, এমন বোধ হয় না।

আমাদিগের দীর্ঘনিঃশ্বাসের প্রায় অর্দ্ধঘণ্টার পর তাহারা ফিরিয়া আসিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'খবর কি?'

বীরেন্দ্র বলিল, 'সব ঠিক। আমি দেখিলাম, জন কতক স্ত্রীলোক খানিক ক্ষণ পরে পুষ্করিণীর পাড়ে গিয়া ঐ শিশি ও সাবানের বাক্সগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল।'

সন্ধ্যার পর বিড়ালের মারফৎ বন্ধুবরের এক পত্র পাইলাম।—

'প্রিয়বরেষু।—কি অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম অদ্য দিবাশেষে! অনেকগুলি রমণী আমার গৃহপাদপের নিম্নস্থ 'ভীমা' পুষ্করিণীর পাড়ে প্রায় ছুই ঘণ্টা ধরিয়া সাবান মাখিতেছিলেন, এবং সন্ধ্যা গাঢ় হইয়া আসিলে তাঁহাদের অর্দ্ধমগ্ন গ্রীবা-দেশোত্থিত (কণ্ঠ?) কলরব দ্বারা বোধ হইতেছিল যে, পরস্পরের চেহারায় পূর্ব্বাপেক্ষা খুব ভাল অবস্থা দেখিয়া তাঁহারা অতিশয় আনন্দোন্মত্তা। হঠাৎ আমার শিষ্য (বিড়াল) বৃক্ষ হইতে রজ্জু অবলম্বন করায় তাঁহারা উপদেবতা অনুমান করিয়া, অনেকে কলসী ও বস্ত্র প্রভৃতি রাখিয়া চম্পট দিয়াছেন।

'যদিও বেদান্তদর্শনের মতে রজ্জুতে সর্প-ভ্রম হওয়া জীবের পক্ষে খুব সম্ভব, তাহা কেবল ন্যায়শাস্ত্রের অজ্ঞতার ফল। কিন্তু ভ্রমবশতঃ বস্ত্রাদি পরিত্যাগ

করিয়া যাওয়া অতিশয় ভীতি-চিহ্ন। যদিও গীতাতে পাওয়া যায়, 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়', অর্থাৎ ভ্রমবশতঃ জীব মনে করে, 'আমি এই দেহ ছাড়িয়া যাইতেছি', তথাপি ভগবান তাহাদিগকে অন্য নূতন বস্ত্র জুটাইয়া দেন। কিন্তু এ স্থলে তাহার স্পষ্ট সংবাদ শুনা যায় নাই। অপিচ আমার মনে হইতেছে, এ হেন সান্ধ্য অত্যাচারে অবলাগণের ভীতিযুক্ত জ্বরে পড়া সম্ভব, এবং বিকার-বশতঃ অলীক দৃশ্য সকল দেখিয়া খুব প্রলাপ বকিতে পারে। যদি এই রকম সংবাদ পান, তবে ডাক্তার বাবু যেন, আমার 'সিরপ্ অফ্ ফিগ্স্' ব্যবস্থা করেন।

আমি কমলাকে ডাকিয়া বলিলাম, 'এখন উপায় ?' কমলা আমার মস্তকের দুই এক গুচ্ছ কেশ টিকির ধরণে বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু অত্যন্ত ছোট বলিয়া হতাশ হইয়া পড়িল।

আমি। কথা কও না যে ?

সরলা। আমার বোধ হয়, বর্ণাশ্রম রক্ষা করিবার প্রবৃত্তি যেমন সকল জীব জন্তুর আছে, সেইরকম মানুষেরও আছে। দলাদলি তাহার একটা মস্ত প্রমাণ। তুমি সেদিন আমাকে বুঝাইতেছিলে যে, নিম্নস্তরের জীব হইতে মানুষের উদ্ভব। আমার বোধ হয়, সেটা ঠিক।

৫

কমলা তাহার পর একটা ক্ষুদ্র বক্তৃতা আরম্ভ করিল।—'এই যে বাঙ্গালা-দেশ, ইহার মধ্যে জ্বরের প্রকোপে অন্য কোনও জাতি কখনই বাস করিতে পারিবে না। মাটীর এ রকম অবস্থা যে, বিশেষ পরিশ্রমের প্রয়োজন নাই। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা চিরকালই একরকম রাখিতে হইবে। একটু এদিক ওদিক হইয়া গেলে নিস্তার নাই। কোনও জিনিসে বাড়াবাড়ি করিলে বাঙ্গালার জলবায়ু সহিবে না।

'ডোবা হইতে ছোট মাছ, বন বাদাড় হইতে কচুর শাক ও অল্প চারিটি মোটা-চাউল হইলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। খুব ইচ্ছা হইলে কাঁচাগোল্লা, নারিকেলের ও তিলের নাড়ু, এবং উৎসবের সময় তদপেক্ষা কিছু অধিক চলিতে পারে। এই সুবিধা পরম কারুণিক জগদীশ্বর আমাদিগের মঙ্গলের জন্য দিয়াছেন।'

আমি বলিলাম, 'পূজার ভোগের জন্য তোমার যে নানাপ্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিবার কথা হইয়াছিল, তাহার কি হইল ?'

কমলা বলিল, 'তাহার জন্য ভাবিও না।'

আমাদের বাটীতে কেরসিন তৈল উঠিয়া গিয়াছে; কারণ, এখন যাহা পাওয়া

যায়, তাহা কেবল মূর্ত্তিমান ধূম, বহ্নির সহিত কোনও সম্পর্ক নাই। কেবল একটা প্রদীপেই সংসার চলে। কাদম্বিনী ঠাকুরাণীর রন্ধনশালায় আলোকের দরকার হয় না। আমি চণ্ডীমণ্ডপের বহির্ভাগে তারকার জ্যোতিতেই বসিয়া থাকি, এবং বন্ধুবান্ধবের সহিত গল্প করি। বিশ্বের সৃষ্টির পূর্ব্বে, শুনিতে পাই, কোনও জ্যোতিঃ ছিল না। সৃষ্টির পরে চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা প্রভৃতি, অনেক রকম জ্যোতির আবির্ভাব হইয়াছিল। সেগুলি যখন রহিয়া গিয়াছে, তখন পরিশ্রম করিয়া অন্য প্রকারের আলোকের সাহায্যে মনুষ্যজাতিকে জীবজগতের সম্মুখে ধরিয়া হাস্যাস্পদ করা অতিশয় নির্বুদ্ধিতার লক্ষণ।

আমার বোধ হয়, চোখে যত কম দেখা যায়, ততই অন্তর্জগতে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ বাড়ে। আমার বন্ধু নির্ব্বিকার বাবু বরাবর বলেন, 'অন্ধ সাকার উপাসনা করিতে চায়, এবং চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি নিরাকারের জন্য ব্যস্ত; যেমন স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসিতে চাহে, এবং স্ত্রী স্বামীকে।' অন্ধকারে যদিও কমলার মুখ দেখিতে পাই নাই, কিন্তু পূর্ব্বেকার ভালবাসা হইতে এখনকার ভালবাসা অনেক প্রগাঢ়। তাহার হস্তের আঘ্রাণ লইয়া বুঝিতে পারিলাম যে, অনেকক্ষণ ধরিয়া নারিকেল বাটিতেছিল।

অদূরে বীরেন্দ্র গুড় লইয়া লাড়ু তৈয়ারী করিতেছিল, এবং সরলা ছানা লইয়া ব্যস্ত হইতেছিল। কর্ম্মকাণ্ডে সকলের ব্যগ্রতা ও একাগ্রতা দেখিয়া আমিও দা-কাটা তামাকে চিটাগুড় দিয়া গুলি পাকাইতে লাগিলাম।

এমত সময় ডাক্তার ও পাড়ার এক জন ভদ্রলোক ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত। নাম জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, 'মুখুর্য্যে মহাশয়।' গ্রামে এক এক জন বিজ্ঞ লোক পাওয়া যায়, যাঁহার নিকট বিশ্বটা কিছুই নয়। মুখুর্য্যে মহাশয় সেই ছাঁচের লোক। জগতে এমন জিনিস কিছুই নাই যে, তিনি জানিতেন না। কেবল মধ্যে মধ্যে একটু জ্বর হইলে মুখবিকারপূর্ব্বক ডাক্তারের শরণাগত হইতেন। অথচ বলিতেন, 'ডাক্তারটা কিছুই জানে না।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'দলাদলির কৃত দূর?'

ডাক্তার আমার দা-কাটা তামাকের একটা গুলি অগ্নিসংযোগে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, 'বেশ হইয়াছে।' সকলেই ধূমপানপূর্ব্বক প্রীত হইলেন।

মুখুর্য্যে মহাশয় বলিলেন, 'তোমাদের ঐ ব্রাহ্মণীটিকে লইয়া সমাজে একটু গোল হইয়াছে। যাহার কুলশীলের পূর্ব্বপরিচয় পাওয়া যায় না, তাহাকে গৃহে স্থান দেওয়া অতিশয় অন্যায়; বিশেষতঃ স্ত্রীলোক হইলে দোষের হইয়া পড়ে।'

আমি বলিলাম, 'শীলের লক্ষণ আমি জানি। ব্রাহ্মণীর বয়স প্রায় পঞ্চান্ন বৎসর, তাহার মধ্যে চৌত্রিশ বৎসরের খবর খুব পাকা। তাহা হইলেই যথেষ্ট। কিন্তু কুলের সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, বাঙ্গালা দেশের ও বাঙ্গালী জাতির আদিম ইতিহাস কয়টা লোকে জানে? তাই বলিয়া কি আমরা হেয়?'

মুখুর্য্যে। ইতিহাসের কথা জানি না বাপু, কিন্তু সকলের কথা মানিয়া চলিতে হয়; নচেৎ আপদ ঘটে। আমার বোধ হয়, গ্রামের কোনও ভদ্রলোকই পূজার সময় তোমার বাটীতে পদার্পণ করিবে না।

ডাক্তার। উনি কোথা হইতে আসিয়াছিলেন, এবং ভবিষ্যতে কোথায় যাইবেন, তাহার একটা প্রমাণ সকলে চাহে। কাগজপত্র কিছু আছে?

আমি। জীব কোথা হইতে আসে, এবং কোথায় যায়, তাহার কথা বোধ হয় গীতায় পাওয়া যায়। স্ত্রীলোক, মনুষ্যজাতি, ছেলেপুলে নাই, শুদ্ধচারিণী, এবং ধর্ম্মে নিষ্ঠাবতী, এ সব কথা ঠিক, এবং তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

ভট্টাচার্য্য। তাহা ঠিক, কিন্তু কাহার কন্যা, এবং কাহার স্ত্রী, সে কথাটা ঠিক জানা না গেলে লোকের মনে স্বতঃই সন্দেহ উপস্থিত হয়।

আমি বলিলাম, 'পূর্ব্বে কখনও তাহার তদন্ত করি নাই; যত শীঘ্র পারি, তাহার সঠিক খবর আপনাদিগকে দিব।'

বন্ধুগণ চলিয়া গেলে, গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, স্ত্রীলোকেরা সকলেই উৎসুক হইয়া যুদ্ধের খবরের মত আমাদের কথোপকথনগুলি অন্তরালে গ্রাস করিতেছিল।

কাদম্বিনী ঠাকুরাণী ভয়ানক চটিয়া গিয়া মুখুর্য্যে মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া গালি পাড়িতেছিলেন। পিসী গ্রীবাসঞ্চালন করিয়া তাহার অনুমোদনপূর্ব্বক হরিনামের মালা জপ করিতেছিলেন। কমলা জিজ্ঞাসা করিল, 'ও লোকটা কে?'

কাদম্বিনী। ওর নাড়ীনক্ষত্র আমি জানি। কুলীনের ছেলে বলিয়া হতভাগার এত দর্প। তিনটি বিবাহ করিয়াছিল। একটাকে বিবাহ করিয়া জন্মাবধি তাহার সহিত দেখা করে নাই। অন্য একটাকে তীর্থস্থানে পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়াছিল, সে রোগে মরিয়া যায়। তৃতীয়াকে লইয়া আজন্ম যন্ত্রণা দিতেছে। আমি আজই উহাকে ঝাঁটা পেটা করিতাম, কিন্তু বচ্ছরকার দিনে জীবকে কষ্ট দেওয়া মহাপাপ, নয় ত—'

বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ঘোরতর রকম নাকাইতে লাগিলেন। আমি তাঁহার

বচ্ছরকার দিনের করুণাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম, 'তোমায় একটা সাফাই দিতে হবে।'

কাদম্বিনী। 'আচ্ছা, দশমীর দিনে দিব।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'জলযোগের তালিকাটা কি?'

কমলা বলিল, 'মানের মুড়্‌কী, খইচুর, মুড়ির চাক্‌তি, কচুর বরফী, পানিফলের পালো, পদ্মের কুঁড়ি ভাজা, নারিকেলের পাটালি, তিলের শক্ত লাড়ু—অনেক রকম তৈয়ারী, যেটা খুসী।'

স্বাস্থ্যকর জিনিস লইয়া নাড়াচাড়া করিলে স্বাস্থ্য ফুটিয়া উঠে। অগ্নির নিকট বসিয়া, কিসে সেগুলি ভাল হইবে, তাহারই ভাবনায় ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়া, কমলাকে অতিশয় সুন্দর দেখাইতেছিল। গ্রামের যত চাষাভুষার ছেলে ও মেয়ে, ঝি ও বৌ, পিতা ও মাতা, খুড়া ও জ্যেঠা, নানাপ্রকার নূতন ধরণের প্রস্তুত পুরাতন জিনিস প্রতিদিন অপর্য্যাপ্ত খাইয়া দিগ্‌দিগন্তে আমাদের যশ প্রচার করিতে লাগিল।

বাটীতে একটা চাকর নাই, কিন্তু দশ বিশ জন অহরহ সেবার জন্য ব্যস্ত। এই গুণেই বোধ হয় পুরাকালে ব্রাহ্মণের সেবার জন্য লোকের অভাব ছিল না। ঈশ্বরের মত এক জন লোক বসিয়া খাওয়াইবে, এবং সকলে তাহাকে গালি দিলেও সে কোনও কথা কহিবে না, এই রকম লোকই প্রজাতন্ত্রে কেন, সকল প্রকার তন্ত্রেই, আদর্শ মনুষ্য। গ্রামের তাঁতী ও কুম্ভকার, নাপিত ও মালাকার, কলু ও বাস্তকার, যতপ্রকার সনাতন বর্ণাশ্রমের শাখাপ্রশাখা একত্রিত হইয়া আমাদের বাটীর সম্মুখে ধর্ম্মরূপী অশ্বত্থবৃক্ষের মত জুটিয়া গেল।

তাহারা লাড়ু খাইতে খাইতে বলিল, 'আমাদের পেশার নকল করিয়া চতুর্দ্দিকে কল কারখানা হইতেছে, যেমন ভগবানের নকল মানুষ।'

আমি বুঝাইয়া বলিলাম, 'ক্রমে মানুষ গিয়া কেবল কলকারখানা থাকিবে। আমরা সরিয়া পড়িলেই বিশ্বের কলকারখানা একাকী চলিবে, কলকারখানাতেই যুদ্ধ ও কাটাকাটি হইবে। মানবহীন বিশ্বে, সৃষ্টির প্রাক্‌কালে, এইরূপ কলকারখানা চলিত। ক্রমে আমরা আসিয়া তাহার যন্ত্র অনেকটা থামাইয়া দিয়াছিলাম। তাহাকে সাধুভাষায় আমরা 'শান্তি' বলিয়া থাকি। এখন আমাদের অন্তকাল। বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় হাত পা ছুঁড়িতেছি।'

চাষাভূষা লোক যেমন শাস্ত্র বুঝে, পণ্ডিতেরা তেমন বুঝে না। দলাদলির সূত্রপাতের কথা বলাতে জনার্দ্দন মণ্ডল বলিল, 'অনেক দিন ধরিয়া আমরা দলাদলি দেখিয়াছি, উহা কেবল চালাকী। আমরাই মার পূজাকে জাঁকাইয়া তুলিব। সংসারে সবই প্রথমতঃ বিচ্ছিন্ন থাকে, আমরাই একত্র করিয়া সুন্দর করি। দশটা ফুল গাঁথিয়া মালা, দশটা কথা ও সাতটা সুর লইয়া গান, দশটা মানুষ লইয়া দল। যতই একত্র হবে, ততই মঙ্গল।'

বুঝা গেল, প্রজার মধ্যে অনেকেই সুরজ্ঞ লোক। গ্রামে পূর্ব্বে একটা কবির দল ছিল, সেটা মধ্যে ভাঙ্গিয়া যাত্রার দল হইয়াছিল। আমার অনুরোধে তাহারা মহাষ্টমীর দিন আসরে নামিতে চাহিল।

জনার্দ্দন। পূর্ব্বে আমরা সুরের লড়াই করিতাম, কবিতায় লড়াই করিতাম। এখন লড়াই ছাড়িয়া দিয়াছি।

আমি। কেন ?

জনার্দ্দন। লড়াই করাটা মহাপাপ, ছোট লোকের কাজ। বড় বড় যুদ্ধই হউক, আর গ্রামের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে গালাগালি, মারামারি ও কাটাকাটিই হউক, কেবল খানিকক্ষণ ভাল লাগে। সাঙ্গ হইলে মনে একটা দুঃখ হয়। মুখুর্য্যে মহাশয়ের একটা কালো বিড়াল ছিল। সেটা মধ্যে মধ্যে গ্রামের অন্যান্য বিড়ালের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া অবশেষে দুই তিন দিন ধরিয়া অনুতাপ করিত। এখন তাহার সম্পূর্ণ বৈরাগ্য উপস্থিত। গাছে বসিয়া থাকে।'

আমি বুঝিতে পারিলাম, এটা আমাদের বন্ধু নির্ব্বিকার বাবুর শিষ্য সেই বিড়ালটি! জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আচ্ছা, বৈরাগ্য তোমরা কি করিয়া বুঝ ?'

জনার্দ্দন। আহারের প্রতি অনাস্থাই বৈরাগ্য। আহারে অনাস্থা হইলেই সব জিনিসে অনাস্থা হয়।

এমন সময়ে জনার্দ্দনের কন্যা আসিয়া কমলার চরণে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, এবং প্রায় এক মিনিট পরেই চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিতে লাগিল। 'আমার অপরাধ হয়েছে ; ক্ষমা কর।'

কমলা তাহার হাত ধরিয়া সাদরে বলিল, 'ছি! সামান্য কথার জন্য এত দুঃখ কেন ? একটা সাবানের বাক্স বৈ ত নয়।'

জনার্দ্দনের কন্যা খুব মোটা সোটা। দিব্যি মেয়ে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিধবা। সে বলিল, 'আমি মনে করেছিলাম, ওটা খাবার জিনিস। মা! তুমি সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা ; আমাকে ক্ষমা কর।'

কমলা তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিল, 'এমন মেয়ের আবার বিবাহ দেওয়াতে দোষ কি ?'

জনার্দ্দনের কন্যা অপ্রতিভ হইয়া বলিল, 'তা কি কখনও হয় মা ? সোয়ামী যে পর কালেও বেঁচে থাকে। তিনি বেঁচে থাকৃতে অন্য বিবাহ করা যে মহাপাপ ! পুনর্ব্বার জন্ম না হ'লে সেটা কি ভুলা যায় ? (ক্রন্দন)।

এই সময় কাদম্বিনী ঠাকুরাণীও সকলের জন্য মুড়কি লইয়া উপস্থিত হইলেন। কাদম্বিনী বলিলেন, 'মেয়েটী যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি বলবান।' বাবা যজ্ঞেশ্বর ! আত্মার যে মরণ নাই, সেই জন্য বিয়ে একবারই হয়। সে সব কথা আমি দশমীর দিন বুঝাব এখন।'

ক্রমে জানা গেল, যে সকল স্ত্রীলোক সাবান মাখিয়া সন্ধ্যাকালে পুষ্করিণীতে গা ধুইয়াছিল, তাহার মধ্যে এক জনের খুব জ্বর। তিনি হারাণ গাঙ্গুলীর স্ত্রী।

হারাণ গাঙ্গুলীই বিপক্ষ দলের সর্দ্দার ; আমি শুনিয়া অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া গেলাম, এবং এক শিশি 'সিরপ্ অফ্ ফিগ্স্' লেবেল মারিয়া জনার্দ্দনের কন্যার হাতে দিলাম। 'এটা দুই ঘণ্টা অন্তর, যতক্ষণ না খোলাসা হয়।'

জনার্দ্দনের কন্যা গাঙ্গুলীগৃহিণীকে তাহা সেবন করাইবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়া চলিয়া গেল। জনার্দ্দন বলিল, 'ওটা কি অষুধ দাদা ঠাকুর ?'

আমি বলিলাম, 'টিংচার হাইড্রোষ্ট্যাটিক্সের সঙ্গে সিরপ্ অফ্ ফিগ্স্ মেশানো। অনেক সময় সিরপ্ অধিকপরিমাণে সেবন করিলে ডাইন্যামিক্স বাড়িয়া যায়, সেই জন্য একটু হাইড্রোষ্ট্যাটিক্স্ দেওয়া গেছে। এটা আমার পরম বৈজ্ঞানিক বন্ধু নির্ব্বিকার বাবু বটবৃক্ষে বসিয়া পক্ষীদিগের সাহায্যে আবিষ্কার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ইহা দ্বারা পয়সা রোজগার করার মোটেই ইচ্ছা নাই। ভবিষ্যতে তিনি কলিকাতার জলের কলে এটা মিশাইয়া দিবেন, তাহা হইলে বিনা ব্যয়ে এই অপূর্ব্ব সোমরস আবালবৃদ্ধবনিতা সেবন করিতে থাকিবে। কলের জলে গেলে দুগ্ধের সঙ্গেও মিশিয়া যাইবে।'

৭

ঠিক সপ্তমীর প্রভাতে মা দশভুজা গ্রামের মধ্যে উঁকি মারিতে লাগিলেন। পদ্মবন ঈষৎ দুলিতেছিল। পুষ্করিণীর পাড়ের বৃহৎবটবৃক্ষস্থিত বিহঙ্গদের কাকলী একটু সুরের দিকে ভিড়িল। গগনমণ্ডলের চেহারা ও জনার্দ্দন মণ্ডলের চেহারা ক্রমে খোলাসা ভাব ধারণ করিল। অনন্তজীবনের আভাস পাইয়া মানব আত্ম-জীবন বিস্মৃত হইল। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান একত্র হইয়া মুহূর্ত্তের জন্য পরস্পরকে আলিঙ্গন করিল।

কেবল মনের কষ্টে ছিলেন হারাণ গাঙ্গুলী। মুখুর্য্যে মহাশয় ও তিনি দশ বারো জন ভদ্রলোককে লইয়া ক্রমাগত দল পাকাইতেছিলেন। কিন্তু দলটা পাকিতেছিল না। বটবৃক্ষস্থ নির্ব্বিকার বাবু যে এক জন মস্ত যোগী পুরুষ, তাহা গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল। অনেকে পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া বৃক্ষের অধোভাগে যোড়হস্তে দাঁড়াইয়া থাকিত। তিনি রজ্জুর সাহায্যে সেই ভদ্রলোকদিগকে স্বীয় কুটীরে লইয়া গিয়া দীক্ষা দিতেন। ক্রমে মানবজীবন ও কলহবহ্নিময় সংসারের উপর ভাল ভাল লোকের অনাস্থা হইয়া গেল। দলের কথা উত্থাপন করিলে তাহারা হারাণ গাঙ্গুলীর দাড়ির দিকে তাকাইয়া ঈষৎ হাসিত।

গ্রামের যাত্রা দিনের বেলাতেই হয়। রাত্রিকালে সকলে প্রতিমা দর্শন করিয়া ঘুমায়। ইহাই স্বাভাবিক। প্রথম দিন আমাদের বাটীতে অনেকে আহার করিতে আসে নাই, কিন্তু যাত্রা শুনিবার জন্য আমবাগানের ছায়ার মধ্যে বিপক্ষ দলের স্ত্রীলোকেরা সকলেই জুটিয়াছিল। মধ্যাহ্নসূর্য্য গগনে প্রচণ্ডভাব ধারণ করিলে, বিপক্ষদলের ক্ষুধাতুর পুরুষগণ রন্ধনশালায় অন্ন না দেখিয়া নিজ নিজ সহধর্ম্মিণীর অনুসন্ধানে আমবাগানের দিকে আসিয়া রোষকষায়িতলোচনে অগ্নিসঞ্চারণ করিতে লাগিলেন। স্ত্রীলোকেরা ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বিলক্ষণরূপে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল।

কমলা উহাদের ভাব বুঝিয়া পিসীমা, কাদম্বিনী, বীরেন্দ্র, সরলা এবং আরও দশ জন স্ত্রীলোক বন্ধুকে ডাকিয়া, এবং দশরকম জলখাবার সরাতে সাজাইয়া বাড়ী বাড়ী পাঠাইতে আরম্ভ করিল। নিজেও অনেকগুলি সরা হাতে লইয়া মুখুর্য্যে মহাশয় ও হারাণ গাঙ্গুলীর বাটীতে রাখিয়া আসিল। হারাণ গাঙ্গুলীর মেয়েরা যাত্রা শুনিতে আসিয়াছিল, এবং সরলা লুকাইয়া তাহাদিগকে চণ্ডীমণ্ডপের দালানের এক কোণে নৈবেদ্য ঢাকিবার শ্বেত মলমলের থানের কাপড় দিয়া ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল। তাঁহারা সেখানে মধ্যে মধ্যে লাড়ু ও পাটালি প্রভৃতি লইয়া বিলক্ষণ ব্যস্ত ছিলেন। দলের কর্ত্তাদিগের অবস্থাটা কি রকম, তাহা জানিবার জন্য কেহই বিশেষ চেষ্টা করেন নাই।

রান্নাঘরে জমীদার-গৃহিণী সুন্দরী কমলার স্বহস্তে তৈয়ারী জলখাবার প্রস্তুত দেখিয়া, এবং তাহার ব্রীড়াবনত মুখ দেখিয়া দলের অনেকের মন টলিয়া গেল। হারাধন চাটুর্য্যে নামক এক জন বলিষ্ঠ ভদ্রলোক মুখুর্য্যে মহাশয়কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'লাড়ুতে দোষ কি ?'

মুখুর্য্যে। ওটাও ত গুড়ে পাক হয়েছে।

চাটুর্য্যে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'ময়রার দোকানেও ত শুড়ে পাক হয়। দোকানে কে পাক করে, তাহা কি আমরা দেখিয়া থাকি ?'

মুখুর্য্যে। তবুও কি জান, অন্ততঃ আমরা ময়রাকে জানি। এ স্থলে সে মেয়ে-মানুষটাকে কেহ জানে না।

চাটুর্য্যে। আরে, আমরা ত তাহাদের বাটীতে খাইতে যাই নাই, ঘরে বসিয়া খাওয়া যাইতেছে, এবং 'উনি' নিজে বহিয়া আনিয়াছেন।

মুখুর্য্যে মহাশয় চাটুর্য্যের ভাব দেখিয়া হাসিলেন। চাটুর্য্যের পিত্ত পূর্ব্বেই জঠরে জ্বলিতেছিল। মুখুর্য্যের ভাব দেখিয়া তাহা শোণিতের সহিত মিশিয়া ধমনীর সাহায্যে মস্তকে উঠিল। একে শরৎকাল, তাহার উপর অবেলা, প্রাচীন অভ্যাসবশতঃ চাটুর্য্যের মুষ্টি ক্রমে গোলাকার ও বজ্রের মত কঠিন হইয়া মুখুর্য্যের নাকের উপর গিয়া পড়িল।

এরূপ স্থানে, এমন সময়ে, গ্রামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান লোকের কিল যে ঠিক নাসিকার উপরে পতিত হইবে, তাহা মুখুর্য্যের মত অতিশয় চতুর লোক পূর্ব্বে অনুমান করিতে পারেন নাই। বড় বড় যুদ্ধেও এই রকম দেখা গিয়াছে যে, হঠাৎ কোন্ দিক দিয়া এক দল সৈন্যের গোলাগুলি আসে, তাহা খুব দক্ষ সেনাপতিগণও আগে বুঝিতে পারেন না।

মুখুর্য্যে মহাশয় গোঁ-গোঁ করিয়া ভূপতিত হইলেন। চাটুর্য্যে একনিঃশ্বাসে দুই সরা জলখাবার সাবাড় করিয়া নির্ব্বিকার বাবুর নিকট বৃক্ষের উপর গিয়া বসিলেন।

কমলা এই সকল দেখিয়াছিল। সে চীৎকার করিয়া ভগ্নদূতীর ন্যায় আমার নিকট সব কথা জ্ঞাপন করিল। আমি বিষণ্ণ হইয়া বলিলাম, 'তাই ত।'

মুখুর্য্যে পড়িয়া গেলে হারাণ গাঙ্গুলী বহির্ভাগে আসিয়া জেনারেল কুরুপাট্‌-কিনের ন্যায় শূন্য রণস্থল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। সিরপ্ অফ ফিগ্‌স তিন চারিবার সেবনের পর তাঁহার গৃহিণীর পিত্ত পরিষ্কার হইয়া গিয়াছিল। গাঙ্গুলী-গিন্নী তাঁহার শিয়রে কমলা-রক্ষিত দুগ্ধ-সাবু দেখিয়া সমস্ত নিঃশেষ করিলেন।

গাঙ্গুলী। ও গো! দেখ্‌ছ, এ সংসারে ধর্ম্ম নাই। চাটুর্য্যে শালা মুখুর্য্যেকে মেরে' গাছের উপর গিয়া বসিয়াছে।

ভ্রাতার উপর গালিবর্ষণ শুনিয়া গাঙ্গুলী-গৃহিণী ক্ষীণস্বরে বলিলেন, 'তুমি মুখ সাম্‌লে কথা কও। আমার বাপের বিষয়ের সাহায্যে তুমি জেল হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছ।'

মুখুর্য্যে মহাশয় ভাবিয়া দেখিলেন, তাহা ঠিক। সুতরাং 'ভগবানের যাহা ইচ্ছা' এই রকম একটা কথা বলিয়া বৈঠকখানায় গিয়া শয়ন করিবেন।

মুখুর্য্যে মহাশয় নাসিকার ব্যথা অনেকটা সামলাইয়া বারান্দায় আসিয়া স্ত্রীপুত্রগণকে ঘোরতর গালি দিতে আরম্ভ করিলেন। একে বৃদ্ধ মানুষ, তাহাতে অল্প উৎসাহেই বরাবর তাঁহার মুখবিকার হইত। সেটা এ যাত্রায় ভয়ানক রকম হওয়াতে মুখুর্য্যের গৃহিণী স্বামীর গৌরবরক্ষার জন্য রটাইয়া দিলেন, 'উহাকে ভূতে পাইয়াছে।'

সকলে দৌড়িয়া আসিল। জনার্দ্দন মণ্ডল বলিল, 'উহাকে গাছের নীচে লইয়া চল, সেখানে ভূতের ওঝা আছে।'

৮

বাস্তবিক পক্ষে মুখুর্য্যের দুর্দ্দশা বর্ণনাতীত। পুষ্করিণীর পাড়ে জ্বর আসিল; সে জ্বর বিকারে পরিণত হইল। তৎক্ষণাৎ বৃক্ষের নীচেই একটা পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করা হইল। যে হেতু মুখুর্য্যে নিজেই বলিলেন, 'আমি এখানেই দেহত্যাগ করিব।'

যাদব ডাক্তার, বীরেন্দ্র, ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং আমি পালা করিয়া দেখিয়া আসিতাম। সরলা ও কমলা তাঁহার শুশ্রূষার জন্য শয্যা পাতিয়া ও রোগীর পথ্যাদি আনিয়া দিত। সারাদিন ও সারা রাত্রি তাঁহার শিয়রে এক জন স্ত্রীলোক বিমর্ষভাবে বসিয়া থাকিত। সে আমাদের আজন্মবিধবা কাদম্বিনী ঠাকুরাণী।

অষ্টমী ও নবমী কাটিয়া গেল। সকলে আমাদের পূজায় যোগ দিল। কিন্তু আমাদের মনে শান্তি ছিল না। বন্ধুবর নির্ব্বিকার বাবু বৃক্ষের ডালেই বসিয়া থাকিতেন। অনুনয় বিনয় দ্বারাও তাঁহাকে মুখুর্য্যের নিকট আনা গেল না। বিড়ালের দ্বারা তিনি খবর পাঠাইলেন, 'দশমীর অপরাহ্ণে বিসর্জ্জনের পূর্ব্বে আসিয়া ঝাড়িয়া দিব।'

কাদম্বিনীর অবস্থা দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইলাম। তাহাকে শিয়রে অহরহ জাগ্রত দেখিয়া মুখুর্য্যের গৃহিণী ভয়ে নিকটে আসিত না। ছেলেপুলেরা দূরে থাকিত।

যখন প্রতিমা মণ্ডপ হইতে বাহির হইবে, এমন সময়ে বাদ্য বাজিয়া উঠিল। নূতন কাপড় পরিয়া গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আম্রবাগানের পার্শ্বে আসিয়া জুটিল। কমলা বলিল, 'এই সময় মুখুর্য্যে মহাশয়কে দেখিয়া আসিলে ভাল হয়।

আমরা দেখিতে গেলাম। সেইদিন প্রাতঃকালে সিরপ অফ্ ফিগ্স্ সেবন করিয়া মুখুর্য্যের মুখের ভাব অনেকটা আশাপ্রদ হইয়াছিল।

দেখিলাম, বন্ধু নির্ব্বিকার বাবু রজ্জু ধরিয়া বিড়ালের সহিত বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার দাড়ি এবং মস্তকের কেশ জটার আকার ধারণ করিয়াছিল। তাঁহার শিষ্যগণ, এবং গ্রামের চাষাভূষা সসম্ভ্রমে তাঁহাকে প্রণাম করিল।

নির্ব্বিকার বাবু পর্ণকুটীরে আসিয়া মুখুর্য্যের নাড়ী পরীক্ষা করিলেন, এবং তৎপরে দাড়ি পরীক্ষা করিয়া চক্ষু উল্টাইতে লাগিলেন। কৃষ্ণবর্ণ বিড়ালও চক্ষু উল্টাইতে লাগিল। তাহার পর দুই হস্ত দিয়া ঝাড়া আরম্ভ হইল। কৃষ্ণবর্ণ বিড়াল 'ম্যাও, ম্যাও' শব্দ করিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল।

যাদব ডাক্তার বলিলেন, 'এটা হিপ্‌নটিজ্‌ম। ইহার দ্বারা অনেক রোগী আরোগ্য হইতে শুনিয়াছি।'

কাদম্বিনীর চক্ষু হইতে বারিধারা অজস্রভাবে বর্ষিত হইতেছিল। সে নির্ব্বিকারের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'বাঁচবেন্ ত?'

বন্ধুবর নির্ব্বিকার ধমক দিয়া বলিলেন, 'চুপ কর।'

ঝাড়ার গুণে মুখুর্য্যের দুই চক্ষু এবং জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। তিনি প্রথমতঃ উঠিয়া বসিলেন, এবং উঠিয়াই বিড়ালকে কোলে লইলেন।

মুখুর্য্যে (বিড়ালের প্রতি সাদরে)। মনে পড়ে ত? বিড়াল লাঙ্গুল দোলাইয়া বুঝাইয়া দিল, 'পড়ে।' তাহার পরই কাদম্বিনী ঠাকুরাণীর সকরুণ ক্রন্দন। মুখুর্য্যে হাসিয়া বলিলেন, 'আর কেঁদ না। চল্লিশ বৎসর তোমাকে দেখি নাই, তবুও ভুলিতে পারি নাই। লক্ষ্মী! ঘরে চল'।

অতঃপর মুখুর্য্যে নির্ব্বিকার বাবুর হস্ত ধরিয়া বলিলেন, 'ভাই! ঘরের ছেলে ঘরে এস। যত অপরাধ করিয়াছি—ক্ষমা কর।'

মুখুর্য্যের স্ত্রী কাদম্বিনীর হাত ধরিয়া তুলিল। 'দিদি, আর কেঁদো না। তুমি সতীন, তবুও তোমার আজন্মের কষ্ট মনে করিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে।'

এই কয়টি কথাতেই আমরা সকলেই বুঝিতে পারিলাম যে, কাদম্বিনী ঠাকুরাণীই মুখুর্য্যে মহাশয়ের প্রথমা স্ত্রী, এবং বন্ধুবর নির্ব্বিকার বাবু মুখুর্য্যে মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। এতদিন নিরুদ্দেশে থাকিয়া তাঁহারা মুখুর্য্যে মহাশয়ের মসৃণ সংসারের পথে কাঁটা দেন নাই। কথাটা গুরুতর। স্বয়ং নির্ব্বিকার বাবু মুখুর্য্যের সম্পত্তির অর্দ্ধেক অংশীদার। অথচ অনাহারে এবং কষ্টে আমার গলগ্রহ হইয়া

তিনি এতদিন সংসারের জীর্ণ ভাগটুকুর সংশোধনে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। কাদম্বিনী ঠাকুরাণীও পুত্রসন্তানের ন্যায় মধ্যে মধ্যে জীর্ণবস্ত্র, মধ্যে মধ্যে রন্ধনশালা হইতে দুগ্ধ এবং জলখাবারটুকু লইয়া, তাঁহাকে পালন করিয়া আসিতেছিল।

দশমীর দিনে এই রকম একটা অপূর্ব্ব মিলন হওয়াতে আমরা সকলেই খুসী হইলাম। যদিও জগন্মাতার মৃণ্ময়ী প্রতিমাকে বিসর্জ্জন দিলাম, কিন্তু তাঁহার প্রতিভা ও দৈবীসম্পদ হৃদয়ে রহিয়া গেল। যে বাদ্য বাজিয়া উঠিল, তাহা প্রতিমা-বিসর্জ্জনের নহে, আত্ম-বিসর্জ্জনের, দশটা ইন্দ্রিয়-বিসর্জ্জনের।

আনন্দের কান্না কাঁদিয়া আমি কমলার মুখচুম্বন করিলাম।

মণ্ডপের নীচে বীরেন্দ্র নতমুখে দাঁড়াইয়া ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ব্যাপারটা কি?'

বীরেন্দ্র ধীরে ধীরে বলিল, 'সরলার সঙ্গে—'

আমরা, অর্থাৎ আমি এবং কমলা প্রতিমা-শূন্য মণ্ডপের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উভয়েই বলিলাম, 'পার। ইহা অতি সামান্য কথা। যখন আমরাও ঐ প্রতিমার মত এই মন্দির হইতে মাতার অনুসরণ করিব, তখন তোমরা তাঁহার সিংহাসনের গৌরব রক্ষা করিও। আর জনার্দ্দন মণ্ডলের কন্যার কথা যেন মনে থাকে।—পরলোকেও আমরা বাঁচিয়া থাকি।'

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

সহযোগী সাহিত্য।

ইউরোপে যুগান্তর।

ভাবের কথা।

এবার ইউরোপ হইতে যে সকল সাময়িক পত্র আসিয়াছে, সে সকলে ইউরোপের মহারণ ছাড়া অন্য কথা নাই। এমন ভীষণ রণ বাধিল কেন,—কেন ইংলণ্ড এংলো-স্যাকসন্ (Anglo-Saxon) জাতির আবাসভূমি হইয়াও, টিউটন বা আধুনিক জর্ম্মণ জাতির সহিত শোণিত-সম্পর্কে সম্পর্কিত হইয়াও, জর্ম্মণীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন,—কেন রুস এই সমরসাগরে সর্ব্বাগ্রে ঝম্পপ্রদান করিলেন,—ইত্যাদি নানা প্রশ্নের মীমাংসা-চেষ্টায় প্রায় সকল সাময়িক পত্রই পূর্ণ। অগত্যা এই সকল জিজ্ঞাসার আলোচনা করিয়া এবারকার 'সহযোগী সাহিত্যে'র অঙ্গপুষ্টি করিতে হইবে। 'টাইম্‌সে'র এক জন প্রাজ্ঞ লেখক এবং খ্যাতিমান ফেরেরো নামক এক জন ইতালীয় মনীষী এই সকল জিজ্ঞাসার উত্তর-চেষ্টায় আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার বিশ্লেষণ করিয়া দিয়াছেন। কলিকাতার 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ' এবং এলাহাবাদের 'পাইওনীয়র' ইঁহাদের সিদ্ধান্ত অবলম্বনে অনেক নূতন কথা কহিয়াছেন।

যুগপৎ কলম্বস্ (Columbus) আমেরিকা মহাদেশের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আমেরিকা আবিষ্কৃত হইবার পর হইতে ইউরোপের বিলাসবুভুক্ষা ধর্ম্ম ও সমাজের গণ্ডী কাটিয়া বাহির

হইয়া পড়ে। কাঙ্গালকে শাকের ক্ষেত দেখাইলে কাঙ্গাল যেমন কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়, এবং বে-সামাল হইয়া পড়ে, ইউরোপও তেমনই মেক্সিকো ও পেরুর অতুল ঐশ্বর্য্য দেখিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার অত্যুর্ব্বর ও অসীম কেদার-কান্তার দেখিয়া, নদনদীখচিত, বনস্পতি-বিভূষিত, গিরিমেখলাসমন্বিত বনভূমি দেখিয়া, ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানশূন্য হইয়া, অত্যন্ত অর্থলোলুপ হইয়া পড়িয়াছিলেন। সে সময়ে হিস্পানী জাতি ইউরোপের শিরোমণি ছিলেন; খ্রীষ্টানধর্ম্মের রক্ষা ও প্রচার পক্ষে তাঁহারাই যত্নশীল ছিলেন। কিন্তু আমেরিকা-আবিষ্কারের পর ধর্ম্মান্ধ হিস্পানী অর্থলোলুপ দস্যু হইয়া উঠিলেন। অর্থলোভে অধীর হইয়া তাঁহারা সত্যসত্যই মেক্সিকো এবং পেরু দেশে দস্যুতা অবলম্বন করিয়া নগর গ্রাম লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। পিজারো এবং কোর্টেজ প্রমুখ হিস্পানী সেনানীদিগের কীর্ত্তিকলাপের আলোচনা করিলে, তাহাদিগকে দস্যু-ডাকাত ছাড়া অন্য কোনও নামে পরিচিত করা যায় না। যতদিন দস্যুতার সাহায্যে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভবপর ছিল, ততদিন হিস্পানী, পর্ত্তুগীজ, ফরাসী, ইংরেজ, পশ্চিম ইউরোপের সকল প্রধান জাতিই এই উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। টাকাই তাঁহাদের ইহকালের দেবতা হইয়াছিল, যেন-তেন-প্রকারেণ অর্থোপার্জ্জনই তাঁহাদের জীবনের সাধনা ছিল। ইউ-রোপীয়দিগের অমানুষিক ভীষণ অত্যাচারে আমেরিকার আদিম জাতি সকল নিপীড়িত যূথিকাগুচ্ছের মতন শুকাইয়া গেল। তখন বিশাল, বিরাট আমেরিকা তাঁহাদের চরণতলে লুটাইয়া পড়িল। যে যতটা পারিল, সে ততটা দেশ অধিকার করিয়া লইল। পরন্তু অর্থের পিপাসা একবার ধরিলে তাহার ত তৃপ্তি থাকে না; সাগর শোষণ করিলেও সে ভীষণ পিপাসা সমভাবে প্রবল থাকে। আমেরিকাকে বারে বারে মন্থন করিয়া উহার সকল অর্থ, সকল বৈভব ও ধনসম্পত্তি শোষণ করিয়া লইলেও, ইউরোপের অর্থপিপাসা মিটিল না। ইউরোপ আরও অর্থ চাহে,—জগৎ ছানিয়া সর্ব্বসম্পত্তি আহরণ করিতে চাহে। ফলে, পরিণামে,—ফরাসী-বিপ্লবের পরে—ইউরোপকে হলাহল গ্রহণ করিতে হইল;—শিল্পব্যবসায়কে মাথার মণি করিয়া, অর্থোপার্জ্জনকে মানব-জীবনের একমাত্র ঈপ্সিত গ্রাহ্য করিয়া, ইউরোপ ধর্ম্মের বেষ্টনীকে অবহেলা করিল।

এসিয়া হইতে যে সকল ধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে, সে সকলই সংযমের ও ত্যাগের ধর্ম্ম। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান—সকল ধর্ম্মেরই সার উপদেশ, ত্যাগ—সন্ন্যাস। আমেরিকা-আবিষ্কারের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত ইউরোপের খৃষ্টান ধর্ম্ম ত্যাগের ধর্ম্মই ছিল; ইউরোপের খ্রীষ্টান-সমাজ সন্ন্যাসের আদর্শকেই শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া গ্রাহ্য করিত। তখন শিল্পী ও বণিক ইউরোপীয় খৃষ্টান-সমাজের নিম্নস্তর অধিকার করিয়া ছিল; তখন কার্ডিন্যাল জাইমিনিজের (Cardinal Ximines) মতন সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী ধর্ম্মযাজকগণ সমাজ-তরীর হাল ধরিয়া থাকিতেন, রাজা প্রজা উভয়কে ধর্ম্মের শাসনে শাসিত রাখিবার প্রয়াস পাইতেন। তখন ধনী অপেক্ষা জ্ঞানীর আদর সমাজে অধিকতর ছিল। কিন্তু আমেরিকা-আবিষ্কারের পর টাকা যখন খ্রীষ্টান-সমাজের দেবতা হইয়া দাঁড়াইল, তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত ইউরোপের সকল দেশের খৃষ্টান-সমাজে, এই অতি দীর্ঘকাল, বিলাসের পঙ্কিল প্রবাহই বহিয়া যাইতেছে; সমাজকে আগাগোড়া বিলাসী ও ভোগী করিয়া তুলিয়াছে। এই বিলাস-উপভোগের নিবৃত্তি নাই; একটা জাতি ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইয়া পড়িলেই, পার্শ্বের উদ্যমশীল অর্থলোভী জাতি তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিতেছে। অর্থলালসায় ও দস্যুতায় যখন হিস্পানী জাতি হীনবীর্য্য হইয়া পড়িল, তাহার স্থান প্রথমে ফরাসী জাতি অধিকার করিল। তখন ফরাসী আমেরিকা ও এসিয়ার অর্দ্ধেক গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। সেই উদ্যমের সূচনাতেই ফরাসী-বিপ্লবের ঘূর্ণাবর্ত্তে ইউরোপ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল; সে ত্রাসকে যেন ঘনীভূত করিতেই বিধাতা প্রথম নেপোলিয়নের ন্যায় লোক-বিধ্বংসী পুরুষ-প্রধানের সৃষ্টি করিলেন। নেপোলিয়ন ইউরোপকে পদতলে চূর্ণ করিয়া, একা ফরাসী জাতির সহিত জগতের সার উপভোগ করিতে উদ্যত হইলেন। ঠিক ঐ সময়ে এই অর্থোপার্জ্জনের সাধনায় ইংরেজজাতির অভ্যুদয় হইতেছিল। ইংরেজ, জর্ম্মণ ও রুস বা স্লাভ-জাতির সাহায্যে নেপোলিয়নের দর্প চূর্ণ করিলেন। এইবার ফরাসীর স্থান ইংরেজজাতি অধিকার

করিয়া বসিলেন। যাহা হিস্পানী সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপ বা মহাবীর নেপোলিয়ন সাধন করিতে পারেন নাই, ইংলণ্ড, তাহা করামলকবৎ আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন।

গত ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পর ফরাসী জাতির পরাজয়ে নবীনভাবে জর্ম্মণজাতির উদ্বোধন হইলে, জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চ্চা করিয়া, পদার্থতত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়া, জর্ম্মণী নবীন শিল্পের উদ্ভাবনা করেন, এবং সস্তার মুখে ইংরেজ ব্যবসায়ীর সহিত প্রতিযোগিতায় কতকটা জয়ী হইয়া জর্ম্মণ শিল্পবাণিজ্যের বিস্তার অগম্যর ঘটাইয়াছেন। এই শিল্পবাণিজ্য রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে জর্ম্মণ সমধিকভাবে সমরচর্চ্চা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, সর্ব্বত্র সমভাবে অপরাজেয় হইবার বাসনায় গত চুয়াল্লিশ বৎসরকাল জর্ম্মণজাতি অসাধ্যসাধনা করিয়াছেন। সে সাধনার আজ পরীক্ষার দিন উপস্থিত। জর্ম্মণী এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিল কি না, তাহা এই মহারণের পরিণামেই বুঝা যাইবে। আজ জর্ম্মণীর অগ্নিপরীক্ষার দিন। প্রথম নেপোলিয়নের মত আজ জর্ম্মণ সম্রাট ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনিই ইউরোপখণ্ডে অদ্বৈত ও অমর হইয়া থাকিবেন, পৃথিবীর সূচ্যগ্র ভূমিরও তিনি কাহাকেও ভাগ দিবেন না। তাই ইউরোপের মধ্য-প্রদেশে কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের সূচনা হইয়াছে।

বলিয়াছি ত, অর্থাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নাই; বিষম জ্বরের তৃষ্ণার মতন উহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়; শেষে মনে হয়, যেন সাগর শোষণ করিলেও এ তৃষ্ণার উপশম ঘটিবে না। ভোগে তৃপ্তি নাই, তৃপ্তি ত্যাগেই আছে; সন্ন্যাস-সংযমেই পাওয়া যায়। ভোগে আর একটা মজা আছে; ভোগে জাতিবিচার নাই, দেহিমাত্রই ভোগলোলুপ। উচ্চ নীচ, পণ্ডিত মূর্খ, ধর্ম্মযাজক ও যোদ্ধা, সবাই সমভাবে ভোগলোলুপ। এই ভোগস্পৃহাই মানুষকে পশুর সমান করিয়া রাখিয়াছে। এই ভোগস্পৃহার অতিবৃদ্ধি ঘটিলে সমাজে পাশবতার প্রসারই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। পাশবতা বৃদ্ধি পাইলে সমাজে আর দুর্ব্বলের স্থান থাকে না; প্রবল দুর্ব্বলকে গ্রাস করে। তখন সমাজের এক দিকে অতুল ধনৈশ্বর্য্য বিরাজ করে, অসীম ভোগের উত্তালতরঙ্গ উত্থিত হইতে থাকে, অন্য দিকে দারিদ্র্য, দুঃখ, কষ্ট অতি ভীষণ আকার ধারণ করিয়া দুর্ব্বলতাহেতু প্রচ্ছন্নভাবে থাকে। মানুষের মনুষ্যত্ব পশুত্বের উন্মেষে হ্রাস পায়। মানুষ ধনৈশ্বর্য্যকে সংযমের বেড়ায় আট্‌কাইয়া রাখিতে চাহে, দরিদ্রতাকে মাধুরীর আবরণে আবৃত করিয়া উহাকে মনোহর করিয়া তুলে। বৈভবের এবং দারিদ্র্যের মধ্যে এই সামঞ্জস্যের ভাব ধর্ম্মের দ্বারাই সাধিত হয়। যতদিন ইউরোপে ধর্ম্ম ছিল, ততদিন এ সামঞ্জস্যের ভাব প্রবল ছিল। তাহার পর যেদিন হইতে ইউরোপ অর্থলোলুপ ভোগী হইয়া উঠিয়াছে, সেইদিন হইতে পশুত্বের মাপকাঠিতে ইউরোপের মনীষিগণ ইউরোপের খৃষ্টান-সমাজকে মাপিয়া আসিতেছেন। ডারবিন (Darwin) পাশবতার বিশ্লেষণ করিয়া মনুষ্যসমাজের ধর্ম্মাধর্ম্মের নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার "জীবযোনির মূলতত্ত্ব" (Origin of the Species) পাশবতার বিশ্লেষণ ছাড়া আর কিছু নহে। তাঁহার প্রবলতাবাদ, (Survival of the fittest) বা যোগ্যের বা প্রবলের উদ্বর্ত্তন ও দুর্ব্বলের অন্তর্দ্ধান, এই পাশবতার বিশ্লেষণজাত সিদ্ধান্তমাত্র। তাঁহার পর হক্‌সলি (Huxley), স্পেন্সার (Spencer), ভিরচাউ (Virchow), হুম্‌বোল্‌ট (Humbold) প্রভৃতি ইংরেজ ও ইউরোপীয় মনীষিগণ এই নাস্তিকতার বেদীর উপর তাঁহাদের আবিষ্কৃত জীবতত্ত্বের ও সমাজতত্ত্বের সকল সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। অধুনা জর্ম্মণী দেশে সাধারণ শিক্ষার গতিও ঐ দিকে ধাবিত। জর্ম্মণ পণ্ডিতগণ বলেন যে, দয়া-মায়া-ক্ষমা-শম-দম-তিতিক্ষা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল মানুষ দুর্ব্বলতামাত্র। মানুষ যখন দেহী, সে দেহ যখন বিবর্ত্তনবাদের হিসাবে পশুদেহ হইতে উৎপন্ন, তখন দেহীর হিসাবে মানুষও পশু। পাশবতাই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক; অতএব যে প্রবল, সেই দুর্ব্বলকে মারিবে—দুর্ব্বলই প্রবলের খাদ্য। মারামারি কাটাকাটি, ইহাই স্বাভাবিক; কেন না, পশুযোনির মধ্যে ঐ অবস্থাই নিত্য বিদ্যমান। তবে মানুষের বিশিষ্টতা সংঘাত্মক। মানুষ—মানুষ, যে হেতু মানুষ দল বাঁধিয়া থাকিতে পারে। দল বাঁধিয়া থাকিতে পারে ও জানে বলিয়াই মনুষ্যবুদ্ধির উন্মেষের সীমা নাই। সুতরাং মানুষ বুদ্ধির প্রভাবে আত্মরক্ষার নানা উপায় উদ্ভাবন করুক সমর-কৌশলের উন্নতিসাধন করুক।

সিংহ ও শার্দ্দূল যেমন সর্ব্বজীববিজয়ী হইয়া পশুপতির পদ লাভ করিয়াছে, তেমনই সেই জাতিই শ্রেষ্ঠ বরজাতি, যে জাতি অন্ত সকল জাতিকে পরাজিত করিয়া আত্মসাৎ করিতে পারে। মহাবনে—জীবযোনিতে যেমন প্রবলের পুষ্টিসাধনই দুর্ব্বলের জীবনের ধর্ম্ম; দুর্ব্বল বাঁচিয়া থাকিতে পায় ততদিন, যতদিন না সে প্রবলের দংষ্ট্রান্তর্গত হয়! তেমনই মনুষ্য-সমাজে সর্ব্বত্র বলীরই জয়; যে বিদ্যা, যে জ্ঞান বলের সহায়ক, সেই বিদ্যা, সেই জ্ঞানেরই দাবী অধিক। জর্ম্মণী এই সিদ্ধান্ত মাথায় করিয়া ইউরোপের আদর্শ হইতে চাহে। এই মহারণের পরিণামে বুঝা যাইবে, জর্ম্মণীর এই সকল সিদ্ধান্ত ঠিক কি না।

বলা বাহুল্য, জর্ম্মণী এ সকল সিদ্ধান্ত আকাশ হইতে লাভ করেন নাই। আমেরিকা-আবিষ্কারের পর, ইউরোপ অতুল ঐশ্বর্য্য আস্বাদ করিবার পর, ইউরোপের খৃষ্টানগণ ভোগ-বিলাসপরায়ণ হইবার পর, Nature Worship বা প্রকৃতি-পূজা ইউরোপে প্রচলিত হইয়াছিল। ফরাসী রুসো (Rousseau) ইহার প্রধান প্রবর্ত্তক। রুসোর এমীল (Emile) এই স্বাভাবিকতার পরিচায়ক পুঁথী। ফ্রান্স হইতে এই বিদ্যা ইংলণ্ডে ও জর্ম্মণীতে প্রসার লাভ করিয়াছে। আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানে নিত্য নূতন তথ্য-আবিষ্কারের ফলে এই প্রকৃতিবাদের পুষ্টি ও অধিকতর বিস্তৃতি হইয়াছে। ভোগী চাহে অবাধে ভোগবাসনার পরিতৃপ্তি; যেখানে সমাজ-বন্ধন নাই, সম্ভ্রম সমীহ করিবার কেহ বা কিছু নাই, লজ্জা সঙ্কোচ নাই;—প্রাণ যাহা চাহে, তাহাই করিতে পারা যায়;—সেইখানে প্রকৃতির পূজা করিতে হয়। তাই ইংলণ্ডের কোলরীজ, সাউদে প্রমুখ কবিগণ আমেরিকার সস্কোয়েহানায় (Susquehanna) প্রকৃতিপূজার মঠ করিতে চাহিয়াছিলেন। অবাধ পাশবতার পরিতোষই এই প্রকৃতি-পূজার সার। ইহা হইতেই অধুনা জর্ম্মণীতেই প্রাকৃত শিক্ষার প্রচলন হইয়াছে। রক্তমাংসের দেহটাই এ পূজার প্রধান উপচার; প্রবৃত্তিনিচয় উহার পত্র পুষ্প ফল জল। এই পূজাই আজ ইউরোপকে নাস্তিক, বিলাসী, দেহসর্ব্বস্ব করিয়াছে। এই শিক্ষা ইউরোপে টিকিবে কি না, তাহারই চূড়ান্ত মীমাংসা এই যুদ্ধের পরে হইবে।

জাতির কথা।

এইবার ইউরোপের প্রধান তিন জাতির পরিচয় একটু দিতে হইবে। ইউরোপে এখন তিন জাতির প্রাধান্ত বিদ্যমান। প্রথম লাটিন (Latin) জাতি; ইতালী, স্পেন, পর্ত্তুগাল এবং ফ্রান্স, এই সকল দেশে লাটিন জাতির বাস। দ্বিতীয়, এংলো-স্যাক্সন ও টিউটন জাতি; ইংলণ্ড, জর্ম্মণী, নরওয়ে, সুইডেন এবং অষ্ট্রিয়া রাজ্যের পশ্চিমাংশে টিউটন ও এংলো-স্যাক্সন জাতির বাস। তৃতীয়, স্লাভ (Slav) জাতি; বিশাল রুস সাম্রাজ্য, সার্ভিয়া, রুমেনিয়া, মণ্টেনিগ্রো প্রভৃতি দেশে স্লাভ জাতির অধিকার বিস্তৃত। প্রথমে লাটিন জাতিই ইউরোপকে ব্যবসায়-বাণিজ্য শিখায়। জেনোয়া ও ভেনিসের ব্যবসায়িগণ সর্ব্বাগ্রে খৃষ্টান ইউরোপকে ব্যবসায়-বাণিজ্যের মহিমা বুঝাইয়া দেয়। কিন্তু সে মহিমা নবোদ্গত খ্রীষ্টান ধর্ম্মের কঠোর সংযমের বেষ্টনীমধ্যে আবদ্ধ থাকে। তাহার পর হিস্পানী কলম্বসই আমেরিকার আবিষ্কার করেন। সেই সময়ে আমেরিকার দুই দিক বেষ্টন করিয়া জলপথে ভারতবর্ষে আসিবার পন্থা ভাসকো-ডা-গামা (Vasco-da-Gama) আবিষ্কার করেন। ইঁহারা দুই জনে ইউরোপে কনকপ্রবাহ ছুটাইয়াছিলেন, ইউরোপকে অর্থের মদিরায় প্রমত্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। প্রায় দেড় শত বৎসর কাল এই ঐশ্বর্য্যের প্রবাহ হিস্পানী ও পর্ত্তুগীজ জাতি উপভোগ করিয়াছিলেন। তাহার পর ফরাসী জাতির পালা পড়ে। ফরাসী ডুমে, লাবোর্দিনে, লালী প্রভৃতি যোদ্ধৃগণ ফরাসী জাতির হস্তে এসিয়া ও আমেরিকার দুইটি সাম্রাজ্য তুলিয়া দিবার যোগাড় করিয়াছিলেন। বিধাতার বিধানে মহাবীর নেপোলিয়নের অধঃপতনে সে সাধ পূর্ণ হয় নাই। শেষে ইংলণ্ড, অসীম অধ্যবসায়ের ফলে, জগতের ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন। এখন জর্ম্মণী সে ঐশ্বর্য্য একা ভোগ করিবার জন্ত সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছেন। হিস্পানী, ফরাসী, ইংরেজ ও জর্ম্মণ প্রায় একই উপায়ে প্রাধান্ত-লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাঁহাদের সাধনার পদ্ধতি একই প্রকারের; তাঁহাদের পরিণতিও একই প্রকারের। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভোগে উচ্চ-নীচ থাকে না, জাতিবিচার থাকে না,

সমাজের সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ নষ্ট হয়, সমাজ-শরীরে একটা বিষম ওলট-পালট উপস্থিত হয়। ভোগ যখন পশুসামান্য গুণ, তখন ভোগস্পৃহা নরসামান্য গুণ ত বটেই। নর যখন ভোগী হইতে উদ্যত হয়, তখন তাহার আর হ্রস্ব-দীর্ঘ-জ্ঞান থাকে না; সে তখন জাতির অতীত ইতিহাসটাকে, বংশপরম্পরাগত সংস্কাররাশিকে মুছিয়া ফেলিয়া নূতন করিয়া সমাজ গড়িতে চাহে। সমাজের নিম্নতম স্তর উপরে উঠে, উচ্চতর একেবারে নামিয়া যায়। কারণ, উচ্চস্তর সহসা অতীতটাকে মুছিয়া ফেলিতে পারে না, জাতির সংস্কাররাশিকে হঠাৎ বর্জ্জন করিতে পারে না; তাহাদের সকল কাজে একটা 'কিন্তু' থাকিয়া যায়। এই 'কিন্তু'ই দুর্ব্বলতার লক্ষণ। যে দুর্ব্বল, সে প্রবলের কাছে পরাজিত হইবে। যে ইতস্ততঃ করে, তাহাকে হটিয়া যাইতেই হইবে। ফলে, ভোগস্পৃহার ফলে হিস্পানী-সমাজে একটা বিপ্লব ঘটিয়াছিল; সে বিপ্লবের পরিণতি জাতির স্থবিরতায় পরিস্ফুট হয়। ফরাসী-বিপ্লবও এই ভোগস্পৃহাজাত; সমাজের নিম্নস্তরের মানুষ উচ্চস্তরের ধনী ও ভোগীকে ঈর্ষ্যার দৃষ্টিতে দেখিল, তাহাদের ধূলিসাৎ করিয়া নিজেরা সেই স্থান অধিকার করিবার প্রয়াস পাইল। তাই সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার ঝুটা বুলি সমাজের চারি দিকে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। পরিণামে ফরাসী-সমাজ বিধ্বস্ত হইয়া গেল। ইংলণ্ড ও জর্ম্মণীতে এই প্রকারের বিপ্লবের সূচনা হইতেছিল; এমন সময়ে বিধাতার বিধানে এই মহারণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বিধাতার বিধান এই জন্য বলিলাম যে, এই যুদ্ধ ঠিক সময়মত না বাধিলে আর ছয় মাসের মধ্যে ইংলণ্ডে বিষম সমাজবিপ্লব ঘটিত; জর্ম্মণীতেও সোসিয়ালিজমের প্রাবল্য ঘটিত। সে ঝাঁজটা—সে তেজটা এই মহারণের মুখেই বাহির হইয়া যাইবে।

রুসিয়ার স্লাভজাতির উপর পশ্চিম ইউরোপের অর্থলিপ্সার প্রভাবটা আদৌ প্রবল হয় নাই আমেরিকা যখন আবিষ্কৃত হয়, যখন ভারতের সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্বন্ধ হিস্পানী ও পর্তুগীজ জাতির সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে, তখন স্লাভ জাতি আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার হিসাবে বর্ব্বর বলিয়াই পরিচিত ছিল। যে দুইটি শক্তি পশ্চিম ইউরোপের খৃষ্টান-সমাজে বিপ্লব ঘটাইয়াছিল, পশ্চিম ইউরোপকে কতকটা নাস্তিকতার পথে আগাইয়া দিয়াছিল, সে দুইটি শক্তি স্লাভ জাতির উপর কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। স্লাভ কখনও মার্টিলুথারের সংস্কার-প্রভাব সহ্য করে নাই; ধর্ম্মকে কখনও সমাজের উচ্চতম আসন হইতে নামাইনবার অবসর স্লাভজাতির হয় নাই। এখনও রুসের সম্রাট রুসজাতির প্রধান ধর্ম্মযাজক, ধর্ম্মপদ্ধতির নিয়ামক ও প্রবর্ত্তক। স্লাভ জাতির খৃষ্টান ধর্ম্মকে গ্রীক চর্চ্চ বলে। গ্রীক চর্চ্চে পোপ নাই; সম্রাটই পোপ, সম্রাটই দেশের রক্ষাকর্ত্তা। ধর্ম্মবিষয়ে রুস-জার ধর্ম্মযাজকের এক সংসদ দ্বারা পরিচালিত; দেশশাসন বিষয়েও রাজনীতিকগণের মণ্ডলীর পরামর্শে তিনি কার্য্য করেন। গ্রীক চর্চ্চের খৃষ্টানগণ প্রতীক (Ikon) পূজা করে, ধূপ ধুনা প্রদীপের সাহায্যে প্রতীকের আরতি করে। প্রত্যেক স্লাভের গৃহে একটি করিয়া প্রতীক প্রতিষ্ঠিত থাকে। আমাদের শালগ্রাম-পূজার ন্যায় প্রত্যহ উহার পূজা হইয়া থাকে। আমাদের পুরোহিত যেমন পূর্ব্বে ঘর-গৃহস্থালীর সকল ব্যাপারে পরামর্শ দিবার অধিকারী ছিলেন, গ্রীক চর্চ্চের পাদরীগণও তেমনই তাঁহাদের অধিকারভুক্ত সকল গৃহস্থের গৃহে পরামর্শদাতার কার্য্য করেন। স্লাভ ধর্ম্মযাজকের পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া সংসারের কোনও কার্য্যে একপদ অগ্রসর হয় না। ধর্ম্মযাজকগণও সমাজ ও ধর্ম্মসংস্কারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া গৃহস্থগণকে পরিচালিত করিয়া থাকেন। এই হেতু স্লাভসমাজ এখনও অনেকটা সংবদ্ধ ভাবে রহিয়াছে। রুসিয়ার ধর্ম্মের বন্ধন বড়ই কঠোর বন্ধন। স্যার ম্যাকেঞ্জী ওয়ালেস রুসিয়ার স্লাভসমাজের যে বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার উপর নূতন কথা বলিবার এখনও কিছু নাই। রুসিয়ার ধর্ম্মযাজকগণের এখনও অক্ষুণ্ণ প্রতাপ রহিয়াছে; বর্ত্তমান রুস-সম্রাট র‍্যাপস্যুতীন (Rapsutin) নামক এক জন ধর্ম্মযাজকের পরামর্শে পরিচালিত।

তবে পশ্চিম ইউরোপের নাস্তিকতার প্রভাব যে রুসদেশে স্লাভজাতির মধ্যে একবারে প্রবেশলাভ করে নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। সম্রাট পিটারের সময় হইতে রুসের উচ্চতম ও মধ্যবিত্ত সমাজে জর্ম্মণ-শিক্ষার ও সভ্যতার প্রভাব খুব বাড়িয়াছিল। জর্ম্মণ ও

ফরাসী ভাষা রুসের সভ্যসমাজের ভাষা হইয়াছিল। সোসিয়ালিজম্ (Socialism) ও নিহিলিজম্ (Nihilism) এই দুই বিপ্লববাদ রুস জর্ম্মণী হইতেই শিক্ষা করিয়াছিল। এক সময়ে রুসে নিহিলিষ্টদিগের বিষম উৎপাত হইয়াছিল। রুস-জাপান যুদ্ধের পর নিহিলিজমের প্রভাব অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। কমিবার আরও একটু হেতু আছে। বর্ত্তমান রুস-সম্রাটের পিতার সময় হইতে রুস মনীষিগণ বুঝিয়াছিলেন যে, জর্ম্মণ ও ফরাসী শিক্ষার প্রভাব স্লাভসমাজে যত বাড়িবে, নাস্তিকতা ও বিপ্লববাদ ততই বাড়িতে থাকিবে। তাই রুসের শিক্ষাবিভাগ এখন গ্রীক চর্চ্চের ধর্ম্মযাজকগণের হস্তে সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত হইয়াছে; স্লাভভাষায় এখন রুসের সর্ব্বত্র পঠন পাঠন চলিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ডুমা (Duma) বা লোকসমাজের সৃষ্টি করিয়া, লোকমতকে মন্ত্রণামণ্ডলীতে কতকটা গ্রাহ্য করিয়া, অসন্তোষের বহ্নি অনেকটা নির্ব্বাপিত হইয়াছে। বিশেষ, রুস-জাপান যুদ্ধে জাতির দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিয়া, সেই দুর্ব্বলতা-সংবরণের জন্য রাজা প্রজা—শাসক ও শাসিত সম্প্রদায়—উভয়েই সচেষ্ট হইয়াছেন। এখন আর রাজশক্তির সহিত প্রজাশক্তির তেমন বিরোধ নাই। ইহার ফলে, এই দশ বৎসরের মধ্যে রুস পূর্ব্ব-দুর্ব্বলতা পরিহার করিয়া অনেকটা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। এই মহারণে রুসের প্রাবল্য অনেকটা পরিস্ফুট হইবে।

রুসে এখনও পশ্চিম ইউরোপের Industrialism বা শ্রম-শিল্পের ও বাণিজ্য-প্রভাবের দোষ সকল ফুটিয়া উঠে নাই। রুসের স্লাভজাতি এখনও প্রধানতঃ কৃষিজীবী। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র শিল্পকলাকে শূদ্রের অধিকারভুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, এবং বাণিজ্য ব্যাপার দ্বিজাতির নিম্নতম জাতির হস্তে ন্যস্ত রাখিয়াছেন। রুসের স্লাভ জাতির মধ্যে কতকটা আমাদের মতন জাতিবিভাগ আছে। ধর্ম্মযাজক ও পুরোহিত সমাজের শিরোমণি; অতি দরিদ্র ধর্ম্মযাজকের সম্রাজ্-সদনে যাইবার পূর্ণ অধিকার আছে। তাহার পর যোধ জাতি। ইহারাই আবার দেশের ও সমাজের শাসনকর্ত্তা। তাহার পর কৃষিজীবী গৃহস্থ; ইহারাই জাতির মেরুদণ্ড; ইহাদের দ্বারা জাতির পুষ্টি ও বিস্তৃতিসাধন হইতেছে। শেষ serf বা দাসের জাতি। ইহারা পূর্ব্বে slave বা গোলাম ছিল। এখন উহারা চিরজীবন গোলাম হইয়া না থাকিলেও, এখনও উহাদিগকে দাস্যবৃত্তি করিতে হয়। এই ভাবে সমাজবিভাগ থাকাতে স্লাভ-সমাজে এখনও কেবল টাকার জন্য টাকার আদর নাই। যে হেতু তোমার ধন দৌলত আছে,—সে ধনদৌলত যে ভাবেই এবং যে উপায়েই উপার্জ্জিত হউক না—সেই হেতু তুমি সমাজে সমাদরের আসন পাইবে, এমন রীতি রুস সমাজে নাই। ইংলণ্ডে যেমন টাকা থাকিলেই তাহার আদর হয়,—যে সুরা চোলাই করিয়া ধনদৌলত করিয়াছে, সেও লর্ড উপাধি পায়; ঠিক সে ভাবে টাকার আদর রুসে নাই। আমেরিকা-আবিষ্কারের ফলে, ভারতবর্ষে ও পূর্ব্ব এসিয়ায় অবাধ ব্যবসায় বাণিজ্য চালাইবার ফলে, পশ্চিম ইউরোপের লাটিন ও টিউটন জাতি সকল যে ভাবে অর্থের জন্য ইহপরকালে জলাঞ্জলি দিয়া অর্থপিপাসায় প্রমত্ত হইয়াছিল, ঠিক সে ভাবে রুসের স্লাভজাতি প্রমত্ত হয় নাই। স্লাভ আমেরিকার হিস্‌সা পান নাই, সমুদ্রতীরে ভাল বন্দর ও তীর্থ না থাকাতে স্লাভ ব্যবসায়ী হইতে পারে নাই। কিন্তু অর্থের লালসা আছেই; বিশেষতঃ প্রতিবেশী যদি ধনৈশ্বর্য্যে মাতিয়া উঠে, তাহা হইলে সে লালসা তীব্রতর হয়। রুস, জর্ম্মণ ও ইংরেজ জাতির মতন ধনী হইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সে চেষ্টার ফলে রুস অর্দ্ধেক এসিয়া গ্রাস করিয়াছেন। কৃষ্ণসাগরের তীর হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের তটভূমি পর্য্যন্ত রুসের বিরাট বিশাল সাম্রাজ্য বিস্তৃত। এই বিশাল সাম্রাজ্য অধিকার করিতে রুসের ক্ষত্রশক্তি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। রুস যুদ্ধ করিয়া দেশ জয় করিয়াছেন, ব্যবসায়ের ব্যপদেশে সহসা কোনও দেশের রাজা হইয়া বসেন নাই। তথাপি রুসের ঈপ্সিত এখনও করায়ত্ত হয় নাই। একটা ভাল রকমের বন্দর ও সাগরতীর্থভূমি এখনও রুসের করায়ত্ত হয় নাই। রুস চাহেন কনষ্টাণ্টিনোপল ও তুর্ক সাম্রাজ্য; রুস চাহেন পারস্য সাম্রাজ্য এবং পারস্য সাগরের তটভূমি। রুসের এই দুই সাধে ইউরোপের অন্য সকল জাতিই এত কাল বাদ সাধিয়া আসিয়াছেন। দেখা যাউক, এই যুদ্ধের পরিণামে রুসের আশা পূর্ণ হয় কি না।

বিবাদের কথা ।

এইবার বর্ত্তমান বিবাদের কথা একটু খুলিয়া বলিতে হইবে। মহাবীর নেপোলিয়ন ওয়াটার্লুর যুদ্ধের পর বলিয়াছিলেন, Europe will be either Teuton or Slav—এইবার ইউরোপ হয় টিউটন-প্রাধান্যের বশীভূত হইবে, নহে ত একেবারেই স্লাভ হইয়া যাইবে। তিনি ইউরোপে লাটিন জাতির প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ওয়াটার্লুর যুদ্ধের পর তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। কাজেই তিনি অনুমান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, যে দুই শক্তির সমবেত প্রভাবে তাঁহাকে পর্য্যুদস্ত হইতে হইয়াছিল, সেই দুই শক্তির একটা শক্তি গতিকেই ইউরোপে প্রাধান্য লাভ করিবে। তবে তিনি সেণ্ট হেলেনায় বাসকালে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, আপাততঃ টিউটনের প্রাধান্য হইলেও, পরিণামে স্লাভই ইউরোপ-বিজয়ী হইবে। মহাবীর নেপোলিয়নের কথাটা একটু তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

টিউটন ও এ্যাংলো-স্যাক্সন জাতি Insular বা একলসেঁড়ে বা নিজের জাতির মধ্যে সংবদ্ধ থাকিতে চেষ্টা করে। উহাদের গ্রাহিকাশক্তি নাই; অন্য সকল দুর্ব্বল জাতিকে আত্মস্থ করিয়া স্বজাতির পুষ্টি ও বিস্তৃতিসাধন করিতে উহারা জানে না। জাতির এই গ্রাহিকাশক্তি লাটিন জাতির মধ্যে তেমন প্রবল ছিল না; তাই পরিণামে লাটিন জাতিকে হারিতে হইয়াছে। কিন্তু স্লাভজাতি ষোল আনা continental বা মহাদেশ-ভাবসমেত। মুসলমান যেমন ধর্ম্মের প্রভাবে পৃথিবীর সকল জাতিকে আত্মসাৎ করিতে পারে, এবং এই আত্মীয়করণের প্রভাবে মুসলমান যেমন সহস্রাধিক বৎসরকাল জগজ্জয়ী হইয়াছিল, তেমনই স্লাভজাতি অন্য সকল জাতিকে অনায়াসে আত্মস্থ করিতে পারে। এই গ্রাহিকাশক্তির প্রভাবে মধ্য-এসিয়া, তাতার, ককেশস, ইরাণ প্রভৃতি দেশের তাতার, তুর্ক, কুর্দ্দ, ইরাণী প্রভৃতি জাতি সকল রুসভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছে। রুস এখন হেলায় কোটী পদাতি ও অশ্বারোহী যুদ্ধক্ষেত্রে আনিয়া উপস্থিত করিতে পারে। পরিণামে ইউরোপের তুর্কসাম্রাজ্য অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে রুস গত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে রুমেনিয়া, সার্ভিয়া, মণ্টিনিগ্রো প্রভৃতি দেশকে স্লাভজাতিতে পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যে প্রায় দুই কোটী সর্ভ (serb) বা স্লাভজাতি বাস করিতেছে। মুসলমান যেমন যে দেশেই থাকুক, যে রাজার প্রজা হউক, তুর্কসম্রাটকে খলিফা ও ইসলাম ধর্ম্মের প্রধান যাজক বলিয়া মনে করে; স্লাভও তেমনই যে দেশে থাকুক, যে রাজার প্রজা হউক, রুস সম্রাটকে নিজেদের প্রকৃত সম্রাট ও পুরোহিত বলিয়া গ্রাহ্য করে। ফলে, বলকান প্রদেশে স্লাভের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাওয়ায় জর্ম্মণজাতির দক্ষিণ দিকে প্রসারের পথ রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

জর্ম্মণী ইউরোপবিজয়ী ও জগদ্বরেণ্য হইবার জন্য ইউরোপের উত্তরে ও দক্ষিণে বিস্তৃত হইবার চেষ্টা করিতেছেন। জর্ম্মণ সম্রাট ও জর্ম্মণজাতি নিজেদের জন্য খোলা সমুদ্র ও উপযোগী বন্দর চাহেন। তাই তিনি উত্তরে বেলজিয়ম ও হল্যাণ্ড দখল করিয়া ঐ সকল দেশের সুন্দর সুন্দর বন্দর সকলকে স্বীয় ব্যবসায়-বাণিজ্যের আগম-নিগমের পথে পরিণত করিতে চাহেন। বেলজিয়ম ও হল্যাণ্ড এবং দেনমার্ক জর্ম্মণীর অধিকারভুক্ত হইলে ইংলণ্ডের সিংহদ্বারে যাইয়া জর্ম্মণজাতি উপস্থিত হইবেন। ফ্রান্সও তাহা হইলে কোণঠেসা হইয়া পড়িবেন। এই জন্য এই তিন ক্ষুদ্র দেশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করায় ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের স্বার্থ রক্ষা পায়। কারণ, এই তিন দেশ জর্ম্মণজাতির মতন প্রবল ও পরাক্রান্ত জাতির হস্তগত হইলে অচিরে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের স্বাধীনতা নষ্ট হইবে। তাই ইংলণ্ড ও ফ্রান্স সম্মিলিত হইয়া জর্ম্মণ-জিগীষার বিরোধ ঘটাইতেছেন। পক্ষান্তরে, বলকান দেশে স্লাভ-প্রাধান্য নষ্ট হইলে রুসের স্বার্থহানি হইবে; তাই রুস জর্ম্মণ-দর্প খর্ব্ব করিবার উদ্দেশ্যে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের সহায়ক হইয়াছেন। জর্ম্মণ-সম্রাট তুর্কীর মুসলমানদের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিয়া, বোগদাদ রেলপথ খুলিয়া, একই কালে রুস ও ইংলণ্ডকে জব্দ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। জর্ম্মণী যদি তুর্কীর সাহায্যে, বোগদাদ রেলের প্রভাবে পশ্চিম-এসিয়ায় আপন প্রভাব বিস্তৃত করিতে পারে, তাহা হইলে রুসের মধ্য-এসিয়ার সাম্রাজ্য, ইংলণ্ডের ভারত-সাম্রাজ্য, এই দুই সাম্রাজ্য বিপন্ন হইবে। কেবল এইটুকুই নহে; জর্ম্মণী

ইতালীর পূর্ব্বদিকের এড্রিয়াটিক সমুদ্রের (Adritic sea) তীরে অবস্থিত বস্নিয়া ও হর্জগভনীয়া নামক দুই প্রদেশ গত ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কসাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করাইয়া অষ্ট্রিয়ারাজ্যভুক্ত করাইয়াছিলেন। অষ্ট্রিয়া যখন জর্ম্মণীর সাহায্যে এই দুই প্রদেশ কাড়িয়া লন, তখন ইহার প্রতিবিধান করিবার জন্য রুসিয়া প্রস্তুত ছিলেন না। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স বুঝিয়াছিলেন যে, এই দুইটী প্রদেশ গ্রহণ করায়, এবং এড্রিয়াটিক সমুদ্রের তীরে স্বীয় রণতরীর বহর প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করায়, অষ্ট্রিয়া ইতালীর স্বার্থে আঘাত করিলেন। অতঃপর ইতালী স্বীয় স্বার্থ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবে, জর্ম্মণী এবং অষ্ট্রিয়ার সঙ্গী হইয়া ইউরোপের এই মহাসমরে আত্মদান করিতে উদ্যত হইবেন না। বাস্তবিক ঘটিয়াছেও তাহাই; ইতালী এ মহাসমরে কোনও পক্ষ অবলম্বন করেন নাই।

বাস্তবিক, এই যুদ্ধ স্লাভ ও টিউটন জাতির মধ্যে যুদ্ধ; এই দুই জাতির মধ্যে কোন জাতি ইউরোপে সর্ব্বজনমান্য হইয়া থাকিবে, তাহারই মীমাংসা এই যুদ্ধে হইয়া যাইবে। শত বৎসর পূর্ব্বে লাটিন ও টিউটন জাতির মধ্যে কোন জাতি ইউরোপে প্রাধান্য লাভ করিবে, তাহারই চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গিয়াছিল; আর আজ জর্ম্মণী বড় থাকিবে, কি স্লাভ বড় হইবে, তাহারই চূড়ান্ত মীমাংসা হইতেছে। ইংলণ্ড চিরকালই বাট্‌খারার কাজ করিয়া আসিয়াছেন। সাক্ষাতে যে জাতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, যাহার প্রতাপ সদ্যঃ সদ্যঃ অসহ্য বোধ হইতেছে, ইংলণ্ড তাহারই বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া থাকেন। যখন হিস্পানী জাতি প্রবল হইয়াছিল, দ্বিতীয় ফিলিপের প্রতাপে ইউরোপ টলমল করিতেছিল, তখন ক্ষুদ্র ইংলণ্ড রণতরীর বহরকে চূর্ণ করিয়া ইউরোপের শক্তি-সামঞ্জস্য (Balance of Power) রক্ষা করিয়াছিলেন। পরে যখন মহাবীর নেপোলিয়ন ইউরোপবিজয়ী হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার সহিত বিরোধ ঘটাইয়া, ইউরোপের সমবেত শক্তি-সাহায্যে, তাঁহাকে ধূলিসাৎ করিয়াছিলেন। এবারও জর্ম্মণসম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ম ও জর্ম্মণজাতি অতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছেন, ক্ষুদ্র রাজ্য সকলকে গ্রাস করিয়া জর্ম্মণী একেশ্বর হইয়া থাকিতে চাহেন, তাই ইংলণ্ড এবার জর্ম্মণীর বিরোধী, স্লাভের পক্ষপাতী। এই ভীষণ যুদ্ধের পর বিজয়ী হইলেও স্লাভজাতিকে প্রতাপশালী হইতে হইলে কালের অপেক্ষা করিতে হইবে। ততদিন ত ইউরোপে শক্তি-সামঞ্জস্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে; তাহাই বড় লাভ। তাহার পর ভবিষ্যতে কি হইবে, কি না হইবে, তাহা বিধাতাই জানেন। আপাততঃ জর্ম্মণ-দর্প খর্ব্ব হইলে ইউরোপে কিছু কাল শান্তি বিরাজ করিবে। এই সিদ্ধান্ত করিয়া ইংলণ্ড এ মহারণে ফ্রান্স ও রুসিয়ার পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন। আসল কথা, 'আত্মানং সততং রক্ষেৎ'—এ চিন্তাও ইংলণ্ডের মনে জাগরূক রহিয়াছে। পররাষ্ট্রসচিব স্তার এডওয়ার্ড গ্রে যুদ্ধের পূর্ব্বাহ্নে পার্লামেণ্টে এ কথাটাও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন। ডেনমার্ক হইতে বেলজিয়ম পর্য্যন্ত ভূভাগ জর্ম্মণীর করতলগত হইলে, ফ্রান্স হীনবীর্য্য হইলে, ইংলণ্ডের স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার পক্ষে বিষম ব্যাঘাত ঘটিবে। জর্ম্মণীর উন্নতির মুখে ইংলণ্ডই প্রধান অন্তরায়; সে অন্তরায় দূর করিবার জন্য জর্ম্মণী প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। ইউরোপের পূর্ব্বভাগে স্লাভ-প্রাধান্য নষ্ট করা এবং পশ্চিম দিকে ইংলণ্ডের নৌ-শক্তির হ্রাস করাই জর্ম্মণীর উদ্দেশ্য। সুতরাং সে উদ্দেশ্য ব্যাহত করিতে হইলে, ইংলণ্ডকে ফ্রান্স ও রুসিয়ার পক্ষাবলম্বন করিতেই হইবে। তাই ইংলণ্ড শোণিত-সম্পর্কে জর্ম্মণীর জ্ঞাতি ও কুটুম্ব হইলেও, আজ জর্ম্মণীর বিরোধী।

এইবার একটু পুরাতন ইতিহাস-কথার আবৃত্তি করিতে হইবে। পূর্ব্বে অষ্ট্রিয়ার সম্রাটই জর্ম্মণ-সম্রাট্ এই নামে অভিহিত হইতেন। গত ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে শাডোয়ার (sadowa) যুদ্ধে অষ্ট্রিয়াকে প্রসিয়া পরাজিত করিয়া, অষ্ট্রিয়ার সে দাবী নষ্ট করে। পরে ১৮৭০।৭১ খৃষ্টাব্দে প্রসিয়া, ব্যাভেরিয়া, স্যাক্‌সনি প্রভৃতি অন্য জর্ম্মণ রাজ্যের সহায়তায়, ফ্রান্সকে পর্য্যুদস্ত করিলে, প্যারী নগরের উপনগর ভার্সেল সে প্রসিয়ার রাজা প্রথম উইলিয়ম জর্ম্মণ-সম্রাট এই উপাধি প্রাপ্ত করেন। জর্ম্মণদেশের সকল খণ্ডরাজ্যের রাজা প্রসিয়ার সামন্ত হইতে স্বীকার করেন; পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ও সমর বিষয়ে তাঁহারা প্রসিয়ার অধীনতা স্বীকার করে। প্রসিয়ার কৌটিল্যপ্রধান রাজনীতিক প্রিন্স বিসমার্ক ও সমরকুশল মহাবীর ভন্ মল্‌ৎকে প্রসিয়া রাজ্যের এই প্রাধান্য সাধন করিয়া-

ছিলেন। ইহার ফলে জর্ম্মণজাতি সুসংবদ্ধ, সন্নিবিষ্ট, একভাব-প্রমত্ত হইয়া উঠে। এই একীকরণের প্রভাবে ধীরে ধীরে নবীন জর্ম্মণী—প্রসিয়া-শাসিত জর্ম্মণ সাম্রাজ্য—ইউরোপে প্রধান আসন লাভ করেন। বিশেষতঃ ইংলণ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়া জর্ম্মণ জাতির বিশেষ পক্ষপাতিনী ছিলেন; একে ত তাঁহার শ্বশুরঘর স্যাক্সকোবর্গে ছিল; তাহার উপর প্রসিয়ার প্রথম সম্রাট উইলিয়মের জ্যেষ্ঠ পুত্র সম্রাট তৃতীয় ফ্রেডারিক তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা ছিলেন। জর্ম্মণীর বর্ত্তমান সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ম মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র; আমাদের সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের পিসতুত ভাই। যতদিন মহারাণী ভিক্টোরিয়া জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি ইংরেজ জাতিকে জর্ম্মণীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে দেন নাই। ফ্রান্সের সহিত প্রসিয়ার যুদ্ধকালে তিনি ইংলণ্ডকে কোনও পক্ষ অবলম্বন করিতে দেন নাই। বিস্মার্ক মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে বুঝাইয়াছিলেন যে, জর্ম্মণ জাতি কখনই নৌবিদ্যাবিশারদ হইবে না; জর্ম্মণী কখনই ইংলণ্ডের সাগরপারের কোনও উপনিবেশ বা রাজ্য অধিকার করিতে চাহিবে না; জর্ম্মণী ইউরোপে প্রাধান্যলাভ করিতে চাহে; ইংলণ্ডের সে পিপাসা নাই; ইংলণ্ডের জগৎজোড়া ব্যবসায় বাণিজ্য অক্ষুণ্ণ থাকিলেই, ভারত-সাম্রাজ্য হস্তগত থাকিলেই, ইংলণ্ড সন্তুষ্ট; অতএব ইউরোপে জর্ম্মণীর উন্নতির মুখে কণ্টক হইবার কোনও স্বার্থ ইংলণ্ডের নাই। এই সিদ্ধান্তটুকু ইংলণ্ডের তাৎকালিক রাজনীতিকগণেরও মনে লাগিয়াছিল। তাঁহারা ফ্রান্সের পরাজয়ে উদাসীন ছিলেন; জর্ম্মণীর অতি-উন্নতির পথে কোনও ব্যাঘাত ঘটান নাই। অল্‌সাস্‌ ও লোরেণ নামক ফ্রান্সের পূর্ব্বসীমান্তের দুইটি প্রদেশ যখন জর্ম্মণী কাড়িয়া লইল, তখনও ইংলণ্ড কিছু বলিলেন না। সে বেদনা, সে অপমান ফরাসী জাতি কখনও ভুলিতে পারে না; আজও ভুলে নাই।

বিস্মার্ক জর্ম্মণ রাজনীতিকগণকে বুঝাইয়া গিয়াছিলেন যে, দেখিও, ইংলণ্ড যেন রুস ও ফরাসীর সহিত সম্মিলিত না হয়; এই তিন শক্তি সম্মিলিত হইলে জর্ম্মণীর বিপদ অনিবার্য্য। জর্ম্মণ জাতি ব্যবসায়ী হউক, বাণিজ্যব্যাপারে ইংলণ্ডের সমকক্ষতা করুক, তথাপি ইংলণ্ড কিছু বলিবে না; কিন্তু যে দিন জর্ম্মণী নৌশক্তিতে ইংলণ্ডের প্রতিযোগিতা করিতে আরম্ভ করিবে, সেই দিন ইংলণ্ড জর্ম্মণীর শত্রু হইয়া উঠিবে। বিস্মার্কের এই পরামর্শ যতদিন জর্ম্মণ সম্রাট ও জর্ম্মণ-জাতি শুনিয়াছিলেন, ততদিন ইংলণ্ডের সহিত জর্ম্মণীর কোনও প্রকার মনোবাদ ঘটে নাই। জর্ম্মণীর বর্ত্তমান সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ম বিস্মার্কের কোনও পরামর্শই গ্রাহ্য করেন নাই। তিনি জর্ম্মণীর নৌশক্তি-বৃদ্ধির জন্য অশেষ আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। সর্ব্বাগ্রে তিনি ডেনমার্কের নিকট হইতে স্লেসউইগ-হলষ্টীন (Schleswig-Holstein) প্রদেশ কাড়িয়া লইলেন। পরে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কাছে একরূপ আবদার করিয়া হেলিগোল্যাণ্ড (Heligoland) দ্বীপ চাহিয়া লইলেন। তৎকালের মহামন্ত্রী লর্ড সলস্‌বরী এ দানে কোনও দোষ দেখিলেন না। শেষে কীল সাগর-শাখা হইতে এল্‌ব (Elbe) নদীর মোহানা পর্য্যন্ত এক বিশাল খাল খনন করাইলেন। বলটিক্‌ সাগর-শাখা হইতে উত্তর-সমুদ্র (North sea) পর্য্যন্ত জর্ম্মণ জাহাজ সকল অনায়াসে যাতায়াত করিবার পথ পাইল। এইবার ইংরেজ জাতির জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল। ইংরেজ বুঝিলেন যে, জর্ম্মণ জাতি নৌশক্তিতে ইংরেজের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। তাহার পর, বুয়র যুদ্ধে ইংরেজ জাতির প্রতি জর্ম্মণ সম্রাটের মনোভাব ফুটিয়া বাহির হইল। ইংরেজ বুঝিলেন যে, এমন দিন আসিতেছে, যখন জগৎ-প্রাধান্যের জন্য জর্ম্মণীর সহিত ইংরেজকে যুদ্ধ করিতেই হইবে।

যতদিন মহারাণী ভিক্টোরিয়া বাঁচিয়াছিলেন, ততদিন ইংরেজ জাতি জর্ম্মণীর বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই। মহারাণীর মৃত্যুর পর সপ্তম এডওয়ার্ড ইংরেজ জাতির রাজা হইলেন। তিনি রাজাসন অধিকার করিবার অব্যবহিত পরেই ফরাসী জাতির সহিত সদ্ভাব করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার উদ্যম সফল হইল। ফরাসীর সহিত ভাব করাতে রুস আপনা-আপনি ইংরেজের বন্ধু হইলেন। তখন রুস জাপান-যুদ্ধের পর জর্জ্জরিত; ইংরেজদের বান্ধবতা তাঁহাদের পক্ষে বড়ই মধুর বোধ হইল। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড শেষে গাঁটছড়ায় ইউরোপকে বাঁধিয়া ফেলিলেন। স্পানী-রাজ আল্‌ফন্‌সোকে তিনি কন্যা ভাগিনেয়ী দান

করিলেন; নরওয়ের রাজাকে কন্যা দান করিলেন; সুইডেনের রাজাকে ভ্রাতুষ্পুত্রী দিলেন। গ্রীসের রাজা তাঁহার শ্যালক; রুস সম্রাট তাঁহার শ্যালিকার পুত্র, এবং ভাগনী-জামাই হইলেন। ফলে, সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজনীতিক পটুতার প্রভাবে জর্ম্মণী ও অষ্ট্রীয়া ইউরোপে কতকটা একলা হইয়া পড়িল। তখন জর্ম্মণীর সম্রাট মাতুল সপ্তম এডওয়ার্ডের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত আর এক চাল চালিলেন। তিনি তুর্ক সম্রাটের সহিত ভাব করিয়া বোগদাদ রেলপথ গড়িবার অধিকার গ্রহণ করিলেন। এই বোগদাদ রেল-বিস্তারই সকল সর্ব্বনাশের গোড়া হইল। ইহার জন্যই এসিয়া মহাদেশের পশ্চিম অংশ লইয়া রুসিয়ার সহিত ইংরেজের একটা ভাগবাটোয়ারা হইয়া গেল। এই বাটোয়ারাকে ইংরেজী রাজনীতির ভাষায় বলে— Anglo-Russian Convention। এই বাটোয়ারা অনুসারে ইংলণ্ড পারস্যের দক্ষিণাংশ, আরব দেশের পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশ, বালুচিস্থানের সবটা স্বীয় অধিকারে পাইলেন। বোগদাদ রেলপথের প্রসারবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ ও রুস উভয়ে বিচলিত হইলেন। সে চাঞ্চল্যের ফলে কলিকাতা হইতে দিল্লীতে ভারতের রাজধানী উঠিয়া গেল। সে চাঞ্চল্যের ফলে বল্‌কান যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অষ্ট্রীয়া যখন বস্‌নিয়া ও হর্জ্জগভ্‌নীয়া—এই দুই প্রদেশ কাড়িয়া লইয়াছিলেন, তখন রুস ঠিক করিয়াছিলেন যে, অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্য এবং তুর্ক সাম্রাজ্যের মধ্যে স্লাভ-প্রধান একটা রাজ্যের সৃষ্টি করিতেই হইবে। বল্‌কান মহাসমর এই উদ্দেশ্যসাধন জন্য আরব্ধ হয়। সে যুদ্ধের ফলে সর্ব্বাগ্রে তুর্কসাম্রাজ্য চূর্ণ হইল। তুর্কী যে পরে জর্ম্মণীকে বিশেষভাবে সাহায্য করিবেন, তাহার পথ আর রহিল না। কিন্তু বুলগেরিয়া প্রধান হইয়া উঠিল। বুলগেরিয়া জর্ম্মণীর করতলগত জানিয়া সার্ভিয়ার সহিত বুলগেরিয়ার যুদ্ধ বাধিল। বুলগেরিয়া পরাজিত হইল; সার্ভিয়া বড় হইয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে গ্রীসও প্রবল হইলেন। পাছে বস্‌নিয়ার পথে অষ্ট্রিয়া কালে বড় হইয়া উঠে, তাই উহার পার্শ্বে আল্‌বানিয়া নাম দিয়া একটা নূতন রাজ্যের সৃষ্টি করা হইল। জর্ম্মণী ও অষ্ট্রিয়া উভয়ে বুঝিলেন যে, বলকান যুদ্ধে রুস ও ইংরেজ আমাদের মাৎ করিয়াছেন। এইবার প্রশস্ত রাজনীতির পরিবর্ত্তে কূটরাজনীতির চাল চালিতে লাগিল। গ্রীসের রাজা, মহারাণী এলেকজান্দ্রার ভ্রাতা, ঘাতুকের হস্তে প্রাণ দিলেন। পাল্‌টা জবাবে বস্‌নিয়ায় ষড়যন্ত্র হইল। গত ২৩শে জুলাই তারিখে অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ ও তাঁহার পত্নী সেরাজেভো নগরে নিহত হইলেন। এইবার চাপা আগুন ফুটিয়া উঠিল। অষ্ট্রিয়া সার্ভিয়ার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। রুস বলিলেন, আমি থাকিতে স্লাভ সার্ভিয়াকে তুমি অষ্ট্রিয়া দমন করিতে চাহ কোন সাহসে? রুস যুদ্ধের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। জর্ম্মণী বলিলেন, আমি অষ্ট্রিয়াকে রক্ষা করিবই, রুস যুদ্ধে নামিলে আমিও যুদ্ধ করিব—একা রুসের সহিত নহে, ফরাসী জাতির সহিতও যুদ্ধ করিব। ইংলণ্ড বলিলেন, তুমি জর্ম্মণী যে দেনমার্ক, হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম অধিকার করিয়া ফরাসী জাতিকে চাপিয়া ধরিবে, সন্ধিপত্র পদদলিত করিবে, তাহা আমরা সহিব না, আমরাও ফরাসী ও রুসের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধে নামিব। একটা ইউরোপব্যাপী সমরানল জ্বলিয়া উঠিল।

সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের আঁতাত-কর্দ্দিয়াল (Entente-Cordiale) বা ফরাসী ও রুসের সহিত সদ্ভাব-বিস্তারের প্রতিরোধ ঘটাইবার উদ্দেশ্যে জর্ম্মণ সম্রাট গত পনর বৎসরকাল স্বীয় নৌশক্তি-বৃদ্ধির চেষ্টায় ইংলণ্ডের সহিত নিয়মিতরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া আসিতেছেন। এই বিষম প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে ইংলণ্ডে এক বিরাট নৌবাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছে; জর্ম্মণীও নৌশক্তিতে ইংলণ্ডের কতকটা সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন। এই যুদ্ধে উভয় জাতির নৌবলের পরীক্ষা হইবে। বিলাতের নৌসচিব মান্যবর চর্চ্চিল বলিয়াছেন যে, এ যুদ্ধে যদি ইংরেজ জাতি হারে, তাহা হইলে, পরে মার্কিণ যুক্তরাজ্যের উপনিবেশিকগণকে অচিরে জর্ম্মণীর সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। যে হিসাবে নেপোলিয়নের প্রভাব খর্ব্ব করিবার জন্য ইংলণ্ডকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, সেই হিসাবে এই যুদ্ধও চলিবে। পরিণাম বোধ হয় একই রকমের হইবে। ইতালীর মনীষী ফেরেরো বলিয়াছেন,—"এ যুদ্ধ কেবল স্লাভ ও টিউটনের প্রাধান্যলাভের যুদ্ধ নহে। বিলাসপ্রধান, দেহসর্ব্বস্ব আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার অগ্নিপরীক্ষার স্বরূপ এই যুদ্ধ। এই

যুদ্ধের পরিণামে হয় ইউরোপীয় সভ্যতা ধূলিসাৎ হইবে, শ্লাভ-প্রাধান্যে ইউরোপ নির্জীব হইয়া পড়িবে ;—নহে ত এ সভ্যতা বিশুদ্ধি লাভ করিয়া প্রবলতর হইবে।" ফেরেরো আরও বলেন, হূণ, গথ, ভাণ্ডালদের আক্রমণে রোমরাজ্য ও রোমক সভ্যতা যে ভাবে ধ্বংসমুখে গিয়াছিল, পরে খৃষ্টানধর্ম্ম ও খৃষ্টান সভ্যতা যে ভাবে ইউরোপ অধিকার করিয়াছিল, এবারও ঠিক তেমনই ভাবে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইবে। আমেরিকা ও এসিয়ার সংস্পর্শে অতিধনের ধনী হইয়া ইউরোপে যে পাপ সঞ্চিত হইয়াছে, তাহারই প্রায়শ্চিত্তের দিন আসিয়াছে। এ যুদ্ধ শীঘ্র শেষ হইবার নহে। এ ন্যাকড়ার আগুণ, তুষানলের জ্বালা এখন জ্বলিতেই থাকিবে ; পাপের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত না হইলে ইউরোপে আবার স্থায়ী শান্তি বিরাজ করিবে না। "বহ্নির্দ্ধের্মনসি স্থিতম্‌।"

এ যুদ্ধের গৌণপক্ষের—পরোক্ষ ভাবের সকল কথা বলিয়া রাখিলাম। বারান্তরে ইহার সাক্ষাৎ-সম্বন্ধের সকল কথা ও যোধমণ্ডলীর বলাবলের ও রণচাতুরীর পরিচয় দিব।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

খাস্‌-মুন্সীর নক্সা।

পঞ্চম অধ্যায়—নূতন জীবন।

জুন মাসের শেষভাগে আমি এবং আমার একটী সমবয়স্ক পরম বন্ধু দুই জনে কাশী ত্যাগ করিলাম। আমি কোনও হিন্দু রাজার রাজ্যে চলিয়াছি। আমার বন্ধুটি নিমকমহলের বড় কর্ত্তা কোনও একটী বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর বাটীতে তাঁহার সন্তানদের শিক্ষক-রূপে চলিয়াছেন। সুতরাং উভয়েই এক উদ্দেশ্যে বহুদূর এক সঙ্গে চলিলাম। যথাসময়ে বন্ধুর গন্তব্য স্থলে উপস্থিত হইলাম। পরদিন বন্ধুর সহিত তাঁহার নূতন মনিবের বাসা খুঁজিয়া তাঁহাকে সেখানে কার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া ছোট লাইনের গাড়ী চড়িয়া নিজ গন্তব্য স্থানে চলিলাম। বন্ধুবরের সহিত [illegible] গাঢ় আলিঙ্গন করিলাম। বন্ধুবর এখনও জীবিত আছেন। কখনও কখনও তাঁহার স্নেহপূর্ণ পত্রাদিও পাই। কিন্তু জীবনের স্রোত এমনই বিভিন্ন মার্গে চলিয়াছে যে, সেই বিদায়ের পর আর তাঁহার সহিত আজ পর্য্যন্ত চাক্ষুষ সাক্ষাৎ হয় নাই। তাঁহার সেই হাস্যপূর্ণ মুখ আর দেখি নাই, রঙ্গ-বিদ্রূপ-পূর্ণ পাগলামীর কথা এ পর্য্যন্ত আর শুনিতে পাই নাই। ইহজগতে আর যে শুনিতে পাইব, তাহার আশাও করি না।

ছোট লাইনে এই আমার প্রথম ভ্রমণ। অর্থের অল্পতাবশতঃ অবশ্য রাজ-শ্রেণীতেই (Royal class, তৃতীয় শ্রেণী) চাপিতে হইল। ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান্‌ বাদশাহী লাইন। যেমন সুন্দর গাড়ীগুলি, তেমনই—তখনকার প্রত্যেক গাড়ীতে লৌহ-গরাদে থাকাতে,—জনতার অনেকটা লাঘব হইত। ছোট লাইনের তৃতীয়

শ্রেণী ভদ্রলোকের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। গয়াদে একেবারে নাই। তাহা ছাড়া ছোট ছোট গাড়ী, এবং জনতা এত বেশী যে, কে কার স্কন্ধে পড়িতেছে, তাহার ঠিকানা নাই। তখন আবার একখানি ডাক ও একখানি প্যাসেঞ্জর মাত্র ছিল। সুতরাং জনতার মাত্রাটা আরও কিছু বেশী ছিল। এতদ্ব্যতীত তৃতীয় শ্রেণীতে অতি-নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকেরা গতায়াত করিয়া থাকে বলিয়া, গরীব ভদ্রলোকের তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত অত্যন্ত কষ্টদায়ক ছিল। কি করা যায়, পয়সা না থাকিলে সব কষ্টই সহ্য করিতে হয়। দেখিতে দেখিতে অনেক দূর ছাড়াইয়া নিজ গন্তব্য স্থানে পঁহুছিবার ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গাড়ী হইতে নামিয়া নিজ তৈজস-পত্রগুলি লইয়া টিকিটখানি ফেরত দিয়া ষ্টেশনের বাবুদের জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, অমুক রাজধানী এখান হইতে কত দূর ?" তাঁহারা বলিলেন, "এখান হইতে ৬০ মাইল।" জিজ্ঞাসা করিলাম, "যাইবার কোনও যান পাওয়া যায় কি না ?" বলিলেন, "সরাইয়ে গমন করুন, সেখানে একা পাওয়া যাইবে।" তখন প্রায় বেলা একটা হইবে। বিমর্ষভাবে ভাবিতে ভাবিতে ষ্টেশনের সীমা ছাড়াইয়া নিকটবর্ত্তী বাজারে গিয়া পঁহুছিলাম, এবং সরাইয়ে উপস্থিত হইলাম। সেক্রেটারী মহাশয় যে উৎকৃষ্ট ইংরেজী ভাষায় আমার নিয়োগপত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে আমার একটা ধারণা হইয়াছিল যে, ষ্টেশন হইতে রাজধানী কেবলমাত্র ১৭ মাইল, এবং একাও যথেষ্ট পাওয়া যায়। সুতরাং আমি ভাবিয়াছিলাম যে, ১৭ মাইল একায় যাওয়া এমন বিশেষ কষ্টকর হইবে না। এখন সরাইয়ে একা-চালকদের নিকট তদন্ত করায় তাহারা বলিল, "মহাশয়, ৬০ মাইল দূর নহে ; তবে এখান হইতে প্রায় ৫০ মাইল দূরে রাজধানী।" এ সঠিক সংবাদও বিশেষ আশাপ্রদ হইল না। ৬০ ও ৫০এ তফাৎ বড়ই অল্প। আমি এখন উভয়-সঙ্কটে পড়িলাম। কি করি, ভাবিয়াই স্থির করিতে পারিতেছি না। রেলে আসিতে উভয় পার্শ্বে যেরূপ পর্ব্বতশ্রেণী দেখিয়াছি, এবং একা-চালকদের নিকট রাস্তার যেরূপ বর্ণনা শুনিলাম, তাহাতে আমার মন খুব দমিয়া গেল। পাঠকগণ ভাবিতে পারেন, কর্ম্মত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিলেই হইত। সুতরাং ইহাতে আবার উভয়-সঙ্কট কি ? আমি পূর্ব্ব অধ্যায়ে লিখিতে একটু ভুলিয়াছি। একটু উভয়-সঙ্কট ছিল ; সে কারণ আমায় যথেষ্ট চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছিল।

যখন আমি কাশীধামে নিয়োগপত্র পাই, তখন [illegible] কার্য্য ত্যাগ করি নাই। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, গ্রীষ্মাবকাশে কাশীতে ছিলাম। প্রায় দুই মাসের বেতন প্রাপ্য ছিল। জিনিসপত্র সমস্তই কর্ম্মস্থানে ছিল। এই সূত্রে

সেই সময়ে একবার ২।১ দিবসের জন্য আমাকে কর্ম্মস্থলে যাইতে হয়। ইস্কুলের অধ্যক্ষ পাদরী-পুঙ্গবের সহিত সাক্ষাৎ করি, এবং তাঁহাকে নূতন কর্ম্মের বিষয় জানাইয়া বিনা বেতনে ছয় মাসের অবকাশ প্রার্থনা করি। দেশী রাজ্যে নূতন কার্য্য, আমার দ্বারা চলিবে কি না, তাহা জানি না। এই নিমিত্ত অবকাশ-প্রার্থনা। এই ন্যায্য অনুরোধ পাদরী-পুঙ্গব গ্রাহ্য করিলেন না। পদত্যাগের পূর্ব্বাহ্নে নোটিশ দেও নাই বলিয়া চাপ দিলেন, এবং ১৫ দিনের বেতন কাটিয়া লইলেন। আমি অসদ্ব্যবহারে দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রাপ্য বেতনের মধ্যে যাহা তিনি ন্যায়সঙ্গত ও ধর্ম্মসঙ্গত বিবেচনা করিয়া দিলেন, তাহাই লইয়া কর্ম্মত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলাম। মনে মনে চিন্তা করিলাম, বি. এ পাস করিয়াছি; যদি এই নূতন স্থানে একান্তই না টিকিতে পারি, তাহা হইলে কি ৪০৲ টাকা মাহিনার আর একটা চাকুরী জুটিবে না? ৪০৲টা টাকা পাইলেই আমার আপততঃ মোটামুটি শাক অন্ন চলিয়া যাইবেক। বিচারবিহীন ধর্ম্মপ্রাণ পাদরী-পুঙ্গবের অধীনে ৪৫৲ কেন, ৫০৲ টাকা বেতনের কার্য্যও করা উচিত নহে। এইরূপ চিন্তায় প্রণোদিত হইয়া কার্য্য ত্যাগ করি, এবং ৬০৲ টাকা মাহিনার নূতন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে চলিয়াছি।

ষ্টেশনের নিকটস্থ সরাইয়ে যে উভয়-সঙ্কটে পড়িয়াছিলাম, তাহার ইতিবৃত্ত উপরে লিখিত হইল। পূর্ব্বেই চাকুরী ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, নূতনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই এই ধোঁকা। রাস্তা মনে করিলেই শরীরের রক্ত শুষ্ক হইয়া যায়। এক্কা-চালকদের জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাপু! রাজধানীতে কখন পঁহুছিব?" তাহারা বলিল, "বাবু! আজ আমরা এখান হইতে বেলা চারিটার সময় যাত্রা করিয়া, ১০ মাইল দূরে একটী চটী আছে, সেইখানে রাত্রিবাস করিব। পরদিন প্রত্যূষে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া বেলা তিনটার সময় রাজধানী পঁহুছিব।" হৃদয় সংশয়-দোলায় দোদুল্যমান। যাই, কি না যাই। যদি ফিরিয়া যাই, তবে পূর্ব্ব চাকুরী ত্যাগ করিয়াছি, সুতরাং "পুনর্মূষিকো ভব" গোছ হইয়া বাড়ী ফিরিতে হইবে। আবার সেই ঠাকুরমা-রূপিণী কর্ত্রীর বাক্যযন্ত্রণা ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইবে। যদি গন্তব্যস্থলে যাই, তবে এই নিদারুণ রাস্তায় রাত্রিযাপন, এবং দস্যু তস্করের হস্তে প্রাণ যাইলেও কেহ বাঁচাইবার নাই। কি করি, কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না, এমন সময়ে এক্কা-চালকেরা বলিল, "বাবু! আপনি যদি রাজধানীতে যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে একখানি এক্কা ভাড়া করিয়া ফেলুন। নচেৎ পরে আর এক্কা পাইবেন না। সমস্ত

একা চারিটার সময় এখান হইতে চলিয়া যাইবে।" অগত্যা তিন মুদ্রা দিয়া একখানি এক্কা ভাড়া করিলাম, এবং সরাইয়ের একখানি ভগ্ন 'খাটিয়া'য় পড়িয়া নিজের অবস্থা চিন্তা করিতে লাগিলাম। সেই সময়ে আমার মনে পড়িল :—

মা! আমায় কোথায় আনিলে।
অগাধ জলধি-জলে আমায় ভাসালে॥
কোথা রহিল মাতা পিতা, কে করে স্নেহ মমতা,
প্রাণপ্রিয়া রইল কোথা, বন্ধু সকলে॥

এইরূপে ভাবিতে ভাবিতে এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। বেলা চারিটার সময় আমরা কতকগুলি লোক পাঁচ ছয়খানি এক্কায় আরোহণ করিয়া রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

রেলের ষ্টেশন হইতে কিছু দূর আসিবার পর এক বৃহৎ পাহাড়ী নদী পাইলাম। পাড় পাকা একটী মাইল। জলের লেশ নাই। যত দূর দৃষ্টি যায়, কেবল বালুকাময়ী মরুভূমির ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। এই বালুকাক্ষেত্র দিয়া আরোহী সহিত ঘোড়ার পক্ষে এক্কা টানা বড় সহজ ব্যাপার নহে। তজ্জন্য, আরোহিবর্গকে একে একে নামিয়া পদব্রজে বালি ভাঙ্গিয়া যাইতে হইল। নদীটি বর্ষাকালে অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করে। পাহাড় অঞ্চলে অতিবৃষ্টি হইলে নদীগর্ভ জলে ভরিয়া যায়; কিন্তু পাড় অত্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া জল কোনও স্থলেই কোমর অথবা বক্ষঃস্থলের অধিক হয় না। কিন্তু স্রোত এত খরতর যে, কটিদেশ পর্য্যন্ত জল হইলে কাহার সাধ্য হাঁটিয়া নদী পার হয়। সুতরাং বর্ষাকালে পথিকদের বড় অসুবিধা ঘটে; অনেক সময়ে রাস্তা বন্ধ হইয়া যায়; এবং হয় ত নদীর সন্নিকটবর্ত্তী স্থলে দুই চারি দিবস পড়িয়া থাকিতে হয়। ভাল আশ্রয়-স্থল না থাকায় অত্যন্ত কষ্টও পাইতে হয়। শুনিয়াছি, এক সময়ে এক জন সাহেব হাকিম বর্ষাকালে এই দেশ পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে এই নদীর তীরে কয়েক দিন পড়িয়া থাকিতে হইয়াছিল। সাহেব শ্রাবণ মাসে উক্ত দেশ পরিদর্শনার্থ যাইতেছিলেন। নদীটি সাহেবের পথ আটক করিল। নদীতীরে কোনও স্থলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে এক রাত্রি কাটাইতে হয়। সাহেব দুর্ভাগ্যবশতঃ Tiffin-Basket (জলযোগের ঝুড়িটি) ভুলিয়া আসিয়াছিলেন। জনবুলের সব সহ্য হয়, কিন্তু ক্ষুধা সহ্য হয় না। কি করেন? মহা বিপদ উপস্থিত! নিকটস্থ এক গোঁয়ার-গোবিন্দ গুজর-জাতীয় লোককে দেখিয়া তাঁহার খানসামা কিছু খাদ্য অন্বেষণ করে। এতদঞ্চলে গোয়ালাকে

গুজর বলে। সে বলিল, "আমার নিকট রাবড়ী আছে; সাহেব্ বাহাদুরকে দিতে পারি।" সাহেব ক্ষুধার্ত্ত; তাহাতেই সম্মত। পাঠক! উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে উৎকৃষ্ট ক্ষীরকে রাবড়ী বলে। এ সে রাবড়ী নহে। এ রা-ব-রী। এ অঞ্চলের প্রস্তুত-প্রণালী অতি সহজ। গো অথবা মহিষের দুগ্ধের ঘোল সিদ্ধ করিয়া তাহাতে বাজরা নামক শস্যের আটা ফেলিয়া দিলেই "রাবরী" হইল। সাহেব কখনও এ উপাদেয় আহার্য্য আহার করেন নাই! গুজর বেচারী একটি পাত্র রাবরী-পূর্ণ করিয়া সাহেবের নিকট আনিয়া ধরিল। সাহেব ক্ষুধার চোটে প্রথমে কতকটা গলধঃকরণ করিয়া ফেলিলেন; তৎপরে যখন "রাবরী"র প্রকৃত স্বাদ পাইলেন, তখন উক্ত "রাবরী"-পাত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গুজরকে মারিতে দৌড়িলেন; চীৎকার করিয়া তাহাকে গালি দিয়া বলিতে লাগিলেন, "ও বদমাস, তু হামকো — খিলায়া।" সে গরীব যত হাত যোড় করিয়া বলে, "না হুজুর, হামনে রাবরী খিলায়ী", সাহেবের ক্রোধ-বহ্নি ততই প্রজ্বলিত হইতে লাগিল, এবং চীৎকারের মাত্রাও ততই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল!

নদী পার হইয়া আমরা একটী গ্রামের বহির্ভাগে সরাইয়ে (চটীতে) আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা। সে রাত্রি তথায় স্থিতি। আমি ক্ষুধার্ত্ত। এক জন সহযাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাই, এখানে কিছু খাদ্যসামগ্রী পাওয়া যায়?" সে বলিল, "হাঁ বাবু, নিকটস্থ গ্রামে কলাকন্দ প্রভৃতি সমস্ত মিঠাই পাওয়া যায়, একটু অনুসন্ধান করিলেই পাইবেন।" কলাকন্দ দ্রব্যটী কি, জানিবার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল। সুতরাং গ্রামের দিকে চলিলাম। গ্রামের বাজারে "কলাকন্দ" তল্লাস করাতে একটী দোকানদার "বরফী" বাহির করিয়া দিল। তখন বুঝিলাম, এ দেশে বরফীকে কলাকন্দ বলে।

নূতন দেশে নূতন শিক্ষা আরব্ধ হইল। সরাইয়ে সে রাত্রি কোনরূপে যাপন করিয়া পরদিন প্রত্যূষে রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথ আর ফুরায় না। ক্রমাগত একা ছুটিয়াছে, এবং এক এক বার একার ধাক্কায় শরীরের অস্থি পর্য্যন্ত যেন চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া প্রায় দুই প্রহরের সময় আমার গন্তব্য রাজ্যের সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখান হইতে একার যন্ত্রণা আরও বর্দ্ধিত হইল। এই স্থান হইতে পাহাড় ও বৃহৎ বৃহৎ নালার আরম্ভ। কখনও একা শত হস্ত নিম্নে নামিতেছে, কখনও বা শত হস্ত উচ্চে উঠিতেছে। চলিতে চলিতে যখন আমরা রাজধানী হইতে প্রায় তিন

মাইল দূরে, আসিয়া পঁহুছিলাম, তখন সম্মুখে একটী পাহাড়ী নদী দৃষ্টিগোচর হইল। এক দিকে উচ্চ পর্ব্বত, অপর দিকে উচ্চ মাটীর ঢিপি। ইহার মধ্য দিয়া স্রোতস্বতী চলিয়াছে। পর্ব্বতের উপর হইতে এক্কা প্রায় ১৫০ হস্ত নিম্নে নামিয়া নদীগর্ভ দিয়া চলিল;—যেন কোনও ক্রমে পাতালপুরীতে নামিয়া নদীর ভিতর চলিলাম। এমন সময়ে পর্জ্জন্যদেব বিশেষ কৃপা করিলেন। আকাশ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। মুষলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল। বলাই বাহুল্য, সমস্ত বস্ত্রাদি সিক্ত হইয়া গেল। আমার কষ্টে যেন ইন্দ্রদেব অজস্র অশ্রুপাত করিতেছেন! সঙ্গে তৈজসপত্রের মধ্যে একটী পুরাতন কাণপুরী চর্ম্মনির্ম্মিত ট্রঙ্ক। সেটাকে পেন্‌সন দিলেই হয়। কাণপুরী ট্রঙ্কের ডালাগুলা গোল। কিন্তু আমার এই ভ্রাতৃ-দত্ত ট্রঙ্কটীর ডালাখানি পূর্ব্বে মালের চাপে গোলত্ব ত্যাগ করিয়া চেপ্টা মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। দুঃখীর উহাই পথের সম্বল। উহার মধ্যস্থ দ্রব্যাদি সমস্ত ভিজিয়া গেল। বেলা দেড়টা অথবা দুইটার সময় অশেষবিধ পথকষ্ট ভোগ করিয়া রাজধানীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

তখন আমার মনে যে সকল যৌবনসুলভ নূতন ভাবের উদয় হইল, তাহা আমি বর্ণনা করিতে অক্ষম। আমি এক সম্পূর্ণ কাল্পনিক জগতে আসিয়া পড়িলাম। কল্পনায় কত শত নূতন ভাবের লহরী আমার মনে উদিত হইতে লাগিল, তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। সম্মুখে এক নূতন ধরণের সহর। চতুর্দ্দিকে রক্তবর্ণ প্রস্তরের উচ্চ প্রাচীর নগরটাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, এবং পথিকদিগকে হিন্দুদিগের পুরাতন গৌরব অতি গর্ব্বিত-ভাবে যেন স্মরণ করাইয়া দিতেছে। হিন্দুরা আট শত বৎসরের অধিক হইল স্বাধীনতা হারাইয়া "পর দাসখত" স্বাক্ষর করিয়াছেন। আমি আজ যেন এই হিন্দু রাজ্যের নগরের তোরণদ্বারের সম্মুখে একটু স্বস্তিলাভ করিলাম। তখন যেন বোধ হইল, অদ্য আমি স্বদেশীয় ও স্বজাতীয়ের রাজ্যে আসিয়াছি। মনে এক অপূর্ব্ব আনন্দ হইল। তখন ভাবি নাই যে, আমার আশা আকাশকুসুমে পরিণত হইবে। তখন ভাবি নাই যে, এ কেবল নামমাত্র হিন্দুর রাজ্য; ইহার সহিত ন্যায়পরায়ণ ইংরাজের রাজ্যের কোনও সাদৃশ্য নাই। তখন জানিতাম না যে, হিন্দুর রাজ্যে বাস করা অপেক্ষা বৃটিশ রাজ্যে বাস করা বা ইংরাজের অধীনে চাকুরী করা শতগুণে শ্রেয়ঃ ও বাঞ্ছনীয়।

সম্মুখে বৃহৎ ফটক। ফটক পার হইয়া আমাদের এক্কাখানি নগরমধ্যে প্রবেশ করিল। আমিও এইখানে এ অধ্যায় শেষ করিলাম।

ষষ্ঠ অধ্যায়।—সবই নূতন।

নগরে প্রবেশ করিয়া সবই নূতন দেখিলাম। রাস্তা নূতন, বাটী নূতন, বাজার নূতন, নগরবাসী স্ত্রী পুরুষদের পরিচ্ছদ নূতন, কথাবার্ত্তা নূতন, ভাষা নূতন; এমন কি, আমিও যেন নূতন নূতন বোধ হইতে লাগিলাম। রাস্তাগুলি সমস্তই পাথর দিয়া বাঁধান, বেশ পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন, সমস্তই রক্তবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত। বাটীগুলি সমস্তই এক নূতন ধরণের, লিখিয়া তাহা পাঠকদের হৃদয়ঙ্গম করান একটু কঠিন। এ প্রদেশ বালুকাময়, সুতরাং এখানে ইষ্টকনির্ম্মিত বাটী অতি বিরল। নাই বলিলেই হয়। অন্যান্য রাজ্যে থাকিতে পারে, কিন্তু আমি যেখানে আসিয়াছি, সেখানে ইষ্টক অথবা কাঁচা মৃত্তিকার ঘর বাড়ী একেবারে নাই। বেলে মাটী, সুতরাং মৃত্তিকায় ঘর বাড়ী নির্ম্মাণ হওয়া একেবারেই অসম্ভব। বাটীর দেওয়াল প্রস্তরনির্ম্মিত। প্রস্তর খণ্ড খণ্ড নহে। এক একখানি ৪।৫ হাত লম্বা এবং দেড় হস্ত চওড়া প্রস্তর খাড়া ভাবে দাঁড় করাইয়া চুন দিয়া আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। ছাদে কড়ী বরগার নামমাত্র নাই। বৃহৎ বৃহৎ লম্বা প্রস্তর, যাহাকে এখানে চলিত ভাষায় "চিড়ী" বলে, তাহারই দ্বারা ছাদ আচ্ছাদিত হয়। হিন্দুর রাজ্যে বেশী পরদা; সুতরাং বাটীর ভিতর গবাক্ষ ইত্যাদির কোনও বালাই নাই। বাটী একেবারে সিন্দুক বলিলেই হয়। আবার এ প্রদেশের গ্রীষ্ম জগৎপ্রসিদ্ধ। গ্রীষ্মকালে এই প্রস্তরনির্ম্মিত বাটীগুলি যখন প্রখর সূর্য্যতাপে উত্তপ্ত হয়, তখন তাহাদের মধ্যে বাস করা যে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

নগরটি অতি ক্ষুদ্র। প্রায় ২২।২৩ হাজার লোকের বসতি। সুতরাং রাজবাটীও অতি ক্ষুদ্র। দোকানগুলি কিছু নূতন ধরণের, অর্থাৎ কতকগুলি পাকা দোকান আছে, আবার কতকগুলি লোক পাকা রোয়াকের উপর বসিয়া দ্রব্যাদি বিক্রয় করে।

স্ত্রী পুরুষও নূতন, অর্থাৎ ইহাদের পরিচ্ছদাদি সমস্তই নূতন ধরণের। নীচজাতীয় পুরুষের বস্ত্রপরিধানপ্রণালী প্রায় পশ্চিমোত্তরদেশীয় হিন্দুস্থানীদিগের সহিত মিলে। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যদের, অথবা বণিকগণের বস্ত্র পরিধান-রীতি একটু নূতন ধরণের। তাঁহারা হাঁটুর নিম্নভাগ পর্য্যন্ত বস্ত্র

পরিধান করিয়া থাকেন। কিন্তু পায়ের ডিমের দিকে বস্ত্রখণ্ড এক অদ্ভুত রকমে পাকাইয়া দিয়া থাকেন। ভারতখণ্ডের কুত্রাপি এরূপ ধরণের বস্ত্রপরিধান-প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায় না। মস্তকে সকলেই উষ্ণীষ ধারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাও একটু নূতন ধরণের। অর্দ্ধ মস্তকে উষ্ণীষ এবং অর্দ্ধেক মস্তক প্রায় দক্ষিণ পার্শ্বে খোলা। বাম পার্শ্ব কর্ণ পর্য্যন্ত ঢাকিয়া যায়, এই নিমিত্ত অনেক ক্ষত্রিয় কর্ণে কুণ্ডল ব্যবহারের সময় এক কর্ণেই পরিয়া থাকেন। উষ্ণীষ প্রায় ৩০।৩২ হাত লম্বা। উষ্ণীষ সম্বন্ধে শুনিলাম, ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধরণ। এক রাজ্যের বন্ধন-প্রণালী অপরের সহিত মেলে না। প্রত্যেক রাজ্যের লোকেরা নিজ নিজ রাজ্যের রীত্যনুসারে বিভিন্ন প্রকারে উষ্ণীষ বাঁধিয়া থাকেন। কোট ইত্যাদির বড় একটা ব্যবহার নাই। অধিকাংশ লোকই লম্বা আংরাখা ব্যবহার করেন। এই ত গেল পুরুষদের নূতনত্ব। আবার স্ত্রীলোক বস্ত্র ব্যবহার আদবেই করেন না। সকলেই ঘাগরী ব্যবহার করেন। এলাহাবাদের কিঞ্চিৎ পশ্চিম হইতে ঘাগরীর ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। তবে ফতেপুর, কাণপুর, ইটাওয়া, আগরা, এ সমস্ত জেলায় ঘাগরী ব্যবহার কতকটা "পোষাকী" রকমের, "আটপৌরে" রকমের নহে। কিন্তু এ প্রদেশের স্ত্রীলোকের মধ্যে ঘাগরীর "আটপৌরে" ব্যবহার। ইঁহাদের সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য পরিচ্ছদ "ঘাগরী", বক্ষঃস্থলে কাঁচুলী, এবং শরীর-আচ্ছাদনার্থ এক দোপাট্টা; তাহাকে "ফরিয়া" অথবা "লুগড়ী" বলে। আমরা যেমন বিবাহের সময় কন্যাকে "শাঁখা" অথবা "নোয়া" পরাইয়া দিই, সেইরূপ এ দেশে বিবাহের সময় কন্যা যে কঁচুলী ধারণ করেন, তাহা আমরণ পরিতে হয়। ঘাগরীটী প্রায় নাভিস্থলের নিম্নদেশে পরিধান করা হয়। বক্ষঃস্থলে কাঁচুলী থাকায় বক্ষঃস্থল পুনরায় দোপাট্টা দিয়া আবৃত করিবার পক্ষে তত দৃষ্টি নাই। ফল কথা, দোপাট্টা সরিয়া গেলে উদর ও কাঁচুলী দ্বারা আবৃত বক্ষঃস্থল দেখা গেলেও কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। আর নাভির নিম্নভাগে ঘাগরী পরার কারণ উদর প্রায়ই বৃহদাকার ও কদর্য্য দেখায়। এখানকার স্ত্রীজাতিকে সাধারণতঃ এই পরিচ্ছদ-বিপর্য্যয় হেতু যেন একটু নির্লজ্জ বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, এ সমস্তই আমার চোখে নূতন ঠেকিল। আমি কেন, সকল বাঙ্গালীর চোখেই নূতন ঠেকিবে।

আবার কথাবার্ত্তাও একটু নূতন ধরণের। সমস্ত কথার শেষ ভাগ ওকারান্ত করিয়া বলা হয়; যথা—লিজো, দিজো, অইয়ো, যইয়ো, খইয়ো ইত্যাদি। পশ্চিমোত্তর দেশে ঐ ঐ কথাগুলি লেনা, দেনা, আনা, জানা, খানা রূপে ব্যক্ত করা হয়। আবার কতকগুলি কথা এমন আছে, যাহা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের, যথা-

স্ত্রীলোককে "বইয়র বাগি" বলিবে। অল্পকে "নেক" বলিবে। নেক কথাটা অনেকের উল্টা। অনেকের অ উড়াইয়া নেক হইয়াছে। অনেক—অধিক, নেক—অল্প। আবার লোক অর্থে পুরুষ, লোগাই অর্থে স্ত্রীলোক। এ সমস্ত নূতন ভাষা। এখানকার লোকের লিঙ্গজ্ঞান অতি চমৎকার দেখিলাম। বড় ছোট লিঙ্গভেদে হয়, যথা—বেলা, বেলী; অর্থাৎ বেলা বলিলে বড় বাটী বুঝাইবে, বেলী বলিলে ছোট বাটী। হবেলা বলিলে বৃহৎ অট্টালিকা বুঝিতে হইবে, হবেলী বলিলে তদপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তন। পথরৌটা বলিলে বৃহৎ প্রস্তরনির্ম্মিত পাত্র বুঝাইবে, আবার পথরৌটী বলিলে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র। কতকগুলি শব্দ এরূপ আছে, যাহা সংস্কৃতের অপভ্রংশ, এবং বাঙ্গলার সহিত বেশ মেলে। যেমন বালককে এখানে সকলেই "বালক" বলে। দাদা কাকা, এগুলি বেশ বাঙ্গালার মত ব্যবহৃত হয়। জ্যেষ্ঠতাত ও পিতামহ, মাতামহ প্রভৃতি একই "বাবা" শব্দে ব্যক্ত করা হয়। "বাবা" বলিলে জেঠাও বুঝাইতে পারে, অথবা পিতামহ, কিংবা মাতামহও বুঝাইতে পারে। রক্তালু শব্দ হইতে রতালু উৎপন্ন হইয়াছে। আটাকে এ দেশে চুণ বলে। এ শব্দটি চূর্ণ শব্দের অপভ্রংশমাত্র। আর কলি চুণকে চুনা বলে। সুতরাং এখানকার ভাষা ও কথাবার্ত্তা নূতন। উপরি-উক্ত উদাহরণগুলিতে পাঠকগণ দেখিবেন, আমি যে সবই নূতন দেখিলাম বলিয়াছি, তাহা মিথ্যা নহে। চতুর্দ্দিকে সমস্তই নূতনের মধ্যে পড়িয়া আমিও নূতন নূতন বোধ হইব, তাহাতে আর বিচিত্র কি? বাঙ্গালীর নামগন্ধ এ দেশে নাই। এ রাজ্যে সমগ্র হিন্দুসমাজপূজ্য জগৎপ্রসিদ্ধ এক বিগ্রহ আছেন। বিগ্রহের সেবার্থ রাজ্য হইতে প্রায় ৫০,০০০ হাজার টাকার জায়গীর দেওয়া হইয়াছে। এই বিগ্রহের সেবক ও মোহন্ত বাঙ্গালী। তাঁহারা এ দেশে প্রায় দুই শত বৎসর হইতে বাস করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের আকার প্রকার, ভাষা পরিচ্ছদ, আহার, ব্যবহার, সমস্তই এদেশীয়দের ন্যায়! আকার ইঙ্গিত ও বাহ্য ব্যবহারে কোনও প্রকারেই তাঁহাদের বাঙ্গালী বলিয়া চেনা যায় না। সম্পূর্ণ আচারভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছেন। এই জন্য 'বাঙ্গালীর নামগন্ধ' এ দেশে নাই, লেখা হইল। সকলের সঙ্গেই উদয়াস্ত হিন্দী ভাষায় কথা, কাজেই আমিও এক নূতন জীব হইয়া পড়িলাম। আজ ২৮।২৯ বৎসর এই রাজ্যে নানারূপ সুখ দুঃখে এমন কি, সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, কাটাইলাম। এবং উদয়াস্ত "জনাব" "জনাব" করিয়াছি ইহা সত্ত্বেও যে মাতৃভাষা আমার কথঞ্চিৎ মনে আছে, যখন এ কথা মনে পড়ে, তখন আমি নিজের অবস্থা ভাবিয়া আশ্চর্য্য হই।

বেলা ১॥০ টা অথবা ২টার সময় নগরমধ্যে প্রবেশ করিয়া সমস্তই ত নূতন দেখিলাম। তাহা ছাড়া একটু নূতন ঘটনায় পড়িলাম। সেক্রেটারী মহাশয়ের নিয়োগপত্র পাইবার পর কাশী হইতে আমি তাঁহাকে অমুক তারিখে পৌছিব, এরূপ পত্র লিখি। তাঁহার বাসা জানা ছিল না বলিয়া একাখানি স্কুলে লইয়া গেলাম, এবং সেক্রেটারী মহাশয়ের অনুসন্ধান করায় জানিতে পারিলাম, দুই দিবস পূর্ব্বে কার্য্যান্তরে তিনি অন্যত্র গিয়াছেন, এবং আমার থাকিবার কোনও বন্দোবস্ত করিয়া যান নাই। ইহাও একটু নূতন বোধ হইল। এখন বল মা তারা দাঁড়াই কোথা? ইস্কুলে একটী হিন্দী পণ্ডিত থাকিতেন, তিনি আমায় সাদরে আহ্বান করিলেন, এবং আপাততঃ ইস্কুলেই বাস করিতে অনুরোধ করিলেন। আমারও আর দাঁড়াইবার স্থল নাই, সুতরাং তাঁহার প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি দিলাম। এখন ইস্কুলটীর একটু বর্ণনা করি। এরূপ ইস্কুলের বাটী আমি কখনও দেখি নাই। এই আমার প্রথম দর্শন। যখন সবই নূতন, তখন এটাই বা নূতন না হইবে কেন? একটী চতুষ্কোণ হাতা। তিন দিকে উচ্চ রোয়াক। উপরে ছাদের আচ্ছাদন। মধ্যে মৃত্তিকাময় উঠান। চতুর্থ দিকটীতে ফটক। যদি উচ্চ রোয়াক না থাকিত, তাহা হইলে ঠিক সারি সারি অশ্ব বাঁধিবার "আস্তাবল" বলিলেই চলিতে পারিত। সেই রোয়াকের এক দিকে এক স্থলে তিন চারিখানি বেঞ্চ ও একটী ভাঙ্গা টেবিল ইস্কুলের অস্তিত্ব জগতে ঘোষিত করিতেছে। ব্যাপার দেখিয়াই ত আমার চক্ষুঃস্থির!

আপাততঃ সে চিন্তা ছাড়িলাম। বেলা প্রায় ২॥০টা হইয়াছে। এখন ক্ষুধার চিন্তা অতি প্রবল। পণ্ডিতজীর তখনও আহার হয় নাই। রোয়াকগুলির পরেই এক একটা ঘর। ঘরগুলি—যেমন পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি—এক একটী সিন্দুক এবং অন্ধকারময়। তাহারই মধ্যে একটীতে পণ্ডিতজীর দ্রব্যাদি থাকে, এবং অপরটীতে তাঁহার রন্ধনকার্য্য সম্পন্ন হয়। দেখিলাম, তিনি রন্ধনে প্রবৃত্ত, এবং পাক প্রায় শেষ হইয়াছে। আমাকে আমন্ত্রণ করিলেন। আমি কোনরূপ দ্বিধা না করিয়া তৎক্ষণাৎ সম্মতিদানে তাঁহাকে আপ্যায়িত করিলাম। পর্জ্জন্য দেবের অনুকম্পায় পথে দিব্য স্নান হইয়াছিল; আর আবশ্যকতা ছিল না বলিয়া পরিধেয় বস্ত্রখানি পরিত্যাগ করিয়াই আহারে বসিলাম। আটার বৃহৎ বৃহৎ মোটা মোটা পুরী জঠরানলের অনুকম্পায় বিলক্ষণ গলাধঃকরণ করিয়া পণ্ডিতজীকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়া আচমন করিলাম। এই সমস্ত কার্য্য শেষ করিতে বেলা প্রায় ৪॥০টা বাজিয়া গেল। তৎপরে পণ্ডিতজীর সহিত খানিক সদালাপ

খানিক বা নিজ অবস্থা চিন্তা করিতে সন্ধ্যা হইল। সে রাত্রি আর আহার হইল না। প্রয়োজনও ছিল না। কারণ, বৃহৎ পুরীখণ্ডগুলি উদরে তখনও যুদ্ধ করিতেছে। ইস্কুলের সেই মৃত্তিকাময় উঠানে পণ্ডিতজী-দত্ত একখানি খাটিয়া পাতিয়া সে রাত্রি কোনও ক্রমে যাপন করিলাম। নূতন চাঁকুরীর স্থলে এইরূপে আমার প্রথম রাত্রি গেল।

প্রাতঃকালে উঠিয়াই প্রথম প্রশ্ন,—শৌচক্রিয়া। ইস্কুলে পায়খানা নাই। এ নগরটীতে দেখিলাম, অধিকাংশ লোকই—স্ত্রী-পুরুষনির্ব্বিশেষে নগর-প্রাচীরের বাহিরে জঙ্গলে গিয়া শৌচ করেন। আমার আজন্ম তাহা অভ্যাস নাই। মহা বিপদ উপস্থিত। অবশেষে পণ্ডিতজী আমার কষ্টে ব্যথিত হইয়া এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন।

এখন ইস্কুলের অবস্থা একটু বলি। গ্রীষ্মকাল। প্রাতেই পাঠশালা বসিয়া থাকে। দেখিলাম, একটী মুসলমান চাকর আসিয়া ইস্কুলের দালানগুলি ঝাঁট দিতেছে। তৎপরে একটা কুঠুরী হইতে বৃহৎ বৃহৎ জাজিম বাহির করিয়া পাতিয়া দিল। ক্রমশঃ বালকদের আগমন আরম্ভ হইল। প্রায় ১০০ অথবা ১২৫টী বালক সমবেত হইল। তাহারা আসিয়া জাজিমে বসিতে লাগিল। ইস্কুলে চারিটী বিভাগ দেখিলাম। হিন্দী, ফারসী, সংস্কৃত, এবং ইংরাজী। ইংরাজী শ্রেণীতে গুটী ১০।১৫ বালক। তাহারা আসিয়া সেই তিন চারিখানি বেঞ্চ আর ভাঙ্গা টেবিলটী দখল করিয়া বসিয়া আছে। সর্ব্বশুদ্ধ ৯।১০ জন শিক্ষক। অনুষ্ঠানের কোনও ত্রুটী নাই। চারি বিদ্যারই শিক্ষা মহারাজের বিদ্যালয়ে দেওয়া হইয়া থাকে। আবার ইহাও দেখিলাম, পার্শী শ্রেণীতে ফরাস বিছানায় মৌলবী সাহেব বসিয়া গুলেস্তাঁ পড়াইতে লাগিলেন। এবং কিঞ্চিৎপরে পূর্ব্বকথিত মুসলমান চাকরটী দিব্য এক কলিকা তামাকু সাজিয়া আনিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিল। মৌলবী সাহেব কতকটা আলবোলার ন্যায় গুড়্‌গুড়িতে দিব্য তামাকু সেবন করিতে করিতে আপনার সাগরেদদের গোলেস্তাঁ, বোঁস্তা, আনওয়ার সোহেলী ইত্যাদি পুস্তক হইতে পাঠ দিতে লাগিলেন। আমি অবাক হইয়া সমস্ত দেখিতে লাগিলাম। কিঞ্চিৎকাল পরে নিজের মহকুমা পরিদর্শন করিলাম।

দেখিলাম, ইংরাজীতে ১০।১৫টী বালক; কেহ Christian Societyর Primer পড়ে, ; কেহ বা আমাদের পুরাতন গুরু প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের

ফার্ষ্ট বুক আরম্ভ করিয়াছে; কেহ বা খানিক ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। গণিত ইত্যাদিও তদনুরূপ। ব্যাপার দেখিয়া আমার চক্ষুঃস্থির! ভাবিলাম, এ মন্দ নহে। বি.এ. পাশ করিয়া এখন পুরাতন গুরুর সেবা করাই আমার যোগ্যতার উপযুক্ত পারিতোষিক। হিন্দুরাজার অধীনে চাকুরী করা আমার সযত্নপোষিত একটী সাধ। ভগবান তাহা সমুচিতরূপে পূর্ণ করিয়াছেন। ইস্কুলে যেমন বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ করিয়া শিক্ষক মহাশয়েরা ছাত্রদের পাঠ দিয়া থাকেন, চারি বিভাগের মধ্যে কোনটীতেই তাহার চিহ্নমাত্র দেখিলাম না। যে যাহা ইচ্ছা, পাঠ করিতেছে, এবং শিক্ষক মহাশয়েরা তাহাই পড়াইতেছেন। মাহিনা পাইব কেন ভাবিয়া, বেলা ১০টা পর্য্যন্ত আমার ইংরাজী-পাঠী ছাত্রগুলিকে বি-এল্-এ=ব্লে পাঠ দিয়া ইস্কুল বন্ধ করিলাম। তৎপরে পণ্ডিতজীর কৃপায় দ্বিতীয় দিবসও তাঁহারই নিকট উদর পূর্ণ করিয়া নিজ অবস্থা চিন্তা করিতে বসিলাম। কোথায় আসিলাম, কাহার নিকট আসিলাম? সেক্রেটারী মহাশয়ের ব্যবহারও অদ্ভুত দেখিতেছি। ইস্কুলের অবস্থা ত এই। আমিই একমাত্র ইংরাজী-শিক্ষক; তাহার উপর এই প্যারীচরণের ফার্ষ্ট বুক পড়াইতে হইবে। দরিদ্র পিতৃদেব পেট ভরিয়া নিজে না খাইয়া আমায় উচ্চশিক্ষা দিয়াছেন; তাহা যদি এই ফার্ষ্ট-বুক পড়ানতে পর্য্যবসিত হয়, তাহা হইলে, যাহা কিছু শিখিয়াছি, তাহা ২।১ বৎসরের মধ্যে ভুলিয়া যাইব, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এক অতি কদাকার স্থলে আসিয়া পড়িলাম। তাহার উপর যে কার্য্য করিতে আসিয়াছি, তাহার অবস্থা এই। ও দিকে পূর্ব্ব চাকুরীও ছাড়িয়া আসিয়াছি, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া নানারূপ দুশ্চিন্তার হিল্লোলে ভাসিতে লাগিলাম। দূর দেশে বন্ধুবান্ধবহীন স্থানে একা নির্জনে পড়িয়া ক্রমাগত ভাবিতেছি; ভাবনার আর কূল কিনারা নাই। পাঠক, যদি কখনও আমার অবস্থায় পড়িয়া থাক, তবে আমার সে সময়কার মনের ভাব বুঝিতে পারিবে। আমায় শত সহস্র চিন্তারূপী বৃশ্চিক দংশন করিতেছে; আমি জ্বালায় ফট্‌ফট্ করিতেছি। আমায় একটু সাহস দেয়, এমন একটী লোক নাই। আমি তখন নিরাশা-সাগরের অন্তস্তলে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি। এক একবার ভগবানের নাম লইতেছি। এক একবার মনে মনে ভাবিতেছি, যদি এখনও দ্বিতীয় আবেদনপত্রের উত্তর পাই, তাহা হইলে এ দেশ হইতে প্রস্থান করি। কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায়, আমি দেশী রাজ্যে নিজের অধিকাংশ জীবন কাটাইব। সুতরাং দ্বিতীয় আবেদন-পত্রসম্বন্ধীয় কোনও নিয়োগপত্র তখন আসিল না।

ইস্কুলের 'চার্য্য'ই বা কাহার নিকট হইতে লইব, তাহাও জানি না। পরম্পরায় অবগত হইলাম যে, পূর্ব্বে এক জন চৌবে-জাতীয় ব্রাহ্মণ প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি ইস্কুলটীর মস্তক বিলক্ষণরূপে চর্ব্বণ করিয়া আজ দুই মাস হইল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন। সুতরাং বুঝিলাম, আজ দুই মাস হইতে বিদ্যালয়টী এক প্রকার মস্তকশূন্য। তজ্জন্য যাহা কিছু জীবনীশক্তি ছিল, তাহাও লোপ পাইয়াছে। পরদিন আবার প্রাতঃকৃত্য ইত্যাদি শেষ করিয়া গুরু মহাশয়ের পাঠশালার ন্যায় প্যারীচরণ অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলাম। বেলা প্রায় ৮ টার সময় এক জন লোক আসিয়া সংবাদ দিল যে, সেক্রেটারী মহাশয় আসিয়াছেন; তিনি আমার সহিত দেখা করিবার জন্য আফিসে আহ্বান করিতেছেন। তাঁহার আবার আফিস কি? তদন্তে জানিলাম, তিনি হস্পিট্যাল-এসিষ্ট্যাণ্ট পর্য্যায়ের এক জন প্রথম শ্রেণীর ডাক্তার। এখানকার মিউনিসিপালিটীর সেক্রেটারী, এবং ইস্কুলেরও সেক্রেটারী। তাঁহার আফিস অর্থে, এখানে মিউনিসিপাল আফিস বুঝিতে হইবে। যাহা হউক, তাঁহার উদ্দেশে গমন করিলাম। তিনি অতি সাদরে আহ্বান করিলেন, এবং তাঁহার ভদ্র ব্যবহারে যথেষ্ট আপ্যায়িত হইলাম। পরিচয়ে ক্রমশঃ অবগত হইলাম, তিনি এক জন ক্ষত্রিয়, কলিকাতায় মেডিকেল কালেজে পুরাতন মিলিটারী শ্রেণীতে হস্পিটাল-এসিষ্টাণ্ট বিভাগে শিক্ষিত। ১৮৬৮ সালে পাস করিয়া পরীক্ষায় প্রথম হইয়া এ দেশে আগমন করেন, এবং তদবধি এতদ্দেশেই আছেন। বৎসর দুই হইল, একটী বৃহৎ রাজ্য হইতে বদলী হইয়া এখানে আসিয়াছেন। প্রথমে এখানে কলেরা-ডিউটীতে আগমন করেন; তৎপরে নগর অত্যন্ত অপরিষ্কৃত থাকায়, তৎপ্রতি এজেন্ট সাহেবের দৃষ্টিপাত হয়। তিনি একটী মিউনিসিপাল বোর্ড স্থাপিত করিয়া উক্ত ডাক্তার মহাশয়কে উহার সেক্রেটারী এবং হেল্‌থ-আফিসার নিযুক্ত করেন। কলিকাতায় শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ডাক্তার মহাশয় একটু বাঙ্গালী-ঘেঁসা এবং শিক্ষিত বলিয়া স্বভাবতঃই তাঁহাকে বিলক্ষণ নিরহঙ্কার ও অকপটহৃদয় দেখিলাম। বলিতে কি, তাঁহার সহিত আমার সেই দিন অবধি এমন বন্ধুত্ব জন্মিল যে, সেই বন্ধুত্ব আজ ২৮।২৯ বৎসর সমভাবে যাইতেছে। উভয়ের মস্তকোপরি কত ঝড় বহিয়া গিয়াছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে একদিনের জন্যও মনোমালিন্য ঘটে নাই। আমি তাঁহার নিকট কত বিষয়ে ঋণী, তাহা লিখিয়া শেষ করিতে পারি না।

প্রথম আলাপের পর তিনি ইস্কুলের চার্জ আমাকে বুঝাইয়া দিলেন, এবং

বলিলেন যে, ইস্কুলের অবস্থা দেখিয়া আপনি অবশ্যই আশ্চর্য্য হইয়াছেন; কিন্তু আপনাকে ঐ ইস্কুলটী নূতন করিয়া খাড়া করিতে হইবে। যাহাতে ইস্কুলটী একটী আদর্শ ইস্কুলে পরিণত হয়, সে বিষয়ে আপনাকে যত্নবান হইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যেই আপনাকে আনা হইয়াছে। আপনি প্রথম প্রথম অত্যন্ত নিরাশ হইবেন। কিন্তু নিরাশ হইলে কাজ চলিবে না। আমি আপনাকে সর্ব্বদা সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। আপনি কোনও বিষয়ে চিন্তা করিবেন না। যখন আমি আপনাকে আনাইয়াছি, তখন ইহা নিশ্চয় জানিবেন, আমি আপনার সম্পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকরূপে দাঁড়াইয়া আছি, এবং প্রাণপণ যত্নে আপনার সাহায্য করিতে প্রস্তুত। আপনি দেশীয় রাজ্যে কখনও কার্য্য করেন নাই। এখানকার জলবায়ু অন্যরূপ। কিন্তু কোনও বিষয়ে আপনি ভীত হইবেন না। আমি সমস্ত বিষয়ে ক্রমে ক্রমে আপনাকে অভিজ্ঞ করিয়া দিব। এইরূপে উৎসাহ দিয়া তিনি আমায় প্রথমে ইস্কুলটী খাড়া করিবার জন্য কি কি আবশ্যক, তাহার একটী বিস্তৃত রিপোর্ট দিতে অনুরোধ করিলেন। আমি রিপোর্ট লিখিতে সম্মত হইয়া উপস্থিত একটী বিপদের বিষয় তাঁহাকে জানাইলাম। আমি বলিলাম, রিপোর্ট আমি ইংরাজীতে লিখিব। আপনাদের কমিটীর মেম্বর মহাশয়েরা ইংরাজী জানেন না; আমি যদিও ছাত্রাবস্থায় গৃহে উর্দ্দুর চর্চ্চা করিয়াছিলাম, তথাপি সে ভাষায় এত পরিপক্ক হই নাই যে, উর্দ্দুতে রিপোর্ট লিখিয়া দিই। তিনি বলিলেন, তাহাতে কোনও চিন্তা নাই। আপনি ইংরাজীতে লিখুন; আমরা উভয়ে মিলিয়া অনুবাদ করিয়া লইব। তাঁহার এই নিঃস্বার্থ পরোপকারিতা দেখিয়া আমি প্রথমে অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছিলাম। কিন্তু পরে জানিতে পারিলাম যে, এই পরোপকারিতার মূলে একটু স্বার্থ ছিল। তাহার বিস্তৃত বর্ণনা পরে করিব। যাহা হউক, মূলে স্বার্থ থাকিলেও, তিনি যে এক জন উন্নতচেতা মহৎপ্রকৃতির লোক, আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব। কেবল ফার্সী বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া মনুষ্য এরূপ উন্নতচিত্ত হইতে ও উদার প্রকৃতি লাভ করিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত এই প্রথম দেখিলাম।

এখন প্রতিদিন আহার তাঁহার বাটীতেই চলিতে লাগিল। আমি কতবার তাঁহাকে আমার জন্য অন্য একটী বাসা করিয়া দিতে অনুরোধ করি, কোনও মতেই তিনি আমার অনুরোধ রক্ষা করেন না। এইরূপে প্রায় এক মাস ক্রমাগত তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া অবশেষে আমি জেদ করিয়া অন্য বাসায় থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমায় ছাড়িয়া

দেন। ইতিমধ্যে আমার বিস্তৃত রিপোর্ট লেখা চলিতেছে। তিনি সঙ্গে লইয়া আমাকে এখানকার প্রধান ব্যক্তিবর্গের সহিত দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ পরিচয় করাইয়া দিতে লাগিলেন। আমি হিন্দী ও উর্দ্দু জানি বটে, তবে এ পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানী সভ্যসমাজে বেশী মিশিবার অবকাশ না পাওয়ায় উক্ত সমাজের নানারূপ আদব কায়দায় তত দূর পরিপক্ক ছিলাম না। তিনি আমাকে জ্যেষ্ঠভ্রাতার ন্যায় সমস্ত শিখাইতে লাগিলেন। ভদ্রমণ্ডলীর সহিত সাক্ষাৎ-সময়ে একটী মহা গোলে পড়িলাম। আমি বাঙ্গালী। বাঙ্গালীদের কোনও মস্তক-আবরণ নাই। পুরাতন রীত্যনুসারে আমি খোলা মস্তকেই এ দেশে আসিয়াছি। আমার খোলা মস্তক দেখিয়া এ দেশের লোকেরা নানারূপ বিদ্রূপ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া সেক্রেটারী মহাশয় আমার জন্য তাড়াতাড়ি একটী টুপীর বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। আবার এখানকার এই নিয়ম যে, উচ্চপদস্থ অথবা রাজপরিবারভুক্ত কোনও মহাশয় ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, অথবা রাজবাটীতে যাইতে হইলে, খোলা মাথায় ত যাওয়া হইতেই পারে না, কিন্তু টুপী পরিয়া যাওয়াও নিষিদ্ধ। উষ্ণীষ ধারণ করিয়া যাওয়া উচিত। আমি মহা মুস্কিলে পড়িলাম। সেক্রেটারী মহাশয়ের ইচ্ছা, আমার সহিত ইস্কুল-কমিটীর সভাপতি যুবরাজের সহিত আলাপ পরিচয় এবং সাক্ষাৎ করান। কিন্তু সেখানে যাইতে হইলে মস্তকে "পাগড়ী" বাঁধিয়া যাইতে হইবে। আমি বাল্য-কালাবধি পাগড়ীর ধার ধারি না; সঙ্গেও আনি নাই। সেক্রেটারী মহাশয় নিজে পাগড়ীর বন্দোবস্ত করিয়া স্বহস্তে আমার শিরে পাগড়ী বাঁধিয়া দিয়া, সঙ্গে করিয়া "যুবরাজের" নিকট লইয়া গেলেন। যুবরাজ সুপুরুষ, ২৪।২৫ বৎসর বয়সের ক্ষত্রিয়। তিনিই এ রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী। বর্ত্তমান মহারাজার ভ্রাতষ্পুত্র। কিন্তু পোষ্য-গ্রহণ করায় রাজপুত্র। ভবিষ্যতে এই রাজ্যের অধিপতি হইবেন বলিয়া কোনও সূত্রে কিছু কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য এজেণ্ট সাহেব তাঁহাকে কমিটীর সভাপতি করিয়া দিয়াছেন। দেখিলাম, তাঁহার ইস্কুলের কার্য্যের দিকে যতটা মনোযোগ হউক বা না হউক, পুরাতন ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের রীত্যনুসারে শিকারের প্রতি যথেষ্ট টান। যতক্ষণ আমি বসিয়াছিলাম, আমার সহিত দুই চারিটী কথা কহিয়া ও সেক্রেটারীর সহিত ২।৪টী ইস্কুলের কথা কহিয়া তাঁহার সহিত ক্রমাগত বন্দুক ও শিকারের কথা কহিতে লাগিলেন। যুবরাজের হাস্যমুখ দেখিয়া ও সারল্যপূর্ণ কথা শুনিয়া অনেকটা প্রীতিলাভ করিয়া গৃহে ফিরিলাম। কিন্তু সমস্ত দিন "জনাব জনাব", বাঙ্গালীর

মুখটী পর্য্যন্ত দেখিবার উপায় নাই, আর এই টুপী ও পাগড়ীরূপী গোলকধাঁধার মধ্যে পড়িয়া আমার জীবনটা কেমন বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল। মন আর এখানে কোনও মতেই টেঁকে না। অন্য উপায় নাই বলিয়া যেন দায়গ্রস্ত হইয়া হিন্দুর রাজ্যে দিনপাত করিতে লাগিলাম।

এ রাজ্যের রাজা বৃদ্ধ। তাঁহার রাজ্য-পরিচালনের ক্ষমতা সরকার বাহাদুর নিজ হস্তে লইয়াছেন। এবং পাঁচটি সভ্য সমবায়ে এক কৌনসিল স্থাপন করিয়া তদ্দারা রাজ্যের সমস্ত বন্দোবস্ত চলিতেছে। এই ব্যাপারঘটিত সমস্ত বৃত্তান্ত পরে আমূল বর্ণন করিব। ৫ জন সভ্যের মধ্যে তিন জন পুত্তলিকাবৎ; অপর দুইটীর মধ্যে একটি মুসলমান, অপরটি হিন্দু। মুসলমানটি লেখা-পড়ায় ও আইন কানুনে বেশ দক্ষ, তবে ইংরাজী শিক্ষা না থাকায় কিছু পুরাতন ধরণের। হিন্দুটি লেখাপড়া কতক কতক জানেন, তবে মুসলমানের ন্যায় সর্ব্ব বিষয়ে দক্ষ নহেন। এই দু জনে এক দল। মুসলমান খাঁ সাহেব বলিয়া পরিচিত। অতি স্থূলকায় দেহ বলিয়া 'মোটা খাঁ' নাম পাইয়াছেন, এবং হিন্দুটি 'দেওয়ান' নামে প্রসিদ্ধ! যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার কিয়দ্দিবস পরে সেক্রেটারী মহোদয় খাঁ সাহেবের সহিত পরিচিত করাইবার প্রস্তাব করিলেন, এবং বলিলেন, তিনি এ রাজ্যের এখন প্রধান ব্যক্তি; তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করা উচিত। আমি সম্মত হইলাম, এবং সেক্রেটারী মহাশয়ের সহিত তাঁহার গৃহে গমন করিলাম। কিন্তু তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিতে পারিলাম না। তিনি বড় একটা ভাল করিয়া আলাপ করিলেন না। তখন আমি কিছু বিস্মিত হইলাম। পরে কারণ অবগত হইয়া বিস্ময়ের লোপ হইল। কিছুদিন পরে দেওয়ানের সাক্ষাৎ লাভ করিলাম। তিনি খাঁ সাহেব অপেক্ষা একটু ভাল করিয়া আলাপ করিলেন বটে, কিন্তু তাদৃশ আন্তরিক সহৃদয়তা পাইলাম না।

এই সকল আলাপ পরিচয় সাক্ষাদাদির মধ্যে আমার ইস্কুলের রিপোর্ট প্রস্তুত হইল। কমিটীতে পেশ্ হইয়া মঞ্জুর হইয়া গেল। ইস্কুলে চারি বিভাগই শিক্ষা চলিতে লাগিল। অন্যান্য বিভাগগুলি—যথা সংস্কৃত, পার্সী ও হিন্দীতে যথেষ্ট শিক্ষক ছিল; সুতরাং কার্য্য এক প্রকার বেশ চলিতে লাগিল। ইংরাজী বিভাগে আমিই একা, তাই একটু গোলযোগে পড়িতে হইল। ইংরাজীপাঠী ছাত্রদের শ্রেণীবিভাগ করিয়া চারিটী শ্রেণী করিলাম। চারি শ্রেণীতে বালক-সংখ্যাও কিছু কিছু বেশী হইতে লাগিল। সুতরাং একা সমস্ত ইস্কুল পরিদর্শন এবং চারি শ্রেণীতে পড়ান একটু কষ্টকর হইল।

খাঁ সাহেব ও দেওয়ানের সহিত সাক্ষাৎ করিবার পর সেক্রেটারী মহাশয় আমার সহিত আর একটী লোকের পরিচয় করাইয়া দেন। ইনি এখানকার ম্যাজিষ্ট্রেট। এক জন পণ্ডিত-উপাধিধারী ব্রাহ্মণ। পণ্ডিতজীর সহিত আলাপ করিয়া অত্যন্ত আপ্যায়িত হইলাম। প্রথম সাক্ষাতে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া আমায় যথেষ্ট সাদরসম্ভাষণ করেন। জানিতে পারিলাম, সেক্রেটারী মহাশয়ের তিনি এক জন বিশিষ্ট বন্ধু। আমাকে এখানে আনাইবার এক জন অন্যতম প্রধান উদ্যোগী। সুতরাং সেক্রেটারী মহাশয়ের ন্যায় মূলে ইঁহারও একটু স্বার্থ ছিল। যাহা হউক, বিদেশে বন্ধুবান্ধবহীন স্থানে এই দুই মহানুভব আমার প্রধান পৃষ্ঠ-পোষক ও আশ্রয়স্থল হইলেন। বলাই নিষ্প্রয়োজন যে, প্রায় এক মাস হইতে চলিল, আমি এখানে আসিয়াছি ; কিন্তু আমার মন কোনও ক্রমেই তিষ্ঠিতেছে না। পিঞ্জরের পক্ষীর ন্যায় আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছি। বিশেষতঃ মস্তকে পাগড়ী বাঁধা ও সমস্ত দিন বিজাতীয় হিন্দী অথবা উর্দ্দু ভাষায় কথোপকথন আমার পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইতিমধ্যে ইস্কুল লইয়া একটু ক্ষুদ্র খুঁটিনাটি উৎপন্ন হইল ; তাহাতে ক্রমে ক্রমে এখানকার সমস্ত গূঢ় রহস্য ভেদ হইতে লাগিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমিই একা ইংরাজী শিক্ষক, এবং চারি শ্রেণীতে একা শিক্ষা দিতে হয়। কিছুদিন পরে কার্য্য চলা কষ্টকর দেখিয়া আমি ইস্কুল-কমিটীতে এক জন ইংরাজী-ভাষাভিজ্ঞ সহকারীর জন্য বাধ্য হইয়া আবেদন করি। ইতিমধ্যে অবস্থায়ী এজেন্ট সাহেব রাজ্য-পরিদর্শনার্থ ৩।৪ দিবসের জন্য এখানে আগমন করেন। এই রাজ্যের সহিত আরও ২।৩টী রাজ্য মিলিত করিয়া একটী এজেন্সী হইয়াছে। তজ্জন্য তিনি কখনও এই রাজ্য, কখনও বা অপর রাজ্যগুলি মধ্যে মধ্যেই পরিদর্শন করিয়া বেড়ান।

আমার সহিত তাঁহার এই প্রথম সাক্ষাৎ। আমি বাঙ্গালী, তাহাতে আব্যর দেশী রাজ্যে চাকুরী লইয়াছি। এজেন্ট মহাশয়দের স্বভাব চরিত্রের আভাস সংবাদ-পত্রপাঠে কতকটা যাহা জানা ছিল, তাহাতে আমার ধারণা অন্যরূপ ছিল। তজ্জন্য সন্দিহানচিত্তে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। কিন্তু গিয়া দেখিলাম, আমার পূর্ব্ব সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক। সংবাদপত্রপাঠে আমার যে ধারণা হইয়া-ছিল, তাহা সমস্তই অলীক। তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অত্যন্ত সরলহৃদয়ে ও অকপটচিত্তে কথাবার্ত্তা কহিলেন। ইহার পরে এই সাহেব দুই তিন বার আমাদের রাজ্যের এজেন্ট হইয়া আসিয়া একাদিক্রমে ২।৩ বৎসর ধরিয়া থাকিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কখনও আমি ইঁহাকে রূক্ষস্বভাব দেখি নাই।

আমার প্রতি ইঁহার বিশেষ অনুগ্রহদৃষ্টি ছিল, এবং মহারাজার সহিতও অত্যন্ত সুহৃৎভাব ছিল। ইঁহার ন্যায় দয়াশীল এজেণ্ট আমি অল্পই দেখিয়াছি।

ইস্কুলের সমস্ত অবস্থা, এবং আসিয়া পর্য্যন্ত যাহা যাহা আমি করিয়াছি, সমস্ত বৃত্তান্ত আমার নিকট অতি ধীরভাবে শ্রবণ করিলেন। আমার কার্য্যে আনন্দ-প্রকাশ করিয়া নানারূপ সৎপরামর্শদানে উৎসাহিত করিলেন; তাঁহার কয়েকটী কথা আমার এখন পর্য্যন্ত মনে আছে। ইস্কুলটীকে এক প্রকার ভাঙ্গিয়া নূতন প্রস্তুত করিতে হইবে, তদ্বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আমায় উৎসাহ দিবার জন্য তিনি বলিয়াছিলেন, "Virgin soil, promising rich crop"। পরে বিদায়গ্রহণ-কালে আমায় বলিয়া দেন, আমি যখন এখানে আসিব, তুমি আমার সহিত অবশ্য সাক্ষাৎ করিবে; এবং তোমার ইস্কুলের যাহা যাহা আবশ্যক, আমায় বলিবে। এই সূত্রে আমি নিজ সহকারীর বিষয়ও তাঁহার কর্ণগোচর করিয়া বলি যে, আমি কমিটীতে আবেদন করিয়াছি।

সাহেবের সহিত সাক্ষাতের পর দিনেই কমিটীর অধিবেশন হয়। খাঁ সাহেব এবং দেওয়ানজী কমিটীর ক্ষমতাশালী সভ্য। পণ্ডিতজীও সভ্য বটে, তবে খাঁ সাহেব ও দেওয়ানের আর তাঁহার পড়তা ভাল নয় বলিয়া, তিনি একটু টিপিয়া চলেন। পাঠকগণ ক্রমশঃই সমস্ত অবগত হইবেন। পর দিন শুনিলাম, আমার আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছে। খাঁ সাহেব এবং দেওয়ানজী এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, দুই দুই মুদ্রা প্রাত্যহিক বেতন দিয়া শিক্ষক আনান হইল (পাঠক মনে রাখিবেন, আমার বেতন ৬০৲ মুদ্রা, অর্থাৎ প্রত্যহ দুই টাকা হিসাবে পাইতেছি, ৩১-এ মাসের হিসাব এখানে ধর্ত্তব্য নহে!) আবার সহকারী কেন? আমরা এই রাজ্যের নিমকে প্রতিপালিত; রাজ্যের অর্থ এরূপ অন্যায়ভাবে অপব্যয় করিতে পারি না। ক্রমশঃ।

শূন্য-পুরাণ।

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে"র উদ্যমে রামাই পণ্ডিতের শূন্য-পুরাণের পুরাতন পুঁথী মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার সহিত একটি গবেষণাপূর্ণ ভূমিকা সংযুক্ত করিয়া প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বুঝাইয়াছেন,—শূন্য-পুরাণোক্ত "ধর্ম্মপূজা" প্রাচীন বাঙ্গালার "বৌদ্ধপূজা"। পশ্চিমবঙ্গে এখনও এই "ধর্ম্মপূজা" প্রচলিত আছে।

এই সিদ্ধান্ত বসুজ মহাশয়ের কপোল-কল্পিত বলিয়া বোধ হয় না। অনেক দিন পূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ইহার অবতারণা করেন; এবং তাঁহারই প্রশংসনীয় উদ্যমে পশ্চিম-বঙ্গে "ধর্ম্মপূজা" আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই সময় হইতে এই সিদ্ধান্তটি বহু গ্রন্থে ও প্রবন্ধে পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়া, রামাই পণ্ডিতের নাম, ধর্ম্মপূজার নাম, শূন্য-পুরাণের নাম বাঙ্গালী সুধীসমাজে সুপরিচিত করিয়া তুলিয়াছে।

শূন্য-পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় রচিত পাঁচালী প্রবন্ধ। এক সময়ে মনসার ভাসানের ন্যায় শূন্য-পুরাণের পাঁচালীও বহু স্থানে বহু ভাবে রচিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে রামাই পণ্ডিতের পাঁচালী মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার প্রধান কথা, "ধর্ম্ম-পূজা"র কথা। কিন্তু ধর্ম্মপূজা" কাহার পূজা, বসুজ মহাশয় স্বাধীনভাবে তাহার তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন স্বীকার করিতে পারেন নাই। কারণ, শাস্ত্রী মহাশয় পূর্ব্বেই তাহার মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। তথাপি কতকগুলি কারণে শাস্ত্রী মহাশয়ের মীমাংসাকে শেষ মীমাংসা বলিয়া স্বীকার না করিয়া, এই প্রশ্ন পুনরায় উত্থাপিত করা যাইতে পারে। শূন্য-পুরাণের ভূমিকায় [॥৵০ পৃষ্ঠায়] বসুজ মহাশয় যাত্রাসিদ্ধি রায়ের ধর্ম্মপূজা-পদ্ধতি হইতে একটি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া, প্রশ্নটির পুনরুত্থাপনের অবসর দান করিয়া রাখিয়াছেন। সে পংক্তিটি এই :—

"ধাং ধীং ধুং বলি চরণে পড়িল।"

এই শ্লোকার্দ্ধের "ধাং—ধীং—ধুং" অর্থহীন। বসুজ মহাশয় ইহার ব্যাখ্যা করেন নাই। ইহা অপপাঠ বলিয়াই প্রতিভাত হয়। প্রকৃত পাঠ

"ধ্রাং ধ্রীং ধ্রুং"।

তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলে, "ধর্ম্মপূজা" কাহার পূজা, তাহার সন্ধান লাভ করা সম্ভব হইত। সে পথে অগ্রসর না হইয়া, বসুজ মহাশয় লিখিয়াছেন,—"সৃষ্টি-পত্তনে একটি নিজস্ব আছে, যাহা ধর্ম্মমঙ্গল ছাড়া আর কোথাও পাইতেছি না,—তাহা উলুক ও বল্লুকা নদী। রামাই পণ্ডিত এ দুইটিকে কোথা হইতে বাহির করিলেন, তাহা অনুসন্ধেয়।" লিখনভঙ্গীতে বোধ হয়, বসুজ মহাশয় যেন গ্রন্থ খুঁজিতে বাকী রাখেন নাই। সুতরাং তিনি যখন খুঁজিয়া পান নাই, তখন আর খুঁজিয়া পরিশ্রান্ত হইবার প্রয়োজন কি? যে কারণেই হউক, অনুসন্ধান-কার্য্য এই পর্য্যন্তই শেষ হইয়া রহিয়াছে,—অগত্যা উলুক ও বল্লুকা নদী রামাই পণ্ডিতের নিজস্ব বলিয়াই পরিচিত হইয়াছে। "বল্লুকা নদী" এই পাঠটি প্রকৃত

পাঠ কি না, তাহাতে কিছু সংশয়ের কারণ থাকিলেও, উলূক-সম্বন্ধে সংশয় নাই। তাহা শূন্য-পুরাণে অনেকবার উল্লিখিত হইয়াছে। শূন্য-পুরাণের বর্ণনা-অনুসারে উলূকের সংখ্যা নিতান্ত পক্ষে পাঁচ। যথা,—

"চৌদ্দ জুগ বই পরভু তুলিলেন হাই।
উর্দ্ধ নিশ্বাসে জনমিলেন পঞ্চ উলূকাই॥"

উলূকের এইরূপ বিস্ময়কর উৎপত্তি-বিবরণ শূন্য-পুরাণের প্রকৃতি-নির্ণয়ের পক্ষে অনুকূল। প্রভুর হাই হইতে উদ্ভূত উলূক কে, তাহা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বে "প্রভু" কে, তাহা জিজ্ঞাসা করা স্বাভাবিক। বসুজ মহাশয় তাহার আলোচনা না করিয়া, বুঝাইয়াছেন,—উলূক ধর্ম্ম; তাঁহার পূজাই "ধর্ম্মপূজা"। সুতরাং উলূক কে, তাহাই প্রথমে জিজ্ঞাসা করিতে হয়।

শূন্য-পুরাণে তাহার পরিচয় থাকিলেও, তাহা প্রচ্ছন্ন। তন্ত্রে তাহা সুব্যক্ত। বসুজ মহাশয় তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। তন্ত্রেও "ধর্ম্মপূজা"র কথা আছে; তন্ত্রেও "উলূক" অপরিচিত নহে। তন্ত্রোক্ত উলূক ধর্ম্ম,—তাঁহার নামান্তর নন্দী,—তিনি মহাদেবের বাহন। তাঁহার পূজা "ধর্ম্মপূজা" নামে পরিচিত;—তাহা শৈবতন্ত্রের অন্তর্গত। লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে এই "ধর্ম্মপূজা"র বিস্তৃত বিবরণ উল্লিখিত আছে। "ধর্ম্মপূজা"র মন্ত্রোদ্ধার এইরূপ :—

"প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য দান্ত-বীজং ততঃ প্রিয়ে।
বল-বীজযুতং কৃত্বা চূড়া-যুতং ততঃ কুরু॥
ধর্ম্মশব্দং চতুর্থ্যন্তং বহ্নি-জায়া ততঃ পরং।
এষা সপ্তাক্ষরী বিদ্যা চতুর্বর্গ-ফলপ্রদা॥"

প্রণব = ওঁ। দান্ত—বীজ = ধ্। বল-বীজ = র্। চূড়া = ং। চতুর্থ্যন্ত ধর্ম্ম-শব্দ = ধর্ম্মায়। বহ্নি-জায়া = স্বাহা। অতএব "ধর্ম্মপূজা"র সপ্তাক্ষর মন্ত্র—

ওঁ ধ্রং ধর্ম্মায় স্বাহা।

এই মন্ত্রের বীজ ধ্রং,—ইহার শক্তি স্বাহা। সুতরাং ইহার অঙ্গন্যাস-মন্ত্র দীর্ঘস্বর-সমাযুক্ত ধ্রাং ধ্রীং ধ্রূং। শিবলিঙ্গার্চ্চনের পূর্ব্বেই তাহার আধার-দেবতা ধর্ম্মের পূজা করিতে হইবে বলিয়া, লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্রে [২।৫৭] উপদেশ আছে। যথা—

"প্রথমং পরমেশানি ধর্ম্মং সম্পূজ্য সত্বরং।
ততস্তু পরমেশানি পার্থিব-লিঙ্গপূজনম্॥"

এই পূজা যদি "বৌদ্ধপূজা" হয়, তবে শিবলিঙ্গ-পূজকমাত্রই বৌদ্ধ। লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্র এরূপ মীমাংসার পক্ষসমর্থন করে না। পূর্ব্ব—পশ্চিম—উত্তর—

দক্ষিণ, সকল বঙ্গেই লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্র বর্ত্তমান আছে। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি কর্ত্তৃক তাহা পরীক্ষিত হইয়াছে। যথাকালে পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবার আশা আছে।

শূন্য-পুরাণের শূন্যবাদ লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্রের দ্বিতীয় পটলের প্রথম শ্লোক হইতেই সূচিত হইয়াছে। প্রথম পটলে মহাদেব লিঙ্গার্চ্চনের প্রয়োজন ও প্রশংসা বিজ্ঞাপিত করিলে, দ্বিতীয় পটলের প্রথম শ্লোকেই দেবী আপত্তি তুলিয়া বলিয়াছেন,—শিবের আবার পূজা কি? শিব শূন্য-রূপ,—শিব ইন্দ্রিয়-রহিত,—শিব ক্রিয়াশূন্য,—তাঁহার আবার পূজা কি?

"ইন্দ্রিয়ৈ রহিতো দেবঃ শূন্যরূপঃ শিবঃ সদা।
শিবস্ত করণং নাস্তি কিং তস্য পূজনং ততঃ॥"

দেবীর এই প্রশ্নে সকল-তন্ত্র-প্রতিপাদ্য শূন্যবাদই সূচিত হইয়াছে। শক্তি-শূন্য শিব শবস্বরূপ—শূন্য-রূপ। তাঁহার পূজা চলিতে পারে না। প্রত্যুত্তরে মহাদেব তাহা মানিয়া লইয়া বলিয়াছেন,—

"শক্তিং বিনা মহেশানি প্রেতত্বং তস্য নিশ্চিতম্।"

কিন্তু শিব-শক্তি-সমাযোগে উভয়ের যে একতা জন্মে, তাহার জ্ঞানই জ্ঞান। শিবলিঙ্গে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া, তাহার পূজা আবশ্যক। এই তত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া, মহাদেব বলিয়াছেন,—শিবের সেই শক্তিরূপিণী কামিনী বৃষ,—তাহারই নামান্তর ধর্ম্ম-নন্দি-উলূক। শক্তি নিজেই এই রহস্য মহেশ্বরকে জানাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন :—

"বৃষরূপং সমাস্থায় উলূকোঽহং মহেশ্বর।"

শিবলিঙ্গার্চ্চনের অঙ্গীভূত উলূক-পূজা বা ধর্ম্মপূজা, তান্ত্রিকী পূজা। দ্বিতীয় পটলে উলূক-শব্দের ব্যুৎপত্তি উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাতেও সেই কথা বুঝিতে পারা যায়। যথা,—

"উকারঞ্চ মহাদেবী লূকারং কামিনীপ্রভো।
লকারং পৃথিবী দেব বিদ্ধি ত্বং গুণসাগর॥
ককারঞ্চ মহাদেব সদা তু উগ্রভোজনা।
তত্তত্তেজস্বিনী বা তু পৃথ্বীধারণকারণং।
অতএব মহেশান নাম্না উলূক যোগধৃক্॥"

লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্রের তৃতীয় পটলে উলূক-পূজার বা ধর্ম্মপূজার বিস্তৃত বিবরণ উল্লিখিত আছে। তন্মধ্যে ধ্যান এইরূপে উল্লিখিত,—

"ধ্যানং শৃণু বরারোহে! সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্বরূপিণং।
কোটীচন্দ্রপ্রভাকারং শ্বেতসিংহাসনস্থিতম্॥
চতুর্ভুজং মহাবাহুং পদ্মনেত্রং মনোহরং।
আজানুলম্বিনীমালা-হৃদ্দামপরিশোভিতম্॥
গঙ্গাতরঙ্গ-কর্পূর-শুভ্রাম্বর-বিভূষিতং।
হাস্যবক্ত্রং কটাক্ষং তু ভুবনত্রয়-মোহনং।
উলূকং ভাবয়েদ্দেবং সাক্ষাদ্ধর্ম্ম স্বরূপিণম্॥"

ইহার সহিত শূন্য-পুরাণের "ধবল-মূর্ত্তি"র এবং "ধবল সিংহাসনে"র সামঞ্জস্য আছে। সুতরাং শূন্য-পুরাণোক্ত "ধর্ম্মপূজা"কে প্রাচীন বাঙ্গালার "বৌদ্ধ-পূজা" মনে করিয়া, এই সিদ্ধান্তকে একটি নবাবিষ্কৃত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রচার করা চলে কি না, তাহাতে স্বভাবতই সংশয় উপস্থিত হয়।

আশুজিয়া—ময়মনসিংহ। শ্রীসতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।

ভারতীয় প্রজা ও নৃপতিবর্গের প্রতি শ্রীশ্রীমান্ ভারত-সম্রাটের সম্ভাষণ।

মানবজাতির সভ্যতা ও শান্তির বিরুদ্ধে যে অভূতপূর্ব্ব আক্রমণ হইয়াছে, তাহা প্রতিরুদ্ধ ও পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য, গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া আমার স্বদেশ ও সমুদ্রের পরপারে অবস্থিত সমগ্র সাম্রাজ্যের প্রজাগণ, এক মনে ও এক উদ্দেশ্যে কার্য্য করিতেছেন। এই সর্ব্বনাশকর সংগ্রাম আমার ইচ্ছায় সংঘটিত হয় নাই। আমার মত পূর্ব্বাপরই শান্তির অনুকূলে প্রদত্ত হইয়াছিল। যে সকল বিবাদের কারণ ও বিসংবাদের সহিত আমার সাম্রাজ্যের কোন প্রকার সম্পর্ক নাই, আমার মন্ত্রিগণ সর্ব্বান্তঃকরণে সেই সমস্ত কারণ দূর করিতে ও সেই সমস্ত বিসম্বাদ প্রশমিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে সকল প্রতিশ্রুতি পালনার্থ আমার রাজ্য অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল, সেই সকল প্রতিশ্রুতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া যখন বেল্‌জিয়ম্ আক্রান্ত ও তাহার নগরসমুহ বিধ্বস্ত হইল, যখন ফরাসি জাতির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লুপ্ত হইবার আশঙ্কা হইল, তখন যদি আমি ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া থাকিতাম, তাহা হইলে আমাকে আত্মমর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিতে হইত ও আমার সাম্রাজ্য এবং সমগ্র মনুষ্যজাতির স্বাধীনতা ধ্বংসের মুখে সমর্পণ করিতে হইত। আমার এই সিদ্ধান্তে আমার সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশ আমার সহিত একমত জানিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। নৃপতিগণের ও জাতিসমুহের কৃত সন্ধি ও তাঁহাদের প্রদত্ত আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতির প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ইংলণ্ড ও ভারতের সাধারণ জাতিগত ধর্ম্ম। আমার সমগ্র প্রজাবর্গ আমার সাম্রাজ্যের একতা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য একপ্রাণে অভ্যুত্থান করিয়াছেন। যে কয়েকটী ঘটনায় ঐ অভ্যুত্থানের পরিচয় পাওয়া যায়, তন্মধ্যে আমার ভারতীয় ও ইংলণ্ডীয় প্রজাগণ এবং ভারতবর্ষের সামন্ত নৃপতিবর্গ

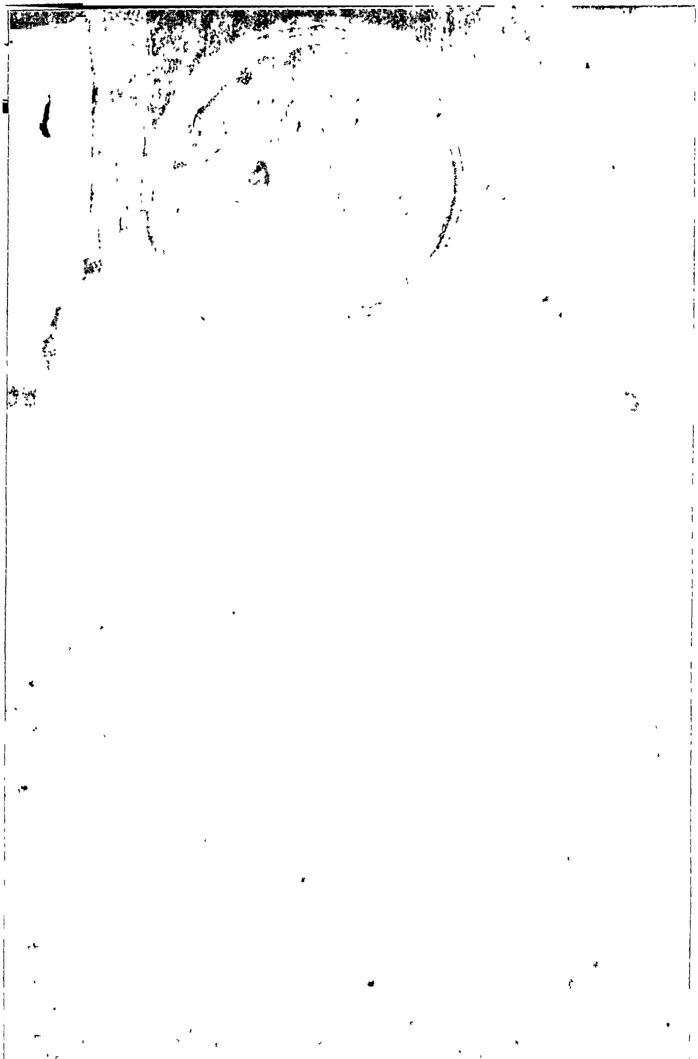
আমার সিংহাসনের প্রতি যে প্রগাঢ় অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন ও সাম্রাজ্যের মঙ্গলকামনায় স্ব স্ব ধনপ্রাণ উৎসর্গ করিবার যে বিরাট্ সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহাতে আমি যেরূপ মুগ্ধ হইয়াছি, এমন আর কিছুতেই হই নাই। যুদ্ধে সর্ব্বাগ্রগামী হইবার জন্য তাঁহারা একবাক্যে যে প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা আমার মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে; ও যে প্রীতি ও অনুরাগের সূত্রে আমি ও আমার ভারতীয় প্রজাগণ আবদ্ধ আছি, সেই প্রীতি ও অনুরাগকে প্রকৃষ্টতম ফললাভের নিমিত্ত অনুপ্রাণিত করিয়াছে। দিল্লীতে আমার অভিষেকোৎসবার্থ মহা-সমারোহে যে দরবার আহূত হয়, সেই দরবারের অবসানে, ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে আমি ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর, ভারত ইংরাজজাতির প্রতি অনুরাগ ও সৌহৃদ্যসূচক যে প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণবার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছিল, তাহা অদ্য আমার স্মরণপথে উদয় হইতেছে। গ্রেট্‌ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের ভাগ্য পরস্পর অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ আছে বলিয়া আপনারা আমাকে যে আশ্বাস দিয়াছিলেন, এই সঙ্কট-সময়ে আমি দেখিতেছি যে, তাহা প্রচুর ও সুমহৎ ফল প্রসব করিয়াছে।

৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৪।
২২শে ভাদ্র, ১৩২১।

গত ২৭শে আশ্বিন আমরা এই ঘোষণাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদের পাঠকবর্গ ও সাধারণের অবগতির জন্য অবিকল মুদ্রিত হইল। ইতি

২৮শে আশ্বিন, ১৩২১।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি
সাহিত্য-সম্পাদক।



লোকনাথের ত্রিপুর-শাসন। ১ম পৃষ্ঠা।

ঐতিহাসিক রচনা-কৌতুক।

"বাঙ্গালীতে বাঙ্গালার ইতিহাস যে যাহাই লিখুক না কেন,—সে মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি"। স্বদেশপ্রেমপূর্ণ উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে অমর কবি বঙ্কিমচন্দ্র যখন এই কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন বাঙ্গালীকে বাঙ্গালার ইতিহাস-রচনায় প্রবৃত্ত করাইবার জন্য এরূপ কথা লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন ছিল। এখন সে প্রয়োজন তিরোহিত হইয়াছে। এখন বাঙ্গালী বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক লেখা লিখিতেছে। সুতরাং এখন যথাযোগ্যভাবে ইতিহাস রচনা করিবার প্রয়োজনের কথা শুনাইবার সময় আসিয়াছে। এখন আর "যে যাহা লিখুক না কেন", তাহাকে "মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি" বলিয়া স্বীকার করিবার উপায় নাই।

বাঙ্গালীর ইতিহাসের যে সকল উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে পারা যায়,—বাঙ্গালী চিরদিন তাহার অবস্থা সম্বন্ধে উদাসীন ছিল না;—চিরদিন কপালের উপর সকল দোষ চাপাইয়া দিয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিত না;—প্রতীকার-সাধনের উপায় থাকিলে, তাহা অবলম্বন করিত। এরূপ প্রাণস্পন্দনের পরিচয় সকল জাতির ইতিহাসেই উল্লেখযোগ্য।

বাঙ্গালার পালরাজবংশের শাসন-সময়ে বাঙ্গালী অনেকবার অনেক বিষয়ে প্রাণস্পন্দনের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। এই রাজবংশের তৃতীয় বিগ্রহ-পালদেব নামক নরপাল পরলোকগমন করিলে, একটি উল্লেখযোগ্য প্রাণস্পন্দনের পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিতীয় মহীপালদেব সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, "অনীতিকারম্ভরত" হইয়াছিলেন। তাহাতে পুরাপ্রচলিত শাসনশৃঙ্খলা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। যে "মাৎস্যন্যায়ে"র উচ্ছৃঙ্খল অত্যাচার দূরীভূত করিবার প্রশংসনীয় উদ্যমে বাঙ্গালী প্রকৃতিপুঞ্জ গোপালদেবকে রাজপদে নির্ব্বাচিত করিয়া, পাল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাসাধন [illegible], সেই "মাৎস্যন্যায়" আবার প্রচলিত হইবার সূত্রপাত হইয়াছিল। প্রজানায়ক দিব্য বা দিব্বোক নামক কৈবর্ত্তপতি দ্বিতীয় মহীপালদেবকে সিংহাসনচ্যুত ও নিহত করিয়া, বরেন্দ্রী-মণ্ডলের রক্ষণভার গ্রহণ করায়, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম রাজা কালক্রমে বরেন্দ্রীমণ্ডলের রাজপদে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিলেন। তখন তৃতীয়

বিগ্রহপালদেবের অপর দুই পুত্র—শূরপাল ও রামপাল,—গৃহতাড়িত হইয়া, *পালসাম্রাজ্যের নানা সামন্তচক্র পর্য্যটন* করিয়া বরেন্দ্রীমণ্ডলের উদ্ধারসাধনের আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শূরপাল অল্পকালের মধ্যে পরলোক-গমন করায়, রামপালদেবেই অবশেষে বরেন্দ্রীর পৈতৃকরাজ্যের উদ্ধারসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তাঁহার এই উল্লেখযোগ্য অধ্যবসায়পূর্ণ কীর্ত্তিকথা সমসাময়িক জনসমাজে তাঁহাকে দাশরথি রামচন্দ্রের ন্যায় যশস্বী করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার পুত্র কুমারপালদেবের প্রিয় সুহৃদ্ ও প্রধান মন্ত্রী বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে এই কীর্ত্তিকথার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। যথা,—

তস্যোর্জ্জিত-পৌরুষস্য নৃপতেঃ শ্রীরামপালোঽভবৎ
পুত্রঃ পালকুলাব্ধি-শীতকিরণঃ সাম্রাজ্য-বিখ্যাতিভাক্।
তেনে যেন জগত্রয়ে জনকভূ-লাভাৎ যথাবৎ যশঃ
ক্ষোণীনায়ক-ভীমরাবণবধাৎ যুদ্ধার্ণবোল্লঙ্ঘনাৎ ॥

গৌড়কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতম্ কাব্য আবিষ্কৃত হইবার পর, এই রাজ্যনাশের ও রাজ্যোদ্ধারের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ সুধীসমাজে সুপরিচিত হইয়াছে। রামপাল যে ক্ষোণীনায়ক ভীমরাজার বধসাধন করিয়া জনকভূমির (বরেন্দ্রীমণ্ডলের) উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন বলিয়াই দাশরথি রামচন্দ্রের ন্যায় ত্রিজগতে "যথাবৎ যশঃ" বিস্তৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। তথাপি প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় তাঁহার নবপ্রকাশিত "রাজন্যকাণ্ড" নামক সুবৃহৎ গ্রন্থে (১৯২ পৃষ্ঠায়) এতৎসম্বন্ধে একটি নূতন কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন। সে কাহিনী এইরূপ :—

"মনে হয়, শূরপাল ও রামপাল উভয়েই ২য় মহীপালের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন। ৩য় বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর তাঁহারা উভয়ে হয় ত পিতৃসিংহাসন অধিকারে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তজ্জন্য প্রকৃত অধিকারী ২য় মহীপাল তাঁহাদিগকে বন্দী করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অবশেষে তিনি কৈবর্ত্তপতির হস্তে পরাজিত হইয়া ও গৃহবিবাদে বিরক্ত হইয়া সংসার পরিত্যাগ করেন। এই সুযোগে শূরপাল ও রামপাল মুক্তিলাভ করেন। মহীপালের সংসার পরিত্যাগের কথা তাঁহার বিরুদ্ধপক্ষীয় কবি লিখিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, সন্ধ্যাকর নন্দীর সমসাময়িক মদনপালের লিপি হইতে আমরা মহীপালের যে প্রকৃত পরিচয় পাইয়াছি, তাহা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। শিবপথ-সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও ২য় মহীপাল নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারেন নাই। ভাবী রাজপদ নিষ্কণ্টক করিবার জন্য কিছুকাল পরে রামপাল তাঁহার হত্যাসাধন করেন।"

এরূপ কাহিনীর প্রমাণরূপে সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় রামচরিতম্ কাব্য হইতেই একটি শ্লোক পাদটীকায় উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। তাহার বিশুদ্ধ পাঠ উদ্ধৃত হয় নাই। বিশুদ্ধ পাঠ এইরূপ :—

হত্বা রাজপ্রবরং ভূয়ো ভূমণ্ডলং গৃহীতবতঃ।
স নিরাস্থদস্ত্রকলয়া সহস্রদোর্ব্বিদ্বিষঃ স্বাস্থ্যম্॥

রামচরিতম্ কাব্যের অন্যান্য শ্লোকের ন্যায় এই শ্লোকটিও রাম-পক্ষে এক অর্থ ও রামপাল-পক্ষে অন্য অর্থ প্রকাশিত করিবার জন্য রচিত হইয়াছিল। এই শ্লোকের "রাজপ্রবরং", "ভূয়ঃ", "সঃ", "সহস্রদোঃ" এবং "স্বাস্থ্যম্" রাম-পক্ষে এক অর্থে, ও রামপাল-পক্ষে অন্য অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে;—অন্যান্য শব্দের অর্থ উভয়ত্র একরূপ। তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য টীকাকার লিখিয়া গিয়াছেন,—

[রাম-পক্ষে]

সঃ (রাঘবঃ) রাজপ্রবরং (ক্ষত্রিয়-সন্তানং) হত্বা ভূয়ঃ (পুনঃপুনরেক-বিংশতিবারান্) ভূমণ্ডলং গৃহীতবতঃ সহস্রদো-র্ব্বিদ্বিষঃ (কার্ত্তবীর্য্যারাতেঃ পরশুরামস্য) স্বাস্থ্যং (স্বর্গস্থিতিং) অস্ত্রকলয়া নিরাস্থৎ।

[বঙ্গানুবাদ]

যিনি (রাজপ্রবর) ক্ষত্রিয়সন্তান নিহত করিয়া, পুনঃ পুনঃ একবিংশতিবার ভূমণ্ডল গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সহস্রবাহু-কার্ত্তবীর্য্যশত্রু-পরশুরামের (স্বাস্থ্য) স্বর্গস্থিতি (সঃ) সেই রাঘব রামচন্দ্র অস্ত্রকলাপ্রয়োগে নিরস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

[রামপাল-পক্ষে]

স (রামপালঃ) অস্ত্রকলয়া সহস্রদোঃ (সহস্রবাহুঃ) রাজপ্রবরং (নৃপতি-শ্রেষ্ঠং মহীপালং) হত্বা ভূয়ঃ (প্রচুরং) ভূমণ্ডলং গৃহীতবতঃ বিদ্বিষঃ (শত্রোঃ কৈবর্ত্তস্য নৃপস্য) স্বাস্থ্যং (সৌষ্ঠবং) নিরাস্থৎ।

[বঙ্গানুবাদ]

যিনি (রাজপ্রবর) নৃপতিশ্রেষ্ঠ মহীপালকে নিহত করিয়া, প্রচুর ভূমণ্ডল গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই শত্রুর অর্থাৎ কৈবর্ত্ত-নৃপের (স্বাস্থ্য) সৌষ্ঠব সেই রামপাল অস্ত্রকলাপ্রয়োগে নিরস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

এই শ্লোকের মধ্যে যে রামপালের ভ্রাতৃহত্যার বিবরণ নাই ও থাকিতে পারে না, তাহা সুস্পষ্ট হইলেও, তাহা নূতন কাহিনীর অবতারণায় বাধা প্রদান

করিতে পারে নাই। "ভাই দিয়া ভ্রাতৃহত্যা" কেবল কোমলপ্রাণ কবির নিকটেই গর্হিত বলিয়া প্রতিভাত হয় না; ঐতিহাসিকের নিকটেও তাহা গর্হিত। সুতরাং তাহার একটি কৈফিয়তের অবতারণা করিবার জন্য সিদ্ধান্ত-বারিধি মহাশয়কে একটু উদ্বেগ সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু "রাজপদ নিষ্কণ্টক করিবার জন্য" অনেক সময়ে এরূপ ঘটনা সংঘটিত হইতে পারে মনে করিয়া, তিনি মনে করিয়া লইয়াছেন যে, এখানেও সেইরূপ ঘটিয়াছিল; এবং তাহা সহোদরের পক্ষে নিন্দনীয় হইলেও, বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পক্ষে অধিক নিন্দনীয় হইতে পারে না বলিয়া, মনে করিয়া লইয়াছেন যে, রামপালদেব দ্বিতীয় মহী-পালদেবের "বৈমাত্রেয় ভ্রাতা" ছিলেন। গৌড়কবি সন্ধ্যাকর নন্দী সে কথার উল্লেখ করেন নাই;—তিনি "কৈবর্ত্তপতি কর্ত্তৃক মহীপালদেব নিহত হইয়া-ছিলেন" বলিয়াই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় গৌড়কবি সন্ধ্যাকর নন্দীকে [বিরুদ্ধ পক্ষের রাজকবি বলিয়া] এ বিষয়ে "মিথ্যাবাদী" মনে করিয়া লইয়াছেন। গৌড়কবি সন্ধ্যাকর নন্দী আসল ঘটনা গোপন করিয়া, একটি অলীক ঘটনার অবতারণা করিয়া থাকিলে, জঘন্য প্রকৃতির মনুষ্য ছিলেন বলিয়াই নিন্দিত হইবার যোগ্য। কিন্তু তাঁহাকে এরূপভাবে কলঙ্কিত করিবার কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

ভীম রাজার কি হইল, তৎসম্বন্ধেও সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় এক নূতন কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন। বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনের "ভীমরাবণবধাৎ" হইতে জানিতে পারা গিয়াছিল,—রামপালদেব কর্ত্তৃক ভীম নিহত হইয়াছিলেন। গৌড়কবি সন্ধ্যাকর নন্দীও সে কথা স্পষ্টাক্ষরেই লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু রামচরিতম্ কাব্যের যে অংশে তাহা উল্লিখিত আছে, সেই অংশের টীকা প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। তাহার টীকা-রচনার ক্লেশ স্বীকার না করিয়া, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়া গিয়াছেন,—"ভীমও নিহত হইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়।" সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন,—"এ দিকে আর রাজ্যপ্রাপ্তির আশা নাই বুঝিয়া, ভীম আত্মহত্যা করেন।" কৌতুকের বিষয় এই যে, রামচরিতম্ কাব্যের যে যুগ্মক-শ্লোকে রামপালদেব কর্ত্তৃক ভীম নিহত হইবার কথা উল্লিখিত আছে, তাহারই একটিমাত্র শ্লোক ভীমের আত্মহত্যার প্রমাণ-রূপে সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় পাদটীকায় উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। যুগ্মক-শ্লোক এই—

অথ তেন খেলৎ-খগমণ্ডলিকা-বিলাসবিবরস্ত।
উৎকৃত্ত-কণ্ঠকান্তরজ-নির্ব্যদস্থকটা-জটালস্ত॥
নিহিতকুটুম্বস্ত পুরো দারুণমাক্রন্দনং কিমপি রবতঃ।
ধৃতচন্দ্রহাসধাম্না লকারাজঃ কৃতোঽস্ত বধঃ॥

এই যুগ্মকোক্ত "তেন ধৃতচন্দ্রহাসধাম্না" একপক্ষে রামচন্দ্রকে ও অন্যপক্ষে রামপালদেবকে সূচিত করিতেছে। রাম-পক্ষের অর্থ সুব্যক্ত। কবি রাম-পক্ষে ও রামপাল-পক্ষে তুল্যকার্য্যের বর্ণনা করায়, রামের ন্যায় রামপালকেও যে কাহারও বধকর্ত্তা বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। শ্লিষ্টপ্রয়োগবাহুল্যে রামপাল-পক্ষের অর্থ কিঞ্চিৎ প্রচ্ছন্ন হইলেও, "তেন ধৃতচন্দ্রহাসধাম্না অলং কারাজঃ" এইরূপে পদচ্ছেদ করিয়া পাঠ করিলে, অর্থ অতি সহজেই প্রতিভাত হয়। রামপাল কর্ত্তৃক (অলং) পর্য্যাপ্তরূপে (কারাজঃ) কৈবর্ত্তনৃপতির বধ সুসম্পন্ন হইয়াছিল,—এই কথা শ্লিষ্টকাব্যে যত স্পষ্ট করিয়া বলা সম্ভব, তত স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে। ইহাতে কাহারও আত্মহত্যার কথা নাই ও থাকিতে পারে না।

সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়ের নবপ্রকাশিত "রাজন্যকাণ্ড" নামক গ্রন্থ এইরূপ অনেক রচনা-কৌতুকের আধার। সকলগুলির ব্যাখ্যা করা দূরে থাকুক, উল্লেখ করিতে হইলেও একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করিতে হয়। "কায়স্থ-সমাজের বিশাল ইতিহাসের মুখবন্ধ" যে এইরূপ রচনা-কৌতুকের আধার হইয়াছে, ইহা যথার্থ ই অনুশোচনীয়। অনবধানতাবশতঃ কোনও কোনও স্থলে যৎসামান্য ভ্রমপ্রমাদ সঙ্ঘটিত হইলে, শুদ্ধিপত্রে তাহার সংশোধনকার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারিত। কিন্তু রাজন্যকাণ্ডের ভ্রমপ্রমাদ মজ্জাগত,—সুতরাং শুদ্ধিপত্রে তাহার সংশোধনকার্য্য অসাধ্য-সাধন। গ্রন্থখানি পুনর্লিখিত না হইলে, কায়স্থসমাজের ইতিহাস ঐতিহাসিক রচনা-কৌতুকের অদ্বিতীয় আধার বলিয়াই চিরকলঙ্কিত হইয়া রহিবে। ইহা ঐতিহাসিক বিচার-নিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিতে পারে নাই; সংস্কৃতসাহিত্যে অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিতে পারে নাই; যাহার পরিচয় প্রদান করিতে পারিয়াছে, তাহাকে ইতিহাস বলিবার উপায় নাই;—তাহা ঐতিহাসিক রচনা-কৌতুক।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

লোক-লক্ষ্মী।

ক্ষুব্ধ যবে রুদ্রতেজে উঠিল মাতিয়া,
ভোগমত্ত, মদদৃপ্ত বিশ্ববিদ্রোহীর
হস্ত হ'তে অকস্মাৎ পড়িল খসিয়া
রাজদণ্ড, ছিন্ন হ'ল মণিদীপ্ত শির ;—

জাগিল জগতে চেতনার দিব্যদ্যুতি,
মোহসুপ্ত বক্ষোমাঝে বজ্রাগ্নি-বিভাস,
নবতন্ত্র-প্রতিষ্ঠায় দিল আত্মাহুতি
লক্ষ লক্ষ নরনারী—নির্ম্মম নিরাশ।

সে সময়ে যুগান্তের প্রথম প্রভাতে
উঠেছিল উন্মথিত জন-সিন্ধু হ'তে
অপূর্ব্ব অভয়া মূর্ত্তি ! পুণ্য দৃষ্টিপাতে
ক্ষরিল অমৃতধারা এ দগ্ধ মরতে।

ভক্তহৃদি-নররক্ত-প্রবালের মালা
বিলম্বিত বরকণ্ঠে, বিমুক্ত কুন্তল,
শুচিশুভ্র দিব্য ভালে অতি দীপ্ত জ্বালা
উদয়শিখরে ভানু—আলোকচঞ্চল।

শোভিছে দক্ষিণ করে বিজয়পতাকা,
বামহস্তে ঝলমল দীর্ঘ দীপ্ত অসি,
রণরক্ত-অলক্তকে পাদপদ্ম আঁকা,
সগর্ব্ব প্রসাদ-হাস্তে দেবী মহীয়সী।

কোটী ভক্তকণ্ঠ হ'তে মেঘমন্দ্রস্বরে,—
উঠিল ধ্বনিত স্বরে বন্দনার গান,
স্নান করি সবে তব করুণা-নির্ঝরে
লভিল নবীন দীপ্তি—তেজোদীপ্ত প্রাণ।

ফরাসীর মহাক্ষেত্রে—হে অমৃতময়ি,
যেই মহামুক্তিমন্ত্র করিলে প্রচার,
অক্ষয় সে রুদ্রমন্ত্র চির কালজয়ী,
যুগে যুগে উঠিতেছে প্রতিধ্বনি তার !

পতিত পেয়েছে শক্তি সে মন্ত্রসাধনে,
ব্যথিত ল'ভেছে তাহে অমৃত-বিভব ;
পূর্ণকাম নরনারী তব আরাধনে,
দেশে দেশে তব স্তুতি, জয় জয় রব।

মদগর্ব্বে রাজদম্ভ হ'য়ে অভ্রভেদী
আবার জেলেছে বহ্নি প্রতীচীর বুকে ;
ভাবিতেছে পাদপীঠ তব জয়-বেদী
আপন মহিম্নঃ-স্তব গাহি নিজ মুখে !

চলিয়াছে মহারণ—প্রচণ্ড বিপ্লব—
মরণের রাজসূয়—মহা উদ্দীপনা !
পৃথিবী করিছে পান শোণিত-আসব,
লক্ষ লক্ষ বক্ষে জাগে মৃত্যুর প্রেরণা !

বহ্নিব্যাপ্ত পুরপল্লী পূর্ণ আর্ত্তনাদে—
চিরারাধ্য কলা-লক্ষ্মী ধূলায় লুণ্ঠিত,
অত্যাচার-মহাপাপ চলিছে অবাধে,
কামমত্ত পশুত্বের লীলা অকুণ্ঠিত !

এ প্রলয়-পয়োধির মহাগর্ভ হ'তে
উঠিবে কি রূপ ধরি' হে লোক-কল্যাণি ?
রণ-রক্তধারা-ধৌত প্রতীচ্য জগতে
পুনঃ নবযুগারম্ভে কহিবে কি বাণী ?

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যে গীতি উদ্গীত,
গাহিবে কি সেই গীতি—অয়ি মহাভাগে ?
বুঝিবে কি তব মন্ত্রে আর্ত্ত, মুগ্ধ, ভীত
সংযম কি মহাশক্তি, কি অমৃত ত্যাগে ?

শিখাবে কি বিশ্বে শুধু এক মহাপ্রাণ
লীলারসে ধরিয়াছে বিচিত্র আকার।
আপনার মাঝে মিলে অমৃত-সন্ধান,
সম্ভোগ মোহের সিন্ধু, নরকের দ্বার?

নব মন্ত্রে মহীয়ান্ মনুষ্যত্ব নব
য়ুরোপের মহাক্ষেত্রে পাবে কি উন্মেষ?
কিংবা কামদুষ্ট এই ঐশ্বর্য্য-গৌরব,—
এ মহা সংহারানলে শেষ, তার শেষ?

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

লোকনাথের ত্রিপুরা-তাম্রশাসন।

প্রায় দ্বাদশ বর্ষেরও পূর্ব্বে, ত্রিপুরা রাজষ্টেটের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ম্যাক্‌মিন্ মহোদয় এই তাম্রশাসনখানি বঙ্গীয় এসিয়াটীক সোসাইটীতে উপহার-রূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহা পূর্ব্ববঙ্গের ত্রিপুরা জেলার কোনও স্থানে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। কিন্তু কে, কি ভাবে, কোথায় ইহা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সম্যক্ কিছুই অবগত হওয়া যায় নাই (১)। এই তাম্রশাসনের কথা সর্ব্বপ্রথম পরলোকগত ডাঃ ব্লক (২) ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের ১৯০৩-৪ সালের রিপোর্টে প্রকাশিত করেন। তাহা হইতে জানা যায় যে, স্বর্গীয় গঙ্গামোহন লস্কর এম্. এ. মহাশয় পাঠোদ্ধার করিবার জন্য বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে তাম্রশাসনখানি লইয়া গিয়াছিলেন। অভিলষিত কার্য্যের সমাধা না হইতেই তিনি অকালে কালের করাল কবলে পতিত হয়েন। তাম্রশাসনখানি যে ৺লস্কর মহাশয়ের হস্তেই ছিল—সে কথা, ১৯০৯ সালের এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় (৩) বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্. এ. মহাশয়ও [মাধাইনগরে প্রাপ্ত] "লক্ষ্মণসেনদেবের তাম্রশাসন" শীর্ষক প্রবন্ধে [প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত করিয়াছিলেন। প্রায় তিন বৎসর হইল, স্বর্গীয় গঙ্গামোহনের [অচিরমৃত] বৃদ্ধ পিতা হরিমোহন লস্কর মহাশয় একখানি তাম্রশাসন লইয়া, তাহা

আবিষ্কার-কাহিনী।

(১) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন—কলিকাতা যাদুঘরেও বা ইহা প্রেরিত হইয়া থাকিবে। J. A. S. B. 1911. P. 302.

(২) Annual Report of the Archœological Survey of India. 1903-4.

(৩) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V. N. S. 1909.

বিক্রয় করিবার জন্য বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির নিকট রাজসাহীতে উপস্থিত হন। ডাক্তার ব্লকের রিপোর্ট সহ এই তাম্রশাসনে সংলগ্ন মুদ্রাটিও মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। সমিতির নিকট বিক্রয়ার্থ আনীত তাম্রশাসনখানির মুদ্রাটির প্রতি লক্ষ্য করিয়াই সমিতি ইহাকে এসিয়াটিক সোসাইটীর "ত্রিপুরা-তাম্রশাসন" বলিয়া চিনিতে পারায়, ইহা ক্রয় করিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু বৃদ্ধ লস্কর মহাশয় অর্থাভাব বিজ্ঞাপিত করিয়া সমিতির নিকট হইতে ২৫৲ টাকা লইয়া, কেবল তিন মাসের জন্য তাম্রপট্টখণ্ড সমিতির নিকট রাখিতে ও তাহার ফটোগ্রাফ্‌ প্রভৃতি লইতে অনুমতি দিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তির পর তাম্র-শাসনখানি ৺গঙ্গামোহনের উত্তরাধিকারীর নিকট প্রত্যর্পণের নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছিল। সেদিন "ঢাকা মিউসিয়মে" যাইয়া দেখিলাম—তাম্রশাসনখানি সম্প্রতি সেখানে রক্ষিত হইতেছে।

গঙ্গামোহন পাঠোদ্ধার-কার্য্যে ব্যাপৃত হইবেন বলিয়া ডাঃ ব্লক এই শাসনের পাঠোদ্ধার-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন। তাঁহার রিপোর্টে তিনি কেবল প্রথম দুই পংক্তির পাঠ প্রকাশিত করিয়াই নিরস্ত হইয়াছিলেন। ইহার পর এ পর্য্যন্ত এই তাম্রশাসনের পাঠ কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। তাম্রশাসনখানি যতদিন বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির হস্তে ছিল, ততদিন মূলের সহিত মিলাইয়া, এবং তৎপরে কেবল ফটোগ্রাফের সাহায্যে,—যেরূপ পাঠ উদ্ধৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তাহাই সুধী-সমাজের সম্মুখে প্রকাশিত হইল। তাম্র-পট্টের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। ইহার চারিটি কোণই খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ইহার নিম্নাংশের স্থূলতা কমিয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে অক্ষরগুলি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত; কোনও কোনও স্থলে আবার সেগুলি অর্দ্ধবিলুপ্ত; আবার কোনও কোনও অংশে সেগুলি অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। কাল-প্রভাবে শাসনখানি এইরূপ জীর্ণ হওয়ায়, পাঠোদ্ধার-কার্য্য যে কত দূর দুরূহ এবং কঠিন-শ্রম-সাধ্য হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। এই সকল কারণে সংশয়যুক্ত স্থানের কতক পাঠ সম্প্রতি ইহার সঙ্গে সংযোজিত করা হইল না। ভারত গবর্মেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব-বিষয়ক পত্রিকার ["Ephigraphia Indica"] সম্পাদক প্রত্নতত্ত্ব-বিশারদ মনীষী ডাঃ ষ্টেন্ কোনোও মহোদয় এই তাম্রশাসন-সম্বন্ধীয় মৎপ্রণীত প্রবন্ধ সেই পত্রিকায় ছাপিবেন বলিয়া জানাইয়া অনু-

পাঠোদ্ধার-কাহিনী।

গৃহীত ও উৎসাহিত করিয়াছেন। আনুমানিক পাঠগুলি সেই পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইলে, তাহার আলোচনা হইতে পারিবে। যে সকল স্থানে লুপ্ত বা অপঠিত অক্ষর থাকা নিশ্চয় জানা গিয়াছে, তাহা × × × এইরূপ চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করা হইল।

এই শাসন-সংযোজিত মুদ্রাটির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ডাঃ ব্লক তাঁহার রিপোর্টে একটি ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক সমালোচনা সংযোজিত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রাখাল বাবুও পুনরায় ১৯১১ সালের এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় (১) ডাঃ ব্লক সাহেবের কথারই পুনরালোচনা করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, পাঠোদ্ধার সাধন করিয়া, ইহার ব্যাখ্যাকার্য্যেও আমাকেই হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে।

বহু কারণে এই তাম্রশাসনের ব্যাখ্যা ঐতিহাসিকগণের নিকট সমাদর লাভ করিতে পারিবে, এই আশা করিয়া, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে স্বোদ্ধৃত পাঠ অবলম্বন করিয়া, ইহার ঐতিহাসিক বিবরণের পর্য্যালোচনার জন্য একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। প্রবন্ধটি "সাহিত্যে"র [বর্ত্তমান সালের] জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত কোনও ভাষাতে এই তাম্রশাসনের অনুবাদ বাহির হয় নাই বলিয়া, টীকা সহ ইহার একটী সম্পূর্ণ অনুবাদ এই প্রবন্ধ সহ প্রকাশিত করিতে প্রয়াসী হইলাম। বঙ্গ-সাহিত্যে ইহার পরিচয়ের বহু প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

ব্যাখ্যা-কাহিনী।

তাম্রশাসনখানির আয়তন প্রায় ১০½×৭½ ইঞ্চ। ইহার লিপিটি ৫৭ পংক্তিতে সমাপ্ত বলিয়া মনে হয়। প্রথম পৃষ্ঠে ২৬ পংক্তি, এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠে ৩১ পংক্তি উৎকীর্ণ হইয়াছিল; কিন্তু দ্বিতীয় পৃষ্ঠার প্রথম পংক্তিটি সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। উৎকিরণ-কার্য্যে শিল্পীর বেশী কৌশল ছিল বলিয়া মনে হয় না; কারণ, অক্ষরগুলি সর্ব্বত্র সমান মাপের না হইয়া ছোট বড় হইয়াছে। সমগ্র লিপিটি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পদ্যগদ্যাত্মক লিপি। উপরিভাগের দক্ষিণ কোণটি জীর্ণ হইয়া খসিয়া পড়ায়, লিপিটির আরম্ভ বুঝা যাইতেছে না। উপরিভাগের বাম দিকের লুপ্ত কোণে ও সেই দিকেরই অন্যান্য লুপ্তাংশে তাম্রশাসন-সম্পাদয়িতার

(১) Journal of the Asiatic Society of Bengal—Vol. VII, 1911, p. 302.

পূর্ব্বপুরুষগণের নাম থাকার সম্ভাবনা ছিল। শ্লোকগুলির ছন্দ হইতে অন্ততঃ তাহাই মনে হয়। তাম্রশাসনের ২ পংক্তি হইতে ১৬ পংক্তির মধ্যে বিভিন্ন বৃত্তে বিরচিত নয়টি শ্লোক আছে।

লিপি-পরিচয়।

তৎপূর্ব্বে ও তাহার পরে লিপির গদ্যাংশ—কেবল ৫৩—৫৫ পংক্তির কতক অংশে ধর্ম্মানুশংসী তিনটি শ্লোকের খণ্ডিত অংশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই তাম্রশাসনে একটি সুবৃহৎ [প্রায় ৪ ইঞ্চি ব্যাসের] মুদ্রা সংযুক্ত আছে। তাহাতে পদ্মাসনে দণ্ডায়মানা "শ্রী" বা "লক্ষ্মী"র মূর্ত্তি উৎকীর্ণ। শ্রীমূর্ত্তির দুই পার্শ্বের উপরিভাগে দুইটী হস্তী শুণ্ড দ্বারা জলকলস উত্তোলন করিয়া দেবীকে অভিষিক্ত করিতেছে। উভয় পার্শ্বের নিম্নভাগে দুইটি পুরুষমূর্ত্তি সমাসীন অবস্থায় দুইটি কলস হইতে কিছু যেন ঢালিয়া লইতেছে। দেবীর পাদমূলে উত্তর ভারতের গুপ্তবংশীয় সম্রাট্‌দিগের সময়ে প্রচলিত অক্ষরে উৎকীর্ণ একটিমাত্র পংক্তিতে লিখিত আছে,—"কুমারামাত্যাধিকরণস্য"। শ্রীমূর্ত্তির দক্ষিণ পার্শ্বে আর একটি ক্ষুদ্র মুদ্রার মধ্যে পরবর্ত্তী কালের উত্তর-ভারতীয় কুটিলাক্ষরে উৎকীর্ণ একটি পংক্তিতে লিখিত আছে—"শ্রীলোকনাথস্য"। এই মুদ্রার দুই স্থানে ভিন্ন ভিন্ন কালের অক্ষর দেখা যায় কেন?—শাসন-সম্পাদনকারীর কাল-নির্ণয়-বিষয়ে তাহার কোনও সার্থকতা আছে কি না, তাহা আমার পূর্ব্বপ্রকাশিত প্রবন্ধে পর্য্যালোচিত হইয়াছে। সমগ্র লিপিটি যে অক্ষরে ক্ষোদিত রহিয়াছে, তাহা সপ্তম শতাব্দীতে [উত্তর ভারতের পূর্ব্বাংশে] প্রচলিত উত্তরভারতীয় লিপি। সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের সম-সাময়িক কামরূপাধিপতি ভাস্কর বর্ম্মার [পঞ্চখণ্ডে প্রাপ্ত] তাম্রশাসনের (১) অক্ষরের সহিত ত্রিপুরা-তাম্রশাসনের অক্ষরের সাদৃশ্য অত্যধিক। ডাঃ ব্লক ও রাখাল বাবু এই শাসনের লিপিকাল নবম-দশম শতাব্দীতে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন কেন, তাহা সহজে প্রতিভাত হয় না। লিপিভঙ্গীর অনেক বিশেষত্ব আছে, তাহা এ স্থলে বিস্তৃতভাবে পর্য্যালোচিত হইল না। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, 'র' সংযোগে 'ত' ব্যতীত কোনও অক্ষরেরই দ্বিত্ব সাধিত হয় নাই,—আর্য্য বীর্য্য প্রভৃতি শব্দ "আর্য" "বীর্য" প্রভৃতি রূপে লিখিত হইয়া সেকালের উচ্চারণশুদ্ধতার পরিচয় দিতেছে। ণ, প, ম, য প্রভৃতির মস্তক খোলা। মাত্রার বিকাশ অল্পই লক্ষিত হয়। আগ্রহের ও বিরামের চিহ্ন কুত্রাপি ব্যবহৃত হয় নাই। ৯ পংক্তির "উজ্জ্বলায়াম্" এবং ১৩ পংক্তির "ক্ষয়ম্" ও "সৈনিকম্"

(১) "বিজয়া"—১৩২০ সালের আষাঢ়-সংখ্যা। এবং "Dacca Review"—June, 1913.

শব্দের 'ম্'এর রূপ অবধান-যোগ্য। লিপিকার-প্রমাদ যথাস্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে।

"কুমারামাত্যাধিকরণ" সামন্তরাজ লোকনাথ এই তাম্রশাসনের সম্পাদয়িতা। তাঁহার ব্রাহ্মণ-জাতীয় মহাসামন্ত প্রদোষ শর্ম্মা [২১ পংক্তি] রাজপুত্র লক্ষ্মীনাথকে "দূতক" করিয়া নৃপপাদমূলে বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, সুব্বুঙ্গ-বিষয়ের অটবী-ভূখণ্ডে তিনি "দেবকুল" ["দেবাবসথং" ২২ পংক্তি] প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাতে "অবিদিতান্ত অনন্তনারায়ণে"র [২২ পংক্তি] বিগ্রহ স্থাপন করিতে অভিলাষ করিতেছেন; এবং সেই দেবতার "অষ্টপুষিকা (?)-বলি-চরু-সত্র"-প্রবর্ত্তনের [২৪ পংক্তি] জন্য, এবং সেই স্থানে উপনিবিষ্ট "চাতুর্ব্বিদ্য" ব্রাহ্মণ ও আর্য্যগণের [২৪ পংক্তি] বাসস্থানের জন্য, তিনি রাজ-সমীপে ভূমি-প্রার্থী হইয়াছেন। লোকনাথ তাঁহার নিজ সান্ধিবিগ্রহিক প্রশান্তদেব [৫৫ পংক্তি] দ্বারা এই তাম্রশাসন সম্পাদন করাইয়া, মহাসামন্ত প্রদোষ শর্ম্মার প্রার্থনাক্রমে বহু ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন। তাম্রশাসনের শেষ অর্দ্ধাংশে শতাধিক ব্রাহ্মণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, এবং তাঁহাদের মধ্যে কে কতটুকু ভূমি প্রাপ্ত হইবেন, তাহারও বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

লিপি-বিবরণ।

প্রদত্ত ভূমির পূর্ব্বসীমায় "কণামোটিকা" নামক [৩০ পংক্তি] এক পর্ব্বতের উল্লেখ দেখিয়া, অটবী-ভূখণ্ড যে পার্ব্বত্য প্রদেশেই অবস্থিত ছিল, এরূপ অনুমান যথাযথ বলিয়াই বোধ হইবে। শাসন-সম্পাদনের কাল—"চতুশ্চত্বারিংশৎ-সংবৎসরে ফাল্গুনমাসে" বলিয়া [২৯ পংক্তি] নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। লিপিকাল বিচার করিয়া ইহাকে হর্ষসংবৎ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাম্রশাসনে লেখক বা শিল্পীর নাম উল্লিখিত নাই।

প্রদোষ শর্ম্মার প্রপিতামহ "অগস্ত্য-সগোত্র" ব্রাহ্মণ [১৭ পংক্তি] ছিলেন। তাঁহার আহিতাগ্নি প্রমাতামহ অগ্নিতে যথাবিধি হোম [১৮ পংক্তি] করিতেন। তাঁহার মাতা "সুবচনা" দেবী প্রততই অর্থিকুলের প্রার্থনা পূরণ [১৯ পংক্তি] করিতেন। পিতৃমাতৃ উভয়কুলই সদাচারের যথাচরণ [২০ পংক্তি] করিতেন। মহাসামন্ত প্রদোষ শর্ম্মার পূর্ব্বপুরুষগণের এইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়; যথা,—

[অগস্ত্য-সগোত্র] দেবশর্ম্মা — বুধস্বামী
|
জয়শর্ম্ম স্বামী — বৃহস্পতি স্বামী
|
তোষ শর্ম্মা — সুবচনা

প্রদোষ শর্ম্মা [মহাসামন্ত]

সাগ্নিক ব্রাহ্মণকুলের দৌহিত্র মহাসামন্ত প্রদোষ শর্ম্মার ভুজবলবীর্য্য সম্বন্ধে সকলেই সুবিদিত ছিলেন। সেকালে ভুজবলবীর্য্য থাকিলে ব্রাহ্মণও মহাসামন্তাদির পদ প্রাপ্ত হইতে পারিতেন, এই তাম্রশাসনের ইহা একটি উল্লেখ-যোগ্য কথা। যাঁহাদের বাসের জন্য প্রদোষ শর্ম্মা নৃপতি লোকনাথের নিকট ভূমি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা চতুর্ব্বেদবিৎ ["চাতুর্ব্বিদ্য" ২৪ পংক্তি] বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। অন্ততঃ সপ্তম শতাব্দীতেও পূর্ব্ববঙ্গে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব ছিল না, তাহারও প্রমাণ এই তাম্রশাসন হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। ইহা হইতে আদিশূরের আহ্বানে কান্যকুব্জ হইতে এই দেশে ব্রাহ্মণাগমনের কাল-নির্ণয়-সম্বন্ধে কুলজ্ঞগণ ও কুলশাস্ত্র-পরায়ণ ঐতিহাসিকগণ পুনরালোচনা করিতে পারিবেন। রাজা লোকনাথের পিতৃকুলের পূর্ব্বপুরুষগণ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন কি না, তাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ না পাওয়া গেলেও, তাঁহার মাতৃকুলের কেহ কেহ "দ্বিজসত্তমঃ", "দ্বিজবরঃ" রূপে [৬ষ্ঠ শ্লোকে] বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি নিজে "পারশবে"র দৌহিত্র এবং "করণ"জাতীয় ছিলেন, তাহাও সেই শ্লোক হইতে এবং নবম শ্লোকের মর্ম্ম হইতে অবগত হওয়া গিয়াছে। আমার পূর্ব্ব-প্রকাশিত প্রবন্ধে (১) এই "পারশব"-শব্দটির বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। লোকনাথ কোনও সার্ব্বভৌমের সামন্ত-রূপে বঙ্গের পূর্ব্বাঞ্চলের কোন স্থানে রাজত্ব করিতেছিলেন, এবং কোন "পরমেশ্বরে"র সহিত [৭ম শ্লোক] তাঁহার যুদ্ধ বাধিয়াছিল, এবং নবম-শ্লোকোক্ত "শ্রীজীবধারণ নৃপ"ই এই পরমেশ্বর হইতে পারেন কি না ?—ইত্যাদি বিষয়েরও আলোচনা সেই প্রবন্ধেই করা হইয়াছে। বংশবিবৃতি-বিজ্ঞাপক শ্লোকাবলী হইতে লোকনাথের পূর্ব্বপুরুষগণের এইরূপ বংশতালিকা অঙ্কিত হইতে পারে ; যথা,—

ঐতিহাসিক তথ্য।

(১) "সাহিত্য"—১৩২০, জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা।

(১) [মহারাজ]...........নাথ — হাবর
(২) [সামন্ত] শ্রী(?)নাথ — বীর
(৩) ভবনাথ — ভ্রাতা — কেশব = অট্টারিকা
(৪) সুতঃ = গোত্রদেবী
(৫) নৃপলোকনাথঃ।

এই তাম্রশাসনের আর একটি উল্লেখযোগ্য কথা লিপিবদ্ধ করিয়াই এই অবতরণিকার উপসংহার করিব। কথাটি এই যে, বঙ্গে "মাৎস্য-ন্যায়ে"র প্রাদুর্ভাবকালের অর্থাৎ উত্তরাপথের সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের তিরোভাবেরও পর এবং গৌড়ে পাল-সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বের—এই তাম্রশাসনে বৌদ্ধধর্ম্মের তৎকালীন অবস্থার ক্ষীণ আভাসও প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না। এই যুগে, এমন কি, শ্রীহর্ষের সমসময়ে কামরূপেও বৌদ্ধধর্ম্মপ্রভাবের যথেষ্ট অভাব ছিল, এ কথা চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান্ চোয়াঙের বিবরণে (১) উল্লিখিত আছে। কামরূপরাজ্যের সহিত ত্রিপুরা-তাম্রশাসনের কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে কি না, তাহাও বিবেচ্য। লোকনাথের পূর্ব্বপুরুষগণ "শঙ্করে"র উপাসক [১ম শ্লোক] ছিলেন; তাঁহার মহাসামন্ত প্রদোষ শর্ম্মাও "অনন্তনারায়ণে"র বিগ্রহ স্থাপন করাইয়াছিলেন। লিপিতে উল্লিখিত যাগযজ্ঞাদির কথা, পৌরাণিক দেবদেবীর কথা, এমন কি, ব্রাহ্মণের মহাসামন্ত-রূপে রাজ্য-পরিচালনার কথা হইতে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রভাবেরই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

প্রশস্তি-পাঠ।

[সম্মুখের পৃষ্ঠা]

১। ... ।২ (২) কুমারামাত্যা অধিকরণঞ্চ (৩) স্বব্রূজ-বিষয়ে ব্রাহ্মণার্য্য পুরস্সরান্ বর্ত্তমানান্ ভাবিনশ্চ শ্রীসামন্ত-ম (৪)...

(১) Watters—Vol. II. P. 186.

(২) এই স্থলের খণ্ডিত শব্দটি দানাদেশের স্থান-বাচক কোনও শব্দের পঞ্চম্যন্ত পদ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

(৩) ডাঃ ব্লক "অধিকরণশ্চ" পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি যে দুইটি পংক্তির পাঠ তাঁহার রিপোর্টে সংযোজিত করিয়াছিলেন, তাহাতে চারিটি অশুদ্ধি লক্ষিত হইতেছে। তিনি "অধিকরণঞ্চ"কে "অধিকরণশ্চ"রূপে, "স্বব্রূজ"কে "সর্ব্বজ"রূপে, "ব্রাহ্মণার্য্য"কে "ব্রাহ্মণান্ত"রূপে, এবং "বোধয়ত্য"কে "বোধয়ত্য"রূপে পাঠ করিয়াছিলেন। ৩১ পংক্তিতে আমরা "স্ববুদ্ধ" স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই। "স প্রধান" পাঠ তিনি উদ্ধৃত করিতে পারেন নাই।

(৪) এ স্থানের শব্দটী "মহা সামন্ত" হইবারই সম্ভাবনা।

২। ...[বি]ষয়পতীন্ সাধিকরণান্ স[প্র]ধান-ব্যবহারি-জ(জা)নপদান্
বোধয়ত্যস্তু বো বিদিতমিহ হি ॥
(১) য[স্য]—⏑বিধি(?) ⏑—⏑

৩। ⏑ ⏑— — —ধ(?)রো বিগ্রহে
যেনায়ং ভুবন-ত্রয়-[স্থি]তি-সুখ-প্রাপ্ত্যর্থমাত্মা(ত্মা)ইধা [। *]
প্রত্যেক (কং) প্রভু(ভু)তাদি-তুল্য-মহিমা— —⏑— —⏑—

৪। (২) কা[য়েনো (?)]জ্জিত-মন্মথঃ স জয়[তি] ধ্বস্তাশুভঃশ[ঙ্ক]রঃ ॥[১*]
(৩) শম্ভোঃ পাদাব্জ-রেণু-প্রকর-কৃত-শিরঃ-পূত-দিব্যাভিষেক (কঃ)
প্রাপ্তা চন্দ্রা ⏑— —⏑ ⏑ ⏑

৫। [মু]নি-ভরদ্বাজ-সদ্বং শজাতঃ [। *]
শ্রীমান্ প্রখ্যাত-কীর্ত্তিঃ প্রভবদধিমহার(রা)জ-শব্দাধিকারঃ
সংসারোচ্ছিত্তিহেতুঃ প্রশমিত-দুরিতো—(৪) ⏑[পা(না)থো]

৬। বনীশঃ ॥ [২ *]
(৫) সূনুস্তস্য মহাত্মনো গুণনিধেঃ প্রখ্যাত-বীর্য্যো মহান্
সামন্তো যুধি লব্ধ-পৌরুষ-ধনো ধর্ম্মক্রিয়ৈকাশ্র[য়ঃ] [।*]
(৬) [শ্রীণা (না)] (?)

৭। ...থো ভগবানিব প্রতিহত-[ব্যা]পৎ স্বশক্ত্যাস্পদৈ-
র্বীরোত্থনবনীতল-প্রকটিত-প্রাপ্তব্য-যাবৎ-ক্রিয়ঃ ॥ [৩ *]
(৭) তস্যা[ত্ম]জোপি গুণবান্ ভ[ব]

৮। পা(না)থ-নামা
সংসার-সা[গ]র-জলোত্তরণৈকচিত্তঃ [। *]
ভ্রাতুঃ সুতে গুণবতি প্রতিপাদ্য রাজ্যং
শ্রীমানভূদৃষিসমো বি ⏑—⏑—

(১) শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত।
(২) "ক্রোধেন" বা "কোপেন" হইলেও ছন্দঃ-পতন ঘটে না।
(৩) স্রগ্ধরা।
(৪) এ স্থলে অবনীশের নামটি থাকাই সম্ভব,—তিনি "নাথ"শব্দযুক্ত কোনও ব্যক্তি হইবেন।
(৫) শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত।
(৬) ভগবানের সহিত উপমিত হওয়ায়, নামটির "শ্রীনাথঃ" হওয়ায়ই অধিক সম্ভাবনা।
(৭) বসন্ত-তিলকা।

৯। স্বঃ॥ [৪ *]

(১) তোনোদপাবি কুল-সন্তভয়ে সদৃক্ষাম্

(২) বিভ্রৎ পতিব্রতগুণাভরণোজ্জলায়াম্ [। *]

গোত্রশ্রিয়ামিব মহৌজসি গোত্রদে[ব্যা];

[ম]—

১০। টাম্রিকা-বিহিত-জন্মনি পুত্রবর্য্যঃ ॥ [৫ *]

(৩) যস্যা (স্য) স্থাবর-সংজ্ঞকো দ্বিজবরঃ প্রাবে[ং]া জনন্যাঃ পিতু-

[র্বী]রাখ্যো দ্বিজ-সত্তমো ⌣ ⌣— —

১১। স্যাস্তঃ প্রমাতামহঃ [। *]

প্রখ্যাতো নৃপ গোচরা (রো) বল-গণ-প্রাপ্তাধিকারঃ কৃতী •

সাধুঃ[প্]পারশবঃ সতামভিমতো মা[তামহঃ] (?)

১২। কেশ[বঃ] ॥ [৬ *]

(৪) দৌহিত্রস্সতু কেব[শ](শব)স্য গুণবান্ সত্যেক বন্ধুস্সদা.

দোর্দ্দণ্ড-অলিতোত্তমাসি-সি(স)চিব-প্রজ্ঞা-জয়ৎসাধনঃ [। *]

কৃত্য (?)

১৩। স্তোর্জ্জিত-সত্ত্ব-সার-তুরগঃ শ্রীলোকনাথো [নৃ]পো

যস্মিন্ পরমেশ্বরস্য বহুশো যাতং ক্ষয়ম্ সৈনিকম্ ॥ [৭ *]

(৫) দুর্লঙ্ঘ্য

১৪। জয়তুঙ্গ-বর্ষ-স-[ম*]রে,সত্তঃ[প্রয়ো]গোদ্বিনাং

• নীতৌ-নীতি-বিধানতা(তো) নি(তি)চতুরো,নিত্য-প্রহৃষ্ট-প্রজঃ [। *]

মৈত্র্যাপিদিত-নির্ব্[তি *]-বহ্-[গু]

১৫। পো বিম্ব[ৎপ্রি]য়[স্স]র্ব্বদা

সার্বঃ (৬) সা [ধু]-সমাশ্রয়ঃ পটুমতির্ল ব্ধ-প্রতাপোদয়ঃ॥ [৮*]

---

(১) বসন্ত-তিলকা।

(২) "বিভ্রৎ" শব্দটি 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত হইলে সমাসটির অর্থসংগতি হইতে পারিত। "পুত্র-বর্য্যঃ" শব্দের বিশেষণরূপে গৃহীত হইলে, ভরণকারী অর্থে প্রযুক্ত ধরিয়া, শব্দটিকে, তদ্রূপেই কথঞ্চিৎ রক্ষা করা যাইতে পারে।

(৩) শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত।

(৪) শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত। এই শ্লোকের তৃতীয় চরণের প্রথমাংশের পাঠ সংশয়-বিহীন নহে।

(৫) শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত। এই শ্লোকে দুইটি অক্ষর ক্ষোদিত হয় নাই, তাহা তারকা [*] চিহ্ন-যুক্ত করা হইয়াছে।

(৬) বন্ধনী-মধ্যস্থিত অক্ষরটি অন্ত কোনও অক্ষর হইলেও হইতে পারে।

(১) ইত্যাপ্ত-মন্ত্র-সুবিনিশ্চিত-কৃত্য-বস্তুঃ

১৬। ধারণ নৃপ [স্ত]⌣—⌣[(পত)][।*]
যস্মৈ দদৌ স(স্ব)বিষয়ং সহ সাধনেন
শ্রীপট্টপ্রাপ্তকরণায় বিহায় যুদ্ধং (ম্) ॥ [৭ *]

তৎসুত রাজপু [ত্র]—

১৭। লক্ষ্মীনাথ-[দূত]কেনা (২) [জ (?)] [অ]গস্ত্য-সগোত্রস্য ব্রাহ্মণস্য দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রেণ জয়শর্ম্ম-স্বামিনঃ পৌত্রেণ দ্বিজগুরু-[জ]—

১৮। নতা-তী(তি)তোষস্য [তো]ষশর্ম্মণো বিপ্রস্য পুত্রেণ যথাবিধিহুতাগ্ন্যাগ্ন্যাহিত-বুধস্বামিন [ঃ*] প্রমাতামহস্য সূনোঃ প্রথিতগু—

১৯। ণ-গণস্য ধর্ম্ম[র্জনতয়া (?)] বৃহস্পতি-স্বা[মি]নো দুহিতরি যথাথিজনাভ্যর্থিতার্থদস্তসুবচনায়াং সুবচনায়াং ব্রাহ্মণ্যামুৎপ—

২০। ন্নেন যথাচারাচরণ-প্রতিপ্রিতোভয়কুল [প্রা]প্ত-[জন্ম]না বিদিত[ভুজ]-বল-বীর্য্যেণ দ্বিজ-সাধুজনতোপভুজ্যমান-বিভবেনোদারান্বয়িনা দ্বিজন্মনা [বি]

২১। লুপ্তা]শেষদোষেণ মহাসামন্ত-প্রদোষশর্ম্মণা বিজ্ঞাপিতা বয়ং—স্ব [বা]জবিষয়ে মৃগ-মহিষ-বরাহ-ব্যাঘ্র-সরি(রী)সৃপাদিভির্যথেচ্ছমনুভূয়মান—গৃ[হ (?)]—

২২। সম্ভোগ-গহন-গুল্ম-লতাবিতানে কৃতাকৃতাবিরুদ্ধাটবী-ভূখণ্ডো (ণ্ডে) ম [য়া (?)] দেবাবসথং (৩) কারয়িত্বা ভগবানবিদিতান্তোনন্তনারায়ণ [ঃ*] স্থাপয়িত…………

২৩। [দি (?)] মমোপরি কৃতপ্রসাদা [ঃ*] পাদাস্তত্র ভগবতোমরবরাসুর-দিনকর-শশধর-কুবের-কিন্নর-বিদ্যাধর-মহোরগ-গন্ধর্ব্ব-বরুণ-য[ক্ষো]—…………

২৪। …ভিষ্টুত-বপুষোনন্তনারায়ণস্য সততমষ্টপুষ্পিকা-বলি-চরু-সত্র-প্রবৃত্তয়ে তত্র কৃতসামাস্থানাঞ্চ চাতুর্বিদ্য-ব্রাহ্মণা[র্য্যা]ণাং………

২৫। …(৪) তা-বিরুদ্ধাটবীভূখণ্ড [ঃ*] তাম্রেভিলেখ্য মাতাপিত্রোর্ম্ম চ পুণ্য-প্রবৃ[দ্ধয়ে] সর্ব্বতো (?) ভোগেন…ব….

(১) বসন্ত-তিলকা।
(২) অক্ষরটি সংশয়শূন্য নহে।
(৩) "দেবাবসথকারয়িত্বা" এরূপ পাঠও হইতে পারিবে।
(৪) এই স্থলের খণ্ডিতাংশে "কৃতাকৃতা……" ইত্যাদি থাকা সম্ভব।

২৬।...[লোকনা (?)]থেণ(ন)·········প্রতিনা[দিতো (?) ···পরম···

[পশ্চাতের পৃষ্ঠা]

(১)

২৭।···

(২)

২৮। ··················স্বামি···

২৯। ·············কে চতুশ্চত্বারিংশৎ সম্বৎসরে ফাল্গু[নমা]সে·········· মেকবন্ধদশে (?) নৈকাস্য·········

৩০।···[অ]এ পূর্ব্বেণ কণামোটিকা-পর্ব্বতো দক্ষিণেন পদ্মবাপিকোত্তর-গ্রাম[সী]মা পশ্চিমেন জয়েশ্বর-তাম্রপথ (?) র খণ্ড······

৩১।···বল-মণ্ডলিকা উত্তরেণ মহত্তর-রণশুভ-পুষ্করিণী-ইত্যেবমবধৃত-চতু[ঃ]-সীমক-(৩) হুবু(ব্ব)ঙ্গ-কৃতাকৃতাবিরুদ্ধাট বীভূখ[ণ্ডঃ]······

৩২।···(৪) পট্টা[রোপি]তো মহাসামন্তপ্রদোষশর্ম্মণো মাতাপিত্রোরস্য চ পুণ্য-প্রচয়ায় এতদীয়মঠে ভগবতোনন্তনারায়ণস্য পূজাবিধিসম্পত্তয়ে ••······

৩৩। [প্রদ (?)]এ[ঃ•] প্রত্যেক[ং] পাটক-ভাগোত্তমকুবৈরিক, ভট্টা-নন্তদেবস্বামিপাটক ২ ভট্ট-ধর্ম্ম-দামপাটক ১, ভট্টনাগদত্তপাটক ১,ভট্টকেশবপাটক ১, ভট্ট-গদ(?)

৩৪। -নন্দিপাটক ১, ভট্টমেধসোমপাটক ১, উদয়চন্দ্রপাটক ১, ভট্টমনোজ্ঞ-দেবপাটক ১, খলিষ-কর্ম্মান্ত(স্থি)ক-প্রভ-প্রাপি ভট্ট-জয়সোম—

৩৫। স্বামি অর্দ্ধপাটক, ভট্টপূর্ণদামদ্রোণং, বিদেশদ্রোণং, ভট্টযজ্ঞদেবদ্রোণং, ভট্টাম্বরদেবদ্রোণং, ল[ব্র (?)]-স্বামি [দ্রোণং (?)], [ভট্ট]-পূর্ণ—

৩৬। ঘোষ-দ্রোণং, .ভট্ট-উগ্রসোমদ্রোণং, মনো[র]থ-সাধারণং [র]বি× লয়সঙ্খ্যাল-ভিক্ষত ভ্রাত পাটক-দ্বয়॥ হরিশর্ম্ম দ্রোণ্ট (র?) ৭, জনসোম দ্রোণ্ড (র?) ৪,

৩৭। বিষ্ণুদ্রোণ্ট (র?) ৪, ভট্টভানু× × × × × [দ্রোণ্ট (র?)] ক[ণ]-বিশ্ব-[খড়্গ]-বদর—বিচক্ষণ-তত্তি-গোবর্দ্ধন-প্রভাববরিষ-বিষ্ণু-অন্দ (আনন্দ ?)-সুরি-পিতৃকেশ্বির (রা)-স্তচর

---

(১) এই পংক্তিটি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত ও খণ্ডিত।

(২) এই পংক্তিটিরও প্রায় তদ্রূপ অবস্থা—অক্ষরগুলি অত্যন্ত অস্পষ্ট।

(৩) ১ম ও ২১শ পংক্তিতে শব্দটি "হুবঙ্গ" রূপে কোদিত হইয়াছে।

(৪) শব্দটি "তাম্র-পট্টারোপিত" হইতে পারে।

৩৮। ত-হর্ষভূতি-সুভ্রা(?)৩-ভাগু অর্দ্ধ, হর্ষ-মা[ত্র-ধ]লিশ-× × × জ বুদ্ধিদ্রোহ-অটব্যাং ম (অ)দৈন্যেব দ্রোণং বিদগ্ধ-প্রম(মু)থ পাটক[১], ক [ক] দ্রোণং মহে[শ (?)]

৩৯। *তেজসোম-জনার্দ্দনা-নন্দ-নু [গ(?)] × × × × × সদেশ-[শ]ঙ্কর দ্রোণং রুদ্র-বিকসিত-দিবাকর-হরিশ(ষ)-বিজয়-বামন-গোপিশর্ম-আনন্দ-নির্দ্ধার(?)*

৪০। স (সু)তোষ-লুছকা[ভ্যাং পাটক ১], ন × × × সুক্ষ্মভূতেঃ পাটক ১, রুদ্র-দামোদরাভ্যাং পাটক আন্দ(ন)ন্দ সোম-বিদগ্ধ-জনার্দ্দন [উপ(?)]

৪১। তি-স্কন্দ-ই(ঈ)শা[ন] × × × ন × × × × পতি-কৃষ্ণ-ভব-রুদ্র-সুরঠ-জনসোম-বিদগ্ধ-বপ্‌ম(?)-ধৃতি-অবলিপ্ত-কোণ্ট(প্ল?)-বুদ্ধদত্তশর্ম্ম—

৪২। বপ্‌ম(?)-শর্ম-'× × ধাম-নবচ[ক্র] × × জয়-শিব-বিষ্ণু-সুজাত-শর্ম্মদ্রোণং বন্ধু-বেদজু-লব্‌বু-ধৃতি-জয়া [মিত্র দে(?)]ব-শ্র (?) ধু-বিদেশ-জীব-মহাসক (?)—

৪৩। বিহি-সুযত-উগ্র-[প্রতোষক] × × × অর্থ (?)-অভু[ত*]-সন্তোষ-দৈত্তগণ-রু(রূ)প-সন্ত(?)-বিষ্ণুমিত্র-নিস্তারণ-গোবিন্দ-কোণ্ট(প্ল?)-কণাদগুপ ×

৪৪। বপ্‌ম (?)-সুষেণ-লব্‌বু (?)-স × ন × [লিজ (?)] শোক-হম্বোশুভ-গুণতোষ-বপ্‌ম (?)-শোক-বপ্‌ম (?)-অতিথি-ভানু-ক্ষীর[গ]ও-নিধি-'× × ×

৪৫। ভদ্র-জনার্দ্দন-ভাস্কর- [বপ্‌ম (?)] × × × [দ্রো]ণং [ভ]ব-দত্ত দ্রোণং-ধনঙ্কর-ভট্টব্রহ্মদত্ত-দ্রোণং ভট্ট-অপদত্ত-দ্রোণং স্বামিদত্ত-বপ্‌ম (?)-চন্দ্র-পণ × × × ×

৪৬। কৃষ্ণ-হরিষ-বিকসিত-ম[নোরথ (?)]-বৃকশ-নয়ন-চিত্র-বিপশ্চিত-যজ্ঞ-সুকৃত-তোষ-চন্দ্র-বপ্‌ম (?) লি-অহি-মর্কট-চন্দ্র-প্রাণ-নন্দ-সাধারণ × × ×

৪৭। ভট্টসাধারণদ্রোণং ক্ষেমভূতিপাটকদ্বয় বপ্‌ম (?) দেব-প্রশান্ত-ভু (?) ধু স্বামি-প্রকাশ-গৌণ-পাটক-রাজি পৃ(প্রি)য়দাম-দ্রোণং, আনন্দ-ইন্দ্র-স্বামিদ্রো[ণং] × ×

৪৮। নারায়ণ-হরিদেব-চন্দ্রকেশ পাটক ১, ভট্ট-সূত দ্রোণ্ট (প্ল?) ২, ভট্টপিঙ্গ-দেবস্ত পাটক ১, নন্দগোপ-বন[মা]লি-ভু(ত্রি)লোচন-থ [স্থ (?)] × × × × ×

৪৯। সত্ত্রোপযোগায় পাটক, পুজিষ্ণু-[অহি] × × [স্বা]মি পাটক ২, সম্মুখ-সত্য সন্তোষ-জয়শর্ম-দৈদব-ইবল্লি (?)-নরবিজয়-শম্ভু (?) বিজয়-গুপ্তজয়-× × ×

৫০। × × ভটাৎ সুরিদ্রোর প্রিয় দ্রোণ্ট (প্ল?) মুধু বা × × × × × ×

লক্ষণ-ধন-নন্দ-পর পালশো (?)-ইন্দ্র-হরিধৃতি-ইচ্ছদেব-গণ-(পা) ঢং মহারাজ দদি (ধি?) ভট-সরপ (?) × × বক

৫১। × [কৃ]তা ভূময়ন্তাম্রপটে সমারোপিতা অস্ত মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যপ্রসবার্থভগবদ্] [ন*][ন্তনারায়ণায়[ব*]থা-লিখিত ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ সর্ব্বতে(তো) তোগেনাগ্র × × × ×

৫২। × × × তি(তী)র্থ-[পু]জনোপচীয়মান-সং[স্কা]রস্বাম্রূপ-গৌর-বাতি-থেয়-পৃ(প্রি)য়ত্বাচ্চ সততমনুমন্তব্যাঃ পালণী(নী)য়াশ্চ দানাচ্ছে য়োনুপাল[নং]

৫৩। ...[দো]ব-দর্শ[না]য় ভগবতা [ব্যা]সেন গীতা[ঃ*]শ্লোকাঃ—

বষ্টিম্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গে মোদতি ভূমিদ [ঃ । *]

আক্ষেপ্তা চানুমন্তা চ তান্যে[ব] (১) × × × × × × × ×

৫৪। × × × × × (২) ভ্যো যত্নাদ্রক্ষ যুধিষ্ঠির [।*]

মহী[ং?] মহি(হী)মতাংশ্রেষ্ঠ দানাচ্ছে য়োনুপালনং (ম্) ॥

বহুভির্বসুধা দত্তা রাজভিস্সগরাদিভি[ঃ*]

যস্ত যস্ত (৩) × × × ×

৫৫। × × × × × × × [ফ] লমি (ম্ ॥ ই) তি কৃতং

[সা]ন্ধি-বিগ্রহিক-প্রশান্ত[দে]বেন ভোগি-ভবদাসস্ত দ্রোণং,

পাচক-বসু-দ্রোণং, × × × × × × × ....

৫৬। ......বাচকম্বেন সুধামদ্রোণং বির (?)হ-দ্রোণ্ট (গ্ন?)২, উৎথাতু-কাম(মে)ন নরদত্তস্ত দ্রোণ্ট (গ্ন?) ২, প্রকৃত[ায়(?)] পাদমূলা......

৫৭। (৪)......রক অবি × × × তয়া ......সি......॥

[অনুবাদ।]

কুমারামাত্য (১) [শ্রীলোকনাথ] নিজ অধিকরণকে (২) [রাজকর্ম্মচারি-বর্গকে] ও সুব্বঙ্গবিষয়ের ব্রাহ্মণার্য্যগণকে এবং অধিকরণ, প্রধান ব্যবহারী

(১) অন্যান্য তাম্রশাসনে ব্যবহৃত এই শ্লোকটি হইতে এ স্থলের খণ্ডিতাংশ পূর্ণ করা যায় ; যথা,—"তান্যেব নরকে বসেৎ"।

(২) এই স্থলে খণ্ডিতাংশটি এইরূপ হইবে ; যথা,—"পূর্ব্বদত্তাং দ্বিজাতি"—ইত্যাদি।

(৩) এই স্থলের খণ্ডিতাংশটি "যদা ভূমিস্তস্ত তস্ত তদা" ইত্যাদি রূপ হইবে।

(৪) তাম্রপট্টের পশ্চাদ্ভাগের নিম্নাংশ উর্দ্ধাংশ হইতে অধিকতর ঘন বলিয়া প্রতিভাত হওয়ায় এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, ৫৭ পংক্তির পর আর কোনও পংক্তি লুপ্ত হয় নাই, বরং ৫৭ পংক্তিতেই শাসনটি সমাপ্তি লাভ করিয়াছে।

[ব্যবসায়ী] ও জনপদবাসিবর্গ সহিত বর্ত্তমান ও ভাবী শ্রীসামন্ত, মহাসামন্ত, বিষয়পতিগণকে জানাইতেছেন—আপনারা এই বিষয়ে অবগত হউন,—

(১)

যাঁহার বিগ্রহ·..............; যিনি ত্রিভুবনের স্থিতিসুখপ্রাপ্তির জন্য অষ্টধা (৩) বিভক্ত নিজ তনুর প্রত্যেক [ভাগে] প্রভুতাদি বিষয়ে তুল্য মহিমা [লইয়া বিরাজমান], এবং যিনি মদনদেবকে কায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন,—অশুভধ্বংসকারী সেই শঙ্কর জয়যুক্ত হয়েন।

(২)

প্রভাবান্বিত-মহারাজাধিরাজ-শব্দে অধিকারী, ভরদ্বাজমুনির সদ্বংশে উৎপন্ন, প্রথিতযশাঃ, পাপ প্রশমিত হওয়ায় সংসারোচ্ছেদের হেতুভূত, শ্রীমান্ [···নাথ] শম্ভুর পাদপঙ্কজরেণুরাজি দ্বারা শিরোদেশে পবিত্র দিব্যাভিষেক প্রাপ্ত হইয়া অবনীশ [রাজা] হইয়াছিলেন।

(৩)

গুণাধার সেই মহাত্মার মহান্ পুত্র, সামন্ত শ্রী (?) নাথ নিজ বলবীর্য্যে প্রসিদ্ধ হইয়া, যুদ্ধে পৌরুষ ধন প্রাপ্ত হইয়াও ধর্ম্ম্য ক্রিয়ার একমাত্র আশ্রয় ছিলেন। ভগবানের ন্যায় (সকলের) বিপৎ প্রতিহত করিয়া, নিজশক্তি-মাহাত্ম্যে তিনি অবনীতলে সম্পাদয়িতব্য সমস্ত ক্রিয়া প্রকটিত করিয়া বীর বলিয়া (পরিগণিত) হইয়াছিলেন।

(৪)

তাঁহার ভবনাথ-নামা গুণবান্ পুত্র সংসারসাগরজল উত্তীর্ণ হইবার জন্য একমনাঃ হইয়া, গুণসম্পন্ন ভ্রাতুষ্পুত্রের উপর রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া .... ঋষিতুল্য হইয়াছিলেন।

---

(১) 'কুমারামাত্য' শব্দটি রাজপুত্রদিগের মন্ত্রীকে বুঝাইলেও, গুপ্তসাম্রাজ্যে ইহা একটি বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারীর উপাধিরূপেই ব্যবহৃত হইত। কুমারামাত্য-পদবী-বিভূষিত ব্যক্তি নিজেও ক্ষুদ্ররাজরূপে স্ববিষয় পরিচালন করিতে পারিতেন। Fleet সাহেবের গুপ্তলেখমালা-গ্রন্থে এই শব্দের বহুশঃ উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পালসাম্রাজ্যেও যে এই কর্ম্মচারীর নাম বিলুপ্ত হয় নাই, তাহার প্রমাণরূপে নারায়ণপালের [ভাগলপুর] তাম্রশাসনে "মহা মারামাত্য" শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। [গৌড়-লেখমালা ৬০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।]

(২) এ স্থলের "অধিকরণ" শব্দটি রাজ্যশাসন-বিভাগের কর্ম্মচারিগণকে বুঝাইতেছে বলিয়া প্রতিভাত হয়। ইংরাজীতে তাহাকে আমরা Court [রাজপরিষদ্] বলিয়া বুঝিতে পারি।

(৩) "পৃথিবী সলিলং তেজো বায়ুরাকাশমেব চ।
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ সোম-যাজী চেত্যষ্টমূর্ত্তয়ঃ॥"—ইতি যাদবঃ॥

(৫)

অষ্টাম্বিকা-নাম্নী [জননী] হইতে লব্ধজন্মা, গোত্রলক্ষ্মীর ন্যায় মহাতেজঃ-সম্পন্না, পতিব্রতধর্ম্ম পালন করিয়া মহিমময়ী, অনুরূপা ভার্য্যা গোত্রদেবীর গর্ভে কুল অবিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্যই ভরণশীল তিনি (৪) এক পুত্ররত্নকে উৎপাদন করিয়াছিলেন।

(৬)

স্থাবরনামা দ্বিজবর যাঁহার মাতামহের প্রার্য্য (পিতামহ) (৫) ছিলেন, বীরনামা দ্বিজসত্তম যাঁহার........মান্য প্রমাতামহ ছিলেন; যাঁহার খ্যাতি-সম্পন্ন, সাধু পারশব(৬)জাতীয় কেশবনামা মাতামহ নৃপসন্নিধানে থাকিয়া, সৈন্যাধিকার (সৈন্যাধ্যক্ষপদ) প্রাপ্ত হওয়ায়, নিজ কৃতিত্বে সজ্জনমণ্ডলের অভিমত ব্যক্তি ছিলেন।—

(৭)

সর্ব্বদা সত্যের একমাত্র সুহৃৎ গুণবান্ রাজা লোকনাথ এই কেশবের দৌহিত্র ছিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ নিজ দোর্দ্দণ্ডে আলিত শ্রেষ্ঠ-অসিবলে ও সচিবগণের বুদ্ধিবলে জয়লাভ করিত। কর্ত্তব্যবিৎ (লোকনাথ) জন্তুগণের সারভূত

৪। এই শ্লোকের আদিতে উল্লিখিত "তেন" পদটি পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের ভ্রাতুঃসুতকে বুঝাইবে—কারণ, "ভবনাথ তাঁহার হস্তেই রাজ্যভার অর্পণ করিয়া ঋষিতুল্য হইয়াছিলেন।"—এইরূপ বর্ণনা হইতে তাঁহার [ভবনাথের] কোনও সন্তানোৎপাদনের সম্ভাবনা ছিল বলিয়া প্রতিভাত হয় না।

৫। "প্রার্য্য" শব্দটি সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল বলিয়াই বোধ হয়। "আর্য্য" শব্দে শ্বশুরকেও বুঝাইতে পারে। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে "স্বামী" অর্থে "আর্য্যপুত্র" শব্দের প্রয়োগ সকলেরই সুবিদিত। অতএব "প্রার্য্য" শব্দকে "শ্বশুরের পিতা" অর্থে প্রযুক্ত ধরিলে, গোত্রদেবীর মাতা অষ্টাম্বিকার পিতামহও হইতে পারেন। শব্দমালাতে "আর্য্যক" শব্দ পিতামহ ও মাতামহ উভয়ার্থে প্রযুক্ত দেখিয়া, আমরা এ স্থলে "স্থাবর"কে লোকনাথের মাতামহ কেশবের "প্রার্য্য" অর্থাৎ পিতামহ মনে করিয়া অনুবাদ করিয়াছি।

৬। পারশবঃ—লোকনাথ পারশবের দৌহিত্র ছিলেন। সপ্তম শতাব্দীতে হিন্দুসমাজে অনুলোম-বিবাহ যে প্রচলিত ছিল, তাম্রশাসনে ব্যবহৃত এই শব্দটিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কেশবকেই আমরা পারশব বলিয়া বর্ণিত পাইতেছি; কিন্তু তাঁহার পিতা "দ্বিজসত্তম" ছিলেন। "হর্ষচরিত"-প্রণেতা বাণভট্টের পিতা বাৎস্যায়ন-বংশাবতংস বৈদিক ব্রাহ্মণ চন্দ্রভানুও এক শূদ্রাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার গর্ভজাত [চন্দ্রসেন-নামা] পারশব পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। [হর্ষচরিত, ২য় উচ্ছ্বাস দ্রষ্টব্য।]

মনু [৯।১৭৮] "পারশব" শব্দের এইরূপ সংজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

"যং ব্রাহ্মণস্তু শূদ্রায়াং কামাদুৎপাদয়েৎ সুতম্।
স পারয়ন্নেব শবস্তস্মাৎ পারশবঃ স্মৃতঃ॥"

অশ্বগণ (৭) লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার (বিরুদ্ধে যাইয়া) পরমেশ্বরের (৮) (সার্ব্বভৌম নৃপতির) সৈন্যসমূহ বহুবার নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল।

(৮)

জয়তুঙ্গবর্ষের (৯) দুর্লঙ্ঘ্য সময়ে তিনি তৎক্ষণাৎ প্রয়োগ-[উপায়]-বিধানকারী হইয়াছিলেন। নীতিবিষয়ে যাঁহারা অর্থী হইতেন, তাঁহাদিগের জন্য নীতিবিধান করিতে তিনি অতি চতুর ছিলেন। প্রজাকুলকে প্রহৃষ্ট রাখিয়া, বহুগুণ-বিশিষ্ট এই নরপতি মৈত্রী দ্বারা আত্মসন্তোষ লাভ করিতেন। সর্ব্বদা বিদ্বজ্জনকে প্রিয়জন মনে করিয়া, সর্ব্বহিত-রত, সাধুগণের আশ্রয়ীভূত, পটুমতি [লোকনাথ] প্রতাপ-সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

(৯)

এই সকল কারণে, আপ্তজনের মন্ত্র লইয়া কর্ত্তব্যাবধারণপূর্ব্বক শ্রীজীবধারণ নৃপতি......[অবিলম্বে] যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া যে শ্রীপট্ট-প্রাপ্ত করণকে (১০) সসৈন্য নিজ বিষয় [দেশ] দান করিয়াছিলেন।—

তাঁহার পুত্র যুবরাজ লক্ষ্মীনাথকে দূতক করিয়া, অগস্ত্য-সগোত্র দেবশর্ম্ম-

---

৭। অক্ষর অর্দ্ধ-বিলুপ্ত হওয়ায়, এই শ্লোকের তৃতীয় চরণের প্রথমাংশের পাঠ সংশয়-বিহীন হইতে পারে নাই ; "কৃত্যজ্ঞঃ" পাঠ আনুমানিক ধরিয়া, পরবর্ত্তী শব্দটিকে "অর্জ্জিত"রূপে গ্রহণ করিয়া অনুবাদ প্রদত্ত হইল। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী শব্দটিকে অকারান্ত ধরিয়া পরবর্ত্তী শব্দটিকে "উর্জ্জিত"রূপে গ্রহণ করিলেও, অর্থসঙ্গতি সুরক্ষিত হয়। তখন সমাসটির এইরূপ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে—"যাঁহার জন্তুশ্রেষ্ঠ অশ্বগণ "উর্জ্জিত" [বলশালী] ছিল।

৮। এই সার্ব্বভৌম নৃপতি কে, তাহা বলা যায় না। ৯ম শ্লোকোক্ত জীবধারণ-নামা নৃপতিই যদি এই শ্লোকের পরমেশ্বর-পদবাচ্য ব্যক্তি হইয়া থাকেন,—তাহা হইলেও, পূর্ব্বভারতের পূর্ব্বাঞ্চলের কোন্ স্থানে, কোন্ সময়ে তিনি আত্মপ্রাধান্যস্থাপনে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাহা অনুসন্ধেয়।

৯। তাম্রশাসনের কাল আমরা সপ্তমশতাব্দীর শেষার্দ্ধে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি কেন, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যাঁহার পিতা [ধ্রুব] গুর্জ্জরপতি-বৎসরাজের হস্ত হইতে গৌড়েশ্বরের শ্বেত-ছত্র-দ্বয় কাড়িয়া লইয়াছিলেন, সেই রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের একটি নাম "জগত্তুঙ্গ" ছিল ; কিন্তু এই "জগত্তুঙ্গ" ৮ম শতাব্দীর শেষভাগের রাজা ছিলেন। তাম্রশাসনে উল্লিখিত "জয়তুঙ্গবর্ষ" যদি রাষ্ট্রকূটবংশীয় কোনও ব্যক্তি হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, তিনি তৃতীয় গোবিন্দের কোনও পূর্ব্বপুরুষ হইয়া থাকিবেন। কিন্তু রাষ্ট্রকূটদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বিস্তৃত হইয়া গেলে, রাষ্ট্রকূটরাজগণের "তুঙ্গ" "বর্ষ" প্রভৃতি নাম অন্যান্য বংশের রাজগণও গ্রহণ করিয়াছিলেন। কমারাজ্যের এক জয়তুঙ্গসিংহের কথা আমরা Keilhornএর লিষ্টে উল্লিখিত পাইতেছি। [Ep. Ind. Vol. V. P. 79. No. 575.] সুতরাং আলোচ্য শাসনের "জয়তুঙ্গবর্ষ" কে, তাহা ঠিক করা সম্প্রতি কঠিন।

১০। শ্রীপট্ট-প্রাপ্ত লোকনাথ জাতিতে "করণ" ছিলেন। তিনি যে "পারশব" [অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার গর্ভজাত সন্তান] কেশবের দৌহিত্র ছিলেন, তাহা ৬ষ্ঠ শ্লোক হইতে জানা গিয়াছে।

নামক ব্রাহ্মণের প্রপৌত্র, জয়শর্ম্ম-স্বামীর পৌত্র, দ্বিজ-গুরু-জনতার নিরতিশয়-তোষ-বিধান-কারী তোষশর্ম্মনামক বিপ্রের পুত্র,—অগ্নিতে যথাবিধি হোমকারী, আহিতাগ্নি প্রমাতামহ বুধস্বামীর পুত্র, ধর্ম্মার্জ্জনহেতু গুণগ্রামোপেত বলিয়া বিখ্যাত, বৃহস্পতি স্বামীর দুহিতা—যাচকগণের যথাভিলষিত অর্থ প্রদান করিয়া, প্রাপ্তসুবচনা, সুবচনা-নাম্নী ব্রাহ্মণীর-গর্ভোৎপন্ন, সদাচারের যথাচরণ করিয়া প্রতিষ্ঠিত এই উভয় কুল হইতে লব্ধজন্মা, বিদ্রুত-ভুজবল-বীর্য্য দ্বিজ-গুরু-জনতার সহিত আত্মবিভব-ভোগকারী, মহৎকুলসম্ভূত, দ্বিজ বিলুপ্ত-সকল-দোষ, মহাসামন্ত প্রদোষশর্ম্মা আমাদিগকে বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন—

"যে স্থানের ঘন-গুল্ম-লতা-বিতানের মধ্যে মৃগ, মহিষ, বরাহ, ব্যাঘ্র, সরীসৃপ প্রভৃতি যথেচ্ছভাবে গৃহসুখ অনুভব করে, সুবৃদ্ধ বিষয়ের কৃতাকৃতী-বিরুদ্ধ সেই অটবীভূখণ্ডে দেবায়তন নির্ম্মাণ করাইয়া আমি ভগবান্ অবিদিতান্ত অনন্তনারায়ণ (১১) স্থাপিত করিতে অভিলাষী হওয়ায় রাজপাদের প্রসাদ লাভ করিয়াছি। সেই স্থানে দেব, অসুর, দিবাকর, শশধর, কুবের, কিন্নর, বিদ্যাধর, মহানাগ, গন্ধর্ব্ব, বরুণ, যম, যক্ষাদি দ্বারা পূজিত-বিগ্রহ সেই অনন্ত-নারায়ণের সতত অষ্টপুষিকা (১২) বলি, চরু ও সত্রের সতত-প্রবৃত্তির জন্য,—এবং সমান-সম্পত্তি-ভোগকারী চাতুর্বিদ্য [চতুর্ব্বেদবিৎ] ব্রাহ্মণ ও আর্য্যগণের [ব্যবহারের] জন্য এই কৃতাকৃতাবিরুদ্ধ অটবীভূখণ্ড তাম্রপট্টে [শাসনভাবে] লিখাইয়া আমার মাতাপিতার ও নিজের পুণ্যবৃদ্ধির জন্য····················
···[রাজা লোকনাথ] কর্ত্তৃক প্রদত্ত হউক"।

··············[এই প্রার্থনাক্রমে] চতুশ্চত্বারিংশৎ [৪৪] সংবৎসরে ফাল্গুন মাসে পূর্ব্ব দিকে কণামোটিকা পর্ব্বত, দক্ষিণ দিকে পঙ্গ ও বাপিকা নামক উভয় গ্রামের সীমা, পশ্চিম দিকে জয়েশ্বরের তাম্রপথর (?) খণ্ড···········

১১। এ স্থলে "অনন্তনারায়ণ" শব্দে কোন্ বিগ্রহকে বুঝাইতেছে, তাহা চিন্তনীয়।

"গন্ধর্ব্বাপ্সরসঃ সিদ্ধাঃ কিন্নরোরগচারণাঃ।
নান্তং গুণানাং জানন্তি তেনানন্তোঽয়মুচ্যতে॥"

এই নিমিত্ত বিষ্ণুর এক নাম "অনন্ত"; সুতরাং "অনন্তনারায়ণ" বলিলে বিষ্ণুমূর্ত্তির বিগ্রহও হইতে পারে। "শেষনাগ"কে বুঝাইবার জন্যও "অনন্ত" শব্দের প্রয়োগ প্রসিদ্ধ। অতএব "অনন্তনারায়ণ"শব্দে শেষশয্যাশায়ী বিষ্ণুকেও বুঝাইতে পারে কি না, তাহাও বিবেচ্য।

১২। অষ্টপুষিকা—শব্দটির অর্থ সম্যক্ প্রতিভাত হইতেছে না। "অষ্টমুষ্টিকা" পাঠ হইতে পারিলে, একটি অর্থ হইতে পারিত।

বলমগুলিকা, উত্তর দিকে মহত্তর (১৩) বপ্পতত্তের পুষ্করিণী—এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন স্বব্রুবের কৃতাকৃতাবিরুদ্ধ অটবীভূখণ্ড..................তাম্রপট্টে লিখাইয়া, মহাসামন্ত প্রদোষশর্ম্মার মাতাপিতার ও তাঁহার নিজের পুণ্য-বৃদ্ধির জন্য, তাঁহার মঠে [স্থাপিত] ভগবান্ অনন্তনারায়ণের পূজাবিধি-সম্পাদনের নিমিত্ত..........প্রদান করিলাম।

[অতঃপর ৫০ পংক্তি পর্য্যন্ত লিখিতাংশের অনুবাদ প্রদত্ত হইল না। কারণ, এই অংশে কেবল শতাধিক ব্রাহ্মণের নাম ও তাঁহাদের মধ্যে কে কত পাটক, কত দ্রোণ, বা কত আঢ় (ক) ভূমি পাইবেন, তাহারই নির্দ্দেশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। উপরি-উদ্ধৃত পাঠ হইতে সকলেই তাহা সহজে বুঝিয়া লইতে পারিবেন।]

[এইরূপে বিভক্ত] ভূমিখণ্ড সকল তাম্রপট্টে [শাসন-রূপে] সমারোপিত করিয়া, উঁহার [প্রদোষ শর্ম্মার] মাতাপিতার ও নিজের পুণ্যোদয়ের জন্য, ভগবান্ অনন্তনারায়ণকে এবং যথালিখিত ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বত্র যথেচ্ছভোগের জন্য [প্রদত্ত হইল]। তীর্থপূজন দ্বারা সংস্কার প্রচীয়মান হয়, এবং নৃপতি-গৌরব ও অতিথিসৎকার সকলের প্রিয় হওয়া উচিত—এইরূপ মনে করিয়া, অনুমোদনপূর্ব্বক সকলেরই এই আদেশ সতত পালন করা কর্ত্তব্য,—যেহেতু দান অপেক্ষা পালন শ্রেয়স্কর। [ভূমির অপহরণাদি] দোষ প্রদর্শন করিবার জন্য, ভগবান্ ব্যাসদেবও কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

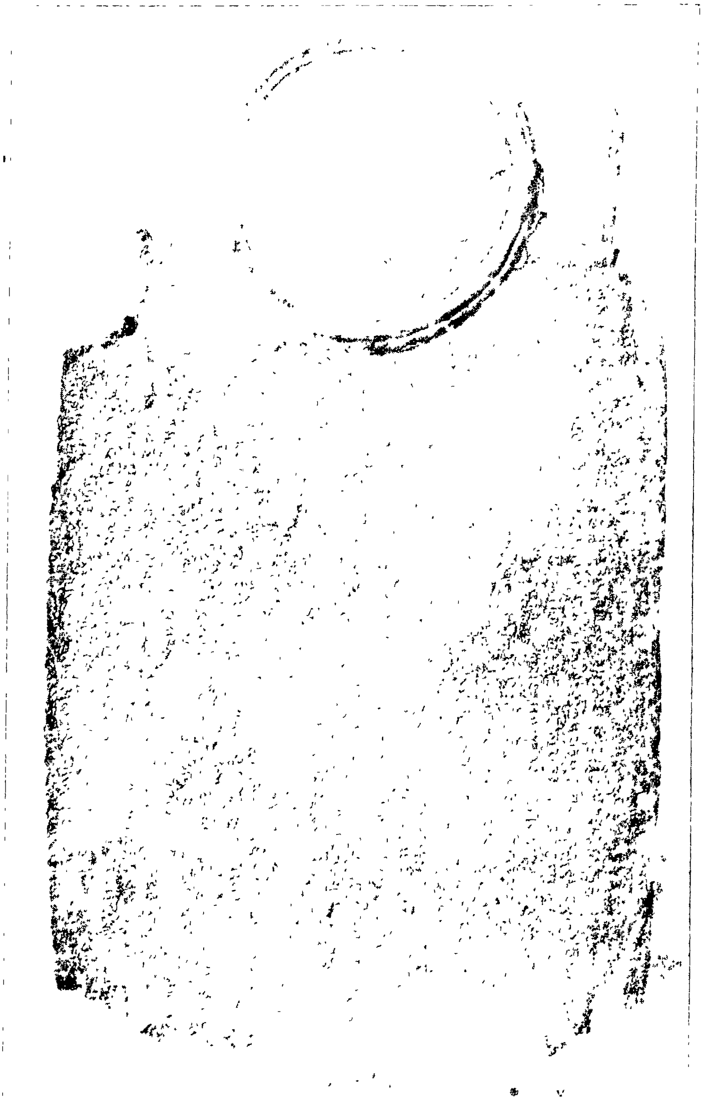
ভূমিদাতা ষষ্টি সহস্র বৎসর স্বর্গসুখ ভোগ করেন; এবং ভূমির অপহর্ত্তা ও [অপহরণের] অনুমোদনকারী তৎপরিমিত কাল নরকবাস করেন।

হে রাজশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণগণকে যে মহী পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা কর। দানাপেক্ষা পালন শ্রেয়স্কর॥

সগরাদি বহু নৃপতিগণ ভূমিদান করিয়াছেন; কিন্তু যখন যাঁহার [অধিকারে] ভূমি থাকে, তখন [ভূমিদানের] ফল তাঁহারই হইয়া থাকে॥

সান্ধি-বিগ্রহিক প্রশান্তদেব এই শাসন সম্পাদিত করিয়াছিলেন। ভোগী

১৩। মহত্তর—সেকালে গ্রামের বৃদ্ধ বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে "মহত্তর" বলা হইত। দশকুমার-চরিতের ২য় উচ্ছ্বাসে "জনপদ-মহত্তর" শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। বাঙ্গালাদেশের নানা স্থানে গ্রামের নায়ককে এখনও "মাতব্বর" বলা হয়। এই শব্দটি [ফরিদপুর জিলায় আবিষ্কৃত] মহারাজ ধর্ম্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচারদেবের তাম্রশাসনেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। Indian Antiquary [1910] ২১৩ পৃষ্ঠায় পার্জ্জিটার সাহেবের টীকা দ্রষ্টব্য।



লোকনাথের ত্রিপুর-শাসন। ২য় পৃষ্ঠা।

(১৪) ভবদাসের দ্রোণ (১৫), পাচক বসুর দ্রোণ.................সুধামের দ্রোণ, বিরহের ২ দ্রোণ,.................নরদত্তের ২ দ্রোণ............।

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক।

শূন্য।

শূন্য কথাটা কত পুরাতন, তাহার "সন তারিখ" এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু সম্প্রতি যে নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা "শূন্য"কে বৌদ্ধগণের "একচেটিয়া" সম্পত্তি করিয়া তুলিয়াছে। ইহাতে একটু আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। আর, তাহার যৎকিঞ্চিৎ কারণও দেখিতে পাওয়া যায়।

যখন কিছু ছিল না, তখন যাহা ছিল, তাহা, "শূন্য"। কিছু না হইতে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি আমাদের পৌরাণিক-কাহিনী। সুতরাং আমাদের পক্ষে "শূন্য" নূতন কথা হইতে পারে না। "শূন্য" ফাটিয়াই "পূর্ণ" বাহির হইয়া পড়িয়াছে;—নচেৎ স্রষ্টা জন্মিত না;—দেখিবার বস্তুকেও প্রাপ্ত হইত না। এতাবতা "শূন্য"কে আমাদের নিতান্ত অনাত্মীয় ও অপরিচিত বলা চলে না। অপিচ-তাহাকে বৌদ্ধ কল্পনা-প্রসূত আগন্তুক বলিয়া মনে করিতেও সাহস হয় না।

শ্রীমদানন্দ তীর্থ [পূর্ণপ্রজ্ঞ-দর্শনে] ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া, এক স্থানে [প্রথমাধ্যায়স্থ চতুর্থপাদে] প্রসঙ্গক্রমে "শূন্যে"র একটু আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি শ্রুতির মধ্যে অনুসন্ধান করিতে গিয়া, মহোপনিষৎ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলেন;—

"এষ হ্যেব শূন্য, এষ হ্যেব তুচ্ছ, এষ হ্যেবাভাব, এষ হ্যেবাব্যক্তোঽদৃশ্যোঽচিন্ত্যো নির্গুণশ্চেতি।"

ইনি [সেই পরম পুরুষ] "শূন্য"—ইনিই "তুচ্ছ"—ইনিই "অভাব"—ইনিই "অব্যক্ত—অদৃশ্য—অচিন্ত্য"-এবং "নির্গুণ"।

১৪। ভোগী—এ স্থলে এই শব্দটিকে ইহার অন্যতম অর্থ "গ্রামবৃদ্ধ" বা "নাপিত" অর্থে প্রযুক্ত বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

১৫। "দ্রোণ" শব্দটা অন্য কুত্রাপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু এই তাম্রশাসনে ভূমিবিভাগবিবরণপ্রসঙ্গে এই শব্দটির বহুবার প্রয়োগ দেখা যাইতেছে। শব্দটি বিশিষ্ট-পরিমাণযুক্ত কোনও ভূমিভাগকে বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

ইহাতে যদি বা কাহারও বুঝিবার অসুবিধা থাকিয়া যায়, তন্নিরসন-বাসনায়, শ্রীমদানন্দতীর্থ পুনরপি মহাকৌর্ম্ম-পুরাণ হইতে প্রমাণ তুলিয়া বুঝাইয়াছিলেন ;—সেই শূন্যই "বিষ্ণু"।

তৎ যথা,—

"শমূনং কুরুতে বিষ্ণুরদৃশ্যঃ সন্ পরঃ স্বয়ম্।
তস্মাচ্ছূন্যমিতি প্রোক্তস্তোদনাত্তুচ্ছ উচ্যতে ॥
নৈষ ভাবয়িতুং যোগ্যঃ কেনচিৎ পুরুষোত্তমঃ।
অতোঽভাবং বদন্ত্যেনং নাশ্যত্বান্নাশ ইত্যপি ॥"

মহোপনিষদের "শূন্য—তুচ্ছ—অভাবাদি" পারিভাষিক শব্দ। তদন্তর্গত "শূন্য—তুচ্ছ—অভাব"-শব্দের নিরুক্তি মহাকৌর্ম্ম-পুরাণে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।—তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে বলা হইয়াছে,—সেই পরাৎপর বিষ্ণু নিজে "অদৃশ্য" হইয়া থাকেন বলিয়া, তিনি "শম্ ঊনং" * করেন। সেই জন্যই বিষ্ণুকে "শূন্য" নামে অভিহিত করা হয়। তিনি যেমন "শম্ ঊনং" করেন, সেইরূপ "তোদন" করেন বলিয়া, তাঁহাকে "তুচ্ছ"-নামেও অভিহিত করা হয়। এই পুরুষোত্তম [শূন্যাবস্থায় অবস্থিত বিষ্ণু] কাহারও ভাবনার যোগ্য হইতে পারেন না বলিয়া, তাঁহাকে "অভাব" বলা হয় ;—তাঁহাকে "নাশ"-নামেও অভিহিত করা হইয়া থাকে।

উপনিষদে ও পুরাণে পরম পুরুষকে যে অবস্থায় ও যে কারণে "শূন্য" নামে অভিহিত করা হইয়াছে, তন্ত্রে সেই অবস্থায় ও সেই কারণে শিবকেও "শূন্য" নামে অভিহিত করা হইয়াছে, এ বিষয়ে বৈদিকী ও তান্ত্রিকী শ্রুতির মধ্যে অসামঞ্জস্য নাই,—উভয়ে উভয়ের পক্ষ সমর্থন করে।

"শূন্য" ভাবনার অযোগ্য, [অতএব] "অভাব"-পদবাচ্য। তথাপি সাধককে শূন্যপ্রতিপাদ্য পরমপুরুষের সন্ধান-লাভের জন্য প্রথমে "শূন্য-ভাবনা" ধরিয়াই, সাধনার আরম্ভ করিতে হয়। কারণ, যাহা ঘটপটাদিরূপে বাহ্য দৃষ্টির সম্মুখে নিয়ত দেদীপ্যমান, তাহা জ্ঞান-চক্ষুকে আবৃত করিয়া রাখে। সে আবরণ সরাইয়া দিতে হইলে, "লয়ে"র সাধনায় সমস্ত দৃশ্যমানকে বিলীন করিয়া লইয়া, প্রথমে "শূন্যে"ই উপনীত হইতে হয়। তাহার পর, সেই "শূন্য" হইতে শিবশক্তি-সমাযোগে, উৎপত্তি-তত্ত্বের গুপ্ত রহস্য স্বপ্রকাশ হইয়া পড়ে।

---

* শমূনং কুরুতে শম্ ঊনং কুরুতে বহুখাৎ অন্য-সুখং অল্পং করোতি ইতি তত্ত্বপ্রকাশিকায়াম্।

এইরূপে "শূন্য" আমাদের সাধন-শাস্ত্রের গোড়ার কথা; রামাই পণ্ডিত তাহাই বুঝাইবার জন্য পাঁচালী রচনা করিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালা দেশের মামুলী "ধর্ম্মপূজা"কে বৌদ্ধপূজা বলিয়া ধরিয়া লইলে, যে গ্রন্থে সেই ধর্ম্মপূজার পরিচয় আছে, তাহাকে অগত্যা "বৌদ্ধশাস্ত্র" বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; এবং ধর্ম্মপূজা-কীর্ত্তনপরায়ণ রামাই পণ্ডিতকেও অবৌদ্ধ বলিবার উপায় থাকে না। তবে এ বিষয়েও একটু আপত্তি উঠিতে পারে; এবং তাহারও যৎকিঞ্চিৎ কারণ দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঙ্গালাদেশ যখন অর্ব্বাচীন বৌদ্ধাচারের লীলাভূমি হইয়া উঠিয়াছিল, তখন বাঙ্গালাদেশই তিব্বতের "গুরুস্থান" হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বাঙ্গালার কোন্ স্থানে কোন্ কোন্ হাড়ি-ডোম-চণ্ডালাদি নীচজাতি অর্ব্বাচীন বৌদ্ধাচারের প্রবর্ত্তক হইয়াছিল, কোন্ রাজা কোন্ স্থানে তাহাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল, এ সকল বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ বাঙ্গালাদেশ হইতে অধুনা বিলুপ্ত হইয়া গেলেও, তিব্বতে বংশানুক্রমে আলোচিত হইতেছে। তদবলম্বনে তিব্বতীয় লেখকগণ যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাও প্রচলিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে রামাই পণ্ডিতের পরিচয় থাকা এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। কুলশাস্ত্রের ন্যায় এই সকল শাস্ত্র যখন এখনও অপ্রকাশিত, তখন ভবিষ্যতে হয় ত প্রমাণ আবিষ্কৃত হইলেও হইতে পারে। যে পর্য্যন্ত তাহা আবিষ্কৃত না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত "ধর্ম্মপূজা"র আবিষ্কার নব্য-বঙ্গমনীষার এক অদ্বিতীয় কীর্ত্তিরূপে বিঘোষিত না হইলেই ভাল হইত। কিরূপে এই অচিন্তিতপূর্ব্ব ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, আবিষ্কর্ত্তা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্বয়ং তাহার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছেন। সে ইতিহাস তাঁহার ভাষায় এইরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যথা,—

"নানা কারণে আমার সংস্কার হইয়াছিল যে, ধর্ম্মমঙ্গলের ধর্ম্মঠাকুর বৌদ্ধধর্ম্মের পরিণাম। সুতরাং ধর্ম্মঠাকুর সম্বন্ধে কোন পুথি পাইলে তাহার সন্ধান করা, কেনা ও কপি করা একান্ত আবশ্যক, এ কথাটা আমি বেশ করিয়া বুঝিলাম। শুদ্ধ তাই নয়, যেখানে ধর্ম্মঠাকুরের মন্দির আছে, সেইখান হইতে মন্দির ও মন্দিরের দেবতার বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইবে এবং ধর্ম্মঠাকুর সম্বন্ধে চলিত ছড়াও সংগ্রহ করিতে হইবে। প্রথমেই মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল পাওয়া গেল। পুথির মালিক ছাড়িয়া দিতে চায় না, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সেজ ভাই শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন জামিন হইয়া মাসিক ১০৲ দশ টাকা ভাড়ায় আমাকে ঐ পুথি পাঠাইয়া দেন, আমি বাড়ী বসিয়া তাহা

কপি করাই। সে পুথি বহুদিন হইল সাহিত্য-পরিষদে ছাপা হইয়া গিয়াছে। আর একখানি পাইয়াছিলাম—শূন্যপুরাণ, রামাই পণ্ডিতের লেখা। ধর্ম্মঠাকুরের পূজা-পদ্ধতি অর্দ্ধেক আছে এবং তাহার শেষে 'নিরঞ্জনের উষ্মা' নামে একটি রামাই পণ্ডিতের লম্বা ছড়া আছে। সে ছড়া পড়িলে ধর্ম্মঠাকুর যে হিন্দু ও মুসলমানের বাহির, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। ব্রাহ্মণের অত্যাচারে অত্যন্ত প্রপীড়িত হইয়া ধর্ম্মঠাকুরের সেবকগণ তাঁহার নিকট উদ্ধার কামনা করিল। তিনি যবনরূপে অবতীর্ণ হইয়া ব্রাহ্মণদিগের সর্ব্বনাশ করিলেন। রামাই ঠাকুরের ছড়াগুলি নিশ্চয় মুসলমান অধিকারের পরে লেখা হইয়াছিল। বেশী পরেও নয়, মুসলমানরা ব্রাহ্মণদের জব্দ করিয়াছিল দেখিয়া ধর্ম্মঠাকুরের দল খুসী হইল; অথবা ইহাও হইতে পারে, তাহারাই মুসলমানকে ডাকিয়া আনিয়াছিল।* শূন্যপুরাণ সাহিত্য-পরিষদ ছাপাইয়াছেন। আর একখানি পুস্তক পাইয়াছিলাম, অনেক কষ্টে, অনেক পরিশ্রমের পর, ময়ূরভট্টের ধর্ম্মমঙ্গল; সেখানি বোধ হয়, পঞ্চদশ শতাব্দীর লেখা; কারণ, তাহাতে রাঢ়দেশে বর্দ্ধমান ও মঙ্গলকোট প্রধান জায়গা। আর একখানি পুস্তক পাইয়াছিলাম, তাহা না বাঙ্গালা, না সংস্কৃত, এক অপরূপ ভাষায় লিখিত। মঙ্গলাচরণ-শ্লোকের শেষে আছে,—"বক্তি শ্রীরঘুনন্দনঃ।" অর্থাৎ যিনি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তিনি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে চান যে, তাহা রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি-তত্ত্বের এক তত্ত্ব; সুতরাং হিন্দুদিগের একখানি প্রমাণ-গ্রন্থ। উহাতে ধর্ম্মঠাকুরের ও তাঁহার আবরণ-দেবতাগণের উল্লেখ ও তাঁহাদের পূজা-পদ্ধতির ব্যবস্থা আছে। এই পুথিখানি হইতে আরও বুঝিতে হইবে যে, রঘুনন্দনেরও পরে বাঙ্গালা দেশে এত বৌদ্ধ ছিল যে, তাহাদের জন্য একখানি তত্ত্ব লেখাও আবশ্যক হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুও আমার মত অনেক পুথি সংগ্রহ করিয়া এখন ইউনিভারসিটীকে দিয়াছেন। আমি প্রায় পাঁচ শত পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

"এই সময়ে কুমিল্লা স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র সেন বি এ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস লিখিবেন বলিয়া এসিয়াটিক সোসাইটীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। দীনেশবাবুর সাহায্যে পরাগলির মহাভারত, ছুটিখাঁর অশ্বমেধপর্ব্ব প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ খরিদ হয়।

"যখন ধর্ম্মঠাকুর সম্বন্ধে অনেকগুলি পুথি সংগ্রহ হইল এবং অনেক বৃত্তান্ত পাওয়া গেল, তখন ধর্ম্মঠাকুর যে বৌদ্ধ, ঐ সম্বন্ধে বাঙ্গালায় যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে, তাহার একটা ইতিহাস লিখিয়া রাখিয়া নেপালে হিন্দুরাজের অধীনে বৌদ্ধ ধর্ম্ম কিরূপ চলিতেছে, দেখিতে যাইলাম।

"আমি নেপাল হইতে আসিয়া প্রকাশ্যে বলিয়া দিই, ধর্ম্মঠাকুরের পূজাই বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ। তাহা শুনিয়া এক জন বলিয়াছিলেন,—ছিঃ! জেলে মালারা যে ধর্ম্মঠাকুরের পূজা করে, সে ধর্ম্মঠাকুর কিনা বৌদ্ধ! ছিঃ!"

* অতঃপর কেহ মুসলমান অভিযানের এইরূপ হেতুমূলক একখানি ইতিহাস লিখিয়া ফেলিলে, বিস্মিত হইবার কারণ থাকিবে না। যখন মধ্যযুগের ইউরোপে অনেকস্থলে রাজ-বিপ্লবের মূলে ধর্ম্মবিপ্লব দেখা যায়, তখন ভারতবর্ষের ইতিহাসেও তাহার দুই চারিটা উদাহরণ না থাকিলে, আমরা খাটো হইয়া যাইতাম। সৌভাগ্যক্রমে কিছুদিন পূর্ব্বে মৌর্য্যসাম্রাজ্যের অধঃপতনের মূলে ধর্ম্মবিপ্লব বাহির হইয়াছিল; সম্প্রতি বাঙ্গালার কৈবর্ত্তবিপ্লবের মূলেও ধর্ম্ম-বিপ্লবের ধূয়া গুণগুণ করিয়া উঠিয়াছে; এখন বঙ্গে মুসলমান-আগমনের মূলে ধর্ম্মবিপ্লব বাহির হইয়া পড়িলে, আমরা নিশ্চয়ই ইউরোপকে হারাইয়া দিতে পারিব।

শাস্ত্রী মহাশয়ের ন্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ নিষ্ঠাবান্ হিন্দু লেখকের লেখনী-প্রসূত [হিন্দুগণের গ্লানিজনক] এই নবাবিষ্কারের ইতিহাস পুনর্মুদ্রিত করিয়া, "প্রবাসী" উহাকে আহ্লাদের সঙ্গেই বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে ছড়াইয়া দিয়াছেন। কেবল কৌতুকের বিষয় এই যে, যাহা এই ইতিহাসের গোড়ার কথা, ইহাতে সেই কথাটারই প্রমাণ উল্লিখিত হয় নাই। "নানা কারণে" শাস্ত্রী মহাশয়ের "সংস্কার হইয়াছিল যে ধর্ম্মমঙ্গলের ধর্ম্মঠাকুর বৌদ্ধধর্ম্মের পরিণাম"। সেই "নানা কারণে"র একটিমাত্র "কারণ" উল্লিখিত হইলেও, তাহার সামর্থ্য বিচার করিয়া দেখিবার সুযোগ ঘটিত। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় সে সুযোগদানে কৃপণতা করিয়াছেন। লোকেও তাহা জানিবার জন্য কৌতূহল প্রকাশ করে নাই,—সকলই হয় ত ধরিয়া লইয়াছে যে, যখন শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, তখন অবশ্যই "কারণে"র অভাব নাই;—তাহার সামর্থ্যেরও অভাব থাকিতে পারে না।

এই নবাবিষ্কৃত তথ্য যদি বাঙ্গালার ঐতিহাসিক তথ্য হয়, তবে বাঙ্গালী হিন্দুমাত্রই যে এখনও বৌদ্ধাচার-নিরত, সে বিষয়ে আর সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না। কিন্তু কথাটা কি সত্য? শাস্ত্রী মহাশয় স্বয়ং যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতেই সংশয়কে আরও প্রবল করিয়া তুলিয়াছেন। "বক্তি শ্রীরঘুনন্দনঃ"—ভণিতিযুক্ত পুথিখানি যে স্মার্ত্তচূড়ামণি রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি-তত্ত্বের অন্তর্গত নহে, তাহা সহজেই জানিতে পারা যায়। উহা অন্য যে কোনও রঘুনন্দনেরই রচিত হউক না কেন, উহাতে যখন "ধর্ম্মঠাকুরের ও তাঁহার আবরণ-দেবতাগণের উল্লেখ ও তাঁহাদের পূজাপদ্ধতির ব্যবস্থা আছে" বলিয়া শাস্ত্রী মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন, তখন উহা হইতে বৌদ্ধত্ব-দ্যোতক দুই চারিটি প্রমাণ তুলিয়া দিলেই সকল সংশয় নিরস্ত হইয়া যাইত। তাহা করিতে না পারিয়া, তিনি একটি আনুমানিক সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়া, ব্যবস্থা দিয়াছেন,—"এই পুথিখানি হইতে আরও বুঝিতে হইবে যে, রঘুনন্দনেরও পরে বাঙ্গালা দেশে এত বৌদ্ধ ছিল যে, তাহাদের জন্য একখানি তত্ত্ব লেখাও আবশ্যক হইয়াছিল।" এখানেও গ্রন্থোক্ত প্রমাণের কথা নাই; আছে কেবল শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুমানপ্রসূত নিজের কথা। তাহা তাঁহার শিষ্যবর্গের পক্ষে "আপ্তবাক্য" হইলেও, সর্ব্বসাধারণের জন্য অন্য প্রমাণ আবশ্যক।

একদা বাঙ্গালাদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল হইয়াছিল;—তাহা অনেক দিন

ধরিয়া অনেক প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছিল;—হয় ত বাঙ্গালা ভাষায় "বৌদ্ধপূজা-পদ্ধতি"র পুথিপাঁচালী-ছড়াকীর্ত্তনাদিও রচিত হইয়াছিল। তাহার কিছু কিছু আবিষ্কৃত হইয়া থাকিলে, ভাল কথা। তাহাতে পুরাতত্ত্বের উপকার সাধিত হইবে। তাহার কথা আপাততঃ জিজ্ঞাস্য নহে। জিজ্ঞাস্য এই যে,—বাঙ্গালার "ধর্ম্মপূজা" যে "বৌদ্ধপূজা," তাহার প্রমাণ কি? তাহাকে শৈবাচারের পরিণাম বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষে আপত্তি কি? "ধর্ম্মপূজা"র প্রমাণ-রূপে যে শূন্য-পুরাণের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহাতে "উলূকে"র কথা আছে,—কিন্তু কোনও বৌদ্ধগ্রন্থে বা শূন্যপুরাণে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। পরিচয় পাওয়া গিয়াছে শৈব তন্ত্রে। তাহারও গোড়ার কথা "শূন্যে"র কথা,—শূন্যরূপী শিবের কথা, সুতরাং "ধর্ম্মপূজা"কে শৈবাচারের পরিণাম বলিয়া স্বীকার করিবার পক্ষে বাধা দেখা যায় না। শিবলিঙ্গার্চ্চন ব্রাহ্মণমাত্রের নিত্য কর্ত্তব্য; এখনও তাহা তিরোহিত হয় নাই, তাহার অঙ্গীভূত "ধর্ম্মপূজা"ও ঘরে ঘরেই চলিতেছে। তাহা যদি "বৌদ্ধপূজা" হইয়া যায়, তবে এই নবাবিষ্কারকে সত্য সত্যই বঙ্গমনীষার অদ্বিতীয় কীর্ত্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু প্রমাণ? প্রমাণ না থাকিলে, সকলকেই বলিতে হইবে,—ছিঃ!

শ্রীসতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।

বিদেশী গল্প।

তৃষ্ণা।

ভেলা ভাসিয়া চলিয়াছে! বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, স্রোতোবেগে ভেলা ভাসিয়াই চলিয়াছে!

পাঁচ দিন, পাঁচ রাত্রি কাষ্ঠভেলা সমুদ্রোপরি ভাসিতেছে, তরঙ্গতাড়নে ইচ্ছামত ও ভাঁটার টানে অনির্দ্দিষ্ট রাজ্যে চলিয়াছে। শীতল, নিরানন্দময় রজনীর অন্ধকারে ভাসিতে ভাসিতে ভেলা আর্দ্র, কুজ্ঝটিকা-সমাচ্ছন্ন প্রভাতে এবং ক্রমে, শুভ্র, প্রচণ্ড-রৌদ্রদগ্ধ দিবাভাগ অতিক্রম করিয়া সারাপথে চলিয়াছে। ভারতবর্ষ তখন পশ্চাতে, উত্তরপূর্ব্ব দিক্‌চক্রবালে মিলাইয়া গিয়াছে। জলমগ্ন জাহাজের পরিত্যক্ত আরোহীগুলি কল্পনানেত্রে প্রতিমুহূর্ত্তে বহুদূরে জাহাজের উড্ডীয়মান পাল যেন দেখিতে পাইতেছিল।

প্রখর সূর্য্যাতপ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ভেলার সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগে ত্রিপল এবং ভগ্ন দাঁড়ের সাহায্যে দুইটি স্বতন্ত্র ছাউনি নির্ম্মিত হইয়াছে। ভেলাটি দেখিতে অনেকটা চৈনিক

সাম্পানের ন্যায়। কিন্তু বস্ত্রাচ্ছাদনের মধ্যবর্ত্তী কাষ্ঠখণ্ডে দোদুল্যমান রক্ত ও শ্বেতবর্ণের জামা দেখিলে সে ভ্রম অপনোদিত হয়।

ভেলায় পাঁচটি পুরুষ, একটি রমণী ও একটী চারি বৎসরবয়স্ক বালকমাত্র আরোহী। পুরুষগণ সম্মুখস্থিত ছাউনির নীচে জড়সড়ভাবে শুইয়াছিল। এক ব্যক্তি তাহার ক্ষত পদতল সমুদ্রের উষ্ণ সলিলমধ্যে নিমগ্ন করিয়া ভেলার প্রান্তদেশে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়াছিল। তাহার আশঙ্কা হইতেছিল, পাছে স্রোতোবেগে সে ভাসিয়া যায়।

পাঁচ দিন ও পাঁচ রাত্রি ভেলা অনির্দ্দিষ্ট সমুদ্রপথে এই ভাবে ভাসিতেছে।

ভেলার পশ্চাতে ছাউনির নিম্নে রমণী তাহার পুত্রসহ পড়িয়া আছে। কি কষ্টে, কি যন্ত্রণায় এই কয় দিন যে যাইতেছে, তাহা শুধু ভগবান্‌ই জানেন। এখন মৃত্যু না আসিলে এ যন্ত্রণার অবসান হইবে না। কিন্তু তথাপি সেও অন্যের ন্যায় জীবনের আশা একেবারে পরিত্যাগ করে নাই। নৈরাশ্যের বিভীষিকা তাহার চিত্তকে অধীর করিয়া তুলিতেছিল, কিন্তু রমণী ধৈর্য্য ও সাহসসহকারে হৃদয়ের এই দুর্ব্বলতা দমন করিবার চেষ্টা করিতেছিল। মূর্খা নারীর ন্যায় জীবনের সঙ্কট-সময়ে জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে সে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ে নাই।

তাহার পদতলে শায়িত নিদ্রিত বালক মাঝে মাঝে চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল, নিমীলিত নয়নের উপর ক্ষুদ্র বাহু রক্ষা করিয়া মাঝে মাঝে অস্ফুটস্বরে সে জল চাহিতেছিল।

রমণী অমনই চকিতভাবে সম্মুখবর্ত্তী ছাউনির অন্তরালে শায়িত পুরুষগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল। বালকের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত ক্ষীণ ও অস্ফুট হইলেও পুরুষগুলির কর্ণগোচর হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। সহসা রমণী দেখিল, এক ব্যক্তি মাথা তুলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে। লোকটার নয়নে জীবনীশক্তির চিহ্ন যেন ম্লান হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু তথাপি সে দৃষ্টি যেন রমণীকে চঞ্চল করিয়া তুলিল।

কণ্ঠস্বর উচ্চে তুলিয়া রমণী বলিল, "এখনও সময় হয় নাই, বাবা।" সে ভাবিয়াছিল, এই কথা বলিলেই লোকটি নিশ্চিন্ত হইয়া আবার শয়ন করিবে।

রমণী বালককে অঙ্কে তুলিয়া লইল। তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বসনের অন্তরালস্থিত লুক্কায়িত পানীয়পূর্ণ পাত্রের নলটি সুকৌশলে তাহার মুখে সংলগ্ন করিয়া দিল।

সীমাহীন, অন্তহীন ধূসর সমুদ্র সম্মুখে প্রসারিত। পার নাই, কূল নাই; অনন্ত, অসীম, নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর সমুদ্র! দূরে শুধুই বারিবিস্তার—আকাশ ও জল মিশিয়া গিয়াছে। রমণীর কণ্ঠতালু শুষ্ক, নীরস। ভেলার প্রান্তে তরঙ্গহীন সমুদ্র-সলিলের ছলছলাৎ শব্দ কি নৈরাশ্যপূর্ণ—ভীষণ!

বালক জলপানের পর মৃদু-ক্ষীণ-কণ্ঠে জননীর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। মাতা পুত্রকে কথা কহিতে নিষেধ করিয়াছিল, পাছে কেহ শুনিতে পায়। কিন্তু বালক নিষেধ মানিল না। সে হৃদয়ের আবেগে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া ফেলিল। যে লোকটি ইতিপূর্ব্বে মাথা তুলিয়া দেখিতেছিল, সে আবার উঠিল। ভীতা রমণীর দিকে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে অস্ফুট-স্বরে বলিল, "জল কোথায়?"

রমণী তাহার পার্শ্বস্থিত একটি জলপাত্র দেখাইয়া দিল। সর্দ্দার নাবিক পানীয়পূর্ণ পাত্রটি তাহারই জিম্মায় রাখিয়াছিল।

রমণী বলিল, "কোনও ভয় নাই, জল ঠিক আছে, এখন শুইয়া থাক।"

লোকটি একবার চারি দিকে চাহিয়া দেখিল। সে বুঝিল, সকলেই গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন। সে কাতরস্বরে বলিল, "এক ফোঁটা জল দাও।" তাহার শুষ্ক স্ফীত কৃষ্ণবর্ণ জিহ্বা মুখবিবর হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল।

"আমি পারিব না। সে সাহস আমার নাই। তুমি শুয়ে পড়।"

রমণী পানীয়পূর্ণ আধারটি পরিধেয় বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিল।

"একটু জল দাও—না দিলে আমি সকলকে বলিয়া দিব।"

লোকটি বালককে দেখাইয়া দিল।

সে হামা দিয়া ক্রমশঃ রমণীর সন্নিহিত হইতেছিল। পুরুষটির চক্ষুতারকার চতুষ্পার্শ্বস্থ রক্তরেখা রমণীর দৃষ্টি এড়াইল না। তাহার ওষ্ঠযুগল রক্তহীন এবং স্বাভাবিক অবস্থার দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। সে যখন তাহার বসনের প্রান্ত আকর্ষণ করিবার জন্য হস্ত উদ্যত করিল, তখন তাহার অঙ্গুলির নখগুলি দেখিয়া রমণী শিহরিয়া উঠিল। নখগুলি কাচের স্থায় শাদা হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে যেন ঈষৎ নীলবর্ণের আভা বিজড়িত।

রুদ্ধনিশ্বাসে রমণী বলিল, "শীঘ্র চ'লে যাও! উহারা জানিতে পারিলে তোমায় মারিয়া ফেলিবে। মোটে এক গ্যালন জল আছে।"

"এক গ্যালন!"—তাহার নিষ্প্রভ নয়নে সহসা একটা আলোক-রেখা নৃত্য করিয়া উঠিল, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন তাড়িতস্পৃষ্টের ন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। "এক গ্যালন জল আছে! একবার আমাকে দেখ্‌তে দাও—এক ফোঁটা জল পান করতে দাও, শুধু এক চুমুক—বেশী নয়। ওরা কেউ জান্‌তে পারবে না!"

রমণী মাথা নাড়িল। তাহারও কণ্ঠতালু শুষ্ক ও জিহ্বা স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল।

"সর্দ্দার যখন ভাগ করে দেবেন, তখন পাইবে। তার আগে নয়।"

"আমি এখনই চাই।" তাহার রক্তবর্ণ নেত্রে উন্মত্ততার চিহ্ন পরিস্ফুট হইল। রমণী মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। পুরুষ বলিল, "জল তোমার নয়, আমাদের। তুমি ও তোমার ছেলে যদি এখানে না আসিতে, আমরা আরও বেশী জল পেতাম।"

পুরুষটি ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া রমণী শঙ্কিতভাবে সরিয়া বসিল; অমনই বস্ত্রাবৃত জলাধার সে দেখিতে পাইল।

লোকটা আনন্দের আতিশয্যে সম্মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

রমণী উত্থিতপ্রায় চীৎকার রুদ্ধ করিল। সে অস্ফুট মৃদু কণ্ঠরবে ক্রোড়ের বালকও নয়ন উন্মীলিত করিল না; কিন্তু অত মৃদু শব্দেও অপর ছাউনীর অন্তরালস্থিত লোকগুলির নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাহারা সকলে সম্মুখে অগ্রসর হইল।

তাহারা যে ভাবে আসিতেছিল, তাহাতে বেশ বোঝা গেল—সাংঘাতিক কিছু ঘটিবে। পুরুষটি যতই ভীত হউক না কেন, রমণীর হৃদয় বিভীষিকায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। লোকটি তখনও রমণীর জানু ধারণ করিয়া ছিল।

লোকগুলি হাঁমা দিয়া অগ্রসর হইতেছিল। তাহাদের গতিতে বিন্দুমাত্র ব্যস্ততা ছিল না; তাহারা যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছিল, রমণীর আর্ত্তনাদ ততই স্পষ্ট ও প্রবল হইতেছিল। সর্দ্দারটি যুবাপুরুষ। লিভারপুলে তাহার গৃহ। যুবক যখন পানীয়চোরের মস্তকের কেশগুচ্ছ ধারণ করিল, রমণী আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া তখন আরও উচ্চে চীৎকার করিয়া উঠিল।

লোকটা আত্মরক্ষার জন্ম কোনও চেষ্টা করিল না। বরং তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে হাস্যরেখা দেখা গেল। সে বুঝিল, অসহ্য অবর্ণনীয় যন্ত্রণা হইতে এইবার সে মুক্তিলাভ করিবে। আর তাহাকে তিল তিল করিয়া মৃত্যু-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে না। মুক্তি আসন্ন। সর্দ্দার নাবিক রমণীকে অস্ফুটস্বরে বলিল, "ত্রিপল টানিয়া দিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা কর। ছেলেটি কেমন আছে?"

রমণী সে প্রশ্নের উত্তর দিবার কোন চেষ্টা করিল না। যুবকও সেজন্ম বিশেষ চিন্তিত ছিল না। যুবতী ত্রিপল টানিয়া মুক্ত পথ বন্ধ করিল, তার পর পুত্রকে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিল।

রমণী নয়নযুগল নিমীলিত করিয়া অতীত কাহিনীগুলি মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল। একমাস পূর্ব্বের ঘটনাগুলি তাহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। "জেনেট" জাহাজে চড়িয়া লিভারপুল হইতে রেঙ্গুনে যাত্রা করিবার পূর্ব্বের কথা মনে পড়িতে লাগিল।

একমাস পূর্ব্বে সে স্কট্‌ল্যাণ্ডের পল্লীগ্রামে—নিজের গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া ছিল; দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে খল্ল ডাকহরকরার প্রতীক্ষা করিতেছিল। পিয়ন যথাসময়ে আকাঙ্ক্ষিত পত্র তাহার হাতে দিয়া গেল। সে সাগ্রহে তাহার স্বামীর পত্র পাঠ করিল। তাহার স্বামী ডেভিড সবে এক বৎসর হইল ইঞ্জিনীয়ার হইয়া রেঙ্গুনে কার্য্য করিতে গিয়াছেন। পত্রখানি এইরূপ:—

"তোমার জন্ম একটি চমৎকার বাড়ী তৈয়ার করাইয়াছি। রুথ, আমার পুত্রটিকে লইয়া তুমি চলিয়া আইস। নগরে তুমি বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তির সহিত থাকিবে। এখানে চারি বৎসর বাস করিবার পর আমরা গৃহে ফিরিয়া যাইব। তখন একটা গোলাবাড়ী কিনিয়া অথবা অন্য কোন লাভজনক ব্যবসায় দ্বারা দেশে জীবন যাপন করা যাইবে। ষ্টীমারে আসিতে তোমার ভয় হইবে না ত? ভয় কি? তুমি ত ভীরু নহ। "জেনেট" জাহাজের অধ্যক্ষ পর্ভিস্ আমার বিশেষ বন্ধু। তোমার ও বালকের যাহাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয়, সে বিষয়ে তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। আর মনে রাখিও, আমিও তোমার আশাপথ চাহিয়া রহিলাম।"

সাহস! সে ত যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়াছে। জাহাজের সকলেই তাহার দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার যাবতীয় অসুবিধা দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এইমাত্র যে তৃষ্ণাতুর উন্মত্ত ব্যক্তি তাহার বসনপ্রান্ত ধরিয়া টানাটানি করিতেছিল, সেও তাহার জীবনরক্ষার জন্ম কত চেষ্টাই না করিয়াছিল। অতীত কাহিনীগুলি উজ্জ্বলবর্ণে তাহার নয়নসমক্ষে প্রতিভাত হইল।

"মা, ও কি?"

বালক চমকিয়া উঠিল। তুষারশুভ্র করপুটে সে মাতার বসনপ্রান্ত চাপিয়া ধরিল।

"বাবা ডেভিড, ও কিছু নয়। সমুদ্রচর পক্ষী ডাকিতেছে, উহা তাহারই শব্দ।"

জননী পুত্রের নয়নে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু উদ্‌গ্রীবভাবে সে কান খাড়া করিয়া রহিল। সে বুঝিতে পারিল, কোন ভারী দ্রব্য তাহারা টানিয়া লইয়া যাইতেছে। রমণী ইত্যবসরে নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া আসন্ন দুর্ঘটনার জন্য মনকে প্রস্তুত করিয়া রাখিল।

সমুদ্রজলে গুরুভার দ্রব্য-পতনের শব্দ মিলাইয়া যাইবার পরে সে একটা কাষ্ঠদণ্ডের উপর পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিয়া শুইয়া রহিল। তাহার নয়নপ্রান্তে মুক্তাবিন্দুর ন্যায় অশ্রু দুলিতেছিল।

বালক মাথা তুলিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "মা, বাবা আমাদের জন্য বড় ভাব্‌ছেন, না?"

"হ্যাঁ ডেভিড্‌, বোধ হয় তিনি ভাবিতেছেন। কিন্তু তুমি ঘুমিয়ে পড়। তোমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে হয়ত তাঁকে এখানেই তুমি দেখিতে পাইবে।"

"মা, বড় পিপাসা!"

ক্রন্দন বুকের মধ্যে গুঞ্জরিয়া উঠিতেছিল; যুবতী উচ্ছ্বসিত আবেগ দমন করিয়া বালককে লুকায়িত পানীয়ের আধার হইতে কিছু জলপান করিতে দিল; সর্দ্দার নাবিক ঐ জলাধারটি গোপনে তাহাকে দিয়াছিল। কারণ, সে জানিত, শিশুর পানতৃষ্ণা প্রতিমুহূর্ত্তেই সম্ভবপর। রমণীকে সে বলিয়া দিয়াছিল, অন্য কেহ যেন পাত্রটি দেখিতে না পায়।

"ডেভিড্‌, তুমি অত জল খেয়ো না, বাবা। অত জল খাওয়া ভাল নয়। তোমার মা এখনও পর্য্যন্ত এক ফোঁটা—"

"বাবার কাছে ঢের জল আছে, না মা?"

যুবতী তাড়াতাড়ি বলিল, "তাঁর জন্য একটু জল রাখ্‌বে না? তাই বল্‌ছি, বেশী জল খেয়ো না।"

"তাঁর জন্য রাখ্‌বো বৈ কি। কিন্তু মা, আমি বাজী রাখ্‌তে পারি, আমার মত বাবার কখনও এত পিপাসা নেই।"

"তুমি বীর বালক।"

মাতার কথায় বালক পুনরায় জননীর ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া শয়ন করিল।

যে রজনীতে "জেনেট" জাহাজ জলমগ্ন শৈলে আহত হয়, সেই ভীমা রজনীর ভীষণ কাহিনী রমণীর স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। সে কি ভীষণ দৃশ্য!

লোহিতসাগরের নিস্তরঙ্গ প্রশান্ত জলরাশি অতিক্রম করিবার পর এই দুর্ঘটনা ঘটে। তখন জাহাজ আরবদেশের মরুভূমি পশ্চাতে ফেলিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিল। ভগবানের নিদর্শন-আলোকের ন্যায় পূর্ণচন্দ্র আকাশপ্রান্তে দুলিতেছিল। প্রকৃতি হাস্যময়ী, মধুরা, আলোকোজ্জ্বলা।

সেই মধুর পূর্ণিমারজনীতে এই ভীষণ কাণ্ড সংঘটিত হইল। জলমগ্ন শৈলে আহত হইয়া জাহাজ ভাঙ্গিয়া গেল। নৌকাগুলি নামাইবার অবসর হইল না। কাপ্তেন পর্কিন্‌স্‌ সমগ্র নাবিককে সমবেত করিবার পূর্ব্বেই জাহাজ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া সমুদ্র-সমাধি লাভ করিল।

সময় বুঝিয়া বাতাস প্রবল হইল, সমুদ্রও গর্জ্জন করিয়া উঠিল। জাহাজ দ্বিধা বিভক্ত হইবার পূর্ব্বে জাহাজের নৌকা তিনখানি দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়াছিল। শৈলসংলগ্ন জাহাজের

গলুইয়ের উপর অপেক্ষা করা বিপজ্জনক। নৌকা ফিরিয়া আসিয়া বাকী সকলকে উদ্ধার করিবে, সে আশা সুদূরপরাহত। কারণ, তৎপূর্ব্বে মৃত্যু আসিয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিবে।

তিনখানি ভেলা অবিলম্বে নির্ম্মিত হইল। সামান্য আহার্য্য ধ্বংসাবশেষ জাহাজ হইতে সংগ্রহ করিয়া ভেলার উপর স্থাপিত হইল। তার পর কি ঘটিয়াছিল, তাহা স্মরণ হয় না। বিস্মৃতির কুহেলিকার আবরণে পরবর্ত্তী ঘটনা আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।

আশার উত্তুঙ্গ গিরিশিখর হইতে হতভাগী নৈরাশ্যের অন্ধতম গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। কত আশা, কত আনন্দ ও উল্লাস হৃদয়ে লইয়া সে স্বামিসকাশে যাইতেছিল, অকস্মাৎ অদৃষ্ট-চক্রের এ কি ঘোর পরিবর্ত্তন! এখন সে সহজাত বুদ্ধিপ্রভাবে বুঝিতে পারিয়াছে, তাহার পুত্রের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। তাহার পুত্র সম্বন্ধে শীঘ্রই কোন দুর্ঘটনা ঘটিবে।

নিজের সম্বন্ধে তাহার কোনই চিন্তা ছিল না। সে অবস্থা বহুক্ষণ অতীত হইয়া গিয়াছে। প্রখর রৌদ্রের ভীষণ উত্তাপ এবং দুর্দ্দমনীয় পানতৃষ্ণা তাহার চিত্তে প্রথমতঃ যে বিভীষিকার সঞ্চার করিয়াছিল, এখন তাহার প্রভাব অনেকটা সে আত্মস্থ করিতে পারিয়াছে।

এখন সন্তানের শুভাশুভই রমণীর প্রধান চিন্তনীয় বিষয়। যদি শুধু নিজের বিষয় হইত, তাহা হইলে এতক্ষণ কোন্ কালে সে অলক্ষ্যে সমুদ্রগর্ভে দেহ বিসর্জ্জন করিয়া সকল যন্ত্রণার জ্বালা জুড়াইত। সমুদ্রের রহস্যময় অতলস্পর্শ ক্রোড়ে সে চিরবিশ্রামস্থল খুঁজিয়া লইত। কিন্তু বিভীষিকার রহস্য-যবনিকার অন্তরালে সে তাহার পুত্রের ভীষণ বিপদের ছায়া যেন দেখিতে পাইতেছিল।

সে বিপদ যে কি, তাহা সে পূর্ব্বে স্পষ্ট বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু এক ঘণ্টা পূর্ব্বে জলচোরের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহার মনের অন্ধকার যেন কিছু সরিয়া গিয়াছে। বিপদটি যে কি, সে যেন তাহা কিছু কিছু অনুমান করিতে পারিয়াছিল।

সর্দ্দার নাবিক হামা দিয়া জলপাত্রের সম্মুখে আসিল। প্রত্যহ সকলকে যেমন পানীয় ভাগ করিয়া দেয়, আজও সেইরূপ ভাবে জল বণ্টন করিয়া দিল। সেই সময় অস্ফুটস্বরে সে যেন কি বলিয়া উঠিল। তাহার মুখমণ্ডল সে সময় অত্যন্ত পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, ললাটে নিদারুণ চিন্তার রেখা দেখা গেল। তাহার পশ্চাতে তিন জন নাবিকও আসিয়াছিল। সর্দ্দার রমণীর দিকে চাহিল। রমণীর ওষ্ঠ কম্পিত হইল; ভগ্নকণ্ঠে সে উচ্চারণ করিল, "আজ একজন লোক কম।"

কয়েক ফোঁটা জল রমণীকে দিয়া সর্দ্দার তিন ব্যক্তিকে তাহাদের অংশের পানীয় দিল। তার পর স্বয়ং জীবনীশক্তি-সংস্কারক তরল পদার্থটুকু পান করিল। তার পর যখন সে পানীয়ের আধারের মুখ বন্ধ করিতে উদ্যত হইল, যেন নীরব দৃষ্টিতে রমণী সর্দ্দারের পানে চাহিল।

মাতৃ-অঙ্কে শায়িত বালকের দিকে চাহিয়া পুরুষ বলিল, "ছেলেটি এখনও ঘুমাইয়া আছে।"

রমণী বালককে জাগাইয়া দিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে বলিল। সে জানিত, তাহার বক্ষঃস্থলে লুক্কায়িত আধারে বিন্দুমাত্র জল নাই। পুত্র যদি জলপান করিতে না পায়, তবে ছয় ঘণ্টার মধ্যে বিন্দুমাত্র জল পাইবার প্রত্যাশা নাই। কারণ, ছয় ঘণ্টার পূর্ব্বে আর জল বিতরিত হইবে না।

সর্দ্দার নাবিক বালককে কিছু জলপান করিতে দিল। আশাপূর্ণকণ্ঠে বালক যখন বলিল, "বাবা এসেছেন কি ?" তখন তাহার নয়নযুগল ঈষৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

রমণীর কানে কানে পুরুষ বলিল, "এখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর। তিন দিনের মত জল আছে।"

শিরঃসঞ্চালনপূর্ব্বক, সর্দ্দার নাবিক রমণীর দিকে পশ্চাৎ ফিরিল। সঙ্গীদিগকে তাহার অনুবর্ত্তী হইতে আদেশ করিল।

কিন্তু সঙ্গি-ত্রয়ের মধ্যে যে বলিষ্ঠ, সে অতিকষ্টে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া আপনার কণ্ঠনালীতে হাত দিয়া বলিল, "আরও জল। ছোকরাকে জল দিলে কেন ? বাড়ীতে আমারও ছেলে মেয়ে আছে। দাও, আরও জল দাও !"

সে জলপাত্রের দিকে দুই পদ অগ্রসর হইল। তাহার মস্তিষ্কে তখন উন্মত্ততার সঞ্চার হইয়াছিল।

"আরও জল ! জল !"

লোকটা তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। তার পর জলপাত্রের দিকে অগ্রসর হইল।

খানিকটা শ্বেত ধূম উত্থিত হইল, একটা শব্দ উত্থিত হইয়া সমুদ্রতরঙ্গে মিলাইয়া গেল। উন্মত্ত ব্যক্তি সশব্দে ভেলার উপর পড়িয়া গেল।

কাহারও মুখে একটি শব্দ নাই। এমন কি, মাতৃ-অঙ্কে শায়িত ভীত বালকটিও একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করিল না। শুধু নাবিকের সর্দ্দার তাহার দাক্ষিণ হস্তে ধৃত ধূমায়মান পিস্তলটি ত্রিপলে মুছিয়া লইল। তার পর বাম হস্তের তিনটি অঙ্গুলি উত্থিত করিল। সঙ্গী দুইটি তাহার ইঙ্গিত বুঝিল, এবং ধীরে ধীরে হামা দিয়া ভেলার অপর অংশে চলিয়া গেল।

ভেলা ভাসিয়া চলিয়াছে ! বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই—অনির্দ্দিষ্ট রাজ্যে ভাসিয়া চলিয়াছে ! কোথায় তাহার শেষ, কে জানে ! বিশাল সমুদ্রবক্ষে, অনন্ত অপার সলিলরাশির উপর রৌদ্র-তাপদগ্ধ ভেলা দুলিয়া দুলিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে !

ভেলা চলিয়াছে ! ক্রমে ক্রমে রমণীর পার্শ্বস্থিত জলাধারের পানীয়ও হ্রাস পাইয়া আসিতেছে। রমণী এক একবার ভাবিতেছিল, জলাধার শূন্য হইয়া পড়িয়াছে ; ইহা আবিষ্কৃত হইলে কি ঘটিবে ! সর্দ্দার নাবিক বলিয়াছিল, জলে আর তিন দিন চলিবে। কিন্তু তাহার বক্ষোবসনের অন্তরালে লুক্কায়িত জলপাত্রের কথা কি সর্দ্দার নাবিক বিস্মৃত হইয়াছিল ? যদি না ভুলিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে প্রতি রজনীতে সে পাত্রটি গোপনে জলে পরিপূর্ণ করিয়া লইত, তাহা কি সে বুঝিতে পারে নাই ?

সে বেশ বুঝিয়াছিল, তাহার চৌর্য্যবৃত্তির কথা আবিষ্কৃত হইলে কি ঘটিবে। তখন আত্মহত্যার চিন্তা তাহার মনে সমুদিত হইল। সে ধীরে ধীরে ভেলার পার্শ্বে বসিয়া নীল সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিল।

সে এইভাবে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় রহিয়াছে, এমন সময় ভেলা কোন একটা পদার্থে যেন আহত হইল। সমস্ত ভেলাটি সে আঘাতে যেন কাঁপিয়া উঠিল। সূর্য্যালোকে সে একটা হাঙ্গরের পুচ্ছদেশ দেখিতে পাইল। জলরাক্ষস মুহূর্ত্তমধ্যে অতল সমুদ্রগর্ভে অন্তর্হিত হইয়া গেল। রমণী

নিদ্রিত পুত্রের পার্শ্বে সরিয়া বসিল। তাহার হৃদয়ে গাঢ় নীরবতা, বক্ষঃস্পন্দন পর্য্যন্ত যেন থামিয়া গিয়াছে।

পর দিনের রাত্রি ঘন তমসাচ্ছন্ন। এত গাঢ় অন্ধকার যে, দুই হস্ত দূরের পদার্থ পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। সমুদ্রবক্ষে এক বিচিত্র নীরবতা বিরাজিত। ভেলার পার্শ্বস্থ শিথিল কাষ্ঠখণ্ডগুলি পর্য্যন্ত স্থির হইয়া ছিল। সমুদ্রবক্ষে হিল্লোল পর্য্যন্ত ছিল না।

সারাদিন ধরিয়া ডেভিড্ তাহার পিতার জন্য কাঁদিয়াছিল। সমস্ত দিন রমণী ভগবানের কাছে সাহায্য ও মুক্তি প্রার্থনা করিয়াছিল।

অকস্মাৎ উন্মত্তের বিকট চীৎকারধ্বনি সমুদ্রবক্ষ আলোড়িত করিয়া শূন্যে উত্থিত হইল। পর মুহূর্ত্তে নগ্ন পদের তাড়নার শব্দ শ্রুত হইল।

"ওঃ! ওঃ!"

তার পরে জলে ঝম্প-প্রদানের শব্দ হইল!

এক ঘণ্টা চলিয়া গেল। আবার সেই প্রগাঢ় নীরবতা। নিদ্রিত বালক মাতার বক্ষে মাথা রাখিল। তাহার কাতর কণ্ঠস্বরে রমণী বুঝিল, বক্ষঃস্থলস্থিত জলাধার আবার শূন্য হইয়াছে।

বালককে সতর্ক করিয়া সে বলিল, "ডেভিড্, চুপ্ কর্!"

অন্ধকারে হাত বাড়াইয়া সে জলের জালা খুঁজিতে লাগিল।

শিহরিয়া উঠিয়া সে হাত সরাইয়া লইল। তাহার স্ফীত শুষ্ক জিহ্বা শব্দ উচ্চারণে প্রায় অসমর্থ হইলেও, সে প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিল। অন্ধকারে আর একখানি হস্ত জলপাত্রের দিকে প্রসৃত হইয়াছিল। সেই হস্ত সে স্পর্শ করিয়াছিল।

অতিকষ্টে সে বলিল, "ডেভিড্, চীৎকার কর!" ভীত বালক "বাবা! বাবা!" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

উত্তরে রমণী শুনিতে পাইল, এক ব্যক্তি অতিকষ্টে সেই দিকে আসিতেছে। তাহার ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শোনা যাইতেছিল। বাদানুবাদ হইল না। শুধু পিস্তলের শব্দ—সঙ্গে সঙ্গে গুরুভার দ্রব্য জলে পড়িয়া গেল।

প্রভাত হইল। সুদূর পূর্ব্বদিক্‌চক্রবাল—গগনপ্রান্ত সোণালী বর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল। নবোদিত তরুণ তপনের হিরণ্ময় রশ্মিচ্ছটা হীরকচূর্ণের ন্যায় সমুদ্রগর্ভ হইতে যেন ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল। সমুদ্রতরঙ্গের ঘন কুজ্ঝটিকাজাল তখনও সম্পূর্ণ অপসৃত হয় নাই। তরঙ্গের উপর কোন কোন স্থলে ধূম্রজাল যেন জমাট বাঁধিয়া দুলিয়া উঠিতেছিল। আবার তৃষ্ণার অগ্রদূত পৃথিবীতে দেখা দিল। আবার মরণাধিক যন্ত্রণার সময় আসিতেছে।

দূরে—বহুদূরে—যতদূর দৃষ্টি চলে, প্রভাত-সূর্য্যালোকে সমুদ্র-সলিল শিহরিয়া উঠিতেছিল।

রমণী ত্রিপলের আবরণ সরাইয়া ভেলার অপর অংশে দৃষ্টিপাত করিল। সে দেখিল, নাবিকের সর্দ্দার লম্বমানভাবে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। তাহার অর্দ্ধাঙ্গ আবরণের নিম্নে, অপরার্দ্ধ বাহিরে। সে উপুড় হইয়া শুইয়া ছিল। সে এমন নিশ্চলভাবে পড়িয়া ছিল যে, রমণীর আশঙ্কা হইল, এই ভেলায় সে ও তাহার পুত্র ব্যতীত তৃতীয় কেহ জীবিত নাই। কিন্তু সে যখন

একদৃষ্টে এই নিশ্চল মূর্ত্তির দিকে চাহিয়াছিল, তখন সহসা তাহার বোধ হইল, লোকটির দক্ষিণ হস্ত যেন একবার নড়িয়া উঠিল। অমনই তাহার করধৃত পিস্তলটি ভেলার একপার্শ্বে গড়াইয়া গেল।

"ডেভি, বাবা আমার, একটু চুপ্ করিয়া শুইয়া থাক। আমি আসিতেছি।"

পুত্রের কানে কানে এই কথা বলিয়া রমণী নিঃশব্দে হামা দিয়া অর্দ্ধসংজ্ঞাশূন্য সর্দ্দারের দিকে অগ্রসর হইল।

যুবকের মাথা ঘুরাইয়া ধরিয়া রমণী তাহার শুষ্ক মুখে জলপাত্রটির নল লাগাইয়া দিল।

ক্ষীণস্বরে নাবিক বলিল, "আঃ! ভগবান্! আরও একটু দাও!"

যতক্ষণ না যুবক উঠিয়া বসিল, সে সেইখানে অপেক্ষা করিল। জলপানে শীঘ্রই সে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল এবং চারিদিকে চাহিয়া দেখিল।

কাতরস্বরে সে বলিল, "সব গেছে! কেউ নেই! তোমার ছেলে কেমন আছে?"

তখনও রমণী যুবকের হস্ত ত্যাগ করে নাই। তাহার নয়নে তখন এক বিচিত্র আলোক জ্বলিতেছিল। সর্দ্দার নাবিকের আশাশূন্য মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া রমণীর দেহে যেন শক্তি সঞ্চারিত হইল। হয় সে মরিবে, নয়ত শেষ পর্য্যন্ত জীবন রক্ষা করিবে, এইরূপ একটা দৃঢ়তা যেন তাহার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইল।

"আমাদের বাঁচিবার কোন আশা আছে?"

ক্লান্তভাবে শিরঃসঞ্চালন করিয়া যুবক বলিল, "আশা খুবই কম। তবে—স্রোতের বেগ প্রবল—বিশেষ প্রবল; শীঘ্রই কোন না কোন স্থানে আমরা পঁহুছিতে পারি!"

করুণস্বরে রমণী বলিল, "ভগবান্, আমাদিগকে রক্ষা কর! আমার পুত্র ডেভিড্‌কে বাঁচাও!"

সে নিজের স্থানে ফিরিয়া গেল। গমনকালে পিস্তলটি অলক্ষ্যে তুলিয়া লইয়া সে বসনাভ্যন্তরালে লুকাইয়া রাখিল। মধ্যাহ্নকালে নাবিকসর্দ্দার জলপান করিবার জন্য রমণীর কাছে আসিল। তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ। রমণী তাহার পুত্রের জন্য জল চাহিল।

ফিরিয়া যাইবার সময় যুবক বলিল, "স্রোত ক্রমশই প্রবলতর হইতেছে। যদি আর দুই দিন জল থাকে, হয়ত আমরা রক্ষা পাইতে পারি।"

"যদি জল থাকে!" তাহার দৃষ্টি ও কথার কোন গূঢ় অর্থ আছে। রমণী অমনই লুক্কায়িত পিস্তলটি একবার স্পর্শ করিল।

আবার যুবক যখন আসিল, তখন তাহার কণ্ঠস্বর রুক্ষ, মূর্ত্তি ভীষণ।

"খুব দ্রুতবেগে ভেলা চলিয়াছে! শুধু এখন কিছুকাল বাঁচিতে পারিলে হয়!"

রমণী বলিল, "মাত্র এক বোতল জল আছে। আর বেশী জল নাই।"

সে মাথা নাড়িল। পূর্ব্বে সে তাহা অনুমান করিয়াছিল।

"তিন জন ঐ জলে দুই দিন মাত্র বাঁচিতে পারে। দুই জন হইলে আরও বেশী সময় বাঁচিতে পারে।

যুবক নিদ্রিত বালকের দিকে চাহিল।

রমণীর নিকট হইতে সরিয়া গিয়া সে ভেলার মধ্যস্থলে বসিল। রমণী বুঝিল, যুবকের

হৃদয়ে ঝড় উঠিয়াছে। প্রলোভনের সহিত তাহার হৃদয় সংগ্রাম করিতেছে। রমণীর চিত্তে পূর্ব্ব হইতেই যে আশঙ্কা জন্মিয়াছিল, এখন সেই সঙ্কটকাল উপস্থিত।

অপরাহ্ণ ক্রমশঃ সন্ধ্যার ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িল। লোকটি তখনও সেইভাবে বসিয়া আছে।

বহুক্ষণ পরে যুবক আবার রমণীর পার্শ্বে আসিয়া বসিল। সে বুঝিল, এইবার ভীষণ সঙ্কটের মুহূর্ত্ত আসিয়াছে। সর্দ্দার নাবিকের চক্ষুতে ভীষণ দৃষ্টি, তাহার ব্যবহারে তাহার মনের ভাব প্রকট হইল।

"তোমার বেশ সাহস আছে। নয় কি?"

বালকের পার্শ্বে পুরুষটি বসিয়াছিল। রমণীকে লক্ষ্য করিয়া সে কথা বলিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার দৃষ্টি নিদ্রিত বালকের উপর সংস্থাপিত।

"তোমার বেশ সাহস আছে।" তোমার স্বামী তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমারও তাই। আমারও স্ত্রী আছে, ঐরূপ পুত্র আছে।"

সে বালককে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল।

"তার পর?"

সর্দ্দার নাবিক বলিল, "দুই দিনের মাত্র জল আছে। হয়ত কোনও জাহাজের সম্মুখে পড়িতে পারি। বুঝিয়াছ? দুইজন মাত্র বাঁচিতে পারে। তিন জনের মত জল নাই। তোমার স্বামী আছেন—আর আমার স্ত্রী আছে; বুঝিয়াছ?"

রমণীর যতটুকু শক্তি অবশিষ্ট ছিল, এই কথা শুনিয়া তাহাও অন্তর্হিত হইল। সে মুগ্ধ, অভিভূত ও হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিল।

নাবিকসর্দ্দার বালকের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিল।

"আমার সঙ্গে এস।" এই বলিয়া যুবক উঠিয়া দাড়াইল। বালককেও তাহার অনুবর্ত্তী হইতে আদেশ করিল। "নানারকম মাছ দেখ্‌তে পাবি—আয়, আমার সঙ্গে চল্‌।"

তাহারা ভেলার মধ্যস্থলে না পঁহুছিতেই যুবতীর হৃদয়ে শক্তি সঞ্চারিত হইল। এতক্ষণ সে ভগবানের নিকট এই প্রার্থনাই করিতেছিল। তিনি তাহার প্রার্থনায় বোধ হয় কর্ণপাত করিয়াছিলেন।

নাবিকসর্দ্দার বালককে লইয়া ভেলার ধারে জানু পাতিয়া বসিল। বালকের বাম হস্ত সে ধারণ করিয়াছিল। রমণী যে তাহাদের সন্নিহিত হইয়াছে, লোকটা তাহা বুঝিতে পারিল না। নীরবে জননী পুত্রের পশ্চাতে বসিয়া রহিল। তাহার দক্ষিণ হস্ত পরিধেয় বসনের উপর সংস্থাপিত।

"সাহসী বালক, বুঝেছ? আমি যা বলি, তুমি তাই উচ্চারণ করিবে, কেমন? বল, 'ভগবান্‌ ক্ষমা কর।'"

বালক বলিল, "ভগবান্‌ ক্ষমা কর।"

"নাবিককে ক্ষমা কর, সে আমার মাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছে।"

"নাবিককে ক্ষমা কর, সে আমার মাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছে।"

"আমি ছোটছেলে মাত্র, আমার জীবনের মূল্য কি?"

"আমি ছোটছেলে মাত্র, আমার জীবনের মূল্য কি?"

"আমি ভয় পাই নাই, ভগবান্ আমায় সাহায্য কর।"

"আমি ভয় পাই নাই, ভগবান্ আমায় সাহায্য কর।"

"আমি নাবিককে ক্ষমা করিলাম।"

"আমি নাবিককে ক্ষমা করিলাম।"

"তথাস্তু!"

"তথাস্তু!"

যুবক উঠিয়া দাঁড়াইয়া বালকের গলদেশ ধারণ করিল। সেই মুহূর্ত্তে সেই কালান্তক পিস্তলও আর একবার ধূম উদ্গীরণ করিল। বালক সংজ্ঞাশূন্য জননীর বাহুমধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল। নাবিকসর্দ্দার সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছিল। ভেলার পার্শ্বে সে হটিয়া গেল, পর মুহূর্ত্তে সে সমুদ্রগর্ভে পতিত হইল।

কিছুকাল রমণী নিমীলিতনেত্রে পড়িয়া রহিল। বালক মাতাকে আঁকড়িয়া ধরিয়াছিল। অকস্মাৎ তাহার আননে কোন পদার্থ পতিত হইল। সে পদার্থ অত্যন্ত শীতল এবং আর্দ্র। ধীরে ধীরে রমণী নয়ন উন্মীলিত করিয়া আকাশপানে চাহিল।

সূর্য্যদেবকে আবৃত করিয়া একখণ্ড মেঘ সরিয়া যাইতেছিল।

তখন বারিপাত হইতেছিল। *

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

ওঙ্কার-মান্ধাতা।

পথে।

হোল্‌কারের রাজধানী ইন্দোরে আমি ব্যারিষ্টার আর, কে, ব্যানার্জীর অতিথি ছিলাম। ইনি অতিশয় সদাশয় ভদ্রলোক। চালচলন ইহার বিলাতফেরত দিগের ন্যায় নাই; অতি সাদাসিদে বাঙ্গালীর মত থাকেন। আহার ও আচার হিন্দুর মতন; আমিষে তাদৃশ রুচি নাই। আমি প্রায় এক সপ্তাহ ইহার অতিথি ছিলাম। ইহার বাটীতে একটী বালক-ভৃত্য ছিল, তাহার নাম টিপু। তাহার গায়ে কোট, মাথায় কাটা টুপী। রাজকুমার বাবুর পিতা দুর্ভিক্ষের সময় এই অনাথ বালককে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তখন এ নিতান্ত শিশু ছিল। এক্ষণে বয়স প্রায় তেরো। ইহার কথা আমাকে একটু লিখিতে হইতেছে।

বিগত ১৪ই জানুয়ারী (ইং ১৯১৪ খৃঃ) আমি ওঙ্কারনাথ দর্শনের নিমিত্ত

---

* এন্‌ড্রু সাউটার্ নামক কোন প্রসিদ্ধ গল্পলেখকের ইংরাজী গল্প হইতে অনূদিত।

প্রায় তিনটার সময় ইন্দোর হইতে বি, বি, সি, আই, রেলওয়ের মিটার গেজ ট্রেণে যাত্রা করিলাম। টিপু আমাকে ষ্টেশনে রেলগাড়ীতে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিল। আমি ট্রেণে উঠিয়া তাহাকে কিছু বক্‌সিস দিতে গেলাম। কারণ, সে কষ্ট স্বীকার করিয়া আমার সঙ্গে আসিয়াছে ও আমার দ্রব্যাদি গাড়ীতে তুলিয়া দিয়াছে। বক্‌সিস দিতে যাওয়ায় সে বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল, "বাবু, হাম কুলী নেহি হ্যায়। বক্‌সিস কড়ি নেহি লেঙ্গে।" আমি তাহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলাম যে, "টিপু, তুমি কুলী হ'তে যাবে কেন? আমি তোমার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া কিছু পারিতোষিক দিতেছি—ইহা লইতে কিছুমাত্র দোষ নাই, তুমি লও।" সে কিছুতেই গ্রহণ করিবে না, আমি জোর করিয়া তাহাকে লইতে বাধ্য করিলাম। সে অতি অনিচ্ছায় লইল। আমি তাহার এই নির্লোভতায় বিস্মিত হইয়াছিলাম।

বি, বি, সি, আই রেলওয়ের সর্পাকৃতি সুদীর্ঘ ট্রেণ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিল। ট্রেণ যাত্রীতে পূর্ণ। স্বল্প ভাড়ায় আজমীর হইতে বোম্বাই আসিতে হইলে এমন সুবিধাজনক ট্রেণ আর নাই। কাজেই যাত্রীর ভিড় অসম্ভব। ট্রেণ মাউ ষ্টেশনে থামিল। মাউ মধ্যভারতের প্রকাণ্ড ক্যাণ্টনমেণ্ট। ছোট ছোট পাহাড়ের উপর ব্যারাকশ্রেণী শোভা পাইতেছে। পথ ঘাট অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। রাস্তার দুই ধারে শ্রেণীবদ্ধ তরুরাজী।—মাউ সহর দেখিবার যোগ্য।

ক্রমে পাতালপাণি ষ্টেশনে ট্রেণ পঁহুছিল। এই পাতালপাণি হইতে incline আরম্ভ হইয়াছে। এই ষ্টেশন হইতে গভীর অরণ্য ও ঘন পর্ব্বত ভেদ করিয়া রেল চলিতে লাগিল। পথের শোভা কি অপূর্ব্ব—কি চমৎকার! দুইধারে নিবিড়-শ্যামল বৃক্ষরাজি-মণ্ডিত পর্ব্বতশ্রেণী সূর্য্যকিরণ অবরুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।—কোনও কোনও স্থলে হেমন্তের পত্রশূন্য বিচিত্র-দর্শন কাননমালা—কোথাও গগনচুম্বী কৃষ্ণকায় পর্ব্বতশৃঙ্গ!—শৈবালের বিচিত্র মাধুরী—জল-প্রপাতের ও নির্ঝরিণীর রজতধারার ঝর ঝর শব্দে চতুর্দ্দিক্ মুখরিত হইতেছে! সূর্য্যের কনকরশ্মি নিবিড় পত্রপল্লবের স্থানে স্থানে প্রতিফলিত হইতেছে।

দেখিতে দেখিতে দুইটি 'টনেল্' (Tunnel) ও একটি গিরিসেতু (Via-duct) পার হইলাম। পাহাড় কাটিয়া সুদীর্ঘ রেলপথ চলিয়া গিয়াছে—মধ্যে মধ্যে গিরিপ্রাচীর উন্মুক্ত—পথের দক্ষিণপার্শ্বে বহুনিম্নপ্রদেশে দুইটি পর্ব্বতের মধ্যভাগে (Gorge) গিরিনদী প্রবাহিত হইতেছে। ট্রেণ হইতে

এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইলাম। কত উচ্চে ট্রেণ চলিতেছে—আর তাহার কত শত ফীট নিম্নে দক্ষিণদিকে পর্ব্বততল চুম্বন করিয়া রজত-তরঙ্গময়ী তরঙ্গিণী রজতহিল্লোলে কলধ্বনি করিতে করিতে ছুটিতেছে। ইহার পর আবার একটি টনেল্ ও একটি পুল পার হইয়া একটি গিরিসেতু অতিক্রম করিলাম।

ক্রমে শৈলক্রোড়ে অবস্থিত কানাখণ্ড ষ্টেশনে ট্রেণ পঁহুছিল। এখানে যেন অপরাহ্নে সন্ধ্যার অন্ধকার হইয়াছে!—চতুর্দ্দিকে এমনই পর্ব্বত ও অরণ্য! ট্রেণ পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করিতে করিতে হাঁফাইয়া পড়িয়াছে। এখানে আসিয়া আকণ্ঠ পূরিয়া জলপান করিতে লাগিল। তাহার তৃষ্ণার আর নিবৃত্তি হয় না। অবশেষে নিদারুণ পিপাসা শান্ত করিয়া লৌহ-অশ্ব পুনরায় ছুটিতে লাগিল। পথে তেমনই উপত্যকায় উপলবহুলপথগামিনী স্রোতস্বিনী মৃদুমন্থরে প্রবাহিতা—তেমনই গিরিসেতু—সুদীর্ঘ পর্ব্বতভেদী রেলপথ। নিবিড় বনকান্তার প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া, চোরান নদীর উপরিস্থিত দুইটি সেতু অতিক্রম করিয়া ট্রেণ বাড়োয়াতে উপস্থিত হইল। বাড়োয়াতে কয়েকটি রক্তবর্ণ চিত্রপ্রতিম রাজভবন সুশোভিত। ইন্দোরের রাজা বা উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিবর্গ সময়ে সময়ে ভ্রমণ বা শিকার উপলক্ষে আসিয়া ঐ সকল ভবনে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। বাড়োয়া পরিত্যাগ করিয়া উচ্চাবচ বনভূমি, শালবন, শস্যক্ষেত্র প্রভৃতি দৃষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল। দক্ষিণদিকে সুদূরে নীলাভ সাতপুরা গিরিশ্রেণী। দেখিতে দেখিতে নর্ম্মদা নদীর সুদীর্ঘ সেতু উত্তীর্ণ হইয়া অপরাহ্নে মর্ত্তাকা ষ্টেশনে ট্রেণ পঁহুছিল। ওঙ্কার-যাত্রিগণ এই ষ্টেশনে অবতরণ করে। আমিও গাড়ী হইতে নামিলাম। এ দেশের লোকে মর্ত্তাকাকে খেড়ীঘাট বলিয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইন্দোর হইতে মর্ত্তাকা অবধি অনেক ষ্টেশনে আমি ভারবাহী কুলী দেখি নাই। গৃহস্থযুবতীগণ, এমন কি, বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন বিত্তশালী লোকের পুত্রবধূ, পত্নী ও কন্যা ট্রেণ হইতে নামিয়া বড় বড় মোট, ট্রঙ্ক, বিছানা প্রভৃতি অবলীলাক্রমে মাথায় করিয়া লইয়া যাইতেছে। এদেশের রমণীদের অধিকাংশই সুন্দরী; এমন কি, ইন্দোরে ফেরিওয়ালী, শাকওয়ালী, ঘেসেড়ানী ও সম্মার্জ্জনী হস্তে রথ্যামার্জ্জনকারিণী রমণীদিগের চম্পকনিন্দিত বর্ণ ও গঠনের পারিপাট্যে মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না। ভদ্রকুলাঙ্গনাদিগের সৌন্দর্য্য ত অতুলনীয়। আমি ষ্টেশনে ষ্টেশনে এই সকল সৎকুলোদ্ভবা সুন্দরীদিগের মস্তকে গুরুভার

মোট, সিন্দুক, বাক্স প্রভৃতি দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছিলাম। অথবা 'যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ।'

আমি নিজে মর্ত্তাকা ষ্টেশনে কুলী পাই নাই। আমি বিষম বিপদে পড়িলাম। ব্যস্ত হইয়া ষ্টেশনমাষ্টারকে বলিলে, তিনি একজন চাপরাসীকে আমার দ্রব্যাদি নামাইতে আদেশ করিলেন। ষ্টেশনে একটি বই আর ঘর নাই। আমি ইচ্ছা করিলে সেই গৃহেই থাকিতে পারি, মাষ্টার এরূপ অভিমত জ্ঞাপন করিলেন। আমি ওঙ্কারনাথ যাইব, এ কথাও তাঁহাকে জানাইলাম। মনোহরলাল নামক জনৈক পাণ্ডা দূর হইতে আমাদের কথাবার্ত্তা একাগ্রচিত্তে শুনিতেছিল। সে যেই আমার মুখে 'ওঙ্কার' শব্দ শুনিল, অমনই ঝঙ্কার করিয়া আমার নিকটে উপস্থিত হইল; বলিল, "আপনার কোনও চিন্তা নাই; আমি সব বন্দোবস্ত করিয়া আপনাকে ওঙ্কারে লইয়া যাইব। আপনার কোনও কষ্ট হইবে না।" এই মনোহর আমাকে আগে হিন্দু বলিয়া বুঝিতে পারে নাই, সাহেব ঠাওরাইয়াছিল। এ কথা সে পরে আমাকে বলিয়াছিল।

তখন সূর্য্যদেব পশ্চিমে অস্তগিরিপ্রান্তে ঢলিয়া পড়িতেছেন, দিবসের আলো নিবিয়া আসিতেছে। সন্ধ্যার ছায়াও অন্ধকারে ঘনাইয়া নিবিড় হইতেছে; শীতের বাতাস ধীরে ধীরে বহিতেছে—আমি ষ্টেশনের বারান্দায় একখানি কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট হইয়া বিশ্রামসুখ উপভোগ করিলাম।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। মর্ত্তাকা বা খেড়ীঘাট হইতে ওঙ্কার-মান্ধাতা সাড়ে তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত। পথ নিরাপদ নহে, সুতরাং রাত্রিতে যাওয়া সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। মর্ত্তাকাতেই রাত্রিযাপন করিলাম। ষ্টেশনের পশ্চাতে পথিপার্শ্বে সুন্দর সুন্দর দ্বিতল চটী অবস্থিত। তীর্থযাত্রী ও পথিকেরা এই সকল চটীতেই রাত্রিযাপন করিয়া থাকেন। এস্থানে কয়েকটি হালুইকারের দোকানও আছে। তাহারা কয়েক প্রকার মিষ্টান্ন, পুরী ও ভাজী প্রস্তুত করে। কাজেই পথিকগণকেও মর্ত্তাকায় রাত্রিযাপনের কোন ক্লেশ অনুভব করিতে হয় না।

পাণ্ডা মনোহরলাল একটি দ্বিতল চটীর নিম্নতলে আমার রাত্রিযাপনের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিল। বলিল, "আপনি যদি ইচ্ছা করেন, উপরিতলে থাকিতে পারেন।" আমি কিন্তু তাহার বিশেষ প্রয়োজন বোধ করিলাম না। একটি প্রকোষ্ঠে চারপাই আনিয়া আমার শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিয়া একটি 'হরিকেন ল্যাম্প' জ্বালিয়া দিয়া সে চলিয়া গেল। পরে হালুইকারের দোকান হইতে পুরী,

ভাজী ও কিছু মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া আনিয়া আমার আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিল। আমি আহারান্তে সেই চটীতেই নিদ্রিত হইলাম।

"জয় ওঙ্কারনাথকী জয়!" শব্দে প্রভাতে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। লিখিতে ভুলিয়াছি যে, আমি ইন্দোর হইতে শত শত কণ্ঠে ক্রমাগত "জয় ওঙ্কারনাথকী জয়" শুনিয়া আসিতেছি। প্রত্যেক ষ্টেশন হইতে যখনই ট্রেণ ছাড়ে, তখনই যাত্রিবর্গ 'ওঙ্কার' স্মরণ করিয়া জয়ধ্বনি করে। এমন কি, আমি যখন ভূপাল হইতে উজ্জয়িনী, এবং উজ্জয়িনী হইতে ইন্দোরে আসি, তখনও পথে ওঙ্কারধ্বনি শুনিতে শুনিতে আসিয়াছি। উজ্জয়িনীতে মহাকাল বিরাজ করিতেছেন; কিন্তু ওঙ্কারই এ অঞ্চলে সর্ব্বত্র সমাদৃত ও পূজিত হইতেছেন।

পায়দল-যাত্রীর দল অতি প্রত্যূষেই ওঙ্কার-মান্ধাতার অভিমুখে রওনা হইয়া গেল। আমি প্রাতঃকৃত্য সমাধান করিয়া যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলাম। এই সাড়ে তিন ক্রোশ পথ পদব্রজে, ডুলীতে, পাল্কীতে, অশ্বে অথবা গোযানে যাইতে হয়। হাতী, ঘোড়া, পাল্কীর বন্দোবস্ত পূর্ব্বাহ্ণে করিতে হয়। গরুর গাড়ীর ভাড়া আট আনা। কিন্তু আমি ব্যস্ততা-প্রযুক্ত বার আনা বলিয়া ফেলিয়াছিলাম; কাজেই আমাকে চারি আনা দণ্ড দিতে হইয়াছিল।

পাণ্ডার সহিত গোযানে তীর্থাভিমুখে যাত্রা করিলাম। এক ক্রোশ পরেই পথের দুইধারে সমান্তরালে তরুশ্রেণী। দেড় ক্রোশের পর হইতেই শাল প্রভৃতি তরুর জঙ্গল আরম্ভ হইল। আড়াই ক্রোশের পর জঙ্গল বিরল হইয়া আসিল। চারিদিকে ছোট ছোট পাহাড়। পথিমধ্যে স্থানে স্থানে ময়ূর বিচরণ করিতেছে; অন্যান্য কয়েক প্রকার পার্ব্বত্য পক্ষী ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইতেছে।

গোযানে প্রায় আড়াই ঘণ্টা অতিবাহিত করিয়া আমরা নর্ম্মদাতীরে উপস্থিত হইলাম। এ কোন্ স্বর্গে আসিলাম! কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য! জীবনে কখনও এমন দৃশ্য দেখি নাই! এ কি মর্ত্ত্যভূমে দেবতাদিগের লীলাস্থল, না সুরাঙ্গনা-দিগের বিহারভূমি! এক দিকে রক্তোজ্জ্বল ঊষার সীমন্তে শুমন্তকের ন্যায় শুকতারা, অপর দিকে চন্দ্রতারকাময়ী শারদীয়া নিশীথিনী! যেন হরি ও হর উভয়ে সম্মিলিত হইয়া শুভ্রনীলদেহে বিরাজমান!

পীত প্রভাতের সূর্য্যকিরণ নীল নর্ম্মদার অঙ্গে তরঙ্গে তরঙ্গে রঙ্গে ভঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—নর্ম্মদার অপর তীরে ওঙ্কার-মান্ধাতা-দ্বীপ। দ্বীপগাত্রে ভগবান্ ওঙ্কারেশ্বরের শ্বেতবর্ণ উত্তুঙ্গ মন্দির যেন গগন স্পর্শ করিতেছে।

মন্দির দেখিয়াই দেবাদিদেবের উদ্দেশে প্রণাম করিলাম। মন্দিরের স্বর্ণ-কলস সূর্য্য-রশ্মি-সম্পাতে ঝক্-ঝক্ করিতেছে। এই মান্ধাতা-দ্বীপ বেষ্টন করিয়া সম্মুখভাগে নর্ম্মদা নদী ও পশ্চাদ্ভাগে কাবেরী নদী বহিতেছে। এই কাবেরী দক্ষিণভারতের প্রসিদ্ধ নদী কাবেরী নয়; ইহা স্বতন্ত্র কাবেরী। কি বিচিত্র শোভা! নীলনর্ম্মদাকাবেরী-পরিবেষ্টিত মান্ধাতা-দ্বীপের উপরে গগনচুম্বী গিরি উত্থিত হইয়াছে—নদীযুগলের এপারে ওপারে কেবলই নীল, পীত, কৃষ্ণ উপলশ্রেণী বিরাট্ গাম্ভীর্য্যে নদীবক্ষ রৌদ্রছায়াময়ী করিয়া রাখিয়াছে। শুধু যে নদীর উভয় তীরেই শৈলমালা শোভিত, তাহা নহে; নদীগর্ভে স্থানে স্থানে গণ্ডশৈল উত্থিত হইয়াছে—তাহার উভয় পার্শ্বে নীলজল-স্রোত বহিতেছে! আলোক ও ছায়ার সংমিশ্রণে গিরিগাত্র, নদীবক্ষ, বন্যরাজি, সৌধমালা, মন্দিরসমূহ—সমস্তই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত। সর্ব্বোপরি পর্ব্বতের ছায়া জলমধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া যে অপূর্ব্ব মাধুর্য্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে, তাহা অনির্ব্বচনীয়। মান্ধাতা-পর্ব্বত দৈর্ঘ্যে অর্দ্ধ ক্রোশের কিঞ্চিৎ অধিক। দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিক্ একেবারে খাড়া হইয়া পাঁচ ছয় শত ফীট ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। নদীর পরপারের পর্ব্বতমালাও উচ্চতায় বড় অল্প নহে। উভয়-পার্শ্বস্থ দুরারোহ অভ্রভেদী গিরির মধ্যভাগে নীলনর্ম্মদা জলবাহু বিস্তার করিয়া, তরঙ্গময়ী বেণী এলাইয়া মন্দ্রমধুর গর্জ্জনে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই গম্ভীর-সুন্দর দৃশ্যে আমি একেবারে আত্মহারা হইলাম।

গোযান হইতে নামিয়া পূর্ব্বোক্ত দৃশ্যাবলী দেখিতে দেখিতে পরপারে যাইবার জন্য দ্রব্যাদি লইয়া নৌকায় উঠিলাম। দুই তিনখানি কাষ্ঠনির্ম্মিত সুদীর্ঘ নৌকা যাত্রীদিগকে লইয়া ক্রমাগত পারাপার করিতেছে। আমি পরপারে উপনীত হইয়া পাণ্ডার সহিত একটি দ্বিতল বাটীর একটি প্রকোষ্ঠ অধিকার করিলাম। যখন বাসায় পঁহুছিলাম, তখন বেলা প্রায় এগারটা। বাড়ীটি নর্ম্মদাতীরে অবস্থিত; ঠিক যেন নর্ম্মদার জলগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে। তীরে এইরূপ অনেক দ্বিতল, ত্রিতল সৌধাবলী আছে।

আমি নর্ম্মদানীরে স্নান করিলাম। অনেকগুলি সুবৃহৎ প্রস্তরনির্ম্মিত ঘাট নদীর শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। অনেক নরনারী বালকবালিকা স্নান করিতেছে। আমি নদীর কন্কনে ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়া বাসায় ফিরিলাম। পাণ্ডা বলিল, "নর্ম্মদাতীরে কতকগুলি ধর্ম্মকার্য্য করিতে হয়। তন্মধ্যে নর্ম্মদায় নারিকেল ভেট, নর্ম্মদাপূজা, শ্রাদ্ধ, তর্পণ প্রভৃতি তীর্থকার্য্যগুলি বিশেষ

প্রয়োজনীয়।" আমি বলিলাম, "আমার এ সকল কার্য্যে আপাততঃ প্রয়োজন নাই, ভগবান্ ওঙ্কারনাথকে দর্শন করিলেই আমার তীর্থদর্শন সফল হইবে। তোমাকে সেজন্ত বিশেষ চিন্তিত হইতে হইবে না। তোমার প্রাপ্য আমি তোমাকে দিয়া যাইব।" আমার ভাবগতিক দেখিয়া পাণ্ডা মহাশয় বিশেষ নিরুৎসাহ হইলেন। অনিচ্ছায় আমার সহিত ওঙ্কারের মন্দির পর্য্যন্ত গেলেন। তাঁহার যাইবার আবশ্যকতা আদৌ ছিল না; তথাপি সঙ্গে চলিলেন।

ওঙ্কারনাথের সুবৃহৎ মন্দির প্রায় সত্তর ফীট উচ্চ। সম্মুখে মনোরম কারুকার্য্য-বিশিষ্ট বহুস্তম্ভ-সমন্বিত নাটমন্দির। মন্দির-সম্মুখস্থ মণ্ডপে শ্বেতপ্রস্তর-রচিত মসৃণ বৃহদাকার বৃষমূর্ত্তি। এমন সুন্দর আভরণ-সমন্বিত বৃষমূর্ত্তি অতি অল্পই দৃষ্ট হয়।

মন্দিরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বাম দিকের একটি প্রকোষ্ঠে মহারাজ মান্ধাতার প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিয়া কিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া প্রণাম করিলাম। মান্ধাতার নাম কে না শুনিয়াছেন? আপনারা প্রাচীন কথাপ্রসঙ্গে যে 'মান্ধাতার আমল' বাক্য ব্যবহার করিয়া থাকেন, এই অতুল শোভাময় নদীবলয় শৈলের উপর সেই মহারাজ মান্ধাতার মহাসমৃদ্ধ রাজধানী ছিল। পরে তাহার বর্ণনা করিব। মান্ধাতার মূর্ত্তি দেখিয়া বাম দিকের প্রকোষ্ঠে ভগবান্ ওঙ্কারনাথকে ভূমিতে ললাটস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলাম। এই শিবলিঙ্গ ভারতবর্ষের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। নর্ম্মদার অপরপারে অমরেশ্বর মহাদেব জ্যোতির্লিঙ্গের পর্য্যায়ে পরিগণিত হইয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, ওঙ্কারই জ্যোতির্লিঙ্গ। এ বিষয়ের মীমাংসা আমার সাধ্যাতীত। তবে এ অঞ্চলে ওঙ্কারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিবলিঙ্গরূপে বিরাজিত। অবিরাম আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে ওঙ্কারধ্বনি শুনিতে শুনিতে রোমাঞ্চ হইতেছে। আমিও 'জয় ওঙ্কারনাথ!' বলিয়া কিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া মন্দিরাভ্যন্তর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

বাহিরে আসিয়া দেখি, নাটমন্দিরের এক পার্শ্বে পাণ্ডা মনোহর ম্রিয়মাণ হইয়া বসিয়া আছেন। মুখে কথাটি নাই, নীরবে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাসায় প্রত্যাগত হইলেন।

বাসায় আসিয়া দেখি, আমার বাসার সম্মুখস্থ বাটীর দ্বিতলে পাণ্ডা কর্ত্তৃক নিযুক্ত একটি পাচক আমার আহার প্রস্তুত করিয়াছে। এ দেশের লোকে বড় তরকারীপ্রিয় নহে। তরকারীকে তাহারা 'শাক' নামে অভিহিত করে;

কালে তত্রে শাক খায়। নচেৎ দাউল, আচার, চিনি, দুগ্ধ ও রুটিই তাহাদের নিত্য-খাদ্য। পাচক আমার জন্ত অন্ন, দাউল, আলুর তরকারী ও এক প্রকার চাটনী প্রস্তুত করিয়াছিল। আমি তাহাই পরমপরিতোষসহকারে ভোজন করিলাম। পাণ্ডা মহাশয় যাইবার সময় আর একটি অর্দ্ধপ্রবীণ পাণ্ডাকে আনিয়া, আমাকে তাহার জিম্মা করিয়া দিয়া জানাইলেন যে, তিনি খেড়ি-ঘাটে যাত্রী আনিতে যাইতেছেন, আগন্তুক আমাকে দর্শনায় স্থানসমূহ দেখাইবেন। আমি আগন্তুককে বেলা ২॥০ টার সময় আসিতে বলিলাম।

যথাসময়ে অর্দ্ধপ্রবীণ নব পাণ্ডা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, একদিনে সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থান দেখিতে পারা যাইবে ত? সে একটু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, এ কার্য্য (অর্থাৎ একদিনে আমার পক্ষে সমস্ত দর্শনীয় স্থান দেখা) অসম্ভব। আমি তাহাকে 'আচ্ছা দেখা যাউক' বলিয়া তাহার সহিত বাহির হইলাম। সহরের এক প্রান্তে আসিয়া দেখিলাম, পাহাড়ে উঠিবার সোপানাবলী রহিয়াছে—এ স্থান হইতে শৈলশিখরে অধি-রোহণ করিয়া প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষসমূহ দেখিতে হইবে। আমরা সোপানপথে পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিলাম। শীতকাল, তবুও সিঁড়ি ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে গলদঘর্ম্ম হইলাম, হাঁফাইতে লাগিলাম। ধাপগুলি একটু উঁচু উঁচু, এক ফুটের কিছু অধিক। ১৫০শত ধাপ উঠিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে আবার উঠিতে উঠিতে দুই একবার সামান্ত বিশ্রাম করিয়া, সর্ব্বসমেত ৩৮০টি ধাপ অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতে উঠিয়া গৌরী-সোমনাথ মহাদেবের মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। গৌরী-সোমনাথ দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। মসৃণ-কৃষ্ণ-প্রস্তর-নির্ম্মিত এত বড় শিবলিঙ্গ ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই। গৌরী কুলঙ্গীতে বিরাজিতা। এই গৌরী-সোমনাথ মহাদেবের কাহিনী অতি বিচিত্র। শুনিলাম, পূর্ব্বকালে ইহার অঙ্গে দর্পণ প্রতিফলিত হইত। তাহাতে নরনারী তিন জন্মের মূর্ত্তি দর্শন করিত। কোনও বাদশাহ দেবাদিদেবের দেহ-দর্পণে দেখিলেন, তিনি গতজন্মে ফকীর ছিলেন, বর্ত্তমান জন্মে বাদশাহ হইয়াছেন, এবং ভবিষ্যৎ জন্মে শূকর-জন্ম লাভ করিবেন। ইহাতে তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া গদাঘাতে মূর্ত্তি অপবিত্র করেন। মধ্যে মধ্যে সূক্ষ্ম কাটার দাগ পরিলক্ষিত হয়। তাহার পরেও জনৈক রাখাল দর্পণে দেখিয়াছিল যে, গত জন্মে সে গর্দ্দভ ছিল, বর্ত্তমান জন্মে রাখাল, আগামী জন্মে পক্ষী। এই প্রকার অলৌকিক কিংবদন্তী শুনিয়া আমি সোপানপথে মন্দিরচূড়ে আরোহণ করিয়া

চতুর্দ্দিকে প্রকৃতির শোভা ও কালের বিচিত্র লীলা দর্শন করিলাম। দেখিলাম, এই অনিন্দ্যসুন্দর শৈলদ্বীপকে নর্ম্মদা ও কাবেরী বেষ্টন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে; তাহার চতুর্দ্দিকে শৈলমালা—পাহাড়ের উপর মান্ধাতার কোন্ সুদূর অতীত যুগের বিধ্বস্ত রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ পর্ব্বত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। কেবলই প্রস্তর-রচিত প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ, মন্দির, প্রাচীর, তোরণ, সৌধ, দেবমূর্ত্তি, প্রাণিমূর্ত্তি, স্তম্ভ, সিংহদ্বার প্রভৃতি চূর্ণিত, খণ্ডিত ও দলিত অবস্থায় ধূলায় অবলুণ্ঠিত হইতেছে। পাহাড়ের সর্ব্বত্র কোন না কোন কীর্ত্তির ভগ্নাংশ পড়িয়া আছে। আমি স্তব্ধচিত্তে কিয়ৎকাল মন্দিরচূড়ে উপবেশন করিয়া নামিয়া আসিলাম। মন্দিরের সম্মুখেই একটি সুবৃহৎ বৃষমূর্ত্তি; মস্তকের কতকাংশ কর্ত্তিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন প্রস্তর-রচিত গণেশ ও অন্যান্য দেবতা ও দানবের মূর্ত্তি খণ্ডিত অবস্থায় ভূতলে পড়িয়া আছে।

গৌরী-সোমনাথের মন্দির হইতে যতই পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, স্থানে স্থানে সিন্দূরলিপ্ত নানাবিধ প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিলাম। ক্রমে সীতাদেবীর মূর্ত্তির নিকটে উপনীত হইয়া তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিলাম। পরে একে একে দুইটি প্রস্তরনির্ম্মিত সমুচ্চ তোরণ অতিক্রম করিলাম। প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতীয়টির শিল্পসৌন্দর্য্য অধিক মনোহর। গভর্মেণ্টের আদেশে এই অতুলনীয় তোরণের সংস্কার হইতেছে। ইহার আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটি জীর্ণ তোরণদ্বারের নিকট উপনীত হইয়া দেখিলাম, বৃহৎ দানেশ্বর মূর্ত্তি ভগ্নাবস্থায় তোরণের দক্ষিণ পার্শ্বে পতিত রহিয়াছে। এই মূর্ত্তির নাম কেরোপালু।

উপরোক্ত তোরণদ্বার হইতে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে সিদ্ধনাথ মহাদেবের ভগ্ন মন্দির। এমন শিল্পসৌন্দর্য্যমণ্ডিত অপূর্ব্ব মন্দির এই শৈলচূড়ে আর নাই। এরূপ মন্দির আমি কখনও দেখি নাই। হায়, অতীত যুগে ইহার কি সৌন্দর্য্য ও শোভাই ছিল! এখনও এই ভগ্ন মন্দির দেখিয়া ইহার শিল্পচাতুর্য্যে বিস্মিত ও মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না। ইহার অতীত গৌরব ও শিল্পবৈভব চিন্তা করিতে করিতে আমার নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়াছিল।

বিংশতি ভুজবিশিষ্ট সমুচ্চ প্রস্তরনির্ম্মিত বেদিকার (Platform) উপর এই অপূর্ব্ব মন্দির নির্ম্মিত। মধ্যবেদীর চারি দিকে সংলগ্ন প্রত্যেক বেদিকায় ষোল ষোল করিয়া সর্ব্বসমেত চৌষট্টিটি অপূর্ব্ব কারুকার্য্য-খোদিত স্তম্ভশ্রেণী-শোভিত অলিন্দ। দুঃখের বিষয়, এই স্বর্গীয় মন্দিরের ছাদ অদৃশ্য

হইয়াছে। ইহার উন্নত বেদিকার বিংশতি দিকে উৎকীর্ণ যুদ্ধ যুদ্ধ হস্তিযূথের মূর্ত্তিগুলি দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। প্রত্যেক হস্তিযুগল শুণ্ডে শুণ্ডে জড়াইয়া ক্রীড়া করিতেছে; কোনও হস্তী পদতলে রাক্ষসের দেহ নিষ্পিষ্ট করিতেছে। কেহ কোনও রাক্ষসকে শুণ্ডে ঝুলাইয়া উর্দ্ধে তুলিতেছে। এতদ্ভিন্ন আরও নানা শিল্প-সুষমায় মন্দির পরিপূর্ণ। সিদ্ধনাথ নির্জ্জনে অবস্থান করিতেছেন। আকাশ তাঁহার মন্দিরের চন্দ্রাতপ। গভর্মেণ্ট, মন্দিরের যাহা বর্ত্তমান আছে, তাহারই সংস্কারকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। যাহা আছে, তাহাই অতুলনীয়। যাহা আছে, তাহাই রক্ষিত হউক। নর্ম্মদার উপকূলে শৈলশৃঙ্গে কি অপূর্ব্ব দেবকীর্ত্তিই মহাকাল ধ্বংস করিয়াছেন!

সিদ্ধনাথের মন্দিরের নিকটেই পূর্ব্ব দিকে একটি সমুচ্চ তোরণ অবস্থিত। বাহির হইতে প্রবেশপথের উভয় পার্শ্বে দুইটি ভীম মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। বাম দিকের মূর্ত্তিটির দশ হস্তে নানা প্রহরণ ও নর-রাক্ষসের ছিন্নমুণ্ড। দক্ষিণ দিকের মূর্ত্তি অষ্টভুজ, বিবিধ অস্ত্রধারী, চারি হস্ত ভগ্ন। এখানকার লোকে মূর্ত্তিদ্বয়কে অর্জ্জুন-ভীম বলে। আমার কিন্তু মূর্ত্তিদ্বয়কে অর্জ্জুন-ভীমের কোনও লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া বোধ হইল না; রাবণের মূর্ত্তি বলিয়াই অনুমান হয়।

এতদ্ভিন্ন কুন্তীদেবী, পঞ্চপাণ্ডব, কৃষ্ণরাধিকা, গণেশ প্রভৃতি নানা দেব-মূর্ত্তি ও পৌরাণিকী মূর্ত্তি আছে। কাবেরী নদীর পরপারে যুগ-অবতারের মূর্ত্তি আছে। সেগুলি জীর্ণ, ভগ্ন।

পূর্ব্বোক্ত রাবণের মূর্ত্তি হইতে কিঞ্চিৎ অবতরণ করিয়া, ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত ও তৃষিত হইয়া আশ্রমে উপনীত হইলাম। সন্ন্যাসীরা আমার তৃষ্ণা দূর করিলেন। আমি বঙ্গদেশীয় পরিব্রাজক জানিয়া, তাঁহারা আমার সহিত নানা কথা কহিলেন। তাঁহাদের আশ্রমস্থিত রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীকে দর্শন করিয়া, কিছু প্রণামী দিয়া আশ্রম ত্যাগ করিলাম।

এইবার আমরা মান্ধাতাশৈলের পূর্ব্ব প্রান্তে উপনীত হইয়া বীরখানা শৃঙ্গে আরোহণ করিলাম। শৃঙ্গোপরি একটি প্রস্তরমণ্ডপ অবস্থিত। এই স্থানকে ভৈরবঝম্প বলে। নিম্নে নর্ম্মদা-কাবেরী-সঙ্গম। গঙ্গাযমুনার ন্যায় উভয় নদীর জলের বর্ণের পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইল। নর্ম্মদা-নীর নীল, কাবেরী-বারি-গৌরি। প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে শিবভক্ত সন্ন্যাসীরা ভৈরবঝম্প হইতে ঝম্প প্রদান করিয়া বহুনিম্নে নদীবক্ষে পাষাণোপরি পতিত হইয়া চূর্ণদেহে ভবলীলা সাঙ্গ করিতেন। সেদিন আর নাই। তাঁহাদের

বিশ্বাস ছিল, কঠোর কষ্টে তনুত্যাগ করিতে পারিলে পাপমুক্ত হইয়া জীবন্মুক্ত হইতে পারা যায়। মহাদুঃখে মহাসাধনা না করিতে পারিলে, মহাদেব প্রসন্ন হন না। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ঝম্পপ্রদান-প্রথা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

ভৈরবঝম্প হইতে আর একবার নয়ন ভরিয়া স্বভাবের শোভা দেখিলাম। এইবার আমার শিখরভ্রমণ শেষ হইল। আর কি জীবনে এখানে আসিব? দেখিলাম, নিম্নে—বহুনিম্নে মৃদুলহিল্লোলবাহিনী স্রোতস্বিনী পাষাণে প্রহতা হইয়া আবর্ত্তে ঘুরিতেছে। নদীতীর হইতে পর্ব্বত এই ভাগে বরাবর সোজা চারি পাঁচ শত ফীট উচ্চে উঠিয়াছে—দেখিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। পূর্ব্বে লোকে ইহাকে বৈদূর্য্যমণি পর্ব্বত বলিত। সূর্য্যবংশোদ্ভব নৃপতি মান্ধাতা শিবযজ্ঞে শিবকে প্রসন্ন করিয়া বরলাভ করেন। তদবধি এই পর্ব্বতের নাম মান্ধাতা হইয়াছে। তিনি পর্ব্বতের চারি দিকে গড়বন্দী প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া অতুলসৌন্দর্য্যশালিনী নগরীর প্রতিষ্ঠা করিয়া অসংখ্য দেবমন্দির ও তোরণ নির্ম্মাণ করেন। সেই মহানগরী কালের প্রভাবে ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে—কিন্তু মান্ধাতার অবিনশ্বর কীর্ত্তি ও স্মৃতি এখনও দেদীপ্যমান।

পর্ব্বত হইতে অবতরণ-কালে আমি পাণ্ডাকে কহিলাম যে, 'পাণ্ডাজী! আপ্ কয়্‌তেথে, হাম্ এক্ রোজমে সব্ ঘুম্‌নে নেহি সেকেঙ্গে?' পাণ্ডা উত্তর করিল, 'বাবুজী! আপ্‌কো ভিতর ওঙ্কারজীকো প্রভাব হ্যায়!' আমি মনে মনে ভাবিলাম, 'যদি আমার মধ্যে ওঙ্কারনাথের কণামাত্রও প্রভাব থাকিত, তা হ'লে কি আমার এমন অধোগতি হইত?'

রাত্রে এই পাণ্ডাপ্রবর আমার আহারের জন্য কয়েকখানি রুটি, ভাজী, শাক, তরকারী ও কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন আনিলেন। পূর্ব্বতন পাণ্ডা মনোহরের দেখা নাই—তিনি অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। আমাকে আহার করাইয়া পাণ্ডা চলিয়া গেল। আমি সেই বাড়ীতে একাকী একটি কক্ষের অর্গল বন্ধ করিয়া শয়ন করিলাম। ১৬ই জানুয়ারী, ১৯১৪।

অতি সুন্দর মধুর প্রভাত! নর্ম্মদার নীল বক্ষ সূর্য্যকিরণসম্পাতে জল্ জল্ করিতেছে! মনে হইতেছে, যেন দীপ্ত তারকাসমূহ গগনবিচ্যুত হইয়া নদীর বুকে খসিয়া পড়িয়া, মাধবের উরসে কৌস্তভমণির মত জ্বলিতেছে। সির্ সির্ করিয়া শীতল সমীরণ বহিতেছে। আমি নদীতীরে আসিয়া একখানি নৌকা ভাড়া করিলাম। মান্ধাতা-দ্বীপের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নৌ-ভ্রমণের ভাড়া একটাকা ধার্য্য হইল।

নৌকারোহণে প্রথমে পূর্ব্বাভিমুখে চলিলাম। জব্বলপুরে একদিন দ্বিপ্রহরে এই মর্ম্মরশৈল-বিহারিণী নর্ম্মদাতেই জলভ্রমণে স্বর্গসুখ উপভোগ করিয়াছি—আর এই মান্ধাতার আজ আবার অপূর্ব্ব দৃশ্যাবলী দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। জব্বলপুর অপেক্ষা এ দৃশ্য আরও মহান্ বলিয়া বোধ হইল। এ যেন "শোভার উপরে শোভা গগনে ভূতলে!" নৌকা যতই চলিতে লাগিল, ততই প্রকৃতি সুন্দরী হইতে 'সুন্দরীতরা' হইতে লাগিলেন! নদীর উভয় কূলে প্রস্তর-রচিত ঘাট, শুভ্র সৌধাবলী, প্রমোদভবন প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া দুই দিকে পার্ব্বত্য সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইলাম। যতই দেখি, সৌন্দর্য্য আর ফুরায় না—নয়ন যেন কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইতে চায় না। মধ্যে মধ্যে নদী-গর্ভের পাষাণপুঞ্জ নৌকার গতি রুদ্ধ করিতে লাগিল। যে যে স্থানে নৌগতি স্থগিত হয়, সেই সেই স্থানেই স্বচ্ছ নীল বারিরাশি পাষাণস্তূপে প্রহত হইয়া, শুভ্র ফেনোচ্ছ্বাসে স্ফীত হইয়া, গম্ভীর কলরোলে গর্জ্জন করিতেছে! অমনই নাবিকেরা নৌকা হইতে নামিয়া, ধরাধরি ঠেলাঠেলি করিয়া পাষাণের উপর দিয়া নৌকার অগ্রভাগে রজ্জু বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া পার করিয়া দিতেছে। স্নিগ্ধ প্রভাত-সমীর-হিল্লোলে নৌকা আবার মৃদুমন্দ গতিতে চলিতে লাগিল। চারি দিকে পাহাড় ঘিরিয়া আসিতেছে। ভাবিলাম, বুঝি নৌকার গতি রুদ্ধ হইল; আর বুঝি অগ্রসর হইবার পথ নাই; এইবার বুঝি ফিরিতে হইল!. অমনই আবার দেখি, ধীরে ধীরে পাহাড় সরিয়া যাইতেছে; সঙ্গে সঙ্গে নৌকা-গমনের নিমিত্ত নীল তরঙ্গায়িত পথ উন্মুক্ত করিতেছে। এইরূপে স্বর্গদৃশ্য দেখিতে দেখিতে নৌকার গতি ফিরাইয়া উত্তর দিকে নর্ম্মদা-কাবেরী-সঙ্গমে আসিলাম। এখান হইতে নর্ম্মদা মর্ত্তাকার দিকে গিয়াছে—নৌকাযোগে মর্ত্তাকায় যাওয়া যায়। এই সঙ্গমের মুখে রণমুক্তেশ্বর মহাদেবের মন্দির। এই দেবায়তনে চতুর্ভুজ কৃষ্ণ ও অন্যান্য দেবতা আছেন। আমি নৌকা হইতে নামিয়া মহাদেবকে দর্শন করিলাম। দর্শনান্তে নৌকাযোগে বাসায় ফিরিলাম। এই নৌ-ভ্রমণের স্মৃতি আমার হৃদয়ে চিরদিন অঙ্কিত থাকিবে।

বাসায় আসিয়া স্নানান্তে দেবাদিদেব ওঙ্কারনাথকে দর্শন করিয়া আমার নূতন পাণ্ডার গৃহে ভোজনার্থ গমন করিলাম। ইহাও একটি পূর্ব্বের ন্যায় দ্বিতল প্রশস্ত বারান্দা; উঠিবার সিঁড়ি বড়ই বিপজ্জনক, বারান্দায় রেলিং নাই। পাণ্ডা ভাত, দাল, তরকারী, রুটী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আমার আহার শেষ হইলে দুইখানি রুটী দুগ্ধ দিয়া খাইতে বলিলেন। আমি

তাঁহার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া রুটী ও দুগ্ধ খাইতে লাগিলে, তিনি পাতে চিনি ঢালিতে লাগিলেন। চিনি ঢালিতে ঢালিতে তিনি আর থামেন না দেখিয়া আমি বলিয়া উঠিলাম, 'বাস্, আউর্ মত্ দেও'; সে বলিল, 'পাও পাও'; আমি যত বুলি 'মত্ দেও মত্ দেও', সে তত বলে 'পাও পাও'; বলে আর ঢালে। বিষম বিপদ্। অর্দ্ধসের চিনি ঢালা দেখিয়া আমি ব্যাঘ্রকম্পনে পাতের উপর উপুড় হইয়া পড়িলে, তবে সে থামে। কি জ্বালা!

ওঙ্কারের অপর পারে অমরেশ্বরের মন্দির। এতদ্ভিন্ন বিষ্ণুপুরী ও ব্রহ্মপুরী নামে দুইটি তীর্থ। কার্ত্তিক মাসে মেলা উপলক্ষে প্রায় কুড়ি হাজার নরনারী ওঙ্কার-অমরেশ্বর দর্শনে সমবেত হয়। আমি যে দিন এই তীর্থ হইতে প্রত্যাগত হই, তৎপূর্ব্বদিবস পৌষসংক্রান্তি উপলক্ষে খুব জনতা হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়, মহারাষ্ট্র, বেনিয়া, ব্রাহ্মণ, গুজরাটী প্রভৃতি নানাশ্রেণীর এতদ্দেশীয় হিন্দুতীর্থযাত্রী ও বহুসম্প্রদায়ভুক্ত সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগমে নর্ম্মদাতীর কোলাহলে মুখরিত হইয়াছিল। ফলপুষ্প-বিক্রয়কারিণী রমণীরা ফুলের ডালা, ফুল, ফুলের মালা ও বিল্বপত্রে সজ্জিত করিয়া ক্রেতাদিগকে আহ্বান করিতেছে —দেবাদিদেবের পূজার অন্যান্য অর্ঘ্য উপহার লইয়া স্নানান্তে নরনারীগণ মন্দিরাভিমুখে চলিয়াছে—কেহ কেহ চলিতে চলিতে গান ধরিয়াছে,—

"শিব ওঙ্কার অবিনাশী,
নর্ম্মদা-তীরকে বাসী!"

এতদ্ব্যতীত সন্ন্যাসীরা শিবস্তোত্রের গম্ভীর তানে আকাশ ধ্বনিত করিতে করিতে চলিয়াছেন। আমিও মন্দিরে গিয়া মহাদেবের মস্তকে বিল্বদল দিয়াছিলাম।

তাহার পরদিন আমি ওঙ্কারনাথ পরিত্যাগ করি।

বিদায়কালে পূর্ব্ব পাণ্ডা আসিয়া উপস্থিত! নূতনটি ত ছিলেনই! আমি তাহাকে প্রথমে দুই টাকা দিলাম; কিন্তু সে ঠিক হইল না বলায়, আরও এক টাকা দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিলাম। নদী পার হইয়া আবার গোযানে মর্ত্তাকার অভিমুখে যাত্রা করিলাম। কি বিভ্রাট্! আবার সেই পূর্ব্ব পাণ্ডা মনোহর গোযানের সম্মুখে বসিয়া মর্ত্তাকায় চলিল; নূতন যাত্রী লইয়া আসিবে।

ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। ষ্টেশনমাষ্টার কথাপ্রসঙ্গে একটু হাসিয়া বলিলেন, "মনোহর বড় আপশোষ করিতেছে; ও বলিতেছে, আপনাকে বিক্রয়

করিয়া ভাল কাজ করে নাই, ঠকিয়া গিয়াছে।" আমি ত শুনিয়াই অবাক্! আমি মাষ্টারকে বলিলাম, "আপনি এ কি বলিতেছেন?—বেচে কে? কেনেই বা কে?" তিনি বলিলেন, "মনোহর পাণ্ডা আপনার সহিত কথা-বার্ত্তায় বুঝিয়াছিল যে, আপনি তীর্থকার্য্য করিতে আসেন নাই, দেশ দেখিতে আসিয়াছেন। এরূপ যজমানের দ্বারা কোনও লাভের সম্ভাবনা নাই ভাবিয়া, সে আপনাকে এক টাকায় আর একজন দরিদ্র পাণ্ডাকে বেচিয়াছিল। যে পাণ্ডা মনোহরকে একটি টাকা দিয়া আপনাকে কিনিয়াছিল, আপনি এক টাকার উপর চারি আনা, আট আনা, যা দেন, তাই তাহারই লাভ। আপনি যে তিন টাকা দিবেন, মনোহর স্বপ্নেও তাহা ভাবে নাই। কাজেই তাহার দু' টাকা লোকসান হইল! বেচারী বিলক্ষণ মর্ম্মাহত হইয়াছে।" ওঃ! এতক্ষণে আমি মনোহরের অন্তর্দ্ধানের কারণ বুঝিতে পারিলাম। এক টাকা মূল্যে একটি শশক বা মেষশিশু পাওয়া যায় না—কিন্তু এই দীর্ঘাকৃতি বাঙ্গালী ভ্রমণকারীর মূল্য কি এক টাকার অধিক নহে? যাহা হউক, মনোহরের অবস্থা ভাবিয়া আমি হাস্য সংবরণ করিতে পারিলাম না। আমি খাণ্ডোয়া হইয়া বুরহানপুরে যাত্রা করিলাম।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

ব্রহ্মভাষায় সংস্কৃত শব্দের কৌতুকাবহ রূপান্তর।

ব্রহ্মভাষার বর্ণমালা সংস্কৃত এবং পালি হইতে গৃহীত হইলেও ঠিক সংস্কৃত বর্ণমালার অনুরূপ নহে। দেশ ও পাত্রভেদে কতকটা পার্থক্য ও বৈচিত্র্য প্রবেশ করিয়াছে। নিম্নে তাহার কতিপয় প্রদর্শিত হইল:—

১। ব্রহ্মভাষায় স্বর অ এবং স্বর আ নাই, তৎপরিবর্ত্তে হ্রস্ব আ, দীর্ঘ আ আছে। সুতরাং অন্য কোন স্বরবর্ণ যুক্ত না থাকিলে, বর্ণসকলকে হ্রস্ব আকারান্ত বলিয়া গণ্য করা হয়। সংস্কৃত বা বাঙ্গালার ন্যায় অকারান্ত নহে।

২। শ, ষ এবং স এই তিনের পরিবর্ত্তে একটী বর্ণ আছে, যাহার উচ্চারণ ত এবং থ এর মধ্যবর্ত্তী। জিহ্বাগ্রভাগ দ্বারা উপরের দন্ত স্পর্শ করিয়া ত উচ্চারণ করিতে যে শব্দ হয়, সেই উচ্চারণ।

৩। য় এবং অন্তঃস্থ ব এর উচ্চারণ যথাক্রমে ইয়া এবং ওয়া।

৪। আরাকান প্রদেশ ব্যতীত ব্রহ্মদেশের সর্ব্বত্র র এর উচ্চারণ ইয়া, অর্থাৎ য এবং র এর উচ্চারণগত প্রভেদ নাই। বানান করিবার সময় য-কে ইয়া-পেলে এবং র-কে ইয়া-গাও, এইরূপে প্রভেদ করা হয়। (আমাদের দেশে কোন কোন অল্পবয়স্ক শিশু ল এবং র-কে অ বা য় উচ্চারণ করে। ব্রহ্মদেশীয়েরা বালকের জাতি, এই জন্যই র এর ইয়া উচ্চারণ করে কি?)

৫। ট, ঠ, ড, ঢ, ণ কেবল পালিমূলক শব্দে ব্যবহৃত হয়।

৬। ত, থ, দ, ধ, ন এর উচ্চারণ ট, ঠ, ড, ঢ, ণ। কাজেই দুই সেট্ ট, ঠ, ড, ঢ, ণ বর্ত্তমান।

৭। শব্দের শেষ হসন্ত বর্ণের প্রায়ই উচ্চারণ হয় না। তৎপরিবর্ত্তে অনুচ্চারিত বর্ণ নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত ব্যঞ্জনস্বরের ব্যবহার হয়। এই ব্যঞ্জনস্বরের অনুরূপ কিছু বাঙ্গালায় বা সংস্কৃতে নাই। ব্যঞ্জনস্বর নির্দ্দেশ করিবার জন্য 'এইরূপ একটী চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

৮। একই বর্ণে একাধিক ফলা ব্যবহৃত হয়।

৯। র-এ হ-ফলা দিলে তাহার শ উচ্চারণ হয়।

১০। স্বরবর্ণ ও অনুনাসিক বর্ণের পরবর্ত্তী বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণের উচ্চারণ প্রায়শঃ তৃতীয় বর্ণের অনুরূপ হয়।

১১। কখন কখন বর্গের তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্ণের উচ্চারণ যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণের অনুরূপ হয়।

১২। ক্য, খ্য, গ্য এর উচ্চারণ যথাক্রমে চ্য, ছ্য, জ্য হয়।

১৩। ভ এর উচ্চারণ পূর্ব্ববঙ্গের "বাগ্যধরী", "বাত"এর মত ব। (লেখকের বাড়ী বাঙ্গালের আদিস্থান ঢাকাজেলায়, কিন্তু সত্য চিরকালই সত্য এবং স্বীকার্য্য।)

১৪। পালির ন্যায় অনেক স্থলে যুক্ত বর্ণের সরল উচ্চারণ হয়।

১৫। যুক্তবর্ণ পরে থাকিলে, কখনও কখনও পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরবর্ণের বৃদ্ধি হয়।

১৬। স্থলবিশেষে উকারান্ত বর্ণ অকারান্ত বর্ণের ন্যায় উচ্চারিত হয়।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে—

রথ—ইয়া-ঠা। (অনেক ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতসন্তান জানেন না যে, যখন গাড়ী ডাকিবার জন্য তাঁহার ব্রহ্মদেশীয় ভৃত্যকে তিনি "ইয়া-ঠা খ" বলেন, তখন তিনি বাস্তবিক বলিতেছেন "রথ কহ (?)")

বীর্য্য=ওয়ী-রিয়া।

শক্র=শক্য=তা-ক্যা=তা-হ্যা=তা-জ্যা।

মেঘ=মেঘ্=মোঘ্=মো।

সিংহ=সিহ=তিহা। (সিংহের আর এক রূপান্তর "ছিন্থে"।)

হংসবতী=হান্ তা ওয়াটী=হান্তা ওয়াডী। (পেগু নগরের প্রাচীন নাম হংসবতী। প্রবাদ এইরূপ, ঐ স্থানে পূর্ব্বে সমুদ্র ছিল এবং তীর-সন্নিহিত ক্ষুদ্র দ্বীপে যুগল হেমহংস উপবেশন করিয়াছিল। বুদ্ধদেব ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, "যে স্থানে হংস উপবেশন করিয়াছে, সেই স্থানে কালে এক মহানগর সংস্থাপিত হইবে।" ব্রহ্মদেশীয়েরা মনে করে, পেগু নগর স্থাপিত হওয়ায় বুদ্ধদেবের দৈববাণী সফল হইয়াছে।)

সারবতী=তা ইয়া ওয়াটী=তা ইয়া ওয়াডী। (ইং Tharrawaddy)

হংসস্থ=হিং তা ঠা। (ইং Henzada, নিম্নব্রহ্মের একটী জেলা।)

ভাষা=বা তা=বাদা।

শব্দ=তড্ডা। (শব্দশাস্ত্র বা ব্যাকরণ।)

শাস্ত্র=শাত=তাটা=তাট্=তা।

পঞ্চদিন=পিয়াক্থ্যা-ডেইন। (পঞ্জিকা।)

কর্ম্ম=কাম্মা=কাম্=কান্।

ধর্ম্ম=ঢাম্মা।

দণ্ড=ডাণ্ডা=ডান্।

কুল=কলা=কালা। (কুল বা জাতিভেদযুক্ত জাতি। পূর্ব্বে ইহা "বিদেশী" অর্থে প্রযুক্ত হইত।)

জ্ঞান=ঞান্=নিয়ান্।

পুণ্য=পা-ণ্যা=পিণিয়া।

সামান্য=তামানিয়া=তামা ঞা।

ভয়=ভে ইয়া=বে ইয়া।

ভূত=ভোট্=ভো=বো।

বল=বোল্=বো। (সেনা বা সেনানায়ক।)

প্রাসাদ=পিয়া তাট্=পিয়াতা।

বুদ্ধ=বুড্ঢা=বৌঢা।

দুঃখ=ডুখ খা=ডোখা।

কার্য্য—কিচ্চা—কেইছা।

বিনামা (?)—বিনা—বনা—ফনা। (পাদুকা।)

এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। এই সকল রূপান্তর দেখিয়া "ছোলাভাজা"র কলিকাতা যাইয়া "চাণাচুর" নাম ধারণের গল্প মনে পড়ে।

উচ্চারণ অপেক্ষা সংস্কৃত শব্দের অর্থের প্রভেদ এবং বৈচিত্র্য আরও কৌতুকজনক এবং স্থানবিশেষে ঐতিহাসিক তত্ত্ব-প্রদর্শক।

বারান্তরে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দাস, বি, এল্।

বেসিন্, ব্রহ্ম।

দিল্লীর কথা।*

দিল্লী অতি প্রাচীন নগরী। সম্প্রতি দিল্লীতে ব্রিটিশ রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে নূতনভাবে তৎপ্রতি লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতে কালচক্রের আবর্ত্তনে দিল্লীর ভাগ্যাকাশে শত শত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পবিত্রসলিলা দৃষদ্বতীর তীরভূমে পৃথ্বীরায়ের পতনের সঙ্গে সঙ্গে দিল্লী হইতে হিন্দুর আধিপত্য বিলুপ্ত হইয়াছে; কেবল একবার বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় ক্ষণকালের জন্য হিমুর (হেমচন্দ্র) বিজয়-বৈজয়ন্তী দিল্লীর দুর্গপ্রাকারে উড্ডীন হইয়াছিল। হিমুর সঙ্কীর্ণ সময় ছাড়িয়া দিলে, বৈচিত্র্যময়ী দিল্লী নগরী ছয়শত বৎসর মোসলমানজাতির লীলাক্ষেত্র ছিল। এই লীলার বিবরণ অত্যন্ত নানা রসে আপ্লুত এবং কৌতুহলোদ্দীপক। আমরা এখানে সে বিবরণ সঙ্কলন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

শাহজাহান পাদশাহের সমসাময়িক ইতিহাস-লেখক শোভন রায় দিল্লীর বর্ণনা উপলক্ষে লিখিয়া গিয়াছেন, "পুরাকালে হস্তিনাপুর হিন্দুস্থানের অধীশ্বরদের রাজধানী ছিল। হস্তিনাপুর গঙ্গানদীর তীরে অবস্থিত ছিল। তৎকালে এই

---

* 1. Elliot's History, Vols. II—VIII, 2. Fall of the Moghul Empire (Keene), 3. The Turks in India (Keene), 4. "Erskine's Babar and Humayun".

নগরীর বিস্তার ও আকার কিরূপ ছিল, তৎসম্বন্ধে গ্রন্থাদিতে অনেক আলোচনা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়েও (শাহজাহানের আমলেও) ইহা সাতিশয় জনাকীর্ণ, কিন্তু পুরাকালের তুলনায় নগণ্য। পাণ্ডব ও কৌরবে বিবাদ উপস্থিত হইলে, পাণ্ডবগণ যমুনার তীরবর্ত্তী ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করেন। তথায় তাঁহাদের রাজধানী স্থাপিত হয়। এই ঘটনার বহুকাল পরে রাজা অনঙ্গ পাল তোমর ইন্দ্রপ্রস্থের নিকটবর্ত্তী স্থানে দিল্লী নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্ত্তী কালে পৃথ্বী রায় একটী দুর্গ এবং নগর নির্ম্মাণ করিয়া, তাহা স্বীয় নামানুসারে অভিহিত করেন।

সুলতান কুতবউদ্দীন আইবক এবং সুলতান আলতমাস পৃথ্বী রায়ের দুর্গে বাস করিতেন। অতঃপর সুলতান গিয়াসউদ্দীন বল্‌বন্‌ সহর জগন নামক আর একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। তদীয় পৌত্র কৈকোবাদ যমুনা নদীর তীরে সৌষ্ঠবশালী প্রাসাদাবলীপূর্ণ কিলুগড়ি নামক একটি নূতন নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্রুতনামা পারসীর কবি আমীর খুসরু এই নগরীর বর্ণনা করিয়া কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। সুলতান জালালউদ্দীন কুস্কলাল নাম্নী নগরী স্থাপন করিয়া তথায় বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। সুলতান আলাউদ্দীনের রাজধানীর নাম ছিল কুস্কসিরি। এই নগরী তাঁহার স্বপ্রতিষ্ঠিত ছিল। সুলতান গিয়াসউদ্দীন তোগলোকের আমলে আর একটি নূতন নগরী স্থাপিত হইয়াছিল। পুত্র মোহাম্মদ জুনা আবার একটি নূতন নগরী স্থাপন করিয়া তথায় সুদৃশ্য সহস্রস্তম্ভ প্রাসাদ এবং রক্তপ্রস্তরগঠিত কতিপয় অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। তদীয় উত্তরাধিকারী ফিরোজশাহ তোগলকের সময়ে ফিরোজাবাদ নামক একটি সুবৃহৎ নগরীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ফিরোজশাহ যমুনা নদী হইতে খালকর্ত্তন করিয়া এই নূতন নগরীতে জল আনয়ন করেন। এই নূতন নগরী হইতে তিন ক্রোশ দূরে তিনি একটি সুদৃশ্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই প্রাসাদের অভ্যন্তরে একটি সুদীর্ঘ স্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল। এই স্তম্ভ অদ্যাপি (শাহজাহানের রাজত্বকাল) একটি ক্ষুদ্র শৈলপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহা সাধারণ্যে ফিরোজশাহের লাট নামে পরিচিত। সুলতান মবারকশাহ আপন নাম অনুসারে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। মোগল অধিপতি হুমায়ুন প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ দুর্গের উদ্ধার এবং জীর্ণসংস্কার সাধন করিয়া তাহার নাম দীনপান্না রাখেন এবং তথায় বাস করিতে প্রবৃত্ত হন। অতঃপর সের আফগানের অভ্যুদয় হয়। তিনি কুস্কসিরি নগরীর ধ্বংস

করিয়া আর একটি নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। পুত্র সেলিমশাহ সেলিমগড় নামে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। এই দুর্গ এখনও (শাহজাহানের রাজত্ব-কাল) শাহজাহানাবাদের অপর তীরে যমুনা নদীর তীরে দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও অনেক অধিপতিই এক একটি নূতন রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা হইলেও হিন্দুস্থানের রাজধানীরূপে দিল্লী নগরীর নামই সর্ব্বত্র খ্যাত রহিয়াছে। শাহজাহান পাদশাহ দিল্লী নগরীর নিকটে শাহজাহানাবাদ নামে একটি নূতন নগরীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই নূতন নগরীর ঔজ্জ্বল্যে পূর্ব্ব-বর্ত্তী সুলতানগণের নির্ম্মিত নগরী সকল হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে এবং তৎ-সমুদয় এক সাধারণ শাহজাহানাবাদ নামে পরিচিত হইয়াছে।"

সুলতান মহম্মদঘোরী দিল্লীতে মোসলমানের অধিকার স্থাপন করেন। কিন্তু তাঁহার বিজয়োদ্যমের অন্যূন দুই শত বৎসর পূর্ব্বে মোসলমানজাতি রত্না-লঙ্কার-ভূষিতা দিল্লীর প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। মোসলেম্ কুল-মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষের কালান্তক যমস্বরূপ সুলতান মাহমুদ গজনীর ভাগিনেয় মসায়ুদ দিল্লী নগরী আক্রমণ করেন। আমরা সে বিবরণ মির-আত-ই-মস্থদি নামক গ্রন্থ অবলম্বনে সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।

রাজকুমার মসায়ুদ বিপুল বাহিনী সহ দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তিনি দিল্লীর সম্মুখবর্ত্তী হইয়াও আক্রমণে বিরত হইলেন এবং শিবির সংস্থাপন করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এইভাবে মাসাধিক কাল অতিবাহিত হইল। তখন মসায়ুদ শঙ্কাকুল হইয়া পরমেশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ইহার পর হঠাৎ কতিপয় মোসলমান সেনাপতি সসৈন্যে আগমন-পূর্ব্বক তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন। দিল্লীর অধিপতি মহীপাল শত্রুর বলাধিক্য দর্শনে ভীত হইয়া কালহরণ করা অসমীচীন বিবেচনা করিয়া শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিলেন। রাজকুমার গোপালের অস্ত্রাঘাতে মসায়ুদের নাসিকা হইতে রক্ত প্রবাহিত হইল, তাঁহার দুইটি দন্ত ভগ্ন হইল। কিন্তু মসায়ুদ তাহাতে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া অমিতপরাক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বহুসংখ্যক মোসলমানসৈন্য হত হইল; অসংখ্য হিন্দুসৈন্য জীবন বিসর্জ্জন করিল। হিন্দুসৈন্যের সংখ্যা ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। অনেকে পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিল। কিন্তু মহীপাল এবং শ্রীপাল কতিপয় সেনানীসহ অবিচলিতভাবে অমিতপরাক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আত্মীয় স্বজন তাঁহাদিগকে যুদ্ধ ক্ষান্ত করিয়া প্রাণ রক্ষা করিতে অনুরোধ

করিলেন। কিন্তু তাঁহারা যুদ্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনাদের নাম কলঙ্কপূর্ণ করিতে অসম্মত হইলেন; তাঁহারা স্বরাজ্যের রক্ষা-কল্পে প্রাণপাত করিলেন। মসায়ুদ জয়লাভ করিলেন, দিল্লীর রাজ্য তাঁহার পদতলে পতিত হইল। কিন্তু তিনি তথায় আধিপত্য-স্থাপন সম্বন্ধে ঔদাসীন্য দেখাইলেন; দিল্লীতে অর্দ্ধবৎসর-কাল অবস্থানপূর্ব্বক উহার রক্ষার নিমিত্ত তিন সহস্র উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী ও সৈন্য রাখিয়া মিরাটের অভিমুখে অভিযান করিলেন। দুই শত বৎসরের মধ্যে দিল্লীতে আর মোসলমানের আক্রমণ হয় নাই। তার পর মোহাম্মদ ঘোরী কর্ত্তৃক দিল্লী নগরী অধিকৃত হইয়াছিল। বিজয়ী বীর হিন্দুর সর্ব্বপ্রধান নগরী দিল্লীর অভি-মুখে অভিযান করিলেন। তিনি দিল্লীর সম্মুখবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন যে, পৃথিবীর সপ্ত ভাগের কোন স্থানেই দিল্লীর ন্যায় সমুচ্চ এবং সদৃশ দুর্গ অথবা তত্তুল্য দ্বিতীয় দুর্গ বর্ত্তমান নাই। সৈন্যগণ দুর্গের চতুষ্পার্শ্বে শিবির সংস্থাপন করিয়া রহিল। যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইল। ইহা প্রতীয়মান হইল যে, পৃথিবীর অধীশ্বরের আক্রমণ হইতে নিরাপদ্ হইবার জন্য ইচ্ছুক না হইলে এবং শয়তানের পরামর্শ গ্রহণ করিলে, দিল্লীর অবস্থা শোচনীয় হইবে। এজন্য রাজদণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভ জন্য সে রাজ্যের রায় এবং মোকদমগণ বশ্যতা অঙ্গীকারপূর্ব্বক মালগুজারী প্রদান এবং অন্যান্য কর্ম্মসাধন সম্বন্ধে সুদৃঢ় সর্ত্ত সকল পালন করিতে সম্মত হইলেন। অতঃপর সুলতান গজনী রাজ্যের রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু রাজসৈন্য দিল্লীর অন্তর্গত ইন্দ্রপ্রস্থ মৌজায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। অতঃপর কুতব-উদ্দীন প্রতিনিধির পদে নিযুক্ত হইয়া সমগ্র পৃথিবীর সম্পদের বেদিস্বরূপ দিল্লী নগরীতে বাস করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া এরূপ নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন যে, তৎকালে ব্যাঘ্র ও মেষ এক জলাশয়ের জলপান করিত এবং যে চোর ও চৌর্য্যের কথা সকলের জিহ্বাগ্রে থাকিত, তাহা ধূলিসাৎ হইয়াছিল। মোসলমান ঐতিহাসিক কুতবের শাসনকার্য্যের এইরূপ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার সময়েও বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়াতে দিল্লীর অধিবাসীরা বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছিল। বিদ্রোহের প্রথম অবস্থায় কুতবউদ্দীন উহার দমন জন্য মনোযোগী হয়েন নাই। পরে তিনি বিদ্রোহীদের মুণ্ডপাত জন্য কতিপয় সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারা বায়ুর ন্যায় গতিতে অগ্নিতুল্য তেজে বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিলেন। অনেকে নিহত হইল, অনেকে সিংহের ভয়ে শৃগালের ন্যায় পলায়ন করিল এবং

কুমীর ও চিতা বাঘের স্থায় জলপথে এবং পার্ব্বত্যপথে ধাবিত হইয়া বনজঙ্গলে কোষস্থিত তরবারি অথবা কাগজপত্রাধারস্থিত কলমের স্থায় লুক্কায়িত হইল। *

সুলতান মোহাম্মদ ঘোরী পরলোকগত হইলে, কুতব উদ্দীন আইবক স্বাধীনভাবে হিন্দুস্থানের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদ্বংশীয়গণ অষ্টম পুরুষ পর্য্যন্ত দিল্লীতে আধিপত্য করেন। কুতব উদ্দীন এবং তাঁহার পরবর্ত্তী ছয় জন সুলতান পৃথ্বী রায়ের দুর্গে অবস্থিতি করিতেন। সুলতান গিয়াস উদ্দীন বল্বনের রাজত্বকালে নূতন দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। মিওয়াত্তি নামক একদল দুর্ব্বৃত্ত দিল্লীর উপকণ্ঠে বাস করিত। তাহাদের উপদ্রবে দিল্লীবাসীর শান্তি অন্তর্হিত হইয়াছিল। তাহারা দিবা দ্বিপ্রহরে প্রকাশ্যভাবে অধিবাসীদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিত। সুলতান বল্বন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তাহাদের বিষদন্ত ভগ্ন করিতে উদ্যোগী হন। সুলতান গোপালগির নামক স্থানে নূতন দুর্গের প্রতিষ্ঠা করেন। শোভন রায় সহর জগন নামে এই দুর্গের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার পার্শ্বে কতিপয় সৈন্যের থানা স্থাপিত হয়। এইরূপ নানা উপায় অবলম্বন করিয়া সুলতান মিওয়াত্তি দুর্ব্বৃত্তদিগের বিনাশ সাধন করেন। তদীয় বিলাসী উত্তরাধিকারী পৌত্র কৈকোবাদ আপন মনোমত এক নূতন নগরীর প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। কৈকোবাদ কালগ্রাসে পতিত হইলে অভিনব রাজবংশের অভ্যুদয় হয়। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম জালাল উদ্দান খিলিজি। সুলতান কুতব উদ্দীন আইবকের সময় হইতে সুলতান কৈকোবাদের রাজত্ব পর্য্যন্ত যে সকল নৃপতি দিল্লীতে আধিপত্য করেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই তুর্কী। জালাল খিলিজিবংশসম্ভূত ছিলেন। দিল্লীর ওমরাহগণ ৮০ বৎসর কাল তুর্কীদিগের অধীন ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা স্বভাবতঃই তুর্কীর আধিপত্যের অনুরাগী ছিলেন। তাঁহারা তুর্কীর আধিপত্য-ধ্বংসকারী জালালের বিদ্বেষী হইলেন। জালাল বিবেচনা করিলেন, দিল্লীতে অবস্থিতি করিয়া শাসনকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহাদের বিদ্বেষ উত্তরোত্তর ঘনীভূত হইবে এবং তাহাতে শাসনযন্ত্র বিশৃঙ্খল ভাব ধারণ করিবে। এই কারণে তিনি দিল্লীতে প্রবেশ না করিয়া কিলুগড়ি নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিলেন। অচিরে কিলুগড়ি বিচিত্র সৌধমালায় ভূষিত হইয়া উঠিল। ব্যবসায়ীরা দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া

* তাজু-ল-মা আসির নামক ইতিহাস হইতে সংক্ষিপ্তভাবে অনূদিত।

তথায় পণ্যশালা স্থাপন করিল। লোকে কিলুগড়িকে নূতন নগরী নামে অভিহিত করিতে লাগিল। *

জালাল উদ্দীনের পরবর্ত্তী সুলতান আলা উদ্দীনের সময় আবার রাজধানীর পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। মোগলেরা ভারতবর্ষের ধনধান্য লুণ্ঠন করিবার উদ্দেশ্যে দিল্লীর দ্বারদেশে উপনীত হয়। এই সময় দিল্লী নগরী অরক্ষিত অবস্থায় ছিল, কেবল দৈবানুগ্রহে রক্ষা প্রাপ্ত হয়। এই কারণ আলা উদ্দীন অভিযান এবং দুর্গ জয়ের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন এবং সিরি নামক স্থানে একটি নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হন। এই দুর্গ নির্ম্মিত হইলে, তিনি তথায় বাস করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে এই স্থান সম্পদশালী হইয়া উঠে। আলা উদ্দীনের আদেশে দিল্লীর পুরাতন দুর্গেরও সংস্কার হইয়াছিল। আলা উদ্দীন পরলোকগত হইলে তদীয় পুত্র কুতব উদ্দীন খিলিজি সাম্রাজ্যাধিকারী হন। তাঁহার অবিমৃষ্যকারিতায় খিলিজিবংশের বিলোপ হয় এবং সুলতান গিয়াস উদ্দীন তোগলক দিল্লীর আধিপত্য লাভ করিয়া একটি নূতন (তোগলক) বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। গিয়াস উদ্দীন নূতন বংশের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নগরীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই নগরীর নাম তোগলকাবাদ।

এইরূপে রাজপরম্পরায় দিল্লীর সৌষ্ঠব ও আয়তন বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সুলতান গিয়াস উদ্দীন তোগলকের পুত্র মোহাম্মদ জুনার রাজত্বকালে এই শোভা ও সম্পদের আধার দিল্লী নগরী জনশূন্য হইয়াছিল। তাঁহার আমলে দুইজন বৈদেশিক পর্য্যটক দিল্লী নগরী পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে দিল্লী নগরী সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। দুইজন পর্য্যটকের একজনের নাম ইবন বতুতা, অপরের নাম সাহবুদ্দীন। সাহবুদ্দীন দিল্লীর যে বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা তাহা এখানে প্রকাশ করিতেছি:—

"দিল্লী কতিপয় নগরীর একত্রীভূত সমষ্টি মাত্র। প্রত্যেক নগরীর স্বতন্ত্র নাম আছে। তন্মধ্যে একটির নাম দিল্লী বলিয়া তাহার পার্শ্ববর্ত্তিনী অন্যান্য নগরীও ঐ নামে পরিচিত। সমগ্র দিল্লী নগরীর পরিধি ২০ ক্রোশ। গৃহ সকল প্রস্তর ও ইষ্টক-নির্ম্মিত, কিন্তু ছাদ কাষ্ঠময়। মর্ম্মরের ন্যায় একপ্রকার শুভ্রবর্ণ

* এই বিবরণ তারিখ-ই ফিরোজশাহী নামক বিখ্যাত ইতিহাস অবলম্বনে সঙ্কলিত হইয়াছে। তারিখ-ই ফিরোজশাহীতে সুলতান জালাল উদ্দীন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত নগরীর নাম কিলুগড়ি লিখিত হইয়াছে। কিন্তু শোভন রায়ের ইতিহাস অনুসারে কৈকোবাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত নগরীর নাম কিলুগড়ি এবং সুলতান জালাল উদ্দীন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত নগরীর নাম কুষ্কলাল ছিল। আমরাও শোভন রায় কর্ত্তৃক লিখিত বিবরণ সঙ্কলন করিবার সময়ে ঐরূপ লিখিয়াছি।

প্রস্তর দ্বারা গৃহচত্বর নির্ম্মিত হয়। দিল্লীতে ত্রিতল গৃহ দেখিতে পাওয়া যায় না; অধিকাংশ গৃহই দ্বিতল, কোন কোন গৃহ একতল মাত্র। সুলতানের প্রাসাদ ব্যতীত আর কোথায়ও গৃহচত্বর মর্ম্মরপ্রস্তরগ্রথিত নহে। কিন্তু অধুনা যে সকল গৃহ প্রস্তুত হইতেছে, তাহার নির্ম্মাণপ্রণালী স্বতন্ত্র। দিল্লী একুশটী বিভিন্ন নগরীর সমষ্টি। ইহার তিন দিক্ উদ্যানে শোভিত, পশ্চিম পার্শ্ব পর্ব্বতসংলগ্ন বলিয়া সে দিকে কোন উদ্যান প্রস্তুত হইতে পারে নাই। দিল্লীতে এক সহস্র পাঠশালা ও সত্তরটি সাধারণ চিকিৎসালয় বিদ্যমান রহিয়াছে। নগরী ও উহার উপকণ্ঠের ধর্ম্মমন্দির ও আশ্রমের সংখ্যা দ্বিসহস্র। সুবৃহৎ মঠ, প্রশস্ত বিচরণভূমি এবং অগণিত স্নানাগার সংস্থাপিত দেখিতে পাওয়া যায়। দিল্লীর অধিবাসীরা অনতিগভীর কূপের জল ব্যবহার করিয়া থাকে। এই সকল কূপ কদাচিৎ সাত হাত অপেক্ষা গভীর। অধিবাসীরা বৃহৎ বৃহৎ চৌবাচ্চায় বৃষ্টির জল সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া পান করে। একটি তীর নিক্ষেপ করিলে যতদূরে পতিত হয়, ততদূর অন্তর অন্তর এই সকল চৌবাচ্চা সংস্থাপিত। দিল্লীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মসজিদ অভ্রভেদী চূড়ার জন্য বিখ্যাত। তাদৃশ সমুচ্চ চূড়া পৃথিবীর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। উহা ছয় শত হস্ত পরিমিত উচ্চ।"

ইবন বতুতা দিল্লীর বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় দিল্লীর তদানীন্তন অবস্থা পরিস্ফুট হইয়াছে। আমরা সেই চিত্র এখানে পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম। "শোভা ও সম্পদের আধার সুপ্রসিদ্ধ বৃহদায়তন দিল্লী নগরীতে উপনীত হইলাম। ইহা চতুর্দ্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত। ঈদৃশ প্রাচীর পৃথিবীর আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। দিল্লী ভারতবর্ষের বৃহত্তম নগরী। কেবল ভারতবর্ষ কেন, ইহা মোসলমানাধীন প্রাচ্যজগতের বৃহত্তম নগরী। দিল্লী সুবিস্তীর্ণ ও জনাকীর্ণ নগরী। বর্ত্তমান সময়ে ইহা পরস্পর সংযুক্ত চারিটী স্বতন্ত্র ভাগে বিভক্ত।

১। প্রকৃত দিল্লী পৌত্তলিক হিন্দু রাজগণ কর্ত্তৃক সংস্থাপিত। ১১৮৪ খৃষ্টাব্দে মোসলমানগণ দিল্লী-জয় সম্পন্ন করিয়াছেন।

২। সিরি অথবা দারুলখিলাফত। খলিফা আব্বা সৈয়দ আল মুস্তান সিরের পৌত্র (grand son) সুলতান গিয়াস উদ্দীনের সহিত সাক্ষাৎ জন্য আগমন করিলে, তিনি তাঁহাকে এই অংশ প্রদান করেন। সুলতান আলা উদ্দীন এবং তদীয় পুত্র কুতব উদ্দীন এখানে বাস করিতেন।

৩। তোগলিকাবাদ। বর্ত্তমান সম্রাটের পিতা সুলতান তোগলক

এই অংশ সংস্থাপন করেন। এই কারণ ইহা তাঁহার নামানুসারে অভিহিত হইয়াছে।

৪। জাহানপান্না (Refuge of the world) বর্ত্তমান সম্রাটের বাসের জন্য বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট। মোহাম্মদ নিজে এই অংশ সংস্থাপন করিয়াছেন। তিনি এই বিভাগ-চতুষ্টয়কে বেষ্টন করিতে ইচ্ছা করিয়া প্রাচীরের কিয়দংশ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কিন্তু এই কার্য্য বহুব্যয়সাধ্য বলিয়া সে সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হইয়াছে। দিল্লীর চতুর্দ্দিক্ প্রাচীর-বেষ্টিত। ঈদৃশ প্রাচীর আর কোথাও দেখা যায় না। ইহার প্রশস্ততার পরিমাণ ১১ হস্ত। প্রাচীরের গাত্রে প্রহরী ও দ্বাররক্ষকদের জন্য বাসগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল গৃহে নানাবিধ যুদ্ধোপকরণ সংরক্ষিত রহিয়াছে। Mangonels (an engine formerly used for throwing stones and battering walls) এবং র আদস (a machine employed in seize) নামক যুদ্ধাস্ত্র রাখিবার জন্য প্রাচীর-গাত্রে গৃহ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এই সকল প্রাচীরসংলগ্ন গৃহে শস্য সঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহাতে শস্যের কোন প্রকার অনিষ্ট অথবা পরিবর্ত্তন হয় নাই। আমি একটি ভাণ্ডার হইতে কতকগুলি চাউল বাহির করিয়া দেখিয়াছি, উহার রং কাল, কিন্তু স্বাদ উত্তম। আমি কতকগুলি ঘাসের দানাও বাহির করিয়া দেখিয়াছি। নব্বই বৎসর পূর্ব্বে সুলতান বল্‌বন এই সকল শস্য সঞ্চিত করিয়াছিলেন। পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য প্রাচীরের অন্তর্ভাগে সহরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অনায়াসে গমনাগমন করিতে পারে। আলোকপ্রবেশ জন্য প্রাচীরের অন্তর্ভাগে নগরমুখে গবাক্ষ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। প্রাচীরের নিম্নভাগ প্রস্তর ও ঊর্দ্ধভাগ ইষ্টকনির্ম্মিত। তদুপরি অসংখ্য বরুজ ঘন ঘন ভাবে সংস্থাপিত। দিল্লী নগরীর আটাইশটী প্রবেশদ্বার। তন্মধ্যে বদায়ুন নামক দ্বারই প্রথম ও প্রধান।" মোহাম্মদ তোগলকের দুর্ব্বুদ্ধি ও হঠকারিতা নিবন্ধন এইরূপ শোভা ও সম্পদের আধার ও বহুজনাকীর্ণ দিল্লী নগরী জনশূন্য ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছিল। ইতিহাসবেত্তৃগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, মোহাম্মদ শাসন-সৌকর্য্যার্থ পাঠানসাম্রাজ্যের মধ্যবিন্দু দেবগিরিতে রাজধানী স্থাপন করিতে সঙ্কল্প করেন। তজ্জন্য রাজাদেশে বালবৃদ্ধনির্ব্বিশেষে দিল্লীর অধিবাসী মাত্রেই দেবগিরিতে (মোহাম্মদ এই স্থানের নাম দৌলতাবাদ রাখেন) গমন করিতে বাধ্য হয়। ইহাতেই দিল্লী জনশূন্য ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু ইবন বতুতা ইহার অন্যবিধ কারণ

নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমরা এখানে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম।—"সুলতানের বিরুদ্ধে একটি গুরুতর অভিযোগ এই যে, তিনি দিল্লীর অধিবাসীদিগকে তাহাদের বাসভবন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। দিল্লীর অধিবাসীরা সুলতানকে কয়েকখানি ভৎর্সনা ও অপমানসূচক পত্র লিখিয়াছিল। এই কারণ তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। তাহারা পত্রগুলি বন্ধ করিয়া রাত্রিযোগে দরবারগৃহে নিক্ষেপ করিয়াছিল। এই সকল পত্রের শিরোভাগে নিম্নোদ্ধৃত বাক্যটী লিখিত ছিল;—'পৃথিবীশ্বরের মাথার দিব্য, তিনি ব্যতীত আর কেহ যেন এই পত্র পাঠ না করেন।' সুলতান খুলিয়া দেখেন যে, পত্রগুলি তাঁহার বিরুদ্ধে ভৎর্সনা ও অপমানসূচক বাক্যে পূর্ণ। তিনি দিল্লী নগরী বিনষ্ট করিতে সঙ্কল্প করিয়া প্রথমতঃ মূল্য দিয়া সমস্ত গৃহ ও সরাই ক্রয় করেন। তার পর সমস্ত অধিবাসীকে দৌলতাবাদ (দেবগিরি) গমন করিতে আদেশ করেন। প্রথমে তাহারা রাজাদেশ প্রতিপালন করিতে অনিচ্ছা করিয়াছিল। কিন্তু রাজপ্রচারকগণ ঘোষণা করে যে, তিন দিন পরে কেহই দিল্লীতে বাস করিতে পারিবে না। অধিকাংশ অধিবাসীই দিল্লী পরিত্যাগ করে; কেহ বা গৃহমধ্যে লুক্কায়িত হইয়াছিল। যাহারা গমন করে নাই, মোহাম্মদ তাহাদিগকে তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিতে আদেশ করেন। তদীয় ক্রীতদাসেরা রাজপথে দুইজন লোক পাইয়াছিল; তাহাদের একজন পঙ্গু, অপরটি অন্ধ। ইহাদিগকে সুলতানের নিকট উপস্থিত করা হয়। তিনি পঙ্গুকে একটি মঞ্জালিক হইতে গুলি করিয়া নিক্ষেপ করিতে এবং অন্ধকে দিল্লী হইতে চল্লিশ দিনের পথ দৌলতাবাদে টানিয়া লইয়া যাইতে আদেশ করেন। ভ্রমণকালে এই নিরুপায় দুর্ভাগার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল, তাহার একখানি পদমাত্র দৌলতাবাদে পৌঁছিয়াছিল। আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেই দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া গমন করে; তাহারা পণ্যদ্রব্য ও গৃহসামগ্রী দিল্লীতে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। এইভাবে দিল্লী সম্পূর্ণ জনশূন্য হয়। আমার বিশ্বাসভাজন এক ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছেন যে, একদা সুলতান প্রাসাদোপরি আরোহণ করিয়া অগ্নি, ধূম ও আলোক-বর্জ্জিত দিল্লীর চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক বলেন, 'এতদিনে আমার হৃদয় পরিতুষ্ট এবং জিঘাংসাবৃত্তি পরিতৃপ্ত হইয়াছে।' কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে, মোহাম্মদ অন্যান্য প্রদেশ হইতে প্রজা আনয়ন করিয়া পুনর্ব্বার দিল্লী নগরী জনপূর্ণ করিতে আদেশ করেন। কিন্তু দিল্লী নগরী এত বৃহৎ যে, তাহারা স্ব স্ব

দেশের অনিষ্ট করিয়াও উহা পূর্ব্ববৎ সৌষ্ঠবশালী করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ দিল্লী পৃথিবীর একটী বৃহত্তম নগরী, দিল্লী শোভা ও সম্পদের কেন্দ্রস্থল। উহার কারুকার্য্যখচিত মসজিদ ও সুগঠিত প্রাচীর পৃথিবীতে অতুলনীয়। যদিচ সুলতান দিল্লী নগরীকে পুনর্ব্বার জনপূর্ণ করিতেছেন, তথাপি পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগরী লোকসংখ্যায় একান্ত নগণ্য। আমি যে সময় রাজধানীতে উপনীত হই, তখন উহার যেরূপ অবস্থা দেখিয়াছি, তাহা বর্ণনা করিলাম। দিল্লী নগরীর লোকসংখ্যা অতি সামান্য; সমস্ত নগরী জনশূন্য ও পরিত্যক্ত বলিয়া বোধ হয়।"*

মোহাম্মদ জুনার উত্তরাধিকারী ফিরোজ শাহ তোগলক কর্ত্তৃক দিল্লী নগরী পুনর্নির্ম্মিত এবং জনপূর্ণ হইয়াছিল। তিনি স্বরচিত বৃত্তান্তের একস্থানে লিখিয়াছেন, পূর্ব্ববর্ত্তী নরপতি এবং আমীর ওমরাহগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত যে সকল সৌধ এবং ইমারত কালপ্রভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, পরমেশ্বরের আদেশে আমি তৎসমুদয় পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করিয়াছি। এই কার্য্য সমাধা করিয়া আমরা নিজের সঙ্কল্পিত নগরী নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। এই নবনির্ম্মিত অংশ ফিরোজাবাদ নামে খ্যাত হইয়াছিল। ফিরোজ শাহের স্বরচিত বৃত্তান্তে তৎকর্ত্তৃক সংস্কৃত সৌধ এবং ইমারতের সুবিস্তৃত তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা অনাবশ্যক বোধ করিয়া তাহা উদ্ধৃত করিলাম না।

ফিরোজ শাহ কর্ত্তৃক দিল্লীর পুনরুদ্ধারসাধন সম্পাদিত হইয়াছিল। কিন্তু দিল্লীর ভাগ্য অভিশপ্ত বলিয়া ইহার পর আট বৎসরের মধ্যেই দিল্লী নগরীর সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছিল। এই সর্ব্বনাশের কারণ তৈমুরের দিল্লী আক্রমণ। মানবজাতির শত্রুস্বরূপ তৈমুরলঙ্গ বৃকপত্রসদৃশ বিপুল বাহিনীসহ ভারতবর্ষে উপনীত হন এবং সমৃদ্ধ জনপদ সকল ধ্বংস করিতে করিতে দিল্লীর দ্বারদেশে আগমন করেন। যৎকিঞ্চিৎ প্রতিরোধের পর দিল্লী নগরী বিজয়ী বীরের নিকট আপন দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছিল। তৈমুরলঙ্গ দিল্লী নগরীতে প্রবিষ্ট হইয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন এবং আনন্দিতচিত্তে উৎসবে মত্ত হইলেন। ইহার এক সপ্তাহ পরে দুর্দ্দান্ত মোগলসৈন্য প্রলোভন সংবরণ করিতে অসমর্থ হইয়া সহর লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হইল। সহস্র সহস্র হিন্দু নরনারী মোগলের হস্ত হইতে মান ইজ্জত রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে জীবন বিসর্জ্জন

* সুলতান মোহাম্মদ জুনার রাজত্বকালে দিল্লী নগরীর অবস্থা সম্বন্ধে যে বর্ণনা প্রদত্ত হইল, তাহা লেখকের পাঠানরাজবৃত্ত নামক পুস্তক হইতে সঙ্কলিত।

করিল। লোভোন্মত্ত মোগলসৈন্য পাঁচ দিন পর্য্যন্ত অতুল সমৃদ্ধি ও শ্রীশালিনী দিল্লী নগরী ছারখার করিল। তাহাদের অমানুষিক অত্যাচারে শত শত সুদৃশ্য অট্টালিকা বিনষ্ট হইল। অসংখ্য নরনারী শত্রুহস্তে বন্দী হইল। প্রত্যেক মোগলসৈন্য অন্যূন বিংশতি জন নরনারী বন্দী করিল। ধনলুব্ধ মোগলসৈন্য বন্দী হিন্দুরমণীদের গাত্রালঙ্কার অপহরণ করিল। মৃতদেহরাশি দ্বারা রাজপথ অবরুদ্ধ হইল। পাঁচদিন পরে এই প্রচণ্ড অনল আর ভোগ্যবস্তু না পাইয়া আপনা আপনি নির্ব্বাপিত হইল। তৈমুরলঙ্গ স্বরচিত জীবনবৃত্তে লিখিয়াছেন, "লুণ্ঠন শেষ হইলে আমি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করিতে বহির্গত হইলাম। সিরি গোলাকার সহর। ইহার হর্ম্ম্যরাজি সমুচ্চ। ইহার চতুর্দ্দিক্ প্রস্তর এবং ইষ্টকে নির্ম্মিত দুর্গদ্বারা পরিবেষ্টিত। এই দুর্গ অতিশয় দৃঢ়। পুরাতন দিল্লীতেও এইরূপ একটি দুর্গ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা সিরির দুর্গ অপেক্ষা বৃহৎ। সিরি দুর্গ পুরাতন দিল্লী দুর্গ হইতে দূরে অবস্থিত। এই সমস্ত স্থান সুদৃঢ় প্রস্তর গঠিত প্রাচীর দ্বারা রক্ষিত। জাহানপান্না নামক অংশ জনাকীর্ণ নগরীর মধ্যস্থলে অবস্থিত। এই তিন নগরীর দুর্গের ত্রিশটি দ্বার আছে। জাহান পান্নার ত্রয়োদশ দ্বার; সাত দ্বার দক্ষিণ দিকে আর ছয়দ্বার উত্তর দিকে। সিরির দ্বারসংখ্যা সাত; পুরাতন দিল্লীর দশ দ্বার দেখিতে পাওয়া যায়। আমি পরিশ্রান্ত হইয়া মস্‌জিদ-ই জমিতে প্রবেশ করিয়াছিলাম। এই স্থানে বহু সম্ভ্রান্ত লোক উপাসনার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে উপহার দিয়াছিলাম এবং মিষ্ট বাক্যে সান্ত্বনা করিয়াছিলাম।"

তৈমুরলঙ্গ সহস্র সহস্র পৌত্তলিককে শমনসদনে প্রেরণ করিয়া ১৫ দিন পর অন্যস্থানের বিধর্ম্মীদিগের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধে ব্যাপৃত হইবার উদ্দেশ্যে দিল্লী পরিত্যাগ করিলেন। পাঠানগণ * তৈমুরের দিল্লী পরিত্যাগের পরও তথায় শতাধিক বৎসর আধিপত্য করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে মবারকবাদের প্রতিষ্ঠা হইলেও, তাঁহারা দিল্লীর পূর্ব্ব সৌষ্ঠব ও বৈভব আর ফিরাইয়া আনিতে পারেন নাই। পরন্তু জৌনপুরের আক্রমণে অবসন্না দিল্লী নগরী ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল। জৌনপুরের সুলতান মাহমুদ বিপুল বিক্রমে দিল্লী অবরোধ করিলে, তদানীন্তন

* মোহাম্মদ ঘোরী কর্ত্তৃক দিল্লী অধিকৃত হইবার পর এবং মোগলবংশের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের আগমনের পূর্ব্বে তুর্কী, পাঠান, সৈয়দ প্রভৃতি নানাজাতীয় বা বংশীয় মোসলমান তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সাধারণ্যে পাঠান নৃপতি নামেই পরিচিত।

অধিপতি নিরুপায় হইয়া বলিলেন, হিন্দু-দেশ সুবিস্তৃত ও ধনশালী। আমাদের স্বদেশে অনেক যোদ্ধা আছে। তাহারা অর্থাভাবে ক্লিষ্ট হইতেছে। যদি তাহারা এই দেশে আইসে, তবে তাহাদেরও দারিদ্র্য ঘুচিবে, আমিও হিন্দুস্থান গ্রাস এবং শত্রুকুল ধ্বংস করিতে পারিব। তিনি এইরূপ বিবেচনা করিয়া নানাবংশীয় পাঠানদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। তদনুসারে রোবাসী পাঠানগণ পিপীলিকাশ্রেণী ও পঙ্গপালের ন্যায় দিল্লীতে উপনীত হয় এবং জৌনপুরের সুলতানকে দূরীভূত করিয়া দেয়। *

অতঃপর নূতন অভিনেতা দিল্লীর রঙ্গক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া পাঠানদের আধিপত্য বিনষ্ট করিয়া সাম্রাজ্যাধিকারী হন এবং দিল্লী নগরীকে অপূর্ব্ব সৌষ্ঠব ও বৈভবশালিনী করিয়া তুলেন। সে সৌষ্ঠব এবং বৈভবের প্রভাব প্রাচ্য আকাশ আলোকিত করিয়া সমস্ত পৃথিবীতে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। এই অভিনেতার নাম মোগল। মোগলের অধিনেতা বাবর দিল্লী অধিকার করেন। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল শুক্রবার দিল্লীর মস্‌জিদে তাঁহার নামে খোতবা পঠিত হইয়াছিল। বাবর দিল্লী অধিকার করিয়া স্বরচিত জীবনবৃত্তে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, এখানে তাহার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ প্রদত্ত হইতেছে;—"হিন্দুস্থানের রাজধানী দিল্লী। এক সময়ে দিল্লী হইতে হিন্দুস্থানের অধিকাংশ শাসিত হইত; কিন্তু আমার হিন্দুস্থান-জয়কালে পাঁচটি মোসলমানরাজ্য এবং দুইটি হিন্দুরাজ্য শক্তিশালী ছিল। এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র রাজা ও রায় বন্য এবং পার্ব্বত্য প্রদেশে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

(১) দিল্লীর সাম্রাজ্য। লোদীগণ এই সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিল, ইহাদের প্রভুত্ব বিহার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

(২) গুজরাট রাজ্য। এই রাজ্যের অধিপতি সুলতান মোহাম্মদ-মুজাফ্‌ফর পানিপথের যুদ্ধের কয়েক দিন পূর্ব্বে পরলোক গমন করেন। ইনি নানা শাস্ত্রে বিশারদ এবং হদিশ পাঠে অনুরাগী ছিলেন। সুলতান সর্ব্বদা কোরাণ নকল করিতেন। গুজরাট রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা প্রথমে ফিরোজ শাহের পানপাত্রবাহক ছিলেন।

---

* রোবাসী পাঠানদের ভারতে আগমন ইতিহাসের স্মরণযোগ্য ঘটনা। এই বংশীয় ফরিদ খাঁ (সের শাহ) ভারতবর্ষে বহুব্যাপী বিপ্লব সংঘটিত করিয়া চিরস্থায়িনী কীর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

(৩) বাহমনী রাজ্য। দক্ষিণাপথের সুলতানগণ বীর্য্যহীন হইয়া পড়িয়াছেন। আমীর ওমরাহগণ সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছেন। সুলতানগণ আপনাদের অভাব পূরণ জন্য তাঁহাদের শরণাপন্ন হইতেছেন।

(৪) মালব রাজ্য। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাও প্রথমে সুলতান ফিরোজ শাহের পানপাত্রবাহক ছিলেন।

(৫) বঙ্গ রাজ্য। এই রাজ্যে একটি আশ্চর্য্য প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। যদি কোন ব্যক্তি রাজহত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন, তবে প্রজাপুঞ্জ বিনা আপত্তিতে তাঁহার বশ্যতা অঙ্গীকার করে। একবার একজন হাবশী ক্রীতদাসের এইভাবে রাজ্যাধিকার লাভ হইয়াছিল। বাঙ্গালীরা বলে, আমরা রাজসিংহাসনের আজ্ঞাবহ; যিনি রাজসিংহাসনে উপবেশন করিবেন, আমরা তাঁহারই আজ্ঞা পালন করিব এবং তাঁহার বাধ্য থাকিব।

এই পাঁচটি মোসলমান রাজ্য। এই সকল রাজ্য পরাক্রান্ত এবং সৈন্যবলে গরিষ্ঠ।

(৬) বিজয়নগর রাজ্য।

(৭) চিতোর রাজ্য। রাণা সঙ্গ এই রাজ্যের নরপতি। তিনি প্রভূত-পরাক্রমশালী, মালব রাজ্যের কিয়দংশ অধিকার করিয়া সুবিস্তীর্ণ ভূমির অধিস্বামী হইয়াছেন।

আমি দিল্লীর সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছি। বহরহ (Bahrah) হইতে বিহার পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমস্ত ভূমি আমার পদানত হইয়াছে। আমি এই স্থান হইতে বার্ষিক রাজস্বরূপে ৫২ কোটি মুদ্রা প্রাপ্ত হইতেছি। ইহার মধ্যে পূর্ব্বকাল হইতে দিল্লীর আজ্ঞাধীন কতিপয় রাজা ও রায় আট কি নয় কোটি মুদ্রা প্রদান করিতেছেন।"

বাবর জীবনের সায়াহ্নকালে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যেও তাঁহাকে অনবরত সন্ধিবিগ্রহে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল। এজন্য তিনি দিল্লীর কোন উন্নতি সাধন করিতে পারেন নাই। পুত্র হুমায়ুন পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়া দিল্লীর শোভা বর্দ্ধন জন্য মনোযোগী হয়েন। তিনি প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ দুর্গের উদ্ধার এবং জীর্ণসংস্কার সাধন করিয়া তাহার নাম দীনপান্না রাখেন এবং তথায় বাস করিতে আরম্ভ করেন।

এই সময় দিল্লীতে পুনর্ব্বার প্রবল রাজবিপ্লব উপস্থিত হইল। যে রোহবাসী পাঠানদল স্বদেশে অন্নাভাবে ক্লিষ্ট হইয়া শত বৎসর পূর্ব্বে ভাগ্যপরীক্ষার জন্য

দিল্লীতে আগমন করিয়াছিল, তাহাদের অন্যতম ইব্রাহিমের পৌত্র ফরিদ খাঁ মোগলশক্তি বিধ্বস্ত করিয়া নূতন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন। হুমায়ুন অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন। নবীন ভূপতি ইতিহাসে সের শাহ নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। সের শাহ এবং তদীয় উত্তরাধিকারী কর্ত্তৃক দিল্লী নগরীর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল।

দিল্লীর রাজধানী যমুনা নদী হইতে দূরবর্ত্তী ছিল। সের শাহ এই রাজধানী ভাঙ্গিয়া ফেলেন এবং যমুনার তীরে নূতন রাজধানী নির্ম্মাণ করেন। নূতন রাজধানী পুরাতন রাজধানী হইতে ২।৩ ক্রোশ দূরবর্ত্তী এবং কিলুগড়ি ও ফিরোজাবাদের মধ্যস্থানে স্থাপিত ছিল। সের শাহ সিরি নাম্নী নগরীস্থিত আলাউদ্দীন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এবং দৃঢ়তা ও উচ্চতার জন্য খ্যাত দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলেন এবং নূতন রাজধানীতে পর্ব্বতের ন্যায় সুদৃঢ় এবং তদপেক্ষা উচ্চ দুইটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ইহার ছোট দুর্গে শাসনকর্ত্তার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তথায় একটি প্রস্তরগঠিত জুমা মস্‌জিদ নির্ম্মিত হয়। এই মস্‌জিদের কারুকার্য্য জন্য স্বর্ণ প্রভৃতি মহার্ঘ পদার্থ ব্যবহৃত হয়। বড় দুর্গের (এই দুর্গে সেরগড় নামে কথিত হইত) পরিবেষ্টন জন্য উচ্চ, প্রশস্ত এবং সুদৃঢ় প্রাচীর নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পরিসমাপ্তির পূর্ব্বেই সের শাহ পরলোক গমন করেন। এই দুর্গাভ্যন্তরে সেরমণ্ডল নামে একটি ক্ষুদ্র প্রাসাদও নির্ম্মিত হইতেছিল, তাহাও সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই।

সের শাহের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র সেলিম শাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সেলিমগড় নামক একটি নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। যমুনাগর্ভ হইতে এই দুর্গ উত্থিত হইয়াছিল। এই নূতন দুর্গ হিন্দুস্থানের সমস্ত দুর্গ অপেক্ষা সুদৃঢ় করাই সেলিম শাহের অভিপ্রায় ছিল। এই দুর্গ দেখিলে বোধ হইত, যেন একটি প্রস্তর কাটিয়া উহার গঠন করা হইয়াছে।

সেলিম শাহ পরলোকগত হইলে, তদ্বংশীয়গণ আত্মকলহে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়েন এবং সেই সুযোগে হুমায়ুন ভারতবর্ষে আগমনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার দিল্লী অধিকার করেন। কিন্তু তিনি ছয় মাসের মধ্যে হঠাৎ কালগ্রাসে পতিত হন এবং তদীয় অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্র অরাজকতা বিস্তৃত হয়। এই অরাজকতার মধ্যে হিমু নামক সেরবংশের একজন হীনবংশীয় অসাধারণ ধীশক্তিশালী হিন্দু কর্ম্মচারী বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক দিল্লী অধিকার করেন। হিমু বিদ্যুদ্বেগতার

ন্যায় ক্ষণিক আলোক প্রদর্শন করিয়া নির্ব্বাপিত হন এবং আকবর দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়া ভূতলে অতুল মোগলসাম্রাজ্যের সূত্রপাত করেন। আকবর অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে বহু সাধনায় সুগঠিত সুশাসিত সুবিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আকবরের পৌত্র শাহজাহান যেমন সুদক্ষ শাসনকর্ত্তা, তেমনি বিলাসী ও সৌন্দর্য্যপ্রিয় ছিলেন। দিল্লীর দীনপানা নামক মোগলপ্রাসাদ জাঁকজমকপ্রিয় শাহজাহানের মনঃপূত হইল না। তাঁহার সমসাময়িক ইতিহাসবেত্তা এনায়ৎ খাঁ লিখিয়াছেন, তিনি জলবায়ু দ্বারা প্রীতিকর যমুনার তীরে নিজ উচ্চ হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ সুদৃশ্য দুর্গ এবং আনন্দদায়ক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই দুর্গ ও অট্টালিকার ভিতর দিয়া যমুনাস্রোত প্রবাহিত করিতে এবং উহাদের ছাদ যমুনার অভিমুখী করিতে ইচ্ছা করিলেন। এজন্য মনোজ্ঞ স্থানের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং বহু অনুসন্ধানে দিল্লী নগরীর বহির্ভাগে সুদূরবর্ত্তী উপপল্লী এবং সেলিমগড়ের মধ্যস্থলে একটি স্থান মনোনীত করিলেন। রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষে ১০৪৮ হিজরী অব্দের জেলহজ্জ মাসের ২৫ তারিখে রাত্রিকালে জ্যোতিষীদের নির্দ্দিষ্ট শুভক্ষণে রাজাদেশে উপযুক্ত সমারোহে মহোচ্চ উপস্থিতিতে (শাহজাহানের সম্মুখে) নক্সামত ভিত্তি চিহ্নিত হইল। পরিশ্রমপটু শ্রমজীবিগণ ভিত্তি খনন করিতে আরম্ভ করে এবং ১০৪৯ হিজিরী অব্দের মহরম চাঁদের নবম দিনে রজনীযোগে এই সুন্দর হর্ম্ম্যরাজির প্রথম প্রস্তরখণ্ড প্রোথিত হয়। সাম্রাজ্যের প্রত্যেক অংশের শিল্পিগণ, কারুনিপুণ রাজমিস্ত্রী ও সূত্রধর সকলেই অবশ্য-প্রতিপাল্য রাজাদেশে সম্মিলিত হয়। এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক শ্রমজীবী কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। ষাট লক্ষ টাকা ব্যয়ে পাদশাহের সিংহাসনারোহণের দ্বাবিংশতম বর্ষে রবিউলআওয়াল চাঁদের ২৪শে তারিখে এই হর্ম্ম্যরাজির নির্ম্মাণ সমাপ্ত হয়। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক সুদৃশ্য এমারত নির্ম্মিত হইয়া দিল্লীর শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিল। শাহজাহান আপন নামানুসারে সমগ্র দিল্লীর নাম শাহজাহানাবাদ রাখেন এবং তদবধি সমস্ত রাজকীয় কাগজপত্রে দিল্লীর নাম বিলুপ্ত এবং শাহজাহানাবাদ নাম প্রচলিত হয়।

শাহজাহান পাদশাহের রাজত্বের ন্যূনাধিক অশীতি বৎসর পরে দিল্লীর দুর্দ্দশা আরম্ভ হইয়াছিল। প্রথমতঃ পারস্যের অধিপতি শোণিতলোলুপ পরস্বাপহারী নাদির শাহ দিল্লী লুণ্ঠন করেন। তাহার নয় ঘণ্টাব্যাপী লুণ্ঠনে হর্ম্ম্যরাজিশোভিত দিল্লী ভস্মীভূত, নরনারীর রক্তপাতে রাজপথ প্লাবিত এবং

রাজকোষ কপর্দ্দকশূন্য হইয়াছিল। নাদির শাহের আক্রমণের পরেই জগৎ-প্রথিত মোগলসাম্রাজ্য অন্তিম দশায় উপস্থিত হইয়াছিল। এই অন্তিমকালে মোগলের রাজধানী দিল্লী শত্রুর পদাঘাতে অনেকবার বিধ্বস্ত হইয়াছিল। নাদির শাহের ভারতবর্ষ পরিত্যাগের পর কতিপয় বৎসরের মধ্যেই আফগানের অধিপতি আবদালী ধনরত্নলোভে দিল্লীতে উপনীত হইলেন। তিনি দিল্লীবাসীর নিকট হইতে এক কোটি মুদ্রা সংগ্রহ করিতে আদেশ করিলেন। এই সময়ে তাহাদের এতদূর দুর্দ্দশা হইয়াছিল যে, নাদির শাহের আক্রমণকালে দশ কোটি মুদ্রা সংগ্রহ করা অপেক্ষা আবদালীর আদেশে এক কোটি মুদ্রা সংগ্রহ করাই অধিক দুরূহ হইল। সুতরাং তাহারা সর্ব্বস্বান্ত হইল। অতঃপর আবদালী দিল্লী হইতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু পর বৎসর আবার ফিরিয়া আসিলেন। আবদালীর সৈন্য গৃহ সকল দগ্ধ ও নরনারীকে হত্যা করিতে লাগিল। রক্তপিপাসু সৈন্যেরা নির্দ্দোষ নরনারীর রক্তপাতে কিছুতেই বিরত হইল না। অবশেষে তাহারা মৃতদেহরাশির পূতিগন্ধ সহ্য করিতে না পারিয়া নগরী পরিত্যাগ করিল; দিল্লীবাসীর জীবন রক্ষা পাইল। কিন্তু তাহাদের প্রতি বিধাতার অভিসম্পাত ছিল; তাহারা তরবারির মুখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া দুর্ভিক্ষের ভীষণ গ্রাসে পতিত হইল। দলে দলে নরনারী অনাহারে আপন আপন ভগ্নাবশেষ গৃহমধ্যে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল।

দিল্লী ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের এই দুরবস্থার সময়ে মহারাষ্ট্রের অধিনেতা পেশওয়া আবদালীকে ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া বিলুপ্তপ্রায় মোগল-সাম্রাজ্যের পূর্ণ ধ্বংস সাধনপূর্ব্বক তদুপরি মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত বিপুল বাহিনী প্রেরণ করিলেন।

মহারাষ্ট্র-সৈন্য দিল্লীতে প্রবেশ করিল। মহারাষ্ট্রা-সেনাপতি অলঙ্কারের লোভে রাজপ্রাসাদ, সমাধিভবন ও ধর্ম্মমন্দিরের কারুকার্য্য ধ্বংস করিলেন। তিনি দরবারগৃহের রৌপ্যনির্ম্মিত চন্দ্রাতপ ধ্বংস করিয়া সত্তর লক্ষ মুদ্রা প্রাপ্ত হইলেন এবং রাজসিংহাসন ও অন্যান্য মূল্যবান্ আসবাব আত্মসাৎ করিলেন।

আবদালী এবং মহারাষ্ট্রার মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধের নাম পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ। যুদ্ধক্ষেত্রে পঞ্চাশ সহস্র মহারাষ্ট্রা-সৈন্য জীবন বিসর্জ্জন করিল। আবদালী জয়শ্রীতে শোভিত হইলেন। কিন্তু তিনি গুরুতর প্রয়োজনবশতঃ দিল্লীতে অবস্থিতি করিতে অসমর্থ হইয়া শাহ আলমকে

দিল্লীর রাজপদ প্রদানপূর্ব্বক স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর প্রথমতঃ গোলাম কাদের, তার পর মহারাষ্ট্রা-নায়ক সিন্ধিয়া শাহ আলমের নামে দিল্লী শাসন করিতে লাগিলেন। এইভাবে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইলে, ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সেনাপতি লর্ড লেক্ দিল্লী জয় করিয়া অন্ধ ও উপবাসক্লিষ্ট পাদশাহ শাহ আলমকে হস্তগত করিলেন। ইংরাজগণ তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। দিল্লী ইংরেজরাজ্যভুক্ত হইল।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

ঐতিহাসিক রচনা-গরজ।

সম্প্রতি প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় তাঁহার নবপ্রকাশিত "রাজন্য-কাণ্ড" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন;—বরেন্দ্রভূমির গরুড়স্তম্ভ-লিপিতে উল্লিখিত গুরব মিশ্রের বংশ "মগ-বংশীয় সূর্য্যোপাসক গণক-ব্রাহ্মণে"র বংশ। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "রামচরিতম্" কাব্যের ভূমিকায় গরুড়স্তম্ভ-লিপির কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে বরেন্দ্রনিবাসী গুরব মিশ্রের পিতার "দেবগ্রামভবা" বব্বা দেবীকে বিবাহ করিবার কথা উল্লিখিত থাকায়, শাস্ত্রী মহাশয় দেবগ্রামকে নদীয়া জেলার স্বনামখ্যাত গ্রাম মনে করিয়া লিখিয়াছিলেন,—সেকালের রাঢ়ীবারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজের মধ্যে এবিবাহ প্রচলিত ছিল; তাঁহারা একালের রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের ন্যায় এত স্বসমাজ-নিষ্ঠ ছিলেন না। সুতরাং শাস্ত্রী মহাশয় স্তম্ভ-লিপির ব্রাহ্মণবংশকে "গণক ব্রাহ্মণে"র বংশ বলিয়া বর্ণনা করিতে পারেন নাই।

গরুড়স্তম্ভ-লিপিতে যে সকল বিবরণ উল্লিখিত আছে, তাহাতে ব্রাহ্মণত্বেরই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়;—"গণক ব্রাহ্মণে"র পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। গরুড়স্তম্ভ-লিপি ও নারায়ণপাল দেবের তাম্রশাসনের একটি শ্লোক ভিন্ন গুরব মিশ্রের অন্য কোনও পরিচয়বিজ্ঞাপক প্রমাণ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। এই দুইটিমাত্র সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে "গণক ব্রাহ্মণে"র আবিষ্কার-সাধন অনায়াসসাধ্য বলিয়া কথিত হইতে পারে না।

গুরুব মিশ্র ভট্ট গুরব নামেও পরিচিত ছিলেন। ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসনে যুবরাজ ত্রিভুবনপাল "দূতক" ছিলেন;—দেবপালদেবের তাম্রশাসনে যুবরাজ রাজ্যপাল "দূতক" ছিলেন; আর নারায়ণপালদেবের তাম্রশাসনে ভট্টগুরব "দূতক" ছিলেন। তাঁহার পদমর্য্যাদা কিরূপ ছিল, ইহাতে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেকালের শাস্ত্রসংযত সুদৃঢ় সমাজ-বন্ধনের মধ্যে "গণক ব্রাহ্মণে"র পক্ষে এরূপ উচ্চপদলাভের সম্ভাবনা বড় অধিক ছিল বলিয়া বোধ হয় না। নারায়ণপালদেবের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়,—

> বেদান্তৈরপ্যসুগমতমং বেদিতা ব্রহ্মতার্থং
>
> যঃ সর্ব্বাসু শ্রুতিষু পরমঃ সার্দ্ধ মঙ্গৈরধীতি।
>
> যো যজ্ঞানাং সমুদিত-মহাদক্ষিণানাং প্রণেতা
>
> ভট্টঃ শ্রীমানিহ স গুরবো দূতকঃ পুণ্যকীর্ত্তিঃ॥

ইহাতে দেখা যায়,—ভট্টগুরব সমগ্র বেদাঙ্গের সহিত সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এরূপ ব্রাহ্মণকে "গণক ব্রাহ্মণ" বলিবার কারণ কি, তাহা সহসা বোধগম্য হয় না। তজ্জন্য সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় অনেকগুলি কারণের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"নক্ষত্রচিন্তক জমদগ্নিগোত্র গৌড়-বঙ্গের রাঢ়ীয় বারেন্দ্র বা বৈদিক ব্রাহ্মণগণমধ্যেই সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কেবলমাত্র বঙ্গের শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের মধ্যেই পাওয়া গিয়াছে।" শেষের কথাটি "নদীয়া বঙ্গসমাজের কুলপঞ্জিকা"র কথা। সুতরাং তাহার আলোচনা করা সকলের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না। কারণ, সে কুলপঞ্জিকা সকলে পরীক্ষা করিবার সুযোগ লাভ করেন নাই। তাহাতে "জমদগ্নিগোত্র" আছে কি না, জানি না; কিন্তু গরুড়স্তম্ভ-লিপিতে "জমদগ্নিগোত্র" নাই; তাহাতে (অষ্টাদশ শ্লোকে) গুরবমিশ্র "জমদগ্নিকুলোৎপন্ন" বলিয়া উল্লিখিত। এই শ্লোকে শ্লেষের অনুরোধে "জমদগ্নি" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার উপর নির্ভর করা চলে না; চলিলেও, তাহাতে "গোত্রে"র সমাচার প্রাপ্ত হওয়া যায় না। স্তম্ভলিপিতে "শাণ্ডিল্যবংশে"র এবং "জমদগ্নিকুলে"র উল্লেখ থাকায় বুঝিতে পারা যায়, তদ্দ্বারা কিছুমাত্র অসামঞ্জস্য সূচিত হয় নাই। প্রথম শ্লোকের প্রথম শব্দটি বিসর্গান্ত; দুইটি অক্ষর ছিল, দুইটি অক্ষরই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কেবল বিসর্গচিহ্নই বর্ত্তমান আছে। ঐ শব্দটিকে অধ্যাপক কিল্‌হরণ "বিষ্ণু" বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ অনুমানের হেতু কি, তিনি তাহার উল্লেখ করেন নাই। স্তম্ভলিপিতে যে ব্রাহ্মণবংশের পরিচয় উল্লিখিত আছে, তাহাকে "শাণ্ডিল্য-বংশ" বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়; সে বংশের ব্রাহ্মণগণকে "জগদগ্নিগোত্রীয়" বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কোনও অপ্রকাশিত কুলপঞ্জিকায় "জমদগ্নিগোত্রের গণক ব্রাহ্মণে"র উল্লেখ থাকা সত্য হইলেও, তাহার বলে গরুড়স্তম্ভ-লিপির ব্রাহ্মণবংশকে "গণক ব্রাহ্মণে"র বংশ বলিয়া বর্ণনা কদাচ চলে না। কিন্তু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় পাদটীকায় লিখিয়াছেন,—"নক্ষত্রচিন্তক এই বিশেষণ থাকায় এই বংশকে আমরা নিঃসন্দেহে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।" দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে, এই বিশেষণে সকলের সন্দেহ সহজে দূরীভূত হইতে পারে না। কারণ, গরুড়স্তম্ভ-লিপিতে আদৌ "নক্ষত্র-চিন্তক" বিশেষণ নাই; তাহাতে আছে—"সম্পন্নক্ষত্রচিন্তক"। তাহার একাংশ পরিত্যাগ করিয়া, আর এক অংশমাত্র গ্রহণ করিয়া, সকলে "নিঃসন্দেহে" ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত প্রচারিত করিতে সম্মত হইবেন বলিয়া বোধ হয় না।

গরুড়স্তম্ভ-লিপির এক স্থানে ভট্টগুরব "সম্পন্নক্ষত্রচিন্তক" বলিয়া, এবং আর এক স্থানে "জ্যোতিষে নিষ্ণাত" বলিয়া উল্লিখিত। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় তাহার মধ্যে "নক্ষত্রচিন্তক"—শব্দটি বাছিয়া লইয়া, তাহাকেই "গণক ব্রাহ্মণে"র পরিচয়-বিজ্ঞাপক প্রধান প্রমাণ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। জ্যোতিষে "নিষ্ণাততা" তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছে। সুতরাং এই দুইটি মুখ্য প্রমাণ আলোচনার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ ব্যাখ্যা শাস্ত্রী মহাশয়ের কল্পনায় স্থান লাভ করিতে পারিত না। কারণ, বেদাঙ্গের সংখ্যা ছয়টি; তন্মধ্যে একটির নাম জ্যোতিষ। ষড়ঙ্গ-বেদাধ্যায়ী আদর্শ ব্রাহ্মণের পক্ষে জ্যোতিষ অধ্যয়ন করাও যে অবশ্যকর্ত্তব্য, শাস্ত্রী মহাশয় তাহা বিস্মৃত হইতে পারিতেন না। জ্যোতিষে "নিষ্ণাততা" ধরিয়া, "গণকব্রাহ্মণ" বলিতে হইলে, সকল আদর্শ ব্রাহ্মণকেই "গণকব্রাহ্মণ" বলিতে হয়। একটিমাত্র কাব্যকথার জোরে এত বড় সিদ্ধান্তের অবতারণা করা যে ব্রাহ্মণোচিত হইত না, শাস্ত্রী মহাশয়কে তাহা স্বীকার করিতেই হইত।

জ্যোতিষে "নিষ্ণাততা" ধরিয়া, "গণকব্রাহ্মণে"র পরিচয় পাওয়া না গেলেও, "নক্ষত্রচিন্তক" ধরিয়া কি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না? এ বিষয়ে প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব মহাশয়ের অনুকূলে এক শ্রেণীর শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত হইতে পারিবে। শাস্ত্রে "জ্যোতির্বিদে"র ও "নক্ষত্র-পাঠকে"র নিন্দার অভাব নাই। যথা,—

জ্যোতির্বিদোহ্যথর্বাণঃ কীরপৌরাণ-পাঠকাঃ।
শ্রাদ্ধে যজ্ঞে মহাদানে বরণীয়াঃ কদাচ ন॥

তথাহি

আবিকশ্চিত্রকারশ্চ বৈদ্যো নক্ষত্র-পাঠকঃ।
চতুর্বিপ্রা ন পূজ্যন্তে বৃহস্পতিসমা যদি॥

যাঁহাদের শাস্ত্রে এইরূপ নিন্দাবাদ আছে, তাঁহাদের শাস্ত্রেই "জ্যোতির্বিদ্যা" ষড়ঙ্গের অন্তর্গত। সুতরাং শাস্ত্রে ইহার মীমাংসা থাকিবার কথা। বরাহমিহির তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। এখানে তাহার অবতারণা করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ, "নক্ষত্র-পাঠক" ও "নক্ষত্র-চিন্তক" আদৌ একার্থে ব্যবহৃত হয় নাই। স্তম্ভলিপির যে শ্লোকে নক্ষত্র-চিন্তকের উল্লেখ আছে, তাহাতেই তাহা সুব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। "গৌড়লেখমালা"র সম্পাদনকালে সে কথা সংক্ষেপে বুঝাইতে গিয়া, গণক না বলিয়া "জ্যোতিষিক গণনাকারী" বলিয়া

বন্দনীমধ্যে একটি কথার উল্লেখ করিয়াছিলাম। তাহাই হয় ত অনর্থের মূল হইয়াছে। শ্লোকটিতে শ্লেষের সম্পর্ক থাকায়, একটু তলাইয়া বুঝিতে হইবে। যথা,—

জমদগ্নিকুলোৎপন্নঃ সম্পন্নক্ষত্রচিন্তকঃ।
যঃ শ্রীগুরবমিশ্রাখ্যো রামো রাম ইবাপরঃ॥

এই শ্লোকে "নক্ষত্র-চিন্তক"মাত্র নাই, "সম্পন্নক্ষত্রচিন্তক" আছে। গুরব-মিশ্রকে পরশুরাম বলিয়া বর্ণনা করিতে গিয়া, "জমদগ্নি-কুলোৎপন্ন" ও "সম্পন্ন-ক্ষত্রচিন্তক" এই দুইটি বিশেষণ-পদের অবতারণা করিতে হইয়াছিল। তাহা পরশুরাম-পক্ষে এক অর্থে, ও ভট্টগুরব-পক্ষে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছিল। পরশুরাম-পক্ষে "সম্পন্ন + ক্ষত্র + চিন্তক" রূপে পাঠ করিতে হইবে; কারণ, কোথায় নিধনার্হ কোন্ সম্পন্ন ক্ষত্রিয় আছে, তাহার চিন্তাই পরশুরামের প্রধান চিন্তা ছিল। গুরব-পক্ষে "সম্পৎ + নক্ষত্র + চিন্তক"রূপে পাঠ করিতে হইবে; কারণ, তিনি "সম্পৎ-নক্ষত্রে"র চিন্তা করিতেন।

"সম্পৎ-নক্ষত্র" একটি পারিভাষিক সংজ্ঞা। তাহা প্রতিবর্ষেই "নূতন পঞ্জিকায়" ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। সুতরাং তাহার ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন পূর্ব্বে অনুভব করিতে না পারিয়া, "গৌড়লেখমালা"র অনুবাদমধ্যে "সম্পৎ-নক্ষত্রচিন্তক" এইরূপে পদচ্ছেদ করিয়া পাঠ করিবার সঙ্কেত ব্যক্ত করিয়াই নিরস্ত হইয়াছিলাম। আমাদের দেশের পাঠকের পক্ষে এইটুকু ইঙ্গিত যথেষ্ট হইবে বলিয়া মনে হইয়াছিল এখন দেখিতেছি, সকলের পক্ষে তাহা যথেষ্ট হয় নাই। যাঁহার যে নক্ষত্রে জন্ম, তাঁহার পক্ষে সেই নক্ষত্রের নাম "জন্ম-নক্ষত্র"। সেই নক্ষত্র ধরিয়া পর 'পর নয়টি নক্ষত্র তাঁহার পক্ষে পৃথক্ নামে কথিত হয়। এইরূপ পর্য্যায়ে গণনা করিবার সময় যাহাকে দ্বিতীয় নক্ষত্র বলিতে হয়, তাহাই "সম্পৎ" নামে কথিত হইয়া থাকে। নক্ষত্রগুলির নাম এইরূপ,—

"জন্ম-সম্পৎ-বিপৎ-ক্ষেমং প্রত্যরিঃ সাধকো বধঃ।
মিত্রং পরমমিত্রঞ্চ নবতারাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

জাতকের পক্ষে যে নক্ষত্রটি "সম্পৎ", সেই নক্ষত্রে শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, তাহা সুসম্পন্ন হয়। ভট্টগুরব অনেক শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। সুতরাং কোন সময়ে তাঁহার "সম্পৎ-নক্ষত্র" উদিত হইবে, তাহা জানিবার জন্য তাঁহাকে জ্যোতিবিক গণনা করিতে হইত। ইহা ভট্টগুরবের নিয়ত সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের আগ্রহ-সূচনার জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছিল। তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া "সম্পৎ"

শব্দটি ছাড়িয়া দিয়া, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় কেবল "নক্ষত্র-চিন্তক"টুকু বাহাল রাখিয়াছেন, এবং তাহাকেই "নক্ষত্রপাঠক" অর্থে প্রমাণরূপে খাড়া করিয়া, এক অশ্রুতপূর্ব্ব শাস্ত্রব্যাখ্যায় বঙ্গসাহিত্যকে এমন করিয়া উপহাসাস্পদ করিয়াছেন। সুতরাং গত্যন্তর না দেখিয়া, বাধ্য হইয়াই বলিতে হয়,—"গরজ বড় বালাই।"

গরুড়স্তম্ভ-লিপির প্রথম শ্লোকের প্রথম শব্দটি বিলুপ্ত হইয়া গেলেও, তাহা যে গুরবমিশ্রের পূর্ব্বপুরুষের নাম সূচিত করিত, তাহা সহজেই প্রতিভাত হয়। তিনি যে শাণ্ডিল্যবংশীয় ছিলেন, তাহা স্পষ্টাক্ষরেই উল্লিখিত আছে। আদিশূরানীত পঞ্চব্রাহ্মণের মধ্যে যিনি শাণ্ডিল্যবংশীয় ছিলেন, তাঁহার নাম নারায়ণ। স্তম্ভলিপির বিলুপ্ত নামটি নারায়ণ হইতে পারে না। তাহাকে নারায়ণের তুল্যার্থবোধক "বিষ্ণু" বলিয়া অধ্যাপক কিল্‌হরণ্ অনুমান করিয়া গিয়াছেন। সে অনুমান সঙ্গত হইলেও, তদ্দ্বারা ভট্টনারায়ণ সূচিত হইতে পারে না। উক্ত শ্লোকে পরশুরাম ও গুরবমিশ্র, উভয়েই "জমদগ্নিকুলোৎপন্ন" বলিয়া বর্ণিত। পরশুরাম-পক্ষে তাহার সার্থকতা সুস্পষ্ট। কারণ, তিনি "জমদগ্নি"র পুত্র বলিয়া সুপরিচিত। গুরব-পক্ষে "জমদগ্নিকুলোৎপন্ন" বিশেষণটি ব্যবহৃত হইবার সার্থকতাসূচক কোনও নাম স্তম্ভলিপিতে উল্লিখিত না থাকিলে; শ্লেষের অবতারণা করিবার সুযোগ ঘটিত না। "শাণ্ডিল্যবংশে" এই পদের সাহায্যে, অথবা প্রথম শ্লোকের প্রথম শব্দেই তাহা সূচিত হইয়াছিল। সুতরাং কোনরূপ হেতু ধরিয়া সে নামটির অনুমান করিতে হইলে, বলিতে হইবে,—সে নাম "বিষ্ণু" নহে—"ভৃগুঃ"। তিনিই বীজিপুরুষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিলেন। অতএব তাঁহার বংশধরগণকে অথবা শাণ্ডিল্য-বংশধরগণকে শ্লেষের অনুরোধে "জমদগ্নি-কুলোৎপন্ন" বলা চলিতে পারে। এই রূপে স্তম্ভলিপির ব্যাখ্যা করিলে, তদুল্লিখিত শাণ্ডিল্যবংশীয় ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে আদিশূরানীত পঞ্চব্রাহ্মণ-কাহিনীর সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে আদিশূর-কাহিনী মিথ্যা হইয়া যায় না। ইহাতে বরং এইমাত্র বুঝা যায় যে—পালরাজগণের শাসনসময়ের পূর্ব্ব হইতেই বঙ্গদেশে বেদবেদাঙ্গপারগ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের অসদ্ভাব ছিল না। কিন্তু এরূপ প্রমাণের সহিত আদিশূরের ব্রাহ্মণা-নয়ন-কাহিনীর মূল প্রয়োজনের কিঞ্চিৎ অসামঞ্জস্য সূচিত হইতে পারে। সেই আশঙ্কা-নিবারণের উদ্দেশ্যে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় এক নূতন ব্যাখ্যায় গুরব-মিশ্রের বংশকে "গণকব্রাহ্মণে"র বংশ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া, আদিশূর-কাহিনীর পক্ষসমর্থনের জন্য এক অভিনব রচনা-গরজের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এরূপ রচনা-গরজের আতিশয্যে বাঙ্গালীর ইতিহাসের লুপ্তাবশিষ্ট উপাদানগুলির যথাযোগ্য

আলোচনার পথ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে। আগে সিদ্ধান্ত, তাহার পর প্রমাণের আলোচনা,—এরূপ বিচারপদ্ধতি পরিত্যাগ করিতে সম্মত না হইলে, আমাদিগের ঐতিহাসিক গবেষণা আমাদিগের বিচারনিষ্ঠার গৌরববর্দ্ধন করিতে পারিবে না।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

বাঙ্গালার সভ্যতার প্রাচীনতা এবং বাঙ্গালীর উৎপত্তি।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি. আই. ই. মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের কলিকাতার অধিবেশনে যে সুদীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি প্রসঙ্গক্রমে অনেক উৎকট ঐতিহাসিক সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। তন্মধ্যে বাঙ্গালার সভ্যতার প্রাচীনতা সম্বন্ধে এবং বাঙ্গালীর উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা লইয়া এখনও আন্দোলন চলিতেছে। শাস্ত্রী মহাশয় যে বিষয়ের যেরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ দিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। যাঁহারা তাঁহার সিদ্ধান্ত লইয়া হৈ-চৈ বা হা-হুতাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারাও কোনরূপ প্রমাণের অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্যবোধ করিতেছেন না।

জাতিবিশেষের উৎপত্তি এবং প্রাগৈতিহাসিকযুগের সভ্যতা জাতি-বিজ্ঞানের (Ethnology) আলোচ্য বিষয়। জাতি-বিজ্ঞান বিজ্ঞানশ্রেণীর মধ্যে সর্ব্ব-কনিষ্ঠ। জাতি-বিজ্ঞানের এখনও এমন দিন আসে নাই যে, তাহার সিদ্ধান্তকে অভ্রান্তসূত্ররূপে (text) লইয়া, সমাজসংস্কারক বা ধর্ম্মসংস্কারক (sermon) উপদেশ দিতে পারেন। জাতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে যত প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে, তাহার অতি অল্পাংশমাত্রই সংগৃহীত হইয়াছে। এই অল্পপ্রমাণের উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত-স্থাপন অসম্ভব। সংগৃহীত প্রমাণগুলিকে একত্র সাজাইয়া ভাবী অনুসন্ধানের পথ সুগম করিবার জন্য একটা সিদ্ধান্ত করা আবশ্যক মনে করিয়াই জাতিতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহার সূচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু এই সকল সিদ্ধান্ত স্বভাবতঃই অস্থায়ী। সুতরাং ইহা লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে উল্লাস বা অবসাদ উপস্থিত হইতে পারে না।

শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—

আমার বিশ্বাস বাঙ্গালী একটী আত্মবিস্মৃত জাতি। বিষ্ণু যখন রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন কোন ঋষির শাপে তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন। তিনি ধরাধামে আসিয়া ঈশ্বরেরই লীলা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিনি যে ঈশ্বর এ কথা তিনি কখনও বলেন নাই, কার্য্যে বা কর্ম্মে কখনও দেখানও নাই এবং কখনও তিনি স্মরণ করেন নাই। বাঙ্গালীও তেমনি।" (২৬ পৃঃ)

শাস্ত্রী মহাশয়ের মত প্রবীন প্রত্নবিদের নিকট এত বড় কথা শুনিয়া কোন্ বাঙ্গালীর হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিবে না? কিন্তু এত বড় কথার প্রমাণস্বরূপ শাস্ত্রী মহাশয় কেবল লিখিয়াছেন;—

"দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে এক জন সাহেব বলিয়া গিয়াছেন * * বাঙ্গালা অতি প্রাচীনকালে সভ্যতার অতি উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিল। যে কেহ মন দিয়া বাঙ্গালার কথা ভাবিয়াছে, বাঙ্গালাকে ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহাকেই বলিতে হইবে বাঙ্গালা একটী অতি প্রাচীন সভ্যদেশ।"

কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গালার সভ্যতার পক্ষ হইতে যতটা প্রাচীনতা দাবী করিয়াছেন, তাহা দেড় শত বৎসরের পূর্ব্বের কোনও সাহেবের কথার বা এখনকার কোনও ভাবুকের কথার উপর নির্ভর করিয়া স্বীকার করা যায় না। তিনি লিখিয়াছেন;—

"যখন আর্য্যগণ মধ্য-এসিয়া হইতে পঞ্জাবে আসিয়া উপনীত হন তখনও বাঙ্গালা সভ্য ছিল।"

এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার এমন কোনও শিল্পজাত দ্রব্যাবশেষ পাওয়া গিয়াছে কি, যাহা ৩।৪ হাজার বৎসরের পুরাতন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে? ঋগ্বেদে বাঙ্গালার উল্লেখ আছে, এমন কথা কোনও বেদজ্ঞের মুখে শোনা যায় নাই। অবশ্যই ঋগ্বেদে মগধ অর্থে ব্যবহৃত "কীকটে"র উল্লেখ আছে। কিন্তু মগধ ও বাঙ্গালা এক কথা নয়। বাঙ্গালীর পূর্ব্বপুরুষগণ তৎকালে মগধবাসী ছিলেন বলিয়া শাস্ত্রী মহাশয়ও আভাস দেন নাই।

তার পর, "আর্য্যগণ আপনাদের বসতি বিস্তার করিয়া যখন এলাহাবাদ পর্য্যন্ত উপস্থিত হন, তখন বাঙ্গালার সভ্যতায় ঈর্ষাপরবশ হইয়া, তাঁহারা বাঙ্গালীকে ধর্ম্ম-জ্ঞানশূন্য এবং ভাষাশূন্য পক্ষী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।" (২৭ পৃঃ) এখানে শাস্ত্রী মহাশয় ঐতরেয় আরণ্যকের দ্বিতীয় আরণ্যকের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম অংশের কতিপয় পংক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বোধ হয় এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকিবেন। এই অংশের সূচনায় আছে, "ইহাই পথ; ইহাই কর্ম্ম; ইহাই ব্রহ্ম; ইহাই সত্য। অতএব ইহা হইতে কেহ যেন বিচলিত না হয়;

ইহা যেন কেহ লঙ্ঘন না করে। কারণ, তাঁহারা ইহা লঙ্ঘন করিতেন না। পূর্ব্বে যাহারা ইহা লঙ্ঘন করিয়াছিল, তাহারা পরাভূত হইয়াছিল।" (১) তার পর দৃষ্টান্তস্বরূপে একটি ঋকের ব্যাখ্যাচ্ছলে বলা হইয়াছে,—"তিন প্রকার প্রজা লঙ্ঘন করিয়াছিল। বয়সগণ, বঙ্গারগধগণ, ঈরপাদগণ, এই তিন শ্রেণীর প্রজা লঙ্ঘন করিয়াছিল।" (২) সায়ন তাঁহার ভাষ্যে "বঙ্গে"র অর্থ লিখিয়াছেন—"বনগত বৃক্ষ"; "অবগধে"র অর্থ লিখিয়াছেন—"ওষধি"; এবং "ঈরপাদে"র অর্থ লিখিয়াছেন—"সর্প"। আনন্দতীর্থ এই সকল শব্দ পিশাচ, রাক্ষস এবং অসুর অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। সায়নের এবং আনন্দতীর্থের মধ্যে এই সকল শব্দের অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ দেখিয়া, মোক্ষমূলর এবং কিথ্ প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, এই সকল শব্দের অর্থ সম্বন্ধে কোনও সর্ব্ববাদসম্মত জনশ্রুতি পণ্ডিতসমাজে প্রচলিত ছিল না, সুতরাং এই সকল শব্দ "জনগণ" অর্থেও গৃহীত হইতে পারে। শাস্ত্রী মহাশয় বোধ হয় এই সকল পণ্ডিতের মতানুসরণ করিয়াই "বঙ্গ" শব্দকে জনগণ অর্থে গ্রহণ করিয়া, সায়ণ যে স্থলে "বয়াংসি" অর্থ লিখিয়াছেন "কাক-গৃধ্রাদি পক্ষী", তাহা "বঙ্গ" শব্দের উপর আরোপ করিয়াছেন। (৩) এরূপ অর্থবিপর্য্যয়ের কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন। যদি তর্কের স্থলে স্বীকারও করা যায়, এখানে "বঙ্গে"র অর্থ "জনগণ", তথাপি আরণ্যক-কারের উক্তিতে ঈর্ষ্যার চিহ্ন কোথায়? যাহারা বেদমার্গ লঙ্ঘন করায় পূর্ব্বে পরাভূত হইয়াছিল, আরণ্যক-কার তাহাদেরই নাম করিয়াছেন। ঐতরেয় আরণ্যকের রচনাকালে আর্য্যগণ এলাহাবাদ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন, পূর্ব্ব দিকে আর অগ্রসর হয়েন নাই, এই অভিমতও সমীচীন বোধ হয় না। সামবেদের পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে বিদেহরাজের নমী যাইবার কথা আছে, এবং শতপথব্রাহ্মণের বিদেহমাধবের আখ্যানে বিদেহ বা মিথিলায় আর্য্য-উপনিবেশ-স্থাপনের প্রবাদ পরিরক্ষিত হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭।৩৩) উত্তরবঙ্গের প্রাচীন অধিবাসী পুণ্ড্রগণকে অন্ধ্র, শবর, পুলিন্দ ও মুতিবগণের সমতুল্য "অন্ত্য" এবং "দস্যু" বলা হইয়াছে। সুতরাং এই সকল গ্রন্থের

১। "এষ পন্থা এতৎ কর্ম্মৈতদ্‌ব্রহ্মৈতৎ সত্যম্। তস্মান্ন প্রমাদেত্তন্নাতীয়াৎ। ন হ্যত্যায়ন্ পূর্ব্বে যেঽত্যায়ংস্তে পরাবভূবুঃ।"

২। "প্রজাহ তিস্রো অত্যায়মীয়ুরিতি যা বৈ তা ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায়মায়ংস্তানীমানি বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ।"

৩। "'বয়াংসি' পক্ষিণঃ কাকগৃধ্রাদয়ঃ আকাশে দৃশ্যন্তে। সোঽয়ং পক্ষিসজ্ঘস্ত্রিবিধানাং প্রজানামেকো ভাগঃ। 'বঙ্গাঃ' বনগতা বৃক্ষাঃ।"

পরবর্ত্তী কালে রচিত ঐতরেয় আরণ্যকের সময় আর্য্যগণ যে এলাহাবাদ ছাড়াইয়া পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা অনায়াসে মনে করা যাইতে পারে। সংস্কৃত-সাহিত্যে বিন্ধ্যপর্ব্বতবাসী বর্ব্বরজাতিনিচয় শবর এবং পুলিন্দ নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহাতে মনে হয়, ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ-রচনার কালে উত্তরবঙ্গ সভ্য জনপদ বলিয়া গণ্য হইত না।

খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠশতাব্দে, গোতমবুদ্ধ এবং মহাবীর বর্দ্ধমানের অভ্যুদয়কালেও বাঙ্গালার কোনও অংশ সভ্যজনপদরূপে গণ্য হইত কি না সন্দেহ। নিঃসংশয়িতরূপে খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠশতাব্দের রচনা বলিয়া গৃহীত হইতে পারে, এমন কোনও গ্রন্থ এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই; কিন্তু ষষ্ঠশতাব্দের কথা আছে, এমন অনেক গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে বৌদ্ধ পালিপিটক সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। পালিপিটকের স্থানে স্থানে যে উত্তরাপথের ষোড়শ মহাজনপদের নাম একত্র উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মগধ এবং অঙ্গ জনপদের নাম আছে, কিন্তু বঙ্গ, সুহ্ম, বা পুণ্ড্র জনপদের নাম-গন্ধ নাই। পালিপিটকে উত্তরাপথের সুসভ্যভাগকে "মধ্যদেশ" (মজ্ঝিমদেশ) বলা হইয়াছে। বিনয়পিটকে এই "মধ্যদেশে"র পূর্ব্বসীমা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে,—পূর্ব্বদিকে কজঙ্গল নামক নগর, তাহার পর মহাসাল, তাহার পর সীমান্তের জনপদনিচয়; উহার এই দিক্ মধ্যে (মধ্যদেশে) অবস্থিত। (৪) চীন পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াং "কজঙ্গল" নগরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—কজঙ্গল হইতে পূর্ব্বদিকে কিয়দ্দূর চলিয়া, গঙ্গা পার হইয়া ৬০০ লি চলিয়া যাইবার পর তিনি পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কজঙ্গল গঙ্গার পশ্চিম-দিকে, প্রাচীন অঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল। পাণিনির ব্যাকরণে মগধের এবং কলিঙ্গের নাম আছে, পুণ্ড্র, সুহ্ম, বা বঙ্গের নাম নাই। জৈনদিগের "আচারাঙ্গ-সূত্রে" লাঢ় বা রাঢ়, (সুহ্ম) দেশের বিবরণ আছে। (৫) এই সূত্রে কথিত হইয়াছে,—বর্দ্ধমান সংসার ত্যাগ করিয়া দ্বাদশ বৎসরেরও অধিককাল রাঢ়দেশে বজ্জভূমিতে এবং সুভ্ভভূমিতে বিচরণ করিয়াছিলেন। রাঢ়দেশ পথশূন্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে কুকুরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল; পথিক দেখিলে সেই সকল কুকুর কামড়াইতে আসিত। রাঢ়ের অধিবাসিগণও কুকুর অপেক্ষা

৪। The Journal of the Royal Asiatic Society, 1904, p. 84.

৫। Acharanga Sutra (I. 8. 3.) translated by Professor Jaocbi, Sacred Books of the East, Vol.

বড় উন্নত ছিল না। তাহারা বর্দ্ধমানকে পাইলেই প্রহার করিত, "ছুছু" বলিয়া কুকুর লেলাইয়া দিত, এবং "দূর দূর" বলিয়া তাড়াইয়া দিত। আচারাঙ্গ-সূত্রের রাঢ়ের বিবরণ পাঠ করিলে মনে হয়, যেন সমাজে প্রচলিত জনশ্রুতি অনুসারে বর্দ্ধমানের সময়ের রাঢ়ের অধিবাসিগণ সুসভ্য বলিয়া গণ্য হইত না।

মহাবীর বর্দ্ধমান হয় ত খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দের শেষভাগে রাঢ়ে বিচরণ করিয়াছিলেন। ইহার দুই শত বৎসর পরের রাঢ়, বঙ্গ, এবং পুণ্ড্রের যে চিত্র পাওয়া যায়, তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। রাঢ়ে তখন পরাক্রান্ত "গঙ্গরিডই" রাজ্য প্রতিষ্ঠিত। (৬) "কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে" দেখিতে পাওয়া যায়, তৎকালের বাঙ্গালী শিল্পে, বিশেষতঃ বস্ত্রবয়ন-শিল্পে, বিশেষ পারদর্শিতালাভ করিয়াছিল। কৌটিল্য বলেন (২।১১), "বঙ্গদেশীয় রেশমের কাপড় শাদা এবং কোমল; পুণ্ড্রদেশীয় রেশমের কাপড় শ্যামবর্ণ এবং মণির মত শীতল।" কৌটিল্য পুণ্ড্রদেশীয় "পত্রোর্ণা" বা ধোলাই করা রেশমী কাপড়ের এবং শ্রেষ্ঠ কার্পাস বস্ত্রের মধ্যে বঙ্গদেশীয় কার্পাস বস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। (৭) এই সময়ের পূর্ব্বেই এক দল বাঙ্গালী সমুদ্রযাত্রিক সিংহলে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। কৌটিল্য "চীনভূমিজ" বা "চীনপট্টে"র উল্লেখ করিয়াছেন। বাঙ্গালার বন্দর তাম্রলিপ্তিতে সমুদ্রযানে আরোহণ করিয়াই তখন বণিকেরা চীনের সহিত বাণিজ্য করিত। সিংহলের ইতিহাস "মহাবংশে" আছে, যখন অশোকের প্রদত্ত নানা উপঢৌকন লইয়া সিংহলের রাজদূত পাটলিপুত্র হইতে সিংহলে ফিরিয়া গিয়াছিলেন, তখন তিনি "তামলিত্তী" (তাম্রলিপ্তি) বন্দরে গিয়া সমুদ্রযানে আরোহণ করিয়াছিলেন (১১।৩৮)। বাঙ্গালায় সভ্যতার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ শাস্ত্রে মধ্যদেশের সংজ্ঞা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, এবং উহার পূর্ব্বসীমাও সরাইয়া লওয়া হইয়াছিল।

৬। গৌড়রাজমালা; ১-২ পৃষ্ঠা।

৭। "বাঙ্গকং শ্বেতং স্নিগ্ধং দুকূলং, পৌণ্ড্রকং শ্যামং মণিস্নিগ্ধং। * * তেন কাশিকং পৌণ্ড্রকং চ ক্ষৌমং ব্যাখ্যাতম্। মাগধিকা পৌণ্ড্রিকা সৌবর্ণকুড্যকা চ পত্রোর্ণাঃ। * * মাধুরমাপরান্তকং কালিঙ্গকং কাশিকং বাঙ্গকং বাৎসকং মাহিষকং চ কার্পাসিকং শ্রেষ্ঠমিতি। ৮০-৮১ পৃঃ।" অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের এই অংশের বঙ্গানুবাদে কিছু কিছু ভুল আছে, এবং কিছু কিছু অংশ বাদ পড়িয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার "অভিভাষণে"র ২৯ পৃষ্ঠায় "শিল্পশাস্ত্র সম্বন্ধে যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন পুস্তক" তাহা হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা "কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে"র এই অংশেরই সারভাগ বলিয়া মনে হয়। শাস্ত্রী মহাশয় যে লিখিয়াছেন, "সর্ব্বোৎকৃষ্টপত্রোর্ণা কেবল বাঙ্গালাই পাওয়া যাইত", এ কথা মূলানুগত নহে।

"দিব্যাবদানে"র "কোটীকর্ণাবদানে" উপালী বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "অন্ত বা সীমান্ত কোন্ স্থান, এবং প্রত্যন্ত বা সীমান্তের বাহিরে কোন্ স্থান?" বুদ্ধ উত্তরে বলিতেছেন, "হে উপালি, পূর্ব্বদিকে পুণ্ড্রবর্দ্ধন নামক নগর এবং তাহার পূর্ব্বদিকে পুণ্ড্রকক্ষো নামক পর্ব্বত। অতঃপর প্রত্যন্ত।" (৮) গারো পাহাড়ই সম্ভবতঃ এখানে "পুণ্ড্রকক্ষো" পর্ব্বত নামে অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, "কোটীকর্ণাবদান"-রচনার সময়ে শুধু পুণ্ড্রদেশে (বর্ত্তমান বরেন্দ্র) নয়, কামরূপেও আর্য্যসভ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখন জিজ্ঞাস্য,—বর্দ্ধমানের রাঢ়-ভ্রমণের সময়, এবং মেগাস্থিনিস ও কৌটিল্যের সময়, এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী কিঞ্চিন্ন্যূন দুই শতাব্দী কালের মধ্যে বাঙ্গালার অসভ্য অধিবাসিগণ কেমন করিয়া সভ্যতার এত উচ্চ সোপানে আরোহণ করিল?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে বাঙ্গালীর উৎপত্তির আলোচনা করা আবশ্যক। শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গালীর উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"এখনকার Enthropologistsরা স্থির করিয়াছেন যে, বাঙ্গালী মঙ্গল ও দ্রাবিড় জাতির মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে। আর্য্যগণ এখানে অতি অল্পদিনই আসিয়াছেন। আর্য্য-আবর্ত্ত সমুদ্রের উপকূল বঙ্গদেশে অতি অল্পই প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।.........জীবন্ত ব্রাহ্মণে শ্রাদ্ধ করিতে হইলে ব্রহ্মাবর্ত্তের ব্রাহ্মণই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। বাঙ্গলাদেশের ব্রাহ্মণ একেবারেই প্রশস্ত নহে। ইহার কারণ অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, আর্য্য ভিন্ন অন্য কোন জাতি বঙ্গদেশে প্রবল ছিল।" পরলোকগত রিস্‌লি সাহেব বাঙ্গালীর উৎপত্তি সম্বন্ধে যে মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন, এখানে শাস্ত্রী মহাশয় তাহারই পুনরুল্লেখ করিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে পঠিত এবং তাহার কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশিত (১০৫—১২৪পৃঃ) "বাঙ্গালীতত্ত্ব" নামক একটী প্রবন্ধে রিস্‌লি সাহেবের মত বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই "সাহিত্য-সম্মিলনে"রই সপ্তম অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে পাঠের জন্য লিখিত এই সুদীর্ঘ অভিভাষণে উক্ত প্রবন্ধের কোনও উল্লেখই নাই। পঞ্জাব, আগ্রা, অযোধ্যাপ্রদেশ, বিহার, এবং রাজপুতানার অধিবাসি-

৮। "পূর্বেণোপালি পুণ্ড্রবর্দ্ধনং নাম নগরং তস্য পূর্বেণ পুণ্ড্রকক্ষো নাম পর্ব্বতঃ, ততঃ পরেণ প্রত্যন্তঃ।"—The Divyavadana, Edited by Cowell and Neil, Cambridge, 1886, p. 21.

গণের গড়ে শতকরা ৭৫ জনের মস্তক দীর্ঘ (Dolichocephalic); অর্থাৎ,

$$\frac{\text{মস্তকের প্রশস্ততা} \times ১০০}{\text{মস্তকের দৈর্ঘ্য}} = ৭৫ \text{ এর ন্যূন}$$

। পক্ষান্তরে, গুজরাট, মারাঠাদেশ, কূর্গ, উড়িষ্যা, এবং বাঙ্গালার অধিবাসিগণের গড়ে শতকরা প্রায় ৮০ জনের মস্তকের এই অনুপাত ৭৫এর উপর। ইহার দক্ষিণে আবার তামিল এবং মলয়ালম-ভাষী দ্রাবিড়গণ দীর্ঘ-মস্তকবিশিষ্ট। গুজরাথী, মারাঠী, উড়িয়া এবং বাঙ্গালীগণের মধ্যে চৌড়া মাথার (Brachycephalic) বাহুল্য দেখিয়া রিস্‌লি অনুমান করিয়াছিলেন, গুজরাথী এবং মারাঠীগণ খুব চৌড়া-মাথা শক আক্রমণকারী এবং লম্বা-মাথা দ্রাবিড়গণের মিশ্রণজাত; এবং উড়িয়া ও বাঙ্গালীগণ খুব চৌড়ামাথা মোঙ্গল এবং লম্বামাথা দ্রাবিড়ের মিশ্রণজাত।

গুজরাথী এবং মারাঠীগণকে শক-দ্রাবিড়-সঙ্কর বলিয়া কল্পনা করা ইতিহাস না জানার ফল। উক্ত "বাঙ্গালীতত্ত্ব" প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে,—"ভারত-ইতিহাসের যে যুগকে সিথীয় আক্রমণের যুগ বলা যাইতে পারে, সেই যুগে শক, কুষাণ এবং হূণ, এই তিন জাতীয় আক্রমণকারী ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। শকেরা মহারাষ্ট্রদেশে প্রবেশের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু অন্ধ্রবংশীয় রাজগণ তাঁহাদের গতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কুষাণ এবং হূণগণ কখনও মহারাষ্ট্রের সীমান্তে পদার্পণ করিয়াছিলেন, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং মারাঠাগণের মধ্যে অধিকাংশ ভাগ সিথীয়, এরূপ অনুমান কষ্টকল্পনামাত্র। গুজরাতের কথা কিছুটা স্বতন্ত্র।·········কিন্তু তাই বলিয়া কাশ্মীর, পঞ্জাব এবং মথুরায় যে পরিমাণ শক, কুষাণ এবং হূণ আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল, তার চেয়ে বেশী পরিমাণ শক এবং গুর্জ্জর গুজরাতে প্রবেশ করিয়াছিল, এরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ নাই। * * এত শক, কুষাণ এবং হূণ আসিয়া মিলিত হওয়া সত্ত্বেও কাশ্মীর, পঞ্জাব এবং মথুরার অধিবাসীরা যেমন দীর্ঘকরোটি তেমন দীর্ঘকরোটিই রহিয়া গিয়াছেন; অথচ শক এবং গুর্জ্জরেরা গুজরাতীগণকে প্রায় প্রশস্তকরোটি করিয়া তুলিয়াছেন, এরূপ অনুমান যুক্তিবিরুদ্ধ।"

তার পর ঐ প্রবন্ধে উড়িয়া এবং বাঙ্গালীর মোঙ্গল-সংস্রব সম্পর্কে বলা হইয়াছে, "প্রশস্তকরোটি মোঙ্গলীয়দিগের বিশেষ লক্ষণ নহে, অথবা মোঙ্গলীয়দিগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। * * মোঙ্গলীয়দিগের বিশেষ লক্ষণ, অতিনিম্ন নাসিকার মূল, গণ্ডস্থলের অস্থির উচ্চতা, শ্মশ্রুর অভাব বা অল্পতা, এবং বঙ্কিমছাঁদের নেত্র। বাঙ্গালী এবং উড়িয়াগণের মধ্যে এই সকল লক্ষণ মোটেই দেখা যায় না।" এই

প্রকারে রিস্‌লির মত খণ্ডন করিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে,—"উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ, গুজরাত ও মহারাষ্ট্র, এবং বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, এই সকল প্রদেশের প্রশস্তকরোটী অধিবাসিগণকে তুরুষ্ক, শক ও মোঙ্গল এই তিনটি [স্বতন্ত্র] বংশসম্ভূত মনে না করিয়া, একই বংশসম্ভূত এবং একই আকৃতিক জাতির অন্তর্ভূত বলিয়া গ্রহণ করিলে, রিস্‌লি সাহেব যে সকল ভ্রম প্রমাদে পতিত হইয়াছেন, তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ করা যাইতে পারে।" অর্থাৎ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের আর্য্য-ভাষাভাষী পাঠানাদি জাতিনিচয়ের মধ্যে ও গুজরাথী, মারাঠী, উড়িয়া ও বাঙ্গালীগণের মধ্যে যে চৌড়ামাথা দেখা যায়, তাহা একই মূল হইতে উৎপন্ন। একই প্রস্রবণ হইতে উৎপন্ন হইয়া এই চৌড়ামাথা আক্রমণকারীর প্রবাহ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, গুজরাত, মারাঠাদেশ, কর্ণাট, অন্ধ্র, উড়িষ্যা ও কতক পরিমাণে বিহার প্লাবিত করিয়া বাঙ্গালাদেশে আসিয়া পড়িয়াছে। ইঁহারাও আর্য্যভাষাভাষী ছিলেন, দীর্ঘকরোটি হিন্দুস্থানী বা পঞ্জাবীর নিকট হইতে ইঁহারা আর্য্য-ভাষা ধার করেন নাই। গ্রিয়ার্সন, হেনিলি প্রভৃতি ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ দেখাইয়াছেন, এক দিকে পঞ্জাবী এবং হিন্দুস্থানী ভাষা, অপর দিকে বিহারী, বাঙ্গালা, উড়িয়া, মারাঠী প্রভৃতি ভাষা, দুইটি স্বতন্ত্র মূল হইতে উৎপন্ন। এই প্রশস্তকরোটি আর্য্যভাষাভাষী আক্রমণ-কারিগণের ধারার উৎপত্তিস্থান কোথায়, তাহা উক্ত প্রবন্ধে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। মধ্য-এসিয়ার পামীর প্রদেশের গালচাগণ, পশ্চিম-এসিয়ার আরমেনীয়গণ এবং য়ুরোপের শ্লাভ্‌ এবং কেল্‌ট্‌গণ আর্য্যভাষাভাষী, অথচ প্রশস্তকরোটি; সুতরাং প্রশস্তকরোটি আর্য্য দেখিলেই উহাতে শক বা মোঙ্গল-মিশ্রণ কল্পনা করা অনাবশ্যক, এই পর্য্যন্ত বলা হইয়াছিল। (৯)

৯। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের East West পত্রে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে গুজরাটী, মারাঠী, উড়িয়া এবং বাঙ্গালীর মধ্যে যে প্রশস্তকরোটি মানুষের ভাগ দেখা যায়, তাহা একই মূল হইতে উৎপন্ন, এবং তদ্দ্বারা এই সকল জনগণের সহিত য়ুরোপীয় আল্পাইন জাতির (Alpine) জ্ঞাতিত্ব সূচিত হইতেছে, এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলাম। লণ্ডনের "নেচর" পত্র (Nature, June 7, 1907) বাঙ্গালীর পক্ষে এরূপ উচ্চবংশে উৎপত্তি দাবী করার জন্য আমাকে একটু উপহাস করিয়াছিল। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'The Races of man and Their Distribution' নামক পুস্তকে ডাক্তার হেডন (Haddon) লিখিয়াছেন,—

"A zone of relatively 'broad-headed' people extends from the great grazing country of the Western Punjab through the Deccan to the Coorgs. Risley supports the view that this may be track of the Seythians, who found the progress east blocked by the Indo-Aryans and so turned south, mingled with Dravidian population, and became the ancestors of the Marathas and Canarese. Bnt evidence seems to be lacking that the

এখন চৌড়ামাথা অথচ আর্য্যভাষী গুজরাথী, মারাঠী, উড়িয়া এবং বাঙ্গালীর উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও কিছু বলা সম্ভব হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ সার ওরেল ষ্টিন মধ্য-এসিয়ায় প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানে ভ্রমণকালে তদ্দেশবাসীদিগের জাতিতত্ত্বনিরূপণের জন্য তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিমাণ করিয়াছিলেন। নৃবিজ্ঞানবিৎ টি. এ. জয়েসের (T. A. Joyace) উপর সকল উপাদানের বিচারের ভার ন্যস্ত হইয়াছিল। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের "জর্ণ্যাল অফ্ দি এন্থ্রপলজিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটে" প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে তিনি উহাদের আলোচনা করিয়াছেন। যাঁহারা জয়েসের সিদ্ধান্ত জানিতে চাহেন, তাঁহারা ঐ জর্ণ্যালের ৪৬৭—৪৬৮ পৃষ্ঠা পাঠ করিবেন। এখানে অতি-সংক্ষেপে তাহার সারাংশ প্রদত্ত হইতেছে।

মধ্য-এসিয়ার তক্ল-মকান মরুভূমির চারি দিকের অধিবাসীদিগের মস্তক খুব চৌড়া, এবং ইহারা আর্য্য-ইরাণী ভাষা ব্যবহার করে। ওয়াখি এবং গালচাগণ ইহাদিগের জ্ঞাতি। পামীর প্রদেশের কাফীর এবং চিত্রলীগণও একরূপ ভাষাই ব্যবহার করে; কিন্তু ইহাদের মাথা তত চৌড়া নয়, ইহাদের মধ্যে লম্বা মাথার মিশ্রণের চিহ্ন পাওয়া যায়। তার পর, ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের হিন্দু আফগান জাতি। ইহারা ভাষায় আর্য্য-ইরাণী হইলেও, ইহাদের মাথা তত চৌড়া নয়; অর্থাৎ, ৮০র উপরের অনুপাতের মাথা ইহাদের মধ্যে খুব বেশী দেখা যায় না। গড়পড়তায় ইহারা মধ্যমকরোটি (mesocephalic, index, 75 to 80 এই মধ্যম করোটি, প্রশস্তকরোটি এবং দীর্ঘকরোটির মিশ্রণের ফল। তক্ল-মকান প্রদেশের খাঁটী ইরাণীগণের পশ্চিম দিকে তুরুষ্কগণের বাস। তুরুষ্কগণ ভাষায় মোঙ্গলীয়, কিন্তু আকারে ইরাণীয়। তুরুষ্কগণ প্রশস্তকরোটি মোঙ্গলীয়ের সহিত প্রশস্তকরোটি, দীর্ঘকায়, সুনাসিক ইরাণীর মিশ্রণজাত। তক্ল-মকান এবং পামীর প্রদেশের এই প্রশস্তকরোটি ইরাণী আর্য্যগণ আকারে ইউরোপের হোমো-অ্যাল্পাইনস্ (Homo-Alpinus) বা রুস, ফরাসী, আইরিস প্রভৃতি আল্পাইন জাতির সদৃশ। জয়েস উপসংহারে বলিয়াছেন,—মধ্য-এসিয়ার ইরাণীগণকে আক্-

'Scythians' penetrated far into the Deccan, and apart from brachycephaly there is little to associate these peoples with Scythians. It seems quite possible that these brachycephalic are the result of an unrecorded migration of some members of the Alpine race from the highlands of Southwest Asia in pre-historic times" (pp. 60—61).

ব্রিটিশ মিউজিয়মের Ethnology বিভাগের যে নূতন Hand-Book বাহির হইয়াছে, তাহাতে রিজলি সাহেবের মত গৃহীত হয় নাই।

তির হিসাবে আমি "হোমো-অ্যাল্পাইনস" বলি, কিন্তু আল্পস্ প্রদেশের বর্ত্তমান অধিবাসীদিগের সহিত যে তুর্কীস্থানের অধিবাসীদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহা আমি সূচিত করিতে চাহি না। (১০)

রিস্‌লির একটা সংস্কার ছিল, আদৌ যাহারা আর্য্য ভাষা ব্যবহার করিত, তাহারা সকলেই দীর্ঘকরোটি ছিল। তাই আর্য্যভাষী কোনও জাতির মধ্যে প্রশস্তকরোটি দেখিলেই তিনি মনে করিতেন, ইহা অনার্য্য-মোঙ্গল-মিশ্রণের ফল। যুরোপের প্রশস্তকরোটি আর্য্যভাষিগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে রিস্‌লির কি মত ছিল, তাহা জানি না। চীন জাপান থাকিতে বাঙ্গালীর মোঙ্গলের সহিত জ্ঞাতিত্ব স্বীকার করিতে কোনও সঙ্কোচ হইতে পারে না। কিন্তু বাঙ্গালীর ভাষা, বাঙ্গালীর নাসা, বাঙ্গালীর গোঁপদাঁড়ি সেইরূপ জাতিত্বের অন্তরায়। ষ্টিনের অনুসন্ধানের ফলে আমরা মধ্য-এসিয়ায় চিরকাল আর্য্য-ইরাণী-ভাষাভাষী, মোঙ্গল-সম্পর্ক-বর্জ্জিত একটি বিশাল জনসঙ্ঘের সন্ধান পাইতেছি। সীমান্তের হিন্দু আফগানগণ আদৌ ইহাদের জাতীয় ছিল; পরে দীর্ঘকরোটি জনগণের সহিত মিশিয়া স্বতন্ত্র আকৃতি ধারণ করিয়াছে। গুজরাথী, মারাঠী, উড়িয়া এবং বাঙ্গালীরও সেই দশা। ইহাদের মধ্যে চৌড়ামাথার যে ভেজাল দৃষ্ট হয়, তাহা তক্ল-মকান এবং পামীর হইতে উৎপন্ন শোণিত-নদের প্লাবনের ফল। ভাষায় মারাঠী, উড়িয়া, বিহারী এবং বাঙ্গালী পরস্পরের সহিত সম্পর্কিত। ধর্ম্মসূত্রকার বোধায়নের মতে, ইহারা সকলেই "সঙ্কীর্ণযোনি", এবং মধ্যদেশবাসীর বর্জ্জনীয়। বিহারীদিগের সহিত বাঙ্গালীর ভাষাগত ঘনিষ্ঠতা থাকিলেও, আকারে এবং আচারে বিহারী হিন্দুস্থানী হইয়া গিয়াছে। মধ্য-এসিয়ার চৌড়ামাথা আর্য্যেরা ভাষায় ইরাণী, কিন্তু বাঙ্গালীর ভাষার সহিত ইরাণী অপেক্ষা সংস্কৃতের সম্বন্ধ অধিক। তথাপি বাঙ্গালীর ইরাণী-গন্ধ একেবারে দূর হয় নাই। বাঙ্গালী, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গবাসী, এখনও অনেক সময় 'স'কে 'হ' উচ্চারণ করে।

এখানে যে মত প্রকটিত হইল, তাহা স্বীকার করিতে গেলে, গুজরাত,

১০। "Finally, the point which emerges most clearly from the welter of measurements and descriptive data contained in this paper is this: that the original inhabitants of the Pamirs and Takla-makan Desert, including the cities now buried beneath the sand, is that type of man described by Laponge as "Homo-Apinus," within the west, traces of the Indo-Afghan; and that the Mongolian has had very little influence upon the population. In using "Homo-Alpinus" term, I wish it to be understood that I employ it merely as the name of certain type already described, and do not necessarily imply that the actual population of the Alps is closely allied to the population of Chinese Turkestan."

দাক্ষিণাত্য, মগধ, বাঙ্গলা প্রভৃতি দেশে আর্য্য-সমাগমের ইতিহাস এই ভাবে অনুমান করা যাইতে পারে। বেদ যাঁহাদের মধ্যে রচিত হইয়াছিল, সেই দীর্ঘকরোটি আর্য্যগণ পঞ্জাব এবং হিন্দুস্থানের কতকাংশে উপনিবেশ-স্থাপন করিবার পর তরু-মকান এবং পামীর প্রদেশ হইতে আর্য্যভাষী প্রশস্তকরোটি আর এক দল আগন্তুক আফগানিস্থান এবং হিন্দুকুশ প্রদেশ অধিকার করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে, এবং ক্রমে গান্ধার, আনর্ত্ত, সৌরাষ্ট্র, অবন্তী, মগধ, অঙ্গ, অধিকার করে। উত্তরকালে ইহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হইলে, ইহারা দাক্ষিণাত্যে, উড়িষ্যায় এবং বাঙ্গলায় বিস্তৃত হইয়া পড়ে। উড়িয়া, বাঙ্গালা, এবং বিহারী ভাষা মাগধী প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন। আচারাঙ্গসূত্রোক্ত বর্দ্ধমানের রাঢ়-ভ্রমণকাহিনী-পাঠে মনে হয়, খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দ হইতে মিথিলা, মগধ এবং অঙ্গ হইতে ঔপনিবেশিকগণ যাইয়া বাঙ্গলায় বসতি করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দে বাঙ্গালী শৌর্য্যে বীর্য্যে শিল্পবাণিজ্যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

শাস্ত্রী মহাশয় রিসলি সাহেবের মতানুসরণ করিয়া বাঙ্গালী সাধারণকে মোঙ্গল-দ্রাবিড়-বংশোদ্ভব বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া থাকিলেও, ব্রাহ্মণগণকে উহার সামিল করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন,—"৭৩২ খ্রীঃ অব্দে যখন যশোবর্ম্মদেব কনোজের রাজা, বৈদিকচূড়ামণি ভবভূতি তাঁহার রাজকবি, সেই সময়ে বঙ্গদেশের কোন রাজা বৈদিকযজ্ঞের জন্য তাঁহার নিকট ব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠান। সেই যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ বাঙ্গালা দেশে আসেন, তাঁহাদের হইতেই বাঙ্গালাদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের দৃঢ়ভিত্তি স্থাপিত হয়। ইহার পূর্ব্বেও অনেকবার এদেশে ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন বলিয়া, শুনিতে পাওয়া যায়"। (২৯ পৃঃ) "রিস্‌লি সাহেবের অনুসরণ করিয়া মাথার আকারকে যদি জাতির উৎপত্তির প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে, বাঙ্গালীর রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণকে যশোবর্ম্মদেবের প্রেরিত পাঁচ জন ব্রাহ্মণের বিশুদ্ধশোণিত বংশধর বলিয়া স্বীকার করা যায় না। রিস্‌লি সাহেব ৬৮ জন পূর্ব্ববঙ্গের ব্রাহ্মণের মাথা মাপিয়াছিলেন। তন্মধ্যে শতকরা ১৩ জন দীর্ঘকরোটী (dolichocephalic); ৫২ জন মধ্যমকরোটি (mesocephalic); এবং ৩৫ জন প্রশস্তকরোটি (brachycephalic)। পূর্ব্বোক্ত "বাঙ্গালীতত্ত্ব" নামক প্রবন্ধের টীকায় স্বতন্ত্রভাবে বারেন্দ্র এবং রাঢ়ী ব্রাহ্মণের মাথা মাপার ফল দেওয়া হইয়াছে। সেখানে দেখা যাইবে, রাঢ়ী, বারেন্দ্র, এবং বৈদিক ব্রাহ্মণের মধ্যে বিভিন্ন আকারের মাথার অনুপাত প্রায় ঐরূপ। তৎপরে আমি ভাটপাড়ায়

যাইয়া শ্রদ্ধাভাজন পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের সাহায্যে ৫০ জন পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণের মাথা মাপিয়াছিলাম। তাঁহাদের মধ্যে শতকরা ৬ জন দীর্ঘকরোটি, ৪৮ জন মধ্যমকরোটি এবং ৪৬ জন প্রশস্তকরোটি। পক্ষান্তরে, হিন্দুস্থানী এবং বিহারী ব্রাহ্মণের মধ্যে শতকরা ৭২ জন দীর্ঘকরোটি; ২৫ জন মধ্যমকরোটি; এবং ৩ জন মাত্র প্রশস্তকরোটি। সুতরাং মাথার আকারের হিসাবে বলিতে গেলে বলিতে হয়, বাঙ্গালার সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণের শরীরে দীর্ঘকরোটি কনৌজীয়া ব্রাহ্মণের শোণিত অপেক্ষা প্রশস্ত বা মধ্যমকরোটি বাহ্যদেশীয় আর্য্য-শোণিতের পরিমাণ অধিক। কনৌজের রাজা যশোবর্ম্মা যে বঙ্গদেশের কোনও রাজা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া বাঙ্গালায় পাঁচ জন ব্রাহ্মণ পাঠাইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ কি? অবশ্যই বিনা প্রমাণে শাস্ত্রী মহাশয় এত দৃঢ়স্বরে এ কথা কখনই বলেন নাই। আমার সেই প্রমাণ দেখিবার জন্য বিশেষ উৎসুক রহিলাম। সাঁওতাল এবং ওরাওঁগণের পূর্ব্বপুরুষদিগের জ্ঞাতিগণ খুব সম্ভব বাঙ্গালার আদিম অধিবাসী ছিল। এই আদিম অধিবাসিগণের সহিত প্রশস্তকরোটি বা মধ্যমকরোটি আর্য্যভাষাভাষী আগন্তুকগণের মিশ্রণে বাঙ্গালীর উৎপত্তি। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী কোচগণের মধ্যে মোঙ্গল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ইহাদের আচার ও খাঁটি বাঙ্গালী হিন্দুর আচার হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র। কোচ্-রাজবংশী ছাড়িয়া দিলে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণেতর সকল বাঙ্গালীকে একই আকৃতিক জাতির (raceএর) সামিল মনে করা যাইতে পারে। কনৌজ হইতে পাঁচজন কেন, হয়ত পাঁচ সহস্র ব্রাহ্মণ আসিয়া বাঙ্গালার আদিম ব্রাহ্মণগণের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন কিন্তু এইরূপ মিশ্রণের ফলে বাঙ্গালীর আকৃতির যাহা বিশেষত্ব অপেক্ষাকৃত চৌড়ামাথা তাহার কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। কেহ কেহ বলিতে পারেন, কনৌজ হইতে আগত দীর্ঘকরোটি ব্রাহ্মণগণের বংশধরগণের মস্তক বাঙ্গালার জলবায়ুর প্রভাবে চৌড়া হইয়া গিয়াছে। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে সকল মাথাই চৌড়া হইত, কতক চৌড়া, কতক লম্বা হইত না। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণই হউক আর শূদ্রই হউক সকলেই আকারে, সুতরাং মূলে একজাতীয়। শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গালীর ইতিহাসে আধুনিক মানববিজ্ঞানের অনুসন্ধানফল লিপিবদ্ধ করিতে যত্ন করিয়া উৎসাহের পরিচয় দিয়াছেন। রিসলি সাহেবের 'রিপোর্ট' প্রকাশের পরে এ বিষয়ে কে কোথায় কি লিখিয়াছেন, তাহা একটু খুঁজিয়া দেখিয়া লইয়া, লিখিলে এবং ব্রাহ্মণকে অপরাপর জাতির বাঙ্গালী হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন না করিলে, তাঁহার বিরুদ্ধে আমাদের কোনও অভিযোগ থাকিত না।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

বিধাতার বিড়ম্বন।

—:•:—

প্রথম পরিচ্ছেদ।—আরম্ভ।

পুরুষকারে বিদ্যা-অর্জ্জন হয়, পুরুষকারে ধর্ম্ম-অর্জ্জন হয়, পুরুষকারে অর্থ-অর্জ্জন হয়, কিন্তু পুরুষকারে চিরবাঞ্ছিত দাম্পত্যসুখার্জ্জন হয় না। এইখানে অদৃষ্টবাদি দিগের জয়।

সচরাচর মনুষ্যজীবনের পূর্ব্বাহ্ন প্রাতঃসূর্য্যরশ্মিতে উজ্জ্বল থাকে, কিন্তু আমার তাহা ঘটে নাই। বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের প্রারম্ভ অন্ধকারময় ছিল; নৈরাশ্য, নিরুৎসাহ ও নিরানন্দ আমার জীবনকে অধিকার করিয়াছিল। একদিন বাল্য-কালে আমি অসীম আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহা ক্ষণকালের জন্য। সে আমার বিবাহের দিন। পরে জীবনটা আবার অন্ধকার-ময় বিজন অরণ্য হইল।

আমি সামান্য গৃহস্থের সন্তান ছিলাম বটে, কিন্তু আমার দুইটা বিষয়ে বড় অহংকার ছিল। প্রথমতঃ, আমি ব্রাহ্মণ, কুলীনশ্রেষ্ঠ; দ্বিতীয়তঃ, আমি এই বাঙ্গালা মুলুকের এক প্রধান জমীদারের বংশজাত।

আমার পিতামহকে চরিত্রদোষের জন্য তাঁহার পিতা গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। পিতামহ পশ্চিমে এলাহাবাদে প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতে থাকেন; সেখানে এক গৃহস্থের কন্যাকে বিবাহ করেন। বিবাহের পাঁচ ছয় বৎসর পরে আমার পিতার জন্ম হইল। তাহার আট মাস পরে পিতামহের মৃত্যু হইল। আর উহার চার মাস পরে পিতামহীর মৃত্যু হইল। পিতা এক বৎসরমাত্র বয়ঃক্রমকালে পিতৃমাতৃ-হীন হইলেন। তাঁহার মাতামহ তাঁহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন; তাঁহাকে লেখাপড়া শিখাইয়া, যথাকালে তাঁহার বিবাহ দিলেন। পিতার যখন পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রম, তখন তাঁহার মাতামহের মৃত্যু হইল। এই সময় হইতে পিতা, আমার মাতুলের সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলেন—সামান্য ব্যবসায়—এই সময় আমার জন্ম হইল। এই জন্য আমাদের পূর্ব্ব পরিচয় কেহ জানিতে পারে নাই।

বাল্যকাল হইতে আমি বড় রুগ্ন ছিলাম—কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পীড়ার উপশম হইতে লাগিল। ছয় বৎসর বয়সে স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। রুগ্নাবস্থায়ও

আমি আমাদের শ্রেণীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলাম, এবং প্রতি বৎসর সর্ব্বোচ্চ পারিতোষিক পাইতাম। নবম বৎসর বয়সে আমার উপনয়ন হইল। এই উপলক্ষে পিতা যথাসাধ্য খরচপত্র করিলেন, কেন না, আমি তাঁহার একমাত্র পুত্র, বড় আদরের ছেলে ছিলাম। আমার যখন তের বৎসর বয়ঃক্রম হইল, তখন হইতে আমার জীবনে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সচরাচর মনুষ্যজীবনে ঘটে না। সেই ঘটনাগুলি এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকায় প্রকটিত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।—বর্ষীয়ান্।

আমার যখন তের বৎসর বয়স, তখন একদিন আমার মাতুলানীর সাধ হইল যে, বৈশাখ মাসে বিশ্বেশ্বরের মাথায় গঙ্গাজল ও বিল্বপত্র অর্পণ করিবেন। সুতরাং চৈত্রমাসের শেষে আমরা সকলে কাশীতে উপস্থিত হইলাম। বিশ্বেশ্বরের মাথায় জল ঢালিতে ঢালিতে মামীর আর একটা সাধ হইল—বিন্ধ্যাচলের বিন্ধ্যবাসিনী-দর্শন। তখনই তাহার বন্দোবস্ত হইল। পিতা, মাতা ও মাতুলানীকে লইয়া বিন্ধ্যাচলে গেলেন। মাতুল ও আমি কাশীতেই রহিলাম।

আমি প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া দশাশ্বমেধ ঘাটের নিকট বেড়াইতাম। সেখানে একটী প্রাচীনের সহিত আমার দেখা হইত। তিনি প্রতিদিন গঙ্গাস্নানে আসিতেন; পশ্চাতে এক জন চাকর, কোশাকুশি, একখানি আসন ও তাঁহার কাপড় লইয়া আসিত। আমি তাঁহাকে প্রত্যহ দেখিতাম—একাগ্রচিত্তে দেখিতাম, কিন্তু কেন যে এরূপ করিতাম, তাহা তখন বুঝি নাই, এখন বুঝিয়াছি। কোনও কোনও ব্যক্তির কার্য্যের প্রভাব, অপরের জীবনকে কখনও সুখময়, কখনও বা দুঃখময় করে। এই প্রাচীনের কার্য্যের প্রভাব আমার জীবনকে ঐরূপ কি একটা করিয়াছিল, তাহা এই আখ্যায়িকায় প্রকাশ পাইবে। আমি যেমন ঐ বৃদ্ধটিকে অনিমিষচক্ষে দেখিতাম, তিনিও আমাকে ঐরূপ দেখিতে দেখিতে যাইতেন। একদিন অতি প্রত্যূষে সদরদরজা খুলিতেছি, এমন সময় রাস্তায় একটা গোলমাল শুনিয়া উঁকি মারিয়া দেখি যে, সেই প্রাচীনটিকে একটা দুরন্ত ষাঁড় তাড়া করিয়াছে। আমি দৌড়িয়া যাইয়া তাঁহাকে টানিয়া আনিয়া আমাদের দরজার ভিতর প্রবেশ করিলাম। প্রাচীনটি রক্ষা পাইলেন বটে, কিন্তু ঐ ষাঁড়টা একটি স্থূলকায় অর্দ্ধবয়সী স্ত্রীলোককে পদদলিত করিয়া পলাইল। স্ত্রীলোকটিকে এরূপ জখম করিয়াছিল যে, তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইতে হইল। আমাদের দরজা হইতে প্রাচীন তাহা দেখিয়া, আমাকে দাড়ি ধরিয়া বড় আদর করিলেন,

এবং আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে আমার মাতুল গোলমাল শুনিয়া, নীচে নামিয়া আসিলে, তাঁহাকে বলিলেন, "এই বালকটি আজ আমার জীবন রক্ষা করিয়াছে, এটি আপনার কে?" উত্তরে মাতুল বলিলেন, "আমার ভাগ্‌নে।" প্রাচীন বলিলেন, "বড় সুন্দর ছেলে, বড় বুদ্ধিমান্, আর ইহার কপালে রাজদণ্ড রহিয়াছে, বড় ভাগ্যবান্ হইবে।" পরে বৃদ্ধ আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মাতুল আমার পিতামহের নাম ও তিনি যে বাঙ্গালাদেশ হইতে এলাহাবাদে বাস করিতেছিলেন, সে সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। প্রাচীন উহা শুনিয়া কিছুক্ষণ কি ভাবিলেন, পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলেটি লেখাপড়া করিতেছে কেমন?" মাতুল আমার যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। প্রাচীন বলিলেন, "ভাল, ভাল, বেঁচে থাক্, বেঁচে থাক্।" পরে তাঁহার চাকর গাড়ী আনিলে, গাড়ীতে উঠিবার সময় আবার আমাকে আদর করিলেন। আমি তাঁহার পদধূলি লইলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।—'ওঠ ছেলে' তোর বিয়ে।

অদ্য আমাদের বাটীর সম্মুখে একটি বাঙ্গালীর বাটীতে বিবাহ উপলক্ষে বড় ধুমধাম হইতেছিল। আমি সন্ধ্যার সময় বারাণ্ডায় বসিয়া তাহা দেখিতেছিলাম, এমন সময় আমাদের দরজার সম্মুখে একখানি গাড়ি থামিল। কে এক জন আমাদের দরজায় করাঘাত করিতে লাগিল। আমি অতিক্রুত যাইয়া দেখিলাম, আমাদের চাকর দরজা খুলিয়া দিয়াছে, আর সেই বৃদ্ধটি লাঠীর উপর ভর দিয়া আসিতেছেন, এবং তাঁহার খানসামাটি দরজার নিকট দাঁড়াইয়া আছে। আমাকে দেখিয়া বর্ষীয়ান্ লাঠী ফেলিয়া দুই হাত তুলিলেন, যেন আমাকে আলিঙ্গন করিবেন। আমি ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার পদধূলি লইলাম। তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাবা ও মা বাড়ী আসিয়াছেন?" আমি বলিলাম "না, অদ্যাপি আসেন নাই।" প্রাচীন একটু বিমর্ষ হইলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার মামা কোথায়?" আমি বলিলাম, "উপরে, তাঁহার ঘরে।" তিনি বলিলেন, "তবে চল, তাঁহার সহিত দেখা করিব।" এই বলিয়া আমার সঙ্গে উপরে গেলেন। আমি তাঁহাকে আমাদের ঘরে একখানি আসন পাতিয়া বসাইয়া, মামাকে সংবাদ দিলাম। মাতুল তখন ঐ দিবসের বাজার-খরচের হিসাব লিখিতেছিলেন। কিন্তু হিসাব মিলাইতে পারিতে-ছিলেন না বলিয়া বিরক্ত হইয়া আমাকে বলিলেন "যা, আমি এখন যাব না। আমার হিসাব না মিলিলে, আমি যাব না।" আমি বলিলাম, "মামা ক'টা পয়সার

বাজারখরচ যে; হিসাব মিলাইতে পারিতেছেন না; আপনি আসুন, প্রাচীন বসিয়া আছেন।" মাতুল আসিলে, অন্যান্য কথার পর, বৃদ্ধ, মামাকে বলিলেন, "আমি বড় বিপন্ন হইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি।"

মামা। আজ্ঞা করুন, আমাকে কি করিতে হইবে?

প্রা। অদ্য রাত্রে আমার পৌত্রীর বিবাহের দিন স্থির ছিল; কিন্তু বিধাতা বড় বিড়ম্বনা করিয়াছেন।

মামা। কি হইয়াছে?

প্রা। কলিকাতার এক জন মহাধনাঢ্য ব্যক্তির পুত্রের সহিত বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলাম। তাহার পিতামাতা তাহাকে লইয়া আজ দুই দিবস এখানে আসিয়াছেন। গাত্রহরিদ্রা আভ্যুদয়িক প্রভৃতি হইয়া গিয়াছে। সকলই গোপনে হইয়াছে, কেন না, আমার ইচ্ছা ছিল, গোপনে বিবাহ হয়। পাত্রের পিতা ধনী হইলেও তাহাতে আপত্তি করেন নাই, কেন না, তাঁহার পুত্র এই বিবাহসূত্রে অনেক বিষয়ের অধিকারী হইবে। আমার পৌত্র নাই, ঐ একমাত্র পৌত্রী। কিন্তু বিধাতা বাদ সাধিলেন, সে পাত্রের সহিত বিবাহ হইল না।

মামা। কেন?

প্রা। এইমাত্র সংবাদ পাইলাম যে, পাত্রটি তাহাদের বাসার বারাণ্ডার ভাঙ্গা রেল ধরিয়া কি দেখিতেছিল, সেই সময় হঠাৎ পড়িয়া গিয়াছে।

মামা। আরোগ্য হইলে বিবাহ হইবে। ভগবান তাহাকে অচিরাৎ আরোগ্য করিবেন।

প্রা। সে আশা নাই। ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, পাত্রটির জীবন শেষ হইয়াছে।

এই কথায় মামা শিহরিয়া উঠিলেন, আমিও শিহরিয়া উঠিলাম। কিছুক্ষণ উভয়ে নীরব রহিলেন। পরে মামা বলিলেন, "আবার পাত্র অনুসন্ধান করুন। পুনরায় আভ্যুদয়িক প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিয়া বিবাহ দিবেন।" প্রাচীন বলিলেন, "না, তা' হইতে পারে না। আমাদের বংশে এইরূপ ঘটনা আর একবার ঘটিয়াছিল, পুনরায় আভ্যুদয়িক করিয়া অন্য পাত্রের সহিত বিবাহ দেওয়া হয়, তাহাতে ত্রি-রাত্রের মধ্যে গৃহস্বামীর মৃত্যু হইয়াছিল। সুতরাং অদ্য রাত্রেই বিবাহ দিব, স্থির-সঙ্কল্প হইয়াছি।

মামা। আমাকে কি করিতে হইবে? আমার সন্ধানে ত এমন পাত্র নাই যে, অদ্য রাত্রেই তাহার সহিত বিবাহ হইতে পারে।

প্রা। আছে বৈ কি? এই আপনার ভাগিনেয়ের সহিত বিবাহ দিতে ইচ্ছা করি। কি বলেন?

মামা। (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া)—উহার পিতামাতা এখানে নাই। তাঁহাদের বিনা অনুমতিতে কিরূপে বিবাহ হইতে পারে? আর আমার ভাগিনের ত বালক।

প্রা। আমি বড় বিপদগ্রস্ত হইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। আর এই সুন্দর ছেলেটিকে আমি বড় ভালবাসিয়াছি। উহাকে কখনও চাকরী বা ব্যবসা করিয়া খাইতে হইবে না। পণস্বরূপ অনেক টাকা দিব, বহুমূল্যের সোনার ঘড়ি চেন দিব, বহুমূল্যের হীরার আংটী দিব। আসুন—আমার সহিত, আসুন—লগ্ন উত্তীর্ণ হইয়া যায়—আর বাক্যব্যয় করিবেন না।”

মামা লোভে পড়িয়া অগত্যা স্বীকার করিলেন।

প্রা। তবে শীঘ্র আমার সহিত পাত্র লইয়া আসুন—দরজায় গাড়ী উপস্থিত। বিলম্বে লগ্ন উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে।

মামা। আমি একটা বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত আছি, সেটা শেষ না করিয়া যাইতে পারিতেছি না।

প্রা। হরিবোল! হরি! তবে কি হইবে? আমি পাত্র লইয়া যাই, আপনি আপনার কার্য্য শেষ করিয়া যাইবেন।

এই বলিয়া, প্রাচীন মামাকে বিবাহ-স্থানের ঠিকানা বলিয়া দিয়া, আনন্দ-সহকারে আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, “ওঠ ছেলে, তোর বিয়ে।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।—বিবাহ।

বর্ষীয়ানের সহিত আমি গাড়ী চড়িয়া গড়্ গড়্ করিয়া চলিলাম। চারি দিক হইতে দেবমন্দিরের আরতির শঙ্খ, ঘণ্টা ও কাঁসরের শব্দে নগরে একটা কোলাহল উঠিল। দূর হইতে নহবৎ ও রৌসনচৌকির মধুর রাগরাগিণীর আলাপ কর্ণগোচর হইতেছিল। এই ধূমধামের মধ্যে আমি কেরাঞ্চি গাড়ী চড়িয়া গড়্ গড়্ করিয়া বিবাহ করিতে চলিলাম। ইহা কি শুভ নয়? প্রাচীন গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া কি ভাবিতেছিলেন, আমিও ভাবিতেছিলাম। এ বিবাহে আমার তিলমাত্র আনন্দ হয় নাই। যে পিতামাতার আমি সর্ব্বস্ব ধন, যে পিতামাতা আমাকে আজও বুকে টিপিয়া রাখেন, যে পিতামাতা আমার মাথা ধরিলে অন্ধকার দেখেন, তাঁহারা কোথায়? তাঁহারা ত কিছুই জানিতে পারিলেন না। এই সকল ভাবিতেছিলাম—ইতিমধ্যে একটা অন্ধকার গলির

মধ্যে গাড়ী থামিল। খানসামা কোচ্‌বক্স্‌ হইতে নামিয়া গাড়ীর দরজা খুলিল। প্রাচীন নামিলেন, আমাকেও নামিতে বলিলেন; পরে তিনি আমার হাত ধরিয়া চলিলেন। 'কিন্তু এ কি সুসজ্জিত বিবাহপুরী, না সমাধিমন্দির? চারি দিক অন্ধকার। মাটীর প্রশস্ত উঠানে দুইটি অশ্বত্থবৃক্ষ থাকাতে বাড়ীটি আরও অন্ধকার হইয়াছে। কোথাও একটীও জনমানব নাই। খানসামা নিঃশব্দে একটী গুপ্ত দ্বারে আমাদের লইয়া গিয়া, উহার চাবি খুলিল। আমরা গৃহে প্রবেশ করিলাম। প্রাচীন আমার হাত ধরিয়া একটি ঘরে প্রবেশ করিয়া একখানি আসন দেখাইয়া বসিতে বলিয়া চলিয়া গেলেন। এই ঘরটীতে অনেকগুলি আলোক ছিল; সেই জন্য উহা আলোকময়। আমি আসনে বসিয়া দেখিলাম, সম্মুখে এক দেবীমূর্ত্তি। ইনি কি জগদ্ধাত্রী? না, জগদ্ধাত্রী যে সিংহবাহিনী। ইনি পদ্মাসনা। জগদ্ধাত্রী যে চতুর্ভুজা, ইনি যে দ্বিভুজা। জগদ্ধাত্রী ত্রিনয়না। ইনি যে দ্বিনয়না। জগদ্ধাত্রী ত বালার্কজ্যোতির্ম্ময়ী, ইনি যে হেমপ্রভা। আমি একাগ্রচিত্তে দেবীমূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া রহিলাম। ক্রমে বোধ হইতে লাগিল তখন তিনি হাসিতেছেন। আমি বালক, বড় মনঃকষ্টে বিবাহ করিতেছি, দেবী যেন উহা বুঝিতে পারিয়া আমাকে অভয় দিতেছেন। আমি ভূমিষ্ঠ হইয়া দেবীর নিকট বর চাহিলাম, যেন পিতামাতা আসিয়া, এই বিবাহের সংবাদে আমার প্রতি বিরক্ত না হন। যেন আমি এ বিবাহে সুখী হই। দেবী যেন প্রসন্ন হইয়া মৃদুমন্দ হাসি হাসিলেন। আমার বিষাদ অন্তর্হিত হইল। এমন সময় নেপথ্যে অলঙ্কারের ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম। একটী সুসজ্জিতা অনুপমা সুন্দরী মন্থরগমনে আমার দিকে আসিতেছেন। ইনিই আমার কনে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার পিতামহ (সেই প্রাচীন) ও পুরোহিত আসিয়া আপন আপন আসনে বসিলেন। পিতামহ যখন কন্যার রত্নালঙ্কারভূষিত কোমল ও সুগোল বাহুযুগল আমার হাতের উপর রাখিয়া সম্প্রদান করিলেন, তখন বুঝিলাম, এই বালিকা অসামান্যা সুন্দরী। তার পর, যখন শুভদৃষ্টি হইল, তখন জানিলাম, এই বালিকা অদ্ভুত সুন্দরী। আনন্দে শরীর পুলকিত হইল। লজ্জা সরম ত্যাগ করিয়া অনিমেষনেত্রে আমার পত্নীকে দেখিতে লাগিলাম। বুড়ো পিতামহ বড় তুষ্ট, আমার আনন্দ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া, আমাকে বলিলেন, "কি হে? কি দেখ্‌ছ? এত রূপ কি কখনও দেখ নাই?" আমি লজ্জায় মুখ নত করিলাম। পরে পিতামহ আমার স্ত্রীকে বলিলেন, "সেই আঙটিটি কোথায়?" আমার বালিকা পত্নী তাহার অঙ্গুলী হইতে একটি আঙ্‌টি খুলিয়া

দিল। আঙটিটী বিলাতী কারিগরের দ্বারা গঠিত, উহার পালিশ্ বড় সুন্দর। উহার উপর একটী মূর্ত্তি ক্ষোদিত ছিল। পিতামহ বলিলেন, "তুমি উহা তোমার বরের আঙ্গুলে পরাইয়া দাও।" আমার স্ত্রী তাহাই করিল। পরে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইলে সকলে উঠিয়া গেলেন। কেবলমাত্র আমার স্ত্রী ও আমি রহিলাম। আমার স্ত্রীকে দেখিতে দেখিতে, তাহার সহিত কথা কহিবার বাসনা জন্মিল। কিন্তু কি কথা কহিব, তাহা স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। ঐ ঘরের কোণে একটী প্রকাণ্ড জালা ছিল, তাহার বর্ণ প্রস্তরের ন্যায় কালো, উহার গলায় এক ছড়া ফুলের মালা ছিল। আমি অঙ্গুলি দ্বারা স্ত্রীকে ঐ জালা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "উহা কোন্ ঠাকুর ?" আমার স্ত্রী সেই দিকে মুখ ফিরাইয়া, একবার দেখিয়া, যেন মৃদু মৃদু হাসিলেন। আমি নাছোড়বন্দা, কথা কহাইব, পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই কি কাশীর তিলভাণ্ডেশ্বর ?" আমার স্ত্রী এবার খুব হাসিলেন। সে হাসির শব্দ নাই, কেবল অধরোষ্ঠের ভঙ্গী দেখিয়াই বুঝিলাম যে, বড় হাসি হাসিতেছেন। কথাটা নিশ্চয়ই বড় নির্ব্বোধের ন্যায় হইয়াছিল, বড় অপ্রতিভ হইয়া বসিয়া রহিলাম ; ভাবিলাম, প্রথম বাক্যালাপে স্ত্রীর নিকট ষ্টুপিড্ ফুল (Stupid fool) হইলাম কি কৌশলে আমার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিব ? এমন সময়ে দুইটি প্রাচীনা আসিলেন এক জন বলিলেন, "ও মা, কনে এত হাসিতেছে কেন গো ? হ্যাঁ বর, তুমি কি কিছু বলেছ নাকি ?" আমি কোনও উত্তর করিলাম না। প্রাচীনাদ্বয় আমার স্ত্রীকে বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তিনি কোনও উত্তর দিলেন না ; হাসি সংবরণ করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম, কেন না, যে কথায় আমার নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় হইবে, তাহা তিনি চাপিয়া রাখিলেন। আদুরে মেয়ে বড় হাসি হাসিয়া ঘামিতেছিল। সে জন্য প্রাচীনাদ্বয় তাহাকে বাহিরে লইয়া গেল, আমিও উঠিলাম।

আমি বাহিরে যাইতে একটা ঘরে দুই জনের কথোপকথন শুনিতে পাইলাম। শুনিয়া আমার বিবাহে যে আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা অন্তর্হিত হইল। ঐ দুই ব্যক্তির মধ্যে এক জনকে গলার স্বরে চিনিলাম যে, তিনি সেই বর্ষীয়ান্ পিতামহ। অপর ব্যক্তিকে অনুভবে বুঝিলাম, তাঁহার পুত্র—আমার শ্বশুর। কথোপকথনের শেষাংশ এই :—

পুত্র।—আপনি বলিয়াছিলেন যে, এই নগরে কোনও ধনাঢ্য ব্যক্তি প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতেন, তাঁহার একমাত্র পুত্রের সহিত আমার কন্যারবিবাহ দিবেন।

এই বলিয়া আমার কন্যাকে লইয়া আসিলেন। এখন বিবাহ দিয়া বলিতেছেন যে, সে পাত্রটি ব্যবসাদারের ছেলে, অর্থাৎ দোকানদারের ছেলে। কেন আমার কন্যাকে হাত পা বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া দিলেন?

পিতা।—না, তোমার কন্যাকে বড় ঘরে দিয়াছি. কিন্তু এখন তাহার পরিচয় দিতে পারিতেছি না।

তার পর পিতামহ মৃদুস্বরে কি বলিলেন, তাহা আমি শুনিতে পাইলাম না। কিন্তু আমার শ্বশুর তদুত্তরে যাহা বলিলেন, তাহা শুনিতে পাইলাম। তিনি বলিলেন, "কাহার সহিত বিবাহ হইয়াছে, তাহা আমাদের কথনও জানাইবেন না, কিংবা আমাদের পরিচয় পাত্রদের অবগত করাইবেন না। যদি করেন, তাহা হইলে আপনি নিঃসন্তান হইবেন। অদ্য হইতে আমার কন্যা বিধবা হইল। আমার কন্যাকে দেশে লইয়া চলিলাম।" পিতামহ বলিলেন, "ভাল, আমার সহিতও আর দেখা হইবে না।" কিঞ্চিৎ পরে গাড়ীর শব্দে বুঝিতে পারিলাম যে, শ্বশুর তাঁহার কন্যাকে লইয়া গেলেন। তাহার অনতিবিলম্বে পিতামহ আমাকে লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। আমাকে বলিলেন, "তোমার শ্বশুর আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন।" আমি বলিলাম, "পিতার উপর পুত্র বিরক্ত হয়, এ ত কথনও শুনি নাই।" প্রাচীন বলিলেন, "কথনও কথনও পিতার কার্য্যে পুত্র অসন্তুষ্ট হয় বৈ কি। আমি তাহার অনভিমতে তোমার সহিত তাহার কন্যার বিবাহ দিয়াছি। তোমাকে বড় ভালবাসি, সেইজন্য আমার বড় সাধ হইয়াছিল, আমার পৌত্রীর সহিত তোমার বিবাহ হয়। সে কারণে আমার পুত্রের সহিত কিছু প্রতারণা করিয়াছি, অর্থাৎ তোমাদের অবস্থা তাহাকে জ্ঞাত করাই নাই। যাহা হউক, ভায়া, এ বিবাহটা তুমি ভুলিয়া যাও। আবার বিবাহ করিও। কুলীনের সন্তানের বহু-বিবাহে দোষ নাই। আর পণ দানসামগ্রী যাহা তোমার প্রাপ্য, তাহা বিবাহের সময় দেওয়া হয় নাই, এই পুঁটুলির মধ্যে আছে, উহা লও।" এই বলিয়া প্রাচীন আমার হস্তে একটী পুঁটুলি দিবার জন্য হাত তুলিলেন। আমি "গ্রহণ করিব না" বলিয়া তাঁহার হাত সরাইয়া দিলাম। আমার মনে যে কি একটা বিপ্লব উপস্থিত হইল, তাহা বুঝাইতে পারিব না। আমি হীনাবস্থার পাত্র, দোকানদারের ছেলে, ঐ কন্যার যোগ্য পাত্র নহি, সেই জন্য শ্বশুর আমাকে ত্যাগ করিলেন, এই অপমানে [illegible] ক্রোধ উপস্থিত হইল। আবার ইহার অন্তরালে একখানি চাঁদপানা মুখ উঁকি মারিতেছিল। অপমানের ও ক্রোধের সঙ্গে সঙ্গে বিষাদ জন্মিল। এ জীবনে আমার কেহ সঙ্গী ছিল না, একাকী থাকিতাম, এই সুন্দরী বালিকাকে বিবাহ

করিয়া মনে মনে আশা করিয়াছিলাম যে, ইনিই আমার জীবনে মরণে সঙ্গিনী হইবেন। একত্র পড়িব, একত্র খাইব, একত্র খেলাইব, কিন্তু তাহা হইল না। এ জীবনে আর তাহাকে পাইব না। হরিষে বিষাদ জন্মিল। চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল। অন্ধকারে গাড়ীর কোণে মুখ লুকাইয়া, পিতামহের অজ্ঞাতে কাঁদিতে লাগিলাম, গভীর দুঃখে নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলাম। এমন সময় গাড়ী আমাদের দরজায় থামিল। চাকর দরজা খুলিল। আমি গাড়ী হইতে লাফ দিয়া একেবারে দোতালায় গিয়া আমার ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিলাম। পিতামহের গলার শব্দ শুনিলাম—মাতুলের সহিত কথা কহিতেছেন। উহা শুনিবার ইচ্ছা ছিল না। দারুণ অপমানে ঐ প্রাচীনের প্রতি ক্রোধ উপস্থিত হইয়াছিল। কতক্ষণ পরে যে ঘুমাইলাম, মনে নাই। অতি প্রত্যুষে যেমন প্রতিদিন নিদ্রা ভাঙ্গিয়া থাকে, অদ্যও সেইরূপ হইল। বারাণ্ডায় গিয়া বসিলাম। সেই প্রাচীন অদ্য গঙ্গাস্নানে আসিলেন না, পরদিনও আসিলেন না; তাহার পরদিনও আসিলেন না। বুঝিলাম, কাশী ত্যাগ করিয়া তিনি অন্য কোনও স্থানে গিয়াছেন।

তিন চারি দিবস পরে পিতা, মাতা ও মাতুলানী আসিলেন। তাঁহারা আসিবামাত্র মাতুল আমার বিবাহের সংবাদ দিলেন। মাতা চীৎকার করিয়া বলিলেন, "দাদা, আমার বউ কৈ?" তখন মাতুল সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিলেন। দোকানদারের ছেলে বলিয়া, তাঁহাদের ছেলেকে শ্বশুর ত্যাগ করিয়াছেন, শুনিয়া মাতা অঞ্চল দ্বারা চোখের জল মুছিলেন। পিতা ক্রোধান্বিত হইয়া মামাকে বলিলেন, "এই জমীদারের নাম ধাম আমাকে বল। আমি নালিশ করিয়া আমার পুত্রবধূ ঘরে আনিব।" তখন মামা একটা "ওঃ" শব্দ করিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। "তাই ত 'তাই ত' বড় ভুল হ'য়েছে, পরিচয়টা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।" পিতা বলিলেন, "কেন?" মামা বলিলেন, "কি জান, আমি তখন বড় ব্যস্ত ছিলাম, ঐ দিনের বাজার খরচের হিসাবটা মিলাইতে পারিতেছিলাম না, দুইটা পয়সার গরমিল হইতেছিল।"

পিতা।—'আচ্ছা, বিবাহের পর সে ব্যক্তি যখন ছেলে পঁহুছিয়া দিয়া গেল, তখন ত তাহাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে পারিতে।

মামা।—তখন যে আমি নোট গুণিতেছিলাম। তোমার ছেলেকে পণস্বরূপ এক কাঁড়ি নোট দিয়া গিয়াছিল, আমি তাহাই গুণিতেছিলাম।

পিতা বিরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইলেন। মামী অন্তরাল হইতে কি বলিলেন,

বোধ হয়, ভৎর্সনা করিলেন। মামা বলিলেন, "বটে! দশ টাকা করিয়া পাঁচ হাজার টাকার নোট গণনা করা কি সহজ কায?" এই বলিয়া এক বাণ্ডিল নোট ও বহুমূল্যের সোনার ঘড়ি ও চেন ও একটী হীরকখচিত আঙটী আনিয়া দিয়া বলিলেন, "এই লও, তোমার ছেলের দানসামগ্রী লও।"

পিতা।—তোমার নিকট রাখ। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমার ছেলেকে যিনি লইয়া গিয়াছিলেন, তিনি কোথায় থাকেন?

মামা।—তা' কি করিয়া জানিব?

পিতা।—(আমার প্রতি চাহিয়া) তুমি কি জান?

আমি।—না, আমি জানি না। তিনি প্রত্যহ গঙ্গাস্নানে আসিতেন; কিন্তু বিবাহের পরদিন হইতে আর আসেন না।

মামা।—দেখ মনোহর, (আমার পিতার নাম মনোহর), বোধ হয়, কোনও জুয়াচোরে জুয়াচুরী করিয়া ছেলেটার সহিত তাহার নাত্নীর বিবাহ দিয়াছে। ছেলেটা বড় সুন্দর কি না দেখিতে,—তাই।"

পিতা মাতুলকে ভাল জানিতেন, সেই জন্য কেবলমাত্র হাসিলেন; কিন্তু মাতুলানী অন্তরাল হইতে মামাকে নানা প্রকার তিরস্কার করিতেছিলেন। মাতুল বলিলেন, "দেখ মনোহর, তোমরা অকারণে গোল করিতেছ। আমি ঐ ছেলেটার দু'শ বিবাহ দিব। কুলীনের সন্তান, দেখিতে সুন্দর, বছর বছর প্রাইজ, পাইতেছে, উহার বিবাহের ভাবনা কি? আমি দু'শ বিবাহ দিয়া এইরূপ প্রতিবার পাঁচ হাজার টাকা করিয়া পণ লইয়া দুই লক্ষ টাকা রোজগার করিব। কেন অকারণে গোলযোগ করিতেছ?" এই কথার পর আমার পিতা ও মাতা ঐ স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। এখন মাতুল ও মাতুলানীতে বচসা হইতে লাগিল।

এইরূপে আমার শুভবিবাহ সমাপ্ত হইল। দুই এক মাস ধরিয়া ঐ কথার আন্দোলন হইল বটে, কিন্তু তাহার পর উহার স্মৃতি পর্য্যন্ত লুপ্ত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।—সর্ব্বমঙ্গলার মন্দির।

লক্ষ্মী চঞ্চলা, সরস্বতী মুখরা—এ কথাটি বড় ঠিক। লক্ষ্মী বামুন কায়েত ত্যাগ করিয়া কখনও কখনও হাড়ী ডোমের ঘরে উঠেন, তাঁহার পাত্রাপাত্র-বোধ নাই। আজকাল দেখিতেছি, সরস্বতীরও পাত্রাপাত্র-বোধ নাই, নহিলে আমার ঘাড়ে চাপিবেন কেন?

চঞ্চলা লক্ষ্মী আবার আমাদের ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমার বিবাহের চারি বৎসর পরে, একদিন পিতা একখানি পত্র পাইলেন যে, তাঁহার মাতুল ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি নিঃসন্তান থাকাতে আমার পিতাকে তাঁহার বিষয় উইল করিয়া দিয়া গিয়াছেন। পিতার মাতুল কলিকাতায় ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রভূত ধনসম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া ভাগীরথীর তীরে, তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান শ্রীনগর গ্রামে, রাজপুরীর ন্যায় অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছিলেন। প্রায় অশীতি বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহার মৃত্যু হইল। তৎপূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছিল। এই সংবাদ পাইয়া আমরা শ্রীনগর যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। মাতুল ও মাতুলানী বলিলেন, "আমরা এখানে থাকিয়া কি করিব ? আমাদের ত আর কেহ নাই। ঐ ছেলেটাই আমাদের সর্ব্বস্বধন, উহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না।" পিতা ও মাতা এই প্রস্তাবে বড় আনন্দিত হইলেন। সুতরাং ব্যবসায় একবারে উঠাইয়া দিয়া দ্রব্যাদি বিক্রয় করিলেন। আমার বয়ঃক্রম তখন অষ্টাদশ বৎসর। ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া Scholarship লইয়া নূতন বাসস্থানে চলিলাম। কলিকাতায় কি কৃষ্ণনগর কলেজে ভর্ত্তি হইয়া B. A. পরীক্ষা দিব, এইরূপ বন্দোবস্ত হইল।

একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বাহ্নে আমরা শ্রীনগর দেখিতে পাইলাম। এলাহাবাদের রেল, ভাগীরথীর পশ্চিমপারে ও শ্রীনগর উহার পূর্ব্বপারে। সুতরাং নৌকাযোগে নদী পার হইতে হইল। আমরা নৌকা হইতে শ্রীনগর দেখিতে পাইলাম। নদীতীরে অসংখ্য শ্বেত অট্টালিকার শ্রেণী ও মন্দিরের চূড়া দেখিয়া বুঝিলাম যে, এই গ্রামে অনেক ধনাঢ্য লোকের বাস। পরে একটা চাঁদনীওয়ালা ঘাটে আমাদের নৌকা ভিড়িল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। রাস্তায় যাইতে যাইতে কাঁসর ঘণ্টা ও খোল করতালের শব্দ শুনিয়া মাতা ও মাতুলানী বড় আনন্দিত হইলেন। পরে আমরা আমাদের বাটীতে পঁহুছিলাম। বাটী দেখিয়া সকলে সন্তুষ্ট হইলেন। এইরূপে আমরা আমাদের শ্রীনগরের গৃহে প্রবেশ করিলাম।

দুঃখের কথা বলিব কি, এই শ্রীনগর গ্রামে আসিয়া আমার বড় অনিষ্ট ঘটিল। পড়াশুনা উৎসন্ন গেল, উহাতে মন একেবারেই ছিল না। খেলিতেও মন ছিল না ; আহারেও মন ছিল না। আমার মনটা (যাহাকে বলে "heart)", অন্যত্র ছিল।

রামচরণ চক্রবর্ত্তী নামে এক জন ব্রাহ্মণ আমাদের বাটীর পার্শ্বে একটি বাটী ভাড়া লইয়া বাস করিতেন। তাঁহার কোথায় নিবাস, কোথা হইতে আসিয়া-

ছিলেন, কেহ জানিত না। তাঁহার পরিবারের মধ্যে তাঁহার স্ত্রী ও এক বালিকা কন্যা,—নাম গিরিজায়া। বালিকার বয়স দশ বৎসর। আমার পিতা ও মাতুলের সহিত রামচরণ বাবুর বিশেষ আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল। আমার মাতা ও মাতুলানীর সহিত তাঁহার স্ত্রীর সেইরূপ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। আমার মাতা তাঁহার মেয়েটিকে আপন কন্যার ন্যায় ভালবাসিতেন। সে সর্ব্বদা আমাদের বাড়ীর নিকটে থাকিত। আমার বড় অনুগত হইয়াছিল। আমার নিকট পড়িত; আমার পাতে খাইত; আমার সঙ্গে বেড়াইত; আমার কাযকর্ম্ম করিত।

একদিন বৈকালে আমাকে গিরিজায়া বলিল, "বাবু মহাশয়, (সে আমাকে এইরূপ সম্বোধন করিত) চলুন না, আজ সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরে আরতি দেখিয়া আসি।" আমি বালিকা গিরিজায়ার সহিত চলিলাম। সে কখনও দৌড়িয়া যাইতেছে, কখনও বা আসিয়া আমার হাত ধরিতেছে। সর্ব্বমঙ্গলার বাটীতে যখন উপস্থিত হইলাম, তখনও সন্ধ্যা হয় নাই; কিঞ্চিৎ বেলা আছে। সেখানে অনেকগুলি প্রাচীনা ব্রাহ্মণকন্যা ও অনেকগুলি বালিকা, আরতি দর্শন জন্য উপস্থিত ছিল। আমি প্রথমে দেবীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া এ দিক ও দিক চাহিলাম। নূতন লোক বলিয়া সকলেই আমাকে দেখিতেছিল। দুইটী সুসজ্জিতা সুন্দরী কিশোরী আমাকে দেখিয়া মুখ ঢাকিয়া প্রাচীনাদের পশ্চাতে সরিয়া বসিল। উভয়েরই পনর বৎসর বয়ঃক্রম হইবে, উভয়েই পরমাসুন্দরী। তন্মধ্যে এক জনের মুখ দেখিলাম—আর ভুলিলাম না। আমি প্রতিদিন গিরিজায়াকে লইয়া সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরে আরতি দেখিতে যাইতাম। ক্রমে ক্রমে ঐ দুইটি কিশোরীর লজ্জার অপনয়ন হইল। আমাকে দেখিলে আর তাহারা মুখাবরণ করিত না। অবশেষে আমার সহিত তাহাদের কথাবার্ত্তাও চলিল। উহাদের এক জনের প্রতি আমার অনুরাগ জন্মিল। এই অপ্সরোনিন্দিত সুন্দরীটী কে—পাঠক পাঠিকারা জানিতে উৎসুক হইয়া থাকিবেন।

ইনি আমাদের দেশের জমীদার পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত আদিত্যমোহন চৌধুরীর একমাত্র কন্যা। বাঙ্গালামুলুকে যে দশটা দিক্‌পাল আছে, তন্মধ্যে আদিত্যবাবুকে একটা দিক্‌পাল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাবুর বৈঠকখানায় দশটা হুঁকা হামে হাল চলিত। আর স্বয়ং বাবু মোসাহেববেষ্টিত মস্‌নদ উপরি বসিয়া সপ্তহস্ত-পরিমিত সট্‌কাতে সর্ব্বদা ধূমপান করিতেন। বাবুর দেউড়ীতে বিশ ত্রিশ জন সিপাহী গিস্‌গিস্ করিত। আস্তাবলে দশ বারটা ঘোড়া। হাতীশালায় দুই চারিটা হাতী থাকিত। আর তাঁহার সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরে প্রহরে প্রহরে নহবৎ বাজিত।

জমীদার-কন্যাকে মালিনী বলিয়া ডাকিত। কিন্তু তাহার নাম ছিল মণিমালিনী। দ্বিতীয়া কিশোরীটি আদিত্যবাবুর ভাগিনেয়ী, অর্থাৎ মালিনীর পিস্তুতো ভগিনী, তাহার নাম গৌরী। গৌরীর পিতা এক জন বড় জমীদার ছিলেন। যখন গৌরীর দশ বৎসর বয়ঃক্রম, তখন তাহার পিতামহ, পিতার উপর রাগ করিয়া, বিরাগী হইয়াছিলেন। গৌরীর পিতা তাঁহার অনুসন্ধানে দেশে দেশে ফিরিতেন। সেই জন্য বাটীতে অল্পদিন বাস করিতেন। আর গৌরী মাতৃহীনা হওয়াতে ও বাটীতে অন্য অভিভাবিকা না থাকাতে গৌরীকে আদিত্যবাবুর নিকট রাখিয়া, তিনি দেশে দেশে বেড়াইতেন এবং মধ্যে মধ্যে গৌরীকে দেখিতে আসিয়া শ্রীনগরে বাস করিতেন। সেই জন্য এই স্থানে একটি বাগানবাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

একদিন আরতির সময় মালিনী ও অনেকগুলি বালিকা মন্দিরে বসিয়া আছে, তাহাদের মধ্যে দুইটি বালিকা এক জন অপরকে গোলাপ বলিয়া ডাকিতেছে। গিরি জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা, তোমাদের দুইজনের নাম কি গোলাপ?" এক জন বলিল "না আমরা গোলাপ পাতাইয়াছি।"

গিরি আমার প্রতি চাহিয়া বলিল, "আমিও গোলাপ পাতাইব।" তন্মধ্যে পরী নামে একটী বালিকা বলিল, "আচ্ছা, মালিনী, তুমি কেন গিরির সঙ্গে গোলাপ পাতাও না।" মালিনী ভ্রুভঙ্গী করিল, কথাটা তার ভাল লাগিল না। আমি বুঝিলাম, মালিনী দৃপ্তা ঐশ্বর্য্যাভিমানিনী। এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় একটি প্রাচীনা মন্দিরের থামে ঠেস দিয়া জপের মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল, "মালিনীর সহিত গিরি গোলাপ পাতাইবে, সে কি কথা, সে কি সম্ভব?"

পরী। আমরা ছেলেয় ছেলেয় কথা কহিতেছি, তুমি কথা কও কেন গা?

প্রা। আ মর! ছুঁড়ীর স্পর্দ্ধা দেখ, কলির মেয়ে, না হ'বে কেন?

পরী। কলির মেয়ে তোমার কি কর্‌লে?

প্রা। সর্‌, ছুঁস্‌নে।

আর এক জন প্রাচীনা প্রথমোক্তা প্রাচীনার নিকট বসিয়া মালা ঘুরাইতেছিলেন তিনি বলিলেন, "ছুঁড়ী তোমায় ছুঁয়েছে না কি?"

প্রা। হাঁ, ছুয়েছে বই কি?

দ্বি প্রা। ও মা, কি হ'বে! আমিও যে ছোঁয়া পড়িলাম! আঃ, মর ছুঁড়ী, মর্‌তে আর জায়গা পাও নি, ঠাকুর দেবতার মন্দিরে মর্‌তে এয়েছ? যা ছুঁড়ী, ভাগাড়ে মর্‌গে যা। হাঁ গা, ও ছুঁড়ী কাদের মেয়ে?

প্র প্রা। কি জানি-কাদের মেয়ে। এখানে যমের বাড়ী যেতে এয়েছে। আবার এই রাত্রে নাইতে হ'ল। (পরীর প্রতি , তুই শীগ্‌গির যমের বাড়ী যা'।

গৌরী।—তুমি কবে যা'বে গা ? তোমার কি সময় হয় নাই ?

গৌরীর কথা শুনিবামাত্র প্রাচীনা কথঞ্চিৎ শান্ত হইল; কেন না গৌরী, আদিত্য বাবুর ভাগিনেয়ী। প্রাচীনা অতিমৃদুস্বরে বলিল, "মা, স্পর্দ্ধার কথা দেখ, আমাদের জমীদারের কন্যা মালিনীর সঙ্গে এক জন সামান্য লোকের মেয়ের গোলাপ পাতাইবার পরামর্শ দেয়। তাইতে আমার রাগ হ'ল।

গৌ।—তা যেন হ'ল। ওকে যমের বাড়ী পাঠাও কেন ?

প্রা।—ও আমাদের ছুঁলে কেন, মা ?

গৌ।—হাঁ গা ! ব্রাহ্মণের মেয়ে ছুঁলে কি নাইতে হয় ?

প্রা।—হাঁ, পরী শতেক জাত ছুঁয়ে কত কি মাড়ি'য়ে দেবমন্দিরে এয়েছে। ওকে ছুঁলে নাইতে হ'বে না ত কি ?

পরী।—সাহস পাইয়া বলিল, "আমি মন্দিরে এসেছি, তা তোর কিরে

প্রা।—দেখ্‌লে ! স্পর্দ্ধা দেখ্‌লে, মা ?

এই প্রকার প্রাচীনা ও বালিকার বাগ্‌বিতণ্ডায় মন্দিরমধ্যে একটা গণ্ডগোল উঠিল। মালিনী এই গণ্ডগোলে যোগদান করে নাই, স্থিরা ও ধীরা হইয়া এক স্থানে বসিয়াছিল। গিরিজায়া গোলাপ পাতাইতে না পারিয়া হতশ্বাস হইয়া আমার কাছে সরিয়া বসিল। পরে প্রাচীনাদ্বয় "যাই, এইরাত্রে আবার নাইতে হ'ল, বলিয়া উঠিল। আমিও গিরিজায়ার সহিত উঠিলাম। পথে প্রাচীনাদিগকে দেখিয়া, গিরিজায়া ঘাড় বাঁকাইয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "মর, মর, শিগ্‌গীর মর, শিগ্‌গীর মর।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।—অঙ্গুরী-দর্শন।

শ্রীনগরে আসিয়া আমি একটা বাবু হইয়া পড়িলাম। পাঠক পাঠিকাগণ ভুল করিবেন না, আফিসের সাহেবেরা যে প্রিয়বাক্য দ্বারা কেরাণীদিগকে সম্বোধন করিয়া থাকেন, আমি সে বাবু হই নাই। অথবা বঙ্গকুলবধূগণ সঙ্গিনীদিগের নিকট স্বামিপ্রসঙ্গে যে আদরের বাক্যে "আমার বাবু" বলিয়া স্বামীকে অভিহিত করিয়া থাকেন, তাহাও হই নাই। কখনও যে হইব, সে আশাও নাই। সর্ব্বদা সুসজ্জিত যুবকদিগকে যে অভিধানে সকলে সম্বোধন করিয়া থাকে, আমি তাহাই

হইয়াছি। আমার বড় অপরাধ ছিল না। এখন আমি ধনাঢ্য ব্যক্তির পুত্র—একমাত্র পুত্র; আবার মামা ও মামীর সন্তানের অপেক্ষাও আদরের ছিলাম। সুতরাং আমার নানারকমের কাপড়চোপড়, জুতা ও রকমারি হীরার আংটী, সোনার বোতাম ইত্যাদি হইয়াছিল। সর্ব্বদা ঐ সকল না ব্যবহার করিলে ধমক খাইতে হইত।

একদিন মাতুল বলিলেন, "ওহে মনোহর! ছেলেটা চামড়ার জুতা পায়ে দিয়া খালি-মাথায় বেড়াইতে যায়, আমার বড় কষ্ট হয়। তুমি উহার জন্য জরীর জুতা ও জরীর পাগড়ী অথবা জরীরটুপী আনাইয়া দাও। তাই পরিয়া বেড়াইতে যাইবে—যেরূপ পোষাকে পশ্চিমে বড়মানুষের ছেলেরা বেড়াইতে যায়।" পিতা হাসিয়া বলিলেন "এ দেশে বাঙ্গালীর ছেলের ধুতির সহিত টুপী ও পাগড়ী ব্যবহার করা চলিত নয়। ওরূপ বেশ করিলে হাস্যাস্পদ হইবে।"

আর একদিবস আমার মামা মাতাকে বলিলেন, "পারি, (আমার মাতার নাম পার্ব্বতী ছিল) ছেলেটার কান বিঁধিয়ে দিস ত। পশ্চিমে বড়মানুষের ছেলেদের যেমন কানে মতির মাকৃড়ি ঝোলে, আমি ঐ ছেলেটার দুই কানে তেমনই গোটাকত মতির মাকৃড়ি পরাইয়া দিব।" মাতা হাসিয়া বলিলেন "দাদা! অত বড় ছেলের কানে মাকৃড়ি দিলে সকলে হাস্‌বে যে।" "তুই ত সব জানিস্!" বলিয়া মামা চলিয়া গেলেন।

আর একদিন জমীদার আদিত্যমোহন বাবু গাড়ী চড়িয়া বায়ুসেবনে যাইতেছিলেন, তাঁহার চোখে সোনার চশ্‌মা ছিল। মামা উহা দেখিয়া বলিলেন, "দেখ মনোহর! ছেলেটার জন্য একখানা ঐ রকম জুড়িগাড়ী কেনো।" পিতা বলিলেন, "হাঁ, কিন্‌ব বই কি, শীঘ্র কিন্‌ব।" মামা বলিলেন, "আর দেখ, ঐ জমীদারের চোখে যে সোনার চশমা দেখ্‌লে, ঠিক ঐ রকম একখানা চশমা ছেলেটাকে কিনিয়া দাও।" পিতা বলিলেন, "আচ্ছা তাহাই হইবে।" আমার মাতুলানী ঐ প্রস্তাব শুনিয়া আমার মামাকে বলিলেন, "বালাই, কচি ছেলে, চশমা চোখে দিতে যা'বে কেন?" মাতুল বলিলেন, "বটে! চশমা বাবুদের অলঙ্কার, ঘরের ভিতর থাকো, কিছু ত জান না।

মামী।—(করযোড়ে) রক্ষা কর, আর বুদ্ধির পরিচয় দিও না।

তদুত্তরে মামা কি বলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু মামী, "এস খাবার প্রস্তুত" বলিয়া হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন। মামাকে আর কিছু বলিতে দিলেন না।

একদিন কোনও আত্মীয়ের বাটীতে পিতার, মামার ও আমার মধ্যাহ্ন-জলপানের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। মা ও মামী আমাকে ভালরূপ বেশভূষা করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। ফিরিয়া আসিয়া কাপড় ইত্যাদি ত্যাগ করিলাম, কিন্তু আঙটীগুলি হাতে রহিল। তন্মধ্যে বিবাহের সুন্দর পালিশ করা আঙটীটিও হাতে ছিল। বৈকালে গিরিজায়ার সহিত আমি সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরে যাইলাম। সেখানে দেখিলাম, বালিকারা দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। প্রাচীনারা কিঞ্চিৎ অন্তরে বসিয়া মুখোমুখী করিয়া চুপিচুপি কথা কহিতেছিল। বোধ হয় পরনিন্দা করিতেছিল, নহিলে চুপি চুপি কথা কেন? আমি বসিলে পরী বলিল, "তোমরা কি আজ গোঁসাই-বাড়ী নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছিলে?"

আমি। হাঁ, তুমি কেমন ক'রে জান্‌লে?

পরী। আমরাও গিয়াছিলাম, তোমার বাবাকে আজ দেখেছি,—বেশ মানুষ!

আমাদের এই কথোপকথন হইতেছিল বটে, কিন্তু আমি মধ্যে মধ্যে গৌরী ও মালিনীর প্রতি লক্ষ্য করিতেছিলাম। আমার স্পষ্ট বোধ হইল যে, গৌরী আমার হাতের আঙটীর প্রতি চাহিতেছে, এবং আমাকে দেখিতেছে। কিছুক্ষণ পরে আমার বিবাহের আঙটীটি দেখিয়া আমাকে বলিল, "ঐ আঙটিটি দেখি?" আমি উহা খুলিয়া তাহার হাতে দিলাম। সে উহা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল, এবং আমার মুখপ্রতি চাহিতে লাগিল। মালিনী গৌরীর হাত হইতে উহা লইয়া এ পিঠ ও পিঠ দেখিয়া ফেরত দিল। গৌরী আমায় বলিল, "বড় সুন্দর পালিস, এ আঙটী তুমি কোথায় পাইলে?"

আমি। কাশীতে পাইয়াছি।

গৌ। (আমার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া) ঠিক উত্তর হইল না। তোমাকে ইহা কে দিয়াছে?

আ। একটী বালিকা আমাকে দিয়াছে।

গৌ। সে তোমার কে?

আ। (ইতস্ততঃ করিয়া) কে আবার হবে? কেউ না।

গৌ। তবে সে তোমাকে এ আঙটি দিলে কেন?

আ। আমি তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম।

গৌ। বাঙ্গালা ভাষায় কথা কও না। কি হইতে উদ্ধার করিয়াছিলে?

আ। বিপদ হইতে।

গৌ। কি বিপদ, শুনি ?

আ। সকল কথা কি বলা যায় ?

গৌ। কেন বলা যায় না ?

আ। না, বলা যায় না।

গৌ। তবে কি তুমি সে মেয়েটির আঙ্গুল হইতে ইহা চুরি করিয়াছ ?

আ। (হাসিয়া) না, না, না, চুরি করি নাই, সে নিজে আমার অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিয়াছে।

গৌ। তা'র এত কি গরজ্ যে তোমার হাতে পরাইয়া দেয় ?

আ। বিশেষ গরজ্ ছিল, তাই নিজে পরাইয়া দিয়াছে।

গৌ। সে ছুঁড়ীর তখন বয়স কত ?

আ। ছুঁড়ী কেন ? মেয়েটী বলিতে পার না ?

গৌ। আচ্ছা, আচ্ছা, তখন সে মেয়েটির বয়স কত ?

আ। দশ এগার বৎসর।

গৌ। এখন কত হইবে ?

আ। চৌদ্দ কি পনর বৎসর।

গৌ। আর কি তোমার সহিত তা'র দেখা হয় নাই ?

আ। না।

গৌ। আহা ! কি দুঃখ।

আ। আমার দুঃখ আমারই আছে, তোমার তাতে কি, আমার আঙটি দাও।

আ। আমি দিব না।

আ। বড়মানুষের মেয়েদের বুঝি এই ব্যবসা ? পরের জিনিস কাড়িয়া লয় ?

গৌ। ইহার পরিবর্ত্তে আমি আর একটা আঙ্‌টি দিচ্চি।

মালিনী বলিল, "না, উহার আঙ্‌টি উহাকে ফেরত দাও।" এই সময় প্রাচীনারা গৌরীকে ডাকাতে সে আঙ্‌টি ফেরত দিয়া উঠিয়া গেল। তখন মালিনী আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "সে মেয়েটি কি কারণে তোমার আঙ্গুলে আঙ্‌টি পরাইয়া দেয়।"

আ। সে অনেক কথা, গোপনীয় কথা, আমি তোমাকে বিশ্বাস করিয়া বলিতে পারি, কিন্তু তুমি নাই বা উহা শুনলে।

মা। না। তবে আমি শুন্‌তে চাহি না। আমি মনে করিয়াছিলাম, সে বুঝি তোমাকে বিবাহ করিয়াছিল।

আ। তুমি আমাকে বিবাহ কর্‌বে?

মা। (হাসিয়া) কেন? আমাকে বিয়ে কর্‌বার সাধ কেন?

আ। তাহা তোমাকে বুঝাইয়া বলিতে আমার লজ্জা করে।

মা। (মুখে কাপড় ঢাকিয়া) তবে কর্‌বো।

এই বলিয়া উঠিয়া গেল। একেই ত Courtship বলে। আরতি ভাঙ্গিবার পর যখন বাটী ফিরিয়া আসি, তখন একটা থামের আড়াল হইতে গৌরী জিজ্ঞাসা করিল, "যে মেয়েটী তোমাকে আঙ্‌টি পরাইয়া দিয়াছিল, তাহাকে তুমি ভালবাস?" আমি বলিলাম, "সে অনেক দিনের কথা, তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছি।" "তবে তুমি বাগ্‌দিনী গিরিজায়ার যোগ্য, তাহাকে বিবাহ করগে।" এই বলিয়া গৌরী অন্তর্হিত হইল। আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, গিরি আমার সহিত বেড়াইলে গৌরী বড় বিরক্ত হইত।

সকল সুখের সীমা আছে, কিন্তু অদ্য আমি যে সুখানুভব করিয়াছিলাম, তাহার সীমা ছিল না। মালিনী আমাকে বিবাহ করিবে, এই আনন্দে আর বাটী ফিরিলাম না। গঙ্গাতীরে নির্জ্জনে গিয়া বসিলাম। রাত্রি একপ্রহর হইয়াছে। সম্মুখে কলনাদিনী ভাগীরথী কলকলনাদে সাগরাভিমুখে ছুটিতেছে। পশ্চাতে একটা বকুল বৃক্ষের অন্তরালে রোহিণীপতি ধীরে ধীরে রূপার থালার ন্যায় উদিত হইতেছিলেন। আহা! আজ বসুন্ধরা কি সুন্দরী! আজ চাঁদের কি রূপ! যেন গাছের ভিতর হইতে বড় বড় হীরকখণ্ড জ্বলিতেছে! আর ঐ বকুলডালে বসিয়া একটা কোকিল—না, আর না, পাঠকপাঠিকাগণ গালি দিবেন, বলিবেন, ঢের হইয়াছে—আবার তোমার আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে কোকিলের কুহুরব কেন?—চাঁদের আলোক, কোকিলের কুহুরব, বসন্তের পবন না লিখিলে কি তোমার আনন্দপ্রকাশ হয় না? হবে না কেন? হয় বৈ কি? তবে চির-প্রচলিত প্রথাটা অবলম্বন না করিলে, আমার এই দুঃখের কাহিনী পড়িবে কে?

অধিক রাত্রিতে বাড়ী ফিরিলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।—জমীদার আদিত্যমোহন বাবু।

আদিত্যবাবু যে একজন প্রকাণ্ড জমীদার ছিলেন, তাহার পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি। এ ছাড়া তিনি উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ও মহাকুলীন ছিলেন। এই

ত্র্যহস্পর্শযোগে আদিত্যবাবু অদ্বিতীয় লোক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় যাইয়া বড় বড় Speech দিতেন, সংবাদপত্রে উহা লইয়া হুলস্থূল পড়িত। আমাদের দেশে একবার একটী সাহিত্য-সম্মিলনী হয়, তাহাতে কত দেশ দেশান্তর হইতে বড় বড় লোক উপস্থিত হন। আদিত্যমোহন বাবু সভাপতির আসনগ্রহণ করিয়া যে কি একটা প্রকাণ্ড বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই বটে, কিন্তু চারি দিক হইতে করতালিধ্বনি শুনিয়া বুঝিলাম যে, আমাদের জমীদার বাবু এক অতি আশ্চর্য্য বক্তৃতা করিয়াছিলেন। আদিত্যবাবু অধিকাংশ সময় কলিকাতায় বাস করিতেন। সেখানে সাহিত্য-সম্প্রদায়ের তিনি এক জন প্রধান নেতা। আমাদের গ্রামে বালক ও বালিকাদিগের জন্য দুইটি পৃথক্ পৃথক্ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, কলিকাতায় থাকিয়া বড় বড় সাহেবদিগকে সর্ব্বদা খানা দিতেন—শুনিয়াছি, তিনি নাকি শীঘ্র রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইবেন। যখন দেশে থাকিতেন, তখন এক একদিন সন্ধ্যার সময় গাড়ী চড়িয়া বায়ুসেবনে যাইতেন। শূদ্রেরা নতশিরে বাবুকে অভিবাদন করিত, ব্রাহ্মণেরা হস্ত তুলিয়া নমস্কার করিতেন, আদিত্যবাবু কেবলমাত্র ঈষৎ মাথা দুলাইয়া ব্রাহ্মণদের অভিবাদন গ্রহণ করিতেন, হাত তুলিতেন না—ইহা বোধ হয় উচ্চশিক্ষার ফল। আদিত্যবাবুর পিতা জীবিত, কিন্তু তিনি জমীদারী ইত্যাদি তাঁহার বংশধরকে দান করিয়া কোন তীর্থে বাস করিতেন—সে কোন তীর্থ কেহ জানিত না। তিনি আদিত্যবাবুকে তাঁহার সংবাদ দিতেন না, বা তাঁহার কোনও সংবাদ লইতেন না, অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়াছিলেন। আদিত্যবাবু তাঁহার কন্যা ও ভাগিনেয়ীর বিবাহের জন্য দেশে দেশে ঘটক দ্বারা পাত্র অনুসন্ধান করিতেন; তাঁহার পণ ছিল যে, পাত্রদিগের তাঁহার ন্যায় ত্র্যহস্পর্শযোগ থাকিবে; অর্থাৎ ধনী, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত এবং মহাকুলীন হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কুলীনশ্রেষ্ঠ পাত্রমাত্রেরই মৃত্তিকানির্ম্মিত ঘর, লেখাপড়া পাঠশালায় খতম; সুতরাং আদিত্যবাবুকে এই ধনুর্ভঙ্গ পণ ছাড়িয়া দিতে হইল। কিন্তু পিতার জীবিতাবস্থাতে তাঁহাদের কৌলীন্যমর্য্যাদা ধ্বংস করিতে পারেন না; সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর অপেক্ষায় রহিলেন। সেইজন্য মালিনী ও গৌরী পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত অনূঢ়াবস্থায় ছিল। আদিত্যবাবু বালিকাদিগের জন্য গ্রামে একটী ইংরাজী ও বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নিজকন্যা ও ভাগিনেয়ীর শিক্ষার জন্য অন্যরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। জেনানা-মিশনের এক জন বিবি বাটীতে আসিয়া তাহাদের

ইংরাজি শিখাইত। আর এক জন প্রাচীন পণ্ডিত আসিয়া সংস্কৃত ও বাঙ্গালা শিখাইত। মালিনী ও গৌরী অতীত-শৈশব হইলেও আদিত্যবাবু তাহাদের অবরোধে না রাখিয়া কথঞ্চিৎ স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাহারা দাসদাসী সমভিব্যাহারে সর্ব্বমঙ্গলার বাটীতে প্রতিদিন আরতি দেখিতে যাইত।

কিছু দিন পরে শুনিলাম, নিকটস্থ এক জন জমীদারপুত্রের সহিত মালিনীর বিবাহ হইবে। ছেলেটী সুশিক্ষিত, আর ধনে মানে গৌরবান্বিত বটে, কিন্তু কুলে অপকৃষ্ট। গোপনে বিবাহ দিবেন, সর্ব্বমঙ্গলার-মন্দিরে বিবাহ হইবে—রটনা অদ্ভুত বটে, কিন্তু আমাদের দেশে একটা কিংবদন্তী ছিল যে, গোপনে সর্ব্বমঙ্গলার-মন্দিরে বিবাহ হইলে দাম্পত্যসুখ অনিবার্য্য। আমি এ কথা বিশ্বাস করিলাম না; সুতরাং মনে বড় কষ্ট হয় নাই। আমার আশা যে, আমি মালিনীর স্বামী হইব। এ আশার কোনও সূচনা ছিল না বটে, কিন্তু সেই ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপিনী আশার মোহিনীশক্তিতে অন্ধ হইয়াছিলাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।—আমার বিবাহ-প্রস্তাব।

মালিনীর বিবাহের কথা সকলেই কহিতে লাগিল, কিন্তু চুপি চুপি কহিত। দিন দিন জনরব বড় প্রবল হইল। আমি বড় কাতর হইলাম। আমার অবস্থা দেখিয়া পিতামাতার মনে একটা সন্দেহ হইল—কি সন্দেহ হইল, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। একদিন মাতা বলিলেন, "বিরজা, তোমার কি অসুখ হইয়াছে ?" (আমার নাম বিরজাকুমার।)

আ। কৈ ? মা, আমার ত কোনও অসুখ হয় নাই।

মা। তবে, পড়াশুনা কর না কেন ?

আ। আমি ত খুব পড়াশুনা করি মা, দিবারাত্র পড়ি।

মা। আমার মাথা পড়, মুণ্ড পড়, দিবারাত্র শুইয়া থাক। তুমি খুব মন দিয়া পড়, তোমার শীঘ্র বিয়ে দিব।

এই বলিয়া মাতা উঠিয়া গেলেন। কিন্তু আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কাহার সহিত বিবাহ ? আমি কি আর কাহাকেও বিবাহ করিতে পারি ? কখনও না। সেই একজনের রূপ আমার হৃদয়ে অঙ্কিত, হাড়ে হাড়ে অঙ্কিত। আমি কি কখনও তাহাকে ভুলিতে পারিব ?

পরে অনুসন্ধানে জানিলাম যে, গিরির সহিত বিবাহ হইবে। শুনিয়া আমার মনে কি একটা বিপ্লব উপস্থিত হইল। ক্রমে বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী হইল।

লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া মাতার পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলাম, বলিলাম, "আমি গিরিকে বিবাহ করিব না।" মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?" আমি উত্তরে কেবল কাঁদিতে লাগিলাম। মাতা বিরক্ত হইলেন, রাগিয়া উঠিলেন, গালি দিলেন, শেষে পিতাকে বলিয়া দিলেন। পিতা অতিশয় বিরক্ত হইয়া গালি ও ধমক দিলেন। উপায় নাই, নিষ্কৃতি নাই, বিবাহ নিশ্চিত। ২রা ফাল্গুন বিবাহ-দিন স্থির হইল। গোপনে সর্ব্বমঙ্গলার বাটীতে বিবাহ হইবে।

কৈশোরের বিবাহে যে কি আনন্দ, তাহা আমি জানি। আমার সমবয়স্ক বালকগণ বিবাহের নাম-উল্লেখমাত্র আনন্দে চঞ্চল হয়, তার পর বিবাহের কয়েক দিবস অবিশ্রান্ত আনন্দের স্রোত বহিতে থাকে। যে বালক সমাজে লাঞ্ছিত, যাহাকে দেখিবামাত্র সকলে বেত লইয়া তাড়া করে, তাহারও জীবনের মধ্যে এই এক দিন! সেও এই সময়ে আদর যত্ন ও সম্মান পায় ও সর্ব্বজনের লক্ষ্য হয়; কিন্তু আমার আনন্দ হওয়া দূরে থাকুক, আমার জীবন অন্ধকারময় হইল। যে আলোক ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ দেখাইয়া দেয়, তাহা নির্ব্বাপিত হইল, যে উৎসাহে মনুষ্যের চরিত্র উন্নত ও গঠিত হয় তাহার অবসান হইল, আশা ভরসা সকলই লোপ পাইল, ফুটিনোন্মুখ যৌবনে বজ্রাঘাত হইল। কোনও প্রসিদ্ধ উপন্যাস-লেখক বলিয়া গিয়াছেন যে, বাল্যপ্রণয়ে কোনও অভিসম্পাত আছে। আমাতেই কি উহা প্রমাণীকৃত হইল? হা কৃষ্ণ!

নবম পরিচ্ছেদ।—গৌরী।

তখন জানিতাম না যে, মনুষ্যজীবনের ঘটনা-পরম্পরা এক অপূর্ব্ব নিয়মের অধীন। মালিনী ও গৌরী উভয়কে এক সময়ে দেখিয়া আমার যে মালিনীর প্রতি অনুরাগ জন্মিল, তাহা সেই নিয়মের অধীন। উভয়েই সুন্দরী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, উভয়েরই ফুটিতোন্মুখযৌবনা, তবে কেন? মালিনীর প্রতি অনুরাগ কেন? তাহাও সেই নিয়মের অধীন। তখন উহা বুঝিতাম না, এখন বুঝিয়াছি বটে, কিন্তু শান্তি কি পাইয়াছি? এ পর্য্যন্ত আশাতে জীবিত ছিলাম, এখন নৈরাশ্যে প্রস্তরবৎ হইয়াছি। সর্ব্বদাই সর্ব্বমঙ্গলার বাটীর দিকে কিসে আমায় টানিত, টানিত বটে, কিন্তু যাইতাম না। সে কি মালিনীর প্রতি অবিহিত অনুরাগ প্রশমিত করিবার জন্য?—তাহা নহে, একাকী যাইতে কুণ্ঠিত হইতাম। সঙ্গিনী গিরিজায়া বিবাহের কথা উল্লেখমাত্র আমাদের গৃহ ত্যাগ করিয়াছিল। কৈশোরের অনুরাগের সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা জন্মে, সুতরাং যাইতে কুণ্ঠিত হইতাম। একদিন সন্ধ্যার সময়ে

মনের আবেগে সর্ব্বমঙ্গলার-মন্দিরে উপস্থিত হইতাম। সেখানে অনেকগুলি বালিকায় বেষ্টিত হইয়া গৌরী বসিয়া আছে, কিন্তু মালিনী নাই। গৌরী রূপে আলো করিয়া বসিয়া আছে, আমাকে দেখিয়া মাথায় ঈষৎ কাপড় টানিল, একটু হাসিল, চক্ষের ইঙ্গিতে বোধ হয় বসিতে বলিল। গৌরী বড় দুষ্ট। আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার সেই অন্ধের নড়িটী আজ কোথায়?" আমি বুঝিয়া উত্তর করিলাম, "কে? গিরিজায়া?"

গৌ। (মুখ ফিরাইয়া) কে জানে—নামটাম অত মনে নাই।

আ। গিরিজায়াকে আজ আনি নাই।

গৌ। কেন? এখন নড়ির আবশ্যক হয় না? চোখ ফুটেছে নাকি?

আ। হাঁ।

গৌ। কিসে চোখ ফুট্‌ল? প্রতিদিন সর্ব্বমঙ্গলাকে দর্শন করে' বুঝি?

আ। হাঁ।

মাথামুণ্ড কি উত্তর দিব। কি কারণে গিরি আসে নাই, তাহা ত বলিতে পারি না। সুতরাং হাঁ না উত্তর দিতে লাগিলাম।

এই প্রকার কথাবার্ত্তা আমার ভাল না লাগাতে, এবং যাহাকে দেখিতে আসিয়াছিলাম, তাহাকে দেখিতে না পাওয়াতে আমি উঠিলাম। গৌরী বলিল, "কি বলিলাম যে, রাগ হইল? বস, বস।" আবার বসিলাম।

গৌরী বলিল, "গিরিজায়া তোমার কে হয়?"

আ। কেহ নহে।

গৌ। ও অদ্ভুত রত্ন কোথায় কুড়াইয়া পাইলে?

আ। এই গ্রামে, আমাদের বাটীর নিকট।

গৌ। ওকে কি বিয়ে কর্‌বে নাকি?

আ। করিই যদি, তা'তে কি?

গৌ। ও মা! ও মা! অত রাগ কেন? তুমি বাঁদর বিড়াল পোষ না কেন, আমাদের কি তাতে এসে যায়।

আ। গিরিজায়া কি বাঁদর বিড়ালের মধ্যে?

পশ্চাৎ হইতে অতি মধুরকণ্ঠে কে বলিল, "যদি গিরিজায়াকে বিয়ে কর, তবে একটা ডুগ্‌ডুগি কিন্‌তে হ'বে।" আমি মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম যে, পিছনে মনোমোহিনী সুন্দরী দাঁড়াইয়া মৃদুমধুর হাসিতে হাসিতে মাথা দুলাইয়া বলিতেছে, "একটা ডুগডুগি কিন্‌তে হবে।"

উহাকে দেখিবামাত্র আমার শরীর পুলকিত হইল, অনিমেষলোচনে তাহাকে দেখিতে লাগিলাম। মালিনী আস্তে আস্তে গিয়া বসিল, আস্তে আস্তে মৃদুমধুর হাসিতে হাসিতে আমার প্রতি চাহিয়া বলিল, "কি হয়েছে?"

পরী। উনি গিরিকে বিবাহ করিবেন, সেই কথা হইতেছে।

মা। সত্য নাকি?

আ। উঁহারাই বলিতেছেন, আমি কিছু বলি নাই।

ইতিমধ্যে একজন প্রাচীনা মালিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা! তোমরা দুই বোনে নাকি কলিকাতায় যাবে?

মা। হাঁ।

প্রা। কবে যাবে?

মা। এখনো দিন স্থির হয় নাই।

গৌরী আমাকে বলিল, "তুমি আমাদের সঙ্গে চল না কেন। তোমার গিরিকে সঙ্গে লইয়া চল।"

আ। কেন? আমরা তোমার সঙ্গে যা'ব কেন?

গৌ। বেশ ত, চল না। কলিকাতায় নাকি "জু" বলে একটা বড় বাগান আছে, সেখানে তোমার মতন আর তোমার গিরির মতন অনেক আছে। দেশ দেশান্তর হইতে কত লোক তাহাদিগকে দেখিতে আসে, তোমাকে ও তোমার গিরিকে দেখিতে আসিবে। যাবে?

আমি বুঝিলাম, গৌরী আমাকে জানোয়ার ব'লে গাল দিল। গৌরী কি মুখরা, কি দুষ্ট! পনর বৎসরের মেয়ে হয়ে—আমি এই যুবাপুরুষ—আমি যুবা-পুরুষ ত বটে? আঠারো বৎসর বয়সের ছেলে কি যুবাপুরুষ নহে?—আমার সহিত বিদ্রূপ করে! যাহা হউক, দুষ্টা হউক আর মুখরা হউক, হাসি-হাসি মুখে গৌরী যে বিদ্রূপ করিত, তাহা বড় মিষ্ট লাগিত। তাহার চক্ষে হাসি, ঠোঁটে হাসি, অঙ্গচালনাতেও হাসি। যদি মালিনীকে না দেখিতাম, বুঝি এ মুখরা সুন্দরীতে চিত্ত হারাইতাম।

আমি উত্তর করিলাম, "আমাদিগকে দেখিলে কিছু আশ্চর্য্য দেখিবে না, তোমাতে আশ্চর্য্য জিনিস আছে, তোমাকে একবার দেখিলে আবার দেখিতে আসিবে, প্রতিদিন আসিবে; তোমার রূপ আছে, তাহা দেখিবে; হাসি আছে, তাহা দেখিবে; কোঁকড়া কোঁকড়া চুল দুলাইয়া কথা কহ, তাহা দেখিবে, আমাতে কি আছে যে দেখিতে আসিবে?" এবার মালিনী উত্তর দিল, "গৌরীকে নূতন

জিনিস দেখ্‌বে বটে, কিন্তু তোমাতে তাহারা গাছের উপর মধ্যে মধ্যে যাহা দেখে থাকে, তাই দেখ্‌বে।"

মন্দ নয়—গৌরী আমায় জানোয়ার বলিল, আর মালিনী আমায় বানর বলিল। যে মালিনী কখনও কাহাকেও বিদ্রূপ করে নাই, সেই মালিনী আমায় বানর বলিল। বুঝিলাম, গৌরীর একটু রূপের প্রশংসাতে মালিনীর রাগ হইয়াছে। আমি শুনিয়াছিলাম, স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকের রূপের প্রশংসা শুনিলে হিংসাতে রাগ করে। পনর বৎসরের মেয়েদেরও কি তাই—ছি! বড় হিংসুকে জাত!

ইতিমধ্যে আরতি আরম্ভ হইল। সকলেই উঠিয়া গললগ্নীকৃতবাসে এবং করযোড়ে দাঁড়াইয়া সেই মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। মন্দিরাভ্যন্তরে এবং বাহিরে আলোকের উজ্জ্বলতার ও নানাপ্রকার বাদ্যের কোলাহলে এবং ভক্তদিগের "জয় মা! বিশ্বজননি! দুর্গতিনাশিনি!" ইত্যাদি চীৎকারে আমার শরীর কণ্টকিত হইল। মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, সেই বিশ্বজননী বা বিশ্বপিতা এই মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী প্রতিমার অভ্যন্তরে আবির্ভূত হইয়াছেন। আমিও হৃদয় ভরিয়া ডাকিতে লাগিলাম, "সর্ব্বমঙ্গলমাঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে" ইত্যাদি। আরতি শেষ হইলে সকলে চলিয়া গেল। আমিও উঠিলাম।

দশম পরিচ্ছেদ।—রামচরণ চক্রবর্ত্তী।

মনের চাঞ্চল্যহেতু বাটী ফিরিলাম না; জাহ্নবীতটে উপস্থিত হইলাম। অন্ধকার হইয়াছে। নদীর বিশাল হৃদয় তিমিরাবৃত হইয়াছে, আকাশে নক্ষত্রগণ একটী একটী ফুটিতেছে, আর জাহ্নবীজলে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। সন্ধ্যা-সমাগমে নৈশ সমীরণ কিঞ্চিৎ খরতরবেগে বহিতেছে, মাঝিরা রাত্রে বিশ্রামের জন্য নৌকা সকল তীরলগ্ন করিতেছে। এই শোভা দেখিয়া সকল ভুলিয়া গেলাম; কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্য। আবার আমার সেই দারুণ মনঃপীড়া আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি বাটীতে ফিরিলাম।

কখনও কখনও দারুণ মানসিক যন্ত্রণায় মনুষ্য নিদ্রাভিভূত হয়, ঐ রাত্রে আমার তাহাই হইল। অজ্ঞানাভিভূত হইয়া ঘুমাইলাম, কিছুক্ষণ পরে নিদ্রা ভাঙ্গিল, বোধ হইল, একটা শব্দতে নিদ্রা ভাঙ্গিল, শয্যাত্যাগ করিয়া দক্ষিণদিকের জানালায় গিয়া দাঁড়াইলাম। বুঝিলাম, রজনী গভীরা, দ্বিতীয় প্রহর, চারি দিক অন্ধকারময় নিকটে একটী আমবাগান ছিল; সেই দিকে চাহিলাম—অন্ধকার, রাজপথের দিকে চাহিলাম—অন্ধকার, জনহীন, শব্দহীন। উপরে চাহিলাম, দেখিলাম,

নীলাকাশে কোটী কোটী নক্ষত্র অন্ধকারে আমার কষ্টে হাসিতেছে। দূরপ্রান্তে একখানি ক্ষুদ্র কালমেঘ অন্ধকারে উঁকি মারিতেছে। পৃথিবী অন্ধকার, আমার জীবনের ন্যায় অন্ধকার, যে দিকে দেখি, সেই দিকে আঁধার, জনহীন, শব্দহীন।

আমি পূর্ব্বোক্ত শব্দানুসরণে উত্তরদিকের জানালায় গিয়া দাঁড়াইলাম। নীরবে, নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে অন্ধকারে দেখিলাম যে, ৫।৬ জন লোক আমাদের বাটীর উপরের ছাদে উঠিতে চেষ্টা করিতেছে। আমার ঘরের পশ্চিমের ছাদ খোলা অর্থাৎ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। উহারা একখানা মই লাগাইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। তন্মধ্যে এক জনকে চিনিলাম, স্পষ্ট চিনিতে পারিলাম, কিন্তু—কিন্তু চিনিয়া আমার অঙ্গ অবশ হইল, পা কাঁপিতে লাগিল; দ্রুত যাইয়া যে পিতাকে উঠাইব, সে ক্ষমতা রহিল না। বাটীতে ডাকাইত আসিয়াছে, সর্ব্বস্ব লইয়া যাইবে, এই আশঙ্কায় শরীরে বল পাইলাম, পিতাকে গিয়া জানাইলাম। তিনি আমার সহিত আসিয়া ঐ জানালায় দাঁড়াইয়া দেখিলেন। আমি তাঁহাকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে জিজ্ঞাসা করিলাম, "উহাকে চিনিতে পারেন?" পিতা বলিলেন, "না।" আমি বলিলাম "আমার ভাবী শ্বশুর রামচরণ চক্রবর্ত্তী।" পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "মিথ্যা কথা।" পরক্ষণেই তিনি গোলমাল করাতে এবং চাকর ও দ্বারবানগণ আসাতে ডাকাতগণ চলিয়া গেল। * * * * রজনী তৃতীয় প্রহর। সেই গভীর নিস্তব্ধতা মন্থন করিয়া একটা ভয়ঙ্কর কোলাহল উঠিল। গ্রামবাসী সকলেরই নিদ্রা ভাঙ্গিল, শয্যাত্যাগ করিয়া রাজপথে দাঁড়াইল, অল্পক্ষণ পরেই শুনিলাম যে, রামগোবিন্দ ঘোষালের ঘরে পাঁচ ছয় জন চোর ঢুকিয়া সর্ব্বস্ব লইয়া গিয়াছে। গ্রামবাসিগণ কিছুক্ষণ পরে গৃহে যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিল। প্রায় রাত্রি অবসান হইয়াছে, শুকতারা দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। পিতার সহিত ভগ্নহৃদয়ে গৃহে প্রবেশ করিলাম। কেবল মাত্র আমি জানিলাম, সে ডাকাইত কে?

একাদশ পরিচ্ছেদ।—বন্দী হইলাম।

অদ্য রাত্রে আমার বিবাহ, গিরির সহিত বিবাহ। এই বিবাহ বন্ধ করিবার উপায় নাই, পিতামাতার বিশ্বাস যে, রামচরণ ডাকাইত নহে, অতি ভদ্রলোক। ভগবান মারীচিমালী ধীরে ধীরে বিন্ধ্যাচলাভিমুখে গমন করিতেছিলেন। তিনি অল্পক্ষণ পরেই অচলপতির পশ্চাতে লুকাইবেন। তাহা হইলে রজনীসমাগমে আমার

সর্ব্বনাশ হইবে, ডাকাইত-পুত্রীর সহিত বিবাহ হইবে, ভাবিতে ভাবিতে যেন উন্মত্ততা জন্মিল। সূর্য্যদেবের স্তব করিলে না মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়? স্তব করিলে তিনি অস্তে যাইবেন না? রজনীর আবির্ভাব হইবে না? এই ভাবিয়া তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলাম। ভূমিতে দুই জানু পাতিয়া, করযোড়ে ঊর্দ্ধমুখে, একাগ্রচিত্তে অতি কাতরস্বরে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলাম, "হে আদিত্য, অস্তে যাইও না; তাহা হইলে অন্ধকার হইবে, আমার বিবাহ হইবে।" এই প্রকার প্রার্থনা করিতে করিতে চক্ষুরুন্মীলন করিলাম। হরি! হরি! ক্রমে সব অন্ধকার। সূর্য্যদেব পলাইয়াছেন, লোধ হয় অনেক দূরে পলাইয়াছেন। ইতিমধ্যে কে এক জন আলো লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। দেখিলাম, আমার মা। মাকে দেখিবামাত্র আমার উন্মত্ততা অন্তর্হত হইল, ঝাঁপ দিয়া মার বুকে পড়িয়া কাঁদিলাম। মা—আমাকে ঘরে লইয়া গেলেন। সমস্ত দিন উপবাসী ছিলাম কিছু খাওয়াইলেন। মার আদরে কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।

রজনী দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে আমার বিবাহ হইবে। মাতা আসিয়া নিদ্রাভঙ্গ করাইলেন, এবং বিবাহের জন্য যে কাপড় চাদর আনাইয়াছিলেন, তাহা পরাইলেন। অনেক আদর করিলেন—তাঁহার আদরে সব ভুলিয়া গেলাম। পরে পিতা আমাকে হাত ধরিয়া খিড়কীর দ্বার দিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন। দেখিলাম, অনন্ত নীলাকাশে নিশানাথ নিঃশব্দে ভাসিতেছেন। রজনী গভীরা; নিতান্ত শব্দহীনা। কখনও দূরে কুক্কুর-রব শুনা যাইতেছে। পিতা পুত্রে একটী আম্রকাননে প্রবেশ করিলাম। উহার ভিতরে একটী ক্ষুদ্র পথ আছে। তদ্দ্বারা মন্দিরাভিমুখে চলিলাম। আম্রকানন নিবিড় অন্ধকারময়, নিঃশব্দ। মনুষ্যপদ দলিত শুষ্ক পত্রের মর্ম্মর-শব্দ শুনিয়া পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেও?" উত্তর নাই। শাখার বিচ্ছেদে এক স্থানে চন্দ্রালোক পড়াতে আমি চিনিতে পারিয়া পিতাকে বলিলাম, "রামচরণ চক্রবর্ত্তী।" তিনি বিশ্বাস করিলেন না, ধমক দিলেন। ইতিমধ্যে মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলাম। উহার গুপ্ত দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলাম। সেখানে রামচরণ আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরের ভীষণ অন্ধকারে নিকটস্থ বড় বড় অশ্বত্থ বৃক্ষে চন্দ্রকিরণ বন্ধ করিয়াছে। কোথাও কোনও একটী ঘরে আলোক নাই। পূজারীগণ ভূতের ন্যায় ঘুরিতেছে। আমরা সেইখানে পঁহুছিবামাত্র, রামচরণ আমাকে একটী অন্ধকার ঘরে লুকাইয়া রাখিল। কিছুক্ষণ পরে সে পুনরায় আসিয়া আমার হস্ত ধরিয়া আমাকে আর একটী ঘরে লইয়া গেল।

এই ঘরটিতে আলো যথেষ্ট ছিল, এবং বিবাহের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত ছিল। রামচরণ আমাকে একটি আসনে বসাইয়া বলিল, "তোমার পিতা পুরোহিত লইয়া আসিতেছেন, আমি পাত্রী লইয়া আসিতেছি; বড় গোপনে বিবাহ হইবে, সাবধানে থাক, কোথায় উঠিয়া যাইও না, কেন না, আদিত্য বাবুর বিনা অনুমতিতে অদ্য রাত্রে এ মন্দিরে তোমাদের বিবাহ হইতেছে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন? তাঁহার এত আপত্তি কেন? দেবতার মন্দিরে সকলেরই ত বিবাহ হইতে পারে।"

রাম।—বোধ হয় এ মন্দিরে অদ্যরাত্রে তাঁহার কন্যা ও ভাগিনেয়ীর বিবাহ হইবে, গোপনে হইবে, সেই জন্য অন্য রাত্রে এ মন্দিরে অন্য বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু আমার সহিত এ মন্দিরের প্রধান পূজারীর বড় সম্প্রীতি থাকাতে, তিনি আমার অনুরোধে দক্ষিণদিকের এই ঘরটি ছাড়িয়া দিয়াছেন।

এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। আমি শৃঙ্খলাবদ্ধ পশুর ন্যায় সেইখানে বসিয়া রহিলাম। পিতামাতার প্রতি স্নেহ এবং কর্ত্তব্য, আমার শৃঙ্খল। গভীর মনের দুঃখে বসিয়া আছি, এমন সময়ে পূজারীবেশী এক জন ব্রাহ্মণ, দীর্ঘাকার, শ্বেতশ্মশ্রুবিশিষ্ট, পরিধানে গেরুয়া বসন, এই কক্ষে প্রবেশ করিয়া আমাকে চুপি চুপি বলিল, "আপনি একবার উঠিয়া আসুন। কোনও স্ত্রীলোক আপনাকে কোনও কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, শুনিবেন আসুন।" আমি অনন্ত সমুদ্রে ভাসিতেছিলাম, পূজারী ঠাকুর যেন একখানি নৌকা আনিয়া আমাকে তুলিয়া লইলেন। সেই মায়াবিনী আশা আবার আমাকে উত্তেজিত করিল, কিন্তু কিসের আশা তাহা বুঝিতে পরিলাম না। যাহা হউক, আমি আসন ত্যাগ করিয়া ঐ পূজারীর পশ্চাদনুসরণ করিলাম। ঐ কক্ষ হইতে নিক্রান্ত হইয়া পূর্ব্বোল্লিখিত আম্রকানন অতিক্রম করিয়া পূজারীগণের বাসস্থানের জন্য মন্দিরপার্শ্বে যে গৃহশ্রেণী আছে, তাহার একটী ঘরে আমাকে লইয়া পূজারী ঠাকুর প্রবেশ করিলেন। ঘরটিতে একটি সামান্য আলো মিট্ মিট্ করিতেছিল, তাহার নিকটে একটি টুল ছিল। পূজারী বলিলেন, "আপনি ঐ স্থানে বসিয়া এই পত্রখানি পাঠ করুন; পাঠান্তে, ঐ আসনের নিকট কি দ্রব্যাদি ঢাকা আছে, উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন, আমি আসিতেছি।" এই বলিয়া যখন তিনি চলিয়া যান, তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি আমাকে যে কি কথা বলিবেন?" তিনি বলিলেন, "ঐ পত্রখানি পড়িলে সকল কথা বুঝিতে পারিবেন।" আমি বড় আশান্বিত হইয়া পত্রখানি খুলিলাম। ইতিমধ্যে পূজারী ঠাকুর বাহির-দিকে কুলুপ

দ্বারা ঘর বন্ধ করিয়া পলাইলেন। "কি করেন! কি করেন!" বলিয়া চীৎকার করিলাম, কিন্তু পূজারীর কোনও উত্তর পাইলাম না। আমি ঐ ঘরে বন্দী হইলাম। পূজারীর ব্যবহারে আমার আশা ভরসা লুপ্ত হইল। পত্র পড়িতে ইচ্ছা হইল না। উহা ফেলিয়া ভাবিতে লাগিলাম, আমি ত বন্দী, বিবাহ ত বন্ধ হইল, কিন্তু পিতা-মাতার আমার প্রতি কিরূপ ভাব দাঁড়াইবে? কিরূপেই বা তাঁহাদিগকে এই ঘটনা বুঝাইব? আমার কথা কি তাঁহারা বিশ্বাস করিবেন? আর মালিনীর অন্যের সহিত—দূর হউক, ও কথা যাউক। পুনরায় সাহায্যের জন্য চীৎকার করিতে লাগিলাম। কাহারও কোনও উত্তর পাইলাম না। ঘরের দরজা ঠেলিতে লাগিলাম, কোনও প্রকারে কাহারও সাহায্য পাইলাম না। পরে ভাবিলাম, আমার ন্যায় মূর্খ এ জগতে নাই, কে এবং কি জন্য আমাকে বন্দী করিল, তাহা নিশ্চয়ই ঐ পত্রে আছে। পত্রখানি খুলিলাম—

"শ্রীচরণেষু,—মনে পড়ে কি, প্রায় পাঁচ বৎসর হইল কাশীতে সাবিত্রী-মন্দিরে, সাবিত্রী-সম্মুখে, একটি দশমবর্ষীয়া বালিকাকে বিবাহ করিয়াছিলে? মনে পড়ে কি, একটা কালো জালায় গলায় ফুলের মালা দেখিয়া তোমার বালিকাপত্নীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, 'ঐ কি কাশীর তিলভাণ্ডেশ্বর?—' আমি তোমার সেই পত্নী। মরি নাই, জীবিতা আছি, কিন্তু এখন আর বালিকা নহি, এখন আমার স্বামীকে চিনিয়াছি, এখন বিষয়-বোধ হইয়াছে, বিষয় হইতে বেদখল হইব না, আমার স্বামীকে আর কাহাকেও স্বামী বলিতে দিব না, জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়াছি।

"শুনিলাম, অদ্যরাত্রে তুমি গিরিজায়াকে বিবাহ করিবে। আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্যানুরোধে তুমি তাহাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছ। বাগ্দিনী গিরিজায়ার হাত হইতে এবং পিতামাতার ক্রোধ হইতে তোমায় রক্ষা করিব—কৌশল করিয়াছি, তোমাকে বন্দী করিয়া বিবাহ বন্ধ করিব। এখন ভগবান যাহা করেন, কিন্তু যদি সফল হই—তাহা হইলে আমায় কি দিবে?—স্বামীর নিকট স্ত্রীর চিরবাঞ্ছিত ধন, যাহা আমার দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে, তাহারই আকাঙ্ক্ষা করি—দিবে কি? সে আশাই বা করি কেন? তুমি ত আমায় কখনও দেখ নাই, সেই এক মুহূর্ত্তের জন্য শুভদৃষ্টি ভিন্ন আর আমায় ত কখনও দেখ নাই—কে জানে আমার অদৃষ্টে কি আছে!—আমার ন্যায় মন্দভাগিনী বুঝি এ জগতে আর নাই।

"যে পূজারী তোমায় বন্দী করিবে, তাহার উপর বিরক্ত হইও না। তাহার

কোনও অপরাধ নাই,—অপরাধ আমার। ঐ পূজারী আমাদের বিবাহ দিয়াছিলেন, ইনি আমাদের কুলোপুরোহিতের পুত্র, বাল্যকালে আমাকে কোলে পিঠে করিতেন, পরে কাশীতে পিতামহের নিকট থাকিতেন, আমাদের বিবাহ গোপনে রাখিবার জন্য কাশীর বিশ্বেশ্বরের সম্মুখে পিতামহ উঁহাকে শপথ করাইয়াছিলেন, ইনি এখন শ্রীনগরের কোনও মন্দিরের এক জন পূজারী। গিরির সহিত তোমার বিবাহ-সংবাদ ইনি আমাকে দিয়াছিলেন। এই সংবাদে আমি তিন দিন বিছানায় পড়িয়াছিলাম, এবং এই অবস্থাতে কিরূপে এ বিবাহ বন্ধ করিব, তাহার কৌশল মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম, এবং ঐ পূজারীকে ঐ কৌশলাবলম্বনে বিবাহ বন্ধ করিতে অনুরোধ করিয়াছি। তাহার কোনও অপরাধ নাই।

"আমার পরিচয় দিবার এখনও সময় হয় নাই, কখনও যে হইবে, সে আশাও করি না। যাহা হউক, একবার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কথা কহিবার বড় সাধ হইয়াছে, যদি কেহ 'জয় তিলভাণ্ডেশ্বর' বলিয়া তোমার সম্মুখে শব্দ করে, তবে তুমি তাহার সহিত আসিও, দেখা হইবে।

"বিবাহ ত হইবে না, তবে সমস্ত দিন উপবাস করিয়া থাক কেন? কিছু আহার্য্য সামগ্রী পাঠাইলাম, তোমার সহধর্ম্মিণীর অনুরোধে খাইও।

"সেবিকা

শ্রীমতী———"

মন্দ নয়,—ইনিই আমার স্ত্রী,—ইনি ত সহজ মেয়ে নহেন,—ইনি কে?—ইঁহার শ্রীনগরে বাস, ইহা নিশ্চয়,—কিন্তু কাহার কন্যা? ভাবিতে ভাবিতে স্থির করিলাম যে, আমার পিতৃদেবের পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত মোহিতমোহন গোস্বামীর অনেকগুলি পৌত্রী ও দৌহিত্রী আছে, তাহাদের মধ্যে একটি। গোস্বামী মহাশয় আমার পিতার মামা-সম্বন্ধে কে হয়েন, সে জন্য মেয়েরা আমার সম্মুখে বাহির হয়েন, ও কথা কহেন। তাহাদের বয়সের হিসাব করিয়া তিনটির প্রতি আমার সন্দেহ হইল—কৃষ্ণভাবিনী. সত্যভামিনী ও গরবিনী—তিনটীই বিদ্যা, বুদ্ধি ও রূপে শ্রীনগরে বিখ্যাত। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোনটি? আচ্ছা, কাল বুঝিব। কাল আমি তাহাদের বাটীতে যাইয়া তাহাদের ভাবভঙ্গীতে বুঝিতে পারিব। কিন্তু ভাবভঙ্গীতে স্ত্রীর অনুসন্ধান করিতে হইল না—তিনি আপনি আসিয়া দেখা দিলেন—কিন্তু হায়! কি অবস্থাতে দেখা দিলেন, অদ্যাপি মনে হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

এইরূপ ভাবিতেছিলাম, এমন সময়ে কে এক জন ঐ ঘরের দ্বার খুলিয়া দিয়া বলিলেন, "লগ্ন উত্তীর্ণ হইয়াছে, এখন আপনি মন্দিরে ফিরে যান।" আমি বাহিরে আসিয়া, দ্রুতপদে মন্দিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। গুপ্তদ্বারদেশে পিতা আমার অপেক্ষা করিতেছিলেন, আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "আমি বড় ভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম। রামচরণ কে, তাহা তদন্ত না করিয়া তাহার কন্যার সহিত তোমার বিবাহ দিতে আসিয়াছিলাম। এক জন পূজারী আমার চোখ ফুটাইয়া দিলেন, আমাকে বলিলেন, রামচরণ কি জাত, কোথায় উহার পৈতৃক বাসভূমি, তাহা তদন্ত না করিয়া এ বিবাহ দিলে গ্রামে আমায় একঘরে করিবে। সেই পূজারী আরও বলিলেন, আমার জাতকুল রক্ষার জন্য পূজারীগণ আমার নাম করিয়া তোমাকে অন্যস্থানে রাখিয়াছেন। লগ্ন উত্তীর্ণ হইলে তুমি ফিরিয়া আসিবে। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম।" বুঝিলাম, এ সকল আমার স্ত্রীর কৌশল। এইরূপে পিতার সহিত কথা কহিতে কহিতে মন্দিরমধ্যে একটা গোল শুনিলাম। অনুসন্ধানে জানিলাম যে, ঐ মন্দিরে একটি ধনাঢ্য ব্যক্তির পুত্রের সহিত একটি কন্যার বিবাহ হইতেছিল, কিন্তু ঐ পাত্রী ঐ ঘরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে রামচরণ কৌশলে তাহার কন্যা গিরিজায়াকে বসাইতে গিয়া ধরা পড়িয়া কন্যা লইয়া পলাইয়াছে। এই গোলমালে ঐ ধনী পাত্রেরও বিবাহ বন্ধ হইল। আমার আনন্দের আর সীমা রহিল না, গিরির সহিত আমার বিবাহ বন্ধ হইল, আবার মালিনীরও বিবাহ বন্ধ হইল—ঐ পাত্রী যে মালিনী, তাহা আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছিলাম। আনন্দে আমি মালিনীকে দেখিবার জন্য মন্দিরমধ্যে লাঠিমের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। দেখা না পাইয়া পিতার নিকট ফিরিয়া আসিলাম। পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে পূজারী আমাকে সতর্ক করিয়াছিলেন তিনি আমাদের বড় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী; সে ব্যক্তি কে, চেন ?" তখন আমার স্ত্রীকে মনে পড়িল, আমার স্ত্রীর বুদ্ধিতে গিরির সহিত আমার বিবাহ বন্ধ হইল, আমার স্ত্রীর বুদ্ধিতে মালিনীর বিবাহ বন্ধ হইল—আমি সেই স্ত্রীকে ভুলিয়া গিয়া "মালিনী, মালিনী" করিয়া বেড়াইতেছি! মনে একটা ধিক্কার জন্মিল। হায়, ভালবাসা! তোমাকে জানিতাম, তুমি আকাশকুসুম; এখন বুঝিতে পারিতেছি, তুমি কোমলমধুর, সুবাসিত বিষাক্ত কুসুমদাম।

এইরূপ মনের অবস্থাতে পিতার সহিত গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। পরদিন শুনিলাম, রামচরণ সপরিবারে শ্রীনগর হইতে পলায়ন করিয়াছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।—এটর্ণী-সংবাদ।

কিছুদিন পরে এক দিবস বেলা আটটার সময়, এক জন হ্যাট-কোট-ধারী ভদ্রলোক আমাদের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি পিতাকে দেখিয়া, টুপী খুলিয়া ঈষৎ মাথা নোয়াইয়া অভিবাদন করিলেন। পিতাও তদ্রূপ করিলেন। পিতা তাঁহাকে উপরে লইয়া গিয়া বৈঠকখানার একটী কোচে বসাইলেন। তিনি আপনার পরিচয় আপনি দিলেন। জিজ্ঞাসা করিতে হইল না। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের এক জন এটর্ণী, তাঁহার নিবাস শ্রীনগরে। প্রথম মিষ্টালাপের পর তিনি বলিলেন, "আপনি একটি সম্পত্তি পাইলেন।" পিতা বলিলেন "হাঁ, আমার মাতুলের বিষয় পাইয়াছি।"

এটর্ণী। না না, সে সম্পত্তির কথা বলিতেছি না। একটা নূতন সম্পত্তি—আপনার পৈতৃক সম্পত্তি।

পি। আমার ত পৈতৃক সম্পত্তি নাই।

এ। আপনি ত এলাহাবাদের হরিহর বাবুর পুত্র মনোহর বাবু?

পি। হাঁ।

এ। তবে আপনার পৈতৃক বিষয় কিছু ছিল কি না, তা জানেন না?

পি। না।

এ। না জানিবার কথা বটে। তবে শুনুন। আপনার পিতা হরিহর বাবুর প্রতি, তাঁহার পিতা শ্রীধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও কারণে ক্রোধ উপস্থিত হওয়ায়, তিনি দেশত্যাগ করিয়া গেলেন। কোথায় গেলেন, তাহা কেহ জানিতে পারে নাই। ছয় বৎসর পরে হরিহর বাবু তাঁহার পিতাকে একখানি পত্র লিখিলেন যে, তিনি বিবাহ করিয়াছেন ও তাঁহার একটী পুত্র সন্তান জন্মিয়াছে, তাঁহার নাম রাখিয়াছেন—মনোহর। পিতাকে অনুনয় বিনয় করিয়া লিখিলেন যে, তিনি তাঁহার সন্তানকে আশীর্ব্বাদ করেন, যেন তাঁহার ন্যায় তাঁহার সন্তান ভাগ্যহীন না হয়; কিন্তু কোন্ স্থান হইতে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পত্রে লেখেন নাই। এই পত্র পাইয়া শ্রীধর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁছার পুত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। যে স্থানের পোষ্টমার্ক ছিল, সে স্থানে ও অন্যান্য স্থানে অনুসন্ধান করা হইয়াছিল, কিন্তু কোনও স্থানেই তাঁহার সন্ধান পাইলেন না। এক বৎসর পরে যখন শ্রীধরের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল, তখন একখানি উইল দ্বারা তাঁহার সর্ব্বস্ব তাঁহার পৌত্র মনোহর বন্দ্যোপাধ্যায়কে অর্পন করিলেন; কিন্তু যতদিন না তাঁহার পৌত্রের

সন্ধান পাওয়া যায়, ততদিন তাঁহার কোনও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়া, তাঁহার জিম্মায় ঐ বিষয় রাখিয়া গেলেন। সে প্রায় ৪০।৪৫ বৎসরের কথা। সেই ম্যানেজার তীর্থ-পর্য্যটনে যাইয়া সম্প্রতি জানিতে পারিয়াছেন যে, হরিহর বাবু এলাহাবাদে বাস করিতেন; তাঁহার পুত্র মনোহর বাবুও সেই স্থানেই ছিলেন; পরে মাতুলের বিষয় পাইয়া শ্রীনগরে আসিয়াছেন। ম্যানেজারের সেই তীর্থস্থানেই মৃত্যু হয়। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার পুত্রকে এই সংবাদ লিখিয়া অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন যে, বিষয় পত্রপাঠ মনোহর বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছাড়িয়া দেন, এবং তৎসহিত উইলখানি ও একখানি রেজেষ্ট্রী করা নাদাবী পত্রও পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার পুত্র আপনাকে এই সংবাদ দিবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন।

পি। উইলখানি দেখি?

এ। অদ্য দেখাইতে পারিলাম না, আগামী কল্য দেখাইব।

পি। কেন?

এ। আপনি যদি উইলখানি এখন পাঠ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে চিনিতে পারিবেন।

পি। তাহাতে আপত্তি কি?

এ। ইনি এক জন বিশেষ সম্ভ্রান্ত লোক। ইনি জানিতেন না যে, পরের বিষয় ভোগ করিতেছিলেন। জন্মাবধি জানিতেন যে, বিষয় তাঁহার পৈতৃক! এখানে সকলেরই ঐরূপ ধারণা। হঠাৎ এ কথা প্রকাশ হইলে, এই ভদ্রলোকটীর অপমানের ও মনঃকষ্টের সীমা থাকিবে না। সেই জন্য তিনি অদ্য রাত্রেই এই গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, আর ফিরিবেন না। আপনি আগামী কল্য পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন।

পি। তিনি ত চলিয়া যাইবেন, তবে কাহার নিকট হইতে বিষয় বুঝিয়া লইব?

এ। আমার নিকট হইতে; অথবা তাঁহার এক জন কর্ম্মচারী আছেন, তাঁহার নিকট হইতে লইবেন। একটী কথা আপনাকে বলিয়া রাখি যে, এই ভদ্রলোকটী কেবলমাত্র পরিধানের ধুতি ও চাদর লইয়া যাইবেন। আপনার একটী পয়সাও লইয়া যাইবেন না।

পি। তাঁহার নিজের পৈতৃক বিষয় কি আছে?

এ। কিছু না। হবিষ্য করিবার বা পিতৃশ্রাদ্ধ করিবার সঙ্গতি আছে কি না সন্দেহ।

পি। আমি বিষয় হইতে কিছু তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছি।

এ। কিছু লইবেন না। সে কথা আমি বলিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি রাজি হন নাই।

পি। তাঁহার স্ত্রী পুত্র আছে কি?

এ। "না,—এক্ষণে আমি উঠিলাম।" এই বলিয়া টুপী ও ছড়ি হাতে করিয়া পিতার সহিত করমর্দ্দন করিয়া চলিলেন। যাইবার সময়—"একটা অনুরোধ আছে" বলিয়া দাঁড়াইলেন, পরে বলিলেন আগামী কল্য পর্য্যন্ত এই কথাগুলি গোপন রাখিবেন। আর একটা অনুরোধ—একটী পাত্রী আছে, পরমসুন্দরী ও সুশিক্ষিতা। আপনার পুত্রের সহিত যদি তাহার বিবাহ দেন—যা'ক, পরে সে কথা হইবে। এখন চলিলাম।" এই বলিয়া আমাদের Grand Staircase দিয়া সাহেবী চালে নামিয়া গেলেন। ইনি কখনও বিলাতযান নাই, কলিকাতায় বাস করিয়া সাহেব হইয়াছেন।

এই এটর্ণী সাহেবের শেষ কথা শুনিয়া আমার বড় রাগ হইল। আবার বিবাহ। উনি করেন এটর্ণীগিরি। রামের ধন শ্যামকে দিবার জন্য অহরহঃ মাথা ঘামাইয়া মরেন, আবার ইহার উপর ঘটকালি কেন? বুঝেছি, উঁহার ভগিনীকে আমায় দিতে চান। আমাতে এখন ত্র্যহস্পর্শ যোগ ঘটিয়াছে; আমি বিদ্যাতে, ঐশ্বর্য্যে ও কৌলীন্যমর্য্যাদায় সর্ব্বপ্রধান। আমি যদি উহাকে পত্নী-সহোদরবাচক সম্বোধনে ডাকি, তাহা হইলে উঁহার গৌরববৃদ্ধি হইবে। কিন্তু সে আশা যেন না করেন।

ঐ দিন সন্ধ্যার সময় সর্ব্বমঙ্গলার আরতি দেখিয়া বাটী ফিরিতেছিলাম, এমন সময় অন্ধকারে আমার সম্মুখে একটী লোক আসিয়া দাঁড়াইয়া "জয় তিলভাণ্ডেশ্বর" বলিয়া শব্দ করিল। আমি উহা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমাকে কোথায় যাইতে হইবে?" তিনি বলিলেন, "গোবিন্দজীর মন্দিরের পশ্চাতে যে একটী বকুল বৃক্ষ আছে, রাত্রি দ্বিপ্রহরে উহার তলায় দাঁড়াইয়া থাকিবেন, আমি আসিয়া লইয়া যাইব।" ঐই বলিয়া তিনি অন্ধকারে অদৃশ্য হইলেন। আমিও বাটী ফিরিলাম।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।—দেশান্তরে।

পূর্ব্বোল্লিখিত সঙ্কেত অনুসারে আমি রাত্রি দ্বিপ্রহরে সেই বকুলতলায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। পৃথিবী অন্ধকারময়ী, আকাশ নিবিড় নীরদমালায় আবৃত, সন্ সন্

শব্দে ঝড় বহিতেছে—ঠিক ঝড় নহে—প্রবল বায়ু বহিতেছে। ভাগীরথী গাঢ় অন্ধকারে অদৃশ্য। তীরে তাহার তরঙ্গাভিঘাতশব্দ হইতেছে। দূরে একটী অশ্বত্থবৃক্ষে বসিয়া একটা পেচক অমঙ্গলসূচক ধ্বনি করিতেছে। বুঝিলাম, বড় অশুভ। লেখাপড়া শিখিলেই কি বাল্যসংস্কার যায়? যায় না। মনে মনে নানা প্রকার ভয় হইতে লাগিল; কি জানি, কি কারণে আমার মন বড় চঞ্চল হইল। কিসের আশঙ্কা বুঝিতে পারিলাম না—যেন আমার কি একটা দুর্ঘটনা ঘটিবে। এইরূপ আশঙ্কায় অস্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছি, ইত্যবসরে এক জন সম্মুখে আসিয়া "জয় তিলভাণ্ডেশ্বর" শব্দ করিল। আমি বলিলাম, "কোথায় যাইতে হইবে, চলুন।" "আসুন" বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন। পরে গোবিন্দজীর মন্দিরের গুপ্তদ্বার দিয়া আমাকে লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিয়া একটী অন্ধকার ঘরে ছাড়িয়া দিলেন। কিঞ্চিৎ পরে চুড়ির শব্দে বুঝিলাম, একটী স্ত্রীলোক ঘরে প্রবেশ করিলেন ও অতি কাতর স্বরে আমাকে ডাকিলেন, "তুমি কোথায়? আমি যে অন্ধকারে তোমায় দেখিতে পাইতেছি না, আমার কাছে এস।" এই কাতর কণ্ঠস্বরে আমার হৃদয় আর্দ্র হইল। কিন্তু যে কণ্ঠস্বর শুনিলাম, উহা যেন কোথায় শুনিয়াছি। আর এত করুণস্বরে ডাকিল কেন? আমি বলিলাম, "আমি এইখানে, এস-এস।" এই বলিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া হাত ধরিলাম। আমার হস্তে দুই এক ফোঁটা তাহার চক্ষের জল পড়িল। আমি বলিলাম, "এ কি? কাঁদিতেছ কেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "না, কাঁদি নাই।" আমি তাঁহাকে নিকটে বসাইলাম। চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে তিনি আমার সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন। উহাতে কেবল কাতরতা ছিল। সে কাতরতা আমারই জন্য। আমার স্ত্রীর প্রতি আমার হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল। ক্ষণকালের জন্য আমি মালিনীকে ভুলিয়া গিয়া, স্ত্রীকে বলিলাম—"চল, গৃহে চল, আর এ জীবনে ছাড়াছাড়ি হইব না।" স্ত্রী মৌনাবলম্বনে রহিলেন। আমি পুনঃ পুনঃ ঐরূপ অনুরোধ ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, "আর আমি পরিচয় দিব না।" আমি একটু বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "তবে দেখা করিতে এলে কেন?" আমার স্ত্রী অস্ফুটভাবে কাঁদিয়া বলিলেন, "এলুম কেন, তা' তুমি বুঝিবে কিরূপে? স্বামীর নিকট বসিয়া, স্বামীর সহিত কথা কহিয়া স্ত্রীলোকের যে কি সুখ, তাহা তুমি বুঝিবে কি প্রকারে?" এই কথায় আমি অপ্রতিভ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কি চিরকাল স্বামীর নিকট অপরিচিতা থাকিবে?"

স্ত্রী বলিলেন—ভগবান তাই করিলেন বটে।

আ। স্বামীর নিকট অপরিচিতা থাকিবার এরূপ আকাঙ্ক্ষা হিন্দুরমণীর ত কখনও শুনি নাই।

স্ত্রী। শুনিবে কেমন করিয়া? আমার ন্যায় চিরদুঃখিনী ত কখনও জন্মায় নাই।

আ। তুমি চিরদুঃখিনী? কেন?

স্ত্রী। মনে পড়ে? কাশীতে সেই বিবাহরাত্রে স্বামীর মুখ দেখিলাম। মুখ দেখিয়া আর ভুলিলাম না। কিন্তু সে মুখ আর দেখিতে পাইলাম না। আর কখনও যে দেখিতে পাইব, এমন ভরসাও ছিল না। তখন বালিকা ছিলাম, তবু কত কাঁদিতাম। তবে শ্রীনগরে যখন তোমায় দেখিলাম—দেখিয়া চিনিলাম যে, তুমিই আমার স্বামী; তখন তোমায় দেখিবার বড় বাসনা জন্মিল। দিন দিন সে বাসনা বড় প্রবল হইল। মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাইতাম বটে, কিন্তু স্বামী বলিয়া নয়। আমার স্বামীর প্রতি আমার অধিকার জন্মিল না। বল দেখি, আমি কি চিরদুঃখিনী নই? আমি কি এমন অপরাধ করিয়াছি যে, আমার স্বামীকে আমি দেখিতে পাইব না? বালিকা হইতে প্রাচীনারা, হাড়ি ডোম হইতে রাজরাজেশ্বরের ঘরের মেয়েরা, সকলেই ত স্বামী লইয়া ঘর করে। তবে আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে, স্বামী পাইব না? আমার অপেক্ষা চিরদুঃখিনী আর কেহ আছে? এইরূপ মনঃকষ্টে দিন রাত কাটাইতাম, কিন্তু মনে মনে একটা আশা ছিল যে, চিরদিন কখনও সমান যায় না। পিতার হয় ত নিরপরাধ জামাতার প্রতি কোনও না কোনও সময়ে ক্রোধের অপনয়ন হইবে। তখন স্বামী পাইব। কিন্তু গতকল্য হইতে সে আশা ভরসা অন্তর্হিত হইয়াছে। এক্ষণে যদি পিতা জানিতে পারেন যে, তুমি তাঁহার জামাতা, তাহা হইলে তোমার প্রতি তাঁহার ক্রোধ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইবে।

আ। তোমার কথা বুঝিতে পারিতেছি না। কেন তাঁহার ক্রোধ বাড়িবে?

স্ত্রী। অদ্য প্রাতে তোমাদের বাটীতে কোনও এটর্ণী বাবু যাইয়া কোনও নূতন সম্পত্তিপ্রাপ্তির সংবাদ দিয়াছেন কি?

আ। হাঁ।

স্ত্রী। ঐ সম্পত্তি আমার পিতা জন্মাবধি ভোগ করিতেছিলেন। তিনি জানিতেন যে, উহা তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি। কিন্তু গত কল্য রাত্রে উহা যে তোমাদের সম্পত্তি, তাহা জানিতে পারিয়া লজ্জায়, অপমানে ও ঘৃণায় মৃতবৎ হইয়াছেন। অদ্য রাত্রেই দেশ ছাড়িয়া যাইবেন। আমরা যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছি। আমি গোবিন্দজী দর্শন উপলক্ষ্য করিয়া তোমাকে দেখিতে

আসিয়াছি। তিনি তোমাদের কিছুই লইয়া যাইবেন না। কেবল পরিধেয় বস্ত্র ও চাদর লইয়া যাইবেন।

আ। তুমিও কি সঙ্গে যাইবে নাকি ?

স্ত্রী। হাঁ।

আ। এইমাত্র বলিতেছিলে যে, স্বামীকে না পাইয়া তুমি চিরদুঃখিনী হইয়াছ। তবে আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইবে কেন ?

স্ত্রী। দরিদ্র পিতার জন্য তোমাকে ত্যাগ করিতে হইল। তোমাকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী দেখিয়া চলিলাম ; তুমি আবার বিবাহ করিবে, সুখী হইবে ও আমাকে ভুলিয়া যাইবে। তাহাও বুঝিতে পারিতেছি। তোমাকে না দেখিতে পাইলে আমার যে দুঃখ, তাহা আজীবন আমারই রহিল। কিন্তু তুমি যে সুখী হইবে, তাহা বুঝিতে পারিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইয়া চলিলাম। কিন্তু আমার পিতার ত আর কেহ নাই। তিনি এক্ষণে দরিদ্র হইলেন, তাঁহার জন্য এক্ষণে আমার চিন্তা। আমি কি এ অবস্থায় তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারি, সেই জন্য আমি নিজ সুখে জলাঞ্জলি দিয়া পিতার সঙ্গেই চলিলাম। তাই বলিতেছিলাম—আমার ন্যায় চিরদুঃখিনী আর জন্মে নাই।

এই সকল কথা শুনিয়া স্ত্রীর প্রতি আমার দয়ার উদ্রেক হইল। কিন্তু আমার স্ত্রী কে ? তাহা জানিবার জন্য আগ্রহ হইল। আমি জানিতাম যে, তনি কোনমতেই তাঁহার পরিচয় দিবেন না, সেই জন্য সঙ্গে একটী বাতী ও দিয়াশালাই আনিয়াছিলাম। পকেট হইতে ঐগুলি বাহির করিয়া আলো জ্বালিয়া দেখিলাম, মলিনবসনা, রুক্ষকেশী, অলঙ্কারবিহীনা ষোড়শী দাঁড়াইয়া মুখে অঞ্চল চাপিয়া কাঁদিতেছে। দুই হস্তে কেবল কাচের চুড়ি ছিল। দেখিবামাত্র আমি উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিলাম—মালিনী, মালিনী, মালিনী আমার স্ত্রী, আমি এত ভাগ্য করিয়াছি যে, মালিনী আমার স্ত্রী। মালিনী স্থিরভাবে মস্তক নত করিয়া অবিশ্রান্ত কাঁদিতে লাগিল।

আ। মালিনী, তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া গেলে আমি বাঁচিব না। যাইও না, রক্ষা কর, রক্ষা কর।

স্ত্রী। (দুই পদ অগ্রসর হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমার হস্ত ধরিয়া বলিল) তুমি আমার সর্ব্বস্বধন। ইহকাল ও পরকাল। আমাকে যাইতে নিষেধ করিও না। আমার পিতা কে ? তাহা জানিতে পারিলে ত ? এখন বল দেখি, সেই পিতা দরিদ্র হইয়া একাকী দেশান্তরে যাইলে কে তাঁহাকে রাঁধিয়া খাওয়াইবে ?

কে তাঁহার সেবা করিবে? মানসিক ও শারীরিক কষ্টে তাঁহার দেহ ভগ্ন হইয়া পড়িবে। আমি কি তোমার নিকট থাকিয়া সুখী হইতে পারিব? দিবানিশি তাঁহার কষ্ট মনে পড়িবে। তাহাতে তুমি অসুখী ব্যতীত সুখী হইবে না। আমার উপর রাগ করিও না। আমি অনুরোধ করি, আবার তুমি বিবাহ কর। আমার ভগিনী গৌরীকে বিবাহ কর। আমি এখন জন্মের মত বিদায় হই। এই বলিয়া আমার পদধূলি লইতে গিয়া আমার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "গিরির সহিত বিবাহ কত কৌশলে বন্ধ করিয়া আবার গৌরীকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিতেছ কেন?"

স্ত্রী। তখন আশা ছিল, তখন ভরসা ছিল। এখন সে আশা নাই, সে ভরসা নাই। তখন স্বামী লইয়া আমিই সুখী হইব, এই আশা সর্ব্বদা প্রবল ছিল। এখন স্বামী কিসে সুখী হইবেন, এই বাসনা বলবতী হইয়াছে। আর পিতার কিসে কষ্ট দূর হইবে, সেই উদ্দেশ্যে আমার বড় আদরের স্বামী পরকে দিয়া পিতার দরিদ্রতা গ্রহণ করিয়া তাঁহার সঙ্গেই চলিলাম। কিন্তু তোমায় দেখিতে না পাইয়া বেশীদিন বাঁচিব না। এই বলিতে বলিতে সে আছড়াইয়া আমার পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি বসিয়া তাহার হাত ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। উভয়ে নীরবে কতই কাঁদিতে লাগিলাম। বুঝিলাম, মালিনী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, উহাকে ফিরাইবার আর উপায় নাই। মালিনী বলিল, "বিলম্ব হইলে পিতা এই ঘরে খুঁজিতে আসিতে পারেন।" এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পলাইয়া গেল। যাইতে যাইতে পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া গেল।

আমি বাহিরে গিয়া আবার সেই বকুলতলার সিমেণ্টের পিঁড়িতে গিয়া বসিলাম। কেন যে সেখানে গেলাম, তা বুঝিতে পারি নাই। সেইরূপ অন্ধকার ছিল, কিন্তু বায়ুর গর্জ্জন ছিল না। আমি গাছতলায় বসিয়া অবিশ্রান্ত কাঁদিতে লাগিলাম। অতি অল্পক্ষণ পরেই দেখিলাম, দুই ব্যক্তি অন্ধকারে আমার দিকে আসিতেছেন। ঐ বকুলগাছের নীচে যাতায়াতের রাস্তা ছিল। আমি তাহাদের দেখিয়া গাছের অন্তরালে লুকাইয়া দেখিলাম। আমার শ্বশুর আদিত্যমোহন বাবু ও মালিনী আসিতেছেন। শ্বশুর তাহাকে বলিলেন, "মালিনী! আর কাঁদিতেছ কেন মা?" মালিনী ফুঁপাইতে ফুঁপাইতে কাঁদিয়া বলিল, "বাবা, আমি যে আমার সর্ব্বস্বধন ফেলিয়া চলিলাম।" শ্বশুর বলিলেন, "ছিঃ মা! ও যে পরের।" মালিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ভগবান তাই করিলেন? আমার—পরকে দিলেন। হে ভগবান তুমি যাহাই করিবে, তাহাই আমার শিরোধার্য্য।" আমি বুঝিলাম,

আমার জন্য কাঁদিতেছে। বাঁধাঘাটে একটী ছোট নৌকা ছিল। তাহাতে দুই জনে উঠিলেন। পরে শ্বেতপাল বিস্তার করিয়া নৌকা অনন্তস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে অনন্ত অন্ধকারে মিশিল। ঐশ্বর্য্যে লালিতা, আদরের আদরিণী, গৌরবের গৌরবিনী, চির-অবরোধবাসিনী, মালিনী পথের কাঙ্গালিনী হইয়া চলিলেন। পিতৃসেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া চলিলেন।

রাত্রিশেষে আমিও কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিলাম।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের স্মৃতি-সভায় কিশোরীচাঁদ মিত্র।

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের স্বর্গারোহণের পরে, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ২৯শে অক্টোবর দিবসে, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সভাগৃহে, তাঁহার স্মৃতিরক্ষাকল্পে একটি সভা আহূত হয়। স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র এই সভায় ইংরাজী ভাষায় যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সভাপতি মহাশয় এবং ভদ্র মহোদয়গণ! যে পরোলোকগত মহাত্মার প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ আমরা এই স্থলে সমবেত হইয়াছি, তাঁহার অশেষবিধ গুণগ্রামে বিমুগ্ধ হইয়া যদি আমার বাক্‌শক্তি তিরোহিত না হইত, তাহা হইলে আমি আমার ক্ষীণ স্বর উত্থিত করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতাম না। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবের সমর্থনে আমি কয়েকটি কথা বলিব—অধিক বলিবার সামর্থ্য নাই। বহুদিন পূর্ব্বে—যখন আমি হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলাম, এবং তিনি উহার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন—তখন হইতে স্বর্গীয় মহাত্মাকে আমি জানি। কিন্তু তাঁহার সহিত আমি ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশি নাই, এবং সেই জন্য তাঁহার গার্হস্থ্য এবং ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কিছু বলিতে অক্ষম। কিন্তু জননায়করূপে তাঁহার যে সকল বিবিধ সদ্‌গুণরাজি বিরাজিত ছিল, তাহা প্রত্যক্ষ ও প্রশংসা করিবার বহু সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছি। বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর বিশেষ ভাবে এক জন স্বদেশহিতৈষী জননায়ক ছিলেন, এবং দেশের অনেক জনহিতকর কার্য্য

করিয়া গিয়াছেন। তরুণ বয়সেই,—যখন সংবাদপত্রাদি আজিকার স্থায় কল্যাণ ও অকল্যাণ সাধন করিবার ক্ষমতা লাভ করে নাই,—তিনি উহার শক্তির গুরুত্ব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সংবাদ পত্রের স্তম্ভে দেশের অভাব অভিযোগের কথা সুপ্রকাশ করিলে দেশের মহাকল্যাণ সাধিত হইবে, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি 'রিফর্মার' (সংস্কারক) নামে একখানি সংবাদ পত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সাপ্তাহিক পত্রখানি অতি যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইত। উঁহার জীবনকালে উহা দেশের অনেক উপকার সাধিত করিয়াছিল। উহার পরে জ্ঞানান্বেষণ, বেঙ্গল স্পেক্টেটর, হিন্দুপেট্রিয়ট প্রভৃতি বহু সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা হয়, কিন্তু বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরই ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্রের জন্মদাতা বলিয়া অভিহিত হইবেন। বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটী বা জমীদার-সভা সংস্থাপন করেন, তখন বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মিষ্টার কব্ হারীর সহিত উহার সম্পাদক নিযুক্ত হয়েন। সম্পাদকরূপে ইনি ভূমিসংক্রান্ত বহু জটিল প্রশ্নের আলোচনায় যোগদান করিতেন। কলিকাতা জর্ণ্যালের স্তম্ভগুলির প্রতি নেত্রপাত করিলে ইহার বহু প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার গৃহে অদ্য আমরা সমবেত হইয়াছি, সেই সভার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ সকলেই অবগত আছেন—বিস্তারিতভাবে বিবৃত করা নিষ্প্রয়োজন। কর্ম্ম ও ভাবরাজ্যের এই বর্ত্তমান বিপ্লবের প্রধান নায়কগণ যে হিন্দুকলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই বিদ্যালয়ের সহিত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নাম অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত। উহার তত্ত্বাবধায়ক ও পরিচালকরূপে তিনি এই মহাবিদ্যালয়ের উন্নতির নিমিত্ত সর্ব্বদাই আগ্রহপূর্ণ যত্ন প্রকাশ করিতেন। কিন্তু ব্যবহারশাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্যই তিনি বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার কারণ তিনি ব্যবহারশাস্ত্র—রেগুলেশন আইন—বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; তাহাই নহে—তাঁহার সূক্ষ্মবিচারশক্তি ও অপূর্ব্ব মেধা তাঁহাকে এই শাস্ত্রে সম্পূর্ণ পারদর্শী করিয়াছিল। রেগুলেশন আইনের ইতিহাসের জ্ঞানে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিলেন না। বিবিধ রেগুলেশন এবং ব্যবস্থা, গবর্মেণ্টের যে সকল মন্তব্য, অবধারণ বা ব্যবস্থাপক-সভার আলোচনায় বিধিবদ্ধ, পরিবর্ত্তিত, বা পরিত্যক্ত হইয়াছে তাহা তাঁহার নখদর্পণে ছিল, এবং যেন স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানপ্রণোদিত হইয়া তাহা যে কোনও মুহূর্ত্তে বাহির করিয়া দিতে পারিতেন। যখন ভূমিকরবিষয়ক আইন (Rent Law) এবং দেওয়ানী কার্য্যবিধি (Civil Procedure code) প্রস্তুত হয়, তখন তিনি ব্যবস্থাপক সভাকে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছিলেন, এবং ইহার জন্য সদস্যগণের

উচ্চপ্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার উইলে তিনি যে সকল দানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার অপর্ব্ব সূক্ষ্মদর্শিতা ও বদান্যতার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

যাঁহারা সম্মানজনক ব্যবসায়ে সাধুভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া প্রভূত সম্মান ও ঐশ্বর্য্য অর্জ্জন করিয়াছেন, যাঁহারা দেশের সেবা দ্বারা তাঁহাদিগের স্বজাতির মঙ্গল-সাধন করিয়াছেন,—সেই সকল হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্রবিদ্ এবং রাজনীতিকগণের স্মৃতি যে অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভে বিরাজিত আছে, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নামও তথায় উচ্চস্থান অধিকৃত করিবে।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

কুসুম ও কবিতা।

[স্বর্গীয় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় লিখিত।]

কুসুম নিজেই একটি কবিতা। কবিতা নিজেই একটি কুসুম। কুসুমে কবিতা এবং কবিতায় কুসুম, দেখা এবং দেখান, না—কোন আর একখানি কবিতা?

ফুলের সহিত কবিতার তুলনা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। এ তুলনা সুন্দর;—ফুলের মতই সুন্দর, কুসুমের মতই সুন্দর। কবিতার মতই সুন্দর। যদি বলি, তাদের অপেক্ষাও বরং কিছু বেশী সুন্দর, তাহা হইলেও অন্ততঃ সৌন্দর্য্যের পরিমাণের হিসাবে, প্রলাপবাক্য বলা হয় না।

কেন না, তুলনা, কুসুম তুলিয়া আনিয়া কবিতার কাণে দোলাইয়া দেয়; কবিতা তল্লাস করিয়া আনিয়া কুসুমের প্রাণে মাখিয়া দেয়। যেখানে কবিতা ছিল না, কেবল কুসুম ছিল; অথবা সেখানে কুসুম ছিল না, কবিতা একলা ছিল; তুলনা, সেখানে 'আপ্ত দূতীর' মত এককে আনিয়া অপরের সহিত মিলাইয়া দিয়া ডবল সৌন্দর্য্য দীপ্ত করিল; দুই কবিতায় কোলাকুলি করিয়া দিয়া নিজে অপর এক কবিতা হইয়া তৃতীয় সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিল। এক সুন্দর অপেক্ষা, দুই সুন্দরের সংমিলন নিশ্চয় সুন্দরতর। পরন্তু সেই সংমিলনের সংযোগ-সূত্রও সুন্দর বটে; নহিলে, সংমিলন সম্ভবে না। জলেই জল বাহির করে। চোরেই চোর ধরিতে পারে। কবিতা ব্যতীত আর কেহই এক কবিতাকে

অপর কবিতার নিকটবর্ত্তী করিতে পারে না। নিকটকারিণী কবিতার নামই তুলনা বা সমালোচনা। পক্ষান্তরে,—কবিমাত্রই তুলনার সংযোজক বা সমালোচক।

সৌন্দর্য্যতত্ত্ববিদ্ বলেন, সুন্দর সাদৃশ্যের সংযোজনাই' কবিতা; উৎকৃষ্ট উপমা ও উপাদেয় উদার তুলনাই কবিতা। * অতএব এ হিসাবেও কবিতা সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিকারিণী তুলনা। অতএব সুন্দরের সৌন্দর্য্য-সাদৃশ্যের সমালোচনাও কবিতা। †

কুসুমে কবিতায় তুলনা সুন্দর, এবং সমুন্নত ভাবোদ্দীপক বটে। সমুন্নত ভাবোদ্দীপক কিসে, বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পারিবে।

প্রস্ফুটিত কুসুম—প্রস্ফুটোন্মুখ কুসুম-কলি কবিতা—কবিতারও কবিতা;—জাগ্রত, জীবন্ত, দেদীপ্যমান, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ কবিতা। কেবল তাহাই নয়। কুসুম কথাটীও কবিত্ব দিয়া গঠিত। কবিতা কথাটীও তাই দিয়া তৈয়ার করা। কুসুম কথাটীতে কুসুমত্ব ও কবিত্ব ক্রীড়া করিতেছে। কবিতা কথাটীতে কোমলত্ব ও কবিত্ব কোলাকুলী করিয়া রহিয়াছে। কুসুম এবং কবিতা; এই দু'টী শব্দ যিনি বা যাঁহারা সৃষ্টি বা সংগঠন করিয়াছিলেন, তিনি বা তাঁহারা অপরিজ্ঞাত অমর কবি। স্বভাবানুকরণ যদি শব্দ-সৃষ্টির সোপান হয়, তাহা হইলে, এবং তাহা না হইলেও, ঐ দুই শব্দে কুসুম-স্বভাব ও কবিতা-স্বরূপ সবিশেষ বিকশিত হইয়া রহিয়াছে।

কুসুম কথাটী মুখের বাহির হইতে হইতেই কাণের ভিতর দিয়া মনে তখনই প্রবেশ করিয়া মর্ম্ম-স্পর্শ করে; মনকে সুন্দরের সৌন্দর্য্য অনুভব ও উপভোগ করায়। কবিতা কথাটীও সেইরূপ। শব্দটী শুনিতে শুনিতেই মন সৌন্দর্য্য-স্পৃষ্ট হয়; সুন্দরকে সহসা সম্মুখে দেখে; স্নায়ু-শৃঙ্খল সন্দীপন করিয়া, শোণিত-প্রবাহ দিয়া, যেন একটী কোমলতার তরঙ্গ—মধুরতার প্রবাহ, প্রাণ-বায়ু আনন্দে আলোকিত করিয়া, ছুটিয়া যায়।

* Poetry consists in liberation of beautiful analogies.

† বলা আবশ্যক যে, তুলনামাত্রই কবিতা নয়; সুন্দর ও সমুন্নত ভাবোদ্দীপক এবং সরল ও সম্যক সাদৃশ্যপরিজ্ঞাপক তুলনাই কবিতা। এ নিয়মে, গদ্য ও পদ্যের প্রভেদ কেবল ছন্দে, যতি-স্থাপনে, ভাষা-সংগঠনে বা লিপি-শরীরে; কবিত্বে ও কবিতায় নহে। গদ্য ও পদ্য উভয়ই, এ নিয়মে কবিতা বা কাব্য হইতে পারে। প্রত্যুত পদ্যে এ নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিলে কবিতা হইতে পারে না। গদ্য এ নিয়মানুরূপ অর্থাৎ সৌন্দর্য্যজ্ঞাপক ও সমুন্নতভাবোদ্দীপক হইলে কাব্য হয়। তুলনা কেবল সুন্দর হইলে ও সমুন্নতভাবোদ্দীপক না হইলে কবিতা হয় না, রসিকতা হইতে পারে।—লেখক।

সর্ব্বত্রই এমনতরটী না হউক, ইহা অপেক্ষা না—হয় কিছু কম হয়। যে সব স্থলে সৌন্দর্য্যানুভূতি তীক্ষ্ণ, মধুরতা ও কোমলতা গ্রহণের শক্তি সজাগ, শিক্ষিত ও সজীব,—এক কথায়, যে সব স্থলে, প্রকৃতি কাব্য-প্রবণ, হৃদয় ভাব-রসাভিজ্ঞ, আত্মা অতীন্দ্রিয় দ্রব্যাকর্ষণ ধারণক্ষম, সেই সব স্থলেই ঐ আলোক ও বিদ্যুৎপ্রবাহ খুব বেশী ফুটে—খুব বেশী বেশী ছুটে। * কিন্তু এমন স্থলও অবশ্য আছে; হায়! তেমনই স্থলই অধিক, যেথানে উহার কোনও কিছু হয় না। আলোকও ফুটে না, বিদ্যুৎও ছুটে না, তরঙ্গও উঠে না। সে সব স্থলে কুসুম, কবিতা, সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাদি অতি লঘু অসার পদার্থ বা অপদার্থ। † সে সকল স্থলে, কবিতা অপেক্ষা কড়াই ভাজাই অবশ্য অধিক প্রিয়। কুসুম অপেক্ষা কচু, কাঁচকলা, কুমড়া প্রভৃতি সসার পদার্থের মূল্য অধিক, অতএব মর্য্যাদাও

* ইহাই সৌন্দর্য্যানুভব ;—appriciation ও admiration অবস্থাটী – ভাবটুকু, ঠিক কিরূপ, বাক্যের বা বর্ণের দ্বারা আঁকিয়া দেখান যায় না। তাহা কেবল অন্তরিন্দ্রিয়েরই অনুভবনীয়।

† কুসুম না-হয়-কোনও-কিছু-একটা পদার্থ ই হইল। হাঁ, উদ্ভিদ বটে। কুসুম মানে ফুল। ফুল দিয়া ঠাকুর-পূজা করিতে হয়, করি; তা, সে কাজটীও কেবলমাত্র ফুলে হয় না। বিল্বপত্র লাগে। সর্ব্বোপরি তণ্ডুল ও কদলীর দরকার হয়। নহিলে দৃষ্টি-ভোজী দেবতারও পেট ভরে না। ভট্টাচার্য্যের ভরা ত পরের কথা। যদি কেবল ফুলেই দেবতাদের চলিত, তাহা হইলে দুনিয়াশুদ্ধ লোক দুর্গোৎসব করিত। তবে ফুলের মালা বেচে কিছু পয়সা হয় বটে। তা সে কয় পয়সাই বা! নেহাত অন্য রকম বিষয়কর্ম্ম না থাকে, ফুল তোলো, মালা গাঁথো; দুটা পয়সা পাবে। এক দণ্ডের ওয়াস্তা—ফুলের মালা! অকর্ম্মা, আহম্মক, সৌখীন, 'ফাজিল' প্রকৃতির লোকেরাই, পয়সা দিয়া ফুলের মালা কিনিয়া গলায় পরে, আর পরায়। তাহাতে কাহারও পেট ভরে না। ফুলের গন্ধ খেয়ে কে কয়দিন কাটাতে পারো বাপু? ফুলে, তবে ইহলোকের কোন্ কাজ হয়? মন্ত্র পড়িয়া, ফুল দিয়া (তাহাতেও চন্দন চাই—শুধু ফুলে হয় না) দেবতার পূজা করিলে পুণ্য ও পরলোকের কিছু কল্যাণ হইতে পারে বটে; কিন্তু, ফুল গলায় পরিলে, চুলে গুঁজিলে, কাণে দোলাইলে, ইহকালের কোনও কাজই ত হয় না, পরকালেরও পুণ্য ও পরিত্রাণ হয় না। প্রত্যুত তাহাতে পাপই আছে। কবি, 'ককনী' নট, লম্পট, স্ত্রৈণ, স্ত্রীজন, বিলাসী ও অপব্যয়ী বাবুরাই ফুলের অনুরাগী, ভ্রষ্টা রমণীই ফুল-সোহাগী। পুরস্ত্রীর পক্ষে পুষ্পের আঘ্রাণ, পুষ্পেরই জন্য, পুষ্পপ্রীতি মহাপাতক। প্রণয়ী প্রণয়িনীর ত কথাই নাই। প্রণয় পদার্থ টাই পাপসূচক—ব্যভিচার-ব্যঞ্জক; "স্বধর্ম্ম" অর্থাৎ আর্য্য-ধর্ম্মের বিরুদ্ধ, অশুচি, অশাস্ত্রীয়, বেদপুরাণ স্মৃতির অসম্মত, হিন্দু সাহিত্যের এবং আচার ব্যবহারের বহির্ভূত! অনার্য্য ইংরেজী সাহিত্য আমদানী হইয়াই অস্মদ্দেশ উৎসন্ন যাইতেছে; "প্রণয় প্রণয়" বলিয়া একটা পৈশাচিক রব উঠিয়াছে, পুষ্পও যাইয়া প্রণয়ের সঙ্গে জুটিয়াছে। জাহন্নমে যাওয়ার আর বাকি কি! প্রায় ষোল আনা পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

অধিক। মন, এ সব স্থলে, কেবল অন্ন ব্যঞ্জনেরই অপর অবয়ব; কাযেই যত অন্ন ব্যঞ্জনই ইহাদের যথাসর্ব্বস্ব। অতএব, এ সকল স্থলে কবিতা ও কুসুমাদির অশরীরী সৌন্দর্য্য ও আধ্যাত্মিকতা উপস্থিত করা উনপঞ্চাশবায়ু-গ্রস্থ ব্যক্তির বাতুলতা-কোষেরই কার্য্য বটে।

কুসুম কথাটী শুনিয়া তাহার কুসুমত্ব ও কবিত্ব "কনকুত" করিবার জন্য তখনই কুসুমকে দেখিতে কাহারও দৌড়িতে হয় না। কবিতা শব্দটী শুনিয়া কবিতার কোমলতা ও মধুরতা মাপিয়া মূল্য নিরূপণ করিবার জন্য, তখনি একখানা কাব্য খুলিয়া কোনও কবিতা পাঠ করিতে বসিতে হয় না। যাহাদের হয়, তাহারা নিশ্চয়ই আলু কচুর উপাসক। কিন্তু আত্মা একান্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন না হইলে, আলুতেও আলোক এবং কচুতেও কবিতা পাওয়া যাইতে পারে।

কথাটার আসল তাৎপর্য্য এই যে, আলোক এবং কবিতা, মধুরতা এবং কোমলতা 'এণ্ড কোম্পানীর কারখানা, কারবার, কার্য্যালয়, ফারম এবং আফিস সমস্তই অদৃশ্য আত্মার মধ্যে। বাহিরে কেবল তাহাদের মালগুদাম মাত্র। মালের এবং মালের মূল্যের 'ইনভয়েস' আত্মার অভ্যন্তর হইতেই ইস্যু হয়। অতএব আত্মার ইনভয়েস—কাব্য-রসের "বিল অব লেডিং" যাদের 'ক্রেডিট' ইস্যু না হইয়াছে, তাহারা কাযেই মাল পায় না। মালের মূল্য ও মর্য্যাদাও বুঝে না। মাল গুদামের বাহিরেই কেবল ঘুরিয়া বেড়ায়। *

* কাযেই গুদামগুলি কেবল দেখিতে পায়। গুদামের ভিতরে যে কি, তাহা জানে না। কচু, ঘেঁচু, কলা, মুলা গিলিয়া উদরবিবরের গভীর গর্ত্তখানা বুজাইতে পারিলেই পরিতৃপ্ত হয়। সেই তৃপ্তি ছাড়া আর কিছুরই তোয়াক্কা রাখে না। ক্ষণমাহাত্ম্যে দেব-দুর্ল্লভ স্বর্গের সুধা সম্মুখস্থ হইলেও শুঁকিয়া ফেলিয়া দেয়। হো হো করিয়া হাসে, হাততালি দিয়া তামাসা করে। বলে—"এ আবার কি! ইহা ত আমাদের সেই সুভক্ষ্য সারাল দ্রব্য নয়। এ যে মিছরীর পানার মিহিদানা! জলসাবু পাতিনেবুও যে এর চেয়ে ঢের সারযুক্ত। আকাশের এসেন্স কি আবশ্যকে লাগে? চোখেই যেটা দেখা যায় না, সেটাতে কি আর জঠরানল জুড়ায়।" এ কথা সত্য—ষোল আনাই সত্য।

কিন্তু, কবি বাবুদের খুব কম লোকেই এ কথাটা বুঝেন। কবিগোষ্ঠীর আর যতই গুণজ্ঞান থাকুক, কাণ্ডজ্ঞানের ভাগটা তাঁদের হয় ত, কিছু কম। জীবমাত্রেই তাঁদের কাব্যরস সম্ভোগ করিবে, তাঁরা ইহা ইচ্ছা করেন, আশা করেন—আবদার করেন। সে ইচ্ছা—আশা—আবদার অবশ্যই পূর্ণ হয় না। কবিগোষ্ঠী ক্লিষ্ট হন, কুপিত হন, অভিমানে আত্মহারা হন, ম্রিয়মাণ হন;

কিন্তু, যাহাদের হৃদয়ে রস আছে, তাহাদের সে রস রগড়াইয়া বাহির করিতে হয় না; ছেঁচিয়াও নিঙ্গড়াইতে হয় না। তাহা স্পর্শমাত্রই প্রবাহিত, প্লাবিত হয়।

কুসুমে কবিতায় উপমা সুন্দর, উত্তম এবং উপযোগীও বটে। কেন না, উপমেয় এবং উপমান অনেকাংশে একই রূপ।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, গৌরব, কোমলতা, কান্তি, মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য কুসুমের মত কবিতারও আছে;—থাকাই চাই, নহিলে কবিতা কুসুম হইবে কি বলিয়া? থাকে এবং থাকিবে বলিয়াই কবিতা-কুসুম, কবিতার নামও কবিতা হইয়াছে।

কিন্তু সব কবিতাই কি কুসুম; সব কুসুমই কি একই রকমের ফুল; এবং সব ফুলই কি সৌন্দর্য্যে ও সৌরভে গৌরবশালী?

না, তা নয়। ফুল-রাজ্যে অসংখ্য প্রকারের ফুল। কবিতা-সংসারে অসংখ্য রকমের কবিতা। অতএব উত্তর এত সহজ যে, সমালোচনা না করিলেও চলে।

বেল, মল্লিকা, জুঁই, গোলাপ গন্ধরাজ, কুন্দ, কেতকী কি নাই? পুষ্প-রাণী একা পদ্মিনীরই কত রকমের রূপ, কত রকমের পোষাক, সৌন্দর্য্য, সোহাগ এবং সুবাস, পবিত্রতার এবং প্রণয়ের নিঃশ্বাস। পরন্তু পদ্মরাণীর নিবাসে তাঁহার তাম্বূল-করঙ্কবাহিনী (?) (না-লেডিজ্ মেইড়?) পরিচারিকা মৃণালীরও, না কোন রূপ, রস, বর্ণ, বিলাস্, মৃদুহাস্য, নয়নভঙ্গী ও নির্ম্মল হৃদয়খানি দেখিয়া তুমি বিমুগ্ধ না হও? পুষ্পরাজ্যে সূর্য্যমুখী, চন্দ্রমুখী, চামেলী, শেফালী, কে না আছে? কৃষ্ণকেলি, কামিনী, করবী, কুরুবক, কতই না ফুল? পলাশ, জবা, টগর, দোমুখী, ডেজী, দেশী, বিলাতী ব্রাহ্মণী, যবনী, অসংখ্য, অসংখ্য, অসংখ্য ফুল। ভিন্ন ভিন্ন রঙ্গের, ভিন্ন রূপের, ভিন্ন রসের, ভিন্ন ভিন্ন সৌরভের কত রকমেরই কত কুসুম। এক গোলাপই দেখ কত জাতীয়। বাঙ্গালী গোলাপ, আর বোসরাই গোলাপ কি এক? বাঙ্গালাই, বোসরাই, বিলাতী, এই তিনের মধ্যেও আবার অগণিত শ্রেণীর গোলাপ। সকলেরই কি একই রকম গন্ধ, রূপ, লাবণ্য মাধুরী? বর্ণ-বৈভব, রূপ-ঐশ্বর্য্য, সৌরভ-সৌন্দর্য্য, কুসুম-কান্তি, সুষমা, মধুরিমা প্রায়

না-হল-যে-কি, জানি না। তা, যাহাই হউন, কুকুরে কখনও কবিতা বুঝিতে পারে না। কুসুম-ঘ্রাণ নিশ্চয়ই কাকে কখনও লইতে যায় না। শুভ্র জ্যোৎস্না-স্রোতে ছুছুন্দর জাতি কখনও সাঁতার কাটিয়া কেলি করে না, এবং প্রেমের পুলকোচ্ছ্বাসে ছুছুন্দরী সুন্দরীকে কুসুমোপহার দিয়া কেলির কবিতা পড়িয়া শুনায় না;—কবিদের এটা জানা কর্ত্তব্য।

সব কুসুমেরই আছে। কিন্তু স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। পরন্তু, সৌরভশালিনীর ন্যায় সৌরভ-বিহীনাও কোন্ নাই? রূপ-রস-গর্ব্বিতার ন্যায় রূপ-রস-আবৃতা বিনম্রমুখীও দেখিতে পাইয়া থাক। গোলাপও ফুল, গাঁদাও ফুল, অশোক, অপরাজিতা, কিংশুক, কদম্ব, প্রত্যেকই পুষ্প বটে। পদ্মফুলও ফুল; ঘেঁটু ফুল কি আর ফুল নয়? কুসুম-রাজ্যে রাজা রাণী, নলিনী কমলিনীর ন্যায় কাঙ্গাল কাঙ্গালিনী না থাকিবে কেন? কাঙ্গাল কাঙ্গালিনী কুসুমের শোভা সৌন্দর্য্যের সুতীক্ষ্ণ ছটা ও সৌরভ-গৌরবের গর্ব্বিত ঘটা এবং লোক-বিখ্যাত সুখ্যাতি-সম্পদ না থাকিলেও কুসুম-কান্তি নিশ্চয়ই আছে। কুসুম কুসুমত্ববর্জ্জিত কিছুতেই নয়। তোমার আদরের উদ্যান-কুসুমটী আদরে, আহ্লাদে, ঐশ্বর্য্যে ফুটিয়া, বহুলোকের আদরে, প্রশংসায়, পরিচর্য্যায় হয় ত অমরত্ব পায়; আর ঐ গহনবনের বন্য কুসুম অনাদরে অজ্ঞাতে, আপন আনন্দে, আপনি ফুটিয়া আপনা-আপনি হয় ত শুকাইয়া যায়। আবার ফুটে, আবার শুকায়, পুনঃবার ফুটিয়া উঠে; কেহ দেখিতে পায় না। এইরূপে ফুটিয়া ফুটিয়া, শুকাইয়া শুকাইয়া, ঝরিয়া ঝরিয়া, ঝুরিয়া ঝুরিয়া, শেষে প্রাণত্যাগ করে। তাহাও কেহ দেখে না, হয় ত দেখিতে পায় না, বা দেখিয়াও দেখে না। কিন্তু তবুও সেই বন-কুসুম কুসুম বটে। অজ্ঞাতে অনাদরে প্রাণত্যাগ করিয়াছে বলিয়া সে পুষ্প অপুষ্প নহে, পুষ্পত্বহীনও নহে। তাহার কেশর, পরাগ, পরিমল, নিঃশ্বাস ও সুবাস, কি না ছিল। পুষ্পত্বের সবই ছিল। তোমার আদরের উদ্যানকুসুম অপেক্ষা হয় ত অধিকও ছিল। তাহার অসভ্য উচ্ছ্বাস, বন্যপ্রভা হয় ত তোমার সভ্য সুমার্জ্জিত উদ্যানকুসুমকেও পরাজয় করিতে পারিত। এমন কত বন্যকুসুম আবিষ্কৃত হইয়া উদ্যানে আনীতও ত হইয়াছে। কবিতার তেমনিতর বন্যকুসুম যখন উদ্যানে আনীত হইয়াছে—সভ্য-সমাজে সাহিত্যসংসারে পরিচিত হইয়াছে, তখন হয় ত সে পুষ্পের নিজের পুষ্প-লীলা ফুরাইয়া গিয়াছে, পুষ্প চিরবৃন্তচ্যুত হইয়া, বহুকাল পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া গিয়াছে, তাহার অবিনশ্বর পরিমলটুকু—পরিমলের প্রাণবায়ুটুকু বনে বনে ঘুরিতেছিল, তাহাই উদ্যানে আনীত হইয়াছে।

কুসুম সম্বন্ধে যেমন, কবিতা সম্বন্ধেও ঠিক তেমনই। কুসুম-জাতি ও কুসুমের জীবন সম্বন্ধে যে যে সর্ব্বজনজানিত কথা জানাইয়াছি—যে যে তথ্য ও সত্য বিবৃত করিয়াছি, কবিতার জাতিতে এবং কবির জীবনে তাহা একে একে যোগ কর, জমা কর, প্রতিপদে প্রয়োগ করিয়া পাঠ কর, দেখিবে, উভয়েতেই একতা আছে।

কুসুমরাজ্যের কুসুমেরই মত, কবিতারাজ্যের কবিতাও নানা শ্রেণীর, নানা রকমের, নানা রূপের, রঙ্গের, রসের, রুচির, সৌন্দর্য্যের, ছন্দের, সৌরভের ইত্যাদি। কুসুমেও যেমন রূপে, রসে, সৌরভে "সরেস নিরেস" আছে, উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট আছে, উদ্ধত বিনম্র আছে, দুরন্ত, শান্ত, ধীর, চঞ্চল আছে, ধনী দরিদ্র আছে, সম্রাজ্ঞী ও সেবিকা কুসুম আছে, কবিতাতেও তেমনি রাণী ও কাঙ্গালিনী না থাকিবে কেন? সৌন্দর্য্য-সৌরভ-গৌরবান্বিতা বা গর্ব্বিতার মত গন্ধ-গৌরব-বিরহিতাও কোন নাই? চঞ্চলনয়নার ন্যায় বিনম্রমুখী কবিতাও বিস্তর। কবিতায় স্বর্ণ-গোলাপের ন্যায় ঘেঁটু ঘণ্টাকর্ণও বিদ্যমান; পোইট্রিতে পদ্ম জন্মে বলিয়া কি আর পলাশ প্রসূত হয় না, না হইবে না? পদ্ম যদি পুষ্প হন, পলাশও পুষ্প নিশ্চয়। কমলিনী কবিতা রাণীর রাজভাণ্ডার রূপরসে সৌরভ-সম্পদে সদাই পূর্ণ বটে; কিন্তু কাঙ্গালিনীর অলঙ্কার-বিহীন অঙ্গেও এক অনুপম কান্তি আছে। কাঙ্গালিনী— কাঙ্গালিনী বলিয়া কি তুমি তাহার দেহে, তাঁহার হৃদয়ে কোনও কান্তিই দেখিতে পাও না? ছি ছি! তাহা হইলে যে বড় লজ্জার কথা! অনেক সময়ে যে কাঙ্গালিনীর কান্তিই নিষ্কলঙ্ক, অধিকতর নির্ম্মল এবং স্নিগ্ধ। অত্যুচ্চ উত্থিত উগ্র অরুণ কিরণৈশ্বর্য্যে আঁখি যখন উত্তপ্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া অন্ধ হইবার উপক্রম হয়, পৌর্ণমাসীর পরিপূর্ণ শশীর সর্ব্বগ্রাসা উত্তাল, উদ্দাম, অগাধ, উন্মত্ত, মদিরাময়, মধুর জ্যোৎস্নার অতি জাগ্রত জ্যোতির অবিরাম তরঙ্গ-তুফানে, সন্দীপ্ত-সৌন্দর্য্য-সাইক্লোনে যখন তুমি ভাসিয়া, ডুবিয়া, প্লাবিত হইয়া যাও, কোনও দিকেই কূল পাও না, পূর্ণতার অপ্রশম্য প্রভাবে যখন প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে, যখন লাবণ্য-রাণীর অতুল রূপরাশির অত্যুজ্জ্বল রশ্মি-ছটা তোমার নয়ন মন আচ্ছন্ন অবসন্ন করে—তাহার সৌরভ-উচ্ছ্বাসে—সৌরভের শীতল সন্তাপ তুমি আর সহ্য করিতে পার না, তখন, বল দেখি, তোমার উদ্‌ভ্রান্ত, ক্লান্ত চিত্ত কি চায়? তখন কবিতা রাজরাণীর অত্যুচ্চ অতি-আলোকিত অট্টালিকা হইতে সটান্ নিম্নে নামিয়া আসিয়া কবিতা কাঙ্গালিনীর মৃদু, স্নিগ্ধকান্তির মৃদু স্নিগ্ধ ছায়ালোকসংক্ষুব্ধ সামান্য ও সাধারণ পর্ণ-কুটিরখানিতে বসিতে, বসিয়া অবাধে অসঙ্কোচে বিশ্রাম করিতে সাধ যায় না? সুন্দরী তোমার সন্দীপন করেন, মার্জ্জিতা তোমার মন হরণ করেন, কিন্তু কুৎসিতা তোমার সেবা করে। কুৎসিতা কি কেহই নয়? কুৎসিতার কুরূপ দেখিয়া তুমি মুখ ফিরাও; কিন্তু তাহার প্রাণের "পলস্" তুমি কি কখনও "ফিল্" করে দেখেছ? শুধু পদ্ম-মধুই কি জীবনোপযোগী? কেবল গোলাপ-গন্ধই কি পুষ্প-রাজ্যে প্রচুর হইত? কেবল বাল্মীকি, কালিদাস, সেক্সপীয়র, টেনিসনই কি,

কাব্যরাজ্য পরিপূর্ণ করিতে পারিতেন? বাল্মীকি-কালিদাসাদিরই মত কি কবিকঙ্কণ কৃত্তিবাস কাশীদাসের দরকার নাই?

এই সব কথার সারসংগ্রহ এই যে, শ্রেষ্ঠ আর নিকৃষ্টই হউক, কুসুম কুসুমই বটে, কবিতা কুসুমই বটে, কবিতা কবিতাই বটে, এবং কুসুমও কবিতা বটে।

প্রাচীন শিল্প-পরিচয়।

পাকবিদ্যা।

আর্য্যসাহিত্যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই পাক-বিদ্যার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় এই বিদ্যাও সভ্য-সমাজে বিশেষ পরিচিত ছিল। এমন কি, স্বাধীন রাজা এবং রাজ-পরিবারবর্গও আগ্রহের সহিত এই বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। পুণ্যশ্লোক নৈষধ এবং মধ্যমপাণ্ডব ভীমসেন এই বিষয়ে উদাহরণস্বরূপ উপন্যস্ত হইবার যোগ্য। বাৎসায়নের কামসূত্রে এবং তাহার টীকায় এই বিদ্যা চতুঃষষ্টিকলার অন্যতম বলিয়া কথিত হইয়াছে। শিল্পেরই অংশবিশেষ কলানামে পরিচিত। রাজপুত্রদিগের বিদ্যাশিক্ষা বর্ণনপ্রসঙ্গে কলা-শিক্ষারও উল্লেখ দেখা যায়। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে যেমন নিরক্ষর উড়েঠাকুর বা বিষ্ণুপুরের চাটুয্যে পাচকের পদ একচেটিয়া করিয়াছে, এবং বড়লোকের ভক্ষ্যান্নরস-পাচকতার ভার বাবুরচীর উপরই ন্যস্ত হইয়াছে, পূর্ব্বকালে তেমন ছিল না। সেকালে অন্যান্য বিদ্যায় সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ নানাশ্রেণীর খাদ্য প্রস্তুত করিত, এবং তাহাতে নৈপুণ্য দেখাইয়া সভ্যসমাজে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিত। ভীমসেন বলিয়াছিলেন যে, যে সকল সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইঁহার (বিরাটের) জন্য বিবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া থাকে, আমি তাহাদিগকেও পরাভূত করিব।

খাদ্যের প্রস্তুত-প্রণালীর প্রতি লক্ষ্য করিলে, পক্ব ও অপক্ব, এই দুই প্রকার খাদ্যের বিভাগানুসারে পাক ও তদতিরিক্ত প্রক্রিয়া, এই দুই প্রণালী দেখা যায়। তন্মধ্যে পাকের নানাপ্রকার পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়। (১)

অনেকের বিশ্বাস এবং অভিমত যে, মুসলমানের শুভাগমনের পর হইতেই

---

(১) কৃতপূর্ব্বাণি যৈরস্য ব্যঞ্জনানি সুশিক্ষিতৈঃ।
তানপ্যভিভবিষ্যামি প্রীতিং সঞ্জনয়ন্নহম্‌।—বিরাটপর্ব্ব; ২য় অধ্যায়।

নানাশ্রেণীর উপাদেয় খাদ্য ভারতবাসীর রসনা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব-রস-বিতরণে তাহাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে। পলান্ন প্রভৃতি নৈপুণ্যোদ্‌ভাবিত নরদুর্লভ অমৃতায়মান খাদ্য মুসলমান নরপতিবৃন্দের পরিপ্রীণনসম্পর্কেই ভারতে পদ-ক্ষেপ করিয়াছে। এই সকল কথা আপাততঃ অতীতযুগের অবস্থা-জ্ঞাপক ইতিহাসের উপাদান বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু সেই সুপ্রাচীনযুগের সংহিতা, পুরাণ, ব্যাকরণ, কাব্য, নাটক, চিকিৎসাগ্রন্থ প্রভৃতির প্রতি মনোনিবেশ করিলে দেখা যায়, যাহা আমাদের নিজস্ব ছিল, তাহাই ঘটনাচক্রে কালের আবর্ত্তনে বিদেশে উদ্‌ভাবিত শিল্প বলিয়া আজ বিবেচিত হইতেছে।

কত জিনিসে যে এই বিদেশীয় স্বত্ব স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহাই সম্পূর্ণভাবে দেখাইতে অনেক সময়ের ও যত্নের প্রয়োজন ;—সুতরাং আজ কয়টিমাত্র পক্কবস্তুর উল্লেখ করিব।

পলান্ন ও পোলাও, এই উভয় শব্দের পর্য্যায়তায় কাহারও প্রায় বিপ্রতিপত্তি দেখা যায় না। কারণ, বর্ত্তমান সময়ে পোলাও যে প্রণালীতে পক্ক হইয়া থাকে, আমাদের পুরাতন পলান্নও এই প্রণালীর অতিক্রম করিত বলিয়া বোধ হয় না। পলান্ন এই শব্দটি যোগরূঢ় ; পল অর্থ=মাংস, তাহার সহিত পক্ক অন্ন পলান্ন-নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রচুরপরিমাণ ঘৃতের সহিত ইহার পাক নিষ্পন্ন হয়, ইহার সৌরভে সর্ব্বদিক্‌ আমোদিত হইয়া থাকে। ঘৃতের বাহুল্যনিবন্ধন এই অন্ন সর্পিষ্মৎ নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভবভূতির লেখনী এই সর্পিষ্মৎ ভক্তের (অন্নের) মনোহর গন্ধে বাল্মীকির তপোবন সৌরভিত করিয়া গিয়াছে। (২)

এই পলান্ন যে কেবল মানবের উপভোগেই লাগিত, তাহা নহে ; দেবপূজায় উপকরণরূপেও ইহার ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় বিনায়ক-শান্ত্যর্থ-পূজায় যে সকল উপকরণের নির্দ্দেশ আছে, তাহাতে পললৌদনের নামও দেখিতে পাওয়া যায়। কৃতাকৃত (অর্দ্ধকৃত) তণ্ডুল, পললৌদন, পক্ক ও অপক্ক মৎস্য এবং মাংস, বিচিত্র পুষ্প সুগন্ধ-দ্রব্য, এবং বিবিধপ্রকার সুরা। (৩)

(২) গন্ধেন স্ফুরতা মনাগনুসৃতো ভক্তস্য সর্পিষ্মতঃ।
কর্কন্ধুফলমিশ্রশাকপচনামোদঃ পরিস্তীর্য্যতে॥—উত্তরচরিত। ২য় অ।

(৩) কৃতাকৃতাংস্তণ্ডুলাংশ্চ পললৌদনমেব চ।
মৎস্যান্‌ পক্কাং স্তথৈবামান্‌ মাংস মেতাবদেব তু॥
পুষ্পং চিত্রং সুগন্ধঞ্চ সুরাঞ্চ বিবিধামপি॥—১অ। ২৮৭—৮৮

অত্রত্য পললৌদন ও পলান্ন সমানার্থক ; কারণ, পলল=মাংস, তাহার সহিত পক্ক ওদন (অন্ন) পললৌদন নামেও পরিচিত ছিল। যদিও অপরার্ক এবং মিতাক্ষরা পললৌদন শব্দের তিলপিষ্টমিশ্র ওদন (৪) এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি আমরা অবিচারিতভাবে তাঁহাদের এই মত গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ, অভিধানে পলল শব্দের অর্থান্তর দৃষ্ট হইলেও, মাংস অর্থেই ইহার প্রসিদ্ধি দেখা যায়। সুতরাং পলান্নের সমানার্থ পললৌদন শব্দের প্রসিদ্ধার্থ-পরিত্যাগের হেতু দেখা যায় না। পিষ্টতলের সহিত অন্ন-পাক প্রসিদ্ধও নহে।

এই অন্নে ঘৃতের প্রাচুর্য্য-নিবন্ধন কবিপ্রবর ভবভূতি সর্পিতেই ইহার পাক নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র উভয়েই পরশুরামকে বলিতেছেন— সর্পিতে অন্ন-পাক করা হইয়াছে, বৎসতরী সংজ্ঞপন করা হইয়াছে, তুমি শ্রোত্রিয়, শ্রোত্রিয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়াছ ; আমাদের এই সকল দ্রব্য গ্রহণ কর। (৫)

এই উক্তিতে বুঝা যায়, আজকাল যেমন বিশিষ্ট অতিথি সমাগত হইলে, তাঁহার জন্য পোলাও মাংসের ব্যবস্থা করা হয়, পূর্ব্বকালেও এইরূপ হইত।

কন্দু-পক্ক।

প্রাচীন সাহিত্যে "কন্দু-পক্ক" নামক একশ্রেণীর খাদ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। "কন্দু-পক্ক" এই শব্দটি যৌগিক, অর্থাৎ দুইটি শব্দের মিশ্রণে নিষ্পন্ন। কন্দুতে পক্ক বস্তু "কন্দু-পক্ক" নামে অভিহিত হয়। সুতরাং কন্দু-পক্ক চিনিতে হইলে প্রথমতঃ কন্দু চেনা আবশ্যক।

অমরসিংহ একটি কারিকার্দ্ধে "অম্বরীষ," "ভ্রাষ্ট্র," "কন্দু," ও "স্বেদনী," এই চারিটি শব্দ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। (৬) আপাততঃ এই কারিকার্দ্ধ-পাঠে বোধ হয়, যেন এই চারিটি শব্দই একার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু টীকাকার ভানুজী-দীক্ষিত "অম্বরীষ" ও "ভ্রাষ্ট্র," এই উভয় শব্দকে ভর্জনপাত্র (খোলাহাঁড়ী) নামে নির্দ্দেশ করিয়া, "কন্দু" ও "স্বেদনী" এই উভয় শব্দের অর্থান্তর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে,—শোষণার্থ "স্কন্দ" ধাতুর উত্তর ঔণাদিক উ প্রত্যয়ের দ্বারা এবং সকার-লোপের দ্বারা "কন্দু" এইরূপ সিদ্ধ হইয়াছে। (৭) "স্বেদনী" শব্দের

(৪) তিলপিষ্টমিশ্র ওদনঃ পললৌদনঃ।—৫৫পৃ অপরার্ক।

(৫) সংজ্ঞপ্যতে বৎসতরী সর্পিষান্নং বিপচ্যতে।
শ্রোত্রিয়ঃ শ্রোত্রিয়গৃহানাগতোঽসি জুষস্ব নঃ॥—বীরচরিত। ৩ অঙ্ক।

(৬) ক্লীবেঽম্বরীষং ভ্রাষ্ট্রো না কন্দুর্বা স্বেদনী স্ত্রিয়াম্।—

ব্যুৎপত্তি দেখাইয়াছেন যে, স্বিদ ধাতুর উত্তর অধিকরণবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয়ের দ্বারা "স্বেদন" এইরূপ সিদ্ধ হইয়া, স্ত্রীলিঙ্গে ঈকার-যোগে "স্বেদনী" এই রূপ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

ধাতুপ্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দের অর্থ স্বেদ করা হয়, অর্থাৎ তাপ দেওয়া হয় যাহাতে। "কন্দু" শব্দেরও ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ শোষণ করা হয় যাহাতে। কন্দু ও স্বেদনী একার্থক শব্দ। দীক্ষিত মহাশয় ইহাকে মদ্যনির্ম্মাণোপযোগী করাহী নামে প্রসিদ্ধ পাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি যে এই অর্থনির্দ্দেশে সর্ব্বতোভাবে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। আচার্য্য হেমচন্দ্র "ভক্ষ্য-কার" ও "কান্দবিক," এই উভয়ের একর্থতা নির্দ্দেশ করিয়া "কন্দু" ও "স্বেদনিকা," এই উভয়ের একার্থতা কীর্ত্তন করিয়াছেন। (৮) তাঁহার এই উক্তিতে "ভ্রাষ্ট্র" হইতে "কন্দু"র পার্থক্য সুস্পষ্ট উপলব্ধ হইতেছে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থের অতিরিক্ত কন্দুর স্বরূপজ্ঞাপক বিশেষ কিছু জানা যায় না। হেমচন্দ্র যে পর্য্যায়ে ভক্ষকারের ও কান্দবিকের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অমরসিংহ সেই পর্য্যায়ে "আপূপিকে"রও উল্লেখ করিয়াছেন। এই আপূপিক ভক্ষকারের অন্তরালে অতীত-সমাজ-তত্ত্বের এক গূঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে যেমন "খাবার" বলিলে লুচী, কচুড়ী প্রভৃতি খাদ্যবিশেষকেই বুঝায়, সেইরূপ পূর্ব্বকালেও "ভক্ষ" বলিলে সাধারণ খাদ্য না বুঝাইয়া "কান্দব" অর্থাৎ কন্দুপক্ক খাদ্যই বুঝাইত। মহাভারতে ভীমের উক্তিতেও সাধারণ অন্ন হইতে "ভক্ষে"র স্বতন্ত্র উল্লেখ দেখা যায়।

"ভক্ষান্ন-রসপানানাং ভবিষ্যামি তথেশ্বরঃ।"—বিরাট পর্ব্ব।

এই শ্রেণীর খাদ্য পিষ্টক-সমানার্থক অপূপ-পদবাচ্য খাদ্য হইতে স্বতন্ত্র বস্তু হইলেও, অমরসিংহ এই যৎকিঞ্চিৎ ভেদকে অগ্রাহ্য করিয়া "কান্দবিকে"র পর্য্যায়ে "আপূপিকে"র সন্নিবেশ করিয়াছেন। (৯) কান্দবিক শব্দের ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থানুসারে বুঝা যায়, কন্দুতে সংস্কৃত এই অর্থে, কন্দু শব্দের উত্তর অন্ প্রত্যয় হইয়া "কান্দব" এই রূপ সিদ্ধ হইয়াছে। কান্দব যাহার পণ্য

(৭) ভক্ষ-কারঃ কান্দবিকঃ কন্দুঃ স্বেদনিকে সমে।—মর্ত্ত্যকাণ্ড।

(৮) ঋচীষং পিষ্টপবনং।

(৯) কন্দু-পক্কানি তৈলেন পায়সং দধিশক্তবঃ।
দ্বিজৈ রেতানি ভোজ্যানি শূদ্র-গেহ-কৃতান্যপি॥—তিথিতত্ত্বে কূর্ম্মপুরাণ

(৪।৪।৫১) অর্থাৎ বিক্রেয়, এই অর্থে কান্দব শব্দের উত্তর "ঠক" প্রত্যয় হইয়া "কান্দবিক" এই রূপ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

অমরের উক্তির পৌর্ব্বাপর্য্যের পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, সাধারণ পিষ্টক হইতে কান্দব পদার্থ স্বতন্ত্র। কারণ, তিনি পিষ্টকের পাক-পাত্রকে "ঋচীষ" নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (১০) পিষ্টক এবং অপূপ একার্থক শব্দ। পিষ্টকের এবং কান্দবের পাক-পাত্র স্বতন্ত্র; পাক-প্রণালীও স্বতন্ত্র। পিষ্টকের পাক সাক্ষাৎ অগ্নিসাপেক্ষ; কান্দবের পাকে অগ্নির অপেক্ষা নাই। কন্দুটি উষ্ণ করিয়া স্বেদের উপযোগী করিতে কেবল অগ্নির অপেক্ষা। কারণ কন্দু শব্দের ব্যুৎপত্তি-লক্ষ্য অর্থ শোষকযন্ত্র; তাহাতে সংস্কৃত খাদ্য—"কান্দব"। সুতরাং "কান্দব" পিষ্টক যে সাধারণ পিষ্টক হইতে ভিন্ন, তাহা সুস্পষ্টই বুঝা যাইতেছে; অতএব "কান্দব"-মাত্রে অপূপ শব্দ প্রযুক্ত হইলেও, অপূপমাত্রে কান্দব শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না। হেমচন্দ্র এই ভেদের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই কান্দবিকের পর্য্যায় হইতে আপূপিকের নির্ব্বাসন করিয়াছেন, এবং কান্দবিকের নির্দ্দেশ করিয়াই তাহার পরিচয়ার্থ কন্দুরও নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে যেমন একশ্রেণীর লোক রুটী বিক্রয় করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে, এবং জীবিকার অনুসারে রুটীওয়ালা নামে পরিচিত হইয়া থাকে, সেইরূপ পূর্ব্বকালেও "কান্দব"-বিক্রেতা "কান্দবিক" নামে প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছিল।

এই শ্রেণীর ভক্ষ্য-দ্রব্য বৈশ্যগণ বিক্রয় করিত। বৈশ্য দ্বিজাতি, সুতরাং তাহার পক্বদ্রব্য খাইতে কাহারও আপত্তির কারণ ছিল না। যখন শূদ্রগণও এই শ্রেণীর পণ্যে হস্তক্ষেপ করিল, হয় ত সেই সময়ে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইল, শূদ্রগৃহ-কৃত ভক্ষদ্রব্য দ্বিজাতির খাদ্য কি না? জিজ্ঞাসিত শাস্ত্রকার মীমাংসা করিলেন,—"কন্দুপক্ব দ্রব্য প্রভৃতি শূদ্র-গৃহ-কৃত হইলেও দ্বিজাতির ভক্ষ্য হইবে। (১১)

এই শ্রেণীর কারখানাতে সর্ব্বতোভাবে শৌচাশৌচ বিবেচিত হয় না, তাহা দেখিয়াও হয় ত একটা আলোচনা হইয়াছিল। তাহার মীমাংসায় প্রয়াসী মহর্ষি শাতাতপ ব্যবস্থা করিলেন গোকুলে, কন্দুশালাতে, অর্থাৎ কন্দুর কারখানাতে,

(১০) গোকুলে কন্দুশালায়াং তৈলযন্ত্রেক্ষুযন্ত্রয়োঃ।
অমীমাংস্যানি শৌচানি স্ত্রীষু বালাতুরেষু চ॥

(১১) দ্বিপুরুষপ্রমাণ মৃন্ময়ং কন্দুসংস্থানম্। সূত্র। ১৫ অধ্যায়।

তৈল-যন্ত্রে, ইক্ষু-যন্ত্রে, এবং স্ত্রীলোক, বালক ও আতুরের সম্বন্ধে শৌচাশৌচ বিবেচ্য নহে। (১২)

মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে বিদূষকের উক্তিতে কন্দুর কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। রাজা অগ্নিমিত্র বিদূষককে বলিলেন,—সখে! অধিক আর বলিয়া ফল কি? আমার সম্বন্ধে তোমাকে কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিতে হইবে। উত্তরে বিদূষক বলেন, আপনাকেও আমার বিষয়ে ভাবিতে হইবে; কারণ, বিপণিস্থিত কন্দুর ন্যায় আমার উদরের অভ্যন্তর দগ্ধ হইতেছে।

এই উক্তিতে সাধারণতঃ বুঝা যায়, কন্দু বিপণিতে অবস্থিত হইত, এবং তাহার মধ্যভাগ দগ্ধ হইত।

চরকসংহিতায় জেন্তাক-স্বেদের প্রসঙ্গে কন্দুর উল্লেখ দেখা যায়। তত্রত্য স্বেদোপযোগী যন্ত্রটি দ্বিপুরুষ-প্রমাণ, মৃণ্ময় এবং কন্দুসদৃশ বলিয়া কথিত হইয়াছে। (১৩)

অভিধানে "হসন্তী" নামক এক প্রকার অঙ্গারবাহী ক্ষুদ্র শকটের পরিচয় পাওয়া যায়। (১৪) "হসন্তী" এই নামের অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে হয়, যে পদার্থ হাসিতেছে, তাহাই যেন হসন্তী শব্দের ধাতুপ্রত্যয়ানুযায়ী অর্থ। কিন্তু শকটের হাস্য অসম্ভব; সুতরাং এই প্রয়োগটি সাদৃশ্যার্থে বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে ইহার অর্থ হইতেছে, হাস্যকারীর মত। জ্বলদঙ্গারপূর্ণ শকট ঔজ্জ্বল্যনিবন্ধন হাস্যকারীর সদৃশ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। জ্বলদঙ্গারেও অঙ্গার শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—

"অঙ্গারচুম্বিতমিব ব্যথমানমাস্তে।"

এই হসন্তী সম্ভবতঃ কন্দুর অভ্যন্তরদগ্ধকারী অঙ্গারের প্রবেশণ নিষ্কাশণ কার্য্যেই ব্যবহৃত হইত। এই সকল প্রমাণের প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে হয়, যে জিনিসের ব্যবহার সম্বন্ধে আর্য-যুগেও নানারূপ আলোচনা হইয়াছিল, পাণিনির পূর্ব্বেও যে জিনিসের বাচক শব্দের সাধনের প্রয়াস দেখা যায়, যাহার জন্য স্বতন্ত্র শালা বা প্রকোষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহা যে কত প্রাচীন, এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষ-

---

(১২) অঙ্গারধানিকাঙ্গারশকট্যপি হসন্ত্যপি। অমর; বৈশ্যকা। ২৯

(১৩) জলোপসেকং বিনা কেবলপাত্রে যদ্বহ্নিনা পক্বং ভৃষ্টতণ্ডুলাদি।

(১৪) স্কন্দেঃ সলোপশ্চ। উণাদি ।১।১৫। স্কন্দিরগতি-শোষণাঃ। কন্দুরিতি স্কন্দত্যস্মিন্ জলতাপ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা ভোগস্থানমিতি কেচিৎ। অন্যে তু স্কন্দতি শোষয়তীতি "কন্দু" লোহাদি-পাত্রমিত্যাহঃ। অতএব "ক্লীবেহম্বরীষং ভ্রাষ্ট্রো না কন্দুর্ব্বা স্বেদনী স্ত্রিয়া" মিত্যমরঃ।

দিগের সহিত কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, তাহা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। সম্ভবতঃ কালের পরিবর্ত্তনে, কোনও অপরিজ্ঞাত কারণে আমাদের দেশ হইতে নির্ব্বাসিত "কন্দু"ই বর্ত্তমানে "তন্দুর" নামে পরিচিত হইয়া আমাদের সম্মুখে বিদেশীয় আগন্তুক-রূপে প্রতিভাত হইতেছে। "কন্দু"-পক্ক বা "কান্দব" পদার্থই পাঁউরুটী বিস্কুট প্রভৃতি অনার্য্যজুষ্ট নাম ধারণ করিয়া খাঁটী হিন্দুর অখাদ্য বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয়, কূর্ম্মপুরাণ-বচনের ব্যাখ্যায় "কন্দু-পক্ক" শব্দের যে অর্থনির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই অর্থ সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। তাঁহার মতে, জলোপসেক-ব্যতীত, অর্থাৎ কোনরূপ জলসম্পর্ক বিনা কেবল পাত্রে অগ্নির দ্বারা যাহার পাক নিষ্পন্ন হয়, তাহাই "কন্দু-পক্ক" নামে অভিহিত; যেমন ভাজা চাউল প্রভৃতি। (১৫) তিনি কন্দুপক্ক চিনাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু কন্দু শব্দের অর্থ-নির্ণয়ে তাঁহাকে উদাসীন বলিয়াই বোধ হয়। তাঁহার এই ব্যাখ্যা দেখিয়া মনে হয়, তিনি অমর-কারিকাস্থ অম্বরীষ হইতে স্বেদনী পর্য্যন্ত চারিটি শব্দকে অবিচারিতভাবে ভর্জ্জন-পাত্র অর্থেই গ্রহণ করিয়াছেন।

সিদ্ধান্তকৌমুদীর তত্ত্ববোধিনী-টীকাকারের উক্তিতে বুঝা যায়, তিনিও যেন চারিটী শব্দের একার্থতাই বুঝিয়াছেন, (১৫) এবং অদ্ভুত রকমের একটী ব্যুৎপত্তিও জনান্তরের মত বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনিই আবার মতান্তরে শোষণকারী লৌহপাত্রকে "কন্দু" নামে নির্দ্দেশ করিয়া, সমর্থনার্থ অমরের কারিকা উপন্যস্ত করিয়াছেন। এই সকল ব্যাখ্যা দেখিয়া মনে হয়, কি স্মার্ত্ত, কি তত্ত্ববোধিনী-কার, কেহই কন্দু জিনিসটা চিনিতে পারেন নাই; অথবা চিনিবার উপায়ও তাঁহাদের ছিল না। তেঁতুলপাতা সিদ্ধ খাইয়া গৃহিণীর হস্তে রক্তসূত্র পরাইয়া সংসার-সুখে অনাসক্ত মনীষিগণ নিরাপদে দার্শনিক কূট-তত্ত্বের মীমাংসা করিতে পারেন। বাহ্যনিরপেক্ষ আধ্যাত্মিক চিন্তায় লৌকিক-বৃত্তান্ত-জ্ঞানের আবশ্যকতা নাই সত্য, কিন্তু যে সমস্ত শাস্ত্রের সহিত সমাজতত্ত্ব, শিল্পকলা প্রভৃতি সংসৃষ্ট, তাহাদের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে হইলে, সেই সেই বিদ্যা, সমাজের তাৎকালিক অবস্থা, এবং শিল্প ও শিল্পোপকরণ, এই কয়টির সহিত বিশেষ পরিচয় আবশ্যক। এই সকল উপাদান সংগ্রহ না করিয়া যাঁহারা কেবল ব্যাকরণের অথবা কোষের সাহায্যে কোনও গ্রন্থের ব্যাখ্যানে প্রয়াসী হইয়াছেন, তাঁহারা অদ্ভুত ব্যাখ্যার উদ্ভাবন করিয়া আরব্ধগ্রন্থের সমাপন করিয়া গিয়াছেন। এই অনভিজ্ঞতার ফলেই কাহারও মতে "কন্দু" মদ্য-নির্ম্মাণোপযোগী পাত্র; কাহারও মতে, ভোগ-স্থান; কাহারও মতে, তাওয়া হইয়াছে।

শব্দকল্পদ্রুম, বিশ্বকোষ প্রভৃতি আধুনিক কোষের নিবন্ধৃগণও গতানুগতিকভাবে অসন্দিগ্ধচিত্তে পুরাতন ব্যাখ্যাতৃ-বর্গের প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন করিয়া সাহিত্যের পথ তমসাচ্ছন্ন করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাখ্যানের উপর সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিয়া যদি যুক্তিবলে পদ-পদার্থের বিচারপূর্ব্বক প্রকৃত-তথ্য-নির্ণয়ে প্রয়াসী হওয়া যায়, তাহা হইলে হয় ত অনেক স্থলেই মধ্যযুগের সিদ্ধান্তের অন্যথা ঘটিবে। কারণ, পদার্থ না চিনিয়া কেবল পদজ্ঞানের দ্বারা শিল্পের বা সমাজের প্রকৃত অবস্থা বুঝা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী বিবরণ উল্লেখযোগ্য।

মৃদঙ্গ যাহার শিল্প, এই অর্থে মার্দ্দঙ্গিক এই রূপ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ-নির্ণয়-প্রসঙ্গে মহাভাষ্যকার পূর্ব্বপক্ষের উত্থাপন করিয়াছেন যে, মৃদঙ্গ যাহার শিল্প, সেই যদি "মার্দ্দঙ্গিক" নামে অভিহিত হয়, তবে ত মৃদঙ্গ-নির্ম্মাতাই মার্দ্দঙ্গিক-সংজ্ঞা পাইবার যোগ্য; কারণ, মুখ্যতঃ মৃদঙ্গ তাহারই শিল্প, সে-ই মৃদঙ্গ-নির্ম্মাণের দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। কিন্তু লৌকিক ব্যবহারে মৃদঙ্গ-বাদকেই মার্দ্দঙ্গিক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়; অতএব বুঝিতে হইবে যে, লক্ষণার দ্বারা মৃদঙ্গ-শব্দ মৃদঙ্গ-বাদনে স্থিত হইয়াছে। সুতরাং মৃদঙ্গ-বাদন যাহার শিল্প, সেই মৃদঙ্গ-বাদকই মার্দ্দঙ্গিক নামে কথিত হইয়া থাকে।

মহাভাষ্যকার রাজা পুষ্পমিত্রের সভায় থাকিয়া মৃদঙ্গ-মার্দ্দঙ্গিকের সহিত পরিচিত ছিলেন, সুতরাং বিচারপূর্ব্বক প্রকৃত অর্থ বুঝাইতেও সমর্থ হইয়াছিলেন। যে ব্যক্তি মৃদঙ্গ চেনে না, মার্দ্দঙ্গিককেও জানে না, সে যদি মার্দ্দঙ্গিক শব্দের অর্থ-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সে যে তদ্ধিতের বলে মৃদঙ্গ-নির্ম্মাতা কুম্ভকারকেই মার্দ্দঙ্গিকের আসনে বসাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আলোচ্য বিষয়েও এইরূপ হইয়াছে, তাহা বুঝা যাইতেছে।

প্রায়শ্চিত্তবিবেক-কার কন্দুপকের উল্লেখ করিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, অনাপদ অবস্থাতেও শূদ্রান্ন-ভোজনশীল ব্রাহ্মণ শূদ্রগৃহে কন্দুপক প্রভৃতি বস্তু খাইতে পারেন। কিন্তু তাঁহার উক্তিতে কন্দুর অথবা কন্দুপকের অর্থ-নির্ণয়ের প্রয়াস দেখা যায় না। তবে যে ভাবে তিনি প্রমাণগুলির বিন্যাস করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে মনে হয়, পিষ্টকবিশেষকেই যেন তিনি কন্দুপক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যথা,—

> "অনাপদ্যপি ভোজ্যবিশেষমাহ সুমন্তুঃ গোরসঞ্চৈব শক্তুঞ্চ তৈলং পিণ্যাকমেব চ। অপূপান্ ভোজয়েচ্ছূদ্রাদ্ যচ্চান্যৎ পয়সা কৃতম্ এতানি শূদ্রান্না দনিবৃত্তেনৈব ভক্ষ্যাণি।" ২৩৮ পৃ।

"সুমন্তু বলেন,—'ব্রাহ্মণ গোরস (দুগ্ধ), শক্তু, তৈল, খৈল, অপূপ, এবং

দুগ্ধনির্ম্মিত অন্যান্য বস্তু শূদ্র হইতেও গ্রহণ করিয়া খাইতে পারেন। শূদ্রান্নভক্ষণে অনিবৃত্ত' অর্থাৎ শূদ্রান্ন খাইতে যাঁহার আপত্তি নাই, তিনিই উক্ত দ্রব্য খাইতে পারেন। ইহার পরেই আবার বলিয়াছেন—

"অতএব হারীতঃ—"কন্দুপক্বং স্নেহপক্বং পায়সং দধিশক্তবঃ।
এতানি শূদ্রান্ন-ভুজো ভোজ্যানি মনুরব্রবীৎ।"

"এই জন্যই হারীতও বলিয়াছেন,—'কন্দুপক্ব' স্নেহপক্ব (ঘৃতে বা তৈলে পক্ব), দুগ্ধনির্ম্মিত-দ্রব্য, দধিমিশ্রিত শক্তু, এই সকল দ্রব্যকে মনু শূদ্রান্ন-ভোজীর ভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সুমন্তু-বচনে অপূপ উক্ত হইয়াছে ; হারীত-বচনে অপূপের পরিবর্ত্তে "কন্দু-পক্ব" পঠিত হইয়াছে। সুতরাং সুমন্তুর অভিমত অপূপ কন্দু-পক্ব অপূপ বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু টীকাকার গোবিন্দানন্দ বলেন,—অপূপ-পদে পয়োবিকার-কৃত অর্থাৎ ছানা প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত অপূপ বুঝিতে হইবে ; যে হেতু পরবর্ত্তী অংশে "যচ্চান্যৎ পয়সা কৃতম্" এই উক্তির দ্বারা দুগ্ধকৃতেরই গ্রহণ করা হইয়াছে।

টীকাকারের এই উক্তির সারবত্তা অনুভূত হয় না ;—কারণ বিবেককার যে দুইটি বচনের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে একটিতে অপূপ, অপরটিতে "কন্দু-পক্ব" শব্দ আছে ; সুতরাং একই বস্তু এই উভয় পদের প্রতিপাদ্য বলিয়া বুঝা যাইতেছে, কন্দুতে যাহা পক্ব হয়, তাহাই কন্দু-পক্ব। ইহার উপাদান কি হইবে, শাস্ত্র-কারগণ তদ্বিষয়ে কোনও বিশেষ উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে বুঝিতে হইবে, পাকগত বৈজাত্যেই ইহার তাৎপর্য্য, উপাদান-বৈজাত্যে নহে। সুতরাং যচ্চান্যৎ এই উক্তির দ্বারা অন্যান্য পয়োবিকার-কৃতেরই গ্রহণ হইয়াছে, ইহার সহিত অপূপের কোনও সম্পর্ক নাই। সুমন্তু-বচনে "অপূপান্" এবং কূর্ম্মপুরাণ-বচনে "কন্দুপক্বানি," এই উভয় স্থলে বহুবচন দেখিয়া মনে হয়, "কন্দুপক্ব" অপূপের নানাপ্রকার শ্রেণীবিভাগ ছিল।

উপসংহারে ইহাও বক্তব্য যে, ভ্রাষ্ট্র ও কন্দু, এই উভয়ের একার্থতার আশঙ্কাই হইতে পারে না। কারণ, ভ্রস্জ ধাতুর উত্তর অধিকরণবাচ্যে ষ্ট্রন প্রত্যয়ে ভ্রাষ্ট্র শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ধাতুর অর্থ—পাক। এই পাক ভর্জ্জন, অর্থাৎ ভাজা। সাধারণ পাক নহে। সুতরাং যাহাতে ভাজা করা হয়, তাহাই ভ্রাষ্ট্র। পক্ষান্তরে, যাহাতে সেঁকা হয়, তাহা কন্দু।

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

৪৭।১ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে শ্রীঅধর চন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ক্ষত্রপ কর্ণসেন।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় তাঁহার নবপ্রকাশিত "রাজন্যকাণ্ড" নামক গ্রন্থে বটুভট্টের "দেববংশ" নামধেয় একখানি নবাবিষ্কৃত কুলগ্রন্থ অবলম্বনে বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় সংযোজিত করিয়াছেন। সুধু নূতনত্বই যে এই অধ্যায়ের বিশেষত্ব, তাহা নয়; কি প্রণালীতে অন্যান্য শ্রেণীর প্রমাণের সহিত কুলশাস্ত্রের সমন্বয় করিয়া সিদ্ধান্ত-বারিধি মহাশয় লুপ্ত ইতিহাস গড়িয়া তুলিতে চাহেন, এখানে তাহার অতি সুন্দর নমুনা পাওয়া যায়। সুতরাং "রাজন্যকাণ্ডে"র এই অংশটি (৫৫—৬০ পৃঃ) বিশেষভাবে আলোচ্য।

"দেববংশ" সম্বন্ধে সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় লিখিয়াছেন,—"এই কুলগ্রন্থখানি চারি শত বর্ষের আদর্শ দৃষ্টে ১৬২২ শকে নকল করা হইয়াছে।" ১৬২২ শকে যে নকল করা হইয়াছে, এ কথা নিশ্চয়ই পুথির শেষ পত্রে লেখা আছে। কিন্তু আদর্শখানি যে চারি শত বৎসরের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল, এ কথার প্রমাণ কি? এই প্রমাণ উপস্থিত করা নিতান্ত উচিত ছিল। সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় "দেব-বংশে"র প্রথম ১৯টি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই অংশের প্রধান কথা—

> "আসীদ্রাজা দাতা কর্ণঃ খ্যাতিবাংশ্চ মহীতলে।
> কর্ণসেন-নামধেয়ঃ কর্ণপুরস্য ভূপতিঃ॥
> ক্ষত্রপঃ কায়স্থো রাজা মহাসুরো মহাবলী।
> কর্ণস্বর্ণরাজ্যস্থাতা (?) উক্তঞ্চ ভারতে যথা॥" ৬—৭

সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়ের অনুবাদ—"মহীতলে দাতা কর্ণ নামে খ্যাতিবান্ কর্ণসেন নামে কর্ণপুরের রাজা ছিলেন। তিনি কায়স্থ ক্ষত্রপ রাজা, মহাসুর, মহাবলী, এবং কর্ণ রাজ্য স্থাপয়িতা বলিয়া কথিত।"

মূলে আছে,—"উক্তঞ্চ ভারতে যথা।" ইহার সহজ অর্থ,—"ভারতে অর্থাৎ মহাভারতে যেমন উক্ত বা বর্ণিত হইয়াছে।" কিন্তু সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় অনুবাদ-কালে "ভারতে যথা" এই দুটি কথা ছাড়িয়া দিয়াছেন। এইরূপে কুরুকুলের কুলশাস্ত্র মহাভারত উপেক্ষা করিয়া, বাঙ্গালার কর্ণসেন নামক এক জন ক্ষত্রপ ছিলেন, ইহা ধরিয়া লইয়াছেন।

কর্ণের পুত্র সম্বন্ধে "দেববংশে" আছে—

> "দেবাংশেন কর্ণপত্নেঃ কুমারো জাতবান্‌সৌ।
> বৃষকেতুরিতি নামা প্রসিদ্ধশ্চ হি ভারতে ॥
> শুভান্নপ্রাশনাদীনাগতাংশ্চ ততঃ পরং।
> বিভীষণো লঙ্কেশ্বরো যথাগতো মহাকৃতিঃ ॥
> তস্মাদদ্ভবত্তত্র হেমবৃষ্টিঃ সুরলোকাৎ ॥"

সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় "দেবাংশেন" স্থলে "দেবসেন" পাঠ করিতে চাহেন। "বাণভট্টের হর্ষচরিত হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সুহ্মাধিপতি দেবসেনের মহিষী দেবকী দেবরের প্রতি অনুরক্তা ছিলেন। তিনি বিষচূর্ণগর্ভ কর্ণোৎপল-সাহায্যে দেবসেনকে নিহত করেন। এই কারণে তিনি বলিতে চাহেন, "দেবাংশেন" =দেবসেন=বৃষকেতু। যদি বটুভট্টের বৃষকেতু এবং বাণভট্টের দেবসেন একই ব্যক্তি হয়েন, তবে "দেবাংশেন" কাটিয়া "দেবসেন" পড়া গেলেও যাইতে পারে। কিন্তু বাণভট্ট-কথিত সুহ্মাধিপতি "দেবসেন" এবং বটুভট্টের "বৃষকেতু" যে এক ব্যক্তি, তাহার প্রমাণ কি? বাণভট্টের দেবসেন যে ভাবে দেবরানুরক্তা দেবকী কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন, দেবরানুরক্তা দেবকী নাম্নী ভার্য্যা কর্ত্তৃক বৃষকেতুর সেই ভাবে নিধনের কথা বটুভট্টের গ্রন্থে আছে কি? থাকিলে তাহার উল্লেখ করা উচিত ছিল।

তার পর সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় লিখিয়াছেন,—"বাণভট্ট যে সময়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সময়ে আমরা কর্ণসেনের পুত্র দেবসেন বা বৃষকেতুকে পাই।" ভাণভট্ট কোন সময়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় তাহা কেমন করিয়া জানিলেন? বাণভট্ট হর্ষচরিতের ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসে স্কন্দগুপ্তের মুখে, নৃপতিগণের প্রমাদদোষে বিপন্ন হইবার যে বহুবার্ত্তা বা প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার কতকগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল বার্ত্তার মধ্যেই পুষ্পমিত্র কর্ত্তৃক মৌর্য্য বৃহদ্রথের নিধনের কথাও আছে। কিন্তু "হর্ষ-চরিতে" এমন কোনও কথা নাই, যদ্দ্বারা দেবসেন বা আর কাহারও সময়নিরূপণ করা যাইতে পারে।

সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় স্বতন্ত্র প্রমাণের দ্বারাও বৃষকেতুর তথা কর্ণসেনের সময়নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বটুভট্ট বলিয়াছেন, বৃষকেতুর শুভান্ন-প্রাশনে মহাকৃতি লঙ্কেশ্বর বিভীষণ আসিয়াছিলেন; সেই হেতু সুরলোক হইতে হেমবৃষ্টি হইয়াছিল। লঙ্কেশ্বর বিভীষণের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সুরলোক হইতে

হেমবৃষ্টির কথায় মনে হয়, এই বিভীষণ "রামায়ণে"র রাবণানুজ বিভীষণ। কিন্তু সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় বলেন,—"কুলগ্রন্থে যে লঙ্কাধিপ বিভীষণের প্রসঙ্গ আছে, কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ ইতিহাস রাজতরঙ্গিণী এবং সিংহলের 'মহাবংশ' হইতে তাহার কিছু কিছু আভাস পাইয়াছি। রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে, কাশ্মীর-পতি মেঘবাহন লঙ্কাপতি বিভীষণকে পরাজিত করেন। সেই মেঘবাহন প্রাগ্‌-জ্যোতিষ-রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এরূপ স্থলে মনে হয়, সিংহলে না গিয়া যে সময়ে বিভীষণ বঙ্গে আসিয়া বাস করিতেছিলেন, সেই সময় মেঘবাহন বিভীষণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন। রাজতরঙ্গিণীর লিখিত বৃত্তান্ত হইতে মনে হয় যে, মেঘবাহন ৪৪০ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী সময়ে বিদ্যমান ছিলেন।" সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়ের ঐতিহাসিক তথ্যোদ্ধারপ্রণালী যে কিরূপ কৌতুকা-বহ, উদ্ধৃত অংশের সহিত কহ্লণ-বর্ণিত মেঘবাহনের লঙ্কাজয়-বৃত্তান্তের তুলনা করিলেই তাহা বেশ বুঝা যাইতে পারে। কহ্লণ লিখিয়াছেন,—কাশ্মীর-রাজ মেঘবাহন অন্যান্য রাজ্যের নৃপতিগণকে প্রাণিহিংসা হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন। তার পর—

"প্রভাববিজিতান্ কৃত্বা সোঽহিংসাদীক্ষিতান্ নৃপান্।
অর্ণসাং পত্যুরভ্যর্ণ মবাপাবর্ণবর্জিতঃ ॥৩।২৯॥"

"নিজ প্রভাবের দ্বারা বিজিত নৃপতিগণকে অহিংসা-ব্রতে দীক্ষিত করিয়া দোষবর্জ্জিত [মেঘবাহন] সমুদ্রের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন।"

তখন মেঘবাহন চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি উপায়ে সমুদ্র পার হইয়া অপর পারস্থ দ্বীপে উপস্থিত হইবেন। জলাধিপতি বরুণ মেঘবাহনকে পরীক্ষা করিয়া লইয়া তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইলেন। মেঘবাহন প্রার্থনা করিলেন, "আমাকে সমুদ্র পার হইবার উপায় বলিয়া দিন।" বরুণ বলিলেন, "তুমি যখন সমুদ্র পার হইতে ইচ্ছা করিবে, তখন আমি জল জমাইয়া নিরেট করিয়া দিব।" পরদিন রাজা সসৈন্যে সমুদ্র পার হইয়া রোহণ পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন।

"তত্র তালীতরুবনচ্ছায়াধ্যাসিতসৈনিকম্।
প্রীত্যা লঙ্কাধিরাজস্তমুপতস্থে বিভীষণঃ ॥
সমাগমং স শুশুভে নররাক্ষসরাজয়োঃ।
বন্দিনাদাশ্রুতান্যোন্যপ্রথমালাপসংভ্রমঃ ॥
অথ রক্ষঃপতি র্লঙ্কাং নীত্বালংকরণং ক্ষিতেঃ
অমর্ত্ত্যসুলভাভিস্তং বিভূতিভি রুপাচরৎ ॥

যদাসীৎ পিশিতাশা ইত্যন্বর্থং নাম রক্ষসাম্।
তদা তদাজ্ঞাগ্রহণে প্রাপ তদ্রূঢ়িশব্দতাম্॥" ৩।৭৩—৭৬॥

"সেখানে তালীতরুবনচ্ছায়ায় তাঁহার সৈনিকগণ যখন অবস্থান করিতেছিল, তখন লঙ্কাধিরাজ বিভীষণ প্রীতিবশতঃ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন।

"নরপতির এবং রাক্ষসপতির মিলন সুশোভন হইয়াছিল; বন্দিগণের স্তুতিগানের জন্ম তাঁহাদের পরস্পরের প্রথম আলাপ শুনা যায় নাই।

"তৎপর রক্ষঃপতি [বিভীষণ] ক্ষিতিভূষণ [মেঘবাহনকে] লঙ্কায় লইয়া গিয়া অমরগণের সুলভ ঐশ্বর্য্যের দ্বারা তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন।

"[বিভীষণ মেঘবাহনের] আজ্ঞা গ্রহণ করায় রাক্ষসগণের 'পিশিতাশ' (মাংসখাদক) এই সার্থক [যৌগিক] নামটি রূঢ়িশব্দতা প্রাপ্ত হইয়াছিল।"

মেঘবাহন যে সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কায় গিয়াছিলেন, এবং বিভীষণ যে রাক্ষসরাজ এবং পিশিতাশ রাক্ষস ছিলেন, এই দুইটি কথা সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় একেবারে উড়াইয়া দিয়াছেন, এবং বিভীষণকে বঙ্গবাসী করিয়া মেঘবাহনের দ্বারা তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করাইয়াছেন। এইরূপ জবরদস্তির কারণ কি? তিনি বলিতে চাহেন, বটুভট্টের "দেববংশ"-মতে যে বিভীষণ বৃষকেতুর অন্নারম্ভে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন, এবং মেঘবাহন যাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন, এই দুইই এক ব্যক্তি। তিনি এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে একমাত্র যুক্তি দিয়াছেন, "সিংহলে না গিয়া যে সময় বিভীষণ বঙ্গে আসিয়া বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে মেঘবাহন বিভীষণকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন।" এ কথা সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়ের অঘটনঘটনপটীয়সী ঐতিহাসিক-কল্পনার সৃষ্টি। প্রমাণ হিসাবে সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়ের কথার সারাংশ এই,—'যেহেতু বটুভট্ট-কথিত বিভীষণ এবং কহ্লণের বিভীষণ এই দুই এক ব্যক্তি, সুতরাং দুই বিভীষণই এক ব্যক্তি।' অর্থাৎ, বটুভট্টের বিভীষণ এবং কহ্লণের বিভীষণ যে অভিন্ন ব্যক্তি, তাহা স্বতঃসিদ্ধ! সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়ের বিচারপ্রণালীর বিশেষত্ব এই, তিনি যাহা ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া গ্রহণ করা আবশ্যক বোধ করেন, তাহা স্বতঃসিদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়। তার পর সাধারণ ঐতিহাসিকেরা শিলালিপি, তাম্রশাসন, মুদ্রা, রাজতরঙ্গিণী, মহাবংশ, হর্ষচরিত প্রভৃতি যে যে সুপরিচিত আকর হইতে প্রমাণ আহরণ করিয়া ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিস্থাপন করেন, সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় সেই সকল প্রমাণকে তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ মূল তথ্যের সহিত শাখা-প্রশাখা-পল্লব-রূপে

যোজনা করিয়া একটা মহামহীরুহের সৃষ্টি করেন। এই বিভীষণ-প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত-বারিধি মহাশয়ের মূল তথ্য হইল, বটুভট্টের কথা স্বতঃসিদ্ধ, 'লঙ্কার বিভীষণ বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। তার পর রাজতরঙ্গিণীর দোহাই দিয়া এই মূল কথার সহিত প্রথম শাখা যোজনা করিলেন,—"সিংহলে আ গিয়া যে সময় বিভীষণ বঙ্গে আসিয়া বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে মেঘবাহন বিভীষণকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন।" এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে গিয়া সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় কহ্লণের প্রায় সকল কথা উড়াইয়া দিয়াছেন। কেন না, কহ্লণের কথায় অবিশ্বাস করা কুলশাস্ত্রে আস্থাহীন "নবীন ঐতিহাসিকে"র পক্ষে দোষাবহ হইলেও, কুলশাস্ত্রৈক-পরায়ণ প্রবীণ ঐতিহাসিকের পক্ষে দোষাবহ হইতে পারে না।

সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় সিংহলের "মহাবংশ" হইতে আনিয়া এই বিভীষণ-কথার দ্বিতীয় শাখার যোজনা করিয়াছেন। সেই শাখা এই,—বটুভট্টের বিভীষণ রাক্ষসের রাজা রাক্ষস ছিলেন না, তিনি লঙ্কেশ্বর ধাতুসেনের পুত্র, এবং কস্‌সপের ভ্রাতা মোগ্‌গল্লান নামক মানুষ। যথা—

"সিংহলের মহাবংশ আলোচনা করিলেও জানিতে পারি, ৪৫০ খৃষ্টাব্দের কিছু পরে ধাতুসেন সিংহল বা লঙ্কার অধিপতি ছিলেন। তিনি স্থবিরবাদীদিগের জন্য ১৮টী বিহার ও ১৮টী বাপী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ঐ ১৮টী বিহারের মধ্যে একটীর নাম ধাতুসেন, একটীর নাম কাশ্যপীপিট্‌ঠক ও একটীর নাম বিভীষণবিহার। মহাবংশে মহারাজ ধাতুসেনের দুই বিভিন্ন পত্নীর গর্ভজাত দুইটী পুত্রের নাম পাওয়া যায়, একটীর নাম কস্‌সপো (কশ্যপ), অপরটীর নাম মোগ্‌গল্লানো (মৌদ্গল্যায়ন)। কশ্যপ দুষ্ট ব্যক্তির পরামর্শে পিতাকে বন্দী করিয়া রাজছত্র গ্রহণ করেন। মৌদ্গল্যায়নও ভ্রাতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু উপযুক্ত সেনাবলের অভাবে জম্বুদ্বীপে (ভারতবর্ষে) পলাইয়া আসেন। এই মোগ্‌গল্লানকেই আমরা লঙ্কার রাজপুত্র বিভীষণ বলিয়া মনে করি। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, মহারাজ ধাতুসেন নিজ ও নিজ পুত্রের নামানুসারে বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার অপর পুত্রের নামানুসারে যখন কাস্‌সপিপিট্‌ঠক অর্থাৎ কাশ্যপীপিট্‌ঠক বিহারের নাম পাইতেছি, অথচ তাঁহার প্রিয়পুত্র মোগ্‌গল্লানের নামে কোন বিহারের উল্লেখ পাইতেছি না, তৎপরেই বিভীষণবিহারের নাম দেখিতেছি, আবার ঐ সময়ে প্রাচ্যভারতে কাশ্মীরপতি মেঘবাহনের নিকট সিংহলাধিপ বিভীষণের পরাজয়সংবাদ এবং কুলগ্রন্থে কর্ণ-সেনের রাজধানীতে তাঁহার আগমনসংবাদ পাইতেছি, তখন মোগ্‌গল্লান ও

বিভীষণকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে বিশেষ আপত্তি দেখিতেছি না।"

মোগ্‌গল্লান'ও বিভীষণকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করায় কিঞ্চিৎ আপত্তি হইতে পারে। "রাজতরঙ্গিণী"তে লঙ্কার রাক্ষসরাজ বিভীষণ সম্বন্ধে এবং কুলগ্রন্থে "লঙ্কেশ্বর বিভীষণ" সম্বন্ধে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা মোগ্‌গল্লায়ন ও বিভীষণের ভিন্নতাই প্রমাণিত করে। কারণ, "মহাবংশে"র মোগ্‌গল্লায়ন রাক্ষসও নহেন, লঙ্কেশ্বরও নহেন; লঙ্কার পলাতক রাজপুত্র। লঙ্কেশ্বর ধাতুসেনের পুত্র মোগ্‌গল্লান বিভীষণ নামেও পরিচিত ছিলেন, এ কথারই বা প্রমাণ কি? ধাতুসেন ১৮টী বিহার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটি নিজের নামে, এবং একটি পুত্র কস্‌সপের নামে। বাকী ১৬টী বিহারের মধ্যে বিভীষণবিহারকে মোগ্‌গল্লানের নামের বিহার মনে করিব কেন? ধাতুসেন বেনামী করিয়া মোগ্‌গল্লানের নামে বিহার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এ কথা যদি নিতান্তই স্বীকারই করিতে হয়, তবে ১৬টী বিহারের যে কোনটিকেই ত ঐরূপ মনে করিতে পারি; বিভীষণ-বিহারকে বাছিয়া লইবার অধিকার কি? লঙ্কার রাক্ষসরাজ বিভীষণও ধাতুসেনের সময়ে (৫০৯—৫২৭ খৃষ্টাব্দে) লঙ্কাবাসীর অপরিচিত ছিলেন না। কারণ, ইহার অনতিকাল পরেই কুমারদাস বা কুমার ধাতুসেন নামক লঙ্কাধিপ বাল্মীকির রামায়ণের আখ্যানবস্তু লইয়া "জানকীহরণ" নামক সংস্কৃত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। (১)

সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় বটুভট্টের "উক্তঞ্চ ভারতে যথা" বাক্যের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া একটিমাত্র মুদ্রা অবলম্বন করিয়া ক্ষত্রপ কর্ণসেনের পূর্ব্ব-পুরুষের বৃত্তান্তও প্রদান করিয়াছেন। কানিংহাম সুলতানগঞ্জের স্তূপ খনন-প্রসঙ্গে স্তূপের অভ্যন্তরে লব্ধ দুইটি মুদ্রা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

On clearing them I found one to be a silver coin of Maha K-hatrapa Swami Rudra Sena, the son of M. Ksh. Satya, or Surya, Sena. The other was a coin of Chandra Gupta Vikramaditya, or Chandra Gupta II. —Arch. Surv. Reports, XV. pp. 29—30.

কানিংহাম মনে করিয়াছিলেন, এই মুদ্রাটি মালব এবং সুরাষ্ট্রের শেষ মহা-

(১) Journal of the Royal Asiatic Society, 1901, p. 254 (৫৪৪ খৃষ্টাব্দে নির্ব্বাণাব্দের আরম্ভ ধরিলে ৫১৭ হইতে ৫১৬ খৃষ্টাব্দ কুমারদাসের রাজত্বকাল হয়। Geiger, ৪৮৩ খৃষ্টাব্দ নির্ব্বাণাব্দের আরম্ভ ধরিয়া সিংহলের নৃপতিগণের কাল নির্ণয় করিয়াছেন। এই হিসাবে "জানকীহরণ"-কার কুমারদাসের রাজত্বকাল ৫৭৭ হইতে ৫৮৫ খৃষ্টাব্দ।

ক্ষত্রপ সত্যসেনের [বিশুদ্ধ পাঠ—"সত্যসিংহে"র] পুত্র রুদ্রসেনের [বিশুদ্ধ পাঠ "রুদ্রসিংহে"র] মুদ্রা।* রুদ্রসিংহের মুদ্রায় ৩১০ শকাব্দ অর্থাৎ ৩৮৮ খৃষ্টাব্দ মুদ্রিত আছে। মহাক্ষত্রপ রুদ্র সিংহের সময়েই সম্ভবতঃ সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য সুরাষ্ট্র ও মালব জয় করিয়াছিলেন। বিজয়ী চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের এবং বিজিত মহাক্ষত্রপ রুদ্রসেনের মুদ্রার একত্র সমাবেশ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় সুলতানগঞ্জের মুদ্রার রুদ্রসেন-[রুদ্র সিংহ]-কে মালবের মহাক্ষত্রপ বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না; কারণ, তিনি "বিশেষ পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন বলিয়া মনে হয় না।" তিনি বলেন—

"উদ্ধৃত কুলগ্রন্থের প্রমাণানুসারে কায়স্থ-ক্ষত্রপবংশ হরিদ্বার হইতেই আগমন করেন। শকসম্রাটগণের অধীনে ক্ষত্রপরূপে সম্ভবতঃ তাঁহারা মগধ শাসন করিতেন। গুপ্তবংশের অভ্যুদয়কালে মগধ হইতে বিতাড়িত হইয়া প্রথমে অঙ্গে বা ভাগলপুর (সুলতনগঞ্জ) অঞ্চলে, তৎপর বঙ্গে চলিয়া আইসেন। গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্তের আলাহাবাদের শিলালিপিতে সমুদ্রগুপ্তের নিকট পরাজিত আর্য্যাবর্ত্ত-নৃপতিগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম রুদ্রদেবের নাম পাওয়া যায়। এই রুদ্রদেবকে সুলতানগঞ্জের মুদ্রানির্দ্দিষ্ট মহাক্ষত্রপ রুদ্রসেন মনে করি। * * * রুদ্রদেব সমুদ্রগুপ্তের নিকট পরাজিত বা নিহত হইলে সম্ভবতঃ তৎপুত্র বঙ্গদেশে পলাইয়া আসেন। এই পলাতক রুদ্রসেন-দেব-পুত্রের ঔরসে খুব সম্ভব কর্ণসেন জন্মগ্রহণ করেন। পিতামহ গুপ্তসম্রাটের নিকট পরাজিত ও তৎপুত্র নিজরাজ্য ত্যাগ করিয়া পলায়নপর হইয়াছিলেন বলিয়া সম্ভবতঃ কুলগ্রন্থে তাঁহাদের নাম গৃহীত হয় নাই।"

সমুদ্রগুপ্তের শিলালিপির রুদ্রদেব, সুলতানগঞ্জের স্তূপের অভ্যন্তরে প্রাপ্ত "মহাক্ষত্রপ স্বামী রুদ্রসেন"-নামাঙ্কিত মুদ্রা, এবং ১৬২২ শকে নকল করা কুলগ্রন্থের "কর্ণস্বর্ণরাজ্যস্থাতা উক্তঞ্চ ভারতে যথা," এই তিনের সামঞ্জস্য করিয়া, মগধ-অঙ্গ-বঙ্গে খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দে আদৌ শকসম্রাটগণের অধীন ক্ষত্রপ-শাসনের কল্পনা কষ্টকল্পনা। চতুর্থ শতাব্দের প্রথম পাদে গুপ্ত-বংশের অভ্যুদয়। সকল প্রাচীন রাজকুলের কুলশাস্ত্র পুরাণে আস্থাস্থাপন করিতে গেলে, গুপ্তাভ্যুদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা সমসময়ে মগধে, অঙ্গে, বা সুহ্মে দেববংশের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। যথা—

মাগধানাং মহাবীর্য্যো বিশ্বস্ফানির্ভবিষ্যতি।
উৎসাদ্য পার্থিবান্ সর্বান্ সোহন্যান্ বর্ণান্ করিষ্যতি॥
কৈবর্ত্তান্ পঞ্চকাংশ্চৈব পুলিন্দান্ ব্রাহ্মণাংস্তথা।
স্থাপয়িষ্যতি রাজানো নানাদেশেষু তে জনাঃ॥

বিশ্বস্ফানি র্মহাসত্ত্বো যুদ্ধে বিষ্ণুসমো বলী।
বিশ্বস্ফানি র্নরপতিঃ ক্লীবাকৃতি রিবোচ্যতে ॥
উৎসাদয়িত্বা ক্ষত্রং তু ক্ষত্রমন্যৎ করিষ্যতি।
দেবান্ পিতৃংশ্চ বিপ্রাংশ্চ তর্পয়িত্বা সকৃৎ পুনঃ ॥
জাহ্নবীতীরমাসাদ্য শরীরং যংস্যতে বলী।
সন্ন্যস্য স্বশরীরং তু শক্রলোকং গমিষ্যতি ॥
নব নাকাংস্তু ভোক্ষ্যন্তি পুরীং চম্পাবতীং নৃপাঃ।
মথুরাং চ পুরীং রম্যাং নাগা ভোক্ষ্যন্তি সপ্ত বৈ ॥
অনুগঙ্গং প্রয়াগং চ সাকেতং মগধাংস্তথা।
এতান্ জনপদান্ সর্বান্ ভোক্ষ্যন্তে গুপ্তবংশজাঃ ॥
* * * * *
কোশলাংশ্চান্ধ্রপৌণ্ড্রাংশ্চ তাম্রলিপ্তান্ স-সাগরান্।
চম্পাং চৈব পুরীং রম্যাং ভোক্ষ্যন্তে দেবরক্ষিতাঃ ॥" (২)

"মহাবীর্য্য বিশ্বস্ফানি মাগধগণের রাজা হইবেন। সমস্ত নৃপতিগণকে উচ্ছেদ করিয়া অন্যান্য বর্ণের লোককে— কৈবর্ত্ত, পঞ্চক, পুলিন্দ এবং ব্রাহ্মণগণকে রাজা করিবেন। তিনি ঐ সকল লোককে নানা দেশে নৃপতিরূপে স্থাপন করিবেন। মহাসত্ত্ব বিশ্বস্ফানি যুদ্ধে বিষ্ণুর সমান বলী হইবেন। বিশ্বস্ফানি নরপতি ক্লীবাকৃতি বলিয়া কথিত। তিনি ক্ষত্রিয় জাতির উচ্ছেদ করিয়া অন্য ক্ষত্রিয় জাতির সৃষ্টি করিবেন। দেবগণ, পিতৃগণ এবং ব্রাহ্মণগণকে একবার এবং পুনর্বার তৃপ্ত করিয়া জাহ্নবীতীরে উপস্থিত হইয়া দেহ দমন করিবেন; দেহত্যাগ করিয়া ইন্দ্রলোকে গমন করিবেন।

"নয় জন নাক (বা নাগ)-বংশীয় নৃপতি চম্পাবতী নগরী উপভোগ করিবেন, এবং ৭ জন নাগবংশীয় নৃপতি মনোরম মথুরাপুরী উপভোগ করিবেন। গঙ্গার তীরবর্ত্তী ভূভাগ, প্রয়াগ, সাকেত এবং মগধ—এই সকল জনপদ গুপ্তবংশীয় নরপতিগণ উপভোগ করিবেন। * * * দেবরক্ষিত-[বংশীয় নৃপতি] গণ কোশল, অন্ধ্র, পৌণ্ড্র, তাম্রলিপ্ত এবং সাগরতীরবাসী জনপদ এবং মনোরম চম্পাপুরী উপভোগ করিবেন।"

পুরাণোক্ত শিশুনাগ, নন্দ, মৌর্য্য ও শুঙ্গবংশীয় নৃপতিগণের বংশাবলী ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর কত দূর প্রতিষ্ঠিত, তাহা সম্যক অবধারিত হইয়াছে।

২। Pargiter's The Purana Text of the Dynasties of the Kali Age, pp. 52—54.

বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড, বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণে প্রদত্ত এই ভবিষ্যৎ রাজবংশ-বিবরণে মগধে, প্রয়াগে, এবং সাকেতে বা অযোধ্যায় গুপ্তবংশীয় নৃপতির রাজ্য-প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে, তাঁহার পিতা প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময়ে, গুপ্তরাজ্য ঐরূপ বিস্তৃত ছিল। মৎস্যপুরাণে গুপ্তবংশের সমসময়ের অন্যান্য বংশের এবং পূর্ব্ববর্ত্তী বিশ্বস্ফাণির এবং আরও কয়েকটি রাজবংশের উল্লেখ নাই; অন্ধ্র-বংশ এবং তৎসাময়িক শক, যবন, আভীর, তুষারাদি বংশ উল্লিখিত হইয়াছে। এই নিমিত্ত পার্জিটার অনুমান করেন,—পুরাণোক্ত কলিযুগের রাজবংশাবলী প্রথমতঃ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দের মাঝামাঝি বা তাহার কিছু পরে সঙ্কলিত হইয়াছিল, এবং মৎস্য ভিন্ন অন্যান্য পুরাণে যেটুকু বেশী আছে, তাহা প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময়ে সঙ্কলিত হইয়াছিল। (৩) ইহার পরে যদি কেহ কখনও এই রাজবংশ-বিবরণে হস্তক্ষেপ করিতেন, তবে অশ্বমেধযাজী সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের নাম নিশ্চয়ই গুপ্তবংশ-বিবরণে স্থান লাভ করিত। সুতরাং পুরাণে গুপ্তরাজগণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব-সময়ের এবং সমসময়ের মগধের এবং বাঙ্গালার রাজনীতিক অবস্থার যে আভাস পাওয়া যায়, তাহা সহসা উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। মগধরাজ বিশ্বস্ফাণি কর্ত্তৃক নূতন ক্ষত্রিয়-সৃষ্টি-সম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত একেবারে অমূলক হইলে ব্রাহ্মণের লিখিত কলিকালের বিবরণে কখনই তাহা স্থান লাভ করিত না। যদি গুপ্তবংশের অভ্যুদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে দিগ্বিজয়ী মগধরাজ বিশ্বস্ফাণির অস্তিত্ব এবং সমসময়ে চম্পানগরীতে, পৌণ্ড্রে এবং তাম্রলিপ্ত জনপদে দেবরক্ষিত বংশের রাজত্ব স্বীকার করিতে হয়, তবে সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়ের কথিত দেববংশীয় রাজগণের স্থান কোথায়?

দেববংশের "ক্ষত্রপ" উপাধিটিও সন্দেহজনক। পুরাণে "ক্ষত্রপ" শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় না। সংস্কৃত সাহিত্যে ইহা অপরিচিত ছিল। তজ্জন্য "কোষ"-গ্রন্থসমূহে, এমন কি, "কর্ণস্বর্ণ নামধেয় সমাজে বাসকারক" রাজা সার রাধাকান্ত দেবের "শব্দকল্পদ্রুমে"ও ইহা স্থান লাভ করে নাই। করিয়াছে সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়ের "বিশ্বকোষে"। তাহার কারণ এই যে, আধুনিক প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানে আবিষ্কৃত মুদ্রায় ও ক্ষোদিত লিপিতে "ক্ষত্রপ" দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, এবং সেই সূত্রে প্রত্নতত্ত্বানুরাগিগণের নিকট সুবিদিত হইয়াছে। সুতরাং "চারি শত বৎসরের আদর্শ দৃষ্টে ১৬২২ শকে নকল করা" কুলগ্রন্থে "ক্ষত্রপ" শব্দ কেমন করিয়া প্রবেশ লাভ করিল, তাহা অনুসন্ধেয়।

৩। Ibid. pp. xii—xiii.

দেববংশের ইতিবৃত্ত-আলোচনার কালে সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় পুরাণ বিস্মৃত হইলেও, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দের বাঙ্গালার ইতিহাসের উপাদানের আকর তাম্রশাসন, শিলালিপি, “হর্ষচরিত” প্রভৃতি বিস্মৃত হয়েন নাই। এই সকল আকর হইতে লব্ধ ইতিহাসের সহিত ক্ষত্রপ-বংশের ইতিহাস তিনি মজবুত করিয়া জুড়িবার দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যথা—কর্ণসেনের পুত্র বৃষকেতু বা “দেবসেন পত্নীহস্তে নিহত হইলে দেবকীর প্রণয়ী দেবসেন-ভ্রাতা রাজা হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু এই ভ্রাতৃহত্যার রাজপদ নিরাপদ ছিল বলিয়া মনে হয় না; রাজপুরুষ ও প্রজাবৃন্দ তাঁহার বিরুদ্ধে থাকায় তাঁহাকে বেশী দিন রাজ্যসুখ ভোগ করিতে হয় নাই। যে সময়ে কর্ণসুবর্ণ রাজ্যে এইরূপ বিপ্লব উপস্থিত, তাহারই অত্যল্পকাল পরে মালবে যশোধর্ম্মের এবং বঙ্গে ধর্ম্মাদিত্য নামক এক ব্যক্তির অভ্যুদয়। সম্ভবতঃ দেবসেন-ভ্রাতা নিকটবর্ত্তী অপরাপর নৃপতিগণকে পরাজিত করিয়া ধর্ম্মাদিত্য মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেন”। (৬০ পৃঃ) ফরিদপুর জেলায় আবিষ্কৃত তাম্রশাসনচতুষ্টয়ে উল্লিখিত ধর্ম্মাদিত্য, গোপচন্দ্র এবং সমাচার দেব, এই তিন জন নৃপতিকে সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় নানা গোত্রে বিভক্ত কাণসোনার কোন-দেব-বংশোদ্ভব মনে করেন (৬১—৬২ পৃঃ)। চীন পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াংএর উল্লিখিত কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্কের “যে সুপ্রাচীন মোহর আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে তিনি ‘মহাসামন্ত শ্রীশশাঙ্কদেব’ নামে পরিচিত হইয়াছেন। এ অবস্থায় অনায়াসেই মনে করা যাইতে পারে যে, কর্ণসুবর্ণ-প্রতিষ্ঠাতা কর্ণ-দেবের বংশেই শশাঙ্কদেবের জন্ম (৬৩ পৃঃ)।” সকলের পক্ষে “অনায়াসে” এরূপ মনে করা কঠিন। “দেব” শব্দ থাকিলেই দেববংশোদ্ভব বুঝিতে হইবে না। “রাজা ভট্টারকো দেবঃ”ও বটে।

কুলগ্রন্থের সাহায্যে সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় “অনায়াসে” শশাঙ্কের পূর্ব্বপুরুষের পরিচয়প্রদান করিতে সমর্থ হইয়া থাকিলেও, তিনি শশাঙ্কে আস্ত রাখেন নাই, কাটিয়া দুই ভাগ করিয়াছেন। তিনি এক সময় পাশ্চাত্য প্রত্নবিদ্‌গণের অনুসরণ করিয়া বাণভট্ট-কথিত হর্ষবর্দ্ধনের অগ্রজ রাজ্যবর্দ্ধনহন্তা “গৌড়াধিপ” এবং ইউয়ান চোয়াং-কথিত উক্ত রাজ্যবর্দ্ধন-হন্তা কর্ণসুবর্ণপতি শশাঙ্ক অভিন্ন, এইরূপ মনে করিয়াছিলেন। “কিন্তু এখন আলোচনা দ্বারা বুঝিতেছেন, রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত গৌড়পতি এবং কর্ণসুবর্ণপতি এক ব্যক্তি হইতে পারেন না।” কিরূপ আলোচনা দ্বারা তিনি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতের ভুল বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহাও গ্রন্থবদ্ধ করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। (৬২—৬৩ পৃঃ)।

কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে সকল প্রমাণের বলে শশাঙ্ককেই গৌড়পতি মনে করেন, তাহার খণ্ডন করা দূরে থাকুক, উল্লেখ করিতেও বিস্মৃত হইয়াছেন। হর্ষ-চরিতের ইংরেজী অনুবাদক কাউয়েল এবং টমাস উক্ত গ্রন্থের ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসে যে শ্লেষাত্মক সন্ধ্যাবর্ণনা আছে, তাহার টীকায় লিখিয়াছেন—

"Sri, the goddess of sovereignty, is roaming, i. e. not yet settled with a new king. The paragraph contains several significant allusions ('the pathetic fallacy') The red sunset is a sign of bloody wars; the separation of the ruddy geese, of the separation of the brothers; the buzzing bees, of arrows; the rise of the blotted moon, of the rising power of the Ganda king. The last is important as the word used for moon ('Sasanka') confirms the comm's in P. 195 (text) that this was the Ganda king's name(Hiuen Thsang's Ch-chang-kia) one Ms. of the Harsa Charita names him Narendra Gupta, Vide Buhler Epigr. Ind. I. P 70. (২১৪ পৃঃ)

কাউয়েল এবং টমাস উভয়েই পাশ্চত্য প্রত্নবিৎ, কিন্তু ইহাঁরা যাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছেন, সেই "হর্ষচরিত"-কার বাণভট্ট, এবং "হর্ষচরিতে"র সঙ্কেতাখ্য-টীকাকার শঙ্কর, উভয়েই প্রাচ্য। শঙ্কর ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসের টীকার সূচনায় লিখিয়াছেন, "কৃতো হন্তো বিনাশো যেন স শশাঙ্কাখ্যো গৌড়াধিপতিঃ;" এবং "খলোঽত্র গৌড়াপসদঃ শশাঙ্কঃ" (নির্ণয়সাগর যন্ত্রে মুদ্রিত সটীক "হর্ষচরিত", ২য় সংস্করণ, ১৭৫ পৃঃ। স্বয়ং বাণভট্ট সন্ধ্যা-বর্ণনায় রুধিররসমাংসচ্ছবি অরুণ-সারথি (সূর্য্য), । সংচরণশীলা শ্রীর সঙ্গে আকাশে পঙ্কসংকর শশাঙ্কমণ্ডলের উল্লেখ করিয়া স্পষ্টাক্ষরে তাহাই সূচিত করিয়াছেন। পাশ্চাত্য প্রত্নবিদের করস্পর্শে প্রাচ্যবিদ্যা অব্যবহার্য্য হইবে, এরূপ ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত কেহ প্রচার করিতে সাহসী হয়েন নাই। সুতরাং কেন যে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বাণ-ভট্টের এবং তাঁহার টীকাকারের উক্তি উপেক্ষা করিলেন, তাহা বলা দুঃসাধ্য। সুধু তাহাই নয়। যে প্রমাণ এ পর্য্যন্ত কোনও পাশ্চাত্য প্রত্নবিৎ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয় নাই, তাহাও তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে উপেক্ষা করিয়াছেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় স্বয়ং তাঁহার স্বরচিত "ব্রাহ্মণকাণ্ডে"র চতুর্থ অংশে গৌড়ে শাকদ্বীপীয়গণের আগমনপ্রসঙ্গে উমেশচন্দ্র শর্ম্মা কর্ত্তৃক ধৃত মহাদেব-কারিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"কদাচিন্নৃপতিশ্রেষ্ঠঃ শশাঙ্কো গৌড়ভূপতিঃ" ইত্যাদি (৮৭ পৃঃ)

তৎপরে "গৌড়সিংহাসনে একাধিক শশাঙ্করাজ অধিষ্ঠিত" থাকিলেও, সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—মহাদেব-কারিকার গৌড়ভূপতি শশাঙ্ক, এবং হর্ষবর্দ্ধনের সহোদর-

রাজ্যবর্দ্ধনের প্রাণসংহারকারী, একই ব্যক্তি। "রাজন্যকাণ্ডে"ও (৭১—৭২ পৃঃ) কর্ণসুবর্ণপতি শশাঙ্কের প্রসঙ্গে সরযূপারী শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের কুলপঞ্জিকার দোহাই দিয়া, এই শশাঙ্কই যে সরযূপার হইতে কয়েক জন শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, তাহা বর্ণা হইয়াছে; কিন্তু উক্ত কুলপঞ্জিকায় শশাঙ্ক যে "গৌড়ভূপতি" বলিয়া কথিত হইয়াছেন, তাহার উল্লেখমাত্রও করা হয় নাই। কুলপঞ্জিকাকারের উক্তি এই ভাবে উপেক্ষিত হইবার কারণ কি? কুলপঞ্জিকাকারও পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের মতানুসরণ করিয়াই গৌড়পতি এবং কর্ণসুবর্ণপতিকে এক মনে করিয়াছেন, সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় এরূপ সন্দেহ করেন কি?

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

আমাদিগের সাহিত্য-সেবা।

৩

সর্ব্বপ্রকার সাহিত্য-সেবার উদ্দেশ্যই "অগ্রসর" হওয়া। অর্থাৎ, ব্যক্তির ও জাতির উন্নতিসাধন করা। অবস্থা-বিবেচনায় অধুনা কোন্ পথে অগ্রসর হইলে ব্যক্তিগত ও জাতীয় মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা, তাহা ইঙ্গিত করিবার পর, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—"আমরা করিতেছি কি?" এক্ষণে এই প্রশ্নের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ের কথা বলিতে গেলে আশঙ্কা হয়, অনেকে অসন্তুষ্ট হইতে পারেন। কিন্তু আমার কোনও ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া কিছু বলা উদ্দেশ্য নহে; সুতরাং আমি ক্ষমার্হ।

আমরা করিতেছি কি? মোটামুটি এ প্রশ্নের উত্তর এই ভাবে দেওয়া যাইতে পারে। আমরা গ্রন্থ লিখিতেছি; গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিতেছি; মাসিক পত্রিকা বাহির করিতেছি; সাহিত্য-সম্মিলন বসাইতেছি।

গ্রন্থ লিখিতেছি কেন? দেশের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ত প্রায় কেহই লিখিতেছি না। দেশ নিরন্ন হইল; মধ্য শ্রেণীর লোকের সংসার চলাই কঠিন। উচ্চ শ্রেণীর লোক ডুবিতে বসিয়াছে। নিম্ন শ্রেণীর অধিকাংশ লোক দেনায় বিব্রত; এত বিব্রত যে, তাহাদিগকে ঋণ দিবার নিমিত্ত সরকারী ব্যবস্থা হইয়াছে। জ্বরে এবং নানাবিধ পীড়ায় অসংখ্য লোক মরিতেছে, এবং অসংখ্য আধমরা হইয়া আছে। যেরূপ জ্ঞানবিস্তারে এই অবস্থার উন্নতি হইতে পারে,

সেরূপ গ্রন্থ লিখিতেছি না ত। কৃষি, শিল্প ইত্যাদিতে অল্পব্যয়ে অধিক লাভবান হইতে পারা যায় কিসে? অল্প ব্যয়ে স্বাস্থ্যের উন্নতি করা যায়,—গ্রামের উন্নতি করা যায় কিসে? অপরিমিত ব্যয়ের সুতরাং ঋণের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করা যায় কিসে? এ সকল জ্ঞানের বিস্তার করা প্রায় কোনও গ্রন্থেরই উদ্দেশ্য নহে। উপন্যাসাদি সুকুমার সাহিত্য এই সকল বিষয়ে কত উপকার করিতে পারে, তাহার সীমাই নাই। কিন্তু কৈ? তাহা করে কে? জনসাধারণের বোধগম্য সাহিত্য কৈ? আমার "মানব-সমাজ" ত আমার গ্রামের স্কুল-পণ্ডিত মহাশয় বুঝিতেই পারেন না। তবে আমি লিখিলাম কাহার জন্য? আমারও যদি বা একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া চলে, কিন্তু উপকারজনক জ্ঞান-বিস্তারের চেষ্টায় সাহিত্য এখন পর্য্যন্ত প্রায় কিছুই করিতেছেন না, এ কথা বলিলে কৈফিয়ৎ কি আছে?

হিতকারী গ্রন্থ না লেখা, এক দোষ। আবার, অহিতকারী গ্রন্থ লেখা তদপেক্ষা গুরুতর দোষ। হিন্দু মুসলমান-সমাজে নিন্দনীয়, লোমহর্ষণ অশ্লীল প্রণয়-চিত্র গত দশ বৎসরে আমাদিগের গ্রন্থকারগণ বহুবার অঙ্কিত করিয়াছেন। আমার এক জন বন্ধু বলেন, দুই জন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ঐ কালের মধ্যে স্বীয় রচনায় সম্বন্ধ-বিরুদ্ধ রসিকতা অন্ততঃ দশ বারো বার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা তিনি জানেন। কবিতা ক্রমে সম্পূর্ণ নিরর্থক হইয়া উঠিতেছে। আমি এক জন প্রসিদ্ধ কবির একটী কবিতা সে দিন দুইবার পড়িয়াও বুঝিতে পারিলাম না। কবিতাতে হয় ত দুর্ব্বোধ, মামুলী ধর্ম্মকথা লিখিত হইতেছে; না হয় প্রণয়-বিষয়ক নানারূপ অবস্থা ও ঘটনা বর্ণিত হইতেছে। যাহাতে হৃদয়ে উৎসাহ দেয়, প্রাণে মঙ্গলময় আবেগ জাগাইয়া তুলে, স্নায়ুমণ্ডলে ও মস্তিষ্কে বলসঞ্চার করে, মনে উদ্যম ও প্রতিজ্ঞা অঙ্কিত করিয়া মানুষকে কল্যাণের পথে লইয়া যায়; অন্য দিকে, স্বভাবের কোমল বৃত্তি সকলকে ধ্বংস করে না, বরং তাহাদিগকে উত্তরোত্তর পবিত্র করিয়া দেশকালোপযোগী মনুষ্যত্বের আদর্শের সৃষ্টি করে, সেরূপ কবিতা প্রায় দেখিতেই পাই না।

ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, উহারা এখনও এতদ্দেশে মঙ্গলজনক পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না। জনসাধারণের সেবায় নিযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত দেশকালোপযোগী পথ পাইবেও না।

ফলতঃ, আমাদিগের গ্রন্থ লেখা সফল হইতেছে, দেশের ও সমাজের দিকে তাকাইয়া সার্থক হইতেছে, এ কথা বলিতে কেহই সাহসী হইবেন না।

গ্রন্থ-সংগ্রহ সম্বন্ধেও তাহাই বলা যাইতে পারে। দেশের ও দশের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া গ্রন্থের সংগ্রহ ও সম্পাদন করা হইতেছে না।

অল্পদিন হইল, একখানি প্রাচীন পদ্য গ্রন্থ সংগৃহীত ও মুদ্রিত হইয়াছে। উহাতে সামাজিক চিত্র, বৌদ্ধধর্ম্মের ও হিন্দুধর্ম্মের সামাজিক বিকাশ, প্রাচীন শিল্প বাণিজ্য, যুদ্ধ বিগ্রহ, বেশভূষা, লোকচরিত্র এমন উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত হইয়াছে যে, সম্পাদক সে সকলের দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া শুধু কতকগুলি বাঁধা কথা লিখিয়া ভূমিকা শেষ করায়, পরম পরিতাপের কারণ হইয়াছে। এতদ্দেশে কেমন করিয়া পুরাতন হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম একত্রিত হইয়াছিল, তাহাতে জনসাধারণের চরিত্র কিরূপে গড়িয়া উঠিতেছিল, বর্ত্তমান লোক-চরিত্রের সহিত তাহার সংস্রব কি, এ সকল বুঝাইয়া না দিলে ঐরূপ গ্রন্থের সম্পাদন বিফল হয়। প্রাচীন গ্রন্থের সংগ্রহ, মুদ্রণ ও সম্পাদন বিষয়ে দেশের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করাই সঙ্গত। কিন্তু তাহা হইতেছে কি ?

এই স্থানে আর একটী কথা বলিব। নানা ভাষায় অনেক উৎকৃষ্ট এবং সময়োপযোগী গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। সে সকলের বঙ্গানুবাদ করিয়া দশের প্রয়োজন অনুসারে টীকা ভাষ্যাদি সংযুক্ত করিয়া মুদ্রিত করিলে, মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি হয়, হিতকর জ্ঞান দেশমধ্যে প্রচারিত হয়, এবং সমাজও ক্রমে "অগ্রসর" হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইতে পারে। এ সম্বন্ধে মন্তব্যের অভাব নাই ; কিন্তু করে কে ? আমি জানি, এক জন ডারুইনের কোনও বিখ্যাত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিতেছিলেন। উহা মাসে মাসে কোনও পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে অধিকসংখ্যক পাঠক পড়িতে পারিবেন, এই আশায় কোনও পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছিল। অবশেষে অত্যন্ত মর্ম্মভেদী কারণে ঐরূপ ব্যবস্থা বন্ধ হইয়া গেল। এক্ষণে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। কিন্তু পড়িবে কে ? কেহ না পড়িলে ছাপাইয়া লাভ কি ? অবশ্যই উহা প্রকাশিত হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য। যাহা হউক, অনেকেই নানা সদ্‌গ্রন্থ ভাষান্তরিত করিয়া বঙ্গভাষার ও দশের উপকার করিতে পারেন। তাহা করিতেছেন কি ?

এক্ষণে মাসিক পত্রিকা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক বোধ করি। আমাদিগের অলঙ্কারশাস্ত্র বলে,—সাহিত্য-সেবায় চতুর্বর্গ ফল হয় ; সুতরাং অর্থলাভও হয়। ফল অর্থলাভ হইলেও, উদ্দেশ্য,—অন্ততঃ অর্থলাভ মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। তাহা হইলেই ব্যবসাদারী হইয়া উঠিল।

তাহাতে সাহিত্যের গৌরবরক্ষা হয় না। তেমনই, যাহার কিছু বলিবার নাই, সে যত বড় ধনী মানী পণ্ডিত হউক না কেন, যাহার সাধুতা, সচ্চরিত্রতা, একাগ্রতা ও সদুদ্দেশ্য নাই বলিলেই হয়, কেবল বিলাসিতা ও খেয়াল আছে, সে যত বড় ধনী, মানী, পণ্ডিত হউক না কেন; সৎসাহিত্যকে স্পর্শ করিবারও তাহার অধিকার নাই। গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ করা প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থকারের অবশ্যকর্ত্তব্য ছিল; প্রাচীন খৃষ্টান মহাকবি গ্রন্থারম্ভে কবিতার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে সম্বোধন করিয়া হৃদয়ের পাপবৃত্তি দূরীভূত করিবার নিমিত্ত এবং হৃদয়কে পবিত্র করিবার উদ্দেশ্যে কত স্তব করিয়াছেন :—এ সকল কি নিরর্থক? অপবিত্র হস্ত হইতে পবিত্র সদ্ভাবপূর্ণ গ্রন্থ বাহির হওয়া এবং তদ্দ্বারা লোকহিত-সাধন অসম্ভব। আমরাও এখন মঙ্গলাচরণ করি, কিন্তু সে কেবল নকল-নবীশী। মিল্টন্ ঢং করিবার জন্য গ্রন্থারম্ভে দেবীর স্তব করেন নাই। প্রকৃতই উহা তাঁহার সাধু হৃদয়ের উচ্ছ্বাস। এ সকল কথা প্রকাশ্যে অস্বীকার কেহই করিবেন না। কিন্তু আমাদিগের মাসিকপত্রিকাগুলি কি এই ভাবে পরিচালিত হইতেছে? মাসিকপত্রিকার সংখ্যা দেখিয়া বোধ হয়, উহা কুবেরের ব্যর্থ সাধনার প্রয়াসমাত্র। যাহার কিছুই বলিবার নাই, সে কত কথা বলিতেছে। আবার সব কথা শ্লীলতা রক্ষা করিয়া বলা হইতেছে না। গল্পই প্রায় সকলগুলির অঙ্গাভরণ হইয়া উঠিয়াছে। তাহাও সদ্ভাবপূর্ণ, হিতকর আদর্শ-সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, অথবা মানবচরিত্র-গঠনের নিমিত্ত প্রায়ই লিখিত হয় না। কেহ দেশের দিকে চাহিয়া কিছু লিখিতেছেন, এরূপ বলিবার উপায় নাই। দুই একখানি মাসিকপত্রিকা বাদ দিলে অন্যগুলির সম্বন্ধে এরূপ সমালোচনা কটু হইলেও, অসত্য হইবে বলিয়া বোধ হয় না। মাসিকপত্রিকায় ছবি দেওয়া একটা নিয়ম হইয়া উঠিয়াছে। ইহা কি চিত্রকলার সাধনা? না গ্রাহক-সংগ্রহের ফাঁদ? এ ছবিগুলি প্রায়ই বিলাসভাবোদ্দীপক রমণীমূর্ত্তি। তিন চারি মাস পূর্ব্বে একখানি মাসিকপত্রিকায় নারী মূর্ত্তির লজ্জাস্থান প্রায় নগ্ন দেখিয়াছি। এ পত্রিকা এখনও ভদ্রলোকে স্পর্শ করিতেছে। কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট লেখক আমাদিগের সম্বল; তাঁহারাই অনবরত ডিম্ব প্রসব করিতেছেন। এ লেখার মূল্য কি? মাসিকপত্রিকা লোকশিক্ষাবিস্তারের প্রধান উপায়; কিন্তু ফলে হইতেছে এই যে, অধিকাংশ স্থলেই সুশিক্ষার কিছুই পাইতেছি না, কুশিক্ষার অনেক উপাদান সংগ্রহ করিতেছি। এ অবস্থায় নীরব থাকা আর চলিতেছে না। লেখক ও সম্পাদকগণের মধ্যে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু অনেক

আছেন। তাঁহাদিগের দুই এক জনকে বাদ দিলে অপরের সম্বন্ধে এরূপ সমালোচনা অপ্রযোজ্য নহে। কিন্তু এরূপ সমালোচনা আমাকে প্রয়োগ করিতে হইল, ইহা গভীর পরিতাপের বিষয়। বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া, অল্পসংখ্যক মাসিকপত্রিকার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিবার নিমিত্ত সাধারণের প্রয়োজনানুরূপ প্রবন্ধ লিখিয়া, ঐ সকল পত্রিকার প্রচার বিষয়ে যত্নশীল হইলে, সমাজের অধিক মঙ্গল হইতে পারে, এ কথা কখনই বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। পুরাতনের উন্নতিসাধন করিতে পারিলে বর্ত্তমান অবস্থায় রাশি রাশি উদ্দেশ্যবিহীন পত্রিকার প্রচার অসঙ্গত, ইহা বলিতে আমি কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করি না। কিন্তু যেখানে সকলেই বলিবার জন্য ব্যাকুল, সেখানে কেবলই হট্টগোল হয়, শুনিবার লোক থাকে না। এ সকল কথা কেহ কি শুনিবেন? পরস্পরের অস্তিত্বই সঙ্কটাপন্ন করিয়া তোলা সম্পাদকগণের কর্ত্তব্য হয় না। ইহা সবল ভাবের প্রতিযোগিতা নহে, বর্ত্তমান অবস্থায় মারাত্মক চেষ্টামাত্র।

এক্ষণে সাহিত্য-সম্মিলন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। ইহার জন্য নিজে অনেক লাঞ্ছনা মাথায় করিয়া লইয়াছি। ইহার কার্য্য-প্রণালী যদি চুঁচুড়া অধিবেশন হইতে বিশেষভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তবে তাহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। ইহাকে ভালবাসি। এ সকল আস্পর্দ্ধা করিবার নিমিত্ত বলিতেছি না; শুধু আমার বক্তব্যের কেহ বিপরীত অর্থ না করেন, এই নিমিত্ত বলিতেছি। আমরা অধুনা অর্থকেই বড় করিয়াছি; শিক্ষার আদর করিতেছি না। কিছু দিন পূর্ব্বেও শিক্ষিত সম্প্রদায়ই সর্ব্ববিষয়ে অগ্রণী ও আদৃত ছিলেন। আজি দেবতার অভিসম্পাত হইল, "শিক্ষিত সম্প্রদায় অধঃপাতে যাউক।" অমনই আমরা তাঁহাদিগকে নীচে নামাইতেছি। সকল বিষয়েই এই অনুষ্ঠান চলিতেছে; অর্থের জয়জয়কার; বিদ্যার অনাদর। অর্থের আদর চিরদিনই অল্লাধিক থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহাকেই জীবনের একমাত্র সেব্য পদার্থ বিবেচনা করাই সাংঘাতিক। আজি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পূর্ব্বের ন্যায় পসার নাই; আমাদিগের কাছেও নাই। এ এক দুঃখ। তা'র পর, দলাদলিতে নিজের দল পুষ্ট করিবার নিমিত্ত অন্য দলকে লাঞ্ছিত করিতেছি। নিজ দলের লোককে বাড়াইয়া অন্য দলের সুযোগ্যকে নামাইতেছি। সাহিত্যকে উপলক্ষ করিয়া উপকারপ্রত্যাশায় নীচতা স্বীকার করিতেছি। শৃঙ্খলার অভাববশতঃ, বিধি-নিষেধের অধীনতা-স্বীকারে অনভ্যাসবশতঃ, আমরা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিতেছি।

মনের দৃঢ়তা না থাকায় কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে ভীত হইতেছি। এ সকল যদি আমাদিগের হইয়া থাকে, তবে সাহিত্য-সম্মিলনও এ সকল হইতে উদ্ধার পায় নাই। দৃষ্টান্ত দিয়া এই অপ্রিয় বিষয় আরও অপ্রিয় করিতে ইচ্ছা করি না। অর্থশালী সম্প্রদায়ে আমার বন্ধু অনেক আছেন। যাঁহাদিগকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করি, এরূপ ব্যক্তিও আছেন। কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সর্ব্বত্রই, বিশেষতঃ সাহিত্য-ক্ষেত্রে, এরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া নীরব থাকিলে পাপস্পর্শ করে, তাই বাধ্য হইয়া এ সকল বলিতে হইল।

এই সকল কথা স্মরণ রাখিয়া সাহিত্য-সম্মিলন সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথমে বলিতে ইচ্ছা করি যে,

১। এ পদার্থটাকে বড়লোকের (ধনে অথবা বিদ্যাতেই হউক না কেন,) খেয়ালের সামগ্রী করা উচিত নহে।

২। কাহাকেও নিয়ম লঙ্ঘন করিতে দেওয়া উচিত নহে। মুখে বক্তৃতা করিতে কাহাকেও দেওয়া সঙ্গত নহে।

৩। ইহাকে দলাদলির রঙ্গভূমি করিতে দেওয়া উচিত নহে।

৪। ইহাকে রাজতন্ত্র ভাবা উচিত নহে, ইহা সাধারণতন্ত্র। যাহাতে এক জন অপেক্ষা অন্য জন একটুও বড় বোধ হয়, সেরূপ ভাব ইহাতে দুষ্ট হওয়া উচিত নহে। কেবল সভাপতি অবশ্যই সকলের অপেক্ষাই বড়; কিন্তু তিনিও সকলের ন্যায় ব্যবহার করিলেই শোভন হয়। *

৫। যাঁহার কিছু বলিবার নাই তিনি যেই হউন, সময় নষ্ট করিতে পারিবেন না।

৬। প্রবন্ধের বিষয় ও সংখ্যা—পূর্ব্বে স্থির করিয়া দেওয়া উচিত। ইহার অল্প ইতরবিশেষ মার্জ্জনীয়।

৭। নবাবী, বড়মানুষী ইহার সংস্রবে আসিতে পারিবে না। ধুমধামেও না; সাজ সজ্জা, পান ভোজন, কিছুতেই না।

৮। যাহাতে চাটুকারিতা, কর্ত্তাভজা, অথবা খোসামুদির গন্ধমাত্রও থাকে, কিংবা বিলাসিতার এক বিন্দুও লক্ষিত হয়, তাহা সর্ব্বদা বর্জ্জন করিতে হইবে। ...... যে দিন সভাপতির আগে পাছে নিশান, ডঙ্কা, আশা, ছোটা দেখিয়াছি; যে দিন স্বর্ণমুদ্রাকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে

* কেহ সিংহাসনে, কেহ ছেঁড়া কন্থায় বসিবার যে প্রথা আছে, তাহা রাজসাহীতেও কাবাখ্যায় পালিত হয় নাই। এ প্রথা এখনই উঠাইয়া দেওয়া উচিত।

দেখিয়াছি; যে দিন চরিত্রহীনতাকে সম্মিলনস্থলে নৃত্য করিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছি; যে দিন বিদেশী ব্যক্তির অনুকূলে বিধি নিষেধ লজ্ঘিত হইতে দেখিয়াছি; যে দিন রং তামাসার ভাব আহারে ব্যবহারে সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইতে দেখিয়াছি; যে দিন, বর্ত্তমান যুগের আশা আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শকে পদদলিত করিয়া মরণসঙ্গীতের ধূয়া বিনা প্রতিবাদে গায়িতে শুনিয়াছি; যে দিন চাটুকারিতার, দলাদলির, লাট ও বেলাটের, জজ ম্যাজিষ্ট্রেটের, নবাব বাদশাহের ছড়াছড়ি দেখিয়াছি, সেই দিন হইতে নীরবে নিভৃতে বসিয়া অশ্রুপাত করা ভিন্ন অন্য পথ দেখিতেছি না। সে দিন হইতে বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; মন অবসন্ন হইয়াছে। বুঝিয়াছি, মহাত্মা রামমোহনের ধর্ম্মান্দোলনের ন্যায়; অক্ষয়কুমার, ভূদেব ও বিদ্যাসাগরের সামাজিক জীবনদানের ন্যায়; হরিশ্চন্দ্র, রামগোপাল ও সুরেন্দ্রনাথের মৃতসঞ্জীবন মন্ত্রের ন্যায়; কৃষক ও শ্রমজীবীর উন্নতিসাধনকল্পে স্বদেশী চেষ্টার ন্যায় সাহিত্যিক জাগরণ, (অন্ততঃ সম্মিলন অবলম্বনে সাহিত্যিক জাগরণও দু'দিনের জন্য একবার চক্ষু মেলিয়া আবার দীর্ঘ তন্দ্রার অধীন হইবে। একবার একটু জীবনের চিহ্ন দেখাইয়াই আবার মৃতপ্রায় হইবে, তাহাতে সন্দেহ-মাত্র নাই। জাতীয় জড়তা দূরীভূত না হইলে সাহিত্য-ক্ষেত্রেও কোনও আশাই নাই।

৯। তাই, দু'দিনের চীৎকার, খাওয়া দাওয়া, রঙ্গরসের পর সমস্ত বৎসর কোনও একটী মন্তব্যও কার্য্যে পরিণত করিবার কিছুমাত্র চেষ্টা লক্ষিত হয় না। এ জড়তা দূর করিতে হইবে।

১০। সকল প্রবন্ধই ছাপান উচিত নয়। যাহাতে দেশের ও দশের কিছুই মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহা মুদ্রিত হইবে না।

১১। অনুষ্ঠানকার্য্যে বহু অর্থ ব্যয়িত হওয়া উচিত নহে।

আরও কত কথা বলিবার ছিল; কিন্তু ইচ্ছা হইতেছে না। আমাদিগের সকল অনুষ্ঠানের মধ্যেই বিধাতা কেন যে মরণের বীজ বপন করিয়া দেন, তাঁহার ইচ্ছা কি, তাহা তিনিই জানেন; আমারা তাহার কি বুঝিব? বুঝি বা বংশ-সংশোধন, বেষ্টনী-সংশোধন না হইলে, আমাদিগের দ্বারা কোনও মহৎ কার্য্যই সিদ্ধ হইবার নহে। কিন্তু সে দিকে চিন্তা করে কে?

শ্রীশশধর রায়।

সাক্ষী।

পাখী আমার সাক্ষী আছে, উষা অরুণ এসেছিল।
কুঞ্জতলে দীঘির জলে হাসির দীপ্তি ভেসেছিল।
আঁধার ঘরে আমি একা! আমাকে না দিল দেখা!
ভুলে গেছে, আগে সে যে কত ভাল বেসেছিল।
শিশির-ধোয়া কুসুমরাশির গাল-ভরা সেই শুভ্র হাসির
মধুটুকু লুটে নিতে এই কাননের দেশে ছিল;
তখন আমি দুয়ার খুলে ছুটে গেলাম তরুর মূলে;
আমার দুঃখে ডাক্‌ল পাখী, বাতাস একটু শ্বসেছিল।
জান্‌ত তারা আগে মোরে কত ভাল বেসেছিল।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

ভূপাল।

হোসেঙ্গাবাদ মধ্যপ্রদেশের একটি জেলা। বিশিষ্ট সহর। এখানে কমিশনর অবস্থিতি করেন। আমি হোসেঙ্গাবাদে শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস ঘোষ উকীল মহাশয়ের বাটীতে দুই সপ্তাহ কাল অবস্থিতি করি। ইনি অতি সজ্জন। ইনি কবি; 'বীণা' ও 'কণা' নামে ইঁহার দু'খানি বই আছে। আরও অনেক কবিতা লিখিয়াছেন; অবকাশকালে পড়িয়া শুনাইলেন। যে কোনও বঙ্গদেশীয় ভদ্রলোক ইঁহার বাটীতে গিয়া স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে পারেন। আমি ইঁহার অতিথিসেবাব্রতে মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

হোসেঙ্গাবাদ সহর নর্ম্মদাতীরে অবস্থিত। নদীর পরপারে বিন্ধ্য-গিরি-শ্রেণী। যে দিকে সহর অবস্থিত, সে দিকে প্রস্তররচিত চার পাঁচটি প্রকাণ্ড ঘাট নদী-তটের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। এত বড় ঘাট ও সুপ্রশস্ত সোপানাবলী আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ঘাটের উপরে সাধু সন্ন্যাসীদিগের বাসের নিমিত্ত ধর্ম্মশালা ও শ্রেণীবদ্ধ মন্দিরমালা। প্রত্যেক মন্দিরে রামসীতা, রাধাকৃষ্ণ, মহাবীর, মহাদেব প্রভৃতি নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি। তন্মধ্যে নর্ম্মদা-দেবীর মূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য। মর্ম্মরগঠিতা দেবী নর্ম্মদা মকরবাহিনী গঙ্গার ন্যায়

মনোহারিণী। এতদ্ভিন্ন নগরমধ্যে আরও অনেক দেবদেবীর মন্দির আছে। সেগুলি দ্রষ্টব্যের মধ্যে গণনীয়। রামদাস বাবাজীর আখড়ায় তাঁহার চরণপাদুকা ও অনেক মহাত্মার সমাধি আছে।

প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে বড়তাওয়া ও নর্ম্মদা নদীর সঙ্গমে (হোসেঙ্গাবাদ হইতে ৩।৪ মাইল দূরে) বান্দ্রাবন নামক স্থানে মহা মেলা হয়। সে সময় নর্ম্মদা-যাত্রা হইয়া থাকে। তদুপলক্ষে অসংখ্য লোকের সমাগত হয়।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী, বেলা একটার সময় হোসেঙ্গাবাদ হইতে ভূপালে যাত্রা করিলাম। প্রথমেই খররাঘাট নামক স্থানে নর্ম্মদার সুদীর্ঘ রেলসেতু পার হইয়া, প্রায় তিন মাইল পরে ট্রেণ বিন্ধ্যপর্ব্বতমালার ঘাট-শ্রেণীর মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। উভয় পার্শ্বের গগনচুম্বী শৈলরাজির বিচিত্র শোভা অত্যন্ত মনোহর। কখনও ট্রেণ ঊর্দ্ধে উঠিতেছে; কখনও বা নিম্নে নামিতেছে। পর্ব্বতগাত্রে স্থানে স্থানে নিবিড় অরণ্যানী,—আবার কোথাও হেমন্তের পত্রপল্লব-শূন্য কানন। কোথাও তৃণলতাগুল্মবিবর্জ্জিত পর্ব্বতের দগ্ধমরুভূমিবৎ পাষাণ-বক্ষ হা হা করিতেছে। কোথাও পাষাণের গাত্র ঘোর পীতবর্ণ; কোথাও বা ঘোর-কৃষ্ণ,—কোথাও বা ধূসর। অনেক স্থানে ঊর্দ্ধদেশ-উন্মুক্ত অর্দ্ধক্রোশাধিক দীর্ঘ সুড়ঙ্গপথ ভেদ করিয়া ট্রেণ চলিতেছে। আবার তাহা অতিক্রম করিয়া বিচিত্র-দর্শন উপত্যকার মধ্য দিয়া ছুটিতেছে। সূর্য্যরশ্মি স্থানে স্থানে ঝলিতেছে—উপত্যকার এক দিক রৌদ্রদীপ্ত, অপর দিক ছায়াময়! এই রৌদ্র ও ছায়ার মিলন বড়ই মর্ম্মস্পর্শী! প্রায় চৌদ্দ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ট্রেণ বারখেড়া নামক ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। শৈল পথের দৃশ্য এই স্থানেই শেষ হইয়া গেল। তার পর কতক পথ কেবল নিবিড় বন। দিবসেই অর্দ্ধ-অন্ধকার। অপরাহ্নে হেমন্তের ক্ষীণ রৌদ্র বন-যবনিকা ভেদ করিয়া মধ্যে মধ্যে ঝক্ ঝক্ করিতেছে দেখিয়া মধুসূদনের দুইটি পংক্তি মনে পড়িল;—

"স্থানে স্থানে পত্রপুঞ্জে ছেদি প্রবেশিছে
রশ্মি, তেজোহীন কিন্তু রোগিহাস্য যথা।"

তাহার পরে ট্রেণ সমতল প্রান্তরমধ্যবর্ত্তী পথে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিল। এখন শৈলসৌন্দর্য্য অন্তর্হিত। শস্যক্ষেত্র—তৃণখর্পরাচ্ছাদিত-গৃহাবলি-সমন্বিত গ্রাম-সমূহ—তুষার কল (Ginning Factory) তুষারস্তূপের ন্যায় তুলারাশি স্তূপাকার হইয়া কারখানার পার্শ্বস্থিত উন্মুক্ত প্রান্তরে পড়িয়া আছে। এই সকল সাধারণ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে ক্রমে ভূপাল ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী হইলাম। দেখিলাম,

বিশাল-পাদপ-সমাচ্ছন্ন উদ্যানরাজির শীর্ষদেশ ভেদ করিয়া ভূপালের নয়নরঞ্জন সৌধশিখরশ্রেণী, গগণস্পর্শী মসজীদ-মিনার, গুম্বজমালা, তোরণ, বুরুজ প্রভৃতি নেত্রপথে দিনান্তকিরণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। মুসলমান অধিবাসীর অধ্যুষিত খাঁটী মুসলমান রাজ্য কখনও দেখি নাই। তাহার উপর আবার এক জন মুসলমান শাসনকর্ত্রী এই রাজ্যের রাজদণ্ড ধারণ করিয়া প্রজাপালন করিতে-ছেন—এই সকল কথা ভাবিয়া আমার চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল! কখন যে ট্রেণ ষ্টেশনে প্রবেশ করিল, বুঝিতে পারি নাই। অকস্মাৎ স্বপ্নভঙ্গের ন্যায় চমকিত হইয়া গাড়ী হইতে দ্রব্যাদি সহ নামিয়া পড়িলাম।

ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়াই দেখি, সারি সারি টাঙ্গা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। টাঙ্গা-চালক আমাকে ঘিরিয়া 'সাহেব, কাঁহা যাইয়েগা? আইয়ে, টাঙ্গা'পর চড়িয়ে' বলিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। এক জন আমার ট্রাঙ্ক, হ্যাণ্ড-ব্যাগ, টিফিন-বক্স, বিছানা প্রভৃতি কুলীর নিকট হইতে জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া আপনার টাঙ্গায় তুলিয়া ফেলিল। আমি কি করি, অগত্যা নিরুপায় হইয়া তাহার টাঙ্গায় চড়িয়া বসিলাম। বলিলাম, "চোপদারপুরায় দেওয়ান ঠাকুরপ্রসাদের বাটীতে লইয়া চল। কত ভাড়া লাগিবে?" সে প্রথমে বার আনা, শেষে আট দশ আনা বলিয়া, উর্দ্ধশ্বাসে টাঙ্গা চালাইয়া দিল।

ভূপাল প্রাচীর-পরিবেষ্টিত নগর। একটি তোরণদ্বার অতিক্রম করিয়া, উভয়পার্শ্বে পণ্যপূর্ণ বিপণীশ্রেণীশোভিত, জনপূর্ণ একটি সঙ্কীর্ণ রাজপথ দিয়া টাঙ্গা চোপদারপুরার অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। ঐ স্থান ষ্টেশন হইতে দুই মাইলের অধিক। নগরীর এক প্রান্তে অবস্থিত। ঠাকুরপ্রসাদ পূর্ব্বে বেগমসাহেবার দেওয়ান ছিলেন। তিনি স্বর্গস্থ হইয়াছেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র মুন্সী দৌলত রায় রাজসরকারে উচ্চপদে নিযুক্ত। তাঁহার নামে একখানি পরিচয়পত্র ছিল।

টাঙ্গা হইতে নামিয়া আমি তাঁহার বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবু দৌলত রায় কোথায়?" কথাটি শেষ হইতে না হইতেই, মস্তকে পীতবর্ণের প্রকাণ্ড পাগড়ী বাঁধা এক জন আমাকে অতি পরিচিতভাবে "আইয়ে, আইয়ে, বৈঠিয়ে, আরাম কিজিয়ে" বলিয়াই আর এক জনকে তৎক্ষণাৎ টাঙ্গা হইতে আমার দ্রব্যাদি নামাইয়া লইতে আদেশ করিলেন। টাঙ্গাওয়ালাকে কি দিতে হইবে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি হিন্দীতে বলিলেন, "চারি আনা দিন।" আমি একটি সিকি ব্যাগ হইতে বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলাম। সে ক্রুদ্ধ

হইয়া বলিল, "আট আনা দিবার কথা—চারি আনা কেন?" দৌলত রায় গম্ভীরভাবে বলিলেন, "চলা যাও।" সে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল।

আমি বলিলাম, "উহাকে আট আনা দিবার কিন্তু কথা হইয়াছিল।" তিনি মৃদুমধুরহাস্তে বলিলেন, "চারি আনাই রীতি।" দৌলত রায় বাজে কথা কহেন না। রাশভারি লোক। রাজকার্য্যে দক্ষ। কিন্তু তাঁহার হাসিটি অতি মৃদু ও মধুর। আমি তাহা কখনও ভুলিব না।

কিছুকাল বিশ্রামান্তে কিঞ্চিৎ জলযোগের পর ভ্রমণেচ্ছা জ্ঞাপন করিলে, দৌলত রায় তাঁহার এক জন কর্ম্মচারীকে সঙ্গে দিয়া বলিলেন, "অত্য বেলা গিয়াছে; ইঁহাকে নিকটস্থ পানচাক্কী, কমলাবতীর প্রাসাদ ও মতি-মস্‌জীদ দেখাইয়া আনুন।" সে ব্যক্তি প্রথমেই আমাকে পানচাক্কী দেখাইতে লইয়া গেল। বাস্তবিক পানচাক্কী অতি সুন্দর! ইহা আটা ময়দা পিষিবার কল! হ্রদের জলস্রোতে সাত আটটি চাকা বন্‌বন্ করিয়া কল চালাইয়া আটা ময়দা পিষিতেছে। অমিত জলরাশি চাকাগুলিকে ঘুরাইয়া নদীপ্রপাতের ন্যায় অজস্র মুক্তাগুচ্ছ বর্ষণ করিতে করিতে সশব্দে পশ্চাদ্বর্ত্তী গহ্বরে পতিত হইয়া বহিয়া চলিয়াছে। অসংখ্য মুসলমান ভদ্রলোক এই দৃশ্য দেখিতেছেন।

পানচাক্কীর নিকটেই রাণী কমলাবতীর দীর্ণ জীর্ণ প্রকাণ্ড প্রাচীন সপ্ততল প্রাসাদভবন। এই রাণী কমলাবতী দিল্লীর সেই আল্লাউদ্দীনের কমলাবতী নহেন। পূর্ব্বকালে ইনি গণ্ড রাজবংশের শক্তিশালিনী রাণী ছিলেন। এক সময়ে ইঁহার প্রভূত প্রতাপ ছিল। কালে সব গিয়াছে; কিন্তু এই প্রস্তরনির্ম্মিত সমুচ্চ প্রাসাদ অসংখ্য শূন্য কক্ষ লইয়া অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এখন শৃগাল, কুকুর, পারাবত ও চর্ম্মচটিকা প্রভৃতি এবং সরীসৃপজাতীয় জীবের আবাসভবন হইয়াছে। শ্রী-সৌষ্ঠব কিছুই নাই—যেমন ধ্বংসের জাগ্রত মূর্ত্তি।

ভূপালের হ্রদ বিশ্ববিখ্যাত। আমরা যথাস্থানে তাহার বর্ণনা করিব। এতদঞ্চলে একটি শ্লোক প্রচলিত আছে;—তাহাতে দুর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চিতোর দুর্গ, 'তাল' অর্থাৎ হ্রদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভূপাল তাল, আর রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কমলাবতী।

"গড় ত চিতোর গড়, আউর সব গড়িয়া।
তাল ত ভূপাল তাল, আউর সব তালিয়া।
রাণী ত কমলাবতী;"—

রাণী কমলাবতীর এক সময় এতই নাম ছিল। এখনও সেই নাম কীর্ত্তিত হইতেছে!

এই প্রাসাদ দেখিয়া মতি মসজিদ দেখিতে যাত্রা করিলাম। কিয়দ্দূর গমন করিয়া একটি বিস্তৃত উন্মুক্ত স্থানে উপনীত হইলাম। এই স্থানের মধ্যস্থলেই অনিন্দ্য-সুন্দর চিত্র-প্রতিম মতি-মসজিদ। চারি দিকেই রাজপথ। পাঠক! শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, এই মসজিদটি ক্ষুদ্র আকারে দিল্লীর জুম্মা মসজিদের অবিকল অনুকৃতি। কে যেন সেই মসজিদটি ছোট করিয়া সেখান হইতে উঠাইয়া আনিয়া এই স্থানে বসাইয়া দিয়াছে। প্রস্তরনির্ম্মিত সোপানাবলীর দ্বারা মসজিদ-প্রাঙ্গনে উপনীত হইয়া, চারি দিক দেখিয়া, মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলাম। ঠিক জুম্মা মসজিদের ন্যায় প্রাচীরগাত্রে কোরাণের শ্লোকাবলী সুন্দর টোগরা অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। মসজিদের মুসলমান পুরোহিত এতই ভদ্র যে, এই বিদেশী পথিককে মসজিদের সমস্ত দ্রষ্টব্য যত্ন করিয়া দেখাইলেন। আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া মসজিদ পরিত্যাগ করিলাম।

রাত্রে বাসায় আসিয়া আহারান্তে শয়ন করিলাম। আহার্য্য অতি উৎকৃষ্ট আটার রুটী, দুই তিন প্রকার তরকারী, তন্মধ্যে একটি অম্লমধুর, ডাউল, দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন। মৎস্যাদি নাই। ইহাঁরা নিরামিষাশী। মুসলমান রাজ্যে বাস করিলেও ইঁহাদের হিন্দু আচারের কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। বাবু দৌলত রায় আবার রবিবারে ব্যঞ্জনে লবণ ব্যবহার করেন না। আমার জন্য স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত হইয়াছিল। দিবসে আমার জন্য অন্ন প্রস্তুত হইত; কারণ, ইঁহারা কচিৎ 'চাউল' বা অন্ন ব্যবহার করেন। তবুও বাটীর ছেলেরা বলিত, "অন্নের সহিত দুইখানি রুটী গ্রহণ করুন।" মুসলমান-প্লাবিত দেশে বাস করিয়া, মুসলমানের অধীনস্থ কর্ম্মচারী হইয়া, ইঁহারা হিন্দুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন; আর আমরা দুই পাতা ইংরাজী পড়িয়া (যাহা ভাল করিয়াও শিখি নাই) একেবারে বিকৃত হইয়া গিয়াছি! আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কি? এখানে প্রবাসী যে দুটি বাঙ্গালী আছেন, তাঁহারা মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

এখানে আটার কথা একটু বলিব। মালোয়ায়, মধ্যপ্রদেশে, মধ্যভারতে, দাক্ষিণাত্যে আটা যেন অমৃত। রুটীগুলি যেন মাখমের ন্যায় নরম। স্পর্শমাত্রেই সূক্ষ্ম কাগজের ন্যায় ছিন্ন হইয়া যায়। মুখে দিলেই সত্বর মিলাইয়া কণ্ঠে প্রবেশ করে। খাইতে যেমন সুস্বাদু, তেমনই মুখরোচক। আমি এ অঞ্চলের কত স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি। সর্ব্বত্রই অমৃত তুল্য আটার রুটী

খাইয়া তৃপ্ত হইয়াছি। এ রুটী কিছুদিন খাইলে অন্নে অরুচি হইয়া যায়।

তাহার পরদিন প্রভাতে নগর-ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। ভূপালের সর্ব্বপ্রধান দ্রষ্টব্য,—ভূপাল হ্রদ। এত বড় হ্রদ ভারতের আর কোনও নগরে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্বচ্ছোজ্জ্বল মুকুরবৎ বিশাল-বিস্তৃত জলরাশি সম্মুখে দূরে দূরে প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বে নাকি ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় চারি ক্রোশ ছিল। এক্ষণে কতক অংশ ভরাট করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং সেই স্থানে প্রায় চারি শত গ্রাম বা মৌজা বসান হইয়াছে। হ্রদের বর্ত্তমান দৈর্ঘ্য প্রায় ছয় মাইল। এইটি বড় হ্রদ। ইহাকে লোকে 'বড়া তলাও' বলিয়া থাকে। আরও একটি আছে—তাহাকে 'ছোটা তাল' বলে। তাহার নাম 'পোক্তা-পুন তলাও'। উহাও দৈর্ঘ্যে প্রায় ক্রোশাধিক। মধ্যে প্রকাণ্ড বাঁধ উভয় হ্রদকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। জলের কল হইয়াছে। হ্রদদ্বয় হইতেই সহরে জল সরবরাহ হয়। ভারতের অতি অল্প নগরীই অবস্থানের রমণীয়তায় ভূপালের সঙ্গে তুলনীয়। সুন্দর নদের তীরে সুরম্য চিত্রের ন্যায় চারুদর্শন ভূপালনগরী পথিকের নয়ন-রঞ্জন করিতেছে। প্রায় ৩০০ শত ফিট পাহাড়ের মঞ্চোপরি থাকে থাকে স্তরে স্তরে শুভ্র সৌধমালা মধ্যে মধ্যে হরিতোদ্যানের পত্রপল্লবে সমাচ্ছন্ন হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে প্রতিভাত হইতেছে। রজতশুভ্র মেখলার ন্যায় নদদ্বয় নগরীকে দুই দিকে ঘিরিয়া আছে। কিয়ৎকাল হ্রদের দৃশ্য দেখিয়া সহরে প্রবেশ করিলাম। বেটোয়া নদীর স্রোত অবরুদ্ধ করিয়া এই বিরাট হ্রদ প্রস্তুত হইয়াছিল।

একটি সঙ্কীর্ণ পথের দুই ধারে প্রস্তরের প্রাচীর (Rubble Stone) ও খর্পর-ছাদ-সমন্বিত অট্টালিকা-শ্রেণী—কোনও বাটী দ্বিতল, কোনটি ত্রিতল; সম্মুখে অলিন্দ। অট্টালিকাগুলির সর্ব্ব উপরিতলের ছাদটি খর্পরাচ্ছাদিত। আমাদের দেশের মতন বক্রাকার লম্বা খর্পর নহে। খর্পরের আকৃতি চেপ্টা (Flat), পঞ্চকোণবিশিষ্ট। দূর হইতে দেখিলে ঘুঁটের মত বোধ হয়। নিম্নতলের ছাদ কাষ্ঠনির্ম্মিত। মধ্যবিত্ত গৃহস্থদিগের প্রায় সকল বাটীর সম্মুখভাগে বারান্দা আছে। একটি রাজপথের উভয় পার্শ্বের অট্টালিকাশ্রেণী পূর্ব্বাপেক্ষা মনোহর। শুভ্রবর্ণ সুচারু-খিলান-বিশিষ্ট ও সম্মুখভাগ কারুকার্য্যময় কাষ্ঠের অলিন্দ-সমন্বিত। এ পথ প্রশস্ত—সৌধাবলী সম্ভ্রান্ত মুসলমান ধনাঢ্য ভদ্রলোক-দিগের বলিয়া বোধ হইল। অনেক পথে এরূপ হর্ম্ম্যমালা দেখিলাম। বাজারের পথগুলি সঙ্কীর্ণ; চওড়ায় ১২।১৫ ফুটের অধিক নহে। উভয় পার্শ্বে দ্বিতল,

ত্রিতল অট্টালিকাশ্রেণী। মধ্যাহ্ন ভিন্ন রৌদ্র পায় না। প্রথম তলে নানাপণ্যপূর্ণ বিপণীশ্রেণী। পথ জনাকীর্ণ, কোলাহলময়। সহজে চলিবার যো নাই। টাঙ্গাওয়ালাকে প্রতিপদবিক্ষেপে 'হটো' 'হটো' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে লোক হটাইতে হটাইতে চলিতে হয়। এ জন্য অনেক সময়ে কোথাও শীঘ্র যাইবার দরকার হইলে টাঙ্গা-চালক সহরের প্রাচীরের বহির্ভাগ দিয়া যায়। পথের দু'ধারে মধ্যে মধ্যে পানের দোকান,—আচার, মিষ্টান্ন, নানাবিধ সুগন্ধি তৈল প্রভৃতি বিক্রয় হইতেছে। দেখিতে দেখিতে জুম্মা মসজিদের নিকট উপস্থিত হইলাম। এই মসজিদ উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কুদসিয়া বেগম কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ইহা উচ্চ পাষাণময় ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার গগনচুম্বী মিনার বহুদূর হইতে দৃষ্ট হয়। ইহার সুবর্ণকলস সূর্য্যকিরণে প্রদীপ্ত হইয়া রশ্মি বিকীর্ণ করিতেছে। গাঢ় রক্তবর্ণের প্রস্তরে নির্ম্মিত, অত্যুচ্চ সোপানাবলীর উপর সুরম্য অলিন্দে শোভিত চারিতল তোরণদ্বার অতিক্রম করিয়া মসজিদের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে হয়। মসজিদশীর্ষে বিপুল গম্বুজ শোভা পাইতেছে।

আমরা মসজিদ হইতে বাহির হইয়া ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থিত রত্নবণিকদিগের বিপণীমালা দেখিতে লাগিলাম। নানা প্রকার স্বর্ণ রৌপ্যে গঠিত, মণি মুক্তা ও হীরকে খচিত অলঙ্কার, স্বর্ণ ও রৌপ্যে নির্ম্মিত রেকাব, বাটী, গেলাস, ডিবা, আতর-দান, গোলাপদান, ফুলদানী, পিচকারী ও অন্যান্য বিবিধ প্রকারের পানপাত্র দোকানগুলি আলো করিয়া রাখিয়াছে। পথিপার্শ্বে নানাবিধ টাটকা তরিতরকারী, শাকসবজী, কমলালেবু, সবুজ কলা প্রভৃতি ফল সজ্জিত—বিক্রেতারা ক্রেতাদিগকে আহ্বান করিতেছে। পুষ্পবিক্রয়কারীরা পুষ্পসম্ভার লইয়া বসিয়া আছে। এ জায়গাটা চকের ন্যায় খুব সরগরম।

বাসায় প্রত্যাগত হইয়া স্নানাহার শেষ করিলাম। বিশ্রামান্তে 'সদর মঞ্জীল' নামক পূর্ব্বতন রাজপ্রসাদ দেখিতে যাই। ভূপাল-রাজবংশের আদি-পুরুষ এই বিশাল প্রসাদ নির্ম্মাণ করেন। তাহার পর ১৭০৯ খৃষ্টাব্দ হইতে আরব্ধ হইয়া ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হইয়া আসিতেছে—এক জনের পরে আর এক জন শাসনকর্ত্তা পর্য্যায়ক্রমে ক্রমান্বয়ে ইহার কলেবর-বৃদ্ধি করিতে করিতে রাজ্যশাসন করিয়া আসিতেছেন। প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ একটি প্রান্তরের ন্যায়—চারি দিকে একতল, দ্বিতল, ত্রিতল, চৌতল হর্ম্ম্যশ্রেণী শোভা পাইতেছে। শিল্পসৌন্দর্য্য না থাকিলেও, ইহার বিশালতায় হৃদয় স্তম্ভিত হয়। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহাতে আর কোনও অট্টালিকা সংযুক্ত হয় নাই।

সদরু-মঞ্জীল দেখিয়া বাবু দৌলতরায়ের সহিত টম্‌টমে আমেদাবাদ যাত্রা করিলাম। বর্ত্তমান বেগম তাঁহার স্বর্গগত স্বামী আহম্মদ আলির নামে এই নগরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহা ভূপাল হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ। অতি পরিচ্ছন্ন রাজপথ দিয়া টম্‌টম্ চলিতে লাগিল। এই রাস্তার নাম সুলতানা রোড, বা Imperial Road। পথের এক পার্শ্বে দক্ষিণ দিকে টেলিগ্রাফ-পোষ্টে বৈদ্যুতিক আলোক। পথের ডান দিকে নূতন নূতন আদালত, আফিস প্রভৃতি বড় বড় অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতেছে। নূতন সহরে উপনীত হইয়া দেখিলাম— রেলওয়ে-বাঙ্গলোর ন্যায় অসংখ্য বাঙ্গলো সরকারী-আফিস-রূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

আমেদাবাদে রোহাত মঞ্জীল নামক নূতন রাজপ্রাসাদ ইংরাজী ধরণে নির্ম্মিত। প্রাচীন প্রাসাদে যে গাম্ভীর্য্য আছে, ইহাতে তেমন কিছুই নাই। তবে ইহা দেখিবার যোগ্য। প্রাসাদের চারি দিকে সুরম্য উদ্যান। নানাবিধ ফলপুষ্পের বৃক্ষে পরিপূর্ণ। মধ্যে মধ্যে সুন্দর রাজপথ। Hot-house, Ferns প্রভৃতি আছে। বর্ত্তমান বেগম এই প্রাসাদেই বাস করেন। আমি এক জন কর্ম্মচারীর সহিত প্রাসাদের দরবারগৃহে উপনীত হইলাম। ইহা ইংরাজী ফ্যাশনে সজ্জিত। কৌচ কেদারা টেবিল সোফা প্রভৃতি মখমলমণ্ডিত আস্‌বাব প্রচুর। প্রাচীরে ভূতপূর্ব্ব নবাব, বেগম ও রাজপরিবারের নরনারীর চিত্র। বর্ত্তমান মহামান্যা নবাব সুলতানা জাঁহা বেগমের চিত্রখানি দেখিলাম। তাঁহার মস্তকে রাজমুকুট, অঙ্গে রাজ-পরিচ্ছদ—ও তদুপরি জি, সি, আই, কেতাবের চিহ্ন উজ্জ্বল তারকা। পার্শ্বস্থ গৃহগুলিও নানা মর্ম্মরমূর্ত্তি ও মর্ম্মর-অলঙ্কারে সুসজ্জিত। বড় বড় ইংরাজ রাজ কর্ম্মচারী—পলিটিক্যাল-এজেণ্ট ও বেগমের বন্ধু কোনও কোনও গবর্ণর জেনেরেলের চিত্রাবলী প্রাচীরে বিলম্বিত রহিয়াছে।

কক্ষ হইতে নিস্ক্রান্ত হইয়া অলিন্দে বিচরণ করিতে লাগিলাম। হেমন্তের স্নিগ্ধ শীতল সমীর আমার উত্তপ্ত ললাট স্নিগ্ধ করিতে লাগিল। সম্মুখে সেই অনিন্দ্যসুন্দর হ্রদের বারি প্রবাহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলশ্রেণীর মধ্য দিয়া মৃদুহিল্লোলে প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু এই সকল পাহাড়ের পাষাণ-অঙ্গে তৃণ তরু লতা গুল্ম কিছুই নাই।

এখানে একটী বাঙ্গালী বালক আমার সঙ্গী হইল। ছোক্‌রাটি কুমিল্লা হইতে এখানে রাজ-সরকারে গুটিপোকা বা রেশমের চাষ করিতে

আসিয়াছে। সে এখান হইতে আমাকে হ্রদের পরপারস্থিত সেমনা দেখাইতে লইয়া চলিল। এই কিশোরবয়স্ক বালক অতি শান্ত, শিষ্ট ও নম্র। দুইটী বলদ-সংযুক্ত সেজগাড়ী নামক একখানি যান বাবু দৌলত রায় আমার সেমনা যাইবার জন্ত ঠিক করিয়া দিয়া স্বকার্য্যে গমন করিলেন। গাড়ীখানি কতকটা পুস্‌পুস্‌ বা কমিশেরিয়েট বিভাগের গাড়ী স্থায়। আমরা দুই জনে সেই গাড়ীতে আরোহণ করিয়া মন্থরগতিতে সেমনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। আমরা আবার সেই রাজপথ অতিক্রম করিয়া সদর-মঞ্জীল প্রাসাদের ভিতর দিয়া হ্রদের বাঁধের উপর দিয়া নানা দৃশ্য দেখিতে দেখিতে প্রায় পাঁচ মাইল পরে হ্রদের পর-পারে উপনীত হইলাম। পর্ব্বতের স্থায় উচ্চভূমিতে সেমনা প্রতিষ্ঠিত। এখানে সুন্দর রাজপ্রাসাদে বেগমের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাস করেন। ইহাও ইংরাজী প্রথায় সজ্জিত। আমরা হ্রদের তীরে প্রাসাদের সম্মুখস্থিত উদ্যানে একটি বেঞ্চের উপর বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। নিম্নে—বহু নিম্নে নদী বহিয়া যাইতেছে; অপর পারে ভূপাল নগরী। অস্তগমনোন্মুখ-রবিকর, মস্‌জিদে, মিনারে গম্বুজে, সৌধশিরে, প্রাসাদচূড়ে, দুর্গপ্রাকারে প্রতিফলিত হইয়া স্বর্ণরশ্মি বিকীর্ণ করিতেছে। আমরা উদ্যানে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম—একটি গাছে পেঁপে ফলিয়াছে—দেখিতে বড় নারিকেলের মত!

আবার সেই 'সেজগাড়ী' চড়িয়া সন্ধ্যার সময় গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। ৪ঠা জানুয়ারী। ১৯১৪।—প্রভাতেই কিছু জলযোগ করিয়া তাজ-উল-মস্‌জিদ দেখিতে যাত্রা করিলাম) পূর্ব্বোক্ত সদর-মঞ্জীল রাজপ্রাসাদের অল্প দূরেই সাজেহান বেগম কর্ত্তৃক আরব্ধ এই প্রকাণ্ড মসজিদ অবস্থিত। ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে আরব্ধ হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত শেষ হয় নাই। এক্ষণে অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে—কার্য্য আপাততঃ বন্ধ। আমি এ প্রকার মসজিদ জীবনে কোথাও দেখি নাই। ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য যদি কখনও ভূতপূর্ব্ব বেগমের কল্পনানুসারে সমাপ্ত হয়, তাহা হইলে ভূ-ভারতে এ মসজিদের প্রতিদ্বন্দ্বী থাকিবে না। দিল্লীর জুম্মা মসজিদের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য ইহার নিকট নিষ্প্রভ হইয়া পড়িবে। মসজিদের বিরাট আকৃতি ঊর্দ্ধনেত্রে দর্শন করিলে মস্তক অবনত হইয়া পড়ে। আকাশস্পর্শী মিনার ৮৬ ফুট মাত্র ঊর্দ্ধে উঠিয়া স্থগিত হইয়া রহিয়াছে। গম্বুজমালা স্ফীত হইতে না হইতেই ক্ষান্ত হইয়াছে। বিশাল প্রাঙ্গণ মণ্ডিত করিবার জন্ত আনীত চতুষ্কোণ সুরম্য প্রস্তররাশি স্তূপাকারে শৈবালা-চ্ছাদিত হইয়া পড়িয়া আছে; প্রস্তরোৎকীর্ণ নানাপ্রকার অপূর্ব্ব গঠন ধূলায়

সুচিত হইতেছে। নির্ম্মাণকার্য্যে ব্যবহৃত বংশমঞ্চসমূহ (Scaffolding) বর্ষাতপ সহ্য করিয়া জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই মস্‌জিদ অনিন্দ্য সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিবার অভিপ্রায়ে নানা দেশ হইতে নানাবর্ণের শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত, হরিত, গোলাপী, পাংশু, ধূসর, আলোহিত, গাঢ় হরিত, প্রভৃতি প্রস্তর আনীত হইয়াছিল। শুনিলাম, মুসলমান ধর্ম্মে তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরই নমাজের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভূমি—তাই মসজিদ-প্রাঙ্গণ বিমণ্ডিত করিবার জন্য দূর্ব্বাদলনিভ হরিতবর্ণের প্রস্তরও আসিয়াছিল। সাজাহান বেগমের মৃত্যুর পরে সেই সকল দুষ্প্রাপ্য বহু-মূল্য প্রস্তরসমূহ অন্যান্য প্রাসাদের অঙ্গ বিভূষিত করিয়াছে। শুনিলাম, বর্ত্তমান বেগম নির্ম্মাণকার্য্যে যাহাতে সম্পূর্ণ হয়, সে জন্য একটি কমিটী গঠিত করিয়াছেন। মসজিদ-চূড়া হইতে পাহাড়ে বিরাজিত ইদগা ও শ্যামল পাদপরাজিসমাচ্ছন্ন ভূপালের দৃশ্য অতীব মনোহর। তাজ-উল-মসজিদ দেখিয়া আমরা সাজেহান বেগম কর্ত্তৃক নির্ম্মিত তাজমহল প্রাসাদ দেখিতে গেলাম। সহস্রাধিক বিঘা ভূমি ব্যাপিয়া এই প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই প্রাসাদে সাজেহান বেগম বাস করিতেন। প্রায় ৬০ ফুট উচ্চ সমুন্নত তোরণসমূহ প্রাসাদের প্রবেশপথ। প্রাসাদশীর্ষে অসংখ্য চাঁদনী, শিরোভূষণ, বিবিধ গঠনের উচ্চসমূহ শোভা পাইতেছে। এ প্রাসাদ দেখিলে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইতে হয়। কিন্তু এই অপূর্ব্ব প্রাসাদ দপ্তরখানায় পরিণত হইয়াছে।

তাজমহল প্রাসাদ দেখিয়া আমরা ফতেগড়ের দুর্গচূড়া দেখিতে গেলাম। ইহা প্রাচীন সদর-মঞ্জীল প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া আমেদাবাদ পথের অনতিদূরে বামপার্শ্বে অবস্থিত। দুর্গ পাহাড়ের উপরে নির্ম্মিত। ইহার শিখর-দেশ হইতে দেখিলে ভূপালের চিত্তহারিণী শোভায় হৃদয় মুগ্ধ হয়। দুর্গের পদতল বিধৌত করিয়া স্বচ্ছহ্রদবারি প্রবাহিত।—যেন যোজনবিস্তৃত মুকুরে দুর্গ ও নগর প্রতিবিম্বিত হইতেছে।' ভূপাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দোস্তমহম্মদ খাঁ ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন।

৫ই জানুয়ারী ১৯১৪।—ভূপালে ভূতপূর্ব্ব বেগমদিগের রচিত অনেক মনোহর উদ্যান আছে। তন্মধ্যে এক মাইল দূরে কুদসিয়া বেগম কর্ত্তৃক নির্ম্মিত কুদশিয়া বাগে তাঁহার স্বামী নজর মহম্মদ খাঁর সমাধিমন্দির দর্শনযোগ্য। এ উদ্যানে রাজপরিবারের অনেক নরনারীর সমাধি আছে। প্রাচীরবেষ্টিত উচ্চ বেদিকার উপর কুদশিয়া বেগম মহানিদ্রায় নিদ্রিত। উদ্যানে অনেক বড় বড় বৃক্ষ আছে।

এই স্থান হইতে ছুই মাইল দূরে নগরের উত্তরে আমরা হায়াত-আব্জা নামক মনোহর উদ্যান দর্শন করিয়া, সাজেহান বেগম কর্তৃক নির্ম্মিত নারিয়ল-খেড়াবাগ নামক অলকা-লাঞ্ছিত উদ্যান দর্শন করিলাম। নানাবিধ ছুর্লভ পুষ্পবৃক্ষে ও তরুলতায় বিশাল উদ্যান অলঙ্কৃত। সুন্দর বারদ্বারী উদ্যানের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। পশ্চাদ্‌ভাগ প্রস্তরনির্ম্মিত বৃত্তাকার চৌবাচ্চার মধ্যস্থলে প্রস্রবণ-নীর উচ্ছ্বসিত হইতেছে।

প্রখরবুদ্ধিমতী সাজেহান বেগমের সুন্দর সমাধি দর্শন করিলাম। মর্ম্মর-নির্ম্মিত সোপান দ্বারা শুভ্র মর্ম্মরনির্ম্মিত চতুষ্কোণ বেদিকার উপর—মধ্যস্থলে শ্যামলতৃণাচ্ছাদিত স্নিগ্ধশীতল মৃত্তিকাতলে বেগম মরণের মহাস্বপ্নে অভিভূত। সকল ছুঃখ সকল সুখ বিস্মৃত হইয়া অলোকসামান্যা রমণী চিরবিশ্রাম ভোগ করিতেছেন।

বেদিকার চারি দিকে সুন্দর জাফরী-সমন্বিত মর্ম্মর-প্রাচীর। দিল্লীতে জাহানারা ও রোশেনারা বেগমের সমাধি দেখিয়া অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিলাম। আর এই ভূপালে আসিয়া সুন্দর প্রভাতে নবদূর্ব্বাদলমণ্ডিত, শিশিরমুক্তা-মালা খচিত সমাধিবক্ষে এক বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

এতদ্ভিন্ন সেকেন্দর বেগম কর্তৃক নির্ম্মিত সেকেন্দর-বাগ ও আয়েস-বাগ প্রভৃতি আরও মনোহর উদ্যান আছে।

ভ্রমণ-কাহিনীর প্রারম্ভেই বলিয়াছি যে, ভূপাল নগর অনুচ্চ প্রস্তরপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত। মধ্যে মধ্যে তোরণদ্বার, বুরুজ, সিপাহী শাস্ত্রীর কক্ষ প্রভৃতি। প্রাচীরাভ্যন্তর্গত স্থান সৌধমালা ও হাটবাজার প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেলে, আবার কতকটা স্থান প্রাচীরে বেষ্টিত করিয়া, তন্মধ্যে বসবাস আরম্ভ হইয়াছে। এইরূপে কোনও কোনও স্থানে তিন চারি ফের প্রাচীর হইয়াছে। নগরের উত্তর দিকে প্রাচীরের বহির্ভাগেও অনেক বসতি হইয়াছে। এক স্থানে একটি প্রাচীন হামাম বা স্নানাগার দেখিলাম। ইহা গণ্ড রাজাদিগের সময়ে নির্ম্মিত; মুসলমানের আমলে নহে। এখানে স্নান করিতে হইলে এক টাকা, আট আনা করিয়া দর্শনী দিতে হয়।

ভূপালের রাজপথ আমাদের চক্ষে অনেক নূতন দৃশ্যের অবতারণা করে। মুসলমানী সহর—কেবল মুসলমানই গমনাগমন করিতেছে; কচিৎ ছুই চারি জন পশ্চিমদেশীয় হিন্দু। তাহারা এ দেশের অধিবাসী নহে। বিষয়কর্ম্ম অথবা ব্যবসায় বাণিজ্য উপলক্ষে এ দেশে আসিয়াছে। শুনিলাম, যদি কোনও হিন্দু

মুসলমান-ধর্ম্ম অবলম্বন করে, বেগম মহোদয়া তাহাকে অর্থ, ভূমি প্রভৃতি দান করিয়া এখানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন। সহরে গণিকা নাই—বেগমের আদেশে সকলেই 'নিকা' করিয়া সংসারী হইয়াছে।

ভূপালের বাঁটুয়া বিখ্যাত।০ সূচের কারুকার্য্যে, জরীর বাঁটুয়া সুন্দর। আমি এক টাকার একটি কিনিয়াছিলাম। এক একটি গুড়গুড়ির নল চারি হাত লম্বা। পথিপার্শ্বে তাহাতেই কেহ কেহ ধূমপান করিতেছে।—রজকেরা যেমন গর্দ্দভের পৃষ্ঠের উভয় পার্শ্বে বস্ত্রের বোঝা দিয়া লইয়া যায়, এখানেও সেইরূপ মহিষের পৃষ্ঠের দুই দিকে জালে করিয়া ইষ্টকের বোঝা দিয়া লইয়া যাইতেছে।

ভূপাল নগরী ধার-রাজ্যের রাজা ভোজ কর্ত্তৃক ১০১০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনিই ভূপালের প্রাচীন দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই কোনও মন্ত্রী কর্ত্তৃক হ্রদ প্রস্তুত হইয়াছিল। যে স্থানে ভোজের দুর্গ—সে স্থানের নাম ভোজপুরা। এখন দুর্গ কারাগারে পরিণত হইয়াছে। হিন্দু রাজত্বের স্মৃতি ভূপাল হইতে বহুকাল অন্তর্হিত।

বর্ত্তমান মুসলমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দোস্ত মহম্মদ খাঁ নামক জনৈক আফগান সর্দ্দার কর্ম্মের প্রত্যাশায় ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে বাহাদুর শাহের রাজত্বকালের প্রথমে দিল্লীতে আগমন করিয়া রাজকার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। তিনি ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে বারসিয়া পরগণায় জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ রাজত্বের প্রসারবৃদ্ধি করিয়া, প্রথমে ইসলামপুর নামে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া ভূপালে রাজধানী মনোনীত করেন। তাঁহারই বংশপরম্পরা তদবধি ভূপালে রাজত্ব করিতেছেন।

ইংরাজী ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের পর হইতেই ভূপালের রাজদণ্ড রমণীহস্তেই ধৃত হইয়া আসিতেছে। নবাব নাজের মহম্মদের মৃত্যুর পর তৎপত্নী কুদসিয়া বেগম রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। দুহিতা সেকেন্দর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তাঁহারই হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত হয়। ইনি যোগ্যতার সহিত রাজ্যশাসন করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার কন্যা সাজেহান বেগম রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই প্রখরবুদ্ধিশালিনী বেগমের অধিকারকালে ভূপালের বহু উন্নতি সাধিত হয়। সুদৃশ্য নয়ন-রঞ্জন অট্টালিকা, প্রশস্ত রাজপথ, অপূর্ব্ব মসজিদ-মিনার, নন্দন-লাঞ্ছিত উদ্যান, ভুবনমোহন বিশাল রাজপ্রাসাদ প্রভৃতি সাজেহান বেগম কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়া ভূপালে জিজিন-

শ্রীর আরোপ করিয়াছে। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বক্সী বাকি মহম্মদ খাঁর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। তিনি রাজবংশজাত ছিলেন না। নবাবের পরিবর্ত্তে নবাব-কন্সর্ট (Nowab Consort) হইয়াছিলেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বাকি মহম্মদ খাঁর মৃত্যু হইলে, সাজেহান বেগম পর্দ্দার বাহির হইয়া প্রকাশ্যে রাজ-দরবার করিতেন। কিন্তু ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে এই শক্তিশালিনী বেগম আবার কান্নোজ-নিবাসী মৌলবী সিদ্দিক হোসেনকে বিবাহ করেন। ইঁহার দ্বিতীয় পরিণয়ে রাজপরিবারবর্গ, প্রজাব্রজ ও তদীয় দুহিতা মহামান্যা বর্ত্তমান নবাব সুলতান জাঁহা বেগমের প্রীতিকর হয় নাই। এ জন্য তিনি সকলের কিঞ্চিৎ বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। বিবাহের পরে সাজেহান বেগম রাজদরবার ত্যাগ করিয়া আবার পর্দ্দানসীন্ হইলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে সিদ্দিক হোসেন প্রাণত্যাগ করেন। পরবৎসর ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে সাজাহান বেগমের ভবলীলা সমাপ্ত হয়।—সিদ্দিক হোসেন কান্নোজবাসী;—কান্নোজে আতর, গোলাপ, চামেলী, বেলা প্রভৃতি নানা সুগন্ধসম্ভার প্রস্তুত হইত বলিয়া ভূপালের অধিবাসীরা রহস্য করিয়া তাঁহাকে 'আতরওয়ালা' বলিত!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

বঙ্গীয় মুসলমান ও বঙ্গ-সাহিত্য।

১১৯৯ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর দাস সম্রাট কুতবুদ্দীনের জনৈক বিচক্ষণ সেনা-নায়ক মহম্মদ বিন্ বখ্‌তিয়ার খিলিজি বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। বঙ্গের তখন নাম ছিল গৌড়; নবদ্বীপ ছিল রাজধানী।

ইহার প্রায় ষাট বৎসর পরে আবু ওমর মিন্‌হাজুদ্দীন নামক এক যবন ঐতিহাসিক লিখিয়া গিয়াছেন—তিনি বখ্‌তিয়ারের বৃদ্ধ সৈনিকগণের প্রমুখাৎ শুনিয়াছিলেন, খিলিজি-পুঙ্গব সপ্তদশ জন অশ্বারোহী সঙ্গে লইয়া গৌড়াধিপকে খেদাইয়া দিয়াছিলেন!

সে সময়ে লক্ষ্মণসেন গৌড়েশ্বর। কেহ কেহ বলেন,—লক্ষ্মণ নয়, তাঁহার পৌত্র লাক্ষ্মণের। মুসলমানগণ নামটা উচ্চারণ করিয়াছেন—লাছমণিয়া। যাহাই হউক, শুনা যায়, বর্ষীয়ান রাজাধিরাজ মধ্যাহ্নভোজনে বসিয়াছিলেন; তাঁহার নিকট সংবাদ পঁহুছিল, যবন আসিয়াছে। অর্দ্ধভুক্ত আহার পরিত্যাগপূর্ব্বক

সকৃড়ি-হাতে খিড়্‌কীদ্বার দিয়া জলপথে তিনি প্রপলায়মান হইলেন; কেহ বলেন, একেবারে ৺জগন্নাথধামে তীর্থ যাত্রা করিলেন; কেহ কেহ বলেন, সুবর্ণগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইতিহাসে আছে, তাঁহার বংশধরগণ বিক্রমপুরে আরও এক শত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

সপ্তদশ অশ্বারোহীর কথা ঠান্‌দিদির উপকথা বলিয়া অনেকেই উড়াইয়া দিয়াছেন; তবে রাজা যে পলাতক হইয়াছিলেন, এবং পাঠানেরা রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, ইহা অস্বীকার করিবার যো নাই।

লক্ষ্মণ সেন যৌবনকালে মহাপরাক্রান্ত দিগ্বিজয়ী রাজা ছিলেন; তাঁহার জয়স্তম্ভ বারাণসী, প্রয়াগ হইতে শ্রীক্ষেত্র পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তিনিই হউন, আর তাঁহার পৌত্র লাক্ষণেয়ই হউন,—যে সময়ে পাঠানেরা গৌড়ে শুভাগমন করেন, তখন গৌড়েশ্বর অশীতিপর বৃদ্ধ, তাঁহার নিশ্চয় 'ভীমরতি' ঘটিয়াছিল। প্রবাদ আছে, রাজা দৈবজ্ঞ-গণককারগণের নিকট হাত গুণাইয়া এবং জয়দেব-প্রমুখ কবিগণের 'ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে' গান শুনিয়া সময় অতিবাহিত করিতেন। শাস্ত্রজ্ঞ পারিষদ ব্রাহ্মণঠাকুরেরা নাকি শাস্ত্রের পাতা খুলিয়া গণনা করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, গৌড় যবনাধিকৃত হইবে; যবন-সেনাপতি খর্ব্বকায় বখ্‌তিয়ারের আকৃতি পর্য্যন্ত নাকি বর্ণিত ছিল। শাস্ত্রের উপর হিন্দুচূড়ামণি রাজার অগাধ বিশ্বাস ছিল। ব্রাহ্মণ ঠাকুরগণের প্রতি অচলা ভক্তি ছিল। সুতরাং অজ্ঞাতসারে চম্পট-প্রদানে উভয়ের মর্য্যাদা রক্ষা করাই তিনি কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াছিলেন। এই গণনার সহিত পাঠানদিগের কাঞ্চনমূল্যের সম্বন্ধ ছিল, এমন রটনাও শুনা গিয়াছে।

এ সকল ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও কিম্বদন্তীর উত্থাপন না করিলেও চলিত। কিন্তু একটু প্রয়োজন আছে। সে সময়াকর দেশের অবস্থাটা জানিয়া রাখা আবশ্যক। গৌড়ীয় বা বাঙ্গালী জাতির কিঞ্চিৎ পরিচয়-গ্রহণ দোষাবহ হইবে। রাজাও রাজ্য রক্ষা করিতে বাঙ্গালী অঙ্গুলী উত্তোলন করে নাই; বিনা যুদ্ধে রাজধানী বিজাতি বিধর্ম্মীর করতলগত হইল। দেশের অবস্থা জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব। নানা কারণ হইতে আমরা বুঝিতে পারি, বাঙ্গালী জাতি উচ্চাভিলাষ-শূন্য, নিস্তেজ, অলস, নিশ্চেষ্ট ও গৃহ-সুখপরায়ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তজ্জন্য গৌড় অত সহজে পরাধীন হইল।

কেহ কেহ অনুমান করেন, মায়াবাদে একান্ত আশ্রয়-পরায়ণ বিষয়-বিমুখ

হিন্দুর শিথিল মুষ্টি হইতে পার্থিব সুখ-সম্ভোগে ব্রতী রণপটু মুসলমানগণ অতি সহজে তাঁহাদের দেশ অধিকার করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কাহারও কাহারও বিশ্বাস অন্যবিধ ;—পালরাজগণের সময় পর্য্যন্ত গৌড়দেশ-বাসীরা বৌদ্ধতান্ত্রিক ছিল ; শূর বা সেন-রাজগণ আসিলেন, কান্যকুব্জ হইতে শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণগণকে আনাইলেন ; তাঁহারা বৌদ্ধতান্ত্রিকতার, বৌদ্ধভাবের সমূলে উচ্ছেদ করিবার বাসনায় এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে সামাজিক আচার-বিধির শৈথিল্য এবং উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতার পরেই তাহার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ কঠিন হইতে কঠিনতর শাসন-শৃঙ্খল গড়িতে লাগিলেন। এই সময় হইতেই ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের ন্যায় বঙ্গদেশেও স্মৃতি, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি সহস্র নাগ-পাশের সৃষ্টি হইতে লাগিল। দেশে দুই বর্ণ—দুইটিমাত্র জাতি দাঁড়াইল ; এক ব্রাহ্মণ, অপর শূদ্র ; এক সেব্য, অপর সেবক। ক্ষত্রিয় বৈশ্য বর্ণদ্বয় ব্রাহ্মণগণের বিচারে লোপ পাইল। যে দুই বর্ণ রহিল, নূতন নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র ও তাহার টীকা টিপ্পনী ভাষ্য প্রণয়ন দ্বারা উভয়ের মধ্যে জমীন্-আশমান্ পার্থক্য নির্দ্ধারিত হইল। * জ্ঞান বিদ্যা ত ব্রাহ্মণবর্ণের একচেটিয়া করা ছিলই, তাহার উপর জন-সাধারণের—ব্রাহ্মণেতর জাতির পক্ষে শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম জানিতে পারিবার পথ পর্য্যন্ত রুদ্ধ করিবার উদ্যোগ হইতে লাগিল—

"অষ্টাদশপুরাণানি রামস্য চরিতানি চ।
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥"

সেন রাজগণের সময়ে রাজার সাহায্যে ব্রাহ্মণজাতির উদ্ভাবিত আচার-বিচারের বন্ধনে এবং গুণনির্ব্বিশেষে ব্রাহ্মণগণের একান্ত প্রাধান্যস্থাপনে উত্যক্ত হইয়া প্রজাসাধারণ রাজত্বরক্ষায় রাজার সহায়তা করিতে অগ্রসর হয় নাই, এবং তজ্জন্যই মুসলমানগণ অত সহজে বঙ্গবিজয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহাও অনেক সুধী জনের ধারণা।

যাহা হউক, সপ্তদশ অশ্বারোহীর গল্পে ইহা সপ্রমাণ হয় যে, গৌড় বিজাতির

* It is a remarkable fact that all the smriti compilations were made after the Mahamedans had obtained a footing in India. Madhabacharjya, Bisweswar Bhatta, Chandeswar, Vachaspati Misra, Acharjya Churamani, Prataprudra, Raghunandan, and Kamalakar, all flourished during the Pathan period and by their teachings fixed Hindu manners and customs in different parts of the land.

Mahamahopadhyaya Hara Prosad Sastri. History of India. P. 104.

আয়ত্ত ও অধীন হইতেছে দেখিয়াও প্রজাসাধারণ সে সর্ব্বগ্রাসী তরঙ্গ রুদ্ধ করিবার বিশেষ্ চেষ্টা করে নাই।

পাঠানেরা এ দেশে আসিলেন, আসিয়া দেখিলেন, গৌড়ভূমি সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বটে, এবং দেশবাসিগণও 'ললিতলবঙ্গলতা'র মত কোমল-প্রকৃতিও বটে। দেখিয়া শুনিয়া তাঁহারা মায়া কাটাইতে পারিলেন না; দেশটিকে বেশ করিয়া আঁকড়াইয়া বসিলেন। গৌড় অধিকার করিয়া ক্রমে এ দিকে ও দিকে হস্তপ্রসারণ করিতে লাগিলেন।

গৌড় নিতান্ত ছোটখাটো রাজ্য ছিল না; সমগ্র গৌড় পাঠানেরা একেবারে অধিকার করেন নাই, বা করিতে পারেন নাই, ইহা স্থির; আশে পাশে স্বাধীন হিন্দুরাজ্যও ছিল। তৎসত্ত্বেও ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে বাঙ্গালা দেশ পাঠানদের হইয়াছিল, তাহা মানিতে হয়।

পাঠানেরা দেশ অধিকার করিয়া শুধু যে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন, এমন নহে। অধিকারসীমা বর্দ্ধিত করিতে ব্যস্ত হইলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে নবজিত রাজ্যের প্রজাগণকে নানা উপায়ে আপনার জন করিয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 'মুরগীর পালো' সেবন করাইয়া এবং 'কলমা' পড়াইয়া দেশে দেদার শেখ গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বঙ্গভারতীর কৃতী পুত্র বঙ্কিমচন্দ্র পাঠান-রাজত্বের প্রারম্ভকালে বখ্‌তিয়ার খিলিজির মুখ দিয়া এবং পাঠান-রাজত্বের অন্তিম সময়ে ওসমান খাঁর জোবানে বলাইয়াছেন—"মোছলমানের বিবেচনায় মহম্মদীয় ধর্ম্মই সত্য ধর্ম্ম; বলে হউক, ছলে হউক, সত্যধর্ম্ম-প্রচারে আমাদের মতে অধর্ম্ম নাই, ধর্ম্ম আছে।" দেশে মুসলমানধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা বাড়িতে লাগিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে ষোড়শ শতাব্দীর শেষাশেষি সময় পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় বা গৌড়ে পাঠান রাজত্বকাল; ষোড়শ শতাব্দীর শেষাশেষি সময় হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত মোগল রাজত্বকাল। সার্দ্ধ পাঁচ শত বৎসর আমরা বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানদিগের অধীন ছিলাম; তৎপরবর্ত্তী দেড় শত বৎসর আমরা বাঙ্গালী হিন্দু ও বাঙ্গালী মুসলমান একত্র বাস করিতেছি।

মুসলমানেরা বঙ্গদেশ জয় করিয়া এইখানেই ঘরবাড়ী করিয়া সপরিবারে বসবাস করিতে লাগিলেন; বঙ্গদেশকে তাঁহারা নিজের পিতৃভূমি করিয়া তুলিয়াছিলেন। বাঙ্গালী গোরুকে খড় ভুষি খাওয়াইয়া পুষ্ট করিয়া কেবলমাত্র দুগ্ধদোহন তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না; মামুদ নাদিরের মত জ্বালাইয়া পোড়াইয়া

কেবল ধনরত্নের লুণ্ঠন তাঁহাদের অভিপ্রেত ছিল না; আমরা দেখিতে পাই, মুসলমান রাজগণ বিজিত বাঙ্গালী হিন্দুকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা যত্ন করিতেন; তাহাদের ঐহিক উন্নতির দিকে 'নেক্ নজর' রাখিতেন; এমন কি, রাজকীয় যে কোনও ব্যাপারে হিন্দুকে নিয়োগ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। বিজেতা বিজিতের সম্পর্ক ভুলিয়া মুসলমান অধিবাসিগণ প্রতিবেশী হিন্দুকে আপন 'ভাই' জ্ঞান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। বাঙ্গালী প্রাচীন কবিরা অনেক ভিন্নধর্ম্মী গৌড়েশ্বরের গুণগান করিয়া গিয়াছেন। প্রজাগণ হিন্দু মুসলমানে আদরের সম্পর্ক পাতাইয়া সুখে কালযাপন করিতেছেন, দেখা গিয়াছে। অবশ্য আমরা এমন কথা বলি না যে, মুসলমানেরা কাফের হিন্দুদিগের উপর কখনও নির্য্যাতন করেন নাই। কাজীর বিচার, নিষ্ঠীবনের পালা, মুর্‌শিদ কুলীর 'বৈকুণ্ঠ' ভুলিবার নহে।

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন শাসক ও শাসিতের পার্থক্য বুঝাইবার জন্ম বেশ একটি ফর্দ্দ রচিয়াছেন;—হিন্দুর 'কুঁড়ে' (কুটীর)—মুসলমানের 'দালান'; 'এমারত'। হিন্দুর 'গাঁ' (গ্রাম)—মুসলমানের 'সহর'। হিন্দুর 'শস্য' কর্ত্তিত হইয়া যখন মুসলমানের সেবায় লাগে, তখন তাহা 'ফসল'। হিন্দুর 'টাকা' (তঙ্কা) করগ্রাহী মুসলমানের হস্তে পঁহুছিলে 'খাজানা' হয়। ক্ষুদ্র মেটে তৈলের 'প্রদীপ'টিমাত্র হিন্দুর; 'ঝাড়', 'ফানুস', 'দেয়ালগিরি', সমস্ত বিলাসের আলো মুসলমানের। হিন্দু অপরাধ করিলে 'কাজি' 'মেয়াদ' দেয়। ইহা ছাড়া 'বাদশাহ' 'ওমরাহ' হইতে 'উজীর' 'নাজীর' সামান্য 'কোটাল' 'পেয়াদা' 'বরকন্দাজ' 'নফর' পর্য্যন্ত সকলই মুসলমানী শব্দ। 'জমিদার' 'তালুকদার'ও তাই। 'জমি' 'তালুক' 'মুলুক' প্রভৃতি মুসলমানী শব্দ। উপাধিগুলিও সমস্ত মুসলমানী—'জুমলাদার' 'মজুমদার' 'হাবিলদার'; সম্মানসূচক 'সাহেব', প্রভুত্ব-সূচক 'হুজুর', এ সকল কথা বঙ্গের ঘরে ঘরে প্রবেশ করিয়া হিন্দুর ভাষাকে যবনাধিকারচিহ্নিত করিয়াছিল।

বঙ্গে মোগল-রাজত্বের প্রথম সময়ে রচিত মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের 'চণ্ডী'তে 'গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ'-পাঠকালে আমরা বুঝিতে পারি, মুসলমানী প্রভাব ভাষার মধ্যে কেমন 'কায়েমী বন্দোবস্ত' করিয়া আপন অধিকার বিস্তার করিয়াছে। *

* দেশের রাজা মুসলমান, রাজভাষা পারসী; আইন আদালত, বিষয়কর্ম্মের ভাষা ছিল পারসী। রাজদরবারে উন্নতি প্রতিপত্তির আশায় এবং নানারূপ কার্য্যসৌকর্য্যার্থ বাঙ্গালী হিন্দুও পারসী শিখিতে লাগিলেন। তাহার ফলে বাঙ্গালা ভাষার ভিতর বিস্তর পারসী শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে, এবং বহুকালের অনুশীলনে এমন ভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, তাহা এখন ভাষার অস্থিমজ্জাগত বলিলেও হয়। সে বিষয়ে এখানে কিছু বলিতেছি না।

আমরা বলিয়াছি, বহুকাল ধরিয়া একত্র বাস নিবন্ধন বঙ্গে হিন্দু মুসলমানে বেশ মেশামিশি হইয়াছিল। বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসে দৃষ্টি করিলেও আমাদের বুঝিতে বাকি থাকে না, এই মেশামেশিটা বেশ ঘনিষ্ঠভাবেই হইয়াছিল।

মুসলমান আমলে বঙ্গের বা গৌড়ের যাঁহারা সুলতান বা শাসনকর্ত্তা হইতেছিলেন, তাঁহারা বরাবর দিল্লীর বাদশাহের অধীন ছিলেন। ১৩৪৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গাধিপতি সামসুদ্দীন ইলায়স্ শাহ দিল্লীর অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া আপনার স্বাধীনতা প্রচার করেন। তাঁহাকে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া টোগলক-বংশীয় দিল্লীশ্বর ফিরোজ শাহ ১৩৫৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার স্বাধীনতা স্বীকার করিলেন। বঙ্গদেশ বা গৌড় এই সময়ে স্বাধীন রাজ্য দাঁড়াইল। সামসুদ্দীন গৌড় হইতে পাণ্ডুয়ায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এ সময়ে দেশের নাম ছিল গৌড়, রাজধানীর নামও ছিল গৌড়। সামসুদ্দীনের বংশধরেরা বাঙ্গালী রাজা গণেশ বা কংসনারায়ণ রায়ের নিকট পরাজিত হইয়া রাজ্য হারাইলেন। প্রবলপ্রতাপশালী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ জমীদার রাজা গণেশ গৌড় দেশের স্বাধীন অধিপতি হইলেন। তিনি আট বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। বিজাতি বাদশাহদিগের অধীনতা হইতে এই একবারমাত্র কিয়ৎক্ষণের জন্য বাঙ্গালী হিন্দুর ভাগ্যে স্বাধীনতা-বিজলী চমকাইয়াছিল। রাজা গণেশের মৃত্যুর পর তৎপুত্র যদু ভূতপূর্ব্ব গৌড়-সুলতানের কন্যা আশমান তারার প্রণয়ে মজিয়া জেলালুদ্দীন নাম-ধারণ পূর্ব্বক সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন। হিন্দু রাজত্ব স্বপ্নের মত ফুরাইল। এখানে স্বেচ্ছায় হিন্দু মুসলমান হইলেন; ছল কিংবা বল আবশ্যক হয় নাই।

যবন ঐতিহাসিক মীর্ ফরজন্দ হোসেন লিখিয়াছেন,—রাজা গণেশেরও 'বেগম' ছিল। তিনি যখন গৌড়ে থাকিতেন, তখন প্রায় মুসলমানের ন্যায় চলিতেন; আবার যখন পাণ্ডুয়াতে থাকিতেন, তখন অতি নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণের ন্যায় সদাচারে চলিতেন। হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিই তাঁহাকে স্বজাতি জ্ঞান করিত। তিনি বেগমদিগের নামে গৌড় নগরে অনেক দর্গা ও মস্‌জিদ করাইয়াছিলেন; আবার পাণ্ডুয়া, টণ্ডা ও বাঁটুয়াতে নিজ নামে বহু দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করাইয়াছিলেন।

দেশের স্বাধীন রাজা—ব্রাহ্মণ রাজারই যখন এই দশা, অন্যে পরে কা কথা! প্রজাসাধারণ যে কতকটা রাজার অনুসরণ করিত, তাহা ধরিয়া লওয়া অসঙ্গত হইবে না। প্রমাণেরও অভাব নাই; আমরা মুসলমানী 'জলপাত্রে'র কথা

শুনিয়াছি। অনেক বাদশাহ সুলতান নবাবের হিন্দু বেগম ছিল, তজ্জাতপুত্র উত্তরাধিকারী হইয়াছেন, ইহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কথা। তাই বলিতেছিলাম, দেশে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

প্রবলপরাক্রান্ত বাঙ্গালী ভূম্যধিকারী "বার ভূঞা"র অন্যতম খিজিরপুরের ঈশা খাঁ। ইঁহার পিতা হিন্দু ছিলেন, নাম কালিদাস। ইনি সুবর্ণপুরে রাজত্ব করিতেন। সমগ্র পূর্ব্ববাঙ্গালা ইঁহার অধীন ছিল। ইনি আকবর বাদশাহের সেনাপতিকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। বাপ ছিলেন হিন্দু, পুত্র মহাবীর রাজ্যেশ্বর হইয়াও মুসলমান।

রাজ-অনুগ্রহ-লাভের লোভে অনেক হিন্দু মুসলমান হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণও মিলে। মধ্যে মধ্যে হিন্দু-মুসলমানে আদান প্রদানও চলিত, তাহার সংবাদও পাওয়া যায়। কুলাচার্য্যগণের পুঁথি হইতে জানিতে পারা যায়, একটাকিয়ার সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ জমীদার-গৃহের উনত্রিশ জন বংশদুলাল মুসলমান রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন, অবশ্য মুসলমান হইয়া যান। ঘটক ঠাকুরদিগের কুলজী গ্রন্থ হইতে আমরা অনেক সামাজিক তত্ত্ব পাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি শ্লোক উদ্ধৃত করি,—

"দোস্তের গোস্তখানা খাটা তায় যে কদু।
সেই খানা খেয়ে গেল বেলগড়ের মধু॥"

স্বার্থ অশনে, বসনে ও ব্যসনে বহু অনর্থ ঘটাইতেছিল। হিন্দু কমিতেছিল; মুসলমান বাড়িতেছিল।

আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই, ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে সলেমান কেরাণি বাঙ্গালার সুলতান হইয়াছেন। কালাচাঁদ নামক এক ব্রাহ্মণ যুবক সুলতানের অধীনে রাজধানী গৌড়নগরের ফৌজদার ছিলেন। ঘটনাচক্রে পড়িয়া তাঁহাকে এক প্রেমমুগ্ধা মুসলমান-তনয়াকে গ্রহণ করিতে হয়। ইহার জন্য কালাচাঁদ জাতিচ্যুত ও স্বজাতি-সমাজে 'একঘরে' হইয়া পড়েন। কালাচাঁদ অনুতপ্ত হইলেন, যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিলেন, জগন্নাথক্ষেত্রে গিয়া 'ধরণা' দিলেন, সপ্তাহকাল অনাহারে থাকিয়া কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করিলেন, কিছুতেই কিছু হইল না; প্রত্যাদেশ ত হইলই না, বরং পাণ্ডারা তাঁহার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে শ্রীক্ষেত্র হইতে তাড়াইয়া দিল। তখনকার বড় বড় তর্কচূড়ামণি-তর্কপঞ্চাননের দল তাঁহাকে জাতিতে উঠাইতে একেবারে অসম্মত হইলেন। তখন কালাচাঁদ ক্রোধে অধীর হইয়া মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন; তাঁহার নাম হইল মহম্মদ

কায়মুলি। মুসলমান হইয়া তিনি হিন্দুদিগের উপর যেরূপ ভীষণ অত্যাচার করিতে লাগিলেন, তাহাতে হিন্দুদিগের নিকট তাঁহার নাম হইল—'কালাপাহাড়।' তিনি গৌড়াধিপকে প্ররোচিত করিয়া উড়িষ্যা জয় করিলেন; শ্রীক্ষেত্রে যেরূপ উপদ্রব করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করা যায় না। জনরব, ৺ জগন্নাথ দেবের বর্ত্তমান বিরূপ মূর্ত্তি তাঁহারই প্রাসাদাৎ। কালাপাহাড় গৌড়দেশে প্রত্যাগমন করিয়া প্রথমে রাঢ় দেশে হিন্দুদিগের উপর—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগের উপর অকথ্য নির্য্যাতন আরম্ভ করিলেন। কথিত আছে, তিনি দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেই চূর্ণ করিয়া অস্থানে নিক্ষেপ করিতেন। ব্রাহ্মণবাড়ী হইতে কাড়িয়া আনিয়া কতকগুলি শালগ্রামশিলা একত্র করিয়া রাখিয়াছিলেন, প্রত্যহ তাহাদের উপর ঘোরতর অনাচার করিতেন। কালাপাহাড় সহস্র সহস্র হিন্দুকে বলপূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্ম-গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন। যাহাদের ধরিতেন, যতক্ষণ তাহারা মুসলমান না হইত, তাহাদের উপর তিনি নিষ্ঠুরভাবে উৎপীড়ন করিতেন; শুনা যায়, সেই পীড়নের প্রকোপে অনেকের ইহলীলার অবসান হইয়া গিয়াছে। ঐতিহাসিক যথার্থই বলিয়াছেন,—এক কালাপাহাড় গৌড় ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশে, এমন কি, আসাম কামরূপে পর্য্যন্ত—হিন্দুদিগের যত অনিষ্ট করিয়াছেন, অন্য সমস্ত মুসলমানের অত্যাচার একত্র করিলেও তত হইবে না। কথিত আছে, কালাপাহাড়ের অত্যাচারের সীমা এ দিকে কাশীধাম পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছিল। কাশীতে উপদ্রবের তৃতীয় দিবসে তিনি নিরুদ্দেশ হন; সম্ভবতঃ ঘাতকের গুপ্ত অস্ত্রাঘাতে অপসারিত হন। কালাপাহাড় একাদশ বৎসর হিন্দুধর্ম্মবিনাশনে ও মুসলমানের সংখ্যাবর্দ্ধনে ব্রতী ছিলেন। কালাপাহাড় খাঁটী ব্রাহ্মণের সন্তান; সমাজের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। ব্রাহ্মণঠাকুরগণের অনুদারতায় ব্রাহ্মণ কালাচাঁদ ব্রাহ্মণদ্বেষী কালাপাহাড় হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে, কালাপাহাড় দুই জন ছিলেন; দুই জনই ব্রাহ্মণ, গুণে এবং কর্ম্মে যথা পূর্ব্বং তথা পরম্। দেশে মুসলমানের সংখ্যা হু হু করিয়া বাড়িতে লাগিল।

অনেকটা অপ্রসঙ্গিক কথা হইল, কিন্তু ইহার একটু কারণ আছে। শুধু মুসলমানদিগের দ্বারা নহে, হিন্দু হইতে, ব্রাহ্মণ হইতে বঙ্গে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা-বৃদ্ধির কত সহায়তা হইয়াছে, তাহার আভাস দিবার জন্যই আমাদের এই "ধান ভানিতে শিবের গীত।"

বঙ্গদেশে মুসলমানধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা-বৃদ্ধির অন্যান্য কারণও আছে। ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা হিন্দু জাতির মধ্যে নিজের প্রাধান্য পাকা করিয়া রাখিবার জন্য দেশে

হিন্দুর মধ্যে দুই বর্ণ লুপ্ত করিয়া ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুই বর্ণমাত্র খাড়া করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশে এ বিধানটা বেশ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। অজস্র স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র মনের মত করিয়া গড়িয়া সামাজিক আচার বিচারের গ্রন্থি তাঁহারা কঠিনভাবে কষিতে লাগিলেন; নিষিদ্ধ ভোজের আঘ্রাণমাত্রে জাতিপাতের ব্যবস্থা করিলেন; 'পান হইতে চুণটুকু খসিলে' জাতিতে ঠেলার বন্দোবস্ত হইল।

ইহার আভাস পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে। কিন্তু অন্য দিক হইতে একটা বড় মুস্কিল বাধিল। যতদিন দেশ স্বাধীন ছিল, যতদিন দেশে হিন্দুরাজত্ব ছিল, ততদিন ব্রাহ্মণ শূদ্রের সম্পর্ক ছিল—প্রভু ও দাস, সেব্য ও সেবক। ব্রাহ্মণ জাতির পদলেহন করিয়াই শূদ্রকে তাহার কষ্টকর জীবন কাটাইতে হইত; কোনও উচ্চ সুখে শূদ্রের অধিকার ছিল না। হিন্দু রাজত্ব গেল, ব্রাহ্মণের 'পড়্‌তা' কমিয়া আসিল। মুসলমান রাজত্বে অনেক শূদ্র রাজনিয়োগে উচ্চপদস্থ হইয়া ধনবান হইলেন; ব্রাহ্মণের অপেক্ষা অনেক শূদ্রের অবস্থা বহুগুণে ভাল হইয়া দাঁড়াইল। শূদ্রেরা দানধ্যানে অনেক খরচপত্র করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণের মাথায় টনক নড়িল। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে মহাপণ্ডিত স্মৃতিকারগণ ধর্ম্মসূত্রে প্রচার করিয়া গিয়াছেন—"যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের পৌরোহিত্য করিবে, যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের দান গ্রহণ করিবে, যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের অন্ন ঘরে তুলিবে, তাহার ব্রহ্মণত্বের দফা রফা, অধিকন্তু পরজন্মে তাহাকে শূকর বা কুক্কুর হইয়া পৃথিবীতে আসিতে হইবে।" * ভগবানের ইচ্ছায় দেশ পরাধীন হওয়ায় সব উলট পালট হইয়া গেল। শূদ্রের দ্বারস্থ হওয়া ভিন্ন ব্রাহ্মণের দিন চলা কঠিন হইয়া উঠিল। তখন সূচ্যগ্রবুদ্ধি শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণপণ্ডিতবর্গ বুঝিলেন, প্রাচীন সূত্রের উপর আর কলম না চালাইলে চলে না। তখন তাঁহাদিগকে স্মৃতি-সঙ্কলয়িতৃরূপে 'শূদ্র-কৃত্য-বিচারণ' প্রভৃতি নব্য স্মৃতির আবির্ভাব ঘটাইতে হইল। শূদ্র জাতির মধ্যে আপনাদের আবশ্যকমাত্র কতকগুলি সৎশূদ্র ও অধিকাংশ অনাচরণীয় অর্থাৎ 'জল-চল' নহে, এমন নির্ব্বাচনের বিধান বাহির হইল। শেষোক্তদিগের অবস্থা হিন্দুসমাজে ক্রমে এরূপ শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল যে, তাহাদের অনেকে স্বজাতি-সমাজে ততটা অস্পৃশ্য ঘৃণিত হেয় হইয়া থাকা অপেক্ষা পিতৃ-পিতামহের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করা শতগুণে শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিল। হিন্দু রাজত্বের সময় সমাজের গণ্ডীমধ্য হইতে পলাইবার পথ ছিল না। হিন্দুরাজত্ব-

* বশিষ্ঠ ৬ বা অঙ্গিরা ১।৪৮, ১।৫৩-৫৭, আপস্তম্ব ৮।৯।১১, পরাশর ১২।৩১-৩২, ব্যাস ৪।৬৩—৬৭, মনু ৪।২১৮, ১১।২৪, ১১।৪৩

লোপে শৃঙ্খল ছিঁড়িবার অবসর মিলিল। সমাজের নিম্নশ্রেণীর বহু লোক দলে দলে মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধি করিতে লাগিল। এইরূপ কারণবশতঃ দেশের অনার্য্য আদিম অধিবাসীর অনেকে এবং বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের বিস্তর লোক, যাহাদিগকে ব্রাহ্মণঠাকুরগণ আদৌ আমলে আনিলেন না, তাহারাও মুসলমান হইতে লাগিল; মুসলমান হইয়া হিন্দুদিগের ঘৃণা অবজ্ঞা সুদ সমেত ফিরাইয়া দিতে কশুর করিল না! তেলী, জোলা, নিকারি, পাজারি, পাটুয়া প্রভৃতি জাতির বহুলোক মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণদিগের সামাজিক নির্য্যাতন হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

* বঙ্গদেশে হিন্দুর সংখ্যার হ্রাস হইয়া মুসলমানের সংখ্যা অনর্গল বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। আমরা দেখিয়াছি, ছলে বলে অনেককে মুসলমান করা হইয়াছিল, ব্রাহ্মণদিগের সামাজিক খুঁটিনাটীর শাসনে অনেককে মুসলমান হইতে হইয়াছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের পরিকল্পিত স্মৃতির নির্যাতন এড়াইতে বোধ হয় তদপেক্ষা অধিক লোককে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছে। চণ্ডাল ও নমঃশূদ্রের ব্যাপার অদ্যাপি আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি।

বঙ্গদেশে মুসলমানের সংখ্যা যত, তাহার অনুপাতে ভারতবর্ষের আর কোনও প্রদেশে তত নহে। শেষ আদমসুমারী হইতে জানা যায়, হিন্দুর দেশ এই বাঙ্গালায় অধুনা মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা তেত্রিশ লক্ষ বেশী!

বঙ্গদেশের অধিকাংশ মুসলমানের উদ্ভব কোথা হইতে, আমরা দেখিয়াছি।

আমরা বলিয়াছি, বহুকাল একত্র বাস নিবন্ধন হিন্দু মুসলমান পরস্পরের প্রতি অনেকটা সহানুভূতিপরায়ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন; অনেক প্রকারে পরস্পর আদান প্রদান চলিয়াছিল। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' আমরা দেখিতে পাই, মুসলমান কাজী সাহেব মহাপ্রভুকে বলিতেছেন—

"গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয় আমার চাচা।
দেহ-সম্বন্ধ হইতে গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা।
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা॥"

যবন ব্রাহ্মণে স্নেহের কুটুম্বিতা!

---

* সমগ্র ভারতে মুসলমান সংখ্যা সাড়ে ছয় কোটির উপর (৬৬৬৪৭২৯৯)। ইহার মধ্যে এক বাঙ্গালায় মুসলমান কিছু কম আড়াই কোটি (২৪২৩৭২২৮)। বঙ্গদেশে হিন্দুর সংখ্যা কিছু বেশী দুই কোটি মাত্র (২০১৫৭৩৭৯)।

বহুদিন একত্রবাস নিবন্ধন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধেও উদার ভাব আসিয়াছিল; তাহারই ফলস্বরূপ বঙ্গদেশে মিশ্র-দেবতা সত্যপীরের আবির্ভাব। ক্রমে সেই পীর পাকা হিন্দু ভাবে রূপান্তরিত হইয়া সত্যনারায়ণ-নামে পূজিত হইতেছেন।

আমরা ক্ষেমানন্দ-রচিত 'মনসার ভাসানে' দেখিতে পাই, লখিন্দরের লোহার বাসরে হিন্দুয়ানীর রক্ষাকবচ ও অন্যান্য মন্ত্রপূত সামগ্রীর সঙ্গে একখানি কোরাণও রাখা হইয়াছিল। রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের 'সত্যনারায়ণে' দেবতা মুসলমান ফকীর সাজিয়া ধর্ম্মের ছবক শিখাইয়াছেন। ইতিহাসে দেখা যায়, নবাব মীরজাফরের মৃত্যুকালে তাঁহার পাপক্ষালনের জন্য তাঁহাকে কিরীটেশ্বরী দেবীর চরণামৃত পান করিতে দেওয়া হইয়াছিল। হিন্দুগণ যেরূপ নানা পীরের সিন্নি দিতেন, পীরের দরগায় মাটীর ঘোড়া মানত করিতেন, মুসলমানগণও সেইরূপ বহু দেব-মন্দিরে নানা সামগ্রী ভোগ দিতেন। ত্রিপুরা জেলার মির্জ্জা হোসেন আলি নামক জনৈক মুসলমান জমীদার নিজ বাড়ীতে সমারোহসহকারে কালী-পূজা করিতেন। ঢাকার গরীব হুসেন চৌধুরী সাহেব বিস্তর টাকা ব্যয় করিয়া শীতলা দেবীর পূজা করিতেন। অনেক স্থলে মুসলমানগণের 'গোপী', 'চাঁদ' প্রভৃতি হিন্দু নাম ও হিন্দুদিগের 'ফকীর' 'জহর' প্রভৃতি মুসলমানী রকম নাম এখনও প্রদত্ত হইয়া থাকে। পীর গোরাচাঁদ, মুস্কিল আসান এখনও হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের ঘর হইতে সেলামী আদায় করিতেছেন।

মুন্সী আবদুল করিম সাহেব স্বয়ং মুসলমান; তিনি জানাইয়াছেন,—কুসংস্কার কি ভক্তির বশে বলা যায় না, হিন্দুগণ মুসলমান পীরের ও মুসলমানগণ হিন্দু দেবতার পূজা করিতে কুণ্ঠিত বা বিরত হন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, আজও চট্টগ্রামে মুসলমানের মধ্যে কেহ কেহ কাত্যায়নীর ব্রত পালন করেন। অনেক হিন্দুও সত্যপীর, মাণিকপীর ইত্যাদির সিন্নি দিয়া থাকেন। অতি অল্প দিন হইল, মুসলমানসমাজ হইতে মনসা-পূজা লোপ পাইয়াছে, এবং হিন্দুসমাজ হইতেও গাজী কালুর সম্মাননা উঠিয়া যাইতেছে। সেকালে শিক্ষার প্রসার এত অধিক না থাকিলেও, হিন্দু মুসলমানে বর্ত্তমান কালের মত এমন অহি-নকুল ভাব ছিল না। দুঃখের বিষয়, শিক্ষা-বিস্তৃতির সঙ্গে অধুনা এই দুই জাতির মধ্যে একটা ব্যবধানের সৃষ্টি হইতেছে। *

---

* পূর্ব্ববঙ্গের জনৈক উচ্চতমপদস্থ রাজপুরুষ সুয়ো রাণী দুয়ো রাণীর কথা মুখে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সপত্নী-বিদ্বেষ চিরপ্রচলিত। ইঁহাদের মূলমন্ত্র বোধ হয় Divide and Rule। এ মন্ত্র বিপদ্ আনিতে পারে।

বাস্তবিক, পূর্ব্বকালে মুসলমানী প্রভাব-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমানে সদ্ভাব ও সহৃদয়তা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেকালে অনেক মুসলমান হিন্দুর সংসর্গ প্রীতিজনক মনে করিতেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এমন কি, ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও তাঁহারা ভক্তি-শ্রদ্ধা-সহকারে হিন্দুর দেবদেবীগণের উপাসনা করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। বঙ্গের মুসলমানী সাহিত্যে দৃষ্ট হয়, কোনও কোনও মুসলমান কবি স্বরচিত-গ্রন্থমধ্যে স্বরস্বতীর বন্দনা করিয়াছেন; সুপ্রসিদ্ধ ফকীর দরাফ খাঁ সংস্কৃত ভাষায় গঙ্গাস্তোত্র লিখিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার গঙ্গাষ্টকের শেষ শ্লোকটি এই—

"সুরধুনি মুনিকন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তং
স তরতি নিজপুণ্যৈ স্তত্র কিন্তে মহত্ত্বম্।
যদি চ গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং
তদিহ তব মহত্ত্বং তন্মহত্ত্বং মহত্ত্বম্।"

অন্যধর্ম্মী যবনের মুখে এমন প্রকৃত ভক্ত সাধকের বাণী শুনিয়া পুলকিত না হইয়া থাকা যায় না। শ্লোকটি অপর এক জন ভিন্নধর্ম্মী কবির একটি উদার গান মনে পড়াইয়া দেয়। কবিওয়ালা খৃষ্টান অ্যাণ্টনি ফিরিঙ্গী একদিন 'ভবানী বিষয়' গাহিয়াছিলেন—

"ভজন পূজন জানিনে মা জাতিতে ফিরিঙ্গী।
যদি দয়া করে তার মোরে এ ভবে মাতঙ্গী॥"

'রাগমালা', 'তানমালা' প্রভৃতি মুসলমান-রচিত সঙ্গীত গ্রন্থে দেখা যায়, বহু মুসলমান কবি হিন্দু দেবতাবিষয়ক ব্রজলীলা-ঘটিত গান রচনা করিয়া গিয়াছেন। সম্রাট আকবার বাদশাহের রাজগায়ক মিঞা তানসেন প্রভৃতি অনেক ওস্তাদ শক্তিদেবী ও মহাদেবের প্রসঙ্গে গীত রচনা করিয়া উদারতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

সৈয়দ জাফর খাঁ ও মূর্জা হুসেন আলির শ্যামা-সঙ্গীত প্রসিদ্ধ। হুসেন আলির একটি গান—

"যা রে শমন, এবার ফিরি।
এস না মোর আঙিনাতে, দোহাই লাগে ত্রিপুরারি॥
আমি তোমার কি ধার ধারি!
শ্যামা মায়ের খাস তালুকে বসত করি॥
বলে মূর্জা হুসেন আলি—যা করে মা জয়কালী,
পুণ্যের ঘরে শূন্য দিয়ে পাপ নিয়ে যাও নিলাম করি॥"

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশে মুসলমানের সংখ্যা অধিক—খাস বাঙ্গালায় প্রায় সার্দ্ধ দুই কোটী। এই আড়াই কোটী মুসলমান সবই যে পাঠান বা মোগল, সবই যে ভারতের বহির্ব্বর্ত্তী দেশ আফগানিস্থান তুর্কিস্থান হইতে আমদানী, এমন নহে। সবই যে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত খাঁটী মোগল পাঠানের সন্তান, এখানকার উপনিবেশী, এমনও নহে। আমরা দেখাইয়াছি, এই বিশাল মুসলমান জনসঙ্ঘের অনেকটা অংশ এই দেশেরই লোক; হিন্দু বা অপর জাতি; 'কারে পড়িয়া' স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছেন। * যাঁহারা পরদেশী, তাঁহারাও বঙ্গদেশে বহুকাল বাসনিবন্ধন ক্রমে বাঙ্গালীর রীতি নীতি আচার ব্যবহার কতক কতক গ্রহণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বত্রই এই প্রকার হইয়া থাকে। কিন্তু লেখাপড়ার বেলা কি হইত? বাঙ্গালা ভাষার সহিত ইঁহাদের সম্পর্ক কত দূর? বঙ্গের এই বিশাল মুসলমান জাতির সাহিত্য কই? মুসলমানী ভাষার কথা জানি না, কিন্তু দেশ-ভাষায় ইঁহাদের অভিজ্ঞতার পরিচয় কই? নিম্নশ্রেণীর লোকের কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম—হিন্দু মুসলমান উভয়ই নিরক্ষর; কিন্তু সমাজের উচ্চস্তরের লোকের সম্বন্ধে কি বলা চলে? তাঁহারা দেশের ভাষার সহিত কতটা সংস্রব রাখিতেন? প্রায় চারি শত বৎসরের পাঠান-রাজত্বের ভিতর মুসলমানের রচিত কয়খানি বাঙ্গালা বহির (পুঁথি বা রচনা) বা কোনরূপ সন্দর্ভের সন্ধান পাওয়া যায়? সে যুগেও দেশী মুসলমান ত বিস্তর ছিলেন।

আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণের এ বিষয়ে কি বলিবার আছে, শুনা যাউক। আমরা মুন্সী এক্রামুদ্দীনের কিছু কিছু কথা শুনাইব। তিনি বলেন—মুসলমান-গণ বাঙ্গালা ভাষায় যে সেরূপ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই, তাহার কারণ,—প্রথমতঃ তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা করেন নাই। যখন স্পেন হইতে ভারত পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ তাঁহাদের করতলগত, তখন তাঁহারা বিজাতীয়ের সহিত বাস করিয়াও জাতীয় ভাষা ত্যাগ করেন নাই। বিজাতীয় ভাষায় বাক্যালাপে পর্য্যন্ত তাঁহারা আন্তরিক ঘৃণা প্রকাশ করিতেন। ভারতের রাজভাষা ছিল পারসী; সুতরাং রাজত্বের শেষ সময় পর্য্যন্ত তাঁহাদের দেশীয় ভাষায়

* বাঙ্গালা দেশের প্রায় আড়াই কোটী মুসলমানের ভিতর ইদানীং পাঠান দুই লক্ষ আশী হাজার আট শত নব্বই জন; মোগল চৌদ্দ হাজার ছয় শত সাতাইশ জন মাত্র; মোট তিন লক্ষেরও কম। পূর্ব্বে বেশী ছিল, সম্ভব।

অনুরাগের সঞ্চার হইল না। মুসলমান-রাজত্বের অবসানে এবং ইংরাজের শুভাগমনের পরও বহুদিন আদালতের ভাষা পার্‌সীই রহিয়া গেল। সুতরাং এ দেশীয় ভাষার প্রতি তাঁহাদের আবজ্ঞা দূর হইল না। সম্প্রতি বাঙ্গালায় আদালত-সমূহে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত হইয়া মুসলমানের মধ্যে কিয়ৎপরিমানে বাঙ্গালা ভাষার আলোচনা আরব্ধ হইলেও, এখনও তাঁহারা স্কুল কলেজে সাধারণতঃ পার্‌সী ও উর্দ্দু ভাষাই শিক্ষা করেন। বাঙ্গালা ভাষার রীতিমত আলোচনা না থাকাই মুসলমানের বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভ না করিবার প্রধান হেতু বলিয়া অনুমিত হয়।

কথাটা আংশিক সত্য বটে। পরদেশী মুসলমান—আসল মোগল পাঠান, কিংবা তাঁহাদের বংশধরের পক্ষে উল্লিখিত মত খাটে বটে; কিন্তু এ-দেশী মুসলমান—যাঁহাদের দায়ে পড়িয়া পরধর্ম্মগ্রহণ—এবং তাঁহাদের উত্তরপুরুষগণ সম্বন্ধেও কি এই কথা বলা চলে? তাঁহাদের ভাষা ত বাঙ্গালা ভাষা ছিল; ফল্গু নদীর মত হিন্দু মত ভাবও তাঁহাদের অন্তরে অন্তরে বহিত, এরূপ অনুমানও অসঙ্গত হইবে না। বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালা-ভাষা-ভাষী মুসলমানের তুলনায় উর্দ্দু বা-হিন্দু ভাষাভাষী মুসলমানের সংখ্যা নগণ্য, এ কথা বোধ হয় উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। ১৯১১ সালের সেন্‌সস্‌ রিপোর্ট হইতে অবগত হওয়া যায়, নূতন বাঙ্গালার জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে চারি কোটী (৪৬৩০৪৬৪২)। ইহার ভিতর মুসলমান প্রায় আড়াই কোটী (২৪২৩৭২২৮)। কিন্তু বাঙ্গালা-ভাষাভাষীর সংখ্যা মোট কুড়ি লক্ষেরও কম (১৯১৭৩৯০)। ইহার ভিতর অবশ্য হিন্দী-ভাষা-ভাষী পশ্চিমা হিন্দুও অনেক আছেন। ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায়, বঙ্গদেশে প্রায় আড়াই কোটী মুসলমানের ভিতর ২৮৫০ জনের ভাষা পষ্‌তু; ৮৪০ জনের আর্‌বী; ১১৬২ জনের ফার্‌সী। অতএব, খাঁটী মুসলমানী-ভাষাভাষীর সংখ্যা মোট ৪৮৫২; অর্থাৎ, মোট পাঁচ হাজারেরও কম। অবশ্য, উর্দ্দু ভাষা ধরিলে এই সংখ্যা আরও কিছু বাড়ে; কিন্তু সে কত, তাহাও আমরা দেখাইয়াছি।

আলি রাজা অনেক পদেই আপনাকে 'রাধা-কানু-চরণ-ভক্ত' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ইঁহার রচিত শ্যামা-সঙ্গীতও আছে।

অনেকগুলি মুসলমান বৈষ্ণব-কবি আবিষ্কৃত হইয়াছেন। ভিন্নধর্ম্মী কবিগণ মধুর ভাষায় মধুর ভাবে রাধাকৃষ্ণেরলীলা, বাল্যলীলাও গোষ্ঠ বা সখ্যের বর্ণনা করিয়াছেন। অনেক স্থলে রচনা এমন সুন্দর হইয়াছে যে, ভণিতা

না থাকিলে কাহার সাধ্য স্থির করে যে, রচনা মুসলমানের। গীতগুলিতে হিন্দুভাব ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান। চট্টগ্রাম হইতে বিস্তর বৈষ্ণব পদাবলী পাওয়া গিয়াছে।

চট্টগ্রামে হিন্দু-মুসলমান সামাজিক আচার ব্যবহারে যত দূর সন্নিহিত হইয়াছিলেন, অন্যত্র সেরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। চট্টগ্রামের কবি হামিদুল্লার 'ভেলুয়া সুন্দরী' কাব্যে বর্ণিত আছে, লক্ষপতি সদাগর পুত্রকামনায় ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে আহ্বান করিলেন, এবং সওদাগরের পুত্র বাণিজ্যে যাইবার পূর্ব্বে 'বেদ-প্রায়' পিতৃবাক্য মান্য করিয়া আল্লার নাম গ্রহণপূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। ১৫০ বৎসরের প্রাচীন কবি আপ্তাবুদ্দীন তাঁহার 'জামিল দিলারাম' কাব্যে নায়িকা দিলারামকে পাতালে প্রেরণ করিয়া সপ্ত ঋষির নিকট বর-প্রার্থনায় নিযুক্ত করিয়াছেন, এবং তাঁহার রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে 'লক্ষ্মণের চন্দ্রকলা' 'রামচন্দ্রের সীতা', 'বিদ্যাধরী চিত্ররেখা' ও 'বিক্রমাদিত্যের ভানুমতী'র সহিত তুলনা করিয়াছেন।

চট্টগ্রামে কিছুকাল পূর্ব্বে সঙ্গীতবিদ্যারও বিলক্ষণ অনুশীলন ছিল বলিয়া বোধ হয়। অনেক স্থান হইতে রাগ-তান-সম্বন্ধীয় অনেকগুলি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থগুলির নাম,—'রাগমালা', 'ধ্যানমালা', 'রাগনামা', তালনামা', 'তালমালা' ইত্যাদি। এই গ্রন্থগুলিতে রাগ-তান সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য নানা কথাই আলোচিত হইয়াছে। প্রত্যেক রাগে এক একটি প্রাচীন সঙ্গীত বা পদ বিন্যস্ত আছে। পদগুলি ভিন্ন ভিন্ন কবির রচিত। তাঁহাদের মধ্যে অনেক মুসলমান কবিও আছেন। অধিকাংশ পদই কৃষ্ণলীলাত্মক। মুন্সী আবদুল করিম সাহেব জানাইয়াছেন,—তিনি কেবল স্বীয় চেষ্টায় পাঁচ শতের অধিক হস্ত-লিখিত পুঁথি, সন্দর্ভ-পুস্তক ও প্রায় দেড় শত কবির পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে অবশ্য কতকগুলি বিদেশীয় (অর্থাৎ চট্টগ্রামের বাহিরের) রচয়িতা, কিন্তু অধিকাংশই—চট্টগ্রামবাসী না হউন—অন্ততঃ পূর্ব্ববঙ্গবাসী, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মুন্সী করিম সাহেব একটি প্রবন্ধে ৮৫ জন প্রাচীন মুসলমান কবির পরিচয় দিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই একমাত্র চট্টগ্রামে আবির্ভূত। এই হিসাবে সমগ্র বাঙ্গালায় কত কবির আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। চট্টগ্রামেও অদ্যাপি সকল স্থানের অনুসন্ধান শেষ হয় নাই; সুতরাং মুন্সীজীর তালিকা এখনও অসম্পূর্ণ। সাহেব লিখিয়াছেন—"বলিতে যুগপৎ

দুঃখ ও লজ্জা হয়, এই সকল কবির পুঁথি আমি সামান্য হাড়ীদিগের নিকট পাইয়াছি।" চট্টগ্রামের হাড়ী মুচিও কবির মর্য্যাদা বুঝে; কবির রচনা সযত্নে তাহারাও রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

এই পঁচাশী জন ভিন্ন অনেকগুলি গ্রন্থের রচয়িতার নাম প্রকাশিত না থাকায় জানা যায় নাই। অনেক কবি কোনও ধারাবাহিক গ্রন্থের রচনা না করিয়া কেবল সঙ্গীত, পদ ইত্যাদিই লিখিয়া গিয়াছেন।

উল্লিখিত কবিগণের প্রায় সকলেই 'ভাষা বাঙ্গালা' লিখিয়া গিয়াছেন। অধিকাংশই মুসলমানী বাঙ্গালা। তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিয়াছেন, অথচ আরবী বা পারসীতে রচিত গ্রন্থাদির নামকরণ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে অনেকগুলি আরবী কি পারসী গ্রন্থের অনুবাদ; সুতরাং সেগুলির এই প্রকার নামকরণ অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল।

মুসলমান কবিগণের সময়-নির্দ্ধারণের সুযোগ আজিও উপস্থিত হয় নাই। সংগ্রহ কার্য্য শেষ হইলে, এবং তাহা মুদ্রাযন্ত্র সাহায্যে লোকলোচনের গোচরীভূত হইলে, অনেকের সময় স্পষ্ট নির্দ্ধারিত হইতে পারিবে, আশা করা যায়। অল্প কবিই গ্রন্থমধ্যে আপনার পরিচয় বা আবির্ভাব-কালের অতি সামান্য উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সংক্ষেপতঃ এ কথা বলা যাইতে পারে যে, প্রায় সমস্ত কবিই এক শত হইতে সার্দ্ধ তিন শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী হইবেন। অবশ্য দুই চারি জন খুব আধুনিকও হইতে পারেন। ইঁহাদিগের মধ্যে চল্লিশ জনেরও অধিক বৈষ্ণব-পদাবলীরচয়িতা।

গৌড়ের মুসলমান অধিপতিগণের উৎসাহে অনেক সুপণ্ডিত বাঙ্গালী হিন্দু-শাস্ত্রাদির অনুবাদে অগ্রসর হইয়াছিলেন, আমরা জানি। খ্যাতনামা মালাধর বসু শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ করিয়া গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

মুসলমান কবিগণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। মুসলমান রাজকর্ম্মচারিগণ অনেকে অর্থ-সাহায্য দিয়া বাঙ্গালী হিন্দুকে মহাভারতের অনুবাদে প্রবর্ত্তিত করেন, তাহার নিদর্শন আমরা পাইয়াছি। সুপ্রসিদ্ধ হুসেন শাহার বিখ্যাত সেনাপতি পরাগল খাঁর সাহায্যে কবীন্দ্র পরমেশ্বর (স্ত্রী পর্ব্ব-পর্য্যন্ত) প্রায় সমগ্র মহাভারতের এবং তদীয় পুত্র ছুটি খাঁর কল্যাণে শ্রীকর নন্দী অশ্বমেধ পর্ব্বের অনুবাদ করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের সময় হইতে হিন্দু বৈষ্ণব-কবিগণ

যেরূপ নানা গ্রন্থাদি লিখিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অনুকরণে সেইরূপ অনেক মুসলমান কবিও বহু গীত ও গ্রন্থের রচনা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি করিয়াছেন। এই সকল রচনা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, সুপণ্ডিত মুসলমানগণও হিন্দুর শাস্ত্র ও বাঙ্গালা ভাষাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। বাস্তবিক, এক সময়ে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কত দূর সদ্ভাব ও প্রীতি স্থাপিত হইয়াছিল!

বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুকরণ ব্যতীত মুসলমান কবিগণ ইস্‌লাম-জগতের অনেক মৌলিক বৃত্তান্ত বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত করিয়া এবং রচনা করিয়া ভাষার কলেবর পুষ্ট করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে ইস্‌লাম ধর্ম্মের ব্যাখ্যা, তত্ত্ব, নীতি, উপদেশ প্রভৃতিও আছে; এবং ইতিহাস, উপাখ্যান, গল্প, সঙ্গীত, গাথাও অনেক পাওয়া যায়।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য আগাগোড়াই পদ্য সাহিত্য। বঙ্গদেশে হিন্দুর ন্যায় মুসলমানের রচনাও প্রায় সমস্তই পদ্যে রচিত। গদ্য খুব কমই দৃষ্ট হয়।

জনৈক মুসলমান সমালোচক লিখিয়াছেন,—মুসলমানগণ চৈতন্যদেবের সৃষ্ট প্রেম-বন্যার দু এক ঢোঁক ইচ্ছা বা অনিচ্ছা সত্বে উদরস্থ করিয়া তাহাই প্রস্রবণে পরিণত করিয়া ক্ষান্ত থাকিলেন না। তাঁহাদের প্রস্রবণ হইতে নানাবিধ রত্নের উদ্ভব হইল। কবি দৌলত কাজি আনুমানিক ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে 'লোর চন্দ্রানী' ও কবি আলাওল প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে 'পদ্মাবতী' প্রভৃতি কাব্য রচনা করিয়াছেন।

হিন্দু ভাবের কথা মুন্সীজী মানিবেন না, কিন্তু ভাষা সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার মতে, হিন্দু ভাব মুসলমানের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে না পারিলেও তাঁহারা ভাব-প্রকাশের নিমিত্ত বাঙ্গালা-ভাষী মুসলমানগণের জন্য এক অদ্ভুত বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি করিলেন। (বহুকাল ভারতবর্ষে অবস্থান হেতু মুসলমানের আর্‌বী পার্‌সী ভাঙ্গিয়া দেশভাষা হিন্দীর সহিত মিশ্রিত হইয়া উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে উর্দ্দু ভাষা জন্মিয়াছিল)। উর্দ্দুর সহিত বাঙ্গালা ভাষার মিশ্রণে বঙ্গে এক নূতন মিশ্র-ভাষার উৎপত্তি হইল। উর্দ্দু ও বাঙ্গালা মিশ্রিত ভাষার কবিতায় মুসলমানগণ-লিখিত পুঁথি সকলের বহুল প্রচার হইল, এবং উর্দ্দু-ভাষানভিজ্ঞ মুসলমানগণ সমাদরের সহিত তাহা পাঠ করিতে লাগিল। এই শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যে আজিও ঐ সকল পুস্তকের আদর অক্ষুন্ন রহিয়াছে, এবং সন্ধ্যাকালে মুসলমান-পল্লীতে গমন করিলে দেখিতে

পাওয়া যাইবে, সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর, অবসরপ্রাপ্ত মুসলমানগণ (বাঙ্গালী) 'গোলে হরমুজের' প্রণয়-কাহিনী বা 'কারবালার যুদ্ধ'-বৃত্তান্তের ন্যায় কোনও উপাখ্যান অত্যন্ত একাগ্রতাসহকারে শ্রবণ করিতেছে।

উচ্চ শ্রেণীর লেখক ও পাঠক এ দেশে থাকিয়াও পারসী ভাষার পরিপুষ্টি-সাধন করিতে লাগিলেন; সুতরাং নবসৃষ্ট উর্দ্দু-বাঙ্গালা-মিশ্র ভাষা নিম্নশ্রেণীর মুসলমানগণের মধ্যেই আবদ্ধ রহিল।

আমরা এই ভাষাকে মুসলমানী বাঙ্গালা বলিতে পারি। স্বীকার করিতেই হয়, বঙ্গদেশে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চ্চা যৎসামান্য ছিল। * কিন্তু বাড়িতেছিল; এবং ক্রমে নবসৃষ্ট এই মিশ্র-ভাষাও মার্জ্জিত হইয়া বিশুদ্ধ বাঙ্গালার সন্নিহিত হইতেছিল। বিশেষতঃ, যখন যথার্থ গুণী ব্যক্তির হাতে পড়িতেছিল, তখন তাহার ভাব ও গঠন উৎকৃষ্টই দাঁড়াইতেছিল। কবি আলাওল, আলি রাজা, সৈয়দ মর্ত্তুজা প্রভৃতি কবির রচনা বাঙ্গালী হিন্দু কবির হাতের হইলেও গৌরবের সামগ্রী হইত।

পাঠান রাজত্বের শেষাশেষি গৌড়েশ্বর সুলতান হুসেন শাহার আমল বাঙ্গালা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এ সময়ে বঙ্গে ভাব ও ভাষার বন্যা আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহাতে হিন্দু মুসলমান সকলকেই মাতিয়া উঠিতে হইয়াছিল। সেই সময়ে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য প্রভুর আবির্ভাব।

চৈতন্য-যুগে যখন প্রেমের দুর্নিবার স্রোত গৌড় বা বাঙ্গালা দেশ প্লাবিত করিল, তখন তাহা মুসলমানের ঘেরা আঙ্গিনার মধ্যেও প্রবেশ করিতে বাকি থাকিল না। তৎকালেই প্রেমপূর্ণ বৈষ্ণব-হৃদয়ের উচ্ছ্বাস পদাবলী-রূপে পরিস্ফুট হইতে লাগিল, এবং তাহা গৃহে গৃহে গীত হইয়া মুসলমানকেও চলিত বাঙ্গালা ভাষা শিখাইয়া ফেলিল। শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল। এক কালেই ভাব ও ভাব-প্রকাশের শক্তি ধীরে ধীরে মুসলমানের হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করিল; এবং একে একে মুসলমান বৈষ্ণব-কবিগণের আবির্ভাব হইতে লাগিল।

এই সকল মুসলমান কবি প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন কি না, সে বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত কোনও পক্ষেই বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই; কিন্তু তাঁহারা

* শেষ সেন্‌সস্-রিপোর্ট হইতে সংবাদ পাওয়া যায়, আজ পর্য্যন্ত এই লেখাপড়ার চর্চ্চার দিনেও, প্রায় আড়াই কোটী মুসলমানের ভিতর লেখাপড়া-জানা লোক—দশ লক্ষ মাত্র। পূর্ব্বে আরও কম ছিল।

বৈষ্ণব পদাবলীর রচয়িতা বলিয়া সাহিত্য-জগতে 'বৈষ্ণব কবি' আখ্যা পাইয়াছেন। এক জনের একটু পরিচয় দি—

চট্টগ্রামবাসী কবি আলিরাজা। আলি রাজার গীতে রাধা কৃষ্ণের লীলা বর্ণনা আছে। তিনি বৈষ্ণবীয় মধুর রস গাহিয়াছেন। মুসলমান হইয়া তিনি এরূপ করিলেন কেন? কেহ কেহ বলেন মুসলমান ফকীরদিগের মতে মানব-দেহই রাধা ও মনই কানু। যদি এই পথ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে আলি রাজা প্রভৃতি কবিগণকে মুসলমান বৈষ্ণব কবি নামে অভিহিত করা অসঙ্গত হয় না। আলি রাজার একটি গান—

"অই না লোহে আমার   দুঃখ সাক্ষী পীতাম্বর!
সর্ব্ব জগ দেখি ধান্ধা।
অই চতুর্ভুজ বিনে   আনরে না মানে মনে,
সে রাঙা চরণে প্রাণি বান্ধা।'

আলাওল সম্বন্ধে কোন প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ কহিয়াছেন—কবিশ্রেষ্ঠ সৈয়দ আলাওল সাহেব বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। মুসলমান জাতির মধ্যে ত তিনি মহাকবির স্বর্ণসিংহাসনে সমাসীন আছেনই, গুণ তুলনায় তাঁহার সম-সাময়িক হিন্দু কবি-কুলেও তাঁহার আসন অতি উচ্চে। বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে মাতৃভাষায় (বাঙ্গালায়) এবং তাহার জনয়িত্রী সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার ন্যায় এতটা প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও ব্যুৎপত্তি লাভে কেহ কখনও সমর্থ হন নাই এবং হইবেন কি না সন্দেহ।

আলাওল জন্মগ্রহণ করেন ফরিদপুরে, কিন্তু তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল চট্টগ্রামে (রোসাঙ্গে)। তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। সমস্ত বঙ্গীয় মুসলমান কবিগণের মধ্যে আলাওলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র তাঁহার কাব্যের বিস্তারিত সমালোচনা করিয়াছেন। 'পদ্মাবতী' কাব্যে আলাওলের গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে। কবিবর পিঙ্গলাচার্য্যের মগন রগণ প্রভৃতি অষ্ট মহাগণের তত্ত্ব বিচার করিয়াছেন; খণ্ডিতা, বাসকসজ্জা ও কলহান্তরিতা প্রভৃতি অষ্টনায়িকার ভেদ ও বিরহের দশ দশা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়াছেন; আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র লইয়া উচ্চাঙ্গের কবিরাজী কথা শুনাইয়াছেন; জ্যোতিষ প্রসঙ্গে লগ্নাচার্য্যের ন্যায় যাত্রার শুভাশুভের এবং যোগিনী চক্রের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন; একজন প্রবীণা এয়োর মত হিন্দুর বিবাহাদি ব্যাপারের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আচারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ও

পুরোহিত ঠাকুরের মত প্রশস্ত বন্দনার উপকরণের একটি শুদ্ধ তালিকা দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত টোলের পণ্ডিতের মত অধ্যায়ের শিরোভাগে সংস্কৃত শ্লোক তুলিয়া দিয়াছেন। এই পুস্তক পড়িলে স্বতঃই মনে হইবে মুসলমানের এতটা হিন্দু ভাবাপন্ন হওয়া নিতান্তই আশ্চর্য্যের বিষয়। গ্রন্থে পাণ্ডিত্যের সঙ্গে কবিত্বও প্রগাঢ়। আলাওল কবির কথায় বাঁধুনির পরিচয় দিতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করি—

বসন্তে নাগরবর নাগরী বিলাসে।

বর বালা দুই ইন্দু স্রবে যেন সুধাসিন্ধু মৃদুমন্দ অধরে ললিত মধু হাসে॥
প্রফুল্লিত কুসুম মধুব্রত ঝঙ্কৃত হুঙ্কৃত পরভৃত কুঞ্জে রত রাসে।
মলয় সমীর সুসৌরভ সুশীতল বিলোলিত পতি অতি রস ভাষে॥
প্রফুল্লিত বনস্পতি কুটিল তমালিক্রম মুকুলিত চূতলতা কোরকজালে।
যুবজন হৃদয় আনন্দে পরিপূরিত রঙ্গমল্লিকা মালতীমালে॥

ভাষা জয়দেব কবির কোমল কান্ত পদাবলী মনে পড়াইয়া দেয়।

অপর স্থল হইতে আলাওলের একটু রূপ বর্ণনা শুনাই—

কুটিল কবরী কুসুম মাঝে। তারকা-মণ্ডলে জলদ সাজে॥
শশীকলা প্রায় সিন্দুর ভালে। বেড়ি বিধুমুখ অলক জালে॥
সুন্দরী কামিনী কাম বিমোহে। খঞ্জন-গঞ্জন নয়নে চাহে॥
মদন ধনুক ভুরু-বিভঙ্গে। অপাঙ্গ ইঙ্গিত বাণ তরঙ্গে॥
নাসা খগপতি নহে সমতুল। সুরঙ্গ অধর বাঁধুলী ফুল॥
দশন মুকুতা বিজলি হাসি। অমিয় বরিষে আঁধার নাশি॥
উরজ কঠিন হেম কঠোর। হেরি মুনিজন মন বিভোর॥
হরি করি-কুম্ভ কটি নিতম্ব। রাজহংস জিনি গতি বিলম্ব॥
কবি আলাওল মধু গায়। আপন আরতি রহুক অদায়॥

পড়িতে পড়িতে অনেকের সহজ সুন্দর ভাষা ও ছন্দে ভারত চন্দ্রকে স্মরণ হইবে। আমাদের মনে রাখিতে হয়, কবি আলাওল ভারতচন্দ্রের প্রায় শত বর্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী, সুতরাং মুসলমান কবির গুণপণা বিস্ময়জনক।

আমরা বলিয়াছি অনেকগুলি মুসলমান বৈষ্ণব কবি আবির্ভূত হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে সৈয়দ মর্ত্তুজা একজন শ্রেষ্ঠ কবি। দুই দিকে দুই জন সৈয়দ মর্ত্তুজার কীর্ত্তি চিহ্ন প্রকাশিত হইয়াছে। পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে এক সৈয়দ মর্ত্তুজার পদাবলী দৃষ্ট হয়। তিনি মুরসিদাবাদ-বাসী ছিলেন। আর চট্টগ্রামে এক সৈয়দ মর্ত্তুজার পদাবলী আবিষ্কৃত হইয়াছে। উভয় মর্ত্তুজার অনেকগুলি পদ সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে উৎকৃষ্ট হিন্দু কবির রচনার সমকক্ষ হইতে পারে।

মুর্‌সিদাবাদের সৈয়দ্ মর্ত্তুজা সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় লিখিয়াছেন—মর্ত্তুজার এরূপ উদার ধর্ম্মভাব ছিল যে মুসলমানেরা তাঁহাকে ফকির, তান্ত্রিকেরা সাধক, এবং বৈষ্ণবেরা একজন প্রসিদ্ধ ভক্ত বলিয়া মনে করিতেন।

চট্টগ্রামের মর্ত্তুজা সম্বন্ধে একজন মুসলমান সমালোচক লিখিয়াছেন—তিনি অতি উদার ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি বৈষ্ণব ও মুসলমানধর্ম্মের সার উপলব্ধি করত উভয় ধর্ম্মের মূলমন্ত্র অভিন্ন দেখিয়া মহামতি কবীরের ন্যায় গাহিয়া গিয়াছেন 'যে রাম সেই রহিম।'

দুই মর্ত্তুজা একই ব্যক্তি কি না, এখনও সে বিষয়ে কিছু নির্দ্ধারিত মীমাংসা হয় নাই; উপস্থিত আমরা দুইজনই ধরিয়া লইতেছি।

মুর্‌সিদাবাদের সৈয়দ মর্ত্তুজার একটি পদ—

শ্যাম বন্ধু চিত নিবারণ তুমি।
কোন শুভদিনে দেখা তোমা সনে পাসরিতে নারি আমি॥
যখন দেখিয়ে ও চাঁদ বদন ধৈরজ ধরিতে নারি।
অভাগীর প্রাণ করে আন্‌চান্ দণ্ডে দশবার মরি॥
মোরে কর দয়া দেহ পদছায়া শুনহ পরাণ কানু।
কুল শীল সব ভাসাইনু জলে প্রাণ না রহে তোমা বিনু॥
সৈয়দ মর্ত্তুজা ভণে কানুর চরণে নিবেদন শুন হরি।
সকল ছাড়িয়া রহিল তুয়া পায়ে জীবন মরণ ভরি॥

এরূপ গান চণ্ডীদাসকে মনে পড়াইয়া দেয় না কি?

চট্টগ্রামের মর্ত্তুজার একটি পদ—

কি কহিব অএ সখি কালা গুণনিধি।
অনেক পুণ্যের ফলে মিলায়েছে বিধি॥
সাত পাঁচ সখী মেলি যমুনাতে আসি।
কালা নিল জাতি কুল প্রাণ নিল বাঁশী
চূড়া এ কদম্ব পুষ্প পত্র সারি সারি।
দেখেছি অবধি রূপ পাসরিতে নারি॥
চৌদিকে নিকুঞ্জ লতা মধ্যেরে যমুনা।
তার মাঝে বসিয়াছে মন্মের মন্দনা॥
ছৈয়দ মর্ত্তুজা কহে শুন প্রাণসখি।
এমুন বিনোদরূপ কভু নাহি দেখি॥

ইঁহার রচিত একটি সুন্দর পদ হইতে তাঁহার প্রকৃত ধর্ম্মমতের আভাস পাওয়া যায়; আমরা উঠাই—

সই এক বিনে মাওলা এক বিনে আর নাহি কোই।
আপে হরে আপে রাখে সখি মন্তলা আপে করে কেলি।
আনন্দ মোহন মাওলা খেলয়ে ধামালি।
আপে মন আপে তন আপে মম হরি।
আপে কানু আপে রাধা আপে সে মুরারি।

মুসলমানের রচনা, সাধক সঙ্গীতের মত শুনায়। ভক্তবীর রামপ্রসাদ এক-দিন গাহিয়াছিলেন—

মন ক'র না দ্বেষাদ্বেষি।
মহাকালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম সকল আমার এলোকেশী।

মুরসিদাবাদী সৈয়দজীর আর একটি পদ—ভাব সম্মিলন:—

ওহে পরাণ বঁধু তুমি।
কি আর বলিব আমি।
তুমি সে আমার আমি সে তোমার
তোমার তোমাকে দিতে কি যাবে আমার।
কে জানে মনের কথা কাহারে কহিব।
তোমার তোমারে দিয়া তোমার হৈয়া রব।
সৈয়দ মর্ত্তুজা কহে আমি ও না জানি।
ভবসিন্ধু হৈতে পার যে কর আপনি।

ভণিতা না থাকিলে জ্ঞানদাস কি সেই রকম কাহারও রচনা মনে হইত।

মুসলমান কবিগণের রচনা হইতে আমরা একটি গোষ্ঠলীলা শুনাই। ইহার রচয়িতা নাসির মহম্মদ—

চলত রাম সুন্দর শ্যাম ধেনু সঙ্গে গোঠে রঙ্গে
পাঁচনি কাচনি বেত্র বেণু মুরলী খুরলি গান রি
প্রিয় শ্রীদাম সুদাম মেলি তপন তনয়া তীরে কেলি
ধবলি শাঙলি আঁওরি, আওরি ফুকারি চলত কান রি।
বয়সে কিশোর মোহন ভাতি বদন ইন্দু জলদ কাঁতি
চারু চন্দ্রক গুঞ্জা হার বদনে মদন ভান রি।
আগম নিগম বেদ সার লীলায় করত গোঠবিহার
নসির মামুদ করত আশ চরণে শরণ দান রি।

আমরা মুসলমান কবির রচিত ব্রজবুলী একটি শুনাই। দোললীলা,

বয়জ কিশোরী কান্তি খেলত রঙ্গে।
চুয়া চন্দন আবীর গুলাব ফেরত শ্যামর অঙ্গে।

কাণ্ড হত করি	ফিরত শ্রীহরি	ফিরি ফিরি বোলত নাই।
ঘুঘট উঠায়ে	বয়ানে ছাপায়ত	বেরি বেরি যৈসে মেঘমে চাঁদ লুকাই।
ললিতা এক সখী	কাণ্ড হাত করি	দেয়ত কানু নয়ান
বৃকভানু কিশোরী	দুঁহু বাহু ধরি	মারত শ্যাম বয়ান।
আওর এক সখী	জীউ জীউ করি	কাঁহা লাগাওয়ে আবীর।
কমরি কাণ্ড লেই	কান নয়ানে	বেরি দেওত হঁ হা করত কবীর।

রচয়িতা 'কমরি' সম্ভবতঃ কবি কমর আলি; ইহাঁর বহু পদাবলী, 'রাধার সম্বাদ' ও 'ঋতুর বারমাস' নামক নিবন্ধ আছে। আলি রাজা ভিন্ন আর কোনও মুসলমান বৈষ্ণব-কবিই তাঁহার সমান পদ প্রণয়ন করেন নাই। সাধারণ্যে তিনি কমর আলি পণ্ডিত নামে পরিচিত ছিলেন। অপরাপর অনেক মুসলমান 'পণ্ডিতের' ন্যায় তিনিও এতদ্দেশীয় সমাজের অতি নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগকে সঙ্গীত বিদ্যায় শিক্ষা দিতেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চট্টগ্রাম অঞ্চলে অস্পৃশ্য নীচশূদ্রদিগের ঘর হইতে অনেক প্রাচীন পুঁথি, উৎকৃষ্ট রচনা বাহির হইতেছে। আশ্চর্য্য! আমরা একটি শ্যাম বিষয়ক পদ শুনাই—রচয়িতা আলি আকবর;

মায়ের চরণে নিবেদি। ধ্রু।
জননি গো মা—
হরে যারে হৃদে ধরে সে পদনি পাব নি রে
অন্তরে জপিলে পাব নি ॥
তরাহ জনম আদি আমি কথ অপরাধী
না জানি কোন পাপ কৈরাছি॥
দয়াময়ী নাম ধর অধম তারাইতে পার
আহ্মারে তরাইতে ক্ষতি কই।
আলি আকবর মতিহীন মনের বাঞ্ছা অনুদিন
ত্রাণ কর পদছায়া দেই॥

মুসলমানই হউক, যাহা হউক, ভক্ত সাধকের গীন মনে হয় না কি? ভিন্নধর্ম্মী মুসলমানের এমন সব হিন্দুজনোচিত ভাবোচ্ছ্বাস দেখিলে চমৎকৃত না হইয়া থাকা যায় না। এ সকল পদাবলী হিন্দুর প্রতি মুসলমানের শ্রদ্ধা অনুরাগের নিদর্শন সন্দেহ নাই।

হিন্দুর ন্যায় মুসলমানের রচিত শক্তি সঙ্গীত অপেক্ষা বৈষ্ণব পদাবলী অনেক

অধিক বলাই বাহুল্য। এ জাতীয় গীতির মূল প্রস্রবণ যে প্রেমময় গোরাচাঁদ! তিনি যে হিন্দু মুসলমান বাছেন নাই, সকলকেই মাতাইয়াছিলেন।

মুসলমান কবি রচিত সকল শ্রেণীর পদাবলীই পাওয়া যায়; আমরা একটি 'গৌরচন্দ্রিকা' শুনাই—

জিউ জিউ মেরে মনচোরা গোরা।
আপহি নাচত আপন রসে ভোরা॥
খোল করতাল বাজে ঝিকি ঝিকিয়া।
আনন্দে ভকত নাচে লিকি লিকিয়া॥
পদ দুই চারি চলু নট নটিয়া।
থির নাহি হোয়ত আনন্দে মাতোলিয়া॥
ঐছন পঁহুকে যাহু বলিহারি।
সাহ আকবর তেরে প্রেম ভিখারী॥

গানটির ভণিতায় 'সাহ আকবার' নাম রহিয়াছে। তজ্জন্য কেহ কেহ পদটি ভুবন-বিখ্যাত উদারচেতা দিল্লীশ্বর আকবার বাদশাহের রচিত বলিয়া অনুমান করেন। সম্রাট্ নাকি ভক্তগণসহ শ্রীচৈতন্য দেবের হরি সঙ্কীর্ত্তন চিত্র দেখিয়া বিহ্বল হইয়া এই পদটি রচনা করিয়াছিলেন। ভক্তের নিকট ইহাও সম্ভব বলিয়া বিবেচিত হওয়া বিচিত্র নহে।

আমরা আর একটি পদ তুলিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করি; রচয়িতা— ফকির হবীব—

দেখ মাই অপরূপ নন্দ গোপাল।
কপালে চন্দন ফোঁটা বিনোদ চালনি খোঁটা
গলে শোভে বকুল মাল।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে কটাক্ষে ভুবন ভোলে
শ্রীমুখ অতি অনুপাম।
করেতে মোহন বেণু নির্ম্মল কোমল তনু
অতসী কুসুম জিনি শ্যাম॥
কটিতে পীতাম্বর দেখিতে মনোহর
মুকুন্দ মোহন বহুরায়।
দাঁড়াইয়া কদম্ব তলে সুনাদ মুরলী পূরে
তিন লোক মোহিত যায়॥
ফকির হবীব বলে কানুরে দেখিনু ভালে
যেন শশী পূর্ণ উদয়।
হেন মোর করে হিয়া কানুরে সমুখে থুয়া
নিরবধি দেখহুঁ সদায়॥

হিন্দু আমরা মুসলমানগণকে দেব-নিন্দক অনাচারী অস্পৃশ্য মনে করি; গোঁড়া মুসলমানগণও আমাদিগকে পুতুল পূজক, কাফের কমবক্ত বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকেন; কিন্তু এমন সব রচনা পড়িলে আমাদের মুসলমানকে ভ্রাতৃ সম্বোধন করতঃ গাঢ় আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিতে ইচ্ছা হয় না কি?

মুসলমানের হৃদয়ে হিন্দুদের দেবতার প্রতি ভক্তিসূচক এ সব ভাব আসিল কোথা হইতে? ইহার কারণ কি? ইহার প্রথম ও প্রধান কারণ বোধ হয় বহুকাল একত্র বাস নিবন্ধন পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির স্ফুরণ; দ্বিতীয় কারণ বোধ হয় শ্রীচৈতন্য-চরণ-সমুদ্ভবা প্রেম-মন্দাকিনীর তরঙ্গাভিঘাত; তৃতীয় কারণ সম্ভবতঃ কবি হৃদয়ের সার্ব্বজনীন উদারতা। এই উদারতার গুণেই বিধর্ম্মী আণ্টুনি ফিরিঙ্গি একদিন হিন্দুর মর্ম্ম স্পর্শ করিয়া গাহিয়াছিলেন,

খৃষ্টে আর কৃষ্টে কিছু ভিন্ন নাই রে ভাই।
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এ ও কথা শুনি নাই।
আমার খোদা যে হিন্দুর হরি সে,
ঐ দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে আছে,
আমার মানব জনম সফল হবে. যদি রাঙা চরণ পাই।

মুন্সী এক্রামুদ্দীন লিখিয়াছিলেন,—"কোন দেশীয় ভাষায় কবিতা লিখিয়া সফল হইবার নিমিত্ত তদ্দেশীয় ভাবের উদ্দীপনা আবশ্যক......বাঙ্গালার জাতীয়ভাবে মুসলমান অনুপ্রাণিত হইতে পারেন নাই......শ্রীকৃষ্ণে দেবত্ব আরোপে মুসলমান হৃদয় দ্রবীভূত হওয়া দূরে থাকুক ব্যঙ্গভাবে পরিণত না হইলেই সুখের কথা। সুতরাং হিন্দুর জাতীয়-ভাব-শূন্য মুসলমানের হিন্দুর জন্য কবিতা লেখা সম্ভব হইল না।"

মুন্সীজির কথাগুলি যে সমীচীন নহে, আমাদের উদ্ধৃত পদগুলি হইতেই বুঝা যাইবে। এমন বিস্তর পদ আছে, নমুনা স্বরূপ আমরা গুটিকতক মাত্র তুলিয়াছি। মুন্সী আবদুল করিম সাহেবের সংগ্রহ হইতে বুঝা যায়, তিনি প্রায় পঞ্চাশ জন মুসলমান পদকর্ত্তার পদ সংগ্রহ করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন। সুপ্রসিদ্ধ 'সাহিত্য' পত্রিকায় দেখিতেছিলাম, পদাবলী সাহিত্যের ভণিতায় ৭৪।৭৫ জন মুসলমান কবির নাম পাওয়া যায়। (মাঘ' ১৫)

ইহা ত গেল শুধু পদাবলীর কথা। মুসলমান কবিগণের রচিত কাব্য ইতিহাসাদি ও যাহা বাঙ্গালা ভাষায় আছে, সে সকলের ভিতরও দেশীয় ভাবের অসদ্ভাব নাই। কিন্তু তৎসমস্তের পরিচয় দিবার উপস্থিত আমাদের স্থানাভাব

আমরা নিতান্ত আধুনিক সাহিত্য বা সাহিত্যিক সম্বন্ধে বড় কিছু বলিতেছি না। আধুনিক সাহিত্যিক সম্বন্ধে কোন কথা না বলিলেও একটি নাম আমাদের উল্লেখ না করা অন্যায় হইবে। 'বিষাদ সিন্ধু' প্রণেতা স্বর্গগত মীরমশারফ হোসেন বঙ্গসাহিত্যে মুসলমান লেখকগণের অগ্রণী। ইঁহার রচনা গম্ভ, ভাষা সুন্দর।

মুসলমান বঙ্গসাহিত্য-সেবিগণের পরিচয় দিতে গিয়া আর আমি আপনাদের মূল্যবান সময় বৃথা নষ্ট করিব না। পদকল্পতরুতে তিন জন মুসলমান পদকর্ত্তার নাম পাওয়া যায়। পদকল্পলতিকা, রসমঞ্জরী, ও গীতচিন্তামণি হইতে রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র তাঁহার অপূর্ব্ব গ্রন্থ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' তে এগার জনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। পরলোকগত রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় কয়েক জন মুসলমান কবির পদাবলী সংগ্রহ করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন। রাজসাহীর বাবু ব্রজসুন্দর সান্যাল মহাশয় অনেক মুসলমান কবির পদাবলী ও যথাসম্ভব পরিচয় পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতেছেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার গৌরবের কোষগ্রন্থ 'বিশ্বকোষে' অনেকগুলি মুসলমান গ্রন্থকারের নাম ও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাদির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা কৃতিত্ব চট্টগ্রাম আনোয়ারা স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত আবদুল করিম B.A. সাহেবের। তাঁহার সংগৃহীত অপ্রকাশিত পদাবলী এবং পুঁথির বিবরণ এখনও নানা পত্রিকায় বাহির হইতেছে। তাঁহার অধ্যবসায়, পরিশ্রম, বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রীতি ও অনুরাগ এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে উদারতার প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। চট্টগ্রামে মুন্সী আবদুল করিম যাহা করিয়াছেন দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। বাঙ্গালার স্থানে স্থানে যদি তাঁহার মত মাতৃভাষার একনিষ্ঠ সাধক কর্ম্মঠ ভাবুক ব্যক্তি পাওয়া যায়, তাহা হইলে বঙ্গ সাহিত্যের প্রভূত উপকার হয়; অনেক লুপ্তপ্রায় ও গুপ্তরত্নের উদ্ধার হয় সন্দেহ নাই।

শ্রীঅনাথকৃষ্ণ দেব।

হিন্দুসমাজ তত্ত্ব।*

হিন্দুসমাজের প্রধান লক্ষণ বর্ণাশ্রমবিভাগ। মহর্ষি মনু প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহা সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত এবং রামায়ণ ও মহাভারতের যুগেও ইহা সুপ্রতিপালিত হইতে দেখা যায়। যদিও বৌদ্ধধর্ম্মের আন্দোলনে এবং পরে মুসলমান ধর্ম্মের প্রভাবে, এবং সর্ব্বশেষে ইউরোপীয় ভাবের সংঘাতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনেক শক্তি ক্ষয় হইয়া যায় তথাপি আজও উহাকে হিন্দুসমাজের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব বলিলে অন্যায় হইবে না।

বৈদিকযুগে দেখা যায়, আর্য্যগণ অনার্য্যগণকে পরাজিত করিয়া পঞ্জাবপ্রদেশে বাস করিতেছিলেন। অনার্য্যগণ শারীরিক সৌন্দর্য্য, মানসিক বৃত্তি ও নৈতিক বল সকল বিষয়েই আর্য্যগণ অপেক্ষা অত্যন্ত হীন ছিল। এখন অনার্য্যগণের সহিত আর্য্যগণের ব্যবহার তিন প্রকার হওয়া সম্ভব ছিল। প্রথম, অনার্য্য জাতিকে সমূলে ধ্বংস করা। ইচ্ছা করিয়াই হউক আর অনিচ্ছায়ই হউক আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায় ইউরোপীয়গণ এই নীতির অনুসরণ করিয়াছেন। দ্বিতীয়, পরস্পরের মধ্যে বিবাহ হইয়া দুইটী জাতি মিলিয়া একজাতি হইয়া যাওয়া। আরব প্রভৃতি মুসলমানজাতিগণ বিজিত জাতির সহিত এইরূপ আচরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের সমূহ অনিষ্ট হইবার কথা, বিজিত জাতির (যদি তাহারা নিকৃষ্ট হয়) দোষ গ্রহণ দ্বারা তাহাদের বংশ নিকৃষ্ট হইয়া যাইবার কথা। ইতিহাসেও দেখা যায়, কোনও একটী মুসলমানজাতি অধিক-কাল প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে নাই; আরব, তুরক, মোগল, পাঠান, পারস্য প্রভৃতি নানা জাতি একের পর আর একটী প্রতাপশালী হইয়াছিল।

তৃতীয় ব্যবহারটী হইতেছে, অনার্য্যগণকে স্বসমাজের নিম্নস্তরে স্থান দিয়া রক্ষা করা; আর্য্যগণ তাহাই করিয়াছিলেন। অনার্য্যগণ আর্য্যগণের সহবাসে ক্রমশঃ উন্নতি পথে অগ্রসর হওয়ায় তাহাদের যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল। অপর পক্ষে উভয় জাতির মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ায় আর্য্যগণের বংশের অপকর্ষ জন্মিতে পারে নাই।

এই আর্য্য অনার্য্যের বর্ণসঙ্করতা নিবারণের জন্যই বর্ণভেদ বা জাতিভেদের

* চুঁচুড়া বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত।

উৎপত্তি। বর্ত্তমান কালের হিন্দুও যে আর্য্যজনোচিত সৌন্দর্য্য, বুদ্ধি ও চরিত্র কতকটা উত্তরাধিকার করিয়াছেন, তাহার জন্ম তিনি এই বর্ণভেদ প্রথার নিকট ঋণী।

যাহাদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ তাহাদের পরস্পরের ঘনিষ্ঠ ভাবে স্ত্রীপুরুষের মেলামেশা উচিত নয়। এই জন্য তাহাদের বাটীতে নিমন্ত্রণভোজনাদিও নিষেধ করা হইয়াছে।

শূদ্রগণকে হীনাবস্থ করিয়া রাখার জন্য অনেকে মনুকে দোষ দেন; কিন্তু যখন মনে পড়ে সেই সকল শূদ্র কোল, ভীল ও নাগাদের জাতি ছিল, তখন এই নিয়মের আবশ্যকতা বুঝা যায়। এই সকল হীনব্যক্তির হস্তে পড়িলে জ্ঞান বিজ্ঞান শাসনক্ষমতা এবং ধনের যে বহুল পরিমাণে অপপ্রয়োগ হইত সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? *

প্রথম প্রথম সমুদয় আর্য্যগণই একজাতীয় ছিলেন—সকলকেই সব রকম কাজ করিতে হইত এবং পরস্পরের মধ্যে বিবাহের আদানপ্রদান চলিত। ক্রমে সমাজের উন্নতির সঙ্গে শ্রমবিভাগের আরম্ভ হইল। সমাজের উৎকৃষ্ট অংশ জ্ঞানচর্চ্চা ও শাসনকার্য্য লইয়া রহিলেন, অবশিষ্ট লোকে কৃষি শিল্প বাণিজ্যাদি দ্বারা সমাজ পোষণে নিযুক্ত হইলেন। এইরূপে আর্য্যগণের মধ্যে তিনটী বর্ণের সৃষ্টি হইল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে বিবাহাদি চলিত। ক্রমে বৈশ্যগণের সহিত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বিবাহ কমিয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বিবাহ তখনও চলিতে লাগিল। রামায়ণ মহাভারতাদিতে দেখা যায়, অনেক ঋষি রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোনও সঙ্কর বর্ণের সৃষ্টি হইত না, সন্তান ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় হইত। শূদ্রের সহিত দ্বিজাতিগণের মিশ্রণে যে সকল সঙ্করজাতির উৎপত্তি হইত তাহারা অত্যন্ত হেয় ছিল। দ্বিজগণের মধ্যে উচ্চ জাতীয় পুরুষের সহিত নিম্নজাতীয়া স্ত্রীর বিবাহ ততটা দোষাবহ ছিল না, কিন্তু নিম্নজাতীয় পুরুষের সহিত উচ্চজাতীয়া স্ত্রীর বিবাহ নিন্দনীয় ছিল।

যাহা হউক এই সকল বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি সমাজের অত্যন্ত অনিষ্টকর বলিয়া বিবেচিত হইত। মনুমহারাজ বলেন—

যত্র ত্বেতে পরিধ্বংসা জায়ন্তে বর্ণদূষকাঃ।
রাষ্ট্রিকৈঃসহ তদ্রাষ্ট্রং ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি॥

---

* এই শূদ্র শব্দটার অর্থ কালক্রমে একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানকালে যিনি ব্রাহ্মণ নহেন তাঁহাকেই শূদ্রনামে অভিহিত করা হইয়াছে।

যে রাজ্যে বর্ণদূষক বর্ণসঙ্করজাতি সমুৎপন্ন হয় সে রাজ্য অচিরাৎ রাজ্যবাসী সমস্ত প্রজাবর্গের সহিত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইহার কারণ অসদ্বংশীয়ের সহিত মিশ্রণে সদ্বংশীয়ের সন্তান অপকৃষ্ট হইবে। মনুসংহিতা বলেন "অনার্য্যতা, নিষ্ঠুরতা এবং বধকর্ম্মের অনুষ্ঠান এই সকল মনুষ্যের নীচজাতিত্ব প্রকাশ করে। অসদ্বংশসম্ভূত ব্যক্তি পিতৃপ্রকৃতি সম্পন্ন বা মাতৃপ্রকৃতি সম্পন্ন অথবা তদুভয়সম্পন্ন হয়, নিজ নীচকুলোদ্ভূতি কোনরূপে গোপন করিতে পারে না। মহাকুল-প্রসূত ব্যক্তির জনমে কোন দোষ থাকিলে, সে অবশ্যই অল্পপরিমাণে হউক আর প্রচুর পরিমাণেই হউক তাহার (নীচকুলোদ্ভব) পিতৃমাতৃস্বভাবের অনুকরণ করিবে।"*

পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে মানুষের প্রধান প্রধান দোষ ও গুণগুলি বংশানুক্রমিক (hereditary) এবং কিরূপে ধনবৈষম্য ও অন্যান্য কারণে একটী জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠব্যক্তির সংখ্যাহ্রাস এবং নিকৃষ্টব্যক্তির সংখ্যাবৃদ্ধি হয় তাহাও আলোচিত হইয়াছে। সেই সিদ্ধান্তগুলির আলোকে এই বর্ণভেদপ্রথা অধ্যয়ন করা যাক।

সমাজের চক্ষে একজন মানুষের শ্রেষ্ঠতা তিনটী কারণের উপর নির্ভর করে। প্রথম তাহার নিজের গুণাবলি; দ্বিতীয় তাহার ধন, তৃতীয়, তাহার বংশমর্য্যাদা বা আভিজাত্য। প্রথমটীর কথা ছাড়িয়া দিয়া শেষের দুইটীর মধ্যে কোন্‌টী ভাল তাহার বিচার করা যাক। ধনের সহিত মানুষের দেহ মনের কোনও অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নাই, অনেক স্থলে ইহা অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে। কাজেই বর্ত্তমান ইউরোপে যেরূপ ধনশালিতাকেই সর্ব্বোচ্চ আসন দেওয়া হইয়াছে তাহাতে অনেক অযোগ্য ব্যক্তি ধনবলে বংশবৃদ্ধি করিতেছেন, কিন্তু অনেক যোগ্য ব্যক্তি ধনহীন হওয়ায় অবিবাহিত থাকিয়া নির্ব্বংশ হইতেছেন।

আমাদের সমাজে ধনের আসন আভিজাত্যের নিম্নে। বর্ত্তমানের বিজ্ঞান এই নিয়মের সমীচীনতা প্রতিপাদিত করিতেছে। একজনের শ্রেষ্ঠতা বিচার

---

* অনার্য্যতা নিষ্ঠুরতা ক্রূরতা নিষ্ক্রিয়াত্মতা।
পুরুষং ব্যঞ্জয়ন্তীহ লোকে কলুষ-যোনিজম্‌। ৫৮
পিত্র্যং বা ভজতে শীলং মাতুর্ব্বোভয়মেববা।
ন কথঞ্চন দুর্যোনিঃ প্রকৃতিং স্বাং নিযচ্ছতি। ৫৯
কুলে মুখ্যেঽপি জাতস্য যস্য স্যাদ্‌ যোনিসংকরঃ।
সংশ্রয়ত্যেব তচ্ছীলং নরোঽল্পমপি বা বহু। ৬০
১০ম অধ্যায়।

করিতে হইলে শুধু তাহার গুণাবলি দেখিলে চলিবে না তাহার মাতৃ ও পিতৃকুলের ইতিহাসও জানিতে হইবে। কেননা, এমন অনেক বংশানুক্রমিক দোষ-গুণ আছে যাহা দুই এক পুরুষ পরে প্রকাশ পায়। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে বংশমর্য্যাদার সহিত একজনের দেহ মন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে বদ্ধ রহিয়াছে এবং বর্ণভেদ প্রথা প্রচলিত থাকায় অন্যান্য সমাজের ন্যায় এখানে ধনবৈষম্যের জন্য যোগ্যব্যক্তির বংশ নিকৃষ্ট হইতে পাইতেছে না—রক্তের বিশুদ্ধত্ব সমধিক পরিমাণে রক্ষিত হইতেছে। নীচবংশোদ্ভব ব্যক্তি যতই ধনবান হউক না কেন সে কিছুতেই উচ্চবংশে বিবাহ করিতে পারে না।

দেখা গেল, আর্য্য অনার্য্যের মিশ্রণ নিবারণের জন্য, বর্ণভেদের সৃষ্টি এবং পরে আর্য্যগণের মধ্যে ধনবৃদ্ধির সহিত অন্যান্য সমাজে যেরূপ অযোগ্যলোকের সংখ্যাবৃদ্ধি ও যোগ্যলোকের সংখ্যাহ্রাস হয় তাহা নিবারণ করিবার জন্য, তাহাদের মধ্যে তিন বর্ণের উৎপত্তি। প্রথমতঃ, জ্ঞানচর্চ্চা, শিক্ষাবিধান ও রাজকার্য্য স্বভাবতঃ সমাজের উৎকৃষ্টতর অংশের হস্তে আসিয়া পড়ে; তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় করিয়া বৈশ্য বা সাধারণ লোক হইতে পৃথক্ করা হয়। এইরূপে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বংশ, নিকৃষ্টতর লোকের সহিত মিশ্রিত না হওয়ায় অপকর্ষ লাভ করিতে পারে না, বরং অনেক স্থলে উৎকর্ষ লাভ করিতে থাকে। তারপর দেখা গেল, যিনি জ্ঞানালোচনা করিবেন তাঁহার শান্তিপ্রিয় ও জ্ঞানপিপাসু হওয়া আবশ্যক এবং যিনি রাজকার্য্য পরিচালন করিবেন তাঁহার যুদ্ধপ্রিয় ও কর্ম্মকুশল (practical) হওয়া আবশ্যক। একজন জ্ঞানবীর, অপরজন কর্ম্মবীর; একজনের সাত্ত্বিক ও অপরের রাজসিক গুণের প্রয়োজন। তখন, তাহাদেরও বংশদুইটী পৃথক করা হইল। এইরূপে এই সুবুদ্ধিপরিচালিত কৃত্রিম নির্ব্বাচনের সহায়তায় ব্রাহ্মণের বংশে জ্ঞানী ও শিক্ষক জ্ঞানোচিত গুণাবলী; ক্ষত্রিয়ের বংশে যোদ্ধা ও শাসনকর্ত্তৃজনোচিত গুণাবলি এবং বৈশ্যের বংশে কৃষক ও শিল্পীজনোচিত গুণসমূহ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই বর্ণভেদপ্রথা যে কেবল বিজ্ঞানসম্মত তাহা নহে, ইতিহাসও ইহার শ্রেষ্ঠতা যথেষ্ট প্রতিপাদন করিয়াছে। ব্রাহ্মণের অপেক্ষা উচ্চতর জ্ঞানী; ক্ষত্রিয়ের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বীর এবং বৈশ্যের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর শিল্পী পৃথিবীর কোনও জাতি কোনওকালে দেখাইতে পারে নাই।

বর্ণভেদপ্রথার বিরুদ্ধে কয়টী প্রধান আপত্তির উত্থাপন হইয়া থাকে। তদ্বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

(১) কেহ কেহ বলেন, সমাজের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা না থাকায়

প্রতিভার স্ফুরণ হয় না। ইহার বিরুদ্ধে প্রথম বক্তব্য এই যে, বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে প্রতিভাবান ব্যক্তির, অন্ততঃ বুদ্ধিমান্ (Talented) ব্যক্তির জননের পক্ষে বংশপ্রভাবই সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকর। কাজেই বলিতে হইবে বর্ণভেদপ্রথারগুণে অধিকসংখ্যক প্রতিভাবান্ বা বুদ্ধিমান্ লোক জন্মগ্রহণ করিবে। আর যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর সেই প্রতিভার স্ফুরণ নির্ভর করে তাহাও হিন্দুসমাজে অপকৃষ্ট হইবার কোনও কারণ নাই। প্রতিযোগিতা সমস্ত জাতির মধ্যে অবাধ না হইলেও প্রত্যেকবর্ণের মধ্যে যে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়সমাজের মধ্যে এবং বৈশ্য বৈশ্যসমাজে অপরের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও অধিকতর যশস্বী হইবার চেষ্টা করিতেন। উপযুক্ত পণ্ডিতের পুত্রের পক্ষে পণ্ডিত হওয়া এবং শিল্পীর পুত্রের পক্ষে শিল্পী হওয়া সহজ, কেননা বংশানুক্রমিক গুণাবলির কথা ছাড়িয়া দিলেও বাল্যকাল হইতে পৈত্রিক ব্যবসায়ে রুচি জন্মিবার ও শিক্ষালাভ করিবার সুবিধা রহিয়াছে; নিজবংশের কীর্ত্তিকলাপ শ্রবণে বালকের মনে যেরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হয় এমন আর কিছুতে হয় না। দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, বর্ণভেদপ্রথার এই সকল বিপক্ষ সমালোচকগণ পাশ্চাত্যসমাজের মাপকাটী লইয়া আমাদের সমাজের পরিমাণ করিতে আসিয়া মহাভ্রমে পতিত হন। আহার্য্যসংগ্রহ ও ধনলিপ্সাই সে সমাজের লোককে পরিশ্রম করিতে বাধ্য করে, কাজেই তাঁহারা মনে করেন ঐ দুটীর অভাব হইলেই লোকে অলস হইব। আমাদের সমাজ কিন্তু ধর্ম্মবিশ্বাসী— এখানে অন্নাভাবে কষ্ট ছিলনা বটে এবং অর্থকে কেহ পরমার্থ জ্ঞান করিতেন না বটে, কিন্তু সমাজের—শুধু সমাজ কেন সমগ্র বিশ্বের—হিতেরজন্য সদাসর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিবার জন্য শাস্ত্রের অমোঘ আদেশ—এবং সে আদেশ এখানে যেরূপ সুপ্রতিপালিত হইয়াছিল এমন আর কোথায়ও হয় নাই, কেন না হিন্দু জীবনের যে একমাত্র উদ্দেশ্য মোক্ষলাভ তাহার জন্য শাস্ত্রাদেশ পালন অত্যাবশ্যক। স্পেন্সারের ন্যায় নাস্তিক এই ধর্ম্মানুশাসনের বল কেমন করিয়া বুঝিবেন? যাহার প্রভাবে ব্রাহ্মণ জীবনব্যাপী দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইতেন, ক্ষত্রিয় যুদ্ধে মৃত্যু কামনা করিতেন, বৈশ্য ইলোরার গুহা এবং মাদুরার মন্দির নির্ম্মাণ করিতেন।

(২) বর্ণভেদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তি এই যে ইহা কতকগুলি কার্য্য কতকগুলি লোকের একচেটীয়া করিয়া দিয়াছে, তাহাতে সমাজের আবশ্যকতানুযায়ী শ্রমবিভাগ থাকিতে পারে না। মনে করুন কোনও এক ব্যবসায়ে লোকাধিক্য হওয়ায় বা আর কোনও কারণে জীবিকা অর্জ্জনে কষ্ট হইতেছে, তখন সে

জাত্যভিমান নিবন্ধন নিম্নজাতির বৃত্তি অবলম্বন করিতে চায় না। আমাদের শাস্ত্রকার কিন্তু যুক্তিপূর্ণ কথাই বলিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ যদি নিজের বৃত্তিদ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে না পারেন তাহা হইলে ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি এবং তাহাতেও সুবিধা না হইলে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিবেন তাহাতে তাঁহার কোনও লাঘব হইবে না; ক্ষত্রিয়ও ঐরূপ বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন। বাস্তবিক, চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীতি হয় যে রক্তের বিশুদ্ধতারক্ষা করাই বর্ণভেদের উদ্দেশ্য, শ্রমবিভাগ আনুসঙ্গিক প্রক্রিয়ামাত্র। জাতিব্যবসায় ত্যাগ করিবার জন্য কাহার জাতি গিয়াছে শুনিয়াছেন কি?

এতদ্ভিন্ন শাস্ত্রে আপদ্ধর্ম্ম বলিয়া একটী কথা আছে। জাতীয় ইতিহাসে মাঝে মাঝে এমন সময় আসে যখন সকল বর্ণকে নিজ নিজ বৃত্তি ত্যাগ করিয়া সমাজ রক্ষায় নিযুক্ত হইতে হয়। এক সময় দুর্ব্বৃত্ত ক্ষত্রিয়গণ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া ব্রাহ্মণ পরশুরাম ও তাঁহার গোষ্ঠী যুদ্ধে মন দিয়াছিলেন। আর সেদিন যখন হিন্দুসমাজের অস্তিত্বরক্ষা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন ছত্রপতি শিবাজীর নায়কতায় মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণগণ কোশাকুশীর পরিবর্ত্তে তরবারি গ্রহণ করেন, কৃষকগণ হলের পরিবর্ত্তে ভল্ল গ্রহণ করে।

(৩) বর্ণভেদের বিরুদ্ধে তৃতীয় আপত্তি এই যে ইহা একরূপ স্বার্থপর আভিজাত্য (aristocracy) এবং ইহা সাম্যের (eqality) বিরুদ্ধে যায়। বর্ত্তমান ভারতের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল লেখক ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'সামাজিক প্রবন্ধ' নামক পুস্তকে এবিষয়টি যেরূপ সুন্দর ভাবে বুঝাইয়াছেন তাহার পর আর কোনও কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। তিনি দেখাইয়াছেন সাম্য দুই প্রকার আছে; প্রথম, সমস্ত মানুষই সমাজে সমান অবস্থায় থাকা উচিত; দ্বিতীয় সমুদায় প্রাণীই একের বিভূতি অতএব সকলেই সমান। প্রথমটী ইউরোপীয়ভাব, কিন্তু উহা একটা কথার কথা হইয়া রহিয়াছে; বাস্তবিক পক্ষে কোনও সমাজে সকল লোক সমান অবস্থায় থাকিতে পারে না। দ্বিতীয়টী হিন্দুভাব, উহা সামাজিক হিসাবে লোকের মধ্যে বিভিন্নতা স্বীকার করে কিন্তু কাহাকেও অবজ্ঞা করে না; ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, এমন কি গো ও কুক্কুর পর্য্যন্ত সকলের প্রতিই সমদর্শী হয়; জীব কর্ম্মফলে নানা অবস্থা প্রাপ্ত হয় কিন্তু তাহাতে তাহাদের মধ্যে মৌলিক কোনও ভেদ আছে এরূপ বুঝায় না।

তবে এস্থলে ইহাও স্বীকার্য্য যে পরবর্ত্তী কালের অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি উচ্চশ্রেণীস্থ লোক নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগকে অত্যন্ত অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন।

আমি বলিতে চাহি ইহা কখনই ব্রহ্মদর্শী আর্য্যের যোগ্য ব্যবহার নহে। তাঁহাদের এই নিন্দার্হ ব্যবহারে তাঁহারা যে শাস্ত্রার্থ হৃদয়ঙ্গম করেন নাই তাহাই প্রতিপন্ন হয় মাত্র।

ইউরোপীয় সাম্যবাদের (socialism) মূল অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে ধনবৈষম্য ও তজ্জনিত দারিদ্র্য দুঃখ হইতেই উহার উৎপত্তি। সেখানকার ক্ষমতাশালী ব্যক্তিবর্গ বিলাস সরোবরে ক্রীড়া করিতেছেন এবং নিম্নশ্রেণীস্থ লোকগণ দারিদ্র্য মরুভূমে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে; কাজেই সমাজের নিয়ম ওলটপালট করিয়া দিয়া সকলকে এক অবস্থায় আনিবার চেষ্টা চলিতেছে। হিন্দুর স্বাভাবিক উদারতা ও বিচক্ষণতা এখানে সেরূপ বিসদৃশ দৃশ্যের অবতারণা হইতে দেয় নাই। এখানে যিনি যে পরিমাণে ক্ষমতাশালী তিনি সেই পরিমাণে দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করিলেন।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ॥

তাই বাণিজ্য ও কৃষিকর্ম্ম বৈশ্যের আয়ত্ত হইল, ক্ষত্রিয়ের রাজসেবা বিহিত হইল এবং সমাজকর্ত্তা ব্রাহ্মণ আপনি ভিখারী হইলেন। ব্রাহ্মণকে ঈর্ষা করিতে চাও ধনলোভ ত্যাগ কর, বিলাস বর্জ্জন কর, সদাচারী হও, তপস্যাপরায়ণ হও। দুঃখের বিষয় সে পথে যাত্রীর সংখ্যা বড় অধিক নহে। যাহা হউক, ব্রাহ্মণ আদর্শ থাকায়, আমাদের নিম্নশ্রেণীস্থ লোকের মধ্যে যেরূপ সদাচার দেখা যায় পাশ্চাত্যদেশে সেরূপ দেখা যায় না। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আভিজাত্য বটে, কিন্তু তাহা ধনের উপর নির্ভর করে না মানবের স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠতা ভিন্ন অন্য কোনও অবস্থার উপর উহার ভিত্তি স্থাপিত হয় নাই। আজকালকার অনেক বৈজ্ঞানিক ঐরূপ আভিজাত্যের প্রশংসা করিতেছেন। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আভিজাত্য বটে কিন্তু উহা শারীরিক সৌন্দর্য্যের আভিজাত্য, প্রখর বুদ্ধির আভিজাত্য, নৈতিক বলের আভিজাত্য।

এই সম্পর্কে আর একটা কথার বিচার আবশ্যক হইতেছে। অনেকে বলেন বর্ণভেদ প্রথার দোষে একটী নিম্নজাতি চিরকালই অধম থাকিয়া যায়, তাহারা আর সমাজে উন্নতিলাভ করিতে পারে না এবং একটী উচ্চজাতি অযোগ্য হইয়া পড়িলেও উন্নত থাকিয়া যায়। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র ও ইতিহাস উভয়েই একথার অযথার্থতা প্রতিপাদিত করিতেছে। মনুসংহিতার মতে—

"জাতিগণ যুগে যুগে তপস্যা প্রভাবে ও বীজোৎকর্ষে মনুষ্যমধ্যে যেমন

জাত্যুৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তদ্বৈপরীতে তাহাদের জাত্যপকর্ষও ঘটিয়া থাকে। বক্ষ্যমাণ ক্ষত্রিয়েরা উপনয়নাদি সংস্কারাভাবে এবং যজনাধ্যয়নাদির অভাবে ক্রমশঃ শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছেন। ... স্বপত্নী শূদ্রাতে ব্রাহ্মণ হইতে জাতা পারশব নাম্নী কন্যা যদি অন্য ব্রাহ্মণে বিবাহ করে এবং তাহার কন্যাকে যদি অপর ব্রাহ্মণে বিবাহ করে এবং এইরূপ ব্রাহ্মণ সংসর্গ যদি ধারাবাহিক সাত পুরুষ পর্য্যন্ত হয় তবে সপ্তম জন্মে ঐ পারশবাখ্যবর্ণ বীজের উৎকর্ষ জন্য ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। এবং এই ক্রমে যেরূপে শূদ্র ব্রাহ্মণ হয়, তদ্রূপ ব্রাহ্মণেরও শূদ্রত্বপ্রাপ্তি হয়—ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্বন্ধেও ঐরূপ জানিবে।"*

এইবার চতুরাশ্রমবিষয়ে আলোচনা করা যাউক। প্রথম আশ্রম ব্রহ্মচর্য্য বা শিক্ষার কাল। শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে প্রবন্ধান্তরে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। এখানে কেবল এইটুকু বলিতে চাই যে প্রাচীন আর্য্য শিক্ষাপ্রণালী কেবল মানসিক বৃত্তিগুলিকে পরিস্ফুট করে না, শারীরিক ও সর্ব্বাপেক্ষা নৈতিক বৃত্তিগুলিকেও ফুটাইয়া তুলে। পরবর্ত্তীকালে যাহাকে ধর্ম্মপরায়ণ, সমাজসেবী বিলাসশূন্য এবং বিচক্ষণ গৃহস্থ হইতে হইবে তাহার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম অত্যন্ত উপযোগী ও আবশ্যক। এবং এই ব্রহ্মচর্য্যের ফলস্বরূপ সেকালের ব্রাহ্মণগণ যেরূপ অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি এবং সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহা বর্ত্তমানকালের পণ্ডিতবর্গের বিস্ময়ের সামগ্রী হইয়া রহিয়াছে।

দ্বিতীয় আশ্রম গার্হস্থ্য, ইহার সর্ব্বপ্রধান ঘটনা বিবাহ। বিবাহ না করিলে কেহ গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিতে পারে না; সকল ধর্ম্মকার্য্য সস্ত্রীক করিবার বিধি। বিবাহের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য পুত্রোৎপাদন—পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা। ইহাই যে বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য, বিজ্ঞান তাহা সপ্রমাণ করিয়াছে। গৃহস্থের

---

* তপোবীজপ্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ॥৪২
শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেনচ॥৪৩
শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ শ্রেয়সা চেৎ প্রজায়তে।
অশ্রেয়ান্ শ্রেয়সীং জাতিং গচ্ছত্যাসপ্তমাদ্যুগাৎ॥৪৪
শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতিশূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাৎ তথৈবচ॥৪৫

১০ম অধ্যায়।

নিত্য অনুষ্ঠেয় পঞ্চ মহাযজ্ঞ ও তিনটী ঋণের কথা ভাবিলে বুঝা যায় আর্য্য গৃহস্থ জীবন কি উচ্চসুরে বাঁধা ছিল। দেবঋণ, পিতৃঋণ ও ঋষি ঋণ এই তিনটী ঋণ; দেবঋণ পরিশোধ করিতে হয় যজ্ঞদ্বারা, অর্থাৎ স্বার্থত্যাগমূলক লোকহিতকর অনুষ্ঠানদ্বারা পিতৃঋণ ধর্ম্মানুসারে পুত্রোৎপাদন দ্বারা পরিশোধ করিতে হয় এবং ঋষিঋণ বেদাধ্যয়ন দ্বারা পরিশোধ হইয়া থাকে। মানবধর্ম্মশাস্ত্র বলিতেছেন—

> ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।
> অনপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ ॥৩৫
> অধীত্য বিধিবদ্বেদান্ পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধর্ম্মতঃ।
> ইষ্ট্বা চ শক্তিতো যজ্ঞৈর্মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ ॥৩৬
> অনধীত্য দ্বিজো বেদানমুৎপাদ্য তথা সুতান্।
> অনিষ্ট্বা চৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ। ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

ঋষিঋণ, দেবঋণ, পিতৃঋণ,—এই ঋণত্রয় পরিশোধ করিয়া মোক্ষসাধন সন্ন্যাসাশ্রমে মনোনিবেশ করা উচিত; কিন্তু এই ঋণ সকল পরিশোধ না করিয়া মোক্ষধর্ম্মের সেবা করিলে নরক প্রাপ্তি হয়। বিধানানুসারে বেদাধ্যয়ন করিয়া ধর্ম্মানুসারে পুত্রোৎপাদন করিয়া, শক্তি অনুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া তবে মোক্ষে মনোনিবেশ করা উচিত। দ্বিজগণ বেদ অধ্যয়ন না করিয়া, সন্তানোৎপাদন না করিয়া, এবং যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া যদি মোক্ষ ইচ্ছা করেন, তবে অধোগতি প্রাপ্ত হন।

এখন এই যে সকলেই কিছুকাল সংসারাশ্রমে থাকিয়া তবে বাণপ্রস্থ আশ্রমে প্রবেশলাভ করিতে পারিতেন তাহাতে একটী সুফল ফলিয়াছিল। সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের বংশ থাকিত। বর্ত্তমান ইউরোপে যেরূপ এই সকল লোকের মধ্যে অনেকে অবিবাহিত থাকায় নির্ব্বংশ হয়েন সেরূপ হইতে পাইত না। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে যখন বর্ণাশ্রমধর্ম্ম শিথিল হইয়া গেল তখন বুদ্ধিমান ও ত্যাগী ব্যক্তিগণ গার্হস্থ্যাশ্রমের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কাজেই এই সকল শ্রেষ্ঠ লোকের বংশ থাকিল না, যাহারা গৃহস্থ থাকিত এবং যাহাদের বংশ থাকিত তাহারা ত্যাগশীলতায় এবং বুদ্ধিতে নিকৃষ্টতর ব্যক্তি। এইরূপে সমাজে যে যোগ্য ব্যক্তির হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধমতবাদ খণ্ডন করিলেও বৌদ্ধদেরই ত্যাগ-সন্ন্যাসপ্রবণতা প্রচার করিয়া যান।

আর এক বিষয়ে আর্য্য গার্হস্থ্য প্রথা বর্ত্তমান ইউরোপীয় গৃহস্থজীবনের

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। পূর্ব্বোল্লিখিত প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে স্পেন্সার প্রমাণ করিয়াছেন যে সমাজের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর জননশক্তি নিম্নশ্রেণীর অপেক্ষা কম। সম্প্রতি কয়েকটী বৈজ্ঞানিক এ সম্বন্ধে আরও গবেষণা করিয়া দেখাইয়াছেন যে সমাজের যে শ্রেণীর মধ্যে বিলাস যত অধিক তাহাদের বংশবৃদ্ধি তত কম। কাজেই বিলাস বর্জ্জন করিতে পারিলে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সন্তান সংখ্যা বিশেষ অল্প হইবার কথা নহে। হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণগণ বিলাস সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়াছিলেন—এই জন্য তাঁহাদের বংশবৃদ্ধি যথোচিতরূপেই হইত।*

বিবাহের উদ্দেশ্য পুত্রোৎপাদন—এই মহাহিতকর বৈজ্ঞানিক সত্যটী হৃদয়ঙ্গম থাকায় হিন্দুসমাজ অনেক কদাচারের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। আজকালকার ইউরোপে বিবাহের উদ্দেশ্য হইয়াছে—সম্ভোগ; এখন সন্তান জন্মিলে তাহার জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হয়, আরামের ব্যাঘাত হয়, এই জন্য উচ্চশিক্ষিত সৌখিন নরনারী সন্তান হওয়া পছন্দ করেন না। যদি সন্তান হয়, তাহার পালনে তাঁহাদের যত্ন থাকে না, বেতনভোগী নীচজাতীয় স্ত্রীলোকের উপর তাহার লালনপালনের ভার অর্পিত হয়। এই ব্যাপার দেখিয়া সেখানকার কোনও কোনও চিন্তাশীল লোক সমাজের অনিষ্টাশঙ্কায় ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন—"বুদ্ধিমান্ এবং চরিত্রবান্ লোকগণের যথোপযুক্ত সন্তান হওয়া প্রার্থনীয় এবং মহিলাগণের জানা উচিত যে তাঁহাদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সন্তান পালন। তাঁহারা বিদ্যাবত্তায় এবং শিল্পকলায় পুরুষদিগের সহিত টক্কর দিতে পারেন; না পারিলেও কোনও ক্ষতি নাই; কিন্তু তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে স্নেহময়ী এবং সুদক্ষা জননী হওয়া।" † হিন্দুস্মৃতিশাস্ত্র কিন্তু সন্তানোৎপাদনের অত্যাবশ্যকতা প্রচারিত করায় হিন্দুসমাজে এরূপ বিপত্তি ঘটিতে পারে নাই। যতদূর জানিতে পারিয়াছি, অন্য কোনও দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রে পুত্রোৎপাদনের দায়িত্ব সম্বন্ধে এরূপ বিশদভাবে আলোচনা নাই।

---

* Dr. Ireland points to the significant fact that some of the high castes of India (Brahmins and Rajputs) who are most exclusive in their marriages do not show the usual dwindling tendency, which he connected with the circumstance that they are mostly poor and abstemious (Thomson's Heredity, P. 535)

† The first requisite, then, for mothers of the future, the elements of health being assumed, is that they should be motherly. They may or may not, in addition, be worthy of such exquisite titles as "the female Shakespere of America" but they must have motherliness to begin with [Saleeby's Parenthood and Raceculture. P. 153]

স্মৃতিশাস্ত্র মতে যদি কেহ দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইত তাহাকে পতিত করিয়া দেওয়া হইত অর্থাৎ তাহার সহিত উচ্চজাতীয় লোকের বিবাহাদি নিষিদ্ধ হইত। ইহাতে একটী এই সুফল ফলিত যে কোনও দুশ্চরিত্র লোকের বংশবৃদ্ধি কম হইত এবং সে যোগ্য সুচরিত্র লোকের বংশে আপনার চরিত্রহীনতা প্রবেশ করাইয়া দিয়া সে বংশের অধঃপতন সংসাধিত করিতে পারিত না।

অপরদিকে সদ্বংশজাত চরিত্রবান্ ও বুদ্ধিমান্ লোকের বংশ যাহাতে বৃদ্ধি পায় তজ্জন্য কৌলীন্যপ্রথার প্রচলন হয়। কুলীন নির্ধন হইলেও তাহার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে সকলেই ব্যগ্র হইতেন। এখন এক ব্যক্তির স্বীয় দোষগুণ ব্যতীত আর দুইটী কারণে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয়, এক ধনশালিতা; দ্বিতীয়, বংশমর্য্যাদা। পাশ্চাত্যদেশে ধনশালিতার গৌরব অধিক, ভারতবর্ষে বংশমর্য্যাদার গৌরব অধিক। আজকাল যখন বংশানুক্রমের প্রভাব প্রমাণিত হইয়াছে, তখন বংশমর্য্যাদা যে ধনশালিতা অপেক্ষা গরীয়সী তাহার আর সন্দেহ কি?

বংশানুক্রমের প্রভাবটী সুবিদিত থাকায়ই যে কৌলীন্যের প্রতিষ্ঠা হয় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। গীতাকারের বিশ্বাস ছিল যোগীর বংশেই যোগী জন্মগ্রহণ করেন। * মহর্ষি বশিষ্ঠ লিখিয়াছেন—"কুলোপদেশেন হয়োঽপি পূজ্যস্তস্মাৎ কুলীনাং স্ত্রিয়মুদ্বহন্তি।"—বংশমর্য্যাদাবলে অশ্বও সম্মাননীয় হয়; অতএব সদ্বংশজাতা কন্যাকে বিবাহ করিবে। এই কথাটী এমন সুন্দর যে বর্ত্তমান কালের কোনও সমাজ বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তকে লিখিত থাকিলেও বেশ শোভা পাইত।

কৌলীন্য প্রথার ভিত্তি যদিও আর্য্যঋষিগণের ভূয়োদর্শনের উপর স্থাপিত তথাপি মুসলমান আমলে যখন দেশে জ্ঞানালোচনার স্রোত মন্দীভূত হইয়া আসিল এবং লোকে প্রাচীন বিধি ব্যবস্থাগুলির কারণ পরম্পরা বুঝিতে না পারিয়া অন্ধভাবে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল, তখন বঙ্গের কৌলীন্যপ্রথা একটা হাস্যাস্পদ ব্যাপারে পরিণত হইল। ঘোড়ার বংশ উন্নত করিতে হইলে যে সকল নিয়ম অবলম্বন করা যাইতে পারে মনুষ্যসমাজের বেলা তাহা চলে না। বংশানুক্রমের প্রভাব যতই হউক না কেন, তথাপি এক একটী বুদ্ধিমান লোক বহুসংখ্যক বিবাহ করিবে এবং একজন নিকৃষ্টতর

* অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্। এতদ্ধি দুর্লভতরম্ লোকে জন্ম যদীদৃশম্।৪২। ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

ব্যক্তির বিবাহ জুটিবে না এরূপ পক্ষপাতিতা চলিতে পারেনা। অবশ্য ঘটক মহাশয়েরা যে এরূপ জীবতত্ত্বের কোনও কথা অবলম্বন করিয়া কৌলীন্যকে জটিল হইতে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহা মনে হয় না। তবে তাঁহাদের স্বপক্ষে যতটা বলা সম্ভব তাহা ধরিয়া লইয়াই তাহার অসারতা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

বহুবিবাহ সম্বন্ধে (Polygamy) একটা কথা বলা যায় যে গুণবান ব্যক্তির বংশ থাকা যদি প্রার্থনীয় হয়, তাহা হইলে প্রথমা স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে দারান্তর পরিগ্রহ অন্যায় বলিতে পারা যায় না। খৃষ্টান শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, সকল অবস্থাতেই একস্ত্রী বর্ত্তমানে পুরুষের অন্যস্ত্রী গ্রহণ নিষিদ্ধ; সেটা জীবতত্ত্বের চক্ষে কুপ্রথা বলিতে হইবে।*

বিধবাবিবাহ বিষয়টা বর্ত্তমান সমাজ তত্ত্বের সাহায্যে বিচার করিবার চেষ্টা করা যাক। অনেক বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান বংশের কন্যা বিধবা হওয়ায় নিঃসন্তানা থাকেন; তাহাতে সমাজে যে বুদ্ধিমান ব্যক্তির সংখ্যাবৃদ্ধির একটী উপায় নষ্ট হয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে অনেকে বলিবেন "কেবলমাত্র জীববিজ্ঞানের মতে ত সমাজ চলিতে পারে না। মানুষ পশু নহে, তাহার নানারূপ কোমল মনোবৃত্তি আছে। আর একটা বড় কথা আছে। জীবন ও মৃত্যুর অদ্ভুত প্রহেলিকার যতদিন পর্য্যন্ত না কতকটা মীমাংসা হইতেছে— স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু বিশ্বাস করেন আর্য্যমহর্ষিগণ এবিষয়ে সম্পূর্ণ না হউক আংশিক কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিলেন—ততদিন পর্য্যন্ত এবিষয়ে একটা মতামত দেওয়া বিজ্ঞানের অধিকার বহির্ভূত।"

কিরূপ কন্যা বিবাহযোগ্য তদ্বিষয়ে মনু বলেন যে স্ত্রীলোক "মাতার অসপিণ্ডা (অর্থাৎ সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত মাতামহাদি বংশজাত নহে) এবং পিতার সগোত্রা বা সপিণ্ডা না হয় এমন স্ত্রীলোকই বিবাহে প্রশস্তা। গো, ছাগ, মেষ ও ধনধান্য দ্বারা অতি সমৃদ্ধ মহাবংশ হইলেও স্ত্রীগ্রহণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত দশকুল পরিত্যাগ করিতে হইবে। হীনক্রিয় (অর্থাৎ সংস্কারবিরহিত), নিষ্পুরুষ (অর্থাৎ যে কুলে পুরুষ জন্মায় না কেবল কন্যামাত্র জন্মিয়া থাকে), নিশ্ছন্দ অর্থাৎ বেদাধ্যায় রহিত; রোমশ অর্থাৎ সকলেই বহুরোম যুক্ত এবং

* From the point of view of certain eugenists polygamy would be desirable in many cases, as extending the parental opportunities of the man of fine physique or intellectual distinction [Saleeby's Parenthood and Race culture, P, 169]

অর্শ, রাজযক্ষ্মা, অপস্মার, শ্বিত্র ও কুষ্ঠরোগাক্রান্ত এই দশকুলে বিবাহ সম্বন্ধ রাখিবে না।”

উপরোক্ত নিয়মগুলি বিজ্ঞান সম্মত। বর ও কন্যার রক্ত সম্বন্ধ অতি নিকট হইলে তাঁহাদের বংশ ভাল হয় না, কোনও কোনও বৈজ্ঞানিকের এইরূপ ধারণা। এ বিষয়ে আরও গবেষণার আবশ্যক।* যে বংশ হীনক্রিয় অর্থাৎ নীতিবর্জ্জিত বা মূর্খ (সম্ভবতঃ নির্ব্বুদ্ধি) বা যাহাতে বংশানুক্রমিক কোনও ব্যাধি আছে তাহা বর্জ্জন করা নিশ্চয়ই বিবেচনার কার্য্য। যে কুলে পুরুষ জন্মায় না কেবল কন্যামাত্র জন্মিয়া থাকে (অর্থাৎ পুরুষের তুলনায় কন্যা অত্যন্ত অধিকসংখ্যক জন্মিয়া থাকে) তাহা বর্জ্জনীয়; ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে একজনের কয়টী পুত্র ও কয়টী কন্যা হইবে সেটা অনেকটা বংশানুক্রমিক। এখন, আমি যতদুর পড়িয়াছি তাহাতে এসম্বন্ধে কোনও রীতিমত গবেষণা দেখি নাই। † সেই জন্য কিছুদিন হইতে আমি কয়েকটী বন্ধুর সাহায্যে এই প্রীতিপ্রদ গবেষণা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি। আমার ইচ্ছা বহুসংখ্যক পরিবারের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া দেখিব পুত্র ও কন্যার অনুপাত বংশানুক্রমিক কি না।

এ পর্য্যন্ত যতগুলি বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতেই এই গুণটী বংশানুক্রমিক এইরূপ অনুমান (working hypothesis) গঠন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা ইহার পরীক্ষা করা খুব আশাপ্রদ বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। কিছুকাল পরে প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা রহিল।

বিবাহ সম্বন্ধে আর একটি কথা আছে। চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ মন্দ ছিল না ধরিয়া লইলেও, পরে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হওয়ায় এবং শ্রমবিভাগের ফলে যখন এক এক বর্ণের ভিতর আবার ছত্রিশ জাতির সৃষ্টি হইল তখন ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়িতে গিয়া দাঁড়াইল। শেষটা এমন পর্য্যন্ত হইল যে, একই বংশের লোক

---

* 'The consequences of close interbreeding carried on for too long a time, are as is generally believed, loss of size, constitutional vigour, and fertility, sometimes accompanied by a tendency to malformation'—Darwin [See Thomson's Heredity, P. 392]

† If the sex of the offspring is not determined by the environmental conditions, on what does it depend? It may depend on a number of minute and variable factors such as the relative ages of the parents and the relative ages of the sex-cells when they unite in fertilisation or it may be "hereditary." [Thomson's Heredity, P. 505]

দুই বিভিন্ন প্রদেশে বাস করিলে তাহাদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হইল। এইরূপে কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ নানাদেশে বাস করিয়া নানাজাতি হইলেনই, বেশীর ভাগ এক বঙ্গদেশেই—দুই বিভাগে বাস করা নিবন্ধন রাঢ়ী ও বারেন্দ্র এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন। এই সকল অন্যান্য বিভাগের বিভাগ (sub-castes) উৎপন্ন হইবার কারণ বোধ হয় সেকালে এক প্রদেশের লোকের সম্বন্ধে অন্য প্রদেশের লোকের অজ্ঞতা; আজ-কালকার রেল টেলিগ্রাফের দিনে সে সমুদায় বজায় থাকিবার কোনই কারণ দেখা যায় না। এই নিয়মের একটী কুফল এই হইয়াছে যে অনেক জাতি সংখ্যায় এত কম হইয়া গিয়াছে যে তাহাদের মধ্যে উপযুক্ত পাত্র পাত্রীর নির্ব্বাচন দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

শাস্ত্রের ব্যবস্থা "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ"। এটীও একটী সুন্দর ব্যবস্থা বলিয়া বোধ হয়। চিরকাল সংসারের কোলাহলে না থাকিয়া, বৃদ্ধবয়স নির্জ্জনে শান্তিতে ও আত্মচিন্তায় অতিবাহিত করা বেশ সুসঙ্গত। বর্ত্তমান ইউরোপে কিন্তু দেখা যায় অতি বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত লোকে বিষয় কর্ম্মে ব্যাপৃত আছেন—এই জন্য সেখানে সত্তর বৎসর বয়স্ক সেনাপতিকে যুদ্ধ করিতে এবং পঁচাত্তর বৎসর বয়স্ক আচার্য্যকে অধ্যাপনা করিতে দেখা যায়। পরকালের কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল ইহকালের কথা লইয়া বিচার করিলেও বলিতে হইবে উভয় প্রথাতেই সমাজের কিছু উপকার ও কিছু অপকার হইয়া থাকে। ইউরোপীয় প্রথায় গুণ এই যে সমাজের বিভাগ গুলি কতকগুলি বহুদর্শী লোকের তত্ত্বাবধানে থাকে। অপর পক্ষে ইউরোপীয় প্রথার দোষ এই যে কতকগুলি জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের হাতে থাকে বলিয়া রাজকীয় বিভাগ গুলিতে অভিনব নিয়মের প্রবর্ত্তন ও যথোচিত সত্বরতা অসম্ভব হইয়া পড়ে। অধিকাংশস্থলে দেখা যায় একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি পঁচিশ হইতে পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত খুব কৃতিত্ব দেখান; আরও বয়স হইলে তাঁহার প্রতিভা ক্রমশঃ ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে থাকে। তখন বয়ঃকনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের হস্তে কার্য্যভার অর্পণ করিয়া তাঁহাদের অবসর গ্রহণ করাই উচিত; তবে সময়ে সময়ে বৃদ্ধগণের নিকট হইতে পরামর্শ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। *

শুনা যায় ফ্রান্সে অনেক বিদ্বান্ ব্যক্তি জীবনের অধিকাংশ কাল বৈষয়িক কার্য্য করিবার পর অবসর গ্রহণ করিয়া শেষ কয়টা বৎসর বৃক্ষপালন বিদ্যার (horticultural researches) বা ঐরূপ একটী বিদ্যার চর্চ্চায় অতিবাহিত করেন।

* ভারত গবর্ণমেণ্টও পঞ্চান্ন বৎসর বয়সেই কর্ম্মচারিগণকে পেন্সন দিয়া থাকেন।

ইহাদের এই সাধুচেষ্টার ফলে সে দেশে বৃক্ষপালন বিদ্যা এমন উন্নতি লাভ করিয়াছে যে শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। আমাদের বিবেচনায় এই প্রথার সহিত প্রাচীন ভারতের বাণপ্রস্থ আশ্রমের তুলনা করা যায়। তাঁহারাও বৃদ্ধ বয়সে সংসার হইতে ছুটী লইয়া একাগ্রচিত্তে আত্মতত্ত্বসম্বন্ধে গবেষণায় নিযুক্ত হইতেন। প্রভেদের মধ্যে এই যে বর্ত্তমান ইউরোপীয় বিজ্ঞান বহির্মুখী, প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান ছিল অন্তর্মুখী। কাজেই সে দেশের বৃদ্ধগণ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোচনা করেন, কিন্তু আমাদের দেশের বৃদ্ধগণ আত্মবিজ্ঞানের আলোচনা করিতেন। চতুর্থ আশ্রম যতি বা সন্ন্যাস। যখন অতিবৃদ্ধ হওয়ায় আর বনে বাস করিতে পারিতেন না তখন বাণপ্রস্থ আশ্রমী পুনরায় গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন; কিন্তু আর সংসারে লিপ্ত হইতেন না। তাঁহার মন তখন বড় উচ্চসুরে বাঁধা। তিনি তখন সম্পূর্ণরূপে কর্ম্মশূন্য, মুক্ত, ও সিদ্ধপুরুষ। তিনি তখন জীবন বা মরণ কিছুতেই কামনা করিতেন না, কিন্তু ভৃত্য যেমন বেতনের জন্য নির্দ্দিষ্ট কালের প্রতীক্ষা করে, তদ্রূপ কর্ম্মাধীন জীবন কাল বা মরণ কাল প্রতীক্ষা করিতেন। যাহাতে কোনও জীবের প্রাণনাশ না হয়, সেই জন্য পথ দেখিয়া পদবিক্ষেপ করিতেন এবং বস্ত্রাদিদ্বারা ছাকিয়া জলপান করিতেন; সত্যকথা বলিতেন এবং মনকে পবিত্র রাখিতেন। অবমান-জনক বাক্যসকল সহ্য করিয়া থাকিতেন, কাহাকেও অপমান করিতেন না এবং কাহারও সহিত শত্রুতা করিতেন না। কেহ ক্রোধ করিলে তাহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিতেন না; কেহ আক্রোশের কথা কহিলে তাহার প্রতি কুশল বাক্যপ্রয়োগ করিতেন। সর্ব্বদা ব্রহ্মধ্যানপর হইয়া আসীন থাকিতেন; কোনও বিষয়ের অপেক্ষা রাখিতেন না—সর্ব্ববিষয়ে নিস্পৃহ হইতেন কেবল আত্মসহায়েই একাকী মোক্ষার্থী হইয়া ইহ সংসারে বিচরণ করিতেন। *

* নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্।
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দ্দেশং ভৃত্যকো যথা॥ ৪৫
দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
সত্যপূতাং বদেদ্বাচং মনঃপূতং সমাচরেৎ॥ ৪৬
অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন।
নচেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্ব্বীত কেনচিৎ॥ ৪৭
ক্রুধ্যন্তং ন প্রতিক্রুধ্যেদাক্রুষ্টঃ কুশলং বদেৎ।
সপ্তদ্বারাবকীর্ণাঞ্চ ন বাচমনৃতাং বদেৎ॥ ৪৮

পাঠক দেখিবেন হিন্দুধর্ম্মে সন্ন্যাস আশ্রমে যেরূপ আচরণ বিহিত হইয়াছে পরবর্ত্তী কালের বৌদ্ধধর্ম্ম, জৈনধর্ম্ম, খৃষ্টধর্ম্ম ও চৈতন্য প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মে সেইরূপ আচরণ—সকলেরই পক্ষে অবলম্বনীয় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু গৃহস্থের পক্ষে ঐ সকল নিয়ম পালন করিতে হইলে কিরূপ পদে পদে হাস্যাস্পদ ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় তাহা একবার ভাবিয়া দেখিবেন। আত্মরক্ষার্থ ও সমাজরক্ষার্থ সংসারী ব্যক্তিকে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইতে হয় এবং দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতে হয়। একগালে চড় মারিলে অন্যগাল ফিরাইয়া দেওয়া সন্ন্যাসীর পক্ষে সম্ভব, কিন্তু গৃহস্থের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

এখন একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে যে সন্ন্যাসী তাঁহার দীর্ঘজীবনে যে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জ্জন করিতেন তাহা কি তাঁহার সহিতই নষ্ট হইয়া যাইত, পরবর্ত্তী বংশ কি তাহার উত্তরাধিকারী হইত না? হইত বৈ কি। এই সকল জ্ঞানী বৃদ্ধের চরণতলে বসিয়া লোকে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান শিক্ষা করিত। তাঁহাদের অমূল্য উপদেশই পুরাণ উপপুরাণাদিতে লিপিবদ্ধ হইয়া আজিও হিন্দু গৌরবের অক্ষয় ভাণ্ডার স্বরূপ বিরাজিত রহিয়াছে।*

অধ্যাত্মরতিরাসীনো নিরপেক্ষো নিরামিষঃ।
আত্মনৈব সহায়েন সুখার্থী বিচরেদিহ। ৪৯

মনুসংহিতা, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

* In cities he (the Yati) had to impart the knowledge he had acquired, during a long and meritorious life, on domestic, social, religious and other matters, to younger people. It is the lectures of these venerable old people, cast into the shape of books, that have come down to us, after many a revision, as Puranas and Upapuranas—Haraprasad Sastri.

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্, এ; বি, এস্, সি।

সাহিত্য, ২৫ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা।

আদিশূর। *

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত "গৌড়রাজমালা" নামক পুস্তকে আদিশূর নামক কোন রাজা কখনও ছিলেন না, এ কথা বলা হয় নাই, কিন্তু আদিশূর ও জয়ন্ত অভিন্ন ব্যক্তি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের এই মতের প্রতি অনাদর প্রকাশ করা হইয়াছে। কারণস্বরূপ উক্ত পুস্তকের ১৮ পৃষ্ঠার পাদটীকায় লিখিত হইয়াছে—

"শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় 'ব্রাহ্মণকাণ্ড' নামক গ্রন্থের প্রথমাংশে কহ্লণোক্ত 'জয়ন্ত' এবং কুলপঞ্জিকা সমূহে উল্লিখিত পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়নকারী আদিশূরকে অভিন্ন বলিয়া প্রতিপাদন করিতে যত্ন করিয়াছেন। ...উক্ত গ্রন্থের ১১৪ পৃষ্ঠার ২নং টীকায় [দ্বিতীয় সংস্করণ, ১১৬ পৃঃ, ১নং পাদটীকায়] বসু মহাশয় ব্রাহ্মণডাঙ্গা নিবাসী ৺বংশীবিদ্যারত্ন ঘটকের সংগৃহীত কুলপঞ্জিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন—

'ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি শ্রীজয়ন্তসুতেন চ।
নাম্নাপি দেশাভেদৈস্তু রাঢ়ী বারেন্দ্র সাতশতী।'

এই টীকার টীকায় আবার লিখিয়াছেন, 'আদিশূর সুতেন চ' এইরূপ পাঠান্তর লক্ষিত হয়। অন্য কোন পুস্তকে এই পাঠান্তর লক্ষিত হয়, না একই পুস্তকের টীকায় পাঠান্তর প্রদত্ত হইয়াছে, এ বিষয়ে বসু মহাশয় কিছুই বলেন নাই। জয়ন্ত ঐতিহাসিক ব্যক্তি হইলে ১১০০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। আর ৺বংশী বিদ্যারত্ন ঘটক ঊনবিংশ শতাব্দীর লোক। বংশীবিদ্যারত্ন কোন্ মূল গ্রন্থ হইতে এই তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই মূলগ্রন্থ কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল, এবং উহার ঐতিহাসিক মূল্যই বা কত? ইত্যাদি বিষয়ের সম্যক্ বিচার না করিয়া এত বড় একটা কথা স্বীকার করা যায় না।"

সৌভাগ্যবশতঃ এই ক্ষুদ্রটীকা বসু মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। তিনি তাঁহার নবপ্রকাশিত 'রাজন্যকাণ্ড' নামক গ্রন্থের ৯৯ পৃষ্ঠার পাদটীকায় লিখিয়াছেন,—

* গত ১৭ই পৌষ কলিকাতা সাহিত্য-সভায় পঠিত।

"ব্রাহ্মণডাঙ্গা নিবাসী বংশীবদন বিদ্যারত্ন ঘটক মহাশয় সংগৃহীত বহুসংখ্যক কুলগ্রন্থের কথা রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ঘটক ও কুলীন ব্রাহ্মণ মাত্রই অবগত আছেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ২৮ বর্ষ পূর্ব্বে "গৌড়ে ব্রাহ্মণ' রচয়িতা ৺মহিম চন্দ্র মজুমদার মহাশয় উক্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বহু কুলগ্রন্থের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নাম পাইয়াই আজ পঞ্চদশ বর্ষের অধিক হইল আমরা ব্রাহ্মণডাঙ্গায় উক্ত ঘটক মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তৎকালে তাঁহার বৃদ্ধা কন্যা আমাদিগকে তাঁহার সংগৃহীত কুলগ্রন্থ দেখিতে দিয়াছিলেন,—এরূপ বহুসংখ্যক কুলগ্রন্থ আমি আর কোথাও দেখি নাই। বৃদ্ধা যক্ষের ধনের ন্যায় সেগুলি রক্ষা করিতেছিলেন, মূল গ্রন্থগুলি গৃহের বাহির করিবার কাহারও শক্তি ছিল না। বহু কষ্টে কএকখানি কুলগ্রন্থ স্বহস্তে নকল করিয়া আনিয়াছি। মূল গ্রন্থগুলি সেই গৃহেই রক্ষিত আছে। তন্মধ্যে 'রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী' নামক প্রায় দুইশত বর্ষের হস্তলিখিত পুথিতে শ্রেণীবিভাগ প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে—

ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি শ্রীজয়ন্তসুতেনচ।
নাম্নাপি দেশভেদৈস্তু রাঢ়ীবারেন্দ্রসাতশতী।

এতদ্ভিন্ন উক্ত ঘটক মহাশয়ের সংগৃহীত 'রাঢ়ীয় কুলপঞ্জী' নামক একখানি পুথিতে 'ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি আদিশূর সুতেন চ' এইরূপ পাঠ দেখিয়াছি, ইহাই পাঠান্তর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।" (জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১ম অংশ, ১১৪, পৃঃ)। যে রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরীতে ভূশূর শ্রীজয়ন্তসুত বলিয়া পরিচিত, সেই কুলমঞ্জরীর অন্যত্র শূররাজ বংশ সম্বন্ধে এইরূপ শ্লোক দৃষ্ট হয়—

আদিশূরো ভূশূরশ্চ ক্ষিতিশূরোঽবনীশূরঃ।
ধরণী শূরকশ্চাপি ধরাঽশূরোঽনুশূরকঃ।
এতে সপ্তশূরাঃ প্রোক্তাঃ ক্রমশঃ সুতবর্ণিতা।
বেদবাণাঙ্গশাকে তু নৃপোঽভূচ্চাদিশূরকঃ।
বসুকর্ম্মাঙ্গকে শাকে গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ।'

(রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী)

এই রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরীর প্রমাণেও জয়ন্ত ও আদিশূর অভিন্ন ব্যক্তি হইতেছেন। আদিশূর ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে, উহা উপাধি তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।"

বসু মহাশয় এখানে পূর্ব্বপক্ষের সকল প্রশ্নের উত্তর না দিয়া থাকিলেও কয়েকটি নূতন তথ্য প্রদান করিয়াছেন। প্রথম তথ্য—"ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি

শ্রীজয়ন্তসুতেন চ" এই বচনের আকর, যাহা "ব্রাহ্মণকাণ্ডে" বংশীবিস্তারত্ন ঘটকের সংগৃহীত "কুল পঞ্জিকা" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার প্রকৃত নাম "রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী" এবং তাহা "প্রায় দুইশত বর্ষের হস্তলিখিত।" 'প্রায় দুইশত বর্ষের হস্তলিখিত "রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী" গ্রন্থকে "বংশীবিস্তারত্ন ঘটকের সংগৃহীত কুলপঞ্জিকা" বলিয়া বর্ণন করা সুসঙ্গত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। বচন ধরার সময় গ্রন্থের যথাযথ নাম প্রদান করাই চিরন্তন রীতি। বসু মহাশয় কেন যে এ ক্ষেত্রে তাহা করেন নাই তাহার কারণ জানিতে কৌতূহল হয়।

দ্বিতীয় তথ্য—'রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী' গ্রন্থেই জয়ন্ত ও আদিশূর যে অভিন্ন উহার প্রমাণ আছে। তথাপি "ব্রাহ্মণকাণ্ড" রচনার সময় সেই প্রমাণ উপেক্ষা করিয়া কেন যে বসু মহাশয় 'রাঢ়ীয় কুলপঞ্জী' নামক স্বতন্ত্র গ্রন্থে প্রমাণ অনুসন্ধান করিতে গিয়াছিলেন তাহাও কৌতূহলজনক। এবং স্বতন্ত্র গ্রন্থের স্বতন্ত্র বচনই বা কেমন করিয়া পাঠান্তর কথিত হইতে পারে, তাহাও বুঝা যায় না।

তৃতীয় তথ্য—আদিশূরের রাজ্যলাভের এবং গৌড়ে ব্রাহ্মণ আগমনের কালজ্ঞাপক বচন। যথা—

বেদবাণাঙ্গশাকেতু নৃপোঽভূচ্চাদিশূরকঃ।
বসুকর্ম্মাঙ্গকে শাকে গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ॥

অর্থাৎ ৬৫৪ শাকে আদিশূরের রাজ্যলাভ এবং ৬৬৮ শাকে গৌড়ে ব্রাহ্মণ আগমন। এই বচন "ব্রাহ্মণকাণ্ডে" উদ্ধৃত হয় নাই। পক্ষান্তরে আদিশূরের সময় সম্বন্ধে ৮৮ পৃষ্ঠায় উক্ত হইয়াছে—

"বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে, ৬৫৪ শকে গৌড়স্থ বেদবিধানবঞ্চিত বিপ্রগণ রাজা আদিশূরকে (ব্রাহ্মণ আনাইবার জন্য) জানাইয়াছিলেন। আবার রাঢ়ীয় ঘটককারিকার মতে, ঐ শকেই পঞ্চব্রাহ্মণ গৌড়ে আগমন করেন।"

শেষোক্ত অংশ সম্বন্ধে পাদটীকায় লিখিত হইয়াছে—

"বেদবাণাঙ্গশাকেতু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ।"

এখনকার অধিকাংশ কুলগ্রন্থে 'বেদবাণাঙ্ক' এইরূপ পাঠ দেখা যায়। এপাঠ প্রকৃত নয়।"

এখানে ৬৫৪ শকে আদিশূরের রাজ্যলাভ এবং ৬৬৮ শকে গৌড়ে ব্রাহ্মণ আগমন সম্বন্ধীয় "রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরীর" বচন উদ্ধৃত করিবার বিশেষ সুযোগ ছিল; কিন্তু বসু মহাশয় ১৩০৫ সালে, 'ব্রাহ্মণকাণ্ডের' প্রথম সংস্করণের প্রকাশের সময়, বা ১৩১৮ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময়, তাহা আদৌ আবশ্যক

বোধ করেন নাই। পক্ষান্তরে উক্ত গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে গ্রন্থকার আদিশূর কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ আনয়ন কাল সম্বন্ধে নয় প্রকার বিভিন্ন মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং তৎপর চারি পৃষ্ঠা ভরিয়া নানা প্রকার যুক্তি প্রমাণের অবতারণা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—

"এরূপ স্থলে রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের কুলপঞ্জিকাবর্ণিত বেদবাণাঙ্গ বা ৬৫৪ শক (৭৩২ খৃষ্টাব্দে) কনোজপতি যশোবর্ম্মদেবের সময়ে প্রথম ব্রাহ্মণাগমন এবং তৎপরে জয়াদিত্যের বিজয় কালে আনুমানিক ৭৫৩ হইতে ৭৫৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণের পুনরাগমনে গৌড়মণ্ডল নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল।" (১০৫ পৃঃ)

'রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরীর' এই—

"বেদবাণাঙ্গশাকেতু নৃপোঽভূচ্চাদিশূরকঃ।
বসুকর্ম্মাঙ্গকে শাকে গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ।"

বচনটি শুধু যে এক সময় বসু মহাশয়ের দৃষ্টি পথে পতিত হয় নাই তাহা নয়, স্বয়ং বংশীবদন বিদ্যারত্ন ঘটক মহাশয়ও এই বচনটি দেখিতে পাইয়াছিলেন না। যে "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" পাঠ করিয়া বসু মহাশয় ব্রাহ্মণডাঙ্গার বংশীবদন বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সংগৃহীত "বহুকুলগ্রন্থের" সন্ধান পাইয়াছিলেন, সেই গ্রন্থের উপক্রমণিকায় লিখিত আছে—

"জেলা যশোহরের অন্তঃপাতী ব্রাহ্মণডাঙ্গা গ্রামনিবাসী ঘটকশ্রেষ্ঠ বংশীবদন বিদ্যারত্ন রাঢ়ীয় কুলবিবরণ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং তাহার প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু সেই সকল প্রমাণ কোন্ গ্রন্থের লিখিত তাহা লিখেন নাই। দুর্ভাগ্য বশতঃ বিদ্যারত্ন ঘটকের মৃত্যু সংবাদ শুনা গিয়াছে, সুতরাং তৎপ্রেরিত ঐতিহাসিক বিবরণ কোন্ গ্রন্থসম্মত এবং তাঁহার প্রেরিত বচনসকল কোন্ গ্রন্থের তাহা জানিবার উপায় নাই।"

উক্ত গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "ঘটকদিগের গ্রন্থেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে আদিশূর ৯৫৪ শকাব্দে ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন।"

পাদটীকায় লিখিয়াছেন—

"বেদবাণাঙ্ক শাকে তু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ।"

বিদ্যারত্ন ঘটক প্রদত্ত প্রমাণ (গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ২য় সংস্করণ, ৭৩ পৃষ্ঠা)। ২ পৃষ্ঠা পরে পুনরায় লিখিয়াছেন, "পক্ষান্তরে রাঢ়ীয় সুবিখ্যাত ঘটক বংশীবদন বিদ্যারত্ন

কুলপঞ্জিকায় যে প্রমাণ দিয়াছেন তাহাতে ৯৫৪ শকাব্দে গৌড়ে ব্রাহ্মণ আইসে প্রমাণ হয়।"

"রাজন্যকাণ্ড" আলোচনা করিয়া যে দুইটি বচনের উপর বসু মহাশয়ের একরূপ সর্ব্বজনসমাদৃত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ—

১। ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি শ্রীজয়ন্তসুতেন চ।
নাম্নাপি দেশভেদৈস্তু রাঢ়ী বারেন্দ্র সাতশতী।
২। বেদবাণাঙ্কশাকে তু নৃপোঽভূচ্চাদিশূরকঃ।
বসুকর্ম্মাঙ্গকে শাকে গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ।—

এই দুইটি শ্লোকের পাঠশুদ্ধি সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হওয়ায় পুথিগুলি আর একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ ব্রাহ্মণডাঙ্গা যাতায়াতের ব্যয়ভার বহনে এবং সমিতির সহকারী পুস্তকরক্ষক পণ্ডিত শ্রীমান্ পুরন্দর কাব্যতীর্থকে তথায় যাইবার অবসর দিতে প্রস্তুত হওয়ায় উক্ত, কাব্যতীর্থ মহাশয় বিশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া দুইবার ব্রাহ্মণডাঙ্গায় যাইয়া তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া আসিয়াছেন। কাব্যতীর্থ মহাশয় ব্রাহ্মণডাঙ্গায় কুলগ্রন্থানুসন্ধানে যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায়, তিনি নড়াইলের উকিল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট হইতে ৺বংশীবদন বিদ্যারত্ন ঘটকের পৌত্র শ্রীযুক্ত মণিমোহন ঘটকের নামে অনুরোধপত্র লইয়া ব্রাহ্মণডাঙ্গায় গমন করিয়াছিলেন। মণিমোহন বাবু তাঁহাকে বিশেষ সমাদর করিয়া তাঁহার গৃহের সমস্ত পুথি পরীক্ষা করিতে দিয়াছিলেন। নগেন্দ্রবাবুর কথিত "বিদ্যারত্ন ঘটকের বৃদ্ধা কন্যা এখনও জীবিত আছেন এবং এখনও তিনি তাঁহার পিতার কোনও গ্রন্থ কাহাকেও দিতে পূর্ব্ববৎই অসম্মত। বিদ্যারত্ন ঘটকের পৌত্র মণিমোহন ইংরেজী-শিক্ষিত, এবং সজ্জন। শ্রীমান্ পুরন্দর কাব্যতীর্থ মহাশয় মণিমোহন বাবুর বাড়ীতে তিন বাণ্ডিল কুলশাস্ত্রীয় পুথি দেখিতে পাইয়াছেন। এক বাণ্ডিলে শ্রীযুত মিশ্রকৃত "রাঢ়ীয় কুলপঞ্জী" বা মূল পুথি আছে। এই পুথির পত্রসংখ্যা ৪৩০, তন্মধ্যে অনেকগুলি পত্র অতি জীর্ণ এবং কীটদষ্ট। আরম্ভে এই শ্লোকটি আছে—

"প্রণম্য বিশ্বেশ্বর পাদমাদৌ
সরস্বতীং তাং কুলদেবতাঞ্চ।
নৃপ প্রবোধায় কুলস্তপঞ্জী
বিবিচ্যতে শ্রীযুত-মিশ্রকেণ।"

ইহার পর বংশাবলী আরম্ভ হইয়াছে। তদ্ভিন্ন কোনও ঐতিহাসিক কথা এই গ্রন্থে নাই। আর দুইটি ব্র্যাণ্ডিলে ধ্রুবানন্দমিশ্রকৃত দুইখানি মহাবংশাবলী আছে। ইহার একখানি "মহাবংশাবলীর" সহিত আরও আটখানি পত্র আছে। এই পত্রগুলি প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়। প্রথম পত্রে এক পৃষ্ঠায় মাত্র লেখা আছে। আরম্ভ এইরূপ—

"ওঁ নমঃ কুলদেবতায়ৈ।
বন্দ্যং বন্দ্যতমং মুখং মুখবরং চট্টং প্রকৃষ্টং কুলং
ঘোষং দোষ বিমার্জ্জিতং সুবিহিতং পূতিং প্রসিদ্ধশ্রিয়ং।
গাঙ্গুলীয় কুলস্ত গাঙ্গসদৃশং কাঞ্জীতি সঞ্জীবিনং
কুন্দং কুন্দ বিভাতি কুন্দ্য সদৃশং (মিবাতি) (সুন্দরকুল ২)
খ্যাতা ইমে চাট্টকা (:)।"

চতুর্থ পত্রের শেষ ভাগে লেখা আছে—

"চতুর্ব্বিংশতি দোষাশ্চনিচ্যতে (লিখ্যন্তে) কুলঘাতকাঃ।
বিপর্য্যয় কুলং নাস্তি ন কুলং রণ্ডপিণ্ডয়োঃ।

ইতি কুল দোষ (:) সমাপ্তঃ॥ ওঁনমঃ কুলদেবতায়ৈ॥" পঞ্চম পত্রের গোড়ায় "অথ বন্দ্যঘটীয় কুলং লিখ্যতে" এই কথা আছে। বাকী কয় পত্রে বন্দ্যঘটীয় কুলের বংশাবলী আছে, কিন্তু তাহা অসম্পূর্ণ। মণিমোহন বাবুর অনুগ্রহে আমরা এই কয়েকটী পত্র আপনাদের নিকট আজ উপস্থিত করিতেছি।

এই "কুলদোষঃ" গ্রন্থই যে শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব কর্ত্তৃক "ব্রাহ্মণ কাণ্ডে" বংশীবিদ্যারত্ন সংগৃহীত "কুল পঞ্জিকা" বা "কুলকারিকা" নামে অভিহিত এবং "রাজন্যকাণ্ডে" 'রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী" নামে অভিহিত, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। "ব্রাহ্মণকাণ্ডের" ১১৭ পৃষ্ঠার পাদটীকায় বিদ্যারত্ন সংগৃহীত কুলপঞ্জিকা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে—

'ক্ষিতিশূরেণ রাজ্ঞাপি ভূশূরস্ত সুতেন চ।
ক্রিয়ন্তে গাঞিসংজ্ঞানি তেষাং স্থানবিনির্ণয়াৎ।"

"কুলদোষঃ"গ্রন্থের ২য় পত্রে এই বচন বানান ভুল ছাড়িয়া দিলে অবিকল দৃষ্ট হয়। তাহার পর বসু মহাশয়ের উল্লিখিত সপ্তশতী ২৮ গাঁয়ীরও নাম প্রদত্ত হইয়াছে। "ব্রাহ্মণ কাণ্ডের" ১৯৬ পৃষ্ঠার ১নং পাদটীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে—

"কামরূপে মহাপীঠে সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়কে।
তত্রাগত্য প্রযত্নেন দেবীবর বিশারদঃ।

দ্বিশ বেদেন্দুশাকে চ মেষে মার্ত্তণ্ডমাগতে।
ক্রিয়তে বন্দ্যসিদ্ধির্বা রাঢ়ী দ্বিজ কুলোপরি।” (১৪০২)

এই দুইটি শ্লোক “কুলদোষঃ” গ্রন্থের ৩থ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট হয়। তথাকথিত “বংশীবিদ্যারত্ন-সংগৃহীত কুলকারিকা” হইতে “ব্রাহ্মণকাণ্ডের” ১৮৭ পৃষ্ঠার ৩নং পাদটীকায় ধৃত ধ্রুবানন্দমিশ্রের সময় (১৪০৭ শাক) জ্ঞাপক শ্লোকটিও “কুলদোষ, গ্রন্থের ৩থ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায়। বসু মহাশয় “রাজন্য কাণ্ডের” পূর্ব্বোদ্ধৃত টীকায় সপ্ত-শূররাজের নাম সম্বলিত যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা' কুলদোষ” গ্রন্থের ৩য় পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় না এই বচনের ঠিক পরে বসু মহাশয়ের ধৃত—

“বেদবাণাঙ্গ শাকেতু নৃপোঽ ভূচ্ছাদিশূরকঃ।
বসুকর্ম্মাঙ্গকে শাকে গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ॥”

তৎপরিবর্ত্তে ২ক পৃষ্ঠায় এই শ্লোকটি আছে—

“ক্ষত্রিয় বংশে সমুৎপন্নো মাধবো কুলসম্ভবঃ।
বসু ধর্ম্মাষ্টকে শাকে নৃপ (পো) ভু (ভূ) চ্চাদিশূরকঃ।”

এই শ্লোকের পরে ৮৭৮ অঙ্ক আছে। তথা ২থ পৃষ্ঠায় এই বচনটি আছে—

বেদবাণাঙ্ক শাকেতু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ।

সুতরাং “কুলদোষঃ” হইতেই বংশীবদন বিদ্যারত্ন মহাশয় এই বচন সংগ্রহ করিয়া “গৌড়েব্রাহ্মণকার” ৺মহিমাচন্দ্র মজুমদারের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন এইরূপ সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত। “কুলদোষঃ” গ্রন্থে নগেন্দ্র বাবুর উদ্ধৃত “ভূশূরেণচ রাজ্ঞাপি শ্রীজয়ন্ত সুতেন চ” বচন নাই; আছে—

“ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি আদিশূরসুতেনচ।
নাম্নাপি দেশভেদৈস্তু রাঢ়ী বারেন্দ্রসাতশতী।” (২থ)

সুতরাং ৺বংশীবদন বিদ্যারত্নের ঘরের পুস্তকের দোহাই দিয়া আদিশূর ও জয়ন্ত অভিন্ন বলা চলে না, এবং ৬৫৮ শকাব্দে গৌড়ে ব্রাহ্মণ আগমন করিয়াছিলেন একথাও বলা চলে না।

“কুলদোষ” গ্রন্থে যে সকল ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় তাহারই বা মূল্য যে কত তাহা নিরূপণ করা কঠিন। ‘কুলদোষ”কার বল্লালসেন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে মনে হয় তাহার কোন বচন বিনা বিচারে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। যথা—

"বেদযুগ্ম (গ্ম) ধরা ক্ষৌণি (ণী) শাকে সিংহস্থ ভাস্করে।
মিত্রসেনস্য পুত্রোভূৎ শ্রী (মৎ) বল্লাল ভূপতিঃ। ১১২৪

এখানে বল্লাল সেনকে মিত্রসেনের পুত্র বলা হইয়াছে এবং ১১২৪ শাক বা ১২০২ খৃষ্টাব্দ তাঁহার আবির্ভাবকালরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা অধিকতর নির্ভরযোগ্য প্রমাণের বিরোধী। তবে "বেদবাণাঙ্কশাকেতু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ" আদিশূরের সম্বন্ধে এই বচন একেবারে অমূলক বলিয়া মনে হয় না। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত এবং বঙ্গদেশীয় এসিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত আনন্দভট্ট রচিত "বল্লাল চরিত" গ্রন্থে এই বচন দৃষ্ট হয়। "বল্লাল চরিত" দুই খানি আদর্শ পুস্তক অবলম্বনে সম্পাদিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একখানি পুস্তক ১৬২৯ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে লিখিত। সুতরাং "বল্লালচরিতে" যে জনশ্রুতি নিবদ্ধ হইয়াছে তাহা যে অন্যূন দুইশত বৎসর পূর্ব্বে এদেশে প্রচলিত ছিল, এ কথা বলা যাইতে পারে। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে রচিত "ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে" ৯৯৯ শকাব্দ গৌড়ে ব্রাহ্মণ আগমনের কাল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। জনশ্রুতি-মূলক বচন প্রমাণোক্ত ৯৫৪ বা ৯৯৯ এর যে প্রভেদ তাহা গণনীয় নহে। যাঁহারা "সম্বন্ধ নির্ণয়", "গৌড়ে ব্রাহ্মণ", "ব্রাহ্মণকাণ্ড" প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন আদিশূর কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ আনয়নের সময় সম্বন্ধে, অনুরূপ অনেক বচন প্রমাণ প্রকাশিত হইয়াছে। "নহ্যমূলাঃ জনশ্রুতিঃ" এ কথা ঐতিহাসিকের উপেক্ষণীয় নহে। কিন্তু জনশ্রুতির একটা ধর্ম্ম এই, ইহার মূল হইতে এত বৃহৎ কাণ্ড এবং বহু সংখ্যক শাখা প্রশাখা উৎপন্ন হয় যে, অনেক সময় তাহার মূল খুঁজিয়া বাহির করা সুকঠিন হইয়া উঠে। জনশ্রুতির মূল খুঁজিয়া বাহির করিবার প্রধান উপায় ঘটনার সমসময়ের লোকের সাক্ষ্য। আদিশূর সম্বন্ধে এরূপ কোনও সাক্ষ্য এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই। কিন্তু একাদশ শতাব্দে শূররাজবংশের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এবং মধ্যদেশ বা কান্যকুব্জ অঞ্চল হইতে বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ আগমন সম্বন্ধে প্রমাণ ক্রমশঃ আবিষ্কৃত হইতেছে। রাজেন্দ্র চোলের ১০২৩ খৃষ্টাব্দে সম্পাদিত তিরুমলয় লিপিতে দক্ষিণরাঢ়ের অধিপতি রণশূরের পরিচয় পাওয়া যায়। নবাবিষ্কৃত (কিন্তু এ যাবৎ অপ্রকাশিত) বিজয় সেনের তাম্র শাসনে কথিত হইয়াছে যে, বিজয় সেনের মহিষী এবং বল্লালসেনের জননী বিলাসদেবী শূররাজবংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বারেন্দ্রকুলজ্ঞগণের গ্রন্থে যে কথিত হইয়াছে বল্লালসেন

আদিশূরের দৌহিত্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ইহাই হয়ত তাহার ভিত্তি। কান্যকুব্জ তৎকালে মধ্যদেশের রাজধানী ছিল। কান্যকুব্জ রাজ্য বা মধ্যদেশ হইতে তখন যে পঞ্চগোত্রের মধ্যে অন্ততঃ দুইটি গোত্রের—বাৎস্য ও সাবর্ণ গোত্রের—ব্রাহ্মণ বাঙ্গলায় আসিয়াছিল তাহার প্রমাণ সমসাময়িক লিপিতে পাওয়া যায়। বিজয় সেনের তাম্রশাসনের প্রতিগ্রহকর্ত্তা বাৎস্য গোত্রীয় এবং তাঁহার প্রপিতামহ মধ্যদেশ বিনির্গত বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ভোজবর্ম্মণের বেলাব-লিপির প্রতিগ্রহকর্ত্তা সাবর্ণ সগোত্র ছিলেন এবং তাঁহার প্রপিতামহও মধ্যদেশ বিনির্গত বলিয়া কথিত হইয়াছেন। সুতরাং আমরা যদি অনুমান করি মধ্যদেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়নকারী আদিশূর নামক রাজা একাদশ শতাব্দে বা তাহার কাছাকাছি কোন সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা হইলে কুলশাস্ত্রের এবং তাম্রশাসনের প্রমাণের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধিত হইতে পারে। বিভিন্নশ্রেণীর প্রমাণের সামঞ্জস্য-বিধানই theory বা মতবাদের উদ্দেশ্য। ইতিহাস অর্থাৎ history অনেক সময়েই ইহা অপেক্ষা বড়বেশী কিছু—কোন বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা বা অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত—প্রদান করিতে পারে না। অবশ্যই একাদশ শতাব্দ ব্রাহ্মণ আনয়নকারী আদিশূরের কাল ধরিয়া লইলে তাঁহাকে গৌড়মণ্ডলে অর্থাৎ বর্ত্তমান বাঙ্গলা ও বিহারের একচ্ছত্র মহারাজ,পার্শ্ববর্ত্তী কামরূপ কলিঙ্গের অধিরাজ, এবং বাঙ্গলায় বৈদিক ধর্ম্ম সংস্থাপক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। কারণ একাদশ শতাব্দের প্রথমভাগে পালনরপালগণের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিল এবং শেষ ভাগে বরেন্দ্রে প্রজাবিদ্রোহের ফলে বর্ম্মণ এবং সেনবংশের অভ্যুত্থানের সুযোগ ঘটিয়াছিল। এ সময়ে শূররাজের প্রাচ্যভারতে সার্ব্বভৌমত্ব লাভের অবসর ছিল না এবং ইহার অনেক পূর্ব্ব হইতে এদেশে বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণও ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া "বেদবাণাঙ্ক শাকেতু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ।" এই শ্লোকার্দ্ধের "বেদবাণাঙ্ক" কে আজ "বেদবাণাঙ্গ" পড়া, এবং তার পরদিন আবার "গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ"স্থলে "নৃপোঽভূচ্চাদিশূরকঃ" ধরা, সমর্থন করা যাইতে পারে না। যখন "গৌড়রাজমালা" লিখিত হইয়াছিল তখনও বিজয়সেনের তাম্রশাসনের খবর জানা ছিল না এবং ভোজবর্ম্মণের বেলাব-তাম্রশাসনও তখন আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং আদিশূর সম্বন্ধে আজ যত কথা বলিতে সাহস করা যাইতে পারে, তখন ততটা সম্ভবপর ছিল না।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

স্নাহিত্য, ২৫ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা।

কৃষ্ণমতী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্যামসুন্দরের মন্দিরে মাসীর সমভিব্যাহারে কৃষ্ণমতী ঝুলন দেখিতে গিয়াছিল। শ্যামসুন্দরের মন্দির অদ্য রাত্রিতে আলোকে উজ্জলিত, কিন্তু দশম বর্ষীয়া বালিকা কৃষ্ণমতীর প্রবেশমাত্রে মন্দির যেন আরো উজ্জল হইল। দর্শকেরা কৃষ্ণমতীকেই দেখিতে লাগিল, কৃষ্ণমতী যেখানে যায় রূপে আলো করে।

নীলাপুরে শ্যামসুন্দরের মন্দিরে ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে বড় ধুম। মন্দিরের ভিতরে ঝাড়ের আলো, ছবি ও ফুলের মালায় সুসজ্জিত; মন্দিরের বাহিরে ছোট ছোট শিশির আলোতে নীলাপুর গ্রামের অনেকদূর পর্য্যন্ত রোস্‌নাই হইয়াছিল। মন্দিরের সম্মুখে প্রশস্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বে দোকান বসিয়াছে, তাহাও উজ্জলিত। মন্দিরের ছাদের উপরে চতুর্দ্দিকে বিশ হাত অন্তরে বড় বড় লাল নিশান উড়িতেছে। মন্দিরের ফটকের উপরে নহবৎ খানায় নহবৎ বাজিতেছে।

অদ্য সন্ধ্যার পর মন্দিরের ভিতরে কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। সুসজ্জিত প্রশস্ত প্রাঙ্গণে নীলাপুরের ও পার্শ্বস্থ গ্রামের বহুসংখ্যক ভদ্রলোক বসিয়া কীর্ত্তন শুনিতেছেন; মধ্যস্থানে পৃথগাসনে নীলাপুরের জমিদার বংশধর, নীলাপুরের কুলাঙ্গার, সয়তানের অবতার, অষ্টাদশবর্ষীয় শ্রীযুক্ত অসিতকুমার বাবু বিরাজমান। কীর্ত্তনী সুরূপা নহে কিন্তু সুগায়িকা। শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাধাপ্যারীর প্রথম সন্দর্শন কিরূপে এবং কি অবস্থাতে হইয়াছিল তাহাই কীর্ত্তন করিতেছিল। শ্রোতৃবৃন্দ একাগ্রমনে শুনিতেছিল, কিন্তু এই দেবালয়ের অধিকারী জমিদার-পুত্রের মন অন্যদিকে ছিল। গ্রামের কুলাঙ্গনাগণ শ্যামসুন্দর দর্শনের জন্য যে পথ দিয়া যাতায়াত করিতেছিল সেই দিকে তাঁহার চক্ষু ছিল। হঠাৎ তিনি উঠিয়া গেলেন।

মন্দিরের বাহিরে বড় গুলজার, মেলা বসিয়াছে, নানা প্রকার দ্রব্যাদিতে দোকান সাজাইয়াছে; তন্মধ্যে পানের ও ফুলের মালার দোকানে জনতা বেশী

একটি মশলার দোকানে কৃষ্ণমতীর মাসী মশলার দর করিতেছিলেন; কৃষ্ণমতী তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চারিদিক দেখিতেছিল। দশমবর্ষীয়া বালিকা (দেখিতে যেন দ্বাদশবর্ষীয়া) অঞ্চলের কিয়দংশ দ্বারা মাথা ও মুখ আবৃত করিয়া কেবলমাত্র চক্ষু দুইটী বাহির করিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছে, হঠাৎ তাহার দৃষ্টি একস্থানে স্থাপিত হইল। সন্নিহিত একটী ফুলের মালার দোকানে পঞ্চদশবর্ষীয় একটী সুকুমার কিশোর বালক ফুলের মালা কিনিতেছিল। কৃষ্ণমতী তাহাকেই এক দৃষ্টে দেখিতেছিল। এমন সময়ে কে একজন তাহার পশ্চাৎ হইতে বলিল—"কৃষ্ণমতি' আমি তোমার জন্য শ্যামসুন্দরের প্রসাদি মালা আনিয়াছি এই লও, গলায় পর"। কৃষ্ণমতী ভ্রূভঙ্গী করিয়া মাথায় আরো কাপড় টানিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল। অসিতকুমার বাবু অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, তবু মালা লইল না। তাহার মাসী উহা দেখিয়া বড় রাগ করিলেন; বালিকা কৃষ্ণমতী জমিদার পুত্রের অপমান করাতে তাঁহার একটু ভয়ও হইল। কৃষ্ণমতীকে ভৎর্সনা করিতে করিতে তিনি অন্য মশলার দোকানে গেলেন, কৃষ্ণমতী ধমক খাইয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। ইতিমধ্যে সেই অপরিচিত কিশোর বালক তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিল—"এই মালা ছড়াটি তোমার জন্য কিনিয়াছি তুমি ইহা লও"। বলিয়া কৃষ্ণমতীর হাতে উহা দিতে গেল, কৃষ্ণমতী হাসিয়া ঘাড় নাড়িল। কিন্তু যখন অপরিচিত কিশোর বলিল, "মালা ছড়াটী না লইলে আমি বড় দুঃখিত হইব, আমি তোমাদের জানি," তখন কৃষ্ণমতী আর থাকিতে পারিল না, হাত পাতিয়া মালা লইয়া তাহার অঞ্চলে বাঁধিয়া মাসীর নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল "মাসি, উনি কে?"

মা। কে—জান না—আমাদের জমিদার পুত্র অসিতকুমার বাবু।

কৃ। না, না, আমাকে যিনি মালা দিয়া গেলেন।

এই বলিয়া অঞ্চল হইতে এক ছড়া জুঁই ফুলের গড়েমালা মাসীকে দেখাইল।

মা। ও পোড়ারমুখী, তুমি অসিতকুমারের মালা ত্যাগ করিয়া একজন অজ্ঞাত, অপরিচিত দুষ্ট লোকের মালা লইয়াছ।

কৃষ্ণমতী লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া সেইস্থানে দাঁড়াইয়া রহিল।

এই দুই ব্যক্তি কৃষ্ণমতীকে আদর করিয়া মালা দিতে যায় কেন? ইহারা উভয়ে রূপে মুগ্ধ। কৃষ্ণমতী অসামান্য সুন্দরী।

মাসীর সহিত কৃষ্ণমতী বাটী ফিরিল, পথিমধ্যে মাসী অতি মৃদু স্নেহব্যঞ্জক

স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি অসিতকুমারের মালা ত্যাগ ক'রে একজন অপরিচিত লোকের মালা লইলে কেন?" কৃষ্ণমতী উত্তর করিল "কি জানি।" কৃষ্ণমতী বালিকা, আপনার মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া ঐরূপ উত্তর দিয়াছিল। মনুষ্য হৃদয় মধ্যে যত প্রকার ক্রিয়া জন্মে, তন্মধ্যে দুই প্রকার ক্রিয়া জীবনে বড় অশুভকর হয়; প্রথমটী কোন কোন ব্যক্তিকে দেখিবামাত্র শিহরিয়া উঠিতে হয়; দ্বিতীয়টী কোন কোন ব্যক্তিকে দেখিয়া আবার দেখিতে ইচ্ছা করে। প্রথমটীর নাম "ঘৃণা", দ্বিতীয়টীর নাম ঠিক বলিতে পারিলাম না। এই দুই ব্যক্তিকে দেখিয়া কৃষ্ণমতীর হৃদয়ে এই দুই প্রকার ক্রিয়া জন্মিয়াছিল। অসিতকুমারকে দেখিয়া ঘৃণা, ও অপরিচিত কিশোরকে দেখিয়া কি একটা সুখানুভব করিয়াছিল। সেই জন্য প্রথমের মালা লইল না, দ্বিতীয়ের মালা লইল। এই দুইটি হৃদয়ের ক্রিয়াতে কুসুমকলিকা বালিকা কৃষ্ণমতীর ভবিষ্যৎ জীবন কিরূপ হইয়াছিল, তাহা এই আখ্যায়িকাতে ক্রমশঃ প্রকটিত হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণমতী দরিদ্রকন্যা। বাল্যকালে পিতৃমাতৃহীনা হইয়া, বিধবা মাসীর দ্বারা প্রতিপালিত হয়। তাহার মাসীরও তাহার ন্যায় তিন কুলে কেহ ছিল না। তিনি স্বামীর কিছু সঞ্চিত ধন সুদে খাটাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন ও কৃষ্ণমতীকে প্রতিপালন করিতেন। মৃত্তিকানির্ম্মিত প্রাচীর বেষ্টিত একখানি মেটে ঘরে দুইজনে বাস করিতেন। কিন্তু এই মেটে ঘরের প্রতি দেশের লোকের লক্ষ্য ছিল, কেন না এই মেটে ঘরে অতুল্য রূপরাশি বিরাজ করিত। কৃষ্ণমতীর রূপ দেখিয়া জানানা মিশনের বিবিরা বিনা বেতনে অতি যত্ন সহকারে তাহাকে শিক্ষা দিতেন। ঐরূপ একজন গুরুমা বাঙ্গালা পড়াইতেন; কৃষ্ণমতী একদিনে ক, খ, শিখিয়াছিল।

কৃষ্ণমতীর বিবাহ সময় উপস্থিত, কিন্তু বিবাহ হয় না। গ্রামের সকল গৃহস্থ ও গৃহিণীর ইচ্ছা যে কৃষ্ণমতীকে পুত্রবধূ করেন। সকল যুবকের ইচ্ছা যে কৃষ্ণমতীকে বিবাহ করে; কিন্তু দুষ্প্রাপ্য, বহুমূল্য বস্তু কেবল ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের অদৃষ্টেই ঘটে। কৃষ্ণমতীকে পুত্রবধূ করিবার জন্য গ্রামের প্রধান দুই জমিদারের মধ্যে লাঠালাঠি বাধিবার উপক্রম হইল।

নীলাপুর একটী গণ্ডগ্রাম। উহাতে অনেক ধনী লোকের বাস, সুখধান বহুসংখ্যক বৃহৎ শ্বেত অট্টালিকায় গ্রাম পরিপূর্ণ। উল্লিখিত দুই জন যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী। এক জনের নাম রোহিণীকুমার রায়, অপরের নাম তখন বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়। রোহিণীকুমার রায় বুনিয়াদী বড় মানুষ, পাঁচ খানা জমিদার, কিন্তু অশিক্ষিত—চাল চলন সেকেলে জমিদারের ন্যায়, আবার প্রবল, দুঁদে ও দুর্দ্দান্ত জমিদার ছিলেন। পুত্র সন্তান না হওয়ায় ইনি ক্রমে ক্রমে তিনটী দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। অবশেষে অনেক যাগ যজ্ঞের পর কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভে তাঁহার একটী পুত্র সন্তান জন্মিয়াছিল। এই পুত্রের নামকরণ হইল অসিতকুমার।

গ্রামের দ্বিতীয় ধনাঢ্য ব্যক্তি রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন, সামান্য গৃহস্থের সন্তান; কৃতবিদ্য হইয়া এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতি করিয়া প্রভূত ধন সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া স্বদেশে অনেক তালুক মুলুক খরিদ করিয়া ঐশ্বর্য্যে রোহিণীকুমার রায়ের সমকক্ষ হইলেন; কিন্তু তিনি কখন দেশে আসিতেন না, তাঁহার একজন জ্ঞাতি-ভাই নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে সকল বিষয়ে তাঁহার প্রতিনিধি করিয়াছিলেন। রাসবিহারী বাবুর এক স্ত্রী, ও এক পুত্র, নাম বনবিহারী, বড় ভাল ছেলে, ভালরূপ লেখা পড়া শিখিতেছে। ইতিপূর্ব্বে রাসবিহারী বাবু সপরিবারে বাটী আসিয়াছিলেন, কৃষ্ণমতীকে দেখিয়া বনবিহারীর সহিত বিবাহ দিতে তাঁহার স্ত্রীর বড় সাধ হইয়াছিল। সেজন্য তিনি ম্যানেজার নবীন বাবুর স্ত্রীকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়া গেলেন। এদিকে অসিতকুমারের মাতা ও দুই বিমাতা প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, ঐ মেয়েকে পুত্রবধূ করিয়া ঘরে আনিবেন। সেজন্য জমিদার বাবু ও নবীন বাবুর মধ্যে লাঠালাঠি আরম্ভ হইল, সে সকল ঘটনা এ স্থলে বিবৃত করিবার আবশ্যকতা নাই।

এইরূপ গোলমালে কৃষ্ণমতীর বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর হইল, কিন্তু দেখিতে যেন চতুর্দ্দশ বৎসর, সে জন্য কৃষ্ণমতীর মাসী বড় গোলে পড়িলেন। আবার এদিকে দুই জন দেশের বড় লোক কৃষ্ণমতীর জন্য লাঠালাঠি আরম্ভ করিলেন। একবার ভাবিলেন "মেয়েটাকে নিয়ে কাশী পলাইয়া যাই।" কিন্তু তাঁহার একজন মুরব্বি ছিলেন, তিনি অন্যরূপ পরামর্শ দিলেন। দেবনাথ ঘোষাল অতি প্রাচীন লোক, নিরীহ ভাল মানুষ, হরি নাম জপ করিয়া কালাতিপাত করিতেন। তিনি বলিলেন, "তোমার কৃষ্ণমতী যেমন সুন্দরী ও গুণবতী রাসবিহারীর পুত্রও সেই-

ঘরে ও রূপবান্। অতি অল্প বয়সে দুইটা পাশ করিয়াছে, দুইটাতে জলপানি পাইয়াছে। আর জমিদারপুত্র অসিতকুমার অপাত্র, তাহার সহিত বিবাহ হইলে কৃষ্ণমতী চিরদুঃখিনী হইবে, বনবিহারীর সহিত বিবাহ হইলে চিরসুখী হইবে।"

মাসি। তাত বুঝলুম, কিন্তু রাত্রে যদি আমাদের ঘরে আগুন দিয়া পোড়াইয়া মারে?

দেব। বটে, বটে, যে দুর্দ্দান্ত জমিদার, সকলি পারে। শুন, তোমার যদি মত থাকে, তবে অতি শীঘ্র বনবিহারীর সহিত কৃষ্ণমতীর বিবাহ দিবার বন্দোবস্ত করিব, বিবাহের পর তুমি কাশী চলিয়া যাইও। তোমার মেটে ঘর আমি বিক্রয় করিয়া দিতেছি, তুমি দেনাদারের নিকট কাঁদা কাটা করিয়া তোমার টাকা গুলি আদায় করিয়া লও; বিবাহ গোপনে আমার বাটিতে হবে, বিবাহের পর দিন হইতে তুমি রাসবিহারীর বাটিতে থাকিও, তোমার কেহ অনিষ্ট করিতে পারিবে না, পরে তাহাদের সহিত কাশী যাইও।

তাহাই হইল। প্রাচীন দেবনাথ নবীন বাবু ম্যানেজারের সহিত দেখা করিয়া বিবাহের দিন স্থির করিলেন। বিবাহ গোপনে হইবে, কেননা জমিদার কি তাহার পুত্র উহা জানিতে পারিলে, লাঠালাঠি করিয়া বিবাহ বন্ধ করিবে। রাসবিহারী বাবু সপরিবারে বাটী আসিলেন, জমিদার তাঁহার বিরুদ্ধে একটা বড় মোকদ্দমা রুজু করিয়াছিলেন, সেই উপলক্ষে আসিলেন।

বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। দেবনাথের বিধবা কন্যা কৃষ্ণমতীর মাসীকে বলিল, "হ্যাঁ—গা, আমি কয় দিন ধরিয়া দেখিতেছি বিবাহের কথা উপস্থিত হইলে, কৃষ্ণমতীর মুখখানি শুকাইয়া যায় কেন—গা?

মাসি বলিলেন,—হ্যাঁ—মা, আমিও উহা লক্ষ্য করিয়াছি, কিন্তু কেন তাহা বুঝিতে পারি নাই।

কিন্তু আমরা বুঝিয়াছি কেন। সেই যে, ঝুলন যাত্রার রাত্রে একটী পঞ্চদশবর্ষীয় কিশোর কৃষ্ণমতীকে মালা দিয়াছিল, তাহার মুখখানি কৃষ্ণমতীর হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল, কৃষ্ণমতী সেই মুখ খানি ভুলিতে পারে নাই। বিবাহের কথা উত্থাপিত হইলে সেই মুখখানি আরো উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিত, সেই জন্য কৃষ্ণমতীর মুখ ম্লান হইত। যাহা হউক, বিবাহের দিনে গাত্রে হরিদ্রা ও অন্যান্য কৌলিক কার্য্য সকলই গোপনে সম্পাদিত হইল। রাত্রে পাত্রকে দেবনাথের বাটিতে গোপনে আনিয়া একটী নিভৃত কক্ষে বিবাহ আরম্ভ হইল, সে ঘরে

কেবল মাত্র পাঁচ ছয়টী স্ত্রীলোক ছিল। কৃষ্ণমতী সাত হাত ঘোমটা দিয়া মুখখান তোলো হাঁড়ি করিয়া বিবাহ করিতে বসিল; কিন্তু যখন শুভদৃষ্টির জন্য যে আচ্ছাদন দ্বারা বরকনেকে ঢাকিয়াছিল উহা উঠাইয়া লওয়া হয়, তখন স্ত্রীলোকেরা দেখিল কৃষ্ণমতী মৃদু মৃদু হাসিতেছে। অসাবধানতা বশতঃ ঘোমটা টানিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, পরে আবার সাত হাত ঘোমটা দিয়া বসিল, স্ত্রীলোকেরা আরো দেখিল যে, বর বনবিহারী ঐরূপ হাসিতে হাসিতে ঘাড় হেঁট করিল। স্ত্রীলোকেরা উহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল। বরকনে চোকাচোকি করিয়া হাসিল কেন? কেহ কিছু বুঝিতে পারিল না। বোধ হয় পাঠকদিগকে বুঝাইতে হইবে না, এ বর কে। সেই যে কিশোর বালক ঝুলন যাত্রার রাত্রে কৃষ্ণমতীকে মালা দিয়াছিল, তাহারি সহিত চোকাচোকি করিয়া কৃষ্ণমতী হাসিয়াছিল। তিনি রাসবিহারীর পুত্র বনবিহারী, আজ তিনিই কৃষ্ণমতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। শুভদৃষ্টির সময় কৃষ্ণমতী তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া ঈষৎ হাসিয়াছিল, এবং আনন্দে ঘোমটা টানিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, সে জন্য স্ত্রীলোকেরা তাঁহার হাসি দেখিতে পাইয়াছিল।

পরদিন প্রাতে এ বিবাহ গ্রামে প্রচারিত হইল, অসিতকুমার ক্রোধে আচড়াপিচড়ি করিতে লাগিল; চাকর বাকরদের মারধর করিতে লাগিল, সম্মুখে যাহা পাইত তাহাই ভাঙ্গিতে লাগিল। এইরূপে জমিদার বাবুর অনেক ক্ষতি করিল, অবশেষে পিতামাতা ও বিমাতাদের গালি পাড়িতে লাগিল। ক্রমে ক্রোধের শমতা হইলে, বয়স্যদিগের নিকট প্রতিজ্ঞা করিল, যে রূপেই হউক কৃষ্ণমতীকে সে কাড়িয়া লইবে।

কিছু দিন পরে রাসবিহারী বাবু সপরিবারে এলাহাবাদে যাত্রা করিলেন। কৃষ্ণমতীর মাসী তাঁহাদের সহিত কাশী যাইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বহুকালের পর নীলাপুরের লোক কৃষ্ণমতীকে আবার দেখিতে পাইল। দশবৎসর পরে রাসবিহারী বাবু সপরিবারে নীলাপুরের বাটীতে আসিলেন। তাঁহার বর্ষীয়সী জননী পীড়িত হইয়া এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন যে, নীলাপুরের গঙ্গাতীরে তাঁহার মৃত্যু হয়। সেই জন্য রাসবিহারী বাবু সপরিবারে

নীলাপুরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু জননীর না এদিক না ওদিক, মরিবেনও না বাঁচিবেনও না, কেবল শয্যাশায়ী হইয়া রহিলেন। সুতরাং রাসবিহারী বাবুকে অনেকদিন নীলাপুরের বাটীতে বাস করিতে হইল। কৃষ্ণমতীকে দেশের লোক দলে দলে দেখিতে আসিল। তাঁহার এক্ষণে দ্বাবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম, কিন্তু সন্তানাদি হয় নাই; স্বামী বনবিহারী কৃতবিদ্য হইয়া পিতার সহিত ওকালতি করিয়া যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতেছেন। এই দম্পতিকে দেখিয়া সকলেই মনে করিত ইহারাই সুখী। বাস্তবিক যদি কেহ এই পৃথিবীতে সুখী থাকে তবে ইহারা দুইজন। কৃষ্ণমতী সন্তানাদি হয় নাই বলিয়া যে দুঃখিতা, তাহা নহে, সে জন্য তাহার শ্বশুরশাশুড়ী দুঃখিত। কৃষ্ণমতীকে যে দেখিত সে বলিত, "কি রূপ গা! এমন রূপ ত কখনও দেখি নাই!" যাহা হউক, কৃষ্ণমতীর রূপের ও গুণের কথা লইয়া দেশে হৈ হৈ পড়িয়া গেল, যেখানে দুই চারি জন স্ত্রীলোক জমিত সেইখানেই কৃষ্ণমতীর কথা হইত।

একটি মনোহর উদ্যানবাটীতে বয়স্যদিগের সহিত সুরাপান করিতে করিতে শ্রীযুক্ত অসিতকুমার বাবু কৃষ্ণমতীর রূপের কথা শুনিলেন, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ওষ্ঠাধর দংশন করিতে লাগিলেন। বয়স্যগণ বুঝিল বনবিহারী ও কৃষ্ণমতীর বড় বিপদ, কেননা অসিতকুমারের অসাধ্য কোন কাজ নাই। কিছু দিন ধরিয়া অসিতকুমার তাঁহার দুই জন প্রিয় বয়স্যের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন, কি পরামর্শ তাহা কেহ জানিতে পারিল না। ইহার সঙ্গে কৃষ্ণমতীকে একবার দেখিবার বাসনা জন্মিল, তাহার সুযোগও হইল। রামচরণ ঘোষাল তাঁহার পৌত্রীর বিবাহোপলক্ষে রাসবিহারী বাবুর বাটীর স্ত্রীলোকদিগকে আনিবার চেষ্টা করিলেন, সফলও হইলেন, কেননা তিনি ম্যানেজার নবীন বাবুর শ্যালক। শাশুড়ী ও অন্যান্য পৌরস্ত্রীর সহিত কৃষ্ণমতী অলঙ্কারে সজ্জিতা হইয়া রামচরণ বাবুর বাটী আসিলেন। অসিতকুমার এই সংবাদ তাঁহার গুপ্তচরের মুখে শুনিলেন। তাঁহার একটা বিশেষ গুণ ছিল যে, তিনি স্ত্রীলোক বেশ ধারণ করিতে শিখিয়াছিলেন, তজ্জন্য গোঁপ দাড়ি রাখিতেন না। রাসবিহারী বাবুর বাটীর মেয়েরা আসিয়াছে, সুতরাং স্ত্রী আচারের সময়ে অন্তঃপুরে কোন পুরুষের যাইবার হুকুম ছিল না, কিন্তু অসিতকুমার রমণীবেশে সামান্য অলঙ্কারে সজ্জিতা হইয়া ঘোমটা টানিয়া যে স্থানে কৃষ্ণমতী ঘরের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া স্ত্রী আচার দেখিতেছিলেন, তাহারাই নিকট দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। কৃষ্ণমতী মুখের কাপড় কিঞ্চিৎ

খুলিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, বরকে কেহ কাণ মুলিয়া দিতেছিল, কেহ বা গুম্ গুম্ করিয়া পিঠে কিল মারিতেছিল; তাহা দেখিয়া হাসিতেছিলেন ও সঙ্গিনীদিগকে কি বলিতেছিলেন। অসিতকুমার এইরূপে অনেকক্ষণ কৃষ্ণমতীকে দেখিতে লাগিলেন, পরে স্ত্রী আচার শেষ হইলে, তিনি আর সে বাটীতে থাকিতে সাহস করিলেন না। কিন্তু কৃষ্ণমতীকে দেখিয়া উন্মত্তের ন্যায় হইলেন, বাটী ফিরিলেন না, দুই তিনজন বয়স্য লইয়া বাগান বাটীতে সুরাপান করিতে করিতে কৃষ্ণমতীর কথা কহিতে লাগিলেন; সে রাত্রে অধিক পরিমাণে সুরাপান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাসবিহারী বাবুর বাটীর সদর অন্দরে লোক গিস্‌গিস্ করিতেছে। বনবিহারী একমাত্র সন্তান, বড় আদরের সন্তান, তাহার জন্মদিন উপলক্ষে উৎসব হইতেছে। সাতখানা গ্রামের লোক নিমন্ত্রিত, কি ভদ্র কি ইতর সকল শ্রেণীর লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছে; এ অঞ্চলের যত কাঙ্গালগরীব আছে তাহাদের একদিন ভোজন করান হইবে, ও কিছু কিছু নগদ ও এক একখানা শীতবস্ত্র দান করা হইবে। এই উপলক্ষে রাসবিহারী বাবুর বাটীতে এক সপ্তাহ ধুমধাম চলিবে, অদ্য হইতে উহা আরম্ভ হইল। অবশেষে একরাত্রি নাচ ও এক রাত্রি থিয়েটার হইবে, কিরূপে এই কার্য্য সম্পাদিত হইল, তাহা এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকাতে বিবৃত করিবার আবশ্যকতা নাই। প্রথম দিবসের রাত্রে সাত আটটার সময় একটি নিভৃত কক্ষে অনেকগুলি সমবয়স্কা লইয়া কৃষ্ণমতী পান সাজিতেছিলেন, নানা বিষয়ের গল্প চলিতেছিল, কৃষ্ণমতীর গল্পে সকলেই হাসিতেছিল, কথায় কথায় দুই একটি বালিকার বিবাহের কথা উত্থাপিত হইল। রঙ্গমতী নামে একটি বধূ জিজ্ঞাসা করিল, "উদ্ধারিণীর বিয়ে কবে হবে?" জ্যোৎস্নাবতী বলিল "তার বিয়ে হবে না।"

রঙ্গ।—কেন?

জ্যোৎ।—টাকা কোথায়? গরীব বিধবার মেয়ে, একটি মাত্র রোজগারে ভাই, কলেতে কাজ করে দশটি টাকা পায়, আপনি খায় আর মা বোনকে

খাওয়ায়। একটা ছেলে ঐ কলে কাজ করে, সে বিবাহ ক'র্‌তে রাজি হ'য়েছে বটে, কিন্তু দু'শ' টাকা চায়।

কৃষ্ণমতী।—কেন? এত টাকা কেন? বর কনে দু'জনে ত গরীব তবে এত টাকা চায় কেন?

জ্যোৎ।—সে যে কুলীন।

কৃষ্ণ।—কুলীন বর ছেড়ে অন্য বরকে দিক্ না কেন?

জ্যোৎ।—না তা দিবে না। উদ্ধারিণীর বাপ মৃত্যুর সময় তার মাকে বলে গেছে যে মেয়েটাকে অঘরে দিয়ো না।

কৃষ্ণমতী কিছুক্ষণ ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "উদ্ধারিণীর মা রমণী মাসী কোথায়?"

জ্যোৎ।—তোমাদেরই বাটীতে এয়েছেন।

কৃষ্ণমতী বাহিরে আসিয়া উদ্ধারিণীর মাতাকে খুঁজিয়া একটি ঘরে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "হ্যাঁ গা মাসী, উদ্ধারিণীর বিয়ে দিচ্ছনা কেন?" উদ্ধারিণীর মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে সব কথা বলিল।

কৃষ্ণ।—কত টাকা হ'লে বিয়ে হয়।

রমণীমাসী।—বরকে দু'শ' টাকা আর বিয়ের অন্যান্য খরচ বড় জোর পঞ্চাশ টাকা।

কৃষ্ণ।—মাসী! আমি বড় গরীবের মেয়ে ছিলাম, আমি তোমার কষ্ট বুঝিতে পারিতেছি, বাল্যকালে তুমি আমায় বড় ভালবাসিতে, সর্ব্বদা কোলে পিঠে করিতে, উদ্ধারিণীর বিয়ের জন্য আমি আড়াই শ' টাকা দিতেছি, তুমি তার বিয়ে দাও গে। আমি তাকে বোনের মত দেখি, আমার টাকায় বিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হয়ো না।

এই বলিয়া দশ টাকা মূল্যের পঁচিশ খানি নোট রমণী মাসীর হাতে গুনিয়া দিলেন, ও আর একটি অনুরোধ করিলেন যেন এই কথাটি গোপনে থাকে। রমণীমাসী কাঁদিতে কাঁদিতে যথেষ্ট আশীর্ব্বাদ করিলেন ও এই দান গোপন রাখিতে স্বীকৃতা হইলেন। কিন্তু ইহা গোপনে রহিল না, সকলেই জানিতে পারিল যে স্বামীর জন্মদিনে একজন গরীব বিধবা কন্যার বিবাহের জন্য কৃষ্ণমতী আড়াইশত টাকা দান করিয়াছেন।

যে দিবস স্ত্রীলোক খাওয়ানো হয়, সেই দিবস সন্ধ্যার সময় বাটীর অনেকগুলি স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে কৃষ্ণমতী খিড়্‌কি পুকুরে পা ধুইতে

গিয়াছিলেন। পাড়ার একটি মেয়ে পেট-ভরে খেয়ে তাহার একটি শিশু ছেলেকে পাড়ের কিঞ্চিৎ দূরে রাখিয়া হাত-মুখ ধুইতে গিয়াছিল, শিশুটি হামাগুড়ি দিয়া পাড়ের ধারে আসিয়া জলে পড়িয়া গেল। উহা দেখিয়া কৃষ্ণমতী চীৎকার করিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া শিশুকে তুলিতে গেলেন; কিন্তু সাঁতার না জানাতে আপুনি ডুবিয়া গেলেন; ঘাটের স্ত্রীলোকেরা জলে ঝাঁপ দিয়া কৃষ্ণমতীকে ও শিশুকে তুলিল। এই সংবাদ পাইয়া বাটীর স্ত্রীলোকরা পুকুরে দৌড়াইয়া আসিল এবং যখন কৃষ্ণমতী হাসিতে হাসিতে উপরে উঠিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। ম্যানেজার নবীন বাবুর স্ত্রী বলিলেন, "হ্যাঁমা! তুমি সাঁতার জান না, কি সাহসে জলে ঝাঁপ দিয়া ছেলে তুলিতে গেলে?"

কৃষ্ণমতী।—জ্যাঠাই মা, একটা কচিছেলে রোয়াক হইতে পড়িয়া গেলে যেমন সকলে দৌড়িয়া তাহাকে তুলিতে যায়, আমি সেই ভাবে উহাকে তুলিতে গিয়াছিলাম। ঐখানে যে গভীর জল ছিল তাহা বুঝিতে পারি নাই।

জ্যাঠাইমা।—কে জানে মা, আমি তোমায় আজও চিন্‌তে পার্‌লাম না; তুমি সৃষ্টিছাড়া মেয়ে।

অন্তঃপুরে নিজশয্যাগৃহে স্ত্রীর নিকট বসিয়া অসিতকুমার এই সকল কথা শুনিয়া স্তম্ভিত ও নিরুৎসাহ হইলেন, তাঁহার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এইটুকু আসিল, যে স্ত্রীলোক আপন জীবন দিয়া পরের শিশু ছেলেকে রক্ষা করিতে যায়, তাহাকে হস্তগত করা অসম্ভব। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বিছানায় শুইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অদ্য রাসবিহারী বাবুর বাটীতে 'নাচ' হইবে, একজন বিখ্যাত মুসলমান বাইজীর নাচ গান হইবে। সদর বাটী জনাকীর্ণ, উঠানে, বারান্দায়, রোয়াকে, দালানে, এবং দোতালার বারান্দায় "ন স্থানং তিলধারণম্", আর রোসনাই ও বাটী সাজানর ত কথাই নাই; ছোট গল্পেতে সে সকল কথা লিখিতে গেলে চলে না। অন্দরেও এইরূপ রোসনাই, কিন্তু জনমানব নাই, কেবল খিড়কি-

দ্বারে একজন সিপাহী পাহারায় আছে, ঐ দ্বার দিয়া পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় দেশের স্ত্রীলোকগণ নাচ দেখিতে প্রবেশ করিতেছে এবং একাবেক সদর বাটীতে যাইতেছে, সুতরাং অন্দরে জনমানব নাই, কেবল তিনজন দাসী অন্তঃপুরের হেপাজতে আছে। এই তিনজন দাসীর মধ্যে একজন দাসী বিশেষ উল্লেখ-যোগ্যা, তাহার নাম গুণমণি, বড় বিশ্বাসী, বড় দরদী, বড় চতুরা, বড় সাহসী ও প্রত্যুৎপন্নমতি—গিন্নির আমলের দাসী, অনেক কালের দাসী, সুতরাং অন্যান্য দাসদাসীরা এমন কি রাসবিহারী বাবুর কর্ম্মচারিগণ তাহাকে গুণমাসী বলিয়া ডাকিত। গুণমাসী চাকরাণীদের সর্দ্দার, সকলে তাহার হুকুমে চলিত, কিন্তু মধ্যে মধ্যে গুণমাসী তাহাদের উপর পীড়ন করিত, সেজন্য তাঁবেদার চাকরাণীরা তাহার উপর বড় নারাজ ছিল। হলে হয় কি, গুণমাসী এতই বলিষ্ঠা যে, সে তিন চারিজন পুরুষের মহাড়া লইতে পারিত, সেজন্য তাহারা গুণকে ভয় করিত। মোট কথা, সেকালের যে মুসলমান বাদসাদের অন্তঃপুরে তাতার প্রহরিণী থাকিত, গুণমাসী বাঙ্গালীকুলে সেইরূপ একজন জন্মিয়াছিল। ছোট লোকের মেয়েদের দেবতা ব্রাহ্মণের প্রতি বড় ভক্তি থাকে। গুণমণির দেবতার প্রতি ভক্তি ছিল বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণের প্রতি কিছুমাত্র ছিল না। একদিন গুণমাসীর দাঁতের গোড়া ফুলিয়া বড় কষ্টদায়ক হইয়াছিল। দাসীদের উপর প্রভুত্ব চলিত না, বাম গাল বামহস্ত দ্বারা চাপিয়া 'উহু উহু' করিয়া বেড়াইত, দাসীরা উহা দেখিয়া টিট্‌কারি দিয়া হাসিত, গুণমাসী সেজন্য অতিশয় দুঃখিত হইয়া শ্যামসুন্দরের নিকট হরিরলুট মানিয়াছিল, কিন্তু পোন পয়সার হরিরলুট। কৃষ্ণমতী উহা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন "গুণ, ছি ছি ছি! তুমি শ্যামসুন্দরকে এত ভক্তি কর তাঁকে পোন পয়সার পূজা দেবে?" গুণ বলিল "গরীব মানুষের এই ঢের। শ্যামসুন্দর আমাকে টাকা দিন না আমি পাঁচসিকার হরিরলুট দিব।" কৃষ্ণমতী পাঁচসিকা দিতে চাহিলেন, গুণ তাহা লইল না, বলিল "আপনার গতর খাটনের রোজগার থেকে হরিরলুট দিব, নইলে আবার দাঁতের গোড়া ফুলবে।"

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে; কৃষ্ণমতী নাচ গান ভাল না লাগাতে অন্তঃপুরে নিজকক্ষে ফিরিয়া আসিলেন, এই মহলে কেবল উপরোল্লেখিত তিনটি দাসী মাত্র ছিল, তাহারা নীচে রোয়াকে বসিয়া যে সকল স্ত্রীলোক অন্দরে প্রবেশ করিয়া সদরে যাইতেছিল তাহাদের দেখিতেছিল। এমন সময়ে একটি অপরিচিতা অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোক সদরের দিকে না যাইয়া অন্দরের রোয়াকে উঠিয়া দালানে প্রবেশ করিয়া কৃষ্ণমতীর মহলের দিকে যাইতেছিল, পরিচারিকাত্রয়

উহা দেখিয়া তাহার পশ্চাৎ লইল। গুণমাসী জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কোথায় যাইতেছেন ?"

অপরিচিতা।—তোমাদের কৃষ্ণমতীর সহিত দেখা করিব।

গুণ। আপনি এইখানে বসুন, তিনি কোথায় আছেন, আমি দেখিয়া আসি। আপনার সহিত কি তাঁহার কখনও জানা শুনা ছিল ?

অপ। এলাহাবাদে সর্ব্বদা—আমাদের দেখা শুনা হইত।

অপরিচিতা চুপি চুপি কথা কহিতেছিল, কিন্তু গুণমণির সন্দেহ হওয়াতে পার্শ্বের ঘরের একখানা কেদারা টানিয়া 'এইখানে বসুন' বলিয়া চলিয়া গেল এবং তাহার ইঙ্গিতে অপর দুইজন দাসী তাহার সঙ্গে গেল। কক্ষ নির্জ্জন দেখিয়া অপরিচিতা অবগুণ্ঠন কিঞ্চিৎ অপসৃত করিয়া এদিক ওদিক দেখিতে লাগিল। এই অবসরে নিকটের ঘর হইতে ঐ তিনজন দাসী তাহাকে স্পষ্টরূপে দেখিয়া চিনিতে পারিল। কিছুক্ষণ পরে গুণ আসিয়া অপরিচিতাকে বলিল, "আপনি বসুন, তিনি কাপড় ছাড়িতেছেন, গহনা খুলিতেছেন, একটু বিলম্বে আপনাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইব।" ইতিমধ্যে পিছনের দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া কে একজন হঠাৎ অপরিচিতার মুখে হাত দিয়া কি মাখাইতে লাগিল, অপরিচিতা চীৎকার করিয়া যেমন মুখ হইতে ঐ ব্যক্তির হাত সরাইবার চেষ্টায় দুইহাত তুলিলেন, অমনি গুণমণি কাপড়ের ভিতর হইতে একগাছ সরু ছিপ্‌ছিপে লাক্‌লাইন দড়ি দ্বারা তাহার দুইহাত বাঁধিতে লাগিল, তৃতীয় দাসী তাহাকে সাহায্য করিতে লাগিল; ইতিমধ্যে যে দাসী অপরিচিতার মুখে তেল ও টিকের গুঁড়া মাখাইয়াছিল সে আবার চূণ দ্বারা অপরিচিতার মুখমণ্ডল অলঙ্কৃত করিল,—অবগুণ্ঠনবতীর এখন অতি ভয়ঙ্কর রূপ হইল। তিনি গুণকে বলিলেন "তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, আমি তোমাকে অনেক টাকা দিব, তোমাকে আর দাসীপনা করিতে হইবে না।" গুণমণি অপরিচিতার দাড়ি ধরিয়া আদর করিয়া বলিলেন, "ও আমার সোণারচাঁদ! তুমি রাসবিহারী বাবুর বাটী ঢুকেছ তোমার এখন হ'য়েছে কি ? আরো কত আদর খাবে" এই বলিয়া একটা গরাদেতে তাঁহাকে বাঁধিয়া অপর দুইজন দাসীর জিম্মায় তাহাকে রাখিয়া খিড়্‌কিতে আসিয়া সিপাহিকে বলিল—

লছমনসিং, আমি এখনো খাই নাই, আমার একটু দই খাবার সাধ হ'য়েছে, তুমি যদি ভাঁণ্ডারী যদু ঠাকুরের কাছ থেকে একটু দই এনে দাও তবে পেট ভরে খাই।

লছ। দ-হি দ-হি।

গুণ। হাঁ দহি।

লছ। হামি তা এনে দিতে পারে, তো, খিড়কি পাহারা দেবে কে?

গুণ। হামি দেবে।

লছমন। হাঁ গুণোমাসী তুম্মি তা পারবে। এই বলিয়া সে দই আনিতে চলিয়া গেল।

ইত্যবসরে গুণো অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তাহার দুইজন সঙ্গিনী দাসীর সাহায্যে অপরিচিতার হাতের দড়ি ধরিয়া অন্তঃপুর হইতে তাহাকে বাহির করিয়া নিকটস্থ একটী ক্ষুদ্র ঝোপে বাঁধিয়া লছমন সিংহের অপেক্ষা করিতে লাগিল, লছমন সিং আসিলে বলিল "এখন দহি তোমার নিকট রাখ। আমি আসছি" এই বলিয়া দাসী তিনজন অপরিচিতাকে লইয়া কোথায় গেল। অনতিবিলম্বে ফিরিয়া আসিল।

এই গভীর রাত্রে নাচের মজলিসে গুণ গুণ শব্দে একটা জনরব উঠিল যে, একটা প্রেত্তিনী দেখা গিয়াছে, রামেশ্বরের মন্দিরের নিকট বড় রাস্তার ধারে মিউনিসিপাল আলোর থামের নিকট দাঁড়াইয়া আছে, যে যেখানে ছিল দৌড়িয়া দেখিতে গেল। এইরূপে নাচের মজলিসের অর্দ্ধেক লোক সেখানে উপস্থিত হইল। দেশের একজন ভদ্রলোকের ষণ্ডা গুণ্ডা ছেলে একখান ভিজে তুয়ালের দ্বারায় প্রেত্তিনীর মুখ মুছাইয়া দেওয়াতে সকলেই করতালি দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"বদমায়েস অসিত কুমার, মার ঝাঁটা!" এই প্রকারে অসিত বাবুকে গালি দিতে লাগিল। সকলেই অসম্মান করিল, নিকটে যে কয়টা বড় বড় বাটি আছে তাহার মধ্যে একটা বাটিতে অসিতকুমার প্রবেশ করিয়াছিল। যাহা হউক, অসিত কুমার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া তাহার উদ্যান বাটিতে দৌড়িয়া পলাইলেন।

বড় ঘরের ছোট কথা পর্য্যন্ত গোপন থাকে না, রঞ্জিত হইয়া প্রকাশ হয়, কিন্তু গুণো মাসীর কৌশলে এ কথা প্রকাশ হইল না। তাহার সঙ্গিনী দাসী দুইজন, এই কথা গোপন করিয়া পেট ফুলিয়া মারা যাইবার উপক্রম হইল, কিন্তু গুণো দাসীর ভয়ে উহা প্রকাশ করিতে পারিল না; আধমরা হইয়া রহিল। আমাদের বিবেচনায় গুণোমাসীর এই কথাটা বাটীর কর্ত্তা রাসবিহারী বাবুকে ও কৃষ্ণমতীর স্বামী বনবিহারীকে বলিয়া তাঁহাদের সতর্ক করা উচিত ছিল।

অসিতকুমার বাগান বাটীতে যাইয়া বিছানা লইলেন, তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে কৃষ্ণমতীর কৌশলে এবং হুকুমে তাহার দাসীরা তাঁহাকে সং সাজাইয়া রাস্তায় বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। কৃষ্ণমতীকে তিনি কখন ভালবাসেন নাই, তাহার প্রকৃতির লোকের হৃদয়ে কখন ভালবাসা জন্মিতে পারে না, তবে তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া অসিতকুমারের চিত্তমালিন্য জন্মিয়াছিল। এক্ষণে কৃষ্ণমতীর প্রতি ক্রোধ উপস্থিত হইল, কি প্রকারে তাহাকে চিরদুঃখিনী করিবেন তাহারই চেষ্টায় রহিলেন। তাহার সুযোগও হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

চাঁদড়া গ্রামে বনবিহারী বাবুর মামার বাটী, চাঁদড়ার কৃষ্ণনাথ ঘোষাল তাঁহার মাতুল। কৃষ্ণনাথ বাবু হাজার বিঘা চাষি জমির মালিক, সুতরাং তাঁহার কিছু অভাব ছিল না, রাসবিহারী বাবুর শ্যালক পরিচয় দিয়া তিনি পল্লীগ্রামবাসীদিগের নিকট বড়লোক হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে এবং ভগিনী ও ভাগিনেয়কে একবার তাঁহার বাটীতে আনিতে পারিলে, যেন তাঁহার গৌরব আরও বৃদ্ধি হয়, এই ভাবিয়া চিন্তিয়া শ্যামাপূজার কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহাদের আনিবার জন্য স্বয়ং নীলাপুর উপস্থিত হইলেন। বহুকালের পর ভগ্নী তাঁহাকে দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ভাগিনেয় বনবিহারী তাঁহাকে পিতার ন্যায় সম্মান করিলেন। কর্ত্তা রাসবিহারী বাবু মোকদ্দমা উপলক্ষে কলিকাতায় ছিলেন, কিন্তু তাহার জন্য কৃষ্ণনাথ বাবুর কার্য্যের কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই। ভগিনী ও ভাগিনেয় শ্যামাপূজার সময় তাঁহার বাটীতে যাইতে স্বীকৃত হইলেন। কৃষ্ণনাথ বাবু বিশেষ আপ্যায়িত হইয়া চলিয়া গেলেন। এ বৎসর তিনি শ্যামাপূজা বড় ধুমধামের সহিত করিবার উদ্যোগ করিলেন।

কৃষ্ণমতী এই বন্দোবস্তে বিশেষ আপত্তি করিতে লাগিলেন। বনবিহারী বলিল, "কেন যাইতে নিষেধ করিতেছ?"

কৃ। তা তোমাকে বুঝাইয়া বলিতে পারিব না।

বন। বুঝাইবার চেষ্টা কর দেখি।

কৃ। কি চেষ্টা করিব, মনে মনে নানাপ্রকার কু গাইতেছে।

বন। ছি! তুমি ত ঘ্যান ঘ্যানে প্যান প্যানে স্ত্রী ছিলে না! স্বামী দুই দিনের জন্য কোথাও যাইতে চাহিলে ঘ্যান ঘ্যান প্যান প্যান করিতে না, নীলাপুরে এসে এরূপ হ'য়েছ বুঝি?

কৃষ্ণ। তা যদি হইয়া থাকে, সে ত অসঙ্গত নহে, জান ত কি প্রবল শত্রু সম্মুখে বসে আছে! তা জেনে শুনেও তুমি আমাকে একাকিনী রেখে যাচ্চ, ছিঃ!

বন। (হাসিয়া) কাহার সাধ্য তোমার কিছু অনিষ্ট করে, সদর খিড়কী অষ্টপ্রহর পাহারায় আছে, একটী মাছি পর্য্যন্ত প্রবেশ ক'র্‌তে পারে না, আর ২০।২৫ জন বাটীর স্ত্রীলোকে তোমাকে সর্ব্বদা ঘেরে থাকে, আবার ম্যানেজার নবীন বাবু বাঘের মতন বসে আছেন।

কৃষ্ণ। তাত সব বুঝলুম, আমি ত আমার জন্য ভয় পাইতেছি না, আমার ভয় কেবল তোমার জন্য।

বন। কি ভয়?

কৃষ্ণ। তা বুঝাইয়া বলিতে পারিব না।

বন। তা না পার, তবে আমি কিছুদিনের জন্য মামার বাড়ী বেড়াইয়া আসি, কি বল?

কৃষ্ণমতী বুঝিলেন যে, স্বামীর মামার বাটী যাইবার বড় ইচ্ছা হইয়াছে, আর কোন আপত্তি না করিয়া মনের কষ্ট সংযত করিয়া স্বামীর সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। ইহার তিন চার দিবস পরে বনবিহারী বাবু মাতাকে লইয়া চাঁদড়া যাত্রা করিলেন। বারো চৌদ্দক্রোশ দূর, মাঠাল পথ ধরিয়া যাইতে হয়। ট্রেন কি ঘোড়ার গাড়ির পথ নহে, মাতা পুত্রে দাসদাসী লইয়া পাল্কিতে গেলেন।

এই সংবাদ অসিতকুমারের নিকট পৌছিল। তাহার দুইজন মাত্র বয়স্য, যাহারা তাহার অসৎ কার্য্যে সহায়তা করিত, তাহারাই কেবল ঐ স্থানে বসিয়া ছিল। অসিতকুমার তাহাদের বলিলেন "এই সময় হইয়াছে। ইহারা দুইজন ছাড়াছাড়ি হইয়াছে।" এই বলিয়া তাহারা তিন জনে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ইহার ফল, পরবর্ত্তী ঘটনাতে প্রকাশ পাইবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

"কেন আমার স্ত্রীর জন্য মন এত চঞ্চল হইয়াছে? কেন আমার এত মন কাঁদিতেছে?"

অন্ধকার অমাবস্যার নিশীথে বনবিহারী বাবু একজন ভৃত্য সমভিব্যাহারে এই ভাবিতে ভাবিতে একটী প্রকাণ্ড প্রান্তরে দ্রুত পদে গমন করিতেছিলেন। মাতুল কৃষ্ণনাথ বাবু বনবিহারীর বাটী আসিবার জন্য ব্যাগ্রতা দেখিয়া তাঁহাকে আহারাদি করাইয়া, পূজার দিবসে এক খানি পাল্কি করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। পথিমধ্যে সন্ধ্যার সময় পাল্কির বাঁট ভাঙ্গিয়া তিনি পাল্কির সহিত পড়িয়া গেলেন। বনবিহারী আর পাল্কি কি গরুর গাড়ির চেষ্টা করিলেন না, পদব্রজেই তাঁহার ভৃত্য হারাধন বাগ্‌দির সহিত আসিতেছিলেন। রাত্রি প্রায় এক প্রহর, প্রকাণ্ড প্রান্তর, আকাশ ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, গম্ভীর গর্জ্জনে মেঘ ডাকিতেছে, অন্ধকারে কোলের মানুষ দেখা যায় না, কেবল এক এক বার বিদ্যুদালোকে পথ দেখা যাইতেছিল। এই প্রান্তরে ঝড় বৃষ্টির পূর্ব্ব লক্ষণ বুঝিয়া ভৃত্য হারাধন মুনিবকে বলিল, "আজ্ঞে, বড় ঝড় বৃষ্টি হইবার সম্ভব, আমি আমাদের গ্রামের পথ চিনিতে পারিতেছি না।"

বন। সে কি! এখন উপায়?

হারা। উপায় আছে বই কি, আমার বোধ হয়, রমণপুরের দীঘি ক্রোশখানেক দূরে আছে, উহার উত্তরে রমণপুর গ্রাম, ঐ গ্রামে আপনার খুড়া বিশুবাবুর বাড়ী। এস্থানে অন্ধকার রাত্রে থাকলে ভাল হয়, না হয় ঐ গ্রাম হইতে একখান পাল্কি কি গরুর গাঁড়ি ভাড়া করিয়া এই রাত্রেই বাড়ী যাইবেন। বোধ হয়, পাল্কি পাওয়া যাইবে না।

বনবিহারীর এক জ্ঞাতি খুড়া বিশেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ গ্রামে বাস করিতেন, তিনি এবং তাঁহার স্ত্রী রাসবিহারীকে আপনাদের পুত্রের ন্যায় ভাল বাসিতেন, সম্প্রতি তাহারা বনবিহারীকে দেখিবার জন্য নীলাপুরে গিয়াছিলেন, শ্যামাপূজা উপলক্ষে বাটী ফিরিয়া আসিয়াছেন। বনবিহারী বুঝিলেন যে, এই পরামর্শই ভাল, এবং ইহা স্থির করিয়া পশ্চিমের রাস্তা ধরিলেন।

কিছু দূর আসিয়া এক অতি বিস্তৃত জলা দেখিয়া, হারাধন বলিল, "বাবু পথ বুঝিতে পারিতেছি না, বোধ হয় আমরা হাড়িনীর জলাতে আসিয়া পড়িয়াছি।"

বন। হাড়িনীর জলা কি হারাধন?

হারা। আজ্ঞে, শুনা আছে, যে চাঁদি (চন্দ্র) হাড়িনী নামে এক মাগী এইরূপ এক অন্ধকার রাত্রে পথ ভুলিয়া এই জলাতে আসিয়া পড়ে, দুই এক পা যেতে যেতে ক্রমে কোমর পর্য্যন্ত, শেষে গলা পর্য্যন্ত দঁকে পড়িয়া আর উঠিতে পারিল না, অবশেষে এই নির্জ্জন অন্ধকার তেপান্তর মাঠে সে মরিয়া গেল, কিন্তু মরেও মরে নাই।

বন। সে কি?

হারা। আজ্ঞে, সে কথা আর এ ভয়ঙ্কর স্থানে কায নাই।

বনবিহারী বুঝিলেন যে, সাধারণের ধারণা যে হাড়িনী মাগী প্রেতিনী হইয়া এই মাঠে বিচরণ করে। যাহা হউক, তাঁহার নিজের ঐ হাড়িনীর দশা না হয়, এই ভাবিয়া ঐ পথ ত্যাগ করিয়া হারাধনের প্রদর্শিত পথ ধরিলেন। ইতি মধ্যে হারাধন "রাম! রাম! রাম!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। আর "বাবু শিগ্‌গির আসুন, মাগী জলাতে দেখা দিয়াছে" বলিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিল। এই শুনিয়া বনবিহারী জলার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কেবল অন্ধকার—চতুর্দ্দিকে ঘোরতর অন্ধকার। একবার বিদ্যুৎ চমকাইলে দেখিলেন, সম্মুখে অতি বিস্তৃত জলা, বিদ্যুদালোকে উহার জল চিক চিক করিতেছে। কিছুক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। হারাধনের উত্তেজনায় আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু যে দিকে যান সেই দিকেই কর্দ্দম, কোন্ পথ কর্দ্দমহীন তাহা বুঝিতে পারিলেন না, বড় গোলে পড়িলেন। হারাধন বড় চতুর ও হুঁসিয়ারি, খুঁজে খুঁজে সেই পথ বাহির করিল। ইতি মধ্যে বনবিহারী হঠাৎ একটা আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া দাঁড়াইলেন, ঐ জলা হইতে একটা আলো দপ্‌ করিয়া জলিয়া উপরে কিছুদূর উঠিয়া নিবিয়া গেল, এইরূপ দুই একবার দেখিলেন, তিনি কখনও আলেয়া দেখেন নাই; কিছুক্ষণ ঐখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। হারাধন "রাম! রাম" নাম করিতে করিতে ছুটাছুটি করিতে লাগিল; বাবুকে একাকী রাখিয়া পলাইতে পারে না, অথচ ভয়ে সেখানে দাঁড়াইতে পারে না। আর ঐরূপ আলো না দেখিতে পাইয়া বনবিহারী চলিলেন।

এইরূপে অন্ধকারে পথিভ্রান্ত দুইজন পথিক ঘুরিতে ঘুরিতে অর্দ্ধঘণ্টার পর বিদ্যুদালোকে একটা বৃহৎ জলাশয়ের উচ্চ পাড় দেখিতে পাইলেন। হারাধন রাম নাম ছাড়িয়া আনন্দে চীৎকার করিয়া বলিল "বাবু এই রমণীপুরের দীঘি, ইহার উত্তরে রমণপুর গ্রাম।" কিঞ্চিৎ পরেই উভয়ে দীঘির ঘাটের

নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা মানসিংহ বাঙ্গালায় প্রতাপাদিত্যকে শাসন করিতে আসিবার সময় তাঁহার ফৌজদিগের জন্য এক অতি প্রশস্ত রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছিলেন;—অদ্যাপি উহা গৌড়বঙ্গের রাস্তা বলিয়া পরিচিত। আর ফৌজদিগের জল ব্যবহারের জন্য ঐ রাস্তার অনতিদূরে মধ্যে মধ্যে এক একটা অতি বৃহৎ জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন; ঐ দীর্ঘিকাও মানসিংহের আদেশে খোদিত হইয়াছিল। গৌড়বঙ্গের রাস্তা উহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে। বনবিহারী—পদব্রজে কিছুদূর ঐ রাস্তা ধরিয়া আসিয়াছিলেন, অন্ধকারে ঘুরিতে ঘুরিতে আবার সেই রাস্তার নিকট আসিলেন। এই দীর্ঘিকার চারিদিকে চারিটি ঘাট ছিল, (বাঁধা-ঘাট নহে); উত্তর দিকের ঘাটে একটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ ডালপালা চতুর্দ্দিকে বহুদূর বিস্তৃত করিয়া তাহার শতাধিক বর্ষ বয়সের পরিচয় দিতেছিল। পথিকদ্বয় দক্ষিণদিকের মাঠের রাস্তা দিয়া দীঘিতে প্রবেশ করিলেন। বনবিহারী গায়ের জামা খুলিয়া হারাধনের হাতে দিয়া, মাথায় চাদর বাঁধিয়া এক গাছি লাঠি হাতে হন্ হন্ করিয়া চলিলেন, এখন তৃণাচ্ছাদিত সমতলভূমি পাইয়া অতি দ্রুত চলিতে লাগিলেন, ইতিমধ্যে উত্তরের ঘাট হইতে রমণীকণ্ঠনিঃসৃত ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইয়া হারাধন আবার রাম! রাম! বলিতে লাগিল। পাঁচ ছয় মিনিট পরে বনবিহারী বিদ্যুদালোকে দেখিলেন যে, একটি স্ত্রীলোক এলোচুলে জল হইতে ধীরে ধীরে উঠিয়া বটবৃক্ষের তলে যাইল। হারাধন বলিল "বাবু, ঐ দেখুন"। বনবিহারী বলিলেন "হুঁ, দেখেছি।" জলাশয় দৈর্ঘ্যে অতি বিস্তৃত; সেজন্য উত্তরের ঘাটে পথিকদিগের পৌঁছিতে কিছু বিলম্ব হইল। তাঁহারা পৌঁছিয়া দেখিলেন, সেখানে জনমানব নাই, বটবৃক্ষ তলাতেও কেহ নাই, কেবল উহার তলস্থ সিমেণ্টনির্ম্মিত বেদীতে জলের চিহ্ন রহিয়াছে যেন কোন স্ত্রীলোক ঐ স্থানে ভিজে কাপড়ে দাঁড়াইয়াছিল। বনবিহারী গ্রাম্যপথ অবলম্বন করিয়া চলিলেন, রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর হইয়াছে। গ্রামের ভিতর হইতে কাঁসর ঘণ্টা ঢাকঢোল বাজনার শব্দ শুনিলেন। তিনি যে পথে যাইতেছিলেন তাহা নির্জ্জন, কেননা উহা গ্রামপ্রান্তে। কিছুদূর যাইয়া দেখিলেন একটি স্ত্রীলোক একটা কলসী লইয়া দীঘিতে জল লইতে আসিতেছে। বনবিহারী বিদ্যুদালোকে তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিলেন, তাঁহার বিশুখুড়ার পরিচারিকা নাম রমণী, সে সম্প্রতি তাঁহার খুড়াখুড়ীর সহিত নীলাপুরের বাটীতে তাঁহাদের দেখিতে গিয়াছিল। তাহার পশ্চাৎ একজন পুরুষ আসিতেছিল, দূরতাবশতঃ তাহাকে চিনিতে পারিলেন না। পরিচারিকা রমণী

অন্ধকারে একটা মাথায় পাগড়ী মানুষ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে—র‍্যা, কে আসচে—র‍্যা ? আমর্! উত্তর দেয় না কেন ?" বনবিহারী পরিচারিকাকে চিনিতে পারিয়া বড় আশান্বিত হইয়া বলিলেন, "রমণী, আমি।" রমণী বলিল, "তুই কে—র‍্যা মিন্‌সে, নাম বল্‌না।" অনাহারে পথিশ্রান্তে বনবিহারীর গলা শুকাইয়া গিয়াছিল, ঈষৎ বিকৃতস্বরে তিনি বলিলেন, "আমি তোমাদের নীলা-পুরের বনবিহারীবাবু, আমাদের বাটীর সংবাদ জান ?" এই কথায় পরিচারিকা রমণী কলসী ফেলিয়া চীৎকার করিয়া দৌড়িতে লাগিল,—"ওরে—বাবারে—এগোরে—আমায় ভূতে ধর্‌লেরে—ও জীবন, ও জীবন—ও জীব্‌নে—মিন্‌সে তুই কোথায়—এগোনা—আমাদের বনবিহারী বাবু ভূত হ'য়ে আমারই কি ঘাড়ে চাপ্‌তে এয়েচে !" জীবন পশ্চাৎ হইতে ধমক দিল, "চুপ কর্—ও কথা মুখে আনিস্ নি।" রমণী বলিল, 'ওরে মিন্‌সে—চুপ ক'র্‌ব কি—তুই এগিয়ে গিয়ে দেখ্‌না।" জীবন অগ্রসর হইতে পারিল না। ইতিমধ্যে হারাধন জীবনের কণ্ঠস্বরে তাহাকে চিনিতে পারিয়া বলিল, "জীবন! রমণী মাগী কি বলে—র‍্যা ?" হারাধনের গলার স্বর শুনিয়া জীবন অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথায় গিয়াছিলে ?"

হারাধন। আমাদের বাবুর সঙ্গে তাঁর মামার বাড়ী গিয়াছিলাম।

জীবন। তিনি কেমন আছেন ?

হারাধন। তিনি ভাল আছেন, এই যে তোমার সম্মুখে।

তখন বনবিহারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "জীবন, আমাদের বাড়ীর কোন সংবাদ জান ?"

জীবন ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—আজ্ঞে জানি না।

বনবিহারী। আমি অদ্য রাত্রেই বাড়ী যাইব, তুমি একখান্য পাল্কী করিয়া দিতে পার ?

জীবন। পাল্কী পাওয়া বড় কঠিন, কিন্তু গরুর গাড়ী পাওয়া যাইবে।

বন। তবে শীঘ্র আন, আমি এক্ষণেই রওনা হইব।

জীবন। তবে আমার সঙ্গে আসুন।

বন। কোথায়, বিশুকাকার বাটী ?

জী। না, সেখানে যাইলে অদ্য রাত্রে ছেড়ে দিবেন না। আমার বাটীতে অপেক্ষা করিবেন—আসুন।

পথে যাইতে যাইতে হারাধন জিজ্ঞাসা করিল "জীবন, তোমাদের দীঘির বটগাছে কি পেত্নী আছে ?"

জীবন। তা'ত কখনও শুনি নাই।

হারা। আমরা দক্ষিণের ঘাট হইতে প্রথমে একটা মেয়ের কান্না শুনিলাম, পরে দেখিলাম একটী মেয়ে জল হইতে চুল এলো ক'রে বটগাছে গিয়া উঠিল।

জী। ওঃ—আমাদের গাঁয়ে কোন গৃহস্থবাটীর মেয়েরা তাহাদের এক জ্ঞাতির মৃত্যুসংবাদ পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঐ দীঘিতে নাইতে গিয়াছিল, আমাদের এই অ-গঙ্গার দেশে ঐ দীঘিতে নেয়ে সকলে শুদ্ধ হয়।

বন। কে—কে মরেছে ?

জী। কি জানি, আমি মনিব বাড়ীর পূজার কাজ করিতেছিলাম।

বনবিহারী নীরব হইয়া রহিলেন। পরে হারাধন জিজ্ঞাসা করিল, "জীবন, রমণী মাসী কি বল্‌তে বল্‌তে পালাল ?"

জী। ওর কথা শুনো না, ওর একটা ভারী রোগ হয়েছে, কেবল ভূত দেখে আর ভূত ভূত করে ; ওর বুঝি ইষ্টি রস. হইয়াছে।

বনবিহারী জীবনের বাটীতে পৌছিয়া পথশ্রান্তিতে এবং মানসিক যন্ত্রণায় নিদ্রাভিভূত হইয়া একখানি তক্তপোষের উপর ঘুমাইয়া পড়িলেন, এমত সময়ে গভীর গর্জ্জনে ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। রাত্রিশেষে জীবন একখানি গরুর গাড়ী আনিয়া বনবিহারীকে উঠাইল, তখনও মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। গাড়ীখানির উপর দরমার আবরণ ছিল ; বনবিহারী গাড়িতে উঠিলেন, হারাধন ও জীবন একখানি ত্রিপল মুড়ি দিয়া বসিল, জীবন গাড়ি হাঁকাইতে লাগিল। বৃষ্টির জন্য পথ অতি দুর্গম হইয়াছিল, জীবন ও হারাধন মধ্যে মধ্যে নামিয়া চাকা ঠেলিতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, এমন সময়ে বনবিহারী নিজগ্রামে পৌছিলেন। গরুর গাড়ী ত্যাগ করিয়া পদব্রজে চলিলেন। গ্রামপ্রান্তে পথ কর্দ্দমময়, উভয় পার্শ্বে বড় বড় আমবাগান, উহার ভিতরে অন্ধকার ঘনীভূত হইতেছে, ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকিতেছে, জোনাকি পোকা দপ্‌ দপ্‌ করিয়া জ্বলিতেছে। বনবিহারী দ্রুতপদে চলিলেন। গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, একস্থানে বালকেরা

পাঁকাঠির আলো আলিয়া খেলা করিতেছে, বনবিহারীকে দেখিবামাত্র তাহারা পাঁকাঠি ফেলিয়া পলাইল। বনবিহারী বুঝিলেন যে, অসিতকুমার তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার মৃত্যু রটনা করিয়াছে, সেই সংবাদ রমণপুরে তাঁহার বিশু-খুড়ার বাটী পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে; সেই সংবাদ শুনিয়া তাঁহার খুড়ী কাঁদিতে কাঁদিতে রাত্রি দ্বিপ্রহরে দীঘিতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন, সেই সংবাদে রমণী দাসী তাঁহাকে দেখিয়া ভূত ভূত করিয়া পলাইয়াছিল। কিন্তু এমন আশ্চর্য্য কৌশলের সহিত মৃত্যু সংবাদ রটনা করিয়াছে যে সকলেই উহা বিশ্বাস করিয়াছে। যাহা হউক, কথাটা তিনি হাসিয়া উড়াইতে পারিলেন না, কেননা যদি তাঁহার মৃত্যু সংবাদ তাঁহার স্ত্রীর কানে উঠিয়া থাকে তবে তাঁহার কি অবস্থা হইয়াছে! এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বাটীর সন্নিকটে পৌঁছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের ছাদের উপর যাহা দেখিলেন ও শুনিলেন তাহাতে তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া ঘুরিয়া পড়িলেন, পিছন হইতে হারাধন তাঁহাকে ধরিল। দোতালার ছাদের উপর অনেকগুলি দাসীবেষ্টিতা আলুলায়িতকেশা কৃষ্ণমতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন, "আমি অনেক দিন তাঁকে দেখি নাই, আর না দেখে থাকৃতে পারি না" ইত্যাদি। বনবিহারী টলিতে টলিতে গৃহে প্রবেশ করিয়া শুনিলেন যে, গ্রামে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া একজন পরিচারিকা সন্ধ্যার পর অন্ধকারে সিঁড়ির নিকট অপর একজন পরিচারিকাকে চুপি চুপি ঐ কথা বলিতেছিল। কৃষ্ণমতী ঐ সময়ে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছিলেন; ঐ কথা শুনিবামাত্র চীৎকার করিয়া পড়িয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন, মাথায় কপালে ও অন্যান্য স্থানে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল। পরে মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলেও আর জ্ঞান প্রাপ্ত হন নাই, কেবল "আমি আর তাঁকে না দেখে থাকৃতে পার্‌ছি না" এই বুলি তাঁহার মুখে দিবারাত্রি ছিল।

বনবিহারী তাঁহার স্ত্রীর সহিত দেখা করিলেন, কিন্তু কৃষ্ণমতী তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না, চুপ করিয়া রহিলেন। বনবিহারী দিবারাত্রি তাঁহার নিকট থাকিয়া পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু সফল হইতেন না। স্মৃতির উদ্দীপন আর হইল না, কৃষ্ণমতীকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া বড় বড় ডাক্তার কবিরাজের দ্বারা চিকিৎসা করাইলেন, কিন্তু সবই নিষ্ফল হইল। এইরূপে কয়েক মাস গেল; কৃষ্ণমতী বনবিহারীকে চিনিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার প্রতি বড় অনুরক্তা হইলেন, দিবারাত্রি তাঁহার নিকট থাকিতেন, তাঁহাকে কোথাও যাইতে দিতেন না। যখন বনবিহারী

বহির্বাটীতে যান কৃষ্ণমতী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেন। গ্রামের ইতর ভদ্র সকলেই রাস্তায় দাঁড়াইয়া দেখিত যে, রাস্তার ধারে বারান্দায় বনবিহারী একখান ইজি চেয়ারে বসিয়া সংবাদপত্র ও পুস্তকাদি পড়িতেন, আর একটি ছোট টুলে বসিয়া একটি দ্বাবিংশবর্ষীয়া কেশবিন্যাসবিহীনা রুক্ষকেশা অনুপমা সুন্দরী তাঁহার নিকট বসিয়া থাকিত; কখনও তাঁহাকে দাড়ি ধরিয়া আদর করিতেছে, কখনও বা চিরুণি ব্রুস লইয়া তাঁহার চুল আঁচড়াইয়া দিতেছে, আঁচল দিয়া তাঁহার মুখ মুছিয়া দিতেছে, আবার কখনও বা তাঁহার হাত হইতে পুস্তক খানি কাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া হাসিয়া উঠিতেছে।

এইরূপে উভয়ের দিন কাটিতে লাগিল। উভয়ে উভয়কে চোখের আড়াল করিতে পারিতেন না; কিন্তু তাঁহাদের এইরূপ সুখও চিরদিন রহিল না। বনবিহারী পীড়িত হইয়া বিছানা লইলেন। কৃষ্ণমতী দিনরাত তাঁহার বিছানায় বসিয়া থাকিতেন, সেইরূপ চিরুণি ব্রুস দিয়া চুল আঁচড়াইয়া দিতেন, আঁচল দিয়া মুখ মুছাইতেন, আবার বলিতেন, "তুমি তোমার কেতাব পড়্‌বে না? কেতাব এনে দিব? তুমিত অনেক দিন পড় নাই? আমি আর কেতাব কেড়ে নেবো না।" বনবিহারী বলিতেন "এখন আর পড়িব না; তোমার সহিত গল্প করিব।" কৃষ্ণমতী বড় সন্তুষ্ট হইয়া বলিতেন "আচ্ছা আচ্ছা।" বনবিহারী আর বিছানা হইতে উঠিতে পারিতেন না দেখিয়া কৃষ্ণমতী শ্বশুরকে ধমক দিয়া বলিলেন, (এখন কৃষ্ণমতী লজ্জাহীনা) "হাঁ গা, তুমি কি তোমার ছেলেকে না খেতে দিয়ে মেরে ফেল্‌বে? ওঁকে খেতে দাও, খেতে দাও, ওঁর প্রতি দিন মাংস খাওয়া অভ্যাস, মাংস খাওয়াও।" শ্বশুর চোখ মুছিতে মুছিতে বাহিরে গেলেন। সেই দিন হইতে কৃষ্ণমতী দাসীদিগকে মাংস কিনিতে টাকা দিতেন, তাহারা আনিত না; বলিত মাংস পাওয়া গেলনা। একদিন একজন দাসীর অসাবধানতা বশতঃ জানিতে পারিলেন যে কালীবাড়ীতে প্রতিদিন সকালে বলিদান হয়, সেইখানে পাঁঠার মাংস পাওয়া যায়। কৃষ্ণমতী বলিলেন "বাবু মাংস না খেতে পেয়ে উঠ্‌তে পাচ্ছেননা, তাঁহাকে না খাইয়ে সবাই মেরে ফেল্লে।" এই বলিয়া তিনি স্বয়ং কালীবাটীর মাংস আনিতে চলিলেন, তাঁহার গতিরোধ করিতে কেহ সাহস করিল না। চির-অবরোধিনী কৃষ্ণমতী রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইলেন, পরিচারিকাগণ এবং দুই চারিজন দ্বারবান তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কৃষ্ণমতী রূপে পথে আলো

করিয়া চলিলেন। রাস্তার উভয় পার্শ্বে স্ত্রীলোক ও পুরুষেরা তাঁহাকে দেখিয়া চমকিত হইয়া, "ইনি কে? ইনি কে? ইনি কোন দেবী!" বলিয়া পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিল। পরে যখন সকলেই জানিতে পারিল যে, ইনিই কৃষ্ণমতী, তখন প্রাচীনেরা দুইহাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল, স্ত্রীলোকেরা যাহারা তাঁহার অবস্থা শুনিয়াছিল, তাহারা চোখের জল মুছিতে লাগিল। "আহা! আমরি মরি! কি রূপ! "ভগবান্ কেন এর এমন দুর্দ্দশা করিলেন!" এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে পথিকগণ সকলেই কৃষ্ণমতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। কৃষ্ণমতীর কোন দিকে দৃষ্টি নাই; কাহারও সহিত বাক্যালাপ নাই। যেমন প্রবল বায়ুতে ছোট সরু সুপারি গাছের কেবল মাথা হইতে কিয়দংশ দুলিতে থাকে, মন্থরগমনা কৃষ্ণমতী সেইরূপ দুলিতে দুলিতে হাঁটিতে লাগিলেন। কবরী স্খলিত, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে, ঈষৎ সুলাজ বলিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরা; অভ্যাসবশতঃ মধ্যে মধ্যে মাথায় কাপড় টানিতে টানিতে কৃষ্ণমতী রূপে পথঘাট আলো করিয়া চলিতেছেন। ঘটনা-ক্রমে অসিতকুমার বয়স্যদিগের সহিত বাগানবাটী হইতে বসতবাটীতে মধ্যাহ্নাহারের জন্য আসিতেছিলেন। রাস্তার একটা বাঁক ফিরিয়া পথে হঠাৎ সম্মুখে বহুজনবেষ্টিত এক দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তিনি রামচরণ ঘোষালের বাটীতে বিবাহোৎসবে কিছুক্ষণের জন্য অবগুণ্ঠনবতী কৃষ্ণমতীকে দেখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সেইরূপ এখন আর নাই। কৃষ্ণমতী উন্মাদিনী হইয়া দেবীমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। পূর্ব্বের রূপ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, সেইজন্য অসিতকুমার তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই, দেবী বলিয়া স্থির করিলেন। এরূপ ধারণার একটা বিশেষ কারণ ছিল, অসিতকুমার তখন সুরাপান করিয়া ঈষৎ বিকৃত অবস্থাতে আসিতেছিলেন (তাঁহার কাছে সুরা-পানের সময়াসময় ছিল না)। পথের উভয়পার্শ্বে ইতর লোকের মেয়েরা কৃষ্ণমতীকে দেখিয়া 'মা মা' সম্বোধন করিয়া, ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে-ছিল। অসিতকুমার বয়স্যদিগের সহিত কৃষ্ণমতীর নিকটে যাইয়া "মা মা" বলিয়া গলায় চাদর দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। কৃষ্ণমতী তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কে? ভিক্ষুক?" একজন পরি-চারিকা বলিল, "না, ভিক্ষুক নহে।" "হাঁ ভিক্ষুক, নহিলে আমাকে মা ব'লে ডাকে কেন?" এই বলিয়া একটি টাকা ছুঁড়িয়া দিয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পূজারীর নিকট মাংস চাহিলেন, বলিলেন "এখন দু'বেলার খুশি

মাংস দাও, আবার কাল এসে নিয়ে যাব।" দুইবেলার জন্য দুইটাকা ফেলিয়া দিলেন, পূজারী একজন দাসীর হাতে কলাপাতায় বাঁধিয়া মাংস দিলেন এবং টাকা দুইটী তাহার হাতে ফেরৎ দিলেন। কৃষ্ণমতী তাহার হাত হইতে মাংস কাড়িয়া আপনার হাতে লইয়া বাটী ফিরিলেন, সেইরূপ বহুজনবেষ্টিতা হইয়াই বাটী ফিরিলেন। অসিতকুমার এখন জানিতে পারিলেন যে, যাঁহাকে তিনি "মা" বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়াছিলেন, তিনি আর কেহ নহেন, কৃষ্ণমতী। তখন নেশা ছাড়িয়া গেল, মনে মনে লজ্জা, ঘৃণা, ও গুরুতর আক্ষেপ জন্মিল। স্ত্রীলোকের রূপ দেখিলে যে পাষণ্ডের চিত্তমালিন্য জন্মিত, কৃষ্ণমতীর রূপ দেখিয়া আজ তাহার ভক্তির উদ্রেক হইল। ধন্য কৃষ্ণমতীর রূপের মহিমা! সেই রাত্রেই অসিতকুমার গৃহত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। বাটী যাইয়া কৃষ্ণমতী মাংস স্বয়ং রাঁধিয়া উহা একটা ডিসে করিয়া স্বামীর মুখের নিকট ধরিয়া বলিলেন, "খাও, খাও।" বনবিহারী বলিলেন, "বড় গরম, একটু জুড়ুক।" মাংস ঠাণ্ডা করিবার জন্য কৃষ্ণমতী সেইখানে মাংসের ডিস রাখিয়া একটা পাত্র আনিতে গেলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার শাশুড়ী উহা গোপন করিয়া রাখিলেন। ফিরিয়া আসিয়া উহা না দেখিতে পাইয়া কৃষ্ণমতী ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন; অবশেষে বালিকার ন্যায় কাঁদিতে বসিলেন। কান্না শুনিয়া বনবিহারী তাঁহাকে ডাকিলেন, স্বামীর নিকট আসিয়া তিনি মাংসের কথা ভুলিয়া গেলেন। কৃষ্ণমতীর এইরূপ পতিভক্তি দেখিয়া দেশের স্ত্রীলোকগণ বলিত "ধন্য মেয়ে! জ্ঞানেতেও স্বামী স্বামী ব'লে পাগল—অজ্ঞানেতেও তাই।"

বনবিহারী দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন, শেষে তাঁহার বাকশক্তি রহিত হইল। কৃষ্ণমতী তাঁহার কথার আর উত্তর না পাইয়া স্বামীকে ক্রোড়ে লইয়া থাকিতেন, আর মধ্যে মধ্যে তাঁহার দাড়ি ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেন "কথা কও—কথা কচ্ছোনা কেন?" এইরূপে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া স্বামীকে ক্রোড়ে লইয়া থাকিতেন। যেমন তাঁহার স্বামীর দেহ দিন দিন অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হইল, তাঁহারও সেইরূপ হইতে লাগিল। কেহ তাঁহাকে আহার করাইতে পারিত না, কাহারও সহিত আর কথা কহিতেন না, কেবল স্বামীকে বলিতেন "কথা কও।"

* * * * * * * * * * *

ইহার কিছুদিন পরে রাসবিহারী বাবুর বৃহৎ পুরী অন্ধকারময় হইল।

জনমানবের সাড়া শব্দ নাই, কেবল এক একবার একটী স্ত্রীলোককে দেখিতে পাওয়া যাইত; শীর্ণশরীরা মলিনবসনা, আলুলায়িতরুক্ষকেশা একটী বিধবা যুবতী, অন্ধকারে এঘর ওঘর করিয়া বাটীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যেন কাহাকে খুঁজিতেছে; আর ডাকিতেছে, "তুমি কোথায় গেলে? আর যে তোমাকে না দেখে থাক্‌তে পারি না!" এই রূপে ঘুরিতে ঘুরিতে যে ঘরে বনবিহারী থাকিতেন, সেই ঘর খুঁজিত; পরে তাঁহার বিছানায় বসিয়া তাঁহাকে ডাকিত। কিছুদিন পরে, গভীর রাত্রে, ছাদের উপর হইতে একটী স্ত্রীলোকের হৃদয়-ভেদী চীৎকার শুনিয়া প্রতিবাসীদের নিদ্রাভঙ্গ হইত। "তুমি কোথায় গেলে? এসো না, আমার কাছে এসো না, আমি যে তোমাকে না দেখে আর থাক্‌তে পারি না।" গভীর নিশিতে প্রতিবাসীরা প্রতিদিন এইরূপ হৃদয়ভেদী চীৎকার শুনিতে পাইতেন। অল্প দিবস পরে এই চীৎকার বন্ধ হইল, কৃষ্ণমতী অনন্ত ধামে চলিয়া গিয়াছেন।

আমরা সঠিক সংবাদ পাইয়াছি যে, অসিতকুমার আর বাটী ফিরেন নাই। তাঁহার সম্বন্ধে দুইটা জনরব উঠিয়াছে, কেহ বলে যে তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন, আবার কেহ বলে যে তিনি প্রেমানন্দ স্বামী নাম ধারণ করিয়া দেশে দেশে আর্য্যধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। যাহাই হউক, তাঁহার অনুপস্থিতিতে নীলাপুরবাসীরা শান্তিলাভ করিয়াছে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সমাপ্ত।

পতিতের উদ্ধার।

অনেক স্থলে দেখা যায়, অতিশয় যোগ্য ব্যক্তির সন্তানও অযোগ্য হইয়া থাকে; আবার অযোগ্যের সন্তানও সুযোগ্য হয়। মানুষ জন-সাধারণের প্রায় তুল্য হওয়াই নিয়ম; জন-সাধারণ অপেক্ষা গুরুতর রূপে বিভিন্ন হওয়া সাধারণ নিয়ম নহে। সুতরাং কোনও নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির সন্তান যোগ্যতায় জন-সাধারণের ন্যায় হইবে, ইহাই আশা করা যায়। এই আশাকে পণ্ডিতগণ একটী বিধি বলেন, "সাধারণ সন্নিকর্ষ" বিধি; অর্থাৎ জাতক যোগ্যতায় সমাজস্থ জন-সাধারণের নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকে। ইহা বহুক্ষেত্রে পরীক্ষায় অবগত হওয়া যায়।

অতিশয় যোগ্য ব্যক্তি অধিক জন্মে না। যদি কোনও বংশে ঐরূপ কোনও ব্যক্তি জাত হন, তাঁর সহিত সমাজস্থ জন সাধারণের প্রভেদ অত্যন্ত অধিক। এই আধিক্য তাঁহার পরবর্ত্তী বংশে কমিয়া গিয়া "সাধারণ সন্নিকর্ষ বিধির" অনুসরণ করিয়া থাকে। সাধারণের প্রায় সমান হইতে হইলেই তাঁহার সন্তানকে যোগ্যতায় কিছু কমিয়া যাইতে হয়। আবার অযোগ্য সম্বন্ধেও এই বিধি অনুসরণ করিয়াই দেখা যায় যে, তাহার অপত্যকে কিছু উন্নত হইতে হয়। এই বিধি অনুসারে অত্যন্ত যোগ্যতা যেমন বংশানুক্রমে স্থায়ী হয় না, অত্যন্ত অযোগ্যতাও তেমনই স্থায়ী হয় না। ইহাতে একদিকে সমাজের অমঙ্গল হইলেও অপর দিকে অনেক মঙ্গল সিদ্ধ হয়। এইরূপে ভগবান্ মানব-সমাজের সাধারণ গড়-যোগ্যতা স্থির রাখেন।

অতিশয় যোগ্য ব্যক্তির সন্তানের যোগ্যতায় হীন হওয়া আক্ষেপের বিষয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু এ কুফল নিবারণ করিবার উপায় নাই, এমত নহে। বহুস্থলে পরীক্ষা দ্বারা জানা যায় যে, যদি পিতা মাতা উভয়ের মধ্যে একজন মাত্র যোগ্য হন, তবে-ই ঐ কুফল হয়; কিন্তু যদি উভয়েই অতিশয় যোগ্য হন, তাহা হইলে সন্তান যোগ্যতায় হীন তো হয়ই না, বরং অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে। বংশপরম্পরায় যোগ্যতার মাত্রা অধিক উন্নত রাখিতে হইলে, বংশপরম্পরায়-ই সুযোগ্য বরের সহিত সুযোগ্য কন্যার বিবাহ দেওয়া আবশ্যক। এইরূপে, অতিশয় যোগ্য এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তির আবির্ভাব হওয়ার আশা করা যায়। কিন্তু তদ্রূপ ব্যক্তি অধিক বংশে জাত না হইলেও, যোগ্য-যোগ্যার অপত্য সুযোগ্য হইবার সম্ভাবনা

অধিক হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। পিতা মাতা উভয়েই যোগ্য হইলে যোগ্য বংশে যোগ্য সন্তান উৎপন্ন হওয়া যত সম্ভব, অযোগ্যগণের সন্তান মধ্যে যোগ্য ব্যক্তির উৎপত্তি হওয়া তত সম্ভব নহে। আবার, যদি বা দম্পতির মধ্যে একের যোগ্যতা হেতু অপত্য যোগ্য হইতে পারিত, কিন্তু অপরের অযোগ্যতা থাকিলে অপত্য অযোগ্য হইবার সম্ভাবনা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

এই সকল কথা প্রায় সকলেই জানেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে এতদনুসারে চলেন না। যে কোন রূপে হউক, পুত্রদায় ও কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করেন, যোগ্যাযোগ্যের বিচার করেন না। যেখানে যোগ্যাযোগ্যের বিচার নাই, সেখানে যোগ্যতা শীঘ্রই বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু বংশপরম্পরায় যোগ্য নর-নারীর বিবাহ হইলে, এবং অযোগ্য দম্পতির সন্তান হওয়া নিবৃত্ত করিতে পারিলে, জাতীয় উন্নতির আশা সফল হইতে পারে। পতিত, অবসন্ন জাতির এই পন্থা ভিন্ন অন্য পন্থা নাই। ইহাই তাহার পতিতোদ্ধার মন্ত্র। এ মন্ত্রের সাধনা করা বড়ই কঠিন কার্য্য। হিন্দু সমাজে একে বিবাহের ক্ষেত্র সংকীর্ণ; তার পর উপযুক্ত পাত্র অথবা কন্যা দুষ্প্রাপ্য। অর্থাভাবের কথা ছাড়িয়া দিলেও, বিবাহ কার্য্যে যোগ্যাযোগ্য বিচার স্থির রাখা বড়ই কঠিন কার্য্য সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাও নিশ্চিত যে, যে জাতি সর্ব্বাগ্রে এই কার্য্য সুসিদ্ধ করিয়া তাহা বংশানুক্রমে স্থির রাখিবার উপায় করিতে সমর্থ হইবে, সেই জাতিই মানব সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে। পণ্ডিতবর ডন্‌কাষ্টার বলেন,—

"The whole trend of the results obtained is that in order to produce exceptionally gifted men in both body and mind, those with high development of the characters desired should be encouraged to marry; and that to prevent the production of the weakly and feeble-minded, the only method is to prevent such from having offspring. * * * * There is little doubt that the nation which first finds a way to make them practical will in a very short time be the leader of the world."

অর্থাৎ, সুযোগ্য সন্তান উৎপন্ন করিতে হইলে, যাহারা দেহে ও মনে যোগ্য এরূপ নরনারীদিগকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিতে হয়; এবং যাহারা অযোগ্য তাহাদিগের সন্তান হওয়া নিষেধ করিতে হয়। যাহারা সর্ব্বাগ্রে এইরূপ করিতে সক্ষম হইবে, তাহারাই পৃথিবীর নেতা হইবে।

এ সকল স্থলে 'যোগ্য' বলিতে সুস্থ, সবলদেহ, তেজস্বী, উদ্যোগী, ও পবিত্র মনের অধিকারী বুঝিতে হইবে। যাহারা বংশানুক্রমিক পীড়াগ্রস্ত, দুর্ব্বল, ভগ্নদেহ, যাহারা অলস, পরমুখাপেক্ষী, দুর্নীতিপরায়ণ, বিকৃতমনা, তাহারা পরবর্ত্তী বংশ গঠন করিলে সমাজ অধঃপতিত হইবেই। কিন্তু সংসারে ইহা সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করা দুঃসাধ্য। যে বংশ তদ্রূপ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সে বংশ পুরুষানুক্রমে যোগ্যতার মাত্রা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। তাঁহারা দুঃসাধ্য সাধন করিয়াছেন; পুরুষপরম্পরায় সমাজকে সুযোগ্য ব্যক্তি উপহার দিতেছেন। তাঁহারা জাতীয় উৎকর্ষ সাধনের আদর্শ দেখাইতেছেন; তাঁহারা আমাদিগের কৃতজ্ঞতার পাত্র।

আমি অদ্য এইরূপ একটী পরিবারের কথা বিবৃত করিব। এ বংশের ১৫০ দেড়শত বৎসরের কুর্চ্চিনামা নিম্নে দেওয়া গেল:—

মুন্সী রামনারায়ণ সর্ব্বাধিকারী
|
মথুরমোহন সর্ব্বাধিকারী
|
যদুনাথ ঐ
|
- প্রসন্নকুমার (সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ; প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরাজি ও ইতিহাসের অধ্যাপক; বাঙ্গালা বীজগণিত ও পাটীগণিত প্রণেতা)
- সূর্য্যকুমার (বিখ্যাত ডাক্তার)
- আনন্দকুমার (সবজজ)
- রাজকুমার (হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক, ঠাকুর অধ্যাপক; ক্যানিং কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক)

সূর্য্যকুমার
|
- সত্যপ্রসাদ (ফ্রিমেসনের সম্মান প্রাপ্ত)
- দেবপ্রসাদ (বিখ্যাত ভাইস্ চ্যান্সলার)
- কৃষ্ণপ্রসাদ (হাইকোর্টের উকিল)
- সুরেশপ্রসাদ (বিখ্যাত ডাক্তার)
  |
  কনকচন্দ্র (শিশু)

যখন সাধারণের হিতার্থে দান করিলে খেলাত পাওয়া যাইত না, সংবাদ পত্রেও উঠিত না, তখনমুন্সী রামনারায়ণ লোকহিতার্থে যে ভূমিদান করিয়াছিলেন তাহাই এখন মুন্সীগঞ্জ। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাকে ১ লক্ষ মুদ্রা দিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি লোকের উপকারের নিমিত্ত ভূমিদান করিয়া অর্থগ্রহণ করা অসঙ্গত বোধে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। তাঁহার পৌত্র যদুনাথ উত্তর পশ্চিম প্রদেশে কানপুরাদি স্থান দর্শনান্তে "তীর্থভ্রমণ" নাম দিয়া যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে নানাতীর্থস্থানের এবং অন্যান্য স্থানের উজ্জ্বল বর্ণনা আছে। গদ্য রচনায় সেকালে এরূপ পটুতা লাভ করা সাধারণ ক্ষমতার পরিচায়ক নহে। শুনিয়াছি, এই গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কনের ভার বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রহণ করিয়াছেন। যদুনাথের পুত্রগণ স্বনামধন্য, তাঁহাদিগের পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কেবল সূর্য্যকুমার সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তিনি সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে সৈনিক বিভাগের ডাক্তার ছিলেন, এবং অত্যন্ত তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। ইঁহার ভার্য্যা ধর্ম্মপরায়ণ ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। ইঁহাদিগের পুত্রগণেরও কোন পরিচয়ই আবশ্যক নাই। ডাঃ দেবপ্রসাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার এবং তাঁহার তীক্ষ্ণ মনীষা ও কর্ম্মকুশলতা সর্ব্বজনবিদিত। ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ অনন্যসাধারণ প্রতিভাশালী, তেজস্বী ও নির্ভীক। ইঁহার প্রতিভা, দক্ষতা ও শ্রমসহিষ্ণুতা পরিজ্ঞাত। ইঁহার ভার্য্যার একখানি আলোক চিত্র আমি দেখিয়াছি। তিনি যে ভাবে কন্যা ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছেন, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, তাঁহার পৃষ্ঠবংশ ঋজু, জানু এবং পদযষ্টি দৃঢ় ও সবল। তাঁহার পূর্ণাবয়ব, বিশেষতঃ নাসিকা, চক্ষু এবং হনু দৃষ্টে তাঁহাকে বুদ্ধিমতী ও তেজস্বিনী বলিয়াই বোধ হইয়াছে। ইঁহার পিতা হাটখোলার দত্তবংশীয় কেদারনাথ দত্ত। ইনি এক অসাধারণ ব্যক্তি, অথচ নিভৃতে অঙ্গ ঢাকিয়া থাকিতেন, করতালির প্রত্যাশাও করিতেন না। মাইকেল দত্তের পূর্ব্বে ইনি বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর পদ্য রচনা করিয়াছেন; বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। ইঁহার প্রণীত কবিতা, উপন্যাস এবং ইতিহাস গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি মুদ্রিত হয় নাই। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে ইঁহার শক্তি বিশেষ ভাবেই উল্লেখযোগ্য।

এক্ষণে কনকচন্দ্রের কথা বলিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এই শিশুর বয়স এখন চারি বৎসর। বৈজ্ঞানিক প্রণালীমতে ইহার অসাধারণ শক্তির

ব্যাখ্যা করিতে হইলে, পিতৃকুলের ও মাতৃকুলের যে সকল বিষয় বলিতে হয়, উপরে কেবল তাহাই বিবৃত করিয়াছি। জীবিত ব্যক্তির কৃতিত্ব বর্ণনা করা বড়ই কঠিন কর্ম্ম এবং বাঞ্ছনীয়ও নহে। তথাপি, সুযোগ্য সন্তান লাভ করিবার যে সকল নিয়মাবলী পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিলে দেশের ও দশের কল্যাণ সম্ভাবনা আছে, এই নিমিত্তই ইহার পূর্ব্বপুরুষগণের জীবনের আবশ্যকীয় বৃত্তান্তগুলি সংক্ষেপে বলিতে হইয়াছে।

এই শিশুর পিতামহ সৈনিক ডাক্তারের কার্য্য করিয়াছেন। পিতা সুরেশপ্রসাদ ২৪ বৎসর বয়সে ডাঃ কেনেথ ম্যাক্লাউডের সঙ্গে বিলাতের সৈনিক বিভাগের ডাক্তার হইতে যাইতেছিলেন; কেবল তাঁহার মাতৃভক্তি ও মাতৃবৎসলতা তাঁহাকে এ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিল। সুতরাং ইহার এই বয়সেই সেই দিকে প্রবণতা দৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। পিতা পিতামহের প্রতিভা ও স্মৃতি শক্তি এই শিশু প্রাপ্ত হইবে, ইহাও আশা করা যায়। ইহার দেহের অস্থি, পেশী, শিরা, স্নায়ু ও মস্তিষ্ক তেজস্বী এবং সবল হইবারই কথা; কারণ কনকচন্দ্র পিতামাতার পরিণত বয়সের সন্তান এবং তদীয় পিতা মাতার দেহ সবল ও দৃঢ়। এ সকল সে পাইয়াছে কেন? অতিশয় যোগ্য ব্যক্তির সন্তান "সাধারণ সন্নিকর্ষে"র বিধানানুসারে যোগ্যতায় হীন হইবার কথা। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যদি পিতা মাতার মধ্যে উভয়েই যোগ্য হন তবে অপত্য যোগ্যতায় হীন হয় না, বরং আরও উন্নত হইতে পারে। সুতরাং ইহার মাতা ও পিতামহীর বিষয় আমরা কিছু না জানিলেও বলিতে পারিতাম যে, তাঁহারা নিশ্চয়ই সুযোগ্যা। এই বালক চারি মাস বয়সে বসিয়া থাকিতে পারিত; ছ মাস বয়সে দেওয়ালের গাত্রলগ্ন বিদ্যুৎ-সংযোজক চাবিগুলির * মধ্যে কোন্‌টী আলোকের, কোন্‌টী পাখার তাহা জানিত এবং টানিয়া দিতে পারিত। কনক আট মাস বয়সে দাঁড়াইতে এবং এগার মাস বয়সে বেড়াইতে পারিত। তদপেক্ষাও আশ্চর্য্যের বিষয়, সে ঐ সময়েই স্পষ্ট করিয়া কতিপয় বাক্য উচ্চারণ করিতে পারিয়াছিল; এবং পঞ্চদশ মাস বয়সে তিন চারিটী বাক্য সংযুক্ত করিয়া সরল পদ গঠন করিতে পারিত। প্রপিতামহ এবং মাতামহ উভয়েই গ্রন্থকার কি না; তাই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থকার

* Switch

মুখে মুখে অত অল্পবয়সে পদ রচনা করিত, বুঝি? ইহাকে আঠার মাস বয়সে পিতা ও মাতা একদিন আলিপুরের পশুশালায় লইয়া গিয়াছিলেন; এবং গণ্ডার প্রভৃতি কয়েকটী জন্তুর ইংরাজি নাম পিতা ও বাঙ্গালা নাম মাতা বলিয়া দিয়াছিলেন। তৎপর দিবস ইহাকে জিজ্ঞাসা করায় সেই সকল জন্তুর ইংরাজি ও বাঙ্গালা নাম শুদ্ধ রূপে বলিতে সক্ষম হইয়াছিল!!!

এই শিশু দুই বৎসর বয়সে সৈন্যের ন্যায় কাওয়াজ করিত, এবং পিতাকে কাওয়াজ করাইত। এই সময়ের একটী চিত্র দৃষ্টে স্পষ্টই দেখা যাইবে, ইহার পদযষ্টি ও তল্লগ্ন পেশী ও শিরা সকল কেমন বলিষ্ঠ; দক্ষিণ ও বাম পদের সংস্থান দৃষ্টেই তাহা প্রতীয়মান হইতেছে। এই চিত্রে নৌ-সেনার বেশ; সুতরাং দক্ষিণহস্ত কপালের মধ্য ভাগে নৌ-সেনার উপযোগী অভিবাদন সঙ্কেতে স্থাপিত হইয়াছে। ভঙ্গীতে বোধ হয় হস্তের পেশী ও শিরা এবং গ্রীবাদেশ কেমন দৃঢ়। এই শিশু দুই বৎসর দুই মাস বয়সে "বন্দে মাতরং" এবং "আমার জন্মভূমি" স্বর সহিত আবৃত্তি করিতে পারিত। ইহার তিন বৎসর বয়সের চিত্রে দেখা যাইতেছে, পৃষ্ঠবংশ, হস্ত ও পদ কেমন দৃঢ় ও শক্তিব্যঞ্জক। এ শিশু সৈনিক বেশ ভালবাসে; এবং সেনাগণের পদমর্য্যাদা-সূচক সংজ্ঞা সকল জানে এবং তেজস্বিতার সহিত উচ্চারণ করিতে পারে। এক্ষণে চারি বৎসর মাত্র বয়স; কিন্তু দিবা রাত্রি, ঋতুভেদ, বৃষ্টি, বজ্র ইত্যাদি কি কারণে হইয়া থাকে তাহা শিক্ষা করিয়াছে।

দৃঢ়, বলিষ্ঠ দেহের সহিত, অসাধারণ ধী ও স্মৃতি কেমন সংযুক্ত হইয়াছে তাহার উত্তম দৃষ্টান্ত এই কনকচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী।

এত বিস্তৃত ভাবে এই শিশুর দেহ ও মনের আলোচনা করিবার আর কোনই কারণ নাই, কেবল ইহাই বুঝাইতে ইচ্ছা করি যে, সুযোগ্য নরনারী-গণের বিবাহের ফলে সুযোগ্য সন্তান লাভ হয়; এবং অযোগ্যগণের সন্তান দ্বারা সমাজ অধঃপতিত হয়। আর বংশানুক্রমে এই নিয়ম স্মরণ রাখিয়া বিবাহ কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে পারিলে এক গৃহে নহে, বহু গৃহেই এইরূপ কনক-চন্দ্র লাভ হইতে পারে। প্রতিভা হয়ত সকল বংশে পাওয়া যাইবে না; কিন্তু সমাজের গড়-যোগ্যতা যে এই উপায়ে বর্দ্ধিত ও সংরক্ষিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বকালে যেমন কৌলীন্যমর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত ঘটকগণ বংশাবলীর পুঁথি রাখিতেন, এক্ষণে এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক ঘটকগণ যদি যোগ্যতার মাত্রা-

সুসারে ভিন্ন ভিন্ন যোগ্য বংশ সকলের তালিকা পুস্তকাকারে রক্ষা করেন, এবং সাধারণের অবগতির নিমিত্ত মুদ্রিত করেন; এবং সাধারণে বিবাহ কার্য্যে ঐ পুস্তকের নির্দ্দেশ মত সুযোগ্য বংশের প্রতিই অধিক সমাদর প্রদর্শন করেন, তবে এতদ্দেশের বিশেষ কল্যাণ সিদ্ধ হইতে পারে। কেহ এ পথে অগ্রসর হইবেন কি ?

আমরা ইচ্ছা করিয়াছি, এতদ্দেশীয় অসাধারণ প্রতিভাশালী, যোগ্য ও কৃতী বংশগুলির যথাসম্ভব আলোচনা করিব। কেবল সুযোগ্য অপত্য-লাভের দিক্ হইতে এই সকল বংশের যে পরিমাণ ইতিহাস জ্ঞাতব্য তাহাই বিবৃত করিব। আবার, নিতান্ত অযোগ্য অকৃতী ও জড়বৎ বংশের এবং তদ্রূপ সন্তানের ইতিহাসও বিবৃত করিব। ইহা হইতে সাধারণে যদি বুঝিতে পারেন যে, মানুষ গড়িবারও একটা পদ্ধতি আছে, এবং জীবতত্ত্বের নিয়ম সকল পালন করিয়া চলিলে সুযোগ্য মানুষ গড়া সম্ভব, তবেই কৃতার্থ হই। মানুষ গড়িতে না জানিলে, কেবল শাস্ত্রজ্ঞান, বাহুবল, ধনবল, বাণিজ্য ইত্যাদি দ্বারা সমাজকে উন্নত রাখা যায় না। প্রাচীন হিন্দুগণ, গ্রীকগণ, রোমকগণ, ফিনিসিয়গণ, ওলন্দাজগণ, স্পেনীয়গণ ইহার সাক্ষী স্বরূপ কি মহা শিক্ষাই দিতেছে!! কিন্তু শিক্ষা করিবে কে ? আমরা জাতি হিসাবে মরিতে বসিয়াছি; এখনও কি এদিকে মনোযোগী হইব না ?

শ্রীশশধর রায়।

সাহিত্য, ২৫ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা।

পালিসাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ।

অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, পালিসাহিত্যকে প্রধানতঃ বুদ্ধবচন ও বৌদ্ধবচন এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ভগবান্ বুদ্ধ নিজে যে সকল আদেশ ও উপদেশ বাণী প্রচার করিয়াছিলেন এবং বৌদ্ধস্থবির-স্থবিরার যে সকল উপদেশ তিনি অনুমোদন করিয়াছিলেন, সমুদয় একত্রে বুদ্ধবচন নামে অভিহিত। পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধাচার্য্যগণ বুদ্ধবচন অবলম্বনে যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তৎসমুদয়কে আমরা বৌদ্ধবচন নামে অভিহিত করিতেছি।

বুদ্ধবচন স্থবিরবাদ, অগ্রবাদ, বিভাজ্যবাদ, পালি, তন্ত্রী, পর্য্যাপ্তি ও Buddhist canon নামে প্রসিদ্ধ। শ্রেণী বিভাগ অনুসারেও ইহার কতকগুলি নাম আছে। যথা—ধর্ম্মবিনয়, ত্রিপিটক, পঞ্চনিকায়, নবাঙ্গ জিনশাসন ও চুরাশী সহস্র ধর্ম্মখণ্ড। বৌদ্ধবচনকে ইংরাজীতে বলা যাইতে পারে Ex-canonical works।

বুদ্ধবচনের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে সুমঙ্গলবিলাসিনী ও অথসালিনী বলেন, "সব্বম্পি বুদ্ধবচনং রসবসেন একবিধং, ধম্ম-বিনয়বসেন দু-বিধং, পঠম-মজ্ঝিম-পচ্ছিমবসেন তি-বিধং তথা পিটকবসেন, নিকায়-বসেন পঞ্চবিধং, অঙ্গ-বসেন নব-বিধং, ধম্মক্খন্ধবসেন চতুরাসীতিসহস্সবিধন্তি বেদিতব্বং।"

"সমগ্র বুদ্ধবচন রসহিসাবে এক শ্রেণীর ও ধর্ম্ম বিনয় হিসাবে দুই শ্রেণীর। প্রথম মধ্যম ও পশ্চিম হিসাবে উহা তিন ভাগে, পিটক হিসাবে ও তিনভাগে, নিকায় হিসাবে পাঁচভাগে, অঙ্গ হিসাবে নয় শ্রেণীতে ও ধর্ম্মখণ্ড হিসাবে চুরাশী সহস্র ধর্ম্মখণ্ডে বিভক্ত।"

১। অদ্বিতীয় সম্যক্ সম্বোধিলাভ ও মহাপরিনির্ব্বাণলাভের মধ্যে পূরা পঞ্চচত্বারিংশৎ বর্ষকাল ব্যাপিয়া ভগবান্ বুদ্ধ দেবতা, মনুষ্য, নাগ, যক্ষ, প্রভৃতির নিকট যাহা কিছু প্রচার করিয়াছিলেন সমস্তই একমাত্র বিমুক্তি রসে আপ্লুত ছিল। এই কারণে বুদ্ধবচন রসহিসাবে মাত্র এক শ্রেণীর।

২। ধর্ম্ম ও বিনয় হিসাবে বুদ্ধবচন দুই শ্রেণীর। এই সম্বন্ধে শ্রীমান্ বেণীমাধব বড়ুয়া এম্, এ লিখিয়াছেন, "ধর্ম্ম ও বিনয় বৌদ্ধধর্ম্ম সাহিত্যের

অতি প্রাচীন বিভাগ। বুদ্ধ তাঁহার সার্ব্বজনীন নীতিমূলক উপদেশ গুলিকে ধর্ম্ম ও আদেশমূলক বাণী সমূহকে বিনয় নামে অভিহিত করিতেন। ধর্ম্ম বলে—ইহা করা তোমার কর্ত্তব্য এবং বিনয়বলে,—ইহা তোমাকে করিতেই হইবে, যদি না কর এই এইরূপে দণ্ডিত হইবে। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, ধর্ম্ম নীতিবিষয়ক উপদেশ এবং বিনয় বিধি বা আইন।" ধর্ম্ম বিনয় শব্দটী বৌদ্ধসাহিত্যে যেরূপ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে হয় যে, উহা দ্বারা ভারতবর্ষীয় যে কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্র বিজ্ঞাপিত হইত, এবং অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে পার্থক্য জ্ঞাপন মানসেই 'ইমস্মিং-ধম্ম-বিনয়ে' এইরূপ বিশেষাত্মক সংজ্ঞা বৌদ্ধসাহিত্যের স্থানে স্থানে প্রয়োগ করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিতে হয় যে, প্রত্যেক ভারতবর্ষীয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যেই উপদেশ ও আদেশ প্রধানতঃ এই দুইটী জিনিষ বিদ্যমান ছিল। কথিত আছে, বুদ্ধের দেহত্যাগের তিন মাস পরে বুদ্ধবচন সংগ্রহ করিবার মানসে রাজগৃহে প্রথম বৌদ্ধসভা আহ্বান করা হইয়াছিল। ৫০০ জন খ্যাতনামা অগ্রনিক্ষিপ্ত * স্থবির সভায় যোগদান করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে আনন্দ ছিলেন ধর্ম্ম বিষয়ে বহুশ্রুত এবং উপালি ছিলেন বিনয় বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা পারদর্শী। স্থবির মহাকাশ্যপ সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি আনন্দকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে এবং উপালিকে বিনয় সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের উত্তর সমূহ অন্যান্য স্থবির কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে পর উহা সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। এইরূপে ধর্ম্ম বিনয় বা প্রথম বৌদ্ধশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছিল। ইহাতে বুঝিতে হয় যেন ধর্ম্ম বিনয় ত্রিপিটকের নামান্তর মাত্র। সুমঙ্গলবিলাসিনীর গ্রন্থকার বলিয়াছেন "তত্থ বিনয়পিটকং বিনয়ো, অবসেসং বুদ্ধবচনং ধম্মো।" "বিনয় পিটক বিনয় সংজ্ঞার এবং অবশিষ্ট বুদ্ধবচন অর্থাৎ সূত্রপিটক ও অভিধর্ম্ম পিটক ধর্ম্ম সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত।" কিন্তু দীপবংশের গ্রন্থকার বলিতে চাহেন যেন আগম বা সূত্র পিটক তথাকথিত ধর্ম্ম বিনয়ের বহির্ভূত কিংবা উহাই কেবল ধর্ম্ম সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত; তিনি পূর্ব্বোল্লিখিত ভাবে ধর্ম্ম বিনয় সংগ্রহ বর্ণনা করিয়া শেষভাগে বলিয়াছেন,—

* অগ্রনিক্ষিপ্ত—একদম্রে স্থাপিত ; কোন বিষয়ে অদ্বিতীয় বলিয়া ভগবান্ বুদ্ধ হইতে উপাধিপ্রাপ্ত।

"পবিভজ্জ ইমং থেরা সদ্ধম্মং অবিনাসনং।
বগ্‌গপঞ্ঞাসকন্নাম সংযুত্তঞ্চ নিপাতকং॥
আগম পিটকং নাম অকংসু সুত্তসম্মতং॥"

"স্থবিরগণ এই অবিনাশী সদ্ধর্ম্মকে বগ্‌গ, পঞ্ঞাস, সংযুত্ত ও নিপাত হিসাবে সুন্দর ভাবে বিভক্ত করিয়া সূত্রানুসারে আগম পিটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন।"

বাস্তবিক ইহা এক মহা সমস্যার বিষয় যে, প্রথম বৌদ্ধ-সভায় অভিধর্ম্ম-পিটক প্রণীত হইয়াছিল কি না। তিব্বতীয় গ্রন্থগুলি এইরূপ কোন গোল-যোগে না যাইয়া সোজাসুজি ভাবে বলিতে গিয়াছেন, আনন্দ সূত্র-পিটক, উপালি বিনয়-পিটক এবং মহাকাশ্যপ অভিধর্ম্ম-পিটকের মাত্রিকা আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

৩। বুদ্ধ বচনগুলি প্রথম, মধ্যম, এবং পশ্চিম হিসাবেও বিভক্ত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, শাক্যরাজকুমার সিদ্ধার্থ সিদ্ধিলাভের পর যে উদাস গীতি গাহিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার প্রথম বাক্য।

"অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিস্‌সং অনিব্বিসং।
গহকারকং গবেসন্তো দুক্‌খা জাতি পুনপ্পুনং॥"

ইত্যাদি।

অপর কাহারও কাহারও মতে, "যদা হবে পাতু ভবন্তি ধম্মা আতাপিনো আয়তো ব্রাহ্মণস্‌স।" ইত্যাদি। খন্ধক গ্রন্থে উদ্ধৃত গাথাই তাঁহার প্রথম বাক্য। দেহত্যাগ করিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তিনি ভিক্ষু সংঘকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার পশ্চিম বা সর্ব্বশেষ বাক্য। "হন্দ দানি ভিক্‌খবে আমন্তয়ামি বো বয় ধম্মা সংখারা, অপ্পমাদেন সম্পাদেথ।"

এই দুই বাক্যের মধ্যবর্ত্তী সময়ে তিনি যে সকল বাণী প্রচার করিয়াছিলেন তৎসমুদয় তাঁহার মধ্যম বাক্য নামে প্রসিদ্ধ।

৪। পিটক হিসাবেও বুদ্ধবচন তিন ভাগে বিভক্ত। যথা—বিনয় পিটক, সূত্রান্ত পিটক ও অভিধর্ম্ম পিটক। পিটক শব্দের অর্থ ঝুড়ি, পেঁটরা। বিনয় পিটকের অপর নাম 'আনা দেসনা' বা আদেশ বাণী; সূত্রান্ত পিটকের অপর নাম 'বোহারো দেসনা' বা ব্যবহারি বাণী; এবং অভিধর্ম্ম পিটকের অপর নাম 'পরমত্থ দেসনা' বা পারমার্থিক বাণী। বিনয় পিটকের অপর নাম 'সংবরা-সংবর-কথা,' সংযম-অসংযম বিষয়ক কথা; সূত্রান্ত পিটকের অপর নাম 'দিট্ঠি-

বিনিবেঠন কথা' মিথ্যাদৃষ্টি-বেষ্টন বিষয়ক কথা ; এবং অভিধর্ম্ম পিটকের অপর নাম 'নামরূপপরিচ্ছেদ-কথা।'—বিনয় পিটকের প্রধান আলোচ্য বিষয় 'অধিশীল সিক্খা',—শীল বা সদাচার ; সুত্রান্ত পিটকের প্রধান আলোচ্য বিষয় 'অধিচিত্ত সিক্খা',—সমাধি ; এবং অভিধর্ম্ম পিটকের প্রধান আলোচ্য বিষয় 'অধিপঞ্ঞা সিক্খা',—প্রজ্ঞা বা জ্ঞান। বিনয় পিটকের অন্তর্গত পাতিমোক্খ, বিভঙ্গ, খন্ধক ও পরিবার এই চারি গ্রন্থ ; সুত্রান্ত পিটকের অন্তর্গত পঞ্চ নিকায়, যথা—দীঘ, মজ্ঝিম, সংযুত্ত, অঙ্গুত্তর ও খুদ্দক। তন্মধ্যে খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত পনরটী পুস্তক; যথা—খুদ্দক পাঠ, ধর্ম্মপদ, উদান, ইতিবুত্তক, সুত্তনিপাত, বিমানবত্থু, পেতবত্থু, থের গাথা, থেরীগাথা, জাতক, নিদ্দেস, পটিসংভিদা, অপদান, বুদ্ধবংশ ও চরিয়া পিটক। কিন্তু দীঘ-ভাণক-শ্রেণী-বিভাগ অনুসারে খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত মাত্র বারটী পুস্তক। যথা—জাতক, মহানিদ্দেস, চুলনিদ্দেশ, পটিসংভিদা মগ্‌গ, সুত্ত-নিপাত, ধর্ম্মপদ, উদান, ইতিবুত্তক, বিমানবত্থু, পেতবত্থু, থের-গাথা ও থেরীগাথা। মজ্ঝিমভাণক-শ্রেণী-বিভাগ অনুসারে পনরটী পুস্তক, যথা—দীঘভাণকের বারটী পুস্তক, চরিয়া পিটক, অপদান ও বুদ্ধবংশ। সুতরাং দেখা যাইতেছে, দীঘভাণক ও মজ্ঝিমভাণকের তালিকায় খুদ্দক পাঠের উল্লেখ নাই এবং নিদ্দেশের পরিবর্ত্তে মহানিদ্দেশ ও ও চুলনিদ্দেশ উল্লিখিত আছে। অভিধর্ম্ম পিটকের অন্তর্গত সাতটী প্রকরণ। যথা—ধর্ম্মসঙ্গণি বা ধর্ম্মসঙ্গৎ, বিভঙ্গ, ধাতুকথা, পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি, কথাবত্থু, যমক ও পট্‌ঠান। তন্মধ্যে কথাবত্থু রাজা অশোকের সময় ত্রিপিটকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সাঞ্চিস্তূপের প্রাচীর গাত্রে 'পেটকী" (যিনি পিটকশাস্ত্র—জানেন) নাম দৃষ্ট হয়।

৫। নিকায় হিসাবে বুদ্ধ বচন পঞ্চ ভাগে বিভক্ত। যথা—দীঘ-নিকায়, মজ্ঝিম-নিকায়, সংযুক্ত নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায়, ও খুদ্দক নিকায়। এই শ্রেণী বিভাগ অনুসারে খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত পূর্ব্বোল্লিখিত পনরটী পুস্তক এবং সমগ্র বিনয় ও অভিধর্ম্ম পিটক। রাজা অশোকের সাঞ্চিস্তূপের প্রাচীর-গাত্রে পঞ্চ-নেকয়িক (যিনি পঞ্চ-নিকায় জানেন) নামটী দৃষ্ট হয়।

৬। অঙ্গ হিসাবে বুদ্ধ-বচন নয় শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—সুত্ত, গেয়্য, বেয়্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অব্‌ভুতধম্ম ও বেদল্ল।

"সুত্তং গেয়্যং বেয়্যাকরণং গাথ্‌দানীতিবুত্তকং।
জাতকব্‌ভুতবেদল্লং নবঙ্গং সত্থু-সাসনং॥"

নেপালী বৌদ্ধেরা তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থকে দ্বাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। মহাবৈপুল্যসূত্র, অবদান প্রভৃতি তিন চারি নামই উক্ত তালিকার অতিরিক্ত।

বিভঙ্গ, নিদ্দেশ, খন্ধক, পরিবার, সুত্তনিপাতে মঙ্গল সুত্ত, রতন-সুত্ত, নালক-সুত্ত, তুবটকসুত্ত প্রভৃতি ও সুত্ত নামধেয় অন্যান্য বুদ্ধবচন সুত্তসংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত।

যে সকল সুত্তের মধ্যে গাথা বিদ্যমান আছে তৎসমুদয় গেয্য নামে অভিহিত। দৃষ্টান্তস্থলে সংযুত্ত নিকায়ের সগাথ-বগ্‌গ।

সমগ্র অভিধর্ম্ম পিটক, অন্যান্য আটশ্রেণীর বহির্ভূত গাথাশূন্য সুত্তগুলি বেয়্যাকরণ নামে অভিহিত।

ধম্মপদ, থেরগাথা, থেরীগাথা, ও সুত্তনিপাতের শুদ্ধগাথা গুলি গাথা শ্রেণীর অন্তর্গত।

ভাবাবেশে যে সকল উচ্ছ্বাস গীতি গীত হয়, তৎসমুদয় উদান নামে অভিহিত। দৃষ্টান্তস্থলে, খুদ্দক নিকায়ে উদান পুস্তক।

ইতিবুত্তকে বুদ্ধের উক্তি সমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রত্যেক সুত্তের প্রারম্ভে লিখিত আছে, "বুত্তং হে'তং ভগবতা"।

ভগবান্ বুদ্ধের অতীত জন্ম বিষয়ক পুস্তকের নাম জাতক।

যে সকল সুত্তে আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত বিষয় সমূহ আলোচিত হইয়াছে তৎসমুদয় অব্‌ভুতধম্ম সংজ্ঞায় অভিহিত।

চুল্লবেদল্ল, মহাবেদল্ল, সম্যাদিট্ঠি, সক্কপঞ্হ, প্রভৃতি যে সকল সুত্তের প্রশ্নোত্তর শুনিলে হৃদয়ে বেদ (আনন্দ) ও জ্ঞানের সঞ্চার হয়, তাহাদের নাম বেদল্ল।

৭। ধর্ম্মখণ্ড হিসাবে বুদ্ধবচন চুরাশী সহস্র ধর্ম্মখণ্ডে বিভক্ত। এক বিষয়ক সুত্ত একটি ধর্ম্মখণ্ড। বিষয় বিভিন্ন হইলে প্রত্যেক সুত্তে একাধিক ধর্ম্মখণ্ড হইতে পারে। গাথা বন্ধে প্রশ্নভাগ একটি ধর্ম্মখণ্ড। উত্তর ভাগ অপর এক ধর্ম্মখণ্ড। ইত্যাদি।

কথিত আছে, বুদ্ধবচনের মধ্যে ৮২,০০০ বিষয় বুদ্ধের দ্বারা এবং ২,০০০ বিষয় স্থবির স্থবিরার দ্বারা আলোচিত হইয়াছিল। সিংহলী গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে যে, রাজা অশোক ৮৪০০০ ধর্ম্মখণ্ডের সম্মানার্থে ৮৪০০০ স্তূপ, স্তম্ভ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

সুমঙ্গলবিলাসিনীর গ্রন্থকার বলেন, পূর্ব্বোক্ত শ্রেণী বিভাগ ভিন্ন,

ত্রিপিটকের মধ্যে উদান-সংগ্রহ, বগ্‌গ-সংগ্রহ, পেয়্যাল-সংগ্রহ, নিপাত-সংগ্রহ, সংযুত্ত-সংগ্রহ, পঞ্চাস-সংগ্রহ প্রভৃতি আরও অনেক প্রকার বিষয় বিন্যাস আছে।

নেত্তি-পকরণের গ্রন্থকার সাসনপট্‌ঠানে সুত্তকে আলোচ্য বিষয় অনুসারে পশ্চাল্লিখিত শ্রেণীগুলিতে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা—

(১) বাসনা বিষয়ক সুত্ত; (২) নির্ব্বেধ বিষয়ক সুত্ত, (৩) অশৈক্ষ্য বা অর্হৎ বিষয়ক সুত্ত; (৪) সঙ্কলুষ বিষয়ক সুত্ত; (৫) সঙ্কলুষ ও বাসনা বিষয়ক সুত্ত; (৬) সঙ্কলুষ ও নির্ব্বেধ বিষয়ক সুত্ত; (৭) সঙ্কলুষ ও অশৈক্ষ্য বিষয়ক সুত্ত; ইত্যাদি।

আধুনিক সাহিত্যের শ্রেণী বিভাগের দিক্ দিয়া দেখিলে বলিতে হয় যে, বুদ্ধবচনে উপন্যাস, নবন্যাস, কাব্য, নাটক প্রভৃতি নাই। নীতিশাস্ত্র, দর্শন, মনোবিজ্ঞান, জীবন চরিত, পুরাণ, গীতি কবিতা প্রভৃতি আছে। স্থানে স্থানে কাব্য ও নাটকের ছায়া পরিদৃষ্ট হয়।

বুদ্ধবচনের শ্রেণী বিভাগের ধারা নির্ণীত হইল। এখন আমরা বৌদ্ধবচন আলোচনা করিব।

পালিতে ত্রিপিটকের বহির্ভূত আরও অনেক গ্রন্থ আছে। পরবর্ত্তী কালের বৌদ্ধাচার্য্যগণ ত্রিপিটক বুঝাইবার সুবিধা কল্পে ঐ সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমানেও সিংহল, ব্রহ্মদেশ ও শ্যামে অনেক পুস্তক প্রণীত হইতেছে। অধিকন্তু দেখা যায়, বৌদ্ধবচনকেও বুদ্ধবচনের ভাবে শ্রেণী বিভাগ করা যাইতে পারে।

বৌদ্ধবচনের মধ্যে ব্যাকরণই সর্ব্বাগ্রে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। অর্থকথা (commentary), টীকা (Sub-commentary), অনুটীকা, মধুটীকা, ব্যাকরণ (Grammars), প্রভৃতিকে ব্যাকরণ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। আচার্য্য বুদ্ধঘোষ ধর্ম্মপাল ও অন্যান্য কতিপয় স্থবিরের লিখিত ত্রিপিটকের ব্যাখ্যাগুলিই অর্থকথা নামে প্রসিদ্ধ। অথসালিনী পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়, বুদ্ধঘোষ যখন লঙ্কাদ্বীপে উপনীত হন, তখন তথায় মহাবিহারট্‌ঠ কথা, পোরাণট্‌ঠ কথা, প্রভৃতি বিবিধ অর্থকথা প্রচলিত ছিল। তৎসমুদয়ের সাহায্যেই বুদ্ধঘোষ তাঁহার নিজের অর্থকথাগুলি রচনা করিয়াছিলেন। মহাবংশের মতে, ত্রিপিটকের সহিত উহাদের অর্থকথাগুলি প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সঙ্গীতিতে আবৃত্তি করা হইয়াছিল। রাজা অশোকের পুত্র

আয়ুষ্মান্ মহেন্দ্রই তৎসমুদয়কে সিংহলী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। অর্থকথার প্রাচীনত্ব বিঘোষিত করিবার জন্যই কি মহাবংশের গ্রন্থকার এইরূপ কিংবদন্তীর অবতারণা করিয়াছেন কিংবা সত্যসত্যই অর্থকথা ও মূলগ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করা হইয়াছিল? বাস্তবিক এই প্রশ্নের মীমাংসা এখনও দুষ্কর। আমাদের ধারণা এই যে, ত্রিপিটক গ্রথিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিংবা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ও তৎ-পরবর্ত্তী কাল হইতে বৌদ্ধাচার্য্যগণের মুখে মুখে অর্থকথার ন্যায় কিছু প্রচলিত ছিল। নচেৎ ত্রিপিটকের অর্থ অনেক স্থলে দুরূহ বোধ হইত। অথবা ইহাও হইতে পারে যে, ত্রিপিটকের স্থানে স্থানে আমরা যে সকল নিদ্দেস দেখিতে পাই, তদনুসারেই পরবর্ত্তীকালে অর্থকথা সমূহ বিরচিত হইয়াছিল। যাহা হউক, অন্তত আমরা ইহা নির্ব্বিবাদে বলিতে পারি যে, বুদ্ধঘোষের বহুপূর্ব্বে অর্থকথা সমূহ প্রণীত হইয়াছিল।

পশ্চাল্লিখিত অর্থকথাগুলি বুদ্ধঘোষের রচিত বলিয়া পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন্। যথা—সমন্ত পাসাদিকা বিনয় পিটকের অর্থকথা, কঙ্খাবিতরণী পাতিমোক্খের অর্থকথা, অট্ঠসালিনী ধম্মসঙ্গণির, সম্মোহ বিনোদনী বিভঙ্গ পকরণের, ধাতুকথাপকরণ ট্ঠকথা, পুগ্গলপঞ্ঞত্তি পকরণট্ঠকথা, কথাবত্থুট্ঠ কথা, যমক পকরণট্ঠকথা, পট্ঠাণপকরণট্ঠকথা, সুমঙ্গলবিলাসিনী দীঘনিকায়ের অর্থকথা, পপঞ্চসূদনী মজ্ঝিম নিকায়ের অর্থকথা, সারত্থপকাসিনী সংযুক্ত নিকায়ের অর্থকথা, এবং পরমত্থজোতিকা খুদ্দকপাঠ ধম্মপদ সুত্তনিপাত ও জাতকের অর্থকথা।

ভদ্রতীর্থবাসী ধর্ম্মপাল স্থবির পরমত্থদীপনী নামে উদান, ইতিবুত্তক, বিমানবত্থু, পেতবত্থু, থেরগাথা, থেরীগাথা ও চরিয়া পিটকের অর্থকথা রচনা করিয়াছিলেন।

ত্রিপিটকের অন্তর্গত অবশিষ্ট চারিটী গ্রন্থেরও অর্থকথা বিদ্যমান আছে। যথা—উপসেন স্থবিরের কৃত সদ্ধম্মপজ্জোতিকা নিদ্দেসের অর্থকথা; মহানাম স্থবিরের কৃত সদ্ধম্মপকাসিনী পটি সম্ভিদা মগ্গে‌র অর্থকথা; বুদ্ধদত্ত স্থবিরের কৃত মধুরত্থপকাসিনী বুদ্ধবংশের অর্থকথা; এবং বিসুদ্ধজনবিলাসিনী অপদানের অর্থকথা। এই শেষোক্ত অর্থকথার গ্রন্থকারের নাম জানা যায় নাই।

অর্থকথার পালা প্রায় শেষ হইল। এক্ষণে আমরা টীকার পালা আরম্ভ করিব। অর্থকথাগুলির ভাষা স্থানে স্থানে সহজবোধ্য নহে বলিয়া পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ অর্থকথা সমূহের টীকাদি প্রণয়ন করেন। ত্রিপিটকের সর্ব্বশুদ্ধ

বারখানি টীকা গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে। যথা—সারত্থদীপনী, বিমতীবিনোদনী, ও বজিরবুদ্ধি টীকা-সমন্তপাসাদিকা নামিকা বিনয়ট্‌ঠ-কথার টীকা; বিনয়ত্থ মঞ্জুসা কঙ্খাবিতরণীর টীকা। প্রথম সারত্থমঞ্জুসা সুমঙ্গলবিলাসিনীর, দ্বিতীয় সারত্থমঞ্জুসা অপ্পত্থ সুদনীর, তৃতীয় সারত্থমঞ্জুসা সারত্থপ্পকাসিনীর ও চতুর্থ সারত্থমঞ্জুসা মনোরথপূরণীর টীকা। সেইরূপ মূলটীকা সপ্তপ্রকরণ অভিধর্ম্মের অর্থকথা সমূহের, প্রথম পরমত্থপকাসনী অত্থসালিনীর, দ্বিতীয় পরমত্থপকাসনী সম্মোহবিনোদনীর ও তৃতীয় পরমত্থপকাসনী অভিধর্ম্মের শেষ পাঁচখানি প্রকরণের অর্থকথা সমূহের টীকা।

পালিতে ব্যাকরণের সংখ্যাও কম নহে। কচ্চায়ন, কচ্চায়ন-বুত্তি, কচ্চায়ন-বণ্ণনা, মহারূপসিদ্ধি, বালাবতার, মোগ্‌গল্লান, চুলনীতি, পয়োগসিদ্ধি, আখ্যাতপাদ, ধাতুমঞ্জুসা, মহাসদ্দনীতি, মুখমত্তদীপনী পালি ব্যাকরণগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ব্যাকরণ সংজ্ঞার অন্তর্ভূত অন্যান্য গ্রন্থও দৃষ্ট হয়। যথা—অভিধম্মত্থসঙ্গহ ও উহার টীকা, অভিধম্মাবতার ও উহার টীকা।

অভিসম্বোধি অলঙ্কার নামে অলঙ্কার শাস্ত্র সম্বন্ধেও একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ আছে।

পালি কাব্যের মধ্যে জিনচরিত, জিনালঙ্কার, তেলকটাহগাথা, মালালঙ্কারবত্থু, সমন্তকুটবণ্ণনা ও অনাগতবংস বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দীন, নীতি, বিনয় প্রভৃতি বিষয়ক গ্রন্থেরও অভাব নাই। কিন্তু আমরা মনে করি যে, বংশ শ্রেণীর গ্রন্থগুলিই বৌদ্ধবচনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

বংশ শব্দের অর্থ Chronicle ইতিবৃত্ত, এক প্রকার ইতিহাস। বংশশ্রেণীর সাহিত্যের মধ্যে দীপবংস, মহাবংস, শাসনবংস, গন্ধবংস, দাঠাবংস, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলি বৌদ্ধ সংস্কৃতে অবদান নামে অভিহিত হইয়াছে। যথা—অবদানকল্পলতা, দিব্যাবদান, ইত্যাদি।

এতদ্ব্যতিরিক্ত পালিতে অভিধান শ্রেণীর গ্রন্থও দৃষ্ট হয়। যথা—অভিধানপ্প-দীপিকা ও অভিধানপ্পদীপিকা সূচি।

বৌদ্ধবচনের মধ্যে অপর দুইটী গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব। গ্রন্থ দুইটী জগৎপ্রসিদ্ধ। উহাদের নাম—বিসুদ্ধিমগ্‌গ ও মিলিন্দপঞ্‌হা। তন্মধ্যে বিসুদ্ধিমগ্‌গকে বলা যাইতে পারে Buddhist Encyclopadia এবং মিলিন্দ পঞ্‌হাকে বলা যাইতে পারে প্রাচীন ভারতের আদর্শ পৌরাণিক উপন্যাস (Historical Romance).

সাহিত্য, ২৫ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা।

সাঞ্চী।

সাঞ্চীতে ভারতের প্রধান বৌদ্ধস্তূপ বিরাজিত। এইটি সকল স্তূপের অপেক্ষা সুন্দর বলিয়া বিখ্যাত।

ভূপাল হইতে বেলা চারিটার ট্রেণে সাঞ্চীর স্তূপ দেখিতে যাত্রা করিলাম। দূরত্ব মোটে আটাশ মাইল। দেড় ঘণ্টায় রেল পৌছে। যদি ফিরিবার ট্রেণের সুবিধা থাকিত তাহা হইলে স্তূপ দেখিয়া অনায়াসে ভূপালে রাত্রি দশটার মধ্যে প্রত্যাগত হইয়া আহারাদি করিয়া শয়নে পদ্মলাভ করিতে পারা যাইত। কিন্তু সে সুবিধা নাই। আমার পক্ষে রাত্রি সাড়ে চারিটার ট্রেণে প্রত্যাগত হওয়াই সঙ্গত, তাহা হইলে ভূপালে ভোরে পৌছিতে পারা যায়। সাঞ্চীতে থাকিবার কোন সুবিধাজনক স্থান নাই, কেবল ভূপালের বেগমের নির্ম্মিত একটি ডাক বাঙ্গলা আছে—খাদ্যদ্রব্যের কোন ব্যবস্থা নাই—ক্ষুদ্র ষ্টেশন—কিছুই বিক্রয় হয় না, পুরী মিঠাই ত আশার অতীত; একটি পান-বিড়ি-সিগারেট-ওয়ালাও নাই।

কাজেই ভূপাল ষ্টেশনে কিঞ্চিৎ জলযোগ (মিষ্টান্ন পুরী ডালমুট জিলাপী) সমাপন করিয়া, রাত্রিতে অনাহারে সাঞ্চী ষ্টেশনে একখানি বেঞ্চে অলষ্টারের উপর মলিদা মুড়ি দিয়া শয়নের কল্পনা করিয়া—অপরাহ্ণ প্রায় চারিটার সময় জি, আই, পি, রেলে (পূর্ব্বে ইহা Indian Midland Railway নামে অভিহিত ছিল) ভূপালের উত্তরপূর্ব্ব সাঞ্চী অভিমুখে যাত্রা করিলাম। এই আটাশ মাইল পথের শোভা বড়ই মনোরম। ট্রেন উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল—কিছুক্ষণ পরেই পাহাড় আরম্ভ হইল—বড় পাহাড় নহে। ছোট ছোট উঁচু নীচু লম্বা চওড়া নানারকমের স্তূপ স্তূপ শৈলমালা ঘেরিয়া আসিতে লাগিল। এ সকল পাহাড়ে বড় বড় গাছ নাই—কিন্তু আবার অনাবৃতও নহে। শ্যামল গুল্মরাজিতে সমাচ্ছন্ন ছোট ছোট ঝোপঝাপে ঢাকা—গাঢ় সবুজ রং; মনে হইতে লাগিল যেন পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘখণ্ড আকাশ হইতে ভূতলে খসিয়া পড়িয়া পথের দু'ধারে স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে। দৃশ্য বড়ই চমৎকার—

বড়ই বাহার খুলিয়াছে—শ্যামায়িত তরঙ্গায়িত ধরিত্রীর নীল শোভায় চক্ষু জুড়াইয়া যহিতে লাগিল—এ স্থানটি যেন প্রকৃতির নিকুঞ্জকানন (Gnove of Nature)। দূরদূরান্তর শ্যামল পাদপরাজিতে সমাচ্ছন্ন। শ্যামল, হরিত, নীল শোভা চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত। ক্রমে অল্পে অল্পে সন্ধ্যার স্তিমিত ছায়া প্রসারিত হইতেছে—বিটপীশিরে দিনান্ত কিরণের স্বর্ণাভা কৃষ্ণ হরিতে মিশ্রিত হইয়া বিচিত্র মৃদু দীপ্তি ফুটাইতেছে—শীতের বেলা, দিন ছোট—অপরাহ্ন অন্ধকার ও আলোক মিশ্রিত! ট্রেন চলিতেছে; প্রায় দেড়ঘণ্টা পরে সহসা নেত্রপথে ও কি দৃশ্য প্রকটিত হইল! শৈলশৃঙ্গোপরি ও কি শোভা পাইতেছে! অপূর্ব্ব তোরণ-সমন্বিত সাঞ্চীর বৌদ্ধস্তূপ ওই গিরিশিখরে বিরাজিত! ঈষৎ অন্ধকার-মিশ্রিত আলোকে ট্রেন হইতে স্তূপের দৃশ্য বড়ই বিচিত্র-দর্শন!—স্তূপের দূর দৃশ্যে হৃদয়ে যেমন অননুভূত আনন্দের সঞ্চার হইল, সেই সঙ্গে সঙ্গে আবার বড় ভয়ও হইতে লাগিল।—স্তূপ ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধমাইলেরও কিঞ্চিৎ অধিক, তদুপরে আবার পাহাড়ের উপর অবস্থিত দেখিতেছি—যদি ঘোর সন্ধ্যা হইয়া যায় তাহা হইলে কি প্রকারে বনপথ অতিক্রম করিয়া পাহাড়ে উঠিব? আমি একাকী—আমার সঙ্গে বন্ধু বা ভৃত্য কেহই নাই—শুনিয়াছিলাম এ অঞ্চলে ব্যাঘ্র ও অন্য বন্য জন্তুরও ভয় আছে। জনমানবশূন্য বনপ্রান্তর—নিকটে কোন ক্ষুদ্র গ্রামও নাই; ষ্টেশন মাষ্টার যদি সাহায্য না করেন, সঙ্গে যদি কোন লোক অনুগ্রহ করিয়া না দেন, তাহা হইলেইত সকল আশা বৃথা হইল? এত ক্লেশ স্বীকার কি পণ্ড হইয়া যাইবে! যা করেন ঈশ্বর! পথিকের সহায় তিনি, এই ভাবিয়া নীরবে পাহাড়ের দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া চলিলাম—ক্রমে সাঞ্চী ষ্টেশনে ট্রেন আসিয়া পৌঁছিল।

ষ্টেশন্ প্ল্যাটফরমে অবতরণ করিয়া এদিক ওদিক চাহিতেছি, এমন সময় দেখি কোট প্যাণ্টুলন ও মস্তকে মলিদার টুপী পরিহিত একটি সৌম্য-দর্শন ভদ্রলোক যষ্টিহস্তে দাঁড়াইয়া আমার দিকে দেখিতেছেন। আমারও তাঁহার দিকে দৃষ্টি পতিত হইবামাত্র মনে কেমন একটা সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, ইনি আমাদের দেশীয় লোক হইবেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয়ের কি নাম? তিনি বলিলেন, 'শ্রীপাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায়।' মহাশয়ের নিবাস? 'বালি'। এ কথা শুনিবামাত্র আমার আপাদমস্তক হর্ষে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল—তখন আনন্দে আমার মনে যে কি ভাব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে লিখিয়া বুঝাইবার শক্তি আমার নাই। আমি

তাঁহাকে বলিলাম, মহাশয়, আমি সাঞ্চীস্তূপ দেখিতে আসিয়াছি। তিনি বলিলেন, "চলুন, আমি আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছি—অগ্রে আমার তাঁবুতে যাইয়া চা পান করিয়া লউন,"—পরে একটু ভাবিয়া বলিলেন, "না, অগ্রে দেখিয়া আসিয়া পরে চা পান করিবেন, কারণ সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে।" আমি বলিলাম—তা বেশ, স্তূপ দেখিতে পারা যাইবে ত? পাহাড়ের উপরে অবস্থিত দেখিতেছি। তিনি বলিলেন, "আমরা প্রথমে একটি সোজা পথ দিয়া পাহাড়ে উঠিব—বেশী বড় পাহাড় নয়—আমি লইয়া যাইতেছি চলুন।" এই বলিয়া তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া চলিতে লাগিলেন—ষ্টেশনের কিয়দ্দূরে কয়েকটি শুভ্র শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছে।—প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডাইরেক্টর জেনেরল নিজ কর্ম্মচারিগণের সহিত এই বিশাল স্তূপের সংস্কার কার্য্য পরিদর্শনে আসিয়াছেন—পাঁচকড়ি বাবু তাঁহার হেড ক্লার্ক।—আমরা চলিতে চলিতে ক্রমে শৈলের মূলদেশে উপস্থিত হইলাম। গিরি আরোহণ করিতে লাগিলাম—চলিতে চলিতে মধ্যে মধ্যে দুইজনে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। চড়াই কষ্টকর নহে—সরল ঈষৎ ঢালু পথ পাহাড়ের বৃক্ষবিটপের মধ্য দিয়া উপরে উঠিয়াছে—ক্রমে আমরা সেই জগদ্বিখ্যাত স্তূপের তোরণ সমীপে আসিয়া উপনীত হইলাম—দেখিলাম ডাইরেক্টর জেনেরল স্বয়ং স্তূপের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। পাঁচুবাবু বলিলেন, "সাহেব এখনও যায় নাই দেখ্‌ছি, আপনি ঐ দিকটা দেখিয়া আসুন—আমি এ দিকে অপেক্ষা করিতেছি—আপনি ঘুরিয়া আসিলে আপনাকে অন্যান্য অংশ দেখাইব।" আমি কর্ম্মজীবনের সাহেবভীতি বুঝি—তাঁহার ন্যায়সঙ্গত কথার অনুবর্ত্তী হইয়া স্তূপ দেখিতে গেলাম—তিনি ক্ষণকালের নিমিত্ত অন্তরালে অন্তর্হিত হইলেন।

প্রকাণ্ড গম্বুজের ন্যায় বিরাট্ স্তূপের চতুর্দ্দিক্ অপূর্ব্ব-সুন্দর প্রস্তর নির্ম্মিত রেলিংএ পরিবেষ্টিত। এরূপ রেলিং আর কোথাও দেখি নাই। রেলিংএর উচ্চতা ছয় ফুটেরও অধিক হইবে। যেন মোটা মোটা প্রস্তর জুড়িয়া এই অনিন্দ্য সুন্দর বৃত্তাকার পরিবেষ্টনী নির্ম্মিত হইয়াছে। চারিদিকে চারিটি অপূর্ব্ব শিল্পশোভাখচিত তোরণ; এরূপ তোরণ আর কোথাও নাই। চিত্র না থাকিলে কাহারও সাধ্য নাই যে লিখিয়া বর্ণনা করিয়া, ইহার গঠন ও শিল্পসৌন্দর্য্য বুঝাইতে পারে।—সচরাচর যেরূপ সমুচ্চ দ্বার বা খিলান-সমন্বিত তোরণ দৃষ্ট হয়, এই চারিটি তোরণের তাহাদের সহিত কোন সৌসাদৃশ্যই

নাই। চারিটি তোরণের গঠন প্রণালী একই প্রকার, তবে শিল্পচাতুর্য্য বিভিন্ন রকমের। প্রথমে সংক্ষেপে একটি তোরণের গঠন-প্রণালী বুঝাইতেছি, অপর তিনটির গঠনও সেইরূপ। দুইটি শিল্পশোভাখচিত চতুষ্কোণ স্তম্ভ ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে; শীর্ষদেশে তিনটি পাড়ের ন্যায় চতুষ্কোণ লম্বা প্রস্তর সমান্তরাল ভাবে পর পর সংলগ্ন হইয়া আছে। এই চতুষ্কোণ প্রস্তরগুলির সর্ব্বাঙ্গে বুদ্ধলীলাবিষয়ক ও জাতকের নানা চিত্রাবলী উৎকীর্ণ হইয়াছে। পূর্ব্ব তোরণের স্তম্ভদ্বারের উপরিভাগে হস্তিযূথ পৃষ্ঠোপরে পূর্ব্বোক্ত অপূর্ব্ব খিলান-সদৃশ শিল্পসম্ভার বহন করিতেছে। দক্ষিণ তোরণের স্তম্ভোপরি মর্কটাকার স্থূলোদর, ক্ষুদ্রপদ, স্ফীতগণ্ড, ও দৈত্যমুণ্ডাকৃতি মনুজগণ ক্ষুদ্র হস্তযুগ উত্তোলন করিয়া দীর্ঘশিল্পভার ধারণ করিতেছে। এতদ্ভিন্ন অপর তোরণদ্বয়ের শোভাও বিচিত্র গঠনের কৃশ-স্থূল আকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য্যে মনোহারী। বুদ্ধদেবের অগণ্যলীলার চিত্রের বর্ণনার স্থান নাই। সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ, পক্ষী, অপ্সর অপ্সরা, যক্ষ, রক্ষঃ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, লতা, ফুল, পাতা প্রভৃতি যে কত রকমের শিল্পচাতুর্য্য তোরণ চতুষ্টয়ে সমলঙ্কৃত, তাহা আর কি বর্ণনা করিব! কত প্রকারের শোভাযাত্রা চলিয়াছে—স্বর্গ হইতে দেবকন্যাগণ অবতরণ করিয়া বুদ্ধের নানাবিষয়িণী লীলা অবলোকন করিতেছেন, এইরূপ অসংখ্য চিত্রভূষিত শিল্পসৌন্দর্য্য দেখিয়া তোরণের নিম্ন দিয়া পরিবেষ্টনীর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলাম। বিশাল বৃত্তাকার বেদিকার উপর স্তূপ অবস্থিত। বেদিকার ব্যাস ১২০ ফিট। উচ্চতা চৌদ্দ ফিট এবং স্তূপের (বৃত্তাকার) চতুষ্পার্শ্বের বেদিকার প্রশস্ততা ৬ ফিট। স্তূপের ব্যাস ১০৬ ফিট, উচ্চতা ৪২ ফিট। ইহা ইষ্টকপ্রস্তরে গ্রথিত, দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ। কালের পীড়নে শৈবাল তৃণগুল্মে সমাচ্ছাদিত হইয়াছে—স্থানে স্থানে জীর্ণ ভগ্ন—কিন্তু সংস্কার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে—শীঘ্রই নবশ্রী ধারণ করিবে।

দুই তিনবার স্তূপরাজকে প্রদক্ষিণ করিয়া ইহার উত্তর পশ্চিম কোণে অপর আর একটি ছোট স্তূপ দেখিলাম। ইহার দশা অতিশয় শোচনীয়, সংস্কৃত হইতেছে। এই স্তূপটি দেখিয়া পর্ব্বতের একপার্শ্বে আসিয়া দেখি, পাঁচুবাবু আমার অপেক্ষায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া পর্ব্বতের দক্ষিণদিকের কিঞ্চিৎ নিম্নপ্রদেশে আরও একটি প্রস্তর বেষ্টনীবেষ্টিত স্তূপ দেখাইলেন—ইহার পরিবেষ্টনীর শিল্পসৌন্দর্য্যের যে কি বাহার তাহা আর কি বলিব! ইহাতেও নানা বৌদ্ধশিল্প অপূর্ব্ব নৈপুণ্যে উৎকীর্ণ হইয়াছে।

মুগ্ধ হইয়া দেখিতে লাগিলাম! শৈলচূড়ে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে—সে দিকে দৃক্‌পাত নাই—প্রফুল্লচিত্তে শিল্প-শোভাই দেখিতেছি। এমন সময় অপরিচিতের মাঝে চিরপরিচিত বন্ধু বলিলেন, "মহাশয়, সন্ধ্যা হইয়াছে, পাহাড় হইতে নামুন—এই দিকে পাহাড়ে অধিরোহণ ও অবরোহণ করিবার সোপান, স্বচ্ছন্দে অবতরণ করুন।" নামিতে নামিতে পূর্ব্বোক্ত স্তূপের কিয়দ্দূরে একটি প্রকাণ্ড পাথরের বাটি পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলাম। তাহার একপার্শ্ব আবার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—এর চেয়ে বড় পাথরের বাটি আগরা দুর্গে দেখিয়াছি। এইটি কিন্তু কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত।

এতদ্ব্যতীত নামিতে নামিতে আরও স্থানে স্থানে নানা বৌদ্ধকীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ ও নিদর্শন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দৃষ্ট হইতে লাগিল। পাহাড়ের উপর হইতে নিবিড় ঘনাচ্ছাদিত শৈলশ্রেণীর মনোমুগ্ধকর দৃশ্যাবলী নয়নপথে পতিত হইতে লাগিল। এ অঞ্চলের চতুর্দ্দিকে বৌদ্ধকীর্ত্তি রাজা অশোকের সময় নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই অঞ্চলের বহু বর্গ মাইল ভূভাগ ব্যাপিয়া অসংখ্য বৌদ্ধস্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সাঞ্চীর ৬ মাইল দূরে সোণারী গ্রামে ৮টি; সোণারীর ৩ মাইল দূরে সা-দারায় ১টি; সাঞ্চীর ৭ মাইল দূরে ভোজপুরে ৩৭টি; ও ভোজপুর হইতে পাঁচ মাইল দূরে ৩টি স্তূপ আছে অবগত হইলাম। কিন্তু এই সাঞ্চীর স্তূপই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা মনোহারী। সাঞ্চী হইতে ৬ মাইল দূরে ভুবনমোহিনী বিদিশালক্ষণার দিগন্তপ্রথিতা রাজনগরী সুদূর অতীতের ঘন ঘোর ভূকম্পনে ভূপ্রোথিতা হইয়া রহিয়াছে। পাহাড়ের উপর হইতে দৃশ্য মনোরম—দূরে বেত্রবতী রজত তরঙ্গে প্রবাহিতা। এই নগরী সৌন্দর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে, সম্পদে, প্রাসাদে, পণ্যবীথিকায়, হর্ম্ম্যমালায়, সরোবরে, উদ্যানে, রথ্যায় বৈজয়ন্তপুরীকেও পরাজিত করিয়াছিল। বৌদ্ধবিহার, মঠ, মন্দির, সৌধ, অলিন্দ, তোরণ, প্রাচীর, প্রস্তরা, স্তূপ, স্তম্ভ, চৈত্য, সঙ্ঘারাম, বেদিকা, গুহা, গুম্ফা, প্রভৃতির স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণা ছিল। এই স্থানে বেত্রবতী নদী প্রবাহিতা। কালিদাসের মেঘদূতের যক্ষ আষাঢ়ের প্রথম দিবসে উদিত মেঘকে অলকাভিমুখে প্রেরণ করিবার সময় এই স্থানের কীর্ত্তিকলাপ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া যাইতে কাতর অনুরোধ করিয়াছিল। এই স্থানের বর্ণনায় যক্ষ এইরূপ বলিয়াছিলেন—"দশার্ণের রাজধানী বিদিশা। উঁহার যশে ভুবন ভরিয়া আছে। তুমি তথায় বেত্রবতীর জল প্রচুর পরিমাণে পান করিবে। বেত্রবতী নদী, সুতরাং তোমার রসরঙ্গিণী; সে বিদিশার পাশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে; উঁহার

জল চলিতেছে, তরঙ্গে তরঙ্গে লাফাইতেছে, বোধ হইতেছে যেন কোন প্রৌঢ়া কামিনী মুখে ভ্রুভঙ্গী করিয়া তোমায় ডাকিতেছে। সুতরাং সে জল পানে তোমার মুখে চুম্বনের ফল হইবে।” তাহার পর মহাকবি কালিদাস যক্ষের মুখ দিয়া মদ্‌বর্ণিত স্থানের বর্ণনা করিয়া বলাইতেছেন, “সেখানে গিয়া তুমি নীচৈ (সাঞ্চি) নামে সহরতলীর পাহাড়ে বাসা লইও। তোমার স্পর্শে তাহার শরীর পুলকে পূরিত হইয়া উঠিবে। দেখিবে তাহার পুলক কদম্বফুলরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই পাহাড়টি কূর্ম্মপৃষ্ঠ, ৩০০।৪০০ ফুটের অধিক উচ্চ নহে। ইহা বৌদ্ধবিহার, বৌদ্ধস্তূপ ও বৌদ্ধসঙ্ঘারামে বিমণ্ডিত।”

সন্ধ্যা হইয়াছে—স্বচ্ছ অন্ধকার কাননতলে লুকোচুরি খেলা খেলিতেছে। আমি কবিত্বপূর্ণ প্রদেশে কবিত্বময়ী শোভা উপভোগ করিতে করিতে বন্ধু সঙ্গে নামিয়া আসিয়া তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হইলাম।

তাঁবুতে আসিয়াই চা’র ব্যবস্থা হইল। শুধু কি চা! তাঁহার আফিসের আর একটি বাবু কাশী হইতে উৎকৃষ্ট কাঁচাগোল্লা, লাড্ডু, খাজা প্রভৃতি অতি উপাদেয় মিষ্টান্ন আনিয়াছিলেন, তাহা চা’র সঙ্গে দুই তিনটি প্রদত্ত হইল। রাত্রে রুটী তরকারী দুগ্ধ ও আবার সেই অমৃতোপম উপাদেয় মিষ্টান্ন প্রভৃতি আহার। আমি তাঁবুতে ঘণ্টা দুই তিন বিশ্রাম করিবার পর, একটি লোকের হস্তে হরিকেন ল্যাম্প দিয়া পাঁচু বাবু আমাকে ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিলেন। ষ্টেশন মাষ্টার দুই খানি বেঞ্চ জুড়িয়া শয্যা রচনা করিয়া ঘুমাইতেছিলেন, বিদেশী অতিথি সমাগত দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ সেই শয্যা অধমকে প্রদান করিয়া, নিজে ভূতলে শয়ন করিলেন। আমি স্বীকৃত না হইলেও তিনি কিছুতেই ছাড়িলেন না। এই অতিথিবৎসল প্রবাসিগণের আতিথেয়তা দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া গেলাম। কি ভাবিয়া আসিতেছিলাম, আর এখানে বিধাতার ইচ্ছায় কি ঘটিল! জনপ্রাণীহীন অরণ্যপ্রান্তর সুখালয়ে পরিণত হইল! অতি ভোরে যখন চারিদিক অরুণের রক্তরাগে রঞ্জিত হয় নাই, তখনও নিবিড় অন্ধকার অরণ্যে খেলিতেছিল। আমিও অলষ্টারের উপর মলিদা মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছিলাম। ঘোর শীত, কন্‌কনে ঠাণ্ডা, জল জমিয়া বরফে পরিণত হইবার উপক্রম। কাক কোকিল বিহঙ্গ কুক্কুট কাহারও সাড়া নাই। এই ভোরে আমি রেলের শব্দে জাগিয়া উঠিলাম। গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল, আমিও বিদায় গ্রহণ করিলাম। প্রবাসে অনেক সুখস্মৃতির মধ্যে এটিও আমার চিত্তে চিত্রের ন্যায় প্রতিফলিত থাকিবে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

সাহিত্য, ২৫ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা।

পর্য্যায় রত্নমালা। *

চিকিৎসা বিজ্ঞানে পারদর্শী হইতে হইলে নিদানাঙ্গে শারীর তত্ত্বের ন্যায় চিকিৎসাঙ্গে দ্রব্য পরিচয় তুল্য ভাবেই শিক্ষা করিতে হয়। দ্রব্যের সাধারণ পরিচয় প্রথমে সংজ্ঞা বা পর্য্যায় দ্বারাই পাওয়া যাইতে পারে, বিশেষ পরিচয় আকারাদির বর্ণনা দ্বারা অবগত হওয়া যায়। সুতরাং ভৈষজ্য-তত্ত্বানুশীলনে প্রথমতঃ পর্য্যায় জ্ঞান বিশেষ আবশ্যক।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের শল্য শলাকাদি অঙ্গের চর্চ্চা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। এক্ষণে অধিকাংশ বৈদ্য মহোদয়গণ একমাত্র ভেষজের আশু ও নির্ব্বাধ কার্য্যকারিতার গুণে আয়ুর্ব্বেদের গৌরব রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আজকাল ভৈষজ্য-তত্ত্বানুশীলনও ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইতে চলিয়াছে। এখন আর দ্রব্যের পরিচয় গ্রহণে তেমন আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিয়দ্দিবস পূর্ব্বেও আয়ুর্ব্বেদের অধ্যয়নার্থীদিগকে যত্নপূর্ব্বক অমরকোষ, বিশেষতঃ তাহার বনৌষধিবর্গ এক প্রকার অনর্গল কণ্ঠস্থ রাখিতে হইত, এবং বনে বনে দ্রব্যাহরণের দ্বারা দ্রব্য পরিচয় ও হাতে কলমে খল ধরিয়া ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিতে হইত। কিন্তু এখন অধ্যাপক ও ছাত্রবর্গ তাদৃশ অসভ্যতা প্রকাশ করিতে অসম্মত হইয়া উঠিতেছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা বিভাগের অনুকরণে অমরকোষ পাঠ্য তালিকা হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। সুলভ "শব্দকল্পদ্রুম" বা "বৈদ্যক শব্দসিন্ধু" তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে, এবং তাহার সাহায্যেই এক একটা অদ্ভুত সিদ্ধান্ত বাহির হইয়া যাইতেছে।

এই দুর্দ্দশা লক্ষ্য করিয়া "বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি" পুরাতন আয়ুর্ব্বেদের গ্রন্থানুসন্ধান ও সংস্কার সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া দ্রব্যতত্ত্ব-শিক্ষার্থিগণের সুবিধার জন্য প্রাচীন "পর্য্যায় রত্নমালা" নামক দ্রব্যাভিধান খানি মুদ্রিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

তজ্জন্য যে কয়েকখানি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হইয়াছে তাহার সাহায্যে বিশুদ্ধ পাঠ নির্ণীত হইতেছে। তদুল্লিখিত দ্রব্যাদির পরিচয় ও সন্দিগ্ধ বিষয়ঃ

* উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের ৮ম অধিবেশনে পঠিত।

গুলির মীমাংসাসূচক উপযুক্ত চিত্রাদির সহ এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে, আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপক ও অধ্যয়নার্থীদিগের বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়াই বোধ হয়। প্রাচীনকালে এই গ্রন্থখানির বিশেষভাবে পঠন পাঠন প্রচলিত ছিল। চক্রদত্তের টীকাকার শিবদাস সেন মহাশয় ও তাঁহার তত্ত্বচন্দ্রিকা টীকার নানা স্থানে এই গ্রন্থের মত উদ্ধৃত করিয়া আমাদের এই মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। (১)

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিতে এ পর্য্যন্ত এই গ্রন্থের যে ৪ খানি হস্তলিখিত পুথি সংগৃহীত হইয়াছে তাহা একই স্থান হইতে সংগৃহীত হওয়ায় ইহার প্রচুর প্রচলনের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। আজ কাল অনেকেই অমরকোষের বনৌষধিবর্গ ব্যতীত আয়ুর্ব্বেদাধ্যায়ীদিগের উৎকৃষ্ট সহায়ক আর কোন অভিধানের সত্তা অবগত নহেন। "পর্য্যায় রত্নমালা"র আদ্যোপান্ত আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, এই গ্রন্থ অমরকোষ অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী। ইহাতে প্রায় পাঁচ শত শব্দের পর্য্যায় উল্লিখিত হইয়াছে। অমরকোষের বনৌষধিবর্গে ২১৭টী পর্য্যায়ের অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার অন্যান্য বর্গে আয়ুর্ব্বেদে ব্যবহৃত পদার্থের পর্য্যায় বিক্ষিপ্ত ভাবে বিন্যস্ত থাকিলেও, কষ্ট কল্পনা করিয়া তাহার উদ্ধার করা অপেক্ষা রত্নমালা অধ্যয়ন করাই অধিক সুবিধাজনক বলিয়া স্বীকৃত হইবে। দুই এক স্থানে রত্নমালা দ্বারা অধিক সাহায্য পাইবারও সম্ভাবনা আছে।

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি এই গ্রন্থের যে কয়খানি পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে একখানি ১৬৪১ শকে অর্থাৎ ১৭১৯ খৃঃ লিখিত। এই গ্রন্থখানি অনেকটা সংশুদ্ধ। অন্য কয়খানিতে লিপিকরের কোন সময়ের উল্লেখ নাই, তবে তাহা পরবর্ত্তী কালের বলিয়াই বোধ হয়। প্রতি গ্রন্থেই প্রায় প্রতি পর্য্যায়ের শেষে উক্ত দ্রব্যের দেশজ নাম সন্নিবিষ্ট থাকায় সন্দিগ্ধ দ্রব্য গুলির মীমাংসা হইবার বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। পুথি কয়খানিতে সামান্য পাঠের তারতম্য থাকিলেও মূল বস্তু ও দেশজ নাম প্রায়ই এক প্রকার। গ্রন্থের মূল তিন ভাগে বিভক্ত। কতগুলি পর্য্যায় পূর্ণ শ্লোকে, কতগুলি অর্দ্ধ শ্লোকে এবং কতগুলি পাদ শ্লোকে লিখিত। গ্রন্থারম্ভে সেই ভাবেই লিখিবার জন্য গ্রন্থকার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন :—

"তেষ নামানি বক্ষ্যামি শ্লোকেনার্দ্ধেন পাদতঃ।"

এই গ্রন্থের রচয়িতা কে, তদ্বিষয়ে সংশয়ের অভাব নাই। "বৈদ্যক শব্দ-

(১) চক্রদত্ত ১১৬, ৩৭৬, ৪০৬ পৃঃ।

সিন্ধু"কার কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব পুস্তকালয়াধ্যক্ষ ৺উমেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় এই গ্রন্থের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে তিনি গ্রন্থকর্ত্তার নাম বলিতে পারেন নাই। "কোনও বঙ্গীয় গ্রন্থকার কর্ত্তৃক রচিত" এই মাত্র বলিয়াছেন। সম্ভবতঃ প্রতি পর্য্যায়ের শেষে বঙ্গ ভাষা প্রচলিত নাম থাকায় এই প্রকার অনুমান করিয়াছিলেন। প্রফেসর উইলসন গ্রন্থকারকে জৈন বলিয়া সন্দেহ করেন; তবে তিনি কোন্ প্রমাণে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা আমরা অবগত হইতে পারি নাই।

সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সম্পাদক কবিরাজ শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়, ১৩২০ সালের প্রথম সংখ্যা সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় এই গ্রন্থের বিবরণ প্রসঙ্গে "প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা ও শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদ নরহরি দাস ঠাকুরের পিতা রাজবৈদ্য শ্রীনারায়ণান্তরঙ্গ"কে ইহার গ্রন্থকার নির্ণয় করিয়া এক নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। পরিষদে রক্ষিত একখানা প্রাচীন পুথিতে এই গ্রন্থকারের নাম পাইয়াছেন। ঐ পুথির যে প্রকার বিবরণ দিয়াছেন ও যে সকল প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত হইল :—

"রত্নমালাধ্যায়ঃ * * * পুথির প্রথম পত্র নাই। * * * লিপি সুখ-পাঠ্য সুন্দর ও বিশুদ্ধ। (?) একটী কারণে এই পুথিখানা বড়ই মূল্যবান। এ পর্য্যন্ত আমি যত খানা হস্তলিখিত ও মুদ্রিত রত্নমালা দেখিয়াছি তাহাতে কোথাও গ্রন্থকারের নাম পাই নাই। * * * * এই পুথি খানার সমাপ্তিতে গ্রন্থকারের নামের উল্লেখ আছে। * * * এই গ্রন্থের লেখক জাম্‌ভা নিবাসী রামজী সেন। ১৭২১ শকাব্দে গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার রাজবৈদ্য শ্রীনারায়ণান্তরঙ্গ। ইনি বীজীপন্থ দাসের অনন্তর বংশীয়। ইনি প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা ও শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদ নরহরি দাস ঠাকুরের পিতা। * * * * একটী সংস্কৃত বন্দনায় জানা যায় নরহরির বর্ণ বিশুদ্ধ গৌর ও তাহার পিতার নাম নারায়ণ ছিল। নরহরি সরকার ১৫৪০ অব্দে গুপ্ত হন। * * * * রাজবৈদ্য অন্তরঙ্গ নারায়ণের একখানা কুলজী গ্রন্থও ছিল। ভরত মল্লিক চন্দ্রপ্রভায় স্থানে স্থানে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা এই গ্রন্থের নাম পাইলাম রত্নমালাধ্যায়ঃ। আমাদের বোধ হয় ইহা কোনও বিরাট গ্রন্থের অধ্যায় মাত্র। গ্রন্থ সমাপ্তি পাঠ করিয়া আমাদের এরূপ ধারণা হইয়াছে। সে যাহা হউক এইগ্রন্থ ১৫৫০

থৃঃ অব্দের পূর্ব্বে রচিত, তাহা বুঝিতে পারা যায়। সমাপ্তি—ইতি চিকিৎসাকে (?) মুতাং (?) রাজং (?) বৈদ্য শ্রীনারায়ণান্তরঙ্গ বিরচিতায়াং (?) রত্নমালাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।”

আমরা এতাবৎ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বুঝিতে পারি নাই শাস্ত্রী মহাশয় কোন্ প্রমাণ বলে নরহরি ঠাকুরের পিতাকে এই গ্রন্থের কর্ত্তা নির্ণয় করিলেন। নরহরি ঠাকুরের পিতার নাম নারায়ণ হইতে পারে বটে, কিন্তু তাঁহার এই গ্রন্থকর্ত্তৃত্বে কোন প্রমাণই শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে অবগত হইতে পারি নাই। গ্রন্থে যে সমাপ্তি বাক্য উল্লিখিত হইয়াছে তাহার অর্থ বোধ হইতে পারে বলিয়া আমাদের ধারণা নাই। শাস্ত্রী মহাশয় গ্রন্থ খানি বিশুদ্ধ বলিয়াছেন, কিন্তু ঐ বাক্য সংস্কৃত হইলে তাহা কখনই বিশুদ্ধ হইতে পারে না। তবে অসংস্কৃত বাক্য মধ্যে “বৈদ্যশ্রীনারায়ণান্তরঙ্গ” বলিয়া একটি নাম পাওয়া যায়, যদি তাহা গ্রন্থ কর্ত্তার নাম হয়, তবে নরহরি ঠাকুরের পিতা না হইয়া অন্য কাহারও পিতা হইতে পারেন। শাস্ত্রী মহাশয় একটি সংস্কৃত বন্দনায় জানিয়াছেন যে নরহরি ঠাকুরের পিতার নাম নারায়ণ ছিল, সুতরাং উক্ত নারায়ণকেই গ্রন্থধৃত নারায়ণান্তরঙ্গ স্থির করিয়াছেন। ইহাকে যথেষ্ট প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। উক্ত বন্দনাও উদ্ধৃত হয় নাই। তাহাতে নরহরির পিতা নারায়ণ নামে থাকিলেও তিনি চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন কি না ও তাঁহার অন্তরঙ্গ উপাধি ছিল কি না তাহার কোন প্রমাণই সেন শাস্ত্রী মহাশয় প্রদর্শন করেন নাই; পক্ষান্তরে আমরা উক্ত মতের বিরুদ্ধে প্রবল প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। উক্ত নারায়ণ শ্রীচৈতন্য দেবের কিছুদিন পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু এই রত্নমালার বচন তৎপূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকারগণ স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। চক্রদত্ত সংগ্রহের টীকাকার শিবদাস সেন আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে তাঁহার পিতা গৌড়পতি বর্ব্বাক সাহার নিবাস হইতে ছত্র ও দুষ্প্রাপ্য অন্তরঙ্গ উপাধি পাইয়াছিলেন *। ঐ বর্ব্বাক সাহা শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং শিবদাস সেনও যে পূর্ব্ববর্ত্তী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

যোন্তরঙ্গপদবীং দুরাবাপাং ছত্রমপ্যতুলকীর্ত্তি রবাপ।
গৌড়ভূমিপতিবর্ব্বাক্‌সাহাত্তৎ সুতস্য কৃতিনঃ কৃতিরেষা। দ্রং গুং টীঃ

যদিও বর্ত্তমান মুদ্রিত পুস্তকে ‘গৌড়ভূমিপতি রর্ব্বাক্ সাহাৎ’ এই পাঠ দেখা যায়, কিন্তু তাহা যে লিপিকর-প্রমাদ তাহা আর চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতে হইবে না। প্রাচীন বঙ্গীয় লিপির-বিন্দুবিশিষ্ট ‘ব’ পাঠের ভুলে ‘বর্ব্বাক্’ স্থানে ‘রর্ব্বাক্’ হইয়াছে।

আরও গ্রন্থ রচিত হইবামাত্র তাহা কিছুদিন বিবুধমণ্ডলীর দ্বারা অধীত ও অধ্যাপিত হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ না করিলে অন্য গ্রন্থকার কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হয় না, অতএব এই রত্নমালা যে শিবদাস সেনেরও বহু পূর্ব্ববর্ত্তী ইহা প্রত্যেক বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন। তিনি তাঁহার চক্রদত্ত টীকায় অনেক স্থানে প্রমাণ স্বরূপ এই পুঁথির বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।* শিবদাস গ্রন্থের নাম রত্নকোষ বলিয়াছেন। আমরা বিভিন্ন কয়েকটি স্থান হইতে উদ্ধৃত কয়েকটী পর্য্যায়ই যথাবৎ বর্ত্তমান রত্নমালায় দেখিতে পাইতেছি; অতএব শিবদাস-কথিত রত্নকোষই যে পর্য্যায় রত্নমালা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এমত স্থলে সেন শাস্ত্রী মহাশয় কথিত অর্ব্বাচীন নরহরি ঠাকুরের পিতা ইহার গ্রন্থকার হইতে পারেন না।

আমরা চিকিৎসক সমাজে একজন প্রসিদ্ধ রাজবৈদ্য নারায়ণ দেখিতে পাই। চক্রপাণি স্বীয় পরিচয় প্রসঙ্গে প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি গৌড় নরপতির অমাত্য চক্রের অন্যতম মহানসাধ্যক্ষ নারায়ণের পুত্র ও অন্তরঙ্গ উপাধিধারী ভানুর অনুজ ছিলেন। † শিবদাস সেন বলেন এই গৌড় পতি নরপালদেব (১০৩৩ খৃঃ) নারায়ণ রাজবৈদ্য ছিলেন এবং তাঁহার পুত্রের অন্তরঙ্গ উপাধি ছিল, সুতরাং তাঁহার অন্তরঙ্গ উপাধি থাকা অসমীচীন নহে; বরং নরহরির পিতা অপেক্ষা তাদৃশ প্রবল পরাক্রান্ত বঙ্গের স্বাধীন নৃপতির পারিবারিক চিকিৎসকেরই অন্তরঙ্গ উপাধি পাওয়া সমীচীন বলিয়া প্রতিভাত হয়। এই নারায়ণ শিবদাস সেনের বহু পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার গ্রন্থ বহু পরে বর্ব্বাক্ সাহার আমলে প্রথিত হওয়াই স্বাভাবিক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথির সমাপ্তি বাক্যের প্রতি আস্থা স্থাপন করিতে হইলে সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের চক্রপাণির পিতাকেই গ্রন্থকার নির্ণয় করা উচিত ছিল।

* শক্রঃ—কুটজঃ উক্তং হি রত্নকোষে। "বৃক্ষকঃ শক্রপর্য্যায়োবৎসকো গিরিমল্লিক." ইত্যাদি ১১৬ পৃঃ; তথাচ রত্নকোষঃ "শীতলী শীত কুম্ভীচ শুক্লপুষ্পা জলোদ্ভবা" ইত্যাদি ৩১৬ পৃঃ, উক্তং হি রত্নকোষে "গ্রন্থিকং পিপ্পলীমূলং ষড়্গ্রন্থিচটিকা শিরঃ" ইতি ৪০৬ পৃঃ। দেবেন্দ্রনাথ সেন প্রথম সংস্করণ।

† গৌড়াধিনাথ রসবত্যধিকারি পাত্র
শ্রীনারায়ণস্য তনয়ঃ সুনয়োঽন্তরঙ্গাৎ।
ভানো রনুপ্রথিত লোধ্রবলী কুলীনঃ
শ্রীচক্রপাণি রিহ কর্ত্তৃপদাধিকারী।

সাহিত্য পরিষদের পুথি ব্যতীত এ পর্য্যন্ত যত খানা পুথি পাওয়া গিয়াছে তাহার কোন খানেই গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায় নাই। প্রাচীন কালে প্রতি গ্রন্থ শেষে গ্রন্থকারের পরিচয় না থাকিলেও তাঁহার নাম থাকিবার রীতি সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এ গ্রন্থে রীতি লঙ্ঘনের বিশেষ কোন হেতু ছিল সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আমরা ঐ পুথিতে নাম না পাইলেও তৎসমসাময়িক গ্রন্থান্তরে রত্নমালার গ্রন্থকারের নির্দ্দেশ পাইয়াছি। এই রত্নমালাকে উপজীব্য করিয়া রচিত পর্য্যায়মুক্তাবলী নামক একখানা প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যগুণাভিধান দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার নিবদ্ধ শ্লোকে মুক্তাবলীকার বলেন যে—

পূর্ব্বে ভিষক্ মাধবকর আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকর হইতে যে রত্নময়ী মালা সংগ্রহ করিয়া গ্রথিত করেন তাহা তাদৃশ শোভাশালিনী না হওয়ায় আমি অন্য ভাবে গ্রথিত করিলাম। * এই মুক্তাবলীতে দ্রব্যের নাম ও গুণ লিখিত হইয়াছে। যে যে দ্রব্যের পর্য্যায় লিখিত হইয়াছে তাহা সর্ব্বাংশে রত্নমালার অনুরূপ, সুতরাং মুক্তাবলীকার-কথিত রত্নময়ী মালা যে পর্য্যায়রত্নমালা তাহা নিঃসন্দেহ। তাঁহার মতানুসারে রত্নমালাকে মাধবকরের রচিত গ্রন্থ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে।

এই সিদ্ধান্তের পরিপন্থী একমাত্র রামজী সেনের একশত বৎসর পূর্ব্বের লিখিত "ইতি চিকিৎসাকে" ইত্যাদি বচন। সেন শাস্ত্রী মহাশয় রামজী সেনের পুথিকে বিশুদ্ধ বলিয়া প্রশংসাপত্র দিলেও আমরা আলোচনা করিয়া দেখিলাম গ্রন্থলেখকের ভাষাজ্ঞান মোটেই ছিল না। লেখকের "শোক" শব্দের পর্য্যায় বড়ই কৌতুকাবহ বলিয়া এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"শ্লোকার্দ্ধে ভাষিতঃ পূর্ব্বং শ্লোক পাদৈরতঃ পরং।" "শোক"—

সমস্ত পুস্তকে অনুস্বার বিসর্গের স্থানে অপ্রয়োগ ও অস্থানে অপপ্রয়োগ ভূরি ভূরি দেখা যায়। এমত স্থলে এরূপ অনুমান অযৌক্তিক নহে যে, রামজী সেন যে গ্রন্থ দেখিয়া নকল করিয়াছিলেন তাহার পূর্ব্ব লেখকের নাম হয় ত শুদ্ধ ভাষায় কিছু লেখা ছিল, তাহা লিখিতে যাইয়া ভাষার অজ্ঞতা বশতঃ একটি অদ্ভুত ভাষার সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছেন।

সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত রামজী সেন লিখিত এক খানা রুগ্বিনিশ্চয় দেখিয়া

* পূর্ব্বং লোকহিতায় মাধব করাজ্ঞিভ্যো ভিষক্ কেবলং কোষান্বেষণতৎপরঃ প্রবিতত্যায়ুর্ব্বেদরত্নাকরাৎ। মালাং রত্নময়ীং চকার স যথা নাভূৎন শোভাধিকা সাম্যাক্তিঃ কমনীয়ভক্তিরচনা যানান্যথা গ্রথ্যতে। পর্য্যায়মুক্তাবলী ১ পৃঃ।

আমাদের এই ধারণা বলবতী হইয়াছে। ঐ পুথি খানিতে পূর্ব্ব লেখকের নাম যে প্রকার লিখিত ছিল তাহা অবিকল্প উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"চন্দ্রবাণ তিথৌশাকে স্বকীয়ো লিখিতো ময়া।
ভিষক্ শ্রীরামচন্দ্রেণ রুগ্বিনিশ্চয়সংগ্রহঃ।"

ভাগ্যে এই গ্রন্থের রচয়িতা চিরপ্রসিদ্ধ প্রাচীন, নতুবা রামজী সেনের ঐ বাক্যবলে অনেকে রামচন্দ্র ভিষক্ ১৫৫১ শাকে নিদান রচনা করিয়াছেন অনুমান করিতেন। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিতে এক খানি পুথি আছে তাহার সমাপ্তি বাক্য এইরূপ :—

"ভবানীং প্রণত্যাসুরত্রাসনীং বৈ
চতুর্থ্যাং গুরোর্ব্বাসরে রত্নমালাং।
মৃগাঙ্কাঙ্গ বেদেন্দু শাকে প্রযত্না
দ্বিজো রামকান্তঃ সমাপূরি রাধে।"

এই গ্রন্থ পরবর্ত্তী রামজী সেনের মত লেখকের দ্বারা উক্ত সমাপ্তি বাক্য সহ পুনর্লিখিত হইলে অনেকেই দ্বিজ রামকান্তের বংশাবলী অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেন।

পর্য্যায় রত্নমালার প্রতি পুথিতেই "ইতি চিকিৎসাঙ্গে রত্নমালাধ্যায়ঃ" এই মাত্রই সমাপ্তি বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ মাধবকরকে ইহার গ্রন্থকার নির্ণয় করিলে এই "অধ্যায়" বাক্যের তাৎপর্য্য ও সমস্ত গ্রন্থে গ্রন্থকারের নাম না থাকায় হেতু উদ্ঘাটিত হয়। মাধব নিদানের প্রথমে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে তিনি অল্পমেধস্ক চিকিৎসকগণের প্রতি কৃপাবশতঃ দুরবগাহ চিকিৎসা সংহিতা হইতে এই সংগ্রহ গ্রন্থ প্রথমে নির্ম্মাণ করিলেন। এক মাত্র ব্যাধিনিদান (Pathology) জ্ঞাপক গ্রন্থ দ্বারা তাঁহার এই উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না। সংহিতা দেখিয়া রোগ বিনিশ্চয় যত কঠিন চিকিৎসা ততোধিক কঠিন, সুতরাং সুগম উপায় করিতে হইলে নিদানের ন্যায় চিকিৎসা গ্রন্থ ও আনুসঙ্গিক দ্রব্যের পর্য্যায় ও গুণসংগ্রহ গ্রন্থও প্রণয়ন না করিলে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। পণ্ডিতবর মাধব যে অবহেলা বশতঃ কেবল নিদান গ্রন্থ লিখিয়াই অবসর গ্রহণ করিয়াছেন তাহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। তিনি চিকিৎসাঙ্গে একখানি বিরাট্ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, যাহার আদি রুগ্বিনিশ্চয়, পরে চিকিৎসা, দ্রব্যকোষ ও দ্রব্যগুণ লিখিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

কেহ কেহ বলেন তৎকালে চক্রপাণির চিকিৎসা সংগ্রহ বর্ত্তমান থাকায় মাধবের চিকিৎসা গ্রন্থ লিখিবার আবশ্যক হয় নাই। তাঁহাদের এই বাক্য অযৌক্তিক। চক্রপাণি তাঁহার সংগ্রহ গ্রন্থ সিদ্ধযোগ নামক চিকিৎসা সংগ্রহ গ্রন্থ দেখিয়া তাহারই ক্রম অনুসারে ও তাহারই সমস্ত সিদ্ধফল যোগ লইয়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন। * এই বৃন্দকণ্ঠ প্রণীত সিদ্ধযোগ মাধবের রুগ্বিনিশ্চয়ের ক্রমে রচিত হইয়াছে। † এতাবৎ প্রমাণ দেখিয়া সম্ভবতঃ আর কেহই মাধবকে চক্রপাণির অর্ব্বাচীন বলিতে সাহসী হইবেন না। বর্ত্তমান মাধবের কোন চিকিৎসা গ্রন্থ না পাইলেও শ্রীমাধবের শ্লোকে লিখিত লঙ্ঘন শব্দের ভেদ নির্দ্দেশ ও অঞ্জন ব্যবস্থা সিদ্ধযোগের টীকায় উল্লিখিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। ‡ সেই সব পরিভাষা মাধব প্রণীত নিদান বা অভিধান গ্রন্থে নাই এবং থাকিতেও পারে না। তাহা চিকিৎসা গ্রন্থে থাকাই স্বাভাবিক। এতাবতা মাধবের এক খানা চিকিৎসা গ্রন্থ ছিল এরূপ অনুমান অযৌক্তিক নহে। মাধবের একখানা দ্রব্যগুণও ছিল তাহার প্রমাণ আমরা চক্রদত্ত সংগ্রহের টীকায় পাইয়াছি। ¶ পর্য্যায় রত্নমালা যে মাধবেরই রচিত গ্রন্থ মুক্তাবলীকার তাহা বলিতেছেন। এমত অবস্থায় আমাদের এরূপ অনুমান অযৌক্তিক নহে যে মাধব তদানীন্তন সুধীবর্গের আকাঙ্ক্ষায় চিকিৎসাঙ্গে একখানি বিরাট্ সংগ্রহ গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, যাহার নিদানাধ্যায় ও কোষাধ্যায় মাত্রই বর্ত্তমানে পাওয়া যাইতেছে এবং চিকিৎসাধ্যায় ও দ্রব্যগুণাধ্যায়ের সত্তা অবগত হওয়া যাইতেছে। সমগ্র গ্রন্থের শেষেই গ্রন্থকারের পরিচয় থাকা কর্ত্তব্য কোন অংশ বিশেষের শেষে থাকিতে পারে না। সেই জন্যই মাধব নিদান ও রত্নমালার শেষে গ্রন্থকারের

যঃ সিদ্ধযোগলিখিতাধিক সিদ্ধযোগানত্রৈব নিক্ষিপতি কেবল মুদ্ধরেখা।
ভট্টত্রয়ত্রিপথ বেদবিদাজনেন দত্তঃ পতেৎ সপদিমূর্দ্ধনি তস্যশাপঃ।

নানামতপ্রথিতদৃষ্টফল প্রয়োগৈঃ
প্রস্তাববাক্যসহিতৈরিহ সিদ্ধযোগঃ।
বৃন্দেন মন্দমতিনাত্মহিতার্থিনায়ং
সংলিখ্যতে গদবিনিশ্চয়তত্ক্রমেন।

সিংযোং ২ পৃঃ অত্র শ্রীকণ্ঠদত্তঃ—গদবিনিশ্চয়তত্ক্রমেণেতি—রুগ্বিনিশ্চয়াখ্য নিদান-সংগ্রহোক্তা-ধ্যায়পরিপাট্যা।

‡ সিদ্ধযোগ ৯ ও ৪৫১ পৃঃ।

¶ চক্রদত্ত (দেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রথম সংস্করণ) ১২৮ পৃঃ।

পরিচয়মূলক কোন সমাপ্তি বাক্য দেখা যাইতেছে না।* প্রফেসর হর্নলে মহোদয়ও এই সমস্ত হেতুবাদের সমর্থন করিয়া "সিদ্ধযোগ"কে মাধবের চিকিৎসাগ্রন্থ বলেন † এবং নিদান ও সিদ্ধযোগ এই উভয় গ্রন্থের গ্রন্থকারের নাম বৃন্দ সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত কতদূর যাতসহ তাহা বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

এই মাধবকর কতদিন পূর্ব্বে আমাদের দেশের কোন প্রদেশকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন তাহা নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা কঠিন। বর্ত্তমান মুদ্রিত নিদানে যে প্রক্ষিপ্ত শ্লোকটী দেখিতে পাওয়া যায় তাহা দ্বারা তিনি ইন্দুকর বা ইন্দ্রকরের পুত্র ছিলেন, এতদরিক্ত কিছুই জানিতে পারা যায় না। বর্ত্তমান কালে আয়ুর্ব্বেদের যে সমস্ত গ্রন্থ পাওয়া যায় তাহার গ্রন্থকারদের মধ্যে শিবদাস সেন (পঞ্চদশ শতাব্দী) ও ডহ্বন (দ্বাদশ শতাব্দী) তাঁহাদের গ্রন্থে মাধবের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের অপেক্ষা প্রাচীন চক্রপাণি (১০৫০ খৃঃ) মাধবের নিদানের অনুক্রমে রচিত সিদ্ধযোগ নামক সংগ্রহকে উপজীব্য করিয়া চিকিৎসা সংগ্রহ রচনা করিয়াছেন। চক্রপাণির গ্রন্থ রচনা কালীন 'সিদ্ধযোগ' ও তাহার রচনা কালে 'রুগ্বিনিশ্চয়' বিশেষ প্রথিত ছিল সন্দেহ নাই। নতুবা ঐ গ্রন্থদ্বয় ভাবী গ্রন্থকারের অবলম্বন হইতে পারিত না। প্রফেসর হর্নলে মহোদয় বলেন চক্রপাণি ১০৫০ খৃঃ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। গৌড়রাজ মালাকার লিখিয়াছিলেন যে নরপাল দেব ১০৩৩ খৃষ্টাব্দে গৌড়রাজ্য শাসন করিতেন। এমত অবস্থায় তাঁহার অমাত্য চক্রের অন্যতম মহানসাধ্যক্ষ নারায়ণের পুত্র চক্রপাণির সময় ১০৫০ খৃঃ অব্দ হওয়া বিচিত্র নহে। এই কাল হইতে অতি প্রাচীন মাধবের নির্দ্দিষ্ট কাল নির্ণয় করিতে না পারিলেও খৃষ্টিয় সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দী অনুমান করা অযৌক্তিক নহে। প্রফেসর হর্নলে মহোদয়ও এই প্রকারই অনুমান করেন। এতদতিরিক্ত বিশেষ সময় বা

---

* বর্ত্তমান নিদানে যে সমাপ্তি বাক্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহা টীকাকারগণ কর্ত্তৃক ধৃত হয় নাই; সুতরাং তাহা গ্রন্থকার নিজে লিখিয়াছেন বলিয়া কেহ স্বীকার করেন না।

† The famous Vrinda better known by his sobriquet Madhava or the Honeyed, apparently on account of the attractiveness of his writings, who in the seventh or eighth century had published his system of medicine, of which two parts called respectively রোগবিনিশ্চয় or Pathology and সিদ্ধযোগ or Therapeutics have survived to the present day. I. R. S. G. P P. 998.

জাত্যাদিনির্ণয় বর্ত্তমানে যতদূর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহার সাহায্যে অসম্ভব। তবে কেবল মুখের জোরে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বা বৈদ্য বলা উন্মত্তপ্রলাপবৎ

পর্য্যায় রত্নমালার প্রায় প্রতি পর্য্যায়ের শেষে তাহার অর্থ সংস্কৃত ভাষায় অথবা দেশজ নামে দেখিতে পাওয়া যায়, যথা :—

ধন্বী ধনঞ্জয়ঃ পার্থো নদীজঃ ককুভোঽর্জ্জুনঃ। অর্জ্জুনবৃক্ষস্য
ওষ্ঠী রক্তফলা বিম্বী তুণ্ডী কেবী চ বিম্বিকা। তেলাকুচা

এই স্থলে প্রথম পর্য্যায়ে সংস্কৃত শব্দ, দ্বিতীয় পর্য্যায়ে দেশজ নাম দ্বারা অর্থ কথিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন এই অর্থ অধস্তন লিপিকারের স্বকপোল-কল্পিত, ইহাতে গ্রন্থকারের কোন হাত ছিল না। আমাদের ধারণা এইরূপ অর্থ সহই এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে যে সমস্ত হস্ত লিখিত পুথি সংগৃহীত হইয়াছে, সকল পুস্তকেই এক ভাবে অর্থ লিখার প্রথা দেখা যাইতেছে। আমাদের দেশে বহু সাধারণ অভিধান ও বৈদ্যক নিঘণ্টু দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কোন গ্রন্থেই এইরূপ অর্থ লিখিবার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি এই গ্রন্থেই লিপিকারের অর্থ লিখিবার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে তবে অন্যান্য অভিধানেও তাদৃশ অর্থ লিখিত দেখা যাইত। আরও পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তর বঙ্গ হইতে সংগৃহীত পুথির দেশজ নাম প্রায় একরূপ থাকায় আমাদের এই ধারণা বলবতী হইয়াছে। আমরা পূর্ব্ববঙ্গে লিখিত যে পুথি খানি পরিষৎ পুস্তকালয় হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি তাহারও উত্তর বঙ্গে লিখিত পুথির দেশজ নামের ঐক্য ও বর্ত্তমানে পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত দেশজ নামে অনৈক্য প্রদর্শনার্থ কতগুলি শব্দ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

বগুড়ার পুথি	ঢাকার পুথি	বর্ত্তমান ঢাকার ভাষা
চাকলিয়া	চাকলিয়া	পিঠানি
শোনালু	শোনালু	বানরনড়ী
আকনাধি	আকনাধি	আকান্দী
উলু	উসা	ছন
পাষাণ ভেদী	পাষাণ ভেদী	শোণা পাথর
তেলাকুচা	তেলাকুচা	তেলাকুচ
বৃহিঞ্চি	বুঞিছি	বোকই
হলা	হেলা নালি	শাপলা

বিছাতি	বিছাটী	চোতরা
বাড়িআলা	খাড়িয়ালা	বাইর কোলি
ওকড়া	ওকড়া	কৈকোড়া

ঢাকায় লিখিত বা বগুড়ায় লিখিত পুথিতে সর্ব্বত্র নিজ নিজ দেশজ ভাষা অনুসৃত হয় নাই। তবে অর্থগুলি যে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন না হইয়াছে তাহা বলা যায় না, এবং তজ্জন্যই সব পুথির সমস্ত শব্দের অর্থ ঠিক একরূপ নাই।

কেহ কেহ বলেন মাধবের সময় (খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দী) এদেশে এরূপ দেশজ নামই ছিলনা, সুতরাং এগুলি অর্ব্বাচীন। আমরা এ মত সমর্থন করিতে পারিলাম না। প্রাচীন কাল হইতেই এদেশের একটী নিজস্ব ভাষা ছিল। তবে এই গ্রন্থের দেশজ ভাষার মধ্যে যে অর্ব্বাচীন ভাষা প্রবেশ করে নাই একথা বলিতে পারিনা। সর্ব্বত্রই লিপিকারের বিদ্যাবত্তার ফলে ঝুড়ি ঝুড়ি পাঠান্তর ও রূপান্তরের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই পুস্তকের দেশজ ভাষা দেখিয়াই শিবদাস যেন চক্রের টীকায় দেশজ নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। আমরা শিবদাসের উল্লিখিত যতটী দেশজ নাম পাইতেছি, তাহার অধিকাংশই পর্য্যায় রত্নমালায় ধৃত হইয়াছে। নিম্নে কতকগুলি উদ্ধৃত হইল।

সংস্কৃতনাম	দেশজ ভাষা শিবদাস সেন	দেশজ ভাষা পর্য্যায়রত্নমালা	পত্রাঙ্ক। *
অবাক্‌পুষ্পী	হেঠবহুলী	হেঠহুলী	১১৮
শতাহবা	শলুকা	শলুকা	১৪১
কেবুক	কেঁউতারা	কেঁউ	১৪৪
বৃশ্চিকালী	বিছাতী	বিছাতী	১৫৬
নীবার	উড়িয়া	উড়ীধান্য	১৫৭
প্রিয়ঙ্গু	কায়োনী	কাঁঅনি	১৫৮
দর্ভ	উলুত্থাম	উলু	১৬৩
চুক্রিকা	চুকাই	চুকাই	২১৭
অতসী	তিসী	তিসি	২৫০
বলা	বাড়িয়ালা	বাড়িআলা	২৫৩
প্রসারণী	গন্ধভাদালিয়া	গন্ধভাদালিয়া	২৫৬

* দেবেন্দ্রনাথ সেন মুদ্রিত প্রথম সংস্করণ চক্রদত্তঃ।

পূতীক	ন্যাটাকরঞ্জ	লাটাকরঞ্জ	২৫৭
কৈবর্ত্তমুস্তক	কেওঠমুথা	কেউটিয়া মুথা	
মিষি	গুয়ামোঁহরী	গুআমহরী	২৮৭
সামুদ্র	করকচ	করকচ	৩২১
রাজবৃক্ষঃ	শোনালু	শোনালু	৩৬১
বিম্বী	তেলাকুচা	তেলাকুচা	৩৭৪
কুম্ভীক	পাহ্না	পাহ্না	৩৮০
প্লক্ষ	লাকড়ি	লাকড়ি	৩৮১

ইহা খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর কথা। তখন দেশজ ভাষার ভূরি প্রয়োগ ছিল। চক্রপাণি তাঁহার চিকিৎসা সংগ্রহে রত্নমালাধৃত দেশজ নাম "শিয়লী ছোপড়" লিখিয়া গিয়াছেন, সুতরাং ১০৫০ খৃষ্টাব্দেও দেশজ নামের প্রচলন ছিল সন্দেহ নাই। *

মহামতি ডল্লন নিবন্ধ সংগ্রহ নামক সুশ্রুত সংহিতার যে টীকা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, "আমি টীকাকার শ্রীজৈজ্জট পঞ্জিকাকার গয়দাস ও ভাস্কর এবং টীপ্পনীকার শ্রীমাধব ও ব্রহ্মদেব আদিকে উপজীব্য করিয়া সুশ্রুতব্যাখ্যার নিমিত্ত এই নিবন্ধ সংগ্রহ করিলাম।" † এই ডল্লন নগরীবৃর মথুরা সমীপে অঙ্কোন নামক বৈদ্যস্থানের ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার টীকায় অনেক দেশজ ভাষা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে অনেকগুলি বাঙ্গালীর নিজস্ব ভাষা। নিম্নে কতকগুলি উদ্ধৃত হইল।

সংস্কৃত ভাষা	দেশজ ভাষা	পত্রাঙ্ক ‡
	ডল্লন ধৃত	
সুন্নিষণ্ণক	সুষুণি	৪১৬
বার্ত্তাকু	বেগুন	"
কোষাতকী	তোরই	৪১৭
পনস	কাঁটাল	৪০৯
ওল	ভোল্দর	৪০০

* চক্রদত্ত ২৫৭ পৃঃ। তগরং স্যান্নতং তদভাবে শিয়লী ছোপড়ঃ।

† তেন শ্রীজৈজ্জটং টীকাকারং শ্রীগয়দাস ভাস্করৌ পঞ্জিকাকারৌ শ্রীমাধবব্রহ্মদেবাদীন্ টিপ্পনকারাংশ্চোপজীব্য * * * নিবন্ধসংগ্রহঃ ক্রিয়তে। সুশ্রুতটীং ১ পৃঃ।

‡ জীবানন্দ বিদ্যাসাগর প্রকাশিত সুশ্রুতটীকা।

সংস্কৃত ভাষা	দেশজ ভাষা	পত্রাঙ্ক
ক্রৌঞ্চ	কোঁচবক	৪০১
শম্বুক	শামুক	৪০২
পাঠীন	বোয়াল	”
অতসী	মসিনা	২৯৫
বন্ধুক	বকপুষ্প	৩০৫
টঙ্কন	সুহাগা	৩২৩
কতক	ফটকিরি	৬৯৬
বঙ্কণ	কুঁচকী	৪৯৩
কাশীশ	হীরাকস	৭১৩
কালা	বড়হিংস্রা	৭৪৮
কঙ্কতিকা	চিরুনী, কাঁকই	৭৬৬
বাণবারক	সাঁজোয়া	৭৬৯
গোধা	গোসাপ	৭৭৪
বেশবার	বাটনা	৭৯৫
তরক্ষু	নেকড়ে	৯০১
মধূলিকা	রাইসর্ষপ	১১২৫

অল্প অনুসন্ধানে এতগুলি বাঙ্গালা দেশজ নাম পাওয়া গেল। কেহ কেহ ডল্লনকে বাঙ্গালী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু যিনি নিজ পরিচয় প্রসঙ্গে নগরীবর মথুরা সমীপে বাসস্থান বলিয়াছেন, তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিবার সাহস সংস্কৃতাজ্ঞতারই পরিচয় প্রদান করে। তবে এতগুলি খাস বাঙ্গালার ভাষা তাঁহার গ্রন্থে কি প্রকারে স্থান লাভ করিয়াছে, ইহাই বিচার্য্য বিষয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ডল্লন নিজের কথা টীকায় কিছু লেখেন নাই। কয়েকখানি টীকার উপাদান গ্রহণ করিয়া প্রায় তাঁহাদেরই ভাষায় তাহার নিবন্ধসংগ্রহ গড়িয়া তুলিয়াছেন মাত্র। অবলম্বন টীকা ও টিপ্পনীকারদের মধ্যে নানা দেশীয় লোক থাকায় ডল্লনের টীকায় নানা দেশীয় ভাষা দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি পনস শব্দের ভাষায় একই স্থানে কাঁটাল, কটাহল ইতি লোকে, এবং সুনিষণ্ণক শব্দে সুষুণি ও সিরিবালিকা লিখিয়াছেন। জীবন্তী শব্দে ডোডীতি হিন্দিভাষা (৪১৭ পৃঃ) বলিয়া ভাষা বিশেষের নামও করিয়াছেন। এই কয় টীকাকারের মধ্যে আমরা মাধবকরকেই বঙ্গদেশীয় টীপ্পনীকার দেখিয়া মনে করিতে

পারি যে, তাঁহারই টিপ্পনী হইতে 'বেগুণ' প্রভৃতি লিখিত হইয়াছিল। মাধবের টিপ্পনী আজিকাল পাওয়া যায় না। অতএব সাক্ষাৎ প্রমাণ না পাইলেও তদবলম্বনে লিখিত ডল্লনের নিবন্ধ-সংগ্রহে বঙ্গভাষা থাকায়, আমাদের এ অনুমান অসঙ্গত নহে যে, মাধবই টিপ্পনী গ্রন্থে অল্পমেধস্ক বৈদ্যবৃন্দের সুবিধার জন্য ভাষা অর্থ লিখিয়া অনায়াসে বোধগম্য হইবার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। এমত অবস্থায় কোষগ্রন্থে দেশজ নাম লিখিয়া পরিচয়ের সুবিধা করিয়া দেওয়া তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। ইহার মধ্যে পর্য্যায় রত্নমালায় উল্লিখিত বকপুষ্প, কায়ফল, সুহাগা, যোয়ান, মুথা, মেঁদী, মসিনা প্রভৃতি শব্দ ডল্লনে পাইতেছি। ডল্লন যে পরের কথা বলিয়াছেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ—একস্থানে একটি শব্দের যে ভাষা অর্থ দিয়াছেন অন্যত্র অপর দেশের ভাষা দিয়া তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং বঙ্গ ভাষায় জ্ঞান না থাকায় দু এক স্থলে ভুলও করিয়াছেন। যেমন "কতক" অর্থে তিনি "ফট্‌কিরি" লিখিয়াছেন; কিন্তু "কতকের" জল পরিষ্কার করায় ধর্ম্ম "ফট্‌কিরির" মত হইলেও, তাহাকে আজ কাল "নির্ম্মলী" ফল বলা হইয়া থাকে। বঙ্গীয় গ্রন্থ হইতে উঠাইবার আর একটী প্রবল উদাহরণ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। সম্ভব তৎকালে ডল্লনের দেশে চিড়া ছিল না, সেই জন্য 'পৃথুকা' শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন :—"আর্দ্রশালিধান্যং মৃদুভৃষ্টং মুষলাঘাতচিপ্পটীভূতং মোরবং পৃথুকা ইত্যুচ্যতে চিঁড়েতি লোকে।" এই "মোরবং" অন্য দেশীয় শব্দের মধ্যে বাঙ্গালায় চিঁড়া প্রবিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত "কঙ্কতিকা" অর্থে "চিরুনী, কাঁকই," বর্ম্ম-অর্থে "সাঁজোয়া," গোধা-অর্থে "গোসাপ," বেশবার অর্থে "বাট্‌না," তরক্ষু-অর্থে "নেকড়ে" প্রভৃতি যে মাধবের টীপ্পনী হইতে ধার করা, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। কেবল দ্রব্যের নাম নহে, শারীর-স্থানে বক্ষণ-অর্থে বাঙ্গালীর নিজস্ব 'কুঁচকী' প্রযুক্ত হইয়াছে। ডল্লন প্রতিজ্ঞাই করিয়াছিলেন যে, তিনি জেজ্জটাদির সমস্ত নিবন্ধেরই অর্থ জ্ঞাপন করিবেন, * কিন্তু জেজ্জটাদির ন্যায় প্রায়ই নাম উল্লেখ পূর্ব্বক শ্রীমাধবের পুস্তকের নাম কুত্রাপি উল্লিখিত না হইলেও, টীকার লিখিত বঙ্গীয় ভাষা বাঙ্গালী মাধবেরই সম্পত্তি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সরস্বতী।

---

* সমস্ত নিবন্ধার্থ জ্ঞাপকে নিবন্ধ সংগ্রহে ৪৫৫ পৃঃ।

দামুর অরণ্যবাস।

(১)

দামোদর ভায়ার সংসারের প্রতি অনাস্থা ক্রমশঃ সম্পূর্ণ বৈরাগ্যে পরিণত হইতেছিল। একদিন হঠাৎ মনে হইল 'এই সুযোগে অরণ্যে চলিয়া গেলে কি হয়?'

পাঁচকড়ি দাদার পরামর্শ বরাবর দামু গ্রহণ করিত। এ যাত্রায় মনে করিল 'দরকার কি?' কিন্তু অরণ্য একটা ভয়ঙ্কর স্থান, তথায় বাঘ ভালুক, ভূত প্রেত, নানা প্রকার অজানা জীবের বাস, কাহার কি মতিগতি, কখন কে তাড়া হুড়া দৌরাত্ম্য করে, তাহা কে বলিতে পারে? হঠাৎ একটা গোসাপ, কিম্বা তক্ষকও যদি আক্রমণ করে, তবে তাহার নিবারণের উপায় বলিয়া দিবে কে? এখন অরণ্যে মুনি ঋষিগণ কোথায় কে বাস করে, তাহাও অজ্ঞাত। অরণ্যের মধ্যে একটা কুটীর নির্ম্মাণ করিতে গেলেও কাঠখড় এবং দড়ি সংগ্রহ করিতে হইবে। এই সকল জঞ্জাল উত্তরোত্তর কল্পনায় উদিত হইয়া দামুকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল।

সন্ধ্যাকাল। দামোদরের গৃহ একটা প্রকাণ্ড মশার আড্ডা। প্রথম যুগে সেটা চা'র আড্ডা ছিল, এবং অনেক লোক চা খাইতে, হাসিতে এবং গল্প করিতে আসিত। দামোদরের অবস্থা কিছু হীন হইয়া পড়াতে, এবং আড্ডাধারীগণের মধ্যে খুব প্রতিভাশালী জনকতক মরিয়া কি বিদেশে চলিয়া যাওয়াতে, এখন গৃহ শ্রীহীন, এবং অন্ধকার। দামোদর সেই গৃহের এক কোণে বসিয়া ভাবিত। কি ভাবিত তাহা সেই জানে, কিন্তু সেই সুযোগে মশার পাল দামোদরকে আপাদমস্তক ঘিরিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিত। দামু তাহাদের ভাব বুঝিত না, এমন কথা কিছু নয়; কারণ— মধ্যে মধ্যে 'তোরা এক তরফ হইতে আমার রক্ত শোষণ কর্' এই প্রকারের প্রেমপূর্ণ এবং আত্মত্যাগ ভাবযুক্ত বাক্য দ্বারা মশকবৃন্দের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সর্ব্বদাই দামু যত্নবান্ ছিল।

হঠাৎ চিন্তা করিতে করিতে দামুর এক অভিনব ভাব আসিয়া পড়িল। এই যে নির্জ্জন গৃহ, এটাও ত অরণ্যের মর্ত্ত! অথচ গাছ পালা এবং বন্য জন্তু কিছুই নাই। এ গৃহও ত অরণ্যে পরিণত করা যাইতে পারে। কিন্তু পাঁচকড়ি দা ভিন্ন এ সমস্যা পূরণ করে কে?

হঠাৎ পাঁচকড়ি দা আসিয়া উপস্থিত। পাঁচকড়ি স্মরণ করিতে করিতেই প্রায়শঃ উপস্থিত হয়, এই জন্য সে অনেকদিন বাঁচিয়া ছিল। ইহা ভিন্ন পাঁচকড়ির দীর্ঘায়ুর কোন কারণ ছিল না, কেন না, সে একেই চিররুগ্ন, তাহার উপর মাসিক পত্রে গল্প লেখে। এই দুইটী গুণ একত্র হইলে কাহারও বাঁচিয়া থাকিবার সাধ্য নাই, যদি বন্ধু বান্ধব মধ্যে মধ্যে স্মরণ না করে, এবং স্মরণ করিবামাত্র সে আসিয়া না পড়ে।

পাঁচকড়ি দা' দর্শনবিৎ সুপণ্ডিত। দুঃখীর প্রতি সর্ব্বদাই দয়ার্দ্র চিত্ত, কারণ দুঃখ কি তাহা সে জানিত, এবং জানাটা কি কষ্টকর তাহাও জানিত এবং বুঝিত। দামুর প্রতি তাহার স্নেহ অটল ছিল বরাবর, এবং পাছে দামুর দেহ পতনের পূর্ব্বে মাথা খারাপ হইয়া যায়, সেই ভয়ে পাঁচকড়ি দা' হয় ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে কিংবা প্রদোষের সময় আসিয়া দামু ভায়ার মাথা পরীক্ষা করিয়া যাইত। প্রয়াণকালে জীবের 'মনসাচলেন' ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই, তাহা পাঁচকড়ি দা'র স্থির বিশ্বাস ছিল। আজ দামুকে অন্যদিন হইতে অধিকতর গম্ভীর দেখিয়া পাঁচকড়ি দা' একটু চিন্তিত হইয়া পড়িল।

দামু ভায়া অরণ্যবাসের কথা বলিবামাত্র পাঁচকড়ি দা' হাস্যমুখে জ্ঞানগর্ভ তর্কজাল বিস্তার করিল। 'দেখ দামু! ভাবিয়া দেখ, সংসারে কাহারও সহিত মায়া সম্বন্ধ না থাকিলেই ইহা অরণ্য, কিন্তু এই সম্বন্ধ এড়াইতে গেলে প্রথমতঃ ঋণ পরিশোধ করা দরকার। দারা সুতের নিকট, সমাজের নিকট, দেশের নিকট তুমি নানা বিষয়ে ঋণী। দর্জ্জির দোকানে, ধোপার কাছে, নাপিতের কাছেই তোমার এত বাকি আছে যে, হঠাৎ তুমি চলিয়া গেলে কিংবা মরিয়া গেলে পরিবারবর্গ অকূল সমুদ্রে পড়িবে। ধর্ম্মতঃ এটা কি তোমার করা উচিত?

দামু। যদি ঋণ পরিশোধ করিয়া যাই?

পাঁচকড়ি। কত রকম ঋণ আছে তা কি জান? তোমাকে যাহারা ভাল বাসিয়াছে তাহাদের ভালবাস নাই, যাহাদের উত্তম মধ্যম প্রহার দিয়াছ (দামু একজন বিখ্যাত গুণ্ডা ছিল) তাহাদের প্রহার সহ্য কর নাই, যাহাদের ঠকাইয়া দু' পয়সা লইয়াছ তাহারা তোমাকে ঠকায় নাই, এই রকম আজীবন কত প্রকার ঋণ আমরা করি তাহার হিসাব রাখি না। এই দেখ আমারই নিকট ছাপাখানার তিনশত টাকা বাকি, তাহার জন্য রাত্রি জাগিয়া গল্প

লিখি। কিংবা পুরাকালে অধর্ম্ম করিয়াছিলাম তাহার জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রের টীকা লিখিয়া হাড়াইলাম। আমরা একটা 'ঝাঁকড়' মাত্র।

দামু। যদি মরিয়াই যাই।

পাঁচকড়ি। মরিয়াই যাও এবং অরণ্যেই বাস কর অঋণী হইতে পারিবে না। স্মৃতির মধ্যে সবই আছে। তোমাকে টানিতে থাকিবে, লজ্জা দিবে। ভাবিয়া দেখ, অরণ্যে গেলেও যদি তুমি সংস্কার ও প্রবৃত্তিগুলি এড়াইতে পার, পূর্ব্বে যাহা করিয়াছ তাহার পরিশোধের জন্য তোমাকে আবার সভাস্থলে ফিরিয়া আসিয়া বিব্রত হইতে হইবে।

দামু। তবে এখন উপায়?

পাঁচকড়ি। মাসিক পত্রে লেখ, এবং সমালোচনা কর। অরণ্যে রোদন করাও যা,' মাসিক পত্রে লেখা ও সমালোচনাও তা'। চুপ করিয়া ঘরে বসিয়া থাক, এবং ক্রমে মায়া এড়াও। শরীর এবং মনকে উৎসর্গ করিয়া দেও। ঘরে যত মশা হয় হউক, শয্যায় ছারপোকা হউক, আহারের সময় পাতে মক্ষিকা বসুক, লোকে নিন্দা করুক, দারিদ্র্য আক্রমণ করুক, কিছুরই পরওয়া করিবে না। অরণ্যে যে সকল জন্তু আছে তদপেক্ষা সমাজের জন্তু অধিকতর হিংস্রক এবং ভয়ঙ্কর। প্রথমে এখানকার হিংসা দ্বেষ হইতে যদি আত্মগুণে পরিত্রাণ পাও, অবশেষে জঙ্গলে কিংবা পাহাড়ে যেখানে খুসি নির্ব্বিঘ্নে যাইতে পারিবে। এমন কি যাওয়ার দরকার হইবে না। যতদিন গৃহে থাক দশজনের লাভ।

দামু। তাহাতে কি ঈশ্বর দর্শন হয়?

পাঁচকড়ি দা' হাসিয়া বলিল 'সংসার ছাড়াও যা,' ঈশ্বর ছাড়াও তা'। ঈশ্বরের সম্মুখে থাকিতে চাও তবে সংসারে থাক। ঈশ্বর রোজ এক একটা নূতন সৃষ্টি করিয়া, পুরাতন সৃষ্টিকে পশ্চাতে ফেলিতেছেন। অরণ্য পুরাতন সৃষ্টি। সমাজ, অর্থাৎ মানবসমাজ অপেক্ষাকৃত নূতন। এই সমাজ নূতন রকম করিয়া প্রত্যহ দেখা দিতেছে। এই সৃষ্টির ভাবটা বুঝিলেই ঈশ্বরকে বুঝা হইল। তাঁহার পশ্চাতে গিয়া অরণ্যে কি সমুদ্রের বালুকা সৈকতে বাস করা ঘোর মূর্খের কাজ। ভগবান্ এই সৃষ্টিক্ষেত্রে পরামর্শদাতা চাহেন, তুমি একজন বিজ্ঞ লোক, মাসিক পত্রে ক্রমাগত পরামর্শ দেও। হঠাৎ সংসার-অরণ্যে রোদন করিতে করিতে এক সময় নিশ্চয় ভগবানকে দেখিতে পাইবে, এবং খুসি হইয়া নকল অরণ্যে যাইতে চাহিবে না।

৩৮। ত-হর্ষভূতি-সুভ্রা(?)ত-ভাগু অর্দ্ধ, হর্ষ-মা[ত্র-ধ]লিশ-× × ×
জ বুদ্ধিদ্রোহ-অটব্যাং ম (অ)নৈস্যেব দ্রোথং বিদগ্ধ-প্রম(মু)থ পাটক[১], ক [ক] দ্রোথং মহে[শ (?)]

৩৯। তেজসোম-জনার্দ্দনা-ন্দ-নু [গ(?)] × × × × × সদেশ-[শ]ঙ্কর দ্রোথং রুদ্র-বিকসিত-দিবাকর-হরিশ(ষ)-বিজয়-বামন-গোপিশর্ম-আনন্দ-নির্দ্ধার(?)

৪০। স (সু)তোষ-লুছকা[ভ্যাং পাটক ১], ন × × × সুস্মভূতেঃ পাটক ১, রুদ্র-দামোদরাভ্যাং পাটক আন্দ(ন)ন্দ সোম-বিদগ্ধ-জনার্দ্দন [উপ(?)]

৪১। তি-স্কন্দ-ই(ঈ)শা[ন] × × × ন × × × × পতি-কৃষ্ণ-ভব-রুদ্র-সুরঠ-জনসোম-বিদগ্ধ-বপ্ম(?)-ধৃতি-অবলিপ্ত-কোণ্ট(ণ্ঠ?)-বুদ্ধদত্তশর্ম্ম—

৪২। বপ্ম(?)-শর্ম-' × × ধাম-নবচ[ক্র] × × জয়-শিব-বিষ্ণু-সুজাত-শর্ম্মদ্রোথং বন্ধু-বেদজু-লবুবু-ধৃতি-জয়া [মিত্র দে(?)]ব-শ্র (?) ধু-বিদেশ-জীব-মহাসক (?)—

৪৩। বিহি-সুযত-উগ্র-[প্রতোষক] × × × অর্থ (?)-অভু[ত*]-সন্তোষ-দৈত্তগণ-রু(রূ)প-সত্ত্ব(?)-বিষ্ণুমিত্র-নিস্তারণ-গোবিন্দ-কোণ্ট(ণ্ঠ?)-কণাদগুপ ×

৪৪। বপ্ম (?)-সুষেণ-লবুবু (?)-স × ন × [লিজ (?)] শোক-হম্বোশুভ-গুণতোষ-বপ্ম (?)-শোক-বপ্ম (?)-অতিথি-ভানু-ক্ষীর[গ]ও-নিধি-' × × ×

৪৫। ভদ্র-জনার্দ্দন-ভাস্কর- [বপ্ম (?)] × × × [দ্রো]থং [ভ]ব-দত্ত দ্রোথং-ধনঙ্কর-ভট্টব্রহ্মদত্ত-দ্রোথং ভট্ট-অপদত্ত-দ্রোথং স্বামিদত্ত-বপ্ম (?)-চন্দ্র-পণ × × × ×

৪৬। কৃষ্ণ-হরিষ-বিকসিত-ম[নোরথ (?)]-বৃকশ-নয়ন-চিত্র-বিপশ্চিত-যজ্ঞ-সুকৃত-তোষ-চন্দ্র-বপ্ম (?) শি-অহি-মর্কট-চন্দ্র-প্রাণ-নন্দ-সাধারণ × × ×

৪৭। ভট্টসাধারণদ্রোথং ক্ষেমভূতিপাটকদ্বয় বপ্ম (?) দেব-প্রশান্ত-দু (?) ধু স্বামি-প্রকাশ-গৌণ-পাটক-রাজি পৃ(প্রি)য়দাম-দ্রোথং, আনন্দ-ইন্দ্র-স্বামিদ্রো[থং] × ×

৪৮। নারায়ণ-হরিদেব-চন্দ্রকেশ পাটক ১, ভট্ট-সুত দ্রোণ্ট (ণ্ঠ?) ২, ভট্টপিঙ্গ-দেবস্ত পাটক ১, নন্দগোপ-বন[মা]লি-ভু(ত্রি)লোচন-থ [স্ত (?)] × × × × ×

৪৯। সত্রোপযোগায় পাটক, পুজিষ্ণু-[অহি] × × [স্বা]মি পাটক ২, সমুধ-সত্য সন্তোষ-জয়শর্ম-দৈদব-ইবল্লি (?)-নরবিজয়-শম্ভু (?) বিজয়-গুপ্তজয়-× × ×

৫০। × × ভটাৎ সুরিদ্রোর প্রিয় দ্রোণ্ট (ণ্ঠ?) মুধু বা × × × × × ×

লক্ষ্ণ-ধন-নন্দ-পর পালশো (?)-ইন্দ্র-হরিধৃত্তি-ইচ্ছদেব-গণ-(পা) ঢং মহারাজ দদি (ধি?) তট-সরপ (?) × × বক

৫১। × [কৃ]তা ভূময়স্তাম্রপটে সমারোপিতা অস্ত মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যপ্রসবার্থভগবদ্] [ন*][ন্তনারায়ণায়[ব*]থা-লিখিত ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ সর্ব্বতে(তো) ভোগেনাগ্র × × × ×

৫২। × × × তি(তী)র্থ-[পু]জনোপচীয়মান-সং[স্কা]রত্বায়ৃপ-গৌর-বাভি-থেয়-পৃ(প্রি)য়ত্বাচ্চ সততমনুমন্তব্যাঃ পালণী(নী)য়াশ্চ দানাচ্ছে য়োনুপাল[নং]

৫৩। ...[দো]ব-দর্শ[না]য় ভগবতা [ব্যা]সেন গীতা[ঃ*]শ্লোকাঃ—

বষ্টিম্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গে মোদতি ভূমিদ [ঃ। *]

আক্ষেপ্তা চানুমন্তা চ তান্যে[ব] (১) × × × × × × × ×

৫৪। × × × × × (২) ভ্যো যত্নাদ্রক্ষ যুধিষ্ঠির [।*]

মহী[ং?] মহি(হী)মতাঙ্গেষ্ঠ দানাচ্ছে য়োনুপালনং (ম্) ॥

বহুভির্বসুধা দত্তা রাজভিস্সগরাদিভি[ঃ*]

যস্ত যস্ত (৩) × × × ×

৫৫। × × × × × × × [ফ] লমি (ম্ ॥ ই) তি কৃতং

[সা]ন্ধি-বিগ্রহিক-প্রশান্ত[দে]বেন ভোগি-ভবদাসস্ত দ্রোথং,

পাচক-বসু-দ্রোথং, × × × × × × × ....

৫৬। ......বাচকস্বেন সুধামদ্রোথং বির (?)হ-দ্রোণ্ট (ম্ন?)২, উৎথাতু-কাম(মে)ন নরদত্তস্ত দ্রোণ্ট (ম্ন?) ২, প্রকৃত[ায়(?)] পাদমূলা......

৫৭। (৪)......রক অবি × × × তয়া ......সি......॥

[অনুবাদ।]

কুমারামাত্য (১) [শ্রীলোকনাথ] নিজ অধিকরণকে (২) [রাজকর্ম্মচারি-বর্গকে] ও সুব্বঙ্গবিষয়ের ব্রাহ্মণার্য্যগণকে এবং অধিকরণ, প্রধান ব্যবহারী

(১) অন্যান্ত তাম্রশাসনে ব্যবহৃত এই শ্লোকটি হইতে এ স্থলের খণ্ডিতাংশ পূর্ণ করা যায় ; যথা,—"তান্যেব নরকে বসেৎ"।

(২) এই স্থলে খণ্ডিতাংশটি এইরূপ হইবে ; যথা,—"পূর্ব্বদত্তাং দ্বিজাতি"—ইত্যাদি।

(৩) এই স্থলের খণ্ডিতাংশটি "যদা ভূমিস্তস্ত তস্ত তদা" ইত্যাদি রূপ হইবে।

(৪) তাম্রপট্টের পশ্চাদ্ভাগের নিম্নাংশ উর্দ্ধাংশ হইতে অধিকতর ঘন বলিয়া প্রতিভাত হওয়ায় এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, ৫৭ পংক্তির পর আর কোনও পংক্তি লুপ্ত হয় নাই, বরং ৫৭ পংক্তিতেই শাসনটি সমাপ্তি লাভ করিয়াছে।

[ব্যবসায়ী] ও জনপদবাসিবর্গ সহিত বর্ত্তমান ও ভাবী শ্রীসামন্ত, মহাসামন্ত, বিষয়পতিগণকে জানাইতেছেন—আপনারা এই বিষয়ে অবগত হউন,—

(১)

যাঁহার বিগ্রহ·..............; যিনি ত্রিভুবনের স্থিতিসুখপ্রাপ্তির জন্য অষ্টধা (৩) বিভক্ত নিজ তনুর প্রত্যেক [ভাগে] প্রভুতাদি বিষয়ে তুল্য মহিমা [লইয়া বিরাজমান], এবং যিনি মদনদেবকে কায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন,—অশুভধ্বংসকারী সেই শঙ্কর জয়যুক্ত হয়েন।

(২)

প্রভাবান্বিত-মহারাজাধিরাজ-শব্দে অধিকারী, ভরদ্বাজমুনির সদ্বংশে উৎপন্ন, প্রথিতযশাঃ, পাপ প্রশমিত হওয়ায় সংসারোচ্ছেদের হেতুভূত, শ্রীমান্ [···নাথ] শম্ভুর পাদপঙ্কজরেণুরাজি দ্বারা শিরোদেশে পবিত্র দিব্যাভিষেক প্রাপ্ত হইয়া অবনীশ [রাজা] হইয়াছিলেন।

(৩)

গুণাধার সেই মহাত্মার মহান্ পুত্র, সামন্ত শ্রী (?) নাথ নিজ বলবীর্য্যে প্রসিদ্ধ হইয়া, যুদ্ধে পৌরুষ ধন প্রাপ্ত হইয়াও ধর্ম্ম্য ক্রিয়ার একমাত্র আশ্রয় ছিলেন। ভগবানের ন্যায় (সকলের) বিপৎ প্রতিহত করিয়া, নিজশক্তি-মাহাত্ম্যে তিনি অবনীতলে সম্পাদয়িতব্য সমস্ত ক্রিয়া প্রকটিত করিয়া বীর বলিয়া (পরিগণিত) হইয়াছিলেন।

(৪)

তাঁহার ভবনাথ-নামা গুণবান্ পুত্র সংসারসাগরজল উত্তীর্ণ হইবার জন্য একমনাঃ হইয়া, গুণসম্পন্ন ভ্রাতুষ্পুত্রের উপর রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া .... ঋষিতুল্য হইয়াছিলেন।

---

(১) 'কুমারামাত্য' শব্দটি রাজপুত্রদিগের মন্ত্রীকে বুঝাইলেও, গুপ্তসাম্রাজ্যে ইহা একটি বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারীর উপাধিরূপেই ব্যবহৃত হইত। কুমারামাত্য-পদবী-বিভূষিত ব্যক্তি নিজেও ক্ষুদ্ররাজরূপে স্ববিষয় পরিচালন করিতে পারিতেন। Fleet সাহেবের গুপ্তলেখমালা-গ্রন্থে এই শব্দের বহুশঃ উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পালসাম্রাজ্যেও যে এই কর্ম্মচারীর নাম বিলুপ্ত হয় নাই, তাহার প্রমাণরূপে নারায়ণপালের [ভাগলপুর] তাম্রশাসনে "মহা মারামাত্য" শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। [গৌড়-লেখমালা ৬০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।]

(২) এ স্থলের "অধিকরণ" শব্দটি রাজ্যশাসন-বিভাগের কর্ম্মচারিগণকে বুঝাইতেছে বলিয়া প্রতিভাত হয়। ইংরাজীতে তাহাকে আমরা Court [রাজপরিষদ্] বলিয়া বুঝিতে পারি।

(৩) "পৃথিবী সলিলং তেজো বায়ুরাকাশমেব চ।
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ সোম-যাজী চেত্যষ্টমূর্ত্তয়ঃ॥"—ইতি যাদবঃ॥

(৫)

অষ্টাগ্নিকা-নাম্নী [জননী] হইতে লব্ধজন্মা, গোত্রলক্ষ্মীর ন্যায় মহাতেজঃ-সম্পন্না, পতিব্রতধর্ম্ম পালন করিয়া মহিমময়ী, অনুরূপা ভার্য্যা গোত্রদেবীর গর্ভে কুল অবিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্যই ভরণশীল তিনি (৪) এক পুত্ররত্নকে উৎপাদন করিয়াছিলেন।

(৬)

স্থাবরনামা দ্বিজবর যাঁহার মাতামহের প্রার্য্য (পিতামহ) (৫) ছিলেন, বীর-নামা দ্বিজসত্তম যাঁহার········মান্য প্রমাতামহ ছিলেন; যাঁহার খ্যাতি-সম্পন্ন, সাধু পারশব(৬)জাতীয় কেশবনামা মাতামহ নৃপসন্নিধানে থাকিয়া, সৈন্যাধিকার (সৈন্যাধ্যক্ষপদ) প্রাপ্ত হওয়ায়, নিজ কৃতিত্বে সজ্জনমণ্ডলের অভিমত ব্যক্তি ছিলেন।—

(৭)

সর্ব্বদা সত্যের একমাত্র সুহৃৎ গুণবান্ রাজা লোকনাথ এই কেশবের দৌহিত্র ছিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ নিজ দোর্দ্দণ্ডে জালিত শ্রেষ্ঠ-অসিবলে ও সচিবগণের বুদ্ধিবলে জয়লাভ করিত। কর্ত্তব্যবিৎ (লোকনাথ) জন্তগণের সারভূত

৪। এই শ্লোকের আদিতে উল্লিখিত "তেন" পদটি পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের ভ্রাতুঃসুতকে বুঝাইবে—কারণ, "ভবনাথ তাঁহার হস্তেই রাজ্যভার অর্পণ করিয়া ঋষিতুল্য হইয়াছিলেন।"—এইরূপ বর্ণনা হইতে তাঁহার [ভবনাথের] কোনও সন্তানোৎপাদনের সম্ভাবনা ছিল বলিয়া প্রতিভাত হয় না।

৫। "প্রার্য্য" শব্দটি সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল বলিয়াই বোধ হয়। "আর্য্য" শব্দে শ্বশুরকেও বুঝাইতে পারে। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে "স্বামী" অর্থে "আর্য্যপুত্র" শব্দের প্রয়োগ সকলেরই সুবিদিত। অতএব "প্রার্য্য" শব্দকে "শ্বশুরের পিতা" অর্থে প্রযুক্ত ধরিলে, গোত্রদেবীর মাতা অষ্টাগ্নিকার পিতামহও হইতে পারেন। শব্দমালাতে "আর্য্যক" শব্দ পিতামহ ও মাতামহ উভয়ার্থে প্রযুক্ত দেখিয়া, আমরা এ স্থলে "স্থাবর"কে লোকনাথের মাতামহ কেশবের "প্রার্য্য" অর্থাৎ পিতামহ মনে করিয়া অনুবাদ করিয়াছি।

৬। পারশবঃ—লোকনাথ পারশবের দৌহিত্র ছিলেন। সপ্তম শতাব্দীতে হিন্দুসমাজে অনুলোম-বিবাহ যে প্রচলিত ছিল, তাম্রশাসনে ব্যবহৃত এই শব্দটিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কেশবকেই আমরা পারশব বলিয়া বর্ণিত পাইতেছি; কিন্তু তাঁহার পিতা "দ্বিজসত্তম" ছিলেন। "হর্ষচরিত"-প্রণেতা বাণভট্টের পিতা বাৎস্যায়ন-বংশাবতংস বৈদিক ব্রাহ্মণ চন্দ্রভানুও এক শূদ্রাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার গর্ভজাত [চন্দ্রসেন-নামা] পারশব পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। [হর্ষচরিত, ২য় উচ্ছ্বাস দ্রষ্টব্য।]

মনু [৯।১৭৮] "পারশব" শব্দের এইরূপ সংজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

"যং ব্রাহ্মণস্তু শূদ্রায়াং কামাদুৎপাদয়েৎ সুতম্।
স পারয়ন্নেব শবস্তস্মাৎ পারশবঃ স্মৃতঃ॥"

অশ্বগণ (৭) লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার (বিরুদ্ধে যাইয়া) পরমেশ্বরের (৮) (সার্ব্বভৌম নৃপতির) সৈন্যসমূহ বহুবার নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল।

(৮)

জয়তুঙ্গবর্ষের (৯) দুর্লঙ্ঘ্য সময়ে তিনি তৎক্ষণাৎ প্রয়োগ-[উপায়]-বিধানকারী হইয়াছিলেন। নীতিবিষয়ে যাঁহারা অর্থী হইতেন, তাঁহাদিগের জন্য নীতিবিধান করিতে তিনি অতি চতুর ছিলেন। প্রজাকুলকে প্রহৃষ্ট রাখিয়া, বহুগুণ-বিশিষ্ট এই নরপতি মৈত্রী দ্বারা আত্মসন্তোষ লাভ করিতেন। সর্ব্বদা বিদ্বজ্জনকে প্রিয়জন মনে করিয়া, সর্ব্বহিত-রত, সাধুগণের আশ্রয়ীভূত, পটুমতি [লোকনাথ] প্রতাপ-সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

(৯)

এই সকল কারণে, আপ্তজনের মন্ত্র লইয়া কর্ত্তব্যাবধারণপূর্ব্বক শ্রীজীবধারণ নৃপতি......[অবিলম্বে] যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া যে শ্রীপট্ট-প্রাপ্ত করণকে (১০) সসৈন্য নিজ বিষয় [দেশ] দান করিয়াছিলেন।—

তাঁহার পুত্র যুবরাজ লক্ষ্মীনাথকে দূতক করিয়া, অগস্ত্য-সগোত্র দেবশর্ম্ম-

---

৭। অক্ষর অর্দ্ধ-বিলুপ্ত হওয়ায়, এই শ্লোকের তৃতীয় চরণের প্রথমাংশের পাঠ সংশয়-বিহীন হইতে পারে নাই; "কৃত্যজ্ঞঃ" পাঠ আনুমানিক ধরিয়া, পরবর্ত্তী শব্দটিকে "অর্জ্জিত"রূপে গ্রহণ করিয়া অনুবাদ প্রদত্ত হইল। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী শব্দটিকে অকারান্ত ধরিয়া পরবর্ত্তী শব্দটিকে "উর্জ্জিত"রূপে গ্রহণ করিলেও, অর্থসঙ্গতি সুরক্ষিত হয়। তখন সমাসটির এইরূপ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে—"যাঁহার জন্তুশ্রেষ্ঠ অশ্বগণ "উর্জ্জিত" [বলশালী] ছিল।

৮। এই সার্ব্বভৌম নৃপতি কে, তাহা বলা যায় না। ৯ম শ্লোকোক্ত জীবধারণ-নামা নৃপতিই যদি এই শ্লোকের পরমেশ্বর-পদবাচ্য ব্যক্তি হইয়া থাকেন,—তাহা হইলেও, পূর্ব্বভারতের পূর্ব্বাঞ্চলের কোন্ স্থানে, কোন্ সময়ে তিনি আত্মপ্রাধান্যস্থাপনে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাহা অনুসন্ধেয়।

৯। তাম্রশাসনের কাল আমরা সপ্তমশতাব্দীর শেষার্দ্ধে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি কেন, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যাঁহার পিতা [ধ্রুব] গুর্জ্জরপতি-বৎসরাজের হস্ত হইতে গৌড়েশ্বরের শ্বেত-ছত্র-দ্বয় কাড়িয়া লইয়াছিলেন, সেই রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের একটি নাম "জগত্তুঙ্গ" ছিল; কিন্তু এই "জগত্তুঙ্গ" ৮ম শতাব্দীর শেষভাগের রাজা ছিলেন। তাম্রশাসনে উল্লিখিত "জয়তুঙ্গবর্ষ" যদি রাষ্ট্রকূটবংশীয় কোনও ব্যক্তি হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, তিনি তৃতীয় গোবিন্দের কোনও পূর্ব্বপুরুষ হইয়া থাকিবেন। কিন্তু রাষ্ট্রকূটদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বিস্তৃত হইয়া গেলে, রাষ্ট্রকূটরাজগণের "তুঙ্গ" "বর্ষ" প্রভৃতি নাম অন্যান্য বংশের রাজগণও গ্রহণ করিয়াছিলেন। কমারাজ্যের এক জয়তুঙ্গসিংহের কথা আমরা Keilhornএর লিষ্টে উল্লিখিত পাইতেছি। [Ep. Ind. Vol. V. P. 79. No. 575.] সুতরাং আলোচ্য শাসনের "জয়তুঙ্গবর্ষ" কে, তাহা ঠিক করা সম্প্রতি কঠিন।

১০। শ্রীপট্ট-প্রাপ্ত লোকনাথ জাতিতে "করণ" ছিলেন। তিনি যে "পারশব" [অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার গর্ভজাত সন্তান] কেশবের দৌহিত্র ছিলেন, তাহা ৬ষ্ঠ শ্লোক হইতে জানা গিয়াছে।

নামক ব্রাহ্মণের প্রপৌত্র, জয়শর্ম্ম-স্বামীর পৌত্র, দ্বিজ-গুরু-জনতার নিরতিশয়-তোষ-বিধান-কারী তোষশর্ম্মনামক বিপ্রের পুত্র,—অগ্নিতে যথাবিধি হোম-কারী, আহিতাগ্নি প্রমাতামহ বুধস্বামীর পুত্র, ধর্ম্মার্জ্জনহেতু গুণগ্রামোপেত বলিয়া বিখ্যাত, বৃহস্পতি স্বামীর দুহিতা—যাচকগণের যথাভিলষিত অর্থ প্রদান করিয়া, প্রাপ্তসুবচনা, সুবচনা-নাম্নী ব্রাহ্মণীর-গর্ভোৎপন্ন, সদাচারের যথাচরণ করিয়া প্রতিষ্ঠিত এই উভয় কুল হইতে লব্ধজন্মা, বিদ্রুত-ভুজবল-বীর্য্য দ্বিজ-গুরু-জনতার সহিত আত্মবিভব-ভোগকারী, মহৎকুলসম্ভূত, দ্বিজ বিলুপ্ত-সকল-দোষ, মহাসামন্ত প্রদোষশর্ম্মা আমাদিগকে বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন—

"যে স্থানের ঘন-গুল্ম-লতা-বিতানের মধ্যে মৃগ, মহিষ, বরাহ, ব্যাঘ্র, সরীসৃপ প্রভৃতি যথেচ্ছভাবে গৃহসুখ অনুভব করে, সুবন্ধ বিষয়ের কৃতাকৃতী-বিরুদ্ধ সেই অটবীভূখণ্ডে দেবায়তন নির্ম্মাণ করাইয়া আমি ভগবান্ অবিদিতান্ত অনন্তনারায়ণ (১১) স্থাপিত করিতে অভিলাষী হওয়ায় রাজপাদের প্রসাদ লাভ করিয়াছি। সেই স্থানে দেব, অসুর, দিবাকর, শশধর, কুবের, কিন্নর, বিদ্যাধর, মহানাগ, গন্ধর্ব্ব, বরুণ, যম, যক্ষাদি দ্বারা পূজিত-বিগ্রহ সেই অনন্ত-নারায়ণের সতত অষ্টপুষিকা (১২) বলি, চরু ও সত্রের সতত-প্রবৃত্তির জন্য,—এবং সমান-সম্পত্তি-ভোগকারী চাতুর্বিদ্য [চতুর্ব্বেদবিৎ] ব্রাহ্মণ ও আর্য্যগণের [ব্যবহারের] জন্য এই কৃতাকৃতাবিরুদ্ধ অটবীভূখণ্ড তাম্রপট্টে [শাসনভাবে] লিখাইয়া আমার মাতাপিতার ও নিজের পুণ্যবৃদ্ধির জন্য......................
...[রাজা লোকনাথ] কর্ত্তৃক প্রদত্ত হউক"।

..............[এই প্রার্থনাক্রমে] চতুশ্চত্বারিংশৎ [৪৪] সংবৎসরে ফাল্গুন মাসে পূর্ব্ব দিকে কণামোটিকা পর্ব্বত, দক্ষিণ দিকে পঙ্গ ও বাপিকা নামক উভয় গ্রামের সীমা, পশ্চিম দিকে জয়েশ্বরের তাম্রপথর (?) খণ্ড............

১১। এ স্থলে "অনন্তনারায়ণ" শব্দে কোন্ বিগ্রহকে বুঝাইতেছে, তাহা চিন্তনীয়।

"গন্ধর্ব্বাপ্সরসঃ সিদ্ধাঃ কিন্নরোরগচারণাঃ।
নান্তং গুণানাং জানন্তি তেনানন্তোঽয়মুচ্যতে॥"

এই নিমিত্ত বিষ্ণুর এক নাম "অনন্ত"; সুতরাং "অনন্তনারায়ণ" বলিলে বিষ্ণুমূর্ত্তির বিগ্রহও হইতে পারে। "শেষনাগ"কে বুঝাইবার জন্যও "অনন্ত" শব্দের প্রয়োগ প্রসিদ্ধ। অতএব "অনন্তনারায়ণ"শব্দে শেষশয্যাশায়ী বিষ্ণুকেও বুঝাইতে পারে কি না, তাহাও বিবেচ্য।

১২। অষ্টপুষিকা—শব্দটির অর্থ সম্যক্ প্রতিভাত হইতেছে না। "অষ্টমুষ্টিকা" পাঠ হইতে পারিলে, একটি অর্থ হইতে পারিত।

বলমণ্ডলিকা, উত্তর দিকে মহত্তর (১৩) বপ্পত্তের পুষ্করিণী—এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন সুব্রুঙ্গের কৃতাকৃতাবিরুদ্ধ অটবীভূখণ্ড.....................তাম্রপট্টে লিখাইয়া, মহাসামন্ত প্রদোষশর্ম্মার মাতাপিতার ও তাঁহার নিজের পুণ্যবৃদ্ধির জন্য, তাঁহার মঠে [স্থাপিত] ভগবান্ অনন্তনারায়ণের পূজাবিধিসম্পাদনের নিমিত্ত..........প্রদান করিলাম।

[অতঃপর ৫০ পংক্তি পর্য্যন্ত লিখিতাংশের অনুবাদ প্রদত্ত হইল না। কারণ, এই অংশে কেবল শতাধিক ব্রাহ্মণের নাম ও তাঁহাদের মধ্যে কে কত পাটক, কত দ্রোণ, বা কত আঢ় (ক) ভূমি পাইবেন, তাহারই নির্দ্দেশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। উপরি-উদ্ধৃত পাঠ হইতে সকলেই তাহা সহজে বুঝিয়া লইতে পারিবেন।]

[এইরূপে বিভক্ত] ভূমিখণ্ড সকল তাম্রপট্টে [শাসন-রূপে] সমারোপিত করিয়া, উঁহার [প্রদোষ শর্ম্মার] মাতাপিতার ও নিজের পুণ্যোদয়ের জন্য, ভগবান্ অনন্তনারায়ণকে এবং যথালিখিত ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বত্র যথেচ্ছভোগের জন্য [প্রদত্ত হইল]। তীর্থপূজন দ্বারা সংস্কার প্রচীয়মান হয়, এবং নৃপতি-গৌরব ও অতিথিসৎকার সকলের প্রিয় হওয়া উচিত—এইরূপ মনে করিয়া, অনুমোদনপূর্ব্বক সকলেরই এই আদেশ সতত পালন করা কর্ত্তব্য,—যেহেতু দান অপেক্ষা পালন শ্রেয়স্কর। [ভূমির অপহরণাদি] দোষ প্রদর্শন করিবার জন্য, ভগবান্ ব্যাসদেবও কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

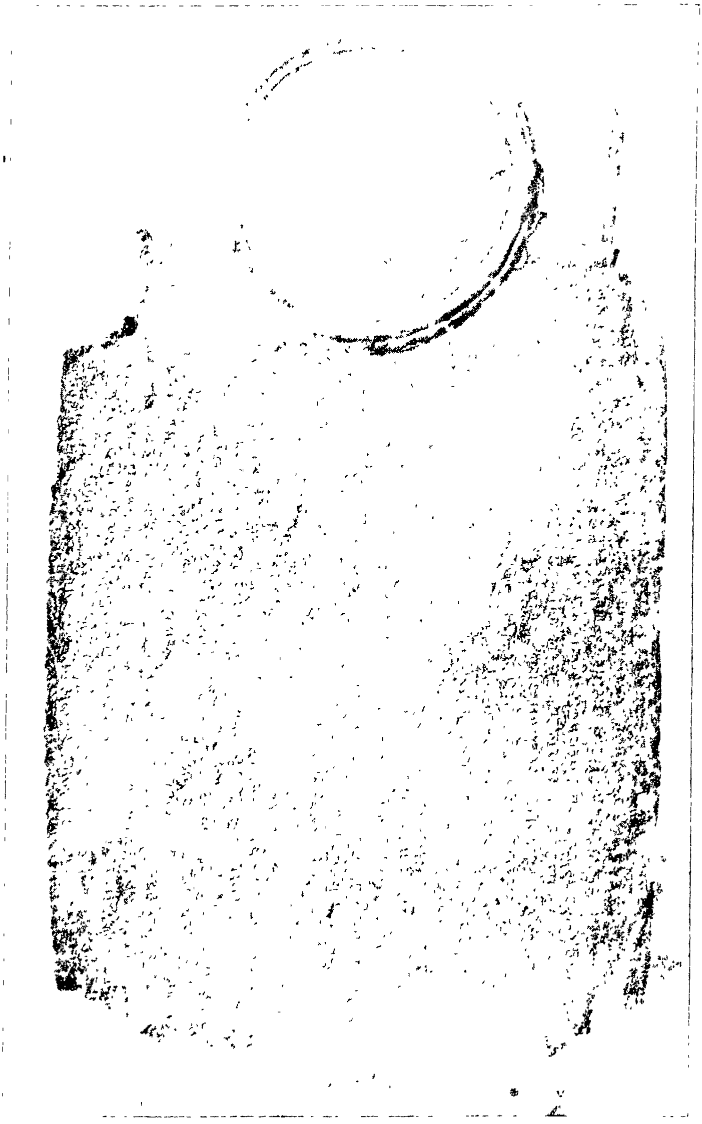
ভূমিদাতা ষষ্টি সহস্র বৎসর স্বর্গসুখ ভোগ করেন; এবং ভূমির অপহর্ত্তা ও [অপহরণের] অনুমোদনকারী তৎপরিমিত কাল নরকবাস করেন।

হে রাজশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণগণকে যে মহী পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা কর। দানাপেক্ষা পালন শ্রেয়স্কর॥

সগরাদি বহু নৃপতিগণ ভূমিদান করিয়াছেন; কিন্তু যখন যাঁহার [অধিকারে] ভূমি থাকে, তখন [ভূমিদানের] ফল তাঁহারই হইয়া থাকে॥

সান্ধি-বিগ্রহিক প্রশান্তদেব এই শাসন সম্পাদিত করিয়াছিলেন। ভোগী

১৩। মহত্তর—সেকালে গ্রামের বৃদ্ধ বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে "মহত্তর" বলা হইত। দশকুমার-চরিতের ২য় উচ্ছ্বাসে "জনপদ-মহত্তর" শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। বাঙ্গালাদেশের নানা স্থানে গ্রামের নায়ককে এখনও "মাতব্বর" বলা হয়। এই শব্দটি [ফরিদপুর জিলায় আবিষ্কৃত] মহারাজ ধর্ম্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচারদেবের তাম্রশাসনেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। Indian Antiquary [1910] ২১৩ পৃষ্ঠায় পার্জ্জিটার সাহেবের টীকা দ্রষ্টব্য।



লোকনাথের ত্রিপুর-শাসন।　　　　২য় পৃষ্ঠা।

(১৪) ভবদাসের দ্রোণ (১৫), পাচক বসুর দ্রোণ.................সুধামের দ্রোণ, বিরহের ২ দ্রোণ,...................নরদত্তের ২ দ্রোণ............ ।

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক।

শূন্য।

শূন্য কথাটা কত পুরাতন, তাহার "সন তারিখ" এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু সম্প্রতি যে নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা "শূন্য"কে বৌদ্ধগণের "একচেটিয়া" সম্পত্তি করিয়া তুলিয়াছে। ইহাতে একটু আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। আর, তাহার যৎকিঞ্চিৎ কারণও দেখিতে পাওয়া যায়।

যখন কিছু ছিল না, তখন যাহা ছিল, তাহা, "শূন্য"। কিছু না হইতে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি আমাদের পৌরাণিক-কাহিনী। সুতরাং আমাদের পক্ষে "শূন্য" নূতন কথা হইতে পারে না। "শূন্য" ফাটিয়াই "পূর্ণ" বাহির হইয়া পড়িয়াছে;—নচেৎ স্রষ্টা জন্মিত না;—দেখিবার বস্তুকেও প্রাপ্ত হইত না। এতাবতা "শূন্য"কে আমাদের নিতান্ত অনাত্মীয় ও অপরিচিত বলা চলে না। অপিচ-তাহাকে বৌদ্ধ কল্পনা-প্রসূত আগন্তুক বলিয়া মনে করিতেও সাহস হয় না।

শ্রীমদানন্দ তীর্থ [পূর্ণপ্রজ্ঞ-দর্শনে] ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া, এক স্থানে [প্রথমাধ্যায়স্থ চতুর্থপাদে] প্রসঙ্গক্রমে "শূন্যে"র একটু আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি শ্রুতির মধ্যে অনুসন্ধান করিতে গিয়া, মহোপনিষৎ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলেন;—

"এষ হ্যেব শূন্য, এষ হ্যেব তুচ্ছ, এষ হ্যেবাভাব, এষ হ্যেবাব্যক্তোঽদৃশ্যোঽচিন্ত্যো নির্গুণশ্চেতি।"

ইনি [সেই পরম পুরুষ] "শূন্য"—ইনিই "তুচ্ছ"—ইনিই "অভাব"—ইনিই "অব্যক্ত—অদৃশ্য—অচিন্ত্য"-এবং "নির্গুণ"।

১৪। ভোগী—এ স্থলে এই শব্দটিকে ইহার অন্যতম অর্থ "গ্রামবৃদ্ধ" বা "নাপিত" অর্থে প্রযুক্ত বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

১৫। "দ্রোণ" শব্দটা অন্য কুত্রাপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু এই তাম্রশাসনে ভূমিবিভাগবিবরণপ্রসঙ্গে এই শব্দটির বহুবার প্রয়োগ দেখা যাইতেছে। শব্দটী বিশিষ্ট-পরিমাণযুক্ত কোনও ভূমিভাগকে বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

ইহাতে যদি বা কাহারও বুঝিবার অসুবিধা থাকিয়া যায়, তন্নিরসন-বাসনায়, শ্রীমদানন্দতীর্থ পুনরপি মহাকৌর্ম্ম-পুরাণ হইতে প্রমাণ তুলিয়া বুঝাইয়াছিলেন ;—সেই শূন্যই "বিষ্ণু"।

তৎ যথা,—

"শমূনং কুরুতে বিষ্ণুরদৃশ্যঃ সন্ পরঃ স্বয়ম্।
তস্মাচ্ছূন্যমিতি প্রোক্তস্তোদনাত্তুচ্ছ উচ্যতে॥
নৈষ ভাবয়িতুং যোগ্যঃ কেনচিৎ পুরুষোত্তমঃ।
অতোঽভাবং বদন্ত্যেনং নাশ্যত্বান্নাশ ইত্যপি॥"

মহোপনিষদের "শূন্য—তুচ্ছ—অভাবাদি" পারিভাষিক শব্দ। তদন্তর্গত "শূন্য—তুচ্ছ—অভাব"-শব্দের নিরুক্তি মহাকৌর্ম্ম-পুরাণে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।—তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে বলা হইয়াছে,—সেই পরাৎপর বিষ্ণু নিজে "অদৃশ্য" হইয়া থাকেন বলিয়া, তিনি "শম্ ঊনং" * করেন। সেই জন্যই বিষ্ণুকে "শূন্য" নামে অভিহিত করা হয়। তিনি যেমন "শম্ ঊনং" করেন, সেইরূপ "তোদন" করেন বলিয়া, তাঁহাকে "তুচ্ছ"-নামেও অভিহিত করা হয়। এই পুরুষোত্তম [শূন্যাবস্থায় অবস্থিত বিষ্ণু] কাহারও ভাবনার যোগ্য হইতে পারেন না বলিয়া, তাঁহাকে "অভাব" বলা হয়;—তাঁহাকে "নাশ"-নামেও অভিহিত করা হইয়া থাকে।

উপনিষদে ও পুরাণে পরম পুরুষকে যে অবস্থায় ও যে কারণে "শূন্য" নামে অভিহিত করা হইয়াছে, তন্ত্রে সেই অবস্থায় ও সেই কারণে শিবকেও "শূন্য" নামে অভিহিত করা হইয়াছে, এ বিষয়ে বৈদিকী ও তান্ত্রিকী শ্রুতির মধ্যে অসামঞ্জস্য নাই,—উভয়ে উভয়ের পক্ষ সমর্থন করে।

"শূন্য" ভাবনার অযোগ্য, [অতএব] "অভাব"-পদবাচ্য। তথাপি সাধককে শূন্যপ্রতিপাদ্য পরমপুরুষের সন্ধান-লাভের জন্য প্রথমে "শূন্য-ভাবনা" ধরিয়াই, সাধনার আরম্ভ করিতে হয়। কারণ, যাহা ঘটপটাদিরূপে বাহ্য দৃষ্টির সম্মুখে নিয়ত দেদীপ্যমান, তাহা জ্ঞান-চক্ষুকে আবৃত করিয়া রাখে। সে আবরণ সরাইয়া দিতে হইলে, "লয়ে"র সাধনায় সমস্ত দৃশ্যমানকে বিলীন করিয়া লইয়া, প্রথমে "শূন্যে"ই উপনীত হইতে হয়। তাহার পর, সেই "শূন্য" হইতে শিবশক্তি-সমাযোগে, উৎপত্তি-তত্ত্বের গুপ্ত রহস্য স্বপ্রকাশ হইয়া পড়ে।

---

* শমূনং কুরুতে শম্ ঊনং কুরুতে স্বসুখাৎ অন্য-সুখং অল্পং করোতি ইতি তত্ত্বপ্রকাশিকায়াম্।

এইরূপে "শূন্য" আমাদের সাধন-শাস্ত্রের গোড়ার কথা; রামাই পণ্ডিত তাহাই বুঝাইবার জন্য পাঁচালী রচনা করিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালা দেশের মামুলী "ধর্ম্মপূজা"কে বৌদ্ধপূজা বলিয়া ধরিয়া লইলে, যে গ্রন্থে সেই ধর্ম্মপূজার পরিচয় আছে, তাহাকে অগত্যা "বৌদ্ধশাস্ত্র" বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; এবং ধর্ম্মপূজা-কীর্ত্তনপরায়ণ রামাই পণ্ডিতকেও অবৌদ্ধ বলিবার উপায় থাকে না। তবে এ বিষয়েও একটু আপত্তি উঠিতে পারে; এবং তাহারও যৎকিঞ্চিৎ কারণ দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঙ্গালাদেশ যখন অর্ব্বাচীন বৌদ্ধাচারের লীলাভূমি হইয়া উঠিয়াছিল, তখন বাঙ্গালাদেশই তিব্বতের "গুরুস্থান" হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বাঙ্গালার কোন্ স্থানে কোন্ কোন্ হাড়ি-ডোম-চণ্ডালাদি নীচজাতি অর্ব্বাচীন বৌদ্ধাচারের প্রবর্ত্তক হইয়াছিল, কোন্ রাজা কোন্ স্থানে তাহাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল, এ সকল বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ বাঙ্গালাদেশ হইতে অধুনা বিলুপ্ত হইয়া গেলেও, তিব্বতে বংশানুক্রমে আলোচিত হইতেছে। তদবলম্বনে তিব্বতীয় লেখকগণ যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাও প্রচলিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে রামাই পণ্ডিতের পরিচয় থাকা এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। কুলশাস্ত্রের ন্যায় এই সকল শাস্ত্র যখন এখনও অপ্রকাশিত, তখন ভবিষ্যতে হয় ত প্রমাণ আবিষ্কৃত হইলেও হইতে পারে। যে পর্য্যন্ত তাহা আবিষ্কৃত না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত "ধর্ম্মপূজা"র আবিষ্কার নব্য-বঙ্গমনীষার এক অদ্বিতীয় কীর্ত্তিরূপে বিঘোষিত না হইলেই ভাল হইত। কিরূপে এই অচিন্তিতপূর্ব্ব ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, আবিষ্কর্ত্তা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্বয়ং তাহার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছেন। সে ইতিহাস তাঁহার ভাষায় এইরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যথা,—

"নানা কারণে আমার সংস্কার হইয়াছিল যে, ধর্ম্মমঙ্গলের ধর্ম্মঠাকুর বৌদ্ধধর্ম্মের পরিণাম। সুতরাং ধর্ম্মঠাকুর সম্বন্ধে কোন পুথি পাইলে তাহার সন্ধান করা, কেনা ও কপি করা একান্ত আবশ্যক, এ কথাটা আমি বেশ করিয়া বুঝিলাম। শুদ্ধ তাই নয়, যেখানে ধর্ম্মঠাকুরের মন্দির আছে, সেইখান হইতে মন্দির ও মন্দিরের দেবতার বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইবে এবং ধর্ম্মঠাকুর সম্বন্ধে চলিত ছড়াও সংগ্রহ করিতে হইবে। প্রথমেই মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল পাওয়া গেল। পুথির মালিক ছাড়িয়া দিতে চায় না, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সেজ ভাই শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন জামিন হইয়া মাসিক ১০৲ দশ টাকা ভাড়ায় আমাকে ঐ পুথি পাঠাইয়া দেন, আমি বাড়ী বসিয়া তাহা

কপি করাই। সে পুথি বহুদিন হইল সাহিত্য-পরিষদে ছাপা হইয়া গিয়াছে। আর একখানি পাইয়াছিলাম—শূন্যপুরাণ, রামাই পণ্ডিতের লেখা। ধর্ম্মঠাকুরের পূজা-পদ্ধতি অর্দ্ধেক আছে এবং তাহার শেষে 'নিরঞ্জনের উষ্মা' নামে একটি রামাই পণ্ডিতের লম্বা ছড়া আছে। সে ছড়া পড়িলে ধর্ম্মঠাকুর যে হিন্দু ও মুসলমানের বাহির, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। ব্রাহ্মণের অত্যাচারে অত্যন্ত প্রপীড়িত হইয়া ধর্ম্মঠাকুরের সেবকগণ তাঁহার নিকট উদ্ধার কামনা করিল। তিনি যবনরূপে অবতীর্ণ হইয়া ব্রাহ্মণদিগের সর্ব্বনাশ করিলেন। রামাই ঠাকুরের ছড়াগুলি নিশ্চয় মুসলমান অধিকারের পরে লেখা হইয়াছিল। বেশী পরেও নয়, মুসলমানরা ব্রাহ্মণদের জব্দ করিয়াছিল দেখিয়া ধর্ম্মঠাকুরের দল খুসী হইল; অথবা ইহাও হইতে পারে, তাহারাই মুসলমানকে ডাকিয়া আনিয়াছিল।* শূন্যপুরাণ সাহিত্য-পরিষদ ছাপাইয়াছেন। আর একখানি পুস্তক পাইয়াছিলাম, অনেক কষ্টে, অনেক পরিশ্রমের পর, ময়ূরভট্টের ধর্ম্মমঙ্গল; সেখানি বোধ হয়, পঞ্চদশ শতাব্দীর লেখা; কারণ, তাহাতে রাঢ়দেশে বর্দ্ধমান ও মঙ্গলকোট প্রধান জায়গা। আর একখানি পুস্তক পাইয়াছিলাম, তাহা না বাঙ্গালা, না সংস্কৃত, এক অপরূপ ভাষায় লিখিত। মঙ্গলাচরণ-শ্লোকের শেষে আছে,—"বক্তি শ্রীরঘুনন্দনঃ।" অর্থাৎ যিনি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তিনি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে চান যে, তাহা রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি-তত্ত্বের এক তত্ত্ব; সুতরাং হিন্দুদিগের একখানি প্রমাণ-গ্রন্থ। উহাতে ধর্ম্মঠাকুরের ও তাঁহার আবরণ-দেবতাগণের উল্লেখ ও তাঁহাদের পূজা-পদ্ধতির ব্যবস্থা আছে। এই পুথিখানি হইতে আরও বুঝিতে হইবে যে, রঘুনন্দনেরও পরে বাঙ্গালা দেশে এত বৌদ্ধ ছিল যে, তাহাদের জন্য একখানি তত্ত্ব লেখাও আবশ্যক হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুও আমার মত অনেক পুথি সংগ্রহ করিয়া এখন ইউনিভারসিটীকে দিয়াছেন। আমি প্রায় পাঁচ শত পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

"এই সময়ে কুমিল্লা স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র সেন বি এ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস লিখিবেন বলিয়া এসিয়াটিক সোসাইটীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। দীনেশবাবুর সাহায্যে পরাগলির মহাভারত, ছুটিখাঁর অশ্বমেধপর্ব্ব প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ খরিদ হয়।

"যখন ধর্ম্মঠাকুর সম্বন্ধে অনেকগুলি পুথি সংগ্রহ হইল এবং অনেক বৃত্তান্ত পাওয়া গেল, তখন ধর্ম্মঠাকুর যে বৌদ্ধ, ঐ সম্বন্ধে বাঙ্গালায় যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে, তাহার একটা ইতিহাস লিখিয়া রাখিয়া নেপালে হিন্দুরাজের অধীনে বৌদ্ধ ধর্ম্ম কিরূপ চলিতেছে, দেখিতে যাইলাম।

"আমি নেপাল হইতে আসিয়া প্রকাশ্যে বলিয়া দিই, ধর্ম্মঠাকুরের পূজাই বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ। তাহা শুনিয়া এক জন বলিয়াছিলেন,—ছিঃ! জেলে মালারা যে ধর্ম্মঠাকুরের পূজা করে, সে ধর্ম্মঠাকুর কিনা বৌদ্ধ! ছিঃ!"

* অতঃপর কেহ মুসলমান অভিযানের এইরূপ হেতুমূলক একখানি ইতিহাস লিখিয়া ফেলিলে, বিস্মিত হইবার কারণ থাকিবে না। যখন মধ্যযুগের ইউরোপে অনেকস্থলে রাজ-বিপ্লবের মূলে ধর্ম্মবিপ্লব দেখা যায়, তখন ভারতবর্ষের ইতিহাসেও তাহার দুই চারিটা উদাহরণ না থাকিলে, আমরা খাটো হইয়া যাইতাম। সৌভাগ্যক্রমে কিছুদিন পূর্ব্বে মৌর্য্যসাম্রাজ্যের অধঃপতনের মূলে ধর্ম্মবিপ্লব বাহির হইয়াছিল; সম্প্রতি বাঙ্গালার কৈবর্ত্তবিপ্লবের মূলেও ধর্ম্ম-বিপ্লবের ধূয়া গুণগুণ করিয়া উঠিয়াছে; এখন বঙ্গে মুসলমান-আগমনের মূলে ধর্ম্মবিপ্লব বাহির হইয়া পড়িলে, আমরা নিশ্চয়ই ইউরোপকে হারাইয়া দিতে পারিব।

শাস্ত্রী মহাশয়ের ন্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ নিষ্ঠাবান্ হিন্দু লেখকের লেখনী-প্রসূত [হিন্দুগণের গ্লানিজনক] এই নবাবিষ্কারের ইতিহাস পুনর্মুদ্রিত করিয়া, "প্রবাসী" উহাকে আহ্লাদের সঙ্গেই বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে ছড়াইয়া দিয়াছেন। কেবল কৌতুকের বিষয় এই যে, যাহা এই ইতিহাসের গোড়ার কথা, ইহাতে সেই কথাটারই প্রমাণ উল্লিখিত হয় নাই। "নানা কারণে" শাস্ত্রী মহাশয়ের "সংস্কার হইয়াছিল যে ধর্ম্মমঙ্গলের ধর্ম্মঠাকুর বৌদ্ধধর্ম্মের পরিণাম"। সেই "নানা কারণে"র একটিমাত্র "কারণ" উল্লিখিত হইলেও, তাহার সামর্থ্য বিচার করিয়া দেখিবার সুযোগ ঘটিত। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় সে সুযোগদানে কৃপণতা করিয়াছেন। লোকেও তাহা জানিবার জন্য কৌতূহল প্রকাশ করে নাই,—সকলই হয় ত ধরিয়া লইয়াছে যে, যখন শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, তখন অবশ্যই "কারণে"র অভাব নাই;—তাহার সামর্থ্যেরও অভাব থাকিতে পারে না।

এই নবাবিষ্কৃত তথ্য যদি বাঙ্গালার ঐতিহাসিক তথ্য হয়, তবে বাঙ্গালী হিন্দুমাত্রই যে এখনও বৌদ্ধাচার-নিরত, সে বিষয়ে আর সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না। কিন্তু কথাটা কি সত্য? শাস্ত্রী মহাশয় স্বয়ং যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতেই সংশয়কে আরও প্রবল করিয়া তুলিয়াছেন। "বক্তি শ্রীরঘুনন্দনঃ"—ভণিতিযুক্ত পুথিখানি যে স্মার্ত্তচূড়ামণি রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি-তত্ত্বের অন্তর্গত নহে, তাহা সহজেই জানিতে পারা যায়। উহা অন্য যে কোনও রঘুনন্দনেরই রচিত হউক না কেন, উহাতে যখন "ধর্ম্মঠাকুরের ও তাঁহার আবরণ-দেবতাগণের উল্লেখ ও তাঁহাদের পূজা-পদ্ধতির ব্যবস্থা আছে" বলিয়া শাস্ত্রী মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন, তখন উহা হইতে বৌদ্ধত্ব-দ্যোতক দুই চারিটি প্রমাণ তুলিয়া দিলেই সকল সংশয় নিরস্ত হইয়া যাইত। তাহা করিতে না পারিয়া, তিনি একটি আনুমানিক সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়া, ব্যবস্থা দিয়াছেন,—"এই পুথিখানি হইতে আরও বুঝিতে হইবে যে, রঘুনন্দনেরও পরে বাঙ্গালা দেশে এত বৌদ্ধ ছিল যে, তাহাদের জন্য একখানি তত্ত্ব লেখাও আবশ্যক হইয়াছিল।" এখানেও গ্রন্থোক্ত প্রমাণের কথা নাই; আছে কেবল শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুমানপ্রসূত নিজের কথা। তাহা তাঁহার শিষ্যবর্গের পক্ষে "আপ্তবাক্য" হইলেও, সর্ব্বসাধারণের জন্য অন্য প্রমাণ আবশ্যক।

একদা বাঙ্গালাদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল হইয়াছিল;—তাহা অনেক দিন

ধরিয়া অনেক প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছিল ;—হয় ত বাঙ্গালা ভাষায় "বৌদ্ধপূজা-পদ্ধতি"র পুথিপাঁচালী-ছড়াকীর্ত্তনাদিও রচিত হইয়াছিল। তাহার কিছু কিছু আবিষ্কৃত হইয়া থাকিলে, ভাল কথা। তাহাতে পুরাতত্ত্বের উপকার সাধিত হইবে। তাহার কথা আপাততঃ জিজ্ঞাস্য নহে। জিজ্ঞাস্য এই যে,—বাঙ্গালার "ধর্ম্মপূজা" যে "বৌদ্ধপূজা," তাহার প্রমাণ কি ? তাহাকে শৈবাচারের পরিণাম বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষে আপত্তি কি ? "ধর্ম্মপূজা"র প্রমাণ-রূপে যে শূন্য-পুরাণের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহাতে "উলূকে"র কথা আছে,—কিন্তু কোনও বৌদ্ধগ্রন্থে বা শূন্যপুরাণে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। পরিচয় পাওয়া গিয়াছে শৈব তন্ত্রে। তাহারও গোড়ার কথা "শূন্যে"র কথা,—শূন্যরূপী শিবের কথা, সুতরাং "ধর্ম্মপূজা"কে শৈবাচারের পরিণাম বলিয়া স্বীকার করিবার পক্ষে বাধা দেখা যায় না। শিবলিঙ্গার্চ্চন ব্রাহ্মণমাত্রের নিত্য কর্ত্তব্য ; এখনও তাহা তিরোহিত হয় নাই, তাহার অঙ্গীভূত "ধর্ম্মপূজা"ও ঘরে ঘরেই চলিতেছে। তাহা যদি "বৌদ্ধপূজা" হইয়া যায়, তবে এই নবাবিষ্কারকে সত্য সত্যই বঙ্গমনীষার অদ্বিতীয় কীর্ত্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু প্রমাণ ? প্রমাণ না থাকিলে, সকলকেই বলিতে হইবে,—ছিঃ !

শ্রীসতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।

বিদেশী গল্প।

তৃষ্ণা।

ভেলা ভাসিয়া চলিয়াছে ! বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, স্রোতোবেগে ভেলা ভাসিয়াই চলিয়াছে !

পাঁচ দিন, পাঁচ রাত্রি কাষ্ঠভেলা সমুদ্রোপরি ভাসিতেছে, তরঙ্গতাড়নে ইচ্ছামত ও ভাঁটার টানে অনির্দ্দিষ্ট রাজ্যে চলিয়াছে। শীতল, নিরানন্দময় রজনীর অন্ধকারে ভাসিতে ভাসিতে ভেলা আর্দ্র, কুজ্ঝটিকা-সমাচ্ছন্ন প্রভাতে এবং ক্রমে, শুভ্র, প্রচণ্ড-রৌদ্রদগ্ধ দিবাভাগ অতিক্রম করিয়া সারাপথে চলিয়াছে। ভারতবর্ষ তখন পশ্চাতে, উত্তরপূর্ব্ব দিক্‌চক্রবালে মিলাইয়া গিয়াছে। জলমগ্ন জাহাজের পরিত্যক্ত আরোহীগুলি কল্পনানেত্রে প্রতিমুহূর্ত্তে বহুদূরে জাহাজের উড্ডীয়মান পাল যেন দেখিতে পাইতেছিল।

প্রখর সূর্য্যাতপ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ভেলার সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগে ত্রিপল এবং ভগ্ন দাঁড়ের সাহায্যে দুইটি স্বতন্ত্র ছাউনি নির্ম্মিত হইয়াছে। ভেলাটি দেখিতে অনেকটা চৈনিক

সাম্পানের ন্যায়। কিন্তু বস্ত্রাচ্ছাদনের মধ্যবর্ত্তী কাষ্ঠখণ্ডে দোদুল্যমান রক্ত ও শ্বেতবর্ণের জামা দেখিলে সে ভ্রম অপনোদিত হয়।

ভেলায় পাঁচটি পুরুষ, একটি রমণী ও একটী চারি বৎসরবয়স্ক বালকমাত্র আরোহী। পুরুষগণ সম্মুখস্থিত ছাউনির নীচে জড়সড়ভাবে শুইয়াছিল। এক ব্যক্তি তাহার ক্ষত পদতল সমুদ্রের উষ্ণ সলিলমধ্যে নিমগ্ন করিয়া ভেলার প্রান্তদেশে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়াছিল। তাহার আশঙ্কা হইতেছিল, পাছে স্রোতোবেগে সে ভাসিয়া যায়।

পাঁচ দিন ও পাঁচ রাত্রি ভেলা অনির্দ্দিষ্ট সমুদ্রপথে এই ভাবে ভাসিতেছে।

ভেলার পশ্চাতে ছাউনির নিম্নে রমণী তাহার পুত্রসহ পড়িয়া আছে। কি কষ্টে, কি যন্ত্রণায় এই কয় দিন যে যাইতেছে, তাহা শুধু ভগবানই জানেন। এখন মৃত্যু না আসিলে এ যন্ত্রণার অবসান হইবে না। কিন্তু তথাপি সেও অন্যের ন্যায় জীবনের আশা একেবারে পরিত্যাগ করে নাই। নৈরাশ্যের বিভীষিকা তাহার চিত্তকে অধীর করিয়া তুলিতেছিল, কিন্তু রমণী ধৈর্য্য ও সাহসসহকারে হৃদয়ের এই দুর্ব্বলতা দমন করিবার চেষ্টা করিতেছিল। মূর্খা নারীর ন্যায় জীবনের সঙ্কট-সময়ে জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে সে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ে নাই।

তাহার পদতলে শায়িত নিদ্রিত বালক মাঝে মাঝে চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল, নিমীলিত নয়নের উপর ক্ষুদ্র বাহু রক্ষা করিয়া মাঝে মাঝে অস্ফুটস্বরে সে জল চাহিতেছিল।

রমণী অমনই চকিতভাবে সম্মুখবর্ত্তী ছাউনির অন্তরালে শায়িত পুরুষগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল। বালকের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত ক্ষীণ ও অস্ফুট হইলেও পুরুষগুলির কর্ণগোচর হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। সহসা রমণী দেখিল, এক ব্যক্তি মাথা তুলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে। লোকটার নয়নে জীবনীশক্তির চিহ্ন যেন ম্লান হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু তথাপি সে দৃষ্টি যেন রমণীকে চঞ্চল করিয়া তুলিল।

কণ্ঠস্বর উচ্চে তুলিয়া রমণী বলিল, "এখনও সময় হয় নাই, বাবা!" সে ভাবিয়াছিল, এই কথা বলিলেই লোকটি নিশ্চিন্ত হইয়া আবার শয়ন করিবে।

রমণী বালককে অঙ্কে তুলিয়া লইল। তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বসনের অন্তরালস্থিত লুক্কায়িত পানীয়পূর্ণ পাত্রের নলটি সুকৌশলে তাহার মুখে সংলগ্ন করিয়া দিল।

সীমাহীন, অন্তহীন ধূসর সমুদ্র সম্মুখে প্রসারিত। পার নাই, কূল নাই; অনন্ত, অসীম, নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর সমুদ্র! দূরে শুধুই বারিবিস্তার—আকাশ ও জল মিশিয়া গিয়াছে। রমণীর কণ্ঠতালু শুষ্ক, নীরস। ভেলার প্রান্তে তরঙ্গহীন সমুদ্র-সলিলের ছলছলাৎ শব্দ কি নৈরাশ্যপূর্ণ—ভীষণ!

বালক জলপানের পর মৃদু-ক্ষীণ-কণ্ঠে জননীর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। মাতা পুত্রকে কথা কহিতে নিষেধ করিয়াছিল, পাছে কেহ শুনিতে পায়। কিন্তু বালক নিষেধ মানিল না। সে হৃদয়ের আবেগে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া ফেলিল। যে লোকটি ইতিপূর্ব্বে মাথা তুলিয়া দেখিতেছিল, সে আবার উঠিল। ভীতা রমণীর দিকে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে অস্ফুট-স্বরে বলিল, "জল কোথায়?"

রমণী তাহার পার্শ্বস্থিত একটি জলপাত্র দেখাইয়া দিল। সর্দ্দার নাবিক পানীয়পূর্ণ পাত্রটি তাহারই জিম্মায় রাখিয়াছিল।

রমণী বলিল, "কোনও ভয় নাই, জল ঠিক আছে, এখন শুইয়া থাক।"

লোকটি একবার চারি দিকে চাহিয়া দেখিল। সে বুঝিল, সকলেই গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন। সে কাতরস্বরে বলিল, "এক ফোঁটা জল দাও।" তাহার শুষ্ক স্ফীত কৃষ্ণবর্ণ জিহ্বা মুখবিবর হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল।

"আমি পারিব না। সে সাহস আমার নাই। তুমি শুয়ে পড়।"

রমণী পানীয়পূর্ণ আধারটি পরিধেয় বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিল।

"একটু জল দাও—না দিলে আমি সকলকে বলিয়া দিব।"

লোকটি বালককে দেখাইয়া দিল।

সে হামা দিয়া ক্রমশঃ রমণীর সন্নিহিত হইতেছিল। পুরুষটির চক্ষুতারকার চতুষ্পার্শ্বস্থ রক্তরেখা রমণীর দৃষ্টি এড়াইল না। তাহার ওষ্ঠযুগল রক্তহীন এবং স্বাভাবিক অবস্থার দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। সে যখন তাহার বসনের প্রান্ত আকর্ষণ করিবার জন্য হস্ত উদ্যত করিল, তখন তাহার অঙ্গুলির নখগুলি দেখিয়া রমণী শিহরিয়া উঠিল। নখগুলি কাচের ন্যায় শাদা হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে যেন ঈষৎ নীলবর্ণের আভা বিজড়িত।

রুদ্ধনিশ্বাসে রমণী বলিল, "শীঘ্র চ'লে যাও! উহারা জানিতে পারিলে তোমায় মারিয়া ফেলিবে। মোটে এক গ্যালন জল আছে।"

"এক গ্যালন!"—তাহার নিষ্প্রভ নয়নে সহসা একটা আলোক-রেখা নৃত্য করিয়া উঠিল, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন তাড়িতস্পৃষ্টের ন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। "এক গ্যালন জল আছে! একবার আমাকে দেখ্‌তে দাও—এক ফোঁটা জল পান করতে দাও, শুধু এক চুমুক—বেশী নয়। ওরা কেউ জান্‌তে পারবে না!"

রমণী মাথা নাড়িল। তাহারও কণ্ঠতালু শুষ্ক ও জিহ্বা স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল।

"সর্দ্দার যখন ভাগ করে দেবেন, তখন পাইবে। তার আগে নয়।"

"আমি এখনই চাই।" তাহার রক্তবর্ণ নেত্রে উন্মত্ততার চিহ্ন পরিস্ফুট হইল। রমণী মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। পুরুষ বলিল, "জল তোমার নয়, আমাদের। তুমি ও তোমার ছেলে যদি এখানে না আসিতে, আমরা আরও বেশী জল পেতাম।"

পুরুষটি ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া রমণী শঙ্কিতভাবে সরিয়া বসিল; অমনই বস্ত্রাবৃত জলাধার সে দেখিতে পাইল।

লোকটা আনন্দের আতিশয্যে সম্মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

রমণী উত্থিতপ্রায় চীৎকার রুদ্ধ করিল। সে অস্ফুট মৃদু কণ্ঠরবে ক্রোড়ের বালকও নয়ন উন্মীলিত করিল না; কিন্তু অত মৃদু শব্দেও অপর ছাউনীর অন্তরালাশ্রিত লোকগুলির নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাহারা সকলে সম্মুখে অগ্রসর হইল।

তাহারা যে ভাবে আসিতেছিল, তাহাতে বেশ বোঝা গেল—সাংঘাতিক কিছু ঘটিবে। পুরুষটি যতই ভীত হউক না কেন, রমণীর হৃদয় বিভীষিকায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। লোকটি তখনও রমণীর জানু ধারণ করিয়া ছিল।

লোকগুলি হাঁমা দিয়া অগ্রসর হইতেছিল। তাহাদের গতিতে বিন্দুমাত্র ব্যস্ততা ছিল না; তাহারা যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছিল, রমণীর আর্ত্তনাদ ততই স্পষ্ট ও প্রবল হইতেছিল। সর্দ্দারটি যুবাপুরুষ। লিভারপুলে তাহার গৃহ। যুবক যখন পানীয়চোরের মস্তকের কেশগুচ্ছ ধারণ করিল, রমণী আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া তখন আরও উচ্চে চীৎকার করিয়া উঠিল।

লোকটা আত্মরক্ষার জন্ম কোনও চেষ্টা করিল না। বরং তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে হাস্যরেখা দেখা গেল। সে বুঝিল, অসহ্য অবর্ণনীয় যন্ত্রণা হইতে এইবার সে মুক্তিলাভ করিবে। আর তাহাকে তিল তিল করিয়া মৃত্যু-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে না। মুক্তি আসন্ন। সর্দ্দার নাবিক রমণীকে অস্ফুটস্বরে বলিল, "ত্রিপল টানিয়া দিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা কর। ছেলেটি কেমন আছে?"

রমণী সে প্রশ্নের উত্তর দিবার কোন চেষ্টা করিল না। যুবকও সেজন্য বিশেষ চিন্তিত ছিল না। যুবতী ত্রিপল টানিয়া মুক্ত পথ বন্ধ করিল, তার পর পুত্রকে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিল।

রমণী নয়নযুগল নিমীলিত করিয়া অতীত কাহিনীগুলি মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল। একমাস পূর্ব্বের ঘটনাগুলি তাহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। "জেনেট" জাহাজে চড়িয়া লিভারপুল হইতে রেঙ্গুনে যাত্রা করিবার পূর্ব্বের কথা মনে পড়িতে লাগিল।

একমাস পূর্ব্বে সে স্কট্ল্যাণ্ডের পল্লীগ্রামে—নিজের গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া ছিল; দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে খঞ্জ ডাকহরকরার প্রতীক্ষা করিতেছিল। পিয়ন যথাসময়ে আকাঙ্ক্ষিত পত্র তাহার হাতে দিয়া গেল। সে সাগ্রহে তাহার স্বামীর পত্র পাঠ করিল। তাহার স্বামী ডেভিড সবে এক বৎসর হইল ইঞ্জিনীয়ার হইয়া রেঙ্গুনে কার্য্য করিতে গিয়াছেন। পত্রখানি এইরূপ:—

"তোমার জন্য একটি চমৎকার বাড়ী তৈয়ার করাইয়াছি। রুথ, আমার পুত্রটিকে লইয়া তুমি চলিয়া আইস। নগরে তুমি বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তির সহিত থাকিবে। এখানে চারি বৎসর বাস করিবার পর আমরা গৃহে ফিরিয়া যাইব। তখন একটা গোলাবাড়ী কিনিয়া অথবা অন্য কোন লাভজনক ব্যবসায় দ্বারা দেশে জীবন যাপন করা যাইবে। ষ্টীমারে আসিতে তোমার ভয় হইবে না ত? ভয় কি? তুমি ত ভীরু নহ। "জেনেট" জাহাজের অধ্যক্ষ পর্ভিস্ আমার বিশেষ বন্ধু। তোমার ও বালকের যাহাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয়, সে বিষয়ে তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। আর মনে রাখিও, আমিও তোমার আশাপথ চাহিয়া রহিলাম।"

সাহস! সে ত যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়াছে। জাহাজের সকলেই তাহার দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার যাবতীয় অসুবিধা দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এইমাত্র যে তৃষ্ণাতুর উন্মত্ত ব্যক্তি তাহার বসনপ্রান্ত ধরিয়া টানাটানি করিতেছিল, সেও তাহার জীবনরক্ষার জন্য কত চেষ্টাই না করিয়াছিল। অতীত কাহিনীগুলি উজ্জ্বলবর্ণে তাহার নয়নসমক্ষে প্রতিভাত হইল।

"মা, ও কি?"

বালক চমকিয়া উঠিল। তুষারশুভ্র করপুটে সে মাতার বসনপ্রান্ত চাপিয়া ধরিল।

"বাবা ডেভিড, ও কিছু নয়। সমুদ্রচর পক্ষী ডাকিতেছে, উহা তাহারই শব্দ।"

জননী পুত্রের নয়নে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু উদ্‌গ্রীবভাবে সে কান খাড়া করিয়া রহিল। সে বুঝিতে পারিল, কোন ভারী দ্রব্য তাহারা টানিয়া লইয়া যাইতেছে। রমণী ইত্যবসরে নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া আসন্ন দুর্ঘটনার জন্য মনকে প্রস্তুত করিয়া রাখিল।

সমুদ্রজলে গুরুভার দ্রব্য-পতনের শব্দ মিলাইয়া যাইবার পরে সে একটা কাষ্ঠদণ্ডের উপর পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিয়া শুইয়া রহিল। তাহার নয়নপ্রান্তে মুক্তাবিন্দুর ন্যায় অশ্রু দুলিতেছিল।

বালক মাথা তুলিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "মা, বাবা আমাদের জন্য বড় ভাব্‌ছেন, না?"

"হ্যাঁ ডেভিড্, বোধ হয় তিনি ভাবিতেছেন। কিন্তু তুমি ঘুমিয়ে পড়। তোমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে হয়ত তাঁকে এখানেই তুমি দেখিতে পাইবে।"

"মা, বড় পিপাসা!"

ক্রন্দন বুকের মধ্যে গুঞ্জরিয়া উঠিতেছিল; যুবতী উচ্ছ্বসিত আবেগ দমন করিয়া বালককে লুকায়িত পানীয়ের আধার হইতে কিছু জলপান করিতে দিল; সর্দ্দার নাবিক ঐ জলাধারটি গোপনে তাহাকে দিয়াছিল। কারণ, সে জানিত, শিশুর পানতৃষ্ণা প্রতিমুহূর্ত্তেই সম্ভবপর। রমণীকে সে বলিয়া দিয়াছিল, অন্য কেহ যেন পাত্রটি দেখিতে না পায়।

"ডেভিড্, তুমি অত জল খেয়ো না, বাবা। অত জল খাওয়া ভাল নয়। তোমার মা এখনও পর্য্যন্ত এক ফোঁটা—"

"বাবার কাছে ঢের জল আছে, না মা?"

যুবতী তাড়াতাড়ি বলিল, "তাঁর জন্য একটু জল রাখ্‌বে না? তাই বল্‌ছি, বেশী জল খেয়ো না।"

"তাঁর জন্য রাখ্‌বো বৈ কি। কিন্তু মা, আমি বাজী রাখ্‌তে পারি, আমার মত বাবার কখনও এত পিপাসা নেই।"

"তুমি বীর বালক।"

মাতার কথায় বালক পুনরায় জননীর ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া শয়ন করিল।

যে রজনীতে "জেনেট" জাহাজ জলমগ্ন শৈলে আহত হয়, সেই ভীমা রজনীর ভীষণ কাহিনী রমণীর স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। সে কি ভীষণ দৃশ্য!

লোহিতসাগরের নিস্তরঙ্গ প্রশান্ত জলরাশি অতিক্রম করিবার পর এই দুর্ঘটনা ঘটে। তখন জাহাজ আরবদেশের মরুভূমি পশ্চাতে ফেলিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিল। ভগবানের নিদর্শন-আলোকের ন্যায় পূর্ণচন্দ্র আকাশপ্রান্তে দুলিতেছিল। প্রকৃতি হাস্যময়ী, মধুরা, আলোকোজ্জ্বলা।

সেই মধুর পূর্ণিমারজনীতে এই ভীষণ কাণ্ড সংঘটিত হইল। জলমগ্ন শৈলে আহত হইয়া জাহাজ ভাঙ্গিয়া গেল। নৌকাগুলি নামাইবার অবসর হইল না। কাপ্তেন পর্ভিস্ সমগ্র নাবিককে সমবেত করিবার পূর্ব্বেই জাহাজ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া সমুদ্র-সমাধি লাভ করিল।

সময় বুঝিয়া বাতাস প্রবল হইল, সমুদ্রও গর্জ্জন করিয়া উঠিল। জাহাজ দ্বিধা বিভক্ত হইবার পূর্ব্বে জাহাজের নৌকা তিনখানি দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়াছিল। শৈলসংলগ্ন জাহাজের

গলুইয়ের উপর অপেক্ষা করা বিপজ্জনক। নৌকা ফিরিয়া আসিয়া বাকী সকলকে উদ্ধার করিবে, সে আশা সুদূরপরাহত। কারণ, তৎপূর্ব্বে মৃত্যু আসিয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিবে।

তিনখানি ভেলা অবিলম্বে নির্ম্মিত হইল। সামান্য আহার্য্য ধ্বংসাবশেষ জাহাজ হইতে সংগ্রহ করিয়া ভেলার উপর স্থাপিত হইল। তার পর কি ঘটিয়াছিল, তাহা স্মরণ হয় না। বিস্মৃতির কুহেলিকার আবরণে পরবর্ত্তী ঘটনা আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।

আশার উত্তুঙ্গ গিরিশিখর হইতে হতভাগী নৈরাশ্যের অন্ধতম গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। কত আশা, কত আনন্দ ও উল্লাস হৃদয়ে লইয়া সে স্বামিসকাশে যাইতেছিল, অকস্মাৎ অদৃষ্ট-চক্রের এ কি ঘোর পরিবর্ত্তন! এখন সে সহজাত বুদ্ধিপ্রভাবে বুঝিতে পারিয়াছে, তাহার পুত্রের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। তাহার পুত্র সম্বন্ধে শীঘ্রই কোন দুর্ঘটনা ঘটিবে।

নিজের সম্বন্ধে তাহার কোনই চিন্তা ছিল না। সে অবস্থা বহুক্ষণ অতীত হইয়া গিয়াছে। প্রখর রৌদ্রের ভীষণ উত্তাপ এবং দুর্দ্দমনীয় পানতৃষ্ণা তাহার চিত্তে প্রথমতঃ যে বিভীষিকার সঞ্চার করিয়াছিল, এখন তাহার প্রভাব অনেকটা সে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে।

এখন সন্তানের শুভাশুভই রমণীর প্রধান চিন্তনীয় বিষয়। যদি শুধু নিজের বিষয় হইত, তাহা হইলে এতক্ষণ কোন্ কালে সে অলক্ষ্যে সমুদ্রগর্ভে দেহ বিসর্জ্জন করিয়া সকল যন্ত্রণার জ্বালা জুড়াইত। সমুদ্রের রহস্যময় অতলস্পর্শ ক্রোড়ে সে চিরবিশ্রামস্থল খুঁজিয়া লইত। কিন্তু বিভীষিকার রহস্য-যবনিকার অন্তরালে সে তাহার পুত্রের ভীষণ বিপদের ছায়া যেন দেখিতে পাইতেছিল।

সে বিপদ যে কি, তাহা সে পূর্ব্বে স্পষ্ট বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু এক ঘণ্টা পূর্ব্বে জলচোরের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহার মনের অন্ধকার যেন কিছু সরিয়া গিয়াছে। বিপদটি যে কি, সে যেন তাহা কিছু কিছু অনুমান করিতে পারিয়াছিল।

সর্দ্দার নাবিক হামা দিয়া জলপাত্রের সম্মুখে আসিল। প্রত্যহ সকলকে যেমন পানীয় ভাগ করিয়া দেয়, আজও সেইরূপ ভাবে জল বণ্টন করিয়া দিল। সেই সময় অস্ফুটস্বরে সে যেন কি বলিয়া উঠিল। তাহার মুখমণ্ডল সে সময় অত্যন্ত পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, ললাটে নিদারুণ চিন্তার রেখা দেখা গেল। তাহার পশ্চাতে তিন জন নাবিকও আসিয়াছিল। সর্দ্দার রমণীর দিকে চাহিল। রমণীর ওষ্ঠ কম্পিত হইল; ভগ্নকণ্ঠে সে উচ্চারণ করিল, "আজ একজন লোক কম।"

কয়েক ফোঁটা জল রমণীকে দিয়া সর্দ্দার তিন ব্যক্তিকে তাহাদের অংশের পানীয় দিল। তার পর স্বয়ং জীবনীশক্তি-সংস্কারক তরল পদার্থটুকু পান করিল। তার পর যখন সে পানীয়ের আধারের মুখ বন্ধ করিতে উদ্যত হইল, যেন নীরব দৃষ্টিতে রমণী সর্দ্দারের পানে চাহিল।

মাতৃ-অঙ্কে শায়িত বালকের দিকে চাহিয়া পুরুষ বলিল, "ছেলেটি এখনও ঘুমাইয়া আছে।"

রমণী বালককে জাগাইয়া দিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে বলিল। সে জানিত, তাহার বক্ষঃস্থলে লুক্কায়িত আধারে বিন্দুমাত্র জল নাই। পুত্র যদি জলপান করিতে না পায়, তবে ছয় ঘণ্টার মধ্যে বিন্দুমাত্র জল পাইবার প্রত্যাশা নাই। কারণ, ছয় ঘণ্টার পূর্ব্বে আর জল বিতরিত হইবে না।

সর্দ্দার নাবিক বালককে কিছু জলপান করিতে দিল। আশাপূর্ণকণ্ঠে বালক যখন বলিল, "বাবা এসেছেন কি ?" তখন তাহার নয়নযুগল ঈষৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

রমণীর কানে কানে পুরুষ বলিল, "এখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর। তিন দিনের মত জল আছে।"

শিরঃসঞ্চালনপূর্ব্বক, সর্দ্দার নাবিক রমণীর দিকে পশ্চাৎ ফিরিল। সঙ্গীদিগকে তাহার অনুবর্ত্তী হইতে আদেশ করিল।

কিন্তু সঙ্গি-ত্রয়ের মধ্যে যে বলিষ্ঠ, সে অতিকষ্টে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া আপনার কণ্ঠনালীতে হাত দিয়া বলিল, "আরও জল। ছোকরাকে জল দিলে কেন? বাড়ীতে আমারও ছেলে মেয়ে আছে। দাও, আরও জল দাও !"

সে জলপাত্রের দিকে দুই পদ অগ্রসর হইল। তাহার মস্তিকে তখন উন্মত্ততার সঞ্চার হইয়াছিল।

"আরও জল ! জল !"

লোকটা তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। তার পর জলপাত্রের দিকে অগ্রসর হইল।

খানিকটা শ্বেত ধূম উত্থিত হইল, একটা শব্দ উত্থিত হইয়া সমুদ্রতরঙ্গে মিলাইয়া গেল। উন্মত্ত ব্যক্তি সশব্দে ভেলার উপর পড়িয়া গেল।

কাহারও মুখে একটি শব্দ নাই। এমন কি, মাতৃ-অঙ্কে শায়িত ভীত বালকটিও একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করিল না। শুধু নাবিকের সর্দ্দার তাহার দক্ষিণ হস্তে ধৃত ধূমায়মান পিস্তলটি ত্রিপলে মুছিয়া লইল। তার পর বাম হস্তের তিনটি অঙ্গুলি উত্থিত করিল। সঙ্গী দুইটি তাহার ইঙ্গিত বুঝিল, এবং ধীরে ধীরে হামা দিয়া ভেলার অপর অংশে চলিয়া গেল।

ভেলা ভাসিয়া চলিয়াছে ! বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই—অনির্দ্দিষ্ট রাজ্যে ভাসিয়া চলিয়াছে ! কোথায় তাহার শেষ, কে জানে ! বিশাল সমুদ্রবক্ষে, অনন্ত অপার সলিলরাশির উপর রৌদ্র-তাপ-দগ্ধ ভেলা দুলিয়া দুলিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে !

ভেলা চলিয়াছে ! ক্রমে ক্রমে রমণীর পার্শ্বস্থিত জলাধারের পানীয়ও হ্রাস পাইয়া আসিতেছে। রমণী এক একবার ভাবিতেছিল, জলাধার শূন্য হইয়া পড়িয়াছে; ইহা আবিষ্কৃত হইলে কি ঘটিবে! সর্দ্দার নাবিক বলিয়াছিল, জলে আর তিন দিন চলিবে। কিন্তু তাহার বক্ষোবসনের অন্তরালে লুক্কায়িত জলপাত্রের কথা কি সর্দ্দার নাবিক বিস্মৃত হইয়াছিল? যদি না ভুলিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে প্রতি রজনীতে সে পাত্রটি গোপনে জলে পরিপূর্ণ করিয়া লইত, তাহা কি সে বুঝিতে পারে নাই ?

সে বেশ বুঝিয়াছিল, তাহার চৌর্য্যবৃত্তির কথা আবিষ্কৃত হইলে কি ঘটিবে। তখন আত্ম-হত্যার চিন্তা তাহার মনে সমুদিত হইল। সে ধীরে ধীরে ভেলার পার্শ্বে বসিয়া নীল সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিল।

সে এইভাবে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় রহিয়াছে, এমন সময় ভেলা কোন একটা পদার্থে যেন আহত হইল। সমস্ত ভেলাটি সে আঘাতে যেন কাঁপিয়া উঠিল। সূর্য্যালোকে সে একটা হাঙ্গরের পুচ্ছদেশ দেখিতে পাইল। জলরাক্ষস মুহূর্ত্তমধ্যে অতল সমুদ্রগর্ভে অন্তর্হিত হইয়া গেল। রমণী

নিদ্রিত পুত্রের পার্শ্বে সরিয়া বসিল। তাহার হৃদয়ে গাঢ় নীরবতা, বক্ষঃস্পন্দন পর্য্যন্ত যেন থামিয়া গিয়াছে।

পর দিনের রাত্রি ঘন তমসাচ্ছন্ন। এত গাঢ় অন্ধকার যে, দুই হস্ত দূরের পদার্থ পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। সমুদ্রবক্ষে এক বিচিত্র নীরবতা বিরাজিত। ভেলার পার্শ্বস্থ শিথিল কাষ্ঠখণ্ডগুলি পর্য্যন্ত স্থির হইয়া ছিল। সমুদ্রবক্ষে হিল্লোল পর্য্যন্ত ছিল না।

সারাদিন ধরিয়া ডেভিড্ তাহার পিতার জন্য কাঁদিয়াছিল। সমস্ত দিন রমণী ভগবানের কাছে সাহায্য ও মুক্তি প্রার্থনা করিয়াছিল।

অকস্মাৎ উন্মত্তের বিকট চীৎকারধ্বনি সমুদ্রবক্ষ আলোড়িত করিয়া শূন্যে উত্থিত হইল। পর মুহূর্ত্তে নগ্ন পদের তাড়নার শব্দ শ্রুত হইল।

"ওঃ! ওঃ!"

তার পরে জলে ঝম্প-প্রদানের শব্দ হইল!

এক ঘণ্টা চলিয়া গেল। আবার সেই প্রগাঢ় নীরবতা। নিদ্রিত বালক মাতার বক্ষে মাথা রাখিল। তাহার কাতর কণ্ঠস্বরে রমণী বুঝিল, বক্ষঃস্থলস্থিত জলাধার আবার শূন্য হইয়াছে।

বালককে সতর্ক করিয়া সে বলিল, "ডেভিড্, চুপ্ কর্!"

অন্ধকারে হাত বাড়াইয়া সে জলের জালা খুঁজিতে লাগিল।

শিহরিয়া উঠিয়া সে হাত সরাইয়া লইল। তাহার স্ফীত শুষ্ক জিহ্বা শব্দ উচ্চারণে প্রায় অসমর্থ হইলেও, সে প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিল। অন্ধকারে আর একখানি হস্ত জলপাত্রের দিকে প্রসৃত হইয়াছিল। সেই হস্ত সে স্পর্শ করিয়াছিল।

অতিকষ্টে সে বলিল, "ডেভিড্, চীৎকার কর!" ভীত বালক "বাবা! বাবা!" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

উত্তরে রমণী শুনিতে পাইল, এক ব্যক্তি অতিকষ্টে সেই দিকে আসিতেছে। তাহার ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শোনা যাইতেছিল। বাদানুবাদ হইল না। শুধু পিস্তলের শব্দ—সঙ্গে সঙ্গে গুরুভার দ্রব্য জলে পড়িয়া গেল।

প্রভাত হইল। সুদূর পূর্ব্বদিক্‌চক্রবাল—গগনপ্রান্ত সোণালী বর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল। নবোদিত তরুণ তপনের হিরণ্ময় রশ্মিচ্ছটা হীরকচূর্ণের ন্যায় সমুদ্রগর্ভ হইতে যেন ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল। সমুদ্রতরঙ্গের ঘন কুজ্‌ঝটিকাজাল তখনও সম্পূর্ণ অপসৃত হয় নাই। তরঙ্গের উপর কোন কোন স্থলে ধূম্রজাল যেন জমাট বাঁধিয়া দুলিয়া উঠিতেছিল। আবার তৃষ্ণার অগ্রদূত পৃথিবীতে দেখা দিল। আবার মরণাধিক যন্ত্রণার সময় আসিতেছে।

দূরে—বহুদূরে—যতদূর দৃষ্টি চলে, প্রভাত-সূর্য্যালোকে সমুদ্র-সলিল শিহরিয়া উঠিতেছিল।

রমণী ত্রিপলের আবরণ সরাইয়া ভেলার অপর অংশে দৃষ্টিপাত করিল। সে দেখিল, নাবিকের সর্দ্দার লম্বমানভাবে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। তাহার অর্দ্ধাঙ্গ আবরণের নিম্নে, অপরার্দ্ধ বাহিরে। সে উপুড় হইয়া শুইয়া ছিল। সে এমন নিশ্চলভাবে পড়িয়া ছিল যে, রমণীর আশঙ্কা হইল, এই ভেলায় সে ও তাহার পুত্র ব্যতীত তৃতীয় কেহ জীবিত নাই। কিন্তু সে যখন

একদৃষ্টে এই নিশ্চল মূর্ত্তির দিকে চাহিয়াছিল, তখন সহসা তাহার বোধ হইল, লোকটির দক্ষিণ হস্ত যেন একবার নড়িয়া উঠিল। অমনই তাহার করধৃত পিস্তলটি ভেলার একপার্শ্বে গড়াইয়া গেল।

"ডেভি, বাবা আমার, একটু চুপ্ করিয়া শুইয়া থাক। আমি আসিতেছি।"

পুত্রের কানে কানে এই কথা বলিয়া রমণী নিঃশব্দে হামা দিয়া অর্দ্ধসংজ্ঞাশূন্য সর্দ্দারের দিকে অগ্রসর হইল।

যুবকের মাথা ঘুরাইয়া ধরিয়া রমণী তাহার শুষ্ক মুখে জলপাত্রটির নল লাগাইয়া দিল।

ক্ষীণস্বরে নাবিক বলিল, "আঃ! ভগবান্! আরও একটু দাও!"

যতক্ষণ না যুবক উঠিয়া বসিল, সে সেইখানে অপেক্ষা করিল। জলপানে শীঘ্রই সে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল এবং চারিদিকে চাহিয়া দেখিল।

কাতরস্বরে সে বলিল, "সব গেছে! কেউ নেই! তোমার ছেলে কেমন আছে?"

তখনও রমণী যুবকের হস্ত ত্যাগ করে নাই। তাহার নয়নে তখন এক বিচিত্র আলোক জ্বলিতেছিল। সর্দ্দার নাবিকের আশাশূন্য মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া রমণীর দেহে যেন শক্তি সঞ্চারিত হইল। হয় সে মরিবে, নয়ত শেষ পর্য্যন্ত জীবন রক্ষা করিবে, এইরূপ একটা দৃঢ়তা যেন তাহার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইল।

"আমাদের বাঁচিবার কোন আশা আছে?"

ক্লান্তভাবে শিরঃসঞ্চালন করিয়া যুবক বলিল, "আশা খুবই কম। তবে—স্রোতের বেগ প্রবল—বিশেষ প্রবল; শীঘ্রই কোন না কোন স্থানে আমরা পঁহুছিতে পারি!"

করুণস্বরে রমণী বলিল, "ভগবান্, আমাদিগকে রক্ষা কর! আমার পুত্র ডেভিড্‌কে বাঁচাও!"

সে নিজের স্থানে ফিরিয়া গেল। গমনকালে পিস্তলটি অলক্ষ্যে তুলিয়া লইয়া সে বসনাভ্যন্তরালে লুকাইয়া রাখিল। মধ্যাহ্নকালে নাবিকসর্দ্দার জলপান করিবার জন্য রমণীর কাছে আসিল। তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ। রমণী তাহার পুত্রের জন্য জল চাহিল।

ফিরিয়া যাইবার সময় যুবক বলিল, "স্রোত ক্রমশই প্রবলতর হইতেছে। যদি আর দুই দিন জল থাকে, হয়ত আমরা রক্ষা পাইতে পারি।"

"যদি জল থাকে!" তাহার দৃষ্টি ও কথার কোন গূঢ় অর্থ আছে। রমণী অমনই লুক্কায়িত পিস্তলটি একবার স্পর্শ করিল।

আবার যুবক যখন আসিল, তখন তাহার কণ্ঠস্বর রুক্ষ, মূর্ত্তি ভীষণ।

"খুব দ্রুতবেগে ভেলা চলিয়াছে! শুধু এখন কিছুকাল বাঁচিতে পারিলে হয়!"

রমণী বলিল, "মাত্র এক বোতল জল আছে। আর বেশী জল নাই।"

সে মাথা নাড়িল। পূর্ব্বে সে তাহা অনুমান করিয়াছিল।

"তিন জন ঐ জলে দুই দিন মাত্র বাঁচিতে পারে। দুই জন হইলে আরও বেশী সময় বাঁচিতে পারে।

যুবক নিদ্রিত বালকের দিকে চাহিল।

রমণীর নিকট হইতে সরিয়া গিয়া সে ভেলার মধ্যস্থলে বসিল। রমণী বুঝিল, যুবকের

হৃদয়ে ঝড় উঠিয়াছে। প্রলোভনের সহিত তাহার হৃদয় সংগ্রাম করিতেছে। রমণীর চিত্তে পূর্ব্ব হইতেই যে আশঙ্কা জন্মিয়াছিল, এখন সেই সঙ্কটকাল উপস্থিত।

অপরাহ্ণ ক্রমশঃ সন্ধ্যার ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িল। লোকটি তখনও সেইভাবে বসিয়া আছে।

বহুক্ষণ পরে যুবক আবার রমণীর পার্শ্বে আসিয়া বসিল। সে বুঝিল, এইবার ভীষণ সঙ্কটের মুহূর্ত্ত আসিয়াছে। সর্দ্দার নাবিকের চক্ষুতে ভীষণ দৃষ্টি, তাহার ব্যবহারে তাহার মনের ভাব প্রকট হইল।

"তোমার বেশ সাহস আছে। নয় কি?"

বালকের পার্শ্বে পুরুষটি বসিয়াছিল। রমণীকে লক্ষ্য করিয়া সে কথা বলিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার দৃষ্টি নিদ্রিত বালকের উপর সংস্থাপিত।

"তোমার বেশ সাহস আছে।" তোমার স্বামী তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমারও তাই। আমারও স্ত্রী আছে, ঐরূপ পুত্র আছে।"

সে বালককে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল।

"তার পর?"

সর্দ্দার নাবিক বলিল, "দুই দিনের মাত্র জল আছে। হয়ত কোনও জাহাজের সম্মুখে পড়িতে পারি। বুঝিয়াছ? দুইজন মাত্র বাঁচিতে পারে। তিন জনের মত জল নাই! তোমার স্বামী আছেন—আর আমার স্ত্রী আছে; বুঝিয়াছ?"

রমণীর যতটুকু শক্তি অবশিষ্ট ছিল, এই কথা শুনিয়া তাহাও অন্তর্হিত হইল। সে মুগ্ধ, অভিভূত ও হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিল।

নাবিকসর্দ্দার বালকের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিল।

"আমার সঙ্গে এস।" এই বলিয়া যুবক উঠিয়া দাঁড়াইল। বালককেও তাহার অনুবর্ত্তী হইতে আদেশ করিল। "নানারকম মাছ দেখ্‌তে পাবি—আয়, আমার সঙ্গে চল্‌।"

তাহারা ভেলার মধ্যস্থলে না পঁহুছিতেই যুবতীর হৃদয়ে শক্তি সঞ্চারিত হইল। এতক্ষণ সে ভগবানের নিকট এই প্রার্থনাই করিতেছিল। তিনি তাহার প্রার্থনায় বোধ হয় কর্ণপাত করিয়াছিলেন।

নাবিকসর্দ্দার বালককে লইয়া ভেলার ধারে জানু পাতিয়া বসিল। বালকের বাম হস্ত সে ধারণ করিয়াছিল। রমণী যে তাহাদের সন্নিহিত হইয়াছে, লোকটা তাহা বুঝিতে পারিল না। নীরবে জননী পুত্রের পশ্চাতে বসিয়া রহিল। তাহার দক্ষিণ হস্ত পরিধেয় বসনের উপর সংস্থাপিত।

"সাহসী বালক, বুঝেছ? আমি যা বলি, তুমি তাই উচ্চারণ করিবে, কেমন? বল, 'ভগবান্ ক্ষমা কর!'"

বালক বলিল, "ভগবান্ ক্ষমা কর।"

"নাবিককে ক্ষমা কর, সে আমার মাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছে।"

"নাবিককে ক্ষমা কর, সে আমার মাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছে।"

"আমি ছোটছেলে মাত্র, আমার জীবনের মূল্য কি?"

"আমি ছোটছেলে মাত্র, আমার জীবনের মূল্য কি?"

"আমি ভয় পাই নাই, ভগবান্ আমায় সাহায্য কর।"

"আমি ভয় পাই নাই, ভগবান্ আমায় সাহায্য কর।"

"আমি নাবিককে ক্ষমা করিলাম।"

"আমি নাবিককে ক্ষমা করিলাম।"

"তথাস্তু!"

"তথাস্তু!"

যুবক উঠিয়া দাঁড়াইয়া বালকের গলদেশ ধারণ করিল। সেই মুহূর্ত্তে সেই কালান্তক পিস্তলও আর একবার ধূম উদ্গীরণ করিল। বালক সংজ্ঞাশূন্য জননীর বাহুমধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল। নাবিকসর্দ্দার সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছিল। ভেলার পার্শ্বে সে হটিয়া গেল, পর মুহূর্ত্তে সে সমুদ্রগর্ভে পতিত হইল।

কিছুকাল রমণী নিমীলিতনেত্রে পড়িয়া রহিল। বালক মাতাকে আঁকড়িয়া ধরিয়াছিল। অকস্মাৎ তাহার আননে কোন পদার্থ পতিত হইল। সে পদার্থ অত্যন্ত শীতল এবং আর্দ্র। ধীরে ধীরে রমণী নয়ন উন্মীলিত করিয়া আকাশপানে চাহিল।

সূর্য্যদেবকে আবৃত করিয়া একখণ্ড মেঘ সরিয়া যাইতেছিল।

তখন বারিপাত হইতেছিল। *

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

ওঙ্কার-মান্ধাতা।

পথে।

হোল্‌কারের রাজধানী ইন্দোরে আমি ব্যারিষ্টার আর, কে, ব্যানার্জীর অতিথি ছিলাম। ইনি অতিশয় সদাশয় ভদ্রলোক। চালচলন ইঁহার বিলাতফেরত দিগের ন্যায় নাই; অতি সাদাসিদে বাঙ্গালীর মত থাকেন। আহার ও আচার হিন্দুর মতন; আমিষে তাদৃশ রুচি নাই। আমি প্রায় এক সপ্তাহ ইঁহার অতিথি ছিলাম। ইঁহার বাটীতে একটী বালক-ভৃত্য ছিল, তাহার নাম টিপু। তাহার গায়ে কোট, মাথায় কাটা টুপী। রাজকুমার বাবুর পিতা দুর্ভিক্ষের সময় এই অনাথ বালককে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তখন এ নিতান্ত শিশু ছিল। এক্ষণে বয়স প্রায় তেরো। ইহার কথা আমাকে একটু লিখিতে হইতেছে।

বিগত ১৪ই জানুয়ারী (ইং ১৯১৪ খৃঃ) আমি ওঙ্কারনাথ দর্শনের নিমিত্ত

---

* এন্‌ড্রু সাউটার্ নামক কোন প্রসিদ্ধ গল্পলেখকের ইংরাজী গল্প হইতে অনূদিত।

প্রায় তিনটার সময় ইন্দোর হইতে বি, বি, সি, আই, রেলওয়ের মিটার গেজ ট্রেণে যাত্রা করিলাম। টিপু আমাকে ষ্টেশনে রেলগাড়ীতে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিল। আমি ট্রেণে উঠিয়া তাহাকে কিছু বক্‌সিস দিতে গেলাম। কারণ, সে কষ্ট স্বীকার করিয়া আমার সঙ্গে আসিয়াছে ও আমার দ্রব্যাদি গাড়ীতে তুলিয়া দিয়াছে। বক্‌সিস দিতে যাওয়ায় সে বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল, "বাবু, হাম কুলী নেহি হ্যায়। বক্‌সিস কড়ি নেহি লেঙ্গে।" আমি তাহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলাম যে, "টিপু, তুমি কুলী হ'তে যাবে কেন? আমি তোমার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া কিছু পারিতোষিক দিতেছি—ইহা লইতে কিছুমাত্র দোষ নাই, তুমি লও।" সে কিছুতেই গ্রহণ করিবে না, আমি জোর করিয়া তাহাকে লইতে বাধ্য করিলাম। সে অতি অনিচ্ছায় লইল। আমি তাহার এই নির্লোভতায় বিস্মিত হইয়াছিলাম।

বি, বি, সি, আই রেলওয়ের সর্পাকৃতি সুদীর্ঘ ট্রেণ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিল। ট্রেণ যাত্রীতে পূর্ণ। স্বল্প ভাড়ায় আজমীর হইতে বোম্বাই আসিতে হইলে এমন সুবিধাজনক ট্রেণ আর নাই। কাজেই যাত্রীর ভিড় অসম্ভব। ট্রেণ মাউ ষ্টেশনে থামিল। মাউ মধ্যভারতের প্রকাণ্ড ক্যাণ্টনমেণ্ট। ছোট ছোট পাহাড়ের উপর ব্যারাকশ্রেণী শোভা পাইতেছে। পথ ঘাট অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। রাস্তার দুই ধারে শ্রেণীবদ্ধ তরুরাজী।—মাউ সহর দেখিবার যোগ্য।

ক্রমে পাতালপাণি ষ্টেশনে ট্রেণ পঁহুছিল। এই পাতালপাণি হইতে incline আরম্ভ হইয়াছে। এই ষ্টেশন হইতে গভীর অরণ্য ও ঘন পর্ব্বত ভেদ করিয়া রেল চলিতে লাগিল। পথের শোভা কি অপূর্ব্ব—কি চমৎকার! দুইধারে নিবিড়-শ্যামল বৃক্ষরাজি-মণ্ডিত পর্ব্বতশ্রেণী সূর্য্যকিরণ অবরুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।—কোনও কোনও স্থলে হেমন্তের পত্রশূন্য বিচিত্র-দর্শন কাননমালা—কোথাও গগনচুম্বী কৃষ্ণকায় পর্ব্বতশৃঙ্গ!—শৈবালের বিচিত্র মাধুরী—জল-প্রপাতের ও নির্ঝরিণীর রজতধারার ঝর ঝর শব্দে চতুর্দ্দিক্‌ মুখরিত হইতেছে! সূর্য্যের কনকরশ্মি নিবিড় পত্রপল্লবের স্থানে স্থানে প্রতিফলিত হইতেছে।

দেখিতে দেখিতে দুইটি 'টনেল্‌' (Tunnel) ও একটি গিরিসেতু (Via-duct) পার হইলাম। পাহাড় কাটিয়া সুদীর্ঘ রেলপথ চলিয়া গিয়াছে—মধ্যে মধ্যে গিরিপ্রাচীর উন্মুক্ত—পথের দক্ষিণপার্শ্বে বহুনিম্নপ্রদেশে দুইটি পর্ব্বতের মধ্যভাগে (Gorge) গিরিনদী প্রবাহিত হইতেছে। ট্রেণ হইতে

এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইলাম। কত উচ্চে ট্রেণ চলিতেছে—আর তাহার কত শত ফীট নিম্নে দক্ষিণদিকে পর্ব্বততল চুম্বন করিয়া রজত-তরঙ্গময়ী তরঙ্গিণী রজতহিল্লোলে কলধ্বনি করিতে করিতে ছুটিতেছে। ইহার পর আবার একটি টনেল্ ও একটি পুল পার হইয়া একটি গিরিসেতু অতিক্রম করিলাম।

ক্রমে শৈলক্রোড়ে অবস্থিত কানাথণ্ড ষ্টেশনে ট্রেণ পঁহুছিল। এখানে যেন অপরাহ্নে সন্ধ্যার অন্ধকার হইয়াছে!—চতুর্দ্দিকে এমনই পর্ব্বত ও অরণ্য! ট্রেণ পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করিতে করিতে হাঁফাইয়া পড়িয়াছে। এখানে আসিয়া আকণ্ঠ পূরিয়া জলপান করিতে লাগিল। তাহার তৃষ্ণার আর নিবৃত্তি হয় না। অবশেষে নিদারুণ পিপাসা শান্ত করিয়া লৌহ-অশ্ব পুনরায় ছুটিতে লাগিল। পথে তেমনই উপত্যকায় উপলবহুলপথগামিনী স্রোতস্বিনী মৃদুমন্থরে প্রবাহিতা—তেমনই গিরিসেতু—সুদীর্ঘ পর্ব্বতভেদী রেলপথ। নিবিড় বনকান্তার প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া, চোরান নদীর উপরিস্থিত দুইটি সেতু অতিক্রম করিয়া ট্রেণ বাড়োয়াতে উপস্থিত হইল। বাড়োয়াতে কয়েকটি রক্তবর্ণ চিত্রপ্রতিম রাজভবন সুশোভিত। ইন্দোরের রাজা বা উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিবর্গ সময়ে সময়ে ভ্রমণ বা শিকার উপলক্ষে আসিয়া ঐ সকল ভবনে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। বাড়োয়া পরিত্যাগ করিয়া উচ্চাবচ বনভূমি, শালবন, শস্যক্ষেত্র প্রভৃতি দৃষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল। দক্ষিণদিকে সুদূরে নীলাভ সাতপুরা গিরিশ্রেণী। দেখিতে দেখিতে নর্ম্মদা নদীর সুদীর্ঘ সেতু উত্তীর্ণ হইয়া অপরাহ্নে মর্ত্তাকা ষ্টেশনে ট্রেণ পঁহুছিল। ওঙ্কার-যাত্রিগণ এই ষ্টেশনে অবতরণ করে। আমিও গাড়ী হইতে নামিলাম। এ দেশের লোকে মর্ত্তাকাকে খেড়ীঘাট বলিয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইন্দোর হইতে মর্ত্তাকা অবধি অনেক ষ্টেশনে আমি ভারবাহী কুলী দেখি নাই। গৃহস্থযুবতীগণ, এমন কি, বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন বিত্তশালী লোকের পুত্রবধূ, পত্নী ও কন্যা ট্রেণ হইতে নামিয়া বড় বড় মোট, ট্রাঙ্ক, বিছানা প্রভৃতি অবলীলাক্রমে মাথায় করিয়া লইয়া যাইতেছে। এদেশের রমণীদের অধিকাংশই সুন্দরী; এমন কি, ইন্দোরে ফেরিওয়ালী, শাকওয়ালী, ঘেসেড়ানী ও সম্মার্জ্জনী হস্তে রথ্যামার্জ্জনকারিণী রমণীদিগের চম্পকনিন্দিত বর্ণ ও গঠনের পারিপাট্যে মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না। ভদ্রকুলাঙ্গনাদিগের সৌন্দর্য্য ত অতুলনীয়। আমি ষ্টেশনে ষ্টেশনে এই সকল সৎকুলোদ্ভবা সুন্দরীদিগের মস্তকে গুরুভার

মোট, সিন্দুক, বাক্স প্রভৃতি দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছিলাম। অথবা 'যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ।'

আমি নিজে মর্ত্তাকা ষ্টেশনে কুলী পাই নাই। আমি বিষম বিপদে পড়িলাম। ব্যস্ত হইয়া ষ্টেশনমাষ্টারকে বলিলে, তিনি একজন চাপরাসীকে আমার দ্রব্যাদি নামাইতে আদেশ করিলেন। ষ্টেশনে একটি বই আর ঘর নাই। আমি ইচ্ছা করিলে সেই গৃহেই থাকিতে পারি, মাষ্টার এরূপ অভিমত জ্ঞাপন করিলেন। আমি ওঙ্কারনাথ যাইব, এ কথাও তাঁহাকে জানাইলাম। মনোহরলাল নামক জনৈক পাণ্ডা দূর হইতে আমাদের কথাবার্ত্তা একাগ্রচিত্তে শুনিতেছিল। সে যেই আমার মুখে 'ওঙ্কার' শব্দ শুনিল, অমনই ঝঙ্কার করিয়া আমার নিকটে উপস্থিত হইল; বলিল, "আপনার কোনও চিন্তা নাই; আমি সব বন্দোবস্ত করিয়া আপনাকে ওঙ্কারে লইয়া যাইব। আপনার কোনও কষ্ট হইবে না।" এই মনোহর আমাকে আগে হিন্দু বলিয়া বুঝিতে পারে নাই, সাহেব ঠাওরাইয়াছিল। এ কথা সে পরে আমাকে বলিয়াছিল।

তখন সূর্য্যদেব পশ্চিমে অস্তগিরিপ্রান্তে চলিয়া পড়িতেছেন, দিবসের আলো নিবিয়া আসিতেছে। সন্ধ্যার ছায়াও অন্ধকারে ঘনাইয়া নিবিড় হইতেছে; শীতের বাতাস ধীরে ধীরে বহিতেছে—আমি ষ্টেশনের বারান্দায় একখানি কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট হইয়া বিশ্রামসুখ উপভোগ করিলাম।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। মর্ত্তাকা বা খেড়ীঘাট হইতে ওঙ্কার-মান্ধাতা সাড়ে তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত। পথ নিরাপদ নহে, সুতরাং রাত্রিতে যাওয়া সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। মর্ত্তাকাতেই রাত্রিযাপন করিলাম। ষ্টেশনের পশ্চাতে পথিপার্শ্বে সুন্দর সুন্দর দ্বিতল চটী অবস্থিত। তীর্থযাত্রী ও পথিকেরা এই সকল চটীতেই রাত্রিযাপন করিয়া থাকেন। এস্থানে কয়েকটি হালুইকারের দোকানও আছে। তাহারা কয়েক প্রকার মিষ্টান্ন, পুরী ও ভাজী প্রস্তুত করে। কাজেই পথিকগণকেও মর্ত্তাকায় রাত্রিযাপনের কোন ক্লেশ অনুভব করিতে হয় না।

পাণ্ডা মনোহরলাল একটি দ্বিতল চটীর নিম্নতলে আমার রাত্রিযাপনের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিল। বলিল, "আপনি যদি ইচ্ছা করেন, উপরিতলে থাকিতে পারেন।" আমি কিন্তু তাহার বিশেষ প্রয়োজন বোধ করিলাম না। একটি প্রকোষ্ঠে চারপাই আনিয়া আমার শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিয়া একটি 'হরিকেন ল্যাম্প' জ্বালিয়া দিয়া সে চলিয়া গেল। পরে হালুইকারের দোকান হইতে পুরী,

ভাজী ও কিছু মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া আনিয়া আমার আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিল। আমি আহারান্তে সেই চটীতেই নিদ্রিত হইলাম।

"জয় ওঙ্কারনাথকী জয়!" শব্দে প্রভাতে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। লিখিতে ভুলিয়াছি যে, আমি ইন্দোর হইতে শত শত কণ্ঠে ক্রমাগত "জয় ওঙ্কারনাথকী জয়" শুনিয়া আসিতেছি। প্রত্যেক ষ্টেশন হইতে যখনই ট্রেণ ছাড়ে, তখনই যাত্রিবর্গ 'ওঙ্কার' স্মরণ করিয়া জয়ধ্বনি করে। এমন কি, আমি যখন ভূপাল হইতে উজ্জয়িনী, এবং উজ্জয়িনী হইতে ইন্দোরে আসি, তখনও পথে ওঙ্কারধ্বনি শুনিতে শুনিতে আসিয়াছি। উজ্জয়িনীতে মহাকাল বিরাজ করিতেছেন; কিন্তু ওঙ্কারই এ অঞ্চলে সর্ব্বত্র সমাদৃত ও পূজিত হইতেছেন।

পায়দল-যাত্রীর দল অতি প্রত্যুষেই ওঙ্কার-মান্ধাতার অভিমুখে রওনা হইয়া গেল। আমি প্রাতঃকৃত্য সমাধান করিয়া যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলাম। এই সাড়ে তিন ক্রোশ পথ পদব্রজে, ডুলীতে, পাল্কীতে, অশ্বে অথবা গোযানে যাইতে হয়। হাতী, ঘোড়া, পাল্কীর বন্দোবস্ত পূর্ব্বাহ্নে করিতে হয়। গরুর গাড়ীর ভাড়া আট আনা। কিন্তু আমি ব্যস্ততা-প্রযুক্ত বার আনা বলিয়া ফেলিয়াছিলাম; কাজেই আমাকে চারি আনা দণ্ড দিতে হইয়াছিল।

পাণ্ডার সহিত গোযানে তীর্থাভিমুখে যাত্রা করিলাম। এক ক্রোশ পরেই পথের দুইধারে সমান্তরালে তরুশ্রেণী। দেড় ক্রোশের পর হইতেই শাল প্রভৃতি তরুর জঙ্গল আরম্ভ হইল। আড়াই ক্রোশের পর জঙ্গল বিরল হইয়া আসিল। চারিদিকে ছোট ছোট পাহাড়। পথিমধ্যে স্থানে স্থানে ময়ূর বিচরণ করিতেছে; অন্যান্য কয়েক প্রকার পার্ব্বত্য পক্ষী ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইতেছে।

গোযানে প্রায় আড়াই ঘণ্টা অতিবাহিত করিয়া আমরা নর্ম্মদাতীরে উপস্থিত হইলাম। এ কোন্ স্বর্গে আসিলাম! কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য! জীবনে কখনও এমন দৃশ্য দেখি নাই! এ কি মর্ত্ত্যভূমে দেবতাদিগের লীলাস্থল, না সুরাঙ্গনা-দিগের বিহারভূমি! এক দিকে রক্তোজ্জ্বল উষার সীমন্তে শুমন্তকের ন্যায় শুকতারা, অপর দিকে চন্দ্রতারকাময়ী শারদীয়া নিশীথিনী! যেন হরি ও হর উভয়ে সম্মিলিত হইয়া শুভ্রনীলদেহে বিরাজমান!

পীত প্রভাতের সূর্য্যকিরণ নীল নর্ম্মদার অঙ্গে তরঙ্গে তরঙ্গে রঙ্গে ভঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—নর্ম্মদার অপর তীরে ওঙ্কার-মান্ধাতা-দ্বীপ। দ্বীপগাত্রে ভগবান্ ওঙ্কারেশ্বরের শ্বেতবর্ণ উত্তুঙ্গ মন্দির যেন গগন স্পর্শ করিতেছে।

মন্দির দেখিয়াই দেবাদিদেবের উদ্দেশে প্রণাম করিলাম। মন্দিরের স্বর্ণ-কলস সূর্য্য-রশ্মি-সম্পাতে ঝক্-ঝক্ করিতেছে। এই মান্ধাতা-দ্বীপ বেষ্টন করিয়া সম্মুখভাগে নর্ম্মদা নদী ও পশ্চাদ্ভাগে কাবেরী নদী বহিতেছে। এই কাবেরী দক্ষিণভারতের প্রসিদ্ধ নদী কাবেরী নয়; ইহা স্বতন্ত্র কাবেরী। কি বিচিত্র শোভা! নীলনর্ম্মদাকাবেরী-পরিবেষ্টিত মান্ধাতা-দ্বীপের উপরে গগনচুম্বী গিরি উত্থিত হইয়াছে—নদীযুগলের এপারে ওপারে কেবলই নীল, পীত, কৃষ্ণ উপলশ্রেণী বিরাট্ গাম্ভীর্য্যে নদীবক্ষ রৌদ্রছায়াময়ী করিয়া রাখিয়াছে। শুধু যে নদীর উভয় তীরেই শৈলমালা শোভিত, তাহা নহে; নদীগর্ভে স্থানে স্থানে গণ্ডশৈল উত্থিত হইয়াছে—তাহার উভয় পার্শ্বে নীলজল-স্রোত বহিতেছে! আলোক ও ছায়ার সংমিশ্রণে গিরিগাত্র, নদীবক্ষ, বন্যরাজি, সৌধমালা, মন্দিরসমূহ—সমস্তই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত। সর্ব্বোপরি পর্ব্বতের ছায়া জলমধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া যে অপূর্ব্ব মাধুর্য্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে, তাহা অনির্ব্বচনীয়। মান্ধাতা-পর্ব্বত দৈর্ঘ্যে অর্দ্ধ ক্রোশের কিঞ্চিৎ অধিক। দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিক্ একেবারে খাড়া হইয়া পাঁচ ছয় শত ফীট ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। নদীর পরপারের পর্ব্বতমালাও উচ্চতায় বড় অল্প নহে। উভয়-পার্শ্বস্থ দুরারোহ অভ্রভেদী গিরির মধ্যভাগে নীলনর্ম্মদা জলবাহু বিস্তার করিয়া, তরঙ্গময়ী বেণী এলাইয়া মন্দ্রমধুর গর্জ্জনে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই গম্ভীর-সুন্দর দৃশ্যে আমি একেবারে আত্মহারা হইলাম।

গোযান হইতে নামিয়া পূর্ব্বোক্ত দৃশ্যাবলী দেখিতে দেখিতে পরপারে যাইবার জন্য দ্রব্যাদি লইয়া নৌকায় উঠিলাম। দুই তিনখানি কাষ্ঠনির্ম্মিত সুদীর্ঘ নৌকা যাত্রীদিগকে লইয়া ক্রমাগত পারাপার করিতেছে। আমি পরপারে উপনীত হইয়া পাণ্ডার সহিত একটি দ্বিতল বাটীর একটি প্রকোষ্ঠ অধিকার করিলাম। যখন বাসায় পঁহুছিলাম, তখন বেলা প্রায় এগারটা। বাড়ীটি নর্ম্মদাতীরে অবস্থিত; ঠিক যেন নর্ম্মদার জলগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে। তীরে এইরূপ অনেক দ্বিতল, ত্রিতল সৌধাবলী আছে।

আমি নর্ম্মদানীরে স্নান করিলাম। অনেকগুলি সুবৃহৎ প্রস্তরনির্ম্মিত ঘাট নদীর শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। অনেক নরনারী বালকবালিকা স্নান করিতেছে। আমি নদীর কন্‌কনে ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়া বাসায় ফিরিলাম। পাণ্ডা বলিল, "নর্ম্মদাতীরে কতকগুলি ধর্ম্মকার্য্য করিতে হয়। তন্মধ্যে নর্ম্মদায় নারিকেল ভেট, নর্ম্মদাপূজা, শ্রাদ্ধ, তর্পণ প্রভৃতি তীর্থকার্য্যগুলি বিশেষ

প্রয়োজনীয়।" আমি বলিলাম, "আমার এ সকল কার্য্যে আপাততঃ প্রয়োজন নাই, ভগবান্ ওঙ্কারনাথকে দর্শন করিলেই আমার তীর্থদর্শন সফল হইবে। তোমাকে সেজন্ত বিশেষ চিন্তিত হইতে হইবে না। তোমার প্রাপ্য আমি তোমাকে দিয়া যাইব।" আমার ভাবগতিক দেখিয়া পাণ্ডা মহাশয় বিশেষ নিরুৎসাহ হইলেন। অনিচ্ছায় আমার সহিত ওঙ্কারের মন্দির পর্য্যন্ত গেলেন। তাঁহার যাইবার আবশ্যকতা আদৌ ছিল না; তথাপি সঙ্গে চলিলেন।

ওঙ্কারনাথের সুবৃহৎ মন্দির প্রায় সত্তর ফীট উচ্চ। সম্মুখে মনোরম কারুকার্য্য-বিশিষ্ট বহুস্তম্ভ-সমন্বিত নাটমন্দির। মন্দির-সম্মুখস্থ মণ্ডপে শ্বেতপ্রস্তর-রচিত মসৃণ বৃহদাকার বৃষমূর্ত্তি। এমন সুন্দর আভরণ-সমন্বিত বৃষমূর্ত্তি অতি অল্পই দৃষ্ট হয়।

মন্দিরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বাম দিকের একটি প্রকোষ্ঠে মহারাজ মান্ধাতার প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিয়া কিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া প্রণাম করিলাম। মান্ধাতার নাম কে না শুনিয়াছেন? আপনারা প্রাচীন কথাপ্রসঙ্গে যে 'মান্ধাতার আমল' বাক্য ব্যবহার করিয়া থাকেন, এই অতুল শোভাময় নদীবলয় শৈলের উপর সেই মহারাজ মান্ধাতার মহাসমৃদ্ধ রাজধানী ছিল। পরে তাহার বর্ণনা করিব। মান্ধাতার মূর্ত্তি দেখিয়া বাম দিকের প্রকোষ্ঠে ভগবান্ ওঙ্কারনাথকে ভূমিতে ললাটস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলাম। এই শিবলিঙ্গ ভারতবর্ষের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। নর্ম্মদার অপরপারে অমরেশ্বর মহাদেব জ্যোতির্লিঙ্গের পর্য্যায়ে পরিগণিত হইয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, ওঙ্কারই জ্যোতির্লিঙ্গ। এ বিষয়ের মীমাংসা আমার সাধ্যাতীত। তবে এ অঞ্চলে ওঙ্কারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিবলিঙ্গরূপে বিরাজিত। অবিরাম আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে ওঙ্কারধ্বনি শুনিতে শুনিতে রোমাঞ্চ হইতেছে। আমিও 'জয় ওঙ্কারনাথ!' বলিয়া কিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া মন্দিরাভ্যন্তর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

বাহিরে আসিয়া দেখি, নাটমন্দিরের এক পার্শ্বে পাণ্ডা মনোহর ম্রিয়মাণ হইয়া বসিয়া আছেন। মুখে কথাটি নাই, নীরবে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাসায় প্রত্যাগত হইলেন।

বাসায় আসিয়া দেখি, আমার বাসার সম্মুখস্থ বাটীর দ্বিতলে পাণ্ডা কর্ত্তৃক নিযুক্ত একটি পাচক আমার আহার প্রস্তুত করিয়াছে। এ দেশের লোকে বড় তরকারীপ্রিয় নহে। তরকারীকে তাহারা 'শাক' নামে অভিহিত করে;

কালে তত্রে শাক খায়। নচেৎ দাউল, আচার, চিনি, দুগ্ধ ও রুটিই তাহাদের নিত্য-খাদ্য। পাচক আমার জন্ত অন্ন, দাউল, আলুর তরকারী ও এক প্রকার চাটনী প্রস্তুত করিয়াছিল। আমি তাহাই পরমপরিতোষসহকারে ভোজন করিলাম। পাণ্ডা মহাশয় যাইবার সময় আর একটি অর্দ্ধপ্রবীণ পাণ্ডাকে আনিয়া, আমাকে তাহার জিম্মা করিয়া দিয়া জানাইলেন যে, তিনি খেড়ি-ঘাটে যাত্রী আনিতে যাইতেছেন, আগন্তুক আমাকে দর্শনীয় স্থানসমূহ দেখাইবেন। আমি আগন্তুককে বেলা ২॥০ টার সময় আসিতে বলিলাম।

যথাসময়ে অর্দ্ধপ্রবীণ নব পাণ্ডা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, একদিনে সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থান দেখিতে পারা যাইবে ত? সে একটু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, এ কার্য্য (অর্থাৎ একদিনে আমার পক্ষে সমস্ত দর্শনীয় স্থান দেখা) অসম্ভব। আমি তাহাকে 'আচ্ছা দেখা যাউক' বলিয়া তাহার সহিত বাহির হইলাম। সহরের এক প্রান্তে আসিয়া দেখিলাম, পাহাড়ে উঠিবার সোপানাবলী রহিয়াছে—এ স্থান হইতে শৈলশিখরে অধি-রোহণ করিয়া প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষসমূহ দেখিতে হইবে। আমরা সোপানপথে পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিলাম। শীতকাল, তবুও সিঁড়ি ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে গলদঘর্ম্ম হইলাম, হাঁফাইতে লাগিলাম। ধাপগুলি একটু উঁচু উঁচু, এক ফুটের কিছু অধিক। ১৫০শত ধাপ উঠিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে আবার উঠিতে উঠিতে দুই একবার সামান্ত বিশ্রাম করিয়া, সর্ব্বসমেত ৩৮০টি ধাপ অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতে উঠিয়া গৌরী-সোমনাথ মহাদেবের মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। গৌরী-সোমনাথ দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। মসৃণ-কৃষ্ণ-প্রস্তর-নির্ম্মিত এত বড় শিবলিঙ্গ ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই। গৌরী কুলঙ্গীতে বিরাজিতা। এই গৌরী-সোমনাথ মহাদেবের কাহিনী অতি বিচিত্র। শুনিলাম, পূর্ব্বকালে ইহার অঙ্গে দর্পণ প্রতিফলিত হইত। তাহাতে নরনারী তিন জন্মের মূর্ত্তি দর্শন করিত। কোনও বাদশাহ দেবাদিদেবের দেহ-দর্পণে দেখিলেন, তিনি গতজন্মে ফকীর ছিলেন, বর্ত্তমান জন্মে বাদশাহ হইয়াছেন, এবং ভবিষ্যৎ জন্মে শূকর-জন্ম লাভ করিবেন। ইহাতে তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া গদাঘাতে মূর্ত্তি অপবিত্র করেন। মধ্যে মধ্যে সূক্ষ্ম ফাটার দাগ পরিলক্ষিত হয়। তাহার পরেও জনৈক রাখাল দর্পণে দেখিয়াছিল যে, গত জন্মে সে গর্দ্দভ ছিল, বর্ত্তমান জন্মে রাখাল, আগামী জন্মে পক্ষী। এই প্রকার অলৌকিক কিংবদন্তী শুনিয়া আমি সোপানপথে মন্দিরচূড়ে আরোহণ করিয়া

চতুর্দ্দিকে প্রকৃতির শোভা ও কালের বিচিত্র লীলা দর্শন করিলাম। দেখিলাম, এই অনিন্দ্যসুন্দর শৈলদ্বীপকে নর্ম্মদা ও কাবেরী বেষ্টন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে; তাহার চতুর্দ্দিকে শৈলমালা—পাহাড়ের উপর মান্ধাতার কোন্ সুদূর অতীত যুগের বিধ্বস্ত রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ পর্ব্বত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। কেবলই প্রস্তর-রচিত প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ, মন্দির, প্রাচীর, তোরণ, সৌধ, দেবমূর্ত্তি, প্রাণিমূর্ত্তি, স্তম্ভ, সিংহদ্বার প্রভৃতি চূর্ণিত, খণ্ডিত ও দলিত অবস্থায় ধূলায় অবলুণ্ঠিত হইতেছে। পাহাড়ের সর্ব্বত্র কোন না কোন কীর্ত্তির ভগ্নাংশ পড়িয়া আছে। আমি স্তব্ধচিত্তে কিয়ৎকাল মন্দিরচূড়ে উপবেশন করিয়া নামিয়া আসিলাম। মন্দিরের সম্মুখেই একটি সুবৃহৎ বৃষমূর্ত্তি; মস্তকের কতকাংশ কর্ত্তিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন প্রস্তর-রচিত গণেশ ও অন্যান্য দেবতা ও দানবের মূর্ত্তি খণ্ডিত অবস্থায় ভূতলে পড়িয়া আছে।

গৌরী-সোমনাথের মন্দির হইতে যতই পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, স্থানে স্থানে সিন্দূরলিপ্ত নানাবিধ প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিলাম। ক্রমে সীতাদেবীর মূর্ত্তির নিকটে উপনীত হইয়া তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিলাম। পরে একে একে দুইটি প্রস্তরনির্ম্মিত সমুচ্চ তোরণ অতিক্রম করিলাম। প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতীয়টির শিল্পসৌন্দর্য্য অধিক মনোহর। গভর্মেণ্টের আদেশে এই অতুলনীয় তোরণের সংস্কার হইতেছে। ইহার আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটি জীর্ণ তোরণদ্বারের নিকট উপনীত হইয়া দেখিলাম, বৃহৎ দানেশ্বর মূর্ত্তি ভগ্নাবস্থায় তোরণের দক্ষিণ পার্শ্বে পতিত রহিয়াছে। এই মূর্ত্তির নাম কেরোপালু।

উপরোক্ত তোরণদ্বার হইতে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে সিদ্ধনাথ মহাদেবের ভগ্ন মন্দির। এমন শিল্পসৌন্দর্য্যমণ্ডিত অপূর্ব্ব মন্দির এই শৈলচূড়ে আর নাই। এরূপ মন্দির আমি কখনও দেখি নাই। হায়, অতীত যুগে ইহার কি সৌন্দর্য্য ও শোভাই ছিল! এখনও এই ভগ্ন মন্দির দেখিয়া ইহার শিল্পচাতুর্য্যে বিস্মিত ও মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না। ইহার অতীত গৌরব ও শিল্পবৈভব চিন্তা করিতে করিতে আমার নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়াছিল।

বিংশতি ভুজবিশিষ্ট সমুচ্চ প্রস্তরনির্ম্মিত বেদিকার (Platform) উপর এই অপূর্ব্ব মন্দির নির্ম্মিত। মধ্যবেদীর চারি দিকে সংলগ্ন প্রত্যেক বেদিকায় ষোল ষোল করিয়া সর্ব্বসমেত চৌষট্টিটি অপূর্ব্ব কারুকার্য্য-খোদিত স্তম্ভশ্রেণী-শোভিত অলিন্দ। দুঃখের বিষয়, এই স্বর্গীয় মন্দিরের ছাদ অদৃশ্য

হইয়াছে। ইহার উন্নত বেদিকার বিংশতি দিকে উৎকীর্ণ যুদ্ধ যুদ্ধ হস্তিযূথের মূর্ত্তিগুলি দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। প্রত্যেক হস্তিযুগল শুণ্ডে শুণ্ডে জড়াইয়া ক্রীড়া করিতেছে; কোনও হস্তী পদতলে রাক্ষসের দেহ নিষ্পিষ্ট করিতেছে। কেহ কোনও রাক্ষসকে শুণ্ডে ঝুলাইয়া উর্দ্ধে তুলিতেছে। এতদ্ভিন্ন আরও নানা শিল্প-সুষমায় মন্দির পরিপূর্ণ। সিদ্ধনাথ নির্জ্জনে অবস্থান করিতেছেন। আকাশ তাঁহার মন্দিরের চন্দ্রাতপ। গভর্মেণ্ট, মন্দিরের যাহা বর্ত্তমান আছে, তাহারই সংস্কারকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। যাহা আছে, তাঁহাই অতুলনীয়। যাহা আছে, তাহাই রক্ষিত হউক। নর্ম্মদার উপকূলে শৈলশৃঙ্গে কি অপূর্ব্ব দেবকীর্ত্তিই মহাকাল ধ্বংস করিয়াছেন!

সিদ্ধনাথের মন্দিরের নিকটেই পূর্ব্ব দিকে একটি সমুচ্চ তোরণ অবস্থিত। বাহির হইতে প্রবেশপথের উভয় পার্শ্বে দুইটি ভীম মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। বাম দিকের মূর্ত্তিটির দশ হস্তে নানা প্রহরণ ও নর-রাক্ষসের ছিন্নমুণ্ড। দক্ষিণ দিকের মূর্ত্তি অষ্টভুজ, বিবিধ অস্ত্রধারী, চারি হস্ত ভগ্ন। এখানকার লোকে মূর্ত্তিদ্বয়কে অর্জ্জুন-ভীম বলে। আমার কিন্তু মূর্ত্তিদ্বয়কে অর্জ্জুন-ভীমের কোনও লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া বোধ হইল না; রাবণের মূর্ত্তি বলিয়াই অনুমান হয়।

এতদ্ভিন্ন কুন্তীদেবী, পঞ্চপাণ্ডব, কৃষ্ণরাধিকা, গণেশ প্রভৃতি নানা দেব-মূর্ত্তি ও পৌরাণিকী মূর্ত্তি আছে। কাবেরী নদীর পরপারে যুগ-অবতারের মূর্ত্তি আছে। সেগুলি জীর্ণ, ভগ্ন।

পূর্ব্বোক্ত রাবণের মূর্ত্তি হইতে কিঞ্চিৎ অবতরণ করিয়া, ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত ও তৃষিত হইয়া আশ্রমে উপনীত হইলাম। সন্ন্যাসীরা আমার তৃষ্ণা দূর করিলেন। আমি বঙ্গদেশীয় পরিব্রাজক জানিয়া, তাঁহারা আমার সহিত নানা কথা কহিলেন। তাঁহাদের আশ্রমস্থিত রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীকে দর্শন করিয়া, কিছু প্রণামী দিয়া আশ্রম ত্যাগ করিলাম।

এইবার আমরা মান্ধাতাশৈলের পূর্ব্ব প্রান্তে উপনীত হইয়া বীরখানা শৃঙ্গে আরোহণ করিলাম। শৃঙ্গোপরি একটি প্রস্তরমণ্ডপ অবস্থিত। এই স্থানকে ভৈরবঝম্প বলে। নিম্নে নর্ম্মদা-কাবেরী-সঙ্গম। গঙ্গাযমুনার ন্যায় উভয় নদীর জলের বর্ণের পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইল। নর্ম্মদা-নীর নীল, কাবেরী-বারি-গৌরি। প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে শিবভক্ত সন্ন্যাসীরা ভৈরবঝম্প হইতে ঝম্প প্রদান করিয়া বহুনিম্নে নদীবক্ষে পাষাণোপরি পতিত হইয়া চূর্ণদেহে ভবলীলা সাঙ্গ করিতেন। সেদিন আর নাই। তাঁহাদের

বিশ্বাস ছিল, কঠোর কষ্টে তনুত্যাগ করিতে পারিলে পাপমুক্ত হইয়া জীবন্মুক্ত হইতে পারা যায়। মহাদুঃখে মহাসাধনা না করিতে পারিলে, মহাদেব প্রসন্ন হন না। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ঝম্পপ্রদান-প্রথা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

ভৈরবঝম্প হইতে আর একবার নয়ন ভরিয়া স্বভাবের শোভা দেখিলাম। এইবার আমার শিখরভ্রমণ শেষ হইল। আর কি জীবনে এখানে আসিব? দেখিলাম, নিম্নে—বহুনিম্নে মৃদুলহিল্লোলবাহিনী স্রোতস্বিনী পাষাণে প্রহতা হইয়া আবর্ত্তে ঘুরিতেছে। নদীতীর হইতে পর্ব্বত এই ভাগে বরাবর সোজা চারি পাঁচ শত ফীট উচ্চে উঠিয়াছে—দেখিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। পূর্ব্বে লোকে ইহাকে বৈদূর্য্যমণি পর্ব্বত বলিত। সূর্য্যবংশোদ্ভব নৃপতি মান্ধাতা শিবযজ্ঞে শিবকে প্রসন্ন করিয়া বরলাভ করেন। তদবধি এই পর্ব্বতের নাম মান্ধাতা হইয়াছে। তিনি পর্ব্বতের চারি দিকে গড়বন্দী প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া অতুলসৌন্দর্য্যশালিনী নগরীর প্রতিষ্ঠা করিয়া অসংখ্য দেবমন্দির ও তোরণ নির্ম্মাণ করেন। সেই মহানগরী কালের প্রভাবে ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে—কিন্তু মান্ধাতার অবিনশ্বর কীর্ত্তি ও স্মৃতি এখনও দেদীপ্যমান।

পর্ব্বত হইতে অবতরণ-কালে আমি পাণ্ডাকে কহিলাম যে, 'পাণ্ডাজী! আপ্ কয়্‌তেথে, হাম্ এক্ রোজমে সব্ ঘুম্‌নে নেহি সেকেঙ্গে?' পাণ্ডা উত্তর করিল, 'বাবুজী! আপ্‌কো ভিতর ওঙ্কারজীকো প্রভাব হ্যায়!' আমি মনে মনে ভাবিলাম, 'যদি আমার মধ্যে ওঙ্কারনাথের কণামাত্রও প্রভাব থাকিত, তা হ'লে কি আমার এমন অধোগতি হইত?'

রাত্রে এই পাণ্ডাপ্রবর আমার আহারের জন্য কয়েকখানি রুটি, ভাজী, শাক, তরকারী ও কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন আনিলেন। পূর্ব্বতন পাণ্ডা মনোহরের দেখা নাই—তিনি অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। আমাকে আহার করাইয়া পাণ্ডা চলিয়া গেল। আমি সেই বাড়ীতে একাকী একটি কক্ষের অর্গল বন্ধ করিয়া শয়ন করিলাম। ১৬ই জানুয়ারী, ১৯১৪।

অতি সুন্দর মধুর প্রভাত! নর্ম্মদার নীল বক্ষ সূর্য্যকিরণসম্পাতে জল্ জল্ করিতেছে! মনে হইতেছে, যেন দীপ্ত তারকাসমূহ গগনবিচ্যুত হইয়া নদীর বুকে খসিয়া পড়িয়া, মাধবের উরসে কৌস্তুভমণির মত জ্বলিতেছে। সির্ সির্ করিয়া শীতল সমীরণ বহিতেছে। আমি নদীতীরে আসিয়া একখানি নৌকা ভাড়া করিলাম। মান্ধাতা-দ্বীপের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নৌ-ভ্রমণের ভাড়া একটাকা ধার্য্য হইল।

নৌকারোহণে প্রথমে পূর্ব্বাভিমুখে চলিলাম। জব্বলপুরে একদিন দ্বিপ্রহরে এই মর্ম্মরশৈল-বিহারিণী নর্ম্মদাতেই জলভ্রমণে স্বর্গসুখ উপভোগ করিয়াছি— আর এই মান্ধাতার আজ আবার অপূর্ব্ব দৃশ্যাবলী দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। জব্বলপুর অপেক্ষা এ দৃশ্য আরও মহান্ বলিয়া বোধ হইল। এ যেন "শোভার উপরে শোভা গগনে ভূতলে!" নৌকা যতই চলিতে লাগিল, ততই প্রকৃতি সুন্দরী হইতে 'সুন্দরীতরা' হইতে লাগিলেন! নদীর উভয় কূলে প্রস্তর-রচিত ঘাট, শুভ্র সৌধাবলী, প্রমোদভবন প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া দুই দিকে পার্ব্বত্য সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইলাম। যতই দেখি, সৌন্দর্য্য আর ফুরায় না—নয়ন যেন কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইতে চায় না। মধ্যে মধ্যে নদী-গর্ভের পাষাণপুঞ্জ নৌকার গতি রুদ্ধ করিতে লাগিল। যে যে স্থানে নৌগতি স্থগিত হয়, সেই সেই স্থানেই স্বচ্ছ নীল বারিরাশি পাষাণস্তূপে প্রহত হইয়া, শুভ্র ফেনোচ্ছ্বাসে স্ফীত হইয়া, গম্ভীর কলরোলে গর্জ্জন করিতেছে! অমনই নাবিকেরা নৌকা হইতে নামিয়া, ধরাধরি ঠেলাঠেলি করিয়া পাষাণের উপর দিয়া নৌকার অগ্রভাগে রজ্জু বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া পার করিয়া দিতেছে। স্নিগ্ধ প্রভাত-সমীর-হিল্লোলে নৌকা আবার মৃদুমন্দ গতিতে চলিতে লাগিল। চারি দিকে পাহাড় ঘিরিয়া আসিতেছে। ভাবিলাম, বুঝি নৌকার গতি রুদ্ধ হইল; আর বুঝি অগ্রসর হইবার পথ নাই; এইবার বুঝি ফিরিতে হইল! অমনই আবার দেখি, ধীরে ধীরে পাহাড় সরিয়া যাইতেছে; সঙ্গে সঙ্গে নৌকা-গমনের নিমিত্ত নীল তরঙ্গায়িত পথ উন্মুক্ত করিতেছে। এইরূপে স্বর্গদৃশ্য দেখিতে দেখিতে নৌকার গতি ফিরাইয়া উত্তর দিকে নর্ম্মদা-কাবেরী-সঙ্গমে আসিলাম। এখান হইতে নর্ম্মদা মর্ত্তাকার দিকে গিয়াছে—নৌকাযোগে মর্ত্তাকায় যাওয়া যায়। এই সঙ্গমের মুখে রণমুক্তেশ্বর মহাদেবের মন্দির। এই দেবায়তনে চতুর্ভুজ কৃষ্ণ ও অন্যান্য দেবতা আছেন। আমি নৌকা হইতে নামিয়া মহাদেবকে দর্শন করিলাম। দর্শনান্তে নৌকাযোগে বাসায় ফিরিলাম। এই নৌ-ভ্রমণের স্মৃতি আমার হৃদয়ে চিরদিন অঙ্কিত থাকিবে।

বাসায় আসিয়া স্নানান্তে দেবাদিদেব ওঙ্কারনাথকে দর্শন করিয়া আমার নূতন পাণ্ডার গৃহে ভোজনার্থ গমন করিলাম। ইহাও একটি পূর্ব্বের ন্যায় দ্বিতল প্রশস্ত বারান্দা; উঠিবার সিঁড়ি বড়ই বিপজ্জনক, বারান্দায় রেলিং নাই। পাণ্ডা ভাত, দাল, তরকারী, রুটী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আমার আহার শেষ হইলে দুইখানি রুটী দুগ্ধ দিয়া খাইতে বলিলেন। আমি

তাঁহার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া রুটী ও দুগ্ধ খাইতে লাগিলে, তিনি পাতে চিনি ঢালিতে লাগিলেন। চিনি ঢালিতে ঢালিতে তিনি আর থামেন না দেখিয়া আমি বলিয়া উঠিলাম, 'বাস্, আউর্ মত্ দেও'; সে বলিল, 'পাও পাও'; আমি যত বুলি 'মত্ দেও মত্ দেও', সে তত বলে 'পাও পাও'; বলে আর ঢালে। বিষম বিপদ্। অর্দ্ধসের চিনি ঢালা দেখিয়া আমি ব্যাঘ্রবম্পনে পাতের উপর উপুড় হইয়া পড়িলে, তবে সে থামে। কি জালা!

ওঙ্কারের অপর পারে অমরেশ্বরের মন্দির। এতদ্ভিন্ন বিষ্ণুপুরী ও ব্রহ্মপুরী নামে দুইটি তীর্থ। কার্ত্তিক মাসে মেলা উপলক্ষে প্রায় কুড়ি হাজার নরনারী ওঙ্কার-অমরেশ্বর দর্শনে সমবেত হয়। আমি যে দিন এই তীর্থ হইতে প্রত্যাগত হই, তৎপূর্ব্বদিবস পৌষসংক্রান্তি উপলক্ষে খুব জনতা হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়, মহারাষ্ট্র, বেনিয়া, ব্রাহ্মণ, গুজরাটী প্রভৃতি নানাশ্রেণীর এতদ্দেশীয় হিন্দুতীর্থযাত্রী ও বহুসম্প্রদায়ভুক্ত সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগমে নর্ম্মদাতীর কোলাহলে মুখরিত হইয়াছিল। ফলপুষ্প-বিক্রয়কারিণী রমণীরা ফুলের ডালা, ফুল, ফুলের মালা ও বিল্বপত্রে সজ্জিত করিয়া ক্রেতাদিগকে আহ্বান করিতেছে —দেবাদিদেবের পূজার অন্যান্য অর্ঘ্য উপহার লইয়া স্নানান্তে নরনারীগণ মন্দিরাভিমুখে চলিয়াছে—কেহ কেহ চলিতে চলিতে গান ধরিয়াছে,—

"শিব ওঙ্কার অবিনাশী,
নর্ম্মদা-তীরকে বাসী!"

এতদ্ব্যতীত সন্ন্যাসীরা শিবস্তোত্রের গম্ভীর তানে আকাশ ধ্বনিত করিতে করিতে চলিয়াছেন। আমিও মন্দিরে গিয়া মহাদেবের মস্তকে বিল্বদল দিয়াছিলাম।

তাহার পরদিন আমি ওঙ্কারনাথ পরিত্যাগ করি।

বিদায়কালে পূর্ব্ব পাণ্ডা আসিয়া উপস্থিত! নূতনটি ত ছিলেনই! আমি তাহাকে প্রথমে দুই টাকা দিলাম; কিন্তু সে ঠিক হইল না বলায়, আরও এক টাকা দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিলাম। নদী পার হইয়া আবার গোযানে মর্ত্তাকার অভিমুখে যাত্রা করিলাম। কি বিভ্রাট! আবার সেই পূর্ব্ব পাণ্ডা মনোহর গোযানের সম্মুখে বসিয়া মর্ত্তাকায় চলিল; নূতন যাত্রী লইয়া আসিবে।

ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। ষ্টেশনমাষ্টার কথাপ্রসঙ্গে একটু হাসিয়া বলিলেন, "মনোহর বড় আপশোষ করিতেছে; ও বলিতেছে, আপনাকে বিক্রয়

করিয়া ভাল কাজ করে নাই, ঠকিয়া গিয়াছে।" আমি ত শুনিয়াই অবাক্! আমি মাষ্টারকে বলিলাম, "আপনি এ কি বলিতেছেন?—বেচে কে? কেনেই বা কে?" তিনি বলিলেন, "মনোহর পাণ্ডা আপনার সহিত কথা-বার্ত্তায় বুঝিয়াছিল যে, আপনি তীর্থকার্য্য করিতে আসেন নাই, দেশ দেখিতে আসিয়াছেন। এরূপ যজমানের দ্বারা কোনও লাভের সম্ভাবনা নাই ভাবিয়া, সে আপনাকে এক টাকায় আর একজন দরিদ্র পাণ্ডাকে বেচিয়াছিল। যে পাণ্ডা মনোহরকে একটি টাকা দিয়া আপনাকে কিনিয়াছিল, আপনি এক টাকার উপর চারি আনা, আট আনা, যা দেন, তাই তাহারই লাভ। আপনি যে তিন টাকা দিবেন, মনোহর স্বপ্নেও তাহা ভাবে নাই। কাজেই তাহার দু' টাকা লোকসান হইল! বেচারী বিলক্ষণ মর্ম্মাহত হইয়াছে।" ওঃ! এতক্ষণে আমি মনোহরের অন্তর্দ্ধানের কারণ বুঝিতে পারিলাম। এক টাকা মূল্যে একটি শশক বা মেষশিশু পাওয়া যায় না—কিন্তু এই দীর্ঘাকৃতি বাঙ্গালী ভ্রমণকারীর মূল্য কি এক টাকার অধিক নহে? যাহা হউক, মনোহরের অবস্থা ভাবিয়া আমি হাস্য সংবরণ করিতে পারিলাম না। আমি খাণ্ডোয়া হইয়া বুরহানপুরে যাত্রা করিলাম।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

ব্রহ্মভাষায় সংস্কৃত শব্দের কৌতুকাবহ রূপান্তর।

ব্রহ্মভাষার বর্ণমালা সংস্কৃত এবং পালি হইতে গৃহীত হইলেও ঠিক সংস্কৃত বর্ণমালার অনুরূপ নহে। দেশ ও পাত্রভেদে কতকটা পার্থক্য ও বৈচিত্র্য প্রবেশ করিয়াছে। নিম্নে তাহার কতিপয় প্রদর্শিত হইল :—

১। ব্রহ্মভাষায় স্বর অ এবং স্বর আ নাই, তৎপরিবর্ত্তে হ্রস্ব আ, দীর্ঘ আ আছে। সুতরাং অন্য কোন স্বরবর্ণ যুক্ত না থাকিলে, বর্ণসকলকে হ্রস্ব আকারান্ত বলিয়া গণ্য করা হয়। সংস্কৃত বা বাঙ্গালার ন্যায় অকারান্ত নহে।

২। শ, ষ এবং স এই তিনের পরিবর্ত্তে একটী বর্ণ আছে, যাহার উচ্চারণ ত এবং থ এর মধ্যবর্ত্তী। জিহ্বাগ্রভাগ দ্বারা উপরের দন্ত স্পর্শ করিয়া ত উচ্চারণ করিতে যে শব্দ হয়, সেই উচ্চারণ।

৩। য় এবং অন্তঃস্থ ব এর উচ্চারণ যথাক্রমে ইয়া এবং ওয়া।

৪। আরাকান প্রদেশ ব্যতীত ব্রহ্মদেশের সর্ব্বত্র র এর উচ্চারণ ইয়া, অর্থাৎ য এবং র এর উচ্চারণগত প্রভেদ নাই। বানান করিবার সময় য-কে ইয়া-পেলে এবং র-কে ইয়া-গাও, এইরূপে প্রভেদ করা হয়। (আমাদের দেশে কোন কোন অল্পবয়স্ক শিশু ল এবং র-কে অ বা য় উচ্চারণ করে। ব্রহ্মদেশীয়েরা বালকের জাতি, এই জন্যই র এর ইয়া উচ্চারণ করে কি ?)

৫। ট, ঠ, ড, ঢ, ণ কেবল পালিমূলক শব্দে ব্যবহৃত হয়।

৬। ত, থ, দ, ধ, ন এর উচ্চারণ ট, ঠ, ড, ঢ, ণ। কাজেই দুই সেট্ ট, ঠ, ড, ঢ, ণ বর্ত্তমান।

৭। শব্দের শেষ হসন্ত বর্ণের প্রায়ই উচ্চারণ হয় না। তৎপরিবর্ত্তে অনুচ্চারিত বর্ণ নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত ব্যঞ্জনস্বরের ব্যবহার হয়। এই ব্যঞ্জনস্বরের অনুরূপ কিছু বাঙ্গালায় বা সংস্কৃতে নাই। ব্যঞ্জনস্বর নির্দ্দেশ করিবার জন্য 'এইরূপ একটী চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

৮। একই বর্ণে একাধিক ফলা ব্যবহৃত হয়।

৯। র-এ হ-ফলা দিলে তাহার শ উচ্চারণ হয়।

১০। স্বরবর্ণ ও অনুনাসিক বর্ণের পরবর্ত্তী বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণের উচ্চারণ প্রায়শঃ তৃতীয় বর্ণের অনুরূপ হয়।

১১। কখন কখন বর্গের তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্ণের উচ্চারণ যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণের অনুরূপ হয়।

১২। ক্য, খ্য, গ্য এর উচ্চারণ যথাক্রমে চ্য, ছ্য, জ্য হয়।

১৩। ভ এর উচ্চারণ পূর্ব্ববঙ্গের "বাগ্যধরী", "বাত"এর মত ব। (লেখকের বাড়ী বাঙ্গালের আদিস্থান ঢাকাজেলায়, কিন্তু সত্য চিরকালই সত্য এবং স্বীকার্য্য।)

১৪। পালির ন্যায় অনেক স্থলে যুক্ত বর্ণের সরল উচ্চারণ হয়।

১৫। যুক্তবর্ণ পরে থাকিলে, কখনও কখনও পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরবর্ণের বৃদ্ধি হয়।

১৬। স্থলবিশেষে উকারান্ত বর্ণ অকারান্ত বর্ণের ন্যায় উচ্চারিত হয়।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে—

রথ—ইয়া-ঠা। (অনেক ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতসন্তান জানেন না যে, যখন গাড়ী ডাকিবার জন্য তাঁহার ব্রহ্মদেশীয় ভৃত্যকে তিনি "ইয়া-ঠা খ" বলেন, তখন তিনি বাস্তবিক বলিতেছেন "রথ কহ (?)")

বীর্য্য=ওয়ী-রিয়া।

শক্র=শক্য=তা-ক্যা=তা-হ্যা=তা-জ্যা।

মেঘ=মেঘ্=মোঘ্=মো।

সিংহ=সিহ=তিহা। (সিংহের আর এক রূপান্তর "ছিন্থে"।)

হংসবতী=হান্ তা ওয়াটী=হান্‌তা ওয়াডী। (পেগু নগরের প্রাচীন নাম হংসবতী। প্রবাদ এইরূপ, ঐ স্থানে পূর্ব্বে সমুদ্র ছিল এবং তীর-সন্নিহিত ক্ষুদ্র দ্বীপে যুগল হেমহংস উপবেশন করিয়াছিল। বুদ্ধদেব ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, "যে স্থানে হংস উপবেশন করিয়াছে, সেই স্থানে কালে এক মহানগর সংস্থাপিত হইবে।" ব্রহ্মদেশীয়েরা মনে করে, পেগু নগর স্থাপিত হওয়ায় বুদ্ধদেবের দৈববাণী সফল হইয়াছে।)

সারবতী=তা ইয়া ওয়াটী=তা ইয়া ওয়াডী। (ইং Tharrawaddy)

হংসস্থ=হিং তা ঠা। (ইং Henzada, নিম্নব্রহ্মের একটী জেলা।)

ভাষা=বা তা=বাদা।

শব্দ=তড্ডা। (শব্দশাস্ত্র বা ব্যাকরণ।)

শাস্ত্র=শাত=তাটা=তাট্=তা।

পক্ষদিন=পিয়াক্‌থ্যা-ডেইন। (পঞ্জিকা।)

কর্ম্ম=কাম্মা=কাম্=কান্।

ধর্ম্ম=ঢাম্মা।

দণ্ড=ডাণ্ডা=ডান্।

কুল=কলা=কালা। (কুল বা জাতিভেদযুক্ত জাতি। পূর্ব্বে ইহা "বিদেশী" অর্থে প্রযুক্ত হইত।)

জ্ঞান=ঞান্=নিয়ান্।

পুণ্য=পা-ণ্যা=পিণিয়া।

সামান্য=তামানিয়া=তামা ঞা।

ভয়=ভে ইয়া=বে ইয়া।

ভূত=ভোট্=ভো=বো।

বল=বোল্=বো। (সেনা বা সেনানায়ক।)

প্রাসাদ=পিয়া তাট্=পিয়াতা।

বুদ্ধ=বুড্ঢা=বৌঢা।

দুঃখ=ডুখ খা=ডোখা।

কার্য্য—কিচ্ছা—কেইছা।

বিনামা (?)—বিনা—বনা—ফনা। (পাদুকা।)

এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। এই সকল রূপান্তর দেখিয়া "ছোলাভাজা"র কলিকাতা যাইয়া "চাণাচুর" নাম ধারণের গল্প মনে পড়ে।

উচ্চারণ অপেক্ষা সংস্কৃত শব্দের অর্থের প্রভেদ এবং বৈচিত্র্য আরও কৌতুকজনক এবং স্থানবিশেষে ঐতিহাসিক তত্ত্ব-প্রদর্শক।

বারান্তরে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দাস, বি, এল্।

বেসিন্, ব্রহ্ম।

দিল্লীর কথা।*

দিল্লী অতি প্রাচীন নগরী। সম্প্রতি দিল্লীতে ব্রিটিশ রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে নূতনভাবে তৎপ্রতি লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতে কালচক্রের আবর্ত্তনে দিল্লীর ভাগ্যাকাশে শত শত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পবিত্রসলিলা দৃষদ্বতীর তীরভূমে পৃথ্বীরায়ের পতনের সঙ্গে সঙ্গে দিল্লী হইতে হিন্দুর আধিপত্য বিলুপ্ত হইয়াছে; কেবল একবার বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় ক্ষণকালের জন্য হিমুর (হেমচন্দ্র) বিজয়-বৈজয়ন্তী দিল্লীর দুর্গপ্রাকারে উড্ডীন হইয়াছিল। হিমুর সঙ্কীর্ণ সময় ছাড়িয়া দিলে, বৈচিত্র্যময়ী দিল্লী নগরী ছয়শত বৎসর মোসলমানজাতির লীলাক্ষেত্র ছিল। এই লীলার বিবরণ অদ্ভুত নানা রসে আপ্লুত এবং কৌতূহলোদ্দীপক। আমরা এখানে সে বিবরণ সঙ্কলন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

শাহজাহান পাদশাহের সমসাময়িক ইতিহাস-লেখক শোভন রায় দিল্লীর বর্ণনা উপলক্ষে লিখিয়া গিয়াছেন, "পুরাকালে হস্তিনাপুর হিন্দুস্থানের অধীশ্বরদের রাজধানী ছিল। হস্তিনাপুর গঙ্গানদীর তীরে অবস্থিত ছিল। তৎকালে এই

* 1. Elliot's History, Vols. II—VIII, 2. Fall of the Moghul Empire (Keene), 3. The Turks in India (Keene), 4. "Erskine's Babar and Humayun".

নগরীর বিস্তার ও আকার কিরূপ ছিল, তৎসম্বন্ধে গ্রন্থাদিতে অনেক আলোচনা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়েও (শাহজাহানের আমলেও) ইহা সাতিশয় জনাকীর্ণ, কিন্তু পুরাকালের তুলনায় নগণ্য। পাণ্ডব ও কৌরবে বিবাদ উপস্থিত হইলে, পাণ্ডবগণ যমুনার তীরবর্ত্তী ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করেন। তথায় তাঁহাদের রাজধানী স্থাপিত হয়। এই ঘটনার বহুকাল পরে রাজা অনঙ্গ পাল তোমর ইন্দ্রপ্রস্থের নিকটবর্ত্তী স্থানে দিল্লী নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্ত্তী কালে পৃথ্বী রায় একটী দুর্গ এবং নগর নির্ম্মাণ করিয়া, তাহা স্বীয় নামানুসারে অভিহিত করেন।

সুলতান কুতবউদ্দীন আইবক এবং সুলতান আল্তমাস পৃথ্বী রায়ের দুর্গে বাস করিতেন। অতঃপর সুলতান গিয়াসউদ্দীন বল্বন্ সহর জগন নামক আর একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। তদীয় পৌত্র কৈকোবাদ যমুনা নদীর তীরে সৌষ্ঠবশালী প্রাসাদাবলীপূর্ণ কিলুগড়ি নামক একটি নূতন নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্রুতনামা পারসীর কবি আমীর খুসরু এই নগরীর বর্ণনা করিয়া কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। সুলতান জালালউদ্দীন কুস্কলাল নাম্নী নগরী স্থাপন করিয়া তথায় বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। সুলতান আলাউদ্দীনের রাজধানীর নাম ছিল কুস্কসিরি। এই নগরী তাঁহার স্বপ্রতিষ্ঠিত ছিল। সুলতান গিয়াসউদ্দীন তোগলোকের আমলে আর একটি নূতন নগরী স্থাপিত হইয়াছিল। পুত্র মোহাম্মদ জুনা আবার একটি নূতন নগরী স্থাপন করিয়া তথায় সুদৃশ্য সহস্রস্তম্ভ প্রাসাদ এবং রক্তপ্রস্তরগঠিত কতিপয় অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। তদীয় উত্তরাধিকারী ফিরোজশাহ তোগলকের সময়ে ফিরোজাবাদ নামক একটি সুবৃহৎ নগরীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ফিরোজশাহ যমুনা নদী হইতে খালকর্ত্তন করিয়া এই নূতন নগরীতে জল আনয়ন করেন। এই নূতন নগরী হইতে তিন ক্রোশ দূরে তিনি একটি সুদৃশ্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই প্রাসাদের অভ্যন্তরে একটি সুদীর্ঘ স্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল। এই স্তম্ভ অদ্যাপি (শাহজাহানের রাজত্বকাল) একটি ক্ষুদ্র শৈলপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহা সাধারণ্যে ফিরোজশাহের লাট নামে পরিচিত। সুলতান মবারকশাহ আপন নাম অনুসারে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। মোগল অধিপতি হুমায়ুন প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ দুর্গের উদ্ধার এবং জীর্ণসংস্কার সাধন করিয়া তাহার নাম দীনপান্না রাখেন এবং তথায় বাস করিতে প্রবৃত্ত হন। অতঃপর সের আফগানের অভ্যুদয় হয়। তিনি কুস্কসিরি নগরীর ধ্বংস

করিয়া আর একটি নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। পুত্র সেলিমশাহ সেলিমগড় নামে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। এই দুর্গ এখনও (শাহজাহানের রাজত্ব-কাল) শাহজাহানাবাদের অপর তীরে যমুনা নদীর তীরে দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও অনেক অধিপতিই এক একটি নূতন রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা হইলেও হিন্দুস্থানের রাজধানীরূপে দিল্লী নগরীর নামই সর্ব্বত্র খ্যাত রহিয়াছে। শাহজাহান পাদশাহ দিল্লী নগরীর নিকটে শাহজাহানাবাদ নামে একটি নূতন নগরীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই নূতন নগরীর ঔজ্জ্বল্যে পূর্ব্ব-বর্ত্তী সুলতানগণের নির্ম্মিত নগরী সকল হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে এবং তৎ-সমুদয় এক সাধারণ শাহজাহানাবাদ নামে পরিচিত হইয়াছে।"

সুলতান মহম্মদঘোরী দিল্লীতে মোসলমানের অধিকার স্থাপন করেন। কিন্তু তাঁহার বিজয়োদ্যমের অন্যূন দুই শত বৎসর পূর্ব্বে মোসলমানজাতি রত্না-লঙ্কার-ভূষিতা দিল্লীর প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। মোসলেম্ কুল-মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষের কালান্তক যমস্বরূপ সুলতান মাহমুদ গজনীর ভাগিনেয় মসায়ুদ দিল্লী নগরী আক্রমণ করেন। আমরা সে বিবরণ মির-আত-ই-মসুদি নামক গ্রন্থ অবলম্বনে সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।

রাজকুমার মসায়ুদ বিপুল বাহিনী সহ দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তিনি দিল্লীর সম্মুখবর্ত্তী হইয়াও আক্রমণে বিরত হইলেন এবং শিবির সংস্থাপন করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এইভাবে মাসাধিক কাল অতিবাহিত হইল। তখন মসায়ুদ শঙ্কাকুল হইয়া পরমেশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ইহার পর হঠাৎ কতিপয় মোসলমান সেনাপতি সসৈন্যে আগমন-পূর্ব্বক তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন। দিল্লীর অধিপতি মহীপাল শত্রুর বলাধিক্য দর্শনে ভীত হইয়া কালহরণ করা অসমীচীন বিবেচনা করিয়া শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিলেন। রাজকুমার গোপালের অস্ত্রাঘাতে মসায়ুদের নাসিকা হইতে রক্ত প্রবাহিত হইল, তাঁহার দুইটি দন্ত ভগ্ন হইল। কিন্তু মসায়ুদ তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অমিতপরাক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বহুসংখ্যক মোসলমানসৈন্য হত হইল; অসংখ্য হিন্দুসৈন্য জীবন বিসর্জ্জন করিল। হিন্দুসৈন্যের সংখ্যা ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। অনেকে পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিল। কিন্তু মহীপাল এবং শ্রীপাল কতিপয় সেনানীসহ অবিচলিতভাবে অমিতপরাক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আত্মীয় স্বজন তাঁহাদিগকে যুদ্ধ ক্ষান্ত করিয়া প্রাণ রক্ষা করিতে অনুরোধ

করিলেন। কিন্তু তাঁহারা যুদ্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনাদের নাম কলঙ্কপূর্ণ করিতে অসম্মত হইলেন; তাঁহারা স্বরাজ্যের রক্ষা-কল্পে প্রাণপাত করিলেন। মসায়ুদ জয়লাভ করিলেন, দিল্লীর রাজ্য তাঁহার পদতলে পতিত হইল। কিন্তু তিনি তথায় আধিপত্য-স্থাপন সম্বন্ধে ঔদাসীন্য দেখাইলেন; দিল্লীতে অর্দ্ধবৎসর-কাল অবস্থানপূর্ব্বক উহার রক্ষার নিমিত্ত তিন সহস্র উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী ও সৈন্য রাখিয়া মিরাটের অভিমুখে অভিযান করিলেন। দুই শত বৎসরের মধ্যে দিল্লীতে আর মোসলমানের আক্রমণ হয় নাই। তার পর মোহাম্মদ ঘোরী কর্ত্তৃক দিল্লী নগরী অধিকৃত হইয়াছিল। বিজয়ী বীর হিন্দুর সর্ব্বপ্রধান নগরী দিল্লীর অভি-মুখে অভিযান করিলেন। তিনি দিল্লীর সম্মুখবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন যে, পৃথিবীর সপ্ত ভাগের কোন স্থানেই দিল্লীর ন্যায় সমুচ্চ এবং সদৃশ দুর্গ অথবা তত্তুল্য দ্বিতীয় দুর্গ বর্ত্তমান নাই। সৈন্যগণ দুর্গের চতুষ্পার্শ্বে শিবির সংস্থাপন করিয়া রহিল। যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইল। ইহা প্রতীয়মান হইল যে, পৃথিবীর অধীশ্বরের আক্রমণ হইতে নিরাপদ্ হইবার জন্য ইচ্ছুক না হইলে এবং শয়তানের পরামর্শ গ্রহণ করিলে, দিল্লীর অবস্থা শোচনীয় হইবে। এজন্য রাজদণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভ জন্য সে রাজ্যের রায় এবং মোকদমগণ বশ্যতা অঙ্গীকারপূর্ব্বক মালগুজারী প্রদান এবং অন্যান্য কর্ম্মসাধন সম্বন্ধে সুদৃঢ় সর্ত্ত সকল পালন করিতে সম্মত হইলেন। অতঃপর সুলতান গজনী রাজ্যের রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু রাজসৈন্য দিল্লীর অন্তর্গত ইন্দ্রপ্রস্থ মৌজায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। অতঃপর কুতব-উদ্দীন প্রতিনিধির পদে নিযুক্ত হইয়া সমগ্র পৃথিবীর সম্পদের বেদিস্বরূপ দিল্লী নগরীতে বাস করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া এরূপ নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন যে, তৎকালে ব্যাঘ্র ও মেষ এক জলাশয়ের জলপান করিত এবং যে চোর ও চৌর্য্যের কথা সকলের জিহ্বাগ্রে থাকিত, তাহা ধূলিসাৎ হইয়াছিল। মোসলমান ঐতিহাসিক কুতবের শাসনকার্য্যের এইরূপ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার সময়েও বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়াতে দিল্লীর অধিবাসীরা বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিল। বিদ্রোহের প্রথম অবস্থায় কুতবউদ্দীন উহার দমন জন্য মনোযোগী হয়েন নাই। পরে তিনি বিদ্রোহীদের মুণ্ডপাত জন্য কতিপয় সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারা বায়ুর ন্যায় গতিতে অগ্নিতুল্য তেজে বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিলেন। অনেকে নিহত হইল, অনেকে সিংহের ভয়ে শৃগালের ন্যায় পলায়ন করিল এবং

কুমীর ও চিতা বাঘের ন্যায় জলপথে এবং পার্ব্বত্যপথে ধাবিত হইয়া বনজঙ্গলে কোষস্থিত তরবারি অথবা কাগজপত্রাধারস্থিত কলমের ন্যায় লুক্কায়িত হইল।*

সুলতান মোহাম্মদ ঘোরী পরলোকগত হইলে, কুতব উদ্দীন আইবক স্বাধীনভাবে হিন্দুস্থানের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদ্বংশীয়গণ অষ্টম পুরুষ পর্য্যন্ত দিল্লীতে আধিপত্য করেন। কুতব উদ্দীন এবং তাঁহার পরবর্ত্তী ছয় জন সুলতান পৃথ্বী রায়ের দুর্গে অবস্থিতি করিতেন। সুলতান গিয়াস উদ্দীন বল্‌বনের রাজত্বকালে নূতন দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। মিওয়াত্তি নামক একদল দুর্ব্বৃত্ত দিল্লীর উপকণ্ঠে বাস করিত। তাহাদের উপদ্রবে দিল্লী-বাসীর শান্তি অন্তর্হিত হইয়াছিল। তাহারা দিবা দ্বিপ্রহরে প্রকাশ্যভাবে অধিবাসীদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিত। সুলতান বল্‌বন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তাহাদের বিষদন্ত ভগ্ন করিতে উদ্যোগী হন। সুলতান গোপালগির নামক স্থানে নূতন দুর্গের প্রতিষ্ঠা করেন। শোভন রায় সহর জগন নামে এই দুর্গের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার পার্শ্বে কতিপয় সৈন্যের থানা স্থাপিত হয়। এইরূপ নানা উপায় অবলম্বন করিয়া সুলতান মিওয়াত্তি দুর্ব্বৃত্তদিগের বিনাশ সাধন করেন। তদীয় বিলাসী উত্তরাধিকারী পৌত্র কৈকোবাদ আপন মনো-মত এক নূতন নগরীর প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। কৈকোবাদ কালগ্রাসে পতিত হইলে অভিনব রাজবংশের অভ্যুদয় হয়। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম জালাল উদ্দীন খিলিজি। সুলতান কুতব উদ্দীন আইবকের সময় হইতে সুলতান কৈকোবাদের রাজত্ব পর্য্যন্ত যে সকল নৃপতি দিল্লীতে আধিপত্য করেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই তুর্কী। জালাল খিলিজি-বংশসম্ভূত ছিলেন। দিল্লীর ওমরাহগণ ৮০ বৎসর কাল তুর্কীদিগের অধীন ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা স্বভাবতঃই তুর্কীর আধিপত্যের অনুরাগী ছিলেন। তাঁহারা তুর্কীর আধিপত্য-ধ্বংসকারী জালালের বিদ্বেষী হইলেন। জালাল বিবেচনা করিলেন, দিল্লীতে অবস্থিতি করিয়া শাসনকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহাদের বিদ্বেষ উত্তরোত্তর ঘনীভূত হইবে এবং তাহাতে শাসনযন্ত্র বিশৃঙ্খল ভাব ধারণ করিবে। এই কারণে তিনি দিল্লীতে প্রবেশ না করিয়া কিলুগড়ি নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিলেন। অচিরে কিলুগড়ি বিচিত্র সৌধমালায় ভূষিত হইয়া উঠিল। ব্যবসায়ীরা দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া

---

* তাজু-ল-মা আসির নামক ইতিহাস হইতে সংক্ষিপ্তভাবে অনূদিত।

তথায় পণ্যশালা স্থাপন করিল। লোকে কিলুগড়িকে নূতন নগরী নামে অভি-হিত করিতে লাগিল। *

জালাল উদ্দীনের পরবর্ত্তী সুলতান আলা উদ্দীনের সময় আবার রাজ-ধানীর পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। মোগলেরা ভারতবর্ষের ধনধান্য লুণ্ঠন করিবার উদ্দেশ্যে দিল্লীর দ্বারদেশে উপনীত হয়। এই সময় দিল্লী নগরী অরক্ষিত অবস্থায় ছিল, কেবল দৈবানুগ্রহে রক্ষা প্রাপ্ত হয়। এই কারণ আলা উদ্দীন অভিযান এবং দুর্গ জয়ের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন এবং সিরি নামক স্থানে একটি নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হন। এই দুর্গ নির্ম্মিত হইলে, তিনি তথায় বাস করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে এই স্থান সম্পদশালী হইয়া উঠে। আলা উদ্দীনের আদেশে দিল্লীর পুরাতন দুর্গেরও সংস্কার হইয়াছিল। আলা উদ্দীন পরলোকগত হইলে তদীয় পুত্র কুতব উদ্দীন খিলিজি সাম্রাজ্যাধিকারী হন। তাঁহার অবিমৃষ্যকারিতায় খিলিজিবংশের বিলোপ হয় এবং সুলতান গিয়াস উদ্দীন তোগলক দিল্লীর আধিপত্য লাভ করিয়া একটি নূতন (তোগলক) বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। গিয়াস উদ্দীন নূতন বংশের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নগরীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই নগরীর নাম তোগলকাবাদ।

এইরূপে রাজপরম্পরায় দিল্লীর সৌষ্ঠব ও আয়তন বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সুলতান গিয়াস উদ্দীন তোগলকের পুত্র মোহাম্মদ জুনার রাজত্বকালে এই শোভা ও সম্পদের আধার দিল্লী নগরী জনশূন্য হইয়াছিল। তাঁহার আমলে দুইজন বৈদেশিক পর্য্যাটক দিল্লী নগরী পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে দিল্লী নগরী সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। দুই-জন পর্য্যাটকের একজনের নাম ইবন বতুতা, অপরের নাম সাহবুদ্দীন। সাহ-বুদ্দীন দিল্লীর যে বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা তাহা এখানে প্রকাশ করিতেছি:—

"দিল্লী কতিপয় নগরীর একত্রীভূত সমষ্টি মাত্র। প্রত্যেক নগরীর স্বতন্ত্র নাম আছে। তন্মধ্যে একটির নাম দিল্লী বলিয়া তাহার পার্শ্ববর্ত্তিনী অন্যান্য নগরীও ঐ নামে পরিচিত। সমগ্র দিল্লী নগরীর পরিধি ২০ ক্রোশ। গৃহ সকল প্রস্তর ও ইষ্টক-নির্ম্মিত, কিন্তু ছাদ কাষ্ঠময়। মর্ম্মরের ন্যায় একপ্রকার শুভ্রবর্ণ

* এই বিবরণ তারিখ-ই ফিরোজশাহী নামক বিখ্যাত ইতিহাস অবলম্বনে সঙ্কলিত হই-য়াছে। তারিখ-ই ফিরোজশাহীতে সুলতান জালাল উদ্দীন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত নগরীর নাম কিলুগড়ি লিখিত হইয়াছে। কিন্তু শোভন রায়ের ইতিহাস অনুসারে কৈকোবাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত নগরীর নাম কিলুগড়ি এবং সুলতান জালাল উদ্দীন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত নগরীর নাম কুস্ক-লাল ছিল। আমরাও শোভন রায় কর্ত্তৃক লিখিত বিবরণ সঙ্কলন করিবার সময়ে ঐরূপ লিখিয়াছি।

প্রস্তর দ্বারা গৃহচত্বর নির্ম্মিত হয়। দিল্লীতে ত্রিতল গৃহ দেখিতে পাওয়া যায় না; অধিকাংশ গৃহই দ্বিতল, কোন কোন গৃহ একতল মাত্র। সুলতানের প্রাসাদ ব্যতীত আর কোথায়ও গৃহচত্বর মর্ম্মরপ্রস্তরগ্রথিত নহে। কিন্তু অধুনা যে সকল গৃহ প্রস্তুত হইতেছে, তাহার নির্ম্মাণপ্রণালী স্বতন্ত্র। দিল্লী একুশটী বিভিন্ন নগরীর সমষ্টি। ইহার তিন দিক্ উদ্যানে শোভিত, পশ্চিম পার্শ্ব পর্ব্বতসংলগ্ন বলিয়া সে দিকে কোন উদ্যান প্রস্তুত হইতে পারে নাই। দিল্লীতে এক সহস্র পাঠশালা ও সত্তরটি সাধারণ চিকিৎসালয় বিদ্যমান রহিয়াছে। নগরী ও উহার উপকণ্ঠের ধর্ম্মমন্দির ও আশ্রমের সংখ্যা দ্বিসহস্র। সুবৃহৎ মঠ, প্রশস্ত বিচরণভূমি এবং অগণিত স্নানাগার সংস্থাপিত দেখিতে পাওয়া যায়। দিল্লীর অধিবাসীরা অনতিগভীর কূপের জল ব্যবহার করিয়া থাকে। এই সকল কূপ কদাচিৎ সাত হাত অপেক্ষা গভীর। অধিবাসীরা বৃহৎ বৃহৎ চৌবাচ্চায় বৃষ্টির জল সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া পান করে। একটি তীর নিক্ষেপ করিলে যতদূরে পতিত হয়, ততদূর অন্তর অন্তর এই সকল চৌবাচ্চা সংস্থাপিত। দিল্লীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মসজিদ অভ্রভেদী চূড়ার জন্য বিখ্যাত। তাদৃশ সমুচ্চ চূড়া পৃথিবীর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। উহা ছয় শত হস্ত পরিমিত উচ্চ।”

ইবন বতুতা দিল্লীর বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় দিল্লীর তদানীন্তন অবস্থা পরিস্ফুট হইয়াছে। আমরা সেই চিত্র এখানে পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম। “শোভা ও সম্পদের আধার সুপ্রসিদ্ধ বৃহদায়তন দিল্লী নগরীতে উপনীত হইলাম। ইহা চতুর্দ্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত। ঈদৃশ প্রাচীর পৃথিবীর আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। দিল্লী ভারতবর্ষের বৃহত্তম নগরী। কেবল ভারতবর্ষ কেন, ইহা মোসলমানাধীন প্রাচ্যজগতের বৃহত্তম নগরী। দিল্লী সুবিস্তীর্ণ ও জনাকীর্ণ নগরী। বর্ত্তমান সময়ে ইহা পরস্পর সংযুক্ত চারিটী স্বতন্ত্র ভাগে বিভক্ত।

১। প্রকৃত দিল্লী পৌত্তলিক হিন্দু রাজগণ কর্ত্তৃক সংস্থাপিত। ১১৮৪ খৃষ্টাব্দে মোসলমানগণ দিল্লী-জয় সম্পন্ন করিয়াছেন।

২। সিরি অথবা দারুলখিলাফত। খলিফা আব্বা সৈয়দ আল মুস্তান সিরের পৌত্র (grand son) সুলতান গিয়াস উদ্দীনের সহিত সাক্ষাৎ জন্য আগমন করিলে, তিনি তাঁহাকে এই অংশ প্রদান করেন। সুলতান আলা উদ্দীন এবং তদীয় পুত্র কুতব উদ্দীন এখানে বাস করিতেন।

৩। তোগলিকাবাদ। বর্ত্তমান সম্রাটের পিতা সুলতান তোগলক

এই অংশ সংস্থাপন করেন। এই কারণ ইহা তাঁহার নামানুসারে অভিহিত হইয়াছে।

৪। জাহানপান্না (Refuge of the world) বর্ত্তমান সম্রাটের বাসের জন্য বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট। মোহাম্মদ নিজে এই অংশ সংস্থাপন করিয়াছেন। তিনি এই বিভাগ-চতুষ্টয়কে বেষ্টন করিতে ইচ্ছা করিয়া প্রাচীরের কিয়দংশ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কিন্তু এই কার্য্য বহুব্যয়সাধ্য বলিয়া সে সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হইয়াছে। দিল্লীর চতুর্দ্দিক্ প্রাচীর-বেষ্টিত। ঈদৃশ প্রাচীর আর কোথাও দেখা যায় না। ইহার প্রশস্ততার পরিমাণ ১১ হস্ত। প্রাচীরের গাত্রে প্রহরী ও দ্বাররক্ষকদের জন্য বাসগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল গৃহে নানাবিধ যুদ্ধোপকরণ সংরক্ষিত রহিয়াছে। Mangonels (an engine formerly used for throwing stones and battering walls) এবং র আদস (a machine employed in seize) নামক যুদ্ধাস্ত্র রাখিবার জন্য প্রাচীর-গাত্রে গৃহ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এই সকল প্রাচীরসংলগ্ন গৃহে শস্য সঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহাতে শস্যের কোন প্রকার অনিষ্ট অথবা পরিবর্ত্তন হয় নাই। আমি একটি ভাণ্ডার হইতে কতকগুলি চাউল বাহির করিয়া দেখিয়াছি, উহার রং কাল, কিন্তু স্বাদ উত্তম। আমি কতকগুলি ঘাসের দানাও বাহির করিয়া দেখিয়াছি। নব্বই বৎসর পূর্ব্বে স্বলতান বল্‌বন এই সকল শস্য সঞ্চিত করিয়াছিলেন। পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য প্রাচীরের অন্তর্ভাগে সহরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অনায়াসে গমনাগমন করিতে পারে। আলোকপ্রবেশ জন্য প্রাচীরের অন্তর্ভাগে নগরমুখে গবাক্ষ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। প্রাচীরের নিম্নভাগ প্রস্তর ও ঊর্দ্ধভাগ ইষ্টকনির্ম্মিত। তদুপরি অসংখ্য বরুজ ঘন ঘন ভাবে সংস্থাপিত। দিল্লী নগরীর আটাইশটী প্রবেশদ্বার। তন্মধ্যে বদায়ুন নামক দ্বারই প্রথম ও প্রধান।" মোহাম্মদ তোগলকের দুর্ব্বুদ্ধি ও হঠকারিতা নিবন্ধন এইরূপ শোভা ও সম্পদের আধার ও বহুজনাকীর্ণ দিল্লী নগরী জনশূন্য ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছিল। ইতিহাসবেত্তৃগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, মোহাম্মদ শাসন-সৌকর্য্যার্থ পাঠানসাম্রাজ্যের মধ্যবিন্দু দেবগিরিতে রাজধানী স্থাপন করিতে সঙ্কল্প করেন। তজ্জন্য রাজাদেশে বালবৃদ্ধনির্ব্বিশেষে দিল্লীর অধিবাসী মাত্রেই দেবগিরিতে (মোহাম্মদ এই স্থানের নাম দৌলতাবাদ রাখেন) গমন করিতে বাধ্য হয়। ইহাতেই দিল্লী জনশূন্য ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু ইবন বতুতা ইহার অন্যবিধ কারণ

নির্দেশ করিয়াছেন, আমরা এখানে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম।—"সুলতানের বিরুদ্ধে একটি গুরুতর অভিযোগ এই যে, তিনি দিল্লীর অধিবাসীদিগকে তাহাদের বাসভবন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। দিল্লীর অধিবাসীরা সুলতানকে কয়েকখানি ভৎর্সনা ও অপমানসূচক পত্র লিখিয়াছিল। এই কারণ তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। তাহারা পত্রগুলি বন্ধ করিয়া রাত্রিযোগে দরবারগৃহে নিক্ষেপ করিয়াছিল। এই সকল পত্রের শিরোভাগে নিম্নোদ্ধৃত বাক্যটী লিখিত ছিল ;—'পৃথিবীশ্বরের মাথার দিব্য, তিনি ব্যতীত আর কেহ যেন এই পত্র পাঠ না করেন।' সুলতান খুলিয়া দেখেন যে, পত্রগুলি তাঁহার বিরুদ্ধে ভৎর্সনা ও অপমানসূচক বাক্যে পূর্ণ। তিনি দিল্লী নগরী বিনষ্ট করিতে সঙ্কল্প করিয়া প্রথমতঃ মূল্য দিয়া সমস্ত গৃহ ও সরাই ক্রয় করেন। তার পর সমস্ত অধিবাসীকে দৌলতাবাদ (দেবগিরি) গমন করিতে আদেশ করেন। প্রথমে তাহারা রাজাদেশ প্রতিপালন করিতে অনিচ্ছা করিয়াছিল। কিন্তু রাজপ্রচারকগণ ঘোষণা করে যে, তিন দিন পরে কেহই দিল্লীতে বাস করিতে পারিবে না। অধিকাংশ অধিবাসীই দিল্লী পরিত্যাগ করে ; কেহ বা গৃহমধ্যে লুক্কায়িত হইয়াছিল। যাহারা গমন করে নাই, মোহাম্মদ তাহাদিগকে তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিতে আদেশ করেন। তদীয় ক্রীতদাসেরা রাজপথে দুইজন লোক পাইয়াছিল ; তাহাদের একজন পঙ্গু, অপরটি অন্ধ। ইহাদিগকে সুলতানের নিকট উপস্থিত করা হয়। তিনি পঙ্গুকে একটি মঞ্জালিক হইতে গুলি করিয়া নিক্ষেপ করিতে এবং অন্ধকে দিল্লী হইতে চল্লিশ দিনের পথ দৌলতাবাদে টানিয়া লইয়া যাইতে আদেশ করেন। ভ্রমণকালে এই নিরুপায় দুর্ভাগার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল, তাহার একখানি পদমাত্র দৌলতাবাদে পৌঁছিয়াছিল। আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেই দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া গমন করে ; তাহারা পণ্যদ্রব্য ও গৃহসামগ্রী দিল্লীতে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। এইভাবে দিল্লী সম্পূর্ণ জনশূন্য হয়। আমার বিশ্বাসভাজন এক ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছেন যে, একদা সুলতান প্রাসাদোপরি আরোহণ করিয়া অগ্নি, ধূম ও আলোক-বর্জ্জিত দিল্লীর চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক বলেন, 'এতদিনে আমার হৃদয় পরিতুষ্ট এবং জিঘাংসাবৃত্তি পরিতৃপ্ত হইয়াছে।' কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে, মোহাম্মদ অন্যান্য প্রদেশ হইতে প্রজা আনয়ন করিয়া পুনর্ব্বার দিল্লী নগরী জনপূর্ণ করিতে আদেশ করেন। কিন্তু দিল্লী নগরী এত বৃহৎ যে, তাহারা স্ব স্ব

দেশের অনিষ্ট করিয়াও উহা পূর্ব্ববৎ সৌষ্ঠবশালী করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ দিল্লী পৃথিবীর একটী বৃহত্তম নগরী, দিল্লী শোভা ও সম্পদের কেন্দ্রস্থল। উহার কারুকার্য্যখচিত মসজিদ ও সুগঠিত প্রাচীর পৃথিবীতে অতুলনীয়। যদিচ সুলতান দিল্লী নগরীকে পুনর্ব্বার জনপূর্ণ করিতেছেন, তথাপি পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগরী লোকসংখ্যায় একান্ত নগণ্য। আমি যে সময় রাজধানীতে উপনীত হই, তখন উহার যেরূপ অবস্থা দেখিয়াছি, তাহা বর্ণনা করিলাম। দিল্লী নগরীর লোকসংখ্যা অতি সামান্য; সমস্ত নগরী জনশূন্য ও পরিত্যক্ত বলিয়া বোধ হয়।"*

মোহাম্মদ জুনার উত্তরাধিকারী ফিরোজ শাহ তোগলক কর্ত্তৃক দিল্লী নগরী পুনর্নির্ম্মিত এবং জনপূর্ণ হইয়াছিল। তিনি স্বরচিত বৃত্তান্তের একস্থানে লিখিয়াছেন, পূর্ব্ববর্ত্তী নরপতি এবং আমীর ওমরাহগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত যে সকল সৌধ এবং ইমারত কালপ্রভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, পরমেশ্বরের আদেশে আমি তৎসমুদয় পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করিয়াছি। এই কার্য্য সমাধা করিয়া আমরা নিজের সঙ্কল্পিত নগরী নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। এই নবনির্ম্মিত অংশ ফিরোজাবাদ নামে খ্যাত হইয়াছিল। ফিরোজ শাহের স্বরচিত বৃত্তান্তে তৎকর্ত্তৃক সংস্কৃত সৌধ এবং ইমারতের সুবিস্তৃত তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা অনাবশ্যক বোধ করিয়া তাহা উদ্ধৃত করিলাম না।

ফিরোজ শাহ কর্ত্তৃক দিল্লীর পুনরুদ্ধারসাধন সম্পাদিত হইয়াছিল। কিন্তু দিল্লীর ভাগ্য অভিশপ্ত বলিয়া ইহার পর আট বৎসরের মধ্যেই দিল্লী নগরীর সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছিল। এই সর্ব্বনাশের কারণ তৈমুরের দিল্লী আক্রমণ। মানবজাতির শত্রুস্বরূপ তৈমুরলঙ্গ বৃকপত্রসদৃশ বিপুল বাহিনীসহ ভারতবর্ষে উপনীত হন এবং সমৃদ্ধ জনপদ সকল ধ্বংস করিতে করিতে দিল্লীর দ্বারদেশে আগমন করেন। যৎকিঞ্চিৎ প্রতিরোধের পর দিল্লী নগরী বিজয়ী বীরের নিকট আপন দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছিল। তৈমুরলঙ্গ দিল্লী নগরীতে প্রবিষ্ট হইয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন এবং আনন্দিতচিত্তে উৎসবে মত্ত হইলেন। ইহার এক সপ্তাহ পরে দুর্দ্দান্ত মোগলসৈন্য প্রলোভন সংবরণ করিতে অসমর্থ হইয়া সহর লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হইল। সহস্র সহস্র হিন্দু নরনারী মোগলের হস্ত হইতে মান ইজ্জত রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে জীবন বিসর্জ্জন

* সুলতান মোহাম্মদ জুনার রাজত্বকালে দিল্লী নগরীর অবস্থা সম্বন্ধে যে বর্ণনা প্রদত্ত হইল, তাহা লেখকের পাঠানরাজবৃত্ত নামক পুস্তক হইতে সঙ্কলিত।

করিল। লোভোন্মত্ত মোগলসৈন্য পাঁচ দিন পর্য্যন্ত অতুল সমৃদ্ধি ও শ্রীশালিনী দিল্লী নগরী ছারখার করিল। তাহাদের অমানুষিক অত্যাচারে শত শত সুদৃশ্য অট্টালিকা বিনষ্ট হইল। অসংখ্য নরনারী শত্রুহস্তে বন্দী হইল। প্রত্যেক মোগলসৈন্য অন্যূন বিংশতি জন নরনারী বন্দী করিল। ধনলুব্ধ মোগলসৈন্য বন্দী হিন্দুরমণীদের গাত্রালঙ্কার অপহরণ করিল। মৃতদেহরাশি দ্বারা রাজপথ অবরুদ্ধ হইল। পাঁচদিন পরে এই প্রচণ্ড অনল আর ভোগ্যবস্তু না পাইয়া আপনা আপনি নির্ব্বাপিত হইল। তৈমুরলঙ্গ স্বরচিত জীবনবৃত্তে লিখিয়াছেন, "লুণ্ঠন শেষ হইলে আমি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করিতে বহির্গত হইলাম। সিরি গোলাকার সহর। ইহার হর্ম্ম্যরাজি সমুচ্চ। ইহার চতুর্দ্দিক্ প্রস্তর এবং ইষ্টকে নির্ম্মিত দুর্গদ্বারা পরিবেষ্টিত। এই দুর্গ অতিশয় দৃঢ়। পুরাতন দিল্লীতেও এইরূপ একটি দুর্গ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা সিরির দুর্গ অপেক্ষা বৃহৎ। সিরি দুর্গ পুরাতন দিল্লী দুর্গ হইতে দূরে অবস্থিত। এই সমস্ত স্থান সুদৃঢ় প্রস্তর গঠিত প্রাচীর দ্বারা রক্ষিত। জাহানপান্না নামক অংশ জনাকীর্ণ নগরীর মধ্যস্থলে অবস্থিত। এই তিন নগরীর দুর্গের ত্রিশটি দ্বার আছে। জাহান পান্নার ত্রয়োদশ দ্বার; সাত দ্বার দক্ষিণ দিকে আর ছয়দ্বার উত্তর দিকে। সিরির দ্বারসংখ্যা সাত; পুরাতন দিল্লীর দশ দ্বার দেখিতে পাওয়া যায়। আমি পরিশ্রান্ত হইয়া মস্‌জিদ-ই জমিতে প্রবেশ করিয়াছিলাম। এই স্থানে বহু সম্ভ্রান্ত লোক উপাসনার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে উপহার দিয়াছিলাম এবং মিষ্ট বাক্যে সান্ত্বনা করিয়াছিলাম।"

তৈমুরলঙ্গ সহস্র সহস্র পৌত্তলিককে শমনসদনে প্রেরণ করিয়া ১৫ দিন পর অন্যস্থানের বিধর্ম্মীদিগের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধে ব্যাপৃত হইবার উদ্দেশ্যে দিল্লী পরিত্যাগ করিলেন। পাঠানগণ * তৈমুরের দিল্লী পরিত্যাগের পরও তথায় শতাধিক বৎসর আধিপত্য করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে মবারকবাদের প্রতিষ্ঠা হইলেও, তাঁহারা দিল্লীর পূর্ব্ব সৌষ্ঠব ও বৈভব আর ফিরাইয়া আনিতে পারেন নাই। পরন্তু জৌনপুরের আক্রমণে অবসন্না দিল্লী নগরী ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল। জৌনপুরের সুলতান মাহমুদ বিপুল বিক্রমে দিল্লী অবরোধ করিলে, তদানীন্তন

* মোহাম্মদ ঘোরী কর্ত্তৃক দিল্লী অধিকৃত হইবার পর এবং মোগলবংশের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের আগমনের পূর্ব্বে তুর্কী, পাঠান, সৈয়দ প্রভৃতি নানাজাতীয় বা বংশীয় মোসলমান তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সাধারণ্যে পাঠান নৃপতি নামেই পরিচিত।

অধিপতি নিরুপায় হইয়া বলিলেন, হিন্দু-দেশ সুবিস্তৃত ও ধনশালী। আমাদের স্বদেশে অনেক যোদ্ধা আছে। তাহারা অর্থাভাবে ক্লিষ্ট হইতেছে। যদি তাহারা এই দেশে আইসে, তবে তাহাদেরও দারিদ্র্য ঘুচিবে, আমিও হিন্দুস্থান গ্রাস এবং শত্রুকুল ধ্বংস করিতে পারিব। তিনি এইরূপ বিবেচনা করিয়া নানাবংশীয় পাঠানদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। তদনুসারে রোবাসী পাঠানগণ পিপীলিকাশ্রেণী ও পঙ্গপালের ন্যায় দিল্লীতে উপনীত হয় এবং জৌনপুরের সুলতানকে দূরীভূত করিয়া দেয়। *

অতঃপর নূতন অভিনেতা দিল্লীর রঙ্গক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া পাঠানদের আধিপত্য বিনষ্ট করিয়া সাম্রাজ্যাধিকারী হন এবং দিল্লী নগরীকে অপূর্ব্ব সৌষ্ঠব ও বৈভবশালিনী করিয়া তুলেন। সে সৌষ্ঠব এবং বৈভবের প্রভাব প্রাচ্য আকাশ আলোকিত করিয়া সমস্ত পৃথিবীতে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। এই অভিনেতার নাম মোগল। মোগলের অধিনেতা বাবর দিল্লী অধিকার করেন। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল শুক্রবার দিল্লীর মস্‌জিদে তাঁহার নামে খোতবা পঠিত হইয়াছিল। বাবর দিল্লী অধিকার করিয়া স্বরচিত জীবনবৃত্তে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, এখানে তাহার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ প্রদত্ত হইতেছে;—"হিন্দুস্থানের রাজধানী দিল্লী। এক সময়ে দিল্লী হইতে হিন্দুস্থানের অধিকাংশ শাসিত হইত; কিন্তু আমার হিন্দুস্থান-জয়কালে পাঁচটি মোসলমানরাজ্য এবং দুইটি হিন্দুরাজ্য শক্তিশালী ছিল। এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র রাজা ও রায় বন্য এবং পার্ব্বত্য প্রদেশে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

(১) দিল্লীর সাম্রাজ্য। লোদীগণ এই সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিল, ইহাদের প্রভুত্ব বিহার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

(২) গুজরাট রাজ্য। এই রাজ্যের অধিপতি সুলতান মোহাম্মদ-মুজাফ্‌ফর পানিপথের যুদ্ধের কয়েক দিন পূর্ব্বে পরলোক গমন করেন। ইনি নানা শাস্ত্রে বিশারদ এবং হদিশ পাঠে অনুরাগী ছিলেন। সুলতান সর্ব্বদা কোরাণ নকল করিতেন। গুজরাট রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা প্রথমে ফিরোজ শাহের পানপাত্রবাহক ছিলেন।

---

* রোবাসী পাঠানদের ভারতে আগমন ইতিহাসের স্মরণযোগ্য ঘটনা। এই বংশীয় ফরিদ খাঁ (সের শাহ) ভারতবর্ষে বহুব্যাপী বিপ্লব সংঘটিত করিয়া চিরস্থায়িনী কীর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

(৩) বাহমনী রাজ্য। দক্ষিণাপথের সুলতানগণ বীর্য্যহীন হইয়া পড়িয়াছেন। আমীর ওমরাহগণ সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছেন। সুলতানগণ আপনাদের অভাব পূরণ জন্য তাঁহাদের শরণাপন্ন হইতেছেন।

(৪) মালব রাজ্য। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাও প্রথমে সুলতান ফিরোজ শাহের পানপাত্রবাহক ছিলেন।

(৫) বঙ্গ রাজ্য। এই রাজ্যে একটি আশ্চর্য্য প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। যদি কোন ব্যক্তি রাজহত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন, তবে প্রজাপুঞ্জ বিনা আপত্তিতে তাঁহার বশ্যতা অঙ্গীকার করে। একবার একজন হাবশী ক্রীতদাসের এইভাবে রাজ্যাধিকার লাভ হইয়াছিল। বাঙ্গালীরা বলে, আমরা রাজসিংহাসনের আজ্ঞাবহ; যিনি রাজসিংহাসনে উপবেশন করিবেন, আমরা তাঁহারই আজ্ঞা পালন করিব এবং তাঁহার বাধ্য থাকিব।

এই পাঁচটি মোসলমান রাজ্য। এই সকল রাজ্য পরাক্রান্ত এবং সৈন্যবলে গরিষ্ঠ।

(৬) বিজয়নগর রাজ্য।

(৭) চিতোর রাজ্য। রাণা সঙ্গ এই রাজ্যের নরপতি। তিনি প্রভূত-পরাক্রমশালী, মালব রাজ্যের কিয়দংশ অধিকার করিয়া সুবিস্তীর্ণ ভূমির অধিস্বামী হইয়াছেন।

আমি দিল্লীর সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছি। বহরহ (Bahrah) হইতে বিহার পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমস্ত ভূমি আমার পদানত হইয়াছে। আমি এই স্থান হইতে বার্ষিক রাজস্বরূপে ৫২ কোটি মুদ্রা প্রাপ্ত হইতেছি। ইহার মধ্যে পূর্ব্বকাল হইতে দিল্লীর আজ্ঞাধীন কতিপয় রাজা ও রায় আট কি নয় কোটি মুদ্রা প্রদান করিতেছেন।"

বাবর জীবনের সায়াহ্নকালে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যেও তাঁহাকে অনবরত সন্ধিবিগ্রহে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল। এজন্য তিনি দিল্লীর কোন উন্নতি সাধন করিতে পারেন নাই। পুত্র হুমায়ুন পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়া দিল্লীর শোভা বর্দ্ধন জন্য মনোযোগী হয়েন। তিনি প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ দুর্গের উদ্ধার এবং জীর্ণসংস্কার সাধন করিয়া তাহার নাম দীনপানা রাখেন এবং তথায় বাস করিতে আরম্ভ করেন।

এই সময় দিল্লীতে পুনর্ব্বার প্রবল রাজবিপ্লব উপস্থিত হইল। যে রোহবাসী পাঠানদল স্বদেশে অন্নাভাবে ক্লিষ্ট হইয়া শত বৎসর পূর্ব্বে ভাগ্যপরীক্ষার জন্য

দিল্লীতে আগমন করিয়াছিল, তাহাদের অন্যতম ইব্রাহিমের পৌত্র ফরিদ খাঁ মোগলশক্তি বিধ্বস্ত করিয়া নূতন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন। হুমায়ুন অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন। নবীন ভূপতি ইতিহাসে সের শাহ নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। সের শাহ এবং তদীয় উত্তরাধিকারী কর্ত্তৃক দিল্লী নগরীর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল।

দিল্লীর রাজধানী যমুনা নদী হইতে দূরবর্ত্তী ছিল। সের শাহ এই রাজধানী ভাঙ্গিয়া ফেলেন এবং যমুনার তীরে নূতন রাজধানী নির্ম্মাণ করেন। নূতন রাজধানী পুরাতন রাজধানী হইতে ২।৩ ক্রোশ দূরবর্ত্তী এবং কিলুগড়ি ও ফিরোজাবাদের মধ্যস্থানে স্থাপিত ছিল। সের শাহ সিরি নাম্নী নগরীস্থিত আলাউদ্দীন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এবং দৃঢ়তা ও উচ্চতার জন্য খ্যাত দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলেন এবং নূতন রাজধানীতে পর্ব্বতের ন্যায় সুদৃঢ় এবং তদপেক্ষা উচ্চ দুইটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ইহার ছোট দুর্গে শাসনকর্ত্তার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তথায় একটি প্রস্তরগঠিত জুমা মস্‌জিদ নির্ম্মিত হয়। এই মস্‌জিদের কারুকার্য্য জন্য স্বর্ণ প্রভৃতি মহার্ঘ পদার্থ ব্যবহৃত হয়। বড় দুর্গের (এই দুর্গে সেরগড় নামে কথিত হইত) পরিবেষ্টন জন্য উচ্চ, প্রশস্ত এবং সুদৃঢ় প্রাচীর নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পরিসমাপ্তির পূর্ব্বেই সের শাহ পরলোক গমন করেন। এই দুর্গাভ্যন্তরে সেরমণ্ডল নামে একটি ক্ষুদ্র প্রাসাদও নির্ম্মিত হইতেছিল, তাহাও সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই।

সের শাহের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র সেলিম শাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সেলিমগড় নামক একটি নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। যমুনাগর্ভ হইতে এই দুর্গ উত্থিত হইয়াছিল। এই নূতন দুর্গ হিন্দুস্থানের সমস্ত দুর্গ অপেক্ষা সুদৃঢ় করাই সেলিম শাহের অভিপ্রায় ছিল। এই দুর্গ দেখিলে বোধ হইত, যেন একটি প্রস্তর কাটিয়া উহার গঠন করা হইয়াছে।

সেলিম শাহ পরলোকগত হইলে, তদ্বংশীয়গণ আত্মকলহে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়েন এবং সেই সুযোগে হুমায়ুন ভারতবর্ষে আগমনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার দিল্লী অধিকার করেন। কিন্তু তিনি ছয় মাসের মধ্যে হঠাৎ কালগ্রাসে পতিত হন এবং তদীয় অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্র অরাজকতা বিস্তৃত হয়। এই অরাজকতার মধ্যে হিমু নামক সেরবংশের একজন হীনবংশীয় অসাধারণ ধীশক্তিশালী হিন্দু কর্ম্মচারী বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক দিল্লী অধিকার করেন। হিমু বিদ্যাবত্তার

ন্যায় ক্ষণিক আলোক প্রদর্শন করিয়া নির্ব্বাপিত হন এবং আকবর দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়া ভূতলে অতুল মোগলসাম্রাজ্যের সূত্রপাত করেন। আকবর অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে বহু সাধনায় সুগঠিত সুশাসিত সুবিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আকবরের পৌত্র শাহজাহান যেমন সুদক্ষ শাসনকর্ত্তা, তেমনি বিলাসী ও সৌন্দর্য্যপ্রিয় ছিলেন। দিল্লীর দীনপান্না নামক মোগলপ্রাসাদ জাঁকজমকপ্রিয় শাহজাহানের মনঃপূত হইল না। তাঁহার সমসাময়িক ইতিহাসবেত্তা এনায়ৎ খাঁ লিখিয়াছেন, তিনি জলবায়ু যায়া প্রীতিকর যমুনার তীরে নিজ উচ্চ হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ সুদৃঢ় দুর্গ এবং আনন্দদায়ক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই দুর্গ ও অট্টালিকার ভিতর দিয়া যমুনাস্রোত প্রবাহিত করিতে এবং উহাদের ছাদ যমুনার অভিমুখী করিতে ইচ্ছা করিলেন। এজন্য মনোজ্ঞ স্থানের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং বহু অনুসন্ধানে দিল্লী নগরীর বহির্ভাগে সুদূরবর্ত্তী উপপল্লী এবং সেলিমগড়ের মধ্যস্থলে একটি স্থান মনোনীত করিলেন। রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষে ১০৪৮ হিজরী অব্দের জেলহজ্জ মাসের ২৫ তারিখে রাত্রিকালে জ্যোতিষীদের নির্দ্দিষ্ট শুভক্ষণে রাজাদেশে উপযুক্ত সমারোহে মহোচ্চ উপস্থিতিতে (শাহজাহানের সম্মুখে) নক্সামত ভিত্তি চিহ্নিত হইল। পরিশ্রমপটু শ্রমজীবিগণ ভিত্তি খনন করিতে আরম্ভ করে এবং ১০৪৯ হিজিরী অব্দের মহরম চাঁদের নবম দিনে রজনীযোগে এই সুন্দর হর্ম্ম্যরাজির প্রথম প্রস্তরখণ্ড প্রোথিত হয়। সাম্রাজ্যের প্রত্যেক অংশের শিল্পিগণ, কারুনিপুণ রাজমিস্ত্রী ও সূত্রধর সকলেই অবশ্য-প্রতিপাল্য রাজাদেশে সম্মিলিত হয়। এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক শ্রমজীবী কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। ষাট লক্ষ টাকা ব্যয়ে পাদশাহের সিংহাসনারোহণের দ্বাবিংশতম বর্ষে রবিউলআওয়াল চাঁদের ২৪শে তারিখে এই হর্ম্ম্যরাজির নির্ম্মাণ সমাপ্ত হয়। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক সুদৃশ্য এমারত নির্ম্মিত হইয়া দিল্লীর শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিল। শাহজাহান আপন নামানুসারে সমগ্র দিল্লীর নাম শাহজাহানাবাদ রাখেন এবং তদবধি সমস্ত রাজকীয় কাগজপত্রে দিল্লীর নাম বিলুপ্ত এবং শাহজাহানাবাদ নাম প্রচলিত হয়।

শাহজাহান পাদশাহের রাজত্বের ন্যূনাধিক অশীতি বৎসর পরে দিল্লীর দুর্দ্দশা আরম্ভ হইয়াছিল। প্রথমতঃ পারস্যের অধিপতি শোণিতলোলুপ পরস্বাপহারী নাদির শাহ দিল্লী লুণ্ঠন করেন। তাহার নয় ঘণ্টাব্যাপী লুণ্ঠনে হর্ম্ম্যরাজিশোভিত দিল্লী ভস্মীভূত, নরনারীর রক্তপাতে রাজপথ প্লাবিত এবং

রাজকোষ কপর্দ্দকশূন্য হইয়াছিল। নাদির শাহের আক্রমণের পরেই জগৎ-প্রথিত মোগলসাম্রাজ্য অন্তিম দশায় উপস্থিত হইয়াছিল। এই অন্তিমকালে মোগলের রাজধানী দিল্লী শত্রুর পদাঘাতে অনেকবার বিধ্বস্ত হইয়াছিল। নাদির শাহের ভারতবর্ষ পরিত্যাগের পর কতিপয় বৎসরের মধ্যেই আফগানের অধিপতি আবদালী ধনরত্নলোভে দিল্লীতে উপনীত হইলেন। তিনি দিল্লীবাসীর নিকট হইতে এক কোটি মুদ্রা সংগ্রহ করিতে আদেশ করিলেন। এই সময়ে তাহাদের এতদূর দুর্দ্দশা হইয়াছিল যে, নাদির শাহের আক্রমণকালে দশ কোটি মুদ্রা সংগ্রহ করা অপেক্ষা আবদালীর আদেশে এক কোটি মুদ্রা সংগ্রহ করাই অধিক দুরূহ হইল। সুতরাং তাহারা সর্ব্বস্বান্ত হইল। অতঃপর আবদালী দিল্লী হইতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু পর বৎসর আবার ফিরিয়া আসিলেন। আবদালীর সৈন্য গৃহ সকল দগ্ধ ও নরনারীকে হত্যা করিতে লাগিল। রক্তপিপাসু সৈন্যেরা নির্দ্দোষ নরনারীর রক্তপাতে কিছুতেই বিরত হইল না। অবশেষে তাহারা মৃতদেহরাশির পূতিগন্ধ সহ্য করিতে না পারিয়া নগরী পরিত্যাগ করিল; দিল্লীবাসীর জীবন রক্ষা পাইল। কিন্তু তাহাদের প্রতি বিধাতার অভিসম্পাত ছিল; তাহারা তরবারির মুখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া দুর্ভিক্ষের ভীষণ গ্রাসে পতিত হইল। দলে দলে নরনারী অনাহারে আপন আপন ভগ্নাবশেষ গৃহমধ্যে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল।

দিল্লী ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের এই দুরবস্থার সময়ে মহারাষ্ট্রের অধিনেতা পেশওয়া আবদালীকে ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া বিলুপ্তপ্রায় মোগল-সাম্রাজ্যের পূর্ণ ধ্বংস সাধনপূর্ব্বক তদুপরি মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত বিপুল বাহিনী প্রেরণ করিলেন।

মহারাষ্ট্র-সৈন্য দিল্লীতে প্রবেশ করিল। মহারাষ্ট্রা-সেনাপতি অলঙ্কারের লোভে রাজপ্রাসাদ, সমাধিভবন ও ধর্ম্মমন্দিরের কারুকার্য্য ধ্বংস করিলেন। তিনি দরবারগৃহের রৌপ্যনির্ম্মিত চন্দ্রাতপ ধ্বংস করিয়া সতর লক্ষ মুদ্রা প্রাপ্ত হইলেন এবং রাজসিংহাসন ও অন্যান্য মূল্যবান্ আসবাব আত্মসাৎ করিলেন।

আবদালী এবং মহারাষ্ট্রার মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধের নাম পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ। যুদ্ধক্ষেত্রে পঞ্চাশ সহস্র মহারাষ্ট্রা-সৈন্য জীবন বিসর্জ্জন করিল। আবদালী জয়শ্রীতে শোভিত হইলেন। কিন্তু তিনি গুরুতর প্রয়োজনবশতঃ দিল্লীতে অবস্থিতি করিতে অসমর্থ হইয়া শাহ আলমকে

দিল্লীর রাজপদ প্রদানপূর্ব্বক স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর প্রথমতঃ গোলাম কাদের, তার পর মহারাষ্ট্রা-নায়ক সিন্ধিয়া শাহ আলমের নামে দিল্লী শাসন করিতে লাগিলেন। এইভাবে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইলে, ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সেনাপতি লর্ড লেক্ দিল্লী জয় করিয়া অন্ধ ও উপবাসক্লিষ্ট পাদশাহ শাহ আলমকে হস্তগত করিলেন। ইংরাজগণ তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। দিল্লী ইংরেজরাজ্যভুক্ত হইল।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

সাহিত্য, ২৪শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা।

ঐতিহাসিক রচনা-গরজ।

সম্প্রতি প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় তাঁহার নবপ্রকাশিত "রাজন্য-কাণ্ড" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;—বরেন্দ্রভূমির গরুড়স্তম্ভ-লিপিতে উল্লিখিত গুরব মিশ্রের বংশ "মগ-বংশীয় সূর্য্যোপাসক গণক-ব্রাহ্মণে"র বংশ। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "রামচরিতম্" কাব্যের ভূমিকায় গরুড়স্তম্ভ-লিপির কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে বরেন্দ্রনিবাসী গুরব মিশ্রের পিতার "দেবগ্রামভবা" বব্বা দেবীকে বিবাহ করিবার কথা উল্লিখিত থাকায়, শাস্ত্রী মহাশয় দেবগ্রামকে নদীয়া জেলার স্বনামখ্যাত গ্রাম মনে করিয়া লিখিয়াছিলেন,—সেকালের রাঢ়ীবারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজের মধ্যে এবিবাহ প্রচলিত ছিল ; তাঁহারা একালের রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের ন্যায় এত স্বসমাজ-নিষ্ঠ ছিলেন না। সুতরাং শাস্ত্রী মহাশয় স্তম্ভ-লিপির ব্রাহ্মণবংশকে "গণক ব্রাহ্মণে"র বংশ বলিয়া বর্ণনা করিতে পারেন নাই।

গরুড়স্তম্ভ-লিপিতে যে সকল বিবরণ উল্লিখিত আছে, তাহাতে ব্রাহ্মণত্বেরই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় ;—"গণক ব্রাহ্মণে"র পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। গরুড়স্তম্ভ-লিপি ও নারায়ণপাল দেবের তাম্রশাসনের একটি শ্লোক ভিন্ন গুরব মিশ্রের অন্য কোনও পরিচয়বিজ্ঞাপক প্রমাণ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। এই দুইটিমাত্র সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে "গণক ব্রাহ্মণে"র আবিষ্কার-সাধন অনায়াসসাধ্য বলিয়া কথিত হইতে পারে না।

গুরব মিশ্র ভট্ট গুরব নামেও পরিচিত ছিলেন। ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসনে যুবরাজ ত্রিভুবনপাল "দূতক" ছিলেন ;—দেবপালদেবের তাম্রশাসনে যুবরাজ রাজ্যপাল "দূতক" ছিলেন ; আর নারায়ণপালদেবের তাম্রশাসনে ভট্টগুরব "দূতক" ছিলেন। তাঁহার পদমর্য্যাদা কিরূপ ছিল, ইহাতে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেকালের শাস্ত্রসংযত সুদৃঢ় সমাজ-বন্ধনের মধ্যে "গণক ব্রাহ্মণে"র পক্ষে এরূপ উচ্চপদলাভের সম্ভাবনা বড় অধিক ছিল বলিয়া বোধ হয় না। নারায়ণপালদেবের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়,—

বেদান্তৈরপ্যসুগমতমং বেদিতা ব্রহ্মতার্থং
যঃ সর্ব্বাসু শ্রুতিষু পরমঃ সার্দ্ধমঙ্গৈরধীতি।
যো যজ্ঞানাং সমুদিত-মহাদক্ষিণানাং প্রণেতা
ভট্টঃ শ্রীমানিহ স গুরবো দূতকঃ পুণ্যকীর্ত্তিঃ॥

ইহাতে দেখা যায়,—ভট্টগুরব সমগ্র বেদাঙ্গের সহিত সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এরূপ ব্রাহ্মণকে "গণক ব্রাহ্মণ" বলিবার কারণ কি, তাহা সহসা বোধগম্য হয় না। তজ্জন্য সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় অনেকগুলি কারণের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"নক্ষত্রচিন্তক জমদগ্নিগোত্র গৌড়-বঙ্গের রাঢ়ীয় বারেন্দ্র বা বৈদিক ব্রাহ্মণগণমধ্যেই সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কেবলমাত্র বঙ্গের শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের মধ্যেই পাওয়া গিয়াছে।" শেষের কথাটি "নদীয়া বঙ্গসমাজের কুলপঞ্জিকা"র কথা। সুতরাং তাহার আলোচনা করা সকলের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না। কারণ, সে কুলপঞ্জিকা সকলে পরীক্ষা করিবার সুযোগ লাভ করেন নাই। তাহাতে "জমদগ্নিগোত্র" আছে কি না, জানি না; কিন্তু গরুড়স্তম্ভ-লিপিতে "জমদগ্নিগোত্র" নাই; তাহাতে (অষ্টাদশ শ্লোকে) গুরবমিশ্র "জমদগ্নিকুলোৎপন্ন" বলিয়া উল্লিখিত। এই শ্লোকে শ্লেষের অনুরোধে "জমদগ্নি" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার উপর নির্ভর করা চলে না; চলিলেও, তাহাতে "গোত্রে"র সমাচার প্রাপ্ত হওয়া যায় না। স্তম্ভলিপিতে "শাণ্ডিল্যবংশে"র এবং "জমদগ্নিকুলে"র উল্লেখ থাকায় বুঝিতে পারা যায়, তদ্দ্বারা কিছুমাত্র অসামঞ্জস্য সূচিত হয় নাই। প্রথম শ্লোকের প্রথম শব্দটি বিসর্গান্ত; দুইটি অক্ষর ছিল, দুইটি অক্ষরই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কেবল বিসর্গচিহ্নই বর্ত্তমান আছে। ঐ শব্দটিকে অধ্যাপক কিল্‌হরণ "বিষ্ণু"* বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ অনুমানের হেতু কি, তিনি তাহার উল্লেখ করেন নাই। স্তম্ভলিপিতে যে ব্রাহ্মণবংশের পরিচয় উল্লিখিত আছে, তাহাকে "শাণ্ডিল্য-বংশ" বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়; সে বংশের ব্রাহ্মণগণকে "জগদগ্নিগোত্রীয়" বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কোনও অপ্রকাশিত কুলপঞ্জিকায় "জমদগ্নিগোত্রের গণক ব্রাহ্মণে"র উল্লেখ থাকা সত্য হইলেও, তাহার বলে গরুড়স্তম্ভ-লিপির ব্রাহ্মণবংশকে "গণক ব্রাহ্মণে"র বংশ বলিয়া বর্ণনা কদাচ চলে না। কিন্তু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় পাদটীকায় লিখিয়াছেন,—"নক্ষত্রচিন্তক এই বিশেষণ থাকায় এই বংশকে আমরা নিঃসন্দেহে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।" দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে, এই বিশেষণে সকলের সন্দেহ সহজে দূরীভূত হইতে পারে না। কারণ, গরুড়স্তম্ভ-লিপিতে আদৌ "নক্ষত্র-চিন্তক" বিশেষণ নাই; তাহাতে আছে—"সম্পন্নক্ষত্রচিন্তক"। তাহার একাংশ পরিত্যাগ করিয়া, আর এক অংশমাত্র গ্রহণ করিয়া, সকলে "নিঃসন্দেহে" ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত প্রচারিত করিতে সম্মত হইবেন বলিয়া বোধ হয় না।

গরুড়স্তম্ভ-লিপির এক স্থানে ভট্টগুরব "সম্পন্নক্ষত্রচিন্তক" বলিয়া, এবং আর এক স্থানে "জ্যোতিষে নিষ্ণাত" বলিয়া উল্লিখিত। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় তাহার মধ্যে "নক্ষত্রচিন্তক"—শব্দটি বাছিয়া লইয়া, তাহাকেই "গণক ব্রাহ্মণে"র পরিচয়-বিজ্ঞাপক প্রধান প্রমাণ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। জ্যোতিষে "নিষ্ণাততা" তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছে। সুতরাং এই দুইটি মুখ্য প্রমাণ আলোচনার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ ব্যাখ্যা শাস্ত্রী মহাশয়ের কল্পনায় স্থান লাভ করিতে পারিত না। কারণ, বেদাঙ্গের সংখ্যা ছয়টি; তন্মধ্যে একটির নাম জ্যোতিষ। ষড়ঙ্গ-বেদাধ্যায়ী আদর্শ ব্রাহ্মণের পক্ষে জ্যোতিষ অধ্যয়ন করাও যে অবশ্যকর্ত্তব্য, শাস্ত্রী মহাশয় তাহা বিস্মৃত হইতে পারিতেন না। জ্যোতিষে "নিষ্ণাততা" ধরিয়া, "গণকব্রাহ্মণ" বলিতে হইলে, সকল আদর্শ ব্রাহ্মণকেই "গণকব্রাহ্মণ" বলিতে হয়। একটিমাত্র কাব্যকথার জোরে এত বড় সিদ্ধান্তের অবতারণা করা যে ব্রাহ্মণোচিত হইত না, শাস্ত্রী মহাশয়কে তাহা স্বীকার করিতেই হইত।

জ্যোতিষে "নিষ্ণাততা" ধরিয়া, "গণকব্রাহ্মণে"র পরিচয় পাওয়া না গেলেও, "নক্ষত্রচিন্তক" ধরিয়া কি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না? এ বিষয়ে প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব মহাশয়ের অনুকূলে এক শ্রেণীর শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত হইতে পারিবে। শাস্ত্রে "জ্যোতির্বিদে"র ও "নক্ষত্র-পাঠকে"র নিন্দার অভাব নাই। যথা,—

জ্যোতির্বিদোহ্যথর্বাণঃ কীরপৌরাণ-পাঠকাঃ।
শ্রাদ্ধে যজ্ঞে মহাদানে বরণীয়াঃ কদাচ ন॥

তথাহি

আবিকশ্চিত্রকারশ্চ বৈদ্যো নক্ষত্র-পাঠকঃ।
চতুর্বিপ্রা ন পূজ্যন্তে বৃহস্পতিসমা যদি॥

যাঁহাদের শাস্ত্রে এইরূপ নিন্দাবাদ আছে, তাঁহাদের শাস্ত্রেই "জ্যোতির্বিদ্যা" ষড়ঙ্গের অন্তর্গত। সুতরাং শাস্ত্রে ইহার মীমাংসা থাকিবার কথা। বরাহমিহির তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। এখানে তাহার অবতারণা করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ, "নক্ষত্র-পাঠক" ও "নক্ষত্র-চিন্তক" আদৌ একার্থে ব্যবহৃত হয় নাই। স্তম্ভলিপির যে শ্লোকে নক্ষত্র-চিন্তকের উল্লেখ আছে, তাহাতেই তাহা সুব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। "গৌড়লেখমালা"র সম্পাদনকালে সে কথা সংক্ষেপে বুঝাইতে গিয়া, গণক না বলিয়া "জ্যোতিষিক গণনাকারী" বলিয়া

বন্দনীমধ্যে একটি কথার উল্লেখ করিয়াছিলাম। তাহাই হয় ত অনর্থের মূল হইয়াছে। শ্লোকটিতে শ্লেষের সম্পর্ক থাকায়, একটু তলাইয়া বুঝিতে হইবে। যথা,—

জমদগ্নিকুলোৎপন্নঃ সম্পন্নক্ষত্রচিন্তকঃ।
যঃ শ্রীগুরবমিশ্রাখ্যো রামো রাম ইবাপরঃ॥

এই শ্লোকে "নক্ষত্র-চিন্তক"মাত্র নাই, "সম্পন্নক্ষত্রচিন্তক" আছে। গুরব-মিশ্রকে পরশুরাম বলিয়া বর্ণনা করিতে গিয়া, "জমদগ্নি-কুলোৎপন্ন" ও "সম্পন্ন-ক্ষত্রচিন্তক" এই দুইটি বিশেষণ-পদের অবতারণা করিতে হইয়াছিল। তাহা পরশুরাম-পক্ষে এক অর্থে, ও ভট্টগুরব-পক্ষে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছিল। পরশুরাম-পক্ষে "সম্পন্ন + ক্ষত্র + চিন্তক" রূপে পাঠ করিতে হইবে; কারণ, কোথায় নিধনার্হ কোন্ সম্পন্ন ক্ষত্রিয় আছে, তাহার চিন্তাই পরশুরামের প্রধান চিন্তা ছিল। গুরব-পক্ষে "সম্পৎ + নক্ষত্র + চিন্তক"রূপে পাঠ করিতে হইবে; কারণ, তিনি "সম্পৎ-নক্ষত্রে"র চিন্তা করিতেন।

"সম্পৎ-নক্ষত্র" একটি পারিভাষিক সংজ্ঞা। তাহা প্রতিবর্ষেই "নূতন পঞ্জিকায়" ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। সুতরাং তাহার ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন পূর্ব্বে অনুভব করিতে না পারিয়া, "গৌড়লেখমালা"র অনুবাদমধ্যে "সম্পৎ-নক্ষত্রচিন্তক" এইরূপে পদচ্ছেদ করিয়া পাঠ করিবার সঙ্কেত ব্যক্ত করিয়াই নিরস্ত হইয়াছিলাম। আমাদের দেশের পাঠকের পক্ষে এইটুকু ইঙ্গিত যথেষ্ট হইবে বলিয়া মনে হইয়াছিল এখন দেখিতেছি, সকলের পক্ষে তাহা যথেষ্ট হয় নাই। যাঁহার যে নক্ষত্রে জন্ম, তাঁহার পক্ষে সেই নক্ষত্রের নাম "জন্ম-নক্ষত্র"। সেই নক্ষত্র ধরিয়া পর 'পর নয়টি নক্ষত্র তাঁহার পক্ষে পৃথক্ নামে কথিত হয়। এইরূপ পর্য্যায়ে গণনা করিবার সময় যাহাকে দ্বিতীয় নক্ষত্র বলিতে হয়, তাহাই "সম্পৎ" নামে কথিত হইয়া থাকে। নক্ষত্রগুলির নাম এইরূপ,—

"জন্ম-সম্পৎ-বিপৎ-ক্ষেমং প্রত্যরিঃ সাধকো বধঃ।
মিত্রং পরমমিত্রঞ্চ নবতারাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

জাতকের পক্ষে যে নক্ষত্রটি "সম্পৎ", সেই নক্ষত্রে শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, তাহা সুসম্পন্ন হয়। ভট্টগুরব অনেক শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। সুতরাং কোন সময়ে তাঁহার "সম্পৎ-নক্ষত্র" উদিত হইবে, তাহা জানিবার জন্য তাঁহাকে জ্যোতিষিক গণনা করিতে হইত। ইহা ভট্টগুরবের নিয়ত সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের আগ্রহ-সূচনার জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছিল। তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া "সম্পৎ"

শব্দটি ছাড়িয়া দিয়া, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় কেবল "নক্ষত্র-চিন্তক"টুকু বাহাল রাখিয়াছেন, এবং তাহাকেই "নক্ষত্রপাঠক" অর্থে প্রমাণরূপে খাড়া করিয়া, এক অশ্রুতপূর্ব্ব শাস্ত্রব্যাখ্যায় বঙ্গসাহিত্যকে এমন করিয়া উপহাসাস্পদ করিয়াছেন। সুতরাং গত্যন্তর না দেখিয়া, বাধ্য হইয়াই বলিতে হয়,—"গরজ বড় বালাই।"

গরুড়স্তম্ভ-লিপির প্রথম শ্লোকের প্রথম শব্দটি বিলুপ্ত হইয়া গেলেও, তাহা যে গুরবমিশ্রের পূর্ব্বপুরুষের নাম সূচিত করিত, তাহা সহজেই প্রতিভাত হয়। তিনি যে শাণ্ডিল্যবংশীয় ছিলেন, তাহা স্পষ্টাক্ষরেই উল্লিখিত আছে। আদিশূরানীত পঞ্চব্রাহ্মণের মধ্যে যিনি শাণ্ডিল্যবংশীয় ছিলেন, তাঁহার নাম নারায়ণ। স্তম্ভলিপির বিলুপ্ত নামটি নারায়ণ হইতে পারে না। তাহাকে নারায়ণের তুল্যার্থবোধক "বিষ্ণু" বলিয়া অধ্যাপক কিল্‌হরণ্ অনুমান করিয়া গিয়াছেন। সে অনুমান সঙ্গত হইলেও, তদ্দ্বারা ভট্টনারায়ণ সূচিত হইতে পারে না। উক্ত শ্লোকে পরশুরাম ও গুরবমিশ্র, উভয়েই "জমদগ্নিকুলোৎপন্ন" বলিয়া বর্ণিত। পরশুরাম-পক্ষে তাহার সার্থকতা সুস্পষ্ট। কারণ, তিনি "জমদগ্নি"র পুত্র বলিয়া সুপরিচিত। গুরব-পক্ষে "জমদগ্নিকুলোৎপন্ন" বিশেষণটি ব্যবহৃত হইবার সার্থকতাসূচক কোনও নাম স্তম্ভলিপিতে উল্লিখিত না থাকিলে; শ্লেষের অবতারণা করিবার সুযোগ ঘটিত না। "শাণ্ডিল্যবংশে" এই পদের সাহায্যে, অথবা প্রথম শ্লোকের প্রথম শব্দেই তাহা সূচিত হইয়াছিল। সুতরাং কোনরূপ হেতু ধরিয়া সে নামটির অনুমান করিতে হইলে, বলিতে হইবে,—সে নাম "বিষ্ণু" নহে—"ভৃগুঃ"। তিনিই বীজিপুরুষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিলেন। অতএব তাঁহার বংশধরগণকে অথবা শাণ্ডিল্য-বংশধরগণকে শ্লেষের অনুরোধে "জমদগ্নি-কুলোৎপন্ন" বলা চলিতে পারে। এই রূপে স্তম্ভলিপির ব্যাখ্যা করিলে, তদুল্লিখিত শাণ্ডিল্যবংশীয় ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে আদিশূরানীত পঞ্চব্রাহ্মণ-কাহিনীর সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে আদিশূর-কাহিনী মিথ্যা হইয়া যায় না। ইহাতে বরং এইমাত্র বুঝা যায় যে—পালরাজগণের শাসনসময়ের পূর্ব্ব হইতেই বঙ্গদেশে বেদবেদাঙ্গপারগ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের অসদ্ভাব ছিল না। কিন্তু এরূপ প্রমাণের সহিত আদিশূরের ব্রাহ্মণা-নয়ন-কাহিনীর মূল প্রয়োজনের কিঞ্চিৎ অসামঞ্জস্য সূচিত হইতে পারে। সেই আশঙ্কা-নিবারণের উদ্দেশ্যে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় এক নূতন ব্যাখ্যায় গুরব-মিশ্রের বংশকে "গণকব্রাহ্মণে"র বংশ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া, আদিশূর-কাহিনীর পক্ষসমর্থনের জন্য এক অভিনব রচনা-গরজের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এরূপ রচনা-গরজের আতিশয্যে বাঙ্গালীর ইতিহাসের লুপ্তাবশিষ্ট উপাদানগুলির যথাযোগ্য

আলোচনার পথ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে। আগে সিদ্ধান্ত, তাহার পর প্রমাণের আলোচনা,—এরূপ বিচারপদ্ধতি পরিত্যাগ করিতে সম্মত না হইলে, আমাদিগের ঐতিহাসিক গবেষণা আমাদিগের বিচারনিষ্ঠার গৌরববর্দ্ধন করিতে পারিবে না।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

বাঙ্গালার সভ্যতার প্রাচীনতা এবং বাঙ্গালীর উৎপত্তি।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি. আই. ই. মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের কলিকাতার অধিবেশনে যে সুদীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি প্রসঙ্গক্রমে অনেক উৎকট ঐতিহাসিক সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। তন্মধ্যে বাঙ্গালার সভ্যতার প্রাচীনতা সম্বন্ধে এবং বাঙ্গালীর উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা লইয়া এখনও আন্দোলন চলিতেছে। শাস্ত্রী মহাশয় যে বিষয়ের যেরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ দিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। যাঁহারা তাঁহার সিদ্ধান্ত লইয়া হৈ-চৈ বা হা-হুতাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারাও কোনরূপ প্রমাণের অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্যবোধ করিতেছেন না।

জাতিবিশেষের উৎপত্তি এবং প্রাগৈতিহাসিকযুগের সভ্যতা জাতি-বিজ্ঞানের (Ethnology) আলোচ্য বিষয়। জাতি-বিজ্ঞান বিজ্ঞানশ্রেণীর মধ্যে সর্ব্ব-কনিষ্ঠ। জাতি-বিজ্ঞানের এখনও এমন দিন আসে নাই যে, তাহার সিদ্ধান্তকে অভ্রান্তসূত্ররূপে (text) লইয়া, সমাজসংস্কারক বা ধর্ম্মসংস্কারক (sermon) উপদেশ দিতে পারেন। জাতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে যত প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে, তাহার অতি অল্পাংশমাত্রই সংগৃহীত হইয়াছে। এই অল্পপ্রমাণের উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত-স্থাপন অসম্ভব। সংগৃহীত প্রমাণগুলিকে একত্র সাজাইয়া ভাবী অনুসন্ধানের পথ সুগম করিবার জন্য একটা সিদ্ধান্ত করা আবশ্যক মনে করিয়াই জাতিতত্ত্ববিদ্‌-গণ তাহার সূচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু এই সকল সিদ্ধান্ত স্বভাবতঃই অস্থায়ী। সুতরাং ইহা লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে উল্লাস বা অবসাদ উপস্থিত হইতে পারে না।

শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—

আমার বিশ্বাস বাঙ্গালী একটী আত্মবিস্মৃত জাতি। বিষ্ণু যখন রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন কোন ঋষির শাপে তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন। তিনি ধরাধামে আসিয়া ঈশ্বরেরই লীলা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিনি যে ঈশ্বর এ কথা তিনি কখনও বলেন নাই, কার্য্যে বা কর্ম্মে কখনও দেখানও নাই এবং কখনও তিনি স্মরণ করেন নাই। বাঙ্গালীও তেমনি।" (২৬ পৃঃ)

শাস্ত্রী মহাশয়ের মত প্রবীন প্রত্নবিদের নিকট এত বড় কথা শুনিয়া কোন্ বাঙ্গালীর হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিবে না? কিন্তু এত বড় কথার প্রমাণস্বরূপ শাস্ত্রী মহাশয় কেবল লিখিয়াছেন;—

"দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে এক জন সাহেব বলিয়া গিয়াছেন * * বাঙ্গালা অতি প্রাচীনকালে সভ্যতার অতি উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিল। যে কেহ মন দিয়া বাঙ্গালার কথা ভাবিয়াছে, বাঙ্গালাকে ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহাকেই বলিতে হইবে বাঙ্গালা একটী অতি প্রাচীন সভ্যদেশ।"

কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গালার সভ্যতার পক্ষ হইতে যতটা প্রাচীনতা দাবী করিয়াছেন, তাহা দেড় শত বৎসরের পূর্ব্বের কোনও সাহেবের কথার বা এখনকার কোনও ভাবুকের কথার উপর নির্ভর করিয়া স্বীকার করা যায় না। তিনি লিখিয়াছেন;—

"যখন আর্য্যগণ মধ্য-এসিয়া হইতে পঞ্জাবে আসিয়া উপনীত হন তখনও বাঙ্গালা সভ্য ছিল।"

এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার এমন কোনও শিল্পজাত দ্রব্যাবশেষ পাওয়া গিয়াছে কি, যাহা ৩।৪ হাজার বৎসরের পুরাতন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে? ঋগ্বেদে বাঙ্গালার উল্লেখ আছে, এমন কথা কোনও বেদজ্ঞের মুখে শোনা যায় নাই। অবশ্যই ঋগ্বেদে মগধ অর্থে ব্যবহৃত "কীকটে"র উল্লেখ আছে। কিন্তু মগধ ও বাঙ্গালা এক কথা নয়। বাঙ্গালীর পূর্ব্বপুরুষগণ তৎকালে মগধবাসী ছিলেন বলিয়া শাস্ত্রী মহাশয়ও আভাস দেন নাই।

তার পর, "আর্য্যগণ আপনাদের বসতি বিস্তার করিয়া যখন এলাহাবাদ পর্য্যন্ত উপস্থিত হন, তখন বাঙ্গালার সভ্যতায় ঈর্ষাপরবশ হইয়া, তাঁহারা বাঙ্গালীকে ধর্ম্ম-জ্ঞানশূন্য এবং ভাষাশূন্য পক্ষী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।" (২৭ পৃঃ) এখানে শাস্ত্রী মহাশয় ঐতরেয় আরণ্যকের দ্বিতীয় আরণ্যকের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম অংশের কতিপয় পংক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বোধ হয় এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকিবেন। এই অংশের সূচনায় আছে, "ইহাই পথ; ইহাই কর্ম্ম; ইহাই ব্রহ্ম; ইহাই সত্য। অতএব ইহা হইতে কেহ যেন বিচলিত না হয়;

ইহা যেন কেহ লঙ্ঘন না করে। কারণ, তাঁহারা ইহা লঙ্ঘন করিতেন না। পূর্ব্বে যাহারা ইহা লঙ্ঘন করিয়াছিল, তাহারা পরাভূত হইয়াছিল।” (১) তার পর দৃষ্টান্তস্বরূপে একটি ঋকের ব্যাখ্যাচ্ছলে বলা হইয়াছে,—“তিন প্রকার প্রজা লঙ্ঘন করিয়াছিল। বয়সগণ, বঙ্গারগধগণ, ঈরপাদগণ, এই তিন শ্রেণীর প্রজা লঙ্ঘন করিয়াছিল।” (২) সায়ন তাঁহার ভাষ্যে “বঙ্গে”র অর্থ লিখিয়াছেন—“বনগত বৃক্ষ”; “অবগধে”র অর্থ লিখিয়াছেন—“ওষধি”; এবং “ঈরপাদে”র অর্থ লিখিয়াছেন—“সর্প”। আনন্দতীর্থ এই সকল শব্দ পিশাচ, রাক্ষস এবং অসুর অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। সায়নের এবং আনন্দতীর্থের মধ্যে এই সকল শব্দের অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ দেখিয়া, মোক্ষমূলর এবং কিথ্ প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, এই সকল শব্দের অর্থ সম্বন্ধে কোনও সর্ব্ববাদসম্মত জনশ্রুতি পণ্ডিতসমাজে প্রচলিত ছিল না, সুতরাং এই সকল শব্দ “জনগণ” অর্থেও গৃহীত হইতে পারে। শাস্ত্রী মহাশয় বোধ হয় এই সকল পণ্ডিতের মতানুসরণ করিয়াই “বঙ্গ” শব্দকে জনগণ অর্থে গ্রহণ করিয়া, সায়ণ যে স্থলে “বয়াংসি” অর্থ লিখিয়াছেন “কাক-গৃধ্রাদি পক্ষী”, তাহা “বঙ্গ” শব্দের উপর আরোপ করিয়াছেন। (৩) এরূপ অর্থবিপর্য্যয়ের কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন। যদি তর্কের স্থলে স্বীকারও করা যায়, এখানে “বঙ্গে”র অর্থ “জনগণ”, তথাপি আরণ্যক-কারের উক্তিতে ঈর্ষ্যার চিহ্ন কোথায়? যাহারা বেদমার্গ লঙ্ঘন করায় পূর্ব্বে পরাভূত হইয়াছিল, আরণ্যক-কার তাহাদেরই নাম করিয়াছেন। ঐতরেয় আরণ্যকের রচনাকালে আর্য্যগণ এলাহাবাদ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন, পূর্ব্ব দিকে আর অগ্রসর হয়েন নাই, এই অভিমতও সমীচীন বোধ হয় না। সামবেদের পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে বিদেহরাজের নমী যাইবার কথা আছে, এবং শতপথব্রাহ্মণের বিদেহমাধবের আখ্যানে বিদেহ বা মিথিলায় আর্য্য-উপনিবেশ-স্থাপনের প্রবাদ পরিরক্ষিত হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭।৩৩) উত্তরবঙ্গের প্রাচীন অধিবাসী পুণ্ড্রগণকে অন্ধ্র, শবর, পুলিন্দ ও মুতিবগণের সমতুল্য “অন্ত্য” এবং “দস্যু” বলা হইয়াছে। সুতরাং এই সকল গ্রন্থের

১। “এষ পন্থা এতৎ কর্ম্মৈতদ্‌ব্রহ্মৈতৎ সত্যম্। তস্মান্ন প্রমাদেত্তন্নাতীয়াৎ। ন হ্যত্যায়ন্ পূর্ব্বে যেঽত্যায়ংস্তে পরাবভূবুঃ।”

২। “প্রজাহ তিস্রো অত্যায়মীয়ুরিতি যা বৈ তা ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায়মায়ংস্তানীমানি বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ।”

৩। “‘বয়াংসি’ পক্ষিণঃ কাকগৃধ্রাদয়ঃ আকাশে দৃশ্যন্তে। সোঽয়ং পক্ষিসজ্ঘস্ত্রিবিধানাং প্রজানামেকো ভাগঃ। ‘বঙ্গাঃ’ বনগতা বৃক্ষাঃ।”

পরবর্ত্তী কালে রচিত ঐতরেয় আরণ্যকের সময় আর্য্যগণ যে এলাহাবাদ ছাড়াইয়া পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা অনায়াসে মনে করা যাইতে পারে। সংস্কৃত-সাহিত্যে বিন্ধ্যপর্ব্বতবাসী বর্ব্বরজাতিনিচয় শবর এবং পুলিন্দ নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহাতে মনে হয়, ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ-রচনার কালে উত্তরবঙ্গ সভ্য জনপদ বলিয়া গণ্য হইত না।

খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠশতাব্দে, গোতমবুদ্ধ এবং মহাবীর বর্দ্ধমানের অভ্যুদয়কালেও বাঙ্গালার কোনও অংশ সভ্যজনপদরূপে গণ্য হইত কি না সন্দেহ। নিঃসংশয়িত-রূপে খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠশতাব্দের রচনা বলিয়া গৃহীত হইতে পারে, এমন কোনও গ্রন্থ এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই; কিন্তু ষষ্ঠশতাব্দের কথা আছে, এমন অনেক গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে বৌদ্ধ পালিপিটক সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। পালিপিটকের স্থানে স্থানে যে উত্তরাপথের ষোড়শ মহাজনপদের নাম একত্র উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মগধ এবং অঙ্গ জনপদের নাম আছে, কিন্তু বঙ্গ, সুহ্ম, বা পুণ্ড্র জনপদের নাম-গন্ধ নাই। পালিপিটকে উত্তরাপথের সুসভ্যভাগকে "মধ্যদেশ" (মজ্ঝিমদেশ) বলা হইয়াছে। বিনয়পিটকে এই "মধ্যদেশে"র পূর্ব্বসীমা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে,—পূর্ব্বদিকে কজঙ্গল নামক নগর, তাহার পর মহাসাল, তাহার পর সীমান্তের জনপদনিচয়; উহার এই দিক্ মধ্যে (মধ্যদেশে) অবস্থিত। (৪) চীন পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াং "কজঙ্গল" নগরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—কজঙ্গল হইতে পূর্ব্বদিকে কিয়দ্দূর চলিয়া, গঙ্গা পার হইয়া ৬০০ লি চলিয়া যাইবার পর তিনি পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কজঙ্গল গঙ্গার পশ্চিম-দিকে, প্রাচীন অঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল। পাণিনির ব্যাকরণে মগধের এবং কলিঙ্গের নাম আছে, পুণ্ড্র, সুহ্ম, বা বঙ্গের নাম নাই। জৈনদিগের "আচারাঙ্গ-সূত্রে" লাঢ় বা রাঢ়, (সুহ্ম) দেশের বিবরণ আছে। (৫) এই সূত্রে কথিত হইয়াছে,—বর্দ্ধমান সংসার ত্যাগ করিয়া দ্বাদশ বৎসরেরও অধিককাল রাঢ়দেশে বজ্জভূমিতে এবং সুভ্ভভূমিতে বিচরণ করিয়াছিলেন। রাঢ়দেশ পথশূন্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে কুকুরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল; পথিক দেখিলে সেই সকল কুকুর কামড়াইতে আসিত। রাঢ়ের অধিবাসিগণও কুকুর অপেক্ষা

৪। The Journal of the Royal Asiatic Society, 1904, p. 84.

৫। Acharanga Sutra (I. 8. 3.) translated by Professor Jaocbi, Sacred Books of the East, Vol.

বড় উন্নত ছিল না। তাহারা বর্দ্ধমানকে পাইলেই প্রহার করিত, "ছুছু" বলিয়া কুকুর লেলাইয়া দিত, এবং "দূর দূর" বলিয়া তাড়াইয়া দিত। আচারাঙ্গ-সূত্রের রাঢ়ের বিবরণ পাঠ করিলে মনে হয়, যেন সমাজে প্রচলিত জনশ্রুতি অনুসারে বর্দ্ধমানের সময়ের রাঢ়ের অধিবাসিগণ সুসভ্য বলিয়া গণ্য হইত না।

মহাবীর বর্দ্ধমান হয় ত খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দের শেষভাগে রাঢ়ে বিচরণ করিয়াছিলেন। ইহার দুই শত বৎসর পরের রাঢ়, বঙ্গ, এবং পুণ্ড্রের যে চিত্র পাওয়া যায়, তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। রাঢ়ে তখন পরাক্রান্ত "গঙ্গরিডই" রাজ্য প্রতিষ্ঠিত। (৬) "কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে" দেখিতে পাওয়া যায়, তৎকালের বাঙ্গালী শিল্পে, বিশেষতঃ বস্ত্রবয়ন-শিল্পে, বিশেষ পারদর্শিতালাভ করিয়াছিল। কৌটিল্য বলেন (২।১১), "বঙ্গদেশীয় রেশমের কাপড় শাদা এবং কোমল; পুণ্ড্রদেশীয় রেশমের কাপড় শ্যামবর্ণ এবং মণির মত শীতল।" কৌটিল্য পুণ্ড্রদেশীয় "পত্রোর্ণা" বা ধোলাই করা রেশমী কাপড়ের এবং শ্রেষ্ঠ কার্পাস বস্ত্রের মধ্যে বঙ্গদেশীয় কার্পাস বস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। (৭) এই সময়ের পূর্ব্বেই এক দল বাঙ্গালী সমুদ্রযাত্রিক সিংহলে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। কৌটিল্য "চীনভূমিজ" বা "চীনপট্টে"র উল্লেখ করিয়াছেন। বাঙ্গালার বন্দর তাম্রলিপ্তিতে সমুদ্রযানে আরোহণ করিয়াই তখন বণিকেরা চীনের সহিত বাণিজ্য করিত। সিংহলের ইতিহাস "মহাবংশে" আছে, যখন অশোকের প্রদত্ত নানা উপঢৌকন লইয়া সিংহলের রাজদূত পাটলিপুত্র হইতে সিংহলে ফিরিয়া গিয়াছিলেন, তখন তিনি "তামলিত্তী" (তাম্রলিপ্তি) বন্দরে গিয়া সমুদ্রযানে আরোহণ করিয়াছিলেন (১১।৩৮)। বাঙ্গালায় সভ্যতার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ শাস্ত্রে মধ্যদেশের সংজ্ঞা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, এবং উহার পূর্ব্বসীমাও সরাইয়া লওয়া হইয়াছিল।

৬। গৌড়রাজমালা; ১-২ পৃষ্ঠা।

৭। "বাঙ্গকং শ্বেতং স্নিগ্ধং দুকূলং, পৌণ্ড্রকং শ্যামং মণিস্নিগ্ধং। * * তেন কাশিকং পৌণ্ড্রকং চ ক্ষৌমং ব্যাখ্যাতম্। মাগধিকা পৌণ্ড্রিকা সৌবর্ণকুড্যকা চ পত্রোর্ণাঃ। * * মাধুরমাপরান্তকং কালিঙ্গকং কাশিকং বাঙ্গকং বাৎসকং মাহিষকং চ কার্পাসিকং শ্রেষ্ঠমিতি। ৮০-৮১ পৃঃ।" অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের এই অংশের বঙ্গানুবাদে কিছু কিছু ভুল আছে, এবং কিছু কিছু অংশ বাদ পড়িয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার "অভিভাষণে"র ২৯ পৃষ্ঠায় "শিল্পশাস্ত্র সম্বন্ধে যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন পুস্তক" তাহা হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা "কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে"র এই অংশেরই সারভাগ বলিয়া মনে হয়। শাস্ত্রী মহাশয় যে লিখিয়াছেন, "সর্ব্বোৎকৃষ্টপত্রোর্ণা কেবল বাঙ্গালাই পাওয়া যাইত", এ কথা মূলানুগত নহে।

"দিব্যাবদানে"র "কোটীকর্ণাবদানে" উপালী বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "অন্ত বা সীমান্ত কোন্ স্থান, এবং প্রত্যন্ত বা সীমান্তের বাহিরে কোন্ স্থান?" বুদ্ধ উত্তরে বলিতেছেন, "হে উপালি, পূর্ব্বদিকে পুণ্ডবর্দ্ধন নামক নগর এবং তাহার পূর্ব্বদিকে পুণ্ডকক্ষো নামক পর্ব্বত। অতঃপর প্রত্যন্ত।" (৮) গারো পাহাড়ই সম্ভবতঃ এখানে "পুণ্ডকক্ষো" পর্ব্বত নামে অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, "কোটীকর্ণাবদান"-রচনার সময়ে শুধু পুণ্ড্রদেশে (বর্ত্তমান বরেন্দ্র) নয়, কামরূপেও আর্য্যসভ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখন জিজ্ঞাস্য,—বর্দ্ধমানের রাঢ়-ভ্রমণের সময়, এবং মেগাস্থিনিস ও কৌটিল্যের সময়, এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী কিঞ্চিন্ন্যূন দুই শতাব্দী কালের মধ্যে বাঙ্গালার অসভ্য অধিবাসিগণ কেমন করিয়া সভ্যতার এত উচ্চ সোপানে আরোহণ করিল?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে বাঙ্গালীর উৎপত্তির আলোচনা করা আবশ্যক। শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গালীর উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"এখনকার Enthropologistsরা স্থির করিয়াছেন যে, বাঙ্গালী মঙ্গল ও দ্রাবিড় জাতির মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে। আর্য্যগণ এখানে অতি অল্পদিনই আসিয়াছেন। আর্য্য-আবর্ত্ত সমুদ্রের উপকূল বঙ্গদেশে অতি অল্পই প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।.........জীবন্ত ব্রাহ্মণে শ্রাদ্ধ করিতে হইলে ব্রহ্মাবর্ত্তের ব্রাহ্মণই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। বাঙ্গলাদেশের ব্রাহ্মণ একেবারেই প্রশস্ত নহে। ইহার কারণ অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, আর্য্য ভিন্ন অন্য কোন জাতি বঙ্গদেশে প্রবল ছিল।" পরলোকগত রিস্‌লি সাহেব বাঙ্গালীর উৎপত্তি সম্বন্ধে যে মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন, এখানে শাস্ত্রী মহাশয় তাহারই পুনরুল্লেখ করিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে পঠিত এবং তাহার কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশিত (১০৫—১২৪পৃঃ) "বাঙ্গালীতত্ত্ব" নামক একটী প্রবন্ধে রিস্‌লি সাহেবের মত বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই "সাহিত্য-সম্মিলনে"রই সপ্তম অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে পাঠের জন্য লিখিত এই সুদীর্ঘ অভিভাষণে উক্ত প্রবন্ধের কোনও উল্লেখই নাই। পঞ্জাব, আগ্রা, অযোধ্যাপ্রদেশ, বিহার, এবং রাজপুতানার অধিবাসি-

৮। "পূর্বেণোপালি পুণ্ডবর্দ্ধনং নাম নগরং তস্য পূর্বেণ পুণ্ডকক্ষো নাম পর্ব্বতঃ, ততঃ পরেণ প্রত্যন্তঃ।"—The Divyavadana, Edited by Cowell and Neil, Cambridge, 1886, p. 21.

গণের গড়ে শতকরা ৭৫ জনের মস্তক দীর্ঘ (Dolichocephalic); অর্থাৎ,

$$\frac{\text{মস্তকের প্রশস্ততা} \times ১০০}{\text{মস্তকের দৈর্ঘ্য}} = ৭৫ \text{ এর ন্যূন।}$$

পক্ষান্তরে, গুজরাট, মারাঠাদেশ, কূর্গ, উড়িষ্যা, এবং বাঙ্গালার অধিবাসিগণের গড়ে শতকরা প্রায় ৮০ জনের মস্তকের এই অনুপাত ৭৫এর উপর। ইহার দক্ষিণে আবার তামিল এবং মলয়ালম-ভাষী দ্রাবিড়গণ দীর্ঘ-মস্তকবিশিষ্ট। গুজরাথী, মারাঠী, উড়িয়া এবং বাঙ্গালীগণের মধ্যে চৌড়া মাথার (Brachycephalic) বাহুল্য দেখিয়া রিস্‌লি অনুমান করিয়াছিলেন, গুজরাথী এবং মারাঠীগণ খুব চৌড়া-মাথা শক আক্রমণকারী এবং লম্বা-মাথা দ্রাবিড়গণের মিশ্রণজাত; এবং উড়িয়া ও বাঙ্গালীগণ খুব চৌড়ামাথা মোঙ্গল এবং লম্বামাথা দ্রাবিড়ের মিশ্রণজাত।

গুজরাথী এবং মারাঠীগণকে শক-দ্রাবিড়-সঙ্কর বলিয়া কল্পনা করা ইতিহাস না জানার ফল। উক্ত "বাঙ্গালীতত্ত্ব" প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে,—"ভারত-ইতিহাসের যে যুগকে সিথীয় আক্রমণের যুগ বলা যাইতে পারে, সেই যুগে শক, কুষাণ এবং হূণ, এই তিন জাতীয় আক্রমণকারী ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। শকেরা মহারাষ্ট্রদেশে প্রবেশের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু অন্ধ্রবংশীয় রাজগণ তাঁহাদের গতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কুষাণ এবং হূণগণ কখনও মহারাষ্ট্রের সীমান্তে পদার্পণ করিয়াছিলেন, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং মারাঠাগণের মধ্যে অধিকাংশ ভাগ সিথীয়, এরূপ অনুমান কষ্টকল্পনামাত্র। গুজরাতের কথা কিছুটা স্বতন্ত্র।.........কিন্তু তাই বলিয়া কাশ্মীর, পঞ্জাব এবং মথুরায় যে পরিমাণ শক, কুষাণ এবং হূণ আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল, তার চেয়ে বেশী পরিমাণ শক এবং গুর্জ্জর গুজরাতে প্রবেশ করিয়াছিল, এরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ নাই। * * এত শক, কুষাণ এবং হূণ আসিয়া মিলিত হওয়া সত্ত্বেও কাশ্মীর, পঞ্জাব এবং মথুরার অধিবাসীরা যেমন দীর্ঘকরোটি তেমন দীর্ঘকরোটিই রহিয়া গিয়াছেন; অথচ শক এবং গুর্জ্জরেরা গুজরাতীগণকে প্রায় প্রশস্তকরোটি করিয়া তুলিয়াছেন, এরূপ অনুমান যুক্তিবিরুদ্ধ।"

তার পর ঐ প্রবন্ধে উড়িয়া এবং বাঙ্গালীর মোঙ্গল-সংস্রব সম্পর্কে বলা হইয়াছে, "প্রশস্তকরোটি মোঙ্গলীয়দিগের বিশেষ লক্ষণ নহে, অথবা মোঙ্গলীয়দিগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। * * মোঙ্গলীয়দিগের বিশেষ লক্ষণ, অতিনিম্ন নাসিকার মূল, গণ্ডস্থলের অস্থির উচ্চতা, শ্মশ্রুর অভাব বা অল্পতা, এবং বঙ্কিমছাঁদের নেত্র। বাঙ্গালী এবং উড়িয়াগণের মধ্যে এই সকল লক্ষণ মোটেই দেখা যায় না।" এই

প্রকারে রিস্‌লির মত খণ্ডন করিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে,—"উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ, গুজরাত ও মহারাষ্ট্র, এবং বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, এই সকল প্রদেশের প্রশস্তকরোটী অধিবাসিগণকে তুরুষ্ক, শক ও মোঙ্গল এই তিনটি [স্বতন্ত্র] বংশসম্ভূত মনে না করিয়া, একই বংশসম্ভূত এবং একই আকৃতিক জাতির অন্তর্ভূত বলিয়া গ্রহণ করিলে, রিস্‌লি সাহেব যে সকল ভ্রম প্রমাদে পতিত হইয়াছেন, তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ করা যাইতে পারে।" অর্থাৎ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের আর্য্য-ভাষাভাষী পাঠানাদি জাতিনিচয়ের মধ্যে ও গুজরাথী, মারাঠী, উড়িয়া ও বাঙ্গালীগণের মধ্যে যে চৌড়ামাথা দেখা যায়, তাহা একই মূল হইতে উৎপন্ন। একই প্রস্রবণ হইতে উৎপন্ন হইয়া এই চৌড়ামাথা আক্রমণকারীর প্রবাহ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, গুজরাত, মারাঠাদেশ, কর্ণাট, অন্ধ্র, উড়িষ্যা ও কতক পরিমাণে বিহার প্লাবিত করিয়া বাঙ্গালাদেশে আসিয়া পড়িয়াছে। ইঁহারাও আর্য্যভাষাভাষী ছিলেন, দীর্ঘকরোটি হিন্দুস্থানী বা পঞ্জাবীর নিকট হইতে ইঁহারা আর্য্য-ভাষা ধার করেন নাই। গ্রিয়ার্সন, হেনিলি প্রভৃতি ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ দেখাইয়াছেন, এক দিকে পঞ্জাবী এবং হিন্দুস্থানী ভাষা, অপর দিকে বিহারী, বাঙ্গালা, উড়িয়া, মারাঠী প্রভৃতি ভাষা, দুইটি স্বতন্ত্র মূল হইতে উৎপন্ন। এই প্রশস্তকরোটি আর্য্যভাষাভাষী আক্রমণ-কারিগণের ধারার উৎপত্তিস্থান কোথায়, তাহা উক্ত প্রবন্ধে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। মধ্য-এসিয়ার পামীর প্রদেশের গালচাগণ, পশ্চিম-এসিয়ার আরমেনীয়গণ এবং য়ুরোপের শ্লাভ্‌ এবং কেল্‌ট্‌গণ আর্য্যভাষাভাষী, অথচ প্রশস্তকরোটি; সুতরাং প্রশস্তকরোটি আর্য্য দেখিলেই উহাতে শক বা মোঙ্গল-মিশ্রণ কল্পনা করা অনাবশ্যক, এই পর্য্যন্ত বলা হইয়াছিল। (৯)

৯। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের East West পত্রে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে গুজরাটী, মারাঠী, উড়িয়া এবং বাঙ্গালীর মধ্যে যে প্রশস্তকরোটি মানুষের ভাগ দেখা যায়, তাহা একই মূল হইতে উৎপন্ন, এবং তদ্দ্বারা এই সকল জনগণের সহিত য়ুরোপীয় আল্পাইন জাতির (Alpine) জ্ঞাতিত্ব সূচিত হইতেছে, এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলাম। লণ্ডনের "নেচর" পত্র (Nature, June 7, 1907) বাঙ্গালীর পক্ষে এরূপ উচ্চবংশে উৎপত্তি দাবী করার জন্য আমাকে একটু উপহাস করিয়া-ছিল। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'The Races of man and Their Distribution' নামক পুস্তকে ডাক্তার হেডন (Haddon) লিখিয়াছেন,—

"A zone of relatively 'broad-headed' people extends from the great grazing country of the Western Punjab through the Deccan to the Coorgs. Risley supports the view that this may be track of the Scythians, who found the progress east blocked by the Indo-Aryans and so turned south, mingled with Dravidian population, and became the ancestors of the Marathas and Canarese. Bnt evidence seems to be lacking that the

এখন চৌড়ামাথা অথচ আর্য্যভাষী গুজরাথী, মারাঠী, উড়িয়া এবং বাঙ্গালীর উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও কিছু বলা সম্ভব হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ সার ওরেল ষ্টিন মধ্য-এসিয়ায় প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানে ভ্রমণকালে তদ্দেশবাসীদিগের জাতিতত্ত্বনিরূপণের জন্য তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিমাণ করিয়াছিলেন। নৃবিজ্ঞানবিৎ টি. এ. জয়েসের (T. A. Joyace) উপর সকল উপাদানের বিচারের ভার ন্যস্ত হইয়াছিল। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের "জর্ণ্যাল অফ্ দি এন্থ্রপলজিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটে" প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে তিনি উহাদের আলোচনা করিয়াছেন। যাঁহারা জয়েসের সিদ্ধান্ত জানিতে চাহেন, তাঁহারা ঐ জর্ণ্যালের ৪৬৭—৪৬৮ পৃষ্ঠা পাঠ করিবেন। এখানে অতি-সংক্ষেপে তাহার সারাংশ প্রদত্ত হইতেছে।

মধ্য-এসিয়ার তক্ল-মকান মরুভূমির চারি দিকের অধিবাসীদিগের মস্তক খুব চৌড়া, এবং ইহারা আর্য্য-ইরাণী ভাষা ব্যবহার করে। ওয়াখি এবং গালচাগণ ইহাদিগের জাতি। পামীর প্রদেশের কাফীর এবং চিত্রলীগণও একরূপ ভাষাই ব্যবহার করে; কিন্তু ইহাদের মাথা তত চৌড়া নয়, ইহাদের মধ্যে লম্বা মাথার মিশ্রণের চিহ্ন পাওয়া যায়। তার পর, ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের হিন্দু আফগান জাতি। ইহারা ভাষায় আর্য্য-ইরাণী হইলেও, ইহাদের মাথা তত চৌড়া নয়; অর্থাৎ, ৮০র উপরের অনুপাতের মাথা ইহাদের মধ্যে খুব বেশী দেখা যায় না। গড়পড়তায় ইহারা মধ্যমকরোটি (mesocephalic, index, 75 to 80 এই মধ্যম করোটি, প্রশস্তকরোটি এবং দীর্ঘকরোটির মিশ্রণের ফল। তক্ল-মকান প্রদেশের খাঁটী ইরাণীগণের পশ্চিম দিকে তুরুস্কগণের বাস। তুরুস্কগণ ভাষায় মোঙ্গলীয়, কিন্তু আকারে ইরাণীয়। তুরুস্কগণ প্রশস্তকরোটি মোঙ্গলীয়ের সহিত প্রশস্তকরোটি, দীর্ঘকায়, সুনাসিক ইরাণীর মিশ্রণজাত। তক্ল-মকান এবং পামীর প্রদেশের এই প্রশস্তকরোটি ইরাণী আর্য্যগণ আকারে ইউরোপের হোমো-অ্যাল্পাইনস্ (Homo-Alpinus) বা রুস, ফরাসী, আইরিস প্রভৃতি আল্পাইন জাতির সদৃশ। জয়েস উপসংহারে বলিয়াছেন,—মধ্য-এসিয়ার ইরাণীগণকে আকৃ-

'Scythians' penetrated far into the Deccan, and apart from brachycephaly there is little to associate these peoples with Scythians. It seems quite possible that these brachycephalic are the result of an unrecorded migration of some members of the Alpine race from the highlands of Southwest Asia in pre-historic times" (pp. 60—61).

ব্রিটিশ মিউজিয়মের Ethnology বিভাগের যে নূতন Hand-Book বাহির হইয়াছে, তাহাতে রিজলি সাহেবের মত গৃহীত হয় নাই।

তির হিসাবে আমি "হোমো-অ্যাল্পাইনস" বলি, কিন্তু আল্পস্ প্রদেশের বর্ত্তমান অধিবাসীদিগের সহিত যে তুর্কীস্থানের অধিবাসীদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহা আমি সূচিত করিতে চাহি না। (১০)

রিস্‌লির একটা সংস্কার ছিল, আদৌ যাহারা আর্য্য ভাষা ব্যবহার করিত, তাহারা সকলেই দীর্ঘকরোটি ছিল। তাই আর্য্যভাষী কোনও জাতির মধ্যে প্রশস্তকরোটি দেখিলেই তিনি মনে করিতেন, ইহা অনার্য্য-মোঙ্গল-মিশ্রণের ফল। য়ুরোপের প্রশস্তকরোটি আর্য্যভাষিগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে রিস্‌লির কি মত ছিল, তাহা জানি না। চীন জাপান থাকিতে বাঙ্গালীর মোঙ্গলের সহিত জ্ঞাতিত্ব স্বীকার করিতে কোনও সঙ্কোচ হইতে পারে না। কিন্তু বাঙ্গালীর ভাষা, বাঙ্গালীর নাসা, বাঙ্গালীর গোঁপদাঁড়ি সেইরূপ জাতিত্বের অন্তরায়। ষ্টিনের অনুসন্ধানের ফলে আমরা মধ্য-এসিয়ায় চিরকাল আর্য্য-ইরাণী-ভাষাভাষী, মোঙ্গল-সম্পর্ক-বর্জ্জিত একটি বিশাল জনসঙ্ঘের সন্ধান পাইতেছি। সীমান্তের হিন্দু আফগানগণ আদৌ ইহাদের জাতীয় ছিল; পরে দীর্ঘকরোটি জনগণের সহিত মিশিয়া স্বতন্ত্র আকৃতি ধারণ করিয়াছে। গুজরাথী, মারাঠী, উড়িয়া এবং বাঙ্গালীরও সেই দশা। ইহাদের মধ্যে চৌড়ামাথার যে ভেজাল দৃষ্ট হয়, তাহা তক্ল-মকান এবং পামীর হইতে উৎপন্ন শোণিত-নদের প্লাবনের ফল। ভাষায় মারাঠী, উড়িয়া, বিহারী এবং বাঙ্গালী পরস্পরের সহিত সম্পর্কিত। ধর্ম্মসূত্রকার বোধায়নের মতে, ইহারা সকলেই "সঙ্কীর্ণযোনি", এবং মধ্যদেশবাসীর বর্জ্জনীয়। বিহারীদিগের সহিত বাঙ্গালীর ভাষাগত ঘনিষ্ঠতা থাকিলেও, আকারে এবং আচারে বিহারী হিন্দুস্থানী হইয়া গিয়াছে। মধ্য-এসিয়ার চৌড়ামাথা আর্য্যেরা ভাষায় ইরাণী, কিন্তু বাঙ্গালীর ভাষার সহিত ইরাণী অপেক্ষা সংস্কৃতের সম্বন্ধ অধিক। তথাপি বাঙ্গালীর ইরাণী-গন্ধ একেবারে দূর হয় নাই। বাঙ্গালী, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গবাসী, এখনও অনেক সময় 'স'কে 'হ' উচ্চারণ করে।

এখানে যে মত প্রকটিত হইল, তাহা স্বীকার করিতে গেলে, গুজরাত,

১০। "Finally, the point which emerges most clearly from the welter of measurements and descriptive data contained in this paper is this: that the original inhabitants of the Pamirs and Takla-makan Desert, including the cities now buried beneath the sand, is that type of man described by Laponge as "Homo-Apinus," within the west, traces of the Indo-Afghan; and that the Mongolian has had very little influence upon the population. In using "Homo-Alpinus" term, I wish it to be understood that I employ it merely as the name of certain type already described, and do not necessarily imply that the actual population of the Alps is closely allied to the population of Chinese Turkestan."

দাক্ষিণাত্য, মগধ, বাঙ্গলা প্রভৃতি দেশে আর্য্য-সমাগমের ইতিহাস এই ভাবে অনুমান করা যাইতে পারে। বেদ যাঁহাদের মধ্যে রচিত হইয়াছিল, সেই দীর্ঘকরোটি আর্য্যগণ পঞ্জাব এবং হিন্দুস্থানের কতকাংশে উপনিবেশ-স্থাপন করিবার পর তরু-মকান এবং পামীর প্রদেশ হইতে আর্য্যভাষী প্রশস্তকরোটি আর এক দল আগন্তুক আফগানিস্থান এবং হিন্দুকুশ প্রদেশ অধিকার করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে, এবং ক্রমে গান্ধার, আনর্ত্ত, সৌরাষ্ট্র, অবন্তী, মগধ, অঙ্গ, অধিকার করে। উত্তরকালে ইহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হইলে, ইহারা দাক্ষিণাত্যে, উড়িষ্যায় এবং বাঙ্গলায় বিস্তৃত হইয়া পড়ে। উড়িয়া, বাঙ্গালা, এবং বিহারী ভাষা মাগধী প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন। আচারাঙ্গসূত্রোক্ত বর্দ্ধমানের রাঢ়-ভ্রমণকাহিনী-পাঠে মনে হয়, খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দ হইতে মিথিলা, মগধ এবং অঙ্গ হইতে ঔপনিবেশিকগণ যাইয়া বাঙ্গলায় বসতি করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দে বাঙ্গালী শৌর্য্যে বীর্য্যে শিল্পবাণিজ্যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

শাস্ত্রী মহাশয় রিসলি সাহেবের মতানুসরণ করিয়া বাঙ্গালী সাধারণকে মোঙ্গল-দ্রাবিড়-বংশোদ্ভব বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া থাকিলেও, ব্রাহ্মণগণকে উহার সামিল করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন,—"৭৩২ খ্রীঃ অব্দে যখন যশোবর্ম্মদেব কনোজের রাজা, বৈদিকচূড়ামণি ভবভূতি তাঁহার রাজকবি, সেই সময়ে বঙ্গদেশের কোন রাজা বৈদিকযজ্ঞের জন্য তাঁহার নিকট ব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠান। সেই যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ বাঙ্গালা দেশে আসেন, তাঁহাদের হইতেই বাঙ্গালাদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের দৃঢ়ভিত্তি স্থাপিত হয়। ইহার পূর্ব্বেও অনেকবার এদেশে ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন বলিয়া, শুনিতে পাওয়া যায়"। (২৯ পৃঃ) "রিস্‌লি সাহেবের অনুসরণ করিয়া মাথার আকারকে যদি জাতির উৎপত্তির প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে, বাঙ্গালীর রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণকে যশোবর্ম্মদেবের প্রেরিত পাঁচ জন ব্রাহ্মণের বিশুদ্ধশোণিত বংশধর বলিয়া স্বীকার করা যায় না। রিস্‌লি সাহেব ৬৮ জন পূর্ব্ববঙ্গের ব্রাহ্মণের মাথা মাপিয়াছিলেন। তন্মধ্যে শতকরা ১৩ জন দীর্ঘকরোটী (dolichocephalic); ৫২ জন মধ্যমকরোটি (mesocephalic); এবং ৩৫ জন প্রশস্তকরোটি (brachycephalic)। পূর্ব্বোক্ত "বাঙ্গালীতত্ত্ব" নামক প্রবন্ধের টীকায় স্বতন্ত্রভাবে বারেন্দ্র এবং রাঢ়ী ব্রাহ্মণের মাথা মাপার ফল দেওয়া হইয়াছে। সেখানে দেখা যাইবে, রাঢ়ী, বারেন্দ্র, এবং বৈদিক ব্রাহ্মণের মধ্যে বিভিন্ন আকারের মাথার অনুপাত প্রায় ঐরূপ। তৎপরে আমি ভাটপাড়ায়

যাইয়া শ্রদ্ধাভাজন পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের সাহায্যে ৫০ জন পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণের মাথা মাপিয়াছিলাম। তাঁহাদের মধ্যে শতকরা ৬ জন দীর্ঘকরোটি, ৪৮ জন মধ্যমকরোটি এবং ৪৬ জন প্রশস্তকরোটি। পক্ষান্তরে, হিন্দুস্থানী এবং বিহারী ব্রাহ্মণের মধ্যে শতকরা ৭২ জন দীর্ঘকরোটি; ২৫ জন মধ্যমকরোটি; এবং ৩ জন মাত্র প্রশস্তকরোটি। সুতরাং মাথার আকারের হিসাবে বলিতে গেলে বলিতে হয়, বাঙ্গালার সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণের শরীরে দীর্ঘকরোটি কনৌজীয়া ব্রাহ্মণের শোণিত অপেক্ষা প্রশস্ত বা মধ্যমকরোটি বাহ্যদেশীয় আর্য্য-শোণিতের পরিমাণ অধিক। কনৌজের রাজা যশোবর্ম্মা যে বঙ্গদেশের কোনও রাজা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া বাঙ্গালায় পাঁচ জন ব্রাহ্মণ পাঠাইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ কি? অবশ্যই বিনা প্রমাণে শাস্ত্রী মহাশয় এত দৃঢ়স্বরে এ কথা কখনই বলেন নাই। আমার সেই প্রমাণ দেখিবার জন্য বিশেষ উৎসুক রহিলাম। সাঁওতাল এবং ওরাওঁগণের পূর্ব্বপুরুষদিগের জ্ঞাতিগণ খুব সম্ভব বাঙ্গালার আদিম অধিবাসী ছিল। এই আদিম অধিবাসিগণের সহিত প্রশস্তকরোটি বা মধ্যমকরোটি আর্য্যভাষাভাষী আগন্তুকগণের মিশ্রণে বাঙ্গালীর উৎপত্তি। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী কোচগণের মধ্যে মোঙ্গল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ইহাদের আচার ও খাঁটি বাঙ্গালী হিন্দুর আচার হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র। কোচ্-রাজবংশী ছাড়িয়া দিলে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণেতর সকল বাঙ্গালীকে একই আকৃতিক জাতির (raceএর) সামিল মনে করা যাইতে পারে। কনৌজ হইতে পাঁচজন কেন, হয়ত পাঁচ সহস্র ব্রাহ্মণ আসিয়া বাঙ্গালার আদিম ব্রাহ্মণগণের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন কিন্তু এইরূপ মিশ্রণের ফলে বাঙ্গালীর আকৃতির যাহা বিশেষত্ব অপেক্ষাকৃত চৌড়ামাথা তাহার কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। কেহ কেহ বলিতে পারেন, কনৌজ হইতে আগত দীর্ঘকরোটি ব্রাহ্মণগণের বংশধরগণের মস্তক বাঙ্গালার জলবায়ুর প্রভাবে চৌড়া হইয়া গিয়াছে। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে সকল মাথাই চৌড়া হইত, কতক চৌড়া, কতক লম্বা হইত না। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণই হউক আর শূদ্রই হউক সকলেই আকারে, সুতরাং মূলে একজাতীয়। শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গালীর ইতিহাসে আধুনিক মানববিজ্ঞানের অনুসন্ধানফল লিপিবদ্ধ করিতে যত্ন করিয়া উৎসাহের পরিচয় দিয়াছেন। রিসলি সাহেবের 'রিপোর্ট' প্রকাশের পরে এ বিষয়ে কে কোথায় কি লিখিয়াছেন, তাহা একটু খুঁজিয়া দেখিয়া লইয়া, লিখিলে এবং ব্রাহ্মণকে অপরাপর জাতির বাঙ্গালী হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন না করিলে, তাঁহার বিরুদ্ধে আমাদের কোনও অভিযোগ থাকিত না।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

বিধাতার বিড়ম্বন।

—:•:—

প্রথম পরিচ্ছেদ।—আরম্ভ।

পুরুষকারে বিদ্যা-অর্জ্জন হয়, পুরুষকারে ধর্ম্ম-অর্জ্জন হয়, পুরুষকারে অর্থ-অর্জ্জন হয়, কিন্তু পুরুষকারে চিরবাঞ্ছিত দাম্পত্যসুখার্জ্জন হয় না। এইখানে অদৃষ্টবাদি দিগের জয়।

সচরাচর মনুষ্যজীবনের পূর্ব্বাহ্ন প্রাতঃসূর্য্যরশ্মিতে উজ্জ্বল থাকে, কিন্তু আমার তাহা ঘটে নাই। বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের প্রারম্ভ অন্ধকারময় ছিল; নৈরাশ্য, নিরুৎসাহ ও নিরানন্দ আমার জীবনকে অধিকার করিয়াছিল। একদিন বাল্য-কালে আমি অসীম আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহা ক্ষণকালের জন্য। সে আমার বিবাহের দিন। পরে জীবনটা আবার অন্ধকার-ময় বিজন অরণ্য হইল।

আমি সামান্য গৃহস্থের সন্তান ছিলাম বটে, কিন্তু আমার দুইটা বিষয়ে বড় অহংকার ছিল। প্রথমতঃ, আমি ব্রাহ্মণ, কুলীনশ্রেষ্ঠ; দ্বিতীয়তঃ, আমি এই বাঙ্গালা মুলুকের এক প্রধান জমীদারের বংশজাত।

আমার পিতামহকে চরিত্রদোষের জন্য তাঁহার পিতা গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। পিতামহ পশ্চিমে এলাহাবাদে প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতে থাকেন; সেখানে এক গৃহস্থের কন্যাকে বিবাহ করেন। বিবাহের পাঁচ ছয় বৎসর পরে আমার পিতার জন্ম হইল। তাহার আট মাস পরে পিতামহের মৃত্যু হইল। আর উহার চার মাস পরে পিতামহীর মৃত্যু হইল। পিতা এক বৎসরমাত্র বয়ঃক্রমকালে পিতৃমাতৃ-হীন হইলেন। তাঁহার মাতামহ তাঁহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন; তাঁহাকে লেখাপড়া শিখাইয়া, যথাকালে তাঁহার বিবাহ দিলেন। পিতার যখন পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রম, তখন তাঁহার মাতামহের মৃত্যু হইল। এই সময় হইতে পিতা, আমার মাতুলের সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলেন—সামান্য ব্যবসায়—এই সময় আমার জন্ম হইল। এই জন্য আমাদের পূর্ব্ব পরিচয় কেহ জানিতে পারে নাই।

বাল্যকাল হইতে আমি বড় রুগ্ন ছিলাম—কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পীড়ার উপশম হইতে লাগিল। ছয় বৎসর বয়সে স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। রুগ্নাবস্থায়ও

আমি আমাদের শ্রেণীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলাম, এবং প্রতি বৎসর সর্ব্বোচ্চ পারিতোষিক পাইতাম। নবম বৎসর বয়সে আমার উপনয়ন হইল। এই উপলক্ষে পিতা যথাসাধ্য খরচপত্র করিলেন, কেন না, আমি তাঁহার একমাত্র পুত্র, বড় আদরের ছেলে ছিলাম। আমার যখন তের বৎসর বয়ঃক্রম হইল, তখন হইতে আমার জীবনে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সচরাচর মনুষ্যজীবনে ঘটে না। সেই ঘটনাগুলি এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকায় প্রকটিত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।—বর্ষীয়ান্।

আমার যখন তের বৎসর বয়স, তখন একদিন আমার মাতুলানীর সাধ হইল যে, বৈশাখ মাসে বিশ্বেশ্বরের মাথায় গঙ্গাজল ও বিল্বপত্র অর্পণ করিবেন। সুতরাং চৈত্রমাসের শেষে আমরা সকলে কাশীতে উপস্থিত হইলাম। বিশ্বেশ্বরের মাথায় জল ঢালিতে ঢালিতে মামীর আর একটা সাধ হইল—বিন্ধ্যাচলের বিন্ধ্যবাসিনী-দর্শন। তখনই তাহার বন্দোবস্ত হইল। পিতা, মাতা ও মাতুলানীকে লইয়া বিন্ধ্যাচলে গেলেন। মাতুল ও আমি কাশীতেই রহিলাম।

আমি প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া দশাশ্বমেধ ঘাটের নিকট বেড়াইতাম। সেখানে একটী প্রাচীনের সহিত আমার দেখা হইত। তিনি প্রতিদিন গঙ্গাস্নানে আসিতেন; পশ্চাতে এক জন চাকর, কোশাকুশি, একখানি আসন ও তাঁহার কাপড় লইয়া আসিত। আমি তাঁহাকে প্রত্যহ দেখিতাম—একাগ্রচিত্তে দেখিতাম, কিন্তু কেন যে এরূপ করিতাম, তাহা তখন বুঝি নাই, এখন বুঝিয়াছি। কোনও কোনও ব্যক্তির কার্য্যের প্রভাব, অপরের জীবনকে কখনও সুখময়, কখনও বা দুঃখময় করে। এই প্রাচীনের কার্য্যের প্রভাব আমার জীবনকে ঐরূপ কি একটা করিয়াছিল, তাহা এই আখ্যায়িকায় প্রকাশ পাইবে। আমি যেমন ঐ বৃদ্ধটিকে অনিমিষচক্ষে দেখিতাম, তিনিও আমাকে ঐরূপ দেখিতে দেখিতে যাইতেন। একদিন অতি প্রত্যুষে সদরদরজা খুলিতেছি, এমন সময় রাস্তায় একটা গোলমাল শুনিয়া উঁকি মারিয়া দেখি যে, সেই প্রাচীনটিকে একটা দুরন্ত ষাঁড় তাড়া করিয়াছে। আমি দৌড়িয়া যাইয়া তাঁহাকে টানিয়া আনিয়া আমাদের দরজার ভিতর প্রবেশ করিলাম। প্রাচীনটি রক্ষা পাইলেন বটে, কিন্তু ঐ ষাঁড়টা একটি স্থূলকায় অর্দ্ধবয়সী স্ত্রীলোককে পদদলিত করিয়া পলাইল। স্ত্রীলোকটিকে এরূপ জখম করিয়াছিল যে, তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইতে হইল। আমাদের দরজা হইতে প্রাচীন তাহা দেখিয়া, আমাকে দাড়ি ধরিয়া বড় আদর করিলেন,

এবং আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে আমার মাতুল গোলমাল শুনিয়া, নীচে নামিয় আসিলে, তাঁহাকে বলিলেন, "এই বালকটি আজ আমার জীবন রক্ষা করিয়াছে; এটি আপনার কে?" উত্তরে মাতুল বলিলেন, "আমার ভাগ্‌নে।" প্রাচীন বলিলেন, "বড় সুন্দর ছেলে, বড় বুদ্ধিমান্, আর ইহার কপালে রাজদণ্ড রহিয়াছে, বড় ভাগ্যবান্ হইবে।" পরে বৃদ্ধ আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মাতুল আমার পিতামহের নাম ও তিনি যে বাঙ্গালাদেশ হইতে এলাহাবাদে বাস করিতেছিলেন, সে সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। প্রাচীন উহা শুনিয়া কিছুক্ষণ কি ভাবিলেন, পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলেটি লেখাপড়া করিতেছে কেমন? মাতুল আমার যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। প্রাচীন বলিলেন, "ভাল, ভাল, বেঁচে থাক্, বেঁচে থাক্।" পরে তাঁহার চাকর গাড়ী আনিলে, গাড়ীতে উঠিবার সময় আবার আমাকে আদর করিলেন। আমি তাঁহার পদধূলি লইলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।—'ওঠ ছেলে' তোর বিয়ে।

অদ্য আমাদের বাটীর সম্মুখে একটি বাঙ্গালীর বাটীতে বিবাহ উপলক্ষে বড় ধুমধাম হইতেছিল। আমি সন্ধ্যার সময় বারাণ্ডায় বসিয়া তাহা দেখিতেছিলাম, এমন সময় আমাদের দরজার সম্মুখে একখানি গাড়ি থামিল। কে এক জন আমাদের দরজায় করাঘাত করিতে লাগিল। আমি অতিক্রুত যাইয়া দেখিলাম, আমাদের চাকর দরজা খুলিয়া দিয়াছে, আর সেই বৃদ্ধটি লাঠীর উপর ভর দিয়া আসিতেছেন, এবং তাঁহার খানসামাটি দরজার নিকট দাঁড়াইয়া আছে। আমাকে দেখিয়া বর্ষীয়ান্ লাঠী ফেলিয়া দুই হাত তুলিলেন, যেন আমাকে আলিঙ্গন করিবেন। আমি ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার পদধূলি লইলাম। তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাবা ও মা বাড়ী আসিয়াছেন?" আমি বলিলাম "না, অদ্যাপি আসেন নাই।" প্রাচীন একটু বিমর্ষ হইলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার মামা কোথায়?" আমি বলিলাম, "উপরে, তাঁহার ঘরে।" তিনি বলিলেন, "তবে চল, তাঁহার সহিত দেখা করিব।" এই বলিয়া আমার সঙ্গে উপরে গেলেন। আমি তাঁহাকে আমাদের ঘরে একখানি আসন পাতিয়া বসাইয়া, মামাকে সংবাদ দিলাম। মাতুল তখন ঐ দিবসের বাজার-খরচের হিসাব লিখিতেছিলেন। কিন্তু হিসাব মিলাইতে পারিতে-ছিলেন না বলিয়া বিরক্ত হইয়া আমাকে বলিলেন "যা, আমি এখন যাব না। আমার হিসাব না মিলিলে, আমি যাব না।" আমি বলিলাম, "মামা ক'টা পয়সার

বাজারখরচ যে; হিসাব মিলাইতে পারিতেছেন না; আপনি আসুন, প্রাচীন বসিয়া আছেন।" মাতুল আসিলে, অন্যান্য কথার পর, বৃদ্ধ, মামাকে বলিলেন, "আমি বড় বিপন্ন হইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি।"

মামা। আজ্ঞা করুন, আমাকে কি করিতে হইবে?

প্রা। অদ্য রাত্রে আমার পৌত্রীর বিবাহের দিন স্থির ছিল; কিন্তু বিধাতা বড় বিড়ম্বনা করিয়াছেন।

মামা। কি হইয়াছে?

প্রা। কলিকাতার এক জন মহাধনাঢ্য ব্যক্তির পুত্রের সহিত বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলাম। তাহার পিতামাতা তাহাকে লইয়া আজ দুই দিবস এখানে আসিয়াছেন। গাত্রহরিদ্রা আভ্যুদয়িক প্রভৃতি হইয়া গিয়াছে। সকলই গোপনে হইয়াছে, কেন না, আমার ইচ্ছা ছিল, গোপনে বিবাহ হয়। পাত্রের পিতা ধনী হইলেও তাহাতে আপত্তি করেন নাই, কেন না, তাঁহার পুত্র এই বিবাহসূত্রে অনেক বিষয়ের অধিকারী হইবে। আমার পৌত্র নাই, ঐ একমাত্র পৌত্রী। কিন্তু বিধাতা বাদ সাধিলেন, সে পাত্রের সহিত বিবাহ হইল না।

মামা। কেন?

প্রা। এইমাত্র সংবাদ পাইলাম যে, পাত্রটি তাহাদের বাসার বারাণ্ডার ভাঙ্গা রেল ধরিয়া কি দেখিতেছিল, সেই সময় হঠাৎ পড়িয়া গিয়াছে।

মামা। আরোগ্য হইলে বিবাহ হইবে। ভগবান তাহাকে অচিরাৎ আরোগ্য করিবেন।

প্রা। সে আশা নাই। ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, পাত্রটির জীবন শেষ হইয়াছে।

এই কথায় মামা শিহরিয়া উঠিলেন, আমিও শিহরিয়া উঠিলাম। কিছুক্ষণ উভয়ে নীরব রহিলেন। পরে মামা বলিলেন, "আবার পাত্র অনুসন্ধান করুন। পুনরায় আভ্যুদয়িক প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিয়া বিবাহ দিবেন।" প্রাচীন বলিলেন, "না, তা' হইতে পারে না। আমাদের বংশে এইরূপ ঘটনা আর একবার ঘটিয়াছিল, পুনরায় আভ্যুদয়িক করিয়া অন্য পাত্রের সহিত বিবাহ দেওয়া হয়, তাহাতে ত্রি-রাত্রের মধ্যে গৃহস্বামীর মৃত্যু হইয়াছিল। সুতরাং অদ্য রাত্রেই বিবাহ দিব, স্থির-সঙ্কল্প হইয়াছি।

মামা। আমাকে কি করিতে হইবে? আমার সন্ধানে ত এমন পাত্র নাই যে, অদ্য রাত্রেই তাহার সহিত বিবাহ হইতে পারে।

প্রা। আছে বৈ কি? এই আপনার ভাগিনেয়ের সহিত বিবাহ দিতে ইচ্ছা করি। কি বলেন?

মামা। (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া)—উহার পিতামাতা এখানে নাই। তাঁহাদের বিনা অনুমতিতে কিরূপে বিবাহ হইতে পারে? আর আমার ভাগিনের ত বালক।

প্রা। আমি বড় বিপদগ্রস্ত হইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। আর এই সুন্দর ছেলেটিকে আমি বড় ভালবাসিয়াছি। উহাকে কখনও চাকরী বা ব্যবসা করিয়া খাইতে হইবে না। পণস্বরূপ অনেক টাকা দিব, বহুমূল্যের সোনার ঘড়ি চেন দিব, বহুমূল্যের হীরার আংটী দিব। আসুন—আমার সহিত, আসুন—লগ্ন উত্তীর্ণ হইয়া যায়—আর বাক্যব্যয় করিবেন না।"

মামা লোভে পড়িয়া অগত্যা স্বীকার করিলেন।

প্রা। তবে শীঘ্র আমার সহিত পাত্র লইয়া আসুন—দরজায় গাড়ী উপস্থিত। বিলম্বে লগ্ন উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে।

মামা। আমি একটা বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত আছি, সেটা শেষ না করিয়া যাইতে পারিতেছি না।

প্রা। হরিবোল! হরি! তবে কি হইবে? আমি পাত্র লইয়া যাই, আপনি আপনার কার্য্য শেষ করিয়া যাইবেন।

এই বলিয়া, প্রাচীন মামাকে বিবাহ-স্থানের ঠিকানা বলিয়া দিয়া, আনন্দ-সহকারে আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, "ওঠ ছেলে, তোর বিয়ে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।—বিবাহ।

বর্ষীয়ানের সহিত আমি গাড়ী চড়িয়া গড়্ গড়্ করিয়া চলিলাম। চারি দিক হইতে দেবমন্দিরের আরতির শঙ্খ, ঘণ্টা ও কাঁসরের শব্দে নগরে একটা কোলাহল উঠিল। দূর হইতে নহবৎ ও রৌসনচৌকির মধুর রাগরাগিণীর আলাপ কর্ণগোচর হইতেছিল। এই ধূমধামের মধ্যে আমি কেরাঞ্চি গাড়ী চড়িয়া গড়্ গড়্ করিয়া বিবাহ করিতে চলিলাম। ইহা কি শুভ নয়? প্রাচীন গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া কি ভাবিতেছিলেন, আমিও ভাবিতেছিলাম। এ বিবাহে আমার তিলমাত্র আনন্দ হয় নাই। যে পিতামাতার আমি সর্ব্বস্ব ধন, যে পিতামাতা আমাকে আজও বুকে টিপিয়া রাখেন, যে পিতামাতা আমার মাথা ধরিলে অন্ধকার দেখেন, তাঁহারা কোথায়? তাঁহারা ত কিছুই জানিতে পারিলেন না। এই সকল ভাবিতেছিলাম—ইতিমধ্যে একটা অন্ধকার গলির

মধ্যে গাড়ী থামিল। খানসামা কোচ্‌বক্স্‌ হইতে নামিয়া গাড়ীর দরজা খুলিল। প্রাচীন নামিলেন, আমাকেও নামিতে বলিলেন; পরে তিনি আমার হাত ধরিয়া চলিলেন। 'কিন্তু এ কি সুসজ্জিত বিবাহপুরী, না সমাধিমন্দির? চারি দিক অন্ধকার। মাটীর প্রশস্ত উঠানে দুইটি অশ্বত্থবৃক্ষ থাকাতে বাড়ীটি আরও অন্ধকার হইয়াছে। কোথাও একটীও জনমানব নাই। খানসামা নিঃশব্দে একটী গুপ্ত দ্বারে আমাদের লইয়া গিয়া, উহার চাবি খুলিল। আমরা গৃহে প্রবেশ করিলাম। প্রাচীন আমার হাত ধরিয়া একটি ঘরে প্রবেশ করিয়া একখানি আসন দেখাইয়া বসিতে বলিয়া চলিয়া গেলেন। এই ঘরটীতে অনেকগুলি আলোক ছিল; সেই জন্য উহা আলোকময়। আমি আসনে বসিয়া দেখিলাম, সম্মুখে এক দেবীমূর্ত্তি। ইনি কি জগদ্ধাত্রী? না, জগদ্ধাত্রী যে সিংহবাহিনী। ইনি পদ্মাসনা। জগদ্ধাত্রী যে চতুর্ভুজা, ইনি যে দ্বিভুজা। জগদ্ধাত্রী ত্রিনয়না। ইনি যে দ্বিনয়না। জগদ্ধাত্রী ত বালার্কজ্যোতির্ম্ময়ী, ইনি যে হেমপ্রভা। আমি একাগ্রচিত্তে দেবীমূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া রহিলাম। ক্রমে বোধ হইতে লাগিল তখন তিনি হাসিতেছেন। আমি বালক, বড় মনঃকষ্টে বিবাহ করিতেছি, দেবী যেন উহা বুঝিতে পারিয়া আমাকে অভয় দিতেছেন। আমি ভূমিষ্ট হইয়া দেবীর নিকট বর চাহিলাম, যেন পিতামাতা আসিয়া, এই বিবাহের সংবাদে আমার প্রতি বিরক্ত না হন। যেন আমি এ বিবাহে সুখী হই। দেবী যেন প্রসন্ন হইয়া মৃদুমন্দ হাসি হাসিলেন। আমার বিষাদ অন্তর্হিত হইল। এমন সময় নেপথ্যে অলঙ্কারের ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম। একটী সুসজ্জিতা অনুপমা সুন্দরী মন্থরগমনে আমার দিকে আসিতেছেন। ইনিই আমার কনে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার পিতামহ (সেই প্রাচীন) ও পুরোহিত আসিয়া আপন আপন আসনে বসিলেন। পিতামহ যখন কন্যার রত্নালঙ্কারভূষিত কোমল ও সুগোল বাহুযুগল আমার হাতের উপর রাখিয়া সম্প্রদান করিলেন, তখন বুঝিলাম, এই বালিকা অসামান্যা সুন্দরী। তার পর, যখন শুভদৃষ্টি হইল, তখন জানিলাম, এই বালিকা অদ্ভুত সুন্দরী। আনন্দে শরীর পুলকিত হইল। লজ্জা সরম ত্যাগ করিয়া অনিমেষনেত্রে আমার পত্নীকে দেখিতে লাগিলাম। বুড়ো পিতামহ বড় তুষ্ট, আমার আনন্দ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া, আমাকে বলিলেন, "কি হে? কি দেখ্‌ছ? এত রূপ কি কখনও দেখ নাই?" আমি লজ্জায় মুখ নত করিলাম। পরে পিতামহ আমার স্ত্রীকে বলিলেন, "সেই আঙ্‌টিটি কোথায়?" আমার বালিকা পত্নী তাহার অঙ্গুলী হইতে একটি আঙ্‌টি খুলিয়া

দিল। আঙটিটী বিলাতী কারিগরের দ্বারা গঠিত, উহার পালিশ্ বড় সুন্দর। উহার উপর একটী মূর্ত্তি ক্ষোদিত ছিল। পিতামহ বলিলেন, "তুমি উহা তোমার বরের আঙ্গুলে পরাইয়া দাও।" আমার স্ত্রী তাহাই করিল। পরে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইলে সকলে উঠিয়া গেলেন। কেবলমাত্র আমার স্ত্রী ও আমি রহিলাম। আমার স্ত্রীকে দেখিতে দেখিতে, তাহার সহিত কথা কহিবার বাসনা জন্মিল। কিন্তু কি কথা কহিব, তাহা স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। ঐ ঘরের কোণে একটী প্রকাণ্ড জালা ছিল, তাহার বর্ণ প্রস্তরের ন্যায় কালো, উহার গলায় এক ছড়া ফুলের মালা ছিল। আমি অঙ্গুলি দ্বারা স্ত্রীকে ঐ জালা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "উহা কোন্ ঠাকুর?" আমার স্ত্রী সেই দিকে মুখ ফিরাইয়া, একবার দেখিয়া, যেন মৃদু মৃদু হাসিলেন। আমি নাছোড়বন্দা, কথা কহাইব, পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই কি কাশীর তিলভাণ্ডেশ্বর?" আমার স্ত্রী এবার খুব হাসিলেন। সে হাসির শব্দ নাই, কেবল অধরোষ্ঠের ভঙ্গী দেখিয়াই বুঝিলাম যে, বড় হাসি হাসিতেছেন। কথাটা নিশ্চয়ই বড় নির্ব্বোধের ন্যায় হইয়াছিল, বড় অপ্রতিভ হইয়া বসিয়া রহিলাম; ভাবিলাম, প্রথম বাক্যালাপে স্ত্রীর নিকট ষ্টুপিড্ ফুল (Stupid fool) হইলাম কি কৌশলে আমার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিব? এমন সময়ে দুইটি প্রাচীনা আসিলেন এক জন বলিলেন, "ও মা, কনে এত হাসিতেছে কেন গো? হ্যাঁ বর, তুমি কি কিছু বলেছ নাকি?" আমি কোনও উত্তর করিলাম না। প্রাচীনাদ্বয় আমার স্ত্রীকে বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তিনি কোনও উত্তর দিলেন না; হাসি সংবরণ করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম, কেন না, যে কথায় আমার নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় হইবে, তাহা তিনি চাপিয়া রাখিলেন। আদুরে মেয়ে বড় হাসি হাসিয়া ঘামিতেছিল। সে জন্য প্রাচীনাদ্বয় তাহাকে বাহিরে লইয়া গেল, আমিও উঠিলাম।

আমি বাহিরে যাইতে একটা ঘরে দুই জনের কথোপকথন শুনিতে পাইলাম। শুনিয়া আমার বিবাহে যে আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা অন্তর্হিত হইল। ঐ দুই ব্যক্তির মধ্যে এক জনকে গলার স্বরে চিনিলাম যে, তিনি সেই বর্ষীয়ান্ পিতামহ। অপর ব্যক্তিকে অনুভবে বুঝিলাম, তাঁহার পুত্র—আমার শ্বশুর। কথোপকথনের শেষাংশ এই:—

পুত্র।—আপনি বলিয়াছিলেন যে, এই নগরে কোনও ধনাঢ্য ব্যক্তি প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতেন, তাঁহার একমাত্র পুত্রের সহিত আমার কন্যারবিবাহ দিবেন।

এই বলিয়া আমার কন্যাকে লইয়া আসিলেন। এখন বিবাহ দিয়া বলিতেছেন যে, সে পাত্রটি ব্যবসাদারের ছেলে, অর্থাৎ দোকানদারের ছেলে। কেন আমার কন্যাকে হাত পা বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া দিলেন?

পিতা।—না, তোমার কন্যাকে বড় ঘরে দিয়াছি. কিন্তু এখন তাহার পরিচয় দিতে পারিতেছি না।

তার পর পিতামহ মৃদুস্বরে কি বলিলেন, তাহা আমি শুনিতে পাইলাম না। কিন্তু আমার শ্বশুর তদুত্তরে যাহা বলিলেন, তাহা শুনিতে পাইলাম। তিনি বলিলেন, "কাহার সহিত বিবাহ হইয়াছে, তাহা আমাদের কখনও জানাইবেন না, কিংবা আমাদের পরিচয় পাত্রদের অবগত করাইবেন না। যদি করেন, তাহা হইলে আপনি নিঃসন্তান হইবেন। অদ্য হইতে আমার কন্যা বিধবা হইল। আমার কন্যাকে দেশে লইয়া চলিলাম।" পিতামহ বলিলেন, "ভাল, আমার সহিতও আর দেখা হইবে না।" কিঞ্চিৎ পরে গাড়ীর শব্দে বুঝিতে পারিলাম যে, শ্বশুর তাঁহার কন্যাকে লইয়া গেলেন। তাহার অনতিবিলম্বে পিতামহ আমাকে লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। আমাকে বলিলেন, "তোমার শ্বশুর আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন।" আমি বলিলাম, "পিতার উপর পুত্র বিরক্ত হয়; এ ত কখনও শুনি নাই।" প্রাচীন বলিলেন, "কখনও কখনও পিতার কার্য্যে পুত্র অসন্তুষ্ট হয় বৈ কি। আমি তাহার অনভিমতে তোমার সহিত তাহার কন্যার বিবাহ দিয়াছি। তোমাকে বড় ভালবাসি, সেইজন্য আমার বড় সাধ হইয়াছিল, আমার পৌত্রীর সহিত তোমার বিবাহ হয়। সে কারণে আমার পুত্রের সহিত কিছু প্রতারণা করিয়াছি, অর্থাৎ তোমাদের অবস্থা তাহাকে জ্ঞাত করাই নাই। যাহা হউক, ভায়া, এ বিবাহটা তুমি ভুলিয়া যাও। আবার বিবাহ করিও। কুলীনের সন্তানের বহু-বিবাহে দোষ নাই। আর পণ দানসামগ্রী যাহা তোমার প্রাপ্য, তাহা বিবাহের সময় দেওয়া হয় নাই, এই পুঁটুলির মধ্যে আছে, উহা লও।" এই বলিয়া প্রাচীন আমার হস্তে একটী পুঁটুলি দিবার জন্য হাত তুলিলেন। আমি "গ্রহণ করিব না" বলিয়া তাঁহার হাত সরাইয়া দিলাম। আমার মনে যে কি একটা বিপ্লব উপস্থিত হইল, তাহা বুঝাইতে পারিব না। আমি হীনাবস্থার পাত্র, দোকানদারের ছেলে, ঐ কন্যার যোগ্য পাত্র নহি, সেই জন্য শ্বশুর আমাকে ত্যাগ করিলেন, এই অপমানে [illegible] ক্রোধ উপস্থিত হইল। আবার ইহার অন্তরালে একখানি চাঁদপানা মুখ উঁকি মারিতেছিল। অপমানের ও ক্রোধের সঙ্গে সঙ্গে বিষাদ জন্মিল। এ জীবনে আমার কেহ সঙ্গী ছিল না, একাকী থাকিতাম, এই সুন্দরী বালিকাকে বিবাহ

করিয়া মনে মনে আশা করিয়াছিলাম যে, ইনিই আমার জীবনে মরণে সঙ্গিনী হইবেন। একত্র পড়িব, একত্র খাইব, একত্র খেলাইব, কিন্তু তাহা হইল না। এ জীবনে আর তাহাকে পাইব না। হরিষে বিষাদ জন্মিল। চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল। অন্ধকারে গাড়ীর কোণে মুখ লুকাইয়া, পিতামহের অজ্ঞাতে কাঁদিতে লাগিলাম, গভীর দুঃখে নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলাম। এমন সময় গাড়ী আমাদের দরজায় থামিল। চাকর দরজা খুলিল। আমি গাড়ী হইতে লাফ দিয়া একেবারে দোতালায় গিয়া আমার ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিলাম। পিতামহের গলার শব্দ শুনিলাম—মাতুলের সহিত কথা কহিতেছেন। উহা শুনিবার ইচ্ছা ছিল না। দারুণ অপমানে ঐ প্রাচীনের প্রতি ক্রোধ উপস্থিত হইয়াছিল। কতক্ষণ পরে যে ঘুমাইলাম, মনে নাই। অতি প্রত্যুষে যেমন প্রতিদিন নিদ্রা ভাঙ্গিয়া থাকে, অদ্যও সেইরূপ হইল। বারাণ্ডায় গিয়া বসিলাম। সেই প্রাচীন অদ্য গঙ্গাস্নানে আসিলেন না, পরদিনও আসিলেন না; তাহার পরদিনও আসিলেন না। বুঝিলাম, কাশী ত্যাগ করিয়া তিনি অন্য কোনও স্থানে গিয়াছেন।

তিন চারি দিবস পরে পিতা, মাতা ও মাতুলানী আসিলেন। তাঁহারা আসিবামাত্র মাতুল আমার বিবাহের সংবাদ দিলেন। মাতা চীৎকার করিয়া বলিলেন, "দাদা, আমার বউ কৈ?" তখন মাতুল সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিলেন। দোকানদারের ছেলে বলিয়া, তাঁহাদের ছেলেকে শ্বশুর ত্যাগ করিয়াছেন, শুনিয়া মাতা অঞ্চল দ্বারা চোখের জল মুছিলেন। পিতা ক্রোধান্বিত হইয়া মামাকে বলিলেন, "এই জমীদারের নাম ধাম আমাকে বল। আমি নালিশ করিয়া আমার পুত্রবধূ ঘরে আনিব।" তখন মামা একটা "ওঃ" শব্দ করিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। "তাই ত 'তাই ত' বড় ভুল হ'য়েছে, পরিচয়টা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।" পিতা বলিলেন, "কেন?" মামা বলিলেন, "কি জান, আমি তখন বড় ব্যস্ত ছিলাম, ঐ দিনের বাজার খরচের হিসাবটা মিলাইতে পারিতেছিলাম না, দুইটা পয়সার গরমিল হইতেছিল।"

পিতা।—'আচ্ছা, বিবাহের পর সে ব্যক্তি যখন ছেলে পঁহুছিয়া দিয়া গেল, তখন ত তাহাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে পারিতে।

মামা।—তখন যে আমি নোট গুণিতেছিলাম। তোমার ছেলেকে পণস্বরূপ এক কাঁড়ি নোট দিয়া গিয়াছিল, আমি তাহাই গুণিতেছিলাম।

পিতা বিরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইলেন। মামী অন্তরাল হইতে কি বলিলেন,

বোধ হয়, ভৎর্সনা করিলেন। মামা বলিলেন, "বটে! দশ টাকা করিয়া পাঁচ হাজার টাকার নোট গণনা করা কি সহজ কায ?" এই বলিয়া এক বাণ্ডিল নোট ও বহুমূল্যের সোনার ঘড়ি ও চেন ও একটী হীরকখচিত আঙটী আনিয়া দিয়া বলিলেন, "এই লও, তোমার ছেলের দানসামগ্রী লও।"

পিতা।—তোমার নিকট রাখ। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমার ছেলেকে যিনি লইয়া গিয়াছিলেন, তিনি কোথায় থাকেন ?

মামা।—তা' কি করিয়া জানিব ?

পিতা।—(আমার প্রতি চাহিয়া) তুমি কি জান ?

আমি।—না, আমি জানি না। তিনি প্রত্যহ গঙ্গাস্নানে আসিতেন; কিন্তু বিবাহের পরদিন হইতে আর আসেন না।

মামা।—দেখ মনোহর, (আমার পিতার নাম মনোহর), বোধ হয়, কোনও জুয়াচোরে জুয়াচুরী করিয়া ছেলেটার সহিত তাহার নাত্নীর বিবাহ দিয়াছে। ছেলেটা বড় সুন্দর কি না দেখিতে,—তাই।"

পিতা মাতুলকে ভাল জানিতেন, সেই জন্য কেবলমাত্র হাসিলেন; কিন্তু মাতুলানী অন্তরাল হইতে মামাকে নানা প্রকার তিরস্কার করিতেছিলেন। মাতুল বলিলেন, "দেখ মনোহর, তোমরা অকারণে গোল করিতেছ। আমি ঐ ছেলেটার দু'শ বিবাহ দিব। কুলীনের সন্তান, দেখিতে সুন্দর, বছর বছর প্রাইজ্ পাইতেছে, উহার বিবাহের ভাবনা কি ? আমি দু'শ বিবাহ দিয়া এইরূপ প্রতিবার পাঁচ হাজার টাকা করিয়া পণ লইয়া দুই লক্ষ টাকা রোজগার করিব। কেন অকারণে গোলযোগ করিতেছ ?" এই কথার পর আমার পিতা ও মাতা ঐ স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। এখন মাতুল ও মাতুলানীতে বচসা হইতে লাগিল।

এইরূপে আমার শুভবিবাহ সমাপ্ত হইল। দুই এক মাস ধরিয়া ঐ কথার আন্দোলন হইল বটে, কিন্তু তাহার পর উহার স্মৃতি পর্য্যন্ত লুপ্ত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।—সর্ব্বমঙ্গলার মন্দির।

লক্ষ্মী চঞ্চলা, সরস্বতী মুখরা—এ কথাটি বড় ঠিক। লক্ষ্মী বামুন কায়েত ত্যাগ করিয়া কখনও কখনও হাড়ী ডোমের ঘরে উঠেন, তাঁহার পাত্রাপাত্র-বোধ নাই। আজকাল দেখিতেছি, সরস্বতীরও পাত্রাপাত্র-বোধ নাই, নহিলে আমার ঘাড়ে চাপিবেন কেন ?

চঞ্চলা লক্ষ্মী আবার আমাদের ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমার বিবাহের চারি বৎসর পরে, একদিন পিতা একখানি পত্র পাইলেন যে, তাঁহার মাতুল ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি নিঃসন্তান থাকাতে আমার পিতাকে তাঁহার বিষয় উইল করিয়া দিয়া গিয়াছেন। পিতার মাতুল কলিকাতায় ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রভূত ধনসম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া ভাগীরথীর তীরে, তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান শ্রীনগর গ্রামে, রাজপুরীর ন্যায় অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছিলেন। প্রায় অশীতি বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহার মৃত্যু হইল। তৎপূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছিল। এই সংবাদ পাইয়া আমরা শ্রীনগর যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। মাতুল ও মাতুলানী বলিলেন, "আমরা এখানে থাকিয়া কি করিব?, আমাদের ত আর কেহ নাই। ঐ ছেলেটাই আমাদের সর্ব্বস্বধন, উহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না।" পিতা ও মাতা এই প্রস্তাবে বড় আনন্দিত হইলেন। সুতরাং ব্যবসায় একবারে উঠাইয়া দিয়া দ্রব্যাদি বিক্রয় করিলেন। আমার বয়ঃক্রম তখন অষ্টাদশ বৎসর। ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া Scholarship লইয়া নূতন বাসস্থানে চলিলাম। কলিকাতায় কি কৃষ্ণনগর কলেজে ভর্ত্তি হইয়া B. A. পরীক্ষা দিব, এইরূপ বন্দোবস্ত হইল।

একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বাহ্ণে আমরা শ্রীনগর দেখিতে পাইলাম। এলাহাবাদের রেল, ভাগীরথীর পশ্চিমপারে ও শ্রীনগর উহার পূর্ব্বপারে। সুতরাং নৌকাযোগে নদী পার হইতে হইল। আমরা নৌকা হইতে শ্রীনগর দেখিতে পাইলাম। নদীতীরে অসংখ্য শ্বেত অট্টালিকার শ্রেণী ও মন্দিরের চূড়া দেখিয়া বুঝিলাম যে, এই গ্রামে অনেক ধনাঢ্য লোকের বাস। পরে একটা চাঁদনীওয়ালা ঘাটে আমাদের নৌকা ভিড়িল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। রাস্তায় যাইতে যাইতে কাঁসর ঘণ্টা ও খোল করতালের শব্দ শুনিয়া মাতা ও মাতুলানী বড় আনন্দিত হইলেন। পরে আমরা আমাদের বাটীতে পঁহুছিলাম। বাটী দেখিয়া সকলে সন্তুষ্ট হইলেন। এইরূপে আমরা আমাদের শ্রীনগরের গৃহে প্রবেশ করিলাম।

দুঃখের কথা বলিব কি, এই শ্রীনগর গ্রামে আসিয়া আমার বড় অনিষ্ট ঘটিল। পড়াশুনা উৎসন্ন গেল, উহাতে মন একেবারেই ছিল না। খেলিতেও মন ছিল না; আহারেও মন ছিল না। আমার মনটা (যাহাকে বলে "heart)", অন্যত্র ছিল।

রামচরণ চক্রবর্ত্তী নামে এক জন ব্রাহ্মণ আমাদের বাটীর পার্শ্বে একটি বাটী ভাড়া লইয়া বাস করিতেন। তাঁহার কোথায় নিবাস, কোথা হইতে আসিয়া-

ছিলেন, কেহ জানিত না। তাঁহার পরিবারের মধ্যে তাঁহার স্ত্রী ও এক বালিকা কন্যা,—নাম গিরিজায়া। বালিকার বয়স দশ বৎসর। আমার পিতা ও মাতুলের সহিত রামচরণ বাবুর বিশেষ আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল। আমার মাতা ও মাতুলানীর সহিত তাঁহার স্ত্রীর সেইরূপ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। আমার মাতা তাঁহার মেয়েটিকে আপন কন্যার ন্যায় ভালবাসিতেন। সে সর্ব্বদা আমাদের বাড়ীর নিকটে থাকিত। আমার বড় অনুগত হইয়াছিল। আমার নিকট পড়িত; আমার পাতে খাইত; আমার সঙ্গে বেড়াইত; আমার কাযকর্ম্ম করিত।

একদিন বৈকালে আমাকে গিরিজায়া বলিল, "বাবু মহাশয়, (সে আমাকে এইরূপ সম্বোধন করিত) চলুন না, আজ সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরে আরতি দেখিয়া আসি।" আমি বালিকা গিরিজায়ার সহিত চলিলাম। সে কখনও দৌড়িয়া যাইতেছে, কখনও বা আসিয়া আমার হাত ধরিতেছে। সর্ব্বমঙ্গলার বাটীতে যখন উপস্থিত হইলাম, তখনও সন্ধ্যা হয় নাই; কিঞ্চিৎ বেলা আছে। সেখানে অনেকগুলি প্রাচীনা ব্রাহ্মণকন্যা ও অনেকগুলি বালিকা, আরতি দর্শন জন্য উপস্থিত ছিল। আমি প্রথমে দেবীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া এ দিক ও দিক চাহিলাম। নূতন লোক বলিয়া সকলেই আমাকে দেখিতেছিল। দুইটী সুসজ্জিতা সুন্দরী কিশোরী আমাকে দেখিয়া মুখ ঢাকিয়া প্রাচীনাদের পশ্চাতে সরিয়া বসিল। উভয়েরই পনর বৎসর বয়ঃক্রম হইবে, উভয়েই পরমাসুন্দরী। তন্মধ্যে এক জনের মুখ দেখিলাম—আর ভুলিলাম না। আমি প্রতিদিন গিরিজায়াকে লইয়া সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরে আরতি দেখিতে যাইতাম। ক্রমে ক্রমে ঐ দুইটি কিশোরীর লজ্জার অপনয়ন হইল। আমাকে দেখিলে আর তাহারা মুখাবরণ করিত না। অবশেষে আমার সহিত তাহাদের কথাবার্ত্তাও চলিল। উহাদের এক জনের প্রতি আমার অনুরাগ জন্মিল। এই অপ্সরোনিন্দিত সুন্দরীটী কে—পাঠক পাঠিকারা জানিতে উৎসুক হইয়া থাকিবেন।

ইনি আমাদের দেশের জমীদার পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত আদিত্যমোহন চৌধুরীর একমাত্র কন্যা। বাঙ্গালামুলুকে যে দশটা দিক্‌পাল আছে, তন্মধ্যে আদিত্যবাবুকে একটা দিক্‌পাল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাবুর বৈঠকখানায় দশটা হুঁকা হামে হাল চলিত। আর স্বয়ং বাবু মোসাহেববেষ্টিত মস্‌নদ উপরি বসিয়া সপ্তহস্ত-পরিমিত সট্‌কাতে সর্ব্বদা ধূমপান করিতেন। বাবুর দেউড়ীতে বিশ ত্রিশ জন সিপাহী গিস্‌গিস্ করিত। আস্তাবলে দশ বারটা ঘোড়া। হাতীশালায় দুই চারিটা হাতী থাকিত। আর তাঁহার সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরে প্রহরে প্রহরে নহবৎ বাজিত।

জমীদার-কন্যাকে মালিনী বলিয়া ডাকিত। কিন্তু তাহার নাম ছিল মণিমালিনী। দ্বিতীয়া কিশোরীটি আদিত্যবাবুর ভাগিনেয়ী, অর্থাৎ মালিনীর পিস্তুতো ভগিনী, তাহার নাম গৌরী। গৌরীর পিতা এক জন বড় জমীদার ছিলেন। যখন গৌরীর দশ বৎসর বয়ঃক্রম, তখন তাহার পিতামহ, পিতার উপর রাগ করিয়া, বিরাগী হইয়াছিলেন। গৌরীর পিতা তাঁহার অনুসন্ধানে দেশে দেশে ফিরিতেন। সেই জন্য বাটীতে অল্পদিন বাস করিতেন। আর গৌরী মাতৃহীনা হওয়াতে ও বাটীতে অন্য অভিভাবিকা না থাকাতে গৌরীকে আদিত্যবাবুর নিকট রাখিয়া, তিনি দেশে দেশে বেড়াইতেন এবং মধ্যে মধ্যে গৌরীকে দেখিতে আসিয়া শ্রীনগরে বাস করিতেন। সেই জন্য এই স্থানে একটি বাগানবাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

একদিন আরতির সময় মালিনী ও অনেকগুলি বালিকা মন্দিরে বসিয়া আছে, তাহাদের মধ্যে দুইটি বালিকা এক জন অপরকে গোলাপ বলিয়া ডাকিতেছে। গিরি জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা, তোমাদের দুইজনের নাম কি গোলাপ?" এক জন বলিল "না আমরা গোলাপ পাতাইয়াছি।"

গিরি আমার প্রতি চাহিয়া বলিল, "আমিও গোলাপ পাতাইব।" তন্মধ্যে পরী নামে একটী বালিকা বলিল, "আচ্ছা, মালিনী, তুমি কেন গিরির সঙ্গে গোলাপ পাতাও না।" মালিনী ভ্রুভঙ্গী করিল, কথাটা তার ভাল লাগিল না। আমি বুঝিলাম, মালিনী দৃপ্তা ঐশ্বর্য্যাভিমানিনী। এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় একটি প্রাচীনা মন্দিরের থামে ঠেস দিয়া জপের মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল, "মালিনীর সহিত গিরি গোলাপ পাতাইবে, সে কি কথা, সে কি সম্ভব?"

পরী। আমরা ছেলেয় ছেলেয় কথা কহিতেছি, তুমি কথা কও কেন গা?

প্রা। আ মর! ছুঁড়ীর স্পর্দ্ধা দেখ, কলির মেয়ে, না হ'বে কেন?

পরী। কলির মেয়ে তোমার কি করলে?

প্রা। সর্, ছুঁস্‌নে।

আর এক জন প্রাচীনা প্রথমোক্তা প্রাচীনার নিকট বসিয়া মালা ঘুরাইতে-ছিলেন তিনি বলিলেন, "ছুঁড়ী তোমায় ছুঁয়েছে না কি?"

প্রা। হাঁ, ছুয়েছে বই কি?

দ্বি প্রা। ও মা, কি হ'বে! আমিও যে ছোঁয়া পড়িলাম! আঃ, মর ছুঁড়ী, মর্‌তে আর জায়গা পাও নি, ঠাকুর দেবতার মন্দিরে মর্‌তে এয়েছ? যা ছুঁড়ী, ভাগাড়ে মর্‌গে যা। হাঁ গা, ও ছুঁড়ী কাদের মেয়ে?

প্র প্রা। কি জানি-কাদের মেয়ে। এখানে যমের বাড়ী যেতে এয়েছে। আবার এই রাত্রে নাইতে হ'ল। (পরীর প্রতি , তুই শীগ্‌গির যমের বাড়ী যা'।

গৌরী।—তুমি কবে যা'বে গা? তোমার কি সময় হয় নাই?

গৌরীর কথা শুনিবামাত্র প্রাচীনা কথঞ্চিৎ শান্ত হইল; কেন না গৌরী, আদিত্য বাবুর ভাগিনেয়ী। প্রাচীনা অতিমৃদুস্বরে বলিল, "মা, স্পর্দ্ধার কথা দেখ, আমাদের জমীদারের কন্যা মালিনীর সঙ্গে এক জন সামান্য লোকের মেয়ের গোলাপ পাতাইবার পরামর্শ দেয়। তাইতে আমার রাগ হ'ল।

গৌ।—তা যেন হ'ল। ওকে যমের বাড়ী পাঠাও কেন?

প্রা।—ও আমাদের ছুঁলে কেন, মা?

গৌ।—হাঁ গা! ব্রাহ্মণের মেয়ে ছুঁলে কি নাইতে হয়?

প্রা।—হাঁ, পরী শতেক জাত ছুঁয়ে কত কি মাড়ি'য়ে দেবমন্দিরে এয়েছে। ওকে ছুঁলে নাইতে হ'বে না ত কি?

পরী।—সাহস পাইয়া বলিল, "আমি মন্দিরে এসেছি, তা তোর কিরে

প্রা।—দেখ্‌লে! স্পর্দ্ধা দেখ্‌লে, মা?

এই প্রকার প্রাচীনা ও বালিকার বাগ্‌বিতণ্ডায় মন্দিরমধ্যে একটা গণ্ডগোল উঠিল। মালিনী এই গণ্ডগোলে যোগদান করে নাই, স্থিরা ও ধীরা হইয়া এক স্থানে বসিয়াছিল। গিরিজায়া গোলাপ পাতাইতে না পারিয়া হতশ্বাস হইয়া আমার কাছে সরিয়া বসিল। পরে প্রাচীনাদ্বয় "যাই, এইরাত্রে আবার নাইতে হ'ল, বলিয়া উঠিল। আমিও গিরিজায়ার সহিত উঠিলাম। পথে প্রাচীনাদিগকে দেখিয়া, গিরিজায়া ঘাড় বাঁকাইয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "মর, মর, শিগ্‌গীর মর, শিগ্‌গীর মর।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।—অঙ্গুরী-দর্শন।

শ্রীনগরে আসিয়া আমি একটা বাবু হইয়া পড়িলাম। পাঠক পাঠিকাগণ ভুল করিবেন না, আফিসের সাহেবেরা যে প্রিয়বাক্য দ্বারা কেরাণীদিগকে সম্বোধন করিয়া থাকেন, আমি সে বাবু হই নাই। অথবা বঙ্গকুলবধূগণ সঙ্গিনীদিগের নিকট স্বামিপ্রসঙ্গে যে আদরের বাক্যে "আমার বাবু" বলিয়া স্বামীকে অভিহিত করিয়া থাকেন, তাহাও হই নাই। কখনও যে হইব, সে আশাও নাই। সর্ব্বদা সুসজ্জিত যুবকদিগকে যে অভিধানে সকলে সম্বোধন করিয়া থাকে, আমি তাহাই

হইয়াছি। আমার বড় অপরাধ ছিল না। এখন আমি ধনাঢ্য ব্যক্তির পুত্র—একমাত্র পুত্র; আবার মামা ও মামীর সন্তানের অপেক্ষাও আদরের ছিলাম। সুতরাং আমার নানারকমের কাপড়চোপড়, জুতা ও রকমারি হীরার আঙটী, সোনার বোতাম ইত্যাদি হইয়াছিল। সর্ব্বদা ঐ সকল না ব্যবহার করিলে ধমক খাইতে হইত।

একদিন মাতুল বলিলেন, "ওহে মনোহর! ছেলেটা চামড়ার জুতা পায়ে দিয়া খালি-মাথায় বেড়াইতে যায়, আমার বড় কষ্ট হয়। তুমি উহার জন্য জরীর জুতা ও জরীর পাগড়ী অথবা জরীরটুপী আনাইয়া দাও। তাই পরিয়া বেড়াইতে যাইবে—যেরূপ পোষাকে পশ্চিমে বড়মানুষের ছেলেরা বেড়াইতে যায়।" পিতা হাসিয়া বলিলেন "এ দেশে বাঙ্গালীর ছেলের ধুতির সহিত টুপী ও পাগড়ী ব্যবহার করা চলিত নয়। ওরূপ বেশ করিলে হাস্যাস্পদ হইবে।"

আর একদিবস আমার মামা মাতাকে বলিলেন, "পারি, (আমার মাতার নাম পার্ব্বতী ছিল) ছেলেটার কান বিঁধিয়ে দিস ত। পশ্চিমে বড়মানুষের ছেলেদের যেমন কানে মতির মাকৃড়ি ঝোলে, আমি ঐ ছেলেটার দুই কানে তেমনই গোটাকত মতির মাকৃড়ি পরাইয়া দিব।" মাতা হাসিয়া বলিলেন "দাদা! অত বড় ছেলের কানে মাকৃড়ি দিলে সকলে হাস্‌বে যে।" "তুই ত সব জানিস্!" বলিয়া মামা চলিয়া গেলেন।

আর একদিন জমীদার আদিত্যমোহন বাবু গাড়ী চড়িয়া বায়ুসেবনে যাইতেছিলেন, তাঁহার চোখে সোনার চশ্‌মা ছিল। মামা উহা দেখিয়া বলিলেন, "দেখ মনোহর! ছেলেটার জন্য একখানা ঐ রকম জুড়িগাড়ী কেনো।" পিতা বলিলেন, "হাঁ, কিন্‌ব বই কি, শীঘ্র কিন্‌ব।" মামা বলিলেন, "আর দেখ, ঐ জমীদারের চোখে যে সোনার চশমা দেখ্‌লে, ঠিক ঐ রকম একখানা চশমা ছেলেটাকে কিনিয়া দাও।" পিতা বলিলেন, "আচ্ছা তাহাই হইবে।" আমার মাতুলানী ঐ প্রস্তাব শুনিয়া আমার মামাকে বলিলেন, "বালাই, কচি ছেলে, চশমা চোখে দিতে যা'বে কেন?" মাতুল বলিলেন, "বটে! চশমা বাবুদের অলঙ্কার, ঘরের ভিতর থাকো, কিছু ত জান না।

মামী।—(করযোড়ে) রক্ষা কর, আর বুদ্ধির পরিচয় দিও না।

তদুত্তরে মামা কি বলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু মামী, "এস খাবার প্রস্তুত" বলিয়া হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন। মামাকে আর কিছু বলিতে দিলেন না।

একদিন কোনও আত্মীয়ের বাটীতে পিতার, মামার ও আমার মধ্যাহ্ন-জলপানের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। মা ও মামী আমাকে ভালরূপ বেশভূষা করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। ফিরিয়া আসিয়া কাপড় ইত্যাদি ত্যাগ করিলাম, কিন্তু আঙটীগুলি হাতে রহিল। তন্মধ্যে বিবাহের সুন্দর পালিশ করা আঙটীটিও হাতে ছিল। বৈকালে গিরিজায়ার সহিত আমি সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরে যাইলাম। সেখানে দেখিলাম, বালিকারা দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। প্রাচীনারা কিঞ্চিৎ অন্তরে বসিয়া মুখোমুখী করিয়া চুপিচুপি কথা কহিতেছিল। বোধ হয় পরনিন্দা করিতেছিল, নহিলে চুপি চুপি কথা কেন? আমি বসিলে পরী বলিল, "তোমরা কি আজ গোঁসাই-বাড়ী নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছিলে?"

আমি। হাঁ, তুমি কেমন ক'রে জান্‌লে?

পরী। আমরাও গিয়াছিলাম, তোমার বাবাকে আজ দেখেছি,—বেশ মানুষ!

আমাদের এই কথোপকথন হইতেছিল বটে, কিন্তু আমি মধ্যে মধ্যে গৌরী ও মালিনীর প্রতি লক্ষ্য করিতেছিলাম। আমার স্পষ্ট বোধ হইল যে, গৌরী আমার হাতের আঙটীর প্রতি চাহিতেছে, এবং আমাকে দেখিতেছে। কিছুক্ষণ পরে আমার বিবাহের আঙটীটি দেখিয়া আমাকে বলিল, "ঐ আঙটিটি দেখি?" আমি উহা খুলিয়া তাহার হাতে দিলাম। সে উহা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল, এবং আমার মুখপ্রতি চাহিতে লাগিল। মালিনী গৌরীর হাত হইতে উহা লইয়া এ পিঠ ও পিঠ দেখিয়া ফেরত দিল। গৌরী আমায় বলিল, "বড় সুন্দর পালিস, এ আঙটী তুমি কোথায় পাইলে?"

আমি। কাশীতে পাইয়াছি।

গৌ। (আমার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া) ঠিক উত্তর হইল না। তোমাকে ইহা কে দিয়াছে?

আ। একটী বালিকা আমাকে দিয়াছে।

গৌ। সে তোমার কে?

আ। (ইতস্ততঃ করিয়া) কে আবার হবে? কেউ না।

গৌ। তবে সে তোমাকে এ আঙটি দিলে কেন?

আ। আমি তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম।

গৌ। বাঙ্গালা ভাষায় কথা কও না। কি হইতে উদ্ধার করিয়াছিলে?

আ। বিপদ হইতে।

গৌ। কি বিপদ, শুনি ?

আ। সকল কথা কি বলা যায় ?

গৌ। কেন বলা যায় না ?

আ। না, বলা যায় না।

গৌ। তবে কি তুমি সে মেয়েটির আঙ্গুল হইতে ইহা চুরি করিয়াছ ?

আ। (হাসিয়া) না, না, না, চুরি করি নাই, সে নিজে আমার অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিয়াছে।

গৌ। তা'র এত কি গরজ্ যে তোমার হাতে পরাইয়া দেয় ?

আ। বিশেষ গরজ্ ছিল, তাই নিজে পরাইয়া দিয়াছে।

গৌ। সে ছুঁড়ীর তখন বয়স কত ?

আ। ছুঁড়ী কেন ? মেয়েটী বলিতে পার না ?

গৌ। আচ্ছা, আচ্ছা, তখন সে মেয়েটির বয়স কত ?

আ। দশ এগার বৎসর।

গৌ। এখন কত হইবে ?

আ। চৌদ্দ কি পনর বৎসর।

গৌ। আর কি তোমার সহিত তা'র দেখা হয় নাই ?

আ। না।

গৌ। আহা ! কি দুঃখ।

আ। আমার দুঃখ আমারই আছে, তোমার তাতে কি, আমার আঙটি দাও।

আ। আমি দিব না।

আ। বড়মানুষের মেয়েদের বুঝি এই ব্যবসা ? পরের জিনিস কাড়িয়া লয় ?

গৌ। ইহার পরিবর্ত্তে আমি আর একটা আঙ্‌টি দিচ্চি।

মালিনী বলিল, "না, উহার আঙ্‌টি উহাকে ফেরত দাও।" এই সময় প্রাচীনারা গৌরীকে ডাকাতে সে আঙ্‌টি ফেরত দিয়া উঠিয়া গেল। তখন মালিনী আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "সে মেয়েটি কি কারণে তোমার আঙ্গুলে আঙ্‌টি পরাইয়া দেয়।"

আ। সে অনেক কথা, গোপনীয় কথা, আমি তোমাকে বিশ্বাস করিয়া বলিতে পারি, কিন্তু তুমি নাই বা উহা শুনলে।

শ্য। না। তবে আমি শুনতে চাহি না। আমি মনে করিয়াছিলাম, সে বুঝি তোমাকে বিবাহ করিয়াছিল।

আ। তুমি আমাকে বিবাহ কর্‌বে?

মা। (হাসিয়া) কেন? আমাকে বিয়ে কর্‌বার সাধ কেন?

আ। তাহা তোমাকে বুঝাইয়া বলিতে আমার লজ্জা করে।

মা। (মুখে কাপড় ঢাকিয়া) তবে কর্‌বো।

এই বলিয়া উঠিয়া গেল। একেই ত Courtship বলে। আরতি ভাঙ্গিবার পর যখন বাটী ফিরিয়া আসি, তখন একটা থামের আড়াল হইতে গৌরী জিজ্ঞাসা করিল, "যে মেয়েটী তোমাকে আঙ্‌টি পরাইয়া দিয়াছিল, তাহাকে তুমি ভালবাস?" আমি বলিলাম, "সে অনেক দিনের কথা, তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছি।" "তবে তুমি বাগ্‌দিনী গিরিজায়ার যোগ্য, তাহাকে বিবাহ করগে।" এই বলিয়া গৌরী অন্তর্হিত হইল। আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, গিরি আমার সহিত বেড়াইলে গৌরী বড় বিরক্ত হইত।

সকল সুখের সীমা আছে, কিন্তু অদ্য আমি যে সুখানুভব করিয়াছিলাম, তাহার সীমা ছিল না। মালিনী আমাকে বিবাহ করিবে, এই আনন্দে আর বাটী ফিরিলাম না। গঙ্গাতীরে নির্জ্জনে গিয়া বসিলাম। রাত্রি একপ্রহর হইয়াছে। সম্মুখে কলনাদিনী ভাগীরথী কলকলনাদে সাগরাভিমুখে ছুটিতেছে। পশ্চাতে একটা বকুল বৃক্ষের অন্তরালে রোহিণীপতি ধীরে ধীরে রূপার থালার ন্যায় উদিত হইতেছিলেন। আহা! আজ বসুন্ধরা কি সুন্দরী! আজ চাঁদের কি রূপ! যেন গাছের ভিতর হইতে বড় বড় হীরকখণ্ড জ্বলিতেছে! আর ঐ বকুলডালে বসিয়া একটা কোকিল—না, আর না, পাঠকপাঠিকাগণ গালি দিবেন, বলিবেন, ঢের হইয়াছে—আবার তোমার আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে কোকিলের কুহুরব কেন?—চাঁদের আলোক, কোকিলের কুহুরব, বসন্তের পবন না লিখিলে কি তোমার আনন্দপ্রকাশ হয় না? হবে না কেন? হয় বৈ কি? তবে চির-প্রচলিত প্রথাটা অবলম্বন না করিলে, আমার এই দুঃখের কাহিনী পড়িবে কে?

অধিক রাত্রিতে বাড়ী ফিরিলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।—জমীদার আদিত্যমোহন বাবু।

আদিত্যবাবু যে একজন প্রকাণ্ড জমীদার ছিলেন, তাহার পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি। এ ছাড়া তিনি উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ও মহাকুলীন ছিলেন। এই

ত্র্যহস্পর্শযোগে আদিত্যবাবু অদ্বিতীয় লোক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় যাইয়া বড় বড় Speech দিতেন, সংবাদপত্রে উহা লইয়া হুলস্থূল পড়িত। আমাদের দেশে একবার একটী সাহিত্য-সম্মিলনী হয়, তাহাতে কত দেশ দেশান্তর হইতে বড় বড় লোক উপস্থিত হন। আদিত্যমোহন বাবু সভাপতির আসনগ্রহণ করিয়া যে কি একটা প্রকাণ্ড বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই বটে, কিন্তু চারি দিক হইতে করতালিধ্বনি শুনিয়া বুঝিলাম যে, আমাদের জমীদার বাবু এক অতি আশ্চর্য্য বক্তৃতা করিয়াছিলেন। আদিত্যবাবু অধিকাংশ সময় কলিকাতায় বাস করিতেন। সেখানে সাহিত্য-সম্প্রদায়ের তিনি এক জন প্রধান নেতা। আমাদের গ্রামে বালক ও বালিকাদিগের জন্য দুইটি পৃথক্ পৃথক্ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, কলিকাতায় থাকিয়া বড় বড় সাহেবদিগকে সর্ব্বদা খানা দিতেন—শুনিয়াছি, তিনি নাকি শীঘ্র রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইবেন। যখন দেশে থাকিতেন, তখন এক একদিন সন্ধ্যার সময় গাড়ী চড়িয়া বায়ুসেবনে যাইতেন। শূদ্রেরা নতশিরে বাবুকে অভিবাদন করিত, ব্রাহ্মণেরা হস্ত তুলিয়া নমস্কার করিতেন, আদিত্যবাবু কেবলমাত্র ঈষৎ মাথা দুলাইয়া ব্রাহ্মণদের অভিবাদন গ্রহণ করিতেন, হাত তুলিতেন না—ইহা বোধ হয় উচ্চশিক্ষার ফল। আদিত্যবাবুর পিতা জীবিত, কিন্তু তিনি জমীদারী ইত্যাদি তাঁহার বংশধরকে দান করিয়া কোন তীর্থে বাস করিতেন—সে কোন তীর্থ কেহ জানিত না। তিনি আদিত্যবাবুকে তাঁহার সংবাদ দিতেন না, বা তাঁহার কোনও সংবাদ লইতেন না, অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়াছিলেন। আদিত্যবাবু তাঁহার কন্যা ও ভাগিনেয়ীর বিবাহের জন্য দেশে দেশে ঘটক দ্বারা পাত্র অনুসন্ধান করিতেন; তাঁহার পণ ছিল যে, পাত্রদিগের তাঁহার ন্যায় ত্র্যহস্পর্শযোগ থাকিবে; অর্থাৎ ধনী, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত এবং মহাকুলীন হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কুলীনশ্রেষ্ঠ পাত্রমাত্রেরই মৃত্তিকানির্ম্মিত ঘর, লেখাপড়া পাঠশালায় খতম; সুতরাং আদিত্যবাবুকে এই ধনুর্ভঙ্গ পণ ছাড়িয়া দিতে হইল। কিন্তু পিতার জীবিতাবস্থাতে তাঁহাদের কৌলীন্যমর্য্যাদা ধ্বংস করিতে পারেন না; সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর অপেক্ষায় রহিলেন। সেইজন্য মালিনী ও গৌরী পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত অনূঢ়াবস্থায় ছিল। আদিত্যবাবু বালিকাদিগের জন্য গ্রামে একটী ইংরাজী ও বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নিজকন্যা ও ভাগিনেয়ীর শিক্ষার জন্য অন্যরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। জেনানা-মিশনের এক জন বিবি বাটীতে আসিয়া তাহাদের

ইংরাজি শিখাইত। আর এক জন প্রাচীন পণ্ডিত আসিয়া সংস্কৃত ও বাঙ্গালা শিখাইত। মালিনী ও গৌরী অতীত-শৈশব হইলেও আদিত্যবাবু তাহাদের অবরোধে না রাখিয়া কথঞ্চিৎ স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাহারা দাসদাসী সমভিব্যাহারে সর্ব্বমঙ্গলার বাটীতে প্রতিদিন আরতি দেখিতে যাইত।

কিছু দিন পরে শুনিলাম, নিকটস্থ এক জন জমীদারপুত্রের সহিত মালিনীর বিবাহ হইবে। ছেলেটী সুশিক্ষিত, আর ধনে মানে গৌরবান্বিত বটে, কিন্তু কুলে অপকৃষ্ট। গোপনে বিবাহ দিবেন, সর্ব্বমঙ্গলার-মন্দিরে বিবাহ হইবে—রটনা অদ্ভুত বটে, কিন্তু আমাদের দেশে একটা কিংবদন্তী ছিল যে, গোপনে সর্ব্বমঙ্গলার-মন্দিরে বিবাহ হইলে দাম্পত্যসুখ অনিবার্য্য। আমি এ কথা বিশ্বাস করিলাম না; সুতরাং মনে বড় কষ্ট হয় নাই। আমার আশা যে, আমি মালিনীর স্বামী হইব। এ আশার কোনও সূচনা ছিল না বটে, কিন্তু সেই ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপিনী আশার মোহিনীশক্তিতে অন্ধ হইয়াছিলাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।—আমার বিবাহ-প্রস্তাব।

মালিনীর বিবাহের কথা সকলেই কহিতে লাগিল, কিন্তু চুপি চুপি কহিত। দিন দিন জনরব বড় প্রবল হইল। আমি বড় কাতর হইলাম। আমার অবস্থা দেখিয়া পিতামাতার মনে একটা সন্দেহ হইল—কি সন্দেহ হইল, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। একদিন মাতা বলিলেন, "বিরজা, তোমার কি অসুখ হইয়াছে?" (আমার নাম বিরজাকুমার।)

আ। কৈ? মা, আমার ত কোনও অসুখ হয় নাই।

মা। তবে, পড়াশুনা কর না কেন?

আ। আমি ত খুব পড়াশুনা করি মা, দিবারাত্র পড়ি।

মা। আমার মাথা পড়, মুণ্ড পড়, দিবারাত্র শুইয়া থাক। তুমি খুব মন দিয়া পড়, তোমার শীঘ্র বিয়ে দিব।

এই বলিয়া মাতা উঠিয়া গেলেন। কিন্তু আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কাহার সহিত বিবাহ? আমি কি আর কাহাকেও বিবাহ করিতে পারি? কখনও না। সেই একজনের রূপ আমার হৃদয়ে অঙ্কিত, হাড়ে হাড়ে অঙ্কিত। আমি কি কখনও তাহাকে ভুলিতে পারিব?

পরে অনুসন্ধানে জানিলাম যে, গিরির সহিত বিবাহ হইবে। শুনিয়া আমার মনে কি একটা বিপ্লব উপস্থিত হইল। ক্রমে বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী হইল।

লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া মাতার পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলাম, বলিলাম, "আমি গিরিকে বিবাহ করিব না।" মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?" আমি উত্তরে কেবল কাঁদিতে লাগিলাম। মাতা বিরক্ত হইলেন, রাগিয়া উঠিলেন, গালি দিলেন, শেষে পিতাকে বলিয়া দিলেন। পিতা অতিশয় বিরক্ত হইয়া গালি ও ধমক দিলেন। উপায় নাই, নিষ্কৃতি নাই, বিবাহ নিশ্চিত। ২রা ফাল্গুন বিবাহ-দিন স্থির হইল। গোপনে সর্ব্বমঙ্গলার বাটীতে বিবাহ হইবে।

কৈশোরের বিবাহে যে কি আনন্দ, তাহা আমি জানি। আমার সমবয়স্ক বালকগণ বিবাহের নাম-উল্লেখমাত্র আনন্দে চঞ্চল হয়, তার পর বিবাহের কয়েক দিবস অবিশ্রান্ত আনন্দের স্রোত বহিতে থাকে। যে বালক সমাজে লাঞ্ছিত, যাহাকে দেখিবামাত্র সকলে বেত লইয়া তাড়া করে, তাহারও জীবনের মধ্যে এই এক দিন! সেও এই সময়ে আদর যত্ন ও সম্মান পায় ও সর্ব্বজনের লক্ষ্য হয়; কিন্তু আমার আনন্দ হওয়া দূরে থাকুক, আমার জীবন অন্ধকারময় হইল। যে আলোক ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ দেখাইয়া দেয়, তাহা নির্ব্বাপিত হইল, যে উৎসাহে মনুষ্যের চরিত্র উন্নত ও গঠিত হয় তাহার অবসান হইল, আশা ভরসা সকলই লোপ পাইল, স্ফুটিনোন্মুখ যৌবনে বজ্রাঘাত হইল। কোনও প্রসিদ্ধ উপন্যাস-লেখক বলিয়া গিয়াছেন যে, বাল্যপ্রণয়ে কোনও অভিসম্পাত আছে। আমাতেই কি উহা প্রমাণীকৃত হইল? হা কৃষ্ণ!

নবম পরিচ্ছেদ।—গৌরী।

তখন জানিতাম না যে, মনুষ্যজীবনের ঘটনা-পরম্পরা এক অপূর্ব্ব নিয়মের অধীন। মালিনী ও গৌরী উভয়কে এক সময়ে দেখিয়া আমার যে মালিনীর প্রতি অনুরাগ জন্মিল, তাহা সেই নিয়মের অধীন। উভয়েই সুন্দরী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, উভয়েরই স্ফুটিতোন্মুখযৌবনা, তবে কেন? মালিনীর প্রতি অনুরাগ কেন? তাহাও সেই নিয়মের অধীন। তখন উহা বুঝিতাম না, এখন বুঝিয়াছি বটে, কিন্তু শান্তি কি পাইয়াছি? এ পর্য্যন্ত আশাতে জীবিত ছিলাম, এখন নৈরাশ্যে প্রস্তরবৎ হইয়াছি। সর্ব্বদাই সর্ব্বমঙ্গলার বাটীর দিকে কিসে আমায় টানিত, টানিত বটে, কিন্তু যাইতাম না। সে কি মালিনীর প্রতি অবিহিত অনুরাগ প্রশমিত করিবার জন্য?—তাহা নহে, একাকী যাইতে কুণ্ঠিত হইতাম। সঙ্গিনী গিরিজায়া বিবাহের কথা উল্লেখমাত্র আমাদের গৃহ ত্যাগ করিয়াছিল। কৈশোরের অনুরাগের সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা জন্মে, সুতরাং যাইতে কুণ্ঠিত হইতাম। একদিন সন্ধ্যার সময়ে

মনের আবেগে সর্ব্বমঙ্গলার-মন্দিরে উপস্থিত হইতাম। সেখানে অনেকগুলি বালিকায় বেষ্টিত হইয়া গৌরী বসিয়া আছে, কিন্তু মালিনী নাই। গৌরী রূপে আলো করিয়া বসিয়া আছে, আমাকে দেখিয়া মাথায় ঈষৎ কাপড় টানিল, একটু হাসিল, চক্ষের ইঙ্গিতে বোধ হয় বসিতে বলিল। গৌরী বড় দুষ্ট। আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার সেই অন্ধের নড়িটী আজ কোথায়?" আমি বুঝিয়া উত্তর করিলাম, "কে? গিরিজায়া?"

গৌ। (মুখ ফিরাইয়া) কে জানে—নামটাম অত মনে নাই।

আ। গিরিজায়াকে আজ আনি নাই।

গৌ। কেন? এখন নড়ির আবশ্যক হয় না? চোখ ফুটেছে নাকি?

আ। হাঁ।

গৌ। কিসে চোখ ফুট্‌ল? প্রতিদিন সর্ব্বমঙ্গলাকে দর্শন করে' বুঝি?

আ। হাঁ।

মাথামুণ্ড কি উত্তর দিব। কি কারণে গিরি আসে নাই, তাহা ত বলিতে পারি না। সুতরাং হাঁ না উত্তর দিতে লাগিলাম।

এই প্রকার কথাবার্ত্তা আমার ভাল না লাগাতে, এবং যাহাকে দেখিতে আসিয়াছিলাম, তাহাকে দেখিতে না পাওয়াতে আমি উঠিলাম। গৌরী বলিল, "কি বলিলাম যে, রাগ হইল? বস, বস।" আবার বসিলাম।

গৌরী বলিল, "গিরিজায়া তোমার কে হয়?"

আ। কেহ নহে।

গৌ। ও অদ্ভুত রত্ন কোথায় কুড়াইয়া পাইলে?

আ। এই গ্রামে, আমাদের বাটীর নিকট।

গৌ। ওকে কি বিয়ে কর্‌বে নাকি?

আ। করিই যদি, তা'তে কি?

গৌ। ও মা! ও মা! অত রাগ কেন? তুমি বাঁদর বিড়াল পোষ না কেন, আমাদের কি তাতে এসে যায়।

আ। গিরিজায়া কি বাঁদর বিড়ালের মধ্যে?

পশ্চাৎ হইতে অতি মধুরকণ্ঠে কে বলিল, "যদি গিরিজায়াকে বিয়ে কর, তবে একটা ডুগ্‌ডুগি কিন্‌তে হ'বে।" আমি মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম যে, পিছনে মনোমোহিনী সুন্দরী দাঁড়াইয়া মৃদুমধুর হাসিতে হাসিতে মাথা দুলাইয়া বলিতেছে, "একটা ডুগডুগি কিন্‌তে হবে।"

উহাকে দেখিবামাত্র আমার শরীর পুলকিত হইল, অনিমেষলোচনে তাহাকে দেখিতে লাগিলাম। মালিনী আস্তে আস্তে গিয়া বসিল, আস্তে আস্তে মৃদুমধুর হাসিতে হাসিতে আমার প্রতি চাহিয়া বলিল, "কি হয়েছে?"

পরী। উনি গিন্নিকে বিবাহ করিবেন, সেই কথা হইতেছে।

মা। সত্য নাকি?

আ। উঁহারাই বলিতেছেন, আমি কিছু বলি নাই।

ইতিমধ্যে একজন প্রাচীনা মালিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা! তোমরা দুই বোনে নাকি কলিকাতায় যাবে?

মা। হাঁ।

প্রা। কবে যাবে?

মা। এখনো দিন স্থির হয় নাই।

গৌরী আমাকে বলিল, "তুমি আমাদের সঙ্গে চল না কেন। তোমার গিরিকে সঙ্গে লইয়া চল।"

আ। কেন? আমরা তোমার সঙ্গে যা'ব কেন?

গৌ। বেশ ত, চল না। কলিকাতায় নাকি "জু" বলে একটা বড় বাগান আছে, সেখানে তোমার মতন আর তোমার গিরির মতন অনেক আছে। দেশ দেশান্তর হইতে কত লোক তাহাদিগকে দেখিতে আসে, তোমাকে ও তোমার গিরিকে দেখিতে আসিবে। যাবে?

আমি বুঝিলাম, গৌরী আমাকে জানোয়ার ব'লে গাল দিল। গৌরী কি মুখরা, কি দুষ্ট! পনর বৎসরের মেয়ে হয়ে—আমি এই যুবাপুরুষ—আমি যুবা-পুরুষ ত বটে? আঠারো বৎসর বয়সের ছেলে কি যুবাপুরুষ নহে?—আমার সহিত বিদ্রূপ করে! যাহা হউক, দুষ্টা হউক আর মুখরা হউক, হাসি-হাসি মুখে গৌরী যে বিদ্রূপ করিত, তাহা বড় মিষ্ট লাগিত। তাহার চক্ষে হাসি, ঠোঁটে হাসি, অঙ্গচালনাতেও হাসি। যদি মালিনীকে না দেখিতাম, বুঝি এ মুখরা সুন্দরীতে চিত্ত হারাইতাম।

আমি উত্তর করিলাম, "আমাদিগকে দেখিলে কিছু আশ্চর্য্য দেখিবে না, তোমাতে আশ্চর্য্য জিনিস আছে, তোমাকে একবার দেখিলে আবার দেখিতে আসিবে, প্রতিদিন আসিবে; তোমার রূপ আছে, তাহা দেখিবে; হাসি আছে, তাহা দেখিবে; কোঁকড়া কোঁকড়া চুল দুলাইয়া কথা কহ, তাহা দেখিবে, আমাতে কি আছে যে দেখিতে আসিবে?" এবার মালিনী উত্তর দিল, "গৌরীকে নূতন

জিনিস দেখ্‌বে বটে, কিন্তু তোমাতে তাহারা গাছের উপর মধ্যে মধ্যে যাহা দেখে থাকে, তাই দেখ্‌বে।"

মন্দ নয়—গৌরী আমায় জানোয়ার বলিল, আর মালিনী আমায় বানর বলিল। যে মালিনী কখনও কাহাকেও বিদ্রূপ করে নাই, সেই মালিনী আমায় বানর বলিল। বুঝিলাম, গৌরীর একটু রূপের প্রশংসাতে মালিনীর রাগ হইয়াছে। আমি শুনিয়াছিলাম, স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকের রূপের প্রশংসা শুনিলে হিংসাতে রাগ করে। পনর বৎসরের মেয়েদেরও কি তাই—ছি! বড় হিংসুকে জাত!

ইতিমধ্যে আরতি আরম্ভ হইল। সকলেই উঠিয়া গললগ্নীকৃতবাসে এবং করযোড়ে দাঁড়াইয়া সেই মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। মন্দিরাভ্যন্তরে এবং বাহিরে আলোকের উজ্জ্বলতায় ও নানাপ্রকার বাদ্যের কোলাহলে এবং ভক্তদিগের "জয় মা! বিশ্বজননি! দুর্গতিনাশিনি!" ইত্যাদি চীৎকারে আমার শরীর কণ্টকিত হইল। মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, সেই বিশ্বজননী বা বিশ্বপিতা এই মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী প্রতিমার অভ্যন্তরে আবির্ভূত হইয়াছেন। আমিও হৃদয় ভরিয়া ডাকিতে লাগিলাম, "সর্ব্বমঙ্গলমাঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে" ইত্যাদি। আরতি শেষ হইলে সকলে চলিয়া গেল। আমিও উঠিলাম।

দশম পরিচ্ছেদ।—রামচরণ চক্রবর্ত্তী।

মনের চাঞ্চল্যহেতু বাটী ফিরিলাম না; জাহ্নবীতটে উপস্থিত হইলাম। অন্ধকার হইয়াছে। নদীর বিশাল হৃদয় তিমিরাবৃত হইয়াছে, আকাশে নক্ষত্রগণ একটী একটী ফুটিতেছে, আর জাহ্নবীজলে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। সন্ধ্যা-সমাগমে নৈশ সমীরণ কিঞ্চিৎ খরতরবেগে বহিতেছে, মাঝিরা রাত্রে বিশ্রামের জন্য নৌকা সকল তীরলগ্ন করিতেছে। এই শোভা দেখিয়া সকল ভুলিয়া গেলাম; কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্য। আবার আমার সেই দারুণ মনঃপীড়া আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি বাটীতে ফিরিলাম।

কখনও কখনও দারুণ মানসিক যন্ত্রণায় মনুষ্য নিদ্রাভিভূত হয়, ঐ রাত্রে আমার তাহাই হইল। অজ্ঞানাভিভূত হইয়া ঘুমাইলাম, কিছুক্ষণ পরে নিদ্রা ভাঙ্গিল, বোধ হইল, একটা শব্দতে নিদ্রা ভাঙ্গিল, শয্যাত্যাগ করিয়া দক্ষিণদিকের জানালায় গিয়া দাঁড়াইলাম। বুঝিলাম, রজনী গভীরা, দ্বিতীয় প্রহর, চারি দিক অন্ধকারময় নিকটে একটী আমবাগান ছিল; সেই দিকে চাহিলাম—অন্ধকার, রাজপথের দিকে চাহিলাম—অন্ধকার, জনহীন, শব্দহীন। উপরে চাহিলাম, দেখিলাম,

নীলাকাশে কোটী কোটী নক্ষত্র অন্ধকারে আমার কষ্টে হাসিতেছে। দূরপ্রান্তে একখানি ক্ষুদ্র কালমেঘ অন্ধকারে উঁকি মারিতেছে। পৃথিবী অন্ধকার, আমার জীবনের ন্যায় অন্ধকার, যে দিকে দেখি, সেই দিকে আঁধার, জনহীন, শব্দহীন।

আমি পূর্ব্বোক্ত শব্দানুসরণে উত্তরদিকের জানালায় গিয়া দাঁড়াইলাম। নীরবে, নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে অন্ধকারে দেখিলাম যে, ৫।৬ জন লোক আমাদের বাটীর উপরের ছাদে উঠিতে চেষ্টা করিতেছে। আমার ঘরের পশ্চিমের ছাদ খোলা অর্থাৎ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। উহারা একখানা মই লাগাইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। তন্মধ্যে এক জনকে চিনিলাম, স্পষ্ট চিনিতে পারিলাম, কিন্তু—কিন্তু চিনিয়া আমার অঙ্গ অবশ হইল, পা কাঁপিতে লাগিল; দ্রুত যাইয়া যে পিতাকে উঠাইব, সে ক্ষমতা রহিল না। বাটীতে ডাকাইত আসিয়াছে, সর্ব্বস্ব লইয়া যাইবে, এই আশঙ্কায় শরীরে বল পাইলাম, পিতাকে গিয়া জানাইলাম। তিনি আমার সহিত আসিয়া ঐ জানালায় দাঁড়াইয়া দেখিলেন। আমি তাঁহাকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে জিজ্ঞাসা করিলাম, "উহাকে চিনিতে পারেন?" পিতা বলিলেন, "না।" আমি বলিলাম "আমার ভাবী শ্বশুর রামচরণ চক্রবর্ত্তী।" পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "মিথ্যা কথা।" পরক্ষণেই তিনি গোলমাল করাতে এবং চাকর ও দ্বারবানগণ আসাতে ডাকাতগণ চলিয়া গেল। * * * *

রজনী তৃতীয় প্রহর। সেই গভীর নিস্তব্ধতা মন্থন করিয়া একটা ভয়ঙ্কর কোলাহল উঠিল। গ্রামবাসী সকলেরই নিদ্রা ভাঙ্গিল, শয্যাত্যাগ করিয়া রাজপথে দাঁড়াইল, অল্লক্ষণ পরেই শুনিলাম যে, রামগোবিন্দ ঘোষালের ঘরে পাঁচ ছয় জন চোর ঢুকিয়া সর্ব্বস্ব লইয়া গিয়াছে। গ্রামবাসিগণ কিছুক্ষণ পরে গৃহে যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিল। প্রায় রাত্রি অবসান হইয়াছে, শুকতারা দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। পিতার সহিত ভগ্নহৃদয়ে গৃহে প্রবেশ করিলাম। কেবল মাত্র আমি জানিলাম, সে ডাকাইত কে?

একাদশ পরিচ্ছেদ।—বন্দী হইলাম।

অদ্য রাত্রে আমার বিবাহ, গিরির সহিত বিবাহ। এই বিবাহ বন্ধ করিবার উপায় নাই, পিতামাতার বিশ্বাস যে, রামচরণ ডাকাইত নহে, অতি ভদ্রলোক। ভগবান মারীচিমালী ধীরে ধীরে বিন্ধ্যাচলাভিমুখে গমন করিতেছিলেন। তিনি অল্লক্ষণ পরেই অচলপতির পশ্চাতে লুকাইবেন। তাহা হইলে রজনীসমাগমে আমার

সর্ব্বনাশ হইবে, ডাকাইত-পুত্রীর সহিত বিবাহ হইবে, ভাবিতে ভাবিতে যেন উন্মত্ততা জন্মিল। সূর্য্যদেবের স্তব করিলে না মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়? স্তব করিলে তিনি অস্তে যাইবেন না? রজনীর আবির্ভাব হইবে না? এই ভাবিয়া তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলাম। ভূমিতে দুই জানু পাতিয়া, করযোড়ে ঊর্দ্ধমুখে, একাগ্রচিত্তে অতি কাতরস্বরে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলাম, "হে আদিত্য, অস্তে যাইও না; তাহা হইলে অন্ধকার হইবে, আমার বিবাহ হইবে।" এই প্রকার প্রার্থনা করিতে করিতে চক্ষুরুন্মীলন করিলাম। হরি! হরি! ক্রমে সব অন্ধকার। সূর্য্যদেব পলাইয়াছেন, লোধ হয় অনেক দূরে পলাইয়াছেন। ইতিমধ্যে কে এক জন আলো লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। দেখিলাম, আমার মা। মাকে দেখিবামাত্র আমার উন্মত্ততা অন্তর্হিত হইল, ঝাঁপ দিয়া মার বুকে পড়িয়া কাঁদিলাম। মা— আমাকে ঘরে লইয়া গেলেন। সমস্ত দিন উপবাসী ছিলাম কিছু খাওয়াইলেন। মার আদরে কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।

রজনী দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে আমার বিবাহ হইবে। মাতা আসিয়া নিদ্রাভঙ্গ করাইলেন, এবং বিবাহের জন্য যে কাপড় চাদর আনাইয়াছিলেন, তাহা পরাইলেন। অনেক আদর করিলেন—তাঁহার আদরে সব ভুলিয়া গেলাম। পরে পিতা আমাকে হাত ধরিয়া খিড়্কীর দ্বার দিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন। দেখিলাম, অনন্ত নীলাকাশে নিশানাথ নিঃশব্দে ভাসিতেছেন। রজনী গভীরা; নিতান্ত শব্দহীনা। কখনও দূরে কুক্কুর-রব শুনা যাইতেছে। পিতা পুত্রে একটী আম্রকাননে প্রবেশ করিলাম। উহার ভিতরে একটী ক্ষুদ্র পথ আছে। তদ্দ্বারা মন্দিরাভিমুখে চলিলাম। আম্রকানন নিবিড় অন্ধকারময়, নিঃশব্দ। মনুষ্যপদ দলিত শুষ্ক পত্রের মর্ম্মর-শব্দ শুনিয়া পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেও?" উত্তর নাই। শাখার বিচ্ছেদে এক স্থানে চন্দ্রালোক পড়াতে আমি চিনিতে পারিয়া পিতাকে বলিলাম, "রামচরণ চক্রবর্ত্তী।" তিনি বিশ্বাস করিলেন না, ধমক দিলেন। ইতিমধ্যে মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলাম। উহার গুপ্ত দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলাম। সেখানে রামচরণ আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরের ভীষণ অন্ধকারে নিকটস্থ বড় বড় অশ্বথ বৃক্ষে চন্দ্রকিরণ বন্ধ করিয়াছে। কোথাও কোনও একটী ঘরে আলোক নাই। পূজারীগণ ভূতের ন্যায় ঘুরিতেছে। আমরা সেইখানে পঁছিবামাত্র, রামচরণ আমাকে একটী অন্ধকার ঘরে লুকাইয়া রাখিল। কিছুক্ষণ পরে সে পুনরায় আসিয়া আমার হস্ত ধরিয়া আমাকে আর একটী ঘরে লইয়া গেল।

এই ঘরটিতে আলো যথেষ্ট ছিল, এবং বিবাহের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত ছিল। রামচরণ আমাকে একটি আসনে বসাইয়া বলিল, "তোমার পিতা পুরোহিত লইয়া আসিতেছেন, আমি পাত্রী লইয়া আসিতেছি; বড় গোপনে বিবাহ হইবে, সাবধানে থাক, কোথায় উঠিয়া যাইও না, কেন না, আদিত্য বাবুর বিনা অনুমতিতে অদ্য রাত্রে এ মন্দিরে তোমাদের বিবাহ হইতেছে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন? তাঁহার এত আপত্তি কেন? দেবতার মন্দিরে সকলেরই ত বিবাহ হইতে পারে।"

রাম।—বোধ হয় এ মন্দিরে অদ্যরাত্রে তাঁহার কন্যা ও ভাগিনেয়ীর বিবাহ হইবে, গোপনে হইবে, সেই জন্য অন্য রাত্রে এ মন্দিরে অন্য বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু আমার সহিত এ মন্দিরের প্রধান পূজারীর বড় সম্প্রীতি থাকাতে, তিনি আমার অনুরোধে দক্ষিণদিকের এই ঘরটি ছাড়িয়া দিয়াছেন।

এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। আমি শৃঙ্খলাবদ্ধ পশুর ন্যায় সেইখানে বসিয়া রহিলাম। পিতামাতার প্রতি স্নেহ এবং কর্ত্তব্য, আমার শৃঙ্খল। গভীর মনের দুঃখে বসিয়া আছি, এমন সময়ে পূজারীবেশী এক জন ব্রাহ্মণ, দীর্ঘাকার, শ্বেতশ্মশ্রুবিশিষ্ট, পরিধানে গেরুয়া বসন, এই কক্ষে প্রবেশ করিয়া আমাকে চুপি চুপি বলিল, "আপনি একবার উঠিয়া আসুন। কোনও স্ত্রীলোক আপনাকে কোনও কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, শুনিবেন আসুন।" আমি অনন্ত সমুদ্রে ভাসিতেছিলাম, পূজারী ঠাকুর যেন একখানি নৌকা আনিয়া আমাকে তুলিয়া লইলেন। সেই মায়াবিনী আশা আবার আমাকে উত্তেজিত করিল, কিন্তু কিসের আশা তাহা বুঝিতে পরিলাম না। যাহা হউক, আমি আসন ত্যাগ করিয়া ঐ পূজারীর পশ্চাদনুসরণ করিলাম। ঐ কক্ষ হইতে নিক্রান্ত হইয়া পূর্ব্বোল্লিখিত আম্রকানন অতিক্রম করিয়া পূজারীগণের বাসস্থানের জন্য মন্দিরপার্শ্বে যে গৃহশ্রেণী আছে, তাহার একটী ঘরে আমাকে লইয়া পূজারী ঠাকুর প্রবেশ করিলেন। ঘরটিতে একটি সামান্য আলো মিট্ মিট্ করিতেছিল, তাহার নিকটে একটি টুল ছিল। পূজারী বলিলেন, "আপনি ঐ স্থানে বসিয়া এই পত্রখানি পাঠ করুন; পাঠান্তে, ঐ আসনের নিকট কি দ্রব্যাদি ঢাকা আছে, উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন, আমি আসিতেছি।" এই বলিয়া যখন তিনি চলিয়া যান, তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি আমাকে যে কি কথা বলিবেন?" তিনি বলিলেন, "ঐ পত্রখানি পড়িলে সকল কথা বুঝিতে পারিবেন।" আমি বড় আশান্বিত হইয়া পত্রখানি খুলিলাম। ইতিমধ্যে পূজারী ঠাকুর বাহির-দিকে কুলুপ

দ্বারা ঘর বন্ধ করিয়া পলাইলেন। "কি করেন! কি করেন!" বলিয়া চীৎকার করিলাম, কিন্তু পূজারীর কোনও উত্তর পাইলাম না। আমি ঐ ঘরে বন্দী হইলাম। পূজারীর ব্যবহারে আমার আশা ভরসা লুপ্ত হইল। পত্র পড়িতে ইচ্ছা হইল না। উহা ফেলিয়া ভাবিতে লাগিলাম, আমি ত বন্দী, বিবাহ ত বন্ধ হইল, কিন্তু পিতা-মাতার আমার প্রতি কিরূপ ভাব দাঁড়াইবে? কিরূপেই বা তাঁহাদিগকে এই ঘটনা বুঝাইব? আমার কথা কি তাঁহারা বিশ্বাস করিবেন? আর মালিনীর অন্তের সহিত—দূর হউক, ও কথা যাউক। পুনরায় সাহায্যের জন্য চীৎকার করিতে লাগিলাম। কাহারও কোনও উত্তর পাইলাম না। ঘরের দরজা ঠেলিতে লাগিলাম, কোনও প্রকারে কাহারও সাহায্য পাইলাম না। পরে ভাবিলাম, আমার ন্যায় মূর্খ এ জগতে নাই, কে এবং কি জন্য আমাকে বন্দী করিল, তাহা নিশ্চয়ই ঐ পত্রে আছে। পত্রখানি খুলিলাম—

"শ্রীচরণেষু,—মনে পড়ে কি, প্রায় পাঁচ বৎসর হইল কাশীতে সাবিত্রী-মন্দিরে, সাবিত্রী-সম্মুখে, একটি দশমবর্ষীয়া বালিকাকে বিবাহ করিয়াছিলে? মনে পড়ে কি, একটা কালো জালায় গলায় ফুলের মালা দেখিয়া তোমার বালিকাপত্নীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, 'ঐ কি কাশীর তিলভাণ্ডেশ্বর?—' আমি তোমার সেই পত্নী। মরি নাই, জীবিতা আছি, কিন্তু এখন আর বালিকা নহি, এখন আমার স্বামীকে চিনিয়াছি, এখন বিষয়-বোধ হইয়াছে, বিষয় হইতে বেদখল হইব না, আমার স্বামীকে আর কাহাকেও স্বামী বলিতে দিব না, জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়াছি।

"শুনিলাম, অদ্যরাত্রে তুমি গিরিজায়াকে বিবাহ করিবে। আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্যানুরোধে তুমি তাহাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছ। বাগ্দিনী গিরিজায়ার হাত হইতে এবং পিতামাতার ক্রোধ হইতে তোমায় রক্ষা করিব—কৌশল করিয়াছি, তোমাকে বন্দী করিয়া বিবাহ বন্ধ করিব। এখন ভগবান যাহা করেন, কিন্তু যদি সফল হই—তাহা হইলে আমায় কি দিবে?—স্বামীর নিকট স্ত্রীর চিরবাঞ্ছিত ধন, যাহা আমার দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে, তাহারই আকাঙ্ক্ষা করি—দিবে কি? সে আশাই বা করি কেন? তুমি ত আমায় কখনও দেখ নাই, সেই এক মুহূর্ত্তের জন্য শুভদৃষ্টি ভিন্ন আর আমায় ত কখনও দেখ নাই—কে জানে আমার অদৃষ্টে কি আছে!—আমার ন্যায় মন্দভাগিনী বুঝি এ জগতে আর নাই।

"যে পূজারী তোমায় বন্দী করিবে, তাহার উপর বিরক্ত হইও না। তাহার

কোনও অপরাধ নাই,—অপরাধ আমার। ঐ পূজারী আমাদের বিবাহ দিয়াছিলেন, ইনি আমাদের কুলোপুরোহিতের পুত্র, বাল্যকালে আমাকে কোলে পিঠে করিতেন, পরে কাশীতে পিতামহের নিকট থাকিতেন, আমাদের বিবাহ গোপনে রাখিবার জন্য কাশীর বিশ্বেশ্বরের সম্মুখে পিতামহ উঁহাকে শপথ করাইয়াছিলেন, ইনি এখন শ্রীনগরের কোনও মন্দিরের এক জন পূজারী। গিরির সহিত তোমার বিবাহ-সংবাদ ইনি আমাকে দিয়াছিলেন। এই সংবাদে আমি তিন দিন বিছানায় পড়িয়াছিলাম, এবং এই অবস্থাতে কিরূপে এ বিবাহ বন্ধ করিব, তাহার কৌশল মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম, এবং ঐ পূজারীকে ঐ কৌশলাবলম্বনে বিবাহ বন্ধ করিতে অনুরোধ করিয়াছি। তাহার কোনও অপরাধ নাই।

"আমার পরিচয় দিবার এখনও সময় হয় নাই, কখনও যে হইবে, সে আশাও করি না। যাহা হউক, একবার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কথা কহিবার বড় সাধ হইয়াছে, যদি কেহ 'জয় তিলভাণ্ডেশ্বর' বলিয়া তোমার সম্মুখে শব্দ করে, তবে তুমি তাহার সহিত আসিও, দেখা হইবে।

"বিবাহ ত হইবে না, তবে সমস্ত দিন উপবাস করিয়া থাক কেন? কিছু আহার্য্য সামগ্রী পাঠাইলাম, তোমার সহধর্ম্মিণীর অনুরোধে খাইও।

"সেবিকা

শ্রীমতী———"

মন্দ নয়,—ইনিই আমার স্ত্রী,—ইনি ত সহজ মেয়ে নহেন,—ইনি কে?—ইঁহার শ্রীনগরে বাস, ইহা নিশ্চয়,—কিন্তু কাহার কন্যা? ভাবিতে ভাবিতে স্থির করিলাম যে, আমার পিতৃদেবের পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত মোহিতমোহন গোস্বামীর অনেকগুলি পৌত্রী ও দৌহিত্রী আছে, তাহাদের মধ্যে একটি। গোস্বামী মহাশয় আমার পিতার মামা-সম্বন্ধে কে হয়েন, সে জন্য মেয়েরা আমার সম্মুখে বাহির হয়েন, ও কথা কহেন। তাহাদের বয়সের হিসাব করিয়া তিনটির প্রতি আমার সন্দেহ হইল—কৃষ্ণভাবিনী. সত্যভামিনী ও গরবিনী—তিনটীই বিদ্যা, বুদ্ধি ও রূপে শ্রীনগরে বিখ্যাত। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোনটি? আচ্ছা, কাল বুঝিব। কাল আমি তাহাদের বাটীতে যাইয়া তাহাদের ভাবভঙ্গীতে বুঝিতে পারিব। কিন্তু ভাবভঙ্গীতে স্ত্রীর অনুসন্ধান করিতে হইল না—তিনি আপনি আসিয়া দেখা দিলেন—কিন্তু হায়! কি অবস্থাতে দেখা দিলেন, অদ্যাপি মনে হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

এইরূপ ভাবিতেছিলাম, এমন সময়ে কে এক জন ঐ ঘরের দ্বার খুলিয়া দিয়া বলিলেন, "লগ্ন উত্তীর্ণ হইয়াছে, এখন আপনি মন্দিরে ফিরে যান।" আমি বাহিরে আসিয়া, দ্রুতপদে মন্দিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। গুপ্তদ্বারদেশে পিতা আমার অপেক্ষা করিতেছিলেন, আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "আমি বড় ভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম। রামচরণ কে, তাহা তদন্ত না করিয়া তাহার কন্যার সহিত তোমার বিবাহ দিতে আসিয়াছিলাম। এক জন পূজারী আমার চোখ ফুটাইয়া দিলেন, আমাকে বলিলেন, রামচরণ কি জাত, কোথায় উহার পৈতৃক বাসভূমি, তাহা তদন্ত না করিয়া এ বিবাহ দিলে গ্রামে আমায় একঘরে করিবে। সেই পূজারী আরও বলিলেন, আমার জাতকুল রক্ষার জন্য পূজারীগণ আমার নাম করিয়া তোমাকে অন্যস্থানে রাখিয়াছেন। লগ্ন উত্তীর্ণ হইলে তুমি ফিরিয়া আসিবে। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম।" বুঝিলাম, এ সকল আমার স্ত্রীর কৌশল। এইরূপে পিতার সহিত কথা কহিতে কহিতে মন্দিরমধ্যে একটা গোল শুনিলাম। অনুসন্ধানে জানিলাম যে, ঐ মন্দিরে একটি ধনাঢ্য ব্যক্তির পুত্রের সহিত একটি কন্যার বিবাহ হইতেছিল, কিন্তু ঐ পাত্রী ঐ ঘরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে রামচরণ কৌশলে তাহার কন্যা গিরিজায়াকে বসাইতে গিয়া ধরা পড়িয়া কন্যা লইয়া পলাইয়াছে। এই গোলমালে ঐ ধনী পাত্রেরও বিবাহ বন্ধ হইল। আমার আনন্দের আর সীমা রহিল না, গিরির সহিত আমার বিবাহ বন্ধ হইল, আবার মালিনীরও বিবাহ বন্ধ হইল—ঐ পাত্রী যে মালিনী, তাহা আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছিলাম। আনন্দে আমি মালিনীকে দেখিবার জন্য মন্দিরমধ্যে লাঠিমের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। দেখা না পাইয়া পিতার নিকট ফিরিয়া আসিলাম। পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে পূজারী আমাকে সতর্ক করিয়াছিলেন তিনি আমাদের বড় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী; সে ব্যক্তি কে, চেন ?" তখন আমার স্ত্রীকে মনে পড়িল, আমার স্ত্রীর বুদ্ধিতে গিরির সহিত আমার বিবাহ বন্ধ হইল, আমার স্ত্রীর বুদ্ধিতে মালিনীর বিবাহ বন্ধ হইল—আমি সেই স্ত্রীকে ভুলিয়া গিয়া "মালিনী, মালিনী" করিয়া বেড়াইতেছি! মনে একটা ধিক্কার জন্মিল। হায়, ভালবাসা! তোমাকে জানিতাম, তুমি আকাশকুসুম; এখন বুঝিতে পারিতেছি, তুমি কোমলমধুর, সুবাসিত বিষাক্ত কুসুমদাম।

এইরূপ মনের অবস্থাতে পিতার সহিত গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। পরদিন শুনিলাম, রামচরণ সপরিবারে শ্রীনগর হইতে পলায়ন করিয়াছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।—এটর্ণী-সংবাদ।

কিছুদিন পরে এক দিবস বেলা আটটার সময়, এক জন হ্যাট-কোট-ধারী ভদ্রলোক আমাদের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি পিতাকে দেখিয়া, টুপী খুলিয়া ঈষৎ মাথা নোয়াইয়া অভিবাদন করিলেন। পিতাও তদ্রূপ করিলেন। পিতা তাঁহাকে উপরে লইয়া গিয়া বৈঠকখানার একটী কোচে বসাইলেন। তিনি আপনার পরিচয় আপনি দিলেন। জিজ্ঞাসা করিতে হইল না। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের এক জন এটর্ণী, তাঁহার নিবাস শ্রীনগরে। প্রথম মিষ্টালাপের পর তিনি বলিলেন, "আপনি একটি সম্পত্তি পাইলেন।" পিতা বলিলেন "হাঁ, আমার মাতুলের বিষয় পাইয়াছি।"

এটর্ণী। না না, সে সম্পত্তির কথা বলিতেছি না। একটা নূতন সম্পত্তি—আপনার পৈতৃক সম্পত্তি।

পি। আমার ত পৈতৃক সম্পত্তি নাই।

এ। আপনি ত এলাহাবাদের হরিহর বাবুর পুত্র মনোহর বাবু?

পি। হাঁ।

এ। তবে আপনার পৈতৃক বিষয় কিছু ছিল কি না, তা জানেন না?

পি। না।

এ। না জানিবার কথা বটে। তবে শুনুন। আপনার পিতা হরিহর বাবুর প্রতি, তাঁহার পিতা শ্রীধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও কারণে ক্রোধ উপস্থিত হওয়ায়, তিনি দেশত্যাগ করিয়া গেলেন। কোথায় গেলেন, তাহা কেহ জানিতে পারে নাই। ছয় বৎসর পরে হরিহর বাবু তাঁহার পিতাকে একখানি পত্র লিখিলেন যে, তিনি বিবাহ করিয়াছেন ও তাঁহার একটী পুত্র সন্তান জন্মিয়াছে, তাঁহার নাম রাখিয়াছেন—মনোহর। পিতাকে অনুনয় বিনয় করিয়া লিখিলেন যে, তিনি তাঁহার সন্তানকে আশীর্ব্বাদ করেন, যেন তাঁহার ন্যায় তাঁহার সন্তান ভাগ্যহীন না হয়; কিন্তু কোন্ স্থান হইতে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পত্রে লেখেন নাই। এই পত্র পাইয়া শ্রীধর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পুত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। যে স্থানের পোষ্টমার্ক ছিল, সে স্থানে ও অন্যান্য স্থানে অনুসন্ধান করা হইয়াছিল, কিন্তু কোনও স্থানেই তাঁহার সন্ধান পাইলেন না। এক বৎসর পরে যখন শ্রীধরের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল, তখন একখানি উইল দ্বারা তাঁহার সর্ব্বস্ব তাঁহার পৌত্র মনোহর বন্দ্যোপাধ্যায়কে অর্পন করিলেন; কিন্তু যতদিন না তাঁহার পৌত্রের

সন্ধান পাওয়া যায়, ততদিন তাঁহার কোনও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়া, তাঁহার জিম্মায় ঐ বিষয় রাখিয়া গেলেন। সে প্রায় ৪০।৪৫ বৎসরের কথা। সেই ম্যানেজার তীর্থ-পর্য্যটনে যাইয়া সম্প্রতি জানিতে পারিয়াছেন যে, হরিহর বাবু এলাহাবাদে বাস করিতেন; তাঁহার পুত্র মনোহর বাবুও সেই স্থানেই ছিলেন; পরে মাতুলের বিষয় পাইয়া শ্রীনগরে আসিয়াছেন। ম্যানেজারের সেই তীর্থস্থানেই মৃত্যু হয়। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার পুত্রকে এই সংবাদ লিখিয়া অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন যে, বিষয় পত্রপাঠ মনোহর বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছাড়িয়া দেন, এবং তৎসহিত উইলখানি ও একখানি রেজেষ্ট্রী করা নাদাবী পত্রও পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার পুত্র আপনাকে এই সংবাদ দিবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন।

পি। উইলখানি দেখি?

এ। অদ্য দেখাইতে পারিলাম না, আগামী কল্য দেখাইব।

পি। কেন?

এ। আপনি যদি উইলখানি এখন পাঠ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে চিনিতে পারিবেন।

পি। তাহাতে আপত্তি কি?

এ। ইনি এক জন বিশেষ সম্ভ্রান্ত লোক। ইনি জানিতেন না যে, পরের বিষয় ভোগ করিতেছিলেন। জন্মাবধি জানিতেন যে, বিষয় তাঁহার পৈতৃক। এখানে সকলেরই ঐরূপ ধারণা। হঠাৎ এ কথা প্রকাশ হইলে, এই ভদ্রলোকটীর অপমানের ও মনঃকষ্টের সীমা থাকিবে না। সেই জন্য তিনি অদ্য রাত্রেই এই গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, আর ফিরিবেন না। আপনি আগামী কল্য পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন।

পি। তিনি ত চলিয়া যাইবেন, তবে কাহার নিকট হইতে বিষয় বুঝিয়া লইব?

এ। আমার নিকট হইতে; অথবা তাঁহার এক জন কর্ম্মচারী আছেন, তাঁহার নিকট হইতে লইবেন। একটী কথা আপনাকে বলিয়া রাখি যে, এই ভদ্রলোকটী কেবলমাত্র পরিধানের ধুতি ও চাদর লইয়া যাইবেন। আপনার একটী পয়সাও লইয়া যাইবেন না।

পি। তাঁহার নিজের পৈতৃক বিষয় কি আছে?

এ। কিছু না। হবিষ্য করিবার বা পিতৃশ্রাদ্ধ করিবার সঙ্গতি আছে কি না সন্দেহ।

পি। আমি বিষয় হইতে কিছু তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছি।

এ। কিছু লইবেন না। সে কথা আমি বলিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি রাজি হন নাই।

পি। তাঁহার স্ত্রী পুত্র আছে কি?

এ। "না,—এক্ষণে আমি উঠিলাম।" এই বলিয়া টুপী ও ছড়ি হাতে করিয়া পিতার সহিত করমর্দ্দন করিয়া চলিলেন। যাইবার সময়—"একটা অনুরোধ আছে" বলিয়া দাঁড়াইলেন, পরে বলিলেন আগামী কল্য পর্য্যন্ত এই কথাগুলি গোপন রাখিবেন। আর একটা অনুরোধ—একটী পাত্রী আছে, পরমসুন্দরী ও সুশিক্ষিতা। আপনার পুত্রের সহিত যদি তাহার বিবাহ দেন—যা'ক, পরে সে কথা হইবে। এখন চলিলাম।" এই বলিয়া আমাদের Grand Staircase দিয়া সাহেবী চালে নামিয়া গেলেন। ইনি কখনও বিলাতযান নাই, কলিকাতায় বাস করিয়া সাহেব হইয়াছেন।

এই এটর্ণী সাহেবের শেষ কথা শুনিয়া আমার বড় রাগ হইল। আবার বিবাহ। উনি করেন এটর্ণীগিরি। রামের ধন শ্যামকে দিবার জন্য অহরহঃ মাথা ঘামাইয়া মরেন, আবার ইহার উপর ঘটকালি কেন? বুঝেছি, উঁহার ভগিনীকে আমায় দিতে চান। আমাতে এখন ত্র্যহস্পর্শ যোগ ঘটিয়াছে; আমি বিদ্যাতে, ঐশ্বর্য্যে ও কৌলীন্যমর্য্যাদায় সর্ব্বপ্রধান। আমি যদি উঁহাকে পত্নী-সহোদরবাচক সম্বোধনে ডাকি, তাহা হইলে উঁহার গৌরববৃদ্ধি হইবে। কিন্তু সে আশা যেন না করেন।

ঐ দিন সন্ধ্যার সময় সর্ব্বমঙ্গলার আরতি দেখিয়া বাটী ফিরিতেছিলাম, এমন সময় অন্ধকারে আমার সম্মুখে একটী লোক আসিয়া দাঁড়াইয়া "জয় তিলভাণ্ডেশ্বর" বলিয়া শব্দ করিল। আমি উহা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমাকে কোথায় যাইতে হইবে?" তিনি বলিলেন, "গোবিন্দজীর মন্দিরের পশ্চাতে যে একটী বকুল বৃক্ষ আছে, রাত্রি দ্বিপ্রহরে উহার তলায় দাঁড়াইয়া থাকিবেন, আমি আসিয়া লইয়া যাইব।" ঐই বলিয়া তিনি অন্ধকারে অদৃশ্য হইলেন। আমিও বাটী ফিরিলাম।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।—দেশান্তরে।

পূর্ব্বোল্লিখিত সঙ্কেত অনুসারে আমি রাত্রি দ্বিপ্রহরে সেই বকুলতলায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। পৃথিবী অন্ধকারময়ী, আকাশ নিবিড় নীরদমালায় আবৃত, সন্ সন্

শব্দে ঝড় বহিতেছে—ঠিক ঝড় নহে—প্রবল বায়ু বহিতেছে। ভাগীরথী গাঢ় অন্ধকারে অদৃশ্য। তীরে তাহার তরঙ্গাভিঘাতশব্দ হইতেছে। দূরে একটী অশ্বত্থবৃক্ষে বসিয়া একটা পেচক অমঙ্গলসূচক ধ্বনি করিতেছে। বুঝিলাম, বড় অশুভ। লেখাপড়া শিখিলেই কি বাল্যসংস্কার যায়? যায় না। মনে মনে নানা প্রকার ভয় হইতে লাগিল; কি জানি, কি কারণে আমার মন বড় চঞ্চল হইল। কিসের আশঙ্কা বুঝিতে পারিলাম না—যেন আমার কি একটা দুর্ঘটনা ঘটিবে। এইরূপ আশঙ্কায় অস্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছি, ইত্যবসরে এক জন সম্মুখে আসিয়া "জয় তিলভাণ্ডেশ্বর" শব্দ করিল। আমি বলিলাম, "কোথায় যাইতে হইবে, চলুন।" "আসুন" বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন। পরে গোবিন্দজীর মন্দিরের গুপ্তদ্বার দিয়া আমাকে লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিয়া একটী অন্ধকার ঘরে ছাড়িয়া দিলেন। কিঞ্চিৎ পরে চুড়ির শব্দে বুঝিলাম, একটী স্ত্রীলোক ঘরে প্রবেশ করিলেন ও অতি কাতর স্বরে আমাকে ডাকিলেন, "তুমি কোথায়? আমি যে অন্ধকারে তোমায় দেখিতে পাইতেছি না, আমার কাছে এস।" এই কাতর কণ্ঠস্বরে আমার হৃদয় আর্দ্র হইল। কিন্তু যে কণ্ঠস্বর শুনিলাম, উহা যেন কোথায় শুনিয়াছি। আর এত করুণস্বরে ডাকিল কেন? আমি বলিলাম, "আমি এইখানে, এস-এস।" এই বলিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া হাত ধরিলাম। আমার হস্তে দুই এক ফোঁটা তাহার চক্ষের জল পড়িল। আমি বলিলাম, "এ কি? কাঁদিতেছ কেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "না, কাঁদি নাই।" আমি তাঁহাকে নিকটে বসাইলাম। চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে তিনি আমার সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন। উহাতে কেবল কাতরতা ছিল। সে কাতরতা আমারই জন্য। আমার স্ত্রীর প্রতি আমার হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল। ক্ষণকালের জন্য আমি মালিনীকে ভুলিয়া গিয়া, স্ত্রীকে বলিলাম—"চল, গৃহে চল, আর এ জীবনে ছাড়াছাড়ি হইব না।" স্ত্রী মৌনাবলম্বনে রহিলেন। আমি পুনঃ পুনঃ ঐরূপ অনুরোধ ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, "আর আমি পরিচয় দিব না।" আমি একটু বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "তবে দেখা করিতে এলে কেন?" আমার স্ত্রী অস্ফুটভাবে কাঁদিয়া বলিলেন, "এলুম কেন, তা' তুমি বুঝিবে কিরূপে? স্বামীর নিকট বসিয়া, স্বামীর সহিত কথা কহিয়া স্ত্রীলোকের যে কি সুখ, তাহা তুমি বুঝিবে কি প্রকারে?" এই কথায় আমি অপ্রতিভ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কি চিরকাল স্বামীর নিকট অপরিচিতা থাকিবে?"

স্ত্রী বলিলেন—ভগবান তাই করিলেন বটে।

আ। স্বামীর নিকট অপরিচিতা থাকিবার এরূপ আকাঙ্ক্ষা হিন্দুরমণীর ত কখনও শুনি নাই।

স্ত্রী। শুনিবে কেমন করিয়া? আমার ন্যায় চিরদুঃখিনী ত কখনও জন্মায় নাই।

আ। তুমি চিরদুঃখিনী? কেন?

স্ত্রী। মনে পড়ে? কাশীতে সেই বিবাহরাত্রে স্বামীর মুখ দেখিলাম। মুখ দেখিয়া আর ভুলিলাম না। কিন্তু সে মুখ আর দেখিতে পাইলাম না। আর কখনও যে দেখিতে পাইব, এমন ভরসাও ছিল না। তখন বালিকা ছিলাম, তবু কত কাঁদিতাম। তবে শ্রীনগরে যখন তোমায় দেখিলাম—দেখিয়া চিনিলাম যে, তুমিই আমার স্বামী; তখন তোমায় দেখিবার বড় বাসনা জন্মিল। দিন দিন সে বাসনা বড় প্রবল হইল। মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাইতাম বটে, কিন্তু স্বামী বলিয়া নয়। আমার স্বামীর প্রতি আমার অধিকার জন্মিল না। বল দেখি, আমি কি চিরদুঃখিনী নই? আমি কি এমন অপরাধ করিয়াছি যে, আমার স্বামীকে আমি দেখিতে পাইব না? বালিকা হইতে প্রাচীনারা, হাড়ি ডোম হইতে রাজরাজেশ্বরের ঘরের মেয়েরা, সকলেই ত স্বামী লইয়া ঘর করে। তবে আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে, স্বামী পাইব না? আমার অপেক্ষা চিরদুঃখিনী আর কেহ আছে? এইরূপ মনঃকষ্টে দিন রাত কাটাইতাম, কিন্তু মনে মনে একটা আশা ছিল যে, চিরদিন কখনও সমান যায় না। পিতার হয় ত নিরপরাধ জামাতার প্রতি কোনও না কোনও সময়ে ক্রোধের অপনয়ন হইবে। তখন স্বামী পাইব। কিন্তু গতকল্য হইতে সে আশা ভরসা অন্তর্হিত হইয়াছে। এক্ষণে যদি পিতা জানিতে পারেন যে, তুমি তাঁহার জামাতা, তাহা হইলে তোমার প্রতি তাঁহার ক্রোধ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইবে।

আ। তোমার কথা বুঝিতে পারিতেছি না। কেন তাঁহার ক্রোধ বাড়িবে?

স্ত্রী। অদ্য প্রাতে তোমাদের বাটীতে কোনও এটর্ণী বাবু যাইয়া কোনও নূতন সম্পত্তিপ্রাপ্তির সংবাদ দিয়াছেন কি?

আ। হাঁ।

স্ত্রী। ঐ সম্পত্তি আমার পিতা জন্মাবধি ভোগ করিতেছিলেন। তিনি জানিতেন যে, উহা তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি। কিন্তু গত কল্য রাত্রে উহা যে তোমাদের সম্পত্তি, তাহা জানিতে পারিয়া লজ্জায়, অপমানে ও ঘৃণায় মৃতবৎ হইয়াছেন। অদ্য রাত্রেই দেশ ছাড়িয়া যাইবেন। আমরা যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছি। আমি গোবিন্দজী দর্শন উপলক্ষ্য করিয়া তোমাকে দেখিতে

আসিয়াছি। তিনি তোমাদের কিছুই লইয়া যাইবেন না। কেবল পরিধেয় বস্ত্র ও চাদর লইয়া যাইবেন।

আ। তুমিও কি সঙ্গে যাইবে নাকি ?

স্ত্রী। হাঁ।

আ। এইমাত্র বলিতেছিলে যে, স্বামীকে না পাইয়া তুমি চিরদুঃখিনী হইয়াছ। তবে আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইবে কেন ?

স্ত্রী। দরিদ্র পিতার জন্য তোমাকে ত্যাগ করিতে হইল। তোমাকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী দেখিয়া চলিলাম ; তুমি আবার বিবাহ করিবে, সুখী হইবে ও আমাকে ভুলিয়া যাইবে। তাহাও বুঝিতে পারিতেছি। তোমাকে না দেখিতে পাইলে আমার যে দুঃখ, তাহা আজীবন আমারই রহিল। কিন্তু তুমি যে সুখী হইবে, তাহা বুঝিতে পারিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইয়া চলিলাম। কিন্তু আমার পিতার ত আর কেহ নাই। তিনি এক্ষণে দরিদ্র হইলেন, তাঁহার জন্য এক্ষণে আমার চিন্তা। আমি কি এ অবস্থায় তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারি, সেই জন্য আমি নিজ সুখে জলাঞ্জলি দিয়া পিতার সঙ্গেই চলিলাম। তাই বলিতেছিলাম—আমার ন্যায় চিরদুঃখিনী আর জন্মে নাই।

এই সকল কথা শুনিয়া স্ত্রীর প্রতি আমার দয়ার উদ্রেক হইল। কিন্তু আমার স্ত্রী কে ? তাহা জানিবার জন্য আগ্রহ হইল। আমি জানিতাম যে, তিনি কোনমতেই তাঁহার পরিচয় দিবেন না, সেই জন্য সঙ্গে একটী বাতী ও দিয়াশলাই আনিয়াছিলাম। পকেট হইতে ঐগুলি বাহির করিয়া আলো জ্বালিয়া দেখিলাম, মলিনবসনা, রুক্ষকেশী, অলঙ্কারবিহীনা ষোড়শী দাঁড়াইয়া মুখে অঞ্চল চাপিয়া কাঁদিতেছে। দুই হস্তে কেবল কাচের চুড়ি ছিল। দেখিবামাত্র আমি উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিলাম—মালিনী, মালিনী, মালিনী আমার স্ত্রী, আমি এত ভাগ্য করিয়াছি যে, মালিনী আমার স্ত্রী। মালিনী স্থিরভাবে মস্তক নত করিয়া অবিশ্রান্ত কাঁদিতে লাগিল।

আ। মালিনী, তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া গেলে আমি বাঁচিব না। যাইও না, রক্ষা কর, রক্ষা কর।

স্ত্রী। (দুই পদ অগ্রসর হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমার হস্ত ধরিয়া বলিল) তুমি আমার সর্ব্বস্বধন। ইহকাল ও পরকাল। আমাকে যাইতে নিষেধ করিও না। আমার পিতা কে ? তাহা জানিতে পারিলে ত ? এখন বল দেখি, সেই পিতা দরিদ্র হইয়া একাকী দেশান্তরে যাইলে কে তাঁহাকে রাঁধিয়া খাওয়াইবে ?

কে তাঁহার সেবা করিবে? মানসিক ও শারীরিক কষ্টে তাঁহার দেহ ভগ্ন হইয়া পড়িবে। আমি কি তোমার নিকট থাকিয়া সুখী হইতে পারিব? দিবানিশি তাঁহার কষ্ট মনে পড়িবে। তাহাতে তুমি অসুখী ব্যতীত সুখী হইবে না। আমার উপর রাগ করিও না। আমি অনুরোধ করি, আবার তুমি বিবাহ কর। আমার ভগিনী গৌরীকে বিবাহ কর। আমি এখন জন্মের মত বিদায় হই। এই বলিয়া আমার পদধূলি লইতে গিয়া আমার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি তাঁহার হাত ধরিয়া তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "গিরির সহিত বিবাহ কত কৌশলে বন্ধ করিয়া আবার গৌরীকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিতেছ কেন?"

স্ত্রী। তখন আশা ছিল, তখন ভরসা ছিল। এখন সে আশা নাই, সে ভরসা নাই। তখন স্বামী লইয়া আমিই সুখী হইব, এই আশা সর্ব্বদা প্রবল ছিল। এখন স্বামী কিসে সুখী হইবেন, এই বাসনা বলবতী হইয়াছে। আর পিতার কিসে কষ্ট দূর হইবে, সেই উদ্দেশ্যে আমার বড় আদরের স্বামী পরকে দিয়া পিতার দরিদ্রতা গ্রহণ করিয়া তাঁহার সঙ্গেই চলিলাম। কিন্তু তোমায় দেখিতে না পাইয়া বেশীদিন বাঁচিব না। এই বলিতে বলিতে সে আছড়াইয়া আমার পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি বসিয়া তাহার হাত ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। উভয়ে নীরবে কতই কাঁদিতে লাগিলাম। বুঝিলাম, মালিনী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, উহাকে ফিরাইবার আর উপায় নাই। মালিনী বলিল, "বিলম্ব হইলে পিতা এই ঘরে খুঁজিতে আসিতে পারেন।" এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পলাইয়া গেল। যাইতে যাইতে পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া গেল।

আমি বাহিরে গিয়া আবার সেই বকুলতলার সিমেণ্টের পিঁড়িতে গিয়া বসিলাম। কেন যে সেখানে গেলাম, তা বুঝিতে পারি নাই। সেইরূপ অন্ধকার ছিল, কিন্তু বায়ুর গর্জ্জন ছিল না। আমি গাছতলায় বসিয়া অবিশ্রান্ত কাঁদিতে লাগিলাম। অতি অল্পক্ষণ পরেই দেখিলাম, দুই ব্যক্তি অন্ধকারে আমার দিকে আসিতেছেন। ঐ বকুলগাছের নীচে যাতায়াতের রাস্তা ছিল। আমি তাহাদের দেখিয়া গাছের অন্তরালে লুকাইয়া দেখিলাম। আমার শ্বশুর আদিত্যমোহন বাবু ও মালিনী আসিতেছেন। শ্বশুর তাহাকে বলিলেন, "মালিনী! আর কাঁদিতেছ কেন মা?" মালিনী ফুঁপাইতে ফুঁপাইতে কাঁদিয়া বলিল, "বাবা, আমি যে আমার সর্ব্বস্বধন ফেলিয়া চলিলাম।" শ্বশুর বলিলেন, "ছিঃ মা! ও যে পরের।" মালিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ভগবান তাই করিলেন? আমার—পরকে দিলেন। হে ভগবান তুমি যাহাই করিবে, তাহাই আমার শিরোধার্য্য।" আমি বুঝিলাম,

আমার জন্য কাঁদিতেছে। বাঁধাঘাটে একটী ছোট নৌকা ছিল। তাহাতে দুই জনে উঠিলেন। পরে শ্বেতপাল বিস্তার করিয়া নৌকা অনন্তস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে অনন্ত অন্ধকারে মিশিল। ঐশ্বর্য্যে লালিতা, আদরের আদরিণী, গৌরবের গৌরবিনী, চির-অবরোধবাসিনী, মালিনী পথের কাঙ্গালিনী হইয়া চলিলেন। পিতৃসেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া চলিলেন।

রাত্রিশেষে আমিও কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিলাম।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের স্মৃতি-সভায় কিশোরীচাঁদ মিত্র।

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের স্বর্গারোহণের পরে, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ২৯শে অক্টোবর দিবসে, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সভাগৃহে, তাঁহার স্মৃতিরক্ষাকল্পে একটি সভা আহূত হয়। স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র এই সভায় ইংরাজী ভাষায় যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সভাপতি মহাশয় এবং ভদ্র মহোদয়গণ! যে পরোলোকগত মহাত্মার প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ আমরা এই স্থলে সমবেত হইয়াছি, তাঁহার অশেষবিধ গুণগ্রামে বিমুগ্ধ হইয়া যদি আমার বাক্‌শক্তি তিরোহিত না হইত, তাহা হইলে আমি আমার ক্ষীণ স্বর উত্থিত করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতাম না। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবের সমর্থনে আমি কয়েকটি কথা বলিব—অধিক বলিবার সামর্থ্য নাই। বহুদিন পূর্ব্বে—যখন আমি হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলাম, এবং তিনি উহার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন—তখন হইতে স্বর্গীয় মহাত্মাকে আমি জানি। কিন্তু তাঁহার সহিত আমি ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশি নাই, এবং সেই জন্য তাঁহার গার্হস্থ্য এবং ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কিছু বলিতে অক্ষম। কিন্তু জননায়করূপে তাঁহার যে সকল বিবিধ সদ্‌গুণরাজি বিরাজিত ছিল, তাহা প্রত্যক্ষ ও প্রশংসা করিবার বহু সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছি। বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর বিশেষ ভাবে এক জন স্বদেশহিতৈষী জননায়ক ছিলেন, এবং দেশের অনেক জনহিতকর কার্য্য

করিয়া গিয়াছেন। তরুণ বয়সেই,—যখন সংবাদপত্রাদি আজিকার স্থায় কল্যাণ ও অকল্যাণ সাধন করিবার ক্ষমতা লাভ করে নাই,—তিনি উহার শক্তির গুরুত্ব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সংবাদ পত্রের স্তম্ভে দেশের অভাব অভিযোগের কথা সুপ্রকাশ করিলে দেশের মহাকল্যাণ সাধিত হইবে, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি 'রিফর্মার' (সংস্কারক) নামে একখানি সংবাদ পত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সাপ্তাহিক পত্রখানি অতি যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইত। উঁহার জীবনকালে উহা দেশের অনেক উপকার সাধিত করিয়াছিল। উহার পরে জ্ঞানান্বেষণ, বেঙ্গল স্পেক্টেটর, হিন্দুপেট্রিয়ট প্রভৃতি বহু সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা হয়, কিন্তু বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরই ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্রের জন্মদাতা বলিয়া অভিহিত হইবেন। বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটী বা জমীদার-সভা সংস্থাপন করেন, তখন বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মিষ্টার কব্‌হারীর সহিত উহার সম্পাদক নিযুক্ত হয়েন। সম্পাদকরূপে ইনি ভূমিসংক্রান্ত বহু জটিল প্রশ্নের আলোচনায় যোগদান করিতেন। কলিকাতা জর্ণ্যালের স্তম্ভগুলির প্রতি নেত্রপাত করিলে ইহার বহু প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার গৃহে অন্ত আমরা সমবেত হইয়াছি, সেই সভার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ সকলেই অবগত আছেন—বিস্তারিতভাবে বিবৃত করা নিষ্প্রয়োজন। কর্ম্ম ও ভাবরাজ্যের এই বর্ত্তমান বিপ্লবের প্রধান নায়কগণ যে হিন্দুকলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই বিদ্যালয়ের সহিত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নাম অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত। উহার তত্ত্বাবধায়ক ও পরিচালকরূপে তিনি এই মহাবিদ্যালয়ের উন্নতির নিমিত্ত সর্ব্বদাই আগ্রহপূর্ণ যত্ন প্রকাশ করিতেন। কিন্তু ব্যবহারশাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্যই তিনি বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার কারণ তিনি ব্যবহারশাস্ত্র—রেগুলেশন আইন—বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; তাহাই নহে—তাঁহার সূক্ষ্মবিচারশক্তি ও অপূর্ব্ব মেধা তাঁহাকে এই শাস্ত্রে সম্পূর্ণ পারদর্শী করিয়াছিল। রেগুলেশন আইনের ইতিহাসের জ্ঞানে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিলেন না। বিবিধ রেগুলেশন এবং ব্যবস্থা, গবর্মেণ্টের যে সকল মন্তব্য, অবধারণ বা ব্যবস্থাপক-সভার আলোচনায় বিধিবদ্ধ, পরিবর্ত্তিত, বা পরিত্যক্ত হইয়াছে তাহা তাঁহার নখ-দর্পণে ছিল, এবং যেন স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানপ্রণোদিত হইয়া তাহা যে কোনও মুহূর্ত্তে বাহির করিয়া দিতে পারিতেন। যখন ভূমিকরবিষয়ক আইন (Rent Law) এবং দেওয়ানী কার্য্যবিধি (Civil Procedure code) প্রস্তুত হয়, তখন তিনি ব্যবস্থাপক সভাকে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছিলেন, এবং ইহার জন্য সদস্যগণের

উচ্চপ্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার উইলে তিনি যে সকল দানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার অপর্ব্ব সুক্ষ্মদর্শিতা ও বদান্যতার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

যাঁহারা সম্মানজনক ব্যবসায়ে সাধুভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া প্রভূত সম্মান ও ঐশ্বর্য্য অর্জ্জন করিয়াছেন, যাঁহারা দেশের সেবা দ্বারা তাঁহাদিগের স্বজাতির মঙ্গল-সাধন করিয়াছেন,—সেই সকল হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্রবিদ্ এবং রাজনীতিকগণের স্মৃতি যে অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভে বিরাজিত আছে, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নামও তথায় উচ্চস্থান অধিকৃত করিবে।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

কুসুম ও কবিতা।

[স্বর্গীয় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় লিখিত।]

কুসুম নিজেই একটি কবিতা। কবিতা নিজেই একটি কুসুম। কুসুমে কবিতা এবং কবিতায় কুসুম, দেখা এবং দেখান, না—কোন আর একখানি কবিতা?

ফুলের সহিত কবিতার তুলনা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। এ তুলনা সুন্দর;—ফুলের মতই সুন্দর, কুসুমের মতই সুন্দর। কবিতার মতই সুন্দর। যদি বলি, তাদের অপেক্ষাও বরং কিছু বেশী সুন্দর, তাহা হইলেও অন্ততঃ সৌন্দর্য্যের পরিমাণের হিসাবে, প্রলাপবাক্য বলা হয় না।

কেন না, তুলনা, কুসুম তুলিয়া আনিয়া কবিতার কাণে দোলাইয়া দেয়; কবিতা তল্লাস করিয়া আনিয়া কুসুমের প্রাণে মাখিয়া দেয়। যেখানে কবিতা ছিল না, কেবল কুসুম ছিল; অথবা সেখানে কুসুম ছিল না, কবিতা একলা ছিল; তুলনা, সেখানে 'আপ্ত দূতীর' মত এককে আনিয়া অপরের সহিত মিলাইয়া দিয়া ডবল সৌন্দর্য্য দীপ্ত করিল; দুই কবিতায় কোলাকুলি করিয়া দিয়া নিজে অপর এক কবিতা হইয়া তৃতীয় সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিল। এক সুন্দর অপেক্ষা, দুই সুন্দরের সংমিলন নিশ্চয় সুন্দরতর। পরন্তু সেই সংমিলনের সংযোগ-সূত্রও সুন্দর বটে; নহিলে, সংমিলন সম্ভবে না। জলেই জল বাহির করে। চোরেই চোর ধরিতে পারে। কবিতা ব্যতীত আর কেহই এক কবিতাকে

অপর কবিতার নিকটবর্ত্তী করিতে পারে না। নিকটকারিণী কবিতার নামই তুলনা বা সমালোচনা। পক্ষান্তরে,—কবিমাত্রই তুলনার সংযোজক বা সমালোচক।

সৌন্দর্য্যতত্ত্ববিদ্ বলেন, সুন্দর সাদৃশ্যের 'সংযোজনাই' কবিতা; উৎকৃষ্ট উপমা ও উপাদেয় উদার তুলনাই কবিতা। * অতএব এ হিসাবেও কবিতা সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিকারিণী তুলনা। অতএব সুন্দরের সৌন্দর্য্য-সাদৃশ্যের সমালোচনাও কবিতা। †

কুসুমে কবিতায় তুলনা সুন্দর, এবং সমুন্নত ভাবোদ্দীপক বটে। সমুন্নত-ভাবোদ্দীপক কিসে, বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পারিবে।

প্রস্ফুটিত কুসুম—প্রস্ফুটোন্মুখ কুসুম-কলি কবিতা—কবিতারও কবিতা;—জাগ্রত, জীবন্ত, দেদীপ্যমান, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ কবিতা। কেবল তাহাই নয়। কুসুম কথাটীও কবিত্ব দিয়া গঠিত। কবিতা কথাটীও তাই দিয়া তৈয়ার করা। কুসুম কথাটীতে কুসুমত্ব ও কবিত্ব ক্রীড়া করিতেছে। কবিতা কথাটীতে কোমলত্ব ও কবিত্ব কোলাকুলী করিয়া রহিয়াছে। কুসুম এবং কবিতা; এই দু'টী শব্দ যিনি বা যাঁহারা সৃষ্টি বা সংগঠন করিয়াছিলেন, তিনি বা তাঁহারা অপরিজ্ঞাত অমর কবি। স্বভাবানুকরণ যদি শব্দ-সৃষ্টির সোপান হয়, তাহা হইলে, এবং তাহা না হইলেও, ঐ দুই শব্দে কুসুম-স্বভাব ও কবিতা-স্বরূপ সবিশেষ বিকশিত হইয়া রহিয়াছে।

কুসুম কথাটী মুখের বাহির হইতে হইতেই কাণের ভিতর দিয়া মনে তখনই প্রবেশ করিয়া মর্ম্ম-স্পর্শ করে; মনকে সুন্দরের সৌন্দর্য্য অনুভব ও উপভোগ করায়। কবিতা কথাটীও সেইরূপ। শব্দটী শুনিতে শুনিতেই মন সৌন্দর্য্য-স্পৃষ্ট হয়; সুন্দরকে সহসা সম্মুখে দেখে; স্নায়ু-শৃঙ্খল সন্দীপন করিয়া, শোণিত-প্রবাহ দিয়া, যেন একটী কোমলতার তরঙ্গ—মধুরতার প্রবাহ, প্রাণ-বায়ু আনন্দে আলোকিত করিয়া, ছুটিয়া যায়।

* Poetry consists in liberation of beautiful analogies.

† বলা আবশ্যক যে, তুলনামাত্রই কবিতা নয়; সুন্দর ও সমুন্নত ভাবোদ্দীপক এবং সরল ও সম্যক সাদৃশ্যপরিজ্ঞাপক তুলনাই কবিতা। এ নিয়মে, গদ্য ও পদ্যের প্রভেদ কেবল ছন্দে, যতি-স্থাপনে, ভাষা-সংগঠনে বা লিপি-শরীরে; কবিত্বে ও কবিতায় নহে। গদ্য ও পদ্য উভয়ই, এ নিয়মে কবিতা বা কাব্য হইতে পারে। প্রত্যুত পদ্যে এ নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিলে কবিতা হইতে পারে না। গদ্য এ নিয়মানুরূপ অর্থাৎ সৌন্দর্য্যজ্ঞাপক ও সমুন্নতভাবোদ্দীপক হইলে কাব্য হয়। তুলনা কেবল সুন্দর হইলে ও সমুন্নতভাবোদ্দীপক না হইলে কবিতা হয় না, রসিকতা হইতে পারে। —লেখক।

সর্ব্বত্রই এমনতরটা না হউক, ইহা অপেক্ষা না—হয় কিছু কম হয়। যে সব স্থলে সৌন্দর্য্যানুভূতি তীক্ষ্ণ, মধুরতা ও কোমলতা গ্রহণের শক্তি সজাগ, শিক্ষিত ও সজীব,—এক কথায়, যে সব স্থলে, প্রকৃতি কাব্য-প্রবণ; হৃদয় ভাব-রসাভিজ্ঞ, আত্মা অতীন্দ্রিয় দ্রব্যাকর্ষণ ধারণক্ষম, সেই সব স্থলেই ঐ আলোক ও বিদ্যুৎপ্রবাহ খুব বেশী ফুটে—খুব বেশী বেশী ছুটে। * কিন্তু এমন স্থলও অবশ্য আছে; হায়! তেমনই স্থলই অধিক, যেখানে উহার কোনও কিছু হয় না। আলোকও ফুটে না, বিদ্যুৎও ছুটে না, তরঙ্গও উঠে না। সে সব স্থলে কুসুম, কবিতা, সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাদি অতি লঘু অসার পদার্থ বা অপদার্থ। † সে সকল স্থলে, কবিতা অপেক্ষা কড়াই ভাজাই অবশ্য অধিক প্রিয়। কুসুম অপেক্ষা কচু, কাঁচকলা, কুমড়া প্রভৃতি সসার পদার্থের মূল্য অধিক, অতএব মর্য্যাদাও

* ইহাই সৌন্দর্য্যানুভব;—appriciation ও admiration অবস্থাটী – ভাবটুকু, ঠিক কিরূপ, বাক্যের বা বর্ণের দ্বারা আঁকিয়া দেখান যায় না। তাহা কেবল অন্তরিন্দ্রিয়েরই অনুভবনীয়।

† কুসুম না-হয়-কোনও-কিছু-একটা পদার্থ ই হইল। হাঁ, উদ্ভিদ বটে। কুসুম মানে ফুল। ফুল দিয়া ঠাকুর-পূজা করিতে হয়, করি; তা, সে কাজটীও কেবলমাত্র ফুলে হয় না। বিল্বপত্র লাগে। সর্ব্বোপরি তণ্ডুল ও কদলীর দরকার হয়। নহিলে দৃষ্টি-ভোজী দেবতারও পেট ভরে না। ভট্টাচার্য্যের ভরা ত পরের কথা। যদি কেবল ফুলেই দেবতাদের চলিত, তাহা হইলে দুনিয়াশুদ্ধ লোক দুর্গোৎসব করিত। তবে ফুলের মালা বেচে কিছু পয়সা হয় বটে। তা সে কয় পয়সাই বা! নেহাত অন্য রকম বিষয়কর্ম্ম না থাকে, ফুল তোলো, মালা গাঁথো; দুটা পয়সা পাবে। এক দণ্ডের ওয়াস্তা—ফুলের মালা! অকর্ম্মা, আহম্মক, সৌখীন, 'ফাজিল' প্রকৃতির লোকেরাই, পয়সা দিয়া ফুলের মালা কিনিয়া গলায় পরে, আর পরায়। তাহাতে কাহারও পেট ভরে না। ফুলের গন্ধ খেয়ে কে কয়দিন কাটাতে পারো বাপু? ফুলে, তবে ইহলোকের কোন্ কাজ হয়? মন্ত্র পড়িয়া, ফুল দিয়া (তাহাতেও চন্দন চাই—শুধু ফুলে হয় না) দেবতার পূজা করিলে পুণ্য ও পরলোকের কিছু কল্যাণ হইতে পারে বটে; কিন্তু, ফুল গলায় পরিলে, চুলে গুঁজিলে, কাণে দোলাইলে, ইহকালের কোনও কাজই ত হয় না, পরকালেরও পুণ্য ও পরিত্রাণ হয় না। প্রত্যুত তাহাতে পাপই আছে। কবি, 'ককনী' নট, লম্পট, স্ত্রৈণ, স্ত্রীজন, বিলাসী ও অপব্যয়ী বাবুরাই ফুলের অনুরাগী, ভ্রষ্টা রমণীই ফুল-সোহাগী। পুরস্ত্রীর পক্ষে পুষ্পের আঘ্রাণ, পুষ্পেরই জন্য, পুষ্পপ্রীতি মহাপাতক। প্রণয়ী প্রণয়িনীর ত কথাই নাই। প্রণয় পদার্থ টাই পাপসূচক—ব্যভিচার-ব্যঞ্জক; "স্বধর্ম্ম" অর্থাৎ আর্য্য-ধর্ম্মের বিরুদ্ধ, অশুচি, অশাস্ত্রীয়, বেদপুরাণ স্মৃতির অসম্মত, হিন্দু সাহিত্যের এবং আচার ব্যবহারের বহির্ভূত! অনার্য্য ইংরেজী সাহিত্য আমদানী হইয়াই অস্মদ্দেশ উৎসন্ন যাইতেছে; "প্রণয় প্রণয়" বলিয়া একটা পৈশাচিক রব উঠিয়াছে, পুষ্পও যাইয়া প্রণয়ের সঙ্গে জুটিয়াছে। জাহান্নবে যাওয়ার আর বাকি কি! প্রায় ষোল আনা পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

অধিক। মন, এ সব স্থলে, কেবল অন্ন ব্যঞ্জনেরই অপর অবয়ব; কাযেই যত অন্ন ব্যঞ্জনই ইহাদের যথাসর্ব্বস্ব। অতএব, এ সকল স্থলে কবিতা ও কুসুমাদির অশরীরী সৌন্দর্য্য ও আধ্যাত্মিকতা উপস্থিত করা উনপঞ্চাশবায়ু-গ্রস্থ ব্যক্তির বাতুলতা-কোষেরই কার্য্য বটে।

কুসুম কথাটা শুনিয়া তাহার কুসুমত্ব ও কবিত্ব "কনকুত" করিবার জন্য তখনই কুসুমকে দেখিতে কাহারও দৌড়িতে হয় না। কবিতা শব্দটী শুনিয়া কবিতার কোমলতা ও মধুরতা মাপিয়া মূল্য নিরূপণ করিবার জন্য, তখনি একখানা কাব্য খুলিয়া কোনও কবিতা পাঠ করিতে বসিতে হয় না। যাহাদের হয়, তাহারা নিশ্চয়ই আলু কচুর উপাসক। কিন্তু আত্মা একান্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন না হইলে, আলুতেও আলোক্ এবং কচুতেও কবিতা পাওয়া যাইতে পারে।

কথাটার আসল তাৎপর্য্য এই যে, আলোক এবং কবিতা, মধুরতা এবং কোমলতা 'এণ্ড কোম্পানীর কারখানা, কারবার, কার্য্যালয়, ফারম এবং আফিস সমস্তই অদৃশ্য আত্মার মধ্যে। বাহিরে কেবল তাহাদের মালগুদাম মাত্র। মালের এবং মালের মূল্যের 'ইনভয়েস' আত্মার অভ্যন্তর হইতেই ইস্যু হয়। অতএব আত্মার ইনভয়েস—কাব্য-রসের "বিল অব লেডিং" যাদের 'ক্রেডিট' ইস্যু না হইয়াছে, তাহারা কাযেই মাল পায় না। মালের মূল্য ও মর্য্যাদাও বুঝে না। মাল গুদামের বাহিরেই কেবল ঘুরিয়া বেড়ায়। *

* কাযেই গুদামগুলি কেবল দেখিতে পায়। গুদামের ভিতরে যে কি, তাহা জানে না। কচু, ঘেঁচু, কলা, মূলা গিলিয়া উদরবিবরের গভীর গর্ত্তখানা বুজাইতে পারিলেই পরিতৃপ্ত হয়। সেই তৃপ্তি ছাড়া আর কিছুরই তোয়াক্কা রাখে না। ক্ষণমাহাত্ম্যে দেব-দুর্ল্লভ স্বর্গের সুধা সম্মুখস্থ হইলেও শুঁকিয়া ফেলিয়া দেয়। হো হো করিয়া হাসে, হাততালি দিয়া তামাসা করে। বলে—"এ আবার কি! ইহা ত আমাদের সেই সুভক্ষ্য সারাল দ্রব্য নয়। এ যে মিছরীর পানার মিহিদানা! জলসাবু পাতিনেবুও যে এর চেয়ে ঢের সারযুক্ত। আকাশের এসেন্স কি আবশ্যকে লাগে? চোখেই যেটা দেখা যায় না, সেটাতে কি আর জঠরানল জুড়ায়।" এ কথা সত্য—ষোল আনাই সত্য।

কিন্তু, কবি বাবুদের খুব কম লোকেই এ কথাটা বুঝেন। কবিগোষ্ঠীর আর যতই গুণজ্ঞান থাকুক, কাণ্ডজ্ঞানের ভাগটা তাঁদের হয় ত, কিছু কম। জীবমাত্রেই তাঁদের কাব্যরস গ্রহণ করিবে, তাঁরা ইহা ইচ্ছা করেন, আশা করেন—আবদার করেন। সে ইচ্ছা—আশা—আবদার অবশ্যই পূর্ণ হয় না। কবিগোষ্ঠী ক্লিষ্ট হন, কুপিত হন, অভিমানে আত্মহারা হন, ম্রিয়মাণ হন;

কিন্তু, যাহাদের হৃদয়ে রস আছে, তাহাদের সে রস রগড়াইয়া বাহির করিতে হয় না; ছেঁচিয়াও নিঙ্গড়াইতে হয় না। তাহা স্পর্শমাত্রই প্রবাহিত, প্লাবিত হয়।

কুসুমে কবিতায় উপমা সুন্দর, উত্তম এবং উপযোগীও বটে। কেন না, উপমেয় এবং উপমান অনেকাংশে একই রূপ।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, গৌরব, কোমলতা, কান্তি, মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য কুসুমের মত কবিতারও আছে;—থাকাই চাই, নহিলে কবিতা কুসুম হইবে কি বলিয়া? থাকে এবং থাকিবে বলিয়াই কবিতা-কুসুম, কবিতার নামও কবিতা হইয়াছে।

কিন্তু সব কবিতাই কি কুসুম; সব কুসুমই কি একই রকমের ফুল; এবং সব ফুলই কি সৌন্দর্য্যে ও সৌরভে গৌরবশালী?

না, তা নয়। ফুল-রাজ্যে অসংখ্য প্রকারের ফুল। কবিতা-সংসারে অসংখ্য রকমের কবিতা। অতএব উত্তর এত সহজ যে, সমালোচনা না করিলেও চলে।

বেল, মল্লিকা, জুঁই, গোলাপ গন্ধরাজ, কুন্দ, কেতকী কি নাই? পুষ্প-রাণী একা পদ্মিনীরই কত রকমের রূপ, কত রকমের পোষাক, সৌন্দর্য্য, সোহাগ এবং সুবাস, পবিত্রতার এবং প্রণয়ের নিঃশ্বাস। পরন্তু পদ্মরাণীর নিবাসে তাঁহার তাম্বূল-করঙ্কবাহিনী (?) (না-লেডিজ্ মেইড়?) পরিচারিকা মৃণালীরও, না কোন রূপ, রস, বর্ণ, বিলাস্, মৃদুহাস্য, নয়নভঙ্গী ও নির্ম্মল হৃদয়খানি দেখিয়া তুমি বিমুগ্ধ না হও? পুষ্পরাজ্যে সূর্য্যমুখী, চন্দ্রমুখী, চামেলী, শেফালী, কে না আছে? কৃষ্ণকেলি, কামিনী, করবী, কুরুবক, কতই না ফুল? পলাশ, জবা, টগর, দোমুখী, ডেজী, দেশী, বিলাতী ব্রাহ্মণী, যবনী, অসংখ্য, অসংখ্য, অসংখ্য ফুল। ভিন্ন ভিন্ন রঙ্গের, ভিন্ন রূপের, ভিন্ন রসের, ভিন্ন ভিন্ন সৌরভের কত রকমেরই কত কুসুম। এক গোলাপই দেখ কত জাতীয়। বাঙ্গালী গোলাপ, আর বোসরাই গোলাপ কি এক? বাঙ্গালাই, বোসরাই, বিলাতী, এই তিনের মধ্যেও আবার অগণিত শ্রেণীর গোলাপ। সকলেরই কি একই রকম গন্ধ, রূপ, লাবণ্য মাধুরী? বর্ণ-বৈভব, রূপ-ঐশ্বর্য্য, সৌরভ-সৌন্দর্য্য, কুসুম-কান্তি, সুষমা, মধুরিমা প্রায়

না-হয়-যে-কি, জানি না। তা, যাহাই হউন, কুকুরে কখনও কবিতা বুঝিতে পারে না। কুসুম-ঘ্রাণ নিশ্চয়ই কাকে কখনও লইতে যায় না। শুভ্র জ্যোৎস্না-স্রোতে ছুছুন্দর জাতি কখনও সাঁতার কাটিয়া কেলি করে না, এবং প্রেমের পুলকোচ্ছ্বাসে ছুছুন্দরী সুন্দরীকে কুসুমোপহার দিয়া কেলির কবিতা পড়িয়া শুনায় না;—কবিদের এটা জানা কর্ত্তব্য।

সব কুসুমেরই আছে। কিন্তু স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। পরন্তু, সৌরভশালিনীর ন্যায় সৌরভ-বিহীনাও কোন্ নাই? রূপ-রস-গর্ব্বিতার ন্যায় রূপ-রস-আবৃতা বিনম্রমুখীও দেখিতে পাইয়া থাক। গোলাপও ফুল, গাঁদাও ফুল, অশোক, অপরাজিতা, কিংশুক, কদম্ব, প্রত্যেকই পুষ্প বটে। পদ্মফুলও ফুল; ঘেঁটু ফুল কি আর ফুল নয়? কুসুম-রাজ্যে রাজা রাণী, নলিনী কমলিনীর ন্যায় কাঙ্গাল কাঙ্গালিনী না থাকিবে কেন? কাঙ্গাল কাঙ্গালিনী কুসুমের শোভা সৌন্দর্য্যের সুতীক্ষ্ণ ছটা ও সৌরভ-গৌরবের গর্ব্বিত ঘটা এবং লোক-বিখ্যাত সুখ্যাতি-সম্পদ না থাকিলেও কুসুম-কান্তি নিশ্চয়ই আছে। কুসুম কুসুমত্ববর্জ্জিত কিছুতেই নয়। তোমার আদরের উদ্যান-কুসুমটী আদরে, আহ্লাদে, ঐশ্বর্য্যে ফুটিয়া, বহুলোকের আদরে, প্রশংসায়, পরিচর্য্যায় হয় ত অমরত্ব পায়; আর ঐ গহনবনের বন্য কুসুম অনাদরে অজ্ঞাতে, আপন আনন্দে, আপনি ফুটিয়া আপনা-আপনি হয় ত শুকাইয়া যায়। আবার ফুটে, আবার শুকায়, পুনঃবার ফুটিয়া উঠে; কেহ দেখিতে পায় না। এইরূপে ফুটিয়া ফুটিয়া, শুকাইয়া শুকাইয়া, ঝরিয়া ঝরিয়া, ঝুরিয়া ঝুরিয়া, শেষে প্রাণত্যাগ করে। তাহাও কেহ দেখে না, হয় ত দেখিতে পায় না, বা দেখিয়াও দেখে না। কিন্তু তবুও সেই বন-কুসুম কুসুম বটে। অজ্ঞাতে অনাদরে প্রাণত্যাগ করিয়াছে বলিয়া সে পুষ্প অপুষ্প নহে, পুষ্পত্বহীনও নহে। তাহার কেশর, পরাগ, পরিমল, নিঃশ্বাস ও সুবাস, কি না ছিল। পুষ্পত্বের সবই ছিল। তোমার আদরের উদ্যানকুসুম অপেক্ষা হয় ত অধিকও ছিল। তাহার অসভ্য উচ্ছ্বাস, বন্যপ্রভা হয় ত তোমার সভ্য সুমার্জ্জিত উদ্যানকুসুমকেও পরাজয় করিতে পারিত। এমন কত বন্যকুসুম আবিষ্কৃত হইয়া উদ্যানে আনীতও ত হইয়াছে। কবিতার তেমনিতর বন্যকুসুম যখন উদ্যানে আনীত হইয়াছে—সভ্য-সমাজে সাহিত্যসংসারে পরিচিত হইয়াছে, তখন হয় ত সে পুষ্পের নিজের পুষ্প-লীলা ফুরাইয়া গিয়াছে, পুষ্প চিরবৃন্তচ্যুত হইয়া, বহুকাল পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া গিয়াছে, তাহার অবিনশ্বর পরিমলটুকু—পরিমলের প্রাণবায়ুটুকু বনে বনে ঘুরিতেছিল, তাহাই উদ্যানে আনীত হইয়াছে।

কুসুম সম্বন্ধে যেমন, কবিতা সম্বন্ধেও ঠিক তেমনই। কুসুম-জাতি ও কুসুমের জীবন সম্বন্ধে যে যে সর্ব্বজনজানিত কথা জানাইয়াছি—যে যে তথ্য ও সত্য বিবৃত করিয়াছি, কবিতার জাতিতে এবং কবির জীবনে তাহা একে একে যোগ কর, জমা কর, প্রতিপদে প্রয়োগ করিয়া পাঠ কর, দেখিবে, উভয়েরই একতা আছে।

কুসুমরাজ্যের কুসুমেরই মত, কবিতারাজ্যের কবিতাও নানা শ্রেণীর, নানা রকমের, নানা রূপের, রঙ্গের, রসের, রুচির, সৌন্দর্য্যের, ছন্দের, সৌরভের ইত্যাদি। কুসুমেও যেমন রূপে, রসে, সৌরভে "সরেস নিরেস" আছে, উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট আছে, উদ্ধত বিনম্র আছে, দুরন্ত, শান্ত, ধীর, চঞ্চল আছে, ধনী দরিদ্র আছে, সম্রাজ্ঞী ও সেবিকা কুসুম আছে, কবিতাতেও তেমনি রাণী ও কাঙ্গালিনী না থাকিবে কেন? সৌন্দর্য্য-সৌরভ-গৌরবান্বিতা বা গর্ব্বিতার মত গন্ধ-গৌরব-বিরহিতাও কোন নাই? চঞ্চলনয়নার ন্যায় বিনম্রমুখী কবিতাও বিস্তর। কবিতায় স্বর্ণ-গোলাপের ন্যায় ঘেঁটু ঘণ্টাকর্ণও বিদ্যমান; পোইট্রিতে পদ্ম জন্মে বলিয়া কি আর পলাশ প্রসূত হয় না, না হইবে না? পদ্ম যদি পুষ্প হন, পলাশও পুষ্প নিশ্চয়। কমলিনী কবিতা রাণীর রাজভাণ্ডার রূপরসে সৌরভ-সম্পদে সদাই পূর্ণ বটে; কিন্তু কাঙ্গালিনীর অলঙ্কার-বিহীন অঙ্গেও এক অনুপম কান্তি আছে। কাঙ্গালিনী—কাঙ্গালিনী বলিয়া কি তুমি তাহার দেহে, তাঁহার হৃদয়ে কোনও কান্তিই দেখিতে পাও না? ছি ছি! তাহা হইলে যে বড় লজ্জার কথা! অনেক সময়ে যে কাঙ্গালিনীর কান্তিই নিষ্কলঙ্ক, অধিকতর নির্ম্মল এবং স্নিগ্ধ। অত্যুচ্চ উত্থিত উগ্র অরুণ কিরণৈশ্বর্য্যে আঁখি যখন উত্তপ্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া অন্ধ হইবার উপক্রম হয়, পৌর্ণমাসীর পরিপূর্ণ শশীর সর্ব্বগ্রাসা উত্তাল, উদ্দাম, অগাধ, উন্মত্ত, মদিরাময়, মধুর জ্যোৎস্নার অতি জাগ্রত জ্যোতির অবিরাম তরঙ্গ-তুফানে, সন্দীপ্ত-সৌন্দর্য্য-সাইক্লোনে যখন তুমি ভাসিয়া, ডুবিয়া, প্লাবিত হইয়া যাও, কোনও দিকেই কূল পাও না, পূর্ণতার অপ্রশম্য প্রভাবে যখন প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে, যখন লাবণ্য-রাণীর অতুল রূপরাশির অত্যুজ্জ্বল রশ্মি-ছটা তোমার নয়ন মন আচ্ছন্ন অবসন্ন করে—তাহার সৌরভ-উচ্ছ্বাসে—সৌরভের শীতল সন্তাপ তুমি আর সহ্য করিতে পার না, তখন, বল দেখি, তোমার উদ্‌ভ্রান্ত, ক্লান্ত চিত্ত কি চায়? তখন কবিতা রাজরাণীর অত্যুচ্চ অতি-আলোকিত অট্টালিকা হইতে সটান নিম্নে নামিয়া আসিয়া কবিতা কাঙ্গালিনীর মৃদু, স্নিগ্ধকান্তির মৃদু স্নিগ্ধ ছায়ালোকসংক্ষুব্ধ সামান্য ও সাধারণ পর্ণকুটিরখানিতে বসিতে, বসিয়া অবাধে অসঙ্কোচে বিশ্রাম করিতে সাধ যায় না? সুন্দরী তোমার সন্দীপন করেন, মার্জ্জিতা তোমার মন হরণ করেন, কিন্তু কুৎসিতা তোমার সেবা করে। কুৎসিতা কি কেহই নয়? কুৎসিতার কুরূপ দেখিয়া তুমি মুখ ফিরাও; কিন্তু তাহার প্রাণের "পলস্" তুমি কি কখনও "ফিল্" করে দেখেছ? শুধু পদ্ম-মধুই কি জীবনোপযোগী? কেবল গোলাপ-গন্ধই কি পুষ্পরাজ্যে প্রচুর হইত? কেবল বাল্মীকি, কালিদাস, সেক্সপীয়র, টেনিসনই কি,

কাব্যরাজ্য পরিপূর্ণ করিতে পারিতেন? বাল্মীকি-কালিদাসাদিরই মত কি কবিকঙ্কণ কৃত্তিবাস কাশীদাসের দরকার নাই?

এই সব কথার সারসংগ্রহ এই যে, শ্রেষ্ঠ আর নিকৃষ্টই হউক, কুসুম কুসুমই বটে, কবিতা কুসুমই বটে, কবিতা কবিতাই বটে, এবং কুসুমও কবিতা বটে।

প্রাচীন শিল্প-পরিচয়।

পাকবিদ্যা।

আর্য্যসাহিত্যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই পাক-বিদ্যার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় এই বিদ্যাও সভ্য-সমাজে বিশেষ পরিচিত ছিল। এমন কি, স্বাধীন রাজা এবং রাজ-পরিবারবর্গও আগ্রহের সহিত এই বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। পুণ্যশ্লোক নৈষধ এবং মধ্যমপাণ্ডব ভীমসেন এই বিষয়ে উদাহরণস্বরূপ উপন্যস্ত হইবার যোগ্য। বাৎসায়নের কামসূত্রে এবং তাহার টীকায় এই বিদ্যা চতুঃষষ্টিকলার অন্যতম বলিয়া কথিত হইয়াছে। শিল্পেরই অংশবিশেষ কলানামে পরিচিত। রাজপুত্রদিগের বিদ্যাশিক্ষা বর্ণনপ্রসঙ্গে কলা-শিক্ষারও উল্লেখ দেখা যায়। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে যেমন নিরক্ষর উড়েঠাকুর বা বিষ্ণুপুরের চাটুয্যে পাচকের পদ একচেটিয়া করিয়াছে, এবং বড়লোকের ভক্ষ্যান্নরস-পাচকতার ভার বাবুরচীর উপরই ন্যস্ত হইয়াছে, পূর্ব্বকালে তেমন ছিল না। সেকালে অন্যান্য বিদ্যায় সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ নানাশ্রেণীর খাদ্য প্রস্তুত করিত, এবং তাহাতে নৈপুণ্য দেখাইয়া সভ্যসমাজে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিত। ভীমসেন বলিয়াছিলেন যে, যে সকল সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইঁহার (বিরাটের) জন্য বিবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া থাকে, আমি তাহাদিগকেও পরাভূত করিব।

খাদ্যের প্রস্তুত-প্রণালীর প্রতি লক্ষ্য করিলে, পক্ক ও অপক্ক, এই দুই প্রকার খাদ্যের বিভাগানুসারে পাক ও তদতিরিক্ত প্রক্রিয়া, এই দুই প্রণালী দেখা যায়। তন্মধ্যে পাকের নানাপ্রকার পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়। (১)

অনেকের বিশ্বাস এবং অভিমত যে, মুসলমানের শুভাগমনের পর হইতেই

---

(১) কৃতপূর্ব্বাণি যৈরস্য ব্যঞ্জনানি সুশিক্ষিতৈঃ।
তানপ্যভিভবিষ্যামি প্রীতিং সঞ্জনয়ন্নহম্।—বিরাটপর্ব্ব ; ২য় অধ্যায়।

নানাশ্রেণীর উপাদেয় খাদ্য ভারতবাসীর রসনা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব-রস-বিতরণে তাহাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে। পলান্ন প্রভৃতি নৈপুণ্যোদ্ভাবিত নরদুর্লভ অমৃতায়মান খাদ্য মুসলমান নরপতিবৃন্দের পরিপ্রীণনসম্পর্কেই ভারতে পদ-ক্ষেপ করিয়াছে। এই সকল কথা আপাততঃ অতীতযুগের অবস্থা-জ্ঞাপক ইতিহাসের উপাদান বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু সেই সুপ্রাচীনযুগের সংহিতা, পুরাণ, ব্যাকরণ, কাব্য, নাটক, চিকিৎসাগ্রন্থ প্রভৃতির প্রতি মনোনিবেশ করিলে দেখা যায়, যাহা আমাদের নিজস্ব ছিল, তাহাই ঘটনাচক্রে কালের আবর্ত্তনে বিদেশে উদ্ভাবিত শিল্প বলিয়া আজ বিবেচিত হইতেছে।

কত জিনিসে যে এই বিদেশীয় স্বত্ব স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহাই সম্পূর্ণভাবে দেখাইতে অনেক সময়ের ও যত্নের প্রয়োজন ;—সুতরাং আজ কয়টিমাত্র পক্কবস্তুর উল্লেখ করিব।

পলান্ন ও পোলাও, এই উভয় শব্দের পর্য্যায়তায় কাহারও প্রায় বিপ্রতিপত্তি দেখা যায় না। কারণ, বর্ত্তমান সময়ে পোলাও যে প্রণালীতে পক্ক হইয়া থাকে, আমাদের পুরাতন পলান্নও এই প্রণালীর অতিক্রম করিত বলিয়া বোধ হয় না। পলান্ন এই শব্দটি যোগরূঢ় ; পল অর্থ=মাংস, তাহার সহিত পক্ক অন্ন পলান্ন-নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রচুরপরিমাণ ঘৃতের সহিত ইঁহার পাক নিষ্পন্ন হয়, ইহার সৌরভে সর্ব্বদিক্ আমোদিত হইয়া থাকে। ঘৃতের বাহুল্যনিবন্ধন এই অন্ন সর্পিষ্মৎ নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভবভূতির লেখনী এই সর্পিষ্মৎ ভক্তের (অন্নের) মনোহর গন্ধে বাল্মীকির তপোবন সৌরভিত করিয়া গিয়াছে। (২)

এই পলান্ন যে কেবল মানবের উপভোগেই লাগিত, তাহা নহে ; দেবপূজার উপকরণরূপেও ইহার ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় বিনায়ক-শান্ত্যর্থ-পূজায় যে সকল উপকরণের নির্দ্দেশ আছে, তাহাতে পললৌদনের নামও দেখিতে পাওয়া যায়। কৃতাকৃত (অর্দ্ধকৃত) তণ্ডুল, পললৌদন, পক্ক ও অপক্ক মৎস্য এবং মাংস, বিচিত্র পুষ্প সুগন্ধ-দ্রব্য, এবং বিবিধপ্রকার সুরা। (৩)

(২) গন্ধেন স্ফুরতা মনাগনুসৃতো ভক্তস্য সর্পিষ্মতঃ।
কর্কন্ধূফলমিশ্রশাকপচনামোদঃ পরিস্তীর্য্যতে ॥—উত্তরচরিত। ২য় অ।

(৩) কৃতাকৃতাংস্তণ্ডুলাংশ্চ পললৌদনমেব চ।
মৎস্যান্ পক্কাং স্তথৈবামান্ মাংস মেতাবদেব তু ॥
পুষ্পং চিত্রং সুগন্ধঞ্চ সুরাঞ্চ বিবিধামপি ॥—১অ। ২৮৭—৮৮

অত্রত্য পললৌদন ও পলান্ন সমানার্থক; কারণ, পলল=মাংস, তাহার সহিত পক্ব ওদন (অন্ন) পললৌদন নামেও পরিচিত ছিল। যদিও অপরার্ক এবং মিতাক্ষরা পললৌদন শব্দের তিলপিষ্টমিশ্র ওদন (৪) এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি আমরা অবিচারিতভাবে তাঁহাদের এই মত গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ, অভিধানে পলল শব্দের অর্থান্তর দৃষ্ট হইলেও, মাংস অর্থেই ইহার প্রসিদ্ধি দেখা যায়। সুতরাং পলান্নের সমানার্থ পললৌদন শব্দের প্রসিদ্ধার্থ-পরিত্যাগের হেতু দেখা যায় না। পিষ্টতিলের সহিত অন্ন-পাক প্রসিদ্ধও নহে।

এই অন্নে ঘৃতের প্রাচুর্য্য-নিবন্ধন কবিপ্রবর ভবভূতি সর্পিতেই ইহার পাক নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র উভয়েই পরশুরামকে বলিতেছেন—সর্পিতে অন্ন-পাক করা হইয়াছে, বৎসতরী সংজ্ঞপন করা হইয়াছে, তুমি শ্রোত্রিয়, শ্রোত্রিয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়াছ; আমাদের এই সকল দ্রব্য গ্রহণ কর। (৫)

এই উক্তিতে বুঝা যায়, আজকাল যেমন বিশিষ্ট অতিথি সমাগত হইলে, তাঁহার জন্য পোলাও মাংসের ব্যবস্থা করা হয়, পূর্ব্বকালেও এইরূপ হইত।

কন্দু-পক্ব।

প্রাচীন সাহিত্যে "কন্দু-পক্ব" নামক একশ্রেণীর খাদ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। "কন্দু-পক্ব" এই শব্দটি যৌগিক, অর্থাৎ দুইটি শব্দের মিশ্রণে নিষ্পন্ন। কন্দুতে পক্ব বস্তু "কন্দু-পক্ব" নামে অভিহিত হয়। সুতরাং কন্দু-পক্ব চিনিতে হইলে প্রথমতঃ কন্দু চেনা আবশ্যক।

অমরসিংহ একটি কারিকার্দ্ধে "অম্বরীষ," "ভ্রাষ্ট্র," "কন্দু," ও "স্বেদনী," এই চারিটি শব্দ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। (৬) আপাততঃ এই কারিকার্দ্ধ-পাঠে বোধ হয়, যেন এই চারিটি শব্দই একার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু টীকাকার ভানুজী-দীক্ষিত "অম্বরীষ" ও "ভ্রাষ্ট্র," এই উভয় শব্দকে ভর্জনপাত্র (খোলাহাঁড়ী) নামে নির্দ্দেশ করিয়া, "কন্দু" ও "স্বেদনী" এই উভয় শব্দের অর্থান্তর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে,—শোষণার্থ "স্কন্দ" ধাতুর উত্তর ঔণাদিক উ প্রত্যয়ের দ্বারা এবং সকার-লোপের দ্বারা "কন্দু" এইরূপ সিদ্ধ হইয়াছে। (৭) "স্বেদনী" শব্দের

(৪) তিলপিষ্টমিশ্র ওদনঃ পললৌদনঃ।—৫৫পৃ অপরার্ক।

(৫) সংজ্ঞপ্যতে বৎসতরী সর্পিষান্নং বিপচ্যতে।
শ্রোত্রিয়ঃ শ্রোত্রিয়গৃহানাগতোঽসি জুষস্ব নঃ॥—বীরচরিত। ৩ অঙ্ক।

(৬) ক্লীবেঽম্বরীষং ভ্রাষ্ট্রো না কন্দুর্বা স্বেদনী স্ত্রিয়াম্।—

ব্যুৎপত্তি দেখাইয়াছেন যে, স্বিদ ধাতুর উত্তর অধিকরণবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয়ের দ্বারা "স্বেদন" এইরূপ সিদ্ধ হইয়া, স্ত্রীলিঙ্গে ঈকার-যোগে "স্বেদনী" এই রূপ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

ধাতুপ্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দের অর্থ স্বেদ করা হয়, অর্থাৎ তাপ দেওয়া হয় যাহাতে। "কন্দু" শব্দেরও ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ শোষণ করা হয় যাহাতে। কন্দু ও স্বেদনী একার্থক শব্দ। দীক্ষিত মহাশয় ইহাকে মদ্যনির্ম্মাণোপযোগী করাহী নামে প্রসিদ্ধ পাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি যে এই অর্থনির্দ্দেশে সর্ব্বতোভাবে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। আচার্য্য হেমচন্দ্র "ভক্ষ্য-কার" ও "কান্দবিক," এই উভয়ের একর্থতা নির্দ্দেশ করিয়া "কন্দু" ও "স্বেদনিকা," এই উভয়ের একার্থতা কীর্ত্তন করিয়াছেন। (৮) তাঁহার এই উক্তিতে "ভ্রাষ্ট্র" হইতে "কন্দু"র পার্থক্য সুস্পষ্ট উপলব্ধ হইতেছে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থের অতিরিক্ত কন্দুর স্বরূপজ্ঞাপক বিশেষ কিছু জানা যায় না। হেমচন্দ্র যে পর্য্যায়ে ভক্ষকারের ও কান্দবিকের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অমরসিংহ সেই পর্য্যায়ে "আপূপিকে"রও উল্লেখ করিয়াছেন। এই আপূপিক ভক্ষকারের অন্তরালে অতীত-সমাজ-তত্ত্বের এক গূঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে যেমন "খাবার" বলিলে লুচী, কচুড়ী প্রভৃতি খাদ্যবিশেষকেই বুঝায়, সেইরূপ পূর্ব্বকালেও "ভক্ষ" বলিলে সাধারণ খাদ্য না বুঝাইয়া "কান্দব" অর্থাৎ কন্দুপক্ব খাদ্যই বুঝাইত। মহাভারতে ভীমের উক্তিতেও সাধারণ অন্ন হইতে "ভক্ষে"র স্বতন্ত্র উল্লেখ দেখা যায়।

"ভক্ষান্ন-রসপানানাং ভবিষ্যামি তথেশ্বরঃ।"—বিরাট পর্ব্ব।

এই শ্রেণীর খাদ্য পিষ্টক-সমানার্থক অপূপ-পদবাচ্য খাদ্য হইতে স্বতন্ত্র বস্তু হইলেও, অমরসিংহ এই যৎকিঞ্চিৎ ভেদকে অগ্রাহ্য করিয়া "কান্দবিকে"র পর্য্যায়ে "আপূপিকে"র সন্নিবেশ করিয়াছেন। (৯) কান্দবিক শব্দের ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থানুসারে বুঝা যায়, কন্দুতে সংস্কৃত এই অর্থে, কন্দু শব্দের উত্তর অন্ প্রত্যয় হইয়া "কান্দব" এই রূপ সিদ্ধ হইয়াছে। কান্দব যাহার পণ্য

(৭) ভক্ষ-কারঃ কান্দবিকঃ কন্দুঃ স্বেদনিকে সমে।—মর্ত্ত্যকাণ্ড।

(৮) ঋচীষং পিষ্টপবনং।

(৯) কন্দু-পক্কানি তৈলেন পায়সং দধিশক্তবঃ।
দ্বিজৈ রেতানি ভোজ্যানি শূদ্র-গেহ-কৃতান্যপি॥—তিথিতত্ত্বে কূর্ম্মপুরাণ

(৪।৪।৫১) অর্থাৎ বিক্রেয়, এই অর্থে কান্দব শব্দের উত্তর "ঠক" প্রত্যয় হইয়া "কান্দবিক" এই রূপ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

অমরের উক্তির পৌর্ব্বাপর্য্যের পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, সাধারণ পিষ্টক হইতে কান্দব পদার্থ স্বতন্ত্র। কারণ, তিনি পিষ্টকের পাক-পাত্রকে "ঋচীষ" নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (১০) পিষ্টক এবং অপূপ একার্থক শব্দ। পিষ্টকের এবং কান্দবের পাক-পাত্র স্বতন্ত্র; পাক-প্রণালীও স্বতন্ত্র। পিষ্টকের পাক সাক্ষাৎ অগ্নিসাপেক্ষ; কান্দবের পাকে অগ্নির অপেক্ষা নাই। কন্দুটি উষ্ণ করিয়া স্বেদের উপযোগী করিতে কেবল অগ্নির অপেক্ষা। কারণ কন্দু শব্দের ব্যুৎপত্তি-লক্ষ্য অর্থ শোষকযন্ত্র; তাহাতে সংস্কৃত খাদ্য—"কান্দব"। সুতরাং "কান্দব" পিষ্টক যে সাধারণ পিষ্টক হইতে ভিন্ন, তাহা সুস্পষ্টই বুঝা যাইতেছে; অতএব "কান্দব"-মাত্রে অপূপ শব্দ প্রযুক্ত হইলেও, অপূপমাত্রে কান্দব শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না। হেমচন্দ্র এই ভেদের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই কান্দবিকের পর্য্যায় হইতে আপূপিকের নির্ব্বাসন করিয়াছেন, এবং কান্দবিকের নির্দ্দেশ করিয়াই তাহার পরিচয়ার্থ কন্দুরও নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে যেমন একশ্রেণীর লোক রুটী বিক্রয় করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে, এবং জীবিকার অনুসারে রুটীওয়ালা নামে পরিচিত হইয়া থাকে, সেইরূপ পূর্ব্বকালেও "কান্দব"-বিক্রেতা "কান্দবিক" নামে প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছিল।

এই শ্রেণীর ভক্ষ্য-দ্রব্য বৈশ্যগণ বিক্রয় করিত। বৈশ্য দ্বিজাতি, সুতরাং তাহার পক্কদ্রব্য খাইতে কাহারও আপত্তির কারণ ছিল না। যখন শূদ্রগণও এই শ্রেণীর পণ্যে হস্তক্ষেপ করিল, হয় ত সেই সময়ে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইল, শূদ্রগৃহ-কৃত ভক্ষদ্রব্য দ্বিজাতির খাদ্য কি না? জিজ্ঞাসিত শাস্ত্রকার মীমাংসা করিলেন,—"কন্দুপক্ক দ্রব্য প্রভৃতি শূদ্র-গৃহ-কৃত হইলেও দ্বিজাতির ভক্ষ্য হইবে। (১১)

এই শ্রেণীর কারখানাতে সর্ব্বতোভাবে শৌচাশৌচ বিবেচিত হয় না, তাহা দেখিয়াও হয় ত একটা আলোচনা হইয়াছিল। তাহার মীমাংসায় প্রয়াসী মহর্ষি শাতাতপ ব্যবস্থা করিলেন গোকুলে, কন্দুশালাতে, অর্থাৎ কন্দুর কারখানাতে,

(১০) গোকুলে কন্দুশালায়াং তৈলযন্ত্রেক্ষুযন্ত্রয়োঃ।
অমীমাংস্যানি শৌচানি স্ত্রীষু বালাতুরেষু চ॥

(১১) দ্বিপুরুষপ্রমাণ মৃন্ময়ং কন্দুসংস্থানম্। সূত্র। ১৫ অধ্যায়।

তৈল-যন্ত্রে, ইক্ষু-যন্ত্রে, এবং স্ত্রীলোক, বালক ও আতুরের সম্বন্ধে শৌচাশৌচ বিবেচ্য নহে। (১২)

মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে বিদূষকের উক্তিতে কন্দুর কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। রাজা অগ্নিমিত্র বিদূষককে বলিলেন,—সখে! অধিক আর বলিয়া ফল কি? আমার সম্বন্ধে তোমাকে কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিতে হইবে। উত্তরে বিদূষক বলেন, আপনাকেও আমার বিষয়ে ভাবিতে হইবে; কারণ, বিপণিস্থিত কন্দুর ন্যায় আমার উদরের অভ্যন্তর দগ্ধ হইতেছে।

এই উক্তিতে সাধারণতঃ বুঝা যায়, কন্দু বিপণিতে অবস্থিত হইত, এবং তাহার মধ্যভাগ দগ্ধ হইত।

চরকসংহিতায় জেন্তাক-স্বেদের প্রসঙ্গে কন্দুর উল্লেখ দেখা যায়। তত্রত্য স্বেদোপযোগী যন্ত্রটি দ্বিপুরুষ-প্রমাণ, মৃণ্ময় এবং কন্দুসদৃশ বলিয়া কথিত হইয়াছে। (১৩)

অভিধানে "হসন্তী" নামক এক প্রকার অঙ্গারবাহী ক্ষুদ্র শকটের পরিচয় পাওয়া যায়। (১৪) "হসন্তী" এই নামের অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে হয়, যে পদার্থ হাসিতেছে, তাহাই যেন হসন্তী শব্দের ধাতুপ্রত্যয়ানুযায়ী অর্থ। কিন্তু শকটীর হাস্য অসম্ভব; সুতরাং এই প্রয়োগটি সাদৃশ্যার্থে বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে ইহার অর্থ হইতেছে, হাস্যকারীর মত। জ্বলদঙ্গারপূর্ণ শকট ঔজ্জ্বল্যনিবন্ধন হাস্যকারীর সদৃশ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। জ্বলদঙ্গারেও অঙ্গার শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—

"অঙ্গারচুম্বিতমিব ব্যথমানমাস্তে।"

এই হসন্তী সম্ভবতঃ কন্দুর অভ্যন্তরদগ্ধকারী অঙ্গারের প্রবেশণ নিষ্কাশণ কার্য্যেই ব্যবহৃত হইত। এই সকল প্রমাণের প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে হয়, যে জিনিসের ব্যবহার সম্বন্ধে আর্য-যুগেও নানারূপ আলোচনা হইয়াছিল, পাণিনির পূর্ব্বেও যে জিনিসের বাচক শব্দের সাধনের প্রয়াস দেখা যায়, যাহার জন্য স্বতন্ত্র শালা বা প্রকোষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহা যে কত প্রাচীন, এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষ-

---

(১২) অঙ্গারধানিকাঙ্গারশকট্যপি হসন্ত্যপি। অমর; বৈশ্যকা। ২৯

(১৩) জলোপসেকং বিনা কেবলপাত্রে যদ্বহ্নিনা পক্বং ভৃষ্টতণ্ডুলাদি।

(১৪) স্কন্দেঃ সলোপশ্চ। উণাদি।১।১৫। স্কন্দিরগতি-শোষণাঃ। কন্দুরিতি স্কন্দত্যস্মিন্ জলতাপ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা ভোগস্থানমিতি কেচিৎ। অন্যে তু স্কন্দতি শোষয়তীতি "কন্দু" লোহাদি-পাত্রমিত্যাহঃ। অতএব "ক্লীবেহম্বরীষং ভ্রাষ্ট্রো না কন্দুর্ব্বা স্বেদনী স্ত্রিয়া" মিত্যমরঃ।

দিগের সহিত কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, তাহা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। সম্ভবতঃ কালের পরিবর্ত্তনে, কোনও অপরিজ্ঞাত কারণে আমাদের দেশ হইতে নির্ব্বাসিত "কন্দু"ই বর্ত্তমানে "তন্দুর" নামে পরিচিত হইয়া আমাদের সম্মুখে বিদেশীয় আগন্তুক-রূপে প্রতিভাত হইতেছে। "কন্দু"-পক্ক বা "কান্দব" পদার্থই পাঁউরুটী বিস্কুট্ প্রভৃতি অনার্য্যজুষ্ট নাম ধারণ করিয়া খাঁটী হিন্দুর অখাদ্য বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয়, কূর্ম্মপুরাণ-বচনের ব্যাখ্যায় "কন্দু-পক্ক" শব্দের যে অর্থনির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই অর্থ সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। তাঁহার মতে, জলোপসেক-ব্যতীত, অর্থাৎ কোনরূপ জলসম্পর্ক বিনা কেবল পাত্রে অগ্নির দ্বারা যাহার পাক নিষ্পন্ন হয়, তাহাই "কন্দু-পক্ক" নামে অভিহিত; যেমন ভাজা চাউল প্রভৃতি। (১৫) তিনি কন্দুপক্ক চিনাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু কন্দু শব্দের অর্থ-নির্ণয়ে তাঁহাকে উদাসীন বলিয়াই বোধ হয়। তাঁহার এই ব্যাখ্যা দেখিয়া মনে হয়, তিনি অমর-কারিকাস্থ অম্বরীষ হইতে স্বেদনী পর্য্যন্ত চারিটি শব্দকে অবিচারিতভাবে ভর্জ্জন-পাত্র অর্থেই গ্রহণ করিয়াছেন।

সিদ্ধান্তকৌমুদীর তত্ত্ববোধিনী-টীকাকারের উক্তিতে বুঝা যায়, তিনিও যেন চারিটী শব্দের একার্থতাই বুঝিয়াছেন, (১৫) এবং অদ্ভুত রকমের একটী ব্যুৎপত্তিও জনান্তরের মত বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনিই আবার মতান্তরে শোষণ-কারী লৌহপাত্রকে "কন্দু" নামে নির্দ্দেশ করিয়া, সমর্থনার্থ অমরের কারিকা উপন্যস্ত করিয়াছেন। এই সকল ব্যাখ্যা দেখিয়া মনে হয়, কি স্মার্ত্ত, কি তত্ত্ব-বোধিনী-কার, কেহই কন্দু জিনিসটা চিনিতে পারেন নাই; অথবা চিনিবার উপায়ও তাঁহাদের ছিল না। তেঁতুলপাতা সিদ্ধ খাইয়া গৃহিণীর হস্তে রক্তসূত্র পরাইয়া সংসার-সুখে অনাসক্ত মনীষিগণ নিরাপদে দার্শনিক কূট-তত্ত্বের মীমাংসা করিতে পারেন। বাহ্যনিরপেক্ষ আধ্যাত্মিক চিন্তায় লৌকিক-বৃত্তান্ত-জ্ঞানের আবশ্যকতা নাই সত্য, কিন্তু যে সমস্ত শাস্ত্রের সহিত সমাজতত্ত্ব, শিল্পকলা প্রভৃতি সংসৃষ্ট, তাহাদের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে হইলে, সেই সেই বিদ্যা, সমাজের তাৎকালিক অবস্থা, এবং শিল্প ও শিল্পোপকরণ, এই কয়টির সহিত বিশেষ পরিচয় আবশ্যক। এই সকল উপাদান সংগ্রহ না করিয়া যাঁহারা কেবল ব্যাকরণের অথবা কোষের সাহায্যে কোনও গ্রন্থের ব্যাখ্যানে প্রয়াসী হইয়াছেন, তাঁহারা অদ্ভুত ব্যাখ্যার উদ্ভাবন করিয়া আরব্ধগ্রন্থের সমাপন করিয়া গিয়াছেন। এই অনভিজ্ঞতার ফলেই কাহারও মতে "কন্দু" মদ্য-নির্ম্মাণোপযোগী পাত্র; কাহারও মতে, ভোগ-স্থান; কাহারও মতে, তাওয়া হইয়াছে।

শব্দকল্পদ্রুম, বিশ্বকোষ প্রভৃতি আধুনিক কোষের নিবন্ধৃগণও গতানুগতিকভাবে অসন্দিগ্ধচিত্তে পুরাতন ব্যাখ্যাতৃ-বর্গের প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন করিয়া সাহিত্যের পথ তমসাচ্ছন্ন করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাখ্যানের উপর সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিয়া যদি যুক্তিবলে পদ-পদার্থের বিচারপূর্ব্বক প্রকৃত-তথ্য-নির্ণয়ে প্রয়াসী হওয়া যায়, তাহা হইলে হয় ত অনেক স্থলেই মধ্যযুগের সিদ্ধান্তের অন্যথা ঘটিবে। কারণ, পদার্থ না চিনিয়া কেবল পদজ্ঞানের দ্বারা শিল্পের বা সমাজের প্রকৃত অবস্থা বুঝা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী বিবরণ উল্লেখযোগ্য।

মৃদঙ্গ যাহার শিল্প, এই অর্থে মার্দ্দঙ্গিক এই রূপ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ-নির্ণয়-প্রসঙ্গে মহাভাষ্যকার পূর্ব্বপক্ষের উত্থাপন করিয়াছেন যে, মৃদঙ্গ যাহার শিল্প, সেই যদি "মার্দ্দঙ্গিক" নামে অভিহিত হয়, তবে ত মৃদঙ্গ-নির্ম্মাতাই মার্দ্দঙ্গিক-সংজ্ঞা পাইবার যোগ্য; কারণ, মুখ্যতঃ মৃদঙ্গ তাহারই শিল্প, সে-ই মৃদঙ্গ-নির্ম্মাণের দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। কিন্তু লৌকিক ব্যবহারে মৃদঙ্গ-বাদকেই মার্দ্দঙ্গিক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়; অতএব বুঝিতে হইবে যে, লক্ষণার দ্বারা মৃদঙ্গ-শব্দ মৃদঙ্গ-বাদনে স্থিত হইয়াছে। সুতরাং মৃদঙ্গ-বাদন যাহার শিল্প, সেই মৃদঙ্গ-বাদকই মার্দ্দঙ্গিক নামে কথিত হইয়া থাকে।

মহাভাষ্যকার রাজা পুষ্পমিত্রের সভায় থাকিয়া মৃদঙ্গ-মার্দ্দঙ্গিকের সহিত পরিচিত ছিলেন, সুতরাং বিচারপূর্ব্বক প্রকৃত অর্থ বুঝাইতেও সমর্থ হইয়াছিলেন। যে ব্যক্তি মৃদঙ্গ চেনে না, মার্দ্দঙ্গিককেও জানে না, সে যদি মার্দ্দঙ্গিক শব্দের অর্থ-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সে যে তদ্ধিতের বলে মৃদঙ্গ-নির্ম্মাতা কুম্ভকারকেই মার্দ্দঙ্গিকের আসনে বসাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আলোচ্য বিষয়েও এইরূপ হইয়াছে, তাহা বুঝা যাইতেছে।

প্রায়শ্চিত্তবিবেক-কার কন্দুপকের উল্লেখ করিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, অনাপদ অবস্থাতেও শূদ্রান্ন-ভোজনশীল ব্রাহ্মণ শূদ্রগৃহে কন্দুপক প্রভৃতি বস্তু খাইতে পারেন। কিন্তু তাঁহার উক্তিতে কন্দু অথবা কন্দুপকের অর্থ-নির্ণয়ের প্রয়াস দেখা যায় না। তবে যে ভাবে তিনি প্রমাণগুলির বিন্যাস করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে মনে হয়, পিষ্টকবিশেষকেই যেন তিনি কন্দুপক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যথা,—

> "অনাপদ্যপি ভোজ্যবিশেষমাহ সুমন্তুঃ গোরসঞ্চৈব শক্তুঞ্চ তৈলং পিণ্যাকমেব চ। অপূপান্ ভোজয়েচ্ছূদ্রাদ্ যচ্চান্যৎ পয়সা কৃতম্ এতানি শূদ্রান্না দনিবৃত্তেনৈব ভক্ষ্যাণি।" ২৩৮ পৃ।

"সুমন্তু বলেন,—'ব্রাহ্মণ গোরস (দুগ্ধ), শক্তু, তৈল, খৈল, অপূপ, এবং

দুগ্ধনির্ম্মিত অন্যান্য বস্তু শূদ্র হইতেও গ্রহণ করিয়া খাইতে পারেন। শূদ্রান্নভক্ষণে অনিবৃত্ত অর্থাৎ শূদ্রান্ন খাইতে যাঁহার আপত্তি নাই, তিনিই উক্ত দ্রব্য খাইতে পারেন। ইহার পরেই আবার বলিয়াছেন—

"অতএব হারীতঃ—"কন্দুপক্বং স্নেহপক্বং পায়সং দধিশক্তবঃ।
এতানি শূদ্রান্ন-ভুজো ভোজ্যানি মনুরব্রবীৎ।"

"এই জন্যই হারীতও বলিয়াছেন,—'কন্দুপক্ব' স্নেহপক্ব (ঘৃতে বা তৈলে পক্ব), দুগ্ধনির্ম্মিত-দ্রব্য, দধিমিশ্রিত শক্তু, এই সকল দ্রব্যকে মনু শূদ্রান্ন-ভোজীর ভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সুমন্তু-বচনে অপূপ উক্ত হইয়াছে; হারীত-বচনে অপূপের পরিবর্ত্তে "কন্দু-পক্ব" পঠিত হইয়াছে। সুতরাং সুমন্তুর অভিমত অপূপ কন্দু-পক্ব অপূপ বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু টীকাকার গোবিন্দানন্দ বলেন,—অপূপ-পদে পয়োবিকার-কৃত অর্থাৎ ছানা প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত অপূপ বুঝিতে হইবে; যে হেতু পরবর্ত্তী অংশে "যচ্চান্যৎ পয়সা কৃতম্" এই উক্তির দ্বারা দুগ্ধকৃতেরই গ্রহণ করা হইয়াছে।

টীকাকারের এই উক্তির সারবত্তা অনুভূত হয় না;—কারণ বিবেককার যে দুইটি বচনের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে একটিতে অপূপ, অপরটিতে "কন্দু-পক্ব" শব্দ আছে; সুতরাং একই বস্তু এই উভয় পদের প্রতিপাদ্য বলিয়া বুঝা যাইতেছে, কন্দুতে যাহা পক্ব হয়, তাহাই কন্দু-পক্ব। ইহার উপাদান কি হইবে, শাস্ত্র-কারগণ তদ্বিষয়ে কোনও বিশেষ উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে বুঝিতে হইবে, পাকগত বৈজাত্যেই ইহার তাৎপর্য্য, উপাদান-বৈজাত্যে নহে। সুতরাং যচ্চান্যৎ এই উক্তির দ্বারা অন্যান্য পয়োবিকার-কৃতেরই গ্রহণ হইয়াছে, ইহার সহিত অপূপের কোনও সম্পর্ক নাই। সুমন্তু-বচনে "অপূপান্" এবং কূর্ম্মপুরাণ-বচনে "কন্দুপক্বানি," এই উভয় স্থলে বহুবচন দেখিয়া মনে হয়, "কন্দুপক্ব" অপূপের নানাপ্রকার শ্রেণীবিভাগ ছিল।

উপসংহারে ইহাও বক্তব্য যে, ভ্রাষ্ট্র ও কন্দু, এই উভয়ের একার্থতার আশঙ্কাই হইতে পারে না। কারণ, ভ্রস্জ ধাতুর উত্তর অধিকরণবাচ্যে ষ্ট্রন প্রত্যয়ে ভ্রাষ্ট্র শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ধাতুর অর্থ—পাক। এই পাক ভর্জ্জন, অর্থাৎ ভাজা। সাধারণ পাক নহে। সুতরাং যাহাতে ভাজা করা হয়, তাহাই ভ্রাষ্ট্র। পক্ষান্তরে, যাহাতে সেঁকা হয়, তাহা কন্দু।

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

৪৭।১ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে শ্রীঅধর চন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ক্ষত্রপ কর্ণসেন।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় তাঁহার নবপ্রকাশিত "রাজন্যকাণ্ড" নামক গ্রন্থে বটুভট্টের "দেববংশ" নামধেয় একখানি নবাবিষ্কৃত কুলগ্রন্থ অবলম্বনে বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় সংযোজিত করিয়াছেন। সুধু নূতনত্বই যে এই অধ্যায়ের বিশেষত্ব, তাহা নয়; কি প্রণালীতে অন্যান্য শ্রেণীর প্রমাণের সহিত কুলশাস্ত্রের সমন্বয় করিয়া সিদ্ধান্ত-বারিধি মহাশয় লুপ্ত ইতিহাস গড়িয়া তুলিতে চাহেন, এখানে তাহার অতি সুন্দর নমুনা পাওয়া যায়। সুতরাং "রাজন্যকাণ্ডে"র এই অংশটি (৫৫—৬০ পৃঃ) বিশেষভাবে আলোচ্য।

"দেববংশ" সম্বন্ধে সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় লিখিয়াছেন,—"এই কুলগ্রন্থখানি চারি শত বর্ষের আদর্শ দৃষ্টে ১৬২২ শকে নকল করা হইয়াছে।" ১৬২২ শকে যে নকল করা হইয়াছে, এ কথা নিশ্চয়ই পুথির শেষ পত্রে লেখা আছে। কিন্তু আদর্শখানি যে চারি শত বৎসরের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল, এ কথার প্রমাণ কি? এই প্রমাণ উপস্থিত করা নিতান্ত উচিত ছিল। সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় "দেব-বংশে"র প্রথম ১৯টি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই অংশের প্রধান কথা—

> "আসীদ্রাজা দাতা কর্ণঃ খ্যাতিবাংশ্চ মহীতলে।
> কর্ণসেন-নামধেয়ঃ কর্ণপুরস্য ভূপতিঃ॥
> ক্ষত্রপঃ কায়স্থো রাজা মহাসুরো মহাবলী।
> কর্ণস্বর্ণরাজ্যস্থাতা (?) উক্তঞ্চ ভারতে যথা॥" ৬—৭

সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়ের অনুবাদ—"মহীতলে দাতা কর্ণ নামে খ্যাতিবান্ কর্ণসেন নামে কর্ণপুরের রাজা ছিলেন। তিনি কায়স্থ ক্ষত্রপ রাজা, মহাসুর, মহাবলী, এবং কর্ণ রাজ্য স্থাপয়িতা বলিয়া কথিত।"

মূলে আছে,—"উক্তঞ্চ ভারতে যথা।" ইহার সহজ অর্থ,—"ভারতে অর্থাৎ মহাভারতে যেমন উক্ত বা বর্ণিত হইয়াছে।" কিন্তু সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় অনুবাদ-কালে "ভারতে যথা" এই দুটি কথা ছাড়িয়া দিয়াছেন। এইরূপে কুরুকুলের কুলশাস্ত্র মহাভারত উপেক্ষা করিয়া, বাঙ্গালার কর্ণসেন নামক এক জন ক্ষত্রপ ছিলেন, ইহা ধরিয়া লইয়াছেন।

কর্ণের পুত্র সম্বন্ধে "দেববংশে" আছে—

"দেবাংশেন কর্ণপতেঃ কুমারো জাতবানসৌ।
বৃষকেতুরিতি নামা প্রসিদ্ধশ্চ হি ভারতে॥
শুভান্নপ্রাশনাদীনাগতাংশ্চ ততঃ পরং।
বিভীষণো লঙ্কেশ্বরো যথাগতো মহাকৃতিঃ॥
তস্মাদভবত্তত্র হেমবৃষ্টিঃ সুরলোকাৎ॥"

সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় "দেবাংশেন" স্থলে "দেবসেন" পাঠ করিতে চাহেন। "বাণভট্টের হর্ষচরিত হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সুহ্মাধিপতি দেবসেনের মহিষী দেবকী দেবরের প্রতি অনুরক্তা ছিলেন। তিনি বিষচূর্ণগর্ভ কর্ণোৎপল-সাহায্যে দেবসেনকে নিহত করেন। এই কারণে তিনি বলিতে চাহেন, "দেবাংশেন" = দেবসেন = বৃষকেতু। যদি বটুভট্টের বৃষকেতু এবং বাণভট্টের দেবসেন একই ব্যক্তি হয়েন, তবে "দেবাংশেন" কাটিয়া "দেবসেন" পড়া গেলেও যাইতে পারে। কিন্তু বাণভট্ট-কথিত সুহ্মাধিপতি "দেবসেন" এবং বটুভট্টের "বৃষকেতু" যে এক ব্যক্তি, তাহার প্রমাণ কি? বাণভট্টের দেবসেন যে ভাবে দেবরানুরক্তা দেবকী কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন, দেবরানুরক্তা দেবকী নাম্নী ভার্য্যা কর্তৃক বৃষকেতুর সেই ভাবে নিধনের কথা বটুভট্টের গ্রন্থে আছে কি? থাকিলে তাহার উল্লেখ করা উচিত ছিল।

তার পর সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় লিখিয়াছেন,—"বাণভট্ট যে সময়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সময়ে আমরা কর্ণসেনের পুত্র দেবসেন বা বৃষকেতুকে পাই।" ভাণভট্ট কোন সময়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় তাহা কেমন করিয়া জানিলেন? বাণভট্ট হর্ষচরিতের ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসে স্কন্দগুপ্তের মুখে, নৃপতিগণের প্রমাদদোষে বিপন্ন হইবার যে বহুবার্ত্তা বা প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার কতকগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল বার্ত্তার মধ্যেই পুষ্পমিত্র কর্তৃক মৌর্য্য বৃহদ্রথের নিধনের কথাও আছে। কিন্তু "হর্ষ-চরিতে" এমন কোনও কথা নাই, যদ্দ্বারা দেবসেন বা আর কাহারও সময়নিরূপণ করা যাইতে পারে।

সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় স্বতন্ত্র প্রমাণের দ্বারাও বৃষকেতুর তথা কর্ণসেনের সময়নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বটুভট্ট বলিয়াছেন, বৃষকেতুর শুভান্ন-প্রাশনে মহাকৃতি লঙ্কেশ্বর বিভীষণ আসিয়াছিলেন; সেই হেতু সুরলোক হইতে হেমবৃষ্টি হইয়াছিল। লঙ্কেশ্বর বিভীষণের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সুরলোক হইতে

হেমবৃষ্টির কথায় মনে হয়, এই বিভীষণ "রামায়ণে"র রাবণানুজ বিভীষণ। কিন্তু সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় বলেন,—"কুলগ্রন্থে যে লঙ্কাধিপ বিভীষণের প্রসঙ্গ আছে, কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ ইতিহাস রাজতরঙ্গিণী এবং সিংহলের 'মহাবংশ' হইতে তাহার কিছু কিছু আভাস পাইয়াছি। রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে, কাশ্মীর-পতি মেঘবাহন লঙ্কাপতি বিভীষণকে পরাজিত করেন। সেই মেঘবাহন প্রাগ্-জ্যোতিষ-রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এরূপ স্থলে মনে হয়, সিংহলে না গিয়া যে সময়ে বিভীষণ বঙ্গে আসিয়া বাস করিতেছিলেন, সেই সময় মেঘবাহন বিভীষণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন। রাজতরঙ্গিণীর লিখিত বৃত্তান্ত হইতে মনে হয় যে, মেঘবাহন ৪৪০ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী সময়ে বিদ্যমান ছিলেন।" সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়ের ঐতিহাসিক তথ্যোদ্ধারপ্রণালী যে কিরূপ কৌতুকা-বহ, উদ্ধৃত অংশের সহিত কহ্লণ-বর্ণিত মেঘবাহনের লঙ্কাজয়-বৃত্তান্তের তুলনা করিলেই তাহা বেশ বুঝা যাইতে পারে। কহ্লণ লিখিয়াছেন,—কাশ্মীর-রাজ মেঘবাহন অন্যান্য রাজ্যের নৃপতিগণকে প্রাণিহিংসা হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন। তার পর—

"প্রভাববিজিতান্ কৃত্বা সোঽহিংসাদীক্ষিতান্ নৃপান্।
অর্ণসাং পত্যুরভ্যর্ণ মবাপাবর্ণবর্জিতঃ॥৩।২৯॥"

"নিজ প্রভাবের দ্বারা বিজিত নৃপতিগণকে অহিংসা-ব্রতে দীক্ষিত করিয়া দোষবর্জ্জিত [মেঘবাহন] সমুদ্রের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন।"

তখন মেঘবাহন চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি উপায়ে সমুদ্র পার হইয়া অপর পারস্থ দ্বীপে উপস্থিত হইবেন। জলাধিপতি বরুণ মেঘবাহনকে পরীক্ষা করিয়া লইয়া তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইলেন। মেঘবাহন প্রার্থনা করিলেন, "আমাকে সমুদ্র পার হইবার উপায় বলিয়া দিন।" বরুণ বলিলেন, "তুমি যখন সমুদ্র পার হইতে ইচ্ছা করিবে, তখন আমি জল জমাইয়া নিরেট করিয়া দিব।" পরদিন রাজা সসৈন্যে সমুদ্র পার হইয়া রোহণ পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন।

"তত্র তালীতরুবনচ্ছায়াধ্যাসিতসৈনিকম্।
প্রীত্যা লঙ্কাধিরাজস্তমুপতস্থে বিভীষণঃ॥
সমাগমং স শুশুভে নররাক্ষসরাজয়োঃ।
বন্দিনাদাশ্রুতাত্তোক্তপ্রথমালাপসংভ্রমঃ॥
অথ রক্ষঃপতি র্লঙ্কাং নীত্বালংকরণং ক্ষিতেঃ
অমর্ত্ত্যসুলভাভিস্তং বিভূতিভি রুপাচরৎ॥

যদাসীৎ পিশিতাশা ইত্যন্বর্থং নাম রক্ষসাম্।
তদা তদাজ্ঞাগ্রহণে প্রাপ তদ্রূঢ়িশব্দতাম্॥" ৩।৭৩—৭৬॥

"সেখানে তালীতরুবনচ্ছায়ায় তাঁহার সৈনিকগণ যখন অবস্থান করিতেছিল, তখন লঙ্কাধিরাজ বিভীষণ প্রীতিবশতঃ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন।

"নরপতির এবং রাক্ষসপতির মিলন সুশোভন হইয়াছিল; বন্দিগণের স্তুতিগানের জন্য তাঁহাদের পরস্পরের প্রথম আলাপ শুনা যায় নাই।

"তৎপর রক্ষঃপতি [বিভীষণ] ক্ষিতিভূষণ [মেঘবাহনকে] লঙ্কায় লইয়া গিয়া অমরগণের সুলভ ঐশ্বর্য্যের দ্বারা তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন।

"[বিভীষণ মেঘবাহনের] আজ্ঞা গ্রহণ করায় রাক্ষসগণের 'পিশিতাশ' (মাংসখাদক) এই সার্থক [যৌগিক] নামটি রূঢ়িশব্দতা প্রাপ্ত হইয়াছিল।"

মেঘবাহন যে সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কায় গিয়াছিলেন, এবং বিভীষণ যে রাক্ষসরাজ এবং পিশিতাশ রাক্ষস ছিলেন, এই দুইটি কথা সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় একেবারে উড়াইয়া দিয়াছেন, এবং বিভীষণকে বঙ্গবাসী করিয়া মেঘবাহনের দ্বারা তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করাইয়াছেন। এইরূপ জবরদস্তির কারণ কি? তিনি বলিতে চাহেন, বটুভট্টের "দেববংশ"-মতে যে বিভীষণ বৃষকেতুর অন্নারম্ভে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন, এবং মেঘবাহন যাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন, এই দুইই এক ব্যক্তি। তিনি এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে একমাত্র যুক্তি দিয়াছেন, "সিংহলে না গিয়া যে সময় বিভীষণ বঙ্গে আসিয়া বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে মেঘবাহন বিভীষণকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন।" এ কথা সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়ের অঘটনঘটনপটীয়সী ঐতিহাসিক-কল্পনার সৃষ্টি। প্রমাণ হিসাবে সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়ের কথার সারাংশ এই,—'যেহেতু বটুভট্ট-কথিত বিভীষণ এবং কহ্লণের বিভীষণ এই দুই এক ব্যক্তি, সুতরাং দুই বিভীষণই এক ব্যক্তি।' অর্থাৎ, বটুভট্টের বিভীষণ এবং কহ্লণের বিভীষণ যে অভিন্ন ব্যক্তি, তাহা স্বতঃসিদ্ধ! সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়ের বিচারপ্রণালীর বিশেষত্ব এই, তিনি যাহা ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া গ্রহণ করা আবশ্যক বোধ করেন, তাহা স্বতঃসিদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়। তার পর সাধারণ ঐতিহাসিকেরা শিলালিপি, তাম্রশাসন, মুদ্রা, রাজতরঙ্গিণী, মহাবংশ, হর্ষচরিত প্রভৃতি যে যে সুপরিচিত আকর হইতে প্রমাণ আহরণ করিয়া ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিস্থাপন করেন, সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় সেই সকল প্রমাণকে তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ মূল তথ্যের সহিত শাখা-প্রশাখা-পল্লব-রূপে

যোজনা করিয়া একটা মহামহীরুহের সৃষ্টি করেন। এই বিভীষণ-প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত-বারিধি মহাশয়ের মূল তথ্য হইল, বটুভট্টের কথা স্বতঃসিদ্ধ, 'লঙ্কার বিভীষণ বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। তার পর রাজতরঙ্গিণীর দোহাই দিয়া এই মূল কথার সহিত প্রথম শাখা যোজনা করিলেন,—"সিংহলে না গিয়া যে সময় বিভীষণ বঙ্গে আসিয়া বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে মেঘবাহন বিভীষণকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন।" এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে গিয়া সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় কহ্লণের প্রায় সকল কথা উড়াইয়া দিয়াছেন। কেন না, কহ্লণের কথায় অবিশ্বাস করা কুলশাস্ত্রে আস্থাহীন "নবীন ঐতিহাসিকে"র পক্ষে দোষাবহ হইলেও, কুলশাস্ত্রৈক-পরায়ণ প্রবীণ ঐতিহাসিকের পক্ষে দোষাবহ হইতে পারে না।

সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় সিংহলের "মহাবংশ" হইতে আনিয়া এই বিভীষণ-কথার দ্বিতীয় শাখার যোজনা করিয়াছেন। সেই শাখা এই,—বটুভট্টের বিভীষণ রাক্ষসের রাজা রাক্ষস ছিলেন না, তিনি লঙ্কেশ্বর ধাতুসেনের পুত্র, এবং কস্‌সপের ভ্রাতা মোগ্‌গল্লান নামক মানুষ। যথা—

"সিংহলের মহাবংশ আলোচনা করিলেও জানিতে পারি, ৪৫০ খৃষ্টাব্দের কিছু পরে ধাতুসেন সিংহল বা লঙ্কার অধিপতি ছিলেন। তিনি স্থবিরবাদীদিগের জন্ম ১৮টী বিহার ও ১৮টী বাপী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ঐ ১৮টী বিহারের মধ্যে একটীর নাম ধাতুসেন, একটীর নাম কাশ্যপীপিট্ঠক ও একটীর নাম বিভীষণবিহার। মহাবংশে মহারাজ ধাতুসেনের দুই বিভিন্ন পত্নীর গর্ভজাত দুইটী পুত্রের নাম পাওয়া যায়, একটীর নাম কস্‌সপো (কশ্যপ), অপরটীর নাম মোগ্‌গল্লানো (মৌদ্গল্যায়ন)। কশ্যপ দুষ্ট ব্যক্তির পরামর্শে পিতাকে বন্দী করিয়া রাজছত্র গ্রহণ করেন। মৌদ্গল্যায়নও ভ্রাতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু উপযুক্ত সেনাবলের অভাবে জম্বুদ্বীপে (ভারতবর্ষে) পলাইয়া আসেন। এই মোগ্‌গল্লানকেই আমরা লঙ্কার রাজপুত্র বিভীষণ বলিয়া মনে করি। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, মহারাজ ধাতুসেন নিজ ও নিজ পুত্রের নামানুসারে বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার অপর পুত্রের নামানুসারে যখন কাস্‌সপিপিট্ঠক অর্থাৎ কাশ্যপীপিট্ঠক বিহারের নাম পাইতেছি, অথচ তাঁহার প্রিয়পুত্র মোগ্‌গল্লানের নামে কোন বিহারের উল্লেখ পাইতেছি না, তৎপরেই বিভীষণবিহারের নাম দেখিতেছি, আবার ঐ সময়ে প্রাচ্যভারতে কাশ্মীরপতি মেঘবাহনের নিকট সিংহলাধিপ বিভীষণের পরাজয়সংবাদ এবং কুলগ্রন্থে কর্ণ-সেনের রাজধানীতে তাঁহার আগমনসংবাদ পাইতেছি, তখন মোগ্‌গল্লান ও

বিভীষণকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে বিশেষ আপত্তি দেখিতেছি না।"

মোগ্‌গল্লান'ও বিভীষণকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করায় কিঞ্চিৎ আপত্তি হইতে পারে। "রাজতরঙ্গিণী"তে লঙ্কার রাক্ষসরাজ বিভীষণ সম্বন্ধে এবং কুলগ্রন্থে "লঙ্কেশ্বর বিভীষণ" সম্বন্ধে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা মোগ্‌গল্লায়ন ও বিভীষণের ভিন্নতাই প্রমাণিত করে। কারণ, "মহাবংশে"র মোগ্‌গল্লায়ন রাক্ষসও নহেন, লঙ্কেশ্বরও নহেন; লঙ্কার পলাতক রাজপুত্র। লঙ্কেশ্বর ধাতুসেনের পুত্র মোগ্‌গল্লান বিভীষণ নামেও পরিচিত ছিলেন, এ কথারই বা প্রমাণ কি? ধাতুসেন ১৮টী বিহার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটি নিজের নামে, এবং একটি পুত্র কস্‌সপের নামে। বাকী ১৬টী বিহারের মধ্যে বিভীষণবিহারকে মোগ্‌গল্লানের নামের বিহার মনে করিব কেন? ধাতুসেন বেনামী করিয়া মোগ্‌গল্লানের নামে বিহার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এ কথা যদি নিতান্তই স্বীকারই করিতে হয়, তবে ১৬টী বিহারের যে কোনটিকেই ত ঐরূপ মনে করিতে পারি; বিভীষণ-বিহারকে বাছিয়া লইবার অধিকার কি? লঙ্কার রাক্ষসরাজ বিভীষণও ধাতুসেনের সময়ে (৫০৯—৫২৭ খৃষ্টাব্দে) লঙ্কাবাসীর অপরিচিত ছিলেন না। কারণ, ইহার অনতিকাল পরেই কুমারদাস বা কুমার ধাতুসেন নামক লঙ্কাধিপ বাল্মীকির রামায়ণের আখ্যানবস্তু লইয়া "জানকীহরণ" নামক সংস্কৃত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। (১)

সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় বটুভট্টের "উক্তঞ্চ ভারতে যথা" বাক্যের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া একটিমাত্র মুদ্রা অবলম্বন করিয়া ক্ষত্রপ কর্ণসেনের পূর্ব্ব-পুরুষের বৃত্তান্তও প্রদান করিয়াছেন। কানিংহাম সুলতানগঞ্জের স্তূপ খনন-প্রসঙ্গে স্তূপের অভ্যন্তরে লব্ধ দুইটি মুদ্রা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

On clearing them I found one to be a silver coin of Maha K·hatrapa Swami Rudra Sena, the son of M. Ksh. Satya, or Surya, Sena. The other was a coin of Chandra Gupta Vikramaditya, or Chandra Gupta II. —Arch. Surv. Reports, XV. pp. 29—30.

কানিংহাম মনে করিয়াছিলেন, এই মুদ্রাটি মালব এবং সুরাষ্ট্রের শেষ মহা-

---

(১) Journal of the Royal Asiatic Society, 1901, p. 254 (৫৪৪ খৃষ্টাব্দে নির্ব্বাণাব্দের আরম্ভ ধরিলে ৫১৭ হইতে ৫১৬ খৃষ্টাব্দ কুমারদাসের রাজত্বকাল হয়। Geiger ৪৮৩ খৃষ্টাব্দ নির্ব্বাণাব্দের আরম্ভ ধরিয়া সিংহলের নৃপতিগণের কাল নির্ণয় করিয়াছেন। এই হিসাবে "জানকীহরণ"-কার কুমারদাসের রাজত্বকাল ৫৭৭ হইতে ৫৮৫ খৃষ্টাব্দ।

ক্ষত্রপ সত্যসেনের [বিশুদ্ধ পাঠ—"সত্যসিংহে"র] পুত্র রুদ্রসেনের [বিশুদ্ধ পাঠ "রুদ্রসিংহে"র] মুদ্রা।* রুদ্রসিংহের মুদ্রায় ৩১০ শকাব্দ অর্থাৎ ৩৮৮ খৃষ্টাব্দ মুদ্রিত আছে। মহাক্ষত্রপ রুদ্র সিংহের সময়েই সম্ভবতঃ সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য সুরাষ্ট্র ও মালব জয় করিয়াছিলেন। বিজয়ী চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের এবং বিজিত মহাক্ষত্রপ রুদ্রসেনের মুদ্রার একত্র সমাবেশ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় সুলতানগঞ্জের মুদ্রার রুদ্রসেন-[রুদ্র সিংহ]-কে মালবের মহাক্ষত্রপ বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না; কারণ, তিনি "বিশেষ পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন বলিয়া মনে হয় না।" তিনি বলেন—

"উদ্ধৃত কুলগ্রন্থের প্রমাণানুসারে কায়স্থ-ক্ষত্রপবংশ হরিদ্বার হইতেই আগমন করেন। শকসম্রাটগণের অধীনে ক্ষত্রপরূপে সম্ভবতঃ তাঁহারা মগধ শাসন করিতেন। গুপ্তবংশের অভ্যুদয়কালে মগধ হইতে বিতাড়িত হইয়া প্রথমে অঙ্গে বা ভাগলপুর (সুলতনগঞ্জ) অঞ্চলে, তৎপর বঙ্গে চলিয়া আইসেন। গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্তের আলাহাবাদের শিলালিপিতে সমুদ্রগুপ্তের নিকট পরাজিত আর্য্যাবর্ত্ত-নৃপতিগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম রুদ্রদেবের নাম পাওয়া যায়। এই রুদ্রদেবকে সুলতানগঞ্জের মুদ্রানির্দ্দিষ্ট মহাক্ষত্রপ রুদ্রসেন মনে করি। * * * রুদ্রদেব সমুদ্রগুপ্তের নিকট পরাজিত বা নিহত হইলে সম্ভবতঃ তৎপুত্র বঙ্গদেশে পলাইয়া আসেন। এই পলাতক রুদ্রসেন-দেব-পুত্রের ঔরসে খুব সম্ভব কর্ণসেন জন্মগ্রহণ করেন। পিতামহ গুপ্তসম্রাটের নিকট পরাজিত ও তৎপুত্র নিজরাজ্য ত্যাগ করিয়া পলায়নপর হইয়াছিলেন বলিয়া সম্ভবতঃ কুলগ্রন্থে তাঁহাদের নাম গৃহীত হয় নাই।"

সমুদ্রগুপ্তের শিলালিপির রুদ্রদেব, সুলতানগঞ্জের স্তূপের অভ্যন্তরে প্রাপ্ত "মহাক্ষত্রপ স্বামী রুদ্রসেন"-নামাঙ্কিত মুদ্রা, এবং ১৬২২ শকে নকল করা কুলগ্রন্থের "কর্ণস্বর্ণরাজ্যস্থাতা উত্তরঞ্চ ভারতে যথা," এই তিনের সামঞ্জস্য করিয়া, মগধ-অঙ্গ-বঙ্গে খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দে আদৌ শকসম্রাটগণের অধীন ক্ষত্রপ-শাসনের কল্পনা কষ্টকল্পনা। চতুর্থ শতাব্দের প্রথম পাদে গুপ্ত-বংশের অভ্যুদয়। সকল প্রাচীন রাজকুলের কুলশাস্ত্র পুরাণে আস্থাস্থাপন করিতে গেলে, গুপ্তাভ্যুদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা সমসময়ে মগধে, অঙ্গে, বা সুহ্মে দেববংশের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। যথা—

মাগধানাং মহাবীর্য্যো বিশ্বস্ফানির্ভবিষ্যতি।
উৎসাদ্য পার্থিবান্ সর্বান্ যোঽন্যান্ বর্ণান্ করিষ্যতি॥
কৈবর্ত্তান্ পঞ্চকাংশ্চৈব পুলিন্দান্ ব্রাহ্মণাংস্তথা।
স্থাপয়িষ্যতি রাজানো নানাদেশেষু তেজনাঃ॥

বিশ্বস্ফানি র্মহাসত্ত্বো যুদ্ধে বিষ্ণুসমো বলী।
বিশ্বস্ফানি র্নরপতিঃ ক্লীবাকৃতি রিবোচ্যতে॥
উৎসাদয়িত্বা ক্ষত্রং তু ক্ষত্রমন্যাৎ করিষ্যতি।
দেবান্ পিতৃংশ্চ বিপ্রাংশ্চ তর্পয়িত্বা সকৃৎ পুনঃ॥
জাহ্নবীতীরমাসাদ্য শরীরং যংস্যতে বলী।
সন্ন্যস্য স্বশরীরং তু শক্রলোকং গমিষ্যতি॥
নব নাকাংস্তু ভোক্ষ্যন্তি পুরীং চম্পাবতীং নৃপাঃ।
মথুরাং চ পুরীং রম্যাং নাগা ভোক্ষ্যন্তি সপ্ত বৈ॥
অনুগঙ্গং প্রয়াগং চ সাকেতং মগধাংস্তথা।
এতান্ জনপদান্ সর্বান্ ভোক্ষ্যন্তে গুপ্তবংশজাঃ॥
* * * * *
কোশলাংশ্চান্ধ্রপৌণ্ড্রাংশ্চ তাম্রলিপ্তান্ স-সাগরান্।
চম্পাং চৈব পুরীং রম্যাং ভোক্ষ্যন্তে দেবরক্ষিতাঃ॥" (২)

"মহাবীর্য্য বিশ্বস্ফানি মাগধগণের রাজা হইবেন। সমস্ত নৃপতিগণকে উচ্ছেদ করিয়া অন্যান্য বর্ণের লোককে—কৈবর্ত্ত, পঞ্চক, পুলিন্দ এবং ব্রাহ্মণগণকে রাজা করিবেন। তিনি ঐ সকল লোককে নানা দেশে নৃপতিরূপে স্থাপন করিবেন। মহাসত্ত্ব বিশ্বস্ফানি যুদ্ধে বিষ্ণুর সমান বলী হইবেন। বিশ্বস্ফানি নরপতি ক্লীবাকৃতি বলিয়া কথিত। তিনি ক্ষত্রিয় জাতির উচ্ছেদ করিয়া অন্য ক্ষত্রিয় জাতির সৃষ্টি করিবেন। দেবগণ, পিতৃগণ এবং ব্রাহ্মণগণকে একবার এবং পুনর্বার তৃপ্ত করিয়া জাহ্নবীতীরে উপস্থিত হইয়া দেহ দমন করিবেন; দেহ-ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রলোকে গমন করিবেন।

"নয় জন নাক (বা নাগ)-বংশীয় নৃপতি চম্পাবতী নগরী উপভোগ করিবেন, এবং ৭ জন নাগবংশীয় নৃপতি মনোরম মথুরাপুরী উপভোগ করিবেন। গঙ্গার তীরবর্ত্তী ভূভাগ, প্রয়াগ, সাকেত এবং মগধ—এই সকল জনপদ গুপ্তবংশীয় নরপতিগণ উপভোগ করিবেন। * * * দেবরক্ষিত-[বংশীয় নৃপতি] গণ কোশল, অন্ধ্র, পৌণ্ড্র, তাম্রলিপ্ত এবং সাগরতীরবাসী জনপদ এবং মনোরম চম্পাপুরী উপভোগ করিবেন।"

পুরাণোক্ত শিশুনাগ, নন্দ, মৌর্য্য ও শুঙ্গবংশীয় নৃপতিগণের বংশাবলী ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর কত দূর প্রতিষ্ঠিত, তাহা সম্যক অবধারিত হইয়াছে।

২। Pargiter's The Purana Text of the Dynasties of the Kali Age, pp. 52—54.

বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড, বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণে প্রদত্ত এই ভবিষ্যৎ রাজবংশ-বিবরণে মগধে, প্রয়াগে, এবং সাকেতে বা অযোধ্যায় গুপ্তবংশীয় নৃপতির রাজ্য-প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে, তাঁহার পিতা প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময়ে, গুপ্তরাজ্য ঐরূপ বিস্তৃত ছিল। মৎস্যপুরাণে গুপ্ত-বংশের সমসময়ের অন্যান্য বংশের এবং পূর্ব্ববর্ত্তী বিশ্বস্ফাণির এবং আরও কয়েকটি রাজবংশের উল্লেখ নাই; অন্ধ্র-বংশ এবং তৎসাময়িক শক, যবন, আভীর, তুষারাদি বংশ উল্লিখিত হইয়াছে। এই নিমিত্ত পার্জিটার অনুমান করেন,—পুরাণোক্ত কলিযুগের রাজবংশাবলী প্রথমতঃ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দের মাঝামাঝি বা তাহার কিছু পরে সঙ্কলিত হইয়াছিল, এবং মৎস্য ভিন্ন অন্যান্য পুরাণে যেটুকু বেশী আছে, তাহা প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময়ে সঙ্কলিত হইয়াছিল। (৩) ইহার পরে যদি কেহ কখনও এই রাজবংশ-বিবরণে হস্তক্ষেপ করিতেন, তবে অশ্বমেধযাজী সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের নাম নিশ্চয়ই গুপ্তবংশ-বিবরণে স্থান লাভ করিত। সুতরাং পুরাণে গুপ্তরাজগণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব-সময়ের এবং সমসময়ের মগধের এবং বাঙ্গালার রাজনীতিক অবস্থার যে আভাস পাওয়া যায়, তাহা সহসা উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। মগধরাজ বিশ্বস্ফাণি কর্ত্তৃক নূতনক্ষত্রিয়-সৃষ্টি-সম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত একেবারে অমূলক হইলে ব্রাহ্মণের লিখিত কলিকালের বিবরণে কখনই তাহা স্থান লাভ করিত না। যদি গুপ্তবংশের অভ্যুদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে দিগ্বিজয়ী মগধরাজ বিশ্বস্ফাণির অস্তিত্ব এবং সমসময়ে চম্পানগরীতে, পৌণ্ড্রে এবং তাম্রলিপ্ত জনপদে দেবরক্ষিত বংশের রাজত্ব স্বীকার করিতে হয়, তবে সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়ের কথিত দেববংশীয় রাজগণের স্থান কোথায়?

দেববংশের "ক্ষত্রপ" উপাধিটিও সন্দেহজনক। পুরাণে "ক্ষত্রপ" শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় না। সংস্কৃত সাহিত্যে ইহা অপরিচিত ছিল। তজ্জন্য "কোষ"-গ্রন্থসমূহে, এমন কি, "কর্ণস্বর্ণ নামধেয় সমাজে বাসকারক" রাজা সার রাধাকান্ত দেবের "শব্দকল্পদ্রুমে"ও ইহা স্থান লাভ করে নাই। করিয়াছে সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়ের "বিশ্বকোষে"। তাহার কারণ এই যে, আধুনিক প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানে আবিষ্কৃত মুদ্রায় ও ক্ষোদিত লিপিতে "ক্ষত্রপ" দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, এবং সেই সূত্রে প্রত্নতত্ত্বানুরাগিগণের নিকট সুবিদিত হইয়াছে। সুতরাং "চারি শত বৎসরের আদর্শ দৃষ্টে ১৬২২ শকে নকল করা" কুলগ্রন্থে "ক্ষত্রপ" শব্দ কেমন করিয়া প্রবেশ লাভ করিল, তাহা অনুসন্ধেয়।

৩। Ibid. pp. xii—xiii.

দেববংশের ইতিবৃত্ত-আলোচনার কালে সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় পুরাণ বিস্মৃত হইলেও, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দের বাঙ্গালার ইতিহাসের উপাদানের আকর তাম্রশাসন, শিলালিপি, "হর্ষচরিত" প্রভৃতি বিস্মৃত হয়েন নাই। এই সকল আকর হইতে লব্ধ ইতিহাসের সহিত ক্ষত্রপ-বংশের ইতিহাস তিনি মজবুত করিয়া জুড়িবার দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যথা—কর্ণসেনের পুত্র বৃষকেতু বা "দেবসেন পত্নীহস্তে নিহত হইলে দেবকীর প্রণয়ী দেবসেন-ভ্রাতা রাজা হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু এই ভ্রাতৃহত্যার রাজপদ নিরাপদ ছিল বলিয়া মনে হয় না; রাজপুরুষ ও প্রজাবৃন্দ তাঁহার বিরুদ্ধে থাকায় তাঁহাকে বেশী দিন রাজ্যসুখ ভোগ করিতে হয় নাই। যে সময়ে কর্ণসুবর্ণ রাজ্যে এইরূপ বিপ্লব উপস্থিত, তাহারই অত্যল্পকাল পরে মালবে যশোধর্ম্মের এবং বঙ্গে ধর্ম্মাদিত্য নামক এক ব্যক্তির অভ্যুদয়। সম্ভবতঃ দেবসেন-ভ্রাতা নিকটবর্ত্তী অপরাপর নৃপতিগণকে পরাজিত করিয়া ধর্ম্মাদিত্য মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেন"। (৬০ পৃঃ) ফরিদপুর জেলায় আবিষ্কৃত তাম্রশাসনচতুষ্টয়ে উল্লিখিত ধর্ম্মাদিত্য, গোপচন্দ্র এবং সমাচার দেব, এই তিন জন নৃপতিকে সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় নানা গোত্রে বিভক্ত কাণসোনার কোন-দেব-বংশোদ্ভব মনে করেন (৬১—৬২ পৃঃ)। চীন পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াংএর উল্লিখিত কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্কের "যে সুপ্রাচীন মোহর আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে তিনি 'মহাসামন্ত শ্রীশশাঙ্কদেব' নামে পরিচিত হইয়াছেন। এ অবস্থায় অনায়াসেই মনে করা যাইতে পারে যে, কর্ণসুবর্ণ-প্রতিষ্ঠাতা কর্ণদেবের বংশেই শশাঙ্কদেবের জন্ম (৬৩ পৃঃ)।" সকলের পক্ষে "অনায়াসে" এরূপ মনে করা কঠিন। "দেব" শব্দ থাকিলেই দেববংশোদ্ভব বুঝিতে হইবে না। "রাজা ভট্টারকো দেবঃ"ও বটে।

কুলগ্রন্থের সাহায্যে সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় "অনায়াসে" শশাঙ্কের পূর্ব্বপুরুষের পরিচয়প্রদান করিতে সমর্থ হইয়া থাকিলেও, তিনি শশাঙ্ককে আস্ত রাখেন নাই, কাটিয়া দুই ভাগ করিয়াছেন। তিনি এক সময় পাশ্চাত্য প্রত্নবিদ্‌গণের অনুসরণ করিয়া বাণভট্ট-কথিত হর্ষবর্দ্ধনের অগ্রজ রাজ্যবর্দ্ধনহন্তা "গৌড়াধিপ" এবং ইউয়ান চোয়াং-কথিত উক্ত রাজ্যবর্দ্ধন-হন্তা কর্ণসুবর্ণপতি শশাঙ্ক অভিন্ন, এইরূপ মনে করিয়াছিলেন। "কিন্তু এখন আলোচনা দ্বারা বুঝিতেছেন, রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত গৌড়পতি এবং কর্ণসুবর্ণপতি এক ব্যক্তি হইতে পারেন না।" কিরূপ আলোচনা দ্বারা তিনি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতের ভুল বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহাও গ্রন্থবদ্ধ করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। (৬২—৬৩ পৃঃ)।

কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে সকল প্রমাণের বলে শশাঙ্ককেই গৌড়পতি মনে করেন, তাহার খণ্ডন করা দূরে থাকুক, উল্লেখ করিতেও বিস্মৃত হইয়াছেন। হর্ষ-চরিতের ইংরেজী অনুবাদক কাউয়েল এবং টমাস উক্ত গ্রন্থের ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসে যে শ্লেষাত্মক সন্ধ্যাবর্ণনা আছে, তাহার টীকায় লিখিয়াছেন—

"Sri, the goddess of sovereignty, is roaming, i. e. not yet settled with a new king. The paragraph contains several significant allusions ('the pathetic fallacy') The red sunset is a sign of bloody wars; the separation of the ruddy geese, of the separation of the brothers; the buzzing bees, of arrows; the rise of the blotted moon, of the rising power of the Ganda king. The last is important as the word used for moon ('Sasanka') confirms the comm's in P. 195 (text) that this was the Ganda king's name (Hiuen Thsang's Ch-chang-kia) one Ms. of the Harsa Charita names him Narendra Gupta, Vide Buhler Epigr. Ind. I. P 70. (২৭৪ পৃঃ)

কাউয়েল এবং টমাস উভয়েই পাশ্চত্য প্রত্নবিৎ, কিন্তু ইহাঁরা যাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছেন, সেই "হর্ষচরিত"-কার বাণভট্ট, এবং "হর্ষচরিতে"র সঙ্কেতাখ্য-টীকাকার শঙ্কর, উভয়েই প্রাচ্য। শঙ্কর ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসের টীকার সূচনায় লিখিয়াছেন, "কৃতো হন্তো বিনাশো যেন স শশাঙ্কাখ্যো গৌড়াধিপতিঃ;" এবং "খলোঽত্র গৌড়াপসদঃ শশাঙ্কঃ" (নির্ণয়সাগর যন্ত্রে মুদ্রিত সটীক "হর্ষচরিত", ২য় সংস্করণ, ১৭৫ পৃঃ। স্বয়ং বাণভট্ট সন্ধ্যা-বর্ণনায় রুধিররসমাংসচ্ছবি অরুণ-সারথি (সূর্য্য), । সংচরণশীলা শ্রীর সঙ্গে আকাশে পঙ্কসংকর শশাঙ্কমণ্ডলের উল্লেখ করিয়া স্পষ্টাক্ষরে তাহাই সূচিত করিয়াছেন। পাশ্চাত্য প্রত্নবিদের করস্পর্শে প্রাচ্যবিদ্যা অব্যবহার্য্য হইবে, এরূপ ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত কেহ প্রচার করিতে সাহসী হয়েন নাই। সুতরাং কেন যে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বাণভট্টের এবং তাঁহার টীকাকারের উক্তি উপেক্ষা করিলেন, তাহা বলা দুঃসাধ্য। সুধু তাহাই নয়। যে প্রমাণ এ পর্য্যন্ত কোনও পাশ্চত্য প্রত্নবিৎ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয় নাই, তাহাও তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে উপেক্ষা করিয়াছেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় স্বয়ং তাঁহার স্বরচিত "ব্রাহ্মণকাণ্ডে"র চতুর্থ অংশে গৌড়ে শাকদ্বীপীয়গণের আগমনপ্রসঙ্গে উমেশচন্দ্র শর্ম্মা কর্ত্তৃক ধৃত মহাদেব-কারিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"কদাচিন্নৃপতিশ্রেষ্ঠঃ শশাঙ্কো গৌড়ভূপতিঃ" ইত্যাদি (৮৭ পৃঃ)

তৎপরে "গৌড়সিংহাসনে একাধিক শশাঙ্করাজ অধিষ্ঠিত" থাকিলেও, সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—মহাদেব-কারিকার গৌড়ভূপতি শশাঙ্ক, এবং হর্ষবর্দ্ধনের সহোদর-

রাজ্যবর্দ্ধনের প্রাণসংহারকারী, একই ব্যক্তি। "রাজন্যকাণ্ডে"ও (৭১—৭২ পৃঃ) কর্ণসুবর্ণপতি শশাঙ্কের প্রসঙ্গে সরযূপারী শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের কুলপঞ্জিকার দোহাই দিয়া, এই শশাঙ্কই যে সরযূপার হইতে কয়েক জন শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, তাহা বর্ণা হইয়াছে; কিন্তু উক্ত কুলপঞ্জিকায় শশাঙ্ক যে "গৌড়ভূপতি" বলিয়া কথিত হইয়াছেন, তাহার উল্লেখমাত্রও করা হয় নাই। কুলপঞ্জিকাকারের উক্তি এই ভাবে উপেক্ষিত হইবার কারণ কি? কুলপঞ্জিকাকারও পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতানুসরণ করিয়াই গৌড়পতি এবং কর্ণসুবর্ণপতিকে এক মনে করিয়াছেন, সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় এরূপ সন্দেহ করেন কি?

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

আমাদিগের সাহিত্য-সেবা।

৩

সর্ব্বপ্রকার সাহিত্য-সেবার উদ্দেশ্যই "অগ্রসর" হওয়া। অর্থাৎ, ব্যক্তির ও জাতির উন্নতিসাধন করা। অবস্থা-বিবেচনায় অধুনা কোন্ পথে অগ্রসর হইলে ব্যক্তিগত ও জাতীয় মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা, তাহা ইঙ্গিত করিবার পর, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—"আমরা করিতেছি কি?" এক্ষণে এই প্রশ্নের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ের কথা বলিতে গেলে আশঙ্কা হয়, অনেকে অসন্তুষ্ট হইতে পারেন। কিন্তু আমার কোনও ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া কিছু বলা উদ্দেশ্য নহে; সুতরাং আমি ক্ষমার্হ।

আমরা করিতেছি কি? মোটামুটি এ প্রশ্নের উত্তর এই ভাবে দেওয়া যাইতে পারে। আমরা গ্রন্থ লিখিতেছি; গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিতেছি; মাসিক পত্রিকা বাহির করিতেছি; সাহিত্য-সম্মিলন বসাইতেছি।

গ্রন্থ লিখিতেছি কেন? দেশের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ত প্রায় কেহই লিখিতেছি না। দেশ নিরন্ন হইল; মধ্য শ্রেণীর লোকের সংসার চলাই কঠিন। উচ্চ শ্রেণীর লোক ডুবিতে বসিয়াছে। নিম্ন শ্রেণীর অধিকাংশ লোক দেনায় বিব্রত; এত বিব্রত যে, তাহাদিগকে ঋণ দিবার নিমিত্ত সরকারী ব্যবস্থা হইয়াছে। জ্বরে এবং নানাবিধ পীড়ায় অসংখ্য লোক মরিতেছে, এবং অসংখ্য আধমরা হইয়া আছে। যেরূপ জ্ঞানবিস্তারে এই অবস্থার উন্নতি হইতে পারে,

সেরূপ গ্রন্থ লিখিতেছি না ত। কৃষি, শিল্প ইত্যাদিতে অল্পব্যয়ে অধিক লাভবান হইতে পারা যায় কিসে? অল্প ব্যয়ে স্বাস্থ্যের উন্নতি করা যায়,—গ্রামের উন্নতি করা যায় কিসে? অপরিমিত ব্যয়ের সুতরাং ঋণের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করা যায় কিসে? এ সকল জ্ঞানের বিস্তার করা প্রায় কোনও গ্রন্থেরই উদ্দেশ্য নহে। উপন্যাসাদি সুকুমার সাহিত্য এই সকল বিষয়ে কত উপকার করিতে পারে, তাহার সীমাই নাই। কিন্তু কৈ? তাহা করে কে? জনসাধারণের বোধগম্য সাহিত্য কৈ? আমার "মানব-সমাজ" ত আমার গ্রামের স্কুল-পণ্ডিত মহাশয় বুঝিতেই পারেন না। তবে আমি লিখিলাম কাহার জন্য? আমারও যদি বা একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া চলে, কিন্তু উপকারজনক জ্ঞান-বিস্তারের চেষ্টায় সাহিত্য এখন পর্য্যন্ত প্রায় কিছুই করিতেছেন না, এ কথা বলিলে কৈফিয়ৎ কি আছে?

হিতকারী গ্রন্থ না লেখা, এক দোষ। আবার, অহিতকারী গ্রন্থ লেখা তদপেক্ষা গুরুতর দোষ। হিন্দু মুসলমান-সমাজে নিন্দনীয়, লোমহর্ষণ অশ্লীল প্রণয়-চিত্র গত দশ বৎসরে আমাদিগের গ্রন্থকারগণ বহুবার অঙ্কিত করিয়াছেন। আমার এক জন বন্ধু বলেন, দুই জন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ঐ কালের মধ্যে স্বীয় রচনায় সম্বন্ধ-বিরুদ্ধ রসিকতা অন্ততঃ দশ বারো বার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা তিনি জানেন। কবিতা ক্রমে সম্পূর্ণ নিরর্থক হইয়া উঠিতেছে। আমি এক জন প্রসিদ্ধ কবির একটী কবিতা সে দিন দুইবার পড়িয়াও বুঝিতে পারিলাম না। কবিতাতে হয় ত দুর্ব্বোধ, মামুলী ধর্ম্মকথা লিখিত হইতেছে; না হয় প্রণয়-বিষয়ক নানারূপ অবস্থা ও ঘটনা বর্ণিত হইতেছে। যাহাতে হৃদয়ে উৎসাহ দেয়, প্রাণে মঙ্গলময় আবেগ জাগাইয়া তুলে, স্নায়ুমণ্ডলে ও মস্তিষ্কে বলসঞ্চার করে, মনে উদ্যম ও প্রতিজ্ঞা অঙ্কিত করিয়া মানুষকে কল্যাণের পথে লইয়া যায়; অন্য দিকে, স্বভাবের কোমল বৃত্তি সকলকে ধ্বংস করে না, বরং তাহাদিগকে উত্তরোত্তর পবিত্র করিয়া দেশকালোপযোগী মনুষ্যত্বের আদর্শের সৃষ্টি করে, সেরূপ কবিতা প্রায় দেখিতেই পাই না।

ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, উহারা এখনও এতদ্দেশে মঙ্গলজনক পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না। জনসাধারণের সেবায় নিযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত দেশকালোপযোগী পথ পাইবেও না।

ফলতঃ, আমাদিগের গ্রন্থ লেখা সফল হইতেছে, দেশের ও সমাজের দিকে তাকাইয়া সার্থক হইতেছে, এ কথা বলিতে কেহই সাহসী হইবেন না।

গ্রন্থ-সংগ্রহ সম্বন্ধেও তাহাই বলা যাইতে পারে। দেশের ও দশের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া গ্রন্থের সংগ্রহ ও সম্পাদন করা হইতেছে না।

অল্পদিন হইল, একখানি প্রাচীন পদ্য গ্রন্থ সংগৃহীত ও মুদ্রিত হইয়াছে। উহাতে সামাজিক চিত্র, বৌদ্ধধর্ম্মের ও হিন্দুধর্ম্মের সামাজিক বিকাশ, প্রাচীন শিল্প বাণিজ্য, যুদ্ধ বিগ্রহ, বেশভূষা, লোকচরিত্র এমন উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত হইয়াছে যে, সম্পাদক সে সকলের দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া শুধু কতকগুলি বাঁধা কথা লিখিয়া ভূমিকা শেষ করায়, পরম পরিতাপের কারণ হইয়াছে। এতদ্দেশে কেমন করিয়া পুরাতন হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম একত্রিত হইয়াছিল, তাহাতে জনসাধারণের চরিত্র কিরূপে গড়িয়া উঠিতেছিল, বর্ত্তমান লোক-চরিত্রের সহিত তাহার সংস্রব কি, এ সকল বুঝাইয়া না দিলে ঐরূপ গ্রন্থের সম্পাদন বিফল হয়। প্রাচীন গ্রন্থের সংগ্রহ, মুদ্রণ ও সম্পাদন বিষয়ে দেশের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করাই সঙ্গত। কিন্তু তাহা হইতেছে কি?

এই স্থানে আর একটী কথা বলিব। নানা ভাষায় অনেক উৎকৃষ্ট এবং সময়োপযোগী গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। সে সকলের বঙ্গানুবাদ করিয়া দশের প্রয়োজন অনুসারে টীকা ভাষ্যাদি সংযুক্ত করিয়া মুদ্রিত করিলে, মাতৃভাষায় শ্রীবৃদ্ধি হয়, হিতকর জ্ঞান দেশমধ্যে প্রচারিত হয়, এবং সমাজও ক্রমে "অগ্রসর" হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইতে পারে। এ সম্বন্ধে মন্তব্যের অভাব নাই; কিন্তু করে কে? আমি জানি, এক জন ডারুইনের কোনও বিখ্যাত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিতেছিলেন। উহা মাসে মাসে কোনও পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে অধিকসংখ্যক পাঠক পড়িতে পারিবেন, এই আশায় কোনও পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছিল। অবশেষে অত্যন্ত মর্ম্মভেদী কারণে ঐরূপ ব্যবস্থা বন্ধ হইয়া গেল। এক্ষণে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। কিন্তু পড়িবে কে? কেহ না পড়িলে ছাপাইয়া লাভ কি? অবশ্যই উহা প্রকাশিত হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য। যাহা হউক, অনেকেই নানা সদ্‌গ্রন্থ ভাষান্তরিত করিয়া বঙ্গভাষার ও দশের উপকার করিতে পারেন। তাহা করিতেছেন কি?

এক্ষণে মাসিক পত্রিকা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক বোধ করি। আমাদিগের অলঙ্কারশাস্ত্র বলে,—সাহিত্য-সেবায় চতুর্বর্গ ফল হয়; সুতরাং অর্থলাভও হয়। ফল অর্থলাভ হইলেও, উদ্দেশ্য,—অন্ততঃ অর্থলাভ মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। তাহা হইলেই ব্যবসাদারী হইয়া উঠিল।

তাহাতে সাহিত্যের গৌরবরক্ষা হয় না। তেমনই, যাহার কিছু বলিবার নাই, সে যত বড় ধনী মানী পণ্ডিত হউক না কেন, যাহার সাধুতা, সচ্চরিত্রতা, একাগ্রতা ও সদুদ্দেশ্য নাই বলিলেই হয়, কেবল বিলাসিতা ও খেয়াল আছে, সে যত বড় ধনী, মানী, পণ্ডিত হউক না কেন; সৎসাহিত্যকে স্পর্শ করিবারও তাহার অধিকার নাই। গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ করা প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থকারের অবশ্যকর্ত্তব্য ছিল; প্রাচীন খৃষ্টান মহাকবি গ্রন্থারম্ভে কবিতার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে সম্বোধন করিয়া হৃদয়ের পাপবৃত্তি দূরীভূত করিবার নিমিত্ত এবং হৃদয়কে পবিত্র করিবার উদ্দেশ্যে কত স্তব করিয়াছেন :—এ সকল কি নিরর্থক? অপবিত্র হস্ত হইতে পবিত্র সদ্ভাবপূর্ণ গ্রন্থ বাহির হওয়া এবং তদ্দ্বারা লোকহিত-সাধন অসম্ভব। আমরাও এখন মঙ্গলাচরণ করি, কিন্তু সে কেবল নকল-নবীশী। মিল্টন্ ঢং করিবার জন্য গ্রন্থারম্ভে দেবীর স্তব করেন নাই। প্রকৃতই উহা তাঁহার সাধু হৃদয়ের উচ্ছ্বাস। এ সকল কথা প্রকাশ্যে অস্বীকার কেহই করিবেন না। কিন্তু আমাদিগের মাসিকপত্রিকাগুলি কি এই ভাবে পরিচালিত হইতেছে? মাসিকপত্রিকার সংখ্যা দেখিয়া বোধ হয়, উহা কুবেরের ব্যর্থ সাধনার প্রয়াসমাত্র। যাহার কিছুই বলিবার নাই, সে কত কথা বলিতেছে। আবার সব কথা শ্লীলতা রক্ষা করিয়া বলা হইতেছে না। গল্পই প্রায় সকলগুলির অঙ্গাভরণ হইয়া উঠিয়াছে। তাহাও সদ্ভাবপূর্ণ, হিতকর আদর্শ-সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, অথবা মানবচরিত্র-গঠনের নিমিত্ত প্রায়ই লিখিত হয় না। কেহ দেশের দিকে চাহিয়া কিছু লিখিতেছেন, এরূপ বলিবার উপায় নাই। দুই একখানি মাসিকপত্রিকা বাদ দিলে অন্যগুলির সম্বন্ধে এরূপ সমালোচনা কটু হইলেও, অসত্য হইবে বলিয়া বোধ হয় না। মাসিকপত্রিকায় ছবি দেওয়া একটা নিয়ম হইয়া উঠিয়াছে। ইহা কি চিত্রকলার সাধনা? না গ্রাহক-সংগ্রহের ফাঁদ? এ ছবিগুলি প্রায়ই বিলাসভাবোদ্দীপক রমণীমূর্ত্তি। তিন চারি মাস পূর্ব্বে একখানি মাসিকপত্রিকায় নারী মূর্ত্তির লজ্জাস্থান প্রায় নগ্ন দেখিয়াছি। এ পত্রিকা এখনও ভদ্রলোকে স্পর্শ করিতেছে। কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট লেখক আমাদিগের সম্বল; তাঁহারাই অনবরত ডিম্ব প্রসব করিতেছেন। এ লেখার মূল্য কি? মাসিকপত্রিকা লোকশিক্ষাবিস্তারের প্রধান উপায়; কিন্তু ফলে হইতেছে এই যে, অধিকাংশ স্থলেই সুশিক্ষার কিছুই পাইতেছি না, কুশিক্ষার অনেক উপাদান সংগ্রহ করিতেছি। এ অবস্থায় নীরব থাকা আর চলিতেছে না। লেখক ও সম্পাদকগণের মধ্যে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু অনেক

আছেন। তাঁহাদিগের দুই এক জনকে বাদ দিলে অপরের সম্বন্ধে এরূপ সমালোচনা অপ্রযোজ্য নহে। কিন্তু এরূপ সমালোচনা আমাকে প্রয়োগ করিতে হইল, ইহা গভীর পরিতাপের বিষয়। বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া, অল্পসংখ্যক মাসিকপত্রিকার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিবার নিমিত্ত সাধারণের প্রয়োজনানুরূপ প্রবন্ধ লিখিয়া, ঐ সকল পত্রিকার প্রচার বিষয়ে যত্নশীল হইলে, সমাজের অধিক মঙ্গল হইতে পারে, এ কথা কখনই বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। পুরাতনের উন্নতিসাধন করিতে পারিলে বর্ত্তমান অবস্থায় রাশি রাশি উদ্দেশ্যবিহীন পত্রিকার প্রচার অসঙ্গত, ইহা বলিতে আমি কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করি না। কিন্তু যেখানে সকলেই বলিবার জন্য ব্যাকুল, সেখানে কেবলই হট্টগোল হয়, শুনিবার লোক থাকে না। এ সকল কথা কেহ কি শুনিবেন? পরস্পরের অস্তিত্বই সঙ্কটাপন্ন করিয়া তোলা সম্পাদকগণের কর্ত্তব্য হয় না। ইহা সবল ভাবের প্রতিযোগিতা নহে, বর্ত্তমান অবস্থায় মারাত্মক চেষ্টামাত্র।

এক্ষণে সাহিত্য-সম্মিলন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। ইহার জন্য নিজে অনেক লাঞ্ছনা মাথায় করিয়া লইয়াছি। ইহার কার্য্য-প্রণালী যদি চুঁচুড়া অধিবেশন হইতে বিশেষভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তবে তাহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। ইহাকে ভালবাসি। এ সকল আস্পর্দ্ধা করিবার নিমিত্ত বলিতেছি না; শুধু আমার বক্তব্যের কেহ বিপরীত অর্থ না করেন, এই নিমিত্ত বলিতেছি। আমরা অধুনা অর্থকেই বড় করিয়াছি; শিক্ষার আদর করিতেছি না। কিছু দিন পূর্ব্বেও শিক্ষিত সম্প্রদায়ই সর্ব্ববিষয়ে অগ্রণী ও আদৃত ছিলেন। আজি দেবতার অভিসম্পাত হইল, "শিক্ষিত সম্প্রদায় অধঃপাতে যাউক।" অমনই আমরা তাঁহাদিগকে নীচে নামাইতেছি। সকল বিষয়েই এই অনুষ্ঠান চলিতেছে; অর্থের জয়জয়কার; বিদ্যার অনাদর। অর্থের আদর চিরদিনই অল্পাধিক থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহাকেই জীবনের একমাত্র সেব্য পদার্থ বিবেচনা করাই সাংঘাতিক। আজি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পূর্ব্বের ন্যায় পসার নাই; আমাদিগের কাছেও নাই। এ এক দুঃখ। তা'র পর, দলাদলিতে নিজের দল পুষ্ট করিবার নিমিত্ত অন্য দলকে লাঞ্ছিত করিতেছি। নিজ দলের লোককে বাড়াইয়া অন্য দলের সুযোগ্যকে নামাইতেছি। সাহিত্যকে উপলক্ষ করিয়া উপকারপ্রত্যাশায় নীচতা স্বীকার করিতেছি। শৃঙ্খলার অভাববশতঃ, বিধি-নিষেধের অধীনতা-স্বীকারে অনভ্যাসবশতঃ, আমরা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিতেছি।

মনের দৃঢ়তা না থাকায় কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে ভীত হইতেছি। এ সকল যদি আমাদিগের হইয়া থাকে, তবে সাহিত্য-সম্মিলনও এ সকল হইতে উদ্ধার পায় নাই। দৃষ্টান্ত দিয়া এই অপ্রিয় বিষয় আরও অপ্রিয় করিতে ইচ্ছা করি না। অর্থশালী সম্প্রদায়ে আমার বন্ধু অনেক আছেন। যাঁহাদিগকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করি, এরূপ ব্যক্তিও আছেন। কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সর্ব্বত্রই, বিশেষতঃ সাহিত্য-ক্ষেত্রে, এরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া নীরব থাকিলে পাপস্পর্শ করে, তাই বাধ্য হইয়া এ সকল বলিতে হইল।

এই সকল কথা স্মরণ রাখিয়া সাহিত্য-সম্মিলন সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথমে বলিতে ইচ্ছা করি যে,

১। এ পদার্থটাকে বড়লোকের (ধনে অথবা বিদ্যাতেই হউক না কেন,) খেয়ালের সামগ্রী করা উচিত নহে।

২। কাহাকেও নিয়ম লঙ্ঘন করিতে দেওয়া উচিত নহে। মুখে বক্তৃতা করিতে কাহাকেও দেওয়া সঙ্গত নহে।

৩। ইহাকে দলাদলির রঙ্গভূমি করিতে দেওয়া উচিত নহে।

৪। ইহাকে রাজতন্ত্র ভাবা উচিত নহে, ইহা সাধারণতন্ত্র। যাহাতে এক জন অপেক্ষা অন্য জন একটুও বড় বোধ হয়, সেরূপ ভাব ইহাতে দুষ্ট হওয়া উচিত নহে। কেবল সভাপতি অবশ্যই সকলের অপেক্ষাই বড়; কিন্তু তিনিও সকলের ন্যায় ব্যবহার করিলেই শোভন হয়। *

৫। যাঁহার কিছু বলিবার নাই তিনি যেই হউন, সময় নষ্ট করিতে পারিবেন না।

৬। প্রবন্ধের বিষয় ও সংখ্যা—পূর্ব্বে স্থির করিয়া দেওয়া উচিত। ইহার অল্প ইতরবিশেষ মার্জ্জনীয়।

৭। নবাবী, বড়মানুষী ইহার সংস্রবে আসিতে পারিবে না। ধুমধামেও না; সাজ সজ্জা, পান ভোজন, কিছুতেই না।

৮। যাহাতে চাটুকারিতা, কর্ত্তাভজা, অথবা খোসামুদির গন্ধমাত্রও থাকে, কিংবা বিলাসিতার এক বিন্দুও লক্ষিত হয়, তাহা সর্ব্বদা বর্জ্জন করিতে হইবে। ...... যে দিন সভাপতির আগে পাছে নিশান, ডঙ্কা, আশা, ছোটা দেখিয়াছি; যে দিন স্বর্ণমুদ্রাকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে

* কেহ সিংহাসনে, কেহ ছেঁড়া কন্থায় বসিবার যে প্রথা আছে, তাহা রাজসাহীতে ও কাবাখ্যায় পালিত হয় নাই। এ প্রথা এখনই উঠাইয়া দেওয়া উচিত।

দেখিয়াছি; যে দিন চরিত্রহীনতাকে সম্মিলনস্থলে নৃত্য করিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছি; যে দিন বিদেশী ব্যক্তির অনুকূলে বিধি নিষেধ লঙ্ঘিত হইতে দেখিয়াছি; যে দিন রং তামাসার ভাব আহারে ব্যবহারে সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইতে দেখিয়াছি; যে দিন বর্ত্তমান যুগের আশা আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শকে পদদলিত করিয়া মরণসঙ্গীতের ধূয়া বিনা প্রতিবাদে গায়িতে শুনিয়াছি; যে দিন চাটুকারিতার, দলাদলির, লাট ও বেলাটের, জজ ম্যাজিষ্ট্রেটের, নবাব বাদশাহের ছড়াছড়ি দেখিয়াছি, সেই দিন হইতে নীরবে নিভৃতে বসিয়া অশ্রুপাত করা ভিন্ন অন্য পথ দেখিতেছি না। সে দিন হইতে বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; মন অবসন্ন হইয়াছে। বুঝিয়াছি, মহাত্মা রামমোহনের ধর্ম্মান্দোলনের ন্যায়; অক্ষয়কুমার, ভূদেব ও বিদ্যাসাগরের সামাজিক জীবনদানের ন্যায়; হরিশ্চন্দ্র, রামগোপাল ও সুরেন্দ্রনাথের মৃতসঞ্জীবন মন্ত্রের ন্যায়; কৃষক ও শ্রমজীবীর উন্নতিসাধনকল্পে স্বদেশী চেষ্টার ন্যায় সাহিত্যিক জাগরণ, (অন্ততঃ সম্মিলন অবলম্বনে সাহিত্যিক জাগরণও দু'দিনের জন্য একবার চক্ষু মেলিয়া আবার দীর্ঘ তন্দ্রার অধীন হইবে। একবার একটু জীবনের চিহ্ন দেখাইয়াই আবার মৃতপ্রায় হইবে, তাহাতে সন্দেহ-মাত্র নাই। জাতীয় জড়তা দূরীভূত না হইলে সাহিত্য-ক্ষেত্রেও কোনও আশাই নাই।

৯। তাই, দু'দিনের চীৎকার, খাওয়া দাওয়া, রঙ্গরসের পর সমস্ত বৎসর কোনও একটী মন্তব্যও কার্য্যে পরিণত করিবার কিছুমাত্র চেষ্টা লক্ষিত হয় না। এ জড়তা দূর করিতে হইবে।

১০। সকল প্রবন্ধই ছাপান উচিত নয়। যাহাতে দেশের ও দশের কিছুই মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহা মুদ্রিত হইবে না।

১১। অনুষ্ঠানকার্য্যে বহু অর্থ ব্যয়িত হওয়া উচিত নহে।

আরও কত কথা বলিবার ছিল; কিন্তু ইচ্ছা হইতেছে না। আমাদিগের সকল অনুষ্ঠানের মধ্যেই বিধাতা কেন যে মরণের বীজ বপন করিয়া দেন, তাঁহার ইচ্ছা কি, তাহা তিনিই জানেন; আমারা তাহার কি বুঝিব? বুঝি বা বংশ-সংশোধন, বৈষ্টনী-সংশোধন না হইলে, আমাদিগের দ্বারা কোনও মহৎ কার্য্যই সিদ্ধ হইবার নহে। কিন্তু সে দিকে চিন্তা করে কে?

শ্রীশশধর রায়।

সাক্ষী।

পাখী আমার সাক্ষী আছে, উষা অরুণ এসেছিল।
কুঞ্জতলে দীঘির জলে হাসির দীপ্তি ভেসেছিল।
আঁধার ঘরে আমি একা! আমাকে না দিল দেখা!
ভুলে গেছে, আগে সে যে কত ভাল বেসেছিল।
শিশির-ধোয়া কুসুমরাশির গাল-ভরা সেই শুভ্র হাসির
মধুটুকু লুটে নিতে এই কাননের দেশে ছিল;
তখন আমি দুয়ার খুলে ছুটে গেলাম তরুর মূলে;
আমার দুঃখে ডাক্‌ল পাখী, বাতাস একটু শ্বসেছিল।
জান্‌ত তারা আগে মোরে কত ভাল বেসেছিল।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

ভূপাল।

হোসেঙ্গাবাদ মধ্যপ্রদেশের একটি জেলা। বিশিষ্ট সহর। এখানে কমিশনর অবস্থিতি করেন। আমি হোসেঙ্গাবাদে শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস ঘোষ উকীল মহাশয়ের বাটীতে দুই সপ্তাহ কাল অবস্থিতি করি। ইনি অতি সজ্জন। ইনি কবি; 'বীণা' ও 'কণা' নামে ইঁহার দু'খানি বই আছে। আরও অনেক কবিতা লিখিয়াছেন; অবকাশকালে পড়িয়া শুনাইলেন। যে কোনও বঙ্গদেশীয় ভদ্রলোক ইঁহার বাটীতে গিয়া স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে পারেন। আমি ইঁহার অতিথিসেবাব্রতে মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

হোসেঙ্গাবাদ সহর নর্ম্মদাতীরে অবস্থিত। নদীর পরপারে বিন্ধ্য-গিরি-শ্রেণী। যে দিকে সহর অবস্থিত, সে দিকে প্রস্তররচিত চার পাঁচটি প্রকাণ্ড ঘাট নদী-তটের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। এত বড় ঘাট ও সুপ্রশস্ত সোপানাবলী আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ঘাটের উপরে সাধু সন্ন্যাসীদিগের বাসের নিমিত্ত ধর্ম্মশালা ও শ্রেণীবদ্ধ মন্দিরমালা। প্রত্যেক মন্দিরে রামসীতা, রাধাকৃষ্ণ, মহাবীর, মহাদেব প্রভৃতি নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি। তন্মধ্যে নর্ম্মদা-দেবীর মূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য। মর্ম্মরগঠিতা দেবী নর্ম্মদা মকরবাহিনী গঙ্গার ন্যায়

মনোহারিণী। এতদ্ভিন্ন নগরমধ্যে আরও অনেক দেবদেবীর মন্দির আছে। সেগুলি দ্রষ্টব্যের মধ্যে গণনীয়। রামদাস বাবাজীর আখড়ায় তাঁহার চরণপাদুকা ও অনেক মহাত্মার সমাধি আছে।

প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে বড়তাওয়া ও নর্ম্মদা নদীর সঙ্গমে (হোসেঙ্গাবাদ হইতে ৩।৪ মাইল দূরে) বান্দ্রাবন নামক স্থানে মহা মেলা হয়। সে সময় নর্ম্মদা-যাত্রা হইয়া থাকে। তদুপলক্ষে অসংখ্য লোকের সমাগত হয়।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী, বেলা একটার সময় হোসেঙ্গাবাদ হইতে ভূপালে যাত্রা করিলাম। প্রথমেই খররাঘাট নামক স্থানে নর্ম্মদার সুদীর্ঘ রেলসেতু পার হইয়া, প্রায় তিন মাইল পরে ট্রেণ বিন্ধ্যপর্ব্বতমালার ঘাট-শ্রেণীর মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। উভয় পার্শ্বের গগনচুম্বী শৈলরাজির বিচিত্র শোভা অত্যন্ত মনোহর। কখনও ট্রেণ ঊর্দ্ধে উঠিতেছে; কখনও বা নিম্নে নামিতেছে। পর্ব্বতগাত্রে স্থানে স্থানে নিবিড় অরণ্যানী,—আবার কোথাও হেমন্তের পত্রপল্লবশূন্য কানন। কোথাও তৃণলতাগুল্মবিবর্জ্জিত পর্ব্বতের দগ্ধমরুভূমিবৎ পাষাণবক্ষ হা হা করিতেছে। কোথাও পাষাণের গাত্র ঘোর পীতবর্ণ; কোথাও বা ঘোরকৃষ্ণ,—কোথাও বা ধূসর। অনেক স্থানে ঊর্দ্ধদেশ-উন্মুক্ত অর্দ্ধক্রোশাধিক দীর্ঘ সুড়ঙ্গপথ ভেদ করিয়া ট্রেণ চলিতেছে। আবার তাহা অতিক্রম করিয়া বিচিত্র-দর্শন উপত্যকার মধ্য দিয়া ছুটিতেছে। সূর্য্যরশ্মি স্থানে স্থানে ঝলিতেছে—উপত্যকার এক দিক রৌদ্রদীপ্ত, অপর দিক ছায়াময়! এই রৌদ্র ও ছায়ার মিলন বড়ই মর্ম্মস্পর্শী! প্রায় চৌদ্দ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ট্রেণ বারখেড়া নামক ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। শৈল পথের দৃশ্য এই স্থানেই শেষ হইয়া গেল। তার পর কতক পথ কেবল নিবিড় বন। দিবসেই অর্দ্ধ-অন্ধকার। অপরাহ্লে হেমন্তের ক্ষীণ রৌদ্র বন-যবনিকা ভেদ করিয়া মধ্যে মধ্যে ঝক্ ঝক্ করিতেছে দেখিয়া মধুসূদনের দুইটি পংক্তি মনে পড়িল;—

"স্থানে স্থানে পত্রপুঞ্জ ভেদি প্রবেশিছে
রশ্মি, তেজোহীন কিন্তু রোগিহাস্য যথা।"

তাহার পরে ট্রেণ সমতল প্রান্তরমধ্যবর্ত্তী পথে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিল। এখন শৈলসৌন্দর্য্য অন্তর্হিত। শস্যক্ষেত্র—তৃণখর্পরাচ্ছাদিত-গৃহাবলি-সমন্বিত গ্রামসমূহ—তুষার কল (Ginning Factory) তুষারস্তূপের ন্যায় তূলারাশি স্তূপাকার হইয়া কারখানার পার্শ্বস্থিত উন্মুক্ত প্রান্তরে পড়িয়া আছে। এই সকল সাধারণ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে ক্রমে ভূপাল ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী হইলাম। দেখিলাম,

বিশাল-পাদপ-সমাচ্ছন্ন উত্থানরাজির শীর্ষদেশ ভেদ করিয়া ভূপালের নয়নরঞ্জন সৌধশিখরশ্রেণী, গগনস্পর্শী মসজীদ-মিনার, গুম্বজমালা, তোরণ, বুরুজ প্রভৃতি নেত্রপথে দিনান্তকিরণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। মুসলমান অধিবাসীর অধ্যুষিত খাঁটী মুসলমান রাজ্য কখনও দেখি নাই। তাহার উপর আবার এক জন মুসলমান শাসনকর্ত্রী এই রাজ্যের রাজদণ্ড ধারণ করিয়া প্রজাপালন করিতে-ছেন—এই সকল কথা ভাবিয়া আমার চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল! কখন যে ট্রেণ ষ্টেশনে প্রবেশ করিল, বুঝিতে পারি নাই। অকস্মাৎ স্বপ্নভঙ্গের ন্যায় চমকিত হইয়া গাড়ী হইতে দ্রব্যাদি সহ নামিয়া পড়িলাম।

ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়াই দেখি, সারি সারি টাঙ্গা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। টাঙ্গা-চালক আমাকে ঘিরিয়া 'সাহেব, কাঁহা যাইয়েগা? আইয়ে, টাঙ্গা'পর চড়িয়ে' বলিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। এক জন আমার ট্রাঙ্ক, হ্যাণ্ড-ব্যাগ, টিফিন-বক্স, বিছানা প্রভৃতি কুলীর নিকট হইতে জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া আপনার টাঙ্গায় তুলিয়া ফেলিল। আমি কি করি, অগত্যা নিরুপায় হইয়া তাহার টাঙ্গায় চড়িয়া বসিলাম। বলিলাম, "চোপদারপুরায় দেওয়ান ঠাকুরপ্রসাদের বাটীতে লইয়া চল। কত ভাড়া লাগিবে?" সে প্রথমে বার আনা, শেষে আট দশ আনা বলিয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে টাঙ্গা চালাইয়া দিল।

ভূপাল প্রাচীর-পরিবেষ্টিত নগর। একটি তোরণদ্বার অতিক্রম করিয়া, উভয়পার্শ্বে পণ্যপূর্ণ বিপণীশ্রেণীশোভিত, জনপূর্ণ একটি সঙ্কীর্ণ রাজপথ দিয়া টাঙ্গা চোপদারপুরার অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। ঐ স্থান ষ্টেশন হইতে দুই মাইলের অধিক। নগরীর এক প্রান্তে অবস্থিত। ঠাকুরপ্রসাদ পূর্ব্বে বেগমসাহেবার দেওয়ান ছিলেন। তিনি স্বর্গস্থ হইয়াছেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র মুন্সী দৌলত রায় রাজসরকারে উচ্চপদে নিযুক্ত। তাঁহার নামে একখানি পরিচয়পত্র ছিল।

টাঙ্গা হইতে নামিয়া আমি তাঁহার বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবু দৌলত রায় কোথায়?" কথাটি শেষ হইতে না হইতেই, মস্তকে পীতবর্ণের প্রকাণ্ড পাগড়ী বাঁধা এক জন আমাকে অতি পরিচিতভাবে "আইয়ে, আইয়ে, বৈঠিয়ে, আরাম কিজিয়ে" বলিয়াই আর এক জনকে তৎক্ষণাৎ টাঙ্গা হইতে আমার দ্রব্যাদি নামাইয়া লইতে আদেশ করিলেন। টাঙ্গাওয়ালাকে কি দিতে হইবে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি হিন্দীতে বলিলেন, "চারি আনা দিন।" আমি একটি সিকি ব্যাগ হইতে বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলাম। সে ক্রুদ্ধ

হইয়া বলিল, "আট আনা দিবার কথা—চারি আনা কেন ?" দৌলত রায় গম্ভীর-ভাবে বলিলেন, "চলা যাও।" সে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল।

আমি বলিলাম, "উহাকে আট আনা দিবার কিন্তু কথা হইয়াছিল।" তিনি মৃদুমধুরহাস্তে বলিলেন, "চারি আনাই রীতি।" দৌলত রায় বাজে কথা কহেন না। রাশভারি লোক। রাজকার্য্যে দক্ষ। কিন্তু তাঁহার হাসিটি অতি মৃদু ও মধুর। আমি তাহা কখনও ভুলিব না।

কিছুকাল বিশ্রামান্তে কিঞ্চিৎ জলযোগের পর ভ্রমণেচ্ছা জ্ঞাপন করিলে, দৌলত রায় তাঁহার এক জন কর্ম্মচারীকে সঙ্গে দিয়া বলিলেন, "অদ্য বেলা গিয়াছে ; ইঁহাকে নিকটস্থ পানচাক্কী, কমলাবতীর প্রাসাদ ও মতি-মসজীদ দেখাইয়া আনুন।" সে ব্যক্তি প্রথমেই আমাকে পানচাক্কী দেখাইতে লইয়া গেল। বাস্তবিক পানচাক্কী অতি সুন্দর! ইহা আটা ময়দা পিষিবার কল! হ্রদের জলস্রোতে সাত আটটি চাকা বন্‌বন্ করিয়া কল চালাইয়া আটা ময়দা পিষিতেছে। অমিত জলরাশি চাকাগুলিকে ঘুরাইয়া নদীপ্রপাতের ন্যায় অজস্র মুক্তাগুচ্ছ বর্ষণ করিতে করিতে সশব্দে পশ্চাদ্বর্ত্তী গহ্বরে পতিত হইয়া বহিয়া চলিয়াছে। অসংখ্য মুসলমান ভদ্রলোক এই দৃশ্য দেখিতেছেন।

পানচাক্কীর নিকটেই রাণী কমলাবতীর দীর্ণ জীর্ণ প্রকাণ্ড প্রাচীন সপ্ততল প্রাসাদভবন। এই রাণী কমলাবতী দিল্লীর সেই আল্লাউদ্দীনের কমলাবতী নহেন। পূর্ব্বকালে ইনি গণ্ড রাজবংশের শক্তিশালিনী রাণী ছিলেন। এক সময়ে ইঁহার প্রভূত প্রতাপ ছিল। কালে সব গিয়াছে ; কিন্তু এই প্রস্তরনির্ম্মিত সমুচ্চ প্রাসাদ অসংখ্য শূন্য কক্ষ লইয়া অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এখন শৃগাল, কুকুর, পারাবত ও চর্ম্মচটিকা প্রভৃতি এবং সরীসৃপজাতীয় জীবের আবাসভবন হইয়াছে। শ্রী-সৌষ্ঠব কিছুই নাই—যেমন ধ্বংসের জাগ্রত মূর্ত্তি।

ভূপালের হ্রদ বিশ্ববিখ্যাত। আমরা যথাস্থানে তাহার বর্ণনা করিব। এতদঞ্চলে একটি শ্লোক প্রচলিত আছে ;—তাহাতে দুর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চিতোর দুর্গ, 'তাল' অর্থাৎ হ্রদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভূপাল তাল, আর রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কমলাবতী।

"গড় ত চিতোর গড়, আউর সব গড়িয়া।
তাল ত ভূপাল তাল, আউর সব তালিয়া।
রাণী ত কমলাবতী ;"—

রাণী কমলাবতীর এক সময় এতই নাম ছিল। এখনও সেই নাম কীর্ত্তিত হইতেছে!

এই প্রাসাদ দেখিয়া মতি মসজিদ দেখিতে যাত্রা করিলাম। কিয়দ্দূর গমন করিয়া একটি বিস্তৃত উন্মুক্ত স্থানে উপনীত হইলাম। এই স্থানের মধ্যস্থলেই অনিন্দ্য-সুন্দর চিত্র-প্রতিম মতি-মসজিদ। চারি দিকেই রাজপথ। পাঠক! শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, এই মসজিদটি ক্ষুদ্র আকারে দিল্লীর জুম্মা মসজিদের অবিকল অনুকৃতি। কে যেন সেই মসজিদটি ছোট করিয়া সেখান হইতে উঠাইয়া আনিয়া এই স্থানে বসাইয়া দিয়াছে। প্রস্তরনির্ম্মিত সোপানাবলীর দ্বারা মসজিদ-প্রাঙ্গনে উপনীত হইয়া, চারি দিক দেখিয়া, মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলাম। ঠিক জুম্মা মসজিদের ন্যায় প্রাচীরগাত্রে কোরাণের শ্লোকাবলী সুন্দর টোগরা অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। মসজিদের মুসলমান পুরোহিত এতই ভদ্র যে, এই বিদেশী পথিককে মসজিদের সমস্ত দ্রষ্টব্য যত্ন করিয়া দেখাইলেন। আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া মসজিদ পরিত্যাগ করিলাম।

রাত্রে বাসায় আসিয়া আহারান্তে শয়ন করিলাম। আহার্য্য অতি উৎকৃষ্ট আটার রুটী, দুই তিন প্রকার তরকারী, তন্মধ্যে একটি অম্লমধুর, ডাউল, দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন। মৎস্যাদি নাই। ইহাঁরা নিরামিষাশী। মুসলমান রাজ্যে বাস করিলেও ইঁহাদের হিন্দু আচারের কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। বাবু দৌলত রায় আবার রবিবারে ব্যঞ্জনে লবণ ব্যবহার করেন না। আমার জন্য স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত হইয়াছিল। দিবসে আমার জন্য অন্ন প্রস্তুত হইত; কারণ, ইঁহারা কচিৎ 'চাউল' বা অন্ন ব্যবহার করেন। তবুও বাটীর ছেলেরা বলিত, "অন্নের সহিত দুইখানি রুটী গ্রহণ করুন।" মুসলমান-প্লাবিত দেশে বাস করিয়া, মুসলমানের অধীনস্থ কর্ম্মচারী হইয়া, ইঁহারা হিন্দুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন; আর আমরা দুই পাতা ইংরাজী পড়িয়া (যাহা ভাল করিয়াও শিখি নাই) একেবারে বিকৃত হইয়া গিয়াছি! আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কি? এখানে প্রবাসী যে দুটি বাঙ্গালী আছেন, তাঁহারা মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

এখানে আটার কথা একটু বলিব। মালোয়ায়, মধ্যপ্রদেশে, মধ্যভারতে, দাক্ষিণাত্যে আটা যেন অমৃত। রুটীগুলি যেন মাখমের ন্যায় নরম। স্পর্শমাত্রেই সূক্ষ্ম কাগজের ন্যায় ছিন্ন হইয়া যায়। মুখে দিলেই সত্বর মিলাইয়া কণ্ঠে প্রবেশ করে। খাইতে যেমন সুস্বাদু, তেমনই মুখরোচক। আমি এ অঞ্চলের কত স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি। সর্ব্বত্রই অমৃত তুল্য আটার রুটী

খাইয়া তৃপ্ত হইয়াছি। এ রুটী কিছুদিন খাইলে অন্নে অরুচি হইয়া যায়।

তাহার পরদিন প্রভাতে নগর-ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। ভূপালের সর্ব্বপ্রধান দ্রষ্টব্য,—ভূপাল হ্রদ। এত বড় হ্রদ ভারতের আর কোনও নগরে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্বচ্ছোজ্জ্বল মুকুরবৎ বিশাল-বিস্তৃত জলরাশি সম্মুখে দূরে দূরে প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বে নাকি ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় চারি ক্রোশ ছিল। এক্ষণে কতক অংশ ভরাট করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং সেই স্থানে প্রায় চারি শত গ্রাম বা মৌজা বসান হইয়াছে। হ্রদের বর্ত্তমান দৈর্ঘ্য প্রায় ছয় মাইল। এইটি বড় হ্রদ। ইহাকে লোকে 'বড়া তলাও' বলিয়া থাকে। আরও একটি আছে—তাহাকে 'ছোটা তাল' বলে। তাহার নাম 'পোকৃতা-পুন তলাও'। উহাও দৈর্ঘ্যে প্রায় ক্রোশাধিক। মধ্যে প্রকাণ্ড বাঁধ উভয় হ্রদকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। জলের কল হইয়াছে। হ্রদদ্বয় হইতেই সহরে জল সরবরাহ হয়। ভারতের অতি অল্প নগরীই অবস্থানের রমণীয়তায় ভূপালের সঙ্গে তুলনীয়। সুন্দর নদের তীরে সুরম্য চিত্রের ন্যায় চারুদর্শন ভূপালনগরী পথিকের নয়ন-রঞ্জন করিতেছে। প্রায় ৩০০ শত ফিট পাহাড়ের মঞ্চোপরি থাকে থাকে স্তরে স্তরে শুভ্র সৌধমালা মধ্যে মধ্যে হরিতোদ্যানের পত্রপল্লবে সমাচ্ছন্ন হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে প্রতিভাত হইতেছে। রজতশুভ্র মেখলার ন্যায় নদদ্বয় নগরীকে দুই দিকে ঘিরিয়া আছে। কিয়ৎকাল হ্রদের দৃশ্য দেখিয়া সহরে প্রবেশ করিলাম। বেটোয়া নদীর স্রোত অবরুদ্ধ করিয়া এই বিরাট হ্রদ প্রস্তুত হইয়াছিল।

একটি সঙ্কীর্ণ পথের দুই ধারে প্রস্তরের প্রাচীর (Rubble Stone) ও খর্পর-ছাদ-সমন্বিত অট্টালিকা-শ্রেণী—কোনও বাটী দ্বিতল, কোনটি ত্রিতল; সম্মুখে অলিন্দ। অট্টালিকাগুলির সর্ব্ব উপরিতলের ছাদটি খর্পরাচ্ছাদিত। আমাদের দেশের মতন বক্রাকার লম্বা খর্পর নহে। খর্পরের আকৃতি চেপ্টা (Flat), পঞ্চকোণবিশিষ্ট। দূর হইতে দেখিলে ঘুঁটের মত বোধ হয়। নিম্নতলের ছাদ কাষ্ঠনির্ম্মিত। মধ্যবিত্ত গৃহস্থদিগের প্রায় সকল বাটীর সম্মুখভাগে বারান্দা আছে। একটি রাজপথের উভয় পার্শ্বের অট্টালিকাশ্রেণী পূর্ব্বাপেক্ষা মনোহর। শুভ্রবর্ণ সুচারু-খিলান-বিশিষ্ট ও সম্মুখভাগ কারুকার্য্যময় কাষ্ঠের অলিন্দ-সমন্বিত। এ পথ প্রশস্ত—সৌধাবলী সম্ভ্রান্ত মুসলমান ধনাঢ্য ভদ্রলোক-দিগের বলিয়া বোধ হইল। অনেক পথে এরূপ হর্ম্ম্যমালা দেখিলাম। বাজারের পথগুলি সঙ্কীর্ণ; চওড়ায় ১২।১৫ ফুটের অধিক নহে। উভয় পার্শ্বে দ্বিতল,

ত্রিতল অট্টালিকাশ্রেণী। মধ্যাহ্ন ভিন্ন রৌদ্র পায় না। প্রথম তলে নানাপণ্যপূর্ণ বিপণীশ্রেণী। পথ জনাকীর্ণ, কোলাহলময়। সহজে চলিবার যো নাই। টাঙ্গাওয়ালাকে প্রতিপদবিক্ষেপে 'হটো' 'হটো' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে লোক হটাইতে হটাইতে চলিতে হয়। এ জন্য অনেক সময়ে কোথাও শীঘ্র যাইবার দরকার হইলে টাঙ্গা-চালক সহরের প্রাচীরের বহির্ভাগ দিয়া যায়। পথের দু'ধারে মধ্যে মধ্যে পানের দোকান,—আচার, মিষ্টান্ন, নানাবিধ সুগন্ধি তৈল প্রভৃতি বিক্রয় হইতেছে। দেখিতে দেখিতে জুম্মা মসজিদের নিকট উপস্থিত হইলাম। এই মসজিদ উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কুদসিয়া বেগম কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ইহা উচ্চ পাষাণময় ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার গগনচুম্বী মিনার বহুদূর হইতে দৃষ্ট হয়। ইহার সুবর্ণকলস সূর্য্যকিরণে প্রদীপ্ত হইয়া রশ্মি বিকীর্ণ করিতেছে। গাঢ় রক্তবর্ণের প্রস্তরে নির্ম্মিত, অত্যুচ্চ সোপানাবলীর উপর সুরম্য অলিন্দে শোভিত চারিতল তোরণদ্বার অতিক্রম করিয়া মসজিদের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে হয়। মসজিদশীর্ষে বিপুল গম্বুজ শোভা পাইতেছে।

আমরা মসজিদ হইতে বাহির হইয়া ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থিত রত্নবণিকদিগের বিপণীমালা দেখিতে লাগিলাম। নানা প্রকার স্বর্ণ রৌপ্যে গঠিত, মণি মুক্তা ও হীরকে খচিত অলঙ্কার, স্বর্ণ ও রৌপ্যে নির্ম্মিত রেকাব, বাটী, গেলাস, ডিবা, আতর-দান, গোলাপদান, ফুলদানী, পিচকারী ও অন্যান্য বিবিধ প্রকারের পানপাত্র দোকানগুলি আলো করিয়া রাখিয়াছে। পথিপার্শ্বে নানাবিধ টাটকা তরিতরকারী, শাকসবজী, কমলালেবু, সবুজ কলা প্রভৃতি ফল সজ্জিত—বিক্রেতারা ক্রেতাদিগকে আহ্বান করিতেছে। পুষ্পবিক্রয়কারীরা পুষ্পসম্ভার লইয়া বসিয়া আছে। এ জায়গাটা চকের ন্যায় খুব সরগরম।

বাসায় প্রত্যাগত হইয়া স্নানাহার শেষ করিলাম। বিশ্রামান্তে 'সদর মঞ্জীল' নামক পূর্ব্বতন রাজপ্রসাদ দেখিতে যাই। ভূপাল-রাজবংশের আদি-পুরুষ এই বিশাল প্রসাদ নির্ম্মাণ করেন। তাহার পর ১৭০৯ খৃষ্টাব্দ হইতে আরব্ধ হইয়া ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হইয়া আসিতেছে—এক জনের পরে আর এক জন শাসনকর্ত্তা পর্য্যায়ক্রমে ক্রমান্বয়ে ইহার কলেবর-বৃদ্ধি করিতে করিতে রাজ্যশাসন করিয়া আসিতেছেন। প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ একটি প্রান্তরের ন্যায়—চারি দিকে একতল, দ্বিতল, ত্রিতল, চৌতল হর্ম্ম্যশ্রেণী শোভা পাইতেছে। শিল্পসৌন্দর্য্য না থাকিলেও, ইহার বিশালতায় হৃদয় স্তম্ভিত হয়। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহাতে আর কোনও অট্টালিকা সংযুক্ত হয় নাই।

সদর-মঞ্জীল দেখিয়া বাবু দৌলতরায়ের সহিত টম্‌টমে আমেদাবাদ যাত্রা করিলাম। বর্ত্তমান বেগম তাঁহার স্বর্গগত স্বামী আহম্মদ আলির নামে এই নগরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহা ভূপাল হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ। অতি পরিচ্ছন্ন রাজপথ দিয়া টম্‌টম্ চলিতে লাগিল। এই রাস্তার নাম সুলতানা রোড, বা Imperial Road। পথের এক পার্শ্বে দক্ষিণ দিকে টেলিগ্রাফ-পোষ্টে বৈদ্যুতিক আলোক। পথের ডান দিকে নূতন নূতন আদালত, আফিস প্রভৃতি বড় বড় অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতেছে। নূতন সহরে উপনীত হইয়া দেখিলাম—রেলওয়ে-বাঙ্গলোর ন্যায় অসংখ্য বাঙ্গলো সরকারী-আফিস-রূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

আমেদাবাদে রোহাত মঞ্জীল নামক নূতন রাজপ্রাসাদ ইংরাজী ধরণে নির্ম্মিত। প্রাচীন প্রাসাদে যে গাম্ভীর্য্য আছে, ইহাতে তেমন কিছুই নাই। তবে ইহা দেখিবার যোগ্য। প্রাসাদের চারি দিকে সুরম্য উদ্যান। নানাবিধ ফলপুষ্পের বৃক্ষে পরিপূর্ণ। মধ্যে মধ্যে সুন্দর রাজপথ। Hot-house, Ferns প্রভৃতি আছে। বর্ত্তমান বেগম এই প্রাসাদেই বাস করেন। আমি এক জন কর্ম্মচারীর সহিত প্রাসাদের দরবারগৃহে উপনীত হইলাম। ইহা ইংরাজী ফ্যাশনে সজ্জিত। কৌচ কেদারা টেবিল সোফা প্রভৃতি মখমলমণ্ডিত আস্‌বাব প্রচুর। প্রাচীরে ভূতপূর্ব্ব নবাব, বেগম ও রাজপরিবারের নরনারীর চিত্র। বর্ত্তমান মহামান্যা নবাব সুলতানা জাঁহা বেগমের চিত্রখানি দেখিলাম। তাঁহার মস্তকে রাজমুকুট, অঙ্গে রাজ-পরিচ্ছদ—ও তদুপরি জি, সি, আই, কেতাবের চিহ্ন উজ্জ্বল তারকা। পার্শ্বস্থ গৃহগুলিও নানা মর্ম্মরমূর্ত্তি ও মর্ম্মর-অলঙ্কারে সুসজ্জিত। বড় বড় ইংরাজ রাজ কর্ম্মচারী—পলিটিক্যাল-এজেণ্ট ও বেগমের বন্ধু কোনও কোনও গবর্ণর জেনেরেলের চিত্রাবলী প্রচীরে বিলম্বিত রহিয়াছে।

কক্ষ হইতে নিক্রান্ত হইয়া অলিন্দে বিচরণ করিতে লাগিলাম। হেমন্তের স্নিগ্ধ শীতল সমীর আমার উত্তপ্ত ললাট স্নিগ্ধ করিতে লাগিল। সম্মুখে সেই অনিন্দ্যসুন্দর হ্রদের বারি প্রবাহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলশ্রেণীর মধ্য দিয়া মৃদুহিল্লোলে প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু এই সকল পাহাড়ের পাষাণ-অঙ্গে তৃণ তরু লতা গুল্ম কিছুই নাই।

এখানে একটী বাঙ্গালী বালক আমার সঙ্গী হইল। ছোকরাটি কুমিল্লা হইতে এখানে রাজ-সরকারে গুটীপোকা বা রেশমের চাষ করিতে

আসিয়াছে। সে এখান হইতে আমাকে হ্রদের পরপারস্থিত সেমনা দেখাইতে লইয়া চলিল। এই কিশোরবয়স্ক বালক অতি শান্ত, শিষ্ট ও নম্র। দুইটী বলদ-সংযুক্ত সেজগাড়ী নামক একখানি যান বাবু দৌলত রায় আমার সেমনা যাইবার জন্ত ঠিক করিয়া দিয়া স্বকার্য্যে গমন করিলেন। গাড়ীখানি কতকটা পুস্-পুস্ বা কমিশেরিয়েট বিভাগের গাড়ী স্থায়। আমরা দুই জনে সেই গাড়ীতে আরোহণ করিয়া মন্থরগতিতে সেমনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। আমরা আবার সেই রাজপথ অতিক্রম করিয়া সদর-মঞ্জীল প্রাসাদের ভিতর দিয়া হ্রদের বাঁধের উপর দিয়া নানা দৃশ্য দেখিতে দেখিতে প্রায় পাঁচ মাইল পরে হ্রদের পর-পারে উপনীত হইলাম। পর্ব্বতের স্থায় উচ্চভূমিতে সেমনা প্রতিষ্ঠিত। এখানে সুন্দর রাজপ্রাসাদে বেগমের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাস করেন। ইহাও ইংরাজী প্রথায় সজ্জিত। আমরা হ্রদের তীরে প্রাসাদের সম্মুখস্থিত উদ্যানে একটি বেঞ্চের উপর বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। নিম্নে—বহু নিম্নে নদী বহিয়া যাইতেছে; অপর পারে ভূপাল নগরী। অস্তগমনোন্মুখ-রবিকর, মস্‌জিদে, মিনারে গম্বুজে, সৌধশিরে, প্রাসাদচূড়ে, দুর্গপ্রাকারে প্রতিফলিত হইয়া স্বর্ণরশ্মি বিকীর্ণ করিতেছে। আমরা উদ্যানে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম—একটি গাছে পেঁপে ফলিয়াছে—দেখিতে বড় নারিকেলের মত!

আবার সেই 'সেজগাড়ী' চড়িয়া সন্ধ্যার সময় গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। ৪ঠা জানুয়ারী। ১৯১৪।—প্রভাতেই কিছু জলযোগ করিয়া তাজ-উল-মস্‌জিদ দেখিতে যাত্রা করিলাম) পূর্ব্বোক্ত সদর-মঞ্জীল রাজপ্রাসাদের অল্প দূরেই সাজেহান বেগম কর্ত্তৃক আরব্ধ এই প্রকাণ্ড মসজিদ অবস্থিত। ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে আরব্ধ হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত শেষ হয় নাই। এক্ষণে অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে—কার্য্য আপাততঃ বন্ধ। আমি এ প্রকার মসজিদ জীবনে কোথাও দেখি নাই। ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য যদি কখনও ভূতপূর্ব্ব বেগমের কল্পনানুসারে সমাপ্ত হয়, তাহা হইলে ভূ-ভারতে এ মসজিদের প্রতিদ্বন্দ্বী থাকিবে না। দিল্লীর জুম্মা মসজিদের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য ইহার নিকট নিষ্প্রভ হইয়া পড়িবে। মসজিদের বিরাট আকৃতি ঊর্দ্ধ্বনেত্রে দর্শন করিলে মস্তক অবনত হইয়া পড়ে। আকাশস্পর্শী মিনার ৮৬ ফুট মাত্র ঊর্দ্ধে উঠিয়া স্থগিত হইয়া রহিয়াছে। গম্বুজমালা স্ফীত হইতে না হইতেই ক্ষান্ত হইয়াছে। বিশাল প্রাঙ্গণ মণ্ডিত করিবার জন্ত আনীত চতুষ্কোণ সুরম্য প্রস্তররাশি স্তূপাকারে শৈবাল-চ্ছাদিত হইয়া পড়িয়া আছে; প্রস্তরোৎকীর্ণ নানাপ্রকার অপূর্ব্ব গঠন ধূলায়

দুষ্টিত হইতেছে। নির্ম্মাণকার্য্যে ব্যবহৃত বংশমঞ্চসমূহ (Scaffolding) বর্ষাতপ সহ্য করিয়া জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই মসজিদ অনিন্দ্য সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিবার অভিপ্রায়ে নানা দেশ হইতে নানাবর্ণের শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত, হরিত, গোলাপী, পাংশু, ধূসর, আলোহিত, গাঢ় হরিত, প্রভৃতি প্রস্তর আনীত হইয়াছিল। শুনিলাম, মুসলমান ধর্ম্মে তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরই নমাজের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভূমি—তাই মসজিদ-প্রাঙ্গণ বিমণ্ডিত করিবার জন্য দূর্ব্বাদলনিভ হরিতবর্ণের প্রস্তরও আসিয়াছিল। সাজাহান বেগমের মৃত্যুর পরে সেই সকল দুষ্প্রাপ্য বহু-মূল্য প্রস্তরসমূহ অন্যান্য প্রাসাদের অঙ্গ বিভূষিত করিয়াছে। শুনিলাম, বর্ত্তমান বেগম নির্ম্মাণকার্য্যে যাহাতে সম্পূর্ণ হয়, সে জন্য একটি কমিটী গঠিত করিয়াছেন। মসজিদ-চূড়া হইতে পাহাড়ে বিরাজিত ইদগা ও শ্যামল পাদপরাজিসমাচ্ছন্ন ভূপালের দৃশ্য অতীব মনোহর। তাজ-উল-মসজিদ দেখিয়া আমরা সাজেহান বেগম কর্ত্তৃক নির্ম্মিত তাজমহল প্রাসাদ দেখিতে গেলাম। সহস্রাধিক বিঘা ভূমি ব্যাপিয়া এই প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই প্রাসাদে সাজেহান বেগম বাস করিতেন। প্রায় ৬০ ফুট উচ্চ সমুন্নত তোরণসমূহ প্রাসাদের প্রবেশপথ। প্রাসাদশীর্ষে অসংখ্য চাঁদনী, শিরোভূষণ, বিবিধ গঠনের উচ্চসমূহ শোভা পাইতেছে। এ প্রাসাদ দেখিলে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইতে হয়। কিন্তু এই অপূর্ব্ব প্রাসাদ দপ্তরখানায় পরিণত হইয়াছে।

তাজমহল প্রাসাদ দেখিয়া আমরা ফতেগড়ের দুর্গচূড়া দেখিতে গেলাম। ইহা প্রাচীন সদর-মঞ্জীল প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া আমেদাবাদ পথের অনতিদূরে বামপার্শ্বে অবস্থিত। দুর্গ পাহাড়ের উপরে নির্ম্মিত। ইহার শিখর-দেশ হইতে দেখিলে ভূপালের চিত্তহারিণী শোভায় হৃদয় মুগ্ধ হয়। দুর্গের পদতল বিধৌত বরিয়া স্বচ্ছহ্রদবারি প্রবাহিত।—যেন যোজনবিস্তৃত মুকুরে দুর্গ ও নগর প্রতিবিম্বিত হইতেছে।' ভূপাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দোস্তমহম্মদ খাঁ ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন।

৫ই জানুয়ারী ১৯১৪।—ভূপালে ভূতপূর্ব্ব বেগমদিগের রচিত অনেক মনোহর উদ্যান আছে। তন্মধ্যে এক মাইল দূরে কুদসিয়া বেগম কর্ত্তৃক নির্ম্মিত কুদশিয়া বাগে তাঁহার স্বামী নজর মহম্মদ খাঁর সমাধিমন্দির দর্শনযোগ্য। এ উদ্যানে রাজপরিবারের অনেক নরনারীর সমাধি আছে। প্রাচীরবেষ্টিত উচ্চ বেদিকার উপর কুদশিয়া বেগম মহানিদ্রায় নিদ্রিত। উদ্যানে অনেক বড় বড় বৃক্ষ আছে।

এই স্থান হইতে দুই মাইল দূরে নগরের উত্তরে আমরা হায়াত-আব্জা নামক মনোহর উদ্যান দর্শন করিয়া, সাজেহান বেগম কর্তৃক নির্ম্মিত মারিয়ল-খেড়াবাগ নামক অলকা-লাঞ্ছিত উদ্যান দর্শন করিলাম। নানাবিধ দুর্লভ পুষ্পবৃক্ষে ও তরুলতায় বিশাল উদ্যান অলঙ্কৃত। সুন্দর বারদ্বারী উদ্যানের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। পশ্চাদ্‌ভাগে প্রস্তরনির্ম্মিত বৃত্তাকার চৌবাচ্চার মধ্যস্থলে প্রস্রবণ-নীর উচ্ছ্বসিত হইতেছে।

প্রখরবুদ্ধিমতী সাজেহান বেগমের সুন্দর সমাধি দর্শন করিলাম। মর্ম্মর-নির্ম্মিত সোপান দ্বারা শুভ্র মর্ম্মরনির্ম্মিত চতুষ্কোণ বেদিকার উপর—মধ্যস্থলে শ্যামলতৃণাচ্ছাদিত স্নিগ্ধশীতল মৃত্তিকাতলে বেগম মরণের মহাস্বপ্নে অভিভূত। সকল দুঃখ সকল সুখ বিস্মৃত হইয়া অলোকসামান্যা রমণী চিরবিশ্রাম ভোগ করিতেছেন।

বেদিকার চারি দিকে সুন্দর জাফরী-সমন্বিত মর্ম্মর-প্রাচীর। দিল্লীতে জাহানারা ও রোশেনারা বেগমের সমাধি দেখিয়া অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিলাম। আর এই ভূপালে আসিয়া সুন্দর প্রভাতে নবদূর্ব্বাদলমণ্ডিত, শিশিরমুক্তা-মালা খচিত সমাধিবক্ষে এক বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

এতদ্ভিন্ন সেকেন্দর বেগম কর্তৃক নির্ম্মিত সেকেন্দর-বাগ ও আয়েস-বাগ প্রভৃতি আরও মনোহর উদ্যান আছে।

ভ্রমণ-কাহিনীর প্রারম্ভেই বলিয়াছি যে, ভূপাল নগর অনুচ্চ প্রস্তরপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত। মধ্যে মধ্যে তোরণদ্বার, বুরুজ, সিপাহী শাস্ত্রীর কক্ষ প্রভৃতি। প্রাচীরাভ্যন্তরস্থ স্থান সৌধমালা ও হাটবাজার প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেলে, আবার কতকটা স্থান প্রাচীরে বেষ্টিত করিয়া, তন্মধ্যে বসবাস আরম্ভ হইয়াছে। এইরূপে কোনও কোনও স্থানে তিন চারি ফের প্রাচীর হইয়াছে। নগরের উত্তর দিকে প্রাচীরের বহির্ভাগেও অনেক বসতি হইয়াছে। এক স্থানে একটি প্রাচীন হামাম বা স্নানাগার দেখিলাম। ইহা গণ্ড রাজাদিগের সময়ে নির্ম্মিত; মুসলমানের আমলে নহে। এখানে স্নান করিতে হইলে এক টাকা, আট আনা করিয়া দর্শনী দিতে হয়।

ভূপালের রাজপথ আমাদের চক্ষে অনেক নূতন দৃশ্যের অবতারণা করে। মুসলমানী সহর—কেবল মুসলমানই গমনাগমন করিতেছে; কচিৎ দুই চারি জন পশ্চিমদেশীয় হিন্দু। তাহারা এ দেশের অধিবাসী নহে। বিষয়কর্ম্ম অথবা ব্যবসায় বাণিজ্য উপলক্ষে এ দেশে আসিয়াছে। শুনিলাম, যদি কোনও হিন্দু

মুসলমান-ধর্ম্ম অবলম্বন করে, বেগম মহোদয়া তাহাকে অর্থ, ভূমি প্রভৃতি দান করিয়া এখানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন। সহরে গণিকা নাই—বেগমের আদেশে সকলেই 'নিকা' করিয়া সংসারী হইয়াছে।

ভূপালের বাঁটুয়া বিখ্যাত।৷৹ সূচের কারুকার্য্যে, জরীর বাঁটুয়া সুন্দর। আমি এক টাকায় একটি কিনিয়াছিলাম। এক একটি গুড়গুড়ির নল চারি হাত লম্বা। পথিপার্শ্বে তাহাতেই কেহ কেহ ধূমপান করিতেছে।— রজকেরা যেমন গর্দ্দভের পৃষ্ঠের উভয় পার্শ্বে বস্ত্রের বোঝা দিয়া লইয়া যায়, এখানেও সেইরূপ মহিষের পৃষ্ঠের দুই দিকে জালে করিয়া ইষ্টকের বোঝা দিয়া লইয়া যাইতেছে।

ভূপাল নগরী ধার-রাজ্যের রাজা ভোজ কর্ত্তৃক ১০১০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনিই ভূপালের প্রাচীন দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই কোনও মন্ত্রী কর্ত্তৃক হ্রদ প্রস্তুত হইয়াছিল। যে স্থানে ভোজের দুর্গ—সে স্থানের নাম ভোজপুরা। এখন দুর্গ কারাগারে পরিণত হইয়াছে। হিন্দু রাজত্বের স্মৃতি ভূপাল হইতে বহুকাল অন্তর্হিত।

বর্ত্তমান মুসলমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দোস্ত মহম্মদ খাঁ নামক জনৈক আফগান সর্দ্দার কর্ম্মের প্রত্যাশায় ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে বাহাদুর শাহের রাজত্বকালের প্রথমে দিল্লীতে আগমন করিয়া রাজকার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। তিনি ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে বারসিয়া পরগণায় জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ রাজত্বের প্রসারবৃদ্ধি করিয়া, প্রথমে ইসলামপুর নামে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া ভূপালে রাজধানী মনোনীত করেন। তাঁহারই বংশপরম্পরা তদবধি ভূপালে রাজত্ব করিতেছেন।

ইংরাজী ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের পর হইতেই ভূপালের রাজদণ্ড রমণীহস্তেই ধৃত হইয়া আসিতেছে। নবাব নাজের মহম্মদের মৃত্যুর পর তৎপত্নী কুদসিয়া বেগম রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। দুহিতা সেকেন্দর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তাঁহারই হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত হয়। ইনি যোগ্যতার সহিত রাজ্যশাসন করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার কন্যা সাজেহান বেগম রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই প্রখরবুদ্ধিশালিনী বেগমের অধিকারকালে ভূপালের বহু উন্নতি সাধিত হয়। সুদৃশ্য নয়ন-রঞ্জন অট্টালিকা, প্রশস্ত রাজপথ, অপূর্ব্ব মসজিদ-মিনার, নন্দন-লাঞ্ছিত উদ্যান, ভুবনমোহন বিশাল রাজপ্রাসাদ প্রভৃতি সাজেহান বেগম কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়া ভূপালে জিজিন-

শ্রীর আরোপ করিয়াছে। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বক্সী বাকি মহম্মদ খাঁর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। তিনি রাজবংশজাত ছিলেন না। নবাবের পরিবর্ত্তে নবাব-কন্সর্ট (Nowab Consort) হইয়াছিলেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বাকি মহম্মদ খাঁর মৃত্যু হইলে, সাজেহান বেগম পর্দ্দার বাহির হইয়া প্রকাশ্যে রাজ-দরবার করিতেন। কিন্তু ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে এই শক্তিশালিনী বেগম আবার কাম্বোজ-নিবাসী মৌলবী সিদ্দিক হোসেনকে বিবাহ করেন। ইঁহার দ্বিতীয় পরিণয়ে রাজপরিবারবর্গ, প্রজাব্রজ ও তদীয় দুহিতা মহামান্যা বর্ত্তমান নবাব সুলতান জাঁহা বেগমের প্রীতিকর হয় নাই। এ জন্য তিনি সকলের কিঞ্চিৎ বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। বিবাহের পরে সাজেহান বেগম রাজদরবার ত্যাগ করিয়া আবার পর্দ্দানসীন্ হইলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে সিদ্দিক হোসেন প্রাণত্যাগ করেন। পরবৎসর ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে সাজাহান বেগমের ভবলীলা সমাপ্ত হয়।—সিদ্দিক হোসেন কাম্বোজবাসী;—কাম্বোজে আতর, গোলাপ, চামেলী, বেলা প্রভৃতি নানা সুগন্ধসম্ভার প্রস্তুত হইত বলিয়া ভূপালের অধিবাসীরা রহস্য করিয়া তাঁহাকে 'আতরওয়ালা' বলিত!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

বঙ্গীয় মুসলমান ও বঙ্গ-সাহিত্য।

১১৯৯ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর দাস সম্রাট কুতবুদ্দীনের জনৈক বিচক্ষণ সেনা-নায়ক মহম্মদ বিন্ বখ্তিয়ার খিলিজি বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। বঙ্গের তখন নাম ছিল গৌড়; নবদ্বীপ ছিল রাজধানী।

ইহার প্রায় ষাট বৎসর পরে আবু ওমর মিন্হাজুদ্দীন নামক এক যবন ঐতিহাসিক লিখিয়া গিয়াছেন—তিনি বখ্তিয়ারের বৃদ্ধ সৈনিকগণের প্রমুখাৎ শুনিয়াছিলেন, খিলিজি-পুঙ্গব সপ্তদশ জন অশ্বারোহী সঙ্গে লইয়া গৌড়াধিপকে খেদাইয়া দিয়াছিলেন!

সে সময়ে লক্ষ্মণসেন গৌড়েশ্বর। কেহ কেহ বলেন,—লক্ষ্মণ নয়, তাঁহার পৌত্র লাক্ষ্মণেয়। মুসলমানগণ নামটা উচ্চারণ করিয়াছেন—লাছমণিয়া। যাহাই হউক, শুনা যায়, বর্ষীয়ান রাজাধিরাজ মধ্যাহ্নভোজনে বসিয়াছিলেন; তাঁহার নিকট সংবাদ পঁহুছিল, যবন আসিয়াছে। অর্দ্ধভুক্ত আহার পরিত্যাগপূর্ব্বক

সকুড়ি-হাতে খিড়্‌কীদ্বার দিয়া জলপথে তিনি প্রপলায়মান হইলেন; কেহ বলেন, একেবারে ৺জগন্নাথধামে তীর্থ যাত্রা করিলেন; কেহ কেহ বলেন, সুবর্ণগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইতিহাসে আছে, তাঁহার বংশধরগণ বিক্রমপুরে আরও এক শত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

সপ্তদশ অশ্বারোহীর কথা ঠান্‌দিদির উপকথা বলিয়া অনেকেই উড়াইয়া দিয়াছেন; তবে রাজা যে পলাতক হইয়াছিলেন, এবং পাঠানেরা রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, ইহা অস্বীকার করিবার যো নাই।

লক্ষ্মণ সেন যৌবনকালে মহাপরাক্রান্ত দিগ্বিজয়ী রাজা ছিলেন; তাঁহার জয়স্তম্ভ বারাণসী, প্রয়াগ হইতে শ্রীক্ষেত্র পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তিনিই হউন, আর তাঁহার পৌত্র লাক্ষণেয়ই হউন,—যে সময়ে পাঠানেরা গৌড়ে শুভাগমন করেন, তখন গৌড়েশ্বর অশীতিপর বৃদ্ধ, তাঁহার নিশ্চয় 'ভীমরতি' ঘটিয়াছিল। প্রবাদ আছে, রাজা দৈবজ্ঞ-গণককারগণের নিকট হাত গুণাইয়া এবং জয়দেব-প্রমুখ কবিগণের 'ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে' গান শুনিয়া সময় অতিবাহিত করিতেন। শাস্ত্রজ্ঞ পারিষদ ব্রাহ্মণঠাকুরেরা নাকি শাস্ত্রের পাতা খুলিয়া গণনা করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, গৌড় যবনাধিকৃত হইবে; যবন-সেনাপতি খর্ব্বকায় বখ্‌তিয়ারের আকৃতি পর্য্যন্ত নাকি বর্ণিত ছিল। শাস্ত্রের উপর হিন্দুচূড়ামণি রাজার অগাধ বিশ্বাস ছিল। ব্রাহ্মণ ঠাকুরগণের প্রতি অচলা ভক্তি ছিল। সুতরাং অজ্ঞাতসারে চম্পট-প্রদানে উভয়ের মর্য্যাদা রক্ষা করাই তিনি কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াছিলেন। এই গণনার সহিত পাঠানদিগের কাঞ্চনমূল্যের সম্বন্ধ ছিল, এমন রটনাও শুনা গিয়াছে।

এ সকল ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও কিম্বদন্তীর উত্থাপন না করিলেও চলিত। কিন্তু একটু প্রয়োজন আছে। সে সময়কার দেশের অবস্থাটা জানিয়া রাখা আবশ্যক। গৌড়ীয় বা বাঙ্গালী জাতির কিঞ্চিৎ পরিচয়-গ্রহণ দোষাবহ হইবে। রাজাও রাজ্য রক্ষা করিতে বাঙ্গালী অঙ্গুলী উত্তোলন করে নাই; বিনা যুদ্ধে রাজধানী বিজাতি বিধর্ম্মীর করতলগত হইল। দেশের অবস্থা জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব। নানা কারণ হইতে আমরা বুঝিতে পারি, বাঙ্গালী জাতি উচ্চাভিলাষ-শূন্য, নিস্তেজ, অলস, নিশ্চেষ্ট ও গৃহ-সুখপরায়ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তজ্জন্য গৌড় অত সহজে পরাধীন হইল।

কেহ কেহ অনুমান করেন, মায়াবাদে একান্ত আশ্রয়-পরায়ণ বিষয়-বিমুখ

হিন্দুর শিথিল মুষ্টি হইতে পার্থিব সুখ-সম্ভোগে ব্রতী রণপটু মুসলমানগণ অতি সহজে তাঁহাদের দেশ অধিকার করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কাহারও কাহারও বিশ্বাস অন্যবিধ;—পালরাজগণের সময় পর্য্যন্ত গৌড়দেশ-বাসীরা বৌদ্ধতান্ত্রিক ছিল; শূর বা সেন-রাজগণ আসিলেন, কান্যকুব্জ হইতে শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণগণকে আনাইলেন; তাঁহারা বৌদ্ধতান্ত্রিকতার, বৌদ্ধভাবের সমূলে উচ্ছেদ করিবার বাসনায় এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে সামাজিক আচার-বিধির শৈথিল্য এবং উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতার পরেই তাহার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ কঠিন হইতে কঠিনতর শাসন-শৃঙ্খল গড়িতে লাগিলেন। এই সময় হইতেই ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের ন্যায় বঙ্গদেশেও স্মৃতি, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি সহস্র নাগ-পাশের সৃষ্টি হইতে লাগিল। দেশে দুই বর্ণ—দুইটিমাত্র জাতি দাঁড়াইল; এক ব্রাহ্মণ, অপর শূদ্র; এক সেব্য, অপর সেবক। ক্ষত্রিয় বৈশ্য বর্ণদ্বয় ব্রাহ্মণগণের বিচারে লোপ পাইল। যে দুই বর্ণ রহিল, নূতন নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র ও তাহার টীকা টিপ্পনী ভাষ্য প্রণয়ন দ্বারা উভয়ের মধ্যে জমীন্-আশ্‌মান্ পার্থক্য নির্দ্ধারিত হইল। * জ্ঞান বিদ্যা ত ব্রাহ্মণবর্ণের একচেটিয়া করা ছিলই, তাহার উপর জন-সাধারণের—ব্রাহ্মণেতর জাতির পক্ষে শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম জানিতে পারিবার পথ পর্য্যন্ত রুদ্ধ করিবার উদ্যোগ হইতে লাগিল—

"অষ্টাদশপুরাণানি রামস্য চরিতানি চ।
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥"

সেন রাজগণের সময়ে রাজার সাহায্যে ব্রাহ্মণজাতির উদ্ভাবিত আচার-বিচারের বন্ধনে এবং গুণনির্ব্বিশেষে ব্রাহ্মণগণের একান্ত প্রাধান্যস্থাপনে উত্যক্ত হইয়া প্রজাসাধারণ রাজত্বরক্ষায় রাজার সহায়তা করিতে অগ্রসর হয় নাই, এবং তজ্জন্যই মুসলমানগণ অত সহজে বঙ্গবিজয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহাও অনেক সুধী জনের ধারণা।

যাহা হউক, সপ্তদশ অশ্বারোহীর গল্পে ইহা সপ্রমাণ হয় যে, গৌড় বিজাতির

* It is a remarkable fact that all the smriti compilations were made after the Mahamedans had obtained a footing in India. Madhabacharjya, Bisweswar Bhatta, Chandeswar, Vachaspati Misra, Acharjya Churamani, Prataprudra, Raghunandan, and Kamalakar, all flourished during the Pathan period and by their teachings fixed Hindu manners and customs in different parts of the land.

Mahamahopadhyaya Hara Prasad Sastri. History of India. P. 104.

আয়ত্ত ও অধীন হইতেছে দেখিয়াও প্রজাসাধারণ সে সর্ব্বগ্রাসী তরঙ্গ রুদ্ধ করিবার বিশেষ চেষ্টা করে নাই।

পাঠানেরা এ দেশে আসিলেন, আসিয়া দেখিলেন, গৌড়ভূমি সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বটে, এবং দেশবাসিগণও 'ললিতলবঙ্গলতা'র মত কোমল-প্রকৃতিও বটে। দেখিয়া শুনিয়া তাঁহারা মায়া কাটাইতে পারিলেন না; দেশটিকে বেশ করিয়া আঁকড়াইয়া বসিলেন। গৌড় অধিকার করিয়া ক্রমে এ দিকে ও দিকে হস্তপ্রসারণ করিতে লাগিলেন।

গৌড় নিতান্ত ছোটখাটো রাজ্য ছিল না; সমগ্র গৌড় পাঠানেরা একেবারে অধিকার করেন নাই, বা করিতে পারেন নাই, ইহা স্থির; আশে পাশে স্বাধীন হিন্দুরাজ্যও ছিল। তৎসত্ত্বেও ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে বাঙ্গালা দেশ পাঠানদের হইয়াছিল, তাহা মানিতে হয়।

পাঠানেরা দেশ অধিকার করিয়া শুধু যে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন, এমন নহে। অধিকারসীমা বর্দ্ধিত করিতে ব্যস্ত হইলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে নবজিত রাজ্যের প্রজাগণকে নানা উপায়ে আপনার জন করিয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 'মুরগীর পালো' সেবন করাইয়া এবং 'কলমা' পড়াইয়া দেশে দেদার শেখ গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বঙ্গভারতীর কৃতী পুত্র বঙ্কিমচন্দ্র পাঠান-রাজত্বের প্রারম্ভকালে বখ্‌তিয়ার খিলিজির মুখ দিয়া এবং পাঠান-রাজত্বের অন্তিম সময়ে ওসমান খাঁর জোবানে বলাইয়াছেন—"মোছলমানের বিবেচনায় মহম্মদীয় ধর্ম্মই সত্য ধর্ম্ম; বলে হউক, ছলে হউক, সত্যধর্ম্ম-প্রচারে আমাদের মতে অধর্ম্ম নাই, ধর্ম্ম আছে।" দেশে মুসলমানধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা বাড়িতে লাগিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে ষোড়শ শতাব্দীর শেষাশেষি সময় পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় বা গৌড়ে পাঠান রাজত্বকাল; ষোড়শ শতাব্দীর শেষাশেষি সময় হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত মোগল রাজত্বকাল। সার্দ্ধ পাঁচ শত বৎসর আমরা বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানদিগের অধীন ছিলাম; তৎপরবর্ত্তী দেড় শত বৎসর আমরা বাঙ্গালী হিন্দু ও বাঙ্গালী মুসলমান একত্র বাস করিতেছি।

মুসলমানেরা বঙ্গদেশ জয় করিয়া এইখানেই ঘরবাড়ী করিয়া সপরিবারে বসবাস করিতে লাগিলেন; বঙ্গদেশকে তাঁহারা নিজের পিতৃভূমি করিয়া তুলিয়াছিলেন। বাঙ্গালী গোরুকে খড় ভুষি খাওয়াইয়া পুষ্ট করিয়া কেবলমাত্র দুগ্ধদোহন তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না; মামুদ নাদিরের মত জ্বালাইয়া পোড়াইয়া

কেবল ধনরত্নের লুণ্ঠন তাঁহাদের অভিপ্রেত ছিল না; আমরা দেখিতে পাই, মুসলমান রাজগণ বিজিত বাঙ্গালী হিন্দুকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা যত্ন করিতেন; তাহাদের ঐহিক উন্নতির দিকে 'নেক্ নজর' রাখিতেন; এমন কি, রাজকীয় যে কোনও ব্যাপারে হিন্দুকে নিয়োগ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। বিজেতা বিজিতের সম্পর্ক ভুলিয়া মুসলমান অধিবাসিগণ প্রতিবেশী হিন্দুকে আপন 'ভাই' জ্ঞান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। বাঙ্গালী প্রাচীন কবিরা অনেক ভিন্নধর্ম্মী গৌড়েশ্বরের গুণগান করিয়া গিয়াছেন। প্রজাগণ হিন্দু মুসলমানে আদরের সম্পর্ক পাতাইয়া সুখে কালযাপন করিতেছেন, দেখা গিয়াছে। অবশ্য আমরা এমন কথা বলি না যে, মুসলমানেরা কাফের হিন্দুদিগের উপর কখনও নির্য্যাতন করেন নাই। কাজীর বিচার, নিষ্ঠীবনের পালা, মুর্‌শিদ কুলীর 'বৈকুণ্ঠ' ভুলিবার নহে।

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন শাসক ও শাসিতের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য বেশ একটি ফর্দ্দ রচিয়াছেন;—হিন্দুর 'কুঁড়ে' (কুটীর)—মুসলমানের 'দালান'; 'এমারত'। হিন্দুর 'গাঁ' (গ্রাম)—মুসলমানের 'সহর'। হিন্দুর 'শস্য' কর্ত্তিত হইয়া যখন মুসলমানের সেবায় লাগে, তখন তাহা 'ফসল'। হিন্দুর 'টাকা' (তঙ্কা) করগ্রাহী মুসলমানের হস্তে পঁহুছিলে 'খাজানা' হয়। ক্ষুদ্র মেটে তৈলের 'প্রদীপ'টিমাত্র হিন্দুর; 'ঝাড়', 'ফানুস', 'দেয়ালগিরি', সমস্ত বিলাসের আলো মুসলমানের। হিন্দু অপরাধ করিলে 'কাজি' 'মেয়াদ' দেয়। ইহা ছাড়া 'বাদশাহ' 'ওমরাহ' হইতে 'উজীর' 'নাজীর' সামান্য 'কোটাল' 'পেয়াদা' 'বরকন্দাজ' 'নফর' পর্য্যন্ত সকলই মুসলমানী শব্দ। 'জমিদার' 'তালুকদার'ও তাই। 'জমি' 'তালুক' 'মুলুক' প্রভৃতি মুসলমানী শব্দ। উপাধিগুলিও সমস্ত মুসলমানী—'জুমলাদার' 'মজুমদার' 'হাবিলদার'; সম্মানসূচক 'সাহেব', প্রভুত্ব-সূচক 'হুজুর', এ সকল কথা বঙ্গের ঘরে ঘরে প্রবেশ করিয়া হিন্দুর ভাষাকে যবনাধিকারচিহ্নিত করিয়াছিল।

বঙ্গে মোগল-রাজত্বের প্রথম সময়ে রচিত মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের 'চণ্ডী'তে 'গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ'-পাঠকালে আমরা বুঝিতে পারি, মুসলমানী প্রভাব ভাষার মধ্যে কেমন 'কায়েমী বন্দোবস্ত' করিয়া আপন অধিকার বিস্তার করিয়াছে। *

* দেশের রাজা মুসলমান, রাজভাষা পারসী; আইন আদালত, বিষয়কর্ম্মের ভাষা ছিল পারসী। রাজদরবারে উন্নতি প্রতিপত্তির আশায় এবং নানারূপ কার্য্যসৌকর্য্যার্থ বাঙ্গালী হিন্দুও পারসী শিখিতে লাগিলেন। তাহার ফলে বাঙ্গালা ভাষার ভিতর বিস্তর পারসী শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে, এবং বহুকালের অনুশীলনে এমন ভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, তাহা এখন ভাষার অস্থিমজ্জাগত বলিলেও হয়। সে বিষয়ে এখানে কিছু বলিতেছি না।

আমরা বলিয়াছি, বহুকাল ধরিয়া একত্র বাস নিবন্ধন বঙ্গে হিন্দু মুসলমানে বেশ মেশামিশি হইয়াছিল। বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসে দৃষ্টি করিলেও আমাদের বুঝিতে বাকি থাকে না, এই মেশামেশিটা বেশ ঘনিষ্ঠভাবেই হইয়াছিল।

মুসলমান আমলে বঙ্গের বা গৌড়ের যাঁহারা সুলতান বা শাসনকর্ত্তা হইতেছিলেন, তাঁহারা বরাবর দিল্লীর বাদশাহের অধীন ছিলেন। ১৩৪৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গাধিপতি সামসুদ্দীন ইলায়স্ শাহ দিল্লীর অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া আপনার স্বাধীনতা প্রচার করেন। তাঁহাকে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া টোগলক-বংশীয় দিল্লীশ্বর ফিরোজ শাহ ১৩৫৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার স্বাধীনতা স্বীকার করিলেন। বঙ্গদেশ বা গৌড় এই সময়ে স্বাধীন রাজ্য দাঁড়াইল। সামসুদ্দীন গৌড় হইতে পাণ্ডুয়ায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এ সময়ে দেশের নাম ছিল গৌড়, রাজধানীর নামও ছিল গৌড়। সামসুদ্দীনের বংশধরেরা বাঙ্গালী রাজা গণেশ বা কংসনারায়ণ রায়ের নিকট পরাজিত হইয়া রাজ্য হারাইলেন। প্রবলপ্রতাপশালী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ জমীদার রাজা গণেশ গৌড় দেশের স্বাধীন অধিপতি হইলেন। তিনি আট বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। বিজাতি বাদশাহদিগের অধীনতা হইতে এই একবারমাত্র কিয়ৎক্ষণের জন্য বাঙ্গালী হিন্দুর ভাগ্যে স্বাধীনতা-বিজলী চমকাইয়াছিল। রাজা গণেশের মৃত্যুর পর তৎপুত্র যদু ভূতপূর্ব্ব গৌড়-সুলতানের কন্যা আশমান তারার প্রণয়ে মজিয়া জেলালুদ্দীন নামধারণ পূর্ব্বক সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন। হিন্দু রাজত্ব স্বপ্নের মত ফুরাইল। এখানে স্বেচ্ছায় হিন্দু মুসলমান হইলেন; ছল কিংবা বল আবশ্যক হয় নাই।

যবন ঐতিহাসিক মীর্ ফরজন্দ হোসেন লিখিয়াছেন,—রাজা গণেশেরও 'বেগম' ছিল। তিনি যখন গৌড়ে থাকিতেন, তখন প্রায় মুসলমানের ন্যায় চলিতেন; আবার যখন পাণ্ডুয়াতে থাকিতেন, তখন অতি নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণের ন্যায় সদাচারে চলিতেন। হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিই তাঁহাকে স্বজাতি জ্ঞান করিত। তিনি বেগমদিগের নামে গৌড় নগরে অনেক দরগা ও মস্জিদ করাইয়াছিলেন; আবার পাণ্ডুয়া, টণ্ডা ও বাঁটুয়াতে নিজ নামে বহু দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করাইয়াছিলেন।

দেশের স্বাধীন রাজা—ব্রাহ্মণ রাজারই যখন এই দশা, অন্যে পরে কা কথা! প্রজাসাধারণ যে কতকটা রাজার অনুসরণ করিত, তাহা ধরিয়া লওয়া অসঙ্গত হইবে না। প্রমাণেরও অভাব নাই; আমরা মুসলমানী 'জলপাত্রে'র কথা

শুনিয়াছি। অনেক বাদশাহ সুলতান নবাবের হিন্দু বেগম ছিল, তজ্জাতপুত্র উত্তরাধিকারী হইয়াছেন, ইহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কথা। তাই বলিতেছিলাম, দেশে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

প্রবলপরাক্রান্ত বাঙ্গালী ভূম্যধিকারী "বার ভূঞা"র অন্যতম খিজিরপুরের ঈশা খাঁ। ইঁহার পিতা হিন্দু ছিলেন, নাম কালিদাস। ইনি সুবর্ণপুরে রাজত্ব করিতেন। সমগ্র পূর্ব্ববাঙ্গালা ইঁহার অধীন ছিল। ইনি আকবর বাদশাহের সেনাপতিকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। বাপ ছিলেন হিন্দু, পুত্র মহাবীর রাজ্যেশ্বর হইয়াও মুসলমান।

রাজ-অনুগ্রহ-লাভের লোভে অনেক হিন্দু মুসলমান হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণও মিলে। মধ্যে মধ্যে হিন্দু-মুসলমানে আদান প্রদানও চলিত, তাহার সংবাদও পাওয়া যায়। কুলাচার্য্যগণের পুঁথি হইতে জানিতে পারা যায়, একটাকিয়ার সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ জমীদার-গৃহের উনত্রিশ জন বংশদুলাল মুসলমান রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন, অবশ্য মুসলমান হইয়া যান। ঘটক ঠাকুরদিগের কুলজী গ্রন্থ হইতে আমরা অনেক সামাজিক তত্ত্ব পাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি শ্লোক উদ্ধৃত করি,—

"দোস্তের গোস্তখানা খাটা তায় যে কদু।
সেই খানা খেয়ে গেল বেলগড়ের মধু॥"

স্বার্থ অশনে, বসনে ও ব্যসনে বহু অনর্থ ঘটাইতেছিল। হিন্দু কমিতেছিল; মুসলমান বাড়িতেছিল।

আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই, ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে সলেমান কেরাণি বাঙ্গালার সুলতান হইয়াছেন। কালাচাঁদ নামক এক ব্রাহ্মণ যুবক সুলতানের অধীনে রাজধানী গৌড় নগরের ফৌজদার ছিলেন। ঘটনাচক্রে পড়িয়া তাঁহাকে এক প্রেমমুগ্ধা মুসলমান-তনয়াকে গ্রহণ করিতে হয়। ইহার জন্য কালাচাঁদ জাতিচ্যুত ও স্বজাতি-সমাজে 'একঘরে' হইয়া পড়েন। কালাচাঁদ অনুতপ্ত হইলেন, যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিলেন, জগন্নাথক্ষেত্রে গিয়া 'ধরণা' দিলেন, সপ্তাহকাল অনাহারে থাকিয়া কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করিলেন, কিছুতেই কিছু হইল না; প্রত্যাদেশ ত হইলই না, বরং পাণ্ডারা তাঁহার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে শ্রীক্ষেত্র হইতে তাড়াইয়া দিল। তখনকার বড় বড় তর্কচূড়ামণি-তর্কপঞ্চাননের দল তাঁহাকে জাতিতে উঠাইতে একেবারে অসম্মত হইলেন। তখন কালাচাঁদ ক্রোধে অধীর হইয়া মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন; তাঁহার নাম হইল মহম্মদ

কাররুনি। মুসলমান হইয়া তিনি হিন্দুদিগের উপর যেরূপ ভীষণ অত্যাচার করিতে লাগিলেন, তাহাতে হিন্দুদিগের নিকট তাঁহার নাম হইল—'কালাপাহাড়।' তিনি গৌড়াধিপকে প্ররোচিত করিয়া উড়িষ্যা জয় করিলেন; শ্রীক্ষেত্রে যেরূপ উপদ্রব করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করা যায় না। জনরব, ৺জগন্নাথ দেবের বর্ত্তমান বিরূপ মূর্ত্তি তাঁহারই প্রাসাদাৎ। কালাপাহাড় গৌড়দেশে প্রত্যাগমন করিয়া প্রথমে রাঢ় দেশে হিন্দুদিগের উপর—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগের উপর অকথ্য নির্য্যাতন আরম্ভ করিলেন। কথিত আছে, তিনি দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেই চূর্ণ করিয়া অস্থানে নিক্ষেপ করিতেন। ব্রাহ্মণবাড়ী হইতে কাড়িয়া আনিয়া কতকগুলি শালগ্রামশিলা একত্র করিয়া রাখিয়াছিলেন, প্রত্যহ তাহাদের উপর ঘোরতর অনাচার করিতেন। কালাপাহাড় সহস্র সহস্র হিন্দুকে বলপূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন। যাহাদের ধরিতেন, যতক্ষণ তাহারা মুসলমান না হইত, তাহাদের উপর তিনি নিষ্ঠুরভাবে উৎপীড়ন করিতেন; শুনা যায়, সেই পীড়নের প্রকোপে অনেকের ইহলীলার অবসান হইয়া গিয়াছে। ঐতিহাসিক যথার্থই বলিয়াছেন,—এক কালাপাহাড় গৌড় ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশে, এমন কি, আসাম কামরূপে পর্য্যন্ত—হিন্দুদিগের যত অনিষ্ট করিয়াছেন, অন্য সমস্ত মুসলমানের অত্যাচার একত্র করিলেও তত হইবে না। কথিত আছে, কালাপাহাড়ের অত্যাচারের সীমা এ দিকে কাশীধাম পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছিল। কাশীতে উপদ্রবের তৃতীয় দিবসে তিনি নিরুদ্দেশ হন; সম্ভবতঃ ঘাতকের গুপ্ত অস্ত্রাঘাতে অপসারিত হন। কালাপাহাড় একাদশ বৎসর হিন্দুধর্ম্মবিনাশনে ও মুসলমানের সংখ্যাবর্দ্ধনে ব্রতী ছিলেন। কালাপাহাড় খাঁটী ব্রাহ্মণের সন্তান; সমাজের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। ব্রাহ্মণঠাকুরগণের অনুদারতায় ব্রাহ্মণ কালাচাঁদ ব্রাহ্মণদ্বেষী কালাপাহাড় হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে, কালাপাহাড় দুই জন ছিলেন; দুই জনই ব্রাহ্মণ, গুণে এবং কর্ম্মে যথা পূর্ব্বং তথা পরম্। দেশে মুসলমানের সংখ্যা হু হু করিয়া বাড়িতে লাগিল।

অনেকটা অপ্রসঙ্গিক কথা হইল, কিন্তু ইহার একটু কারণ আছে। শুধু মুসলমানদিগের দ্বারা নহে, হিন্দু হইতে, ব্রাহ্মণ হইতে বঙ্গে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা-বৃদ্ধির কত সহায়তা হইয়াছে, তাহার আভাস দিবার জন্যই আমাদের এই "ধান ভানিতে শিবের গীত।"

বঙ্গদেশে মুসলমানধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা-বৃদ্ধির অন্যান্য কারণও আছে। ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা হিন্দু জাতির মধ্যে নিজের প্রাধান্য পাকা করিয়া রাখিবার জন্য দেশে

হিন্দুর মধ্যে দুই বর্ণ লুপ্ত করিয়া ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুই বর্ণমাত্র খাড়া করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশে এ বিধানটা বেশ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। অজস্র স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র মনের মত করিয়া গড়িয়া সামাজিক আচার বিচারের গ্রন্থি তাঁহারা কঠিনভাবে কষিতে লাগিলেন ; নিষিদ্ধ ভোজের আঘ্রাণমাত্রে জাতিপাতের ব্যবস্থা করিলেন ; 'পান হইতে চুণটুকু খসিলে' জাতিতে ঠেলার বন্দোবস্ত হইল।

ইহার আভাস পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে। কিন্তু অন্য দিক হইতে একটা বড় মুস্কিল বাধিল। যতদিন দেশ স্বাধীন ছিল, যতদিন দেশে হিন্দুরাজত্ব ছিল, ততদিন ব্রাহ্মণ শূদ্রের সম্পর্ক ছিল—প্রভু ও দাস, সেব্য ও সেবক। ব্রাহ্মণ জাতির পদলেহন করিয়াই শূদ্রকে তাহার কষ্টকর জীবন কাটাইতে হইত ; কোনও উচ্চ সুখে শূদ্রের অধিকার ছিল না। হিন্দু রাজত্ব গেল, ব্রাহ্মণের 'পড়্তা' কমিয়া আসিল। মুসলমান রাজত্বে অনেক শূদ্র রাজনিয়োগে উচ্চপদস্থ হইয়া ধনবান হইলেন ; ব্রাহ্মণের অপেক্ষা অনেক শূদ্রের অবস্থা বহুগুণে ভাল হইয়া দাঁড়াইল। শূদ্রেরা দানধ্যানে অনেক খরচপত্র করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণের মাথায় টনক নড়িল। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে মহাপণ্ডিত স্মৃতিকারগণ ধর্ম্মসূত্রে প্রচার করিয়া গিয়াছেন—"যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের পৌরোহিত্য করিবে, যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের দান গ্রহণ করিবে, যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের অন্ন ঘরে তুলিবে, তাহার ব্রহ্মণত্বের দফা রফা, অধিকন্তু পরজন্মে তাহাকে শূকর বা কুক্কুর হইয়া পৃথিবীতে আসিতে হইবে।" * ভগবানের ইচ্ছায় দেশ পরাধীন হওয়ায় সব উলট পালট হইয়া গেল। শূদ্রের দ্বারস্থ হওয়া ভিন্ন ব্রাহ্মণের দিন চলা কঠিন হইয়া উঠিল। তখন সূচ্যগ্রবুদ্ধি শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণপণ্ডিতবর্গ বুঝিলেন, প্রাচীন সূত্রের উপর আর কলম না চালাইলে চলে না। তখন তাঁহাদিগকে স্মৃতি-সঙ্কলয়িতৃরূপে 'শূদ্র-কৃত্য-বিচারণ' প্রভৃতি নব্য স্মৃতির আবির্ভাব ঘটাইতে হইল। শূদ্র জাতির মধ্যে আপনাদের আবশ্যকমাত্র কতকগুলি সৎশূদ্র ও অধিকাংশ অনাচরণীয় অর্থাৎ 'জল-চল' নহে, এমন নির্ব্বাচনের বিধান বাহির হইল। শেষোক্তদিগের অবস্থা হিন্দুসমাজে ক্রমে এরূপ শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল যে, তাহাদের অনেকে স্বজাতি-সমাজে ততটা অস্পৃশ্য ঘৃণিত হেয় হইয়া থাকা অপেক্ষা পিতৃ-পিতামহের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করা শতগুণে শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিল। হিন্দু রাজত্বের সময় সমাজের গণ্ডীমধ্য হইতে পলাইবার পথ ছিল না। হিন্দুরাজত্ব-

---

* বশিষ্ঠ ৬ বা অঙ্গিরা ১।৪৮, ১।৫৩—৫৭, আপস্তম্ব ৮।৯১১, পরাশর ১২।৩১-৩২, ব্যাস ৪।৬৩—৬৭, মনু ৪।২১৮, ১১।২৪, ১১।৪৩

লোপে শৃঙ্খল ছিঁড়িবার অবসর মিলিল। সমাজের নিম্নশ্রেণীর বহু লোক দলে দলে মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধি করিতে লাগিল। এইরূপ কারণবশতঃ দেশের অনার্য্য আদিম অধিবাসীর অনেকে এবং বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের বিস্তর লোক, যাহাদিগকে ব্রাহ্মণঠাকুরগণ আদৌ আমলে আনিলেন না, তাহারাও মুসলমান হইতে লাগিল; মুসলমান হইয়া হিন্দুদিগের ঘৃণা অবজ্ঞা সুদ সমেত ফিরাইয়া দিতে কশুর করিল না! তেলী, জোলা, নিকারি, পাজারি, পাটুয়া প্রভৃতি জাতির বহুলোক মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণদিগের সামাজিক নির্য্যাতন হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

* বঙ্গদেশে হিন্দুর সংখ্যার হ্রাস হইয়া মুসলমানের সংখ্যা অনর্গল বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। আমরা দেখিয়াছি, ছলে বলে অনেককে মুসলমান করা হইয়াছিল, ব্রাহ্মণদিগের সামাজিক খুঁটিনাটীর শাসনে অনেককে মুসলমান হইতে হইয়াছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের পরিকল্পিত স্মৃতির নির্যাতন এড়াইতে বোধ হয় তদপেক্ষা অধিক লোককে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছে। চণ্ডাল ও নমঃশূদ্রের ব্যাপার অদ্যাপি আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি।

বঙ্গদেশে মুসলমানের সংখ্যা যত, তাহার অনুপাতে ভারতবর্ষের আর কোনও প্রদেশে তত নহে। শেষ আদমসুমারী হইতে জানা যায়, হিন্দুর দেশ এই বাঙ্গালায় অধুনা মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা তেত্রিশ লক্ষ বেশী!

বঙ্গদেশের অধিকাংশ মুসলমানের উদ্ভব কোথা হইতে, আমরা দেখিয়াছি।

আমরা বলিয়াছি, বহুকাল একত্র বাস নিবন্ধন হিন্দু মুসলমান পরস্পরের প্রতি অনেকটা সহানুভূতিপরায়ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন; অনেক প্রকারে পরস্পর আদান প্রদান চলিয়াছিল। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' আমরা দেখিতে পাই, মুসলমান কাজী সাহেব মহাপ্রভুকে বলিতেছেন—

"গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয় আমার চাচা।
দেহ-সম্বন্ধ হইতে গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা।
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা॥"

যবন ব্রাহ্মণে স্নেহের কুটুম্বিতা!

---

* সমগ্র ভারতে মুসলমান সংখ্যা সাড়ে ছয় কোটীর উপর (৬৬৬৪৭২৯৯)। ইহার মধ্যে এক বাঙ্গালায় মুসলমান কিছু কম আড়াই কোটী (২৪২৩৭২২৮)। বঙ্গদেশে হিন্দুর সংখ্যা কিছু বেশী দুই কোটী মাত্র (২০৯৪৫৩৭৯)।

বহুদিন একত্রবাস নিবন্ধন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধেও উদার ভাব আসিয়াছিল; তাহারই ফলস্বরূপ বঙ্গদেশে মিশ্র-দেবতা সত্যপীরের আবির্ভাব। ক্রমে সেই পীর পাকা হিন্দুভাবে রূপান্তরিত হইয়া সত্যনারায়ণ-নামে পূজিত হইতেছেন।

আমরা ক্ষেমানন্দ-রচিত 'মনসার ভাসানে' দেখিতে পাই, লখিন্দরের লোহার বাসরে হিন্দুয়ানীর রক্ষাকবচ ও অন্যান্য মন্ত্রপূত সামগ্রীর সঙ্গে একখানি কোরাণও রাখা হইয়াছিল। রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের 'সত্যনারায়ণে' দেবতা মুসলমান ফকীর সাজিয়া ধর্ম্মের ছবক শিখাইয়াছেন। ইতিহাসে দেখা যায়, নবাব মীরজাফরের মৃত্যুকালে তাঁহার পাপক্ষালনের জন্য তাঁহাকে কিরীটেশ্বরী দেবীর চরণামৃত পান করিতে দেওয়া হইয়াছিল। হিন্দুগণ যেরূপ নানা পীরের সিন্নি দিতেন, পীরের দর্‌গায় মাটীর ঘোড়া মানত করিতেন, মুসলমানগণও সেইরূপ বহু দেব-মন্দিরে নানা সামগ্রী ভোগ দিতেন। ত্রিপুরা জেলার মির্জা হোসেন আলি নামক জনৈক মুসলমান জমীদার নিজ বাড়ীতে সমারোহসহকারে কালী-পূজা করিতেন। ঢাকার গরীব হুসেন চৌধুরী সাহেব বিস্তর টাকা ব্যয় করিয়া শীতলা দেবীর পূজা করিতেন। অনেক স্থলে মুসলমানগণের 'গোপী', 'চাঁদ' প্রভৃতি হিন্দু নাম ও হিন্দুদিগের 'ফকীর' 'জহর' প্রভৃতি মুসলমানী রকম নাম এখনও প্রদত্ত হইয়া থাকে। পীর গোরাচাঁদ, মুস্কিল আসান এখনও হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের ঘর হইতে সেলামী আদায় করিতেছেন।

মুন্সী আবদুল করিম সাহেব স্বয়ং মুসলমান; তিনি জানাইয়াছেন,—কুসংস্কার কি ভক্তির বশে বলা যায় না, হিন্দুগণ মুসলমান পীরের ও মুসলমানগণ হিন্দু দেবতার পূজা করিতে কুণ্ঠিত বা বিরত হন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, আজও চট্টগ্রামে মুসলমানের মধ্যে কেহ কেহ কাত্যায়নীর ব্রত পালন করেন। অনেক হিন্দুও সত্যপীর, মাণিকপীর ইত্যাদির সিন্নি দিয়া থাকেন। অতি অল্প দিন হইল, মুসলমানসমাজ হইতে মনসা-পূজা লোপ পাইয়াছে, এবং হিন্দুসমাজ হইতেও গাজী কালুর সম্মাননা উঠিয়া যাইতেছে। সেকালে শিক্ষার প্রসার এত অধিক না থাকিলেও, হিন্দু মুসলমানে বর্ত্তমান কালের মত এমন অহি-নকুল ভাব ছিল না। দুঃখের বিষয়, শিক্ষা-বিস্তৃতির সঙ্গে অধুনা এই দুই জাতির মধ্যে একটা ব্যবধানের সৃষ্টি হইতেছে। *

পূর্ব্ববঙ্গের জনৈক উচ্চতমপদস্থ রাজপুরুষ সুয়ো রাণী দুয়ো রাণীর কথা মুখে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সপত্নী-বিদ্বেষ চিরপ্রচলিত। ইঁহাদের মূলমন্ত্র বোধ হয় Divide and Rule। এ মন্ত্র বিপদ্ আনিতে পারে।

বাস্তবিক, পূর্ব্বকালে মুসলমানী প্রভাব-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমানে সদ্ভাব ও সহৃদয়তা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেকালে অনেক মুসলমান হিন্দুর সংসর্গ প্রীতিজনক মনে করিতেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এমন কি, ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও তাঁহারা ভক্তি-শ্রদ্ধা-সহকারে হিন্দুর দেবদেবীগণের উপাসনা করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। বঙ্গের মুসলমানী সাহিত্যে দৃষ্ট হয়, কোনও কোনও মুসলমান কবি স্বরচিত-গ্রন্থমধ্যে স্বরস্বতীর বন্দনা করিয়াছেন; সুপ্রসিদ্ধ ফকীর দরাফ খাঁ সংস্কৃত ভাষায় গঙ্গাস্তোত্র লিখিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার গঙ্গাষ্টকের শেষ শ্লোকটি এই—

"সুরধুনি মুনিকন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তং
স তরতি নিজপুণ্যৈ স্তত্র কিন্তে মহত্বম্।
যদি চ গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং
তদিহ তব মহত্বং তন্মহত্বং মহত্বম্।"

অন্যধর্ম্মী যবনের মুখে এমন প্রকৃত ভক্ত সাধকের বাণী শুনিয়া পুলকিত না হইয়া থাকা যায় না। শ্লোকটি অপর এক জন ভিন্নধর্ম্মী কবির একটি উদার গান মনে পড়াইয়া দেয়। কবিওয়ালা খৃষ্টান অ্যাণ্টনি ফিরিঙ্গী একদিন 'ভবানী বিষয়' গাহিয়াছিলেন—

"ভজন পূজন জানিনে মা জাতিতে ফিরিঙ্গী।
যদি দয়া করে তার মোরে এ ভবে মাতঙ্গী॥"

'রাগমালা', 'তানমালা' প্রভৃতি মুসলমান-রচিত সঙ্গীত গ্রন্থে দেখা যায়, বহু মুসলমান কবি হিন্দু দেবতাবিষয়ক ব্রজলীলা-ঘটিত গান রচনা করিয়া গিয়াছেন। সম্রাট আকবার বাদশাহের রাজগায়ক মিঞা তানসেন প্রভৃতি অনেক ওস্তাদ শক্তিদেবী ও মহাদেবের প্রসঙ্গে গীত রচনা করিয়া উদারতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

সৈয়দ জাফর খাঁ ও মূর্জা হুসেন আলির শ্যামা-সঙ্গীত প্রসিদ্ধ। হুসেন আলির একটি গান—

"যা রে শমন, এবার ফিরি।
এস না মোর আঙ্গিনাতে, দোহাই লাগে ত্রিপুরারি॥
আমি তোমার কি ধার ধারি!
শ্যামা মায়ের খাস তালুকে বসত করি॥
বলে মূর্জা হুসেন আলি—যা করে মা জয়কালী,
পুণ্যের ঘরে শূন্য দিয়ে পাপ নিয়ে যাও নিলাম করি॥"

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশে মুসলমানের সংখ্যা অধিক—খাস বাঙ্গালায় প্রায় সার্দ্ধ দুই কোটী। এই আড়াই কোটী মুসলমান সবই যে পাঠান বা মোগল, সবই যে ভারতের বহির্ব্বর্ত্তী দেশ আফগানিস্থান তুর্কিস্থান হইতে আমদানী, এমন নহে। সবই যে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত খাঁটী মোগল পাঠানের সন্তান, এখানকার উপনিবেশী, এমনও নহে। আমরা দেখাইয়াছি, এই বিশাল মুসলমান জনসঙ্ঘের অনেকটা অংশ এই দেশেরই লোক; হিন্দু বা অপর জাতি; 'কারে পড়িয়া' স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছেন। * যাঁহারা পরদেশী, তাঁহারাও বঙ্গদেশে বহুকাল বাসনিবন্ধন ক্রমে বাঙ্গালীর রীতি নীতি আচার ব্যবহার কতক কতক গ্রহণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বত্রই এই প্রকার হইয়া থাকে। কিন্তু লেখাপড়ার বেলা কি হইত? বাঙ্গালা ভাষার সহিত ইঁহাদের সম্পর্ক কত দূর? বঙ্গের এই বিশাল মুসলমান জাতির সাহিত্য কই? মুসলমানী ভাষার কথা জানি না, কিন্তু দেশ-ভাষায় ইঁহাদের অভিজ্ঞতার পরিচয় কই? নিম্নশ্রেণীর লোকের কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম—হিন্দু মুসলমান উভয়ই নিরক্ষর; কিন্তু সমাজের উচ্চস্তরের লোকের সম্বন্ধে কি বলা চলে? তাঁহারা দেশের ভাষার সহিত কতটা সংস্রব রাখিতেন? প্রায় চারি শত বৎসরের পাঠান-রাজত্বের ভিতর মুসলমানের রচিত কয়খানি বাঙ্গালা বহির (পুঁথি বা রচনা) বা কোনরূপ সন্দর্ভের সন্ধান পাওয়া যায়? সে যুগেও দেশী মুসলমান ত বিস্তর ছিলেন।

আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণের এ বিষয়ে কি বলিবার আছে, শুনা যাউক। আমরা মুন্সী এক্রামুদ্দীনের কিছু কিছু কথা শুনাইব। তিনি বলেন—মুসলমান-গণ বাঙ্গালা ভাষায় যে সেরূপ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই, তাহার কারণ,—প্রথমতঃ তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা করেন নাই। যখন স্পেন হইতে ভারত পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ তাঁহাদের করতলগত, তখন তাঁহারা বিজাতীয়ের সহিত বাস করিয়াও জাতীয় ভাষা ত্যাগ করেন নাই। বিজাতীয় ভাষায় বাক্যালাপে পর্য্যন্ত তাঁহারা আন্তরিক ঘৃণা প্রকাশ করিতেন। ভারতের রাজভাষা ছিল পারসী; সুতরাং রাজত্বের শেষ সময় পর্য্যন্ত তাঁহাদের দেশীয় ভাষায়

* বাঙ্গালা দেশের প্রায় আড়াই কোটী মুসলমানের ভিতর ইদানীং পাঠান দুই লক্ষ আশী হাজার আট শত নব্বই জন; মোগল চৌদ্দ হাজার ছয় শত সাতাইশ জন মাত্র; মোট তিন লক্ষেরও কম। পূর্ব্বে বেশী ছিল, সম্ভব।

অনুরাগের সঞ্চার হইল না। মুসলমান-রাজত্বের অবসানে এবং ইংরাজের শুভাগমনের পরও বহুদিন আদালতের ভাষা পারসীই রহিয়া গেল। সুতরাং এ দেশীয় ভাষার প্রতি তাঁহাদের আবজ্ঞা দূর হইল না। সম্প্রতি বাঙ্গালার আদালত-সমূহে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত হইয়া মুসলমানের মধ্যে কিয়ৎপরিমানে বাঙ্গালা ভাষার আলোচনা আরব্ধ হইলেও, এখনও তাঁহারা স্কুল কলেজে সাধারণতঃ পারসী ও উর্দ্দূ ভাষাই শিক্ষা করেন। বাঙ্গালা ভাষার রীতিমত আলোচনা না থাকাই মুসলমানের বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভ না করিবার প্রধান হেতু বলিয়া অনুমিত হয়।

কথাটা আংশিক সত্য বটে। পরদেশী মুসলমান—আসল মোগল পাঠান, কিংবা তাঁহাদের বংশধরের পক্ষে উল্লিখিত মত থাটে বটে; কিন্তু এ-দেশী মুসলমান—যাঁহাদের দায়ে পড়িয়া পরধর্ম্মগ্রহণ—এবং তাঁহাদের উত্তরপুরুষগণ সম্বন্ধেও কি এই কথা বলা চলে? তাঁহাদের ভাষা ত বাঙ্গালা ভাষা ছিল; ফল্গু নদীর মত হিন্দু মত ভাবও তাঁহাদের অন্তরে অন্তরে বহিত, এরূপ অনুমানও অসঙ্গত হইবে না। বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালা-ভাষা-ভাষী মুসলমানের তুলনায় উর্দ্দূ বা-হিন্দু ভাষাভাষী মুসলমানের সংখ্যা নগণ্য, এ কথা বোধ হয় উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। ১৯১১ সালের সেন্‌সস্ রিপোর্ট হইতে অবগত হওয়া যায়, নূতন বাঙ্গালার জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে চারি কোটী (৪৬৩০৪৬৪২)। ইহার ভিতর মুসলমান প্রায় আড়াই কোটী (২৪২৩৭২২৮)। কিন্তু বাঙ্গালা-ভাষাভাষীর সংখ্যা মোট কুড়ি লক্ষেরও কম (১৯১৭৩৯০)। ইহার ভিতর অবশ্য হিন্দী-ভাষা-ভাষী পশ্চিমা হিন্দুও অনেক আছেন। ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায়, বঙ্গদেশে প্রায় আড়াই কোটী মুসলমানের ভিতর ২৮৫০ জনের ভাষা পষ্‌তু; ৮৪০ জনের আরবী; ১১৬২ জনের ফারসী। অতএব, খাঁটী মুসলমানী-ভাষাভাষীর সংখ্যা মোট ৪৮৫২; অর্থাৎ, মোট পাঁচ হাজারেরও কম। অবশ্য, উর্দ্দূ ভাষা ধরিলে এই সংখ্যা আরও কিছু বাড়ে; কিন্তু সে কত, তাহাও আমরা দেখাইয়াছি।

আলি রাজা অনেক পদেই আপনাকে 'রাধা-কানু-চরণ-ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ইঁহার রচিত শ্যামা-সঙ্গীতও আছে।

অনেকগুলি মুসলমান বৈষ্ণব-কবি আবিষ্কৃত হইয়াছেন। ভিন্নধর্ম্মী কবিগণ মধুর ভাষায় মধুর ভাবে রাধাকৃষ্ণেরলীলা, বাল্যলীলাও গোষ্ঠ বা সখ্যের বর্ণনা করিয়াছেন। অনেক স্থলে রচনা এমন সুন্দর হইয়াছে যে, ভণিতা

না থাকিলে কাহার সাধ্য স্থির করে যে, রচনা মুসলমানের। গীতগুলিতে হিন্দুভাব ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান। চট্টগ্রাম হইতে বিস্তর বৈষ্ণব পদাবলী পাওয়া গিয়াছে।

চট্টগ্রামে হিন্দু-মুসলমান সামাজিক আচার ব্যবহারে যত দূর সন্নিহিত হইয়াছিলেন, অন্যত্র সেরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। চট্টগ্রামের কবি হামিদুল্লার 'ভেলুয়া সুন্দরী' কাব্যে বর্ণিত আছে, লক্ষপতি সদাগর পুত্রকামনায় ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে আহ্বান করিলেন, এবং সওদাগরের পুত্র বাণিজ্যে যাইবার পূর্ব্বে 'বেদ-প্রায়' পিতৃবাক্য মান্য করিয়া আল্লার নাম গ্রহণপূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। ১৫০ বৎসরের প্রাচীন কবি আপ্তাবুদ্দীন তাঁহার 'জামিল দিলারাম' কাব্যে নায়িকা দিলারামকে পাতালে প্রেরণ করিয়া সপ্ত ঋষির নিকট বর-প্রার্থনায় নিযুক্ত করিয়াছেন, এবং তাঁহার রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে 'লক্ষ্মণের চন্দ্রকলা' 'রামচন্দ্রের সীতা', 'বিদ্যাধরী চিত্ররেখা' ও 'বিক্রমাদিত্যের ভানুমতী'র সহিত তুলনা করিয়াছেন।

চট্টগ্রামে কিছুকাল পূর্ব্বে সঙ্গীতবিদ্যারও বিলক্ষণ অনুশীলন ছিল বলিয়া বোধ হয়। অনেক স্থান হইতে রাগ-তান-সম্বন্ধীয় অনেকগুলি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থগুলির নাম,—'রাগমালা', 'ধ্যানমালা', 'রাগনামা', তালনামা', 'তালমালা' ইত্যাদি। এই গ্রন্থগুলিতে রাগ-তান সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য নানা কথাই আলোচিত হইয়াছে। প্রত্যেক রাগে এক একটি প্রাচীন সঙ্গীত বা পদ বিন্যস্ত আছে। পদগুলি ভিন্ন ভিন্ন কবির রচিত। তাঁহাদের মধ্যে অনেক মুসলমান কবিও আছেন। অধিকাংশ পদই কৃষ্ণলীলাত্মক। মুন্সী আবদুল করিম সাহেব জানাইয়াছেন,—তিনি কেবল স্বীয় চেষ্টায় পাঁচ শতের অধিক হস্ত-লিখিত পুঁথি, সন্দর্ভ-পুস্তক ও প্রায় দেড় শত কবির পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে অবশ্য কতকগুলি বিদেশীয় (অর্থাৎ চট্টগ্রামের বাহিরের) রচয়িতা, কিন্তু অধিকাংশই—চট্টগ্রামবাসী না হউন—অন্ততঃ পূর্ব্ববঙ্গবাসী, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মুন্সী করিম সাহেব একটি প্রবন্ধে ৮৫ জন প্রাচীন মুসলমান কবির পরিচয় দিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই একমাত্র চট্টগ্রামে আবির্ভূত। এই হিসাবে সমগ্র বাঙ্গালায় কত কবির আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। চট্টগ্রামেও অদ্যাপি সকল স্থানের অনুসন্ধান শেষ হয় নাই; সুতরাং মুন্সীজীর তালিকা এখনও অসম্পূর্ণ। সাহেব লিখিয়াছেন—"বলিতে যুগপৎ

দুঃখ ও লজ্জা হয়, এই সকল কবির পুঁথি আমি সামান্য হাড়ীদিগের নিকট পাইয়াছি।" চট্টগ্রামের হাড়ী মুচিও কবির মর্য্যাদা বুঝে; কবির রচনা সযত্নে তাহারাও রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

এই পঁচাশী জন ভিন্ন অনেকগুলি গ্রন্থের রচয়িতার নাম প্রকাশিত না থাকায় জানা যায় নাই। অনেক কবি কোনও ধারাবাহিক গ্রন্থের রচনা না করিয়া কেবল সঙ্গীত, পদ ইত্যাদিই লিখিয়া গিয়াছেন।

উল্লিখিত কবিগণের প্রায় সকলেই 'ভাষা বাঙ্গালা' লিখিয়া গিয়াছেন। অধিকাংশই মুসলমানী বাঙ্গালা। তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিয়াছেন, অথচ আরবী বা পারসীতে রচিত গ্রন্থাদির নামকরণ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে অনেকগুলি আরবী কি পারসী গ্রন্থের অনুবাদ; সুতরাং সেগুলির এই প্রকার নামকরণ অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল।

মুসলমান কবিগণের সময়-নির্দ্ধারণের সুযোগ আজিও উপস্থিত হয় নাই। সংগ্রহ কার্য্য শেষ হইলে, এবং তাহা মুদ্রাযন্ত্র সাহায্যে লোকলোচনের গোচরীভূত হইলে, অনেকের সময় স্পষ্ট নির্দ্ধারিত হইতে পারিবে, আশা করা যায়। অল্প কবিই গ্রন্থমধ্যে আপনার পরিচয় বা আবির্ভাব-কালের অতি সামান্য উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সংক্ষেপতঃ এ কথা বলা যাইতে পারে যে, প্রায় সমস্ত কবিই এক শত হইতে সার্দ্ধ তিন শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী হইবেন। অবশ্য দুই চারি জন খুব আধুনিকও হইতে পারেন। ইঁহাদিগের মধ্যে চল্লিশ জনেরও অধিক বৈষ্ণব-পদাবলীরচয়িতা।

গৌড়ের মুসলমান অধিপতিগণের উৎসাহে অনেক সুপণ্ডিত বাঙ্গালী হিন্দু-শাস্ত্রাদির অনুবাদে অগ্রসর হইয়াছিলেন, আমরা জানি। খ্যাতনামা মালাধর বসু শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ করিয়া গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

মুসলমান কবিগণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। মুসলমান রাজকর্ম্মচারিগণ অনেকে অর্থ-সাহায্য দিয়া বাঙ্গালী হিন্দুকে মহাভারতের অনুবাদে প্রবর্ত্তিত করেন, তাহার নিদর্শন আমরা পাইয়াছি। সুপ্রসিদ্ধ হুসেন শাহার বিখ্যাত সেনাপতি পরাগল খাঁর সাহায্যে কবীন্দ্র পরমেশ্বর (স্ত্রী পর্ব্ব-পর্য্যন্ত) প্রায় সমগ্র মহাভারতের এবং তদীয় পুত্র ছুটি খাঁর কল্যাণে শ্রীকর নন্দী অশ্বমেধ পর্ব্বের অনুবাদ করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের সময় হইতে হিন্দু বৈষ্ণব-কবিগণ

যেরূপ নানা গ্রন্থাদি লিখিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অনুকরণে সেইরূপ অনেক মুসলমান কবিও বহু গীত ও গ্রন্থের রচনা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি করিয়াছেন। এই সকল রচনা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, সুপণ্ডিত মুসলমানগণও হিন্দুর শাস্ত্র ও বাঙ্গালা ভাষাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। বাস্তবিক, এক সময়ে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কত দূর সদ্ভাব ও প্রীতি স্থাপিত হইয়াছিল!

বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুকরণ ব্যতীত মুসলমান কবিগণ ইস্‌লাম-জগতের অনেক মৌলিক বৃত্তান্ত বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত করিয়া এবং রচনা করিয়া ভাষার কলেবর পুষ্ট করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে ইস্‌লাম ধর্ম্মের ব্যাখ্যা, তত্ত্ব, নীতি, উপদেশ প্রভৃতিও আছে; এবং ইতিহাস, উপাখ্যান, গল্প, সঙ্গীত, গাথাও অনেক পাওয়া যায়।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য আগাগোড়াই পদ্য সাহিত্য। বঙ্গদেশে হিন্দুর ন্যায় মুসলমানের রচনাও প্রায় সমস্তই পদ্যে রচিত। গদ্য খুব কমই দৃষ্ট হয়।

জনৈক মুসলমান সমালোচক লিখিয়াছেন,—মুসলমানগণ চৈতন্যদেবের সৃষ্ট প্রেম-বন্যার দু এক ঢোঁক ইচ্ছা বা অনিচ্ছা সত্ত্বে উদরস্থ করিয়া তাহাই প্রস্রবণে পরিণত করিয়া ক্ষান্ত থাকিলেন না। তাঁহাদের প্রস্রবণ হইতে নানাবিধ রত্নের উদ্ভব হইল। কবি দৌলত কাজি আনুমানিক ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে 'লোর চন্দ্রানী' ও কবি আলাওল প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে 'পদ্মাবতী' প্রভৃতি কাব্য রচনা করিয়াছেন।

হিন্দু ভাবের কথা মুন্সীজী মানিবেন না, কিন্তু ভাষা সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার মতে, হিন্দু ভাব মুসলমানের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে না পারিলেও তাঁহারা ভাব-প্রকাশের নিমিত্ত বাঙ্গালা-ভাষী মুসলমানগণের জন্য এক অদ্ভুত বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি করিলেন। (বহুকাল ভারতবর্ষে অবস্থান হেতু মুসলমানের আর্‌বী পার্‌সী ভাঙ্গিয়া দেশভাষা হিন্দীর সহিত মিশ্রিত হইয়া উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে উর্দ্দু ভাষা জন্মিয়াছিল)। উর্দ্দুর সহিত বাঙ্গালা ভাষার মিশ্রণে বঙ্গে এক নূতন মিশ্র-ভাষার উৎপত্তি হইল। উর্দ্দু ও বাঙ্গালা মিশ্রিত ভাষায় কবিতায় মুসলমানগণ-লিখিত পুঁথি সকলের বহুল প্রচার হইল, এবং উর্দ্দু-ভাষানভিজ্ঞ মুসলমানগণ সমাদরের সহিত তাহা পাঠ করিতে লাগিল। এই শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যে আজিও ঐ সকল পুস্তকের আদর অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, এবং সন্ধ্যাকালে মুসলমান-পল্লীতে গমন করিলে দেখিতে

পাওয়া যাইবে, সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর, অবসরপ্রাপ্ত মুসলমানগণ (বাঙ্গালী) 'গোলে হরমুজের' প্রণয়-কাহিনী বা 'কারবালার যুদ্ধ'-বৃত্তান্তের ন্যায় কোনও উপাখ্যান অত্যন্ত একাগ্রতাসহকারে শ্রবণ করিতেছে।

উচ্চ শ্রেণীর লেখক ও পাঠক এ দেশে থাকিয়াও পারসী ভাষার পরিপুষ্টি-সাধন করিতে লাগিলেন; সুতরাং নবসৃষ্ট উর্দ্দু-বাঙ্গালা-মিশ্র ভাষা নিম্নশ্রেণীর মুসলমানগণের মধ্যেই আবদ্ধ রহিল।

আমরা এই ভাষাকে মুসলমানী বাঙ্গালা বলিতে পারি। স্বীকার করিতেই হয়, বঙ্গদেশে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চ্চা যৎসামান্য ছিল। * কিন্তু বাড়িতেছিল; এবং ক্রমে নবসৃষ্ট এই মিশ্র-ভাষাও মার্জ্জিত হইয়া বিশুদ্ধ বাঙ্গালার সন্নিহিত হইতেছিল। বিশেষতঃ, যখন যথার্থ গুণী ব্যক্তির হাতে পড়িতেছিল, তখন তাহার ভাব ও গঠন উৎকৃষ্টই দাঁড়াইতেছিল। কবি আলাওল, আলি রাজা, সৈয়দ মর্ত্তুজা প্রভৃতি কবির রচনা বাঙ্গালী হিন্দু কবির হাতের হইলেও গৌরবের সামগ্রী হইত।

পাঠান রাজত্বের শেষাশেষি গৌড়েশ্বর সুলতান হুসেন শাহার আমল বাঙ্গালা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এ সময়ে বঙ্গে ভাব ও ভাষার বন্যা আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহাতে হিন্দু মুসলমান সকলকেই মাতিয়া উঠিতে হইয়াছিল। সেই সময়ে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য প্রভুর আবির্ভাব।

চৈতন্য-যুগে যখন প্রেমের দুর্নিবার স্রোত গৌড় বা বাঙ্গালা দেশ প্লাবিত করিল, তখন তাহা মুসলমানের ঘেরা আঙ্গিনার মধ্যেও প্রবেশ করিতে বাকি থাকিল না। তৎকালেই প্রেমপূর্ণ বৈষ্ণব-হৃদয়ের উচ্ছ্বাস পদাবলী-রূপে পরিস্ফুট হইতে লাগিল, এবং তাহা গৃহে গৃহে গীত হইয়া মুসলমানকেও চলিত বাঙ্গালা ভাষা শিখাইয়া ফেলিল। শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল। এক কালেই ভাব ও ভাব-প্রকাশের শক্তি ধীরে ধীরে মুসলমানের হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করিল; এবং একে একে মুসলমান বৈষ্ণব-কবিগণের আবির্ভাব হইতে লাগিল।

এই সকল মুসলমান কবি প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন কি না, সে বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত কোনও পক্ষেই বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই; কিন্তু তাঁহারা

* শেষ সেন্‌সস্‌-রিপোর্ট হইতে সংবাদ পাওয়া যায়, আজ পর্য্যন্ত এই লেখাপড়ার চর্চ্চার দিনেও, প্রায় আড়াই কোটী মুসলমানের ভিতর লেখাপড়া-জানা লোক—দশ লক্ষ মাত্র। পূর্ব্বে আরও কম ছিল।

বৈষ্ণব পদাবলীর রচয়িতা বলিয়া সাহিত্য-জগতে 'বৈষ্ণব কবি' আখ্যা পাইয়াছেন। এক জনের একটু পরিচয় দি—

চট্টগ্রামবাসী কবি আলি রাজা। আলি রাজার গীতে রাধা কৃষ্ণের লীলা বর্ণনা আছে। তিনি বৈষ্ণবীয় মধুর রস গাহিয়াছেন। মুসলমান হইয়া তিনি এরূপ করিলেন কেন? কেহ কেহ বলেন মুসলমান ফকীরদিগের মতে মানব-দেহই রাধা ও মনই কানু। যদি এই পথ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে আলি রাজা প্রভৃতি কবিগণকে মুসলমান বৈষ্ণব কবি নামে অভিহিত করা অসঙ্গত হয় না। আলি রাজার একটি গান—

"অই না লোহে আমার দুঃখ সাক্ষী পীতাম্বর!
সর্ব্ব জগ দেখি ধান্ধা।
অই চতুর্ভুজ বিনে আনরে না মানে মনে,
সে রাঙা চরণে প্রাণি বান্ধা।"

আলাওল সম্বন্ধে কোন প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ কহিয়াছেন—কবিশ্রেষ্ঠ সৈয়দ আলাওল সাহেব বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। মুসলমান জাতির মধ্যে ত তিনি মহাকবির স্বর্ণসিংহাসনে সমাসীন আছেনই, গুণ তুলনায় তাঁহার সম-সাময়িক হিন্দু কবি-কুলেও তাঁহার আসন অতি উচ্চে। বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে মাতৃভাষায় (বাঙ্গালায়) এবং তাহার জনয়িত্রী সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার ন্যায় এতটা প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও ব্যুৎপত্তি লাভে কেহ কখনও সমর্থ হন নাই এবং হইবেন কি না সন্দেহ।

আলাওল জন্মগ্রহণ করেন ফরিদপুরে, কিন্তু তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল চট্টগ্রামে (রোসাঙ্গে)। তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। সমস্ত বঙ্গীয় মুসলমান কবিগণের মধ্যে আলাওলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র তাঁহার কাব্যের বিস্তারিত সমালোচনা করিয়াছেন। 'পদ্মাবতী' কাব্যে আলাওলের গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে। কবিবর পিঙ্গলাচার্য্যের মগন রগণ প্রভৃতি অষ্ট মহাগণের তত্ত্ব বিচার করিয়াছেন; খণ্ডিতা, বাসকসজ্জা ও কলহান্তরিতা প্রভৃতি অষ্টনায়িকার ভেদ ও বিরহের দশ দশা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়াছেন; আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র লইয়া উচ্চাঙ্গের কবিরাজী কথা শুনাইয়াছেন; জ্যোতিষ প্রসঙ্গে লগ্নাচার্য্যের ন্যায় যাত্রার শুভাশুভের এবং যোগিনী চক্রের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন; একজন প্রবীণা এয়োর মত হিন্দুর বিবাহাদি ব্যাপারের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আচারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ও

পুরোহিত ঠাকুরের মত প্রশস্ত বন্দনার উপকরণের একটি শুদ্ধ তালিকা দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত টোলের পণ্ডিতের মত অধ্যায়ের শিরোভাগে সংস্কৃত শ্লোক তুলিয়া দিয়াছেন। এই পুস্তক পড়িলে স্বতঃই মনে হইবে মুসলমানের এতটা হিন্দু ভাবাপন্ন হওয়া নিতান্তই আশ্চর্য্যের বিষয়। গ্রন্থে পাণ্ডিত্যের সঙ্গে কবিত্বও প্রগাঢ়। আলাওল কবির কথায় বাঁধুনির পরিচয় দিতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করি —

বসন্তে নাগরবর নাগরী বিলাসে।
বর বালা দুই ইন্দু স্রবে যেন সুধাসিন্ধু মৃদুমন্দ অধরে ললিত মধু হাসে॥
প্রফুল্লিত কুসুম মধুব্রত ঝঙ্কৃত হুঙ্কৃত পরভৃত কুঞ্জে রত রাসে।
মলয় সমীর সুসৌরভ সুশীতল বিলোলিত পতি অতি রস ভাষে॥
প্রফুল্লিত বনস্পতি কুটিল তর্মলিক্রম মুকুলিত চূতলতা কোরকজালে।
যুবজন হৃদয় আনন্দে পরিপূরিত রঙ্গমল্লিকা মালতীমালে॥

ভাষা জয়দেব কবির কোমল কান্ত পদাবলী মনে পড়াইয়া দেয়।

অপর স্থল হইতে আলাওলের একটু রূপ বর্ণনা শুনাই—

কুটিল কবরী কুসুম মাঝে। তারকা-মণ্ডলে জলদ সাজে॥
শশীকলা প্রায় সিন্দুর ভালে। বেড়ি বিধুমুখ অলক জালে॥
সুন্দরী কামিনী কাম বিমোহে। খঞ্জন-গঞ্জন নয়নে চাহে॥
মদন ধনুক ভুরু-বিভঙ্গে। অপাঙ্গ ইঙ্গিত বাণ তরঙ্গে॥
নাসা খগপতি নহে সমতুল। সুরঙ্গ অধর বাঁধুলী ফুল॥
দশন মুকুতা বিজলি হাসি। অমিয় বরিষে আঁধার নাশি॥
উরজ কঠিন হেম কঠোর। হেরি মুনিজন মন বিভোর॥
হরি করি-কুম্ভ কটি নিতম্ব। রাজহংস জিনি গতি বিলম্ব॥
কবি আলাওল মধু গায়। আপন আরতি রহুক অদায়॥

পড়িতে পড়িতে অনেকের সহজ সুন্দর ভাষা ও ছন্দে ভারত চন্দ্রকে স্মরণ হইবে। আমাদের মনে রাখিতে হয়, কবি আলাওল ভারতচন্দ্রের প্রায় শত বর্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী, সুতরাং মুসলমান কবির গুণপণা বিস্ময়জনক।

আমরা বলিয়াছি অনেকগুলি মুসলমান বৈষ্ণব কবি আবির্ভূত হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে সৈয়দ মর্ত্তুজা একজন শ্রেষ্ঠ কবি। দুই দিকে দুই জন সৈয়দ মর্ত্তুজার কীর্ত্তি চিহ্ন প্রকাশিত হইয়াছে। পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে এক সৈয়দ মর্ত্তুজার পদাবলী দৃষ্ট হয়। তিনি মুরসিদাবাদ-বাসী ছিলেন। আর চট্টগ্রামে এক সৈয়দ মর্ত্তুজার পদাবলী আবিষ্কৃত হইয়াছে। উভয় মর্ত্তুজার অনেকগুলি পদ সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে উৎকৃষ্ট হিন্দু কবির রচনায় সমকক্ষ হইতে পারে।

মুর্শিদাবাদের সৈয়দ মর্ত্তুজা সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় লিখিয়াছেন—মর্ত্তুজার এরূপ উদার ধর্ম্মভাব ছিল যে মুসলমানেরা তাঁহাকে ফকির, তান্ত্রিকেরা সাধক, এবং বৈষ্ণবেরা একজন প্রসিদ্ধ ভক্ত বলিয়া মনে করিতেন।

চট্টগ্রামের মর্ত্তুজা সম্বন্ধে একজন মুসলমান সমালোচক লিখিয়াছেন—তিনি অতি উদার ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি বৈষ্ণব ও মুসলমানধর্ম্মের সার উপলব্ধি করত উভয় ধর্ম্মের মূলমন্ত্র অভিন্ন দেখিয়া মহামতি কবীরের ন্যায় গাহিয়া গিয়াছেন 'যে রাম সেই রহিম।'

দুই মর্ত্তুজা একই ব্যক্তি কি না, এখনও সে বিষয়ে কিছু নির্দ্ধারিত মীমাংসা হয় নাই; উপস্থিত আমরা দুইজনই ধরিয়া লইতেছি।

মুর্শিদাবাদের সৈয়দ মর্ত্তুজার একটি পদ—

শ্যাম বন্ধু চিত নিবারণ তুমি।

কোন শুভদিনে	দেখা তোমা সনে	পাসরিতে নারি আমি॥
যখন দেখিয়ে	ও চাঁদ বদন	ধৈরজ ধরিতে নারি।
অভাগীর প্রাণ	করে আনচান্	দণ্ডে দশবার মরি॥
মোরে কর দয়া	দেহ পদছায়া	শুনহ পরাণ কানু।
কুল শীল সব	ভাসাইনু জলে	প্রাণ না রহে তোমা বিনু॥
সৈয়দ মর্ত্তুজা ভণে	কানুর চরণে	নিবেদন শুন হরি।
সকল ছাড়িয়া	রহিল তুয়া পায়ে	জীবন মরণ ভরি॥

এরূপ গান চণ্ডীদাসকে মনে পড়াইয়া দেয় না কি?

চট্টগ্রামের মর্ত্তুজার একটি পদ—

কি কহিব অএ সখি কালা গুণনিধি।
অনেক পুণ্যের ফলে মিলায়েছে বিধি॥
সাত পাঁচ সখী মেলি যমুনাতে আসি।
কালা নিল জাতি কুল প্রাণ নিল বাঁশী
চূড়া এ কদম্ব পুষ্প পত্র সারি সারি।
দেখেছি অবধি রূপ পাসরিতে নারি॥
চৌদিকে নিকুঞ্জ লতা মধ্যেরে যমুনা।
তার মাঝে বসিয়াছে মন্মের মন্মনা॥
ছৈয়দ মর্ত্তুজা কহে শুন প্রাণসখি।
এমন বিনোদরূপ কভু নাহি দেখি॥

ইঁহার রচিত একটি সুন্দর পদ হইতে তাঁহার প্রকৃত ধর্ম্মমতের আভাস পাওয়া যায়; আমরা উঠাই—

সই এক বিনে মাওলা এক বিনে আর নাহি কোই।
আপে হরে আপে রাখে সখি মওলা আপে করে কেলি।
আনন্দ মোহন মাওলা খেলয়ে ধামালি।
আপে মন আপে তন আপে মম হরি।
আপে কানু আপে রাধা আপে সে মুরারি।

মুসলমানের রচনা, সাধক সঙ্গীতের মত শুনায়। ভক্তবীর রামপ্রসাদ এক-দিন গাহিয়াছিলেন—

মন ক'র না দ্বেষাদ্বেষি।
মহাকালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম সকল আমার এলোকেশী।

মুর্‌সিদাবাদী সৈয়দজীর আর একটি পদ—ভাব সম্মিলন:—

ওহে পরাণ বঁধু তুমি।
কি আর বলিব আমি।
তুমি সে আমার আমি সে তোমার
তোমার তোমাকে দিতে কি যাবে আমার।
কে জানে মনের কথা কাহারে কহিব।
তোমার তোমারে দিয়া তোমার হৈয়া রব।
সৈয়দ মর্ত্তুজা কহে আমি ও না জানি।
ভবসিন্ধু হৈতে পার যে কর আপনি।

ভণিতা না থাকিলে জ্ঞানদাস কি সেই রকম কাহারও রচনা মনে হইত।

মুসলমান কবিগণের রচনা হইতে আমরা একটি গোষ্ঠলীলা শুনাই। ইহার রচয়িতা নাসির মহম্মদ—

চলত রাম সুন্দর শ্যাম ধেনু সঙ্গে গোঠে রঙ্গে
পাঁচনি কাচনি বেত্র বেণু মুরলী খুরলি গান রি।
প্রিয় শ্রীদাম সুদাম মেলি তপন তনয়া তীরে কেলি
ধবলি শাঙলি আঁওরি, ঝাওরি ফুকারি চলত কান রি।
বয়সে কিশোর মোহন ভাতি বদন ইন্দু জলদ কাঁতি
চারু চন্দ্রক গুঞ্জা হার বদনে মদন ভান রি।
আগম নিগম বেদ সার লীলায় করত গোঠবিহার
নসির মামুদ করত আশ চরণে শরণ দান রি।

আমরা মুসলমান কবির রচিত ব্রজবুলী একটি শুনাই। দোললীলা,

নওল কিশোরী কান্তি খেলত রঙ্গে।
চুয়া চন্দন আবীর গুলাব ফেকত শ্যামর অঙ্গে।

কাণ্ড হত করি ফিরত শ্রীহরি ফিরি ফিরি বোলত নাই।
ঘুমট উঠায়ে বয়ানে ছাপায়ত বেরি বেরি যৈসে মেঘমে চাঁদ লুকাই।
ললিতা এক সখী কাণ্ড হাত করি দেয়ত কানু নয়ান
বৃকভানু কিশোরী দুঁহু,বাহু ধরি মারত শ্যাম বয়ান।
আওর এক সখী জীউ জীউ করি কাঁহা লাগাওয়ে আবীর।
কমরি কাণ্ড লেই কান নয়ানে বেরি দেওত হঁ হা করত কবীর।

রচয়িতা 'কমরি' সম্ভবতঃ কবি কমর আলি; ইহাঁর বহু পদাবলী, 'রাধার সম্বাদ' ও 'ঋতুর বারমাস' নামক নিবন্ধ আছে। আলি রাজা ভিন্ন আর কোনও মুসলমান বৈষ্ণব-কবিই তাঁহার সমান পদ প্রণয়ন করেন নাই। সাধারণ্যে তিনি কমর আলি পণ্ডিত নামে পরিচিত ছিলেন। অপরাপর অনেক মুসলমান 'পণ্ডিতের' ন্যায় তিনিও এতদ্দেশীয় সমাজের অতি নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগকে সঙ্গীত বিদ্যায় শিক্ষা দিতেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চট্টগ্রাম অঞ্চলে অস্পৃশ্য নীচশূদ্রদিগের ঘর হইতে অনেক প্রাচীন পুঁথি, উৎকৃষ্ট রচনা বাহির হইতেছে। আশ্চর্য্য! আমরা একটি শ্যাম বিষয়ক পদ শুনাই—রচয়িতা আলি আকবর;

মায়ের চরণে নিবেদি। ধ্রু।
জননি গো মা—
হরে যারে হৃদে ধরে সে পদনি পাব নি রে
অন্তরে জপিলে পাব নি॥
তরাহ জনম আদি আমি কথ অপরাধী
না জানি কোন পাপ কৈরাছি॥
দয়াময়ী নাম ধর অধম তারাইতে পার
আমারে তরাইতে ক্ষতি কই।
আলি আকবর মতিহীন মনের বাঞ্ছা অনুদিন
ত্রাণ কর,পদছায়া দেই॥

মুসলমানই হউক, যাহা হউক, ভক্ত সাধকের গীন মনে হয় না কি? ভিন্নধর্ম্মী মুসলমানের এমন সব হিন্দুজনোচিত ভাবোচ্ছ্বাস দেখিলে চমৎকৃত না হইয়া থাকা যায় না। এ সকল পদাবলী হিন্দুর প্রতি মুসলমানের শ্রদ্ধা অনুরাগের নিদর্শন সন্দেহ নাই।

হিন্দুর ন্যায় মুসলমানের রচিত শক্তি সঙ্গীত অপেক্ষা বৈষ্ণব পদাবলী অনেক

অধিক বলাই বাহুল্য। এ জাতীয় গীতির মূল প্রস্রবণ যে প্রেমময় গোরাচাঁদ! তিনি যে হিন্দু মুসলমান বাছেন নাই, সকলকেই মাতাইয়াছিলেন।

মুসলমান কবি রচিত সকল শ্রেণীর পদাবলীই পাওয়া যায়; আমরা একটি 'গৌরচন্দ্রিকা' শুনাই—

জিউ জিউ মেরে মনচোরা গোরা।
আপহি নাচত আপন রসে ভোরা॥
খোল করতাল বাজে ঝিকি ঝিকিয়া।
আনন্দে ভকত নাচে লিকি লিকিয়া॥
পদ দুই চারি চলু নট নটিয়া।
থির নাহি হোয়ত আনন্দে মাতোলিয়া॥
ঐছন পঁহুকে যাহু বলিহারি।
সাহ আকবর তেরে প্রেম ভিখারী॥

গানটির ভণিতায় 'সাহ আকবার' নাম রহিয়াছে। তজ্জন্য কেহ কেহ পদটি ভুবন-বিখ্যাত উদারচেতা দিল্লীশ্বর আকবার বাদশাহের রচিত বলিয়া অনুমান করেন। সম্রাট্ নাকি ভক্তগণসহ শ্রীচৈতন্য দেবের হরি সঙ্কীর্ত্তন চিত্র দেখিয়া বিহ্বল হইয়া এই পদটি রচনা করিয়াছিলেন। ভক্তের নিকট ইহাও সম্ভব বলিয়া বিবেচিত হওয়া বিচিত্র নহে।

আমরা আর একটি পদ তুলিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করি; রচয়িতা— ফকির হবীব—

দেখ মাই অপরূপ নন্দ গোপাল।
কপালে চন্দন ফোঁটা   বিনোদ চালনি খোঁটা
গলে শোভে বকুল মাল॥
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে   কটাক্ষে ভুবন ভোলে
শ্রীমুখ অতি অনুপাম।
করেতে মোহন বেণু   নির্ম্মল কোমল তনু
অতসী কুসুম জিনি শ্যাম॥
কটিতে পীতাম্বর   দেখিতে মনোহর
মুকুন্দ মোহন বহুরায়।
দাঁড়াইয়া কদম্ব তলে   সুনাদ মুরলী পূরে
তিন লোক মোহিত যায়॥
ফকির হবীব বলে   কানুরে দেখিনু ভালে
যেন শশী পূর্ণ উদয়।
হেন মোর করে হিয়া   কানুরে সমুখে থুয়া
নিরবধি দেখহুঁ সদায়॥

হিন্দু আমরা মুসলমানগণকে দেব-নিন্দক অনাচারী অস্পৃশ্য মনে করি; গোঁড়া মুসলমানগণও আমাদিগকে পুতুল পূজক, কাফের কমবক্ত বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকেন; কিন্তু এমন সব রচনা পড়িলে আমাদের মুসলমানকে ভ্রাতৃ সম্বোধন করতঃ গাঢ় আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিতে ইচ্ছা হয় না কি?

মুসলমানের হৃদয়ে হিন্দুদের দেবতার প্রতি ভক্তিসূচক এ সব ভাব আসিল কোথা হইতে? ইহার কারণ কি? ইহার প্রথম ও প্রধান কারণ বোধ হয় বহুকাল একত্র বাস নিবন্ধন পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির স্ফুরণ; দ্বিতীয় কারণ বোধ হয় শ্রীচৈতন্য-চরণ-সমুদ্ভবা প্রেম-মন্দাকিনীর তরঙ্গাভিঘাত; তৃতীয় কারণ সম্ভবতঃ কবি হৃদয়ের সার্ব্বজনীন উদারতা। এই উদারতার গুণেই বিধর্ম্মী আণ্টুনি ফিরিঙ্গি একদিন হিন্দুর মর্ম্ম স্পর্শ করিয়া গাহিয়াছিলেন,

খৃষ্টে আর কৃষ্ণে কিছু ভিন্ন নাই রে ভাই।
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এও কথা শুনি নাই।
আমার খোদা যে হিন্দুর হরি সে,
ঐ দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে আছে;
আমার মানব জনম সফল হবে. যদি রাঙা চরণ পাই।

মুন্সী এক্রামুদ্দীন লিখিয়াছিলেন,—"কোন দেশীয় ভাষায় কবিতা লিখিয়া সফল হইবার নিমিত্ত তদ্দেশীয় ভাবের উদ্দীপনা আবশ্যক......বাঙ্গালার জাতীয়ভাবে মুসলমান অনুপ্রাণিত হইতে পারেন নাই.....শ্রীকৃষ্ণে দেবত্ব আরোপে মুসলমান হৃদয় দ্রবীভূত হওয়া দূরে থাকুক ব্যঙ্গভাবে পরিণত না হইলেই সুখের কথা। সুতরাং হিন্দুর জাতীয়-ভাব-শূন্য মুসলমানের হিন্দুর জন্য কবিতা লেখা সম্ভব হইল না।"

মুন্সীজির কথাগুলি যে সমীচীন নহে, আমাদের উদ্ধৃত পদগুলি হইতেই বুঝা যাইবে। এমন বিস্তর পদ আছে, নমুনা স্বরূপ আমরা গুটিকতক মাত্র তুলিয়াছি। মুন্সী আবদুল করিম সাহেবের সংগ্রহ হইতে বুঝা যায়, তিনি প্রায় পঞ্চাশ জন মুসলমান পদকর্ত্তার পদ সংগ্রহ করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন। সুপ্রসিদ্ধ 'সাহিত্য' পত্রিকায় দেখিতেছিলাম, পদাবলী সাহিত্যের ভণিতায় ১৪।১৫ জন মুসলমান কবির নাম পাওয়া যায়। (মাঘ' ১৫)

ইহা ত গেল শুধু পদাবলীর কথা। মুসলমান কবিগণের রচিত কাব্য ইতিহাসাদি ও যাহা বাঙ্গালা ভাষায় আছে, সে সকলের ভিতরও দেশীয় ভাবের অসদ্ভাব নাই। কিন্তু তৎসমস্তের পরিচয় দিবার উপস্থিত আমাদের স্থানাভাব

আমরা নিতান্ত আধুনিক সাহিত্য বা সাহিত্যিক সম্বন্ধে বড় কিছু বলিতেছি না। আধুনিক সাহিত্যিক সম্বন্ধে কোন কথা না বলিলেও একটি নাম আমাদের উল্লেখ না করা অন্যায় হইবে। 'বিষাদ সিন্ধু' প্রণেতা স্বর্গগত মীরমশারফ হোসেন বঙ্গসাহিত্যে মুসলমান লেখকগণের অগ্রণী। ইঁহার রচনা গভ্য, ভাষা সুন্দর।

মুসলমান বঙ্গসাহিত্য-সেবিগণের পরিচয় দিতে গিয়া আর আমি আপনাদের মূল্যবান সময় বৃথা নষ্ট করিব না। পদকল্পতরুতে তিন জন মুসলমান পদকর্ত্তার নাম পাওয়া যায়। পদকল্পলতিকা, রসমঞ্জরী, ও গীতচিন্তামণি হইতে রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র তাঁহার অপূর্ব্ব গ্রন্থ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' তে এগার জনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। পরলোকগত রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় কয়েক জন মুসলমান কবির পদাবলী সংগ্রহ করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন। রাজসাহীর বাবু ব্রজসুন্দর সান্যাল মহাশয় অনেক মুসলমান কবির পদাবলী ও যথাসম্ভব পরিচয় পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতেছেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার গৌরবের কোষগ্রন্থ 'বিশ্বকোষে' অনেকগুলি মুসলমান গ্রন্থকারের নাম ও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাদির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা কৃতিত্ব চট্টগ্রাম আনোয়ারা স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত আবদুল করিম B.A. সাহেবের। তাঁহার সংগৃহীত অপ্রকাশিত পদাবলী এবং পুঁথির বিবরণ এখনও নানা পত্রিকায় বাহির হইতেছে। তাঁহার অধ্যবসায়, পরিশ্রম, বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রীতি ও অনুরাগ এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে উদারতার প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। চট্টগ্রামে মুন্সী আবদুল করিম যাহা করিয়াছেন দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। বাঙ্গালার স্থানে স্থানে যদি তাঁহার মত মাতৃভাষার একনিষ্ঠ সাধক কর্ম্মঠ ভাবুক ব্যক্তি পাওয়া যায়, তাহা হইলে বঙ্গ সাহিত্যের প্রভূত উপকার হয়; অনেক লুপ্তপ্রায় ও গুপ্তরত্নের উদ্ধার হয় সন্দেহ নাই।

শ্রীঅনাথকৃষ্ণ দেব।

হিন্দুসমাজ তত্ত্ব।*

হিন্দুসমাজের প্রধান লক্ষণ বর্ণাশ্রমবিভাগ। মহর্ষি মনু প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহা সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত এবং রামায়ণ ও মহাভারতের যুগেও ইহা সুপ্রতিপালিত হইতে দেখা যায়। যদিও বৌদ্ধধর্ম্মের আন্দোলনে এবং পরে মুসলমান ধর্ম্মের প্রভাবে, এবং সর্ব্বশেষে ইউরোপীয় ভাবের সংঘাতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনেক শক্তি ক্ষয় হইয়া যায় তথাপি আজও উহাকে হিন্দুসমাজের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব বলিলে অন্যায় হইবে না।

বৈদিকযুগে দেখা যায়, আর্য্যগণ অনার্য্যগণকে পরাজিত করিয়া পঞ্জাবপ্রদেশে বাস করিতেছিলেন। অনার্য্যগণ শারীরিক সৌন্দর্য্য, মানসিক বৃত্তি ও নৈতিক বল সকল বিষয়েই আর্য্যগণ অপেক্ষা অত্যন্ত হীন ছিল। এখন অনার্য্যগণের সহিত আর্য্যগণের ব্যবহার তিন প্রকার হওয়া সম্ভব ছিল। প্রথম, অনার্য্য জাতিকে সমূলে ধ্বংস করা। ইচ্ছা করিয়াই হউক আর অনিচ্ছায়ই হউক আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায় ইউরোপীয়গণ এই নীতির অনুসরণ করিয়াছেন। দ্বিতীয়, পরস্পরের মধ্যে বিবাহ হইয়া দুইটী জাতি মিলিয়া একজাতি হইয়া যাওয়া। আরব প্রভৃতি মুসলমানজাতিগণ বিজিত জাতির সহিত এইরূপ আচরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের সমূহ অনিষ্ট হইবার কথা, বিজিত জাতির (যদি তাহারা নিকৃষ্ট হয়) দোষ গ্রহণ দ্বারা তাহাদের বংশ নিকৃষ্ট হইয়া যাইবার কথা। ইতিহাসেও দেখা যায়, কোনও একটী মুসলমানজাতি অধিক-কাল প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে নাই; আরব, তুরক, মোগল, পাঠান, পারস্য প্রভৃতি নানা জাতি একের পর আর একটী প্রতাপশালী হইয়াছিল।

তৃতীয় ব্যবহারটী হইতেছে, অনার্য্যগণকে স্বসমাজের নিম্নস্তরে স্থান দিয়া রক্ষা করা; আর্য্যগণ তাহাই করিয়াছিলেন। অনার্য্যগণ আর্য্যগণের সহবাসে ক্রমশঃ উন্নতি পথে অগ্রসর হওয়ায় তাহাদের যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল। অপর পক্ষে উভয় জাতির মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ায় আর্য্যগণের বংশের অপকর্ষ জন্মিতে পারে নাই।

এই আর্য্য অনার্য্যের বর্ণসঙ্করতা নিবারণের জন্যই বর্ণভেদ বা জাতিভেদের

---

* চুচুড়া বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত।

উৎপত্তি। বর্ত্তমান কালের হিন্দুও যে আর্য্যজনোচিত সৌন্দর্য্য, বুদ্ধি ও চরিত্র কতকটা উত্তরাধিকার করিয়াছেন, তাহার জন্ত তিনি এই বর্ণভেদ প্রথার নিকট ঋণী।

যাহাদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ তাহাদের পরস্পরের ঘনিষ্ঠ ভাবে স্ত্রীপুরুষের মেলামেশা উচিত নয়। এই জন্য তাহাদের বাটীতে নিমন্ত্রণভোজনাদিও নিষেধ করা হইয়াছে।

শূদ্রগণকে হীনাবস্থ করিয়া রাখার জন্য অনেকে মনুকে দোষ দেন; কিন্তু যখন মনে পড়ে সেই সকল শূদ্র কোল, ভীল ও নাগাদের জাতি ছিল, তখন এই নিয়মের আবশ্যকতা বুঝা যায়। এই সকল হীনব্যক্তির হস্তে পড়িলে জ্ঞান বিজ্ঞান শাসনক্ষমতা এবং ধনের যে বহুল পরিমাণে অপপ্রয়োগ হইত সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? *

প্রথম প্রথম সমুদয় আর্য্যগণই একজাতীয় ছিলেন—সকলকেই সব রকম কাজ করিতে হইত এবং পরস্পরের মধ্যে বিবাহের আদানপ্রদান চলিত। ক্রমে সমাজের উন্নতির সঙ্গে শ্রমবিভাগের আরম্ভ হইল। সমাজের উৎকৃষ্ট অংশ জ্ঞানচর্চ্চা ও শাসনকার্য্য লইয়া রহিলেন, অবশিষ্ট লোকে কৃষি শিল্প বাণিজ্যাদি দ্বারা সমাজ পোষণে নিযুক্ত হইলেন। এইরূপে আর্য্যগণের মধ্যে তিনটী বর্ণের সৃষ্টি হইল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে বিবাহাদি চলিত। ক্রমে বৈশ্যগণের সহিত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বিবাহ কমিয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বিবাহ তখনও চলিতে লাগিল। রামায়ণ মহাভারতাদিতে দেখা যায়, অনেক ঋষি রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোনও সঙ্কর বর্ণের সৃষ্টি হইত না, সন্তান ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় হইত। শূদ্রের সহিত দ্বিজাতিগণের মিশ্রণে যে সকল সঙ্করজাতির উৎপত্তি হইত তাহারা অত্যন্ত হেয় ছিল। দ্বিজগণের মধ্যে উচ্চ জাতীয় পুরুষের সহিত নিম্নজাতীয়া স্ত্রীর বিবাহ ততটা দোষাবহ ছিল না, কিন্তু নিম্নজাতীয় পুরুষের সহিত উচ্চজাতীয়া স্ত্রীর বিবাহ নিন্দনীয় ছিল।

যাহা হউক এই সকল বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি সমাজের অত্যন্ত অনিষ্টকর বলিয়া বিবেচিত হইত। মনুমহারাজ বলেন—

যত্র ত্বেতে পরিধ্বংসা জায়ন্তে বর্ণদূষকাঃ।
রাষ্ট্রিকৈঃসহ তদ্রাষ্ট্রং ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি॥

---

* এই শূদ্র শব্দটার অর্থ কালক্রমে একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানকালে যিনি ব্রাহ্মণ নহেন তাঁহাকেই শূদ্রনামে অভিহিত করা হইয়াছে।

যে রাজ্যে বর্ণদূষক বর্ণসঙ্করজাতি সমুৎপন্ন হয় সে রাজ্য অচিরাৎ রাজ্যবাসী সমস্ত প্রজাবর্গের সহিত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইহার কারণ অসদ্বংশীয়ের সহিত মিশ্রণে সদ্বংশীয়ের সন্তান অপকৃষ্ট হইবে। মনুসংহিতা বলেন "অনার্য্যতা, নিষ্ঠুরতা এবং বধকর্ম্মের অনুষ্ঠান এই সকল মনুষ্যের নীচজাতিত্ব প্রকাশ করে। অসদ্বংশসম্ভূত ব্যক্তি পিতৃপ্রকৃতি সম্পন্ন বা মাতৃপ্রকৃতি সম্পন্ন অথবা তদুভয়সম্পন্ন হয়, নিজ নীচকুলোদ্ভূতি কোনরূপে গোপন করিতে পারে না। মহাকুল-প্রসূত ব্যক্তির জনমে কোন দোষ থাকিলে, সে অবশ্যই অল্পপরিমাণে হউক আর প্রচুর পরিমাণেই হউক তাহার (নীচকুলোদ্ভব) পিতৃমাতৃস্বভাবের অনুকরণ করিবে।" *

পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে মানুষের প্রধান প্রধান দোষ ও গুণগুলি বংশানুক্রমিক (hereditary) এবং কিরূপে ধনবৈষম্য ও অন্যান্য কারণে একটী জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠব্যক্তির সংখ্যাহ্রাস এবং নিকৃষ্টব্যক্তির সংখ্যাবৃদ্ধি হয় তাহাও আলোচিত হইয়াছে। সেই সিদ্ধান্তগুলির আলোকে এই বর্ণভেদপ্রথা অধ্যয়ন করা যাক।

সমাজের চক্ষে একজন মানুষের শ্রেষ্ঠতা তিনটী কারণের উপর নির্ভর করে। প্রথম তাহার নিজের গুণাবলি; দ্বিতীয় তাহার ধন, তৃতীয়, তাহার বংশমর্য্যাদা বা আভিজাত্য। প্রথমটীর কথা ছাড়িয়া দিয়া শেষের দুইটীর মধ্যে কোন্‌টী ভাল তাহার বিচার করা যাক। ধনের সহিত মানুষের দেহ মনের কোনও অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নাই, অনেক স্থলে ইহা অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে। কাজেই বর্ত্তমান ইউরোপে যেরূপ ধনশালিতাকেই সর্ব্বোচ্চ আসন দেওয়া হইয়াছে তাহাতে অনেক অযোগ্য ব্যক্তি ধনবলে বংশবৃদ্ধি করিতেছেন, কিন্তু অনেক যোগ্য ব্যক্তি ধনহীন হওয়ায় অবিবাহিত থাকিয়া নির্ব্বংশ হইতেছেন।

আমাদের সমাজে ধনের আসন আভিজাত্যের নিম্নে। বর্ত্তমানের বিজ্ঞান এই নিয়মের সমীচীনতা প্রতিপাদিত করিতেছে। একজনের শ্রেষ্ঠতা বিচার

---

* অনার্য্যতা নিষ্ঠুরতা ক্রূরতা নিষ্ক্রিয়াত্মতা।
পুরুষং ব্যঞ্জয়ন্তীহ লোকে কলুষ-যোনিজম্‌। ৫৮
পিত্র্যং বা ভজতে শীলং মাতুর্ব্বোভয়মেব বা।
ন কথঞ্চন দুর্যোনিঃ প্রকৃতিং স্বাং নিযচ্ছতি। ৫৯
কুলে মুখ্যেঽপি জাতস্য যস্য স্যাদ্‌ যোনিসংকরঃ।
সংশ্রয়ত্যেব তচ্ছীলং নরোঽল্পমপি বা বহু। ৬০
১০ম অধ্যায়।

করিতে হইলে শুধু তাহার গুণাবলি দেখিলে চলিবে না তাহার মাতৃ ও পিতৃকুলের ইতিহাসও জানিতে হইবে। কেননা, এমন অনেক বংশানুক্রমিক দোষ-গুণ আছে যাহা দুই এক পুরুষ পরে প্রকাশ পায়। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে বংশমর্য্যাদার সহিত একজনের দেহ মন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে বদ্ধ রহিয়াছে এবং বর্ণভেদ প্রথা প্রচলিত থাকায় অন্যান্য সমাজের ন্যায় এখানে ধনবৈষম্যের জন্য যোগ্যব্যক্তির বংশ নিকৃষ্ট হইতে পাইতেছে না—রক্তের বিশুদ্ধত্ব সমধিক পরিমাণে রক্ষিত হইতেছে। নীচবংশোদ্ভব ব্যক্তি যতই ধনবান হউক না কেন সে কিছুতেই উচ্চবংশে বিবাহ করিতে পারে না।

দেখা গেল, আর্য্য অনার্য্যের মিশ্রণ নিবারণের জন্য, বর্ণভেদের সৃষ্টি এবং পরে আর্য্যগণের মধ্যে ধনবৃদ্ধির সহিত অন্যান্য সমাজে যেরূপ অযোগ্যলোকের সংখ্যাবৃদ্ধি ও যোগ্যলোকের সংখ্যাহ্রাস হয় তাহা নিবারণ করিবার জন্য, তাহাদের মধ্যে তিন বর্ণের উৎপত্তি। প্রথমতঃ, জ্ঞানচর্চ্চা, শিক্ষাবিধান ও রাজকার্য্য স্বভাবতঃ সমাজের উৎকৃষ্টতর অংশের হস্তে আসিয়া পড়ে; তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় করিয়া বৈশ্য বা সাধারণ লোক হইতে পৃথক্ করা হয়। এইরূপে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বংশ, নিকৃষ্টতর লোকের সহিত মিশ্রিত না হওয়ায় অপকর্ষ লাভ করিতে পারে না, বরং অনেক স্থলে উৎকর্ষ লাভ করিতে থাকে। তারপর দেখা গেল, যিনি জ্ঞানালোচনা করিবেন তাঁহার শান্তিপ্রিয় ও জ্ঞানপিপাসু হওয়া আবশ্যক এবং যিনি রাজকার্য্য পরিচালন করিবেন তাঁহার যুদ্ধপ্রিয় ও কর্ম্মকুশল (practical) হওয়া আবশ্যক। একজন জ্ঞানবীর, অপরজন কর্ম্মবীর; একজনের সাত্ত্বিক ও অপরের রাজসিক গুণের প্রয়োজন। তখন, তাহাদেরও বংশদুইটী পৃথক করা হইল। এইরূপে এই সুবুদ্ধিপরিচালিত কৃত্রিম নির্ব্বাচনের সহায়তায় ব্রাহ্মণের বংশে জ্ঞানী ও শিক্ষক জ্ঞানোচিত গুণাবলী; ক্ষত্রিয়ের বংশে যোদ্ধা ও শাসনকর্ত্তৃজনোচিত গুণাবলি এবং বৈশ্যের বংশে কৃষক ও শিল্পীজনোচিত গুণসমূহ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই বর্ণভেদপ্রথা যে কেবল বিজ্ঞানসম্মত তাহা নহে, ইতিহাসও ইহার শ্রেষ্ঠতা যথেষ্ট প্রতিপাদন করিয়াছে। ব্রাহ্মণের অপেক্ষা উচ্চতর জ্ঞানী; ক্ষত্রিয়ের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বীর এবং বৈশ্যের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর শিল্পী পৃথিবীর কোনও জাতি কোনওকালে দেখাইতে পারে নাই।

বর্ণভেদপ্রথার বিরুদ্ধে কয়টী প্রধান আপত্তির উত্থাপন হইয়া থাকে। তদ্বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

(১) কেহ কেহ বলেন, সমাজের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা না থাকায়

প্রতিভার স্ফুরণ হয় না। ইহার বিরুদ্ধে প্রথম বক্তব্য এই যে, বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে প্রতিভাবান ব্যক্তির, অন্ততঃ বুদ্ধিমান্ (Talented) ব্যক্তির জননের পক্ষে বংশপ্রভাবই সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকর। কাজেই বলিতে হইবে বর্ণভেদপ্রথারগুণে অধিকসংখ্যক প্রতিভাবান্ বা বুদ্ধিমান্ লোক জন্মগ্রহণ করিবে। আর যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর সেই প্রতিভার স্ফুরণ নির্ভর করে তাহাও হিন্দুসমাজে অপকৃষ্ট হইবার কোনও কারণ নাই। প্রতিযোগিতা সমস্ত জাতির মধ্যে অবাধ না হইলেও প্রত্যেকবর্ণের মধ্যে যে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়সমাজের মধ্যে এবং বৈশ্য বৈশ্যসমাজে অপরের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও অধিকতর যশস্বী হইবার চেষ্টা করিতেন। উপযুক্ত পণ্ডিতের পুত্রের পক্ষে পণ্ডিত হওয়া এবং শিল্পীর পুত্রের পক্ষে শিল্পী হওয়া সহজ, কেননা বংশানুক্রমিক গুণাবলির কথা ছাড়িয়া দিলেও বাল্যকাল হইতে পৈত্রিক ব্যবসায়ে রুচি জন্মিবার ও শিক্ষালাভ করিবার সুবিধা রহিয়াছে; নিজবংশের কীর্ত্তিকলাপ শ্রবণে বালকের মনে যেরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হয় এমন আর কিছুতে হয় না। দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, বর্ণভেদপ্রথার এই সকল বিপক্ষ সমালোচকগণ পাশ্চাত্যসমাজের মাপকাটী লইয়া আমাদের সমাজের পরিমাণ করিতে আসিয়া মহাভ্রমে পতিত হন। আহার্য্যসংগ্রহ ও ধনলিপ্সাই সে সমাজের লোককে পরিশ্রম করিতে বাধ্য করে, কাজেই তাঁহারা মনে করেন ঐ দুটীর অভাব হইলেই লোকে অলস হইব। আমাদের সমাজ কিন্তু ধর্ম্মবিশ্বাসী— এখানে অন্নাভাবে কষ্ট ছিলনা বটে এবং অর্থকে কেহ পরমার্থ জ্ঞান করিতেন না বটে, কিন্তু সমাজের—শুধু সমাজ কেন সমগ্র বিশ্বের—হিতেরজন্য সদাসর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিবার জন্য শাস্ত্রের অমোঘ আদেশ—এবং সে আদেশ এখানে যেরূপ সুপ্রতিপালিত হইয়াছিল এমন আর কোথায়ও হয় নাই, কেন না হিন্দু জীবনের যে একমাত্র উদ্দেশ্য মোক্ষলাভ তাহার জন্য শাস্ত্রাদেশ পালন অত্যাবশ্যক। স্পেন্সারের ন্যায় নাস্তিক এই ধর্ম্মানুশাসনের বল কেমন করিয়া বুঝিবেন? যাহার প্রভাবে ব্রাহ্মণ জীবনব্যাপী দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইতেন, ক্ষত্রিয় যুদ্ধে মৃত্যু কামনা করিতেন, বৈশ্য ইলোরার গুহা এবং মাদুরার মন্দির নির্ম্মাণ করিতেন।

(২) বর্ণভেদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তি এই যে ইহা কতকগুলি কার্য্য কতকগুলি লোকের একচেটীয়া করিয়া দিয়াছে, তাহাতে সমাজের আবশ্যকতানুযায়ী শ্রমবিভাগ থাকিতে পারে না। মনে করুন কোনও এক ব্যবসায়ে লোকাধিক্য হওয়ায় বা আর কোনও কারণে জীবিকা অর্জ্জন কষ্ট হইতেছে, তখন সে

জাত্যভিমান নিবন্ধন নিম্নজাতির বৃত্তি অবলম্বন করিতে চায় না। আমাদের শাস্ত্রকার কিন্তু যুক্তিপূর্ণ কথাই বলিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ যদি নিজের বৃত্তিদ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে না পারেন তাহা হইলে ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি এবং তাহাতেও সুবিধা না হইলে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিবেন তাহাতে তাঁহার কোনও লাঘব হইবে না; ক্ষত্রিয়ও ঐরূপ বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন। বাস্তবিক, চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীতি হয় যে রক্তের বিশুদ্ধতারক্ষা করাই বর্ণভেদের উদ্দেশ্য, শ্রমবিভাগ আনুসঙ্গিক প্রক্রিয়ামাত্র। জাতিব্যবসায় ত্যাগ করিবার জন্য কাহার জাতি গিয়াছে শুনিয়াছেন কি?

এতদ্ভিন্ন শাস্ত্রে আপদ্ধর্ম্ম বলিয়া একটী কথা আছে। জাতীয় ইতিহাসে মাঝে মাঝে এমন সময় আসে যখন সকল বর্ণকে নিজ নিজ বৃত্তি ত্যাগ করিয়া সমাজ রক্ষায় নিযুক্ত হইতে হয়। এক সময় দুর্ব্বৃত্ত ক্ষত্রিয়গণ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া ব্রাহ্মণ পরশুরাম ও তাঁহার গোষ্ঠী যুদ্ধে মন দিয়াছিলেন। আর সেদিন যখন হিন্দুসমাজের অস্তিত্বরক্ষা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন ছত্রপতি শিবাজীর নায়কতায় মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণগণ কোশাকুশীর পরিপর্ত্তে তরবারি গ্রহণ করেন, কৃষকগণ হলের পরিবর্ত্তে ভল্ল গ্রহণ করে।

(৩) বর্ণভেদের বিরুদ্ধে তৃতীয় আপত্তি এই যে ইহা একরূপ স্বার্থপর আভিজাত্য (aristocracy) এবং ইহা সাম্যের (eqality) বিরুদ্ধে যায়। বর্ত্তমান ভারতের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল লেখক ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'সামাজিক প্রবন্ধ' নামক পুস্তকে এবিষয়টি যেরূপ সুন্দর ভাবে বুঝাইয়াছেন তাহার পর আর কোনও কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। তিনি দেখাইয়াছেন সাম্য দুই প্রকার আছে; প্রথম, সমস্ত মানুষই সমাজে সমান অবস্থায় থাকা উচিত; দ্বিতীয় সমুদায় প্রাণীই একের বিভূতি অতএব সকলেই সমান। প্রথমটী ইউরোপীয়ভাব, কিন্তু উহা একটা কথার কথা হইয়া রহিয়াছে; বাস্তবিক পক্ষে কোনও সমাজে সকল লোক সমান অবস্থায় থাকিতে পারে না। দ্বিতীয়টী হিন্দুভাব, উহা সামাজিক হিসাবে লোকের মধ্যে বিভিন্নতা স্বীকার করে কিন্তু কাহাকেও অবজ্ঞা করে না; ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, এমন কি গোও কুক্কুর পর্য্যন্ত সকলের প্রতিই সমদর্শী হয়; জীব কর্ম্মফলে নানা অবস্থা প্রাপ্ত হয় কিন্তু তাহাতে তাহাদের মধ্যে মৌলিক কোনও ভেদ আছে এরূপ বুঝায় না।

তবে এস্থলে ইহাও স্বীকার্য্য যে পরবর্ত্তী কালের অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি উচ্চশ্রেণীস্থ লোক নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগকে অত্যন্ত অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন।

আমি বলিতে চাহি ইহা কখনই ব্রহ্মদর্শী আর্য্যের যোগ্য ব্যবহার নহে। তাঁহাদের এই নিন্দার্হ ব্যবহারে তাঁহারা যে শাস্ত্রার্থ হৃদয়ঙ্গম করেন নাই তাহাই প্রতিপন্ন হয় মাত্র।

ইউরোপীয় সাম্যবাদের (socialism) মূল অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে ধনবৈষম্য ও তজ্জনিত দারিদ্র্য দুঃখ হইতেই উহার উৎপত্তি। সেখানকার ক্ষমতাশালী ব্যক্তিবর্গ বিলাস সরোবরে ক্রীড়া করিতেছেন এবং নিম্নশ্রেণীস্থ লোকগণ দারিদ্র্য মরুভূমে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে; কাজেই সমাজের নিয়ম ওলটপালট করিয়া দিয়া সকলকে এক অবস্থায় আনিবার চেষ্টা চলিতেছে। হিন্দুর স্বাভাবিক উদারতা ও বিচক্ষণতা এখানে সেরূপ বিসদৃশ দৃশ্যের অবতারণা হইতে দেয় নাই। এখানে যিনি যে পরিমাণে ক্ষমতাশালী তিনি সেই পরিমাণে দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করিলেন।

বাণিজ্যে বসতেলক্ষ্মী তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ॥

তাই বাণিজ্য ও কৃষিকর্ম্ম বৈশ্যের আয়ত্ত হইল, ক্ষত্রিয়ের রাজসেবা বিহিত হইল এবং সমাজকর্ত্তা ব্রাহ্মণ আপনি ভিখারী হইলেন। ব্রাহ্মণকে ঈর্ষা করিতে চাও ধনলোভ ত্যাগ কর, বিলাস বর্জ্জন কর, সদাচারী হও, তপস্যাপরায়ণ হও। দুঃখের বিষয় সে পথে যাত্রীর সংখ্যা বড় অধিক নহে। যাহা হউক, ব্রাহ্মণ আদর্শ থাকায়, আমাদের নিম্নশ্রেণীস্থ লোকের মধ্যে যেরূপ সদাচার দেখা যায় পাশ্চাত্যদেশে সেরূপ দেখা যায় না। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আভিজাত্য বটে, কিন্তু তাহা ধনের উপর নির্ভর করে না মানবের স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠতা ভিন্ন অন্য কোনও অবস্থার উপর উহার ভিত্তি স্থাপিত হয় নাই। আজকালকার অনেক বৈজ্ঞানিক ঐরূপ আভিজাত্যের প্রশংসা করিতেছেন। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আভিজাত্য বটে কিন্তু উহা শারীরিক সৌন্দর্য্যের আভিজাত্য, প্রখর বুদ্ধির আভিজাত্য, নৈতিক বলের আভিজাত্য।

এই সম্পর্কে আর একটা কথার বিচার আবশ্যক হইতেছে। অনেকে বলেন বর্ণভেদ প্রথার দোষে একটী নিম্নজাতি চিরকালই অধম থাকিয়া যায়, তাহারা আর সমাজে উন্নতিলাভ করিতে পারে না এবং একটী উচ্চজাতি অযোগ্য হইয়া পড়িলেও উন্নত থাকিয়া যায়। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র ও ইতিহাস উভয়েই একথার অযথার্থতা প্রতিপাদিত করিতেছে। মনুসংহিতার মতে—

"জাতিগণ যুগে যুগে তপস্যা প্রভাবে ও বীজোৎকর্ষে মনুষ্যমধ্যে যেমন

জাত্যুৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তদ্বৈপরীতে তাহাদের জাত্যপকর্ষও ঘটিয়া থাকে। বক্ষ্যমাণ ক্ষত্রিয়েরা উপনয়নাদি সংস্কারাভাবে এবং যজনাধ্যয়নাদির অভাবে ক্রমশঃ শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছেন। ... স্বপত্নী শূদ্রাতে ব্রাহ্মণ হইতে জাতা পারশব নাম্নী কন্যা যদি অন্য ব্রাহ্মণে বিবাহ করে এবং তাহার কন্যাকে যদি অপর ব্রাহ্মণে বিবাহ করে এবং এইরূপ ব্রাহ্মণ সংসর্গ যদি ধারাবাহিক সাত পুরুষ পর্য্যন্ত হয় তবে সপ্তম জন্মে ঐ পারশবাখ্যবর্ণ বীজের উৎকর্ষ জন্য ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। এবং এই ক্রমে যেরূপে শূদ্র ব্রাহ্মণ হয়, তদ্রূপ ব্রাহ্মণেরও শূদ্রত্বপ্রাপ্তি হয়—ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্বন্ধেও ঐরূপ জানিবে।"*

এইবার চতুরাশ্রমবিষয়ে আলোচনা করা যাউক। প্রথম আশ্রম ব্রহ্মচর্য্য বা শিক্ষার কাল। শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে প্রবন্ধান্তরে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। এখানে কেবল এইটুকু বলিতে চাই যে প্রাচীন আর্য্য শিক্ষাপ্রণালী কেবল মানসিক বৃত্তিগুলিকে পরিস্ফুট করে না, শারীরিক ও সর্ব্বাপেক্ষা নৈতিক বৃত্তিগুলিকেও ফুটাইয়া তুলে। পরবর্ত্তীকালে যাহাকে ধর্ম্মপরায়ণ, সমাজসেবী বিলাসশূন্য এবং বিচক্ষণ গৃহস্থ হইতে হইবে তাহার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম অত্যন্ত উপযোগী ও আবশ্যক। এবং এই ব্রহ্মচর্য্যের ফলস্বরূপ সেকালের ব্রাহ্মণগণ যেরূপ অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি এবং সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহা বর্ত্তমানকালের পণ্ডিতবর্গের বিস্ময়ের সামগ্রী হইয়া রহিয়াছে।

দ্বিতীয় আশ্রম গার্হস্থ্য, ইহার সর্ব্বপ্রধান ঘটনা বিবাহ। বিবাহ না করিলে কেহ গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিতে পারে না; সকল ধর্ম্মকার্য্য সস্ত্রীক করিবার বিধি। বিবাহের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য পুত্রোৎপাদন—পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা। ইহাই যে বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য, বিজ্ঞান তাহা সপ্রমাণ করিয়াছে। গৃহস্থের

---

* তপোবীজপ্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ ॥৪২
শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেনচ ॥৪৩
শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ শ্রেয়সা চেৎ প্রজায়তে।
অশ্রেয়ান্ শ্রেয়সীং জাতিং গচ্ছত্যাসপ্তমাদ্যুগাৎ ॥৬৪
শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাৎ তথৈবচ ॥৬৫

১০ম অধ্যায়।

নিত্য অনুষ্ঠেয় পঞ্চ মহাযজ্ঞ ও তিনটী ঋণের কথা ভাবিলে বুঝা যায় আর্য্য গৃহস্থ জীবন কি উচ্চসুরে বাঁধা ছিল। দেবঋণ, পিতৃঋণ ও ঋষি ঋণ এই তিনটী ঋণ; দেবঋণ পরিশোধ করিতে হয় যজ্ঞদ্বারা, অর্থাৎ স্বার্থত্যাগমূলক লোকহিতকর অনুষ্ঠানদ্বারা পিতৃঋণ ধর্ম্মানুসারে পুত্রোৎপাদন দ্বারা পরিশোধ করিতে হয় এবং ঋষিঋণ বেদাধ্যয়ন দ্বারা পরিশোধ হইয়া থাকে। মানবধর্ম্মশাস্ত্র বলিতেছেন—

> ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।
> অনপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ ॥৩৫
> অধীত্য বিধিবদ্বেদান্ পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধর্ম্মতঃ।
> ইষ্ট্বা চ শক্তিতো যজ্ঞৈর্মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ ॥৩৬
> অনধীত্য দ্বিজো বেদাননুৎপাদ্য তথা সুতান্।
> অনিষ্ট্বা চৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ। ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

ঋষিঋণ, দেবঋণ, পিতৃঋণ,—এই ঋণত্রয় পরিশোধ করিয়া মোক্ষসাধন সন্ন্যাসাশ্রমে মনোনিবেশ করা উচিত; কিন্তু এই ঋণ সকল পরিশোধ না করিয়া মোক্ষধর্ম্মের সেবা করিলে নরক প্রাপ্তি হয়। বিধানানুসারে বেদাধ্যয়ন করিয়া ধর্ম্মানুসারে পুত্রোৎপাদন করিয়া, শক্তি অনুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া তবে মোক্ষে মনোনিবেশ করা উচিত। দ্বিজগণ বেদ অধ্যয়ন না করিয়া, সন্তানোৎপাদন না করিয়া, এবং যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া যদি মোক্ষ ইচ্ছা করেন, তবে অধোগতি প্রাপ্ত হন।

এখন এই যে সকলেই কিছুকাল সংসারাশ্রমে থাকিয়া তবে বাণপ্রস্থ আশ্রমে প্রবেশলাভ করিতে পারিতেন তাহাতে একটী সুফল ফলিয়াছিল। সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের বংশ থাকিত। বর্ত্তমান ইউরোপে যেরূপ এই সকল লোকের মধ্যে অনেকে অবিবাহিত থাকায় নির্ব্বংশ হয়েন সেরূপ হইতে পাইত না। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে যখন বর্ণাশ্রমধর্ম্ম শিথিল হইয়া গেল তখন বুদ্ধিমান ও ত্যাগী ব্যক্তিগণ গার্হস্থ্যাশ্রমের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কাজেই এই সকল শ্রেষ্ঠ লোকের বংশ থাকিল না, যাহারা গৃহস্থ থাকিত এবং যাহাদের বংশ থাকিত তাহারা ত্যাগশীলতায় এবং বুদ্ধিতে নিকৃষ্টতর ব্যক্তি। এইরূপে সমাজে যে যোগ্য ব্যক্তির হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধমতবাদ খণ্ডন করিলেও বৌদ্ধদেরই ত্যাগসন্ন্যাসপ্রবণতা প্রচার করিয়া যান।

আর এক বিষয়ে আর্য্য গার্হস্থ্য প্রথা বর্ত্তমান ইউরোপীয় গৃহস্থজীবনের

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। পূর্ব্বোল্লিখিত প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে স্পেন্সার প্রমাণ করিয়াছেন যে সমাজের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর জননশক্তি নিম্নশ্রেণীর অপেক্ষা কম। সম্প্রতি কয়েকটী বৈজ্ঞানিক এ সম্বন্ধে আরও গবেষণা করিয়া দেখাইয়াছেন যে সমাজের যে শ্রেণীর মধ্যে বিলাস যত অধিক তাহাদের বংশবৃদ্ধি তত কম। কাজেই বিলাস বর্জ্জন করিতে পারিলে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সন্তান সংখ্যা বিশেষ অল্প হইবার কথা নহে। হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণগণ বিলাস সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়াছিলেন—এই জন্য তাঁহাদের বংশবৃদ্ধি যথোচিতরূপেই হইত।*

বিবাহের উদ্দেশ্য পুত্রোৎপাদন—এই মহাহিতকর বৈজ্ঞানিক সত্যটী হৃদয়ঙ্গম থাকায় হিন্দুসমাজ অনেক কদাচারের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। আজকালকার ইউরোপে বিবাহের উদ্দেশ্য হইয়াছে—সম্ভোগ; এখন সন্তান জন্মিলে তাহার জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হয়, আরামের ব্যাঘাত হয়, এই জন্য উচ্চশিক্ষিত সৌখিন নরনারী সন্তান হওয়া পছন্দ করেন না। যদি সন্তান হয়, তাহার পালনে তাঁহাদের যত্ন থাকে না, বেতনভোগী নীচজাতীয় স্ত্রীলোকের উপর তাহার লালনপালনের ভার অর্পিত হয়। এই ব্যাপার দেখিয়া সেখানকার কোনও কোনও চিন্তাশীল লোক সমাজের অনিষ্টাশঙ্কায় ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন—"বুদ্ধিমান্ এবং চরিত্রবান্ লোকগণের যথোপযুক্ত সন্তান হওয়া প্রার্থনীয় এবং মহিলাগণের জানা উচিত যে তাঁহাদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সন্তান পালন। তাঁহারা বিদ্যাবত্তায় এবং শিল্পকলায় পুরুষদিগের সহিত টক্কর দিতে পারেন; না পারিলেও কোনও ক্ষতি নাই; কিন্তু তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে স্নেহময়ী এবং সুদক্ষা জননী হওয়া।" † হিন্দুস্মৃতিশাস্ত্র কিন্তু সন্তানোৎপাদনের অত্যাবশ্যকতা প্রচারিত করায় হিন্দুসমাজে এরূপ বিপত্তি ঘটিতে পারে নাই। যতদূর জানিতে পারিয়াছি, অন্য কোনও দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রে পুত্রোৎপাদনের দায়িত্ব সম্বন্ধে এরূপ বিশদভাবে আলোচনা নাই।

* Dr. Ireland points to the significant fact that some of the high castes of India (Brahmins and Rajputs) who are most exclusive in their marriages do not show the usual dwindling tendency, which he connected with the circumstance that they are mostly poor and abstemious (Thomson's Heredity, P. 535)

† The first requisite, then, for mothers of the future, the elements of health being assumed, is that they should be motherly. They may or may not, in addition, be worthy of such exquisite titles as "the female Shakespere of America" but they must have motherliness to begin with [Saleby's Parenthood and Raceculture. P. 153]

স্মৃতিশাস্ত্র মতে যদি কেহ দুক্রিয়াসক্ত হইত তাহাকে পতিত করিয়া দেওয়া হইত অর্থাৎ তাহার সহিত উচ্চজাতীয় লোকের বিবাহাদি নিষিদ্ধ হইত। ইহাতে একটী এই সুফল ফলিত যে কোনও দুশ্চরিত্র লোকের বংশবৃদ্ধি কম হইত এবং সে যোগ্য সুচরিত্র লোকের বংশে আপনার চরিত্রহীনতা প্রবেশ করাইয়া দিয়া সে বংশের অধঃপতন সংসাধিত করিতে পারিত না।

অপরদিকে সদ্বংশজাত চরিত্রবান্ ও বুদ্ধিমান্ লোকের বংশ যাহাতে বৃদ্ধি পায় তজ্জন্য কৌলীন্যপ্রথার প্রচলন হয়। কুলীন নির্ধন হইলেও তাহার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে সকলেই ব্যগ্র হইতেন। এখন এক ব্যক্তির স্বীয় দোষগুণ ব্যতীত আর দুইটী কারণে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয়, এক ধন-শালিতা; দ্বিতীয়, বংশমর্য্যাদা। পাশ্চাত্যদেশে ধনশালিতার গৌরব অধিক, ভারতবর্ষে বংশমর্য্যাদার গৌরব অধিক। আজকাল যখন বংশানুক্রমের প্রভাব প্রমাণিত হইয়াছে, তখন বংশমর্য্যাদা যে ধনশালিতা অপেক্ষা গরীয়সী তাহার আর সন্দেহ কি?

বংশানুক্রমের প্রভাবটী সুবিদিত থাকায়ই যে কৌলীন্যের প্রতিষ্ঠা হয় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। গীতাকারের বিশ্বাস ছিল যোগীর বংশেই যোগী জন্ম-গ্রহণ করেন। * মহর্ষি বশিষ্ঠ লিখিয়াছেন—"কুলোপদেশেন হয়োঽপি পূজ্যস্তস্মাৎ কুলীনাং স্ত্রিয়মুদ্বহন্তি।"—বংশমর্য্যাদাবলে অশ্বও সম্মাননীয় হয়; অতএব সদ্বংশজাতা কন্যাকে বিবাহ করিবে। এই কথাটী এমন সুন্দর যে বর্ত্তমান কালের কোনও সমাজ বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তকে লিখিত থাকিলেও বেশ শোভা পাইত।

কৌলীন্য প্রথার ভিত্তি যদিও আর্য্যঋষিগণের ভূয়োদর্শনের উপর স্থাপিত তথাপি মুসলমান আমলে যখন দেশে জ্ঞানালোচনার স্রোত মন্দীভূত হইয়া আসিল এবং লোকে প্রাচীন বিধি ব্যবস্থাগুলির কারণ পরম্পরা বুঝিতে না পারিয়া অন্ধভাবে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল, তখন বঙ্গের কৌলীন্যপ্রথা একটা হাস্যাস্পদ ব্যাপারে পরিণত হইল। ঘোড়ার বংশ উন্নত করিতে হইলে যে সকল নিয়ম অবলম্বন করা যাইতে পারে মনুষ্যসমাজের বেলা তাহা চলে না। বংশানুক্রমের প্রভাব যতই হউক না কেন, তথাপি এক একটী বুদ্ধিমান লোক বহুসংখ্যক বিবাহ করিবে এবং একজন নিকৃষ্টতর

* অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্। এতদ্ধি দুর্লভতরম্ লোকে জন্ম যদীদৃশম্।৪২, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

ব্যক্তির বিবাহ জুটিবে না এরূপ পক্ষপাতিতা চলিতে পারেনা। অবশ্য ঘটক মহাশয়েরা যে এরূপ জীবতত্ত্বের কোনও কথা অবলম্বন করিয়া কৌলীন্যকে জটিল হইতে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহা মনে হয় না। তবে তাঁহাদের স্বপক্ষে যতটা বলা সম্ভব তাহা ধরিয়া লইয়াই তাহার অসারতা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

বহুবিবাহ সম্বন্ধে (Polygamy) একটা কথা বলা যায় যে গুণবান ব্যক্তির বংশ থাকা যদি প্রার্থনীয় হয়, তাহা হইলে প্রথমা স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে দারান্তর পরিগ্রহ অন্যায় বলিতে পারা যায় না। খৃষ্টান শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, সকল অবস্থাতেই একস্ত্রী বর্ত্তমানে পুরুষের অন্যস্ত্রী গ্রহণ নিষিদ্ধ; সেটা জীবতত্ত্বের চক্ষে কুপ্রথা বলিতে হইবে।*

বিধবাবিবাহ বিষয়টী বর্ত্তমান সমাজ তত্ত্বের সাহায্যে বিচার করিবার চেষ্টা করা যাক। অনেক বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান বংশের কন্যা বিধবা হওয়ার নিঃসন্তানা থাকেন; তাহাতে সমাজে যে বুদ্ধিমান ব্যক্তির সংখ্যাবৃদ্ধির একটী উপায় নষ্ট হয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে অনেকে বলিবেন "কেবলমাত্র জীববিজ্ঞানের মতে ত সমাজ চলিতে পারে না। মানুষ পশু নহে, তাহার নানারূপ কোমল মনোবৃত্তি আছে। আর একটা বড় কথা আছে। জীবন ও মৃত্যুর অদ্ভুত প্রহেলিকার যতদিন পর্য্যন্ত না কতকটা মীমাংসা হইতেছে—স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু বিশ্বাস করেন আর্য্যমহর্ষিগণ এবিষয়ে সম্পূর্ণ না হউক আংশিক কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিলেন—ততদিন পর্য্যন্ত এবিষয়ে একটা মতামত দেওয়া বিজ্ঞানের অধিকার বহির্ভূত।"

কিরূপ কন্যা বিবাহযোগ্য তদ্বিষয়ে মনু বলেন যে স্ত্রীলোক "মাতার অসপিণ্ডা (অর্থাৎ সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত মাতামহাদি বংশজাত নহে) এবং পিতার সগোত্রা বা সপিণ্ডা না হয় এমন স্ত্রীলোকই বিবাহে প্রশস্তা। গো, ছাগ, মেষ ও ধনধান্য দ্বারা অতি সমৃদ্ধ মহাবংশ হইলেও স্ত্রীগ্রহণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত দশকুল পরিত্যাগ করিতে হইবে। হীনক্রিয় (অর্থাৎ সংস্কারবিরহিত), নিষ্পুরুষ (অর্থাৎ যে কুলে পুরুষ জন্মায় না কেবল কন্যামাত্র জন্মিয়া থাকে), নিশ্ছন্দ অর্থাৎ বেদাধ্যায় রহিত; রোমশ অর্থাৎ সকলেই বহুরোম যুক্ত এবং

* From the point of view of certain eugenists polygamy would be desirable in many cases, as extending the parental opportunities of the man of fine physique or intellectual distinction [Saleeby's Parenthood and Race culture, P, 169]

অর্শ, রাজযক্ষ্মা, অপস্মার, শ্বিত্র ও কুষ্ঠরোগাক্রান্ত এই দশকুলে বিবাহ সম্বন্ধ রাখিবে না।”

উপরোক্ত নিয়মগুলি বিজ্ঞান সম্মত। বর ও কন্যার রক্ত সম্বন্ধ অতি নিকট হইলে তাঁহাদের বংশ ভাল হয় না, কোনও কোনও বৈজ্ঞানিকের এইরূপ ধারণা। এ বিষয়ে আরও গবেষণার আবশ্যক।* যে বংশ হীনক্রিয় অর্থাৎ নীতিবর্জ্জিত বা মূর্খ (সম্ভবতঃ নির্ব্বুদ্ধি) বা যাহাতে বংশানুক্রমিক কোনও ব্যাধি আছে তাহা বর্জ্জন করা নিশ্চয়ই বিবেচনার কার্য্য। যে কুলে পুরুষ জন্মায় না কেবল কন্যামাত্র জন্মিয়া থাকে (অর্থাৎ পুরুষের তুলনায় কন্যা অত্যন্ত অধিকসংখ্যক জন্মিয়া থাকে) তাহা বর্জ্জনীয়; ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে একজনের কয়টী পুত্র ও কয়টী কন্যা হইবে সেটা অনেকটা বংশানুক্রমিক। এখন, আমি যতদূর পড়িয়াছি তাহাতে এসম্বন্ধে কোনও রীতিমত গবেষণা দেখি নাই।† সেই জন্য কিছুদিন হইতে আমি কয়েকটী বন্ধুর সাহায্যে এই প্রীতিপ্রদ গবেষণা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি। আমার ইচ্ছা বহুসংখ্যক পরিবারের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া দেখিব পুত্র ও কন্যার অনুপাত বংশানুক্রমিক কি না।

এ পর্য্যন্ত যতগুলি বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতেই এই গুণটী বংশানুক্রমিক এইরূপ অনুমান (working hypothesis) গঠন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা ইহার পরীক্ষা করা খুব আশাপ্রদ বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। কিছুকাল পরে প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা রহিল।

বিবাহ সম্বন্ধে আর একটি কথা আছে। চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ মন্দ ছিল না ধরিয়া লইলেও, পরে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হওয়ায় এবং শ্রমবিভাগের ফলে যখন এক এক বর্ণের ভিতর আবার ছত্রিশ জাতির সৃষ্টি হইল তখন ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়িতে গিয়া দাঁড়াইল। শেষটা এমন পর্য্যন্ত হইল যে, একই বংশের লোক

---

* 'The consequences of close interbreeding carried on for too long a time, are as is generally believed, loss of size, constitutional vigour, and fertility, sometimes accompanied by a tendency to malformation'—Darwin [See Thomson's Heredity, P. 392]

† If the sex of the offspring is not determined by the environmental conditions, on what does it depend ? It may depend on a number of minute and variable factors such as the relative ages of the parents and the relative ages of the sex-cells when they unite in fertilisation or it may be "hereditary." [Thomson's Heredity, P. 505]

দুই বিভিন্ন প্রদেশে বাস করিলে তাহাদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হইল। এইরূপে কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ নানাদেশে বাস করিয়া নানাজাতি হইলেনই, বেশীর ভাগ এক বঙ্গদেশেই—দুই বিভাগে বাস করা নিবন্ধন রাঢ়ী ও বারেন্দ্র এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন। এই সকল অন্যান্য বিভাগের বিভাগ (sub-castes) উৎপন্ন হইবার কারণ বোধ হয় সেকালে এক প্রদেশের লোকের সম্বন্ধে অন্য প্রদেশের লোকের অজ্ঞতা; আজ-কালকার রেল টেলিগ্রাফের দিনে সে সমুদায় বজায় থাকিবার কোনই কারণ দেখা যায় না। এই নিয়মের একটী কুফল এই হইয়াছে যে অনেক জাতি সংখ্যায় এত কম হইয়া গিয়াছে যে তাহাদের মধ্যে উপযুক্ত পাত্র পাত্রীর নির্ব্বাচন দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

শাস্ত্রের ব্যবস্থা "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ"। এটীও একটী সুন্দর ব্যবস্থা বলিয়া বোধ হয়। চিরকাল সংসারের কোলাহলে না থাকিয়া, বৃদ্ধবয়স নির্জ্জনে শান্তিতে ও আত্মচিন্তায় অতিবাহিত করা বেশ সুসঙ্গত। বর্ত্তমান ইউরোপে কিন্তু দেখা যায় অতি বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত লোকে বিষয় কর্ম্মে ব্যাপৃত আছেন—এই জন্য সেখানে সত্তর বৎসর বয়স্ক সেনাপতিকে যুদ্ধ করিতে এবং পঁচাত্তর বৎসর বয়স্ক আচার্য্যকে অধ্যাপনা করিতে দেখা যায়। পরকালের কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল ইহকালের কথা লইয়া বিচার করিলেও বলিতে হইবে উভয় প্রথাতেই সমাজের কিছু উপকার ও কিছু অপকার হইয়া থাকে। ইউরোপীয় প্রথায় গুণ এই যে সমাজের বিভাগ গুলি কতকগুলি বহুদর্শী লোকের তত্ত্বাবধানে থাকে। অপর পক্ষে ইউরোপীয় প্রথার দোষ এই যে কতকগুলি জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের হাতে থাকে বলিয়া রাজকীয় বিভাগ গুলিতে অভিনব নিয়মের প্রবর্ত্তন ও যথোচিত সত্বরতা অসম্ভব হইয়া পড়ে। অধিকাংশস্থলে দেখা যায় একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি পঁচিশ হইতে পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত খুব কৃতিত্ব দেখান; আরও বয়স হইলে তাঁহার প্রতিভা ক্রমশঃ ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে থাকে। তখন বয়ঃকনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের হস্তে কার্য্যভার অর্পণ করিয়া তাঁহাদের অবসর গ্রহণ করাই উচিত; তবে সময়ে সময়ে বৃদ্ধগণের নিকট হইতে পরামর্শ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। *

শুনা যায় ফ্রান্সে অনেক বিদ্বান্ ব্যক্তি জীবনের অধিকাংশ কাল বৈষয়িক কার্য্য করিবার পর অবসর গ্রহণ করিয়া শেষ কয়টা বৎসর বৃক্ষপালন বিদ্যার (horticultural researches) বা ঐরূপ একটী বিদ্যার চর্চ্চায় অতিবাহিত করেন।

* ভারত গবর্ণমেণ্টও পঞ্চান্ন বৎসর বয়সেই কর্ম্মচারিগণকে পেন্সন দিয়া থাকেন।

ইহাদের এই সাধুচেষ্টার ফলে সে দেশে বৃক্ষপালন বিদ্যা এমন উন্নতি লাভ করিয়াছে যে শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। আমাদের বিবেচনায় এই প্রথার সহিত প্রাচীন ভারতের বাণপ্রস্থ আশ্রমের তুলনা করা যায়। তাঁহারাও বৃদ্ধ বয়সে সংসার হইতে ছুটী লইয়া একাগ্রচিত্তে আত্মতত্ত্বসম্বন্ধে গবেষণায় নিযুক্ত হইতেন। প্রভেদের মধ্যে এই যে বর্ত্তমান ইউরোপীয় বিজ্ঞান বহির্মুখী, প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান ছিল অন্তর্মুখী। কাজেই সে দেশের বৃদ্ধগণ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোচনা করেন, কিন্তু আমাদের দেশের বৃদ্ধগণ আত্মবিজ্ঞানের আলোচনা করিতেন। চতুর্থ আশ্রম যতি বা সন্ন্যাস। যখন অতিবৃদ্ধ হওয়ায় আর বনে বাস করিতে পারিতেন না তখন বাণপ্রস্থ আশ্রমী পুনরায় গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন; কিন্তু আর সংসারে লিপ্ত হইতেন না। তাঁহার মন তখন বড় উচ্চসুরে বাঁধা। তিনি তখন সম্পূর্ণরূপে কর্ম্মশূন্য, মুক্ত, ও সিদ্ধপুরুষ। তিনি তখন জীবন বা মরণ কিছুতেই কামনা করিতেন না, কিন্তু ভৃত্য যেমন বেতনের জন্য নির্দ্দিষ্ট কালের প্রতীক্ষা করে, তদ্রূপ কর্ম্মাধীন জীবন কাল বা মরণ কাল প্রতীক্ষা করিতেন। যাহাতে কোনও জীবের প্রাণনাশ না হয়, সেই জন্য পথ দেখিয়া পদবিক্ষেপ করিতেন এবং বস্ত্রাদিদ্বারা ছাকিয়া জলপান করিতেন; সত্যকথা বলিতেন এবং মনকে পবিত্র রাখিতেন। অবমান-জনক বাক্যসকল সহ্য করিয়া থাকিতেন, কাহাকেও অপমান করিতেন না এবং কাহারও সহিত শত্রুতা করিতেন না। কেহ ক্রোধ করিলে তাহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিতেন না; কেহ আক্রোশের কথা কহিলে তাহার প্রতি কুশল বাক্যপ্রয়োগ করিতেন। সর্ব্বদা ব্রহ্মধ্যানপর হইয়া আসীন থাকিতেন; কোনও বিষয়ের অপেক্ষা রাখিতেন না—সর্ব্ববিষয়ে নিস্পৃহ হইতেন কেবল আত্মসহায়েই একাকী মোক্ষার্থী হইয়া ইহ সংসারে বিচরণ করিতেন। *

* নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্।
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দ্দেশং ভৃত্যকো যথা ॥ ৪৫
দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
সত্যপূতাং বদেদ্বাচং মনঃপূতং সমাচরেৎ ॥ ৪৬
অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন।
নচেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্ব্বীত কেনচিৎ ॥ ৪৭
ক্রুধ্যন্তং ন প্রতিক্রুধ্যেদাক্রুষ্টঃ কুশলং বদেৎ।
সপ্তদ্বারাবকীর্ণাঞ্চ ন বাচমনৃতাং বদেৎ ॥ ৪৮

পাঠক দেখিবেন হিন্দুধর্ম্মে সন্ন্যাস আশ্রমে যেরূপ আচরণ বিহিত হইয়াছে পরবর্ত্তী কালের বৌদ্ধধর্ম্ম, জৈনধর্ম্ম, খৃষ্টধর্ম্ম ও চৈতন্য প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মে সেইরূপ আচরণ—সকলেরই পক্ষে অবলম্বনীয় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু গৃহস্থের পক্ষে ঐ সকল নিয়ম পালন করিতে হইলে কিরূপ পদে পদে হাস্যাস্পদ ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় তাহা একবার ভাবিয়া দেখিবেন। আত্মরক্ষার্থ ও সমাজরক্ষার্থ সংসারী ব্যক্তিকে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইতে হয় এবং দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতে হয়। একগালে চড় মারিলে অন্যগাল ফিরাইয়া দেওয়া সন্ন্যাসীর পক্ষে সম্ভব, কিন্তু গৃহস্থের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

এখন একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে যে সন্ন্যাসী তাঁহার দীর্ঘজীবনে যে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জ্জন করিতেন তাহা কি তাঁহার সহিতই নষ্ট হইয়া যাইত, পরবর্ত্তী বংশ কি তাহার উত্তরাধিকারী হইত না? হইত বৈ কি। এই সকল জ্ঞানী বৃদ্ধের চরণতলে বসিয়া লোকে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান শিক্ষা করিত। তাঁহাদের অমূল্য উপদেশই পুরাণ উপপুরাণাদিতে লিপিবদ্ধ হইয়া আজিও হিন্দু গৌরবের অক্ষয় ভাণ্ডার স্বরূপ বিরাজিত রহিয়াছে।*

অধ্যাত্মরতিরাসীনো নিরপেক্ষো নিরামিষঃ।
আত্মনৈব সহায়েন সুখার্থী বিচরেদিহ। ৪৯

মনুসংহিতা, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

* In cities he (the Yati) had to impart the knowledge he had acquired, during a long and meritorious life, on domestic, social, religious and other matters, to younger people. It is the lectures of these venerable old people, cast into the shape of books, that have come down to us, after many a revision, as Puranas and Upapuranas—Haraprasad Sastri.

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্, এ; বি, এস্, সি।

সাহিত্য, ২৫ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা।

আদিশূর। *

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত "গৌড়রাজমালা" নামক পুস্তকে আদিশূর নামক কোন রাজা কখনও ছিলেন না, এ কথা বলা হয় নাই, কিন্তু আদিশূর ও জয়ন্ত অভিন্ন ব্যক্তি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের এই মতের প্রতি অনাদর প্রকাশ করা হইয়াছে। কারণস্বরূপ উক্ত পুস্তকের ১৮ পৃষ্ঠার পাদটীকায় লিখিত হইয়াছে—

"শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় 'ব্রাহ্মণকাণ্ড' নামক গ্রন্থের প্রথমাংশে কহ্লণোক্ত 'জয়ন্ত' এবং কুলপঞ্জিকা সমূহে উল্লিখিত পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়নকারী আদিশূরকে অভিন্ন বলিয়া প্রতিপাদন করিতে যত্ন করিয়াছেন। ...উক্ত গ্রন্থের ১১৪ পৃষ্ঠার ২নং টীকায় [দ্বিতীয় সংস্করণ, ১১৬ পৃঃ, ১নং পাদটীকায়] বসু মহাশয় ব্রাহ্মণডাঙ্গা নিবাসী ৺বংশীবিদ্যারত্ন ঘটকের সংগৃহীত কুলপঞ্জিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন—

'ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি শ্রীজয়ন্তসুতেন চ।
নাম্নাপি দেশাভেদৈস্তু রাঢ়ী বারেন্দ্র সাতশতী॥'

এই টীকার টীকায় আবার লিখিয়াছেন, 'আদিশূর সুতেন চ' এইরূপ পাঠান্তর লক্ষিত হয়। অন্য কোন পুস্তকে এই পাঠান্তর লক্ষিত হয়, না একই পুস্তকের টীকায় পাঠান্তর প্রদত্ত হইয়াছে, এ বিষয়ে বসু মহাশয় কিছুই বলেন নাই। জয়ন্ত ঐতিহাসিক ব্যক্তি হইলে ১১০০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। আর ৺বংশী বিদ্যারত্ন ঘটক ঊনবিংশ শতাব্দীর লোক। বংশীবিদ্যারত্ন কোন্ মূল গ্রন্থ হইতে এই তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই মূলগ্রন্থ কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল, এবং উহার ঐতিহাসিক মূল্যই বা কত? ইত্যাদি বিষয়ের সম্যক্ বিচার না করিয়া এত বড় একটা কথা স্বীকার করা যায় না।"

সৌভাগ্যবশতঃ এই ক্ষুদ্রটীকা বসু মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। তিনি তাঁহার নবপ্রকাশিত 'রাজন্যকাণ্ড' নামক গ্রন্থের ৯৯ পৃষ্ঠার পাদটীকায় লিখিয়াছেন,—

---

* গত ১৭ই পৌষ কলিকাতা সাহিত্য-সভায় পঠিত।

"ব্রাহ্মণডাঙ্গা নিবাসী বংশীবদন বিদ্যারত্ন ঘটক মহাশয় সংগৃহীত বহুসংখ্যক কুলগ্রন্থের কথা রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ঘটক ও কুলীন ব্রাহ্মণ মাত্রই অবগত আছেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ২৮ বর্ষ পূর্ব্বে "গৌড়ে ব্রাহ্মণ' রচয়িতা ৺মহিম চন্দ্র মজুমদার মহাশয় উক্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বহু কুলগ্রন্থের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নাম পাইয়াই আজ পঞ্চদশ বর্ষের অধিক হইল আমরা ব্রাহ্মণডাঙ্গায় উক্ত ঘটক মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তৎকালে তাঁহার বৃদ্ধা কন্যা আমাদিগকে তাঁহার সংগৃহীত কুলগ্রন্থ দেখিতে দিয়াছিলেন,—এরূপ বহুসংখ্যক কুলগ্রন্থ আমি আর কোথাও দেখি নাই। বৃদ্ধা যক্ষের ধনের ন্যায় সেগুলি রক্ষা করিতেছিলেন, মূল গ্রন্থগুলি গৃহের বাহির করিবার কাহারও শক্তি ছিল না। বহু কষ্টে কএকখানি কুলগ্রন্থ স্বহস্তে নকল করিয়া আনিয়াছি। মূল গ্রন্থগুলি সেই গৃহেই রক্ষিত আছে। তন্মধ্যে 'রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী' নামক প্রায় দুইশত বর্ষের হস্তলিখিত পুঁথিতে শ্রেণীবিভাগ প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে—

ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি শ্রীজয়ন্তসুতেনচ।
নাম্নাপি দেশভেদৈস্তু রাঢ়ীবারেন্দ্রসাতশতী।

এতদ্ভিন্ন উক্ত ঘটক মহাশয়ের সংগৃহীত 'রাঢ়ীয় কুলপঞ্জী' নামক একখানি পুঁথিতে 'ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি আদিশূর সুতেন চ' এইরূপ পাঠ দেখিয়াছি, ইহাই পাঠান্তর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।" (জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১ম অংশ, ১১৪, পৃঃ)। যে রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরীতে ভূশূর শ্রীজয়ন্তসুত বলিয়া পরিচিত, সেই কুলমঞ্জরীর অন্যত্র শূররাজ বংশ সম্বন্ধে এইরূপ শ্লোক দৃষ্ট হয়—

আদিশূরো ভূশূরশ্চ ক্ষিতিশূরোঽবনীশূরঃ।
ধরণী শূরকশ্চাপি ধরাঽশূরোঽনুশূরকঃ।
এতে সপ্তশূরাঃ প্রোক্তাঃ ক্রমশঃ সুতবর্ণিতা।
বেদবাণাঙ্গশাকে তু নৃপোঽভূচ্চাদিশূরকঃ।
বসুকর্ম্মাঙ্গকে শাকে গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ।'

(রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী)

এই রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরীর প্রমাণেও জয়ন্ত ও আদিশূর অভিন্ন ব্যক্তি হইতেছেন। আদিশূর ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে, উহা উপাধি তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।"

বসু মহাশয় এখানে পূর্ব্বপক্ষের সকল প্রশ্নের উত্তর না দিয়া থাকিলেও কয়েকটি নূতন তথ্য প্রদান করিয়াছেন। প্রথম তথ্য—"ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি

শ্রীজয়ন্তসুতেন চ” এই বচনের আকর, যাহা “ব্রাহ্মণকাণ্ডে” বংশীবিস্তারত্ন ঘটকের সংগৃহীত “কুল পঞ্জিকা” বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার প্রকৃত নাম “রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী” এবং তাহা “প্রায় দুইশত বর্ষের হস্তলিখিত।” ‘প্রায় দুইশত বর্ষের হস্তলিখিত “রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী” গ্রন্থকে “বংশীবিস্তারত্ন ঘটকের সংগৃহীত কুলপঞ্জিকা” বলিয়া বর্ণন করা সুসঙ্গত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। বচন ধরার সময় গ্রন্থের যথাযথ নাম প্রদান করাই চিরন্তন রীতি। বসু মহাশয় কেন যে এ ক্ষেত্রে তাহা করেন নাই তাহার কারণ জানিতে কৌতূহল হয়।

দ্বিতীয় তথ্য—‘রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী’ গ্রন্থেই জয়ন্ত ও আদিশূর যে অভিন্ন উহার প্রমাণ আছে। তথাপি “ব্রাহ্মণকাণ্ড” রচনার সময় সেই প্রমাণ উপেক্ষা করিয়া কেন যে বসু মহাশয় ‘রাঢ়ীয় কুলপঞ্জী’ নামক স্বতন্ত্র গ্রন্থে প্রমাণ অনুসন্ধান করিতে গিয়াছিলেন তাহাও কৌতূহলজনক। এবং স্বতন্ত্র গ্রন্থের স্বতন্ত্র বচনই বা কেমন করিয়া পাঠান্তর কথিত হইতে পারে, তাহাও বুঝা যায় না।

তৃতীয় তথ্য—আদিশূরের রাজ্যলাভের এবং গৌড়ে ব্রাহ্মণ আগমনের কালজ্ঞাপক বচন। যথা—

বেদবাণাঙ্গশাকেতু নৃপোঽভূচ্চাদিশূরকঃ।
বসুকর্ম্মাঙ্গকে শাকে গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ॥

অর্থাৎ ৬৫৪ শাকে আদিশূরের রাজ্যলাভ এবং ৬৬৮ শাকে গৌড়ে ব্রাহ্মণ আগমন। এই বচন “ব্রাহ্মণকাণ্ডে” উদ্ধৃত হয় নাই। পক্ষান্তরে আদিশূরের সময় সম্বন্ধে ৮৮ পৃষ্ঠায় উক্ত হইয়াছে—

“বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে, ৬৫৪ শকে গৌড়স্থ বেদবিধানবঞ্চিত বিপ্রগণ রাজা আদিশূরকে (ব্রাহ্মণ আনাইবার জন্য) জানাইয়াছিলেন। আবার রাঢ়ীয় ঘটককারিকার মতে, ঐ শকেই পঞ্চব্রাহ্মণ গৌড়ে আগমন করেন।”

শেষোক্ত অংশ সম্বন্ধে পাদটীকায় লিখিত হইয়াছে—

“বেদবাণাঙ্গশাকেতু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ।”

এখনকার অধিকাংশ কুলগ্রন্থে ‘বেদবাণাঙ্ক’ এইরূপ পাঠ দেখা যায়। এপাঠ প্রকৃত নয়।”

এখানে ৬৫৪ শকে আদিশূরের রাজ্যলাভ এবং ৬৬৮ শকে গৌড়ে ব্রাহ্মণ আগমন সম্বন্ধীয় “রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরীর” বচন উদ্ধৃত করিবার বিশেষ সুযোগ ছিল; কিন্তু বসু মহাশয় ১৩০৫ সালে, ‘ব্রাহ্মণকাণ্ডের’ প্রথম সংস্করণের প্রকাশের সময়, বা ১৩১৮ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময়, তাহা আদৌ আবশ্যক

বোধ করেন নাই। পক্ষান্তরে উক্ত গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে গ্রন্থকার আদিশূর কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ আনয়ন কাল সম্বন্ধে নয় প্রকার বিভিন্ন মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং তৎপর চারি পৃষ্ঠা ভরিয়া নানা প্রকার যুক্তি প্রমাণের অবতারণা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—

"এরূপ স্থলে রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের কুলপঞ্জিকাবর্ণিত বেদবাণাঙ্ক বা ৬৫৪ শক (৭৩২ খৃষ্টাব্দে) কনোজপতি যশোবর্ম্মদেবের সময়ে প্রথম ব্রাহ্মণাগমন এবং তৎপরে জয়াদিত্যের বিজয় কালে আনুমানিক ৭৫৩ হইতে ৭৫৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণের পুনরাগমনে গৌড়মণ্ডল নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল।" (১০৫ পৃঃ)

'রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরীর' এই—

"বেদবাণাঙ্গশাকেতু নৃপোহভূচ্চাদিশূরকঃ।

বসুকর্ম্মাঙ্গকে শাকে গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ।"

বচনটি শুধু যে এক সময় বসু মহাশয়ের দৃষ্টি পথে পতিত হয় নাই তাহা নয়, স্বয়ং বংশীবদন বিদ্যারত্ন ঘটক মহাশয়ও এই বচনটি দেখিতে পাইয়াছিলেন না। যে "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" পাঠ করিয়া বসু মহাশয় ব্রাহ্মণডাঙ্গার বংশীবদন বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সংগৃহীত "বহুকুলগ্রন্থের" সন্ধান পাইয়াছিলেন, সেই গ্রন্থের উপক্রমণিকায় লিখিত আছে—

"জেলা যশোহরের অন্তঃপাতী ব্রাহ্মণডাঙ্গা গ্রামনিবাসী ঘটকশ্রেষ্ঠ বংশীবদন বিদ্যারত্ন রাঢ়ীয় কুলবিবরণ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং তাহার প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু সেই সকল প্রমাণ কোন্ গ্রন্থের লিখিত তাহা লিখেন নাই। দুর্ভাগ্য বশতঃ বিদ্যারত্ন ঘটকের মৃত্যু সংবাদ শুনা গিয়াছে, সুতরাং তৎপ্রেরিত ঐতিহাসিক বিবরণ কোন্ গ্রন্থসম্মত এবং তাঁহার প্রেরিত বচনসকল কোন্ গ্রন্থের তাহা জানিবার উপায় নাই।"

উক্ত গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "ঘটকদিগের গ্রন্থেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে আদিশূর ৯৫৪ শকাব্দে ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন।"

পাদটীকায় লিখিয়াছেন—

"বেদবাণাঙ্ক শাকে তু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ।"

বিদ্যারত্ন ঘটক প্রদত্ত প্রমাণ (গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ২য় সংস্করণ, ৭৩ পৃষ্ঠা)। ২ পৃষ্ঠা পরে পুনরায় লিখিয়াছেন, "পক্ষান্তরে রাঢ়ীয় সুবিখ্যাত ঘটক বংশীবদন বিদ্যারত্ন

কুলপঞ্জিকায় যে প্রমাণ দিয়াছেন তাহাতে ৯৫৪ শকাব্দে গৌড়ে ব্রাহ্মণ আইসে প্রমাণ হয়।"

"রাজন্যকাণ্ড" আলোচনা করিয়া যে দুইটি বচনের উপর বসু মহাশয়ের একরূপ সর্ব্বজনসমাদৃত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ—

১। ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি শ্রীজয়ন্তসুতেন চ।
নাম্নাপি দেশভেদৈস্তু রাঢ়ী বারেন্দ্র সাতশতী।
২। বেদবাণাঙ্কশাকে তু নৃপোঽভূচ্চাদিশূরকঃ।
বসুকর্ম্মাঙ্গকে শাকে গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ।—

এই দুইটি শ্লোকের পাঠশুদ্ধি সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হওয়ায় পুথিগুলি আর একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ ব্রাহ্মণডাঙ্গা যাতায়াতের ব্যয়ভার বহনে এবং সমিতির সহকারী পুস্তকরক্ষক পণ্ডিত শ্রীমান্ পুরন্দর কাব্যতীর্থকে তথায় যাইবার অবসর দিতে প্রস্তুত হওয়ায় উক্ত, কাব্যতীর্থ মহাশয় বিশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া দুইবার ব্রাহ্মণডাঙ্গায় যাইয়া তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া আসিয়াছেন। কাব্য-তীর্থ মহাশয় ব্রাহ্মণডাঙ্গায় কুলগ্রন্থানুসন্ধানে যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায়, তিনি নড়াইলের উকিল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট হইতে ৺বংশীবদন বিদ্যারত্ন ঘটকের পৌত্র শ্রীযুক্ত মণিমোহন ঘটকের নামে অনুরোধপত্র লইয়া ব্রাহ্মণডাঙ্গায় গমন করিয়াছিলেন। মণিমোহন বাবু তাঁহাকে বিশেষ সমাদর করিয়া তাঁহার গৃহের সমস্ত পুথি পরীক্ষা করিতে দিয়াছিলেন। নগেন্দ্রবাবুর কথিত "বিদ্যারত্ন ঘটকের বৃদ্ধা কন্যা এখনও জীবিত আছেন এবং এখনও তিনি তাঁহার পিতার কোনও গ্রন্থ কাহাকেও দিতে পূর্ব্ববৎই অসম্মত। বিদ্যারত্ন ঘটকের পৌত্র মণিমোহন ইংরেজী-শিক্ষিত, এবং সজ্জন। শ্রীমান্ পুরন্দর কাব্যতীর্থ মহাশয় মণিমোহন বাবুর বাড়ীতে তিন বাণ্ডিল কুলশাস্ত্রীয় পুথি দেখিতে পাইয়াছেন। এক বাণ্ডিলে শ্রীযুত মিশ্রকৃত "রাঢ়ীয় কুলপঞ্জী" বা মূল পুথি আছে। এই পুথির পত্রসংখ্যা ৪৩০, তন্মধ্যে অনেকগুলি পত্র অতি জীর্ণ এবং কীটদষ্ট। আরম্ভে এই শ্লোকটি আছে—

"প্রণম্য বিশ্বেশ্বর পাদমাদৌ
সরস্বতীং তাং কুলদেবতাঞ্চ।
নৃপ প্রবোধায় কুলস্তপঞ্জী
বিবিচ্যতে শ্রীযুত-মিশ্রকেণ।"

ইহার পর বংশাবলী আরম্ভ হইয়াছে। তদ্ভিন্ন কোনও ঐতিহাসিক কথা এই গ্রন্থে নাই। আর দুইটি ব্র্যাণ্ডিলে ধ্রুবানন্দমিশ্রকৃত দুইখানি মহাবংশাবলী আছে। ইহার একখানি "মহাবংশাবলীর" সহিত আরও আটখানি পত্র আছে। এই পত্রগুলি প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়। প্রথম পত্রে এক পৃষ্ঠায় মাত্র লেখা আছে। আরম্ভ এইরূপ—

"ওঁ নমঃ কুলদেবতায়ৈ।
বন্দ্যং বন্দ্যতমং মুখং মুখবরং চট্টং প্রকৃষ্টং কুলং
ঘোষং দোষ বিমার্জ্জিতং সুবিহিতং পূতিং প্রসিদ্ধশ্রিয়ং।
গাঙ্গুলীয় কুলস্তু গাঙ্গসদৃশং কাঞ্জীতি সঞ্জীবিনং
কুন্দং কুন্দ বিভাতি কুন্দ্য সদৃশং (মিবাতি) (সুন্দরকুল ২)
খ্যাতা ইমে চাট্টকা (:)॥"

চতুর্থ পত্রের শেষ ভাগে লেখা আছে—

"চতুর্ব্বিংশতি দোষাশ্চনিচ্যতে (লিখ্যন্তে) কুলঘাতকাঃ।
বিপর্য্যয় কুলং নাস্তি ন কুলং রণ্ডপিণ্ডয়োঃ।

ইতি কুল দোষ (:) সমাপ্তঃ॥ ওঁনমঃ কুলদেবতায়ৈ॥" পঞ্চম পত্রের গোড়ায় "অথ বন্দ্যঘটীয় কুলং লিখ্যতে" এই কথা আছে। বাকী কয় পত্রে বন্দ্যঘটীয় কুলের বংশাবলী আছে, কিন্তু তাহা অসম্পূর্ণ। মণিমোহন বাবুর অনুগ্রহে আমরা এই কয়েকটী পত্র আপনাদের নিকট আজ উপস্থিত করিতেছি।

এই "কুলদোষঃ" গ্রন্থই যে শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব কর্তৃক "ব্রাহ্মণ কাণ্ডে" বংশীবিদ্যারত্ন সংগৃহীত "কুল পঞ্জিকা" বা "কুলকারিকা" নামে অভিহিত এবং "রাজন্যকাণ্ডে" "রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী" নামে অভিহিত, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। "ব্রাহ্মণকাণ্ডের" ১১৭ পৃষ্ঠার পাদটীকায় বিদ্যারত্ন সংগৃহীত কুলপঞ্জিকা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে—

'ক্ষিতিশূরেণ রাজ্ঞাপি ভূশূরস্ত সুতেন চ।
ক্রিয়ন্তে গাঞিসংজ্ঞানি তেষাং গ্রামবিনির্ণয়াৎ।"

"কুলদোষঃ" গ্রন্থের ২থ পত্রে এই বচন বানান ভুল ছাড়িয়া দিলে অবিকল দৃষ্ট হয়। তাহার পর বসু মহাশয়ের উল্লিখিত সপ্তশতী ২৮ গায়ীরও নাম প্রদত্ত হইয়াছে। "ব্রাহ্মণ কাণ্ডের" ১৯৬ পৃষ্ঠার ১নং পাদটীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে—

"কামরূপে মহাপীঠে সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়কে।
তত্রাগত্য প্রযত্নেন দেবীবর বিশারদঃ।

দ্বিথ বেদেন্দুশাকে চ মেষে মার্ত্তণ্ডমাগতে।
ক্রিয়তে বল্লিসিম্বিনা রাঢ়ী দ্বিজ কুলোপরি।" (১৪০২)

এই দুইটি শ্লোক "কুলদোষঃ" গ্রন্থের ৩থ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট হয়। তথাকথিত "বংশীবিদ্যারত্ন-সংগৃহীত কুলকারিকা" হইতে "ব্রাহ্মণকাণ্ডের" ১৮৭ পৃষ্ঠার ৩নং পাদটীকায় ধৃত ধ্রুবানন্দমিশ্রের সময় (১৪০৭ শাক) জ্ঞাপক শ্লোকটিও "কুলদোষ, গ্রন্থের ৩থ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায়। বসু মহাশয় "রাজন্য কাণ্ডের" পূর্ব্বোদ্ধৃত টীকায় সপ্ত-শূররাজের নাম সম্বলিত যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা' কুলদোষ" গ্রন্থের ৩য় পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় না এই বচনের ঠিক পরে বসু মহাশয়ের ধৃত—

"বেদবাণাঙ্গ শাকেতু নৃপোঽ ভূচ্চাদিশূরকঃ।
বসুকর্ম্মাঙ্গকে শাকে গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ॥"

তৎপরিবর্ত্তে ২ক পৃষ্ঠায় এই শ্লোকটি আছে—

"ক্ষত্রিয় বংশে সমুৎপন্নো মাধবো কুলসম্ভবঃ।
বসু ধর্ম্মাষ্টকে শাকে নৃপ (পো) ভু (ভূ) চ্চাদিশূরকঃ।"

এই শ্লোকের পরে ৮৯৮ অঙ্ক আছে। তথা ২থ পৃষ্ঠায় এই বচনটি আছে—

বেদবাণাঙ্ক শাকেতু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ।

সুতরাং "কুলদোষঃ" হইতেই বংশীবদন বিদ্যারত্ন মহাশয় এই বচন সংগ্রহ করিয়া "গৌড়েব্রাহ্মণকার" ৺মহিমাচন্দ্র মজুমদারের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন এইরূপ সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত। "কুলদোষঃ" গ্রন্থে নগেন্দ্র বাবুর উদ্ধৃত "ভূশূরেণচ রাজ্ঞাপি শ্রীজয়ন্ত সুতেন চ" বচন নাই; আছে—

"ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি আদিশূরসুতেনচ।
নানাপি দেশভেদৈস্তু রাঢ়ী বারেন্দ্রসাতশতী।" (২থ)

সুতরাং ৺বংশীবদন বিদ্যারত্নের ঘরের পুস্তকের দোহাই দিয়া আদিশূর ও জয়ন্ত অভিন্ন বলা চলে না, এবং ৬৫৮ শকাব্দে গৌড়ে ব্রাহ্মণ আগমন করিয়াছিলেন একথাও বলা চলে না।

"কুলদোষ" গ্রন্থে যে সকল ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় তাহারই বা মূল্য যে কত তাহা নিরূপণ করা কঠিন। 'কুলদোষ"কার বল্লালসেন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে মনে হয় তাহার কোন বচন বিনা বিচারে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। যথা—

"বেদবুগ্মা (গ্ম) ধরা ক্ষৌণি (ণী) শাকে সিংহস্থ ভাস্করে।
মিত্রসেনস্ত পুত্রোভূৎ শ্রী (মৎ) বল্লাল ভূপতিঃ। ১১২৪

এখানে বল্লাল সেনকে মিত্রসেনের পুত্র বলা হইয়াছে এবং ১১২৪ শাক বা ১২০২ খৃষ্টাব্দ তাঁহার আবির্ভাবকালরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা অধিকতর নির্ভরযোগ্য প্রমাণের বিরোধী। তবে "বেদবাণাঙ্কশাকেতু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ" আদিশূরের সম্বন্ধে এই বচন একেবারে অমূলক বলিয়া মনে হয় না। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত এবং বঙ্গদেশীয় এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত আনন্দভট্ট রচিত "বল্লাল চরিত" গ্রন্থে এই বচন দৃষ্ট হয়। "বল্লাল চরিত" দুই খানি আদর্শ পুস্তক অবলম্বনে সম্পাদিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একখানি পুস্তক ১৬২৯ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে লিখিত। সুতরাং "বল্লালচরিতে" যে জনশ্রুতি নিবদ্ধ হইয়াছে তাহা যে অন্যূন দুইশত বৎসর পূর্ব্বে এদেশে প্রচলিত ছিল, এ কথা বলা যাইতে পারে। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে রচিত "ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে" ৯৯৯ শকাব্দ গৌড়ে ব্রাহ্মণ আগমনের কাল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। জনশ্রুতি-মূলক বচন প্রমাণোক্ত ৯৫৪ বা ৯৯৯ এর যে প্রভেদ তাহা গণনীয় নহে। যাঁহারা "সম্বন্ধ নির্ণয়", "গৌড়ে ব্রাহ্মণ", "ব্রাহ্মণকাণ্ড" প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন আদিশূর কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ আনয়নের সময় সম্বন্ধে, অনুরূপ অনেক বচন প্রমাণ প্রকাশিত হইয়াছে। "নহ্যমূলাঃ জনশ্রুতিঃ" এ কথা ঐতিহাসিকের উপেক্ষণীয় নহে। কিন্তু জনশ্রুতির একটা ধর্ম্ম এই, ইহার মূল হইতে এত বৃহৎ কাণ্ড এবং বহু সংখ্যক শাখা প্রশাখা উৎপন্ন হয় যে, অনেক সময় তাহার মূল খুঁজিয়া বাহির করা সুকঠিন হইয়া উঠে। জনশ্রুতির মূল খুঁজিয়া বাহির করিবার প্রধান উপায় ঘটনার সমসময়ের লোকের সাক্ষ্য। আদিশূর সম্বন্ধে এরূপ কোনও সাক্ষ্য এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই। কিন্তু একাদশ শতাব্দে শূররাজবংশের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এবং মধ্যদেশ বা কান্যকুব্জ অঞ্চল হইতে বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ আগমন সম্বন্ধে প্রমাণ ক্রমশঃ আবিষ্কৃত হইতেছে। রাজেন্দ্র চোলের ১০২৩ খৃষ্টাব্দে সম্পাদিত তিরুমলয় লিপিতে দক্ষিণরাঢ়ের অধিপতি রণশূরের পরিচয় পাওয়া যায়। নবাবিষ্কৃত (কিন্তু এ যাবৎ অপ্রকাশিত) বিজয় সেনের তাম্র শাসনে কথিত হইয়াছে যে, বিজয় সেনের মহিষী এবং বল্লালসেনের জননী বিলাসদেবী শূররাজবংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বারেন্দ্রকুলজ্ঞগণের গ্রন্থে যে কথিত হইয়াছে বল্লালসেন

আদিশূরের দৌহিত্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ইহাই হয়ত তাহার ভিত্তি। কান্যকুব্জ তৎকালে মধ্যদেশের রাজধানী ছিল। কান্যকুব্জ রাজ্য বা মধ্যদেশ হইতে তখন যে পঞ্চগোত্রের মধ্যে অন্ততঃ তুইটি গোত্রের—বাৎস্য ও সাবর্ণ গোত্রের—ব্রাহ্মণ বাঙ্গলায় আসিয়াছিল তাহার প্রমাণ সমসাময়িক লিপিতে পাওয়া যায়। বিজয় সেনের তাম্রশাসনের প্রতিগ্রহকর্ত্তা বাৎস্য গোত্রীয় এবং তাঁহার প্রপিতামহ মধ্যদেশ বিনির্গত বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ভোজবর্ম্মণের বেলাব-লিপির প্রতিগ্রহকর্ত্তা সাবর্ণ সগোত্র ছিলেন এবং তাঁহার প্রপিতামহও মধ্যদেশ বিনির্গত বলিয়া কথিত হইয়াছেন। সুতরাং আমরা যদি অনুমান করি মধ্যদেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়নকারী আদিশূর নামক রাজা একাদশ শতাব্দে বা তাহার কাছাকাছি কোন সময়ে প্রাতুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা হইলে কুলশাস্ত্রের এবং তাম্রশাসনের প্রমাণের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধিত হইতে পারে। বিভিন্নশ্রেণীর প্রমাণের সামঞ্জস্য-বিধানই theory বা মতবাদের উদ্দেশ্য। ইতিহাস অর্থাৎ history অনেক সময়েই ইহা অপেক্ষা বড়বেশী কিছু—কোন বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা বা অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত—প্রদান করিতে পারে না। অবশ্যই একাদশ শতাব্দ ব্রাহ্মণ আনয়নকারী আদিশূরের কাল ধরিয়া লইলে তাঁহাকে গৌড়মণ্ডলে অর্থাৎ বর্ত্তমান বাঙ্গলা ও বিহারের একচ্ছত্র মহারাজ,পার্শ্ববর্ত্তী কামরূপ কলিঙ্গের অধিরাজ, এবং বাঙ্গলায় বৈদিক ধর্ম্ম সংস্থাপক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। কারণ একাদশ শতাব্দের প্রথমভাগে পালনরপালগণের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিল এবং শেষ ভাগে বরেন্দ্রে প্রজাবিদ্রোহের ফলে বর্ম্মণ এবং সেনবংশের অভ্যুত্থানের সুযোগ ঘটিয়াছিল। এ সময়ে শূররাজের প্রাচ্যভারতে সার্ব্বভৌমত্ব লাভের অবসর ছিল না এবং ইহার অনেক পূর্ব্ব হইতে এদেশে বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণও ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া "বেদবাণাঙ্ক শাকেতু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ।" এই শ্লোকার্দ্ধের "বেদবাণাঙ্ক" কে আজ "বেদবাণাঙ্গ" পড়া, এবং তার পরদিন আবার "গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ"স্থলে "নৃপোঽভূচ্ছাদিশূরকঃ" ধরা, সমর্থন করা যাইতে পারে না। যখন "গৌড়রাজমালা" লিখিত হইয়াছিল তখনও বিজয়সেনের তাম্রশাসনের খবর জানা ছিল না এবং ভোজবর্ম্মণের বেলাব-তাম্রশাসনও তখন আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং আদিশূর সম্বন্ধে আজ যত কথা বলিতে সাহস করা যাইতে পারে, তখন ততটা সম্ভবপর ছিল না।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

সাহিত্য, ২৫ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা।

কৃষ্ণমতী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্যামসুন্দরের মন্দিরে মাসীর সমভিব্যাহারে কৃষ্ণমতী ঝুলন দেখিতে গিয়াছিল। শ্যামসুন্দরের মন্দির অদ্য রাত্রিতে আলোকে উজ্জ্বলিত, কিন্তু দশম বর্ষীয়া বালিকা কৃষ্ণমতীর প্রবেশমাত্রে মন্দির যেন আরো উজ্জ্বল হইল। দর্শকেরা কৃষ্ণমতীকেই দেখিতে লাগিল, কৃষ্ণমতী যেখানে যায় রূপে আলো করে।

নীলাপুরে শ্যামসুন্দরের মন্দিরে ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে বড় ধুম। মন্দিরের ভিতরে ঝাড়ের আলো, ছবি ও ফুলের মালায় সুসজ্জিত; মন্দিরের বাহিরে ছোট ছোট শিশির আলোতে নীলাপুর গ্রামের অনেকদূর পর্য্যন্ত রোস্‌নাই হইয়াছিল। মন্দিরের সম্মুখে প্রশস্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বে দোকান বসিয়াছে, তাহাও উজ্জ্বলিত। মন্দিরের ছাদের উপরে চতুর্দ্দিকে বিশ হাত অন্তরে বড় বড় লাল নিশান উড়িতেছে। মন্দিরের ফটকের উপরে নহবৎ খানায় নহবৎ বাজিতেছে।

অদ্য সন্ধ্যার পর মন্দিরের ভিতরে কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। সুসজ্জিত প্রশস্ত প্রাঙ্গণে নীলাপুরের ও পার্শ্বস্থ গ্রামের বহুসংখ্যক ভদ্রলোক বসিয়া কীর্ত্তন শুনিতেছেন; মধ্যস্থানে পৃথগাসনে নীলাপুরের জমিদার বংশধর, নীলাপুরের কুলাঙ্গার, সয়তানের অবতার, অষ্টাদশবর্ষীয় শ্রীযুক্ত অসিতকুমার বাবু বিরাজমান। কীর্ত্তনী সুরূপা নহে কিন্তু সুগায়িকা। শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাধাপ্যারীর প্রথম সন্দর্শন কিরূপে এবং কি অবস্থাতে হইয়াছিল তাহাই কীর্ত্তন করিতেছিল। শ্রোতৃবৃন্দ একাগ্রমনে শুনিতেছিল, কিন্তু এই দেবালয়ের অধিকারী জমিদার-পুত্রের মন অন্যদিকে ছিল। গ্রামের কুলাঙ্গনাগণ শ্যামসুন্দর দর্শনের জন্য যে পথ দিয়া যাতায়াত করিতেছিল সেই দিকে তাঁহার চক্ষু ছিল। হঠাৎ তিনি উঠিয়া গেলেন।

মন্দিরের বাহিরে বড় গুলজার, মেলা বসিয়াছে, নানা প্রকার দ্রব্যাদির দোকান সাজাইয়াছে; তন্মধ্যে পানের ও ফুলের মালার দোকানে জনতা বেশী

একটি মশলার দোকানে কৃষ্ণমতীর মাসী মশলার দর করিতেছিলেন; কৃষ্ণমতী তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চারিদিক দেখিতেছিল। দশমবর্ষীয়া বালিকা (দেখিতে যেন দ্বাদশবর্ষীয়া) অঞ্চলের কিয়দংশ দ্বারা মাথা ও মুখ আবৃত করিয়া কেবলমাত্র চক্ষু দুইটী বাহির করিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছে, হঠাৎ তাহার দৃষ্টি একস্থানে স্থাপিত হইল। সন্নিহিত একটী ফুলের মালার দোকানে পঞ্চদশবর্ষীয় একটী সুকুমার কিশোর বালক ফুলের মালা কিনিতেছিল। কৃষ্ণমতী তাহাকেই এক দৃষ্টে দেখিতেছিল। এমন সময়ে কে একজন তাহার পশ্চাৎ হইতে বলিল—"কৃষ্ণমতি' আমি তোমার জন্য শ্যামসুন্দরের প্রসাদি মালা আনিয়াছি এই লও, গলায় পর"। কৃষ্ণমতী ভ্রূভঙ্গী করিয়া মাথায় আরো কাপড় টানিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল। অসিতকুমার বাবু অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, তবু মালা লইল না। তাহার মাসী উহা দেখিয়া বড় রাগ করিলেন; বালিকা কৃষ্ণমতী জমিদার পুত্রের অপমান করাতে তাঁহার একটু ভয়ও হইল। কৃষ্ণমতীকে ভৎর্সনা করিতে করিতে তিনি অন্য মশলার দোকানে গেলেন, কৃষ্ণমতী ধমক খাইয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। ইতিমধ্যে সেই অপরিচিত কিশোর বালক তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিল—"এই মালা ছড়াটি তোমার জন্য কিনিয়াছি তুমি ইহা লও"। বলিয়া কৃষ্ণমতীর হাতে উহা দিতে গেল, কৃষ্ণমতী হাসিয়া ঘাড় নাড়িল। কিন্তু যখন অপরিচিত কিশোর বলিল, "মালা ছড়াটী না লইলে আমি বড় দুঃখিত হইব, আমি তোমাদের জানি," তখন কৃষ্ণমতী আর থাকিতে পারিল না, হাত পাতিয়া মালা লইয়া তাহার অঞ্চলে বাঁধিয়া মাসীর নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল "মাসি, উনি কে?"

মা। কে—জান না—আমাদের জমিদার পুত্র অসিতকুমার বাবু।

কৃ। না, না, আমাকে যিনি মালা দিয়া গেলেন।

এই বলিয়া অঞ্চল হইতে এক ছড়া জুঁই ফুলের গড়েমালা মাসীকে দেখাইল।

মা। ও পোড়ারমুখী, তুমি অসিতকুমারের মালা ত্যাগ করিয়া একজন অজ্ঞাত, অপরিচিত দুষ্ট লোকের মালা লইয়াছ।

কৃষ্ণমতী লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া সেইস্থানে দাঁড়াইয়া রহিল।

এই দুই ব্যক্তি কৃষ্ণমতীকে আদর করিয়া মালা দিতে যায় কেন? ইহারা উভয়ে রূপে মুগ্ধ। কৃষ্ণমতী অসামান্য সুন্দরী।

মাসীর সহিত কৃষ্ণমতী বাটী ফিরিল, পথিমধ্যে মাসী অতি মৃদু স্নেহব্যঞ্জক

স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি অসিতকুমারের মালা ত্যাগ ক'রে একজন অপরিচিত লোকের মালা লইলে কেন?" কৃষ্ণমতী উত্তর করিল "কি জানি।" কৃষ্ণমতী বালিকা, আপনার মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া ঐরূপ উত্তর দিয়াছিল। মনুষ্য হৃদয় মধ্যে যত প্রকার ক্রিয়া জন্মে, তন্মধ্যে দুই প্রকার ক্রিয়া জীবনে বড় অশুভকর হয়; প্রথমটী কোন কোন ব্যক্তিকে দেখিবামাত্র শিহরিয়া উঠিতে হয়; দ্বিতীয়টী কোন কোন ব্যক্তিকে দেখিয়া আবার দেখিতে ইচ্ছা করে। প্রথমটীর নাম "ঘৃণা", দ্বিতীয়টীর নাম ঠিক বলিতে পারিলাম না। এই দুই ব্যক্তিকে দেখিয়া কৃষ্ণমতীর হৃদয়ে এই দুই প্রকার ক্রিয়া জন্মিয়াছিল। অসিতকুমারকে দেখিয়া ঘৃণা, ও অপরিচিত কিশোরকে দেখিয়া কি একটা সুখানুভব করিয়াছিল। সেই জন্য প্রথমের মালা লইল না, দ্বিতীয়ের মালা লইল। এই দুইটি হৃদয়ের ক্রিয়াতে কুসুমকলিকা বালিকা কৃষ্ণমতীর ভবিষ্যৎ জীবন কিরূপ হইয়াছিল, তাহা এই আখ্যায়িকাতে ক্রমশঃ প্রকটিত হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণমতী দরিদ্রকন্যা। বাল্যকালে পিতৃমাতৃহীনা হইয়া, বিধবা মাসীর দ্বারা প্রতিপালিত হয়। তাহার মাসীরও তাহার ন্যায় তিন কুলে কেহ ছিল না। তিনি স্বামীর কিছু সঞ্চিত ধন সুদে খাটাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন ও কৃষ্ণমতীকে প্রতিপালন করিতেন। মৃত্তিকানির্ম্মিত প্রাচীর বেষ্টিত একখানি মেটে ঘরে দুইজনে বাস করিতেন। কিন্তু এই মেটে ঘরের প্রতি দেশের লোকের লক্ষ্য ছিল, কেন না এই মেটে ঘরে অতুল্য রূপরাশি বিরাজ করিত। কৃষ্ণমতীর রূপ দেখিয়া জানানা মিশনের বিবিরা বিনা বেতনে অতি যত্ন সহকারে তাহাকে শিক্ষা দিতেন। ঐরূপ একজন গুরুমা বাঙ্গালা পড়াইতেন; কৃষ্ণমতী একদিনে ক, খ, শিখিয়াছিল।

কৃষ্ণমতীর বিবাহ সময় উপস্থিত, কিন্তু বিবাহ হয় না। গ্রামের সকল গৃহস্থ ও গৃহিণীর ইচ্ছা যে কৃষ্ণমতীকে পুত্রবধূ করেন। সকল যুবকের ইচ্ছা যে কৃষ্ণমতীকে বিবাহ করে; কিন্তু দুষ্প্রাপ্য, বহুমূল্য বস্তু কেবল ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের অদৃষ্টেই ঘটে। কৃষ্ণমতীকে পুত্রবধূ করিবার জন্য গ্রামের প্রধান দুই জমিদারের মধ্যে লাঠালাঠি বাধিবার উপক্রম হইল।

নীলাপুর একটী গণ্ডগ্রাম। উহাতে অনেক ধনী লোকের বাস। মুখখান বহুসংখ্যক বৃহৎ শ্বেত অট্টালিকায় গ্রাম পরিপূর্ণ। উল্লিখিত দুই জন যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী। এক জনের নাম রোহিণীকুমার রায়, অপরের নাম রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়। রোহিণীকুমার রায় বুনিয়াদী বড় মানুষ, পাঁচ গ্রামটা জমিদার, কিন্তু অশিক্ষিত—চাল চলন সেকেলে জমিদারের ন্যায়, আবার কুল, দুঁদে ও দুর্দ্দান্ত জমিদার ছিলেন। পুত্র সন্তান না হওয়ায় ইনি ক্রমে ক্রমে তিনটী দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। অবশেষে অনেক যাগ যজ্ঞের পর কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভে তাঁহার একটী পুত্র সন্তান জন্মিয়াছিল। এই পুত্রের নামকরণ হইল অসিতকুমার।

গ্রামের দ্বিতীয় ধনাঢ্য ব্যক্তি রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন, সামান্য গৃহস্থের সন্তান; কৃতবিদ্য হইয়া এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতি করিয়া প্রভূত ধন সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া স্বদেশে অনেক তালুক মুলুক খরিদ করিয়া ঐশ্বর্য্যে রোহিণীকুমার রায়ের সমকক্ষ হইলেন; কিন্তু তিনি কখন দেশে আসিতেন না, তাঁহার একজন জ্ঞাতি-ভাই নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে সকল বিষয়ে তাঁহার প্রতিনিধি করিয়াছিলেন। রাসবিহারী বাবুর এক স্ত্রী, ও এক পুত্র, নাম বনবিহারী, বড় ভাল ছেলে, ভালরূপ লেখা পড়া শিখিতেছে। ইতিপূর্ব্বে রাসবিহারী বাবু সপরিবারে বাটী আসিয়াছিলেন, কৃষ্ণমতীকে দেখিয়া বনবিহারীর সহিত বিবাহ দিতে তাঁহার স্ত্রীর বড় সাধ হইয়াছিল। সেজন্য তিনি ম্যানেজার নবীন বাবুর স্ত্রীকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়া গেলেন। এদিকে অসিতকুমারের মাতা ও দুই বিমাতা প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, ঐ মেয়েকে পুত্রবধূ করিয়া ঘরে আনিবেন। সেজন্য জমিদার বাবু ও নবীন বাবুর মধ্যে লাঠালাঠি আরম্ভ হইল, সে সকল ঘটনা এ স্থলে বিবৃত করিবার আবশ্যকতা নাই।

এইরূপ গোলমালে কৃষ্ণমতীর বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর হইল, কিন্তু দেখিতে যেন চতুর্দ্দশ বৎসর, সে জন্য কৃষ্ণমতীর মাসী বড় গোলে পড়িলেন। আবার এদিকে দুই জন দেশের বড় লোক কৃষ্ণমতীর জন্য লাঠালাঠি আরম্ভ করিলেন। একবার ভাবিলেন "মেয়েটাকে নিয়ে কাশী পলাইয়া যাই।" কিন্তু তাঁহার একজন মুরব্বি ছিলেন, তিনি অন্যরূপ পরামর্শ দিলেন। দেবনাথ ঘোষাল অতি প্রাচীন লোক, নিরীহ ভাল মানুষ, হরি নাম জপ করিয়া কালাতিপাত করিতেন। তিনি বলিলেন, "তোমার কৃষ্ণমতী যেমন সুন্দরী ও গুণবতী রাসবিহারীর পুত্রও সেই-

ঘরে ও রূপবান্। অতি অল্প বয়সে দুইটা পাশ করিয়াছে, দুইটাতে জলপানি পাইয়াছে। আর জমিদারপুত্র অসিতকুমার অপাত্র, তাহার সহিত বিবাহ দিলে কৃষ্ণমতী চিরদুঃখিনী হইবে, বনবিহারীর সহিত বিবাহ হইলে চির সুখী হইবে।"

মাসি। তাত বুঝলুম, কিন্তু রাত্রে যদি আমাদের ঘরে আগুন দিয়া পোড়াইয়া মারে ?

দেব। বটে, বটে, যে দুর্দ্দান্ত জমিদার, সকলি পারে। শুন, তোমার যদি মত থাকে, তবে অতি শীঘ্র বনবিহারীর সহিত কৃষ্ণমতীর বিবাহ দিবার বন্দোবস্ত করিব, বিবাহের পর তুমি কাশী চলিয়া যাইও। তোমার মেটে ঘর আমি বিক্রয় করিয়া দিতেছি, তুমি দেনাদারের নিকট কাঁদা কাটা করিয়া তোমার টাকা গুলি আদায় করিয়া লও; বিবাহ গোপনে আমার বাটিতে হবে, বিবাহের পর দিন হইতে তুমি রাসবিহারীর বাটিতে থাকিও, তোমার কেহ অনিষ্ট করিতে পারিবে না, পরে তাহাদের সহিত কাশী যাইও।

তাহাই হইল। প্রাচীন দেবনাথ নবীন বাবু ম্যানেজারের সহিত দেখা করিয়া বিবাহের দিন স্থির করিলেন। বিবাহ গোপনে হইবে, কেননা জমিদার কি তাহার পুত্র উহা জানিতে পারিলে, লাঠালাঠি করিয়া বিবাহ বন্ধ করিবে। রাসবিহারী বাবু সপরিবারে বাটী আসিলেন, জমিদার তাঁহার বিরুদ্ধে একটা বড় মোকদ্দমা রুজু করিয়াছিলেন, সেই উপলক্ষে আসিলেন।

বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। দেবনাথের বিধবা কন্যা কৃষ্ণমতীর মাসীকে বলিল, "হ্যাঁ—গা, আমি কয় দিন ধরিয়া দেখিতেছি বিবাহের কথা উপস্থিত হইলে, কৃষ্ণমতীর মুখখানি শুকাইয়া যায় কেন—গা ?

মাসি বলিলেন,—হ্যাঁ—মা, আমিও উহা লক্ষ্য করিয়াছি, কিন্তু কেন তাহা বুঝিতে পারি নাই।

কিন্তু আমরা বুঝিয়াছি কেন। সেই যে, ঝুলন যাত্রার রাত্রে একটী পঞ্চদশবর্ষীয় কিশোর কৃষ্ণমতীকে মালা দিয়াছিল, তাহার মুখখানি কৃষ্ণমতীর হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল, কৃষ্ণমতী সেই মুখ খানি ভুলিতে পারে নাই। বিবাহের কথা উত্থাপিত হইলে সেই মুখখানি আরো উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিত, সেই জন্য কৃষ্ণমতীর মুখ ম্লান হইত। যাহা হউক, বিবাহের দিনে গাত্রে হরিদ্রা ও অন্যান্য কৌলিক কার্য্য সকলই গোপনে সম্পাদিত হইল। রাত্রে পাত্রকে দেবনাথের বাটিতে গোপনে আনিয়া একটী নিভৃত কক্ষে বিবাহ আরম্ভ হইল, সে ঘরে

কেবল মাত্র পাঁচ ছয়টী স্ত্রীলোক ছিল। কৃষ্ণমতী সাত হাত ঘোমটা দিয়া মুখখান তোলো হাঁড়ি করিয়া বিবাহ করিতে বসিল; কিন্তু যখন শুভদৃষ্টির জন্ত যে আচ্ছাদন দ্বারা বরকনেকে ঢাকিয়াছিল উহা উঠাইয়া লওয়া হয়, তখন স্ত্রীলোকেরা দেখিল কৃষ্ণমতী মৃদু মৃদু হাসিতেছে। অসাবধানতা বশতঃ ঘোমটা টানিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, পরে আবার সাত হাত ঘোমটা দিয়া বসিল, স্ত্রীলোকেরা আরো দেখিল যে, বর বনবিহারী ঐরূপ হাসিতে হাসিতে ঘাড় হেঁট করিল। স্ত্রীলোকেরা উহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল। বরকনে চোকাচোকি করিয়া হাসিল কেন? কেহ কিছু বুঝিতে পারিল না। বোধ হয় পাঠকদিগকে বুঝাইতে হইবে না, এ বর কে। সেই যে কিশোর বালক ঝুলন যাত্রার রাত্রে কৃষ্ণমতীকে মালা দিয়াছিল, তাহারি সহিত চোকাচোকি করিয়া কৃষ্ণমতী হাসিয়াছিল। তিনি রাসবিহারীর পুত্র বনবিহারী, আজ তিনিই কৃষ্ণমতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। শুভদৃষ্টির সময় কৃষ্ণমতী তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া ঈষৎ হাসিয়াছিল, এবং আনন্দে ঘোমটা টানিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, সে জন্ত স্ত্রীলোকেরা তাঁহার হাসি দেখিতে পাইয়াছিল।

পরদিন প্রাতে এ বিবাহ গ্রামে প্রচারিত হইল, অসিতকুমার ক্রোধে আচড়াপিচড়ি করিতে লাগিল; চাকর বাকরদের মারধর করিতে লাগিল, সম্মুখে যাহা পাইত তাহাই ভাঙ্গিতে লাগিল। এইরূপে জমিদার বাবুর অনেক ক্ষতি করিল, অবশেষে পিতামাতা ও বিমাতাদের গালি পাড়িতে লাগিল। ক্রমে ক্রোধের শমতা হইলে, বয়স্তদিগের নিকট প্রতিজ্ঞা করিল, যে রূপেই হউক কৃষ্ণমতীকে সে কাড়িয়া লইবে।

কিছু দিন পরে রাসবিহারী বাবু সপরিবারে এলাহাবাদে যাত্রা করিলেন। কৃষ্ণমতীর মাসী তাঁহাদের সহিত কাশী যাইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বহুকালের পর নীলাপুরের লোক কৃষ্ণমতীকে আবার দেখিতে পাইল। দশবৎসর পরে রাসবিহারী বাবু সপরিবারে নীলাপুরের বাটীতে আসিলেন। তাঁহার বর্ষীয়সী জননী পীড়িত হইয়া এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন যে, নীলাপুরের গঙ্গাতীরে তাঁহার মৃত্যু হয়। সেই জন্ত রাসবিহারী বাবু সপরিবারে

নীলাপুরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু জননীর না এদিক না ওদিক, মরিবেনও না বাঁচিবেনও না, কেবল শয্যাশায়ী হইয়া রহিলেন। সুতরাং রাসবিহারী বাবুকে অনেকদিন নীলাপুরের বাটীতে বাস করিতে হইল। কৃষ্ণমতীকে দেশের লোক দলে দলে দেখিতে আসিল। তাঁহার এক্ষণে দ্বাবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম, কিন্তু সন্তানাদি হয় নাই; স্বামী বনবিহারী কৃতবিদ্য হইয়া পিতার সহিত ওকালতি করিয়া যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতেছেন। এই দম্পতিকে দেখিয়া সকলেই মনে করিত ইহারাই সুখী। বাস্তবিক যদি কেহ এই পৃথিবীতে সুখী থাকে তবে ইহারা দুইজন। কৃষ্ণমতী সন্তানাদি হয় নাই বলিয়া যে দুঃখিতা, তাহা নহে, সে জন্য তাহার শ্বশুরশাশুড়ী দুঃখিত। কৃষ্ণমতীকে যে দেখিত সে বলিত, "কি রূপ গা! এমন রূপ ত কখনও দেখি নাই!" যাহা হউক, কৃষ্ণমতীর রূপের ও গুণের কথা লইয়া দেশে হৈ হৈ পড়িয়া গেল, যেখানে দুই চারি জন স্ত্রীলোক জমিত সেইখানেই কৃষ্ণমতীর কথা হইত।

একটি মনোহর উদ্যানবাটীতে বয়স্যদিগের সহিত সুরাপান করিতে করিতে শ্রীযুক্ত অসিতকুমার বাবু কৃষ্ণমতীর রূপের কথা শুনিলেন, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ওষ্ঠাধর দংশন করিতে লাগিলেন। বয়স্যগণ বুঝিল বনবিহারী ও কৃষ্ণমতীর বড় বিপদ, কেননা অসিতকুমারের অসাধ্য কোন কাজ নাই। কিছু দিন ধরিয়া অসিতকুমার তাঁহার দুই জন প্রিয় বয়স্যের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন, কি পরামর্শ তাহা কেহ জানিতে পারিল না। ইহার সঙ্গে কৃষ্ণমতীকে একবার দেখিবার বাসনা জন্মিল, তাহার সুযোগও হইল। রামচরণ ঘোষাল তাঁহার পৌত্রীর বিবাহোপলক্ষে রাসবিহারী বাবুর বাটীর স্ত্রীলোকদিগকে আনিবার চেষ্টা করিলেন, সফলও হইলেন, কেননা তিনি ম্যানেজার নবীন বাবুর শ্যালক। শাশুড়ী ও অন্যান্য পৌরস্ত্রীর সহিত কৃষ্ণমতী অলঙ্কারে সজ্জিতা হইয়া রামচরণ বাবুর বাটী আসিলেন। অসিতকুমার এই সংবাদ তাঁহার গুপ্তচরের মুখে শুনিলেন। তাঁহার একটা বিশেষ গুণ ছিল যে, তিনি স্ত্রীলোক বেশ ধারণ করিতে শিখিয়াছিলেন, তজ্জন্য গোঁপ দাড়ি রাখিতেন না। রাসবিহারী বাবুর বাটীর মেয়েরা আসিয়াছে, সুতরাং স্ত্রী আচারের সময়ে অন্তঃপুরে কোন পুরুষের যাইবার হুকুম ছিল না, কিন্তু অসিতকুমার রমণীবেশে সামান্য অলঙ্কারে সজ্জিতা হইয়া ঘোমটা টানিয়া যে স্থানে কৃষ্ণমতী ঘরের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া স্ত্রী আচার দেখিতেছিলেন, তাহারই নিকট দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। কৃষ্ণমতী মুখের কাপড় কিঞ্চিৎ

খুলিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, বরকে কেহ কাণ মুলিয়া দিতেছিল, কেহ বা গুম্ গুম্ করিয়া পিঠে কিল মারিতেছিল; তাহা দেখিয়া হাসিতেছিলেন ও সঙ্গিনীদিগকে কি বলিতেছিলেন। অসিতকুমার এইরূপে অনেকক্ষণ কৃষ্ণমতীকে দেখিতে লাগিলেন, পরে স্ত্রী আচার শেষ হইলে, তিনি আর সে বাটীতে থাকিতে সাহস করিলেন না। কিন্তু কৃষ্ণমতীকে দেখিয়া উন্মত্তের ন্যায় হইলেন, বাটী ফিরিলেন না, দুই তিনজন বয়স্য লইয়া বাগান বাটীতে সুরাপান করিতে করিতে কৃষ্ণমতীর কথা কহিতে লাগিলেন; সে রাত্রে অধিক পরিমাণে সুরাপান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাসবিহারী বাবুর বাটীর সদর অন্দরে লোক গিস্‌গিস্ করিতেছে। বনবিহারী একমাত্র সন্তান, বড় আদরের সন্তান, তাহার জন্মদিন উপলক্ষে উৎসব হইতেছে। সাতখানা গ্রামের লোক নিমন্ত্রিত, কি ভদ্র কি ইতর সকল শ্রেণীর লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছে; এ অঞ্চলের যত কাঙ্গালগরীব আছে তাহাদের একদিন ভোজন করান হইবে, ও কিছু কিছু নগদ ও এক একখানা শীতবস্ত্র দান করা হইবে। এই উপলক্ষে রাসবিহারী বাবুর বাটীতে এক সপ্তাহ ধুমধাম চলিবে, অদ্য হইতে উহা আরম্ভ হইল। অবশেষে একরাত্রি নাচ ও এক রাত্রি থিয়েটার হইবে, কিরূপে এই কার্য্য সম্পাদিত হইল, তাহা এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকাতে বিবৃত করিবার আবশ্যকতা নাই। প্রথম দিবসের রাত্রে সাত আটটার সময় একটি নিভৃত কক্ষে অনেকগুলি সমবয়স্কা লইয়া কৃষ্ণমতী পান সাজিতেছিলেন, নানা বিষয়ের গল্প চলিতেছিল, কৃষ্ণমতীর গল্পে সকলেই হাসিতেছিল, কথায় কথায় দুই একটি বালিকার বিবাহের কথা উত্থাপিত হইল। রঙ্গমতী নামে একটি বধূ জিজ্ঞাসা করিল, "উদ্ধারিণীর বিয়ে কবে হবে?" জ্যোৎস্নাবতী বলিল "তার বিয়ে হবে না।"

রঙ্গ।—কেন?

জ্যোৎ।—টাকা কোথায়? গরীব বিধবার মেয়ে, একটি মাত্র রোজগারে ভাই, কলেতে কাজ করে দশটি টাকা পায়, আপনি খায় আর মা বোনকে

খাওয়ায়। একটা ছেলে ঐ কলে কাজ করে, সে বিবাহ ক'র্‌তে রাজি হ'য়েছে বটে, কিন্তু দু'শ' টাকা চায়।

কৃষ্ণমতী।—কেন? এত টাকা কেন? বর কনে দু'জনে ত গরীব তবে এত টাকা চায় কেন?

জ্যোৎ।—সে যে কুলীন।

কৃষ্ণ।—কুলীন বর ছেড়ে অন্য বরকে দিক্ না কেন?

জ্যোৎ।—না তা দিবে না। উদ্ধারিণীর বাপ মৃত্যুর সময় তার মাকে বলে গেছে যে মেয়েটাকে অঘরে দিয়ো না।

কৃষ্ণমতী কিছুক্ষণ ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "উদ্ধারিণীর মা রমণী মাসী কোথায়?"

জ্যোৎ।—তোমাদেরই বাটীতে এয়েছেন।

কৃষ্ণমতী বাহিরে আসিয়া উদ্ধারিণীর মাতাকে খুঁজিয়া একটি ঘরে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "হ্যাঁ গা মাসী, উদ্ধারিণীর বিয়ে দিচ্ছনা কেন?" উদ্ধারিণীর মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে সব কথা বলিল।

কৃষ্ণ।—কত টাকা হ'লে বিয়ে হয়।

রমণীমাসী।—বরকে দু'শ' টাকা আর বিয়ের অন্যান্য খরচ বড় জোর পঞ্চাশ টাকা।

কৃষ্ণ।—মাসী! আমি বড় গরীবের মেয়ে ছিলাম, আমি তোমার কষ্ট বুঝিতে পারিতেছি, বাল্যকালে তুমি আমায় বড় ভালবাসিতে, সর্ব্বদা কোলে পিঠে করিতে, উদ্ধারিণীর বিয়ের জন্য আমি আড়াই শ' টাকা দিতেছি, তুমি তার বিয়ে দাও গে। আমি তাকে বোনের মত দেখি, আমার টাকায় বিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হয়ো না।

এই বলিয়া দশ টাকা মূল্যের পঁচিশ খানি নোট রমণী মাসীর হাতে গুনিয়া দিলেন, ও আর একটি অনুরোধ করিলেন যেন এই কথাটি গোপনে থাকে। রমণীমাসী কাঁদিতে কাঁদিতে যথেষ্ট আশীর্ব্বাদ করিলেন ও এই দান গোপন রাখিতে স্বীকৃতা হইলেন। কিন্তু ইহা গোপনে রহিল না, সকলেই জানিতে পারিল যে স্বামীর জন্মদিনে একজন গরীব বিধবা কন্যার বিবাহের জন্য কৃষ্ণমতী আড়াইশত টাকা দান করিয়াছেন।

যে দিবস স্ত্রীলোক খাওয়ানো হয়, সেই দিবস সন্ধ্যার সময় বাটীর অনেকগুলি স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে কৃষ্ণমতী খিড়্‌কি পুকুরে পা ধুইতে

গিয়াছিলেন। পাড়ার একটি মেয়ে পেট-ভরে খেয়ে তাহার একটি শিশু ছেলেকে পাড়ের কিঞ্চিৎ দূরে রাখিয়া হাত-মুখ ধুইতে গিয়াছিল, শিশুটি হামাগুড়ি দিয়া পাড়ের ধারে আসিয়া জলে পড়িয়া গেল। উহা দেখিয়া কৃষ্ণমতী চীৎকার করিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া শিশুকে তুলিতে গেলেন; কিন্তু সাঁতার না জানাতে আপনি ডুবিয়া গেলেন; ঘাটের স্ত্রীলোকেরা জলে ঝাঁপ দিয়া কৃষ্ণমতীকে ও শিশুকে তুলিল। এই সংবাদ পাইয়া বাটীর স্ত্রীলোকরা পুকুরে দৌড়াইয়া আসিল এবং যখন কৃষ্ণমতী হাসিতে হাসিতে উপরে উঠিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে ভৎসনা করিতে লাগিলেন। ম্যানেজার নবীন বাবুর স্ত্রী বলিলেন, "হ্যাঁমা! তুমি সাঁতার জান না, কি সাহসে জলে ঝাঁপ দিয়া ছেলে তুলিতে গেলে?"

কৃষ্ণমতী।—জ্যাঠাই মা, একটা কচিছেলে রোয়াক হইতে পড়িয়া গেলে যেমন সকলে দৌড়িয়া তাহাকে তুলিতে যায়, আমি সেই ভাবে উহাকে তুলিতে গিয়াছিলাম। ঐখানে যে গভীর জল ছিল তাহা বুঝিতে পারি নাই।

জ্যাঠাইমা।—কে জানে মা, আমি তোমায় আজও চিন্‌তে পার্‌লাম না; তুমি সৃষ্টিছাড়া মেয়ে।

অন্তঃপুরে নিজশয্যাগৃহে স্ত্রীর নিকট বসিয়া অসিতকুমার এই সকল কথা শুনিয়া স্তম্ভিত ও নিরুৎসাহ হইলেন, তাঁহার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এইটুকু আসিল, যে স্ত্রীলোক আপন জীবন দিয়া পরের শিশু ছেলেকে রক্ষা করিতে যায়, তাহাকে হস্তগত করা অসম্ভব। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বিছানায় শুইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অদ্য রাসবিহারী বাবুর বাটীতে 'নাচ' হইবে, একজন বিখ্যাত মুসলমান বাইজীর নাচ গান হইবে। সদর বাটী জনাকীর্ণ, উঠানে, বারান্দায়, রোয়াকে, দালানে, এবং দোতালার বারান্দায় "ন স্থানং তিলধারণম্", আর রোসনাই ও বাটী সাজানর ত কথাই নাই; ছোট গল্পেতে সে সকল কথা লিখিতে গেলে চলে না। অন্দরেও এইরূপ রোসনাই, কিন্তু জনমানব নাই, কেবল খিড়কি-

দ্বারে একজন সিপাহী পাহারায় আছে, ঐ দ্বার দিয়া পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় দেশের স্ত্রীলোকগণ নাচ দেখিতে প্রবেশ করিতেছে এবং একাবেক সদর বাটীতে যাইতেছে, সুতরাং অন্দরে জনমানব নাই, কেবল তিনজন দাসী অন্তঃপুরের হেপাজতে আছে। এই তিনজন দাসীর মধ্যে একজন দাসী বিশেষ উল্লেখ-যোগ্যা, তাহার নাম গুণমণি, বড় বিশ্বাসী, বড় দরদী, বড় চতুরা, বড় সাহসী ও প্রত্যুৎপন্নমতি—গিন্নির আমলের দাসী, অনেক কালের দাসী, সুতরাং অন্যান্য দাসদাসীরা এমন কি রাসবিহারী বাবুর কর্ম্মচারিগণ তাহাকে গুণমাসী বলিয়া ডাকিত। গুণমাসী চাকরাণীদের সর্দ্দার, সকলে তাহার হুকুমে চলিত, কিন্তু মধ্যে মধ্যে গুণমাসী তাহাদের উপর পীড়ন করিত, সেজন্য তাঁবেদার চাকরাণীরা তাহার উপর বড় নারাজ ছিল। হলে হয় কি, গুণমাসী এতই বলিষ্ঠা যে, সে তিন চারিজন পুরুষের মহাড়া লইতে পারিত, সেজন্য তাহারা গুণকে ভয় করিত। মোট কথা, সেকালের যে মুসলমান বাদসাদের অন্তঃপুরে তাতার প্রহরিণী থাকিত, গুণমাসী বাঙ্গালীকুলে সেইরূপ একজন জন্মিয়াছিল। ছোট লোকের মেয়েদের দেবতা ব্রাহ্মণের প্রতি বড় ভক্তি থাকে। গুণমণির দেবতার প্রতি ভক্তি ছিল বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণের প্রতি কিছুমাত্র ছিল না। একদিন গুণমাসীর দাঁতের গোড়া ফুলিয়া বড় কষ্টদায়ক হইয়াছিল। দাসীদের উপর প্রভুত্ব চলিত না, বাম গাল বামহস্ত দ্বারা চাপিয়া 'উহু উহু' করিয়া বেড়াইত, দাসীরা উহা দেখিয়া টিট্‌কারি দিয়া হাসিত, গুণমাসী সেজন্য অতিশয় দুঃখিত হইয়া শ্যামসুন্দরের নিকট হরিরলুট মানিয়াছিল, কিন্তু পোন পয়সার হরিরলুট। কৃষ্ণমতী উহা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন "গুণ, ছি ছি ছি! তুমি শ্যামসুন্দরকে এত ভক্তি কর তাঁকে পোন পয়সার পূজা দেবে?" গুণ বলিল "গরীব মানুষের এই ঢের। শ্যামসুন্দর আমাকে টাকা দিন না আমি পাঁচসিকার হরিরলুট দিব।" কৃষ্ণমতী পাঁচসিকা দিতে চাহিলেন, গুণ তাহা লইল না, বলিল "আপনার গতর খাটনের রোজগার থেকে হরিরলুট দিব, নইলে আবার দাঁতের গোড়া ফুলবে।"

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে; কৃষ্ণমতী নাচ গান ভাল না লাগাতে অন্তঃপুরে নিজকক্ষে ফিরিয়া আসিলেন, এই মহলে কেবল উপরোল্লেখিত তিনটি দাসী মাত্র ছিল, তাহারা নীচে রোয়াকে বসিয়া যে সকল স্ত্রীলোক অন্দরে প্রবেশ করিয়া সদরে যাইতেছিল তাহাদের দেখিতেছিল। এমন সময়ে একটি অপরিচিতা অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোক সদরের দিকে না যাইয়া অন্দরের রোয়াকে উঠিয়া দালানে প্রবেশ করিয়া কৃষ্ণমতীর মহলের দিকে যাইতেছিল, পরিচারিকাত্রয়

উহা দেখিয়া তাহার পশ্চাৎ লইল। গুণমাসী জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কোথায় যাইতেছেন?"

অপরিচিতা।—তোমাদের কৃষ্ণমতীর সহিত দেখা করিব।

গুণ। আপনি এইখানে বসুন, তিনি কোথায় আছেন, আমি দেখিয়া আসি। আপনার সহিত কি তাঁহার কখনও জানা শুনা ছিল?

অপ। এলাহাবাদে সর্ব্বদা—আমাদের দেখা শুনা হইত।

অপরিচিতা চুপি চুপি কথা কহিতেছিল, কিন্তু গুণমণির সন্দেহ হওয়াতে পার্শ্বের ঘরের একখানা কেদারা টানিয়া 'এইখানে বসুন' বলিয়া চলিয়া গেল এবং তাহার ইঙ্গিতে অপর দুইজন দাসী তাহার সঙ্গে গেল। কক্ষ নির্জ্জন দেখিয়া অপরিচিতা অবগুণ্ঠন কিঞ্চিৎ অপসৃত করিয়া এদিক ওদিক দেখিতে লাগিল। এই অবসরে নিকটের ঘর হইতে ঐ তিনজন দাসী তাহাকে স্পষ্ট-রূপে দেখিয়া চিনিতে পারিল। কিছুক্ষণ পরে গুণ আসিয়া অপরিচিতাকে বলিল, "আপনি বসুন, তিনি কাপড় ছাড়িতেছেন, গহনা খুলিতেছেন, একটু বিলম্বে আপনাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইব।" ইতিমধ্যে পিছনের দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া কে একজন হঠাৎ অপরিচিতার মুখে হাত দিয়া কি মাখাইতে লাগিল, অপরিচিতা চীৎকার করিয়া যেমন মুখ হইতে ঐ ব্যক্তির হাত সরাইবার চেষ্টায় দুইহাত তুলিলেন, অমনি গুণমণি কাপড়ের ভিতর হইতে একগাছ সরু ছিপ্‌ছিপে লাক্‌লাইন দড়ি দ্বারা তাহার দুইহাত বাঁধিতে লাগিল, তৃতীয় দাসী তাহাকে সাহায্য করিতে লাগিল; ইতিমধ্যে যে দাসী অপরিচিতার মুখে তেল ও টিকের গুঁড়া মাখাইয়াছিল সে আবার চুণ দ্বারা অপরিচিতার মুখমণ্ডল অলঙ্কৃত করিল,—অবগুণ্ঠনবতীর এখন অতি ভয়ঙ্কর রূপ হইল। তিনি গুণকে বলিলেন "তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, আমি তোমাকে অনেক টাকা দিব, তোমাকে আর দাসীপনা করিতে হইবে না।" গুণমণি অপরিচিতার দাড়ি ধরিয়া আদর করিয়া বলিলেন, "ও আমার সোণারচাঁদ! তুমি রাসবিহারী বাবুর বাটী ঢুকেছ তোমার এখন হ'য়েছে কি? আরো কত আদর খাবে" এই বলিয়া একটা গরাদেতে তাঁহাকে বাঁধিয়া অপর দুইজন দাসীর জিম্মায় তাহাকে রাখিয়া খিড়্‌কিতে আসিয়া সিপাহিকে বলিল—

লছমনসিং, আমি এখনো খাই নাই, আমার একটু দই খাবার সাধ হ'য়েছে, তুমি যদি ভাঁণ্ডারী যদু ঠাকুরের কাছ থেকে একটু দই এনে দাও তবে পেট ভরে খাই।

লছ। দ-হি দ-হি।

গুণ। হাঁ দহি।

লছ। হামি তা এনে দিতে পারে, তো, খিড়কি পাহারা দেবে কে?

গুণ। হামি দেবে।

লছমন। হাঁ গুণোমাসী তুমি তা পারবে। এই বলিয়া সে দই আনিতে চলিয়া গেল।

ইত্যবসরে গুণো অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তাহার দুইজন সঙ্গিনী দাসীর সাহায্যে অপরিচিতার হাতের দড়ি ধরিয়া অন্তঃপুর হইতে তাহাকে বাহির করিয়া নিকটস্থ একটী ক্ষুদ্র ঝোপে বাঁধিয়া লছমন সিংহের অপেক্ষা করিতে লাগিল, লছমন সিং আসিলে বলিল "এখন দহি তোমার নিকট রাখ। আমি আসছি" এই বলিয়া দাসী তিনজন অপরিচিতাকে লইয়া কোথায় গেল। অনতিবিলম্বে ফিরিয়া আসিল।

এই গভীর রাত্রে নাচের মজলিসে গুণ গুণ শব্দে একটা জনরব উঠিল যে, একটা প্রেত্নিনী দেখা গিয়াছে, রামেশ্বরের মন্দিরের নিকট বড় রাস্তার ধারে মিউনিসিপাল আলোর থামের নিকট দাঁড়াইয়া আছে, যে যেখানে ছিল দৌড়িয়া দেখিতে গেল। এইরূপে নাচের মজলিসের অর্দ্ধেক লোক সেখানে উপস্থিত হইল। দেশের একজন ভদ্রলোকের ষণ্ডা গুণ্ডা ছেলে একখান ভিজে তুয়ালের দ্বারায় প্রেত্নিনীর মুখ মুছাইয়া দেওয়াতে সকলেই করতালি দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"বদমায়েস অসিত কুমার, মার ঝাঁটা!" এই প্রকারে অসিত বাবুকে গালি দিতে লাগিল। সকলেই অসম্মান করিল, নিকটে যে কয়টা বড় বড় বাটি আছে তাহার মধ্যে একটা বাটিতে অসিতকুমার প্রবেশ করিয়াছিল। যাহা হউক, অসিত কুমার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া তাহার উত্থান বাটিতে দৌড়িয়া পলাইলেন।

বড় ঘরের ছোট কথা পর্য্যন্ত গোপন থাকে না, রঞ্জিত হইয়া প্রকাশ হয়, কিন্তু গুণো মাসীর কৌশলে এ কথা প্রকাশ হইল না। তাহার সঙ্গিনী দাসী দুইজন, এই কথা গোপন করিয়া পেট ফুলিয়া মারা যাইবার উপক্রম হইল, কিন্তু গুণো দাসীর ভয়ে উহা প্রকাশ করিতে পারিল না; আধমরা হইয়া রহিল। আমাদের বিবেচনায় গুণোমাসীর এই কথাটা বাটীর কর্ত্তা রাসবিহারী বাবুকে ও কৃষ্ণমতীর স্বামী বনবিহারীকে বলিয়া তাঁহাদের সতর্ক করা উচিত ছিল।

অসিতকুমার বাগান বাটীতে যাইয়া বিছানা লইলেন, তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে কৃষ্ণমতীর কৌশলে এবং হুকুমে তাহার দাসীরা তাঁহাকে সং সাজাইয়া রাস্তায় বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। কৃষ্ণমতীকে তিনি কখন ভালবাসেন নাই, তাহার প্রকৃতির লোকের হৃদয়ে কখন ভালবাসা জন্মিতে পারে না, তবে তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া অসিতকুমারের চিত্তমালিন্য জন্মিয়াছিল। এক্ষণে কৃষ্ণমতীর প্রতি ক্রোধ উপস্থিত হইল, কি প্রকারে তাহাকে চিরদুঃখিনী করিবেন তাহারই চেষ্টায় রহিলেন। তাহার সুযোগও হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

চাঁদড়া গ্রামে বনবিহারী বাবুর মামার বাটী, চাঁদড়ার কৃষ্ণনাথ ঘোষাল তাঁহার মাতুল। কৃষ্ণনাথ বাবু হাজার বিঘা চাষি জমির মালিক, সুতরাং তাঁহার কিছু অভাব ছিল না, রাসবিহারী বাবুর শ্যালক পরিচয় দিয়া তিনি পল্লীগ্রামবাসীদিগের নিকট বড়লোক হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে এবং ভগিনী ও ভাগিনেয়কে একবার তাঁহার বাটীতে আনিতে পারিলে, যেন তাঁহার গৌরব আরও বৃদ্ধি হয়, এই ভাবিয়া চিন্তিয়া শ্যামাপূজার কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহাদের আনিবার জন্য স্বয়ং নীলাপুর উপস্থিত হইলেন। বহুকালের পর ভগ্নী তাঁহাকে দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ভাগিনেয় বনবিহারী তাঁহাকে পিতার ন্যায় সম্মান করিলেন। কর্ত্তা রাসবিহারী বাবু মোকদ্দমা উপলক্ষে কলিকাতায় ছিলেন, কিন্তু তাহার জন্য কৃষ্ণনাথ বাবুর কার্য্যের কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই। ভগিনী ও ভাগিনেয় শ্যামাপূজার সময় তাঁহার বাটীতে যাইতে স্বীকৃত হইলেন। কৃষ্ণনাথ বাবু বিশেষ আপ্যায়িত হইয়া চলিয়া গেলেন। এ বৎসর তিনি শ্যামা-পূজা বড় ধুমধামের সহিত করিবার উদ্যোগ করিলেন।

কৃষ্ণমতী এই বন্দোবস্তে বিশেষ আপত্তি করিতে লাগিলেন। বনবিহারী বলিল, "কেন যাইতে নিষেধ করিতেছ ?"

কৃ। তা তোমাকে বুঝাইয়া বলিতে পারিব না।

বন। বুঝাইবার চেষ্টা কর দেখি।

কৃ। কি চেষ্টা করিব, মনে মনে নানাপ্রকার কু গাইতেছে।

বন। ছি! তুমি ত ঘ্যান ঘ্যানে প্যান প্যানে স্ত্রী ছিলে না! স্বামী দুই দিনের জন্য কোথাও যাইতে চাহিলে ঘ্যান ঘ্যান প্যান প্যান করিতে না, নীলাপুরে এসে এরূপ হ'য়েছ বুঝি?

কৃষ্ণ। তা যদি হইয়া থাকে, সে ত অসঙ্গত নহে, জান ত কি প্রবল শত্রু সম্মুখে বসে আছে! তা জেনে শুনেও তুমি আমাকে একাকিনী রেখে যাচ্চ, ছিঃ!

বন। (হাসিয়া) কাহার সাধ্য তোমার কিছু অনিষ্ট করে, সদর খিড়কী অষ্টপ্রহর পাহারায় আছে, একটী মাছি পর্য্যন্ত প্রবেশ ক'রতে পারে না, আর ২০।২৫ জন বাটীর স্ত্রীলোকে তোমাকে সর্ব্বদা ঘেরে থাকে, আবার ম্যানেজার নবীন বাবু বাঘের মৃতন বসে আছেন।

কৃষ্ণ। তাত সব বুঝলুম, আমি ত আমার জন্য ভয় পাইতেছি না, আমার ভয় কেবল তোমার জন্য।

বন। কি ভয়?

কৃষ্ণ। তা বুঝাইয়া বলিতে পারিব না।

বন। তা না পার, তবে আমি কিছুদিনের জন্য মামার বাড়ী বেড়াইয়া আসি, কি বল?

কৃষ্ণমতী বুঝিলেন যে, স্বামীর মামার বাটী যাইবার বড় ইচ্ছা হইয়াছে, আর কোন আপত্তি না করিয়া মনের কষ্ট সংযত করিয়া স্বামীর সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। ইহার তিন চার দিবস পরে বনবিহারী বাবু মাতাকে লইয়া চাঁদড়া যাত্রা করিলেন। বারো চৌদ্দক্রোশ দূর, মাঠাল পথ ধরিয়া যাইতে হয়। ট্রেন কি ঘোড়ার গাড়ির পথ নহে, মাতা পুত্রে দাসদাসী লইয়া পাল্কিতে গেলেন।

এই সংবাদ অসিতকুমারের নিকট পৌঁছিল। তাহার দুইজন মাত্র বয়স্য, যাহারা তাহার অসৎ কার্য্যে সহায়তা করিত, তাহারাই কেবল ঐ স্থানে বসিয়া ছিল। অসিতকুমার তাহাদের বলিলেন "এই সময় হইয়াছে। ইহারা দুইজন ছাড়াছাড়ি হইয়াছে।" এই বলিয়া তাহারা তিন জনে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ইহার ফল, পরবর্ত্তী ঘটনাতে প্রকাশ পাইবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

"কেন আমার স্ত্রীর জন্য মন এত চঞ্চল হইয়াছে? কেন আমার এত মন কাঁদিতেছে?"

অন্ধকার অমাবস্যার নিশীথে বনবিহারী বাবু একজন ভৃত্য সমভিব্যাহারে এই ভাবিতে ভাবিতে একটী প্রকাণ্ড প্রান্তরে দ্রুত পদে গমন করিতেছিলেন। মাতুল কৃষ্ণনাথ বাবু বনবিহারীর বাটী আসিবার জন্ম ব্যাগ্রতা দেখিয়া তাঁহাকে আহারাদি করাইয়া, পূজার দিবসে এক খানি পাল্কি করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। পথিমধ্যে সন্ধ্যার সময় পাল্কির বাঁট ভাঙ্গিয়া তিনি পাল্কির সহিত পড়িয়া গেলেন। বনবিহারী আর পাল্কি কি গরুর গাড়ির চেষ্টা করিলেন না, পদব্রজেই তাঁহার ভৃত্য হারাধন বাগ্দির সহিত আসিতেছিলেন। রাত্রি প্রায় এক প্রহর, প্রকাণ্ড প্রান্তর, আকাশ ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, গম্ভীর গর্জ্জনে মেঘ ডাকিতেছে, অন্ধকারে কোলের মানুষ দেখা যায় না, কেবল এক এক বার বিদ্যুদালোকে পথ দেখা যাইতেছিল। এই প্রান্তরে ঝড় বৃষ্টির পূর্ব্ব লক্ষণ বুঝিয়া ভৃত্য হারাধন মুনিবকে বলিল, "আজ্ঞে, বড় ঝড় বৃষ্টি হইবার সম্ভব, আমি আমাদের গ্রামের পথ চিনিতে পারিতেছি না।"

বন। সে কি! এখন উপায়?

হারা। উপায় আছে বই কি, আমার বোধ হয়, রমণপুরের দীঘি ক্রোশখানেক দূরে আছে, উহার উত্তরে রমণপুর গ্রাম, ঐ গ্রামে আপনার খুড়া বিশুবাবুর বাড়ী। এস্থানে অন্ধকার রাত্রে থাকলে ভাল হয়, না হয় ঐ গ্রাম হইতে একখান পাল্কি কি গরুর গাড়ি ভাড়া করিয়া এই রাত্রেই বাড়ী যাইবেন। বোধ হয়, পাল্কি পাওয়া যাইবে না।

বনবিহারীর 'এক জ্ঞাতি খুড়া বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ গ্রামে বাস করিতেন, তিনি এবং তাঁহার স্ত্রী রাসবিহারীকে আপনাদের পুত্রের ন্যায় ভাল বাসিতেন, সম্প্রতি তাহারা বনবিহারীকে দেখিবার জন্ম নীলাপুরে গিয়াছিলেন, শ্যামাপূজা উপলক্ষে বাটী ফিরিয়া আসিয়াছেন। বনবিহারী বুঝিলেন যে, এই পরামর্শই ভাল, এবং ইহা স্থির করিয়া পশ্চিমের রাস্তা ধরিলেন।

কিছু দূর আসিয়া এক অতি বিস্তৃত জলা দেখিয়া, হারাধন বলিল, "বাবু পথ বুঝিতে পারিতেছি না, বোধ হয় আমরা হাড়িনীর জলাতে আসিয়া পড়িয়াছি।"

বন। হাড়িনীর জলা কি হারাধন?

হারা। আজ্ঞে, শুনা আছে, যে চাঁদি (চন্দ্র) হাড়িনী নামে এক মাগী এইরূপ এক অন্ধকার রাত্রে পথ ভুলিয়া এই জলাতে আসিয়া পড়ে, দুই এক পা যেতে যেতে ক্রমে কোমর পর্য্যন্ত, শেষে গলা পর্য্যন্ত দঁকে পড়িয়া আর উঠিতে পারিল না, অবশেষে এই নির্জ্জন অন্ধকার তেপান্তর মাঠে সে মরিয়া গেল, কিন্তু মরেও মরে নাই।

বন। সে কি?

হারা। আজ্ঞে, সে কথা আর এ ভয়ঙ্কর স্থানে কায নাই।

বনবিহারী বুঝিলেন যে, সাধারণের ধারণা যে হাড়িনী মাগী প্রেতিনী হইয়া এই মাঠে বিচরণ করে। যাহা হউক, তাঁহার নিজের ঐ হাড়িনীর দশা না হয়, এই ভাবিয়া ঐ পথ ত্যাগ করিয়া হারাধনের প্রদর্শিত পথ ধরিলেন। ইতি মধ্যে হারাধন "রাম! রাম! রাম!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। আর "বাবু শিগ্‌গির আসুন, মাগী জলাতে দেখা দিয়াছে" বলিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিল। এই শুনিয়া বনবিহারী জলার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কেবল অন্ধকার—চতুর্দ্দিকে ঘোরতর অন্ধকার। একবার বিদ্যুৎ চমকাইলে দেখিলেন, সম্মুখে অতি বিস্তৃত জলা, বিদ্যুদালোকে উহার জল চিক চিক করিতেছে। কিছুক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। হারাধনের উত্তেজনায় আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু যে দিকে যান সেই দিকেই কর্দ্দম, কোন্ পথ কর্দ্দমহীন তাহা বুঝিতে পারিলেন না, বড় গোলে পড়িলেন। হারাধন বড় চতুর ও হুঁসিয়ারি, খুঁজে খুঁজে সেই পথ বাহির করিল। ইতি মধ্যে বনবিহারী হঠাৎ একটা আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া দাঁড়াইলেন, ঐ জলা হইতে একটা আলো দপ্ করিয়া জলিয়া উপরে কিছুদূর উঠিয়া নিবিয়া গেল, এইরূপ দুই একবার দেখিলেন, তিনি কখনও আলেয়া দেখেন নাই; কিছুক্ষণ ঐখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। হারাধন "রাম! রাম" নাম করিতে করিতে ছুটাছুটি করিতে লাগিল; বাবুকে একাকী রাখিয়া পলাইতে পারে না, অথচ ভয়ে সেখানে দাঁড়াইতে পারে না। আর ঐরূপ আলো না দেখিতে পাইয়া বনবিহারী চলিলেন।

এইরূপে অন্ধকারে পথিভ্রান্ত দুইজন পথিক ঘুরিতে ঘুরিতে অর্দ্ধঘণ্টার পর বিদ্যুদালোকে একটা বৃহৎ জলাশয়ের উচ্চ পাড় দেখিতে পাইলেন। হারাধন রাম নাম ছাড়িয়া আনন্দে চীৎকার করিয়া বলিল "বাবু এই রমণীপুরের দীঘি, ইহার উত্তরে রমণপুর গ্রাম।" কিঞ্চিৎ পরেই উভয়ে দীঘির ঘাটের

নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা মানসিংহ বাঙ্গালায় প্রতাপাদিত্যকে শাসন করিতে আসিবার সময় তাঁহার ফৌজদিগের জন্য এক অতি প্রশস্ত রাস্তা প্রস্তত করিয়াছিলেন;—অদ্যাপি উহা গৌড়বঙ্গের রাস্তা বলিয়া পরিচিত। আর ফৌজদিগের জল ব্যবহারের জন্য ঐ রাস্তার অনতিদূরে মধ্যে মধ্যে এক একটা অতি বৃহৎ জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন; ঐ দীর্ঘিকাও মানসিংহের আদেশে খোদিত হইয়াছিল। গৌড়বঙ্গের রাস্তা উহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে। বনবিহারী—পদব্রজে কিছুদূর ঐ রাস্তা ধরিয়া আসিয়াছিলেন, অন্ধকারে ঘুরিতে ঘুরিতে আবার সেই রাস্তার নিকট আসিলেন। এই দীর্ঘিকার চারিদিকে চারিটি ঘাট ছিল, (বাঁধা-ঘাট নহে); উত্তর দিকের ঘাটে একটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ ডালপালা চতুর্দ্দিকে বহুদূর বিস্তৃত করিয়া তাহার শতাধিক বর্ষ বয়সের পরিচয় দিতেছিল। পথিকদ্বয় দক্ষিণদিকের মাঠের রাস্তা দিয়া দীঘিতে প্রবেশ করিলেন। বনবিহারী গায়ের জামা খুলিয়া হারাধনের হাতে দিয়া, মাথায় চাদর বাঁধিয়া এক গাছি লাঠি হাতে হন্ হন্ করিয়া চলিলেন, এখন তৃণাচ্ছাদিত সমতলভূমি পাইয়া অতি দ্রুত চলিতে লাগিলেন, ইতিমধ্যে উত্তরের ঘাট হইতে রমণীকণ্ঠনিঃসৃত ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইয়া হারাধন আবার রাম! রাম! বলিতে লাগিল। পাঁচ ছয় মিনিট পরে বনবিহারী বিদ্যুদালোকে দেখিলেন যে, একটি স্ত্রীলোক এলোচুলে জল হইতে ধীরে ধীরে উঠিয়া বটবৃক্ষের তলে যাইল। হারাধন বলিল "বাবু, ঐ দেখুন"। বনবিহারী বলিলেন "হুঁ, দেখেছি।" জলাশয় দৈর্ঘ্যে অতি বিস্তৃত; সেজন্য উত্তরের ঘাটে পথিকদিগের পৌছিতে কিছু বিলম্ব হইল। তাঁহারা পৌছিয়া দেখিলেন, সেখানে জনমানব নাই, বটবৃক্ষ তলাতেও কেহ নাই, কেবল উহার তলস্থ সিমেণ্টনির্ম্মিত বেদীতে জলের চিহ্ন রহিয়াছে যেন কোন স্ত্রীলোক ঐ স্থানে ভিজে কাপড়ে দাঁড়াইয়াছিল। বনবিহারী গ্রাম্যপথ অবলম্বন করিয়া চলিলেন, রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর হইয়াছে। গ্রামের ভিতর হইতে কাঁসর ঘণ্টা ঢাকঢোল বাজনার শব্দ শুনিলেন। তিনি যে পথে যাইতেছিলেন তাহা নির্জ্জন, কেননা উহা গ্রামপ্রান্তে। কিছুদূর যাইয়া দেখিলেন একটি স্ত্রীলোক একটা কলসী লইয়া দীঘিতে জল লইতে আসিতেছে। বনবিহারী বিদ্যুদালোকে তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিলেন, তাঁহার বিশুখুড়ার পরিচারিকা নাম রমণী, সে সম্প্রতি তাঁহার খুড়াখুড়ীর সহিত নীলাপুরের বাটীতে তাঁহাদের দেখিতে গিয়াছিল। তাহার পশ্চাৎ একজন পুরুষ আসিতেছিল, দূরতাবশতঃ তাহাকে চিনিতে পারিলেন না। পরিচারিকা রমণী

অন্ধকারে একটা মাথায় পাগড়ী মানুষ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে—র‍্যা, কে আসচে—র‍্যা ? আমর্ ! উত্তর দেয় না কেন ?" বনবিহারী পরিচারিকাকে চিনিতে পারিয়া বড় আশান্বিত হইয়া বলিলেন, "রমণী, আমি।" রমণী বলিল, "তুই কে—র‍্যা মিন্‌সে, নাম বল্‌না।" অনাহারে পথিশ্রান্তে বনবিহারীর গলা শুকাইয়া গিয়াছিল, ঈষৎ বিকৃতস্বরে তিনি বলিলেন, "আমি তোমাদের নীলাপুরের বনবিহারীবাবু, আমাদের বাটীর সংবাদ জান ?" এই কথায় পরিচারিকা রমণী কলসী ফেলিয়া চীৎকার করিয়া দৌড়িতে লাগিল,—"ওরে—বাবারে—এগোরে—আমায় ভূতে ধর্‌লেরে—ও জীবন, ও জীবন—ও জীব্‌নে—মিন্‌সে তুই কোথায়—এগোনা—আমাদের বনবিহারী বাবু ভূত হ'য়ে আমারই কি ঘাড়ে চাপ্‌তে এয়েচে !" জীবন পশ্চাৎ হইতে ধমক দিল, "চুপ কর্—ও কথা মুখে আনিস্ নি।" রমণী বলিল, 'ওরে মিন্‌সে—চুপ ক'র্‌ব কি—তুই এগিয়ে গিয়ে দেখ্‌না।" জীবন অগ্রসর হইতে পারিল না। ইতিমধ্যে হারাধন জীবনের কণ্ঠস্বরে তাহাকে চিনিতে পারিয়া বলিল, "জীবন ! রমণী মাগী কি বলে—র‍্যা ?" হারাধনের গলার স্বর শুনিয়া জীবন অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথায় গিয়াছিলে ?"

হারাধন। আমাদের বাবুর সঙ্গে তাঁর মামার বাড়ী গিয়াছিলাম।

জীবন। তিনি কেমন আছেন ?

হারাধন। তিনি ভাল আছেন, এই যে তোমার সম্মুখে।

তখন বনবিহারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "জীবন, আমাদের বাড়ীর কোন সংবাদ জান ?"'

জীবন ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—আজ্ঞে জানি না।

বনবিহারী। আমি অদ্য রাত্রেই বাড়ী যাইব, তুমি একখানা পাল্কী করিয়া দিতে পার ?

জীবন। পাল্কী পাওয়া বড় কঠিন, কিন্তু গরুর গাড়ী পাওয়া যাইবে।

বন। তবে শীঘ্র আন, আমি এক্ষণেই রওনা হইব।

জীবন। তবে আমার সঙ্গে আসুন।

বন। কোথায়, বিশুকাকার বাটী ?

জী। না, সেখানে যাইলে অদ্য রাত্রে ছেড়ে দিবেন না। আমার বাটীতে অপেক্ষা করিবেন—আসুন।

পথে যাইতে যাইতে হারাধন জিজ্ঞাসা করিল "জীবন, তোমাদের দীঘির বটগাছে কি পেত্নী আছে?"

জীবন। তা'ত কখনও শুনি নাই।

হারা। আমরা দক্ষিণের ঘাট হইতে প্রথমে একটা মেয়ের কান্না শুনিলাম, পরে দেখিলাম একটী মেয়ে জল হইতে চুল এলো ক'রে বটগাছে গিয়া উঠিল।

জী। ওঃ—আমাদের গাঁয়ে কোন গৃহস্থবাটীর মেয়েরা তাহাদের এক জ্ঞাতির মৃত্যুসংবাদ পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঐ দীঘিতে নাইতে গিয়াছিল, আমাদের এই অ-গঙ্গার দেশে ঐ দীঘিতে নেয়ে সকলে শুদ্ধ হয়।

বন। কে—কে মরেছে?

জী। কি জানি, আমি মনিব বাড়ীর পূজার কাজ করিতেছিলাম।

বনবিহারী নীরব হইয়া রহিলেন। পরে হারাধন জিজ্ঞাসা করিল, "জীবন, রমণী মাসী কি বল্‌তে বল্‌তে পালাল?"

জী। ওর কথা শুনো না, ওর একটা ভারী রোগ হয়েছে, কেবল ভূত দেখে আর ভূত ভূত করে; ওর বুঝি ইষ্টি রস্ হইয়াছে।

বনবিহারী জীবনের বাটীতে পৌছিয়া পথশ্রান্তিতে এবং মানসিক যন্ত্রণায় নিদ্রাভিভূত হইয়া একখানি তক্তপোষের উপর ঘুমাইয়া পড়িলেন, এমত সময়ে গভীর গর্জ্জনে ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। রাত্রিশেষে জীবন একখানি গরুর গাড়ী আনিয়া বনবিহারীকে উঠাইল, তখনও মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। গাড়ীখানির উপর দরমার আবরণ ছিল; বনবিহারী গাড়িতে উঠিলেন, হারাধন ও জীবন একখানি ত্রিপল মুড়ি দিয়া বসিল, জীবন গাড়ি হাঁকাইতে লাগিল। বৃষ্টির জন্য পথ অতি দুর্গম হইয়াছিল, জীবন ও হারাধন মধ্যে মধ্যে নামিয়া চাকা ঠেলিতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, এমন সময়ে বনবিহারী নিজগ্রামে পৌছিলেন। গরুর গাড়ী ত্যাগ করিয়া পদব্রজে চলিলেন। গ্রামপ্রান্তে পথ কর্দ্দমময়, উভয় পার্শ্বে বড় বড় আমবাগান, উহার ভিতরে অন্ধকার ঘনীভূত হইতেছে. ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকিতেছে, জোনাকি পোকা দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। বনবিহারী দ্রুতপদে চলিলেন। গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, একস্থানে বালকেরা

পাঁকাঠির আলো জালিয়া খেলা করিতেছে, বনবিহারীকে দেখিবামাত্র তাহারা পাঁকাঠি ফেলিয়া পলাইল। বনবিহারী বুঝিলেন যে, অসিতকুমার তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার মৃত্যু রটনা করিয়াছে, সেই সংবাদ রমণপুরে তাঁহার বিশু-খুড়ার বাটী পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে; সেই সংবাদ শুনিয়া তাঁহার খুড়ী কাঁদিতে কাঁদিতে রাত্রি দ্বিপ্রহরে দীঘিতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন, সেই সংবাদে রমণী দাসী তাঁহাকে দেখিয়া ভূত ভূত করিয়া পলাইয়াছিল। কিন্তু এমন আশ্চর্য্য কৌশলের সহিত মৃত্যু সংবাদ রটনা করিয়াছে যে সকলেই উহা বিশ্বাস করিয়াছে। যাহা হউক, কথাটা তিনি হাসিয়া উড়াইতে পারিলেন না, কেননা যদি তাঁহার মৃত্যু সংবাদ তাঁহার স্ত্রীর কানে উঠিয়া থাকে তবে তাঁহার কি অবস্থা হইয়াছে! এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বাটীর সন্নিকটে পৌছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের ছাদের উপর যাহা দেখিলেন ও শুনিলেন তাহাতে তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া ঘুরিয়া পড়িলেন, পিছন হইতে হারাধন তাঁহাকে ধরিল। দোতালার ছাদের উপর অনেকগুলি দাসীবেষ্টিতা আলুলায়িতকেশা কৃষ্ণমতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন, "আমি অনেক দিন তাঁকে দেখি নাই, আর না দেখে থাকতে পারি না" ইত্যাদি। বনবিহারী টলিতে টলিতে গৃহে প্রবেশ করিয়া শুনিলেন যে, গ্রামে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া একজন পরিচারিকা সন্ধ্যার পর অন্ধকারে সিঁড়ির নিকট অপর একজন পরিচারিকাকে চুপি চুপি ঐ কথা বলিতেছিল। কৃষ্ণমতী ঐ সময়ে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছিলেন; ঐ কথা শুনিবামাত্র চীৎকার করিয়া পড়িয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন, মাথায় কপালে ও অন্যান্য স্থানে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল। পরে মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলেও আর জ্ঞান প্রাপ্ত হন নাই, কেবল "আমি আর তাঁকে না দেখে থাকতে পারছি না" এই বুলি তাঁহার মুখে দিবারাত্রি ছিল।

বনবিহারী তাঁহার স্ত্রীর সহিত দেখা করিলেন, কিন্তু কৃষ্ণমতী তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না, চুপ করিয়া রহিলেন। বনবিহারী দিবারাত্রি তাঁহার নিকট থাকিয়া পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু সফল হইতেন না। স্মৃতির উদ্দীপন আর হইল না, কৃষ্ণমতীকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া বড় বড় ডাক্তার কবিরাজের দ্বারা চিকিৎসা করাইলেন, কিন্তু সবই নিষ্ফল হইল। এইরূপে কয়েক মাস গেল; কৃষ্ণমতী বনবিহারীকে চিনিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার প্রতি বড় অনুরক্তা হইলেন, দিবারাত্রি তাঁহার নিকট থাকিতেন, তাঁহাকে কোথাও যাইতে দিতেন না। যখন বনবিহারী

বহির্বাটীতে যান কৃষ্ণমতী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেন। গ্রামের ইতর ভদ্র সকলেই রাস্তায় দাঁড়াইয়া দেখিত যে, রাস্তার ধারে বারান্দায় বনবিহারী একখান ইজি চেয়ারে বসিয়া সংবাদপত্র ও পুস্তকাদি পড়িতেন, আর একটি ছোট টুলে বসিয়া একটি দ্বাবিংশবর্ষীয়া কেশবিন্যাসবিহীনা রুক্ষকেশা অনুপমা সুন্দরী তাঁহার নিকট বসিয়া থাকিত; কখনও তাঁহাকে দাড়ি ধরিয়া আদর করিতেছে, কখনও বা চিরুণি ব্রুস লইয়া তাঁহার চুল আঁচড়াইয়া দিতেছে, আঁচল দিয়া তাঁহার মুখ মুছিয়া দিতেছে, আবার কখনও বা তাঁহার হাত হইতে পুস্তক খানি কাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া হাসিয়া উঠিতেছে।

এইরূপে উভয়ের দিন কাটিতে লাগিল। উভয়ে উভয়কে চোখের আড়াল করিতে পারিতেন না; কিন্তু তাঁহাদের এইরূপ সুখও চিরদিন রহিল না। বনবিহারী পীড়িত হইয়া বিছানা লইলেন। কৃষ্ণমতী দিনরাত তাঁহার বিছানায় বসিয়া থাকিতেন, সেইরূপ চিরুণি ব্রুস দিয়া চুল আঁচড়াইয়া দিতেন, আঁচল দিয়া মুখ মুছাইতেন, আবার বলিতেন, "তুমি তোমার কেতাব পড়্‌বে না? কেতাব এনে দিব? তুমিত অনেক দিন পড় নাই? আমি আর কেতাব কেড়ে নেবো না।" বনবিহারী বলিতেন "এখন আর পড়িব না; তোমার সহিত গল্প করিব।" কৃষ্ণমতী বড় সন্তুষ্ট হইয়া বলিতেন "আচ্ছা আচ্ছা।" বনবিহারী আর বিছানা হইতে উঠিতে পারিতেন না দেখিয়া কৃষ্ণমতী শ্বশুরকে ধমক দিয়া বলিলেন, (এখন কৃষ্ণমতী লজ্জাহীনা) "হাঁ গা, তুমি কি তোমার ছেলেকে না খেতে দিয়ে মেরে ফেল্‌বে? ওঁকে খেতে দাও, খেতে দাও, ওঁর প্রতি দিন মাংস খাওয়া অভ্যাস, মাংস খাওয়াও।" শ্বশুর চোখ মুছিতে মুছিতে বাহিরে গেলেন। সেই দিন হইতে কৃষ্ণমতী দাসীদিগকে মাংস কিনিতে টাকা দিতেন, তাহারা আনিত না; বলিত মাংস পাওয়া গেলনা। একদিন একজন দাসীর অসাবধানতা বশতঃ জানিতে পারিলেন যে কালীবাড়ীতে প্রতিদিন সকালে বলিদান হয়, সেইখানে পাঁঠার মাংস পাওয়া যায়। কৃষ্ণমতী বলিলেন "বাবু মাংস না খেতে পেয়ে উঠ্‌তে পাচ্ছেননা, তাঁহাকে না খাইয়ে সবাই মেরে ফেল্লে।" এই বলিয়া তিনি স্বয়ং কালীবাটীর মাংস আনিতে চলিলেন, তাঁহার গতিরোধ করিতে কেহ সাহস করিল না। চির-অবরোধিনী কৃষ্ণমতী রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইলেন, পরিচারিকাগণ এবং দুই চারিজন দ্বারবান তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কৃষ্ণমতী রূপে পথে আলো

করিয়া চলিলেন। রাস্তার উভয় পার্শ্বে স্ত্রীলোক ও পুরুষেরা তাঁহাকে দেখিয়া চমকিত হইয়া, "ইনি কে? ইনি কে? ইনি কোন দেবী!" বলিয়া পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিল। পরে যখন সকলেই জানিতে পারিল যে, ইনিই কৃষ্ণমতী, তখন প্রাচীনেরা দুইহাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল, স্ত্রীলোকেরা যাহারা তাঁহার অবস্থা শুনিয়াছিল, তাহারা চোখের জল মুছিতে লাগিল। "আহা! আমরি মরি! কি রূপ! "ভগবান্ কেন এর এমন দুর্দ্দশা করিলেন!" এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে পথিকগণ সকলেই কৃষ্ণমতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। কৃষ্ণমতীর কোন দিকে দৃষ্টি নাই; কাহারও সহিত বাক্যালাপ নাই। যেমন প্রবল বায়ুতে ছোট সরু সুপারি গাছের কেবল মাথা হইতে কিয়দংশ দুলিতে থাকে, মন্থরগমনা কৃষ্ণমতী সেইরূপ দুলিতে দুলিতে হাঁটিতে লাগিলেন। কবরী স্খলিত, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে, ঈষৎ স্থূলাঙ্গ বলিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরা; অভ্যাসবশতঃ মধ্যে মধ্যে মাথায় কাপড় টানিতে টানিতে কৃষ্ণমতী রূপে পথঘাট আলো করিয়া চলিতেছেন। ঘটনাক্রমে অসিতকুমার বয়স্যদিগের সহিত বাগানবাটী হইতে বসতবাটীতে মধ্যাহ্নাহারের জন্য আসিতেছিলেন। রাস্তার একটা বাঁক ফিরিয়া পথে হঠাৎ সম্মুখে বহুজনবেষ্টিত এক দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তিনি রামচরণ ঘোষালের বাটীতে বিবাহোৎসবে কিছুক্ষণের জন্য অবগুণ্ঠনবতী কৃষ্ণমতীকে দেখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সেইরূপ এখন আর নাই। কৃষ্ণমতী উন্মাদিনী হইয়া দেবীমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। পূর্ব্বের রূপ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, সেইজন্য অসিতকুমার তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই, দেবী বলিয়া স্থির করিলেন। এরূপ ধারণার একটা বিশেষ কারণ ছিল, অসিতকুমার তখন সুরাপান করিয়া ঈষৎ বিকৃত অবস্থাতে আসিতেছিলেন (তাঁহার কাছে সুরাপানের সময়াসময় ছিল না)। পথের উভয়পার্শ্বে ইতর লোকের মেয়েরা কৃষ্ণমতীকে দেখিয়া 'মা মা' সম্বোধন করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছিল। অসিতকুমার বয়স্যদিগের সহিত কৃষ্ণমতীর নিকটে যাইয়া "মা মা" বলিয়া গলায় চাদর দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। কৃষ্ণমতী তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কে? ভিক্ষুক?" একজন পরিচারিকা বলিল, "না, ভিক্ষুক নহে।" "হাঁ। ভিক্ষুক, নহিলে আমাকে মা ব'লে ডাকে কেন?" এই বলিয়া একটি টাকা ছুঁড়িয়া দিয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পূজারীর নিকট মাংস চাহিলেন, বলিলেন "এখন দু'বেলার খুশি

মাংস দাও, আবার কাল এসে নিয়ে যাব।" দুইবেলার জন্য দুইটাকা ফেলিয়া দিলেন, পূজারী একজন দাসীর হাতে কলাপাতায় বাঁধিয়া মাংস দিলেন এবং টাকা দুইটী তাহার হাতে ফেরৎ দিলেন। কৃষ্ণমতী তাহার হাত হইতে মাংস কাড়িয়া আপনার হাতে লইয়া বাটী ফিরিলেন, সেইরূপ বহুজনবেষ্টিতা হইয়াই বাটী ফিরিলেন। অসিতকুমার এখন জানিতে পারিলেন যে, যাঁহাকে তিনি "মা" বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়াছিলেন, তিনি আর কেহ নহেন, কৃষ্ণমতী। তখন নেশা ছাড়িয়া গেল, মনে মনে লজ্জা, ঘৃণা, ও গুরুতর আক্ষেপ জন্মিল। স্ত্রীলোকের রূপ দেখিলে যে পাষণ্ডের চিত্তমালিন্য জন্মিত, কৃষ্ণমতীর রূপ দেখিয়া আজ তাহার ভক্তির উদ্রেক হইল। ধন্য কৃষ্ণমতীর রূপের মহিমা! সেই রাত্রেই অসিতকুমার গৃহত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। বাটী যাইয়া কৃষ্ণমতী মাংস স্বয়ং রাঁধিয়া উহা একটা ডিসে করিয়া স্বামীর মুখের নিকট ধরিয়া বলিলেন, "খাও, খাও।" বনবিহারী বলিলেন, "বড় গরম, একটু জুড়ুক।" মাংস ঠাণ্ডা করিবার জন্য কৃষ্ণমতী সেইখানে মাংসের ডিস রাখিয়া একটা পাত্র আনিতে গেলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার শাশুড়ী উহা গোপন করিয়া রাখিলেন। ফিরিয়া আসিয়া উহা না দেখিতে পাইয়া কৃষ্ণমতী ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন; অবশেষে বালিকার ন্যায় কাঁদিতে বসিলেন। কান্না শুনিয়া বনবিহারী তাঁহাকে ডাকিলেন, স্বামীর নিকট আসিয়া তিনি মাংসের কথা ভুলিয়া গেলেন। কৃষ্ণমতীর এইরূপ পতিভক্তি দেখিয়া দেশের স্ত্রীলোকগণ বলিত "ধন্য মেয়ে! জ্ঞানেতেও স্বামী স্বামী ব'লে পাগল—অজ্ঞানেতেও তাই।"

বনবিহারী দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন, শেষে তাঁহার বাক্‌শক্তি রহিত হইল। কৃষ্ণমতী তাঁহার কথার আর উত্তর না পাইয়া স্বামীকে ক্রোড়ে লইয়া থাকিতেন, আর মধ্যে মধ্যে তাঁহার দাড়ি ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেন "কথা কও—কথা কচ্ছোনা কেন?" এইরূপে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া স্বামীকে ক্রোড়ে লইয়া থাকিতেন। যেমন তাঁহার স্বামীর দেহ দিন দিন অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হইল, তাঁহারও সেইরূপ হইতে লাগিল। কেহ তাঁহাকে আহার করাইতে পারিত না, কাহারও সহিত আর কথা কহিতেন না, কেবল স্বামীকে বলিতেন "কথা কও।"

* * * * * * * * * * *

ইহার কিছুদিন পরে রাসবিহারী বাবুর বৃহৎ পুরী অন্ধকারময় হইল।

জনমানবের সাড়া শব্দ নাই, কেবল এক একবার একটী স্ত্রীলোককে দেখিতে পাওয়া যাইত; শীর্ণশরীরা মলিনবসনা, আলুলায়িতরুক্ষকেশা একটী বিধবা যুবতী, অন্ধকারে এঘর ওঘর করিয়া বাটীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যেন কাহাকে খুঁজিতেছে; আর ডাকিতেছে, "তুমি কোথায় গেলে? আর যে তোমাকে না দেখে থাক্‌তে পারি না!" এই রূপে ঘুরিতে ঘুরিতে যে ঘরে বনবিহারী থাকিতেন, সেই ঘর খুঁজিত; পরে তাঁহার বিছানায় বসিয়া তাঁহাকে ডাকিত। কিছুদিন পরে, গভীর রাত্রে, ছাদের উপর হইতে একটী স্ত্রীলোকের হৃদয়-ভেদী চীৎকার শুনিয়া প্রতিবাসীদের নিদ্রাভঙ্গ হইত। "তুমি কোথায় গেলে? এসো না, আমার কাছে এসো না, আমি যে তোমাকে না দেখে আর থাক্‌তে পারি না।" গভীর নিশিতে প্রতিবাসীরা প্রতিদিন এইরূপ হৃদয়ভেদী চীৎকার শুনিতে পাইতেন। অল্প দিবস পরে এই চীৎকার বন্ধ হইল, কৃষ্ণমতী অনন্ত ধামে চলিয়া গিয়াছেন।

আমরা সঠিক সংবাদ পাইয়াছি যে, অসিতকুমার আর বাটী ফিরেন নাই। তাঁহার সম্বন্ধে দুইটা জনরব উঠিয়াছে, কেহ বলে যে তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন, আবার কেহ বলে যে তিনি প্রেমানন্দ স্বামী নাম ধারণ করিয়া দেশে দেশে আর্য্যধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। যাহাই হউক, তাঁহার অনুপস্থিতিতে নীলাপুরবাসীরা শান্তিলাভ করিয়াছে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সমাপ্ত।

পতিতের উদ্ধার।

অনেক স্থলে দেখা যায়, অতিশয় যোগ্য ব্যক্তির সন্তানও অযোগ্য হইয়া থাকে; আবার অযোগ্যের সন্তানও সুযোগ্য হয়। মানুষ জন-সাধারণের প্রায় তুল্য হওয়াই নিয়ম; জন-সাধারণ অপেক্ষা গুরুতর রূপে বিভিন্ন হওয়া সাধারণ নিয়ম নহে। সুতরাং কোনও নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির সন্তান যোগ্যতায় জন-সাধারণের ন্যায় হইবে, ইহাই আশা করা যায়। এই আশাকে পণ্ডিতগণ একটী বিধি বলেন, "সাধারণ সন্নিকর্ষ" বিধি; অর্থাৎ জাতক যোগ্যতায় সমাজস্থ জন-সাধারণের নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকে। ইহা বহুক্ষেত্রে পরীক্ষায় অবগত হওয়া যায়।

অতিশয় যোগ্য ব্যক্তি অধিক জন্মে না। যদি কোনও বংশে ঐরূপ কোনও ব্যক্তি জাত হন, তাঁর সহিত সমাজস্থ জন সাধারণের প্রভেদ অত্যন্ত অধিক। এই আধিক্য তাঁহার পরবর্ত্তী বংশে কমিয়া গিয়া "সাধারণ সন্নিকর্ষ বিধির" অনুসরণ করিয়া থাকে। সাধারণের প্রায় সমান হইতে হইলেই তাঁহার সন্তানকে যোগ্যতায় কিছু কমিয়া যাইতে হয়। আবার অযোগ্য সম্বন্ধেও এই বিধি অনুসরণ করিয়াই দেখা যায় যে, তাহার অপত্যকে কিছু উন্নত হইতে হয়। এই বিধি অনুসারে অত্যন্ত যোগ্যতা যেমন বংশানুক্রমে স্থায়ী হয় না, অত্যন্ত অযোগ্যতাও তেমনই স্থায়ী হয় না। ইহাতে একদিকে সমাজের অমঙ্গল হইলেও অপর দিকে অনেক মঙ্গল সিদ্ধ হয়। এইরূপে ভগবান্ মানব-সমাজের সাধারণ গড়-যোগ্যতা স্থির রাখেন।

অতিশয় যোগ্য ব্যক্তির সন্তানের যোগ্যতায় হীন হওয়া আক্ষেপের বিষয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু এ কুফল নিবারণ করিবার উপায় নাই, এমত নহে। বহুস্থলে পরীক্ষা দ্বারা জানা যায় যে, যদি পিতা মাতা উভয়ের মধ্যে একজন মাত্র যোগ্য হন, তবে-ই ঐ কুফল হয়; কিন্তু যদি উভয়েই অতিশয় যোগ্য হন, তাহা হইলে সন্তান যোগ্যতায় হীন তো হয়ই না, বরং অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে। বংশপরম্পরায় যোগ্যতার মাত্রা অধিক উন্নত রাখিতে হইলে, বংশপরম্পরায়-ই সুযোগ্য বরের সহিত সুযোগ্য কন্যার বিবাহ দেওয়া আবশ্যক। এইরূপে, অতিশয় যোগ্য এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তির আবির্ভাব হওয়ার আশা করা যায়। কিন্তু তদ্রূপ ব্যক্তি অধিক বংশে জাত না হইলেও, যোগ্য-যোগ্যার অপত্য সুযোগ্য হইবার সম্ভাবনা

অধিক হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। পিতা মাতা উভয়েই যোগ্য হইলে যোগ্য বংশে যোগ্য সন্তান উৎপন্ন হওয়া যত সম্ভব, অযোগ্যগণের সন্তান মধ্যে যোগ্য ব্যক্তির উৎপত্তি হওয়া তত সম্ভব নহে। আবার, যদি বা দম্পতির মধ্যে একের যোগ্যতা হেতু অপত্য যোগ্য হইতে পারিত, কিন্তু অপরের অযোগ্যতা থাকিলে অপত্য অযোগ্য হইবার সম্ভাবনা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

এই সকল কথা প্রায় সকলেই জানেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে এতদনুসারে চলেন না। যে কোন রূপে হউক, পুত্রদায় ও কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করেন, যোগ্যাযোগ্যের বিচার করেন না। যেখানে যোগ্যাযোগ্যের বিচার নাই, সেখানে যোগ্যতা শীঘ্রই বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু বংশপরম্পরায় যোগ্য নর-নারীর বিবাহ হইলে, এবং অযোগ্য দম্পতির সন্তান হওয়া নিবৃত্ত করিতে পারিলে, জাতীয় উন্নতির আশা সফল হইতে পারে। পতিত, অবসন্ন জাতির এই পন্থা ভিন্ন অন্য পন্থা নাই। ইহাই তাহার পতিতোদ্ধার মন্ত্র। এ মন্ত্রের সাধনা করা বড়ই কঠিন কার্য্য। হিন্দু সমাজে একে বিবাহের ক্ষেত্র সংকীর্ণ; তার পর উপযুক্ত পাত্র অথবা কন্যা দুষ্প্রাপ্য। অর্থাভাবের কথা ছাড়িয়া দিলেও, বিবাহ কার্য্যে যোগ্যাযোগ্য বিচার স্থির রাখা বড়ই কঠিন কার্য্য সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাও নিশ্চিত যে, যে জাতি সর্ব্বাগ্রে এই কার্য্য সুসিদ্ধ করিয়া তাহা বংশানুক্রমে স্থির রাখিবার উপায় করিতে সমর্থ হইবে, সেই জাতিই মানব সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে। পণ্ডিতবর ডন্‌কাষ্টার বলেন,—

"The whole trend of the results obtained is that in order to produce exceptionally gifted men in both body and mind, those with high development of the characters desired should be encouraged to marry; and that to prevent the production of the weakly and feeble-minded, the only method is to prevent such from having offspring. * * * * There is little doubt that the nation which first finds a way to make them practical will in a very short time be the leader of the world."

অর্থাৎ, সুযোগ্য সন্তান উৎপন্ন করিতে হইলে, যাহারা দেহে ও মনে যোগ্য এরূপ নরনারীদিগকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিতে হয়; এবং যাহারা অযোগ্য তাহাদিগের সন্তান হওয়া নিষেধ করিতে হয়। যাহারা সর্ব্বাগ্রে এইরূপ করিতে সক্ষম হইবে, তাহারাই পৃথিবীর নেতা হইবে।

এ সকল স্থলে "যোগ্য" বলিতে সুস্থ, সবলদেহ, তেজস্বী, উদ্যোগী, ও পবিত্র মনের অধিকারী বুঝিতে হইবে। যাহারা বংশানুক্রমিক পীড়াগ্রস্ত, দুর্ব্বল, ভগ্নদেহ, যাহারা অলস, পরমুখাপেক্ষী, দুর্নীতিপরায়ণ, বিকৃতমনা, তাহারা পরবর্ত্তী বংশ গঠন করিলে সমাজ অধঃপতিত হইবেই। কিন্তু সংসারে ইহা সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করা দুঃসাধ্য। যে বংশ তদ্রূপ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সে বংশ পুরুষানুক্রমে যোগ্যতার মাত্রা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। তাঁহারা দুঃসাধ্য সাধন করিয়াছেন; পুরুষপরম্পরায় সমাজকে সুযোগ্য ব্যক্তি উপহার দিতেছেন। তাঁহারা জাতীয় উৎকর্ষ সাধনের আদর্শ দেখাইতেছেন; তাঁহারা আমাদিগের কৃতজ্ঞতার পাত্র।

আমি অদ্য এইরূপ একটী পরিবারের কথা বিবৃত করিব। এ বংশের ১৫০ দেড়শত বৎসরের কুর্চ্চিনামা নিম্নে দেওয়া গেল :—

- মুন্সী রামনারায়ণ সর্ব্বাধিকারী
  - মথুরমোহন সর্ব্বাধিকারী
    - যদুনাথ ঐ
      - প্রসন্নকুমার (সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ; প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরাজি ও ইতিহাসের অধ্যাপক; বাঙ্গালা বীজগণিত ও পাটীগণিত প্রণেতা)
        - সত্যপ্রসাদ (ফ্রিমেসনের সম্মান প্রাপ্ত)
      - সূর্য্যকুমার (বিখ্যাত ডাক্তার)
        - দেবপ্রসাদ (বিখ্যাত ভাইস্ চ্যান্সেলার)
        - কৃষ্ণপ্রসাদ (হাইকোর্টের উকিল)
        - সুরেশপ্রসাদ (বিখ্যাত ডাক্তার)
          - কনকচন্দ্র (শিশু)
      - আনন্দকুমার (সবজজ)
      - রাজকুমার (হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক, ঠাকুর অধ্যাপক; ক্যানিং কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক)

যখন সাধারণের হিতার্থে দান করিলে খেলাত পাওয়া যাইত না, সংবাদ পত্রেও উঠিত না, তখনমুন্সী রামনারায়ণ লোকহিতার্থে যে ভূমিদান করিয়াছিলেন তাহাই এখন মুন্সীগঞ্জ। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাকে ১ লক্ষ মুদ্রা দিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি লোকের উপকারের নিমিত্ত ভূমিদান করিয়া অর্থগ্রহণ করা অসঙ্গত বোধে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। তাঁহার পৌত্র যদুনাথ উত্তর পশ্চিম প্রদেশে কানপুরাদি স্থান দর্শনান্তে "তীর্থভ্রমণ" নাম দিয়া যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে নানাতীর্থস্থানের এবং অন্যান্য স্থানের উজ্জ্বল বর্ণনা আছে। গদ্য রচনায় সেকালে এরূপ পটুতা লাভ করা সাধারণ ক্ষমতার পরিচায়ক নহে। শুনিয়াছি, এই গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কনের ভার বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রহণ করিয়াছেন। যদুনাথের পুত্রগণ স্বনামধন্য, তাঁহাদিগের পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কেবল সূর্য্যকুমার সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তিনি সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে সৈনিক বিভাগের ডাক্তার ছিলেন, এবং অত্যন্ত তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। ইঁহার ভার্য্যা ধর্ম্মপরায়ণ ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। ইঁহাদিগের পুত্রগণেরও কোন পরিচয়ই আবশ্যক নাই। ডাঃ দেবপ্রসাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্‌সেলার এবং তাঁহার তীক্ষ্ণ মনীষা ও কর্ম্মকুশলতা সর্ব্বজনবিদিত। ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ অনন্যসাধারণ প্রতিভাশালী, তেজস্বী ও নির্ভীক। ইঁহার প্রতিভা, দক্ষতা ও শ্রমসহিষ্ণুতা পরিজ্ঞাত। ইঁহার ভার্য্যার একখানি আলোক চিত্র আমি দেখিয়াছি। তিনি যে ভাবে কন্যা ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছেন, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, তাঁহার পৃষ্ঠবংশ ঋজু, জানু এবং পদযষ্টি দৃঢ় ও সবল। তাঁহার পূর্ণাবয়ব, বিশেষতঃ নাসিকা, চক্ষু এবং হনু দৃষ্টে তাঁহাকে বুদ্ধিমতী ও তেজস্বিনী বলিয়াই বোধ হইয়াছে। ইঁহার পিতা হাটখোলার দত্তবংশীয় কেদারনাথ দত্ত। ইনি এক অসাধারণ ব্যক্তি, অথচ নিভৃতে অঙ্গ ঢাকিয়া থাকিতেন, করতালির প্রত্যাশাও করিতেন না। মাইকেল দত্তের পূর্ব্বে ইনি বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর পদ্য রচনা করিয়াছেন; বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। ইঁহার প্রণীত কবিতা, উপন্যাস এবং ইতিহাস গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি মুদ্রিত হয় নাই। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে ইঁহার শক্তি বিশেষ ভাবেই উল্লেখযোগ্য।

এক্ষণে কনকচন্দ্রের কথা বলিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এই শিশুর বয়স এখন চারি বৎসর। বৈজ্ঞানিক প্রণালীমতে ইঁহার অসাধারণ শক্তির

ব্যাখ্যা করিতে হইলে, পিতৃকুলের ও মাতৃকুলের যে সকল বিষয় বলিতে হয়, উপরে কেবল তাহাই বিবৃত করিয়াছি। জীবিত ব্যক্তির কৃতিত্ব বর্ণনা করা বড়ই কঠিন কর্ম্ম এবং বাঞ্ছনীয়ও নহে। তথাপি, সুযোগ্য সন্তান লাভ করিবার যে সকল নিয়মাবলী পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিলে দেশের ও দশের কল্যাণ সম্ভাবনা আছে, এই নিমিত্তই ইহার পূর্ব্বপুরুষগণের জীবনের আবশ্যকীয় বৃত্তান্তগুলি সংক্ষেপে বলিতে হইয়াছে।

এই শিশুর পিতামহ সৈনিক ডাক্তারের কার্য্য করিয়াছেন। পিতা সুরেশপ্রসাদ ২৪ বৎসর বয়সে ডাঃ কেনেথ ম্যাক্লাউডের সঙ্গে বিলাতের সৈনিক বিভাগের ডাক্তার হইতে যাইতেছিলেন; কেবল তাঁহার মাতৃভক্তি ও মাতৃবৎসলতা তাঁহাকে এ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিল। সুতরাং ইহার এই বয়সেই সেই দিকে প্রবণতা দৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। পিতা পিতামহের প্রতিভা ও স্মৃতি শক্তি এই শিশু প্রাপ্ত হইবে, ইহাও আশা করা যায়। ইহার দেহের অস্থি, পেশী, শিরা, স্নায়ু ও মস্তিষ্ক তেজস্বী এবং সবল হইবারই কথা; কারণ কনকচন্দ্র পিতামাতার পরিণত বয়সের সন্তান এবং তদীয় পিতা মাতার দেহ সবল ও দৃঢ়। এ সকল সে পাইয়াছে কেন? অতিশয় যোগ্য ব্যক্তির সন্তান "সাধারণ সন্নিকর্ষে"র বিধানানুসারে যোগ্যতায় হীন হইবার কথা। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যদি পিতা মাতার মধ্যে উভয়েই যোগ্য হন তবে অপত্য যোগ্যতায় হীন হয় না, বরং আরও উন্নত হইতে পারে। সুতরাং ইহার মাতা ও পিতামহীর বিষয় আমরা কিছু না জানিলেও বলিতে পারিতাম যে, তাঁহারা নিশ্চয়ই সুযোগ্যা। এই বালক চারি মাস বয়সে বসিয়া থাকিতে পারিত; ছ মাস বয়সে দেওয়ালের গাত্রলগ্ন বিদ্যুৎ-সংযোজক চাবিগুলির * মধ্যে কোন্‌টী আলোকের, কোন্‌টী পাখার তাহা জানিত এবং টানিয়া দিতে পারিত। কনক আট মাস বয়সে দাঁড়াইতে এবং এগার মাস বয়সে বেড়াইতে পারিত। তদপেক্ষাও আশ্চর্য্যের বিষয়, সে ঐ সময়েই স্পষ্ট করিয়া কতিপয় বাক্য উচ্চারণ করিতে পারিয়াছিল; এবং পঞ্চদশ মাস বয়সে তিন চারিটী বাক্য সংযুক্ত করিয়া সরল পদ গঠন করিতে পারিত। প্রপিতামহ এবং মাতামহ উভয়েই গ্রন্থকার কি না; তাই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থকার

* Switch

মুখে মুখে অত অল্পবয়সে পদ রচনা করিত, বুঝি? ইহাকে আঠার মাস বয়সে পিতা ও মাতা একদিন আলিপুরের পশুশালায় লইয়া গিয়াছিলেন; এবং গণ্ডার প্রভৃতি কয়েকটী জন্তুর ইংরাজি নাম পিতা ও বাঙ্গালা নাম মাতা বলিয়া দিয়াছিলেন। তৎপর দিবস ইহাকে জিজ্ঞাসা করায় সেই সকল জন্তুর ইংরাজি ও বাঙ্গালা নাম শুদ্ধ রূপে বলিতে সক্ষম হইয়াছিল!!!

এই শিশু দুই বৎসর বয়সে সৈন্যের ন্যায় কাওয়াজ করিত, এবং পিতাকে কাওয়াজ করাইত। এই সময়ের একটী চিত্র দৃষ্টে স্পষ্টই দেখা যাইবে, ইহার পদযষ্টি ও তল্লগ্ন পেশী ও শিরা সকল কেমন বলিষ্ঠ; দক্ষিণ ও বাম পদের সংস্থান দৃষ্টেই তাহা প্রতীয়মান হইতেছে। এই চিত্রে নৌ-সেনার বেশ; সুতরাং দক্ষিণহস্ত কপালের মধ্য ভাগে নৌ-সেনার উপযোগী অভিবাদন সঙ্কেতে স্থাপিত হইয়াছে। ভঙ্গীতে বোধ হয় হস্তের পেশী ও শিরা এবং গ্রীবাদেশ কেমন দৃঢ়। এই শিশু দুই বৎসর দুই মাস বয়সে "বন্দে মাতরং" এবং "আমার জন্মভূমি" স্বর সহিত আবৃত্তি করিতে পারিত। ইহার তিন বৎসর বয়সের চিত্রে দেখা যাইতেছে, পৃষ্ঠবংশ, হস্ত ও পদ কেমন দৃঢ় ও শক্তিব্যঞ্জক। এ শিশু সৈনিক বেশ ভালবাসে; এবং সেনাগণের পদমর্য্যাদা-সূচক সংজ্ঞা সকল জানে এবং তেজস্বিতার সহিত উচ্চারণ করিতে পারে। এক্ষণে চারি বৎসর মাত্র বয়স; কিন্তু দিবা রাত্রি, ঋতুভেদ, বৃষ্টি, বজ্র ইত্যাদি কি কারণে হইয়া থাকে তাহা শিক্ষা করিয়াছে।

দৃঢ়, বলিষ্ঠ দেহের সহিত, অসাধারণ ধী ও স্মৃতি কেমন সংযুক্ত হইয়াছে তাহার উত্তম দৃষ্টান্ত এই কনকচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী।

এত বিস্তৃত ভাবে এই শিশুর দেহ ও মনের আলোচনা করিবার আর কোনই কারণ নাই, কেবল ইহাই বুঝাইতে ইচ্ছা করি যে, সুযোগ্য নরনারী-গণের বিবাহের ফলে সুযোগ্য সন্তান লাভ হয়; এবং অযোগ্যগণের সন্তান দ্বারা সমাজ অধঃপতিত হয়। আর বংশানুক্রমে এই নিয়ম স্মরণ রাখিয়া বিবাহ কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে পারিলে এক গৃহে নহে, বহু গৃহেই এইরূপ কনক-চন্দ্র লাভ হইতে পারে। প্রতিভা হয়ত সকল বংশে পাওয়া যাইবে না; কিন্তু সমাজের গড়-যোগ্যতা যে এই উপায়ে বর্দ্ধিত ও সংরক্ষিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বকালে যেমন কৌলীন্যমর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত ঘটকগণ বংশাবলীর পুঁথি রাখিতেন, এক্ষণে এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক ঘটকগণ যদি যোগ্যতার মাত্রা-

সুসারে ভিন্ন ভিন্ন যোগ্য বংশ সকলের তালিকা পুস্তকাকারে রক্ষা করেন, এবং সাধারণের অবগতির নিমিত্ত মুদ্রিত করেন; এবং সাধারণে বিবাহ কার্য্যে ঐ পুস্তকের নির্দ্দেশ মত সুযোগ্য বংশের প্রতিই অধিক সমাদর প্রদর্শন করেন, তবে এতদ্দেশের বিশেষ কল্যাণ সিদ্ধ হইতে পারে। কেহ এ পথে অগ্রসর হইবেন কি ?

আমরা ইচ্ছা করিয়াছি, এতদ্দেশীয় অসাধারণ প্রতিভাশালী, যোগ্য ও কৃতী বংশগুলির যথাসম্ভব আলোচনা করিব। কেবল সুযোগ্য অপত্য-লাভের দিক্ হইতে এই সকল বংশের যে পরিমাণ ইতিহাস জ্ঞাতব্য তাহাই বিবৃত করিব। আবার, নিতান্ত অযোগ্য অকৃতী ও জড়বৎ বংশের এবং তদ্রূপ সন্তানের ইতিহাসও বিবৃত করিব। ইহা হইতে সাধারণে যদি বুঝিতে পারেন যে, মানুষ গড়িবারও একটা পদ্ধতি আছে, এবং জীবতত্ত্বের নিয়ম সকল পালন করিয়া চলিলে সুযোগ্য মানুষ গড়া সম্ভব, তবেই কৃতার্থ হই। মানুষ গড়িতে না জানিলে, কেবল শাস্ত্রজ্ঞান, বাহুবল, ধনবল, বাণিজ্য ইত্যাদি দ্বারা সমাজকে উন্নত রাখা যায় না। প্রাচীন হিন্দুগণ, গ্রীকগণ, রোমকগণ, ফিনিসিয়-গণ, ওলন্দাজগণ, স্পেনীয়গণ ইহার সাক্ষী স্বরূপ কি মহা শিক্ষাই দিতেছে!! কিন্তু শিক্ষা করিবে কে ? আমরা জাতি হিসাবে মরিতে বসিয়াছি; এখনও কি এদিকে মনোযোগী হইব না ?

শ্রীশশধর রায়।

সাহিত্য, ২৫ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা।

পালিসাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ।

অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, পালিসাহিত্যকে প্রধানতঃ বুদ্ধবচন ও বৌদ্ধবচন এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ভগবান্ বুদ্ধ নিজে যে সকল আদেশ ও উপদেশ বাণী প্রচার করিয়াছিলেন এবং বৌদ্ধস্থবির-স্থবিরার যে সকল উপদেশ তিনি অনুমোদন করিয়াছিলেন, সমুদয় একত্রে বুদ্ধবচন নামে অভিহিত। পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধাচার্য্যগণ বুদ্ধবচন অবলম্বনে যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তৎসমুদয়কে আমরা বৌদ্ধবচন নামে অভিহিত করিতেছি।

বুদ্ধবচন স্থবিরবাদ, অগ্রবাদ, বিভাজ্যবাদ, পালি, তন্ত্রী, পর্য্যাপ্তি ও Buddhist canon নামে প্রসিদ্ধ। শ্রেণী বিভাগ অনুসারেও ইহার কতকগুলি নাম আছে। যথা—ধর্ম্মবিনয়, ত্রিপিটক, পঞ্চনিকায়, নবাঙ্গ জিনশাসন ও চুরাশী সহস্র ধর্ম্মখণ্ড। বৌদ্ধবচনকে ইংরাজীতে বলা যাইতে পারে Ex-canonical works।

বুদ্ধবচনের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে সুমঙ্গলবিলাসিনী ও অত্থসালিনী বলেন, "সব্বম্পি বুদ্ধবচনং রসবসেন একবিধং, ধম্ম-বিনয়বসেন দু-বিধং, পঠম-মজ্ঝিম-পচ্ছিমবসেন তি-বিধং তথা পিটকবসেন, নিকায়-বসেন পঞ্চবিধং, অঙ্গ-বসেন নব-বিধং, ধম্মক্খন্ধবসেন চতুরাসীতিসহস্সবিধন্তি বেদিতব্বং।"

"সমগ্র বুদ্ধবচন রসহিসাবে এক শ্রেণীর ও ধর্ম্ম বিনয় হিসাবে দুই শ্রেণীর। প্রথম মধ্যম ও পশ্চিম হিসাবে উহা তিন ভাগে, পিটক হিসাবে ও তিনভাগে, নিকায় হিসাবে পাঁচভাগে, অঙ্গ হিসাবে নয় শ্রেণীতে ও ধর্ম্মখণ্ড হিসাবে চুরাশী সহস্র ধর্ম্মখণ্ডে বিভক্ত।"

১। অদ্বিতীয় সম্যক্ সম্বোধিলাভ ও মহাপরিনির্ব্বাণলাভের মধ্যে পূরা পঞ্চচত্বারিংশৎ বর্ষকাল ব্যাপিয়া ভগবান্ বুদ্ধ দেবতা, মনুষ্য, নাগ, যক্ষ, প্রভৃতির নিকট যাহা কিছু প্রচার করিয়াছিলেন সমস্তই একমাত্র বিমুক্তি রসে আপ্লুত ছিল। এই কারণে বুদ্ধবচন রসহিসাবে মাত্র এক শ্রেণীর।

২। ধর্ম্ম ও বিনয় হিসাবে বুদ্ধবচন দুই শ্রেণীর। এই সম্বন্ধে শ্রীমান্ বেণীমাধব বড়ুয়া এম্, এ লিখিয়াছেন, "ধর্ম্ম ও বিনয় বৌদ্ধধর্ম্ম সাহিত্যের

অতি প্রাচীন বিভাগ। বুদ্ধ তাঁহার সার্ব্বজনীন নীতিমূলক উপদেশ গুলিকে ধর্ম্ম ও আদেশমূলক বাণী সমূহকে বিনয় নামে অভিহিত করিতেন। ধর্ম্ম বলে—ইহা করা তোমার কর্ত্তব্য এবং বিনয়বলে,—ইহা তোমাকে করিতেই হইবে, যদি না কর এই এইরূপে দণ্ডিত হইবে। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, ধর্ম্ম নীতিবিষয়ক উপদেশ এবং বিনয় বিধি বা আইন।" ধর্ম্ম বিনয় শব্দটী বৌদ্ধসাহিত্যে যেরূপ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে হয় যে, উহা দ্বারা ভারতবর্ষীয় যে কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্র বিজ্ঞাপিত হইত, এবং অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে পার্থক্য জ্ঞাপন মানসেই 'ইমস্মিং-ধম্ম-বিনয়ে' এইরূপ বিশেষাত্মক সংজ্ঞা বৌদ্ধসাহিত্যের স্থানে স্থানে প্রয়োগ করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিতে হয় যে, প্রত্যেক ভারতবর্ষীয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যেই উপদেশ ও আদেশ প্রধানতঃ এই দুইটী জিনিষ বিদ্যমান ছিল। কথিত আছে, বুদ্ধের দেহত্যাগের তিন মাস পরে বুদ্ধবচন সংগ্রহ করিবার মানসে রাজগৃহে প্রথম বৌদ্ধসভা আহ্বান করা হইয়াছিল। ৫০০ জন খ্যাতনামা অগ্রনিক্ষিপ্ত * স্থবির সভায় যোগদান করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে আনন্দ ছিলেন ধর্ম্ম বিষয়ে বহুশ্রুত এবং উপালি ছিলেন বিনয় বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা পারদর্শী। স্থবির মহাকাশ্যপ সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি আনন্দকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে এবং উপালিকে বিনয় সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের উত্তর সমূহ অন্যান্য স্থবির কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে পর উহা সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। এইরূপে ধর্ম্ম বিনয় বা প্রথম বৌদ্ধশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছিল। ইহাতে বুঝিতে হয় যেন ধর্ম্ম বিনয় ত্রিপিটকের নামান্তর মাত্র। সুমঙ্গলবিলাসিনীর গ্রন্থকার বলিয়াছেন "তত্থ বিনয়পিটকং বিনয়ো, অবসেসং বুদ্ধবচনং ধম্মো।" "বিনয় পিটক বিনয় সংজ্ঞার এবং অবশিষ্ট বুদ্ধবচন অর্থাৎ সুত্রপিটক ও অভিধর্ম্ম পিটক ধর্ম্ম সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত।" কিন্তু দীপবংশের গ্রন্থকার বলিতে চাহেন যেন আগম বা সুত্র পিটক তথাকথিত ধর্ম্ম বিনয়ের বহির্ভূত কিংবা উহাই কেবল ধর্ম্ম সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত; তিনি পূর্ব্বোল্লিখিত ভাবে ধর্ম্ম বিনয় সংগ্রহ বর্ণনা করিয়া শেষভাগে বলিয়াছেন,—

* অগ্রনিক্ষিপ্ত—এতদগ্রে স্থাপিত; কোন বিষয়ে অদ্বিতীয় বলিয়া ভগবান্ বুদ্ধ হইতে উপাধিপ্রাপ্ত।

"পবিভজ্জ ইমং থেরা সদ্ধম্মং অবিনাসনং।
বগ্গপঞ্ঞাসকন্নাম সংযুত্তঞ্চ নিপাতকং ॥
আগম পিটকং নাম অকংসু সুত্তসম্মতং ॥"

"স্থবিরগণ এই অবিনাশী সদ্ধর্ম্মকে বগ্গ, পঞ্ঞাস, সংযুত্ত ও নিপাত হিসাবে সুন্দর ভাবে বিভক্ত করিয়া সূত্রানুসারে আগম পিটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন।"

বাস্তবিক ইহা এক মহা সমস্তার বিষয় যে, প্রথম বৌদ্ধ-সভায় অভিধর্ম্ম-পিটক প্রণীত হইয়াছিল কি না। তিব্বতীয় গ্রন্থগুলি এইরূপ কোন গোল-যোগে না যাইয়া সোজাসুজি ভাবে বলিতে গিয়াছেন, আনন্দ সূত্র-পিটক, উপালি বিনয়-পিটক এবং মহাকাশ্যপ অভিধর্ম্ম-পিটকের মাত্রিকা আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

৩। বুদ্ধ বচনগুলি প্রথম, মধ্যম, এবং পশ্চিম হিসাবেও বিভক্ত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, শাক্যরাজকুমার সিদ্ধার্থ সিদ্ধিলাভের পর যে উদাস গীতি গাহিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার প্রথম বাক্য।

"অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিস্‌সং অনিব্বিসং।
গহকারকং গবেসন্তো দুক্‌খা জাতি পুনপ্পুনং ॥"

ইত্যাদি।

অপর কাহারও কাহারও মতে, "যদা হবে পাতু ভবন্তি ধম্মা আতাপিনো ঝায়তো ব্রাহ্মণস্স।" ইত্যাদি। খন্ধক গ্রন্থে উদ্ধৃত গাথাই তাঁহার প্রথম বাক্য। দেহত্যাগ করিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তিনি ভিক্ষু সংঘকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার পশ্চিম বা সর্ব্বশেষ বাক্য। "হন্দ দানি ভিক্‌খবে আমন্তয়ামি বো বয় ধম্মা সংখারা, অপ্পমাদেন সম্পাদেথ।"

এই দুই বাক্যের মধ্যবর্ত্তী সময়ে তিনি যে সকল বাণী প্রচার করিয়াছিলেন তৎসমুদয় তাঁহার মধ্যম বাক্য নামে প্রসিদ্ধ।

৪। পিটক হিসাবেও বুদ্ধবচন তিন ভাগে বিভক্ত। যথা—বিনয় পিটক, সূত্রান্ত পিটক ও অভিধর্ম্ম পিটক। পিটক শব্দের অর্থ ঝুড়ি, পেঁটরা। বিনয় পিটকের অপর নাম 'আনা দেসনা' বা আদেশ বাণী; সূত্রান্ত পিটকের অপর নাম 'বোহারো দেসনা' বা ব্যবহারি বাণী; এবং অভিধর্ম্ম পিটকের অপর নাম 'পরমত্থ দেসনা' বা পারমার্থিক বাণী। বিনয় পিটকের অপর নাম 'সংবরা-সংবর-কথা,' সংযম-অসংযম বিষয়ক কথা; সূত্রান্ত পিটকের অপর নাম 'দিট্‌ঠি-

বিনিবেঠন কথা' মিথ্যাদৃষ্টি-বেষ্টন বিষয়ক কথা ; এবং অভিধর্ম্ম পিটকের অপর নাম 'নামরূপপরিচ্ছেদ-কথা।'—বিনয় পিটকের প্রধান আলোচ্য বিষয় 'অধিশীল সিক্‌খা',—শীল বা সদাচার ; সুত্রান্ত পিটকের প্রধান আলোচ্য বিষয় 'অধিচিত্ত সিক্‌খা',—সমাধি ; এবং অভিধর্ম্ম পিটকের প্রধান আলোচ্য বিষয় 'অধিপঞ্‌ঞা সিক্‌খা',—প্রজ্ঞা বা জ্ঞান। বিনয় পিটকের অন্তর্গত পাতিমোক্‌খ, বিভঙ্গ, খন্ধক ও পরিবার এই চারি গ্রন্থ ; সুত্রান্ত পিটকের অন্তর্গত পঞ্চ নিকায়, যথা—দীঘ, মজ্‌ঝিম, সংযুত্ত, অঙ্গুত্তর ও খুদ্দক। তন্মধ্যে খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত পনরটী পুস্তক; যথা—খুদ্দক পাঠ, ধর্ম্মপদ, উদান, ইতিবুত্তক, সুত্তনিপাত, বিমানবত্থু, পেতবত্থু, থের গাথা, থেরীগাথা, জাতক, নিদ্দেস, পটিসংভিদা, অপদান, বুদ্ধবংশ ও চরিয়া পিটক। কিন্তু দীঘ-ভাণক-শ্রেণী-বিভাগ অনুসারে খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত মাত্র বারটী পুস্তক। যথা—জাতক, মহানিদ্দেস, চুলনিদ্দেশ, পটিসংভিদা মগ্‌গ, সুত্ত-নিপাত, ধর্ম্মপদ, উদান, ইতিবুত্তক, বিমানবত্থু, পেতবত্থু, থের-গাথা ও থেরীগাথা। মজ্‌ঝিমভাণক-শ্রেণী-বিভাগ অনুসারে পনরটী পুস্তক, যথা—দীঘভাণকের বারটী পুস্তক, চরিয়া পিটক, অপদান ও বুদ্ধবংশ। সুতরাং দেখা যাইতেছে, দীঘভাণক ও মজ্‌ঝিমভাণকের তালিকায় খুদ্দক পাঠের উল্লেখ নাই এবং নিদ্দেশের পরিবর্ত্তে মহানিদ্দেশ ও ও চুলনিদ্দেশ উল্লিখিত আছে। অভিধর্ম্ম পিটকের অন্তর্গত সাতটী প্রকরণ। যথা—ধর্ম্মসঙ্গণি বা ধর্ম্মসঙ্গৎ, বিভঙ্গ, ধাতুকথা, পুগ্‌গল পঞ্‌ঞত্তি, কথাবত্থু, যমক ও পট্‌ঠান। তন্মধ্যে কথাবত্থু রাজা অশোকের সময় ত্রিপিটকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সাঞ্চিস্তূপের প্রাচীর গাত্রে 'পেটকী" (যিনি পিটকশাস্ত্র—জানেন) নাম দৃষ্ট হয়।

৫। নিকায় হিসাবে বুদ্ধ বচন পঞ্চ ভাগে বিভক্ত। যথা—দীঘ-নিকায়, মজ্‌ঝিম-নিকায়, সংযুক্ত নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায়, ও খুদ্দক নিকায়। এই শ্রেণী বিভাগ অনুসারে খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত পূর্ব্বোল্লিখিত পনরটী পুস্তক এবং সমগ্র বিনয় ও অভিধর্ম্ম পিটক। রাজা অশোকের সাঞ্চিস্তূপের প্রাচীর-গাত্রে পঞ্চ-নেকয়িক (যিনি পঞ্চ-নিকায় জানেন) নামটী দৃষ্ট হয়।

৬। অঙ্গ হিসাবে বুদ্ধ-বচন নয় শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—সুত্ত, গেয়্য, বেয়্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অব্‌ভুতধম্ম ও বেদল্ল।

"সুত্তং গেয়্যং বেয়্যাকরণং গাথ্‌দানীতিবুত্তকং।
জাতকব্‌ভুতবেদল্লং নবঙ্গং সত্থু-সাসনং॥"

নেপালী বৌদ্ধেরা তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থকে দ্বাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। মহাবৈপুল্যসূত্র, অবদান প্রভৃতি তিন চারি নামই উক্ত তালিকার অতিরিক্ত।

বিভঙ্গ, নিদ্দেশ, খন্ধক, পরিবার, সুত্তনিপাতে মঙ্গল সুত্ত, রতন-সুত্ত, নালক-সুত্ত, তুবটকসুত্ত প্রভৃতি ও সুত্ত নামধেয় অন্যান্য বুদ্ধবচন সুত্তসংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত।

যে সকল সুত্তের মধ্যে গাথা বিদ্যমান আছে তৎসমুদয় গেয়্য নামে অভিহিত। দৃষ্টান্তস্থলে সংযুক্ত নিকায়ের সগাথ-বগ্‌গ।

সমগ্র অভিধর্ম্ম পিটক, অন্যান্য আটশ্রেণীর বহির্ভূত গাথাশূন্য সুত্তগুলি বেয়্যাকরণ নামে অভিহিত।

ধম্মপদ, থেরগাথা, থেরীগাথা, ও সুত্তনিপাতের শুদ্ধগাথা গুলি গাথা শ্রেণীর অন্তর্গত।

ভাবাবেশে যে সকল উচ্ছ্বাস গীতি গীত হয়, তৎসমুদয় উদান নামে অভিহিত। দৃষ্টান্তস্থলে, খুদ্দক নিকায়ে উদান পুস্তক।

ইতিবুত্তকে বুদ্ধের উক্তি সমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রত্যেক সুত্তের প্রারম্ভে লিখিত আছে, "বুত্তং হে'তং ভগবতা"।

ভগবান্ বুদ্ধের অতীত জন্ম বিষয়ক পুস্তকের নাম জাতক।

যে সকল সুত্তে আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত বিষয় সমূহ আলোচিত হইয়াছে তৎসমুদয় অব্ভুতধম্ম সংজ্ঞায় অভিহিত।

চুল্লবেদল্ল, মহাবেদল্ল, সম্যাদিট্ঠি, সক্কপঞ্হ, প্রভৃতি যে সকল সুত্তের প্রশ্নোত্তর শুনিলে হৃদয়ে বেদ (আনন্দ) ও জ্ঞানের সঞ্চার হয়, তাহাদের নাম বেদল্ল।

৭। ধর্ম্মখণ্ড হিসাবে বুদ্ধবচন চুরাশী সহস্র ধর্ম্মখণ্ডে বিভক্ত। এক বিষয়ক সুত্ত একটি ধর্ম্মখণ্ড। বিষয় বিভিন্ন হইলে প্রত্যেক সুত্তে একাধিক ধর্ম্মখণ্ড হইতে পারে। গাথা বন্ধে প্রশ্নভাগ একটি ধর্ম্মখণ্ড। উত্তর ভাগ অপর এক ধর্ম্মখণ্ড। ইত্যাদি।

কথিত আছে, বুদ্ধবচনের মধ্যে ৮২,০০০ বিষয় বুদ্ধের দ্বারা এবং ২,০০০ বিষয় স্থবির স্থবিরার দ্বারা আলোচিত হইয়াছিল। সিংহলী গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে যে, রাজা অশোক ৮৪০০০ ধর্ম্মখণ্ডের সম্মানার্থে ৮৪০০০ স্তূপ, স্তম্ভ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

সুমঙ্গলবিলাসিনীর গ্রন্থকার বলেন, পূর্ব্বোক্ত শ্রেণী বিভাগ ভিন্ন,

ত্রিপিটকের মধ্যে উদান-সঙ্গহ, বগ্গ-সঙ্গহ, পেয়্যাল-সঙ্গহ, নিপাত-সঙ্গহ, সংযুত্ত-সঙ্গহ, পঞ্চাস-সঙ্গহ প্রভৃতি আরও অনেক প্রকার বিষয় বিন্যাস আছে।

নেত্তি-পকরণের গ্রন্থকার সাসনপট্ঠানে সুত্তকে আলোচ্য বিষয় অনুসারে পশ্চাল্লিখিত শ্রেণীগুলিতে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা—

(১) বাসনা বিষয়ক সুত্ত; (২) নির্ব্বেধ বিষয়ক সুত্ত, (৩) অশৈক্ষ্য বা অর্হৎ বিষয়ক সুত্ত; (৪) সঙ্কলুষ বিষয়ক সুত্ত; (৫) সঙ্কলুষ ও বাসনা বিষয়ক সুত্ত; (৬) সঙ্কলুষ ও নির্ব্বেধ বিষয়ক সুত্ত; (৭) সঙ্কলুষ ও অশৈক্ষ্য বিষয়ক সুত্ত; ইত্যাদি।

আধুনিক সাহিত্যের শ্রেণী বিভাগের দিক্ দিয়া দেখিলে বলিতে হয় যে, বুদ্ধবচনে উপন্যাস, নবন্যাস, কাব্য, নাটক প্রভৃতি নাই। নীতিশাস্ত্র, দর্শন, মনোবিজ্ঞান, জীবন চরিত, পুরাণ, গীতি কবিতা প্রভৃতি আছে। স্থানে স্থানে কাব্য ও নাটকের ছায়া পরিদৃষ্ট হয়।

বুদ্ধবচনের শ্রেণী বিভাগের ধারা নির্ণীত হইল। এখন আমরা বৌদ্ধবচন আলোচনা করিব।

পালিতে ত্রিপিটকের বহির্ভূত আরও অনেক গ্রন্থ আছে। পরবর্ত্তী কালের বৌদ্ধাচার্য্যগণ ত্রিপিটক বুঝাইবার সুবিধা কল্পে ঐ সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমানেও সিংহল, ব্রহ্মদেশ ও শ্যামে অনেক পুস্তক প্রণীত হইতেছে। অধিকন্তু দেখা যায়, বৌদ্ধবচনকেও বুদ্ধবচনের ভাবে শ্রেণী বিভাগ করা যাইতে পারে।

বৌদ্ধবচনের মধ্যে ব্যাকরণই সর্ব্বাগ্রে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। অর্থকথা (commentary), টীকা (Sub-commentary), অনুটীকা, মধুটীকা, ব্যাকরণ (Grammars), প্রভৃতিকে ব্যাকরণ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। আচার্য্য বুদ্ধঘোষ ধর্ম্মপাল ও অন্যান্য কতিপয় স্থবিরের লিখিত ত্রিপিটকের ব্যাখ্যাগুলিই অর্থকথা নামে প্রসিদ্ধ। অথসালিনী পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়, বুদ্ধঘোষ যখন লঙ্কাদ্বীপে উপনীত হন, তখন তথায় মহাবিহারট্ঠ কথা, পোরাণট্ঠ কথা, প্রভৃতি বিবিধ অর্থকথা প্রচলিত ছিল। তৎসমুদয়ের সাহায্যেই বুদ্ধঘোষ তাঁহার নিজের অর্থকথাগুলি রচনা করিয়াছিলেন। মহাবংশের মতে, ত্রিপিটকের সহিত উহাদের অর্থকথাগুলি প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সঙ্গীতিতে আবৃত্তি করা হইয়াছিল। রাজা অশোকের পুত্র

আয়ুষ্মান্ মহেন্দ্রই তৎসমুদয়কে সিংহলী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। অর্থকথার প্রাচীনত্ব বিঘোষিত করিবার জন্যই কি মহাবংশের গ্রন্থকার এইরূপ কিংবদন্তীর অবতারণা করিয়াছেন কিংবা সত্যসত্যই অর্থকথা ও মূলগ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করা হইয়াছিল? বাস্তবিক এই প্রশ্নের মীমাংসা এখনও দুষ্কর। আমাদের ধারণা এই যে, ত্রিপিটক গ্রথিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিংবা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ও তৎপরবর্ত্তী কাল হইতে বৌদ্ধাচার্য্যগণের মুখে মুখে অর্থকথার ন্যায় কিছু প্রচলিত ছিল। নচেৎ ত্রিপিটকের অর্থ অনেক স্থলে দুরূহ বোধ হইত। অথবা ইহাও হইতে পারে যে, ত্রিপিটকের স্থানে স্থানে আমরা যে সকল নিদ্দেস দেখিতে পাই, তদনুসারেই পরবর্ত্তীকালে অর্থকথা সমূহ বিরচিত হইয়াছিল। যাহা হউক, অন্ততঃ আমরা ইহা নির্ব্বিবাদে বলিতে পারি যে, বুদ্ধঘোষের বহুপূর্ব্বে অর্থকথা সমূহ প্রণীত হইয়াছিল।

পশ্চাল্লিখিত অর্থকথাগুলি বুদ্ধঘোষের রচিত বলিয়া পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন্। যথা—সমন্ত পাসাদিকা বিনয় পিটকের অর্থকথা, কঙ্খাবিতরণী পাতিমোক্খের অর্থকথা, অট্‌ঠসালিনী ধম্মসঙ্গণির, সম্মোহ বিনোদনী বিভঙ্গ পকরণের, ধাতুকথাপকরণ ট্‌ঠকথা, পুগ্‌গলপঞ্‌ঞত্তি পকরণট্‌ঠকথা, কথাবত্থুট্‌ঠ কথা, যমক পকরণট্‌ঠকথা, পট্‌ঠাণপকরণট্‌ঠকথা, সুমঙ্গলবিলাসিনী দীঘনিকায়ের অর্থকথা, পপঞ্চসূদনী মজ্ঝিম নিকায়ের অর্থকথা, সারত্থপকাসিনী সংযুক্ত নিকায়ের অর্থকথা, এবং পরমত্থজোতিকা খুদ্দকপাঠ ধম্মপদ সুত্তনিপাত ও জাতকের অর্থকথা।

ভদ্রতীর্থবাসী ধর্ম্মপাল স্থবির পরমত্থদীপনী নামে উদান, ইতিবুত্তক, বিমানবত্থু, পেতবত্থু, থেরগাথা, থেরীগাথা ও চরিয়া পিটকের অর্থকথা রচনা করিয়াছিলেন।

ত্রিপিটকের অন্তর্গত অবশিষ্ট চারিটী গ্রন্থেরও অর্থকথা বিদ্যমান আছে। যথা—উপসেন স্থবিরের কৃত সদ্ধম্মপজ্জোতিকা নিদ্দেসের অর্থকথা; মহানাম স্থবিরের কৃত সদ্ধম্মপকাসিনী পটি সম্ভিদা মগ্‌গের অর্থকথা; বুদ্ধদত্ত স্থবিরের কৃত মধুরত্থপকাসিনী বুদ্ধবংশের অর্থকথা; এবং বিসুদ্ধজনবিলাসিনী অপদানের অর্থকথা। এই শেষোক্ত অর্থকথার গ্রন্থকারের নাম জানা যায় নাই।

অর্থকথার পালা প্রায় শেষ হইল। এক্ষণে আমরা টীকার পালা আরম্ভ করিব। অর্থকথাগুলির ভাষা স্থানে স্থানে সহজবোধ্য নহে বলিয়া পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ অর্থকথা সমূহের টীকাদি প্রণয়ন করেন। ত্রিপিটকের সর্ব্বশুদ্ধ

বারখানি টীকা গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে। যথা—সারত্থদীপনী, বিমতীবিনোদনী, ও বজিরবুদ্ধি টীকা-সমন্তপাসাদিকা নামিকা বিনয়ট্ঠ-কথার টীকা; "বিনয়ত্থ মঞ্জুসা কঙ্খাবিতরণীর টীকা। প্রথম সারত্থমঞ্জুসা সুমঙ্গলবিলাসিনীর, দ্বিতীয় সারত্থমঞ্জুসা অপ্পত্থা সূদনীর, তৃতীয় সারত্থমঞ্জুসা সারত্থপ্পকাসিনীর ও চতুর্থ সারত্থমঞ্জুসা মনোরথপূরণীর টীকা। সেইরূপ মূলটীকা সপ্তপ্রকরণ অভিধর্ম্মের অর্থকথা সমূহের, প্রথম পরমত্থপকাসনী অত্থসালিনীর, দ্বিতীয় পরমত্থপকাসনী সম্মোহবিনোদনীর ও তৃতীয় পরমত্থপকাসনী অভিধর্ম্মের শেষ পাঁচখানি প্রকরণের অর্থকথা সমূহের টীকা।

পালিতে ব্যাকরণের সংখ্যাও কম নহে। কচ্চায়ন, কচ্চায়ন-বুত্তি, কচ্চায়নবণ্ণনা, মহারূপসিদ্ধি, বালাবতার, মোগ্গল্লান, চুলনীতি, পয়োগসিদ্ধি, আখ্যাতপাদ, ধাতুমঞ্জুসা, মহাসদ্দনীতি, মুখমত্তদীপনী পালি ব্যাকরণগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ব্যাকরণ সংজ্ঞার অন্তর্ভূত অন্যান্য গ্রন্থও দৃষ্ট হয়। যথা—অভিধম্মত্থসঙ্গহ ও উহার টীকা, অভিধম্মাবতার ও উহার টীকা।

অভিসম্বোধি অলঙ্কার নামে অলঙ্কার শাস্ত্র সম্বন্ধেও একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ আছে।

পালি কাব্যের মধ্যে জিনচরিত, জিনালঙ্কার, তেলকটাহগাথা, মালালঙ্কারবত্থু, সমন্তকূটবণ্ণনা ও অনাগতবংস বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দীন, নীতি, বিনয় প্রভৃতি বিষয়ক গ্রন্থেরও অভাব নাই। কিন্তু আমরা মনে করি যে, বংশ শ্রেণীর গ্রন্থগুলিই বৌদ্ধবচনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

বংশ শব্দের অর্থ Chronicle ইতিবৃত্ত, এক প্রকার ইতিহাস। বংশশ্রেণীর সাহিত্যের মধ্যে দীপবংস, মহাবংস, শাসনবংস, গন্ধবংস, দাঠাবংস, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলি বৌদ্ধ সংস্কৃতে অবদান নামে অভিহিত হইয়াছে। যথা—অবদানকল্পলতা, দিব্যাবদান, ইত্যাদি।

এতদ্ব্যতিরিক্ত পালিতে অভিধান শ্রেণীর গ্রন্থও দৃষ্ট হয়। যথা—অভিধানপ্পদীপিকা ও অভিধানপ্পদীপিকা সূচি।

বৌদ্ধবচনের মধ্যে অপর দুইটী গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব। গ্রন্থ দুইটী জগৎপ্রসিদ্ধ। উহাদের নাম—বিসুদ্ধিমগ্গ ও মিলিন্দপঞ্হা। তন্মধ্যে বিসুদ্ধিমগ্গকে বলা যাইতে পারে Buddhist Encyclopadia এবং মিলিন্দ পঞ্হাকে বলা যাইতে পারে প্রাচীন ভারতের আদর্শ পৌরাণিক উপন্যাস (Historical Romance).

সাহিত্য, ২৫ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা।

সাঞ্চী।

সাঞ্চীতে ভারতের প্রধান বৌদ্ধস্তূপ বিরাজিত। এইটি সকল স্তূপের অপেক্ষা সুন্দর বলিয়া বিখ্যাত।

ভূপাল হইতে বেলা চারিটার ট্রেণে সাঞ্চীর স্তূপ দেখিতে যাত্রা করিলাম। দূরত্ব মোটে আটাশ মাইল। দেড় ঘণ্টায় রেল পৌছে। যদি ফিরিবার ট্রেণের সুবিধা থাকিত তাহা হইলে স্তূপ দেখিয়া অনায়াসে ভূপালে রাত্রি দশটার মধ্যে প্রত্যাগত হইয়া আহারাদি করিয়া শয়নে পদ্মলাভ করিতে পারা যাইত। কিন্তু সে সুবিধা নাই। আমার পক্ষে রাত্রি সাড়ে চারিটার ট্রেণে প্রত্যাগত হওয়াই সঙ্গত, তাহা হইলে ভূপালে ভোরে পৌছিতে পারা যায়। সাঞ্চীতে থাকিবার কোন সুবিধাজনক স্থান নাই, কেবল ভূপালের বেগমের নির্ম্মিত একটি ডাক বাঙ্গলা আছে—খাদ্যদ্রব্যের কোন ব্যবস্থা নাই—ক্ষুদ্র ষ্টেশন—কিছুই বিক্রয় হয় না, পুরী মিঠাই ত আশার অতীত; একটি পান-বিড়ি-সিগারেট-ওয়ালাও নাই।

কাজেই ভূপাল ষ্টেশনে কিঞ্চিৎ জলযোগ (মিষ্টান্ন পুরী ডালমুট জিলাপী) সমাপন করিয়া, রাত্রিতে অনাহারে সাঞ্চী ষ্টেশনে একখানি বেঞ্চে অলষ্টারের উপর মলিদা মুড়ি দিয়া শয়নের কল্পনা করিয়া—অপরাহ্ণ প্রায় চারিটার সময় জি, আই, পি, রেলে (পূর্ব্বে ইহা Indian Midland Railway নামে অভিহিত ছিল) ভূপালের উত্তরপূর্ব্ব সাঞ্চী অভিমুখে যাত্রা করিলাম। এই আটাশ মাইল পথের শোভা বড়ই মনোরম। ট্রেন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল—কিছুক্ষণ পরেই পাহাড় আরম্ভ হইল—বড় পাহাড় নহে। ছোট ছোট উঁচু নীচু লম্বা চওড়া নানারকমের স্তূপ স্তূপ শৈলমালা ঘেরিয়া আসিতে লাগিল। এ সকল পাহাড়ে বড় বড় গাছ নাই—কিন্তু আবার অনাবৃতও নহে। শ্যামল গুল্মরাজিতে সমাচ্ছন্ন ছোট ছোট ঝোপঝাপে ঢাকা—গাঢ় সবুজ রং; মনে হইতে লাগিল যেন পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘখণ্ড আকাশ হইতে ভূতলে খসিয়া পড়িয়া পথের দু'ধারে স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে। দৃশ্য বড়ই চমৎকার—

বড়ই বাহার খুলিয়াছে—শ্যামায়িত তরঙ্গায়িত ধরিত্রীর নীল শোভায় চক্ষু জুড়াইয়া যহিতে লাগিল—এ স্থানটি যেন প্রকৃতির নিকুঞ্জকানন (Gnove of Nature)। দূরদূরান্তর শ্যামল পাদপরাজিতে সমাচ্ছন্ন। শ্যামল, হরিত, নীল শোভা চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত। ক্রমে অল্পে অল্পে সন্ধ্যার স্তিমিত ছায়া প্রসারিত হইতেছে—বিটপীশিরে দিনান্ত কিরণের স্বর্ণাভা কৃষ্ণ হরিতে মিশ্রিত হইয়া বিচিত্র মৃদু দীপ্তি ফুটাইতেছে—শীতের বেলা, দিন ছোট—অপরাহ্ন অন্ধকার ও আলোক মিশ্রিত! ট্রেন চলিতেছে; প্রায় দেড়ঘণ্টা পরে সহসা নেত্রপথে ও কি দৃশ্য প্রকটিত হইল! শৈলশৃঙ্গোপরি ও কি শোভা পাইতেছে! অপূর্ব্ব তোরণ-সমন্বিত সাঞ্চীর বৌদ্ধস্তূপ ওই গিরিশিখরে বিরাজিত! ঈষৎ অন্ধকার-মিশ্রিত আলোকে ট্রেন হইতে স্তূপের দৃশ্য বড়ই বিচিত্র-দর্শন!—স্তূপের দূর দৃশ্যে হৃদয়ে যেমন অননুভূত আনন্দের সঞ্চার হইল, সেই সঙ্গে সঙ্গে আবার বড় ভয়ও হইতে লাগিল।—স্তূপ ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধমাইলেরও কিঞ্চিৎ অধিক, তদুপরে আবার পাহাড়ের উপর অবস্থিত দেখিতেছি—যদি ঘোর সন্ধ্যা হইয়া যায় তাহা হইলে কি প্রকারে বনপথ অতিক্রম করিয়া পাহাড়ে উঠিব? আমি একাকী—আমার সঙ্গে বন্ধু বা ভৃত্য কেহই নাই—শুনিয়াছিলাম এ অঞ্চলে ব্যাঘ্র ও অন্য বন্য জন্তুরও ভয় আছে। জনমানবশূন্য বনপ্রান্তর—নিকটে কোন ক্ষুদ্র গ্রামও নাই; ষ্টেশন মাষ্টার যদি সাহায্য না করেন, সঙ্গে যদি কোন লোক অনুগ্রহ করিয়া না দেন, তাহা হইলেইত সকল আশা বৃথা হইল? এত ক্লেশ স্বীকার কি পণ্ড হইয়া যাইবে! যা করেন ঈশ্বর! পথিকের সহায় তিনি, এই ভাবিয়া নীরবে পাহাড়ের দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া চলিলাম—ক্রমে সাঞ্চী ষ্টেশনে ট্রেন আসিয়া পৌঁছিল।

ষ্টেশন্ প্ল্যাটফরমে অবতরণ করিয়া এদিক ওদিক চাহিতেছি, এমন সময় দেখি কোট প্যাণ্টুলন ও মস্তকে মলিদার টুপী পরিহিত একটি সৌম্য-দর্শন ভদ্রলোক যষ্টিহস্তে দাঁড়াইয়া আমার দিকে দেখিতেছেন। আমারও তাঁহার দিকে দৃষ্টি পতিত হইবামাত্র মনে কেমন একটা সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, ইনি আমাদের দেশীয় লোক হইবেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয়ের কি নাম? তিনি বলিলেন, 'শ্রীপাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায়।' মহাশয়ের নিবাস? 'বালি'। এ কথা শুনিবামাত্র আমার আপাদমস্তক হর্ষে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল—তখন আনন্দে আমার মনে যে কি ভাব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে লিখিয়া বুঝাইবার শক্তি আমার নাই। আমি

তাঁহাকে বলিলাম, মহাশয়, আমি সাঞ্চীস্তূপ দেখিতে আসিয়াছি। তিনি বলিলেন, "চলুন, আমি আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছি—অগ্রে আমার তাঁবুতে যাইয়া চা পান করিয়া লউন,"—পরে একটু ভাবিয়া বলিলেন, "না, অগ্রে দেখিয়া আসিয়া পরে চা পান করিবেন, কারণ সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে।" আমি বলিলাম—তা বেশ, স্তূপ দেখিতে পারা যাইবে ত? পাহাড়ের উপরে অবস্থিত দেখিতেছি। তিনি বলিলেন, "আমরা প্রথমে একটি সোজা পথ দিয়া পাহাড়ে উঠিব—বেশী বড় পাহাড় নয়—আমি লইয়া যাইতেছি চলুন।" এই বলিয়া তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া চলিতে লাগিলেন—ষ্টেশনের কিয়দ্দূরে কয়েকটি শুভ্র শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছে।—প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডাইরেক্টর জেনেরল নিজ কর্ম্মচারিগণের সহিত এই বিশাল স্তূপের সংস্কার কার্য্য পরিদর্শনে আসিয়াছেন—পাঁচকড়ি বাবু তাঁহার হেড ক্লার্ক।—আমরা চলিতে চলিতে ক্রমে শৈলের মূলদেশে উপস্থিত হইলাম। গিরি আরোহণ করিতে লাগিলাম—চলিতে চলিতে মধ্যে মধ্যে দুইজনে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। চড়াই কষ্টকর নহে—সরল ঈষৎ ঢালু পথ পাহাড়ের বৃক্ষবিটপের মধ্য দিয়া উপরে উঠিয়াছে—ক্রমে আমরা সেই জগদ্বিখ্যাত স্তূপের তোরণ সমীপে আসিয়া উপনীত হইলাম—দেখিলাম ডাইরেক্টর জেনেরল স্বয়ং স্তূপের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। পাঁচুবাবু বলিলেন, "সাহেব এখনও যায় নাই দেখ্‌ছি, আপনি ঐ দিকটা দেখিয়া আসুন—আমি এ দিকে অপেক্ষা করিতেছি—আপনি ঘুরিয়া আসিলে আপনাকে অন্যান্য অংশ দেখাইব।" আমি কর্ম্মজীবনের সাহেবভীতি বুঝি—তাঁহার ন্যায়সঙ্গত কথার অনুবর্ত্তী হইয়া স্তূপ দেখিতে গেলাম—তিনি ক্ষণকালের নিমিত্ত অন্তরালে অন্তর্হিত হইলেন।

প্রকাণ্ড গম্বুজের ন্যায় বিরাট্ স্তূপের চতুর্দ্দিক্ অপূর্ব্ব-সুন্দর প্রস্তর নির্ম্মিত রেলিংএ পরিবেষ্টিত। এরূপ রেলিং আর কোথাও দেখি নাই। রেলিংএর উচ্চতা ছয় ফুটেরও অধিক হইবে। যেন মোটা মোটা প্রস্তর জুড়িয়া এই অনিন্দ্য সুন্দর বৃত্তাকার পরিবেষ্টনী নির্ম্মিত হইয়াছে। চারিদিকে চারিটি অপূর্ব্ব শিল্পশোভাখচিত তোরণ; এরূপ তোরণ আর কোথাও নাই। চিত্র না থাকিলে কাহারও সাধ্য নাই যে লিখিয়া বর্ণনা করিয়া, ইহার গঠন ও শিল্পসৌন্দর্য্য বুঝাইতে পারে।—সচরাচর যেরূপ সমুচ্চ দ্বার বা খিলান-সমন্বিত তোরণ দৃষ্ট হয়, এই চারিটি তোরণের তাহাদের সহিত কোন সৌসাদৃশ্যই

নাই। চারিটি তোরণের গঠন প্রণালী একই প্রকার, তবে শিল্পচাতুর্য্য বিভিন্ন রকমের। প্রথমে সংক্ষেপে একটি তোরণের গঠন-প্রণালী বুঝাইতেছি, অপর তিনটির গঠনও সেইরূপ। দুইটি শিল্পশোভাখচিত চতুষ্কোণ স্তম্ভ উর্দ্ধে উঠিয়াছে; শীর্ষদেশে তিনটি পাড়ের ন্যায় চতুষ্কোণ লম্বা প্রস্তর সমান্তরাল ভাবে পর পর সংলগ্ন হইয়া আছে। এই চতুষ্কোণ প্রস্তরগুলির সর্ব্বাঙ্গে বুদ্ধলীলাবিষয়ক ও জাতকের নানা চিত্রাবলী উৎকীর্ণ হইয়াছে। পূর্ব্ব তোরণের স্তম্ভদ্বারের উপরিভাগে হস্তিযূথ পৃষ্ঠোপরে পূর্ব্বোক্ত অপূর্ব্ব খিলান-সদৃশ শিল্পসম্ভার বহন করিতেছে। দক্ষিণ তোরণের স্তম্ভোপরি মর্কটাকার স্থূলোদর, ক্ষুদ্রপদ, স্ফীতগণ্ড, ও দৈত্যমুণ্ডাকৃতি মনুজগণ ক্ষুদ্র হস্তযুগ উত্তোলন করিয়া দীর্ঘশিল্পভার ধারণ করিতেছে। এতদ্ভিন্ন অপর তোরণদ্বয়ের শোভাও বিচিত্র গঠনের কৃশ-স্থূল আকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য্যে মনোহারী। বুদ্ধদেবের অগণ্যলীলার চিত্রের বর্ণনার স্থান নাই। সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ, পক্ষী, অপ্সর অপ্সরা, যক্ষ, রক্ষঃ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, লতা, ফুল, পাতা প্রভৃতি যে কত রকমের শিল্পচাতুর্য্য তোরণ চতুষ্টয়ে সমলঙ্কৃত, তাহা আর কি বর্ণনা করিব! কত প্রকারের শোভাযাত্রা চলিয়াছে—স্বর্গ হইতে দেবকন্যাগণ অবতরণ করিয়া বুদ্ধের নানাবিষয়িণী লীলা অবলোকন করিতেছেন, এইরূপ অসংখ্য চিত্রভূষিত শিল্পসৌন্দর্য্য দেখিয়া তোরণের নিম্ন দিয়া পরিবেষ্টনীর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলাম। বিশাল বৃত্তাকার বেদিকার উপর স্তূপ অবস্থিত। বেদিকার ব্যাস ১২০ ফিট। উচ্চতা চৌদ্দ ফিট এবং স্তূপের (বৃত্তাকার) চতুষ্পার্শ্বের বেদিকার প্রশস্ততা ৬ ফিট। স্তূপের ব্যাস ১০৬ ফিট, উচ্চতা ৪২ ফিট। ইহা ইষ্টকপ্রস্তরে গ্রথিত, দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ। কালের পীড়নে শৈবাল তৃণগুল্মে সমাচ্ছাদিত হইয়াছে—স্থানে স্থানে জীর্ণ ভগ্ন—কিন্তু সংস্কার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে—শীঘ্রই নবশ্রী ধারণ করিবে।

দুই তিনবার স্তূপরাজকে প্রদক্ষিণ করিয়া ইহার উত্তর পশ্চিম কোণে অপর আর একটি ছোট স্তূপ দেখিলাম। ইহার দশা অতিশয় শোচনীয়, সংস্কৃত হইতেছে। এই স্তূপটি দেখিয়া পর্ব্বতের একপার্শ্বে আসিয়া দেখি, পাঁচুবাবু আমার অপেক্ষায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া পর্ব্বতের দক্ষিণদিকের কিঞ্চিৎ নিম্নপ্রদেশে আরও একটি প্রস্তর বেষ্টনীবেষ্টিত স্তূপ দেখাইলেন—ইহার পরিবেষ্টনীর শিল্পসৌন্দর্য্যের যে কি বাহার তাহা আর কি বলিব! ইহাতেও নানা বৌদ্ধশিল্প অপূর্ব্ব নৈপুণ্যে উৎকীর্ণ হইয়াছে।

মুগ্ধ হইয়া দেখিতে লাগিলাম! শৈলচূড়ে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে—সে দিকে দৃক্‌পাত নাই—প্রফুল্লচিত্তে শিল্প-শোভাই দেখিতেছি। এমন সময় অপরিচিতের মাঝে চিরপরিচিত বন্ধু বলিলেন, "মহাশয়, সন্ধ্যা হইয়াছে, পাহাড় হইতে নামুন—এই দিকে পাহাড়ে অধিরোহণ ও অবরোহণ করিবার সোপান, স্বচ্ছন্দে অবতরণ করুন।" নামিতে নামিতে পূর্ব্বোক্ত স্তূপের কিয়দ্দূরে একটি প্রকাণ্ড পাথরের বাটি পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলাম। তাহার একপার্শ্ব আবার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—এর চেয়ে বড় পাথরের বাটি আগরা দুর্গে দেখিয়াছি। এইটি কিন্তু কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত।

এতদ্ব্যতীত নামিতে নামিতে আরও স্থানে স্থানে নানা বৌদ্ধকীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ ও নিদর্শন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দৃষ্ট হইতে লাগিল। পাহাড়ের উপর হইতে নিবিড় ঘনাচ্ছাদিত শৈলশ্রেণীর মনোমুগ্ধকর দৃশ্যাবলী নয়নপথে পতিত হইতে লাগিল। এ অঞ্চলের চতুর্দ্দিকে বৌদ্ধকীর্ত্তি রাজা অশোকের সময় নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই অঞ্চলের বহু বর্গ মাইল ভূভাগ ব্যাপিয়া অসংখ্য বৌদ্ধস্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সাঞ্চীর ৬ মাইল দূরে সোণারী গ্রামে ৮টি; সোণারীর ৩ মাইল দূরে সা-দারায় ১টি; সাঞ্চীর ৭ মাইল দূরে ভোজপুরে ৩৭টি; ও ভোজপুর হইতে পাঁচ মাইল দূরে ৩টি স্তূপ আছে অবগত হইলাম। কিন্তু এই সাঞ্চীর স্তূপই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা মনোহারী। সাঞ্চী হইতে ৬ মাইল দূরে ভুবনমোহিনী বিদিশালক্ষণার দিগন্তপ্রথিতা রাজনগরী সুদূর অতীতের ঘন ঘোর ভূকম্পনে ভূপ্রোথিতা হইয়া রহিয়াছে। পাহাড়ের উপর হইতে দৃশ্য মনোরম—দূরে বেত্রবতী রজত তরঙ্গে প্রবাহিতা। এই নগরী সৌন্দর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে, সম্পদে, প্রাসাদে, পণ্যবীথিকায়, হর্ম্ম্যমালায়, সরোবরে, উদ্যানে, রথ্যায় বৈজয়ন্তপুরীকেও পরাজিত করিয়াছিল। বৌদ্ধবিহার, মঠ, মন্দির, সৌধ, অলিন্দ, তোরণ, প্রাচীর, প্রস্তরা, স্তূপ, স্তম্ভ, চৈত্য, সঙ্ঘারাম, বেদিকা, গুহা, গুম্ফা, প্রভৃতির স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণা ছিল। এই স্থানে বেত্রবতী নদী প্রবাহিতা। কালিদাসের মেঘদূতের যক্ষ আষাঢ়ের প্রথম দিবসে উদিত মেঘকে অলকাভিমুখে প্রেরণ করিবার সময় এই স্থানের কীর্ত্তিকলাপ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া যাইতে কাতর অনুরোধ করিয়াছিল। এই স্থানের বর্ণনায় যক্ষ এইরূপ বলিয়াছিলেন—"দশার্ণের রাজধানী বিদিশা। উহার যশে ভুবন ভরিয়া আছে। তুমি তথায় বেত্রবতীর জল প্রচুর পরিমাণে পান করিবে। বেত্রবতী নদী, সুতরাং তোমার রসরঙ্গিণী; সে বিদিশার পাশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে; উহার

জল চলিতেছে, তরঙ্গে তরঙ্গে লাফাইতেছে, বোধ হইতেছে যেন কোন প্রৌঢ়া কামিনী মুখে ভ্রুভঙ্গী করিয়া তোমায় ডাকিতেছে। সুতরাং সে জল পানে তোমার মুখে চুম্বনের ফল হইবে।” তাহার পর মহাকবি কালিদাস যক্ষের মুখ দিয়া মদ্‌বর্ণিত স্থানের বর্ণনা করিয়া বলাইতেছেন, “সেখানে গিয়া তুমি নীচৈ (সাঞ্চি) নামে সহরতলীর পাহাড়ে বাসা লইও। তোমার স্পর্শে তাহার শরীর পুলকে পূরিত হইয়া উঠিবে। দেখিবে তাহার পুলক কদম্বফুলরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই পাহাড়টি কূর্ম্মপৃষ্ঠ, ৩০০।৪০০ ফুটের অধিক উচ্চ নহে। ইহা বৌদ্ধবিহার, বৌদ্ধস্তূপ ও বৌদ্ধসঙ্ঘারামে বিমণ্ডিত।”

সন্ধ্যা হইয়াছে—স্বচ্ছ অন্ধকার কাননতলে লুকোচুরি খেলা খেলিতেছে। আমি কবিত্বপূর্ণ প্রদেশে কবিত্বময়ী শোভা উপভোগ করিতে করিতে বন্ধু সঙ্গে নামিয়া আসিয়া তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হইলাম।

তাঁবুতে আসিয়াই চা’র ব্যবস্থা হইল। শুধু কি চা! তাঁহার আফিসের আর একটি বাবু কাশী হইতে উৎকৃষ্ট কাঁচাগোল্লা, লাড্ডু, খাজা প্রভৃতি অতি উপাদেয় মিষ্টান্ন আনিয়াছিলেন, তাহা চা’র সঙ্গে দুই তিনটি প্রদত্ত হইল। রাত্রে রুটী তরকারী দুগ্ধ ও আবার সেই অমৃতোপম উপাদেয় মিষ্টান্ন প্রভৃতি আহার। আমি তাঁবুতে ঘণ্টা দুই তিন বিশ্রাম করিবার পর, একটি লোকের হস্তে হরিকেন ল্যাম্প দিয়া পাঁচু বাবু আমাকে ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিলেন। ষ্টেশন মাষ্টার দুই খানি বেঞ্চ জুড়িয়া শয্যা রচনা করিয়া ঘুমাইতেছিলেন, বিদেশী অতিথি সমাগত দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ সেই শয্যা অধমকে প্রদান করিয়া, নিজে ভূতলে শয়ন করিলেন। আমি স্বীকৃত না হইলেও তিনি কিছুতেই ছাড়িলেন না। এই অতিথিবৎসল প্রবাসিগণের আতিথেয়তা দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া গেলাম। কি ভাবিয়া আসিতেছিলাম, আর এখানে বিধাতার ইচ্ছায় কি ঘটিল! জনপ্রাণীহীন অরণ্য-প্রান্তর সুখালয়ে পরিণত হইল! অতি ভোরে যখন চারিদিক অরুণের রক্ত-রাগে রঞ্জিত হয় নাই, তখনও নিবিড় অন্ধকার অরণ্যে খেলিতেছিল। আমিও অলষ্টারের উপর মলিদা মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছিলাম। ঘোর শীত, কন্‌কনে ঠাণ্ডা, জল জমিয়া বরফে পরিণত হইবার উপক্রম। কাক কোকিল বিহঙ্গ কুক্কুট কাহারও সাড়া নাই। এই ভোরে আমি রেলের শব্দে জাগিয়া উঠিলাম। গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল, আমিও বিদায় গ্রহণ করিলাম। প্রবাসে অনেক সুখ-স্মৃতির মধ্যে এটিও আমার চিত্তে চিত্রের ন্যায় প্রতিফলিত থাকিবে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

পর্য্যায় রত্নমালা। *

চিকিৎসা বিজ্ঞানে পারদর্শী হইতে হইলে নিদানাঙ্গে শারীর তত্ত্বের ন্যায় চিকিৎসাঙ্গে দ্রব্য পরিচয় তুল্য ভাবেই শিক্ষা করিতে হয়। দ্রব্যের সাধারণ পরিচয় প্রথমে সংজ্ঞা বা পর্য্যায় দ্বারাই পাওয়া যাইতে পারে, বিশেষ পরিচয় আকারাদির বর্ণনা দ্বারা অবগত হওয়া যায়। সুতরাং ভৈষজ্য-তত্ত্বানুশীলনে প্রথমতঃ পর্য্যায় জ্ঞান বিশেষ আবশ্যক।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের শল্য শলাকাদি অঙ্গের চর্চ্চা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। এক্ষণে অধিকাংশ বৈদ্য মহোদয়গণ একমাত্র ভেষজের আশু ও নির্ব্বাধ কার্য্যকারিতার গুণে আয়ুর্ব্বেদের গৌরব রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আজকাল ভৈষজ্য-তত্ত্বানুশীলনও ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইতে চলিয়াছে। এখন আর দ্রব্যের পরিচয় গ্রহণে তেমন আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিয়দ্দিবস পূর্ব্বেও আয়ুর্ব্বেদের অধ্যয়নার্থীদিগকে যত্নপূর্ব্বক অমরকোষ, বিশেষতঃ তাহার বনৌষধিবর্গ এক প্রকার অনর্গল কণ্ঠস্থ রাখিতে হইত, এবং বনে বনে দ্রব্যাহরণের দ্বারা দ্রব্য পরিচয় ও হাতে কলমে খল ধরিয়া ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিতে হইত। কিন্তু এখন অধ্যাপক ও ছাত্রবর্গ তাদৃশ অসভ্যতা প্রকাশ করিতে অসম্মত হইয়া উঠিতেছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা বিভাগের অনুকরণে অমরকোষ পাঠ্য তালিকা হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। সুলভ "শব্দকল্পদ্রুম" বা "বৈদ্যক শব্দসিন্ধু" তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে, এবং তাহার সাহায্যেই এক একটা অদ্ভুত সিদ্ধান্ত বাহির হইয়া যাইতেছে।

এই দুর্দ্দশা লক্ষ্য করিয়া "বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি" পুরাতন আয়ুর্ব্বেদের গ্রন্থানুসন্ধান ও সংস্কার সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া দ্রব্যতত্ত্ব-শিক্ষার্থিগণের সুবিধার জন্য প্রাচীন "পর্য্যায় রত্নমালা" নামক দ্রব্যাভিধান খানি মুদ্রিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

তজ্জন্য যে কয়েকখানি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হইয়াছে তাহার সাহায্যে বিশুদ্ধ পাঠ নির্ণীত হইতেছে। তদুল্লিখিত দ্রব্যাদির পরিচয় ও সন্দিগ্ধ বিষয়;

---

* উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের ৮ম অধিবেশনে পঠিত।

গুলির মীমাংসাসূচক উপযুক্ত চিত্রাদির সহ এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে, আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপক ও অধ্যয়নার্থীদিগের বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়াই বোধ হয়। প্রাচীনকালে এই গ্রন্থখানির বিশেষভাবে পঠন পাঠন প্রচলিত ছিল। চক্রদত্তের টীকাকার শিবদাস সেন মহাশয়ও তাঁহার তত্ত্বচন্দ্রিকা টীকার নানা স্থানে এই গ্রন্থের মত উদ্ধৃত করিয়া আমাদের এই মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। (১)

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিতে এ পর্য্যন্ত এই গ্রন্থের যে ৪ খানি হস্তলিখিত পুথি সংগৃহীত হইয়াছে তাহা একই স্থান হইতে সংগৃহীত হওয়ায় ইহার প্রচুর প্রচলনের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। আজ কাল অনেকেই অমরকোষের বনৌষধিবর্গ ব্যতীত আয়ুর্ব্বেদাধ্যায়ীদিগের উৎকৃষ্ট সহায়ক আর কোন অভিধানের সত্তা অবগত নহেন। "পর্য্যায় রত্নমালা"র আদ্যোপান্ত আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, এই গ্রন্থ অমরকোষ অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী। ইহাতে প্রায় পাঁচ শত শব্দের পর্য্যায় উল্লিখিত হইয়াছে। অমরকোষের বনৌষধিবর্গে ২১৭টী পর্য্যায়ের অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার অন্যান্য বর্গে আয়ুর্ব্বেদে ব্যবহৃত পদার্থের পর্য্যায় বিক্ষিপ্ত ভাবে বিন্যস্ত থাকিলেও, কষ্ট কল্পনা করিয়া তাহার উদ্ধার করা অপেক্ষা রত্নমালা অধ্যয়ন করাই অধিক সুবিধাজনক বলিয়া স্বীকৃত হইবে। দুই এক স্থানে রত্নমালা দ্বারা অধিক সাহায্য পাইবারও সম্ভাবনা আছে।

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি এই গ্রন্থের যে কয়খানি পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে একখানি ১৬৪১ শকে অর্থাৎ ১৭১৯ খৃঃ লিখিত। এই গ্রন্থখানি অনেকটা সংশুদ্ধ। অন্য কয়খানিতে লিপিকরের কোন সময়ের উল্লেখ নাই, তবে তাহা পরবর্ত্তী কালের বলিয়াই বোধ হয়। প্রতি গ্রন্থেই প্রায় প্রতি পর্য্যায়ের শেষে উক্ত দ্রব্যের দেশজ নাম সন্নিবিষ্ট থাকায় সন্দিগ্ধ দ্রব্য গুলির মীমাংসা হইবার বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। পুথি কয়খানিতে সামান্য পাঠের তারতম্য থাকিলেও মূল বস্তু ও দেশজ নাম প্রায়ই এক প্রকার। গ্রন্থের মূল তিন ভাগে বিভক্ত। কতগুলি পর্য্যায় পূর্ণ শ্লোকে, কতগুলি অর্দ্ধ শ্লোকে এবং কতগুলি পাদ শ্লোকে লিখিত। গ্রন্থারম্ভে সেই ভাবেই লিখিবার জন্য গ্রন্থকার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন :—

"তেষ নামানি বক্ষ্যামি শ্লোকেনার্দ্ধেন পাদতঃ।"

এই গ্রন্থের রচয়িতা কে, তদ্বিষয়ে সংশয়ের অভাব নাই। "বৈদ্যক শব্দ-

(১) চক্রদত্ত ১১৬, ৩৭৬, ৪০৬ পৃঃ।

সিন্ধু"কার কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব পুস্তকালয়াধ্যক্ষ ৺উমেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় এই গ্রন্থের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে তিনি গ্রন্থকর্ত্তার নাম বলিতে পারেন নাই। "কোনও বঙ্গীয় গ্রন্থকার কর্ত্তৃক রচিত" এই মাত্র বলিয়াছেন। সম্ভবতঃ প্রতি পর্য্যায়ের শেষে বঙ্গ ভাষা প্রচলিত নাম থাকায় এই প্রকার অনুমান করিয়াছিলেন। প্রফেসর উইলসন গ্রন্থকারকে জৈন বলিয়া সন্দেহ করেন; তবে তিনি কোন্ প্রমাণে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা আমরা অবগত হইতে পারি নাই।

সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সম্পাদক কবিরাজ শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়, ১৩২০ সালের প্রথম সংখ্যা সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় এই গ্রন্থের বিবরণ প্রসঙ্গে "প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা ও শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদ নরহরি দাস ঠাকুরের পিতা রাজবৈদ্য শ্রীনারায়ণান্তরঙ্গ"কে ইহার গ্রন্থকার নির্ণয় করিয়া এক নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। পরিষদে রক্ষিত একখানা প্রাচীন পুথিতে এই গ্রন্থকারের নাম পাইয়াছেন। ঐ পুথির যে প্রকার বিবরণ দিয়াছেন ও যে সকল প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত হইল:—

"রত্নমালাধ্যায়ঃ * * * পুথির প্রথম পত্র নাই। * * * লিপি সুখ-পাঠ্য সুন্দর ও বিশুদ্ধ। (?) একটী কারণে এই পুথিখানা বড়ই মূল্যবান। এ পর্য্যন্ত আমি যত খানা হস্তলিখিত ও মুদ্রিত রত্নমালা দেখিয়াছি তাহাতে কোথাও গ্রন্থকারের নাম পাই নাই। * * * * এই পুথি খানার সমাপ্তিতে গ্রন্থকারের নামের উল্লেখ আছে। * * * এই গ্রন্থের লেখক জাম্ভা নিবাসী রামজী সেন। ১৭২১ শকাব্দে গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার রাজবৈদ্য শ্রীনারায়ণান্তরঙ্গ। ইনি বীজীপন্থ দাসের অনন্তর বংশীয়। ইনি প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা ও শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদ নরহরি দাস ঠাকুরের পিতা। * * * * একটী সংস্কৃত বন্দনায় জানা যায় নরহরির বর্ণ বিশুদ্ধ গৌর ও তাঁহার পিতার নাম নারায়ণ ছিল। নরহরি সরকার ১৫৪০ অব্দে গুপ্ত হন। * * * * রাজবৈদ্য অন্তরঙ্গ নারায়ণের একখানা কুলজী গ্রন্থও ছিল। ভরত মল্লিক চন্দ্রপ্রভায় স্থানে স্থানে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা এই গ্রন্থের নাম পাইলাম রত্নমালাধ্যায়ঃ। আমাদের বোধ হয় ইহা কোনও বিরাট গ্রন্থের অধ্যায় মাত্র। গ্রন্থ সমাপ্তি পাঠ করিয়া আমাদের এরূপ ধারণা হইয়াছে। সে যাহা হউক এইগ্রন্থ ১৫৫০

খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে রচিত, তাহা বুঝিতে পারা যায়। সমাপ্তি—ইতি চিকিৎসাকে (?) সুতাং (?) রাজং (?) বৈদ্য শ্রীনারায়ণান্তরঙ্গ বিরচিতায়াং (?) রত্নমালাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।"

আমরা এতাবৎ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বুঝিতে পারি নাই শাস্ত্রী মহাশয় কোন্ প্রমাণ বলে নরহরি ঠাকুরের পিতাকে এই গ্রন্থের কর্ত্তা নির্ণয় করিলেন। নরহরি ঠাকুরের পিতার নাম নারায়ণ হইতে পারে বটে, কিন্তু তাঁহার এই গ্রন্থকর্ত্তৃত্বে কোন প্রমাণই শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে অবগত হইতে পারি নাই। গ্রন্থে যে সমাপ্তি বাক্য উল্লিখিত হইয়াছে তাহার অর্থ বোধ হইতে পারে বলিয়া আমাদের ধারণা নাই। শাস্ত্রী মহাশয় গ্রন্থ খানি বিশুদ্ধ বলিয়াছেন, কিন্তু ঐ বাক্য সংস্কৃত হইলে তাহা কখনই বিশুদ্ধ হইতে পারে না। তবে অসংস্কৃত বাক্য মধ্যে "বৈদ্যশ্রীনারায়ণান্তরঙ্গ" বলিয়া একটি নাম পাওয়া যায়, যদি তাহা গ্রন্থ কর্ত্তার নাম হয়, তবে নরহরি ঠাকুরের পিতা না হইয়া অন্য কাহারও পিতা হইতে পারেন। শাস্ত্রী মহাশয় একটি সংস্কৃত বন্দনায় জানিয়াছেন যে নরহরি ঠাকুরের পিতার নাম নারায়ণ ছিল, সুতরাং উক্ত নারায়ণকেই গ্রন্থধৃত নারায়ণান্তরঙ্গ স্থির করিয়াছেন। ইহাকে যথেষ্ট প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। উক্ত বন্দনাও উদ্ধৃত হয় নাই। তাহাতে নরহরির পিতা নারায়ণ নামে থাকিলেও তিনি চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন কি না ও তাঁহার অন্তরঙ্গ উপাধি ছিল কি না তাহার কোন প্রমাণই সেন শাস্ত্রী মহাশয় প্রদর্শন করেন নাই; পক্ষান্তরে আমরা উক্ত মতের বিরুদ্ধে প্রবল প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। উক্ত নারায়ণ শ্রীচৈতন্য দেবের কিছুদিন পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু এই রত্নমালার বচন তৎপূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকারগণ স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। চক্রদত্ত সংগ্রহের টীকাকার শিবদাস সেন আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে তাঁহার পিতা গৌড়পতি বর্ব্বাক সাহার নিবাস হইতে ছত্র ও দুষ্প্রাপ্য অন্তরঙ্গ উপাধি পাইয়াছিলেন *। ঐ বর্ব্বাক সাহা শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং শিবদাস সেনও যে পূর্ব্ববর্ত্তী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

যোন্তরঙ্গপদবীং দুরাবাপাং ছত্রমপ্যতুলকীর্ত্তি রবাপ।
গৌড়ভূমিপতিবর্ব্বাকসাহাত্তৎ সুতস্য কৃতিনঃ কৃতিরেষা। দ্রঃ গুঃ টীঃ

* যদিও বর্ত্তমান মুদ্রিত পুস্তকে 'গৌড়ভূমিপতি রর্ব্বাক্ সাহাৎ' এই পাঠ দেখা যায়, কিন্তু তাহা যে লিপিকর-প্রমাদ তাহা আর চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতে হইবে না। প্রাচীন রীতির লিপির বিন্দুবিশিষ্ট 'ব' পাঠের ভুলে 'বর্ব্বাক্' স্থানে 'রর্ব্বাক্' হইয়াছে।

আরও গ্রন্থ রচিত হইবামাত্র তাহা কিছুদিন বিবদ্‌গুলীর দ্বারা অধীত ও অধ্যাপিত হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ না করিলে অন্য গ্রন্থকার কর্তৃক উদ্ধৃত হয় না, অতএব এই রত্নমালা যে শিবদাস সেনেরও বহু পূর্ববর্তী ইহা প্রত্যেক বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন। তিনি তাঁহার চক্রদত্ত টীকার অনেক স্থানে প্রমাণ স্বরূপ এই পুথির বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।* শিবদাস গ্রন্থের নাম রত্নকোষ বলিয়াছেন। আমরা বিভিন্ন কয়েকটি স্থান হইতে উদ্ধৃত কয়েকটী পর্য্যায়ই যথাবৎ বর্ত্তমান রত্নমালায় দেখিতে পাইতেছি; অতএব শিবদাস-কথিত রত্নকোষই যে পর্য্যায় রত্নমালা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এমত স্থলে সেন শাস্ত্রী মহাশয় কথিত অর্ব্বাচীন নরহরি ঠাকুরের পিতা ইহার গ্রন্থকার হইতে পারেন না।

আমরা চিকিৎসক সমাজে একজন প্রসিদ্ধ রাজবৈদ্য নারায়ণ দেখিতে পাই। চক্রপাণি স্বীয় পরিচয় প্রসঙ্গে প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি গৌড় নরপতির অমাত্য চক্রের অন্যতম মহানসাধ্যক্ষ নারায়ণের পুত্র ও অন্তরঙ্গ উপাধিধারী ভানুর অনুজ ছিলেন। † শিবদাস সেন বলেন এই গৌড় পতি নরপালদেব (১০৩৩ খৃঃ) নারায়ণ রাজবৈদ্য ছিলেন এবং তাঁহার পুত্রের অন্তরঙ্গ উপাধি ছিল, সুতরাং তাঁহার অন্তরঙ্গ উপাধি থাকা অসমীচীন নহে; বরং নরহরির পিতা অপেক্ষা তাদৃশ প্রবল পরাক্রান্ত বঙ্গের স্বাধীন নৃপতির পারিবারিক চিকিৎসকেরই অন্তরঙ্গ উপাধি পাওয়া সমীচীন বলিয়া প্রতিভাত হয়। এই নারায়ণ শিবদাস সেনের বহু পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার গ্রন্থ বহু পরে বর্ব্বাক্ সাহার আমলে প্রথিত হওয়াই স্বাভাবিক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথির সমাপ্তি বাক্যের প্রতি আস্থা স্থাপন করিতে হইলে সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের চক্রপাণির পিতাকেই গ্রন্থকার নির্ণয় করা উচিত ছিল।

---

* শক্রঃ—কুটজঃ উক্তং হি রত্নকোষে। "বৃক্ষকঃ শক্রপর্য্যায়োবৎসকো গিরিমল্লিকা" ইত্যাদি ১১৬ পৃঃ; তথাচ রত্নকোষঃ "শীতলী শীত কুম্ভীচ শুক্লপুষ্পা জলোদ্ভবা" ইত্যাদি ৩১৬ পৃঃ, উক্তং হি রত্নকোষে "গ্রন্থিকং পিপ্পলীমূলং ষড়্‌গ্রন্থিচটিকা শিরঃ" ইতি ৪০৬ পৃঃ। দেবেন্দ্রনাথ সেন প্রথম সংস্করণ।

† গৌড়াধিনাথ রসবত্যধিকারি পাত্র
শ্রীনারায়ণস্য তনয়ঃ সুনয়োঽন্তরঙ্গাৎ।
ভানো রনুপ্রথিত লোধ্রবলী কুলীনঃ
শ্রীচক্রপাণি রিহ কর্তৃপদাধিকারী।

সাহিত্য পরিষদের পুথি ব্যতীত এ পর্য্যন্ত যত খানা পুথি পাওয়া গিয়াছে তাহার কোন খানেই গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায় নাই। প্রাচীন কালে প্রতি গ্রন্থ শেষে গ্রন্থকারের পরিচয় না থাকিলেও তাঁহার নাম থাকিবার রীতি সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এ গ্রন্থে রীতি লঙ্ঘনের বিশেষ কোন হেতু ছিল সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আমরা ঐ পুথিতে নাম না পাইলেও তৎসমসাময়িক গ্রন্থান্তরে রত্নমালার গ্রন্থকারের নির্দ্দেশ পাইয়াছি। এই রত্নমালাকে উপজীব্য করিয়া রচিত পর্য্যায়মুক্তাবলী নামক একখানা প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যগুণাভিধান দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার নিবন্ধ শ্লোকে মুক্তাবলীকার বলেন যে—

পূর্ব্বে ভিষক্ মাধবকর আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকর হইতে যে রত্নময়ী মালা সংগ্রহ করিয়া গ্রথিত করেন তাহা তাদৃশ শোভাশালিনী না হওয়ায় আমি অন্য ভাবে গ্রথিত করিলাম। * এই মুক্তাবলীতে দ্রব্যের নাম ও গুণ লিখিত হইয়াছে। যে যে দ্রব্যের পর্য্যায় লিখিত হইয়াছে তাহা সর্ব্বাংশে রত্নমালার অনুরূপ, সুতরাং মুক্তাবলীকার-কথিত রত্নময়ী মালা যে পর্য্যায়রত্নমালা তাহা নিঃসন্দেহ। তাঁহার মতানুসারে রত্নমালাকে মাধবকরের রচিত গ্রন্থ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে।

এই সিদ্ধান্তের পরিপন্থী একমাত্র রামজী সেনের একশত বৎসর পূর্ব্বের লিখিত "ইতি চিকিৎসাকে" ইত্যাদি বচন। সেন শাস্ত্রী মহাশয় রামজী সেনের পুথিকে বিশুদ্ধ বলিয়া প্রশংসাপত্র দিলেও আমরা আলোচনা করিয়া দেখিলাম গ্রন্থলেখকের ভাষাজ্ঞান মোটেই ছিল না। লেখকের "শোক" শব্দের পর্য্যায় বড়ই কৌতুকাবহ বলিয়া এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"শ্লোকার্দ্ধে ভাষিতঁং পূর্ব্বং শ্লোক পাদৈরতঃ পরং।" "শোক"—

সমস্ত পুস্তকে অনুস্বার বিসর্গের স্থানে অপ্রয়োগ ও অস্থানে অপপ্রয়োগ ভূরি ভূরি দেখা যায়। এমত স্থলে এরূপ অনুমান অযৌক্তিক নহে যে, রামজী সেন যে গ্রন্থ দেখিয়া নকল করিয়াছিলেন তাহার পূর্ব্ব লেখকের নাম হয় ত শুদ্ধ ভাষায় কিছু লেখা ছিল, তাহা লিখিতে যাইয়া ভাষার অজ্ঞতা বশতঃ একটি অদ্ভুত ভাষার সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছেন।

সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত রামজী সেন লিখিত এক খানা রুগ্বিনিশ্চয় দেখিয়া

* পূর্ব্বং লোকহিতায় মাধব করাভিখ্যো ভিষক্ কেবলং কোষান্বেষণতৎপরঃ প্রবিততায়ুর্ব্বেদরত্নাকরাৎ। মালাং রত্নময়ীং চকার স যথা নাভং ন শোভাধিকা সাম্মাক্তিঃ কমনীয়ভক্তিরচনা যারান্যথা গ্রথ্যতে। পর্য্যায়মুক্তাবলী ১ পৃঃ।

আমাদের এই ধারণা বলবতী হইয়াছে। ঐ পুথি খানিতে পূর্ব্ব লেখকের নাম যে প্রকার লিখিত ছিল তাহা অবিকল্প উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"চন্দ্রবাণ তিথৌশাকে স্বকীয়ো লিখিতো ময়া।
ভিষক্ শ্রীরামচন্দ্রেণ রুগ্বিনিশ্চয়সংগ্রহঃ।"

ভাগ্যে এই গ্রন্থের রচয়িতা চিরপ্রসিদ্ধ প্রাচীন, নতুবা রামজী সেনের ঐ বাক্যবলে অনেকে রামচন্দ্র ভিষক্ ১৫২১ শাকে নিদান রচনা করিয়াছেন অনুমান করিতেন। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিতে এক খানি পুথি আছে তাহার সমাপ্তি বাক্য এইরূপ :—

"ভবানীং প্রণত্যাসুরত্রাসনীং বৈ
চতুর্থ্যাং গুরোর্ব্বাসরে রত্নমালাং।
মৃগাঙ্কাঙ্গ বেদেন্দু শাকে প্রবন্ধা
দ্বিজো রামকান্তঃ সমাপুরি রাধে।"

এই গ্রন্থ পরবর্ত্তী রামজী সেনের মত লেখকের দ্বারা উক্ত সমাপ্তি বাক্য সহ পুনর্লিখিত হইলে অনেকেই দ্বিজ রামকান্তের বংশাবলী অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেন।

পর্য্যায় রত্নমালার প্রতি পুথিতেই "ইতি চিকিৎসাঙ্গে রত্নমালাধ্যায়ঃ" এই মাত্রই সমাপ্তি বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ মাধবকরকে ইহার গ্রন্থকার নির্ণয় করিলে এই "অধ্যায়" বাক্যের তাৎপর্য্য ও সমস্ত গ্রন্থে গ্রন্থকারের নাম না থাকায় হেতু উদ্‌ঘাটিত হয়। মাধব নিদানের প্রথমে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে তিনি অল্পমেধস্ক চিকিৎসকগণের প্রতি কৃপাবশতঃ দুরবগাহ চিকিৎসা সংহিতা হইতে এই সংগ্রহ গ্রন্থ প্রথমে নির্ম্মাণ করিলেন। এক মাত্র ব্যাধিনিদান (Pathology) জ্ঞাপক গ্রন্থ দ্বারা তাঁহার এই উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না। সংহিতা দেখিয়া রোগ বিনিশ্চয় যত কঠিন চিকিৎসা ততোধিক কঠিন, সুতরাং সুগম উপায় করিতে হইলে নিদানের ন্যায় চিকিৎসা গ্রন্থ ও আনুসঙ্গিক দ্রব্যের পর্য্যায় ও গুণসংগ্রহ গ্রন্থও প্রণয়ন না করিলে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। পণ্ডিতবর মাধব যে অবহেলা বশতঃ কেবল নিদান গ্রন্থ লিখিয়াই অবসর গ্রহণ করিয়াছেন তাহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। তিনি চিকিৎসাঙ্গে একখানি বিরাট্ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, যাহার আদি রুগ্বিনিশ্চয়, পরে চিকিৎসা, দ্রব্যকোষ ও দ্রব্যগুণ লিখিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

কেহ কেহ বলেন, তৎকালে চক্রপাণির চিকিৎসা সংগ্রহ বর্ত্তমান থাকায় মাধবের চিকিৎসা গ্রন্থ লিখিবার আবশ্যক হয় নাই। তাঁহাদের এই বাক্য অযৌক্তিক। চক্রপাণি তাঁহার সংগ্রহ গ্রন্থ সিদ্ধযোগ নামক চিকিৎসা সংগ্রহ গ্রন্থ দেখিয়া তাহারই ক্রম অনুসারে ও তাহারই সমস্ত সিদ্ধফল যোগ লইয়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন। * এই বৃন্দকণ্ঠ প্রণীত সিদ্ধযোগ মাধবের রুগ্বিনিশ্চয়ের ক্রমে রচিত হইয়াছে। † এতাবৎ প্রমাণ দেখিয়া সম্ভবতঃ আর কেহই মাধবকে চক্রপাণির অর্ব্বাচীন বলিতে সাহসী হইবেন না। বর্ত্তমান মাধবের কোন চিকিৎসা গ্রন্থ না পাইলেও শ্রীমাধবের শ্লোকে লিখিত লঙ্ঘন শব্দের ভেদ নির্দ্দেশ ও অঞ্জন ব্যবস্থা সিদ্ধযোগের টীকায় উল্লিখিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। ‡ সেই সব পরিভাষা মাধব প্রণীত নিদান বা অভিধান গ্রন্থে নাই এবং থাকিতেও পারে না। তাহা চিকিৎসা গ্রন্থে থাকাই স্বাভাবিক। এতাবতা মাধবের এক খানা চিকিৎসা গ্রন্থ ছিল এরূপ অনুমান অযৌক্তিক নহে। মাধবের একখানা দ্রব্যগুণও ছিল তাহার প্রমাণ আমরা চক্রদত্ত সংগ্রহের টীকায় পাইয়াছি। ¶ পর্য্যায় রত্নমালা যে মাধবেরই রচিত গ্রন্থ মুক্তাবলীকার তাহা বলিতেছেন। এমত অবস্থায় আমাদের এরূপ অনুমান অযৌক্তিক নহে যে মাধব তদানীন্তন সুধীবর্গের আকাঙ্ক্ষায় চিকিৎসাঙ্গে একখানি বিরাট্ সংগ্রহ গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, যাহার নিদানাধ্যায় ও কোষাধ্যায় মাত্রই বর্ত্তমানে পাওয়া যাইতেছে এবং চিকিৎসাধ্যায় ও দ্রব্যগুণাধ্যায়ের সত্তা অবগত হওয়া যাইতেছে। সমগ্র গ্রন্থের শেষেই গ্রন্থকারের পরিচয় থাকা কর্ত্তব্য কোন অংশ বিশেষের শেষে থাকিতে পারে না। সেই জন্যই মাধব নিদান ও রত্নমালার শেষে গ্রন্থকারের

যঃ সিদ্ধযোগলিখিতাধিক সিদ্ধযোগানত্রৈব নিক্ষিপতি কেবল মুদ্ধরেখা।
ভট্টত্রয়ত্রিপথ বেদবিদাজনেন দত্তঃ পতেৎ সপদিমূর্দ্ধনি তস্যশাপঃ।

নানামতপ্রথিতদৃষ্টফল প্রয়োগৈঃ
প্রস্তাববাক্যসহিতৈরিহ সিদ্ধযোগঃ।
বৃন্দেন মন্দমতিনাত্মহিতার্থিনায়ং
সংলিখ্যতে গদবিনিশ্চয়ক্রমেন।

সিংযোং ২ পৃঃ অত্র শ্রীকণ্ঠদত্তঃ—গদবিনিশ্চয়ক্রমেণেতি—রুগ্বিনিশ্চয়াখ্য নিদান-সংগ্রহোক্তাধ্যায়পরিপাট্যা।

‡ সিদ্ধযোগ ৯ ও ৪৫১ পৃঃ।

¶ চক্রদত্ত (দেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রথম সংস্করণ) ১২৮ পৃঃ।

পরিচয়মূলক কোন সমাপ্তি বাক্য দেখা যাইতেছে না।* প্রফেসর হর্নলে মহোদয়ও এই সমস্ত হেতুবাদের সমর্থন করিয়া "সিদ্ধযোগ"কে মাধবের চিকিৎসাগ্রন্থ বলেন † এবং নিদান ও সিদ্ধযোগ এই উভয় গ্রন্থের গ্রন্থকারের নাম বৃন্দ সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত কতদূর যাতসহ তাহা বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

এই মাধবকর কতদিন পূর্ব্বে আমাদের দেশের কোন প্রদেশকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন তাহা নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা কঠিন। বর্ত্তমান মুদ্রিত নিদানে যে প্রক্ষিপ্ত শ্লোকটী দেখিতে পাওয়া যায় তাহা দ্বারা তিনি ইন্দুকর বা ইন্দ্রকরের পুত্র ছিলেন, এতদরিক্ত কিছুই জানিতে পারা যায় না। বর্ত্তমান কালে আয়ুর্ব্বেদের যে সমস্ত গ্রন্থ পাওয়া যায় তাহার গ্রন্থকারদের মধ্যে শিবদাস সেন (পঞ্চদশ শতাব্দী) ও ডল্বন (দ্বাদশ শতাব্দী) তাঁহাদের গ্রন্থে মাধবের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের অপেক্ষা প্রাচীন চক্রপাণি (১০৫০ খৃঃ) মাধবের নিদানের অনুক্রমে রচিত সিদ্ধযোগ নামক সংগ্রহকে উপজীব্য করিয়া চিকিৎসা সংগ্রহ রচনা করিয়াছেন। চক্রপাণির গ্রন্থ রচনা কালীন 'সিদ্ধযোগ' ও তাহার রচনা কালে 'রুগ্বিনিশ্চয়' বিশেষ প্রথিত ছিল সন্দেহ নাই। নতুবা ঐ গ্রন্থদ্বয় ভাবী গ্রন্থকারের অবলম্বন হইতে পারিত না। প্রফেসর হর্নলে মহোদয় বলেন চক্রপাণি ১০৫০ খৃঃ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। গৌড়রাজ মালাকার লিখিয়াছিলেন যে নরপাল দেব ১০৩৩ খৃষ্টাব্দে গৌড়রাজ্য শাসন করিতেন। এমত অবস্থায় তাঁহার অমাত্য চক্রের অন্যতম মহানসাধ্যক্ষ নারায়ণের পুত্র চক্রপাণির সময় ১০৫০ খৃঃ অব্দ হওয়া বিচিত্র নহে। এই কাল হইতে অতি প্রাচীন মাধবের নির্দ্দিষ্ট কাল নির্ণয় করিতে না পারিলেও খৃষ্টিয় সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দী অনুমান করা অযৌক্তিক নহে। প্রফেসর হর্নলে মহোদয়ও এই প্রকারই অনুমান করেন। এতদতিরিক্ত বিশেষ সময় বা

---

* বর্ত্তমান নিদানে যে সমাপ্তি বাক্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহা টীকাকারগণ কর্ত্তৃক ধৃত হয় নাই; সুতরাং তাহা গ্রন্থকার নিজে লিখিয়াছেন বলিয়া কেহ স্বীকার করেন না।

† The famous Vrinda better known by his sobriquet Madhava or the Honeyed, apparently on account of the attractiveness of his writings, who in the seventh or eighth century had published his system of medicine, of which two parts called respectively রোগবিনিশ্চয় or Pathology and সিদ্ধযোগ or Therapeutics have survived to the present day. I. R. S. G. P P. 998.

জাত্যাদিনির্ণয় বর্ত্তমানে যতদূর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহার সাহায্যে অসম্ভব। তবে কেবল মুখের জোরে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বা বৈদ্য বলা উন্মত্তপ্রলাপবৎ

পর্য্যায় রত্নমালার প্রায় প্রতি পর্য্যায়ের শেষে তাহার অর্থ সংস্কৃত ভাষায় অথবা দেশজ নামে দেখিতে পাওয়া যায়, যথা :—

ধন্বী ধনঞ্জয়ঃ পার্থো নদীজঃ ককুভোঽর্জ্জুনঃ। অর্জ্জুনবৃক্ষস্য
ওষ্ঠী রক্তফলা বিম্বী তুণ্ডী কেবী চ বিম্বিকা। তেলাকুচা

এই স্থলে প্রথম পর্য্যায়ে সংস্কৃত শব্দ, দ্বিতীয় পর্য্যায়ে দেশজ নাম দ্বারা অর্থ কথিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন এই অর্থ অধস্তন লিপিকারের স্বকপোল-কল্পিত, ইহাতে গ্রন্থকারের কোন হাত ছিল না। আমাদের ধারণা এইরূপ অর্থ সহই এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে যে সমস্ত হস্ত লিখিত পুথি সংগৃহীত হইয়াছে, সকল পুস্তকেই এক ভাবে অর্থ লিখার প্রথা দেখা যাইতেছে। আমাদের দেশে বহু সাধারণ অভিধান ও বৈদ্যক নিঘণ্টু দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কোন গ্রন্থেই এইরূপ অর্থ লিখিবার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি এই গ্রন্থেই লিপিকারের অর্থ লিখিবার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে তবে অন্যান্য অভিধানেও তাদৃশ অর্থ লিখিত দেখা যাইত। আরও পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তর বঙ্গ হইতে সংগৃহীত পুথির দেশজ নাম প্রায় একরূপ থাকায় আমাদের এই ধারণা বলবতী হইয়াছে। আমরা পূর্ব্ববঙ্গে লিখিত যে পুথি খানি পরিষৎ পুস্তকালয় হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি তাহারও উত্তর বঙ্গে লিখিত পুথির দেশজ নামের ঐক্য ও বর্ত্তমানে পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত দেশজ নামে অনৈক্য প্রদর্শনার্থ কতগুলি শব্দ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

বগুড়ার পুথি	ঢাকার পুথি	বর্ত্তমান ঢাকার ভাষা
চাকলিয়া	চাকলিয়া	পিঠানি
শোনালু	শোনালু	বানরনড়ী
আকনাধি	আকনাধি	আকান্দী
উলু	উসা	ছন
পাষাণ ভেদী	পাষাণ ভেদী	শোণা পাথর
তেলাকুচা	তেলাকুচা	তেলাকুচ
বুহিঞ্চি	বুঞ্চিছি	বোকই
হলা	হেলা নালি	শাপলা

বিছাতি	বিছাটী	চোতরা
বাড়িআলা	খাড়িয়ালা	ঝাইর কোলি
ওকড়া	ওকড়া	কৈকোড়া

ঢাকায় লিখিত বা বগুড়ায় লিখিত পুথিতে সর্ব্বত্র নিজ নিজ দেশজ ভাষা অনুসৃত হয় নাই। তবে অর্থগুলি যে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন না হইয়াছে তাহা বলা যায় না, এবং তজ্জন্যই সব পুথির সমস্ত শব্দের অর্থ ঠিক একরূপ নাই।

কেহ কেহ বলেন মাধবের সময় (খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দী) এদেশে এরূপ দেশজ নামই ছিলনা, সুতরাং এগুলি অর্ব্বাচীন। আমরা এ মত সমর্থন করিতে পারিলাম না। প্রাচীন কাল হইতেই এদেশের একটী নিজস্ব ভাষা ছিল। তবে এই গ্রন্থের দেশজ ভাষার মধ্যে যে অর্ব্বাচীন ভাষা প্রবেশ করে নাই একথা বলিতে পারিনা। সর্ব্বত্রই লিপিকারের বিদ্যাবত্তার ফলে ঝুড়ি ঝুড়ি পাঠান্তর ও রূপান্তরের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই পুস্তকের দেশজ ভাষা দেখিয়াই শিবদাস যেন চক্রের টীকায় দেশজ নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। আমরা শিবদাসের উল্লিখিত যতটী দেশজ নাম পাইতেছি, তাহার অধিকাংশই পর্য্যায় রত্নমালায় ধৃত হইয়াছে। নিম্নে কতকগুলি উদ্ধৃত হইল।

সংস্কৃতনাম	দেশজ ভাষা শিবদাস সেন	দেশজ ভাষা পর্য্যায়রত্নমালা	পত্রাঙ্ক। *
অবাক্‌পুষ্পী	হেঠবহুলী	হেঠহুলী	১১৮
শতাহবা	শলুকা	শলুকা	১৪১
কেবুক	কেঁউতারা	কেঁউ	১৪৪
বৃশ্চিকালী	বিছাতী	বিছাতী	১৫৬
নীবার	উড়িয়া	উড়ীধান্য	১৫৭
প্রিয়ঙ্গু	কায়োনী	কাঁঅনি	১৫৮
দর্ভ	উলুছাম	উলু	১৬৩
চুক্রিকা	চুকাই	চুকাই	২১৭
অতসী	তিসী	তিসি	২৫০
বলা	বাড়িয়ালা	বাড়িআলা	২৫৩
প্রসারণী	গন্ধভাদালিয়া	গন্ধভাদালিয়া	২৫৬

* দেবেন্দ্রনাথ সেন মুদ্রিত প্রথম সংস্করণ চক্রদত্তঃ।

পূতীক	ন্নাটাকরঞ্জ	লাটাকরঞ্জ	২৫৭
কৈবর্ত্তমুস্তক	কেওঠমুথা	কেউটিয়া মুথা	
মিষি	গুয়ামোঁহরী	গুআমহরী	২৮৭
সামুদ্র	করকচ	করকচ	৩২১
রাজবৃক্ষঃ	শোনালু	শোনালু	৩৬১
বিম্বী	তেলাকুচা	তেলাকুচা	৩৭৪
কুম্ভীক	পাহ্না	পাহ্না	৩৮০
প্লক্ষ	লাকড়ি	লাকড়ি	৩৮১

ইহা খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর কথা। তখন দেশজ ভাষার ভূরি প্রয়োগ ছিল। চক্রপাণি তাঁহার চিকিৎসা সংগ্রহে রত্নমালাধৃত দেশজ নাম "শিয়লী ছোপড়" লিখিয়া গিয়াছেন, সুতরাং ১০৫০ খৃষ্টাব্দেও দেশজ নামের প্রচলন ছিল সন্দেহ নাই। *

মহামতি ডল্লন নিবন্ধ সংগ্রহ নামক সুশ্রুত সংহিতার যে টীকা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, "আমি টীকাকার শ্রীজৈজ্জট পঞ্জিকাকার গয়দাস ও ভাস্কর এবং টীপ্পনীকার শ্রীমাধব ও ব্রহ্মদেব আদিকে উপজীব্য করিয়া সুশ্রুতব্যাখ্যার নিমিত্ত এই নিবন্ধ সংগ্রহ করিলাম।" † এই ডল্লন নগরীবর মথুরা সমীপে অঙ্কোন নামক বৈদ্যস্থানের ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার টীকায় অনেক দেশজ ভাষা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে অনেকগুলি বাঙ্গালীর নিজস্ব ভাষা। নিম্নে কতকগুলি উদ্ধৃত হইল।

সংস্কৃত ভাষা	দেশজ ভাষা ডল্লন ধৃত	পত্রাঙ্ক ‡
সুনিষণ্ণক	সুষুণি	৪১৬
বার্ত্তাকু	বেগুন	„
কোষাতকী	তোরই	৪১৭
পনস	কাঁটাল	৪০৯
ওল্দ	ভোন্দর	৪০০

* চক্রদত্ত ২৫৭ পৃঃ। তগরং স্যারতং তদভাবে শিয়লী ছোপড়ঃ।

† তেন শ্রীজৈজ্জটং টীকাকারং শ্রীগয়দাস ভাস্করৌ পঞ্জিকাকারৌ শ্রীমাধবব্রহ্মদেবাদীন্ টিপ্পনকারাংশ্চোপজীব্য * * * নিবন্ধসংগ্রহঃ ক্রিয়তে। সুশ্রুতটীং ১ পৃঃ।

‡ জীবানন্দ বিদ্যাসাগর প্রকাশিত সুশ্রুতটীকা।

সংস্কৃত ভাষা	দেশজ ভাষা	পত্রাঙ্ক
ক্রৌঞ্চ	কোঁচবক	৪০১
শম্বুক	শামুক	৪০২
পাঠীন	বোয়াল	”
অতসী	মসিনা	২৯৫
বন্ধুক	বকপুষ্প	৩০৫
টঙ্কন	সুহাগা	৩২৩
কতক	ফটকিরি	৬৯৬
বজ্রাণ	কুঁচকী	৪৯৩
কাশীশ	হীরাকস	৭১৩
কালা	বড়হিংস্রা	৭৪৮
কঙ্কতিকা	চিরুনী, কাঁকই	৭৬৬
বাণবারক	সাঁজোয়া	৭৬৯
গোধা	গোসাপ	৭৭৪
বেশবার	বাট্না	৭৯৫
তরক্ষু	নেকড়ে	৯০১
মধূলিকা	রাইসর্ষপ	১১২৫

অল্প অনুসন্ধানে এতগুলি বাঙ্গালা দেশজ নাম পাওয়া গেল। কেহ কেহ ডল্লনকে বাঙ্গালী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু যিনি নিজ পরিচয় প্রসঙ্গে নগরীবর মথুরা সমীপে বাসস্থান বলিয়াছেন, তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিবার সাহস সংস্কৃতাজ্ঞতারই পরিচয় প্রদান করে। তবে এতগুলি খাস বাঙ্গালার ভাষা তাঁহার গ্রন্থে কি প্রকারে স্থান লাভ করিয়াছে, ইহাই বিচার্য্য বিষয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ডল্লন নিজের কথা টীকায় কিছু লেখেন নাই। কয়েকখানি টীকার উপাদান গ্রহণ করিয়া প্রায় তাঁহাদেরই ভাষায় তাহার নিবন্ধসংগ্রহ গড়িয়া তুলিয়াছেন মাত্র। অবলম্বন টীকা ও টিপ্পনীকারদের মধ্যে নানা দেশীয় লোক থাকায় ডল্লনের টীকায় নানা দেশীয় ভাষা দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি পনস শব্দের ভাষায় একই স্থানে কাঁটাল, কটাহল ইতি লোকে, এবং সুনিষণ্ণক শব্দে সুষুণি ও সিরিবালিকা লিখিয়াছেন। জীবন্তী শব্দে ডোডীতি হিন্দিভাষা (৪১৭ পৃঃ) বলিয়া ভাষা বিশেষের নামও করিয়াছেন। এই কয় টীকাকারের মধ্যে আমরা মাধবকরকেই বঙ্গদেশীয় টিপ্পনীকার দেখিয়া মনে করিতে

পারি যে, তাঁহারই টিপ্পনী হইতে 'বেগুণ' প্রভৃতি লিখিত হইয়াছিল। মাধবের টিপ্পনী আজিকাল পাওয়া যায় না। অতএব সাক্ষাৎ প্রমাণ না পাইলেও তদবলম্বনে লিখিত ডল্লনের নিবন্ধ-সংগ্রহে বঙ্গভাষা থাকায়, আমাদের এ অনুমান অসঙ্গত নহে যে, মাধবই টিপ্পনী গ্রন্থে অল্পমেধস্ক বৈদ্যবৃন্দের সুবিধার জন্য ভাষা অর্থ লিখিয়া অনায়াসে বোধগম্য হইবার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। এমত অবস্থায় কোষগ্রন্থে দেশজ নাম লিখিয়া পরিচয়ের সুবিধা করিয়া দেওয়া তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। ইহার মধ্যে পর্য্যায় রত্নমালায় উল্লিখিত বকপুষ্প, কায়ফল, সুহাগা, যোয়ান, মুথা, মেঁদী, মসিনা প্রভৃতি শব্দ ডল্লনে পাইতেছি। ডল্লন যে পরের কথা বলিয়াছেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ—একস্থানে একটি শব্দের যে ভাষা অর্থ দিয়াছেন অন্যত্র অপর দেশের ভাষা দিয়া তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং বঙ্গ ভাষায় জ্ঞান না থাকায় দু এক স্থলে ভুলও করিয়াছেন। যেমন "কতক" অর্থে তিনি "ফট্‌কিরি" লিখিয়াছেন; কিন্তু "কতকের" জল পরিষ্কার করায় ধর্ম্ম "ফট্‌কিরির" মত হইলেও, তাহাকে আজ কাল "নির্ম্মলী" ফল বলা হইয়া থাকে। বঙ্গীয় গ্রন্থ হইতে উঠাইবার আর একটী প্রবল উদাহরণ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। সম্ভব তৎকালে ডল্লনের দেশে চিড়া ছিল না, সেই জন্য 'পৃথুকা' শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন:—"আর্দ্রশালিধান্যং মৃদুভৃষ্টং মুষলাঘাতচিপ্পটীভূতং মোরবং পৃথুকা ইত্যুচ্যতে চিঁড়েতি লোকে।" এই "মোরবং" অন্য দেশীয় শব্দের মধ্যে বাঙ্গালায় চিঁড়া প্রবিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত "কঙ্কতিকা" অর্থে "চিরুনী, কাঁকই," বর্ম্ম-অর্থে "সাঁজোয়া," গোধা-অর্থে "গোসাপ," বেশবার অর্থে "বাট্‌না," তরক্ষু-অর্থে "নেকড়ে" প্রভৃতি যে মাধবের টীপ্পনী হইতে ধার করা, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। কেবল দ্রব্যের নাম নহে, শারীর-স্থানে বক্ষণ-অর্থে বাঙ্গালীর নিজস্ব 'কুঁচকী' প্রযুক্ত হইয়াছে। ডল্লন প্রতিজ্ঞাই করিয়াছিলেন যে, তিনি জেজ্জটাদির সমস্ত নিবন্ধেরই অর্থ জ্ঞাপন করিবেন,* কিন্তু জেজ্জটাদির ন্যায় প্রায়ই নাম উল্লেখ পূর্ব্বক শ্রীমাধবের পুস্তকের নাম কুত্রাপি উল্লিখিত না হইলেও, টীকার লিখিত বঙ্গীয় ভাষা বাঙ্গালী মাধবেরই সম্পত্তি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সরস্বতী।

---

* সমস্ত নিবন্ধার্থ জ্ঞাপকে নিবন্ধ সংগ্রহে ৪৫৫ পৃঃ।

দামুর অরণ্যবাস।

(১)

দামোদর ভাঁয়ার সংসারের প্রতি অনাস্থা ক্রমশঃ সম্পূর্ণ বৈরাগ্যে পরিণত হইতেছিল। একদিন হঠাৎ মনে হইল 'এই সুযোগে অরণ্যে চলিয়া গেলে কি হয়?'

পাঁচকড়ি দাদার পরামর্শ বরাবর দামু গ্রহণ করিত। এ যাত্রায় মনে করিল 'দরকার কি?' কিন্তু অরণ্য একটা ভয়ঙ্কর স্থান, তথায় বাঘ ভালুক, ভূত প্রেত, নানা প্রকার অজানা জীবের বাস, কাহার কি মতিগতি, কখন কে তাড়া হুড়া দৌরাত্ম্য করে, তাহা কে বলিতে পারে? হঠাৎ একটা গোসাপ, কিম্বা তক্ষকও যদি আক্রমণ করে, তবে তাহার নিবারণের উপায় বলিয়া দিবে কে? এখন অরণ্যে মুনি ঋষিগণ কোথায় কে বাস করে, তাহাও অজ্ঞাত। অরণ্যের মধ্যে একটা কুটীর নির্ম্মাণ করিতে গেলেও কাঠখড় এবং দড়ি সংগ্রহ করিতে হইবে। এই সকল জঞ্জাল উত্তরোত্তর কল্পনায় উদিত হইয়া দামুকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল।

সন্ধ্যাকাল। দামোদরের গৃহ একটা প্রকাণ্ড মশার আড্ডা। প্রথম যুগে সেটা চা'র আড্ডা ছিল, এবং অনেক লোক চা খাইতে, হাসিতে এবং গল্প করিতে আসিত। দামোদরের অবস্থা কিছু হীন হইয়া পড়াতে, এবং আড্ডাধারীগণের মধ্যে খুব প্রতিভাশালী জনকতক মরিয়া কি বিদেশে চলিয়া যাওয়াতে, এখন গৃহ শ্রীহীন, এবং অন্ধকার। দামোদর সেই গৃহের এক কোণে বসিয়া ভাবিত। কি ভাবিত তাহা সেই জানে, কিন্তু সেই সুযোগে মশার পাল দামোদরকে আপাদমস্তক ঘিরিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিত। দামু তাহাদের ভাব বুঝিত না, এমন কথা কিছু নয়; কারণ— মধ্যে মধ্যে 'তোরা এক তরফ হইতে আমার রক্ত শোষণ কর্' এই প্রকারের প্রেমপূর্ণ এবং আত্মত্যাগ ভাবযুক্ত বাক্য দ্বারা মশকবৃন্দের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সর্ব্বদাই দামু যত্নবান্ ছিল।

হঠাৎ চিন্তা করিতে করিতে দামুর এক অভিনব ভাব আসিয়া পড়িল। এই যে নির্জ্জন গৃহ, এটাও ত অরণ্যের মর্ত্ত! অথচ গাছ পালা এবং বন্য জন্তু কিছুই নাই। এ গৃহও ত অরণ্যে পরিণত করা যাইতে পারে। কিন্তু পাঁচকড়ি দা ভিন্ন এ সমস্যা পূরণ করে কে?

হঠাৎ পাঁচকড়ি দা আসিয়া উপস্থিত। পাঁচকড়ি স্মরণ করিতে করিতেই প্রায়শঃ উপস্থিত হয়, এই জন্ত সে অনেকদিন বাঁচিয়া ছিল। ইহা ভিন্ন পাঁচকড়ির দীর্ঘায়ুর কোন কারণ ছিল না, কেন না, সে একেই চিররুগ্ন, তাহার উপর মাসিক পত্রে গল্প লেখে। এই দুইটী গুণ একত্র হইলে কাহারও বাঁচিয়া থাকিবার সাধ্য নাই, যদি বন্ধু বান্ধব মধ্যে মধ্যে স্মরণ না করে, এবং স্মরণ করিবামাত্র সে আসিয়া না পড়ে।

পাঁচকড়ি দা' দর্শনবিৎ সুপণ্ডিত। দুঃখীর প্রতি সর্ব্বদাই দয়ার্দ্র চিত্ত, কারণ দুঃখ কি তাহা সে জানিত, এবং জানাটা কি কষ্টকর তাহাও জানিত এবং বুঝিত। দামুর প্রতি তাহার স্নেহ অটল ছিল বরাবর, এবং পাছে দামুর দেহ পতনের পূর্ব্বে মাথা খারাপ হইয়া যায়, সেই ভয়ে পাঁচকড়ি দা' হয় ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে কিংবা প্রদোষের সময় আসিয়া দামু ভায়ার মাথা পরীক্ষা করিয়া যাইত। প্রয়াণকালে জীবের 'মনসাচলেন' ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই, তাহা পাঁচকড়ি দা'র স্থির বিশ্বাস ছিল। আজ দামুকে অন্যদিন হইতে অধিকতর গম্ভীর দেখিয়া পাঁচকড়ি দা' একটু চিন্তিত হইয়া পড়িল।

দামু ভায়া অরণ্যবাসের কথা বলিবামাত্র পাঁচকড়ি দা' হাস্যমুখে জ্ঞানগর্ভ তর্কজাল বিস্তার করিল। 'দেখ দামু! ভাবিয়া দেখ, সংসারে কাহারও সহিত মায়া সম্বন্ধ না থাকিলেই ইহা অরণ্য, কিন্তু এই সম্বন্ধ এড়াইতে গেলে প্রথমতঃ ঋণ পরিশোধ করা দরকার। দারা সুতের নিকট, সমাজের নিকট, দেশের নিকট তুমি নানা বিষয়ে ঋণী। দর্জ্জির দোকানে, ধোপার কাছে, নাপিতের কাছেই তোমার এত বাকি আছে যে, হঠাৎ তুমি চলিয়া গেলে কিংবা মরিয়া গেলে পরিবারবর্গ অকূল সমুদ্রে পড়িবে। ধর্ম্মতঃ এটা কি তোমার করা উচিত ?

দামু। যদি ঋণ পরিশোধ করিয়া যাই ?

পাঁচকড়ি। কত রকম ঋণ আছে তা কি জান ? তোমাকে যাহারা ভাল বাসিয়াছে তাহাদের ভালবাস নাই, যাহাদের উত্তম মধ্যম প্রহার দিয়াছ (দামু একজন বিখ্যাত গুণ্ডা ছিল) তাহাদের প্রহার সহ্য কর নাই, যাহাদের ঠকাইয়া দু' পয়সা লইয়াছ তাহারা তোমাকে ঠকায় নাই, এই রকম আজীবন কত প্রকার ঋণ আমরা করি তাহার হিসাব রাখি না। এই দেখ আমারই নিকট ছাপাখানার তিনশত টাকা বাকি, তাহার জন্ত রাত্রি জাগিয়া গল্প

লিখি। কিংবা পুরাকালে অধর্ম্ম করিয়াছিলাম তাহার জন্য ধর্মশাস্ত্রের টীকা লিখিয়া হাড়ালার। আমরা একটা 'ঝাঁকড়' মাত্র।

দামু। যদি মরিয়াই যাই।

পাঁচকড়ি। মরিয়াই যাও এবং অরণ্যেই বাস কর অঋণী হইতে পারিবে না। স্মৃতির মধ্যে সবই আছে। তোমাকে টানিতে থাকিবে, লজ্জা দিবে। ভাবিয়া দেখ, অরণ্যে গেলেও যদি তুমি সংস্কার ও প্রবৃত্তিগুলি এড়াইতে পার, পূর্ব্বে যাহা করিয়াছ তাহার পরিশোধের জন্য তোমাকে আবার সভাস্থলে ফিরিয়া আসিয়া বিব্রত হইতে হইবে।

দামু। তবে এখন উপায়?

পাঁচকড়ি। মাসিক পত্রে লেখ, এবং সমালোচনা কর। অরণ্যে রোদন করাও যা,' মাসিক পত্রে লেখা ও সমালোচনাও তা'। চুপ করিয়া ঘরে বসিয়া থাক, এবং ক্রমে মায়া এড়াও। শরীর এবং মনকে উৎসর্গ করিয়া দেও। ঘরে যত মশা হয় হউক, শয্যায় ছারপোকা হউক, আহারের সময় পাতে মক্ষিকা বসুক, লোকে নিন্দা করুক, দারিদ্র্য আক্রমণ করুক, কিছুরই পরওয়া করিবে না। অরণ্যে যে সকল জন্তু আছে তদপেক্ষা সমাজের জন্তু অধিকতর হিংস্রক এবং ভয়ঙ্কর। প্রথমে এখানকার হিংসা দ্বেষ হইতে যদি আত্মগুণে পরিত্রাণ পাও, অবশেষে জঙ্গলে কিংবা পাহাড়ে যেখানে খুসি নির্ব্বিঘ্নে যাইতে পারিবে। এমন কি যাওয়ার দরকার হইবে না। যতদিন গৃহে থাক দশজনের লাভ।

দামু। তাহাতে কি ঈশ্বর দর্শন হয়?

পাঁচকড়ি দা' হাসিয়া বলিল 'সংসার ছাড়াও যা,' ঈশ্বর ছাড়াও তা'। ঈশ্বরের সম্মুখে থাকিতে চাও তবে সংসারে থাক। ঈশ্বর রোজ এক একটা নূতন সৃষ্টি করিয়া, পুরাতন সৃষ্টিকে পশ্চাতে ফেলিতেছেন। অরণ্য পুরাতন সৃষ্টি। সমাজ, অর্থাৎ মানবসমাজ অপেক্ষাকৃত নূতন। এই সমাজ নূতন রকম করিয়া প্রত্যহ দেখা দিতেছে। এই সৃষ্টির ভাবটা বুঝিলেই ঈশ্বরকে বুঝা হইল। তাঁহার পশ্চাতে গিয়া অরণ্যে কি সমুদ্রের বালুকা সৈকতে বাস করা ঘোর মূর্খের কাজ। ভগবান্ এই সৃষ্টিক্ষেত্রে পরামর্শদাতা চাহেন, তুমি একজন বিজ্ঞ লোক, মাসিক পত্রে ক্রমাগত পরামর্শ দেও। হঠাৎ সংসার-অরণ্যে রোদন করিতে করিতে এক সময় নিশ্চয় ভগবানকে দেখিতে পাইবে, এবং খুসি হইয়া নকল অরণ্যে যাইতে চাহিবে না।

এই রকম অনেক তর্ক বিতর্কের পর ঠিক হইল যে সংসারই একটি অরণ্য এবং মানবগৃহ ও সমাজ ঘোরতর অরণ্য। কারণ, অরণ্যে রোদন করিলে পশু পক্ষী শুনে, এখানে কেহ শুনে না। অরণ্যে ধর্ম্মপালন করিলে কেহ বাধা দেয় না, এখানে ধর্ম্ম পথেই প্রথম বাধা, অধর্ম্ম পথে দ্বিতীয় বাধা, এবং ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম, উভয় শূন্যপথে তৃতীয় বাধা।

এমন অদ্ভুত স্থানে বাস করিয়া তাহার রহস্যোদ্ভেদ করাই মানুষের প্রধান কাজ। এখানে দেখিবার অনেক জিনিষ আছে। ঈশ্বরের মতলব বুঝিবার প্রকাণ্ড ক্ষেত্র আছে। অরণ্যে তাহার কি পাওয়া যাইবে, বিশেষতঃ গোসাপ, তক্ষক এবং পোকা মাকড়ের ভয়। সময়ে অসময়ে ফল মূল আহরণ করা, এবং বৃষ্টি বাদলার দিনে পর্ণকুটীরের মধ্যে বাস করা তাহাও ত সোজা নয়।

তবে পাঁচকড়ি দা' বলিল যে, এখানে রীতিমত কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। কোন জিনিষ চাহিবে না। অরণ্যে যাহা পাওয়া যায় তাহার অধিক পাইতে আশা করিবে না। ধ্যাননেত্রে গৃহ সমাজকে ভীষণ অরণ্য বলিয়া মনে করিবে। যদি মনোরম্য কিছু দেখ, মনে করিবে তাহা অলীক। হুবহু অরণ্য ভাবিয়া এবং 'বাস্তবিক আমার কেহ নাই, আমি অরণ্যবাসী' এই প্রকার ধারণা দৃঢ় করিয়া একবার লাগিয়া পড়িয়া দেখ। একপদ স্খলিত হইলে পুনরায় সেই মায়াময় সংসার!

মনের মধ্যে পুনঃ পুনঃ তোলাপাড় করিয়া দামু ভায়ার বোধ হইল যে, পাঁচকড়ি যাহা বলিতেছে তাহা খুব সম্ভব, এবং গৃহেই প্রথমে বৈরাগ্যের এবং বৈরাগ্য-জনিত অরণ্যবাসের হাতে খড়ি দিলে মন্দ হয় না। এই রকম একটা সঙ্কল্প করিয়া দামু বলিল 'আচ্ছা'।

দামোদরের হৃদয়ে যেমন ভক্তি ছিল, মাথার মধ্যে জ্ঞানও তদপেক্ষা কম ছিল না। সে ভাবিয়া দেখিল যে, এই মহাব্রতে প্রথমতঃ একজন উপদেষ্টা মধ্যে মধ্যে চাই, এবং পাঁচকড়ি দা' সেই রকম লোক। পাঁচকড়ি বেদান্ত পাতঞ্জল প্রভৃতি বেশ জানে, এবং হঠাৎ যদি কেহ ধর্ম্মপথে গিয়া বেয়াকুফ হইয়া পড়ে, তাহাকে বুদ্ধি দিয়া এবং সাহস দিয়া অনেকটা অগ্রসর করিয়া দিতে পারে।

পাঁচকড়ি দা' রাত্রি দশটার পর অনেক বুঝাইয়া পড়াইয়া চলিয়া গেলে দীপ মিটি মিটি জ্বলিতেছিল।—সে রাত্রি অমাবস্যা। দামোদর আহার করিবে না। কাকস্য পরিবেদনা? একটি বিড়াল বাতায়ন হইতে উঁকি মারিয়া

দেখিল গৃহে দুগ্ধ নাই, চলিয়া গেল। দামোদর ভাবিল সেটা বন্য বিড়াল! অরণ্যবাস আরম্ভ হইয়াছিল।

প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়াই দামু ভায়া দেখিতে পাইল যে, আকাশ অতিশয় নির্ম্মল, এবং অরণ্যের মধ্যে সহস্রবৃক্ষশীর্ষে প্রভাত কিরণ নৃত্য করিতেছে। বিহঙ্গকাকলির সীমা নাই। মধ্যে মধ্যে শ্বাপদ জন্তুগণ দামুর মুখপানে তাকাইয়া ত্রস্তভাবে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতেছে। দামুর অনেকটা সাহস হইল।—হয় ত আমিই একটি বিভীষিকা, নচেৎ ইহারা পলায় কেন?

রামা চা' ও তামাক লইয়া আসিলে দামু অনেকক্ষণ তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া স্থির করিল, সে কোন বন্যজন্তু বিশেষ; নচেৎ একলাগাড়ে কলিকায় ফুঁ দিবার দরকার কি? কিঞ্চিৎ ত্রস্ত হইয়া দামোদর 'সাহিত্য' মাসিকপত্রের জন্য একটা প্রবন্ধ লিখিতে বসিল। চা' শীতল হইল, তামাকের অগ্নি নিভিয়া গেল।

দামুর স্ত্রী কাদম্বিনী বেলা দশটার সময় খবর লইতে আসিলে দামু প্রহৃষ্টভাবে হস্তোত্তলনপূর্ব্বক কহিল 'হে দেবী! তুমি বনস্থলী রঞ্জিত করিয়া আসিতেছ! হে শোভাময়ি! আমার প্রবন্ধের রঞ্জন ও শোভাবর্দ্ধন করিয়া যাও, বেশীক্ষণ থাকিওনা, বহুবিস্তৃত সংসার অরণ্য তোমার বিহনে অন্ধকার হইয়া পড়িবে।'

কাদম্বিনী খোকার হস্তধারণ করিয়া বলিল 'তবে ইহাকে দেখ, আমি ফল মূল সংগ্রহ করিয়া আনি'।

পাঁচ বৎসরের খোকা দোয়াত কলম লইয়া দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলে দামোদর তাহাকে হরিণশাবক মনে করিয়া গাত্রে হাত বুলাইয়া দিল। দামু আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিল, ইহার গাত্রে এখন লোম হয় নাই, কিন্তু শিং উঠিবার দেরি নাই।

ঝি আসিয়া বলিল 'বাবু! স্নান করিবার বেলা হয়েছে'! দামু ভাবিল 'ইহারা সকলে বনচারিণী রাক্ষসী'।

'আচ্ছা তোমরা যাও, আমার ইষ্টদেবতা যখন লইয়া যাইবেন তখন যাইব'।

অন্যদিনের মত দামু অদ্য তৈলম্রক্ষণ করিল না। অরণ্যে তৈল পাওয়া যায় না। শৈলোদ্গত নির্ঝরিণী মনে করিয়া কলের নীচে মাথা পাতিয়া স্নান করিল। নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে কল্পিত পর্ণকুটীর মধ্যে ঈশ্বরের উপাসনায় যোগাসনে বসিল।

যদিও কলিকাতা সহরে, বিশেষতঃ পটলডাঙ্গায়, দিবসের কোলাহল অতিশয়, তথাপি দামোদর তাহাকে ভীষণ অরণ্যের সুদূরগত বাত্যা প্রভৃতি মনে করিয়া এবং মধ্যে মধ্যে কর্ণরন্ধ্রে অঙ্গুলি দিয়া, বিশেষরূপে আত্মসংযম করিতে পারিয়াছিল। ফলে যদিও ঈশ্বর দর্শন হয় নাই, তবুও দামোদর বুঝিতে পারিল যে, ভগবান তাহার চেষ্টা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন, এবং যদি তাজা ইলিশ মৎস্য-ভাজার সুগন্ধ দামোদরের নাসিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে বিকল করিয়া না ফেলিত, তবে হয়ত অন্ততঃ ঈশ্বরের জ্যোতি সেই দিন দামুর দিব্যচক্ষুর সম্মুখীন হইত।

দামু ভাবিল 'কি ভয়ানক! যোগপথে কত বাধা! বিভূতির লালসা তাহার একটা। ইলিসমাছ বিভূতির মধ্যে একটা সজীব বিভূতি। মানবের খাদ্যদ্রব্যে এত লোভ কেন?'

বনদেবী আজ অরণ্যচারীর পাত পাড়িয়া রাখিয়াছেন। হরিণ শাবক এবং বন্যবিড়ালাদি নিকটে বসিয়া আছে। সামান্য শাকান্ন এবং কিছু ফল মূল মাত্র। অন্যদিনের মৎস্য মাংসাদি ও ডিম প্রভৃতি কিছুই নাই। দুগ্ধের ত কথাই নাই, মহারণ্য কলিকাতায় অলীক দুগ্ধ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। দামোদর অলীকের বিরোধী।

দামু পঞ্চদেবতার ভাগ উৎসর্গ করিয়া খাইতে বসিল। লবণ নাই! কি বিভ্রাট! অরণ্যে ঋষিগণ লবণ পাইতেন কোথায়? বোধ হয় মুনি ঋষির নিকট লবণের পাঠ ছিল না, তাই তাঁহারা অত দীর্ঘজীবী হইতেন। দামু দুই এক গ্রাস লইলেন, কিন্তু হরিণ শাবক এবং বন্য বিড়াল কিছুই লইল না। কি নেমকহারাম ইহারা! লবণ নহিলে গ্রাস করিতে পারে না! মাছ, মাংস, দুগ্ধ, লবণ কি অরণ্যে পাওয়া যায়? ইহারা অলীক হরিণশাবক এবং বন্যবিড়াল।

খোকা উপেক্ষিত হইয়া ট্যাঁ করিয়া কাঁদিলে এবং বন্যবিড়াল বিরক্ত হইয়া 'মেও' করিয়া চলিয়া গেলে, দামু মুখপ্রক্ষালন করিয়া প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। সেখানে মোটা মাদুরের উপর বাহুতে মস্তক রক্ষা করিয়া নিদ্রার চেষ্টা করিল, কিন্তু নিদ্রা হইল না। ইহাতে দামু বুঝিল দিবা নিদ্রা মহাপাপ। সুতরাং মাসিক পত্রের একটা গল্পের প্লট ভাবিতে লাগিল। মহারণ্যে কি রকম গল্প হইতে পারে?

প্রথমতঃ গজ সিংহ ব্যাঘ্রাদির মহাযুদ্ধ। তাহা বিষ্ণুশর্ম্মা লিখিয়া গিয়াছিলেন, এবং খবরের কাগজেও বাহির হয়।

দ্বিতীয়তঃ, চুরি ডাকাতী, প্রবঞ্চনার গল্প, এগুলি কেবল কল্পিত মাত্র। বাস্তবিক পক্ষে অর্থই নাই যেখানে, সেখানে দস্যুবৃত্তির অর্থ কি? অর্থ কোন স্থানে বিকীর্ণ অবস্থায়, কোন স্থানে সঞ্চিত অবস্থায় থাকে। যেমন হিমালয়ে সঞ্চিত অবস্থায়, এবং গোদাবরী প্রভৃতি নদীতটে বিকীর্ণ অবস্থায়। কল্পিত সুখের লালসায় দস্যুগণ এই সকল আক্রমণ করিয়া পাপে বদ্ধ হয়। ইহার আবার গল্প কি?'

কিন্তু দামু ভায়ার পাঁচকড়িদাদার উপদেশ মনে পড়িল। নকল অরণ্যে হিংস্রজন্তু অপর জন্তুকে আক্রমণ করিয়া বধ করিলেও, তাহার জন্য ভগবান্ ডিটেকটিভ্ রাখেন না। কিন্তু সহর-অরণ্যে ডিটেক্‌টিভ রাখিতে হয়। তাহা দেখিয়া ভগবানের পুরাতন সৃষ্টির সহিত নূতন সৃষ্টির পার্থক্য বুঝা যায়। হিংস্র জন্তুর ধর্ম্মে যাহা খুসি তাহা করিবার অধিকার আছে, মানবের ধর্ম্মে তাহা নাই। 'যাহা খুসি তাহা করার' ক্ষমতা বন্য প্রকৃতির হস্তে সমর্পণ করিয়া, ভগবান 'যাহা খুসি তাহা না করার' ক্ষমতা নিজহস্তে লইয়া বেবি সহরের অরণ্যে পাইচারি করিতেছেন। এখানে পুরাতন অরণ্যের সেরা এবং বিজ্ঞ হিংস্রজন্তু কালক্রমে আসিয়া জড় হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

মাসিক পত্রের সম্পাদকগণ কি রকম জন্তু? রামধন মিত্রের গলিতে পুরাতন অরণ্যচারী একজন মহাগজের বাস। সে দন্ত দিয়া সত্য কথা কহে, এবং শুণ্ড দ্বারা সমালোচনা করিয়া জীবকুলকে ত্রস্ত করিতে থাকে। ইহাতে ভগবানের উদ্দেশ্য কি?

মাসিক পত্রে গল্প লিখিয়া অনেকে দাম লইয়া থাকে। অরণ্যে রোদনের আবার দাম কি?

সাহিত্যের সম্পাদককে এই কথা একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দামোদর জানিতে পারিয়াছিল, যে রোদনের মূল্য নাই বটে, কিন্তু 'আসরে' রোদন করিতে গেলেই তাহার খরচ আছে। গৃহের মধ্যে রোদন, হৃদয়ের নিভৃতকন্দরে রোদন এগুলি অরণ্যের প্রভাতী কিংবা নৈশ রোদনের ন্যায়, যেমন গৃহপালিত বিড়াল অম্বল দেখিলে রোদন করে, কিংবা বঙ্গবধূ, স্বামী গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলে দ্বিপ্রহর রাত্রিতে একবার রোদন করিয়া লয়। কিন্তু রঙ্গস্থলে দশজনকে ডাকিয়া, কিংবা মাসিকপত্রের গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া, রোদন করিতে গেলে তাহার আনুসঙ্গিক ঐক্যতান বাদ্য এবং জয়ঢাক চাই।

তৃতীয়তঃ চুরি ডাকাতির গল্পের মধ্যে একটু প্রেমও চাই। ইহা লইয়াই

বৃক্ষপত্রের সহিত মাসিক পত্রের প্রভেদ। বৃক্ষপত্র প্রেমের কথা কহে না। সময় হইলে ঝরিয়া পড়ে। মাসিক পত্র যদি প্রেমের কথা কহে, তবে সে রঙ্গস্থলে থাকিবার যোগ্য। প্রেমের কথা ভাল করিয়া কহিতে না পারিলে তাহার গতিক মন্দ, বিলম্বিত লয়ের মধ্যে সে পড়িয়া যাইবে।

অনেক সময় বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত মাসিক পত্রিকাও গল্পের জন্য ব্যস্ত! গালগল্প যুবতীদিগের জন্য। যাহাদের পৃষ্ঠপোষক কর্ত্তা এবং বন্ধুবান্ধবের পয়সা কড়ি আছে, অল্পদিন বাহির হইয়াছে, তাহাদের পক্ষেই প্রেমের গল্প, পরিচ্ছদের চাকচিক্য, এবং বেসর নাকে দিয়া আসরের লাস্যভাব শোভা পায়, কিন্তু সনাতন জটাধারী পাদপগণের গোবিন্দ অধিকারীর ভাব কেন? হে আরণ্য তালতমালবৃন্দ, তোমরা একবার ইহাদিগকে থামাও না কেন?

দামুর গল্প লিখিবার প্রবৃত্তি ক্রমে সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। দামু বেদান্ত দর্শন পাঠ করিতে বসিয়া গেল।

রামা আসিয়া কহিল 'বাহিরে ঔষধের এবং দর্জ্জির দোকান হইতে বিল্ আসিয়াছে'।

দামু চমৎকৃত হইয়া বলিল—এই মহারণ্যে 'বিল্'। আচ্ছা তাহাদের পাঠাইয়া দেও।

গৃহের আল্মারির উপর বড় বড় আল্‌ষ্টার, কোট এবং প্যাণ্ট। আলমারির মধ্যে দশ বিশ রকম পুরাতন শিশি। নিশ্চয় ইহাদেরই সহিত বিলের সম্বন্ধ। তাহারা ঝুলিতেছে, তাহারা জড়পদার্থের মত দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের মধ্যে আমার দেহ মধ্যে মধ্যে থাকিত এবং তাহাদের মধ্যে যে ঔষধ ছিল তাহা আমি নিশ্চয় খাইয়াছি। মহারণ্যে কি অলীক ব্যাপার!

বিলহরকরা নমস্কার ও নিবেদন দ্বারা আত্মপরিচয় দিয়া তিন শত ছত্রিশ টাকার ধার প্রচার করিল।

দামু বলিল 'বাপু! এ সব ভোগ করিয়াছে কে?'

হরকরা। মহাশয়, এবং মহাশয়ের পরিবারবর্গ। তাউচার্ এবং নিজের স্বাক্ষর দেখিয়া লউন।

দামু। স্বাক্ষর ত দেখিতেছি, কিন্তু জীব যে নিজে আপনাকেই ভোগ করে তাহাত জান বাপু? তবে এত দাম চার্জ্জ করিয়াছ কেন?

হরকরা। মহাশয়, এত দর্শনশাস্ত্র জানিনা, কিন্তু ভগবান্ নিজেই

দোকানদার হইয়া ভোগীকে প্রবঞ্চনা করেন ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। আপনারই জিনিষ ভোগ করিয়া মহাশয় ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন।

দামু রামাকে ডাকিয়া কহিল 'এই বন্ধুদিগ্‌গজকে একটু তামাক দে'।

দামু দেখিল, যে সে নিজেই তাহার নিকট ঋণী। ভগবান্ অরণ্যে কাঠ খড়ের জন্য ট্যাক্স বসান নাই, কিন্তু সেই কাঠ খড়ের একটা সীমা আছে, তাহা লঙ্ঘন করিলেই মহা পাপের একটা প্রায়শ্চিত্ত আছে। অতএব দামু বন-দেবীর ভাণ্ডার হইতে তাহার মূল্য সংগ্রহ করিতে গিয়া দ্বিতলের শয়ন-গৃহে উঠিলেন।

কাদম্বিনী পাড়ার জনকতক স্ত্রীবন্ধু লইয়া পার্শ্বের ঘরে তাস খেলিতেছিল। খোকা খট্টাঙ্গে শয়ন করিয়াছিল। এই সুযোগে অরণ্যবাসী দামোদর বনদেবী কাদম্বরীর বাক্স হইতে তিনশত ছত্রিশ টাকা সাংখ্যদর্শনের সাহায্যে গনিয়া বাহির করিলেন। সেগুলি অঞ্চলে বাঁধিবেন এমন সময় খোকা বিকট চীৎকার পূর্ব্বক প্রচার করিল—

'মা, বাবা তোমার বাক্স হ'তে তাকা চুলি ক'চ্ছে'। দামু একেবারে স্তম্ভিত! এটা হরিণশাবক না ডিটেক্‌টিভ্? সেই চীৎকারের দাপটে কাদম্বরী তাস্ ফেলিয়া শয়নগৃহে উপস্থিত। পাড়ার স্ত্রীবন্ধুগণ দ্বারপার্শ্বে অঙ্গভঙ্গী এবং কর্ণাকর্ণি দ্বারা মহারণ্যের পুরাতন বিধানে সাবধানে সমালোচনা করিতে লাগিল।

কাদম্বিনী। ব্যাপারটা কি?

দামু। তিনশত ছত্রিশ টাকার বিল্ শোধ কচ্ছি।

কাদম্বরী। কিন্তু সেটা না বলিয়া লওয়াটা কি ঠিক? একেত তোমার মাথা খারাপ, তার উপর আমি কোন হিসাব পত্র রাখি না। মনে কর যদি খোকা না থাকিত আমি কি বিপদে পড়িতাম। যা হবার তাহা হইয়াছে, ভবিষ্যতে আর এমন কাজ করিও না।

দামু আশ্চর্য্য হইয়া কহিল 'এ টাকা কি আমার নয়?' কাদম্বিনী রহস্য-পূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল 'যাহা তুমি দিয়াছ সেটা তোমার কিসে?' 'আমার' বলিয়াই দামুর মনে কষ্ট হইল। এই 'আমার' লইয়াই ত ব্রতভঙ্গ হয়। হায়রে পাঁচু দা'! তুমি বলিয়াছিলে ঠিক।

কাদম্বরী আবার বলিল 'তোমারই পরিশ্রমের মূল্য এটা। তুমিই সঞ্চয় করিয়াছ। আমি মরিবার সময় তোমারই হাতে দিয়া যাইব। তবুও তোমার এই প্রবৃত্তি! ছি!'

দামু মনে মনে ভাবিল এটা বেদান্তদর্শন।

প্রলয়কালীন প্রকৃতি পুরুষে লীনা হয়, মায়া রুদ্ধ হইয়া যায়। এই জন্য বোধ হয় হিন্দুসধবা স্বামীকে রাখিয়া মরিতে চাহে!

দামু লজ্জিত হইয়া কহিল 'বনদেবী! আমি হঠাৎ মায়াভ্রমে কার্য্যটা করিয়া ফেলিয়াছি। তুমি টাকাটা ফিরাইয়া লও'।

বনদেবী কাদম্বিনী যতক্ষণ কথোপকথনে প্রবৃত্তা ছিল, নিম্নতলে বিলের বাবু রঙ্গালয়ে ধূম পান দ্বারা উত্তেজিত হইয়া দামুকে বাপান্ত করিতেছিল। তিন-শত ছত্রিশ টাকা সোজা কথা নয়। 'না দিতে পারে আমরা নালিশ করিব। বাবু বাটীর মধ্যে লুকাইয়া আছেন, থাকুন, কিন্তু আমাদের বিল ফেরত দিন, নচেৎ পুলিশ ডাকিব'।

কিন্তু বনদেবী শীঘ্রই বিল শোধ করিয়া দেওয়াতে দামু ঋণমুক্ত হইয়া জ্ঞানানন্দলাভ করিল।

দামু দেখিল যে মহারণ্যে ঈশ্বরকে আত্মসমর্পণ করিলে বনদেবী বিপদের সময় উদ্ধার করিয়া থাকে।

সন্ধ্যাকালে পাঁচকড়ি দা' আসিয়া দেখিল যে—দামু মশক সমিতির মধ্যে বসিয়া গুণ গুণ স্বরে হরিনাম করিতেছে। পাঁচকড়িকে দেখিয়া দামোদর আহ্লাদে নৃত্য করিয়া আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া গেল।

পাঁচকড়ি বুঝিল দামুর অবস্থা অনেক ভাল।—

'দামু তোর জ্ঞান ক্রমে টন্‌টনে অবস্থায় দাঁড়াচ্ছে, তুই মাসিক পত্রিকায় লেখ্। এই বেলায় লেখ্, বাত শ্লেষ্মায় জড়াইয়া পড়িলে আর লেখা ভাল বেরুবে না।'

দামু বলিল, 'আচ্ছা,' এবং 'সাহিত্যের' জন্য একটা সুন্দর গল্প লিখিবে মনে করিল। 'কিন্তু অরণ্যবাসের মধ্যে গল্প কি করিয়া লেখা যায়?' পাঁচকড়ি দা' হাসিয়া বলিল 'সেই ত আসল কথা। মনে করিয়া দেখ রোদন কি করিয়া হয়।'

অরণ্যে হাসি ও বিদ্রূপ চলে না। তাহা হইলে প্রেত যোনি স্কন্ধে চাপে। রোদন করিলে ভূত প্রেত পলাইয়া যায় এবং দেবগণ করুণার বশীভূত হইয়া রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। মনে কর, একটা গৃহস্থ মরিয়া গেলে তাহার পরিবারবর্গ কাঁদে কেন? কেবল ভূত তাড়াইবার জন্য। আত্মা দেহ হইতে বাহির হইলেই তাহাকে প্রেতলোক পার হইতে হয়, পাছে

তথাকার প্রেতগণ আত্মাকে চাপিয়া ধরে, এই ভয়ে আত্মীয়স্বজন মৃতাত্মার জন্য হর্ষপ্রকাশ না করিয়া, কান্নার চোটে তাহাকে বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত পার করিয়া দেয়।

অতএব গল্প লিখিতে গেলে রোদনের ভাবটা খুব জমকালো করিয়া লইবে। থিয়েটারে যে রোদন দেখ, তাহার ফল ক্ষণিক। দর্শকবৃন্দ ভাবভঙ্গী দেখিয়া একটু কাঁদিয়া ফেলে সত্য, কিন্তু সেটা নিমতলার দুঃখের মত। মাসিক-পত্রিকার গল্পের পাঠক ঘরে বসিয়া তন্ন তন্ন করিয়া তাহা পাঠ করে, সুতরাং রোদনের ভাবটাকে পিটাইয়া বার তের পাতা লম্বা করিয়া দিতে হয়। নচেৎ ঠিক অরণ্যে রোদন হয় না।

দামু বলিল 'অনেকটা ঠিক!'

পাঁচুদা। তাহা যদি বুঝিয়া থাক, তবে দেখা উচিত যে, রোদনটা কিসের জন্য? অভাবই দুঃখের মূল। হয়ত পয়সার অভাব, কিংবা প্রেমের অভাব, কিংবা এক কথায় কামিনীকাঞ্চনের অভাব, কিংবা কাব্যজগতের কোন অজানা অভাব, এই সকল অভাবগুলি পুংখানুপুংখরূপে দেখাইবার জন্য গল্প। নায়ক কাঁদে, নায়িকা হাসে। নায়িকা কাঁদে, নায়ক হাসে। উভয়ের ভাবগতিক দেখিয়া পাঠক লেখকের অভাব বুঝিতে পারে, এবং মাসিক পত্রিকায় চাঁদা দেয়। আমরা মনে করি পাঠক এবং পাঠিকাবর্গ বোকা, তাহা নয়। তাহারা খুব চালাক এবং ঈশ্বরের অবতার বিশেষ। শ্রাদ্ধের সময় ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মন্ত্রপাঠ এবং শ্রাদ্ধকর্ত্তার ভাব দেখিয়া যেমন নিমন্ত্রিত মহাজনের দয়ার উদ্রেক হয়, লেখকগণের গল্প এবং সম্পাদকের অবস্থা দেখিয়া পাঠকগণেরও সেইপ্রকার ভাব হয়। নচেৎ সামাজিক দিবে কেন?

পুরাকালে হিমাচলে মিত্রজিৎ নামক এক গন্ধর্ব্ব ছিল। সে সমালোচকগণের আদিপুরুষ। বেদব্যাস মহাভারত লিখিয়া এক কাপি তাঁহার নিকট পাঠাইলে মিত্রজিৎ বলিয়াছিল 'এত বড় পুঁথি ভদ্রলোকের পাঠ করা সাধ্য নহে। ইহা অপেক্ষা অপ্সরা এবং কিন্নরীগণের ছোট ছোট গল্প লিখিলে ব্যাসদেব দু'পয়সা লাভ করিতে পারিতেন। যাহা হউক্ ইহা বেমালুম কদলীবৃক্ষের ন্যায়। ভবিষ্যতে নরলোক ইহার এক একটি পর্ব্বের কাঁদি ভাঙ্গিয়া যথেষ্ট ফল সংগ্রহ করিতে পারিবে।'

উক্ত সমালোচনা দ্বারা বেশ বোধ হয় যে, মানবজীবন মহাভারতের মত বেমালুম কদলীবৃক্ষ। একটা কোন ঘটনা লইয়া ভাবিতে ভাবিতে তাহা বড় হইয়া যায়।

দামু। কোন্ ঘটনাগুলি ছোট গল্পে ভাল শুনায়? এই যে মহারণ্য ইহার মধ্যে কেবল ভীতি ছাড়া আর ত কিছু দেখিতে পাইনা। কাহাকে নায়ক করিব, কাহাকে নায়িকা?

পাঁচুদা। নায়ককে লুপ্ত করিয়া নায়িকাকে বড় করিলেই মহারণ্যের ভাব হইবে সহরের। বাস্তবিক নায়িকাই বড়। আমাদের সমাজের মধ্যে নায়িকা এতদিন লুক্কায়িতা ছিল। সে সকল কচিমেয়ের মত। কথা কহিতে জানেনা যাহারা, তাহাদের লইয়া আবার গল্প কি? নায়ক জিনিষটা কি তাহা জানিয়াও তাহারা ভদ্র সমাজে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিত না। নায়িকা তিন প্রকার, বিবাহিতা, অনূঢ়া এবং বিধবা। নায়কও হয়ত বিবাহিত, কুমার কিংবা বিপত্নীক। পতিবত্নী নায়িকা এবং পত্নীবান্ নায়কের গল্পে একটা রোদনের ভাব আনিতে গেলে, আর একটা নায়ক কিংবা নায়িকার অবতারণা করিয়া উভয়ের মধ্যে বস্তাবাঁধা দুরন্ত বিড়ালের মত তাহাকে ফেলিয়া দিতে হয়। তাহা একটা সুন্দর গল্পের আকর হইয়া পড়ে। কুমারীকে নায়িকা করিতে হইলে তাহাকে সমাজচ্যুত করিয়া বয়স বাড়াইয়া দিলে, কিংবা কোন মিষ্টার অমুক বিলাত ফেরতের দর দালানে ঝুলাইয়া দিলে, সে তিন চারি দিনের মধ্যে কোন নায়কের প্রেমে পড়িয়া হয় নিজে আত্মহত্যা করিবে কিংবা নায়ককে দেশ ছাড়া করিয়া দিবে তাহা সুনিশ্চয়। বিপত্নীক নায়ক এবং বিধবা নায়িকা বড় গল্পেই ভাল লাগে। ছোট গল্পে তাহাদিগকে লইয়া গেলে, চট্ করিয়া হুলুধ্বনি দ্বারা বিবাহসূত্রে বদ্ধ করিতে হইবে, নচেৎ ছুটাছুটি করিয়া তাহারা লোকজনকে বিরক্ত করে।

এই যে তিন প্রকারের নায়ক নায়িকার কথা বলিলাম তাহা সকলই অরণ্যরোদনের বিষয়।

স্ত্রীবর্ত্তমানে অন্য নায়িকাকে বিবাহ করিয়া ফেলারও ছোট গল্প হইতে পারে, কিন্তু তাহা আধুনিক সমাজে ঘৃণাস্কর।

পাঁচুদা রাত্রি হইয়াছে দেখিয়া চলিয়া গেলেন। দামু অন্ধকারে নানাপ্রকার নায়ক এবং নায়িকার কথা ভাবিয়া গল্প রচনা করিতে লাগিল।

দামুর বহুরাত্রি পর্য্যন্ত ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ পঞ্চবটীর কথা মনে পড়িল। শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনার্থ অরণ্যবাস করিয়াছিলেন, কিন্তু অরণ্যে গিয়াও তাঁহার মহাবিভ্রাট ঘটিয়াছিল। 'স্বয়ং ভগবানের যখন এই রকম বিপদ

মধ্যে মধ্যে ঘটে, তখন আমার অরণ্যবাসে যে একটা বিভ্রাট ঘটিবে না, তাহা কে বলিতে পারে'?

হিন্দুশাস্ত্র বড় পাকা শাস্ত্র তাহা দামু জানিত।

অরণ্যবাসের প্রথম বিভ্রাট সূর্পনখা। দামু মধ্যে মধ্যে ভাবিত 'আমাদের এই ঝি বেটি অনেকটা সূর্পনখার মত'। ঝি সময় পাইলে যাহা তাহা যে চুরি করিত তাহা নিশ্চয়। হাব ভাবও অনেকটা সূর্পনখারই মত। দামুর অরণ্যবাসের পর সেই হাব ভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল তাহাও নিশ্চয়। তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য লক্ষ্মণের মত কোন লোক ছিল না, সুতরাং অনেক সময় দামুর আতঙ্ক উপস্থিত হইত। আজও হইতে লাগিল।

তাহারই সঙ্গে সঙ্গে আর একটা আতঙ্ক মনে জাগিতে লাগিল। যদি সীতার ন্যায় কাদম্বিনীকেও নিঃসহায়া পাইয়া কেহ ভুলাইয়া লইয়া যায়, তাহারই বা আশ্চর্য্য কি? বরং রামচন্দ্র সীতার দিবা রাত্রি খবর লইতেন, দামু তাহার স্ত্রীর কি খবর লয়?

এই রকম ন্যায়শাস্ত্রের সাহায্যে তর্ক বিতর্ক করিয়া দামুর বোধ হইল সে একটা ঘোরতর অন্যায় কাজ করিতেছে। তাহার কোন উপায় না করিলে হয়ত লঙ্কাকাণ্ড হইতেও একটা তুমুল কাণ্ড ঘটিতে পারে।

অতএব দামু বাহিরে আসিয়া প্রথমে ঝিকে ডাকিল।—সে নাই। খোকাকে আবাহন করিতে করিতে দ্বিতলে গেল। দ্বিতলে কেহই নাই। সব ঘরই তালা চাবি বন্ধ। এক কথায় বাটীতে কেহই নাই। অবশ্য, দামু আছে, ঊর্দ্ধে নক্ষত্র আছে, বাটীর চতুর্দ্দিকে ও অভ্যন্তরে অন্ধকার খুব আছে, এবং বন্য বিড়ালও হয়ত কোন খানে আছে, কিন্তু তথাপি ঘোর নির্জ্জন।

দামু অতিশয় বিচারপূর্ব্বক দেখিল যে সূর্পনখার নাসিকা ও কান কাটিবার পূর্ব্বেই সে দশাননকে খবর দিয়া সীতাকে লইয়া গিয়াছে। কি ভয়ানক! এখন উপায় কি?

দামু ভায়া বাটীতে তালা বন্ধ করিয়া মোড়ের মাথায় আসিল। সেখানে পাহারাওয়ালা দাঁড়াইয়া ছিল।

পাহারাওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল 'কে হ্যা!'

দামু। দশাননকে খুঁজছি।

পাহারাওয়ালা দামুকে জানিত। সে বলিল 'বোধ হয়, তাঁহারা পঞ্চাননের বাটীতে গিয়াছেন, কিংবা ষ্টার থিয়েটারে। এই রকমত প্রত্যহ দেখি।'

দামু বুঝিতে পারিল যে পঞ্চানন, পাঁচুদা'কে উল্লেখ করিয়া পাহারাওয়ালা বলিতেছে। কিন্তু হঠাৎ পাঁচুদার বাটীতে যাওয়ার পূর্ব্বে দামু 'ষ্টার' থিয়েটারেই গেল। থিয়েটারে গিয়া একটা স্ত্রীলোকের তদন্ত করা নিতান্ত সহজ নহে; অতএব 'ঐক্যতান'বাদনের সময় দামু স্ত্রীলোকের কামরার পরিচারিকাকে আহ্বান করিয়া বলিল 'বাছাগো! একটি স্ত্রীলোক পাঁচ বৎসরের একটি ছেলেকে লইয়া বসিয়া আছে, তাদের বাটী——গলি, তাহাকে একবার বল যে তাহার স্বামীর বড় ব্যামো, একবার যেন আসে'।

পরিচারিকা প্রত্যাগত হইয়া খবর দিল যে একটি মাত্র স্ত্রীলোক পাঁচ বৎসর আন্দাজ ছেলে কোলে ব'সে আছে, কিন্তু সে বিধবা। অলঙ্কার নাই, থানের কাপড় পরণে।

দামু বলিল 'তাহা কখনও সম্ভবে না। দেখিতে কেমন?'

পরিচারিকা। মিশ কালো।

দামু হতাশ হইয়া ফিরিল। বাকি কেবল পাঁচুদাদার বাটী। কিন্তু সে প্রায় দুই মাইল পথ।

পথে আসিতে আসিতে দামুর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছিল।

পাঁচুদার বাটীর নিকট পঁহুছিয়া দামু দেখিল তাহাদের ঝি সেই বাটী হইতে বাহির হইতেছে। দামু আস্তীন গুটাইয়া তাহাকে একটা প্রকাণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করাতে সে চীৎকার করিয়া বলিল 'সর্ব্বনাশ, কর্ত্তা খেপেছেন!'

এই রকম মত প্রকাশ করাতে দামু তাহার চুলের মুষ্টি ধরিয়া বলিল 'সূর্পনখা! শীঘ্র বল্ সীতা কই।'

ঝি ক্রমশঃ মুখের আয়তন বিস্তার করিয়া চক্ষু উল্টাইতে লাগিল। দামু ক্রমশঃ তাহার গলা টিপিয়া লম্বা করিতে লাগিল।

ঝির বিকট আর্ত্তনাদে পাঁচুদার বাটীর লোক বাহিরে আসিল। পাঁচুদা দামুকে দেখিয়া তাহাকে শীঘ্র বাটীর মধ্যে লইয়া মাথায় জলসিঞ্চনাদি দ্বারা প্রকৃতিস্থ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ভায়া এ কি?'

দামু বলিল 'পাঁচু দা, আমার একটা ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত। অরণ্য-বাসের সময় দশানন আসিয়া যদি সীতা হরণ করিয়া লইয়া যায়, তাহার কোন উপায় ত তুমি পূর্ব্বে বলিয়া দেও নাই। বরঞ্চ দেখিতে পাইতেছি সীতা অশোক কাননে বন্ধা। ইহার সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ না দিলে বন্ধুর মনে কি রকম ভাব হইতে পারে, তাহা হয়ত তোমাকে বুঝাইতে হইবে না।'

পাঁচু দা বলিল, 'দামু ভায়া, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মায়া পরিত্যাগ না করিলে অরণ্যবাস হয় না, এবং অরণ্যবাস নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত না হইলে ছোট গল্প লেখা অসম্ভব। তুমি যত দিন অরণ্যবাস করিতেছ, তোমার স্ত্রী এখানে আসিয়া আমার স্ত্রীর নিকট কাঁদিয়া যান।'

দামু। আর কি কাঁদিবার যায়গা নাই?

পাঁচু। এক থিয়েটারে। সেখানে কাঁদা হইয়া গেলে, অন্য উপায় কেবল ছোট গল্প পাঠ করা। তোমার ছোট গল্পগুলি পড়িলেই আমার স্ত্রী এবং তোমার স্ত্রী প্রায়ই কাঁদে। সেগুলি পড়িলে স্বতঃই দুঃখের উদ্রেক হয়। দুঃখের উদ্রেক হইলে তাহা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত এক জন লোক চাই। তোমার নিকট প্রকাশ করিলে হয়ত তুমি চটিয়া যাইতে পার, সেই ভয়ে তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে বন্ধুর শরণাপন্ন হইতে হয়।

দামু ভাবিল 'কৈফিয়ৎটা মন্দ নয়। কিন্তু (প্রকাশ্যে) নিজের বাটী বসিয়া কাঁদিলে হানি কি?

পাঁচু দা। অরণ্যে রোদন, এবং সহরে রোদনের পার্থক্য পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি। সহানুভূতি সহরের প্রথা। তোমার বৈরাগ্যের অবস্থা একটা ছোট গল্প, এবং তাহার জন্য দুঃখ প্রকাশ সকলেরই কর্ত্তব্য।

দামুর অরণ্যবাসে সকলে দুঃখিত, এবং রাত্রি জাগিয়া যে দশজন সেই জন্য দুঃখ প্রকাশ করে ইহাতে দামু অত্যন্ত খুসি হইয়া সকলকে ধন্যবাদ দিল, এবং কাদম্বিনী ও খোকাকে আদর করিয়া বাটীতে ফিরিল। ঝি মুষ্ট্যাঘাতে অচেতন হইয়াছিল বলিয়া দামু তাহার মনস্তুষ্টির জন্য দশ টাকা বখ্‌সিস দিয়াছিল।

এই রকম মধ্যে মধ্যে হঠাৎ বৈরাগ্যভাব হইলে দামু অরণ্যবাস করিত, এবং জীব-দুঃখে দুঃখিত হইয়া ছোট গল্প লিখিয়া মাসিক পত্রিকায় পাঠাইত।

সু:—

নাটক।

প্রথম প্রবন্ধ।

নাটক কি ?

নাটক কি ? এক কথায়, উত্তর দিতে হইলে, বলা যাইতে পারে, নাটক, কাব্য-সংসারের কর্ম্মী। নাটক কর্ম্ম-শরীরী, কর্ম্মাত্মক, কর্ম্ম-মূলক। নাটক, কর্ম্মের সম্পাদন এবং সম্প্রসারণ; কর্ম্মের একতা এবং পূর্ণতা।

নাটক, স্বর্গে দেবতা-কৃত কর্ম্ম এবং সংসারে মনুষ্য-কৃত কর্ম্ম, মনুষ্য দ্বারা অনুকরণ করায় এবং অভিনয় করায়। এই অনুকৃত ও অভিনীত কর্ম্ম স্বাভাবিক অথচ স্বভাবাতিরিক্ত; সঙ্গীত-সমন্বিত, এবং শিল্প-কলা-কল্পিত। পরন্তু, এই অনুকৃত ও অভিনীত কর্ম্ম কাব্য-সৌন্দর্য্য-শোভিত এবং কাব্য-সৌরভ-সুবাসিত। অতএব বিচিত্র।

অপিচ, এই অনুকৃত ও অভিনীত নাটকীয় কর্ম্ম, নাট্য কর্ম্মিগণের মানসিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সংঘর্ষ-সংঘাতে প্রভাবিত; প্রজ্বলিত প্রবৃত্তির প্রদাহে প্রদীপিত, অথবা নির্ব্বাপিত, নির্ব্বাণোন্মুখ প্রত্যাশার অন্ধকারাবৃত নিরাশ কুক্ষি হইতে নির্গত; উহা, কখনও অনুরাগ আগ্রহ আসক্তির উত্তপ্ত উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত, কখনও বা বিরাগ-বিরক্তি ও ঔদাসীন্যের অবসাদে অবলুণ্ঠিত। এই কর্ম্ম,—কর্ম্ম-পরিব্যঞ্জক নাটকীয় বাক্যাবলী, সর্ব্বাবস্থাতেই, কর্ম্মীর মর্ম্মস্থল হইতে উত্থিত, মর্ম্মস্থলের প্রবল ঝঞ্ঝাবাত-বিক্ষোভিত অথবা সেই মর্ম্মস্থলেরই মধুর মলয়জ নিশ্বাসে মুখরিত। অতএব নাটকীয় এই কর্ম্ম ও কর্ম্মাভিনয়, নাটকোপভোগীর চিত্তাকর্ষক ও চিত্ত-বিনোদক, কৌতূহলোদ্দীপক ও হৃদয়গ্রাহী এবং মোহকর।

নাটক, জীব ও জড় জগতে কর্ম্মের অনুকরণে কর্ম্ম সংকল্প করে, কর্ম্মের কল্পনা করে, স্ব-কল্পিত কর্ম্মে কবিতা সিঞ্চিত করিয়া দেয় এবং সেই কর্ম্মকে প্রদর্শিত এবং অভিনীত করে। প্রদর্শিত কর্ম্ম—অনুকৃত ও অভিনীত কর্ম্ম, প্রকৃত কর্ম্মের সংঘটন কালের, সংঘটন ক্ষেত্রের এবং সংঘটক পাত্রের অবিকল অবস্থাপন্ন হইয়া সমুপযুক্ত চিহ্নে চিহ্নিত ও সমুপযোগী মৌলিক সজ্জায় সজ্জিত হইয়া, প্রদর্শিত ও অভিনীত হয়।

নাটক, কাব্যাকারে কবিতাত্মক কর্ম্ম অভিনীত ও প্রদর্শিত করে। এই কারণে

নাটকের অপর নাম দৃশ্যকাব্য। দৃশ্যকাব্য কবিতা-মুখরিত, কাব্যরস-সিঞ্চিত, কর্ম্মময়, দর্শনীয় দৃশ্যাবলী এবং শ্রবণীয়; সম্ভোগনীয় বিচিত্র বাক্যাবলী বা নাটক।

নাটক, কর্ম্মময়, কর্ম্মাভিনয়ময় কাব্য। পরন্তু কর্ম্ম—কর্ম্মের অনুকরণ ও অভিনয় হইতে, মনুষ্য কর্ত্তৃক মনুষ্যাদির কর্ম্মানুকরণ ও কর্ম্মাভিনয়ের স্বাভাবিক প্রবলতা ও স্পৃহা হইতেই নাটকের উৎপত্তি এবং কর্ম্মের একত্ব ও পূর্ণতা গঠন ও স্থাপন করিয়া, কর্ম্মের সাধন ও সমাধানে নাটকের পরিণতি।

সে বিষয় যথাস্থানে আলোচনা করা যাইবে। এ স্থলে, আপাততঃ বিবেচ্য হইতেছে, "কর্ম্ম" কি, কর্ম্ম কাহাকে বলে এবং "নাটকীয় কর্ম্মই" বা কি প্রকার। প্রথমতঃ দেখা যাউক কর্ম্ম কি পদার্থ।

কর্ম্ম।

কর্ম্ম, আমরা সংসারের জীব, সকলেই কিছু কিছু করি। বেশী আর কম। কর্ম্মবীর বহু বহু কর্ম্ম,—বিরাট বিরাট কর্ম্মের সাধন করেন; নিত্য নূতন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন; ক্ষণকাল মধ্যে, শত কর্ম্ম সমাধা করিয়া, আরও শতেকের সাধনা করেন। আর, আমরা কর্ম্মভূমির কা-পুরুষ, আমাদের পক্ষে, প্রতি দিন 'নিত্যকর্ম্ম' সারিয়া উঠাই ভার। দু' বেলার দু' মুঠা অন্ন আহরণ করিতে সমগ্র জীবনব্যাপী ক্লিষ্ট কর্ম্মেও কুলায় না; তাহাতেও এক বেলার অন্ন আহরণ অবশিষ্ট থাকে।

তথাচ, আমরা কিছু কিছু কর্ম্ম করিয়া থাকি। নেহাত নিষ্কর্ম্মারও কোনও না কোন কর্ম্ম আছে। অতি কুঁড়েও, কিছু না কিছু কর্ম্ম না করিয়া পারে না। না করিলে, বোধ করি তাহার কুঁড়েমি করাই চলে না। অপরের হস্ত দ্বারা মুখাগ্রভাগে আনীত অন্নগ্রাসও অন্ততঃ মুখ মধ্যে গ্রহণ ও গলাধঃকরণও তাহার করিতে হয়। এই গ্রহণ ও গলাধঃকরণও একটা কর্ম্ম বটে।

কাহারও পক্ষে, অন্নমুষ্টি উদরস্থ করা একটা কর্ম্ম। আবার কাহারও পক্ষে অন্নের সৃষ্টি সংস্থান বা সংগ্রহ করাই কর্ম্ম। পরন্তু, কাহারও কাহারও পক্ষে প্রভূত অন্নপ্রসূ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দেশ ও প্রদেশ পরাভূত ও পদানত করিয়া, তাহার উপর প্রভুত্ব ও আধিপত্য স্থাপন করাই কর্ম্ম নামধেয় যৎকিঞ্চিৎ কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত। কর্ম্মত্রয়ে পরস্পরে প্রভেদ এই। কিন্তু এ তিনই স্বস্ব প্রকৃতি এবং পর্য্যায়ে—স্বস্ব সচেষ্ট ক্রিয়ায় এবং অনুষ্ঠানে কর্ম্মই বটে।

কর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তিতে কর্ম্মিষ্ঠ সমষ্টি গঠিত হয়। সমষ্টি ব্যষ্টির সকলন বটে। কিন্তু

ব্যষ্টি ও সমষ্টির প্রভাবন ও উত্তেজন। ব্যষ্টি কর্ম্ম সমষ্টি কর্ম্মের একাংশ বটে; কিন্তু, সমষ্টি হইতে প্রসূত ও সমষ্টি দ্বারা প্রভাবিত। কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে উদ্ভূত ও কর্ম্মের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া, উদ্ভাবক ও উত্তেজক কর্ম্মেরই পুনঃ অঙ্গবর্দ্ধক হয়। প্রভাবিত কর্ম্ম ঘনীভূত হইয়া প্রভাবক কর্ম্মের সঙ্গে যাইয়া পুনঃ মিশে, এবং তাহার অঙ্গীভূত হইয়া, ও তাহার অঙ্গ পরিপুষ্ট করিয়া, পুনঃ নূতন কর্ম্মের প্রভাবক হয়।

কর্ম্ম সূত্র এবং কর্ম্মাবসান বা কর্ম্ম প্রশমন যেরূপে, যে কারণ পরম্পরার প্রভাবেই সংঘটিত হউক, কর্ম্ম-প্রবাহ, বোধ হয়, এইরূপেই প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। হিন্দুকর্ম্মবাদই যে কেবল এরূপ বলেন তাহা নয়, জগতে কর্ম্মী জীবের পরিদৃশ্যমান জীবনবৃত্ত, সভ্য ও শৌর্য্যান্বিত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মনুষ্য জাতির পুরাতন ও অধুনাতন অতি প্রামাণ্য জাতীয় ইতিহাসও ইহা প্রতিপন্ন করিতেছেন।

পক্ষান্তরে কর্ম্মের প্রতিষেধক ও প্রতিবন্ধক, আলস্য, অকর্ম্মণ্যতা, ঔদাসীন্য ও অক্ষমতাদি আলস্য ঔদাসীন্যাদিই উৎপাদিত ও প্রভাবিত করে ও তাহাদের ব্যক্তিগত ব্যষ্টি সমষ্টিতে সঙ্কলিত হইয়া পুনঃ পুনঃ সেই আলস্য ঔদাসীন্য অকর্ম্মণ্যতাই পরিবর্দ্ধিত ও প্রভাবিত করিতে থাকে।

ইহা আমাদের "কর্ম্মবাদের" বচন দ্বারা সমর্থিত হয় কিনা জানিনা। কিন্তু ইহা প্রামাণ্য ও প্রত্যক্ষ ইতিহাসে বিদ্যমান; জীবন্মৃত জাতির মধ্যে দেদীপ্যমান; সর্ব্বোপরি আমরা ভারতীয় জাতি ইহার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মূর্ত্তিমান্।

বিপুল কর্ম্মী য়ুরোপীয় জাতিনিচয় পৃথিবীর বর্ত্তমান কর্ম্ম-ক্ষেত্রে "মহাশক্তি" বলিয়া অভিহিত ও পরিচিত। ইহাদের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যের ও জাতীয় জীবনের বিস্তৃত ও বিপুল কর্ম্মপুঞ্জ ব্যষ্টি ও সমষ্টি আকারে, অবিরত ও অবিশ্রান্তভাবে, কেবল কর্ম্মের উৎপাদন ও উত্তেজন করিতেছে; বিরাট কর্ম্মপুঞ্জকে প্রতিনিয়ত বিরাটতর করিয়া চলিয়াছে; অতি বিস্তৃত কর্ম্ম ক্ষেত্রের নিত্যই অধিকতর বিস্তার করিতেছে; অতি সূক্ষ্ম কর্ম্ম কৌশল নিচয়ের সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতর উন্নতি সাধন করিয়াও আরও উন্নতির আকাঙ্ক্ষায় সদাই সচেষ্ট রহিয়াছে; অসীম কর্ম্ম-শৃঙ্খলে অবিরতই অভিনব কর্ম্ম সংযোজন করিয়া, সে শৃঙ্খল, অতি বেগে, বাড়াইয়া বাড়াইয়া, বাড়াইয়াই চলিয়াছে। তাহাতেও তৃপ্তি নাই; শান্তি নাই, সন্তুষ্টি নাই। কর্ম্ম, কর্ম্ম, কর্ম্ম, আরও কর্ম্ম চাহেন ইহারা, কর্ম্ম-প্রাণ, কর্ম্মোন্মাদ ঐ সকল য়ুরোপীয় জাতি! সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে কর্ম্মক্ষেত্র করিয়া. বিশ্ব সংসারের কর্ম্ম-কলাপ আত্মসাৎ করিয়াও ইহাদের কর্ম্ম-বাসনার বিরাম

নাই। বাসনানল বেগে বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইহাদের অতৃপ্ত কর্ম্ম-ভোগ-পিপাসা পৃথিবীর কর্ম্ম-পুঞ্জ পুনঃ পুনঃ পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করিয়াও অতৃপ্ত রহিয়াছে। ইহাদের এই নিরতিশয় কর্ম্মচাঞ্চল্য ও কর্ম্মোদ্যম এবং অপরিসীম কর্ম্মোন্মত্ততা, পরিণামে মঙ্গলকর কি অমঙ্গলের আধার, কে জানে? সে বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। তবে, ইহা একটা ঘটনা;—কর্ম্মক্ষেত্রের একটা দেদীপ্যমান সত্য, তাহাই কেবল বলিতেছিলাম।

ঐ সকল মহাজাতির প্রত্যেক উদ্যোগী পুরুষ-সিংহ জাতীয় উন্নতির, জাতীয় জীবনশ্রীর দিকে অবিচলিত লক্ষ্য রাখিয়া তাহারই সাধন ও সম্পাদন কল্পে, ঊর্দ্ধশ্বাসে কর্ম্ম-পথে ছুটিয়াছেন। তাঁহাদের ব্যক্তিগত খণ্ড কর্ম্ম নিচয় জাতীয় কর্ম্ম-সমষ্টি হইতে আদৌ অবিচ্ছিন্ন; জাতীয় কর্ম্ম-সমষ্টির সহিত শব্দের সহিত অর্থবৎ নিত্য সংযুক্ত। তাঁহাদের ব্যক্তিগত উন্নতি জাতীয় গৌরবশ্রীরই এক একটী অণু পরমাণু। পরন্তু, তাঁহাদের জাতীয়তা, জাতীয় শাসন যন্ত্র, জাতিগত প্রত্যেক ব্যক্তির পরিপুষ্টির জন্য প্রাণপণ করিতেও অকুণ্ঠিত। ব্যক্তিগত জীবন জাতীয় জীবনের সহিত এক সুরে বাঁধা,—একই সূত্রে গাঁথা। এক ব্যক্তির গায়ে একটু আঁচড় লাগিলে সমগ্র জাতি তাহাতে ব্যথা অনুভব করে; তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকারে প্রবৃত্ত হয়। বর্ণ বিভাগ নাই। অথচ কর্ম্ম বিভাগ, শ্রম বিভাগ অতুলনীয়, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রবর্ত্তিত। প্রত্যেক ব্যক্তির খণ্ড কর্ম্ম সকল, বক্ষে করিয়া, জাতীয় কর্ম্মের বিরাট সমষ্টি সদাই সবেগে উধাও ধাবিত হইয়া চলিয়াছে, আর অনবরত বর্দ্ধিতই হইতেছে।

কর্ম্ম-ক্ষেত্রের এক দিকের অবস্থা এই। দেশে বিদেশে অধিকাংশ য়ুরোপীয় জাতির ও প্রথম শ্রেণীর শক্তির আজ এই অবস্থা। পক্ষান্তরে, কর্ম্ম-ক্ষেত্রের অপর দিকে, আসিয়াটিক অধিকাংশ জাতি নিচয়ের মধ্যে, ঠিক ইহার বিপরীত অবস্থা, বিশেষতঃ ভারতীয় আর্য্য জাতির মধ্যে। য়ুরোপীয় ও আধুনিক হিসাবে ভারতীয় আর্য্যদিগকে এক জাতি বলা যায় না, কেননা তাঁহারা জাতীয়তার এক অবিচ্ছিন্ন সূত্রে আদৌ বদ্ধ নহেন। অতএব বলিতে হইতেছে যে,—ভারতীয় আর্য্যবর্ণগণ এই কর্ম্ম-বৈপরীত্যের, কর্ম্ম-বিমুখতার বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত। আলস্যের, অবসন্নতার, অক্ষমতার এবং অকর্ম্মণ্যতার সীমা কোথায়; আত্ম-অচলতা, পরনির্ভরতা, বিচ্ছিন্নতা, সঙ্কীর্ণতা, জাতীয় জুগুপ্সা এবং জীবন্ত জড়ত্ব প্রকৃত প্রস্তাবে কাহাকে বলে, পৃথিবীর কর্ম্ম-ক্ষেত্রে, তাহা কেবল ইঁহারাই প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

পৃথিবীর কর্ম্মী জাতিনিচয় অকর্ম্মাজাতিবর্গের পৃষ্ঠদেশে, কর্ম্ম-দামামা রাখিয়া, তাঁহাদের বিরাট কর্ম্মের বিপুল বাদ্য করেন। সংসারে একেবারে নিকর্ম্মা কাহারই থাকিবার (ইচ্ছা থাকিলেও) উপায় নাই। অতি কুড়েরও কিছু না কিছু কাজ না করিলে চলে না। অতএব, আসিয়ার অকর্ম্মা জাতি সমূহ য়ুরোপীয় কর্ম্মীজাতিগণের কর্ম্ম দামামা বহনের কার্য্য নিঃশব্দে সাধন করিতেছেন। কর্ম্মবীর বাদ্যকর, দামামায় দুরন্ত আঘাত করিয়া, দশদিক্ কাঁপাইয়া, স্বজাতির বিরাট কর্ম্মের বিজয় ঘোষণা করিতে করিতে, কুব্জ-পৃষ্ঠ কর্ম্ম-দামামা-বাহককে চালিত করিতেছেন। দামামায় বড় বড় 'বাড়ি' পড়িতেছে। দামামার মত দামামা-বাহকও অবশ্য সে বাড়ির বিষয়ীভূত হইতেছেন। কেনই বা না হইবেন? বাদন ব্যপদেশে, পড়িতেছে দামামায় বাড়ি। ক্ষীপ্র চালন ও গতি নির্দ্ধারণ কারণে, পড়িতেছে বাহকের পৃষ্ঠে ছড়ি। কর্ম্মীর কর্ম্মের কর্ম্ম-দামামার নিম্নতলে বাহকের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। লোকে দেখিতেছে, বাদ্যকর, বাদ্য আর দামামা। বিলুপ্ত বাহক বহিতেছেন, বহিয়া বহিয়া চলিতেছেন, আর সহিতেছেন। অগ্রেই বলিয়াছি, কর্ম্মিগণের কর্ম্মের যন্ত্রবৎ নির্ব্বাহক,—কর্ম্ম-ভার-ধারক বা কর্ম্ম-দামামা বাহক, এক একটা ব্যক্তি নয়, এক একটা অকর্ম্মণ্য, অক্ষম ও আত্মঘাতী জাতি।

কবি কিপ্‌লিঙের কাব্যখানির নাম "White Men's Burden" না হইয়া "White Men's Beasts of Burden" হওয়া উচিত ছিল;—হইলে, প্রকৃত ঘটনার সহিত কাব্য-কথার ও কাব্য-নামের সঠিক ও সম্পূর্ণ ঐক্য হইত। শ্বেতেতর মনুষ্য, "শ্বেত মনুষ্যের ভার" হইলেও হইতে পারে; তথাচ সে বিষয়ে, কোন কোনও স্থলে কিছু সন্দেহ আছে। কিন্তু শ্বেতেতর মানুষ যে শ্বেত মনুষ্যের "ভার-বাহক" সে কথায় কাহারও কথা কহিবার পথ নাই। কেন না, তাহা কেবল প্রকৃত নয়, নেহাৎ প্রত্যক্ষ। কবি বোধ করি কেবল শিষ্টাচারের খাতিরেই প্রকৃত কথাটি কতক প্রকাশিত করিয়া, কতক প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে, শ্বেতেতর কিনা কৃষ্ণ পীত লোহিতাদি বর্ণ, শ্বেতবর্ণের "বোঝা"ও বটে, বোঝা-বাহকও বটে। শ্রেষ্ঠে নিকৃষ্টের ভার বহন করিলে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টের ভার হয়েন না। কিন্তু, নিকৃষ্ট শ্রেষ্ঠের ভার বহিলেও, নিকৃষ্ট শ্রেষ্ঠের একটা ভারও বটে। কে বলিবে বোঝাবাহী বেকুব, সুবুদ্ধি সাকুবের একটা 'বোঝা' নয়? গর্দ্দভ মানুষের বোঝা বয়, মানুষের ঘাস জলও খায়;

মানুষের আশ্রয়ে ও রক্ষণাবেক্ষণে নিরাপদে বাস করে। নির্ব্বিঘ্নে বাঁচিয়া মানুষের ঘাস-'বাস না পাইলে, গর্দ্দভ অনেক সময়েই অন্ন বিনা মশ্বিত, অন্নাহরণে অরণ্যে প্রবেশ করিয়া এবং অরক্ষণে অরণ্যে থাকিয়া অনেকানেক আপদে বিপদে পড়িত; বলবানের আক্রমণে, আত্মরক্ষায় অক্ষম হইয়া, অকালে প্রাণ হারাইত; বলবানের উদরসাৎ হইত। ইহা কে না বুঝিতে পারে? অতএব গর্দ্দভ মানুষের ভার-বাহক ও ভার উভয়ই বটে।

কিন্তু গর্দ্দভ, "গোঁফ খেজুরে" লোক অপেক্ষা সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠ জীব। গর্দ্দভের বুদ্ধি না থাকিলেও "সাধ্যি" আছে। গর্দ্দভ শ্রম করিতে কদাচ কাতর হয় না। কিন্তু গোঁফ খেজুরে এমনি কর্ম্মক্ষম যে গোঁফের উপর কেহ কৃপা করিয়া খেজুরটি তুলিয়া দিলে, তবে তাহা খাইতে পারেন। প্রাচীন বঙ্গের প্রবাদ উক্তি,—"গোঁফ খেজুরে ভাই, গোঁফের উপর খেজুরটী তুলে দেও ত খাই।" কর্ম্ম-ক্ষেত্রে গোঁফ খেজুরে ব্যক্তির মত গোঁফ খেজুরে জাতিও বিদ্যমান, যেমন আমরা।

নাটকের লক্ষণ ও গঠনাদির আলোচনা করিতেই অঙ্গীকার করিয়াছি; তাহাই করা উদ্দেশ্য; তাহাই করিব। সেই প্রসঙ্গেই কর্ম্মের, কর্ম্মীর ও অকর্ম্মীর এই কথা। ইহা নাটকের অতীব উপযোগী উপাদান। নাটক নকল বই আসল কর্ম্ম নয়। নাটক, প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে কৃত কর্ম্মের ও অকর্ম্মের নকল ও নক্সা; অনুকরণ ও অভিনয়। নকল নাট্য-মঞ্চের অনুকৃত কর্ম্ম-কলাপ অনুভব ও উপভোগ করার পূর্ব্বে, আসল কর্ম্ম-ক্ষেত্রে, সত্য সংসারের প্রকৃত কর্ম্ম-ভূমিতে প্রতি নিয়ত সত্য ও প্রকৃত কর্ম্মের মর্ম্মান্তিক গদ্য পদ্যময় মহা নাটকের যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া চলিয়াছে, তাহা কিঞ্চিৎ প্রণিধান ও চিন্তা করা মন্দ নয়। তাহার পার্শ্বস্থিত আলোকে, প্রস্তাবিত বিষয় একটু অধিক পরিস্ফুটই হইতে পারে।" অতএব অনুকৃতের অবয়বাদির অনুসরণ করার একটু অগ্রে, অনুগ্রহপূর্ব্বক, পাঠক, প্রকৃতের লক্ষণাদির প্রতি বারেক লক্ষ্য করুন।

কর্ম্ম-সংসারের বিচিত্র রঙ্গ-ক্ষেত্রে, ঊর্দ্ধ কর্ম্মীর কর্ম্ম-দামামা অধঃকর্ম্মী বা অকর্ম্মী (অধঃ-কর্ম্মীও অধিক উপযোগী) বহন করে; বহন করিতে বাধ্য। এসিয়ার অনেক জাতির পৃষ্ঠেই, এই দামামা অবস্থিত। কিন্তু, এই দুরন্ত দামামা, ভারতীয় ভারবাহী জাতির অষ্ট পৃষ্ঠে, ললাটে, স্কন্ধে, কণ্ঠে, দিবা রাত্রি, দুলিয়া দুলিয়া, দমাদম কর্ম্ম বাজনা বাজিতেছে। কেবল ইংরাজের ইংরাজী

"ড্রাম" নয়। মার্কিনের মার্কিনী, জর্ম্মনের জর্ম্মানী, য়ুরোপের নানা জাতীয়, তাহার উপর আবার ইদানী জাপানের জাপানী যন্ত্র,—অবাধ বাণিজ্যের বহু আকারের বড় বড়, বিচিত্র এবং বিবিধ রঙ্গের ড্রাম, ঢাক, ঢোল ধামা! অবাধ বাণিজ্যের কর্ম্ম-দামামা আমরা বহন করিতেছি। কর্ম্মী বিদেশীয় ব্যাপারী বিমানে বসিয়া ব্যাপার করিতেছেন; এ দেশীয় পশারী বলদ হইয়া তাঁহার বোঝা বহিতেছেন, খোলে ধরিতেছে; রাত্রি দিন পথে পথে ফিরিয়া, ফুকরাইয়া ফুকরাইয়া তাঁহার ফেরি করিতেছে! বিদেশীয় কার্য্যের ও বাণিজ্যেরকর্ম্ম-ড্রাম, এ দেশীয়ের স্কন্ধে কণ্ঠে, অহরহ বাজিতেছে, তাহার গুরু পেষণে পৃষ্ঠ দেশ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

নাটকের কি উৎকৃষ্ট উপাদান! প্রহসনের কি সুন্দর সামগ্রী! কে বলে, এদেশীয়দের উপস্থিত অবস্থায়, এদেশীয় ভাবে ও ভাষা নিচয়ে, প্রকৃত নাটক নির্ম্মিত হইতে পারে না? এদেশীয়দের উপস্থিত অবস্থায় অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা, রুধিরের রক্তিম ফেনা এবং শুক্ল কৃষ্ণাদি কর্ম্মের হন্‌হনা ও অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ না থাকিলেও, বিবিধ বিচিত্র যন্ত্রের বাজনা, বিবিধ বিচিত্র কর্ম্মের উত্তেজনা, তাড়না এবং বিবিধ বিচিত্র রস—উচ্ছ্বাসেরও স্বর—সংঘাতের মূর্চ্ছনা "মজুত" আছে এবং সর্ব্বদাই সমুদ্ভূত হইতেছ; যাহার দ্বারা নানা ঢঙ্গের নাটক ও নানা রঙ্গের প্রহসন প্রস্তুত হইতে পারে। ট্রাজিডি, কমিডি, ট্রাজো-কমিডি, এবং ফার্‌স্‌, বিশিষ্ট বিশিষ্ট শ্রেণীর দৃশ্য কাব্যেরই উপাদান প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে। তাহা উপযুক্ত কবি-কল্পনার কারখানায় বিশ্লেষণ সংশ্লেষণ করিয়া, সাজাইয়া গোছাইয়া দিলেই, দিব্য দিব্য দৃশ্য কাব্য প্রস্তুত হইতে পারে।

আপাততঃ আমাদের মধ্যে, সংঘর্ষ সংঘাত, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার কিছু মাত্র অভাব নাই। নাটকীয় পরিভাষায় ইংরেজীতে যাহাকে "কলিসন" "আক্‌সন" ও "রি-আক্‌সন" কহে, তাহার ত অভাব দেখি না। বহু শতাব্দী ধরিয়া, এতদ্দেশীয় অধঃপতিত লোকের সহিত, বহু বলিষ্ঠ ও বিশিষ্ট জাতির চিত্তের ও চরিত্রের সংঘর্ষ ও সংঘাত চলিয়াছে; এবং তাহাতে করিয়া সংযোগ, বিয়োগ, সংক্ষোভাদি ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হইতেছে। কার্য্য ক্ষেত্রে, বাণিজ্য বিপণীতে, বিষয় ব্যাপারে, ব্যবস্থাপক আগারে, বিচারালয়ে, তথা শিক্ষা-মন্দিরে, সাহিত্য-সংসারে, সৈনিক-কাহিনীতে ও শান্তির ছায়ায়, কর্ম্মভূমির সর্ব্বত্রই ইহাদের পরস্পরে এই সাক্ষাৎ ও সংঘর্ষ। প্রাচ্যরক্ষণশীলতার শ্লথ ভাবস্রোত, পাশ্চাত্য উন্নতিশীলতার খরচিন্তা-প্রবাহের সংঘর্ষে সংযোগে

আলোড়িত বিলোড়িত হইতেছে,—বিচলিত বিক্ষোভিত হইতেছে। ইহাদের ধাতুগত ও ধর্ম্মগত, জন্মগত ও কর্ম্মগত এবং জাতিগত পার্থক্য-জনিত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার যে যুদ্ধ,—যে জয় পরাজয়,—অথবা যে সন্ধি সংমিলন, তাহা নাটকেরই অনুকরণীয় উপাদান।

কিন্তু এ স্থলে, কেবল কর্ম্মের কথাই বলা হইতেছে। ভারতীয়দিগের কর্ম্মাবসাদ, অনুদ্যম, এবং ঔদাসীন্যাদির সমর্থন কল্পে, সময়ে সময়ে, কৈফিয়ৎ শুনা যায় যে ভারতীয় আর্য্য সন্তানগণ জড় জগতের প্রতি আদৌ আস্থা-শূন্য, ইহ জীবনের উন্নতি, ঐশ্বর্য্য, বিত্ত বৈভবাদি তাঁহাদের নিকট প্রকাণ্ড অসার ও অলীক বস্তু; কেবল অসার ও অলীক নয়, তাহা আদৌ অনিষ্টকর। ত্যাগ্য বস্তুই নয়, অবস্তু। তাহা মায়ার ঘের, কর্ম্মের ফের। তাহা হইতে মুক্তি লাভই পরম পুরুষার্থ। অতএব আপাদমস্তক আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন ও মহা-নির্ব্বাণ-আকাঙ্ক্ষী আর্য্যাবংশাবতংস ভারতবাসী হিন্দু জাতি জড় জগতে ও জড় জীবনে জড়িত থাকিতে অনুৎসুক। অতএব তাহার আবার উন্নতি-সাধনে, তৎপর হইবেন কেন? কর্ম্ম-ফাঁস কিসে কাটিবেন তাঁরা তাহাই ভাবিয়া ভোর; অতএব তাঁরা কর্ম্ম করিয়া কর্ম্ম ভার বাড়াইবেন কেন? কাজেই তাঁরা কর্ম্ম করেন না। কর্ম্ম করিয়া কর্ম্ম ভোগ বাড়াইতে তাঁদের প্রবৃত্তিই হয় না। চিত্ত হইতে কর্ম্ম-মূল বাসনার বাসাখানাকে একেবারেই উজাড় করিয়া ফেলাই হিন্দু সন্তানের উদ্দেশ্য; হিন্দু শাস্ত্রের বিধি তাই; হিন্দুর স্বভাব তাই; হিন্দুর শোণিত স্রোতঃ সেই উদ্দেশ্য সাধনার্থেই স্বতঃ প্রবাহিত হইতেছে। হিন্দু জীবন্মুক্তির পক্ষপাতী, পরলোকের পক্ষপাতী। কাজেই জীবনকে জড় কর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চাহেন। কাজেই ইহকালকে পরকালের অধীন করিয়া রাখিয়াছেন। পক্ষান্তরে, য়ুরোপীয়েরা জড়সর্ব্বস্ব, ইহলোকসর্ব্বস্ব; অতএব তারা জড়ের উন্নতিকল্পেই অমূল্য মানব-জীবন ক্ষয় করিতেছে; অতএব তারা পরকালকে ইহকালের অধীন করিয়াছে, এবং ক্রমাগত কর্ম্ম করিয়া কেবল কর্ম্মভার বাড়াইতেছে; কর্ম্ম-ফাঁদে পড়িতেছে। এই কর্ম্ম-ভারের ভীষণ চাপে ও কর্ম্ম-ফাঁদের অফুরন্ত ফেরে, তাদের অধঃপতন, উৎসাদন ও আসন্ন মরণ অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু, আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান্, পুণ্য জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হিন্দু জাতির এরূপ পরিণাম কদাচ হইবে না। কেননা পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য, কর্ম্ম-ফাঁদ হইতে পরিত্রাণের জন্য, হিন্দু, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, বিত্ত বৈভব

সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়া, "চিট" হইয়া বুসিয়া আছে। অতএব হিন্দুই বাঁচিবে। জগতে হিন্দুজাতিই জীবিত থাকিবে; পরিণামে হিন্দুজাতিরই জয় হইবে।

পুনশ্চ, হিন্দুজাতি যে অসংখ্য যুগ হইতে স্বরাজ্য-বিহীন, পরাধীন; ইহার কারণ তাহার জাতীয় চিত্তের পুণ্য প্রভাব, পরলোক-স্পৃহা এবং ইহলোকে অশ্রদ্ধা। হিন্দু যে আজ অবসন্ন, অধঃপতিত ও উদরান্নহীন, ইহার কারণ তাহার অপরিসীম আধ্যাত্মিকতা। অপিচ, দুর্ভিক্ষের দংশনে, হিন্দু যে জঠরানলে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে অথচ কথাটী কহিতেছে না; ইহা পরম পরিতোষদায়ক এবং সবিশেষ শুভলক্ষণ; কেননা ইহাই হিন্দু ধাতের ও ধর্ম্মের পরিচায়ক। পক্ষান্তরে, জঠরানলের জ্বালায়, হিন্দুর জোর জবরদস্তি খাদ্য সামগ্রী কাড়িয়া খাওয়ার খবর যে সময়ে সময়ে পাওয়া যায়, ইহা বড়ই সাংঘাতিক, বড়ই অশুভকর ও অকল্যাণকর, কেননা তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুধাতুর বৈলক্ষণ্যই বুঝায়। সে বড়ই দোষের * * *। হিন্দুর রাজ্যপাট বাণিজ্য ঐশ্বর্য্য সবই ত ছিল। সে তাহা চায় না বলিয়াই গিয়াছে। নহিলে কি আর যাইত! হিন্দুজাতি, কর্ম্ম-ভার কমাইবার জন্যই অহরহ যত্নবান্। কাজেই বড় একটা কর্ম্ম করে না। ইত্যাদি।

এ প্রকারের উক্তির এবং এ প্রকৃতির যুক্তির ইদানী অভাব নাই। ইহা আমাদের অকর্ম্মতার সবিশেষ সান্ত্বনা নিশ্চয়ই। কিন্তু, শুদ্ধ তাহাই নয়। ইহা উৎকৃষ্ট নাটকীয় উপকরণ। এ উপকরণে সরস কাব্যময় "কমিডি" প্রস্তুত হইতে পারে, প্রহসনের পঁচিশ দেঁড়ে পান্সী ডবল পাল্ উড়াইয়া ছুটিতে পারে।

যাহা হউক্, এ যুক্তির সহিত যুঝিতে যাইয়া, পুনঃ একটা নাট্য রঙ্গের উপ-করণ নির্ম্মাণ না করাই ভাল।

হিন্দু কর্ম্মবাদ গভীর এবং জটিল দার্শনিক তত্ত্ব। অজগর আলস্য ও অমার্জ্জনীয় কর্ম্মণ্যতার পক্ষ সমর্থনার্থে সেই প্রগাঢ় ও পবিত্র তত্ত্ব অনর্থক টানিয়া তুলিয়া, তাহার খুচরা খরচ করা, এক অসাধারণ অপব্যয়। হাল আইনের হিন্দুয়ানী এই অপব্যয় করিয়া, এক দিকে উপহাসাস্পদ হইতেছেন এবং, অপরদিকে অনিষ্টও করিতেছেন। ইদানী হাল হুজুগের হিন্দুয়ানী, কোনও অতি কুৎসিত কাজ করিলে, সেটাকে যেমন তৎক্ষণাৎ "শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ" করিয়া,

"ত্বয়া হৃষীকেশ"

ইত্যাদি আওড়াইয়া ফেলেন, তেমনি ব্যবহারিক ও সাংসারিক কর্ম্ম শৈথিল্য ও অকর্ম্মণ্যতার কৈফিয়তে, দার্শনিক কর্ম্মবাদের দোহাই দিয়া দিব্য নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হন; মনে করেন বড়ই বাহাদুরি হইল; হিন্দুয়ানির মাহাত্ম্য ও হিন্দুর 'মনুষ্যত্ব' অতি সহজেই সটান বাড়িয়া উঠিল! আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে অতি সহজেই কুকর্ম্মের কলঙ্ক কালিমা মুছিয়া গেল। পরন্তু অকর্ম্মণ্যতার অপরাধও ফলতঃ সেই একই কোপে কাটা পড়িল। শ্রীকৃষ্ণ এবং কর্ম্মবাদ হইয়াছেন হাল হিন্দুয়ানীর যেন ঠিক হজমিগুলি। এই কম্পাউণ্ড পিল স্পর্শমাত্রেই, মুখ-বিবর পার হইতে হইতেই পাপমাত্রই পরিপাক হইয়া যায়; গর্হিতাচার যত দুষ্পাচ্যই হউক জলশাবুর মত তাহা মুহূর্ত্ত মধ্যেই জীর্ণ হইয়া যায়। কর্ম্মবাদ বা অদৃষ্টবাদের দোহাই দিলেই সব গোল মিটিল। সে দোহাইও সর্ব্বদা দিতে হয় না। "কৃষ্ণ" শব্দটীতেই সব কিছু কাটিয়া যায়। হাল হিন্দু বলেন, "কৃষ্ণ করাইতেছেন, কৃষ্ণ করাইলেন তা করিব কি? কুকর্ম্ম যদি করিয়া থাকি কৃষ্ণ করাইয়াছেন; অলস অকর্ম্মণ্য যদি হইয়া থাকি তিনিই হওয়াইয়াছেন। কেননা 'যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।' " বস্ নিশ্চিন্ত। হাঁ! তা বটে। তোমাকে আমাকে অসৎ কর্ম্মে উত্তেজিত করা, কুকর্ম্মানুরক্ত করাই কৃষ্ণের কাজ। আর তোমাকে আমাকে নিষ্কর্ম্মা কুড়ে করিবার জন্যই কর্ম্মবাদের সৃষ্টি! কৃষ্ণকে আমরা অতি উত্তম রূপেই চিনিয়াছি। কর্ম্মবাদের মর্ম্মও আমরা বিলক্ষণ বুঝিয়াছি।

না হইবে কেন? আমরা আর্য্যবংশের অতি উপযুক্ত বংশধর; আধ্যাত্মিকতার এক একটী অজ অবতার! আমাদের ইহকালের অসারত্ব-বোধ এত অধিক আর পরকাল-প্রবণতা ও পবিত্রতা-স্পৃহা এতই প্রবল যে, সিকি পয়সার পুঁইশাক পাইবার প্রত্যাশায় আমরা আপাদমস্তক 'পরের পাদুকা ভক্ষণেও প্রস্তুত। আবার, আর এক দিকে, সহজসাধ্য হইলে, বিপদাশঙ্কা না থাকিলে ও সুবিধা পাইলে, সেই সিকি পয়সার শাকের প্রত্যাশায় পরম সুহৃদের শোণিত পান করিতে কুণ্ঠিত হই না! আর্য্য-বংশধরের বাসনার ফের ও কর্ম্মের ফের, কেমন চমৎকার কাটিয়া গিয়াছে না?

অতএব ভারতবাসীর—এই আধ্যাত্মিক ও পরকালগতপ্রাণ পরমহংস জাতির—আর পরোয়া কি? আত্মার প্রতি তাঁদের এমনি অতুলনীয় অনুরাগ এবং জড়ের প্রতি এমনি বিষম বিদ্বেষ ধীরে ধীরে জন্মিয়াছে যে, আপনারাই জড়-

ভরত হইয়া গিয়াছেন। কাজেই দেহ মনের প্রত্যেক অঙ্গই অচল অনড় পরমাত্মায় পরিণত হইয়া গিয়াছে! আর চাই কি! পরার্থপরতার, উচ্চাশয়তার ও আধ্যাত্মিকতার চরম সীমাতেই তাঁরা ঘনাইয়া ঘনাইয়া চলিয়াছেন।

আর য়ুরোপীয়েরা? জড়-বাদী জড়-কর্ম্মী, ইহলোকসর্ব্বস্ব, আত্ম-সুখকামী য়ুরোপীয়, এমনি জড়ধর্ম্মী, আত্মপ্রাণের মমতায় এমনি মুগ্ধ যে, স্বদেশের ও স্বজাতির জন্য, প্রতি মুহূর্ত্তেই আত্মসুখ, আত্মপ্রাণ বলিদান বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত রহিয়াছেন; প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহা বিসর্জ্জন ও বলিদান দিতেছেন।

ইহার ফল, যাহা হইবার, তাহাই হইয়াছে, তাহাই হইতেছে। সে ফল কি, আমরা সকলেই প্রায় সমান দেখিতে পাইতেছি। অতএব তাহা বলিয়া বাক্য ব্যয় করা বৃথা।

কর্ম্মকে ফাঁকি দিয়া, হিন্দুর কর্ম্ম ফাঁদ কিছু মাত্র কাটে না। অপ্রত্যক্ষ পরলোকের বিরাট ব্যাপারে কোন ব্যক্তির,—কোন জাতির কিরূপ গতি হইবে, তাহা সকলেরই চিন্তার বিষয়ীভূত হওয়া উচিত হইলেও, কেহই জানে না; তাহা কেবল বিধাতারই বিদিত। কিন্তু, সুপ্রত্যক্ষ ইহ-সংসারের খুচরা কারবারে, যেরূপ জানা যাইতেছে, তাহাতে জড়-কর্ম্মী য়ুরোপীয় জাতিই ত দেখিতেছি, অধ্যাত্মবাদী আমাদের অপেক্ষা শত সহস্র গুণ অধিক মাত্রায়, জড়াতীত বিষয় অনুভব-সক্ষম। তাঁহারা জড়োপাসনার অপবাদে অভিযুক্ত হইয়াও জড়ের ভিতর জীবন সঞ্চারিত করিয়া দিতেছেন, জড়ের ভিতরেও জড়াতীত সূক্ষ্ম সত্তার অনুশীলন করিতেছেন। আমরা জড়বৎ তাহা দেখিতেছি আর আমাদের আধ্যাত্মিকতার আধিক্য জানাইতেছি। ইহা আমাদেরই উপযুক্ত বটে।

অপরিসীম অতীত কালে এ দেশীয় আর্য্যদের, যে আকারেই হউক, কিছু না কিছু বলবীর্য্য, রাজ্য ঐশ্বর্য্য অবশ্যই ছিল। তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু, তাহা যাহাদের ছিল, তাঁহারা এবং আমরা, বোধ হয়, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জীব—বিভিন্ন জাতি। তাঁহারা কর্ম্মী ছিলেন, তাঁহাদের কর্ম্ম ছিল। পরন্তু, তাঁহাদের পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারিগণ, কর্ম্মভোগ-বর্জ্জনার্থে বা কর্ম্ম-ফাঁস ছেদন করিয়া নির্ব্বাণ মুক্তি অর্জ্জনার্থে, সেই বলবীর্য্য রাজ্য ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া বা অপর জাতিকে দান-পত্র লিখিয়া দিয়া বাসনা-বিরহিত চিত্তে বাণপ্রস্থ অবলম্বনপূর্ব্বক বন-গমন করেন নাই। রাজ্য ঐশ্বর্য্য ভোগের আসক্তি তাঁহাদের ষোল আনাই ছিল। দুর্ভাগ্য বা দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ তাহা রক্ষা করিবার প্রচুর শক্তি ছিল না;

সুবুদ্ধিও ছিল না। কাজেই, কর্ম্মদোষে রাজ্য ঐশ্বর্য্য পরহস্তগত হইয়াছিল। সহজ বুদ্ধিতে পুরাবৃত্তের বিশ্লেষ করিলে, আসল কথাই ইহাই দাঁড়ায়। কিন্তু আসল কথা দেখা ও দাঁড় করান ত আমাদের অভিপ্রায় নয়; অভ্যাসও নয়। আমরা চাই আত্মাভিমানের আস্ফালন ও আর্য্যত্বের গর্ব্ব করিতে। কাজেই ইতিবৃত্তের বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া বলি যে, অতিবৃদ্ধ আর্য্য প্রপিতামহগণের রাজ্য ঐশ্বর্য্যে আসক্তি ছিল না বলিয়াই তৎসমুদয় নষ্ট হইয়াছিল। নহিলে কি আর যায়?

তা, অতি প্রাচীন আর্য্য রাজ্যের ন্যায়, পৃথিবীর আরও অনেক প্রাচীন রাজ্যের অবসান হইয়াছিল। কালবশে বা কর্ম্মদোষেই অবসান হইয়াছিল; রাজ্যৈশ্বর্য্য ভোগের আসক্তির অভাবে অবসান হয় নাই। ইতিহাস, মানব-জাতির প্রকাশ্য কর্ম্মেতিহাস—তাহার সাক্ষী।

গ্রীক সাম্রাজ্যের শেষ হইয়াছিল। রোম রাজ্যের ধ্বংস হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্বে মিসর রাজ্য মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। অধুনাতন কালে, এই হিন্দুস্থানেই মুসলমান ও মারহাট্টা রাজ্যের পতন হইয়া গিয়াছে। নিশ্চয়ই এই সকল জাতি বা এই সকল জাতির কোনও জাতি, অনাসক্তি, জীবন্মুক্তি বা নির্ব্বাণ বৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া, স্বরাজ্য ধ্বংস হইতে দেন নাই। যে সকল কারণের সমবায়ে ধ্বংস কার্য্য সংসাধিত হইয়াছিল, শীতল চিত্তে ও সহজ বুদ্ধিতে ইতিহাস আলোচনা করিলেই তাহার অবধারণ হইতে পারে। পক্ষপাত ও অপ্রামাণ্য পূর্ব্ব সংস্কার সহকারে সহসা কোন সিদ্ধান্ত করিতে গেলে, কেবল প্রমাদেই পড়িতে হয়। ইদানী আর্য্যত্বের অতিরিক্ত অনুরাগ দেখাইতে যাইয়া অনেকানেক আবশ্যকীয় অনুশীলনেই, আমরা পুনঃ পুনঃ কেবল প্রমাদেই পড়িতেছি। অসঙ্গত ও অবিশুদ্ধ সিদ্ধান্তে, অনিষ্ট উৎপাদন করিতেছে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

কামনার সহিত কর্ম্মের নিশ্চয়ই নিত্য সম্বন্ধ। তথাচ, কামনার বিদ্যমানতা সত্ত্বেও, নানা কারণে, কর্ম্মের হ্রাস, কর্ম্মের ব্যতিক্রম ও ব্যভিচার ঘটে। কামনার বিদ্যমানতা সত্ত্বেও কর্ম্মোদ্যম রহিত হইলে, কর্ম্মের সঙ্কোচ ঘটিলে, সাধনা ও শক্তি কমিলে, জীবের যে দুর্গতি হয়, আমাদের তাহাই হইয়াছে। আমাদের কামনা কমে নাই; কর্ম্ম কমিয়াছে। আর এক দিকে, আবার কামনারূপ কর্ম্মই হইতেছে। যাহার যেমন কামনা, ভাবনা এবং সাধনা, সিদ্ধিই তাহার তেমনি। কুঁড়ে কাজ করিতে অক্ষম ও অসম্মত। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার কামনার কিছুমাত্র অভাব নাই। সে শুইয়া শুইয়াও সাত-কুড়ি কামনা করে।—কামনা

করে এই যে, নিজে কোনও কর্ম্ম করিবে না, অপরের কর্ম্মের ভাল ভাল ফলভোগ করিবে। আমাদের ব্যক্তিগত কামনায় এবং জাতীয় সাধনায় (সে বস্তুর যদি আদৌ অস্তিত্ব থাকে) অবস্থা অনেক দিন হইতে প্রায় এইরূপ হইয়া আসিতেছে। বৃক্ষ রোপণ ও বীজ বপন না করিয়া আমরা ফল ও ফসল খাইতে চাই। এক কথায়, আমরা কর্ম্মবিরহিত কাম্য বস্তু উপভোগের বাসনা করি। কাজেই আমাদের "কর্ম্ম ফাঁস" কাটিয়াছে বই আর কি!

এক দিকে এই। ইহার ফলে আমরা অকর্ম্মা হইয়াছি। আর এক দিকে আমাদের কামনা সংকীর্ণ ও নিম্নগামিনী হওয়াতে, আমাদের কর্ম্মও ক্ষুদ্র স্বার্থ-সংক্ষুব্ধ—ও নীচতা-নিমজ্জিত হইয়াছে। এক কথায়, আমরা ইতর কর্ম্মী হইয়াছি! অপরের আজ্ঞাধীন কর্ম্ম-বাহক হইয়া, কর্ম্ম-ক্ষেত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারে, গাধা খাটুনি খাটিতেছি।

শাস্ত্রে আছে, এবং শাস্ত্রের সে উক্তি অযৌক্তিক উক্তিও নহে যে, কর্ম্ম-ফাঁস কাটিতে হইলে, কর্ম্মের দ্বারাই তাহা কাটিতে হয়। কর্ম্মের সাধনা বিনা, সেই চরম সিদ্ধি—সেই পরম পুরুষার্থ কেহ কখনও প্রাপ্ত হইতে পারে না। পরন্তু, নিষ্কাম সিদ্ধ পুরুষগণ কর্ম্ম-বিহীন ও কর্ম্ম-বিরত নহেন। জগতের উন্নতি কল্পে, জীবের কল্যাণার্থে, সর্ব্বভূতের সেবার্থে, তাঁহারাও নানা কর্ম্মে নিরত। তাঁহারা কর্ম্ম ফলের কামনা-বিরহিত হইয়া কর্ম্ম করেন। আর আমরা কর্ম্ম-বিরহিত হইয়া কর্ম্ম-ফল-ভক্ষণে কামনা করি।

অতএব, আমাদের কর্ম্ম-জাল কাটিয়া নিষ্কাম সিদ্ধির কি চমৎকার সম্ভাবনা—বারেক ভাবিয়া দেখুন।

তা, আমরা এই কর্ম্ম-জাল কাটার যতই "জারি" করি না কেন, কর্ম্মের বিরহে, আমরা ক্রমাগত ঐ জালে কেবল জড়াইয়াই পড়িতেছি। জীবন-জঞ্জাল-জালের জটিলতা কিছুই কাটিতেছে না, এরূপ অবস্থায় কখনও কাটিবে না; বাড়িয়া চলিয়াছে; কেবল বাড়িয়াই চলিবে।

অতঃপর চিন্তা করা যাউক, কর্ম্ম কি, কর্ম্ম কাহাকে বলে, কর্ম্মের মূল কোথায়, কর্ম্ম কি প্রণালীতে কেমন উপাদানে ও কোন্ প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হয়, চিত্তের কোন্ স্তরে কিরূপ কর্ম্মের জন্ম এবং তাহাদের কাহার কি প্রকৃতি গতি ও পরিণতি। ইহা অতীব দুরবগাহ দার্শনিক বিষয়। তথাচ উপস্থিত প্রসঙ্গের আকাঙ্ক্ষাবশতঃ কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। ঐ আলোচনা দ্বারা মূল কর্ম্মের প্রকৃতি নির্দ্ধারণের পর, নাটকীয় কর্ম্মের অবতারণা করিব।

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

রামগোপাল ঘোষের স্মৃতিসভায় কিশোরীচাঁদ। *

শত বর্ষ অতীত হইল, ১২২১ বঙ্গাব্দে কার্ত্তিক মাসে আমাদের জাতীয় নবজীবনের সূচনা করিয়া 'স্বদেশরক্ষার ভীম' রামগোপাল ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। এই শত বর্ষের মধ্যে বাঙ্গালী-সমাজে, বাঙ্গালী-জীবনে, কি অসামান্য পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে!

শত বর্ষ জাতীয় জীবনের ইতিহাসে অতি অল্পকাল মাত্র। এই অত্যল্প কালের মধ্যে যাঁহাদিগের প্রতিভা ও শক্তি দেশে নবজীবন সঞ্চারিত করিয়াছে, তাঁহাদিগের মধ্যে রামগোপাল অতি উচ্চ আসন অধিকৃত করিয়া আছেন। যদি এই বহুবৈচিত্র্যপূর্ণ যুগের প্রকৃত সম্পূর্ণ ইতিহাস কখনও রচিত হয়, তবে আমরা বঙ্গ-সমাজের উন্নতির ইতিহাসে রামগোপালের প্রকৃত স্থান নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইব।

আজ আমরা ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে রামগোপালের স্মৃতিসভায় তাঁহার জীবন-সুহৃদ্ বাঙ্গালার অন্যতম দেশনায়ক কিশোরীচাঁদ মিত্র কর্ত্তৃক প্রদত্ত ইংরাজী বক্তৃতার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদান করিয়া পাঠকগণকে কেবলমাত্র রামগোপালের কর্ম্মময় জীবনের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। রামগোপালের ন্যায় মহাত্মার

---

* ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে রামগোপাল ঘোষের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁহার তিনখানি উৎকৃষ্ট ইংরাজী জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম জীবনচরিত কৃষ্ণদাস পাল কর্ত্তৃক লিখিত এবং জানুয়ারি মাসে হিন্দুপেট্রিয়ট্ পত্রে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়খানি কৈলাসচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক লিখিত, হুগলী কলেজে ঐ বৎসর ফেব্রুয়ারি মাসে পঠিত এবং পরে রামগোপালের আলোকচিত্রের সহিত পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। তৃতীয় জীবনচরিত কিশোরীচাঁদ মিত্র কর্ত্তৃক প্রণীত ও কলিকাতা রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

কৃষ্ণদাস লিখিয়াছেন যে মৃত্যুকালে রামগোপাল ৫৪ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে।

কৈলাসচন্দ্র লিখিয়াছেন, রামগোপাল ১২২১ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে, ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। 'চরিতাষ্টক'-প্রণেতা কালীময় ঘটকও কৈলাসচন্দ্রের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই সময়ই রামগোপালের জন্মকাল বলিয়া লিখিয়াছেন।

কিশোরীচাঁদ লিখিয়াছেন, রামগোপাল ১২২১ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিকমাসে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে জন্মগ্রহণ করেন।

স্মৃতি আমাদের জাতির অক্ষয় মূলধনের অংশস্বরূপ। শতাব্দীর পর শতাব্দী পূর্ব্ববর্ত্তী শতাব্দী অপেক্ষা আমাদের দেশ ও জাতিকে উন্নত হইতে উন্নততর করুক, আমাদের জাতি কেবল পার্থিব সম্পদে নহে, অতুলনীয় মানসিক সম্পদে সমৃদ্ধিশালী হউক, তথাপি যেন আমরা আমাদের জাতীয় মূলধনের কথা না বিস্মৃত হই, আমাদের অতীতযুগের মহাপুরুষগণের প্রতি শ্রদ্ধা না হারাই। তাঁহাদের জীবন ধ্রুবতারার ন্যায় আমাদের জাতীয় উন্নতির পথ চিরদিন নির্দ্দেশ করিতে থাকুক।

আমি পরবর্ত্তী প্রস্তাবটি উত্থাপিত করিবার ভারপ্রাপ্ত হইয়াছি। প্রস্তাবটি এই :—

"স্বর্গীয় মহাত্মার স্মরণার্থে কোন উপযুক্ত প্রকাশ্য স্থানে তাঁহার একটি প্রতিকৃতি স্থাপিত হউক এবং নিমতলা শ্মশানঘাটে মৃতের সংকারার্থে সমাগত ব্যক্তিগণের ব্যবহারার্থে তাঁহার নামে একটি গৃহ নির্ম্মাণ করা হউক এবং এতদর্থে উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত হউক।"

যে বান্ধবের স্মৃতিরক্ষাকল্পে এই প্রস্তাবটি উত্থাপিত হইতেছে, তিনি কেবল আমারই প্রিয়বন্ধু ছিলেন, এমত নহে; পরন্তু এই স্থলে সমবেত ভদ্র-মহোদয়গণের অনেকেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহাদিগের জন্য আমি তাঁহার জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। মহাশয়, এই সভা ব্যক্তিগত শোকপ্রকাশের স্থল নহে; পরন্তু আমার বোধ হয় যে, রামগোপাল ঘোষের ন্যায় মহাত্মার মৃত্যু আমাদের জাতীয় দুর্ভাগ্য সূচনা করিতেছে। তাঁহার পরলোকগমনে ভারতমাতা তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গালা ১২২১ সালে রামগোপাল জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এতৎসম্বন্ধে মতভেদ নাই। ইংরাজী তারিখ পরবর্ত্তী লেখকগণ কর্ত্তৃক সম্ভবতঃ কৃষ্ণদাসের জীবন-চরিত হইতেই গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু যে কারণে কৃষ্ণদাস ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে রামগোপালের আবির্ভাবকাল নিরূপিত করিয়াছেন, সেই কারণে উহা ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে হওয়া সম্ভব।

স্থির হইল, ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ১২২১ বঙ্গাব্দে রামগোপাল জন্মগ্রহণ করেন। এক্ষণে ১২২১ বঙ্গাব্দের আশ্বিন বা কার্ত্তিক—কোন্ মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, তাহা বিচার্য্য। রামগোপালের তিনজন প্রধান জীবনচরিতকারের মধ্যে কিশোরীচাঁদের সহিত রামগোপালের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠতা ছিল। বিশেষতঃ কৈলাসচন্দ্রের পুস্তক প্রকাশিত হইবার পরে কিশোরীচাঁদের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সুতরাং কিশোরীচাঁদ কৈলাসচন্দ্রের ভ্রম সংশোধন করিয়া কার্ত্তিকমাস রামগোপালের জন্মকাল বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত নহে।

সমর্থ সন্তানকে এবং আমাদিগের সমাজ সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত এবং সাহসী দেশনায়ককে হারাইলেন।

আমার আরও বোধ হয় যে, যিনি এতকাল এইরূপে দেশকে ভালবাসিয়াছেন এবং দেশের সেবায় আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহার স্মৃতিপূজায় ঈশ্বর প্রীত হয়েন এবং মানবহৃদয় উন্নত হয়।

রামগোপাল বহুবিধ সদ্‌গুণ এবং অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। দারিদ্র্যের ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়া, জীবনের প্রারম্ভে শক্তিমান্ ধনবান্ আত্মীয় এবং বন্ধুবর্গের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়াও, তিনি সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া উচ্চ স্থান অধিকৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। স্বভাবদত্ত প্রতিভা এবং অদম্য অধ্যবসায়গুণে তিনি এইরূপ প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হইয়াছিলেন; তিনি সকলের ন্যায় ইংরাজচরিত্রের সত্যপরায়ণতা, উদ্যম এবং দৃঢ়তাগুণে বিমুগ্ধ হইলেও, কখনও উচ্চপদস্থ ইংরাজের খোসামোদে প্রবৃত্ত হয়েন নাই; পরন্তু তিনি ইংরাজদিগের ন্যায় মানুষ এবং সমান অধিকারবিশিষ্ট, ইহাই সর্ব্বদা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইতেন এবং প্রতিপন্ন করিতেন—রাজপ্রতিনিধির ন্যায় উচ্চস্থান প্রাপ্তির জন্যও তিনি তাঁহার আত্মসম্মান এবং আত্মমর্য্যাদা বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ করিতে সম্মত ছিলেন না। অনেকের বিশ্বাস যে, বাণিজ্য-ব্যাপারে তাঁহার উন্নতি অপ্রতিহত ছিল—ইহা সত্য নহে। অনেকবার তাঁহার ঋদ্ধি প্রতিহত হইয়াছিল—অনেকবার তিনি প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কখনও তিনি জীবনসংগ্রামে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন নাই, অসামান্য শক্তিপ্রয়োগপূর্ব্বক তিনি সাফল্যলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের শিক্ষা অতি সরল এবং হৃদয়স্পর্শী। তাঁহার জীবনের শিক্ষা এই যে, আত্ম-নির্ভর এবং আত্মসম্মানজ্ঞান, অদম্য অধ্যবসায় এবং সাধু আচরণের সহিত সম্মিলিত হইলে সর্ব্বদাই জয়যুক্ত হয়।

দেশহিতৈষণা এবং দেশসেবায় নিঃস্বার্থ নিষ্ঠা আমাদের প্রিয় বন্ধুবরের চরিত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ। দেশবাসিগণের নৈতিক এবং মানসিক উৎকর্ষ বিধানই দেশোন্নতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া তিনি নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, শিক্ষাবিস্তারই দেশকে অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারের পঙ্কিলভূমি হইতে উন্নীত করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। সেইজন্য তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি এবং অর্থবল শিক্ষাবিস্তারকল্পে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি সেই সময়ে শিক্ষাকল্পক্রম একটী ক্ষুদ্র চারাগাছ

মাত্র—অতি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছিল—উহার সযত্নপালন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। ডেবিড্ হেয়ার সর্ব্বপ্রথমে উহার পালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামগোপাল এই বিষয়ে বিবিধপ্রকারে তাঁহাকে সাহায্য ও তাঁহার সহযোগিতা করিয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই হেয়ার সাহেবের বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতেন এবং বিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ ছাত্রগণকে পারিতোষিক প্রদান করিতেন এবং প্রোৎসাহিত করিতেন। তাঁহার শিক্ষাস্থান হিন্দুকলেজেও ঐরূপ করিতেন। ঠনঠনিয়ায় তিনি স্বয়ং একটি বিদ্যালয় এবং তৎসংশ্লিষ্ট একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি মেডিকেল কলেজের উন্নতির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, ইহার সাফল্যে দেশের মহা-কল্যাণ সংসাধিত হইবে।

আমাদের পরলোকগত বন্ধুর চরিত্রের আর একটি প্রধান গুণ বদান্যতা। তাঁহার বদান্যতা সত্ত্বগুণাশ্রিত এবং স্বভাবসিদ্ধ ছিল এবং মানবজীবনের সর্ব্বপ্রকার দুঃখকষ্ট নিবারণার্থে নিরন্তর প্রয়াস পাইত। যাঁহারা তাঁহার সহিত আমার ন্যায় ঘনিষ্ঠ এবং অন্তরঙ্গভাবে মিশিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, তিনি নিজের জন্য নহে—পরের জন্য জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। যাঁহারা প্রার্থনা করিতেন, তিনি তাঁহাদিগের সকলকেই সর্ব্বদা সানন্দে সদুপদেশ ও সাহায্য করিতেন। তিনি ডিষ্ট্রীক্ট্ চ্যারিটেব্‌ল সোসাইটীর নেটিব্ কমিটির সভাপতি ছিলেন এবং এইরূপে এই মহানগরীর বৃদ্ধ এবং অক্ষম দরিদ্রগণকে যথোচিত সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন। সকলপ্রকার সদনুষ্ঠানের সহিতই তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এমন কোনও সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হয় নাই, যাহাতে তিনি মুক্তহস্তে অর্থসাহায্য করেন নাই। বস্তুতঃ তাঁহার সদনুষ্ঠানে দান দেশের সর্ব্বত্র সমৃদ্ধিশালী জমিদার ও মহাজনগণের অনুকরণীয় হওয়া উচিত—ইহাতে তাঁহারাও যশস্বী হইবেন এবং দেশবাসীও উপকৃত হইবেন।

তিনি যে ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার জীবনের কার্য্যই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আচার্য্য বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় * বলিয়াছিলেন যে, রামগোপাল ঘোষের ধর্ম্মমত কি ছিল, তাহা বলা দুষ্কর। কিন্তু তাঁহার কার্য্যাবলীর আলোচনা করিলে এই প্রশ্নের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উত্তর পাওয়া যায়। আচার্য্য মহাশয় 'ধর্ম্মমত' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, আমার বিশ্বাস, সেই অর্থে রামগোপাল কোনও বিশেষ ধর্ম্মমতের অনুবর্ত্তী ছিলেন না। কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস

---

* রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

যে, মানবসমাজের সেবাই পরমেশ্বরের সেবার শ্রেষ্ঠ উপায়—এই মতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। আচার্য্য বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই বিষয়ে যে তর্কবিতর্ক উত্থাপিত করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি দুঃখিত হইলেও আমি তাঁহাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, রামগোপাল হৃদয়ের ধর্ম্মে অন্বিত ছিলেন এবং শৈশব হইতেই পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তিমান্ এবং প্রার্থনারত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার ঈষদ্বিকম্পিত অধরে প্রার্থনাবলী উচ্চারিত হইয়াছিল এবং তিনি সম্পূর্ণ শান্তিতে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

মহাশয়, যে মহদ্গুণ তাঁহার জীবনের বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছিল, এবার আমি রামগোপাল ঘোষের চরিত্রের সেই সর্ব্বপ্রধান গুণের বিষয়ে বলিব। এইবার আমি তাঁহার জনহিতৈষণার বিষয়, জনহিতকর অনুষ্ঠান-সমূহে তিনি যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যে অপূর্ব্ব বাগ্মিতা তাঁহাকে এই ভূমিকা অভিনয়ে সাফল্য প্রদান করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে কিছু বলিব। একটি প্রবাদ আছে যে 'মানুষ নিজের মুখেই অপরাধী সাব্যস্ত হয়' অর্থাৎ নিজের কথাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। রামগোপালের অপূর্ব্ব জনহিতৈষণা এবং বাগ্মিতা তাঁহার নিজের বাক্য দ্বারাই আমি প্রমাণ করিতে প্রস্তুত আছি। আমার হস্তে প্রকাশ্য সভাসমূহে প্রদত্ত তাঁহার বক্তৃতাসম্বলিত একখানি পুস্তক আছে, কিন্তু উহা হইতে পাঠ করিয়া আমি আপনাদিগের সময় নষ্ট করিতে চাহি না। আমি কেবলমাত্র সংক্ষেপে সেইগুলির উল্লেখ করিব।

বক্তৃতাশক্তি তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ ছিল; কৈশোর হইতে উহার অনুশীলন দ্বারা তিনি উহা যথেষ্ট বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। অক্সফোর্ড ক্লাবে যেরূপ অনেক ইংরাজবাগ্মী বক্তৃতাশক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, য়্যাকাডেমিক এসোসিয়েশনে সতত তর্কবিতর্কে যোগদান করিয়া তিনি সেইরূপ উপকৃত হইয়াছিলেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড হার্ডিং তাঁহার শিক্ষাবিষয়ক অবধারণসমূহ প্রকাশিত করেন। তজ্জন্য লর্ড হার্ডিংয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের নিমিত্ত ফ্রি চার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউসনের গৃহে দেশবাসিগণের একটি বিরাট্ সভা আহূত হয়, তথায় রামগোপাল তাঁহার প্রথম প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে লর্ড হার্ডিংয়ের দেশ-সুশাসনের জন্য তাঁহার কোনও স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনার্থে য়ুরোপীয়গণ কর্ত্তৃক টাউনহলে একটি সভা আহূত হয়। লর্ড হার্ডিংকে অভিনন্দনপত্র প্রদানের প্রস্তাব হয়, তাহাতে দেশবাসিগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারবিষয়ক তদনুষ্ঠিত কার্য্যাবলীর উল্লেখ করা হয় নাই। এই স্থলে উপস্থিত মদীয় বন্ধু

আচার্য্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই ভ্রম সংশোধনের জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। সভার প্রধান উদ্যোগী ব্যারিষ্টার মহোদয়গণ আচার্য্য মহাশয়কে নিরস্ত করিতে প্রয়াস পান। তখন রামগোপাল উঠিয়া স্বদেশ-প্রত্যাগমনোন্মুখ বড়লাট বাহাদুরের শিক্ষাবিষয়ক নীতির উল্লেখ করিবার প্রয়োজনীয়তা অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেন। তিনি লাট বাহাদুরের একটি প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি সংস্থাপনের নিমিত্তও একটী মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতা অতি ফলপ্রদায়িনী হইয়াছিল এবং এই সময় হইতেই তিনি বাগ্মী বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ৩রা জুন দিবসে বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের সভাপতি সার্ চার্লস্ উড্ পার্লিয়ামেণ্টের কমন্স্ সভায় ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রেরিত রাজকর্ম্ম-চারিনিয়োগ-বিষয়ক প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। এই প্রস্তাব অনেক বিষয়ে উত্তম হইলেও দেশবাসীর সমুচিত ও ন্যায়সঙ্গত আশার অনুযায়ী হয় নাই। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় এবং সিবিল সার্ভিসে প্রবেশাধিকার, বিচার-বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণের বেতন-বৃদ্ধি, আয়বৃদ্ধিকারী পূর্ত্তকার্য্যের বিস্তার প্রভৃতি বিষয়ে কতিপয় অতি প্রয়োজনীয় ও তাঁহাদের বিবেচনায় অপরিহার্য্য প্রশ্নের উল্লেখ না দেখিয়া তাঁহারা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। এই সকল বিষয়ে আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া রামগোপাল দেশনায়কগণকে একটি প্রকাশ্য সভা আহূত করিতে অনুরোধ করিলেন। এতদনুসারে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই দিবসে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। কলিকাতায় এরূপ বিরাট্ সভা পূর্ব্বে কখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। টাউনহলের সোপান হইতে শত শত ব্যক্তিকে বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাগমন করিতে হয়। সভায় উপস্থিত ব্যক্তির সংখ্যা সম্বন্ধে তিন সহস্র হইতে দশ সহস্রের মধ্যে অনেকে অনেক প্রকার অনুমান করিয়াছিলেন। কলিকাতাস্থ এবং উহার উপকণ্ঠস্থ প্রায় সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই এই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং সমাজের সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিই তথায় আগমন করিয়াছিলেন। এই সভার প্রাণস্বরূপ রামগোপাল এই উপলক্ষে একটি অতি হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাই বোধ হয় তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বক্তৃতা এবং ইহা সমাগত জনসঙ্ঘের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ স্পর্শ করিয়াছিল। লণ্ডনে প্রকাশিত টাইম্‌স্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র ইহাকে বক্তৃতার চূড়ান্ত ("Masterpiece of oratory") বলিয়া শতমুখে ইহার প্রশংসা করেন। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট

নিমতলা হইতে শ্মশানঘাট স্থানান্তরিত করিবার সঙ্কল্প করিলে, উহার প্রতিবাদকল্পে তিনি যে হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহাই তাঁহার শেষ প্রকাণ্ড বক্তৃতা। যদিও শ্মশানঘাট স্থানান্তরিত করিবার বিষয়ে তাঁহার ব্যক্তিগত—ধর্ম্মগত কোনও আপত্তি ছিল না, তথাপি প্রবল কল্পনাশক্তি এবং সার্ব্বজনীন সহানুভূতিপ্রযুক্ত তিনি রক্ষণশীল দেশবাসিগণের প্রতিনিধিরূপে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদিগের অভিযোগের কারণ সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং অপূর্ব্ব বাক্‌পটুতার সহিত সেই অভিযোগ বিজ্ঞাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ইংরাজীশিক্ষার অন্যতম প্রবর্ত্তক এবং রাজনীতিতে জননায়করূপে তিনি দেশের যে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য দেশবাসিগণকর্ত্তৃক চিরদিন তাঁহার স্মৃতি কৃতজ্ঞতার সহিত সম্পূজিত হইবে। য়ুরোপীয় সমাজের কয়েকজন প্রতিনিধি আমাদিগের সহিত এই মহাত্মার স্মৃতিপূজায় যোগদান করিয়াছেন দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি এবং আমি আশা করি যে, যে পরলোকগত মহাত্মার স্মৃতিপূজার্থে আমরা এই স্থলে সমবেত হইয়াছি, তাঁহারি অতুলনীয় কর্ম্মজীবনের দৃষ্টান্ত মনুষ্যত্বের প্রকৃতিগত গুণ, জাতি, অবস্থা এবং ধর্ম্মের পার্থক্য দূর করিয়া য়ুরোপীয় এবং দেশীয়, কর্ম্মচারী এবং স্বাধীনজীবী, ধর্ম্মযাজক এবং সাধারণব্যক্তি—সকলকেই তাঁহার স্মৃতি উদ্দেশে যথোচিত শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে উত্তেজিত করিবে।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

বিয়ের ফর্দ।

(গল্প)

(১)

জীবন সংগ্রামে জয়মাল্য লাভ করিয়া নরেন্দ্রনাথ দশ বৎসর পরে শস্য-শ্যামলা জন্মভূমির স্নেহ-শীতল অঙ্কে ফিরিয়া আসিলেন। ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি সুদূর প্রয়াগে আপনার কর্ম্মক্ষেত্র মনোনীত করেন। প্রবাস যাত্রা কালে সঙ্গে ছিলেন—পত্নী সুকুমারী ও দুই বৎসরের মিনু। দেশে ফিরিবার সময়, মা ষষ্ঠীর আশীর্ব্বাদে নরেন্দ্রনাথ আরও তিনটি কন্যা রত্ন লাভ করিয়াছিলেন। দুই বৎসরের মিনু তখন দ্বাদশীর শশিকলা। গৃহিণী পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিয়া ছিলেন, তাহাকে পাত্রস্থ না করিলে নহে। বিংশ শতাব্দীর ঔদারনীতিক হইলেও নরেন্দ্রনাথ গৃহিণীর তাড়না উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। তাই পাত্রের সন্ধানে দেশে ফিরিয়াছিলেন।

কিন্তু মনের মত সুপাত্র সহজে মিলিল না। কন্যার রূপ ছিল, নরেন্দ্র নাথেরও অর্থাভাব ছিল না, তথাপি বর জুটিল না। যদিও বর জুটিল, ঘর মিলিল না। ঘর ও বর যদিও জুটিল, স্নেহলতার আত্মবিসর্জ্জনের কাহিনী পাঠ করিয়াও বাঙ্গালী পণের মায়া ত্যাগ করিতে সম্মত নহে। কায়স্থ সভায় বড় গলা করিয়া বক্তৃতা দিয়া যাঁহারা সর্ব্বাগ্রে নাম সহি করেন, তাঁহাদেরই ক্ষুধার জ্বালা বেশী। বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপরাশ-ধারী পুত্রগণকে তাঁহারা বিনা পণে ছাড়িয়া দিতে চাহেন না। নানা অজুহাতে তাঁহারা মেয়ের বাপের রক্ত শোষণ করিয়া তবে পুত্রের বিবাহ দেন। তাহার বিস্তৃত ইতিহাস বাঙ্গালা দেশের ঘরে ঘরে পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এই ভীষণ 'কেনা বেচা'র যুগে নরেন্দ্রনাথ বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। কন্যাকে যথেষ্ট যৌতুক দিবার ইচ্ছা ও সামর্থ্য তাঁহার ছিল, কিন্তু পণ দিয়া কন্যার বিবাহ দিবার ইচ্ছা তাঁহার আদৌ ছিল না। পণ প্রথার উপর তিনি হাড়ে চটা ছিলেন। তিনি স্বয়ং বিনা পণে সুকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। পৈতৃক অর্থে তিনি সুখে ও ভোগ-বিলাসে কালযাপন করিতে পারিতেন। কিন্তু পরের উপার্জ্জিত অর্থে

জীবন-যাপনকে তিনি দুর্ভাগ্য ও অক্ষমতার পরিচায়ক বলিয়া মনে করিতেন। তিনি এরূপ অলস ব্যক্তিকে, পরমুখাপেক্ষীকে কখনও ক্ষমা করিতে পারিতেন না। তাই তিনি বিপুল বিত্ত-বিভবের অধীশ্বর হইয়াও বিদেশে অর্থোপার্জ্জন দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে গিয়াছিলেন। দেশে থাকিলে পাছে ঐশ্বর্য্যভোগের প্রবল প্রলোভনে মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন করিতে হয় এই আশঙ্কায় তিনি পৈতৃক অর্থের সাহায্য না লইয়াই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কাহারও নিষেধ মানেন নাই, বা উপদেশ গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার সাধু সংকল্প সার্থক হইয়াছিল। কমলাসনা ইন্দিরা দুই হস্তে অজস্র ধন-রত্ন তাঁহার শিরে বর্ষণ করিয়াছিলেন।

অনুসন্ধান করিতে করিতে এক বৎসর চলিয়া গেল; কিন্তু মনের মত পাত্র মিলিল না। নরেন্দ্রনাথ সমাজের উপর ক্রমশঃ বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী ও নির্ধন সকলেরই মুখে একই কথা—পণ দাও। ফেল কড়ি মাখ তেল। এত বড় কায়স্থ সমাজের মধ্যে এমন একটি সু-পাত্র মিলিল না যে, বিনা পণে তাঁহার কন্যার পাণি গ্রহণে অগ্রসর হয়! পণ না দিলেও তিনি বস্ত্রাভরণ ও কন্যার যৌতুক স্বরূপ এত অর্থ দিতে উৎসুক যে তাহাতে পাত্র পক্ষের ক্ষোভের কোনও কারণ থাকিবে না। তথাপি ছাই পণের প্রলোভন কেহই ত্যাগ করিতে সম্মত নয়! নরেন্দ্রনাথের চিত্ত অত্যন্ত কঠোর ও বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। যদি তাঁহার শক্তি থাকিত তাহা হইলে সমাজের এই কাঠামো খানিকে তিনি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু হিন্দুর সমাজ শত ভাঙ্গনের জীর্ণ স্মৃতি বুকে ধরিয়াও অটল অচল ভাবে রহিয়াছে, তাহাকে ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে এমন শক্তিধর পুরুষ এখনও বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই।

নরেন্দ্রনাথ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, পণ দিয়া তিনি কখনই মেয়ের বিবাহ দিবেন না। সংকল্প সাধু হইলেও মেয়ের বাপের পক্ষে এরূপ সংকল্প যে বালির বাঁধের ন্যায় দুর্ব্বল, প্রয়োজনের কূলপ্লাবী তীব্রস্রোতে সে বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, বোধ হয়, তিনি পূর্ব্বে ততটা ভাবিয়া দেখেন নাই। কিন্তু যতই সময় যাইতে লাগিল নরেন্দ্রনাথ প্রতিজ্ঞা রক্ষা সম্বন্ধে ততই সন্দিহান হইলেন। কোনও সুপাত্র তাঁহাকে বিনা পণে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিল না। সম্ভবতঃ তাঁহার আর্থিক অবস্থার পরিচয় পাইয়া পাত্রের পিতা বা অভিভাবকেরা বুঝিয়াছিলেন, রীতিমত মূল্য পরিণামে তাঁহাদের হস্তগত হইবেই। সুতরাং তাঁহারা খুব চড়াদরেই মূল্য হাঁকিতে ছিলেন।

(২)

গৃহদেবতার সন্ধ্যা পূজার যোগাড় করিয়া দিয়া সুকুমারী বারাণ্ডায় আসিয়া বসিয়াছিলেন এমন সময়ে নরেন্দ্রনাথের ভাগিনেয় প্রবোধ ডাকিল, "মামীমা !"

প্রবোধ মাতুলালয়েই লালিত পালিত। নরেন্দ্রনাথ তাহাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন।

অসময়ে তাহাকে বাড়ীতে দেখিয়া মাতুলানী বলিলেন, "তুমি বেড়াইতে যাও নাই প্রবোধ ?"

"না মামীমা ! একটা কথা আছে; কিন্তু সেটা এখন কাকেও বলিতে পারিবেন না। এমন কি মামা বাবুও যেন জানিতে না পারেন।"

সুকুমারী বলিলেন, "কি কথা, বাবা !"

প্রবোধ একবার চারিদিকে চাহিল, দেখিল কেহ কোথাও নাই। তখন সে মৃদুস্বরে বলিল, "একটা খুব ভাল সম্বন্ধ আছে। যদি হয় ত মিনু বড় সুখে থাকিবে।"

মাতুলানী সাগ্রহে বলিলেন, "কোথায় ?"

"তাদের বাড়ী এই কলিকাতায়। ছেলেটি আমাদের সঙ্গেই এম্ এ পড়ে। বেশ বড়লোক, স্বভাব চরিত্র খুব ভাল, দেখ্‌তেও চমৎকার।"

সুকুমারী বলিলেন, "পণ চাইবে ত ? তাহ'লে কি ক'রে হবে ? তোমার মামাবাবু তা'তে ত রাজী হবেন না।"

প্রবোধ বলিল, "সে পরের কথা। আগে আমি গোপনে একবার মিনুকে দেখিয়ে দেব। ছেলের পছন্দ হলেই বাপ শেষে ছেলের মতে সায় দেবেন। তখন ঠিক সব হয়ে যাবে।"

সুকুমারী নীরবে কি চিন্তা করিলেন, তারপর বলিলেন, "কিন্তু বাবু যদি জান্‌তে পারেন ?"

সোৎসাহে প্রবোধ বলিলেন, "মামাবাবু কেমন ক'রে জান্‌বেন ? দেখ্‌বেন্ আমার বন্ধু সে আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে আস্‌বে, সেই সময় কোন কৌশলে মিনুকে আমার ঘরে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দেব। কাল মল্লিকদের বাড়ী মামাবাবুর নিমন্ত্রণ আছে। সমস্ত দিন তিনি বাড়ী থাকিবেন না। মিনুও কিছুই বুঝ্‌তে পারবেনা। বাড়ীর আর কেউ না জান্‌তে পার্‌লেই হ'ল। শুধু আমি ও আপনি জান্‌লুম। পাত্রটি বড় ভাল। এ সুযোগ হাত ছাড়া করা ঠিক নয়।"

সুকুমারী স্বামীকে লুকাইয়া জীবনে কোনও কাজ করেন নাই। তাঁহাকে না জানাইয়া মেয়ে দেখাইতে প্রথমতঃ তাঁহার ইচ্ছা হইল না। কিন্তু প্রবোধের যুক্তি তর্ক ও কন্যার ভাবী মঙ্গল কামনা অবশেষে তাঁহার হৃদয়ে ভাবান্তর ঘটাইল। এত কাল চেষ্টা করিয়াও মনের মতন একটি সুপাত্র পাওয়া যায় নাই। প্রবোধ যে পাত্রের কথা বলিতেছে তাহার মত যোগ্যপাত্র সহজে মিলিবার সম্ভাবনা কোথায়? বিশেষতঃ এরূপভাবে গোপনে কন্যা দেখাইতে আপত্তিই বা কি? কোনও দোষের কাজত নয়।

সুকুমারী প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলেন না। প্রবোধের প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন।

(৩)

দাদা ডাকিলেন, "মিনু গোটা কয়েক পান নিয়ে আয়ত।"

সরলা কিশোরী গুপ্তষড়যন্ত্রের কোনও সংবাদই রাখিত না। সে পানের ডিবা হস্তে আলুলায়িত কেশে দাদার বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল। টেবিলের উপর পানের ডিবা রাখিতে গিয়া সে চাহিয়া দেখিল, অদূরে আর এক ব্যক্তি বসিয়া আছেন। অপরিচিত যুবককে দাদার সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতে দেখিয়া মিনুর মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। কি লজ্জা! এখানে অন্যলোক থাকিতেও দাদা তাহাকে ডাকিয়াছেন!

মিনু চঞ্চল চরণে পলায়নের উপক্রম করিল। তখন প্রবোধ বলিল, "লজ্জা কি মিনু দিদি! ইনি আমার বিশেষ বন্ধু। ঐ বাঁধান বইখানি আমায় দিয়া যাওত বোন্!"

বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে হইলেও মিনু আজন্ম পশ্চিমাঞ্চলে ছিল; কাজেই বাঙ্গালার কিশোরীদিগের ন্যায় অল্প বয়সেই সে বেশী বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া থাকিয়া উঠে নাই। বয়োধর্ম্মানুসারে লজ্জার সঞ্চার হইলেও বঙ্গবালার ন্যায় অতিরিক্ত কুণ্ঠাবোধ তাহার ছিলনা।

নতশিরে সে দাদার আদেশ প্রতিপালন করিল।

দেবেন্দ্র আগ্রহভরে কিশোরীকে দেখিতেছিল। মিনুরাণীর স্থির সৌদামিনী-তুল্য বর্ণপ্রভা নব-বসন্ত-সমাগম-প্রফুল্ল দেহলতায় সৌন্দর্য্যসুষমা ও সলজ্জগমন-ভঙ্গী দর্শনে সে কি মুগ্ধ হইয়াছিল?

দাদার আদেশ পালন করিবার পর মিনুরাণী মন্থরগমনে চলিয়া গেল।

কপাটের ছিদ্রপথে সুকুমারী দেবেন্দ্রকে দেখিতেছিল। প্রবোধের কথাই

ঠিক। অতি সুন্দর চেহারা—কার্ত্তিকের মত রূপবান্! এই পাত্রের সহিত মিনুর বিবাহ দিতেই হইবে। যদি পণ দিতেও হয় তাহাতে তিনি নরেন্দ্রনাথকে বাধ্য করিবার চেষ্টা করিবেন। হে ভগবান্! সুকুমারীর এ প্রার্থনা কি পূর্ণ হইবে না?

দেবেন্দ্রকে মৌনী দেখিয়া প্রবোধ বলিল, "কি ভাবিতেছ ভাই?"

দেবেন্দ্রের নয়নে একটী আলোক-দীপ্তি উজ্জল হইয়া উঠিয়াছিল। সে বলিল, "এ মেয়েটি কে?"

প্রবোধ উপেক্ষাভরে বলিল, "মিনুরাণী? ও আমার মামাত বোন্।"

দেবেন্দ্র চঞ্চল ভাবে বলিল, "কোথায় বিবাহ হইয়াছে?"

উত্তরের উপর দেবেন্দ্রের সর্ব্বস্ব যেন নির্ভর করিতেছিল এমনই একটা ভাব যুবকের আননে প্রতিফলিত হইল।

প্রবোধ সেক্সপীয়রের পাতা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে বলিল, "না এখনও বিয়ে হয় নাই। একটা ভাল পাত্র দেখে দিতে পার?"

দেবেন্দ্র কিয়ৎকাল নীরবে থাকিয়া বলিল, "ভাই, তুমি হাসিও না। একটা কথা বলিব। ছেলে মানুষী মনে করিও না। আমি প্রায় সাতবৎসর পূর্ব্বে স্বপ্নে ঠিক তোমার ভগিনীর মত অবিকল একটি মেয়ে দেখেছিলুম্। তোমার বিশ্বাস হবে কি না জানিনা, কিন্তু সে মেয়েটির মুখ আমি কখনও ভুলিতে পারি নাই। মেয়েটি কি বলিয়াছিল জান? তার সঙ্গে আমার বিবাহ হবে। বাস্তবিক, তুমি রমেশ ও ধীরেনকে জিজ্ঞাসা করিও তাদের সেই সময়েই আমি স্বপ্নের কথা বলিয়াছিলাম।"

প্রবোধ বিস্মিতভাবে দেবেন্দ্রের পানে চাহিল। সে কৌশল করিয়া দেবেন্দ্রের নিকট মিনুরাণীকে দেখাইয়া উভয়ের বিবাহের সুবিধা করিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু তাহার বহুপূর্ব্ব হইতেই ভবিতব্যতার ইন্দ্রজালে দেবেন্দ্র যে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে ইহা কে ভাবিয়াছিল! বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুগে এমন কথা কে বিশ্বাস করে? স্বপ্নের মধ্য দিয়াও এত বড় বৃহৎ ব্যাপারের পূর্ব্বাভাষ পাওয়া যায় ইহা যে কল্পনারও অতীত!

বন্ধুযুগল কিয়ৎকাল নীরবে বসিয়া রহিল। তারপর সহসা ঈষৎ উত্তেজিত ভাবে দেবেন্দ্র বলিল, "তোমার মামাতভগিনীর সহিত আমার বিবাহ কি অসম্ভব?"

প্রবোধ একদিনেই এতটা প্রত্যাশা করে নাই। সে চমকিয়া উঠিল, তার পর বলিল, "আমাদের সে সৌভাগ্য কি হইবে?"

দেবেন্দ্র গাঢ়স্বরে বলিল, "আমি স্বপ্ন দেখিবার পর প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, এইরূপ কন্যা না পাইলে বিবাহ করিব না। এখন তোমাদের হস্তে আমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।"

প্রবোধ হাসিয়া বলিল, "সেক্ষপীয়র মিথ্যা বলেন নাই, 'প্রথমদর্শনেই প্রেম!' আচ্ছা দেখা যাক্ প্রজাপতির কি অভিপ্রায়। এখন চল একবার গোলদিঘীর ধারে বেড়িয়ে আসি।"

(৪)

প্রবোধের চেষ্টা ও যত্নে দেবেন্দ্রের পিতা হরনাথ বসুর নিকট নরেন্দ্রনাথ কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। ভিতরের কথা উভয়ের কেহই জানিতেন না। উভয়পক্ষ হইতে প্রকাশ্যভাবে কন্যা ও পাত্র দেখার প্রথম অভিনয় সমাপ্ত হইল। মেয়ে দেখিয়া বৃদ্ধ হরনাথ সন্তুষ্ট হইলেন। নরেন্দ্রনাথও পাত্রের সমুদয় পরিচয় পাইয়া সুখী হইলেন। এরূপ পাত্রে কন্যাদান সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আসল কথাটা—অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের কষ্টিপাথরে ঘসা খাঁটি সোনারূপ পুত্ররত্নকে বিনা পণে বসু মহাশয় বিবাহের বাজারে হাতছাড়া করিবেন না—এই কথাটা যখন নরেন্দ্রনাথ শুনিলেন, তখন সে পাত্রের আশা তিনি ত্যাগ করিলেন।

সেদিন পূর্ণিমা। ফাল্গুনের নির্ম্মল আকাশ জ্যোৎস্নাতরঙ্গে ভাসিতেছিল। সুকুমারী ও নরেন্দ্রনাথ ছাদের উপর মাদুর পাতিয়া বসিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথের মুখমণ্ডল গম্ভীর, সুকুমারী খিবণ্ণা।

ছাদের উপর নানাবিধ ফুলগাছের টব সযত্নবিন্যস্ত। আলিসার উপরও অসংখ্য ফুলগাছ। অদূরে সেই পুষ্পোদ্যানের মধ্যে মিনুরাণীও চুপ করিয়া বসিয়াছিল। প্রথম ফাল্গুনের স্নিগ্ধ মধুর বসন্তপবনের ন্যায় তাহার দেহে নবযৌবনের প্রথম হিল্লোল তরঙ্গিত হইয়া উঠিতেছিল। মাতা কন্যার দিকে চাহিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

নরেন্দ্রনাথ নিমীলিত নেত্রে ধূমপান করিতেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারও হৃদয়ে ঠিক অনুরূপ চিন্তার উদ্রেক যে হয় নাই তাহা বলা যায় না। সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় একই চিন্তা তাঁহারও চিত্তে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। মিনুর বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর হইতে চলিল, আর উপেক্ষা করা সাজে না। সেই

পুষ্পিত হইয়া উঠিলে মনও পল্লবিত হইয়া উঠে। তখন কল্পনার নিকুঞ্জবনে চিত্ত কেবলই স্বপ্ন ও গানের ধ্যান করিতে থাকে, এ কথাটা বৈজ্ঞানিক হিসাবেও সত্য। যাহা সত্য তাহাকে অস্বীকার করিবে কে? দেহের যেমন ক্ষুধা বোধ আছে, মনেরও সেইরূপ নহে কি? সুতরাং—

কিন্তু তাই বলিয়া কশাইয়ের গৃহে কন্যাদান করা যাইতে পারে না। মনের এইরূপ দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়াই ত হিন্দুসমাজে নানাবিধ অনাচার প্রবেশ করিয়াছে। ভবিষ্যতের দিকে কেহ চাহিয়া কাজ করে না। শুধু বর্ত্তমানের কাছে মাথা নত করিয়া চলিয়া যায়। নরেন্দ্রনাথও কি এতদিন পরে সেই দলে মিশিবেন? যদি তাই হয় তবে এতদিন এ প্রহসনের অভিনয় করিয়া কি ফল হইল? শুধু লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হওয়া বইত নয়!

নরেন্দ্রনাথ অভিনিবেশ সহকারে ধূমপান করিতে লাগিলেন। না, তিনি আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিবেন। বিনা পণে কেহ তাঁহার কন্যার পাণিপ্রার্থী হয় কি না তাহা তাঁহাকে দেখিতেই হইবে।

বহুক্ষণ নীরবে থাকিয়া সুকুমারী চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তিনি আজ স্বামীকে কন্যার বিবাহের জন্য বিশেষ রূপে পীড়াপীড়ি করিবেন সংকল্প করিয়া ছিলেন। কিন্তু মিনুর সাক্ষাতে কোন কথা বলা চলে না।

সহসা তিনি বলিলেন, "মিনু মা, নীচে গিয়ে গোটা কয়েক পান ভাল করে সেজে আনত। বেশী করে নিয়ে এস।" সঞ্চারিণী লতার ন্যায় মিনু নীচে নামিয়া গেল।

সুকুমারী বলিলেন, "তুমি কি মেয়েকে ঘরে রেখে দেবে বলে ঠিক করেছ, বিয়ে দেবে না?"

নরেন্দ্রনাথ গড়গড়ার নলটা বামহস্তে লইয়া বলিলেন, "এ প্রশ্নের ত বিরাম নাই, দিন রাত্রির মধ্যে অন্ততঃ দশবার ঐ একুই কথা শুনে আসছি। ওটা কি আর পুরাণো হবে না?"

সুকুমারী দৃঢ় স্বরে গম্ভীর ভাবে বলিলেন, 'ঠাট্টা নয়। দেখছ না মেয়ে দিনদিন কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে? দোষ শুধু তোমার। তুমি নিজের জেদ বজায় রাখতে গিয়ে মেয়ের সুখ দুঃখে উদাসীন হয়ে আছ। মেয়ে ত আর এখন ছোটটি নাই! আর ইট পাথরের তৈয়ারী নয় যে প্রাণ বা মন ব'লে কোন পদার্থ তার নেই! তারও বুঝবার বয়স হয়েছে সে হিসাব রাখ কি?"

কথাটা বড় তীব্র। নরেন্দ্রনাথ আহত হইলেন। সত্যই ত তিনি নিজের

জেদ বজায় রাখিতে গিয়া কন্যার মনের অবস্থার দিকে একবারও লক্ষ্য করেন নাই। যৌবনের প্রথম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই যে নরনারীর চিত্ত সঙ্গ-লাভের আশায় উন্মুখ হইয়া উঠে সে কথাটা প্রৌঢ়ের চিত্তে সত্যই ত উদিত হয় না। যাহার ক্ষুধা সর্ব্বদাই পরিতৃপ্ত সে কি বুভুক্ষুর অনশন যন্ত্রণার তীব্রতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে? ধনী কি দরিদ্রের অভাব বুঝে? বাস্তবিক এ কথাটা নরেন্দ্রনাথ পূর্ব্বে একবারও আলোচনা করেন নাই।

তিনি সোজাভাবে বসিয়া বলিলেন, "তা তুমি কি করিতে বল?"

"হরনাথ বসুর ছেলের সঙ্গে আমার মিনুর বিয়ে দাও। মেয়ে আমার সুখে থাকিবে। এমন সর্ব্ব-গুণ-যুক্ত পাত্র আর পাবে না। তা ছাড়া একটা কথা আজ তোমায় বল্‌বো। এতদিন তোমার কাছে লুকিয়ে রেখেছিলাম, আর পার্‌ছি না। ছেলে গোপনে মিনুকে দেখে পছন্দ করেছে। শুধু পছন্দ করা নয়, বলেছে মিনুর সঙ্গে তার বিয়ে না হলে আজীবন সে বিবাহ করিবে না। যদি দরকার হয় বাপের অমতেও সে বিয়ে কর্‌তে রাজি আছে। একবার নয় সে তিন চার বার মিনুকে গোপনে দেখে গিয়েছে। আমারও তার উপর কেমন একটা স্নেহ পড়েছে।"

নরেন্দ্রনাথ আকাশ হইতে পড়িলেন। এত বড় গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে, অথচ তিনি তাহার কোন সংবাদই পান নাই! গম্ভীরভাবে তিনি বলিলেন, "এ সব কবে হলো?"

সুকুমারী তখন আদ্যোপান্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। দেবেন্দ্রের স্বপ্ন বিবরণ পর্য্যন্ত, প্রবোধের নিকট যেমন শুনিয়াছিলেন সমস্তই স্বামীর নিকট প্রকাশ করিলেন। মাঝে মাঝে প্রবোধের সহিত দেখা করিতে আসিবার ছল করিয়া মিনু রাণীকে সে দেখিয়া গিয়াছে, আত্মীয়তার অজুহাতে নানাবিধ দ্রব্যাদিও পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এখন সে পাত্রকে কি হাতছাড়া করা সম্ভব?

নরেন্দ্রনাথ নীরবে কি চিন্তা করিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। কিয়ৎকাল চিন্তার পর তিনি বলিলেন, "সুকুমারি! বিবাহের পর এ পর্য্যন্ত একদিনও তোমায় তিরস্কার করি নাই; কিন্তু আমার অগোচরে তুমি অত্যন্ত অবিবেচনার কাজ করিয়াছ; এরূপ ভাবে মেয়ে দেখাইয়া তুমি গুরুতর অন্যায় করিয়াছ। সেজন্য আজ তোমায় তিরস্কার না করিয়া পারিলাম না। আমাদের মেয়ে নিতান্ত ছোট নয়। যদিও জানি, বাঙ্গালীর ঘরের

মেয়ে প্রথম দর্শনে প্রেমে পড়ে না; সে সব ঔপন্যাসিকের গাঁজাখুরী; কিন্তু এটা তোমার ভাবা উচিত ছিল যে, যদি একবার দাগ বসিয়া যায় তখন সমস্ত জীবনেও তাহার চিহ্ন মুছিয়া ফেলা সম্ভব হয় না। একবার নয়—বহুবার এরূপ পরস্পরের দর্শনে অনর্থ না ঘটিলেও কন্যার চিত্তে ভাবান্তর উপস্থিত হওয়া বিচিত্র নহে। বাস্তবিক তুমি বড়ই অন্যায় কাজ করিয়াছ। আর এক কথা, তুমি ত আমায় জান। যদি কোনও পুত্র পিতামাতার অনভিমতে বিবাহ করিতে সম্মত হয়, আমি কখনই সেরূপ পাত্রে কন্যা সম্প্রদানের পক্ষপাতী নহি; কারণ তাহাতে পিতামাতাও সুখী হয় না, পুত্রও তাঁহাদের ক্ষমা না পাইলে চির-জীবন অশান্তির বোঝা বহিয়া বেড়ায়। সুতরাং সেরূপ কার্য্যের প্রশ্রয় আমি দিতে পারিব না। আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় হউক, তবু পুত্র পিতৃদ্রোহী হয় এরূপ কার্য্যের প্রশ্রয় দিব না।"

সুকুমারী বস্ত্রাঞ্চল গলায় জড়াইয়া বলিলেন, "আমার অপরাধ ক্ষমা কর। না বুঝিয়া, মেয়ের সুখের কথা ভাবিয়াই আমি এ কাজ করিয়াছি। বল, তুমি মার্জ্জনা করিলে?"

নরেন্দ্রনাথ সহাস্যে বলিলেন, "রাগ করি নাই সুকু। তোমার বিবেচনার দোষ দিতেছিলাম। যাক্, এখন যদি সম্ভব হয়, সর্ব্বস্ব দিয়াও ঐ পাত্রে মিনুর বিবাহ দিব।"

দূরে মিনুরাণীর ছায়ামূর্ত্তি দেখা গেল। উভয়ে নীরব হইলেন। মিনু পানের ডিবা পিতার সম্মুখে রাখিল। নরেন্দ্রনাথ সস্নেহে কন্যাকে পার্শ্বে বসাইয়া তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন।

অকস্মাৎ পিতার স্নেহের উৎস উচ্ছ্বসিত হইতে দেখিয়া মিনুরাণী বিস্মিত হইল, কিন্তু পিতার স্নেহ-স্পর্শ-সুখে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু ভরিয়া উঠিল।

(৫)

ঘনায়িত তাম্রকূট ধূমে কক্ষতল আচ্ছন্নপ্রায়। আসরও বেশ জমিয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ সমাগত ভদ্রলোকদিগের অভ্যর্থনায় ব্যস্ত।

বৃদ্ধ হরনাথ বসু তাঁহার বিপুল দেহভার তাকিয়ার উপর ন্যস্ত করিয়া গড়গড়ায় ধূমপান করিতেছিলেন।

সালঙ্কারা মিনুরাণী সভাস্থলে নীত হইল। তাহার সুগৌর মুখমণ্ডল লজ্জা ও সঙ্কোচে এক বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছিল। সভাস্থ সকলেই কন্যা দর্শনে আনন্দিত হইলেন। বৃদ্ধ হরনাথ সতৃষ্ণনয়নে দেখিলেন অলঙ্কারাদি।

বেশ ভারী ভারী। তাঁহার চিত্ত উৎফুল্ল হইল, কিন্তু গহনাগুলি কাহারও জননীর নয়ত? আজ কাল যে দিন পড়িয়াছে, তাহাতে মাতার অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া বিবাহযোগ্যা কন্যা দেখান বিচিত্র নয়।

যথারীতি আশীর্ব্বাদ হইয়া গেল। গলাটা কাসিয়া পরিষ্কার করিয়া লইয়া বসুমহাশয় বলিলেন; "তাহ'লে, বেহাই, আমার সমস্ত প্রস্তাবে রাজি আছেন ত?"

নরেন্দ্রনাথ বিনম্রস্বরে বলিলেন, "যখন কথা দিয়াছি তখন অবশ্যই পালন করিব।"

হরনাথ বাবুর ইঙ্গিত ক্রমে তাঁহার শ্যালক মিত্র মহাশয় বলিলেন, "তবে এই সভায় একবার ফর্দ্দটা পাঠ করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না, কি বলেন নরেন বাবু?"

নরেন্দ্রনাথের হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে চাহিল; কিন্তু যখন স্বেচ্ছায় তিনি এ কার্য্যে নামিয়াছেন তখন প্রবৃত্তির উত্তেজনায় ভুলিলে চলিবে কেন? তিনি মানসিক চাঞ্চল্য দমন করিয়া বলিলেন, "পড়ুন।"

বিবাহের অঙ্গীকার পত্রের অন্যান্য অংশ পাঠ করিবার পর মিত্র মহাশয় পড়িলেন, "আর প্রকাশ থাকে যে, আমি জামাতাকে পণ স্বরূপ নগদ দশহাজার এক মুদ্রা অর্পণ করিব। বরাভরণ, হীরার আংটী মূল্য অন্যূন দুইশত মুদ্রা; ম্যাকেবের বাড়ীর সোণার ঘড়ী; দশ ভরির চেন; এ সকলত দিবই পরন্তু মেহগনিকাঠের খাট, তদুপযোগী সাটিন ও মখমলের শয্যা, হারমোনিয়ম, বাইসিকেল প্রভৃতি অন্যূন দুই সহস্র মুদ্রার বর সজ্জা দিতে বাধ্য রহিলাম। কন্যার অলঙ্কারাদি যথাসাধ্য দিব, তবে সর্ব্ব সাকুল্যে, কন্যার অলঙ্কার স্বর্ণ দুইশত ভরি ও তদুপযুক্ত মণিমুক্তা দিতে অঙ্গীকৃত রহিলাম। নিম্নে প্রত্যেক দ্রব্যের তালিকা প্রদত্ত হইল। এতদতিরিক্ত কোনও বিষয়ে দাবী দাওয়া করিলে আমি তাহাতে বাধ্য থাকিবনা। বিবাহ সভায় দশজন ভদ্রলোকের সাক্ষাতে আমি স্বেচ্ছায় এই বিবাহের অঙ্গীকার পত্রে সহি করিয়া দিলাম, ইতি।"

নরেন্দ্রনাথের ললাট ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অতি কষ্টে তিনি আত্মসংবরণ করিয়া রহিলেন।

কন্যাপক্ষের অনেক কলেজের ছাত্র বলিয়া উঠিল, "মুসাবিদাটা কি বসু মহাশয়ের নিজের না কোন উকীলের?"

শেষ পরিণাম বুঝিতে বসু মহাশয় চিন্তাযুক্ত; তিনি হাসিয়া বলিলেন, "বাপু, আগে আমার মত বয়স হউক, সংসারের মজা আগে টের পাও তখন বুঝিতে পারিবে।"

মিত্রমহাশয় বলিলেন, "নরেন বাবু, ফর্দ্দের নিম্নে আপনি একটা সহি করিয়া দিন, তাহ'লেই কাজ শেষ হয়।"

যন্ত্রচালিতবৎ নরেন্দ্র সহি করিয়া দিলেন।

এমন সময় কেহ কক্ষমধ্যে সশব্দে প্রবেশ করিলেন।

নরেন্দ্রনাথ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "এই যে সুরেশ, তুমি কখন এলে?"

বন্ধুর করমর্দ্দন করিয়া সুরেশ বলিলেন, "ঘণ্টা খানেক হ'ল দেশ থেকে এসেছি। এসেই তোমার পত্র পেলাম। মিনুরাণীর পাকা দেখা, আর কি, দেরি করা যায়, ধূলা পায়েই চলে এসেছি। সব ঠিক হয়ে গেল?"

নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "হ্যাঁ, এই ফর্দ্দ দেখ।"

ফর্দ্দ? সুরেশচন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন। তিনি নরেন্দ্রের বাল্য-সুহৃদ্, সহপাঠী এবং একই মতের উপাসক। নরেন্দ্রের ন্যায় পণ-প্রথার উপর তাঁহার বিজাতীয় ঘৃণা। দীর্ঘ তালিকা দেখিয়াই সুরেশচন্দ্রের সদানন্দ মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল। বন্ধুকে গৃহান্তরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া তিনি বলিলেন, "একি করেছ, নরেন? তোমার এমন মতিচ্ছন্ন হইল কেন?"

নরেন্দ্রনাথ মৃদুস্বরে বলিলেন, "কি করিব বল উপায় নাই। ছেলেটি সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্র। সংস্থানও বেশ আছে। এর চেয়ে ভাল পাত্র কোথায় পাব, ভাই?"

সুরেশ উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, "বাপ্ যে ঘোর চামার! এমন লোকের সঙ্গে কাজ করে! আমায় আগে বল নাই কেন?"

"বলিলে কি হইত বল। এ পাত্র ছাড়া গত্যন্তর নাই।" এই বলিয়া নরেন্দ্রনাথ সংক্ষেপে সমস্ত ইতিহাস বলিলেন। দেবেন্দ্র মিনুরাণীকে বিবাহ করিবার জন্য এরূপ ব্যস্ত যে, প্রয়োজন হইলে সে পিতার অনভিমতে বিনা পণে একার্য্যে অগ্রসর হইতে উদ্যত। বাড়ীর গৃহিণীও দেবেন্দ্রের অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন। কাজেই সকল দিক রক্ষা করিতে গিয়া নরেন্দ্রনাথকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে হইয়াছে।

সুরেশচন্দ্র সমস্ত ঘটনা শুনিয়া বলিলেন, "গোড়ায় যদি আমায় বলিতে, তাহ'লে হইলে এতটা বাড়াবাড়ি হইতে পারিত না। বুড়াকে কিছু শিক্ষাও

দেওয়া যাইত। যাক, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এখন ভাই, বসু মহাশয়ের জ্ঞাননেত্র উন্মীলনের জন্ম আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব। মিনুমার বিবাহ, একার্য্য আমারই, আজ হইতে বাকি যা কিছু সমস্তই আমি করিব, তুমি কোন কথা কহিও না। বুঝিয়াছ?"

নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'দাওনা ভাই, আমায় অব্যাহতি। এসব কাজ আমার নয়, তোমার, তুমি যা বলিবে তাই আমি করিব।"

"বস্, তবে এখন এসো।"

উভয়ে সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সুরেশচন্দ্র সহাস্যে বলিলেন, "বোস্‌জা মহাশয়, আপনার ফর্দ্দে কোন ত্রুটী নাই। বেশ হইয়াছে। তবে ইহার একটা নকল আমাদের দিন। কারণ সমস্ত মনে করিয়া রাখা অসম্ভব। আপনি ফর্দ্দমত সমস্ত জিনিস বুঝিয়া লইবেন।"

একগাল হাসিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "অতি উত্তম প্রস্তাব, খুব সঙ্গত কথা। বোধ হয় আর একখানা অনুরূপ ফর্দ্দ সঙ্গেই আছে, না হে মিত্রমশায়?"

শ্যালক বলিলেন "হ্যাঁ আছে। এই নিন্।"

সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "ফর্দ্দের নীচে একটা সহি করিয়া দিলে ভাল হয়। কারণ সেটা দরকার।"

বসুমহাশয়ের কোনও আপত্তি ছিলনা। তিনি স্বাক্ষর করিয়া দিলেন।

তারপর পান ভোজনে আপ্যায়িত হইয়া পাত্রপক্ষ আনন্দিত মনে বিদায় হইলেন।

(৬)

সম্মুখে অগণিত দীপমালা, আলোক স্তম্ভ চলিয়াছে। ব্যাণ্ডের বিচিত্র বাদ্যে রাজপথ মুখরিত। চতুর্দ্দোলে বর, পশ্চাতে শকটশ্রেণী। ল্যাণ্ডো, ফিটন, ক্রহাম, মোটর ও ভাড়াটিয়া গাড়ী পরে পরে চলিয়াছে। খুব জমকাল বিবাহ —আনন্দোৎসবে মাতিয়া শোভা যাত্রা রাজপথ অতিক্রম করিয়া গলিপথে প্রবেশ করিল।

সহসা কেহ বলিল, "আর কতদূর? মেয়ের বাড়ী কই?"

বাস্তবিক সে গলির মধ্যে দীপালোকিত কোনও বিবাহ বাটী দেখা যাইতেছিল না। শুধু দূরে দূরে সরকারী গ্যাসপোষ্ট মাথা খাড়া করিয়া দীপরশ্মি

বিকীর্ণ করিতেছিল। পথিপার্শ্বস্থ অট্টালিকা সমূহের বাতায়ন পথে অন্তঃপুর চারিণীদিগের কৌতূহল নেত্র শোভাযাত্রার পানে চাহিয়াছিল।

পথ প্রায় শেষ হইয়া আসিল, তথাপি উদ্দিষ্ট ভবন কাহারও দৃষ্টিগোচর হইল না। তখন বাদকদল থমকিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তাহারা কোন্ পথে যাইবে।"

চতুর্দ্দোলের পশ্চাতের ফিটনে বরকর্ত্তা প্রভৃতি ছিলেন। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "থামিলে কেন? আগে চল।"

বরযাত্রীদিগের মধ্যে একজন বলিলেন, "রাস্তা ভুল হয় নাই ত? গলি শেষ হইয়া আসিল, কণের বাড়ী ত এ রাস্তায় দেখা যাচ্ছে না।"

তখন বড় গোল বাধিল। বর কর্ত্তা গাড়ী হইতে নামিলেন, তাঁহার শ্যালকও অবতীর্ণ হইলেন। মেয়ের বাড়ী,তাঁহারা ছাড়া উপস্থিত আর কেহ চিনিতেন না।

বসু মহাশয় বিপুল দেহভার লইয়া পদব্রজে অগ্রসর হইয়া একবার চারি-দিকে চাহিলেন, তার পর বলিলেন, "এই ত রামধন মিত্রের গলি! ঐ ত সাম্‌নের বাড়ী নরেন বাবুর। চল, চল।"

কিন্তু একি? সে অট্টালিকা এমন অন্ধকারাচ্ছন্ন কেন? বিবাহ উৎসবের কোনও চিহ্নই ত দেখা যাইতেছে না! তবে কি সত্যই পথ ভুল হইয়াছে? অসম্ভব। এইত সেই পথ; রামধন মিত্রের গলি যে তাঁহার চিরপরিচিত; আর তাঁহার ভাবী বৈবাহিকের বাড়ীর ফটক ত স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। না— ভ্রম কখনই হয় নাই। কিন্তু এ প্রহেলিকার অর্থ কি? বৃদ্ধ সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হইলেন। ফটকের সম্মুখে কয়েক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে না? পট্টবস্ত্র পরিহিত উনিই ত নরেন্দ্রনাথ। তাঁহার পার্শ্বে সুরেশচন্দ্র।

বৃদ্ধ বসু মহাশয়কে দেখিয়া উভয়ে অগ্রসর হইলেন। সুরেশচন্দ্র করযোড়ে বলিলেন, "এই যে বেহাই এসেছেন, বরও উপস্থিত। ওরে শাঁক বাজাতে বল্। আস্‌তে আজ্ঞা হোক্, বেহাই মহাশয়!"

বসু মহাশয় স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইলেন। কিয়ৎকাল তাঁহার বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না।

অন্তঃপুর হইতে বিপুল উদ্যমে হুলুধ্বনি ও শঙ্খরব উত্থিত হইল।

বৃদ্ধ বলিলেন, "এ সব কি ব্যাপার নরেন বাবু? বাড়ীতে আলো নাই। বরযাত্রীদিগকে অভ্যর্থনা করিবার বসাইবার কোন আয়োজন নাই। এ কিরূপ ব্যবহার?"

ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া কতিপয় বরযাত্রী গাড়ী হইতে নামিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সুরেশচন্দ্র অগ্রবর্ত্তী হইয়া বিনীতভাবে বলিলেন, "বেহাই, রাগ করিবেন না। এই ত আপনার ফর্দ্দ। ফর্দ্দের মধ্যে যা-যা লেখা আছে, আমরা তাহার অনুযায়ী সমস্তই করিয়াছি; কিন্তু আপনি এখন যে প্রস্তাব করিতেছেন ফর্দ্দে ত তাহা নাই।"

জনৈক বরপক্ষীয় যুবক বলিল, "ব্যাপার কি মহাশয়? হয়েছে কি?"

সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "আজ্ঞা ব্যাপার অতি সামান্য। বসুমহাশয় আমাদিগকে এক ফর্দ্দ দিয়াছিলেন, ঠিক সেই মত কাজ করিতে আমাদের বলিয়াছিলেন। আমরা ঠিক সেই মাফিক কাজ করিয়াছি। এখন বলিতেছেন, বাড়ীতে আলো জ্বালা হয় নাই কেন, বসিবার আসর সজ্জিতই বা কেন হয় নাই এইরূপ দাবী করিতেছেন। কিন্তু এই দেখুন ফর্দ্দ—জাল নহে—হরনাথ বসুর স্বাক্ষরিত দলিল দেখুন—তাহাতে বরযাত্রীদিগকে—"

বসু মহাশয় হাঁপাইয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন, "দোহাই, বেহাই, এযাত্রা রক্ষা করুন। অনেক বড় বড় লোক বরযাত্রী আসিতেছেন, রাজা মহারাজ পর্য্যন্ত আছেন। এখন তাঁহাদিগকে কোথায় লইয়া যাই বলুন? এ অবস্থার কথা তাঁহারা শুনিলে আমার মাথা তুলিবার যো থাকিবে না। বড় অপমানিত হইব। আপনারা মহাশয় লোক, আমার মান রক্ষা করুন। শীঘ্র ব্যবস্থা করুন। ক্রমে সকলেই আসিয়া পড়িবেন।"

সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "বেহাই, এত রাত্রিতে আমরা কোথা হইতে এত আয়োজন করিব বলুন! সে কি করিয়া হয়! বিশেষতঃ আপনার ফর্দ্দে সে সব কথা নাই ত।"

শোভাযাত্রা ক্রমশঃ নিকটে আসিয়া পড়িল।

হরনাথ বাবু কাতর ভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "দোহাই সুরেশ বাবু, যা হয় একটা ব্যবস্থা করুন, আমার ঘাট হয়েছে। আর কখনও এমন ফর্দ্দ দিব না। সকলে এসে পড়্‌লো বলে, আমার ইজ্জত রক্ষা করুন।"

হাসিয়া সুরেশ বলিলেন, "বেহাই! পাঁঠা বিক্রয়ের ব্যবসা ত্যাগ যদি করিতে পারেন, তাহা হইলে বরং একবার চেষ্টা করিয়া দেখা যায়।"

ব্যগ্রকণ্ঠে বৃদ্ধ বলিলেন, "আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আর জীবনে এমন কাজ করিব না।"

সুরেশচন্দ্র তখন, বলিলেন "তবে বেহাই এক কাজ করুন, চট করে এই কাগজে, এই পাঁচজন ভদ্রলোকের সাক্ষাতে লিখিয়া দিন আপনার মধ্যমপুত্রের সহিত বিনা পণে কপর্দ্দকমাত্র না লইয়া নরেনের দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ দিবেন। শীঘ্র লিখুন।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "কাগজ কলম দিন, এখনই দিতেছি। তাহা হইলে আমার মান সম্ভ্রম বজায় থাকিবে ত ?"

"চেষ্টা করিয়া দেখা যাক্। হয়তাহতে পারে।"

সুরেশ, কাগজ ও কলম বাহির করিয়া দিলেন। বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি সুরেশ-চন্দ্রের নির্দ্দেশমতে প্রতিজ্ঞা পত্র লিখিয়া স্বাক্ষর, করিলেন।

শোভাযাত্রা ফটকের নিকটে আসিয়া পড়িল। অমনই সুরেশচন্দ্রের ইঙ্গিতে এক ব্যক্তি বৈদ্যুতিক আলোকের কল খুলিয়া দিল। নিমেষ মধ্যে ঐন্দ্রজালিক দণ্ড স্পর্শে যেন সমগ্র অট্টালিকা দীপালোকে ঝলসিয়া উঠিল নহবৎ বাজিয়া উঠিল।

বৃদ্ধ দেখিলেন সম্মুখস্থ ময়দানে সুসজ্জিত, আলোকিত বস্ত্রাবাস, কোথাও কিছুরই অভাব নাই।

তখন সুরেশ বলিলেন, "বেহাই, বেয়াদপি মাপ করিবেন। বিবাহ-উৎসব উপলক্ষে ইহাও একটা রঙ্গ মাত্র। কিছু মনে করিবেন না।"

নিকটে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একটা হাসির ঘটা পড়িয়া গেল।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

আকবর সাহের হিন্দু সেনাপতি

২

রায় রায়সিংহ।

রায় রায়সিংহ চারি হাজারী মনসবদার ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম রায় কল্যাণ। রায়সিংহ বিকানীরের অধিপতি এবং রাঠোরবংশসম্ভূত ছিলেন। তদীয় পিতা কল্যাণমল বৈরাম খাঁর সহিত সৌহৃদ্য-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। আকবরের রাজত্বের পঞ্চদশ বর্ষে রায় কল্যাণ পুত্র সহ তাঁহার সকাশে উপনীত হয়েন। আকবর শাহ তাঁহাদিগকে আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

রায় সিংহ রাজ নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া প্রথমতঃ গুজরাটে গমন করেন এবং তত্রত্য বিদ্রোহ দমন করিয়া যশস্বী হয়েন। অতঃপর তিনি রাজ নিয়োগক্রমে ক্রমান্বয়ে সিরোহী, পঞ্জাব, বেলুচিস্তান, নাসিক প্রভৃতি নানাস্থানে গমন করেন। তিনি যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এই কারণে রায়সিংহ গুণগ্রাহী পাদশাহের সাতিশয় প্রীতিভাজন ছিলেন এবং চারিহাজার মনসব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার কন্যা অকালে বৈধব্য দশাপ্রাপ্ত হইলে আকবর আন্তরিক দুঃখিত হন এবং তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদানার্থ তদীয় গৃহে গমন করেন। পাদশাহ শোকাকুলা কন্যাকে সহমরণ হইতে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হন। এই ঘটনার কিয়দ্দিবস পরে রায়সিংহের একজন ভৃত্য তাঁহার বিরুদ্ধে পাদশাহের সমীপে অভিযোগ উপস্থিত করে। ইহাতে তিনি রোষ প্রকাশ করিয়া ভৃত্যকে দরবারে আনয়ন করিতে আদেশ দেন। রায় সিংহ দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে লুকাইয়া রাখেন এবং তাহার পলায়ন সংবাদ প্রচার করেন। শীঘ্র প্রকৃত তথ্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তজ্জন্য পাদশাহ বিরক্ত হইয়া রায়সিংহকে দরবারে আসিতে নিষেধ করেন। কিন্তু তিনি অচিরে তাঁহার প্রতি পুনর্ব্বার প্রসন্ন হন এবং তাঁহাকে সুরাটের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করেন। এই নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়া তিনি বিকানীরে উপনীত হন এবং স্বরাজ্যে অনেক বিলম্ব করিতে

থাকেন। আকবর তাঁহাকে অগোণে রাজাদেশ প্রতিপালন করিতে লিপি প্রেরণ করেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় না হওয়াতে তিনি রায়সিংহকে রাজধানীতে আনয়ন করেন এবং দরবারে প্রবেশ করিতে নিষেধ আজ্ঞা দেন। এই ভাবে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে পাদশাহ তাঁহাকে ক্ষমা করেন।

পাদশাহ জাহাঙ্গীর রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া রায়সিংহকে পাঁচ হাজারী সৈন্যাপত্যে উন্নীত করেন। রাজকুমার খুসরু বিদ্রোহী হইয়া পঞ্জাবের অভিমুখে ধাবমান হয়েন; জাহাঙ্গীর সসৈন্যে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করেন। তৎকালে রায়সিংহ জাহাঙ্গীরের সহগামিনী রাজাঙ্গনাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। কিন্তু তিনি এই কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাদশাহের অগোচরে বিকানীরে প্রস্থান করেন। ইহার এক বৎসর পরে স্বীয় অপকর্ম্মের জন্য শাস্তিগ্রহণের ইচ্ছাসূচক একটি ফতুয়া গলদেশে ঝুলাইয়া রাজসকাশে উপনীত হয়েন। জাহাঙ্গীর তাঁহার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছিলেন। রায়সিংহের মৃত্যু সময় ১০২১ হিজিরী অব্দ।

জগন্নাথ।

জগন্নাথ বিহারী মলের কনিষ্ঠ পুত্র এবং রাজা ভগবান্ দাসের ভ্রাতা। তিনি আড়াই হাজারী মনসবদার ছিলেন, এবং অধিকাংশ সময় রাজা মানসিংহের সৈন্যাপত্যাধীন হইয়া কাজ করিতেন। তিনি রাণা প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়োজিত ছিলেন; এই চিতোর যুদ্ধে রণকৌশল ও সাহসিকতা প্রদর্শন করিয়া খ্যাতিলাভ করেন। রতনভঁর মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত হইলে আকবরশাহের অনুগ্রহে তিনি তাহা জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন। জাহাঙ্গীর পাদশাহ তাঁহাকে পাঁচ হাজারী সেনাপতির পদে উন্নীত করিয়াছিলেন।

রাজা বীরবল।

রাজা বীরবলের প্রকৃত নাম মহেশ দাস। মহেশ দাস ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অতিশয় দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি সুতীক্ষ্ণ এবং রসোদ্ভাবন ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। তজ্জন্য তিনি আকবরশাহের শুভদৃষ্টিতে পতিত হয়েন, ইহাই তাঁহার উন্নতির মূল কারণ ছিল। তদীয় হিন্দী কবিতাবলী রস মাধুর্য্যে মনোজ্ঞ ছিল। পাদশাহ তাঁহাকে রায়

কবি উপাধি প্রদান করেন। অতঃপর তিনি রাজা বীরবল উপাধিপ্রাপ্ত হয়েন এবং নাগর কোটের জায়গীর লাভ করেন। রাজা বীরবল সর্ব্বদা পাদশাহের নিকট থাকিতেন, কেবল সময় সময় দৌত্যকার্য্যে বৃত হইয়া স্থানান্তরে গমন করিতেন। কিন্তু একবার রাজা বীরবলসিংহ যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। ইউসফজয়ীগণ বিদ্রোহ উপস্থিত করিলে আকবরশাহ তন্নিবারণজন্যে সেনাপতি জৈনখাঁ কোকাকে প্রেরণ করেন। জৈনখাঁ রাজনিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া ইউসফজয়ীদের আবাস ভূমে উপনীত হয়েন, তথা হইতে আরও সৈন্য প্রার্থনা করিয়া সম্রাটের সমীপে আবেদন করেন। এই সৈন্য সহ আবুলফজল অথবা বীরবলকে সেনাপতিরূপে প্রেরণ করা আবশ্যক হয়। রাজাদেশে ভাগ্যপরীক্ষা (lot) করা হয় এবং তাহাতে বীরবল সৈনাপত্যে নির্ব্বাচিত হয়েন। আকবরশাহ তাঁহাকে দরবার হইতে স্থানান্তরিত করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু বাধ্য হইয়া সম্মতি জ্ঞাপন করেন। এই যুদ্ধে বীরবল এবং আট হাজার সৈন্য নিহত হয়েন; রাজার মৃতদেহ শত্রু হস্তে পতিত হয়। সম্রাট্ বীরবলের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া শোকার্ত্ত হইয়া পড়েন, এবং তাঁহার মৃতদেহ শত্রু হস্তে পতিত হওয়াতে গভীর ক্ষোভপ্রকাশ করেন। বীরবলের মৃত্যু সংবাদ মিথ্যা বলিয়া একাধিক বার জনরব উঠে এবং প্রত্যেক বারই পাদশাহ প্রভূত আয়াস সহকারে ঐ সমস্ত জনরবের মূল অনুসন্ধান করেন। ইতিহাসবেত্তা বদায়ুনি লিখিয়াছেন যে, যে সময় রাজার আত্মা নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিল, সেই সময় লোকে, তাঁহার যুদ্ধে পরাজয় হেতু লজ্জাবশতঃ সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্ব্বক দেশে দেশে পরিভ্রমণের জনরব তুলিয়াছিল। ইসলাম ধর্ম্মের গোঁড়া বদায়ুনী বিদ্বেষ-বিষ উদ্গীরণ করিয়াছিলেন, তাহার কারণ এই যে, যে সকল সভাসদের প্রভাবে আকবরশাহ ইস্লাম ধর্ম্মে বিশ্বাসহীন হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বীরবল প্রধান ছিলেন। রাজা বীরবল দুই হাজারী মনসবদার ছিলেন।

রাজা রামচাঁদ বগলা।

রাজা রামচাঁদ মধ্যভারতস্থ ভাটরাজ্যের অধিপতি ছিলেন। বাবরের স্বরচিত জীবনবৃত্তে ভাটরাজ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। চিরখ্যাত গায়ক তানসেন প্রথমতঃ রাজা রামচাঁদ বগলায় সভাসদ ছিলেন। তাঁহার

যশোরাশি চারিদিকে বিকীর্ণ ছিল। পাদশাহ তদীয় খ্যাতি শ্রুত হইয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়েন এবং তাঁহাকে স্বীয় দরবারে পাঠাইতে রাজা রামচাঁদকে আদেশ করেন। রাজা রামচাঁদ আকবরের আদেশ উল্লঙ্ঘন করিবার অক্ষমতা হেতু নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও তাঁহাকে মোগল দরবারে প্রেরণ করেন। তানসেন সম্রাটের সকাশে উপনীত হইয়া সঙ্গীতালাপ দ্বারা তাঁহাকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলেন। তিনি তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ দুই লক্ষ মুদ্রা পুরস্কার প্রদান করেন।

প্রাগুক্ত সূত্রে পাদশাহের সহিত রাজা রামচাঁদের পরিচয় ঘটিয়াছিল। কিন্তু তিনি বহুদিন মোগল দরবার হইতে দূরবর্ত্তী ছিলেন। তারপর আকবর আপন রাজত্বের অষ্টাবিংশবর্ষে তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। ইহাতে রাজা রামচাঁদ অনন্যোপায় হইয়া বশীভূত হয়েন এবং পাদশাহের সরকারে কার্য্য করিতে স্বীকার করিয়া দুই হাজারী মনসব লাভ করেন। রাজা পাদশাহের অধীনে নয়বৎসর কাল সৈনাপত্যে বৃত থাকিয়া পরলোক গমন করেন।

রায় কল্যাণমল।

রায় কল্যাণমল বিকানীর রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। আকবরশাহ তাঁহার ব্যবহারে প্রীতিলাভ করিয়া তাঁহাকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন এবং দুই হাজার মনসব দেন। তদীয় পুত্র রায়সিংহ মোগলরাজ্যের অন্যতম প্রধান সেনাপতি ছিলেন; তাঁহার বিবরণ পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

রায় সুরজন হাদা।

রায় সুরজন চোহান রাজপুত কুলের হাদা বংশে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তিনি রন্থম্ভর নামক ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিকারী ছিলেন। প্রাতঃস্মরণীয় রাণা প্রতাপ রাজপুত জাতির গৌরবরক্ষার্থ দণ্ডায়মান হইলে রায় সুরজন তাঁহার সঙ্গে যোগ দেন এবং বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করেন। সুদীর্ঘ কালব্যাপী সাধনার পর মোগল সৈন্য চিতোর বিজয় সম্পন্ন করে। অতঃপর পাদশাহের আদেশে তাঁহারা রন্থম্ভর রাজ্য অধিকার করিতে প্রবৃত্ত হয়। তখন রায় সুরজন নিরুপায় হইয়া বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক রাজকুমারদ্বয়কে মোগল দরবারে প্রেরণ করেন, সম্রাট তাঁহাদিগকে সম্মান সহকারে গ্রহণ করিয়া দুইটি পরিচ্ছদ

খেলাত দেন, তাঁহারা রাজদত্ত পরিচ্ছদ পরিধান জন্য বহির্ভাগে গমন করিলে, তাঁহাদের অনেক অনুচর সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া তরবারি কোষোন্মুক্ত করিয়া কতিপয় মোগল সেনাকে হত্যা করে। এই দুর্ঘটনা সম্বন্ধে কুমারদ্বয় সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ছিলেন, সেই জন্য পাদশাহ তাঁহাদিগকে ক্ষমা করেন। কিন্তু রন্থুতর রাজ্য আপন সাম্রাজ্য ভুক্ত করিয়া লয়েন। অতঃপর রায় সুরজন হাদা পাদশাহের সমীপে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিবার কল্পনায় গড়কতঙ্গ নামক স্থানের শাসন কর্তৃপদ প্রদান করেন। এই স্থানের শাসন কার্য্যে রায় সুরজন ন্যূনাধিক ছয় বৎসর কাল নিয়োজিত ছিলেন, তদনন্তর চুণার দুর্গের ভার প্রাপ্ত হয়েন। রায় সুরজন দুই হাজারী মনসবদারের শ্রেণীভুক্ত ছিলেন।

রায় দুর্গা।

রায় দুর্গা আকবর শাহের অধীন একজন দেড় হাজারী সেনাপতি ছিলেন। চিতোরের নিকটবর্ত্তী পরগণা রামপুর তাঁহার জন্ম স্থান। তিনি চিরখ্যাত শিশোদিয়া রাজপুত বংশোদ্ভব ছিলেন। আকবরশাহ তাঁহাকে গুজরাট যুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং এই যুদ্ধে তিনি যশোভাজন হয়েন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষ তাঁহার মৃত্যু কাল।

মধু সিংহ।

মধু সিংহ রাজা ভগবানদাসের পুত্র। আকবরশাহ তাঁহাকে দেড় হাজারী মনসব প্রদান করেন। মধু সিংহ শৌর্য্যবীর্য্যশালী সেনাপতি ছিলেন। কাশ্মীরের বিরুদ্ধে যে অভিযান হইয়াছিল, পাদশাহ তাঁহাকে তাহার অন্যতম সেনাপতি রূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

রায়সন দরবারি।

একজন কাচোয়া রাজপুত নিঃসন্তান ছিলেন। এই কারণ তিনি সর্ব্বদা মানসিক কষ্টে কালাতিপাত করিতেন। একালে সেখ উপাধিধারী ফকির দয়া পরবশ হইয়া তাঁহার সন্তান কামনায় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন, তৎফলে কাচোয়া রাজপুত একটী পুত্র সন্তান লাভ করেন। এই পুত্র এবং তদীয় বংশধরগণ উপকারী ফকিরের উপাধি অনুসারে শেখাইত আখ্যা প্রাপ্ত হন। রায়সন এই বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ছিলেন; রায়সন মোগল

দরবারের একজন অতি বিশ্বাস-ভাজন অমাত্য ছিলেন। তিনি রাজাভঃপুরের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্রেও সময় সময় দেখা যাইত। রায়সন সাড়ে বারশতী মনসবদার ছিলেন। একজন বাঙ্গালী রায়সনের প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন।

রূপসি (সিংহ) বৈরাগী।

রূপসি বৈরাগী রাজা বিহারীমলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ম-আসিরের মতে ভ্রাতুষ্পুত্র। রূপসি আকবরশাহের একজন এক হাজারী সেনাপতি ছিলেন। সম্ভবতঃ রাজা বিহারীমলের সহিত সম্পর্কান্বিত বলিয়াই তাঁহার ভাগ্যে এই পদ লাভ ঘটিয়া ছিল, কোন ইতিহাসে তাঁহার শৌর্য্য বীর্য্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ নাই।

জয়মল নামে রূপসির এক পুত্র ছিল। জয়মল পিতার জীবদ্দশায় পরলোক গমন করেন। তদীয় পত্নী সহমৃতা হইতে অস্বীকার করেন। ইহাতে জয়মলের পুত্র অর্থাৎ রূপসির পৌত্র উদয়সিংহ মাতাকে বল পূর্ব্বক সহমৃতা করিতে উদ্যোগী হন। এই ঘটনা শ্রবণ করিয়া আকবরসাহ সেনাপতি জগন্নাথ ও রায়মলকে প্রেরণ করিয়া জয়মলের পত্নীর সহমরণ নিবারণ করেন এবং উদয়সিংহকে ধৃত করিয়া আনেন। উদয়সিংহ আকবরশাহের সমীপে আনীত হইলে তিনি তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিতে আদেশ দেন। জয়মল বীরপুরুষ ছিলেন, তাঁহার বর্ম্ম গুরুভার ছিল। পাদশাহ এই বর্ম্ম করণ নামক একজন প্রিয় পাত্রকে অর্পণ করেন। ইহাতে রূপসি ক্রুদ্ধ হইয়া রূঢ়বাক্যে পাদশাহকে উহা প্রত্যর্পণ করিতে বলে। রাজা ভগবান দাসের অনুরোধে তিনি রূপসির রূঢ়তা মার্জ্জনা করিয়াছিলেন।

মঠরাজা উদয় সিংহ।

মিরআহাদী লিখিয়াছেন, "রাজা উদয়সিংহ রাজা মালদেবের পুত্র। তিনি সাতিশয় প্রতাপশালী ছিলেন, তাঁহার অশীতি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্ত ছিল। রাণা সঙ্গ বাবর শাহের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন; কিন্তু সৈন্তের সংখ্যা ও রাজ্যের বিস্তৃতি ধরিয়া বিচার করিলে মালদেবকে রাণা সঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়। "রাজা মালদেব এবং তৎপরে তাঁহার পুত্র উদয় সিংহ যোধপুর রাজ্যের অধিস্বামী ছিলেন। মোগলরাজের সঙ্গে উদয়সিংহের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত

হইয়াছিল। আকবরশাহের আদেশে কুমার সেলিম (পরে জাহাঙ্গীর) উদয়-সিংহের কন্যার পাণিপীড়ন করেন। এই বিবাহের ফল পাদশাহ শাহজাহান। এক হাজার মোগল সৈন্য তাঁহার শাসনাধীন ছিল।

জগমল।

জগমল রাজা বিহারীমলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। আকবরশাহ এই কুটুম্বকে এক হাজারী সৈনাপত্য প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন।

জগৎসিংহ।

বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী জগৎসিংহের নাম বাঙ্গালী পাঠক-বর্গের নিকট চিরপ্রিয় করিয়া রাখিয়াছেন। জগৎসিংহ রাজা মানসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি এক হাজার সৈন্যের অধিনায়ক নিযুক্ত হইয়া পিতার সমভি-ব্যাহারে বঙ্গদেশে আগমন করেন। এই স্থানে তাঁহার শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশিত হয়। রাজা মানসিংহ কিয়দ্দিবসের নিমিত্ত বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণা-পথের যুদ্ধে যোগদানার্থ গমন করিলে জগৎসিংহ পিতৃপদে প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু স্বকার্য্য গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই তিনি অতিরিক্ত সুরাপান বশতঃ কালগ্রাসে পতিত হয়েন। কুমার সেলিম (পরে জাহাঙ্গীর) তাঁহার কন্যাকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিলেন।

রাজা রাজসিংহ।

রাজা রাজসিংহ বিহারীমলের ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি এক হাজার সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন। তিনি সুদীর্ঘ কাল দক্ষিণাপথে অবস্থিতি করেন এবং তারপর গোয়ালিয়ার দুর্গের অধিপতি নিযুক্ত হয়েন, জাহাঙ্গীরের রাজত্বের তৃতীয়বর্ষে তিনি পুনর্ব্বার দক্ষিণাপথে গমন করেন এবং সেখানে তাঁহার মৃত্যু হয়। রাজসিংহের অন্যতম পৌত্র পুরুষোত্তমসিংহ ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রায়ভোজ।

রায়ভোজ রায় সুরজন হাদার পুত্র। আকবরশাহ তাঁহাকে রাজা মানসিংহের অন্যতম সহকারী রূপে বঙ্গদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সময় জগৎসিংহের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ হয়। শাহজাদা সেলিম এই

পরিণয়জাত কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে অভিলাষী হয়েন। কিন্তু রায়ভোজ বিবাহে আপত্তি করেন। ইহাতে সেলিম কুপিত হইয়া তাঁহাকে দণ্ডিত করিতে উদ্যোগী হন। অতঃপর রায়ভোজ আত্মহত্যা করেন, এবং বিবাহ ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। রায়ভোজ এক হাজারী মনসবদার ছিলেন।

ধরু।

ধরু খ্যাতনামা রাজা টোডরমলের পুত্র। আকবর শাহ তাঁহাকে সাতশতী মনসব প্রদান পূর্ব্বক সম্মানিত করিয়াছিলেন। ধরু বিলাসী এবং আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি সোণা দিয়া অশ্বের ক্ষুর বাঁধাইতেন। সিন্ধু যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রায় পত্রদাস।

রায় পত্র ক্ষেত্রীবংশ সম্ভূত ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ আকবর শাহের হস্তিশালার মুমার নবিসের কার্য্য করিতেন। এই কার্য্যে দক্ষতা বশতঃ আকবর শাহ তাঁহাকে রায় রায়ান উপাধি দেন। অতঃপর চিতোর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তিনি লেখনী পরিত্যাগ করিয়া তরবারি ধারণ করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশিত হয়। পত্রদাস চিতোর হইতে প্রত্যাগত হইয়া বঙ্গদেশের রাজস্ব মন্ত্রীর পদ (দেওয়ানী) প্রাপ্ত হন। অতঃপর তিনি বিহার, কাবুল প্রভৃতি নানা সুবার দেওয়ানী করেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি পুনর্ব্বার তরবারি ধারণ করিয়াছিলেন। বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত বোচ্ছার বীরসিংহ আবুলফজলকে হত্যা করিলে আকবর শাহ তাঁহাকে ধৃত করিয়া আনয়ন করিবার জন্ত পত্রদাসকে প্রেরণ করেন। পত্রদাস তাঁহাকে নানা খণ্ডযুদ্ধে পরাজিত এবং বহু স্থানে অনুসরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু ধৃত করিতে অসমর্থ হন। সম্রাট ইহার পর অল্পকাল জীবিত ছিলেন, এই জন্ত বীর সিংহ অবশেষে নিষ্কৃতি লাভ করেন। পত্রদাস প্রথমতঃ সাতশতী সেনাপতি ছিলেন। তারপর ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিয়া পাঁচ হাজারী সৈনাপত্য এবং রাজা বিক্রমজিৎ উপাধি প্রাপ্ত হন।

মেদিনী রায় চৌহান।

মেদিনী রায় আকবর শাহের একজন সাতশতী সেনাপতি ছিলেন। সম্রাট তাঁহাকে গুজরাট যুদ্ধে নিয়োজিত করেন। বিখ্যাত ইতিহাস লেখক নিজাম-

উদ্দীনও এই সময় গুজরাট যুদ্ধে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি তাঁহার সহচর মেদিনী রায় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "তিনি সাহসীকতা ও দানশীলতায় জন্য বিখ্যাত, এক্ষণে (১০০১ হিজিরী) এক সহস্র সৈন্যের অধিনায়কত্ব করিতেছেন।"

পরমানন্দ।

পরমানন্দ ক্ষেত্রীবংশোদ্ভব ছিলেন। তিনি পাঁচ শত মোগল সৈন্যের অধিনায়কত্ব করিতেন।

জগমল।

জগমল পাঁচশতী মনসবদার ছিলেন।

রাওলভীম।

জাহাঙ্গীর পাদশাহ সেনাপতি রাওলভীম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "রাওলভীম যশল্মীরের অধিবাসী ছিলেন, স্বদেশে তাঁহার পদমর্য্যাদা এবং ক্ষমতা যথেষ্ট ছিল। তিনি মৃত্যুকালে একটি দুই বৎসর বয়স্ক শিশু পুত্র রাখিয়া গিয়াছিলেন। এই শিশুও তাঁহার মৃত্যুর পর অত্যল্প কাল মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। সিংহাসনে আরোহণের পূর্ব্বে আমি তদীয় কন্যার পাণিপীড়ন করিয়াছিলাম এবং তাহাকে মালিক জহান উপাধি দিয়াছিলাম। রাওল পরিবার চিরকাল আমাদের বংশের অনুরাগী, তজ্জন্য এই বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছি।" রাওলভীম পাঁচশতী সেনাপতি ছিলেন।

রামদাস।

রামদাস দরিদ্র পিতা মাতার সন্তান ছিলেন। তিনি প্রথম অবস্থায় মোগল সেনাপতি রায়সাল দরবারীর কার্য্য করিতেন। তাঁহার অনুরোধে আকবরশাহ রামদাসকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া পাঁচশতী মনসব প্রদান করেন। রামদাস বঙ্গদেশে রাজস্ব বিভাগে রাজা তোডরমলের সহকারীরূপে কার্য্য করিতেন। তাঁহার বিশ্বস্ততা অতুলনীয় ছিল; উহা প্রবাদবাক্যরূপে পরিণত হইয়াছিল। আকবর শাহের মৃত্যুকালে রাজকোষ রক্ষার ভার রামদাসের হস্তে অর্পিত ছিল; তিনি সবিশেষ কৌশল ও দৃঢ়তা সহকারে রাজকোষ রক্ষা করেন।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বের ষষ্ঠবর্ষে রামদাস দক্ষিণাপথের যুদ্ধে ব্রতী হন, কিন্তু রণক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া অন্যান্য সেনানায়কসহ পলায়ন করেন, এই সংবাদ

জাহাঙ্গীরের কর্ণগোচর হইলে তাঁহার আদেশে পরাজিত সেনানায়কদের প্রতিকৃতি অঙ্কিত হয়। তিনি এই সকল প্রতিকৃতি উপলক্ষ্য করিয়া সেনানায়কদিগকে ভৎর্সনা করেন। সম্রাট রামদাসের প্রতিকৃতি সম্বোধন করিয়া বলেন, "তুমি যে সময় রায়সাল দরবারীর কার্য্য করিতে, সে সময় তোমার দৈনিক বৃত্তি এক তঙ্কামাত্র ছিল, কিন্তু পিতার অনুগ্রহে তুমি আমীরের পদে উন্নীত হইয়াছ। রাজপুতগণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করা অপমানজনক বলিয়া বিবেচনা করেন; মৃত্যুকালে যেন তোমার ধর্ম্ম তোমাকে সান্ত্বনা দিতে অসমর্থ হয়। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই রামদাস সিন্ধুনদের পশ্চিমতীরবর্ত্তী বঙ্গশ নামক স্থানে প্রেরিত হন। বঙ্গশ তাঁহার মৃত্যু স্থান। জাহাঙ্গীর তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া বলেন, "আমার অভিশাপ সত্য হইয়াছে! কারণ হিন্দু ধর্ম্ম অনুসারে সিন্ধুনদের পশ্চিমতীরে মৃত্যু হইলে হিন্দুর নরকে গতি হয়।" রামদাস দানশীল ছিলেন। তিনি গায়ক এবং বিদুষকদিগকে বহুমূল্য উপহার প্রদান করিতেন।

অর্জ্জুন সিংহ, শিওন সিংহ, শকত সিংহ।

আইনের দুই একখানি পাণ্ডুলিপিতে দুর্জ্জন সিংহ নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা সকলেই প্রখ্যাত নামা রাজা মানসিংহের পুত্র এবং পাঁচশতী সেনাপতি ছিলেন। আকবর শাহ তাঁহাদিগকে পিতার সঙ্গে বঙ্গদেশে নিয়োজিত করেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই পিতার জীবদ্দশায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন।

রামচাঁদ।

রামচাঁদ বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত বোচ্ছা নামক ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি মধুকরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার দুই পুত্র ছিল। কনিষ্ঠ পুত্রের নাম বীরসিংহ। বীরসিংহ অমাত্য শ্রেষ্ঠ আবুলফজলকে হত্যা করিয়া আকবর শাহের সাতিশয় ক্রোধ ভাজন হয়েন। কিন্তু রামচাঁদ সম্রাটের অনুগ্রহ ভাজন ও পাঁচশত সেনার অধিনায়ক ছিলেন। বীরসিংহ জাহাঙ্গীরের প্ররোচনায় আবুলফজলের হত্যা ক্রিয়া সাধন করিয়াছিলেন। একারণ তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রামচাঁদের পরিবর্ত্তে বীরসিংহকে বোচ্ছা রাজ্যের উত্তরাধিকার প্রদান করিতে অভিলাষী হয়েন। ইহাতে উত্যক্ত হইয়া রামচাঁদ বিদ্রোহ অবলম্বন করেন। মোগল সৈন্য তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া জাহাঙ্গীরের নিকট আনয়ন করিয়াছিল। কিন্তু সম্রাট তাঁহাকে শৃঙ্খল মুক্ত করেন

এবং সম্মানসূচক পরিচ্ছদ প্রদান করিয়া বিদায় দেন। অতঃপর বীরসিংহ বোন্দার রাজপদ প্রাপ্ত হন। রামচাঁদ বোন্দার রাজপদ হইতে বঞ্চিত হইয়া জাহাঙ্গীরের অনুগ্রহ লাভের আশায় তাঁহার হস্তে স্বীয় কন্যা অর্পণ করিয়াছিলেন।'

রাজা মুকুটমল।

রাজা মুকুটমল ভদাওয়ার নামক ক্ষুদ্র সংস্থানের অধিপতি ছিলেন। এই স্থান রাজধানী আগ্রার নিকটবর্ত্তী হইলেও তত্রত্য অধিবাসীরা দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। তজ্জন্য আকবরশাহ তাহাদের অধিপতিকে হস্তীপদতলে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করেন। তাদৃশ রাজশাসনে ভদাওয়ার-বাসীদের চরিত্র সংশোধিত হয়। অতঃপর মুকুটমল ভদাওয়ার সংস্থানের আধিপত্য প্রাপ্ত হয়েন এবং মোগল সৈন্যবিভাগে প্রবিষ্ট হইয়া পাঁচশতী মনসব লাভ করেন। রাজা মুকুটমল গুজরাট যুদ্ধে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

রাজা রামচন্দ্র।

রাজা রামচন্দ্র উড়িষ্যার জমিদার এবং আকবর শাহের পাঁচশতী মনসবদার ছিলেন, ইনি উড়িষ্যা জয় কালে রাজা মানসিংহকে সাহায্য করেন।

দলপত।

দলপত রায় রায়সিংহের পুত্র। পাদশাহ তাঁহাকে সিন্ধুদেশের যুদ্ধে প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি কাপুরুষতা প্রদর্শন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দূরবর্ত্তী হয়েন। ফলতঃ তাঁহার যোগ্যতার অভাব ছিল; আকবর শাহের অন্যতম প্রধান সেনাপতি রায় রায়সিংহের পুত্র বলিয়া তিনি মোগল সৈন্য বিভাগে প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

রায় মনোহর।

রায় মনোহর আকবর শাহের চারশতী সেনাপতি ছিলেন। তিনি ক্রমান্বয়ে চিতোর, বিহার এবং গুজরাটে নিয়োজিত হন। এই সকল যুদ্ধে তিনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। রায় মনোহর পারসী ভাষায় পদ্য রচনা করিতেন। জাহাঙ্গীর পাদশাহের রাজত্বের একাদশবর্ষে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রামচাঁদ।

রামচাঁদ সেনাপতি জগন্নাথের পুত্র এবং বিহারীমলের পৌত্র। আকবর শাহ তাঁহাকে চারশতী সৈনাপত্য প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন।

বঙ্ক।

বঙ্ক আকবর পাদশাহের একজন চারশতী সেনাপতি ছিলেন। আকবরের রাজত্বের ষড়বিংশবর্ষে তিনি সহকারী সেনাপতিরূপে কাবুলে গমন করেন।

বিল বিধর।

বিল বিধর রাঠোর রাজপুতবংশীয় ছিলেন। তিনি তিনশত সৈন্যের অধিনায়কত্ব করিতেন।

কিষ দাস।

কিষ দাসের পিতার নাম জয়মল। আইনের একখানি হস্তলিপিতে জেইমল নাম দেখিতে পাওয়া যায়। জাহাঙ্গীর পাদশাহের সহিত কিষু দাসের কন্যার বিবাহ হয়। কিষদাস তিনশত সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন।

তুলসী দাস

তুলসী দাস গুজরাটের যুদ্ধে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁহার আদেশাধীন সৈন্যের সংখ্যা তিনশত ছিল। কিন্তু তাবক্ত আকবরীর মতে এই সৈন্যসংখ্যা দুই সহস্র।

কৃষ্ণদাস।

কৃষ্ণদাস আকবর এবং জাহাঙ্গীরের আমলে হস্তী ও অশ্বশালার অধ্যক্ষ ছিলেন। আকবর শাহ তিনশত সৈন্যের সৈনাপত্য প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্মানিত করেন। জাহাঙ্গীর পাদশাহ তাঁহাকে একসহস্র সৈন্যের সৈনাপত্য এবং রাজা উপাধি দেন।

মানসিংহ।

আকবরি নামায় দরবারী উপাধী ধারী মানসিংহ নামক একজন তিনশত সেনার অধিনায়কের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

নীলকণ্ঠ।

নীলকণ্ঠ উড়িষ্যার একজন জমিদার ছিলেন। আকবর শাহ তাঁহাকে তিনশত সৈন্যের অধিনায়ক নিযুক্ত করেন।

রায় রামদাস দেওয়ান।

রায় রামদাস দেওয়ান আড়াই শত সেনার অধিনায়ক ছিলেন।

প্রতাপসিংহ।

রাজা ভগবান দাসের পুত্র।

শক্ত সিংহ।

রাজা মানসিংহের পুত্র।

শক্র (শক্ত) সিংহ।

প্রাতঃস্মরণীয় রাজা প্রতাপসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে মনোমালিন্য বশতঃ মোগল দরবারে আগমন করিয়াছিলেন।

মথুর দাস (ক্ষত্রী)। সূত্রদাস (মথুরাদাসের পুত্র)। লালা (রাজা বীরবলের পুত্র)। সনওয়াল দাস (আকবর শাহের শরীররক্ষক)। কেশু দাস (রাঠোর রায় রায়সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র)। সঙ্গ ও সুন্দর (উড়িষ্যার জমিদার)। ইঁহারা সকলেই দুইশতী মনসবদার ছিলেন।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

চিত্রশালা।

বহুদিন পরে "সাহিত্যের" চিত্রশালায় দুইখানি চিত্র আসিয়াছে। চিত্র দুইখানি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কাব্য "কাদম্বরীর" উপাখ্যান অবলম্বনে পরিকল্পিত ও চিত্রিত। প্রথমখানি "শূদ্রক-রাজসভায় চণ্ডালকুমারী কর্তৃক বৈশম্পায়ন নামক শুকপক্ষী প্রদান"; দ্বিতীয় খানিতে "মহারাজ শূদ্রক বৈশম্পায়নের আত্মকাহিনী একাগ্রমনে শ্রবণ করিতেছেন," এইরূপ অঙ্কিত আছে। বঙ্গের ও ভারতের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এই উভয় চিত্রেরই রচয়িতা। যামিনী বাবুর বিশেষ পরিচয় প্রদান এস্থলে নিষ্প্রয়োজন, কারণ, তিনি স্বনামধন্য শক্তিশালী স্বভাবশিল্পী। অতি শৈশবাবস্থা হইতেই চিত্রশিল্পে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। সুবিজ্ঞ চিত্রশিল্পী স্বর্গীয় গঙ্গাধর দে মহাশয়ের নিকট তাঁহার চিত্রশিক্ষা আরম্ভ হয়। পরে মিঃ পামার নামক জনৈক য়ুরোপীয় চিত্রকরের নিকট তিনি শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু মূলতঃ তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক তাঁহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার এবং তদনুগত অলৌকিক প্রতিভা। তাহাতেই তিনি এত অল্পকালের মধ্যে জগতে সুশিল্পী বলিয়া পরিচিত হইতে পারিয়াছেন। তিনি প্রাচ্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও প্রতীচ্যের শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্‌গণের নিকট উচ্চসম্মান লাভ করিয়াছেন। ইহাতে কেবল যামিনী বাবুই গৌরবান্বিত হন নাই, আমরা—বাঙ্গালীজাতি, অথবা সমগ্র ভারতবাসী সম্মান লাভ করিয়াছি। যামিনীবাবু চিত্ররচনায় শিল্পপ্রসূ ভারতভূমির নাম রক্ষা করিয়াছেন।

সাহিত্য হউক, বা শিল্প হউক, তাহার রচয়িতৃগণের মধ্যে কেহ তাঁহার জীবিত কালের মধ্যেই নানাকারণে অথবা জন্মার্জ্জিত যশোভাগ্যফলে যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়া থাকেন, আবার কেহবা জীবিতকালের মধ্যে সেরূপ উপযুক্ত সম্মান প্রাপ্ত না হইলেও, তাঁহার অবর্ত্তমানে বিশ্ববাসী তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। সেই অপক্ষপাত সম্মানই শ্রেষ্ঠ সম্মান বলিয়া সুধীমণ্ডলী-মধ্যে কীর্ত্তিত আছে। কারণ, তাহাতেই শিল্পী বা সাহিত্যককে চিরজীবী করিয়া রাখে। পক্ষান্তরে, প্রথমোক্তরূপ প্রশংসা অনুরাগ বা পক্ষপাতদুষ্ট হইলে প্রশংসিতের জীবনান্তের সঙ্গে সঙ্গে সমস্তই 'কালের কবলে বিলীন'

হইয়া যায়। যামিনীবাবুর চিত্রকলা সে শ্রেণীর নহে। যামিনীবাবু প্রকৃতই যশস্বী পুরুষ। তাঁহার কলাকীর্ত্তি তাঁহাকে চিরজীবী করিয়া রাখিবে। আমারা ভগবানের নিকট তাঁহার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

প্রত্যেকেরই কর্ম্মের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্ষেত্র আছে। সকল ক্ষেত্রেই এক ব্যক্তি সমান ভাবে কর্ম্ম করিতে পারেন না। যদি পারেন, তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহার কোনও কর্ম্মই অসাধারণ বা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। তবে যিনি একবিষয়ে সুনিপুণ, তিনি ইচ্ছা করিলে বিষয়ান্তরে সাধারণরূপ কৃতিত্বের অধিকারী হইতে পারেন। যামিনীবাবুরও চিত্রকলার একটী ক্ষেত্র আছে। সে ক্ষেত্রে তিনি অদ্বিতীয় পুরুষ। বস্তুতঃ বর্ত্তমান জগতে সে ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আছে বলিয়া মনে হয় না। সে তাঁহার 'কুহেলিকা-সমাচ্ছন্ন নিসর্গচিত্র' (Misty Landscape Painting)। প্রভাত ও সন্ধ্যার কুহেলিকার মধ্য হইতে সুদূরব্যাপী অস্পষ্ট নিসর্গচিত্র যাহা তিনি দেখাইয়াছেন, তাহা অদ্ভুত, তাহা বর্ণনাতীত। ভারতীয় চিত্র প্রদর্শনীতে যামিনীবাবুর এই পর্য্যায়ের চিত্র দেখিয়া আবালবৃদ্ধ সকলেই বিমোহিত হইয়াছেন।

আজ আমরা তাঁহার যে দুইখানি চিত্রের কথা বলিতেছি, ইহা তাঁহার সুপ্রতিষ্ঠিত ক্ষেত্র নিসর্গচিত্রের অন্তর্ভুক্ত নহে—ইহা পুরাচিত্র বা হিস্‌টোরিপেন্টিং (History Painting), ইহা স্বতন্ত্র ক্ষেত্রের উৎপন্ন বস্তু। তবে যামিনীবাবু ইহাতেও নিতান্ত অল্প সাফল্য লাভ করেন নাই। তাঁহার এ শ্রেণীর অন্তর্গত অন্যান্য চিত্রও দেখিয়াছি। তাহাও বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু এই চিত্র দুইখানি তাঁহার প্রথম সময়ের বা শিক্ষা-কালের অঙ্কিত। বহুদিন পূর্ব্বে যখন বীডন গার্ডেনে কংগ্রেস ও তৎসহ ভারতীয় শিল্পপ্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়, সেই সময়ে এই চিত্রদ্বয় প্রদর্শিত হইয়া-ছিল। প্রদর্শনীর বিচারে যামিনীবাবু পারিতোষিক লাভও করিয়াছিলেন।

ইহার মধ্যে প্রথম চিত্রখানি প্রাচ্যকলানুরাগী শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, আই, ই, মহাশয়ের গৃহে, এবং দ্বিতীয় খানি মহারাজ সার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর বাহাদুরের "প্রাসাদে' রক্ষিত আছে। তাহারই প্রতিলিপি এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস হইতে ক্রমো-লিথো প্রক্রিয়ায় মুদ্রিত হইয়াছে। মুদ্রণ উৎকৃষ্ট না হইলেও নিতান্ত মন্দ হয় নাই। আমরা মূল চিত্র দেখিয়াছি বলিয়াই এইরূপ বলিতেছি। তবে ইণ্ডিয়ান প্রেসেরও বোধ হয় ইহাই প্রথম উদ্যম। এই সূচনা দেখিয়া তাঁহাদের কার্য্যে ভবিষ্যৎ সাফল্যের বিশেষ আশা করা যায়।

আমরা পূর্ব্বেও অনেকবার বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, কোনও কালেই কোন চিত্রের পরিচয় দিবার প্রয়োজন হয় না। যাহা স্বয়ং প্রকাশমান বস্তু, যাহা বিশ্বের সাধারণ ভাষায় রচিত, তাহার আবার অনুবাদ করিবার প্রয়োজন কি? যাঁহারা 'কাদম্বরী' পড়িয়াছেন, তাঁহারা যামিনী বাবুর চিত্র দুইখানির এই অনুলিপি দেখিয়াই চিত্রান্তর্গত সকল ভাব উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

তবে চিত্রের কলাবিধানের দোষগুণ সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, এ চিত্র যামিনী বাবুর প্রাথমিক রচনা। তিনি যে এরূপ বিরাট্ চিত্ররচনায় প্রথমেই হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার অল্প সাহসের পরিচয় নহে। আমরা প্রায় তের চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার এই চিত্র দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলাম, কালে এই শিল্পী ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিবেন। আমাদের সে কথা এখন সার্থক হইয়াছে। আজ ঘটনাচক্রে পুনরায় এই চিত্র দুইখানি দেখিবার সুযোগ হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বাধ্য হইয়া দুই এক কথা সাধারণের অবগতির জন্য বলিতেও হইতেছে। কিন্তু এ চিত্র যামিনী বাবুর প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় দানে সমর্থ নহে, তাহার কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহা তাঁহার কিশোর রচনা; ইহাতে যে সকল ত্রুটী আছে, তাঁহার আধুনিক চিত্রাবলিতে তাহার লেশ মাত্র নাই। তিনি ইচ্ছা করিলে সে সকল দোষ সংশোধন করিয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু বাল্যরচনা দোষদুষ্ট হইলেও তাহা রচয়িতার অত্যন্ত আদরের বস্তু; তাহা অসংস্কৃত অবস্থায় রাখাই বোধ হয় শিল্পীর অভিপ্রেত; তাহা অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে কর্ম্মের তুলনায় বস্তুরূপে সহায়তা করে। যাহা হউক, তিনি সেই অপরিণত বয়সেই চিত্রনীতির সূত্র পঞ্চকের সকল তত্ত্বই যে সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, এবং সাধ্যমত তাহার অনুশীলন করিতে যত্ন করিয়াছেন, তাহা এ চিত্র দেখিলেও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। চিত্রের আবিষ্করণ, চরিত্র নির্ব্বাচন, বা পাত্র সমাবেশ (Composition), উদ্ভাবনা (Design), ছায়ালোক সমাবেশ (chiaroscuro) এবং বর্ণবিলেপন (colouring), চিত্রনীতিভুক্ত এই পঞ্চসূত্রেই তিনি অভিজ্ঞ। এই চিত্রে আবিষ্করণ বা চিত্রের উপাদান সংগ্রহ যেমন অভিনব, চরিত্র নির্ব্বাচন বা পাত্রসমাবেশও সেইরূপ সুন্দর হইয়াছে। যে স্থানে যেটীকে বা যাহাকে রাখিলে সুন্দর দেখাইবে, তিনি বেশ নিপুণ ভাবে ও ধৈর্য্য সহকারে তাহা রক্ষা করিয়াছেন। বাস্তবিক, এরূপ বিরাট্ পাত্র সমাবেশ সকল শিল্পীর সহজ-

সাধ্য নহে। দুই একটী মূর্ত্তির সমাবেশে চিত্র রচনা অপেক্ষাকৃত সহজ কার্য্য। কিন্তু বহুমূর্ত্তির সহযোগে সকলের অবস্থা ও ভাব অনুসারে তাহার সামঞ্জস্য-রক্ষা যথার্থই অতি কঠিন ব্যাপার। ইহার উপর আর্য্যসভ্যতা-সুলভ স্থাপত্য ও পরিচ্ছদাদির বিশুদ্ধিরক্ষাকল্পেও তিনি নিতান্ত অনবহিত ছিলেন না। চিত্রের তলপৃষ্ঠাস্থিত (Background) স্তম্ভাদি, চিত্রের সম্মুখভূমির (Fore-ground) অলঙ্কার-সমাবেশই তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। বাস্তবিক তিনি ইহাতে যে সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্থাপত্য অলঙ্কার রচনা করিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে। সকল চিত্রেই তাঁহার এই পরিচ্ছন্ন ভাব (neat-ness) অতি মনোরম। ইহাতে তাঁহার ধৈর্য্য, উদ্ভাবনী শক্তি ও নিপুণতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ছায়ালোকসম্পাত প্রতিচ্ছায়া ও প্রতিবিম্বিতা-লোকের প্রতিফলন ব্যাপারেও তিনি সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। বর্ণবিলেপন কার্য্যে এক্ষণে তিনি সিদ্ধহস্ত হইলেও সেই কিশোর বয়সে এই চিত্র অঙ্কনে তাহার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। এই সকল কলানীতি উচ্চবিজ্ঞানসম্মত। এ সকল সম্পূর্ণ আয়ত্ত না হইলে, বা ইহাতে উদাসীন হইলে, শিল্পীর চিত্তে ভাবের অক্ষয় ভাণ্ডার থাকিলেও, শিল্পী চিত্রে তাহা প্রতিভাত করিতে সমর্থ হইবেন না। সেই কৌশলই শিল্প এবং তাহার নীতিই বিজ্ঞান। যামিনী বাবু ভাব ও বিজ্ঞান, উভয় সম্পদেরই অধিকারী। তবে তাঁহার আধুনিক চিত্রাবলীর তুলনায় বলিতে হইলে, এই চিত্রে কোনও কোনও বিষয়ে সামান্য ত্রুটী আছে, তবে সে ত্রুটী আধুনিক অন্যান্য বঙ্গীয় শিল্পীর তুলনায় অতি সামান্য বলিতে হইবে। বিশেষ আজ কাল মাসিক পত্রাবলীতে সাধারণতঃ যে শ্রেণীর চিত্র দেখিতে পাই, তাহাতে ইহার উল্লেখ না করাই উচিত ছিল। কিন্তু আবার মনে হয়, যাহার সর্ব্বাঙ্গেই ক্ষত, তাহার কোথায় ঔষধ দিব? সেই কারণ কেবল শিল্পানুরাগী বা শিল্পশিক্ষার্থীর অবগতির জন্যই এই চিত্রের ত্রুটী সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই এক কথার উল্লেখ করিতেছি। চিত্র নীতিনির্দ্দিষ্ট পারিপ্রেক্ষিতিক (Perspective); ইহাতে বিশুদ্ধি সম্পূর্ণ রক্ষিত হয় নাই। শিল্পীর প্রথমেই বিরাট্ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার ফলেই এই সামান্য দোষ ঘটিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক বস্তুই পরিপ্রেক্ষিত নিয়মে ঠিক হইয়াছে; কিন্তু সকলের সমন্বয়ে দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, প্রত্যেক চিত্রের অন্তর্গত যে দিগ্বলয় রেখার (Line of Horizon) নির্দ্দিষ্ট স্থান হওয়া উচিত, তাহা ইহাতে নাই। উভয় চিত্রের প্রস্তর-সোপান গুলি দেখিলেই তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। যে সোপানটী

শিল্পীর চক্ষের সমসূত্রপাতে আসিয়া পড়ে, তাহার উভয়ের স্তর আর দৃষ্টি-গোচর হয় না, হইতেই পারে না; সুতরাং একই চিত্রে এক স্থানে সোপানস্তর রেখাকারে দিগ্বলয়ে লীন দেখাইয়া আবার স্থানান্তরে তাহার উপরের সোপানস্তর দেখান যুক্তিযুক্ত হয় নাই। দিগ্বলয়-রেখার বা শিল্পীর নয়নের উপরিস্থিত গোলাকার স্তম্ভের রেখাগুলি প্রায় সরল না হইয়া ক্রমান্বয়ে উভয় প্রান্ত নিম্নমুখী হইলেই স্তম্ভগুলির গোলত্ব প্রমাণিত হইত। দ্বিতীয় চিত্রের স্তম্ভের উপরি-স্থিত খিলানগুলির নিম্নাংশ না দেখাইবার ফলে, উহাদের প্রকৃত উচ্চতা প্রত্যক্ষ হইতেছে না। এই চিত্রের দক্ষিণ পার্শ্বের সোপানগুলির লীয়মান বিন্দু (Vanishing Point) সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়াছে। ঐ সোপানগুলি বাম দিকে বা সম্মুখ বিন্দুর দিকে লীন (Vanish) করা উচিত ছিল। এইরূপ আস্যরেখাদি (Airs) সম্বন্ধেও সামান্য সামান্য ত্রুটী আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ ত্রুটী তিনি ইচ্ছা করিলে সংশোধন করিয়া দিতে পারিতেন। বোধ হয়, বাল্য স্মৃতি বলিয়া তাহা করেন নাই।

যাহা হউক, আমরা আশা করি অতঃপর যামিনী বাবু তাঁহার আধুনিক কোনও কোনও চিত্র দিয়া সাহিত্যের চিত্রশালা গৌরবান্বিত করিবেন ও দেশের লোককে তাঁহার প্রকৃত পরিচয় দিয়া পরিতৃপ্ত করিবেন।

শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।

ওয়ারেন হেষ্টিংসের মীর মুন্সী।

ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের মীর মুন্সী সৈয়দ সদরুউদ্দিন বাঙ্গালার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, বাঙ্গালার তথাকথিত ইতিহাসাবলীতে তাঁহার নামোল্লেখমাত্রও পরিদৃষ্ট হয় না। বিজ্ঞবর বিভারিজ সাহেব তাঁহার Trials of Nanda Kumar নামক গ্রন্থে বারম্বার তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি সৈয়দ সদরউদ্দিনকে মুর্শিদাবাদের প্রধান ফৌজদার (Fouzdar General) সদরুল হকখান রূপে প্রতিপন্ন করিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বাঙ্গালী পাঠকবর্গের জন্য নিম্নে আমরা এই কৃতিপুরুষের জীবনবৃত্ত সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

মৌলবী সৈয়দ সদরউদ্দিন আহমদ প্রণীত "রওয়ায়ে-উল্-মুস্তফা" নামক পারস্য গ্রন্থ * হইতে জানা যায় যে, সৈয়দ সদরউদ্দিন ইমাম মুসা কাজিম হইতে উদ্ভূত বলিয়া কথিত এক অতি সম্ভ্রান্ত ও উচ্চবংশে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তদীয় পূর্ব্ব পুরুষগণ বাব্‌রা নগরীর অন্তর্গত মাণিকপুর নামক গ্রামে বসতি করিতেন। কথিত আছে, তখন এই গ্রামে কেবল সৈয়দ বংশীয় ভিন্ন অপর কোন জাতীয় লোকের বাস ছিল না। সৈয়দ হেসামুল হক নামধেয় তাঁহার জনৈক পূর্ব্ব পুরুষ বাঙ্গালার অধিপতি নসরত সাহের † এক কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই উদ্বাহের ফলে তিনি তদীয় স্ত্রীর প্রাপ্য তর্কা স্বরূপ বর্দ্ধমানের অন্তর্গত রণহাটি পরগণা জায়গীর লাভ করেন। এই জায়গীরের বার্ষিক আয় ছিল তিন লক্ষ টাকা। তৎপরে তিনি উক্ত জেলার অন্তঃপাতী বোহারের দুই মাইল পূর্ব্বে আভ্রা নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। তাঁহার বংশধরগণ বহু পুরুষ পর্য্যন্ত উক্ত স্থানে বিশেষ ক্ষমতা ও সুখের সহিত বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু কালক্রমে জমিদারীর কতক অংশ হস্তান্তরিত এবং

---

* গ্রন্থখানি ১৩০৭ হিজরী সনে কানপুরে লিথোপ্রেসে ছাপা হইয়াছে। মীরমুন্সীর নামের সহিত এই গ্রন্থের রচয়িতার শুধু নাম-সাদৃশ্য আছে এমন নয়, তিনি মীর মুন্সীর প্রপৌত্রও বটেন।

† সুলতান আলাউদ্দিনের পুত্র নসরত সাহ ১৫২৪ খৃষ্টাব্দ ৯৩০ হিজরী সনে বাঙ্গালার মসনদে আরোহণ করেন এবং ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দ ৯৪৫ হিজরী ইহধাম ত্যাগ করেন।

কতক অংশ তৈমুরবংশীয় রাজগণ দ্বারা বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়। ইহার পর সৈয়দবংশীয়গণ বিশেষ দরিদ্র হইয়া পড়েন। ইহার ফলে সৈয়দ সদরউদ্দিনের বংশই বিশেষতঃ দুরবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন। এমনই দুঃসময়ে সৈয়দ সদর উদ্দিন ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সৈয়দ সিরাজউদ্দিনের শৈশবাবস্থাতেই তাঁহাদের পিতা সৈয়দ মোহম্মদ সাদিক ইহধাম পরিত্যাগ করেন। অতঃপর তাঁহাদের অনাথা ও দারিদ্র ক্লিষ্টা জননীর তত্ত্বাবধানেই ভ্রাতৃযুগল প্রতিপালিত হইতে থাকেন।

পরের চাকরী গ্রহণ সম্বন্ধে সৈয়দবংশীয়দিগের মধ্যে একটা প্রবল কুসংস্কার বিদ্যমান ছিল। এই কুসংস্কারবশতঃ তাঁহারা চাকরী গ্রহণে আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু বংশ-পরম্পরাগত এই কুসংস্কারের বাঁধ ভাঙ্গিবার জন্যই যেন বিধাতা সৈয়দ সদরউদ্দিনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালেই সৌভাগ্যের অন্বেষণে গৃহ পরিত্যাগ করেন। তৎকালে তদীয় স্নেহময়ী জননী তাঁহাকে সস্নেহে বিদায় দিতে যাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন,—"বৎস! যাহা ইচ্ছা, তাহা করিও, কিন্তু উদরান্নের জন্য কখনও পরের নিকট যাচ্ঞা করিও না। সৈয়দ বংশীয়েরা কখনও ঐরূপ কাজ করেন নাই।" মাতার আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া সৈয়দ সদরউদ্দিন গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন কিন্তু কোথায় যাইবেন, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার দুই চক্ষু যে দিকে গেল, তিনি সেই দিকেই চলিতে লাগিলেন। এইরূপে চলিতে চলিতে তিনি অবশেষে রাজধানী মুর্সিদাবাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কথিত আছে, মুর্সিদাবাদে উপনীত হইয়াই তিনি তথাকার এক সম্ভ্রান্ত অভিজাত ও 'রইসে'র স্নেহলাভে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইতিহাসে তাঁহার নাম উল্লিখিত হয় নাই। সৈয়দ সদর উদ্দিন অত্যন্ত সুশ্রী পুরুষ ছিলেন। তদীয় অসামান্য সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া উক্ত রইস তৎপ্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়া পড়েন। তাঁহার মুখে তাঁহার সমস্ত অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া তিনি সৈয়দ সদর উদ্দিনকে 'তালিব-উল্-ইলম্' রূপে আপনার গৃহে স্থান প্রদান করেন। তাঁহার অনুগ্রহে সৈয়দ মুর্সিদাবাদের মাদ্রাসা-ই-নিজামতে ভর্ত্তি হইয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। বিধাতা যাহার অদৃষ্টে যেমন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তেমনটি কোন না কোন রূপে ঘটিবেই। সৌভাগ্যক্রমে এরূপ ঘটিল যে, প্রতিদিন মাদ্রাসায় গমনকালে সৈয়দ সদরউদ্দিনকে পথে মীরজাফরের সম্মুখ দিয়া যাইতে হইত। মীরজাফর তখনও একজন অল্পবয়স্ক যুবক ও অধ্যয়ন-নিরত ছাত্র।

প্রতিদিন সৈয়দ সদরউদ্দিনকে তাঁহার গৃহের নিকট দিয়া যাইতে দেখিয়া তিনি তদীয় রূপমাধুর্য্যে এতদূর বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, একদিন মীরজাফর তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াই মীরজাফর ক্ষান্ত হইলেন না, অপিচ তিনি সে দিন হইতে সৈয়দ সদরউদ্দিনকে আপনার আবাসে আনিয়া স্থান দান করিলেন। সে দিন হইতে সৈয়দ বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ নবাবের একজন প্রিয় সঙ্গী হইলেন এবং তাঁহারই অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপ দৈবানুগ্রহে উচ্চ শিক্ষা দীক্ষা লাভের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া অন্যান্য অনেক যুবকের মত তাহার অপব্যবহার না করিয়া যুবক সদরউদ্দিন আপনারই হিতার্থে তাহার বিনিয়োগে মনোনিবেশ করিলেন।

এই ভাবে প্রচুর শিক্ষা ও জ্ঞানলাভ করিয়া সৈয়দ সদরউদ্দিন হল্‌ওয়েল্ সাহেবের অধীনে তাঁহার কেরাণীর পদ গ্রহণ করিলেন। বিভারিজ সাহেব বলেন, পররাষ্ট্র বিভাগের দপ্তরে প্রাপ্ত কতিপয় কাগজ পত্র হইতে জানা যায় যে, সৈয়দ সদরউদ্দিন প্রথমে মহারাজ নন্দকুমারের অধীনেই চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং উক্ত মহারাজই হল্‌ওয়েল সাহেবকে সুপারিস করিয়া তাঁহাকে চাকরী লইয়া দিয়াছিলেন। মীরজাফর নবাবী পদে অভিষিক্ত হওয়ার পর সৈয়দ সদরউদ্দিন তাঁহার পুরাতন বন্ধুর নিকট চাকরীর জন্য উপস্থিত হন। তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ মাসিক এক শত টাকা বেতনের এক মুন্সীগিরি-পদে নিযুক্ত করিয়া মীরজাফর পুরাতন বন্ধুত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করেন। যেরূপ দক্ষতা ও কর্ম্মকুশলতার সহিত তিনি এই গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি শীঘ্রই স্বীয় প্রভুর বিশেষ বিশ্বাসের পাত্র হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি কতদিন এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ও মীরকাসিম নবাব হওয়ার পর বা মীরজাফরের দ্বিতীয়বার নবাবী আমলে তাঁহার কি হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহার কোন খবর পাওয়া যায় না। ইহার পর নবাব নজমউদ্দৌলার সিংহাসনারোহণ কাল পর্য্যন্ত তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথা জানা যায় না। শেষোক্ত নবাব নাজিমের আমলে আমরা তাঁহাকে একজন বিশেষ প্রভাবশালী লোক দেখিতে পাই। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মিঃ জনষ্টোন্ এবং লিচেষ্টার নবাব ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মধ্যে এক সন্ধি পত্রে নবাবের স্বাক্ষর করাইবার জন্য মুর্সিদাবাদ গমন করেন। এতদ্ঘটনা সম্বন্ধে মেজর ওয়ালস্ * এরূপ লিপিবদ্ধ

* A History of Murshidabad District দ্রষ্টব্য।

করিয়া গিয়াছেন, —"মিঃ জনষ্টোন্ ও লিচেষ্টরের আগমনের পূর্ব্বে নিজামতের পক্ষে প্রতিনিধি স্বরূপ কলিকাতায় প্রেরিত রাজা নবকৃষ্ণ নবাবকে জ্ঞাপন করেন যে, কলিকাতার মন্ত্রী সভায় নিজামতের দেওয়ান ও নায়েব নিয়োগ-সম্বন্ধে এক আলোচনা হইয়া গিয়াছে এবং তাহাতে মোহাম্মদ রেজা খাঁ উক্ত পদের জন্য মনোনীত হইয়াছেন। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া নবাব রেজাখাঁর নিয়োগ প্রস্তাবে আপত্তি করিয়া পাঠাইলেন; কিন্তু নবাবের এই প্রতিবাদ-প্রাপ্তির পূর্ব্বেই মন্ত্রী সভার সদস্যেরা ঢাকা হইতে মোহাম্মদ রেজাখাঁকে আহ্বান করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। নবাবের ইচ্ছা ছিল, মহারাজ নন্দকুমার উক্ত পদে নিযুক্ত হউন। এই সময়ে মিঃ ভান্সিটার্ট কলিকাতায় গবর্ণর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইতিমধ্যে সংবাদ আসে যে, পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী ক্ষমতা প্রদানপূর্ব্বক লর্ড ক্লাইবকে কলিকাতায় গবর্ণর পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠান হইতেছে এবং ক্লাইব ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষ যাত্রা করিয়াছেন। কলিকাতা হইতে মিঃ জনষ্টোন্ ও লিচেষ্টার এবং ঢাকা হইতে মোহাম্মদ রেজা খাঁ ১১৭৮ হিজরী সনের রমজান মাসে মুর্সিদাবাদে উপনীত হন। কলিকাতার মন্ত্রী সমাজ মিঃ মিড্‌লটনকেও এতৎকার্য্যে যোগদান করিবার জন্য পাঠাইয়া-ছিলেন। ইহারা সকলে একযোগে নবাবের সমক্ষে উপস্থিত হন এবং সন্ধি-পত্রের সর্ত্তাদি নির্দ্ধারণ কল্পে এক সভা নিযুক্ত করেন। এই সভায় নবাবের নাজিমের পক্ষে মহারাজ নন্দকুমার এবং মুন্সী সদরউদ্দিন প্রতিনিধি স্বরূপ উপস্থিত ছিলেন। প্রথম দিনের সভায় উভয় পক্ষে অনেক আলো-চনা ও বাদানুবাদের পর সভা স্থগিত থাকে। দ্বিতীয় দিনের সভায় মুন্সী সদর উদ্দিন বলিলেন, যে নবাবের সহিত কোম্পানীর শেষ সন্ধি পত্র যে ভাবে হইয়াছিল, এই নূতন সন্ধি পত্রও ঠিক সেইভাবেই লিখিত হউক। তিনি আরও বলিলেন যে, নবাব নাজিম নানা কারণে মোহম্মদ রেজা খাঁর নিয়োগ মঞ্জুর করেন নাই। ইহাতে মিঃ জনষ্টোন্ জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার আদেশে মুন্সী এই সভায় যোগদান করিয়াছেন? তদুত্তরে মুন্সী সদর উদ্দিন বলিলেন যে, নাজিমের ভৃত্যবর্গ নাজিমের হিতাহিতের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া পারেন না। এই কথা শুনিয়া মিঃ জনষ্টোন্ ক্রোধভরে বলিলেন, তাঁহারা এই বিষয়ে মুন্সী সদর উদ্দিনের সহযোগিতা চাহেন না। এই কথায় মুন্সী সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া সভার বহির্ভাগে বসিয়া রহিলেন।"

যাহা হউক, মিঃ জনষ্টোন্ অবশেষে নবাবকে স্বপক্ষে আনয়ন করিতে

সক্ষম হইয়াছিলেন এবং সন্ধি পত্রে নাজিমের স্বাক্ষর ও শীলমোহর অঙ্কিত করাইয়া লইয়াছিলেন। এই সকল ঘটনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মুন্সী সদর উদ্দিন নবাব নজম-উদ্দৌলার আমলের প্রথম ভাগে নিজামত আদালতে কোন এক উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

নবাব নাজিম নজম উদ্দৌলার উপর মহারাজ নন্দকুমারের মত মুনসী সদর-উদ্দিনেরও বিশেষ প্রভাব ছিল। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রদান ব্যাপারে যাঁহারা যাঁহারা বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন, মুন্সী সদর উদ্দিন তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। তাঁহার সাহায্য না পাইলে লর্ড ক্লাইবের পক্ষে এত শীঘ্র এই কার্য্যে সাফল্য লাভ কতকটা কঠিন হইত, সন্দেহ নাই। লর্ড ক্লাইব সুচতুর পুরুষ ছিলেন। তিনি মিঃ জনষ্টোনের মত মুনসীর প্রতি পরুষ ব্যবহার দ্বারা তাঁহাকে শত্রু করিয়া আপনার উদ্দেশ্য সাধন পথে বিঘ্নোৎপাদন করা ভাল মনে করেন নাই। ক্লাইব চাতুরীজাল বিস্তার করিয়া মুন্সী সদরউদ্দিনকে স্বপক্ষে ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। তাহার ফল এই হইল যে, মুন্সি নবাব নাজিমকে নানা কথা বুঝাইয়া সম্পূর্ণরূপে ক্লাইবের ইচ্ছামতই কাজ করিতে সম্মত করাইলেন। এই বিষয়ে মুন্সী সদর উদ্দিনের সহিত লর্ড ক্লাইব ও রেসিডেণ্ট সাইকের যে সকল কার্য্য সংঘটিত হয়, মেজর ওয়াল্স্ তাহার সুন্দর বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় যে, এই সময়ে নবাব নাজিমের উপর মুন্সী সদর উদ্দিনের খুব বেশী প্রভাব ছিল। এই বিষয়ে মুন্সী ক্লাইবের যে উপকার করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তাহারই পুরস্কার স্বরূপ রাজকীয় কার্য্য সম্পাদনের জন্য মুন্সী সদর উদ্দিনকে নায়েব এবং নাজিমের প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এই পদের মাসিক বেতন ১০০৲ টাকা ছিল। যে পত্রে মীরজাফর ক্লাইবকে তাঁহার 'নুর চসম' রত্ন, স্বর্ণ মুদ্রা ও নগদ টাকা প্রভৃতিতে পাঁচলক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন, মণি বেগম যখন আয়না মহলে সেই সুপ্রসিদ্ধ চরম পত্র খানি ক্লাইবকে দিতে যান তখন মুন্সী সদর উদ্দিনই ক্লাইবের নিকট মণি বেগমের দূত স্বরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। ইতি মধ্যে নবাব নজম উদ্দৌলাও ক্লাইবকে মীরজাফরের এই দান পত্রের (উইলের) বিষয় লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। স্বর্ণ মুদ্রা ও রত্নাদির পরিবর্ত্তে নগদ মুদ্রা ও দুইলক্ষ টাকার চেক তাঁহাকে প্রদত্ত হইবে, ক্লাইব এই সর্ত্তেই উক্ত দান গ্রহণে সম্মত হইলেন। পরিশেষে তিন লক্ষ টাকা নগদ ও দুই লক্ষ টাকার এক

চেক মুন্সী সদর উদ্দিনের মারফত ক্লাইবের নিকট প্রেরিত হয়। নবাব নজম-উদ্দৌলার বিশেষ বিশ্বস্ত কর্ম্মচারিগণের মধ্যে মুন্সী সদর উদ্দিন একতম ছিলেন। এমন কি, নাজিমের অন্তিমকাল পর্য্যন্ত তাঁহার এই বিশ্বস্ততার তিলমাত্র হ্রাস হয় নাই। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল লক্ষ্ণৌ গমন কালে লর্ড ক্লাইব ছাদকবাগে অবস্থিতি করেন। নাজিম নজম-উদ্দৌলা তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান। যে দিন ক্লাইব তথা হইতে প্রস্থান করেন, সে দিন নাজিম তাঁহাকে এক ভোজ দিতেছিলেন। এই সময়ে নাজিম হঠাৎ বিষম জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। এইজন্য উক্ত ভোজে অভ্যাগতবর্গকে তাড়াতাড়ি বিদায় করিয়া দেওয়া হয়। নবাব মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দরবারের হাকিমগণের চিকিৎসাধীন হইলেন। সে দিন চারি ঘটিকার সময় তাঁহার অবস্থা কতকটা ভাল বোধ হওয়ায় উপস্থিত কর্ম্মচারিবর্গকে বিদায় করিয়া দেওয়া হইল। রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় জ্বর পুনরায় নূতন ভাবে দেখা দিল। নবাব মোহাম্মদ রেজা খাঁ এবং হাকিম মোহাম্মদ হোসেনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, সমস্ত রাত্রি চলিয়া গেল; তথাপি তাঁহারা কেহই আসিলেন না। মুন্সী সদরউদ্দিনের উৎসঙ্গেই নাজিম সারা রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। পরদিন প্রভাতে মুজাফর জঙ্গ, হাকিম মোহাম্মদ হোসেন এবং অন্যান্য অমাত্যবর্গ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তখন নাজিম একবারে সংজ্ঞাবিরহিত। তারপর তাঁহার আর সংজ্ঞা লাভ হয় নাই। সেই মূর্চ্ছিত অবস্থাতেই তাঁহার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে তারিখে নশ্বর জগতের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা দূরে ফেলিয়া নবাব নাজিম নজম উদ্দৌলা অনন্ত ধামে প্রস্থান করেন। ইহার পর মেজর ওয়াল্সের গ্রন্থে মুন্সী সদরউদ্দিনের আর কোন উল্লেখ দেখা যায় না।

মুন্সী সদরউদ্দিনের বুদ্ধিমত্তা ও কর্ম্মনৈপুণ্যের পরিচয় পাইয়া তৎপ্রতি অচিরকাল মধ্যে সুপ্রসিদ্ধা মণি বেগমের সুদৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বেগম সাহেবার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাঁহাকে তাঁহার অন্যান্য কার্য্য ব্যতিরিক্ত বেগম সাহেবার দেওয়ানের পদও গ্রহণ করিতে হইল। তিনি এই পদেও বিশেষ কার্য্যক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা বেগম সাহেবার বিশেষ বিশ্বাস-ভাজন হইয়াছিলেন। কথিত আছে, বেগম সাহেবা তাঁহাকে এতই ভাল বাসিতেন যে, তিনি তাঁহাকে পুত্র সম্বোধন করিয়া সে ভালবাসার অভিব্যক্তি করিতেন। একদা যখন মুন্সী সদর উদ্দিন তাঁহার বৃদ্ধা জননীকে দেখিবার জন্য ও. বিক্রের

বিবাহের জন্ম স্বদেশে গিয়াছিলেন, সেই সময় বেগম সাহেবা তাঁহাকে বহু অর্থ ও তাঁহার স্ত্রীর জন্য অনেক মূল্যবান অলঙ্কার প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু এই মহিমান্বিতা রমণীর অত্যধিক প্রীতি-ভাজন হওয়াই উত্তরকালে তাঁহার চিরদিনের জন্ম মুর্শিদাবাদ ত্যাগের এবং ইংরেজের অধীনে চাকরী গ্রহণের কারণ হইয়াছিল। তাঁহার প্রপৌত্র অধুনা পরলোকগত মৌলবী সদরউদ্দিন আহমদ আলিমুল্লাভি সাহেব * এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, এ স্থলে আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। কথাগুলি পুরুষ-পরম্পরাক্রমে তাঁহাদের বংশে চলিয়া আসিতেছে এবং সেগুলি সত্য বলিয়া গ্রহণ না করিবার পক্ষে কোন কারণও দেখা যায় না। আরও একটা কারণে কথাগুলি বিশ্বাস করিতে হয়। সকলেই জানেন, নবাব সৈফ উদ্দৌলার শাসনকালে মুন্সী সদর উদ্দিনের শত্রুরাই ক্ষমতাশালী ছিলেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহারা যে মুন্সীকে অপমানিত ও অপদস্থ করিয়া মণি বেগমের ক্ষমতা হ্রাস করিবার চেষ্টা করিবেন, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। কিন্তু মুন্সীকে অপদস্থ করা তাঁহাদের এক দিনের কাজ ছিল না। এই কারণেই—যদিও তাঁহার শত্রুবর্গ তাঁহার অনিষ্ট সাধনে চেষ্টার কোন ত্রুটী করেন নাই, তথাপি তাঁহারা নবাব মোবারক উদ্দৌলার শাসনকালের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন অনিষ্ট সাধনে সক্ষম হন নাই। ঐশ্বর্য্য ও পদ-গর্ব্বে মত্ত হইয়া মুন্সী কখনো ভাবেন নাই যে, দুরদৃষ্টের ভীষণ শল্য তাঁহার বুকের রক্ত পান করিবার জন্ম সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাঁহার ক্রূরমতি অরিবৃন্দ কিছুতেই আপনাদের দুষ্ট অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে না পারিয়া অবশেষে মণি বেগমের সহিত তাঁহার অবৈধ সম্বন্ধ বিষয়ে নানা কলঙ্ক রটনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে এই সকল কলঙ্ক-কাহিনী ভীষণ আকার পরিগ্রহ করিল। মুন্সী সদর উদ্দিন সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ছিলেন, কিন্তু অপরিণতবুদ্ধি নবাব তাঁহার কুমন্ত্রী অনুচরবর্গের কুপরামর্শে অবিলম্বে মুন্সী সদর উদ্দিনের শিরশ্ছেদ করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। সদর উদ্দিন এই আদেশের কথা কিছু জানিতেন না। কথিত আছে, একদিন

---

* এই প্রবন্ধের প্রথম ভাগে উল্লিখিত পারস্য গ্রন্থের রচয়িতা সৈয়দ সদর উদ্দিন আহমদ আর ইনি একই ব্যক্তি। তিনি দুষ্প্রাপ্য হস্তলিখিত গ্রন্থ-সংগ্রহ ও পাণ্ডিত্যের জন্ম বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি বর্দ্ধমানের একজন প্রধান জমিদার ও ওয়াকফ্ ষ্টেটের মতোয়ালী ছিলেন। ১৯০৫ ইংরেজী ২৩ জুলাই তারিখে তিনি কলিকাতা নগরীতে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

প্রাতঃকালে তিনি আম্র-কূটের ধূমপান করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার এক বিশ্বস্ত বৃদ্ধ চাপরাসী দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে এই আসন্ন বিপদের কথা জ্ঞাপন করে। এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণে তাঁহার অন্তঃকরণে কিরূপ ভাব উদয় হইয়াছিল, তাহা শুধু কল্পনার বিষয়। এরূপ মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া,—এরূপ বিশ্বস্ততা সহকারে তিনি যাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণের সেবা করিয়া আসিতে-ছিলেন, সেই মনিবের নিকট তিনি কখনও স্বপ্নেও এরূপ প্রত্যাশা করেন নাই। তিনি ভালরূপে জানিতেন, নিজের নির্দ্দোষিতা সুপ্রমাণ করিয়া এরূপ ক্ষিপ্রকারিতা সহকারে প্রদত্ত দণ্ডাদেশের পুনর্ব্বিবেচনার জন্য প্রার্থনা করিলে তাহা সম্পূর্ণ নিষ্ফলই হইবে। সুতরাং তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া প্রাণ-রক্ষার্থ মুর্শিদাবাদ হইতে পলায়ন করিলেন। স্বীয় বস্ত্রাভ্যন্তরে লুক্কায়িত করিয়া কতকগুলি বহুমূল্য রত্ন লওয়া ভিন্ন পলায়ন কালে তিনি আর কিছুই সঙ্গে নিতে পারেন নাই। যিনি কা'ল দেশে একজন প্রবল ক্ষমতাশালী পুরুষ ছিলেন, আজ তিনি একজন দীনবেশী ও প্রাণভয়ে পলায়নপর নির্ব্বাসিত ব্যক্তি! যিনি কা'ল শত শত ব্যক্তির প্রাণদণ্ড সজ্যটনে সক্ষম ছিলেন, আজ তিনি যেখানেই গমন করিতেছেন, মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা ছায়ার ন্যায় সেখানেই তাঁহার অনুগমন করিতেছে! নিয়তির কি দুর্নিরীক্ষ্য গতি!

(ক্রমশঃ)

আবদুল করিম।

জাপতির নির্বন্ধ।

(নক্সা)

(১)

কাতলামারার আড়তদার হরিমোহন মজুমদার বৃদ্ধ বয়সে তৃতীয় সংসার করিয়া পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়াছেন, সুতরাং তাড়াতাড়ি পুত্রবধূর মুখ দেখিবার জন্ম তিনি ও তাঁহার তৃতীয় পক্ষ উভয়েই অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। রাইগঞ্জের ডাক্তার শ্রীচরণ প্রামাণিকের দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা নবমল্লিকা ওরফে 'হারাণী' দেখিতে শুনিতে মন্দ নহে—কিন্তু রং কাল। শ্রীচরণ ডাক্তার হরিমোহনের বার্দ্ধক্যের খেয়ালের কথা শুনিয়া তাঁহার নিকট ঘটক্ পাঠাইলেন। শ্রীচরণ ডাক্তারের নাম যশ হরিমোহনের অজ্ঞাত ছিল না। এমন লোক যাচিয়া তাঁহার ঘরে মেয়ে দিতে চাহিতেছেন, হরিমোহনের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি বলিলেন, "মেয়ে একটু কাল, আর ছেলের সঙ্গে একটু অসাজন্ত হইবে, তা হোক্, বৌত আর বাজারে বিক্রী করিতে যাইব না। সাম্‌নের বৈশাখ মাসেই বিয়ে দেব।"

গিন্নি ভবসুন্দরী নথ ঘুরাইয়া বলিলেন, "কালো মেয়ে যে আন্‌বো—বেয়াই দেবেন-থোবেন কি? আমি বাঁউড়ি সুট গহনা চাই।"

কথাটা শ্রীচরণ ডাক্তারের কানে গেল, তাঁহার কালো মেয়ে এত সহজে বিকাইবে ইহা তিনি আশা করেন নাই; শ্রীচরণের স্ত্রী পদ্মমুখী বলিলেন, "সে জন্ম আর ভাবনা কি? আমার পাঁচ নয় সাত নয়, ঐ একটি মেয়ে, মেয়েকে আমি গা ভরা গহনা দেব।"

হরিমোহন কিন্তু কৃপণ ধাতের লোক, 'রূপচাঁদ' ভিন্ন সংসারে তিনি আর কিছু বড় একটা চিনিতেন না; বিশেষতঃ পাটের ব্যবসায়ে তিনি কয়েক বৎসরেই মা কমলাকে তাঁহার গুদামে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি যে সমাজের লোক সে সমাজে ছেলের বিবাহ দিয়া এ পর্য্যন্ত কেহই সুবিধা রকম 'দাঁও' মারিতে পারে নাই, সুতরাং শ্রীচরণ ডাক্তারের কন্যার সহিত হাজার দুই টাকার অলঙ্কার প্রাপ্তির সম্ভাবনায় তিনি আহ্লাদে মুক্তকচ্ছ হইলেন। তিনি তাঁহার

কাঁচা পাকা দাড়ীর মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে হর্ষবিগলিতস্বরে বলিলেন, "না হবে কেন? শ্রীচরণ ডাক্তার কত বড় লোক! আমার ছেলেটিকে তাঁহাকেই দেব, তবে কি না এ বৎসর পেটো মহাজনদের সর্ব্বনাশ! আমার তহবিলে টাকার বড় খাঁকৃতি, তা বেয়াই মহাশয় যখন এতখানি অনুগ্রহই দেখাচ্ছেন, তখন এ দুর্ব্বৎসরে তাঁকে আর একটু ভাগ নিতে হবে। বিয়েতে আমার বিস্তর খরচ পত্র হবে, তহবিল থেকে তা যে যোগাড় করে উঠতে পারবো, এমন ভরসা করতে পারচি নে। বিয়ের খরচ পত্র সম্বন্ধেও তাঁকে কিছু সাহায্য করতে হবে; নৈলে আমি বছর খানেক 'খোকার' বিয়ে দিতে পারবো না।"

শ্রীচরণ বাবু হরিমোহনের নূতন প্রস্তাব শুনিয়া কিছু ভীত হইলেন, পাছে পাত্রটি হাতছাড়া হয় এই ভয়ে তিনি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন, "সে জন্য আট্‌কাবে না। আমার দ্বারা যতটুকু হয় তাতে ক্রটী হবে না।'

ঘটক মারফৎ এ কথা শুনিয়া হরিমোহন আশ্বস্ত হইলেন, হাসিয়া বলিলেন, "হেঁ হেঁ, তখনই জানি শ্রীচরণ বাবু এই সামান্য বিষয়ে আপত্তি করবেন না। আরে, আপত্তিই যদি হবে—তাহ'লে আমার ছেলের সঙ্গে তিনি মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করেন? তা দেখ ঘটক ঠাকুর, সবই যেন হোলো, কিন্তু বেয়াই মশায়কে ত একটা কথা বলা হয় নি। তিনি যেন আমার শ্যামচাঁদকে সোণার দোয়াত কলম দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে যান। শুভকার্য্যে এ অঙ্গহানিটুকু আর কেন থাকে?"

ঘটকটি শ্রীচরণ ডাক্তারের বিশেষ অনুগত লোক, রোগীর নাড়ী টিপিয়া এবং তাঁহার এবং তাঁহার আবিষ্কৃত ম্যালেরিয়ার অব্যর্থ 'পেটেণ্ট' 'সর্ব্বজরান্তক রস' বিক্রয় করিয়া শ্রীচরণ কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, ঘটক মহাশয়ের তাহা অবিদিত ছিল না। বিশেষতঃ হরিমোহন তাঁহার অপোগণ্ড শিশু সন্তানের বিবাহ দিয়া বৈবাহিকের নিকট নানা রকমে গুরুতর 'দাঁও' মারিবার চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া স্পষ্টবাদী ঘটক ঠাকুরের পিত্ত জ্বলিয়া গেল। তিনি কিঞ্চিৎ শ্লেষের সহিত বলিলেন, "তোমার ছেলে এখনও পাঠশালায় কলা পাতায় লেখে, সোণার দোয়াত কলমের ফরমাস্ কর্‌তে তোমার লজ্জা হচ্ছে না? দাঁড়ি পাঁচসেরার সঙ্গে সোণার দোয়াত কলমের কি সম্বন্ধ?"

হরিমোহন তাঁহার গোল গোল রক্তাক্ত চক্ষু দুটী কপালে তুলিয়া এবং ভুরু যোড়াটা জ্যা-সমাকৃষ্ট ধনুকের ন্যায় বক্র করিয়া বলিলেন, "কি যে বল

ঠাকুর! তার না আছে মাথা আর না আছে মুণ্ড। জাফরগঞ্জের মহারাজা তাঁর ভাইপোর সঙ্গে দুর্গতিদত্তের কালো মেয়ের সে দিন বিয়ে দিলেন। মেয়েটী প্রথমে মহারাজার পছন্দ হয় নি, কুচ্‌কুচে কালো কি না। ইতিমধ্যে হঠাৎ কি কাণ্ড হ'লো জান? 'জাক্রানের' ('জর্ম্মান' শব্দের গ্রাম্য অপভ্রংশ) সঙ্গে লড়াই করতে যে সব দেশী ফৌজ কালাপাণির পারে গিয়েছে, তাঁদের তামাক ইচ্ছা হয়েছে; তা হুকো কল্‌কে টিকে তামাক পাঠালে তাদের হাতিয়ার ধর-বার অসুবিধা হয় ভেবে মহারাজা তাদের জন্যে পঞ্চাশ হাজার টাকার এক জাহাজ 'বিড়ি' পাঠানোর বন্দোবস্ত করেন; কিন্তু মহারাজার তহবীলে টাকা নাই, এবার পাট বিক্রীর অভাবে মালগুজারি আদায় হয় নি। মহারাজা টাকার জন্যে ভারি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, খবর শুনে দুকড়ি দত্ত ঝাঁ করে পঞ্চাশ হাজার টাকার এক চেক মহারাজার সামনে ধরলে। আর দুর্গতিদত্তের কালো মেয়েটা মহারাজার সাম্‌নে এক লহমার মধ্যে পরীর মত সুন্দরী হয়ে উঠলো। আরে ভাই রূপচাঁদের পয়জার ভারি পয়জার, বদ্‌লোকে দুর্ণাম রটায় বটে, কিন্তু লাগে কেমন মিঠে! তা আমি ত সোণার দাঁড়ি বাটিখারা চাইনি, চেয়েছি দোয়াত কলম; এতেও যদি বেয়াই রাজি না হন, তা হলে কি ক'রে এ দুর্ব্বৎসরে বিয়ে দিয়ে উঠি? আমার ছেলে সবে এই চোদ্দয় পা দিয়েছে, সে ত আর ঘর ভেঙ্গে পালাচ্ছে না। আর মেয়েটিও নিখুঁত পরী নয়, পাজী ব্যাটারা বলে আমি টাকার লোভে বিয়ে দিচ্ছি!"

ঘটক বলিলেন, "না, তুমি মেয়ের রূপ দেখেই বিয়ে দিচ্ছ! তা দেখ হরিমোহন, অত টানাটানি করলে ছিঁড়ে যাবে। এ দাঁও ফস্‌কালে এমনটি আর মিল্‌বে না।"

হরিমোহন বলিলেন, "বেয়াই মশায় মস্ত লোক, বোঝার উপর শাকের আঁটি বইতে পারবেন।"

ঘটক বলিলেন, "এত শাকের আঁটি নয়, এ যে 'ভাতের কাটি।' প্রথমে কথা হয়, সোণার চেন আর রূপোর ঘড়ি; তুমি বল্লে সোণার সঙ্গে আমাদের রূপো ব্যবহার করতে নেই, ঘড়িটা সোণার দিতে হবে। শ্রীচরণ বাবু তাতেই রাজী হলেন। তার পর ফস্ করে বলে ফেল্‌লে সিঁথি একালে অচল, বেয়াই যেন বৌমার মাথায় 'টায়েরা' দেন; শ্রীচরণ বাবুকে রাজী করতে কি আমাকে অল্প বেগ পেতে হয়েছে? তুমি ত বলে রেখেছ, বিয়েটা দিতে পারলে পঞ্চাশ টাকা ঘটক বিদেয় করবে। এখন আবার বলছ সোণার দোয়াত কলম চাই,

কোন দিন বলে না বস, ছেলের জন্তে সোণার ঝিনুক আর সোণার চুষিকাটি না দিলে বিয়ে হবে না।"

হরিমোহন তাম্বূলরাগরঞ্জিত সুপ্রশস্ত দংষ্ট্রাপংক্তি বিকশিত করিয়া বলিলেন, "হা, হা, ভায়া বড় যে ঠাট্টা কর্‌ছো! তা চোদ্দ বছর বয়সের ছেলের জন্ত ঝিনুক আর চুষিকাটির ফরমাস করলে যে বেয়াই মশায় আমার মাথায় দিবার জন্ত তাঁর সেই যে কি বলে 'বায়ুবিমর্দ্দিনী' তৈলের ব্যবস্থা করবেন। তা সোণার দোয়াত কলমটা আদায় করা চাই। ঘটক বিদেয় আর দু টাকা বেশী পাবে।"

ঘটক ঠাকুর মাথা চুল্‌কাইয়া বলিলেন, "যাঁহা বায়ান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন, আচ্ছা তা দেখা যাবে।"

শ্রীচরণ ডাক্তার যথাসময়ে সেকরা ডাকিয়া সোণার দোয়াত কলমের ফরমাস্ দিলেন।

শ্রীচরণের বন্ধু হারাধন মোক্তার বলিলেন, "এক মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে ভায়া কি সর্ব্বস্বান্ত হবে? বুঝে সুঝে কাজ কর। অন্ত যায়গায় 'চেষ্টা চরিত্তি' করে একটা ভাল ছেলে দেখ।"

শ্রীচরণ গোঁফ ফুলাইয়া বলিলেন, "ঐ একটা বৈ মেয়ে নয়। বিশেষতঃ হরিমোহন বাবু এক পয়সাও চান্ নি, যে না চায় তাকে খুঁটিয়ে দিতে হয়। অনেক টাকা উপায় করেছি, খরচও বিস্তর করেছি,—মেয়েটির বিয়ে দেবো—পাঁচ জন দেখে যেন বলে,—'হাঁ শ্রীচরণ ডাক্তার বিয়ের মত বিয়ে দিয়েছে!'—মেয়ে জামাইকে যা দেব—দেখে যেন লোকে ধন্য ধন্য করে।"

মোক্তার মশায় বলিলেন, "না চাইতেই এই, চাইলে না জানি কি অশ্বমেধ 'যজ্ঞি' করে ফেল্‌তে! তা তোমার ছাগল ন্যাজের দিকে কাট না। আমাদের—কথায় বলে 'মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ।' এক পেট খ্যাটনের যোগাড় হলেই হোল।"

শ্রীচরণ নরম হইয়া বলিলেন, "দেখ দাদা, জামাই অনেক পাওয়া যাবে, কিন্তু এমন বনেদী ঘর, এমন চাল চলন দোরস্ত বেয়াই আর কোথায় পাব? তার উপর আমার মেয়েটী তেমন ফরসা নয় কি না? এ সুযোগ কি ছাড়্‌তে আছে?"

শ্রীচরণ সুযোগ ছাড়িলেন না। বরযাত্রাদের বারবরদার খরচ, রস্থন চৌকী ও জগঝম্পর খরচ, ঝাড়ি ও বারুদের কারখানায় যে সকল রঙ্গমশাল, মাহাতাপ, তুবড়ী, বোম্, হাউই, চরকি, তুইচাঁপা, কদমগাছ—ইত্যাদি ইত্যাদি বাজির বায়না দিতে হইবে,—তাহাদের মূল্য প্রভৃতি বাবদে নগদ

ছয় শত টাকা মায় বাঁউড়ি সুট, অলঙ্কার আদায় করিয়া কাতলামারীর আড়তদার হরিমোহন মজুমদার শ্রীচরণের কন্যার সহিত তাঁহার শিশু পুত্রের বিবাহ দিতে আসিলেন।

(২)

বিবাহ সভায় আসিয়া হরিমোহন বলিলেন, "আমাদের নিয়ম বিবাহের পূর্ব্বে সালঙ্কারা কনেকে দেখিতে হয়।"

একজন কন্যাযাত্রী—তিনি মেয়ের মামা—কোমরে গামছা বাঁধিয়া একটা খেলো হুঁকা চুম্বন করিতে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ছেলের বিয়ে দিতে এসে দাঁড়ি বাটখারা সঙ্গে আনা বেয়াই মশায়দের দেশে নিয়ম নাই? দক্ষিণ দেশের অনেক যায়গাতেই যে এ 'র‍্যাওজ'টা হয়েছে।"

হরিমোহন মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, "তাই নাকি? তাই নাকি? তা ছেলের বিয়ে দিতে এসে সঙ্গে দাঁড়ি পাঁচসেরা আনবার কারণ?"

মামা বুড় রসিক, সেকেলে লোক, তার উপর দুই এক ছিলিম 'বড় তামাক' (গঞ্জিকার গ্রাম্য অপভ্রংশ) টানিয়াও থাকেন। নির্ব্বাপিত কলিকাসহ খেলো হুকাটি নির্ব্বিকার চিত্তে বেয়াই মহাশয়ের করপদ্মে সমর্পণ করিয়া কোমর হইতে গামছা খুলিয়া তদ্দ্বারা ঘর্ম্মাক্ত ললাট মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "মেয়ের বাপ ঠিক ঠিক ওজনের গহনাগুলা দিয়াছে কিনা তা ওজন ক'রে দেখবার জন্যে দাঁড়ি বাটখারা আনা একশো বার দরকার।—আমাদের রানাঘাট শান্তিপুর হুগলী কল্‌কাতা এ দক্ষিণ অঞ্চলের সকল যায়গাতেই বরের ধাপ—বিয়ের সম্বন্ধ পড়্‌তে না পড়্‌তে কামার বাড়ী ছুটাছুটি করেন।"

বরের বাপ লংক্লথের একটা আন্‌কোরা পিরিহানের গলার ফাঁক দিয়া তুলসী কাঠের তিনকাঠি ময়লা মালা বাহির করিয়া—নির্ব্বাপিত খেলো হুকায় উর্দ্ধশ্বাসে একটান্ দিয়া বলিলেন, "কামার বাড়ী আনাগোনা কর্‌বার কারণ?"

মামা সোৎসাহে বলিলেন, "আমাদের দেশে প্রবাদ আছে, 'চোরে কামারে দেখা হয় না।' কিন্তু ছেলের বাপের সঙ্গে কামারের নিত্য দেখা হয়। কারণ তাঁর একখান ছুরি তৈয়ারী করা আবশ্যক।"

হরিমোহন বলিলেন, "বিবাহে ছুরী? আমাদের দেশে দর্পণ ব্যবহার হয়। নাপিতের দর্পণ, অভাবপক্ষে জাঁতি একখান বরের হাতে থাকে।"

মামা বলিলেন, "একালে দর্পণ দূরের কথা জাঁতিতেও আর কুলানাচ্ছে না! এখন ছুরী চাই; কখন কখন বরের হাতে থাকে বটে, কিন্তু বেশী সময়ই বরের বাপদাদার হাতে থাকে। সে ছুরী মেয়ের বাপের গলায় দিবার জন্যে। লাভের মধ্যে ইংরাজের দণ্ডবিধি আইন, পশুক্লেশ নিবারিণী সভার মন্তব্য এখানে নিষ্ফল। বাবা, মস্ত মস্ত সভা কর্‌চো, আর মুখে বল্‌চো— 'বর বিক্রয় অতি অন্যায়, ভারি অন্যায়; বিহিত করো। খবরদার ছেলের বিয়েতে পণ চেয়োনা, পণ নিয়োনা।' আর ছেলের বিয়ের সময় সব ভুলে যাচ্ছ! এ রকম কর্‌লে চোদ্দ হাজার বচ্ছরে তোমাদের সমাজ সংস্কার হবে না, শেষে রাজার আইন যখন তোমাদের কাণ ধরে বল্‌বে, 'ছেলের বিয়ে দিয়ে এক পয়সাও নিতে পার্‌বে না;' তখন তোমাদের চৈতন্য হবে, তার আগে নয়।—হাঁ, মেয়ের বিয়ে দিতে হয় ত উত্তুরে যেতে হয়।"

হরিমোহন বলিলেন, "উত্তুর? বাপ্‌রে! বাঙ্গাল দেশ। সে দেশে বিয়ে দিয়ে মেয়েকে জলে ফেল্‌বে, এমন হতচ্ছাড়া বাপ কে আছে?"

মামা বলিলেন, "কেন, আমিই একজন? আপনাদের রানাঘাট শান্তিপুরের অনেক বাবু ভায়া আজকাল উত্তুর দেশে রাজসাহী, রঙ্গপুর, বগ্‌ড়ো, দিনাজপুরে বিয়ে দিচ্ছে।—বাবা, চড়ুইখালীর ইংরাজী স্কুলে একটা মাষ্টারী চাকরী খালি হয়, মাসে ষাট টাকা মাইনা। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হলো। পাঁচটা এম, এ, সেই চাকরীর জন্যে দরখাস্ত কর্‌লে। আমার জামাইয়ের এমন ষাট সত্তর টাকার চাকর আট দশজন আছে।"

হরিমোহন মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "হাঁ উত্তুরে ধান আছে বটে, কিন্তু সে দেশের লোকগুলা ভারি অসভ্য।"

মামা বলিলেন, "অর্থাৎ তাহারা ভিতরের 'ছুঁচোর কেত্তন' ঢাকিবার জন্য উপরে 'কোঁচার পত্তন' করে না। পেটে না খেয়ে মুখে একটা পান গুঁজেত তারা ঢেঁকুর তুলতে জানে না! ভারি অসভ্য! তাদের গোয়াল ভরা গরু, গোলা ভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ। তাদের কুটুম্বিতা খাঁটি কুটুম্বিতা; তুমি আমার, আমি তোমার এই ভাব। বেয়াইয়ের গলায় দিবার জন্য তারা ছুরী শাণাতে শেখে নি। তারা ঘোর অসভ্য!"

হরিমোহন বলিলেন, "তুমি যে বাঙ্গাল দেশের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠ্‌লে! মেয়ের বিয়ে খুব ফাঁকিতে দিয়েছ বুঝি? তারা কিছু চায় টায়নি বুঝি? তাদের সরল বল্‌তে পার, কিন্তু এমন লোককে বুদ্ধিমান্ বলা যায় কি ক'রে?"

মামা বলিলেন, "অত্যন্ত বোকা; তা না হলে আমার মেয়ে নেয়; দেখ ছোটইত আমার দশা, ভগিনীর মেয়ের বিয়ে, সপরিবারে দশদিন এসে সংসারের খরচ কমাচ্চি! এ বাঙ্গালা দেশে শালাগিরি করা ভয়ঙ্কর ঝক্‌মারি। কারও মন পাবার যো নেই।—সে কথা যাক্, মস্ত লোকের ছেলের সঙ্গেই মেয়েটার বিয়ে দিয়েছি। তা তারা কোন রকম দাবি করলে কি আমি সেখানে মেয়ে দিতে পারতাম? লক্ষ্মী আমার বেশ সুখেই আছে। এত যে দাসদাসী, শ্বশুর খাশুড়ীর এত আদর, কিন্তু বাছা আমার দিনরাত লাটিমের মত ঘুরচে, সংসারের সকল কাজই করচে।"

হরিমোহন বলিলেন, "তবে তো মেয়ের ভারি সুখ! দিনরাত খেটে মরেন, অথচ বড় লোকের বেটার বৌ! সুখ যদি দেখতে চাও ত আমাদের নিতাই ঘোষের মেয়ের শ্বশুর বাড়ী যাও। কলকাতায় মিত্তির বাড়ী তার বিয়ে হয়েছে। না হবে কেন,—নিতাই ঘোষ পাট্‌না ষ্টেটের ম্যানেজারী ক'রে লক্ষপতি হয়েছে। তিনশো টাকা মাইনেত তার জলপান! নিতাই ঘোষ জামাইকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে একখান মোটর গাড়ী কিনে দিয়েছে। অথচ নিতাই ঘোষের বেহাই শুনেছি পণগ্রহণ-প্রথা-নিবারিণী সভার সেক্রেটারী। নিতাইয়ের মেয়ে তেতালায় বাস করে। চেয়ারে বসে দিবারাত্র নাটক নবেল পড়চে। চাকরাণী অষ্টপ্রহর কাছে হাজির। 'ভিনোলিয়া' সাবান ছাড়া মাখে না। বিলেত থেকে তার গন্ধ তেল আসে। মাথার উপর বন্ বন্ করে কলের পাখা চলচে। সন্ধ্যাবেলা দেওয়াল টিপ্‌লেই আলো! রাত্রে খানকত ফুলকো লুচি, দুটিখানি পলাও—আর চপ্, কাটলেট্ ত আছেই।—আজ থিয়েটার, কাল সার্কাস, পরশু ইভনিং পার্টি। নিতাই ঘোষের মেয়ে মনোরমা সার্থক জন্মেছিল—বাঙ্গালীর ঘরে চূড়ান্ত সুখ ভোগ করচে।"

মামা অবাক্ হইয়া বলিলেন, "এই সব মেয়ের গর্ভে যে সকল ছেলে জন্মাবে তারা বাঙ্গালী ব'লে নিজের পরিচয় দেবেত?—আমার মেয়ের সুখ অন্য রকম; গরীব দুঃখীকে দু'হাতে অন্ন বিতরণ করচে, দিনরাত সংসারের সেবা করচে, মোটা খাওয়া মোটা পরা। গিন্নি বলেছিলেন, যেন শাঁখা শাড়ী বজায় থাকে। আমিও তাই চাই।"

হরিমোহন বলিলেন, "কি রকম?"

মামা বলিলেন, "রকমটা ভারি বাজালে। তবে শুনবে নাকি?—তা ফিরে

ত বেশ নির্ব্বিঘ্নে হচ্ছে।—চল, ঐ দিকে গিয়ে কলকেটা বদ্‌লে নেওয়া যা'ক, সে বড় মজার কথা।"

(৩)

বৈবাহিক এবং আরও দুই তিনজন মাতব্বর বরযাত্রী সঙ্গে লইয়া মামা বিবাহ সভার অন্য প্রান্তে একখানা বেঞ্চি অধিকার করিয়া বসিলেন, একজন ভৃত্য আসিয়া হুক্কা বদ্‌লাইয়া দিয়া গেল; তখন মামা আরম্ভ করিলেন,—

মেয়ের বিবাহের জন্য বড় ভাবনা হয়েছিল। গিন্নি রোজ রাত্রিতে তাড়া করেন, পাঁচজন বন্ধু বান্ধবও গঞ্জনা দেন। আমি ভাবি প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ, কেউ খণ্ডাতে পারবে না। যা করেন জগদম্বা।—অনেক ভাবনা চিন্তা করে শেষে একদিন দেখা ক'র্‌লাম—বলরাম হালদারের সঙ্গে। বলরামের ছেলের বয়স বছর সতের; বেশ ছেলে, আর বলরাম ত লক্ষপতি মানুষ! রাজার সংসার। বলরাম তাঁর গদীতে গেন্দা বালিসে ঠেস্ দিয়ে কোন্ মোকামে পত্র লিখ্‌ছিলেন, হঠাৎ আমি সেইখানে হাজির! আমি বলরাম বাবুর কাছে আমার আর্‌জি পেশ ক'র্‌লাম; তিনি একটু ঢোক গিলে বল্‌লেন, "হাঁ শুনেছি তোমার মেয়েটী সুন্দরী বটে; তা অনেক বড় বড় যায়গা থেকেই আমার ছেলের বের সম্বন্ধ আস্‌ছে; কিন্তু আমি মনে করেছি, ছোঁড়া এণ্ট্রেন্সটা পাশ না ক'র্‌লে আর আমি তার বে দিচ্ছিনে। তুমি স্থানান্তরে চেষ্টা দেখ।" বলরাম বাবু বড় উদার প্রকৃতি, বিশেষতঃ তাঁর অগাধ অর্থ; আর পাঁচজনের নিকট শুনাও গিয়েছিল, তিনি শীঘ্রই তাঁর ছেলের বিবাহ দিবেন। তবে আমি গরীব, এই যা কথা। বলরাম বাবুর জবাব শুনে আমি মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলাম।

বলরাম বাবুর একটি মোসাহেব আছেন, তিনি স্কুলে মাষ্টারী করেন, বি, এ, পাশ করেছেন; তিনিও আমাদের স্বজাতি, এবং তাঁর মেয়ের বের জন্য ব্যস্ত হ'য়ে চারি দিকে পাত্রের সন্ধান কর্‌ছেন।—আমি সামান্য লোক বলরামের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বের সম্বন্ধ কর্‌তে এসেছি শুনে তিনি হেসে বল্লেন, "তুমি যেমন গরীব লোক, তেমনই গরীবের ঘরে চেষ্টা কর।—বিয়ে বল্লেই কি বিয়ে হয়? তাতে খরচ পত্র আছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কি খরচ? বলরাম বাবু বড়লোক, তিনি ত আর কিছু প্রত্যাশা করেন না।"

মোসাহেবটি বলিলেন, "বিলক্ষণ! প্রত্যাশা করেন না কি রকম?

হালফিল্ উনি একটি মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, তাতে ওঁর হাজার চারিক টাকা লেগেছে।—সে টাকাটা কি উনি ঘরে থেকে দেবেন?—আসল কথা, তুমি হাজার চারিক টাকার যোগাড় করতে পারবে?—পার ত দেখ আমি ঘটকালি করি।"

আমি আর কোনও কথা না বলে সেখান থেকে উঠে পড়লাম। বলরাম বাবু দয়া করে বল্লেন, "হাঁ হে ও কোন কাজের কথা নয়, আমি এখন ছেলের বিয়ে দিচ্ছিনে।"

শেষে বলরাম বাবু মাস খানেকের মধ্যেই নগদ ও অলঙ্কারে পাঁচ হাজার টাকার লোভে একটি কালো মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিলেন।—দেখ্‌লাম মোসাহেব মাষ্টারের কথাই ঠিক। শেষে উত্তর দেশের এক জমীদার দয়া করে আমার মেয়েটী নিলেন, আমাকে শাঁখা শাড়ী ভিন্ন আর কিছুই দিতে হয় নি। তিনি বলেছিলেন, "আমার অভাব কি যে বেয়াইয়ের উপর কিছু টাকার চাপ দিয়ে তাকে বিপন্ন ক'রে তুল্‌বো?"

হরিমোহন বলিলেন, "বটে! সে কি রকম ব্যাপার শুনি? শুধু শাঁখা শাড়ীতেই ভুলে গিয়ে তোমার মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিলে? আসল বাঙ্গাল দেখ্‌চি!"

কিন্তু ব্যাপারটি কি রকম, তাহা আর শুনিবার অবসর হইল না। হরিমোহনের ভ্রাতা আসিয়া তাঁহার কানে কানে বলিলেন, "গহনা যা যা দিবার কথা ছিল সকলই দেওয়া হইয়াছে দেখিলাম, কিন্তু ওজনে কিছু হাল্‌কা মনে হইল। আর কনের মাথার 'টায়েরা' এখনও আসে নাই!"

তখন কন্যা সম্প্রদান আরম্ভ হইয়াছে, এয়োরা মনের আনন্দে হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করিতেছেন,—সে স্বর ডুবাইয়া হরিমোহন উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "টায়েরা দিবার কথা ছিল; তাহা না পাওয়া গেলে সম্প্রদান হইবে না।"

শ্রীচরণবাবু গরদের ধুতি দোব্‌জা পরিয়া কন্যা সম্প্রদান করিতে বসিয়াছিলেন; বরকর্ত্তার কথা শুনিয়া তাঁহার মন্ত্র ভুল হইয়া গেল, তিনি থামিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন, "কলিকাতা হইতে সেঁক্‌রা বেটা ঠিক সময়ে টায়েরা পাঠাইতে পারে নাই, দুই এক দিনের মধ্যেই তাহা পাওয়া যাইবে।"

হরিমোহন আগুন হইয়া বলিলেন, "যান মশায়, সব তাতেই আপনার চালাকী, ৫০ ভরি সোণা দেবার কথা ছিল, গহনাগুলি পঁচিশ ভরিতেই শেষ করেছেন; তার পর এই রকম ব্যবহার! আপনার কথায় বিশ্বাস কি?"

হরেন্দ্র বাবু মহকুমার প্রধান উকীল, এবং শ্রীচরণ ডাক্তারের বিশিষ্ট বন্ধু; তিনি যখন 'টায়েরা'র জন্ত আমিন হইতে স্বীকার করিলেন, তখন কোনও প্রকারে বিবাহ শেষ হইল।

কন্তাপক্ষের পুরোহিত বলিলেন, 'আমার দক্ষিণা ?'

হরিমোহন পিরিহানের পকেট হইতে চারিটি টাকা বাহির করিয়া পুরোহিতের হস্তে প্রদানে উদ্যত হইলেন; পুরোহিত বলিলেন, "চার টাকা দিচ্ছেন কি ? বরপক্ষের পুরোহিতকে কন্তাকর্ত্তা চার টাকা দিয়াছেন, আমি আট টাকা পাই।"

হরিমোহন বলিলেন, "ছেলের বিয়ে দিতে এসে পুরোতকে আট টাকা দেব ? এমন কথা ত কস্মিন্‌কালে শুনি নি! আট টাকায় চারি জোড়া বিয়ে হয় যে! গোটা দুই মন্ত্র পড়িয়া যদি আট টাকা উপার্জ্জন হয়, তা'হলে লেখা পড়া শিখে কেউ ডেপুটী মাজিষ্টরী চাকরীর উমেদারী করতো না, সকলেই পুরোতগিরি আরম্ভ করতো। ও সব হবে-টবে না।"

পুরোহিত বলিলেন, "তবে দুই হাত এক সঙ্গে বাঁধা থাক, দক্ষিণে না পেলে আমি হাত খুলচি নে।"

অগত্যা হরিমোহনকে ভোজন হস্তে আটটি টাকা বাহির করিয়া দিতে হইল।

গ্রামস্থ ব্রাহ্মণেরা সমস্বরে বলিলেন, হরি বাবু আমাদের "ছায়ামণ্ডপিটা" দিয়ে ফেলুন।"

হরিমোহন বলিলেন, "ও সকল খরচ বেয়াই মশায়ের। ছেলের বিয়ে দিয়ে আমি সর্ব্বস্বান্ত হ'তে আসিনি। আর কোনও বাবদে এক পয়সাও দিচ্ছিনে।"

নরসুন্দর বলিল, "আমার পাওনা গণ্ডা কার কাছে পাব ? চিরকাল বরের বাপের কাছেই ত নাপিত বেদায় হয়।"

হরিমোহন চটিয়া বলিলেন, "আমি কি এখানে টাকায় হরির লুট দিতে এসেছি ? আমার কাছে আর কিছু হবে না।"

শ্রীচরণ বলিলেন, "বেয়াই মশায় বলেন কি ? এই যে বের খরচ বলে আমার কাছে ছয়শ টাকা ধরে নিলেন!"

হরিমোহন বলিলেন, "হাঁ নিয়েছি, আমার বরযাত্রীদের গাড়ী ভাড়া, ঢুলি বাজনার বিদায়, বাজি রোসনাইয়ের খরচ, পাল্কী ভাড়া এসব কি আমি ধরে থোক দেব ? আপনার সুবিধার জন্যেইত বিয়ে দিতে রাজী হয়েছিলাম, নৈলে

আমার একরত্তি ছেলের এত তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়ার জন্য এমন কি মাথা-ব্যথা হয়েছিল ?"

ইতিমধ্যে বরযাত্রী দলের কয়েকটি মাতাল চীৎকার করিয়া সমস্বরে বলিতে লাগিল "ঝপাং— ঝপাং।"

শ্রীচরণবাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এ আবার কি ?—বিয়ে দিতে এসে এ রকম বাঁদরামী কখন ত দেখিনি !"

একটি ভুখোড় মাতাল বরযাত্রী বলিল, "আপনাদের সকলই বাঁদুরে কাণ্ড এখন বাঁদরামী বলে নাক শিট্‌কালেন কেন ? আপনি বহুৎ টাকা খরচ করে মেয়েটার হাত পা ধরে জলে ফেল্‌লেন, আমরা জলে ফেলাব শব্দ কর্‌ছি মাত্র ; এতেই দোষ হ'লো !"

হাসির চোটে বিবাহ সভা ভাজিয়া গেল।

গ্রামের চাঁই হরিহর শিকদার উঠিয়া বলিলেন, "চলহে চল, পাত পড়েছে, শুধু শুধু লুচি জল করে লাভ কি ? প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ ছিল, সাতপাক ঘুরে গিয়েছে। এখন দুই বেয়ায়ে কোলাকুলি কর।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

জাতীয় ধ্বংসের লক্ষণ।

সমাজ যে ঠিক জৈবধর্ম্ম বিশিষ্ট এ কথা বলা যায় না। কিন্তু সাদৃশ্য যে অনেক দূর পর্য্যন্ত টানিয়া লওয়া যাইতে পারে তাহাও অস্বীকার করা চলে না। জীবদেহের যেমন উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও ধ্বংস আছে, সমাজেরও তেমনই উৎপত্তি বৃদ্ধি ও ধ্বংস কিয়ৎ পরিমাণে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। কতকগুলি পারিপার্শ্বিক ও আভ্যন্তরীণ অবস্থা যেমন জীবদেহের উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও ধ্বংসের অনুকূল বা প্রতিকূল—সমাজও তেমনি তাহার উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও ধ্বংসের জন্য সেইরূপ কতকগুলি অবস্থার উপরেই নির্ভর করে। অপরিবর্ত্তনশীল নানা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত নিজের সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে জীবদেহ যেমন নিয়ত চেষ্টা করে, সমাজও তেমনি করে। এই চেষ্টার অক্ষমতায় জীবদেহের যেমন মৃত্যু—সমাজেরও তাহাই।

কোন জীবের মৃত্যু হইবার পূর্ব্বে আমরা কতকগুলি লক্ষণ দেখিয়া অনুমান করিতে পারি যে, সে শীঘ্রই মৃত্যুর মুখে যাইবে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশেষ বিশেষ পরিবর্ত্তন, শারীরিক বা মানসিক শক্তির বিশেষরূপ হ্রাস, প্রভৃতি কতকগুলি মৃত্যুর পূর্ব্ববর্ত্তী লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। একটা জাতির ধ্বংস হইবার পূর্ব্বেও এইরূপ কতকগুলি লক্ষণ দেখা যায়। কোন জাতি বা সমাজের মধ্যে সেই লক্ষণগুলি প্রকাশিত হইতে থাকিলে, তাহার ধ্বংস যে অদূরবর্ত্তী তাহা মনে করা যাইতে পারে।

কারণ ও লক্ষণ লইয়া অনেক দার্শনিক তর্ক থাকিতে পারে। কিন্তু আমি সে সকলের মধ্যে যাইতেছি না। যে আভ্যন্তরীণ বা পারিপার্শ্বিক শক্তি সমূহ কোন জাতিকে ধ্বংসের মুখে লইয়া যায়, তাহাদিগকেই আমি জাতীয় ধ্বংসের কারণ বলিতেছি। আর সেই কারণ সমূহের যে সকল বহিঃপ্রকাশ ধ্বংসের পূর্ব্বে জাতীয় জীবনের উপর তাহাদের প্রভাবের যে সকল চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগকেই জাতীয় ধ্বংসের লক্ষণ বলিতেছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা জাতীয় ধ্বংসের কতকগুলি লক্ষণেরই আলোচনা করিব।

১। লোক সংখ্যা—স্বাভাবিক অবস্থায় কোন জাতীর মধ্যে লোক সংখ্যা সাধারণতঃ বৃদ্ধি পাইয়াই থাকে। কোন জাতি যখন উন্নতির মুখে অগ্রসর

হয়, তখন তাহার লোক সংখ্যা আশ্চর্য্যরূপে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এমন কি এক পুরুষের মধ্যেই দ্বিগুণ হইতে পারে। (১)—আমেরিকায় ইউরোপীয় জাতিদের উপনিবেশ স্থাপনের পরে, তাহাদের লোক সংখ্যা প্রতি ২৫ বৎসরে দ্বিগুণ হইতে দেখা গিয়াছিল। পক্ষান্তরে যে জাতি ধ্বংসের মুখে যাইতে বসিয়াছে, তাহার লোক সংখ্যা ক্রমেই কমিতে থাকে। কোন কোন জাতির মধ্যে লোক সংখ্যা এত দ্রুতগতিতে কমিয়া সেই জাতি ধ্বংস হইয়া যায় যে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইউরোপীয়েরা টাসমানিয়া অধিকার করিলে তাহার আদিম অধিবাসীরা অতি দ্রুতগতিতে লোপ পাইয়াছিল। প্রায় ৩০।৩২ বৎসরের মধ্যে ইহাদের চিহ্ন পর্য্যন্ত আর ছিল না। (২) নিউজিল্যাণ্ডের মেওয়ারীদের মধ্যেও ইহাই দেখা গিয়াছিল। লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া দূরের কথা ১৮৪৪—১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মেওরীরা শতকরা ৩৯.৪২ জন কমিয়াছিল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে লোক সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ৫৩৭০০ আর ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ আর ১৪ বৎসর পরে লোক সংখ্যা কমিয়া মাত্র ৩৬,৩৫৯ হইয়াছিল অর্থাৎ ১৪ বৎসরে লোক সংখ্যা শতকরা ৩২.২৯ জন হিসাবে কমিয়া ছিল। (২) স্যাণ্ডউইচের আদিম অধিবাসীদের অবস্থাও ঐরূপ হইয়াছিল। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে তাহাদের লোক সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০০০০০ আর ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে তাহাদের লোক সংখ্যা দেখিতে পাই মাত্র ৫১,৫৩১। ১৮৩২—১৮৭২ খৃঃ এই ৪০ বৎসরে উহাদের লোক সংখ্যা প্রায় শতকরা ৬৮ জন কমিয়াছিল। (৩)

লোক সংখ্যা এইরূপ দ্রুতগতিতে হ্রাস হওয়া নিতান্ত আসন্ন ধ্বংসেরই লক্ষণ। কিন্তু ধ্বংসের লক্ষণ অন্যরূপেও দেখা দিতে পারে—যদিও তাহা এত দ্রুত ধ্বংস সূচনা করে না। স্বাভাবিক অবস্থায় লোক সংখ্যা যে কেবল বাড়েই তাহা নহে—বৃদ্ধির হারও প্রায়ই বাড়িয়া চলে, অথবা দীর্ঘকাল ধরিয়া একরূপই থাকিতে দেখা যায়। সুতরাং যদি দেখা যায় যে, কোন জাতির মধ্যে বৃদ্ধির হার ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে, তবে সেটা সুলক্ষণ নহে বুঝিতে হইবে। যে কারণে বৃদ্ধির হার কমিতে থাকে, তাহারই ফলে শেষে বৃদ্ধি বন্ধ হইয়া লোকসংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাসের দিকেই যাইতে থাকে। দেশব্যাপী সাময়িক দুর্ভিক্ষ বা মহামারীর জন্যও লোক-

(১) Giddings—Sociology.

(২) Darwin—The Descent of Man.

(৩) Ibid

সংখ্যার বৃদ্ধির হার হয়ত কিয়ৎকালের জন্য কমিতে পারে। আয়র্লণ্ডের ন্যায় অধিবাসীদের অতিরিক্ত দেশান্তর গমনেও লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হার কমিতে পারে। দুর্ভিক্ষ বা মহামারীর ফলে প্রথমতঃ বিবাহ সংখ্যা অন্যান্য সময়ের তুলনায় কম হয়; দ্বিতীয়তঃ পিতামাতার জীবনীশক্তি ও সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদিকা শক্তি কমিয়া যায়;—আর এই সকলের সমবায়ে জন্মের হার ও লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হার কমিতে থাকে। কিন্তু যদি দেখা যায় যে দীর্ঘকাল ধরিয়া একটা জাতির লোক-সংখ্যার বৃদ্ধির হার ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে; দুর্ভিক্ষ বা মহামারী না থাকিলেও অথবা অতিরিক্ত দেশান্তর গমন না ঘটিলেও, বৃদ্ধির হার উপরের দিকে যাইতে পারিতেছে না; তবেই তাহা ভয়ের কারণ হইয়া উঠে। গত ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১১ খৃঃ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের যুক্তরাজ্যের লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হার ক্রমশঃ বাড়িয়া আসে নাই, প্রায় একরূপই আছে। তবু সেখানে অনেকে তাহা জাতীয় জীবনের ধ্বংস বা আত্মহত্যা সূচক বলিয়া আশঙ্কা করিতেছেন। (১) কিছুকাল হইতে ফ্রান্সের লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হার ক্রমশঃই হ্রাস হইয়া যাইতেছে, ইহাতে সেখানকার রাষ্ট্রনায়কগণ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছেন এবং দেশমধ্যে বিবাহ সংখ্যা ও জন্ম সংখ্যা বাড়াইবার নিমিত্ত নানা উপায় উদ্ভাবন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০১ খৃঃ পর্য্যন্ত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালা দেশে লোক সংখ্যার বৃদ্ধির হার ক্রমাগত কমিতেই ছিল ইহা একটা আশঙ্কার কারণ বলিয়া কেহ কেহ যদি মনে করিয়া থাকেন, তবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আবার হিন্দুসমাজে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ কায়স্থ—প্রভৃতি উচ্চবর্ণের ভিতর এই লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হার যে তুলনায় বেশী হ্রাস হইতেছে, তাহার প্রমাণ আমরা সেন্সাসে পাই। সমগ্র ভারতবর্ষেও লোক-সংখ্যার বৃদ্ধির হার ক্রমশঃই কমিয়া যাইতেছে। নিম্নে আমরা উহা দেখাইতেছি—

সমগ্র ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার শতকরা বৃদ্ধির হার—

১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১
২৩.১	১৩.১	১২.৪	৭

২। জন্মমৃত্যু—লোকসংখ্যার হ্রাস বা লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হারের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে জন্মের হার কম, অথবা মৃত্যুর হার বেশী হইতে দেখা যায়। জন্মের হার কমিলেই যে তাহা দুর্লক্ষণ তাহা নহে। ইউরোপ ও আমেরিকার

(১) The Empire and the Birth-rate, a lecture by Dr. C. V. Droysdale D. SC. (1914)

উন্নতিশীল দেশ সমূহে জন্মের হার অপেক্ষাকৃত কমিয়াই যাইতেছে। আধুনিক অনেক পণ্ডিত তাহাকে সমাজের ব্যষ্টিগত উন্নতির সহকারী বলিয়াই মনে করেন (১)। কিন্তু সেই সকল দেশে আবার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর হারও কমিয়া যাইতেছে, সুতরাং তাহার ফলে বৃদ্ধি খুব দ্রুত না হইলেও স্থির ও নিশ্চিন্ত ভাবে হইতেছে। কিন্তু জন্মের তুলনায় মৃত্যুর হার যদি বেশী হয় অথবা জন্মের হার যদি ক্রমাগত কমিতে থাকে, কিন্তু—মৃত্যুর হার প্রায় একরূপই থাকে, তবে তাহা সুলক্ষণ নহে। ফলতঃ মৃত্যুর হার বৃদ্ধি হওয়াতে বেশী ভয়ের কারণ। আর জন্মের হারের তুলনায় এই মৃত্যুর হার ক্রমাগত বেশী হইতে থাকিলেই লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হার ক্রমশঃ কমিতে থাকে। কেহ কেহ মনে করেন, আমাদের ভারতবর্ষে ইউরোপের দেশ সমূহের তুলনায় জন্মের হার খুব বেশী। সুতরাং আমাদের কোন আশঙ্কার কারণ থাকিতেই পারে না। কিন্তু একটু নিবিষ্ট চিত্তে দেখিলে বোঝা যাইবে যে, ভারতবর্ষের জন্মের হার যেমন বেশী, মৃত্যুর হারও তেমনই খুব বেশী। ইউরোপীয় অনেক দেশেই জন্মের হার যেমন অপেক্ষাকৃত কম, মৃত্যুর হারও সেইরূপ খুব কম। ইংলণ্ডের জন্মের হার গড়ে প্রতি হাজারে ২৫।২৬ জন, আর মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ১৩ জন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুর হার ইংলণ্ডে হাজার করা গড়ে ২২ জন ছিল, আর ১৯১১ খৃঃ ইহা হাজার করা ১৩ জনে কমিয়া আসিয়াছে। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষে মৃত্যুর হারের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে না। নিউজিল্যাণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার জন্মের হার হাজার করা ২৬।২৭ জন্ম আর মৃত্যুর হার হাজার করা মাত্র ৯.৫ জন। কানাডার অণ্টেরিওতে জন্মের হার হাজার করা ১৯ জন, আর মৃত্যুর হার হাজার করা ১০ জন। হল্যাণ্ডে জন্মের হার হাজার করা প্রায় ২৭ জন আর মৃত্যুর হার হাজার করা ১২.৩। যে ফ্রান্সের লোকসংখ্যার বৃদ্ধি সম্বন্ধে তথাকার রাষ্ট্রনায়কগণের আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছে, সেখানে দেখিতেছি জন্মের হার হাজার করা ২০.৬—আর মৃত্যুর হার হাজার করা ১৯.৪ !! (২) ১৯০১ সালে সেন্সাসে দেখা যায় ভারতবর্ষে জন্মের হার হাজার করা ৪৮ জন। অন্য দিকে ভারতবর্ষে মৃত্যুর হারও যার পর নাই বেশী—হাজার করা প্রায় ৪১ জন।

(১) The birth-rate diminishes, as the rate of individual evolution increases—(Giddings Sociology)

(২) Dr. C. V. Droysdale—The Empire and the birth-rate.

Statesman's Year Bookএ দেখা যায় ১৯০৮—১৯১০ খৃঃএর মধ্যে ভারতবর্ষের জন্মের হার হাজার করা ৩৭.৭ এবং মৃত্যুর হার হাজার করা ৩৪.৩ জন। ভারতবর্ষের জন্মের হারের ন্যায় মৃত্যুর হারও ব্রিটিশসাম্রাজ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ফলে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হার ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্য দেশ অপেক্ষা কমই হইয়া পড়ে। এমন কি, কেহ কেহ মনে করেন যে ভারতবর্ষের জন্যই সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হার অপেক্ষাকৃত কম। গত ৪০ বৎসর ধরিয়া ইংলণ্ডের লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হার গড়ে প্রায় শতকরা ১০ জন, আর ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হার ১৮৬৮—১৯১১ খৃঃ পর্য্যন্ত গড়ে মাত্র ৪.৩ জন। (১)

সমাজতত্ত্ববিৎ গিডিংস জীবনীশক্তি অনুসারে জন্মমৃত্যুহারের তুলনায় সমাজস্থ লোকসংখ্যার নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন—

প্রথম শ্রেণী—যাহাদের মধ্যে জন্মের হার বেশী এবং মৃত্যুর হার কম। জীবনীশক্তি হিসাবে ইহারা সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী।

দ্বিতীয় শ্রেণী—যাহাদের মধ্যে জন্মের হার কম এবং মৃত্যুর হারও কম। ইহারা জীবনীশক্তি অনুসারে মধ্যম শ্রেণী।

তৃতীয় শ্রেণী—যাহাদের মধ্যে জন্মের হার বেশী আবার মৃত্যুর হারও বেশী। জীবনীশক্তি হিসাবে ইহারা সর্ব্বনিম্ন শ্রেণী। (২)

গিডিংসএর এই প্রণালী ধরিয়া যদি আমরা বিভিন্ন দেশের শ্রেণীবিভাগ করি, তবে ভারতবর্ষ যে জীবনীশক্তি অনুসারে তাহাদের মধ্যে সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীতে স্থান পাইবে তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং অত্যধিক জন্মেরও সঙ্গে সঙ্গে অত্যধিক মৃত্যুর হার যে বিশেষ আশার কথা নহে, পক্ষান্তরে আশঙ্কারই কথা তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। কত বেশী লোক জন্মগ্রহণ করে, উপর উপর তাহাই দেখিয়া খুসী হইলে চলিবে না, কত লোক জন্মের পর টিকিয়া থাকে সেইটাই হিসাব করিয়া দেখিতে হইবে।

৩। শিশুমৃত্যু—মৃত্যুর হার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে পরিবর্দ্ধমান শিশুমৃত্যুর হার দেখা যায়। যেখানেই সাধারণ মৃত্যুর হার বেশী, সেখানেই অনুসন্ধান করিলে শিশুমৃত্যুর হার তন্মধ্যে বেশী দেখা যায়। শিশুমৃত্যু জাতীয় জীবনের পক্ষে যার পর নাই আশঙ্কার কথা। ধ্বংসোন্মুখ জাতি-

---

(১) Dr. C. V. Droysdale D. S. C.—The Empire and the birth-rate.

(২) Giddings—Sociology.

সমূহের মধ্যে সর্ব্বত্রই অত্যধিক শিশুমৃত্যু দেখা গিয়াছে (১) সমাজ যখন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন সুস্থ ও সবল শিশুর জন্ম হয়, মৃত্যুর হার কম হইতে থাকে এবং লোকসংখ্যা বাড়িতে থাকে। কিন্তু ধ্বংসোন্মুখ সমাজে রুগ্ন ও দুর্ব্বল শিশুই বেশী জন্মগ্রহণ করে; জীবন-সংগ্রামে টিকিতে না পারিয়া তাহাদের মধ্যে নানা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়; ফলে সংখ্যায় শিশুরা বেশী মরিতে থাকে, মৃত্যুর হার বেশী হইয়া উঠে এবং লোকসংখ্যার হ্রাস বা বৃদ্ধির হারের হ্রাস হইতে থাকে। ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে শিশুমৃত্যুর হার এত বেশী হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহা ঘোরতর আশঙ্কার কারণ বলিয়া আমাদের মনে হয়। ১৯১১ খৃঃএর সেন্সাসে দেখা যাইতেছে যে, সমগ্র বঙ্গে প্রতি পাঁচ জনে এক জন করিয়া শিশু মরে। আর কলিকাতা সহরে শিশুমৃত্যুর হার শতকরা ৩০ জন। ইংলণ্ডে ১৯০০ সাল হইতে শিশুমৃত্যুর হার ক্রমশঃ কমিয়া আসিয়াছে—কিন্তু আমাদের দেশে সেরূপ আশার কোন কারণ দেখিতেছি না (২) রাজপুরুষেরা বলেন, এ দেশীয় লোকদের মধ্যে বাল্যবিবাহ, নানা প্রকার সামাজিক কুপ্রথা, স্বাস্থ্যতত্ত্বে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা, শ্রমজীবিদের দারিদ্র্য প্রভৃতিই ইহার কারণ। কিন্তু আমাদের মনে হয় ইহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিতে জাতীয় জীবনী-শক্তির মূলে যাইতে হইবে। দারিদ্র্য ও সংক্রামক রোগ প্রভৃতি কতকটা কারণ বটে সন্দেহ নাই; কিন্তু একটা জাতির জীবনী-শক্তি যখন কম হইয়া যায়, তখনই তাহার মধ্যে এইরূপ পরিবর্দ্ধমান শিশুমৃত্যুর হার দেখা যাইয়া থাকে। দারিদ্র্য ও সংক্রামক রোগ প্রভৃতি সেই জীবনীশক্তির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এই অত্যধিক শিশুমৃত্যুর হার এদেশে কেবল সাময়িক নহে ইহা বহুদিন হইতে দেখা দিয়াছে এবং ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহার কারণ নির্ণয় করিতে হইলে জাতীয় জীবনের গোড়ায় যাইতে হইবে। বাল্য-বিবাহ প্রভৃতি ২।৪টা মামুলী বচন আওড়াইয়া পাশ কাটাইলে চলিবে না। একটা বৃক্ষের অঙ্কুরাবস্থাতেই যদি তাহা মুষরাইয়া যায়, তবে তাহার যেমন মৃত্যু অনিবার্য্য, সেইরূপ যে সমাজে শিশুদিগের মধ্যেই মৃত্যুর হার ক্রমশঃ বেশী হইতে থাকে, তাহার ভবিষ্যৎ আশাজনক নহে।

(১) Darwin—The Descent of Man.

(২) Dr. Droysdale—Empire and the birth-rate.

৪। স্ত্রী সংখ্যা ও উৎপাদিকা শক্তি—ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইবার সময়ে সমাজে স্ত্রীলোকদের মধ্যে উৎপাদিকাশক্তির সমধিক রূপে হ্রাস হইতে দেখা যায়। (১) তাহার ফলে জন্মের হার ও লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস হইতে থাকে। অবশ্য স্ত্রীলোকদের মধ্যে অন্য ২।১টী কারণেও উৎপাদিকাশক্তির হ্রাস হইতে পারে। ম্যালথস্ টাহিটিয়ান্ প্রভৃতি দ্বীপবাসীদের জীবন প্রণালী আলোচনা করিয়া স্ত্রীলোকদের মধ্যে অত্যধিক ব্যভিচার ও দুর্নীতিই তাহাদের উৎপাদিকা শক্তির হ্রাসের কারণ বলিয়াছেন (২) কিন্তু সামাজিক প্রণালী ও নীতি প্রভৃতির বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন না হইয়াও ধ্বংসপ্রবণ জাতির মধ্যে স্ত্রীলোকদের উৎপাদিকাশক্তির হ্রাস হইতে দেখা যায়। ইউরোপীয়দের দ্বারা বিজিত দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ার ধ্বংসোন্মুখ জাতিদিগের মধ্যে ইহাই দেখা গিয়াছিল। সমাজে পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোকদের সংখ্যার অত্যধিক হ্রাসও সমাজের পক্ষে একটা অশুভ লক্ষণ। উন্নতিশীল জাতিদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী হইতেই দেখা যায়। আধুনিক ইউরোপের ও আমেরিকার প্রায় সর্ব্বত্রই এইরূপ। ভারতবর্ষে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা কিছু কম। সমগ্র ভারতবর্ষে প্রতি এক হাজার পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৯৪৫ জন। ১৯১১ সালের সেন্সাসে আরও দেখা যায় যে, বাঙ্গালা ও পঞ্জাবে স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের তুলনায় ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। নিম্নে আমরা উহা দেখাইলাম—

প্রতি এক হাজার পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা—

	১৯১১	১৯০১	১৮৯১	১৮৮১
বাঙ্গালা—	৯৪৫	৯৬০	৯৭৩	৯৯৪
পাঞ্জাব—	৮১৭	৮৫৪	৮৫০	৮৪৪

সমাজে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীসংখ্যা কম হইলে বিবাহ সংখ্যা কম হয়, সুতরাং জন্মের হারও কম হয়। স্ত্রীসংখ্যা হ্রাসের ফলে ব্যভিচার প্রভৃতি দোষেরও অত্যধিক বৃদ্ধি হয়—ইহার ফলেও জন্ম সংখ্যা কমিয়া যায়। সমাজে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অত্যন্ত কম হইলে তাহা সেই সমাজের জীবনীশক্তির দুর্ব্বলতাও সূচনা

(১) Darwin—The Descent of Man

(২) Malthus on Population.

করে। পাঞ্জাবে জন্মসংখ্যা অপেক্ষা মৃত্যুসংখ্যা বেশী দেখা যাইতেছে। বাঙ্গালা দেশে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদের মধ্যে স্ত্রীলোকদের সংখ্যা বেশী। আর হিন্দু অপেক্ষা বাঙ্গালার মুসলমানদের বৃদ্ধির হার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিতেছি। ১৯১১ সালের সেন্সাসে বাঙ্গালার মুসলমানদের বৃদ্ধির হার হিন্দুদের অপেক্ষা ৩ গুণ বেশী হইয়াছে দেখা যাইতেছে।

৫। দুর্ভিক্ষ—দেশব্যাপী ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হওয়া জাতীয় জীবনের পক্ষে সুলক্ষণ নহে। জলবায়ুর অবস্থা ও নানা আকস্মিক কারণের ফলে উন্নতিশীল জাতির মধ্যেও কচিৎ ২।১ বার দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে বটে, কিন্তু যদি কোন জাতির মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া পুনঃপুনঃ দুর্ভিক্ষ হইতে দেখা যায়, তবে সেই জাতির মধ্যে দারিদ্র্য যে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে—জীবন-যুদ্ধে যে তাহারা ক্রমেই পিছাইয়া পড়িতেছে, ইহাই অনুমান করিতে হয়। অতীতে ধ্বংসোন্মুখ জাতিদের মধ্যে ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আদিম অসভ্য বা বর্ব্বরাবস্থায় মানুষ যখন বনে জঙ্গলে থাকে, তখন তাহার মধ্যে এইরূপ দুর্ভিক্ষ অনেক সময় হইতে দেখা যায়। লোকসংখ্যার হিসাবে খাদ্যের অপ্রাচুর্য্যই—তাহার কারণ। এই দুর্ভিক্ষের ফলে অনাহারের ভীষণ যন্ত্রণায় বর্ব্বর সমাজে শত শত লোক মরিয়া যায়। এমন কি ছোটবড় অনেক জাতিও ধ্বংস হইয়া যায়। (১) অপেক্ষাকৃত সভ্য অবস্থাতেও মানুষ ইহার হাত হইতে পরিত্রাণ পায় না। ফলতঃ কি সভ্য কি অসভ্য সকল সময়েই যাহারা প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া টিকিতে পারে তাহারাই বাঁচে।—যাহারা অক্ষম তাঁহারাই মরে। কোন জাতির মধ্যে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হইতে আরম্ভ হইলে জীবন-যুদ্ধে তাহার ক্রমবিবর্দ্ধমান অক্ষমতারই পরিচয় দেয়। বিগত ৫০ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে যেরূপ ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ দেখা দিতেছে, তাহা খুব আশাপ্রদ নহে। ধরিতে গেলে প্রতি দশ বৎসর অন্তর ভারতবর্ষের কোন না কোন প্রদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা যাইতেছে। ১৮৭৬,১৮৯৭,১৯০১ খৃঃ প্রভৃতিতে দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ হইতে দেখা গিয়াছে। ইহা যে ভারতবর্ষের চিরদারিদ্র্যের পরিচয় দিতেছে, তাহা বলিবার আবশ্যক করে না। যে দেশের অধিকাংশ লোক দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না—যে দেশের লোকের আয় গড়ে বাৎসরিক ২৭৲। ২৮৲ টাকা মাত্র, তাহাদের দারিদ্র্যের কথা না তোলাই ভাল।

(১) Malthus on Population.

দুর্ভিক্ষ কিয়ৎপরিমাণ দেশের রাজস্ব বাণিজ্য নীতির উপরেও নির্ভর করে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার প্রকৃত কারণ আরও গভীরতর ভাবে জাতীয়-জীবনের মূলে নিহিত থাকে। চিরদারিদ্র্য ও চিরদুর্ভিক্ষ নিত্য সহচর আর উভয়েই ধ্বংসের অগ্রদূত।

৬। মহামারী—ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ যেমন, ঘন ঘন মহামারী ও নানা ব্যাধির প্রাদুর্ভাবও তেমনই জাতীয়-জীবনের পক্ষে ঘোরতর অমঙ্গলের সূচনা করে। সুস্থ ও সবল ব্যক্তির ন্যায় উন্নতিশীল জাতির মধ্যেও ব্যাধি ও মহামারী বিরল দেখা যায়। যাহার জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার দেহেই যেমন নানা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, ধ্বংসোন্মুখ জাতির মধ্যেও তেমনই নানা ব্যাধি মজ্জাগত হইয়া পড়ে। ধ্বংসোন্মুখ প্রাচীন গ্রীক্ জাতির মধ্যে ঠিক ইহাই দেখা গিয়াছিল। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে সমস্ত গ্রীকজাতি তিলে তিলে লুপ্ত হইবার পথে গিয়াছিল। তাহাদের শারীরিক ও মানসিক সর্ব্ববিধ শক্তি ইহার ফলে ধীরে ধীরে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। (১) বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব জনৈক সিবিলিয়ান্ মিঃ ক্লাইন অল্পদিন পূর্ব্বে East and West পত্রিকায় একটী প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে, বর্ব্বর বিজিত ধ্বংসোন্মুখ প্রাচীন রোমক জাতির মধ্যেও ঠিক এইরূপ ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। আর প্রাচীন গ্রীস ও রোমের এই ম্যালেরিয়ার সঙ্গে বাঙ্গালার (শুধু বাঙ্গালার কেন সমগ্র ভারতের) সর্ব্বধ্বংসিনী ম্যালেরিয়ার যে যথেষ্টই সাদৃশ্য আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। গ্রীসের ন্যায় এখানেও ম্যালেরিয়া-পীড়িত প্রদেশে অধিবাসীদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। পরিশ্রমপটুতা, কর্ম্মের উৎসাহ, ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে—আলস্য, নিরাশা, জীবনে বিতৃষ্ণা প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিতেছে। ইহারই মধ্যে কত গ্রাম নগর ম্যালেরিয়ার প্রকোপে শ্মশান হইয়া গিয়াছে, বন জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে তাহার সীমা নাই। যাহারা আছে তাহারাও দিনে দিনে বংশপরম্পরাক্রমে মৃত্যুর মুখে যাইতেছে। উর্ণনাভ যেমন তাহার জাল বিস্তার করিয়া ধীরে ধীরে পতঙ্গকে মৃত্যুমুখে অগ্রসর করে, এই ভীষণ ম্যালেরিয়া আজ তেমনই সমস্ত ভারতময় তাহার জাল ধীরে

(১) Joaue's "Greek History and Malaria"—quoted in "Dying Race and how dying ?"—by Kisori Lal Sarkar M. A. B. L.

ধীরে বিস্তার করিতেছে। এই জালের মধ্যে এই হতভাগ্যজাতি কবে লুপ্ত হইয়া যাইবে তাহা কে বলিতে পারে? আর শুধু ম্যালেরিয়া নয়; প্লেগ, কলেরা ও আরও অনেক নূতন নূতন ব্যাধি ক্রমেই এই দুর্ভাগ্য দেশে রাজত্ব বিস্তার করিতেছে। প্লেগ, কলেরা ও ম্যালেরিয়া ইউরোপেও স্থানে স্থানে ২।১ বার হইয়াছে; কিন্তু সেই সকল দেশবাসীরা তাহাদিগকে দূর করিয়া আপনাদের দেশকে নিরাপদ করিয়াছে। কিন্তু এই দেশে একবার যে রোগ প্রবেশ করিতেছে তাহা আর যাইতেছে না। অন্তঃপ্রবিষ্ট কীটের ন্যায় ক্রমে তাহারা জাতীয় শরীরের শিরা, উপশিরা, যন্ত্রাদি আক্রমণ করিয়া ক্রমেই জীবনীশক্তি লোপ করিয়া দিতেছে। ব্যক্তিগত মানবদেহের ন্যায় সমাজদেহেও যখন জীবনীশক্তির হ্রাস হইতে থাকে তখন বাহিরের রোগের আক্রমণ প্রতিহত করিবার শক্তি তাহার আর পূর্ব্বের মত থাকে না, যেটুকু থাকে তাহাও ক্রমশঃ লোপ পাইয়া যায়। পূর্ব্বপ্রবিষ্ট রোগ ক্রমেই স্বীয় প্রভাব বেশী করিয়া বিস্তার করিতে থাকে এবং নব নব নানা রোগও সুবিধা পাইয়া অধিকার লাভের চেষ্টা করিতে ছাড়ে না। অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যেও ধ্বংসের প্রাক্কালে নানা নূতন নূতন ব্যাধির আবির্ভাব দেখা গিয়াছিল। (১)

৭। প্রতিভাশালীর সংখ্যা হ্রাস—

কোন মানুষ যখন মৃত্যুর পথে, অধোগতির পথে যাইতে থাকে, তখন তাহার শারীরিক শক্তির ন্যায় মানসিক শক্তিরও হ্রাস হইতে থাকে; দৈহিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্যেরও ব্যতিক্রম ঘটিতে থাকে; সেখানেও নানা রোগ দেখা দিতে থাকে; বুদ্ধি তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। সমাজেরও মস্তিষ্ক ও মানসিক শক্তি আছে। সমাজের প্রতিভাশালী ব্যক্তিরাই তত্তৎ-স্থানীয়। উন্নতিশীল সমাজে তাহার এই মানসিক শক্তির ক্রমশঃই বিকাশ হইতে থাকে, আর তাহার ফলে সমাজমধ্যে বহু প্রতিভাশালী লোক জন্মগ্রহণ করিতে থাকে। পৃথিবীতে যেখানেই কোন্ জাতি উন্নতি করিয়াছে কি করি-তেছে সেখানেই এই নিয়মের ক্রিয়া অব্যাহত ভাবে দেখা গিয়াছে। ইংলণ্ড, জর্ম্মনি, ফ্রান্স, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতির গোড়ায় অনুসন্ধান করিলেও ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে, যে সকল জাতি অধঃপতিত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে জাতীয় মানসিক শক্তির

(১) Darwin—The Descent of Man.

হ্রাস অত্যন্ত দ্রুতগতিতে হইতে দেখা গিয়াছে। প্রতিভাশালীর সংখ্যা স্বল্প হইতে স্বল্পতর হইয়াছে। প্রাচীন কালের রোম, গ্রীস ও ভারতবর্ষে ইহার প্রমাণের অভাব নাই। যে দিন রোম অর্দ্ধ পৃথিবীর সম্রাট্ ছিল তখন তাহার রাজনৈতিক, যোদ্ধা বা ব্যবহারবিদের অভাব ছিল না। সিসিরোর মত বক্তা, সিজারের মত বীর, জষ্টিনিয়ানের মত ব্যবহারবেত্তার তখনই সম্ভব হইয়াছিল। বর্ব্বর বিজয়ের প্রাক্কালে রোমের সেই পূর্ব্বগৌরবের কি অবশিষ্ট ছিল? যে গ্রীস জ্ঞানের উজ্জল জ্যোতিতে ইউরোপের প্রভাত আলো করিয়াছিল, পতনের সময় তাহার সে জ্যোতিঃ কোথায় নিবিয়া গিয়াছিল! ডেমস্থিনিস, পেরিক্লিস, বা সক্রেটিশ তখন কয়জন জন্মগ্রহণ করিয়াছিল? মুসলমান বিজয়ের পরে কয়জন যথার্থ মনীষী ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন? কয়জন শঙ্কর, চাণক্য, কপিল, ব্যাস, বাল্মীকি বা কালিদাস তাহার মুখোজ্জল করিয়াছিলেন?

তাই যখন দেখি যে কোন জাতি বা সমাজের মধ্যে আর পূর্ব্বের ন্যায় প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের জন্ম হইতেছে না; যাঁহারা ধর্ম্মে, সমাজে বা রাষ্ট্রে নূতন ভাব আনয়ন করেন, যাঁহারা তাঁহাদের শক্তির প্রাবল্যে দেশময় আলোড়ন উপস্থিত করেন - এমন মানুষ কোন জাতির মধ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বড় একটা দেখা যাইতেছে না, তখন বুঝিতে হইবে সে জাতি ক্রমে ধ্বংসের দিকে—অধোগতির দিকে যাইবার মুখেই দাঁড়াইয়াছে। তাহার জাতীয় মানসিক শক্তি ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে, যে প্রখর বুদ্ধিবলে বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে আপনার সামঞ্জস্য সাধনের নব নব উপায় সমাজ প্রতিনিয়ত উদ্ভাবন করে, তাহার সে বুদ্ধি মলিন হইয়া যাইতেছে; ধরাপৃষ্ঠে তাহার পক্ষে আত্মরক্ষা করা ক্রমশঃই কঠিন হইয়া উঠিতেছে। প্রাচীন ভারতবর্ষের কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আধুনিক ভারতবর্ষেই কি এ বিষয়ে আমাদের নূতন আশার কোন কারণ দেখা যাইতেছে বলা যায়? কেহ কেহ বলিবেন, যে দেশে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র বা প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম সে দেশের নিরাশ হইবার কারণ নাই। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকার উন্নতিশীল অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা করিয়া মনে হয়—এ বুঝি নির্ব্বাণের পূর্ব্বে প্রদীপের তীব্রোজ্জ্বল দীপ্তি! জীবনের সর্ব্ববিভাগে অন্যান্য সভ্যদেশের তুলনায় আমাদের দেশে প্রতিভাশালীর জন্ম সংখ্যা যে নিতান্তই অল্প—ইহা কি অস্বীকার করা যায়? আর সেই সংখ্যা যে অনুকূল অবস্থার অভাবে

ক্রমশঃই বর্দ্ধিত না হইয়া হ্রাসের দিকেই যাইতেছে, ইহাও মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

৮। নৈতিক অবনতি—

প্রতিভাশালীর সংখ্যা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক অবনতিও ঘটিতে থাকে। কেন না চারিত্র নীতি বুদ্ধিবৃত্তিনিরপেক্ষ নহে। অনেকের বিশ্বাস যে চারিত্র নীতির সঙ্গে বুদ্ধির কোন সম্পর্ক নাই—ইহারা স্বতন্ত্র রাজ্যের জিনিষ। কিন্তু আমাদের নিকট এরূপ অনুমান সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক বলিয়াই বোধ হয়। মানবমনকে কতকগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে ভাগ করিয়া ফেলা যায় না। তাহার সকল অংশই পরস্পরের সঙ্গে সম্বদ্ধ। বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে চারিত্র নীতিরও বিকাশ হইয়া থাকে। আদিম অসভ্য মানবদের সঙ্গে বর্ত্তমান কালের সভ্য মানবদের তুলনা করিলে ইহা স্পষ্টই বোঝা যায়। আদিম অসভ্য মানবের তুলনায় বর্ত্তমান কালের সভ্য মানবেরা যে শুধু বুদ্ধিবৃত্তিতেই শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে তাহা নহে, তাহাদের মধ্যে উচ্চতর চারিত্র নীতিরও বিকাশ হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে পৃথিবীর নানা অংশে যে সকল অসভ্য মানব আছে—তাহাদের সঙ্গে সভ্য মানব-সমাজের তুলনা করিলেও ইহা বোঝা যায়। নিগ্রো বা জুলুদের অপেক্ষা ইংরাজ বা ফরাসীর বুদ্ধিবৃত্তিই যে কেবল বেশী তাহা নহে, জাতীয় চরিত্রও অনেক উচ্চ। আর সভ্যতা বলিলে কেবল বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ বুঝায় না—তৎসঙ্গে চারিত্র নীতির উৎকর্ষও সূচিত হয়। বাক্‌ল প্রভৃতি গ্রন্থকারেরা সভ্যতার বিকাশে কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির উপর জোর দিয়া ভ্রান্তধারণার পরিচয় দিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। বাক্‌ল এ পর্য্যন্তও বলিয়াছেন যে, চারিত্র নীতির এক প্রকার ক্রমবিকাশ হইতেই পারে না। তাহা প্রাচীন গ্রীকদের সময়েও যেমন ছিল আধুনিক যুগেও তাহাই। (১) কিন্তু অসভ্য আদিম সমাজের চারিত্র নীতির ধারণায় ও সভ্য সমাজের চারিত্র নীতির ধারণায় কি বিস্তর প্রভেদ নাই? সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে মানব যেমন জ্ঞানের নূতন নূতন দ্বার খুলিয়াছে—সেই সঙ্গে তাহাদের চারিত্র নীতির ধারণাও কি ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া উঠে নাই? ইতিহাস অনুসন্ধান করিলেও আমরা ইহার প্রমাণ পাই। যখনই কোন জাতি জ্ঞান বিজ্ঞানেই উন্নতি করিয়াছে, তখনই তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মধ্যে চারিত্র নীতির উৎকর্ষও ঘটিয়াছে। আবার যখন কোন জাতির অবনতি ঘটিয়াছে, তখনই সেই দলের

(১) Buckle's History of Civilisation.

পথে গিয়াছে, তখনই তাহার মধ্যে চারিত্র নীতির শিথিলতা ও অবনতিও দেখা গিয়াছে। প্রখর বুদ্ধি, অনুসন্ধিৎসা, তীক্ষ্ণমেধা, ধারণাশীলতা যেমন জাতীয় উন্নতির পরিচায়ক—সাহস, সংযম, ধৈর্য্য, তিতিক্ষা, আত্মত্যাগ, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতিও তেমনই। অন্যদিকে স্বল্পমেধা, পল্লবগ্রাহিতা, অদূরদর্শিতা, জড়তা প্রভৃতি যেমন জাতীয় জীবনে অবনতির সূচনা করে, ভীরুতা, বিশ্বাসঘাতকতা, স্বার্থান্ধতা, লোভ, হিংসা প্রভৃতিও তেমনই তাহার সহকারিত্বের সাক্ষ্য দেয়। গ্রীস যখন উন্নতির পথে উঠিয়াছিল, তাহার শিল্প ও দর্শন জগৎময় ঘোষিত হইতেছিল, তখন কি তাহার জাতীয় চরিত্রে অশেষ সদ্‌গুণেরও পরিচয় পাওয়া যায় নাই? আর সেই গ্রীস যখন মাসিদনিয়ার ষড়যন্ত্রে বিধ্বস্ত প্রায়, তখন তাহারই সন্তান বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া দেশকে পরের হাতে দিয়াছিল। অর্দ্ধপৃথিবীর অধীশ্বর রোমের জাতীয় জীবনে যখনই বিলাসিতা, ভোগলিপ্সা ও স্বার্থান্ধতা প্রবেশ করিয়াছিল তখনই সে বর্ব্বর কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিল। দশম শতাব্দীতে যখন ভারতে জ্ঞানের জ্যোতিঃ নির্ব্বাপিত-প্রায় তখনই রাজারা মদনোৎসবে মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, নাগরিকেরা পরস্পরের সঙ্গে "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" করিতেছিল,—আর সেই অবসরেই জয়চাঁদ জন্মগ্রহণ করিয়া মুসলমানদিগকে সিন্ধুবাদ নাবিকের বোঝার মত ভারতের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছিল।—মধ্যযুগে ইউরোপে স্পেন যখন মুরদিগের দ্বারা বিজিত হইয়াছিল, তখন প্রতিভার সঙ্গে সঙ্গে স্পেনের জাতীয় চরিত্রও কি অবনত হইয়া পড়িয়াছিল না? বাক্‌লের নিজের সাক্ষ্যেই আমরা তাহা দেখিতে পাই। (১) সুতরাং যখন কোন জাতির মধ্যে চারিত্র নীতির ক্রমাবনতি দেখিতে পাওয়া যায়, যখন দেখা যায়—কোন জাতি উচ্চ মানব সমাজের উপযোগী সাহস, আত্মত্যাগ, ভক্তি, প্রীতি প্রভৃতি গুণাবলী ক্রমশঃই হারাইতেছে, তখন তাহা সেইজাতির পক্ষে সুলক্ষণ নহে বুঝিতে হইবে। জীবতত্ত্বের হিসাবেও বুদ্ধিবৃত্তির ন্যায় চারিত্রনীতি সম্বন্ধীয় গুণগুলিও জীবন যুদ্ধে সফলতার সহায়ক। অতি নিম্ন জাতীয় জীব হইতে উচ্চ জাতীয় মনুষ্য পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই, কেবল প্রতিযোগিতা ও সংগ্রাম নহে, সহযোগিতা ও সহানুভূতিও জীবের বিকাশ ও সমাজগঠনের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় আর এই সহযোগিতা ও সহানুভূতির উপরেই মানুষের চারিত্র নীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। (২)

---

(১) Buckle's History of Civilization—civilization in Spain.

(২) P. Kropotkin's "Mutual aid as a factor of evolutior

যে জাতির মধ্যে এই সকল গুণ সম্যক্ বিকশিত হইতে থাকিবে, তাহারই পক্ষে ক্রমোন্নতি সম্ভব হইতে পারে; আর যে সকল জাতির মধ্যে এই সকলের অভাব হইতে থাকিবে, তাহারাই ধরাপৃষ্ঠ হইতে ক্রমশঃ লুপ্ত হইতে থাকিবে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

জাতীয় ধ্বংসের প্রাক্কালে যে সকল লক্ষণ দেখা দেয়, সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণের পন্থানুসরণ করিয়া আমরা সেইগুলি যথাসাধ্য সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। ধ্বংসোন্মুখ জাতির মধ্যে সর্ব্বত্রই যে এই সকল লক্ষণ একত্রে বা এক সময়ে প্রকাশ পাইয়া থাকে তাহা নহে। তবে তাহার কোন কোনটী বা কতকগুলি প্রকাশ পাইলে যথেষ্ট আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হয়—বলিতে পারা যায়। যে সকল শক্তি জাতীয় জীবনের গোড়ায় থাকিয়া জাতীয় ধ্বংস কার্য্য সম্পন্ন করে—পূর্ব্ববর্ণিত লক্ষণগুলি যাহাদের বহিঃপ্রকাশ—আমরা সেই সকল শক্তিকেই জাতীয় ধ্বংসের কারণ মনে করি। ভবিষ্যতে জাতীয় ধ্বংসের সেই কারণতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

লতি।

[গল্পের স্কেচ মাত্র।]

(১)

পূর্ব্ববঙ্গ। ঢাকা। ছেলেটি খুব সুন্দর। রমানাথ। অনেক লোকের চেয়ে তাহার চুল কোমল। ঢেউ খেলানো। আপনা আপনিই মুখ খানি দারুণ সুন্দর করিয়া তুলে। অনেকটা টেনিসনের মত। কথাবার্ত্তা মিষ্ট, শিষ্ট, সাদাসিধা।

যাত্রার দলে গেলনা কেন?

বড় ঘরের ছেলে। মার নাম আনন্দময়ী। পিতা যাদবচন্দ্র। বিখ্যাত ডাক্তার। একমাত্র ছেলে রমানাথ। বি, এস, সি। হোমিওপ্যাথিতে খুব সখ্। সব জিনিষেই অরুচি। কেবল কল্পনায় নহে।

বিবাহের নামে মেজাজ 'ত্রেখা'। বন্ধু-বান্ধব দিন রাত্রি পাত্রীর কথা পাড়িত। সেই জন্য দেশের উপর হতশ্রদ্ধা। বাটী হইতে পলাইবার ইচ্ছা।

হিমালয়? বিন্ধ্যাচল? নীলগিরি? না। কলিকাতা। পিতামাতার মতের অভাব। দূরীকরণার্থ কেবল কবিতা। ভাব, সংসার মায়াপুরী।

বন্ধু-বান্ধবের ত্রাস। পিতমাতার বাধ্য হইয়া স্বীকার। কিন্তু দুশ্চিন্তা।

পিতার সে কালের একজন পরম বন্ধু বসন্ত বাবু। মাণিকতলায় বাটী। তাহার নিকট পত্র। রমানাথের আগমন এবং বহির্বাটীতে চুপ করিয়া প্রায় তিনঘণ্টা বসিয়া থাকা। সন্ধ্যা। খুব কোলাহল। বসন্তবাবুর বাটীতে গান বাজনা। তোপ পড়িয়া গেলে নিস্তব্ধ।

ভৃত্যের বাটীর মধ্যে সংবাদ। বাহিরে একটি ভদ্রলোক বসিয়া আছে। ভাবগতিক অজ্ঞাত। আকাশের প্রানে মুখ।

(২)

সকলে আশ্চর্য্য!

নাম? রমানাথ।

নিবাস? ঢাকা।

উদ্দেশ্য? আশ্রয়।

পিতার পত্র প্রদান। তাহা পাঠ এবং বসন্তবাবুর অশ্রুবারি বিগলিত?

'তুমি যাদবের ছেলে? বাহিরে একলা বসিয়া। হায়! হায়! ওরে রামা, তোর মা ঠাকরুণ কে ডেকেদে'। মা ঠাকরুণের প্রবেশ।

'তোমাকে অনেকবার যাদব ডাক্তারের কথা বলেছি। আমার প্রাণদাতা। তারি ছেলে। হোমিওপ্যাথিক শিখিবে। কি আনন্দের দিন! '(রমানাথের প্রতি)

'তোমার খুড়িমা।'

'লতি কই। ও লতি।'

'লতিলো! লতি! একবার বাহিরে আয়! তোর দাদা এসেছে।'

ধোপা কাপড় দিয়ে যায় নাই। তবুও মলিন বসনে লতির প্রবেশ।

'লতি! লতিকা! এর নাম রমানাথ। যাঁর ফটোগ্রাফ আমার মাথার শিয়রে টাঙ্গানো, তাঁর ছেলে। ঠিক বাপের মত সুন্দর। খুব লেখা পড়া জানে। তুই পদ্মার ধারের গল্প শুনিতে ভালবাসিস্? রমানাথ সেই পদ্মার ধারের লোক। কি আনন্দের দিন।'

লতিকার অন্ধকারে রমানাথের মুখের দিকে খুব তাকাইবার চেষ্টা। 'দাদা! বাড়ীর মধ্যে এস'! তোমরা পদ্মার ধারে কি খাও? ভাত্ না রুটী? কইমাছ?

বসন্তবাবু (অশ্রুমোচন করিয়া) একটু লঙ্কার ঝাল বেশী করিয়া দিস্। লতি! লঙ্কার ঝাল! লঙ্কার ঝাল!

(৩)

'কথা কওনা কেন?'

'পাছে আমার কথা শুনিয়া তোমারা হাস! বাঙ্গাল্ দেশের লোক, ভয় হয়।'

'প্রকাণ্ড ভুল। ইংরাজী কথা শুনিয়া আমি ত হাসি না। হিন্দি কথা শুনিয়াও হাসি না।'

'আমাদের রান্নাঘর দোতালায়। আমি নিজে রাঁধি। আজ দুইবার রাঁধিতে হইল। রাঁধা ব্যঞ্জনে লঙ্কাবাটা গুলিয়া দিলে নষ্ট হইয়া যায়। দাদা! তুমি কতখানি লঙ্কা খাও দেখাইয়া দিবে চল। আমি এখনও তোমাদের দেশের রান্না শিখি নাই, কিন্তু একখানা বহিতে পড়িয়াছিলাম, মনে আছে'।'

রমানাথের প্রথম হাস্য। কি সুন্দর পরিবার! কি সুন্দর ভাব মেয়েটির!

রান্নাঘরে গিয়া উপবেশন। নারিকেল লইয়া খুড়িবা ব্যস্ত। কইমাছ লইয়া লতিকা ব্যস্ত। 'সর্ব্বনাশ! আমরা মাছ ভাজি না। তেল টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিলে পরে মাছ ফেলিয়া দিতে হয়।'

কি ভয়ানক! পুনর্ব্বার চেষ্টা। অবশেষে খাদ্য প্রস্তুত; তাহা চমৎকার! অর্দ্ধভাজা এবং অর্দ্ধসিদ্ধ। খুব কাল! এদিকে চন্দ্রপুলি এবং গোকুল পিঠা। সকলেরই ভাল লাগা। নূতন রকমের। নূতন শিক্ষা।

'দাদা! কি চমৎকার। কাল্ হইতে ভাল করিয়া শিখিব। তুমি সব রান্না জান?'

'খানিকটা জানি। তবে শেষ রক্ষা হয় না। পরস্পরের সাহায্যে ক্রমশঃ।'

তেতালায় কেবলমাত্র একটি ঘর।

উন্মুক্ত আকাশ। ছাতে নানারকম ফুলের টব সারি সারি। একটি আঙ্গুরের লতার উপর গ্যাসের আলো। আকাশে পুরাতন নক্ষত্র। নানাবিধ চিন্তা এবং সুনিদ্রা।

(৪)

রমানাথের ঔষধের বাক্স, তিন ভাগ। একভাগে ঔষধ। একভাগে চিঠিপত্র। একভাগে ডাইরি। পাড়ায় খুব যশ। রোগ হইলে তৎক্ষণাৎ উপশম। নূতন নূতন ঔষধের আবিষ্কার। ফিলেডেল্‌ফিয়ার এম, ডি, উপাধি প্রাপ্ত।

বাটীর পার্শ্বে দাঁত বাঁধাইবার দোকান। শ্রীনিবাসবাবু ডেন্টিস্‌ট। বড় গরীব। তাঁর মেয়ের নাম মালতী। পূর্ব্বে নারায়ণগঞ্জে বাটী ছিল। পূর্ব্ববঙ্গের ভাব এখন কম। মালতীকেও তাহারা সাদরে 'লতি' বলিয়া ডাকে।

আমাদের 'লতি' তাদের 'লতির' সই। লুকাইয়া খাবার দিয়া আসে। লুকাইয়া কথা কয়। সে সব 'মনের কথা'। নিজের নিকট রাখিলে পাছে চুরি হইয়া যায়, অতএব পরস্পরের নিকট তাহারা বিশ্বাস করিয়া গচ্ছিত রাখে। দরকার হইলে পরস্পরে ধার করিয়া লয়। লতিকার মনের কথা বাড়িয়া গিয়াছে। রমাদাদার কথা ক্রমে মালতীর নিকট বলে। মালতীর কথা কম, সে কেবল বসিয়া শুনে। রমানাথ ছাত হইতে তাদের ভাব ভঙ্গী দেখিয়া হাসে। লতিকা মালতীকে খাইতে না পারিলেও জোর করিয়া খাওয়াইয়া দেয়। রুক্ষ চুল জোর করিয়া বাঁধিয়া দেয়। মালতী একেই সুন্দরী। লতিকার যত্নে তাহার সৌন্দর্য্য-শ্রী উত্তোরোত্তর বর্দ্ধিত!

মালতী বড়। লতিকা ছোট।

ওবাড়ীর মাসির সঙ্গে থিয়েটরে লতিকা যাইবে। শনিবার। সবই প্রস্তুত। মালতী গেল না। 'আমিরা গরীব। থিয়েটর আমাদের জীবনের আদর্শনা। সই তুই যা! কিন্তু তোরও যাওয়া উচিত না।' মালতীও গেলনা। রমানাথ বুঝিতে পারিল।—

(৫)

প্রাতঃকাল। প্রকৃতি বর্ণনা।

তার পরই চা। বসন্তবাবু ব্যস্ত। গৃহিণী ব্যস্ত। 'খুড়িমা ব্যাপার খানা কি?'

'কি আশ্চর্য্য! লতিকাকে আহিরীটোলা হইতে দেখিতে আসিবে, তাঁ বুঝি জাননা?'

'কি আশ্চর্য্য! লতির কি বিবাহের বয়স হয়েছে!'

'কি আশ্চর্য্য! বাঙ্গাল হইলেই কি চক্ষু ছোট হয়?' হাস্য। বাস্তবিক নূতন কথা! এটা কি রমানাথ ভাবিয়া দেখে নাই?

'সাবান কিনে নিয়ে এস। এসেন্স্। রেশমের ফিতা। এলোচুলের পাউডার। ঠোঁটের আল্তা! সরকারকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও।'

'মালতীর মা ও মালতীকে ডাকিয়া আন—ঝি! তারা কেমন চুল বাঁধে! ঠিক বাঁধে না। খানিকটা বিনাইয়া, খানিকটা এলাইয়া, খানিকটা বাঁধিয়া সম্মুখটা তুলিয়া, অথচ মধ্যে মধ্যে কপালে পাড়িয়া, ছবিটির মত দেখাইতে পারে। বাঙ্গালদেশের লোকের কল্পনা আছে।'

সবুজঘর। লতিকার চুল লইয়া মালতী ব্যস্ত। মালতীর মা ও লতিকার মা আল্তা ও পাউডার লইয়া ব্যস্ত। বসন্তবাবু দুশ্চিন্তায় শুষ্ককণ্ঠ। মেয়ে কিছু কালো। পছন্দ করিবে ত? না করে, আরও তিনহাজার টাকা বাড়াইয়া দিলেই করিবে।

রমানাথ নানাবিধ সরঞ্জাম লইয়া উপস্থিত। লতিকা কত খুসি। কিন্তু হঠাৎ মুখ শুকাইয়া গেল কেন? রমানাথ মালতীকেই দেখিতেছে। মালতীকেই দেখিতেছে। রমাদাদা! এ আনন্দের দিনে আমাকে একবার দেখ্‌ছনা? (এটা মনের কথা, মালতীকেও বলিবে না)। বাঙ্গালদেশের লোক বাঙ্গাল দেশের লোককেই ভালবাসে। তাদেরই ভালবাসে।

(৬)

তাহারা সকলে আসিয়াছে।

'মালতী 'সই'কে আসনে বসাইয়া দিল।

দর্শকবৃন্দ তিনটি। ভবিষ্যতের বর 'পূর্ণচন্দ্র।' খুব বড় ঘরের ছেলে। ভবিষ্যতের ঠাকুর জামাই 'কেদারনাথ।' খুব তীক্ষ্ণদ্রষ্টা। ভবিষ্যতের মামাশ্বশুর 'বনমালী বাবু! কেবল জলযোগে মনোযোগ।

পূর্ণচন্দ্রের দৃষ্টি কেবল মালতীরই দিকে। রমানাথের তাহা ভাল করিয়া লক্ষ্য। মনের মধ্যে কেমন যেন একটা ভাব। মালতীর সঙ্গে রমানাথের কি সম্বন্ধ?

জলখাবার। চা। পদ্মার গল্প।

ঠিক পছন্দ হইয়াছে কিনা, তাহা অপ্রকাশ। পূর্ণচন্দ্র চাপা ছেলে। কেদার নাথ, 'ও মেয়েটি কাহার?' সুন্দরী বটে। অমনি পূর্ণচন্দ্রের মুখ লাল। কান সাদা। চক্ষু অবনত। প্রথম দৃষ্টিতেই এই অবস্থা!

সকলের কানাকানি। উঠিবার ব্যবস্থা। লতিকা অপছন্দ নয়। তবে কথাবার্ত্তা পরে পাকা হইবার সম্ভাবনা।

পূর্ণচন্দ্রের মধ্যে মধ্যে রমানাথের নিকট আসা। দুই জনে বন্ধুত্ব।

রমানাথ তাদের দেশের কথা লতিকাকে শিখান। বাঙ্গালদেশের রান্না খুব শিখিয়াছে। বাঙ্গালদেশের পূর্ব্বগৌরবের কথা, পদ্মার কথা, ব্রহ্মপুত্রের কথা, সে সকলই জানে।

কিন্তু আজকাল সে রমানাথের মুখের দিকে সাহস করিয়া তাকায় না।

কারণ?

ঠিক বুঝা যায় না। সম্ভব:—

১। হয় ত পূর্ণচন্দ্রের সহিত বিবাহের কথা।

২। হয় ত মালতীর দিকে রমানাথের একটু টান। ঠিক টান্ কি? পুরুষের মন এক রকম।

(৭)

অবশ্য শীতকাল।

জ্বর মালতীর। কঠিন জ্বর। লতিকার তরফ হইতে এবং পূর্ণচন্দ্রের তরফ হইতে বড় বড় ডাক্তার। অগাধ টাকা খরচ। সকলেরই জবাব।

'দাদা! তুমি একবার দেখ না।'

হাস্য। 'আমি সামান্য হোমিওপ্যাথি জানি মাত্র, এত বড় 'টাইফয়েড্ কেসে' শেষাবস্থায় কি করিতে পারি?"

লতিকার মুখ শুষ্ক। প্রাণে বড় ব্যথা।

'রমাদা! আমি তাহা হইলে বাঁচিব না।' সেই স্বপ্ন বড় দুঃখের। অবশেষে স্বীকার।

লতিকার অসাধারণ শুশ্রূষা। রমানাথের অসাধারণ দক্ষতা। একই ঔষধে মালতীর অবস্থার পরিবর্ত্তন। জীবনের আশা।

পরস্পরের জীবন কি প্রকার দাঁড়াইয়া গেল তাহা মনে মনে অন্যমনস্কভাবে রুগ্না মালতীর শয্যায় বসিয়া আলোচনা। মালতীর অশ্রুজল।

'সই আয়! বুকে আয়! তুই নিজের জীবন-বৃক্ষে কুঠারঘাত করিতে বসিয়াছিস্। আমার মরা এ সময় নিতান্ত দরকার ছিল।'

আমাদের লতির, ওদের লতির মত বুদ্ধি কোথায়? ব্যথা না পাইলে যাহারা কাঁদিতে জানে না, তাদের মন সাদা। ব্যথা পাইবার পূর্ব্বে যাহারা কাঁদিয়া সারা হয়, তাদের মন আরও গভীর স্তরে।

পদ্মার কথা, ঢাকার কথা, নারায়ণগঞ্জের কথা, মালতীর দেশের কথা, কলিকাতায় বসিয়া রমাদা'র সম্মুখে লতির ক্রমাগত আলোচনা।

রমানাথ ও মালতীর জীবনের মধ্যে লতিকা একটি কঠিন গ্রন্থি দিতে বসিয়াছিল। তাহার প্রতিজ্ঞা রমাদাদার সহিত মালতীর সে বিবাহ দিবেই। যত টাকা লাগে, যত ব্যথা পায়, যত জীবন যায় না। কেন এটা তার জীবনের ব্রত।

কিন্তু মালতী বাঙ্গাল দেশের মেয়ে খুব চালাক। সে হৃদয় হইতে সেই গ্রন্থিটুকু ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ঈশ্বরের চরণে অর্পণ করিল। বাঙ্গালের জেদ বড় ভয়ানক। যখন এত বড় জ্বরে সে মরে নাই, তখন দুঃখ সহিবার জন্যই তাহার জীবন। লতিকা তাহার ধ্রুব। রমানাথের ভালবাসার সহিত তাহার জীবনও সেই জীবনে উৎসর্গ করিল। মালতী জিতিল।

হঠাৎ প্রকাশ যে পূর্ণচন্দ্রের সহিত মালতীর বিবাহের দিন স্থির। বসন্ত বাবু স্তম্ভিত, লতিকা স্তম্ভিত, রমানাথ স্তম্ভিত। লতিকা কিছু সন্দিগ্ধ। 'সই, গা ছুঁইয়া বল্, সত্য সত্যই কি এটা তোর মনোমত?' মালতী, 'নিশ্চয়! এর মধ্যে দুটো কথা আছে। প্রথম, তোকে সে পছন্দ না করিয়া আমাকে পছন্দ করিয়াছে, তাহার শাস্তি আমি ছাড়া আর তাহাকে কেহ দিতে পারিবে না। দ্বিতীয় কথা—।'

'কি বল্‌না মালতী।'

মালতী। আমি ওঁকে ভালবাসি না।

লতি। রমানাথ দাদাকে ?

মালতী। তবে আর কাহাকে ? জগতে সকলকেই ভালবাসি। কেবল তাঁহাকে নয়। কেবল তাঁহাকেই নয়। সে আমার পরম শত্রু। আমার পরম শত্রু! যে আমাকে বাঁচাইয়া এই সংসার কারাগারে আবার ফেলিয়া দিয়াছে সে পরম শত্রু। এই রকম আর এক শত্রু আছে সে ঈশ্বর। এই জন্য তাহাকে আমরা দেখিতে পাই না। তোরা তাহাকে জীবন-দেবতা বলিয়া ডাক্, আমি ডাকিব না।' দুই জনে দুই জনকে আলিঙ্গন করিয়া অনেক কাঁদিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। কোন কথা নাই। তাহাদের মনের কথা তাহারাই বুঝে। দূরদেশের কথা, পদ্মার কথা, পুরাতন গৌরবের কথা। ব্রহ্মপুত্রের সহিত পদ্মা, পদ্মার সহিত গঙ্গার ত্রিধারার কথা।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

খাস্ মুন্সীর নক্সা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ব্যাপার দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। খাঁ সাহেব অথবা দেওয়ানজীর ঊর্দ্ধতন চৌদ্দপুরুষ কেহ ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষা পান নাই, এবং ইংরাজী বিদ্যালয় সমূহে কি রীতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা তাঁহারা আদৌ অবগত নহেন। অবশ্য তাঁহারা অনভিজ্ঞ বলিয়া ভাবিতেছেন যে, ৬০৲ টাকা বেতনে এক জন শিক্ষক আনাইয়াছেন; মহারাজের বিদ্যালয়ের জন্য ইহাই যথেষ্ট। এরূপ লোকেরা বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ। ইহাদের অধীন থাকিয়া আমি কি প্রকারে কাজ করিব, আমার ভাবনা হইল। আমি কেবল মাত্র ১৭৲ টাকা বেতনের একজন সহকারী চাহিয়াছি, তাহাতেই এই। আমি সমস্ত বিষয় সেক্রেটারী মহাশয় ও "পণ্ডিতজী"কে জানাইয়া স্পষ্ট বলিলাম যে, আমার এখানে থাকা অথবা এরূপ বিশ্ব পণ্ডিতদের অধীনে সুচারুরূপে কর্ত্তব্য পালন সম্ভবপর নহে। অতএব আমাকে বিদায় দিলেই ভাল হয়। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময়ে অন্য আবেদনপত্রসম্বন্ধীয় নিয়োগপত্র আমি পাই। সেই নিয়োগপত্রখানি দেখাইয়া আমি পুনরায় নির্ব্বন্ধ সহকারে তাঁহাদের বলি যে, আপনারা আমায় ছাড়িয়া

দিন। তাঁহারা মাসাবধি আমার সহিত বাস করিতেছেন, তজ্জন্য স্নেহবশতই হউক, অথবা আমার কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্যসাধন বিষয়ে আমাদ্বারা বিলক্ষণ সুবিধা হইবে ভাবিয়াই হউক, আমায় নিষ্কৃতি দিতে কোনও মতেই সম্মত হইলেন না। নানারূপ তর্ক বিতর্কের পরে স্থির হইল যে, এজেন্ট সাহেব এখানে বর্ত্তমান, আমি তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করি, এবং সমস্ত বিষয় তাঁহাকে ভাঙ্গিয়া বলি। ভাবিলাম, রহস্য মন্দ নহে! আমার সাহায্য করা দূরে থাকুক, বচসা বাধাইয়া আবার আমাকেই অগ্রসর করিয়া দিতেছেন।

পর দিন এজেন্ট সাহেবের নিকট গিয়া সমস্ত বিষয় তাঁহার গোচর করিলাম। তৎক্ষণাৎ তিনি সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়া আমায় ১৫৲ টাকা বেতনের সহকারী রাখিতে আজ্ঞা দিলেন, এবং বলিলেন, তিনি কৌন্‌সিলের সভ্যদের বলিয়া দিবেন। দুই চারি দিবস পরে শুনিলাম, এজেন্ট সাহেব খাঁ সাহেব ও দেওয়ানজীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হেডমাষ্টার তাঁহার পরামর্শে একজন সহকারীর জন্য আবেদন করিয়াছে, তাহার মঞ্জুরী দেওয়া হইয়াছে কি না! এই উভয় বীর ঠকিবার পাত্র নহেন। তাঁহারা উত্তর দেন, যখন হুজুরের পরামর্শে তিনি আবেদন করিয়াছেন, তখন গ্রাহ্য না হইবে কেন? এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া আমি আরও বিস্মিত হইলাম। স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, দেশী রাজ্যে থাকিতে গেলে বুঝি এইরূপ লুকোচুরী না করিলে চলে না। আমাদ্বারা তাহা হওয়া কঠিন। আমি বাল্যাবস্থা হইতে যে শিক্ষা পাইয়াছি, তাহা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। নূতন জীবনের নূতন অধ্যায় এই খানেই শেষ করা যাউক।

সপ্তম অধ্যায়।

পটোদ্ঘাটন।

দেশী রাজ্যের একজন সুদক্ষ কর্ম্মচারী হইতে গেলে কতকগুলি অদ্ভুত উপাদানে গঠিত হওয়া চাই। তন্মধ্যে তোষামোদের ভাগটা কিছু অধিক। এতদ্ব্যতীত মনে এক মুখে এক, এ অভ্যাসটা যথেষ্ট পরিমাণে থাকা চাই। ভাজিতেছ ঝিঙ্গা, বলিয়া যাও পটোল! আর যদি আপনার মনের অন্তস্তলে কোথায় কি গড়িয়া আছে, তাহা শত চেষ্টায় কেহ জানিতে না পারে, তাহা হইলে আপনি দেশী রাজ্যের একজন পাকা দেওয়ানের উপযুক্ত। আটে পিঠে দড়

তবে ঘোড়ার উপর চড়! যদি সাম, দান, ভেদ, দণ্ড প্রভৃতি সমস্ত রাজনীতি উদরস্থ করিয়া থাকেন, তবে এই দেশী রাজ্যরূপ অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাহাকে স্বচ্ছন্দে হাঁকাইতে পারিবেন, নতুবা আমার ন্যায় প্রতি পদে "পপাত ধরণীতলে"র ভাজন হইবে হইতে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই কৃত্রিমতার আবর্ত্তে যখন আমি প্রথম আসিয়া পড়ি, তখন রাজ্যটীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা অতি অদ্ভুত। মহারাজের বয়স তখন প্রায় ষাট বৎসর। শুনিলাম, তিনি দশ বৎসর পূর্ব্বে, তাঁহার পঞ্চাশ বৎসর বয়সে, রাজ-সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাহার পূর্ব্বে রাজ্যান্তর্গত কোনও পল্লীগ্রামে বাস করিতেন, এবং অবস্থাও তত ভাল ছিল না। সুতরাং এরূপ উচ্চ পদবীর ও দায়িত্বের অনুরূপ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা তাঁহার আদৌ ছিল না। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে বৃদ্ধাবস্থায় বিধাতা তাঁহাকে এই রাজ্যটীর অধীশ্বর করেন। প্রায় দেড় লক্ষ প্রজার জীবন-মরণ তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হইল। একে অশিক্ষিত, তাহাতে চরিত্র অতি দুর্ব্বল ও প্রকৃতি অত্যন্ত সরল, সুতরাং সর্ব্বনাশের যে সকল উপাদান আবশ্যক, একাধারে সে সকলের সমাবেশ ও সামঞ্জস্য ঘটিল।

এ রাজ্যে অপরাপর রাজ্যের ন্যায় রাজাদের নিজ খরচের একটী স্বতন্ত্র বিভাগ আছে। রাজাদের খাইবার পরিবার, নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে দান পারিতোষিক ইত্যাদি সমস্ত কার্য্যের সরবরাহ এই বিভাগ হইতে হইয়া থাকে। রাজ্য পরিরক্ষণার্থে অন্য সমস্ত ব্যয় সরকারী রাজকোষ হইতে হইয়া থাকে। মহারাজা বৃদ্ধ এবং অত্যন্ত সরলমতি, সুতরাং কুচক্রী ও দুষ্ট লোকের অভাব হইল না। নানারূপ দুষ্ট পার্শ্বচরগণ আসিয়া জুটিতে লাগিল। তাহারা সকলেই সেই দলের লোক, যাহাদের উল্লেখ আমি এই অধ্যায়ের প্রারম্ভেই করিয়াছি। দিব্য তোষামোদপটু এবং যুধিষ্ঠির মুখে এক ভিতরে এক। তাহারা প্রথমে মহারাজাকে এই বুঝাইল যে এই বিভাগটি মহারাজের নিজস্ব; যেন রাজ-খাজনা অপর কাহারও। মহারাজাও তাহাই বুঝিলেন। যখন এই ভ্রমাত্মক বিশ্বাস তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইল তখন উক্ত বিভাগে অর্থ সংগ্রহ করিতে তাঁহাকে পরামর্শ দেওয়া হয়। রাজ্যে যে আয় ব্যয়ের বাৎসরিক হিসাব প্রস্তুত হয় তাহাতে মহারাজার নিজ ব্যয় সঙ্কুলনার্থে ২০৷২৫ সহস্র মুদ্রা দেওয়া হইত। তাহা ঐ বিভাগ হইতে রাজার নিজ কর্ম্মচারী দ্বারা ব্যয় করা হইত। কিন্তু অর্থলোভের এমনি মোহিনী শক্তি! রাজার যখন দৃঢ় বিশ্বাস যে তাঁহার নিজ বিভাগটী নিজস্ব আর রাজখাজনা

অপরের, তখন ২০।২৫ সহস্র টাকা বাৎসরিক আয়ে তাঁহার কিরূপে চলিতে পারে? অর্থাকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ বলবতী হইতে লাগিল। এবং কুচক্রীরা নিজ নিজ কু-পরামর্শে সেই আকাঙ্ক্ষারূপ বহ্নিতে লোভরূপ ঘৃতাহুতি দিয়া ক্রমশঃ সেই বহ্নি উদ্দীপিত করিতে লাগিল। ফল এই দাঁড়াইল যে, মহারাজা অর্থলোভে অত্যন্ত উৎকোচগ্রাহী হইয়া দাঁড়াইলেন। রাজ্যের কোন একটী পদ খালি হইয়াছে অমনি আবেদনকারীরা এই সমস্ত কুচক্রীদের মধ্যস্থ করিয়া মূল্য নিরূপণ করিতে উপস্থিত। মূল্যের কসা মাজা আরম্ভ হইল। ফল কথা পদটি নিলামে চড়িল। মূল্য নির্দ্ধারণ হইয়া টাকা মহারাজার নিজ বিভাগে জমা হইলেই যে ব্যক্তি টাকা দিল তাহাকে পদে নিয়োগ করা হইল। ছয় মাস বা এক বৎসর উক্ত ব্যক্তি কার্য্য করিয়াছে কিনা সন্দেহ, অমনি একটা তুচ্ছ অপরাধে ফেলিয়া তাহাকে সরাইয়া অপর ব্যক্তির নিকট হইতে পুনরায় ঐরূপ মূল্য গ্রহণ করিয়া নিয়োগ করা হইল। ঈদৃশ এবং অন্যান্য নানারূপ অবৈধ উপায়ে মহারাজা নিজ বিভাগের কোষ অর্থ পূর্ণ করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে যে "খাঁ" সাহেব ও "দেওয়ান" সাহেবের উল্লেখ করিয়াছি উক্ত মহারাজার সময়ে তাঁহারা এই রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারী। দেওয়ান সাহেব উৎকোচগ্রাহী। দেশী রাজ্যের প্রায় ষোল আনা কর্ম্মচারী উৎকোচগ্রাহী, সুতরাং সেই রাজ্যের অন্ন যাহার "হাড়ে হাড়ে" প্রবেশ লাভ করিয়াছে এমন যে "দেওয়ান" তিনি উৎকোচ গ্রহণ করিবেন ইহাতে আর আশ্চর্য্যের কথা কি? তবে "খাঁ" সাহেবের চরিত্র অতি নির্ম্মল। আমি আজ ২৮।২৯ বৎসর ধরিয়া এখানে রহিয়াছি, কখনও তাঁহার নামে কোনরূপ অপবাদ শুনি নাই। এই দুই-জন যখন প্রধান কর্ম্মচারী তখন ইহারা রাজ্যের সুবন্দোবস্তের জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট দায়ী। এজেণ্ট সাহেব প্রভৃতি দেশের অত্যাচারের কথা শুনিলে তাঁহাদের নিকট হইতেই জবাব তলব করিতেন এবং ইহারা দুই জন জবাব দিতে বাধ্য। সুতরাং মহারাজা যে সমস্ত অদৃষ্টচর কাণ্ড করিতে লাগিলেন এই দুই লোক সময়ে সময়ে তাহাতে বাধা দিতেন এবং প্রতিবাদ করিতেন; তজ্জন্য উক্ত কুচক্রীদের বিষ নয়নে পড়েন। তাহারা নানারূপ ছল করিয়া মহারাজার সহিত ঝগড়া বাধাইয়া ইঁহাদের দুই জনকে বিপদে ফেলিবার উদ্যোগ করে। কিন্তু সফলকাম হইতে পারে নাই। তাহার কারণ ২৮ বৎসরের অভিজ্ঞতায় আমার যে ধারণা হইয়াছে তাহাতে এই বোধ হইতেছে যে যাহারা অত্যাচারী তাহারা কখনই সৎসাহসী হয় না। মহারাজা ক্রমশঃ

অত্যাচারী হইয়াছিলেন বলিয়া, ক্ষত্রিয় হইলেও সৎ-সাহসটুকু হারাইয়াছিলেন এবং "খাঁ" সাহেব ও "দেওয়ানকে" মনে মনে ভয় করিতেন।

রাজ্যের সৈন্য বিভাগের এক পল্টনের নাম আরদালী, ইংরাজী "orderly" শব্দের অপভ্রংশ। "আরদালী" দলভুক্ত সিপাহীরা রাজবাটীতে রাজার সন্নিকটে থাকিয়া সর্ব্বদা পাহারা দিয়া থাকে সুতরাং রাজার সহিত ক্রমশঃ তাহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইয়া উঠে। এবম্প্রকারে কুচক্রীদের মধ্যে "আরদালী"-ভুক্ত গুটীকতক লোক মহারাজার প্রধান কর্ণেজপ হইয়া উঠে। চলিত কথায় এদেশে "আরদালীর সিপাহীদের" "আরদালীকা মোড়া" কহে। এ প্রদেশে গ্রাম্য ভাষায় ছেলেকে "মোড়া" বলে। ক্রমশঃ "আরদালীকা মোড়া"র নামে দেশের লোকের হৃৎকম্প হইতে লাগিল।

এখানকার অধিবাসীরা অধিকাংশই নিরক্ষর মূর্খ, সুতরাং অশিক্ষিত সমাজে যে সকল পুরাতন অপকৃষ্ট ধর্ম্ম বিশ্বাস থাকে এতদ্দেশে তাহার অভাব নাই। ভূত, প্রেত, ডাকিনী, মারণ, উচাটন, যাদু ইত্যাদি সকল বিষয়ে লোকের অটল বিশ্বাস। বৃদ্ধ মহারাজারও এ সকল বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস। "আরদালীর মোড়ারা" রাজাকে উৎকোচগ্রাহী করিয়া সেই সঙ্গে নিজেরাও বেশ দশ টাকা উপার্জ্জনের পথ পরিষ্কার করিয়া লইল। আবার কাহারও সহিত শত্রুতা হইলে বা কোন সঙ্গতিপন্ন লোকের নিকট হইতে কিছু অর্থ দোহন করিবার ইচ্ছা হইলে এক অভিনব উপায় কুচক্রীরা উদ্ভাবন করিল। নগরের বহির্ভাগে বন, জঙ্গল, নালার অভাব নাই। তাহারা কোন একটী নিভৃত স্থানে একজন কৌপীনধারী সন্ন্যাসীকে রাত্রিকালে বসাইয়া, তাঁহার সম্মুখে মাসকলাই বাঁটিয়া তদ্দ্বারা একটী পুত্তলিকা প্রস্তুত করত তাহাতে একটু সিন্দূর লেপন পূর্ব্বক, উক্ত পুত্তলিকার বক্ষস্থলে একটী লৌহ শলাকা বিদ্ধ করিয়া ২।৪টী পুষ্প এবং একটী ঘৃতের প্রদীপ রাখিয়া দিত। কৌপীনধারীকে ২।৪ টাকা দিয়া পূর্ব্বাহ্নে বশীভূত করিয়া মোড়াদিগের মধ্যে একজন গিয়া রাজাকে সংবাদ দিল—"মহারাজ, শুনিলাম অমুক স্থলে এক বাবাজী আপনাকে মারিবার জন্য কোনরূপ জাদু করিতেছে।" মহারাজা ভয়ে ও ক্রোধে কম্পান্বিতকলেবর হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় "মোড়া"দের উক্ত বাবাজীকে ধৃত করিয়া রাজবাটীর সম্মুখে পুলিশ কোতওয়ালীতে আনিবার আজ্ঞা দিলেন। "মোড়ারাও" তাহাই চায়। তাহারা চতুর্দ্দিকে ছুটিল। কৌপীনধারীকে বাঁধিয়া আনিয়া "কোতওয়ালীতে" উপস্থিত করিল। তথায় পূর্ব্ব পরামর্শ

মত ২।৪ বার প্রহারের পরই বাবাজী নগরস্থ কোন ভদ্রলোকের নাম করিয়া বলিল—"তিনি আমায় এ কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন।" মহারাজার নিকট সে সংবাদ "যোড়ারা" জানাইল। ভদ্রলোকটীর সর্ব্বনাশ। তাঁহাকে ধরিয়া আনিবার সময় এই কুচক্রীরা পথে তাঁহাকে নানারূপ ভয় দেখাইয়া বিলক্ষণ অর্থ দোহনের সুবিধা করিয়া লইত। তাঁহাকে তৎপরে রাজবাটীতে হাজির করিয়া তাহারা নিজেরাই ২।৪ জন মিলিয়া রাজার নিকট তাহার সুপারিশ করিত এবং তাঁহার খাস বিভাগে কিছু টাকা দেওয়াইয়া এবং কিছু নিজেরা উদরস্থ করিয়া ছাড়িয়া দিত। আর যদি সে গরিব বেচারী টাকা না দিতে পারিল বা সম্মত না হইল, তাহা হইলে তাহার দোষের কোন বিচার বা অনুসন্ধান না করিয়াই তৎক্ষণাৎ তাহাকে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য "কোতওয়ালীতে" পাঠান হইত। তথায় তাহাকে উলঙ্গ করিয়া চর্ম্ম দ্বারা বিলক্ষণ প্রহার করিয়া এবং নানা প্রকারে অপমান করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত। এইরূপে কতশত লোকের অর্থনাশ ও বিবিধ প্রকারে লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করিতে হইয়াছে তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। পাঠক, আমার বর্ণনা অতিরঞ্জিত মনে করিবেন না। আমি প্রকৃতই সত্য কথা বলিতেছি। পরবর্ত্তী মহারাজার সময় এইরূপ দুই একটী জাদুর মকদ্দমা আমার সম্মুখে হইয়াছে, তবে আমরা থাকাতে এবং সময়ের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনবশতঃ সেইরূপ অত্যাচার হইতে পারে নাই। এ রাজ্য বলিয়া নহে, এ প্রদেশের প্রায় অনেক রাজ্যেই জাদু অর্থাৎ যাহাকে হিন্দীতে "কর্ত্তুত" বলে তাহার বড়ই ভয়।

রাজদরবার হইলেই পাত্র মিত্র, সর্দ্দার, পণ্ডিত, সভাপণ্ডিত প্রভৃতি রাজ দরবারের বিবিধাঙ্গ থাকা চাই। সুতরাং বৃদ্ধ মহারাজার রাজ দরবারেও কতকগুলি পণ্ডিত এবং তাঁহাদের সর্ব্বোপরি এক বিশ্বপণ্ডিত সভাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার নাম ভৈরব। তিনি এখন কালভৈরব রূপ ধারণ করিলেন। এই শ্রীকৃষ্ণের জীবেরা অতি সহজেই এরাজ্যে পণ্ডিত নামধারী হইয়া থাকেন। এখানে যে ব্যক্তি সারস্বত ব্যাকরণের পূর্ব্বার্দ্ধ ও চন্দ্রিকা ব্যাকরণের উত্তরার্দ্ধ পাঠ করিয়াছে এবং শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ মাত্র পাঠ করিয়াছে সেই পণ্ডিত। আর বেদান্তদর্শন, স্মৃতি, সাহিত্য, ব্যাকরণ এ সমস্ত বিবিধ শাস্ত্রের চর্চ্চার কোনই আবশ্যক নাই এবং কেহ এ সকল শাস্ত্র চর্চ্চার তোয়াক্কাও রাখে না। যখন পণ্ডিতপদ এত সহজলভ্য তখন ও সকল কটমটে শাস্ত্র চর্চ্চার এ ক্ষুদ্র-

জীবনটুকু নষ্ট করিবার, আবশ্যক কি? যাহা হউক, ভৈরব যখন দেখিলেন যে মহারাজার পার্শ্বচরগণ তথা আর্দালির "মোড়ারা" জাদু রূপদেশে দিব্য দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতেছে তখন তিনি এ সুবিধা ছাড়েন কেন? তিনি নিজ পণ্ডিতী মস্তিষ্ক আলোড়ন করিয়া এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। এ প্রদেশের প্রত্যেক রাজ্যে রাজাদের কোন না কোন অধিষ্ঠাত্রী দেব বা দেবী আছেন। রাজারা তাঁহাদের নিজ নিজ রাজ্যের রক্ষাকর্ত্তা বা কর্ত্রী মনে করিয়া থাকেন এবং তৎপ্রতি নরপতিদের বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধাও আছে। যেমন উদয়পুর রাজ্যে একলিঙ্গেশ্বর, জয়পুরে আমেরের কালীমাতা। এইরূপ আমাদের এই রাজ্যে একটী প্রসিদ্ধ দেব আছেন, তিনি জগৎপ্রসিদ্ধ। সমগ্র হিন্দু সমাজে তাঁহার নাম ও গৌরব ঘোষিত। দেব বিগ্রহটী খাস রাজধানীতেই বিরাজ করিতেছেন। আবার নগর হইতে কিছুদূরে পর্ব্বত ও জঙ্গলের মধ্যে এক দেবী আছেন, তিনি এ দেশে বিলক্ষণ প্রসিদ্ধা। প্রতি বৎসর তাঁহার মেলা হয়; সেই সময় বহুদূর হইতে ভক্তগণ তাঁহাকে দর্শন করিতে আসে। সকলেরই বিশ্বাস ভগবতী অতি জাগ্রত। ভক্তিভাবে তাঁহার নিকট যাহা প্রার্থনা করা যায় তাহাই সিদ্ধ হয়। ধর্ম্ম বিশ্বাসে প্রণোদিত হইয়া এই সিদ্ধ বা "জাগ্রত" ভাবটী ক্রমশঃ বর্দ্ধমান হইয়া পরিশেষে এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে, যে এখন লোকের দৃঢ় বিশ্বাস দেবী ভাবাবেশ দ্বারা বিশেষ লোকপ্রমুখাৎ নিজ আদেশ প্রকাশ করিয়া থাকেন। মোট কথা, ইতিহাসভক্ত পাঠক গ্রীশদেশে যে ডেল্‌ফিক্ অরেক্‌লের ব্যাপার পাঠ করিয়াছেন ইহাও কতকটা সেইরূপ। এ আদেশ ব্যাপার আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি; কিন্তু সত্যের অনুরোধে আমাকে বলিতে হইতেছে আমার ইহাতে আদৌ বিশ্বাস নাই।

এই আদেশ কিরূপে হইয়া থাকে তাহার আনুসঙ্গিক বিবরণ আমি যেরূপ স্বচক্ষে দেখিয়াছি তাহাই বর্ণনা করিতেছি। একটু গভীর রাত্রিতে দেবীর সম্মুখে 'নাট মন্দিরে" দুই দল "চামার" সারি দিয়া বসে। এতদ্দেশে চামার বলিয়া এক নিকৃষ্ট জাতি আছে। ম্যাথরের ন্যায় নিকৃষ্ট নহে, তবে অস্পৃশ্য বটে। বৃহৎ নাগড়া বাদন করিতে করিতে নিজেদের "চামরী" ভাষায় দেবীর গুণগান করিতে থাকে। এতদঞ্চলে গুজর নামে একজাতি আছে, ইহারা প্রায়ই চাষা শ্রেণীর এবং গোয়ালার সহিত অনেকটা মেলে। কৃষিকর্ষণ ও গো মহিষ পালন ইহাদের প্রধান জীবিকা। এই জাতীয় একটী লোকের দ্বারা দেবীর আদেশ হইয়া থাকে। এতদঞ্চলে উক্ত গুজরকে "ভোপা" বলিয়া থাকে।

"ভোপা" দেবীর বেদীর নিকট স্থিরভাবে বসিয়া চামারদের গীত শ্রবণ করিতে থাকে। প্রায় ১৫।২০ মিনিট এইরূপ গীত শ্রবণ করিতে করিতে তাহার শরীরে কম্পন আরম্ভ হয়। ক্রমশঃ কম্পন বৃদ্ধি হইতে থাকে। যতই কম্পন বৃদ্ধি হয় ততই চামারেরা নাগড়া পেটার মাত্রা বাড়াইতে থাকে; শেষে কম্পন এত বৃদ্ধি হয় যে "ভোপার" মস্তকের উষ্ণীষ পড়িয়া যায়। উষ্ণীষ পড়িয়া গেলেই সে দেবীর চরণে লুটাইয়া পড়ে; অমনি দেবীর মোহন্ত চরণামৃত তাহার মস্তকে ছিটাইয়া দেন। তৎক্ষণাৎ ভোপা কম্পান্বিতকলেবরে লাফাইয়া সেই চামারদের মধ্যে আসিয়া পড়ে এবং এই সময়ে মনুষ্য নিদ্রিতাবস্থায় নাসিকায় যেরূপ গর্জ্জন করিয়া থাকে তদ্রূপ অথবা শূকরের নাসিকার শব্দের ন্যায় মধ্যে মধ্যে শব্দ করিতে থাকে। সে এক অতীব আমোদজনক ব্যাপার। চামার মণ্ডলীর মধ্যগত হইলেই ভোপা মহাশয়ের হস্তে মোহন্ত দেব একখানি উলঙ্গ তরবারী প্রদান করেন। তরবারী খানির মধ্যদেশ ভোপা বজ্রমুষ্টির দ্বারা ধারণ করে। উলঙ্গ তরবারীর মধ্যদেশ এরূপ বজ্রমুষ্টির দ্বারা ধরিতে দেখিয়া আমি প্রথমে একটু বিস্মিত হইয়াছিলাম। কিন্তু পরে মনোযোগপূর্ব্বক দেখিয়া জানিতে পারিলাম তরবারী খানি ভোতা। যে দিন আমি উপস্থিত ছিলাম সে দিবস নিকৃষ্ট জাতির মিনা, গুজর, মালী ইত্যাদি অনেক স্ত্রী পুরুষ দেবীর আদেশ প্রাপ্তির জন্য জাগরণ করাইয়াছিল। প্রদীপ জ্বালিয়া, নাগড়া পিটিয়া গীত প্রভৃতি কার্য্যকে জাগরণ কহে। দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে যাঁহারা জাগরণ করাইয়াছিলেন তন্মধ্যে অনেকেই রুগ্ন। কেহ জ্বর, কেহ চক্ষুরোগ, কেহ বা রাতকাণা প্রভৃতি রোগ হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছায় তথায় আসিয়াছিল। জাগরণ করাইতে গেলে প্রত্যেকের নিকট হইতে ১॥০ টাকা শুল্ক গ্রহণ করা হয়। যাহা হউক, "ভোপা" মহাশয় সর্ব্বাঙ্গ কাঁপাইতে কাঁপাইতে, জন্তু বিশেষের ন্যায় নাসিকার শব্দ করিতে করিতে, তরবারী হস্তে রোগীদিগের মধ্যে উপস্থিত হইয়া কাহাকেও চরণামৃত দিলেন কাহাকেও বা দেবীর বেদীস্থিত কিঞ্চিৎ 'বিভূতি' দান করিলেন; চক্ষুরোগে প্রপীড়িত রোগীর চক্ষুর্দ্বয়ে চরণামৃত ছিটাইয়া দিলেন; এবং প্রত্যেককে এইরূপ ঔষধ দানের পর, কাহাকে বা ১০, কাহাকে বা ৫, কাহাকে বা ১৫ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে বলিলেন। ফল কথা, ব্রাহ্মণের উদর পূর্ণ করিতে না পারিলে কোন কার্য্যেরই সাফল্য নাই। এই সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া এক দীর্ঘ নাসিকার শব্দ করিয়া "ভোপা" মহাশয় আমার দিকে মনোযোগ দিলেন। আমি কোন প্রশ্নই করি নাই।

তবে মনে মনে পরীক্ষার জন্ত একটী প্রশ্ন ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম, এবং ভাবিয়াছিলাম, জগজ্জননী ত সর্ব্বান্তর্যামিণী; যদি বাস্তবিকই তাঁহার আদেশ হয় তবে বিনা শুল্ক দানেও বিনা প্রশ্ন উত্থাপনে আমার মনের কথা সম্মুখস্থ "ভোপা" বলিয়া দিবে। কিন্তু তাহা হইল না। "ভোপা" আমার দিকে ফিরিয়া এক মুষ্টিপূর্ণ ভস্ম এবং বাতাসা চূর্ণ আমার হস্তে দিয়া বলিল "লে মেয়া পাস আওর ক্যা হ্যায়"। আমি দেশ কাল ও পাত্রের মহিমার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া "ভস্মমুঠা পকেটস্থ করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

মহারাজাদের এই আদেশের প্রতি অচলা ভক্তি। তাঁহাদের কৃত জাগরণের সময় জনতা থাকে না। কেবল ২।৪টী বিশ্বাসী লোক ব্যতীত অপর সকলকে মন্দির হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। ভৈরব এখন কাল-ভৈরব রূপ ধারণ করিয়া কিছু অর্থ ব্যয় করত "ভোপা"কে স্বদলভুক্ত করিলেন এবং কাহারও নিকট হইতে অর্থ শোষণ করিতে হইলে বা কোন শত্রুকে লাঞ্ছিত করিতে ইচ্ছা করিলে, মহারাজার জাগরণের সময় "ভোপার" দ্বারা প্রত্যাদেশ করাইতেন "দেখ ছত্রী অমুকের নিকট সাবধান"। মহারাজা অমনি আদিষ্ট ব্যক্তির প্রতি খড়্গহস্ত হইতেন। বিধিমত তাহার উপর অত্যাচার হইতে আরম্ভ হইত। কোন একটী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এক সময়ে কালভৈরবের একটু বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন বলিয়া এই "ভোপার" চক্রান্তে পড়িয়া তাঁহাকে বিলক্ষণ অপমানিত হইতে হয়। রাজবাটীর সম্মুখস্থিত একটী কামানের মুখে তাঁহাকে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়া দুই প্রহর রৌদ্রে প্রায় তিন ঘণ্টা দাঁড় করাইয়া রাখা হয়। তিনি মৃতপ্রায় হইলে কেহ গিয়া মহারাজকে ব্রহ্মহত্যার ভয় দেখায়, তখন সেই গরিব ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এ সমস্ত এখন পুরাতন কথা।

রাজা যখন এরূপ অত্যাচারী হইয়া দাঁড়াইলেন তখন প্রজাকে আর কে রক্ষা করিবে? রাজা যখন উৎকোচগ্রাহী হইলেন তখন রাজকর্ম্মচারীরা উৎকোচ গ্রহণ কেন না করিবে? রাজার এই সমস্ত অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া কর্ম্মচারীদের মনের ভয় ভাঙ্গিয়া গেল; এখন তাহারা প্রকাশ্যে প্রজাপীড়ন ও উৎকোচ গ্রহণ করিতে লাগিল। সকলেই নিজ নিজ স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত। রাজকার্য্যের পরিদর্শন কে করে? রাজা অস্থিরচিত্ত, সুতরাং কর্ম্মচারিবর্গের নিজ নিজ পদের স্থিরতা সম্বন্ধে কোনই বিশ্বাস নাই। অতএব তাহাদের সকলের এই চেষ্টা যে কয়দিন আছি যাহা পারি উপার্জ্জন করিয়া লই। রাজা প্রাক্তে

এক আজ্ঞা দেন, সন্ধ্যার সময় তাহার ঠিক বিপরীত আজ্ঞা প্রচারিত হয়। কর্ম্মচারীদের মধ্যে বিলক্ষণ ঘন ঘন পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। দেওয়ানী, ফৌজদারী কার্য্যাদি তথা ভূমিকর ও রাজস্ব ইত্যাদি আদায় বিষয়ে বিলক্ষণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে লাগিল। রাজস্ব ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল। রাজকোষে টাকা আর দেখা যায় না। রাজ্যের সমস্ত কর্ম্মচারী তথা ফৌজ পল্টন দিগের বেতন বাকি পড়িতে লাগিল। তহসিলদারেরা নিজ নিজ উদর পূরণে ব্যস্ত, সময় মত কেহ তহসিল করিয়া রাজস্ব পাঠায় না। রাজকোষ শূন্য হইয়া রাজ্যটী ক্রমশঃ ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িল; কিন্তু মহারাজার খাস বিভাগ দিব্য অর্থে পূর্ণ হইয়া "সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা" হইয়া উঠিল। মহারাজাকে এখন কুচক্রীরা পরামর্শ দিল যে একটী ব্যাঙ্ক খুলিয়া দেওয়া হউক; নগরবাসীর কাহারও ঋণ আবশ্যক হইলে তাহারা উক্ত খাস বিভাগ হইতে অনায়াসে হ্যাণ্ড-নোট লিখিয়া টাকা লইতে পারিবে। খুব উচ্চহারে ঋণ দেওয়া আরম্ভ হইল। আবার ঋণ-আদায়ের সময় প্রজাবর্গের উপর বিলক্ষণ অত্যাচার ও পীড়ন হইতে লাগিল। ফল কথা, রাজ্য ছারখার করিবার জন্য যে সমস্ত দোষ ও অত্যাচারের আবশ্যক সমস্ত গুলিই আসিয়া একে একে দেখা দিল, কোনটীরই আর অভাব রহিল না।

এ স্থলে রাজ পরিবারের একটু পরিচয় না দিলে সমস্ত কথা পরিস্ফুট হইবে না। আমাদের বৃদ্ধ মহারাজার তিন ভ্রাতা। মহারাজা নিজে মধ্যম। জ্যেষ্ঠের মৃত্যু বহুদিন পূর্ব্বে হইয়াছে। মৃত্যুকালে তিনি এক শিশু পুত্র রাখিয়া যান। কনিষ্ঠের মৃত্যু অতি অল্প দিন হইল হইয়াছে। তাঁহার দুই পুত্র। মহারাজা অপুত্রক। এই নিমিত্ত তিনি জ্যেষ্ঠের পুত্রকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছেন এবং সিংহাসনারোহণের অল্পকাল পরেই তাঁহাকে যৌবরাজ্যে বরণ করিয়াছেন। এখানকার এই নিয়ম, রাজা গদি পাইলেই তৎসঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উত্তরাধিকারীও মনোনীত হয়। যুবরাজের নিজ ব্যয় নির্ব্বাহার্থে যে ভূসম্পত্তি আছে তাহার বাৎসরিক আয় প্রায় দশ সহস্র মুদ্রা হইবে। আমি যখন আসি তখন যুবরাজের বয়স প্রায় ২৩।২৪ বৎসর হইবে। ওদিকে কতক গুলি কুচক্রী মিশিয়া রাজাকে যেরূপ অসৎ পরামর্শ দিয়া রাজ্যনাশ করিতে লাগিল, এদিকে যুবরাজেরও ২।৪টী পার্শ্বচর মিলিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধনে উদ্যত হইল। বুদ্ধি বিবেচনায় পিতাপুত্র উভয়েই সমান। যুবরাজের পার্শ্বচর তাঁহার এক পাচক ব্রাহ্মণ ও দুইজন গোলাম-জাতীয় অর্দ্ধ

ক্ষত্রিয়। পাচককে যুবরাজ "দাদা" বলিয়া ডাকিতেন। এই তিনজনের পরামর্শে যুবরাজের গৃহকার্য্য ও বিষয় কার্য্য সমস্তই সম্পন্ন হইত। ক্রমে ক্রমে এই তিনজন যুবরাজকে অপদেবতার স্থায় পাইয়া বসিল এবং নানাসূত্রে তাহারা নিজেদের উদর পূর্ত্তি করিতে ত্রুটী করিত না। যুবরাজ তাহাদের হস্তে ক্রীড়নক হইয়া দাঁড়াইলেন। যুবরাজের যাহা বাৎসরিক আয় তাহাতে কুলায় না। ইতি মধ্যেই দুইটী দার পরিগ্রহ করা হইয়াছে। দুই স্ত্রীর দাস দাসী, আহার, পরিচ্ছদ সমস্তই স্বতন্ত্র। বড় ঘরের এইরূপ রীতি। তাহার উপর যুবরাজের নিজের খরচ ও পাপগ্রহদের উদরপূর্ত্তি। সুতরাং ব্যয় সংকুলান না হইবারই কথা। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ। ইনিও পিতার ছন্দানুবর্ত্তী হইলেন। প্রথমে নিজ জায়গীরে রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে উৎপীড়ন আরম্ভ হইল। প্রজাবর্গের উপর অত্যাচার ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। প্রজারা সন্নিহিত অন্য রাজ্যে "ভিটা" ত্যাগ করিয়া পলায়ন করত প্রাণ বাঁচাইতে লাগিল। তৎপরে "বোহরা" জাতীয় উত্তমর্ণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ আরম্ভ হইল। না দিলে বাটীর সম্মুখস্থ নিম্ব বৃক্ষের শাখায় লম্বমান করিয়া তাহাদের বেত্রাঘাতে এবং "তুদম" নামক যন্ত্রে (Stocks) তাহাদের পদদ্বয় আটকাইয়া অশেষবিধ অত্যাচার ও অপমান এই তিন নরাধম করিতে আরম্ভ করিল। এখানকার লোকেদের এরূপ ধারণা (ধারণাটি নিতান্ত অলীকও নহে) যে রাজারা অথবা রাজপরিবারস্থ উচ্চপদস্থ লোকেরা প্রায় স্বার্থপর ও চলচিত্ত হইয়া থাকে; এইজন্য এই সকল হীনজাতীয় পার্শ্বচরগণ সতত রাজাদিগকে চতুর্দ্দিক হইতে ঘেরিয়া রাখে, এবং সর্ব্বদা এরূপ কার্য্য করে যাহাতে গ্রহটী তাহাদের সম্পূর্ণ করতলস্থ হইয়া নিজ কক্ষমধ্যে থাকে এবং কক্ষরেখা হইতে এক পদ বাহিরে না যাইতে পারে। এই জন্য এই তিন পাপগ্রহ এখন যুবরাজকে অন্য দিকে চালিত করিল। এখানে কতকগুলি দক্ষিণদেশীয় ব্রাহ্মণ আছেন। এই ব্রাহ্মণদিগের মধ্য হইতে একটী সুন্দরী ব্রাহ্মণীর সহিত যুবরাজের অবৈধ প্রণয় জন্মাইয়া দিল। যুবরাজের চরিত্র যৌবনের প্রারম্ভ হইতে দুষ্ট হইয়াছিল, তাহা পাপগ্রহদের অবিদিত ছিল না। প্রথমে নগর বহির্ভাগে কোন জঙ্গলে উভয়ের মধ্যে মধ্যে মিলন হইত, তৎপরে প্রণয় যখন ক্রমশঃ গাঢ় হইয়া আসিল তখন সেই স্ত্রীলোকটা বাটীতে গুপ্ত ভাবে আসা যাওয়া আরম্ভ করিল। পাপ কার্য্য অধিক কাল প্রচ্ছন্ন থাকে না। জ্যেষ্ঠা পত্নী ক্রমশঃ সমস্ত অবগত হইলেন। সেই তেজস্বিনী

রাজপুত কন্যার, এই সকল ব্যাপার অসহ্য হওয়ায়, তিনি এক দিবস নিজ বাঁদীদিগের দ্বারা উক্ত কুলটাকে ধর পাকড় করেন। যুবরাজ তজ্জন্য ক্রোধান্ধ হইয়া স্ত্রীর কিছু করিতে পারিলেন না, কেবল বাঁদীদিগকে সর্ব্বসমক্ষে কশাঘাত করেন। শ্রাদ্ধ দিব্য গড়াইতে লাগিল। এই ব্যাপারের পর কুলটা প্রকাশ্যেই বাটীতে আসা যাওয়া আরম্ভ করিল। তিন উপগ্রহ উক্ত পাপিষ্ঠা রমণীর দ্বারা যুবরাজকে স্থায়িরূপে করতলগত করিবার আশায় এক ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। কুলটা এখন যুবরাজকে ক্রমশঃ গলাধঃকরণ করিয়া "খাওয়াস" হইবার প্রস্তাব করিল। বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকার কর্ণে "খাওয়াস" কথাটা অদ্ভুত ঠেকিবে। বাস্তবিক তাহাই বটে। আমাদের দেশে এ জঘন্য প্রথা আদৌ প্রচলিত নাই। এ প্রথার একটু ইতিবৃত্ত শুনিলেই পাঠক পাঠিকারা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন যে ক্ষত্রীয় সমাজ কিরূপ উপাদানে গঠিত। এরূপ কলুষিত প্রণয়ে পড়িয়া উপপত্নীকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইয়া পর্দার মধ্যে স্ত্রীর ন্যায় রাখাকে "খাওয়াস" করা বলে। পূর্ব্বে সে রমণী অতি নীচ বারবনিতার ব্যবসায় করিয়া থাকুক তাহাতে কোনই ক্ষতি নাই; অন্তঃপুরে সে "খাওয়াস" রূপে প্রবেশ লাভ করিলেই প্রায় বিবাহিতা পত্নীর সমকক্ষ হইয়া দাঁড়ায়। এ প্রথাটা মুসলমানদের অনুকরণ মাত্র। যুবরাজ এখন প্রেমান্ধ। হ্রস্ব দীর্ঘ জ্ঞান নাই। তাহার উপর সেই তিনটী উপগ্রহ উৎসাহদাতা। সুতরাং নির্ব্বিবাদে কুলটাকে "খাওয়াস" করা হইল। সেই স্ত্রী-লোকটাও সময় বুঝিয়া যুবরাজকে গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া শপথ করাইয়া লইল যে তিনি জীবনান্ত হইলেও তাহাকে ত্যাগ করিবেন না। দক্ষিণদেশীয় ব্রাহ্মণ মহলে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। কুলটার এরাজ্যে পিত্রালয়। তাহার পিতা চতুর্দ্দিকে চিৎকার করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু আপাততঃ সে বেচারির অরণ্যে রোদন। কিছু কাল পরে উক্ত রমণীর স্বামীস্ত্রীপ্রাপ্তির আশায় কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট অনেক অনুযোগ করে। শ্রাদ্ধ আরও গড়াইল। পরে কিছু অর্থ দিয়া তাহার সহিত নিষ্পত্তি করা হয়।

"খাওয়াসজী" যুবরাজের অঙ্কলক্ষ্মী হইয়া তাঁহার গৃহে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইলেন। যুবরাজের পরিণীতা জ্যেষ্ঠা পত্নী সুবুদ্ধি ও তেজস্বিনী রমণী। দ্বিতীয়া পত্নী বালিকা। ইহার বয়স তখন একাদশ অথবা দ্বাদশ। উভয়ের উপর খাওয়াসজীর সমগ্র সপত্নী-বিদ্বেষ পড়িল। সেই সঙ্গে সঙ্গে যুবরাজের

অত্যাচারও বাড়িল। মধ্যে মধ্যে তাহার এই নিরাশ্রয় রাজপুত্র কন্যাদ্বয়ের উপর অশেষবিধ অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। বিশেষতঃ বালিকা পত্নীর উপর অত্যাচারের মাত্রা কিছু বেশী হইতে লাগিল। এই বালিকা পরে পাট্‌রাণী হইয়া এই রাজ্যে অধিষ্ঠাত্রী দেবীর স্বরূপ বিরাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় নিরহঙ্কারা অথচ তেজস্বিনী রাজপুতকন্যা আধুনিক সময়ে অতি অল্প দেখা যায়। তিনি প্রকৃতই ক্ষত্রিয় কন্যা ছিলেন। যে সময়ের কথা লিখিতেছি তখন তিনি বালিকা; সুতরাং তাঁহাকে বিলক্ষণ মানসিক ও শারীরিক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। শুনিয়াছি প্রতি সপ্তাহে দুই তিন দিন করিয়া তাঁহাকে অনাহারে কাটাইতে হইত।

"খাওয়াসজী" গৃহকর্ত্রী হইলেন; ব্যয়ের মাত্রা আরও বর্দ্ধিত হইল। যুবরাজের অত্যাচার পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক পরিমাণে চলিতে লাগিল। রাজা দুর্ব্বলচিত্ত কাণ্ডজ্ঞানহীন। সুতরাং যুবরাজকে আট্‌কাইবার সাধ্য কাহার? সত্যের অনুরোধে ইহা অবশ্য বলিতে হইবে যে, প্রথম প্রথম বৃদ্ধ মহারাজা যুবরাজের চরিত্র সংশোধনার্থে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও সফলপ্রযত্ন হইতে পারেন নাই; অবশেষে তিনি যুবরাজের কথায় আর থাকিতেন না।

উপরে যাহা যাহা বর্ণিত হইল তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও অতিরঞ্জিত নহে। বরঞ্চ অনেক কথা রহিয়া গেল এবং আমার এরূপ ক্ষমতাও নাই যে সমস্ত কথা বিশদ এবং মনোজ্ঞ ভাবে পাঠকগণের গোচর করি। ভাল কার্য্যই হউক আর মন্দ কার্য্যই হউক, সীমা অতিক্রম করিলেই সমূহ অনিষ্ট উৎপাদন করে। এই রাজ্য সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিল। ক্রমশঃ রাজ্যের অত্যাচার-কাহিনী গভর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর হইতে লাগিল। গভর্ণমেণ্ট আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। একজন খাস এজেণ্টকে সমস্ত বিষয়ের তদন্ত করিতে পাঠাইলেন। তিনি আসিয়া তদন্ত আরম্ভ করিলেন। "খাঁ" সাহেব এবং দেওয়ানজী অতি কষ্টে কোন ক্রমে মান বাঁচাইয়া এত দিন জীবন যাপন করিতেছিলেন। দেওয়ানজী এখন মহারাজকে বলিলেন, এইবার আপনার সিংহাসন রক্ষা হওয়া ভার। যে সকল অত্যাচার কুচক্রীদের পরামর্শে করিয়াছেন সে সমস্ত কথা গভর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর হইয়াছে এবং প্রজাবর্গ যেরূপ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া আছে তাহারা সমস্তই প্রমাণ করিয়া দিবে। পূর্ব্বে একস্থলে বলিয়াছি, অত্যাচারী লোক হইলে অন্তরে কাপুরুষ হয়। আমাদের

বৃদ্ধ মহারাজও তদনুরূপ। এখন তাঁহার চক্ষু ফুটিল। দেওয়ানের এখন তোষামোদ করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন পরিত্রাণ পাইবার উপায় বল। দেওয়ান বুঝিলেন ঔষধ ধরিয়াছে। তিনি বলিলেন, এক উপায় আছে আপনি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রস্তাব করুন যে আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন সুতরাং শারীরিক ও মানসিক তাদৃশ তেজ নাই, এই জন্য সমস্ত রাজকার্য্য পরিদর্শনে অসমর্থ; গভর্ণমেণ্ট এ রাজ্য পরিরক্ষণের ভার গ্রহণ করিলে ভাল হয়। এ প্রস্তাব করিলে আপনি সিংহাসনচ্যুত হইবেন না, আপনার পরামর্শে সমস্ত কার্য্য হইবে তবে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা না হইতে পারে তৎপ্রতি গভর্ণমেণ্ট দৃষ্টি রাখিবেন।' মহারাজা নিজ সরল প্রকৃতির অনুযায়িক এই প্রস্তাবের সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন। সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাই বলিলেন। এজেণ্ট সাহেব বাহাদুর সন্তোষ প্রকাশ করিয়া মহারাজকে উক্ত প্রস্তাব পত্র দ্বারা গোচর করাইতে পরামর্শ দিলেন। নৃপতি তাহাই করিলেন।

এইরূপে বৃদ্ধ রাজার হস্তলিপি আসিলে পর, এজেণ্ট সাহেব রাজ্যের সুবন্দোবস্তে মনোযোগী হইলেন। নগর মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন, যাহাদের প্রতি কোনরূপ অযথা অত্যাচার হইয়াছে তাহারা তাঁহার নিকট আবেদন করিলে এবং সমুচিত প্রমাণ দিলে ন্যায়সঙ্গত বিচার হইবে। প্রজাবর্গ প্রথমে ভয় পাইল। বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের প্রজাপেক্ষা দেশীয় রাজ্যের প্রজারা কিছু বেশী ভীরু। তখন এজেণ্ট সাহেব রাত্রিকালে দুই একটী বিশ্বস্ত অনুচর সমভিব্যাহারে ছদ্মবেশে নগরের গলি গলি ভ্রমণ করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জ পরস্পরে কি কথোপকথন করে তাহা জানিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ও অন্যান্য গুপ্ত অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। তাঁহার কার্য্যে সাহস পাইয়া লোকে তখন আত্মদুঃখকাহিনী তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিতে লাগিল। তিনিও তাঁহাদের অনুযোগ ধীরচিত্তে শ্রবণ করিয়া যাহাদের যেরূপ কষ্ট তাহা মোচন করিতে লাগিলেন। অন্যায়রূপে যে সমস্ত উৎকোচ গ্রহণ করা হইয়াছিল, অথবা ঋণ ব্যপদেশে অযথা পীড়ন করিয়া যে অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছিল, সে সমস্ত অর্থ মহারাজের খাস বিভাগ হইতে ফেরত দেওয়াইলেন; এবং আরদালীর "মোড়া"দিগের মধ্যে যে ৫।৬ জন অত্যন্ত প্রজা-পীড়ন ও অত্যাচার করিয়াছিল তাহাদিগকে এ রাজ্য হইতে যাবজ্জীবন বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তাঁহার এই ব্যাপার দেখিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নবাবেরা বেগতিক ভাবিয়া সময়মত নিজে নিজেই প্রচ্ছন্ন ভাবে পলায়ন করিল।

অতঃপর এজেণ্ট সাহেব রাজ্যের অন্যান্য বিশৃঙ্খলার প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। এ রাজ্যের আয় ৫।৬ লক্ষ টাকার বেশী হইবে না। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন প্রায় দুই লক্ষ টাকা ঋণ ছিল। সুতরাং সাহেব আয় ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করণার্থে নূতন করিয়া বাৎসরিক আয় ব্যয়ের তালিকা প্রস্তুত করিলেন। দেশীয় রাজ্যে সাধারণতঃ যেরূপ সৈন্য হইয়া থাকে এখানেও সেইরূপ ছিল। কতকগুলা অলস লোককে প্রতিপালন করিয়া রাজ্য ঋণগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সৈন্য সংখ্যা তাঁহার আসিবার পূর্ব্বে প্রায় সার্দ্ধ দুই সহস্র ছিল, তিনি তাহা কাটিয়া ২১০০ করিলেন এবং চারি শত লোককে ছয় মাসের বেতন অগ্রিম দিয়া বিদায় দিলেন। তাহারা যাইবার সময় হাহাকার করিতে লাগিল। সাহেব অতীব দুঃখিতান্তঃকরণে অহাদের বিদায় দিবার সময় বলিলেন "আমি তোমাদের খুন করিলাম, আমার দুই হস্ত নরশোণিতে কলঙ্কিত ; কিন্তু আমি কি করিব। এ অধর্ম্মের মূল তোমাদের মহারাজা"। বাস্তবিকই এ অধর্ম্মের মূল বৃক্ষ মহারাজা। তিনি যদি নিজ বুদ্ধি দোষে এ প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড না জ্বালাইতেন, তাহা হইলে এই চারি শত নিরীহ দরিদ্র লোক মারা যাইত না। আমি এখানে আসিবার পরে যুবরাজ ও মহারাজপক্ষীয় অনেক লোকের মুখে এই সাহেবের অনেক নিন্দাবাদ শুনি। কিন্তু পরে স্বয়ং "খাঁ" সাহেবের প্রমুখাৎ সাহেবকথিত উপর্য্যুক্ত কথাগুলি শুনি। তদবধি আমার দৃঢ়বিশ্বাস, সাহেব একজন অতি দয়াবান্ লোক ছিলেন। কথাগুলিতেই তাঁহার বিলক্ষণ সহৃদয়তা প্রকাশ পাইতেছে। তবে রাজ্যের সুবন্দোবস্তের জন্য তাঁহাকে বাধ্য হইয়া উক্ত নিষ্ঠুর কার্য্য অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে করিতে হইয়াছিল। নানা উপায়ে ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া আয় ব্যয়ের সামঞ্জস্য স্থাপন করত বাৎসরিক ৭০।৭৫ সহস্র টাকা ঋণ পরিশোধার্থে রাখিলেন। আয় ব্যয়ের এইরূপে সুশৃঙ্খলা সম্পাদন করিয়া দেওয়ানী, ফৌজদারী, রাজস্ব প্রভৃতি একে একে সমস্ত বিভাগগুলিরই সুবন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে আমাদের যুবরাজের সমস্ত অত্যাচারকাহিনী তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তাঁহার জায়গীরস্থ প্রকৃতিপুঞ্জ এবং নগরের লোক ক্রমশঃ তাঁহার অত্যাচার-কাহিনী সাহেবের গোচর করিল এবং খাওয়াসকৃত কলঙ্ককাহিনী ও যুবরাজ-পত্নীদ্বয়ের প্রতি অত্যাচার, তৎসহ তিন উপগ্রহের কীর্ত্তি সমস্তই তাঁহার কর্ণে পৌছিল। তিনি প্রথমে যুবরাজকে ডাকিয়া বন্ধুভাবে অনেক বুঝাইলেন এবং দেখাইয়া দিলেন যে তাঁহার জায়গীরের আয় ৯১০ সহস্র টাকা

এবং তাঁহার ঋণ প্রায় ২৪০০০৲ টাকা হইয়াছে, অতএব ইহার পরিশোধার্থে মতবান্ হওয়া উচিত। তাহা ছাড়া যখন তিনি এই রাজ্যের যুবরাজ ও ভাবী উত্তরাধিকারী, তখন তাঁহার নির্ম্মলচরিত্র হওয়া এবং ভাবী দায়িত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সতত নিজ পদোচিত কর্ত্তব্যপরায়ণ হওয়া উচিত। তিনি তিন উপগ্রহ ও খাওয়াস নাম্নী বেশ্যাকে ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিলেন এবং অতি ধীরভাবে বুঝাইলেন যে যতদিন এই সকল দুষ্ট লোক তাঁহার নিকট থাকিবে তিনি কোন ক্রমেই ঋণমুক্ত হইতে পারিবেন না এবং তাঁহার পদগৌরব ও আত্মমর্য্যাদা কোন ক্রমেই রক্ষিত হইবে না। যুবরাজ লোকটী কতক পরিমাণে পাটিগণিতের শূন্যের ন্যায়। একা তাঁহার কোন মূল্যই নাই, যতক্ষণ তাঁহার বাম পার্শ্বে অন্য কোন সংখ্যা বসান না যায়। বাল্যাবস্থা হইতে অসৎ শিক্ষায় তাঁহার প্রকৃতি এরূপ কদর্য্য হইয়া গিয়াছে যে যখন যাহার বশীভূত হন তখন তাহার এত দূর অধীন হইয়া পড়েন যে কথায় কথায় ধর্ম্মসাক্ষী পূর্ব্বক ধন প্রাণ সমস্তই তাহাকে সমর্পণ করিয়া বসেন। সে উঠিতে বলিলে উঠেন, বসিতে বলিলে বসেন। এই স্বভাব তাঁহার সিংহাসনারোহণের পরও চিরকাল তাঁহাতে পরিলক্ষিত হইয়াছে। উপগ্রহেরা তাঁহাকে শিখাইয়াছিল যে, সাহেবের নিকট কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইও না, কেবল বলিয়া আসিও যে আপনি আমার অবশ্য শুভকামনা করিয়া সৎ পরামর্শ দিতেছেন, আমি এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া ৫।৭ দিবস পরে আপনাকে উত্তর দিব। তিনি সাহেবকে তাহাই বলিয়া সে দিবস চলিয়া আসিলেন।

এ দিকে তিন উপগ্রহ ও খাওয়াস প্রমাদ গণিয়া যুবরাজকে বাটীতে নানারূপে ভজাইতে লাগিলেন। রাজপুত জাতির প্রকৃতি এই যে তাঁহারা যে কথায় জেদ ধরেন তাহা সহসা ত্যাগ করেন না। আবার এ রাজ্যের উচ্চপদস্থ রাজপুতদিগকে প্রায়ই দেখিয়াছি যে তাঁহারা সৎকার্য্যে এরূপ জেদ করেন না, কিন্তু মন্দকার্য্যে তাঁহাদের অত্যন্ত জেদ। প্রাণান্ত হউক, নিজের হঠকারিতা ছাড়িবেন না। যুবরাজও এই দুষ্ট কর্ণেজপদের মধুমিশ্রিত বাক্যে ভুলিয়া পণ করিয়া বসিলেন যে ধন, জন, জায়গীর সমস্ত যাউক, এ চারি জনকে কোন ক্রমেই ত্যাগ করিব না। তাঁহার ইহা স্থির সংকল্প। দেখিতে দেখিতে ৭।৮ দিবস চলিয়া গেল, সাহেবের নিকট কোনই উত্তর গেল না। সাহেব তখন নিজেই ডাকিয়া পাঠাইলেন। তথায় গিয়া যুবরাজ নিজ অভিপ্রায় ও প্রতিজ্ঞা জ্ঞাপন করিলেন। সাহেব তখন রোষপরবশ হইয়া নানারূপ তিরস্কার

করিলেন। কিন্তু রাজপুতি হঠকারিতার সীমা নাই। সাহেব তখন পুনরায় এক সপ্তাহ সময় দিয়া বিদায় দিলেন।

দেখিতে দেখিতে এক সপ্তাহ অতিবাহিত হইয়া গেল। যুবরাজের দেখা নাই। সাহেব তখন বুঝিলেন যে সোজা কথায় চলিবে না। সে সময়ে রাজ্য হইতে চারিজন অশ্বারোহী সৈন্য যুবরাজের শরীররক্ষক রূপে তাঁহার নিকট থাকিত। বৃদ্ধ রাজা তাঁহাকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া এই বিশেষ মর্য্যাদা তাঁহাকে প্রদত্ত হইয়াছিল। সাহেব উক্ত অশ্বারোহী চতুষ্টয়কে কাড়িয়া লইলেন; এবং তৎসহিত আজ্ঞা প্রচারিত হইল যে, যদি এক মাসের মধ্যে আজ্ঞানুসারে কার্য্য না করা হয় তাহা হইলে তাঁহার জায়গীর কাড়িয়া লওয়া হইবে। ইহাতেও তাঁহার চক্ষু ফুটিল না। এক মাস অতিবাহিত হইল। যুবরাজ জায়গীর হারাইলেন। তখন তাঁহার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে অনেকে আসিয়া সাহেবের বশ্যতা স্বীকার করিবার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু কোন ফলই হইল না। যুবরাজ বলিলেন, আমি কিছুই চাহিনা, কেবল খাওয়াসকে চাহি আর এক বন্দুক হইলেই আমার চলিবে। জঙ্গলের শিকারে আমার উদরপূর্ত্তি কার্য্য অতি সহজেই হইবে।

তাঁহার কষ্টের পরিসীমা রহিল না। পূর্ব্ব হইতেই ঋণগ্রস্ত, তদুপরি এখন জায়গীর পর্য্যন্ত গেল। কিন্তু তথাপি উপগ্রহ ও সেই স্ত্রীলোকটাকে পরিত্যাগ করিলেন না। পুত্রবৎসল মহারাজা সাহেবের তোষামোদ আরম্ভ করিলেন এবং পুত্রের মিথ্যা প্রশংসা করিয়া সাহেবের ক্রোধ উপশমের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এক দিন তিনি সাহেবের নিকট বলিয়া বসিলেন যে, যুবরাজের মতি গতি ফিরিয়াছে এবং সে ২।৪ দিবসের মধ্যেই কুলটাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে। অথচ কথাটা সর্ব্বৈব মিথ্যা। ২।৪ দিবসের মধ্যে সাহেব নিজে যুবরাজের বাটীতে গিয়া এ বিষয়ের তদন্ত করিতে উদ্যত হইলেন। মহারাজের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি সত্বর যুবরাজকে বলিয়া পাঠান যে দালানে "কানাত" টাঙ্গাইয়া "খাওয়াসকে" লুকাইয়া রাখ। তদ্রূপই করা হইল। বহির্বাটীতে এক "কানাত" খাটাইয়া তাঁহাকে লুকাইয়া রাখা হইল।

হঠাৎ যুবরাজের বাটীতে সাহেব আসিয়া উপস্থিত। যুবরাজ তাঁহার সহিত নানারূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। সাহেব বহির্বাটীতে চতুর্দ্দিক দেখিয়া হঠাৎ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কানাত" টাঙ্গান কেন? তিনি অবনি

বলিলেন "হুজুর ঘোড়ী (১) বিয়াই হয়, হওয়া না লগনে পাওয়ে ঘাসে পর্দ্দা টাঙ্গ দিয়া হি"। "কেয়সা ঘোড়ী বিয়াই (২) হয় হম দেখনা চাহতা হয়" এই বলিয়া সাহেব দ্রুতপদে সেইদিকে গমন করিলেন। যুবরাজের বদনমণ্ডল শুষ্ক। সাহেব পর্দ্দা উঠাইলা দেখেন অশ্বের পরিবর্ত্তে তথায় হস্তপদবিশিষ্ট "মানুষী"। সাহেব হাসিয়া বলিলেন "ও যুবরাজ (৩) তুমারা ঘোড়ী বিয়াহি হয় ?" এই বলিয়া চলিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য, যে এই ব্যাপার দেখিয়া সাহেব যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন।

এই সময়ে একটী অত্যন্ত ভয়াবহ কার্য্যের সূত্রপাত হয়। আমি এ বিষয়ের অনেক তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াও জানিতে পারি নাই যে এ ভয়াবহ কার্য্যের মূল কে ? দুই একটী লোক আমায় বলেন যে সাহেবের এই কার্য্যে ইঙ্গিত ছিল। আমার এ কথায় আদৌ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা হয় নাই এবং প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার জন্য আমি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। এমন কি "খাঁ" সাহেবকে আমি নিজে এ বিষয়ের জন্য জিজ্ঞাসা করি। তিনি আমায় স্পষ্টই বলেন যে সাহেব এ বিষয়ের বিন্দু বিসর্গও জানিতেন না, বরঞ্চ তাঁহার সম্পূর্ণ অগোচরে উক্ত ভয়াবহ ব্যাপারের সূত্রপাত হয় এবং একটী ক্ষত্রিয় "কিলেদায়" উক্ত কার্য্যে উদ্যোগী হইয়াছিল। কিন্তু সে ব্যক্তি তাদৃশ উচ্চপদস্থ ও ক্ষমতাশালী লোক ছিল না। সে কাহার প্ররোচনায় এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তাহা অনেক চেষ্টা করিয়াও আমি জানিতে পারি নাই। সাহেবের এ কার্য্যের সহিত কোনই সম্বন্ধ ছিল না এ সংবাদে আমি বিশেষ আনন্দিত হই। কারণ আমার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল যে, এজেণ্ট মহোদয়গণ এরূপ নীচ কার্য্যের সংস্রবে কখনও থাকেন না। আমার অনুসন্ধানে তাহাই প্রমাণিত হইল।

মূল যিনিই হউন, কতকগুলি লোক যুবরাজকে পৈতৃক সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। গবর্ণমেণ্টের নামে একখানি আবেদন পত্র লেখাইয়া, রাজবংশোদ্ভব প্রধান প্রধান জায়গীরদার এবং আত্মীয়বর্গের স্বাক্ষর সংগৃহীত হইতে লাগিল। যুবরাজের চরিত্র অতি মন্দ, তিনি একটী অসচ্চরিত্র স্ত্রীলোককে গৃহে নিজ পরিণীতা পত্নীদ্বয়ের সহিত সমভাবে রাখিয়া আত্মমর্য্যাদা লোপ করিয়াছেন; এরূপ হীনচরিত্র ও হিতাহিতজ্ঞান-বিরহিত লোক ভবিষ্যতে রাজ্যরক্ষা রূপ গুরুভার বহন করিতে সমর্থ হইবে

(১) হুজুর ঘুড়ীর বাচ্ছা হইয়াছে। পাছে শীতল বায়ু লাগে তাই কানাত টাঙ্গাইয়া দিয়াছি।
(২) কেমন বাচ্ছা হইয়াছে দেখি ? (৩) ওহে যুবরাজ, এই তোমার ঘোড়ার বাচ্ছা!

তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। অতএব তাঁহাকে এ রাজ্যের উত্তরাধিকারিত্ব হইতে বঞ্চিত করা হউক এবং তাঁহার স্থানে উপযুক্ত ব্যক্তি নিয়োগ করা হউক। উক্ত আবেদনের এই মর্ম্ম। রাজ্যস্থ প্রধান ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রায় এক শত দেড় শত লোকের স্বাক্ষর হইলে পর, আবেদনখানি মহারাজের স্বাক্ষরের জন্ম তাঁহার নিকট লইয়া যাওয়া হয়। মহারাজা ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ সৎসাহস। সেটী মহারাজার আদৌ নাই। সাহেবের নামে তিনি কম্পান্বিতকলেবর। এখানে একা বন্ধুবান্ধবহীন স্থানে মন লাগিত না বলিয়া সাহেব মধ্যে মধ্যে অন্য কোন একটী নগরে গিয়া বাস করিতেন। মহারাজা হয়ত আহারে বসিয়াছেন, এমন সময় কেহ সংবাদ দিল কল্য সাহেব আসিবেন। অমনি মহারাজার হস্তের গ্রাস হস্তেই রহিয়া গেল, বলিয়া উঠিলেন "ক্যা ফিরঙ্গী কল আওয়ে গা।" এখানের সাহেবদের চলিত কথায় ফিরঙ্গী বলে। যে ব্যক্তির সাহেবের নামে এত ভয় তাঁহা দ্বারা ন্যায় অন্যায় বিচারের কোনই সম্ভাবনা নাই। বরঞ্চ সাহেব-ভীতি দেখাইয়া তাঁহা দ্বারা প্রবঞ্চকেরা সমস্ত কার্য্যই করাইয়া লইতে পারে। উক্ত ভীতির বশবর্ত্তী হইয়া বৃদ্ধ মহারাজা এখন সযত্ন ও সস্নেহে পালিত স্বীয় পুত্রের মস্তক চর্ব্বণে উদ্যত। উক্ত আবেদন পত্রে তাঁহার স্বাক্ষর হইলেই সমস্ত চুকিয়া যায়। যুবরাজ চিরজীবনের জন্ম অতলস্পর্শ জলে নিমগ্ন হন। কিন্তু বিধাতা যাহার সহায় দুর্ব্বল মানবশক্তি তাহার কি করিতে পারে? প্রবঞ্চকেরা মিথ্যা সাহেবের নাম লইয়া প্রবঞ্চনাপূর্ব্বক মহারাজার স্বাক্ষর গ্রহণে যে চেষ্টা করিয়াছিল তাহাতে সফলকাম হইল না। বৃদ্ধ মহারাজার অশেষ দোষ থাকিলেও তাঁহার চরিত্রে একটী মহৎ গুণ ছিল। তিনি একপত্নীক ছিলেন। রাজাদের ন্যায় ইন্দ্রিয়দোষ ছিল না এবং মহারাণীর প্রতি তিনি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। দাম্পত্য-প্রেমের অনুপম মধুরত্ব তিনি আস্বাদন করিয়াছিলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে উদয় হইল, এরূপ গুরুতর বিষয়ে মহারাণীর একবার পরামর্শ লওয়া যাউক। অন্তঃপুরে গমন করিয়া মহারাণীর নিকট উক্ত আবেদন পত্র ঘটিত সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। মহারাণী তেজস্বিনী সিংহীর ন্যায় গর্জ্জিয়া বলিলেন "কি? যুবরাজের স্বত্বলোপ! বিধাতা আমাদের সন্তান দেন নাই; ভাশুরপুত্রকে বাল্যাবস্থা হইতে সন্তানবৎ প্রতিপালন করিয়া উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে তাহার স্বত্ব লোপ করা! আবার এই ভয়ঙ্কর কার্য্যে তুমি প্রবৃত্ত হইয়াছ! মহারাজ! বৃদ্ধ হইয়া তোমার বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। এ রাজ্যনাশ ত তুমিই করিলে, আবার সন্তানসন্ততির সর্ব্ব-

নাশ করিতে বসিয়াছ! আমার এ দেহে প্রাণ থাকিতে ইহা কখনই হইতে পারিবে না।" এই বলিয়া আবেদন পত্রখানি দূরে নিক্ষেপ করিলেন। অন্তঃপুরে মহারাজা তাড়া খাইয়া আর সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন না। তাঁহার চক্ষু ফুটিল।

মহারাণী মহারাজাকে বলিলেন, "তোমরা পুরুষ, তোমাদের যত বাহাদুরি তাহা আমি দেখিলাম। দেখ, অদ্যই আমি 'খাওয়াসকে' বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া সমস্ত গোলযোগ মিটাইয়া দিতেছি।" সেই দিন সাহেবের নিকট মহারাণী বলিয়া পাঠাইলেন "কল্যই 'খাওয়াস'কে বহিষ্কৃত করিব, আপনি যেখানে তাহাকে রাখিবার ব্যবস্থা করিতে চাহেন তাহা করুন। যখন রাজপুত্রের গৃহে সে 'খাওয়াস' হইয়াছে তখন তাহাকে সামান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় পথে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে আমাদের কুল মর্য্যাদায় কলঙ্ক স্পর্শিবে।" সাহেব সন্নিহিত ইংরাজ রাজ্যের কোন নগরে তাহার থাকিবার এবং মাসিক বৃত্তির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এ সমস্ত বিষয় সাহেবের সহিত মহারাণীর অতি গোপনে লোক দ্বারা স্থির হইয়া গেল।

পর দিন প্রাতঃকালে রাজ অন্তঃপুর হইতে একটী বাঁদী আসিয়া "খাওয়াস"কে সংবাদ দিল যে মহারাণী রাজবাড়ীতে তাঁহাকে ডাকিয়াছেন। "খাওয়াস" যাইতে সম্মত হইল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে একখানি পালকী, বেহারা ও কতকগুলি বাঁদী তাহাকে লইতে আসিল। সে হৃষ্টচিত্তে পালকীতে আরোহণ করিল। বাহকগণ তাহাকে রাজবাড়ীতে না লইয়া গিয়া একেবারে সাহেবের নিকট উপস্থিত। সেখান হইতে তাহাকে নগর-বহির্ভাগে অপর একটী রাস্তা দিয়া একেবারে রেলের ইষ্টেশনে লইয়া যাওয়া হইল। যখন এ রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া গেল, তখন যুবরাজ শুনিলেন যে পিঞ্জর হইতে পক্ষী পলাইয়াছে এবং তাঁহার খাওয়াসকে প্রবঞ্চনা করিয়া রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে। এখন আর তিনি কি করিবেন? শৃঙ্খলবদ্ধ দৃপ্ত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিন্তু আস্ফালনই সার। এই ব্যাপারের স্বল্প কাল পরেই তিনি উপগ্রহকে তাঁহার নিকট হইতে অপহৃত করা হইল। হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া যুবরাজ এখন একা দিন যাপন করিতে লাগিলেন। ঠিক এই সময়ে এজেণ্ট সাহেব এখান হইতে বদলী হইলেন। অন্য এজেণ্ট আসিলেন।

দুর্লক্ষ্য সূক্ষ্ম দ্বারা বিধাতা এই বিশ্বসংসার চালাইতেছেন। সেই সূত্রধর কখন কি উপায়ে কোন যোগাযোগ দ্বারা আমাদের জীবনের গতি ফিরাইতে-

ছেন, তাহা আমরা কিছুই জানিতে পারি না। সর্ব্বনিয়ন্তার লীলা বোঝা দুর্ব্বল মানবের অসাধ্য। তিনি যাহাকে উন্নত করিতে চাহেন, কাহার সাধ্য তাহাকে অবনত করে? যুবরাজ নিজ বুদ্ধি ও কর্ম্মদোষে অবনতির চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন যে সম্পূর্ণ ঘন-ঘটাচ্ছন্ন, ভবিষ্যতে তাঁহার এ রাজ্যের অধীশ্বর হওয়ার আশা যে সুদূরপরাহত তাহা কাহারও জানিতে বাকি ছিল না। কিন্তু বিধাতা যাহার সহায় অপরে তাহার কি করিতে পারে? জগৎপিতা এখন এমন একটি যোগাযোগ ঘটাইয়া দিলেন যদ্দ্বারা যুবরাজের অতলস্পর্শ জলে নিমগ্ন ভাগ্যতরী পুনরায় ভাসিয়া উঠিল। সে ব্যাপারটি অতি চমৎকার।

(ক্রমশঃ)

সাহিত্যের অগ্নিপরীক্ষা।

ইউরোপের এই ভীষণ যুদ্ধের ফলে সাহিত্যের গতি কেমন হইবে, গত উনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যের নীতি এবং পদ্ধতি ঠিক ছিল কি না, তাহার কতটা পরিবর্ত্তন হইতে পারে, এই সকল বিষম সমস্যার কথা লইয়া ফ্রান্সে এবং মার্কিণ দেশের বিদ্বজ্জন-সমাজে একটা ছোট খাট রকমের আন্দোলন চলিতেছে। ফ্রান্সের সাহিত্যসেবিগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন, এক clerical বা ধর্ম্মযাজক পাদ্রীদের দল; দ্বিতীয় শুদ্ধবাদী সাধারণ সাহিত্যসেবকদিগের দল। দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকগণ ধর্ম্মাধর্ম্মের জন্য তেমন চিন্তিত নহেন, তাঁহারা Art বা কোমল কলাবিদ্যার হিসাবে কাব্যশাস্ত্রের ভাবগত এবং রসগত আলোচনা করিয়া থাকেন। মার্কিণ বা আমেরিকার বিদ্বজ্জন-সমাজও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণী, পরম্পরাবাদী, সেক্সপীয়র মিল্টনের সময় হইতে ইংরেজী সাহিত্যের যে ভাবে উন্মেষ ও পুষ্টি ঘটিয়াছে সেই ভাবের ধারা তাঁহারা রক্ষা করিতে চাহেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকগণ জর্ম্মনীর kultur কুলটুরের পক্ষপাতী এবং নীৎচের সিদ্ধান্ত অনুসারে সাহিত্যের পুষ্টি এবং বিবৃতি করে চেষ্টা করিয়া থাকেন। এই চারি শ্রেণীর লেখকগণের মধ্যে

ইউরোপের উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের পরিণতির কথা লইয়া বেশ একটু নরম গরম আলোচনা ও বিতণ্ডা চলিতেছে। এই চর্চ্চা এবং আলোচনার ফলে এমন অনেক পুরাতন সিদ্ধান্ত নূতন ভাবে ও নূতন আকারে ফুটিয়া উঠিতেছে যে, তাহার প্রভাবে ইউরোপে ভাবান্তর ঘটিবার সম্ভাবনা।

বিতণ্ডার বিষয় উত্থাপিত করেন ফ্রান্সের পণ্ডিত ব্যবহারাজীব মেত্র্ নাবোরী। নাবোরী জিজ্ঞাসা করেন, এই যুদ্ধের পরে ইউরোপের সাহিত্য কোন্ পথে ধাবিত হইবে? যে ভাবের ভাবুক হইয়া জর্ম্মণ জাতি এই মহারণ বাধাইয়াছে সে ভাবটা যে একেবারে আকাশে উপিয়া যাইবে, তাহা হইতেই পারে না। জর্ম্মণ জাতি পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইলেও তাহাদের কুল্টুরের প্রভাব ইউরোপের সকল জাতির মধ্যেই বিসর্পিত হইবে। পুরাতন রোমকগণ গ্রীক যবনদিগকে পরাজিত করিয়াও গ্রীক বিদ্যার ও সভ্যতার অধিকারী হইয়াছিলেন। মনীষার প্রভাব ব্যর্থ হয় না। এই যুদ্ধে জর্ম্মণ জাতি সপ্রমাণ করিয়াছে যে, তাহাদের কুল্টুর বাজে সামগ্রী নহে। যে শিক্ষার প্রভাবে লক্ষ লক্ষ জর্ম্মণ যুবক হেলায় মহারণ-প্রাঙ্গণে জীবন বিসর্জ্জন করিতেছে, যে শিক্ষার প্রভাবে জর্ম্মণ সাম্রাজ্যের প্রায় সাতকোটি নরনারী একনিষ্ঠ হইয়া জাতির ও পিতৃভূমির কল্যাণ কামনায় সাধনশীল হইয়াছে, যে শিক্ষার প্রভাবে আজ একা জর্ম্মণ টিউটন জাতি সমগ্র ইউরোপকে নির্ভয়ে মহারণে আহ্বান করিতেছে,—ফরাসী, ইংরেজ, রুষ ও ইতালী এই চারিটি মহাপ্রবল জাতিকে যুদ্ধে ব্রতী করিয়া বসিয়াছে, সে শিক্ষা, সে সভ্যতা, সে কুল্টুর বাজে সামগ্রী হইতেই পারে না! ভাল হউক, মন্দ হউক, উহা যে প্রভাবশালী সে পক্ষে কোন সংশয় হইতে পারে না। মোস্লেম অভ্যুদয়ের যুগে ইস্লাম্ সভ্যতা খৃষ্টান ইউরোপের রোচক না হইলেও, উহার প্রভাব স্পেন, ইতালী, বাল্কান প্রদেশ এবং দক্ষিণ রুষিয়ায় বিস্তারিত হইয়াছিল। মোস্লেম আংশিক ভাবে খৃষ্টান্ ইউরোপের নিকট পরাজিত হইলেও, ইস্লাম সভ্যতার প্রভাব কেহ এড়াইতে পারেন নাই। মোস্লেমের ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছিল, আধুনিক জর্ম্মণীর ভাগ্যে তাহা ঘটিবে না কেন? সুতরাং ভাবিতে হয়, জর্ম্মণ জাতি বর্ত্তমান যুদ্ধে পরাজিত হইলেও, জর্ম্মণ কুল্টুর প্রভাবহীন হইবে না; তাহার প্রভাবে ইউরোপের খৃষ্টান সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি কেমন আকার ধারণ করিবে? নাবোরী ইহাও বলেন, তোমরা এখন কেহ স্বীকার কর আর নাই কর, এই যুদ্ধের পূর্ব্বে জর্ম্মণ কুল্টুরের প্রভাব ইউরোপের সকল দেশেই এবং সকল

জাতির মধ্যে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এখন আমরা যে জর্ম্মণ জাতির বিরুদ্ধে ভীষণ যুদ্ধ চালাইতেছি, সে যুদ্ধেও জর্ম্মণ রীতি পদ্ধতি, জর্ম্মণ অস্ত্র শস্ত্র, জর্ম্মণ রণচাতুরী এবং ব্যূহরচনা-পটুতা অবলম্বন করিয়া জর্ম্মণ জাতির উদ্ভাবিত উপায়ের সাহায্যে জর্ম্মণ জাতিকে ধূলিসাৎ করিবার চেষ্টা করিতেছি। ইহার প্রভাবও অপরিহার্য্য। জর্ম্মণ জাতির নাম ধরাবক্ষ হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিলেও, এই কুলটুরের পদচিহ্ন বহুকাল ইউরোপের সর্ব্বাঙ্গে চিহ্নিত থাকিবে। সে চিহ্নের প্রভাবে ইউরোপীয় সাহিত্যের কেমন গতি হইবে?

এই প্রশ্নের উত্তরে ফ্রান্সের একজন পাত্রী লেখক বেশ একটা উত্তর দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"ফর্ষা,—সব ফর্ষা! তোমার বালজাক-মোপাঁসা-জোলার প্রাকৃতবাদের সিদ্ধান্ত, তোমার বিলাস-ঐশ্বর্য্যের ও সুখ শান্তির খোস্‌খেয়ালের এবং খোস্ মেজাজের মোলায়েম, মধুর, গোলাপের কুঁড়িটীর মতন আধুনিক সাহিত্যের Art এর জঞ্জাল সব ফর্ষা—সব পরিষ্কার হইয়া যাইবে। যেমন ভীষণ জলপ্লাবনের বেগে ধরাবক্ষের বহুকালের সঞ্চিত হলাহল বিধৌত হইয়া যায়, তেমনি এই যুদ্ধের বেগে ইউরোপের ঊনবিংশ শতাব্দীর বিলাসপ্রধান, রিরংসার উত্তেজক মেকী সাহিত্য সব ভাসিয়া যাইবে। Art এর দোহাই দিয়া সাহিত্যের মারফতে তোমরা যে নাস্তিকতা প্রচার করিতেছিলে, শোভনা ভাষার আবরণে পশুত্বের এবং সয়তানের যে শ্লাঘা বাড়াইতেছিলে, তাহা আর টিকিবে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী ও আমেরিকায় যে সাহিত্যের আদর হইয়াছিল, তাহার চৌদ্দ আনা অংশ টিকিবে না। কারণ, এতদিন সভ্য ও বিলাসী ইউরোপ যে দিক্ দিয়া মনুষ্য জীবনকে দেখিত, যে ভাবে সংসার ধর্ম্মটা বুঝিত, এই যুদ্ধের পরে সে দিক দিয়া জীবনটাকে ইউরোপের আর কেহ দেখিবে না, সংসার ধর্ম্মকে ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-সিদ্ধান্ত অনুসারে বুঝিতে চেষ্টা করিবে না। অতএব সে সাহিত্যের দিকে আর কেহ তাকাইবে না, সে Art এর কথা আর কেহ ভাবিবে না। তবে মানুষের মধ্যে যে টুকু সনাতন, যাহার জন্য মানুষ মনুষ্যত্বের দাবী করিয়া চিরকাল দর্পদম্ভের বিস্তার ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছে, সেই সনাতন মূল মানবতা লইয়া যে কবি ভাবের ও রসের কথা কহিয়া গিয়াছেন, তিনিই এই যুদ্ধের পর সজীব থাকিবেন। সেক্সপীয়র-মিল্টন, লেসিং, গেটে, দান্তে, আলফিয়েরী প্রভৃতি কবিগণ এই

যুগান্তরকারী যুদ্ধের পর ইয়োরোপের শ্বেতাঙ্গ সমাজে আরও কিছুকাল সজীব থাকিতে পারেন। কিন্তু এই মহারণের ফলে ইউরোপের শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টান জাতি সকলের যদি মূলোচ্ছেদ হইবার সম্ভাবনা হয়, যদি পীতাতঙ্ক (yellow peril) প্রকটমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ইউরোপে বিস্তার লাভ করে, খৃষ্টান সভ্যতা ও খৃষ্টান আদর্শ যদি নিশ্চিহ্ন হইয়া ইউরোপ বক্ষ হইতে মুছিয়া যায়, তাহা হইলে খৃষ্টান সাহিত্যও চিরদিনের জন্য বিস্মৃতি সাগরে ডুবিবে। জর্ম্মণ জাতির কুলটুর ইউরোপের সামগ্রী নহে, খৃষ্টান সভ্যতার বেদীর উপর উহা প্রতিষ্ঠিত নহে, উহাতে বৌদ্ধ শক্তিবাদ, শিণ্টোইজমের মোটা কথা সকল পূর্ণাবয়ব লাভ করিয়াছে। রুষ জাপানের যুদ্ধশক্তির দ্বারা পরাজিত হইয়াছিল, জর্ম্মণী জাপানের ফিলসফির মোহে মুগ্ধ হইয়া নূতন শিক্ষার ও সভ্যতার প্রবর্ত্তনা করিয়াছে। আধুনিক সায়ান্সের সহিত বৌদ্ধতন্ত্রকে জড়াইয়া জর্ম্মণ কুলটুরের বিকাশ। সুতরাং জর্ম্মণ কুলটুরের প্রভাব ইউরোপে বিস্তারলাভ করিলে, পীতাতঙ্কের বিভূতি হইল বুঝিতে হইবে। একে অতি ধনে, অতি ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া ইউরোপ খৃষ্টান ধর্ম্ম ভুলিয়াছে, কেবল উহার বাহিরের খোসাটা লইয়া ব্যস্ত আছে, তাহার উপর এই দুর্ব্বার জর্ম্মণ কুলটুরের প্রভাব এবং সর্ব্ববিধ্বংসী মহারণের যুগান্তরকারী প্রভাব ;—তোমরা ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং রুষ যাহার জন্য যুদ্ধ করিতেছ, তাহার কিছুই যুদ্ধান্তে তোমাদের হাতে থাকিবে না। এইবার ইউরোপ অতীতের সহিত পরম্পরার শৃঙ্খলা ছিন্ন করিয়া নূতন আকার ধারণ করিবে। ধর্ম্মের সূত্র ছাড়া বংশের ধারা, জাতির ধারা কিছুতেই অব্যাহত থাকে না। সে সূত্র বহুদিন হইল ছিন্ন হইয়াছে। অতএব সব ফর্সা!

ফরাসী পাদ্রীর এই সিদ্ধান্ত সকল প্রকাশিত হইবার পরেই বিতণ্ডার সূত্রপাত হয়। ফ্রান্সের বহু বিজ্ঞ লেখক এই বিতণ্ডায় যোগ দিলেন। কথাটা ক্রমশঃ ছড়াইতে ছড়াইতে মার্কিণে যাইয়া পঁহুছিল। সে দেশে জর্ম্মণ পক্ষের লেখকগণ প্রকাশ্যে জর্ম্মণ সভ্যতা ও শিক্ষার সমর্থন করিতে লাগিলেন, অনেক ভিতরের কথা, অনেকের মনের কথা বাহির হইয়া পড়িল। এখন বুঝা গিয়াছে যে, জর্ম্মণ শিক্ষা ও সভ্যতা জর্ম্মণ কুলটুর আধুনিক জর্ম্মণ জাতির ধর্ম্ম বলিলেও চলে। জর্ম্মণ পণ্ডিতগণ এই কুলটুরের সিদ্ধান্ত অনুসারে জর্ম্মণীর পূর্ব্বগামী মহাকবিগণের উক্তির ব্যাখ্যা করিতেছেন, এমন কি, বাইবেলেরও ব্যাখ্যা করিতেছেন। এই কুলটুরের আবরণে জর্ম্মণীর খৃষ্টান ধর্ম্ম নবীন আকার ধারণ করিতেছে

আধুনিক জর্ম্মণ জাতির খৃষ্টান ধর্ম্ম ইউরোপের অন্য প্রদেশে বা অন্য জাতির খৃষ্টান ধর্ম্মের অনুরূপ নহে। মুসলমান যেমন ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে জগজ্জয় করিতে উদ্যত হইয়াছিল, আধুনিক জর্ম্মণও তেমনি কুলটুর প্রচারের উদ্দেশ্যে, ইউরোপকে জর্ম্মণ জাতির আদর্শে আকারিত করিবার উদ্দেশ্যে, এই মহাসমরে ব্রতী হইয়াছে। অতএব গত ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সৌখীন সাহিত্য এ বেগ সহ্য করিতে পারিবে না। যাহা সখের সামগ্রী, তাহা কতকটা অস্বাভাবিক; যতক্ষণ সখ থাকিবে ততক্ষণ উহা টিকিবে। ফরাসী বিপ্লবের পরে ইউরোপে যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার, সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতার ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহার ফলে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, তাহা, ১৮৭০-৭১ খৃষ্টাব্দের ফরাসী ও জর্ম্মণ যুদ্ধের পর Imperialism বা সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্য স্থাপনের বাসনার বিনাশ হইলে, অনেকটা ম্লানদ্যুতি হইয়া পড়ে; শেষে বিলাস ঐশ্বর্য্য জন্য Realistic বা বাস্তববিবৃতিপূর্ণ সাহিত্যের উদ্ভব হয়। ইউরোপের সৌখীন সাহিত্যের ইহাই শেষ স্তর। ইহার পরই জর্ম্মণ শিক্ষা ইউরোপে একটা ভাববিপ্লব ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছে। সে চেষ্টা এই মহারণে কার্য্যে পরিণত করা হইতেছে। মহারণের সময়ে, বিশেষতঃ যে রণের ফলাফলের উপর জাতি বিশেষের অস্তিত্ব নাস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে তেমন বিপ্লব বিদ্রোহের কালে, মানুষ অনেকটা স্বাভাবিক জীবে পরিণত হয়। তখন মানুষের মনুষ্যত্বের যে সকল সনাতন গুণ তাহাই ফুটিয়া উঠে; যেটুকু পশুত্ব মনুষ্যত্বের সহিত নিত্য গাঁথা আছে তাহা ফুটিয়া উঠে; যে টুকু দেবত্ব মনুষ্যদেহে থাকিয়া পশুত্বের প্রভাব সঙ্কোচ করিবার উদ্দেশ্যে নিত্য প্রয়াস করিতেছে, তাহাও ফুটিয়া উঠে। সুখশান্তির সময়ে, বিলাসব্যসনাসক্তির কালে, মানুষ সভ্যতার দোহাই দিয়া অনেক মেকী চালাইয়া থাকে। দীর্ঘকালস্থায়ী শান্তি হইলে, উপর্য্যুপরি দুই তিন পুরুষ ধরিয়া ঐশ্বর্য্যের উপভোগ সমান ভাবে হইতে থাকিলে, মানুষ সভ্যতার মেকী অংশটাকে আসল বলিয়া ধরিয়া লইয়া, তাহারই উপর একটা সাহিত্যের সৃষ্টি করে। সে সাহিত্য ধোকার টাটি মাত্র। এমন যুগান্তরকারী মহারণের আঘাতে এ ধোকার টাটি সর্ব্বাগ্রে ভাঙ্গিয়া ধূলিসাৎ হয়। মানুষের মধ্যে যাহা সনাতন ধর্ম্ম তাহা জাগিলে মেকী বাজে সামগ্রী কতক্ষণ তিষ্টিতে পারে? এই যুদ্ধের ফলে যেমন ইউরোপের অর্থতত্ত্ব, রণনীতি, বিজ্ঞাননীতি, সমাজনীতি

আপনা আপনি বদলাইয়া যাইতেছে। যেমন পুরাতনকে মুছিয়া ফেলিয়া নূতন করিয়া সব শাস্ত্র গড়িতে হইতেছে; তেমনই সাহিত্যকেও ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া নূতন আকারে গড়িয়া তুলিতে হইবে। জর্ম্মণ কুলটুরের পক্ষপাতী লেখকগণ স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর অপরিমেয় বিলাস-ঐশ্বর্য্য-জনিত যে সাহিত্য তাহা স্বাভাবিক নহে; ইংলণ্ডের কাউপার হইতে টেনিসন ব্রাউনিং পর্য্যন্ত যে সাহিত্য তাহা এই অস্বাভাবিক যুগের উদ্ভট সভ্যতার পরিচায়ক মেকী সাহিত্য, তাহার অনেকটা ভাঙ্গিয়া গড়িতে হইবে। জর্ম্মণীর নীজ্‌টস্‌ হইতে জিমরুম্যান পর্য্যন্ত কেহই উনবিংশ শতাব্দীর খৃষ্টান সভ্যতাকে মনুষ্য সমাজের স্বাভাবিক অবস্থার খাঁটি সভ্যতা বলিয়া গ্রাহ্য করেন না। জর্ম্মণ কুলটুর এই সভ্যতার বিরোধী; এই সভ্যতার মূলে কুঠারাঘাত করিবার উদ্দেশ্যেই জর্ম্মণ জাতির এই যুদ্ধোদ্যম। অতএব এই সমরের সঙ্ঘাতফলে এই সভ্যতাজাত ইউরোপীয় সাহিত্য অন্ততঃ আংশিক ভাবে নষ্ট হইবেই। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মান্যবর এসকীথ্‌ সাহেবের একটা বক্তৃতার উত্তরে মার্কিণ লেখকগণ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, যাহা রক্ষা করিবার জন্য ব্রিটিশ সম্রাজ্যের সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছ, তাহা রক্ষা করিবার নহে, তাহা থাকিবে না; তাহা নষ্ট হইবেই। কারণ, এ মহাসমরে ব্রিটিশজাতি বিজয়ী হইলেও, উনবিংশ শতাব্দীতে যে ব্রিটিশ জাতি ইউরোপের আদর্শ হইয়াছিল সে ব্রিটিশ জাতি ঠিক তেমনটি আর থাকিবে না। এ যুদ্ধের প্রভাবে এখনই ব্রিটিশ জাতির জীবনের আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে; সুখদুঃখের ধারণা উণ্টাইয়া যাইতেছে; সমাজ বিন্যাস বদলাইয়া যাইতেছে। এই আমূল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের আদর্শও পরিবর্ত্তিত হইবে। কাজেই যাহা ছিল তাহা থাকিবে না।

সাহিত্যে থাকে সেই টুকু যে টুকু সনাতন, যাহা বিপ্লব-বিদ্রোহের আঘাত খাইয়াও স্থির থাকে। সুখের সময়ে, শান্তির সময়ে যে ভাবটাকে স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়; তাহা যুদ্ধ বিগ্রহের অগ্নি পরীক্ষায় অনেক ক্ষেত্রে ভস্মসাৎ হইয়া যায়। সুতরাং সেই ভাবের উপর যে সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাও সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হইয়া যায়। ভাব লইয়াই সাহিত্য, ভাব বিগড়াইলে সাহিত্য থাকে কি? এই যুদ্ধে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ভাব একেবারে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে; লোকে বুঝিয়াছে যে জাতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে হইলে সকল ব্যক্তির শক্তি ও সামর্থ্যকে কেন্দ্রীকৃত রাখিয়া জাতির কল্যাণকামী হইয়া চেষ্টা করিতে হইবে।

নীৎশের স্বতন্ত্রতার এবং পরতন্ত্রতার ব্যাখ্যা এখন ইউরোপের অনেক বুদ্ধিমানেই গ্রহণ করিতেছেন। সুতরাং Liberty বা ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য, এই ভাবের উপর যে সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে, যে কাব্য গাথা রচিত হইয়াছে তাহা এই যুদ্ধের সূচনা কালেই ব্যর্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। আগামিগণ যখন দেখিবে, মূল সিদ্ধান্তে প্রমাদ ঘটাইয়া উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছিল, তখন সে সাহিত্যের প্রতি তাহারা পূর্ণ অবহেলা প্রদর্শন করিবে। উপেক্ষায় কোন সাহিত্য বাঁচে না; উহা বড় আদরের সামগ্রী; উপেক্ষিত সাহিত্য বিস্মৃতি-সাগরে প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় ডুবিয়া যায়। বিশেষতঃ, বেলজিয়ম, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে জর্ম্মণগণ যে ভাবে অধিকার বিস্তার করিতেছে, তাহা দেখিয়া মনে হয় মুর ও তাতারগণ, পাঠান এবং মোগলগণ সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া উত্তর আমেরিকা এবং স্পেনে পারস্যে এবং ভারতবর্ষে ইস্‌লাম সভ্যতা প্রচার করিয়াছিল। ওমার আলেকজাণ্ড্রিয়ার পুস্তকাগার ভস্মসাৎ করিয়াছিল, জর্ম্মণ সেনাপতিগণ লুভেনের বিদ্যামন্দির সকল নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া ফেলিয়াছে। মানুষ একবার গড়ে, আবার ভাঙ্গে। রোমক ও গ্রীক সভ্যতা মানুষ গড়িয়া তুলিল, ইস্‌লাম অভ্যুদয়ে তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। ইসলাম সভ্যতা খৃষ্টান সভ্যতার বিকাশে সঙ্কুচিত হইয়াছিল। এখন জর্ম্মণ কুলটুরের প্রভাবে সেই খৃষ্টান সভ্যতা, সুতরাং খৃষ্টান সাহিত্য নষ্ট হইবে। জর্ম্মণ কুলটুরের মূলে Iconoclasm বিরাজ করিতেছে, তাহার প্রভাব ইউরোপের সাহিত্যের উপর পড়িয়াছে। কাজেই বলিতে হয়, বাছাইয়ের সময় আসিয়াছে, অগ্নি-পরীক্ষার কাল আসিয়াছে। এই বাছাইয়ের মুখে কতটুকু যাইবে, কতটুকু থাকিবে তাহা কেহ বলিতে পারে না; তবে উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সাহিত্যের অধিক অংশই যে নষ্ট হইবে, তাহা স্থির সুনিশ্চিত।

বলিয়া রাখা ভাল যে, ইংলণ্ডের সাহিত্যরথিগণ এখনও এ বিতণ্ডায় যোগ দেন নাই। কেবল বর্ণাড্‌ শা বলিয়া রাখিয়াছেন যে, ভাবের এবং আদর্শের পরিবর্ত্তন হইতেছে, আরও হইবে, সে পরিবর্ত্তন কতকটা জর্ম্মনীর কুলটুর অনুযায়ী হইতে পারে। ম্যাক্সওয়েল বলেন, যাহা হইবার তাহা হইবে; এখন যাহা হইতেছে তাহা দেখিয়া যাও, তাহার প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিয়া স্বকর্ত্তব্য পালন করিয়া যাও। ব্রিটিশ জাতির এমন অবসর নাই যে, এমন সকল বিতণ্ডায় এখন প্রবৃত্ত হইবে। মার্কিন যুদ্ধে যোগ দেয় নাই, তীরে দাঁড়াইয়া স্রোতের খেলা দেখিতেছে, মার্কিনের মনীষিগণ এখন আন্দোলন চালাইতে পারেন।

ইউরোপে যে একটা যুগান্তরের পালাবদল, মহাযুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছে তাহা 'সর্ব্ববাদিসম্মত; তবে ফরাসী বিপ্লব এবং নেপোলিয়নের, যুদ্ধ কালের মতন ইহা খণ্ড প্রলয় কিংবা মহা প্রলয় তাহা নির্দ্ধারণ করিবার এখনও সময়' আসে নাই। যদি মহাপ্রলয় হয়, তাহা হইলে গথ-ভাণ্ডালদিগের আক্রমণ এবং খৃষ্টান ধর্ম্মের আমদানীর পর ইহাই দ্বিতীয় মহাপ্রলয়, পূর্ণ যুগান্তরকারী মহাযুদ্ধ। আরও এক বৎসর না কাটিলে এ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করা যাইবে না। এ যুদ্ধের অবসানে সাহিত্যের গতি যে অন্য পথে ধাবিত হইবে, তাহা ভাবুকমাত্রেই স্বীকার করেন। সে কোন্ পথ, কেমন পথ তাহা মানবকল্পনারও অতীত।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।
